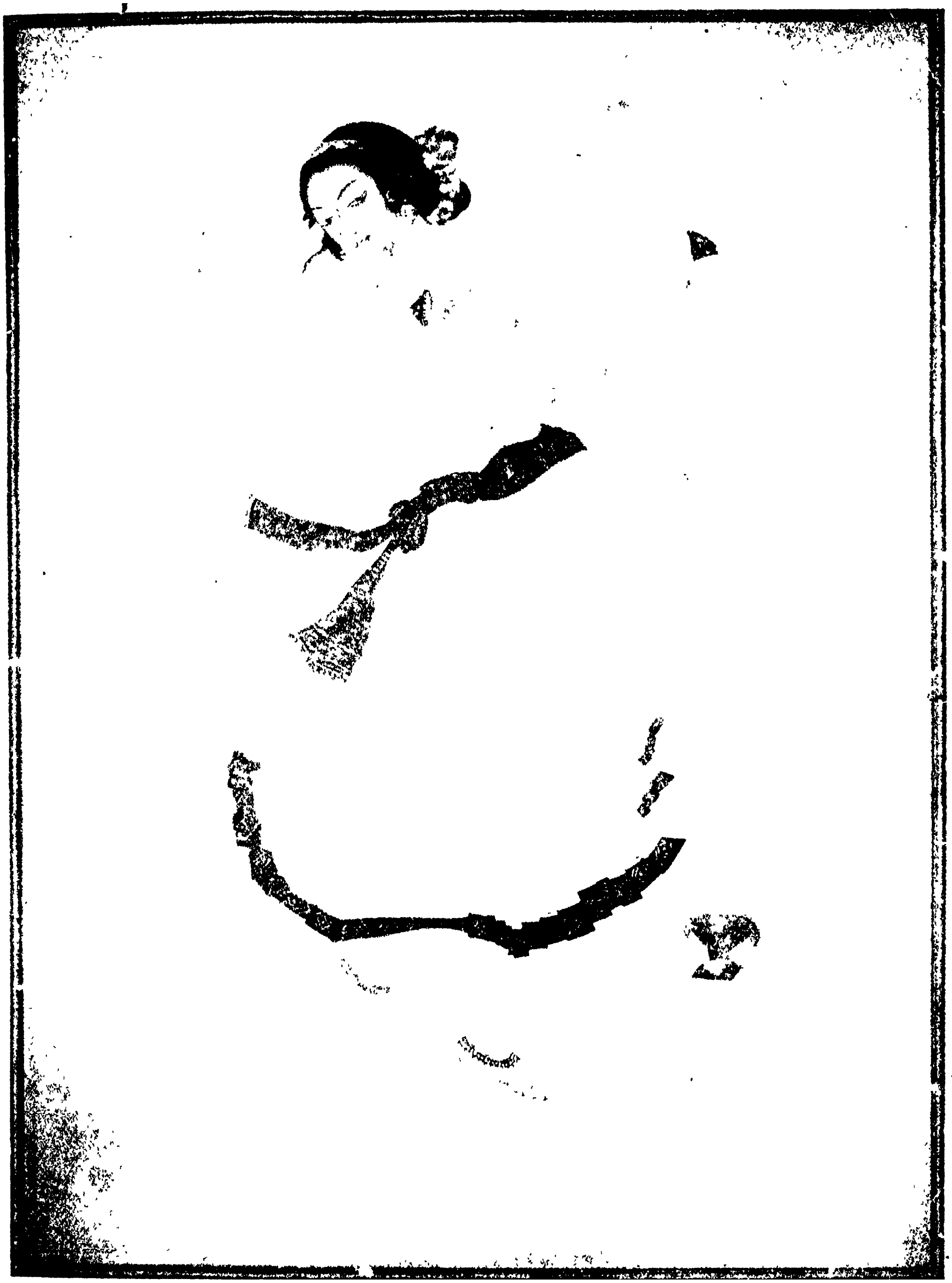


প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ ২য় খণ্ড	কার্ত্তিক, ১৩৩০	১ম সংখ্যা

দাদূর সেবা-যোগ

১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দাদূর জন্ম, ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। চামড়ার "মোট" (কূপ হইতে জল তুলিবার পাত্র) সেলাই করিয়া ইনি জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। এমন সময় সাধু সুন্দরদাসের কাছে ইঁহার ভাগবত জীবনের দীক্ষা হয়। ইঁহার গুরুদত্ত নাম কি তাহা জানা যায় না। পিতৃদত্ত নামও চাপা পড়িয়া গিয়াছে। সকলকে ইনি ভাই অর্থাৎ "দাদা", "দাদূ" বলিতেন। সকলে আবার আদর করিয়া ইঁহাকে "দাদূ" বলিত। সেই "দাদূ দয়াল" নামই ইঁহার রহিয়া গেছে।

লেখাপড়া জানিতেন না, তবে স্বাভাবিক প্রতিভার গুণে ও সাধনার দৃষ্টিতে ইনি অসাধারণ সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন।

সেবার একটা দিক্ আছে যেটা সামাজিক ও নৈতিক (social, ethical)। কিন্তু যে সেবার পন্থা তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা আধ্যাত্মিক (spiritual)। অর্থাৎ তাহা তাঁহার ভগবৎ-প্রেমের বাহ্য প্রকাশ। আধ্যাত্মিক ভাবাবেশের (Spiritual Emotion) কলাসম্মত আত্ম-প্রকাশ (artistic expression) আমরা মন্দির স্থাপত্য ও নানা অনুষ্ঠান পদ্ধতির (Ceremonialism) মধ্যে পাই। সেবার আধ্যাত্মিক (spiritual) আবেগের বাহ্য প্রকাশ কর্ম্মে। ইহার মূল উৎস কর্ত্তব্যবুদ্ধি নহে, ভগবৎ-প্রেম! এইজন্য সেই প্রেমের যে প্রকাশ তাহা কাব্যের ন্যায়, সঙ্গীতের ন্যায় সুন্দর, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত (spontaneous)। তাহা প্রয়োজন সাধনের প্রয়াস নয়, তাহা অন্তর্গূঢ় পূর্ণতার বাহ্য পরিণতি। এই কারণে অধ্যাত্ম (spiritual) সেবকের প্রকৃতি কলাসাধক বা আর্টিষ্টের প্রকৃতি, কবির প্রকৃতি। তাহার প্রেরণা (inspiration) হইতেছে পূর্ণতার (perfection) ক্ষুধায়।

অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য-বোধ নানা উপাদানকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। বর্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহা চিত্র হয়। পাষাণকে আশ্রয় করিয়া তাহাই মূর্ত্তি হয়। মানব-জীবনও তেমনি একটি উপাদান। এই উপাদান লইয়া সেবারূপে আমাদের হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির সেবায় বিধাতা আপনার অন্তরের রসকে মূর্ত্তিমন্ত করিতেছেন। এই রস-সৃষ্টি হৃদয়ের প্রকাশ, ইহা প্রয়োজনাতীত।, কাজেই তিনি কবি, তিনি শিল্পী।

প্রয়োজনে যদি ইহা সমাপ্ত হইয়া যাইত তবে ইহাতে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইত না।

আমরা যেখানে আমাদের অন্তরের প্রয়োজনাতীত প্রেমরসকে সেবায় মূর্ত্তিমান্ করি সেখানে আমরা শিল্পী, স্রষ্টা এবং বিধাতার সমানধর্ম্মা। তাই দাদূ সেবাকে সৃষ্টির একটি ক্ষেত্র বলিয়াছেন এবং এই পথেও বিধাতার সঙ্গে যোগ হয় ইহা বুঝাইয়াছেন। বিশ্বজগতে যেমন বিধাতার সৃষ্টি আজও চলিয়াছে, কোথাও তাহার সমাপ্তি হইবার ভয় নাই, সেবার ক্ষেত্রেও তেম্‌নি মানবের সৃষ্টি নিত্য কাল চলিবে। রসের ও প্রেমের অসীমতার দ্বারা এই রস লোকও অপার অগাধ।

মধ্যযুগের সাধকেরা কেহই পণ্ডিত ছিলেন না। কাজেই তাঁরা আমাদের শাস্ত্রের প্রচলিত শব্দগুলির পারিভাষিক অর্থ জানিতেন না বলিয়াই হউক অথবা নিজেদের সাধনা-লব্ধ সত্য-দৃষ্টি বা প্রতিভার বলেই হউক, ইহারা সেই-সব কথা একেবারে নূতন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। নিজেদের সত্য-উপলব্ধি প্রকাশ করিবার জন্যও অনেক সময় বাধ্য হইয়া পুরাতন কথাকে নূতনভাবে ব্যবহার করিতে ইহারা বাধ্য হইয়াছেন।

"দ্বৈত" ও "অদ্বৈত" এই কথা দুইটি বিশ্ব ও ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দাদূ এই কথা দুইটি সাধনার ও যোগের প্রকার-ভেদ বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাঁর পূর্ব্বে সাধক রবিদাসও এইভাবে সত্য-প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বরের সঙ্গে সাধকের দুই প্রকার যোগ। একপ্রকার যোগ দ্বৈত। সেখানে আমরা কিছু প্রার্থনা করি। সেখানে আমরা কিছু দিই না এবং সৃষ্টিও করি না। সেই মিলনের ক্ষেত্র—প্রয়োজনের ক্ষেত্র, রসের ক্ষেত্র নয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না। সেখানে সাধক ও ঈশ্বর পরস্পরের পরিপূরক (Complementary) মাত্র। আমরা সেখানে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য অনুভব করি না। এই দ্বৈত যোগের মধ্যে নিত্যতা নাই। যেই আমার অভীষ্ট পাইলাম অমনি আমাকে ঈশ্বর হইতে দূরে আমার ভোগ-লোকে নামিয়া আসিতে হইবে। নিত্য-যোগ হয় রস-লোকে যেখানে আমার সঙ্গে তাঁর সাধর্ম্ম্য আছে, যেখানে আমার মধ্যে কোনো দৈন্য নাই। কিন্তু যেখানে আমার প্রার্থনা, সেখানে সিদ্ধিলাভের পরই আমার বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী।

আর-এক যোগ অদ্বৈত-যোগ, যেখানে আমি আপনাকে দিতে চাই। যেখানে আমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই, সেই রস-লোকে আমি তাঁর সমানধর্ম্মা। এই ক্ষেত্রে তিনিও যেমন সেবক আমিও তেমনি সেবক—উভয়েই সেবার মধ্য দিয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। এখানে তাঁহার সঙ্গে আমার নিত্য সাহচর্য্য ঘটে।

নারী যেখানে তার সেবার মূল্য চায় সেখানে সে দাসী মাত্র। কাজেই দ্বৈত যোগের ক্ষেত্রে প্রেম নাই, দাস্য মাত্র আছে, তাও প্রেমের নিষ্কাম দাস্য নয়। নিষ্কাম দাস্য খুব গভীর কথা। অদ্বৈত-যোগের ক্ষেত্রে, রস-লোকে, নারী আপনাকে পতির সহচারিণী বলিয়া জানেন। এই প্রেম-লোকে তিনি পত্নী, দাসী নন, তিনি লইতে চাহেন না, দিতে চাহেন। এই ক্ষেত্র যে অভাবের নয়। এখানে নিত্য প্রয়োজনের অতীত রস ও ঐশ্বর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এখানে পত্নীরূপে তিনি স্রষ্টা, তিনি অন্তরের প্রেমকে নিজের জীবনে নিজের সংসারে সুন্দর আকার দান করেন।

এইপ্রকার যে সেবা তাতে প্রেমের ও রসের মধ্যে অসীমতার বোধ আছে। কারণ এখানে সাধক যেমন-তেমন-ভাবে সেবা করিতেছেন না, তিনি ঈশ্বরের সমধর্ম্মা হইয়া তাঁরই "সদৃশ" (সরীখা) হইয়া সেবা করিতেছেন। এখানে সাধক সেবার মধ্যেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। যদি সেবার ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণতা বা কোনো প্রকারের সাম্প্রদায়িক বা অন্য কোনো সীমার বোধ আসে তবে ব্রহ্ম-বোধই আহত হয়। আমরা ব্রহ্মকে যদি জীবন্ত মনে করি তবে কি আর তাঁকে লইয়া ভাগাভাগি করিতে পারি? প্রেম থাকিলে, দরদ থাকিলে জীবন্ত ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করা অসম্ভব।

আমরা যখন ব্রহ্মকে ও সাধনাকে জীবন্ত মনে না করি তখন "খণ্ড খণ্ড করিয়া" কাজ সহজ করার প্রলোভন ত্যাগ করা কঠিন হইয়া উঠে। কিন্তু এই ভাবে রস-লোকটি সৃষ্টি করা যায় না। জীবন্ত বৃহৎকে যে খণ্ড করিয়া সহজ

করিবার চেষ্টা করি এ এক "ভ্রমের গাঁঠ", এই গাঁঠ ছাড়ানো বড় কঠিন, অথচ এই গাঁঠ না ছাড়িলে কোনো সৃষ্টিই সত্য হইয়া উঠে না।

"খণ্ড খণ্ড করি ব্রহ্মকো পচ্ছ পচ্ছ লিয়া বাঁট।
দাদূ জীবত ব্রহ্ম তেজি বাঁধে ভরমকী গাঁঠ॥"

[হে দাদূ, যে ব্রহ্ম সকল খণ্ডিতকে মিলিত করিবেন তাঁকেই এরা এদলে ওদলে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছে, জীবন্ত ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সবাই ভ্রমের গাঁঠ বাঁধিয়াছে।]

কিন্তু এমন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া প্রথমে মনে হয় যে কাজ বুঝি সহজ হইল, কিন্তু আসলে তা হয় না। যতক্ষণ তাঁকে জীবন্ত না দেখি, যতক্ষণ সমগ্রতার বোধ না হয়, ততক্ষণ হৃদয় ভরে না, আনন্দ জাগে না। কাজেই আমি যে "রামের" সঙ্গে সঙ্গে সেবা করিতে চাই তাঁর সঙ্গে সেবা করা সম্ভব হয় না, রস-লোক সৃষ্ট হয় না।

অপনী অপনী জাতিসেঁ। সবকোই বৈসঈ পাঁতী।
দাদূ সেবক রামকা তাকো নহি ভরাঁতী॥

[আপন আপন জাতি লইয়াই সবাই নিজ নিজ পংক্তি রচনা করিয়াছে। দাদূ যে প্রেমময় রামের সেবক, তার হৃদয় এমন ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে ভরিয়া উঠে না।]

অথচ দাদূ ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষা-হীন সরল-হৃদয় সাধক মাত্র। তাঁকে সবাই প্রশ্ন করিল—"এমন বিরাট ধারণা কি সহজ?" তখন দাদূ বলিলেন— "বহু ভেদবুদ্ধি মনে ধারণ করিয়া রাখিতে বহু বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। আমি পাণ্ডিত্য-হীন সরল লোক. আমি নানান্-খানা করিয়া দেখিতে জানি না—আমি যেখানে এক সেখানে সহজে বুঝিতে পারি। কাজেই আমি কায়ার বা বর্ণের দিক্ দিয়া দেখি না, আমি আত্মার দিক্ দিয়া দেখি। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে ভাগের আর অন্ত নাই, অত বুঝিয়া ওঠা কি আমার চলে? আমি তাই অন্তরের দিক্ দিয়া পূর্ণব্রহ্মের দিক্ দিয়া দেখি, যেখানে সবাই এক।

"পূরণ ব্রহ্ম বিচারিয়ে সকল আত্মা এক।
কায়াকে গুণ দেখিয়ে নানা বরণ অনেক॥"

[পূর্ণ ব্রহ্মের দিক্ দিয়া দেখিলে সকল আত্মাই এক, কায়ার গুণের দিক্ দিয়া দেখিলে অনেক বর্ণ, অনেক ভেদ ।]

অথচ সমগ্রকে পাইবার পক্ষে যতগুলি বাধা আছে তার মধ্যে সীমা-বিশেষে বদ্ধ হওয়াটাই সব চেয়ে ভয়ঙ্কর। কারণ তখন আমরা ঐ খণ্ড সত্যকেই যথার্থ সত্য মনে করি এবং আমাদের জীবনের ব্যর্থতা আমাদের কাছে ধরাই পড়ে না।

সাঁচ ন সূঝই জবলগা তবলগ লোচন নাহিঁ।
দাদূ নিরবন্ধ ছাড়ি করি বন্ধা হোই পথ মাহিঁ॥

[যে পর্যন্ত সেই পরিপূর্ণ সত্য দৃষ্ট না হয় সে পর্যন্ত আমাদের লোচনই নাই। হে দাদূ, তখন বন্ধনাতীতকে ছাড়িয়া আমরা কোন না কোনো দলে বদ্ধ হইয়া পড়ি।]

কাজেই সাধনার এক মাত্র লক্ষ্য যে মুক্তি, তাহাই আমাদের সুদূরপরাহত হইয়া উঠে।

যখন সবাই দাদূকে বলিলেন যে কোনো না কোনো "পন্থে" থাকিয়াই সবাই সেবা করে, ভেদবুদ্ধিহীন "বিশ্বপন্থে" থাকিয়া সেবা করার দৃষ্টান্ত কই? তখন দাদূ বলিলেন, জগতের সব মহাপ্রকৃতি এবং সব মহাপুরুষ সবাই "বিশ্বপন্থের" দলে।

"যে সব হোঁই কিস পন্থমেঁ ধরতী অরু অসমান।
পানি পবন দিন রাতকা চন্দ সূর রহিমান॥

[আমার অন্তরের কথা তুমিই বুঝিবে, এক তোমার কথাই আমি বুঝি, এদের কথা আমার বুঝা কঠিন। হে দয়াময়, ধরিত্রী ও আকাশ, জল ও পবন, দিন ও রাত্রি, চন্দ্র ও সূর্য্য এরা সবাই যে নিত্যনিরন্তর জগতের সেবা করিতেছে, তুমিই বলো তো এরা সব কোন্ সম্প্রদায়ের লোক?]

মহাপুরুষদের নামে না হয় সব লোকে দল বাঁধিয়াছে, কিন্তু তাঁরা কার দলে ছিলেন? তাঁদের সকলের আশ্রয় তো তুমিই।

মহম্মদ থে কিস পন্থমেঁ, জিবরইল কিস রাহ।
ইনকে মুরসিদ পীর কো কহিয়ে এক অলাহ॥
য়ে সব কিসকে হোই রহে যহ মেরে মন মাহিঁ।
অলখ ইলাহী জগতগুরু দূজা কোই নাহিঁ॥

[মহম্মদ কার সম্প্রদায়ে ছিলেন, স্বর্গদূত জিবরেইল (Gabriel) কোন পন্থায় ছিলেন? এঁদের গুরু বা পীর কে? হে ভগবান্ তুমিই ইহা বুঝাইয়া বল। এঁরা সব কার দলের হইয়া কাজ করিয়াছেন? হে অলখ ইলাহী, হে জগদ্গুরু, তুমিই তাঁদের একমাত্র গুরু ও আশ্রয়, ইহা ছাড়া আর কেহ নয়।]

ভগবানের অসীম প্রেমরসে "অহং" গলিয়া যায় এবং যথার্থ সেবা জাগ্রত হয়। গৃহের পত্নী আপন প্রেমরসে সকল গৃহখানি প্রাণময় ও পরিপূর্ণ করিয়া আপনাকে সকলের দৃষ্টির আড়ালে রাখেন। ঈশ্বরের সেবাও এমন ভরপুর যে তিনি আপনার শিশির-বিন্দুটির পিছনেও আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। বৃক্ষের প্রাণের পিছনে যেমন মূল, কায়ার পিছনে যেমন প্রাণ, তেমনি এই বিশ্ব-সেবার পিছনে বিশ্ব-প্রেমময় ভগবান্ আপনাকে নিরন্তর

লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি মূলাধার, তিনি যদি আপন সেবায় আপনাকে গলাইয়া নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতে না পারিতেন তবে যে বিশ্বে প্রলয় লাগিয়া যাইত। আপনাকে পিছনে রাখিয়া আপনার সাধনাকে, আপনার সেবাকে, সামনে রাখাই সৃষ্টি। ইহার উল্টাই প্রলয়। সেবা যে প্রেমের আরতি। আরতি-প্রদীপের পরিপূর্ণ আলো পড়িবে অর্চ্চনীয়ের মুখের উপর, অর্চ্চক দীপের ছায়াতে আপন কায়া লুকাইয়া রাখিবেন। তা নহিলে আরতি কি?

এই জগৎ তাঁর পরিপূর্ণ আরতি। তিনি তাই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়াছেন। সেবার দীক্ষা লইতে হইলে তাঁর কাছেই লইতে হইবে। এমন সেবক আর নাই। এমন করিয়া আপনাকে কে সেবার রসে গলাইয়া দিয়াছে?

> সেবক বিসরই আপকো সেবা বিসরী ন জাই।
> দাদূ পুছই রামকো সো তত্ত কহো সমুঝাই॥

[সেবক আপনাকে মুছিয়া ফেলিবে, অথচ সেবা নিত্যজাগ্রত থাকিবে; এই পরম সেবার তত্ত্ব, হে রাম, আমাকে বুঝাইয়া বল। তোমার কাছে দাদূ সেবার এই রহস্যই জিজ্ঞাসা করিতেছে।]

আমাতে তাঁর আনন্দ ("রাম"), তাই তিনি সেবক হইয়াছেন। অখণ্ডিত সেবা সেই এক রসের প্রকাশ, সেই জন্যই তো তিনি সেবক।

> দাদূ জবলগ রাম হৈ তবলগ সেবক হোই।
> অখণ্ডিত সেবা এক রস দাদূ সেবক সোই।

এই সেবাতে, এই প্রেমেতে যদি মিলিতে পারো তবেই তাঁর নিত্য সাহচর্য্য পাইবে। অদ্বৈত-যোগ সত্য হইবে। এবং সৃষ্টির কর্ম্মে তাঁর পাশে পাশে তোমার সৃষ্টিও চলিতে থাকিবে। যখন তুমি তোমার সাধনায় সকল পরিবার সঁপিয়া দিয়া সেবক হইবে তখন সেই মহাসেবক আপনিই তোমার বশ হইবেন এবং তোমার "দরবারে" আসিয়া তিনি তোমার কাছে উপস্থিত থাকিবেন। সেই রসের ক্ষেত্রে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে তুমি ত দীন নও। তুমি সেখানে কিছু চাও না বলিয়াই তোমার ঐশ্বর্য্য রাজার সমান এবং তোমার সেবার ক্ষেত্রটি রাজ-দরবারের মতই ঐশ্বর্য্যশালী।

> "সেবক সাঁঈ বস কিয়া সঁউপা সব পরিবার।
> তব সাহিব সেবা করই সেবককে দরবার॥"

এতবড় কথা ভাবিতে তোমার ভয় হয়? ভয় নাই। তোমার যা আছে তাই দিয়াই তোমার সেবা। তোমার যা আছে তাতেই তোমার রাজ-ঐশ্বর্য্য। লক্ষ্য ছোট করিও না, প্রেমকে বড় রাখ। আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করো, তবেই তুমি তাঁর সমধর্ম্মা হইবে, তাঁর "সরীখা" (সদৃশ) হইবে। তুমি বৃহৎ হইয়া তাঁর সমান হইবে না, তাঁর সমধর্ম্মা হইয়া তাঁর সমান হইবে।

> "সেবক সেবা করি ডরই হমতে কছু ন হোই।
> তূ হৈ তৈসী বন্দগী করি ঊর ন জানই কোই॥"

[হে সেবক, ভয় পাইতেছ? তোমার দ্বারা কিছুই হইবে না মনে করিতেছ? তুমি যতটুকু, ততটুকুই তোমার প্রণতি হউক, তোমার সত্তার সমানে সমান তোমার প্রণতিটি হউক, আর কিছুই দেখিবার দরকার নাই।]

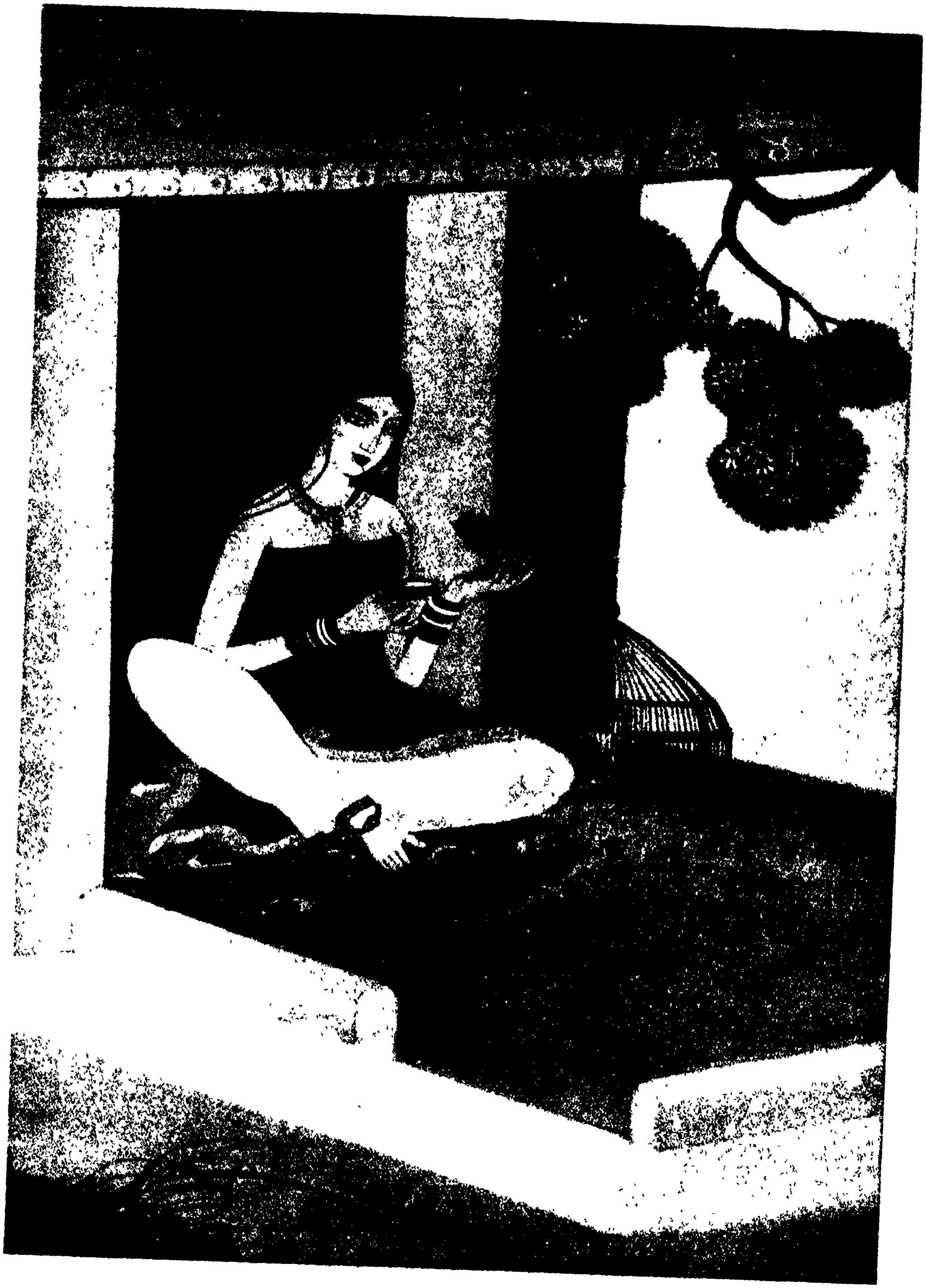
তুমিই তাঁর সমান হইবে। তাঁর সমান হইয়া সেবা না করিলে সুখ নাই। তাঁর সঙ্গী হইয়া সেবাই একটি পরিপূর্ণ সঙ্গীত, তাঁর সঙ্গী হইয়া সেবাই পরম আনন্দ।

> সাঁঈ সরীখা সুমিরন কীজই সাঁঈ সরীখা গাবই।
> সাঁঈ সরীখা সেবা কীজই তব সেবক সুখ পাবই॥

[স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমানে সমান সাধনা কর, তবেই তাঁর গানের সঙ্গে তোমার গান মিলিবে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সমানে সমান সেবা কর, তবেই আনন্দ পাইবে।]

কারণ তাঁর সুরে সুর মিলানই সাধকের চরম লক্ষ্য, চরম সাধনা। সেই পরম আনন্দ তোমার আনন্দ মিলিবে যদি সেবায় সৃষ্টিতে প্রেমে রসে অসীম হইয়া তাঁর সঙ্গে মিলিতে পার। তবে তুমি আপনাকে লইয়া আর প্রকাশ করিতে চাহিবে না, আপনাকে তাঁর মত সেবায় ও প্রেমে গলাইয়া দিবে। তবেই সেবায় কর্ম্মে নিত্য নূতন সৃষ্টিতে নিত্য নিয়ত তোমার স্বামীর সঙ্গ পাইবে। এইখানেই তোমার পত্নীত্ব, সহধর্ম্মিণীত্ব। নহিলে দাসী হইয়া একটু একটু টুক্‌রো টুক্‌রো কাজ করিয়া কিছু লাভ মিলিতে পারে বটে, কিন্তু মানবজন্মের এত-বড় অপমান আর নাই।

শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন



পোষা পাখী

চিত্রকর শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

U. Ray & Sons, Calcutta

রাজপথ

[১২]

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার নামে জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া সুমিত্রা একেবারে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইল। প্রমদাচরণ তখন নিজ কক্ষে একটা আরাম-কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া ছিলেন। পদশব্দে চাহিয়া সুমিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন—, "কি মা? কিছু বল্‌বার আছে?"

সুমিত্রা পিতার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বাবা, আজ আমাকে একটা খদ্দরের স্যুট্ উপহার দেবে? দাম বেশী নয় বাবা; শাড়ী আর ব্লাউস্, দুইয়ে টাকা সাত-আটের মধ্যে হবে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন,—"টাকার জন্যে কিছু ত নয়, কিন্তু তোমার মা খদ্দরের স্যুট্ পছন্দ কর্‌বেন কি?"

সুমিত্রা কহিল,—"মা নিশ্চয়ই পছন্দ কর্‌বেন না, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছা হয়েছে বাবা! খদ্দরের শাড়ী পরা কি এমনই অপরাধ, যে, তোমাকে এ অনুরোধ করা আমার অন্যায় হচ্ছে? তা যদি হয় তা হ'লে অবশ্য আমি অনুরোধ কর্‌ব না।"

প্রমদাচরণ মৃদু হাসিয়া স্নেহভরে কহিলেন,—"এ তোমার একটুও অন্যায় অনুরোধ নয় সুমিত্রা। নিজের দেশের তৈরী কাপড় পর্‌লে যদি অন্যায় হয় তা হ'লে পরের দেশের কাপড় পরার মত পাপ আর কি হ'তে পারে? কিন্তু তোমার মা ও-সব বিষয়ে বিচার করে' ত কিছু দেখ্‌তে চান না—এই হয়েছে বিপদ্!" বলিয়া প্রমদাচরণ চিন্তা করিতে লাগিল।

সুমিত্রা ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল,— "তা হ'লে না হয় থাক্, বাবা। খদ্দরের কাপড় এনে বাড়ীতে যদি একটা অশান্তি হয় তা হ'লে কাজ নেই; থাক্।"

প্রমদাচরণ মনে-মনে জয়ন্তীর সহিত কাল্পনিক বিতর্ক করিতেছিলেন। খদ্দর ব্যবহারের সপক্ষে প্রমদাচরণের প্রযুক্ত সমস্ত যুক্তি ও তর্ক জয়ন্তী যতই অবহেলার সহিত অগ্রাহ্য করিতেছিলেন প্রমদাচরণ ততই অবুঝ জয়ন্তীর প্রতি মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময়ে সুমিত্রার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"না, না, থাক্‌বে কেন?—এ যে জয়ন্তীর অন্যায় কথা!"

জয়ন্তীর প্রতি এই অকারণ ক্রোধ প্রকাশ হইতে দেখিয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—"মা ত এখনও কোনো কথা বলেননি বাবা!"

প্রমদাচরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাসি মুখে কহিলেন, "বলেন নি, কিন্তু আমি ত তাকে জানি, নিশ্চয়ই বল্‌বেন। যা হোক সে পরের কথা পরে হবে, কিন্তু, রাত হ'য়ে গেল, এখন কি খদ্দরের স্যুট্ পাওয়া যাবে?"

সুমিত্রা কহিল,—"তা পাওয়া যাবে। এখন পূজার সময়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত দোকান খোলা থাকে। আমাদের বাড়ীর কাছেই কলেজ-ষ্ট্রীট্ মার্কেটে অনেক দোকানে খদ্দরের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। দশ পনের মিনিটের মধ্যেই এসে পড়্‌বে।"

তখন প্রমদাচরণ তাঁহার বাজার-সরকার বিপিনকে ডাকাইয়া খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউস্ কিনিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

সুমিত্রা কহিল,—"খুব শীঘ্র বিপিন-বাবু, পনের মিনিটের মধ্যে আপনার আসা চাই। আর দেখুন, জমি সাদা হবে; নক্সা-করা বা রং-করা হ'লে চল্‌বে না। দেখে' যেন জিনিসটা খদ্দর বলে'ই মনে হয়, বেনারসী বা অন্য কোনো রকম কাপড় বলে ভুল হ'লে চল্‌বে না।"

বিপিন প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ একবার সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার পর অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন,—"সুরেশ্বর কি এসেছেন সুমিত্রা?"

খদ্দরের প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই সুরেশ্বরের বিষয়ে এই অনুসন্ধানে সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। খদ্দরের প্রসঙ্গ হইতেই সুরেশ্বরকে প্রমদাচরণের মনে

পড়িয়াছে এবং তাহার খদ্দর পরিবার আগ্রহের সহিত প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে কোনও প্রকারে যুক্ত মনে করিতেছেন এই চেতনা সুমিত্রার মনে অপরিহার্য্য সঙ্কোচ লইয়া আসিল। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"হ্যাঁ, এসেছেন।" তাহার পর আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি শুনিয়া প্রমদাচরণ ঈষৎ চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন। সুরেশ্বরের আসিবারই কথা ছিল, তন্মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর কিছুই ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণের যোগ কল্পনা করিয়া পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিবার পর সংশয়িত উত্তর লাভ করিয়া তাঁহার কল্পিত আশঙ্কা যেন ভিত্তি গাড়িয়া বসিল। মনে হইল ঈশান-কোণে এক খণ্ড মেঘের মত সংসারে এই খদ্দর এবং সুরেশ্বরের আবির্ভাব শুভচিহ্ন নহে, হয়ত একটা অদূরবর্ত্তী ঝটিকারই সূচনা।

বিপিনের অপেক্ষায় সুমিত্রা নিজ কক্ষে গিয়া বসিল। প্রমদাচরণের প্রশ্নে তাহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের রূপে যাহা উপস্থিত হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিরক্তি ও অনুতাপের আকার ধারণ করিতে লাগিল। জননীর অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া খদ্দর কিনিয়া পরা সুরেশ্বরের প্রভাবের নিকট এক-প্রকারের বশ্যতা স্বীকার হইতেছে মনে হইবামাত্র তাহার অধীর ভাব-প্রবণ চিত্ত সহসা সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, এত অল্পকারণে উত্তেজিত হইয়া খদ্দরের ব্যবস্থা করা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং সে যখন সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া খদ্দরে আচ্ছাদিত হইয়া ড্রয়িং-রুমে গিয়া দাঁড়াইবে তখন কিরূপে সুরেশ্বরের বিজয়দীপ্ত মুখে সন্তোষের নিঃশব্দ করুণ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিবে মনে হইবা মাত্র কল্পিত দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিবার সঙ্কল্পে সে আলমারী খুলিয়া তাহার মভক্রেপের স্যুটটি বাহির করিল, এবং কিছুমাত্র দ্বিধা চিন্তা বা বিলম্ব না করিয়া তাহা পরিধান করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিজের সজ্জিত আকৃতি একবার দেখিয়া লইবার জন্য যখন সে দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরিচ্ছদের অহেতুক আড়ম্বর দেখিয়া বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার উদ্ধত চিত্ত একেবারে শ্লথ হইয়া পড়িল; মনে হইল, নিজগৃহে পারিবারিক সম্মিলনে বেশভূষার এতটা আতিশয্য ও পারিপাট্য নিতান্তই সুরুচি-বিরুদ্ধ হইতেছে। তখন সে ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল; গভীর-চিন্তিত মনে কথাটাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের দিক্ হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া এবার তাহার মনে হইল, যে, এই খদ্দর কিনিয়া পরিবার মূলে নিমন্ত্রিত সুরেশ্বরের প্রতি শিষ্টাচার ভিন্ন অন্য কোন কথাই নাই। সুরেশ্বর একজন গোঁড়া স্বদেশী, বহু যত্নে প্রস্তুত করাইয়া স্বদেশী রুমাল তাহাকে উপহার দিয়াছে, সে আজ তাহাদের গৃহে অভ্যাগত নিমন্ত্রিত, অতএব বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার চিত্তে আঘাত না দিয়া স্বদেশী বস্ত্র পরিয়া তাহাকে একটু সন্তুষ্ট করা সহজ ভদ্রতা-প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কোথায়ই বা তাহার মধ্যে সুরেশ্বরের প্রভাব-বিস্তার আর কোথায়ই বা তাহার মধ্যে তাহার বশ্যতা-স্বীকার।

তাহার পর মনে পড়িল পূর্ব্বোদিনে সিঁড়ির প্রান্তে সুরেশ্বরের সহিত তাহার কথোপকথন, এবং তৎকালে সুরেশ্বরের প্রসন্ন তৃপ্ত মূর্ত্তি। সুমিত্রা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল তন্মধ্যে সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন দর্প ও দম্ভের লেশ মাত্র ছিল না। সেই অল্প-কারণে হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্র আজ তাহার সমগ্র দেহ খদ্দর-পরিবৃত দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এমন কথাও অস্পষ্ট আকারে তাহার মনের কোণে ধীরে ধীরে দেখা দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল,—"মেজ দিদিমণি, সরকার-মশায় এই বাণ্ডিলটা দিলেন।"

সুমিত্রা বাণ্ডিলটা লইয়া খুলিয়া দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত নিবিষ্টভাবে চিন্তা করিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া তাহার সহজ সুন্দর বেশ দেখিয়া প্রীত হইল। তৎপরে মভক্রেপের স্যুট আলমারীর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া ক্ষিপ্রপদে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার

পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রমদাচরণ দুই হস্তের মধ্যে সুমিত্রার মস্তক ধারণ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুমিত্রা কহিল,—"বাবা, আমি ড্রয়িংরুমে চল্‌লাম; তুমিও এস, দেরী কোরো না। সকলেই বোধ হয় এসেছেন।" বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

সুমিত্রা প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ কিছুকাল অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মনে পড়িল যে জয়ন্তী এবং অন্যান্য সকলের আক্রমণ হইতে সুমিত্রাকে রক্ষা করিতে হইবে। একথা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি ড্রয়িংরুমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

[১৩]

নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুমিত্রা ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলে তাহাকে দেখিয়া জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের বিস্ময়ের কারণ সজনীকান্ত প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সজ্জার প্রতি লক্ষ্য পড়ায় উঠিয়া আসিয়া সুমিত্রার বস্ত্রাংশ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"তাই ত, এ যে দেখ্‌ছি খদ্দর!"

সুমিত্রা হাসিমুখে বলিল,—"হ্যাঁ, দেশী কাপড়।"

সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজনীকান্ত কহিল,—"এও তোমার তাঁতে বোনা নাকি হে?"

সুরেশ্বর কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল,—"না না, এ ওঁর তাঁতে বোনা হবে কেন? এ বাবা আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তী বিস্ময় ও বিরক্তির স্বরে কহিলেন,—"তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছেন? কখন তিনি আন্‌লেন?—আর কখনই বা তোমাকে দিলেন?"

সুমিত্রা একবার মনে করিল এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া এ প্রসঙ্গ এইখানেই বন্ধ করিবে, কিন্তু প্রমদাচরণ আসিলে যাহাতে কথাটা নূতন করিয়া উত্থিত না হয় তদুদ্দেশ্যে সে কথাটা খুলিয়াই বলিল। কহিল,—"এখান থেকে গিয়ে একটা খদ্দরের সুট্ উপহারের জন্য আমি বাবাকে অনুরোধ করি। তাইতে বাবা এই সুট্ আনিয়ে দিয়েছেন।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল অবাধ্য দুর্ব্বিনীত কন্যাকে তখনই বিশেষভাবে তিরস্কার করেন, কিন্তু অতগুলি ব্যক্তির সম্মুখে, বিশেষতঃ বিমানবিহারীর সন্নিধানে, একটা কলহের দৃশ্য করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, উদ্যত ক্রোধকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিলেন,—"আমার কথাটাকে এর চেয়ে ভাল করে অমান্য করবার আর কোনও উপায় খুঁজে পেলে না বুঝি?"

জয়ন্তীর নিকট হইতে তিরস্কার সহ্য করিবার জন্য সুমিত্রা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই অভিমান-পীড়িত গভীর বাণীর জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই জননীর এই আর্ত্ত বাক্যের উত্তরে সে আর্দ্র হইয়া কহিল, "তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনি তোমার আদেশ পালন করে' আস্‌ছি; কিন্তু আজকের দিনে এ নূতন কাপড়ই বা মন্দ কি?"

জয়ন্তী ফিকা হাসি হাসিয়া কহিলেন—"তাই ভাল; আর গরু মেরে জুতো দান করে' কাজ নেই।"

সজনীকান্ত সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"তোমার তিল তাল হ'য়ে দাঁড়াল সুরেশ্বর!"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—"তা হ'লে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার বল্‌তে হবে! তিল তাল হওয়া অনৈসর্গিক ঘটনা!"

সুরেশ্বরের মন্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া সজনীকান্ত কহিল, "একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছ, তা থেকে ক্রমশঃ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

সুরেশ্বর তেমনি অবিচলিতভাবে বলিল,—"শুধু দেশলাইয়ের কাঠি থেকে ত লঙ্কাকাণ্ড হয় না, কাঠিটি এমন জায়গায় পড়া চাই যেখানে জলে' ওঠ্‌বার উপযোগী মশলা আছে।"

সজনীকান্ত ক্ষণকাল সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"মশলার দরকার কি? তুমি ত জ্বলন্ত কাঠি ফেলেছ হে!"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল,—"তা হ'লেও জলে ত ফেলিনি?"

বিমানবিহারীর চিত্ত সুরেশ্বরের প্রতি এমনই একটু বিরূপ হইয়া ছিল; তাহার উপর সুমিত্রার খদ্দর পরিধান ও তৎসংক্রান্ত সুরেশ্বরের এই সোল্লাস কথোপকথন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ বিরক্তি-কটু কণ্ঠে কহিল,—"কিন্তু দেশলায়ের কাঠি জলে না পড়ে' বারুদের স্তূপে পড়্‌লে কি পরমার্থ লাভ হয় তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে সুরেশ্বর-বাবু!"

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে বলিল,—"নিভে যায় না। দেশলায়ের কাঠির পক্ষে জলে পড়ার মত দুর্গতি আর নেই তা মানেন ত?"

বিমান একটু উত্তেজনার সহিত কহিল,—"কিন্তু তাই বলে' কি বারুদের স্তূপে পড়াই তার চরম সার্থকতা?"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল,—"নয়? যার কর্ম্ম জ্বালানো আর যার ধর্ম্ম জ্বলা, তাদের সংযোগই ত পরস্পরের সার্থকতা। আগুন না থাক্‌লে বারুদের সার্থকতাই থাক্‌ত না। ধরুন আপনি একজন গুরু, আপনার জ্ঞানের শিখাটি তা হ'লেই সার্থক হয়, যদি, আপনার শিষ্যের মধ্যে সেই শিখাটি থেকে ধরিয়ে নেবার মত কোনো দাহ্য পদার্থ থাকে।

বিমান এ কথার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই জয়ন্তী কহিলেন,—"না, না, বিমান, তুমি একজন গবর্মেণ্ট্-অফিসার, এ-রকম করে' আগুন আর বারুদের কথা নিয়ে তোমার থাকা উচিত নয়। তোমার যতটা সাবধান হ'য়ে চলা দরকার তার চেয়ে তুমি অনেক অসাবধানী।"

কন্যাকে প্রহার করিয়া বধূকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা বুঝিতে সুরেশ্বরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাহার চিত্তের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের যে বিপুল প্রবাহ বহিতেছিল তন্মধ্যে এইটুকু মালিন্য কিছুমাত্র রেখাপাত করিল না। তাহার মনে হইতেছিল সে আজ সফল-কাম, সে আজ বিজয়ী, তাই পরাজিতের কটূক্তিকে জয়লাভের অপরিহার্য্য অংশ বিবেচনা করিয়া সে অতি সহজেই তাহা উপেক্ষা করিল। বিমান কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল,—"সত্যি! আপনি আমার বন্ধু, তা ছাড়াও যে আপনার অন্যরকম সত্তা আছে তা প্রায়ই ভুলে' যাই।"

বিমান হাসিয়া কহিল,—"সে সত্তায় আমি কি আপনার শত্রু?"

সুরেশ্বর কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রমদাচরণ আসিবার পরে প্রসঙ্গক্রমে খদ্দরের কথাটা পুনরায় উঠিল। প্রমদাচরণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে আসিয়া জয়ন্তীর বিদ্রোহমূর্ত্তি দেখিবেন এবং অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য মনে মনে কতকগুলি যুক্তি এবং তর্ক স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আন্দোলনকালে জয়ন্তীর শান্ত শুদ্ধ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মানসিক ভাব জয়ন্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জয়ন্তীর সৌজন্যের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই তিনি খদ্দরের প্রতিকুল পক্ষ অবলম্বন গ্রহণ করিলেন।

তখন বিমানের তর্কের উত্তরে সুরেশ্বর বলিতেছিল,—"কিন্তু যাই বলুন, খদ্দরের প্রতি গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।"

বিমান কহিল,—"যায়। গঙ্গা আর গঙ্গাজল হিন্দু-মাত্রেরই পবিত্র জিনিস। কিন্তু তাই বলে' কোনো হিন্দুই ঘরের মধ্যে গঙ্গাজলের বন্যা কিছুতেই পছন্দ করে না। খদ্দর আসলে মন্দ জিনিস কোন মতেই নয়; গবর্মেণ্ট্‌ও তা মনে করেন না। কিন্তু খদ্দরকে যদি গবর্মেণ্ট্‌কে বিপন্ন কর্‌বার একটা উপায় করে' তোলা হয়, তা হ'লে, গবর্মেণ্ট্ খদ্দরকে ঠিক তেমনি করে' রোধ কর্‌তে পারেন যেমন করে' হিন্দু গঙ্গাজলের বন্যাকে রোধ করে।"

বিমানের যুক্তি পছন্দ করিয়া প্রমদাচরণ খুশী হইয়া দুলিয়া উঠিলেন, তাহার পর কহিলেন,—"ঠিক কথা, ভাল জিনিসের ক্রিয়া যদি মন্দ হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সে জিনিসটাকে আর ভাল বলা চলে না। সে হিসাবে গবর্মেণ্টের খদ্দর-বিদ্বেষ অন্যায় বলা যায় না।"

কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে অভীষ্ট ফল ফলিল না। এতক্ষণ জয়ন্তী বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাক্ ছিলেন, কিন্তু অপরাধী স্বামীর মুখে এই বিপরীত উক্তি শুনিয়া তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। ঈষৎ ব্যঙ্গভরে কহিলেন,—

"কিন্তু তা হ'লে কোন্ হিসাবে একজন গবমেণ্ট্ অফিসারের পক্ষে খদ্দর ব্যবহার করা অন্যায় নয় তা' ত বুঝ্তে পার্ছিনে!"

উৎসাহের মুখে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া প্রমদাচরণ একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। কি বলিবেন প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না, তাহার পর মৃদু সঙ্কোচ-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"না, না, কথাটার এক দিক্ দেখ্লেই চল্বে না ত! এর মধ্যে যে অনেক কথা আছে।"

কিন্তু এ কথা জয়ন্তীর মনে কিছুমাত্র কৌতূহল সঞ্চার করিল না। এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা না করিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—"বিমান তোমার জন্যে উপহার এনেছেন; তেপায়ার ওপর রয়েছে; খুলে' দেখ।"

জননীর নির্দ্দেশে সুমিত্রা চাহিয়া দেখিল টেবিল-হার্মোনিয়ামের পার্শ্বে আব্লুস-কাঠের ত্রিপদের উপর রঙীন কার্ড্বোর্ডের একটি সুদৃশ্য বাক্স রহিয়াছে। বাক্সটি লইয়া উন্মোচিত করিয়া সুমিত্রা দেখিল তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল পালিশ-করা রৌপ্য-নির্ম্মিত বাক্স; তাহার পর সে বাক্সটি উন্মোচিত করিয়া দেখিল তিন প্রকার এসেন্সে পূর্ণ রূপার তারের বন্ধনীতে আবদ্ধ পলকাটা কাচের তিনটি বড় বড় শিশি।

আসিবার সময়ে এই সামগ্রীটি সঙ্গে আনিয়া বিমান সকলের অগোচরে ত্রিপদের উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু কিছু পরে তাহা সজনীকান্তর দৃষ্টিগোচর হইলে সকলে তাহার তথ্য জানিতে পারে। সুমিত্রার উপহার সুমিত্রা আসিয়া প্রথম খুলিবে, তাই বাক্সের মধ্যে কি আছে তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিত না।

একটি শিশি খুলিয়া আঘ্রাণ লইয়া সুমিত্রা মৃদুস্বরে বলিল,—"চমৎকার গন্ধ!" তাহার পর বিমানের দিকে একবার চাহিয়া মৃদুস্মিতমুখে তাহাকে নিঃশব্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে লাগিল।

সজনীকান্ত ব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইয়া কহিল,—"দাও, দাও, আমরা দেখি। তুমি খুল্বে বলে' আমরা ত এ-পর্য্যন্ত জানিও না কে কি পদার্থ ওর মধ্যে আছে।"

বাক্সটি হস্তে লইয়া সজনীকান্ত একে একে তিনটি শিশিরই আঘ্রাণ লইয়া দেখিল। তাহার পর বাক্সের ঢাকার উপর লেবেল পড়িয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"তাই ত বলি এ কি করে' হ'ল! স্প্রীং টিপ্লে আট্কে যায় না, বাক্সর পালিশ চারদিকে চার রকমের নয়, তিনটি শিশিই সমান এক ছাঁচের, সমস্ত জিনিসটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! এ কি করে' হয়! এ যে দেখ্ছি সমুদ্র-পারের জিনিস, একেবারে খাস মেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড্!" তাহার পর কাগজের বাক্সর একদিকে দেখিয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,—"ঈশ্! এ যে দামী জিনিস দেখ্ছি, পঁয়ষট্টি টাকা পনের আনা!" বলিয়া বিস্ময়বিমূঢ়মুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়ন্তী গম্ভীর ভঙ্গীর সহিত কহিলেন,—"উনি যখন যা দেন, দামী জিনিসই দেন।" তাহার পর বিমানের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এতটা হাত-খোলা কিন্তু ভাল নয় বিমান।"

বিমান এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিল। সুরেশ্বর তিনখানি রুমাল উপহার দিয়াছে, মূল্য হিসাবে তাহা বিমানের উপহারের নিকট নিশ্চয়ই নগণ্য, অতএব সুরেশ্বরের সম্মুখে এ কথাটা এমন করিয়া বলা উচিত হয় নাই। অন্য দিন হইলে বিমান কোন-না-কোনপ্রকারে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিত। কিন্তু আজ তাহার মনটা এমন বিমুখ হইয়া ছিল যে জয়ন্তীর আঘাত হইতে সুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না।

কিন্তু আগ্রহ না হউক, সুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার আজ কোনও প্রয়োজন ছিল না। তাহার মনের মধ্যে সঞ্জাত নিবিড় আনন্দ আঘাতের সকল পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। লটারী টিকিটে দশ টাকা ব্যয় করিয়া লক্ষ টাকা পাওয়ার উল্লাসের মত একটা বিপুল উল্লাস তাহার চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। সজনীকান্তর কথাটা তাহার বারম্বার মনে পড়িতেছিল—বাস্তবিকই তিল তাল হইয়াছে!

সমগ্র ভারতবর্ষের বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে একটি

মাত্র নারীর বিমুখ চিত্তকে প্রকৃত পথে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনে হইতেছিল তাহার সব সাধনা সফল হইয়াছে; তাহার কার্পাস চর্‌কা সূতা তাঁত কিছুই বিফল হয় নাই!

কিন্তু সে কিছুমাত্র জানিত না যে বৈদ্যুতিকবিপ্লবাহত কম্পাসের কাঁটার মত সুমিত্রার চকিত-চেতন চিত্ত ইহারই মধ্যে অন্য দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সজনীকান্ত এবং বিমানের সহিত সুরেশ্বরের কথোপকথনের সময় সুরেশ্বরের উৎসাহ ও উল্লাস উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার মন ধীরে ধীরে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। সুরেশ্বরের কর্ম্ম জ্বালানো এবং সুমিত্রার ধর্ম্ম জ্বলা এইরূপ একটা কথা যখন সুরেশ্বর প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন সুমিত্রার মন সুরেশ্বরের দম্ভ দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিবারই উপক্রম করিয়াছিল, শুধু স্থান এবং পাত্রের কথা স্মরণ করিয়া সে নিজকে দমন করিতে পারিয়াছিল।

কয়েকজন দেখার পর বিমানবিহারীর উপহার যখন সুমিত্রার হস্তে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত কম্পাসের উত্যক্ত কাঁটারই মত ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছিল। সে কটিদেশ হইতে রুমাল বাহির করিয়া একটা শিশি হইতে খানিকটা এসেন্স ঢালিয়া লইয়া ঘন-ঘন আঘ্রাণ লইতে লাগিল।

সজনীকান্ত কহিল,—"ও রুমালটা সুরেশ্বরের দেওয়া রুমাল না কি?"

সজনীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই সুমিত্রা কহিল,—"হাঁ।"

সুরমা হাসিয়া বলিল,—"বেশ হয়েছে ত! দেশী রুমালে বিলাতী এসেন্স্।"

প্রমদাচরণ ঈষৎ দুলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"এটা কিন্তু একটা শুভলক্ষণের মত মনে করা যেতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্বের সঙ্গে যেদিন বিলাতের সার পদার্থ মিলিত হবে সেদিন বাস্তবিকই শুভদিন হবে।" বলিয়া তিনি পুনরায় দুলিতে লাগিলেন।

জয়ন্তী ঈষৎ ব্যঙ্গভরে বলিলেন,—"সে শুভদিনের এখনও অনেকদিন দেরী আছে।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—"আমারও মনে হয় অনেক দেরী আছে। তার আগে ভারতবর্ষের বিশেষত্বকে জাগিয়ে তুল্‌তে হবে। তা না হ'লে যা হবে তা মিলনও হবে না, শুভও হবে না।"

বিমান কহিল,—"তা হ'লে কি আপনার দেশী রুমাল আর আমার বিলাতী এসেন্সের এই যোগটাকে আপনি অশুভ বলতে চাচ্ছেন?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—"অশুভ বলি আর নাই বলি, কিন্তু এ যোগটাকে মিলন বল্‌তে পারিনে, যখন দুটোর মধ্যে একটা ভাবগত বিরোধ রয়েছে। কিন্তু এ-সব তর্ক আজকের মত থাক, এখন একটু গান হোক।" বলিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা সকলে আপনার গানের জন্যেই অপেক্ষা করে' ছিলাম। আপনি দয়া করে' একটু গান করুন।"

গান হইল, কিন্তু জমিল না। বেসুরার আবহাওয়ার মধ্যে সুর কোনপ্রকারেই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না।

আহারে বসিয়া সজনীকান্ত কহিল, "ওহে সুরেশ্বর, কুম্‌ড়োর ছোকাটা তোমার ত চল্‌বে না।"

সুরেশ্বর সকৌতূহলে বলিল,—"কেন?"

সজনীকান্ত হাসিয়া কহিল,—"বিলাতী কুম্‌ড়ো যে! তোমরা ত বিলাতী জিনিস সব বয়কট করেছ?"

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বিমলা মৃদুস্বরে কহিল, 'তা হ'লে চাট্‌নিটাও চল্‌বে না; সেটাও বিলিতী আমড়া দিয়ে হয়েছে।"

পুনরায় একটা হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল।

সুরেশ্বর হাসিমুখে কহিল,—"কতকগুলি বিলিতী জিনিস নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে' আমরা বর্জ্জন করিনি। এ দুটিকেও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে' নেওয়া গেল।"

আহারান্তে বিদায়কালে সুমিত্রাকে একান্তে পাইয়া সুরেশ্বর কহিল,—"বড় খুসী হ'য়ে আজ যাচ্ছি।"

সুমিত্রা আরক্ত-মুখে কহিল,—"কেন? আমার এই খদ্দরের কাপড় পরা দেখে নাকি?"

সুরেশ্বর পবিত্রপ্রমুখে কহিল,—"হ্যাঁ, ঠিক সেই কারণে।"

সুমিত্রা কঠিনস্বরে কহিল,—"কিন্তু এর মধ্যে খুসী

হবার কিছু নেই ত! এ আমার একেবারেই খামখেয়ালী ব্যাপার। আর হয়ত কোন দিনই আমাকে খদ্দর পর্‌তে দেখ্‌তে পাবেন না।"

সুরেশ্বর তেমনি প্রফুল্লমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু আজ যে আপনি খদ্দর পরেছেন, আর ভবিষ্যতের 'বিষয়ে যে 'হয়ত' কথাটা ব্যবহার কর্‌লেন, এই দুটো জিনিসই আমাকে খুসী করে' রাখ্‌বে। তা ছাড়া দেখুন, খামখেয়ালীর মধ্যেও একটা খেয়াল আছে। সেই সদয় খেয়ালটুকুর জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চল্‌লাম।" বলিয়া করজোড়ে নমস্কার করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

গতিহারা হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিদায়ের পূর্ব্বে বিমানবিহারীরও সুমিত্রাকে একান্তে পাইবার সুযোগ ঘটিল। রুষ্ট-স্মিতমুখে বিমানবিহারী কহিল,—"বিলিতী কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্‌বে বলে'ও স্থির কর্‌ছ নাকি?"

সুমিত্রা আরক্তমুখে কহিল,—"এখনও ত স্থির করিনি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।"

মুখখানা কালো করিয়া বিমান কহিল,—"সুরেশ্বর-বাবু সে বিষয়ে কোনো উপদেশ দিয়ে যাননি?"

সুমিত্রা কঠিনস্বরে কহিল,—"এপর্য্যন্তও দেননি; পরে হয়ত দিতে পারেন।"

সে-রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিনিদ্র হইয়া সুমিত্রা অসংলগ্নভাবে বহু বিষয়ে চিন্তা করিল। তাহার ব্লাউসটা খুলিয়া রাখিয়া খদ্দরের শাড়ী পরিয়াই শয়ন করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মুখোস্-পরা নাচের মজ্‌লিস

(আলেকজান্দার দুমা)

আমি বলিয়াছিলাম, আমি কাহাকেও দেখা দিই না, তবু আমার এক বন্ধু বলপূর্ব্বক আমার ঘরে প্রবেশ করিল। আমার ভৃত্য খবর দিল,—আণ্টনি র। আমার চাকরের উর্দ্দি পোষাকের পিছনে, একটা কালো রং-এর বড়-কোর্ত্তা দেখিতে পাইলাম। খুব সম্ভব ঐ বড় কোর্ত্তাধারী ব্যক্তিও আমার ড্রেসিং-গৌনের একটা আঁচলা দেখিতে পাইয়াছিল। আমার পক্ষে লুকাইয়া থাকা অসম্ভব। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম: "আচ্ছা ঘরে প্রবেশ করতে দেও।" মনে মনে বলিলাম, "লোকটা জাহান্নমে যাক্।"

যখন কোন কাজে ব্যাপৃত থাকা যায়, তখন শুধু কোন স্ত্রীলোকই তাহাতে ব্যাঘাত দিয়া পার পাইতে পারে, কেন না, তোমার কাজে হয়ত তাহার আন্তরিক একটা দরদ আছে।

আমি তাই, একটু বিরক্তির ভাবে, সেই বন্ধুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাকে এমন ফ্যাকাশে ও চিন্তা-ক্লিষ্ট দেখিলাম, যে, প্রথমেই এই কথাগুলি আমার মুখ দিয়া বাহির হইল:—

"ব্যাপারখানা কি? তোমার হয়েছে কি?"

সে বলিল—"বোসো, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে নিই। এখনি সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে বল্‌ছি। হয়ত সেটা স্বপ্ন, কিংবা হয়ত আমি পাগল হয়েছি।"

সে এই কথা বলিয়া একটা আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মাথা চাপিয়া রহিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার চুল হইতে বৃষ্টির জল টস টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার জুতা, তাহার হাঁটু, এবং তাহার পাজামার নিম্নদেশ কাদায় আচ্ছন্ন। আমি জানলার কাছে গেলাম। দেখিলাম—দরজার কাছে তাহার ভৃত্য ও তাহার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ইহা হইতে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সে আমার বিস্ময়টা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আমি 'পেয়ারলাশেজের' গোরস্থানে গিয়েছিলাম।"

"সকাল বেলা দশটার সময়?"

"৭টার সময় গিয়েছিলাম—একটা লক্ষ্মীছাড়া মুখোস-নাচের মজ্‌লিসে!"

মুখোস-নাচের মজ্‌লিস ও পেয়ার-লাসেজ এই উভয়ের মধ্যে কি নিকট সম্বন্ধ আমি ত কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম। "চিম্‌নী"-স্থানের দিকে পিছন করিয়া, স্পেনবাসী-সুলভ নির্ব্বিকার ভাব ও ধৈর্য্য সহকারে আঙুলের ভিতর দিয়া একটা সিগারেট পাকাইতে লাগিলাম।

তিনি আসল কথাটা বলিতে আরম্ভ করিলে, আমি বলিলাম—"এই-সব কথা আমি খুব মনোযোগ দিয়েই শুনে থাকি।"

ধন্যবাদের ইঙ্গিত করিয়া তিনি আমার হাতটা ঠেলিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু আবার আমি সিগারেট জ্বালাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি আমাকে নিবারণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন:—

"আলেকজাণ্ডার, দোহাই তোমার, আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো।"

"কিন্তু তুমি ত এখানে সোয়া ঘণ্টা কাল এসেছ—কৈ আমাকে ত এখনো কিছুই বল্‌লে না।"

"দেখ, ঘটনাটা ভারী অদ্ভুত।'

আমি উঠিয়া পড়িলাম। সিগারেট্‌টা চিম্‌নী-বেদিকার উপর রাখিয়া অনন্যগতি নিরুপায় লোকের মত বুকের উপর বাহু আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিলাম। আমারও মনে হইতেছিল, যেন লোকটা শীঘ্রই উন্মাদ হইবে।

একটু থামিয়া সে আমাকে বলিল,—"যে অপেরায় তোমার সহিত আমার দেখা হয়েছিল, সেটা মনে আছে ত ?"

"সব শেষে যে অভিনয়টা হয়েছিল সেখানে অন্ততঃ ২০০ লোক জমা হয়েছিল, তারই কথা ত বল্‌ছ ?"

"হাঁ সেই অপেরা। আরও একটা অদ্ভুত নাট্যশালা দেখবার আছে শুনে', আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে বারণ করলে। কিন্তু আমি তোমার কথা শুন্‌লাম না। নিয়তি যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল। তুমি আমার সঙ্গে কেন গেলে না ; তোমার খুব পর্য্যবেক্ষণ শক্তি আছে, তুমি তা হ'লে সেই অদ্ভুত নাট্যটা তন্ন তন্ন করে' টুকে আন্‌তে পার্‌তে। আমি বিষণ্ণ-ভাবে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপেরা-গৃহ থেকে চলে' এলাম। কিয়ৎকাল পরেই একটা নাট্যশালায় এসে উপস্থিত হলাম। ঘরটা লোকে লোকাকীর্ণ, লোকদের স্ফূর্ত্তিও খুব। ঢাকা-বারাণ্ডা, 'বক্‌স্', 'পিট' সব ভরপূর। আমি সেই নীচের ঘরটায় একবার ঘুর-পাক দিলাম। ২০ জন মুখোস-মুখো লোক আমার নাম ধরে' ডাক্‌লে, তাদেরও নাম আমাকে বল্‌লে।

"এরা সব সমাজপতি, আমীর-ওমরাও, বড় সওদাগর ; এরা সহিস, হরকরা, সার্কাসের সং, মেছুনী—এইরকম নিম্নশ্রেণীর লোকের হীন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এরা সবাই তরুণবয়স্ক, সদ্‌বংশীয়, কৃতবিদ্য, গুণী লোক। এরা নিজের বংশমর্য্যাদা, বিদ্যা বুদ্ধি শিষ্টতা সব ভুলে গিয়ে আমাদের এই গুরুগম্ভীর কালে, নিতান্ত ছির্‌লেমি বেহায়া কাণ্ড আরম্ভ করেছে। আমি পূর্ব্বে একথা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। দুইচার ধাপ উপরে উঠে' একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন হ'য়ে আমি নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। সাগর-তরঙ্গের মত মানুষের জনতা যেন উথ্‌লে উঠ্‌ছে। নানা রংএর মুখোস-পরা, নানা রংএর কাপড়-পরা লোক, অদ্ভুতরকমের ছদ্মবেশ করেছে, তাদের মানুষ বলে' চেনা যায় না। চারিদিকে চীৎকার, হাসি, ঠাট্টা তামাসা, তার মধ্য থেকে একটা ঐকতান বাদ্য বেজে উঠ্‌ল, অম্‌নি সেই জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হল। তারা পরস্পরে হাত-ধরাধরি করে', বাহু-ধরাধরি করে', গলা জড়াজড়ি করে' মণ্ডলাকারে নাচ্‌তে আরম্ভ করে' দিলে, মেঝের উপর সজোরে পা ফেল্‌তে লাগ্‌ল—ধড়াস ধড়াস শব্দ হতে লাগ্‌ল—ধুলো উড়্‌তে লাগ্‌ল, ঝাড় লণ্ঠনের মৃদু আলোকে সব দেখা যাচ্ছিল—ক্রমেই গতি দ্রুত করে' কতরকমের ভঙ্গী করচে, মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে চলেছে—মেয়েগুলো চীৎকার কর্‌চে—প্রলাপ বক্‌চে। সবই যেন নরকের বীভৎস কাণ্ড।

"আমার চোখের নীচে, আমার পায়ের নীচে এইসব ব্যাপার চল্‌ছিল। তারা যখন নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘুরে' ঘুরে' যাচ্ছিল তাদের হাওয়া আমার গায়ে লাগ্‌ছিল। আমার কোন পরিচিত লোক আমার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এমন এক একটা কুৎসিত কথা বল্‌ছিল যে লজ্জায় মরে' যেতে হয়। এইসমস্ত তুমুল শব্দ, এইসমস্ত গুঞ্জন, এই-সমস্ত গোলমাল, এই বাজ্‌নাবাদ্যি যেমন ঘরের মধ্যে, তেম্‌নি আমার মাথার মধ্যেও চল্‌ছিল। শেষে এমন হ'ল, আমি মনে ভাব্‌লাম, এসমস্ত সত্য, না স্বপ্ন ? এরাই আসলে প্রকৃতস্থ আর আমিই বিকৃতমস্তিষ্ক নয় ত ? আমার ভয় হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা পর্য্যন্ত এলাম। সেখানেও সেই বীভৎস আবেগের কণ্ঠধ্বনি ও চীৎকার আমাকে অনুসরণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

"আপনাকে সাম্‌লাবার জন্য, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্য, গাড়ীবারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালাম। আমার রাস্তায় যেতে সাহস হ'ল না। আমার মাথার ভিতর যেরকম গোলমাল চল্‌ছিল, তাতে বোধ হয় আমি যাবার পথ খুঁজে' পেতাম না। হয়ত আমি গাড়ী-চাপা পড়্‌তাম।

"ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে একটা গাড়ী দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। একজন স্ত্রীলোক গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌ল। তার কালো ছদ্মবেশ, মুখে মখ্‌মলের একটা মুখোস। সে দরজার কাছে এল।

"দ্বাররক্ষী বল্‌লে—'আপনার টিকিট ?' রমণী উত্তর কর্‌লে :—'আমার টিকিট ? আমার টিকিট-মিকিট কিছুই নেই।'

" 'তবে বক্সে গিয়ে একটা টিকিট নিয়ে আসুন।'

"মুখোসধারিণী আবার থামলো। চকের কাছে ফিরে এসে নিজের পকেট হাত্‌ড়াতে লাগ্‌ল। তার পর বলে' উঠ্‌ল :—

" 'পয়সা নেই! আঃ! এই আংটি আছে, এই আংটির বদলে একটা প্রবেশ-টিকিট—'

"যে রমণী টিকিট বণ্টন কর্‌ছিল সে উত্তর করলে :—'অসম্ভব, আমরা ওরকমের খরিদবিক্রী করিনে।' এই কথা ব'লে সে হীরের আংটিটা ঠেলে' ফেল্‌লে ; আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেইখানে আংটিটা পড়ে' গেল।

"ছদ্মবেশিনী, আংটিটার কথা ভুলে' গিয়ে, চিন্তামগ্ন হ'য়ে সেইখানেই নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি আংটিটা কুড়িয়ে তার হাতে দিলাম। দেখ্‌লাম, মুখোসের ভিতর দিয়ে তার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। সে আমাকে বল্‌লে :—'যাতে আমি ভিতরে যেতে পারি তার জন্য আমাকে একটু সাহায্য করুন। দোহাই আপনার, আমাকে সাহায্য করতেই হবে।'

"আমি বল্‌লাম :—'কিন্তু মাদাম্ আমি যে বেরিয়ে যাচ্চি।'

" 'তবে আমাকে এই আংটির বদলে তিন্‌টে টাকা দিন। আমি এত দানের জন্য আপনাকে চিরজীবন আশীর্ব্বাদ করব।'

"আমি সেই আংটিটা তার আঙ্গুলে আবার পরিয়ে দিলাম। তার পর বক্‌স-আফিসে গিয়ে দুটো টিকিট কিনে' আমরা দুজনে একসঙ্গে প্রবেশ কর্‌লাম।

"যখন ঢাকা-বারাণ্ডায় পৌঁছলাম, তখন দেখি তার পা টল্‌চে। সে তার অন্য হাতে আমার বাহু জড়িয়ে ধর্‌লে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম :—'আপনার কি কোন কষ্ট হচ্চে।'

"সে উত্তর কর্‌লে :—'না না, ও কিছু না, আমার একটু মাথা ঘুর্‌ছিল, আর কিছু না।'

"সেই প্রমত্ত পাগ্‌লাদের আড্ডায় আবার আমরা প্রবেশ কর্‌লাম।

"তিনবার আমরা ঘুর-পাক দিয়ে এলাম—মুখোসধারীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ভিতর দিয়ে পথ চলা বড়ই কঠিন ;—ঠেলাঠেলি করে' এ ওর ঘাড়ে পড়্‌ছে, এক-একটা অশোভন কথা চীৎকার করে' বলে' উঠ্‌ছে। যে মহিলা আমার বাহু অবলম্বন করে' আমার সঙ্গে চল্‌ছিল এইসব অভদ্র কথা তার কানে আস্‌ছে মনে করে' আমি লজ্জায় মরে' যাচ্ছিলাম। আবার আমরা প্রবেশ দালানের শেষ প্রান্তে ফিরে' এলাম।

"রমণী একটা কৌচের উপর বসে' পড়্‌ল। আমি কৌচের পিঠে হাতটা ভর দিয়ে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বল্‌লে,—

'নিশ্চয়ই তোমার খুব অদ্ভুত বলে' মনে হচ্ছে ? এটা আমারও খুব অদ্ভুত ঠেক্‌ছে। এরকম জিনিসের কোন ধারণাই আমার ছিল না, এসব জিনিষ স্বপ্নেও কখনও মনে করতে পার্‌তাম না। কিন্তু দেখুন, তারা আমাকে লিখলে,—সে লোকটি এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখানে আসবে, আর, এরকম জায়গায় যে আস্‌তে পারে, না জানি সে কিরকম স্ত্রীলোক।'

"আমি বিস্ময়ের ইঙ্গিত কর্‌লাম, সে বুঝ্‌তে পার্‌লে। 'আমিও ত এইখানে এসেছি, কেন এসেছি বোধ হয় আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। আমার কথা স্বতন্ত্র ; আমি তাকে খুঁজতে এসেছি। আমি তার স্ত্রী। আর এইসব লোক যারা এখানে এসেছে এরা এসেছে মত্ততার তাগিদে, বদ্‌খেয়ালের তাগিদে। কিন্তু আমায় এখানে এনেছে একটা দারুণ মর্ম্মান্তিক ঈর্ষা। আমি তাকে খুঁজে' বেড়াচ্ছি, আমি সমস্ত রাত একটা গোরস্থানে ছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে শপথ করে' বল্‌ছি, মাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি এপর্য্যন্ত কখনও একলা রাস্তায় বেরুইনি। আমি যেখানেই গিয়েছি আমার সঙ্গে একজন রক্ষী গিয়েছে। তবু দেখুন, যে সব স্ত্রীলোক অন্য পথের পথিক আমি তাদেরই মত এখানে রয়েছি। একজন অপরিচিত পরপুরুষের হাত ধরে' চলেছি। না জানি তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন। কি লজ্জার কথা। সমস্তই আমি বুঝি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও—আচ্ছা আপনার কি কখনও ঈর্ষা হয়েছে।' আমি উত্তর কর্‌লাম :—'দুর্ভাগ্যক্রমে হয়েছে।'

"'তা হ'লে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন, কেননা আপনি সব বোঝেন।'

" 'কোন উন্মাদের কানে যে কণ্ঠস্বর এই কথা সজোরে বলে—"কর এই কাজ" সে কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই আপনি তবে জানেন। নিয়তির বাহুর মত যে বাহু ঠেলা মেরে পাপের পথে, নরকের পথে কাউকে নিয়ে যায় সে বাহু যে কি প্রবল তা আপনি হয়ত জানেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এইরকম কোন মুহূর্ত্তে, একজন লোক না কর্‌তে পারে এমন কাজ নেই ; সে শুধু প্রতিশোধ চায়, আর কিছু চায় না।'

"আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম এমন সময়, সে উঠে' পড়্‌ল। সেই সময় যে দুজন মুখোসধারী আমাদের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে বল্‌লে,—

" 'চুপ!' এই বলে' তাদের পিছনে পিছনে আমাকে টেনে নিয়ে চল্‌তে লাগল ; আমি কিছুই বুঝিনে—এমন একটা পাপচক্রের মধ্যে আমি গিয়ে পড়্‌লাম, সমস্ত তন্ত্রগুলার স্পন্দন আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পার্‌ছি অথচ কোন তন্ত্রই ঠিক্‌ ধর্‌তে পার্‌ছিনে।

"আমার সঙ্গিনীর ব্যাকুলতা দেখে' আমার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। কোন বাস্তব অনুভূতির এম্‌নি পরাক্রম যে আমি শিশুর মত আজ্ঞাবহ হয়ে পড়্‌লাম এবং আমরা ঐ দুই মুখোস্‌ধারীর পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লাম। ওর মধ্যে একজন পুরুষ, ও আর-একজন রমণী। তারা মৃদুস্বরে কথা কচ্ছিল ; কথার শব্দ অতি কষ্টে আমাদের কানে এসে পৌঁছোচ্ছিল। আমার সঙ্গিনী বলে' উঠ্‌ল :–

" 'এ সেই! তারই কণ্ঠস্বর ; হাঁ, হাঁ তারই মত শরীরের গড়ন—'

"দ্বিতীয় মুখোসধারী হাস্‌তে লাগ্‌ল। আমার সঙ্গিনী বল্‌লে,—'এ তারই হাসি ; ওগো, এ সেই—এ সেই বটে। পত্রটা তা হ'লে ঠিকই বলেছে—ওমা আমার কি হবে।'

"আমরা সেই দুই মুখোসধারীর পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগ্‌লাম। তারা প্রবেশ-দালানের বাইরে গেল, তাদের পিছনে পিছনে আমরাও গেলাম। তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে 'বক্সে' গেল ; আমরাও উপরে উঠ্‌লাম। একটা মাঝখানের 'বক্সে' এসে তারা থাম্‌লে—আমরা ছায়ার মত তাদের পিছনে রইলাম। একটা বন্ধ-করা বক্সের দরজা খুলে' গেল। তারা তার ভিতর প্রবেশ কর্‌লে। তার পর বক্সের দরজাটা আবার বন্ধ হ'য়ে গেল।

"আমার বাহু অবলম্বিনী রমণীর বিষম উত্তেজিত ভাব দেখে' আমি ভীত হ'য়ে পড়্‌লাম। আমি তার মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম না ; কিন্তু সে এতটা আমার গা ঠেসে' ছিল যে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, তার গাত্রশিহরণ, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিলাম। এরূপ অভূতপূর্ব্ব তীব্র যন্ত্রণা আমি কখন পূর্ব্বে দেখিনি। এ একটা অমানুষি ব্যাপার। এই রমণী সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে কেমন লোক আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু তার এই অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যেতেও পারিনে।

"যখন দেখ্‌লে ঐ দুই মুখোসধারী বক্সের মধ্যে ঢুকে' বাক্স বন্ধ করে' দিলে তখন সে নিশ্চলভাবে একটু দাঁড়িয়ে রইল—যেন একেবারে অভিভূত হয়ে। তার পরে চট করে' উঠে', তাদের কথা শোন্‌বার জন্য দরজার কাছে এল। যেরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, একটু নড়াচড়া হ'লেই সে ধরা পড়্‌তে পার্‌ত, তা হ'লে তার সর্ব্বনাশ হ'ত ; তাই আমি তাকে জোর করে টেনে এনে' পাশের বক্সের দরজা খুলে' তার ভিতর প্রবেশ কর্‌লাম। তার পর দরজাটা বন্ধ করে' দিলাম। সে একটা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে' ওদের বক্সের পর্দ্দা-আড়ালের গায়ে কান পেতে রইল। আমি তার উল্টা দিকে মাথা নীচু করে' খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"আমি যা দেখ্‌লাম, তাতে মনে হ'ল, আমার এই সঙ্গিনীর রূপ একটা বিশেষ ছাঁচের। মুখের যে অংশটা মুখোসে ঢাকা ছিল না—সেই মুখের নীচের অংশটা বেশ তরুণ, মখ্‌মলের মত পেলব, বেশ গোলগাল। ঠোঁটদুটি টুক্‌টুকে লাল ও অতি সুকুমার, তার মুক্তার মত ছোট ছোট সাদা দন্তপংক্তি ঝিক্‌মিক্‌ কর্‌চে—তার হাত দুখানি প্রতিমার হাতের মত, তার মাজাটা যেন আঙুলের মধ্যে সাপ্‌টে-ধরা যায়, তার কালো রেশমি চুল, তার মুখোস-টুপির ভিতর থেকে প্রচুর কেশ-গুচ্ছ বেরিয়ে এসেছে—আর তার পা দুখানি কি সুন্দর, কি হাল্‌কা—তার সমস্ত গড়নটাই ছিপ্‌ছিপে ও হাল্‌কা ধরণের।

"নিশ্চয়ই এই রমণী অলোকসামান্য রূপসী। আমি এর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, সমস্ত শরীরের শিহরণ ও কম্পন অনুভব কর্‌চি—এসমস্ত যদি ভালবাসার দরুন্‌ হয়—আমাকে ভালবাসার দরুন্‌ হয়—এই স্বর্গের পরীকে যদি বিধাতা আমার জন্যই রেখে থাকেন—তা হ'লে আমার কি সৌভাগ্য—আমার কি সৌভাগ্য।

"এইরকম আমি ভাব্‌ছি এমন সময়, হঠাৎ দেখি ঐ রমণী উঠে' আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে এই কথাগুলি বল্‌লে—

" 'দেখুন আপনার কাছে আমি শপথ করে' বল্‌ছি—আমি সুন্দরী, আমি নবযৌবনা, আমার বয়স সবেমাত্র উনিশ। এর আগে আমি স্বর্গের দেবতার মত নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ছিলাম—এখন—এখন"—দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে' সে বল্‌লে :—'এখন আমি আপনারই—আমাকে গ্রহণ করুন।'

"এই কথা বলেই সে এরূপ তীব্র আবেগের সঙ্গে আমাকে চুম্বন কর্‌লে—চুম্বন কি দংশন ঠিক্‌ বুঝা গেল না—সেই চুম্বনে আমার সমস্ত শরীর শিউরে' উঠ্‌ল – কেঁপে উঠ্‌ল।

"একটা আগুনের হল্‌কা আমার চোখের উপর দিয়ে চলে' গেল।

"দশমিনিট পরে দেখি, আমি তাকে বাহুপাশে ধরে' আছি, সে মূর্চ্ছিতা, অর্দ্ধমৃতা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে।

"আস্তে আস্তে আবার তার চৈতন্য হ'ল ; তার মুখোসের ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পেলাম—তার চোখ কোটরে বসে' গেছে। আমি তার পাণ্ডু মুখের নীচের অংশটা দেখ্‌তে পেলাম, যেন জ্বরের শীতে তার

দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে—সেইসমস্ত দৃশ্য আবার যেন আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি।

"যা যা ঘটেছিল সে-সমস্তই তার স্মরণে ছিল। সে আমার পায়ের তলায় এসে বসে' পড়ল। তার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বল্‌তে লাগল

"'আমার উপর যদি আপনার কিছুমাত্র দয়া থাকে, আমা থেকে আপনার চোখ ফিরিয়ে নিন, আমাকে জান্‌তে চেষ্টা করবেন না। আমাকে যেতে দিন—আমাকে ভুলে যান। তবে—আমি আপনাকে ভুল্‌ব না।'

"এই কথা বলে' সে আবার উঠে পড়ল ; চট্‌ করে' দরজার কাছে ছুটে' গেল, দরজাটা খুলে' আবার ফিরে এল। ফিরে এসে বল্‌লে—'দোহাই আপনার, আমার পিছনে আর আস্‌বেন না।'

"হাতের ঠেলায় ধড়াস করে' দরজা খুলে' গেল, আবার বন্ধ হ'ল। সে একটা উপচ্ছায়ার মত আমার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হ'ল। সেই অবধি আর আমি তাকে দেখিনি!

"তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সেই অবধি—সেই ছয় মাস থেকে আমি তাকে সর্ব্বত্র খুঁজেছি—নাচের মজ্‌লিসে, থিয়েটারে, বেড়াবার জায়গায়। দূর থেকে, ছিপ ছিপে, শিশুর মত ছোট পাদুখানি—কালো চুল—কোন তরুণী দেখ্‌লেই আমি তার অনুসরণ করতাম, কাছে যেতাম, মুখখানা ভাল করে দেখতাম—মনে কর্‌তাম, আমাকে দেখে' সে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌বে, তা হ'লেই ধরা পড়্‌বে। কিন্তু তাকে আর পেলাম না—কোথাও পেলাম না, কেবল পেতাম তাকে রাত্রে—শুধু আমার স্বপ্নের ভিতর। নানা আকারে তাকে দেখতে পেতাম।

"মোট কথা, সেই রাত্রির থেকে আমি যেন আর আমি নেই। এক জন অপরিচিতা রমণীর প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে, সর্ব্বদাই আশায় আশায় থাক্‌ছি—আর সর্ব্বদাই হতাশ হ'য়ে পড়্‌ছি। ঈর্ষান্বিত হচ্ছি অথচ ঈর্ষা কর্‌বার আমার অধিকার নেই, জানিনে কার উপর ঈর্ষা করতে হবে। এই পাগলামির কথা কারও কাছে প্রকাশ কর্‌তেও পারিনি কেবল আমি আমার অন্তরেই দগ্ধ হচ্ছি, সেই মায়াবিনীই আমাকে পুড়িয়ে মার্‌ছে।"

এই কথাগুলি বলিয়াই, সে একটা পত্র তাহার বুকের পকেট থেকে বাহির করিল। তার পর সে আমাকে বলিল :—

'আমি সবই ত তোমাকে বলেছি, এখন এই পত্রখানা পড়ে' দেখো।'

"সে রমণী কিছুই ভোলেনি, এবং ভুল্‌তে পারে না বলেই মর্‌তে যাচ্চে, সেই হতভাগিনীকে বোধ হয় আপনি ভুলে' গেছেন?

"আপনি যখন এই পত্রখানা পাবেন, আমি তখন আর থাক্‌ব না। তখন আপনি পেয়ার-লাশেজের গোরস্থানে যাবেন, সেখানকার দ্বার-রক্ষককে বল্‌বেন, যে-পাথরের উপর শুধু 'মেরি' এই নাম লেখা আছে, সেই নূতন সমাধি-প্রস্তরটি যেন আপনাকে দেখিয়ে দেয়। তার পর সেই সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে, নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা কর্‌বেন।"

আন্তনি বলিল :—

"আমি সবে কাল এই পত্রখানি পেয়েছি ; আর ঐ পত্র পেয়ে আজ সকালে আমি সেখানে গিয়েছিল'ম। দ্বাররক্ষক সেই সমাধিস্তম্ভের কাছে আমাকে নিয়ে গেল ; আমি সেইখানে দুই ঘণ্টা ধরে' নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা কর্‌লাম, কাঁদ্‌লাম। বুঝ্‌তে পারচ? সেই রমণী সেইখানেই ছিল। কেবল তার জ্বলন্ত আত্মাপুরুষ পালিয়ে গিয়েছিল ; অন্তর্দাহে দগ্ধ—ঈর্ষা ও অনুতাপের ভারে ভারাক্রান্ত তার শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছিল। সে ছিল সেইখানেই—আমার পায়ের নীচে—তার জীবন মরণ সবই আমার অজ্ঞাত। অজ্ঞাত? তবু, যেমন গোরের ভিতর, সেইরকম আমার জীবনের মধ্যেও সে একটা স্থান অধিকার করে' রয়েছে। এরকম কোন কিছু তুমি জান কি?—এরূপ ভীষণ ঘটনার কথা তুমি কখনো শুনেছ কি? তাই আর কোন আশা কোরো না। আমি আবার তাকে দেখ্‌তে পাব মনে কর?—কখনই না। আমার ইচ্ছা, তার গোরটা খুঁড়ে' যদি তার কোন চিহ্ন পাই তা হ'লে, তা দিয়ে তার মুখখানি আবার গড়ে' তুলি। আমি তাকে সত্যই ভালবাসি, বুঝ্‌তে পারচ, আলেক্‌জাণ্ডার? আমি পাগলের মত তাকে ভালবাসি, যদি আমি জান্‌তে পারি,—এ লোকে তার পরিচয় না পেলেও পরলোকে তার পরিচয় পাব—তা হ'লে আমি এই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করি।"

এই কথাগুলি বলিয়া সে আমার হস্ত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইল, পত্রখানা বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল, এবং শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাকে আমার বাহুর মধ্যে গ্রহণ করিলাম, কি বলিব বুঝিতে পারিলাম না—আমিও তার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলাম।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীর আত্মকথা

১১

খুরের শানের উপর দিয়া হেঁচ্‌ড়িয়া চলিবার শব্দ—একটা ফোঁপানির শব্দ।—এই মন্দিরের একটা আঁধার কোণে অনেকক্ষণ ধরিয়া শান্ত ভাবে ছিলাম ; খিলান মণ্ডপের গায়ে যে সব বিরাট্ মূর্ত্তি, কাল্পনিক মূর্ত্তি ছিল তাহারই ছবি আঁকিতেই ব্যাপৃত ছিলাম,—এমন সময় ঐ শব্দ শুনিতে পাইয়া, কে প্রবেশ করিতেছে জানিবার জন্য দরজার দিকে মুখ ফিরাইলাম।

একটি বৃদ্ধা রমণী দীনদশাপন্না ও প্রায় উলঙ্গ। তাহার হাতে আছে চাউল ও মৎস্যপূর্ণ ছোট তিনটা কটোরা এবং ছোট তিনটা গোলাপী রংয়ের মোমবাতী। নিশ্চয়ই দূর হইতে আসিয়াছে ; দেহ যেন শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মনে হইল, কি একটা দারুণ দুঃখে অভিভূত। এই অর্দ্ধনগ্ন [illegible] বোবা বৃদ্ধা [illegible] তাহার নৈরাশ্যক্লিষ্ট বেদিয়া

এই নৈবেদ্য-সামগ্রী,—এই হাস্যময়, প্রকাণ্ডকায়, সোনা-ঝক্‌মকি দেবতার সম্মুখে যজ্ঞ-বেদির উপর অর্পণ করিতে আসিয়াছে। তাহার পরেই সে কাঁসর পিটিতে লাগিল, এবং প্রেতযোনিদিগকে ডাকিবার ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। যেন সে এই কথা বলিতে চাহে,—বাবা বুদ্ধ। তুমি এখানে একবার এসে দেখো, তোমার জন্য আমি কি জিনিষ নিয়ে এসেছি ; আমার যথাসাধ্য এই উপহার সংগ্রহ করেছি ; আমার উপর দয়া করো, কৃপা করো, আমি যা প্রার্থনা কর্‌ছি তা আমাকে দাও ..."

ছোট মোমবাতিগুলা পুড়িয়া গেল ; মাছিরা ছোট তিনটা বাটির উপর নামিয়া নৈবেদ্য সামগ্রী খাইতে লাগিল ;—বেচারী বৃদ্ধা চলিয়া গেল।

একটা মস্তবড় চীৎকার করিয়া বৃদ্ধা হঠাৎ আমার সেই বেঞ্চের

নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহার অন্তরে কে যেন বলিল, এখনও তার "ভূত" ছাড়ে নাই; অথচ সে যথাসাধ্য দেবতাকে উপহার দিয়াছে। তাই সে ছুটিয়া আসিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আর্ত্তরব করিতে করিতে আবার প্রচণ্ডভাবে "গং" পিটিতে লাগিল, ঘটা বাজাইতে লাগিল;—বুম্! বুম্! বুম্! ডিং! ডিং! ডিং! তাহার তাৎপর্য্য এই:—

"বাবা বুদ্ধ! তুমি আমার কথা শুন্‌লে না, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌লে না; আমি যে এক দীন গরিব বৃদ্ধা রমণী—অতি অভাগিনী—তুমি কি এত নিষ্ঠুর হবে,—আমার কথায় কর্ণপাতও কর্‌বে না—এ কখনই সম্ভব নয়।"—তাহার পর, হলদে পার্চ্‌মেণ্টের মত তাহার মুখের উপর দিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

সিল্‌ভেষ্টার,—ব্রেতাঞ্‌-প্রদেশে যাহার খুব-গরিব এক বৃদ্ধা পিতামহী আছে—সেই সর্ব্বপ্রথমে উঠিয়া তাহার কাছে যাহা ছিল—৫ ফ্র্যাঙ্ক্ মূল্যের "সাপেক" মুদ্রা—সমস্তই তাহাকে দিল। আমিও আমার থলে ঝাড়িয়া তাহাকে সমস্তই দিলাম। সে ভ্যাবাচাকা খাইয়া, খুব নতশিরে "চিন্ চিন্" করিতে করিতে আমাদিগকে ধন্যবাদ জানাইল। এই অনপেক্ষিত ধনলাভ করিয়া নিশ্চয়ই তার বেশ একটু উপকার হইল। সে ইসারা সঙ্কেতের দ্বারা আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিল:—সে আর-একটা ভিক্ষার জন্য এখানে এসেছিল - সে ভিক্ষা দেওয়া মানব-দয়ার সাধ্যাতীত…

১৪

আজ দিনটা খুবই বিক্ষুব্ধ। পূবের জোর বাতাস, আকাশ অন্ধকার, দুই দিন ধরিয়া আমরা থুযান্-আনের সম্মুখে আছি। আজ প্রাতে সূর্য্যোদয়-কালে, জাহাজ আর নোঙ্গর মানিতেছে না; কাজেই নোঙ্গরটা মাটি হইতে একটু উপরে উঠানো গেল (এই কৌশলটা বিপদ্‌জনক); তাহার পর, আমরা আমাদের অভ্যস্ত আশ্রয়স্থান তুরানে গিয়া আশ্রয় লইলাম।

আর আমি,—নির্দ্দিষ্ট পোয়া ঘটা কালের পাহারার কাজে নিযুক্ত হইলাম—বেশ একটু কড়া পাহারা, কিন্তু সেই-সঙ্গে একটু বাৎসল্য ভাবও ছিল বরং সচরাচরের চেয়েও বেশী। আমি বিষণ্ণচিত্তে মনে মনে ভাবিতেছিলাম, এই পাহারাটা কি আমার শেষ পাহারা হইবে?

গতকল্য একটা ডাকের জাহাজ যখন এখান দিয়া চলিয়া যায়,—তখন একটা হুকুমনামা আমাকে দিয়া গিয়াছিল। এই হুকুমটা একেবারেই অনপেক্ষিত; পারীতে ফিরিয়া যাইতে হুকুম হইয়াছে। সৈন্যবাহী "করেজ" নামক জাহাজে আমাকে ফ্রান্সে লইয়া যাইবে। হা-লং হইতে ফিরিয়া আমাকে লইবার জন্য জাহাজটা তুরানে আসিয়া থামিবে—আর কাল আমাদের যাত্রাকাল জানানো হইবে। সকল সময়েই এই নৌ-বিভাগের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি ও হুকুম্‌দম!

দুইটার সময় আমাদের সেই তুরানের উপসাগরে প্রবেশ করিলাম—সেখানে সমুদ্র বেশ শান্ত। এখন খুব তাড়াতাড়ি আমাদের তোরঙ্গ-গুলা গুছাইয়া লইতে হইবে। আমার কাম্‌রায় সমস্তই বিশৃঙ্খল ও ওলটপালট হইয়া রহিয়াছে। যে-সকল বাক্‌সো তাড়াতাড়ি "সবুজ চীনা"কে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল তাহা একটা "ঝাঁপান" নৌকা করিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে গরম,—সিল্‌ভেষ্টার হাঁসফাঁস্ করিতে করিতে কাজে চলিয়া গেল। এই জটিল গাঁঠরি বাঁধা কাজে আরও তিন জন সিল্‌ভেষ্টারের তাঁবে খাটিতে লাগিল। আরামে কাজ করিবার জন্য সকলেই বিবস্ত্র হইল।

রাত্রি হইল। আমিও প্রস্তুত হইলাম। আমার গম্যস্থানের অনুসরণ করিতে বেচারী প্রবাসসঙ্গীদিগের সহিত বিদায়-সম্ভাষণ করিতে প্রস্তুত হইলাম। আমার সকলের জন্যই কষ্ট হইতে লাগিল…

আমার জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে এতই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে আজ ঘুমাইতে বেশ একটু দেরী হইয়া গেল।

একজন উচ্চমাস্তুলের নাবিক, আমার কাম্‌রার পোত ছিদ্রের নীচে সেকালের বিষাদময় খুব একঘেয়ে একটা ব্রেতাঞ্‌ প্রদেশের সুর গাহিতেছিল, তাহা শুনিয়া খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দিনটা শান্ত নির্ম্মল, সুন্দর;—এই মেঘ-বৃষ্টির দেশে, এই ঋতুতে এইরূপ দিন খুবই বিরল। পাহাড়গুলা রামধনুর মত বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত; সমুদ্র গাঢ় নীলবর্ণ; একটা ম্লানমধুর দীপ্তিচ্ছটা, গ্রীষ্মমণ্ডলসুলভ একটা গভীর স্বচ্ছতা চারিদিকে বিরাজ করিতেছে; এই সব তুমুল ঝড়-বৃষ্টির পর, সমস্ত প্রকৃতি যেন আরামে বিশ্রাম করিতেছে। আর কিছুই করিবার নাই; আমার কাজ ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার তোরঙ্গগুলা বন্ধ রাখা হইয়াছে। সিল্‌ভেষ্টার আমার বুদ্ধমূর্ত্তি ও আমার পুতুলগুলাকে এইমাত্র কাপড়ে জড়াইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছে;—ইহারা আমার সহযাত্রী।

আমার বিশ্বাস,—আমার শ্রমক্লান্ত জীবনে, কোন স্থান হইতে এমন শান্তভাবে প্রস্থান করা কখনও ঘটে নাই। সমস্ত দিন আমি দিগন্তের পানে চাহিয়া আছি, সমুদ্রের উপর চাহিয়া আছি—"করেজ" জাহাজখানা কখন্ না জানি আমাকে লইতে আসিবে। কিন্তু সাদা পাল-ওয়ালা কতকগুলা "জোঙ্ক" নৌকা ছাড়া আর কিছুই নেত্রগোচর হয় না।

সেই "সবুজ চীনা" শাং ত ফুল-কাটা রেশমের একটা জাঁকালো পোষাক পরিয়া, সন্ধ্যার সময় আমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিল। শীত ঋতুর জন্য এই পোষাক সে কাণ্টন্ হইতে আনাইয়াছে।

সূর্য্যাস্ত সময়ে প্রায় শীতকালের মত ঠাণ্ডা; মনে হয় যেন ডিসেম্বর মাস। কৈ, "করেজ"-জাহাজের ত দেখা নাই; আর-এক রাত্রি এই উপসাগরে, এই অন্ধকারময় পাহাড়গুলার মধ্যে কাটাইতে হইবে। পাঁচমাস কাল উহাদের মধ্যে আমি বন্দী ছিলাম। আবার উহাদিগকে দেখিতে আসিব না ইহা নিশ্চয়। আজ শেষ-রাত্রি, তাই আজ রাত্রে উহাদিগকে একটু বিষণ্ণচিত্তে দেখিতেছি…কি অদ্ভুত, শেষে সকলেরই প্রতি কেমন একটু মমতা জন্মে…সূর্য্যাস্তের ম্লান পীত-আভার উপর এই-সব পাহাড়—এমন কি দূরস্থ পাহাড়-গুলাও নিছক্ কালো বলিয়া মনে হইতেছে; আর দূরত্বের ব্যবধান অনুভূত হয় না; মনে হয় যেন একটি মাত্র শ্লেট-পাথরের খাঁজ-কাটা দেওয়াল, শীত-আকাশের নীহারশীতল গায়ে ছায়াচিত্রের আকারে খাড়া হইয়া আছে।

এই "করেজ" জাহাজখানা, আমাদের গণনানুসারে, অন্তত আজ পৌঁছনো উচিত ছিল; উহার আসিতে খুবই বিলম্ব হইয়াছে। কাল প্রাতে নিশ্চয়ই আসিয়া পৌঁছিবে।

সন্ধ্যার "ডেক্ পরিষ্কার"-এর পর, আমার "পাহারা ঘরে"র বন্ধুরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমার কাম্‌রায় আসিল;—তাহারা নানাপ্রকার ফর্ম্মাশ করিল, বিদায়-সম্ভাষণ করিল।—সবশেষে যে আসিল সে হইতেছে সিল্‌ভেষ্টার—কিছু গুছাইবার আছে কি না তাহাই দেখিবার জন্য সে স্বতই আসিয়াছে। সে ভয়ে-ভয়ে একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আমাকে দিল। এই মূর্ত্তিটি সে তার প্রথম "Communion" অনুষ্ঠানের সময় পাইয়াছিল। এটি কতকটা তাহার রক্ষাকবচের মত:—"স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এটি কি নিয়ে যাবে কাপ্তেন?"—সে আরও মনে করে—এটি আমাকে আপদে বিপদে রক্ষা করিবে।

আমাকে কেন আবার ফ্রান্সে তলব হইল, একথা আমার নাবিকেরা ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না; তাহারা কল্পনা করিতেছে,—আমার কি দশা হইবে, আমার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষেরা কিরূপ আচরণ করিবে, আমি যেন তাহা নিজেই জানি না…

উঁহার এই ক্ষুদ্র উপহারটি বহুমূল্য জ্ঞানে বুকে চাপিয়া ধরিলাম। মূর্ত্তির বিষয়টি এই:—ঘোর তমসাচ্ছন্ন ঝটিকার মধ্যে একটি শিশু নতজানু হইয়া আছে। তাহার সহিত এই পৌরাণিক কাহিনীটি আছে:—"বিপুল জলরাশি আমাকে ঘিরিয়া ছিল, কিন্তু হে ভগবান্, তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ।"

তাহার পর, সিল্‌ভেষ্টারও যেন আমার সহিত দস্তুরমত মুলাকাৎ করিতে আসিয়াছে—এই ভাবে তাকেও আমার কাছে একটু বসাইলাম; এবং ব্রেতাঞ সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিলাম। তাহার গোয়েলো প্রদেশে আমার কখন কখন কাজ পড়ে, সেই সময় তাহার পিতামহীর কুটীরে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এইরূপ স্থির হইল।

তখন, সে যেন কি-একটা চিন্তায় বিভোর হইল:—এই ব্রেতাঞ এখান হইতে কত কত যোজন দূরে।...তাহার গ্রামে ফিরিয়া গিয়া আবার কি আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে?—তাহা কি কখনও ঘটিবে? এই আনমে বসিয়া তাহা কল্পনা করাই যায় না—তাহার সাধের দেশের সম্মুখে যেন একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা রহিয়াছে...

তাহার পর, তাহার ভাবনা হইল, তাহাদের কুটীরে গেলে কি করিয়া আমার যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনা করিবে। সে মাথা নীচু করিয়া আমাকে বলিল:—"জানেন, আমাদের বাড়া,...সেটা একটা খোড়ো চালাঘর"—বেচারী নেহাৎ শিশু। খোড়ো চালা-ঘরের কথা বলিবার পর, আমি তাহার হস্তমর্দ্দন করিয়া তাহাকে শুইতে যাইতে বলিলাম। সে যদি জানিত, এইসব খোড়ো চালাঘর—ব্রেতাঞ-প্রদেশের এইসব পুরাতন চালা-ঘর আমি কত ভালবাসি...

আজ রাত্রে "করেজ" জাহাজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমাদের জাহাজের পাশ দিয়া যাইবার সময় যেরূপ কোলাহল উঠাইল সেরূপ জল মাপিবার বুলি বলিতে লাগিল, তাহাতে আমি জাগিয়া পড়িলাম। যাক্—এইবার তবে প্রস্থানের সময় আসিয়াছে, আমার জীবন পথের এই শেষ যাত্রা, সব অবসানই বিষাদময়—এখন দেখা যাইতেছে এই প্রবাসের অবসানটাও বিষাদময়।

আজিকার দিনটাও বেশ উজ্জ্বল মনোরম। প্রাতঃকাল হইতেই যাত্রার জন্য শেষ-উদ্যোগ-আয়োজনের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, ৯ টার সময় "করেজ"কে সজ্জিত হইতে হইবে। আমার অনুরক্ত-ভক্ত সিল্‌ভেষ্টার ও অন্যান্য নাবিকেরা আমার বোচকাবুচকি বাঁধিবার জন্য, ঐখানে জমা হইয়া পরস্পরের সাথে ঠেলাঠেলি করিতেছে। তাহার পর বিদায় লইবার জন্য এক-লাইন হইয়া উহারা আমার কামরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সকল সরলমতি নাবিকদের বিদায়সম্ভাষণ বাস্তবিকই মর্ম্মস্পর্শী।

আমার "পাহারা-ঘরে"র সহচরেরা আসিয়া আমাকে বিদায়-চুম্বন করিল; সুনিদ্রা-বিরহিত—যা-তা কাপড় পরা—এইরূপ কতকগুলা নাবিক আমাকে তাহাদের জাহাজে লইতে আসিল। একটা ডিঙ্গি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—আমাদের জাহাজ হইতে এই ডিঙ্গিতে নামিবার সময় আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

"করেজ" সজ্জিত হইয়াছে, যাত্রা করিতে উদ্যত, এমন সময় একটা জোঙ্ক-নৌকা—মাণ্ডারীনের—নানা-রকম ইসারা-সঙ্কেত করিয়া তাড়াতাড়ি আমাদের নিকট আসিল।—সেই "সবুজ চীনা," আমার যাত্রাপথের জন্য একরকম খুব মিঠি চা বাক্সোবন্দী করিয়া পাঠাইয়াছে।

আমাদের জাহাজের পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—রবিবারের প্রাভাতিক পরিদর্শনের জন্য, জাহাজের সরঞ্জামসকল ডেকের উপর দস্তুরমত সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আমাকে বিদায়সম্ভাষণ করিবার জন্য উপরিতন কর্ম্মচারীরা শিরস্ত্রাণ এবং টুপি নাড়িতে লাগিল। যখন সব দূরে সরিয়া গেল—যখন সেই-সব পরিচিত গিরি-মালার পিছনে তুরানের উপসাগর ধীরে ধীরে আবার রুদ্ধ হইয়া পড়িল—যখন আমাদের পূর্ব্বজাহাজের মাস্তুলগুলা একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন আমি আর চোখের জল রাখিতে পারিলাম না।

১৫

সমস্তই যেন ছুটিয়া পলাইল, নীলিমার মধ্যে বিলীন হইল। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বেই আমরা "বার দরিয়া"য় আসিয়া পড়িয়াছি।

তখন সেই সমুদ্রের শান্তি আবির্ভূত হইল—সেই সমুদ্র যাহার দ্বারা সমস্তই পরিবর্ত্তিত ও বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। একটা সময়ের অবসানে, চিরকালের মত যেন একটা দাঁড়ি পড়িয়া গেল। এবং এই শান্তির মধ্যে, আমাদের পূর্ব্ব জাহাজ ও তুরানের উপসাগর চট্ করিয়া যেন দ্রবীভূত হইল।—কোন্ সুদূরে যেন বিলীন হইল—আমার মনে একটা স্মৃতিও রাখিয়া গেল না। আমি জানিতাম, উহার স্মৃতি চলিয়া যাইবে, কিন্তু এত শীঘ্র যাইবে বলিয়া মনে করি নাই—আমি ইহাতে বিস্ময়বিহ্বল হইলাম। মোট কথা, প্রেমের বন্ধন ছাড়া আর কোন বন্ধন পৃথিবীর কোন স্থানেই আমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

(সমাপ্ত)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(সত্যকবীর সাখী)

কোথায় থেকে আস্‌লে তুমি,
শুধাই তোমায় তাই,—
তোমার জাতি?—নাম কি স্বামী'র?—
কোথায় তোমার ঠাই?
"অমর-লোকের থেকে এলাম,
সুখ-সাগরে আমার হে ধাম,
জাতি আমার অজাতি,—আর
অগম-পুরুষ 'সাঁই'!"
"জাতি আমার আত্মা, ওগো, পরাণ আমার নাম,
অলখ আমার ইষ্ট সে,—ঐ গগন আমার গ্রাম!"

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

বেনো-জল

বারো

সেদিনকার সেই মারামারির পর থেকে, কুমার-বাহাদুরের অবস্থাটা হ'য়ে উঠ্‌ল দস্তুরমত অসহনীয়। বিনয়-বাবুদের কেউ মুখে বা ব্যবহারে তাঁর প্রতি কিছুমাত্র অনাদর প্রকাশ না কর্‌লেও, কুমার-বাহাদুর মনে-মনে এটা বেশ অনুভব কর্‌তে লাগ্‌লেন যে, সকলের চোখে অকস্মাৎ তিনি অনেকটা নীচে নেমে পড়েছেন! যে চায়ের আসরে ব'সে প্রতিদিন সকলে অবাক্ হ'য়ে তাঁর স্বমুখে-কথিত পল্লবিত বীরত্ব-কাহিনী শুন্‌ত আর বাহবা দিত, আজ সেখানে শুধু রতনের নামেই বাহবা শোনা যায়,—আর সব-চেয়ে যা অসহ্য ব্যাপার, সেই বাহবায় চক্ষুলজ্জার খাতিরে তিনি কোন আপত্তি পর্য্যন্ত কর্‌তে পারেন না! রতনকে আগে তিনি গরীব ব'লে ঘৃণা ও উপেক্ষা কর্‌তেন, আজকাল তাকে পরম শত্রু ব'লে মনে কর্‌তে লাগ্‌লেন।

সেন-গিন্নী এখন রতনকে ছেলের মতন আদর-যত্ন করেন। তিনি যখন-তখন বলেন, "ভাগ্যে সেদিন রতন ছিল! নইলে আমার সন্তোষকে সায়েবরা হয়ত মেরেই ফেল্‌ত!"

সন্তোষ পর্য্যন্ত রতনের মোসাহেব হ'য়ে পড়েছে দেখে' কুমার-বাহাদুরের মনে দুঃখের আর অবধি ছিল না! সন্তোষ এখন প্রায়ই রতনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, রতন সম্বন্ধে তার মনের ভাব একেবারে বদ্‌লে গেছে। আজকাল সে আবার রতনের কাছ থেকে মুষ্টিযুদ্ধ ও যুযুৎসুর কস্‌রৎ শিক্ষা কর্‌ছে।

অথচ এই ভাবান্তরের কোনই সঙ্গত কারণ নেই! সেদিন কুমার-বাহাদুর যে ব্যবহার করেছিলেন, সেইটেই তো স্বাভাবিক! তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহিলা, আর বিরুদ্ধে অতগুলো অভদ্র সাহেব। অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়্‌তে গেলে সেদিন পূর্ণিমার উপরে অত্যাচার হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। রতন যা করেছে, সে তো পাগলের আচরণ! আজ যারা তাঁকে কাপুরুষ ব'লে ভাব্‌ছে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাক্‌লে তারা কি কর্‌ত? নিশ্চয়ই তিনি যা করেছেন, তাই! তবে?

সব-চেয়ে অসহ্য এই সুমিত্রা! আজ সকালে সে তাঁকে মুখের উপরে একরকম অপমান পর্য্যন্ত করতেও লজ্জিত হয়নি। সে হঠাৎ এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল—"কুমার-বাহাদুর, আজকাল আপনি এমন-ধারা মন-মরা হ'য়ে থাকেন কেন?"

তিনি বল্‌লেন, "তার মানে?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আগে আপনি আমাদের সঙ্গে কত গল্প করতেন, কত কথা কইতেন, কিন্তু আজকাল যে হিমালয়ের চেয়েও গম্ভীর হ'য়ে উঠেচেন!"

তিনি বল্‌লেন, "গম্ভীর হ'য়ে উঠেচি? কৈ, না তো! কি গল্প শুন্‌তে চান, বলুন!"

সুমিত্রা ঠোঁট-টেপা হাসি হেসে বল্‌লে, "সেই লাঠি মেরে ব্যাঘ্র-বধের গল্পটা! সে-গল্পটা আমার ভারি ভালো লেগেছিল, আর একবার শুন্‌তে বড় সাধ হচ্চে!"

কুমার-বাহাদুরের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল! সুনীতি সাম্‌নে ব'সে কার্পেটের উপরে ফুল তুল্‌ছিল, সে ধমক দিয়ে বল্‌লে, "সুমি, তোর বড় বাড় হয়েচে দেখ্‌চি!"

সুমিত্রা বল্‌লে, "হ্যাঁ দিদি, কুমার-বাহাদুর কি আমাদের পর গা? তাঁর বীরত্বের গল্প আমার ভালো লাগে, সেজন্যে তুমি ধমক দিচ্চ কেন বল দেখি?"

সুনীতি রেগে বল্‌লে, "সুমি, ফের যদি তুই একটা কথা বলিস্, তোর সঙ্গে আমি কখনো কথা কইব না!"

সুমিত্রা বল্‌লে, "বেশ দিদি, বেশ! তুমি যখন এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌লে, তখন দরকার নেই আমার আর বাঘ-মারার গল্প শুনে।" ব'লেই সে ভঙ্গীভরে দু-হাত দুলিয়ে চ'লে গেল।

কুমার-বাহাদুর দুঃখিতের মতন চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

সুনীতি বল্‌লে, "সুমি'র কথায় আপনি যেন রাগ কর্‌বেন না, সকলের পেছনে লাগাই ওর স্বভাব।"

কুমার-বাহাদুর ভারী-ভারী গলায় বল্‌লেন, "রাগ আর কার ওপরে করব বলুন! আমার অপরাধ, সেদিন আমি গোঁয়ার্ত্তুমি ক'রে আত্মহত্যা করতে চাইনি। তাই আজ এই অপমানও সহ্য করতে হচ্চে!"

সুনীতি ব্যস্ত ভাবে বল্‌লে, "না, না, সুমি নিশ্চয়ই আপনাকে অপমান করবার জন্যে এ-কথা বলেনি, এত সাহস ওর হবে না!"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "থাক্‌, ও-কথা নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই।...আমার আর পুরীতে থাকতে ভালো লাগ্‌চে না, ভাব্‌চি দু চার দিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় চ'লে যাব।"

সুনীতি বল্‌লে, "যখন এসেচেন, আরো কিছুদিন থেকে যান না! এখানকার হাওয়া খুব ভালো।"

—"তা আমি জানি। কিন্তু হাওয়া খেতে আমি তো এখানে আসিনি!"

—"তবে কি জন্যে এসেচেন?"

—"তা কি আপনি জানেন না?"

—"আমি? আমি কি ক'রে জানব?"

—"আপনি কি জানেন না যে, কি সম্পর্কে আমি আপনাদের সঙ্গে এমনভাবে মেলামেশা করি?"

এতক্ষণে সুনীতি বুঝ্‌তে পারলে। সে শুনেছে বটে। কিন্তু কুমার-বাহাদুরের মুখে এমন ইঙ্গিত এর আগে সে আর-কখনো শোনেনি। লজ্জায় তার মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, সে কোন জবাব দিতে পারলে না।

কুমার-বাহাদুরও আত্মপ্রকাশের এই প্রথম সুযোগটা ছাড়্‌তে পারলেন না, এর জন্যে অনেক দিন ধ'রেই তিনি যে অপেক্ষা ক'রে আছেন! চেয়ারখানা সুনীতির আরো কাছে টেনে এনে তিনি বস্‌লেন; তার পর সামনের দিকে হেঁট হ'য়ে, কোমল-স্বরে ধীরে ধীরে বল্‌লেন, "তোমার কাছে কাছে থাকতে পাব ব'লেই আমি পুরীতে এসেচি। আজ যে এত অপমান স'য়েও এখান থেকে যেতে আমার মন উঠ্‌চে না, সে কেবল তোমার জন্যেই। এ-কথা কি তুমি জানো না সুনীতি?"

সুনীতির বুকের ভিতরটা কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, সে যেন তখন সেখান থেকে একছুটে পালিয়ে যেতে পারলেই বাঁচে!

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "এতে তোমার বাবা আর মায়েরও মত আছে—অন্ততঃ আমি এইরকমই শুনেচি। এখন কেবল তোমার মতের অপেক্ষা। তোমার মত পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তা হ'লে—"

—"দিদি, তোমাকে আর কুমার-বাহাদুরকে বাবা ডাকচেন" বল্‌তে বল্‌তে সুমিত্রা এসে আবার সে ঘরে ঢুক্‌ল।

কুমার-বাহাদুর তাড়াতাড়ি সোজা হ'য়ে ব'সে দু-চার-বার কেশে বল্‌লেন, "বিনয় বাবু আমাকে ডাক্‌চেন? কেন, কি দরকার?"

—"আনন্দ-বাবু এসেচেন আমাদের নেমন্তন্ন করতে।"

—"আচ্ছা, যাচ্চি" ব'লে কুমার-বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন। তার পর এমন সুযোগটা নষ্ট ক'রে দিলে ব'লে মনে-মনে সুমিত্রার উপরে আরো-বেশী চ'টে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সুমিত্রা দুষ্টুমি-ভরা হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "দিদি, কুমার-বাহাদুর প্রস্থান করেচেন, সুতরাং এখন তোমার সঙ্গে নির্ভয়ে কথা কইতে পারি?"

সুনীতি ভয়ে-ভয়ে সন্দেহপূর্ণ স্বরে বল্‌লে, "তোর আবার কি কথা আছে?"

সুমিত্রা চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "বা রে, কুমার-বাহাদুরের তোমার সঙ্গে কথা থাকতে পারে, আর আমার নেই বুঝি?"

সুনীতি বুঝ্‌লে সুমিত্রা কিছু সন্দেহ করেচে! সে তাড়াতাড়ি উঠে প'ড়ে বল্‌লে, "সর্‌, সর্‌, বাবা কেন ডাক্‌চেন শুনে আসি।"

সুমিত্রা দিদির একখানা হাত ধ'রে বল্‌লে, "আহা, অত তাড়াতাড়ি কিসের, আগে আমার কথাটাই শুনে' যাও না!"

বেকায়দায় প'ড়ে সুনীতি বল্‌লে, "আচ্ছা, কি বল্‌বি বল্‌!"

খুব চুপিচুপি সুমিত্রা বল্‌লে, "লক্ষ্মী দিদিটি আমার! কুমার-বাহাদুর অমন ভিখিরির মতন মুখ ক'রে তোমাকে কি বল্‌ছিলেন, আমাকে তা বল্‌তেই হবে!"

—"সে একটা বাজে কথা!"

—"উঁহু! কুমার-বাহাদুর নিশ্চয়ই জান্‌তে চাইছিলেন, তাঁর গলায় তুমি মালা দিতে রাজি আছ কি না!"

সুমিত্রার গালে ঠাস্ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিয়ে সুনীতি সে ঘর থেকে চ'লে গেল!

সুমিত্রা তবু ছাড়্‌লে না—সঙ্গে-সঙ্গে যেতে-যেতে বল্‌লে, "তুমি কি জবাব দিলে দিদি, বলোনা!"

তেরো

আজ সকালে এক নতুন বিস্ময়! ইজি-চেয়ারে বস্‌তে গিয়ে একটা ছারপোকার কামড় খেয়ে বিনয়-বাবু বেয়ারাকে মৌখিক শাসনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার যুক্তি এই, কল্‌কাতার ধুলো-ধোঁয়া হট্টগোল যখন এখানে নেই, তখন কল্‌কাতার ছারপোকাই বা এখানে এসে কোন্ অধিকারে তাঁকে দংশন করবে? বেয়ারা এই অকাট্য যুক্তির বিরুদ্ধে কোন কথা বল্‌তে না পেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুল্‌কোচ্ছে, এমন-সময় হঠাৎ বাড়ীর আঙিনার উপরে দেখা গেল, কল্‌কাতার আরো দুটি মূর্ত্তিমান্ বিশেষত্বকে!

বিনয়-বাবু আশ্চর্য্য হয়ে ইংরেজীতে ব'লে উঠ্‌লেন, "অ্যাঁ, মিঃ চ্যাটো! মিঃ বাসু! আপনারা এখনো জীবিত আছেন?"

—"অত্যন্ত। কল্‌কাতায় আপনাদের মত বিখ্যাত ডাক্তারের অভাবে আমরা কিছুতেই মরতে পারিনি!"—এই ব'লে মিঃ চ্যাটো এসে বিনয়-বাবুর করমর্দ্দন করলেন।

মিঃ বাসুর সঙ্গে করমর্দ্দন করতে করতে বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কবে এলেন? কোথায় আছেন?"

মিঃ বাসু বল্‌লেন, "এসেছি কাল সন্ধ্যায়। আছি হোটেলে। বড়দিনের ছুটিটা এইখানেই কাটিয়ে যাব।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "আপনারা কল্‌কাতা অন্ধকার ক'রে এসেচেন—আমরাও তাই আলোকের সন্ধানে পুরীতে এসেছি।"

—"কিন্তু ইলেক্‌ট্রিকের আলোর অভাব এখানে অত্যন্ত। আপনাদের মন উঠ্‌বে কি?"

—"সেই পরীক্ষাই তো করতে চাই!"

তার পর পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বিনয়-বাবু বেয়ারাকে চা আন্‌বার হুকুম দিলেন।... ... ...

মিঃ চ্যাটোকে পেয়ে কুমার-বাহাদুরও যেন বর্ত্তে গেলেন। তিনি বেশ বুঝ্‌লেন, এইবার তাঁর দল ভারি হোলো—আর তাঁকে কোণঠাসা হ'য়ে থাক্‌তে হবে না। ক'জনের ইংরেজী বুক্‌নিতে অকস্মাৎ বিনয়-বাবুর বাড়ী মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল,—আমরা কিন্তু ভবিষ্যতের কথোপকথনের ভাষা থেকে সে বুক্‌নিগুলি বাদ দিয়েই লিখ্‌ব।

সন্ধ্যার মুখে মিঃ চ্যাটো কুমার-বাহাদুরকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। তিনি ক্রমেই সমুদ্রতীরের নির্জ্জন অংশের দিকে যাচ্ছেন দেখে কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "এদিকে কেন?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে।...এস, এইখানে বোসো।"

কুমার-বাহাদুর কলের পুতুলের মতন মিঃ চ্যাটোর সঙ্গে এগিয়ে, সমুদ্রের ধারে একখানা উল্‌টানো ডিঙির উপরে গিয়ে বস্‌লেন।

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "তার পর? আসল খবর কি?"

কুমার-বাহাদুর ম্রিয়মাণ স্বরে বল্‌লেন, "বিশেষ কিছু সুবিধে ক'রে উঠ্‌তে পারিনি।"

—"অর্থাৎ?"

—"এখানে এসে পর্য্যন্ত বিবাহের কথা আর ওঠেনি।"

মিঃ চ্যাটো ক্রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লেন, "নরেন, তুমি একটি গণ্ডমূর্খ! তোমার জন্যে আমার যা করবার, প্রাণপণে করেচি। তোমাকে গাছের উপরে তুলে দিয়েচি, তবু তুমি ফল পাড়্‌তে পারচ না? এমন মূর্খের সঙ্গে আমি আর কোন সম্পর্ক রাখ্‌তে চাই নে!"

কুমার-বাহাদুর কাতরভাবে বল্‌লেন, "আপনি যদি আমার অবস্থা বুঝ্‌তেন, তা হ'লে আমার উপরে কখনই রাগ করতেন না!"

কুমার-বাহাদুরের কাতর মিনতিতে কর্ণপাত না ক'রে তেমনি উগ্রভাবেই মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "জানো, আজ পর্য্যন্ত তোমার পিছনে আমার কত টাকা খরচ হয়েচে? আট হাজার টাকা! পুরী থেকে বার-বার তুমি আরো টাকা চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেচ! আমি কি টাকার পাহাড়? এ গুরুভার চিরকাল যদি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে

রাখ্‌তে চাও, তা হ'লে স'রে দাঁড়ানো ছাড়া আমার আর উপায় নেই।"

—"কিন্তু আমার দশা কি হবে তা হ'লে ?"

—"সে ভাবনা তুমি ভেব। হয় আত্মহত্যা, নয় ভিক্ষা—এই তোমার শেষ পরিণাম।"

—"আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে আর কিছু দিন সাহায্য করুন।"

—"অর্থাৎ, আমাকে আরো টাকা দিতে হবে—তোমার বিলাসী জীবনকে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে! কেমন, তুমি এই বল্‌তে চাও তো? কিন্তু তার পর তুমি যদি বিফল হও, আমার টাকা কে দেবে? একটা মাটির ভাঁড়ের যে দাম, তোমাকে বেচ্‌লেও তো সে দাম আদায় হবে না।"

—"মিঃ চ্যাটো, আমি এত দিনে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হতুম, কিন্তু ঐ রতন ছোঁড়াই মাঝে থেকে আমার সাধে বাদ সাধ্‌চে।"

মিঃ চ্যাটো অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লেন, "সে কি! এরা কি রতনের সঙ্গে স্থনীতির বিবাহ দিতে চায়?"

—"না, না, তা কেন?"

—"রতন কি তবে তোমার গুপ্তকথা জান্‌তে পেরেচে?"

—"না, তাও নয়। আসল কথা কি জানেন? এখানে রতন ক্রমেই দেবতার মত হ'য়ে উঠ্‌চে, আর আমি ক্রমেই পিছনে স'রে যাচ্ছি।"

—"তার মানে, তোমাকে ঠেলে' ফেলে' রতন তোমার শূন্য আসনে উঠে বস্‌বার চেষ্টা করচে?"

—"আমার তো সেই সন্দেহ হয়!"

—"এর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে রতন তোমার চেয়ে বুদ্ধিমান্!"

—"না, তা আমি মানি না। দৈব তার সহায়।"—এই ব'লে কুমার-বাহাদুর বিশেষ ক'রে যে-ঘটনার জন্যে রতনের আদর বেড়ে উঠেছে, আদ্যোপান্ত তা বর্ণনা কর্‌লেন। তার পর স্থনীতির কাছে কাল যে-ভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এই-সঙ্গে সেটাও মিঃ চ্যাটোকে জানিয়ে দিলেন।

মিঃ চ্যাটো সমস্ত শুনে' চিন্তিতমুখে অনেকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে রইলেন। কুমার-বাহাদুরও কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্‌লেন, "আজ আবার মিঃ ঘোষ রতনের জন্যে এক সম্মান-ভোজের আয়োজন করেচেন, আমারও নিমন্ত্রণ আছে।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "তাই তো, পথ-থেকে-কুড়িয়ে-আনা একটা কাঙালকে নিয়ে তো বড় মুস্কিলে পড়্‌তে হ'ল দেখ্‌চি!"

কুমার-বাহাদুর হতাশভাবে বল্‌লেন, "ওর জন্যে আমি হ'য়ে আছি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন। ওকে না সরাতে পার্‌লে আর উপায় নেই!"

মিঃ চ্যাটোর মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল! তিনি বল্‌লেন, "ইতিমধ্যে কল্‌কাতায় থাক্‌তে রতনের এক গুপ্তকথা আমি আবিষ্কার করেচি। একদিন স্থবিধে বুঝে সেইটেকেই কাজে লাগাতে হবে!"

কুমার-বাহাদুর সাগ্রহে ব'লে উঠ্‌লেন, "কি, কি গুপ্তকথা?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "যথাসময়ে শুন্‌তে পাবে। আপাততঃ তোমার কর্ত্তব্য শোনো। রতনের সঙ্গে তুমি সন্ধি স্থাপন কর। সে যাতে তোমাকে বন্ধুভাবে নেয়, সেই চেষ্টায় থাক। তার মনের কথা যত জান্‌তে পার ততই ভালো। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দরকার, তোমাকে স্থনীতি ভালোবাসে কি না সেইটে জান্‌তে পারা।"

—"বোধ হয় বাসে।"

—"বোধ হয় বল্‌লে চল্‌বে না—আগে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে হবে। কারণ স্থনীতির মত থাক্‌লে তার বাপ-মায়েরও অমত হবে না, এ আমি ঠিক জানি। তুমি একবার যখন কথা তুলেচ, তখন দ্বিতীয়বার কথা তোলা বেশ সহজই হবে ব'লে মনে করি!'

—"কিন্তু আমার পকেট যে একেবারে খালি! হাত-খরচও কর্‌তে পার্‌চি না!"

—"আচ্ছা, আরো মাস-দুয়েক আমি তোমার খরচ চালাব—তার পর আর আমার ক্ষমতায় কুলোবে না, এটা কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রেখো!"

—"মিঃ চ্যাটো, এ-জগতে আপনিই আমার

শ্রেষ্ঠ বন্ধু! আপনার ঋণ এ-জীবনে আমি পরিশোধ করতে পারব না!"

কিন্তু মিঃ চ্যাটো এ কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ভুল্‌লেন না। পাকা সওদাগরের মত শুষ্ক ওজন-করা ভাষায় বল্‌লেন, "পরিশোধ করতে পারবে না কি? পরিশোধ করতেই হবে! তুমি বেশ জেনো, মনে-মনে আমরা কেউ কারুর বন্ধু নই—স্বার্থই আমাদের এক ক'রে রেখেচে। আমি কল্‌কাতার সম্ভ্রান্ত ধনী-সমাজে শিকার খুঁজে' বেড়াই—এই আমার ব্যবসা। তুমি আমার পণ্যের মতন। এমন পণ্য আমি আরো বিকিয়েচি। আমি জানি, মিঃ সেন একজন খুব ধনবান্ লোক। ডাক্তারিতে আর নানা ব্যবসায়ে অংশীদার হ'য়ে তিনি অনেক টাকা জমিয়েচেন। তিনি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করেন। তাঁর এই দুর্ব্বলতাই আমার সহায়। আমি আরো জানি, মিঃ সেনের মত নির্ব্বোধের মতন উদার। তিনি মেয়ে আর ছেলের দাবি সমান ব'লে ভাবেন। সুনীতির বিবাহে তিনি যৌতুক-রূপে যে সম্পত্তি দেবেন, তার অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তোমার। এই আমার সর্ত্ত। এই সর্ত্তের একটু এদিক্-ওদিক্ হ'লে বিবাহের পরেও তোমার সুখস্বপ্ন আমি ভেঙে দিতে পারব। বুঝেচ নরেন? পাছে তুমি ভুলে' যাও, তাই সমস্ত ব্যাপারটা আর-একবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম। আমি তোমাকে মাথায় তুলেচি, আবার দরকার হ'লে আমিই তোমাকে পায়ের তলায় ফেল্‌তে পারি!"

কুমার-বাহাদুর দুঃখিতভাবে বল্‌লেন, "মিঃ চ্যাটো, আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ঠকাব না, কিন্তু আপনি বড় হৃদয়হীনের মত কথা কইচেন! আমি সত্যিই আপনার উপকৃত বন্ধু,—আমাকে বিশ্বাস করুন!"

মিঃ চ্যাটো কঠিন হাস্য ক'রে বল্‌লেন, "প্রেম, বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা—ও-সব কাব্যের কথা, ব্যবসা-ক্ষেত্রে একেবারে অকেজো! সংসারটা হচ্চে মস্ত এক ব্যবসা-ক্ষেত্র—এখানে সব-চেয়ে যা উচ্চ, সেই মাতৃস্নেহই নিঃস্বার্থ নয়! মাও নিজের রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানের কাছ থেকে প্রতিদানের আশা রাখেন। যে স্বার্থহীন প্রেমের কথা বলে, আমার মতে সে হয় কপট, নয় নির্ব্বোধ। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না—খালি তোমাকে কেন, কারুকেই না! বিশ্বাস কর্‌লেই আমি ঠকব। ততক্ষণই বন্ধুত্বের প্রাণ, যতক্ষণ দুই পক্ষের কেউ কারুর স্বার্থে বাধা না দেয়! তুমি আমাকে বন্ধুত্বের কথা শোনাচ্চ? হা, হা, হা, হা!" মিঃ চ্যাটো উচ্চস্বরে উপহাসের হাসি হাস্‌তে লাগ্‌লেন!

কুমার-বাহাদুর অবাক্ হ'য়ে মিঃ চ্যাটোর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর নিম্নমুখী মনের গতিও এই অদ্ভুত ও কুৎসিত যুক্তি শুনে' যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেল!

চৌদ্দ

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সাম্‌নের চাতালে, চেয়ারের উপরে ব'সে ব'সে সবাই কথাবার্ত্তা কইছেন।

একদিকে বিনয়-বাবু ও সেন-গিন্নী পাশাপাশি ব'সে আছেন, তাঁদের সাম্‌নে একটা বেতের টেবিল,—পূর্ণিমার হাতে-বোনা কারুকার্য্য-করা প্রচ্ছাদনীতে ঢাকা। টেবিলের ও-ধারে আনন্দ-বাবু, তাঁর দুপাশে রতন ও সন্তোষ। কুমার-বাহাদুর একটু তফাতে একখানা ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায় আছেন। সুনীতি ও সুমিত্রা বাড়ীর ভিতরে—পূর্ণিমা যেখানে রান্নাঘরে ব্যস্ত হ'য়ে আছে, সেখানে সাহায্য করতে গেছে।

সাম্‌নেই সমুদ্র—সীমা থেকে অসীমে, অসীম থেকে সীমায় ক্রমাগত ব্যস্তভাবে আনাগোনা কর্‌ছে—তালে তালে, গতি-লীলার ছন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে! আজ পূর্ণিমা তিথি, সাগরের কালো বুকে আলোর দোলা দুলিয়ে আকাশ-সায়রে চাঁদ স্থির হ'য়ে আছে।

কথা হচ্ছিল সাহসের। কুমার-বাহাদুর একটু আগেই মতপ্রকাশ করেছিলেন, "সাধারণতঃ ইংরেজেরা দেশী লোকের চেয়ে সাহসী।"

রতন বল্‌লে, "আমার তাতে সন্দেহ আছে। কোন্ যুক্তিতে আপনি এ মত প্রকাশ কর্‌লেন?"

—"দেখুন, পথে-ঘাটে ইংরেজ কথায়-কথায় দেশী লোককে আক্রমণ করে। প্রায়ই সে মারে, কিন্তু মার খায় না। কল্‌কাতার গড়ের মাঠে ফুটবল খেলায় জন-

কতক ইংরেজের ভয়ে আমি হাজার হাজার দেশী লোককে পালাতে দেখেচি। এথেকে কি প্রমাণিত হয়?"

—"কিছুই প্রমাণিত হয় না। একজন মাত্র ইংরেজকেও আমরা ব্যক্তিগতভাবে দেখি না, দেখি সমগ্র রাজশক্তির মূর্ত্তিমান্ প্রকাশের মতন। কারণ এটা প্রায়ই দেখা গেছে যে, একজন মাত্র ইংরেজকে আঘাত ক'রে অনেককে বিরাট্ রাজশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করতে হয়েচে—অর্থাৎ নিষ্পেষিত হ'তে হয়েচে। প্রত্যেক ইংরেজও আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখে না, সেও জানে যে, নামেই সে একা, আসলে তার পিছনে দেহ-রক্ষীর মত সমগ্র রাজশক্তি সতর্কভাবে জেগে আছে। সে 'নেটিভ'কে খুন করলেও তার ফাঁসি হবে না—এই দীর্ঘকালের ব্রিটিশ রাজত্বে আজ পর্য্যন্ত তা হয়নি। এই সচেতনতাই তাকে সাহায্য করে, আর আমাদের পিছনে হটিয়ে দেয়। আমাদের স্বদেশেও স্বজাতির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আছে অসংখ্য। বলবান্ ভৃত্যও দুর্ব্বল প্রভুর হাতের মার নীরবে হজম করে, শত শত গরীব প্রজাকে জমিদার-পক্ষের একজন মাত্র কর্ম্মচারী অবাধে নির্যাতন ক'রে আসে,—কিন্তু এ-সব কি সাহসের পরিচয়, না কাপুরুষতার অভিনয়?"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "কিন্তু আমার মতে, আমরা যদি প্রকৃত সাহসী হতুম, তা হ'লে এত ভেবে চিন্তে কাজ করতে পারতুম না। মিঃ ঘোষ সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন।......বেশী বুদ্ধিমান্ হ'য়েই আমরা নিজেদের সর্ব্বনাশ করেচি। এই ধরুন, আপনার কথাই। আমি ভীরু নই, কিন্তু সাত-পাঁচ ভেবে তব তো সেদিন আমিও রুখে' দাঁড়াতে পারলুম না! আপনি কিন্তু প্রকৃত সাহসী, তাই একলা অতগুলো ইংরেজকেও বিরুদ্ধে দেখে' ভয় পেলেন না! হাঁ, একেই বলি সাহস!"

আনন্দ-বাবু ও বিনয়-বাবু অবাক্ হ'য়ে কুমার-বাহাদুরের মুখের দিকে তাকালেন এবং সব-চেয়ে বিস্মিত হ'ল সন্তোষ—কারণ রতন সম্বন্ধে তার মত সেইই বেশীরকম জানত। তারই মুখে আজ রতনের সুখ্যাতি!

রতন কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হ'ল না, সে বল্‌লে, "মাপ করবেন কুমার-বাহাদুর, আলোচনায় যখন নিজেদের কথা ওঠে, তখন তা বন্ধ করাই উচিত।"

কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "আমি সত্য কথাই বলচি, আপনাকে লজ্জিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আপনার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা—"

রতন বাধা দিয়ে বল্‌লে, "আমার সম্বন্ধে আপনার এই উচ্চ ধারণার জন্যে আপনাকে আমি ধন্যবাদ দিচ্চি। কিন্তু দয়া ক'রে অন্য প্রসঙ্গ তুলুন—সুখ্যাতি শুনে' শুনে' আমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়েচি!"

এমন সময়ে সুনীতি ও সুমিত্রাকে নিয়ে পূর্ণিমা সেখানে এসে দাঁড়াল।

আনন্দ-বাবু একবার সমুদ্র ও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "কি চমৎকার রাত্রি! রতন, এখন কথা বন্ধ ক'রে একটি গান গাও।"

রতন বল্‌লে, "তাতে আমি নারাজ নই! আজ আমারও গান গাইতে সাধ হচ্চে!"

—"পূর্ণিমা, হার্মোনিয়ামটা আন্‌তে ব'লে দে তো মা!"

—"না, না, প্রকৃতির এই স্বাভাবিক উৎসব-সমারোহের মধ্যে একটা কৃত্রিম যন্ত্রের আওয়াজ সব মাধুর্য্য নষ্ট ক'রে দেবে! তার চেয়ে এই পরিপূর্ণ পূর্ণিমাতে যদি পূর্ণিমা দেবীও আমার সঙ্গে তাঁর মধুর কণ্ঠ মেলান, তবে গানটি যথার্থই সকলের ভালো লাগ্‌বে!"

আনন্দবাবু বার বার মাথা নেড়ে বল্‌লেন, "অবশ্য, অবশ্য!"

বিনয়-বাবু উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লেন, "চমৎকার প্রস্তাব!"

পূর্ণিমা কিন্তু লজ্জিত-মুখে নারাজ হ'য়ে বল্‌লে, "আমি পারব না!"

সেনগিন্নী বল্‌লেন, "গাও না মা পূর্ণিমা, লজ্জা কি?"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "উনি একে গাইয়ে মানুষ, তার ওপরে কি গান ধরবেন, আমি পারব কেন?"

রতন বল্‌লে, "আমি আপনার জানা-গানই গাইব। আমার গান তো এখানে সবাই শুনেচেন, আজ আপনিও প্রমাণ ক'রে দিন যে, ও-বিদ্যাটি এখানে খালি আমারই একচেটে নয়!"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "বাজে তর্কে চাঁদের আলো ব'য়ে যাচ্চে—পূর্ণিমা, আমি আর অপেক্ষা করতে পারচি না!"

অগত্যা বাধ্য হ'য়ে রতনের সঙ্গে পূর্ণিমা গান ধরলে—

"ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে......"

যুক্ত কণ্ঠের মুক্ত সুরের কুহক-মন্ত্রে আকাশে বাতাসে সাগরে ও চাঁদের আলোতে যেন এক স্বপ্নলোকের কল্পনা পুলক জেগে উঠল—সামনের ঐ শত তরঙ্গের হিন্দোলায় যেন সেই পুলকই বিশ্ব-কবির ভাষায় আপনার প্রাণের কথা বল্‌ছে আর বল্‌ছে! .. ...সকলেই স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "বাবা, সেই বিকেল থেকে রান্না-ঘরের গরমে ব'সে আছি, মাথাটা বড় ধরেচে, একবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে বেড়িয়ে আসব?"

—"একলা?"

—"একলা না যেতে দাও, রতন-বাবু আমার সঙ্গে চলুন।"

—"বেশী দূরে যাস্‌নে যেন!"

—"না, এখনি ফিরে আসচি! আসুন রতন-বাবু!"

পূর্ণিমা ও রতন চ'লে গেল। সুমিত্রা নীরবে তাদের দিকে চেয়ে রইল!... ...

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা বিনয়, রতনের মতন ছেলেকে তোমার জামাই করতে সাধ যায় কি না?"

বিনয়-বাবু বিস্ময়-ভরে বল্‌লেন, "হঠাৎ তোমার এ প্রশ্ন কেন?"

—"যা জিজ্ঞাসা করলুম আগে তার জবাব দাও।"

—"এ-কথা তো আমি কখনো ভেবে দেখিনি, এক কথায় কি ক'রে জবাব দিই? তবে রতন যে সুপাত্র, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

—"শুধু সুপাত্র নয় বন্ধু, দুর্লভ পাত্র! রূপে-গুণে প্রায় অদ্বিতীয়!"

সেনগিন্নী বল্‌লেন, "কিন্তু বংশগৌরব নেই, আর বড় গরীব। স্ত্রীকে পালন করতে পারবে না।"

কুমার-বাহাদুর আগ্রহের সঙ্গে উৎকর্ণ হ'য়ে সব কথা শুন্‌ছিলেন। এখন সেনগিন্নীর মত জেনে তাঁর ঠোঁটের কোণে সকলের অগোচরে আশ্বস্তির একটি ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল! তার বুক থেকে যেন একটা বোঝা নেমে গেল। রতন তা হ'লে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পারবে না।

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "বেশী টাকা আর বেশী গরীবানা এই দুইই মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে। কিন্তু দারিদ্র্যের নিম্ন-স্তরে নেমেও রতন তার চরিত্র হারায়নি, সুতরাং দারিদ্র্য তার পক্ষে সম্মানের।...সে গরীব কি ধনী আমাদের তা দেখ্‌বার দরকার নেই। আমার তো মনে হয়, রতনের যখন চরিত্র আর মনুষ্যত্ব আছে, আমি অনায়াসে তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করতে পারি। তার যদি পয়সার অভাব থাকে, আমি যা যৌতুক দেব তাইতেই তার সে অভাব মিটে যাবে।"

সকলের মধ্যেই বেশ-একটু উত্তেজনার সঞ্চার হ'ল —আনন্দ-বাবু রতনের সঙ্গে পূর্ণিমার বিবাহ দিবেন! .. সুমিত্রা ফিরে তাকিয়ে দেখ্‌লে, দূরে চন্দ্রকরোজ্জ্বল সাগর-সৈকতে রতন ও পূর্ণিমা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে!

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কিন্তু রতনের আত্মসম্মানবোধ কি রকম জান তো? তোমার দেওয়া যৌতুকের টাকার উপর নির্ভর ক'রে সে যে পূর্ণিমাকে বিবাহ করতে রাজি হবে, আমার তো তা বিশ্বাস হয় না।"

—"আমিও অবশ্য তাই মনে করি। সে-ক্ষেত্রে আমি তাকে সাহায্য করব। তার প্রতিভা আছে, পৃষ্ঠ-পোষকের অভাবেই সে খালি রোজগার করতে পারচে না। আমি তার পৃষ্ঠপোষক হব।"

—"তুমি কি সত্যিই রতনকেই তোমার জামাই করবে ব'লে স্থির করেচ?"

আনন্দ-বাবু মস্তক আন্দোলন করতে করতে বল্‌লেন, "স্থির আমি কিছুই করিনি,—যা বল্‌লুম কথার কথা মাত্র! আমি খালি বল্‌তে চাই, রতন আমার জামাই হ'লে আমি খুব সুখী হব। এ কথা রতন বা পূর্ণিমা কেউই জানে না। বিশেষ, রতন আর পূর্ণিমা দুজনেই দুজনের বন্ধু বটে, কিন্তু তারা পরস্পরকে বিবাহ করতে

রাজি হবে কি না, আমিও তা জানি না—অথচ, তাদের সম্মতি আগে দরকার। তবে তারা রাজি হ'লে আমি বাধা দেব না। এ প্রসঙ্গ আর নয়—ঐ ওরা আস্‌চে!"

রতন ও পূর্ণিমা সমুদ্রের ধার থেকে ফিরে এল। সকলেই তাদের দিকে কেমন এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বারংবার তাকিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। রতন তা লক্ষ্য কর্‌লে, কিন্তু কারণ বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

কুমার-বাহাদুর হতাশভাবে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, আমি এখনো অগাধ জলে তলিয়ে আছি, কিন্তু এই রতন লোকটা কি ভাগ্যবান্! এখনো এ জানে না, কি সৌভাগ্য এর জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে! মিঃ ঘোষের সমস্ত সম্পত্তি, আর পূর্ণিমার মত সুন্দরী! এ পেলে আমি এখনি সুনীতিকে ছাড়্‌তে রাজি আছি!—ভগবানের অন্যায় পক্ষপাতিতা দেখে' কুমার-বাহাদুর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন।

রতনের হঠাৎ সুমিত্রার কথা মনে পড়্‌ল। কিন্তু এ'দিকে ওদিকে চেয়ে কোথাও তাকে দেখ্‌তে পেলে না।

... ...রতন ও পূর্ণিমা ফিরে আস্‌বা মাত্র, সকলের অজান্তে সুমিত্রা সেখান থেকে উঠে' গেছে!

ক্রমশঃ

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

কবি

চল্‌রে কবি চল্,
ঐ সাঁঝ-আঁধিয়ার আস্‌ছে নেমে,
উঠ্‌বি কিনা বল্?
ঐ চেয়ে ছাখ্ পুব-কিনারে
মেঘ জমেছে গগন-ধারে,—
শাঙন-সাঁঝের অন্ধকারে
ঝর্‌তে পারে জল;
বর্ষা-সাঁঝে ভরসা কিসের?—
চল্‌রে কবি চল্।

নীরব কবি রে,—
কোন্ অতল-তলে তলিয়ে গেছে
বিরাট্ গভীরে,—
ঢাক্‌ল গগন গহন মেঘে,
ঝড়ের হাওয়া উঠ্‌ল বেগে,
আমি তারে শুধাই রেগে—
ভেজায় কিবা ফল?
বাদল মেঘে মাদল বাজে
চল্ রে কবি চল্।

উঠ্‌ল কবিবর,
আমায় বলে—"চলো, চলো"—
ভাঙা গলার স্বর।
আঁধার নামে ভুবন ঘেরি'—
বৃষ্টি ঝরার নাইক দেরি,
বিদ্যুতেরই আলোয় হেরি—
চোখ্ দুটি ছল্‌ছল্—,
এবার বলি—"কবি, কবি—
কি হয়েছে বল্!"

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

মহীশূরে কফি-চাষ

দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশে চা রবার এবং কফির চাষের বহুল-প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে অনেক বিদেশী চা-কর রবারওয়ালা এবং কফি-ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যেই ইহারা এই-সব ব্যবসায়ে বহু অর্থ খাটাইতেছে এবং ইহাদের চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে অনেক পতিত জমিতে বেশ ভাল ফসল হইতেছে। মহীশূর প্রদেশে কফি-চাষের প্রথম অবস্থা হইতেই, অনেকে, ইহা যে কফির উৎপাদনের একটি কেন্দ্রস্থল হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং কফি-চাষের বাল্যাবস্থা হইতেই অনেক ইংরেজ যুবক এখানে এই কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে। প্রথমে যদিও, সময় সময়, কফি-ফসলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ এবং নিরাশার সঞ্চার হইয়াছিল, তবুও মোটের উপর কফি-ফসলের অবস্থা বরাবরই বেশ ভালই চলিতেছে। প্রথম দিকে প্রত্যেক ক্ষেত্রের মালিক ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু রবার এবং চা-এর চাষের জন্য প্রায়ই কফি-ক্ষেত্রে কাজ করিবার লোকাভাব ঘটিতে লাগিল। এই কারণে এখন মহীশূরে কফির চাষ একরূপ সমবায় পদ্ধতিতে হইতেছে। এক এক জন লোক অনেকগুলি ক্ষেত্রের ম্যানেজার হইয়া কাজ চালাইতেছে। প্রথম প্রথম মাসিক ৬০ হইতে ১০০ টাকা বেতনে কফি চাষের জন্য ম্যানেজার পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই সামান্য বেতনে লোক পাওয়া একরকম অসম্ভব, কারণ একই স্থানে রবার বা চা-এর কাজে ম্যানেজারীর বেতন অনেক বেশী।

মহীশূরে কফি-চাষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে গেলে মিঃ আর এইচ্ ইলিয়ট্ লিখিত "Gold, Sport and Coffee Planting in Mysore নামক পুস্তকের উল্লেখ করিতে হয়। এই পুস্তকে কফি-ব্যবসায় সম্বন্ধে নানা বহুমূল্য তথ্য আছে, তবে ইহার কতক অংশ সাধারণ পাঠকের ভাল লাগে না, তাহা কেবল ব্যবসায়ীদের উপযোগী। ইহার আর কতক অংশ সাধারণ পাঠকেরও পড়িতে বেশ ভাল লাগে। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কফি-চাষ সম্বন্ধে কোন সরকারী কেতাব বা খাতাপত্র নাই। কথিত আছে যে একজন আরব সন্ন্যাসী, আরবদেশ হইতে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে কফি-বীজ আনিয়া, বাবাবুদান পাহাড়ের উপর তাঁহার মন্দিরের চারিদিকে বপন করেন। মিঃ ইলিয়ট বলেন :—

"কফি-বীজ যতদিন পূর্ব্বেই মহীশূর প্রদেশে আনা হোক না কেন, ইহার রীতিমত চাষ আবাদ কিন্তু গত শতাব্দীর (১৮) শেষ ভাগের পূর্ব্বে হয় নাই। কফি-গাছের পরিচয় যদিও লোকেরা বহুকাল হইতেই জানিত, তথাপি ইহার ব্যবহার বেশীদিন হয় নাই।..."



একটি কফি-উৎপাদক প্রদেশ

এইসময় হইতেই কফির প্রচলন বহুলভাবে আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যেই ইহার ব্যবহার বেশী হইতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই ভোর বেলায় কফি তৈয়ার হয়, এবং ইহা পানে লোকদের স্বাস্থ্যও নাকি ভাল থাকে।

ভারতবর্ষের ঐ-অঞ্চলের জলহাওয়ার পক্ষে কফি অত্যন্ত উপকারী, অনেকেই এই কথা বলেন। চায়ের প্রতিযোগিতার জন্য কফির প্রচলন এখনো তেমনভাবে হইতেছে না, কিন্তু কফির ব্যবহার দিন দিন যেমনভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং লোকেরা যেমন আদরের সহিত ইহার অভ্যর্থনা করিতেছে তাহাতে মনে হয় কিছুকালের মধ্যেই কফির প্রচলন সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িবে। বর্ত্তমান সময়ে মহীশূরে যে কফি উৎপন্ন হয়, তাহা ভারতবর্ষেই বিক্রয় হইয়া যায়, পূর্ব্বে ইহা বিদেশে রপ্তানি হইত।



মহীশূর রাজ্যের প্রাচীনতম কফি-বাগানের ভিতরকার বাঙ্গলো

প্রথম যে কফি মহীশূরে পাওয়া যায়, তাহার উৎপত্তি কোথা হইয়াছে, তাহা ঠিক-মত জানা যায় না। এই কফি "চিক্" নামে পরিচিত। "চিক্‌মাগালুর" সহরের নিকট ইহার চাষ-আবাদ হয় বলিয়াই ইহার এই নাম। মিঃ ইলিয়টের পুস্তকে এই চিক্ কফির বিষয় লিখিত আছে :—

"এই কফির অবস্থা গোড়াতেই বেশ আশাপ্রদ ছিল, এবং ইহার ফসল যে বহুকাল পর্য্যন্ত বেশ ভালই হইবে, এমন আশাও অনেকে করিতেন, কিন্তু তাহার পর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে তিন বছর অনাবৃষ্টি-জনিত গরম ভয়ানক হওয়ায়, পোকা কফির ক্ষেত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এইসময় এই কফি গাছের বাড়নের অবনতি হইতে থাকে। এই অবনতি এত ভয়ানক হয় যে, যদি চাষীরা কেবলমাত্র এই চিক্ কফির উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিত তাহা হইলে এইখানেই কফি-চাষের শেষ হইত। বাবাবুদান পাহাড়ের উপর উঁচু জমিতে কেবল কয়েকটি ক্ষেতে কফি-চাষ ভাল করিয়া হইতে পারিত।"

এই বিপদ্ এড়াইবার জন্য কুর্গ্ হইতে অন্য এক-প্রকার কফির বীজ আনা হইল এবং মহীশূরের জমিতে ইহা বেশ ভালরূপে জন্মিতে লাগিল। পরীক্ষার দ্বারা যখন দেখা গেল যে কুর্গের কফি মহীশূরের জমিতে বেশ ভাল করিয়াই গজাইবে তখন পুরানো সব জমিতেই আবার পূর্ণ উদ্যমে কফি চাষ আরম্ভ হইল। যেখানে খালি জমি পাওয়া গেল, তাহাই খুব চড়া দরে ক্রয় করিয়া তাহাতে কফির চাষ আরম্ভ করা হইল। বিলাতের কফিব্যবসায়ীরা এই নূতন কফি সম্বন্ধে বিশেষ আস্থাবান্ বলিয়া মনে হইল না, কারণ তাহারা বলিল যে, কুর্গের কফি তাহারা মহীশূরের কফির দামে কিনিতে পারিবে না।

"কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, যে, কুর্গের বীজ হইতে উৎপন্ন কফি-গাছগুলি যত বাড়িতে লাগিল ততই তাহাদের ফলগুলি মহীশূরের কফি-ফলের মত সমান দরের হইতে লাগিল। এবং ক্রমে এই নূতন কফি লণ্ডনের বাজারে পুরানো মহীশূর-কফি অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রি হইতে লাগিল।"

মহীশূর-কফির দাম বেশী হইবার কারণ মহীশূরের আব্‌হাওয়া এবং জমি খুব চমৎকার এবং কফির বীজ ছায়াতে ধীরে ধীরে পাকান হয়। ইলিযট্ সাহেব এই ছায়াতে "কফি-ফল ক্রমে ক্রমে পাকান" সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। রৌদ্র আট্‌কাইবার জন্যই যে ছায়ার প্রয়োজন তাহা নহে—কফিক্ষেত্রের উপর দিয়া শুষ্ক বায়ু বহিয়া যায়, তাহা রোধ করিবার



কফি-কারখানার একটি দৃশ্য

জন্যও বৃক্ষের ছায়ার প্রয়োজন। এই শুকনো হাওয়া যদি কোন ভিজে জমির উপর দিয়া যাওয়া-আসা করে, তবে তাহা অচিরেই কেঠো জমিতে পরিণত হইবে। কেঠো জমিতে কেবল কফি নয়, প্রায় কোন ফসলই ভাল হয় না। এই ছায়া রচনা করিবার দুটি উপায় আছে। প্রথম—ক্ষেত্রের উপর সমস্ত গাছ পোড়াইয়া দিয়া পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট স্থানে কিছুদূর অন্তর অন্তর করিয়া বৃক্ষ লাগানো। দ্বিতীয়—জঙ্গলের সমস্ত আগাছা পোড়াইয়া দিয়া, তার পর মাঝে মাঝে বড় বড় গাছও নষ্ট করা। অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে তাহাতে কফি গাছেরা যথেষ্ট পরিমাণে ছায়া হইবে এবং শুকনো হাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে। মিঃ ইলিয়ট এই বিষয়ে বলেন ঃ—

"যতদূর সম্ভব পূর্ব্বের বৃক্ষদের ছায়াদানের জন্য রক্ষা করা উচিত, কারণ জমির উপর বৃক্ষাদি পোড়ান হইলে তাহা বৃক্ষাদি-না-পোড়ান জমি অপেক্ষা অনেক কম দিনে ভাল ফসল দেয়।"

ছায়াদানের জন্য নানাপ্রকার বৃক্ষের ব্যবহার আছে, তবে মহীশূর প্রদেশে রূপালি ওক নামক বৃক্ষের ব্যবহার খুব বেশী হয়।

প্রথম জমি নির্ব্বাচন করিবার সময় চাষীকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। কারণ সে যদি প্রথমেই স্বাভাবিকভাবে, অযথা রৌদ্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অথবা পূবে হাওয়া হইতে রক্ষিত জমি পায় তবে তাহার ফসল ভাল হইবে। এই জমি যদি উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব, অথবা উত্তর-পশ্চিমমুখী হয় এবং মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের বৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে পায় অথচ দরকারের বেশী বৃষ্টি না পায়



কফি-বাগানের একদল কুলী-রমণী

তাহা হইলে কফির ফসলের পক্ষে আরো ভাল। প্রত্যেক দেশেই, যেখানে কফির চাষ হয়, সেখানেই একটি করিয়া কফি-চাষের উপযোগী নির্দ্দিষ্ট সীমা (a line of coffee zone) আছে। এই সীমা বা zoneএর একমাইল এদিকে বা ওদিকে কফি জন্মিবে না। মহীশূরে ইহা বেশ ভাল করিয়া দেখা যায়। কফি-গাছ স্যাঁৎসেঁতে এবং গরম স্থানে ভাল হয়। কফির ক্ষেত্র যে-কোন রকমের বাদাটে জমিতে করা যায়। তবে



কফির বস্তাবাহী দল

করা হয় ও তাহার মধ্যে এক ফুট চওড়া দুই ফুট গভীর করিয়া গর্ত্ত খোঁড়া হয়। এইগর্ত্তে কচি চারা বসাইয়া দেওয়া হয়।

কফির চারা যেখানে প্রথম গজান হয়, সেই স্থানটি ভারি চমৎকার। যেখানে সহজে জল পাওয়া যায়, এমন একটি পরিষ্কার জায়গা স্থির করা হয়। ঐ জমিটি দুই ফুট গভীর করিয়া খনন করিয়া পাথরশূন্য করা হয়। তার পর জমিটিকে বেশ পরিষ্কার করিয়া এবং সার ঢালিয়া বীজ লাগাইবার উপযুক্ত করা হয়। প্রত্যেক চারফুট অন্তর জমির মধ্যে চলাফেরা করিবার জন্য পথ রাখা



কফির শুঁটি বাছাই করা হইতেছে

জমির উপরে গাছগাছড়ার সার উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই এবং জমির নীচে বেশী পাথর না থাকাই ভাল। অনেক রকম জমিতে কফির চাষ হয়। ঘন-বৃক্ষাচ্ছাদিত জমিতে, বেঁশো জমিতে, কেঠো জমিতে, ইত্যাদি নানাপ্রকার জমিতে কফির চাষ হয়। তবে যে-সব জমিতে গাছপালা পচিয়া সার হইয়া থাকে এবং বেশী রোদ হাওয়াও পায় না, সেইসব জমিতেই কফি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে হয়। জমি স্থির করা হইয়া গেলে পর, জমির উপরের আগাছা এবং অপ্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি সমস্ত নষ্ট করিয়া ক্ষেত্র হইতে যেমন করিয়াই হোক সরাইয়া ফেলিতে হয়। গরম কালে যে-সমস্ত গাছ বেশ ঘন ছায়া দেয় কিন্তু বর্ষার সময় বিশেষ ছায়াদান করে না, কেবল, সেই সমস্ত বৃক্ষই কিছুদূর অন্তর অন্তর রক্ষা করিতে হইবে। এই-সমস্ত কার্য্য হইয়া গেলে পর সারি সারি খোঁটা পুঁতিয়া ছয় ফুট লম্বা ছয় ফুট চওড়া ক্ষেত্র তৈরী হয়। বীজ লাগাইবার ছয় সপ্তাহ পরে অঙ্কুর দেখা দেয় এবং অঙ্কুর আট ইঞ্চি লম্বা হইলে পর দুইটি ডিম্বাকৃতি পাতা তাহাতে গজায়। তাহার পর দশ মাস এই শিশু-কফিগাছকে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। দশ মাস পরে শিশু-গাছগুলিতে ৬।৭টি করিয়া কচি-কচি ডাল গজায়। তার পর বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের আরম্ভের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ক্ষেত্রে কফি-গাছগুলিকে লাগাইয়া দেওয়া



কফির খারাপ শুঁটি বাছাই করা হইতেছে

হয়। অনেকে, বীজ হইতে অঙ্কুর গজাইবার পর তাহাতে এক জোড়া পাতা যখন ফুটিয়া উঠে তখন, প্রত্যেকটি চারা-গাছকে এক-একটি ছোট ঝুড়িতে করিয়া রাখে। ক্ষেতে লাগাইবার সময় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় যেন চারার প্রধান শিকড় কোন রকমে বাঁকিয়া না যায়। চারাকে বেশ শক্ত করিয়া লাগাইতে হয়। চারা লাগাইবার দ্বিতীয় বৎসরে গাছের মাথা ছাঁটাই করা হয়। গড়ে তিন ফুট করিয়াই ছাঁটিতে হয়। কেহ কেহ অবশ্য দুই ফুট বা চার ফুট করিয়াও গাছ ছাঁটে।

তৃতীয় বৎসরে গাছে ফল ধরা আরম্ভ হয়। কিন্তু সপ্তম বৎসর না আসা পর্য্যন্ত চাষী পূর্ণ ফসলের আশা করিতে পারে না। এই সময় চাষীর সবচেয়ে চিন্তা এবং উদ্বেগের সময়। এপ্রিল মাসের বৃষ্টি পাওয়ার পর কফির ফুল হয়। এই সময় যদি বৃষ্টি সামান্য কয়েক বিন্দু কম হয়, তবে চাষীর সমস্ত আশা ভরসা চলিয়া যায়। তাহার হাজার হাজার টাকার লোক্‌সান হয়। এপ্রিল মাসে জল-হাওয়া নিয়ম মত পাইলে ডিসেম্বর নাগাদ ফল ঝাড়াই হইতে পারে। প্রথমে লাল ফলগুলিকে তুলিয়া ঝুড়িতে করিয়া ওজন করিবার এবং ধুইবার স্থানে লইয়া আসা হয়। জলের বেগে ফলের উপরের পাত্‌লা খোসা ছাড়িয়া যায়। তার পর ২৪ ঘণ্টা কাল ফলগুলিকে জল হইতে ছাঁকিয়া গাজিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ফলের উপর যে সামান্য শর্করা থাকে তাহা দৃঢ় হয়। হাল্‌কা ফলগুলিকে বাছিয়া ফেলা হয় এবং অবশিষ্ট ভাল ফলগুলিকে শুকাইবার জন্য মাদুরের উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে ফলগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিতে হয় এবং শুকাইতে প্রায় একদিন সময় লাগে। মাদুরে একদিন থাকিবার পর ফলগুলিকে ধীরে ধীরে শুকাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কফি ফল বেশ ভাল করিয়া শুকাইয়া গেলে পর



কফির শাঁস ছাড়ান

তাহা বাজারে পাঠাইবার বা চালান দিবার উপযুক্ত হয়।

কফি-চাষের বিষয় সামান্য একটু বলা হইল। এই কার্য্য বাহির হইতে সহজ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তবে একদল লোকের কাছে কফি-চাষ বিশেষ ভাল লাগিবে, কারণ এই কার্য্যে জঙ্গলের খোলা হাওয়াতেই বেশীর ভাগ সময় যাপন করিতে হয়। শিকার ইত্যাদির আনন্দও যথেষ্ট পরিমাণে ইহাতে আছে।

ব

ডঙ্কা-নিশান

নবম পরিচ্ছেদ

বন্ধক-পুরুষ

কিরাতগ্রাম থেকে কুমার চন্দ্রগুপ্ত বৈশালীর দ্বারগ্রামে পৌঁছে, মন্ত্রী শকটারের মুখে শুনলেন—বৈশালীর সাতজন মহামান্য নগর-জ্যেষ্ঠ গলায় কুঠার বেঁধে এবং দাঁতে তৃণ ক'রে মগধের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। গলায় কুঠার বাঁধার অর্থ এই যে, জয়ী মগধ ইচ্ছা করলে ঐ কুঠারেই তাদের মাথাগুলো দেহ থেকে বিচ্যুত করতে পারেন, তার জন্যে অন্যত্র অস্ত্র খুঁজ্‌তে যেতে হবে না। আর দাঁতে তৃণ করার উদ্দেশ্য, মগধের তুলনায় যারা তৃণভোজী জীবের সামিল, গোবেচারা ব'লে মগধ তাদের মার্জ্জনা করলে গোহত্যাটা আর ঘট্‌তে পায় না। মোট কথা বজ্জক-দুর্গ এখন মগধ-সেনারি কৃপার অধীন। সমস্ত শুনে চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করলেন—"হঠাৎ এদের মতি-পরিবর্ত্তনের কারণ ?"

"শুনলুম 'শ্রী'-মহাদেবীর উৎসব উপলক্ষে পণ্য-বীথিকার বেনেরা আলোর মালায় নগর সাজিয়েছিল। ঘি-মাখা সল্‌তের ঘিয়ের লোভে ইঁদুরে নাকি একটা প্রদীপ উল্‌টে ত্যায়, তাইতে বাজারে অগ্নি-কাণ্ড হ'য়ে শস্যাগার পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে; বৈশালীর হঠাৎ আত্ম-সমর্পণের এই হ'ল মুখ্য কারণ।"

"এখন কর্ত্তব্য ?"

"সেইজন্যেই তো তাড়াতাড়ি আপনাকে এখানে আনানো। বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কি, সে-বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে ক'রেই তো আপনাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মগধ থেকে সেনা-ভোজ্য ঠিকমত আস্‌ছিল না। তার উপর সুনক্ষত্রের চিঠিতে জান্‌লুম, মহারাজের শারীরিক অবস্থাও তেমন ভালো নয়। এঅবস্থায় আমাদের এখানে আর বেশী দিন থাকা সম্ভবও নয়, যুক্তিযুক্তও নয়। সুতরাং বৈশালী যে আত্মসমর্পণ করেছে, সেটা আমাদের সৌভাগ্যই বল্‌তে হবে।"

"কিন্তু বৈশালী পূর্ব্বেও অমন অনেকবার আত্মসমর্পণ ক'রে, পরে, মগধের পল্টন পিছন ফিরলেই নিজমূর্ত্তি ধারণ করতে বিলম্ব করে নি। সুতরাং এবার এদের একটু কায়দায় ফেল্‌তে চাই। সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের কুলপুত্রদের ভিতর থেকে জনকয়েক বন্ধক-প্রতিভূ নিতে চাই, তা হ'লে সন্ধি-বন্ধন অটুট রাখ্‌তে এরা বাধ্য হবে, কারণ অন্যথা করলে বন্ধক-প্রতিভূদের প্রাণ যাবে। সন্ধি পাকা করবার এই এক পন্থা আছে, অন্য পন্থা অবশ্য বৈশালীদুর্গের উচ্ছেদ-সাধন।"

প্রসন্ন শকটার স্মিতমুখে বললেন—"আপনি প্রবীণের মতন কথা বলেছেন। আমি ইতিমধ্যে সন্ধিপত্রের একটা খসড়া প্রস্তুত করেছি। আমার প্রথম প্রস্তাব হ'চ্ছে—মগধের রাজকুমারের হস্তে বৈশালীর মহাসম্মতের কন্যা-সমর্পণ। দ্বিতীয় প্রস্তাব, বৈশালীর কুলসঙ্ঘের শ্রেষ্ঠ কুলের অন্ততঃ দশজন কুলপুত্রকে সন্ধি-বন্ধনের বন্ধক-প্রতিভূ স্বরূপ পাটলিপুত্রে অবস্থানের জন্যে প্রেরণ। আর তৃতীয় প্রস্তাব হচ্ছে, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বৈশালীর পাঁচখানি দ্বার-গ্রাম মগধকে দান। তৃতীয় প্রস্তাবে সম্মত না হ'লে, অকারণ যুদ্ধ বাধানোর দণ্ড স্বরূপ

দশ কোটি মুদ্রা দণ্ডকর দিতে হবে, তা নইলে বৈশালীর সমস্ত অধিকারে, মগধের নির্দ্দিষ্ট রাজপুরুষ অর্থাৎ মগধের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।.... অবশ্য যতদিন দণ্ডকরের টাকা শোধ না হয় এ শাসন-প্রতিষ্ঠা ততদিনই বলবৎ থাকবে।"

চন্দ্রগুপ্ত ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"শেষের সর্ত্তে বৈশালী সম্মত হবে ব'লে মনে হয় না। তা' ছাড়া আমি উচ্ছিন্ন সন্ধির পক্ষপাতী নই।"

শকটার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—"কুটুম্বিতা না হ'তেই কুটুম্ব-প্রীতির উদয় হ'ল নাকি?"

চন্দ্রগুপ্তের মুখ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ ক'রে বল্লেন—"আপনি আমায় ভুল বুঝ্‌বেন না, আমার বক্তব্য এই, যে, রাজধানী থেকে যখন নিয়মিত সৈন্যভোজ্য আস্‌ছে না, তার মানে ইন্দ্রমূর্ত্তির দল প্রবল হয়েছে। মহারাজের অসুখ দেখে' এসেছি, সম্ভবতঃ তাঁর পীড়ার বৃদ্ধি ঘটেছে, আর আপনি এইমাত্র বল্লেন সুনক্ষত্রও তাই লিখেছেন। আর সুনক্ষত্র না লিখ্‌লেও এটা অনুমান করা কঠিন নয়, কারণ, তিনি সুস্থ থাক্‌লে সৈন্য-ভোজ্যের এরূপ অব্যবস্থা ঘটত না। তদ্ভিন্ন কিরাত-গ্রামে যাবার ঠিক আগে পাটলিপুত্র থেকে কিছু সৈন্য প্রার্থনা করেছিলাম। এপর্য্যন্ত সৈন্যও পাই নি, চিঠির উত্তরও পাই নি। মহারাজের পীড়া সত্যিই বৃদ্ধি হয়েছে; সুতরাং আমাদের চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। এ অবস্থায়, শত্রু যখন নিজে থেকেই শরণাপন্ন হয়েছে, তখন তার গলায় পা না দিয়ে একটু উদারতা দেখালে ক্ষতির চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। সন্ধির সর্ত্ত নিয়ে তর্ক ক'রে দিন কাটাবার মতন দীর্ঘ সময় আমাদের হাতে নেই। রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে, মহারাজের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকা পুত্র হিসাবে আমার কর্ত্তব্য, এবং উত্তরাধিকার হিসাবে আবশ্যক।"

"কিন্তু বৈশালী যদি এরূপ আপনা থেকে আত্মসমর্পণ না করত? তা হ'লে তো বিলম্ব করতেই হ'ত।"

"রাজনীতিতে 'হ'তে পারত'র জায়গা নেই। যা হয়েছে বা যা' হ'তে পারে, শুধু তাই নিয়েই আমাদের কারবার। মগধের বিচক্ষণ মহামাত্যকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া বাহুল্য ব'লে বিবেচনা করি।"

"আপনি রুষ্ট হবেন না, আমি আপনাকে পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।"

"আপনি আমার হিতৈষী, আমি আপনার উপর রাগ করতে পারিনে। যদি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করি দমন করবেন।"

শকটার প্রসন্নমুখে বল্লেন—"কুমার, আমি আপনাকে মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাট্ ব'লেই মনে করি। তা' ছাড়া এ অভিযানের আপনি সেনাপতি। সেইজন্যে আপনার সঙ্গে পরামর্শ অবশ্য-করণীয় ব'লে মনে করি।"

চন্দ্রগুপ্ত বল্লেন—"আমার মতামতের খুব বেশী মূল্য আছে ব'লে আমি মনে করিনে। কারণ, আমি জানি আপনাদের কাছে আমি বালক। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাই বল্লাম। বল্লাম ব'লেই যে সে মত গ্রহণ করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আপনি বহুদর্শী, বিচক্ষণ; বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি যা শ্রেয় মনে করেন তাই করবেন। যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আদেশ করবেন, আমি যথাসাধ্য করতে ত্রুটি করব না। কিন্তু রাজনীতির পাকা চাল চালা কাঁচা মস্তিষ্কের কর্ম্ম নয়।"

"তা হ'লে সন্ধির সর্ত্ত এখনি লিখে পাঠানো যাক্?"

"ক্ষতি কি?... ভালো কথা, বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে মহারাজকে না জানিয়ে পাকা করা উচিত হবে কি?"

"সময় অল্প, নইলে নিশ্চয়ই জানাতাম। আর তা ছাড়া বীরপুরুষেরা বলেন,—শত্রুর দুর্গ দখল করতে বা সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করতে দিনক্ষণ দেখ্‌বারও অবকাশ নেই; আর অন্যের মতামত নেবারও অবসর নেই; ও ভগবানের নাম ক'রে নিয়ে ফেল্‌তে হয়। তার পর তিনি যা' করেন।"

দশম পরিচ্ছেদ

সীমা-সাক্ষী

শকটার বিদায় হ'য়ে নিজের শিবিরে চ'লে গেলে, চন্দ্রগুপ্ত তাঁর একজন বাহুৎসার বা শরীর-রক্ষীকে ডেকে মসীপাত্র ও লেখনী চাইলেন। অনেক দিন

মায়ের খবর পান নি, তাই মাকে চিঠি লিখ্‌বেন। তাছাড়া মহারাজকেও লিখ্‌তে হবে। মসীপাত্রে কজ্জল নেই দেখে বাহুৎসারকে কাজলের চেষ্টায় শিবিরান্তরে পাঠিয়ে কুমার নিজের বিয়ের প্রসঙ্গটা কিভাবে চিঠিতে প্রথমে উত্থাপন করবেন তাই মনে মনে ভাব্‌ছিলেন। বাহুৎসারের বিলম্ব দেখে হঠাৎ মাথা তুলে' তাঁবুর দরজার দিকে চাইতেই বিস্ময়ে তাঁর মন ভ'রে উঠ্‌ল। আপাদ-মস্তক ধূলোয় আচ্ছন্ন একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরই তাঁবুর দিকে আস্‌ছে। কাছে এসে লোকটা ঘোড়া থেকে নেবে করজোড়ে চন্দ্রগুপ্তকে নমস্কার করলে।

"একি! গোপক তুমি! হঠাৎ এখানে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! বড়ো পাঠিয়ে দিলে।"

"বড়ো? বন্ধগোপ?"

"আজ্ঞে।"

"সে কি? কোনো বিপদ্ হয় নি তো? পাহাড়ীগুলো সন্ধি ভঙ্গ ক'রে সেনাগুল্মে হানা দিয়েছে নাকি?"

"আজ্ঞে না, সন্ধি বরং আরো পাকাই হয়েছে। সীমাসাক্ষী পাওয়া গেছে।"

"পাওয়া গেছে?...আমি যে বারণ করেছিলুম... তোমার ভাই কি কাউকে হত্যা কর্‌লে নাকি?"

"আজ্ঞে, না। আপনি চ'লে আসার পর, ক'দিন ধ'রে উৎসবই চল্‌ছিল। শেষদিনে আমাদের গোয়ালার গ্রামত মহিষের দঙ্গলে শূকর ছেড়ে দিয়ে শিঙের গুঁতোয় শূকর বলির আয়োজন করা হয়। কিন্তু মহিষ ওখানে বেশী পাওয়া গেল না। তাই চমরীর দঙ্গলেই শূকর ছাড়া হয়। চমরীগুলো একাজে অভ্যস্ত নয়, শূকর দেখে কেমন ভড়্‌কে গেল। শূকরটা পালাচ্ছিল; আমাদের মেজো তাকে আট্‌কাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে যায়; তাতে শূকরটা দাঁত দিয়ে তার পেট চিরে দ্যায়। সমস্ত নাড়ীভুঁড়ি বেরিয়ে পড়্‌ল। জানাশুনা গাছগাছ্‌ড়াও পাওয়া গেল না। পাহাড়ীরা বল্‌লে—বাঁচ্‌বে না।। তাই শুনে' মেজো বল্‌লে, যখন বাঁচ্‌বই না তখন আমাকেই সীমা-সাক্ষী করা হোক। বড়ো বারণ করেছিল, কিন্তু মেজো কিছুতেই শুন্‌লে না। সেপাইদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে নিশী'-রাতে কখন যে সে সীমান্তে গিয়ে হাজির হয়েছে তা কেউ জান্‌তে পারে নি। তার পরদিন সকালে যখন খোঁজ পড়্‌ল, এবং অনেক আতিপাতি ক'রেও মেজোকে পাওয়া গেল না, তখন বড়ো বল্‌লে—'তাহ'লে সর্ব্বনাশ হয়েছে, সে সীমা-সাক্ষী হ'তে সীমান্তে গেছে। বড় একগুঁয়ে সে, কাল বলেছিল আমি কান দিই নি।..বোধ হয় সর্ব্বনাশ হয়েছে।'

"তখনি সীমান্তের দিকে যাওয়া হ'ল। রোহিণী নদীর উৎসের কাছে পৌঁছে দ্যাখা গেল বড়ো যা বলেছিল তাই,—গলা পর্য্যন্ত মাটিতে পোঁতা আমাদের মেজো, খালি মাথা বেরিয়ে আছে; আর তার পিঠে পিঠ দিয়ে একটা পাহাড়ী,—তারও গলা পর্য্যন্ত পোঁতা! লোকটা দিন দুই আগে আমাদের একজন সেপাইকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা করে, সেপাইরাই তাকে গ্রেপ্তার করে; সেপাইরাই তাকে মেজোর কথায় এনে, মেজোর সঙ্গে জীবন্ত সমাধিস্থ করে। আমরা যখন গেলুম, তখনো মেজোর দেহে প্রাণ ছিল। বড়োকে দেখেই ক্ষীণ স্বরে বল্‌লে—'বড়ো, মগধের সীমা এইবার পাকা হ'ল।' তার পরেই শিবনেত্র হ'য়ে গেল। ..বড়ো পাগলের মতন দু'হাতের দশটা আঙুল বঁড়শীর মতন শক্ত ক'রে মাটি আঁচ্‌ড়ে তুলে ফেল্‌ছিল...হঠাৎ মেজোর মরা মুখের পানে চেয়ে বিড়বিড় ক'রে কি ব'লে, শেষে চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌ল—না, ভাই, তোর শেষ ইচ্ছে আমি পণ্ড করব না। গ্রামে যখন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পার্‌লাম না, তখন তুই যেখানে থাক্‌তে ইচ্ছে করেছিস্ সেইখানেই তোকে রেখে যেতে হবে। তোর মুমূর্ষু মুখের সত্যপালনই তোর সৎকার।... অন্যরকম সৎকারের চেষ্টা ক'রে তোর আত্মাকে আর কষ্ট দেব না। থাক, ভাই, এইখানেই থাক্, এই তোর কামনার স্বর্গ, এইখানেই তোর চৈত্য নির্ম্মাণ ক'রে দেব।... সীমা-সাক্ষীর কথা শুনে পর্য্যন্ত তুই সাক্ষী-প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলি। জানিনে সীমাসাক্ষী হবার লোভে এ তোর ইচ্ছামৃত্যু কি না।' "

এই পর্য্যন্ত ব'লে গোপক ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেল্‌লে। তরুণ চন্দ্রগুপ্ত শোকার্ত্ত এই গোয়ালার ছেলের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধ'রে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে

রইলেন। তাঁর কপালের শিরগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুলে উঠ্‌ল। তার পর একটা অসহ্য ব্যথাকে যেন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্যে বেগে দুই-একবার মাথা নাড়া দিলেন। তার পর ভাই-হারা রাখাল-ছেলের দুঃখে, সমবেদনায়, মগধের ভবিষ্যৎ সম্রাটের পাথরের মতন নিশ্চল মূর্ত্তির দুই চোখ দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। বন্ধুগোপের মৃত্যুঞ্জয়ী ভাইয়ের শেষ তর্পণ রাজপুত্রের চোখের জলে সমাপ্ত হ'ল।

(অসম্পূর্ণ)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কয়েকটি মূলসূত্র

(১)

একজন লোককে যদি অল্প একটু জল দেওয়া যায়, তা হ'লে সে সম্ভবতঃ সেটুকু খাবে—তা দিয়ে পা ধোবে না। জলের পরিমাণ যদি একটু বাড়ান যায়, তা হলে হয়ত খাওয়া ছাড়া, রান্না বা অপর কোন খুব দরকারি কাজে সে কিছু জল ব্যবহার করবে। যদি একটু একটু করে' জলের পরিমাণ বাড়িয়ে চলা যায়, তা হলে দেখা যাবে, যে, সে ক্রমে ক্রমে কম প্রয়োজনীয় ব্যবহারেও জল খরচ করবে। অর্থাৎ পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রয়োজনীয়তা তার কাছে কমে যাবে। এর থেকে একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে, যে, কোন ভোগ্যের, ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘকে, তৃপ্তিদানের ক্ষমতা, সেই ভোগ্য ইতিপূর্ব্বে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংঘের দ্বারা কি পরিমাণে ভুক্ত হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে, এবং পূর্ব্বভুক্ত ভোগ্যের পরিমাণ যতই বেশী হয়, ততই, নূতন করে' যা আসে, তার প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। এমন কি, এমন সময় আস্‌তে পারে, যখন ভোগ্যের পরিমাণবৃদ্ধির ফলে তার প্রয়োজনীয়তা বা তৃপ্তিদানের ক্ষমতা লোপ পেয়ে তার একটা অপ্রয়োজনীয়তা বা অতৃপ্তিদানের ক্ষমতা জন্মগ্রহণ করে। যথা, যদি পূর্ব্বোক্ত লোকটিকে তিরিশ কোটি ঘড়া জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায়, তা হলে তার তৃপ্তিলাভের পথে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হবে। এর থেকে একটি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যাচ্ছে। সেটি এই, যে, ভোগ্যের প্রয়োজনীয়তা (তৃপ্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যদানের ক্ষমতা) ক্রমশঃ বিলীয়মান। এক কথায়, এ'কে ভোগ্যের ক্রমশঃ বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা বলা যায়। এক গেলাস জল যদি এক ব্যক্তিকে ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, দুই গেলাস জল তাকে ২ ক অপেক্ষা কম স্বাচ্ছন্দ্য দান করবে, দশ গেলাস জল হয়ত তাকে সব শুদ্ধ ৬ ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করবে। দশ গেলাস জল যদি একব্যক্তিকে না দিয়ে দশ ব্যক্তিকে এক গেলাস করে' বা ৫ গেলাস করে' দুই ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তা হলে সেই একই দশ গেলাস জল থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কি না ভোগ্যসমষ্টি ভোগীসমষ্টির মধ্যে কি ভাবে বণ্টন করা হবে, তার উপর ভোগ্যের স্বাচ্ছন্দ্যদান-ক্ষমতা নির্ভর করে। কেন না, স্বাচ্ছন্দ্য ভোগীর মনের একটা অবস্থা মাত্র, ভোগী ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অর্থ হয় না। একজনকে যদি অতি-ভোজন করান যায়, আর দুইজনকে অর্দ্ধভোজনে রাখা যায়, তা হলে যে-পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে, তার চেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে যদি তিনজনকেই পরিমিত ভোজন করান হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, একই পরিমাণ ভোগ্যের নানান্‌ পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য দান করার ক্ষমতা আছে এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য তা হতে পাওয়া যাবে, তা ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর নির্ভর করবে। এ-বিষয়ে বেশী কিছু বলার আগে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুটি কথা বলা দরকার।

প্রথম কথা হচ্ছে এই, যে, কোন ভোগ্যের থেকে তৃপ্তি আহরণ করতে হলে সেই ভোগ্য বস্তু অন্তত একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। তার চেয়ে কম পরিমাণ থাকলে কিছুমাত্রও তৃপ্তি তা হতে পাওয়া

যায় না। যথা, ধরা যাক্ জলের সম্বন্ধে সেই তৃপ্তি-দানারম্ভের সীমা দশ ফোঁটা, অর্থাৎ দশ ফোঁটার কম জল থেকে কেউ কোন তৃপ্তি পেতে পাবে না। তৃষ্ণার্ত্তকে দশ ফোঁটার কম জল দিলে তার তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তিই হবে। দশ ফোঁটার থেকে যদি জলের পরিমাণ এক এক ফোঁটামাত্র করে' ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তা হলে কিছুদূর অবধি তার তৃপ্তিদান-ক্ষমতা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল থাকে এবং তার পরে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে তার তৃপ্তিদান-ক্ষমতা কমতে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে, কোন ভোগ্যের পরিমাণ অতিরিক্ত কম হলে ভোগীর প্রথমে অতৃপ্তিলাভ হয় (যখন তার পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকে অর্থাৎ আস্বাদন দিয়ে শুধু ভোগের ইচ্ছা বাড়িয়ে এবং অভাবটা ভাল করে' বুঝিয়ে দেয়), তার পর হয় (অল্পদূর অবধি) ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীল ভাবে তৃপ্তিলাভ, তারপর সম্ভবত কিছুদূর তৃপ্তিলাভ অপরিবর্ত্তনশীল থাকে, অতঃপর তৃপ্তিলাভ বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে হয় এবং অত্যধিক পরিমাণে ভোগ্যের মাত্রা বাড়ালে পুনরায় অতৃপ্তির সূত্রপাত হয়। (আমাদের দেশে জলকষ্ট দিয়ে সুরু করে' বন্যা অবধি এলে এই সত্যের একটা উদাহরণ পাওয়া যায়।) দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই, যে, কোন কোন স্থলে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম খাটে না। যেমন মাতালের মদ খাওয়া। মদের মাত্রা বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে মাতাল আরও খেতে চায়। তার তৃপ্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলে (এক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায়, যে, ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বা তৃপ্তিদান-ক্ষমতার জের অল্পদূর অবধি না থেকে এত বেশীদূর অবধি চলে, যে, তা শেষ হবার আগেই মাতাল ভোগশক্তি রহিত হয়ে পড়ে)। অথবা ডাকটিকিট-সংগ্রাহকের টিকিটের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তিও বেড়ে চলে। (অবশ্য এ-স্থলে টিকিটগুলিকে এক নামে চালালেও সেগুলি সব বিভিন্ন প্রকার, সুতরাং সবগুলি একজাতীয় ভোগ্য নয়। যদি কোন সংগ্রাহক ভারতবর্ষের পঞ্চম জর্জ্জের মুখ ছাপা এক আনা দামের টিকিটই শুধু সংগ্রহ করে, তা হলে টিকিটের সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে তার তৃপ্তি বেড়ে চলে কি না সন্দেহ)। আর আছে কৃপণ। সে যতই জমায়, তার জমাবার ইচ্ছা ততই বেড়ে চলে। (এস্থ-লে অবশ্য প্রথমতঃ বলা যায়, যে, কৃপণতা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার প্রকাশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ বলা যায়, যে, এ-ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বহুদূরব্যাপী হয়ে রয়েছে। তৃতীয়তঃ বলা যায়, যে, কৃপণ ত ভোগ্য-বিশেষ জমায় না, সে জমায় টাকা, অর্থাৎ কি না, সাধারণ ভাবে কিনবার ক্ষমতা। এসব ছাড়া কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ক্রমাগত জমিয়ে যাবার ইচ্ছা বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা নির্দ্দেশ করছে বলা শক্ত। 'আরও চাই' বলার মানে এ নয়, যে, 'আগে যা পেয়েছি তাতে যে অনুপাতে তৃপ্তিলাভ করেছি পরে যা পাব তা থেকেও সেই অনুপাতে বা তার চেয়ে বেশী অনুপাতে তৃপ্তি পাব'। চতুর্থ গেলাস জল যদি কেউ চায়, তার দ্বারা প্রমাণ হয় না, যে, তার কাছে প্রথম তিন গেলাসের প্রয়োজনীয়তা চতুর্থ গেলাসের তুলনায় কম। অসাধারণ উদাহরণগুলি নিয়ে অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু শুধু ঐ-বিষয়টি নিয়েই তা হ'লে অনেক লিখতে হয়। এইসব উদাহরণের অস্তিত্বের জন্য আমাদের মূল বিষয়ের বিচার আটকায় না।

বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা একটা সাধারণ নিয়ম। বিশেষ বিশেষ স্থলে বর্দ্ধনশীল প্রয়োজনীয়তা বহুদূরব্যাপী স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুই কারণেই হতে পারে। তাতে কিছু যায়-আসে না।

আগেই বলা হয়েছে যে একই পরিমাণ ভোগ্য বা ভোগ্যসমষ্টির বিভিন্ন পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্যদান করবার ক্ষমতা আছে, এবং কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যাবে, তা নির্ভর করে ভোগ্যসমষ্টি বণ্টন কি ভাবে হয়, তার উপর। এই সত্যের মূলে রয়েছে ভোগ্যের বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তা। সামাজিক আয় একটি ভোগ্যসমষ্টি এবং সে-ভোগ্যসমষ্টি ভোগ করে সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা। এখন, সামাজিক আয়টি কি অনুপাতে এই ব্যক্তিরা পায়, তার উপর, সেই আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে, তা নির্ভর করে। এক ব্যক্তি সমগ্র সামাজিক আয়ের অর্দ্ধেক এবং আরও দশজনে বাকি অর্দ্ধেকের

ছয় আনা পরিমাণ পেতে পারে। হয় ত দশ হাজার লোক পাবে দুই আনা পরিমাণ। এটা মোটেই উৎকৃষ্ট রকমের বিভাগ হল না। বণ্টনপ্রণালী পরিবর্ত্তন করে' স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির ক্ষেত্র এখানে খুবই রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে, একই পরিমাণ সামাজিক আয় বণ্টন-প্রণালী পরিবর্ত্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারে।

যদি কোন ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগান যায়, তা হলে সেই ভোগ্যের পরিমাণ বলে একটা কিছু থাক্‌বে নিশ্চয়ই। পরিমাণ কি ভাবে ভাষায় প্রকাশিত হবে, তা, ভোগ্যটি কি এবং কোন সমাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে। যেমন, কখন সের, পাউণ্ড বা কিলোগ্রাম হিসাবে তা প্রকাশিত হবে, কখন গজ বা মিটার হিসাবে, কখন ঘণ্টা হিসাবে (সময় হিসাবে, যেমন গাড়ীভাড়া, চাকরের মাইনে, মাষ্টারের বেতন, ইত্যাদি), কখন সংখ্যা হিসাবে, কখনও বা শক্তি, পরিধি বা ঘনত্ব পরিমাপক অন্য কোন ভাষায়। * আমরা সাধারণতঃ বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য সব ভোগ্যের পরিমাণকে মাত্রায় প্রকাশ করব। যেমন এক মাত্রা কাপড় বা তৃতীয় মাত্রা চাল। আমাদের শুধু কয়েকটি সহজ বুদ্ধির কথা মনে রাখ্‌তে হবে। যেমনঃ—দুই মাত্রা এক মাত্রার চেয়ে বেশী, দশ মাত্রা কুড়ি মাত্রার চেয়ে কম, তৃতীয় মাত্রার কথা বল্লে প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রা যে আছে, এটা ঠিক। বিশেষ বিশেষ স্থলে সব-কিছু বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হবে, কিন্তু সাধারণ ভাবে 'মাত্রা' কথাটাই চল্‌বে।

কয়েক মাত্রা ভোগ্য যদি কারুর থাকে, তা হলে কোন ব্যবহারে তাকে লাগালে যেমন মাত্রা বাড়িয়ে যাওয়া যাবে, তেমনি বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে পরের মাত্রাগুলি আগের গুলির চেয়ে কম স্বাচ্ছন্দ্য দেবে। কাজেই একই ভোগ্য যদি একের বেশী ব্যবহারে লাগান যায়, তা হলে, কোন ব্যবহার বিশেষে অতিরিক্ত মাত্রায় সেই ভোগ্যটি না লাগিয়ে, সব ব্যবহারে হিসাব করে' লাগালে একই পরিমাণ ভোগ্যের থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্তি লাভ হবে। কেউ যদি একশ মাত্রা সুতা কেটে থাকে, সে-সুতা দিয়ে ধুতি, গামছা, বিছানার চাদর, উড়ানি প্রভৃতি অনেক-কিছু প্রস্তুত করতে পারে (অর্থাৎ সুতার অনেকগুলি ব্যবহার আছে)। সে যদি শুধু ধুতিই প্রস্তুত করে তা হলে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধুতি দিয়ে তার স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি খুব হবে না। ধুতি প্রস্তুতে দশম মাত্রা সুতা লাগালে তার যদি ক পরিমাণ তৃপ্তি লাভ হয়, একাদশ মাত্রা ঐ একই ব্যবহারে লাগালে যদি তা থেকে ½ ক পরিমাণ তৃপ্তি লাভ হয় এবং গামছা প্রস্তুতে প্রথম মাত্রা সুতার তৃপ্তিদান ক্ষমতা যদি ¾ ক পরিমাণ হয়, তা হলে ধুতি তৈরীতে দশম মাত্রার পর আর একাদশ মাত্রা সুতা ব্যবহার না করে' সেই সুতাটুক প্রথম মাত্রা রূপে গামছা তৈরীতে লাগালে ¼ ক পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওয়া যাবে। সুতরাং কোন মাত্রা ভোগ্য কোন ব্যবহারে লাগানর পূর্ব্বে দেখা উচিত, যে, অন্য কোনো ব্যবহারে লাগিয়ে তা থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় কি না।

যে-মাত্রার ব্যবহারে কোন ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি হয়, সেই মাত্রা সেই ক্ষেত্রের (ব্যবহারের) সীমাস্থিত মাত্রা (marginal dose) এবং সেই মাত্রা সেই ক্ষেত্রে ব্যবহার করে' যে-টুকু প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়, সেই প্রয়োজনীয়তাটুকু হচ্ছে সেই ভোগ্যের সেই ক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা (marginal utility)। একটি ভোগ্যের যদি চার রকম ব্যবহার থাকে, তা হলে, যে পরিমাণ ভোগ্য আছে, তা এমন ভাবে ঐ চার ব্যবহারের মধ্যে ভাগ করে' দিতে হবে, যে, সব ক্ষেত্রেই যেন সেই ভোগ্যের সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হয়, অর্থাৎ যেন কোন ক্ষেত্রেই সেই ভোগ্যের সীমাস্থিত মাত্রা অন্য ক্ষেত্রের সীমাস্থিত মাত্রার চেয়ে কম প্রয়োজনীয়তা না দেয়। কেন না সে রকম স্থলে যে ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়, সেখানেই ভোগ্যটুকু ব্যবহৃত হলে স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওয়া যাবে! সর্ব্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হলে তা থেকে মোটে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যাবে এবং

* যেমন Horse power, candle power, foot pounds, calory grammes, acres, sq. feet, cubic feet, ইত্যাদি।

সমান হওয়া সম্ভব না হলে যত বেশী সমতার দিকে যাবে ততই প্রয়োজনীয়তা বেশী পাওয়া যাবে।

প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ

মাত্রা	প্রথম ব্যবহারে	দ্বিতীয় ব্যবহারে	তৃতীয় ব্যবহারে	চতুর্থ ব্যবহারে
১ম	১০ ক পরিমাণ	৯ ক পরিমাণ	৮ ক পরিমাণ	৭ ক পরিমাণ
২য়	৯ ক "	৮ ক "	৭ ক "	৬ ক "
৩য়	৮ ক "	৭ ক "	৬ ক "	৫ ক "
৪র্থ	৭ ক "	৬ ক "	৫ ক "	৪ ক "
৫ম	৬ ক "	৫ ক "	৪ ক "	৩ ক "
৬ষ্ঠ	৫ ক "	৪ ক "	৩ ক "	২ ক "
৭ম	৪ ক "	৩ ক "	২ ক "	১ ক "
৮ম	৩ ক "	২ ক "	১ ক "	১/২ ক "
৯ম	২ ক "	১ ক "	১/২ ক "	১/৪ ক "
১০ম	১ ক "	১/২ ক "	১/৪ ক "	১/৮ ক "

উপরের তালিকা মত যদি কোন ভোগ্য থেকে প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়, তা হলে প্রথম ব্যবহারে দ্বিতীয় মাত্রা ভোগ্য লাগানর পূর্ব্বে দ্বিতীয় ব্যবহারে প্রথম মাত্রা লাগান স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবে না। প্রথম ব্যবহারে দ্বিতীয় মাত্রা লাগানও অপচয় হবে। দ্বিতীয় ব্যবহারে দ্বিতীয় মাত্রা লাগানর পূর্ব্বে চতুর্থ ব্যবহারে প্রথম মাত্রা লাগানও অপচয় হবে। যদি ভোগ্য শুধু বার মাত্রা পরিমাণ থাকে, তা হলে চারটি ব্যবহারে তিন তিন মাত্রা লাগালে সবশুদ্ধ প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যাবে (১০+৯+৮)+(৯+৮+৭)+(৮+৭+৬)+(৭+৬+৫) = ২৭+২৪+২১+১৮ = ৯০ ক পরিমাণ।

এইরূপ করিলে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা প্রথম ক্ষেত্রে হচ্ছে ৮ক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৭ক, তৃতীয় ক্ষেত্রে ৬ক ও চতুর্থ ক্ষেত্রে ৫ক, অর্থাৎ কি না অসমান। আগেই বলা হয়েছে, যে, সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সকল ক্ষেত্রে সমতা যত বাড়বে ততই প্রয়োজনীয়তা বেশী পাওয়া যাবে। এখন উপরের তালিকা মত অবস্থাতে (মাত্রার ভগ্নাংশ ছেড়ে দিলে) সর্ব্বাপেক্ষা সমতারক্ষা হয় প্রথম ব্যবহারে পাচ মাত্রা, দ্বিতীয় ব্যবহারে চার মাত্রা, তৃতীয় ব্যবহারে দুই মাত্রা ও চতুর্থ ব্যবহারে এক মাত্রা লাগালে; তাতে পাওয়া যাবে—(১০+৯+৮+৭+৬)+(৯+৮+৭+৬)+(৮+৭) + (৭) = ৪০+৩০+১৫+৭ = ৯২ক পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ২ক বেশী।

এর থেকে আমরা একটি সাধারণ নিয়ম পাচ্ছি। সেটিকে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তার সাম্য বা অধিকতম প্রয়োজনীয়তা লাভের উপায় বলা যেতে পারে।

ব্যবহারকে ব্যক্তির স্থান দিলে এর সঙ্গে বিলীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়মের সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যবহারের কাছে ভোগ্যের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বিলীয়মান। এবং বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে ভোগ্যবণ্টনপ্রণালীর উপর তার প্রয়োজনীতা-দানক্ষমতা নির্ভর করছে।

(২)

ভোগ্য উৎপাদন কি ভাবে হয়, এখন তা দেখতে হবে। ভোগ্য উৎপাদনের প্রধান উপকরণ তিনটি প্রকৃতি (nature), মানুষ (labour) ও মূলধন (capital)। প্রকৃতি আমাদের যা কিছু ভোগ্য বা তার উপকরণ দেয়, তাকে প্রকৃতি বলা হচ্ছে। যথা জমি, জঙ্গল, জল, বায়ু, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। মানুষকে প্রকৃতির থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। তার কারণ মানুষের বিশিষ্টতা এই, যে, সে শুধু ভোগ্য উৎপাদনের একটা উপায় মাত্র নয়; সে ভোগ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যও বটে। মানুষের দ্বারা এবং মানুষের জন্য ভোগ্য উৎপাদিত হয়। প্রকৃতিদত্ত উপকরণগুলির জন্য মানুষকে কোনো শ্রম করতে হয় না। অবশ্য এদের ভোগযোগ্য করে' তুলবার জন্য শ্রম অনেক ক্ষেত্রেই করতে হয়; কিন্তু সে অন্য কথা। এরা যে আছে, সে মানুষ থাকলেও আছে, না থাকলেও আছে। যে-ক্ষেত্রে মানুষের শ্রমের সাহায্য ছাড়া প্রকৃতি উপভোগ্য হয় না, সে-ক্ষেত্রে প্রকৃতি শুধু উপকরণ রূপেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

মানুষ বলতে মানুষের শ্রমই বুঝায়। প্রকৃতির কাছ থেকে ভোগ্য আদায় করে' নিতে শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। ধরা যাক, সমুদ্রে অনেক মাছ আছে। মানুষ যদি নিজের শ্রমে সেই মাছ ধরে' আনে, তা হলে তাকে কি শুধু প্রকৃতির দান বলা চলে? মাছের যে তৃপ্তিদানের ক্ষমতা, সে শুধু মাছের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। অতল জলের তলায় যে মাছ রয়েছে, তাকে কি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে ভোগ্য বলা যায়? সুবিধা মত স্থানে মাছের স্থিতি না হলে তার তৃপ্তিদানক্ষমতা থাকে না। এবং ভোগ্যের স্থিতি মানুষের দিক্ থেকে যত বেশী সুবিধামত স্থানে হবে, ততই তার তৃপ্তিদানক্ষমতা বেশী। যেমন,

ব্যাপারী মাছ গৃহস্থের দরজায় এনে দিচ্ছে, সেইজন্যই ব্যাপারীর শ্রমের একটা মূল্য আছে। সে মাছের তৃপ্তি-দানক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে, বলা যায়। জঙ্গলে কাঠ আছে বলে' দিলে, ত, গৃহস্থের উনুন জ্বলে না; কাজেই কাঠুরের শ্রমের একটা মূল্য আছে। সে, কাঠ যে-খানে কাজে লাগবে, সেইখানে এনে দিচ্ছে, অর্থাৎ কিনা কাঠের তৃপ্তিদানক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। অন্য ভাষায় বলা যায়, যে, কাঠুরে প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জঙ্গলের কাঠ, আর নিজের শ্রমে তাকে করে' তুল্‌ছে উনুনের কাঠ। কয়লার খনির কুলি প্রকৃতির কাছে পায় মাটির তলার কয়লা, আর নিজের শ্রমে তাকে করে' তুল্‌ছে মাটির উপরের কয়লা। মুক্তা-উত্তোলক প্রকৃতির কাছে পাচ্ছে জলের তলায় শুক্তি, আর নিজের শ্রমে তাকে করে' তুল্‌ছে গলার হারের মুক্তা। জঙ্গলের কাঠ ও উনুনের গোড়ার কাঠ, মাটির তলার কয়লা ও মাটির উপরের কয়লা, জলের তলার শুক্তি ও গলার হারের মুক্তা, এসবের কি প্রয়োজনীয়তাসিদ্ধির ক্ষমতা বা প্রয়োজনীয়তা সমান? দ্বিতীয় গুলির যদি প্রয়োজনীয়তা বেশী থাকে, ত, বেশীর ভাগটা আস্‌ছে কোথা থেকে? উত্তর:—মানুষের শ্রমশক্তি থেকে।

প্রাকৃতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্ত্তন করে' কেমন করে' মানুষের শ্রম তার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে, তা আমরা দেখ্‌লাম। এখন দেখ্‌ব, কি করে' বিভিন্ন প্রাকৃতিক জিনিষ মিলিয়ে বা প্রাকৃতিক জিনিষের আকৃতি পরিবর্ত্তন করে' শুধু শ্রম-সাহায্যে (বা অন্য কোন প্রাকৃতিক জিনিষের সাহায্যে) মানুষ ভোগ্য উৎপাদন করে। রন্ধন, নানা জিনিষ মিলিয়ে ভোগ্য উৎপাদনের একটি উদাহরণ। তাপের ও জলের সাহায্যে মাটি থেকে ইট তৈরী করা আর-একটি উদাহরণ। মানুষের শ্রম কেমন করে' প্রকৃতিকে ভোগযোগ্য করে' তোলে এর দ্বারা বোঝা যায়।

নানা জিনিষ মিলিয়ে দেওয়া বা একটার সাহায্যে আর-একটিকে বদ্‌লান, বিশ্লেষণের দিক্ থেকে জিনিষের স্থিতি পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছু নয়। আলুর স্থিতি ক্ষেত থেকে কড়ায় এনে ফেলা এবং সেই একই কড়ায় পটল, মশলা, নুন ইত্যাদি নানা জায়গা থেকে এনে ফেলা ও কড়ার তলায় তাপের সংস্থান দ্বারা রন্ধন হয়। একে প্রাকৃতিক জিনিষের স্থিতি পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কি বলা যায়?

গাছের গুঁড়ি কেটে চেঁচে টেবিল তৈরী করা শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক জিনিষকে নূতন আকৃতি দেওয়ার উদাহরণ। বড় জোর অন্য কিছুর মিশ্রণে তাকে পালিশ করে' তোলা হয় বা তার অংশগুলিকে একত্র রাখা হয়। কাঠ ও পালিশ একত্র স্থাপন, কাঠ ও পালিশের স্থিতি পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছু নয়। কাঠকে টেবিলের আকৃতি দান করাও কাঠের নানা অংশ বাদ দিয়ে বাকি-টুকু রাখা ছাড়া আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে বলা যায়, যে, মানুষ নিজশ্রমে বাদ দেওয়া অংশগুলির স্থিতি পরিবর্ত্তন কর্‌ল।

এখন দেখ্‌তে হবে মূলধন কি। মূলধন সেই ধন, যা অন্য ধন উৎপাদনের মূল। যে-ধনের সাহায্যে নূতন ধন উৎপন্ন হয়, তাই মূলধন। কিন্তু তা হলেও মূলধন ধন ছাড়া আর কিছু নয়। অন্য সব ধনের মত প্রকৃতি ও মানুষের সাহায্যেই মূলধন উৎপন্ন হয়। কেবল ভোগের উদ্দেশ্যে মূলধন উৎপাদন করা হয় না, ভোগ্য উৎপাদনের সহায়তার জন্যই মূলধন উৎপাদিত হয়। অবশ্য ভোগের জন্য যা উৎপাদন করা হয়, তাকেও মূলধনরূপে অনেক সময় ব্যবহার করা যায়। মূলধনকেও ভোগ্য বলা চলে, যদিও তার ভোগ অন্য ভোগ্যের ভিতর দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কাল ধরে' হয়।

প্রকৃতির থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে' মানুষ একটি জাহাজ তৈরী কর্‌ল। আর কর্‌ল লোহার বঁড়শী ও তাঁতের দড়ী এবং মাছ ধরার জাল। এগুলি মানুষ অবিলম্বে ভোগ করতে পার্‌বে, এ-আশায় উৎপাদন করেনি। আশা এই, যে, বহুকাল ধরে' এরই সাহায্যে সমুদ্রের মাছ ধরা যাবে। এখন এই জাহাজ ও মাছ ধরার সরঞ্জাম হচ্ছে মূলধন। মূলধন ভোগ্য হলেও সাক্ষাৎ ভাবে নয়। কেউ কেউ মূলধনের কোন কোন শ্রেণীকে যন্ত্রজাতীয় ভোগ্য নাম দেন।

কিন্তু একথা বলে' রাখা দর্‌কার, যে, মূলধন হলেই

যে তা অবিলম্বে ভোগ্য হবে না, তা নয়। যেমন, একখানা নৌকা। মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হ'ল এটা মূলধন; আবার বেড়িয়ে বেড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত হলে তা নয়। কেননা, ব্যবহারক তার সাহায্যে কিছু উৎপাদন করছেন না, তা থেকে তৃপ্তিই আহরণ করছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে, ভোগ্যটি মূলধন কিনা তার বিচার হয়, সেটি কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা দিয়ে। মূলধন কি এবং কি মূলধন নয়, এ নিয়ে অনেক কট তর্ক চলে। সে সব বাদ দিয়ে আমরা শুধু ধরে' নিচ্ছি, যে, যে ধন সাক্ষাৎভাবে ভোগ্য উৎপাদনের সহায়ক রূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই মূলধন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, প্রধানতঃ প্রকৃতি ও মানুষ এই দুয়ের সাহায্যেই ভোগ্য উৎপাদন হয়। এবং কোন কোন ভোগ্য ভবিষ্যতে ভোগ্য উৎপাদনে সহায়তা করবে, এই উদ্দেশ্যে উৎপাদিত, রক্ষিত এবং ব্যবহৃত হয় (যথা, যন্ত্র ইত্যাদি)। এদের নাম মূলধন। সুতরাং মূলধনকে আলাদা করে' ধরলে ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণ তিনটি—প্রকৃতি, মানুষের শ্রম, ও মূলধন।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

বিদ্রোহী

সেদিন কি তিথি ছিল মনে নেই। কিন্তু বেশ মনে আছে, টিয়ে-পাখীর পালকের মত গাছের পাতাগুলির উপর জ্যোৎস্নার ধারা সেদিন একেবারে ঢলের মত ক'রে নেমে এসেছিল। আর সেই জ্যোৎস্নায় বাগানের শ্বেত-পাথরের মূর্ত্তিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল, ঘুমের দেশের রাজকন্যেরা জ্যোৎস্নার ধারা ব'য়ে নেমে এসে কোন রূপকথার রাজপুত্রের জীয়নকাঠির স্পর্শের অপেক্ষা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁচি দিয়ে সমান ক'রে ছাঁটা মেহেদি-গাছের বেড়াটাকেও সেদিন আর বেড়ার মত দেখাচ্ছিল না—দেখাচ্ছিল একটা মায়াপুরীর দেয়ালের মত যার ভিতরে ঢোকবার পথের সন্ধান কেউ কখনো পায়নি।

সেই নিস্তব্ধতা ও রহস্যের বাগানে ভরা জ্যোৎস্নার মাঝখানে একটা বেঞ্চে পাশাপাশি এসে বসলুম—আমি আর নীলা। আমার বুকের ভিতর তখন যে হাতুড়ীর আঘাত দুপদাপ ক'রে পড়ছিল তার বার্ত্তা, প্রাণপণ চেষ্টাতেও নীলার কাছ থেকে গোপন করতে পেরেছিলুম কি না সে কথা আজ হলপ ক'রে বলতে পারি নে।

বেঞ্চের উপর ব'সেই নীলা আমার একটা হাত তার পদ্মফুলের দলের মত হাত দুটোর ভিতর তুলে নিয়ে বল্‌ল—তোমাকে যে ফিরতে হবে শরৎ-দা।

শরৎ-বাবু হঠাৎ যে কেন শরৎ-দার পদবীটা লাভ করল তার কারণ ঠিক ধরতে না পেরে তার দিকে বিস্মিত বিহ্বল চোখ তুলে চাইতেই সে আবার বলল—অস্বীকার করো না শরৎ-দা, তোমার সমস্ত দেহটা আমাকে ব'লে দিচ্ছে এই হতভাগা দেহটার প্রলোভন তুমি জয় করতে পারছ না। কিন্তু জয় যে তোমাকে করতেই হবে। যে রূপটার দিকে তাকিয়ে তুমি আমাকে লাভ করবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠেছ, সেটা যে আজো এমন অটুট আছে তার কারণ, ও-জিনিষটা আমার পাথর হ'য়ে গেছে। যে জিনিষ পাথর হ'য়ে যায়, চোখের মাপ-কাঠিতে তার পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না। কুৎসিত কদাকার ছাইগুলোও যে পাথরের চাইতে কত ভালো তা তুমি বুঝবে না—কিন্তু আমি তা বুঝি। ঋষির অভিশাপ এইজন্যই অহল্যাকে পুড়িয়ে ভস্ম করেনি—তাকে পাথর ক'রে রেখেছিল।

আমার হাতটা হাতের ভিতর চেপে ধ'রেই নীলার কণ্ঠস্বর বেদনায় ভারী হ'য়ে থেমে গেল। তার স্পর্শ আমার বুকের ভিতর দিয়ে মদের নেশার মত সঞ্চারিত হ'য়ে ফিরতে লাগল।

আমি বললুম—নীলা, মনের হুকুম মেনেই আমি দরিয়ায় তরী ভাসিয়েছি। জানি নে কূল কখনো মিলবে

কি না—মেলে ভালোই, না মেলে তা নিয়েও জোর-জবরদস্তি কখনো কর্‌তে যাব না। মনকে যারা হুকুমে ফেরাতে পারে তাদের সাধনা আমার নেই এবং সে সাধনার জন্য আমি লোভও কখনো করি নে। আমাকে গ্রহণ করা না-করা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু ঐ ফের্‌বার হুকুমটা না দিলেও চল্‌ত।

আঘাতটা হয়তো একটু বেশী রকমের কড়া হয়েছিল। নীলার চোখের জল আমার হাতের উপর শরৎ-প্রভাতের দমকা হাওয়ায় খসে-পড়া শেফালী-দলের মত ঝ'রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সম্বরণ ক'রে নিয়ে সে বল্‌লে না, না, এ হুকুম নয় শরৎ-দা—এ আমার মিনতি,—আমার প্রার্থনা—আমার ভিক্ষা। একটা জীবন ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার দুঃখ যে কত তা জেনেছি ব'লেই আর কারো জীবন নিয়ে খেলবার সাহস আর আমার নেই। আমার জীবনের ইতিহাসটা আগে শোনো, তার পরে আমার বিচার করো।

* * * * *

নরেশ রায়কে তোমার মনে আছে কি না জানিনে। কিন্তু মনে থাকার কথা। কারণ, তুমি এসে আমাদের মজ্‌লিসে যোগ দেওয়ার পরেও কিছুদিন সে ছিল। আর, যে তাকে একবার দেখেছে তার পক্ষে তাকে একেবারে ভুলে যাওয়া আমি তো অন্ততঃ সম্ভবপর ব'লে মনে করিনে। সে ছিল একটা type, তার পায়ের গোড়ালি থেকে চুলের ডগাটি পর্য্যন্ত ছিল বৈশিষ্ট্যে ভরা। লম্বা, বাতাসে হেলে-পড়া মত চেহারা। অথচ তাকে দেখ্‌লেই মনে হ'ত ঝড়ের সম্মুখে পথ রোধ ক'রে দাঁড়াবার জন্যই সে মরিয়া হ'য়ে রয়েছে, ঝড় তাকে ভেঙে না ফেলে হেলিয়ে দিয়ে যেতে পারবে না। রংটা তার আগুনের মত দপ্‌দপ ক'রে জল্‌ত। বাঙালীর ভিতর ও-রকমের রং বড় বেশী দেখা যায় না। সবচেয়ে সুন্দর ছিল তার চোখ। সে যখন চোখ তুলে তাকাত তখন মনে হ'ত, অকূল পাথার জলের ভিতর দুটি নীলোৎপল সৃষ্টির প্রথম আলোর স্পর্শ পেয়ে যেন ফুটে উঠেছে।

ইংরেজীতে ফার্ষ্টক্লাশ ফার্ষ্ট হয়ে সে যেদিন কলেজ হ'তে বেরিয়ে এল, সেই দিনই বাবা তাকে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ীতে আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে সে আমার অভ্যর্থনা কর্‌তে কিছু মাত্র কুণ্ঠা বোধ করেনি।

আমি তাকে কতটা ভাল বেসেছিলুম জানিনে, কিন্তু তার প্রতি হিংসেয় আমার মন যে ভ'রে গিয়েছিল তা আমি ভাল ক'রেই জান্‌তুম। পুরুষের অত সৌন্দর্য্য আমি কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌ছিলুম না। কেমন একটা জেদ চ'ড়ে গেল আমার তাকে জয় কর্‌বার জন্য এবং জয় ক'রে জব্দ কর্‌বার জন্য। তার সুযোগ উপস্থিত হ'লে সে-সুযোগকে আমি কখনো ব্যর্থ হ'তে দেইনি।

সেদিন বর্ষার বাদল আকাশের কানায় কানায় নিকষ-কালো কেশের রাশি এলিয়ে দিয়েছে। আর তার কাজল-আঁকা চোখ দুটি ছাপিয়ে যে-জলের ধারা উপ্‌চে পড়্‌ছে তারই ঝাপ্‌টায় ধরণী ভিজে একেবারে তরুণ হয়ে উঠেছে। মেঘের মায়া-লোকের ভিতর মানুষের মন যে হঠাৎ হারিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে সে-কথাটা সেই দিন প্রথম আমার কাছে ধরা পড়েছিল। এই হারিয়ে-যাওয়া মন নিয়ে আমি জানালার ধারে ব'সে আছি, নরেশ-রায় এসে ঘরের ভেতর ঢুকেই একখানা চেয়ার টেনে প্রায় আমার গা ঘেঁষেই ব'সে পড়্‌ল। আমি কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে বিদ্রূপের ঝালটা ঝাঁঝিয়ে তুলে বল্‌লুম—কি নরেশ-বাবু,—এই বাদ্‌লায় অভিসারে বেরিয়েছেন বুঝি ?

নরেশ আমার মুখের দিকে তার তারার মত জল্‌জ্বলে চোখ্‌ দুটি তুলে ধ'রে বল্‌ল—অভিসারেই বেরিয়েছি বটে, কিন্তু সে-অভিসার তোমারকাছেই নীলা, আর কারো কাছে নয়। আমি আজ তোমার পায়ের তলায় নিজেকে নিবেদন ক'রে দিতে বেরিয়েছি।

আমি হেসে উঠে বল্‌লুম—আপনি বুঝি সবে মাত্র রবীন্দ্রনাথের যৌবনের কবিতাগুলো প'ড়ে এসেছেন, আর তার ঘোর এখনও কাটেনি ! কিন্তু বাস্তব জীবনের ভিতর নরেশ-বাবু যেখানে-সেখানে কবিতা টেনে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লে তাতে সামাজিক আইন-কানুন বিধি-

নিষেধগুলোর প্রতি বিশেষ সুবিচার করা হয় না, এটা বোঝ্‌বার বয়স আপনার হয়েছে। একলা পেয়ে আমাকে অপমান করবেন না আপনি!

আমার কথার ভিতর যে জ্বালা ছিল,—বুঝ্‌তে পার্‌লুম তা চাবুকের মত নরেশকে স্পর্শ করল। সে বিস্ময়ে ব্যথায় গুম্‌রে উঠে বল্‌ল—অপমান,—একে তুমি অপমান মনে কর্‌ছ নীলা! না না, এ যে আমার কেবল মুখের কথা মাত্র নয়! কথার ভিতর দিয়ে আমার সমস্ত হৃদয় যে আজ বেরিয়ে এসেছে, আমার সমস্ত মন যে তোমার পায়ের কাছে আপনাকে বহন ক'রে এনেছে আপনাকে বিকিয়ে দেবার জন্যে—কেন এই সহজ কথাটা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?

তার কান্নার মত আর্ত্ত করুণ সুর আমার কানে পৌঁছালেও মনের দোরে ঘা দিতে পার্‌লে না। আঘাতের বেতটা সমান জোরের সঙ্গেই নিক্ষেপ ক'রে আমি বল্‌লুম—আপনার হৃদয়টাকে আপনি যত বড় একটা চিজ ব'লে মনে করেন, নরেশ-বাবু, সকলে যদি তা মনে কর্‌তে না পারে, তবে সম্ভবতঃ সেটা 'পেনাল কোডের' কোন ধারার ভিতর পড়্‌বে না। কিন্তু আপনি বার বার আমাকে নাম ধ'রে ডাক্‌ছেন কেন বলুন তো? সে অধিকার তো আমি আপনাকে কোন দিন দিইনি।

হঠাৎ বিদ্যুতের 'শক্‌' লাগ্‌লে মানুষের সব দেহ যেমন এক মুহূর্ত্তে শিথিল হ'য়ে এলিয়ে পড়ে, আমার কথার আঘাতে তার দেহটাও তেমনি প্রথমে চেয়ারের উপর এলিয়ে পড়্‌ল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে সোজা হয়ে পায়ের উপরে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—Alright নীল-, adieu! তার পর আর একটি কথাও না ব'লে সে ঘর হতে বেরিয়ে গেল। চেয়ে দেখ্‌লুম আমি—তার মুখের ভিতর কোথাও এতটুকু রক্ত নেই। বাহিরে মেঘের বুকে যে হাহাকারটা জেগে উঠেছে সেই হাহাকারটা যেন মূর্ত্তি নিয়ে তার চারিপাশেও জেগে উঠেছে, সে চল্‌ছে কিন্তু পা সে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ছে না,—বহুকালের রুগ্ন রক্তহীন দুর্ব্বলের মত থর থর ক'রে তার দেহ টল্‌ছে। নিজের নিষ্ঠুরতায় শিউরে উঠে আমি ডাক্‌লুম—নরেশ-বাবু—নরেশ!—কিন্তু সে-ডাক তার কানে পৌঁছাল না।

* * *

হঠাৎ নীলা স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লুম নীলা তো নয়—অবিকল শ্বেত-পাথরে খোদাই-করা শোকের একটি করুণ মূর্ত্তি।

চোখভরা এক কলস জল নিয়ে আমি বল্‌লুম—থাক্‌ নীলা,—আমি আর শুন্‌তে চাইনে।

রোদের-আঁচে-শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের মত একটু ম্লান হাসি হেসে নীলা বল্‌ল—এর পরের কথাগুলো আর আমাকে বল্‌তে হবে না ভাই! নরেশের তিনখানা চিঠির ভিতর দিয়েই তার ইতিহাস লেখা হয়ে গেছে। এ-চিঠিগুলো বাক্সে রেখে আমি সোয়াস্তি পাইনে। আমার বুকের কাছে যে জায়গাটাতে কলিজার ভিতর প্রাণের ইঞ্জিনটা দাপাদাপি কর্‌ছে তারি একান্ত নিকটে এগুলোকে রেখে দিয়েছি। সেইখানে জেগে থেকে এরা রাত্রি দিন আমাকে পাহারা দিচ্ছে। নরেশের দেহের স্পর্শ আমি কখনো পাইনি। কিন্তু তার মনের মদে যে লেখাগুলো মাতাল হয়ে উঠেছে তারি স্পর্শ ফুলের বনের বুকের গন্ধ যেমন বাতাসকে ঘিরে রাখে তেমনি ক'রে আমাকে ঘিরে রেখেছে।

বুকের ভিতর হ'তে গাটাপার্চ্চারের স্বচ্ছ পাতলা খাম্‌খানি খুলে নিয়ে চিঠি ক'খানা আমার হাতের ভিতর গুঁজে দিয়ে নীলা বল্‌ল—চেঁচিয়ে পড়্‌।

চিঠিগুলোর গায়ে নম্বর আঁকা—এক, দুই, তিন। প্রথম নম্বরের চিঠিখানা খুলে নিয়ে আমি পড়্‌লুম—

ইয়োরোপের পথে—

তারিখ—খোঁজ রাখিনে।

নীলা,—ঘরের মানুষকে তুমি পথের উপর এনে দাঁড় করিয়েছ—পথ—যার শেষ নেই—সীমা নেই—যে মনের ইচ্ছার মতই অফুরন্ত। বেদুইনের মত অগাধ অবাধ জীবন—ঝড়ের হওয়ার মত দিগ্বিদিকে ছুটে চলেছে—কখনো দিগন্তবিলীন মরুবালুকার বুকের রেণুগুলো উড়িয়ে ছড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে, আবার কখনো বা ধরণীর কটিতটের অঞ্চলের মত নীলের ছোপে ভরা প্রান্তরের বুকের উপর দেহভারটাকে এলিয়ে দিয়ে। পাহাড় তার উদ্ধত মাথা তুলে আমাকে ডাক্‌ছে, সহর তার কল-কোলাহলের স্তুতি-গান দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌ছে!

আজ আমার আচ্ছাদনহীন মাথার উপর মেঘের মাদল বেজে উঠেছে। তার গর্জ্জানিতে ধরণীর মূর্চ্ছাহত বুকটা দুলে' দুলে' কাঁপ্‌ছে।

মেঘের বুকের এই যে গর্জ্জন—এর সঙ্গে আমার মনের গর্জ্জানির কিছু মাত্র তফাৎ নেই! ওর বুকে যে ক্ষুধা থেকে থেকে থর্‌থরিয়ে উঠ্‌ছে, সে ক্ষুধায় আমার অন্তর ভ'রে গেছে। ওর ক্ষুধার হাহাকারের আকাশ-ভাঙার কান্নার সুরে দুনিয়ার এক প্রান্ত হ'তে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তোলপাড় পড়ে' গেছে, কিন্তু আমার এ বুক-ভাঙা কান্নার হাহাকার কারো কানে পৌঁছচ্ছে না। অত বড় আকাশের বুকটাতে মেঘের এ ক্ষুধা কে জাগিয়ে দিয়েছে জানিনে, কিন্তু আমার বুকের ক্ষুধা কার চারিপাশ ঘিরে হাহাকারে ফেটে পড়্‌ছে তা তুমিও জান—আমিও জানি।

না গো—না—না। আমি ভিক্ষার আর্জ্জি নিয়ে তোমার কাছে দর্‌বার কর্‌তে আসিনি। ক্ষুধা আমার যেমন তীব্র, ভিক্ষা আমার তেম্‌নি অসহ্য। তাই মাঝামাঝি রফার ধার আমি ধারিনে। আমার পণ—হয় জয় কর্‌ব, না হয় জয়ের যুদ্ধে মরণকে বরণ ক'রে নেব। জয় কর্‌তে পারিনি, তাই ছুটে' চলেছি মরণের পথে। এ পথ কোথায় শেষ হবে কেউ তা জানে না। তবুও এই নিরুদ্দেশ যাত্রার পথটা অভিসার-যাত্রার ভয়াকুল আনন্দের মতই আমাকে পেয়ে বসেছে। মৃত্যু-বধূর মুখের ঘোমটা খুলে' তার রূপটা দেখে' নেবার জন্যে আমার মনটা আজ মেতে উঠেছে—তোমাকে পাবার জন্যে সেদিন আমার মনটা যেমন ক'রে মেতে উঠেছিল ঠিক তেম্‌নি ক'রে।

সমুদ্রের নীলা, তরঙ্গের দোলায় দুলে ফেনায় ফেনায় ফুলে' উঠে, আমার পায়ের তলায় বেলা-তটের বুকের উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে। সমুদ্র, নীলা, ঠিক তোমার নীল চোখ-দুটোর মত—তেম্‌নি নীল—তেম্‌নি উজ্জ্বল—তেমনি অথই পাথার। তোমার চোখের চেহারা যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদ্‌লে যায়, এর চেহারাও তেম্‌নি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে ছুটে' চলেছে। এই মুহূর্ত্তে হাসির তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে, পর মুহূর্ত্তেই আবার বিদ্রূপের অট্টহাস্যে চারিদিকে ফেনার বুদ্‌বুদ ছড়িয়ে ফেটে পড়্‌ছে। তোমার "খেয়ালী চোখদুটোর" মতই এরও খেয়ালের অন্ত নেই। এই মুহূর্ত্তে এ যাকে মাথায় তুলে' নাচাচ্ছে, পর মুহূর্ত্তেই নামিয়ে দিচ্ছে কোথায় কোন্‌ অন্ধকার আবর্ত্তের আর্ত্তনাদের মাঝখানে।

হঠাৎ কেন জানিনে, ঘুরে' ঘুরে' সেই দিনের কথাই আজ মনে পড়্‌ছে,—যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলুম—যে দিনের প্রভাত আমার জীবনে যা বহন ক'রে এনেছে তার চাইতে বড় সুখও কেউ আমাকে কখনো দেয়নি, তার চাইতে বড় দুঃখও কেউ আমাকে কখনো দিতে পার্‌বে না। তোমাকে দেখে সেদিন আমার মনের ভিতর কোন্‌ প্রশ্নটা অকস্মাৎ আন্‌মনে জেগে উঠেছিল জান?—

"বৃন্তহীন পুষ্প সম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী!"

তোমার ডান হাতে সুধাপাত্র আর বাম হাতে যে বিষ-ভাণ্ড সেই প্রথম দেখার দিনেও আমার মনের অন্তর্য্যামী দেবতার কাছে সে খবরটা ছাপা ছিল না। হয়ত মনের এক কোণে তখনি পিছিয়ে পড়্‌বার ইচ্ছাও জেগে উঠেছিল। কিন্তু পারিনি গো—তা পারিনি। তুমি জান কি না জানিনে, এক রকমের সাপ আছে যার দৃষ্টির খপ্পরে পড়্‌লে কোন জানোয়ার আপনাকে সরিয়ে আন্‌তে পারে না। তোমার চোখেও যে সেই সাপের চোখের মায়াকাজল কতটা ঘনীভূত হয়েছিল—আজ তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আর তোমার উপর ঘৃণায় আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠ্‌ছে। তোমার স্পর্দ্ধা—তোমার বিদ্রূপ আমাকে কতবার আঘাত করেছে, আর তারি সঙ্গে-সঙ্গে কালো মেঘের ঢেউ কতদিন আমার মনের আকাশ নিবিড় ক'রে দিয়ে গেছে। ঐ বুকটার ভিতর যে উদ্ধতস্পর্দ্ধা ফণীর মত ফণা তুলে' ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ কর্‌ছে তাকে টেনে বের ক'রে এনে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বার জন্যে, তার রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ডটা পায়ের তলায় থেঁৎলিয়ে দেবার জন্যে একটা দারুণ ইচ্ছা সময়ে সময়ে আমার মাথায় অঙ্কুশের আঘাত ঠুকেছে। কিন্তু তোমার ঐ বিদ্রূপের প্রলয়-ঝঞ্ঝার পিছনে যে অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, তার মোহ আমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পারিনি। তোমার সেই মায়াবী চোখের আকর্ষণের খপ্পর হ'তে আমি যে আমাকে মুক্ত ক'রে আন্‌তে

পেরেছি—এ আমি আমার বহু সৌভাগ্যের ফল ব'লে মনে করি। এ মুক্তি তুমি আমাকে দাওনি—এ আমি অর্জ্জন করেছি আমার নিজের সামর্থ্যের জোরে। আমার এ শক্তির বহর—এ স্বাধীনতার আনন্দ তুমি বুঝ্‌বে না, কিন্তু যদি আবার কাউকে খপ্পরে ফেল্‌তে পার এবং সে যদি এম্‌নি ক'রে মুক্তিলাভ কর্‌তে পারে তবে সে বুঝ্‌বে। আর যে পলে পলে তোমার খেয়ালের আগুনে আপনাকে আহুতি দিতে থাক্‌বে সেও বুঝ্‌বে।

এর পরেও যদি আমি তোমার কাছে থাক্‌তুম নীলা, – তবে কি কর্‌তুম জান? ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাব্‌কে আর-একবার তোমাকে সায়েস্তা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তুম—পাকা ঘোড়সোয়ারেরা যেমন ক'রে বদমাইস ঘোড়াকে চাবুকের চোটে সায়েস্তা ক'রে তোলে।

হয়ত জিজ্ঞেস কর্‌বে—এ চিঠি তোমাকে কেন লিখ্‌ছি? তার কোনো কৈফিয়ৎ নেই। লিখেছি খেয়ালের ঝোঁকে, ডাকেও দিলুম খেয়ালের ঝোঁকেই। তোমার খেয়াল হয় পোড়ো—না হয় পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেয়ো।

নরেশ

দ্বিতীয় পত্র

প্যারিস
তারিখ—১০ই মে

ফের প্যারিসে ফিরে এসেছি। লণ্ডনে আমার মন টিক্‌ল না। লণ্ডনের সেই গম্ভীর অতিব্যস্ত ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর আমার মন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিল- নিশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আস্‌ছিল। এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি।

ফরাসী জাতটার দিকে যতই তাকাচ্ছি ততই এদের উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। এরা কাজকে গ্রহণ করে গম্ভীর মুখে নয়—হাসি দিয়ে। জীবন ভারী পাথরের মত এদের বুকে চেপে বসে না, হাওয়ার মত হাল্কা পা ফেলে' এদের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। লঘু হাত দিয়ে এরা তাকে তুলে' নেয়, স্নিগ্ধ হাস্যে শেষ ক'রে নামিয়ে রাখে। অথচ দুনিয়াকে ফরাসী জাতটা কি দেয়নি? দুনিয়ার সাহিত্যের ধনভাণ্ডার ফরাসীর জহরতে ভরপূর, শিল্পকে এরা নূতন ক'রে মূর্ত্তি দিয়ে গড়ে তুলেছে, যে 'ডিমোক্রেসির' হাওয়া দুনিয়ার দম্ভ ও স্পর্দ্ধার উন্নত মাথাকে নুইয়ে দিয়ে সকলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এই ফরাসীর মন থেকেই তার উদ্ভব। এরা রক্তে-রাঙা মাটির উপর দিয়ে হাসির হাওয়া ছড়িয়ে চ'লে যায়, তাতে এদের লঘু নৃত্যের তালভঙ্গ হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই।

'কাফে'তে ব'সে আছি। হঠাৎ আমার চারিদিক্ কলহাস্যে মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। বাতাসে মদের ফেনার মত নেশার আমেজ চারিয়ে গেল। সদ্য-ফোটা হেনার মিষ্ট উগ্র গন্ধ ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়্‌ল। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখি—সুর-সভাতলে অপ্সরীর নৃত্য সুরু হ'য়ে গেছে, অপ্সরীদের বসনাঞ্চল খ'সে পড়েছে, কবরী টুটে' বেণী এলিয়ে গেছে, হস্ত তাদের লীলায়িত। নতোন্নত দেহটাকে ছাপিয়ে তাদের অপূর্ব্ব গতিভঙ্গী লীলার ঝরণা ঝরিয়ে দিয়ে চলেছে।

ভোগ কর্‌ছি—জীবনের পানপাত্র পূর্ণ ক'রে আমার এ উৎসবের মদ উপ্‌চে পড়্‌ছে। বেঁচে গেছি নীলা,—বেঁচে গেছি, যে, তুমি আমাকে বাঁধ্‌তে চাওনি! কি সম্পদ্ ছিল তোমার ঐ দেহটার উপকণ্ঠে?—যার গর্ব্বে ধরাটাকে সবার মত পায়ে মাড়িয়ে চলেছিলে; আমার সূর্য্যের মত দীপ্ত প্রেম উপেক্ষার মেঘে ঢেকে দিতে কুণ্ঠা বোধ করনি! একবার সত্যিই মনে হয়েছিল, আমি দেউলিয়ে হ'য়ে গেছি তাই তোমাকে জয় কর্‌তে পার্‌লুম না। কিন্তু এখানে এসে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। যাদের পায়ের কাছেও তুমি দাঁড়াতে পার না এমন হাজার নারী তাদের অন্তরের পানপাত্র পূর্ণ ক'রে করুণ নেত্রে আমার দিকে চেয়ে আছে, যার পানপাত্রটা আমি গ্রহণ করব সেই আপনাকে সার্থক মনে কর্‌বে। এই তো জীবন! এর আকাশ নীলের ছোপে ভরা—তাজা তরুণ—তারায় তারায় আলোময়। সমুদ্রের দোলার মত এর অশান্ত অক্লান্ত দোলা শিরায় উপশিরায় রক্তের কণাগুলি নাচিয়ে দিয়ে যায়। সৌন্দর্য্য এদের পায়ের

ধূলোয় প'ড়ে ফুল হ'য়ে ফুটে' ওঠে, আনন্দ এদের গায়ের বাতাসে জন্ম নেয়। এদের বুকের বাসনার ভিতরে বসন্তের সম্ভাবনা গোপন হ'য়ে আছে।

কেটি, ক্যাথারাইন, জুলি, জেস্‌মিন, নাইনা, রেনী—অন্ত নেই গো অন্ত নেই। কারো রূপ তরল চপল বিদ্যুতের লতার মত। আগুনের শিখার মত আবার কেউ বা জ্বলছে—কখনো প্রদীপের মত আলো করে, কখনো বা দিক্‌টাকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দ্যায়। এদের সব চাইতে কাকে আমার ভাল লাগে জান? ঝ্যান্সিকে। তার রূপের ভিতর জ্বালা আছে, কিন্তু জ্বালার চাইতে ঢের বেশী রয়েছে শরতের জ্যোৎস্নার করুণ স্নিগ্ধতা। সময় সময় ধরণার ধুলো-মাটি ছাড়িয়ে সে যে কোন্ জ্যোতির্লোকের মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়! তখন তাকে দেখ্‌লে আমার বাংলা মায়ের শ্যামল শ্রীর কথা মনে পড়ে। চোখে তার বাতাসের বুকে দিশেহারা মেঘের মত দৃষ্টি, বুক তার তুলে' ওঠে জ্যোৎস্নার স্পর্শে সমুদ্রের বুকের মত।

তাকে প্রথম আমি দেখেছিলুম প্যারিসের ফুলের একটা 'এক্‌জিবিশনে'। প্যারিসের ফুলের এই এক্‌জিবিশনগুলো এমন একটা জিনিষ—যা দেখে' চোখ জুড়িয়ে যায়—বুক ভ'রে ওঠে—কেবল ফুলের সৌন্দর্য্যে নয়—যারা ফুলের মতই সুন্দর তাদের রূপের আবহাওয়ায়। ক্রেসান্‌থেমামের থোকার মত কারো রূপ যেন দেহের বোঁটাটার উপরে আল্‌গোছে ফুটে উঠেছে, কারো 'ডালিয়ার' মত লাল টুক্‌টুকে ঠোঁটের উপর 'প্যান্সির' হাসির মত মিষ্টি হাসি দপ্‌দপ্ ক'রে জ্বলছে। প্রজাপতি ও ভ্রমরগুলোর আনাগোনা অচল ফুলের কাছে বেশী কি সচল ফুলের কাছে বেশী সে কথাটা ঠিক ক'রে বল্‌বার জো নেই। এক গাদা আধ-ফুটন্ত গোলাপের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে ঝ্যান্সি অন্যমনস্ক হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার সম্মুখেই আর-এক থোকা বস্‌রাই গোলাপ জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলছিল। সেই থোকাটা তুলে নিয়ে ঝ্যান্সির হাতের কাছে তুলে' ধ'রে আমি ফরাসীতে বল্‌লুম—উপহার তাকে, যে রূপে বস্‌রাই গোলাপকেও হার মানিয়েছে।

স্বপ্ন হ'তে জেগে উঠে' আমার মুখের দিকে তাকিয়েই ঝ্যান্সি আমার গোলাপের থোকায় ভরা হাত দুটো তার হাতের ভিতর টেনে নিয়ে বল্‌লে—বিদেশী বন্ধু, তোমাকে কাফেতে দেখেছিলুম—তার পর তোমাকে কত খুঁজেছি!

*   *   *

ঝ্যান্সি বল্‌ছে সে আমাকে নিয়ে শীগ্‌গির ইটালিতে বেড়াতে যাবে। সেখানে হ্রদের জলে গণ্ডোলার তালে তালে তার বুক যখন দুলে উঠ্‌বে সেই বুকের উপর মাথা রেখে ঘুমোব—না, না, সারা রাত জেগে কাটাব। হয়ত আমার মন তখন কীট্‌সের ভাষায় গেয়ে উঠ্‌বে—

"Bright star! would I were
steadfast as thou art—"

নরেশ—

তৃতীয় পত্র

ভেনিস—
তারিখ—শেষের দিন।

নীলা,—

বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি জীবনের খোলা খাতাটা এবার গুটিয়ে নেবার দিন একান্ত আকস্মিকভাবেই ঘনিয়ে এসেছে। হয়ত আজের বেলা-শেষের আলোর পর এ দুনিয়ার আলোর সঙ্গে কোনই সম্পর্ক থাক্‌বে না আর আমার! এই সুন্দর ধরণীটাকে ছেড়ে যেতে মায়া হচ্ছে, কিন্তু ভয় কর্‌ছে না এতটুকুও। পরপারের মোহ আমাকে টান্‌ছে—কিন্তু ধরিত্রীর আলো, তার হাসি, তার কান্না—এগুলোর মায়াও ত কম নয়! ও গো, আজ তোমার কথাই বা এমন ক'রে আমার মনে পড়্‌ছে কেন বল্‌তে পার? আর মনে পড়্‌ছে আমার বাংলা-মায়ের কথা। বাংলা, আমার সোনার বাংলা, শেষ বিদায়ের দিনটাতে তোমার বুকে মাথা রাখ্‌তে পার্‌লুম না মা! বাঙালী তার দেশকে কত ভালবাসে মরণের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আজ তা বেশ ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌ছি। চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে অন্ধকারের যবনিকা নেমে আস্‌ছে—পরপারের অন্ধকার—নিবিড় ঘন—নিকষ-

কালো! তার কূল নেই—শেষ নেই—সীমা নেই। যে দিন প্রথম দরিয়ায় ভেসেছিলুম সে দিন যেমন মনে হয়েছিল, এ অন্ধকারও ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছে। আজ আবার যদি আমার বাংলা-মায়ের বুকে ফিরে যেতে পারতুম!

ইয়োরোপের সব দেশের সেরা দেশ এই ইটালি। এর পত্র-পল্লবে আমার বাংলা-মার শ্যামল শোভার আমেজ আছে, এর নারীর চোখে আমার সোনার বাংলার করুণ কোমল স্নিগ্ধ শ্রী আছে। এর সূর্য্যের আলো বিকাশের জন্য মেঘের অনুগ্রহের ভিখারী হ'য়ে ব'সে থাকে না, এর চাঁদের আলো নায়েগ্রার প্রপাতের মত অজস্র উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ফেটে পড়ে।

ন্যান্সিকে বল্লুম মাথার সাম্নের জানালাটা খুলে' দিতে। জানালার ভিতর দিয়ে আড্রিয়াতিকের নীল জল দেখা যাচ্ছে। নৌকোগুলোর চারি পাশ ঘিরে দাঁড়ের বঠের ছপ্ ছপানির আওয়াজ কার বুকের করুণ কান্নার মত শোনা যাচ্ছে! দাঁড়ের ঘায়ে উছ্‌লে ওঠা জলের কণাগুলো সূর্য্যের আলোতে জ্বল্‌ছে।

শিয়রে এসে ন্যান্সি দাঁড়াল। পশ্চিমের গায়ে ঢ'লে-পড়া সূর্য্যের এক থোকা আলো তার বাষ্পেভরা করুণ মুখখানির উপর পড়ে' তারার বুকে আলোর বিন্দুর মত জ্বল্‌ছে। আমি দুই হাতে ধীরে ধীরে তার মুখখানিকে কপালের উপর টেনে নিয়ে বল্লুম—জলের বুকে বেলা-শেষের আলোটা আজ ঠিক চাঁদের আলোর মত দেখাচ্ছে। এই চাঁদের আলোতে 'গণ্ডোলায়' ভাসার কথা তোমার মনে পড়ে ন্যান্সি। তার আর্ত্তস্বর গুমরে উঠে' বল্‌লে—ওগো থাম থাম। তার পর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সে লুটিয়ে পড়্‌ল আমার বুকের উপর।

কতক্ষণ সংজ্ঞা-হারার মত প'ড়ে ছিলুম মনে নেই। হঠাৎ সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ডাক্‌লুম—নীলা—নীলা—নীলা!—

ন্যান্সি বুকের উপর হ'তে মুখখানি সরিয়ে নিয়ে চোখ দুটোর উদ্ধত অশ্রুর ধারা সংযত ক'রে জিজ্ঞেস করলে—ও কী নাম? ও কার নাম? ও কে?

নীলা যে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়.—সে যে পুরুষ হ'তে পারে না এরি ভিতর সে কথাটা বুঝে নিয়েছে ন্যান্সি! আমি তাকে বল্লুম—তোমাকেই ডাকছি ন্যান্সি আমাদের ভাষায় নীলের অর্থ নীলকান্ত মণি। তোমার চোখ দুটো ঠিক নীলকান্তমণির মত কিনা!

হতভাগিনীর মুখখানি একটা আকস্মিক আনন্দের আলোকে নবারুণের মত রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। পরপারের যাত্রী প্রিয়তমের এই মিথ্যে আদরে হয়ত তার বাকী জীবনের অনেকগুলো দিনের পাথেয় সঞ্চিত হ'য়ে রইল।—কিন্তু বুকের ভিতর এ আমার কিসের ধস্তাধস্তি চল্‌ছে—দেহের সমস্ত রক্ত নিংড়ে বের ক'রে ফেল্‌বার জন্য এ কারা মাতামাতি সুরু ক'রে দিয়েছে—একি গো—একি! * * *

চেয়ে দেখি ন্যান্সি বড় একটা গেলাস ভ'রে নিয়ে যাচ্ছে আমার তরুণ বুকের তাজা তপ্ত রক্তে। বুকের কোন্ নাড়ীটা কোন্ ব্যথার টানে ছিঁড়ে' গেল গো!

ন্যান্সিকে কতবার বলেছি—রোগটা বড় ছোঁয়াচে, আমার এত কাছে সে যেন না ঘেঁসে! কিন্তু কই, সে ত শুন্‌লে না, সে তো মেরি, মরিয়ম, মার্গারেটের মত আনন্দের পান-পাত্র নিঃশেষ ক'রে বসন্তের পিকের মত আনন্দের গান শেষ করেনি! কি পেয়েছে সে আমার ভিতর? বসন্তের আমেজ আমার জীবনের বেলাতট হ'তে যতই স'রে পড়্‌ছে সে যে ততই আমাকে বুকের ভিতর টেনে নিচ্ছে—মা যেমন রুগ্ন মরণোন্মুখ ছেলেটিকে বুকের ভেতর টেনে রাখতে চায়। আমার ন্যান্সি ঠিক আমার বাংলার মেয়েদের মত!

* * * *

ন্যান্সি আমার মাথায় চুমো খেলে—'রুবির' মত তার লাল ঠোঁট দুটো আমার ঠোঁটের উপর এলিয়ে পড়েছে—ঠিক বর্ষার প্রথম মেঘ যেমন ক'রে ধরণীর বুকের উপর এলিয়ে পড়ে। চুমোর পুলকে আমার সারা দেহ শিউরে উঠ্‌ছে—এ শিহরণ যে থাম্‌ছে না গো—থাম্‌ছে না—

হাত হ'তে আমার কলম খ'সে পড়্‌ছে- আবার চোখের পাতা ছেয়ে অন্ধকার নেমে আস্‌ছে—অন্ধকার—অন্ধকার—ঘোলা রাত্রির অন্ধকার হ'তেও গাঢ়—সমুদ্রের

বুকের ভিতরকার অন্ধকার হ'তেও নিবিড়। কানে ন্যান্সির বুকফাটা আর্ত্তনাদের ধ্বনিটা তটের উপর সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছ্ড়ে পড়্ছে—নীলা—নীলা—

* * * * *

এর পর আর পাঁচ ছয় দিন নীলার কাছে যেতে পারিনি। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ঘরের ভিতর আট্‌কে প'ড়ে ছিলুম—সবে সেদিন একটু ভাল আছি। পিয়ন এক-গোছা চিঠি এনে সম্মুখে ফেলে' দিয়ে গেল। একখানি নীল রঙের খামের উপর মুক্তোর মত হাতের লেখাটা আমাকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌লে। চিঠিখানা খুলে দেখি নীলা লিখেছে—"দেখা কর্‌বার ফুর্‌সুৎ পেলাম না বন্ধু, মাফ্ কোরো। জীবনে নরেশের দেহের স্পর্শ পাইনি, তাই ইটালির যে মাটি তার দেহটাকে স্পর্শ ক'রে আছে, তারি কাছ থেকে আমার আহ্বান এসেছে—সে আহ্বান উপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লুম না। আর যদি পাই ন্যান্সিকে—তার দেহে হয়ত নরেশের স্পর্শ এখনো লেগে আছে! বন্ধু, সে আমার চাইতেও হতভাগিনী—কারণ সে পেয়ে হারিয়েছে!—না পাওয়ার যে দুঃখটা আমার কাছে এত অসহ্য হ'য়ে উঠেছে, যে পেয়ে হারিয়েছে তার দুঃখ সে কি ক'রে সহ্য কর্‌ছে?—

কালো মেঘের মত বুকটাকে আলো ক'রে যে নীলা ফুটে' উঠেছিল—কালো মেঘের মতই নীল সমুদ্রের ভিতর সে হারিয়ে গেছে! সে আজ দশ বছরের কথা!—তবু সে নীলের আলো আজো নিভে যায়নি! পরপারের উপকূল থেকে তার জ্যোতির রেখাটা বুকের নিতল অন্ধকারকেও আলোর প্রতীক্ষায় ভ'রে রেখেছে—যেমন ক'রে সূর্য্যের আলোকধারা রজনীর অন্ধকার-গহন বুকটাকেও আলোর আভাসের প্রতীক্ষায় উন্মুখ ক'রে রাখে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

অশোক

অশোকের কথা

আমি আর রিভল্‌ভারটা পাশাপাশি স্তব্ধ হ'য়ে বসে' আছি। ভাব্‌ছি,—রিভল্‌ভারটা বল্‌ছে—আর কেন বন্ধু, বল এক নিমেষে তোমার সব ভাবনার শেষ করে' দিই। হাঁ, বন্ধু, তোমার একটি অগ্নিচুম্বন দিয়ে আমাকে সব বোঝা হ'তে মুক্তি দেবে জানি, কিন্তু মুক্তি কি সত্যই দিতে পার্‌বে—in that sleep of death what dreams may come!

পুলিসকমিশনারের কাছে চিঠিটা তাকিয়ে যেন বল্‌ছে,—না, যেয়ো নাক। ওতে লিখ্‌লুম, তোমরা যে অ্যানার্‌কিস্টকে ধর্‌বার জন্যে কত কাণ্ডই না করেছ, কাবুল পর্য্যন্ত ডিটেক্‌টিভ পাঠিয়েছ, তার মৃতদেহ কাল সকালে এখানে দেখ্‌লে, নিশ্চয় খুব খুসি হবে না, পুরস্কারের মোটা টাকাটা ভাগ্যে জুট্‌ল না। আমি স্ব-ইচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাকে বিনাশ কর্‌ছি, নিজের দলের ষড়যন্ত্রে বা প্রতিহিংসায় কেউ আমায় মারেনি।

আর একখানা চিঠি বাড়ীতে লিখ্‌লে হয়, দাদাকে। তাকে ত আমার জমিদারির সব অংশ দিয়ে এসেছি,—শুধু যদি তিনি কয়েকহাজার টাকা পাশের ঘরের তরুণ কবিটিকে দেন। সেই সাতমহল জমিদার-বাড়ী,—এক ঝিল্লীরব-আকম্পিত তারাভরা নিশীথে সেই বাড়ীর ছোট ছেলেটি যখন সুখসম্পদ্ ছেড়ে এই বিপ্লবের দুঃসহ পথে প্রলয়ের শঙ্খ শুনে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই রাতে বাড়ীখানি নদীর কলকলে আম্রবনের মর্ম্মরে যেমন করে' ডেকে চেয়েছিল, সেই ছবিখানি মনের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ছে। বায়স্কোপের দীর্ঘ ফিল্‌ম্ হ'তে মাঝে মাঝে কাটা অসংলগ্ন টুক্‌রো ঘটনার ছবির মত, শৈশব-জীবনের কত হারাণ ক্ষণ, কত ভুলে-যাওয়া ঘটনা, কত টুক্‌রো কথা, ছড়ান হাসি চোখের উপর নিমেষে জেগে মিলিয়ে যাচ্ছে,—আমের মুকুলের মত সেই যে ছেলেটি গ্রীষ্মের দুপুরে খেয়াঘাটের বটচ্ছায়ায় বসে' পারাপার দেখ্‌ত; বর্ষারাতে

বিদ্যুৎ-চমকে কেঁপে মায়ের কোলে লুকিয়ে তেপান্তরের মাঠ পার হ'ত;—সেই পূজোর সময় একবার বলির ছাগল লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলুম, সেই যে বল লেগে কপালটা কেটে গিয়েছিল, রক্ত দেখে আমার হরিণটা কি সজল চোখে চেয়েছিল, হেমন্তের দুপুরে অঙ্কের পরীক্ষার দিনে স্কুলের ঘর থেকে জ্যোৎস্নার প্রথম-দেখা মুখখানি,—শিরীষফুলের মত সে সাম্‌নের পথ দিয়ে চলে' গেল, আমার চোখে সোনার কাঠি বুলিয়ে, সারা দুপুর গাছপালার ঝরঝরানিতে আকাশ-আলোর কাঁপনে কিশোর মন বীণার মত বাজ্‌তে লাগ্‌ল, সে পরীক্ষায় ফেল হয়েছিলুম—ব্যর্থ হওয়ার পরম আনন্দ এমন করে' কোনদিন অনুভব করিনি।

ঠিক ভাব্‌তে পার্‌ছি না, টুক্‌রো ঘটনাগুলো এলোমেলো আস্‌ছে, মাথাটা হয়ত একটু বিকল হয়েছে। বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমার মধ্যের instinct of self preservation সহজে হার মান্‌তে চাচ্ছে না, অতীত জীবনের রঙীন মধুর স্মৃতি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাচ্ছে। আচ্ছা, বেশ।

ভাল লাগে না ভাব্‌তে। সুন্দরী পৃথিবী তার ছয় ঋতুর সুধাপাত্র দিয়ে একদিন আমায় ভুলিয়েছিল। হৃদয়ের পেয়ালা যখন প্রেমে সৌন্দর্য্যে কানায়-কানায় ভরে' উঠেছে, তৃষিত তপ্ত ওষ্ঠ দিয়ে পান কর্‌তে গেলুম, নিমেষে পেয়ালা খান খান হ'য়ে ভেঙে গেল, স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। তার পর স্বাধীনতা! অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে ধ্বংসের লীলায় মাত্‌লুম, হৃদয় পুড়ে' গেল, জাগ্‌ল না—কেউ জাগ্‌ল না। মৃত্যুর বাঁশি শুনে আমরা রুদ্রের যে ক্ষ্যাপাদল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম, সেই সঙ্গীদের কেউ মরেছে, কেউ জেলে, কারো বিচার হচ্ছে, কেউ বন-জঙ্গলে লুকিয়ে।

বুঝ্‌লুম না, কেন জীবনের এ অগ্নিজ্বালা, দুঃখসুখের মায়াচক্র, সৃষ্টির ভাঙাগড়া খেলা। বড় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

নৃত্যময়ী মোহিনীর মত পূর্ণচন্দ্র সুধাভাণ্ড বুকে করে' দিকে দিকে মদিরাধারা প্রবাহিত করে' চলেছে। প্রথম যৌবনের বসন্তের জ্যোৎস্নাধারাতপ্ত কত রাত্রি গানের সুরে ফেনিয়ে উপ্‌চে উঠেছে। এই চাঁদের আলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আমায় মাতাল করে' তুল্‌ত! আজ এ জ্যোৎস্না চোখে একটু মায়া লাগায় না, মনে হয় এ যেন বিশ্বমাতার অশ্রুজল গলে' ঝরে' পড়্‌ছে। কাল সারারাত ওই বস্তি হ'তে যে পুত্রহীনা কুলীনারীর গুম্‌রে গুম্‌রে কান্না শুনেছি, তাই এ আলোয় মিশে গেছে।

জ্যোৎস্না! এই কথাটি আমার বুকের সমস্ত রক্ত দুলিয়ে দিলে। আমার শৈশবের রূপকথার রাজকন্যা আজ কোথায় আছে জানি না। শুধু যদি তার মন-জাগানো মুখের মিষ্টি হাসিটি, মন-মাতানো চোখের স্বপ্নের চাউনি একবার দেখ্‌তে পেতুম তবে যাবার এ ক্লান্তক্ষণ পূর্ণিমা-রাত্রির মত মধুর হ'ত। তার কতদিনের কত রূপে দেখা কত মূর্ত্তি চোখের সাম্‌নে এলোমেলো ভেসে নিমেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। বকুলগাছের দোল্‌নায় দুল্‌তে দুল্‌তে কি ভ্রূকুটি করে' সে চেয়েছিল! তার জন্মদিনে আমার জলখাবারের পয়সা জমিয়ে যে সেফ্‌টিপিন দিয়েছিলুম কি মিষ্টি হেসে নিয়েছিল।

সতেরো আঠারো বছরের আমি এই উনত্রিশ বছরের আমিকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছে,—আনন্দ কি পাওনি? জীবনের সে দুটি বছর প্রেমস্বপ্নে যৌবনের উদ্দামতায় ভরপুর ছিল। জমিদারের ছেলে, প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, আমার মত সৌখীন সুন্দর ছেলে ক্লাসে কেউ ছিল না। জ্যোৎস্নারা তখন কল্‌কাতায় এসেছে,—সে চঞ্চলা বালিকা নয়, সলজ্জা কিশোরী। তার একটি মিষ্টি কথা মনের মধ্যে সারাক্ষণ ঝুম্‌ঝুমির মত বাজ্‌ত, তার একটুক্ষণ গল্প করায় আমি সাতরাজার ধন মাণিক কুড়িয়ে পেতুম, আমার মত ভাগ্যবান্ কে? তখন আমার জীবনে শেলীর যুগ, অ্যালাষ্টারের কবির মত কোন বিশ্বউর্ব্বশীর সন্ধানে মন উদাস, জ্যোৎস্না, সে ত বিশ্বসৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর প্রতীক মাত্র, যখন রূপ ও রূপকে ভেদাভেদ নেই, তারি চোখের চাওয়ায় ভুবনউর্ব্বশী জেগে উঠেছে।

অন্ধকার রাতে যখন ডিনেমাইট দিয়ে ট্রেন উড়োতে গেছি, ভিড়ের মধ্যে যখন কাউকে মার্‌তে বোমা হাতে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছি, পুলিসের হাত থেকে পালিয়ে

যখন আসামের জঙ্গলে ঘুরেছি, আফগানিস্থানের গোলাপকুঞ্জে দ্রাক্ষারস পান করে' যখন লুটিয়ে পড়েছি, আমার জীবনের এই চিরন্তনী চিরতরুণী আমার সাম্‌নে জেগে উঠে' বারবার কি বল্‌তে চেয়েছে! আজও সে আমায় চঞ্চল করে' তুল্‌লে।

কিন্তু শোন জ্যোৎস্না, আমি যদি কাপুরুষের মত আপনাকে বিনাশ কর্‌তে যেতুম, তা হ'লে কথা ছিল। লোকে ব্যর্থপ্রেমে, অর্থাভাবে, সমাজের লোকনিন্দায়, সংসারের দুঃখভারে আত্মহত্যা করতে যায়। কোন দুঃখকে সংগ্রামকে আমি জীবনে ডরাই না। কিন্তু, কিছু ভাল লাগে না যে,—এই জীবনভরা শূন্যতায়, এই পৃথিবীর অর্থহীন কর্ম্মচক্রে, বেঁচে থাকার সার্থকতা খুঁজে পাই না।

এখন বুঝছি কেন স্বর্ণ বল্‌ত—দাদা, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে' একটা দড়ি এনে গলায় দিয়ে ঝুলে' পড়ি, একদিন সকালে উঠে দেখ্‌বে আমি মরে' আছি। যতক্ষণ থিয়েটার করি বেশ থাকি, কোন রাতে রাজরাণী, কোন রাতে ভিখারিণী, কোন রাতে আয়েসা, কোন রাতে মর্জ্জিনা, কোন রাতে কপালকুণ্ডলা—থিয়েটারের ওই বর্ণহীন সিনে কাল্পনিক জগতে অবাস্তব জীবনে সব ভুলে' থাকি। কিন্তু তার পর, উঃ, দিনের বেলাটা, একটু বাঁচতে ইচ্ছে করে না; তবু তোমরা যে ক'দিন আছ, তোমাদের সেবা করে' একটু পুণ্যি করছি। পুলিসের চোখ এড়াবার জন্যে আমরা যে ক'জন ঘরছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ওই সমাজপরিত্যক্তার ঘরে আড্ডা নিয়েছিলুম, তাদের সেবা করে' সে যে স্বর্গসুখ পেয়েছিল। সে শুধু থিয়েটার করে' জীবিকা অর্জ্জন করত। কিন্তু পঙ্কের মধ্যে সে পদ্মটি কি এতদিন নির্ম্মল আছে? কত পুরুষের মত্ত লালসায় সে পদ্মের সব পাপ্‌ড়ি পঙ্কের তলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হ'য়ে তলিয়ে গেছে।

নারীর ও মোহিনীরূপ আমায় ভুলোয় না। যে রূপে সে গানের সুর, ফুলের পাপ্‌ড়ি, আলেয়ার আলো, স্বর্ণমৃগ হ'য়ে সংসারের মরীচিকায় ঘোরায়, সে প্রিয়ার রূপ নয়,—নিপীড়িতা মাতা যখন দুঃখের ত্যাগের দুর্গম পথে ডাক দেন,—তাঁর বন্ধনশৃঙ্খল ভাঙ্‌বার জন্যে প্রলয়াগ্নি জেলে মৃত্যুর মধ্যে ছুটে যেতে হয়, সেই বন্দিনী মায়ের পায়ে আমি জীবনের বরণমালা দিয়েছি—এই অত্যাচারনিপীড়িতা দুঃখিনী দেশ মা, এই যুদ্ধাগ্নিদগ্ধা আপন সন্তানরক্তকলুষিতা শক্তিমদপীড়িতা পৃথিবী-মা, মা গো, তোমার ওই ব্যথাভরা অশ্রুমাখা মুখ আমাকে ঘরছাড়া করেছে।

কালো মেঘে চাঁদ ঢাকা পড়ছে, একটা ঝড় উঠছে, কৃষ্ণচূড়া গাছটা মত্ত দৈত্যের মত বাতাসে উদ্দাম হ'য়ে উঠেছে। জ্যোৎস্না নয়, এই ঝঞ্ঝা চাই। এই বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে বজ্রের গর্জ্জনে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে কণ্ঠে রুদ্রের আহ্বান জেগে ওঠে, দেহের রক্ত ঝিল্‌মিল্ করে, স্নায়ুগুলো নাচ্‌তে থাকে, এই গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায় নবজীবনের অভিসারে মৃত্যুর বাঁশি বাজে।

ঘর ছেড়ে' পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম। অন্ধকারের গর্ভ হ'তে ঝোড়ো হাওয়া পীড়িত পৃথিবীর বুকের কান্নার মত ছুটে' আসছে। সত্যই একটা কান্নার শব্দ—মা, মা! কে গুমরে গুমরে কাঁদছে—পৃথিবীর বুকের ব্যথায় গুরু গুরু দীর্ঘশ্বাসের মত। চারিদিকে বিদ্যুৎ জ্বলে' উঠ্‌ল, সেই আলোয় দেখ্‌তে পেলুম, রাস্তার মাঝখানে একটি ছোট খুকী লুটিয়ে পড়ে' আছে, তার কালো কোঁকড়া চুলগুলো বাতাসে উড়ে' খোয়ায় লুটিয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে' নিলুম, শঙ্কিত ক্লান্ত মুখখানি শিশিরসিক্ত শেফালির মত, মুদিত কমলের মত চোখ বোজা, জামার বোতাম কয়েকটা খুলে' গেছে, গোঁ গোঁ করে' মৃদু আর্ত্তনাদ করছে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধীরে বল্‌লুম,—কি হয়েছে খুকী? ঘাড়ে মাথা রেখে শান্ত হ'য়ে সে নেতিয়ে পড়্‌ল। গর্জ্জমান অন্ধকারটা টুক্‌রো টুক্‌রো করে' বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত চিরে গেল। কন্যাহীনা মাতার অশ্রুজলের মত বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়্‌তে লাগ্‌ল, বাতাস মত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে মাত্‌বার জন্যে পথে বেরলুম, কোথা থেকে এ ফুলের পাপ্‌ড়ি আমার বুকে পড়ে' ঘরে ফেরালে।

তাড়াতাড়ি খুকীকে বুকে করে' ঘরে ফির্‌লুম।

বিছানাটা পাত্‌তে হ'ল, বাক্‌স হ'তে ফর্‌সা চাদর বের কর্‌তে হ'ল, বালিশটা কি শক্ত—কচি মাথায় লাগ্‌বে। ধুলো-লাগা জামা পাজামা ঝেড়ে দিলুম, ছাড়ান হ'ল না, ছাড়াতে গেলে হয়ত ঘুম ভেঙে যাবে, কেঁদে উঠ্‌বে, আর ছাড়িয়ে পরাব কি! কোনমতে খুকীকে শুইয়ে জান্‌লা বন্ধ করে' তার পাশে বিছানার ধারে বস্‌লুম। ছোট সুন্দর নাকে নোলকটা কি সুন্দর, কচি হাতে সরু বালাগুলো কি সুন্দর দেখাচ্ছে, কি মিষ্টি ছোট পা দুটো, কি মিষ্টি মুখখানা। তার গালে—পা দুটোতে চুমো খেলুম। রিভল্‌ভারটা হেসে উঠ্‌ল।

ঘুমন্ত মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে আছি। সে চঞ্চল হ'য়ে নড়ে' উঠ্‌ল। নিশ্চয় গরম হচ্ছে। খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস কর্‌তে লাগ্‌লুম। অস্থির হ'য়ে সে কেঁদে উঠ্‌ছে,—মা, মা। এ ত ভারি মুস্কিল, ছোট মেয়েদের ভোলাবার মন্ত্র ত আমার জানা নেই, ঘুমন্ত খুকীকে মা ভিন্ন কে শান্ত কর্‌তে পারে। ধীরে বুকে তুলে' নিয়ে মৃদু মৃদু দোলাতে দোলাতে মুখে আঙুল পুরে দিলুম। আঙুল চুষ্‌তে চুষ্‌তে একটু শান্ত হ'ল। শুইয়ে দিতেই আবার ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, কেঁদে উঠ্‌ছে—মা, মা। চোখ খুলে' আস্‌ছে, যদি জাগে ত ভয়ঙ্কর কাঁদ্‌বে—হয়ত দুধ খেতে চাইবে, আমার ঘরে দুধ কোথায়!

রিভল্‌ভারটা হেসে উঠ্‌ল,—কি বন্ধু বড় মুস্কিল! ঘরের কোণে বেহালাটা খুসি হ'য়ে চাইল, বেশ হয়েছে! বেহালাটা তুলে' নিয়ে এলুম, ধুলো জমেছে, তাঁতগুলোয় ছাতা পড়ে' রয়েছে, অভিমানিনী নায়িকার মত সে কোন কথা কইতেই চায় না। বল্লুম, বন্ধু পূর্ব্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করে' একটু সাহায্য কর। বেহালায় ঝঙ্কার উঠ্‌তেই খুকীর কান্না থাম্‌তে লাগ্‌ল, গানের সুরে সুরে সে ধীরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

বাইরে ঝড় থেমে গেছে। জান্‌লা খুলে' দিলুম। কচি-শিশুর আঁখির মত তারারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, খুকীর মুখের দিকে চেয়ে বেহালা বাজাচ্ছি। হঠাৎ এক কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ বেহালার গানের উপর কমলবনে মত্তহস্তীর মত এল। সশব্দে দরজা খুলে' একটা বড় কালো কুকুর ঘরে ঢুকে একেবারে বিছানায় লাফিয়ে উঠ্‌ল, তার পর ঘুমন্ত খুকীর দিকে চেয়ে তার কি আনন্দনৃত্য। বেহালা রেখে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তেই এক বয়স্ক যুবক আর বিদ্যুল্লতার মত এক তরুণী এসে ঘরে ঢুক্‌লেন। তরুণীটির এলোচুল জড়ানয়, লুটান শাড়ীর টানে, চোখের ইসারায় বোঝা যাচ্ছে বিছানা থেকে অতি ব্যস্ত শঙ্কিতভাবে উঠে এসেছে। তার চোখ দুটি আনন্দে দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল, বিছানা হ'তে খুকীকে তুলে' বুকে জড়িয়ে 'এই যে রেণু, এই যে রেণু' বলে' আনন্দে চুমো খেতে আরম্ভ করে' দিলে, আমার দিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। যুবকটি একটু বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বিনীতস্বরে বল্‌লে,—ক্ষমা কর্‌বেন—

আর একটু এগিয়ে আসাতে আলোটা তার মুখে পড়্‌ল, আমি নিমেষে চিন্‌লুম, আনন্দের সঙ্গে বলে' উঠ্‌লুম—আরে তুমি, সুরেশ!

কলেজে সুরেশ ও আমার ভাব বন্ধুত্বের একটা উপমার বস্তু ছিল। একটু এগিয়ে এসে সে অবাক্ হ'য়ে একটু ব্যথার সঙ্গে বল্‌লে,—তুমি! কি চেহারা তোমার হয়েছে! কলেজে তোমার মত কেউ সুন্দর ছিল না, এ যে Asoke's ghost! এটি ভাই আমার মেয়ে, কোথায় পেলে? হেসে বল্লুম,—রাত দুপুরে কি মেয়েটিকে রাস্তায় হাওয়া খেতে পাঠিয়েছিলে? মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে সুরেশ বল্‌লে,—ওর ভাই ওরকম ঘুমন্ত উঠে বেড়ান রোগ হয়েছে, আজ আবার দরজাটা খোলা ছিল,—উনি হচ্ছেন আমার শ্যালিকা।

শিরীষ-ফুলের মত স্নিগ্ধ লাবণ্যমাখা তরুণীর দিকে চাইলুম। খুকীকে কোলে করে' আমার অগোছাল ঘর আর বই-খাতা-গাদা-করা টেবিলটি দেখ্‌ছিল। সুরেশ ধীরে বল্‌লে,—তুমি এত কাছে আছ, জান্‌তুম না। আমি ওই সাম্‌নের গলিতে দ্বিতীয় বাড়ীতে থাকি। এটা বুঝি মেস, না হলে' এত অপরিষ্কার,—কি সৌখীন তুমি ছিলে!

তরুণীর মুখটি একটু করুণ হ'য়ে উঠ্‌ল, সে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার টেবিলের বই-কাগজগুলো ঘাঁট্‌ছে, এই অগোছাল ঘরটা নিমেষে গুছিয়ে দিতে পার্‌লে সে যেন কি আনন্দ পায়। ধীরে সে বল্‌লে,—দাদা, দিদি হয়ত বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।

সুরেশ বল্‌লে,—হাঁ ভাই, রেণুর মা, বুঝ্‌তেই পারছ, কি রকম ছট্‌ফট করছে। এখন যাই, কাল সকালে আসব 'খন। অতসী, বই ঘাঁটতে আরম্ভ করেছ ত! শ্যালিকার বই কিনে কিনে আমি গেলুম। এস এখন, কাল আলাপ হবে 'খন।

দরজা পর্য্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এলুম। যাবার সময় অতসী কিছু বল্‌লে না, শুধু রঙীন চোখে চেয়ে ধীরে একটা নমস্কার করলে। কুকুরটাও আমার দিকে চেয়ে একবার ল্যাজ নাড়্‌লে।

চুপ করে' একা ঘরে বসে' আছি। চাঁদ পশ্চিমাকাশে ঢলে' পড়েছে, পূর্ব্বাকাশের তারাগুলো দপ্‌দপ্‌ করছে। রিভল্‌ভারটা কোথায় রাখ্‌লুম, মনে পড়্‌ছে না। ইজিচেয়ারে বসে' নীলাকাশের দিকে চেয়ে ভাঙা বেহালার মানভঞ্জন করতে বস্‌লুম।

পৃথিবী-মা গো, এই দুরন্ত ক্ষ্যাপা ছেলেটাকে তুমি বুঝি বড় ভালবাস, তাই দুটো সুকোমল সুন্দর বাহু দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বার জন্যে এ ঝড়ের রাতে এম্‌নি ছোট-মা হ'য়ে এলে।

এই ছোট খুকীটি তার দুখানি কচি হাত দিয়ে আমায় বাঁধ্‌লে দেখ্‌ছি। তাই সকাল-বেলা সুরেশ যখন এসে বল্‌লে—চল, শুধু তখন তার ফুলের মত কচি মুখখানি দেখ্‌বার জন্যে ছুটে' চল্‌লুম।

সুরেশ এখন হাইকোর্টের উকীল। সুন্দর বাড়ীখানি। আমাকে বাড়ীর ভিতর একেবারে তার ঘরে নিয়ে গেল। অতসী অভ্যর্থনা করে' বসালে, কুকুরটাও একবার ল্যাজ নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে গেল। সুরেশ বাইরে মক্কেলদের কাছে চলে' গেলে অতসী মুচ্‌কে হেসে বল্‌লে,—কাল আপনার রিভল্‌ভারটা নিয়ে এসেছি।

আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লুম,—খুঁজে' পাচ্ছিলুম না বটে। আর চিঠিটা?

চোখে বিদ্যুৎ ঠিকরে সে বল্‌লে,—সেটাও। ভয় নেই, সেটা পুড়িয়ে ফেলেছি।

বিস্মিত-মুগ্ধ-নেত্রে তার দিকে চাইলুম। মৃদু হেসে সে বল্‌লে,—রিভল্‌ভারটা আর পাচ্ছেন না, আর অমন করতে যাবেন না, কিন্তু—

এ যেন তার হুকুম।

সুরেশের মা রেণুর হাত ধরে' ঘরে এলেন। ছোটবেলায় তাঁকে যেমন দেখেছিলুম, সেই দিব্যস্নিগ্ধ স্নেহ-কল্যাণমণ্ডিত মূর্ত্তি, কাঁচাসোনার মত দেহের আভা সাদা থান ফুটে' বেরুচ্ছে, তাঁকে দেখ্‌লেই পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করে। প্রণাম করে' উঠে' দাঁড়াতে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লেন,—কি রে তুই এত কাছে আছিস, এতদিন দেখা হয়নি!

হেসে বল্‌লুম,—মার দেখা পেতে অনেক পুণ্যির দরকার যে মা।

স্নেহনয়নে চেয়ে বল্‌লেন,—কি রোগা হ'য়ে গেছিস্! মেসে আছিস বুঝি!

অতসী ফোড়ং দিলে,—হ্যাঁ মা, যেমন নোংরা তেম্‌নি অন্ধকার।

মা বল্‌লেন,—কি চেহারা হয়েছে! মেস ছেড়ে আয়, আমাদের এখানে থাক্‌বি।

বল্‌লুম—সে ভাগ্যি কি আছে মা যে তোমার প্রসাদ পাব! এ লক্ষ্মীছাড়া ও-স্বভাবটা খুব আছে, যেখানেই বলো না নিজের ঘর করে' জমিয়ে বস্‌তে পারি।

রেণু মার পাশে সলজ্জভাবে দাঁড়িয়ে আমাকে বার বার দেখ্‌ছিল। তার দিকে অগ্রসর হ'য়ে বল্‌লুম,—এ মা-টি যে কিছু বলে না।

মা হেসে বল্‌লেন,—ওরে রেণু, চিন্‌তে পারছিস্ না, ও যে তোকে কাল চুরি করে' নিয়ে গেছ্‌ল।

রেণু একটু ভীত হ'য়ে মাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। মা হেসে উঠে' বল্‌লেন,—না রে না, ও তোর কাকা, প্রণাম কর। আজ রেণুর জন্মদিন।

রেণু তাড়াতাড়ি প্রণামটা সেরে অতসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আমি তাকে টেনে নিয়ে বল্‌লুম,—না মা, কাকা নয়, আমার এখন মায়ের দরকার, আমার নাম অশোক, একটা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বুঝ্‌লে মা?

মা চলে' গেলেন। রেণু অতসীর কানের কাছে গিয়ে কি বল্‌ছে। আমি বল্‌লুম,—কি বল্‌ছে?

অতসী হেসে বল্‌লে,—বল্‌ছে, চুলগুলো কি বিচ্ছিরি হ'য়ে রয়েছে! ওর কি কেউ নেই যে চুল আঁচ্‌ড়ে দেবে?

রেণুর দিকে চেয়ে বল্লুম,—আমার ত আর মা নেই!

বা, আমি ত হলুম,—বলেই সে রাঙা মুখখানি টেবিলের আড়ালে লুকোলে। একটু পরে এক ভাঙা চিরুণী এনে আমার চুলের সংস্কার করতে বসল।

কাল রাতে জীবনটা একেবারে দেউলে হ'য়ে গিয়েছিল, আজ এই অতসীর-হাতে-গোছান ঘরে বসে' ভাব্‌ছি, রাতারাতি পথের ভিখারী কেমন করে' লাখপতি হ'য়ে ওঠে। আমাকে একেবারে দীন করে' তার পর এ কি ঐশ্বর্য্য দেওয়া!

যে মাকে আবার পেলুম, এমন মা কার আছে। তাঁর কাছে গিয়ে বস্‌লে মনের সব তাপ জুড়িয়ে যায়। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা উনি, ছোট বেলা হ'তে পিতৃহীন সুরেশকে কি স্নেহময় শাসন ও নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষ করেছেন। সুরেশ যখন ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে করতে চাইলে, বাড়ীর সবাই কি আপত্তি করলে, কিন্তু ইনি নিজে গিয়ে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করে' এলেন। এ মায়ের আশীর্ব্বাদের প্রসাদে এক দিনেই যেন সেরে গেছি।

আর এই রেণু-মাটিকে পেলুম, ছেলেবেলার সেই চিরআনন্দময় সরল শিশু আমি আমার মধ্যে মরেনি দেখ্‌ছি, আর-এক শিশুর কলহাস্যে সে জেগে উঠ্‌ল। প্রতিবংশের আশা স্বপ্ন যতবার বিফল হচ্ছে, সৃষ্টি আবার নতুন উদ্যমে ছোট শিশু দিয়ে সে স্বপ্নের সাধনা সুরু করছে!—রেণু সৃষ্টির চিরনবীন বাণী আমার জীবনে নিয়ে এল।

আর অতসী? এই মিষ্টি মেয়েটি যেন কত দিনের বন্ধু। সারা দুপুর তার লাইব্রেরীটা খুব উৎসাহের সঙ্গে আমায় দেখিয়ে কি করুণ মধুর হেসে চাইলে। কত বই সে পড়েছে, সে কত ভাবে, স্বপ্ন দেখে, কিছুই সে করতে পারছে না—দেশের কাজ করতে এত তার ইচ্ছে করে। কতকগুলো রাজনীতি-সমাজনীতির বই দেখিয়ে সে বল্লে,—দেখুন এসব ঠিক বুঝ্‌তে পারি না, কিন্তু যখন দেখি এরা যা বল্‌ছে তার সঙ্গে আমার মনের কথার মিল হ'য়ে যায়, এত আনন্দ হয়। কিন্তু শুধু রাশ-রাশ বই পড়ে' কি হবে বলুন, আমারও মাঝে মাঝে অবসাদ আসে।

বল্লুম,—কেন, তোমরা ত ব্রাহ্ম, তোমাদের কত স্বাধীনতা।

সে বল্লে,—কি আর স্বাধীনতা আছে, এই যা বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছি, আর জোর করে' এখনও বিয়ে দেয় নি।

হেসে বল্লুম,—আমার মত ঘরছাড়া বিদ্রোহী তোমাকে ঘরকন্না করবার উপদেশ দেবে না। তবে কি জান, শান্তি যদি চাও, তবে ওই ঘরকন্নাতেই পাবে।

না, আমি জীবনটাকে সব দিকে পরিপূর্ণ করে' অনুভব করতে চাই,—কথাগুলো বলে'ই সে একটু লজ্জিত হ'য়ে চুপ করলে।

আমার জীবনের এক নিগূঢ় গভীর বেদনার পথে তার সঙ্গে জানা হ'ল বলে' সে একদিনেই আমার পরম বন্ধু হ'য়ে উঠেছে।

সন্ধ্যাবেলায় সে বল্‌ছিল,—চুপচাপ বসে' ভাব্‌বেন না বেশী। আপনার মনটা একটু অসুস্থ আছে, শরীরটা সারিয়ে নিন ভাল করে'। আপনারা নিরাশ হ'লে কি হবে?

বল্লুম,—তুমি কি ভাব আমাদের দিয়ে দেশের কোন মঙ্গল হবে?

সে বল্লে,—আমি কি জানি বলুন, তবে আমি যদি ছেলে হ'য়ে জন্মাতুম, আমিও অ্যানার্কিষ্ট্ হতুম। আপনার বেহালাটা বাজান, চুপচাপ বসে' থাকলেই মন খারাপ হবে।

মেয়েরা চিরকাল আমার কাছে রহস্য, তাদের বুঝ্‌তে চাইনি, শুধু তাদের প্রেমের স্পর্শে জীবনটাকে বাজিয়ে চলেছি।

(৩)

ধীরে ধীরে মনটা দেখছি সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌ছে, অবসাদ কেটে যাচ্ছে, নবজীবন পাচ্ছি। আমাকে তাজা করে' তোল্‌বার জন্যে অতসীর চেষ্টার অন্ত নেই।

ছোট ঘরের গারদে পোরা এই বাঙালীর মেয়েটি। কিন্তু তার মন দেখি পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে গেছে। পৃথিবীর কত ঘরের হাসিকান্না, কত জাতির উত্থান পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিদিনের সুখদুঃখ জড়িয়ে আছে। তার জন্যে সুরেশ সব দৈনিক সংবাদপত্রগুলো নেয়, তার পর কত ইংরেজী ফরাসী মাসিক পত্রিকা, আর বই কেনার ত শেষ নেই। সুরেশ সেদিন বল্লে,

—দেখ, ফ্যালিকার কি expensive hobby! ওর কাছে অতসীর বই-পড়াটা একটা সখ মাত্র। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি, ওটা ওর জীবনের ক্ষুধা, চিত্তের বিকাশ।

রোজ সকালে অতসী আমাকে ধরে' তার খবরের কাগজের রাজত্বে নিয়ে যায়, মানবসভ্যতাচক্রের গুরুগুরু ধ্বনি, পৃথিবী-মার হৃৎপিণ্ডের ধক্‌ধক্ শব্দ যেন শুন্‌তে পাই। প্রথমে দেশের সব খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া,—কোথায় বোমা ফাট্‌ল, কার কারাদণ্ড হ'ল, কোন কলের আগুনে কত কুলী ম'ল, ইত্যাদি। তার পর বিদেশের আয়র্ল্যাণ্ড থেকে হনলুলু সব দেশের খবর চাই, জারের সঙ্গে আমীরের কি গুপ্তমন্ত্রণা হচ্ছে, বল্‌কানে অশান্তির রূপ কি দাঁড়াচ্ছে। কোন নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কোন প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা, কোন রাজবিদ্রোহীর বিচার, প্রতি-বিষয়ে তার মন সজাগ, উৎসুক।

দুপুরে কোন দিন কোন দূরদেশের ভ্রমণকাহিনী বা জাতির বিবরণ নিয়ে বসে, কোন দিন কোন দেশের ইতিহাস নিয়ে বসে; বেদুইনরা কি-ভাবে জীবন চালায়, ফরাসী-বিপ্লবের রাতে কি হয়েছিল, ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের জীবন-ধারা কি রকম, সাহারার মরুভূমে কি সভ্যতা চাপা পড়েছে—সব পড়ে' শুনিয়ে আলোচনা করে' আমার এ মনকে পৃথিবীর মানবসভ্যতার ইতিহাসধারার সঙ্গে যুক্ত করে' দিতে চায়।

প্রথম কয়েক দিন খবরের কাগজ পড়্‌তে মন লাগ্‌ত না, কিন্তু এখন এ নেশার মত লেগে গেছে,—হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে যায়, ভাবি সকালে আয়াল্যাণ্ড্ সম্বন্ধে কাগজে কি লেখা থাক্‌বে, অমুক বিচারের রায় কি বেরুবে,—বৃহৎ মানবসমাজের জীবনস্পন্দন আপন নাড়ীতে অনুভব করি।

কিন্তু মনটা এতে ঠিক সারেনি, সেরেছে অতসীর গানের সুরে। সন্ধ্যেবেলায় সে রেণুকে নিয়ে গান গাইতে বসে, আমাকেও সেই ভাঙা বেহালায় নতুন তাঁত লাগিয়ে বাজাতে বসতে হয়। গানের সুর এক দিন আলো-বাতাসের মত আমার নিত্য প্রয়োজনীয় ছিল, শান্তিহারা জীবনটা আবার সুরে বাঁধ্‌ছি।

আশ্চর্য্য অতসীর গলাটা! এ যেন কোন সঙ্গীতযন্ত্র হ'তে সুর ঝরে' পড়্‌ছে, গান যখন থেমে যায়, নৃত্যময়ী সুরপরীদের শিঞ্জিনীধ্বনি রিনিঝিনি বাজে, মন ভরে' ঘর ভরে' কাঁপে, ঘুরে' বেড়ায়। তার সন্ধ্যায় গাওয়া গানের সুর এখনও কানে বাজ্‌ছে,—

গানের সুরের ভিতর যখন দেখি ভুবনখানি।
আমি তখন তাকে চিনি, আমি তখন তাকে জানি।

পৃথিবীকে জীবনকে গানের সুরের ভিতর দিয়ে দেখা, এই পরম দৃষ্টি সে আমায় দিলে।

আজ বেহালা বাজাতে বাজাতে হঠাৎ থেমে গেলুম, দেখে' সে বল্‌লে,—কি হ'ল আপনার?

বেহালায় এক পুরানো সুর বাজাতে বাজাতে মনে হ'ল, যেন আমি আমার সতেরো বছরের আমিতে ফিরে' এসেছি, জ্যোৎস্না আমার সাম্‌নে বসে' গান গাইছে। এম্‌নি এক শুক্লা একাদশীর হারান সন্ধ্যা চোখের উপর চম্‌কে উঠ্‌ল।

মনের সব অন্ধকার বন্ধ ঘরগুলো খুলে' যাচ্ছে, গানের সুরের আলোয় ভরে' উঠ্‌ছে। রাতে এক ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে সে যে গান গাইছিল, সেই মালশ্রী রাগিণী তারায় তারায় কেঁপে বাজ্‌ছে—

আমি হাত দিয়ে দ্বার খুল্‌ব না গো,
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

(৭)

অতসী আমার চারিদিকে যেন একটা মায়ার জাল রচনা করছিল। মাঝে মাঝে তার কথাগুলো শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হয়, কথাগুলো ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, শুধু সুরের মত বাজ্‌ছে, তার সুন্দর ঠোঁট নাড়ার ভঙ্গীটা এক শিল্পকার্য্যের মত উপভোগ করি, রহস্যময় মধুর চোখের দিকে চেয়ে থাকি। কাল যখন সে সন্ধ্যার অন্ধকারে জান্‌লার সুদূরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আমার মনে হ'ল, সে যেন রূপ নয়—একটা রূপক, চিরন্তনী বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকুলতার মূর্তি, তারার আলোয় চিররাত্রি চেয়ে কার প্রতীক্ষা করছে।

কিন্তু অতসী মায়ামন্ত্র পড়ে' যে সৌন্দর্য্য-আনন্দের

রূপজাল দিয়ে আমায় ঘিরেছিল তা টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে ছিঁড়ে' ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছে।

আজ সন্ধ্যাবেলায় রেণুর সঙ্গে ছাদে ফুলের টবে জল দিচ্ছি, রেণু বল্‌লে—এই টব্‌টায় বেশী জল দাও না, আমি আর পার্‌ছি না।

বল্‌লুম, কৈ টবে গাছ কৈ?

সে অবাক্ হ'য়ে বল্‌লে,—বা, তুমি যে টাকাটা দিয়েছিলে, সেটা ওতে ত পুঁতে' রেখেছি, দেখ্‌বে পরশুদিন কেমন টাকার গাছ হবে।

মা গল্প কর্‌তে ধরে' নিয়ে গেলেন। কথায় কথায় অতসীর কথা উঠ্‌ল। মা বল্‌লেন,—দেখ, ওর মা মরার সময় ওকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন বল্‌লেন—দিদি, সরসীকে তোমার হাতে দিয়েছি, অতসীকে তোমার কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মর্‌ছি, তুমি ওকে ঠিক পাত্রেই দেবে জানি। তা দেখ্, এতদিন ও বিয়ের কথা বল্‌লে হাড়ে জ্বলে' উঠ্‌ত, এখন তোর উপর একটু টান হয়েছে দেখ্‌ছি। তুই কি বলিস বল্?

হেসে বল্‌লুম,—একটু টান হয়েছে? আমার মত লক্ষ্মীছাড়া!

মা বল্‌লেন,—চুপ কর্ হতভাগা। সুরেশ বল্‌ছে, তোরা দু'জনে মিলে একটা কাগজ বের কর্, ও তার টাকা দেবে।

ধীরে বল্‌লুম,—মা, তুমি ত জান সব, কেন এ কথা তুল্‌লে?

বুঝ্‌লুম, মার মনে বেদনা লাগ্‌ল। ধীরে তাঁর হাতখানি ধরে' আদর কর্‌তে লাগ্‌লুম। তার পর জানি না কেমন করে' জ্যোৎস্নার কথা উঠ্‌ল, আমি দেড় বছর বাংলায় নেই তাদের কথা কিছুই জানি না। মা বল্‌লেন, জ্যোৎস্নার স্বামী গেল বছর মারা গেছে, জমিদারের ছেলে মদ খেয়ে লিভারের অসুখ কর্‌লে, বুকটাও খারাপ ছিল।

আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌লুম—সে কেমন আছে মা?

মা ধীরে বল্‌লেন,—তোর কথা ভেবে তাকে একবার দেখ্‌তে গিয়েছিলুম, যখন এসে দাঁড়াল, বুকটা ফেটে গেল রে! একটু কাঁদ্‌লে না, শুধু মুখটা বুকে গুঁজে' পড়ে' রইল।

তার পর মা যে কত কি বলে' যেতে লাগ্‌লেন কিছুই আমার কানে এল না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত মার কাছে জ্যোৎস্নার সব কথা শুন্‌তে লাগ্‌লুম। সেই আমার চিরতরুণী জ্যোৎস্না—বিয়ের রাতে লালচেলীপরা তার প্রতিমার মত মূর্ত্তিটি চোখে আঁকা রয়েছে। এখন সে বৃহৎ জমিদার-পরিবারের কর্ত্রী, এখনও সে তেম্‌নি স্নিগ্ধ মধুর দিব্যশ্রী। মার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে সেই শুভ্রবসনপরিহিতা কল্যাণী লক্ষ্মীর ছবিটি ভাব্‌ছিলুম, ভেনাসের মত মুখখানি এখন ম্যাডোনার মত হয়েছে। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—তার ছেলেটি কেমন হয়েছে মা?

মা বল্‌লেন,—কি সুন্দর হয়েছে রে, কি শান্ত, নম্র, আমায় প্রণাম করে' এমন সুন্দরমুখে দাঁড়াল!

বুকে কি একটা বেদনা হচ্ছে, উঃ, সেই মাতালটা!

ভাব্‌চি জীবনটা কি? আমাকে দিয়ে বিশ্বশক্তি কি করাতে চায়। ধরো, এই সুরেশ, তার হাইকোর্ট, মক্কেল, মোটর, স্ত্রীকন্যা নিয়ে বেশ সুখে আছে, কিন্তু আমি ত এম্‌নি করে' শান্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারি না।

আমার হাতে তোমার বাঁশিকে দিলে না প্রভু, তোমার বজ্রকে দিলে, আমার কপালে তোমার দুঃখের অগ্নিতিলক জ্বালিয়ে দিলে! ইচ্ছে কর্‌ছে, একটা ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে' যাই, অগ্নিপুচ্ছ দিয়ে সব অত্যাচারীদের দগ্ধ করে', রাজার মুকুট খসিয়ে, ধরণীর প্রাসাদ জ্বালিয়ে, শক্তির দম্ভ ধূলায় লুটিয়ে, এই সমাজতন্ত্র রাজতন্ত্র চূরমার করে'।

(৫)

অতসী ধরে' ফেলেছে আবার আমার মনটা বিকল হয়েছে। দুপুরে রেণুর সঙ্গে খেলায় বেশ মন দিতে পার্‌ছিলুম না, সে রেগে আমার সঙ্গে আড়ি করে' চলে' গেল। এবার বুঝ্‌ছি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এসেছে।

অতসী আমাকে লাইব্রেরীতে ধরে' নিয়ে গেল, বল্‌লে—আবার কি ভাব্‌চ? কাল সারারাত ঘুমোওনি—ছাদে ঘুরেচ।

বুঝলুম আজ সহজে সে ছাড়বে না। ভালবাসার দুঃখ তাকে আর দিতে চাই না, খোলাখুলি সব বুঝিয়ে দিই।

হেসে বললুম,—আমি হচ্ছি একটা অ্যানার্কিষ্ট, মৃত্যুর দোসর আমার জন্য ভাব কেন?

কি করুণমুখে সে আমার দিকে চাইলে। কতরূপে নারীকে পেলুম,—কেউ বুকে আগুন জ্বালায়, কেউ চন্দনের প্রলেপ বুলোয়, কেউ আলেয়ার আলো হ'য়ে দিশাহারা করে' ঘোরায়, কেউ স্নিগ্ধ গৃহে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে সারারাত প্রতীক্ষা করে।

ধীরে বললুম,—দেখ, তোমার কথা দিয়ে গান দিয়ে আমার এ ভাঙা মন তুমি সারিয়ে তুলেছ, তোমার ঋণ কোন দিন শুধতে পারব না বন্ধু, কিন্তু এর উপর কোন লোভ কোরো না।

তার বুকের রক্ত রিম্‌ঝিম্ করছে, চোখ জলজলে হ'য়ে উঠল, বললে,—আমাকে শুধু তোমার বন্ধুর কাজই করতে দাও,—তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে, তাকে ব্যর্থ কোরো না।

ধীরে বললুম,—সেই শক্তিকেই সার্থক করবার জন্যে আমায় চলে' যেতে হবে।

সে ভাঙা-গলায় বললে,—আবার তুমি ওই পথে যাবে?

বললুম,—ঠিক ওপথে নয়। দেখ, তুমি ঘরে বসে' কাগজ পড়, অত্যাচার-অবিচারের কথা, আমি তা পারি না, আমার গা জ্বলে, ইচ্ছে করে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে' ধরিগে। রিভলভার আমি ফেরত চাইছি না, এবার প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বালাব, ওই নিপীড়িত পদদলিতদের জাগাতে হবে, তাদের প্রাণের বারুদে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বালিয়ে অবিচারের মরণোৎসব হবে। তুমি কি ভাব, এই যে শ্রমিকের রক্তে রাঙান, নারীর অশ্রুতে ভেজান ধনীর স্বর্ণ স্তূপীকৃত হচ্ছে, শক্তিমদমত্ত রাষ্ট্রশক্তির শাসন-পেয়ালা অত্যাচারের বিষে ভরে' উঠছে, এই রাজ্য নিয়ে রাজনীতিবিদ্‌দের জুয়াখেলা, মানবাত্মা নিয়ে পুরোহিতদের ধাপ্পাবাজি, এই প্রবলজাতির নিষ্ঠুর, লোভ অভিমান, শক্তির ক্রূর অত্যাচার চিরকাল টিঁকবে? এই যন্ত্রশক্তি অধিষ্ঠিত বণিক্-সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাবে, আমরা সেই ধ্বংসের যুগের অগ্রদূত, নটবর রুদ্র আমাদের হাতে তাঁর বজ্র দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে স্বাধীনতার মন্ত্রে পিনাকধ্বনি করে' সবাইকে জাগাতে হবে।

অতসীর মুখ অগ্নিশিখার মত রাঙা হ'য়ে উঠল, চোখে স্বপ্নের গোলাপী আভা জড়াল, চুল ফুলে' উঠল, বুক দুলতে লাগল।

দীপ্তকণ্ঠে বলে' উঠলুম,

"হায় সে কি সুখ এই গৃহ ছাড়ি
হাতে লয়ে' জয়তূরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে বসিয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।"

অতসী বলে' উঠল,—আর আমরা!

বললুম,—বাংলারও সেদিন আসবে, তোমাদের পর্দ্দা ছিঁড়ে' যাবে, গারদ ভেঙে যাবে, অবগুণ্ঠন খসে' যাবে। আজ বাংলার এ কোণে যে প্রাণের আগুন জ্বলে' নিভে যাচ্ছে দেখছ, ভাবছ ওরা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে জেলে পুরে' সে প্রাণকে মারবে?—আজ শুধু পূর্ব্বসূচনা। ভারতের এ যুগের গুরুগোবিন্দ কোথায় কৃচ্ছ্র তপস্যা করছেন জানি না, কিন্তু তিনি দুঃখের সাধনা আরম্ভ করেছেন—তিনি আসছেন, তিনি আসছেন, তাঁর আগমনের জন্যে আমাদের আয়োজন করতে হবে।

(৬)

আজ নিশীথরাতে আবার ঝড় ঘনিয়ে এসেছে। ওই অন্ধকার শূন্য হ'তে ঝঞ্ঝার কণ্ঠে প্রলয়পথে যাত্রার আহ্বান আবার এল। ভাঙা দেহমন ত সারান হ'ল, শান্তিনীড় ছেড়ে' আবার দুঃখের পথে বেরুতে হবে। তরুণী বন্ধুর করুণ চোখের চাওয়া কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে কি ব্যথার টান পড়েছে, এই আকাশ-জোড়া হাহাকারে গাছপালার করুণ মর্ম্মরে বুকের দীর্ঘশ্বাসে তারি বেদনা পাচ্ছি। আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ি, এদের কাছে বিদায় নিয়ে যেতে পারব না।

মাগো! কতরূপে তুমি আমার সঙ্গে কত লীলা করবে। এক ঝড়ের রাতে তুমি ছোট মা হ'য়ে কচি হাতের বাঁধনে বেঁধে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌লে, আর এক রাতে এ কি প্রলয়ঙ্করীরূপে ডাক দিয়ে ঘরছাড়া করছ।

দীক্ষার রাতের কথা মনে পড়্‌ছে। এম্‌নি এক ঝড়ের রাতে বহু পুরাতন বট-গাছের তলায় ভাঙা মন্দিরে কালীমূর্ত্তির সাম্‌নে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, এ জীবন মা'র কাজে উৎসর্গ করব। গৃহ ছাড়্‌লুম, সব স্নেহবন্ধন ছিন্ন করলুম, অর্থ মান সুখলোভ ত্যাগ করলুম। আছে শুধু শাণিত খড়্গ, অত্যাচারীর মুণ্ড, রক্তের স্রোত। এই ঝড়ের আকাশে কালীর বিশ্বরূপ দেখ্‌ছি নিবিড়-তিমির-ঘন কেশরাশি আকাশে ছেয়ে গেছে, বক্রাক্ত খড়্গের আভা নৃত্য করে' বেড়াচ্ছে, প্রলয়-উৎসবের অট্টহাস্যের স্রোতে রাজ্য-সাম্রাজ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে।

বিদ্যুতের চিকিমিকিতে অতসীর চোখের চাউনি জেগে উঠ্‌ল।

বাতাসে লাইব্রেরী-ঘরের জান্‌লাগুলো সশব্দে বার বার খুল্‌ছে আর বন্ধ হচ্ছে। দরজা ঠেলে লাইব্রেরীতে ঢুক্‌লুম, অন্ধকারে আলোর সুইচ্‌টা খুঁজ্‌তে গিয়ে কার গায়ে হাত পড়্‌ল,—শাড়ীর খস্‌খসে—চুড়ির টুং টাং-এ অন্ধকার কেঁপে উঠ্‌ল, কেশের মদির গন্ধ, বিদ্যুতের মত স্পর্শ! জান্‌লা দিয়ে বিদ্যুতের আলো চম্‌কে গেল। দেখ্‌লুম অতসীর অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি।

তুমি?

হাঁ, আমি।

সমস্ত অন্ধকার তার গলার সুরে বেজে আমায় ঘিরে' ধরলে।

দু'জনে ছাদে বেরিয়ে এলুম,—আজ ঝড়-জলে ওই বইয়ের গাদা ভেসে গেলে কিছুই যায় আসে না। কতক্ষণ দুজনে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলুম।

বললুম,—ওই যে ঈশান কোণে কালো মেঘে বিদ্যুৎ জ্বলে' উঠ্‌ছে,—তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না কিন্তু আমি পাচ্ছি,—পৃথিবী জুড়ে' বিদ্রোহের আগুন জ্বলে' উঠ্‌ছে, নটরাজ তাঁর ধ্বংসের লীলা সুরু করেছেন বলে'। এক-এক দেশে তিনি তাঁর পা ছুঁইয়ে যাচ্ছেন, রাজসিংহাসন ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌ছে,—একবার রুশিয়ায়, একবার চীনে, একবার আয়র্ল্যাণ্ডে, একবার তুরস্কে – রুদ্রের চরণ-চিহ্ন দেশে দেশে পড়্‌ছে। যেখানে জাতিতে জাতিতে হিংসা-দ্বেষ অত্যুগ্র হ'য়ে উঠেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী নিপীড়িতের নিরুদ্ধ রোষ জমে' উঠেছে,—ওই ইয়োরোপের অন্তঃস্তলে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের মত যুদ্ধাগ্নি জ্বলে' উঠ্‌ছে, ক্ষুব্ধ জনসংঘের বিদ্রোহের ভূমিকম্পে বর্ত্তমান বণিক্-সভ্যতা কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। দেশে দেশে সে আগুন ছড়িয়ে যাচ্ছে। আজ ঝড়ে রুদ্রের আগমনী বাজ্‌ছে।

আকুল ধারায় বৃষ্টি পড়্‌তে আরম্ভ হ'ল। দুজনে বারান্দার কোণে সরে' পাশাপাশি দাঁড়ালুম। আমার দীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু বল্‌লে,—তুমি কি সত্যি যাবে?

শুধু তার মুখের দিকে চাইলুম।

—তোমাকে আমি বাধা দেব না, আমাকে যখন দরকার হবে ডাক দিও।

আমাদের ঘিরে ঝড়জল উদ্দাম হ'য়ে উঠ্‌ল। মাতার অশ্রুজল, প্রিয়ার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের হাহাকারের মাঝে প্রলয়-পথিককে চলে যেতে হবে।

অতসীর কথা

সেই ঝড়ের রাতে বন্ধু যে চলে' গেল তার পর কত বছর কেটে গেল। প্রতিবছর একবার করে' তার খবর পেতুম, রেণুর প্রতি-জন্মদিনে পৃথিবীর যে কোণেই সে থাকুক তার বিদ্রোহীছেলের একটা উপহার এসে পৌছত। কোন বৎসর নিউইয়র্ক্ থেকে, কোন বার প্যারিস্ থেকে, কোন বার বাগ্‌দাদ থেকে। বর্ত্তমান ধনিক-সভ্যতা ও রাষ্ট্রতন্ত্রের ধ্বংসেচ্ছুক যে পৃথিবী-জোড়া বিপ্লবকারীর দল আছে, সে তাতে গিয়ে যোগ দিয়েছে। বন্ধু যখন ধূমকেতুর মত পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত ঘুরে' বেড়িয়েছে, আমি স্কুলে গিয়ে মেয়েদের পড়িয়েছি, ঘরে বসে' কাগজ পড়েছি, নভেল পড়েছি, রান্না করেছি, সব ঝাট দিয়েছি, আর প্রতিদিন সেই ঝড়ের রাতে-দেখা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিখানি ভেবেছি, সেই মন-ভোলান ঘর-ছাড়ান প্রাণ-মাতান দীপ্ত মুখ।

তার পর ভারতের মহা দিন এল। মহাত্মা গান্ধী

সত্যাগ্রহের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে অন্ধপ্রথা- ও প্রভুত্ব-পীড়িত ভারতের ধূলিলুণ্ঠিত আত্মাকে মুক্তির দুর্গম পথে আহ্বান করলেন, এ নব ভগীরথ স্বাধীনতার শঙ্খ বাজিয়ে চিরঅপরাজিত মৃত্যুঞ্জয়ী অমর আত্মার অমৃত-লোক হ'তে নবশক্তিগঙ্গার আবাহন করলেন—মৃত মূক জনসংঘ এ সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে জেগে উঠ্ল।

বেণুর জন্মদিন। তাকে ধরে' চরকার সূতো কাটাতে বসেছি। সহসা পেছনে পায়ের শব্দে চমকে চেয়ে অবাক হ'য়ে দাঁড়ালুম, অশোক আমার সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা চরকা। কি সৌম্য স্নিগ্ধ মূর্তি, কাঁচাপাকা-দাড়িভরা মুখখানি যেন যিশুখৃষ্টের মত!

আমার হাত জড়িয়ে ধরে' সে বল্লে,—ফিরে' এলুম, আবার নূতন খেলায় মাৎতে।

বল্লুম,—কি আশ্চর্য! তোমার কথাই ভাবছিলুম, আজ বেণুর জন্মদিন, এখনও তোমার উপহার এল না।

এই যে, বলে' সে চরকাটা বেণুকে দিলে। রেণু অতি সলজ্জভাবে তাকে প্রণাম করে' উঠে' দাঁড়াল।

আবার মায়ের ডাকে ফিরে' এলুম,—বলে' সে বেণুকে আদর করলে।

বলে' গিয়েছিলুম, ভারতের দুর্দিন দূর করবার জন্যে বীর সাধক আসবেন, তিনি এসেছেন। কিন্তু মা কৈ?

চোখে অশ্রুর বান ডেকে এল, কোনমতে বল্লুম,—গেল বছর তিনি স্বর্গে গেছেন।

বন্ধু সামনের চেয়ারে বসে' পড়্ল, ভাঙা গলায় বল্লে,—আমায় কিছু বলে' গেছেন।

আমার সমস্ত মুখ রাঙা হ'য়ে উঠ্ল, তাঁর মৃত্যুদিনের কথাগুলো কানে বাজ্তে লাগ্ল, তিনি বলেছিলেন, সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটা যদি আবার ফিরে আসে মা, বলিস, আমি তাকে প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করেছি, তার হাতে তোকে দিয়ে যেতে পারলে আমি খুব আনন্দে মরতুম। বন্ধুর করুণ মুখের দিকে চেয়ে ধীরে বল্লুম,—তোমাকে তিনি প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করে' গেছেন।

অস্ফুটস্বরে মাথা নত করে' সে বল্লে,—বুঝেচি।

দাদা এলে অশোক বল্লে,—ওহে, মনে আছে বলে-ছিলে, যদি কাগজ বের করতে চাও ত টাকা দেব, এখন সে কথাটা রাখ দেখি।

দাদা রাজী হলেন।

তার পরের দিনগুলো লেখায় পড়ায় কাজে কি উৎসাহ-আবেগের সঙ্গে কেটে যেতে লাগ্ল। সভা করে' সমিতি গড়ে' প্রবন্ধ লিখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে' দিনরাত গান্ধীর বাণী প্রচারে অশোক উদ্দাম হ'য়ে উঠ্ল।

একদিন বিকেলে দাদা শুক্‌নো মুখে এসে বল্লেন,—ওরে, অশোককে পুলিসে ধরে' নিয়ে গেছে, কোথায় বিদ্রোহসূচক বক্তৃতা দিয়েছিল।

স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রাণ দিতে হবে জানি, তবু চোখে জল এল। দাদা মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন,—এই বুঝি বাঙালীর বীর মেয়ে!

শুধু বল্লুম, ওর কি ভাঙা শরীর জান ত।

দাদা ধীরে বল্লেন,—দেখ, কাল থেকে আমি আর কোর্টে যাব না।

উৎসাহের সঙ্গে বল্লুম,—সত্যি, যাবে না!

দাদা হেসে বল্লেন,—হ্যাঁরে, আর ভাল লাগে না।

দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে' দাঁড়ালুম।

জেল খেটে বন্ধু যখন ফিরে এল তার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। কিন্তু খদ্দরপরা সেই রোগা লম্বা শরীরে কি তেজ! সোনার আভার মত দেহের রংএ অন্তরাত্মার দীপ্যমান সত্য পুরুষটির রূপ দেখা যাচ্ছে, জেলবাসশীর্ণ তপঃক্লিষ্ট মুখে কি অপরূপ মহিমা জড়ান, অহর্নিশি দেখে'ও চোখ তৃপ্ত হয় না।

অশোকের সঙ্গে জেল থেকে একটি তরুণ সুন্দর যুবক এল। তার স্নিগ্ধ তেজোমণ্ডিত মুখখানির দিকে চেয়ে বল্লুম,—এ কে?

অশোক তার পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্লে,—দেখ, জেলে গিয়েছিলুম তবেই ত এটিকে পেলুম, এ হচ্ছে জ্যোৎস্নার ছেলে, আমরা এক জেলেই ছিলুম।

বল্লুম,—আহা গেল বছর ত ও মা হারিয়েছে।

কি করুণ হেসে বন্ধু বল্লে,—হাঁ, তাই ত মার কাজে এমন করে' লেগেছে। ওরে রেণু, সুতো-কাটা বন্ধু

ক'রে' পালাচ্ছিস কেন, আয়। এটি আমার ছোট-মা। অতু, জান, এর নামও অশোক।

সেই ভাঙা শরীর নিয়ে বন্ধু আবার কাজে লাগ্‌ল। দেহটা প্রতিদিন খুব-শান-দেওয়া ছুরির মত সূক্ষ্ম হ'তে লাগ্‌ল, স্নান করা, খাওয়া, ঘুমান, কিছুরই হুঁশ থাকে না। কোনো বারণ মানে না। আমি যখন ঠেকাতে পার্‌তুম না, রেণুকে পাঠাতুম। রেণু জোর কর্‌লে, তবে লেখা বন্ধ হ'ত, ঘুমোতে যেত।

একটু শরীর সার্‌তেই অশোক আবার কল্‌কাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। রেণুও তাকে ধরে' রাখ্‌তে পার্‌লে না। বল্‌লে, সত্যিকার দেশ যেখানে, সেই নিরন্ন নিপীড়িত অন্ধ মূক ভীত গ্রামবাসীদের জাগাতে হবে, গ্রামেই আমার কাজ।

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় এক গ্রাম থেকে দাদার কাছে টেলিগ্রাম এল,—অশোকের ভয়ানক অসুখ। সেই রাতেই সবাই কল্‌কাতা ছেড়ে বেরলুম। গিয়ে দেখি সহর থেকে অনেক দূরে এক শীর্ণ নদীর তীরে এক প্রাচীন ভগ্ন গ্রামে পচা পুকুরের ধারে এক কুঁড়ে-ঘরে অশোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে' রয়েছে। নীলার মত স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে বল্‌লে,—এসেছ ভাই, ভাব্‌ছিলুম আর বুঝি দেখা হবে না।

দাদাকে বল্‌লুম,—এ কি কাণ্ড দাদা! এত অসুখ, ওই চাষার কুঁড়েতে পড়ে'!

দাদা বল্‌লেন,—এ গ্রাম ওদের জমিদারীর মধ্যে, অসুখ শুনে' ওর দাদা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সহরে নিয়ে যেতে, অবশ্য নিজের বাড়ীতে রাখ্‌তেন না, কোন বন্দো-বস্ত করে' দিতেন, কিন্তু অশোক কিছুতেই গেল না।

রেণুর অনেক কান্নাকাটির পর অশোক পাশেই এক পাকা-বাড়ীতে যেতে রাজী হ'ল।

তার পর সাতদিন মন-প্রাণ দিয়ে তাকে সেবা করে' ধন্য হয়েছি। আমার জীবনের এই সাতটি দিন-রাত আমি কত জন্মের কত পুণ্যফলে পেয়েছিলুম। এ দিন-রাতের প্রতিক্ষণ আমার মনে গাঁথা রয়েছে। জীবনপ্রদীপ নিভ্‌বার আগে কি জ্বলজ্বলে হ'য়ে উঠ্‌ল। সে রাতে বন্ধু অতি শান্ত হ'যে শুয়ে ছিল, জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় এসে পড়েছে, বাগান থেকে আমের মুকুলের গন্ধভরা হাওয়া আস্‌ছে, কচিপাতা-ভরা গাছ থেকে একটা বউ-কথা-কও পাখী মাঝে মাঝে ডেকে উঠ্‌ছে, নিঝুম ঘুমন্ত গ্রাম, শুধু আমরা দুজন জেগে আছি। ধীরে সে বল্‌লে—তুমি শুতে যাও, আমি ত ভালই আছি।

—তুমি একটু ঘুমোও না।

—ঘুম কি চোখে আস্‌বে।

—আমারও ত আসবে না।

—রেণু ঘুমোতে গেছে, ছোট মা?

—হাঁ, ওতে আর অশোকে এতক্ষণ ঝগড়া কর্‌ছিল, কে রাত জাগ্‌বে। আমি দুজনকেই জোর করে' ঘুমোতে পাঠিয়েছি।

—দেখ, ওদের যদি বেশ ভাব হয়, ওদের বিয়ে দিও।

—হাঁ, সে আমি ভেবেছি, তোমাকে সেবা করার মধ্যে ওদের মিলন হ'য়ে গেছে।

—জান্‌লাটা খুলে দাও ত। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! এম্‌নি এক জ্যোৎস্না-রাতে আমি মর্‌তে গিয়েছিলুম! সে মৃত্যু থেকে কে বাঁচিয়েছিল! জীবন কি পরমাশ্চর্য্য রহস্য, সেদিন বুঝিনি, আজও বুঝ্‌লুম না, শুধু জান্‌লুম কোন আনন্দময় বিশ্বশক্তি আমাকে সৃষ্টি করে' তার কাজ করিয়ে আবার ছুটি দিচ্ছে। জীবনের সত্যি কাজটা এতদিন পরে খুঁজে' পেলুম মনে হচ্ছিল। এক মাস গ্রামে গ্রামে পীড়িতদের সেবা করে' যে কি আনন্দ পেয়েছি, তার তুলনা নেই। দেখ, মহাপুরুষদের সেই কথাই সত্যি—শক্তি দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে,—লোভ দিয়ে নয়,ত্যাগ দিয়ে,—জীবনকে ধ্বংস করে' নয়, আপন জীবন উৎসর্গ করে' আত্মার আনন্দ খুঁজে' পাওয়া যায়।

পাখার বাতাস করতে করতে বল্‌লুম,—একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর না।

ভোরের শুকতারার মত কোন্ জাগরণের আলো তার চোখে জ্বলে উঠ্‌ল, আমার হাত নিজের হাতে টেনে নিয়ে সে বল্‌লে,—না, আজ আমায় বল্‌তে দাও। বিশ্বের সৃষ্টির কাজে ব্রহ্মার সঙ্গে আমিও যোগ দিয়েছি, রুদ্রের বজ্র হ'য়ে

ভাঙার খেলাটাই সারাজীবন খেল্‌লুম, গড়ার খেলাটা আর খেলা হল না। আমি এ ছোট মাটির পৃথিবীর বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে আনন্দের সৃষ্টি-সাথী হয়ে জন্মেছিলুম, পৃথিবীর কোন্ অনাগত যুগের স্বপ্ন আমায় মাতাল করেছিল জান, পৃথিবীতে এক ধর্ম্ম—প্রেমধর্ম্ম, এক জাতি—মানব জাতি, এক দেশ—এই পৃথিবী মা। কোন্ মহামিলনের দিকে জগৎ চলেছে, ইংরেজ, জার্ম্মান, কাফ্রী, জুলু, বাঙালী, চীন, যে লাঙ্গল ঠেল্‌ছে, যে লোহা পিটছে, যে লিখ্‌ছে, যে জাহাজ চালাচ্ছে, সবাই সভ্যতার বিপুল রথচক্রের এক-একটি চাকা, শক্তির রথে চড়ে' শতাব্দীর পর শতাব্দী নর-নারায়ণ চলেছেন, কোন্ শান্তির আনন্দের মিলনের যুগের দিকে, কত কোটি তাঁহার বাহু, বিপুল তাঁহার শক্তি, দুঃখদ্বন্দ্বময় ইতিহাস-পথ দিয়ে নব নব ধর্ম্ম, জাতি, রাজ্য ভেঙে গড়ে' কতরূপে তিনি চলেছেন, কখনও নরমুণ্ডের পাহাড় তুলে রাজ্য পুড়িয়ে রক্তের স্রোত বইয়ে—আলেকজান্দার, চেঙ্গিস, নাদির, নেপোলিয়ান; কখন আত্মার জ্ঞান-শিখা জ্বালিয়ে প্রেমের স্রোত বইয়ে—বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, গান্ধী। সে যুগে ইংরেজ বাঙালী কাফ্রীতে প্রভেদ থাক্‌বে না, পুরুষ ও নারীর অধিকারে ভেদ থাক্‌বে না, লোকে লোকে জাতিতে জাতিতে শক্তির জন্য অর্থের জন্য বীভৎস নিষ্ঠুর সংগ্রাম নেই, ধনীর ধনঝঙ্কার, শক্তিমন্তের রণহুঙ্কার থেমে গেছে,—মানব-ইতিহাসের সেই অনাগত যুগের প্রতীক্ষায় ভারত, আমার ভারত, বিশ্বমানবের এই মিলনভূমি, এই বন্দিনী দুঃখিনী ভারত, তার বুকের ধর্ম্মের আরতি-প্রদীপ ছিন্নমলিন অঞ্চলে ঢেকে পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়ার মুখে তপস্বিনীর মত দাঁড়িয়ে আছে,—

শ্রান্ত হয়ে সে চুপ কর্‌ল। তাকে হাওয়া করতে লাগলুম। সে ধীরে বল্লে,—একটা গান গাও, বন্দে মাতরম্।

বল্লুম,—না, তা শুনলে তুমি আরও উত্তেজিত হবে। আর, যে স্বর তুমি শুনেছিলে, সে স্বর আমার গলায় নেই, আমার গলায় যে ঘা হয়েছিল, এখন আর কিছুই গাইতে পারি না।

আবার বন্ধু উত্তেজিত হয়ে বলে' উঠ্‌ল—দেখ ছ কি নির্ম্মম প্রকৃতি!—কাউকে সে রেহাই দেয় না। ডাক্তার বল্‌ছিল, আমি বাঁচতে পার্‌তুম, কিন্তু যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছি, প্রকৃতি তার হিসেব রেখেছে, আজ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিচ্ছে। একটু গাও, সুরের সুধার জন্যে প্রাণটা তৃষিত হচ্ছে।

ধীরে ধীরে মিষ্টি সুরের কয়েকটা হিন্দি গান গাইলুম। বন্ধু একটু শান্ত হল। ছোট শিশুর মত গানের সুরে সুরে ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

রাত গভীর হয়ে এল, ঝিল্লীর রবে পাণ্ডুবর্ণ আকাশ ঝিমঝিম কর্‌ছে রাতের বুকের দীর্ঘশ্বাসের মত, মাঝে মাঝে অন্ধকার বাগানে মর্ম্মরধ্বনি। বন্ধুর রোগশীর্ণ মুখের দিকে চেয়ে চোখে জল এল! ভাব্‌ছিলুম, বৌদ্ধযুগে সেই রাজা অশোকের সময় পৃথিবীতে যে দুঃখ দারিদ্র্য পাপ ছিল, সেই স্বার্থ দম্ভ শক্তির হানাহানি কিছু কমেছে কি? এখনও সেই জীর্ণ তৃণকুটীর, সেই অজ্ঞতা, ভীরুতা, অত্যাচার! এ অশোক চলে' যাবে, ওই তরুণ অশোকও চলে' যাবে, মানবজাতি প্রেমশান্তির যুগের দিকে একটু এগোবে কি?

তারাগুলো মাথার খুব কাছে প্রদীপশিখার মত দপদপ করতে লাগ্‌ল। মনে হল—যুগে যুগে দেশে দেশে যারা স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দিয়ে এসেছে, তারাই অনিমেষ নয়নে এ বর্ত্তমান পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে, আমাদের স্বপ্ন তোমরা কি সফল কর্‌লে, আমাদের মৃত্যু কি সার্থক হল?

এর পরের রাতে অশোক বড় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। শুধু যদি একরাতের জন্য আমার আগের গলাটা পেতুম, গানের সুরে ভিজিয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে' দিতুম। সে রাতে তার বিদ্রোহী মানুষ নয়, কবি-মানুষটি জেগে উঠেছে। চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে সে যেন মাতাল হয়ে উঠ্‌ল,—আহা! কি মধুর জ্যোৎস্না! সমস্ত সৃষ্টি ফুটে এ কার হাসি, এ ভুবনলক্ষ্মীর অঙ্গের লাবণ্য, দেখ, দেখ। পৃথিবী-মা এতদিন তার সাত রংএর আঁচল উড়িয়ে আমায় ধুবিয়েছে—এই রক্তের লাল, আকাশের নীল, গাছপালার সবুজ, আলোর সীমাহীন শুভ্রতা,—আজ পৃথিবী-মা তার কোন সৌন্দর্য্য-অবগুণ্ঠন খুলে

আমায় ডেকে নিচ্ছে,—সেখানে সব ঝরা পাতা, শুক্‌নো ফুল, মরুহারা নদী, মরা পাখীরা জমে। দেখ, দেখ, কে ওখানে দাঁড়িয়ে, ও জ্যোৎস্না, মোনালিসার মত অপূর্ব্ব হেসে আমায় ডাকছে—

শেষরাতে আবেগের প্রতিক্রিয়া হল, সে অবসন্ন হয়ে পড়্‌ল। ধীরে একবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—গান্ধী কেমন আছেন? মহাত্মাজী?

গান্ধীর উদ্দেশ্যে সে বারবার প্রণাম কর্‌ল।

ধীরে বল্লুম—তিনি ভালই আছেন।

গান্ধী যে দুদিন হল ইংরেজের কারাগারে বন্দী, একথা ওই মৃত্যুপথিককে বল্‌তে পার্‌লুম না।

হঠাৎ বন্ধুর চোখ বিদ্যুতের মত জ্বলে' উঠ্‌ল, সে বলে' উঠ্‌ল,—না, ওরা ওঁকে বন্দী কর্‌বে, জেলে পুর্‌বে; যীশুকে কি ফাঁসীকাঠে ঝুল্‌তে হয় নি? এ যে অনেক দিনের জমা পাপ, তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হবে।

ভাব্‌লুম, সত্যই ত—এ ত আমাদের পাপের ফল। এতক্ষণ ভাব্‌ছিলুম, পশ্চিমদেশের বর্ত্তমান সভ্যতার ব্যর্থতার কথা, এ সভ্যতা ইঞ্জিন তৈরী করেছে, এয়ারোপ্লেন তৈরী করেছে, সমুদ্র পার হয়েছে, রাজ্য জয় করেছে, কিন্তু মানবাত্মার স্বাধীনতা দিতে পার্‌লে না,—শুধু শক্তি দিলে, কল্যাণ দিলে না। নিজেদের হীনতা ভীরুতার কথা ত ভাবিনি।

অন্ধকার পৃথিবীর দিকে চেয়ে মনে হল, এ যেন একটা বড় জাহাজ চির-অন্ধকারের জোয়ার ঠেলে চলেছে, যাত্রীরা জাহাজের জায়গার ভাগাভাগি নিয়ে মারামারি করে' চলেছে; জাহাজের উপরে কি আছে, তলায় কি আছে, কোথায় চলেছে তা কেউ জানে না। কোন্ প্রবলজাতি কাপ্তান হয়ে জাহাজের হাল ধরে' চালাবে এই নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। আমার বন্ধু এ জাহাজের প্রান্ত হতে খসে মৃত্যুর অন্ধকার সাগরে কোথায় তলিয়ে যাবে তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ধীরে বন্ধুর পাণ্ডুর মুখে চোখের-জলে-ভেজা একটি চুমো দিলুম।

শেষের রাতে বন্ধু অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল, বিকারে মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেল। শুধু মাঝে মাঝে দু'চারটি কথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত—liberty equality—গান্ধী —অত্যাচারীর মুণ্ড—নরমুণ্ডের পাহাড়—নাদির চাই —রক্তের স্রোত—অতসী—বেহালা নয় রিভলভার—কে জ্যোৎস্না—যাচ্ছি—পৃথিবী-মা—জ্বালাও আগুন—জাগো, জাগো—liberty—

ভোরবেলায় সপ্তর্ষিমণ্ডল মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু চলে' গেলেন।

আজ রেণুর জন্মদিন। বন্ধুর দেওয়া চর্‌কাটা সে আজ ফুল দিয়ে এতক্ষণ সাজাচ্ছিল, আর পার্‌লে না, ছাদের কোণে কাঁদ্‌তে গেল। অশোক পাশের ঘরে বসে' কাগজের জন্য লিখ্‌ছিল, স্বাধীনতার অগ্নিপ্রদীপখানি বন্ধু তার হাতে দিয়ে গেছেন! সেও আর লিখ্‌তে পার্‌লে না, রেণুর পাশে গিয়ে ছাদে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে, টাকা-পোতা টবটার পাশে।

আজ অবিরল ধারায় চোখের জল ঝর্‌ছে, ঝরুক, প্রতিদিনই চোখের জল ঝর্‌বে।

আজ আকাশের এ উদার আলোর দিকে চেয়ে ভাব্‌ছি, রাঙা চেলীর ঘোম্‌টার নীচে সাহানার তানে আমাদের শুভদৃষ্টি হয়নি বটে, কিন্তু মৃত্যুর অবগুণ্ঠন-তলে তারার আলোয় জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় আত্মার সঙ্গে আমার মিলন হয়ে গেছে, আমার নারীজন্ম সার্থক হয়েছে, আমি ধন্য হলুম।

শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু

দক্ষিণ কানাড়ায় বন্যা

ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণে ও মালাবারের উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া জেলা অবস্থিত। দক্ষিণ কানাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী এই জেলাটির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়া প্রবাহিত। এই নদীগুলি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। বর্ষাকালে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার জলরাশি এই নদীগুলিতে আসিয়া পতিত হওয়ায় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীগুলি স্ফীত ও বেগবতী হইয়া উঠে। এই সময় একটু বৃষ্টি হইলেই নদীর জল কূল প্লাবিত করিয়া শস্যক্ষেত্রগুলিকে ধৌত করে। সুতরাং এখানকার শস্যক্ষেত্রগুলি অত্যন্ত পরিমাণ বৃষ্টি হইলে গ্রাহ্য করে না ও তাহাদের ক্ষেত্রগুলিকে সামান্য বান হইতে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করে না।

অপেক্ষাকৃত বড় নদীগুলিতে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলিকে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা 'কুদুর' বলে। এ-সকল দ্বীপে লোকের বসতি আছে ও চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। এ দ্বীপগুলিতে সাধারণত নারিকেল বৃক্ষই জন্মায়—২।১ টি শস্যক্ষেত্রও মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। এইসকল স্থানে ফসল খুব ভাল হয়। সেই কারণেই মধ্যবিত্ত কৃষকেরা স্বচ্ছলতার প্রলোভনে



বন্যা-পীড়িত প্যানেম্যাঙ্গালোরের দৃশ্য



দক্ষিণ কানাড়া জেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে এই সকল স্বেচ্ছাসেবকগণ উদিপী তালুকে সেবা-কার্য্য করিতেছেন
[সাইমন্‌স্ ষ্টুডিও কর্ত্তৃক গৃহীত আলোক চিত্র হইতে]



বন্যা-বিনষ্ট বনতোয়ালের একটি দৃশ্য



বন্যা-বিনষ্ট বানতোয়ালের অপর একটি দৃশ্য

[ছবির মধ্যস্থলে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক শ্রীযুক্ত অচ্চপ্পা দণ্ডায়মান। ইনি ৫২টি বালকবালিকাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন।]

অন্যত্র বাস করে না। অনেকে বেশ পয়সা খরচ করিয়া ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া 'কুদুরে' বাস করে।

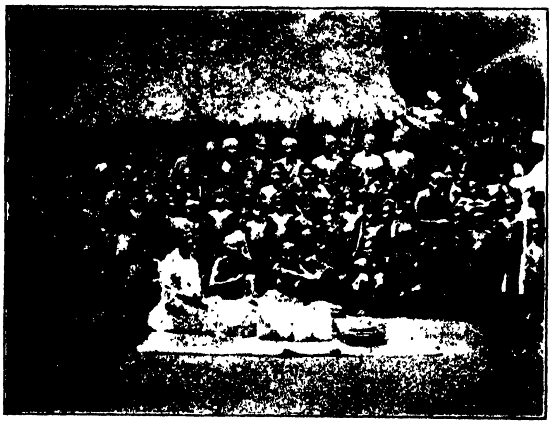
গত ৯ই ও ১০ই জুলাই হঠাৎ এখানকার সুখী কৃষকগণের উপর বরুণদেবের কোপ পড়িল। ৯ই তারিখের রাত্রি হইতে কল্যাণপুর 'কুদুরের' নিকটস্থ নদীর জল কূল প্লাবিত করিয়া বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখানকার লোক সামান্য বানে অভ্যস্ত—কাজেই ইহাকে তাহারা বার্ষিক বান বলিয়া মনে করিল। কিন্তু পরদিন দ্বিপ্রহরে নদীর জল ভয়াবহরূপে বৃদ্ধি পাইল। কৃষকগণ ইহাতে অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। কয়েকখানি কুঁড়েঘর পতিত হওয়ায় দরিদ্র অধিবাসীগণ তাহাদের মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী লইয়া গ্রামস্থ জমীদারের আলয়ে আশ্রয়-গ্রহণ করিল। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে জমীদারের আলয়ও পতিত হইল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সহস্রাধিক নরনারী গৃহহারা হইল। অনেক কষ্টে নরনারীরা নিজেদের জীবন রক্ষা করিল। কিন্তু গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তু ও অন্যান্য দ্রব্য সমস্তই ভাসিয়া গেল। এই বিপন্ন নরনারীকে সময়-মত সাহায্য প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয় নাই। নিকটস্থ গীর্জ্জায় ও পাহাড়ে বন্যাক্লিষ্ট নরনারীকে থাকিবার স্থান দেওয়া হয়। উদিপীর জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া বন্যাপীড়িত স্থানে সাহায্য প্রদান করেন।

সেই দিনই অন্যত্র হইতেও বন্যার সংবাদ পৌঁছিল। কুণ্ডপুর, বানতোয়াল, প্যানেম্যাঙ্গালোর, কুলুর, উপীনানগদী, বেলতানগদী প্রভৃতি স্থান হইতেও বন্যার সংবাদ

পাওয়া গেল। নদীর উভয় পার্শ্বের প্রায় সমস্ত গ্রামেই বন্যার প্রকোপ হইয়াছিল। নদীর খাতটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত বলিয়া উপ্‌চানো জলের বেগে নদীতীরস্থ একটি গ্রামও বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইল না। এইরূপে সহস্র সহস্র নরনারী গৃহহীন ও সম্বলহীন হইয়া পড়িল।



কল্যাণপুরের খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বস্ত্র বিতরণ



কল্যাণপুরে সাধারণের ভিতর বস্ত্র বিতরণ

স্বেচ্ছাসেবকেরা সাধ্যমত সাহায্যপ্রদানে ত্রুটি করেন নাই। প্রয়োজন অনুসারে তাঁহারা চাউল, বস্ত্র, ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিয়াছেন। উদিপী তালুকের অন্তর্গত আরুর নামক একটি গ্রামে রন্ধনের জন্য শুষ্ক স্থান না পাইয়া ভিজা চাউল ভক্ষণ করিয়া প্রায় চারিশত লোক একই সময়ে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়। এই-সকল ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের জন্য একটি অস্থায়ী দাতব্য



কল্যাণপুরের দুর্দ্দশাগ্রস্ত পঙ্কমাদিগকে বস্ত্র বিতরণ



কেম্মান্নুন গ্রামের অধিবাসীদিগকে বস্ত্র বিতরণ



কেম্মান্নুন গ্রামের বন্যাপীড়িত মুসলমানদিগকে বস্ত্র দান

চিকিৎসালয়ও স্থাপন করা হইয়াছে। সুস্থ ও সবল লোকদিগকে চরকা ও তাঁতের কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় সরকারী সাহায্যও উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় নাই।

গত ৬ই ও ৭ই আগষ্ট্ তারিখে আবার একটি ভয়াবহ বন্যার সংবাদ পাওয়া যায়। নেত্রবতী নদীর জল বেগে বৃদ্ধি পাওয়ায় বানতোয়াল, পানেম্যাঙ্গালোর, উপীনানগদী ও ভেন্নুর গ্রামগুলি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রামগুলির কতকগুলি ছবি প্রদত্ত হইল।

বানতোয়াল গ্রামে প্রায় এক হাজার ঘর লোকের বসতি আছে। এই গ্রামটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। কিন্তু এই প্রবল বন্যা এই শান্তিপূর্ণ গ্রামটির সকল সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে। সেখানে প্রাসাদিককাল পূর্ব্বে সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ী গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করিত, সেখানে আজ চারিদিকে শুধু ধ্বংসের লীলা। ৭ই আগষ্ট্ তারিখে নেত্রবতী নদীর জল হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। গ্রামের অধিবাসীরা কোনক্রমে পরিত্যক্ত চালার উপর ও অন্যান্য উঁচু স্থানে যাইয়া নিজেদের জীবন রক্ষা করে। কিন্তু গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগুলি সমস্তই ভাসিয়া যায়। দুইদিন পরে সাতটি মানুষের মৃতদেহও এই ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করা হয়। গ্রামটির চতুর্দ্দিক্ জলে বেষ্টিত হওয়ায় অন্য স্থান হইতে সাহায্য পাইতে বিলম্ব ঘটে। গ্রামে যাইবার রাস্তাগুলি সমস্তই ডুবিয়া যাওয়ায় লোক-চলাচলের পথ বন্ধ হয়।

প্যানেম্যাঙ্গালোর গ্রাম নেত্রবতী নদীর অপর পার্শ্বে অবস্থিত। উভয় গ্রামের মধ্যে নদীর উপরে একটি সেতু আছে। দিবাভাগে এইগ্রামে বান ডাকে। সুতরাং এখানকার অধিবাসীরা সকলেই কোনপ্রকারে প্রাণে বাঁচিয়াছে। মিঃ আচ্চারা নামক একজন মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়া ৫২ জন নিরাশ্রয় রমণীর ও বালকবালিকার প্রাণ রক্ষা করেন। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকেরাও এই বিপন্ন নরনারায়ণের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন।

উপীনানগদী ও ভেন্নুর গ্রামের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এখানকার নরনারীর দুর্দ্দশার কথাও বর্ণনাতীত। ম্যাঙ্গালোর সহর এবং চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামগুলিও এই প্রবল বন্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

এ পর্য্যন্ত এই বন্যাক্রান্ত জেলাতে ২৬টি সাহায্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যহ ১২ হাজার নরনারীকে সাহায্য করা হইতেছে। অন্ন বস্ত্র ঔষধ ও পথ্য ইত্যাদিতে দৈনিক প্রায় আটশত টাকা খরচ হইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আরও বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এখনও ৪৮ হাজার লোকের ঘরবাড়ী প্রস্তুত করিতে সাহায্য করা দরকার। কৃষকদিগকে ফসলের বীজ ক্রয় করিবার জন্যও অর্থসাহায্য করিতে হইবে। যাহাতে এইসকল নদীমাতৃক গ্রামে ভবিষ্যতে বন্যা না হয় সে-বিষয়েও দৃষ্টি দিতে হইবে। স্থায়ীভাবে এই দৈব উপদ্রবের প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাংলা, বোম্বাই, মহীশূর, বিহার ও ব্রহ্মদেশ হইতেও বন্যার সংবাদ আসিয়াছে। গত বৎসরের উত্তর-বঙ্গের ভীষণ বন্যার কথা এখনও কেহ ভুলিতে পারে নাই। সে সময় সমগ্র ভারতবর্ষ যেরূপ ভাবে বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য করিয়াছিল, আশা করা যায়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও সকলেই এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ভুলিবেন না।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

ভাস্কর-শিল্পে জার্ম্মানি

(১)

দেবদেবীর প্রতিমাগড়া ছাড়া বর্ত্তমান ভারতে ভাস্কর-শিল্পের পরিচয় একদম পাই না বলিলেই চলে। আজকাল কয়েকজন মারাঠা এবং বাঙ্গালী শিল্পী ভাস্কর্য্যে হাত দেখাইতে সুরু করিয়াছেন মাত্র।

এমন কি মধ্যযুগের ভারতেও মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রের আওতার বাহিরে কোন স্থপতি তাঁহার শিল্পক্ষমতা দেখাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। মহারাষ্ট্র দেশের মালবান নগরে সম্রাট্ শিবাজীর এক প্রস্তরমূর্ত্তি সাবেক কাল হইতেই দাঁড়াইয়া আছে শুনিয়াছি। কিন্তু এই ধরণের কাজে বোধ হয় এইটাই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আরও প্রাচীনতর যুগের সাক্ষী স্বরূপ মহারাজ কণিষ্কের মূর্ত্তি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মথুরার সরকারী সংগ্রহালয়ে অনেকেই এটা দেখিয়া থাকিবেন।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার যে-কোনো দেশেই যাই, দেখিতে পাই যে, ভাস্কর্য্য আজকাল একমাত্র মন্দির গির্জ্জা বা ধর্ম্মগৃহেরই একচেটিয়া শিল্প নয়। প্রত্যেক বড় বড় শহরের রাস্তায় বাগিচায় পৌরভবনে নানাপ্রকার মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এইগুলা গড়িবার জন্য শিল্পীও সকল দেশেই বিস্তর।

মূর্ত্তিগড়া শিল্পীর একটা সখ মাত্র নয়। ইহা একটা ব্যবসাও বটে। মূর্ত্তি গড়িয়া শিল্পীরা অন্নসংস্থান করিয়া থাকেন। কবি, লেখক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ইত্যাদি শ্রেণীর সুধীদের মতন স্থপতিরাও জনগণের "পূজাস্থান" বিবেচিত হন।

(২)

বর্ত্তমান ভারতের বাগ-বাগিচা, সরকারী বাড়ী, পাঠশালা, সংগ্রহালয় সবই বিদেশীর হাতে। কাজেই এইগুলাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্য যে-সকল শিল্প আবশ্যক সবই বিদেশীরা স্বজাতীয় ওস্তাদগণের হাতে গড়াইয়া থাকেন। কি নগর-নির্ম্মাণ, কি রাস্তা-নির্ম্মাণ, বর্ত্তমান ভারতের প্রত্যেক গঠনকার্য্যেই বিদেশীয় শিল্পী ও কারিগরেরা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিতেছেন। ভারতীয় দেবদেবী এবং মন্দিরগুলা যদি ভারতবাসীর হাতে না থাকিত তাহা হইলে ধর্ম্মসংক্রান্ত ভাস্কর-শিল্পও এতদিনে ভারতীয় শিল্পীর আওতা হইতে বাহিরে চলিয়া যাইত।

পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী যতগুলি ক্ষমতা হারাইয়া বসিয়াছে তাহার ভিতর ভাস্কর্য্যের শিল্পক্ষমতা অন্যতম। স্বাধীন দেশে বেড়াইতে আসিলে ভারতীয় পর্য্যটক মাত্রেই শিল্পের তরফ হইতে স্বদেশের দুর্গতি প্রতি পদবিক্ষেপে বুঝিতে পারেন। স্বরাজ স্থাপিত না হইলে ভারতে স্থপতি-বিদ্যা উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

শিল্পের উন্নতি ও প্রসার পয়সা-সাপেক্ষ। গরীব লোকেরা কুঁড়েঘরে প্রিয়তম বস্তুও আনিয়া মজুদ করিয়া রাখিতে পারে না। নগর-পল্লীর কর্ত্তারা পৌরভবনের কর্ত্তারা সংগ্রহালয়ের কর্ত্তারা সরকারী টাকা খরচ করিতে রাজি থাকিলেই দেশের পল্লীশহরের শিল্পীরা নিজ নিজ ওস্তাদি দেখাইবার জন্য ঝুঁকিতে পারে। ইয়োরোপ-আমেরিকায় ভাস্করশিল্প এইরূপ সরকারী অর্ডারের সাহায্যেই নিজ পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিয়াছে।

(৩)

পশ্চিম মুল্লুকের লোকেরা জার্ম্মান্‌দিগকে মূর্ত্তিশিল্পে পাকা কারিগর বিবেচনা করে না। জার্ম্মান্‌রা বিজ্ঞানে ওস্তাদ, দর্শনে ওস্তাদ, ব্যবসায়ে ওস্তাদ, লড়াইয়ে ওস্তাদ এবং সঙ্গীতে ওস্তাদ। এই-সকল দিকে জার্ম্মানির খ্যাতি ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্রই রটিয়াছে। কিন্তু সুকুমার শিল্পের আসরে জার্ম্মান্ জাতিকে পশ্চিমারা আজও সম্মান করে না। পশ্চিমাদের এই বিচার যুক্তি-সঙ্গত নয়। কি মধ্যযুগে, কি বর্ত্তমান কালে জার্ম্মান্‌রা সুকুমার শিল্পে অনেক উঁচুদরের সৃষ্টি সাধন করিয়াছে। সেইগুলা কোন হিসাবেই অন্যান্য পশ্চিমাশিল্পের তুলনায় খাটো নয়। ভারতীয় পর্য্যটকেরা জার্ম্মানিতে আসিলে

ফ্যাক্টারিগুলা দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান্ স্থাপত্যের সংগ্রহগুলা দেখিতে ভুলিলে অনেক বিষয়ে দরিদ্র থাকিয়া যাইবেন।

ভারতীয় শিল্পীদের সংসারে ইতালীর নাম আছে এবং ফ্রান্সেরও নাম আছে। কিন্তু আমাদের বিদেশ-প্রীতি বা "বিদেশী-আন্দোলন"কে এই দুই দেশের সুকুমার কলার অথবা প্রাচীন গ্রীসের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতেই আটক রাখা ঠিক নয়। রূপের রসে জার্ম্মান্‌রা কোনো দিনই বঞ্চিত ছিল না আজও ইহারা এই রসে বঞ্চিত নয়—এই ধারণা ভারতের জ্ঞানমণ্ডলে প্রচারিত হওয়া উচিত।

(৪)

ফরাসী স্থপতি রোদ্যাঁর সমসাময়িক জার্ম্মান ওস্তাদের নাম হিল্‌ডেব্রাণ্ড্। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিক শহরে ইঁহার কাজের এক বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে জার্ম্মানিতে রোদ্যাঁর প্রভাব কমিতে থাকে। বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মানির ভাস্করেরা অনেকেই কিছু না কিছু হিল্‌ডেব্রাণ্ডের শিল্প হইতে শক্তি লাভ করিয়াছেন। সাহিত্যে হাউপ্‌ট্‌মানের যে স্থান, ভাস্কর্য্যে হিল্‌ডেব্রাণ্ডের সেই স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

হিল্‌ডে ব্রাণ্ড্ মিউনিক শহরেই শেষ পর্য্যন্ত আড্ডা গাড়িয়া ছিলেন। এই শহরের "ম্যাক্‌সিমিলিয়ান প্লাট্‌স্" নামক চৌরাস্তার উপর এক কূআ আছে। নির্ণ্‌বার্গ্ ইত্যাদি শহরের মধ্যযুগের কূআগুলা জার্ম্মানিতে এবং ইয়োরোপে প্রসিদ্ধ। এই পৌর-কূপসমূহ একসঙ্গে বাস্তুশিল্প এবং ভাস্করশিল্পের কেন্দ্র-স্বরূপ। ম্যাক্‌-সিমিলিয়ান প্লাট্‌সের পৌর-কূপের আবেষ্টনকে ভাস্কর্য্যে অলঙ্কৃত করিবার ভার হিল্‌ডেব্রাণ্ডের হাতে পড়িয়াছিল। জার্ম্মানরা তাঁহার নিষ্পন্ন শিল্পের তারিফ করিয়া থাকে। ফ্রান্সেও বহু স্থপতি শড়কের চৌমাথায় স্থিত জলের ফোয়ারায় মূর্ত্তি বসাইয়া নামজাদা হইয়াছেন।

ঘরবাড়ী তৈয়ারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তিগড়ার কাজ চালাইতে হয়। কাজেই স্থপতির পক্ষে মূর্ত্তিটার রূপ-কল্পনায় আশেপাশের আস্‌বাব সরঞ্জামগুলা বিশেষ-শিল্পীর হাত কিরূপ তাহা এই আবেষ্টনের—আকাশের চতুঃসীমার সদ্ব্যবহার করিবার কৌশলে ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য এই কৌশল সম্বন্ধে নানা স্থপতি নানাপ্রকার রূপ-বৈচিত্র্যের পথ বাছিয়া লইয়াছেন।

অনেক সময়ে খোলামাঠে—আকাশের তলে—বাগানে—অথবা শড়কের ধারে মূর্ত্তি গড়িবার ফর্‌মায়েস আসে। শিল্পীকে তখন আবার এক নয়া সমস্যায় পড়িতে হয়। মূর্ত্তিটা খাড়া করিয়া তোলাই স্থপতির একমাত্র কাজ নয়। রূপের সঙ্গে আকাশের বা আবেষ্টনের কি সম্বন্ধ তাহা তলাইয়া মাজাইয়া বুঝাই প্রত্যেক ভাস্কর-শিল্পের ওস্তাদপদবাচ্য গুণীর প্রধান কৃতিত্ব।

এইসকল বিষয় আলোচনা করিয়া হিল্‌ডেব্রাণ্ড্ "ডাস্ প্রোব্‌লেম্ ডার ফর্ম্" (অর্থাৎ "রূপ-সমস্যা") নামক একখানা পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। ফরাসী ওস্তাদ রোদ্যাঁর চিন্তাও ভাস্কর-সাহিত্যে আদৃত হইতেছে।

(৫)

বার্লিনের ন্যাশন্যাল গ্যালারির ময়দানে একটা সিংহমূর্ত্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইটা গড়িয়াছিলেন গার্ডল। গতবৎসর (১৯২২) এই শিল্পীর মৃত্যু হইয়াছে। জানোআর গড়িয়া তিনি প্রসিদ্ধ।

এক-একটা জানোআর আল্‌গা-আল্‌গা ভাবে গড়িবার দিকে তার ঝোঁক ছিল বেশী। পশুগুলাকে বন্য দুর্দ্দান্ত অবস্থায় দেখানো তাঁহার শিল্পের লক্ষ্য নয়। উন্মাদনা, দৌড়ঝাঁপ ইত্যাদির প্রভাব গার্ডলের জানোআরে দেখা যায় না।

আবার পশুচিত্ত, জানোআর-হৃদয় ইত্যাদি বিশ্লেষণের দিকেও গার্ডল মাথা খেলান নাই। জীবজন্তুর যথাসম্ভব প্রাকৃতিক আকৃতি রক্ষা করাই ছিল তাঁহার স্থাপত্যের বিশেষত্ব। জুঅলজি বিদ্যার পণ্ডিতেরা গার্ডলের হাতের সাফাই প্রশংসা করিবেন। জ্যান্ত জানোআর স্থির-ধীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এই দৃশ্য শিল্পে দেখিতে হইলে গার্ডলের চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিতে হইবে।

এই হিসাবে তাঁহার বনমানুষ বা মানুষ-বানর জীবটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। এইটাই

ভার ক্যিন্‌ষ্টে" ভবনে এই মূর্ত্তি দেখানো হইয়াছিল। দর্শকেরা একটা জ্যান্ত নরবানরের হাত পা মুখভঙ্গী পাথরের শিল্পে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে। অনেকদিন ধরিয়া গার্ডল এইটার জন্য খাটিয়াছিলেন।

(৬)

প্যারিসের মতন বার্লিনেও বে-সরকারী প্রদর্শনী-ভবন অনেক আছে। এই-সকল ঘরে শিল্পদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা চিত্রকর ও ভাস্করদের কাজ দেখাইয়া থাকে। কেনা-বেচার ব্যবস্থাও থাকে, বলাই বাহুল্য। হ্বালার্ষ্টাইন কুলিট্‌ ইত্যাদি নানা কোম্পানীর আশ্রয়ে এইরূপ শিল্প-বাজার বসে। এই-সকল বাজারে দুই মহিলা শিল্পীর কাজ দেখা গিয়াছে। ইঁহারা দুইজনেই নারী-মূর্ত্তি গড়িয়াছেন। মূর্ত্তিগুলা সবই দুঃখ-দারিদ্র্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। কোনো গড়নেই প্রাণ নাই, শক্তি বা স্বাস্থ্যও নাই। চোখমুখের ভিতর দিয়া হাহুতাশ বাহির হইতেছে। কতকগুলা শিশু লইয়া এক জননী বিব্রত, দুর্ভিক্ষ এবং নৈরাশ্যের আবহাওয়া। আর-এক মূর্ত্তির লম্বা লম্বা মোচড়ানো হাত-পার আবেষ্টনে অশান্তি উদ্বেগ এবং ব্যাধির উৎপীড়ন পরিস্ফুট।

জীবনে আনন্দের অভাব দেখাইবার জন্যও জার্ম্মান্ শিল্পীরা বাটালি ধরে। দেখিবামাত্র মনে পড়িবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অনাহার-প্রপীড়িত হাস্যবিহীন মরণ-মাত্র-প্রত্যাশী ভারতীয় নরনারীর জীবন। এইগুলা কি জার্ম্মানির বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় দৈন্যের সাক্ষী? না বোল্-শেভিক বিপ্লবের অশান্তি কল্পনা করিয়া মহিলা স্থপতি উদ্ভট সৃষ্টি করিয়াছেন?

চিত্রশিল্পেও জার্ম্মান্‌রা এই ধরণের দৈন্য এবং অশান্তিকে রূপ দিতেছেন। কোনো কোনো সমজ্‌দার বলিতেছেন—"এই ধরণের দুঃখ-কষ্টের মূর্ত্তিকে রুশ সাহিত্যবীর দস্তয়েব্‌স্কির প্রভাব বিরাজ করিতেছে।"

ভারতীয় দর্শক সহজেই অনুমান করিবেন,—জার্ম্মানিতে কোনো এক গড়ন-রীতি অথবা শিল্পাদর্শ প্রভাবশালী নয়। এখানকার শিল্পসংসারে একসঙ্গে বহুবিধ রসের রূপের ও রীতির সৃষ্টি এবং প্রচার চলিতেছে।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

বাদল-বিদায়

ওগো বাদল, তোমার বিদায় বাজে, বাজে,
মোর চেতনায় আঘাত হেনে, বুকের মাঝে!
তোমার চোখের জলে ধুয়ে
যে-বাণী হায় গেলে থুয়ে,—
তারি আকুল বিলাপ-ধ্বনি থামে না যে,
আমার গোপন বুকের মাঝে!

সেই রাগিণী ফির্‌ছে যে গো কেঁদে কেঁদে
কি-যেন তার ছিল বলার, গেছে বেধে;
না-বলা সেই বাণীর আভাস
ছেয়েছে আজ সারা আকাশ,—
মানস-লোকের দ্বারে-দ্বারে সেধে সেধে
সেই রাগিণী ফির্‌ছে কেঁদে।

কত কথাই সেই-কাঁদনে রইল গাঁথা,
কত হারা-স্মৃতির ব্যথা—আকুলতা!
কত প্রেমের কাহিনী যে
ঐ কাঁদনে গেল ভিজে,
আজ বাদলে তারি করুণ সজলতা,
হারা-স্মৃতির আকুলতা!

বিদায়-পথের ওগো বাদল, তোমার বাণী
হারা-দিনের কোন্ বারতা দিল আনি';
নাম-হারা কোন্ সুরের স্মৃতি
মনের মীড়ে জাগায় গীতি,
অনেক-কালের ভুলে-যাওয়া বেদন্ হানি'
ওগো বাদল, তোমার বাণী।

শ্রী হৃষীকেশ চৌধুরী



পাতালে স্বর্গ—

আমরা পৃথিবীর উপরে কত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাই—কত নদ নদী গিরি পর্ব্বত শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রের সারি আমাদের এই স্নেহময়ী ধরার বুকে কত বিচিত্র শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু এই পৃথিবীর তলায়, মাটির মধ্যে কত বিচিত্র দৃশ্য আমাদের চক্ষুর এবং মনের আড়ালে গোপন রহিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। এইসমস্ত দৃশ্যের কয়েকটি সম্বন্ধে এখন কিছু-কিছু জানা গিয়াছে। এডোয়ার্ড এলফ্রেড হার্টেল নামক এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, গত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া, মাটির নীচে কোথায় কি আছে তাহার সন্ধানে ফিরিতেছেন—তাঁহারই অক্লান্ত এবং প্রাণ-তুচ্ছ করা চেষ্টার ফলে আমরা দার্‌গিলান এবং প্যাডিরাক গহ্বরের মধ্যের রম্য দৃশ্যের খবর জানিতে পারিয়াছি। এই গহ্বরের কাছাকাছি স্থানের বাসিন্দারা মনে করে যে এইসব গহ্বরে দৈত্যদানা ভূতপ্রেত বাস করে এবং ইহার তলায় নরক নামক ভীষণ স্থান অবস্থিত। দার্‌গিলান এবং প্যাডিরাক গহ্বরে অবতরণের পর তিনি ফ্রান্সের মালভূমির ১৭টি পর্ব্বতগাত্রের ফাটলে প্রবেশ করেন। ইঁহার পূর্ব্বে কোন লোক এইসমস্ত পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করে নাই। অনেকে বলে যে এইসব গুহার মধ্যে যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছে তাহারা আর কোন দিন ফিরিয়া আসে নাই। সাহসী হার্টেল, ফ্রান্সের রাবুয়েল গুহার মধ্যে অবতরণ করেন—এই স্থানটাকে লোকেরা এতই ভয় করিত যে ইহার পাশ দিয়া হাঁটিবার সময়েও তাহাদের গা ছম্ ছম্ করিত। ইহার মধ্যে প্রবেশ করার কথা লোকের স্বপ্নেরও বাহিরে ছিল। ইহার পরে তিনি সার্‌জাকের নিকটবর্ত্তী মাটির নীচে প্রবহমানা নদী সর্‌গনেসের একটি ম্যাপ তৈয়ার করেন। মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া সমস্ত নদীটি দেখিয়া তার পর এই ম্যাপ তৈয়ার হয়।

এই-সমস্ত অভিযানের মধ্যে একটিতে তিনি এক অগ্নিহ্রদ আবিষ্কার করেন। দড়ির সিঁড়ি, কোমরবাঁধা দড়ি, মোমবাতি, ম্যাগ্নেসিয়াম ফিতা, দিয়াশলাই, হাতুড়ি, ছুরি, থার্‌মোমিটার, ব্যারোমিটার, গ্যাস-মাস্ক (মুখোস) এবং অন্যান্য দর্‌কারী তোড়্‌জোড়ে সজ্জিত হইয়া তিনি অবতরণ সুরু করিলেন। তাঁহার মুখের সাম্‌নে একটি টেলিফোন ঘাড়ে বাঁধা ছিল—এই টেলিফোনের তার তাঁহার কোমরে বাঁধা দড়ির মধ্য দিয়া গহ্বরের উপর পর্য্যন্ত ছিল। তাহাতে উপরিস্থিত লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার বেশ সুবিধা হইত। গুহায় নামিবার পূর্ব্বে, দড়িতে বাঁধিয়া একটা থার্ম্মোমিটার গুহার মধ্যে একেবারে নীচে নামাইয়া গুহার মধ্যের টেম্পারেচার লওয়া হয়, এই-সঙ্গে গুহার গভীরতারও মাপ লওয়া হয়। তার পর ছয় জন লোক মিঃ হার্টেলকে দড়ির সাহায্যে আস্তে আস্তে নামাইতে থাকে—গুহার গায়ে কোথায় কি আছে না জানার জন্য তাঁহাকে অতি ধীরে ধীরে নামান হয়। কিছুক্ষণ পরে টেলিফোনে খবর আসিল—"দড়ি ছাড়িয়া দাও।" তাহারা অবশ্য দড়ির সিঁড়ি উপরেই বাঁধিয়া রাখিল, কারণ আবার তাঁহাকে সেই সিঁড়ি বাহিয়া লোকেরা কান খাড়া করিয়া রহিল, কখন কি খবর আসে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ—তার পর টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং নীচ হইতে শব্দ আসিল "শক্ত করিয়া ধর—খুব জোর করিয়া দড়ি ধর, একটা ভয়ানক খারাপ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।" আবার খানিক ক্ষণ সব চুপচাপ, তার পর আবার খবর আসিল,—"আমি গ্যাস-মাস্ক মুখে ঠিক করিয়া লাগাইতেছি, এখানে ভয়ানক খারাপ গরম।" তার পর দশ মিনিট নিস্তব্ধতার পর উপরের লোকেরা খবর পাইল—"দড়ির সিঁড়ি হারাইয়া ফেলিয়াছি, মোমবাতি নিবিয়া গিয়াছে, প্রথম গহ্বরের তলায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।"



পাতালে আগুনের হ্রদ—নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া মিঃ হার্টেল দড়ির সিঁড়িতে অবতরণ করিতেছেন

আবার একটু পরেই খবর আসিল—"বাতি জ্বালিয়াছি, নতুন-মরা জন্তুর দেহের উপর দিয়া হাঁটিতেছি, এইসমস্ত মরা জন্তুদের দেহ চারিদিকে পাঁচ ফুট উঁচু হইয়া ছড়াইয়া আছে।" ইহার একটু



পাতালে মৃত জন্তুদের কঙ্কালস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া হার্টেল টেলিফোনে কথা বলিতেছেন



মাটির নীচে, পাতালের নদীতে মিঃ হার্টেলের নৌকা-বিহার

পাইয়াছেন। এইরকম করিতে করিতে তিনি মাটির নীচে ১৫০০ ফুট নামিয়া গেলেন। এই সময় টেলিফোন বলিতে লাগিল—"এখানে বেজায় শীত, চারিদিক স্যাঁতসেঁতে, আর কুয়াসা। দ্বিতীয় গুহাতে প্রবেশ করিলাম। ১৮০০ ফুট। প্রকাণ্ড হ্রদ দেখিতে পাইতেছি—অদ্ভুত সমস্ত দৃশ্য—নানারকম গন্ধদ্রব্য পুড়িতেছে—একটা খারাপ গন্ধ ক্রমশ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে।" এইসমস্ত অদ্ভুত এবং মনুষ্যচক্ষুর অ-দৃষ্ট দৃশ্যাদি দেখিয়া বৈজ্ঞানিক হার্টেল সাহেব দড়িতে ঝাঁকানি দিয়া বুঝাইলেন—"এবার উপরে তোল।"

তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া, পাতালপুরী হইতে পুনরায় পৃথিবীর উপরে নীল আকাশের তলায় এবং নির্ম্মল বায়ুর মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। উপরে আসিয়া পরদিন সদলে গুহায় অবতরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। সর্ব্বাগ্রে একটি ছোট নৌকার বন্দোবস্ত হইল—গুহার মধ্যের নদী পার হইবার জন্য ইহা কাজে লাগিবে।

পরদিন অবতরণ করিবার বিশেষ কষ্ট হইল না, কারণ কষ্টের ভার সমস্ত মিঃ হার্টেল দূর করিয়াছিলেন। সকলে নীচে নামিবার পর নৌকাখানিকে নামাইয়া দেওয়া হইল। তার পর সকলে মিলিয়া গুহার পর গুহার মধ্যে ভ্রমণ করিলেন।

অনেক সময় এইসমস্ত কার্য্যে মিঃ হার্টেলের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে—প্রাণ যাইবার মতও অনেক সময় হইয়াছিল। একবার তিনি এবং তাঁহার দুইজন সহকর্ম্মী মাটির তলায় প্যাডরিয়াক নদীতে নৌকায় করিয়া জরীপ করিতেছিলেন। নৌকা ছাড়িয়া একটু-ক্ষণের জন্য তীরে আসিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন নৌকা ভাসিয়া গিয়াছে। কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহাদের মোমবাতি জলে পড়িয়া নিবিয়া গেল। চারিদিক্ অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। কত বিপদ্ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যে আবার সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

ইংলণ্ডে ইয়র্কশায়ার প্রদেশে হাঁকরা পিল্ গুহাতেও তিনি অবতরণ করেন। অন্য কোন সাথী না পাইয়া তিনি একলাই নামিবেন স্থির করিলেন। গুহার মুখে তাঁহার স্ত্রী উপরে থাকিয়া টেলিফোন ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। নামিবার সময় তাঁহাকে বেশ কয়েকবার স্নান করিতে হইল। গুহার নীচে নামিয়া চারিদিক্ দেখিয়া শুনিয়া টেলিফোনে উপরের লোকদের ডাকিতে সুরু করিলেন—কোন সাড়া নাই। জলে টেলিফোনের কল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধ ঘণ্টা ধরিয়া তিনি ক্রমাগত তাঁহার স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকদের চীৎকার করিয়া ডাকিবার পর তাহারা শুনিতে পাইল এবং তাঁহাকে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় টানিয়া তুলিল।

রাশিয়ান্ গবর্ণমেণ্টের নিমন্ত্রণে মিঃ হার্টেল ককেশাস পাহাড়ের মাটির তলায় একটা গরম-জলওয়ালা নদীর মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাকে নদী-গহ্বর হইতে অর্দ্ধেক ঝল্সানো এবং অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় উপরে তোলা হয়। পাহাড়ের ভিতরে সাল্ফিউরিক অ্যাসিডের ধোঁয়াতে এই কাণ্ড হয়।



পাতাল ভ্রমণকারী এডোয়ার্ড এ্যাল্‌ফ্রেড হার্টেল

পন্তোয়াজ্‌ সহরে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে মিঃ হার্টেলের জন্ম হয়। তিনি পৃথিবীর নানা বিখ্যাত স্থানে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই, মানুষের অ-দৃষ্ট স্থানগুলিতে কি আছে তাহা দেখিবার ইঁহার প্রবল অনুরাগ।

কোন গহ্বরে নামিবার পূর্ব্বে, গহ্বরের মুখের চারিদিকের অন্তত ৬৫০ ফুট স্থান, ভূতত্ত্ব এবং স্থানিক (Topographical and geolo.ical survey) জরিপ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। গুহার মধ্যে নানা স্থানে শব্দ উৎপাদন করিয়া তাহার গভীরতা জানিতে পারা যায়। দড়িতে তাপজ্ঞাপক যন্ত্র বাঁধিয়া গুহার ভিতরের টেম্পারেচার লইতে হয়। যে-সমস্ত লোকেরা নীচে নামিবে তাহারা নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইবে—অনেক পরিমাণে দড়ি, মই, বড় বড় মোমবাতি, দিয়াশালাই হাতুড়ি, শিঙা, ছুরি থার্‌মোমিটার, ব্যারোমিটার, কম্পাস, গ্যাস্‌মাস্ক্‌, first-aid packs, খাদ্য দ্রব্য। কিছু রাম (rum) সঙ্গে রাখাও বিশেষ দরকার।

যাহারা নীচে নামিবে তাহারা পরিবে—শক্ত-ফিতা-বাঁধা জুতা, গেটার, পশমের জামা (তাহাতে অনেক পকেট থাকা চাই), ঢোলা প্যাণ্ট্‌, একটা শক্ত কাপড়ের ব্লাউস্‌, যাহাতে পাথরে ঘষিয়া ছিঁড়িয়া না যায়, সিদ্ধ চামড়ার টুপি (ইহাতে পাথর পড়ার শব্দ কানে লাগে না) এবং একটা পিঠে বাঁধিবার ঝোলা।

অসীম সাহস এবং ধৈর্য্য লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ আমাদের জন্য পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার নূতন নূতন রত্নে পূর্ণ করিতেছেন। মিঃ হার্টেলের জন্যই আমরা জানিতে পারিলাম যে মাটির তলায় এত সুন্দর সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য আছে—যে তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব!

বায়স্কোপের ছবি তোলা—

বায়স্কোপে আমরা নানারকম ছবি দেখি, তাহার মধ্যে কতকগুলি দেখিলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া যাইতে হয়। এইসমস্ত ছবি যে সব সময়ে সত্যিকার ঘটনা হইতে তোলা হয়, তা নয়। তবে ইহাও সকলের জানা উচিত যে সবই একেবারে ফাঁকি নয়। কতকগুলি ছবি তোলাইবার সময় অভিনেতারা এবং অভিনেত্রীরা যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেন।

কয়েকবছর আগেও যত সব ডাংপিটে কাণ্ডের ছবি তোলা হইত, সবগুলির মধ্যেই কিছু-না-কিছু চালাকি থাকিত, যাহাতে দর্শকেরা প্রতারিত (?) হইত কিন্তু ...



বায়স্কোপের অভিনেতার চমৎকার অবস্থা দেখুন—মুখের ভাব কৃত্রিম নয়, চিলের ঠোকর খাইয়া হইয়াছে



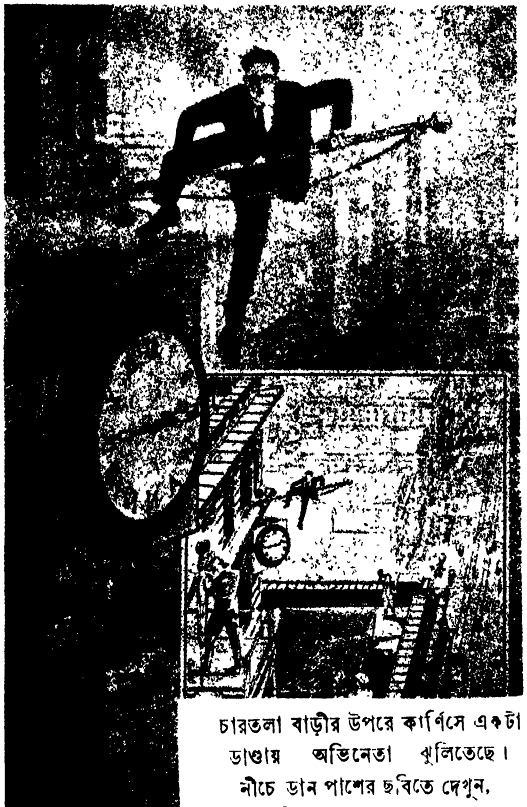
(১) দোতালা হইতে নীচের মোটরে লাফ　　(২) পাহাড় ডিঙ্গান

দুইজনেই বায়স্কোপের অভিনেতা

হইতেছে, ততই, দর্শকেরা সত্যিকার ঘটনার ছবি দেখিতে চাহিতেছে। নকলে আর তাহাদের মন ভরে না। দর্শকদের চক্ষুর ক্ষুধা মিটাইবার জন্য অভিনেতারা তাহাদের সাহসের এবং অভিনয়ের অসীম শক্তির পরিচয় দিতেছে। আমাদের দেশে যে দু-একটি বায়স্কোপ কোম্পানী চলন্ত ছবি তুলিতেছে, তাহারা আমেরিকা এবং ইউরোপের বায়স্কোপওয়ালাদের

চলন্ত চিত্রের নূতন অভিনেতারা (অবশ্য সকলেই নূতন) নিজেদের মহা পণ্ডিত (তুঁইফোড়) বলিয়া মনে করেন এবং জিনিষটার মধ্যে যে কতখানি শিখিবার আছে তাহা একবার ভাবিয়াও দেখেন না।

উচ্চদরের অভিনেতাদের (stars) বিশেষ বিপদজনক অভিনয়ে নামান হয় না। সেইসমস্ত দৃশ্যে তাঁহাদেরই মত দেখিতে শুনিতে অন্য একজনকে নামাইয়া দেওয়া হয়। অভিনয় ভাল হইলে অবশ্য দ্বিতীয় ব্যক্তির কোন যশ বা খ্যাতি হয় না—তবে তাহার জন্য সে যথেষ্ট অর্থ পায়। বর্ত্তমানে কিন্তু অনেক "ষ্টার" অভিনেতাও বিপদ্-জনক দৃশ্যেও নিজেই নামিতেছে। একবার একজন উঁচুদরের



চারতলা বাড়ীর উপরে কার্ণিসে একটা ডাণ্ডায় অভিনেতা ঝুলিতেছে। নীচে ডান পাশের ছবিতে দেখুন, অভিনেতা যত শক্ত কাজ করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে, বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। অভিনেতা হঠাৎ পড়িয়া গেলে নীচের টাঙানো তারের জালে আট্‌কাইয়া যাইবে। দর্শকেরা এই জাল ইত্যাদি কিছুই দেখিতে পায় না

অভিনেত্রীকে প্রখর স্রোতের জলে নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হইল। পিছনে নৌকায় করিয়া ক্যামেরাম্যান্ ছবি তুলিতে তুলিতে চলিল। নদীটি খানিক দূর গিয়া ঝরণার মত হইয়া অনেক নীচে পড়িয়াছে। কথা ছিল এইখানে আসিবার পূর্ব্বেই অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু ঝোরার কাছাকাছি আসিলেও কেহ আর অভিনেত্রীকে জল হইতে তুলিতে পারিল না—হঠাৎ অভিনেত্রীর সেক্রেটারী তাহাকে একটা চড়ায় তুলিয়া কোন রকমে রক্ষা করিল। নির্দ্দিষ্ট স্থান পার হইবার পর অভিনেত্রীকে কেহ যখন জল হইতে তুলিতে পারিল না, তখন তাহার মুখে ভয়ের ভাব ভয়ানক সত্যি হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ছবিতেও তাহা বেশ উপভোগ্য (!) হইয়াছে।

অনেক সময় অভিনেতাদের বিপদজনক উঁচু স্থানে অদৃশ্য শক্ত তার দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে অভিনেতা নির্ভয়ে বেশ ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারে—দর্শকেরাও পর্দ্দার উপর তার দেখিতে পায় না, সেইজন্য তাহারাও চিত্র বেশ উপভোগ করে।

অনেক সময়, বিপদ-জনক ভয়ানক উঁচুস্থানে যখন অভিনেতারা অভিনয় করে, তখন অভিনয়-স্থানের কিছু নিম্নে শক্ত তারের জাল খাটাইয়া দেওয়া হয়। অভিনেতা যদি হঠাৎ পড়িয়াও যায়, তবুও সে কোনপ্রকার আঘাত পাইবে না।



জলের মধ্যে অভিনয়। বিদ্যুতের বাতির সাহায্যে জলের মধ্যে আলোক ছড়ান হয় এবং লোহার মোটা নলের মধ্যে বসিয়া ফটোগ্রাফার ছবি তুলিতে থাকে

চলন্তচিত্র দেখিতে দেখিতে আমরা সকলে অভিনেতা-দেরই দেখি এবং তাহাদেরই প্রশংসা করি, কিন্তু চলন্তচিত্রের ছবি যাহারা তোলে তাহাদের কথা কেহ একবারও ভাবিয়া দেখে না। তাহাদের উপরেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব নির্ভর করে। অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সকলরকম কষ্ট ভোগ করিয়া ছবিটিকে যদি নিখুঁত করিয়া না তুলিত তবে ছবিটি দেখিবার কোন আশাই আমাদের থাকিত না। অভিনেতারা খালি হাতে চলে



হাঁটু-জলে জামা কাপড় ভিজাইয়া ক্যামেরাম্যান্ বায়স্কোপের ছবি তুলিতেছে

ফটোগ্রাফারকে কিন্তু তাহার ছবি তুলিবার সমস্ত সরঞ্জাম ঘাড়ে করিয়া দৌড়াইতে হয়।

—

এশিয়ার পথে বিপথে—

[ডাঃ স্ভেন হেডিন সুইডেন দেশের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। তিনি এসিয়ার লোকের জানা এবং অজানা প্রায় সমস্ত জায়গায় ভ্রমণ করিয়াছেন। তিব্বত, তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য-এসিয়ার সমস্ত অজানা স্থানে বেশী ভ্রমণ করিয়াছে বা স্থান সম্বন্ধে



তাঁহার অপেক্ষা বেশী জানে এমন কেহ বোধ হয় এখন পৃথিবীতে নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক, অসম-সাহসী, সুইডেনের সম্ভ্রান্ত বংশের লোক এবং প্রচুর অমূল্য গ্রন্থের লেখক। তিনি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের সকল বৈজ্ঞানিক সভার কোন-না-কোন-প্রকারের সভ্য। তাঁহার ভ্রমণগুলি কোন সময়েই বিশেষ নিরাপদ্ হয় না—মাঝে মাঝে তাঁহাকে অনাহারে ঝড়বৃষ্টির মধ্য দিয়া, কখনো বা মরুভূমির মাঝখান দিয়া একলা ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। পথে চোর-ডাকাতের ভয়ও বড় কম ছিল না। আমরা তাঁহার নিজের কথায় তাঁহার ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু বলিব।]

আমি এসিয়ার পথে বিপথে ২৪০০০ মাইলেরও বেশী ভ্রমণ করিয়াছি। ভ্রমণ-কালে আমার মাথার উপর দিয়া কত বিপদ্ চলিয়া গিয়াছে এবং কতবার আমি মৃত্যুর অতি নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই।

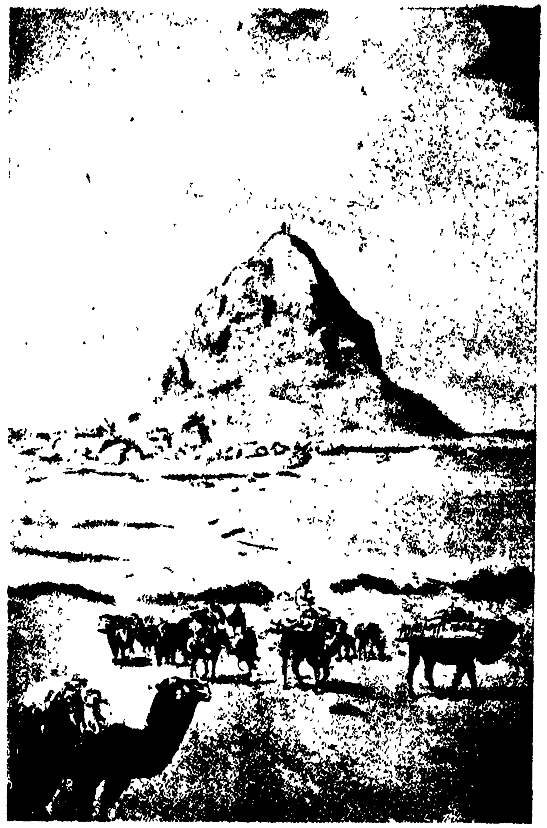
আমি একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিব। অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমি প্রথম এসিয়ায় প্রবেশ করি। তখন গরম কাল। ভ্লাডিকাভ্‌কারী হইতে টিবলিস্ যাইবার জন্য আমি একটা গাড়ী ভাড়া করিলাম। এই গাড়ী 'ট্রয়কা' (তিন ঘোড়ায়) টানে। প্রথম দিকে রাস্তা খুবই চমৎকার। ঘোড়ারা তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। রাস্তার দুধারে গাছের সারি—রাস্তার চারিদিকে অনন্ত সবুজ মাঠ। এই সময় ঘোড়ার গলায় ঘণ্টার শব্দ বেশ মধুর লাগিতেছিল। কিন্তু ক্রমশ রাস্তা খারাপ হইতে লাগিল এবং চড়াই হইতে লাগিল। ক্রমশ পাহাড়ে চড়িতে লাগিলাম। রাস্তার দুইপাশের ঘন কৃষ্ণ পাথরের দেওয়াল মনে ভয়ের সঞ্চার করে, পাহাড়ের উপর দিয়া এই রাস্তা খুব শক্ত করিয়া পাকা তৈরী। ইহাতে অনেক অর্থ ব্যয়ও হইয়াছে। ইহা ককেশিয়ান প্রদেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার নাম সামরিক সরণি। এই রাস্তা হইবার পর রুশিয়ার জার বলিয়াছিলেন—"আমার ধারণা ছিল যে আমি সোনা-বাঁধান রাস্তার উপর দিয়া চলিব, কিন্তু এখন দেখিতেছি কেবল কালো এবং ধূসর পাথরের উপর দিয়া চলিয়াছি।"

রাস্তা যে কেমনভাবে চলিয়াছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সোজা চলিয়াছে, হঠাৎ ডানদিকে ঘুরিয়া গেল, তার পর হঠাৎ বাঁ দিকে। চড়াই চলিয়াছে, হঠাৎ কথা-নাই বার্ত্তা-নাই উৎরাই সুরু হইয়া গেল। রাস্তা মাঝে মাঝে এমন ঢালু যে গড়াইয়া যাইবার যথেষ্ট ভয় আছে। রাস্তার পাশে পাশে খাদ, তাহার তল দেখা যায় না। তাহার মধ্যে পড়িলে সমস্ত চূর্ হইয়া যাইবে। একবার আমার গাড়ীর এক পাশের দুখানা চাকা রাস্তা হইতে হঠাৎ ছিট্‌কাইয়া গেল—তবে ভাগ্য-ক্রমে অন্য পাশের দুখানা চাকা কোন প্রকারে রাস্তায় আট্‌কাইয়া রহিল। কোন রকমে বাঁচিয়া গেলাম। শীতকালে এই পথ বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন স্লেজ ব্যবহার করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। শীতকালে আরো একটা ভয়ানক বিপদ হয়, মাঝে মাঝে উপর হইতে বরফের চাপ ধসিয়া আসে। সেইজন্য রাস্তার যে-সব অংশ দিয়া বরফের চাপ বেশীর ভাগ যায়, সেইসমস্ত অংশের উপর পাথর দিয়া খিলানের মত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে রাস্তার লোকেরা রক্ষা পায়।

একবার ছাত্রাবস্থায় আমি বাগ্‌দাদ হইতে পারস্যের কার্‌মানশা সহর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমি একলা ছিলাম, সঙ্গে কোন চাকর বাকর ছিল না। হাতে তখন আমার মাত্র ২০০ ক্রোন্ (প্রায় ১৫৬ টাকা) ছিল। কাহারো কাছে কিছু ধার করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না—মনে করিলাম যাহা আছে তাহাতেই কুলাইবে। বাজারে একদল আরব বণিকের খোঁজ পাইলাম—তাহারা কার্‌মানশা পর্য্যন্ত মাল বহন



হিমালয়ের একটা উপত্যকায় ডাঃ হেডিনের দল। ভারবাহী পশুরা কাটা পথ অপেক্ষা অসমান জমীতে ভাল চলিতে পারে



ডাঃ হেডিন যাত্রীদলের সঙ্গে চলিয়াছেন। উপবে যে স্তুপ দেখা যাইতেছে, উহা পথিকদিগকে মরুভূমির ডাকাত হইতে সতর্ক করিবায় জন্য

তাহাতে আমার হাতের টাকার সিকি খরচ হইয়া গেল। জুন মাসে গরম অসহ্য বলিয়া দিনে চলা বন্ধ থাকিত। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়িলে আবার যাত্রা সুরু হইত। আমি আমার খচ্চরের পিঠে বসিয়া ভারবাহী জন্তুদের গলার ঘণ্টার শব্দ শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। রাত্রে ভ্রমণ করা হইত বলিয়া আশে-পাশের কোন স্থান দেখা হইত না। সমস্ত স্থান ভাল করিয়া দেখিব স্থির করিয়া একজন বৃদ্ধ আরবকে সঙ্গী হইবার জন্য রাজি করাইলাম। কিন্তু বণিক্‌দের দল আমাদের কথার রাজি হইল না। তখন এক অন্ধকার রাত্রে আমরা আমাদের খচ্চব লইয়া দল ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম। একটু দূরে গিয়া জোবে জোরে চলিতে লাগিলাম। খচ্চরের গলার ঘণ্টার শব্দ আকাশে মিশাইয়া গেল।

কিছুদূর খুব দ্রুত চলিয়া গতির বেগ কমাইয়া দিলাম, কারণ তখন আর ধরা পড়িবার ভয় রহিল না। ভোরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সকাল হইতেই আবাঃ চলিতে আরম্ভ করিলাম। পথে ছোট ছোট অনেক যাত্রীদল দেখিলাম। তাহারা প্রায় সকলেই তীর্থ-যাত্রী। তাহাদের সঙ্গে অনেক মৃতদেহও ছিল। তাহারা সকলে ব্যাবিলোনের নিকট কার্‌বালায় হোসেনের কবরস্থানে যাইতেছে। পুরুষেরা চলিয়াছে ঘোড়ায় এবং নারীরা খচ্চর বা উটের পিঠে ঝুড়িতে বসিয়া চলিয়াছে। পিঠের দুইপাশে দুইটি ঝুড়ি ঝুলান থাকে। তাহাতে দুইজন নারী বসিতে পারে। এই ঝুড়ি

হড্ বলে। ঝুড়ির উপরে শাদা কাপড়ের ছাদ থাকে—তাহাতে, কেহ ইচ্ছা করিলে পুরুষদের তীব্র দৃষ্টি হইতে মুখ লুকাইতে পারে। বড় লোকের বাড়ীর মেয়েরা এরকমভাবে ভ্রমণ করে না। তাহারা দুইটি খচ্চরের উপর বসানো দোলায় করিয়া যায়। ইহা বেশ আরামের আসন, ইচ্ছা করিলে ইহাতে শোয়াও যায়। পারস্যের ধনী লোকেরা কিছু টাকা তাহাদের দেহ-সৎকারের জন্য রাখিয়া দেয়। মরিবার পব তাহাদের দেহ কার্‌বালাতে গোর দেওয়া হয়। দেহকে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া, রঙীন কম্বলে জড়াইয়া কার্‌বালায় বহন করিয়া লওয়া হয়। একটা খচ্চরে একটা দেহ বহন করায় অসুবিধা হয় বলিয়া দুইটি দেহকে একত্রে বহন করা হইয়া থাকে। সেই জন্য কোন স্থানে একজন থাকিলে পর, তাহার দেহ, অন্য কেহ মরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। অনেক সময় বহুসংখ্যক দেহও এক-সঙ্গে লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় অনেক দূর হইতেও অনুকূল বায়ুতে মৃত দেহের বদ গন্ধ নাকে আসে।

পারস্যের রাস্তায় চলিবার সময় এইসমস্ত গন্ধ এবং ঘোড়া উট খচ্চর ইত্যাদির মৃতদেহের পচা গন্ধের সহিত অভ্যস্ত হওয়া একান্ত দরকার।

কার্‌মান্‌সাহে পৌঁছিয়া আমি আমার সঙ্গী বৃদ্ধ আরবকে তাহার

সেখানে কোন পরিচিত লোক নাই, কোন ইয়োরোপীয় নাই। তবে এইটুকু জানিতাম, যে, সেখানে মুহামেদ হাসান নামে একজন ধনী বণিক্ বাস করেন, তিনি ইউরোপের পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তের অনেক স্থানে ব্যবসা করেন। আমি তাঁর বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি দামী কার্পেট এবং কম্বলের উপর বসিয়া হিসাব নিকাশ করিতেছিলেন। আমি কোন রকমেই তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে আমি কোথা হইতে আসিতেছি। কিন্তু যেই আমি বলিলাম যে আমি দ্বাদশ চার্লসের রাজ্য হইতে আসিতেছি, তিনি বলিলেন—"তবে আপনি এখানে ছয় মাস আমার অতিথি হইয়া থাকিবেন।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমার অত সময় নাই, আমাকে আবার ভ্রমণে বাহির হইতে হইবে। একটি চমৎকার বাড়ী আমার জন্য দেওয়া হইল। খাওয়াদাওয়া চাকরবাকর, সবরকমের সুবন্দোবস্ত ছিল। কতরকম ফল যে খাইতাম তাহা মনে নাই। রসেভরা আঙ্গুর, সুমিষ্ট তরমুজ প্রচুর ছিল। আস্তাবলে আমার জন্য চমৎকার আরব ঘোড়া সব সময় মজুত থাকিত। তাহাতে চড়িয়া আমি আশে-পাশের নানা বিখ্যাত স্থান এবং দ্রব্যাদি দেখিতাম। আমার সবই ছিল কিন্তু হাতে একটা পয়সাও ছিল না। আমার অবস্থা ভিক্ষুকের মতনই খারাপ ছিল। সেইজন্য মন বড় খারাপ ছিল। আমি এক দিন আমার একজন ভদ্রলোক পরিচারককে বলিলাম—আমি বড় গরীব আমার হাতে একটাও পয়সা নাই—সে অবাক্ হইয়া বলিল—পয়সা? পয়সার অভাব কি? যত চাও, হাসান সাহেবের কাছে পাবে—"। বিদায়ের সময় আগা হাসান আমাকে একটি রৌপ্যমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া দান করিলেন। এখান হইতে আমি পারস্যের রাজধানী তেহারানের দিকে ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করিলাম। এইসময় প্রত্যহ প্রায় ৯০ মাইল করিয়া পথ চলিতাম। এত দ্রুত আর কখনো ভ্রমণ করি নাই। পথে আমায় পাঁচবার ঘোড়া বদল করিতে হয়।

১৯০৬ সালে আমি একটা ব্যাকট্রিয়ান উটের পিঠে চড়িয়া ১৪০০ মাইল, পূর্ব্ব-পারস্য হইতে বেলুচিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত, ভ্রমণ করি। আমার সঙ্গে ১৪টি উট এবং চার জন পারসীক ভৃত্য ছিল। এই দেশের পূর্ব্ব দিকে প্রকাণ্ড মরুভূমি (কাভির) অবস্থিত। ইহার বেশীর ভাগ স্থানই নোনা এবং পলি মাটিতে পূর্ণ। জায়গাটা বেশীর ভাগই সমতল কিন্তু যেখানে পলিমাটি সেইখানে বেশ ঢালু। শীতকালে এইখানে প্রায়ই বৃষ্টি হয় এবং কাদা এত নরম হয় যে উটের পা তাহার মধ্যে সোজা ঢুকিয়া যায়। ক্রমশ উট বসিয়া পড়ে এবং আর তাহার উঠিবার কোন আশা থাকে না। এইস্থানে অনেক যাত্রীদল এমনিভাবে মরিয়াছে। আমি সমস্ত জানিয়াও কাভির মরুভূমি পার হইব স্থির করিলাম। দুইজন ভৃত্য এবং ৪টি উট লইয়া যাত্রা করিব ঠিক হইল। হঠাৎ খানিকটা বৃষ্টি হইয়া গেল। কাদা শুকাইবার জন্য অপেক্ষা করিলাম। এই সময় অন্য একটা যাত্রীদল আমাদের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। আমরা তাহাদের পিছনে চলিলাম। আমাদের ৮৪ মাইল পথ না-থামিয়া চলিতে হইবে। পথে কোথাও জনমানব নাই, গাছ পালা নাই, জল নাই। অর্দ্ধেক পথ আসিবার পর আবার আকাশে মেঘ দেখা দিল—আমরাও তাড়াতাড়ি চলিতে সুরু করিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইল। পথের চিহ্নও লোপ হইয়া গেল। কাদাও ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। বিকাল বেলায় পশ্চিম আকাশ অস্তগামী সূর্য্যের রঙে রাঙা হইয়া উঠিল। আমরা সামনে অগ্রগামী যাত্রীদলের উটের দলকে মাঝেমাঝে দেখিতে পাইতেছিলাম। আমরা উত্তর দিকে প্রাণপণ জোরে চলিতে লাগিলাম। সূর্য্য ডুবিয়া গেল। চারিদিকে অন্ধকার ছড়াইয়া পড়িল। চোখের সামনে হইতে আলোর ঘণ্টা শুনিতে পাইলাম। এইসময় এই স্থানের সম্বন্ধে একটা চলিত গল্পের কথা মনে পড়িতে লাগিল। কাভির মরুভূমিতে নানাপ্রকার ভূত-প্রেত বাস করে। অন্ধকারে তাহারা বিপন্ন পথিকদের পথ ভুলাইয়া হত্যা করে। এখানে অন্ধকারে ভূতেরা ঘণ্টা বাজাইয়া পথিকদের বিপথে চালিত করে। যে পিছনে পড়িয়া থাকিবে তাহার মরণ স্থির নিশ্চয়।



ডাঃ হেডিনের দল হিমালয়ের অসম্ভব বরফ বৃষ্টির মধ্যে চলিয়াছেন

বৃষ্টি বাড়িয়া চলিয়াছে। আরো কিছুক্ষণ এমনিভাবে বৃষ্টি হইলে সব আশা শেষ হইবে। উটের পা কাদায় বসিয়া যাইবে—আমাদিগকে উট ত্যাগ করিয়া পায়ে চলিতে হইবে। একবার ভাবিলাম উটের পিঠের বোঝা ফেলিয়া দিই তাহাতে উহারা একটু হাল্কা বোধ করিবে। কি করি ভাবিতেছি—এমন সময় হঠাৎ উটের দল আসিয়া গেল। ব্যাপার কি, খোঁজ করিয়া জানিলাম যে, কাদার মাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে—শক্ত ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছি, আর ভয় নাই—সকল বিপদ্ পার হইয়া আসিয়াছি। পূর্ব্বদিকের অন্ধকার দূর হইয়া গেল—আলোক দেখিতে পাইলাম।

—

যাদুঘরের পিছনে—

যাদুঘরে আমরা হাজারো রকমের মৃত জন্তুর দেহ দেখিতে পাই। সেগুলি এমনভাবে রক্ষিত আছে যে তাহাদের দেখিলে একেবারে



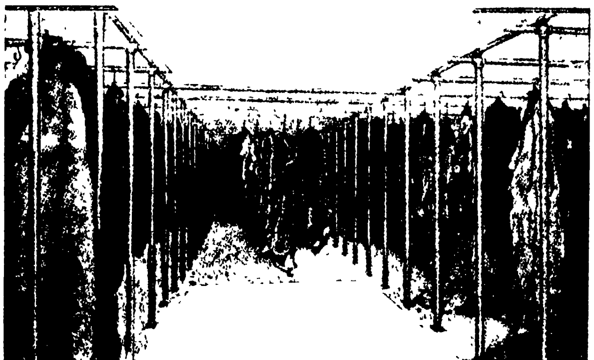
শিল্পির হাতে তৈরী ব্যাঘ্র পুনর্জীবন লাভ করিতেছে বলিয়া মনে হয়

হাড়, বা মাথার খুলি বা অন্য কিছু চিহ্ন পাইয়া শিল্পী তাহার একটা সজীব প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া তোলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তুদের দেহ এমনভাবে তৈরী এবং এমনভাবে চামড়ায় মোড়া হয়, যে, তাহা দেখিলে নকল বলিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারে না।

চিড়িয়াখানাবন্দী জন্তুদের দেখিলে কষ্ট হয় তাহারা মরার মত কোনরকমে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু যাদুঘরের জন্তুগুলিকে তাহাদের বন্য মূর্ত্তিতে এবং হাবে-ভাবে দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয় এবং যে-সব শিল্পীরা এই মৃতজন্তুদের নূতন প্রাণ দান করেন তাঁহাদের প্রশংসা করিবার উপযুক্ত বাক্য পাওয়া যায় না।

এই কাজের শিল্পীকে যাদুকর, শিল্পীমিস্ত্রী এবং প্রাণিতত্ত্ববিদ্, একাধারে সবই হইতে হয়। কারণ, কেবল জন্তুটিকে তৈরী করিলেই তাঁহার কার্য্য শেষ হয় না—কেমন জায়গায় বসাইতে হইবে, কেমনভাবে বসাইতে হইবে, দেহের ভঙ্গী এবং চোখের ভাব ইত্যাদি কেমনধারা হইবে, সবই তাঁহাকে নিখুঁতভাবে করিতে হয়। এইখানেই কার্য্য সমাপ্তি নয়-তাঁহাদের পোকামাকড়ের হাত হইতে রক্ষার জন্য রাসায়নিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রথমে মরা জন্তুর দেহ হইতে চামড়া ছাড়াইয়া লইয়া তাহাকে লোম সমেত ট্যান করিতে হয়। এই কার্য্য যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে করিতে হয় - কারণ সামান্য ভুলে একটি বহুমূল্য চামড়া নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।



মৃত জন্তুদের ছাল টাঙান রহিয়াছে

তার পর এই চামড়াকে "কিকার" নামক কলে বিদ্যুতের সাহায্যে নরম করিয়া লইতে হয়। এই চামড়াকে বিশেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়।

পুরাকালে লোকে মৃতজন্তুর দেহের মাংস বাহির করিয়া ফেলিত—এবং তাহার মধ্যে যা-তা ভরিয়া তাহাকে কোনরকমে খাড়া করিয়া রাখা হইত—তাহাতে খরচ কম হইত বটে কিন্তু জিনিষটা অল্পকালেই নষ্ট হইত, এবং তাহা দেখিতেও বিশেষ সুশ্রী হইত না। বর্ত্তমান সময়ে প্ল্যাষ্টার দিয়া মৃত জন্তুর মাপের একটি মডেল তৈরী করা হয়। এই মডেলটিকে তৈরী করিবার সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয়—কারণ জন্তুর দেহ ভাব ভঙ্গী অনেকটা এই মডেলের উপরেই নির্ভর করে। জন্তুর একটা বিশেষ ভঙ্গীকে আদর্শ ধরিয়া শিল্পী এই মডেল তৈয়ারী করেন। মডেল তৈয়ার হইয়া গেলে পর জন্তুর চামড়াকে তাহার উপর আস্তে আস্তে পরাইয়া দেওয়া হয়। জিনিষটিকে শক্ত করিতে হইলে মডেলের ছাপ লইয়া কোন শক্ত এবং কঠিন দ্রব্য দিয়া জন্তুটির দেহ তৈয়ার করিয়া লওয়া হয়—তাহার পর চামড়া পরাইয়া দেওয়া হয়। অবশেষে জন্তুটির নাক মুখ এবং চোখ তৈয়ার করা হয়। এইরূপে জন্তুটি তৈয়ার করা শেষ হইয়া থাকে।



প্ল্যাষ্টারের তৈরী জন্তুদের মডেল

ইহাকে রক্ষা করিবার উপযোগী দৃশ্য এবং স্থানও তৈয়ার করিতে হইবে। কৃত্রিম গাছপালা ইত্যাদির দ্বারা জন্তুটির বনের সত্যিকার ঘরবাড়ীর মত একটি স্থান, (অবশ্য অনেক ছোট করিয়া) তৈয়ার করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে জন্তুটিকে দেখিলে একেবারে বনের জন্তু বলিয়া মনে হয়। সমস্ত জন্তুটিকে দৃশ্য সমেত একটি কাচের কেসে আবদ্ধ করিয়া হলে রক্ষা করা হয়।

পাখীদের এমনিভাবে তৈরী করা খুব বাহাদুরির কাজ। প্রথমে মৃত পক্ষীর পালক সাবধানে, একটিও না ভাঙ্গিয়া, তুলিয়া লইতে হয়। তার পর চামড়া। কর্ক বা অন্য কোন এমনি-প্রকার দ্রব্যের একটি সমান মাপের মডেল তৈয়ার করিয়া তাহার উপর চামড়া পরাইয়া দিয়া—পাখীর পা গলা এবং ডানা ঠিকমত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। তার পর পালক পরাইবার পালা। এই কাজটি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

সরীসৃপ ইত্যাদির দেহ রক্ষা করিবার জন্য সেলুলয়েডের ব্যবহার হয়। কেমন করিয়া ইহা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা শিল্পীরা গোপন রাখেন- কেবল এইটুকু জানা যায় যে প্লাষ্টার দিয়া প্রথমে মডেল গড়িয়া লইতে হয়।

এইসমস্ত দ্রব্য তৈয়ার হইয়া গেলে পর তাহাদের যাদুঘরে স্থাপন করিয়া বহুমূল্য রত্নাদির মতন যত্নে রক্ষা করা হয়। অনেক সময় তাহাদের কৃত্রিম আলোতে রক্ষা করা হয়, কারণ, দেখা গিয়াছে, যে, সূর্য্যের কিরণে অনেক সময় তাহারা নষ্ট হইয়া যায়।

এক-একটি জন্তুর চামড়ার মূল্য যে কত তাহা বলা যায় না, সেইজন্য



যাদুঘরের জন্তুদের দেখিলে সত্যিকার বনের জন্তু বলিয়া ভ্রম হয়

যে সমস্ত গ্লাস-কেসে এইসব থাকে—তাহা চোরডাকাত পোকামাকড় এবং আগুনের হাত হইতে সব সময় বিশেষ সাবধানতার সহিত রক্ষা করা হয়।

কাচের কেসের মধ্যে রক্ষিত জন্তুদের নমুনাগুলিকে দেখিলে এত সজীব এমন সত্য বলিয়া মনে হয় যে দর্শকেরা অনেক সময় তাহাদের চলাফেরা এবং লাফঝাঁপ দেখিবার জন্য অপেক্ষা করে।

অগ্নির সহিত যুদ্ধ—

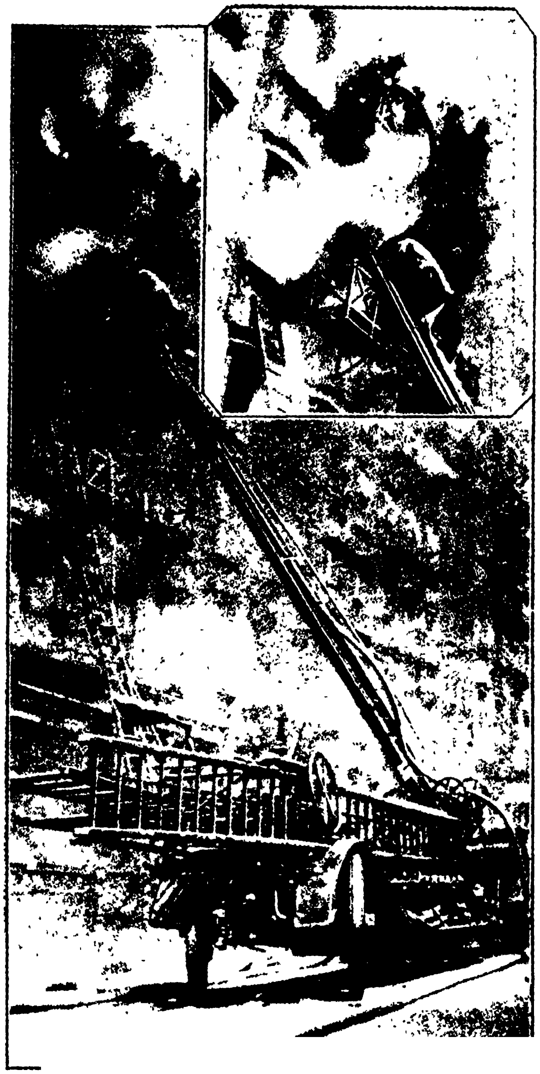
বর্ত্তমান কালে যে প্রথাতে আগুনের সঙ্গে সভ্য দেশের লোকেরা যুদ্ধ করে, তাহাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞান বলিলেও চলে। চিকিৎসা শাস্ত্রের মত ইহাকে অগ্নিনিবারক শাস্ত্র বলিলেও কোন ভুল হয় না।

আগুন জিনিষটির কয়েকটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। তাহা সকল সময়ে এবং সকল স্থানের সকলপ্রকারের আগুনে বর্ত্তমান থাকিবে—সেইজন্য বৈজ্ঞানিকেরা আগুন নিবাইবার সময়ে কয়েকটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন। বর্ত্তমান চিকিৎসকেরা যেমন রোগকে তাড়াইবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া রোগের মূলকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, তেমনি বর্ত্তমান 'অগ্নি যোদ্ধারা'ও আগুন লাগিলে তাহাকে নিবানো অপেক্ষা আগুন যাহাতে না লাগে তাহার চেষ্টাই বিশেষ করিয়া করেন।



আদিম ফায়ার-ব্রিগেড গাড়ী

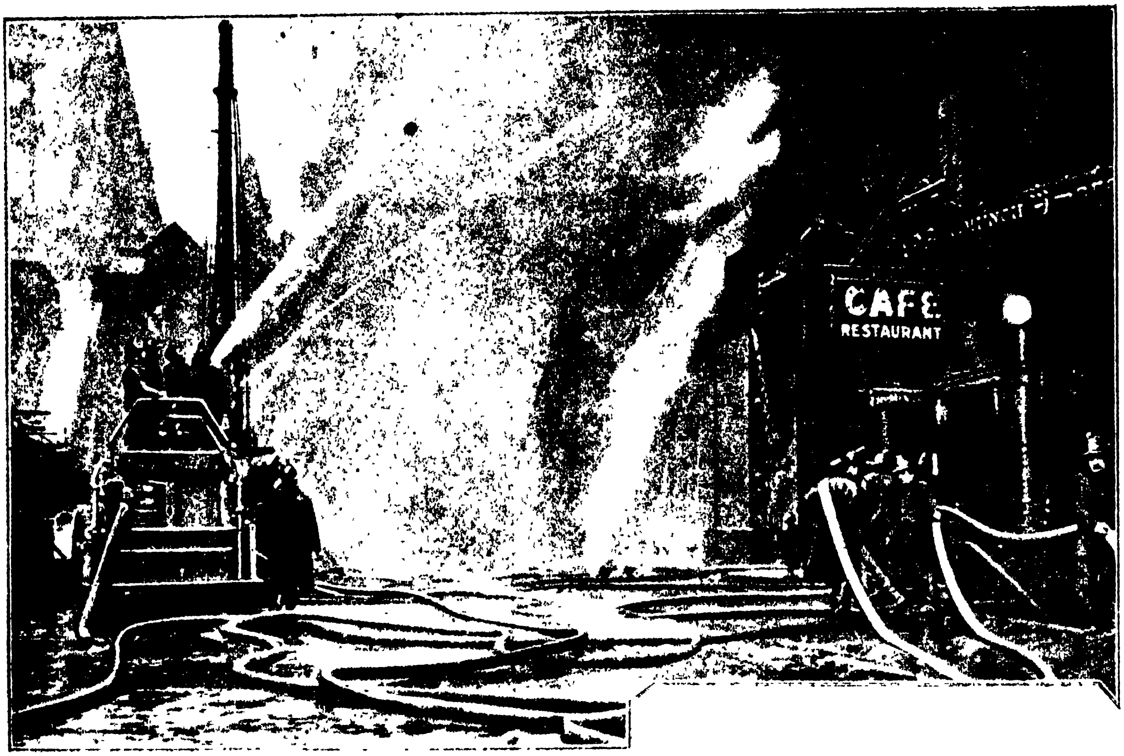
কিন্তু এই কার্য্যে, সাধারণের যথেষ্ট দায়িত্ব বোধ এবং তৎপরতা না থাকার জন্য, অগ্নি-যোদ্ধারা সকল সময়ে তাঁহাদের কার্য্যে সাফল্য লাভ



খুব উঁচু বাড়ীতে আগুন নিবান—অগ্নি-যোদ্ধাদের অসীম সাহস দেখিবার জিনিষ। ফায়ার ইঞ্জিনের মই কলের সাহায্যে খোলে এবং বন্ধ হয়

করে, তাহার সংখ্যা নাই—অথচ এইসব ক্ষেত্রে সাধারণের সামান্য একটু সাবধানতার ফলে অনেক প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আমেরিকাতে প্রত্যেক বৎসর প্রায় ২০৮৪৪৪০০০০ টাকা আগুনে নষ্ট করে। আমাদের দেশের ক্ষতির পরিমাণও খুবই বেশী। আমেরিকা ধনী, আমরা গরীব; আমেরিকার ক্ষতি হইলে তাহা সে অল্প সময়ে পূর্ণ করিতে পারে—আমাদের প্রায় ক্ষতি চিরস্থায়ী হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে আগুন নিবাইবার বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কারে আমেরিকা অগ্রণী। আমেরিকার প্রত্যেক সহরের মিউনিসিপ্যালিটির ফায়ার-ব্রিগেড আছে। ফায়ার-ব্রিগেডের লোকেরা এই কাজের জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত হয—তাহারা কলের মতন নিপুণ এবং সময়-



ফায়ার-ব্রিগেডের পাম্পে জল যোগাইবার মোটা মোটা পাইপ—এই পাম্পের সাহায্যে জল দশতলা পর্য্যন্ত ওঠে

আগুন লাগিবার সর্ব্বপ্রধান কারণ অসাবধানতা। সিগারেটের আগুন হইতে যে কত বাড়ী ঘর দুয়ারে আগুন লাগে তাহার সংখ্যা নাই। অথচ জলন্ত সিগারেট মাটিতে ফেলিয়া তাহা জুতা দিয়া চাপিয়া নিবাইয়া দেওয়া বিশেষ শক্ত কাজ নয় বলিয়া মনে হয়। থিয়েটার, আপিস, বাড়ী, কলঘর ইত্যাদিতে অনেক সময় ইলেকট্রিকের তার জ্বলিয়া গিয়া আগুন লাগে। যদি মাঝে-মাঝে সমস্ত তার ভাল করিয়া পরীক্ষা করা হয় তবে এই ভয় বহু পরিমাণে কমিয়া যায়। একজন একটা জলন্ত সিগারেট, নিউইয়র্কের Asch Building এর কাছে ফেলিয়া দেয়, হাওয়াতে সেই সিগারেট বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়ে এবং আগুন লাগে। সেই আগুনে ১৪৫ জন বালিকা-কর্ম্মচারী পুড়িয়া মরে। ১৯১১ সালে এই ব্যাপার হয়। শিকাগোতেও এইরকমে Iroquois Theatreএ ৬০০ লোক পুড়িয়া মরে।

কোন বাড়ীর ভিতরে আগুন নিবাইবার একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক পন্থা আছে। একটি কল আছে—তাহার নাম স্বয়ংবর্ষী যন্ত্র। বাড়ীর মধ্যের তাপ ১৫৫° ডিগ্রির বেশী হইলেই এই কল হইতে চারিদিকে জল ছড়াইয়া পড়িবে—তাহাতে আগুন একেবারে না নিবিলেও ফায়ার-ব্রিগেড না আসা পর্য্যন্ত আগুন বেশী ছড়াইতে পারিবে না। জল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঘণ্টাও বাজিবে।

একপ্রকার স্বয়ংক্রিয় দরজাও আছে। উত্তাপ বাড়িলেই তাহা আপনা-আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেলে বাহিরের হাওয়া আর ঘরে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া আগুন একই স্থানে আবদ্ধ থাকে—চারিদিকে ছড়াইতে পারে না।

কোথাও আগুন লাগিলে এই কয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত :

(১) সর্ব্বাগ্রে আগুন যেখানে লাগিয়াছে সেইখানেই যেন আবদ্ধ থাকে, এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে।

(২) সহজ-দাহ্য দ্রব্যাদি যেমন করিয়া হোক সরাইয়া ফেলিয়া রক্ষা করিতে হইবে।

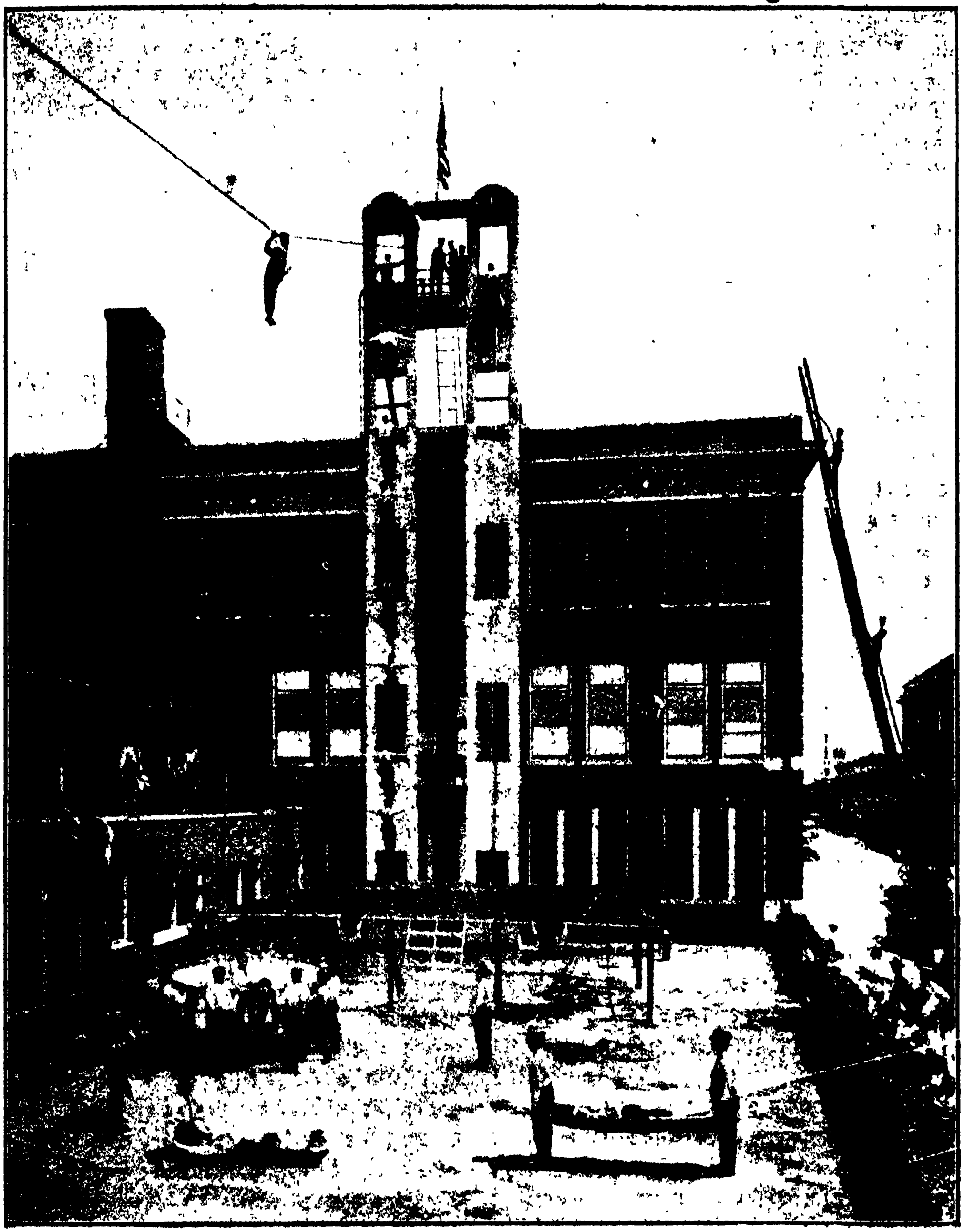


সহরের কোথাও আগুন লাগিলে এইখানে ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। সহরের—এমন কি সমস্ত ডিষ্ট্রিক্টের সঙ্গে এই সেণ্ট্রাল ফায়ার-ব্রিগেড আপিসের যোগ আছে

(৩) প্রাণ-রক্ষার উপায় প্রাণপণ করিয়া করিতে হইবে।

(৪) যেখানে সবচেয়ে বেশী বিপদ্ সেইখানেই সবচেয়ে বেশী জোর দিয়া কাজ করিতে হইবে।

(৫) হট্টগোল না করিয়া বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ফায়ার-ব্রিগেডের কর্ত্তার আজ্ঞামত কাজ করিতে হইবে।



নিউইয়র্কের ফায়ার ব্রিগেডের লোকেদের শিক্ষালয়। আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যাহা কিছু শিখিবার দরকার সবই এইখানে শেখান হয়
(ছবিখানি ১৩২৯এর পৌষ মাসের প্রবাসী হইতে দেওয়া হইল)

আগুনের মত শত্রু আর নাই। এই শত্রু মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে কাহাকেও বন্দী করে না, যাহা পায় সব ধ্বংস করিয়া যায়। আগুন নিবাইবার বৈজ্ঞানিক উপায়ও যেমন দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, সহজে আগুন লাগিবার কারণও তেম্‌নি বাড়িয়া চলিয়াছে। আজকাল থিয়েটার ইত্যাদিতে যেমন আগুন নিবাইবার সকলপ্রকার বৈজ্ঞানিক তাহার মধ্যে একটি সেলুলয়েড ফিল্‌ম্‌। ফ্রান্সে নিয়ম হইয়াছে যে ১৯২৫ সালের পর কোন বায়স্কোপ কোম্পানি অ-দাহ্য ফিল্‌ম্‌ ছাড়া অন্য কোনপ্রকার ফিল্‌ম্‌ ব্যবহার করিতে পারিবে না।

রসায়নাগার এবং রাসায়নিক কারখানায় হঠাৎ আগুন লাগে এবং এইসব আগুন নেবান ভয়ানক শক্ত ব্যাপার।

লাগিলে তাহা সবচেয়ে ভয়ানক হয়। এইসমস্ত স্থানে খাদ্য-দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার কলে অ্যামোনিয়া ব্যবহার হয়। আগুন লাগিলে অ্যামোনিয়ার গ্যাসে লোকে অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং অনেক সময় মরিয়াও যায়। নাইট্রিক অ্যাসিড যেসমস্ত কারখানায় ব্যবহার হয়, সেখানে আগুন লাগিলে আরো মুস্কিল। নাইট্রিক অ্যাসিড গ্যাসের গন্ধ নাই কাজেই প্রথমে বুঝিতে পারা যায় না। যে মুহূর্ত্তে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা নাইট্রিক অ্যাসিড আগুন-লাগা-স্থানে আছে বলিয়া বুঝিতে পারে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। গ্যাস বাহির করিয়া দিবার নলের বন্দোবস্ত আজকাল অনেক কারখানাতে হইয়াছে।

নিউইয়র্ক সহরে ফায়ার ব্রিগেডের লোকদের বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে অগ্নিসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার পাঠ করিতে হয়। যন্ত্রাদি ব্যবহার, ইঞ্জিন চালান, প্রাথমিক সাহায্য-দান, বৈদ্যুতিক ব্যাপার, সহজদাহ্য এবং কঠিনদাহ্য দ্রব্যাদি, মোটর, ড্রিল, বাধ্যতা এবং অবিলম্বে নায়কের আদেশ প্রতিপালন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার সুচারুরূপে অগ্নিযোদ্ধাকে শিক্ষা করিতে হয়।

যদিও অগ্নি-যোদ্ধারা কোথাও আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তথাপি তাহারা কোথাও যাহাতে আগুন না লাগে তাহার চেষ্টাই বিশেষভাবে করে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

"ডেঙ্গু-জ্বর" সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কলিকাতা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানে এবার ডেঙ্গুজ্বরের ভীষণ প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই এক বা ততোধিক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই আক্রান্ত হইয়াছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যেও বোধ হয় কেহ-কেহ এই জ্বরের হাড়ভাঙ্গা প্রকোপ সহ্য করিয়াছেন। তাই আশা করি আমাদের এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"ডেঙ্গু" শব্দটি নাকি হিন্দুস্থানী "ডাণ্ডি" বা একই অর্থবাচক স্পেনদেশীয় "ডেঙ্গুরো" শব্দ হইতে আসিয়াছে। ডেঙ্গু রোগীর চলা ফেরা বেদনাক্লিষ্ট বলিয়া অনেকটা শক্ত ও সোজা ডাণ্ডার মত হয়, তাই এই নাম। এই জ্বরের নিয়মই এই যে বহুলোককে এক সময়ে আক্রান্ত হয়। 'গ্যাল্‌ভেষ্টন' নামক আমেরিকার একটি ক্ষুদ্র সহরে একবার প্রায় ২০,০০০ লোকের এই পীড়া হইয়াছিল। 'ব্রাউন্‌স্‌ভাইল' নামে আর-একটি ক্ষুদ্র স্থানের ৮,০০০ অধিবাসীর মধ্যে ১,০০০ লোকেরই ডেঙ্গু হইয়াছিল। কলিকাতা সহরে এবার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে খুব কম পক্ষে প্রায় লক্ষ লোকের ডেঙ্গু হইয়াছে।

ভারতবর্ষে এই রোগ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম আমদানী হয় এবং ইহার দুই তিন বৎসর পরে ইহা 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ'এ ছড়াইয়া পড়ে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ডেঙ্গুজ্বর কেহ চিনিত না। স্পেন দেশের সেভিল নামক স্থানে এই রোগ প্রথম ধরা পড়ে। ইহার পর পৃথিবীর বহু স্থানের উপর দিয়া এই জ্বরের ঢেউ চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশই এই জ্বরের প্রকোপ সহ্য করিয়াছে। স্পেনদেশে প্রথম আবির্ভাবের দশ বৎসর পরেই ডেঙ্গুজ্বর পারস্য, মিশর ও উত্তর-আমেরিকায় ছড়াইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ব-আফ্রিকা, মিশর, আরবদেশ, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও চীন এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপিয়া ডেঙ্গুর প্রকোপ দৃষ্ট হয়। এবং এই সময়েই ইহা হংকং, সিরিয়া, ফিজি, ভূমধ্যসাগরের কয়েকস্থানে, গ্রীস্ ও এসিয়া মাইনরে ছড়াইয়া পড়ে। বিংশশতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইহা পেনাং, সিঙ্গাপুর, সিংহল, উত্তর-ব্রহ্মদেশ, এমন কি সুদূর পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করে। একস্থানে একবার ডেঙ্গুজ্বরের আবির্ভাব হইলে, সেইস্থানে মাঝে মাঝে পুনরায় ইহার প্রকোপ দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ম্যান্‌সন্ সাহেবের মতে প্রত্যেক ২০ বৎসর অন্তর ডেঙ্গুজ্বরের এইরূপ যাবতীয় সমুদ্রতীরবর্ত্তী বৃহৎ বন্দরগুলিতে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই এই ঢেউ আসিয়া লাগে বলিয়া আমার মনে হয়। কলিকাতা, বোম্বে, মান্দ্রাজ, সিঙ্গাপুর, পেনাং, কলম্বো, হংকং, রেঙ্গুন প্রভৃতি বন্দরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় প্রত্যেক বৎসরেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রকোপ দেখা গিয়াছে। ডেঙ্গুজ্বরের বাহন "ষ্টেগোমাইআ" (stegomyia) মশক বাণিজ্যপোতের ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাধারগুলিতে অনায়াসে বাঁচিতে পারে ও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে, তাহা সুপরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং জাহাজে একটিমাত্রও রোগী থাকিলে তাহার দ্বারা কতকগুলি সহযাত্রীর রোগের সম্ভাবনা থাকে এবং তাহারা যখন কোন বন্দরে নামিবে সেখানেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল থাকিলে কিরূপভাবে রোগ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ষাকালে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা খুবই অনুকূল থাকে সন্দেহ নাই। তাই এখন কলিকাতার ডেঙ্গুজ্বরের ঢেউ গিয়া সুদূর হংকংএর তীরে লাগিতে পারে। দুনিয়ার আবহাওয়ার সহিত আজকালকার নিকট সম্পর্কের এই একটি বিষময় ফল।

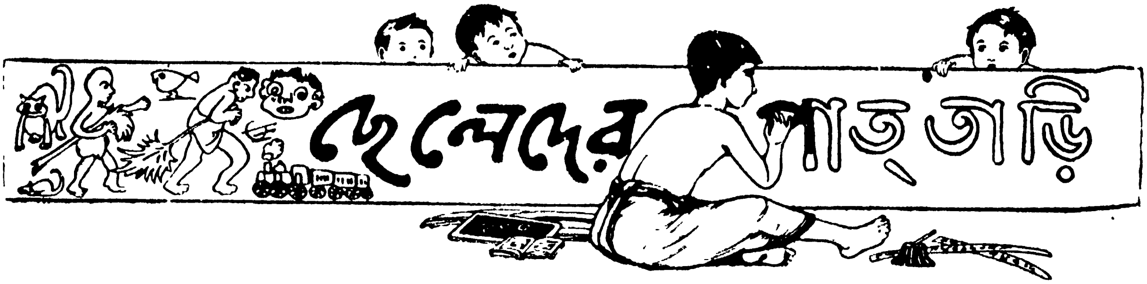
সুখের বিষয় এ জ্বরটা মারাত্মক হয় না। কেহ কেহ বলেন যে একবার এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে ভবিষ্যতে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু প্রায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং শীতপ্রধান দেশে ও শীতকালে এ জ্বর হয় না। গরম ও নীচু জায়গাই ইহার প্রিয় ক্ষেত্র। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান বা নিম্ন বারিবিধৌত প্রদেশই ইহার প্রকৃষ্ট স্থান। এই রোগের বীজাণু এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। যদিও রক্তকণিকার ভিতরে অনেকে এই বীজাণুর অনেকপ্রকার সূক্ষ্মশরীর দেখিতেছেন। তবে এক বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই,—মশকই যে ডেঙ্গুজ্বরের বাহন তাহা সুনিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। ম্যালেরিয়া-জ্বর মশক দ্বারা সংক্রামিত হয়, একথা সকলেই জানেন। এই মশককেই যখন আবার ডেঙ্গুজ্বরের বাহন বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করা হইতেছে, তখন বোধ হয় অনেকেই এটা ডাক্তারদের আজগুবি কথা বলিয়া মনে করেন। যদিও এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে "অ্যানোফেলিস্" নামক মশক যাহা সাধারণতঃ ম্যালেরিয়ার বীজাণু সংক্রামিত করে, তাহা ডেঙ্গুজ্বরের বাহন নহে। যাহা হউক, মশক ডেঙ্গুজ্বরের বাহন কি না সে সম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। তাহা হইতেই পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের মতামত ঠিক করিয়া লইবেন।

স্থানে ডেঙ্গুজ্বরের খুব প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সময় আমেরিকার দুই দল সৈন্য একটি পার্ব্বত্যস্থানে পরস্পরের সান্নিধ্যে বাস করিত। একদল পর্ব্বতের শীর্ষ দেশে উচ্চভূমিতে ছিল, আর একদল পর্ব্বতের সানুদেশে নিম্নভূমিতে ছাউনি করিয়া ছিল। তখন বর্ষাকাল, নিম্নভূমিতে ভয়ানক মশার উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল। যদিও সেই স্থানের কোথাও জল জমিয়া থাকিতে পারিত না তবুও বহুসংখ্যক মশার আবির্ভাব হইল। উচ্চভূমিতে মশা ছিল না এবং সেখানে কাহারও ডেঙ্গুজ্বর হইল না। নিম্নভূমিতে কয়েকজনের ডেঙ্গুজ্বর হইল। এই রোগীদের তৎক্ষণাৎ স্বতন্ত্র করিয়া সর্ব্বদা মশারীর ভিতর রাখা হইল। যাহারা সুস্থ ছিল তাহাদিগের প্রতিও সন্ধ্যার পূর্ব্বে হইতেই মশারীর ভিতর থাকিবার আদেশ হইল। তাহা ছাড়া সেনানিবাসের জানালা ও দরজাগুলি একপ্রকার সূক্ষ্মজালে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। এই-প্রকারে সেনানিবাসে ডেঙ্গুজ্বর বন্ধ হইল। মাত্র একজন সৈনিক এক রাত্রে তাহার সৈন্যাধ্যক্ষের বাড়ীতে বিনা মশারীতে শুইয়াছিল তাহারই ডেঙ্গু হইল। অথচ তাহার ঠিক পার্শ্বেই এক ব্যক্তি মশারী খাটাইয়া শুইত তাহার কিছুই হইল না। সুয়েজ কেনালের 'পোর্ট্ সৈয়দ' বন্দরে ম্যালেরিয়া হইত বলিয়া ১৯০৬ খৃঃ সেখানে মশক-কুল ধ্বংস করিবার আয়োজন হয়। তাহাতে মশা প্রায় নির্ম্মূল হইল। এই বৎসরের শেষভাগে ও তাহার পরের বৎসর ঐ বন্দরের পার্শ্ববর্ত্তী সমুদায় স্থানেই ডেঙ্গুজ্বরের প্রাদুর্ভাব হইল,—কিন্তু এইস্থানে হইল না। আমেরিকার লাজারাস্ ও 'সেন্ট্ ডমিংগো' নামক দুইটি স্থান সমুদ্রতীর হইতে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে। তথায় বৎসরের অধিকাংশ সময়ই প্রচুর পরিমাণে মশা হয়। একবার সেখানে দুইটি নাবিকদলের ভিতর ডেঙ্গুজ্বরের আবির্ভাব হয়। কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ তাহাদের অস্থ সকলের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইলেন ও তাহাদের সর্ব্বদা মশারীর ভিতর রাখিয়া মশা মারিবার নানাপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন। ইহাতে অতিশীঘ্রই ডেঙ্গুজ্বর বন্ধ হইয়া গেল। সিরিয়া প্রদেশের বেরুথ্ নামক স্থানে গ্রাহাম নামক একজন ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ডেঙ্গুরোগীকে কামড়াইয়াছে এরূপ মশা ধরিয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সুস্থগ্রামের দুইটি লোকের দেহে বসাইয়া দেওয়াতে উভয়েরই ৪।৫ দিন পরে ডেঙ্গুজ্বর হইয়াছিল। ইহা ছাড়া কোন কোন ডাক্তার দেখিয়াছেন যে ডেঙ্গুরোগীর শরীর হইতে কিছু রক্ত সুস্থ লোকের দেহের শিরার ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেও ডেঙ্গুজ্বর হয়।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মতে দুইপ্রকার মশা ডেঙ্গুজ্বরের বাহন—কিউলেক্স্ ফ্যাটিগ্রেন্স (Culex fatigrans) ও ষ্টেগোমাইয়া ক্যালোপাস্ (Stegomyia Calopus)। প্রথমোক্তটি গ্রীষ্মপ্রধান সর্ব্বদেশেই খুব প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রং পাট্‌কিলে, বুকের দিকে দুইটি কাল দাগ আছে ও পেটের দিক্‌টায় ধূসর বর্ণের কয়েকটি রেখা আছে। পুরাতন পুষ্করিণী, ডোবা, গর্ত্ত প্রভৃতি বদ্ধ জলাশয়ে এই মশা জন্মে। 'ষ্টেগোমাইয়া' মশক মানুষের বাসস্থানেই চৌবাচ্ছা, পুরাতন টিনের কৌটা, বৃষ্টিজলের পাইপ, হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি গৃহের নানাবিধ অব্যবহার্য্য জলপূর্ণ পাত্রেই বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। এই হিসাবে ইহারা অধিক বিপদ্‌জনক। স্ত্রী-ষ্টেগোমাইয়া একসঙ্গে ২০টা হইতে ৭৫ টা ডিম জলের উপর পাড়ে। এগুলি দেখিতে ক্ষুদ্র, কাল, সিগারের মত এবং সহজে মরে না। বাচ্ছাগুলি ডিম হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার সপ্তাহ মধ্যে নিজেরাই পুনরায় ডিম পাড়িবার উপযুক্ত হইয়া উঠে; স্ত্রীমশক বৎসরের বহুবার ডিম পাড়ে, বিশেষতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালেই অধিক। শীতকালে ডিম শীতকালটা কাটাইয়া পুনরায় গ্রীষ্মকালে খুব সজাগ হইয়া উঠে। পেটের দিক্‌টায় সাদা ও কাল ডোরা-ডোরা দেখিয়াই "ষ্টেগোমাইয়া" মশক চিনিতে পারা যায়। এই-সব ডোরা-ডোরা দাগ থাকে বলিয়া ইহার আর-এক নাম "বাঘা-মশক" (tiger-mosquito)। এই জাতীয় মশা দিনে রাত্রে সর্ব্বদাই কামড়ায়। মশার ভিতর স্ত্রীমশকই মানুষের অধিক শত্রু, কারণ ইহারাই মানুষের রক্ত খায় ও নানাপ্রকার রোগের বীজাণু বহন করিয়া বেড়ায়। পুরুষমশকগুলি অপেক্ষাকৃত ভদ্র এবং মানুষের বিশেষ ক্ষতি করে না।

এইবার ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণগুলি ও ইহার প্রতিকারের কয়েকটি সহজ উপায় বিবৃত করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই রোগে যে ভীষণ গাত্রবেদনা হয় তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বিশেষতঃ যাঁহারা একবার ভুগিয়াছেন তাঁহারা ত বিশেষভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। ইহাতে শরীরের প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থি, মাংসপেশী, ও মাংসপেশীর বন্ধনীতে এত বেদনা হয় যে এই জ্বরের আর-একটি নাম হইয়াছে "breakbone fever" বা হাড়ভাঙ্গা জ্বর। অসহ্য মাথার যন্ত্রণা, চোখের পিছন দিকে ব্যথা,—এমন কি চোখ এদিক্ ওদিক্ ঘুরাইতেও লাগে, রাত্রে অনিদ্রা, জ্বরের সঙ্গে অক্ষুধা, পেটের পীড়া, বা বমি কাহারও কাহারও হয়। ছেলেপিলেদের কখনও কখনও প্রলাপ-বকা বা তড়কা হয় বা হয়ত জ্বরের সময় বেহুঁস হইয়া পড়িয়া থাকে। জ্বরটা তিন-চার দিনেই ছাড়িয়া যায়, জ্বর ছাড়ার সময় প্রায়ই খুব ঘাম হয়, কাহারও কাহারও এই সময় পেটের পীড়াও হয়। জ্বরটা ছাড়িয়া গিয়া দুই-এক দিন রোগী ভাল থাকে। সেই সময় গায়ে হামের মত rash বা গোটা বাহির হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই শেষের জ্বরটা প্রায়ই দু'এক দিনের বেশী থাকে না। কদাচিৎ শেষের জ্বরটা প্রথম জ্বরের চাইতে গুরুতর হয়। জ্বরটা সারিয়া গেলেও শরীরের দুর্ব্বলতা অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকে। কদাচিৎ কাহারও দুইতিন বারও জ্বরটা ফিরিয়া আসে ও গাত্রবেদনা হয়। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

ডেঙ্গুজ্বর নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে :—(১) বাটীতে কোথাও জল জমিয়া না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা। (২) যেখানে জল জমিয়া থাকা নিবারণ করা যায় না (যেমন কলিকাতায় পায়খানার ট্যাঙ্ক্ ইত্যাদি) সেই-সব স্থানে জলের কিনারায় প্রতি দশ দিন অন্তর কেরোসিন তেল কিছু সাবান-জলের সহিত মিশাইয়া ঢালিয়া দেওয়া। প্রতি ১৬ 'কিউবিক্' ফুটে ১ আউন্স কার্ব্বলিক অ্যাসিড দিলেও চলে। পেষ্টারিন (pesterine or crude petroleum) ছড়াইয়া দিলেও চলে। পেষ্টারিন ও কেরোসিন-তেল একসঙ্গে সমান ভাগে মিশাইয়া জলের কিনারায় ছড়াইয়া দেওয়াই বোধ হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। পানামা, কাইরো প্রভৃতি স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এই দুইটিই খুব অধিক ব্যবহার হইয়াছে। পুষ্করিণী বা বড় জলাশয়ে দিতে হইলে টিনের বড় একটা পিচ্‌কারী দিয়া ছিটাইয়া দেওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। (৩) ডেঙ্গু-রোগীকে সর্ব্বদা মশারীর ভিতর রাখা উচিত ও বাড়ীর অন্য সমস্ত সুস্থ ব্যক্তিদের মশারী ব্যবহার করা উচিত। (৪) কেহ কেহ বলেন ডেঙ্গুজ্বরের সময় প্রত্যহ কিছু কিছু কুইনিন খাইলে এই জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। ডেঙ্গুজ্বরের ভীষণ গাত্রবেদনায় একটু 'কুইনিন স্যালিসাইলাস্' (৫ গ্রেন), 'এস্পিরিন্ (৫ গ্রেন) 'ক্যাফিন সাইট্রাস্' (৩ গ্রেন) একসঙ্গে মিশাইয়া একটি বা দুইটি পুরিয়া খাইলে গাত্রবেদনা ও মাথাধরার অনেকটা উপশম হয়।



কুল-প্রদীপ

(গুজরাটী উপকথা)

এক গরীব ব্রাহ্মণের একটিমাত্র ছেলে। ছেলেটির যেমন বুদ্ধি তেমনি লেখাপড়ায় মন। কিন্তু ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট খারাপ, তিনি পয়সার অভাবে ছেলেকে একটু আদর করতে পারেন না, ভাল করে' খেতে দিতে পারেন না। এইজন্যে তাঁর মনে বড় দুঃখ। একদিন ছেলেকে ডেকে তিনি বল্লেন, "তোমার নাম রেখেছি কুল-প্রদীপ, আমার আশা আছে ভবিষ্যতে আমার বংশ তুমি উজ্জ্বল করবে। কিন্তু এখন যে তোমায় খেতে দিতে পার্‌ছি না, তার কি ?"

কুল-প্রদীপ ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়, বাপের কষ্ট সে খুব বুঝ্‌ত। সে বল্লে, "বাবা তুমি কিছু ভেব না, আমি এবার নিজে রোজ্‌গার করতে চল্লুম।"

ব'লে ত সে গ্রাম ছেড়ে সহরে চ'লে গেল। সেখানে গিয়ে বাজারের মাঝখানে এক দোকান খুলে' বস্‌ল। দোকানে জিনিষের মধ্যে ছিল, একটা খালি বাক্স, খানকতক সাদা কাগজ, আর দোয়াত-কলম। তার পর দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে সমস্তদিন ধ'রে চেঁচাতে লাগ্‌ল, "এখানে বুদ্ধি বিক্রী আছে, যে দামের চাও সেই দামের পাবে। কে নেবে গো চ'লে এস।" তাই না শুনে' কত লোক ভিড় করতে লাগ্‌ল, কিন্তু অতটুকু ছেলের কাছ থেকে কে আর বুদ্ধি নিতে যাবে ? যে আসে সেই একটু দাঁড়িয়ে দেখে' চ'লে যায়, খদ্দের আর জোটে না।

শেষটা সন্ধ্যে যখন হয়-হয়, তখন গোবর-গণেশ ব'লে একটি হাঁদা ছেলে সেইখান দিয়ে যাচ্ছিল, সে কিসের গোলমাল হচ্ছে, এগিয়ে দেখ্‌তে এল। "বুদ্ধি চাই, বুদ্ধি চাই" সে মনে করলে বুঝি কোনরকম খাবার জিনিষ বিক্রী হচ্ছে, তাই সে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলে, "কত ক'রে সের দিচ্ছ ?"

কুল-প্রদীপ তখনি জবাব দিলে, "ওজন ক'রে বিক্রী করি না, যেমন পয়সা দেবে, ঠিক তেম্‌নি জিনিষ পাবে।"

গোবর-গণেশ বল্লে, "তবে দাও ত দেখি দুপয়সার !"

তার হাত থেকে দুটো পয়সা নিয়ে কুল-প্রদীপ এক টুক্‌রো কাগজে লিখ্‌লে, "দুজন লোক যেখানে ঝগড়া করবে, সেখানে কখনো দাঁড়িও না।" লিখে' সে গোবরগণেশের কোঁচার খুঁটে কাগজটা বেশ ক'রে বেঁধে' দিলে।

তাই নিয়ে ত গোবরগণেশ বাড়ী চল্‌ল। বাড়ী গিয়ে তার বাবাকে বল্‌লে, "আমি দুপয়সায় বুদ্ধি কিনে এনেছি !"

তার বাবার নাম ছিল ধনুর্দ্ধর। তাঁর টাকাকড়ি ছিল অনেক হাজার, কিন্তু কানাকড়ির বুদ্ধি ছিল না। তিনি ত শুনেই দেখ্‌তে চাইলেন, কিরকম বুদ্ধি কেনা হয়েছে। দেখে'ই মহাখাপ্পা ! বল্লেন, "সকলেই জানে যে ঝগ্‌ড়ার কাছে দাঁড়াতে নেই, খালি তুই জানিস্ না। তাই ব'লে এই দুলাইনের জন্যে দু-দুটো পয়সা খরচ করলি ?" তখনি তিনি বুদ্ধির দোকানে গিয়ে হাজির হলেন, তার পর কুলপ্রদীপকে যা-নয় তাই ব'লে গালাগালি দিতে লাগ্‌লেন। সে চুপ্‌টি ক'রে শুন্‌তে লাগ্‌ল, শেষটা যখন তিনি বল্লেন, "তুমি আমার ছেলেকে বোকা পেয়ে পয়সা ঠকিয়ে নিয়েছ, এখনি ফিরিয়ে দাও, নইলে চৌকিদার ডাকব !"—তখন কুলপ্রদীপ বল্‌লে, "ও কিন্‌তে এসেছিল তাই বিক্রী করেছি। এখন ও যদি আমার বুদ্ধি ফেরৎ দেয়, তা হ'লে আমিও পয়সা ফিরিয়ে দেব।"

ধনুর্দ্ধর কাগজখানা দোকানের বাক্সের উপর রেখে দিলেন। কুলপ্রদীপ মাথা নেড়ে বললে, "উঁহু, কাগজ

ফেরৎ চাই না, বুদ্ধি ফেরৎ চাই। যদি তোমরা পয়সা ফিরিয়ে নিতে চাও তা হ'লে এত লোকের সাম্‌নে একখানা কাগজে নিজের হাতে লিখে' দিতে হবে, যে, ও আমার বুদ্ধি শুনে' কখনও চল্‌বে না। যেখানে ঝগ্‌ড়া হবে, সেইখানেই দাঁড়িয়ে দেখ্‌বে।"

চার পাশে যারা ভিড় করেছিল, তারা সবাই তার কথায় সায় দিলে। কাজেকাজেই ধনুর্দ্ধর একখানা কাগজে, যেমন বলা হ'ল, তেমনি লিখে নাম সই ক'রে দিলেন। তার পর দুটো পয়সা হাতে পেয়ে মনে কর্‌লেন, খুব সহজে কাজ হাসিল্ করা গেল।

পরের দিন সকালবেলা, সেই দেশের রাজার দুই রাণী, দুই সখীকে বাজারে পাঠিয়েছেন আতরের নমুনা আন্‌তে। দুই সখী এক দোকানে এসে উঠ্‌ল। দুজনে দু শিশি আতর দেখ্‌তে চাইলে। দোকানীর কাছে তখন একটিমাত্র শিশি ছিল। কাজেই কে সেটা নিয়ে যাবে এই নিয়ে ঝগ্‌ড়া বেধে গেল। সেই সময়ে গোবরগণেশ সেখানে এসে পড়েছে, আর দূর থেকে কুলপ্রদীপকে দেখ্‌তে পেয়ে সে পালিয়ে যাবে মনে করেছিল, কিন্তু আর পালাবার উপায় নেই! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল। গোবর-গণেশকে একলা সাম্‌নে পেয়ে রাণীর সখীরা দুজনেই তাকে সাক্ষী মেনে বস্‌ল। তার পর তারা বাড়ী গিয়ে দুই রাণীর কাছে পরস্পরের নামে নালিশ কর্‌লে, আর প্রত্যেকেই বল্‌লে, তার যে কোন দোষ নেই একটি ছেলে তার সাক্ষী আছে। রাজার কাছে তাদের বিচারের জন্যে পাঠিয়ে দিয়ে দুই রাণী গোবরগণেশকে ব'লে পাঠালেন যে অপরের সখীর হ'য়ে কোন কথা বল্‌লে তার মাথাটি কাটা যাবে! গোবরগণেশ ভয় পেয়ে তার বাপের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বল্‌লে। তিনি সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভেবেও কোন উপায় বার কর্‌তে পার্‌লেন না। তখন স্থির হ'ল সেই বুদ্ধিওয়ালার কাছে যাওয়া যাক্, সে যদি কিছু বুদ্ধি দেয়।

তার পর দুজনে কুলপ্রদীপের কাছে যেতেই সে চেয়ে বস্‌ল পাঁচশো টাকা। প্রাণের দায়ে ধনুর্দ্ধর তাকে তাই দিলেন। টাকা হাতে নিয়ে সে বল্‌লে, "রাজার কাছে গিয়ে একটি কথারও জবাব দিও না, কেবল পাগলের ভাণ কর্‌বে।"

রাজসভায় গিয়ে গোবরগণেশ তাই কর্‌লে। যা জিজ্ঞেস্ করা হয় তার কিছু জবাব দেয় না, শেষটা ঘোড়ার ডাক, কুকুরের ডাক ডাক্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। রাজা তখন চ'টে গিয়ে বল্‌লেন, "দাও ওটাকে রাস্তায় বার ক'রে!"

রাস্তায় না বেরিয়ে গোবরগণেশ চোঁচা দৌড় দিলে।

দিন কতক যায়। একদিন ধনুর্দ্ধরের ভয় হ'ল, রাজা যদি কোন সূত্রে জান্‌তে পারেন, যে গোবরগণেশ সত্যি সত্যি পাগল নয়, তা হ'লে ত তার ভয়ানক শাস্তি হবে! এর প্রতিকার কি, জান্‌তে গেল বুদ্ধির দোকানে। কুল-প্রদীপ বল্‌লে, "পঞ্চাশ টাকা না নিয়ে ত কথা কইব না!"

তাই দিতে, বল্‌লে, "রাজার মেজাজ যখন ভালো থাক্‌বে, তখন গিয়ে সব কথা খুলে' ব'লে মাপ চাইলেই হবে।"

গোবরগণেশ একদিন তাই কর্‌লে। রাজা ত ব্যাপারটা শুনে ভারি খুসি হলেন! তিনি তখনি কুল-প্রদীপের কাছে লোক পাঠিয়ে খবর দিলেন, "আমাকে একটা বুদ্ধি দাও, যা দাম লাগে, দেব।"

কুলপ্রদীপ ব'লে পাঠালে, "আপনাকে একটি খুব ভাল বুদ্ধি দেব, তার দাম বেশী নয়, একহাজার টাকা।"

রাজা কুলপ্রদীপের কথা সব শুনেই বুঝেছিলেন, ছেলেটির বুদ্ধি বড় কম নয়। তাই তাকে একহাজার টাকাই দিলেন। কুলপ্রদীপ শুধু এই কথাটি লিখে দিলে, "খাবার আগে দেখে' নেওয়া উচিত।"

কথাটি খুব সুন্দর দেখে', রাজা সমস্ত খাবার পাত্রে ঐটি লিখিয়ে রাখ্‌লেন।

দিনকতক পরে হঠাৎ একদিন তাঁর খুব অসুখ হ'ল। মন্ত্রী তাঁকে মেরে ফেল্‌বার মৎলব ক'রে কবিরাজকে ব'লে ওষুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলে। সোনার বাটিতে সেই ওষুধটা ঢেলে রাজার হাতে যখন তুলে' দেওয়া হ'ল, তখন তাঁর নজরে পড়্‌ল সেই লেখাটি,—"খাবার আগে দেখে' নেওয়া উচিত।

তিনি ওষুধটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। দেখে' কবিরাজের ভয় হ'য়ে গেল। সে ভাব্‌লে, ওষুধ খাবার সময়ে রাজা ত কোনদিন দেখেন না! আজ কেন দেখ্‌ছেন? তবে নিশ্চয় জান্‌তে পেরেছেন! তখনি সে রাজার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়্‌ল। রাজা ত কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। তাই প্রহরীকে দিয়ে মন্ত্রীকে তখনি ডাক্‌তে পাঠালেন।

মন্ত্রীর ত চক্ষু স্থির! সে এসেই জোড়হাত ক'রে বল্‌লে, "মহারাজ ত সবই টের পেয়েছেন, আমাদের মাপ করুন্!"

রাজা তখনো কিছুই জান্‌তে পারেননি, ক্রমে জেরা ক'রে সব ঘটনাটা যখন স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন বিষের পাত্রটা ছুড়ে' ফেলে দিয়ে দুজনকে রাজ্য থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

তার পর? তার পর সেই বুদ্ধিমান্ ছেলে কুল-প্রদীপকে এনে মন্ত্রীর আসনে বসালেন। কুল-প্রদীপ আর তার বাবা, গরীব ব্রাহ্মণের সমস্ত দুঃখ চ'লে গেল।

শ্রী প্রভাতকিরণ বসু

ফুলের রেণু

ফুলের মধ্যে নানাবর্ণের ধূলার মত ফুলের রেণু থাকে। ফুলের প্রধান উদ্দেশ্য এই রেণু-ধারণ। গর্ভকেশরের ভিতর ছোট ছোট অপরিপুষ্ট বীজ থাকে, রেণু বা পরাগ গর্ভকেশরে পড়িলে তবে বীজ জন্মে। বীজই বৃক্ষাদির বংশ-রক্ষক বা 'পিণ্ডদাতা'। অবশ্য অনেক গাছের বীজ জন্মে না, কলম করিয়া বা 'তেউড়' দ্বারা তাহাদের বংশ রক্ষা হয়। কোন কোন দেশে হিম ঋতু প্রায় ১২ মাসই থাকে, বরফও একেবারে গলিয়া যায় না, তথায় অনেক গাছ এইরূপে যুগযুগান্তর ধরিয়া বংশ-রক্ষা করিতেছে—যেমন সাইবেরিয়া দেশের তৃণবর্গ। আমাদের বাঁশ বংশবর্গ কয়েক রকম তালীবর্গ, কয়েকপ্রকার কদলী এইরূপে বংশরক্ষা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির উদ্দেশ্য বীজ দ্বারা বংশ-রক্ষা করা। অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন যে বাঁশ-গাছে ৫০।৬০ বৎসর অন্তর ধানের মত বীজ হয়। অনেক তালী-শ্রেণীর জীবনে একবার মাত্র ফল হয় ও তাহার পরেই তাহারা মরিয়া যায়। কদলীরও বীজ হয় ও তাহাতে গাছও হইয়া থাকে। তবে সৌখিন কলার বীজ হয় না বটে। মানব নিজের সুবিধার জন্য কত ফলকে যে বীজশূন্য করিযাছে, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া।

সাধারণতঃ সকল বৃক্ষেরই বীজ আবশ্যক ও বীজ জন্মিতে রেণুর আবশ্যক। সুতরাং রেণুই ফলের চরম লক্ষ্য।

আবার পরাগ কীটেরও অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। মৌমাছি কেবল মধু লুটিতে আসে না, রেণুর লোভও তাহার কম নহে। ভ্রমর কেতকীফুলে পরাগের লোভে আসিয়া কিরূপ অন্ধ হয় প্রাচীন কবিগণ তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

পুরাকালে বিলাসী রমণীগণ ফুলের রেণু মুখে মাখিতেন, শয্যায় ছড়াইতেন ও তাহা দিয়া কেশ সংস্কার করিতেন। এখন যে 'পাউডার' দেখিতে পাই, তাহাও ঐ রেণুর মত, ও তাহারই স্থলাভিষিক্ত। বিলাসীদের আর-একটি দ্রব্য জাফ্‌রান্-ফুলের কেশর।

একটি ফুলে অনেক রেণু জন্মিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুই একটির প্রয়োজন, বাকি সব মাঠে মারা যায়। পূর্ব্বে যখন পরাগ বায়ু দ্বারা গর্ভকেশরে আসিতে পাইত—এখনও এরূপ ফুল অনেক আছে—তখন পুষ্পের রেণু পর্য্যাপ্ত জন্মিত। কারণ অনেক রেণু বাতাসে উড়িতে উড়িতে কচিৎ দুই একটি গর্ভকেশরে পৌছিত। পরে যখন কীট রেণু বহন করিতে আরম্ভ করিল, তখন রেণুর অপব্যয় কমিয়া গেল, কারণ কীট কেবল ফুল হইতে ফুলেই বসিত, সুতরাং অল্প রেণুতেই কাজ হইতে লাগিল। গাছেরও সুবিধা হইল। পর্য্যাপ্ত রেণু সৃজনে তাহার যে শক্তি লাগিত তাহা হইতে অনেকটা বর্ণ গন্ধ ও মধু প্রস্তুত করিতে ব্যয় করিতে পারিল।

আবার বায়ু-বাহিত রেণুগুলি ছোট হাল্কা ও শুষ্ক হয় এবং সহজে বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায় অমুক স্থানে 'চন্দন' বৃষ্টি' বা রক্তবৃষ্টি

হইয়াছে। তাহা আর কিছুই নহে পরাগ-বৃষ্টি! অর্থাৎ বাতাসে সাদা ও লাল বর্ণের রেণু উড়িতেছিল, বৃষ্টির সহিত বর্ষিত হইয়াছে।

কীট-বাহিত রেণুগুলি—বড়, শুঁয়াযুক্ত বা আঠাল হয়, কীট-পতঙ্গের স্পর্শে আসিলে তাহাদের গায়ে লাগিয়া যায়।

পুষ্পের বীজ গর্ভকেশরে বদ্ধ থাকে, বাহিরে আসিতে পারে না—সুতরাং ফুলের অবরোধ-প্রথা আমাদের অপেক্ষা কম নহে। এই বীজই রূপান্তরিত হইয়া ভবিষ্যতে বংশরক্ষা করে। ইহাদেরও আকার-প্রকার-ভেদ আছে।

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

—

ফেরিওয়ালা

ফেরিওয়ালা হেঁকে যাচ্ছিল—"চাই আম—পাকা আউম্"!

রাস্তার ধারে বারান্দায় জমিদার-বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন—ডাক পড়্ল ফেরিওয়ালাকে। দর-দস্তুর হ'ল। ফেরিওয়ালা বলে ১২টা, বাবু বলেন ২০টা। ক্রমে বাবু ১৮টা ক'রে নিতে স্বীকার কর্লেন। ফেরিওয়ালা অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে জানালে ১২টার বেশী সে দিতে পারবে না। গরীব লোক—বেশী লাভ নেই—কয়েকটি পোষ্য আছে, ইত্যাদি। বাবু তবু দর কর্তে ছাড়্লেন না। তিনি ১৬টা পর্য্যন্ত নিতে পারেন। তখন ফেরিওয়ালা ফলের চ্যাঙারিটা মাথায় তুলে' নিয়ে বল্লে, "আমি গরীব মানুষ, পাঁচ জায়গায় ফেরি কর্তে হবে—আমায় বিদায় দিন—আমি ১২টার বেশী দিতে পারব না। আমি দর-দস্তুর করি নে।" বাবু রেগে বল্লেন, "ব্যাটা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! ব্যাটা ফেরিওয়ালা বলে কিনা দর-দস্তুর করি নে!" সময়ের বৈগুণ্যে সে আজ ফেরিওয়ালা—গাল্টা তার পচ্ছন্দ হ'ল না—সে ক্রুদ্ধ-ভাবে উত্তর দিল, "বাবু, আপনি বড়লোক, আমি গরীব ফেরিওয়ালা, তাই বলে' আমাকে গালাগালি করা

সামান্য ফেরিওয়ালা অত বড় একটা জমিদারকে অপমান করে—তাঁকে কিনা প্রকারান্তরে অভদ্র বলে! বাবু ভয়ানক রাগ্লেন—পেয়াদা ডাক্লেন, গরীবকে দুচার ঘা প্রহার দিয়ে তার ফলগুলো সব পথে ফেলিয়ে দিলেন। বেচারির সামান্য পুঁজিটুকু নষ্ট হ'ল। পথে দাঁড়িয়ে সে এই অত্যাচার সহ্য কর্লে—তার মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুট্ল না। যখন ফলগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়্ল—তখন সে নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হ'য়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়্ল—ফলগুলো লোক ও যান-বাহনের চলা-ফেরাতে সব ছড়িয়ে নষ্ট হ'য়ে যেতে লাগ্ল—শুধু চেয়ে ফ্যাল্-ফেলিয়ে দেখ্তে লাগ্ল। তার ক্ষতি যে কতটা হ'ল জান্লেন শুধু সেই অন্তর্যামী। এক অব্যক্ত ব্যথায় উপর দিকে চেয়ে "হা ভগবান্!" বলে' উঠে' দাঁড়াতেই তার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল, নিজেকে সাম্লাতে না পেরে দ্রুতগামী একটা গাড়ীর আঘাতে সে পড়ে' গিয়ে—অজ্ঞান হ'য়ে গেল। বাবু তখন তাঁর "বৈঠকে" বসে' রাগের জেরটুকু অম্বরী তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে উড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

এই ঘটনার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। একটি আট বছরের ছেলে সেদিন সকাল-সকাল স্কুল থেকে বাড়ী ফির্ছিল। ছেলেটি বড়লোকের—রোজ দ্বারবান্ সঙ্গে করে' আনে—আজ একটা অজানিত কারণে আগেই ছুটি হওয়াতে দ্বারবান্ আসেনি। বালক অপেক্ষা না করে' পাড়ার দুজন ছেলের সঙ্গে বাড়ী ফির্ছিল। ছেলে দুটি তার চেয়ে বয়সে বড়। পথের বাঁক ফির্তেই হঠাৎ একটা জুড়ী গাড়ী তাদের সাম্নে এসে পড়্ল। কোচ্ম্যান প্রাণপণে লাগামে টান দিলে। বড় ছেলে দুটি ছুটে দুদিকে সরে' গেল—তারা রোজ হেঁটেই যাওয়া-আসা করে, কিন্তু ছোটটি পথ চল্তে অনভ্যস্ত, ভয়ে কি রকম হতবুদ্ধি হ'য়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়্ল। পলক ফেল্তে না ফেল্তে বেগে জুড়ীটা একেবারে ছেলেটির একহাত তফাতে এসে পড়্ল। কোচ্ম্যান বহু যত্নেও গাড়ীর বেগটা হঠাৎ সংযত কর্তে পার্লে না। চারিদিক্ থেকে একটা হাহাকার রব উঠ্ল।

থেকে পড়ে' গেছে—ভয়ে মুখ বিবর্ণ হ'য়ে গেছে—কিন্তু তবু সে সেখান থেকে নড়্‌তে পারছে না। এইবার তার শরীরটা বুঝি ঘোড়ার পায়ের তলায় চূর্ণ হয়! ছুটে' এসে কোথা থেকে একটা খোঁড়া ছেলেটাকে এক ধাক্কা দিয়ে ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে দূরে ছুড়ে' ফেলে' দিলে, সঙ্গে সঙ্গে জুড়ীটা সেই খোঁড়ার ঘাড়ে এসে পড়্‌ল। হঠাৎ গাড়ীটাও থেমে গেল। চক্ষের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে এই-সকল ঘটনা হ'য়ে গেল। খোঁড়াকে যখন ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে টেনে বার করা হ'ল তখন সে উত্থানশক্তিরহিত।

সংবাদ পাবা মাত্র বালকের পিতা ঘটনাস্থলে এসে খোঁড়াকে দেখ্‌লেন, তাব চিকিৎসার রীতিমত ব্যবস্থা কর্‌লেন। যখন তার জ্ঞান ফিরে এল, তখন ধনী পিতা উপকারীকে জানালেন যে প্রত্যুপকারে খঞ্জকে তিনি মাসিক বৃত্তি দেবেন এবং তার চিকিৎসার সকল ভার বহন কর্‌বেন। খঞ্জ তখন কিছু সুস্থ হয়েছিল, সে উত্তর দিলে, "বাবু, আমরা গরীব লোক, কিন্তু উপকার করে' দাম নিই নে। প্রাণের আবেগে ছেলেটিকে বাঁচিয়েছি, বড়লোকের ছেলে বলে' নয়। ক' বছর আগে ঐ রকম একটি ছেলে আমি হারিয়েছি—তার মা আর সে এক সময়েই আমাকে ছেড়ে চলে' যায়—সে বড় দুঃখের কাহিনী, কি আর বল্‌ব—আপনারই মত এক ধনীর দয়াতে আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি—নিজে পঙ্গু হয়েছি—প্রাণাধিক প্রিয়জনকে দারিদ্র্যের তাড়নায় অনাহারে মর্‌তে দেখেছি—আমার প্রাণ বড় কঠিন, তাই এখনও ভেঙে চুর হ'য়ে যায়নি।"

কথা কয়টার ব্যথা দুজন'কেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ করে' রাখ্‌লে। কিছু পরে ধনী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেমন করে' জীবিকা নির্ব্বাহ কর?"

খঞ্জ—"সে অনেক কথা। অবস্থা-চক্রে সব খুইয়ে আমি-শেষে ফেরিওয়ালা হয়েছিলাম..."

বাবু—"কি হয়েছিলে?"

খঞ্জ—"ফেরিওয়ালা হয়েছিলাম। এক ধনী বাবুর বাড়ীতে আম বিক্রী কর্‌তে যাই—তাঁরই কৃপায় আমি সব হারিয়েছি—আজ আমি খঞ্জ, সর্ব্বস্বান্ত, সংসারে একা। কিন্তু দয়ালের বড় দয়া, যে, তিনি আজ আমার এই অসহায় অবস্থাতেও একটি শিশুর প্রাণ রক্ষা কর্‌বার ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন। আমি প্রাণের আবেগে—আমার সেই মৃত সন্তানকে মনে করে'ই বাছাকে বাঁচিয়েছি। আশা করি বালকের পিতা হ'য়ে আজ আমার এই অসহায় অবস্থায় উপকারের কথা তুলে' আমাকে অপমান কর্‌বেন না।"

ধনী কতক্ষণ যে তার পর স্তব্ধ হ'য়ে বসে' ছিলেন কারও খেয়াল ছিল না যখন তিনি বাড়ী ফির্‌লেন চোখে তাঁর জল—প্রাণে তাঁর বুকজোড়া একটা দারুণ ব্যথা। মৃত্যুশয্যায় শেষের দিন ক'টা বালক গোপালের নিত্য সঙ্গ পেয়ে খঞ্জের যা উপকার হয়েছিল তার ধনী পিতা শত চেষ্টা কর্‌লেও বোধ হয় তার শতাংশের একাংশও হ'ত না। পিতার আজ্ঞায় বালক প্রত্যহ স্কুলের পথে ও বাড়ী ফের্‌বার সময় নিঃসঙ্গ সেই খোঁড়াকে যে নির্ম্মল সাহচর্য্য-টুকু দিত—তা'তে তার শেষ দিন ক'টা যে বড়ই মধুময় হ'য়ে উঠেছিল তা' তার মুখ দেখেই বুঝা যেত।

সেদিন দুর্য্যোগের সম্ভাবনা দেখে' দ্বারবানের ইচ্ছা ছিল না গোপাল পথে দেরী করে। গোপাল স্কুল থেকে একেবারে বাড়ীতেই ফিরে এল। সন্ধ্যায় বড় দুর্য্যোগ হওয়াতে সে সময়ও খঞ্জকে দেখ্‌তে যেতে পার্‌লে না। মনটা কিন্তু তার বড়ই অস্থির হ'য়ে পড়েছিল। সমস্ত রাত সে ভাল করে' ঘুমোতে পারেনি। সকালে উঠে' যখন "খোকা বাবু"কে দেখ্‌তে পাওয়া গেল না, তখন একটা হৈ চৈ পড়ে' গেল। চারি দিকে খোঁজা হ'ল, কোথাও পাওয়া গেল না। বাবু নিজে গাড়ী করে' ছেলে খুঁজ্‌তে বার হলেন। কি মনে হওয়াতে আগেই খঞ্জের বাড়ীতে গেলেন—সেখানে গিয়ে দেখেন এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—! বুকের উপর নিদ্রিত গোপালকে নিয়ে খঞ্জ চিরনিদ্রায় বিশ্রাম কর্‌ছে!

আচার্য্য শ্রী শ্যাম ভট্ট

—

চীনে গল্প

চীনদেশের মস্ত সদাগর চাও-সি। সদাগরের মাথার বেণী হাঁটার তালে হাঁটুর পেছনে দোল খায়। চীন-মুল্লুকে



কাশ্মীরের পণ্ডিতানী

চিত্রকর শ্রীসারদাচরণ উকিল

এ বেণীর জুড়ি নেই। রাজা মহাখুসি হ'য়ে সদাগরকে বখ্শিশ দিলেন—সোনার-পাতে-মোড়া মৌতাতের এক নল; আর তার সাথে 'চিয়েন্'-এর এক পত্র, তার মানে চাও-সির শীগ্গির মরণ নেই।

সদাগরের মাথার বেণী আড়াই হাত। সদাগরের বৌ টিয়ানের পা দুখানি আড়াই আঙ্গুল; রাজ্যের মধ্যে এমন সুন্দর পা আর নেই?—রাণী আদর ক'রে টিয়ানকে ইনাম দিলেন—মুক্তা-ঝিনুকের তৈরী কচি পায়ের জুতো।

সংসারে চাও-সি আর টিয়ানের কোন দুঃখ কষ্ট নেই, কিন্তু মনে ভারি আপ্শোষ—একমাত্র ঘরের ছেলে মানুষ হ'ল না! বেণী দূরে থাক, ছেলে টেকুর মাথায় টিকিটিও নেই! তার উপর আবার সর্ব্বনেশে কথা শোনো,—বলে কিনা, ষোল আঙুল পা না হ'লে সে মেয়েকে বিয়ে করে কে?...ছিঃ ছিঃ! টেকু হ'ল কি!

সকলে বল্লে—দেশের শত্তুর!...বেনেব পো, সময় থাকতে অমন ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্তুর করো।

পাড়াপড়শী সায় দিলে—ঠিক কথা।..আর, চাও তো, আমাদের ঘরের ছেলেকে পুষ্যিপুত্তুর দিতেও আমরা রাজী।

উঠানে দাঁড়িয়ে জ্ঞাতিকুটুম চ্যাচাতে লাগ্ল—'তা তো যেন হ'ল। কিন্তু কুপুষ্যি ছেলে যে বাপ-পিতাম'র আইন না মেনে দেশের মুখে কালী দিয়েচে, তার পেরাচিত্তিরের কি? দেশ যে রসাতলে যাবে,—চাও-সি, ভাল চাও তো হারাকিরি করো। তুমিই ঘরের কত্তা, তোমারই এ পেরাচিত্তির করতে হয়। পেটে ছোরা চালাতে ভয় হয় ত, নাও—এ রেশ্মী ফিতে, গলায় ফাঁশি দিয়ে কুলের কালী ঘুচোও।

শুনে' চাও-সির মহাচিন্তা—সে কি! তোবঙ্গে আমার রাজার নিজেব হাতের লেখা চিয়েন্ তার মানে শীগ্গির আমার মরণ নেই, আমি ম'রে কি রাজার অপমান করতে পারি?

(২)

চাও-সি টিয়ানকে বল্লে—রাঙা বৌ, তুমিও যে আমিও সে—শাস্তরেরই কথা। বাপ-পিতাম'র আইন মানে না—ছেলে, না দেশের শত্তুর। ছেলের জন্যে দেশ ত রসাতলে যায়!—এর পেরাচিত্তির এখন হারাকিরি। কিন্তু তোরঙ্গে আমার রাজার নিজের হাতের লেখা 'চিয়েন্', তার মানে শীগ্গির আমার মরণ নেই; তুমিই এ রেশ্মী ফাঁশটি গলায় দিয়ে কুলের মান রাখো।

আড়াই আঙুল কচি পা দুটি নাচিয়ে নাচিয়ে টিয়ান্ বল্লে—সে কি কথা; পায়ে আমার রাণীর দেওয়া মুক্তো-ঝিনুকের জুতো,—আমি মর্লে এ জুতোর মান রাখে কে?

সদাগর বল্লে—তাও তো বটে!...আচ্ছা, তবে দেখ, কোথায় আছে মালীর বেটা চৌ-চৌ; তারই গলায় রেশ্মী ফাঁশ দিয়ে বংশের ইজ্জত রাখা যাক্।

(৩)

আফিং খেয়ে চৌ-চৌ ঘরের কোণে ঝিমুচ্ছিল। টিয়ান্ তাকে জাগিয়ে তুল্লে, বল্লে—আহা, চৌ-চৌ, চিরদিনটা খেটে খেটে খেটেই মর্লে! এখনও কি জিরোবে না?

মিট মিট ক'রে তাকিয়ে চৌ-চৌ বল্লে—মা ঠাক্রুণ, জিরেন কি আর চাই নে, কিন্তু পাই কই? কত্তা-মশা'র কড়ি হজম ক'রে ব'সে থাক্বে, কার ঘাড়ে দুটো মাথা!

টিয়ান্ বল্লে—তাই তো বলি, বাছা,—এদ্দিন শুধু ভূতের মতন খেটেই মর্লে; তবু কেউ কদর বুঝ্লে না, সেইটেই তো আরো দুঃখ!

টিয়ানের আদরে চৌ-চৌ গ'লে গেল। আঠারবার মাজা নুইয়ে তালে তালে সে টিয়ান্কে সেলাম ঠুক্তে লাগ্ল।

টিয়ান্ বল্লে—আর খাটুনীতে তোমার কাজ নেই, বাপু; এখন একটু জিরোও। ধরো, নাও এ রেশ্মী ফিতেটি—গলায় ক'সে গিরে দিয়ে একবার ঝুলে'ই দেখো, কত আয়েসের জিরেন মিল্বে!'—এই-না ব'লে টিয়ান্ চৌ-চৌর গলায় রেশ্মী ফাঁশটি পরিয়ে দিলে।

ওমাঃ!—ব'লে চৌ-চৌ লাফিয়ে উঠ্ল। টিয়ান্ স'রে যেতেই সে দুহাতে গলার ফাঁশ টেনে খুলে' ফেল্লে। ভাব্লে—দুত্তোর জিরেন! এ কেমন জিরেন রে!... মৌতাতের আয়েসটাই মাটি হ'ল।

(৪)

টেকু বাপের বাক্স খুলে' টাকাকড়ি বিলিয়ে দিচ্ছিল—জান্‌লা গলিয়ে রাজ্যের যত কাঙালীকে। চৌ-চৌ চৌকাঠ ডিঙিয়েই পেছন হ'তে রেশ্‌মী ফাঁশটি তার গলায় পরিয়ে দিলে। বল্‌লে—টেকু কর্ত্তা, ভারি যে পরের ধনে পোদ্দারী হচ্ছে! চুরি ক'রে অত জোর্‌সে খয়রাৎ চালাবেন না, এখন একটু জিরোন্। এ জিরেন-ফিতে খোদ মাঠাকরুণেরই দেওয়া। মা-ঠাকরুণ আমাকেই দিয়েছিলেন; কিন্তু জিরেন আমার কপালে নেই, তাই আপনাকে খয়রাৎ কর্‌তে এলুম।

চৌ-চৌর হাতের হেঁচ্‌কা টানে টেকুর দম আট্‌কে জিভ্ বেরোবার জো হচ্ছিল। দুচারবার গোঁ গোঁ ক'রে সে মুখ থুব্‌ড়ে ভুঁয়ে প'ড়ে গেল। হাফ ছেড়ে চৌ-চৌ ঘরের কোণে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে নতুন ক'রে আফিংএর ডেলা মুখে গুঁজে' ঝিমুতে লাগ্‌ল।

হুঁস হ'য়ে টেকু দুহাতে গলার ফাঁশ খুলে' ফেল্‌লে। তার পর বাগান হ'তে শিকলি-বাঁধা বুড়ো বাঁদরটাকে টেনে আন্‌লে; আর তার গলায় ফাঁশ দিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে, নিজে খিড়্‌কির পথে চম্পট দিলে।

(৫)

কুটুমের বাড়ী 'হারাকিরি' হয়েছে,—ভোর বেলা শোক কর্‌তে জ্ঞাতিগোষ্ঠি সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে সদাগরের বাড়ীতে এসে হাজির।

উঠানে পা দিয়েই তারা দেখে—চাও-সি রাজার দেওয়া সোনার পাতে মোড়া মৌতাতের নল টান্‌ছে।

দেখে' জ্ঞাতিকুটুম চ'টেই লাল—বটে! চাও-সি, তুমিও দেখ্‌চি দেশের শত্তুর;—নইলে 'হারাকিরি' কর্‌লে না?

ভয়ে-ভয়ে চাও-সি বল্‌লে—রাঙাবৌ মালী-বেটার আক্কেল দেখ্‌লে!

টিয়ান্ বল্‌লে—তাইত! চৌ-চৌ, জিরেনের কথাটা ভুলে' গেলি!

চৌ-চৌ বল্‌লে—মা ঠাকরুণ, ভয় নেই,—টেকু-কর্ত্তাকে দিয়ে আমি সে কাজ সেরেছি।

চৌ-চৌর কথা শুনে' সকলে উঠে' পড়ে' ছুটে' গিয়ে দেখে বটেই তো!···কিন্তু এ কি টেকু?—বাগানে গাছের ডালে জিভ্ বের ক'রে ঝুল্‌ছে—চাও-সির বুড়ো বাঁদরটা না?

জ্ঞাতিকুটুম বল্‌লে—বুঝেছি,—এ-ও চাও-সির চালাকি। ম'রেও টেকু সবার উপর টেক্কা দিতে চায়, তাই মুখোস বদ্‌লে গাছে ঝুল্‌ছে! কিন্তু চোদ্দপুরুষের অপমান ক'রে বেণী রাখেনি, তাই মরার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা তাকে বেণীর মত লেজ দিয়ে দেশের মান রেখেছেন। আমরা হলুম জাতকুটুম, আমাদের চোখে ফাঁকি?—রেশ্‌মী ফাঁশে গাছে ঝুল্‌ছে—ওতো টেকুই!

সবাই বল্‌লে—ঠিক ঠিক, হুবহু টেকুই।

দেশের বালাই দূর হ'ল, মনে ক'রে সবাই নিশ্চিন্ত।

(৬)

দশপনের দিন যেতে না-যেতে চাও-সি রাজার-নিজের-হাতে-লেখা 'চিয়েন্'-এর মান না রেখে' চোখ ওল্‌টালে। জ্ঞাতিকুটুম নতুন ক'রে শোক কর্‌তে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে আবার সদাগরের বাড়ীতে এসে হাজির। এসেই তারা চাও-সির টাকার সিন্দুকের উপর আসন গেড়ে বস্‌ল।

এদিকে খবর পেয়ে টেকুও বাড়ীতে এসে উপস্থিত।

জ্ঞাতিকুটুম বল্‌লে—কে হে, বাপু, তুমি?

টেকু বল্‌লে—আমায় চেন না কি?—আমি টেকু, চাও-সি-সদাগরের ছেলে।

'টেকু?'—সবাই বল্‌লে—'মিছে কথা। টেকু তো কবেই মরেছে।'

গাঁয়ের মোড়লরাও বিচার ক'রে বল্‌লে—ঠিকই ত। টেকু ত মরেছেই। বলুক্ দেখি কেউ—মরেনি; তা হ'লে টেকুকে এখনই ধ'রে এ রেশ্‌মী ফিতে দিয়ে ফাঁশি দেওয়া যাবে। আর টেকু যখন আগেই মরেছে, তখন এ আর কে হবে?—চাও-সি সদাগরের যে বুড়ো বাঁদরটাকে খুঁজে' পাওয়া যাচ্ছিল না, হুবহু সে-ই।

মোড়লদের এ বিচারে দেশসুদ্ধ লোক ধন্যি ধন্যি কর্‌তে লাগ্‌ল।

জ্ঞাতিকুটুমরা টেকুকে ধ'রে এক বাঁদর-নাচ-

ওয়ালাকে বিলিয়ে দিলে। বাঁদরওয়ালা তাকে দিয়ে 'বুড়ো শ্বশুরবাড়ী যায়', 'বুড়ো রাগ করেচে'—এ-সব খেলা দেখায়। মনিবের কথায় তাকে উঠ্‌তে বস্‌তে হয়, তাই তার মাথায় এখন আড়াই হাত বেণী। নাচ্‌নার তালে আড়াই হাত বেণী যখন হাঁটুর পেছনে দোল খায়, তখন সবাই বলে—টেকু যে পাপ করেছে, দেবতা তার শোধ তুলেছেন। দেখ্‌ছ না, বাঁদরটার লেজটা যেন চাও-সিরই মাথাব বেণীটি!

শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

বিক্রমশিলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা

মহারাজা ধর্ম্মপাল যখন বাংলা ও মগধে রাজত্ব কর্‌ছিলেন, সে-সময় দেশে শান্তি ফিরে' এসেছিল। যে "মাৎস্যন্যায" দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, গোপালের নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে তার লোপ হয়। দেশে শান্তি ফিরে এসেছিল ব'লে ধর্ম্মপাল যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়া অন্য কাজে হাত দিতে পেরেছিলেন। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, তাই ধর্ম্মপাল একটি নতুন বিহার স্থাপন করেন ভিক্ষুদের জন্যে। সেটি হচ্ছে—বিক্রমশিলার বিহার। যদিও সে সময় নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল, তবু এই নতুন মঠটি খুব শীঘ্র একটি বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

আজকাল একটা প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে বিক্রমশিলার বিহার কোথায় ছিল? কেহ কেহ বিক্রমশিলাকে বিক্রমপুরের সঙ্গে জড়িত করেছেন, তাঁরা বল্‌তে চান যে বিক্রমপুরেই বিক্রমশিলার মঠ ছিল। এখানে নামের সামঞ্জস্য খুব আছে বটে, কিন্তু সেইটেই মুখ্য প্রমাণ হ'তে পারে না। এবিষয়ে লামা তারানাথের কথা আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে করি। লামা তারানাথ তাঁর ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে এই বিক্রমশিলার মঠকে মগধে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে নির্দ্দেশ করেন। (জার্ম্মান পণ্ডিত Schiefnerএর অনুবাদ Taranath পৃ: ২১৭ দ্রষ্টব্য।) এই প্রমাণ অগ্রাহ্য ক'রে আমরা বিক্রমশিলাকে বিক্রম-পুরে নিয়ে যেতে পারি নে। সেইজন্য আমাদের মনে হয়, এটি ভাগলপুরের পাথরঘাটার কাছে গঙ্গার তীরে স্থাপিত ছিল। (J.A.S.B. 1910 পৃঃ১, শ্রীনন্দলাল দের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। যতদিন না এই স্থানটি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খনন করা হচ্ছে, ততদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা হবে না। যদি সরকার বা সাধারণের চেষ্টায় এটি খনন করা হয়, তবে এখান থেকে এমন শিলালিপি বা শীল আবিষ্কৃত হ'তে পারে যার দ্বারা আমরা বল্‌তে পারব যে এইটিই বিক্রমশিলার মঠ ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে মহারাজ ধর্ম্মপাল শুধু এই মঠটির প্রতিষ্ঠা ক'রে ক্ষান্ত হননি, যাতে এটি একটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হ'তে পারে তারও ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। প্রথম, তিনি এর বাহ্যসম্পদের দিকে মন দেন, যাতে ভিক্ষুরা শান্তিতে এখানে থাক্‌তে পারেন তার ব্যবস্থা ক'রে দেন। ভিক্ষুদের পূজার জন্য অনেক মন্দির তৈরী ক'রে দেন। লামা তারানাথ বলেন—এই মঠে ১০৮টি মন্দির ছিল। মঠের ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল—তাতে মহাবোধি-মূর্ত্তি ছিল। এ-ছাড়া আরও ৫৩টি ছোট মন্দির ও ৫৪টি সাধারণ মন্দির ছিল। বলা বাহুল্য এ-সব মন্দির মহাযান বৌদ্ধ মন্দির। এ ছাড়া ছাত্র ও অধ্যাপকের বাসের জন্য যথাযোগ্য ঘর তৈরী ক'রে দেন।

যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানের ও বিদ্যার গৌরব বৃদ্ধি পায় সেজন্য তিনি বিশিষ্ট অধ্যাপকদের জন্য ব্যবস্থা ক'রে দেন। লামা তারানাথের মতে এই-রকম বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন—১০৮ জন। এঁরা ছাড়া আরও ৬ জন আচার্য্য ছিলেন, তাঁদের কাজ ছিল প্রধানতঃ পূজাদি করা ও মঠের রক্ষণাবেক্ষণ করা। রাজা ধর্ম্মপাল ব্যবস্থা ক'রে দিলেন যাতে এই ১১৪ জন

পণ্ডিতের সমস্ত খরচ রাজকোষ থেকে আসে। একজন সাধারণ লোকের যা খরচ, তার চারগুণ খরচ এক-একজন পণ্ডিতের জন্য বরাদ্দ ছিল।

পাঠ্যবিষয় কি হওয়া উচিত ও অধ্যাপনা কিরকম হবে, সে-সব বিষয়ের আলোচনার জন্য একটি সমিতি ছিল। লামা তারানাথ এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে বলেন যে এর দৃষ্টি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরও ছিল (Schiefnerএর Taranath, p. 218)। এর মানে কি বোঝা শক্ত। লামা তারানাথ কি বল্‌তে চান যে—নালন্দা মঠ বিক্রমশিলার অধীনে ছিল? না, দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্য্যের সহযোগ ছিল? তবে এমন দেখা যায় যে একই পণ্ডিত দু জায়গায় বসে কাজ করেছেন। যেমন পণ্ডিত অভয়কর গুপ্ত ও দীপঙ্কর দু-জায়গায়ই নানা বই রচনা করেছিলেন। সে সময় যে-সব পণ্ডিত জীবিত ছিলেন, তারানাথ তার একটা তালিকা দিয়েছেন :—

(১) কল্যাণ গুপ্ত (৭) বুদ্ধগুহ্
(২) সিংহভদ্র (৮) বুদ্ধশান্তি
(৩) সাগর মেঘ (৯) সিংহমুখ
(৪) প্রভাকর (১০) ধর্ম্মাকর দত্ত
(৫) পূর্ণবর্দ্ধন (১১) আচার্য্য পদ্মাকর
(৬) বুদ্ধজ্ঞানপাদ ঘোষ (কাশ্মীরবাসী)।

বোধ হয় এর মধ্যে অনেক পণ্ডিত বিক্রমশিলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। আচার্য্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ দীক্ষাপুরোহিত ছিলেন। তিনি পণ্ডিত সিংহভদ্রের শিষ্য ছিলেন।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

দৈত্যের দুঃখ

গিরিচূড়া ভাঙি আমি, গিরি দরী লঙ্ঘি,
ধ্বংসের আমি চিরসঙ্গী,
লালসের বিলাসের লীলা আমি জানি ঢের—
নিতি মোর নব নব ভঙ্গী।

মন্থনে বাসুকীর ফণা ধরি জাপটি'
বুকে সহি সাহারার তাপটি,
নাচি সুরাপান করি', ঝঞ্ঝায় গান করি,
মানিনাক পুণ্য কি পাপটি।

ঘরে-ঘরে বাজে মোর বিজয়ের ডঙ্কা,
ভাঙি গড়ি কনকের লঙ্কা,
গ্রাস করি চন্দ্রে, ডাক দিই মন্দ্রে,
নাই আশা-নিরাশার শঙ্কা।

নন্দনে হানা দিই—লুটে নিই স্বর্গ,
হানি গজতুণ্ডেতে খড়্গ,
জোরে আমি ভোগ করি,—দাস নহি যক্ষেরি,
মৃত্যু ত প্রলয়ের চর গো।

জোর করে' কেড়ে লই অমিয়ার অংশ,
নিজে করি নিজ কুল ধ্বংস,
কৈলাসে টান দিই, প্রাণ নিতে প্রাণ দিই—
নির্দ্দয় আমি যে নৃশংস।

চণ্ডীর সাথে আমি একা করি যুদ্ধ,
জানকীরে বনে করি রুদ্ধ,
জীবনের ভীতি আমি, মরণের প্রীতি আমি,
আমি চির হিংস্রক ক্রুদ্ধ।

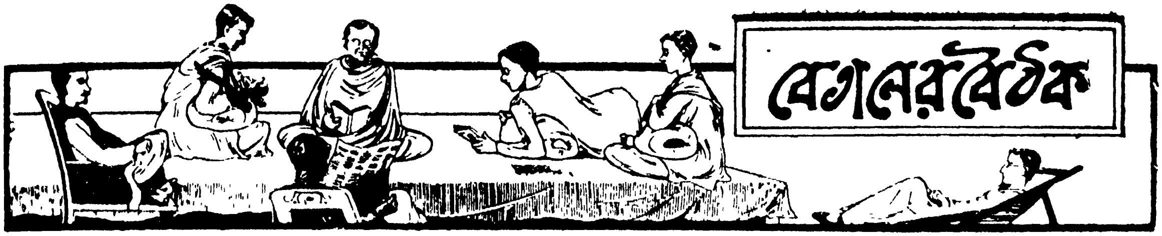
আমি ক্রূর নিষ্ঠুর, আমি ভীম মন্দ,
কিছু নাই কিছু নাই ছন্দ,
ভগবান্ সাথে লড়ি' জোর করে' বুকে ধরি
বাঞ্ছিত রাঙা পাদপদ্ম।

নিয়তির ক্রীড়নক অবিবেকী অন্ধ
কংস ও আমি জরাসন্ধ,
যেই পথ দিয়ে যাই রয়ে যায় শুধু ছাই—
ভাঙ্‌তেই লভি যে আনন্দ।

ভাঙ্‌তেই পারি শুধু, পারিনাক গড়্‌তে,—
মর্‌তেই এসেছি যে মর্ত্তে,
সুষমার ঘটগুলি খালি করে' পদে দলি—
সুধা দিয়ে পারিনেক ভর্‌তে।

চলে' যাই হাসে লোকে বামে আর ডাইনে,—
ঝোঁকে আর কোন দিকে চাইনে,
ভয়ে লোকে দেয় পূজা, ঘৃণা করে যায় বুঝা,
সবই পাই, ভালবাসা পাইনে!

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতে আমরা পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১২১)

বাংলার স্বাধীন হিন্দুরাজা

বাংলা দেশের স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজা প্রথম কে ছিলেন? তাঁহার নাম কি এবং রাজত্ব কোথায় ছিল?

শ্রী শোভাবাণী রায়

(১২২)

ভূ-পর্য্যটক মার্টিনেট্

ভূ-পর্য্যটক মার্টিনেট্ কত সালে পর্য্যটন আরম্ভ করেন এবং কোন্ কোন্ জেলার মধ্য দিয়া ভারতে আসেন তাহার বিবরণ কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

প. স.

(১২৩)

মেক্সিকোতে মঠপ্রতিষ্ঠা

"—মেক্সিকোতে হ'ল যেদিন মঠপ্রতিষ্ঠা রামসীতার—বিধান দিল কোন্ মনীষা খোঁজ রাখে কি পুরাণ তার?"

৺ সত্যেন্দ্রনাথ।

মেক্সিকোতে কাহার দ্বারা এবং কত খৃষ্টাব্দে রামসীতার মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? তাহা আজও বিদ্যমান আছে কি?

শ্রী দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী

(১২৪)

কলার চাষ

কলার চাষ এবং কলা রক্ষা করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবার কোন পুস্তক আছে কি? থাকিলে কোন্ ঠিকানায় ইহা পাওয়া যায়?

গাচিহাটা পাব্লিক-লাইব্রেরীর মেম্বারগণ

(১২৫)

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ

ইহার অর্থ নানা জনে নানারূপ করেন। ইহার বাস্তবিক অর্থ কি ও কোথায় প্রয়োগ হইয়াছিল।

শ্রী বিষ্ণুচরণ শাস্ত্রী

(১২৬)

নারিকেল-গাছ-ধ্বংসকারী পোকা

ঢাকা জেলায় যে নারিকেল-গাছ হয়, তাহা প্রায়ই গুবরে পোকার মত একরূপ পোকার উৎপাতে নষ্ট হইয়া যায়। এই পোকার উৎপাত হইতে গাছ রক্ষা করার উপায় কি?

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী

(১২৭)

মাটির জিনিষে এনামেল

বিলাতে তৈরি মাটির জিনিষের (বৈয়াম, পিপা, চীনা বাসন ইত্যাদির) উপর কাঁচের মত, পাৎলা একপ্রকার এনামেল করা হয়; এই এনামেল প্রস্তুত করিয়া এদেশীয় মাটির জিনিষে ব্যবহার করা যায় কি না? এবং ইহা প্রস্তুত করিতে কি কি জিনিষ লাগিয়া থাকে ও কেমন খরচের সম্ভাবনা? ভারতের কোন স্থানে ইহার কারখানা আছে কি?

শ্রী তীর্থবাসী পাল

(১২৭)

সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু

ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে, আফ্‌গানিস্থানে ও বেলুচিস্থানে যে-সব হিন্দু আছে, উহাদের আচার-ব্যবহার কিরূপ? উহাদের মধ্যে জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান আছে কি? এবং উহারা ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে শ্রদ্ধা করে কি?

শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১২৯)

বিধবা-বিবাহ-সভা

লাহোরে বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা স্থাপিত হইয়াছে। ভারতের অন্য কোনও স্থানে এইরূপ অনুষ্ঠান থাকিলে তাহার ঠিকানা কি? লাহোরের বিধবা-বিবাহের মধ্যে অসবর্ণ বিধবা-বিবাহ থাকিলে সংখ্যায় কত?

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

(১৩০)

কবি হরিশ্চন্দ্র সাহু

উত্তর ভারতে হরিশ্চন্দ্র সাহু নামে এক কবির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইঁহার আদি নিবাস, জীবিত কাল, জাতি ও রচিত কাব্য কি?

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(১৩১)

জাফ্রানের চাষ

ভারতবর্ষে কাশ্মীর ভিন্ন আর কোন জায়গায় জাফ্রানের চাষ হয় কি না।

শ্রী কুহুমিকা সেন

(১৩২)

চীনা-বাদামের চাষ

চীনা-বাদামের চাষ সম্বন্ধে কোন ইংরেজী বা বাংলা বই আছে কি? কোথায় পাওয়া যায়, দাম কত? আমাদের দেশে কোথায় কোথায় চীনে-বাদামের চাষ আছে?

মহম্মদ মনসুর উদ্দীন শাহজাদপুরী

(১৩৩)

ভারতে লবণ-উৎপাদন

পূর্ব্বে আমাদের দেশে নুন উৎপাদন করা হইত; কখন হইতে, কি জন্ম ও কাহাদের দ্বারা উহার উৎপাদন রহিত হইল? কোন্ গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে?

শ্রী জ্যোৎস্নারাণী দেবী

(১৩৪)

জাভায় চিনি প্রস্তুত করা শিক্ষা

"জাভাতে চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী" শিখিতে হইলে কিরূপ অভিজ্ঞতা লইয়া যাইতে হয়? সেখানে মাসিক খরচ কত?

রাজেন রায়

(১৩৫)

উই পোকা নিবারণের উপায়

অনেক ভদ্রলোক পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াও "উই"-পোকার যন্ত্রণায় নিশ্চিন্তমনে বাস করিতে পারিতেছেন না। ঐ পোকা ধ্বংস করিবার কোন উপায় আছে কি?

শ্রী সুকুমার পৈত

(১৩৬)

অম্বুবাচীর মধ্যে অগ্নিপক্ব খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

বিধবাগণ অম্বুবাচীর মধ্যে অগ্নিপক্ব খাদ্য ভোজন করেন না। ইহার কোনও শাস্ত্রসঙ্গত কারণ আছে কি?

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

মীমাংসা

(৩০)

নোবেল পুরস্কার

বিগত শ্রাবণ-সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহতে একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। রসায়নবিদ্ পণ্ডিত ভ্যান্ট্-হফ্ জাতিতে জার্ম্মান নহেন, ওলন্দাজ। ইনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী রটার্ডাম সহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বহুদিন অ্যামষ্টার্ডাম সহরে শিক্ষকতা করিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বের্লিন প্রুশিয়ান অ্যাকাডেমী অব্ সায়ান্সের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া জার্ম্মানীতে আসেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ব্রহ্মমহাশয় ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিবরণ দিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে নোবেল পুরস্কার যাঁহাকে যাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১৯০৫

পদার্থবিদ্যা	পি, লেনার্ড্	জার্ম্মানী
রসায়ন	সি, ফন, বেয়ার	জার্ম্মানী
ভেষজবিদ্যা	আর, কক	জার্ম্মানী
সাহিত্য	সিঙ্কেভিচ	পোল
শান্তি	কাউণ্টেস বার্থা ফন সুটনার	অষ্ট্রিয়া

১৯০৬

পদার্থবিদ্যা	জে, জে, টম্সন্	ইংল্যাণ্ড্
রসায়ন	আঁরি মোর্স্যা (Mossain)	ফ্রান্স
ভেষজবিদ্যা	রামন কাজাল	স্পেন
	গল্গি	ইতালী
সাহিত্য	জিয়োসুয়ে কার্দুচি	ইতালী
শান্তি	থিয়োডোর রুজ্‌ভেল্ট্	আমেরিকার যুক্তরাজ্য

১৯০৭

পদার্থবিদ্যা	এ, এ, মিকেলসেন	আমেরিকার যুক্তরাজ্য
রসায়ন	ই, বুকনার	জার্ম্মানী
ভেষজবিদ্যা	এ, ল্যাভার্ণ	ফ্রান্স্
সাহিত্য	রাড্ইয়ার্ড্ কিপ্‌লিং	ইংলণ্ড্
শান্তি	ই, টি, মনেটা	ইতালী
	ল, রেনো (Renault)	ফ্রান্স্

১৯০৮

পদার্থবিদ্যা	জি, লিপ্‌মান	জার্ম্মানী
রসায়ন	ডাক্তার রাদারফোর্ড্	নিউজিল্যাণ্ড
ভেষজবিদ্যা	এলি মেচ্‌নিকফ্	রুশিয়া
	পল্ এহার্লিক্	জার্ম্মানী
সাহিত্য	রুডল্ফ্ অয়্কেন্	জার্ম্মানী
শান্তি	কে, পি, আরনল্ড্‌সন্	সুইডেন
	ফ্রেডারিক বাইয়ের (Bajer)	ডেন্‌মার্ক্

১৯০৯

পদার্থবিদ্যা	জি, মার্কনি	ইতালী
	সি, ন, ব্রাউন	জার্ম্মানী
রসায়ন	ভিল্‌হেল্ম্ অষ্টওয়াল্ড্	জার্ম্মানী
ভেষজতত্ত্ব	থিয়োডর কসের (Kocher)	অষ্ট্রিয়া
সাহিত্য	সেল্‌মা লাগেরলফ্	সুইডেন
শান্তি	অগষ্টাস বিয়ার্নারেট্	হল্যাণ্ড
	দ' এস্তুর্‌নল্ দ্য কন্‌স্তাঁ (D' Estournelle de constant)	ফ্রান্স্

১৯১০

পদার্থবিদ্যা	জে ভ্যান্ ডার ওয়ালস	হল্যাণ্ড
রসায়ন	ও, ওয়ালাক্	জার্ম্মানী
ভেষজতত্ত্ব	এ, কসেল	জার্ম্মানী
সাহিত্য	পাউল হেইসি	জার্ম্মানী
শান্তি	বার্ণ ইণ্টারন্যাশান্যাল্ পিস্ বুরো নামক সুইস্ শান্তিসভা	সুইডেন

১৯১১

পদার্থবিদ্যা	ভিয়েন্ (Wien)	জার্ম্মানী
রসায়ন	মাদাম কুরি (দ্বিতীয়বার)	পোলাণ্ড
ভেষজতত্ত্ব	গুল্স্ট্র্যা (Gulstrand)	ফ্রান্স
সাহিত্য	মরিস মেটার্লিঙ্ক্	ফ্রান্স
শান্তি	অ্যাসের ফ্রিড	

১৯১২

পদার্থবিদ্যা	জি ডালেন (G. Dalen)	
রসায়ন	ভি গ্রিগুয়ার্ড্ (V. Griguard) পি সাবাটিয়ার (P. Salalier)	
ভেষজবিদ্যা	অ্যালেক্সিস ক্যারেল	আমেরিকার যুক্তরাজ্য
সাহিত্য	গের্হার্ট হাউপ্ট্মান্	জার্ম্মানী
শান্তি	ইলিহু রুট	আমেরিকার যুক্তরাজ্য

১৯১৩

পদার্থবিদ্যা	ওনেস (H K. Onnes)	
রসায়ন	ভ্যারনার (W. Werner)	জার্ম্মানী
ভেষজবিদ্যা	সি, রিশে (Richet)	ফ্রান্স
সাহিত্য	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বাংলা
শান্তি	লা ফন্তেন্ (H. La Fontaine)	ফ্রান্স

১৯১৪

পদার্থবিদ্যা	এইচ, ফন্ লাউই	জার্ম্মানী
রসায়ন	টমাস, ডব্লু, রিচার্ড্স্	
ভেষজবিদ্যা	আর, ব্যারেনি	
সাহিত্য	দেওয়া হয় নাই	
শান্তি	দেওয়া হয় নাই	

১৯১৫

পদার্থবিদ্যা	ডব্লু, এইচ, ব্র্যাগ ডব্লু, এল ব্র্যাগ	ইংলণ্ড ইংলণ্ড
রসায়ন	ভিল্স্টাটের্ (R. Willstatter)	
ভেষজবিদ্যা	দেওয়া হয় নাই	
সাহিত্য	রোম্যাঁ রোলাঁ	ফ্রান্স
শান্তি	দেওয়া হয় নাই	

১৯১৬

সাহিত্য　ভি, ফন্ হাইডেষ্টাম,

অন্য কোনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

১৯১৭

পদার্থবিদ্যা	বার্ক্লা (Ch. G. Barkla.)
সাহিত্য	কার্ল্ জিয়েলরুপ ও এইচ, পন্টোপিড্যান
শান্তি	Comite Internationale de la Froix নামক সভা

অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

১৯১৮

পদার্থবিদ্যা	এম, প্লাঙ্ক্
রসায়ন	হাবের (F. Haber)

অন্য কোনও বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।

১৯১৯

পদার্থবিদ্যা	(J. Stark.)	
রসায়ন	দেওয়া হয় নাই	
ভেষজবিদ্যা	বোর্দে (J. Bordet)	ফ্রান্স
সাহিত্য	স্পিট্লার্ (C. Spittler)	
শান্তি	উড্রো উইল্সন্	আমেরিকার যুক্তরাজ্য

১৯২০

পদার্থবিদ্যা	গুইআমে (Ch. E. Guillame)	ফ্রান্স
রসায়ন	নের্ন্স্ট্ (W. Nernst)	জার্ম্মানী
ভেষজবিদ্যা	ক্রোগ (A. Krogh)	
সাহিত্য	ক্নুট হাম্সুন্	নরওয়ে
শান্তি	লেওঁ বুর্জোয়া (Leon Bourgeois)	ফ্রান্স

১৯২১

পদার্থবিদ্যা	আল্বার্ট আইন্ষ্টাইন্	জার্ম্মানী
রসায়ন	ফ্রেডারিক সডি	ইংল্যাণ্ড
সাহিত্য	আনাতোল ফ্রাঁস্	ফ্রান্স
শান্তি	কে, এইচ, ব্রান্টিং লাঙ্গে (Cler. L. Lange)	সুইডেন

১৯২২

পদার্থবিদ্যা	নিল্সবোর	ডেন্মার্ক
রসায়ন	এফ, ডব্লু, অ্যাষ্টন	ইংলণ্ড
সাহিত্য	জাসিন্তো বেনাভেন্তে	স্পেন

মাঝে সংবাদ আসিয়াছিল যে রকফেলার ইন্ষ্টিটিউট্এর ডাক্তার নোগুচি (জাপান) ভেষজবিদ্যায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দের নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। সংবাদটি সত্য কি না তাহা আমার সঠিক জানা নাই।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(৫৪)

তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে যে কত খরচ পড়িয়াছিল তাহা এখন স্থিরীকৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকের ভিন্ন ভিন্ন মত,—ইহার মধ্যে কোন্টি যে অভ্রান্ত 'হলপ্' করিয়া বলা যায় না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Vincent A. Smith তাঁহার A History of Fine Art in India and Ceylon নামক গ্রন্থে তাজমহল নির্ম্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে স্বীয় মত এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"The statements of cost recorded by writers in Persian vary enormously The Badshah-namah gives Rs. 50,00,000 (50 lakhs) as the cost of the mausoleum itself. The highest estimate of the cost of the whole amounts to the huge sum of Rs. 411, 48, 826 . 7 . 6 (411 lakhs, 48 thousand, 826 rupees, seven annas, six pies), as stated with curious minuteness

equivalent at the rate of 2s. 3d. to the rupee, in round numbers to four and a half million pounds sterling. Intermediate estimates put the expense at three millions sterling, said to have been about the sum which Shahjahan resolved to spend. If the full value of materials be included, the highest figure is not excessive and may be considered as approximately correct."

ইহা হইতে ব্যয়ের মোটামুটি একটি ধারণা করা যাইতে পারে। V. A. Smith এক জায়গায় ইহাও বলিয়াছেন যে—

"Much of the more costly material was presented by tributary princes, and its value probably was excluded from the lower estimates."

উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে তাজমহল নির্ম্মাণের ব্যয় সম্বন্ধে মতের এত বিভিন্নতা হওয়ার একটি সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায়।

শ্রী তপোধীরকৃষ্ণ রায় দস্তিদার

(৭০)

"মহাস্থান গড়"

অতি প্রাচীনকালে পূর্ব্ববঙ্গ কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং করতোয়া নদী-তীরস্থ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পৌণ্ড্ররাজ্যের রাজধানী ছিল। সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক "হিয়ন চাং" খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে তাঁহার ভারত-ভ্রমণকালে উক্ত রাজধানী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের রাজাও খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজগণের তাম্রলিপিতেও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব পৌণ্ড্ররাজত্ব যে খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্যার এ, কানিংহাম বহু গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বগুড়ার প্রায় ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থান-গড়ের যে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই প্রাচীন পৌণ্ড্ররাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্মৃতিস্তূপ।

আধুনিক গবেষণায় মহাস্থান-গড়ের ভিতর একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধমন্দির পাওয়া গিয়াছে। বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টার—সুশিক্ষিত পুরাতত্ত্ববিদ্ বটব্যাল মহাশয় বলিয়াছেন যে মহাস্থানের পুরাতত্ত্বের মধ্যে বৌদ্ধতত্ত্বই শ্রেষ্ঠতম। বগুড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার নন্দী, ১৯০৭ খৃঃ অব্দে মহাস্থানের অনেকগুলি স্তূপ খনন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অনেক পুরাতন ঐতিহাসিক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই-সকল গবেষণার পর্য্যালোচনায় মহাস্থানে বৌদ্ধতত্ত্বের প্রাধান্যই উপলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানে যাহা "মহাস্থান-গড়" নামে অভিহিত, তাহাই যে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ধ্বংসাবশেষ সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

মহাভারত ও পুরাণে দেখা যায় যে, বাসুদেব নামে এক ক্ষমতাশীল পৌণ্ড্ররাজা ১২৮০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন। 'হিয়ন চাং'—যখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন তখন সেখানে কোন রাজা ছিল না—সকলেই স্বাধীন ছিল এবং নানা স্থানে বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়ন্ত নামে এক রাজা ছিলেন এবং নবম শতাব্দীতে তাঁহার রাজ্য পালরাজাদের হস্তগত হয়। পাল-রাজাদের রাজধানীও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ছিল। কিন্তু পালরাজা যখন সেনরাজাদের হস্তগত হয় তখন তাঁহারা গৌড়ে রাজধানী লইয়া যান।

কথিত আছে যে ইহার পর পরশুরাম নামক এক ক্ষত্রিয় রাজার সময়ও উক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই তাঁহার রাজধানী ছিল। অনন্তর শা সুলতান নামক এক মুসলমান ফকির তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ঐ স্থানে মুসলমান শাসনের বিস্তার করেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে মহাস্থান প্রাচীন বিজেতাদের "রাজধানী" ও "গড়" অর্থাৎ দুর্গ ছিল এবং তাহা হইতেই "মহাস্থান গড়ের' উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

"শীলাদেবীর ঘাট"

"মহাস্থান-গড়ের" চারিটি তোরণ ছিল, কথিত আছে যে শীলাদেবীর ঘাট তন্মধ্যে একটি। এখন যাহা শীলাদেবীর ঘাট নামে অভিহিত হয় সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাই "শীত-দ্বীপ" নামে পরিচিত। বটব্যাল মহাশয় বলেন যে, মহাস্থানের নিকট করতোয়া নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পুনরায় বগুড়ার প্রায় এক মাইল উত্তরে সংমিলিত হইয়াছে এবং মধ্যবর্ত্তী স্থান "শীতদ্বীপ' বলিয়া কথিত হয়। তিনি আরো বলেন যে,—"শীত" —বৌদ্ধ শীল শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, সুতরাং শীত দ্বীপ বা "শীল দ্বীপ" অর্থে বৌদ্ধদের একটি ধর্ম্মস্থান বুঝায়। এ সম্বন্ধে আবার মতভেদও দেখা যায়। মিষ্টার ও'ডনেলের মতে গোবিন্দ দ্বীপের নিকট পাথর-ঘাটাই "শীলা দেবীর ঘাট" এবং কানিংহাম সাহেব উক্ত মত সমর্থন করেন। আবার মিষ্টার বিভারিজ বলেন যে, "শীতদ্বীপকেই" স্থানীয় লোকে "শীলাদেবী" বলিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণ করে।

একজন বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের মতে "শীলাদেবী" রাজা পরশুরামের একমাত্র কন্যা। তিনি পরমা সুন্দরী ও অতি বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা যাগযজ্ঞ লইয়া থাকিতেন। শা সুলতানের সৈন্যরা যখন মহাস্থান-গড় আক্রমণ করিয়াছিল, তখন পরশুরাম বৃদ্ধ ছিলেন এবং যুদ্ধ-কার্য্যে অপারগ ছিলেন এবং কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন না ভাবিয়া ক্ষোভে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর তাঁহার সেনাপতি নিহত হইলেন এবং শত্রুরা গড়ে প্রবেশ করিলে শীলাদেবী তাহাদের হস্ত হইতে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করার জন্য গড়ের প্রাচীর হইতে করতোয়া নদীতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন এবং সেই হইতে উক্ত স্থান "শীলাদেবীর ঘাট" বলিয়া অভিহিত হইতেছে। উক্ত স্থানে প্রতিবৎসর যোগের সময় স্নান করার জন্য বহুলোক সমবেত হয়।

দ্রষ্টব্য—

(1) Archaeological Survey of India, Vol. XV, 1879—80—by Sir A. Cunningham.

(2) Antiquities of Bagura—by H. Beveridge, C. S.

(3) Notes on Mahasthan near Bagura,—Eastern Bengal,—Journal of Asiatic Society Bengal—Part I, No 3, 1875.

(4) Report on Antiquities of Bogra, 1895—U.C. Batabyal, I. C. S.

(5) District Gazetteer—Bogra,—J. N. Gupta, M.A., I. C. S.

(6) Paundrabardhana and Karatoa—Harogopal Das Kundu.

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

(৭২)

"পঞ্চসাগরে বারাহী দেবী"

পঞ্চসাগরের ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। পীঠমালা বা অন্য কোথায়ও ইহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে ভারতের মধ্যে নোয়াখালী জিলাতে ৺বারাহী দেবীর প্রতিমা বিদ্যমান আছে এবং এই স্থানেই ভৈরব মহারুদ্র ও দেবী বারাহীর পূজা হইয়া



"বেলা অবসান হল"

চিত্রকর শ্রীপূর্ণচন্দ্র সিংহ।

থাকে। চণ্ডীতে ৺বারাহী সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে জানা যায় যে তিনি অষ্ট শক্তির অন্যতমা। অন্য কোথাও এই মূর্ত্তির পূজা হয় বলিয়া জানা যায় না। দেবীর ধ্যান পাঠে দেবীমূর্ত্তির স্বরূপ জানা যায়। দেবীর ধ্যান,

"ওঁ বারাহীম্ অষ্টক-ভুজাং ত্রিনেত্রাং বরদায়িকাং
পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণং মধ্যে শ্রীনন্দনাম্ভোজাং
দক্ষ কর্ণে মুষং দুর্গং বামকর্ণে বরাহকং
বরাহবাহিনীম্ আদ্যাং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে" ॥ (?)

নোয়াখালী জিলা পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মিথিলার রাজপুত্র বিশ্বম্ভর শূর চন্দ্রনাথ-দর্শন-মানসে জলযানে চট্টগ্রাম জিলায় আগমন করেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে নাবিকগণ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া চট্টগ্রামের পঞ্চাশৎ মাইল পশ্চিমোত্তর কোণে সমুদ্রে নৌকা নঙ্গর করিয়া একরাত্রি যাপন করেন। সেই রাত্রে সমুদ্রগর্ভস্থ বারাহীদেবী রাজা বিশ্বম্ভর শূরকে প্রত্যাদেশ করেন যে তিনি যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে সেই মূর্ত্তির উদ্ধার করিয়া সেস্থানে দেবীর স্থাপনা করেন ও একটি নূতন রাজ্যের পত্তন করেন। অবশ্যই দেবীর কৃপায় যে সেস্থানে একটি নূতন দ্বীপের সৃষ্টি হইবে দেবী তাহাও আশ্বাস দিয়াছিলেন। প্রভাতে দেখা যায় যে নৌকা একটি দ্বীপে আবদ্ধ হইয়া আছে ও নৌকার নিকটেই দেবীমূর্ত্তি পাওয়া যায়। দেবীকে তথায় স্থাপনা করিয়া যথাবিহিত পূজা করা হয়। সেই প্রাতঃকাল কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া দেবীকে পূর্ব্বাস্য করিয়া স্থাপন করা হয়। কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইলে মহারাজ বিশ্বম্ভর তাঁহার ভুল বুঝিতে পারেন এবং সকলেই একযোগে "ভুল হুয়া, ভুল হুয়," বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। সেইজন্য এই স্থানের নাম "ভুলুয়া" হয়। যেস্থানে মূর্ত্তির আবিষ্কার হয়, তাহা এ বি রেলওয়ের নোয়াখালী শাখার সোনামুড়ী ষ্টেশনের অতি নিকটে ও ভালুয়াই নামে প্রসিদ্ধ। তথায় বারাহী গাছ নামে একটি বৃক্ষ ও একখানা প্রস্তর-বেদী আছে। প্রতি বৎসর এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে নোয়াখালী জিলাকে ভুলুয়া বলা হইত এবং এই স্থানেই দ্বাদশ ভূঞার অন্যতম নৃপতি রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য রাজত্ব করিতেন। উক্ত শূর বংশ পুরুষানুক্রমে এখানে রাজত্ব করেন ও দেবীর যথাবিহিত পূজা করেন। দেবীর জন্য কয়েক দ্রোণ জমি বৃত্তিস্বরূপ আছে। বিধবা নিঃসন্তান রাণী শশিমুখী ৺কাশী যাওয়ার সময়ে তাঁহার কুলপুরোহিত আমিশাপাড়া-নিবাসী রাধাকান্ত চক্রবর্ত্তীর নিকটে দেবীকে রাখিয়া যান ও দেবীর জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি দেবী-প্রতিমা আমিশাপাড়াতেই আছে। দেবীর সেবার জন্য যে নির্দ্দিষ্ট জমি আছে, তাহার অধিকাংশ নদীগর্ভস্থ ও পরহস্তগত। অবশিষ্ট জমির আয় দ্বারা দেবীর সেবাকার্য্য নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরটির অবস্থাও চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাভাব-প্রযুক্ত মন্দিরের সংস্কার করা হইতেছে না। ভুলুয়া যে পঞ্চসাগরে অবস্থিত তাহার কিছু আনুমানিক বিবরণ দিতেছি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নোয়াখালী জিলা সমুদ্রগর্ভে ছিল এবং বর্ত্তমান নোয়াখালী জেলা ভুলুয়ারই অধিকাংশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরে মেহার ও ত্রিপুরা, পূর্ব্বে চট্টল ও ত্রিপুরা, দক্ষিণে সন্দীপ, পশ্চিমে চন্দ্রদ্বীপ বা বাক্‌লা বরিশাল—এই পঞ্চ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সমুদ্রকেই সম্ভবতঃ পঞ্চসাগর বলা হইত। এই যুক্তির মৌলিকতা কতদূর আছে, তাহা কোন প্রাচীন ভূগোলবিদ্ পণ্ডিত দিতে পারিলে বিশেষ সুখী হইব। ৺বারাহী দেবী সম্বন্ধে ত্রিপুরার রাজমালায়, প্যারীমোহন সেন প্রণীত নোয়াখালীর ইতিহাসে ও নোয়াখালী পত্রিকায় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আনন্দ রায় প্রণীত বার-ভূঞাতেও তাঁহার বিস্তৃত ইতিহাস আছে। তাঁহার বিবরণে দেখা যায় দেবী চতুর্ভুজা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেবী অষ্টভুজা। এই দেবী সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে দেবীর বর্ত্তমান তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লিখিলেই জানিতে পারিবেন। তাঁহার ঠিকানা পোঃ আমিষাপাড়া, জিঃ নোয়াখালী।

শ্রী সুধাংশুচরণ চক্রবর্ত্তী

(৭৩)

শ্বেতপাথরের বাসন সাফ করা

১ম প্রকরণ,—কতকগুলি ঝামা-পাথরকে ভালরকমে গুঁড়া করিয়া চালিয়া লইবার পর তাহাতে পরিমাণ মত ভিনিগার মিশাইতে হইবে। তৎপরে ঐ মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা শ্বেতপ্রস্তরখানি উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা উচিত। কিছু পরে চামড়া দ্বারা পাথরখানির উপর 'হোয়াইটীং' ঘর্ষণ করিয়া ধুইয়া ফেলিলেই পাথরখানি বেশ পরিষ্কার হইবে।

২য় প্রকরণ,—সমপরিমাণ ঝামাপাথরগুঁড়া ও চা-খড়ির গুঁড়া পরিষ্কার করিয়া চালিয়া লইয়া উভয়ের সম পরিমাণ কার্ব্বনেট অভ্ সোডার সহিত জল দ্বারা মিশাইয়া আঠা-আঠা করা উচিত। তার পর শক্ত বুরুশ দিয়া ঐগুলি শ্বেতপাথরের উপর মাখাইয়া তিনদিন রাখিয়া দাও। তৎপরে জল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া ফেলিলেই পাথরখানি নূতনের ন্যায় হইবে।

৩য় প্রকরণ,—কুইক্-লাইম, সমপরিমাণ কষ্টিক পটাশ ও নরম সাবান মিশ্রিত করতঃ জল দিয়া আঠা-আঠা করা উচিত। তার পর উহা শক্ত বুরুশের দ্বারা শ্বেতপাথরের উপর মাখাইয়া সাত দিন ঐভাবে রাখিয়া দিবে। তার পর জল দিয়া পরিষ্কার করিলেই পাথরখানি নির্ম্মল হইবে। পাথরখানি বেশী ময়লা হইলে এক বারে নাও পরিষ্কার হইতে পারে, সেইজন্য পুনরায় উক্ত প্রক্রিয়া করিবে, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইবে।

৪র্থ প্রকরণ,—শ্বেত-পাথরের উপর প্রথমে সোডা ও গরম জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। তার পর এক টুকরা কাপড় অক্‌জ্যালিক অ্যাসিডে ডুবাইয়া লইয়া পাথরখানির উপর চাপা দিয়া রাখ। তিন দিন পরে কাপড়খানি তুলিয়া লইয়া সোডা ও জল দিয়া পুনরায় ধুইয়া ফেলিবে। একবারে পরিষ্কৃত না হইলে ২।৩ বার উক্ত নিয়ম অবলম্বন করিলেই আর অপরিষ্কার থাকিবে না।

শ্রী ধীরাজমোহন কয়াল কাব্যবিনোদ

(৭৮)

আলু রক্ষা

কুড়ি ভাগ জল ও একভাগ সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড একত্রে মিশ্রিত করিয়া আলুগুলি ঘণ্টা দুইতিন এই সলিউশনে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া বালির উপর রাখিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ছয় মাস পর্য্যন্ত আলু ঠিক থাকে। এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাজারীবাগ কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মহাশয়কে পত্র লিখিবেন।

শ্রী রোহিণীকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৮২)

"পাতকুয়ার জলে কষায় স্বাদ"

কূপ-খননকালে যে কূপের নীচে বালি থাকে তাহার জল সাধারণতঃ কষায় লাগে না এবং পরিষ্কার হয়। আর বালিশূন্য কূপের জল কষায় এবং অপরিষ্কৃত হয়। যে কূপের জল কষায় লাগে তাহাতে চূণ ও ফট্‌কিরী দিলে কষায় স্বাদ লাগে না, ইহা পরীক্ষিত।

কূপ যদি গাছের নীচে অথবা ছায়ায় খনন করা হয় তবে ঐ কষায় স্বাদ সম্পূর্ণরূপে দূর করা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না।

শ্রী কুলদাচরণ রায় ও শ্রী সুরেশচন্দ্র রায়

জলের ভাল-মন্দ মাটির উপর নির্ভর করে। যে মাটিতে কোনরূপ জান্তব বা খনিজ পদার্থ নাই তাহাই ভাল মাটি। পরন্তু যে মাটিতে উহা মিশ্রিত থাকে, তাহাই খারাপ মাটি বলিয়া পরিগণিত। মাটি ভাল হইলে জলও ভাল হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে মাটি খারাপ হইলে জলও খারাপ হয়। বোধ হয় ঢাকা জেলার মাটিতে জান্তব বা খনিজ পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়াই জলে কষায় স্বাদ হইয়া থাকে। আমি উত্তরবঙ্গে ও কোন কোন স্থানে জলের ঐরূপ স্বাদ হইতে দেখিয়াছি। মাটির কারণেই এইরকম হয়।

প্রতিকারের উপায়—জল কষায়স্বাদ হইলেই কয়েক সের পাথরিয়া চূণ বা ঐরূপভাবে অধিক মাত্রায় পানে-খাওয়া চূণ সেই জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলে, ৬।৭ দিন পর (এ কয়দিন জল-ব্যবহার বন্ধ রাখিবেন) দেখিতে পাইবেন, সেই কষার স্বাদ আর নাই। ফলকথা তখন জলে আর কোন গন্ধ থাকে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৮৩)

রাজিয়া ও নেত্রসুলতানার জীবনী।

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দিল্লীশ্বরী" নামক গ্রন্থে সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার (তৎসঙ্গে সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ইতিহাসও আছে) সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। রাজিয়া সম্বন্ধে অনেক নাটক-নভেল বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐগুলিকে প্রকৃত ইতিহাস বলা যায় না। তদ্ভিন্ন আমার যতদূর মনে পড়ে, গত বৎসরের "ভারতবর্ষের" কোন কোন সংখ্যায় রাজিয়া সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুর লেখা বাহির হইয়াছিল।

"দিল্লীশ্বরী" গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০৩।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১০ আনা।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(৮৪)

হিপ্নটিজম শিক্ষা।

শিক্ষাভিলাষিগণকে আমি হিপ্নটিজম্ ও মেসমেরিজম্ ইত্যাদি গুপ্তবিজ্ঞানগুলি হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া থাকি।

(প্রফেসার) আর এন রুদ্র
আলমনগর পোঃ ; রংপুর

প্রফেসার আর, এন, রুদ্র মহাশয় ছাড়া কলিকাতায় ৮৬ নং বিডন ষ্ট্রীটে শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি বাংলা ভাষায় একখানি পুস্তকও লিখিয়াছেন, মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

শ্রী কালীকিঙ্কর সরকার

সর্ব্বপ্রথমে Dr. Friedrich Anton Mesmer এই বিদ্যা (Mesmerism and Hypnotism) আমেরিকায় আবিষ্কার করেন। ক্রমে তথা হইতে প্রায় পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

Prof. R. N. Rudra রংপুর এবং Dr T. R. Sanjiv, M. A, Ph. D, Litt. D, টিনেভেলী ("Latent Light Culture." Tinnevally. S. India) হইতে এই বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

আজকাল প্রায় সকল দেশেই এই বিদ্যা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

রহমান্ খান
তরুণ ঘোষাল

ভাদ্রের "ভারতবর্ষে" শ্রীযদুনাথ দে মহাশয়ের মেসমেরিজম্ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

পুস্তকের নাম

(1) Stage Hypnotism by Prof. Leonidas.

(2) Human Magnetism by Prof. James Coates.

শ্রী প্রমোদচন্দ্র সরকার

(৮৬)

বঙ্গলিপির উৎপত্তি।

বঙ্গীয় বর্ণমালার উৎপত্তির বিবরণটি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। এক মাত্র প্রাচীন গ্রন্থই এতৎসমুদয় বিষয় নির্ণয়ের প্রধান উপায়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র অন্যতম। উক্ত গ্রন্থে বঙ্গলিপির বর্ণনা আছে। যথা—

"অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি ককারতত্ত্বমুত্তমং।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা॥
অধোরেখা ভবেদ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী॥"
কুণ্ডলী অঙ্কুশাকারা মধ্যে শূন্যঃ সদাশিবঃ॥"

ভাবার্থ—"এখনে আমি ককারের তত্ত্ব বলিব। উহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা শিব, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকার কুণ্ডলী দেবতা ও মধ্যে শূন্য সদাশিব।" তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যান্য বঙ্গাক্ষরেরও ঐরূপ বিবরণ আছে। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রের কাল নিরূপিত হইলেই বঙ্গলিপির উৎপত্তিবিবরণ নির্ণীত হইবে।

তন্ত্রশাস্ত্রমাত্রই অতি প্রাচীন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ সকল তন্ত্রই অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কতকগুলি তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক। ঐসকল আধুনিক তন্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের বয়স ২০০।৩০০ বৎসরের বেশী নহে। ফলকথা তন্ত্রমাত্রেই আধুনিক নহে। অথর্ব্ববেদ, গোপথ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। ভিতরীর পাষাণপাত্রে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে তন্ত্রের বিবরণ খোদিত আছে। স্কন্দগুপ্ত ২০০ খৃঃ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। তদ্ভিন্ন "ললিত-বিস্তর"গ্রন্থে উক্ত আছে, "বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের নিকটে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, দ্রাবিড় প্রভৃতি বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করেন।" ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বুদ্ধদেবের সময়েও (খৃঃ পূঃ ৪৭৭ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন) বঙ্গলিপি বিদ্যমান ছিল। অতএব বঙ্গলিপি যে বহু পুরাতন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জয়নগরের রাজা সুন্দরবনের মধ্যে একখানি তাম্রলিপি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাধিকার সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণকে ভূমির সনন্দস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত সনদ লিপির কতকগুলি অক্ষর বাঙ্গালার সদৃশ। পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, বোধ হয়, ঐসকল অক্ষর বর্ত্তমান-রূপ বঙ্গাক্ষর সৃষ্টি হইবার কালে খোদিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং হাজার বৎসরের পূর্ব্বে (লক্ষ্মণসেন হাজার বৎসর হইল রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন) যে বঙ্গলিপির বিদ্যমানতা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গলিপির উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ প্রদর্শন করা অসম্ভব। প্রিন্সেপ্ সাহেব যুগ-যুগান্তরের সমুদয় অক্ষর অধ্যয়ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের দেবনাগর অক্ষর বঙ্গাক্ষরের পর উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত-অনুসারে পুরাতন বঙ্গলিপি বর্ত্তমান দেবনাগর অক্ষর হইতে প্রাচীন।

উড়িয়া, দ্রাবিড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার মধ্যে দ্রাবিড়ী বর্ণমালাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কারণ আর্য্যদের ভারতাগমনের সময় দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষাভাষিগণই সুসভ্য ছিল। (এসম্বন্ধে মতদ্বৈত

আছে।) কোন এক সভ্যতা অনেকটা সেই জাতির ভাষার উপরই নির্ভর করে।

ভাষার ক্রম এইরূপ—সংস্কৃত নামক গাথা-ভাষা, পালী ভাষা, প্রাকৃত ভাষা, হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি। ছন্দচ্ছাব সংস্কৃত ভাষার কোমলতা সাধনের জন্যই গাথাভাষার উৎপত্তি হয়। উহা বুদ্ধদেবের পরকালে প্রচলিত ছিল। এই ভাষা ১৫০ বৎসর-কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া অশোক রাজার সময় পালী ভাষা নামে প্রসিদ্ধ হয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত বররুচি প্রাকৃত ভাষার একখানি ব্যাকরণ লিখেন। তাঁহার সময়ে উক্ত ভাষার বিলক্ষণ প্রচার না থাকিলে তৎ-কর্ত্তৃক কখনই উক্ত ব্যাকরণ রচিত হইত না। এইরূপেই ক্রমে ভাষার বিকাশ হয়।

আমাদের যে সংস্কৃত ভাষা, তাহা সর্ব্বদা একরূপে ব্যবহৃত হয় নাই; ক্রমশঃ উহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ পরিবর্ত্তন হেতু সংস্কৃত ভাষা প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত। যথা—বৈদিক (এই ভাষায় বেদমন্ত্র-সকল রচিত হয়), মানবিক (বৈদিক ভাষা নিতান্ত ছন্দচ্ছান্দস্বভাব বলিয়া ক্রমশঃ উহার সরলতা সাধিত হইলে, মানবিক ভাষায় মনুসংহিতা ও রামায়ণ রচিত হয়), কালিদাসিক ও পৌরাণিক। কালিদাস প্রভৃতি কবিগণের সংস্কৃতের পরিবর্ত্তনে পৌরাণিক সংস্কৃতের সৃষ্টি। প্রকারান্তরে ঐসকল ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এজন্য বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থিগণকে বিভিন্ন বর্ণমালা শিক্ষা করিতে হইত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত The Origin of Bengali Alphabet নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(৮৭)

দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা

মুসলমান সম্রাট্‌দিগের মধ্যে আকবর বাদ্‌শাহ সর্ব্বপ্রকারেই আদর্শ নরপতি ছিলেন। সম্রাট্ আকবরের এই গুণের জন্যই হিন্দু প্রজাগণ তাঁহাকে পরমেশ্বর-স্থানীয় মনে করিয়া সমস্বরে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া স্তব করিতেন।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১৩২৮ সালের নিদাঘ সংখ্যা "প্রভাতীতে" শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" শীর্ষক একটি সুরচিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। তাহা হইতে কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"প্রাচ্য ইতিহাসে অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা নিজেকে প্রজাগণের ধর্ম্মনেতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার কারণ মানুষের স্বাভাবিক আত্মগৌরব হইতে পারে, অথবা গভীর রাজনৈতিক ফন্দী। রাজা যদি অন্তর এবং বহির্জ্জগৎ এই উভয় ক্ষেত্রেই কর্ত্তা হইতে পারেন, তবে দেশে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চতর কোন শক্তি থাকিতে পারে না, জগতে তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত, দ্বন্দ্বহীন একক। নয় লক্ষ অশ্বারোহীর প্রভু, দিল্লীর বাদ্‌শাহ্‌ও এই ভাবিয়া সুখ পাইতেন যে তিনি কোটি কোটি মানবের স্বেচ্ছাভক্তি এবং আন্তরিক প্রেম লাভ করিতেছেন। তিনি অন্য মানবের মত নহেন, দেবতার অবতার অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন।

"মুসলমান রাজ্যে রাজার দেবভাব হওয়া অতি সহজ। ইস্‌লামের বিধি অনুসারে দেশশাসক প্রকৃত বিশ্বাসীগণের সেনাপতি (আমির উল্ মুমেনীন) এবং সমবেত প্রার্থনার (জমাএৎ নমাজ) নেতা অর্থাৎ ইমাম। তিনিই একমাত্র খলিফা এবং যদি তিনি নিজ পদের উপযুক্ত হন, তবে প্রেরিত পুরুষের (মুহম্মদের) গুণ ও শক্তি তাঁহাতেও বর্ত্তিয়াছে, এবং তিনি একাধারে ইস্‌লামীয় সৈন্যের নায়ক ও ধর্ম্ম-গ্রন্থের সর্ব্বোচ্চ ব্যাখ্যা-কারক (মুজ্‌তাহিদ)।

"আর হিন্দুরা ত প্রত্যহই অবতারকে পূজা করিবার জন্য, স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত আছে। তাহাদের বিশ্বাস যে এরূপ অবতার কোটি কোটি বার অতীতে দেখা দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও দেখা দিবেন:—হে ভরত বংশজ! যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইবে তখনই আমি নিজেকে (অবতার রূপে জগতে) সৃষ্টি করিব (গীতা)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মুঘল যুগের ভারতে কি হিন্দু কি মুসলমান অবতারের প্রতীক্ষায় হৃদয় পাতিয়া ছিল। রাজার পক্ষে এ মহা সুযোগ।

"ঠিক এই সুযোগে বাদ্‌শাহ আক্‌বর নিজেকে ইন্‌সান্-ই-কামিল বা সাহিব-ই-জমান (অর্থাৎ যুগাবতার) বলিয়া স্থাপিত করিলেন। যদিও তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, তথাপি দর্‌বারে মুল্লাগণ লোভে ও ভয়ে এক পাঁতি (ফতাওয়া) সহি করিয়া দিল যে বাদশাহই কোরানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নির্ভুল ব্যাখ্যাকারক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্নের শেষ বিচারক (মুজ্‌তাহিদ)। এদিকে হিন্দুরা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহার হাতে নিজেদের ধর্ম্মের প্রশ্রয় এবং সাধু সন্ন্যাসী গণের আদর দেখিয়া তাঁহাকে 'জগদ্‌গুরু' উপাধি দিল।

"মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত ভক্তগণ এবং ভণ্ড অর্থলোভী চাটুকারগণ তাঁহাকে "সাহিব-ই-জামান্" অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের প্রভু বা গুরু বলিতে লাগিল।

"এই ভক্তগণের অধিকাংশই পারসিক ছিল। পারস্য জাতি আর্য্য, মুসলমান হইবার পরও নরপূজার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মজ্জাগত ছিল।

"আকবরের পারসিক শিয়া কর্ম্মচারী ও সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া খোসামদ করিতে লাগিল। তিনি তাহাই বিশ্বাস করিলেন। এবং প্রথমে গোপনে, পরে অনেকটা প্রকাশ্যে নিজেতে মুহম্মদের অনেকগুলি গুণ ও শক্তি আরোপ করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে আরও উঁচুতে উঠিয়া ঈশ্বরত্ব বা অবতারত্ব দাবি করিলেন।"

এই কয়েকটি অংশ পড়িলেই বুঝা যায়, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" কোন্ ক্ষেত্রে, কি কারণে প্রয়োগ হইয়াছিল।

শ্রীমতী চিত্রলেখা চৌধুরাণী

প্রভাতী ছাড়া যদুবাবুর একটি ইংরেজী প্রবন্ধেও ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে—The Sovereign as the Head of Religion in the Mughal Empire, *Modern Review*, August, 1922.

শ্রী—

(৮৮)

হিন্দুদিগের দেবতা

'সদারা বিবুধাঃ সর্ব্বে স্বাং স্বাং স্থানাং গণৈঃ সহ।
ত্রৈলোক্যে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি-সংখ্যতয়াঽভবন্॥'

পদ্মপুরাণের এই শ্লোক দৃষ্টে দেখা যায় যে, উক্ত পদ্মপুরাণেই হিন্দুদের দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত এই দেবতাগণের সংখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গণনা করিলে কি হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না।

অতএব একমাত্র পদ্মপুরাণেই (পদ্মপুরাণ সুবৃহৎগ্রন্থ; উক্ত গ্রন্থ সাত খণ্ডে বিভক্ত—সৃষ্টিখণ্ড, উদ্ভবখণ্ড, পাতালখণ্ড, স্বর্গখণ্ড, ভূমিখণ্ড, ব্রহ্মখণ্ড ও ক্রিয়াযোগসার) হিন্দুদের ৩৩ কোটি দেবতার বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। পদ্মপুরাণের প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গবাসী কার্য্যালয়; ৩৮,২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১০)

আবিরের লাল-রং

আবির প্রস্তুত করার প্রণালী :—শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের সহিত (শঠিগাছের মূল, চুপ্ড়ি ও খাম আলু, বুনো ওল ও কচু হইতে শ্বেতসার পাওয়া যায়) লাল-রং মিশ্রিত করিলেই আবির প্রস্তুত হয়।

শঠি-পালো প্রস্তুত করিবার (বাঙ্গালী-ঘরের নরনারীগণ অনেক স্থলে শঠিপালো প্রস্তুত করার প্রণালী জানেন বলিয়া এস্থলে আর তৎসম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিলাম না) পর আঠাবৎ অবশিষ্ট যে পদার্থ থাকে, তাহা ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া লউন। এই গুঁড়ার সহিত মেজেণ্টা বা খুনখারাপী-রং উত্তমরূপে বাটিয়া মিশাইয়া লইলেই আবিরের লাল-রং প্রস্তুত হইল।

তদ্ভিন্ন আমাদের দেশী অনেক রঞ্জক পদার্থ হইতেও (যেমন পলাশ-ফুল, কুসুম-ফুল, চে-মূল, মঞ্জিষ্ঠা-ছাল ও মূল প্রভৃতি) আবিরের লাল-রং প্রস্তুত হইতে পারে। টাট্কা পলাশ ফুলের রসের সহিত (যদি শুক্না হয়, তবে কাথ করিয়া লইতে হইবে) ক্ষার মিশ্রিত করিলে, সুন্দর লাল-রং পাওয়া যায়। এই লাল-রঙের সঙ্গে শ্বেতসার-পদার্থ মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই আবির লাল-রঙে রঞ্জিত হইয়া যাইবে।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম-অঞ্চলে একপ্রকার বৃক্ষ আছে। সেই গাছ মূল সহ জলে সিদ্ধ করিলে, অতি সুন্দর লাল-রং পাওয়া যায়। উহার সহিত শ্বেতসার মিশাইলেও আবির লাল-বর্ণ ধারণ করে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী

(১০)

কলিকাতা বড়বাজারে আরারুটের সহিত জার্মানি রং মিশ্রিত করিয়া আবির তৈয়ার হয়। কোন ছাদের উপরে বস্তা বস্তা আরারুট ঢালিয়া গাদা করা হয়। কটাহে জল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে বিলাতী রং ঢালা হয়। এই গরম লাল জল আরারুটের গাদায় ঢালিয়া ময়দা ভিজানর মত ভিজান হয়। সমস্ত আরারুট লাল জলে ভিজিলে মেলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। ইহা রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া ধূলার মত হয়। এইগুলি বস্তায় পুরিয়া বাজারে আবির বলিয়া বিক্রি হয় এবং বাংলা দেশে ও বাংলার বাহিরে রপ্তানি হয়।

শ্রী রামানুজ কর

(১২)

বঙ্গভাষায় পশুপালন সম্বন্ধীয় পুস্তক

গিরিশ চক্রবর্ত্তী—গোধন

বঙ্কুবিহারী ধর—গো-চিকিৎসা

বসুমতী আফিস—পশু-চিকিৎসা

ভেটেরেনারি সার্জ্জন

ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দত্ত—পশুচিকিৎসা

গুরুদাস বাবুর দোকানে পাওয়া যায়।

শরৎ ব্রহ্ম

(১৩)

মুর্শিদ কুলী খাঁ

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত "রিয়াজ উস্ সালাতিন" গ্রন্থের তৃতীয় উদ্যান ২৪০ এবং ২৬৯ পৃষ্ঠা পাঠে জানা যায় যে "নবাব বিচারের সময় কোন পক্ষ সমর্থন না করিয়া ধনী ও দরিদ্র নির্ব্বিশেষে ন্যায়বিচার করিতেন। একদা কোন একটি হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি জানিতে পারেন যে তদীয় পুত্রই হত্যাকারী, এজন্য তিনি আপন পুত্রের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন।" মুর্শিদ কুলী খাঁর সুবিচার সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, তন্মধ্যে তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ডের গল্পটিও অন্যতম। "এই ঘটনার কোন বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই" শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ বাবু ঐ পুস্তকের ফুটনোটে ইহাই লিখিয়াছেন।

শ্রী শ্যামাশঙ্কর মৈত্রেয়

মুর্শিদকুলী খাঁ যে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন ইহার বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'বঙ্গের ইতিহাস, ৩২৯ পৃষ্ঠায় আছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী

(১৪)

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথের নিকট চার্টার গ্রহণ করেন—একথা শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "ভারত-পরিচয়ে" ঠিকই লিখিয়াছেন। আবার যে-সমস্ত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডে গঠিত হয় তাঁহারাও ভুল বলেন নাই। উভয় মতই ঠিক। ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডে গঠিত হইবার এক বৎসর পরে রাণী এলিজাবেথ ঐ-কোম্পানীকে চার্টার প্রদান করেন। প্রমাণ-স্বরূপ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে।

1. Mediaeval India—Stanley Lanepoole, M.A., Litt. D.—p. 294.

"In 1597 the Dutch appeared in the Indies and a few years later they were joined by the English upon the incorporation of the first East India Company on the 31st of December, 1600."

2. History of England—David Hume—p. 370.

"On the 31st Dec. 1600, the East India Campany was established by a charter of Elizabeth for 15 years.

3. John Clark Marshman—History of India, p, 202.

"An association was at length formed in London in 1599. * * In the following year they obtained a charter of incorporation from Queen Elizabath."

4. Wheeler's History of India—p. 142 (Mahammedan period, part ii).

"The East India Company had been formed in 1599 in the life-time of Akbar. It obtained its first Charter from Queen Elizabeth in 1600."

5. An advanced History of England by T. F. Tout, M. A.—p. 424.

"In 1600 Elizabeth gave a Charter to the East India Company."

6. History of India—Meadows Taylor—p. 287

" * * * and the Company was finally embodied by a Charter in 1600, under the title of 'The Governor

.nd Company of Merchants of London, trading to the East Indies'."

7. Jack's Reference Book, p. 882.

"The East India Company received its first charter from Queen Elizabeth in 1600."

শ্রী শ্যামাশঙ্কর মৈত্রেয়

১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী য রাণী এলিজাবেথের নিকট চার্টার গ্রহণ করেন তাহার প্রমাণ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্ত-লেখক জন ক্রসেব "Annals of the Honourable East India Company" গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৯৯ খৃঃ অব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর সর্ব্বপ্রথম এই কোম্পানী গঠন করিবার জন্য লণ্ডনে আন্দোলন উপস্থিত হয়। পরদিন ২৫ শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন সহরে এই বিষয় নির্দ্ধারণের জন্য একটি সভা হয় এবং ঐ-সভা হইতেই রাণী এলিজাবেথের নিকট ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের অনুমতির জন্য একখানি আরজি পেশ করা হয়। ১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বর এলিজাবেথ ঐ চার্টার প্রদান করেন।

"The Charter of Queen Elizabeth to the London East India Company is dated 31st December, in the forty-third year of her reign, or 1600, and in its preamble, proceeded on the petition of a numerous body of noblemen, gentlemen and citizens for license to trade to the East Indies." ('Annals of the Honourable East India Company', Vol. I. chap. I, page 136)

শ্রী যোগেশচন্দ্র গোস্বামী

লণ্ডন ও আমষ্টার্ডামের বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ফলে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়।

১৫৮৮ খৃঃ অব্দে স্প্যানিস্ আর্মাডার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজ বণিকদের প্রবল ইচ্ছা হয়, এবং ১৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে ওলন্দাজগণ (the Dutch) ইংরেজদের উপর মরিচের দর প্রতি পাউণ্ডে ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং এবং ক্রমে ৮ শিলিং করাতে ইংরেজ বণিকগণ এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে ভারতের সহিত বাণিজ্য করার সঙ্কল্প স্থির করেন। মহারাণী এলিজাবেথ ১৬০০ খৃঃ অব্দের শেষ তারিখে অর্থাৎ ৩১ শে ডিসেম্বর উক্ত বণিক্ সম্প্রদায়কে ভারতের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য এক সনন্দ (Charter) প্রদান করেন।

Vide : (1) Vincent A. Smith's Oxford History of India, Part II, page 337.

(2) Ransome's History of England, Elizabethan period.

(3) The Indian Mirror—

Prof. Jogindra Ch. Chattoraj,

উক্ত সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকগণের লিখিত বিবরণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া মনে হয় না—সুতরাং প্রভাত-বাবুর "ভারত-পরিচয়ে" লিখিত ১৬০০ খৃঃ অব্দের ৩১ শে ডিসেম্বরই ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এলিজাবেথ চার্টার দেওয়ার প্রকৃত তারিখ বলিয়া মনে হয়।

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

"Auber"এর মতে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ রাণী এলিজাবেথ ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে দান করেন। "Grant"এর মতে ১৬ শতাব্দীর শেষ দিনে রাণী উহা দান করেন। "Hunter"এর মতে লণ্ডনের ১০১ জন বণিক্ ও নাগরিক (Citizen) ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখে Lord Mayorএর সভাপতিত্বে Founders' Hallএ সভা করিয়া London East India Company প্রতিষ্ঠা করিয়া রাণীর নিকটে সনন্দ প্রার্থনা করেন : রাণী তখনই উক্ত সনন্দ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার Privy Council তাঁহাকে তখন সনন্দ দান করিতে নিষেধ করেন ; কারণ স্পেনের সহিত তখন সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল। অবশেষে সন্ধি না হওয়াতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর তিনি Royal Charter বা সনন্দ দান করেন।

শ্রী কালীপদ বিশ্বাস

(৯৬)

ভারতবর্ষে কৃষিবিদ্যালয়

পুসা এগ্রিকাল্চারাল কলেজ, বিহার—বি, এস, সি, পাস দর্কার—

মাসিক খরচ ৩০ হইতে ৩৫ টাকা।

পুনা	কৃষি কলেজ	বম্বে	আই, এস-সি	৪৫—৫০ টাকা
কয়েমবাটুর	"	" মাদ্রাজ	ম্যাট্রিক	৩৫—৪০ টাকা
নাগপুর	"	" মধ্যপ্রদেশ	ঐ	৩৫—৪০ টাকা
কানপুর	"	" যুক্তপ্রদেশ	ঐ	৩৫—৪০ টাকা
লায়েলপুর	"	" পাঞ্জাব	আই, এস-সি	৪০—৪৫ টাকা
সুরুল (বিশ্বভারতী)	"	বাংলা	ম্যাট্রিক	৩০—৪০ টাকা

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক প্রদেশেই ৪ অথবা ৫ টি করিয়া নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় আছে, যাহাতে অতি অল্পদিনের জন্য চাষাদের সেই প্রদেশের ভাষায় কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয়।

বঙ্গদেশে মণিপুর (ঢাকা) অমরপুর (বর্দ্ধমান) দুর্গাপুর (চট্টগ্রাম) চুঁচড়া (হুগলী) প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বিদ্যালয় আছে। এখানে কোনও পাশের আবশ্যক হয় না। খরচ ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা পড়ে। বর্ত্তমান বর্ষে সাবোর কৃষি কলেজ উঠিয়া গিয়াছে।

হিরণ্ময় শীকদার, শ্রী ইন্দিরা দেবী, শ্রী শরৎ রক্ষ, শ্রী তরুণ ঘোষাল ও শ্রী তৃপ্তিবালা রায়

(১০৬)

'দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ'

মনুসংহিতা-রচনা-কালে বঙ্গভূমি আর্য্যবাসের অযোগ্য ছিল ; পরে যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই উহা 'সতত-দ্বিজ-সেবিতম্'। জন্মেজয় যজ্ঞার্থ গৌড়দেশ হইতে ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়াছিলেন। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৮ ; Census of the N. W. P., 1865 ; বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী দ্রষ্টব্য)। কৌটিল্য সম্ভবতঃ এই ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। বগুড়া দিনাজপুরের সীমান্ত-প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভে পালরাজদিগের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীগণের উৎকীর্ণ কীর্ত্তিকাহিনী এসিয়াটিক রিসার্চ্চের ১ম ভলুমে ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। ইঁহারা বঙ্গের আদি বৈদিক।

ইঁহারা আচারভ্রষ্ট হইলে আদিশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন। কিছু দিন পরে বারেন্দ্রগণও এদেশে আসেন। ইহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে শ্যামল বর্ম্মাদেব কর্ত্তৃক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আনীত হন। দ্রাবিড় কাহারা ? স্কন্দ পুরাণে দেখা যায়—"কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ। অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্য-দক্ষিণ-বাসিনঃ॥" কর্ণাট তৈলঙ্গ গুজরাট অন্ধ্র দ্রাবিড় দেশের ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড়।

গদাধর ভট্টের কুলজীর ১৭৪ হইতে ১৮৪ শ্লোকে দেখা যায় মেদিনীপুরের ময়নাগড়-বিজয়ী রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র রাজ্যাভিষেক-হেতু দ্রাবিড় দেশ হইতে পাঁচজন-সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। মাদ্রাজের বৈদিকধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পার্থসারথি আয়াঙ্গারের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল, মহাশয়, সংগ্রহ করিয়া কুলজী মুদ্রিত করিয়াছেন। হাণ্টার স্বীয় ষ্টাটিষ্টিকেল একাউণ্ট্এ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে উহার ১৯৯ শ্লোকে দেখা যায় উৎকল-প্রান্তে কাশীজোড়াস্তরালে জানুখণ্ডী নামে একব্যক্তি সরোবর প্রতিষ্ঠার্থ দ্রাবিড় হইতে সপুত্র পঞ্চানন নামক এক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ২১১ শ্লোকে দেখা যায় দ্রাবিড়াগত ব্রাহ্মণগণ উক্ত আদিবৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই মিলিত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গে 'দ্রাবিড় বৈদিক' ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত। (ভ্রান্তিবিজয়—শ্রী হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত)

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

পশ্চিম বঙ্গের "দ্রাবিড বৈদিক ব্রাহ্মণ" আখ্যায় আখ্যাত ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গে "পরাশর", মধ্যবঙ্গে "গৌড়াদ্য বৈদিক' ও দক্ষিণ বঙ্গে "ব্যাসোক্ত" ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। বাংলা দেশে মনুসংহিতার যুগে ব্রাহ্মণ ছিল না। উক্ত সংহিতায় আছে পুণ্ড্র দেশের (গৌড়) ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ অভাবে উপনয়নাদি সংস্কারচ্যুত হইয়া পতিত হইয়াছেন। মহাভারতের যুগে পুণ্ড্রদেশে (গৌড়ে), কলিঙ্গ দেশে (মেদিনীপুর পর্য্যন্ত এক সীমা), তাম্রলিপ্ত (তমলুকে) আর্য্য ব্রাহ্মণ ও আর্য্য ক্ষত্রিয়ের বসতি ছিল। মহাভারতের যুগে যে ব্রাহ্মণগণ বাংলাদেশে ছিলেন তাঁহারাই বাংলার আদিব্রাহ্মণ। তার পর—"মহাভারতীয় যুগের অবসানে মাহিষ্য বীরবাহিনী নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া তাম্রলিপ্তি পর্য্যন্ত রাজ্যস্থাপন করেন। কালক্রমে সমস্ত দক্ষিণ বাংলা, উত্তর বাংলা ও নদীয়া জেলার মেহেরপুর হইতে ফরিদপুরের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত বিশাল ভূমিখণ্ডের উত্তরাংশের প্রায় বার আনা ভূমি মাহিষ্য-রাজ্যভুক্ত হয়। উক্ত মাহিষ্য রাজাগণ এদেশে আসিবার সময় তাঁহাদের সঙ্গে একদল ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) আনিয়াছিলেন।"—"তমলুকের ইতিহাস"। বৌদ্ধযুগে ৬৩২ খৃঃ অব্দে গৌড় সম্রাট্ রাজা শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) মুলস্থান (মূলতান) হইতে আর-এক দল বিশুদ্ধ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ইঁহারাও পরে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও পাল রাজবংশের মন্ত্রিত্ব ও পৌরোহিত্য করিতে থাকেন। ঠিক এই সময় মাহিষ্য ব্রাহ্মণগণ এই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আসিয়া রাজরোষে পতিত হন ও ধীরে ধীরে সমাজেও সম্মান হারাইতে থাকেন। বলাই বাহুল্য তখন মাহিষ্য রাজগণের রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে, সহানুভূতি দেখাইবার তেমন আর কেহই নাই। তার পর যখন ৮৯১ বৎসর পূর্ব্বে ৯৫৪ শকে রাজা আদিশূর বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন তখন হইতে কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই মাহিষ্য ব্রাহ্মণগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অসিতেছিলেন। কিন্তু যখন ১১০৭ শকে রাজা শ্যামলবর্ম্মদেব দ্রাবিড় হইতে একদল বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তখন হইতেই ধীরে ধীরে ইঁহারা উক্ত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈদিক সমাজে মিশিতে পারেন নাই এমন এক দল এখনও বাংলা দেশে স্থানে স্থানে দেখা যায়, ইঁহারাই পশ্চিমবঙ্গে "দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ" নামে অভিহিত।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

মানসী

তোমার গণ্ডের
বসোরা-গুল-রাগে
আমার মর্ম্মের
কামনা ফুল জাগে!
কাজল-চোখের
সজল ছলছলে
উজল বক্ষের
বেদনা উচ্ছলে!
কোমল চরণের
নূপুরে প্রাণ দিয়া
আমার বন্দনা
উঠিছে ছন্দিয়া!

তোমার কণ্ঠের
করুণ সুর ছাপি'
আমার কম্পিত
ভাষা যে যায় কাঁপি'!
ললিত অঙ্গের
মাধুরী-হিন্দোলে
আবেশ-বিহ্বল
দোদুল মন দোলে!
তোমার সঙ্গীত,
উছল রূপরাশি,
আমার প্রাণ সে যে,
আমার গান হাসি!

শ্রী পরিমলকুমার ঘোষ



গান

আমার আঁধার ভাল,—আলোর কাছে
বিকিয়ে দেবে আপনাকে সে।
আলোরে যে লোপ করে' খায়
সেই কুয়াসা সর্ব্বনেশে।
অবুঝ শিশু মায়ের ঘরে
সহজ মনে বিহার করে,
অভিমানী জ্ঞানী তোমার
বাহির দ্বারে ঠেকে এসে॥
তোমার পথ আপনায় আপনি দেখায়,
তাই বেয়ে, মা, চল্‌ব সোজা।
যারা পথ দেখাবার ভিড় করে গো
তারা শুধু বাড়ায় খোঁজা।
ওরা ডেকে আনে পূজার ছলে—
এসে দেখি দেউল-তলে
আপন মনের বিকারটাকে
সাজিয়ে রাখে ছদ্মবেশে॥

২

কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি
আঁধার তোমার সবই মিছে।
ভরসা কি তোর সাম্‌নে শুধু?
না হয় আমায় রাখ্‌বি পিছে॥
আমায় দূরে যেই তাড়াবি,
সেই ত রে তোর কাজ বাড়াবি,
তোমায় নীচে নাম্‌তে হবে
আমায় যদি ফেলিস্ নীচে॥
যাচাই করে' নিবি মোরে
এই খেলা কি খেল্‌বি ওরে?
যে তোর হাত জানে না মারকে জানে
ভয় জেগে রয় তাহার প্রাণে,
যে তোর হাত জানে না মারকে জানে
ভয় লেগে রয় তাহার প্রাণে,
যে তোর মারকে ছেড়ে হাতকে দেখে
আসল জানা সেই জানিছে॥

(উপাসনা, ভাদ্র) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয়, আয়, আয়,
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।
উড়ে-যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়।
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয়, আয়, আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়।

(প্রাচী, ভাদ্র) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

কদম্বেরি কানন ঘেরি'
আষাঢ় মেঘের ছায়া খেলে।
পিয়ালগুলি নাটের ঠাটে হাওয়ায় হেলে।
বরষণের পরশনে
শিহর লাগে বনে বনে,
বিরহী এই মন যে আমার
সুদূর পানে পাখা মেলে।
আকাশপথে বলাকা ধায়
কোন সে অকারণের বেগে,
পূব হাওয়াতে ঢেউ খেলে যায়
ডানার গানের তুফান লেগে।
ঝিল্লিমুখর বাদল-সাঁঝে,
কে দেখা দেয় হৃদয় মাঝে,
স্বপনরূপে চুপে চুপে
ব্যথায় আমার চরণ ফেলে।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ভাদ্র) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

অগ্নিশিখা এস এস, আনো আনো আলো!
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো।
আনো শক্তি আনো দীপ্তি,
আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো।
এস পুণ্যপথ বেয়ে এস হে কল্যাণী।
শুভ সুপ্তি শুভ জাগরণ দেহ আনি'।
দুঃখরাতে মাতৃবেশে
জেগে থাকো নির্নিমেষে,
আনন্দ-উৎসবে তব শুভ্র হাসি ঢালো॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, ভাদ্র) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাপতি

বিদ্যাপতি বাঙ্গলার ও মিথিলার একজন আদিকবি।...সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহার গানে মুগ্ধ হইয়াছিল।...বিদ্যাপতির নকলে বাঙ্গালায় যে ভাষা হয়, তাহার নাম ব্রজবুলি। কিন্তু ব্রজ বা মথুরার সঙ্গে সে ভাষার কোন সম্পর্ক নাই। সেটা সে-কালের মৈথিলী ভাষার অনুকরণ মাত্র।...

চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ধর্ম্মে গোড়া হইতেই দুইটি দল হয়। একটির নাম গোস্বামীমত, অপরটির নাম সহজিয়া। গোস্বামীমতের লোকেরা মুখে বেদ মানিত কিন্তু কখনও পড়িত না, যাহারা বড় পণ্ডিত হইত তাহারা গীতা ও ব্রহ্মসূত্র পড়িত। কিন্তু ভাগবতই তাহাদের প্রধান পুঁথি।...সহজিয়ারা সংস্কৃত পুঁথির দিক্ দিয়া বড় যাইত না, তাহারা মনে করিত নিজের দেহেতেই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে, দেহের সেবাই তাহাদের পরমার্থ। স্ত্রীলোকের প্রেম হইতেই তাহারা বিশ্বপ্রেমে যাইতে চেষ্টা করিত।...বিদ্যাপতিকে সহজিয়ারা সহজিয়া ভাব হইতেই দেখিত। তাহারা উঁহাকে সাতজন রসিক ভক্তের একজন বলিয়া মনে করিত।...

বিদ্যাপতি কিন্তু সহজিয়াও ছিলেন না, বৈষ্ণবও ছিলেন না। তিনি মিথিলা বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের ব্রাহ্মণের ন্যায় স্মার্ত্ত ও পঞ্চোপাসক ছিলেন—অর্থাৎ স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন এবং গণেশ সূর্য্য শিব বিষ্ণু ও দুর্গা এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেকেই শিবের মন্দির দিয়া গিয়াছিলেন, তিনিও নিজের গ্রাম বিসপীতে শিবের মন্দির দিয়াছিলেন।...গঙ্গার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পাল্কী করিয়া গঙ্গার তীরে যাইতেছিলেন, পথে আর সময় নাই, অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া তিনি পাল্কী নামাইতে বলিলেন এবং মাটিতে বিছানা করিয়া শুইলেন। এমন সময় দূরে একটা জলস্রোতের শব্দ হইল; দেখা গেল, গঙ্গা স্রোতস্বিনী হইয়া বেগে সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই জলেই তাঁহার অন্তর্জলী হইল। তিনি যেমন কৃষ্ণরাধার প্রেমের অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন তেমনি শিব ও গঙ্গার বিষয়ে অনেক পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি শৈবসর্ব্বস্বসার নামে একখানি স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহাতে স্মৃতির মতে শিবপূজার যত বিধান আছে সব দেওয়া আছে। গঙ্গাবাক্যাবলী নামে আর-একখানি স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, উহাতে হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার কোন্ তীর্থে কোন্ তীর্থকৃত্য করিতে হয় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালে নানারূপ দান চলিত ছিল। তাহার মধ্যে ষোড়শ দান অতি প্রসিদ্ধ। এই ষোড়শ দানের মধ্যে আবার তুলাপুরুষ দান সর্ব্বপ্রধান। বিদ্যাপতি দানবাক্যাবলী নামে এক স্মৃতির গ্রন্থ লিখিয়া এই সকল দানের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয় করিয়া যান। বারমাসে তের পার্ব্বণ সকলেই জানেন। তিনি এই তের পার্ব্বণের এক বই লেখেন, তাহার নাম বর্ষক্রিয়া। দায়ভাগেরও তাঁহার এক বই আছে, নাম "বিভাগসার"।

পুরাণেও তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি যখন শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের সঙ্গে নৈমিষারণ্যে বাস করিতেছিলেন সেই সময় কোশল মিথিলা কাশী প্রয়াগ প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান গ্রাম ও নগরগুলির একটি বিবরণ লিখিয়া যান। উহার নাম ভূপরিক্রমা। উহা এখনকার গেজেটিয়ারের মত। কিন্তু পুরাণের সঙ্গে না মিলাইলে ত উহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না, তাই তিনি লিখিয়াছেন যে বলরাম শাপগ্রস্ত হইলে শাপ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য যে-সকল দেশে ও যে সকল তীর্থে গমন করেন তাহারই বিবরণ লইয়া তিনি লিখিতেছেন।

তাঁহার নিজের সময়েরও অনেক ঘটনা তিনি তাঁহার পুরুষপরীক্ষায় লিখিয়া গিয়াছেন। পুরুষপরীক্ষা একরকম গল্পগুচ্ছ বলিলেও হয়।...উহাতে মামুদগজনীর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির সময় পর্য্যন্ত অনেক সত্য ঘটনা পাওয়া যায়। যাঁহারা পুরুষ, যাঁহাদের পুরুষের মত সদ্গুণ ছিল, তাঁহাদেরই গল্প পুরুষপরীক্ষায় পাওয়া যায়। মুসলমানেরা এদেশ জয় করিলে তাঁহারা হিন্দুদের সঙ্গে—বিশেষ হিন্দু বীরপুরুষদের সঙ্গে—কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহার অনেক দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এই সময়কার ভারতবর্ষের ইতিহাস ভাল করিয়া বুঝিতে চান, পুরুষপরীক্ষা তাঁহাদের পক্ষে বড় দরকার।

বিদ্যাপতির আর-একখানি অতি সুন্দর বই লিখনাবলী অর্থাৎ পত্র লিখিবার ধারা। কাহাকে পত্র লিখিতে হইলে কিরূপ পাঠ দেওয়া দরকার, তাহা এই পুস্তকে খুব ভাল করিয়া দেওয়া আছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সে-কালের অনেক রাজারাজড়া ও বড় বড় লোকের নাম আছে।

তখন ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে দুর্গাপূজাটা খুব চলিয়া আসিতেছিল। আমাদের দেশের সাহড়িয়া গাঞীয়ের মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি দুর্গোৎসব-বিবেক নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব দুর্গাপূজার আর-একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রমাণে ও প্রয়োগে এই দুই পুস্তক অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। এইসকল স্মৃতির গ্রন্থ লিখিতে বিদ্যাপতিকে সমস্ত বেদ পুরাণ স্মৃতি পড়িতে হইয়াছিল, কেননা তিনি যাহা কিছু বলিয়াছিলেন সকলেরই প্রমাণ দিয়াছেন।...

প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়া যুক্তবেণী হইয়াছিল। কিন্তু সপ্তগ্রামে গিয়া আবার তিনটি নদী যে মুক্তবেণী হইলেন সে-কথা বিদ্যাপতি প্রথম প্রচার করিয়া যান। প্রথম মুসলমান আক্রমণের প্রবল স্রোতে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম একপ্রকার লোপ হইয়া আসে। মৈথিল পণ্ডিতেরা নানা গ্রন্থ রচনা করিয়া আবার হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করেন। বিদ্যাপতি এই সকল মৈথিল পণ্ডিতদের একজন প্রধান।...

যে সময় মুসলমানেরা কুরুক্ষেত্র, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, এমন কি কাশী পর্য্যন্ত লোপ করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সময় বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়া নানা গ্রন্থ লিখিয়া অনেক তীর্থের পুনঃসংস্থাপন ও অনেক হিন্দু সৎকর্ম্মের পুনঃপ্রচলন করেন। তিনি ও তাঁহার সহযোগী মৈথিল পণ্ডিতদিগের নিকট হিন্দু-সমাজ চিরদিন ঋণী থাকিবে। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা হিন্দুদিগের ক্রিয়াকাণ্ড ও তীর্থ সম্বন্ধে বই লিখিতে গেলেই তাঁহাদিগকে বিদ্যাপতির দোহাই দিতে হইয়াছে।...

বিদ্যাপতির বংশ পণ্ডিতের বংশ।...বিদ্যাপতির অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ কর্ম্মাদিত্য ঠাকুরের নাম পঞ্জীতে এইরূপ পাওয়া যায়—গড়বিসপী-নিবাসী কর্ম্মাদিত্য ত্রিপাঠী; মিথিলায় তিলকেশ্বর নামক শিব-মঠে কীর্ত্তিশিলায় কর্ম্মাদিত্যের নাম উৎকীর্ণ আছে। কাল—অব্দে নেত্রে শশাঙ্ক পক্ষ গদিতে শ্রীলক্ষ্মণ-ক্ষ্মাপতে অর্থাৎ ২১৩ লসং [ইসবী ১৩২৯ সাল]। কর্ম্মাদিত্যের পুত্র সান্ধি-বিগ্রহিক অর্থাৎ সন্ধি বিগ্রহ করিবার ক্ষমতা-প্রাপ্ত মন্ত্রী দেবাদিত্য বিদ্যাপতির পিতামহের সম্বন্ধে ভ্রাতা জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য। ইনি সংস্কৃত ভাষায় পঞ্চসায়কগ্রন্থকর্ত্তা ও ধূর্ত্তসমাগম প্রহসন কর্ত্তা এবং মিথিলার ভাষায় বর্ণন-রত্নাকর নামক প্রথম গদ্যগ্রন্থ-রচয়িতা। প্রপিতামহের ভ্রাতা দশকর্ম্মপদ্ধতি-কর্ত্তা মহামহত্তক বীরেশ্বর ঠাকুর রাজমন্ত্রী ছিলেন। বীরেশ্বরের পুত্র

সুপ্রসিদ্ধ মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক চণ্ডেশ্বর। ইনি সপ্তরত্নাকর, কৃত্যচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।…

চণ্ডেশ্বর তুলাপুরুষ দান করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন এরূপ প্রবাদ আছে। রত্নাকর সপ্ত—কৃত্য, দান, ব্যবহার, শুদ্ধি, পূজা, বিবাদ, গৃহস্থ ; তন্মধ্যে বিবাদ-রত্নাকর আমাদের দেশের প্রামাণিক গ্রন্থ এবং ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

বীরেশ্বরের আর-এক ভ্রাতুষ্পুত্র রামদত্ত উপাধ্যায় কর্ম্মপদ্ধতিকর্ত্তা। দুইজনের গ্রন্থ একত্র মিথিলায় মুদ্রিত হইয়াছে।

বিদ্যাপতির পিতা গণপতি ঠাকুর দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে শিবসিংহের পিতার অগ্রজ রাজা শ্রীগণেশ্বরের নাম আছে। গণপতি ঠাকুর গণেশ্বরের সভাপণ্ডিত ছিলেন।…

মিথিলায় তখন ব্রাহ্মণ রাজা। ইঁহারা এককালে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের গুরু ছিলেন। পরে ইঁহারাই রাজা হইয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পূর্ব্ব-পুরুষেরা ক্ষত্রিয় রাজাদিগের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ব্রাহ্মণ-বংশেরও তাঁহারা দক্ষিণ হস্তই ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজেও অনেক রাজার অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। প্রথম কীর্ত্তিসিংহ, তার পর দেবসিংহ, তার পর শিবসিংহ, তার পর পদ্মসিংহ, তার পর হরসিংহ, তার পর নরসিংহদেব। তার পর ধীরসিংহ। বিদ্যাপতি ইঁহাদের সকলেরই রাজ সভাসদ্ ও পণ্ডিত ছিলেন।

কীর্ত্তিসিংহের রাজত্বের ঠিক পূর্ব্বেই মুসলমানেরা তিরহুত দখল করিয়া লয় এবং তিরহুতে অরাজকতা উপস্থিত হয়। হিন্দু সমাজ লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। কীর্ত্তিসিংহ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন এবং আবার হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন করিতে আরম্ভ করেন।…সমাজ-গঠনের ভারটা দীর্ঘজীবী বিদ্যাপতির উপরই পড়িয়াছিল।…

বিদ্যাপতির শেষ সংস্কৃত গ্রন্থ "গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী" তিরহুতের রাজা বীরসিংহের সময় লেখা হয়। সেটি ১৫ শতকের মাঝামাঝি অর্থাৎ প্রায় ১৪৫০ সালের।…বিদ্যাপতি প্রায় ১০০ শত বৎসর বয়সে ঐ পুস্তক লেখেন।…

সহজিয়ারা যে বলিয়া থাকে বিদ্যাপতি রসিক ভক্ত ছিলেন, লখিমাদেবী তাঁহার প্রেমপাত্রী, একথাটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ বিদ্যাপতি শুধু শিবসিংহ ও লখিমাদেবীরই ভণিতা দেন নাই, ভোগীশ্বর ও তাঁহার রাণীর ভণিতা দিয়াছেন ; দেবসিংহ ও তাঁহার রাণীর ভণিতা দিয়াছেন; শিবসিংহ ও তাঁহার অন্যান্য রাণীর ভণিতা দিয়াছেন; তিরহুতের অনেক বড় বড় রাজকর্ম্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারের নামে ভণিতা দিয়াছেন ; এমন কি হুসেন শাহের নামেও ভণিতা দিয়াছেন। সুতরাং ভণিতায় রাণীদের নাম দেখিয়া বিদ্যাপতিকে সহজিয়া ঠাওরান যুক্তিযুক্ত নয়।…বিদ্যাপতির পুত্রপৌত্রেরা বেশ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্রবধূও গান লিখিয়াছেন শুনা যায়।

বিদ্যাপতি পণ্ডিত।…তিরহুতের রাজাদের একজন প্রধান সভাসদ্ এবং হিন্দুসমাজের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প।…তিনি কবি।…তিনি ইতিহাস লিখিতেছেন। কীর্ত্তিসিংহ কেমন করিয়া পিতৃবৈরীনাশ করিয়া রাজ্য উদ্ধার করিলেন, শিবসিংহ কেমন করিয়া স্বাধীন হইলেন, দেবসিংহের মৃত্যুর পর কেমন করিয়া সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শিবসিংহ রাজ্য লাভ করিলেন, তাহার ইতিহাসের গান-গুলি তাঁহার কীর্ত্তিলতা ও কীর্ত্তি-পতাকা তাঁহাকে ভারতবর্ষের একজন প্রধান ইতিহাস-লেখক করিয়া তুলিয়াছে।…একটা জিনিষ কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য—বিদ্যাপতি সংস্কৃতে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে স্মৃতি অর্থাৎ হিঁদুয়ানী ত আছেই, তার উপর শিব আছেন, দুর্গা আছেন, গঙ্গা আছেন ; কৃষ্ণ বা বিষ্ণু একেবারেই নাই। আবার মৈথিল ভাষায় যে গান লিখিয়াছেন তাহাতে শিবও আছেন, সেই সঙ্গে দুর্গাও আছেন, গঙ্গাও আছেন, বেশীর ভাগ কৃষ্ণরাধা আছেন! ইহার অর্থ কি? যখন পণ্ডিত হইয়া সংস্কৃতে লিখিতেছেন তখন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর নামও করেন নাই, কিন্তু যখন মৈথিলী ভাষায় লিখিতেছেন তখন রাধা ও মাধবে ভরপুর। ইহার অর্থ ঠিক বোঝা যায় না।…

কীর্ত্তনের গান বিদ্যাপতির সময় হয় নাই। উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি রসশাস্ত্রের বই খুব প্রচলিত হইয়া গেলেই বৈষ্ণব-সমাজে ইদানীন্তন কীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়।…বিদ্যাপতির অন্ততঃ দুইশত বৎসর পরে।…বিদ্যাপতির অনেক গানে রাধাকৃষ্ণের নামও নাই, গন্ধও নাই।…মিথিলায় প্রবাদ আছে, কামিনী করএ সনানে গানটি কোন বাদসাহের ফরমায়েসী।…

ফরমায়েসী গান বিদ্যাপতি নিজেও যে সকল লিখিয়াছেন তাহার অনেকই মাত্র আদি রসের, রাধাকৃষ্ণ বা বৈষ্ণবের পদ নয়।…

সংস্কৃত অলঙ্কারে যত কিছু কবিপ্রৌঢ়োক্তি আছে, যত চলিত উপমা আছে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তাঁহার গানগুলিতে সেগুলির প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। হালাসপ্তসতী, আর্য্যাসপ্তসতী, অমরুশতক, শৃঙ্গার-তিলক, শৃঙ্গারশতক, শৃঙ্গারাষ্টক প্রভৃতি সংস্কৃত এবং প্রাকৃত আদিরসের কবিতাগুচ্ছ হইতে বিদ্যাপতি আপনার গানের যথেষ্ট ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক সময় পড়িতে পড়িতে সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোক মনে পড়ে।…শুধুই যে সংস্কৃত উপমা বিদ্যাপতির সম্বল, তাহা নহে, তাঁহার নিজের উপমাও আছে।…বিদ্যাপতির নিজস্ব কিন্তু সাজানর তারিফ। তাহাতে একটা নূতনত্ব আছে, পড়িলেই মুগ্ধ হইতে হয়।…গানের ভিতর ভাবগুলিসাজান বিদ্যাপতির নিজেরই। সে অতি সুন্দর। বিদ্যাপতি বহির্জগতেই হউক, আর অন্তর্জগতেই হউক, সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলি বাছিয়া লইয়া সাজাইবার সময় সুন্দরতর সুন্দরতম করিয়া তুলিয়াছেন।…

বিদ্যাপতি অনেক জায়গায় ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা অতি মিষ্ট, সুর অতি মিষ্ট, সংস্কৃত ঋতু বর্ণনার যা কিছু মিষ্ট আছে সব আনিয়া এক করা হইয়াছে। গানগুলি কিন্তু ছোট। একটা পুরা কিছুর বর্ণনা ভাল করিয়া করিতে গেলে যতটুকু জায়গা চাই, গানে ততটুকু জায়গা পাওয়া যায় না। সুতরাং দু' চারিটি অতি মিষ্ট জিনিস একত্র করিয়া গানটি শেষ করিতে হইয়াছে। বেশী কথা বলিবার জায়গা নাই, সুতরাং যাহারা সংস্কৃত পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সুর আর ভাষা ছাড়া নূতন জিনিষ কিছুই নাই। কেবল সেই সংস্কৃত কবিতার স্মৃতি জাগাইয়া দিয়াই গান থামিয়া যায়।…

তিনি সৌন্দর্য্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

(প্রাচী, ভাদ্র) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

—

পল্‌টুদাস

প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন অযোধ্যায় নবাব সুজা-উদ্দৌলা ও দিল্লীতে সাহ-আলম বিরাজ করিতেছিলেন, তখন অযোধ্যার ভক্ত সাধকগণের হৃদয়-সিংহাসনে এক মহাভক্তের রাজত্ব চলিতেছিল। তিনিই ভক্ত পল্‌টুদাস।…

পল্‌টু অযোধ্যার নগাজলালপুর গ্রামের কান্দু বাণিয়া নামে এক গ্রাম্য দোকানীর ছেলে।…

অযোধ্যাবাসী ভক্ত গোবিন্দদাসের কাছে পল্‌টু উপদেশ লাভ করেন।…তিনি

"চারবরণ-কো মেটি কে ভক্তি চলাঈ মূল।
গোবিন্দ গুরুকে বাগমেঁ পল্‌টু ফলে ফল॥

সহর জলালপুর মূড় মূড়ায়া অরধ তুড়া করধনিয়া।
সহজ করৈ ব্যাপার ঘটমে পলটু নিগুণ বণিয়া॥"

"তিনি ধর্ম্ম-সাধনাতে জাতি-ভেদকে মিটাইয়া ভক্তিকেই মূল বলিয়া চালাইলেন, ভক্ত গোবিন্দের সাধনার উদ্যানে পলটু-ফুলটি বিকশিত হইল। জালালপুর সহরে ইনি মাথা মুড়াইয়া অযোধ্যাতে কোমরের ঘুনসী ছিঁড়িয়া সাধনা গ্রহণ করিলেন। পলটু জাতে বেণে গুণহীন, সে আপন দেহের মধ্যেই সাধনা করিতে লাগিল। আর সহজ-সাধনাতেই সে সিদ্ধি পাইল ও সংসারে সহজ-ভাবেই সে চলিতে লাগিল।"

সাধক মধ্যযুগে নিজ দেহকে মন্দির ও সাধনার ক্ষেত্র মনে করিয়া দেহের মধ্যেই সব সাধনা করিতেন। ধর্ম্ম যে একটা আশমানী বস্তু নয়, এই দেহেই তাহার সহজ ক্ষেত্র ও ক্রমবিকাশের সব "বাট" আছে, ইহা বুঝিতে পারাতে ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক হইয়া আসিল।...তখন প্রায় সব সাধকই অতিহীন বা অস্পৃশ্য কুলের—তাঁহার দেহ কেহ ছোঁয় না। দেহটার অপমান যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন দেহেই তাঁহারা তীর্থকে পাইয়া একেবারে ধন্য হইয়া গেলেন, মানুষ যাহা ছুঁইতে চায় না সেখানে ব্রহ্মযোগের সাধন-কমল ফুটাইলেন। সব অপমান ধন্য হইয়া গেল।

ইনি সাধক হইলেন, তবু কবীর প্রভৃতির মত গৃহস্থও রহিলেন। গৃহ ও সাধনার মধ্যে যে কোনো নিত্য-বিরোধ আছে তাহা তিনি মানিতেন না। "ঘটের মধ্যে সহজ সাধনা" করার সঙ্গে বাহিরেও সহজ-ভাবে সংসারী রহিলেন। সংসার ছাড়িয়া সংসারকে অপমান করিয়া কোনো উৎকট বৈরাগ্যে আপনাকে ভুলাইলেন না—তাই ভজনাবলীতে আছে "সহজ করে বৈরাগ"।

এখনও নগপুরজলালপুর গ্রামে ইঁহার বংশধরেরা বাস করেন।

পলটুর নিজের লেখাতে তাঁর কিছু কিছু আত্ম-পরিচয় মেলে—...

"পলটুদাস ইক বাণিয়া রহৈ অরধ-কে বীচ"

"পলটুদাস তো অযোধ্যাবাসী এক বেণের ছেলে মাত্র"।

"পলটু জাতি ন নীচ মোসম ঔগুণকী খান।
নামকেরে প্রতাপসোঁ। ভাঙ্গ আনকী আন॥"

"আমি পলটু, আমার সমান নীচ জাতি আর কে? সকল অ-গুণের আধার আমি, কেবল নামের প্রতাপেই আমি যা-কিছু মনুষ্যত্ব পাইয়াছি।"...

বাল্যকালে বসন্ত-রোগে তাঁর মুখখানা একেবারে শ্রীহীন হইয়া যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"শকলদার মেঁ নহী নীচ ফির জাতি হমারী"—

"আমি মোটেই সুন্দর নই, তার উপর জাতিও আমার নীচ।" কেবল...

"সন্তনামকে লিহেসে পলটু ভয়া গংভীর"—"সত্য নামের প্রতাপে আমার রূপের মধ্যে একটি গম্ভীরতা তোমরা দেখিতে পাইতেছ।" তাঁহার সৌন্দর্য্য না থাকিলেও একটি বড় পবিত্র মাধুর্য্য ও গম্ভীরতা তাঁর রূপে ছিল।

তিনি বিবাহিত গৃহস্থ হইয়া খুব শান্ত পবিত্র ও সাদাসিধা ভাবে সংসার করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"ভীখ ন মাংগে সংতজন কহৈ পলটুদাস'

পলটুদাস বলেন, সাধক কখনও ভিখারী বৈরাগী হইবেন না। তিনি আপন অন্ন আপনিই করিয়া খাইবেন। বিনা প্রয়োজনে কেন অন্যের বোঝা হইবেন?

আর পেশাদার ধার্ম্মিক হইলেই নানা কু আসিয়া জোটে। এজন্য তিনি সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিলেও তখনকার ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী পুরোহিত মুল্লা বা পণ্ডিতদের দেখিতে পারিতেন না। তাই তিনি আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

"মন সব-কো হরি লেয় সজন-কো রাখৈ রাজী
তীন না দেখ দেখ সকৈ বৈরাগী পংডিত কাজী।"

"সবার মনই পলটু হরিতে পারিল, সবাইকে সে প্রসন্ন করিতে পারিল, কেবল এই তিনটি সে দেখিতে পারে না—বৈরাগী, পণ্ডিত আর কাজী।"

নিন্দা তাঁহাকে অনেক সহিতে হইয়াছে, কিন্তু নিন্দকদের উপর তাঁর একটুও রাগ ছিল না।

"ঔর-কো মৈঁ নহি জানতা হুঁ নিন্দক সাহব মেরা হৈ জী"।

"অন্যদের কথা বলিতে পারি না—তবে নিন্দক মহাশয় আমার বড় আপনার লোক—সবাই আমাকে পরিত্যাগ করিলেও তিনি আমাকে ছাড়িবেন না।"

"দেখিকে নিন্দকহি করৌ পরনাম মৈঁ,
ধন্য মহারাজ তুম ভক্তি ধোয়া।
কিয়া নিস্তার তুম আয় সংসারমেঁ
ভক্তকে মৈল বিনদাম ধোয়া॥"

"নিন্দককে দেখিলেই আমি প্রণাম করি। হে মহাত্মন্, তুমি ধন্য, তুমিই জগতের ভক্তি ধুইয়া পবিত্র কর। সংসারে আসিয়া তুমি সাধকের নিস্তার করিয়াছ, ভক্তের ময়লা বিনা পয়সায় তুমি ধুইলে।"

"নিন্দক জীবৈ জুগন জুগ কাম হমারা হোয়—
কাম হমারা হোয় বিনা কৌড়ীকা চাকর।
কমর বাঁধকে ফিরৈ করৈ তিহুঁ লোক উজাগর।
উসে হমারী সোচ পলক ভর নাহি বিসারী
লগী রহৈ দিন রাত প্রেমসে দেতা গারী॥
সন্তনকো দৃঢ় করৈ জগতকো ভরম ছুড়াবৈ।
নিন্দক গুরু হমার নামকো রহী মিলাবৈ॥"

"নিন্দক যুগের পর যুগ বাঁচিয়া থাকুক, তবেই আমার কাম সিদ্ধ হইবে। আমারই কাজ সে সিদ্ধ করে-সে বিনা পয়সার চাকর, কোমর বাঁধিয়া সে নিত্য জাগ্রত থাকিয়া তিনলোককে জাগ্রত রাখে। আবার এক পলকও তার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, দিন রাত আমার সঙ্গে-সঙ্গেই সে আছে। কত প্রেম-ভরেই সে গালি দেয়। সেই সাধকদের দৃঢ় করিয়া তোলে, জগতের ভ্রম ও জগতের কাছে সম্মান পাইয়া সাধকের যে মোহ ও নেশা জন্মে তাহা দূর করিয়া দেয়। নিন্দক তো আমার গুরু। তাঁর কৃপাতেই তো নাম মেলে।'

"পলটু রে পরস্বারথী নিন্দক নর্ক ন জাহি।
নিন্দক রহৈ জো কুসল হমকো জোখোঁ নাহি॥'

"হে পলটু, নিন্দক বড়ই নিঃস্বার্থ, তারা কি কখনো নরকে যাইতে পারে? নিন্দক যদি কুশলে থাকে তবে আর আমার সাধনায় কোন আশঙ্কা নাই।"

তখন অনেকে পেটের দায়ে সন্ন্যাসী হইত—

"গিরহস্তী মেঁ জব রহে পেট কো রহে হৈরান।
পলটু হরিকী সরনমেঁ হাজির সব পকবান॥'

"গৃহস্থ-জীবনে যখন ছিলাম তখন পেটের দায়ে হয়রান ছিলাম, অন্ন জুটিত না। পলটু বলেন, হরির শরণে আসিয়া দেখি সব মিষ্টান্ন হাজির হইল।" পূর্ব্বে "সাগ মিল্যো বিন লোন রহী" একটু শাক মিলিলেও নুনটুকু জুটিত না।

আবার অনেক বৈরাগী ভিক্ষাও করিত আর ব্যবসাও চালাইত—

"সন্তে নহি অমাজ পরীদ কে রাখতে।

মহংগী-মে ডারৈ চোঙ্গনা চাহতে।
দেখো রহ বৈরাগ॥"

"শস্তার সময় শস্য কিনিয়া মহার্ঘ হইলে চারগুণ দাম আদায় করেন! দেখনা কেমন চমৎকার বৈরাগ্য!"

তারা "টকা ছঃ সাতকা" পাগড়ী পরিয়া "দুশালা রূপেয়া সাঠকা" গায়ে দিতেন! আবার "গোড় ধরা" অর্থাৎ পা পূজা করাইয়া দীক্ষা দিয়া বিলক্ষণ রোজগার করিতেন।

পলটু তাদের সোজাসুজি "সাচ্চা" কথা শুনাইয়া দিতেন। কাজেই
"সব বৈরাগী বটুরকে পলটু কিয়া অজাত"
"সব বৈরাগী মিলিয়া পলটুকে পংক্তি ও জাতির বাহির করিয়া দিল।"

"হম সব রহে মহন্ত তাহিকো কোউ ন মানৈ।
বনিয়া কালহিকা ভক্ত তাহি-কো সব কোই মানৈ॥"

"আমরা সব মহন্ত আছি, আমাদের কেহ মানে না। পলটু হইল বেনে, সে কালকার ভক্ত। সেই অর্ব্বাচীনকে সবাই কিনা মানে!"

পলটু কিছুই উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন—
"পলটু হমসে লড়ন-কো আবৈ সব সংসার।
বে বোলে হম চুপ রহৈ আপুই জাতে হার॥"

"পলটু বলেন, সবাই আমার সঙ্গে আসেন ঝগড়া করিতে, আমি কোন উত্তর না করিয়া চুপ করিয়া থাকি বলিয়া সবাই হারিয়া যায়।"

কিন্তু ইহাতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না। তিনি রাত্রে নিদ্রিত আছেন এমন সময় তাঁর কুটীরে আগুন লাগিল। যাঁরা উত্তর না পাইয়া বিফল-মনোরথ হইয়া যাইতেন তাঁরাই তাঁর উপর এই শোধ তুলিলেন। পলটু কোনমতে রক্ষা পাইলেন। তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তরকালের লোকেরা কেহ কেহ মনে করেন তিনি তাঁর সিদ্ধির গুণে নূতন দেহ লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। এই বিশ্বাসটি হওয়ার একটি হেতু পলটুর লেখাতেই আছে। পলটু লিখিয়াছেন "সুখের সব আগুন লাগিয়া যে ভস্ম হইল ইহাতেই তোমাকে ধন্য বলি আমার প্রভু। তুমি আমার পুরাতন জীর্ণ স্বরূপ—মলিন স্বরূপ—দগ্ধ করিয়া নূতন স্বরূপ দিলে। নমস্কার, তোমার দয়ায় নমস্কার।" ইহা আধ্যাত্মিক জীবনের কথা। তাঁর সম্প্রদায়ের উত্তরকালের লোকেরা ইহা ভুল বুঝিয়া, তাঁর ঘর পুড়িয়া গেলে তাঁর দেহ ভস্ম হইয়া নূতন দেহ হইয়াছিল, ইহাই বুঝাইলেন। ভাব-রসিকদের কথা স্থূল-বাদীদের হাতে পড়িয়া এমন বিড়ম্বনাই লাভ করে। কিন্তু পলটু এ সব কোনো দাবীই করেন নাই। তিনি দেখিলেন কিছুকাল তাঁর দূরে থাকাই উচিত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

"পলটু ঐসন বুঝকে চারদিয়া সব ভার।
লেত পরোসিন ঝোপড়া নিত উঠি বাঢ়ত রার॥"

"পলটু এমন বুঝিয়াই মাথার সব বোঝা নামাইয়া কহিল—হে প্রতিবেশী ভাইরা, তোমরাই আমার এই কুটীরখানি লও, কারণ দেখিতেছি ঝগড়া রোজই বাড়িয়া চলিতেছে।"

"পলটু কিছুকাল জগন্নাথ প্রভৃতি তীর্থ ও নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁর শত্রুরা বলিতে লাগিল—"দেখিলে! পলটুর নিজ দেশের প্রতি মমতা নাই। দেশে দেশে পূজা ও সম্মান কুড়াইতেছেন, অথচ নিজ দেশ অযোধ্যায় কত দুঃখ কত দুর্দ্দশা রহিয়াছে। অযোধ্যার প্রতি তাঁর দেখিতেছি কোনো মমতাই নাই। যেন অযোধ্যা ছাড়িতে পারাটাই সাধনা।"

আসল কথা, তারা পলটুকে দূরে যাইতে দিবে না। সামনে রাখিয়া দগ্ধাইয়া দগ্ধাইয়া মারিবে।

যাহা হউক, দীর্ঘকাল পরে উনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার ধীর ভাবে কাজ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যায় আসিয়া তিনি তাঁর কাজ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। সেখানে এখনও তাঁর সমাধিস্থান ও ভক্তসম্প্রদায় আছে।

ইঁহার ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মমত ও প্রেম প্রভৃতির উপদেশ অতি গভীর ও মধুর। যাঁহারা তাহা আলোচনা করিবেন তাঁহারাই তৃপ্ত হইবেন। এই জন্য ইঁহাকে কেহ কেহ দ্বিতীয় কবীর বলেন।

(প্রবাসী, ভাদ্র)   শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন

—

রামায়ণী যুগের ধাতু ও ধাতব শিল্প

মৌলিক ধাতুগুলির ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ধাতু গালাইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহারের উল্লেখ বেদে আছে। বেদে ধাতু গালান, মুদ্রা প্রস্তুত করণ, লৌহ কলস নির্ম্মাণ প্রভৃতির কথা আছে। (ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল—১৯, ২৭, ৩০, ৩৩, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৫৭ সূক্ত ও ৬ মণ্ডলের ২, ২৭, ৪৬, ৪৭, ৪৮ সূক্ত দ্রষ্টব্য।) শুক্ল যজুর্ব্বেদেও কতকগুলি ধাতুর কথা আছে। যথা—হিরণ্যং চমে; অয়শ্চমে; শ্যামং চমে; লোহং চমে; সীসং চমে; ত্রপু চমে; যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। (১৮।১৩)

রামায়ণে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র লৌহ সীসক পারদ ত্রপু প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সমাজ যে বহু প্রাচীন কাল হইতে এই-সকল ধাতুর বিষয় জানিত, তাহার প্রধান কারণ ভারতবর্ষে এই-সকল ধাতুর অধিকাংশেরই আকর বিদ্যমান ছিল।

দাক্ষিণাত্যের চিত্রকূট, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি অরণ্য প্রদেশের বর্ণনায় জানিতে পারা যায়—

শ্বেতাভিঃ কৃষ্ণতাম্রাভিঃ শিলাভিরুপশোভিতম্। ৭
নানা-ধাতু-সমাকীর্ণং নদী-দর্দ্দুর সংযুতম্। কি—২৭।
অন্যত্র—"বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশাধাতুবিভূষিতাঃ। ৬।২।৯৪

এই-সকল অঞ্চল ধাতুর আকরসমূহে পূর্ণ ছিল।

অযোধ্যার উত্তর প্রদেশেও ধাতুর আকর ছিল বলিয়া জানা যায়। ঐতিহাসিক যুগের বৈদেশিক ইতিহাসলেখকদিগের গ্রন্থে এবং মেগাস্থানিস প্রভৃতি প্রাচীন ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ-কাহিনীতেও এই-সকল ভারতীয় সম্পদের বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

ঐতিহাসিক প্লিনি লিখিয়াছেন—সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি ছিল। ইহা খৃঃ ১ম শতাব্দীর কথা। মেগাস্থানিস তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র লৌহ প্রভৃতির আকরের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর কথা। আধুনিক মোগল-ইতিহাস আইন-ই-আকবরিতেও ভারতবর্ষের ধাতুখনিসমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য এই-সকল বর্ণনা আধুনিক।

রামায়ণী যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার অত্যন্ত অধিক ছিল। সামান্য লোকের গৃহেও তখন কনক- ও রজত-নির্ম্মিত তৈজসপত্র ছিল। বিশিষ্ট প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে বর্ত্তমান সময়ে যেমন মর্ম্মর-প্রস্তরাদির বাহুল্য ব্যবহার দেখা যায়, সে-কালের রাজগৃহাদিতেও সেইরূপ জাঁকজমকের সহিত স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবহৃত হইত।

অযোধ্যায় রাম-ভবনের বহিরাঙ্গণে বেদিকাসমূহে স্বর্ণমূর্ত্তিসমূহ অবস্থিত ছিল।

স্বর্ণের বাহুল্য-ব্যবহারে রাক্ষসপুরী লঙ্কা ছিল কনক-লঙ্কা—স্বর্ণ-কিরীটিনী লঙ্কা। লঙ্কার চতুর্দ্দিকের প্রাচীর, গৃহ, গৃহের ছাদ, কুট্টিম (মেজে), এমন কি সোপানগুলি পর্য্যন্ত স্বর্ণময় ছিল। রাবণ সীতাকে

লইয়া সর্ব্বপ্রথমে লঙ্কার যে গৃহে যাইয়া উপনীত হইয়াছিল, তাহাতে ধাতব শিল্পের এবং মণি মাণিক্য ও স্ফটিক সমাবেশের বিশেষ বিচিত্রতা লক্ষিত হইয়াছিল। "রাবণ শোকদীনা বিবশা সীতাকে বলপূর্ব্বক লইয়া হর্ম্ম্যমালাসমন্বিত অন্তঃপুরের দুন্দুভি-শব্দে মুখরিত কনক-নির্ম্মিত সোপান-পথে আরোহণ করিল। সেই কনক-সোপান হস্তীদন্ত সুবর্ণ রজত ও স্ফটিকে নির্ম্মিত মনোহর স্তম্ভমালার উপর স্থাপিত। সেই স্তম্ভগুলির গাত্রও আবার বজ্রমণি ও বৈদুর্য্যমণিতে খচিত। সেই গৃহের গজদন্ত ও রজতে নির্ম্মিত গবাক্ষগুলি স্বর্ণজালে বিমণ্ডিত ছিল।"

লঙ্কার বর্ণনার প্রায় সর্ব্বত্রই স্বর্ণ- ও রৌপ্য-শিল্পের এইরূপ উচ্চ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তখন সাধারণের ব্যবহার্য্য অনেক জিনিস এবং যুদ্ধাস্ত্রগুলি লৌহ-নির্ম্মিত ছিল।

শকটের উল্লেখ রামায়ণে আছে। যথা—শকটা শতমাক্রান্ত (বালকাণ্ড ৩১ সর্গ)। শকট রথ প্রভৃতি যানগুলি লৌহ কীলকের সাহায্যে প্রস্তুত হইত।

ধাতুনির্ম্মিত যে-সকল দ্রব্যের নাম রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার কতকগুলি নিম্নে প্রদান করা গেল।

ধাতুনির্ম্মিত পশুমূর্ত্তি (অ ১৫), কনকনির্ম্মিত মূর্ত্তি (অ ১৪), কাঞ্চন-নির্ম্মিত মণি-খচিত সিংহাসন (অ ৩), স্বর্ণ ও রৌপ্য বেদিকা (অ ১০), সুবর্ণের ভদ্রাসন (অ ২৬), স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ স্ফটিক-ধবল চামর (ল ১১), (অ ২৬), স্বর্ণময় রথ (বা ৫৩), হস্তী ও অশ্বের লৌহ বর্ম্ম (ল ৭৪), স্বর্ণরজ্জু (ল ১২৮), কাঞ্চন কবচ (আ ৬৪), স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ (আ ৪৩), স্বর্ণ কিরীট (সু ১০), স্বর্ণ ও রজত মুদ্রা (অ ৩০), স্বর্ণ কমণ্ডলু (সু ১), স্বর্ণ কলসী (সু ১১), স্বর্ণ পাত্র (সু ১) স্বর্ণ প্রদীপ (সু ১১), স্বর্ণঘট্টা (ল ৯০), স্বর্ণময় হস্তপ্রক্ষালন-পাত্র (অ ৯১), রজতনির্ম্মিত ভোজন-পাত্র (বা ৫৩), কাংস্যময় দোহন-পাত্র (বা ৭২), স্বর্ণাসন (সু ১), ভৃঙ্গার (অ ১৪), রৌপ্য পল্লব (ল ৬৫), ইত্যাদি।

স্বর্ণ- ও রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্যাদির উল্লেখ ব্যতীত রামায়ণে অন্য হীন ধাতু-দ্রব্যের উল্লেখ বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে রামায়ণ রাজপরিবারেরই ইতিহাস। অযোধ্যা, লঙ্কা ও কিষ্কিন্ধ্যার বিভব বর্ণনায়ই রামায়ণ পূর্ণ; দরিদ্র-জীবনের কথা ইহাতে নাই। যুদ্ধাস্ত্রগুলি বোধ হয় সকলি লৌহ-নির্ম্মিত ছিল।

রামায়ণী যুগে এক ধাতুর সহিত অন্য ধাতুর মিশ্রণ দ্বারা যৌগিক ধাতু প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল কি না তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায় না। আমরা উপরে যে-সকল ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে কাংস্যদোহনার উল্লেখ আছে। কাংস্য একটি যৌগিক ধাতু। বালকাণ্ডের ৭২ সর্গে আছে—পুত্রাদির বিবাহ অন্তে গৃহে যাইয়া রাজা দশরথ চারিজন ব্রাহ্মণকে বৎস ও কাংস্য দোহনভাণ্ড সহ গাভী দান করিয়াছিলেন। সুতরাং এই যৌগিকধাতুটির কথা আমরা রামায়ণে পাই।

কোন বৈদিক সাহিত্যে কাংস্যের উল্লেখ নাই। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক সুশ্রুতের নামে যে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীন গ্রন্থ প্রচলিত আছে, সেই সুপ্রাচীন "সুশ্রুতে" কাংস্যের উল্লেখ আছে। (সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪৬ অঃ ৩৬৩ শ্লোক।)

প্রাচীন ভারতে তামা ও টিন (ত্রপু) পরিচিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে এই দুটি ধাতুর পরস্পর যোগে যে কাংস্য উৎপন্ন হয় তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—ত্রপুতাম্রয়োঃ সংযোগে ধাতুস্তরস্তু কাংস্যস্যোৎপত্তি।"

পিত্তল আর-একটি যৌগিক ধাতু। তাহা দস্তা ও তামার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। আরণ্য কাণ্ডের ২৯ সর্গে রূপক ভাবে পিত্তলের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। নিশাচর খর ক্রুদ্ধ হইয়া রামকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহার এক অংশে আছে:—তুষাগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ-প্রতিরূপ পিত্তলের যেমন মালিন্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ আত্মশ্লাঘায় কেবল তোর লঘুতাই দৃষ্ট হইতেছে।" সুবর্ণপ্রতিরূপ অর্থে তান্ত্রিক যুগে আধুনিক পিত্তলকে বুঝাইত।

রামায়ণে পারদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় না। পারার সংযোগে আধুনিক কালে সিন্দুর প্রস্তুত হয়; রামায়ণে সিন্দুরের উল্লেখ নাই। তখন মহিলারা সিন্দুর ব্যবহার করিত না; আধুনিক যাত্রাগানের শ্রীকৃষ্ণের মত গণ্ড পার্শ্বে রক্তবর্ণ মনঃশিলার তিলক ব্যবহার করিত। সীতা হনুমানকে বলিতেছেন (৫। সু ৪০):—রাম যে মনঃশিলা দিয়া আমার গণ্ডপার্শ্বে তিলক করিয়া দিয়াছিলেন এই কথাটি রামকে স্মরণ করাইয়া দিও। মনঃশিলাও একটি রক্তবর্ণ গিরিজ-ধাতু বিশেষ।

পারদ হইতে সিন্দুরের উৎপত্তি সুশ্রুতের যুগে হইয়াছিল। কাঁচের উল্লেখও সুশ্রুতে আছে (সুশ্রুত—সূত্রস্থান, ৪৬অঃ ৫০৪ শ্লোক)। কিন্তু রামায়ণে নাই।

রামায়ণে দর্পণের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহা ধাতু-নির্ম্মিত কি স্ফটিক-নির্ম্মিত—তাহার আভাস কোন স্থানেই নাই। (বঙ্গীয় সমাজে বিবাহাদি ক্রিয়ায় এখনও বর-কন্যারা নবসুন্দরের প্রদত্ত ধাতু-নির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্ববাঙ্গালার কুমারী কন্যারা মাঘ মাসে মাঘমণ্ডল পূজিতে যাইয়া চিত্রিত দর্পণ পূজা করে ও মন্ত্র জপে—

> আমি পূজিতেছি গুঁড়ির আয়না।
> আমার জন্যে যেন হয় অভ্রের আয়না॥

প্রাচীন দর্পণের কথা চিন্তা করিতে পাঠক এই ছুটি কথাও একটু ভাবিবেন।)

কাচ ও স্ফটিক এক নহে। স্ফটিক আকরিক মহামূল্য প্রস্তর; বালি ও ক্ষারে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থ কাচ। কাচকে দর্পণে পরিণত করিতে পারদের প্রয়োজন। পারদের উল্লেখ রামায়ণে থাকিলেও পারদের যৌগিক বা রাসায়নিক ক্রিয়া সুশ্রুতের পূর্ব্বে পরিচিত হয় নাই। (ডাঃ পি. সি. রায় তাঁহার 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাসে' লিখিয়াছেন—পারদ সুশ্রুতের সময় ভারতীয় সমাজে পরিচিত হইয়াছিল। সুশ্রুত ১ম শতাব্দীর আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ। সুশ্রুত কাশীরাজ দিবোদাসের সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচিত "সুশ্রুত" গ্রন্থে প্রকাশ। কাশীরাজ দিবোদাস ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। তবে সুশ্রুতের যে প্রতিসংস্কার হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সুশ্রুত যে সেই প্রতিসংস্কারেরই ফল তাহা বলা যাইতে পারে।)

কোন ধাতুকে রূপান্তরিত করিয়া কাংস্য ও পিত্তলে পরিণত করা ব্যতীত উচ্চ ধাতুতে অর্থাৎ স্বর্ণে বা রৌপ্যে পরিণত করিবার কোন চিন্তা বা কল্পনা বৈদিক সাহিত্যে নাই। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরাই নাকি নীচ ধাতুকে উচ্চধাতুতে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের এই বিদ্যার নাম ছিল 'কিমিয়া বিদ্যা'। (মিসরীয়েরা কিমিয়া বিদ্যার সাধনে বহু শক্তি ব্যয় করিয়াছিল। শোনা যায়, তাহারা কিমিয়া-প্রভাবে নীচ ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারিত। এই বিদ্যা ক্রমে "এলকেমি" নামে পরিচিত হয়। এখন 'এলকেমিই' কেমিষ্ট্রী নামে পরিচিত।)

রামায়ণে নীচ ধাতুকে উচ্চ ধাতুতে পরিণত করিবার কোন উল্লেখ নাই।

কিন্তু বালকাণ্ডের ৩৭ সর্গে ধাতু উৎপত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এক পদার্থের সংস্পর্শে অন্য পদার্থ—অর্থাৎ কাঞ্চন, রজত, লৌহ, ত্রপু ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল—বলা হইয়াছে। এই রচনা তান্ত্রিক যুগের প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একস্থানে আছে "সুমেরু পর্ব্বতে যাহা থাকিত, তাহা সমস্তই স্বর্ণে পরিণত হইত।" (কি ৪২ সর্গ।) এই কল্পনাও তান্ত্রিক যুগের "পরশ পাথর" সাধনার পরে কল্পিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রামায়ণে গৈরিক, জাম্বুনদ, সুধা (চুন) প্রভৃতি আরো কতগুলি আকরিক পদার্থের নাম আছে।

(সৌরভ, ভাদ্র)

পল্লী-মা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে' প্রবাস-পথে—
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়-বেলার বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে
নূতন করে' দেখা হ'ল অনাদৃতা মায়ের সাথে,
ভক্তি-পূজা দিইনি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে,—
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হ'তে তার মূর্ত্তি দেখে'!

স্নেহময়ীর রূপ ধরে' মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক্ হ'তে ওই দিগন্তরে!
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে,
দেখ্‌ছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই যে মাঠে গরু চরে ল্যাজ দুলিয়ে মনের সুখে,
ওই যে পাখীর গানের সুরে কাঁপন জাগে বনের বুকে,
'মাথাল্'-মাথায়, কাস্তে-হাতে, ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে- ওরাই মায়ের ভালোবাসা!

ওরা কভু ভোগ করে না অন্ন জলের বিষম জ্বালা,
মায়ের বুকের পীযূষ-ধারা ওদের তরে নিত্য-ঢালা,
মাঠ-ভরা ধান, গাছ ভরা ফল, যার খুসী সে যাচ্ছে খেয়ে,
মুক্ত মায়ের অন্নশালা,—হয় না নিতে কিছুই চেয়ে!

সহজভাবে ওরা সবাই ঠাঁই পেয়েছে মায়ের কোলে,
শান্তি-সুখে বাস করে সব, কাটায় না দিন গণ্ডগোলে,
গরু যেথায় চরে' বেড়ায়, শালিক তাহার পাশেই চরে,
কখনো বা পৃষ্ঠে চড়ে, কখনো বা নৃত্য করে!

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, বাজায় বেণু অশথ্-মূলে,
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠ্‌ল দুলে',
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে'
মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্‌ল ফুটে'!

দুপুর-বেলার রৌদ্র-তাপে ক্লান্ত হ'য়ে কৃষক-ভায়া
বস্‌ল এসে গাছের তলে ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ ছায়া,
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি-কচি ওই যে পাতা—
ও যেন মা'র আপন হাতে তৈরী-করা মাঠের ছাতা!

ঘাম-ভেজা তার ক্লান্ত দেহে শীতল সমীর যেম্‌নি চাওয়া—
পাঠিয়ে দিল অম্‌নি মা তার স্নিগ্ধ-শীতল আঁচল-হাওয়া!
কালো দীঘির কাজল-জলে মিটাল তা'র তৃষ্ণা জ্বালা,—
কোন্ সে আদি কাল হ'তে মা রেখেছে এই জলের জালা!

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখ্‌লে চেয়ে—
রঙীন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে!
ওদেরই ও ঘরের জিনিস, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে!

ওই যে লাউএর 'জাংলা' পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে—
কৃষক-বালা আস্‌ছে ফিরে' পুকুর হ'তে কল্‌সী পূরে,'
ওই কুঁড়েঘর—উহার মাঝেই যে চির-সুখ বিরাজ করে
নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে।

কত গভীর তৃপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ, নাই বা জানুক,—সে কথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তা'র খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মত তাই ওরা আর ছুটে নাকো মোহের পিছু!

আজ্‌কে আমার মন ভুলেছে মাটির মায়ের এই এ রূপে,
আপন মনে আপ্‌শোষেতে কাঁদ্‌ছি যে তাই চুপে চুপে!
বাষ্প-শকট,—সে যেন এক অসৎ ছেলের মূর্ত্তি ধরে'
ফুস্‌লে আমায় যাচ্ছে নিয়ে শিস্ দিয়ে আর ফূর্ত্তি করে'!

তাই যেন মা দেখ্‌চে মোরে গভীর ব্যথায় নয়ন মেলে'—
যেমন করে' দেখে মা তা'র ধ্বংস-পথের-পথিক ছেলে!
প্রণাম করি তোমায় মাগো, ভক্তি-ভরে নম্রশিরে,
ক্ষমা করো—আবার আমি তোমার বুকে আস্‌ব ফিরে'!

গোলাম মোস্তফা



দেশ-বিদেশের কথা

বিদেশ

ইউরোপে শক্তিতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—

যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে গণমতের প্রভাব অনেক কমিয়া গিয়াছে। কর্ম্মনৈপুণ্য সুশৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য গণপ্রভাবকে খর্ব্ব করিয়া সুদক্ষ ও কর্ম্মকুশল একদল লোকের উপর শাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি এখন ইউরোপে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জার্ম্মানী ও রুশিয়াতে জননায়কগণ বিনা বাধায় যেরূপ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায় যে শক্তির নিকট মানুষ কত সহজেই মস্তক অবনত করে। জার্ম্মানী ও রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় নেতারা আপনাদের ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেও গণপ্রাধান্যকে তাঁহারা স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং জনসাধারণের প্রতিভূস্বরূপই তাঁহারা ক্ষমতার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু ইতালী ও স্পেনে যে নববিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে গণপ্রাধান্যকে অস্বীকার করিয়া শক্তিধরের শাসনপ্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস। এ হিসাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে ইংলণ্ডের অলিভার ক্রম্‌ওয়েলের আন্দোলনের তুলনা চলিতে পারে। গণমূলক দুর্ব্বল শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে শক্তিধর পুরুষের যথেচ্ছ শাসনে দেশের ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটাইয়া এবং খুব কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার প্রবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা ও সংহতি আনয়ন করিয়া দেশের মঙ্গলসাধন করাই এই নব আন্দোলনের উদ্দেশ্য। একজন শক্তিধর পুরুষ যতদিন পর্য্যন্ত নেতৃত্ব করিবার সুযোগ পান ততদিন পর্য্যন্ত এরূপ শাসনে সুফলই ফলিয়া থাকে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের শক্তির উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় বলিয়াই সে ব্যক্তি-বিশেষটির অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নানারূপ গোলযোগের সূত্রপাত ঘটে। দেশ যখন পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনায় ভরিয়া উঠে, দুর্ব্বলতা যখন নানা অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠে, তখন কিন্তু দুই-একজন শক্তিধরের শাসন অনেক সময়ে মঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিয়া ইতালীকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্য মুসোলিনি ফ্যাসিস্তি বিপ্লবের সূচনা করেন। মুসোলিনির পরিচালনায় শাক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত নবীন ইতালী রোমক সাম্রাজ্যের পূর্ব্বগৌরবে আপনাকে অধিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। অ্যাল্‌বেনীয়াতে গ্রীসের প্ররোচনাতেই ইতালীর দূতের গুপ্তঘাতকের হস্তে মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে মনে করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব গ্রীসের উপর আরোপ করিয়া মুসোলিনি গ্রীক সরকারকে যেরূপ হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন তাহা স্বরাট্ গ্রীসের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

র‍্যাপেলো সন্ধিসর্ত্তে আড্রিয়াটিক উপসাগরের কর্ত্তৃত্ব লইয়া ইতালী সরকার ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে যে রফা-নিষ্পত্তি হয় তাহাতে ফিউম-সংক্রান্ত কতকগুলি সর্ত্তের শেষ মীমাংসা হয় নাই। শেষ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ফিউমে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সিঞ্জোর দোপোলি শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। ইউরোপের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বাড়িয়া উঠাতে ফিউম প্রদেশের দুর্দ্দশা এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছে যে ফিউম সরকার বেকার সমস্যার সমাধান না করিতে পারায় মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। দোপোলি ইতালী-সরকারকে জানাইয়াছেন যে শীঘ্রই ফিউম সম্বন্ধে একটা মীমাংসা না হইলে শাসনতন্ত্রের অভাবে অরাজকতা দেখা দিবে। বৈরাজ্য ও মাৎস্য-ন্যায়ের হস্ত হইতে ফিউমকে রক্ষা করিবার অজুহাতে মুসোলিনি-মন্ত্রীসভা ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল জিয়ার্‌দাইনকে ফিউমের এর সামরিক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইতালীর এই হঠাৎ অধিকারে যুগোস্লাভিয়া-সরকার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। যুগোস্লাভিয়া কোনও দিন আপনার দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। এবং তাহার এই দাবীর সূত্রে উভয় রাজ্যের মধ্যে কথা-বার্ত্তা চলিতেছিল। কাজে-কাজেই যুগোস্লাভিয়ার সহিত কোন-প্রকার নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই ইতালীর ফিউম অধিকার যুগো-স্লাভিয়া কখনই পছন্দ করিতে পারে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ইতালী ফিউম-প্রান্তে সৈন্য-সমাবেশ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্বার্থে স্বার্থে যেরূপ সংঘাত বাধিয়া উঠিতেছে তাহাতে মনে হয় এইরূপ একটি ক্ষুদ্র উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আবার শীঘ্রই শান্তিহীন ইউরোপে সমরানল জ্বলিয়া উঠিবে।

বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইউরোপে পোল, স্লোভাক্ প্রভৃতি জাতিকে আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া স্পেনেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আপনার পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান দুর্গতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে স্পেনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই স্পেন দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। আপনার বিশাল সাম্রাজ্য একে একে হারাইয়া স্পেনের অবশিষ্ট ছিল মরক্কো প্রদেশ। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মুরজাতিও বিদ্রোহী হইয়া মরক্কোর মেলিলা অঞ্চলে স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করে। এই তের বৎসর স্পেন বিদ্রোহ দমনের বৃথা প্রয়াস পাইয়া আসিয়াছে। অভিযানের পর অভিযান অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং তাহার ফলে পনেরো বার মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু অকর্ম্মণ্য মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বল মন্ত্রীসভারই হস্তে শাসনভার পড়াতে ফল একই হইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর নূতন বন্দোবস্তের চেষ্টা হইয়াছে, নূতন লোকের উপর শৃঙ্খলার ভার পড়িয়াছে, কিন্তু একইরকমের বিশৃঙ্খলা, একইরকমের বেবন্দোবস্ত সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানকালোপযোগী সাজসরঞ্জামহীন বৈজ্ঞানিক যুদ্ধপদ্ধতিতে-অশিক্ষিত বর্ব্বর মুর জাতির নিকট বার বার পরাস্ত হইয়াও ইজ্জতের ভয়ে স্পেন মরক্কো প্রদেশ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্পেনের চরম দুর্গতি হয়। এইবার মেলিলা অভিযানকে সফল করিবার জন্য বিপুল উদ্যোগ

চলিতে থাকে। এবং বিরাট্ আয়োজনের ফলে দেড় লক্ষ সুসজ্জিত সৈন্য মেলিলা দুর্গ জয় করিবার জন্য প্রেরিত হয়। কিন্তু স্পেনের এমনই দুর্ভাগ্য যে সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ করিয়া প্রায় দশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় করিয়া অভিযান ফিরিয়া আসে। স্পেন-সরকারের এই শক্তিক্ষয়ে সুযোগ বুঝিয়া ক্যাটালোনিয়া প্রদেশের অধিবাসীবর্গ মাথা নাড়া দিতে আরম্ভ করে। ক্যাটালোনিয়া-প্রদেশবাসীগণ স্পেনের শাসন-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস অনেক দিন হইতেই করিয়া আসিয়াছে। বৈরাজ্যবাদ (anarchism) এ প্রদেশে অনেক দিন হইতেই বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বার্সিলোনা সহর বৈরাজ্যবাদীদের একটি প্রধান আস্তানা। তাই বার্সিলোনা অঞ্চলে সরকার-পক্ষের সহিত ইঁহাদের দাঙ্গা হাঙ্গামা অনেকবারই হইয়া গিয়াছে। অকর্ম্মণ্য মন্ত্রীসভার কর্ম্মকুশলতার অভাব দেখিয়া বৈরাজ্যবাদীগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্যাটালোনীয়া-বাসীগণকে স্পেনের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বরাট্ হইতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ঘরে ও বাহিরে স্পেনের এই অসীম দুর্গতি কর্ম্মবীর দ্য-রিভেরার প্রাণে আঘাত করে। শক্তিধর পুরুষের যথেচ্ছ শাসনের দ্বারাই স্পেনের বর্ত্তমান অবস্থার একমাত্র প্রতিকার সম্ভবপর বিবেচনা করিয়া দ্য-রিভেরা সেইরূপ শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই বিদ্রোহ সম্রাটের বিরুদ্ধে নহে। কেবলমাত্র বর্ত্তমান মন্ত্রীসভাকে দূর করিয়া দিয়া শাসনভার শক্তিধর পুরুষদিগের এক পরিচালনা-সমিতির (directory) হস্তে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করিয়া দেওয়াই এই বিদ্রোহের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্য-রিভেরা বলেন যে বৈরাজ্যবাদী এবং মুক্তিকামীদিগকে দমন করা পরিচালকগণের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। তাহার পর মরক্কোতে আপনার মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করা ইঁহাদের কর্ত্তব্য। জাতীয় অহঙ্কার অটুট রাখিয়া যথাসম্ভব মরক্কোর যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে স্পেনকে সরিয়া পড়িতে হইবে। যুদ্ধের অসম্ভব ব্যয় বহন করা রাজস্বের বর্ত্তমান অবস্থায় স্পেনের পক্ষে সম্ভব নহে। দ্য-রিভেরার কর্ম্মক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া স্পেনের সামরিক বিভাগ দ্য-রিভেরার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। বিপদ্ গণিয়া মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়াছেন ও সম্রাট্ অ্যাল্ফোন্সো দ্য-রিভেরাকে মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান গণসভাকে মানিয়া চলিতে বা আইন-পরিষদের হুকুম মানিতে দ্য রিভেরা রাজী নহেন। সেইজন্য মন্ত্রীসভা গঠন করিতে দ্য রিভেরা সম্মত হন নাই। দলের মতকে ছিন্ন করিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না স্বাধীনমত আত্মবিকাশ করিতে সমর্থ হইবে ততদিন শাসন-পরিষদ ও আইন-মজলিস উঠাইয়া দিয়া শক্তিশালী পুরুষদিগকে বাছাই করিয়া দ্য রিভেরা এক পরিচালকমণ্ডলী (directory) গঠন করিয়া দেশশাসনের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিবেন। সম্রাট্ দ্য-রিভেরার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন এবং দেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ রোধ করিবার জন্য সামরিক আইন জারি করিবার হুকুমনামা সহি করিয়াছেন। সামরিক আইনের বলে বিরুদ্ধবাদীদিগকে দমন করিবার সুবিধা দ্য রিভেরা লাভ করিলেন।

শাসন-ক্ষমতা লাভ করিয়াই দ্য-রিভেরা জুয়া খেলা বন্ধ করিয়া এক হুকুমনামা জারি করিয়াছেন এবং নানাপ্রকার কঠোর বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া দেশে শৃঙ্খলা ও সুশাসন আনিবার প্রয়াস করিতেছেন।

তুরস্কে নূতন শাসনতন্ত্র—

লোজান সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই নবীন তুরস্কের শাসন-পদ্ধতি লইয়া তুরস্কে একটা নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। অ্যাঙ্গোরা-সরকারের হুকুমে খলিফার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লুপ্ত করিয়া তাঁহাকে ইস্লামধর্ম্ম-জগতের গুরু করিয়াই যখন কেবল রাখিবার বন্দোবস্ত হইল তখন প্রয়োজনের চাপে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব মুস্তাফা কামালের উপর অর্পণ করা হইলেও কোনও বিধি অনুসারে আইনসঙ্গতভাবে তাঁহার নির্ব্বাচন হয় নাই। স্তাম্বুল হইতে রাজধানী অ্যাঙ্গোরাতে সরাইয়া লওয়াও প্রজাবর্গের মত লইয়া হয় নাই। লোজান বৈঠকের পর যখন শান্তি স্থাপিত হইল তখন আত্মরক্ষার অজুহাতে যে-সব ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা বজায় রাখিতে হইলে আইন মজ্লিসের সম্মতি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। মুস্তাফার দল নিয়মতন্ত্র প্রচলনের চেষ্টাই পাইয়া আসিয়াছেন। কাজে-কাজেই পূর্ব্বে কাজগুলিকে আইন মজ্লিসের নিকট হইতে মঞ্জুর করাইয়া লওয়া দরকার হইল।

তুরস্কের শাসনতন্ত্র সাধারণতন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইবে বলিয়া আইন-মজ্লিস ঘোষণা করিয়াছেন এবং মুস্তাফা কামাল পাশা প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রাজধানী কোথায় হইবে এখনও স্থির হয় নাই। ধার্ম্মিক মুসলমানেরা স্তাম্বুলেই রাজধানী রাখিবার জন্য ইচ্ছুক কিন্তু জাতীয় দল রাষ্ট্রনীতিক ও সামরিক সুবিধার দিক্ হইতে অ্যাঙ্গোরাতেই রাজধানী স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর। শীঘ্রই এ সম্বন্ধে একটি শেষ মীমাংসা হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত তুরস্ক রাজ্যে ধর্ম্মতন্ত্রের (theocracy র) প্রভাবই বেশী ছিল, মুস্তাফা কামালের সাধনায় তাহা রাষ্ট্রতন্ত্রে পরিণত হইল।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

দিল্লীর কংগ্রেস—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিভাষণে তিনি বলিয়াছেন—"কংগ্রেস এখন আর কেবলমাত্র আমলা-তন্ত্রের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া নাই—সে শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেছে। কেবল মাত্র নিজের নহে, সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির দাসত্ব-মোচনের চেষ্টায় ভারতকে যোগদান করিতে হইবে। খেলাফতের আন্দোলনে যোগদান করায় ভারতবর্ষেরও উপকার হইয়াছে। তাহাতে ভারতবাসীর মনেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। জাতীয় সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পক্ষে অসহযোগিতাই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র। এই অসহযোগ-নীতির ফলেই দেশের লোকের চোখ ফুটিয়াছে—আইন-আদালতের চমকিকে দেশের লোকে এখন আর তেমন ভয় করে না।

"কাউন্সিল প্রবেশ-সম্পর্কে মতভেদ লইয়া যথেষ্ট শক্তির অপব্যয় হইয়াছে। গয়া কংগ্রেসের পর যদি সকলে মিলিয়া একযোগে কাজ করিতেন তাহা হইলে বর্ত্তমান বিরোধ ঘটিত না। বর্ত্তমান অবস্থায় কাউন্সিল বর্জ্জন বৃথা। এখন কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া কাউন্সিল-গুলিকে অসহযোগের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। কাউন্সিলের ভিতরে ও বাহিরে কাজ চালাইবার ভার নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটিকে নিজের হাতে লইতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের একতা ব্যতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ স্বপ্নের মতই অলীক বলিয়া মনে হয়। আমি ঈশ্বরের নামে আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা এইখানেই ঠিক করুন—ভারতবাসী তাহার মুক্তির শেষ আশাটুকু বাঁচাইয়া রাখিবে, না সাহারানপুর ও আগ্রার রক্তাপ্লুত মৃত্তিকায় তাহা বিসর্জ্জন দিবে। ১৯১২ সালে মুসলমানদের রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া থাকা আমি যেমন সমর্থন করি নাই, এখনও তেমনি

হিন্দুদের সংগঠন ও শুদ্ধি-আন্দোলনের আমি বিরোধী। নীতি হিসাবে এ পথ আপত্তিজনক নহে, কিন্তু ঈর্ষা এবং অপ্রীতির আবহাওয়ায় ইহা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষেরই সৃষ্টি করিবে। বর্ত্তমানে ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গ করিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে ব্যাপকভাবে আইনভঙ্গের জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।"

কংগ্রেসে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে :—

(১) অহিংস অসহযোগ নীতি পুনরায় সমর্থন করিয়া এই মহাসভা ঘোষণা করিতেছেন যে, যাঁহাদের ধর্ম্মগত বা বিবেক-সম্পর্কে কোনোরূপ আপত্তি থাকিবে না সেই শ্রেণীর কংগ্রেসসেবকগণ আগামী নির্ব্বাচনে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-পদের প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন। মহাসভা আরো প্রস্তাব করিতেছেন যে, কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ করা হউক, এবং যত সত্বর সম্ভব স্বরাজ লাভের জন্য মহাত্মার নির্দ্দেশ-মত সমস্ত কংগ্রেস-সেবকগণ গঠননীতি সম্পূর্ণ করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ আরম্ভ করুন।

(২) কংগ্রেস স্থির করিতেছেন যে আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য কালবিলম্ব না করিয়া জনকত নেতাকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রাজনৈতিক কয়েদীগণের কারামুক্তি, জজিরৎ-উল-আরবের স্বাধীনতা ও পাঞ্জাব অনাচারের সন্তোষজনক মীমাংসা করার জন্য এখনই স্বরাজলাভ দরকার। সেই স্বরাজলাভের জন্য কমিটি সকল প্রদেশে উপদেশ দিবেন। কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, মৌলনা মহম্মদ আলি, বল্লভভাই পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মঙ্গল সিং, ডাক্তার কিচলু, জহরলাল নেহরু ও বিঠলভাই পটেল।

(৩) হিন্দু মুসলমানের ভিতর ঐক্যস্থাপনের জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হইবে। প্রথম কমিটি জাতীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবেন, দ্বিতীয় কমিটি সম্প্রতি যে-সমস্ত স্থানে হাঙ্গামা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ হইয়া গিয়াছে সেই-সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট্ দাখিল করিবেন।

(৪) ভারতবর্ষ এখন স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ড্ সেই পথের প্রতিবন্ধক। উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীদের প্রতি কৃতদাসের মত ব্যবহার করা হইতেছে ও তাহাদিগকে অপমানিত করা হইতেছে। সুতরাং ভারতবাসী গ্রেট্ ব্রিটেন ও তাহার উপনিবেশ-জাত সমস্ত দ্রব্য বর্জ্জন করিবে।

ইহা ছাড়া কংগ্রেসে ছোটখাট আরো কতকগুলি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

নাভার সম্পর্কে শিখদের চাঞ্চল্য—

নাভার মহারাজকে পদচ্যুত করিয়া রাজ্যশাসনের ভার একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর উপর প্রদত্ত হইয়াছে এই ব্যাপার লইয়া শিখ সম্প্রদায়ের ভিতর ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত মহারাজের প্রতি অবৈধ দণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্টের নিকট হইতে কোনো উত্তর না পাওয়ায় অকালী জথা নাভারাজ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হইতেছে। নাভারাজ্যে শিখ দেওয়ানের অধিবেশনও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিখগণ এ অন্যায় আদেশও প্রতিপালন করিতেছে না। খাল্সা-কলেজের জনৈক অধ্যাপক নাভায় অবস্থান করিতেছিলেন; অকালীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে এই সন্দেহে তাঁহাকে নাভারাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। নাভার আভ্যন্তরিক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল, অধ্যাপক গিদ্‌ওয়ানী এবং শ্রীযুক্ত শান্তনম্ দিল্লী-কংগ্রেসের পর নাভায় গিয়াছিলেন। নাভারাজ্যের জাইটোতে পদার্পণ করিবার পরই তাঁহারাও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। নাভার জেলা আদালতের ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার নারায়ণ সিংহের এজ্‌লাসে তাঁহাদের বিচারও সুরু হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ এবং ১৪৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জহরলালের গ্রেপ্তারের পর পণ্ডিত মতিলাল নেহরু পুত্রের সহিত দেখা করিতে নাভায় গমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজি নাভারাজ্যে কোনোপ্রকার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবেন না এবং পুত্রের সহিত দেখা করিয়াই নাভারাজ্য ত্যাগ করিবেন—এই দুই সর্ত্তে নাভার রাজ-সরকার পিতাকে পুত্রের সহিত দেখা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল সেই সর্ত্তে স্বীকৃত না হইয়া নাভারাজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে নাভায় নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ-আন্দোলন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য কি না দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া ডাঃ কিচ্‌লু এক ইস্তাহার বাহির করিয়াছেন।

ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে। অকালী জথা প্রত্যহ দলে দলে নাভারাজ্য অভিমুখে রওনা হইতেছে এবং গ্রেপ্তার হইতেছে। সুতরাং নাভাতেও আবার গুরুকা-বাগের অভিনয় আরম্ভ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

পঙ্কজমের বিবাহ—

সম্প্রতি মাদ্রাজের খৃষ্টান মিশনারীরা কুমারী পঙ্কজম্ নাম্নী একটি হিন্দু বালিকাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন পরে কুমারীর ভ্রাতা তাঁহাকে মিশনারীদের হাত হইতে উদ্ধার করেন। মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, গত ১৪ই তারিখে শ্রীযুক্ত পি মাণিক নায়াগার নামক একজন ইলেক্ট্রিক-ইঞ্জিনিয়ারের সহিত শ্রীমতী পঙ্কজমের হিন্দুমতে বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পঙ্কজমের আত্মীয়েরা এই বিবাহে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ব্রাহ্মণেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

ডাঃ নাইডুর অবস্থা—

বোম্বাইএর 'ভয়েস্ অব্ ইণ্ডিয়া' জানাইতেছেন, ত্রিচিনপল্লী জেলে ডাঃ বরদারাজুলু নাইডুর উপর জেল-কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতেছে। তাঁহাকে তাঁহার সাধারণ খাদ্য দেওয়া হইতেছে না, অন্যান্য বন্দীদের নিকট হইতে তাঁহাকে আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাঁহাকে কোনো পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেওয়া হয় না, অথবা লিখিবার জিনিসপত্রও দেওয়া হইতেছে না। ওজনে ৬ সের কমিয়া গিয়াও তিনি বেশ প্রফুল্ল আছেন।

সামন্ত-রাজ্য-প্রজাসম্মিলন—

দিল্লীতে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার সময় কংগ্রেসমণ্ডপে নিখিল-ভারত সামন্ত রাজ্য-সমূহের প্রতিনিধিমূলক সমিতি স্থাপন করিবার জন্য একটি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ কেল্‌কার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাপতি সামন্ত-রাজ্যসমূহের শাসন-প্রণালী, শাসন-সংস্কার ও স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন-সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভায় ভারতের সামন্তরাজ্যসমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য সমগ্রভারতব্যাপী সুনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন উপস্থিত করিবার এবং আগামী ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ্ মাসে দিল্লীতে নিখিল-ভারত-সামন্ত-রাজ্য-প্রজা-সম্মিলনের অধিবেশন বসাইবার প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

রয়াল কমিশনের সফর—

রয়াল কমিশনের সভ্যগণ ৪ঠা নবেম্বর হইতে ২০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত

দিল্লীতে, ২২শে নবেম্বর হইতে ২৯শে নবেম্বর পর্য্যন্ত এলাহাবাদে, ১লা ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ে, ৩রা জানুয়ারী হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত মাদ্রাজে, ১৬ই জানুয়ারী হইতে ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতায়, ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পাটনায় সফর করিবেন। পাটনা হইতে তাঁহারা আবার দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন।

বেহার বন্যায় সাহায্য—

মিঃ ম্যাক্‌ফার্সন্ ও শ্রীযুক্ত সিংহ বিহারের বন্যায় প্লাবিত স্থান-সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ছাপরায় একটি সভায় শ্রীযুক্ত সিংহ বলিয়াছেন তিনি বন্যার সাহায্যের জন্য তিন লক্ষ টাকা দান করিবেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের আবেদনের ফলে নানা স্থান হইতে এপর্য্যন্ত ১৫ হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ঝালোয়ারের মহারাজা—

'নেশন' পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদদাতা নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রেরণ করিয়াছেন:—ভারতের রাজন্যবর্গের যে কি দুরবস্থা তাহা দিন দিন জনসাধারণের গোচর হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে নাভা, চাম্পা ও উদয়পুরের মহারাজার বিষয় সকলেই অবগত হইয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ ঝালোয়ারের মহারাজা নাকি রাজ্যের সহিত সাময়িকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বহুদিন যাবৎ তাঁহার ইংলণ্ডে বাস করার ইচ্ছাই নাকি কারণ। সম্প্রতি পলিটিক্যাল বিভাগের একজন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারী রাজ্য শাসন করিতেছেন।

লালা গিরিধারী লাল—

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী লালা গিরিধারী লাল ২ বৎসর কারাদণ্ড ও ৫ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি গ্রেপ্তার হন তখন তাঁহার সঙ্গে ২৩৩ ্ টাকা ছিল। সরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি জরিমানা আদায়ের জন্য তাঁহার বাড়ীর চেয়ার সোফা প্রভৃতি ক্রোক করা হইয়াছে। জিনিষগুলি বিক্রয় করিয়া জরিমানার টাকা সংগৃহীত হইবে।

সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর জন্য দান—

বৃটিশ-সাম্রাজ্য-প্রদর্শনীর যে অংশে মান্দ্রাজের দ্রব্যসমূহ প্রদর্শিত হইবে তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য পীঠাপুরমের রাজা মাদ্রাজের লাট বাহাদুরের নিকট ৫০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

লালা লাজপতের দান—

সাহারনপুরের দাঙ্গায় যে-সকল লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের সাহায্যের জন্য লালা লাজপত রায় ২০০০ ্ টাকা দান করিয়াছেন।

নটরাজনের পদত্যাগ—

'বম্বে ক্রনিকেল' জানাইতেছেন যে কেনিয়া অপমানের প্রতিবাদ-স্বরূপ শ্রীযুক্ত নটরাজন বোম্বাই-গবর্ণমেণ্টের অধীনে বিচারকের পদ পরিত্যাগ করিয়া একখানা পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

কাশ্মীরে তারবিহীন টেলিফোন—

সম্প্রতি কাশ্মীর ও জম্মুরাজ্যে তারহীন টেলিফোন স্থাপিত হইয়াছে। এই পার্ব্বত্য দেশের মধ্য দিয়া ১৫০০০ ফুট পাহাড় অতিক্রম করা অত্যন্ত দুরূহ কার্য্য হইলেও ইঞ্জিনীয়ারের অধ্যবসায়ের ফলে তাহা সম্ভব হইয়াছে। এই টেলিফোন লাইনের উভয় প্রান্তেই কথাবার্ত্তা খুব স্পষ্টভাবে শোনা গিয়াছিল।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

বাংলা

বাংলায় ডাকাতির বহর—

গত জুলাই মাসে বাংলা দেশে ৭৫টি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে হইয়াছে ৫১টি। গত বৎসর (১৯২২) আগষ্ট মাসে হইয়াছিল ৫৫টি। ডাকাতির সংখ্যা বাংলা দেশে নিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে। দারিদ্র্য নিবারিত না হইলে ডাকাতি কমিবার সম্ভাবনা অল্প।

আনন্দময়ীর আবেদন—

আহিরীটোলা বালিকা-বধূ নির্য্যাতনের বিষয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। আমি সেই নির্য্যাতিতা বধূ শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী, বয়স ১৮ বৎসর। এখন আমি পিতার গলগ্রহ। পিতা দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত, তাহাতে বয়সও অধিক, আমার ভবিষ্যৎ-চিন্তায়ও বিশেষ কাতর। এরূপ অবস্থায় দরিদ্র পিতাকে আরো বিপন্ন করা অযৌক্তিক-বিবেচনায় আমার জীবিকার জন্য দেশবাসীর কৃপার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইলাম। অনেক ভদ্রমহিলা মেয়ের মত স্নেহচক্ষে আমাকে দেখিতেছেন, সাহায্য করিতেছেন, নানা প্রকার সদুপদেশও দিতেছেন। সেই মাতৃগণের উপদেশ-মত **"সাবিত্রী আশ্রম"**-প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছি। সম্প্রতি আমার এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক-ঔষধ-ব্যবসায়ী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১১ নং সিমলা ষ্ট্রীট, (কলিকাতা) হইতে ১০০্ টাকা সাহায্য করায়, আমার সংকল্প সাফল্য-লাভ করিবে, এই আশা পাইলাম।

যাঁহারা যেরূপ সাহায্য (মাসিক বা এককালীন) জীবিকার বা আশ্রমের পক্ষে বিবেচনা করিবেন, নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া চির-ঋণী রাখিবেন। ইতি,—

বিনীতা, আপনাদের স্নেহের কন্যা
শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী।
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মজুমদার মহাশয়ের বাটী,
গ্রাম—মালঞ্চা, পোঃ সোনারপুর,
জেলা—২৪ পরগণা।

সাহিত্য-বিষয়ে উৎসাহ দান—

১। দয়ালস্মৃতি সুবর্ণপদক—
বিষয়—"বর্ত্তমান সময়ে অন্নসমস্যার সমাধানকল্পে বঙ্গদেশের কুটীর-শিল্পসমূহের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা।"

২। বটকৃষ্ণস্মৃতি রৌপ্যপদক (স্বর্ণগর্ভ)—
বিষয়—"জাতীয়তাগঠনে সঙ্ঘবদ্ধজীবনের প্রভাব।"

৩। কৃষ্ণদাস পাল রৌপ্যপদক—
বিষয়—Lives of great men and their influence on mass education.

৪। স্বর্ণমণি রৌপ্যপদক—
বিষয়—"একটি ক্ষুদ্রগল্পে বর্ত্তমান কালে বাঙ্গলার পল্লীজীবনের নিখুঁৎ চিত্র।"

৫। নন্দরাণীস্মৃতি রৌপ্যপদক—

বিষয়—"রমেশ দত্তের আদর্শ নারী চিত্র।"

প্রবন্ধগুলি ১২ নং মুরলীধর সেন লেন কলিকাতা এই ঠিকানায় ১৫ই নভেম্বর তারিখের মধ্যে সুহৃদ্ লাইব্রেরীর সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বাংলার একটি প্রাচীন কীর্ত্তি লোপ—

পদ্মাগর্ভে রাজাবাড়ীর মঠ।—খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজা চাঁদরায় ও কেদার রায় তাঁহাদের মাতার চিতার উপর বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজাবাড়ীতে এক সুবৃহৎ মঠ স্থাপন করেন। প্রায় তিনশত কি ততোধিক বৎসর যাবৎ সেই মঠটি বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গর্ব্বভরে শির উন্নত করিয়া পদ্মাতীরে দণ্ডায়মান থাকিয়া হিন্দুদের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। ক্রমাগত দুইবার পদ্মা তাহার কীর্ত্তিনাশা নাম সফল করিবার মানসে মঠটির প্রতি প্রবলবেগে ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু যেন দয়া করিয়া উহাকে গ্রাস করে নাই। ইহার শিল্পকার্য্য এত সুন্দর ছিল যে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। এই সুদৃশ্য মঠটির প্রত্যেকখানি ইষ্টক নানাবিধ কারুকার্য্যে খচিত ছিল। মঠটি উচ্চতায় প্রায় ৮০ হস্ত এবং পরিধি ১২০ হাত ছিল। শুনা যায় ইহা নাকি আরও উচ্চ ছিল, ক্রমেই নীচের দিকে কতকটা বসিয়া গিয়াছিল। গত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় এই মঠটি নিজ ব্যয়ে সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। পদ্মানদী এবার ঢাকা জিলার দক্ষিণ দিক্ দিয়া অতি প্রবলবেগে ভাঙ্গিতেছে। সম্প্রতি উক্ত বিশাল মঠটিকে গ্রাস করিয়া সে ভাঙ্গন-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছে। রাজাবাড়ীর এই মঠের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি লোপ পাইল।

—২৪ পরগণা-বার্ত্তাবহ।

সাহিত্যিকের সম্মান-লাভ—

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কৃত।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে জগৎতারিণী-সুবর্ণ-পদক দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

—স্বদেশ।

বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান—

হিন্দু-ধর্ম্ম অনুসারে হিন্দু বিধবাদেরই বিবাহ দিবার জন্য মেদিনীপুরে একটি বিধবাবিবাহ-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দেশের অনেক গণ্যমান্য লোক এই সমিতির সভ্য হইয়াছেন। বঙ্গের বাহিরেও অনেকে এই সমিতিকে সাহায্য করিতেছেন।—সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস শর্ম্মণের চেষ্টায় এপর্য্যন্ত একটি বিধবাবিবাহ হইয়াছে।—স্বদেশ

দান ও সৎকর্ম্ম—

বেঙ্গল রিলিফ কমিটি।—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বেঙ্গল রিলিফ কমিটির পক্ষ হইতে বিহারের বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের হস্তে ৫০০৲ টাকা এবং তমলুকে বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ শ্রীযুক্ত সাতকড়িপতি রায়ের হস্তে ৪৪১।৶০ প্রদান করিয়াছেন।—যুগবার্ত্তা।

সাহায্যদান—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট্ ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে বিজ্ঞান শ্রেণী খুলিবার জন্য ১৬০০০৲ টাকা এককালীন প্রদান করিয়াছেন। এজন্য লর্ড লিটনের গভর্ণমেণ্ট্ জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ।

—কাশীপুরনিবাসী।

জাপান-সাহায্যে বিশ্বভারতী। ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাপানকে সাহায্য করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ভাণ্ডারের সম্পাদক হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর ছাত্র এবং শিক্ষকদিগের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া ৭৫০৲ টাকা সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইঁহারা যে টাকা সংগ্রহ করিবেন, তাহা সমস্তই জাপানের রাজদূতের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। এই ভাণ্ডারে কেহ চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিলে শান্তি-নিকেতনে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে পারেন।—স্বদেশ।

নূতন শিক্ষালয়—

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ। বৈদ্যনাথ ধাম—পোঃ আঃ দেওঘর। যাহাতে বালকগণ শৈশব হইতেই লৌকিক বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গেই জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইয়া নিজেদের চরিত্রগঠনপূর্ব্বক কর্ম্মঠ স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। শরীর মন ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষ সাধন করিয়া বিদ্যার্থীর ভিতরের পূর্ণতাকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। জ্ঞানানুশীলন, কর্ম্মকুশলতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, চরিত্র এবং সামাজিক জীবন গঠন প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষাজগতের আদর্শগুলিকে লক্ষ্য করিয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর মানুষগঠনই এই বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্য। স্বামী সম্ভাবানন্দ ইঁহার অধ্যক্ষ।

গুরুসদয় দত্তের সৎকার্য্য—

দত্ত মহাশয় আগামী বৎসরের জন্য বাঁকুড়া জেলার প্রত্যেক পল্লী-সমিতির করণীয় এইরূপ কার্য্য-তালিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন:—প্রত্যেক পল্লী-সমিতি বালকদের ও বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় খুলিবে, শ্রমিকদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় খুলিবে। প্রত্যেক পল্লীসমিতি অন্ততঃ ২টি করিয়া পুষ্করিণীর সংস্কার করিবে এবং পাঁচশত করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিবে। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া পুষ্করিণী পানীয়-জলের জন্য স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত হইবে। প্রত্যেক পল্লী সমিতি কৃষি-কার্য্যের কিছু-কিছু নূতন সংস্কার, এবং গ্রাম্য শিল্পের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করিবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা।

সদনুষ্ঠান—

বিনামূল্যে কালাজ্বর চিকিৎসার কেন্দ্র—বেঙ্গল হেল্থ্ এসোসিয়েশন বিনামূল্যে কালাজ্বরগ্রস্ত রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য ইলিয়ট্ রোড ও সার্কুলার রোডের সঙ্গমস্থলে মেসার্স্ শ্রীমানী কোম্পানীর ঔষধালয়ে একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ডাক্তার রোগী দেখিবার জন্য এই ঔষধালয়ে উপস্থিত থাকিবেন।—সম্মিলনী।

—সেবক।

সিন্ধুদেশে নূতন আবিষ্কার

সিন্ধুনদীর গতি-অনুযায়ী সিন্ধুদেশ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—উত্তর সিন্ধুদেশ, মধ্য সিন্ধুদেশ ও দক্ষিণ সিন্ধুদেশ। দক্ষিণ সিন্ধুদেশ আমাদের বাংলা দেশের মত নদীমাতৃক দেশ, কাজেই তাহা আমাদের দেশের মতই জনবহুল, সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা। অতি প্রাচীনকালে এই দেশের ¾র্থ অংশ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। ক্রমে ক্রমে এই বিশাল নদীর পলি পড়িয়া এই দেশটির উদ্ভব হইয়াছে। সিন্ধুদেশের মধ্য অংশ দক্ষিণভাগের পূর্ব্বে পয়বস্তি হইয়াছিল, সেই কারণে এই দেশের মৃত্তিকা শক্ত। উত্তর সিন্ধুদেশে নদীটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও অন্য কোন পয়ঃপ্রণালী নাই। এইকারণে উত্তর সিন্ধুদেশ মরুভূমি-সদৃশ—চারিদিকে বালুকারাশি ধূ ধূ করিতেছে, কেবল মাঝে মাঝে দুই-চারিটি বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। কেবল নদীর উভয় পার্শ্বে ১০।১৫ মাইল পর্য্যন্ত একরূপ ফসল হয়। এই প্রাচীন প্রদেশটির অনেক স্থানে বৌদ্ধ-যুগের অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে সিন্ধুদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনেক কর্ম্মচারী দক্ষিণভাগের অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কেহই এই জনশূন্য ও মরুভূমি-সদৃশ উত্তর প্রদেশে খননকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। গত বৎসর শীতকালে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পশ্চিম-প্রান্তের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সুকঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার এই প্রথম প্রচেষ্টা যথেষ্ট পরিমাণে সার্থক হইয়াছে।

এই চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বে উত্তর সিন্ধুপ্রদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদান করা আবশ্যক। 'রোহরী আলোর' নগর উত্তর সিন্ধুদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এইস্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট পর্ব্বতমালা আছে। এইস্থানে সিন্ধু নদী এই-সকল পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বাংলা দেশের পদ্মা এবং মেঘনা নদীর ন্যায় সিন্ধু নদী গতিপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ঐতিহাসিকেরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন সিন্ধুনদী এপর্য্যন্ত অন্ততঃ ১৭ বার গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এই গতি পরিবর্ত্তনের নিদর্শন উত্তর ও মধ্য সিন্ধুপ্রদেশে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বনারা এবং পশ্চিমে পশ্চিমনারা নাম্নী দুইটি ক্ষুদ্র মরা নদী এখনও এই প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

এই প্রদেশের অনেকগুলি ধ্বংসাবশেষ প্রদক্ষিণান্তে সর্ব্বোচ্চ ধ্বংসাবশেষটিই খনন করা স্থির হয়। ইহা মহেঞ্জদড়ো বা মহেঞ্জমারী নামে পরিচিত। এই স্থানটি নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলপথের রুক্ কোটরী শাখার দোক্রী ষ্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানটির আয়তন প্রায় ৭৫০ বিঘা।

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। নানাপ্রকার চিহ্ন দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে যে সিন্ধুনদী খৃষ্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে এইস্থান দিয়া প্রবাহিত ছিল। এতদিন সকলেই শুনিয়া আসিতেছিল যে, পূর্ব্বনারাই সিন্ধুনদীর সর্ব্বপ্রাচীন গর্ভ। এই ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করিয়া শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে সে ধারণা ভ্রমাত্মক। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপটির সন্নিকটস্থ ঝাউবন দেখিয়া বোঝা যায় পূর্ব্বে এস্থান দিয়া সিন্ধুনদী প্রবাহিত ছিল। তখন এই অংশে নদীর মধ্যে দ্বীপের ন্যায় বড় বড় চড়া ছিল। এইপ্রকার দুইটি চড়ার উপর এই গৌরবমণ্ডিত নগরের• দুইটি প্রধান দেবমন্দির অবস্থিত ছিল। এই বিস্তীর্ণ সহরটির আয়তন ও ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বোধ হয় মহেঞ্জদড়ো প্রাচীন সিন্ধু দেশের রাজধানী ছিল। এই সহরটি নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল। এখানে একটি সুবৃহৎ (প্রায় দেড় মাইল লম্বা) রাজপথেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। দ্বীপের চারিদিকে বাঁধা ঘাট ও সোপানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। রাজপথের নিকটে যাইবার সোপানও ছিল বলিয়া



মহেঞ্জদড়ো নগরের প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ
(প্রাচীন সিন্ধুনদীর গর্ভ হইতে গৃহীত)

প্রতীয়মান হয়। একটি ঘাটের কাছে প্রায় ৫০।৫৫ ফুট উচ্চ একটি ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে। ইহাই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। রাজপ্রাসাদটি পরিখা-বেষ্টিত ছিল তাহাও বোঝা যায়। রাজপ্রাসাদ হইতে কিছুদূরে গেলেই ছোট ছোট রাস্তার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলেই সহরের হাটবাজার ছিল, এবং সহরের এই অংশই জনবহুল ছিল।

বাংলা দেশের মত সিন্ধুদেশেও প্রস্তরের অভাব। কাজেই এখানকার সমস্ত সৌধমালা এবং মন্দিরাদি ইষ্টক-নির্ম্মিত। প্রাচীন ব্যাবিলনের স্থপতিদের ন্যায় সিন্ধুদেশের প্রাচীন স্থপতিরাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টক-নির্ম্মিত মঞ্চের উপর মন্দিরাদি নিম্মাণ করিত। সিন্ধুদেশের স্থপতিরা মন্দিরগুলিকে বন্যার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ৪০।৫০ ফুট দেওয়ালের উপর ইষ্টক-মঞ্চ নির্ম্মাণ করিত। আবিষ্কৃত স্তূপটি ১৬০০ বর্গফুট একটি ইষ্টকমঞ্চের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত। মঞ্চটির চতুর্দ্দিকস্থ প্রাঙ্গণের চারিপাশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। এই প্রাঙ্গণে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপেরও নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহৎ স্তূপটি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মঞ্চে পূর্ব্বদিকের সোপানাবলী দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। সোপানাবলীর সাহায্যে উপরে উঠিলে প্রবেশ-পথ। এখানে ছয়টি স্তম্ভ ছিল। তৎপরে প্রাঙ্গণ। প্রাচীন 'স্তূপ' নামক বৌদ্ধ মন্দির-সমূহ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি ভিতরে ফাঁপা ও অন্যগুলি নিরেট। মহেঞ্জদড়োর স্তূপটি ফাঁপা। এই স্তূপটির উপরিভাগ রৌদ্রপক্ক ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। স্তূপটি পূর্ব্বদ্বারী। ইহার ভিতরের প্রবেশ-পথে উভয় পার্শ্বে সোপানাবলী আছে। এই-সকল সোপানের সাহায্যে চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিতে হয়। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন এই স্তূপটি প্রদক্ষিণ করেন তখন ইহার ছাদ ভগ্নাবস্থায় ছিল। এই প্রদেশের মুসলমান জমিদারবর্গ কর্তৃক এই কুকার্য্যটি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহারা ভূপ্রোথিত অর্থলোভে এই-সকল স্তূপের নানা অংশ বিনষ্ট করিয়া এই-সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পাইবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

এই স্তূপটির প্রবেশপথের দুই দিক্‌কার সোপানাবলীর মধ্যস্থলে একটি ছোট মন্দির আছে—সেখানে একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এত দীর্ঘ

দিন জলরৌদ্র সহ্য করিয়াও যে মূর্ত্তিটির চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মূর্ত্তিটি ইষ্টকের উপর কর্দ্দমের প্রলেপ দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমাসীন বুদ্ধের হস্তদ্বয়ের ও জঙ্ঘা-প্রদেশের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এককালে মূর্ত্তিটি নানা বর্ণে চিত্রিত ছিল এবং বোধ হয় স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত ছিল। কালক্রমে চিত্রলেপ ও স্বর্ণপত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কেবল মূর্ত্তির কাঠামোর সজ্জিত ইষ্টকগুলি দেখিলে বোধ হয় যে এককালে এস্থানে ধ্যানমুদ্রায় সমাসীন বুদ্ধমূর্ত্তি ছিল।

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভাঙ্গা হাঁড়ি কড়ি শঙ্খ প্রভৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে অনেক তামার পয়সাও পরিলক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশের উপরকার লিখিত অংশ অত্যন্ত অস্পষ্ট।

যে ইষ্টক-মঞ্চের উপর স্তূপটি নির্ম্মিত সেটি প্রধান মঞ্চের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত এবং এই ছোট মঞ্চের উত্তর ও দক্ষিণ গাত্রে দুই তিনটি বড় বড় সিঁড়ির ধাপের মত ধাপ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশর দেশের গীর্জে পিরামিডের মত এই ধাপগুলি মানুষের উঠিবার ধাপ নহে। এককালে এই-সমস্ত ধাপের উপরে মাটির বা পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি সজ্জিত থাকিত। খনন-কালে ছোট মঞ্চটির গাত্রে রাশি রাশি ভস্ম পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে স্তূপটি এককালে অগ্নিদাহে বিনষ্ট হইয়াছিল। রৌদ্র-পক্ব ইষ্টকের যে স্তূপটি এই মঞ্চের উপর নির্ম্মিত, তাহার ভিতরটা ফাঁপা ছিল এবং এই রৌদ্র-পক্ব ইষ্টক-নির্ম্মিত স্তূপের ভিতরে অথবা বাহিরে বহু চিত্র ছিল। এই-সমস্ত চিত্রের অনেক অংশ রৌদ্রপক্ব-ইষ্টকের উপরে পাওয়া গিয়াছে। এই ১৭ শত বৎসর জলরৌদ্র সহ্য করিয়াও এই-সমস্ত চিত্রের অংশগুলি এখনও উজ্জ্বল রহিয়াছে। কোন অংশে বুদ্ধ- বা বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি, কোনটিতে বা দেওয়াল-চিত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। একটির উপরে নীল জমিতে শাদা ফুল এবং তাহার উপরে গোলাপী জমিতে মেটে লাল বর্ণের ফুল আছে। বুদ্ধ- বা বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তিগুলি সাধারণতঃ শাদা ও লাল রংএ চিত্রিত হইয়াছে। এই জাতীয় কোন কোন চিত্রযুক্ত ইষ্টকের উপরে কাল অক্ষরে চিত্রিত লিপি আছে। কোন লিপি খরোষ্ঠী অক্ষরে—ইহা এখনকার পার্শী অক্ষরের ন্যায় দক্ষিণ দিক্ হইতে বাম দিকে লিখিত হইত। আবার কোন লিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে। এই আকারের ব্রাহ্মী অক্ষর ও খরোষ্ঠী অক্ষর যীশুখৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পরে আর ব্যবহার হয় নাই।

এই চিত্রগুলি অজন্তার চিত্রাবলী অপেক্ষা বহু পুরাতন এবং স্যার্ আউরেল ষ্টাইন মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন বিনষ্ট নগরগুলিতে যে-জাতীয় চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন এই চিত্রগুলি অনেকটা সেই জাতীয় এবং ইহাতে প্রাচীন গ্রীক শিল্পের প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অপেক্ষাকৃত ছোট ইষ্টকের মঞ্চটির উপর রৌদ্র-পক্ব ইষ্টকের স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার নীচে এক ফুট পরিমাণ ভস্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে একটি প্রাচীন স্তূপ ধ্বংস হইয়া গেলে তাহার ধ্বংসাবশেষের উপর খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই স্তূপটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্তূপের চারিদিকে যে প্রাঙ্গণ আছে, তাহার চারিপাশে যে-সমস্ত ছোট ছোট কুঠুরী আছে, তাহাতে অনেকপ্রকারের প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্ত্তির খণ্ড পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের একটি কুঠুরীতে অনেকগুলি চীনেমাটির ছোট-ছোট বুদ্ধমূর্ত্তির খণ্ড ও একটি শকের মস্তক পাওয়া গিয়াছিল। পশ্চিমদিকের কুঠুরীগুলিতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ঐ-সমস্ত মুদ্রা ঘরের মেঝের নীচে মৃন্ময় পাত্রে রক্ষিত ছিল। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মুদ্রা। অনেকগুলি মুদ্রা নূতন ধরণের। এরূপ মুদ্রা এপর্য্যন্ত ভারতের কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। এ-সমুদয় মুদ্রা সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাচীন কালের মুদ্রা। এই মুদ্রাগুলির সহিত ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে আবিষ্কৃত কার্ষাপণ বা কাহাপণের কোন সাদৃশ্য নাই। এই মুদ্রাগুলি ছাঁচে ঢালাই করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, এগুলি punch-marked (অঙ্ক-চিহ্নিত) নহে।

মহেঞ্জদড়োতে যে তাম্রমুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে

তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকগুলি শক জাতীয় কুষাণ বংশীয় সম্রাট্‌দের রাজত্বকালের মুদ্রা। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন আরও দুই জাতীয় মুদ্রা ঐ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রাগুলির উপরকার চিহ্নাদির পাঠোদ্ধার হওয়াতে প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীনকালে সিন্ধুদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং প্রাচীন জরথুস্ত্রীয় ধর্ম্ম পাশাপাশি বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই-সকল মুদ্রাতে সমাসীন অথবা দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মুদ্রায় আবার মূর্ত্তির মস্তকের চতুর্দ্দিকে প্রভামণ্ডল বা ভামণ্ডল (halo) আছে। অনেক মুদ্রায় প্রাচীন অগ্নিবেদীও আছে। পারস্য দেশের পার্থিয়ান বংশের মুদ্রায় অগ্নি-বেদীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রচলিত মুদ্রাতেই সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি-বেদী দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মহেঞ্জদড়োর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রায় অগ্নি-বেদীর যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাই পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অগ্নি-বেদীর চিত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি গোলাকার, কিন্তু কুষাণ সাম্রাজ্যের মুদ্রার ন্যায় পুরু নহে। এপর্য্যন্ত এরূপ কোন মুদ্রা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই-সকল মুদ্রার এক পার্শ্বে ভারতীয় রণ-দেবতা মহাসেন অথবা কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি, অপর পার্শ্বে অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রাগুলি কুষাণ সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়, এবং বোধ হয় এই মুদ্রাগুলিই ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বপ্রচলিত সমকোণী কার্ষাপণ মুদ্রার স্থান অধিকার করে। কুষাণ বংশের সম্রাট্‌গণ সিন্ধুদেশ অধিকার করিলে এই জাতীয় মুদ্রার পরিবর্ত্তে কুষাণ বংশীয় সম্রাট্‌গণের পুরু তাম্রমুদ্রা সিন্ধু দেশে প্রচলিত হইয়াছিল।

এই ধ্বংসস্তূপের ভিতর কয়েকটি সীল-মোহরও আবিষ্কৃত হয়। এগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত নহে। পূর্ব্বকালে প্যারিস-প্ল্যাষ্টারের ন্যায় একপ্রকার পদার্থ সিন্ধুদেশে ব্যবহার হইত। ইহার বর্ত্তমান সিন্ধী নাম চিরোলী। এই চিরোলী-নির্ম্মিত দুইটি সীলমোহর এবং আর একটি সীলমোহরের একখণ্ড পূর্ব্ববর্ণিত স্তূপের পাদদেশে অর্থাৎ নদীর ঘাটের নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তিনটি সীলমোহরের মধ্যভাগে একটি চতুষ্পদ জন্তুর আকৃতি আছে এবং এই জন্তুর আকৃতির সম্মুখে একটি ধ্বজ আছে এবং সীলমোহরের উপরে ও নিম্নে কতকগুলি অক্ষর আছে। এই জাতীয় সীলমোহর ইতিপূর্ব্বে পাঞ্জাবের মণ্টগমেরী জেলার হারাপ্পা গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলেই রায় বাহাদুর পণ্ডিত দয়ারাম সাহানী কতকগুলি সীলমোহর আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার্ আলেক্‌জাণ্ডার কানিংহাম্ ও অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ-সকল মোহরের উপরকার অক্ষরগুলি ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রাহ্মী বর্ণমালার প্রাচীন আকার। প্রকৃত পক্ষে এই-সকল লিপি চিত্রাক্ষর ভিন্ন আর কিছুই নহে; যাঁহারা বলেন যে এ-সকল লিপি প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালায় লিখিত, তাঁহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টার জেনারল্ ডাক্তার ডি বি স্পুনারও এ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইয়াছেন।

মহেঞ্জদড়োতে যে সীলমোহরগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে তিনটিতে দুইটি বিভিন্নপ্রকারের চিত্রাক্ষর দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবিষ্কৃত ৪।৫টি মুদ্রায় শুধু একপ্রকারের চিত্রাক্ষর আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, যে জাতি এই-সমস্ত সীলমোহর ব্যবহার করিত তাহারা প্রাচীন মিশরবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর সভ্য ছিল এবং মুদ্রার ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল।

এশিয়া মহাদেশে পূর্ব্বে এরূপ চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হয় নাই। এই চিত্রাক্ষরগুলি প্রাচীন মিশরের চিত্রাক্ষরের অনুরূপ নহে। কাজেই এগুলি আবিষ্কৃত হওয়াতে অনেক নূতন তথ্য অবগত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। এই-সকল সীলমোহরের অপর একটি বিশেষত্ব এই যে সীল-মোহরগুলির মধ্যস্থলে বল্গা সমেত একপ্রকার একশৃঙ্গ বন্যগর্দভ (unicorn) মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। হারাপ্পা গ্রামে আবিষ্কৃত সীলমোহর দেখিয়া পূর্ব্বের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা

অনুমান করিয়াছিলেন যে এই জাতীয় সীলমোহরে বৃষের মূর্ত্তি আছে। কিন্তু ডাক্তার স্পুনার প্রমাণ করিয়াছেন যে এই জন্তুগুলি একশৃঙ্গবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা প্রাচীন গ্রীক্ পর্য্যটকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত একশৃঙ্গ গর্দভের (unicorn) মূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতানুসারে এই তিনটি সীলমোহরে যে জাতীয় চিত্রাক্ষর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা এশিয়াখণ্ডে খৃষ্টের জন্মের ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত। এই অনুমানের কারণ সরকারী কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

বারান্তরে এই ধ্বংসাবশেষের অন্যান্য আবিষ্কৃত দ্রব্যের বিবরণ প্রদান করা হইবে। *

* প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেলের অনুমোদন অনুসারে এসোসিয়েটেড প্রেস অব্ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সিন্ধুদেশের ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্তূপের" ইংরেজী বিবরণ হইতে সঙ্কলিত।

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পাঁচের বাড়ি

১। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, পালট, সাণ্ড।
২। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, পালট, শির।
৩। তামেচা, কোমর, শির, করক, বাহেরা।
৪। শির, করক, পালট, হুল, ভাণ্ডার।
৫। বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, সাণ্ড, তামেচা।
৬। তামেচা, পালট, হুল, শির, গ্রীবাণ।
৭। তামেচা, কোমর, হুল, শির, গ্রীবাণ।

"সাণ্ড" = মস্তকের ঠিক্ মধ্যদেশ বরাবর সীঁতির দুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে ভ্রূমধ্য দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের বামপার্শ্ব ঘেঁষিয়া পায়ুর মূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়। অসির অগ্রভাগে দক্ষিণ পৃষ্ঠদেশ ছেদিত হয় এবং অসির মধ্য-ভাগে বাম বক্ষ ও বাম উদর ছেদিত হয়। এই আঘাতের দ্বারা সরলভাবে উপবিষ্ট অশ্বারোহী সহ অশ্ব ছেদিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে।

"করক" = দক্ষিণ পদের সন্ধিস্থলের ভিতর দিকের গিরার উপরের সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে চারি অঙ্গুলী পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে আঘাত করিয়া বক্রভাবে পদসন্ধি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

"হুল" = নাভিকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলি ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসিকে ভূমির সমান্তরালভাবে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণনা :—

১। "সাণ্ড" আট্‌কাইবার নিমিত্ত হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধের উপর বরাবর থাকিবে ও মণিবন্ধ মস্তক হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে, লাঠি বক্ষের সমান্তরালভাবে থাকিবে এবং অগ্রবিন্দু ঈষৎ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বাম স্কন্ধ হইতে প্রায় এক হস্ত বাম দিক্ বরাবর ঊর্দ্ধে থাকিবে।

৩য়, ৪র্থ। "করকের" আঘাত প্রয়োগ করিয়া তরাস কিম্বা গরদেশ উভয়প্রকারেই লাঠির চালনা হইতে পারে।

"শির" আট্‌কাইয়া লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নের দিকে চালনা করিয়া, পদাঙ্গুষ্ঠের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে ও বামে ভূমি সংলগ্ন করিয়া লাঠিকে ভূমির উপরে লম্বভাবে রাখিয়া "করক" আট্‌কাইতে হইবে।

৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম। হুলের প্রতিকার করিবার নিমিত্ত লাঠিকে বক্ষের সমান্তরালভাবে চালনা করিয়া অগ্রবিন্দু বামপার্শ্বের দিক্ দিয়া উপরে তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে। সে সময়ে প্রয়োজন হইলে ঠাটের অন্যান্য ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া সম্মুখের হাঁটু একটু সরল রাখিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

ছয়ের বাড়ি

১। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, করক,

বাহেরা। ২। শির, বাহেরা, তামেচা, কোমর, চির, সাগু। ৩। তামেচা, চির, শির, হুল, বাহেরা, ভাণ্ডার। ৪। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, শির, গ্রীবাণ। ৫। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, শির, করক, বাহেরা। ৬। তামেচা, শির, চির, হুল, সাগু, কোমর। ৭। বাহেরা, হুল, চির, গ্রীবাণ, ভাণ্ডার, করক।

সাতের বাড়ি

১। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, শির। ২। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, উল্টা শির (শির রাস্ত্) ৩। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, সাগু। ৪। তামেচা, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, উল্টা সাগু (সাগু চপ্) ৫। তামেচা, পালট, ভাণ্ডার, কোমর, হুল, শির, গ্রীবাণ।

"উল্টা শির" (শির রাস্ত্) = মস্তকের মধ্য দেশ বরাবর সীঁতির দুই অঙ্গুলী দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ ভ্রূ, দক্ষিণ চক্ষু, নাসিকার অগ্রভাগ ও বাম কোমর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

উল্টা সাগু (সাগু চপ্) = মস্তকের ঠিক মধ্য দেশ বরাবর সীঁতির দুই অঙ্গুলী বাম হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে ভ্রূমধ্য দিয়া আসিয়া নাসিকার ও মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্ব ঘেঁষিয়া পায়ুমূল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়। অসির অগ্রভাগে বাম পৃষ্ঠদেশ ছেদিত হয় এবং অসির মধ্যভাগে দক্ষিণ বক্ষ ও দক্ষিণ উদর ছেদিত হয়।

বর্ণনাঃ—

২য়। "উল্টা শির" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠো দক্ষিণ স্কন্ধের উপর বরাবর থাকিবে, মণিবন্ধ মস্তক হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে, লাঠি বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে, অগ্রবিন্দু ঈষৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া বাম স্কন্ধ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত বাম বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

৪র্থ। "উল্টা সাগু" আট্‌কাইবার কালে দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বের অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে ও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত উর্দ্ধে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিম্নমুখ হইয়া বাম স্কন্ধ হইতে প্রায় এক হস্ত বাম দিক্ বরাবর থাকিবে। লাঠি বক্ষের সমান্তরাল থাকিবে।

আটের বাড়ি

১। শির, করক, বাহেরা, ভাণ্ডার, কোমর, চির, হুল, সাগু।

২। শির, মোঢ়া, করক, পালট, চির,
হুল, ভাণ্ডার, সাগু।

৩। শির, বাহেরা, পালট, ভাণ্ডার,
কোমর, চির, হুল, সাগু।

৪। বাহেরা, অন্তর, মোঢ়া, কোমর,
পালট, হুল, চির, সাগু।

৫। বাহেরা, ভাণ্ডার, পালট, শির,
সাকেন, মোঢ়া, কোমর, তামেচা।

"সাকেন" = অসির অগ্রভাগ দ্বারা বাম হাঁটুর চারি অঙ্গুলী উর্দ্ধে এবং অসির মধ্যভাগ দ্বারা দক্ষিণ হাঁটুর প্রায় দ্বাদশ অঙ্গুলী উর্দ্ধে এক সঙ্গে কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনাঃ—৫ম। "সাকেন" আট্‌কাইবার সময় হাতের মুঠো বাম কোমরপার্শ্ব হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত বাম দিক্ বরাবর থাকিবে। বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে আটের বাড়ি সম্পন্ন করিয়া, ক্রমে অল্পে অল্পে দ্রুত চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। এবং পর্য্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে ও অপরজন বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ও মাঝে মাঝে পরস্পরে বিভিন্ন পাঠের অভ্যাস করিতে হইবে।

নয়ের বাড়ি

১। তামেচা, কোমর, চির, হুল, বাহেরা, করক, পালট, ভাণ্ডার, তেওয়র।

২। তামেচা, কোমর, চির, শির, হুল, বাহেরা, করক, পালট, ভাণ্ডার।

৩। তামেচা, পালট, গ্রীবাণ, কোমর, ভুজ, মোঢ়া করক, সাগু, ভাণ্ডার।

৪। শির, তামেচা, গ্রীবাণ, উল্টা মোঢ়া, মন, ভাণ্ডার, সাকেন, করক, সাগু।

৫। হিমাএল, ভাণ্ডার, আসর, মন, তেওয়র, সাকেন, পালট, তামেচা, সাণ্ড।

"তেওয়র" = দক্ষিণ কর্ণের প্রায় তিন অঙ্গুলী ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কর্ণমূলের নিম্ন কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

"ভুজ" = বাম বাহুর মধ্যভাগ; বাম স্কন্ধ ও কনুই-এর মাঝামাঝি। "উল্টা মোঢ়া" = বাম স্কন্ধ মোঢ় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ স্তনের বোঁটার দুই অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর দক্ষিণ বক্ষপার্শ্ব কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

"মন" = বাম বক্ষপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ গলদেশের মূল কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

"হিমাএল"—দক্ষিণ গলদেশের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া বাম কোমর পার্শ্ব কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

"আসর" = দক্ষিণ হাঁটুর অর্দ্ধহস্ত ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিতরের দিকে ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে উরুদেশ কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা :—১। "তেওয়র" আট্‌কাইবার সময় হাতের কব্জি দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ মোঢ় হইতে প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী বাম দিক্ বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

৩য়। "ভুজ" আট্‌কাইবার সময় হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম স্কন্ধ হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী বামে ও প্রায় অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ বামের দিকে হেলিয়া থাকিবে।

৪র্থ। "উল্টা মোঢ়া" আট্‌কাইবার সময় হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী বাম ভ্রূর অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম কুক্ষি হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম দিক্ বরাবর সম্মুখে থাকিবে।

"মন" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠা বাম বক্ষ-পার্শ্বের বামে ও লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ হাঁটু বরাবর গেলে প্রতিপক্ষের আঘাতকে বামে ও নিম্নে আঘাত করিয়া দূর করিয়া দিতে হইবে।

৫ম। "হিমাএল" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধ মোঢ়ের প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ মোঁঢ় হইতে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত বাম ও সম্মুখ ভাগ বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

"আসর" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠা কোমর হইতে ঈষৎ নিম্ন দিক্ বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে।

নয়ের চতুর্থ বাড়িতে তামেচা ও সাণ্ডের আঘাতের প্রতিকার আঘাত করিয়াই করিতে হইবে।

দশের বাড়ি।

১। তামেচা, মোঢ়া, করক, পালট, চির, বাহেরা, হুল, ভাণ্ডার, কোমর, সাণ্ড।

২। তামেচা, চাপ্‌নি, উল্টা মোঢ়া, ধুনিয়া পালট, সাকেন, করক, তেওয়র, কোমর, ভাণ্ডার, হিমাএল।

৩। শির, হুল, পালট, উল্টা মোঢ়া, চির, তেওয়র, মোঢ়া, চাকি, দক্ষিণ আনি, সাণ্ড।

৪। ধুনিয়া পালট, জঙ্ঘা, চাপনি, আসর, কোমর, মোঢ়া, অন্তর, বাহেরা, তেওয়র, সাণ্ড।

"চাপ্‌নি"—দক্ষিণ হাঁটুকে দক্ষিণ দিক্ হইতে একটু বক্রভাবে নিম্নমুখে কাটিয়া ফেলা হয়।

"ধুনিয়া পালট" = দক্ষিণ পদের বাহিরের দিকের গিরার ঠিক মধ্যভাগ হইতে চারি অঙ্গুলী নিম্ন পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে আঘাত করিয়া উর্দ্ধদিক্ বরাবর সন্ধিস্থল বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

"চাকি" = বাম কর্ণের প্রায় তিন অঙ্গুলী ঊর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন কাটিয়া বাহির হইয়া যায়।

"দক্ষিণ আনি" দক্ষিণ স্তনের বোঁটাকে কেন্দ্র ধরিয়া চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

"দক্ষিণ আনি" প্রয়োগকালে হাতের পিঠ নিজ বাম দিকে, অঙ্গুলীগুলি দক্ষিণ দিকে, কনুইটি নিম্নের দিকে এবং অসির ধারের পিঠ উপরের দিকে থাকে।

"জঙ্ঘা" = দক্ষিণ হাঁটু ও গুল্‌ফের ঠিক মধ্যদেশ বরাবর প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্ হইতে কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা :—২য়। "চাপ্‌নি" আট্‌কাইবার কালে হাতের

মুঠা কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। অসির পার্শ্ব দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে হইবে।

"ধুনিয়া পালট" আট্‌কাইবার কালে লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখ বরাবর ভূমিস্পর্শ করিয়া ভূমির উপরে লম্ব বরাবর থাকিবে।

৩। "চাকি" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠা বাম কর্ণের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু দক্ষিণ স্কন্ধ মোড়ের প্রায় এক হস্ত দক্ষিণ ও কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখ বরাবর উর্দ্ধে থাকিবে।

প্রকারান্তর:—হাতের মুঠা মস্তকের মধ্যদেশের অর্দ্ধ হস্ত সম্মুখে ও উর্দ্ধে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু বাম স্কন্ধ মোড় হইতে প্রায় দেড় হস্ত বাম ও অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবর থাকিবে।

"দক্ষিণ আনি"র প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু নিজ বাম দিক্ দিয়া উপরে তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে। (হুলের অনুরূপ)

৪র্থ। "জঙ্ঘা" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠা কোমর হইতে প্রায় ছয় অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে ও অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে থাকিবে; লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্ন মুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে। অসির পার্শ্ব দ্বারা প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করিতে হইবে।

এগারর বাড়ি।

১। শির, হুল, গ্রীবাণ, আনি, পালট, ভাণ্ডার, চির, মোঢ়া, মন, আসর, তামেচা।

২। তামেচা, পালট, উন্টা মোঢ়া, কোমর, দিগর, তেওয়র, ভাণ্ডার, হাতকাটি, চাকি, দক্ষিণ আনি, সাণ্ড।

৩। তামেচা, কোমর, ভাণ্ডার, আসর, মন, দিগর, করক, মোঢ়া, তেওয়র, আনি, বাহেরা।

৪। করক, পিণ্ডি, দিগর, সাকেন, ভাণ্ডার, মন, ভুজ, উন্টা মোঢ়া, গ্রীবাণ, উন্টা অন্তর, উন্টা সাণ্ড। (সাণ্ড চপ্)

"আনি"—বাম ভ্রূর বটুকে কেন্দ্র করিয়া চারি অঙ্গুলী ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে অসির অগ্রবিন্দু বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

"দিগর"—দক্ষিণ হাঁটুর ভিতর দিক্ হইতে ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়।

"পিণ্ডি"—দক্ষিণ হাঁটু ও গুল্‌ফের মধ্যদেশ বরাবর ঈষৎ নিম্নমুখে বক্রভাবে কাটিয়া ফেলা হয়।

"উন্টা অন্তর"—বাম কর্ণ মূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তক ও গলদেশের ঠিক সন্ধিস্থল ভেদ করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্ন দিয়া বাহির হইয়া যায়।

বর্ণনা:—আনির প্রতিকারের নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া হাকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক্ বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে।

প্রকারান্তর:—অথবা নিজ লাঠি নিম্নমুখ করিয়া রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিম্নের দিক্ হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ বাম দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।

২য়। "দিগর" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠা নিজ নাভির প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবর ঈষৎ নিম্নে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বরাবর সম্মুখে থাকিবে।

৩য়। "পিণ্ডি" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠা নিজ নাভি হইতে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ ও প্রায় অষ্ট অঙ্গুলী নিম্ন বরাবর থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে।

"উন্টা অন্তর" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠা বাম স্কন্ধ-মোড়ের ঈষৎ বাম ও প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবর থাকিবে। লাঠি উর্দ্ধ মুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্ব বরাবর থাকিবে।

ক্রমশঃ

শ্রী পুলিনবিহারী দাস



"মুসলমানী নাম"

উপরি উক্ত প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, যে, 'কোন ইংরেজ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম বেমালুম বদ্‌লাইয়া যাইবেই এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না। অধিকন্তু তিনি অনুমান করেন যে মুসলমান মাত্রেরই নাম আরবী হইতে হইবে এরূপ কোন ইস্‌লামিক ধর্ম্মবিধি নাই।' ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক মুসলমান বালক বালিকার আরবী ভাষাতে নাম দেওয়া এবং কোন হিন্দু বা অপর কোন ধর্ম্মাবলম্বী মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাহার পূর্ব্ব নামের পরিবর্ত্তে মুসলমানী নাম দেওয়া ইস্‌লামিক ধর্ম্মসম্মত। মিষ্টার মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল (Mr. Marmaduke Pickthall) ও মিষ্টার ডি জি আপ্‌সন্ (Mr. D. G Upson) মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সময় ইঁহাদের নামও নিশ্চয়ই পরিবর্ত্তিত করিয়া মুসলমানী নাম রাখা হইয়াছিল। তবে যদি কেহ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বনামেই অভিহিত করেন, তাহা হইলে সে আলাদা কথা।

লেখক বলেন যে ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় ভাষা অনুযায়ী নাম রাখায় কোন বাধা নাই। কিন্তু তাঁহার একথা যে যুক্তিসঙ্গত নয়, তাহা বলাই বাহুলা।

রহিমদাদ খাঁ।

সম্পাদকীয় মন্তব্য। মিঃ মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল ও মিঃ ডি জি আপ্‌সন্‌কে "কেহ" "তাহাদের পূর্ব্বনামেই অভিহিত করেন" না; তাঁহারা নিজেই নিজেদের সংবাদপত্রাদিতে ঐ ঐ ইংরেজী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। পত্রলেখক মহাশয় যদি উক্ত দুই ব্যক্তির আরবী নামের উল্লেখ কোথাও পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া প্রমাণ সহ তাহা আমাদের নিকট পাঠাইবেন।

বাংলা দেশে মুসলমানদের যাদু সেখ, হারু সেখ, কালু প্রভৃতি নাম দৃষ্ট হয়। এগুলি সম্পূর্ণ আরবী নাম নহে।

"ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় ভাষা অনুযায়ী নাম রাখার কোন বাধা নাই", ঠিক্ একথা আমি লিখি নাই। পত্রলেখক আমার মন্তব্যের, "যদি না থাকে, তাহা হইলে," এই কথাগুলি ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুটি বাক্য বাদ দিয়াছেন।

—

জাতীয় ঐক্য ও মিলনের ধারা বজায় রাখিবার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের নাম আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ ও অন্যান্য আউলিয়া দর্‌বেশ পীরপয়গম্বর শাহসুফি প্রভৃতি সাধুপুরুষদের পবিত্র নামের সহিত যোগ রাখিয়া আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। এরূপ নামকরণ পুণ্যজনক বলিয়া মুসলমানদের বিশ্বাস। তাই স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সব-স্থানের মুসলমানদের ও যে-সকল খৃষ্টান হিন্দু প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী ইস্‌লাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের পূর্ব্বনাম বদ্‌লাইয়া আরবী ভাষায় রাখিতে হয়। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদের নামে মুসলমানদের নামকরণ না করা বিষয়ে আর-একটা গুরুতর বাধা রহিয়াছে। হিন্দুগণ প্রতিমাপূজক; সুতরাং তাহাদের নামগুলিও প্রায় সবই পৌরাণিক গ্রন্থাদি হইতে গৃহীত ও নানা দেবদেবীর নামানুসারে হইয়া থাকে। এমতাবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসক মুসলমানের নাম হিন্দুর বহুদেবত্বজ্ঞাপক নামানুসারে একেবারেই হইতে পারে না। মুসলমানী মতে ইহা সম্পূর্ণ নিন্দনীয় ও ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ। প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার অভাবে সময় সময় ইহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়; যথা—সৌদামিনী বেগম, গগন ঠাকুর, মনোহর খাঁ, হরেন্দ্র ভুইঞা, নগেন ইত্যাদি মুসলমানের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমানী নামের সঙ্গে খৃষ্টানী নামের কতকটা ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ, উভয়ের ধর্ম্মতত্ত্বে কিছু মিল আছে। যথা—David = দাউদ, Eve = হাওয়া, Joseph = উইসুফ, Isaac = ইস্‌হাক, Jacob = ইয়াকুব, Adam = আদম, Moses = মুছা, Jeshu = ইসা, Abraham = এব্রাহিম, Solomon = সোলেমান, Sara = সারা, Michael = মোকাইল, Sofia = সোফিয়া, Mary = মরিয়ম, ইত্যাদি। আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষায় মুসলমানের নামকরণ করা নিন্দনীয় হইলেও এদিক্ দিয়া তাহা কতকটা সমর্থন করা যাইতে পারে।

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন "কোন অন্য-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী মুসলমান হইলে তাহার নাম বেমালুম্ বদ্‌লিয়া যায়। কিন্তু মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল, জর্জ্জ আপ্সন প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ মুসলমান হওয়ার পরও তাঁহাদের নাম বদ্‌লায় নাই।" [লেখক যে কথাগুলি আমার বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আমার নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক।] এ ধারণা ঠিক নহে, উক্ত মহোদয়দ্বয়ের সম্পূর্ণ নাম মোহম্মদ মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল ও দাউদ জর্জ্জ আপ্সন। এরূপ লর্ড হেড্‌লি আল্‌ফারুক, প্রফেসর হারুন্ মোস্তফা লিয়ন, কাপ্তেন নুরুদ্দিন ষ্টিফেন্‌সন্, ইত্যাদি। একটু লক্ষ্য করিলে এরূপ নাম হিন্দু হইতে মুসলমানধর্ম্মগ্রহণকারী লোকদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যাইবে। যথা—দীন মোহাম্মদ গাঙ্গুলি, রোকনুদ্দীন ঠাকুর, গাজী মাহমুদ ধর্ম্মপাল, ইত্যাদি। অবশ্য আমরা ব্যক্তিগতভাবে এরূপ খিচুড়ি নামেরও পক্ষপাতী নই। হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃতির ন্যায় মুসলমানের নাম রাখার আরও অসুবিধা আছে। জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক হরেন্দ্র নামক একজন মুসলমান সম্বন্ধে সে হিন্দু কি মুসলমান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হিরণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক খৃষ্টান প্রফেসর ছিলেন, তাঁহার নাম দেখিয়া অনেক ছাত্রই তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া ভ্রম করিতেন। আপ্সন সাহেব যে মুসলমান তাহা আমরা অনেকদিন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। সুতরাং বিশ্বজোড়া মোস্‌লেমের বিশ্বজনীনতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার অনুরোধে আরবী ভাষায় মুসলমানদের নামকরণের যে আবশ্যকতা ও সার্থকতা আছে সেবিষয়ে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

সম্পাদকীয় মন্তব্য। বিক্রমপুরী মহাশয়ের দীর্ঘ পত্রের কেবল প্রাসঙ্গিক অংশটি ছাপিলাম। মুসলমানেরা নিজেদের নাম যেরূপই রাখুন তাহাতে আমাদের কোনপ্রকার বিধি বা নিষেধ নির্দ্দেশ করিবার অধিকার নাই। আমরা কেবল ইংরেজ-জাতীয় মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমানদের নামের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখিয়া কিছু আলোচনা ও অনুমান করিতেছিলাম।

বিক্রমপুরী মহাশয় বলিতেছেন, মিষ্টার পিক্‌থলের নামের গোড়ায় "মোহাম্মদ" শব্দটি আছে। আমরা কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরীতে তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত প্রবন্ধ দেখিয়াছি; আগেকার বোম্বাই ক্রনিক্লে তাঁহার ছাপা নাম দেখিয়াছি; তাঁহার প্রণীত একটি গল্পের বহি সমালোচনার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার নাম দেখিয়াছি; ঐ বহির সঙ্গে আমার নামে তাঁহার একখানা চিঠি আসিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর দেখিয়াছি; কিন্তু কোথাও 'মোহাম্মদ' নামটি দেখি নাই। সেইরূপ, মুসলমান হইবার আগে মিষ্টার ডি জি আপ্‌সন্ ডি.জি আপ্‌সন্‌ই ছিলেন, এখনও আছেন; কিন্তু আগে "ডি"টি "ডেভিড"-জ্ঞাপক ছিল, এখন উহা 'দাউদ'-জ্ঞাপক হইয়াছে। যেমন গোপালচন্দ্র ঘোষ খৃষ্টিয়ান হইলে জজ্ চার্লস্ ঘোষ হইতে পারেন। যাহা হউক, পত্রলেখকদ্বয়ের সব কথাই নির্ভুল বলিয়া মানিয়া লইলেও, আমার আসল বক্তব্য ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না। আমি লিখিয়াছিলাম, "কোন ইংরেজ মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম বেমালুম বদলিয়া যাইবেই, এমন কোন নিয়ম দেখা যায় না।" বিক্রমপুরী মহাশয় যতগুলি ইউরোপীয় মুসলমানের নামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রত্যকটিরই এক বা একাধিক শব্দ হইতে মানুষগুলিকে ইউরোপীয় বলিয়া বুঝা যায়; অর্থাৎ নামগুলি "বেমালুম বদলিয়া" যায় নাই। তাহার মানে এই, যে, এই-সব লোক মুসলমান ধর্ম্মের খাতিরে নিজেদের নাম হইতে ইউরোপীয়ত্ব বিলুপ্ত করেন নাই; কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমান তাঁহাদের নামের মধ্যে ভারতীয় কোন চিহ্নই রাখেন না। যে-সব নামে ভারতীয়ত্ব আছে, সেগুলিকে বিক্রমপুরী মহাশয় খিচুড়ী নাম বলিয়াছেন। তিনি "বিশ্বজোড়া মোস্‌লেমের বিশ্বজনীনতা" চান, অথচ কোন মুসলমান যে আগে হিন্দু ছিলেন, তাহার কোন চিহ্ন তাঁহার নামে রাখিতে চান না। হিন্দুদিগকে "বিশ্ব"-বহির্ভূত মনে করিয়া ইউরোপীয়-দিগকে "বিশ্বের" অন্তর্গত মনে করিবার কোন কারণ নাই। হিন্দুত্ব-বা ভারতীয়ত্ব-জ্ঞাপক নামগুলিকে অবিশ্বজনীন মনে করিলে, কাজেই বলিতে হয়, মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল, মুকদ্দিন্ ষ্টিফেন্সন, বিশ্বজনীন নাম নহে। পুরা আরবী নামও আরবদেশীয়, "বিশ্বজোড়া" নহে। কোন ভাষার নামই "বিশ্বজোড়া" বা "বিশ্বজনীন" নহে ও হইতে পারে না। কেন না, কোন ধর্ম্মের বা কোন ভাষার "বিশ্বজনীন' হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিন্দুদের সব নাম দেবদেবীর নাম অনুসারে রাখা হয় না; যথা বিনয়ভূষণ, বিভুচরণ, গগনলাল, অতুল, প্রফুল্ল, ইত্যাদি। মুসলমানেরা অবশ্য আরব দেশীয় নামকে ভারতীয় সমুদয় নাম অপেক্ষা পবিত্রতর মনে করিয়া থাকেন ও করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা ভারতের নাম অপেক্ষা ইউরোপীয় নাম শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং মুসলমান সমাজ যদি মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল আদি নাম কাহাকেও রাখিতে দেন, তাহা হইলে অতুল ভৌমিক মুসলমান হইলে তাঁহার নাম সম্পূর্ণ বদ্‌লাইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এবিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ ছাপা হইবে না।

সাঁতার

গত আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সাঁতার সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার শেষে যে লিখিত হইয়াছে "কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাদের মধ্যে বাঙ্গালী খুব কম......" ইত্যাদি—ইহা ঠিক হয় নাই। অবশ্য কলেজ-স্কোয়ার-ক্লাবে বাঙ্গালী বেশী না থাকিতে পারে, কিন্তু কলেজ স্কোয়ার ক্লাব ছাড়া আরো বহু সন্তরণ-সমিতি আছে—যেমন সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব, আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাব, লাইফ্ সেভিং সোসাইটী প্রভৃতি। তাহাতে বহু বাঙ্গালী সভ্য আছেন এবং প্রত্যেক বৎসরের সন্তরণ-প্রতিযোগিতার ফল দেখিলেই দেখা যাইবে যে বাঙ্গালী-সন্তান এখন আর তাঁহাদের পিতামাতার অঞ্চল ধরিয়া নাই, প্রত্যেক বৎসরই তাঁহারা সব বিষয়েই ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। এ বিষয়ে একমাত্র অবাঙ্গালী শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাস মুলজী যাহা কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাহা বাঙ্গালী মুরারীলাল (পোকা) মুখোপাধ্যায়, যুগলকিশোর গোস্বামী, প্রবোধচন্দ্র ভড়, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র দে, শান্তিপ্রিয় পাল, প্রফুল্লকুমার ঘোষ, সুশীলসুন্দর শীল, আশুতোষ দত্ত প্রভৃতির তুলনায় কিছুই নহে।

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমারের সম্বন্ধে আরও একটু লেখা উচিত ছিল।—ইনি কেবল প্রথম হন নাই, অধিকন্তু সকল বিষয়েই পূর্ব্বেকার সময়-নির্দ্দেশ (Record) ভঙ্গ করিয়াছেন, তাহা নীচের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বের সময়-নির্দ্দেশ	প্রফুল্লকুমারের সময়
১ মাইল (২৭ মিঃ ৯$\frac{1}{5}$ সেঃ) (কলেজ-স্কোয়ার ক্লাবের শ্রীযুক্ত মোহিতমোহন দে তাঁহাদের Inter-Club Sportএ এই সময়-নির্দ্দেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন)।	২৫ মিঃ ৪৮ সেঃ
অর্দ্ধ মাইল (১২ মিঃ ৪৩ সেঃ 'পোকা' মুখোঃ)	১২ মিঃ ২৯$\frac{4}{5}$ সেঃ
সিকি মাইল (৬ মিঃ ৩$\frac{2}{5}$ সেঃ ঐ)	৫ মিঃ ৪৯$\frac{1}{5}$ সেঃ
২২০ গজ (২ মিঃ ৫১ সেঃ সুশীল শীল)	২ মিঃ ৪৪ সেঃ

গত ২৩ শে সেপ্টেম্বর (৭ই আশ্বিন) তারিখের ১৩ মাইল সাঁতারেও বাঙ্গালী প্রফুল্লকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ পাল ও রবীন্দ্রনাথ রক্ষিত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহারা তিনজনই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য। এক্ষেত্রেও শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার গত বৎসরের সময়-নির্দ্দেশ ভঙ্গ করিয়াছেন।

ছয় বৎসরের শিশুটি অর্দ্ধ মাইল সাঁতার কাটে নাই, সিকি মাইল কাটিয়াছে। তাহাও বিস্ময়কর বটে।

তামসকুমার মল্লিক



বেলা-শেষের গান—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এম্ সি সরকার এণ্ড্ সন্স্, ৯০। ২ এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ১৭৩ পৃষ্ঠা। এক টাকা ছয় আনা। ১৩৩০।

যে কবির জীবন-বেলা অকালে শেষ হওয়াতে সমগ্র বঙ্গ হাহাকার করিয়াছিল, সেই বাঙালীর প্রিয় কবি সত্যেন্দ্রনাথের বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর কতকাংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ৪৫টি বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন রসের কবিতা এই পুস্তকে আছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। এই পুস্তক পাঠক-পাঠিকার নিকট নিশ্চয় সমাদৃত হইবে।

আবোল-তাবোল—শ্রী সুকুমার রায়, বি-এস্ সি, এফ্ আর্ পি এস্ কর্ত্তৃক লিখিত ও চিত্রিত। প্রবাসীর আকারের ৫২ পৃষ্ঠার বই। বহুচিত্রে ভূষিত। দামের উল্লেখ নাই। প্রকাশক ইউ রায় এণ্ড্ সন্স্, ১০০ গড়পার রোড, কলিকাতা। ১৩৩০।

সুকুমার রায়ের লেখার সঙ্গে বঙ্গদেশের শিশু-সমাজ সুপরিচিত, ইঁহার অকাল-বিয়োগে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইঁহার নানা সময়ের যে সব রঙ্গভরা রসরচনা "সন্দেশ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেইগুলিই সংগ্রহ করিয়া বই ছাপা হইতেছিল; দুঃখের বিষয় সুকুমার-বাবু ইহার প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, তাঁহার মরণোত্তর-কালে এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। সুকুমার-বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ উদ্ভট আজগুবি অসংলগ্ন কথায় আবোল তাবোল কবিতা-রচনা-পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। শিশুরা সংলগ্ন চিন্তাধারা অপেক্ষা অসংলগ্ন আবোল-তাবোল রচনায় আনন্দ অধিক পায়; কর্ম্মক্লান্ত প্রবীণেরাও এই অনাবিলহাস্যপূর্ণ রসরচনা সমানই উপভোগ করে। ভাব অসংলগ্ন, ভাষা আবোল-তাবোল হইলেও রচনার বাক্যরীতি বিশুদ্ধ, ছন্দ ও মিল নিখুঁত সুন্দর; এই কবিতা পড়িলে শিশুদের ছন্দ ও মিল সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভাষা-শিক্ষা আনন্দের ভিতর দিয়া হইবে। এরূপ বই বাংলাভাষায় এই একমাত্র ও ইহা নূতন প্রবর্ত্তনা—এজন্য ইহার বিশেষ প্রচার ও সমাদর হওয়া উচিত।

রমলা—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ২৭৬ পৃষ্ঠা। সাত সিকা। ১৩৩০।

মণীন্দ্রলালের রমলা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। মণীন্দ্রলাল বড় মিঠা হাতে কবিত্ব-সরস ভাষায় গল্প লিখেন; এই উপন্যাসে তিনি নিছক কবিপনা ও নিছক অর্থোপাসনার ব্যর্থতা দেখাইয়া উভয়ের সংমিশ্রণে ও সামঞ্জস্যেই যে প্রকৃত সাংসারিক সুখ তাহাই নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন।

প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা মলাটের ছবিটি উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মানসিক প্রবণতা ও সমস্ত ঘটনার একটি ইঙ্গিতপূর্ণ সুন্দর প্রকাশ।

কবি সেখ সাদী—শ্রী সুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত। অধ্যাপক ডাক্তার হেদায়েৎ হোসেন, পি এচ্-ডি লিখিত ভূমিকা। বেঙ্গল পাব্লিশিং হোম, কলিকাতা। ১১০ পৃষ্ঠা। সচিত্র। শক্ত কাগজের মোটা মলাট। পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

ফার্সীভাষার কবিদের মধ্যে কবিবর সেখ সাদী একজন প্রধান। তাঁহার জীবন যুগ ও কাব্যের পরিচয় এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক বহু ইংরেজী গ্রন্থ হইতে উপকরণ সঙ্কলন করিয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন। লেখক ফার্সীভাষা যে জানেন না তাহার প্রমাণ পদে পদে পাওয়া যায়; গ্রন্থকার ফার্সী ভাষাভিজ্ঞ হইলে যেরূপ শুদ্ধ ও নির্ভুল বিবরণ দিতে পারিতেন, এপুস্তক সেরূপ হয় নাই, পরের মুখে ঝাল খাওয়ার ন্যায় ইংরেজী হইতে সঙ্কলিত উপকরণ লেখক নিজস্ব করিয়া আন্তরিকতার সহিত লিখিতে পারেন নাই। যে সব কবিতার অনুবাদ পদ্যে দিয়াছেন তাহারও ছন্দ ও মিল সর্ব্বত্র নিখুঁত হয় নাই। এই অনুবাদগুলির সহিত বাংলা অক্ষরে ফার্সী মূল দিলে আরো ভাল হইত। যাঁহারা নিজে কবি নন, তাঁহাদের উচিত গদ্যে কবিতার অনুবাদ করা। যাহাই হউক, কবি সেখ সাদীর পরিচয় লাভের পক্ষে এই পুস্তক যথেষ্ট সাহায্য করিবে; এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই পুস্তক হইতে সাদীর জীবন ও কাব্য-পরিচায়ক অপর বহু পুস্তকের নাম জানিতে পারিবেন।

জলধর-গ্রন্থাবলী—রায় শ্রী জলধর সেন বাহাদুর। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৬২৪ পৃষ্ঠা। দুই টাকা। ১৩৩০।

এইখণ্ডে জলধর-বাবুর নিম্নলিখিত বইগুলি আছে—

(১) হিমাদ্রি (ভ্রমণ-বৃত্তান্ত), (২) পাগল (উপন্যাস), (৩) প্রবাস চিত্র (ভ্রমণ), (৪) চোখের জল (উপন্যাস), (৫) পুরাতন পঞ্জিকা (গল্পগুচ্ছ), (৬) করিম সেখ (উপন্যাস), (৭) আশীর্ব্বাদ (উপন্যাস সমষ্টি)

জলধর-বাবুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ, উপন্যাস জনপ্রিয়। সুতরাং তাহাদের পরিচয় দিতে হইবে না। যাঁহারা জলধর-বাবুর লেখা ভালোবাসেন, তাঁহারা একত্রে অনেকগুলি বই এই গ্রন্থাবলীতে পাইবেন।

গ্রন্থাবলীতে একটি সূচীপত্রের নিতান্ত অভাব আছে। অন্য খণ্ডে প্রকাশকেরা এ অভাব রাখিবেন না,—এই আশা ও অনুরোধ।

বাসন্তিকা—প্রথম খণ্ড ১৩২৯।—শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি এল্ সম্পাদিত। ডবল ফুলস্ক্যাপ ৮ পেজি ১২০ পৃষ্ঠা। দাম এক টাকা।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত্যসভায় পঠিত ছাত্রদের কতকগুলি রচনার সহিত অধ্যাপকদের কয়েকটি রচনার সমষ্টি এই বাসন্তিকা—প্রতিবৎসরের বাসন্তিক ফসল। এইবারকার ফসলের ফিরিস্তি—

১। সুরের লহর (কবিতা)—শ্রী শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ, বি-এ—বাক্যবহুল স্বল্পপ্রাণ কবিতা। জগতের সমস্তই সুরে বাঁধা এইটুকু মাত্র বক্তব্য।

২। মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা—শ্রী নরেন্দ্রমোহন রায়, বি-এ—সার্ আউরেল্ ষ্টাইন মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার যে-সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন ও অন্যান্য যা-কিছু প্রসঙ্গক্রমে পাওয়া

গিয়াছে এই প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ ও মনোজ্ঞ।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্য—মহামহোপাধ্যায় শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের ধারা অনুসরণ। ১৮৫০ সালে মেকলের ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন হইলে ১৮৬০ পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যে নূতন প্রবর্ত্তনের কাল। কিন্তু "১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের পরে একশ' বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন বড় বই বাংলায় লেখা হয় নাই।" তার পর মিশনরী-প্রচেষ্টা। রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়ন ও রাধামাধবোদয় দুখানি "অমূল্য রত্ন।" "রঘুনন্দনের সঙ্গে পুরাণো যুগ বাংলাদেশ হ'তে বিদায় গ্রহণ কর্‌লে।" মাইকেল নবযুগের প্রবর্ত্তক—অমিত্রাক্ষর, চতুর্দ্দশপদী, নূতন ধরণের নাটক ও প্রহসন রচনা করিলেন, তাঁহার পর রামনারায়ণ তর্করত্ন, দীনবন্ধু মিত্র নাটক রচনায় খ্যাতিলাভ করেন। দীনবন্ধু "হাসির ভিতর দিয়ে বিদ্রূপ বর্ষণে সিদ্ধহস্ত, তাঁর মত কেউ ছিল না।" ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর প্রথম পেশাদারী থিয়েটারের পত্তন ও গিরীশ ঘোষের নাটক অভিনয়। তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও নাটকে শান্তরসের অবতারণা করেছেন।" "অমৃতলাল বসুর আর্টের ধারণা অধিক, তাঁর নাটকের এসব খুঁত নেই।" ১৮৩৮-৩৯ সালে প্রথমে বাংলায় গল্পের বই বের হয়—নব-বাবু-বিলাস ও নব-বিবি-বিলাস। "এসব বই এখন খুঁজে' পাওয়া যায় না।" ১৮৪৬ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বেতালপঞ্চবিংশতি"। তার পর গিরীশ বিদ্যারত্নের "দশকুমার-চরিত" তারাশঙ্করের "কাদম্বরী" "বিচিত্রবীর্য্য" "রোমাবতী"। "কলকাতায় গৌরমোহন আঢ্য প্রথমে ইংরেজী স্কুল খুলেন। ১৮১৭-১৮ সালে হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়।" "১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক্ ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।" "এর পর হুগলীতে একটি প্রাইভেট কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় ও কৃষ্ণনগরে গবর্ণমেণ্ট্ একটি কলেজ স্থাপন করেন।" "বাংলায় প্রথম মৌলিক গল্পের বই টেকচাঁদ ঠাকুর কৃত 'আলালের ঘরের দুলাল।'" তার পর তাঁর 'রামারঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়। তার পর আসিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'হুতুম প্যাঁচার নক্‌সা বইখানি সকলের পড়া উচিত।" "১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয—দুতিন বছর পরে কপালকুণ্ডলা।" "প্রতাপ ঘোষ এসময়ে 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' লেখেন।" "তার পর সাপ্তাহিক পত্রিকার আকারে উপন্যাস বেরুতে সুরু হ'ল।" "লণ্ডন-রহস্য' 'হরিদাসের গুপ্তকথা' এভাবে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত হয়।" "১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব হয। বঙ্গদর্শন বাংলা-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করে।" বঙ্গদর্শনের লেখকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রথম স্তর ঐতিহাসিক উপন্যাস, দ্বিতীয় স্তরে শিল্পকলার দিকে ঝোঁক—বিষবৃক্ষ ও চন্দ্রশেখর—দুটো প্লট্ এক গল্পে জুড়িয়া দেওয়া। 'বিষবৃক্ষে এচেষ্টা সফল হয়েছে, চন্দ্রশেখরে তা হয়নি।' তৃতীয় স্তরে নিখুঁত চরিত্র অঙ্কন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট ফলাইতে চেষ্টা—রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। এরকম শ্রেষ্ঠ রচনা আর হয় নাই।' চতুর্থ স্তরে ধর্ম্মপুস্তক রচনা—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—"এই তিনখানা বইয়ের সাহিত্যিক মূল্য কম।" উপন্যাস-জগতে যাঁরা বঙ্কিমবাবুর অনুসরণ করেন তাঁদের মধ্যে এক নম্বর রমেশ দত্ত। বঙ্গদর্শনের অনুসরণ করিয়া দুখানি পত্রিকা প্রকাশিত হয়—আর্য্যদর্শন ও বান্ধব।

"বঙ্কিম-বাবুর পর অসংখ্য উপন্যাস লেখা হয়েছে।—প্রথমতঃ—আর্টের দিকে এদের দৃষ্টি নেই। লেখকদের যথার্থ সৌন্দর্য্যবোধ নেই ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ক্ষমতাও এদের আছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়ত:—popularityর দিকে দৃষ্টি বেশী। তৃতীয়তঃ—আজকালকার উপন্যাসে moral toneএর বড় অভাব দেখা যায়।"

"গীতিকাব্য বাংলার একচেটিয়া।" "সুদূর বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালী প্রচারক খোল-করতাল নিয়ে গান কর্‌তে কর্‌তে তিব্বত মঙ্গোলিয়া সাইবেরীয়ায় ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন।" জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস গীতিকাব্যের রাজা। বর্ত্তমানে গীতিকাব্যের রাজা রবীন্দ্রনাথ। "বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গানের সাহায্য প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-গান প্রাণের আবেগে রচিত হয়েছিল—ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সে গান রচিত হয় নাই। উদ্দেশ্য নিয়ে গান রচনা করলে কি শোচনীয় ফল হয় তার পরিচয় আমরা ব্রহ্মসঙ্গীতে পাই।"

"Highest Art, Highest Morality, Highest Religion একই জিনিষ (যেখানেই এর কোন একটির নির্ম্মল ও সম্পূর্ণ বিকাশ, সেখানেই অপর দুটি আপনি এসে জুটে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে একটির ভিতর দিয়ে আর-একটিকে প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা হয় তখনি সব পণ্ড হ'য়ে যায়। কালিদাস একথাটি খুব ভাল করে' উপলব্ধি করেছিলেন; তাইতে তাঁর রচনা এত নিখুঁত। তিনি কাব্য লিখ্‌তেন; তার ভিতর দিয়ে ধর্ম্ম-প্রচার কর্‌তে চেষ্টা করেননি; ধর্ম্ম ও নীতি তাঁর লেখায় আপনি এসে জুটেছে।"

শাস্ত্রী-মহাশয় ঐতিহাসিক। এজন্য প্রত্ন যাহা, পুরাতন যাহাও তাহার সম্বন্ধে তিনি যোগ্য জহুরী। যাহা সৃজ্যমান বর্ত্তমান ও নূতন তাহার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য ভ্রমসঙ্কুল। বঙ্কিম পরবর্ত্তী উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত নিতান্ত ভ্রান্ত। ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে প্রাণের আবেগে রচিত রসরচনা আছে বারো আনা—চার আনা ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য হিসাবে নিরেস গানও আছে, কিন্তু কোন কিছুর বিচার করিতে হয় তাহার অধিকাংশ দেখিয়াই।

৪। বিজয়-যাত্রা (কবিতা)—শ্রী উমাপ্রসন্ন দে, বি-এ—mock heroic style।

৫। গোলাপের জন্মকথা (কথিকা)—শ্রী সুনীতিচন্দ্র রায়

৬। একা (গল্প)—শ্রী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

৭। শুকতারা (কবিতা)—শ্রী যতীন্দ্রকুমার গুহরায়

৮। সত্যেন্দ্র প্রয়াণ (কাব্যপরিচয়)—শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী, বি-এ

৯। আবাহন (কবিতা)—শ্রী ভূপেন্দ্রচন্দ্র হাজরা।

১০। বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা—শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার, এম্-এ, পি এইচ্-ডি—এশিয়া-মাইনর সিরিয়া আর্ম্মেনিয়া চীন এক্ষ শ্যাম আনাম কাম্বোডিয়া কোচিন মালয় প্রভৃতি দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিস্তারিত মনোজ্ঞ কৌতূহলোদ্দীপক বহুলতথ্যপূর্ণ সুলিখিত রচনা—প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্যপাঠ্য।

১১। মহারাষ্ট্রে সামাজিক প্রচেষ্টা (বিবরণ)—শ্রী হেরম্ব ভট্টাচার্য্য, বি-এ—মহারাষ্ট্র দেশে সামাজিক হিতসাধন-চেষ্টার বিবরণ।

১২। পল্লীসমস্যা—শ্রী পরিমল রায়—পল্লীসংস্কার ও পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধীয় আলোচনা।

১৩। বহুরূপী (গল্প)—শ্রী মন্মথ রায়, বি-এ।

তিন দফা ছবি আছে। ব্যঙ্গ ও রঙ্গচিত্রগুলি সুন্দর। নরেশ-বাবুর উৎকট ছবিখানি না ছাপিলেই ভালো হইত।

মোটের উপর বাসন্তিকা উত্তম হইয়াছে।

মসনবী-শরিফ—আবদুল ওয়াহেদ প্রণীত। চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুল। ৩৯০ পৃষ্ঠা। দুই টাকা। ১৩৩০।

মওলানা জালালউদ্দীন রুমী একজন ভাবরসিক শ্রেষ্ঠ সুফী ও উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন; তাঁহার ফার্সীভাষায় রচিত মসনবী কাব্য

পারস্য সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ রত্ন। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের একাংশের বঙ্গানুবাদ করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিলেন ও বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। যাঁহারা দেশ-বিদেশের কবিত্ব ভাবুকতা ও সর্ব্বজনীন সার্ব্বকালিক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্বের সম্ভোগ করিতে উৎসুক তাঁহারা এই কাব্য পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন।

অনুবাদ সাধারণ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে হইয়াছে; এবং মিল সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট হয় নাই।

অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অক্ষরে ফার্সী মূল ছাপিলে মূল ফার্সীর ছন্দ-সৌন্দর্য্য বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা উপভোগ করিতে পারিতেন। যদি পুস্তক সুবৃহৎ হইবার ভয়ে তাহা না করা যায়, তবু স্থানে স্থানে বিশেষ কবিত্বমণ্ডিত শ্লোকের মূল দিতে পারা যাইত। ভূমিকায় ফার্সী অক্ষরে মূল শ্লোক কয়েকটি থাকাতে ইহা ফার্সীভাষাভিজ্ঞ বাঙ্গালীর নিকট অধিকতর প্রীতিকর হইয়াছে।

স্বভাবকবি গোবিন্দদাস—শ্রী হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রী পরেশমোহন হালদার, বি-এল্, রংপুর, ৩১৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র। কাপড়ে বাঁধা। দু টাকা। ১৩৩০।

গোবিন্দদাস বাংলাদেশের একজন বড় কবি। তিনি দেশবিদেশের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পান নাই, তাঁহার কাল্‌চার ব্যাপক ছিল না, তবু তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি ছিল—কবিত্ব তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এজন্য তিনি স্বভাব-কবি। তাঁহার কবিত্বের বিশেষত্ব ছিল সরলতা ও পল্লী-জীবনের ছবি এবং স্বদেশ- ও স্বজাতিপ্রীতি। গোবিন্দদাসের জীবন দুঃখের সংগ্রামের নির্য্যাতনভোগের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইলেও তাঁহার কবিতা রসমধুর প্রবহবান সুন্দর সুললিত। এই কবির জীবন ও কাব্যের পরিচয় সকলেরই জানা উচিত। এই দরিদ্র ও অনাদৃত কবির জীবনচরিত এত শীঘ্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমরা যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম, তখন গোবিন্দ দাসের সমস্ত পুস্তক কিনিয়া স্বর্ণমণ্ডিত মরোক্কো চামড়ায় বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলাম—সুতরাং এই কবির জীবনচরিত ও কাব্য-পরিচয় পাইয়া আমরা যে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

মোহন-সুধা—শ্রী শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। প্রকাশক বিপন্ লাইব্রেরী, ঢাকা। ১১৫ পৃষ্ঠা। সচিত্র। পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

রাজা রামমোহন রায় ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। তিনি মানব-জীবনে আবশ্যক প্রত্যেক বিষয়ের আদর্শ অবস্থা আপনার অসামান্য মনীষার বলে দেখিতে পাইয়া তাঁহার স্বদেশে সেইসব বিষয়ের প্রবর্ত্তন ও সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল দিকে তাঁহাকে আমরা অগ্রদূতরূপে দেখিতে পাই। সেই মহাপুরুষের জীবনী ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সকল দিকের পরিচয় এই পুস্তকে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে রাজার বাংলা গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা আছে। যাঁহারা রাজার বড় জীবন চরিত পাঠ করিবার অবসর পান না, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিলেও রাজাকে বুঝিতে পারিবেন এবং তাঁহার সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিত্তের পরিচয়ের প্রভাবে নিজেরাও সর্ব্বক্ষেত্রে স্বাধীনতার উপাসক হইতে পারিবেন।

যুধিষ্ঠির—শ্রী শশিভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, এলাহাবাদ। ১১৪ পৃঃ সচিত্র। এক টাকা। ১৩৩০।

যুধিষ্ঠিরের আখ্যান ও চরিত্র শিশুপাঠ্য করিয়া লেখা। যুধিষ্ঠিরের চরিত্রে বহুগুণের সমাবেশ থাকাতে তিনি ধর্ম্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই আদর্শচরিত্রের আখ্যান শিশুরা পাঠ করিলে, তাহাদের চরিত্র সংগঠনে সাহায্য হইবে। আখ্যান-রচনানীতি একটু সেকেলে, গুরুগম্ভীর সংস্কৃতশব্দবহুল—কিশোর-কিশোরীদিগের পাঠ্য হইতে পারে। ছবিগুলি ভালো।

মুদ্রারাক্ষস

উমাকান্ত (সামাজিক উপন্যাস)—স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিরচিত। সুন্দর বাঁধান। ২৪৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান্ পাব্‌লিশিং হাউস, ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গের একযুগের ধর্ম্মনেতা ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার সকল বিশেষত্বই এই উপন্যাসে বর্ত্তমান। অল্প কথায়, অল্পসংখ্যক উপযুক্ত ঘটনার রেখাপাতে, এক-একটি মহামনা মানুষের ছবি আঁকিয়া তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এপুস্তকে তাঁহার সে শক্তির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। উমাকান্ত, উমাকান্তের জননী, বৃদ্ধ রামগতি,—ইহাদের প্রত্যেকের চরিত্র এমন মহৎ, ও সে চরিত্র এমন সুন্দর ফুটিয়াছে যে পাঠকের মনে এমন সত্যকার মানুষ দেখিতে ও এমন মানুষের সঙ্গে আলাপ করিয়া উন্নত হইতে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। গ্রন্থকার ইহাদের দোষ ও খুঁতগুলিও ঠিক ইহাদের উন্নত প্রকৃতির অনুরূপ করিয়াই আঁকিয়াছেন। "তিনি যদি কখনও জ্ঞাতিবিবাদের রণে অবতীর্ণা হন, তবে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপরে সমগ্র দেহটি রাখিয়া অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় বাক্যবৃষ্টি করিতে পারেন,"—এই একটি কথায় গ্রন্থকার যে-ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন তাহা একটি দীর্ঘ প্যারাগ্রাফেও অধিক স্পষ্ট করা সম্ভব নয়। মানুষের এমন তাজা সজীব ছবি সচরাচর উপন্যাসে পাওয়া যায় না। নবযুবক উমাকান্তের মনে প্রথম দায়িত্ব ও গাম্ভীর্য্যের ভাবের উন্মেষ,—এটি এমন বিষয় যে সহজে কোনও উপন্যাস-লেখক ইহার বর্ণনায় হাত দিতে চাহিবেন না, কিন্তু গ্রন্থকারের হাতে এটি চমৎকার ফুটিয়াছে। উমাকান্তের প্রথম পত্নী-সম্ভাষণও অতি সুন্দর ও পবিত্র। সেকেলে বৃদ্ধ রামগতির মহত্ত্ব দেখিয়া পাঠক চক্ষু শুষ্ক রাখিতে পারিবেন না; উমাকান্তের বাড়ীর মহিলাদের মতই তাঁহাকে বলিতে হইবে, "ওমা, কি মানুষ! কি মানুষ!" ভদ্রযুবক নরেশ পতিতা বিনোদিনীকে প্রেমের শক্তিতে শুদ্ধ করিয়া লইয়া বিবাহ করিলেন। এ ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার পাঠককে পাপের স্বাদটি বেশ করিয়া চাখিবার সুযোগ দিবার জন্য মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে দু'চারি পাতা খরচ করেন নাই; অথচ যে-ভাবে ইহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে হৃদয় আর্দ্র ও উন্নত হয়। গ্রন্থকার দায়িত্ববিহীন সাহিত্যবিলাসী কিংবা লেখনীজীবী ছিলেন না, ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। কি হইলে এরূপ নারীকে ভদ্রসমাজে গ্রহণ করা সম্ভব, এ প্রশ্ন তাঁহাকে স্বীয় জীবনে বহুবার মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। এজন্য এ উপন্যাসে তাঁহার কল্পিত এই ঘটনার বিশেষ মূল্য আছে। গ্রন্থকার সাহিত্যিকরূপেও যশস্বী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উন্নত জীবন ও চরিত্রের বিশেষত্বেই তিনি অমর। এই উপন্যাসে তাঁহার নিজের সেই চরিত্রের ও প্রকৃতির (autobiographical traits) ছায়া যত অধিক পরিমাণে পড়িয়াছে, তাঁহার আর কোনও উপন্যাসে তত পড়ে নাই।

গ্রন্থকারের "বিধবার ছেলে" ও "উমাকান্ত" ঘটনাহিসাবে প্রায় এক, কিন্তু "বিধবার ছেলে"তে নায়কের সদনুষ্ঠানগুলির বিস্তৃত বর্ণনার দরুন্ মানুষগুলি ঝাপ্‌সা হইয়া পড়িয়াছিল। এপুস্তকে তাহা হয় নাই। যাহা হউক, উপন্যাস-লেখকগণ গল্পের প্লটটিকে জটিল করিয়া পাঠকের কৌতূহল উত্তেজিত করিবার জন্য যে-সকল কৌশল অবলম্বন করেন, এপুস্তকে তাহা নাই, ইহার প্লট প্রায় জীবন-চরিতের মতই সরল। কিন্তু সংসারের সাধারণ ঘটনা-বলীর ও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনেকগুলি সজীব সহৃদয় ও মহৎ চরিত্র ফুটাইয়া তুলিতে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

স

বিষ্ণুর দশ অবতার *

হিন্দুদের ধারণা, ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। খৃষ্টানদের খৃষ্ট ভগবৎপ্রেরিত, ভগবানের পুত্র। মুসলমানদের মহম্মদ ভগবানের প্রেরিত পুরুষ, ভগবানের সখা। এইপ্রকারে, ভগবানের বা ভগবৎশক্তিবিশিষ্ট পুরুষের পৃথিবীতে আবির্ভাবে বিশ্বাস পৃথিবীর সভ্য জাতি মাত্রেই দেখা যায়। বাঙ্গলা দেশে আমরা তো অবতারের জ্বালায় বিব্রত, এখানে সেখানে ১০ বছর ১২ বছর অন্তর ভগবান্ কেবল অবতীর্ণই হইতেছেন! এই ব্যাপার কিন্তু অশাস্ত্রীয় নহে, ভাগবতে আছে—অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ। তাই চারিদিকে দেখি, কেহ শিবের অবতার, কেহ বিষ্ণুর অবতার, ইত্যাদি।

বিষ্ণুর অবতারই কিন্তু পুরাণে সমধিক প্রসিদ্ধ। জগৎ-রক্ষারূপ কাজ সহজ নহে, অনেকটা নড়িয়া-চড়িয়া বেড়াইতে হয়। ভগবানের হাতের কারিগরী এই বিশ্বটা বড় সুবিধার জায়গা নহে। একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশভক্ত সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন যে, তিনিও ইহার চেয়ে একটা ভাল বিশ্ব তৈয়ার করিয়া দিতে পারিতেন। এখানে ভোরবেলা রাঁধা ডাল বিকালে টকিয়া উঠে। একটা পরম ধার্ম্মিক শান্তশীল জাতি দেখিতে দেখিতে দু'পাঁচ শ বছরের মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে যা'চ্ছে-তাই করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। নিজে হাতে গড়িয়াছেন, ফেলিয়া তো আর দিতে পারেন না, কাজেই বিষ্ণুকে মাঝে মাঝে আসিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া, বেত পিটিয়া বিদ্রোহী দলকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিতে হয়। এইরূপে পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং যে ভগবানের ভুবনভ্রমণে আগমন, ইহারই নাম অবতার।

ঋগ্বেদের আমল হইতেই বিষ্ণুর কর্ম্মব্যস্ততার পরিচয় পাই। ব্রাহ্মণগুলিতে তো বিষ্ণুই প্রধান দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার পরেই, ইতিহাসে পুরাণে যেখানে যে ব্যক্তি বা উপকথার নায়ক একটু অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, তিনিই বিষ্ণুর অবতার হইয়া পড়িয়াছেন। তাই ভাগবতের উক্তি, অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ।

আমরা কথায় কথায় বলি, বিষ্ণুর দশ অবতার। কিন্তু অবতারের সংখ্যা দশে নির্দ্দেশ অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পুরাণে মাত্র ছয় অবতারের উল্লেখ আছে। কোথাও সাত অবতার। কোথাও আবার অবতারের সংখ্যা তেইশ-চব্বিশে গিয়া উঠিয়াছে (শ্রীমদ্ভাগবত)। নারদ অবতার, ব্যাস অবতার, বুদ্ধ অবতার, জৈনদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব অবতার, ইত্যাদি।

সংখ্যা যখন দশেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল, তখনও কাহাকে কাহাকে ঐ দশ সংখ্যায় ধরা হইবে তাহা ঠিক হয় নাই। মহাভারতের দক্ষিণভারতীয় সংস্করণে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়:—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীতি তে দশ॥

ঠিক এই তালিকার অনুযায়ী এবং অবিকল প্রায় এই ভাষাতেই একটি শ্লোক বাঙ্গালা দেশে অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্লোকটির মূল যে কোন্ পুরাণ, তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। * যাহা হউক, বাঙ্গালা দেশে অবতার-গণনায় এই তালিকাই প্রধানতঃ অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু ব্যতিক্রম যে একেবারে হয় নাই, তাহা নহে।

বাঙ্গালা দেশে যেখানে সেখানে কাল পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া যায়। ইহাদের প্রায় সমস্তই প্রাঙ্মুসলমান যুগের। এই মূর্ত্তির বামাধঃ, বামোর্দ্ধ, দক্ষিণোর্দ্ধ ও দক্ষিণাধঃ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম থাকে। এই মূর্ত্তিগুলির চালেতে সময় সময় দশ

* লেখক কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং অনতিবিলম্বে প্রকাশিতব্য "Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculpture in the Dacca Museum"এর এক অধ্যায় অবলম্বনে লিখিত।

* ঐ শ্লোকটি বরাহপুরাণে আছে।—প্রবাসীর সম্পাদক।

অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। বিষ্ণু-পূজার সহিত সংশ্লিষ্ট আর-একরকম প্রস্তর-শিল্পের নমুনা বাঙ্গালাদেশে পাওয়া যায়। আমি এগুলির বিষ্ণুপট্ট নামকরণ করিয়াছি। চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রবাসীর ভাদ্র সংখ্যায় "দশ অবতার প্রস্তর" নাম দিয়া এইগুলি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। পাঁচ-সাত ইঞ্চি দীর্ঘ, ঐরকম প্রস্থ, এবং ইঞ্চিখানেক বেধের মাপে এই পাথরের পাটাগুলি তৈয়ার হইত। এগুলির এক দিকে বিষ্ণু লক্ষ্মী সরস্বতী ইত্যাদির মূর্ত্তি এবং অপর পিঠে দশ অবতারের মূর্ত্তি খোদিত থাকিত। রাজসাহীর যাদুঘরে, ঢাকার যাদুঘরে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় এইগুলির নমুনা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদে আমার একখানা এইরূপ পাটা আছে। এই বিষ্ণুপট্ট-গুলি হইতেও দশ অবতারের মধ্যে কাহাকে কাহাকে ধরা হইত এবং কাহার পরে কাহাকে বসান হইত, তাহা জানা যায়।

জয়দেব (আনুমানিক ১১৭০ খৃঃ) গীতগোবিন্দের বিখ্যাত দশ-অবতার-স্তোত্রে উপরিউল্লিখিত শ্লোকের মৎস্যে কূর্ম্মো বরাহশ্চ ইত্যাদি তালিকারই অনুসরণ করিয়াছেন। বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বিষ্ণুপট্টগুলিও অধিকাংশই জয়দেবের সময়ের —অর্থাৎ পাল-সেন-বর্ম্ম রাজাদের আমলের—তৈয়ারী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনেক বিষ্ণুমূর্ত্তিতে রামের পরে পরশুরামের স্থান দেখা যায়। কেন যে এই-রকম ভুল শিল্পীরা করিত তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। পরশুরামের পরে রামের আবির্ভাবের মত একটা সর্ব্বজনবিদিত ব্যাপার যে শিল্পীরা জানিত না, ইহাই কি ধরিয়া লইতে হইবে? যদি তাহাই হয়, যাহারা শিল্পীদের নির্ম্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কিনিয়া লইতেন তাঁহারা সকলেই তো আর মূর্খ ছিলেন না? তাঁহারা এমন ভ্রমপূর্ণ মূর্ত্তি স্থাপনার্থ কিনিতেন কেন? ঢাকা-মিউজিয়মে দুখানা বিষ্ণুপট্ট আছে, দুখানাই বিক্রমপুরের খিলপাড়া দেউলে প্রাপ্ত। এই বিষ্ণুপট্ট দুখানিতেও পরশুরামকে রামের পরে দেওয়া হইয়াছে। আর দুখানা বিষ্ণুপট্ট পাওয়া যায় রামপালের দক্ষিণাংশে স্থিত একটা পুকুর কাটিতে। এ দুখানাও ঢাকা-মিউজিয়মে আছে। উহাদের একখানাতে পরশুরাম বাদ পড়িয়াছেন, আর একখানাতে বলরাম বাদ পড়িয়াছেন। উহাঁদের স্থানে দেখা দিয়াছেন ত্রিবিক্রম অর্থাৎ একবার বামন-মূর্ত্তি খোদিয়া তাহার পরে আবার বামনের আকাশে-এক-পা-তোলা লীলা-মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে।

আর-একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কৃষ্ণভক্তের দেশে, এই রাই-কানু-প্রেমগীতি-প্লাবিত দেশে, কৃষ্ণ কোথাও অবতার-রূপে প্রদর্শিত হন নাই! এমন কি গীত-গোবিন্দেও না। গীতগোবিন্দে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং এই শাস্ত্রবাক্য অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ জয়দেব গোস্বামীর মতে দশ অবতার কৃষ্ণেরই অবতার। কিন্তু কৃষ্ণের অংশাবতাররূপে প্রসিদ্ধিও শাস্ত্রেই আছে। বাঙ্গালায় বর্ম্মরাজারা পরমবৈষ্ণব ছিলেন। ভোজবর্ম্মের বেলাব-লিপিতে চন্দ্রবংশ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে।

সোপীহ গোপীশত কেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ।
অ[া]দ্যঃ * পুমানংশকৃতাবতারঃ
প্রাদুর্ভবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ ॥

—*Dacca Review*, July, 1912, JASB, 1914, p. 127. E. I. XII, p. 39.

(অনুবাদ)

সেই কৃষ্ণ যিনি এই পৃথিবীতে শত শত গোপী লইয়া কেলি করিয়াছেন, যিনি মহাভারতের সূত্রধারস্বরূপ, যিনি আদ্য পুরুষের অংশকৃত অবতার, যিনি ভূমিভার হরণ করিয়াছিলেন, তিনিও (এই বংশে) প্রাদুর্ভূত হইয়া-ছিলেন।

এই শ্লোকের মূল উৎস ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় ও ২২শ শ্লোক দুইটি বলিয়া মনে হয়। ঐ শ্লোক দুইটিতেই কৃষ্ণের অংশাবতরণ ও ভূমিভারহরণের প্রসঙ্গ আছে। পরমবৈষ্ণব ভোজবর্ম্মের বেলাব-লিপিতেও যখন কৃষ্ণের অংশাবতারত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তখন মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক যে হয়ত এই

* 'আদ্যঃ' আমার পাঠ। শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা অর্বাঃ এই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আদ্যঃ পাঠই সঙ্গততর বলিয়া বোধ হয়।

অংশাবতরণপ্রসিদ্ধির জন্যই বর্ম্ম-সেনদের আমলের শিল্পী-গণ কৃষ্ণকে অবতারের তালিকা হইতে বাদ দিয়াছেন।

প্রায় প্রত্যেক অবতারেরই এক-একখানা পুরাণ বা উপপুরাণ আছে,—মৎস্য পুরাণ, কূর্ম্ম পুরাণ, বরাহ পুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, বামন পুরাণ ইত্যাদি। রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাস বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ও-দুখানাও প্রকৃত পক্ষে পুরাণ,—একখানা রামের পুরাণ, একখানা কৃষ্ণের পুরাণ।

অবতারসমূহের ঐতিহ্য নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে বিবৃত হইল।



বিক্রমপুরে প্রাপ্ত মৎস্যাবতার মূর্ত্তি

মৎস্যাবতার

মৎস্যাবতারের কাহিনী প্রথমে শতপথ-ব্রাহ্মণে দেখা দেয় (১।৮)। মানবের আদি পিতা মনু একদিন হাত ধুইবার সময় দুইহাতের মধ্যে এক ক্ষুদ্র মৎস্য পাইলেন। মৎস্য বলিল, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমিও আপনাকে রক্ষা করিব।

মনু। কি হইতে আমাকে রক্ষা করিবে?

মৎস্য। জল-প্লাবনে এই সমস্ত স্থল ভাসিয়া যাইবে, আমি সেই প্লাবন হইতে আপনাকে রক্ষা করিব।

মনু। তোমাকে কিরূপে রক্ষা করিব?

মৎস্য। যতদিন ছোট থাকি ততদিনই আমাদের বিপদ্,—অন্য মাছে ধরিয়া ধরিয়া খায়। আপনি আমাকে প্রথমে একটা হাঁড়ীর মধ্যে রাখুন, বড় হইলে একটি পুকুর কাটিয়া তাহাতে রাখিবেন, আরও বড় হইলে সমুদ্রে ছাড়িয়া দিবেন, তখন আর কেহ আমার কিছু করিতে পারিবে না।

মৎস্য শীঘ্রই বড় হইয়া উঠিল। একদিন সে মনুকে বলিল,—বৎসরেকের মধ্যেই জল-প্লাবন হইবে, আপনি নৌকা প্রস্তুত করুন। প্লাবন আসিলে নৌকাতে উঠিয়া আমাকে স্মরণ করিবেন, আমি প্লাবন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব।

প্লাবন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিল। মনু নৌকাতে উঠিয়া মৎস্যকে স্মরণ করিলেন। সেই বিপুলকায় মৎস্য নৌকার নিকটে ভাসিতে লাগিল। মনু মাছের শিংয়ের সহিত দড়ি দিয়া নৌকা বাঁধিলেন। মৎস্য নৌকা টানিয়া উত্তর-গিরিতে গিয়া লাগাইল। এইরূপে জলপ্লাবনে মনু রক্ষা পাইলেন।

শতপথ-ব্রাহ্মণের এই গল্প পুরাণে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে,—তথায় দেখা যায় মনু সমস্ত প্রাণীর এক এক জোড়া, বৃক্ষলতাদির বীজ এবং বেদসমূহ লইয়া নৌকায় উঠিয়াছিলেন। ইহা হইতেই মৎস্যাবতারে বিষ্ণুর বেদ উদ্ধার প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে মৎস্য ব্রহ্মার অবতার, কিন্তু মৎস্য, ভাগবত, ও অগ্নিপুরাণে মৎস্য বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন।

স্মরণীয় যে, জলপ্লাবন-কাহিনী খৃষ্টানদের বাইবেলেও আছে এবং তাহা পুরাণোক্ত কাহিনীর অনুরূপ।



বরাহ অবতার
[ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত]



রাণীহাটিতে প্রাপ্ত বরাহ অবতার-মূর্ত্তি

কূর্ম্মাবতার

কূর্ম্মাবতার-কাহিনীর মূলও শতপথ-ব্রাহ্মণ (৭,৪,৩,৫)।

"স যৎ কূর্ম্মো নাম এতদ্বৈ রূপং কৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোৎ তদ্যদকরোৎ তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্মস্তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য ইতি। স যঃ স কূর্ম্মোঽসৌ স আদিত্যঃ।

(অনুবাদ) প্রজাপতি কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃজিয়াছিলেন অর্থাৎ করিয়াছিলেন। করিয়াছিলেন তাই তিনি কূর্ম্ম। কশ্যপ (কচ্ছপ) অর্থে কূর্ম্ম বুঝায়, তাই এই জীবগণকে কাশ্যপ্য বলা হয়। যিনি সেই কূর্ম্ম, তিনিই আদিত্য।

এই ক্ষুদ্র শাস্ত্রোক্তিটিতে পুরাণ-কাহিনী-সৃষ্টির অনেক বীজ লুক্কায়িত আছে। আজ সেই-সমস্তের আলোচনার দরকার নাই। দ্রষ্টব্য শুধু এই যে এখানে প্রজাপতির কূর্ম্মরূপ ধারণ করার প্রসঙ্গ আছে। সেই কূর্ম্মকেই আবার আদিত্য বলা হইয়াছে। বিষ্ণু এক আদিত্য। ক্রমে পুরাণে কূর্ম্ম বিষ্ণু অভিন্ন হইয়া উঠিলেন।

অমৃতোদ্ধারের জন্য দেবাসুরে সমুদ্রমন্থন-কালে কূর্ম্মরূপী বিষ্ণু মন্থনদণ্ড মন্দর পর্ব্বতের তলে যাইয়া তাহা ধারণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম পুরাণের প্রথম অধ্যায় দেখুন।

বরাহাবতার

পৃথিবী সমুদ্র-জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, অতিরিক্ত



টঙ্গিবাড়ীর নৃসিংহাবতার

লোকের ভারে। কেহ বলেন, পাপীর পাপের ভারে। কেহ বলেন, প্রলয়-জলে। কেহ আবার বলেন, বিষ্ণুর অসহ্য তেজে। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, প্রজাপতি বরাহ-রূপে দাঁতে খুঁড়িয়া পৃথিবীকে জলের উপরে ভাসাইয়া তুলিয়াছিলেন। শতপথ-ব্রাহ্মণে এই বরাহের নাম এমূষ। লিঙ্গপুরাণেও দেখা যায়, প্রজাপতিই বরাহরূপে পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণকার বলিয়াছেন, প্রজাপতি ও নারায়ণ অভিন্ন। এইরূপে বৃদ্ধ প্রজাপতির এই অবতারটিও অপেক্ষাকৃত নব দেবতা বিষ্ণু আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

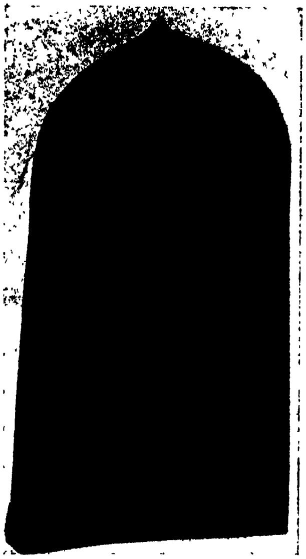
নৃসিংহাবতার

নৃসিংহাবতারের কাহিনী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। প্রহ্লাদের গল্প অনেকেই জানেন। প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর নাম শুনিতে পারিতেন না, প্রহ্লাদ কিন্তু 'ক'তে কৃষ্ণ স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হন! তাই আমরা কথায় বলি, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ! হিরণ্য-কশিপু পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বিষ্ণু কোথায় আছে? ভক্ত প্রহ্লাদ বলিলেন, তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। নিকটে ছিল একটা পাথরের স্তম্ভ। হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে এই পাথরের স্তম্ভেও আছে? প্রহ্লাদ বলিলেন, নিশ্চয়ই আছেন। বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু দৌড়িয়া গিয়া স্তম্ভে লাথি মারিলেন। অমনি সেই স্তম্ভ ফাটিয়া গেল, তাহা হইতে বিষ্ণু অর্দ্ধসিংহ অর্দ্ধ মানুষ আকৃতিতে ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে করিতে বাহির হইলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে নখরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।



বৈদ্যের আশ্রমের নৃসিংহাবতার

এই গল্পও সমস্ত পুরাণে একরকম নহে। কোন কোন পুরাণে স্তম্ভ ফাটিয়া নৃসিংহের আবির্ভাবের গল্প নাই। সম্মুখ-যুদ্ধে নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। ভাগবতে দেখা যায়, হিরণ্যকশিপু স্তম্ভকে লাথি মারেন নাই, মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের নৃসিংহমূর্ত্তিতে কিন্তু হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে লাথি মারিতেছেন, মূর্ত্তির এক ধারে ক্ষুদ্রাকারে এই দৃশ্য দেখান হইয়া থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের মূর্ত্তিতত্ত্ববিৎ ৺ গোপীনাথ রাও লিখিয়া গিয়াছেন, লাথি মারার কথা পদ্মপুরাণে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের



বৈষ্ণব আখড়ায় স্থিত নৃসিংহাবতার-

পদ্মপুরাণে কিন্তু লাথি মারার কথা খুঁজিয়া পাইলাম না।* বঙ্গবাসী সংস্করণের পদ্মপুরাণে আছে, হিরণ্যকশিপু তরবারি দ্বারা স্তম্ভে আঘাত করিলেন।

বৈদিক তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নৃসিংহাবতারের উল্লেখ আছে।

বামনাবতার

প্রহ্লাদের পুত্র বৈরোচন তাঁহার পুত্র বলি। বলি প্রবল হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল দখল করিয়া লইলেন। তখন বিষ্ণু হ্রস্বকায় ব্রাহ্মণের রূপে বলির নিকট যাইয়া শুধু ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি ভিক্ষা চাহিলেন। বলি ভিক্ষা দিলেন। তখন বামনরূপী বিষ্ণু এক পদে আকাশ ও একপদে পৃথিবী আবৃত করিয়া ফেলিলেন। আর এক পা রাখিবার আর যায়গা নাই, তাহা বলির মস্তকে রাখিলেন এবং পা দিয়া ঠেলিয়া বলিকে পাতালে পাঠাইয়া দিলেন। এই গল্প অনেক পুরাণেই আছে, কোন কোন পুরাণে বলির দানের উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে।

বিষ্ণুর তিন পাদবিক্ষেপ বেদের আমল হইতেই



ঢাকা মিউজিয়মের বামনাবতার

প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ আচমনের ঋক্‌মন্ত্র, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্‌, মনে করিতে পারেন। বিষ্ণু (অর্থাৎ সূর্য্য) তিন পাদ নিক্ষেপে আকাশ অতিক্রম করেন। সন্ধ্যা হইতে সকাল এক পা, সকাল হইতে দুপুরে এক পা আর দুপুর হইতে সন্ধ্যায় এক পা ফেলা হয়। আচমনে পরমং পদং অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ পাদবিক্ষেপের (দুপুরের) কথা বলা হইয়াছে।

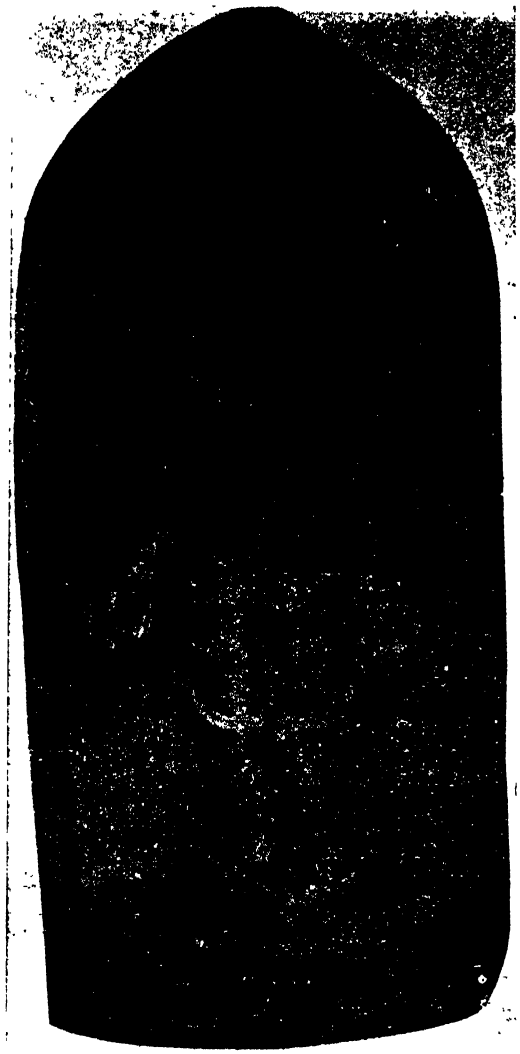
পরশুরাম স্পর্দ্ধিত ক্ষত্রিয়দের দমন করিবার জন্য ২১ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

রামের গল্প সকলেই জানেন।

* এই লাথি মারার কথা কোন্ পুরাণে আছে, কেহ জানিলে দয়া করিয়া পোঃ রমনা, ঢাকা, এই ঠিকানায় লিখিয়া জানাইলে কৃতজ্ঞ থাকিব।—লেখক।



বৈষ্ণব আখড়ায় বামনাবতার



রাণীহাটিতে প্রাপ্ত পরশুরাম মূর্ত্তি

বলরাম যে কি করিয়া অবতাররূপে গ্রাহ্য হইলেন তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তিনি দিবানিশি মদে চুর হইয়া থাকিতেন। পুরাণে তাঁহার কোন একটা বড় কাজের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। লাঙ্গল তাঁহার প্রধান অস্ত্র। মদের ঝোঁকে একবার যমুনা-নদীকে নিকটে আসিতে ডাকিয়াছিলেন। যমুনা আসিল না দেখিয়া হল বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন।

বুদ্ধকে অবতার-রূপে কল্পনা হিন্দুধর্ম্মের জীবনী-শক্তি ও উদারতার পরিচায়ক। কিন্তু পরবর্ত্তী পুরাণ-কারগণ পূর্ব্বপুরুষের এই কীর্ত্তিটি লোপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধরূপে বিষ্ণু অসুরদিগকে নাস্তিক্যবাদ শিখাইয়া নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কল্কি এখনও অবতার হন নাই। কলির শেষে কল্কি আবির্ভূত হইবেন এবং ম্লেচ্ছ নিধন করিবেন।

এই গেল অবতারের কাহিনী। এখন অবতার-

গুলির পাথরের মূর্ত্তির কথা একটু বলি। বাঙ্গলাদেশে বরাহ, নৃসিংহ ও বামন অবতারের মূর্ত্তিই বেশী পাওয়া যায়। বিক্রমপুরে একটি অপূর্ব্বসুন্দর মৎস্য অবতারের মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে, নীচে তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইল। একটি পরশুরাম-অবতারের মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি মূর্ত্তিই অসাধারণ। দ্বিতীয় একটি মৎস্য বা দ্বিতীয় একটি পরশুরাম বাঙ্গলার কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানি না। বুদ্ধমূর্ত্তি অবশ্য বাঙ্গলা দেশে অনেকই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ওগুলিকে বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধের মূর্ত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না।

উপরে যে মৎস্যাবতারের মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি উহা বিক্রমপুরে, রামপালের ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিখানি কাল পাথরের, প্রায় তিন ফুট উঁচু। চিত্রে দেখা যাইবে, মূর্ত্তিখানি খুবই সুন্দর, পাকা কারিকরের হাতের তৈয়ারী।

বিক্রমপুরে বরাহমূর্ত্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। দুখানার ছবি দিলাম। চালভাঙ্গাখানি ঢাকা-মিউজিয়মে আছে। বরাহের উত্থিত বাম কনুইর উপর অঞ্জলিবদ্ধহস্তা ভয়কম্পিতা পৃথিবীর মূর্ত্তি থাকে। সময় সময় বরাহের বিস্তৃত পদদ্বয়ের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র একটি শূকরমূর্ত্তি উৎকীর্ণ থাকে; শূকরটি যেন জলের নীচে পৃথিবীকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ঢাকা-মিউজিয়মের মূর্ত্তিখানায় পৃথিবীর মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নীচে শূকরও নাই, বরাহবতারের দ্বিতীয় মূর্ত্তিখানাতে পৃথিবী ও শূকর দুই আছে। ঢাকা-মিউজিয়মের মূর্ত্তিখানার ভাস্কর্য্য খুব ভাল। দ্বিতীয় খানাও মন্দ নহে। উহা বিক্রমপুর রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া যায়।

মৎস্যপুরাণে অষ্টবাহু নৃসিংহমূর্ত্তি নির্ম্মাণের বিধি লিপিবদ্ধ আছে। ঢাকা-মিউজিয়মে একখানা নৃসিংহ আছে, উহা চতুর্ভুজ। বিক্রমপুরে আরও বহু নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছে। টঙ্গিবাড়ী-বাজারে এক বটগাছের নীচে একখানা ছয়হাতওয়ালা নৃসিংহ আছে। তাহার ছবি দেওয়া হইল। বিক্রমপুরে এক বৈষ্ণব-আখড়ায় কয়েক-খানি নৃসিংহমূর্ত্তি আছে। সবগুলিই ছয়-হাতওয়ালা। আটহাতওয়ালা নৃসিংহ পূর্ব্ববঙ্গে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ঢাকা-মিউজিয়মে একখানা অতি সুন্দর বামন-অবতারের মূর্ত্তি আছে। বামনের এক পা আকাশে উত্থিত। পায়ের নীচে দেখান হইয়াছে, বলি বসিয়া দান করিতেছেন, ছত্রধারী বামন দাঁড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছেন, ভৃত্য ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিতেছে, সেই জলে দান শুদ্ধ হইতেছে।

পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব আখড়ায় প্রায় ছয় ফুট উচ্চ একখানা বামন-অবতারের মূর্ত্তি আছে। ইহাও কাল পাথরে তৈয়ারী ও প্রচুর-কারুকার্য্য-সমন্বিত। নীচে ১১শ—১২শ খৃষ্টীয় শতাব্দীর অক্ষরে 'ন মো বা' এই অক্ষর কয়টি লিখিত আছে। বোধ হয়—নমো বামনায় লিখিত হইতেছিল। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে মূর্ত্তিখানি রাখা হইয়াছে, তাই ভাল ফটোগ্রাফ উঠে নাই।

পূর্ব্বোক্ত পরশুরাম-মূর্ত্তিখানা বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। বিষ্ণুর গদার স্থানে হাতে পরশু। অতি সাদাসিধা মূর্ত্তি। এখানিও রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল।

শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী

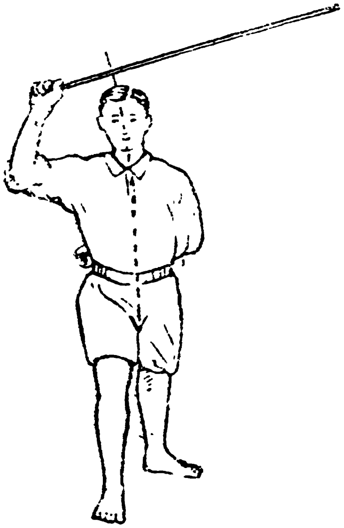


১৫ মাইল সাঁতারের প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রনাথ পাল ও রবীন্দ্রনাথ বন্দিত
(দক্ষিণ দিক হইতে যথাক্রমে)



এক মাইল, ½ মাইল ও ২২০ গজ সাঁতারের প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয়—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ ও শান্তিপ্রিয় পাল

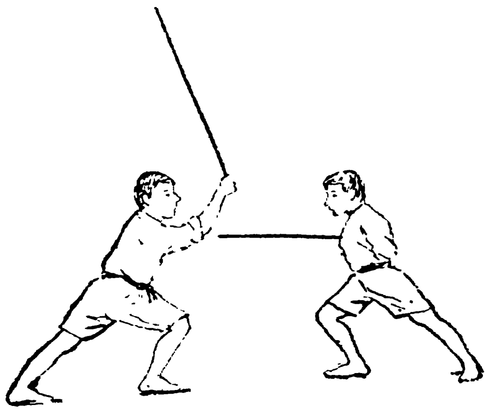
লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষার ছবি



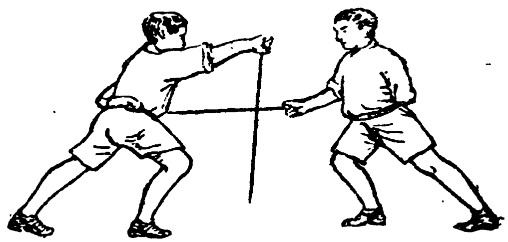
সাও



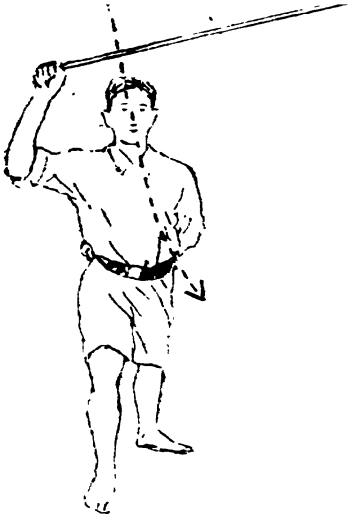
করক



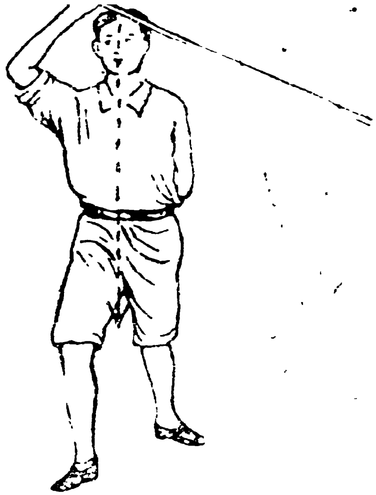
হুল (আরম্ভ কালে)



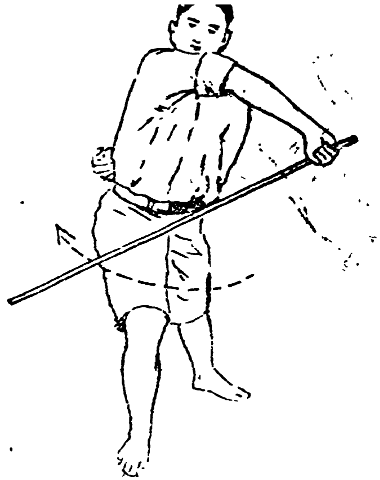
হুল (শেষ ভাগে)



উল্টা শির



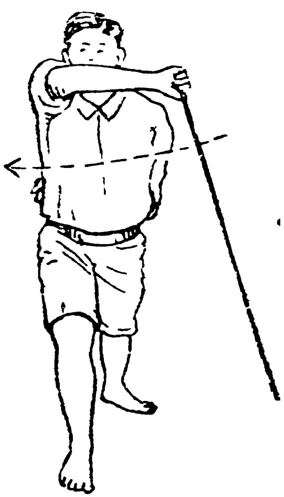
উল্টা সাণ্ড

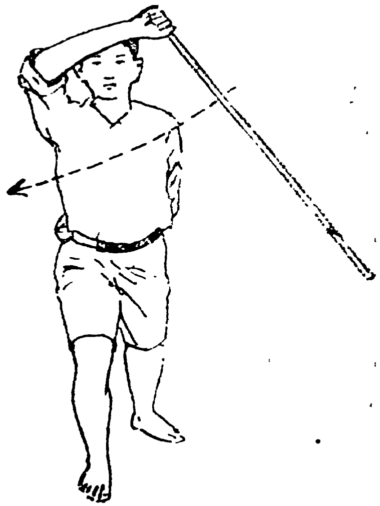


সাকেল
[আটকাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে]

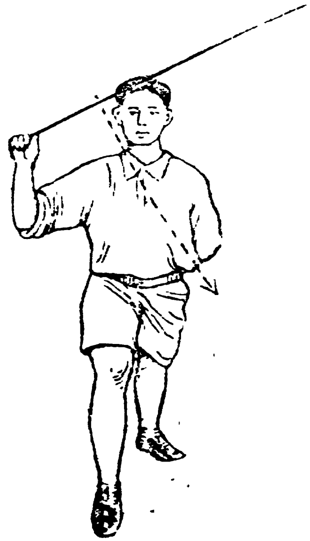


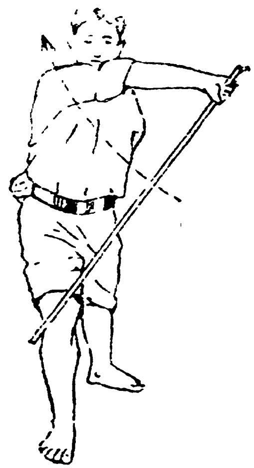
তেওয়র



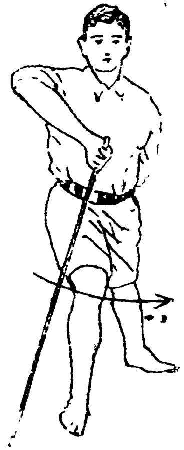


উল্টা মোঢ়া

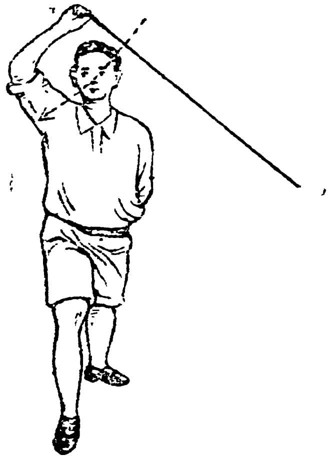


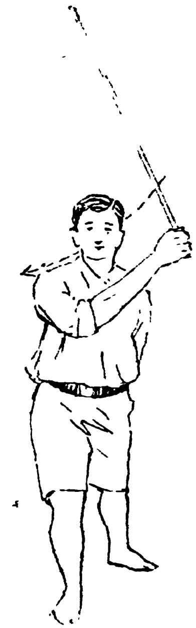


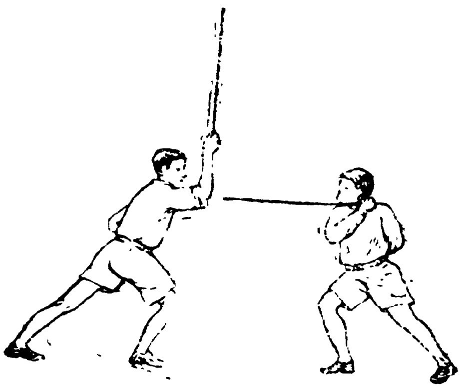

আসর


চাপ্‌নি

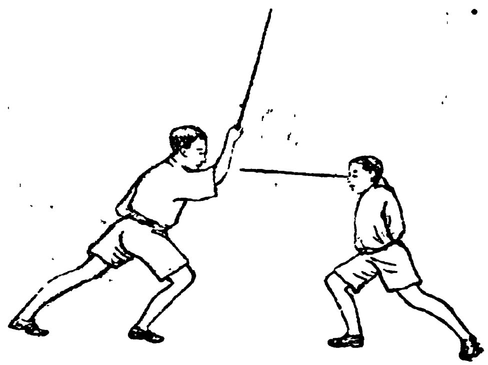

ধুনিয়া পালট্

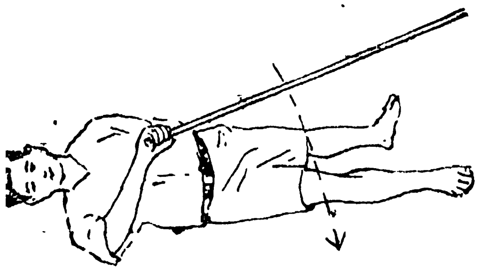

চাকি

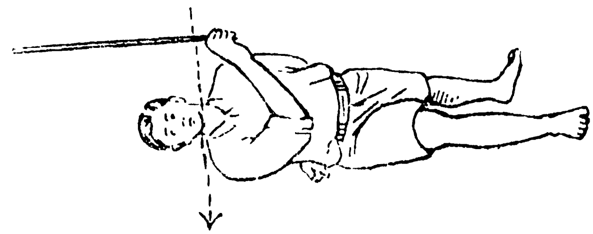

চাকি (প্রকারান্তর).

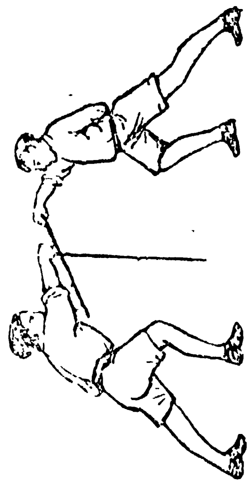

দক্ষিণ আনি

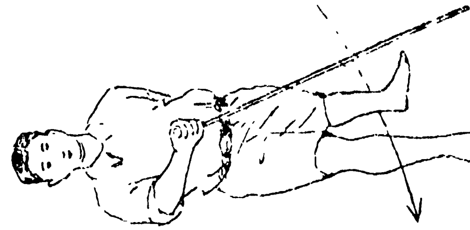

জব্বা


আনি









পরগাছা

১

খুনী মোকদ্দমার ফ্যাঁসাদে পড়ে' পাঁচ বছর সশ্রম কারাবাসের পর শঙ্কর যে-দিন ছাড়া পেয়ে জেলখানার বাইরে এসে দাঁড়াল, সেদিন তার মুক্তির আনন্দ ছাপিয়ে কিসের যেন একটা দুরন্ত আহ্বান তার দেহ-মনকে সবলে আবার সেই সুদীর্ঘকালব্যাপী কারাবাসের দিকেই টান্‌তে লাগ্‌ল। আকাশে আলো-ছায়ার মাতামাতি তার চোখের সাম্‌নে কেমন যেন বিশ্রী দেখাতে লাগ্‌ল। জেলে যতদিন সে ছিল নিয়ম-মত কাজ কর্‌ত, যা খাবার পেত মহানন্দে খেত, রাত্রে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত, আর যখন একটু অবসর পেত ভাব্‌ত তার স্ত্রীর কথা। সংসারে তার স্ত্রীকে দেখ্‌বার লোক আর কেউ ছিল না। বয়স যখন তার বারো বছর তখন শঙ্কর তাকে ঘরে আনে। তার ছিল এক বুড়ো মা, শঙ্কর তাকেও আশ্রয় দেয়। আত্মীয়-অনাত্মীয়ের মধ্যে এই তিনটি লোক নিয়েই তার ছোট সংসারটি বেশ চলে' যাচ্ছিল। বিয়ের বছর না ঘুরে আস্‌তেই শঙ্করের শাশুড়ী মারা গেলেন। তিনি মারা যাবার মাস সাতেক পরেই শঙ্কর জেলে যায়। জেলে যখন সে যায় তখন তার স্ত্রী মালতী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। শঙ্করকে যে-দিন পুলিশ এসে গ্রেপ্তার করে' নিয়ে গেল, সে-দিনের কথা সে এ জীবনে ভুল্‌তে পার্‌বে না। সে-দিন তার সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল মালতীকে দেখে। মালতী সে-দিন কত করে'ই না পুলিশের লোকদের পায়ে মাথা খুঁড়েছিল, কত করে'ই না শঙ্করকে

ফিরিয়ে দেবার জন্য নিতান্ত অবুঝের মতই কাকুতি-মিনতি করেছিল—সে কথা কি শঙ্কর ভুল্‌তে পারে ?

শঙ্করের জেলে যাওয়া ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত। সে নিজে অপরাধী নয়-একথা সে নিজে যেমন জান্‌ত গ্রামের অনেকেই ঠিক্ তেম্‌নি জান্‌ত। সেই খুনের লাসটা যে কি করে' শঙ্করের ঘরের পিছনের পুরানো কূপটাতে কে কোন্ জন্ম-জন্মান্তরের শত্রুতা-সাধন কর্‌বার জন্য এনে রেখেছিল সে রহস্য শঙ্কর আজও ভেদ কর্‌তে পারে নি। বিচারের সময় সারা গ্রামময় খুঁজে সে নিজের সপক্ষে একজন সাক্ষীও পেল না; তার অপরাধ সে কোনোদিন কারু কাছে মাথা নোয়াতে পার্‌ত না। কিন্তু বিপক্ষে তার সাক্ষী হ'ল ঢের। তবুও আরো দু'তিনটি লোক এর মধ্যে জড়িত ছিল বলে' আসল অপরাধী যে কে সেটা ভাল করে' ঠিক করা গেল না। কাজেই কারু চরম দণ্ড হ'ল না। সকলেরই জেল হ'ল, শঙ্করের হল সবচেয়ে বেশী।

শঙ্কর জেল থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল—পৃথিবীটাকে একবার ভাল করে' দেখে নিতে। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। সদর থেকে গ্রামে হেঁটে যেতে হবে। গ্রাম অনেক দূরে। শঙ্কর জেলখানা থেকে কেবল একটা জিনিষ নিয়ে বেরিয়েছিল-সেইটেই তার একমাত্র সম্বল—সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য। এই শঙ্কর যে সেই ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শক্তিহীন সামর্থ্যহীন শঙ্কর, তা' দেশে কারু চিন্‌বার যো নেই—এম্‌নি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়েছে! শঙ্কর আগে ছিল পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে আর লম্বা, মাথার কটা চুল কগাছ গুণে' বেছে দেওয়া যেত; আর এখন তার বুকের পাটা পঞ্চাশ ইঞ্চি; লম্বা লম্বা হাত দুখানি যেমন মোটা তেম্‌নি শক্ত, যেন কাঠ; মাথায় এক বোঝা উস্কখুস্ক চুল। শঙ্কর একবার গ্রামের পথের কথা মনে কর্‌লে, আবার ভাব্‌ল, গ্রামে যেয়ে কি হবে? মালতী কি বেঁচে আছে? এ পাঁচ বছরে তো সে তার কোনো খবরই পায় নি। বেঁচে থাক্‌লেও গ্রামে নেই, কারণ সেখানে কে তাকে খেতে পর্‌তে দেবে? তার কি সন্তান হয়েছে, সে কি বেঁচে আছে? মালতী তাকে কি খাইয়ে মানুষ কর্‌বে—তার যে নিজেরই জোটে না?—এই-সব কত কথাই না আজ শঙ্করের মনকে তোলাপাড়া করে' তুল্‌ল। খানিকক্ষণ সেইখানে বসে' থেকে তার পর শঙ্কর চল্‌তে লাগ্‌ল—গ্রামেরই দিকে।

বোশেখ মাস। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে কালোমেঘের দল মাথার জটা উড়িয়ে দিয়ে আকাশ জুড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মেতে গেল। তাদের হুঙ্কারে আকাশ পাতাল কেঁপে উঠ্‌ল। তাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আগুন ছুট্‌তে লাগ্‌ল। শঙ্করের মনে ভয় হ'ল। প্রকৃতির এমন রুদ্র খেলা সে বহুদিন দেখে নি। বহুদিন এমন উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে মেঘের এমন গুরুগম্ভীর গর্জ্জন তার কানে পশে নি। শঙ্করের পেছন ফিরে চাইতে সাহস হচ্ছে না-দ্রুতপদে ঝড়ের আগে আগে ছুটে চলেছে। পেছনে ভয়ঙ্কর সোঁ-সোঁ শব্দ। শঙ্কর মাঠ পার হয়ে এসে একটা বাড়ীতে উঠ্‌ল। সেটা একটা মন্দিরের পাণ্ডার বাড়ী। বাড়ীতে ঢুকেই শঙ্কর একটা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিল। ভিতর থেকে একজন প্রৌঢ়গোছের পাণ্ডা একটি বছর পাঁচেকের ফুট্‌ফুটে ছেলেকে কোলে নিয়ে দরজা খুলেই একেবারে সভয়ে পিছিয়ে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—একি! কে তুমি?

শঙ্কর তখন ভয়ে কাঁপ্‌ছিল। সাষ্টাঙ্গে পাণ্ডাঠাকুরকে প্রণাম করে' বল্‌ল—ঠাকুর মশাই, আমায় একটু স্থান দিন, ঝড় থেমে গেলেই আমি বেরিয়ে যাব, আমার বড় ভয় কর্‌ছে।

শঙ্করের করুণ সুরে আর অতবড় একটা লোককে সামান্য ঝড়ের ভয়ে এমন করে' কাঁপ্‌তে দেখে পাণ্ডাঠাকুরের দয়া হ'ল, সে শঙ্করকে ভিতরে আস্‌তে বল্‌লে। শঙ্কর ভিতরে এসে সভয়ে দরজা বন্ধ করে' দিয়ে এক-কোণে গিয়ে বসে' পড়্‌ল। পাণ্ডাঠাকুরের কোলের ছেলেটি এতক্ষণ ধরে' শঙ্করকে দেখ্‌ছিল। সে বল্‌লে—দাদাঠাকুর, আমার ভয় কর্‌ছে—ও ডাকাত।

পাণ্ডাঠাকুর হেসে বল্‌লে,—না দাদু, ভয় কি, ও ভালো মানুষ।

ছেলেটি আর কোনো কথা না বলে' দাদাঠাকুরের কোলে ঘুমিয়ে পড়্‌ল। অনেকক্ষণ সেই ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শঙ্করের চোখ যেন ঠিক্‌রে গেল। কি সুন্দর ছেলে, চোখ দুটি যেন ঠিক মালতীর চোখের মতো, রংটাও ঠিক তেম্‌নি। যদি তার অম্‌নি সুন্দর

একটি ছেলে থাক্‌তো, যদি সে গ্রামে যেয়ে দেখ্‌তে পেত যে তার সেই ছোট কুটীরখানিতে মালতী ঠিক এম্‌নি একটি ছেলে কোলে করে' তার প্রতীক্ষায় পথের দিকে চেয়ে বসে' আছে, তবে তার কতই না আনন্দ হ'ত। সহসা শঙ্করের বুক চিরে একটা তপ্ত নিশ্বাস বেরিয়ে এল। আজ বহুদিন পরে তার শুষ্ক চোখের কোণ আপনি আর্দ্র হয়ে উঠ্‌ল। কিসের যেন একটা পুলকময় আবেশে তখন শঙ্করের দেহ-মন অভিভূত।

২

পরদিন দুপুর-বেলায় গ্রামে এসে তার সব সুখ-স্বপ্নই মরীচিকার মতো কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। তার সে কুটীরের চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট নেই। সেখানে সব আগাছার ঝোপ হয়ে গেছে। যাকে সাম্‌নে পেল তার কাছেই মালতীর কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, কেউ ঠিক উত্তর দিতে পার্‌লে না। কেউ বলে—ঐ পাশের গাঁয়ে আছে, কেউ বলে—সে আর নেই; কেউ বলে—তাকে কবে কোন্ বোষ্টম ভেক্ দিয়ে কণ্ঠী-বদল করেছে। শেষের কথাটাই শঙ্করের কাছে সত্য বলে' মনে হ'ল। মালতীর রূপ ছিল। কাজেই এরূপ সহায়সম্পদ্‌হীনা রূপসী যে অনেক বোষ্টমের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বে তাতে আর সন্দেহ কি? সে সেই পরিত্যক্ত ভিটাতে বসে' বসে' অনেক ভাবলে, চোখের অনেক জল টস্ টস্ করে' মাটিতে পড়ে' শুকিয়ে গেল। গ্রামের দু-এক জনে এসে বল্‌ল,—শঙ্কর, আবার বিয়ে করে' সংসারে মন দে।—শঙ্কর এ কথার কোনো উত্তর দিল না। বিয়ে করে' সংসারী হ'তে তার মন আর কিছুতেই চায় না। তবে এমন একটা কিছু চাই যাকে নিয়ে সে তার কর্ম্মক্লান্ত দিনগুলি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পারে। সেই পাণ্ডা-ঠাকুরের কথা মনে হল। পরদিন সেইখানে ফিরে এসে সে বিনা-বেতনে চাকরী নিল।

পাণ্ডা-ঠাকুর যখন মন্দিরে যায় তখন শঙ্কর তার ঘরে পাহারায় থাকে। পাণ্ডা-ঠাকুরের এক ঐ ছোট্ট ছেলেটি ছাড়া আর কেউই নেই। ছেলেটির নাম দেবদাস। পাণ্ডা-ঠাকুর দাসু বলে' ডাকৃত। দাসু এখন শঙ্করের কাছে আস্‌তে ভয় পায় না, শঙ্করের বড়ই বাধ্য হয়ে পড়েছে। কোনো কোনোদিন সন্ধ্যার আরতির সময় সে শঙ্করের সঙ্গে গল্প কর্‌তে কর্‌তে পাণ্ডা-ঠাকুরের সঙ্গে মন্দিরে যেতেও ভুলে যায়। আগে দাসুকে একা পাণ্ডা-ঠাকুরকে দেখ্‌তে হ'ত, এখন শঙ্করই তার সব ভার প্রায় নিয়ে বসেছে। এক-একদিন দাসু রাত্রে শঙ্করের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে, পাণ্ডাঠাকুর শোবার সময় এসে শঙ্করের কোল থেকে তাকে নিয়ে যায়, সারারাত শঙ্কর ছট্‌ফট্ করে' মরে—ঘুম হয় না। একদিন শঙ্করের মনে বড়ই একটা বদ্‌খেয়াল হ'ল। সে ভাব্‌লে কি কর্‌লে সে দাসুর সবটুকু আব্দার সবটুকু অত্যাচারের ভার একা নিতে পারে, কি কর্‌লে দাসুকে সে একা বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাক্‌তে পারে, তাতে বাধা দেবার আর কেউ না থাকে। চুরি? চুরি করে' কি লাভ? কোথায় লুকিয়ে রাখ্‌বে? পাণ্ডা-ঠাকুর তো তক্ষুনি সমস্ত দেশ পাঁতি পাঁতি করে' খুঁজে যেখান থেকে হোক্ দাসুকে বের কর্‌বেই কর্‌বে। দাসুকে ছাড়া যে তার একটি দিনও চলে না। কিন্তু চুরি না করে'ই বা উপায় কি? কোনো প্রকারে লুকিয়ে যদি এদেশ ছেড়ে যেতে পারে, কোনো এক পাহাড়-পর্ব্বতে লুকোতে পারে, তবেই তো রক্ষা পাওয়া যায়—তবেই তো দাসুকে পাওয়া যায়। শঙ্কর দাসুকে চুরি করাই ঠিক করে' ফেল্‌লে।

সে-দিন অমাবস্যার রাত্রি। মন্দিরে পূজার বিরাট্ আয়োজন। পাণ্ডা-ঠাকুরের ফিরে আস্‌তে অনেক বিলম্ব হবে, তাই দাসুকে আর নিয়ে গেল না। দাসু খেয়ে দেয়ে নানা কথা বল্‌তে বল্‌তে শঙ্করের কোলেই ঘুমিয়ে পড়্‌ল। শঙ্কর ঘুমন্ত দাসুকে বুকে ভাল করে' জড়িয়ে ধরে' বেরিয়ে পড়্‌ল। কিছুদূর ধীরে ধীরে হেঁটে চল্‌ল। কিন্তু ভয় হল যে পাছে এর মধ্যে কোন কারণে পাণ্ডা-ঠাকুর যদি হঠাৎ বাসায় ফিরে যেয়ে থাকে তবেই সর্ব্বনাশ ঘটাবে। সে দাসুকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে' প্রাণপণে ছুটতে লাগ্‌ল। দাসুর ঘুম ভেঙে গেল। সে প্রশ্ন কর্‌ল,—কোথায় যাচ্ছ শঙ্কর-দা?

শঙ্কর ছুটতে ছুটতে বল্‌লে,—চল্, পরে শুন্‌বি।

দাসু ভুল্‌বার ছেলে নয়। সে কেঁদে বল্‌ল,—আমায় এ অন্ধকারে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বল?

শঙ্কর কোনো উত্তর দিল না, পূর্ণবেগে ছুটতে লাগ্‌ল।

দাসু চীৎকার করে' কেঁদে উঠে বল্‌লে,—দাদাঠাকুর, শঙ্করদা আমায় চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছে, শীগ্‌গীর এসো। আমায় বাঁচাও। আমায় বাঁচাও।

শঙ্কর দেখ্‌লে এ তো মহামুস্কিল। এর চীৎকারে চারদিকের লোক জড় হতে পারে। সে দাসুর মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে' ছুটতে লাগ্‌ল। তবুও ভাঙা ভাঙা সুরের কান্না শোনা যেতে লাগ্‌ল। এবার শঙ্কর কোমরের কাপড় খুলে তার এক দিক্ দাসুর মুখের মধ্যে ঠেসে দিয়ে ছুটতে লাগ্‌ল। এবার আর দাসু কাঁদতে পার্‌লে না। শঙ্করের বোধ হল যেন তার পিছু পিছু কেউ ছুটে আস্‌ছে। কোথায় পালায়? ঐ যে একটা ঝোপের আড়ালে ছোট একটা কুটীর দেখা যায় না, ঐ যে মিট্‌মিট্ করে' দীপ জল্‌ছে, ঐখানে লুকালে হয় না? শঙ্কর সভয়ে সেই কুটীরে ঢুকে পড়্‌ল। ও

কুটীরে যে থাকত সে শঙ্করকে দেখেই চিনে ফেল্‌লে। যুগ-যুগান্ত না দেখা হলেও কে সে-শঙ্করের মুখ এ জীবনে ভুল্‌তে পারে না। শঙ্করও চিন্‌লে এ তারই সেই মালতী। মালতী শঙ্করের কোলে ছোট ছেলেটি দেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—এ কার ছেলে? তুমি কোথা থেকে একে নিয়ে এলে?

শঙ্কর চুরির কথাটা মালতীর কাছেও গোপন করে' বল্‌লে,—এ আমার এক বন্ধুর ছেলে। তুই আর কথা বলিস্‌নে মালতী, তুই বাইরে একটু সরে' দাঁড়া।

শঙ্করের গলার স্বর ও চোখের চাউনি দেখে মালতীর ভয় হল, সন্দেহ হল। সে বল্‌লে,—চুরি করে' আননি তো?

শঙ্কর বল্‌লে,—চুরি!—না—হাঁ ঠিক নয়—তবে কি জানিস্ মালতী, তুই চুপ্ কর্।

মালতী সবিস্ময়ে প্রশ্ন কর্‌লে,—কোত্থেকে চুরি করে' এনেছ? ঠাকুর-মন্দির থেকে? পাণ্ডা ঠাকুরের ঘর থেকে?

শঙ্কর বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে মালতীর মুখের দিকে হাঁ করে' চেয়ে রইল। মালতী ললাটে করাঘাত করে' চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল,—কি করেছ, শেষে নিজের ছেলে চুরি! কেন আন্‌লে, আমি যে ওকে ঠাকুর-মন্দিরে দান করেছি।

শঙ্কর সবলে দাসুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে' বল্‌লে, —আমার ছেলে! দান করেছ! কার কথায় দান করেছ মালতী?

মালতী শঙ্করের কণ্ঠস্বরে ভয় পেল, একটু পিছনে সরে' বল্‌লে,—দান না করে' আমার যে আর উপায় ছিল না। তা না হলে বাছা এতদিন না খেয়ে মারা যেত!

—কি করে' দান কর্‌লে? পাণ্ডা-ঠাকুর তোমায় চেনেন? তবে চলো তাঁর পা ধরে' মিনতি করে' নিজেদের ছেলে নিজেরা ফিরিয়ে নিয়ে আসব চলো।

মালতী আঁচলে চক্ষু মুছে বল্‌লে,—না তিনি তো আমায় চেনেন না। আমি রাত করে' মন্দিরের বারান্দায় একে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছিলুম, তখন এর বয়েস ছ'মাস। তারপর কতদিন ভেবেছি কেন এমন কাজ করলুম, মা হয়ে বুকের সন্তানকে কেন এমন করে' দূরে ফেলে দিলুম! কিন্তু উপায় ছিল না। তখন আমি সে কথা প্রকাশ কর্‌লেও কেউ বিশ্বাস করত না। পাণ্ডা-ঠাকুরের টাকা পয়সার অভাব নেই, তিনি কত যত্নে ওকে পালন করেছেন। আমি প্রতিদিন কাজে অকাজে আগে একবার করে' মন্দিরে যেতুম, শেষে ভাব্‌লুম যাকে ত্যাগ করেছি তাকে ভুল্‌ব। তাই প্রাণ আমার শতকণ্ঠে হাহাকার করে' উঠ্‌লেও আর আমি সেখানে যাই নি।

শঙ্কর বসে' ছিল, উঠে মালতীকে সজোরে এক পদাঘাত করে' বল্‌লে,—সর্ব্বনাশী! তোর মতো রাক্ষসী মা এমন সোনার কার্ত্তিক গর্ভে ধরেছিল কেন? হায় হায়! এখন কি হবে? কি করে' আমার দাসুকে রক্ষা করি, কোথায় পালাই? শেষে কি নিজের ছেলে নিজে চুরি করে' জেলে যেতে হবে? হা ভগবান্! এ কি কর্‌লে?

৩

দাসুর কান্না আর থামে না। শঙ্কর তাকে কত করে' বুঝালে, তবু সে শোনে না। তার মুখে কেবল সেই একই কথা,—দাদাঠাকুরের কাছে যাব, দাদাঠাকুরের কাছে যাব। শঙ্কর একবার ঘরে যায়, একবার বাইরে আসে। যখন কুটীরের পাশ দিয়ে কোনো লোক যেতে দেখা যায়, তখন সে দৌড়ে গিয়ে দাসুর মুখ চেপে ধরে, আবার লোক সরে' গেলে ছেড়ে দেয়। এমনি করে একদিন একরাত্রি কেটে গেল। দাসু এক ফোঁটা দুধ বা জল কিছুই খেল না। সন্ধ্যার পরে দাসুর জ্বর হ'ল। প্রবল জ্বর। আর সে উচ্চ চীৎকার নেই, দুর্জ্জয় জ্বরের তাড়নে অবোধ ক্ষুদ্র শিশু বিছানায় ঢলে' পড়েছে। শঙ্কর শিয়রে বসে'—নীরব নিঝুম। তার দুর্দ্দান্ত চিত্ত তখন তার বিপক্ষে তুমুল বিদ্রোহ করেছে। এখন সে কি করে? ডাক্তার আন্‌তে গেলে সব কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আর ডাক্তার না আন্‌লেও দাসুর জীবনের কোনো আশা নেই। জ্বরের ত্রাসে দাসুর মুখখানি শুকিয়ে গেছে—বৈশাখের রোদে বাগানের গোলাপ যেমন করে' মলিন হয়ে শুকিয়ে যায়। শঙ্কর সেই মুখখানির দিকে চেয়ে। ক্রমে শিশুর সর্ব্বাঙ্গ অবশ শিথিল হ'য়ে আস্‌ছে। শঙ্কর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—মালতী, তুই বোস্, আমি চল্‌লাম যদি ডাক্তার আনতে পারি তবে ফির্‌ব, নৈলে আর ফির্‌ব না।

শঙ্কর ধীরে ধীরে কুটীর থেকে বেরিয়ে এল। রাত্রির ঘনান্ধকারে নিজের শরীর নিজের চোখে দেখা যায় না—এম্‌নি নিবিড় এম্‌নি সূচিভেদ্য! শঙ্কর সভয়ে সেই অন্ধকারে প্রান্তর অতিক্রম করে' গ্রামের দিকে চল্‌ল; পল্লীর নির্জ্জন প্রান্তর প্রেতপুরীর মত ভয়াবহ। আশে-পাশে সহসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুন্‌লেই শঙ্কর ভয়ে শিউরে ওঠে - ঐ বুঝি ধর্‌তে এল!—আর অম্‌নি দ্রুতপদে চল্‌তে থাকে। এম্‌নি করে' সে গ্রামের ডাক্তারের বাড়ীর সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। একবার মনে হ'ল পাণ্ডা-ঠাকুরকে খবর দিলে হ'ত, সে হয়ত বা বেশী টাকা দিয়ে ভাল ডাক্তার নিতে পারত, হয়ত বা দাসু বাঁচ্‌তে পারত। কিন্তু তাতে শঙ্করের লাভ কি? সে ডাক্তারের ঘরের সাম্‌নে এসে ডাক্‌ল,—ডাক্তার-বাবু!

ডাক্তার ঘুমুচ্ছিল। শঙ্করের ডাকে জেগে উঠে বল্‌লে, —কে?

শঙ্কর বার দুই ইতস্ততঃ করে', বার দুই কেশে নিয়ে বল্‌লে,—আমি শঙ্কর।

শঙ্কর! ডাক্তার লাফিয়ে উঠ্‌ল। পুলিশের খোঁজা-খুঁজির কথা ডাক্তার জান্‌ত। বাইরে এসে একবার শঙ্করের আপাদমস্তক দেখেই সে বুঝ্‌তে পার্‌লে যে এই সেই ছেলে-চুরির অপরাধী ফেরারী আসামী শঙ্কর। ডাক্তার প্রশ্ন করলে,—তুমি মন্দিরের পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ী থাক্‌তে না?

শঙ্কর হাঁ কি না কি বল্‌বে ঠিক না পেয়ে মৌন হয়ে রইল।

ডাক্তার আবার প্রশ্ন করলে,—তুমি তার ঘর থেকে এক ছেলে চুরি করে' নিয়ে পালাও নি?

শঙ্কর এবার ডাক্তারের পায়ের উপর পড়ে' বল্‌লে,—ডাক্তার-বাবু, আপনি ওসব কথা পরে শুন্‌বেন, আগে চলুন।

ডাক্তার সবিস্ময়ে বল্‌লে,—কোথায় যাব?

শঙ্কর ডাক্তারের পা দুখানি আরো জোরে চেপে ধরে' বল্‌লে,—চলুন ডাক্তার-বাবু, কোনো ভয় নেই।

প্রথম ডাক্তারের ভয় হ'ল—শঙ্করের চেহারা দেখে। অতবড় লম্বা, ডাকাতের মত চেহারা, চোখ দুটো শ্বাপদের মত হিংস্র। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনে ডাক্তারের দয়া হ'ল। সে নীরবে শঙ্করের পিছু পিছু চল্‌ল—উদ্দেশ্য—আর কিছু হোক্ আর না হোক্ শঙ্করের বাড়ীর খোঁজটা অন্তত নিয়ে এসে পাণ্ডা-ঠাকুরকে দেওয়া যাবে। অন্ধকারের মধ্যে দুই জনে প্রান্তর অতিক্রম করে' একটা জীর্ণ-কুটীরের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। শঙ্কর কুটীরের বাইরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে,—ডাক্তার-বাবু, ঘরে যান্, দাদু মর্‌ছে, আমি আর যাব না। যদি পারেন তাকে বাঁচাবেন—নির্দ্দোষ শিশু। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে রইলুম, পার্‌ব না তার যন্ত্রণা দেখ্‌তে। শেষ হয়ে যাবার আগে আমায় একবার ডাক্‌বেন, আমি একবার শেষ-দেখা দেখে নেব।

ডাক্তার সভয়ে কুটীরে ঢুক্‌ল। মালতীর কোলে মাথা রেখে দাদু এলিয়ে পড়েছে। একটা আধ-ফোটা গোলাপের কলিকে জোর করে' টেনে ছিঁড়ে তপ্ত মাটিতে ফেলে দিলে সেটা যেমন করে' শুকিয়ে ম্লান হয়ে যায়—দাদুও ঠিক তেম্‌নি হয়ে গেছে। বুকে পিঠে খিল ধরে' গেছে। সেই সরল মুখখানির উপর অন্তিমের করাল ছায়া বড়ই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। দাদুর কাছে বসে' ডাক্তারের দু'চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগ্‌ল। শিশুর বাচ্‌বার কোনো লক্ষণই আর অবশিষ্ট নেই। হাত পা ধীরে ধীরে হিম অসাড় হয়ে আস্‌ছে। নিশ্বাস ক্ষীণ—অতিক্ষীণ। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার জামার হাতায় চোখের জলটা মুছে নিয়ে ডাক্‌ল,—শঙ্কর!

শঙ্কর কাঠের পুতুলের মত ঠিক এই ডাকটির অপেক্ষা করে'ই যেন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়াল—দেব-মন্দিরে শয়তান যেমন সভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার বল্‌ল,—পাণ্ডা-ঠাকুরকে একবার খবর দিলে হয় না?

শঙ্করের গলা ধরে' এসেছিল, সে ভাঙা গলায় বল্‌লে,—তা হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবু, ফিরে এসে কি আর দেখ্‌তে পাবো?

ডাক্তার বল্‌লে,—পাবে। তাড়াতাড়ি এসো।

শঙ্কর আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে' ছুট্‌তে লাগ্‌ল। বাতাসের আগে আগে ছুটে এসে পাণ্ডা-ঠাকুরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়াল। তখন ঘরে প্রদীপ জ্বল্‌ছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে চেয়ে শঙ্কর দেখ্‌লে—পাণ্ডা-ঠাকুর বসে' বসে' কি যেন ভাব্‌ছে, তার চোখের জলে বুক ভেসে গেছে! চেহারা দেখে শঙ্কর চম্‌কে উঠ্‌ল! মহামারীর সময় একে একে সমস্ত পরিবারকে হারিয়ে জীবিতাবশিষ্ট গৃহস্বামীর চেহারা যে রকম দেখায় পাণ্ডা-ঠাকুরের চেহারা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। শঙ্কর অনায়াসে বুঝ্‌তে পার্‌লে, কেন তার এমন দশা হয়েছে। প্রথম পাণ্ডাঠাকুরকে ডাক্‌তে তার সাহস হ'ল না। তার পর দাদুর মুখখানির কথা যেই মনে হল, মনে হল যে ফিরে যেয়ে হয়ত বা আর তাকে দেখ্‌তে পাবে না, তখন তার চমক ভাঙল। সে সভয়ে ডাক্‌ল,—দাদা-ঠাকুর!

শঙ্করের গলার স্বর শুনেই পাণ্ডা-ঠাকুর চিন্‌তে পার্‌লে। সে উন্মাদের মত লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে এসে বল্‌লে,—কে? শঙ্কর? দে আমার দাদুকে দে! তোকে আমি কিছু বল্‌ব না, একজীবন অনায়াসে খেতে পার্‌বি এমন ধন তোকে আমি দিয়ে যাব। তোকে আমি সব দেব, তুই আমার দাদুকে ফিরিয়ে দে।

চলো, দিচ্ছি।—বলে' শঙ্কর বেরিয়ে পড়্‌ল। পাণ্ডা-ঠাকুর পিছু পিছু ছুটে চল্‌ল। নিমিষের মধ্যে মাঠ পেরিয়ে ভাঙা কুটীরের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে শঙ্কর বল্‌লে,—যাও, এই ঘরে যাও।

পাণ্ডা-ঠাকুর লাফিয়ে পড়ে' দাদুকে নিজের কোলে টেনে তুলে নিল—শাবকহারা ব্যাঘ্র যেমন করে' তার সন্তানকে অপহারীর কোল থেকে ছিনিয়ে নেয়। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পাণ্ডা-ঠাকুর ডাক্‌ল,—দাদু!

মুহূর্ত্তকালের জন্য যেন দাদুর জ্ঞান ফিরে এল। রক্তবর্ণ চক্ষু দুটো মেলে একবার পাণ্ডা-ঠাকুরের দিকে চেয়ে আবার চক্ষু বুজ্‌ল—আর চক্ষু খুল্‌ল না, কিন্তু ঠোঁটের উপর ফুটে উঠ্‌ল একটু নিশ্চিন্ত নির্ভরের হাসি!

শ্রী প্রিয়নাথ বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমি পীড়িত ও দুর্ব্বল আছি বলিয়া এ মাসের কাগজে নিয়ম রক্ষার জন্য সামান্য কিছু বিবিধ প্রসঙ্গ লিখিলাম।

—

উইলিয়ম্ উইনষ্টান্‌লী পিয়ার্সন্

শান্তিনিকেতন আশ্রমের অন্যতম অধ্যাপক, ভারতবর্ষের অকৃত্রিম বন্ধু, সকল জাতির স্বাধীনতার একান্ত অনুরাগী, মানবপ্রেমিক উইলিয়ম্ উইনষ্টান্‌লী পিয়ার্সন মহাশয়ের ইটালীতে আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম।

—

মল্লভূম-শিল্পসমিতি

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর বহুকাল হইতে তসর, গরদ, প্রভৃতি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। এক্ষণে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দত্ত, এম্-এ, ও আরও দুইজন গ্রাজুয়েট্ মল্লভূম-শিল্পসমিতি নাম দিয়া একটি কারবার স্থাপন করিয়াছেন, এবং বেনারসী কাপড়ের মত কাপড়ও প্রস্তুত করাইতেছেন। জিনিষ ভাল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। দাম বেনারসী অপেক্ষা কম। বাংলাদেশে এইসব কাপড়ের খুব কাটতি হওয়া উচিত। তা ছাড়া, অন্যান্য রকমের কাপড়ও আছে।

—

ধনুর্বিদ্যা, অসিক্রীড়া, ইত্যাদি

বন্দুক কামান প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে, যুদ্ধে তীর ধনু, তলোয়ার, গদা, প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে যদিও যুদ্ধে তীর ধনু ব্যবহৃত হয় না, তথাপি জাপানে, আমেরিকার ও ইউরোপের নানাদেশে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ধনুবিদ্যা শিক্ষা করে। ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল হয়, এবং পটুতা ও একাগ্রতা জন্মে। তলোয়ারের দ্বারাও যুদ্ধে জয়লাভ করিবার কল্পনা আজকাল কোন প্রকৃতিস্থ লোকে করে না। কিন্তু তলোয়ার খেলারও চলন ইউরোপে খুব আছে। লাঠিখেলারও চলন আছে। একাগ্রতা, পটুতা ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধি প্রধান লক্ষ্য।

এইসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার আর্চ্চারী, ফেন্সিং, ফয়েল্-ফেন্সিং, কেন্-ফেন্সিং, সিংগল্-ষ্টিক, প্রভৃতি প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

—

পঞ্চাশ বৎসর পরের ঘর-সংসার

ভারতবর্ষের অনেক লোকের ধারণা যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসারের আদত রূপটি নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত বিস্তার ও উন্নতি সত্ত্বেও, ইতিমধ্যেই উন্টা কথা শোনা যাইতেছে; ওম্যান্ সিটিজেন্ পত্রে তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

"গৃহকার্য্য বলিতে আজকাল আমরা যাহা বুঝি পঞ্চাশ বৎসর পরে তাহার কোনো চিহ্নই থাকিবে না। অন্তত গৃহস্থালীর দাসত্ব এবং বর্ত্তমান দাস-দাসীর অস্তিত্ব যে আর থাকিবে না, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। প্যাট-ইন্‌ষ্টিটিউটের গার্হস্থ্য-বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ডব্লিউ হো এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞানের আরো বহু শিক্ষক ও ছাত্রেরও এইরূপ ধারণা।"

'মিঃ হো বলেন,—"পঞ্চাশ বৎসর পরে ঝি-চাকরের কোনো স্থানই গৃহস্থালীতে প্রায় থাকিবে না; কিন্তু আমেরিকান্ গৃহ সংসার তখন আধুনিক গৃহের তুলনায় চিত্তাকর্ষক ও কার্য্যকারী অনেক বেশী হইবে।"

'আমি বলিলাম, "কিন্তু ঘর সংসার চালাইতে এবং সকল দিক্ দিয়া ভাল ভাবে ইহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইলে পরিশ্রমের দরকার। এবং কেবল একটি মানুষের শ্রমেও তাহা হওয়া সম্ভব নয়।"

'তিনি বলিলেন, "সে কথা সত্য। কিন্তু ভবিষ্যতে নিজেরা সংসারের কাজে আরো অনেক বেশী সময় দিবেন, এবং বাহিরের লোকের সাহায্য দরকার হইলে ঘণ্টা, দিন কিম্বা সপ্তাহ হিসাবে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের উঁচুদরের কাজ পাইতে পারিবেন। যে জাতীয় কাজ দরকার, তাহার জন্যই লোক ভাড়া পাওয়া যাইবে। গৃহকর্ম্ম আর নীচ কাজ থাকিবে না; ইতিমধ্যেই ইহার সম্বন্ধে মানুষের হীন ধারণা কমিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতে গৃহকর্ম্মকে মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে; সকল রকম কাজকেই আমরা যেমন শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছি ইহাকেও তেমনি করিব।

"একশত বৎসর পূর্ব্বে গৃহই সামাজিক জীবনের কেন্দ্র

ছিল। বহু শিল্পব্যবসায়ের কেন্দ্রও গৃহই ছিল। বৈজ্ঞানিক নানা আবিষ্কারের, কারখানার উদ্ভবের এবং আমাদের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গত শতাব্দী হইতে গৃহের বহু পুরাতন কার্য্য লোপ পাইয়া গিয়াছে। কিছুকাল ধরিয়া আমরা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছি। এদেশের মানুষের মাঝামাঝি একটা জায়গায় স্থির হইয়া বসিবার পূর্ব্বে সকল বিষয়েই চরমে গিয়া উঠিবার একটা ঝোঁক আছে।

"এই ক্ষেত্রেও চরমে উঠিবার বেলা আমরা গৃহের সকল কাজ ও কর্ত্তব্য হইতেই তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলাম। মাঝামাঝির শোভন সীমায় ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের কতকগুলি কাজ আবার তাহাকে ফিরাইয়া দিব বলিয়া মনে হয়। পৃথিবীতে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা একান্তই গৃহের এলাকার অন্তর্গত। তাই আমার মনে হয়, পারিবারিক জীবন আবার ফিরিয়া আসিতেছে; পুরাকালে যে পারিবারিক জীবন ছিল সে-জীবন অবশ্য আর ফিরিয়া আসিবে না; এই নূতন জীবনে অধ্যয়ন ও গভীরতর জ্ঞানের ফলে আরো দৃঢ়তা ও উন্নতির দেখা মিলিবে।

"বিবাহিত রমণীদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনের একটা বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘর-সংসার গড়িতে ব্যয় করিবেন। প্রথমতঃ মেয়েদের নিজেদের ভরণ-পোষণ করিবার মত শিক্ষা দিয়া মানুষ করা হইবে। শিক্ষা সমাপনের পর অনেকে হয়ত নিজ নিজ পছন্দ-মত কাজে কয়েক বৎসর লাগিয়া থাকিতে পারেন। তাহার পর তাঁহারা বিবাহ করিবেন এবং সন্তানসন্ততির জন্ম ও পালন-কালটায় প্রায় সমস্ত চিন্তা ও সময়ই গৃহ-ধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিবেন। মানসিক, আর্থিক ও শারীরিক সকল দিক্ দিয়াই মেয়েরা-জীবনের সন্তান-ধারণ-যুগটায় গৃহের অনুরক্ত হন।

"মেয়েরা নিজেদের কাজ ও সন্তানের যত্ন নিজেরাই করিবেন, দরকার-মত গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, সন্তানপালন ও অন্যান্য কাজে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন। কাজের জন্য ভাড়া করিয়া আনা এইসব বিশেষজ্ঞেরা পুরাকালের মত সংসারের অঙ্গীভূত হইয়া আর থাকিবেন না, বিশেষ একটা শ্রেণীভুক্ত হইয়াও থাকিবেন না। আজকাল সকল শিক্ষিত ব্যবসায়ীর মত ইঁহারাও শিক্ষিত ব্যবসায়ী হইবেন। ইঁহারা শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ী ব্যক্তিদের মত সম্মান ও ব্যক্তিত্বের দাবী করিবেন।

"কোনো কোনো সহরে গৃহকার্য্যকে একটা ব্যবসায়ে পরিণত করিবার জন্য আন্দোলন হইতেছে। শিক্ষার প্রতি অর্থাৎ জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতি আমাদের একটা সার্ব্বজনীন টান হওয়াতে, এবং আমরা শিক্ষিত কর্ম্মীর কর্ম্মের মূল্য বুঝিতে শিখাতে, মানুষের চোখে গৃহকার্য্যের মর্য্যাদা বাড়িয়া উঠিতেছে। এই কার্য্যে লোক পাওয়া জনমতের উপরই নির্ভর করে। আমি এমন অনেক ভদ্র ও শিক্ষিতা যুবতীকে জানি যাঁহারা গৃহকার্য্য সম্বন্ধে মানুষের সেকেলে হীন ধারণাটা ঘুচিয়া গেলেই লোকের বাড়ী গিয়া অর্থের বিনিময়ে কাজের সাহায্য করিয়া দিয়া আসিতে রাজি আছেন। সকল ব্যবসায়েই মানুষ, তাহার কার্য্যপটুতার উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে কি না এবং সম্মানজনক ব্যবহার পাইতেছে কি না, এই দুইটি বড় জিনিষ দেখিয়া চলে। সকলজাতীয় শ্রমেই শ্রমিকদের মনের ভাব বদ্লাইতে সুরু করিয়াছে, গৃহকার্য্যেও নিশ্চয় তাহার সূচনা হইবে। সেকেলে ভেদ-রেখাগুলিকে আমরা ক্রমে উঠাইয়া দিতেছি। হইতে পারে যে ইতিমধ্যেই নূতন কোনো ভেদরেখা দেখা দিয়াছে, কারণ আজকালকার মানুষ পরাসক্ত ও গলগ্রহকে ভাল চোখে দেখে না।"

—

আত্মনিন্দার একটি দৃষ্টান্ত

কাগজে দেখিলাম, হিন্দুমহাসভার অধিবেশন উপলক্ষ্যে মহারাষ্ট্র হইতে আগত শ্রীপাদ শাস্ত্রী নামক একজন লোক বাঙালীদের ভীরুতার গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে হাসাইয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন, যে, বাঙালীদের নিন্দা করিবার জন্য সে-সব কথা তিনি বলেন নাই, অর্থাৎ তিনি আমাদের কল্যাণ-প্রার্থী। একথা আমরা বিশ্বাস করি না। কল্যাণ-কামনায় সমালোচনা ও-রকমের হয় না। ঐ নিন্দুক ব্যক্তিকে আমরা বাঙ্গালীবিদ্বেষী মনে করি, এবং তাঁহার গল্পগুলাও সত্য ঘটনা কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। বাঙালী একটা অদ্ভুত সাহসী জাতি, আমরা তাহা মনে করি না ও বলি না। কিন্তু জন-সমষ্টির ও ব্যক্তিবিশেষের ভীরুতার চরম দৃষ্টান্ত ভারতীয় বীরজাতিদের ব্যবহার হইতেও দেখান যায়। তাহার দ্বারা তাহাদের জাতিগত ভীরুতা প্রমাণ হয় না। অতএব, আমরা মনে করি, যাহারা প্রতিকূল মন্তব্য না করিয়া শ্রীপাদ শাস্ত্রীর অবজ্ঞা-ও-বিদ্বেষ-প্রণোদিত গল্প বাংলা কাগজে ছাপিয়াছেন, তাঁহারা সুবিবেচনার কাজ করেন নাই।

বাঙালী বিপ্লববাদীদের "রাজনৈতিক" ডাকাতী, "রাজনৈতিক" খুন প্রভৃতির সমর্থন আমরা করি না, নিন্দাই করি; যেমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বীরদের পরদেশ লুণ্ঠন ও অগণিত নরহত্যারও প্রশংসা করি না। কিন্তু

আমরা চাই, যে, বাঙালীর ছেলেরা ডাকাত গুণ্ডা জব্দ করিতে, নারীর উপর অত্যাচারীদিগকে দমন করিতে এবং নানা বিপৎসঙ্কুল সৎকাজে সেইরূপ সাহস প্রদর্শন করুন যেরূপ নির্ভীকতা বিপথগামী ও নির্বোধ বিপ্লববাদীরা দেখাইয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি এরূপ সাহস তাঁহাদের অনেকের আছে।

—

শাক্ত বিপ্লববাদীর পুনরাবির্ভাব ?

অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রস্তাব করেন, যে, রাজনৈতিক কয়েদী-দিগকে জেল হইতে খালাস দেওয়া হউক। অবশ্য, যাহারা খুনখারাবী করিয়াছে, তিনি এরূপ কয়েদী-দের মুক্তি চান নাই। যাহা হউক, সরকার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়, এবং বলা হয়, যে, অস্ত্রবলে ও তদ্বিধ অন্য উপায়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগী একটা দল বঙ্গে গোপনে গড়িয়া উঠিতেছে। এই প্রকারে প্রমথবাবুর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। সরকার পক্ষ হইতে ষ্টিফেন্সন্ সাহেব অনেক বাঙ্গালী সম্পাদককে সরকারী উক্তির প্রমাণও দিয়াছিলেন, শুনিতেছি। এই-সব প্রমাণের মূল্য কিরূপ, জানি না। শাক্ত বিপ্লবপন্থীর পুনরাবির্ভাব যে হয় নাই বা হইতেই পারে না, এরূপ বলিবার মত গোপনীয় দেশের খবর আমরা রাখি না। কিন্তু যদি সত্যই সেরূপ পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে, তাহাতে, সাত্ত্বিক প্রতিরোধ ও অসহযোগ-পন্থার অনুসরণ করিয়া যাঁহারা জেলে গিয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তির বাধা কোথায়? তাঁহারা ত শাক্ত বিপ্লববাদী নহেন। আঘাত সহ্য করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম, আঘাত করা তাঁহাদের নীতি নহে।

ইংরেজের রাজনীতি বড় আজব চীজ। অনুনয় বিনয় প্রার্থনা "আইনসঙ্গত" আন্দোলনে তাঁহারা কান দেন না। অসহযোগপন্থীদিগকে তাঁহারা জেলে পাঠান, এবং অন্য সব পথ বন্ধ দেখিয়া যাহারা উন্মত্ত ও "মরিয়া" হইয়া তাহার উল্টা পথের পথিক শাক্ত বিপ্লবপ্রয়াসী হয়, তাহাদের ফাঁসী দেন। অসহযোগ-প্রচেষ্টা ও শাক্ত বিপ্লবচেষ্টা উভয়ই যে ইংরেজের শাসননীতির ফল, তাহা স্বীকৃত হয় না। রাশ্ব্রুক্ উইলিয়মসের লেখা সরকারী বার্ষিক ভারতবিবরণীতে স্বীকৃত হইয়াছে, যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লববাদ ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অন্তর্হিত হয়। সেইজন্য, বোধ হয়, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহাকে ছয় বৎসরের নিমিত্ত কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে, তাঁহার প্রভাব কার্য্যক্ষেত্র হইতে কতকটা অপসৃত হওয়ায়, যদি বিপ্লবপন্থার পুনরাবির্ভাব হয়, তাহা হইলে দোষটা কাহার?

গোস্বামী তুলসীদাসকে শ্রদ্ধা অর্পণ

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বারাণসীধামে হিন্দী ভাষায় রামায়ণ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্য প্রণেতা মহাকবি গোস্বামী তুলসীদাস পরলোক যাত্রা করেন। এইজন্য এবৎসর বারাণসীতে ও হিন্দীভাষী আরও অনেক স্থানে তাঁহাকে শ্রদ্ধা অর্পণের জন্য সভা হয়। তিনি কবি, ভক্ত ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। হিন্দীভাষী প্রদেশসমূহে তাঁহার রামায়ণ দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ ও জীবন যে পরিমাণে গঠিত হইয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থ দ্বারা তাহা হয় নাই। ইঁহার গ্রন্থাবলীর ভাল অনুবাদ ও ইঁহার জীবনের আলোচনা যত হইবে, ততই মঙ্গল।

—

আমেরিকান্ সাংবাদিকদের ত্রুটির কথা

ডাক্তার গ্লেন্ ফ্র্যাঙ্ক সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন্ পত্রে যে সাতটি দোষকে আমেরিকান্ সংবাদ-পত্র পরিচালনের মহাদোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি অন্যদেশেও এবং তথায় সমানই অকল্যাণকর বলিয়া বোধ হয়। অন্ততঃ ভারতবর্ষে ত বটেই। সুতরাং তাঁহার মতগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে কাজে লাগিতে পারে। তাঁহার মতে যে কয়টি মহাদোষের জন্য আমেরিকার (এবং অন্যান্য দেশের) মাসিক এবং সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণে লোকহিত সাধন করিতে পারে না, তাহা এই—

"প্রথমতঃ, আমেরিকান্ পত্রিকাগুলি অপরিবর্ত্তনীয় মতামত এবং কার্য্যপ্রণালীনিয়ামক নীতি (policy) লইয়া কাজ আরম্ভ করে। প্রত্যেক মাসিক পত্রেরই ঐরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট নীতি থাকিতে হইবে, এই ধারণাটির জন্য উপকার অপেক্ষা অপকার হইয়াছে বেশী। অর্থগৃধ্নু হওয়া এক্ষেত্রে যেমন দোষের, কোন প্রকারে মত পরিবর্ত্তন না করাও সেইরূপ। অবশ্য আমি ইহা বলিতে চাই না, যে, উপযুক্ত সম্পাদক হইতে হইলে তাহাকে একেবারে মেরুদণ্ডবিহীন হইতে হইবে। কোন বিষয়েই কোন স্পষ্ট মত নাই, এমন মানুষের পক্ষ লইয়াও আমি ওকালতী করিতেছি না। আমি শুধু এই বলিতে চাই, যে, আজকালকার পরিবর্ত্তনশীল জগতে যদি কতকগুলি অপরি-বর্ত্তনীয় মতামত লইয়া কাজে নামা যায়, তাহা হইলে দেশের লোককে ভাল করিয়া কিছু বুঝাইয়া দেওয়া শক্ত; অথচ এইটাই পত্রিকার কাজ।

"আমেরিকায় দশটা খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রের ভিতর ন'টার এই অবস্থা। তাহার ফলে অধিকাংশ আমেরিকান্ পত্রিকাই খুব ভাল করিয়া মাকা-মারা হইয়া উঠিয়াছে—কতকগুলি রক্ষণশীল, কতকগুলি উদার-নৈতিক, ইত্যাদি। এবং যে মুহূর্ত্তে একটি পত্রিকাকে এইরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট মতের বাহন বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, তখনই ইহার পাঠকের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ মতাবলম্বী মানুষ ভিন্ন আর কেহই উহা পাঠ করিতে চায় না। সাধারণভাবে কথা বলিতে গেলে একেবারে নির্ভুল কিছু বলা শক্ত; তবু ইহা ভরসা

করিয়া বলা চলে, যে, উদারনৈতিকগণ, শুধু উদারনৈতিক পত্রিকাই পাঠ করেন এবং রক্ষণশীলগণও কেবলমাত্র গোঁড়া কাগজগুলির দিকেই পক্ষপাত দেখান। বদ্ধমূল মত, এবং সমুদয় ব্যাপারকে নির্দ্দিষ্ট কোন একটা দিক্ হইতে দেখা; এই দুইটি জিনিষ প্রাচীরের মত খাড়া হইয়া শিক্ষিত সমাজের এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগের ভিতর মানসিক বাণিজ্য বা আদান প্রদান অত্যন্তই কম।"

তাহা হইলে এইরূপ আদান-প্রদানের কি প্রকার ব্যবস্থা করা যায়?

"প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে দুই বা তিন শ্রেণীর পত্রিকা পড়িয়া তবে বিভিন্ন মতামত জানিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। নানাপ্রকার মতামত একই পত্রিকায় পাওয়া যাইবে না কেন? আদর্শ পত্রিকার সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ ভিন্ন আর কোন লক্ষ্য থাকা উচিত নয়। সত্যের খাতিরে যখন যে-দিকে যাইতে হয়, আদর্শ সম্পাদক তাহাই যাইবেন। ফলে হয়ত তাঁহাকে জানুয়ারী মাসে রক্ষণশীল এবং ফেব্রুয়ারী মাসে উদারনৈতিক হইতে হইবে। পত্রিকাগুলিকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট খোপে ভাগ করিয়া রাখা, এবং সম্পাদকদিগের যে অভ্যাস-দোষে এইপ্রকার মার্কা মারা সম্ভব হয়, এই দুইটি দোষে জাতির অগ্রগমন যথেষ্ট দ্রুত হইতে পারে না, এবং জাতির ভিতর ভাবের সংঘাত এবং মানসিক অন্তর্বিপ্লব চলিতে থাকে।"

ডাঃ ফ্র্যাঙ্ক্ আরও বলিতেছেন—

"দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকান্ পত্রিকাগুলি, দেশের লোকে যে-সব বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে, সেইগুলিই বাদ দেয়। ধর্ম্ম, বাণিজ্য, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়ে, যে জিনিষগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং যেগুলি সম্বন্ধে খোলাখুলি আলোচনা হইলে, মণ্ডলী, সম্প্রদায় এবং ক্লাবগুলিতে সত্যসত্যই যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে, সেগুলি অধিকাংশ সম্পাদকের আফিসেই প্রবেশপথ পায় না। আমেরিকান্ সম্পাদকগণ সর্ব্বদাই এমন জিনিষের সন্ধানে ব্যস্ত, যাহা অধিকতম-সংখ্যক লোককে তাঁহাদের পত্রিকা কিনিতে উৎসাহিত করিবে, কিন্তু এমন জিনিষ তাঁহারা চান না, যাহার আলোচনা হইলে শেষে তাঁহাদের অনেক গ্রাহককই তাঁহাদের কাগজ লওয়া বন্ধ করিবেন। খানিকটা আগ্রহ উদ্রেক করিতে তাঁহারা অবশ্য চান, কিন্তু অতিরিক্ত আগ্রহে ইঁহাদের আপত্তি আছে। স্বীকার না করিলেও এই নীতি অনুসরণ করিয়াই তাঁহারা চলেন। সম্পাদক মহাশয় গ্রাহকগণ কিসের ভিতর রস খুঁজিয়া পাইবেন তাহা আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত, তাহাদিগের যথার্থ কল্যাণ কিসে হয় তাহা ভাবিবার বা আলোচনা করিবার অবকাশ তাঁহার নাই। যে সম্পাদক কেবলমাত্র পাঠকের আগ্রহ উদ্রেক করিতেই চান, কালে তিনি একটি উত্তেজনা-সরবরাহের বণিক হইয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু যিনি পাঠকের যথার্থ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁহাকেই বলি যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ।

"একেবারে সর্ব্বদোষের অতীত হইয়া উঠিতে হইবে, এমন উপদেশ আমি দিতেছি না। পাঠকদিগের রুচির প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে তাহারা পত্রিকাটি ত্যাগ করিবে, এবং কাগজ চলিবে না। আমি বলিতে চাই, যে, অনেক ক্ষেত্রে অতি-সাবধানতার পরিবর্ত্তে একটু যদি সাহস দেখানো যায় তাহা হইলে আর্থিক সুবিধাও হয়, এবং পত্রিকা পরিচালনের সামাজিক মূল্য বৃদ্ধি ত হয়ই।

"তৃতীয়তঃ, আমেরিকান্ পত্রিকাগুলি পাঠকবর্গের বুদ্ধিকে বড় কমাইয়া দেখে। অধিকাংশ সম্পাদকই একটি ভুল করেন, 'সাধারণ পাঠক' নামে তাঁহারা একটি কাল্পনিক জীব সৃষ্টি করেন, যে কোন কালে ছিল না, নাই, এবং থাকিবেও না। আমাদের ভিতর অনেকেই পাঠকের বুদ্ধির অগম্য ভাবে লেখনী চালনা করিয়া বা তাঁহার অল্পবুদ্ধির স্তরে নামিয়া আসিয়া লিখিবার চেষ্টায় যে-সময় নষ্ট করেন, পাঠকের মনে যথার্থ কি যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টায় ততটা মোটেই করেন না।

"পাঠকের বুদ্ধি সম্বন্ধে হীন ধারণা পোষণ করাটা সাধারণ সম্পাদকদিগের সর্ব্বপ্রধান দোষ। ইহা অস্বীকার করা চলে না, যে, আমাদের জনপ্রিয় পত্রিকাগুলি এই ধারণা লইয়াই চলে, যে, আমেরিকান্ মনকে কাতুকুতু দেওয়া আমোদ দেওয়া চলে, কিন্তু তাহাকে কখনও দ্বন্দ্বে আহ্বান করা চলে না।

"চতুর্থতঃ, আমেরিকার সম্পাদকবর্গ পাঠকের জ্ঞান একটু বাড়াইয়া দেখেন। উঁচুদরের কাগজগুলির এইটিই সর্ব্বপ্রধান দোষ। বোধ হয় উইলিয়ম হ্যাজলিট্টই বলিয়া থাকিবেন, যে, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া নূতন করিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত, যে, পৃথিবীর লোকে কিছুই জানে না। আসল কথা, আমাদের ভিতর অতি অল্প লোকেই কোন কিছু সম্বন্ধে পাকাপাকি খবর রাখে। উঁচুদরের কাগজগুলিতে এমন অনেক অতিপ্রয়োজনীয় তথ্য সংক্ষেপে দেওয়া থাকে, যাহা একটু বিশদ ভাবে লিখিলে হাজার হাজার আমেরিকান্ অতিশয় আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে পারে। তবে পড়িতে বসিয়া, যদি অভিধান, বিশ্বকোষ, সাময়িক সাহিত্যের নির্ঘণ্ট এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতির এক-একটি বিশেষজ্ঞে পরিবেষ্টিত হইয়া, পড়িতে হয়, তাহা হইলে অবশ্য কেহ পড়িবে কি না সন্দেহ।

"আদর্শ পত্রিকার উচিত পাঠকের বুদ্ধিকে বড় করিয়া এবং তাহার জ্ঞানকে ছোট করিয়া দেখা। পত্রিকায় যেরূপ প্রবন্ধকে আমি আদর্শ মনে করি, তাহা এমন ভাবে লেখা হইবে যেন উহার পাঠকপাঠিকার দল অকস্মাৎ মঙ্গল গ্রহ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে,—তাহারা ইংরেজী ভাষা জানে, কিন্তু প্রবন্ধে যে-সকল তথ্যের আলোচনা হইতেছে, সেগুলির বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। একটি প্রবন্ধ বুঝিতে হইলে যাহা কিছু জানা দরকার, সব যেন ঐ প্রবন্ধের ভিতরেই থাকে। আমি অবশ্য খুব বেশী বাড়াইয়া বলিতেছি। কিন্তু এইদিকে উন্নতির খানিকটা চেষ্টা না করিলে আমাদের গভীরবিষয়ক পত্রিকাগুলিও যথার্থ পত্রিকার পরিবর্ত্তে গল্প শুনাইবার কাগজই থাকিয়া যাইবে।

"পঞ্চমতঃ, আমেরিকান্ কাগজগুলি আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত নয়। উঁচুদরের এবং নীচুদরের সকল কাগজেরই এই দোষ আছে। অভদ্র চল্‌তি কথা যথার্থ মাতৃভাষা নয় এবং দুর্ব্বোধ্য আড়ষ্ট পণ্ডিতী ভাষাও নয়।

"উঁচুদরের কাগজগুলি যদি আপনাদের পণ্ডিতী বুক্‌নী ত্যাগ করিয়া সাধারণ ভাষায় কথা বলেন এবং নীচুদরের কাগজগুলি যদি অভদ্র চল্‌তি কথা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে জনসমাজের কতখানি উন্নতি যে হয়, তাহা একমুখে বর্ণনা করা যায় না। কয়েকটি মাত্র বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তির মধ্যেই দেশের উচ্চ চিন্তার ধারাটা তাহা হইলে আবদ্ধ হইয়া থাকে না, এবং আমেরিকান্ ভাষার শোচনীয় অধঃপতন নিবারিত হয়।

"ষষ্ঠতঃ, আমেরিকান্ পত্রিকাগুলি যথাকালে কথা বলার দিকে বড় বেশী লক্ষ্য রাখে। যখন যাহা ঘটিল, অমনই তৎক্ষণাৎ ঠিক সময়ে কিছু লিখিবার জন্য এমন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ের ভিতর কোথাও একটা গলদ আছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক সকল পত্রিকার বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ করা যায়। চট করিয়া যে মত

প্রকাশ করা হয়, তাহা অপেক্ষা ভাবিয়া চিন্তিয়া যে কথা বলা হয় তাহার মূল্য যে অধিক আমি কেবল ইহাই বলিতেছি না; সে ত জানা কথাই। আমি বরং ইহাই বলিতে চাই, যে, যেদিন একটা ঘটনা ঘটিল অথবা যে মাসে ঘটিল, সেই দিনে বা সেই মাসেই যদি সে বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে উহা যথাকালে প্রকাশিত হইল বলা চলে না। আমেরিকান্ পত্রিকাগুলি আসলে যথাকালে কাজ করে না, ইহাই বোধ হয় আমার বলা উচিত; কারণ যে সময়ে কথা বলিলে কথাতে যথার্থ দেশের কাজ হয়, তাহাই যথাকাল; এবং কোন ঘটনা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার যথাকাল, উহা যে মুহূর্ত্তে ঘটিল তখনই নয়, কিন্তু উহা যখন জনসমাজের মনে চিন্তায় এবং বাক্যে স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন। পাঁজী দেখিয়া দিন স্থির করা সম্পাদকের উচিত নয়। তাঁহার দেখা উচিত, যে, কতদিনে একটা ঘটনার সংবাদ ও চিন্তা এমনভাবে দেশব্যাপী হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে, যে, সে বিষয়ে কিছু লিখিলে অধিকতমসংখ্যক মানুষ আগ্রহ করিয়া উহা পাঠ করিবে এবং সে বিষয়ে আলোচনা করিবে।

"সপ্তমতঃ, আমেরিকান পত্রিকাগুলি আমেরিকানত্বের (Americanismএর) সমর্থন করেন। উহাকে তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত কোন অপরিবর্ত্তনীয় স্থাবর বা স্থিতিশীল জিনিষ মনে করেন। কিন্তু আমেরিকানত্বটা কোন অচল সম্পত্তি নয়, উহাকে সযত্নে রক্ষা করিবার দরকার নাই; উহা বর্দ্ধনশীল জিনিষ, উহাকে বিকশিত হইতে, বাড়িতে দিতে হইবে। আমরা উহাকে রক্ষা করিবার জন্য যে শক্তি ব্যয় করি, তাহার অর্দ্ধেকও যদি উহাকে বিকশিত করিয়া তোলারূপ সৃষ্টি কার্য্যের দিকে দিতাম, তাহা হইলে সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিতাম, যে, উহার বিবর্ত্তন বা বিকাশই উহাকে রক্ষা করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। একটি মজার ব্যাপার এই দেখি, যে, যে-সকল সম্পাদক আমেরিকানত্বকে রক্ষা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ত, তাঁহারাই বোধ হয় জিনিসটি কি ভাল করিয়া বলিতে পারেন না।"

ভারতবর্ষেও আমরা শ্রেণি লোকে "হিন্দুত্ব", "ভারতীয়তা", "ভারতীয় সভ্যতা" প্রভৃতির হইয়া প্রচুর ওকালতী করে। তাহারা ধরিয়া লয়, যে, ঐ জিনিষগুলি অচল স্থাবর, এবং একেবারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত। কিন্তু সেগুলি অচল মোটেই নয়, উহারা এখনও বাড়িতেছে, এবং তাহাদের বিকাশ বিবর্ত্তন এবং বৃদ্ধি যেন উপযুক্ত ভাবে এবং সুপথে হয়, সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার।

—

বিশ্বভারতী-সংবাদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সমস্ত বাংলা পুস্তকের স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন—তাঁহার পুস্তকের সংখ্যা দেড়শতেরও উপর হইবে। ঠাকুর মহাশয়ের সমস্ত বাংলা বই কলিকাতায় ১০ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বিশ্বভারতী-কার্য্যালয়ে বিক্রয় হইবে। এই গ্রন্থালয়ের সংলগ্ন একটি পাঠাগারও খোলা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের যে-কোন বই ঐ পাঠাগারে গিয়া পাঠ করার সুবিধা থাকিবে।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর একটি কারিগরী-বিভাগ খোলা হইয়াছে। সেই বিভাগে বই বাঁধানো, গালার কাজ, কাপড় বোনা, কাঁথা সেলাই, কাঠের ও মাটির খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি কাজ শিখানো হইতেছে। এ বিভাগের পরিচালন-ভার প্রধানত মহিলারাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই বিভাগের সমস্ত কাজের নমুনাও বিশ্বভারতীর উপরি-উক্ত কলিকাতার কার্য্যালয়ে পরিদর্শনের জন্য রাখা হইবে।

চিত্র-পরিচয়

বন্দনা

গুজরাট অঞ্চলে মহিলারা দেবতার সম্মুখে মন্দিরা বাজাইয়া ভজন গান করেন।

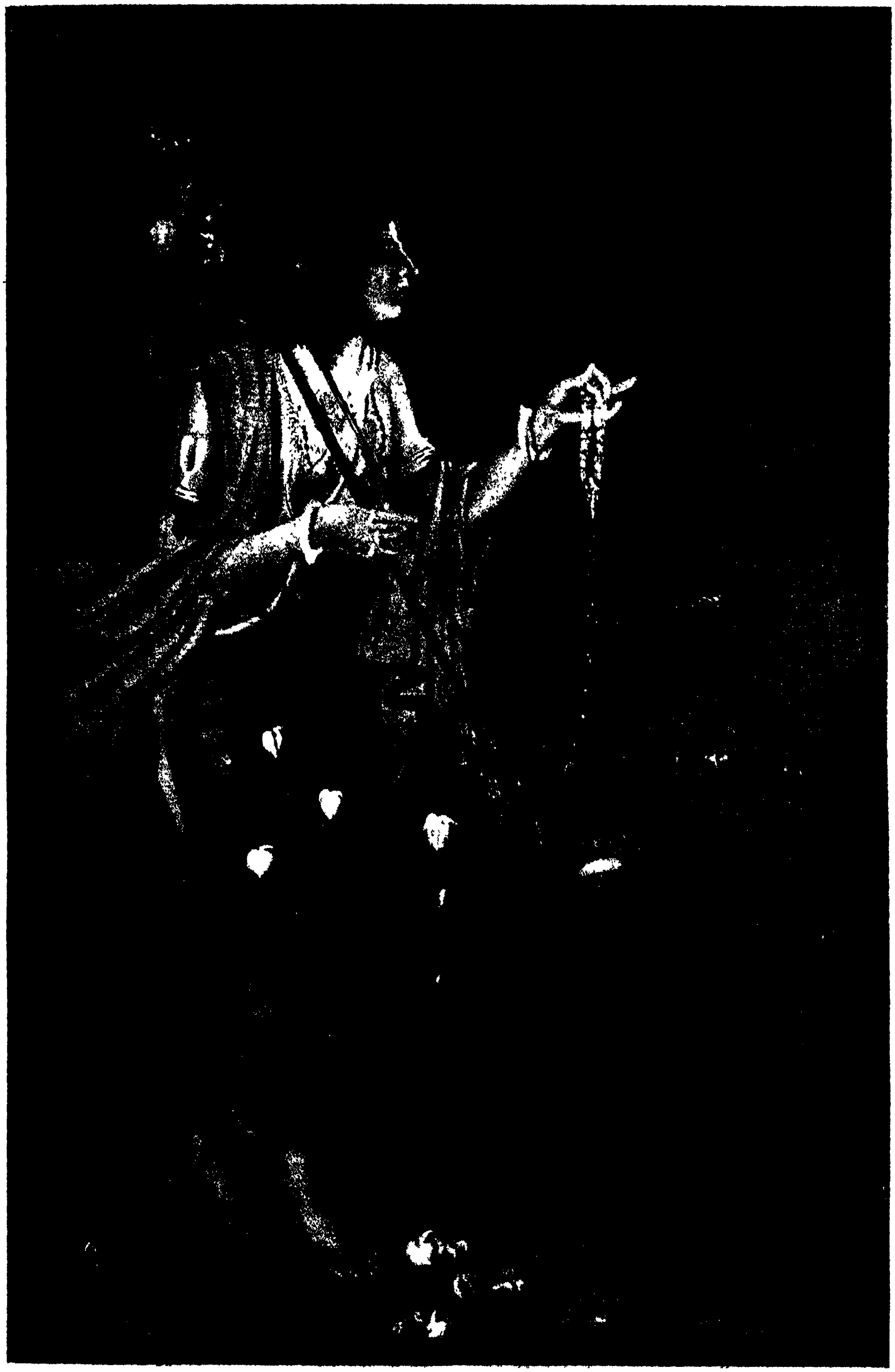
কাশ্মীরী পণ্ডিতানী

কাশ্মীরের ব্রাহ্মণদিগকে পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণীদিগকে পণ্ডিতানী বলে।

"বেলা অবসান হল"

বেলা-অবসানে কমল মুদ্রিত হইতেছে, মুদ্রিত কুসুম ছাড়িয়া প্রজাপতি ও ভ্রমর ফিরিয়া চলিয়াছে—এই মৃত্যুর ও বিচ্ছেদের পূর্ব্বাভাস ভাবুকের মনে বেদনা ও নয়নে অশ্রু জাগাইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়



নারদ

চিত্রকর শ্রীপূরণচন্দ্র সিংহ

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ | ২য় সংখ্যা

সমস্যা

যে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় বসে, তাদের সংখ্যা দশ বিশ হাজার হ'য়ে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই পক্ষে একই প্রশ্ন, এক কালীতে একই অক্ষরে ছাপানো। সেই একই প্রশ্নের একই সত্য উত্তর দিতে পার্‌লে তবে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়ে পদবী পায়। এইজন্যে পার্শ্ববর্ত্তী পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর চুরি করে'ও কাজ চলে। কিন্তু বিধাতার পরীক্ষার নিয়ম এত সহজ নয়। এক এক জাতির কাছে তিনি এক-একটি স্বতন্ত্র সমস্যা পাঠিয়েছেন। সেই সমস্যার সত্য মীমাংসা তারা নিজে উদ্ভাবন করলে তবেই তারা তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পাবে ও মান পাবে। ভারতকেও তিনি একটি বিশেষ সমস্যা দিয়েচেন, যতদিন না তার সত্য মীমাংসা হবে ততদিন ভারতের দুঃখ কিছুতেই শান্ত হবে না। আমরা চাতুরী খাটিয়ে য়ুরোপের পরীক্ষাপত্র থেকে উত্তর চুরি কর্‌চি। একদিন বোকার মত কর্‌ছিলুম মাছি-মারা নকল, আজকে বুদ্ধিমানের মত কর্‌চি ভাষার কিছু বদল ঘটিয়ে। পরীক্ষক বারে বারে তার পাশে নীল পেন্সিল দিয়ে যে গোল গোল চিহ্ন কাট্‌চেন তার সবকটাকেও একত্র যোগ কর্‌তে গেলে বিয়োগান্ত হয়ে ওঠে।

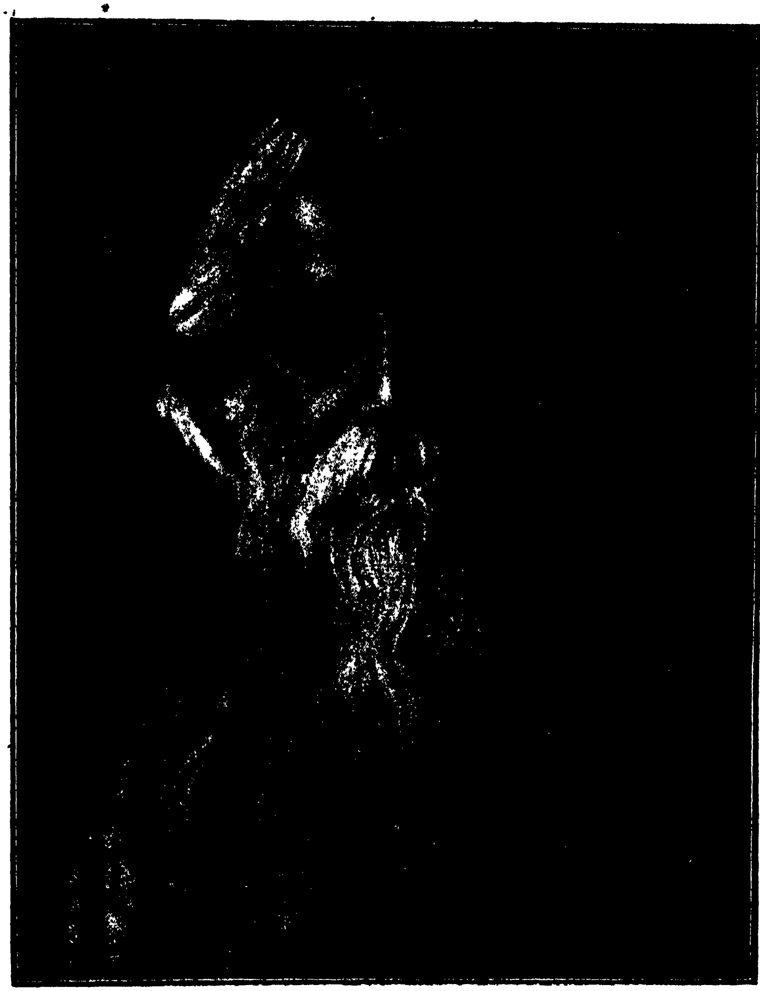
বায়ুমণ্ডলে ঝড় জিনিষটাকে আমরা দুর্য্যোগ বলে'ই জানি। সে যেন রাগী আকাশটার কিল চড় লাথি ঘুষোর আকারে আস্‌তে থাকে। এই প্রহারটা ত হ'ল একটা লক্ষণ। কিসের লক্ষণ? আসল কথা, যে-বায়ুস্তরগুলো পাশাপাশি আছে, যে প্রতিবেশীদের মধ্যে মিল থাকা উচিত ছিল, তাদের মধ্যে ভেদ ঘটেচে। এক অংশের বড় বেশি গৌরব, আর-এক অংশের বড় বেশি লাঘব হয়েচে। এ ত সহ্য হয় না, তাই ইন্দ্রদেবের বজ্র গড়গড় করে' ওঠে, পবনদেবের ভেঁপু হু হু করে' হুঙ্কার দিতে থাকে। যতক্ষণ প্রতিবেশীদের মধ্যে সাম্যসাধন না হয়, হাওয়ায় হাওয়ায় পংক্তি-ভেদ ঘুচে না যায়, ততক্ষণ শান্তি হয় না, ততক্ষণ দেবতার রাগ মেটে না। যাদের মধ্যে পরস্পর মিলে চল্‌বার সম্বন্ধ, তাদের মধ্যে ভেদ ঘট্‌লেই তুমুলকাণ্ড বেধে যায়। তখন ঐ যে অরণ্যটার গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়ে যায়, ঐ যে সমুদ্রটা পাগ্‌লামি কর্‌তে থাকে, তাদের দোষ দিয়ে বা তাদের কাছে শান্তিশতক আউড়িয়ে কোনো ফল নেই। কান পেতে শুনে নাও, স্বর্গে মর্ত্ত্যে এই রব উঠ্‌ল, "ভেদ ঘটেচে, ভেদ ঘটেচে।"

এই হাওয়ার মধ্যে যে কথা, মানুষের মধ্যেও তাই।

বাইরে থেকে যারা কাছাকাছি, ভিতরের থেকে তাদের যদি ভেদ ঘটল, তাহলে ঐ ভেদটাই হল মূল বিপদ্। যতক্ষণ সেটা আছে, ততক্ষণ ইন্দ্রদেবের বজ্রকে, উনপঞ্চাশ পবনের চপেটাঘাতকে, বৈধ বা অবৈধ আন্দোলনের দ্বারা দমন কর্‌বার চেষ্টা করে' ঝড়ের আন্দোলন কিছুতেই থামানো যায় না।

আমরা যখন বলি স্বাধীনতা চাই, তখন কি চাই সেটা ভেবে দেখা চাই। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণ একলা, সেইখানে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সেখানে তার কারো সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ নেই, কারো কাছে কোনো দায়িত্ব নেই, কারো প্রতি কোনো নির্ভর নেই, সেখানে তার স্বাতন্ত্র্যে লেশমাত্র হস্তক্ষেপ কর্‌বার কোনো মানুষই নেই। কিন্তু মানুষ এ স্বাধীনতা কেবল যে চায় না, তা নয়; পেলে বিষম দুঃখ বোধ করে। রবিন্‌সন্ ক্রুসো তার জনহীন দ্বীপে যতখন একেবারে একলা ছিল ততখন সে একেবারে স্বাধীন ছিল। যখনই ফ্রাইডে এল তখনই তার সেই একান্ত স্বাধীনতা চলে' গেল। তখন ফ্রাইডের সঙ্গে তার একটা পরস্পর সম্বন্ধ বেধে গেল। সম্বন্ধ মাত্রেই অধীনতা। এমন কি, প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধে প্রভুও ভৃত্যের অধীন। কিন্তু রবিন্‌সন্ ক্রুসো ফ্রাইডের সঙ্গে পরস্পর-দায়িত্বে জড়িত হয়েও নিজের স্বাধীনতার ক্ষতিজনিত দুঃখ কেন বোধ করে নি? কেননা, তাদের সম্বন্ধের মধ্যে ভেদের বাধা ছিল না। সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ আসে কোথায়? যেখানে অবিশ্বাস আসে, ভয় আসে, যেখানে উভয়ে উভয়কে ঠকিয়ে জিৎতে চায়, যেখানে উভয়ের সঙ্গে উভয়ের ব্যবহারে সংজভাব থাকে না। ফ্রাইডে যদি হিংস্র বর্ব্বর অবিশ্বাসী হ'ত, তাহলে তার সম্বন্ধে রবিন্‌সন্ ক্রুসোর স্বাধীনতা নষ্ট হত। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা নেই, অর্থাৎ যার প্রতি আমি উদাসীন, সে আমাকে টেনে রাখে না, কিন্তু তাই বলে'ই যে তারই সম্পর্কে আমি স্বাধীনতার যথার্থ আনন্দ ভোগ করি তা নয়। যার সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পূর্ণতা, যে আমার পরম বন্ধু, সুতরাং সে আমাকে বাঁধে, আমার চিত্ত তারই সম্বন্ধের মধ্যে স্বাধীনতা পায়, কোনো বাধা পায় না। যে স্বাধীনতা সম্বন্ধহীনতায়, সেটা নেতিসূচক, সেই শূন্যতা-মূলক স্বাধীনতায় মানুষকে পীড়া দেয়। এর কারণ হচ্চে, অসম্বন্ধ মানুষ সত্য নয়, অন্যের সঙ্গে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই সে নিজের সত্যতা উপলব্ধি করে। এই সত্যতা উপলব্ধির বাধায় অর্থাৎ সম্বন্ধের ভেদে, অসম্পূর্ণতায়, বিকৃতিতেই তার স্বাধীনতার বাধা। কেননা, ইতিসূচক স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। মানুষের গার্হস্থ্যের মধ্যে বা রাজ্যের মধ্যে বিপ্লব বাধে কখন, না, যখন পরস্পরের সহজ সম্বন্ধের বিপর্য্যয় ঘটে। যখন ভাইদের মধ্যে সন্দেহ বা ঈর্ষা বা লোভ প্রবেশ করে' তাদের সম্বন্ধকে পীড়িত কর্‌তে থাকে, তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বাধা পায়, কেবলি ঠোকর খেয়ে খেয়ে পড়ে, তাদের জীবনযাত্রার প্রবাহ পদে পদে প্রতিহত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন পরিবারে বিপ্লব ঘটে। রাষ্ট্রবিপ্লবও সম্বন্ধভেদের বিপ্লব। কারণ সম্বন্ধভেদেই অশান্তি, সেই অশান্তিতেই স্বাধীনতার ক্ষতি। আমাদের ধর্ম্মসাধনাতেও কোন্ মুক্তিকে মুক্তি বলে? যে মুক্তিতে অহঙ্কার দূর করে' দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের পূর্ণ যোগ সাধন করে। তার কারণ, বিশ্বের সঙ্গে যোগেই মানুষ সত্য—এইজন্যে সেই সত্যের মধ্যেই মানুষ যথার্থ স্বাধীনতা পায়। আমরা একান্ত স্বাধীনতার শূন্যতাকে চাইনে, আমরা ভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে সম্বন্ধের পরিপূর্ণতাকে চাই, তাকেই বলি মুক্তি। যখন দেশের স্বাধীনতা চাই, তখন নেতিসূচক স্বাধীনতা চাইনে, তখন দেশের সকল লোকের সঙ্গে সম্বন্ধকে যথাসম্ভব সত্য ও বাধামুক্ত করতে চাই। সেটা হয় ভেদের কারণ দূর করে' দিয়ে, কিন্তু সে কারণ ভিতরেও থাক্‌তে পারে, বাইরেও থাক্‌তে পারে। আমরা পশ্চিমের ইতিহাসে পড়েচি, সেখানকার লোকেরা স্বাধীনতা চাই বলে' প্রায় মাঝে মাঝে কোলাহল তুলেচে। আমরাও সেই কোলাহলের অনুকরণ করি, আমরাও বলি আমরা স্বাধীনতা চাই। আমাদের এই কথাটি স্পষ্ট করে' বুঝ্‌তে হবে যে য়ুরোপ যখন বলেচে স্বাধীনতা চাই তখন বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে তার সমাজ-দেহের মধ্যে ভেদের দুঃখ ঘটেছিল—সমাজবর্ত্তী লোকদের মধ্যে কোনো-না-কোনো বিষয়ে কোনো-না-কোনো আকারে সম্বন্ধের বিচ্ছেদ বা বিকৃতি

ঘটেছিল, সেইটেকে দূর করার দ্বারাই তারা মুক্তি পেয়েচে। আমরাও যখন বলি স্বাধীনতা চাই তখন ভাব্‌তে হবে কোন্‌ ভেদটা আমাদের দুঃখ-অকল্যাণের কারণ—নইলে স্বাধীনতা শব্দটা কেবল ইতিহাসের বুলিরূপে ব্যবহার করে' কোনো ফল হবে না। যারা ভেদকে নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা করে' পোষণ করে তারা স্বাধীনতা চায় এ কথার কোনো অর্থই নেই। সে কেমন হয়, না, মেজবৌ বল্‌চেন যে তিনি স্বামীর মুখ দেখ্‌তে চান্‌ না, সন্তানদের দূরে রাখ্‌তে চান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌তে চান না, কিন্তু বড় বৌয়ের হাত থেকে ঘরকর্‌না নিজের হাতে কেড়ে নিতে চান।





য়ুরোপের কোনো কোনো দেশে দেখেচি রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে' তার থেকে রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভাবন হয়েচে। গোড়াকার কথাটা এই যে, তাদের মধ্যে শাসিত ও শাসয়িতা এই দুই দলের মধ্যে ভেদ ঘটেছিল। সে ভেদ জাতিগত ভেদ নয়, শ্রেণীগত ভেদ। সেখানে একদিকে রাজা ও রাজপুরুষ, অন্যদিকে প্রজা যদিচ একই জাতের মানুষ, তবু তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী হয়ে উঠেছিল। এইজন্যে তাদের বিপ্লবের একটি মাত্র কাজ ছিল, এই শ্রেণীগত ভেদটাকে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলে বেশ পাকারকম শেলাই করে' ঘুচিয়ে দেওয়া। আজ আবার সেখানে দেখ্‌চি, আরেকটা বিপ্লবের হাওয়া বইচে। খোঁজ কর্‌তে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বাণিজ্যক্ষেত্রে যারা টাকা খাটাচ্চে, আর যারা মজুরী খাট্‌চে, তাদের মধ্যে অধিকারের ভেদ অত্যন্ত বেশী। এই ভেদে পীড়া ঘটায়, সেই পীড়ায় বিপ্লব। ধনীরা ভীত হয়ে উঠে' কর্ম্মীরা যাতে ভালো বাসস্থান পায়, যাতে তাদের ছেলে-পুলেরা লেখা-পড়া শিখ্‌তে পারে, যাতে তারা সকল বিষয়ে কতকটা পরিমাণে আরামে থাকে দয়া করে' মাঝে মাঝে সে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু ভেদ যে রয়ে গেল; ধনীর অনুগ্রহের ছিটে-ফোঁটায় সেই ভেদ ত ঘোচে না, তাই আপদ্‌ও মিট্‌তে চায় না।

বহুকাল হল ইংলণ্ড থেকে একদল ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে বসতি করে। ইংলণ্ডের ইংরেজ সমুদ্রপার থেকে আমেরিকার ইংরেজের উপর শাসন বিস্তার করেছিল; এই শাসনের দ্বারা সমুদ্রের দুই পারের ভেদ

মেটেনি। এ ক্ষেত্রে নাড়ির টানের চেয়ে দড়ির টানটাই প্রবল হওয়াতে বন্ধন জোর করে' ছিঁড়ে ফেল্‌তে হয়েছিল। অথচ এখানে দুই পক্ষই সহোদর ভাই।

একদিন ইটালিতে অষ্ট্রিয়ান ছিল রাষ্ট্রের মুড়োয়, আর ইটালিয়ান ছিল ল্যাজায়। অথচ ল্যাজায় মুড়োয় প্রাণের যোগ ছিল না। এই প্রাণহীন বন্ধন ভেদকেই দুঃসহরূপে প্রকাশ করেছিল। ইটালি তার থেকে মুক্তিলাভ করে' সমস্যার সমাধান করেচে।

তা হলে দেখা যাচ্চে ভেদের দুঃখ থেকে ভেদের অকল্যাণ থেকে মুক্তিই হচ্চে মুক্তি। এমন কি, আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার মূল কথাটা হচ্চে ঐ,—তাতে বলে—ভেদবুদ্ধিতেই অসত্য, সেই ভেদবুদ্ধি ঘুচিয়ে দিলেই সত্যের মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি বিধাতার পরীক্ষাশালায় সব পরীক্ষার্থীর একই প্রশ্ন নয়। ভেদ এক রকম নয়। এক পায়ে খড়ম আরেক পায়ে বুট, সে এক রকমের ভেদ; এক পা বড় আরেক পা ছোট, সে আরেক রকমের ভেদ; পায়ের হাড় ভেঙে গিয়ে পায়ের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিচ্ছেদ, সে অন্য রকমের ভেদ; এই সব রকম ভেদই স্বাধীন-শক্তি-যোগে চলাফেরা করায় বাধা দেয়। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভেদের প্রতিকার ভিন্ন রকমের। খড়ম-পায়ের কাছ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর চুরি করে' নিয়ে ভাঙা-পা নিজের বলে' চালাতে গেলে তার বিপদ্ আরো বাড়িয়ে তুল্‌তে পারে।

ঐ যে পূর্ব্বেই বলেচি একদা ইংরেজ-জাতের মধ্যে ভেদের যে ছিন্নতা ছিল সেটাকে একটা রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কল দিয়ে তারা পাকা করে' জুড়েচে। কিন্তু যেখানে কাপড়টা তৈরিই হয়নি, সুতোগুলো কতক আলাদা হয়ে কতক জটা পাকিয়ে পড়ে' আছে, সেখানে রাষ্ট্রনৈতিক শেলাইয়ের কলের কথা ভাবাই চলে না, সেখানে আরো গোড়ায় যেতে হয়, সেখানে সমাজ-নৈতিক তাঁতে চড়িয়ে বহু সুতোকে এক অখণ্ড কাপড়ে পরিণত করা চাই। তাতে বিলম্ব হবে, কিন্তু শেলাইয়ের কলে কিছুতেই বিলম্ব সারা যায় না।

শিবঠাকুরের তিনটি বধূ সম্বন্ধে ছড়ায় বল্‌চে :—

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান,
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ী যান।

তিন কন্যেরই আহারের সমান প্রয়োজন ছিল,—কিন্তু দ্বিতীয় কন্যেটি যে সহজ উপায়ে আহার করেছিলেন, বিশেষ কারণে তৃতীয় কন্যের সেটা আয়ত্তাধীন ছিল না; অতএব উদর এবং আহার-সমস্যার পূরণ তিনি অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত উপায়ে কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন,—বাপের বাড়ি ছুটেছিলেন। প্রথম কন্যের ক্ষুধানিবৃত্তি সম্বন্ধে পুরাবৃত্তের বিবরণটি অস্পষ্ট। আমার বিশ্বাস, তিনি আয়োজন মাত্র করেছিলেন, আর মধ্যমাটি তার ফলভোগ করে' পরিতৃপ্ত হয়েচেন। ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমাদের এই জন্মভূমিটি শিবঠাকুরের মধ্যমা প্রেয়সী নন, সে-কথা ধরে' নেওয়া যেতে পারে। বহু শতাব্দী ধরে' বারবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। কাজেই লক্ষ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে মধ্যমার পথটি তাঁর পথ হতেই পারে না। হয় তিনি রাঁধেন নি অথচ ভোজের দাবী করেচেন, শেষে শিব-ঠাকুরের ধমক খেয়ে সনাতন বাপের বাড়ির দিকে চল্‌তে চল্‌তে বেলা বইয়ে দিয়েচেন—নয়ত রেঁধেছেন, বেড়েচেন, কিন্তু খাবার বেলায় দেখেচেন আরেকজন পাত শূন্য করে' দিয়েচে। অতএব তাঁর পক্ষে সমস্যা হচ্চে, যে কারণে এমনটা ঘটে, আর যে কারণে তিনি কথায় কথায় শিব-ঠাকুরকে চটিয়ে তোলেন, সেটা সর্ব্বাগ্রে দূর করে' দেওয়া;—আব্‌দার করে' বল্‌লেই হবে না যে, মেজ-বউ যেমন করে' খাচ্চে আমিও ঠিক তেমনি করে' খাব।

আমরা সর্ব্বদাই বলে' থাকি বিদেশী আমাদের রাজা, এই দুঃখ ঘুচ্‌লেই আমাদের সব দুঃখ ঘুচ্‌বে। বিদেশী রাজা আমি পছন্দ করিনে। পেট-জোড়া পিলেও আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু অনেকদিন থেকে দেখ্‌চি পিলেটি আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে' আপনি এসে পেট জুড়ে বসেচে। বহুযত্নে অন্তরের প্রকোষ্ঠে তাকে পালন কর্‌লেও বিপদ্, আবার রাগের মাথায় ঘুষি মেরে তাকে ফাটিয়ে দিলেও সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বলেন, তোমাদের আশে পাশে চারদিকেই

ম্যালেরিয়াবাহিনী ডোবা, সেইগুলো ভরাট না করলে তোমার পিলের ভরাট ছুটবে না। মুস্কিলের ব্যাপার এই যে, পিলের উপরেই আমাদের যত রাগ, ডোবার উপরে নয়। আমরা বলি, আমাদের সনাতন ডোবা, ওগুলি যদি লুপ্ত হয় তা হলে ভূতকালের পবিত্র পদচিহ্নের গভীরতাই লোপ পাবে। সেই গভীরতা বর্ত্তমানের অবিরল অশ্রুধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হয় হোক, কিন্তু আমাদের লোকালয় চিরদিন যেন ডোবায় ডোবায় শতধা হয়ে থাকে।

পাঠকেরা অধৈর্য্য হয়ে বল্‌বেন, আর ভূমিকা নয়, এখন আমাদের বিশেষ সমস্যাটা কি বলে'ই ফেল। বল্‌তে সঙ্কোচ হচ্চে; কারণ, কথাটা অত্যন্ত বেশি সহজ। শুনে সবাই অশ্রদ্ধা করে' বল্‌বেন—ও ত সবাই জানে! এইজন্যেই রোগের পরিচয় সম্বন্ধে ডাক্তার-বাবু অনিদ্রা না বলে' যদি ইন্‌স্‌মনিয়া বলেন, তা হলে মনে হয় তাঁকে ষোলো টাকা ফি দেওয়া ষোলো আনা সার্থক হল। আসল কথা, আমরা এক নই, আমাদের নিজেদের মধ্যে ভেদের অন্ত নেই। প্রথমেই বলেছি—ভেদটাই দুঃখ, ঐটেই পাপ। সে ভেদ বিদেশীর সঙ্গেই হোক আর স্বদেশীর সঙ্গেই হোক। সমাজটাকে একটা ভেদবিহীন বৃহৎ দেহের মত ব্যবহার করতে পারি কখন? যখন তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বোধশক্তি ও কর্ম্মশক্তির প্রাণগত যোগ থাকে; যখন তার পা কাজ করলে হাত তার ফল পায়, হাত কাজ করলে পা তার ফল পায়। কল্পনা করা যাক, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিছাড়া ভুলে দেহের আকৃতিধারী এমন একটা অপদার্থ তৈরি হয়েছে যার প্রত্যেক বিভাগের চারদিকে নিষেধের বেড়া; যার ডান-চোখে বাঁ-চোখে, ডান-হাতে বাঁ-হাতে ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্পর্ক, যার পায়ের শিরার রক্ত বুকের কাছে উঠ্‌তে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে যায়, যার তর্জ্জনীটা কড়ে-আঙুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে কাজ করতে গেলে প্রায়শ্চিত্তের দায়িক হয়, যার পায়ে তেল মালিশের দরকার হলে' ডান-হাত হরতাল করে' বসে। এই অত্যন্ত নড়বড়ে পদার্থটা অন্য পাড়ার দেহটার মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায় না। সে দেখে অন্য দেহটা জুতো জামা পরে' লাঠি ছাতা নিয়ে পথে অপথে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। তখন সে ভাবে যে, ঐ দেহটার মত জুতো জামা লাঠি ছাতা জুটলেই আমার সব দুঃখ ঘুচ্‌বে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার ভুলের পরে নিজের ভুল যোগ করে' দিয়ে সংশোধন চলে না। জুতো পেলেও তার জুতো খসে' পড়্‌বে, ছাতি পেলেও তার ছাতি হাওয়ায় দেবে উড়িয়ে, আর মনের মত লাঠি যদি সে কোনোমতে জোগাড় করতে পারে অন্য পাড়ার দেহটি সে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে তার নড়বড়ে জীবলীলার প্রহসনটাকে হয়ত ট্র্যাজেডিতে সমাপ্ত করে' দিতে পারে। এখানে জুতো জামা ছাতি লাঠির অভাবটাই সমস্যা নয়, প্রাণগত ঐক্যের অভাবটাই সমস্যা। কিন্তু বিধাতার উক্ত দেহরূপী বিদ্রূপটি হয়ত বলে' থাকে যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনৈক্যের কথাটা এখন চাপা থাক, আপাতত সবার আগে যদি কোনো গতিকে একটা জামা জোগাড় করে' নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকতে পারি তা হলে সেই জামাটার ঐক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐক্য আপ্‌না-আপ্‌নি ঘটে' উঠ্‌বে। আপ্‌নিই ঘটবে এ কথা বলা হচ্চে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া। এই ফাঁকি সর্ব্বনেশে; কেননা, নিজকৃত ফাঁকিকে মানুষ ভালবাসে, তাকে যাচাই করে' দেখ্‌তেই প্রবৃত্তি হয় না।

মনে আছে, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখন দেশে দুই বিরোধীপক্ষের মধ্যে একটা তর্ক প্রায় শোনা যেত,—আমরা কি নেশন, না, নেশন নই। কথাটা সম্পূর্ণ বুঝ্‌তুম তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমরা নেশন নই এ-কথা যে-মানুষ বল্‌ত রাজা হলে তা'কে জেলে দিতুম, সমাজপতি হলে তার ধোবা নাপিত বন্ধ করতুম। তার প্রতি অহিংস্রভাব রক্ষা করা আমার পক্ষে কঠিন হ'ত। তখন এ সম্বন্ধে একটা বাঁধা তর্ক এই ছিল যে, সুইজর্‌ল্যাণ্ডে তিন ভিন্ন জাত পাশাপাশি রয়েচে তবুও ত তারা এক নেশন, তবে আর কি! শুনে ভাবতুম,—যাক্, ভয় নেই। কিন্তু মুখে ভয় নেই বল্‌লেও আসলে ভয় ঘোচে কই। ফাঁসির আসামীকে তার মোক্তার যখন বলেছিল—"ভয় কি, দুর্গা বলে' ঝুলে পড়" তখন সে সান্ত্বনা পায়নি; কেননা দুর্গা বল্‌তে সে রাজি কিন্তু ঐ ঝুলে পড়াটাতেই আপত্তি। সুই-

জর্‌ল্যাণ্ডের লোকেরাও নেশন, আর আমরাও নেশন, এ কথা কেবল তর্কে সাব্যস্ত করে' সান্ত্বনাটা কি,—ফলের বেলায় দেখি আমরা ঝুলে পড়েচি আর তারা মাটির উপর খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। রাধিকা চালুনীতে করে' জল এনে কলঙ্ক ভঞ্জন করেছিলেন। যে হতভাগিনী নারী রাধিকা নয় তারও চালুনীটা আছে, কিন্তু তার কলঙ্ক-ভঞ্জন হয় না, উল্টোই হয়। মূলে যে প্রভেদ থাকাতে ফলের এই প্রভেদ, সেই কথাটাই ভাব্‌বার কথা। সুইজর্‌ল্যাণ্ডে ভেদ যতগুলোই থাক্, ভেদবুদ্ধি ত নেই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে রক্তবিমিশ্রণে কোনো বাধা নেই ধর্ম্মে বা আচারে বা সংস্কারে। এখানে সে বাধা এত প্রচণ্ড যে, অসবর্ণ বিবাহের আইনগত বিঘ্ন দূর কর্‌বার প্রস্তাব হবামাত্র হিন্দুসমাজপতি উদ্বেগে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হয়ে হর্‌তাল কর্‌বার ভয় দেখিয়েছিলেন। সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না। যাঁরা নিজেদের এক মহাজাত বলে' কল্পনা করেন, তাঁদের মধ্যে সেই নাড়ীর মিলনের পথ ধর্ম্মের শাসনে চিরদিনের জন্যে যদি অবরুদ্ধ থাকে, তা হলে তাঁদের মিলন কখনই প্রাণের মিলন হবে না, সুতরাং সকলে এক হয়ে প্রাণ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হতে পার্‌বে না। তাঁদের প্রাণ যে এক প্রাণ নয়। আমার কোনো বন্ধু ভারতের প্রত্যন্ত-বিভাগে ছিলেন। সেখানে পাঠান্ দস্যুরা মাঝে মাঝে হিন্দু লোকালয়ে চড়াও হয়ে স্ত্রী হরণ করে' থাকে। একবার এই রকম ঘটনায় আমার বন্ধু কোনো স্থানীয় হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সমাজের উপর এমন অত্যাচার তোমরা সহ্য কর কেন? সে নিতান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বল্‌লে, "উয়ো ত বেনিয়াকী লড়্‌কী।" "বেনিয়াকী লড়্‌কী" হিন্দু, আর যে ব্যক্তি তার হরণব্যাপারে উদাসীন সেও হিন্দু, উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রগত যোগ থাক্‌তে পারে কিন্তু প্রাণগত যোগ নেই। সেইজন্যে একের আঘাত অন্যের মর্ম্মে গিয়ে বাজে না। জাতীয় ঐক্যের আদিম অর্থ হচ্চে জন্মগত ঐক্য, তার চরম অর্থও তাই।

যেটা অবাস্তব, কোনোমতেই তার উপরে কোনো বড় সিদ্ধির পত্তন করা যায় না। মানুষ যখন দায়ে পড়ে, তখন আপনাকে আপনি ফাঁকি দিয়ে আপনার কাছ থেকে কাজ উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা করে' থাকে। বিভ্রান্ত হয়ে মনে করে, নিজেকে বাম-হাতে ফাঁকি দিয়ে ডান-হাতে লাভ করা যেতেও পারে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্যসাধনার মূলে একটা মস্ত জাতীয় অবাস্তবতা আছে সে-কথা আমরা ভিতরে ভিতরে সবাই জানি—সেইজন্যে সেদিক্‌টাকে আমরা অগোচরে রেখে তার উপরে স্বাজাত্যের যে জয়স্তম্ভ গড়ে' তুল্‌তে চাই তার মালমসলাটাকেই খুব প্রচুর করে' গোচর কর্‌তে ইচ্ছা করি। কাঁচা ভিৎকে মালমসলার বাহুল্য দিয়ে উপস্থিত-মত চাপা দিলেই সে ত পাকা হয়ে ওঠে না। বরঞ্চ একদিন সেই বাহুল্যেরই গুরুভারে ভিতের দুর্ব্বলতা ভীষণরূপে সপ্রমাণ হয়ে পড়ে। খেলাফতের ঠেকো-দেওয়া সন্ধিবন্ধনের পর আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূলে ভুল থাক্‌লে কোনো উপায়েই স্থূলে সংশোধন হতে পারে না। এসব কথা শুন্‌লে অধৈর্য্য হয়ে কেউ কেউ বলে' ওঠেন, "আমাদের চারদিকে যে বিদেশী তৃতীয় পক্ষ শত্রুরূপে আছে সেই আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাচ্চে, অতএব দোষ আমাদের নয়, দোষ তারই। ইতিপূর্ব্বে আমরা হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি নির্ব্বিরোধেই ছিলুম কিন্তু ইত্যাদি ইত্যাদি।" শাস্ত্রে বলে, কলি শনি ব্যাধি মানুষের ছিদ্র খোঁজে। পাপের ছিদ্র পেলেই তারা ভিতরে প্রবেশ করে' সর্ব্বনাশের পালা আরম্ভ করে' দেয়। বিপদ্‌টা বাইরের, আর পাপটা আমার, এই কারণে বিপদের প্রতি ক্রোধ ও পাপের প্রতি মমতা করাই হচ্চে সকল বিপদের সেরা।

জাহাজের খোলের মধ্যে ফাটল ছিল, যতদিন ঝড় তুফান ছিল না ততদিন সে জাহাজ খেয়া দিয়েচে। মাঝে মাঝে লোনা জল সেঁচ্‌তেও হয়েছিল, কিন্তু সে দুঃখটা মনে রাখ্‌বার মত নয়। যেদিন তুফান উঠ্‌ল, সেদিন খোলের ফাটল বেড়ে বেড়ে জাহাজ-ডুবি আসন্ন হয়েচে। কাপ্তেন যদি বলে—যত দোষ ঐ তুফানের, অতএব সকলে মিলে ঐ তুফানটাকে উচ্চৈঃস্বরে গাল পাড়ি, আর আমার ফাটলটি যেমন ছিল তেমনই থাক্; তা হলে ঐ কাপ্তেনের

মত নেতাটি পারে নিয়ে যাবে না, তলায় নিয়ে যাবে। তৃতীয়পক্ষ যদি আমাদের শত্রুপক্ষই হয়, তা হলে এই কথাটা মনে রাখ্‌তে হবে তা'রা তুফানরূপে আমাদের ফাটল মেরামতের কাজে লাগ্‌তে আসেনি। তারা ভয়ঙ্কর বেগে চোখে অ'ঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কোন্‌খানে আমাদের তলা কাঁচা। দুর্ব্বলাত্মাকে বাস্তবের কথাটা তারা ডাইনে বাঁয়ে চাপড় মেরে মেরে স্মরণ করিয়ে দেবে। বুঝিয়ে দেবে ডাইনের সঙ্গে বাঁয়ের যার মিল নেই রসাতলের রাস্তা ছাড়া আর সব রাস্তাই তার পক্ষে বন্ধ। এক-কথায় তারা শিরিষের আঠার ঢেউ নয়, তারা লবণাম্বু। যতক্ষণ তাদের উপর রাগারাগি করে' বৃথা মেজাজ খারাপ ও সময় নষ্ট করুচি ততক্ষণ যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে ফাটল বন্ধ করার কাজে লাগ্‌লে পরিত্রাণের আশা থাকে। বিধাতা যদি আমাদের সঙ্গে কৌতুক করতে চান, বর্ত্তমান তৃতীয় পক্ষের তুফানটাকে আপাতত দমিয়ে দিতেও পারেন—কিন্তু তুফানের সম্পূর্ণ বংশলোপ করে' সমুদ্রকে ডোবা বানিয়ে দেবেন আমাদের মত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরও এতবড় আব্‌দার তিনি শুন্‌বেন না। অতএব কাপ্তেনদের কাছে দোহাই পাড়্‌চি যেন তাঁরা কণ্ঠস্বরে ঝড়ের গর্জ্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ফাটল-মেরামতের কথাটা একেবারে চাপা না দেন।

কাপ্তেনরা বলেন—সেদিকে যে আমাদের লক্ষ্য আছে তার একটা প্রমাণ দেখ যে, যদিও আমরা সনাতন-পন্থী তবু আমরা স্পর্শদোষ সম্বন্ধে দেশের লোকের সংস্কার দূর কর্‌তে চাই। আমি বলি এহ বাহ্য। স্পর্শদোষ ত আমাদের ভেদবুদ্ধির একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ। যে সনাতন ভেদবুদ্ধির বনস্পতি আমাদের পথরোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে তার থেকে একটি কাঠি ভেঙে নিলেই ত পথ খোলসা হবে না।

আমি পূর্ব্বে অন্যত্র বলেচি, ধর্ম্ম যাদের পৃথক্ করে তাদের মেল্‌বার দরজায় ভিতর দিক্ থেকে আগল দেওয়া। কথাটা পরিষ্কার করে' বল্‌বার চেষ্টা করি। সকলেই বলে' থাকে—ধর্ম্মশব্দের মূল অর্থ হচ্চে যা আমাদের ধারণ করে। অর্থাৎ আমাদের যে-সকল আশ্রয় ধ্রুব, তারা ইচ্চে ধর্ম্মের অধিকারভুক্ত। তাদের সম্বন্ধে তর্ক নেই। এই-সকল আশ্রয়ের কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে না। এদের সঙ্গে ব্যবহারে যদি চঞ্চলতা করি, কথায় কথায় যদি মত বদল ও পথ বদল কর্‌তে থাকি, তা হলে বাঁচিনে।

কিন্তু সংসারের এমন একটা বিভাগ আছে যেখানে পরিবর্ত্তন চল্‌চে, যেখানে আকস্মিকের আনাগোনার অন্ত নেই, সেখানে নূতন নূতন অবস্থার সম্বন্ধে নূতন করে' বারে বারে আপোষ-নিষ্পত্তি না কর্‌লে আমরা বাঁচিনে। এই নিত্য-পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে ধ্রুবকে অধ্রুবের জায়গায়, অধ্রুবকে ধ্রুবের জায়গায় বসাতে গেলে বিপদ্ ঘট্‌বেই। যে মাটির মধ্যে গাছ শিকড় চালিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শিকড়ের পক্ষে সেই ধ্রুব মাটি খুব ভাল, কিন্তু তাই বলে' ডালপালাগুলোকেও মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলা কল্যাণকর নয়। পৃথিবী নিত্য আমাকে ধারণ করে, পৃথিবী ধর্ম্মের মত ধ্রুব হ'লেই আমার পক্ষে ভাল—তার নড়চড় হতে থাক্‌লেই সর্ব্বনাশ। আমার গাড়িটাও আমাকে ধারণ করে, সেই ধারণ ব্যাপারটাকে যদি ধ্রুব করে' তুলি, তা হলে গাড়ি আমার পক্ষে পৃথিবী হবে না, পিঁজরে হবে। অবস্থা বুঝে আমাকে পুরোণো গাড়ি বেচ্‌তে হয় বা মেরামত কর্‌তে হয়, নতুন গাড়ি কিন্‌তে হয় বা ভাড়া কর্‌তে হয়, কখনো বা গাড়িতে ঢুক্‌তে হয়, কখনো বা গাড়ি থেকে বেরতে হয়, আর গাড়িটা কাৎ হবার ভাব দেখালে তার থেকে লাফিয়ে পড়্‌বার জন্যে বিধান নেবার পূর্ব্বে ভাটপাড়ায় সইস পাঠাতে হয় না। ধর্ম্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী কর, তখন কোনো তর্ক না করে'ই কথাটাকে মাথায় করে' নেব। ধর্ম্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য। কিন্তু ধর্ম্ম যখন বলে—মুসলমানের ছোঁওয়া অন্ন গ্রহণ কর্‌বে না, তখন আমাকে প্রশ্ন কর্‌তেই হবে—কেন কর্‌ব না? একথাটা আমার কাছে ঘড়ার জলের মত অনিত্য, তাকে রাখ্‌ব কি ফেল্‌ব সেটার বিচার যুক্তির দ্বারা। যদি বল, এসব কথা স্বাধীন বিচারের অতীত, তা হলে শাস্ত্রের সমস্ত বিধানের সামনে দাঁড়িয়েই বল্‌তে হবে,—বিচারের যোগ্য বিষয়কে যারা নির্বিচারে গ্রহণ করে তাদের প্রতি সেই দেবতার ধিক্কার আছে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। তারা পাণ্ডাকে দেবতার চেয়ে

বেশী ভয় ও শ্রদ্ধা করে, এমনি করে' তারা দেবপূজার অপমান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

সংসারের যে ক্ষেত্রটা বুদ্ধির ক্ষেত্র সেখানে বুদ্ধির যোগেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সত্য মিলন সম্ভবপর। সেখানে অবুদ্ধির উৎপাত বিষম বাধা। সে যেন মানুষের বাসার মধ্যে ভূতুড়ে কাণ্ড। কেন, কি বৃত্তান্ত, বলে' ভূতের কোনো জবাবদিহী নেই। ভূত বাসা তৈরি করে না, বাসা-ভাড়া দেয় না, বাসা ছেড়েও যায় না। এত বড় জোর তার কিসের? না, সে বাস্তব নয়, অথচ আমার ভীরু মন তাকে বাস্তব বলে' মেনে নিয়েচে। প্রকৃত বাস্তব যে, সে বাস্তবের নিয়মে সংযত, যদি বা সে বাড়ি-ভাড়া নাও কবুল করে, অন্তত সরকারী ট্যাক্সো দিয়ে থাকে। অবাস্তবকে বাস্তব বলে' মান্‌লে তাকে জ্ঞানের কোনো নিয়মে পাওয়া যায় না। সেইজন্যে কেবল বুক দুরদুর করে, গা ছমছম করে, আর বিনা বিচারে মেনেই চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে "কেন", জবাব দিতে পারিনে, কেবল পিঠের দিকে বুড়ো-আঙুলটা দেখিয়ে দিয়ে বলি "ঐ যে!" তার পরেও যদি বলে "কই যে?" তাকে নাস্তিক বলে' তাড়া করে' যাই। মনে ভাবি, গোঁয়ারটা বিপদ্ ঘটালে বুঝি,—ভূতকে অবিশ্বাস করলে যদি সে ঘাড় মটকে দেয়! তবুও যদি প্রশ্ন ওঠে "কেন?" তা হলে উত্তরে বলি, "আর যেখানেই কেন খাটাও, এখানে কেন খাটাতে এস না বাপু, মানে মানে বিদায় হও। মরবার পরে তোমাকে পোড়াবে কে সে ভাবনাটা ভেবে রেখে দিয়ো।"

চিত্তরাজ্যে যেখানে বুদ্ধিকে মানি সেখানে আমার স্বরাজ; সেখানে আমি নিজেকে মানি, অথচ সেই মানার মধ্যে সর্ব্বদেশের ও চিরকালের মানবচিত্তকে মানা আছে। অবুদ্ধিকে যেখানে মানি সেখানে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া শাসনকে মানি যা না আমার না সর্ব্বমানবের। সুতরাং সে একটা কারাগার, সেখানে কেবল আমার মতো হাত-পা-বাঁধা এক-কারায় অবরুদ্ধ অকাল-জরাগ্রস্ত-দের সঙ্গেই আমার মিল আছে, বাইরের কোটি কোটি স্বাধীন লোকদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বৃহতের সঙ্গে এই ভেদ থাকাটাই হচ্চে বন্ধন। কেননা পূর্ব্বেই বলেচি ভেদটাই সকলদিক্ থেকে আমাদের মূল বিপদ্ ও চরম অমঙ্গল। অবুদ্ধি হচ্চে ভেদবুদ্ধি, কেননা চিত্তরাজ্যে সে আমাদের সকল মানবের থেকে পৃথক্ করে' দেয়, আমরা একটা অদ্ভুতের খাঁচায় বসে' কয়েকটা শেখানো বুলি আবৃত্তি করে' দিন কাটাই।

জীবনযাত্রায় পদে পদেই অবুদ্ধিকে মানা যাদের চিরকালের অভ্যাস, চিত্রগুপ্তের কোনো একটা হিসাবের ভুলে হঠাৎ তারা স্বরাজের স্বর্গে গেলেও তাদের ঢেঁকি-লীলার শান্তি হবে না, সুতরাং পর-পদপীড়নের তালে তালে তারা মাথা কুটে মরবে, কেবল মাঝে মাঝে পদ-যুগলের পরিবর্ত্তন হবে এইমাত্র প্রভেদ।

যন্ত্রচালিত বড় বড় কারখানায় মানুষকে পীড়িত করে' যন্ত্রবৎ করে বলে' আমরা আজকাল সর্ব্বদাই তাকে কটূক্তি করে' থাকি। এই উপায়ে পশ্চিমের সভ্যতাকে গাল পাড়্‌চি জেনে মনে বিশেষ সান্ত্বনা পাই। কারখানায় মানুষের এমন পঙ্গুতা কেন ঘটে; যে-হেতু সেখানে তার বুদ্ধিকে ইচ্ছাকে কর্ম্মকে একটা বিশেষ সঙ্কীর্ণ ছাঁচে ঢালা হয়, তার পূর্ণ বিকাশ হতে পারে না। কিন্তু লোহা দিয়ে গড়া কলের কারখানাই একমাত্র কারখানা নয়। বিচারহীন বিধান লোহার চেয়ে শক্ত, কলের চেয়ে সঙ্কীর্ণ। যে বিপুল ব্যবস্থাতন্ত্র অতি নিষ্ঠুর শাসনের বিভীষিকা সর্ব্বদা উদ্যত রেখে' বহুযুগ ধরে' বহুকোটি নরনারীকে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচারের পুনরাবৃত্তি করতে নিয়ত প্রবৃত্ত রেখেচে সেই দেশ-জোড়া মানুষ-পেষা জাঁতা-কল কি কল-হিসাবে কারো চেয়ে খাটো। বুদ্ধির স্বাধীনতাকে অশ্রদ্ধা করে' এতবড় সুসম্পূর্ণ সুবিস্তীর্ণ চিত্তশূন্য বজ্রকঠোর বিধিনিষেধের কারখানা মানুষের রাজ্যে আর কোনোদিন আর কোথাও উদ্ভাবিত হয়েচে বলে' আমি ত জানিনে। চট-কল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরি হয়ে বেরোয়, জড়ভাবে বোঝা গ্রহণ করবার জন্যেই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটা-কাটা যে-সব অতি ভালোমানুষ পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাহিরের বোঝা বইতেই আছে। একটা বোঝা খালাস হতেই আরেকটা বোঝা তাদের অধিকার করে' বসে।

প্রাচীন ভারত একদিন যখন বিধাতার কাছে বর চেয়েছিলেন তখন বলেছিলেন—"স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—"য একঃ অবর্ণঃ"—যিনি এক, যিনি বর্ণ-ভেদের অতীত, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন। তখন ভারত ঐক্য চেয়েছিলেন কিন্তু পোলিটিকাল বা সামাজিক কলে-গড়া ঐক্যের বিড়ম্বনা চাননি। "বুদ্ধ্যা শুভয়া" শুভবুদ্ধির দ্বারাই মিল্‌তে চেয়েছিলেন, অন্ধ বশ্যতার লম্বা শিকলের দ্বারা নয়, বিচারহীন বিধানের কঠিন কানমলার দ্বারা নয়।

সংসারে আকস্মিকের সঙ্গে মানুষকে সর্ব্বদাই নতুন করে' বোঝা-পড়া কর্‌তেই হয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির সেই কাজটাই খুব বড় কাজ। আমরা বিশ্ব সৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাই, আকস্মিক—বিজ্ঞানে যাকে variation বলে—আচম্‌কা এসে পড়ে। প্রথমটা সে থাকে এক-ঘরে', কিন্তু বিশ্বনিয়ম বিশ্বছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে সবার করে' নেন, অথচ সে এক নূতন বৈচিত্র্যের প্রবর্ত্তন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের সমাজে, আকস্মিক প্রায়ই অনাহূত এসে পড়ে। তার সঙ্গে যে-রকম ব্যবহার কর্‌লে এই নূতন আগন্তুকটি চারদিকের সঙ্গে সুসঙ্গত হয়, অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিকে, রুচিকে, চারিত্রকে, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানকে পীড়িত অবমানিত না করে' সতর্ক বুদ্ধি দ্বারাতেই সেটা সাধন কর্‌তে হয়। মনে করা যাক একদা এক ফকীর বিশেষ প্রয়োজনে রাস্তার মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তাঁর ছাগলটাকে বেঁধে হাট কর্‌তে গিয়েছিলেন। হাটের কাজ সারা হল, ছাগলটারও একটা চরম সদ্গতি হয়ে গেল। উচিত ছিল এই আকস্মিক খুঁটিটাকে সর্ব্বকালীনের খাতিরে রাস্তার মাঝখান থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু উদ্ধার কর্‌বে কে? অবুদ্ধি করে না, কেননা, তার কাজ হচ্চে যা আছে তাকেই চোখ বুজে স্বীকার করা;—বুদ্ধিই করে, যা নূতন এসেচে তার সম্বন্ধে সে বিচারপূর্ব্বক নূতন ব্যবস্থা কর্‌তে পারে। যে দেশে, যা আছে তাকেই স্বীকার করা, যা ছিল তাকেই পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা সনাতন পদ্ধতি, সে দেশে খুঁটিটা শত শত বৎসর ধরে' রাস্তার মাঝখানেই রয়ে গেল। অবশেষে একদিন খামকা কোথা থেকে একজন ভক্তি-গদ্‌গদ মানুষ এসে তার গায়ে একটু সিঁদূর লেপে তার উপর একটা মন্দির তুলে' বস্‌ল। তার পর থেকে বছর বছর পঞ্জিকাতে ঘোষণা দেখা গেল—শুক্লপক্ষের কার্ত্তিক-সপ্তমীতে যে ব্যক্তি খুঁটীশ্বরীকে এক সের ছাগদুগ্ধ ও তিন তোলা রজত দিয়ে পূজা দেয় তার সেই পূজা ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ। এম্‌নি করে' অবুদ্ধির রাজত্বে আকস্মিক খুঁটি সমস্তই সনাতন হয়ে ওঠে, লোক-চলাচলের রাস্তায় চলার চেয়ে বাঁধা পড়ে থাকাটা সহজ হয়ে ওঠে। যাঁরা নিষ্ঠাবান্ তাঁরা বলেন, আমরা বিধাতার বিশেষ সৃষ্টি, অন্য কোনো জাতের সঙ্গে আমাদের মেলে না, অতএব রাস্তা বন্ধ হলেও আমাদের চলে কিন্তু খুঁটি না থাক্‌লে আমাদের ধর্ম্ম থাকে না। যারা খুঁটীশ্বরীকে মানেও না, এমন কি, যারা বিদেশী ভাবুক, তারাও বলে, "আহা, এ'কেই ত বলে আধ্যাত্মিকতা; নিজের জীবনযাত্রার সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই এরা মাটি কর্‌তে রাজি, কিন্তু মাটি থেকে একটা খুঁটি এক ইঞ্চি পরিমাণও ওপ্‌ড়াতে চায় না।" সেই সঙ্গে এও বলে, "আমাদের বিশেষত্ব অন্য রকমের, অতএব আমরা এদের অনুকরণ কর্‌তে চাইনে, কিন্তু এরা যেন হাজার খুঁটিতে ধর্ম্মের বেড়াজালে এই রকম বাঁধা হয়ে অত্যন্ত শান্ত সমাহিত হয়ে পড়ে' থাকে। কারণ, এটি দূর থেকে দেখ্‌তে বড় সুন্দর।"

সৌন্দর্য্য নিয়ে তর্ক কর্‌তে চাইনে। সেটা রুচির কথা। যেমন ধর্ম্মের নিজের অধিকারে ধর্ম্ম বড়, তেমনি সুন্দরের নিজের অধিকারে সুন্দর বড়। আমার মত অর্ব্বাচীনেরা বুদ্ধির অধিকারের দিক্ থেকে প্রশ্ন কর্‌বে, এমনতর খুঁটি-কণ্টকিত পথ দিয়ে কখনো স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধির রথ কি এগোতে পারে? বুদ্ধির অভিমানে বুক বেঁধে নব্যতন্ত্রী প্রশ্ন করে বটে, কিন্তু রাত্রে তার ঘুম হয় না। যে-হেতু, গৃহিণীরা স্বস্ত্যয়নের আয়োজন করে' বলেন, "ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর, কি জানি কোন্ খুঁটি কোন্ দিন বা দৃষ্টি দেয়। তোমরা চুপ করে' থাক না। কলিকালে খুঁটি নাড়া দেবার মত ডানপিটে ছেলের ত অভাব নেই।" শুনে' আমাদের মত নিছক আধুনিকদেরও বুক ধুকধুক কর্‌তে থাকে, কেননা রক্তের ভিতর থেকে

সংস্কারটাকে ত ছেঁকে ফেল্‌তে পারিনে। কাজেই পরের দিন ভোর-বেলাতেই এক সেরের বেশি ছাগদুগ্ধ তিন তোলার বেশি রজত খরচ করে' হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

এই ত গেল আমাদের সবচেয়ে প্রধান সমস্যা। যে বুদ্ধির রাস্তায় কর্ম্মের রাস্তায় মানুষ পরস্পরে মিলে সমৃদ্ধির পথে চল্‌তে পারে সেইখানে খুঁটি গেড়ে থাকার সমস্যা; যাদের মধ্যে সর্ব্বদা আনাগোনার পথ সকল রকমে খোলসা রাখ্‌তে হবে তাদের মধ্যে অসংখ্য খুঁটির বেড়া তুলে' পরস্পরের ভেদকে বহুধা ও স্থায়ী করে' তোলার সমস্যা; বুদ্ধির যোগে যেখানে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, অবুদ্ধির অচল বাধায় সেখানে সকলের সঙ্গে চিরবিচ্ছিন্ন হবার সমস্যা; খুঁটিরূপিণী ভেদবুদ্ধির কাছে ভক্তিভরে বিচার-বিবেককে বলিদান কর্‌বার সমস্যা! ভাবুক লোকে এই সমস্যার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ছলছল নেত্রে বলেন, আহা, এখানে ভক্তিটাই হ'ল বড় কথা এবং সুন্দর কথা, খুঁটিটা ত উপলক্ষ্য; আমাদের মত আধুনিকেরা বলে, এখানে বুদ্ধিটাই হ'ল বড় কথা, সুন্দর কথা, খুঁটিটাও জঞ্জাল, ভক্তিটাও জঞ্জাল।—কিন্তু আহা, গৃহিণী যখন অশুভ-আশঙ্কায় করজোড়ে গলবস্ত্র হয়ে দেবতার কাছে নিজের ডান-হাত বাঁধা রেখে আসেন, তার কি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য! আধুনিক বলে, যেখানে ডান-হাত উৎসর্গ করা সার্থক, যেখানে তাতে নেই অন্ধতা, যেখানে তাতে আছে সাহস, সেখানেই তার মাধুর্য্য;—কিন্তু যেখানে অশুভ-আশঙ্কা মূঢ়তা-রূপে দীনতা-রূপে তাবৎকুশ্রী-কবলে সেই মাধুর্য্যকে গিলে খাচ্চে, সুন্দর সেখানে পরাস্ত, কল্যাণ সেখানে পরাহত।

আমাদের আর-একটি প্রধান সমস্যা হিন্দুমুসলমান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান এত দুঃসাধ্য তার কারণ দুই পক্ষই মুখ্যত আপন আপন ধর্ম্মের দ্বারাই অচলভাবে আপনাদের সীমা-নির্দ্দেশ করেচে। সেই ধর্ম্মই তাদের মানববিশ্বকে শাদা-কালো ছক কেটে দুই সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করেচে, আত্ম ও পর। সংসারে সর্ব্বত্রই আত্মপরের মধ্যে কিছু-পরিমাণে স্বাভাবিক ভেদ আছে। সেই ভেদের পরিমাণটা অতিমাত্র হলেই তাতে অকল্যাণ হয়। বুশ্‌ম্যান জাতীয় লোক পরকে দেখবামাত্র তাকে নির্ব্বিশেষে বিষবাণ দিয়ে মারে। তার ফল হচ্চে পরের সঙ্গে সত্য মিলনে মানুষের যে-মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হয় বুশ্‌ম্যানের তা হতে পারেনি, সে চূড়ান্ত বর্ব্বরতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এই ভেদের মাত্রা যে-জাতির মধ্যে অন্তরের দিক্ থেকে যতই কমে এসেচে সেই জাতি ততই উচ্চ-শ্রেণীর মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হতে পেরেচে। সে-জাতি সকলের সঙ্গে যোগে চিন্তার কর্ম্মের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন কর্‌তে পেরেচে।

হিন্দু নিজেকে ধর্ম্মপ্রাণ বলে' পরিচয় দেয়, মুসলমানও তাই দেয়। অর্থাৎ ধর্ম্মের বাহিরে উভয়েরই জীবনের অতি অল্প অংশই অবশিষ্ট থাকে। এই কারণে এরা নিজ নিজ ধর্ম্ম দ্বারাই পরস্পরকে ও জগতের অন্য সকলকে যথাসম্ভব দূরে ঠেকিয়ে রাখে। এই যে দূরত্বের ভেদ এরা নিজেদের চারি দিকে অত্যন্ত মজ্‌বুৎ করে' গেঁথে রেখেচে, এতে করে' সকল মানুষের সঙ্গে সত্য-যোগে মনুষ্যত্বের যে প্রসার হয় তা এদের মধ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েচে। ধর্ম্মগত ভেদবুদ্ধি সত্যের অসীম স্বরূপ থেকে এদের সঙ্কীর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে' রেখেচে। এইজন্যেই মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে নিত্য-সত্যের চেয়ে বাহ্য-বিধান কৃত্রিম-প্রথা এদের মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেচে।

পূর্ব্বেই বলেচি—মানব-জগৎ এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মের দ্বারাই আত্ম ও পর এই দুই ভাগে অতিমাত্রায় বিভক্ত হয়েচে। সেই পর চিরকালই পর হয়ে থাক হিন্দুর এই ব্যবস্থা, সেই পর, সেই ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ কোনো ফাঁকে তার ঘরের মধ্যে এসে ক না পড়ে এই তার ইচ্ছা। মুসলমানের তরফে ঠিক এর উল্টো। ধর্ম্মগণ্ডীর বহির্বর্ত্তী পরকে সে খুব তীব্র ভাবেই পর বলে' জানে, কিন্তু সেই পরকে সেই কাফেরকে বরাবরকার মত ঘরে টেনে এনে আটক কর্‌তে পার্‌লেই সে খুসী। এদের শাস্ত্রে কোনো একটা খুঁটে'-বের-করা শ্লোক কি বলে, সেটা কাজের কথা নয়, কিন্তু লোকব্যবহারে এদের এক পক্ষ শত শত বৎসর ধরে' ধর্ম্মকে আপন দুর্গম দুর্গ করে' পরকে দূরে ঠেকিয়ে আত্মগত হয়ে আছে, আর অপর পক্ষ ধর্ম্মকে আপন ব্যূহ বানিয়ে পরকে আক্রমণ করে' তাকে ছিনিয়ে এনেচে। এতে করে' এদের মনঃপ্রকৃতি দুই রকম ছাঁদের ভেদ-

বুদ্ধিতে একেবারে পাকা হয়ে গেছে। বিধির বিধানে এমন দুই দল ভারতবর্ষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রধান স্থান অধিকার করে' নিয়েচে;—আত্মীয়তার দিক্ থেকে মুসলমান হিন্দুকে চায় না, তাকে কাফের বলে' ঠেকিয়ে রাখে, আত্মীয়তার দিক্ থেকে হিন্দুও মুসলমানকে চায় না, তাকে ম্লেচ্ছ বলে' ঠেকিয়ে রাখে।

একটা জায়গায় দুই পক্ষ ক্ষণে ক্ষণে মেল্‌বার চেষ্টা করে' সে হচ্চে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে। শিবঠাকুরের ছড়াটা যদি আজ সম্পূর্ণ পাওয়া যেত তা হলে দেখা যেত ঐ যে প্রথমা কন্যাটি রাঁধেন বাড়েন অথচ খেতে পান না, আর সেই যে তৃতীয়া কন্যাটি না খেয়ে বাপের বাড়ি যান, এদের উভয়ের মধ্যে একটা সন্ধি ছিল, সে হচ্চে ঐ মধ্যমা কন্যাটির বিরুদ্ধে। কিন্তু যেদিন মধ্যমা কন্যা বাপের বাড়ি চলে যেত সেদিন অবশিষ্ট দুই সতীন, এই দুই পোলিটিকাল allyদের মধ্যে চুলোচুলি বেধে উঠ্‌ত। পদ্মায় ঝড়ের সময় দেখেচি কাক ফিঙে উভয়েই চরের মাটির উপর চঞ্চু আট্‌কাবার চেষ্টায় একেবারে গায়ে গায়ে হয়ে পাখা ঝট্‌পট্ করেচে। তাদের এই সাযুজ্য দেখে তাড়াতাড়ি মুগ্ধ হবার দরকার নেই। ঝড়ের সময় যতক্ষণ এদের সন্ধি স্থায়ী হয়েচে তার চেয়ে বহুদীর্ঘকাল এরা পরস্পরকে ঠোকর মেরে এসেচে। বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান মেলেনি। কেননা, বাংলার অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গ করার দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব ছিল না। আজ অসহকার আন্দোলনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যোগ দিয়েচে, তার কারণ রুম-সাম্রাজ্যের অখণ্ড অঙ্গকে ব্যঙ্গী-করণের দুঃখটা তাদের কাছে বাস্তব। এমনতর মিলনের উপলক্ষ্যটা কখনই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আমরা সত্যতঃ মিলিনি, আমরা একদল পূর্ব্বমুখ হয়ে, অন্যদল পশ্চিমমুখ হয়ে কিছুক্ষণ পাশাপাশি পাখা ঝাপ্‌টেচি। আজ সেই পাখার ঝাপট বন্ধ হল, এখন উভয় পক্ষের চঞ্চু এক-মাটি কামড়ে না থেকে পরস্পরের অভিমুখে বেগে বিক্ষিপ্ত হচ্চে। রাষ্ট্রনৈতিক অধিনেতারা চিন্তা করচেন আবার কি দিয়ে এদের চঞ্চু দুটোকে ভুলিয়ে রাখা যায়। আসল ভুলটা রয়েচে অস্থিতে মজ্জাতে, তাকে ভোলাবার চেষ্টা করে' ভাঙা যাবে না। কম্বল চাপা দিয়ে যে মনে ভাবে বরফটাকে গরম করে' তোলা গেল সে একদিন দেখ্‌তে পায় তাতে করে' তার শৈত্যটাকে স্থায়ী করা গেছে।

হিন্দুতে মুসলমানে কেবল যে এই ধর্ম্মগত ভেদ তা নয়, তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সামাজিক শক্তির অসমকক্ষতা ঘটেচে। মুসলমানের ধর্ম্মসমাজের চিরাগত নিয়মের জোরেই তার আপনার মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য জমে' উঠেচে আর হিন্দুর ধর্ম্মসমাজের সনাতন অনুশাসনের প্রভাবেই তার আপনার মধ্যে একটা প্রবল অনৈক্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়েচে। এর ফল এই যে, কোনও বিশেষ প্রয়োজন না থাক্‌লেও হিন্দু নিজেকেই মারে, আর প্রয়োজন থাক্‌লেও হিন্দু অন্যকে মার্‌তে পারে না। আর মুসলমান কোনো বিশেষ প্রয়োজন না ঘট্‌লেও নিজেকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে, আর প্রয়োজন ঘট্‌লে অন্যকে বেদম মার দিতে পারে। তার কারণ এ নয় মুসলমানের গায়ে জোর আছে, হিন্দুর নেই; তার আসল কারণ, তাদের সমাজের জোর আছে, হিন্দুর নেই। একদল আভ্যন্তরিক বলে বলী, আর একদল আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতায় নির্জ্জীব। এদের মধ্যে সমকক্ষভাবে আপোষ ঘট্‌বে কি করে'? অত্যন্ত দুর্য্যোগের মুখে ক্ষণকালের জন্যে তা সম্ভব, কিন্তু যেদিন অধিকারের ভাগ-বাটোয়ারার সময় উপস্থিত হয় সেদিন সিংহের ভাগটা বিসদৃশ রকম বড় হয়ে ওঠে, তার কারণটা তার থাবার মধ্যে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে যখন সমস্ত ইংরেজ জাতের মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হয়ে উঠেছিল, তখন আমাদের মত ক্ষীণপ্রাণ জাতকেও তারা আদর করে' সহায়তার জন্যে ডেকেছিল। শুধু তাই নয়, ঘোর বিষয়ী লোকেরও যেমন শ্মশান-বৈরাগ্যে কিছুক্ষণের জন্যে নিষ্কাম বিশ্বপ্রেম জন্মায়, তেমনি যুদ্ধশেষের কয়েক দণ্ড পরেও রক্ত-আহুতি-যজ্ঞে তাদের সহযোগী ভারতীয়দের প্রতি তাদের মনে দাক্ষিণ্যেরও সঞ্চার হয়েছিল। যুদ্ধের ধাক্কাটা এল নরম হয়ে, আর তার পরেই দেখা দিল জালিয়ান-বাগে দানবলীলা, আর তার পরে এল কেনিয়ায় সাম্রাজ্যের সিংহদ্বারে ভারতীয়-দের জন্যে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। রাগ করি বটে, কিন্তু সত্য

সমকক্ষ না হয়ে উঠ্‌লে সমকক্ষের ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মহাত্মাজি খুব একটা ঠেলা দিয়ে প্রজাপক্ষের শক্তিটাকে রাজপক্ষের অনুভবযোগ্য করে' তোল্‌বার চেষ্টা করেচেন। উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তিই তাঁর লক্ষ্য ছিল। এই আপোষ-নিষ্পত্তি সবল-দুর্ব্বলের একান্ত ভেদ থাক্‌লে হতেই পারে না। আমরা যদি ধর্ম্মবলে রাজার সিংহাসনে ভূমিকম্প ঘটাতে পার্‌তুম, তা হলে রাজার বাহুবল একটা ভালো রকম রফা কর্‌বার জন্যে আপনিই আমাদের ডাক পাড়্‌ত। ভারতবর্ষে হিন্দুতে মুসলমানে প্রতিনিয়তই পরস্পর রফা-নিষ্পত্তির কারণ ঘটবে। অসমকক্ষতা থাক্‌লে সে নিষ্পত্তি নিয়তই বিপত্তির আকার ধারণ করবে। ঝরণার জল পানের অধিকার নিয়ে একদা বাঘ ও মেষের মধ্যে একটা আপোষের কন্‌ফারেন্স্‌ বসেছিল। ঈশপের কথামালায় তার ইতিহাস আছে। উপসংহারে প্রবলতর চতুষ্পদটি তর্কের বিষয়টাকে কি রকম অত্যন্ত সরল করে' এনেছিল সে-কথা সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যদি চাই তা হলে হিন্দুমুসলমানে কেবল যে মিলিত হতে হবে তা নয়, সমকক্ষ হতে হবে। সেই সমকক্ষতা তাল-ঠোকা পালোয়ানির ব্যক্তিগত সমকক্ষতা নয়, উভয়-পক্ষের সামাজিক শক্তির সমকক্ষতা।

মালাবারে মোপ্‌লাতে-হিন্দুতে যে কুৎসিত কাণ্ড ঘটেছিল সেটা ঘটেছিল খিলাফৎ-সূত্রে হিন্দুমুসলমানের সন্ধির ভরা জোয়ারের মুখেই। যে দুই পক্ষে বিরোধ তারা সুদীর্ঘকাল থেকেই ধর্ম্মের ব্যবহারকে নিত্য-ধর্ম্ম-নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে' এসেচে। নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম মুসলমানকে ঘৃণা করেচে, মোপ্‌লা-মুসলমানের ধর্ম্ম নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করেচে। আজ এই দুই পক্ষের কন্‌গ্রেস্‌-মঞ্চঘটিত ভ্রাতৃভাবের জীর্ণ মসলার দ্বারা তাড়াতাড়ি অল্প কয়েক দিনের মধ্যে খুব মজ্‌বুৎ করে' পোলিটিকাল সেতু বানাবার চেষ্টা বৃথা। অথচ আমরা বারবারই বলে' আস্‌চি আমাদের সনাতন ধর্ম্ম যেমন আছে তেম্‌নিই থাক, আমরা অবাস্তবকে দিয়েই বাস্তব ফললাভ করব, তার পরে ফললাভ হলে আপনিই সমস্ত গলদ সংশোধন হয়ে যাবে। বাজিমাৎ করে' দিয়ে তার পরে চালের কথা ভাব্‌ব, আগে স্বরাট্‌ হব, তার পরে মানুষ হব।

মালাবার-উৎপাত সম্বন্ধে এই ত গেল প্রথম কথা। তার পরে দ্বিতীয় কথা হচ্চে হিন্দুমুসলমানের অসমকক্ষতা। ডাক্তার মুঞ্জে এই উপদ্রবের বিবরণ আলোচনা করে' দক্ষিণের হিন্দুসমাজগুরু শঙ্করাচার্য্যের কাছে একটি রিপোর্ট্‌ পাঠিয়েচেন; তাতে বলেচেন :—

"The Hindus of Malabar are generally speaking mild and docile, and have come to entertain such a mortal fear of the Moplas that the moment any such trouble arises, the only way of escape the Hindus can think of, is to run for life leaving their children and womenfolk behind, to take care of themselves as best as they could, thinking perhaps honestly that if the Moplas attack them without any previous molestation, God, the Almighty and the Omniscient, is there to teach them a lesson and even to take a revenge on their behalf."

ডাক্তার মুঞ্জের এ-কথাটির মানে হচ্চে এই যে হিন্দু ঐহিককে ঐহিকের নিয়মে ব্যবহার করতে অভ্যেস করে-নি, সে নিত্যে অনিত্যে খিচুড়ি পাকিয়ে বুদ্ধিটাকে দিয়েচে জলে। বুদ্ধির জায়গায় বিধি, এবং আত্মশক্তির জায়গায় ভগবান্‌কে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এরা আত্মাবমাননায় স্বয়ং ভগবানের অবমাননা করে বলে'ই দুঃখ পায়, সে কথা মনের জড়ত্ববশতই বোঝে না।

ডাক্তার মুঞ্জের রিপোর্টের আরেকটা অংশে তিনি বল্‌চেন, আটশো বৎসর আগে মালাবারের হিন্দু রাজা ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদের পরামর্শে তাঁর রাজ্যে আরবদের বাস-স্থাপনের জন্যে বিশেষভাবে সুবিধা করে' দিয়েছিলেন। এমন কি, হিন্দুদের মুসলমান-কর্‌বার কাজে তিনি আরবদের এতদূর প্রশ্রয় দিয়েছিলেন যে তাঁর আইন-মতে প্রত্যেক জেলে-পরিবার থেকে একজন হিন্দুকে মুসলমান হ'তেই হ'ত। এর প্রধান কারণ ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ও তাঁর মন্ত্রীরা সমুদ্র-যাত্রা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলে'ই মেনে নিয়েছিলেন; তাই, মালাবারের সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজ্য রক্ষার ভার সেই-সকল মুসলমানের হাতেই ছিল, সমুদ্রযাত্রার বৈধতা সম্বন্ধে যারা বুদ্ধিকে মান্‌ত, মনুকে মান্‌ত না। বুদ্ধিকে না মেনে অবুদ্ধিকে মানাই যাদের ধর্ম্ম, রাজাসনে বসে'ও

তারা স্বাধীন হয় না। তারা কর্ম্মের মধ্যাহ্নকালকেও সুপ্তির নিশীথ রাত্রি বানিয়ে তোলে। এই জন্যেই তাদের

"ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।"

মালাবারের রাজা একদা নিজে রাজার মুখোস মাত্র পরে' অবুদ্ধিকে রাজাসন ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই অবুদ্ধি মালাবারের হিন্দু-সিংহাসনে এখনো রাজা আছে। তাই হিন্দু এখনো মার খায় আর উপরের দিকে তাকিয়ে বলে ভগবান্ আছেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে আমরা অবুদ্ধিকে রাজা করে' দিয়ে তার কাছে হাত জোড় করে' আছি। সেই অবুদ্ধির রাজত্বকে, সেই বিধাতার বিধি-বিরুদ্ধ ভয়ঙ্কর ফাঁকটাকে কখনো পাঠান কখনো মোগল কখনো ইংরেজ এসে পূর্ণ করে' বস্‌চে। বাইরের থেকে এদের মারটাকেই দেখ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু এরা হল উপলক্ষ্য। এরা এক একটা ঢেলা মাত্র, এরা ভূত নয়।—আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি, সমস্ত তারই কর্ম্ম। তাই ঠিক দুপ্‌প'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা কর্‌চে, কাজ কর্‌চে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর

ঠিক দুপ্‌প'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবাস্তবের সঙ্গে। সেই আমাদের চারিদিকে ভেদ এনেছে, সেই আমাদের কাঁধের উপর পরবশতাকে চ'ড়িয়ে দিয়েচে—সেই আমাদের এতদূর অন্ধ করে' দিয়েচে যে যখন চীৎকার-শব্দে ঢেলাকে গাল পেড়ে গলা ভাঙ্‌চি তখন সেই ভূতটাকে পরমাত্মীয় পরমারাধ্য বলে, তা'কেই আমাদের সমস্ত বাস্তুভিটে দেবত্র করে' ছেড়ে দিয়েছি। ঢেলার দিকে তাকালে আমাদের পরিত্রাণের আশা থাকে না, কেননা জগতে ঢেলা অসংখ্য, ঢেলা পথে ঘাটে, ঢেলা একটা ফুরোলে হাজারটা আসে. কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পার্‌লে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে' থাকে, গায়ে পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই পুরাতন প্রার্থনাকে আজ আবার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে উচ্চারণ করবার সময় এসেছে, শুধু কণ্ঠ দিয়ে নয়, চিন্তা দিয়ে কর্ম্ম দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, পরস্পরের প্রতি ব্যবহার দিয়ে;—"য একঃ অবর্ণঃ" যিনি এক এবং সকল বর্ণভেদের অতীত, "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গেঁয়ো-গীত

(হিন্দুস্থানী)

বাব্‌লা-গাছের আড়াল দিয়ে উঠ্‌ল চাঁদা রে,
ওই আলোর ঝালর ঝুলিয়ে দিল ডাইনে বাঁ ধারে;
সই লো সই কোথায় গেলি তুই!—
হলুদ্-বরণ চাঁদার রং,
মরি কিবা রূপের ঢং,
স্বরগ-পুরে ফুট্‌ল যেন সোনার গাঁদা রে,
তার আলোর-পরাগ ঝর্‌ঝর্ ঐ ঝর্‌ছে আঁধারে;
সই লো সই কোথায় গেলি তুই!—
ঝুরুঝুরু পুবের বায়
শালের বনে কি গান গায়।

ঝিল্লীগুলো তান ধরেছে আঁদাড়্-পাদাড়ে,—
অশথ্-গাছে থাম্‌ল এবার পেঁচার কাঁদা রে;
সই লো সই কোথায় গেলি তুই!—
কেটে গেল বাদল আজ,
উজল হ'ল আঁধার সাঁঝ,
ডিমি ডিমি মাদল বাজায় দাওয়ায় দাদা রে,—
ওই বাব্‌লা-গাছের আড়াল দিয়ে উঠ্‌ল চাঁদা রে।
সই লো সই কোথায় গেলি তুই!—

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

সমাধান

আজকাল আমরা এই একটা বুলি ধরেচি, ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন শিক্ষাদীক্ষা সব ফেলে রেখে সর্ব্বাগ্রে আগুন নেবাতে কোমর বেঁধে দাঁড়ানো চাই; অতএব সকলকেই চর্‌কায় সুতো কাট্‌তে হবে। আগুন লাগ্‌লে আগুন নেবানো চাই এ-কথাটা আমার মত মানুষের কাছেও দুর্ব্বোধ নয়। এর মধ্যে দুরূহ ব্যাপার হচ্চে, কোন্‌টা আগুন সেইটে স্থির করা; তা হলেই সিদ্ধান্ত করা সহজ হবে কোন্‌টা জল। ছাইটাকেই আমরা যদি আগুন বলি তা হলে ত্রিশকোটি ভাঙাকুলো লাগিয়েও সে আগুন নেবাতে পার্‌ব না। নিজের চর্‌কার সুতো, নিজের তাঁতের কাপড় আমরা যে ব্যবহার কর্‌তে পার্‌চিনে সেটা আগুন নয়, সেটা ছাইয়ের একটা অংশ অর্থাৎ আগুনের চরম ফল নিজের তাঁত চালাতে থাক্‌লেও এ আগুন জল্‌তে থাক্‌বে। বিদেশী আমাদের রাজা এটাও আগুন নয়, এটা ছাই; বিদেশীকে বিদায় কর্‌লেও আগুন জল্‌বে—এমন কি স্বদেশী রাজা হলেও দুঃখদহনের নিবৃত্তি হবে না। এমন নয় যে, হঠাৎ আগুন লেগেচে, হঠাৎ নিবিয়ে ফেল্‌ব। হাজার বছরের উর্দ্ধকাল যে আগুন দেশটাকে হাড়ে মাসে জ্বালাচ্ছে, আজ স্বহস্তে সুতো কেটে কাপড় বুন্‌লেই সে আগুন দু'দিনে বশ মান্‌বে এ-কথা মেনে নিতে পারিনে। আজ দুশো-বছর আগে চর্‌কা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয়নি, সেইসঙ্গে আগুনও দাউ-দাউ করে' জল্‌ছিল। সেই আগুনের জ্বালানি-কাঠটা হচ্চে ধর্ম্মে কর্ম্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।

যেখানে বর্ব্বর অবস্থায় মানুষ ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকে, সেখানে বনে জঙ্গলে ফল মূল খেয়ে চলে; কিন্তু যেখানে বহুলোকের সমাবেশে সভ্যতার বিচিত্র উদ্যম প্রকাশ পেতে চায়, সেখানে ব্যাপক ক্ষেত্র জুড়ে বেশ ভালরকম করে' চাষ করা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। সকল বড় সভ্যতারই অন্নরূপের আশ্রয় হচ্চে কৃষিক্ষেত্র। কিন্তু সভ্যতার একটা বুদ্ধিরূপ আছে, সে ত অন্নের চেয়ে বড় বই ছোট নয়। ব্যাপকভাবে সর্ব্বসাধারণের মনের ক্ষেত্র কর্ষণ করে' সমস্যার দিকে কেউ যদি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে, অম্‌নি দেশের কৃতী অকৃতী সকলে সেই ব্যক্তিকেই সমাধানের জন্য দায়িক করে' জবাব চেয়ে বসে। তারা বলে—আমরা ত একটা তবু যাহোক কিছু সমাধানে লেগেচি, তুমিও এম্‌নি একটা সমাধান খাড়া কর, দেখা যাক্ তোমারি বা কত বড় যোগ্যতা!

আমি জানি, কোনও ঔষধ-সত্রে এক বিলাতী ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাছে এক বৃদ্ধ এসে করুণস্বরে যেম্‌নি বলেচে, "জ্বর", অম্‌নি তিনি ব্যস্ত হয়ে তখনি তাকে একটা অত্যন্ত তিতো জ্বরঘ্নরস গিলিয়ে দিলেন—সে লোকটা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু আপত্তি কর্‌বার সময় মাত্র পেল না। সেই সঙ্কটের সময়ে আমি যদি ডাক্তারকে বাধা দিয়ে বল্‌তুম, জ্বর ওর নয়, জ্বর ওর মেয়ের—তা হলে কি ডাক্তার রেগে আমাকে বল্‌তে পার্‌তেন যে, 'তবে তুমিই চিকিৎসা কর না; আমি ত তবু যা হয় একটা কোনো ওষুধ যাকে হয় একজনকে খাইয়েচি, তুমি ত কেবল ফাঁকা সমালোচনাই কর্‌লে!" আমার এইটুকু মাত্র বল্‌বার কথা যে, "আসল সমস্যাটা হচ্চে, বাপের জ্বর নয় মেয়ের জ্বর, অতএব বাপকে ওষুধ খাওয়ালে এ সমস্যার সমাধান হবে না।"

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সুবিধার কথাটা এই যে, আমি যেটাকে সমস্যা বলে' নির্ণয় কর্‌চি, সে আপন সমাধানের ইঙ্গিত আপনিই প্রকাশ কর্‌চে।—অবুদ্ধির প্রভাবে আমাদের মন দুর্ব্বল, অবুদ্ধির প্রভাবে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন; শুধু বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধ; অবুদ্ধির প্রভাবে বাস্তব জগৎকে বাস্তবভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারিনে বলে'ই জীবনযাত্রায় আমরা প্রতিনিয়ত পরাহত; অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পর-বশতার পাথর চাপিয়ে বসেচি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা তখন এর সমাধান 'শিক্ষা' ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

বিচিত্র ও বিস্তীর্ণভাবে বুদ্ধিকে ফলিয়ে তুল্‌তে পারলে তবেই সে সভ্যতা মনস্বী হয়। কিন্তু যেখানে অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আবিষ্ট হয়ে অন্ধসংস্কারের নানা বিভীষিকায় সর্ব্বদা ত্রস্ত হয়ে গুরু-পুরোহিত-গণৎকারের দরজায় সর্ব্বদা ছুটোছুটি করে' মর্‌চে সেখানে এমন কোনো সর্ব্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবস্থাতন্ত্র ঘট্‌তেই পারে না যার সাহায্যে অধিকাংশ মানুষ নিজের অধিকাংশ ন্যায্য অধিকার পেতে পারে। আজকালকার দিনে আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলি যার ভিতর দিয়ে সর্ব্বজনের স্বাধীন বুদ্ধি স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ কর্‌বার উপায় পায়। কোনো দেশেই আজপর্য্যন্ত তার সম্পূর্ণ আদর্শ দেখিনি। কিন্তু আধুনিক য়ুরোপে আমেরিকায় এই আদর্শের অভিমুখে প্রয়াস দেখ্‌তে পাই। এই প্রয়াস কখন্‌ থেকে পাশ্চাত্য দেশে বললাভ করেচে? যখন থেকে সেখানে জ্ঞান- ও শক্তি-সাধনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বহুলপরিমাণে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েচে। যখন থেকে সংসারযাত্রার ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বুদ্ধিকে স্বীকার কর্‌তে সাহস করেচে তখন থেকেই জনসাধারণ রাজা গুরু জড়প্রথা ও অন্ধসংস্কারগত শাস্ত্রবিধির বিষম চাপ কাটিয়ে উঠে' মুক্তির সর্ব্বপ্রকার বাধা আপন বুদ্ধির যোগে দূর কর্‌তে চেষ্টা করেচে। অন্ধ বাধ্যতা দ্বারা চালিত হবার চিরাভ্যাস নিয়ে মুক্তির বিপুল দায়িত্ব কোনো জাতি কখনো ভাল করে' বুঝ্‌তেই পার্‌বে না, বহন করা ত দূরের কথা। হঠাৎ এক সময়ে যাঁকে তারা অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন বলে' বিশ্বাস করে তাঁর বাণীকে দৈববাণী বলে' জেনে তারা ক্ষণকালের জন্যে একটা দুঃসাধ্য সাধনও করতে পারে, অর্থাৎ যে আত্মশক্তি তাদের নিজের মধ্যে থাকা উচিত ছিল সেইটাকে বাইরে কোথাও খাড়া করে' কোনো এক সময়ে কোনো একটা কাজ তারা মরীয়া হয়ে চালিয়ে নিতে পারে। নিত্য ব্যবহারের জন্যে যে আগুন জ্বালাবার কাজটা তাদের নিজের বুদ্ধির হাতেই থাকা উচিত ছিল কোনো একদিন সেই কাজটা কোনও অগ্নিগিরির আকস্মিক উচ্ছ্বাসের সহায়তায় তারা সাধন করে' নিতে পারে। কিন্তু ক্বচিৎ-বিস্ফুরিত অগ্নিগিরির উপরেই যাদের ঘরের আলো জ্বালাবার ভার, নিজেদের বুদ্ধিশক্তির উপর নয়, মুক্তির নিত্যোৎসবে তাদের প্রদীপ জ্বল্‌বে না এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। অতএব যে শিক্ষার চর্চ্চায় তারা আগুন নিজে জ্বালাতে পারে, নিজে জ্বালানো অসাধ্য নয় এই ভরসা লাভ কর্‌তে পারে, সেই শিক্ষা পাওয়াই ঘরের অন্ধকার দূর হওয়ার একমাত্র সদুপায়।

এমন লোককে জানা আছে, যে মানুষ জন্ম-বেকার, মজ্জাগত অবসাদে কাজে তার গা লাগে না। পৈতৃক সম্পত্তি তার পক্ষে পরম বিপত্তি, তাও প্রায় উজাড় হয়ে এল। অর্থ না হলে তার চলে না, কিন্তু উপার্জ্জনের দ্বারা অর্থসঞ্চয়ের পথ এত দীর্ঘ, এত বন্ধুর, যে, সে-পথের সাম্‌নে বসে' বসে' পথটাকে হ্রস্ব কর্‌বার দৈব উপায় চিন্তায় আধ বোজা চোখে সে সর্ব্বদা নিযুক্ত, তাতে কেবল তার চিন্তাই বেড়ে চলেছে, পথ কম্‌চে না। এমন সময় সন্ন্যাসী এসে বল্‌লে, তিনমাসের মধ্যেই সহজ উপায়ে তোমাকে লক্ষপতি করে' দিতে পারি। এক মুহূর্ত্তে তার জড়তা ছুটে' গেল। সেই তিনটে মাস সন্ন্যাসীর কথামত সে দুঃসাধ্য সাধন কর্‌তে লাগ্‌ল। এই জড়পদার্থের মধ্যে সহসা এতটা প্রচুর উদ্যম দেখে সকলেই সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তিতে বিস্মিত হয়ে গেল। কেউ বুঝ্‌লে না, এটা সন্ন্যাসীর শক্তির লক্ষণ নয়, ঐ মানুষটারই অশক্তির লক্ষণ। আত্মশক্তির পথে চল্‌তে যে বুদ্ধি যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, যে মানুষের তা নেই, তাকে অলৌকিক-শক্তি-পথের আভাস দেবামাত্রই সে তার জড়শয্যা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। তা না হলে আমাদের দেশে এত তাগা-তাবিজ বিক্রি হবে কেন? যারা রোগ তাপ বিপদ্ আপদ্ থেকে রক্ষা পাবার বুদ্ধিসঙ্গত উপায়ের পরে মানসিক জড়ত্ব-বশত আস্থা রাখে না, তাগা-তাবিজে স্বস্ত্যয়নে তন্ত্রে মন্ত্রে মানতে তারা প্রভূত ত্যাগ এবং অজস্র সময় ও চেষ্টা ব্যয় কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না। একথা ভুলে যায় যে, এই তাগা-তাবিজ-গ্রস্তদেরই রোগ তাপ বিপদ্ আপদের অবসান দেবতা বা অপদেবতা কারো কৃপাতেই ঘটে না, এই তাগা-তাবিজ-গ্রস্তদেরই ঘরে অকল্যাণের উৎস শত-ধারায় চিরদিন উৎসারিত।

যে-দেশে বসন্ত-রোগের কারণটা লোকে বুদ্ধির দ্বারা

জেনেচে এবং সে কারণটা বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করেচে, সে-দেশে বসন্ত মারীরূপ ত্যাগ করে' দৌড় মেরেচে। আর যে-দেশের মানুষ মা-শীতলাকে বসন্তের কারণ বলে' চোখ বুজে ঠিক করে' বসে' থাকে, সে দেশে মা-শীতলাও থেকে যান, বসন্তও যাবার নাম করে না। সেখানে মা-শীতলা হচ্চেন মানসিক পরবশতার একটি প্রতীক, বুদ্ধির স্বরাজ-চ্যুতির লক্ষণ।

আমার কথার একটা মস্ত জবাব আছে। সে হচ্চে এই যে, দেশের একদল লোক ত বিদ্যাশিক্ষা করেচে। তারা ত পরীক্ষা পাস করবার বেলায় জাগতিক নিয়মের নিত্যতা অমোঘতা সম্বন্ধে ব্যাকরণ বিশুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় সাক্ষ্য দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের দেশে এই ডিগ্রিধারীদেরই ব্যবহারে কি আত্মবুদ্ধির পরে, বিশ্ব-বিধির পরে, বিশ্বাস সপ্রমাণ হচ্চে? তারাও কি বুদ্ধির অন্ধতায় সংসারে সকলরকমেরই দৈন্য বিস্তার করে না?

স্বীকার করতেই হয়, তাদের অনেকের মধ্যেই বুদ্ধি-মুক্তির জোর বড় বেশি দেখতে পাইনে; তারাও উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা'-তা' মেনে নিতে প্রস্তুত; অন্ধভক্তিতে অদ্ভুত পথে অকস্মাৎ চালিত হতে তারা উন্মুখ হয়ে আছে; আধিভৌতিক ব্যাপারের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করতে তাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই; তারাও নিজের বুদ্ধি-বিচারের দায়িত্ব পরের হাতে সমর্পণ করতে লজ্জা বোধ করে না, আরাম বোধ করে।

তার একটা প্রধান কারণ এই যে, মূঢ়তার বিপুল ভারাকর্ষণ জিনিষটা ভয়ঙ্কর প্রবল। নিজের সতর্ক বুদ্ধিকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখতে সচেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হয়। যে-সমাজ দৈব গুরু ও অপ্রাকৃত প্রভাবের পরে আস্থাবান্ নয়, যে সমাজ বুদ্ধিকে বিশ্বাস করতে শিখেচে, সে সমাজে পরস্পরের উৎসাহে ও সহায়তায় মানুষের মনের শক্তি সহজেই নিরলস থাকে। আমাদের দেশে শিক্ষা-প্রণালীর দোষে একে ত শিক্ষা অগভীর হয়, তার উপরে সেই শিক্ষার ব্যাপ্তি নিরতিশয় সঙ্কীর্ণ। এইজন্যে সর্ব্বজনের সম্মিলিত মনের শক্তি আমাদের মনকে অগ্রসরতার দিকে, আত্মশক্তির দিকে উন্মুখ করে' রাখতে পারে না। সে সহজেই অলস হয়ে পড়ে এবং প্রচলিত বিশ্বাস ও চিরাগত প্রথার হাতে গা ঢেলে দিয়ে ছুটি পায়। তার পরে অশিক্ষিতদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ ঘটে এই যে, তারা আপন অন্ধবিশ্বাসে বিনাদ্বিধায় সহজ ঘুম ঘুমোয়, আমরা নিজেকে ভুলিয়ে আফিংয়ের ঘুম ঘুমোই; আমরা কুতর্ক করে' লজ্জা নিবারণ করতে চেষ্টা করি, জড়তা বা ভীরুত্ববশত যে কাজ করি তার একটা সুনিপুণ বা অনিপুণ ব্যাখ্যা বানিয়ে দিয়ে সেটাকে গর্ব্বের বিষয় করে' দাঁড় করাতে চাই। কিন্তু ওকালতির জোরে দুর্গতিকে চাপা দেওয়া যায় না।

দেশকে মুক্তি দিতে গেলে দেশকে শিক্ষা দিতে হবে এ কথাটা হঠাৎ এত অতিরিক্ত মস্ত বলে' ঠেকে যে এ'কে আমাদের সমস্যার সমাধান বলে' মেনে নিতে মন রাজি হয় না। এইখানে গীতার উপদেশ আমাদের মনে করিয়ে দিতে হয় যে, কাজেরই অধিকার আমাদের, ফলের অধিকার নয়। আশুফলের প্রতি অতিশয় লোভ করে'ই আমরা জাদুকরের শরণাপন্ন হই; ফলের বদলে ফলের মরীচিকা দেখে নৃত্য করতে থাকি। তাতে সময়ও নষ্ট হয়, বুদ্ধিও নষ্ট হয়, ফলও নষ্ট হয়। তাতে বর্ত্তমানকে ভোলাতে গিয়ে ভবিষ্যৎকে মাটি করি।

দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড় অথচ তার উপায়টা খুব ছোট হবে একথা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির পরে বিশ্বাস; বাস্তবের পরে নয়, নিজের শক্তির পরে নয়।

সৌভাগ্যক্রমে অনেককাল পরে একটা সদ্দৃষ্টান্ত আমাদের হাতের কাছে এসেচে। সেটা সম্বন্ধে আলোচনা করলে আমার কথাটা পরিষ্কার হবে।—বাংলা দেশ ম্যালেরিয়ায় মরচে। সে মার কেবল দেহের মার নয়, এই রোগে সমস্ত দেশটাকে মন-মরা করে' দিয়েচে। আমাদের মানসিক অবসাদ, চারিত্রিক দৈন্য, অধ্যবসায়ের অভাব এই রোগজীর্ণতার ফল। ম্যালেরিয়া থেকে যদি আমরা উদ্ধার পাই তা হলে কেবল যে আমরা সংখ্যা হিসাবে বাড়ব তা নয়, শক্তি হিসাবে বেড়ে উঠব। তখন কেবল যে দুইজনের কাজ একজনে করতে পারব তাও নয়, এমনপ্রকৃতির কাজ এমন-ধরণে করতে পারব যা এখন পারিনে। অর্থাৎ, কেবল যে কাজের পরিমাণ বাড়বে

তা নয়, কাজের উৎকর্ষ বাড়্‌বে। তাতে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে। এ-কথা সকলেই জানি, সকলেই মানি,—কিন্তু সেইসঙ্গে এতকাল এই কথাই মনে লেগে রয়েচে যে, বাংলা দেশ থেকে ম্যালেরিয়া দূর করে' দেওয়া বা এই রোগের হ্রাস করা অসম্ভব। বাংলা দেশ ক্রমে ক্রমে নির্মানুষ হতে পারে, কিন্তু নির্মশক হবে কি করে'? অতএব অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে।

এমন সময়ে একজন সাহসিক বলে' উঠ্‌লেন দেশ থেকে মশা তাড়াবার ভার আমি নিলুম। এত বড় কথা বল্‌বার ভরসাকেই ত আমি যথেষ্ট মনে করি। এই গুরুমানা অবতারমানা দেশে এতবড় বুকের পাটা ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়না। এক-একটি গ্রাম নিয়ে তিনি কাজ আরম্ভ করেচেন। একটি গ্রামেও যদি তিনি ফল পান তা হলে সমস্ত দেশব্যাপী ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করা হবে।

এইটুকুমাত্র কাজই তাঁর যথার্থ কাজ, মহৎ কাজ। কোনো একটিমাত্র জায়গায় যদি তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন যে বিশেষ উপায়ে রোগের বাহনকে দূর করে' দেওয়া যেতে পারে তা হলেই হ'ল।

স্বহস্তে তিনি নিজের চেষ্টায় সমস্ত অলস দেশকে নীরোগ করে' দেবেন এটা কল্যাণকর নয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি যেটা প্রমাণ করবেন সেইটেকে দেশ স্বয়ং গ্রহণ করলে তবেই সে উপস্থিত বিপদ্ থেকে রক্ষা পাবে এবং ভাবী বিপদের বিরুদ্ধে চিরকালের মত প্রস্তুত হবে। নইলে বারে বারে নূতন নূতন ডাক্তার গোপাল চাটুজ্জের জন্যে তাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে' থাকতে হবে, আর ইতিমধ্যে তার পীলে-যকৃতের সাংঘাতিক উন্নতিসাধনে সে পৃথিবীর সকল দেশকে ছাড়িয়ে যাবে।

ম্যালেরিয়া যেমন শরীরের, অবুদ্ধি তেমনি মনের একটা বিষম ব্যাধি। এ'তে মানুষের মূল্য কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ গুণ্‌তি হিসাবে তার পরিমাণ বাড়্‌লেও গুণের হিসাবে অত্যন্ত কমে' যায়। স্বরাজ বল, সভ্যতা বল, মানুষের যা-কিছু মূল্যবান্ ঐশ্বর্য্য সমস্তই এই গুণের হিসেবের উপরেই নির্ভর করে। বালুর পরিমাণ যতই বেশি হোক্ না কেন, তাতে মাটির গুণ নেই বলে'ই ফসল ফলাতে পারে না। ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি মানুষের মন পরিমাণ-হিসাবে প্রভূত, কিন্তু যোগ্যতা হিসাবে কতই স্বল্প। এই অযোগ্যতার, এই অবুদ্ধির, জগদ্দল পাথরটাকে ভারতবর্ষের মনের উপর থেকে ঠেলে না ফেল্‌লে বিধাতা আমাদের কোনো বর দিলেও তা সফল হবে না এ যদি সত্য হয় তবে আমাদের কোমর বেঁধে বল্‌তেই হবে এই আমাদের কাজ। এ-কাজ প্রত্যেক কর্ম্মীকে তাঁর হাতের কাছ থেকেই সুরু করতে হবে। যেখানেই যতটুকুই সফলতা লাভ করবেন সেই সফলতা সমস্ত দেশের। আয়তন থেকে যাঁরা সফলতার বিচার করেন তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন, সত্যতা থেকে যাঁরা বিচার করেন তাঁরা জানেন যে, সত্য বামনরূপে এসে বলির কাছ থেকে ত্রিভুবন অধিকার করে' নিতে পারেন।

আজকের দিনে জার্ম্মানির কতখানি দুর্গতি হয়েচে, সকল দিক্ থেকে সে কত দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে, তা সকলেরই জানা আছে। এই জার্ম্মানিতে এই দুঃখের দিনে, যখন তার সত্যই ঘরে আগুন লেগেচে, তখন জার্ম্মানি আগুন নেবাবার নানা উপায়ের মধ্যে কোন্ একটা বিশেষ উপায়কে প্রাধান্য দিয়েচে সে কথা আমাদেরও আলোচনার যোগ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবার জন্য যে প্রচেষ্টা আজ সেখানে প্রবর্ত্তিত হয়েচে সে সম্বন্ধে একটি চটি বই বেরিয়েচে। তার নাম, Newer Adult Education in Germany. তার থেকে কয়েকটি লাইন এখানে তুলে' দিই—

There are two forms of ruin—the sudden calamity of an earthquake and the slow, certain, steady advance of general decay that nothing seems able to impede. This latter is now the fate of Germany. A small percentage of the population may still make a display of wealth; but the structure of the country, its general welfare, its healthiness and growth are irretrievably stunted. The people face this. They know that for them there is no hope left, unless they have sufficient courage and vitality to build up with their own hands. The youth of Germany knows that it has no future unless it can build up one, and it is certain that this building will be of far-reaching influence in the entire structure of European civilisation. Adult education going to be one of the pillars of this structure.

এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কয়েকটি ভাব্‌বার কথা আছে

প্রথম হচ্চে, জার্ম্মানির অবস্থা নিতান্তই নৈরাশ্যজনক। কিন্তু তবুও সেখানকার লোকে সেটাকে চরম বলে' মেনে নিয়ে ভাগ্যের নিন্দা করুচে না, তার কারণ, তারা সত্যের বর পাবার জন্যে বরাবর বাস্তব পথ অবলম্বন করুতে অভ্যস্ত। তারা বুদ্ধিকে মানে বলে'ই নিজেকে মানে। দ্বিতীয় কথা হচ্চে, এরা এ-কথা নিঃসন্দেহ জানে যে ভাবী কালের জন্যে যখন উন্নতির নূতন ভিৎ বসাতে হবে তখন সেটা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর। এই উন্নতির দ্বারা তারা যে নিজের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বড় হবে তা নয়, সমগ্র য়ুরোপের সভ্যতার সঙ্গে আপন প্রভাবের দ্বারা সম্মিলিত হবে। তৃতীয় কথা হচ্চে এই, অবস্থা যতই শোচনীয় হোক, ব্যাপারটা যতই দুঃসাধ্য হোক, তবু এটা করাই চাই।

এ-কথা বলা বাহুল্য, প্রধানতঃ মানুষ শিক্ষার দ্বারাই তৈরি হয়,—"মানুষ করে' তোলা" কথাটার মধ্যে এই অর্থ আছে; প্রকৃতির ক্রিয়া জন্তুকে জন্তু করে, মানুষের শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে' তোলে। আজকের দিনে যে মানসিক অবস্থায় আমরা এসে পৌচেছি,—সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, সে অবস্থা আমাদের পূর্ব্বকালীন শিক্ষার দ্বারাই ঘটেচে। এই অবস্থা পাকা করুবার জন্যে কত শাস্ত্র কত উপদেশ কত ব্যবস্থা আছে তার সীমা নেই। যে বর্ত্তমান অবস্থা এই শিক্ষার ফল, সেটা হচ্চে ভিতর দিক্ থেকে মনের স্বাতন্ত্র্যহীনতার অবস্থা। এই অবস্থা কোনোমতেই বাইরের দিকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অনুকূল হতেই পারে না। অতএব যদি স্বরাজকে প্রার্থনীয় বলে'ই মনে করি তা হলে আগেকার শিক্ষাকে অতিক্রম করে' এমন কোনোরকম শিক্ষা দেশে চালাতে হবে যাতে দেশের লোকের মন বুদ্ধিবৃত্তির স্বরাজের প্রতি আস্থাবান্ হতে পারে। যে শিক্ষায় আমাদের বর্ত্তমানটা গড়ে' উঠেচে, সেই শিক্ষাতেই যদি আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে' ওঠে, তা হলে সে আমাদের এই বর্ত্তমানেরই পুনরাবৃত্তি হবে।

আজ জার্ম্মানি একথা চিন্তা করুতে প্রবৃত্ত হয়েচে যে, তার পূর্ব্বতন শিক্ষাবিধির মধ্যে একটা দোষ ছিল।

"Germans feel that the well-oiled and smoothly running machine-like system of pre-war days was a system that was losing its substance, producing a mechanical form of culture—a culture that was lacking in essentials, a culture that seemed to turn out human beings with most extraordinarily cultivated brains but somehow out of touch with the human heart—science as apart from life, art, craft, learning, recreation, all in separate compartments, and disharmony as a summary of all."

সার্ব্বভৌম শিক্ষার সমগ্রতার দ্বারাই জার্ম্মানির অধিবাসী মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করুবে এই চিন্তা সে দেশে আগুন লাগার রূপকের জোরে উপেক্ষিত হয়নি। অথচ সেখানে অন্নাভাব বস্ত্রাভাব আমাদের দেশের চেয়েও প্রবলতর। আগে সুতো কাটুব, কাপড় বুনুব, খাব, এবং তদ্দ্বারায় স্বরাজ পাব, তার পরে উপযুক্ত অবকাশ নিয়ে মনের দিক্ থেকে মানুষ হব এ-কথা মানুষের কথাই নয়। প্রাণের যেমন একটা সমগ্রতা আছে, তা ইঁট সাজিয়ে ক্রমে ক্রমে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' গড়া নয়, মনুষ্যত্বেরও তেমনি সমগ্রতা আছে। তার দেহ পরুবে বস্ত্র, আর তার মন থাকুবে উলঙ্গ, এ সয় না—কোনো প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে তার পূর্ণতাকে কিছুকাল ধরে'ও খণ্ডিত করুলে সে ক্ষতি হয়ত কোনোকালে আর পূরণ হবে না। যদি বলি যতদিন স্বরাজ না পাব ততদিন্ দেশে শিল্পকার্য্যকে প্রশ্রয় দেব না, কেন না, শিল্পকার্য্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় নয়, তা সৌখীন, তা' হলে স্বরাজ কবে পাব জানিনে, কিন্তু যে শিল্প শত শত বৎসরের সাধনায় প্রাণলাভ করেচে, স্বল্পকালের অনাদরে চিরদিনের জন্যে তা লুপ্ত হতে পারে। দেশে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা বলুবেন না হয় তাই হ'ল। আমি এই বলি, মানুষকে একদিকে অসম্পূর্ণ করে' আর একদিকে তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ হচ্চে কলসীর একদিক্ থেকে ছিদ্র করে' আর একদিক্ থেকে তা'তে জল ঢালা। মানুষ আপন সম্পূর্ণতা প্রকাশ করুবার অবসর পাবে এইজন্যই মানুষের স্বাধীনতা। স্পার্টা আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে' বাহুবলের সাধনা করেছিল, তাতে কোনো ফল পায়নি; এথেন্স্ তার কোনো একটা বিশেষ শক্তিকে সঙ্কীর্ণ করুতে চায়নি, মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীনতাকে চেয়েছিল, এইজন্যে সকল

শক্তির সঙ্গে যোগেই সে বাহুবলকে পেয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, মনুষ্যত্বের প্রাণময় অখণ্ডতাই মানুষের পরম সত্য, কোন আশু প্রয়োজনের লোভে তাকে খণ্ডিত করলে সমস্তটাকেই ক্লিষ্ট করা হয়।

সেই চটি বই থেকে আর-একটি অংশ উদ্ধৃত করে' আমার এই লেখা শেষ করি।

"Everywhere, certainly, there is goodwill and courage in the face of insuperable difficulty. Those who have not experienced it, cannot realise what it means to be under-fed, under-paid, over-worked, and yet to go on unswervingly with the work of the education of the people. Through the straining of every nerve many thousand marks may be collected for this purpose, while the sum dwindles as it is held in the hand to mere nothingness through the uncontrollable depreciation of the currency.

"This material side of the question cannot be overlooked, as the instability of conditions ruins all effort. A thousand marks today are a hundred in a couple of days time, and the educator of the people of one week may be working in a factory the next in order to provide for his wife and his child as well as for his own livelihood. If the State were to appoint adult teachers as it does school teachers, salaries would rise to meet the depreciation, but the State stringently refuses to swell the budget by financing any new educational enterprise, and leaves the adult educational movement to struggle on almost unaided. It is exraordinary enough that ways and means can be found to continue at all, and this obviously is due solely to the keenness and self-sacrificing devotion of those working in the cause of bringing education within reach of the people. It will take many years before Germany sees clearly where the moulding of her efforts in adult education has led to, but what can be more absorbing and instructive than to study its growth?"

এই দুটি প্যারাগ্রাফ থেকে আমাদের শিক্ষার ও চিন্তার বিষয় যেটুকু আছে সে হচ্ছে এই যে, কাজের বাধা অতি কঠিন, কাজের ফল অতি নিকট নয়, অথচ কাজের অধ্যবসায় দুর্দ্দমনীয়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উইলিয়াম্ পিয়ার্সন্

ভারতবর্ষে ফিরিবার ঠিক পূর্ব্বে ইটালীতে ভ্রমণকালে শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পিয়াস ন্ মহাশয়ের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তাঁহার নাম জনসাধারণের নিকট বিস্তৃতভাবে পরিচিত না হইতে পারে, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস যে তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা শুধু তাঁহার আত্মীয় এবং বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। বিশ্বমানবের প্রতি ভালবাসা তাঁহার কাছে যেরূপ সত্যকার সামগ্রী ছিল, সেবার আদর্শকে তিনি তাঁহার স্বভাবের সহিত যেরূপ পূর্ণভাবে মিলাইতে পারিয়াছিলেন, খুব কম লোকেরই ভিতর আমরা তাহা দেখিয়াছি। যে-সকল অজ্ঞাত অখ্যাতনামা লোকের মধ্যে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতও কোনো বিশেষত্ব ছিল না, সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি তাহাদের নিজের সখ্য দান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন, এবং এই দানের মধ্যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অহঙ্কার রিপুর সংকর্ষ-সাধনজনিত আত্মতৃপ্তিগত ভাববিলাসের কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত লোককে তিনি নিত্যনিয়ত যে-সাহায্য করিতেন তাহার জন্য তাঁহার সর্ব্বসাধারণের প্রশংসা দ্বারা পুরস্কৃত হইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহার কাছে নিজের দৈনিককৃত্যের মতই তাহা নিতান্ত সহজ এবং প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার দেশপ্রেম ছিল সর্ব্বমানবের দেশের প্রতি, পৃথিবীর যে-কোনো দেশের লোকের উপর কিছুমাত্র অবিচার বা নিষ্ঠুর আচরণ ঘটিলে তিনি অন্তরের সহিত বেদনা অনুভব করিতেন, এবং মহৎভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য তিনি নির্ভীক-চিত্তে আপন দেশবাসীর নিকট শাস্তি বরণ করিয়া লইয়াছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তিনি আপন আবাসভূমি বলিয়া জানিয়াছিলেন, তিনি অনুভব করিয়াছিলেন যে এইখানেই তিনি তাঁহার বিশ্বমানবের প্রতি সেবার আদর্শকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এবং যে-



উইলিয়াম্ পিয়ার্সন্ ও রবীন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন আশ্রমে

ভারতের কল্যাণের সহিত তাঁহার জীবনের সকল আশা জড়িত ছিল, তাহার প্রতিও নিজের সুগভীর ভালবাসা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন।

আমি জানি এদেশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁহারা তাঁহার মহৎ নিঃস্বার্থ হৃদয়ের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করেন, এবং তাঁহার এমন অনেক বন্ধু আছেন যাঁহারা তাহার মৃত্যুসংবাদে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমার মনে দৃঢ় ধারণা যে তাঁহার এই প্রিয় আশ্রমে তাঁহার নামে একটি স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছাকে সকলেই অনুমোদন করিবেন। আমাদের আশ্রম-সংক্রান্ত হাঁসপাতালটি যাহাতে নূতন করিয়া তৈরী হয়, এবং যথাবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের পর উত্তমরূপে চালিত হয়, ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, এবং বরাবরই তিনি এইজন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং যথাসম্ভব অর্থদান করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আমরা যদি তাঁহার এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, এবং ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্রবিভাগের ব্যবস্থা রাখিয়া একটি ভালরকম হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে তাঁহার স্মৃতিকে যথার্থ সম্মান করা হইবে, এবং মানবের দুঃখকষ্টে তিনি যে সমবেদনা অনুভব করিতেন তাহার আদর্শ এই হাঁসপাতাল আমাদের সর্ব্বদা মনে করাইয়া দিবে। এই অভিপ্রায়ে আমরা তাঁহার বন্ধুবান্ধব এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন এমন সব লোকের নিকট আজ উপস্থিত হইতেছি, এবং আশা করিতেছি যে এ বিষয়ে সকলেই আমাদের মুক্তহস্তে দান করিয়া সাহায্য করিবেন।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



[illegible]

[illegible]

রাজপথ

[১৪]

সুমিত্রার জন্মদিনোৎসবের ঘটনার পর মাস দুই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সুরেশ্বর বিমান ও সুমিত্রা কয়েকবার মিলিত হইয়াছে এবং তদবসরে তিন জনের ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের সম্পর্কে প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। একত্র হইলেই একটা কোনও প্রসঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া তিন জনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হয়, এবং মনের গভীরতলনিহিত বিরোধ ভাষার মধ্যে আলোড়িত হইয়া ভাসিয়া উঠে এবং প্রকাশ পায়।

এই বিরোধটা প্রকাশ পাইত বিমান এবং সুরেশ্বরের মধ্যে সর্ব্বদা, সুরেশ্বর ও সুমিত্রার মধ্যে সময় সময়, এবং বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে কদাচিৎ। বিমানবিহারী সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বতোভাবে সুমিত্রার সহিত ঐক্য রাখিয়া চলিত। সুরেশ্বর এবং সুমিত্রার মধ্যে প্রায়ই তর্ক এবং দ্বন্দ্ব ঘটিত বলিয়া সে মনে করিত সুমিত্রার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিবে। কিন্তু মানুষের মন যে অতটা সহজ নহে তাহা সে জানিত না। বিরুদ্ধাচরণে সৌহৃদ্য না বাড়িলেও আকর্ষণ বাড়ে; ঐক্যের চেয়ে বিরোধ অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী।

স্রোতস্বতী যখন সমতল ভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে তখন প্রশান্ত থাকে, কিন্তু যখন বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া যায় তখন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। সেই প্রাকৃতিক বিধির অনুরূপ নিয়মে বিমানের সহিত কথাবার্ত্তায় সুমিত্রাকে বেশ শান্ত মনে হইত, কিন্তু সুরেশ্বরের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময়ে সে অধীর হইয়া উঠিত। সুরেশ্বর কিন্তু সে সময়ে তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা হইতে একটুও ভিত্তিচ্যুত হইত না। জলে আর পাথরে সংঘর্ষ বাধিলে জল অধীর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সফেন উচ্ছ্বাসের মধ্যে পাথর শুব্ধ হইয়াই থাকে।

কিন্তু এই বিরোধ এবং সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই অল্পে অল্পে অলক্ষিতে সুরেশ্বরের প্রতি সুমিত্রার একটা গভীর আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ দিনই বিমানবিহারী একা আসিয়া তাহার সহিত সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া যাইত, কিন্তু সে-সকল দিনে বিমানবিহারীর সহিত একটানা একসুরা নির্বিরোধ নির্ব্বিবাদ কথাবার্ত্তায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সুমিত্রার বিরক্তি ধরিয়া যাইত। না থাকিত তাহার মধ্যে উত্তেজনা, না থাকিত তাহার মধ্যে উদ্দীপনা, না থাকিত বিতর্ক, না থাকিত বিচার। কেবল মিল, কেবল ঐক্য। দুই ঘণ্টার প্রসঙ্গ দুই মিনিটে শেষ হইত।

সুমিত্রা সময়ে সময়ে তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে তর্ককে নিরোধ করিতে বিমানবিহারীর কিছুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব হইত না; শুধু অপ্রতিবাদের দ্বারাই নহে, প্রয়োজন হইলে স্বীয় মত বর্জ্জন করিয়াও বিমানবিহারী সুমিত্রার সহিত একমত হইত। কিন্তু সুমিত্রার উচ্ছল প্রকৃতি তাহাতে তৃপ্তি পাইত না। সুরেশ্বরের সবল এবং সপ্রতিবাদ বিরোধের তুলনায় বিমানবিহারীর নির্ব্বিবাদ ঐক্য সুমিত্রার নিতান্ত ফিকা মনে হইত।

কোন এক মাসিকপত্রে নারীনিগ্রহ-শীর্ষক সুমিত্রার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তব্য, পুরুষ বহুকাল হইতে কৌশলে নারী-জাতিকে তাহাদের সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; তাহার ফলে ক্রমশঃ নারীজাতি দুর্ব্বল ও আশ্রয়ার্থী হইয়া উঠিয়াছে; নচেৎ নারীজাতি কখনই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

যেদিন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় সেদিন সন্ধ্যাকালে সুরেশ্বর ও বিমান উভয়েই সুমিত্রাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। বিমান সে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিল; বলিল প্রবন্ধটি যুক্তি- ও বিচারগৌরবে অপূর্ব্ব হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ এমন অখণ্ডনীয়রূপে নারী-জাতির সপক্ষে ওকালতী করিতে পারে নাই।

কৌতূহলী সুরেশ্বর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া আগ্রহ-ভরে কহিল, "কই দেখি, দেখি! নারীর অধিকারের বিষয়ে কি ওকালতী করেছেন দেখি।"

সুমিত্রা আরক্ত মুখে কহিল, "না, না, সে কিছুই হয়-নি, সে আপনার ভাল লাগ্‌বে না।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "বিমান-বাবুর যখন এত ভাল লেগেছে তখন আমার ভাল লাগ্‌বে না বল্‌ছেন কেন? আপনি কি বল্‌তে চান যে বিমান-বাবুর পছন্দ আর মতের কোনও মূল্য নেই, না আমার রস-বোধের কিছু মাত্র শক্তি নেই?"

অপ্রতিভ মুখে সুমিত্রা কহিল, "না, তা বল্‌ছিনে।

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তবে বিমান-বাবুর আর আমার মধ্যে প্রভেদ কর্‌ছেন কেন? প্রবন্ধটা তাঁকে যখন দেখিয়েছেন তখন আমাকে দেখাতে আপত্তি কি?"

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি দেখাইনি, তিনি নিজেই দেখেছেন।"

সুরেশ্বর তেমনি হাসিয়া কহিল, "আমাকে না হয় আপনি নিজেই দেখান। সব বিষয়েই যে বিমান-বাবু আর আমার মধ্যে অভিন্ন ব্যবহার কর্‌তে হবে তার কি মানে আছে।

এই দ্রুতপরিবর্ত্তিত যুক্তিতে কৌতুকান্বিত হইয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, তার কোনো মানে নেই।" তাহার পর আর বাদানুবাদ না করিয়া মাসিক পত্রখানা লইয়া আসিয়া সুরেশ্বরের হস্তে দিল।

সুরেশ্বর সুমিত্রার প্রবন্ধটি বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অনতিবিলম্বে তন্মধ্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়া পড়িল। যতক্ষণ ধরিয়া সুরেশ্বর পাঠ করিল সুমিত্রা অধীর কম্পিত হৃদয়ে একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তৎকালে বিমানবিহারী তাহার সহিত নানা বিষয়ে কথা কহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও সে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। পাঠান্তে সুরেশ্বর কিরূপ সমালোচনা করিবে,—নিন্দা করিবে, না সুখ্যাতি করিবে, সেই চিন্তা তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল; ক্ষণপূর্ব্বে বিমানবিহারী যে অমিত এবং অমিশ্র প্রশংসা করিয়াছিল তাহা তাহাকে কিছুমাত্র আশ্বাস দিতেছিল না।

পাঠ শেষ হইলে সুরেশ্বর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "এটা কিন্তু আপনার ঠিক ওকালতী হয়নি; এটা পুরুষ-জাতির সঙ্গে কলহ হয়েছে। কলহটা আবার কিরকম জানেন? দেহের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অধিকার-ভোগ আর অধিকার-ভেদ নিয়ে কলহের মত। মুখ বসে' বসে' খায় বলে' হাত একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে বলেছিল, যত রসাস্বাদন মুখ কর্‌বে আর আমি পরিশ্রম করে' তাকে আহার জোগাব? তা হবে না। রইলাম আমি ঝুলে' আর উপর দিকে উঠ্‌ছিনে!' পরে দেখা গিয়েছিল যে বিদ্রোহের ফলে মুখের চেয়ে হাতের লাঞ্ছনা কম হয়নি; মুখ পর্য্যন্ত না ওঠার ফলে মুখ পর্য্যন্ত ওঠ্‌বার শক্তিই তার লুপ্ত হয়েছিল। তেমনি অন্নপূর্ণার বৃত্তিকে দাস্যবৃত্তি বলে' ভুল করে' পুরুষ-জাতিকে আপনারা যদি শুকিয়ে মার্‌তে চেষ্টা করেন, ঠিক জান্‌বেন তাতে আপনারাও পুষ্ট হবেন না।" বলিয়া সুরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রথমটা তাহার মুখ দিয়া প্রতিবাদের কোনো বাক্য বহির্গত হইল না, কিন্তু ক্ষণপরে সে নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইয়া বলিল, "আপনাদের এই দম্ভ, এই অহঙ্কারই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ। আপনারা যে মনে করেন আপনারা উপার্জ্জন করে' এনে না দিলে আমাদের শুকিয়ে মর্‌তে হবে, এইটেই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অত্যাচার।"

সুরেশ্বর শান্ত-সংযতভাবে কহিল, "ঠিক বিপরীত। আমরা যে ও-রকম মনে করি আপনাদের এই ধারণাই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অবিচার। শক্তি আর প্রকৃতির বিভিন্নতার অনুরোধে এতদিন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে অধিকার ভাগ হয়ে এসেছে তা নিয়ে যদি আপনারা মাম্‌লা কর্‌তে চান্ ত সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রতিবাদী কর্‌বেন, পুরুষদের কর্‌বেন না।"

সুমিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের শক্তি আর প্রকৃতির জন্যে কি আপনারাই দায়ী নন? চিরদিন

আমাদের দুর্ব্বল করে' রেখেছেন বলে'ই কি আমরা দুর্ব্বল নই ?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই কথাই ত আপনি আপনার প্রবন্ধের মধ্যে নানা প্রকারে কয়েকবার বলেছেন। কিন্তু এ ত বহুপুরাতন অসার যুক্তি! এ আর আপনারা কতবার বল্‌বেন ? এ তর্কের উত্তরে আমি যদি বলি যে কোনো এক জাতি যদি অপর কোনো জাতিকে চিরদিন বলহীন করে' রাখ্‌তে পেরে থাকে তা হ'লে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে প্রথমোক্ত জাতি অপর জাতির চেয়ে সবল, তার উত্তরে আপনারা কি বল্‌বেন বলুন ?"

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল বিমূঢ়-ভাবে নীরবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, 'বল্‌ব, এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হ'তে পারে যে চিরদিনই পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে নানা ছলে আর কৌশলে দাবিয়ে রেখেছে।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, "অর্থাৎ আপনি স্বীকার কর্‌ছেন পুরুষ নারীর চেয়ে, শক্তিতে বড় না হোক, বুদ্ধিতে নিশ্চয় বড় ?"

বিমান এতক্ষণ এ তর্কের মধ্যে কোনও কথা কহে নাই, কোন্ দিক্ হইতে সুমিত্রার পক্ষ গ্রহণ করিয়া সে সুরেশ্বরকে আক্রমণ করিবে তাহাই সে মনে মনে ভাবিতেছিল। এবার সুমিত্রাকে কোনও উত্তর দিবার অবসর না দিয়া সে বলিল, "ছল আর কৌশলকে বুদ্ধি বলা চলে না; দুষ্টবুদ্ধি বল্‌তে পারেন।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "দুষ্টবুদ্ধিও বুদ্ধিরই অন্তর্গত। তা ছাড়া বুদ্ধি দুষ্ট হ'লেও যে একটা প্রবল শক্তি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

বিমান উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা হ'লে অত্যাচার উৎপীড়ন জুলুম জবরদস্তী সবই যে এক একটা প্রবল শক্তি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই ?"

সুরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, "নিশ্চয়ই নেই। কারণ ওগুলোকে শুধু শক্তির দ্বারাই প্রতিহত করা যায়। তর্ক অথবা প্রবন্ধের দ্বারা করা যায় না। বিশেষতঃ আজকাল মাসিক পত্রে নারীজাগরণ-সম্বন্ধে সচরাচর যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার দ্বারা ত যায়ই না।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত কহিল, "আমার অবিনয় ক্ষমা কর্‌বেন, কিন্তু একথা আমাকে বল্‌তেই হবে যে নারী-জাগরণ-বিষয়ে আপনাদের লেখা প্রবন্ধগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টি করা, জাগরণটা আপনাদের কি-ভাবে হওয়া আবশ্যক সে ধারণাটা বোধ হয় আপনাদেরই ঠিক নেই, তাই আপনাদের প্রবন্ধগুলিতে পুরুষজাতির প্রতি কটূক্তি ছাড়া আর বড় বেশী কিছু পাওয়া যায় না।"

এই স্পষ্ট এবং কঠোর উক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোনও উত্তর না পাইয়া সুমিত্রা বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বিমানবিহারী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "মেয়েরা পুরুষদের প্রতি কটূক্তি কর্‌ছে বলে' আপনি অনুযোগ কর্‌ছেন, কিন্তু আপনি এই দু চারটা কথায় তাদের প্রতি যেরকম কটূক্তি কর্‌লেন তারা সকলে মিলে কি ততটা কর্‌তে পেরেছে ? মাপ কর্‌বেন সুরেশ্বর-বাবু, স্ত্রী-জাতির সম্পর্কে আর-একটু সংযত আর শিষ্ট হ'লে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হয় না।"

বিমানবিহারীর এই তিরস্কারে বিস্মিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "না, নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু মেয়েরা এই যে পুরুষজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধিয়েছেন তাতে কি তাঁরা পুরুষদের পক্ষ থেকে শুধু সংযম আর শিষ্টতাই আশা করেন, সামান্য প্রতিবাদও আশঙ্কা করেন না ?" তাহার পর সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "দেখুন, অন্তঃপুরের পাঁচিল ভেঙে আপনারা যখন রাজ-পথে বেরিয়ে আস্‌তে চাচ্ছেন তখন আর রাজপথের ধূলি-কাঁকর-দুঃখ-তাপকে ভয় কর্‌লে চল্‌বে না। এটা নিশ্চয় জান্‌বেন যে গোলাপের চাষ কর্‌তে হ'লে সঙ্গে-সঙ্গে কাঁটার চাষ কর্‌তেই হবে।"

সুমিত্রা আরও স্মিতমুখে কহিল, "তা আমরা জানি।"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "তা যদি জানেন, তা হ'লে এ কথাও জান্‌বেন যে একই পক্ষ থেকে ভয় আর ভক্তি দুই প্রত্যাশা করা চলে না। মন্দির থেকে বেরিয়ে

এসে দেবতা যদি ভক্তের প্রতি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, তা হ'লে ভক্ত ভয় নিশ্চয়ই পায়; কিন্তু ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া বোধ হয় স্থগিত রাখে।"

এবার সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "স্থগিত রাখ্‌তে হবে না। আপনারা একেবারে বন্ধ করুন। দেবী বলে' আমাদের ভুলিয়ে না রেখে মানবীর পদে আমাদের দাঁড়াতে দিন।"

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "দেখ্‌লেন ত বিমান-বাবু, এঁদের মানসিক অবস্থাটা। নারীজাতির খাতিরে এঁরা আমাদের কাছ থেকে বিশেষ করে' কিছুমাত্র শিষ্টতা বা সংযম-পেতে চান্‌ না। অথচ আমি এঁর প্রবন্ধের অকপট সমালোচনা করছিলাম বলে আপনি আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে অপরাধী করছিলেন!" তাহার পর সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কিন্তু আপনার ভাষাটি ভারি চমৎকার হয়েছে। একেবারে তর্‌তরে, ঝর্‌ঝরে! আমাদের প্রতি যে অকারণ গালি বর্ষণ করেছেন তার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে যা বলেছেন তা সুন্দর করে'ই বলেছেন।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

সেদিন সুরেশ্বর প্রস্থান করার পরও বিমানবিহারী কিছুক্ষণ থাকিয়া গেল। সুমিত্রাকে ঈষৎ উন্মনা লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "সুরেশ্বরের আসল মূর্ত্তিটি ক্রমশঃই প্রকাশ পাচ্ছে! তার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা হ'লে হয়ত দেখা যাবে সে আজ যতটুকু রূঢ়তা প্রকাশ করে' গেল, সেটাও তার ভাণ করা বিনয়ের অভিনয়!"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "রূঢ়তা প্রকাশ করে' গেলেন কখন?"

বিমানবিহারী রুষ্টমুখে কহিল, "তুমি যদি সেটা বুঝ্‌তে না পেরে থাক তা হ'লে এখন তা বোঝাতে যাওয়া যেমন কঠিন তেমনি অনাবশ্যক! তুমি কি মনে কর রূঢ়তা শুধু রূঢ় কথা দিয়েই প্রকাশ করা যায়?"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর স্মিতমুখে কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু যদি হেঁয়ালী করে' গিয়ে থাকেন ত কি করে' বুঝ্‌ব বলুন?"

সুমিত্রার এই সপরিহাস লঘু উত্তরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিমান কহিল, "হেঁয়ালী? কেন, তোমাকে আর তোমাদের সমস্ত দলটিকে সে প্রকারান্তরে কপট বলে' গেল না? বল্‌লে না যে তোমাদের প্রবন্ধ লেখ্‌বার এক মাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টি করা?"

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, সাহিত্যসৃষ্টির কথা বলেছিলেন বটে কিন্তু সমালোচনা কর্‌তে গিয়ে এটুকু বলাকে রূঢ়তা বলা যায় কি?" বিমানবিহারী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "সমালোচনা বল্‌ছ তুমি কাকে? অনর্থক অকারণ নিন্দাকে যদি সমালোচনা বল্‌তে হয় তাহলে গালাগালিকেও উপদেশ বলা চলে! একটা জিনিসকে অপর জিনিসের সঙ্গে গোল কোরো না সুমিত্রা। তোমার প্রবন্ধে যুক্তিতর্কের সংশ্রব নেই বল্‌লে সমালোচনা করা হয়, কি নিন্দা করা হয়, এটুকু বোঝ্‌বার ক্ষমতা আমার আছে—এবং সেটুকু বুঝে' চুপ করে' থাকার ধৈর্য্য আমার নেই!"

বিমানবিহারীর কথার শেষাংশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "কিন্তু অকারণ আমার প্রবন্ধের নিন্দা করে' সুরেশ্বর-বাবুর কি লাভ?"

বিমানবিহারী বলিল, "লাভ কিছুই নেই। ঐটুকু হচ্ছে ওর প্রকৃতি। একদল লোক আছে তারা মনে করে অপরের সঙ্গে একমত হ'লেই খাটো হ'তে হয়। তাই তারা কারণে অকারণে সব কথার প্রতিবাদ করে' নিজেদের বিশেষত্ব প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করে। আমি বল্‌লাম, তোমার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, অতএব সে বলে' গেল আর কিছু থাক আর নাই থাক যুক্তিটাই তাতে নেই!"

কিন্তু বিমানবিহারীর এত কথা, এবং পরে আরও বহু বহু প্রশংসা সত্ত্বেও, সুমিত্রা যখন একাকী হইয়া প্রবন্ধটা খুলিয়া দেখিতে বসিল, তখন তাহার নিকট সুরেশ্বরের নিন্দা-প্রশংসাই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহার প্রবন্ধ যেন সুচারু পরিচ্ছদে আবৃত কুগঠিত দেহ।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মৌরীফুল

অন্ধকার তখনও ঠিক হয় নাই। মুখুয্যে-বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানে জোনাকীর দল সাঁজ জ্বাল্‌বার উপক্রম করিতেছিল। তাল-পুকুরের পাড়ে গাছের মাথায় বাদুড়ের দল কালো হইয়া ঝুলিতেছে—মাঠের ধারে বাঁশ-বাগানের পিছনটা সূর্য্যাস্তের শেষ-আলোয় উজ্জ্বল। চারিদিক্ বেশ কবিত্বপূর্ণ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মুখুয্যেদের অন্দর-বাড়ী হইতে এক তুমুল কলরব আর হৈ চৈ উঠিল।

বৃদ্ধ রামতনু মুখুয্যে শিবকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য। তিনি রোজ সন্ধ্যা বেলায় আহুতি দিয়া থাকেন, এজন্য প্রায় একপোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি তার চাই। তিনি নানা উপায়ে এই ঘি সংগ্রহ করিয়া ঘরে রাখিয়া দেন। অন্যদিনের মত আজও তাকের উপর একটা বাটিতে ঘিটা ছিল, তার পুত্রবধূ সুশীলা সেই বাটি তাকের উপর হইতে পাড়িয়া সে ঘিটার সমস্তই দিয়া খাবার তৈয়ারী করিয়াছে।

রামতনু মুখুয্যে মহকুমার কোর্টে গিয়াছিলেন ও-পাড়ার চৌধুরীদের পক্ষে একটা মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে। বিপক্ষের উকীল তাঁকে জেরার মুখে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনি গত মে মাসে পাঁচু রায় আর তার ভাইয়ের পাঁচীলের জায়গা নিয়ে মাম্‌লায় প্রধান সাক্ষী ছিলেন না?"

রামতনু মুখুয্যে বলিয়াছিলেন—হাঁ তিনি ছিলেন।

উকীল পুনরায় জেরা করিয়াছিলেন—"ভু-নালির চৌধুরীদের কানসোনার মাঠের দাঙ্গার মোকদ্দমায় আপনি পুলিসের দিকে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি না?"

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়কে ঢোক গিলিয়া স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে তিনি দিয়াছিলেন বটে।

বিপক্ষের উকীল আবার প্রশ্ন করেন,—"আচ্ছা এর কিছুদিন পরেই বড়-তরফের স্বত্বের মামলায় আপনি বাদী পক্ষের সাক্ষী ছিলেন কি না?"

কবে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, মুখুয্যে মহাশয় প্রথমটা তাহা মনে করিতে পারেন নাই, তার পর বিপক্ষের উকীলের পুনঃপুনঃ কড়া প্রশ্নে এবং মুন্সেফ-বাবুর ভ্রুকুটী-মিশ্রিত দৃষ্টির সম্মুখে হতভাগ্য রামতনুর মনে পড়িয়াছিল যে তিনি এ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন বটে এবং এই গত জুলাই মাসে এই কোর্টেই তাহা তিনি দিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর কোর্টে কি ঘটিয়াছিল, বিপক্ষের উকীল হাকিমের দিকে চাহিয়া রামতনুর উপর কি ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিলেন, রামতনু উকীল আম্‌লায় ভর্ত্তি মুন্সেফ-বাবুর এজ্‌লাসে হঠাৎ কিরূপে সপুষ্প সর্ষপক্ষেত্রের আবিষ্কার করেন, সে-সকল কথা উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। তবে মোটের উপর বলা যায়, রামতনু মুখুয্যে যখন বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তার শরীরের ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ। কোথায় এ অবস্থায় তিনি ভাবিয়াছিলেন হাত পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া শ্রীগুরুর উদ্দেশে আহুতি দিয়া অনিত্য বিষয়বিষে জর্জ্জরিত মনকে একটু স্থির করিবেন, না দেখেন যে আহুতির জন্য আলাদা করিয়া তোলা যে ঘি-টুকু তাকে ছিল, তার সবটাই একেবারে নষ্ট হইয়াছে!

তার পর প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা ধরিয়া মুখুয্যে-বাড়ীর অন্দর মহলে একটা রীতিমত কবির লড়াই চলিতে লাগিল। মুখুয্যে মহাশয়ের পুত্রবধূ সুশীলা প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইলেও সাম্‌লাইয়া লইয়া এমন সব কথায় শ্বশুরকে জবাব দিতে লাগিল যাহা একজন আঠারো-বৎসর-বয়স্কা তরুণীর মুখে সাজে না। পক্ষান্তরে কোর্টে বিপক্ষের উকীলের অপমানে ও ঘরে আসিয়া পুত্রবধূর নিকট অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় রামতনু মুখুয্যে পুত্রবধূর পিতৃকুল ও তাহার নিজের পিতৃকুলের তুলনামূলক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এমনসব দুরূহ পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুবালের গল্পে উল্লিখিত কুলাদর্শ-বিদ্যা অধ্যয়ন না করিলে সে-সব বুঝা একেবারেই অসম্ভব।

এমন সময় মুখুয্যে মহাশয়ের ছেলে কিশোরী বাড়ী

আসিল, তাহার বয়স ২৫।২৬ হইবে, বেশী লেখা পড়া না শেখায় সে চৌধুরীদের জমিদারী কাছারীতে ৯৲ টাকা বেতনে মুহুরীগিরি করিত।

কিশোরীলাল নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে আলো দেওয়া হয় নাই, অন্ধকারেই জামা কাপড় ছাড়িয়া সে বাহিরে হাত পা ধুইতে গেল। তার পর ঘরে ঢুকিয়া শুনিল, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার ঘরে সুশীলা তাহার সম্মুখের বাতাসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে যে এ সংসারে থাকিয়া সংসার করা তাহার শক্তিতে কুলাইবে না, অতএব কাল সকালেই যেন গরুর গাড়ী ডাকাইয়া তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কিশোরী সে কথার কোন বিশেষ জবাব না দিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া ও বাঁশের লাঠিগাছা ঘরের কোণ হইতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ও-পাড়ায় রায়-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকদিগের যাত্রার আখ্‌ড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্ম্মের ভিতর।

রামতনু মুখুয্যে মহাশয়ও অনেকক্ষণ বাহিরের ঘরে কাটাইলেন। প্রতিবেশী হরি রায় তামাকের খরচ বাঁচাইবার জন্য সকাল সন্ধ্যায় মুখুয্যে মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রয় করিতেন, তাঁহাকে রামতনু জানাইলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই কাশী যাইতেছেন, কারণ আর এ-বয়সে ইত্যাদি।

তাঁহার এ বানপ্রস্থ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষার জন্য দায়ী একমাত্র তাঁহার পুত্রবধূ সুশীলা। সুশীলা সকাল নাই সন্ধ্যা নাই একটা কিছু না বাধাইয়া থাকিতে পারে না। সে অত্যন্ত আনাড়ি, কোন কাজই গুছাইয়া করিতে পারে না, অথচ দোষ দেখাইতে যাইলে ক্ষেপিয়া যায়। তাহার জন্য রামতনু মুখুয্যের বাড়ীতে কাক চিল বসিবার উপায় নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীকে সে হঠাৎ আঁটিয়া উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু এজন্য তাহার চেষ্টার ত্রুটি দেখা যায় না।

অনেক রাত্রে কিশোরী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ঘরে খাবার ঢাকা আছে এবং স্ত্রী ঘুমাইতেছে। খাবারের ঢাকা খুলিয়া আহারাদি শেষ করিয়া সে শুইতে গিয়া দেখিল স্ত্রী ঘুম-জড়ানো চক্ষে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভের সুরে বলিল—"কখন্ এলে? তা আমায় একটু ডাক্‌লে না কেন?"

কিশোরী বলিল—"আর ডেকে কি হবে? আমার আর কি হাত পা নেই! নিতে জানিনে?"

হঠাৎ তাহার স্ত্রী রাগিয়া উঠিল—"নিতে জান তো জেনো। কাল থেকে আমার এখানে আর বন্‌বে না। এ যেন হয়েচে শত্রুপুরীর মধ্যে বাস—বাড়ীসুদ্ধ লোক আমার পেছনে এমন করে' লেগেছে কেন শুন্‌তে চাই। না হয় বরং—"

কান্নায় ফুলিয়া সে বালিসের উপর মুখ গুঁজিল।

কিশোরী দেখিল স্ত্রী রাত দুপুরের সময় গায় পড়িয়া ঝগড়া করিয়া একটা বিভ্রাট বাধাইয়া তোলে। এরকম করিয়া আর সংসার করা চলে না—ভাত ঢাকা ছিল, খুলিয়া লইয়া খাইয়াছে, ইহাতেও যদি স্ত্রী চটিয়া যায়, তাহা হইলে আর পারা যায় না। কিছু না, ও একটা ছল, ঐ সামান্য সূত্র ধরিয়া এখনি সে একটা রাম-রাবণের যুদ্ধ বাধাইয়া তুলিবে।

কিশোরী বলিল—"যা খুসী কাল্‌কে কোরো—এখন একটু ঘুমুতে দাও। ঘুমুচ্ছিলে বলেই আর ডাকিনি এই তো অপরাধ? তা বেশ কাল থেকে ওঠাবো, চুলের নড়া ধরে' ওঠাবো।"

সুশীলা কথাও বলিল না, মুখও তুলিল না, বালিসে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া রামতনু মুখুয্যে শুনিলেন চৌধুরীরা খবর পাঠাইয়াছে কয়েকটি নূতন সাক্ষীর তালিম দিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—"ও বৌমা, একটু সকাল-সকাল ভাত দিয়ো, কোর্টে যেতে হবে।" বেলা ৯টার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন সুশীলা স্নান করিয়া আসিয়া রৌদ্রে কাপড় মেলিয়া দিতেছে, গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরী রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছেন। স্বামীকে দেখিয়াই মোক্ষদা চৌকীদার হাঁকার সুরে বলিতে লাগিলেন—"হয় আমি একদিকে বেরিয়ে যাই, না হয় বাপু এর একটা বিহিত করো। সেই সকাল থেকে

পাক দিয়ে দিয়ে বেড়াচ্ছে, বল্‌চি—ও বৌমা, দুটো ত চড়িয়ে দাও, ওগো যা হয় দুটো-কিছু রাঁধ—হাতে য়ে ধর্‌তে কেবল বাকী রেখেছি। কার কথা কে নে?—এই বেলা দুপুরের সময় রাণী এখন এলেন য়ে—"

সুশীলা রক হইতে সমান গলায় উত্তর দিল—"মাইনে-রা দাসী ত নই, আমি যখন পার্‌বো তখন রান্না চড়াবো -সকাল থেকে বসে' আছি নাকি? এত খাটুনি সেরে বার আটটার মধ্যে ভাত দেবো—মানুষের তো আর রীর নয়—যার না চল্‌বে সে নিজে গিয়ে রেঁধে নিক্—"

এই কথার উত্তরে মোক্ষদা খুন্তী হাতে রান্নাঘরের ওয়ায় আসিয়া নটরাজ শিবের তাণ্ডব নর্ত্তনের একটা াধুনিক সংস্করণ সুরু করিতে যাইতেছিলেন—একটা টনায় তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

একটা দশ-বার বৎসরের ছেলে, রংটা বড়ই কালো, ালেরিয়ায় শরীর জীর্ণশীর্ণ, পরনে অতি ময়লা এক মছা, শীতের দিনেও তাহার গায়ে কিছু নাই, হাতে কটা ছোট বাখারীর ছড়ি লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। ছলেটি পাশের গ্রামের আতরালি ঘরামির ছেলে, গত ৎসর তার বাপ মারা গিয়াছে, দুটি ছোট ছোট বোন ার মা ছাড়া তার আর কেহ নাই। অবস্থা খুব ারাপ, সবদিন খাওয়া জুটে না, ছেলেটা পিঠে ছড়ি াজাইয়া হাপু গাহিয়া মা ও বোন দুটিকে প্রতিপালন রে। সে এগ্রামের প্রায় সব বাড়ীতে আসিত, কিন্তু খুয্যে-বাড়ী আর কখনো আসে নাই, তাহার একটা ারণ এই যে দানশীলতার জন্য রামতনু মুখুয্যে গ্রামের ধ্যে আদৌ প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ছেলেটি উঠানে দাঁড়াইয়া বগল বাজাইয়া নানারূপ সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাপু গাহিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠে জোর করিয়া লাঠির বাড়ি মারিতে লাগিল।

তিনটি নেহাৎ গো-বেচারী সাক্ষীর তালিম দিতে অনেক ধস্তাধস্তি করিয়া রামতনুর মেজাজ ভাল ছিল না, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন—"থাম্—থাম্, ও-সব রাখ্—এখন ও-সব দেখ্‌বার সখ্ নেই—যা অন্য বাড়ী দেখ্‌গে যা—যা—"

সুশীলা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে অবাক্ হইয়া হাপু গাওয়া দেখিতেছিল—ছেলেটি সঙ্কুচিত হইয়া বাহিরে যাইতেই সে তাড়াতাড়ি বাহিরের রকে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—"শোন্, তোর বাড়ী কোথায় রে?"

—হরিষপুর, মা-ঠাকরুণ।

—তোর বাড়ীতে কে আছে আর?

—মোর বাপ মারা গিয়েছে আর-বছর মা-ঠাকরুণ—মোদের আর কেউ নেই, মুই বড়, মোর ছোট দুটো বোন আছে—"

—তাই বুঝি তুই হাপু গাস্? হ্যাঁ রে এতে চলে?

রামতনুর ধমক্ খাইয়া ছেলেমানুষ অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল, সুশীলার কথার ভিতর সহানুভূতির সুর চিনিয়া লইয়া হঠাৎ তাহার কান্না আসিল—চোখের জল হু হু করিয়া পড়িতেই ম্যালেরিয়াশীর্ণ হাতটি তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—না মা-ঠাকরুণ, চলে না। এ-সব লোকে আর দেখ্‌তি চায় না। মুই যদি ভাল গান গাইতি পার্ত্তাম তো যাত্রার দলে যাতাম, বড় কষ্ট মোদের সংসারের—এই শীতি মা-ঠাকরুণ—

সুশীলা বাধা দিয়া বলিল, "দাঁড়া, আমি আস্‌চি।"

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কান্নার বেগ অতিকষ্টে সাম্‌লাইয়া চাহিয়া দেখিল আল্‌নায় একখানা নতুন মোটা বিছানার চাদর ঝুলিতেছে—হাতের গোড়ায় সেইখানা পাইয়া সেইখানা টান দিয়া লইল। তার পর জানালা দিয়া বাড়ীর মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া চাদরখানা তাড়াতাড়ি ছেলেটির হাতে দিয়া চুপিচুপি বলিল—"এইখানা নিয়ে যা, এতে শীত বেশ কাট্‌বে। কাট্‌বে না? খুব মোটা। শীগ্‌গির যা, লুকিয়ে নিয়ে যা কেউ না দেখে—"

ছেলেটা চাদর হাতে হতবুদ্ধি হইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া সুশীলা বলিল—"ওরে এক্ষুনি কে এসে পড়্‌বে, শীগ্‌গির যা—"

ছেলেটাকে বিদায় দিয়া সুশীলা ভিতর-বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল শ্বশুর আহার করিতে বসিয়াছেন। ছেলেটার দুঃখে সুশীলার মন খুব নরম হইয়া গিয়াছিল, সে গিয়া রান্না-ঘরে ঢুকিয়া কাজে মন দিল, শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে কিছু দেব বাবা?"

মোক্ষদা ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"তোমাকে আর কিছু দিতে হবে না, যে মিষ্টি বচন দিয়েছ তাতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে, নাও এখন পার তো এদিকে এস একবার, হাঁড়িটা দেখ, নয়ত বলো নিজে মরি বাঁচি একরকম করে' সাঙ্গ করে' তুলি।"

রামতনু কোন কথা বলিলেন না, আপন মনে খাইয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এই-সব ব্যাপারেই সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া যাইত, রামতনু পুত্রবধূর নিকট কোন জিনিস চাহিয়া খাইলে তাহার রাগ গলিয়া জল হইয়া যাইত, কিন্তু লোকে তাহাকে জব্দ করিতেছে বা অপমান করিবার ফন্দী খুঁজিতেছে ভাবিলে তাহার আর কাণ্ড জ্ঞান থাকিত না, সেও কোমর বাঁধিয়া রণে আগুয়ান্ হইত। সেই বা ছাড়িবে কেন?

মাস দুই পরে।

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, কিন্তু বেশ গরম পড়িয়াছে। কিশোরী অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছে। বাড়ীতে যে যার ঘরে ঘুমাইতেছে। সে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সুশীলা ঘরের মেজেয় বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছে। কিশোরী সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চিঠি লেখা হচ্ছে!

সুশীলা চিঠির কাগজখানা তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়া চাপিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া একটু দুষ্টুমির হাসি হাসিল, বলিল,—বল্‌ব কেন?

—থাক্, না বল, ভাত দাও। রাত কম হয়নি। আবার সকাল থেকেই খাটুনি আরম্ভ হবে।

সুশীলা ভাবিয়াছিল স্বামী আসিয়া সে কি লিখিতেছে দেখিবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সে চিঠি কাহাকেও লিখিতেছিল না, স্বামীকে কথা বলাইবার এ তার একটা পুরানো কৌশল মাত্র। অনেক দিন সে স্বামীর মুখে দুটো ভাল কথা শুনে নাই, তাহার নারীহৃদয় ইহারই জন্য তৃষিত ছিল এবং ইহারই জন্য সে ঘুমে ঢুলিতে ঢুলিতেও এই সামান্য ফাঁদটি পাতিয়া বসিয়া ছিল—কিন্তু কিশোরী ফাঁদে পা দেওয়া দূরে থাকুক্, সে দিকে ঘেঁসিলও না দেখিয়া সুশীলা বড় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কাগজকলম তুলিয়া রাখিয়া সে স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিল। একপ্রকার চুপ্‌চাপ্ অবস্থায় আহারাদি শেষ করিয়া কিশোরী গিয়া শয্যা আশ্রয় করিবার পর, সে নিজে আহারাদি করিয়া শুইতে গিয়া দেখিল কিশোরী ঘুমায় নাই, গরমে এপাশ ওপাশ করিতেছে। আশায় বুক বাঁধিয়া এবার সে তাহার দ্বিতীয় ফাঁদটি পাতিল।

—একটা গল্প বলো না? অনেকদিন তো বলনি, বল্‌বে লক্ষ্মীটি—

বিবাহের পর প্রথম প্রথম কিশোরী তাহার কিশোরী স্ত্রীর নিকট বটতলার আরব্য উপন্যাস হইতে নানা গল্প বলিত। রাত্রির পর রাত্রি তখন এ-সব গল্প শুনিয়া সুশীলা মুগ্ধ হইয়া যাইত,—জনহীন দেশের মধ্যে যেখানে শুধু জীন পরীদের জগৎ, খেজুর-বনের মধ্যে ঠাণ্ডাজলের ফোয়ারা হইতে মণিমুক্তা উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, পথহীন দুরন্ত মরু-প্রান্তরে মৃত্যু যেখানে শিকার সন্ধানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে, সমুদ্রের ঝড়, তরুণ শাহজাদাগণের দৈত্যসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়া নির্ভীক শিকারযাত্রা—এ-সব শুনিতে শুনিতে তাহার গা শিহরিয়া উঠিত, ঘুম ভাঙিলে ঘরের মধ্যের অর্দ্ধ-রাত্রির অন্ধকার বিকটাকার জীন্‌দেহের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে সে স্বামীকে জড়াইয়া ধরিত। প্রাচীন যুগের তরুণ শাহজাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকেই যাত্রার দলের রাজার পোষাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহজাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এইরকমে গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়ক-নায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপরে প্রয়োগ করিয়া সে স্বামীকে প্রথম ভালবাসে। সে আজ ৫।৬ বৎসরের কথা, কিন্তু সুশীলার এখনও সে ঘোর কাটে নাই।

কিশোরী স্ত্রীর কথা উড়াইয়া দিল,—হ্যাঁঃ, এখন গল্প বল্‌ব! সমস্ত দিন খেটেখুটে এলাম, এখন রাত-দুপুরের সময় বক্‌বক্ করি আর কি! তোমাদের কি? বাড়ী বসে' সব পোষায়।

অন্য মেয়ে হইলে চুপ্ করিয়া যাইত। সুশীলার মেজাজ

ছিল একগুঁয়ে। সে আবার বলিল,—তা হোক্, একটা বলো, রাত এখন তো বেশী নয়—

.—না বেশী নয়– তোমার তো রাত কমবেশীর জ্ঞান কত! নাও, চুপ্ চাপ্ শুয়ে পড় এখন—

সুশীলা এইবার জিদ্ ধরিল,—বলো না একটা, একটা ছোট দেখেই না হয় বলো—এত করে' বল্‌ছি একটা কথা রাখ্‌তে পার না—

কিশোরী বিরক্ত হইয়া বলিল,—আঃ! এ তো বড় জ্বালা হ'ল! রাতেও একটু ঘুমুবার যো নেই—সমস্তদিন তো গলাবাজিতে বাড়ী সর্‌গরম রাখ্‌বে, রাত্তিরটাও একটু শান্তি নেই?

এইটাই ছিল সুশীলার ব্যথার স্থান। স্বামীর মুখে একথা শুনিয়া সে ক্ষেপিয়া গেল,—বেশ করি গলাবাজি করি, তাতে অসুবিধে হয় আমাকে পাঠিয়ে দাও এখান থেকে—রাত দুপুর কর্‌লে কে! নিজে আস্‌বেন রাত দুপুরের সময় আড্ডা দিয়ে—কে এত রাত পর্য্যন্ত ভাত নিয়ে বসে' থাকে? নিজের দেহ, পরের আর তো দেহ না! খেটেখুটে এসে একেবারে রাজা করেছেন আর কি! নিজের খাটনিটাই কেবল—

কিশোরী ঘুমাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, স্ত্রীর উত্তরোত্তর চড়া সুরে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—উঠিয়া বসিয়া প্রথমে সে স্ত্রীর পিঠে সজোরে ঘা-কতক পাখার বাঁট বসাইল, তাহার পর তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বিছানার উপর হইতে নামাইয়া ধাক্কা মারিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিল, বলিল—বেরো—ঘর থেকে বেরো আপদ্—দূর হ—রাত দুপুরেও একটু শান্তি নেই—যা বেরো—যেখানে খুসি যা—

ঘরে আলোর কাছে আসিয়া কিশোরী দেখিল স্ত্রী দুই হাতের নখ দিয়া আঁচ্‌ড়াইয়া তাহার হাতের আঙুলগুলিতে রক্তপাত করিয়া দিয়াছে।

ইরাণী শাহাজাদাগণের নজীর না থাকিলেও কিশোরী মধ্যে মধ্যে দুরন্ত স্ত্রীর প্রতি এরূপ ঔষধি প্রয়োগ করিত।

শেষ রাত্রে একাদশীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক্ যখন ফুলের পাপ্‌ড়ীর মত শাদা, ভোর রাত্রের বাতাস নেবু-ফুলের গন্ধে আর পাপিয়ার গানে মাখামাখি, সুশীলা তখন ঘরের দোরের বাহিরে দালানে আঁচল পাতিয়া অকাতরে ঘুমাইতেছিল।

সকাল হইলে যে যার কাজে মন দিল। মোক্ষদা বলিলেন—"বৌমা, আজ চৌধুরীরা শিবতলায় পূজো দিতে যাবে, আমাদের যেতে বলেছে, সকাল-সকাল সেরে নাও।"

এই চৌধুরীটি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে রামতনু মুখুয্যের প্রতিপালক, ইঁহারাই গ্রামের জমিদার এবং ইঁহাদেরই জমি-জমা-সংক্রান্ত মোকদ্দমার তদ্বির ও সাহায্য করিয়া রামতনু অন্নসংস্থান করিতেন।

বেলা দশটার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া ভাল কাপড় পরিয়া সকলে নৌকায় উঠিল—দুই ঘণ্টার পথ। চৌধুরী-বাড়ীতে কলিকাতা হইতে একটি বউ আসিয়াছিল। তাহার স্বামী বড়লোকের ছেলে, এম্-এ পাস করিয়া বছর দুই হইল ডেপুটিগিরি চাকরী পাইয়াছে। বউটি কলিকাতার মেয়ে, চৌধুরীদের সহিত তাহার স্বামীর কিরূপ সম্পর্ক আছে, এজন্য চৌধুরী-গৃহিণী রাসপূর্ণিমার সময় তাহাকে আনাইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সে কখনো পাড়াগাঁয়ে আসে নাই। নৌকায় খানিকটা বসিয়া থাকিবার পর বউটি দেখিল নীলাম্বরী-কাপড়-পরণে তাহারই সমবয়সী আর-একটি বউ নৌকায় উঠিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকায় সমবয়সী সঙ্গিনী পাইয়া কলিকাতার বউটি খুব সন্তুষ্ট হইলেও প্রথমে আলাপ করিতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। সঙ্গিনীর কাপড়চোপড় পরিবার অগোছাল ধরণ দেখিয়া বউটি বুঝিয়াছিল তাহার সঙ্গিনী নিতান্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অবস্থাও খুব ভাল নয়। নৌকার ওধারে চৌধুরীগৃহিণী মোক্ষদার সহিত সাবিত্রীব্রত প্রতিষ্ঠার কি আয়োজন করিয়াছেন, তাহারই বিস্তৃত বড়মানুষী ফর্দ্দ আবৃত্তি করিতেছিলেন। নৌকায় কোন পরিচিতা মেয়েও নাই, কাজেই বউটি অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল। বউটি লেখা-পড়া জানিত এবং দেশবিদেশের খবরাখবরও কিছু-কিছু রাখিত—চৌধুরী-গৃহিণীর একঘেয়ে বড়মানুষী চালের কথাবার্ত্তায় সে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থকিবার পর,

স লক্ষ্য করিল তাহার সঙ্গিনী ঘোমটার ভিতর হইতে কালো-কালো ডাগর চোখে তাহার দিকে সকৌতুকে চাহিতেছে। বউটির হাসি পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি ভাই ?

সুশীলা সন্দিগ্ধস্বরে বলিল—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী দেবী।

সুশীলার রকম-সকম দেখিয়া বউটির খুব হাসি পাইতে লাগিল। সে বলিল—অত ঘোমটা কিসের ভাই ? তুমি আর আমি ছাড়া তো আর কেউ এদিকে নেই, নাও এস ঘোমটা খোল, একটু গল্প করি।

এই কথা বলিয়া বউটি নিজেই সুশীলার ঘোমটা খুলিয়াদিল—খুলিতেই সুশীলার সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—রং যদিও ততটা ফর্সা নয়, কিন্তু কালোর উপর অত শ্রী সে কখনো দেখে নাই, নদীর ধারের সরস সতেজ চিক্কণশ্যাম কল্‌মী-লতারই মত একটা সবুজ লাবণ্য যেন সারামুখখানায় মাখানো। মুখখানি দেখিয়াই সে এই নিরাভরণা পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে ভালবাসিয়া ফেলিল জিজ্ঞাসা করিল—উনি বসে' আছেন তোমার কে ভাই, শাশুড়ী ?

—হ্যাঁ।

—এস আর-একটু সরে' এস ভাই, দুজনে গল্প করি আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাই। তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ভাই ?

সুশীলার ভয় কাটিয়া যাইতেছিল, সে বলিল—সে হ'ল শিম্‌লে।

—কোন শিম্‌লে ? কল্‌কাতা শিম্‌লে ?

কলিকাতায় শিম্‌লে আছে নাকি ? কৈ তাহা তো সুশীলা কোন দিন শোনে নাই। সে বলিল—আমার বাপের বাড়ী এখান থেকে তো বেশী দূর নয়, ৫।৬ কোশ পথ, গরুর গাড়ী করে' যেতে হয়।

নদীর ধারের যবক্ষেত, সর্ষেক্ষেত, বুনো গাছপালা দেখিয়া বউটি খুব খুসি। এ-সব সে পূর্ব্বে বড় দেখে নাই, আঙুল দিয়া একটা মাছরাঙা পাখী দেখাইয়া বলিল—বাঃ, বড় সুন্দর তো! ওটা কি পাখী ভাই ?

—ওটা তো মাছরাঙা পাখী, কেন তুমি দেখনি কখনো ?

বউটি বলিল—ভাই, আমি কল্‌কাতার বাইরে অ্যাদ্দিন পা দিইনি, খুব ছেলেবেলা একবার বাবার সঙ্গে চন্দননগরে বাগান-বাড়ীতে যাবার কথা মনে আছে, তার পর এই আস্‌চি—তুমি আমায় একটু দেখিয়ে নিয়ে চল। ওটা কিসের ক্ষেত ভাই ?

সুশীলা দেখিল তাহার সঙ্গিনী আঙুল দিয়া নদীর ধারের একটা মৌরির ক্ষেত দেখাইতেছে—প্রথমটা সে সঙ্গিনীর চোখ-ঝল্‌সানো রং, অদৃষ্টপূর্ব্ব দামী সিল্কের শাড়ী, ব্লাউজ এবং চিক্‌চিকে নেক্‌লেসের বাহার দেখিয়া যে ভয় অনুভব করিতেছিল, তাহার অজ্ঞতা দেখিয়া সুশীলার সে ভয় কাটিয়া অজ্ঞ সঙ্গিনীর উপর একটু স্নেহ আসিল—কলিকাতায় মাছরাঙা পাখী, মৌরীক্ষেত এসব সামান্য জিনিসও নাই নাকি ? সুশীলা হাসিয়া বলিল, —তুমি ফুলের গন্ধ দেখে' বুঝ্‌তে পার না ভাই ? ও তো মৌরীর ক্ষেত। কেন, আমাদের বাপের বাড়ীর গাঁয়ে তো কত মৌরীর ক্ষেত আছে— মৌরীর শাক কখনো খাওনি ? কল্‌কাতায় বুঝি নেই ?

কলিকাতার বৌটি বুঝাইয়া দিল যে কলিকাতার অতীত ইতিহাসের সে খবর রাখে না, বর্ত্তমান অবস্থায় সেখানে মৌরীক্ষেত প্রভৃতি থাকা সম্ভবপর নয়, তবে ভবিষ্যতে কি হয় বলা যায় না।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন নৌকা শিবতলার ঘাটে গিয়া লাগিল, তখন তাহাদের দুজনের মধ্যে অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের কথাবার্ত্তা হইয়া গিয়াছে। সঙ্গিনীর মুখে স্বামীর আদরের গল্প শুনিয়া সুশীলার মনের মধ্যে একটা গোপন ব্যথা জাগিয়া উঠিল—সেটা সে অনবরত চাপিবার চেষ্টা করে, তবু কি জানি কেন সেটা ফাঁক পাইলেই মাথা তোলে! প্রথম বিবাহের পর তাহার স্বামীও তো তাহাকে কত আদর করিত, রাত্রে ঘুমাইতে না দিয়া নানা গল্পে ভুলাইয়া জাগাইয়া রাখিত, সুশীলা পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত সাধ্যসাধনা করিয়া পান মুখে তুলিয়া দিত—সেই স্বামী তাহার কেন এমন হইল ? তাহার বুকটার মধ্যে কেমন হু হু করিয়া উঠিল।

দুজনে তাহারা খানিকক্ষণ গাছের ছায়ায় নদীর ধারে এদিক্‌ ওদিক্‌ বেড়াইল, কি সুন্দর দেখায় চারিদিক্‌!…

নীল আকাশ সবুজ মাঠের উপর কেমন উপুড় হইয়া আছে! ওমা, পানকৌড়ির ঝাঁক চরের উপর বসিয়া বসিয়া কেমন ঝিমায়!

কলিকাতার বউটি বলিল—এস ভাই, আমরা একটা কিছু পাতাই। কেমন?

সুশীলা খুসি হইয়া বলিল খুব ভাল ভাই, কি পাতাব বলো—

—এক কাজ করি এস—আস্‌তে আস্‌তে নদীর ধারে যে মৌরীফুল দেখে এলাম, এস আমরা দুজনে মৌরীফুল পাতাই। কেমন?

সুশীলা আহ্লাদের সঙ্গে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল। নদী হইতে অঞ্জলি করিয়া জল তুলিয়া তাহারা মৌরীফুল পাতাইল।

এমন সময় মোক্ষদা ডাকিলেন—বৌমারা এদিকে এস।

তাহারা গিয়া দেখিল গাছতলায় অনেক লোক—সেদিন পূজা দিতে অনেক লোক আসিয়াছিল। প্রকাণ্ড বটগাছ, তার তলায় ভাঙা ইটের মন্দির। গাছতলা হইতে একটু দূরে এক বুড়ী নানা ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। সুশীলা ও তাহার সঙ্গিনী সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, রোগ সারা, ছেলে হওয়া হইতে সুরু করিয়া সকলরকমের ঔষধই আছে, গরু হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর্য্যন্ত। মেয়েরা সেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ঔষধ কিনিতেছে। সুশীলার সঙ্গিনী হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে সেখান হইতে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিল, বলিল—চলো মৌরীফুল দেখিগে কেমন পূজো হচ্চে।

একটুখানি মন্দিরে দাঁড়াইয়া সুশীলা একটা ছুতায় সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঔষধ-বেচা বুড়ীর নিকট দাঁড়াইল। সেখানে তখন কেহ ছিল না, বুড়ী বলিল—কি চাই?

সুশীলার মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

বুড়ী বলিল—"আর বল্‌তে হবে না মা-ঠাকরুণ। তা তোমার তো এখনও ছেলে-পিলে হবার বয়েস যায়নি, ও-বয়েসে অনেকের—

সুশীলা সলজ্জভাবে বলিল—তা নয়।

বুড়ী বলিল—এবার বুঝ্‌লাম মা-ঠাক্‌রুণ—তা যদি হয়, তা হ'লে তোমার সোয়ামীর বার-মুখো টান আছে। একটা ওষুধ দিই, নিয়ে যাও, এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হ'য়ে যাবে—ওরকম কত হয় মা-ঠাক্‌রুণ—

বুড়ী একটা শিকড় তুলিয়া বলিল—এই নাও, বেটে খাইয়ে দিও। কেউ টের না পায়, টের পেলে আর ফল হবে না। আট আনা লাগ্‌বে।

স্বামীর বারমুখো টান আছে—একথা শুনিয়া সুশীলা খুব দমিয়া গেল। তাহার আঁচলে একটা আধুলী বাঁধা ছিল, আজ্‌কার দিনে জিনিষটা-আস্‌টা কিনিবার জন্য সে ইহা বাড়ী হইতে শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিয়াছিল। বাড়ীর বার হওয়া তো বড় ঘটে না, কাজেই এটা তাহার পক্ষে একটা উৎসবের দিন। আধুলীটি শাশুড়ীকে লুকাইয়া আনিবার কারণ—মোক্ষদা ঠাক্‌রুণ জানিতে পারিলে ইহা এতক্ষণ তাহার আঁচলে থাকিত না। সুশীলা আঁচল হইতে আধুলীটি খুলিয়া বুড়ীকে দিল এবং খাওয়াইবার প্রণালী জানিয়া লইয়া শিকড়টি কাপড়ের মধ্যে গোপনে বাঁধিয়া লইল।

পূজা দেওয়া সাঙ্গ হইয়া গেল। সকলে আবার আসিয়া নৌকায় উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছাকাছি আসিলে সুশীলা বলিল,—ভাই, তুমি এখন দিন কতক আছ তো?

—না ভাই, আমি কাল কি পরশু চলে' যাব। তা হ'লেও তোমায় ভুলবো না মৌরীফুল, তোমার মুখখানি আমার মনে থাক্‌বে ভাই—চিঠি পত্র দেবে তো? এবার পাড়াগাঁয়ে এসে তোমায় কুড়িয়ে পেলাম—তোমায় কখনো ভুল্‌ব না।

সুশীলার চোখে জল আসিল, এত মিষ্ট কথা তাহাকে কে বলে? সে কেবল শুনিয়া আসিতেছে সে দুষ্ট, একগুঁয়ে ঝগ্‌ড়াটে।

তাহার হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, ইহা তার মায়ের দেওয়া আংটি, প্রথম বিবাহের পর তাহার মা তাহার হাতে এটি পরাইয়া দিয়াছিলেন। সেটি হাত হইতে খুলিয়া সে সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া বলিল—দেখি ভাই

তোমার আঙুল, তুমি হলে মৌরীফুল, তোমায় খাওয়াবার কথা, কাপড় দেওয়ার কথা—এই আংটিটা আমার মায়ের দেওয়া, তোমায় দিলাম, তবু এটা দেখে তুমি গরীব মৌরী-ফুলকে ভুলে যাবে না।

সুশীলা আংটিটা সঙ্গিনীর হাতে পরাইয়া দিতে গেল,—বউটি চট্ করিয়া হাত টানিয়া লইয়া বলিল—দূর্ পাগল! না ভাই, এ রাখো—তোমার মায়ের দেওয়া আংটি—এ কেন আমায় দিতে যাবে? না ভাই—

সুশীলা জোর করিতে গেল—হোক্ ভাই, দেখি—মায়ের দেওয়া বলেই—

বউটি বলিল—দূর্! না ভাই, ও-সব রাখো—সে বরং—

সুশীলা খুব হতাশ হইল। মুখটি তাহার অন্ধকার হইয়া গেল—সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গ্রামের ঘাটে নৌকা লাগিল। বউটি সুশীলার হাত ধরিয়া বলিল,—পায়ে পড়ি ভাই মৌরীফুল, রাগ কোরো না। আচ্ছা, কেন তুমি শুধু শুধু তোমার মায়ের দেওয়া আংটি আমায় দিতে যাবে ভাই?—আচ্ছা, তুমি যদি দিতে চাও এই পূজোর সময় আস্‌বো—অন্য কিছু বরং দিও—একদিন না হয় খাইয়ো—আংটি কেন দেবে ভাই!—আর আমায় ভুল্‌বে না তো ভাই?

সুশীলা ব্যগ্রভাবে বলিল—তোমায় ভুল্‌বো ভাই মৌরীফুল? কখ্‌খোনো না—তুমি কোন্ জন্মে যে আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে ভাই মৌরীফুল—

তাহার পর সে একটু আনাড়ি ধরণে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হ'লে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল—তোমায় কি ভুল্‌তে পারি?—

কথা শেষ না করিয়াই সে দুইহাতে সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।

কলিকাতার বউটি এই অদ্ভুতপ্রকৃতি সঙ্গিনীর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানা বার বার সস্নেহে চুম্বন করিল—তার পর দুজনেই চোখের জলে ঝাপ্‌সাদৃষ্টি হইয়া দুজনের কাছে বিদায় লইল।

দিন কতক কাটিয়া গেল। কিশোরী বাটী নাই, কি-একটা কাজে অন্য গ্রামে গিয়াছে, ফিরিতে ২।১ দিন দেরী হইবে। মোক্ষদা সকালে উঠিয়া জমিদার-গৃহিণীর আহ্বানে তাঁহার সাবিত্রী-ব্রত-প্রতিষ্ঠার আয়োজনে সাহায্য করিতে চৌধুরী-বাড়ী চলিয়া গেলেন। যাবার সময় বলিয়া গেলেন,—বৌমা, আমার ফের্‌বার কোনো ঠিক নেই, রান্না-বান্না করে' রেখো, আমি আজ আর কিছু দেখ্‌তে পার্‌ব না, চৌধুরী-বাড়ীর কাজ—কখন মেটে বলা যায় না।

একথা মোক্ষদার না বলিলেও চলিত। কারণ ভোরে উঠিয়া বাসন-মাজা জল-তোলা হইতে আরম্ভ করিয়া এ সংসারের সমস্ত কাজের ভারই ছিল সুশীলার উপর। এ সংসারে কিশোরীর বিবাহের পর কোনো দিন ঝি-চাকর প্রবেশ করে নাই—যদিও পূর্ব্বে বাড়ীতে বরাবরই একজন করিয়া ঝি থাকিত। সুশীলার খাটুনিতে কোন ক্লান্তি ছিল না, খাটিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট ছিল - যখন মেজাজ ভাল থাকিত, তখন সমস্ত দিন নীরবে ভূতের মত খাটিয়াও সে বিরক্ত হইত না।

শাশুড়ী চলিয়া গেলে অন্যান্য কাজকর্ম্ম সারিয়া সুশীলা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল একখানিও কাঠ নাই। কাঠ অনেক দিনই ফুরাইয়া গিয়াছে, একথা সুশীলা বহুবার শ্বশুরকে জানাইয়াছে। রামতনু মধ্যে মধ্যে মজুর ডাকাইয়া কাঠ কাটাইয়া লইতেন, এবার কিন্তু অনেকদিন হইল তিনি আর এদিকে দৃষ্টি দেন নাই। কিশোরীর দোষ নাই, কেননা সে বড় বাড়ীতে থাকিত না, সংসারের সংবাদ তেমন রাখিতও না। আসল কথা হইতেছে এই যে রান্নাঘরের পিছনে খিড়্‌কীর বাইরে অনেক শুক্‌না বাঁশ ও ডালপালা পড়িয়া আছে—সুশীলা রান্না চড়ানোর পূর্ব্বে বা রান্না করিতে করিতে প্রয়োজন-মত এগুলি দা দিয়া কাটিয়া লইয়া কাজ চালাইত। রামতনু দেখিলেন—কাজ যখন চলিয়া যাইতেছে তখন কেন অনর্থক কাঠ কাটিবার লোক ডাকিয়া আনা—আসিলেই এখনি একটা টাকা খরচ তো? পুত্রবধূ বকিতেছে বকুক্, কারণ বকুনিই উহার স্বভাব।

কাঠ নাই দেখিয়া সুশীলা অত্যন্ত চটিয়া গেল,

দিকে বাড়ীতেও এমন কেহ নাই যাহাকে বকিয়া গায়ের ঝাল মিটায়, কাজেই সে আপন মনে চীৎকার করিতে লাগিল,—পার্‌ব না, রোজ রোজ এমন করে' সংসার করা আমায় দিয়ে হ'য়ে উঠ্‌বে না—আজ দুমাস ধরে' বল্‌চি কাঠ নেই, কাঠ নেই—এদিকে রান্নার বেলা ঠিক আছেন সব, তার একটু এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই—কি দিয়ে রাঁধ্‌বে? হাত পা উনুনের মধ্যে দিয়ে দেবে নাকি? রোজ রোজ কাঠ কাটো, কেটে দাও;—অত সুখে আর কাজ নেই—থাকুক হাঁড়ী পড়ে', যিনি যখন আস্‌বেন, তিনি তখন করে' নেবেন—

রাঁধিবার কোন আয়োজন সে করিল না। খানিকটা বসিয়া বসিয়া তাহার মনে হইল ততক্ষণ মশলাগুলা বাটিয়া রাখা যাক্‌-সে মাঝে মাঝে কাজের সুবিধার জন্য কয়েকদিনের মসলা একসঙ্গে বাটিয়া রাখিত।

বেলা প্রায় দশটার সময় একটি অল্পবয়সী ফুটফুটে বউ, পরনে একখানা পুরানো চেলীর কাপড়, হাতে থাকিবার মধ্যে দুগাছি শাঁখা—একটি বাটি হাতে রান্নাঘরের দোরের কাছে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিয়া বলিল—দিদি আছ নাকি?

সুশীলা মশলা বাটিতে বাটিতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল—আয় আয় ছোট বউ—আয় না ঘরের মধ্যে—ঠাকুরুণ নেই—

বউটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—একি দিদি, এত বেলা হ'ল, এখনও রান্না চড়াওনি যে!

সুশীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—রান্না চড়াব! হাঁড়ী-কুঁড়ি ভেঙে ফেলিনি এই কত!—

বউটির চক্ষে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, সে বলিল—না দিদি, ওসব কিছু কোরো না, ভাত চড়িয়ে দাও লক্ষ্মীটি, নৈলে জান তো কিরকম লোক সব—

– দেব--দেখ্‌বে সব আজ কিরকম মজা, রোজ রোজ কাঠ কাট্‌ব আর ভাত রাঁধ্‌ব, উঃ!

—কাঠ নেই বুঝি? আচ্ছা, দা-খানা দাও দিদি, আমি দিচ্ছি কেটে।

—তোর কি দায় তুই দিতে যাবি? বস্ ঠাণ্ডা হ'য়ে—যাদের গরজ আছে তারা নিজেরা বুঝুক্ গিয়ে—

—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, দাও রান্নাটা চড়িয়ে, জান তো ওরা—

—তুই বস্ দেখি ওখানে চুপ করে', দেখিস্ এখন মজা—আজ দুমাস ধরে' রোজ বল্‌ছি কাঠ নেই, কথা কানে যায় না কারুর,—আজ মজাটি দেখাব—

সুশীলার একগুঁয়েমিতে বউটি কিছু ভীতা হইল, কারণ মজা কোন্ পক্ষ দেখিবে এ সম্বন্ধে তাহার একটু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

এই বউটি রামতনু মুখুয্যের জ্যাঠতুত ভাই রামলোচন মুখুয্যের পুত্রবধূ। পাশেই এদের বাড়ী। রামলোচনের অবস্থা খুবই খারাপ—তা সত্ত্বেও তিনি বছর দুই হইল ছেলের বিবাহ দিয়াছেন—রামলোচনের স্ত্রী ছিল না, পুত্র-বধূই গৃহিণী। দুরবস্থার সংসারে ছেলেমানুষ বউকে সংসার করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে অসময়ে বাটি হাতে খুঁচি হাতে এ বাড়ীতে হাত পাতিয়া তেলটা নুনটা লইয়া যাইত, চাল না থাকিলে আঁচলে বাঁধিয়া চাল লইয়া যাইত—ধার বলিয়াই লইয়া যাইত—কখনও শোধ করিতে পারিত, কখনও পারিত না। মোক্ষদা ঠাকুরুণকে বউটি বড় ভয় করে—তিনি থাকিলে জিনিষপত্র তো দেনই না, যদি বা দেন তাহা বহু মিষ্ট বাক্য বর্ষণ করিবার পর। তবু বউটির আসিতে হয়, কি করিবে, অভাব। সুশীলা তাহাকে মোক্ষদা ঠাকুরুণের আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া গোপনে এটা ওটা যখন যাহা দর্‌কার সাধ্যমত সাহায্য করিত। সামান্য একবাটি তেল লইয়া গেলেও হুঁসিয়ার মোক্ষদা ঠাকুরুণ তাহা কখন ভুলিতেন না—গলা টিপিয়া কড়াক্রান্তিতে তাহা আদায় করিয়া ছাড়িতেন। সুশীলা ছিল অগোছালো ও অন্যমনস্কধরণের মানুষ, সে ধার দিয়া অত শত মনেও রাখিত না, বা সামান্য তেল নুন ধার দিয়া আদায় করিবার কোন চেষ্টাও করিত না,—শোধ দিতে আসিলে অনেক সময় বলিত,—ওই তুই আবার দিতে এলি ভাই ছোট বৌ; ওর আবার নেব কি?—যা,—ও তুই নিয়ে যা ভাই।

সুশীলা আপন মনে খানিকক্ষণ বকিয়া বউটির দিকে চাহিয়া বলিল—তার পর, তোর রান্নাবান্না ?

বউটি বাটিটা আঁচল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, বাহির করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল—সেদিনকার সেই তেল নিয়ে গিয়েছিলাম দিদি, তা আমাদের এখনও আনা হয়নি। আজ রাঁধ্‌বার নেই—একসঙ্গে দুদিনের দিয়ে যাব—সেইজন্তে—

সুশীলা বলিল—আচ্ছা, নিয়ে আয় দেখি বাটি। দেখি কি আছে, আমাদেরও বুঝি তেল আনা হয়নি।

পাত্রে যতটুকু তেল ছিল সুশীলা সবটুকু এই কুণ্ঠিতা দরিদ্রা গৃহলক্ষ্মীটিকে ঢালিয়া দিল। বউটি চলিয়া যাইবার সময় মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি, দাও রান্না চড়িয়ে—

সুশীলা বলিল—তুই পালা দেখি—আমি ওদের মজা না দেখিয়ে আজ আর কিছুতে ছ'ড়্‌চিনে—

বেলা ১২টার সময় মোক্ষদা ঠাকরুণ আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া হৈ চৈ বাধাইয়া দিলেন—প্রকৃতই ইহাতে রাগ হইবারই কথা। একটু পরে রামতনু আসিলেন, তিনি ব্যাপার দেখিয়া দালানে গিয়া আপন-মনে তামাক টানিতে সুরু করিলেন। ঝগড়া ক্রমে খুব চাগাইয়া উঠিল, মোক্ষদা উচ্চৈঃস্বরে সুশীলার কুলজী গাহিতে লাগিলেন—সুশীলাও যে খুব শান্তশিষ্ট, এ অপবাদ তাহাকে শত্রুতেও দিতে পারিত না, কাজেই ব্যাপার যখন খুব বাধিয়া উঠিয়াছে এমন সময় কোথা হইতে কিশোরী আসিয়া হাজির হইল—যদিও আজ তাহার ফিরিবার কথা ছিল না, তবুও কাজ মিটিয়া যাওয়াতে সে আর সেখানে অপেক্ষা করে নাই। মোক্ষদা ছেলেকে পাইয়া হাঁকডাক আ'ও বাড়াইয়া দিলেন। কিশোরী এত বেলায় বাড়ী আসিয়া এ অশান্তির মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল—তাহার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল স্ত্রীর উপর। হাতের গোড়ায় একখানা শুক্‌না চেলা-কাঠ পড়িয়া ছিল, সেইটা লইয়াই লাফাইয়া সে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিল—সুশীলা তখনও বসিয়া বাট্‌না বাটিতেছিল—স্বামীকে শুক্‌না কাঠ হাতে লইয়া বীরদর্পে রান্নাঘরে লাফাইয়া উঠিতে দেখিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল—আত্মরক্ষার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া হাত দুটো তুলিয়া নিজের দেহটা আড়াল করিবার চেষ্টা করিল—কিশোরী প্রথমতঃ স্ত্রীর খোঁপা ধরিয়া এক হেঁচ্‌কা টান দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল, তাহার পর তাহার পিঠে কয়েক ঘা চেলা-কাঠের বাড়ি মারিয়া তাহার গলা ধরিয়া প্রথমে এক ধাক্কা মারিল রান্নাঘরের দাওয়ায় এবং তথা হইতে এক ধাক্কা মারিল একেবারে উঠানে। ধাক্কার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া সুশীলা মুখ থুব্‌ড়িয়া উঠানে পড়িয়া গেল—মার আরও চলিত, কিন্তু রামতনু তামাক খাইতে খাইতে ছেলের কাণ্ড দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িলেন।

পাশের বাড়ীর বউটি তখন শ্বশুর ও স্বামীকে খাওয়াইয়া সবে নিজে খাইতে বসিতেছিল, হঠাৎ এ-বাড়ীর মধ্যে মারের শব্দ শুনিয়া সে খাওয়া ফেলিয়া সুশীলাদের খিড়্‌কীতে ছুটিয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল—সুশীলা উঠানে দাঁড়াইয়া আছে; সর্ব্বাঙ্গে ধূলা, বাট্‌নার পাত্রের উপর পড়িয়া গিয়াছিল, কাপড়ে চোপড়ে হলুদের ছোপ; মাথার খোঁপা এক ধারে খুলিয়া কতক চুল মুখের উপর, কতক পিঠের উপর পড়িয়াছে; গাঙ্গুলী-বাড়ী হইতে দুটো ছেলে ব্যাপার দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, আরও দু একজন পাড়ার মেয়ে সাম্‌নের দরজায় গিয়া উঁকি মারিতেছে—ওদিকে পাঁচীলের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহার নিজের শ্বশুর রামলোচন মজা দেখিতেছেন।

চারিদিকের কৌতুহলদৃষ্টির মাঝখানে, সর্ব্বাঙ্গে হলুদের ছোপ ও ধূলিমাখা, বিস্রস্তকুন্তলা, অপমানিতা দিদিকে অসহায়ভাবে উঠানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের মধ্যে কিরকম করিয়া উঠিল—কিন্তু সে একে ছেলেমানুষ তাহাতে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, শ্বশুর ভাসুর এবং এক-উঠান লোকের মধ্যে বাড়ীর ভিতর ঢুকিতে না পারিয়া প্রথমটা সে খিড়কীর বাহিরে আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল, কিন্তু গাঙ্গুলী-বাড়ীর প্রৌঢ় গাঙ্গুলী মহাশয়ও যখন হুঁকা-হাতে,—কি হে রামতনু, বলি ব্যাপারখানা কি শুনি, বলিয়া বাড়ীর মধ্যের উঠানে আসিয়া হাজির হইলেন, তখন সে আর থাকিতে

না পারিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সুশীলার হাত ধরিয়া খিড়কী-দোর দিয়া বাহিরে লইয়া গিয়াই হঠাৎ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—কেন ও-রকম করতে গেলে দিদিমণি, লক্ষ্মীটি, তখনই যে বারণ করলাম ?—

তার পরদিন দুপুরবেলা সুশীলা রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। কিশোরী খাইতে বসিয়াছে, মোক্ষদা ঠাকরুণ কি প্রয়োজনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, সুশীলা পিছন ফিরিয়া ভাত বাড়িতে বাড়িতে স্বামীর ডালের বাটিতে কি গুলিতেছে, পাশে একটা ছোট বাটি। মোক্ষদার কিরকম সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—বউমা, তোমার বাটিতে কি ?—কি মেশাচ্ছ ডালের বাটিতে ?

সুশীলা পিছন ফিরিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া যেন কেমন হইয়া গেল, তাহার চোখমুখের ভাব দেখিয়া মোক্ষদার সন্দেহ আরও বাড়িল—তিনি বাটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন তাহাতে সবুজ মত কি একটা বাটা।

তিনি কড়াস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বেটেছ এতে ?

তিনি দেখিলেন পুত্রবধূ উত্তর দিতে পারিতেছে না, তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার পর একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটিল। মোক্ষদা ঠাকরুণ বাটি হাতে—ওমা কি সর্ব্বনাশ। আর একটু হ'লে হয়েছিল, গো,—বলিয়া উঠানে আসিয়া চীৎকার করিয়া হাট বাধাইলেন।

কিশোরী দালান হইতে উঠিয়া আসিল, রামতনু আসিলেন, গাঙ্গুলী-বাড়ীর মেয়েপুরুষ আসিল, আরও অনেকে আসিল।

মোক্ষদা সকলের সামনে সে বাটিটা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন—দ্যাখো তোমরা সকলে, তোমরা ভাব শাশুড়ী-মাগী বড় দুষ্টু,—নিজের চোখে দেখে' নাও ব্যাপার, কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত এখুনি, যদি আমি না দেখতাম—দোহাই বাবা তারকনাথ, কি ঠেকানই আজ ঠেকিয়েছ—

এক-উঠান লোক—সকলেই শুনিল রামতনুর দুরন্ত পুত্রবধূ স্বামীর ভাতে বিষ না কি মিশাইয়া খাওয়াইতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। কেউ অবাক্ হইয়া গেল, কেউ মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—ওসব আমরা অনেককাল জানি, আমরা রীত্ দেখলেই মানুষ চিনি, তবে পাড়ার মধ্যে বলে' এতদিন—

কে একজন বলিল—জিনিসটা কি তা দেখা হয়েছে ?—

মোক্ষদা ঠাকরুণের গাল-বাদ্যের রবে সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

গাঙ্গুলী মহাশয় রামতনুকে বলিলেন—গুরু রক্ষা করেছেন! এখন যত শীগ্‌গির বিদেয় করতে পার তার চেষ্টা করো, শাস্ত্রে বলে, দুষ্টা ভার্য্যে! আর একদিনও এখানে রেখো না।

সমস্ত দিন পরামর্শ চলিল।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হইল কাল সকালেই গাড়ী ডাকিয়া আপদ্ বিদায় করা হইবে, আর একদিনও এখানে না, কি জানি কখন কি বিপদ্ ঘটাইবে। বিশেষতঃ পাড়ার মধ্যে ও-রকম দজ্জাল বউ থাকিলে পাড়ার অন্য অন্য বউঝিও দেখাদেখি ঐরকম হইয়া উঠিবে।

সেদিন রাত্রে সুশীলাকে অন্য একঘরে শুইতে দেওয়া হইল—ইহা মোক্ষদাঠাকরুণের বন্দোবস্ত, কাল সকালেই যখন যেখানকার আপদ্ সেখানে বিদায় করিয়া দেওয়া হইবে, তখন আর তাহার সঙ্গে সম্পর্ক কিসের ?

রাত্রে শুইয়া শুইয়া কত রাত পর্য্যন্ত তাহার ঘুম আসিল না। ঘরের জানালা সব খোলা, বাহিরের জ্যোৎস্না ঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার মনে কাল ও আজ এই দুইদিন অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে,—সে স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ, লাঞ্ছনা ভোগের অপমান সে ইহার পূর্ব্বে কখনও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, যদিও মারধর ইহার পূর্ব্বে বহুবার খাইয়াছে। তাহার একটা কারণ এই যে আজ ও কালকার দিনের মত শ্বশুরশাশুড়ী ও এক-উঠান লোকের সামনে এভাবে অপমানিতাও সে কোনদিন হয় নাই। তাই আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চোখের জল বাঁধ মানিতেছে না—কাল মার খাইয়া পিঠ কাটিয়া গিয়াছে।

ও হাত দিয়া ঠেকাইতে গিয়া হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গিয়া হাতও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না, সে পান খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত—সেই স্বামী এরূপ করিল?

পান খাওয়ানোর কথাটিই সুশীলার বার-বার মনে আসিতে লাগিল। রাত্রের জ্যোৎস্না ক্রমে আরো ফুটিল। তখন চৈত্রমাসের মাঝামাঝি, দিনে তখন নতুন-কচি-পাতা-ওঠা গাছের মাথার উপর উদাস অলস বসন্ত-মধ্যাহ্ন ধোঁয়া ধোঁয়া রৌদ্রের উত্তরীয় উড়াইয়া বেড়ায়, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন-গুলো প্রস্ফুট-প্রসূন-সুরভির মধ্য দিয়া চলিয়া চলিয়া নদীর ধারের সিমুলতলায় সন্ধ্যার ছায়ার কোলে গিয়া ঢলিয়া পড়ে, পাড়াগাঁয়ের আমবনে বাঁশবনে জ্যোৎস্না-ঝরা বাতাসে সারারাত কত কি পাখীর আনন্দ-কাকলী, বসন্ত-লক্ষ্মীর প্রথম প্রহরের আরতির শেষে বনের গাছপালা তখন আবার নূতন করিয়া টাট্‌কা ফুলের ডালি সাজাইতেছে।

শুইয়া শুইয়া সুশীলা ভাবিল, জগতে কেউ তাহাকে ভালবাসে না—কেবল ভালবাসে তাহার মৌরীফুল। মৌরীফুল পত্র লিখিয়াছে, তাহার কথা মনে করিয়া সে রোজ রাত্রে কাঁদে, তাহাকে না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার কষ্ট হইতেছে। সত্য সত্য যদি কেউ তাহাকে ভালবাসে তো সে ওই মৌরীফুল—আর ভাল-বাসে ওই ছোট বউটা। আহা, ছোট বউএর বড় কষ্ট! ভগবান্ দিন দিলে সে ছোট বউএর দুঃখ ঘুচাইবে। কিন্তু স্বামী যে তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছে? ও কিছু না, অভাবে পড়িয়া উহার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে, নইলে সেও কি এমন ছিল? মৌরীফুলের বর তো কত জায়গায় বেড়ায়, মৌরীফুলকে একখানা পত্র লিখিয়া দেখিলে হয়, যদি উহার কোন চাকরী করিয়া দিতে পারে। চাকরী হইলে সে আর তার স্বামী একটা আলাদা বাসায় থাকিবে, আর কেহই সেখানে থাকিবে না,...মাঠের ধারের ছোট ঘরখানি সে মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিবে, উঠানে কুমড়ার মাচা বাঁধিবে, বাজার-খরচ কমিয়া যাইবে। লোকে বলে সে গোছাল নয়, একবার বাসায় যাইলে সে দেখাইয়া দিবে যে গোছাল কিনা... আচ্ছা, ওই বাড়ীখানায় যদি আগুন লাগে! না—আগুন দিবে কে? ছোট বউ! উঁহুঁ, দিতে তাহার শাশুড়ী ঠাক্‌রুণই দিবে, যেরকম লোক!

জানালার বাহিরে জ্যোৎস্নায় ওগুলা কি ভাসিতেছে? সেই যে তাহার স্বামী গল্প করিত জ্যোৎস্না-রাত্রে পরীরা সব খেলা করিয়া বেড়ায়, তাহারা নয় তো? তাহার বিবাহের রাত্রে কেমন বাঁশী বাজিয়াছিল, কেমন সুন্দর বাঁশী, ও-রকম বাঁশী নদীর ধারে কত পড়িয়া থাকে...আচ্ছা পিওনে মৌরীফুলের একখানা চিঠি দিয়া গেল না? লাল চৌকা খাম, খুব বড়, সোনার জল দেওয়া, আতর না কি মাখান।

পরদিন সকাল বেলা পুত্রবধূর উঠিবার দেরী হইতে লাগিল দেখিয়া মোক্ষদা ঠাক্‌রুণ ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন পুত্রবধূ জ্বরের ঘোরে অঘোর অচৈতন্য অবস্থায় ছেঁড়া মাদুরের উপর পড়িয়া আছে, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল।

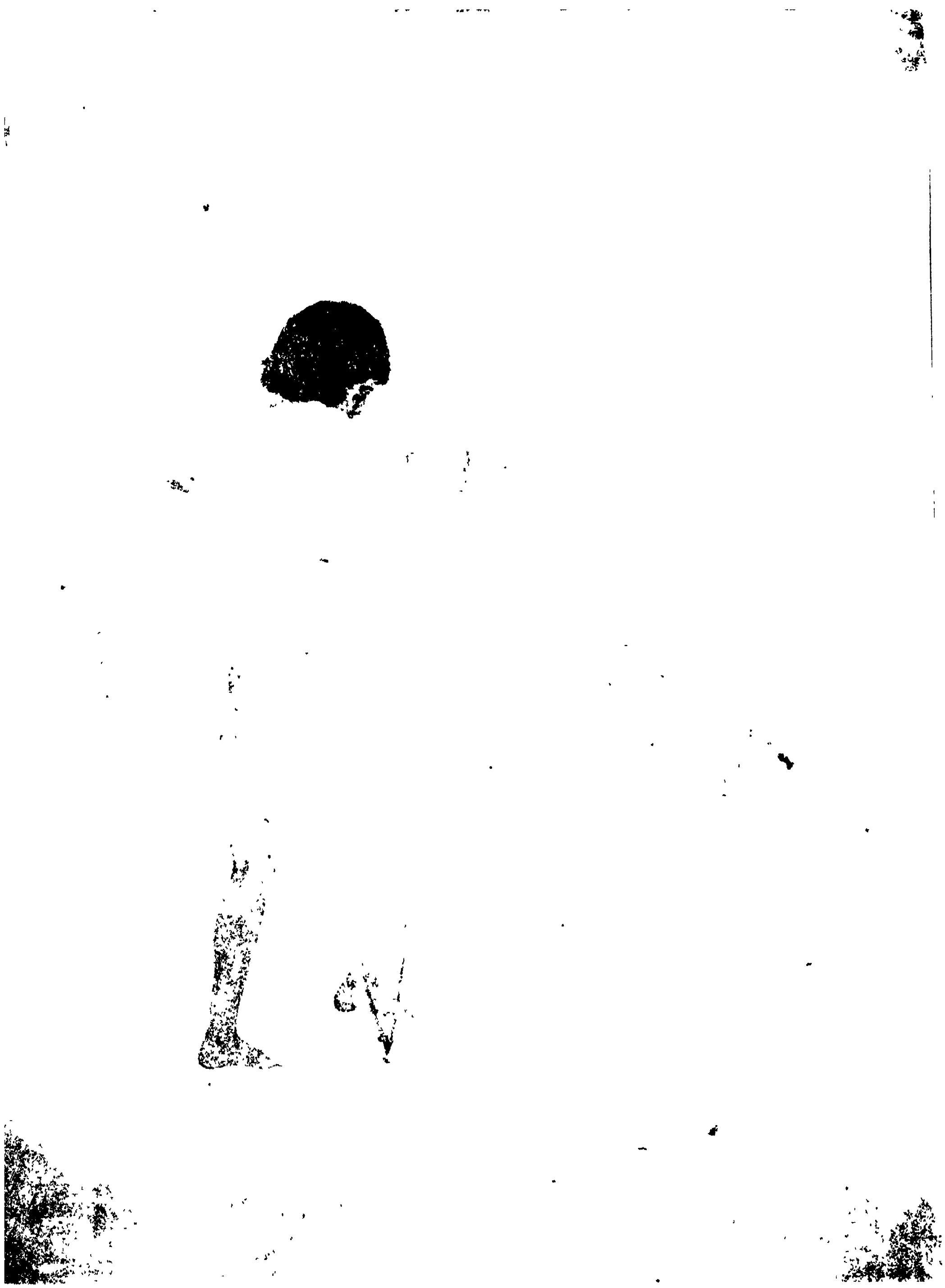
সেদিন সমস্ত রাত একভাবেই কাটিয়া গেল, তাহার দিকে বিশেষ কেহ নজর করিল না, তার পরদিন বেগতিক বুঝিয়া রামতনু ডাক্তার আনিলেন। দুপুরের পর হইতে সে জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতে লাগিল—সত্যি মৌরীফুল তা নয়, ওরা যা বল্‌ছে—আমি অন্য ভেবে—

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে সে মারা গেল।

তাহার মৃত্যুতে গাঙ্গুলী-পাড়ার হাড় জুড়াইয়া গেল, পাড়ার কাকচিলগুলাও একটু সুস্থির হইল। কিছুদিন পরেই কিশোরীর দ্বিতীয় পক্ষের বউ মেঘলতা ঘরে আসিল। দেখিলে চোখ জুড়ায় এমন সুন্দর মেয়ে, কর্ম্মপটু, হুসিয়ার, গোছাল। দ্বিতীয়বার বিবাহের অল্পদিন পরেই যখন কিশোরী পালেদের ষ্টেটে ভাল চাকরীটা পাইল, তখন নতুন বৌএর লক্ষ্মীভাগ্য দেখিয়া সকলেই খুব খুসি হইল।

সংসারের অলক্ষ্মীস্বরূপা আগের পক্ষের বউএর নাম সে সংসারে আর কোনদিন কেহ করে নাই।

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়



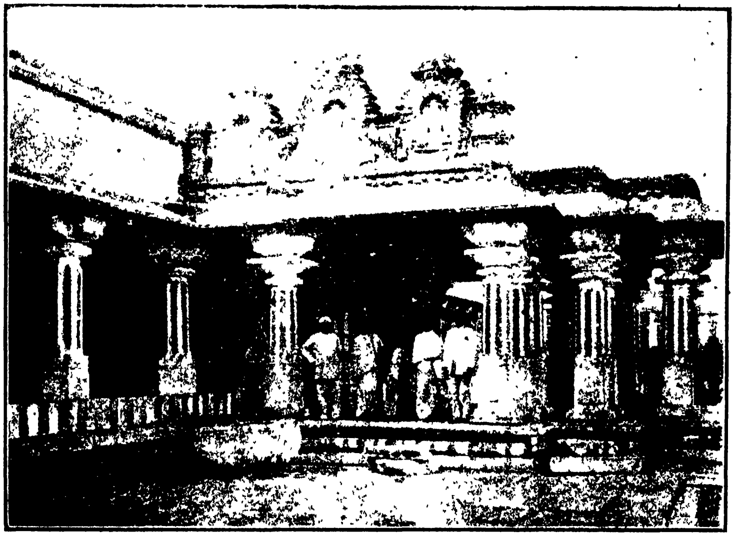
বাঁশী

চিত্রকর শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

... & SONS CALCUTTA

মহীশূর রাজ্যের তীর্থস্থান

রামায়ণে মহীশূর রাজ্যের অনেক তীর্থস্থানের নামের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের পৌরাণিক হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য ধর্ম্মমতালম্বীদেরও অনেক প্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূরে অবস্থিত। যদিও পূর্ব্বে বহু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মহীশূরে বাস করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে এখানে তাহাদের কোন প্রসিদ্ধ তীর্থ নাই। কিন্তু জৈন-শৈব-বৈষ্ণবমতাবলম্বীদের অনেক সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ মহীশূর রাজ্যে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে মহীশূর রাজ্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে প্রয়াস পাইলাম।



শ্রবণবেলগোলার মন্দির

শ্রবণবেলগোলা।— মহাবীর-প্রবর্ত্তিত জৈনধর্ম্মাবলম্বীদের শ্রবণবেলগোলা একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে তাহাদের প্রধান গুরু বাস করেন। সেই কারণে ভারতবর্ষের সমস্ত জৈনরাই এ স্থানটিকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকে। এখানে গোমতেশ্বরের একটি বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটি প্রায় ৬০ ফুট উচ্চ ও পাহাড় খুদিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে অনেক মন্দিরাদি আছে। এখানে একটি সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে ধর্ম্মজীবন যাপন করেন। এখানকার পর্ব্বতোপরিস্থ প্রাচীনতম মন্দিরটি সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে এবং পর্ব্বতের নাম হইয়াছে চন্দ্রবেট্ট। যে পর্ব্বতের উপর বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তিটি খোদিত হইয়াছে তাহার নাম ইন্দ্রবেট্ট। পর্ব্বতটি সানুদেশের গ্রাম হইতে প্রায় চারিশত ফুট উচ্চে উঠিয়াছে। মন্দিরগামী দর্শকগণকে পাহাড়ের পাদদেশে জুতা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পাদুকাবিহীন অবস্থায় এই পর্ব্বতারোহণ করা বিশেষ কষ্টকর। মূর্ত্তিটি উত্তরমুখী অবস্থায় দণ্ডায়মান। যে ভাস্কর এই বিশাল মূর্ত্তিটি প্রস্তুত করিয়াছেন তিনি নিপুণতার সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পাদন করেন নাই। কারণ মূর্ত্তিটির বাহুদ্বয় শরীরের অনুপাতে বড় হইয়াছে। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাপানুযায়ী হয় নাই। নির্ব্বিকারচিত্ত ধ্যানীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভাস্কর মূর্ত্তিটির দেহের নিম্নভাগে উইঢিপি ও পদদ্বয়ে লতাপাতা খোদিত করিয়াছেন! যেন ধ্যাননিরত সন্ন্যাসী ভগবৎচিন্তায় এতই বিভোর যে নিজের দেহের প্রতি মনোনিবেশ করিবার কোনই আগ্রহ নাই। এখানে প্রতিবৎসর ছোট ছোট উৎসব হয়। দশ বার বৎসর অন্তর এই বিশাল মূর্ত্তিটির অঙ্গ ঘৃত দ্বারা ধৌত করা হয়। সেই সময় এখানে খুব বড় উৎসব হইয়া থাকে ও ধনী জৈনরা এই ব্যাপারে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করেন।

শৃঙ্গেরী।—ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ মঠগুলির মধ্যে শৃঙ্গেরী মঠ অন্যতম। মহীশূর রাজ্যের তীর্থস্থানগুলির মধ্যে



গোমতেশ্বর মূর্ত্তি শ্রবণবেলগোলা।



গোমতেশ্বর মূর্ত্তির পশ্চাদভাগ

স্থানটি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। কথিত আছে বিভাণ্ডক ঋষি এখানে প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং রাজা দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের পুরোহিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। রামায়ণীয় যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এস্থানটির মাহাত্ম্য কমিয়া যায় না। শৈব শঙ্করাচার্য্যও এস্থানটিকে নানা উপায়ে মহিমা-মণ্ডিত করিয়াছেন। শঙ্করাচায্য ও তাঁহার পরবর্ত্তী স্থলাভিষিক্তগণ নানা-প্রকার প্রতিষ্ঠান স্থাপন করাতে এই স্থানটি শৈব উপাসকদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানরূপে গণ্য হইয়াছে। শৃঙ্গেরী মঠের গুরু সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী সর্ব্বপ্রকার লোক কর্ত্তৃক



শ্রবণবেলগোলার পবিত্র কুণ্ড

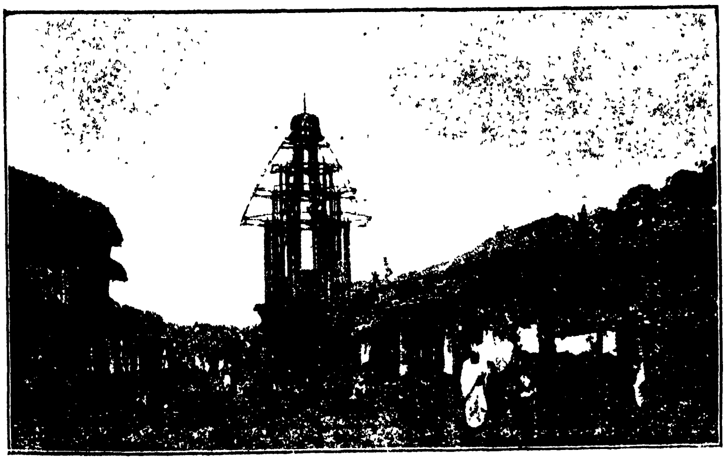
বিশেষরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি যখন তাঁহার পাল্কীতে করিয়া বহির্গত হন তখন সহস্র সহস্র নরনারী



শৃঙ্গেরীর নব-নির্ম্মিত মন্দির



শৃঙ্গেরী মন্দিরের সোপানাবলীতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদল



শৃঙ্গেরীর রথ

সম্পাদন করিতেছেন। শৃঙ্গেরী গ্রামে যাইবার পথ অত্যন্ত দুর্গম। এখানে শতাধিক ছোট ছোট মন্দির আছে। পথ চলিতে চলিতে সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত মন্দিরটির নাম বিদ্যাশঙ্কর। এই মন্দিরটি সুন্দররূপে কারুকার্য্যখচিত। এখানকার গুরু নদীর উপরে একটি নবনির্ম্মিত গৃহে বাস করেন। এই গৃহ আধুনিক কায়দায় নির্ম্মিত। ভেলার সাহায্যে এই গৃহে গমনাগমন করিতে হয়। নদীর তীরে বাঁধা-

নগ্নপদে তাঁহার অনুগমন করে। তিনি যেখানে পদার্পণ করেন সেখানেই রাজার ন্যায় সম্মান ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। কয়েক বর্ষ হইল একটি যুবক এই মঠের গুরু

ঘাট আছে—সেখানে প্রত্যহই শত শত পোষা মৎস্য খেলা করে। এখানে প্রতিবৎসরই কয়েকটি উৎসব হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত উৎসবটির নাম নবরাত্রি।



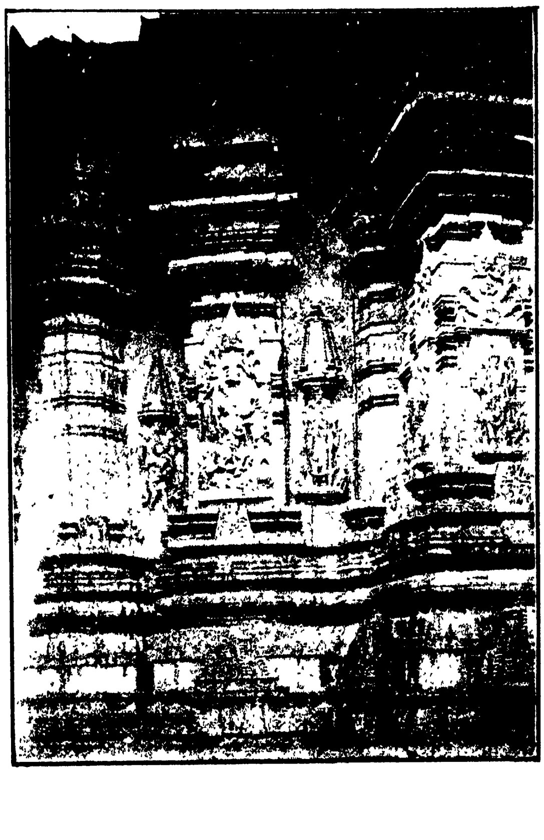
বেলুড় মন্দির

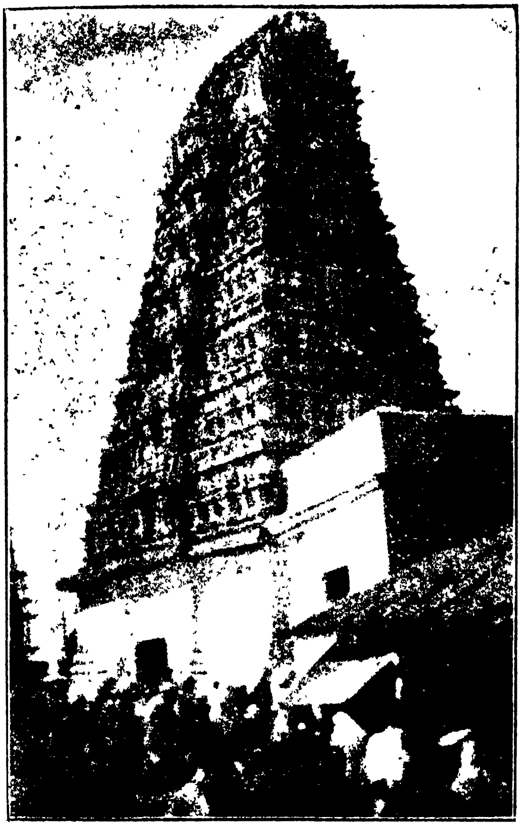
লোকের বিশ্বাস সেইজন্য দেবতা সময় সময় সুবৃহৎ পাদুকা পরিয়া এই পর্ব্বতে গমন করেন। এই কারণে মন্দিরে এক জোড়া বৃহৎ পাদুকা আছে। পাদুকা পুরাতন হইয়া গেলে নির্দ্দিষ্ট কারিগর দ্বারা পুনরায় পাদুকা প্রস্তুত করা হয়। এই শ্রেণীর কারিকরগণের মন্দিরের আঙ্গিনায় প্রবেশাধিকার আছে। প্রতিবৎসর কেবলমাত্র উৎসবদিবসে সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। যদিও ক্রমে ক্রমে উৎসবের ধুম কমিয়া আসিতেছে, তথাপিও এখানকার মন্দিরের কারুকার্য্য দেখিবার নিমিত্ত বৎসরে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

ভোজ দেওয়া হয় ও মহিলাদর্শকদিগকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মহীশূরের রাজা এই মঠটিতে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। মঠের অনেক ধনী ভক্ত আছে। তাঁহারাও বহু অর্থ সাহায্য করেন। যদিও শৃঙ্গেরী তীর্থের অনেক প্রাচীনতম কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি যুগ যুগ ধরিয়া শঙ্কর-উপাসকগণ ও অন্যান্য হিন্দুগণ এই মঠটিকে প্রসিদ্ধ তীর্থরূপে গণ্য করিয়া আসিতেছেন।

বেলুড়—পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে এই স্থানটির নাম ভেলুর বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা দক্ষিণ-কাশী নামেও খ্যাত। এখানকার মন্দিরটি চেন্ন-কেশবের নামে উৎসর্গীকৃত। হৃদ্-শালা বংশের রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া বিষ্ণুর উপাসক হন। তিনিই দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি নিশ্মাণ করেন। এই মন্দিরের চিত্রাদি প্রাচীন চালুক্য চিত্রকলার নিদর্শন প্রদান করে। এই শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাদি দেখিবার জন্য প্রতিবৎসর বেলুড়ে বহু লোক-সমাগম হয়। চৈত্র মাসে এখানে একটি বাৎসরিক উৎসব হয়—সে সময়ে এপ্রদেশের অনেক লোক এখানে সমবেত হয়। এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা সম্বন্ধে এপ্রদেশে একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যখন মন্দিরে দেবতাটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন ভুলক্রমে দেবীকে

নঞ্জনগড়—নঞ্জনগড়ের মন্দিরটি মহীশূর সহর হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। রাজসরকার এই





চামুণ্ডীর মন্দির

মন্দিরটির উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন। এখানে প্রতিবৎসর মহাসমারোহের সহিত রথযাত্রা পর্ব্ব সম্পন্ন হয়। সেই সময় দাক্ষিণাত্যের নানা দেশ হইতে অসংখ্য নরনারী এখানে সমবেত হয়। বহুপ্রাচীনকালে এই মন্দিরটি নঞ্জন্দেশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। মন্দিরটির এক অংশে ৬৬ জন ভক্ত শৈবের মূর্ত্তি আছে। আসল মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৩৮৫ ফুট ও প্রস্থ ১৬০ ফুট। এই মন্দিরটি ১৪৭টি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান। মহীশূরের রাজবংশ বহুদিন হইতেই এই মন্দিরটির ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মুম্মদী কৃষ্ণরাজ ওদেয়ার কর্ত্তৃক গোপুরম্ নির্ম্মিত হয়। রাজ-পরিবারের মহিলারাও মন্দিরের নানা অংশ নিজ নিজ ব্যয়ে নির্ম্মিত করাইয়াছেন। মহীশূর হইতে রেলপথে এই মন্দিরটিতে যাওয়া যায়।

চামুণ্ডী—চামুণ্ডী পর্ব্বতের উপর যে মন্দিরটি আছে তাহাও রাজপরিবারের সাহায্যে পরিচালিত। মহীশূর সহর হইতে চামুণ্ডী পর্ব্বত দেখা যায়। পর্ব্বতটি ৩৫০০ ফুট উচ্চ। ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য রাস্তা ও সোপানাবলী আছে। মহীশূরের রাজা এখানে যাইবার জন্য একটি ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।



চামুণ্ডী মন্দিরের নিকট বৃষ মূর্ত্তি

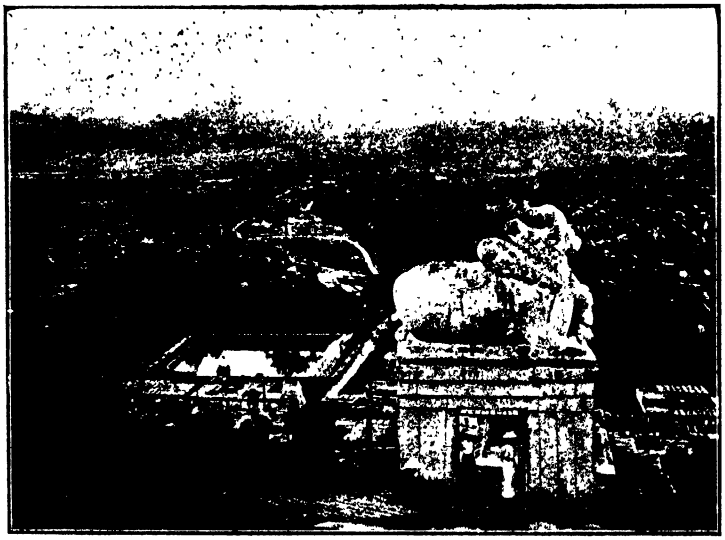
মোটর যোগেও এ পথে পর্ব্বতের উপরে ওঠা যায়। প্রতিবৎসর দশেরা বা বিজয়া-দশমীর সময় এখানে বিরাট্ উৎসব হয়। এই সময় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় নানা শ্রেণীর ভিক্ষুকদল। ইহারা পর্ব্বতে উঠিবার সোপানাবলীতে সমবেত হয়। এখানকার সুদৃশ্য মন্দিরটি পর্ব্বতের উচ্চতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাজ ওদেয়ার মন্দিরটির সংস্কার করান ও মন্দিরটির একটি চূড়া নির্ম্মাণ

করান। মহীশূরের রাজারা এ মন্দিরটির আরও অনেক সংস্কার করাইয়াছেন। বর্ত্তমানে পর্ব্বতে আরোহণ করিবার সোপানাবলীতে বৈদ্যুতিক আলোক সংযোগ করা হইয়াছে। সোপান সাহায্যে পর্ব্বতে উঠিবার মধ্যপথে একটি বিশাল খোদিত বৃষমূর্ত্তি আছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দোদ্দ দেবরাজ এই বৃষটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রাচীনকালে এখানে নরবলি দেওয়া হইত।

মেলকোট—সংস্কারক রামানুজাচার্য্য চোল-রাজগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি এখানে চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বাস করেন। সুতরাং এটি বৈষ্ণবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। মুসলমান আক্রমণকারীগণ এখানকার মন্দিরের অনেক অংশ ধ্বংস করিয়াছে। রামানুজ কতিপয় নিম্নশ্রেণীর লোকের সাহায্যে দিল্লী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অপহৃত মূর্ত্তি উদ্ধার করেন। সেই কারণে প্রতিবৎসর একদিন সেই শ্রেণীর লোকেরা মন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি পায়।

বাবুদান পীঠ—এখানকার গুহাটি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থান। চীক্‌মাগালুর হইতে কয়েক মাইল দূরে এই গুহাটি অবস্থিত। মুসলমানদের বিশ্বাস যে বাবুদান নামক একজন কালান্দরের এখানে সমাধি হইয়াছিল, সেই কারণে ইহা তাহাদের তীর্থস্থান। হিন্দুরা বলে যে এখানে দত্তাত্রেয়ের সিংহাসন আছে, কাজেই ইহা একটি হিন্দুতীর্থ। এখানে উভয় সম্প্রদায়েরই অনেক যাত্রী প্রতিবৎসর আগমন করে। গুহাটি বর্ত্তমানে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে আছে।

শিবগঙ্গা—ব্যাঙ্গালোর জেলার অন্তর্গত শিবগঙ্গা পর্ব্বতে প্রতিবৎসরেই অনেক তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। প্রবাদ যে এই পর্ব্বতে উঠিবার যতটি সোপান আছে এই স্থান হইতে কাশী তত যোজন দূরে অবস্থিত।



শিবগঙ্গা পাহাড় হইতে চামুণ্ডীর দৃশ্য

এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করার নাম কাশী দর্শন। প্রবাদ যে এই পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিলে কাশী তীর্থ দর্শন করার পূণ্য অর্জ্জিত হয়।

তীর্থহল্লী—এই স্থানটি মালনাদ জেলায় অবস্থিত। প্রতি বৎসর স্নানযাত্রা উপলক্ষে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। কথিত আছে যে এখানে স্নান করিয়া পরশুরাম সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

চিতলদ্রুগ—এই স্থানটি লিঙ্গায়তদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। মহীশূর রাজ্যে অনেক লিঙ্গায়তের বাস—সুতরাং ইহা একটি প্রধান তীর্থরূপে পরিগণিত হয়। লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এখানকার মঠে বাস করেন।

এতদ্ব্যতীত মহীশূর রাজ্যে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীর্থস্থান আছে। স্থানাভাবে সকলগুলির বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর হইল না। তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শনের জন্য মহীশূরের রাজার মুজরাই বিভাগে অনেক কর্ম্মচারী আছেন। তাঁহারা সমস্ত মন্দিরাদি সম্বন্ধে অভাব অভিযোগ শ্রবণান্তে রাজ-দরবারে পেশ করেন। মহীশূরের রাজ-সরকার তীর্থস্থানগুলি সংরক্ষণের নিমিত্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

নির্বাসিতের আত্মকথা

আজ জীবনের পঞ্চম অঙ্ক অভিনীত হইবার পূর্ব্বেই যখন যবনিকা ফেলিতে হইবে তখন এই ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনীটা আমি লিখিয়া যাইব। এ কাহিনী লিখিবার কোন প্রয়োজন আছে কি না জানি না, কিন্তু এই সুদূরে সব শেষ হইবার পূর্ব্বে আমার হৃদয়টা অভিমানে ফুলিয়া উঠিতেছে, ঠোঁট দুটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; কাহার উপর এ অভিমান জানি না, কিন্তু যদি এ জীবনের পরেও আমার কিছু বাঁচিয়া থাকে এবং এ পৃথিবীর কথা শুনিতে পায় তাহা হইলে আমি ঠিক জানি যে যদি এ কাহিনী পড়িয়া কেহ সহানুভূতির স্বরে "আহা" বলে, তাহা হইলে আমার সেই অমর অবশেষ নিশ্চয়ই ফুঁকারিয়া কাঁদিয়া উঠিবে।

আমার বয়স এই ২৬ বৎসর। চার বৎসর আগে আমার জীবন সুখের অমৃতে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম এ অমৃতের এক তিল কোন দিনই বুঝি কম পড়িবে না; যেদিন কেশের উপর শুভ্রতার পরোয়ানা জারি করিয়া মৃত্যুর দূত আসিবে, সেদিনও বুঝি এই অমৃত এমনই কানায় কানায় উপ্‌চাইয়া পড়িবে। আজ সেই মৃত্যুর দূত ত কাঁচা চুলের মুঠি ধরিয়া তাহার পরোয়ানা জারি করিতেছে, কিন্তু জীবনে সে অমৃত কই? কণ্ঠ যে শুষ্ক, মন যে শুক্‌নো পাতার চেয়েও নীরস। যাক্ সে কথা - আজ কেন আমি এই আন্দামানে মৃত্যুর কালো গহ্বরের মুখে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি তাহাই বলি—সে এক রমণীর জন্য। অদ্ভুত এক নারী! তেমন মেয়ে বাঙালীর মধ্যে কেন কোন জাতির মধ্যে আছে কি না জানি না। সে আজ কোথায় বলিতে পারি না, কিন্তু তাহার জ্বলন্ত রূপ আজও আমার চোখের সম্মুখে ঠিক সেইভাবেই জ্বলিতেছে—বোধ হয় মৃত্যুর পরেও এই ভাবেই জ্বলিবে।

*		*		*		*

মফঃস্বলের এক কলেজ হইতে আই-এস্‌সি পাস্ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম দিনই যে ছেলেটির পাশে বসিয়াছিলাম তাহার নাম বীরেন। কোঁক্‌ড়ান চুল অযত্নবিন্যস্ত, সুন্দর পুষ্ট শরীরটিতে যত্নের অভাব সুস্পষ্ট, নাকটি টিকোলো বাঁকা, চোখ দুটি তত টানা নয় কিন্তু তীক্ষ্ণ।

অধ্যাপক কথায় কথায় সেদিন নেপোলিয়নের কথা আনিয়া ফেলিলেন। অধ্যাপকটি নেপোলিয়নের একটি গোঁড়া ভক্ত। তিনি নেপোলিয়নের বীরত্ব, নেপোলিয়নের নির্ভীকতা সম্বন্ধে বেশ প্রাণের সহিত বলিতেছিলেন, আর বীরেন শুনিতেছিল সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া—তাহার শরীরটা এক একবার আবেগে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সহিত বন্ধুত্ব সেই দিনই হইয়া গেল; সেদিন আমার সুদিন কি দুর্দ্দিন আজও আমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

সে ছিল যেন একটা স্থির শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার। সে আমাকে দেখাইয়াছিল একটা বিদ্যুতের চমক্ যাহা একবার তীব্র আলো দিয়াই চির-অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়।

একটা বৎসরের মধ্যে একমাস বোধ হয় তাহার সঙ্গ-ছাড়া থাকি নাই, শুধু সে আসিলেই আমার সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ হইয়া উঠিত—ভাবিয়াছিলাম আমি তাহাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়াছি, সম্পূর্ণ পাইয়াছি। কি ভুল! তাহাকে সম্পূর্ণ পাইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু একটুও বুঝি নাই। আজ যখন তাহাকে বুঝিতে পারিয়াছি তখন তাহা হইতে কত দূরে!

তাহার বিশেষত্ব ছিল তাহার অল্প কথা। এত কম কথা কহিতে আমি আর কাহাকেও শুনি নাই। আমরা দুজনে প্রায়ই বেড়াইতে বাহির হইতাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশাপাশি চলিয়াছি, তাহার মুখে একটিও কথা নাই, আমিও যেন তাহার মৌনিতায় মুগ্ধ ও পূর্ণ হইয়া থাকিতাম, কথার অভাব বোধ করিতাম না।

সেদিন শনিবার, কলেজ সকাল-সকাল বন্ধ হইয়াছিল; বীরেনকে সেদিন ক্লাসে দেখি নাই। ছুটির পর মেসের বাসায় নিজের ঘরটিতে বসিয়া আছি, এমন সময় বীরেন

আসিয়া উপস্থিত। তাহার দিকে তাকাইয়া হঠাৎ আজ আমার মনে হইল যে তাহার চোখে মুখে একটা অস্বাভাবিকত্ব আছে যাহা আমি এতদিন লক্ষ্য করি নাই।

সে আসিয়াই বলিল, "অশান্ত, এরকম পড়া-শুনার কোন সার্থকতা আমি কিছুদিন থেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

আমার নাম 'শান্ত'। কিন্তু আমার সকল-রকম খেলায় ও ব্যায়ামে দক্ষতা এবং মারপিট করিবার স্পৃহা দেখিয়া সে নামটা একটু বদ্‌লাইয়া লইয়াছিল।

সে বলিল, "তাই আজ আমি চল্লাম।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায়?"

সে তাহার কোঁকড়ান এক গোছা চুল কপাল হইতে সরাইয়া বলিল, "দেশে ঢাকা জেলায়।"

কেন জানি না আমি বুকের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, দৃষ্টি নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করবে?"

সে বলিল, "এখনো কিছু ঠিক করিনি।"

সে চলিয়া গেল।

২

ইহার পর এক বৎসর হইবে—হ্যাঁ, ঠিক এক বৎসর, ঢাকায় একটা ফুটবল 'ম্যাচে' সাংঘাতিক ভাবে মার খাইয়া খেলা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অতি কষ্টে মাঠ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরিয়া ওঠাতে পড়িয়া যাইতেছিলাম, দু'টি সবল বাহু আমাকে জড়াইয়া ধরিল - তাহা বীরেনের। ঠিক মনে পড়ে আমার মুখের উপর বীরেনের মুখ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, তাহার পর আর মনে নাই, সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম।

যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলাম বিপুল জনতা আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে আর আমি বীরেনের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি। জ্ঞান হইতেই উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম, বীরেন শান্তস্বরে বলিল, "উঠো না—" উঠিলাম না, শুইয়া রহিলাম। খেলার সঙ্গীরা আসিয়া আঘাত পরীক্ষা করিয়া বলিল আঘাত গুরুতর হইয়াছে, অতএব আমাকে ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া দরকার। বীরেন তাহাদিগকে বলিল যে সে আমার আত্মীয়, সেই-জন্য সেবাব্যবস্থা সেই করিবে। ইহাতে কাহারও বিশেষ আপত্তি দেখা গেল না। অতি যত্নে গাড়ীতে তুলিয়া যখন সে আমাকে তাহার বাসায় লইয়া আসিল তখন রাত্রি ৮টা হইবে।

গাড়ী হইতে ছোট শিশুটির মত সে আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। সে বলিষ্ঠ জানিতাম, কিন্তু সে যে এত বলিষ্ঠ সে ধারণা আমার ছিল না। আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, "আমি হেঁটে যেতে পারব।"

সে চিরকালই কম কথা কহে, আজও শুধু সংক্ষেপে বলিল, "না, তোমার পায়ে চোট্ লেগেছে।"

বারান্দা পার হইয়া বীরেন আমাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিতেই, একটি তরুণীর কণ্ঠস্বর অতি নিকট হইতে আমার কানে গেল, "দাদা—"

তরুণীর মুখ আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না, কারণ, আমার মাথা বীরেনের কাঁধে ছিল, কিন্তু যাহা কানে গেল তাহা আমি কখন শুনি নাই—একটা বীণার যেন সাতটা তার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, একটা বাঁশীতে যেন উজান-বহান সুর বাজিয়া গেল।

বিছানায় আসিয়া যখন বীরেন আমাকে শোয়াইয়া দিল তখন দেখিতে পাইলাম সেই তরুণীর মুখ, ১৫।১৬ বৎসরের একটি তরুণী বিস্মিত হইয়া আমার প্রতি চাহিয়া আছে। তাহার সেই দাঁড়াইবার ভঙ্গীটি আজ এই মৃত্যুর দ্বারে আসিয়াও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, মৃত্যুর পরে যদি চোখ থাকে, দেখিব!

তাহার মুখে সৌন্দর্য্য ছিল নিশ্চয়, কিন্তু শুধু সুন্দর সে নয়, সে যে অপূর্ব্ব। তাহার বর্ণ উজ্জ্বল নহে, শ্যাম নহে, তাহার বর্ণ পালিস্-করা সোনার উপর প্রতিফলিত বিদ্যুতের আলোর আভা। তাহার চোখ শুধু টানা নহে, শুধু বড় নহে, টানা বড় চোখ অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতর অমন বিদ্যুতের আলো আর কোথাও দেখিতে পাই না।

বার বার তাহার কথা বলিতে গিয়া বিদ্যুতের কথা বলিতেছি—কারণ এই সুদূরে সব অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে তাহাকে এক টকরা বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছুই মনে হইতেছে

না। বিদ্যুৎই বটে—যাহা আলো দিতে পারে—যাহা নিমেষে ধ্বংস করিতে পারে।

৩

কিছুক্ষণ পরেই খুব জোরে জ্বর আসিয়াছিল। তিন কিম্বা চার দিন জ্বরের ঘোরেই কাটিয়া গিয়াছিল, কিছু মনে নাই। যখন চোখ মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিবার এবং বুঝিবার ক্ষমতা হইল তখন প্রাতঃকাল। সে একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়া টেবিলের নিকট কি করিতেছিল; আমার পাশ-ফেরার শব্দে ফিরিয়া দেখিল আমি চাহিয়া আছি। আমার ঠিক মনে পড়ে আমি তাহার সেই অদ্ভুত দুই চোখে একটা আনন্দের আভা খেলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম! বীরেন আসিয়া ঘরে ঢুকিল এবং আমাকে জাগরিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অশান্ত, কেমন আছ?"

আমি ক্ষীণ স্বরে বলিলাম, "ভাল আছি।"

বীরেন মুখ ফিরাইয়া বলিল, "চপল, অশান্তকে কিছু খেতে দে—"

চপল! চপলা! যে তাহার এই নাম রাখিয়াছিল, সে কি নখদর্পণে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটা দেখিয়া লইয়াছিল?

চপলা এক বাটি গরম দুধ লইয়া আসিল এবং বীরেন 'ফিডিং কাপ্‌' করিয়া তাহা আস্তে আস্তে আমাকে পান করাইয়া দিল।

দুই চারি দিনের মধ্যে আমি অনেকটা সারিয়া উঠিলাম—তাহা যে-ডাক্তার দেখিতেছিল তাহার ঔষধের গুণে, না চপলার সেবার গুণে বলিতে পারি না।

সেদিন ভাত পথ্য করিয়াছি। চপলা আমাকে না ঘুমাইতে দিবার কত-রকম ফন্দীই না বাহির করিতেছে—"আচ্ছা আপনার নাম 'অশান্ত' কে দিয়েছিল? আপনার মা?—ভারি দুষ্টু ছিলেন বুঝি? তা বেশ বোঝা যায়—তা না হ'লে ফুটবল খেলতে এসে এমন মারামারি ক'রে বসেন?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না না, মা আমার নাম 'অশান্ত' দেননি, বরং 'শান্ত'ই দিয়েছিলেন; কিন্তু তোমার ঐ দাদাটিই আমাকে 'অশান্ত' ক'রে তুলেছে।"

চপলা বলিল, "তা হোক্‌গে—ঐ 'অশান্ত'ই বেশ, আমার অশান্ত লোককে ভারি ভাল লাগে।"

আমার মুখ চোখ বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্য রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু চপলা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "চিরকাল শান্ত, পা গুনে গুনে চলে; চারিদিক্ না ভেবে কাজ করে না—এইরকম লোক দেখ্‌লে আমার ঘেন্না হয়। যে জিনিষটা মানুষকে মানুষ ক'রে তোলে, তাদের মধ্যে তা নেই, তারা গাছ-পাথরের সামিল।"

চপলার চোখ দুটা যেন চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। ১৫।১৬ বৎসরের বালিকার মুখে এরকম কথা কখন শুনি নাই—কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

চপলা বোধ হয় আমার এই অভিভূত ভাবটা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই ও-প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য বলিল, "আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কে কে আছেন?"

আমি বলিলাম, "কেউ নেই—মা বাবা বহুদিন মারা গেছেন—এক দাদা আছেন, তিনি বর্ম্মায় থাকেন—"

চপলা কতকটা নিজের মনেই বলিয়া উঠিল, "ঠিক আমাদেরই মত।"

এমন সময় বীরেন একখানা চিঠি-হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চপল, আমি বোধ হয় দিন কতকের জন্য বাইরে যাচ্ছি—"

চপলা কোন কথা বলিল না।

আমি অনুসন্ধিৎসু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাচ্ছ?"

বীরেন বলিল, "কিছু দূরে।"

আমি জেদ্‌ করিয়া বলিলাম, "তবুও—"

বীরেন শান্তস্বরে বলিল, "সে জায়গা তুমি জান না—নাম শুন্‌লেও বুঝ্‌তে পারবে না—আসামের কাছাকাছি।"

তাহার গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করিয়া আমি আর কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলাম না, শুধু জিজ্ঞাসা করিলাম, "কবে ফিরবে?"

পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে সে বলিল, "কিছু ঠিক নেই।

তবে ১৫ দিনের মধ্যে নয়। তুমি ভাল করে' না সেরে যেন যেও না—অন্ততঃ আমি না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরো।"

বীরেনের যাওয়ার কথা শুনিয়া অবধি আমি নিজের যাওয়ার কথা ভাবিতেছিলাম এবং মনের কোণে একটা অজ্ঞাত ব্যথাও অনুভব করিতেছিলাম। বীরেনের অনুপস্থিতিতে আমার আর যে তথায় থাকা উচিত নহে তাহার নিঃসন্দিগ্ধ কারণ চপলা এবং একটি বৃদ্ধা দাসী ছাড়া আর বাড়ীতে কেহ ছিল না। কিন্তু বীরেনের শেষের কথাটায় আমার মনের কোণ হইতে অজ্ঞাত ব্যথাটা যেমন যাদুমন্ত্র-বলে সরিয়া গেল তেম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে সারা মনটা তাহার প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। এ লোকটা কি দেবতা! তাহা না হইলে বন্ধুর প্রতি ইহার এত বিশ্বাস!

সেদিন ঐরকমই ভাবিয়াছিলাম, পরে কিন্তু অন্য-রকম ভাবিয়াছি। সেদিন সে তাহার বন্ধুকে বিশ্বাস করে নাই—করিয়াছিল তাহার ভগ্নীকে।

মনের মধ্যে নানারকম তোলপাড় করিতেছিলাম, এমন সময় দেখিলাম বীরেন বাহির হইয়া যাইতেছে। আমি ডাকিয়া বলিলাম, "বীরেন, আমি বেশ সেরে উঠেছি, এইবার আমিও যাই—"

বীরেন, "পাগল হয়েছ, এখনও তুমি খুব দুর্ব্বল" বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

আমি নিজে না দেখিতে পাইলেও বুঝিতে পারিতে-ছিলাম, যে, আমার মুখের ছবিতে বিপন্ন ভাব স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। চপলার চোখ যেন কৌতুকে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। তাহার ওষ্ঠে চাপাহাসির খেলা আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। তাহার চাপা-হাসিতে তাহার চোখের চাহনিতে আমার সারা মনে যেন আগুন ধরিয়া গেল। আমার মনে তখন কি হইতেছিল জানি না, আমি বলিয়া ফেলিলাম, "চপলা, তুমি কি চাও না যে আমি এখান থেকে যাই?" হঠাৎ কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জায় মরিয়া গেলাম, কিন্তু সে লজ্জা আমার দ্বিগুণ হইল চপলার উত্তরে।

চপলা খুব সাধারণভাবে বলিল, "রুগ্ন লোককে কে চ'লে যেতে দাম বলেন?"

উত্তরটা যেন আমার পিঠে চাবুক মারিয়া আমাকে সজাগ করিয়া দিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা আমার উচিত নহে। সেইজন্য বলিলাম, "আমি বেশ সেরে উঠেছি—তা ছাড়া আমার বাড়ী যাওয়াও একবার নিতান্ত দরকার। তোমার দাদাকে একবার ডাকো, আমি বুঝিয়ে বলি।"

চপলা বলিল, "দাদা চ'লে গেছেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "চ'লে গেছে! কখন?"

"এই যে একটু আগেই গেলেন—যাই আপনাকে ওষুধ দিই" বলিয়া চপলা উঠিয়া গেল।

আমি হতবুদ্ধির মত চুপ করিয়া বিছানায় বসিয়া রহিলাম। অত বড় বাড়ীটাতে আমি আর চপলা! কেমন যেন ভয়-ভয় করিতে লাগিল।

৪

আজ এই মৃত্যুর সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া আমি নিজেকে নিজে প্রশ্ন করিতেছি, যে, যে-নারী আমার সমস্ত জীবনটা এমন বিরস করিয়া আমাকে এমন ঘৃণিত মৃত্যুর মুখে আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাকে কি আজও আমি ভালবাসি?—বলিতে পারি না—আমার এ পোড়া মন এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েও ত স্পষ্টভাবে "না" বলিতে পারিতেছে না। এখন যদি কোন যাদুমন্ত্রবলে এই লৌহ-কারাগার বিবাহ-বাসরে পরিণত হয়, আর সেই নারী ফুলের মালা হাতে লইয়া আমাকে বরণ করিতে আসে, তাহা হইলে আমি কি তাহাকে প্রত্যাখান করিব? এ-সব আমি কী ভাবিতেছি! পাগল হইলাম নাকি—যাহা লিখিতে বসিয়াছি তাহা যে আমাকে শেষ করিতে হইবে, পাগল হইলে চলিবে না ত!

হ্যাঁ, বীরেন সেদিন চলিয়া গেল। সে চলিয়া যাইবার দিন তিন-চার পরে চপলা একখানা দৈনিক সংবাদপত্র আমার হাতে দিয়া বলিল, "ঘুমুবেন না, পড়ুন—"

সেই সময়টা "স্বদেশীর" সময়। সারা বাংলা দেশটা তখন কিসের একটা উন্মাদনায় পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। ডাকাবিটা 'বোমকেসে'র বিবরণ সে-দিনের কাগজটায়

ছিল। আমি কাগজটায় একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম চপলা একটা চেয়ারের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। চোখ তুলিতেই সে বলিল, "এরাই মানুষ, কি বলুন!"

আমি আর কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম। চপলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন এরা ভুল করছে?"

আমি যে কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। কারণ এসব কথা আমি কখন ভাবি নাই। সেইজন্য কোন-রকমে বলিলাম,—"হঁ্যা, তা ভুলই বা কেমন ক'রে বলি—"

চপলা আমার কথায় মনোযোগ না দিয়া নিজেই বলিয়া চলিল, "হয়ত ভুল করছে—হয়ত করছে না, কিন্তু তারা কাজ করছে, তারা চুপ ক'রে ব'সে নেই। যদি ভুলই হয় তা হ'লেও তারা ভুল কাজ ক'রে ঠিক কাজের রাস্তা তৈরী করছে।"

আমি বিস্মিত হইয়া শুনিতেছিলাম আর ভাবিতে-ছিলাম এই ১৫।১৬ বৎসরের কিশোরী এ-কী এ সব বলিতেছে!

আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া চপলা অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "আপনার নাম 'অশান্ত' হ'লেও আপনার ভিতরটা ভারি 'শান্ত', না?

আমি একটু লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "কেন বল ত?"

চপলার ওষ্ঠে তখনও একটু হাসির রেখা প্রভাতের প্রথম কিরণের মত লাগিয়াছিল; সে বলিল, "এই-রকমই আমার মনে হয়।"

তাহার ওষ্ঠের আবেশময় মৃদু হাসি, তাহার মুখের অনুপম সৌন্দর্য্য, তাহার অদ্ভুত চক্ষু আমার মনে তখন বিপ্লব বাধাইয়া তুলিয়াছিল আমি মুগ্ধ হইয়া দেখিতে-ছিলাম, হঠাৎ আমার মুখ দিয়া আমার মনের কথা অস্ফুট স্বরে বাহির হইয়া আসিল, 'চপলা, তুমি বড় সুন্দর!"

একটা খুব মৃদু কম্পন তাহার সমস্ত দেহটা আলোড়িত করিয়া গেল, একটু গোলাপী রঙের আভা গণ্ডে না ফুটিতে ফুটিতেই মিলাইয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত পরেই খুবই সাধারণ কথার মত সে বলিল, "লোকে তাই বলে বটে।" তার পর চেয়ারটা ছাড়িয়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

সে চলিয়া যাইবা মাত্র আমার আবেশ ভাঙিয়া মনটা সজাগ হইয়া উঠিল এবং আমার সমস্ত মুখটা প্রথমে লজ্জায় লাল তাহার পর নিজের প্রতি দারুণ ঘৃণায় কালো হইয়া গেল। মনে মনে, বলিলাম—"আর নয়, আজই শেষ। আজই আমাকে এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে—" আমি ঠিক জানিতাম চপলা ঘৃণায় আমার সম্মুখে আজ আর আসিবে না - অতএব আমাকে নিজে গিয়াই আমার বিদায়ের সংবাদটা দিতে হইবে।

কিন্তু যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা হইল না। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চপলা আমার ঘরে আসিয়া পূর্ব্বের সেই চেয়ারটা অধিকার করিয়া বসিল এবং আমার মুখের প্রতি অসঙ্কোচে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কি ভাবছেন।"

আমি যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলিলাম, "তেমন কিছু নয়।"

চপলা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, সে হাসি নয়, যেন একটা প্রাণ-মাতান গান, যেন রূপার পেয়ালায় সোনার কাঠির আঘাতের শব্দ।

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "তেমন কিছু নয় বলছেন, কিন্তু আমি জানি বেশ একটু 'তেমন কিছু'। কি ভাবছেন বলব?"

আমি শঙ্কিতস্বরে বলিলাম, "কি?"

সে আর-একবার হাসির লহর তুলিয়া বলিল, "ভাবছেন 'ভারি অন্যায় হ'য়ে গেছে, আজই চ'লে যাব' কেমন, না?সেটি কিন্তু হবে না। চলে যাওয়া, সে দাদা আসার পর—" তাহার পর একটু গম্ভীর স্বরে বলিল, "আর অন্যায়ই বা কি হয়েছে বলুন? সুন্দরকে সুন্দর বলতে পাবেন না? ফুলের বেলা পাখীর বেলা বুঝি কিছু দোষ হয় না, যত দোষ মানুষের বেলা।"

আমার মনের অবস্থাটা বর্ণনা করিতে চেষ্টা না করাই ভাল।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "দেখুন, এই যে রাস্তাটা আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে

গিয়েছে, এটা বেশ নির্জ্জন। আমরা ওবেলা ওটা দিয়ে একটু বেড়িয়ে আস্‌ব, কি বলুন? আপনার একটু একটু বেড়ান দরকার হয়েছে। যাই আপনার দুধটা হ'ল কিনা দেখি।"

সে চলিয়া গেল।

আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই অদ্ভুত কিশোরীর কথা। একি মায়াবিনী! কুহক জানে?

৫

সেদিনের কথাটা খুব স্পষ্ট মনে আছে। সেই দিনই সেখানকার শেষ দিন কিনা।

রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিলাম; চপলাও পাশে পাশে চলিয়াছিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিতেছিল। চপলা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "চলুন ফেরা যাক্। আপনি বোধ হয় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন।"

আমি বলিলাম, "না, ক্লান্ত হইনি—চলো আর-একটু এগুনো যাক্।"

চপলা যেন একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না—না, বেশী বেড়ান আপনার ভাল নয়। আর এগুনো হবে না।"

আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "আচ্ছা চলো, ফেরা যাক্। কিন্তু আমার সুস্থতার সম্বন্ধে তোমার দাবী যেন সবচেয়ে বেশী।"

চপলার গণ্ড কপোল আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে কিন্তু যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "আপনি দাদার অসুস্থ বন্ধু কিনা?"

আজ কিন্তু এ কথা আমাকে ততটা লজ্জা দিতে পারিল না। আজ যেন আমার সব কথা বলিবার দিন। আজ আমার সাহস দুর্জ্জয়। আমি বলিলাম "শুধু বন্ধুত্বের খাতিরেই কি—"

কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বে চপলা বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখুন, মেঘ ক'রে আস্‌চে, চলুন চলুন শীগ্‌গির ফেরা যাক্—"

সেদিন সেই বর্ষার সন্ধ্যাও যেন আমার কাছে স্বপ্নময় রঙীন বসন্তের সন্ধ্যার মত মনে হইতে লাগিল। শ্রাবণের সেই ভিজা বাতাসেও যেন কিসের একটা মাদকতা অনুভব করিতে লাগিলাম। আজ সমস্ত প্রকৃতি যেন সিরাজীর পেয়ালায় চুমুক দিয়া মাতাল হইয়া পড়িয়াছে। শিরা-উপশিরার প্রত্যেক রক্তবিন্দু যেন হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, পাইয়াছি! পাইয়াছি!! আবিষ্টের মত বাড়ী ফিরিলাম। রাত্রে আহারের সময় দেখিলাম চপলাও যেন এক মধুর মোহে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার চোখেও যেন গোলাপী নেশার আমেজ! কি সুন্দর সলজ্জ মুগ্ধ দৃষ্টি!

হায়! আমার এ সুখ যদি একটি দিনও স্থায়ী হইত! চিরজীবন চাহি না, সেই এক দিনের জন্য যে আমি চির-জীবন বিনিময় করিতে পারিতাম! কিন্তু না—একটি সম্পূর্ণ দিনও না, প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই যে আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙিল!

রাত্রি ১২টা কি ১টা হইবে, মোহময় আবেশে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। আমার ঘরের যে ছোট জানালাটা চপলার ঘরের দিকে ছিল সেটা অল্প একটু খোলা ছিল, তাহা দিয়া দেখিলাম চপলার ঘরে আলো জ্বলিতেছে। চপলা কাহার সঙ্গে যেন মৃদু কথাবার্ত্তা কহিতেছে। যাহার সহিত কথা কহিতেছিল তাহার স্বর একবার কানে গেল— এ স্বর যে পুরুষের! একটা ঝাঁকানি খাইয়া যেন মোহ ছুটিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম, শিষ্টাচার ভুলিয়া সন্তর্পণে চোরের ন্যায় জানালার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, একটি তরুণ যুবক ১৮।১৯ বৎসর বয়স হইবে, চপলার বিছানায় বসিয়া আছে—চপলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আর দেখিতে পারিলাম না—বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। সেই পুরাতন উপমাটা মনে পড়িল "ফুলের মধ্যে কীট"।

আচ্ছন্নের মত পড়িয়া রহিলাম। সমস্ত চৈতন্য যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। পাশের ঘরের কথাবার্ত্তা আর কানে ঢুকিতেছিল না। মৃদু অথচ অসহ্য একটা যন্ত্রণা সমস্ত বুকটা যেন ভাঙিয়া দিতেছিল। এইরকমভাবে কতক্ষণ পড়িয়া ছিলাম জানি না। দ্বারের উপর মৃদু করাঘাতে চৈতন্য যেন ফিরিয়া আসিল। উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে?"

উত্তর হইল, "আমি চপলা, দোরটা খুলুন ত।"

কি যেন একটা ফিরিয়া পাইবার আশায় তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম চপলা আলো-হাতে দাঁড়াইয়া আছে—সেই অতুল সৌন্দর্য্য, সেই অতুলনীয় দৃষ্টি। "আসুন আমার ঘরে" বলিয়া সে আলো লইয়া অগ্রসর হইল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। হঠাৎ মনে হইল, "এ কী করিতেছি! এই গভীর রাত্রে এক নারীর শয়নকক্ষে চলিয়াছি, যে নারীর দুষ্কৃতির ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা এই মাত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" ভাবিলাম ফিরিয়া যাই—কিন্তু ততক্ষণে চপলার শয়নকক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম।

টেবিলের উপর আলোটা রাখিয়া চপলা এক পার্শ্বে শির নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। এক মিনিট দু'মিনিট করিয়া প্রায় পাঁচমিনিট নিঃশব্দে কাটিয়া গেল।

আমি অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমাকে এখানে ডাক্‌লে কেন?"

দু' এক মুহূর্ত্ত সে কোনও কথা কহিল না, তাহার পর শির নত করিয়া খুব ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি আমাকে ভালবাসেন?"

অন্য সময় হইলে এই অবস্থায় এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর দিতাম জানি না; কিন্তু আজ নাকি কিছু পূর্ব্বে বড় আঘাত পাইয়াছিলাম, তাই তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলাম, "না, কোনদিন না!"

এই কথায় চপলা শির উন্নত করিয়া আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার চক্ষু বিস্ময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এ উত্তর বুঝি সে কোন দিনই আশা করে নাই। তাহার চোখ হঠাৎ ধারাল ছুরির মত চক্‌চক্ করিয়া উঠিল—সে তাহার দৃষ্টি একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে ফিরাইয়া লইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িল ঈষৎ উন্মুক্ত সেই জানালাটার দিকে। দু এক মুহূর্ত্ত সেই দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সে যখন দৃষ্টি ফিরাইল তখন তাহার ওষ্ঠে একটু মৃদু হাসির রেখা লাগিয়া আছে। আমার দিকে তাহার সেই অতুলনীয় চোখের দৃষ্টি ফিরাইয়া সে ঈষৎ হাসির সহিত বলিল, "সে আমার দাদা।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "দাদা!—কে বীরেন?"

"না, তাঁর ছোট, ধীরেন।"

"কই তাঁকে ত আমি—"

"না দেখেননি। সব বল্‌ছি। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিন।"

যে মোহময় আবেশটা এতক্ষণ ছুটিয়া গিয়াছিল সেটা আবার আমাকে চাপিয়া ধরিল। আমি বলিলাম, "তোমার অনুমান ঠিক্।"

ক্ষীণ হাসির একটা রেখা চপলার ওষ্ঠে বিকশিত হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। সেও মস্তক নত করিয়া বলিল, "আমার হৃদয়ের কথা না বল্‌লেও বুঝ্‌তে পেরেছেন বোধ হয়।"

সেদিন ঐ কথায় আমার সমস্ত শরীরটা একটা পুলকের শিহরণে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিসের যেন একটা কুহকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আজ মনে হইতেছে কুমারীর প্রথম-প্রণয়-প্রকাশের ধরণটা বুঝি ঠিক ওরূপ নয়। তাহার কণ্ঠস্বর সে সময় অত স্পষ্ট সতেজ হওয়া যেন একটু কি রকম! যাক্ সে কথা, দু'জনেই স্থান কাল ভুলিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছিলাম। মিনিট পাঁচ পরে চপলা বলিল, "আমরা যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাতে কন্যাপণ দিতে হয় জানেন ত?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "জানি। কেন?"

সে বলিল, "আমারও একটা পণ আছে, সে পণ আপনাকে দিতে হবে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কি পণ?"

চপলা আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, "বল্‌ছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে যে সে পণ আপনি জীবন পণ ক'রেও দেবেন।"

আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। আমার নিকট এ কি এমন পণ চায় যাহার জন্য পূর্ব্বে হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইতেছে। মাথাটা কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় চপলা ধীরে ধীরে আমার কাছে সরিয়া আসিয়া আমার একটা হাত ধরিয়া বলিল, "ভয় পাচ্ছ। ছিঃ! তুমি 'অশান্ত' না!"

এই তাহার প্রথম স্পর্শ। সে স্পর্শে সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া একটা তড়িৎপ্রবাহ বহিয়া গেল। আমি যন্ত্র-চালিতের ন্যায় বলিলাম, "ভয় কিসের? প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম।"

চপলা ধীরগম্ভীরভাবে বলিল, "ঈশ্বর সাক্ষী—প্রতিজ্ঞা কর্‌লে!"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "ঈশ্বর সাক্ষী, প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম।"

চপলা সেই ঘরের কোণে বসান ছোট একটা আলমারী খুলিয়া কি একটা বাহির করিয়া আনিল এবং আমার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল, "এটা কি জান ত?"

কি সর্ব্বনাশ! একটা পিস্তল!

আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, "এটা কি হবে?"

চপলা দৃঢ়ভাবে বলিল, "এটা তোমাকে ব্যবহার কর্‌তে হবে!"

আমি প্রায় চীৎকার করিয়া বলিলাম, "আমাকে?"

চপলা ঠিক তেমনি প্রশান্তভাবে বলিল, "তোমাকে। এটা চালাতে জান ত? এই দেখ এইরকমভাবে চালায়।"

সে ঘোড়া ফেলিয়া চালাইবার কৌশল দেখাইয়া দিল। তাহার পর আমার একটা হাত ধরিয়া খাটের উপর বসাইয়া নিজে পাশে বসিল; অভিভূতের মত বসিয়া রহিলাম। চপলা বলিল, "সব শোন! আজকাল যারা বোমাওয়ালাদের ষড়যন্ত্রে আছে, আমার দু'ভাই তাদের দুজন। দাদা আসামের ছোটলাটকে খুন কর্‌তে গিয়েছিলেন, ধরা পড়েছেন। তোমাকে সেই কাজ কর্‌তে হবে। একজন সৈন্য মর্‌লে তার জায়গায় আর-একজন দাঁড়ায়—লড়াইয়ের নিয়মই এই। ছোড়্‌দা এর চেয়ে আরো দরকারী কাজে লিপ্ত আছে, তার প্রাণও সুতোর উপর ঝুল্‌ছে, তাই তোমাকে প্রয়োজন হয়েছে।"

শুনিতে শুনিতে দু'তিন বার শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। উঃ কি ভয়ানক! আমাকেও ইহার মধ্যে যাইতে হইবে পিস্তল হাতে করিয়া খুন করিতে—। মাথা গোলমাল হইয়া গেল। আর যেন কিছু ধারণা করিতে পারিতে-ছিলাম না। শুধু মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া শিরশির করিয়া কি একটা ওঠা-নামা করিতেছিল। চপলা আমার হাতে পিস্তলটা দিয়া তাহার সেই সুন্দর বাহু দিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "যাও, ভয় কি? তুমি 'অশান্ত', আজ সত্যই অশান্ত হ'য়ে ওঠ, উদ্দাম ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যাও! যায় যাবে প্রাণ—প্রাণ ক'দিনের? সেই প্রাণের মায়া কর্‌ছ যা রোজ বুটের তলায় পেশা যাচ্চে? বাঁচ্‌তে যদি হয় তবে মানুষের মত—আর মর্‌তে যদি হয় তাও মানুষের মত—বীরের মত। আমার মিলন হবে মানুষের সঙ্গে, পশুর সঙ্গে নয়। ইংরেজের ফাঁসি-কাঠে যদি তোমার প্রাণ যায় তবে পরপারে অপেক্ষা কোরো। আমিও ফাঁসি-কাঠে গলা দিয়ে তোমার কাছে যাব। যে দড়ি তোমার গলা আলিঙ্গন কর্‌বে সে দড়ি আমার গলার হার হবে। যাও প্রিয়তম, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি জানিনে—হয় ত এই আমাদের শেষ মিলন-রাত্রি।"

চপলা নিবিড়ভাবে আমাকে চুম্বন করিল। সে চুম্বনে যে কি মদিরা ছিল জানি না, মাতাল হইলাম, পাগল হইলাম!

সেই রাত্রেই আবশ্যক জিনিসপত্র লইয়া ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম।—

* * * *

আর বেশী বলিবার নাই।

ধরা পড়িলাম গাড়ীতেই। বিচারে শাস্তি হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। যখন মাতৃভূমির নিকট শেষ বিদায় লইয়া জাহাজে উঠি তখন ভীড়ের মধ্যে চকিতের মত একটি তরুণীর দীপ্ত মুখ দেখিয়াছিলাম—তাহা চপলার।

ভাবিয়াছিলাম এই মুখের ছবি সম্বল করিয়া ২০ বৎসর কাটাইয়া দিব। কিন্তু কী ভুল! চার বৎসরও অতীত হয় নাই, সে ছবি এই মরুভূমির মাঝে কোথায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। এই ২৬ বৎসর বয়সেই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে—আর যন্ত্রণা-অত্যাচার সহিতে পারি না, আজই আমার জীবনের শেষ রাত্রি!

প্রকাশকের কথা

যাঁহার কাহিনী আমি প্রকাশ করিলাম তিনি যেদিন আত্মহত্যা করেন তাহার পরদিনই আমি সেই কক্ষে নীত হই এবং একটি অন্ধকার কোণে একতাড়া কাগজের

বাণ্ডিল কুড়াইয়া পাই, তাহাতে উপরে লিখিত কাহিনীটি ছিল।

আজ আমি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেশে আসিয়া কৌতূহলের বশে চপলার খোঁজ লইয়াছিলাম। শুনিলাম, বহুদিন যাবৎ সে নিরুদ্দেশ। কেহ বলে সে আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ বলে সে পাগল হইয়া গিয়াছে।

শ্রী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

মায়ের ছেলে

এক

টাইগ্রীসের বুকে কালো জলের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ—আকাশে কালো মেঘের মাতামাতি—পৃথিবীর বুকে ঝড় উঠিবে।

চারিদিকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড ট্রেঞ্চ্ বা পগার, তার পর কাঁটার বেড়া; এর মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্যদের শতাধিক শিবির, শিবিরের মধ্যে সহস্র তরুণ বাঙ্গালী নিদ্রিত।

কোয়াটার্-গার্ডের চারিদিকে ১১ জন সশস্ত্র শান্ত্রী ঘুরিতেছে—গায়ে তাহাদের কালো রংএর লম্বা কোট, স্কন্ধে টোটাভরা রাইফ্ল্—যেন অন্ধকারের মূর্ত্তিমান্ বিদ্রোহী পুত্র। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিল—আকাশে মেঘ ডাকিল—কিন্তু সে গর্জ্জন যেমনি গম্ভীর তেমনি নিস্তেজ, দুইদিকের বৃষ্টিভেজা লাল আলো দুইটা মাতালের চোখের ঘোলাটে চাহনিতে সহস্র রাইফলের উপর পাণ্ডুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল।

অসীম ঘুরিতেছে—তাহার কত কথা মনে হইতেছিল। গ্রামের স্কুল হইতে পাস্ করিয়া সে কলিকাতায় আসে। কথা সে চিরকালই খুব কম কহিত—কিন্তু ভাবিতে পারিত সে খুব। বাঙ্গালী-জীবনের এই ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু আলস্য যুগযুগান্তরব্যাপী পাষাণতুল্য জড়তা,—এর বিরুদ্ধে তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। এক মায়ের এক ছেলে সে—কিন্তু তাহার মারও যিনি মা সেই ভারতমাতার আহ্বান তার কানে পৌঁছিয়াছিল—তাই একদিন কাহাকেও না জানাইয়া সে করাচির জাহাজে উঠিয়াছিল।

আজ সে ভাবিতেছিল বাংলার ছায়া-সুশীতল পাড়াগাঁয়ের কথা। আজ এই অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অতীতের সহস্র স্মৃতিতে সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। কি ভাবিয়া সে আসিয়াছিল—আর বাংলার তথাকথিত ভদ্রসমাজের যে পরিচয় দিনে দিনে সে এইখানে পাইতেছিল তা বাস্তবিকই শোচনীয়।

বৃষ্টি তেমনই অলস-মন্থরভাবে পড়িতেছে—নক্ষত্র তেমনি তন্দ্রালুভাবে ডাকিতেছে—বাংলায় কিন্তু এমনটি হয় না—বৃষ্টি পড়ে তো অনর্গলভাবে ধরার বুক ভাসাইয়া ঝর্ণা-নদী ছুটাইয়া পড়ে—বজ্র ডাকে তো আকাশের বুক ভাঙিয়া চুরিয়া চৌচির করিয়া ডাকে। কোথায় বাংলা—কোথায় তুর্কীস্থানের এই বৃক্ষলতাহীন অন্ধকারময় শিবির-প্রাঙ্গণ!

হঠাৎ অসীম থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। বহুদূরে ছায়ার মত তিন-চারিটা মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেফ্‌টি-কেস্ খুলিয়া জলদগম্ভীর স্বরে হাঁকিল—হু কাম্‌স্ দেয়ার—হল্ট্! কিন্তু তার পরেই আর কিছু নাই—স্কন্ধের বন্দুক স্কন্ধে আসিল—অসীম ভাবিল চোখের ধাঁধা। আবার ভাবিল—গুলি না করা অন্যায় হইয়াছে—সৈনিকের কাজ কর্ত্তব্যপালন করা—সেই অশরীরী ছায়ামূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই বন্দুক ছোড়া উচিত ছিল।

বৃষ্টি একটু বেশী করিয়া নামিল—অসীম আরো বেশী সতর্ক হইল, কারণ তাহার ঘুম পাইতেছিল। চারিদিকে শত্রুর আড্ডা, এমন রাত্রিটা যে তাহারা হেলায় নষ্ট করিবে এমন মনে হইল না। অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হইয়া সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠের কানায় কানায় চাপিয়া বসিল।

হঠাৎ সেই নৈশ অন্ধকার মথিত করিয়া চারিবার রাইফলের শব্দ হইল—মুহূর্ত্তমধ্যে বিউগ্‌ল্ বাজিয়া

উঠিল—চারিদিকে হৈ চৈ পড়িল—বুট পট্টি পরার ধূম। শত্রু আসিয়াছে—সকলের প্রাণ একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল—বুকের নীচে রক্ত যেন লাফাইয়া উঠিল। অসীম কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল—কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। রাত্রিশেষের সেই উচ্ছৃঙ্খল মাতাল বায়ু যেন তাহার কানে কানে বলিয়া গেল—এ যুদ্ধের আহ্বান নয়।

দুই

রাত্রি তখনও ভোর হয় নাই। বৃষ্টি তেমনই পড়িতেছে, অন্ধকার তেমনই মুখ বুজিয়া আছে, আর প্রকৃতির এই ভ্রূকুটি-কুটিল চোখের নীচে দাঁড়াইয়া সহস্র বাঙ্গালী যুবক। প্রত্যেকের হাতে রাইফ্‌ল্‌. কিন্তু কারো মুখে উৎসাহ নাই। নিহিত সুবাদারের মৃতদেহ আনীত হইল। যাহারা যুদ্ধস্থলে শত শত প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে তাহারাও আজ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দর্শনে শিহরিয়া উঠিল। রক্তে সমস্ত দেহ একেবারে মাখা, বুকের পাঁজর উড়িয়া গিয়াছে। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া সকলে দাঁড়াইয়া রহিল।

একে একে প্রত্যেকের রাইফ্‌ল্‌ পরীক্ষা আরম্ভ হইল। সকল অস্ত্রই একেবারে ঝক্‌ঝকে, কোথাও একটু দাগ নাই—নলী সম্পূর্ণ পরিষ্কার। সকলের মনই একবার ভয়ে চম্‌কিয়া উঠিল, হয়ত এখনই সদ্যনিহত সুবাদারের আততায়ী ধরা পড়িবে। কিন্তু সকলের বন্দুকই পরীক্ষা করা হইল।

পূর্ব্বগগনে প্রভাতের অস্ফুট চাপা আলোক দেখা দিল। সে প্রভাত যেমনই কুৎসিত তেমনই ভয়ঙ্কর। সমস্ত আকাশময় পুঞ্জীভূত কালো মেঘের ছড়াছড়ি—মাঝে মাঝে ঘোলাটে সাদা মেঘে সে কালীর উপর যেন চূন লেপিয়াছে। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—চারিদিকে অসম্ভবরকমের বিকট স্তব্ধতা। সূর্য্যের একটি রশ্মিও সে মেঘজাল ভেদ করিয়া বাহির হয় নাই। মুহূর্ত্ত-মধ্যে যেন প্রকৃতির বীভৎস নিস্তব্ধতা সহস্র গর্জ্জনে ভাঙিয়া চূরিয়া চতুর্দ্দিকে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পড়িবে। সহস্র বাঙ্গালী যুবক সেদিন একস্থানে দাঁড়াইয়া সেই দুর্য্যোগময়ী নিশা যাপন করিল।

প্রভাতে সুবাদার-মেজর আসিলেন—সকলে অভ্যাস-মত আজও সম্বৃত হইয়া দাঁড়াইল। তিনি অতিশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন—কে এ-কাজ করিয়াছ বলো—সৈন্য-বিভাগে এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ আর নাই। শত্রুর গুপ্তচরের এ-কাজ নয়—এ-কাজ তোমাদের—বলো, কে, বা কাহারা সৈনিকের অনুপযুক্ত এ জঘন্য নীচ কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিলে।

সকলে নির্ব্বাক্—একটু শব্দ নাই—একটু চাঞ্চল্য নাই। দেখিতে দেখিতে ক্যাপ্‌টেন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হুকুম হইল—যতক্ষণ না দোষী আত্মসমর্পণ করে ততক্ষণ সকলকে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে—অনাহারে অনিদ্রায়—ঝড়ে জলে, নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে। আর এক সপ্তাহমধ্যে অপরাধী বাহির না হইলে সমস্ত রেজিমেণ্ট্‌ দ্বীপান্তরে নির্ব্বাসিত হইবে।

সকলের হৃদয় চম্‌কিয়া উঠিল—শেষ আদেশ শুনিয়া। চোখে চোখে একবার আগুন খেলিল—বাংলার কথা মনে হইল—মা বাবা ভাই বোনের কথা মনে হইল।

সমস্ত দিন চলিয়া গেল। বিকালে আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের একটু ক্ষীণ আভা দেখা দিল। সে আভা যেন মুমূর্ষুর মুখের হাসির মত—পরক্ষণেই আবার গভীর আঁধারে বিলীন হইল। কিছুতেই কিছু হইল না—শত ভয় প্রদর্শন—শত অনুনয়—কিছুতেই দোষী বাহির হইল না।

এড্‌জুট্যাণ্ট্‌ যিনি ছিলেন তাঁহার মাথায় এক নূতন বুদ্ধি আসিল—বাঙ্গালীর ধাত তিনি জানিতেন—বাঙ্গালী-প্রাণের কোমল অংশটুকু তিনি ভাল বুঝিতেন, তাই নিজে আসিয়া তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—বাংলা মায়ের বীর পুত্রগণ! তোমরা বাংলা দেশকে ভালবাস—৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্টনকে ভালবাস। বাংলার ছেলে তোমরা—দুধের সঙ্গে তোমরা "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" বাণী কণ্ঠস্থ করিয়াছ—বাংলা মায়ের বহু বছরের গ্লানি তোমরা ঘুচাইতে এখানে আসিয়াছ। আমার কথা শোন—ভাব—কি কাজ করিতে তোমরা আজ বসিয়াছ। সাহেব বলিয়াছেন সমগ্র পল্টন

নির্ব্বাসিত হইবে। সে কি ভীষণ জিনিষ তোমরা জান্ না—তোমরা দেখ নাই। তোমাদের হাত হইতে ঐ রাইফ্‌ল্ কাড়িয়া লওয়া হইবে—তোমাদের পাশে ঐ সঙ্গীন আর ঝুলিবে না—জগতের পৃষ্ঠ হইতে এক মুহূর্ত্তে—একটি আদেশে ৪৯ নম্বর বাঙ্গালী পল্‌টনের নাম উঠিয়া যাইবে—লোক যুগযুগান্তর ধরিয়া বলিবে বাঙ্গালী সৈন্য হইবার অনুপযোগী—ঐ এত খৃষ্টাব্দে তাহাকে সৈন্যদলে যোগদান করিতে দেওয়া হইয়াছিল আর সে তাহার প্রাপ্ত ক্ষমতার এরূপ ব্যবহার করিয়াছিল।—

সমস্ত রাত্রির জাগরণজনিত ক্লেশে প্রত্যেকের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল—সমস্ত দিন কাহারো মুখে এক ফোঁটা জল পড়ে নাই। কিন্তু এ বক্তৃতা যেন সকলের প্রাণে অগ্নিমদিরা ঢালিল—উদ্‌গ্রীব হইয়া সকলে সেই বাণী শুনিতে লাগিল।

সকলের চেয়ে একটি প্রাণে বেশী আলোড়ন উপস্থিত হইল। তাইতো মায়ের ছেলে সে—মায়ের সম্মান রক্ষা করিতে একটা প্রাণ কি এতই মূল্যবান্—সমস্ত পল্‌টনকে দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি সে তাহার একবারের জীবন দিতে পারে না। সে কি আজ সেই আততায়ীদের সব কলঙ্কভার নিজের স্কন্ধে লইবে না?

এড্‌জুট্যাণ্ট্ বুঝিলেন ফল হইয়াছে—তাঁহার বক্তৃতাতে কাজ হইবে—বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি—তাহাকে ভাবিতে দেওয়া হউক।

কিয়ৎকাল পরে আবার আরম্ভ করিলেন—আর একটা কথা তোমরা মনে রাখিও। যে কলঙ্কের মসীলেপ তোমরা আজ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় করিয়া যাইতেছ তাহা তোমাদের বংশধরগণ শত চেষ্টাতেও ক্ষালন করিতে পারিবে না। সৈনিক তোমরা—বীর তোমরা—প্রাণ তো তোমাদের একটা খেলার জিনিষ। একটা গুলির আঘাত—একটা সঙ্গীনের খোঁচা এর মূল্য—এর জন্য এত। যে-বা যাহারা এ-কাজ করিয়াছে—হয়ত কোন মহান্ উদ্দেশ্যেই করিয়াছে—কিন্তু এই কার্য্য গোপন করিবার অভিলাষে তাহাদের সে মহত্ত্ব ঢাকিয়া যাইবে—এ যেন মনে থাকে—একটা জীবন তো—দেশের জন্য তো তাহা উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছ। আজ যদি আমার স্বীকার-উক্তিতে সমস্ত পল্‌টন রক্ষা পাইত আমি হাসিমুখে তাহা করিতাম—এ মৃত্যু লোভনীয়, এ মৃত্যুর ইতিহাস বাংলার প্রাণে আগুনের অক্ষরে লেখা থাকিবে—স্বীকার কর কে এ-কাজ করিয়াছ?

না—আর থাকা অসম্ভব। প্রাণ দিতে সে আসিয়াছে, প্রাণ দিবার এমন সুযোগ আর কখনও হইবে না—মায়ের ছেলে সে—আজ সকলের সম্মুখে সে অবীরোচিত হত্যার অপরাধ স্বীকার করিয়া জীবন দিবে—জগৎ দেখুক বাঙ্গালী ভীরু নহে—সে প্রাণ দিতে জানে—কারণ সে প্রাণের নেশায় ভরপুর।

এক কোণ হইতে সে উল্কাসম ছুটিয়া বাহির হইল—সকলে সবিস্ময়ে দেখিল সে আর কেহ নহে—অসীম।

তিন

রাত্রি থাকিতেই সকলে বুট পটি পরিয়া প্রস্তুত হইল। আজ অসীমের শাস্তি হইবে—কি যে সে শাস্তি হইবে তাহা কেহ জানে না আর জানে নাই বা কেন—এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যু—নৃশংস হত্যা।

অন্ধকার থাকিতেই বিউগ্‌ল্ বাজিল। সকলের বুক একসঙ্গে নাচিয়া উঠিল। দিনের পর দিন তাহারা এই বিউগলের আহ্বানেই জাগিয়াছে—এই বিউগলের উন্মাদকারী আহ্বানবাণী তাহাদের রক্তের সাথে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু হঠাৎ তাহাদের মনে হইল এ তো প্যারেডের আহ্বান নয়। সকলের মন একসঙ্গে দমিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইল! হুকুম হইল "form fours, left turn, quick march" সহস্র বামপদ অগ্রসর হইল, সহস্র ডান হাত দুলিল, তালে তালে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, কি মনোহর সে দৃশ্য!

বহুদিন তাহারা রাইফ্‌ল্ ছাড়া প্যারেড্ করে নাই—বাম-হাত যেন আর নড়িতে চাহে না—সমশ্রেণীতে তাহারা চলিল।

চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ—বহুদূরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ

বৃক্ষসমূহ—শূন্যতা কানায় কানায় ভরা। খুনখারাবির রক্তরঙে পূব-আকাশ মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে। লাল ডগ্‌ডগে সূর্য্য কালী-মাতার হস্তস্থিত খড়্গে অঙ্কিত সিন্দুর-চক্রের মত ভয়ঙ্কর—দেখিলে ভয় হয়। ক্রমে সূর্য্য উপরে উঠিল—চারিদিক্ হইতে অগ্নিকণাবাহী বাতাস বহিল—মাটির অন্তস্তল হইতে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া সেই বিরাট্ মাঠের বুক বিষাক্ত করিয়া দিল।

মাঝে মাঝে দুই একটা পত্রপুষ্পহীন গাছ—মূর্ত্তিমান্ অলক্ষ্মীর মত দাঁড়াইয়া। গ্রীষ্মে শীতে বসন্তে বর্ষায় এক-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে—কোথায়ও এতটুকু পরিবর্ত্তন হয় নাই। শিকড়গুলি সব বাহির হইয়া রহিয়াছে—যেন বুভুক্ষার প্রবল তাড়নায় সহস্র শীর্ণ বাহু বাড়াইয়াছে।

মার্চ্ করিতে করিতে তাহারা প্রায় এক মাইল পথ আসিল। হুকুম হইল—হল্ট্—সব এক মুহূর্ত্তে নিশ্চল। অদূরে নবনির্ম্মিত ফাঁসিকাষ্ঠ দেখিয়া কাহারও আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না—কি নিষ্ঠুর শাস্তি, সৈনিকের প্রাণ যাইবে ফাঁসিকাষ্ঠে—আর এই নিষ্ঠুর হত্যা-ভিনয়ের জন্য এ বিরাট্ আয়োজনের কি কিছু প্রয়োজন ছিল—সহস্র ভাইয়ের সম্মুখে একটি ভাইকে হত্যা করিবার কি প্রয়োজন ?

২০ জন করিয়া সেক্‌শন ভাগ হইল—প্রত্যেকের সম্মুখে একজন করিয়া সুসজ্জিত গুর্খা সৈন্য দাঁড়াইল—হাতে তাহাদের টোটাভরা বন্দুক—বন্দুকের আগে ঝক্-ঝক্ করিতেছে নররক্তপিপাসু সঙ্গীন।

অসীম উপস্থিত হইল—পরনে কয়েদীর বেশ—হাতে হাতকড়ি—চারিদিকে গুর্খা সৈন্য পরিবেষ্টিত, সকলে এক নিমিষে তাহার মুখের দিকে চাহিল—কি দিব্য জ্যোতিঃতে পরিপূর্ণ সে মুখখানি।

ফাঁসি-কাষ্ঠের নিম্নে সে নীত হইল। সাহেব আসিয়া একটা কাগজ হইতে তাহার দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিলেন—তুমি উপরস্থ কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে—তোমার অপরাধ অতি গুরুতর—অতএব তোমাকে এ শাস্তি দেওয়া গেল যে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলান হইবে—ইহাই কোর্ট-মার্শাল বিচার। সকলে স্তব্ধ—নির্ব্বাক্!

অসীমের মনে শেষবারের মত বাংলার কথা মনে হইল—মনে হইল সেই সোনার ধান-ক্ষেত—সেই সবুজ বেতস বন, মনে হইল সেই সুনীল আকাশ—মিঠে ধানের গন্ধে ভরা মুক্ত বাতাস। ছোট কাল হইতে সে দীঘির কালো জলে সাঁৎরাইয়া মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া ঘুঘুর ডাক শুনিয়া মানুষ হইয়াছে। সহরে আসিয়া তাহার ভাল লাগে নাই—সহরে বড় কৃত্রিমতা। আবার মনে পড়িল তাহার মার কথা—সেই বিধবা মার একমাত্র সন্তান সে—আপনার বলিতে তাঁহার আর কেহ নাই—কোলে পিঠে করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তার সে মা আজও হয়ত তাঁর ছেলের পত্রের আশায় বসিয়া আছেন, কত আশা করিয়া বাঁচিয়া আছেন আবার পুত্রের মুখ দেখিবেন, এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধ থামিলে আবার 'মা' ডাক শুনিবেন। তিনি কি স্বপ্নেও জানেন যে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র অন্যের অপরাধে আজ সুদূর তুর্কীস্থানের লতাগুল্মহীন প্রান্তরে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতেছে—কি ভীষণ! তাহার চোখে জল আসিল, ঐ তো সম্মুখে তাহার চির পরিচিত মাঠ যেখানে সে মাসাধিক কাল যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে—এই তো তাহার সহস্র ভাই যাহাদের সাথে মার্চ্ করিয়াছে,—এ সব ছাড়িয়া সে কোথায় চলিয়াছে!

ফাঁসি-কাষ্ঠে অসীম উঠিল—তাহার গাল বাহিয়া দুই ফোটা অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার পাণ্ডুর মুখ জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে তো আজ মরিতে যাইতেছে না—সে অমর হইতে যাইতেছে—মায়ের জন্য সে প্রাণ দিতেছে—ভারতমাতা—যে তাহার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত শয়ন স্বপন—অশন বসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে—সেই ভারতমাতার জন্য সে আজ মরিতেছে, অসীম চোখ বুজিল। সম্মুখে তাহার মূর্ত্তি-মতী হইয়া দাঁড়াইল—শস্যশ্যামল নদীগিরিমণ্ডিত অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যশোভান্বিত চিরপূজিত ভারতবর্ষ—যাঁর বুকে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে যাঁর অন্নে—যাঁর জলে—যাঁর ফলে সে মানুষ হইয়াছে। করজোড়ে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল—মা, আমি তোমার ছেলে—পাপ মানি না পুণ্য মানি না, ধর্ম্ম মানি না ঈশ্বর মানি না, শুধু জানি তুমি আছ—জানি তুমিই একমাত্র পূজার্হ, তুমি পরপদদলিত

লাঞ্ছিত, তাই আজ আমি যাইতেছি—যুগে যুগে আমি যেন তোমার কোলে আসি—মুক্তি চাই না—আমি যেন শত আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের মধ্যেও তোমাকে না হারাই, তুমি আমার, আমি তোমার। ভাই সব! তোমরা রহিলে, মা'র কলঙ্কভার মোচন করিও, মা'র দাসত্বশৃঙ্খল মোচন করিও।

সকলে চুপ—হায় রে কোন্ মায়ের সাগরছেঁচা মাণিক-সম ছেলে তুই আজ চলিলি। তোর মা যে তোকে অনেক শিবপূজা করিয়া পাইয়াছিল—নিজে না খাইয়া তোকে খাওয়াইয়াছে—আজ তোর মরিবার সময় হইয়াছে, কিন্তু যুগে যুগে তোর মত ছেলের মা যদি ভারত হইতে পারে তবেই ভারত স্বাধীন হইবে।

ঝুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। দ্বিসহস্র চক্ষুতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, সম্মুখের উদ্যত-বন্দুক গুর্খারা সতর্ক হইল—তার পরেই সব চুপ। বিরাট্ মাঠের বুকে চৈত্র-রৌদ্র খাঁখাঁ করিতেছে।

দ্বিসহস্র বাঙ্গালী-চোখের পূত অশ্রুতে সেদিন তুর্কীস্থানের পোড়া মাটি তৃপ্ত হইয়া গেল।*

শ্রী নির্ম্মলকুমার রায়

* গত ফেব্রুয়ারী মাসে Indian Territorial Forceএর ট্রেনিঙে থাকার কালে আমার শিবির-সহচর—২৮ দিনের বন্ধু শ্রী অমলচন্দ্র বসু এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের নিকট হইতে উপরি-উক্ত কাহিনীটি শুনি। নাম-ধাম বদ্‌লাইয়া কাহিনীতে বাদ্‌সাদ দিয়া ও জোড়াতালি লাগাইয়া গল্পটি লিখিলাম।—একটি বাঙ্গালীর তরুণ প্রাণের বীরত্ব যেন বাংলার ঘরে ঘরে ঘোষিত হয়।—লেখক।

অকর্ম্মার কাজ

এই যে ধরার অকেজোরা কি করে তা তারাই জানে,
নাইক তাদের কাজের মানে অমরকোষে অভিধানে।
ছিনিমিনি খেল্‌ছে তারা দিবস-নিশি প্রাণটা নিয়ে,
দেখ্‌লে পরে ভয় লাগে ভাই, বুকটা ওঠে টন্‌টনিয়ে।
রিক্তা তিথি আজকে মঘা,—ঘরের ছেলে নেই বেরুতে,
বরযাত্র যাচ্ছে ওরা সুমেরু আর কুমেরুতে।
মরীচিকার অর্থ খুঁজে সাহারাতে ঝল্‌সে মরে,
চেয়ে চেয়ে চাঁদের পানে চোখে ওদের চাল্‌শে ধরে।
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেঁয়ালিতে,
বিপুল ধরা হচ্ছে উজল খেয়ালীদের দেয়ালীতে।

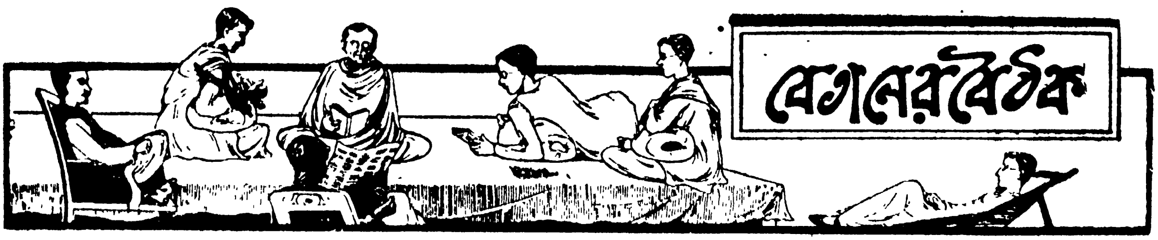
২

আকাশেতে ডিগ্‌বাজী দেয় গ্রহের সাথে কইতে কথা,
চায় পাতাতে তারায় তারায় বিশ্বব্যাপী কুটুম্বতা;
বিসুভিয়স্ ডাক্‌ছে তাদের উষ্ণ তাহার অন্দরেতে,
ঠেক্‌ছে গিয়ে পান্‌সী তাদের মঙ্গলেরি বন্দরেতে।
ঘুর্‌ছে তারা নানান বেশে নানান দেশে কিসের মোহে?
বেদুইনের তাম্বুতে হায় দেখ্‌ছি কেহ উষ্ট্র দোহে।
খেয়াল করে' চাপ্‌তে ছোটে কষ্টে এভারেষ্ট-শিরে,
পেয়াল করে' মাপ্‌তে জোটে পাগ্‌লাঝোরার পাগ্‌লামিরে!
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেঁয়ালিতে,
বিপুল ধরা হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে।

৩

পদ্মরাগের চায়নাক ভাগ, চায় না যেতে স্বর্ণ-ক্ষেতে,
পাতাল-বাণী শুন্‌তে থাকে সাগরতলে কর্ণ পেতে।
আগাছাদের ফুলের সুবাস কি কুতুহল জাগায় প্রাণে,
উষর ভূমে পড়ায় পলি, দিন নবীনের বন্যা আনে।
আমরা অচল মৌনী-বাবা বসে'ই মরি সাত্ত্বিকেরা,
শিখীর পিঠে হচ্ছে উধাও ধরার যত কার্ত্তিকেরা।
আমরা রাখি খস্‌ড়া খতেন, খুদ খুঁটে খাই ঘরের কোণে,
তরুণ গরুড় উঠ্‌ছে নভে অমৃতের ওই অন্বেষণে।
পূর্ণ ওদের জীবন-খাতা রহস্য আর হেঁয়ালিতে,
বিপুল ধরা হচ্ছে উজল ওই খেয়ালের দেয়ালীতে।

শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৩৭)

সর্ব্বপ্রথম যৌথ কারবার

বাঙ্গালীদের স্থাপিত সর্ব্বপ্রথম যৌথ কারবারের নাম কি? উহা কোন্ স্থানে স্থাপিত ও কত মূলধন লইয়া গঠিত হয়? কে কে প্রথম ডাইরেক্টর্ নিযুক্ত হয়?

শ্রী রামানুজ কর

(১৩৮)

'মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর'

১৩২৭ সনের চৈত্র মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেন লিখিয়াছেন বাঙ্গালী মহাপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতের রাজা হ্লা লামাওএর পুত্রগণ কর্ত্তৃক তিব্বতে নীত হইয়াছিলেন। হাজার বৎসর পূর্ব্বের এই বাঙ্গালী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিসে জানা যায়? তিনি ব্রহ্মদেশে ও তিব্বতে কি কি কাজ করিয়াছিলেন? তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে কি কি গ্রন্থের উদ্ধার হইয়াছে? ও কি কি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে?

শ্রী তারাপদ লাহিড়ী

(১৩৯)

ব্যায়াম শিক্ষার বিদ্যালয়

ভারতবর্ষে কোথাও ব্যায়াম শিক্ষা বিদ্যালয় আছে কি না? যদি থাকে তবে কোথায়? তাহার বিস্তারিত ঠিকানা কি?

শ্রী মশায়উদ্দিন প্রধান
শ্রী বাহারউদ্দিন সরকার

(১৪০)

"বর্দ্ধমান জেলার পীঠস্থান"

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত থানা কেতুগ্রামের সামিল নিজ কেতুগ্রামের মধ্যে বহুলা নামক ১টি এবং অট্টহাস নামক ১টি মহাপীঠ বিদ্যমান আছে। এবং ঐ দুইটিই যে তন্ত্রোক্ত মহাপীঠ ইহাই অত্রস্থ জনসাধারণের পুরুষানুক্রমে বিশ্বাস। কিন্তু পঞ্জিকাতে লাভপুর নামক স্থানে অট্টহাস বিদ্যমান আছে এবং সেইটিকেই মহাপীঠ বলিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। এদিকে কেতুগ্রাম-অট্টহাসে ভৈরব বিশ্বেশ নামে খ্যাত আছেন আর লাভপুরে ভৈরব বিশ্বেশ বলিয়া খ্যাত। বর্দ্ধমান রাজষ্টেট্ বহু পূর্ব্বকালে কেতুগ্রামেই অট্টহাস মহাপীঠ স্বীকার করিয়া তাহার সেবা-পূজাদির ব্যবস্থার জন্য কতক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন। এবং ভাল ভাল সাধুসন্ন্যাসীগণও ঐ স্থানটিকেই মহাপীঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব এসম্বন্ধে প্রকৃত বৃত্তান্ত কি অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত মহাপীঠ কোন্ স্থানে? অট্টহাস মহাপীঠ যাহা কেতুগ্রামে আছে তাহার পার্শ্বে এক উত্তরবাহিনী নদীও দেখা যায়, কিন্তু লাভপুরের অট্টহাসের পার্শ্বে কোন উত্তরবাহিনী নদী নাই।

শ্রী নৃসিংহমুরারি পাল

(১৪১)

"কুস্তিশিক্ষা-প্রণালী"

কুস্তি-শিক্ষা-প্রণালী ও নিয়মাবলী জানিতে পারা যায় এরূপ কোন বই আছে কি না?

"সন্তোষ"

(১৪২)

প্রপিতামহের সম্বোধনবাচক বাংলা শব্দ

প্রপিতামহীকে 'ঝিমা' সম্বোধন করা হয়, কিন্তু প্রপিতামহের সম্বোধন পদের কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় না। প্রপিতামহকে কি বলিয়া সম্বোধন করা হয় বা করা যাইতে পারে?

কল্যাণী

(১৪৩)

"বাংলার ত্রয়োদশ চাক্‌লাদারের ইতিবৃত্ত"

"বাংলার ত্রয়োদশ চাক্‌লাদারের" নাম, উপাধি ও কর্ত্তব্য কি কি? কোন্ কোন্ ইতিহাসে চাক্‌লাদারের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়?

মোঃ ইয়াকুব

(১৪৪)

মান্ধাতার আমল

লোকে কোন পুরাতন কথা শুনিলে "মান্ধাতার আমল" এই প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহার অর্থ এবং তাৎপর্য্য কি? মান্ধাতাই কি অতি পুরাতন রাজা?

শ্রী শশিভূষণ ধর চৌধুরী

(১৪৫)

পণ্ডিত গোরীচন্দ্র উবাসনী

সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত গোরীচন্দ্র উবাসনীর জীবনী কেহ জানেন কি? তিনি কতদিন পূর্ব্বে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা লিখিয়াছিলেন।

শ্রী নীরদবরণ ভট্টাচার্য্য

(১৪৬)

গাছের পাতা

পৃথিবীতে কোন্ গাছের পাতা সব চাইতে বড়? সেই গাছ কোন্ কোন্ দেশে জন্মায়? এবং সেই গাছের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাণ কি?

Victoria Regia নামক বিখ্যাত আফ্রিকান্ পদ্মের পত্রের দীর্ঘতম ব্যাসের পরিমাণ কি?

শ্রী সীতেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(১৪৭)

কোন্ কাতে শোওয়া উচিত?

শত পদ আহার শেষে
চলিয়া শোবে বাম পাশে,

বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে, কিন্তু মিঃ ব্যাঙ্ক্স তাঁর Manual of Hygiene and Domestic Economy পুস্তকে ঠিক উল্টা কথা লিখিয়াছেন। কোন্ মতটি বিজ্ঞানসম্মত?

শ্রী যোগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু

(১৪৮)

মৃতসৎকারান্তে

মৃতদেহ দগ্ধ করিয়া ঘরে যাইবার পূর্ব্বে বাহিরে থাকিয়া অগ্নিতে হাত-পায় সেক দিয়া, লৌহ তাম্র ইত্যাদি স্পর্শ করিয়া ঘরে প্রবেশ করার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত। কিজন্য এরূপ করা হয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী পরিমলকান্তি রায়

(১৪৯)

বৌদ্ধ

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভারতের কোন্ প্রদেশে কত আছে এবং কোন্ স্থানে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদির অধিক আলোচনা হইয়া থাকে?

শ্রী ভূপতিনাথ পালিত

(১৫০)

ইক্ষুর পোকা

ইক্ষুর চারা ছোট থাকিতেই একরকম পোকা মাঝে মাঝে গোড়া কাটিয়া দেয়। এই পোকা নিবারণের উপায় কি?

শ্রী নীহাররঞ্জন চৌধুরী

(১৫১)

মৃত শিশুর সৎকার

হিন্দুগণ দুই বৎসরের ন্যূন বয়সের মৃত শিশুকে মৃৎগর্ভে প্রোথিত করেন, এবং তদূর্দ্ধবয়স্ক মৃতের দাহ সৎকার করেন।

এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার হেতু কি?

শ্রী রোহিণীচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

(১৫২)

মাখন রক্ষা করিবার উপায় কি?

শ্রী মণীন্দ্রকুমার দত্ত।

(১৫৩)

"সাদা জীরা"

ভারতে সাদা জীরার চাষ হয় কি না? যদি হয়, উহার আবাদ-প্রণালী কি এবং কোথায় বা উহার বীজ পাওয়া যায়?

শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দাস

(১৫৪)

দাস-ব্যবসায় বা ক্রীতদাস-প্রথা

এখন পৃথিবীর মধ্যে কোথায় দাসব্যবসায় প্রচলিত আছে? কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ মহাত্মার যত্নে কোন কোন্ দেশ হইতে ক্রীতদাস-প্রথা রহিত হইয়াছে?

শ্রী বিহারীভূষণ সাঁতরা

(১৫৫)

চালের পোকা

চাউল কিছুদিনের পুরাতন হইলেই উহাতে একপ্রকার কীটের অবির্ভাব হয় ও উহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। চাউলে এইপ্রকার কীটের উপদ্রব না হইয়া উহা অনেকদিন অবিকৃত রাখিবার সহজ উপায় কি?

এম্ এম্ চৌধুরী

(১৫৬)

"ছাপান্ন গাঁই"

"পাঁচ গোত্র ছাপান্ন 'গাঁই',
তার উপরে ব্রাহ্মণ নাই।
যদি থাকে দুই-এক ঘর,
বশিষ্ঠ আর পরাশর।"

ছাপান্ন গাঁই কি কি? উপরোক্ত শ্লোকটির অর্থ কি?

শ্রী শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

(১৫৭)

গ্রন্থকীট

পুস্তক বহুদিন আলমারিতে রাখিলে উহাতে একরূপ কীট জন্মায় এবং পুস্তকের মলাটে এবং পাতায় ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার কোনও সহজ প্রতীকার আছে কি? ন্যাপথালিন দিয়া কোনও ফল পাই নাই।

শ্রী মন্মথনাথ দত্ত।

—

মীমাংসা

(৩)

বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বাংলার রাজা

খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৪২ অব্দে মগধে শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তদ্বংশীয় ৫ম রাজা "বিম্বিসার" ৫৩৭ হইতে ৫৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন।

"গৌতম বুদ্ধ" খৃঃ পূর্ব্ব ৫৫৭ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৪৭৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অতএব তিনি যে রাজা "বিম্বিসারের" রাজত্বকালীন ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্বীয় "রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তির কামনায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন", সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই এবং তাহার যথেষ্ট প্রমাণও আছে।

মগধের বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ বেহার। প্রাচীন বঙ্গ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা,—অঙ্গ (পূর্ব্ব বেহার বা পশ্চিম বঙ্গ) বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ) ও কলিঙ্গ (দক্ষিণ বঙ্গ ও উড়িষ্যা)।

বিম্বিসারের রাজত্বকালে অঙ্গদেশ মগধ-সাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু তৎকালে কে যে অঙ্গের রাজা ছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না ; তবে ইহা বেশ প্রমাণিত হয়, যে, তখন অঙ্গদেশের স্বতন্ত্র রাজা ছিল।

বিম্বিসারের রাজত্বকালীন বঙ্গে ও কলিঙ্গে স্বতন্ত্র রাজা ছিল কিনা লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের বহুগবেষণাপূর্ণ বিবরণী হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অতএব বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের সময় বাংলার রাজা কে কে ছিলেন তাহার মীমাংসা প্রকৃত পুরাতত্ত্বের অন্তর্গত নহে বলিলে অযৌক্তিক হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আমরা দেখিতে পাই যে বঙ্গে ও কলিঙ্গে খৃঃ পূর্ব্ব ৩৭০ অব্দের পর নন্দবংশীয় রাজন্যবর্গের সময় আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতি হয়। এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালীন (৩২২—২৯৮ খৃঃ পূঃ) বঙ্গদেশ মগধের শাসনাধীনে আসে।

খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলা ও উড়িষ্যা প্রদেশ আদিম জাতির অধিনিবাস ছিল ; তাহারা খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে আর্য্যসভ্যতা প্রাপ্ত হয়।

খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলা দেশে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আর্য্য-সভ্যতাপ্রাপ্ত কোন রাজা ছিলেন না ; কিন্তু আর্য্যেরা যাহাদিগকে দস্যু বলিয়া জানিত বাংলা দেশে সেই-সকল আদিম জাতির মধ্যে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক শাসনকর্ত্তার ইতিহাস নিরূপণ করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

শ্রী যশোদাবিকাশ ঘোষ

(৩৭)

"কাগজ ছেঁড়া"

যে কোন কাগজ ছিঁড়িয়া তাহার বিভক্ত স্থানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম ছিন্ন আঁশ রহিয়াছে—এবং সেই আঁশেই কাগজ সংবদ্ধ হইয়া থাকে। যখন কোন চওড়া কাগজের দুই দিকে সমানভাবে টানা যায় তখন কাগজের সমস্ত অংশে হাতের জোর পড়ে না, সুতরাং হস্ত দ্বারা সাধারণতঃ যে জোর প্রয়োগ করা হয় কাগজের আঁশের বন্ধন ও জোর তদপেক্ষা বেশী, তাই কাগজ সহজে ছেঁড়া যায় না। কিন্তু এক ইঞ্চি চওড়া এক টুকরা কাগজ যদি দুই হস্তের অঙ্গুলীর চাপ দ্বারা বিপরীত দিকে টানা যায় তাহা হইলে সহজেই কাগজ ছিঁড়িয়া যাইবে, কারণ, এরূপ অবস্থায় কাগজের সমস্ত আঁশের উপর হস্তের টান পড়িবে, কাজে-কাজেই সহজে ছিঁড়িয়া যাইবে। ইহাতে অপর কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীমতী স্নেহলতা ঘোষ

(৮৫)

আমেরিকা যাইবার পথ

ভারতবর্ষ হইতে প্রশান্ত-মহাসাগর দিয়া আমেরিকা যাইবার পথ—পি অ্যাণ্ড্ ও কোম্পানীর জাহাজে বোম্বাই হইতে হংকং (১৭ দিন)।

প্রশান্ত মহাসাগরের ডাক-জাহাজ কিংবা তোয়ো কিসেন কাইশার জাহাজে হংকং হইতে কোবে (৭ দিন)

কোবে হইতে ইয়োকোহামা (ট্রেনে)।

পরবর্ত্তী প্রশান্ত-মহাসাগরের ডাক-জাহাজ কিংবা তোয়ো কিসেন কাইশার জাহাজে ইয়োকোহামা হইতে স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কো (১৬ দিন)।

ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকা প্রশান্ত-মহাসাগরের পথে হংকং শাঙ্ঘাই কিংবা অন্য কোন জাপানী বন্দর হইয়া যাইতে হয়। পথ-ক্রম, যথা,—

(১) কলিকাতা হইতে :—

বি-আই-এস্-এন্-কোংর (আপ্ কার লাইন) কিংবা ইন্দোচীন এস্-এন্-কোংর জাহাজে হংকং (১৬ দিন), শাংঘাই (২৪ দিন)। (এই দুই কোংর জাহাজ সম্মিলিতভাবে প্রতিসপ্তাহে ছাড়ে।)

(২) বোম্বাই হইতে :—

পি অ্যাণ্ড্ ও এস্-এন কোংর মাসিক যাত্রী-জাহাজে শাংঘাই (২১ দিন)।

নিপ্পন ইউসেন কাইশার মালের জাহাজে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রী লইবার বন্দোবস্ত আছে।

(৩) কলোম্বো হইতে :—

পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানীর পাক্ষিক যাত্রী-জাহাজে শাংঘাই মেসাজেরি মারিতিমের কিম্বা নিপ্পন ইউসেন কাইশার পাক্ষিক যাত্রী-জাহাজে জাপানী বন্দরে পৌঁছান যাইতে পারে। হংকং শাংঘাই কিম্বা জাপানী বন্দরগুলি হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত :—

(১) কানাডা—প্রশান্তসাগরীয় বাষ্পীয় পোত কোংর পাক্ষিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ১৬ দিন, শাংঘাই হইতে ১৬ দিন এবং ইয়োকোহামা হইতে ৯ দিন লাগে।

(২) অ্যাড্মিরাল লাইনে হংকং হইতে ১৯ দিন, শাংঘাই হইতে ১৬ দিন, ইয়োকোহামা হইতে ১০ দিন লাগে। জাহাজ এক পক্ষ অন্তর ছাড়ে।

(৩) নিপ্পন ইউসেন কাইশার মাসিক যাত্রী জাহাজে হংকং হইতে ৩১ দিন, শাংঘাই হইতে ২৬ দিন ও ইয়োকোহামা হইতে ১৫ দিন লাগে।

(৪) তোয়ো কিসেন কাইশার পাক্ষিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২৯ দিন, শাংঘাই হইতে ২৬ দিন, ইয়োকোহামা হইতে ১৬ দিন লাগে।

(৫) প্রশান্ত-মহাসাগরের ডাকপথে মাসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২২ দিন, শাংঘাই হইতে ১৮ দিন, ও ইয়োকোহামা হইতে ১৪ দিন লাগে।

(৬) চীনা ডাক-পথে মাসিক যাত্রী-জাহাজে হংকং হইতে ২২ দিন, শাংঘাই হইতে ১৯ দিন, ও ইয়োকোহামা হইতে ১৭ দিন লাগে।

সমস্ত আমেরিকার মহাদেশব্যাপী রেলপথ দিয়া যুক্তরাষ্ট্রে এক বন্দরের সহিত অন্য বন্দরের সংযোগ আছে।

টমাস কুক অ্যাণ্ড্ সন্স্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় খোঁজ লইলে কোন্ লাইনে ভাড়া কত ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞাতব্য বিষয় জানা যাইবে।

শ্রী শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

(১০৪)

বোধিদ্রুম

বাবু মহেন্দ্র রায় প্রণীত "তীর্থবিবরণে" দেখিলাম, বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পার্শ্বে যে বোধিদ্রুম বিদ্যমান আছে, উহাই বুদ্ধদেবের বোদ্ধত্ব প্রাপ্তির বট-বৃক্ষ। উহার বয়স আড়াই হাজার বৎসর।

অন্য একখানি পুস্তকে দেখিলাম, সম্রাট্ অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় বোধিদ্রুমের একটি শাখা কাটিয়া অনতিদূরে শাখাটি পুতিয়াছিলেন। সেই বৃক্ষটিই বুদ্ধগয়ার নিকট বুদ্ধমন্দিরের পার্শ্বে অবস্থিত বোধিদ্রুম। উহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল ২৭৩—২২৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত।

তাহা হইলে এই বোধিদ্রুমের বয়স ২১০০ বৎসর কিংবা তাহার কিছু বেশী বলা যাইতে পারে। কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এসম্বন্ধে সঠিক উত্তর দিলে উপকৃত হইব।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বোধি—অশ্বত্থ,—বটবৃক্ষ নয়। এর স্থিতি মন্দিরের পশ্চিমে, মন্দিরদ্বারের ঠিক উল্টা দিকে—মন্দির-সংলগ্ন একটি বেদির উপর। এর পূর্ব্ব স্থান সম্বন্ধে একটু মতান্তর আছে (Vide District Gazeteer, Gaya, by O' Malley)।

বর্ত্তমান বোধিদ্রুমটি দেখে ৫০ বছরের বলে' বোধ হয় না কিন্তু ইতিহাসে এটির বয়স ৫০ বছর সাব্যস্ত হয়েছে। ১৮১১ খৃঃ অঃ বুকানন্ সাহেব যে গাছটি দেখে এক শত বছর বয়স নির্দ্ধারণ করেছিলেন, সেটি ১৮৭৫ সালে ঝড়ে পড়ে' যায়। তার পর পূর্ব্বোক্ত বোধিদ্রুমেরই একটি চারাকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় (District Gazeteer, Gaya, by O' Malley)। বর্ত্তমান গাছটি সেই গাছ। সম্ভবতঃ শান-বাঁধান বেদির উপর থাকার জন্য বয়সের অনুরূপ বাড়্‌তে পায়নি ।

প্রায় ৬০০ খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক বোধিদ্রুমটিকে সমূলে তুলে' ফেলে' পুড়িয়ে দেন (Early History of India by Vincent Smith, page 320)। তার পর অশোকের উত্তর পুরুষ মগধের রাজা পূর্ণবর্ম্মন্ এর পুনরায় স্থাপনা করেন। সে গাছটি কতদিন ছিল কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ৬০০ খৃঃ অঃ থেকে প্রায় ১৭০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বোধিদ্রুমের বিষয় আর কিছু জানা যায় না। কেউ যদি জানেন প্রমাণ সহ সংবাদ দিতে পারেন।

যখন অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেননি তখন তিনিই প্রথম বোধিদ্রুমটি কাটান (সম্ভবতঃ সমূলে নয়)। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করার পর এটির প্রতি এত বেশী যত্নশীল হয়েছিলেন যে তাঁর রাণী ঈর্ষায় এটিকে নষ্ট করেন। তিনিও সম্ভবতঃ এটিকে সমূলে নষ্ট করেননি।

মোট কথা বোধিদ্রুমটি কয়েক বার নষ্ট হয়। মন্দির মেরামতের সময় ৩০ ফুট উঁচু বেদির নীচে পুরাণ বোধিদ্রুম। দুটি সমূল স্তম্ভ পাওয়া যায়। সে-দুটি সম্ভবতঃ ৬০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের। কারণ বেদিটি পুনর্ব্বর্ম্মনের সময়ের।

ওমালি সাহেব বর্ত্তমান বোধিদ্রুমটিকে পূর্ব্বের বোধিদ্রুমেরই বংশজ প্রতিপন্ন করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সে-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

আচার্য্য শ্যামভট্ট

বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক ইহা বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দীক্ষার পরে ইহাকে পুনঃসংস্থাপন করিয়া এই বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে তিনি পূজা ভক্তি করিতেন। বৃক্ষের প্রতি রাজার অত্যধিক ভক্তিশ্রদ্ধা দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া রাণী তিষ্যরক্ষিতা গোপনে উহা কাটিয়া ফেলেন, কিন্তু অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে ইহা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে। তৃতীয়বার ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এই বৃক্ষের মূলোৎপাটন করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধেশ্বর পূর্ণবর্ম্মন্ উহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। এ-সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প এই যে, কোন এক অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে এক রাত্রিতে এই গাছটি দশ ফুট্ উচ্চ হইয়া উঠে। রাজা পূর্ণবর্ম্মন্ শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য উহার চতুর্দ্দিকে ২৪ ফুট্ উচ্চ এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুকানন হামিল্টন সাহেব বুদ্ধগয়ায় আসিয়া এই গাছটিকে খুব সজীব ও সতেজ দেখিতে পান। তাঁহার মতে তখন ইহার বয়স শতবর্ষের কম ছিল না। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া যায় এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে উহা মাটিতে পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান বৃক্ষটির বয়স ৫০ বৎসরের অধিক হইবে না। সম্ভবতঃ উহা মূল বৃক্ষের বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। এবিষয়ে আরও সবিস্তার জানিতে হইলে শ্রী অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত "গয়া-কাহিনী" পাঠ করিবেন।

শ্রী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০৭)

একাদশী দুইপ্রকার। সম্পূর্ণা ও বিদ্ধা। বিদ্ধা আবার পূর্ব্ববিদ্ধা পরবিদ্ধা প্রভৃতি ভেদে অনেকরকম। ব্রত উপবাসাদিতে পূর্ব্ববিদ্ধা পরিত্যাজ্যা। মুনি পৈঠীনসীর উক্তি আছে পঞ্চমী-বিদ্ধা ষষ্ঠীতে, ষষ্ঠী-বিদ্ধা সপ্তমীতে ও দশমী-বিদ্ধা একাদশীতে সুধীব্যক্তি উপবাস করিবে না। সারদা-পুরাণে লিখিত আছে একাদশী ষষ্ঠী পূর্ণিমা চতুর্দ্দশী তৃতীয়া চতুর্থী অমাবস্যা ও অষ্টমী এই-সকল তিথি পরবিদ্ধা হইলে উপবাসে গ্রাহ্য, কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্যা। সৌরধর্ম্মোত্তরে ব্যবস্থা আছে একাদশী ও দ্বাদশী উপবাসের যোগ্য, কিম্বা একাদশী-সমন্বিতা দ্বাদশীতে উপবাস কর্ত্তব্য। কিন্তু দশমীযুক্তা একাদশী উপবাস সম্বন্ধে পরিত্যাজ্যা। হরিভক্তিবিলাসের দ্বাদশ বিলাসে ৭৭ হইতে ১৪৯ শ্লোকে (উপবাস-নির্ণয় ও বিদ্ধা-উপবাস দোষ) নানা পুরাণ সংহিতাদি গ্রন্থের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে। বিশদরূপে জানিতে হইলে হরিভক্তিবিলাসে গোস্বামী পণ্ডিতের ব্যবস্থা পড়িয়া দেখিবেন।

শ্রী সুহৃদয়গোপাল দত্ত

স্কন্দপুরাণে ও পদ্মপুরাণে একাদশীতত্ত্ব সুবিস্তৃত আছে। রঘুনন্দনের একাদশীতত্ত্ব দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের মতে দশমী-বিদ্ধা একাদশী করা নিষিদ্ধ।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০৯)

এলাচের গাছ

এলাচ পাকিতে আরম্ভ করিলে, গাছ হইতে তুলিয়া আনিয়া প্রথমে জলের সহিত ফুটাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর এলাচগুলি বাতাসে শুকাইয়া লইতে হয়। এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে, এলাচ নষ্টের আশঙ্কা থাকে না। ইহা পরীক্ষিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১১২)

দুগ্ধে লবণ খাওয়া

দুগ্ধে লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে কোনপ্রকার অনিষ্ট হইবার কারণ নাই, খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে গাভীদুগ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ বর্ত্তমান থাকে, এইজন্যই দুগ্ধের সহিত লবণ সেবন হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ।

১৩২১ সালের স্বাস্থ্যসমাচারের ১১১ পৃষ্ঠা ও ৩৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রী জগন্নাথ দাস

স্কন্দপুরাণে দুগ্ধে লবণ সংযোগ নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু কোনো কোনো দেশে উহা প্রচলিত বলিয়া সেই সেই দেশের পক্ষে উহা নিষেধ নয় বলা হইয়াছে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

(১১৩)

বিখ্যাত 'শের মুতাক্ষরিণের' অনুবাদক নোটা ম্যানাস (Nota-Manus)। অনুবাদের মূল্য ৬০ টাকা—তিন খণ্ডে আর ক্যাম্বে কোম্পানী R. Cambray & Co. কলিকাতা দ্বারা প্রকাশিত।

মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন শাহজাদপুরী

(১২১)

বাংলার স্বাধীন হিন্দু রাজা

বাঙ্গালাদেশে প্রবাদ আছে যে পুরাকালে সিংহবাহু নামে একজন বাঙ্গালী, এই বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাঢ়দেশে সিংহপুর নামক নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহারই পুত্র বিজয় সিংহ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে সিংহল (Ceylon) বিজয় করিয়াছিলেন। বিজয়-সিংহের সিংহল-বিজয়ের চিত্র এখন অজন্তার গুহায় দেখা যায়।

আরো কিংবদন্তী আছে, যে আদিশূর নামক জনৈক বাঙ্গালী খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজধানী ছিল গৌড়ে। কথিত হয় যে তিনি কনৌজ হইতে বাংলা দেশে যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহারাই বর্ত্তমান রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ।

এই-সকল প্রবাদবাক্যের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে যে-সকল বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি ও মূল্য আছে তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

আর্য্যগণের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে অনার্য্য দস্যুরা বাস করিত। আর্য্যরা আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপন ও আর্য্যসভ্যতার বিস্তার করিলেন এবং তৎসঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, বারেন্দ্র—উত্তরবঙ্গ, বঙ্গ—পূর্ব্ববঙ্গ, ও রাঢ়—পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গ।

মৌর্য্য- ও গুপ্ত-রাজত্বকালে বাংলাদেশ তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া কতকগুলি খণ্ডরাজ্যে পরিণত হইল। তখন বাংলার উপর তন্নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি প্রবল শক্তির নজর পড়িল। তাহার ফলে বাংলার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠে।

বাংলার সেই দুর্দ্দিনে সেই পরিবর্ত্তন-সমন্বিত সময়ে দেশের অনেক ক্ষমতাশালী বিজ্ঞলোক সম্মিলিত হইয়া দেশের শান্তি ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনের জন্য "গোপাল" নামক জনৈক বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর লোককে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহারা সকলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক "গোপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার ওরূপ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই একদিন প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত বাংলার শাসনে আসিয়াছিল। গোপালকে আবার "গোপালদেব" বলিয়াও অভিহিত করা হয়। উক্ত "গোপালদেবই" বাংলার প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দুরাজা ছিলেন।

"গোপাল" এই নামের শেষে "পাল" শব্দ আছে বলিয়া তাহার বংশ বাংলার "পালবংশ" বলিয়া খ্যাত।

গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল এক সময় প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গোপালদেবের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান বগুড়া সহরের ৮ মাইল উত্তরে মহাস্থানগড়ের যে ধ্বংসস্তূপ আছে, তাহাই প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী হিন্দু রাজার রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের স্মৃতিচিহ্ন।

অনন্তর বাংলাদেশ সেনরাজগণের হস্তগত হইলে তাঁহারা প্রথমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে রাজসাহীর অন্তর্গত "দেওপারে" এবং অবশেষে ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান।

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

(১২৫)

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এইরূপ:—স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, আমরা প্রথমে তাহাই আলোচনা করিব। স্বধর্ম্ম কি?—স্ব অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম, অর্থাৎ যে ধর্ম্ম দ্বারা আপনাকে জানা যায় অর্থাৎ যিনি আপনাকে জানেন, তাহাই এস্থলে স্বধর্ম্ম। আর পরধর্ম্ম কি?—ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্ম দ্বারা চিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত থাকে—যাহাতে আত্মজ্ঞান জন্মে না (কারণ জিতেন্দ্রিয় না হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে না), তাহাই এখানে পরধর্ম্মের অর্থ। তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত পরধর্ম্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্মে আসক্ত থাকা যায়, তাবৎ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মে না বা তাহাতে থাকাও যায় না—কেবল পরধর্ম্মেই থাকা হয়।

পরন্তু জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্য্য, তখন স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্মে থাকিয়াই মরণ ভাল। যেহেতু উহা জীবকে ইহজন্মে, বিশেষতঃ পরজন্মে, উন্নত করে। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গণের ধর্ম্মে থাকিয়া মরণ হইলে তাহার মত ভয়াবহ আর কিছুই নাই। কারণ পরধর্ম্মে ভোগের নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। সেইজন্যই শ্রীভগবান্ গীতাতে বলিয়া গিয়াছেন—"স্বধর্ম্মে থাকিয়া মরণও ভাল; কিন্তু পরধর্ম্মে থাকিয়া মরণ বড়ই ভয়াবহ।"

এস্থলে পরধর্ম্মকে ভয়াবহ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উহা দ্বারা ভোগের অবসান না হইয়া বরং ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

"স্বধর্ম্মেঃ নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশ্ন দুইটি—

(১) ইহার বাস্তবিক অর্থ?

(২) কোথায় প্রয়োগ হইয়াছিল?

(১ম) স্বানুষ্ঠিতাৎ (সর্ব্বাঙ্গপূর্ত্ত্যাকৃতাৎ অর্থাৎ উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম হইতে) বিগুণঃ (সদোষ অপি অর্থাৎ অঙ্গহীন) স্বধর্ম্মঃ (স্বকীয়ো ধর্ম্মঃ অর্থাৎ নিজ-প্রকৃতিগত ধর্ম্ম) শ্রেয়ঃ (প্রশস্যতরঃ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ)। অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

"স্বধর্ম্মে (প্রবর্ত্তমানস্য) নিধনং (মরণং অর্থাৎ মৃত্যু) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠঃ অর্থাৎ কল্যাণকর) পরধর্ম্মঃ (ইন্দ্রিয়ধর্ম্মঃ) ভয়াবহঃ (ভয়সঙ্কুল) স্বধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মধর্ম্ম পালনে দেহান্ত হইলেও কল্যাণ লাভ হয় কিন্তু পরধর্ম্মে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের কার্য্য অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল।

(২য়) মহাযুদ্ধ-ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণসম্পন্ন বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন গুরুজন ও আত্মীয়গণ নষ্ট হইলে ধর্ম্মহানি হইবে এই ভাবিয়া যখন শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া আত্মজ্ঞান হারাইয়া সামান্য মানবের ন্যায় দীনভাবে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্তি-রূপ "ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম শ্রেয়" কি যুদ্ধে নিবৃত্তি শ্রেয়, ইহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানেচ্ছু ধীমান্ অর্জ্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ২য় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক হইতে যে-সকল আত্মজ্ঞান দিয়াছিলেন এই শ্লোকাংশ (৩য়) অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকের তন্মধ্যস্থিত।

গীতা-শাস্ত্র সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক, কেননা, পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া কল্পিত শ্রীকৃষ্ণমুখ-পদ্মবিনিঃসৃত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যে সাধারণ সমাজ গঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম্মী ব্যক্তির ন্যায় হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর গোঁড়ামি-ভাব দেখাইয়া অর্জ্জুনকে নীচস্বভাবপ্রাপ্ত দলাদলি বা আত্মপর-ভাবে উপদেশ দিয়াছেন ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কেননা ভগবদুক্ত ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা বা পরিত্রাণের উপায়। সুতরাং এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ এই যে মনুষ্য মাত্রেই সকলেই নিজ নিজ প্রকৃতির ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করে বা করা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কারণ প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুকূল কার্য্য করিতে সকল জ্ঞানীব্যক্তিই ইচ্ছা করে, প্রতিকূল কার্য্য করিতে কেহ চায় না। ৩য় অধ্যায়ের ৩৩শ ৩৪শ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকলে স্বীয় প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্ম করেন,

তবে প্রভেদ এই যে জ্ঞানীর মন (ইন্দ্রিয়াধিপতি) সর্ব্বদা আত্মাতে থাকে এজন্য, তিনি জিতেন্দ্রিয়, সুতরাং ধর্ম্ম-বা সৎপথচ্যুত হয় না। অজ্ঞানীর মন আত্মাকে ছাড়িয়া পঞ্চতত্ত্বে (ইন্দ্রিয়ে আসক্ত) থাকায় সে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে অসমর্থ, অতএব সর্ব্বদা পাপপথে পতিত হয়।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে ক্ষত্রিয়প্রকৃতিবিরুদ্ধ সত্ত্বিকব্রাহ্মণের লক্ষণ ও হিংসা-বিমুখ ও ভিক্ষুধর্ম্মোৎসুক দেখিয়া বলিলেন—"হে অর্জ্জুন, তোমার এই বিপরীতবুদ্ধির স্বধর্ম্মবিরুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইল কেন? কেননা, নিজবর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাচারে (উহা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হউক বা নিকৃষ্ট হউক) স্বর্গ, কীর্ত্তি, বা মুক্তি কিছুই হয় না। যদি তুমি স্বর্গ কামনা করিয়া থাক, তবে তাহা সিদ্ধ হইবে না, কেননা, তুমি ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ। যদি তুমি কীর্ত্তি-কামনায় নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী হইয়া থাক, তবে তাহাও তোমার 'অকীর্ত্তি' হইল, কেননা, তোমার বনগমন-কালে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শাসন ও বিনাশের যে-সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, ক্ষত্রিয় হইয়া তাহা পূর্ণ করিতে পারিলে না। আর যদি 'মুক্তি' লাভের জন্য নিবৃত্ত হইয়া থাক, তবে তাহাও তুমি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহ, কেননা, মুমুক্ষুগণ প্রথমতঃ স্বস্ববর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথাবিধি পালন দ্বারা অন্তঃকরণকে বিশুদ্ধ করিয়া পরিণামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু তুমি স্বধর্ম্মত্যাগী, তোমার মুক্তি সম্ভব কোথায়? তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধকার্য্যই তোমার স্বর্গ, কীর্ত্তি ও মুক্তির কারণ জানিবে। নিবৃত্তি সন্ন্যাস তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয়-বীরের ধর্ম্ম নহে।" এইরূপে সেই মহাবীর-কেশরী অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্টবৎ উপবিষ্ট দেখিয়া চক্রিচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ বীরভাব পুনঃ সচেতন করিবার জন্যই এই-সকল উপদেশ দিলেন। সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ এই সকল আত্মজ্ঞান দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন এমত নহে, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে অপরাঙ্মুখ থাকাই ক্ষত্রিয়ের পরম শ্রেয়স্কর ইহাও উল্লেখ করিয়া অর্জ্জুনের মনে যে অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্ম ভাব উদয় হইয়াছিল তাহাও অপনোদন করিয়াছিলেন। আরো বলিলেন যে এই ধর্ম্মযুদ্ধে দেহত্যাগ হইলে স্বর্গলাভ ও বিজয় হইলে নিষ্কণ্টক রাজ্যলাভ; অতএব "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন। ইহাই এই শ্লোকাংশের প্রকৃত অর্থ। তবে যে নানা লোকে নানারূপ ব্যাখ্যা করেন তাহার কারণ গীতার শ্লোকগুলি ভগবদ্বাক্য, স্বয়ং ভগবান্ দয়া করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া না দিলে কাহারও প্রকৃত সত্যার্থ বুঝিবার ক্ষমতা নাই। অতএব তাঁহার চরণ চিন্তা করিতে করিতে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাই বিবৃত করিলাম।

শ্রী হৃদয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একস্থলে শ্রীভগবান্ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥

(জ্ঞানবান্ও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কার্য্য করেন; প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুসরণ করে; অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিবে?)

এই প্রশ্নের সমাধানের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন —

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

(গীতা, কর্ম্মযোগ নামক ৩য় অধ্যায় ৩৫শ শ্লোক।)

ইহার মোটামোটি অর্থ এই:—স্বধর্ম্মে নিধন ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিয়া না দেখিলে এই অর্থ দ্বারা শ্রীভগবানের উপর পক্ষপাতিতা দোষ আসিয়া পড়ে। স্বধর্ম্ম এবং পরধর্ম্ম এই দুইটি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে ভগবানেরও আত্ম-পর-জ্ঞান আছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। এস্থলে স্বধর্ম্ম অর্থে 'আত্মধর্ম্ম' এবং পরধর্ম্ম অর্থে 'ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম' বুঝিতে হইবে।

সুতরাং উপরোক্ত গীতা-বাক্যের যথার্থ ব্যাখ্যা এইরূপ দাঁড়াইবে—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ যে ধর্ম্ম দ্বারা আপনাকে জানা যায় (জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়) তাহার অনুষ্ঠানে যে দুঃখ কষ্ট এবং বিঘ্ন বিপত্তি (এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত) বরণ করিয়া লইতে হয়, উহা পরম শ্লাঘনীয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি শরীরস্থ ষড়রিপুর তৃপ্তিসাধন দ্বারা যে আপাতমধুর সুখশান্তি পাওয়া যায়, তাহার আচরণ বড়ই ভয়াবহ। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন যে সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় দমন করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীবিরজানাথ ভট্টাচার্য্য

এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা এই সংখ্যা প্রবাসীর কষ্টিপাথর বিভাগে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "কৈফিয়ৎ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

(১২৬)

নারিকেল-গাছ-ধ্বংসকারী পোকা নিবারণের উপায়

১। নারিকেল-গাছের গোড়ায় এক হাঁড়িতে জল ও গোবর মিশাইয়া রাখিয়া দিলে বৃক্ষ-শীর্ষবাসী পোকা উহাতে পড়িয়া বিনষ্ট হয়।

২। যে নারিকেল-গাছকে পোকা আক্রমণ করিয়াছে তাহার তলদেশে (মাটির উপর) এবং শীর্ষদেশে (যেখান হইতে শাখা উদ্গত হয়) কিঞ্চিৎ চিনি গুড় বা অন্য কোনও মিষ্টদ্রব্য ছড়াইয়া রাখিতে হয়। কিছুদিন এইরূপ করিলেই মিষ্টদ্রব্যের লোভে পিপীলিকাকুল দল বাঁধিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাকে। পিপীলিকার দংশন-জ্বালায় বা অন্যবিধ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া নারিকেলবৃক্ষের কীট মরিয়া যায় বা বৃক্ষাশ্রয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

উপরোক্ত দুইটি প্রক্রিয়াই বিশেষ পরীক্ষিত। এতদ্ব্যতীত বৎসরে অন্ততঃ দুইবার নারিকেল-গাছ বাছাই করিলে নারিকেল-গাছকে উক্ত শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ
ও শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া

নারিকেল-গাছের মাথায় নানারূপ আবর্জনা জমিয়া এবং বৃষ্টির জলে এগুলি পচিয়া ইহাতে পোকার সৃষ্টি হয়। এই-সমস্ত পোকা গাছের মজ্জা খাইয়া ফেলে এবং গাছগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। নারিকেল-গাছের মাথা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখাই গাছকে পোকার হাত হইতে রক্ষা করিবার প্রধান উপায়। গাছের মাথাগুলি বৎসরের মধ্যে দুইবার, একবার চৈত্র মাসে ও একবার ভাদ্র মাসে, বেশ পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে পানা দিয়া দেওয়া দরকার। ইহাতে গাছ পিছু প্রতিবৎসর প্রায় এক টাকা খরচ পড়িবে, কিন্তু গাছের ফলন প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। পোকায়-ধরা গাছ পরিষ্কার করিতে একটু বিশেষ সতর্কতার দরকার; কারণ কোন প্রকারে দুই একটি পোকা থাকিয়া গেলে শীঘ্রই বংশবৃদ্ধি হইয়া গাছ নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

গাছিহাটা পাব্লিক-লাইব্রেরীর মেম্বারগণ

আমি অনেক গবেষণার পর দুই প্রকারে নারিকেল-গাছ পোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি এবং প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছি।

১ম প্রকরণ:—যে স্থানে নারিকেল-গাছ রোপণ করিবে সেইখানে ১ হাত পরিমিত গভীর একটি কূপ খনন করিবে। তৎপর /৩ তিনসের অথবা সাড়ে তিনসের লবণ মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্ত পূরণ করতঃ বৃক্ষটি রোপণ করিবে। কিন্তু নারিকেল-জল কিছু লবণাক্ত হইবে।

২য় প্রকরণ। যে নারিকেল-বৃক্ষ দুই তিন হাত লম্বা হইয়াছে সেই গাছের উপর প্রত্যেক দিন লবণ-জল দিবে। এই নিয়ম দুই তিন মাস পালন করিলে দেখিতে পাইবে গাছ শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং কোন প্রকার পোকা ঐ গাছে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই গাছের জলও লবণাক্ত হইবে।

হীরালাল সাহা

নারিকেলের চারা লাগাইবার পূর্ব্বে যে গর্ত্ত করা হয়, তাহাতে যদি ছাই ও লবণ মিশাইয়া নারিকেল চারা লাগান যায়, তাহা হইলে আর পোকার উৎপাত হইতে পারে না। ইহা পরীক্ষিত ঘটনা।

তদ্ভিন্ন নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বনেও পোকার উৎপাত নিবারিত হয়। যথা :—

১। গাছের গোড়ায় চারিদিকে বৃত্তাকারে এক ফুট গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ৩।৪ দিন যাবৎ বেশ করিয়া গো-চোনা ঢালিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

২। মিষ্ট-দ্রব্য যোগে গাছে অধিক পরিমাণে লালপিঁপড়া লাগাইতে পারিলে, তদ্দ্বারাও পোকার উৎপাত কমিয়া যায়।

৩। গাছের গোড়ায় ধানের তুষ ও পানা দিলেও গাছ ভাল থাকে।

৪। যখন গাছে পোকা ধরে, তখন গাছী দ্বারা (যাহারা গাছ বাছিয়া দেয়, তাহাদিগকে গাছী বলে) গাছের পোকা বাছাইয়া ও মাথা কাটাইয়া লইলে সেই গাছের আর কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৩২)

চীনা-বাদামের চাষ

মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও ব্রহ্ম দেশে চীনাবাদামের চাষ হয়। মোট ১৯৪৬ হাজার একর জমিতে এই ফসল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৯২০ হাজার টন। ইহার মধ্যে মান্দ্রাজে ১৪১২ হাজার, ব্রহ্মদেশে ২৪৯ হাজার বোম্বাই প্রদেশে ২৭২ হাজার একার জমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। বাংলাদেশে কোন কোন জেলায় চীনা-বাদামের আবাদ হয়। বাঁকুড়া জেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ১০০ বিঘা। অতি অল্লায়াসে এ-জেলায় ডাঙ্গা জমিতে চীনা-বাদামের চাষ হইতে পারে। ফসল বিঘা-প্রতি ৫ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত হয়। এই চীনাবাদাম ফ্রান্স, বেলজিয়ম অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী জার্ম্মানি ইতালি গ্রেট্‌বৃটেন ও অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। চীনাবাদাম, চীনাবাদামের তৈল এবং খৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। প্রতিবৎসর প্রায় ৩ কোটী টাকার চীনাবাদাম বিদেশে রপ্তানি হয় এবং একা গ্রেট্‌বৃটেন প্রতিবৎসর নানা দেশ হইতে প্রায় ৫।০ কোটী টাকার চীনাবাদাম খরিদ করে। মান্দ্রাজ হইতে বাংলায় চীনাবাদামের তৈল আমদানী হয়। এই চীনাবাদামের তৈলের সহিত চর্ব্বি ও সামান্য বিশুদ্ধ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বাজারে ঘৃত বলিয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়।

শ্রী রামানুজ কর

(১৩৫)

উই পোকা নিবারণের উপায়

সিমেণ্ট্ ফাটিয়া গেলে পাকা ঘরের মেজেতে অনেক সময় উইয়ের ঢিপি তুলিতে দেখা যায়। এইসমস্ত স্থলে ঢিপি ভাঙ্গিয়া প্রচুর পরিমাণে কড়া তামাক পাতা-ভিজান জল, কুঁতের জল কিম্বা কেরোসিন ঢালিয়া দিলে সমস্ত উই নষ্ট হইয়া যাইবে। তখন পুনরায় ভালরূপে সিমেণ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। দালানের কড়িকাঠ বর্গা দরজা জানালা ফ্রেম কবাট ইত্যাদি বড় চৌবাচ্চায় পরিমাণ-মত নুন গুলিয়া সেই লোনা-জলে দুই এক সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উঠাইয়া উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া ক্রিয়োজোট-অয়েল দ্বারা দুইবার বেশ করিয়া প্রলেপ দিয়া কাজে লাগাইবে। ইহাতে কাঠ উই এবং ঘুণ উভয়ের হাত হইতেই রক্ষা পাইবে।

শ্রী সত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী ও
শ্রী সুরেন্দ্রকিশোর নন্দী রায়

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে, উইপোকার উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। যথা,—

১। ঘরের খুঁটী বা দালানের ভীম প্রভৃতি লাগাইবার পূর্ব্বে ভীম প্রভৃতি লবণের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে উহাতে ভিজান-জল মাখাইয়া লইলে উই ধরিতে পারে না। উহার সহিত তালপাতার রস মাখাইয়া লইলে আরও ভাল হয়।

২। দশ সের জলে এক তোলা রসকর্পূর (বেনেদোকানে কিনিতে পাওয়া যায়) গুলিয়া সেই মিশ্রিত জল উইপোকার উপদ্রবের স্থানসমূহে ছিটাইয়া দিলে পোকার উপদ্রব কমিয়া যায়।

৩। জলের সহিত বেশী পরিমাণে লবণ মিশাইয়া সেই জল ছিটাইয়া দিলেও পোকা মরিয়া যায়।

উইপোকা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আমি গত সনের চৈত্র সংখ্যা "ভারতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠকে" আলোচনা করিয়াছি। প্রশ্নকর্ত্তা উহা দেখিতে পাবেন।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৩৬)

অম্বুবাচীর মধ্যে অগ্নিপক্ব খাদ্য খাওয়া নিষিদ্ধ কেন?

অম্বুবাচীর মধ্যে যতী, ব্রতী, বিধবা ও দ্বিজগণের পাকদ্রব্য খাওয়া শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

"যতিনো ব্রতিনশ্চৈব বিধবা চ দ্বিজস্তথা।
অম্বুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥
স্বপাকং পরপাকং বা অম্বুবাচী দিনে তথা।
ভোজনং নৈব কর্ত্তব্যং চাণ্ডালান্ন সমং স্মৃতং॥"

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী



গান

আকাশ-তলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায়।

নদীর ধারে বারে বারে মেঘ যে ডেকে যায়—
আয় আয় আয়,
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই—
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায়॥

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে
ক্ষণেক দাঁড়া।
জয়ধ্বজা ওই যে তোমার গগন জুড়ে
পূব হতে কোন্ পশ্চিমেতে যায় রে উড়ে,
গুরুগুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া।
নাচের নেশা লাগ্‌ল তালের পাতায় পাতায়
হাওয়ার দোলায় দোলায় শালের বনকে মাতায়।
আকাশ হতে আকাশে কার ছুটোছুটি
বনে বনে মেঘের ছায়ায় লুটোপুটি,
ভরা নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে কে দেয় নাড়া॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাখী

তোমার হাতের রাখীখানি
বাঁধো আমার দখিন হাতে,
সূর্য্য যেমন ধরার করে
আলোক-রাখী জড়ায় প্রাতে।
তোমার আশিস্ আমার কাজে
সফল হবে বিশ্বমাঝে,
জ্বলবে তোমার দীপ্ত শিখা
আমার সকল বেদনাতে॥
কর্ম্ম করি যে হাত লয়ে
কর্ম্ম-বাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে
জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি',—
সকল বাঁধন যাবে কাটি',
কর্ম্ম তখন বীণার মত
বাজ্‌বে মধুর মূর্চ্ছনাতে॥

(প্রাচী, আশ্বিন) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবী দুর্গা

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ত্রেতার আগেও প্রমাণ যোগাইয়াছে। এই পুরাণের মতে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য শরতে দুর্গার আরাধনা করিয়া ফল পাইয়াছিলেন। দেবীভাগবত আরও একটু অগ্রসর হইয়া বলেন, ভারতে সুযজ্ঞ রাজা সর্ব্বপ্রথম দেবীর পূজা করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমপাদে রাজা দনুজমর্দ্দন বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি পূজা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে দুর্গোৎসব-তত্ত্বও আছে; কাজেই রঘুনন্দনের সময়ে দুর্গোৎসব হইত। আক্‌বরের চোপদার রাজা কংসনারায়ণ বাঙ্‌লার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম বিখ্যাত টীকাকার কুল্লুকভট্ট, পিতামহের নাম উদয়নারায়ণ—রাজা গণেশের শ্যালক। ইনি এক মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। বাসুদেবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ বংশানুক্রমে তাহিরপুর-রাজাদের পুরোহিত। তাঁহাদের মধ্যে রমেশ শাস্ত্রী বাঙ্‌লা-বেহারের সকলের চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—মহাযজ্ঞ চারিটি—বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, অশ্বমেধ ও গোমেধ। একালে এ সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান অসম্ভব। তিনি তাহাকে দুর্গোৎসব করিবার ব্যবস্থা ও আদেশ দেন। আট নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে এই দুর্গোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। রমেশ শাস্ত্রী দুর্গোৎসবপদ্ধতি লেখেন। এই পূজাপদ্ধতি দেখিয়া জগৎনারায়ণ নয় লক্ষ টাকা খরচ করিয়া পূজা করেন। এ পূজা হইল বাসন্তী পূজা। তার পর সাঁতোড়ের রাজা ও আরও অনেক লোকে দুর্গোৎসব প্রচলিত করেন। সেই পূজা আজও চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশে প্রতিমা গড়িয়া পূজা হয়। বাঙ্‌লার বাহিরে কোন কোন দেশে শুধু নবপত্রিকার পূজা হয়। নেপালে নব-পত্রিকা পূজা হয়।

ঋগ্বেদে (২য় মণ্ডল, ২৭শ সূক্ত, ৯ম ঋক্) উপদেশ করিতেছেন—
ওঁ ধিয়া চক্রে বরেণ্যো ভূতানাং গর্ভমাদধে।
দক্ষস্য পিতরং তনা॥

বৈদিক সাহিত্য আলোচনা করিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দক্ষ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে যজ্ঞবেদি বা কুণ্ডের নাম যে "দক্ষ-তনয়া" ছিল, এইটি বোধ হয় তাহার একটি কারণ। যজ্ঞবেদিতে অগ্নি থাকিত বলিয়া, অথবা দক্ষ-তনয়া অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেন বলিয়া লোকে বৈদিকযুগের শেষ দিকে ধারণা করিয়া লইল, দেবী দুর্গার পতি মহাদেব। মহাদেব অগ্নি ব্যতীত আর কেহ নন। কেন না, 'রুদ্র' শব্দে অগ্নি ও মহাদেব উভয়ই

বুঝাইত। তা' ছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নির পৌরাণিক আখ্যায়িকায় অষ্টমূর্ত্তির নাম—রুদ্র, সর্ব্ব, পশুপতি, উগ্র, অশনি, ভব, মহাদেব, ঈশান পাওয়া যায়।. শিবের সহিত দক্ষ-কন্যা সতীর বিবাহ হইয়াছিল, সেই আখ্যায়িকার মূলে এই বৈদিক ব্যাপার। অগ্নির সহিত বেদি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, এইটুকু বুঝাইবার জন্য বোধ হয় পুরাণে শিব দুর্গার বিবাহ-ব্যাপার।

প্রাচীন ভারতে এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন ঋষিরা অগ্নি প্রজ্বলিত না রাখিয়া তাহা নিবাইয়াই রাখিতেন। সে সময়ে তাঁহারা অগ্নির আরাধনার জন্য কোনই অনুষ্ঠান করিতেন না। তবে তাঁহারা সযত্নে বেদি রক্ষা করিতেন। ঋগ্বেদ (১।১৩৬।৩) উপদেশ করিতেছেন—

"জ্যোতিষ্মতীমদিতিং ধারয়ৎ ক্ষিতিং সর্বতীম,"—

"যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষণা স্বর্গপ্রদায়িনী বেদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"

ঋষিরা এই বেদি বা কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া গভীর ধ্যাননিমগ্ন থাকিতেন। তারপর আবার যখন দেশের গতি ফিরিয়া গেল, তখন তাঁহাদের অগ্নির নিকট হবিঃ প্রভৃতি দানের দরকার হইল। ঋষিরা কিন্তু পুনরায় অগ্নি প্রজ্বলিত না করিয়া কুণ্ডের উপর ...অর্থাৎ 'দক্ষকন্যা'র উপর পীতবর্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিতেন। এই মূর্ত্তিকে তাঁহারা অগ্নি বলিয়া বুঝিতেন এবং অগ্নির নামানুসারে ইহাকে "হব্যবাহনী" বলিতেন। ঋগ্বেদেও তাই (১০।১৮০।১) ইঙ্গিত হইয়াছে—"যারুচো জাতবেদসো দেবত্রা হব্যবাহনীঃ। তাভির্নো যজ্ঞমিষচু॥" অগ্নির এই নাম হইবার কারণ, তিনি দেবতার নিকট হব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। এই মূর্ত্তিই আমাদের দুর্গা। কুণ্ডের দশদিক্ দুর্গার দশ হাত। কুণ্ডে ছোট ছোট কয়েকটি দেবতার সংস্থানের ব্যবস্থা আছে। ইহাঁদের একজন যোদ্ধা কুণ্ডকে রক্ষা করিয়া থাকেন; একজন যজ্ঞের সূচনা করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহার চারি হাত। একটি দেবী যজ্ঞজ্ঞানদাত্রী, আর একজন যজ্ঞের জন্য অর্থাগমের সাহায্য করিয়া থাকেন। দুর্গার সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট দেবতা থাকায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা বৈদিক কুণ্ডের পূর্ণ স্বরূপ। মূর্ত্তিমান্ বেদজ্ঞান হইতেছেন সরস্বতী। যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহাই লক্ষ্মী। যোদ্ধা কার্ত্তিকেয় যজ্ঞ রক্ষা করিতেন—আর গণেশ যজ্ঞের সূচনা করিয়া দেন, তাই তাঁর চার হাত। বৈদিক যজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক্, পুরোহিত ও যজমান, এই চারি হাত। দুর্গার পক্ষেও এগুলি ঠিক খাটে। এ ছাড়া আমরা পাই—

বি পাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমীবাঃ। ৩।১৫।১।

"তুমি বিস্তীর্ণ তেজোদ্বারা অত্যন্ত দীপ্তিমান্, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর।"

আমরা এইরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, বৈদিক মন্ত্রে অগ্নি-দেবতার নিকট অসুরগণকে বধ করা হইতেছে।

দুর্গাই যে বৈদিক অগ্নি, তাহার আর-একটি প্রমাণ এই—

দুর্গা দেবীর অর্চ্চনাকালে আমরা সামবেদের এই মন্ত্র উচ্চারণ করি,—

"ও অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে নি হোতা সৎসি বর্হিসি।"

বৈদিক যুগের শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায়, 'দক্ষ-কন্যা' ক্রমশঃ 'উমা'তে পরিণত হইলেন, 'উমা' 'অম্বিকা'য় এবং 'অম্বিকা' 'দুর্গা'য় পরিণত হইলেন। এ সময় আর তিনি যজ্ঞবেদি রহিলেন না। যজ্ঞবেদি ও অগ্নির সম্মিলিত শক্তি স্ত্রী-দেবতারূপে পূজিত হইতে লাগিলেন।

শুক্ল যজুর্বেদ (৩।৫৭) [বাজসনেয়ী সংহিতা] বলিতেছেন—হে রুদ্র, এই তোমার হবির্ভাগ তুমি তোমার ভগিনী অম্বিকার সহিত আস্বাদন কর—'এষ তে রুদ্রভাগঃ স্বস্রা অম্বিকায়া তং জুষস্ব স্বাহা।' তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে আমরা দুর্গা মহাদেব কার্ত্তিক গণেশ নন্দিকে একসঙ্গে পাইয়াছি। এই সময় রুদ্র ও মহাদেব অভিন্ন হইয়াছেন। উমা অম্বিকা ও দুর্গা এক হইয়াছেন। মহাদেব রুদ্র তখন উমাপতি, অম্বিকাপতি। তখন উমা বা অম্বিকা মহাদেবের ভগিনী নন। আমরা তৈত্তিরীয়-আরণ্যকের উক্তিগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

১। পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। [১০ম প্রপাঠক। ১ম অনুবাক। ৫] তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপুরুষায় মহাসেনায় ধীমহি। তন্নো ষন্মুখঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৬] ৩

২। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। [১০।১।৭] নারায়ণোপনিষৎ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছে—"কাত্যায়নায়ৈঃ বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গা প্রচোদয়াৎ।"

[সায়ণ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদে লিঙ্গব্যত্যয় হইয়া থাকে। তাই 'দুর্গা' বুঝাইতে 'দুর্গি'র প্রয়োগ হইয়াছে। 'দুর্গিঃ দুর্গালিঙ্গাদিব্যত্যয়ঃ সর্ব্বত্র ছান্দসো দ্রষ্টব্যঃ।']

৩। নমো হিরণ্যবাহবে হিরণ্যবর্ণায় হিরণ্যরূপায় হিরণ্যপতয়ে-অম্বিকাপতয় উমাপতয়ে নমো নমঃ। ১০।১৮।

বৃহদ্দেবতা বৈদিক দেবতার ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইহাতে (২।৭৮,৭৯) আমরা দেখিতে পাই, অদিতি বাক্ সরস্বতী এবং দুর্গা অভিন্ন। আমরা যে দুর্গার পূজা করিয়া থাকি, তাঁহার বাহন সিংহ। দেবী বাক্ নিজেকে সিংহে পরিণত করেন এবং দেবতার বিশেষ সাধ্যসাধনায় তাঁহাদের নিকট গমন করেন। এই বাক্ ও সিংহ যে অভিন্ন, শাস্ত্রে (Shakti and ...akta by Sir John Woodroffe pp. 456-457.) তাহার প্রমাণ আছে। বাক্ এবং দুর্গা যে অভিন্ন, বৃহদ্দেবতা তাহার প্রমাণ। আমরা যতটুকু পাইলাম, তাহা হইতে দুর্গার সহিত সিংহের সংশ্রবে একটা কারণ স্থির করা যাইতে পারে। ঋগ্বিধান-ব্রাহ্মণে (৪।১৯) রাত্রিসূক্ত বাচনের নির্দ্দেশ আছে। পূজাকালে স্থালিপাক যজ্ঞরাত্রির পূজা করিতে হয়। দেবী বাক্ ও যজ্ঞ-রাত্রি মূলতঃ এক হইলেও রূপতঃ বিভিন্ন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে (২।৪।৬।১০) উল্লেখ আছে যে, ইহাঁরা কখন কখন সম্পূর্ণ অভিন্ন। রাত্রিসূক্ত ইহাঁকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদের খিলসূক্তে (২৫) রাত্রিদেবীকে দুর্গা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, আর এই সম্পূর্ণ মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১) স্থান পাইয়াছে। এই আরণ্যকে তিনি হব্যবাহন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দুর্গা হব্যবাহনী ও অগ্নি এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুর্গা ও অগ্নি, অভিন্ন বলিয়া দুর্গাকে জিহ্বাশালিনী বলা হইয়াছে। এই জিহ্বা সাতটি। তাহাদের নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং শুচিস্মিতা। এই সপ্তজিহ্বা প্রকট করিয়া যে দুর্গা বলিগ্রহণ করেন, গৃহ্যসংগ্রহ (১।১৩।১৪) তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে অনেকগুলি দেবতার পূজা হইত। সেই দেবতাগুলি

বৈদিক যুগের শেষ দিকে দুর্গা নামে প্রচারিত ও পূজিত হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বাজসনেয়ী-সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রভগিনী, তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে (১০।১৮) দুর্গা রুদ্রপত্নী। এই আরণ্যকে (১০।১) আবার দুর্গাদেবীর আরাধনা আছে। সেইখানে তিনি বৈরোচনী। বিরোচন সূর্য্য বা অগ্নির নাম। অন্যত্র (১০।১।৭) যেখানে অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, সেখানে দুর্গার (দুর্গির) আরও দুইটি নাম আছে—একটি কাত্যায়নী, অপরটি কন্যকুমারী। কেনোপনিষদে (৩।২৫) পাওয়া যায়, ব্রহ্মজ্ঞা দেবী হিমবানের কন্যা উমা। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১৮) রুদ্রকে উমাপতি বলা হইয়াছে। এই আরণ্যকে (১০।২৬।৩০) সরস্বতীকে বরদা, মহাদেবী সন্ধ্যাবিদ্যা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পরে আবার এগুলিকে দুর্গাদেবীর গুণরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।

বৈদিক যুগ হইতে পরযুগের সাহিত্য আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে দুর্গা-তত্ত্বের আরম্ভ হইয়া রামায়ণ-মহাভারত যুগে ইহা সম্পূর্ণ হয়।

(যমুনা, কার্ত্তিক)　　শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

—

কৈফিয়ৎ

কবি হোন বা কলাবিৎ হোন তাঁরা লোকের ফর্‌মাস টেনে আনেন,—রাজার ফর্‌মাস, প্রভুর ফর্‌মাস, বহুপ্রভুর সমাবেশরূপী সাধারণের ফর্‌মাস। ফর্‌মাসের আক্রমণ থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নেই। তার একটা কারণ, অন্দরে তাঁরা মানেন সরস্বতীকে, সদরে তাঁদের মেনে চল্‌তে হয় লক্ষ্মীকে। সরস্বতী ডাক দেন অমৃতভাণ্ডারে, লক্ষ্মী ডাক দেন অন্নের ভাণ্ডারে। শ্বেতপদ্মের অমরাবতী আর সোনার পদ্মের অলকাপুরী ঠিক পাশাপাশি নেই। উভয়ত্রই যাদের ট্যাক্সো দিতে হয়—এক জায়গায় খুসি হয়ে, আরেক জায়গায় দায়ে পড়ে'—তাদের বড় মুস্কিল। জীবিকা অর্জ্জনের দিকে সময় দিলে ভিতর-মহলের কাজ চলে না। যেখানে ট্রামের লাইন বসাতে হবে সেখানে ফুলের বাগানের আশা করা মিথ্যে। এই কারণে ফুলবাগানের সঙ্গে আপিসের রাস্তার একটি আপোষ হয়েচে এই যে, মালি জোগাবে ফুল আর ট্রাম-লাইনের মালেক জোগাবে অন্ন। দুর্ভাগ্যক্রমে যে মানুষ অন্ন জোগায় মর্ত্ত্যলোকে তার প্রতাপ বেশি। কারণ, ফুলের সখ, পেটের জ্বালার সঙ্গে জবরদস্তিতে সমকক্ষ নয়।

শুধু কেবল অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের সুযোগটাই বড় কথা নয়। ধনীদের যে টাকা, তার জন্য তাদের নিজের ঘরেই লোহার সিন্দুক আছে, কিন্তু গুণীদের যে কীর্ত্তি, তার খনি যেখানেই থাক্ তার আধার ত তাদের নিজের মনের মধ্যেই নয়। সে কীর্ত্তি সকল কালের, সকল মানুষের। এইজন্য তার এমন একটি জায়গা পাওয়া চাই যেখান থেকে সকল দেশকালের সে গোচর হতে পারে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার মঞ্চের উপর যে কবি ছিলেন, সেদিনকার ভারতবর্ষে তিনি সকল রসিক-মণ্ডলীর সামনে দাঁড়াতে পেরেছিলেন—গোড়াতেই তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়নি। প্রাচীন কালে অনেক ভাল কবির ভাল কাব্যও দৈবক্রমে এইরকম উঁচু ডাঙাতে আশ্রয় পায় নি বলে' কালের বন্যাস্রোতে ভেসে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ-কথা মনে রাখ্‌তে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফর্‌মাস তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্ম্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তাঁরা মারা যান না, ভাবীকালের জন্যে টিঁকে থাকেন। লোভে পড়ে' ফর্‌মাস যারা সম্পূর্ণ স্বীকার করে' নেয়, তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের কর্‌বার জো নেই। তাঁরা রাজার ফর্‌মাস পুরোপুরী খেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে-হাতে তাঁদের নগদ-পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফর্‌মাস খাট্‌তে অপটু ছিলেন বলে' দিঙ্‌নাগের স্থূল হস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে' মাঝে মাঝে ফর্‌মাস খাট্‌তে হয়েছে তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে বলেছিলেন "যে আদেশ, মহারাজ; যা বল্‌চেন তাই করব" অথচ সম্পূর্ণ আরেকটা কিছু করেচেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্ত্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টিসৎকার হয়ে যায়নি—চিরদিনের রসিক-সভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে।

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে,—একটা প্রয়োজনের, আর একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে। বাইরের ফর্‌মাসে এই প্রয়োজনের আসর সরগরম হয়ে ওঠে, ভিতরের ফর্‌মাসে লীলার আসর জমে। আজকের দিনে জনসাধারণ জেগে উঠেচে; তার ক্ষুধা বিরাট্, তার দাবী বিস্তর। সেই বহুবসনাধারী জীব তার বহুতর ফর্‌মাসে মানবসংসারকে রাত্রিদিন উদ্যত করে' রেখেচে;—কত তার আসবাব আয়োজন, পাইক বরকন্দাজ, কাড়ানাকাড়া-ঢাকঢোলের তুমুল কলরব—তার "চাই চাই" শব্দের গর্জ্জনে স্বর্গমর্ত্ত্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠ্‌ল। এই গর্জ্জনটা লীলার আসরেও প্রবেশ করে' দাবী প্রচার করতে থাকে যে, তোমাদের বীণা, তোমাদের মৃদঙ্গও আমাদের জয়যাত্রার ব্যাণ্ডের সঙ্গে মিলে আমাদের কল্লোলকে ঘনীভূত করে' তুলুক। সে-জন্যে সে খুব বড় মজুরী আর জাঁকালো শিরোপা দিতেও রাজী আছে। আগেকার রাজসভার চেয়ে সে হাঁকও দেয় বেশি, দামও দেয় বেশি। সেইজন্যে ঢাকীর পক্ষে এ সময়টা সুসময়, কিন্তু বীণকারের পক্ষে নয়। ওস্তাদ হাত জোড় করে' বলে, "তোমাদের হট্টগোলের কাজে আমার স্থান নেই; অতএব বরঞ্চ আমি চুপ করে' থাক্‌তে রাজি আছি, বীণাটা গলায় বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে' মর্‌তেও রাজি আছি, কিন্তু আমাকে তোমাদের সদর-রাস্তায় গড়ের বাদ্যের দলে ডেকো না। কেন না, আমার উপরওয়ালার কাছ থেকে তাঁর গানের আসরের জন্যে পূর্ব্ব হতেই বায়না পেয়ে বসে' আছি।" এ'তে জনসাধারণ নানা-প্রকার কটু সম্ভাষণ করে, সে বলে, "তুমি লোকহিত মান না, দেশহিত মান না, কেবল আপন খেয়ালকেই মান।" বীণকার বল্‌তে চেষ্টা করে, "আমি আমার খেয়ালকেও মানি নে, তোমার গরজকেও মানি নে, আমার উপরওয়ালাকে মানি।" সহস্ররসনাধারী গর্জ্জন করে' বলে' ওঠে—"চুপ!"

জনসাধারণ বল্‌তে যে প্রকাণ্ড জীবকে বোঝায়, স্বভাবতই তার প্রয়োজন প্রবল এবং প্রভূত। এইজন্যে স্বভাবতই প্রয়োজন সাধনের দাম তার কাছে অনেক বেশি, লীলাকে সে অবজ্ঞা করে। ক্ষুধার সময়ে বকুলের চেয়ে বার্ত্তাকুর দাম বেশি হয়। সেজন্যে ক্ষুধাতুরকে দোষ দিইনে; কিন্তু বকুলকে যখন বার্ত্তাকুর পদ গ্রহণ কর্‌বার জন্যে ফর্‌মাস আসে, তখন সেই ফর্‌মাসকেই দোষ দিই। বিধাতা ক্ষুধাতুরের দেশেও বকুল ফুটিয়েচেন, এতে বকুলের কোনও হাত নেই। তার একটিমাত্র দায়িত্ব আছে এই যে, যেখানে যাই ঘটুক, তাকে কারো দরকার থাক্ বা না থাক্, তাকে বকুল হয়ে উঠ্‌তেই হবে,—ঝরে' পড়ে ত পড়্‌বে, মালায় গাঁথা হয় ত তাই সই। এই কথাটাকেই গীতা বলেচেন, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। দেখা গেছে স্বধর্ম্মে জগতে খুব মহৎ লোকেরও নিধন হয়েচে, কিন্তু সে নিধন বাইরের, স্বধর্ম্ম

করিলে কখন কোনও পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি কার্য্যজননশক্তি তাহাই মায়া। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ-কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে—এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই অগ্নি বলা যায় না, সেই প্রকার পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কখনও পরমাত্মা বলা যায় না। তাহা হইলে শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি? শূন্য সেই শক্তির স্বরূপ এ-কথা বলিতে পার না, যেহেতু শূন্য সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ বলিয়াছি। সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শক্তিতত্ত্ব এইরূপ লেখা আছে—

অপ্রমেয়স্য শাক্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌখ্যচিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্যানাকৃতেরপি॥
ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ।
তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত॥
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্ত্তৃতাকর্তৃতাপি চ।
ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ॥

অপ্রমেয় শক্তিযুক্ত শুভময় সৌখ্যচিন্মাত্র স্বরূপ আকৃতিবিহীন হইলেও তাহার ইচ্ছাসত্তা, ব্যোমসত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তার ক্রমশঃ বিকাশ হয়। ইচ্ছাসত্তাদির অনুগতা সত্তা মহাসত্তা। পরমাত্মার জ্ঞান-শক্তি ক্রিয়াশক্তি কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি আছে। শিবাত্মা হইতে পৃথক্ সত্তা নাই।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের নির্ব্বাণ-প্রকরণের উত্তর ভাগ ৮১ সর্গে লিখিত আছে—

তাহার পর দেখিলাম সেই মহাকাশে বিশাল-দেহ রুদ্রদেব মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * * * * * দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর হইতে ছায়ার ন্যায় এক মূর্ত্তি নৃত্য করিতে করিতে নির্গত হইল। প্রথমে সেই মূর্ত্তিটি ছায়া ধারণা হওয়াতে মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। * * * * তাহার পর ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলাম—ছায়া নহে; একটি ত্রিলোচনা রমণীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন। সেই রমণী কৃষ্ণবর্ণা, কৃশা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শিরা পরিব্যাপ্ত, তাঁহার বিশাল দেহ জীর্ণ; তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে সতত বহ্নিজ্বালা নির্গত হইতেছিল, তিনি বাদন্ত বনরাজির ন্যায় পুষ্পপল্লবরমণীয় শেখর ধারণ করিয়া ছিলেন। * * * * * তিনি এত কৃশা যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে অসমর্থা; এইজন্য যেন বিধাতা সুদীর্ঘ শিরারূপ রজ্জু দ্বারা তাঁহার পতনোন্মুখ বিশীর্ণ দেহ একত্র গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আকৃতি এত দীর্ঘ লম্বমান যে তাঁহার মস্তক ও চরণ নখ দেখিবার জন্য আমাকে একবার অতি ঊর্দ্ধে, একবার অতি নিম্নে গমনাগমন করিতে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাঁহার মস্তক, হস্ত প্রভৃতি অঙ্গ কেবল শিরা ও অন্ত্রতন্ত্রী দ্বারা গ্রথিত। খদির প্রভৃতি কণ্টকবল্লীর ন্যায় মূল হইতে শাখা পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত শরীর সূত্র দ্বারা বিজড়িত। সূর্য্যাদি দেবের ও দানবগণের বিবিধবর্ণের মস্তক কমলমালা দ্বারা মালা গ্রন্থন করিয়া সেই মালা তিনি কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে বায়ু সঙ্কুঞ্চিত উজ্জলশিখাসম্পন্ন বহ্নির সংযোগে সমুজ্জল হইয়া ছিল। তাঁহার লম্বমান কর্ণে সর্প ঝুলিতেছিল; নরমুণ্ড দ্বারা তিনি কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ বিশাল স্তনদ্বয় বিশুষ্ক দীর্ঘ অলাবুর মত লম্বমান উরু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার খট্টাঙ্গমণ্ডলে কার্ত্তিকেয়ের ময়ূরপুচ্ছে ও ব্রহ্মার কেশজালে বিশোভিত ইন্দ্রাদিদেবগণের মস্তক ঝুলিতেছিল। তাঁহার দন্তপংক্তিরূপ চন্দ্রশ্রেণী হইতে নির্ম্মলকিরণপুঞ্জ বিনিঃসৃত হইতেছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন অন্ধকার-সাগরের একটা ঊর্দ্ধরেখা উঠিয়াছে। * * * * * * দেখিলাম তিনি কখনও একবাহু, কখন বহুবাহু হইতেছেন। কখনও অনন্ত বিশালবাহু উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে-ছেন। তাঁহার বাহুসমূহের উৎক্ষেপণে এই জগৎরূপ নৃত্যমণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিতেছে। কখনও তিনি একমুখী, কখনও বহুমুখী, কখনও মুখবিহীনা হইতেছেন, কখনও বা অনন্ত ভয়ঙ্কর মুখ দেখাইতেছেন। কখনও এক পদে অবস্থান করিতেছেন, কখনও বহুপদা, কখনও বা অনন্তপদা, কখনও বা একেবারে পদশূন্যা হইতেছেন। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া আমি তাঁহাকে কালরাত্রি বলিয়া অনুমান করিলাম। সাধুগণ ইঁহাকেই ভগবতী কালী বলিয়া থাকেন।

নির্ব্বাণ-প্রকরণ, উত্তরভাগ, ৮৪ সর্গে—রাম কহিলেন, হে মুনিবর! ভগবতী কালী নৃত্য করেন কি নিমিত্ত? আর তিনি শূর্প, ফাল, কুদ্দাল মুষলাদির মাল্য ধারণ করেন কেন? বশিষ্ঠ কহিলেন—সেই ভৈরব যাঁহাকে চিদাকাশ শিব বলিয়া বলিলাম তাঁহার যে মনোময়ী স্পন্দশক্তি তাঁহাকেই তুমি মায়া বা কালী বলিয়া জানিও। ঐ মায়া তাঁহা হইতে অভিন্ন। ঐ ইচ্ছারূপিণী স্পন্দশক্তি জীবার্থীদের জীবনরূপে পরিণত হওয়ায় জীবচৈতন্য নামে, সৃষ্টির প্রকৃতি বা মূল কারণ বলিয়া 'প্রকৃতি' নামে দৃশ্যাভাসে অনুভূতি উৎপত্তি প্রভৃতি বিকারের সম্পাদন করিয়া 'ক্রিয়া' নামে অভিহিত হন। ঐ মায়া বড়বাগ্নিজ্বালার ন্যায় দৃশ্যমান আদিত্য-মণ্ডলতাপে শুষ্ক হইয়া যান বলিয়া 'শুষ্কা' নামে অভিহিত হন। উৎপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি 'চণ্ডিকা' নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া ইঁহার নাম 'জয়া'। সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রম বলিয়া ইঁহার নাম 'সিদ্ধা'। সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া ইঁহার নাম 'বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া'। বলে ইঁহাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম 'অপরাজিতা'। ইঁহার মহিমা কেহ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম 'দুর্গা'। প্রণবের সারাংশশক্তিও ইনি; এইজন্য ইঁহার নাম 'উমা' (উ, ম, অ= ওঁ)। নামজপকারীদিগের পরমার্থস্বরূপ বলিয়া ইঁহার নাম 'গায়ত্রী'; সর্ব্বজগৎ প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম 'সাবিত্রী'। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইহা হইতে প্রবাহিত বলিয়া ইঁহার নাম 'সরস্বতী'। ইনি গৌরাঙ্গী বলিয়া ইঁহার নাম 'গৌরী'; যখন শিবশরীরের অনুষঙ্গিণী হন তখনই গৌরী নামে অভিহিত হন। মস্তকের ভূষণবিন্দুরূপ ইন্দুকলা বলিয়াও ইঁহার নাম 'উমা'। উক্ত কাল ও কালী আকাশস্বরূপা বলিয়া উহাঁদের বর্ণ কৃষ্ণ।

উক্ত নির্ব্বাণ-প্রকরণের পূর্ব্বভাগে অষ্টাদশ সর্গে হরের আলয়ে অষ্টমাতৃকার আবাসস্থল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমাতৃকা যথা:— জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুষা ও উৎপলা।

যজুর্বেদেও "অম্বিকা" দেবীর নাম আছে; তিনি তথায় রুদ্রের ভগিনী। কেনোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাকে উমা হৈমবতী বলা হইয়াছে। উমা ব্রহ্মবিদ্যা হইতে কালে ব্রহ্মশক্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মহেশ্বরকে মায়ী বলা হইয়াছে। দেব্যুপনিষদে মহাদেবী ব্রহ্মস্বরূপিণী, প্রকৃতিপুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য ও অশূন্য, আনন্দ ও অনানন্দ, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, ব্রহ্মা ও অব্রহ্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বহ্বৃচোপনিষদে দেবী সর্ব্বাগ্রে একমাত্র ছিলেন এবং তিনিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদ-পরিশিষ্টের রাত্রিপরিশিষ্টে দুর্গা দেবীর স্তোত্র পাওয়া যায়।

কৈবল্যোপনিষৎ:—



ঈদের চাঁদ



তুলসী-তলায়

উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৭॥

এখানে শিবকে 'উমা'-সহায় বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নবম ও অষ্টাদশ অনুবাকে দুর্গা ও অম্বিকা বা উমার উল্লেখ পাওয়া যায়। দুর্গা অগ্নির সহিত অভিন্ন; তাঁহার কালী, করালী, মনোজবা সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, শুচিস্মিতা নামে সপ্তজিহ্বা (গৃহ্যসংগ্রহ ১।৩।১৪; মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৪)।

পাণিনির ব্যাকরণে (৪।১।৪১,৪৯) ইন্দ্রাণী, বরুণানী, শর্বাণী, রুদ্রাণী, মৃড়াণী, পদ পাওয়া যায়।

এই-সকলের মধ্যে ইন্দ্রাণী ও বরুণানী শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।

মহাভারতের বিরাটপর্বে কথিত আছে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কথিত আছে অর্জুন দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদরচনাকালে ও ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-রচনাকালে দেবপত্নীগণ দেবগণের সহিত যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইতেন। উমা হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যাকেই বলিত, কিন্তু অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমশঃ পরব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইল এবং উমা মহেশ্বরের পত্নী ও মায়াশক্তি স্বরূপে উপাসিত হইলেন। সাংখ্যমতাবলম্বী ও অদ্বৈতবাদীগণও পরব্রহ্মের এই শক্তি স্বীকার করিলেন। মহাভারত-রচনাকালে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরীতে দুর্গার মন্দির স্থাপিত হইয়া তাঁহার পূজা হইত। এইরূপ নগরে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া অগ্নি-পুরাণে ১০৬ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। "কারণ দেবালয়শূন্য নগর গ্রাম দুর্গ ও গৃহাদি পিশাচাদি কর্ত্তৃক ভুক্ত ও রোগাদি দ্বারা অভিভূত হইতে পারে"। ১৬-১৭। মহাভারতেও দুর্গাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে। উত্তরকালে পরিচিত অনেক নামও মহাভারতে পাওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ রচনার সময়ে শক্তিরূপিণী দুর্গাদেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও পত্নীর কল্পনা যে পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাও পাইলাম।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।২৯০-২৯১—

বিনায়কস্য জননীমুপতিষ্ঠেৎ ততোঽম্বিকাম্।
দূর্বাসর্ষপপুষ্পাণাং দত্ত্বার্ঘ্যং পূর্ণমঞ্জলিম্॥
রূপং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।
পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি সর্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে॥

অনন্তর বিনায়কজননী অম্বিকাকে দুর্বা সর্ষপ-পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্য ও পূর্ণাঞ্জলি প্রদান করিয়া মূলের কথিত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিবে। কাত্যায়ন-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে মাতৃগণকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবার বিষয় উল্লেখ আছে। বিষ্ণু-সংহিতার ষট্‌পঞ্চাশৎ অধ্যায়ে দুর্গাসাবিত্রীর দ্বারা পূত হইবার উল্লেখ আছে। এই দুর্গাসাবিত্রী তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে। (কাত্যায়ন্যৈ বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ)—তৈত্তিরীয় আরণ্যক নবম অনুবাক। নারায়ণোপনিষৎমতেও এইরূপ।

ললিতবিস্তরের চতুর্বিংশ অধ্যায় পাঠ করিলে চারিদিকে চারি শ্রেণীর অষ্ট শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গরুড়-পুরাণের পূর্ব্ব খণ্ডে (অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে) দুর্গাদেবী অষ্টা-বিংশতিভুজা, অষ্টাদশভুজা, দ্বাদশভুজা, অষ্টভুজা এবং চতুর্ভুজা রূপে পূজিত হইবার উল্লেখ আছে। নবম্যাদি তিথিতে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি এবং তাঁহাদের অসিতাঙ্গাদি ভৈরবের পূজাবিধানও আছে (চতুর্বিংশ অধ্যায়)। কুব্জিকা-পূজারও বিধান আছে (ষড়্‌বিংশ অধ্যায়)। ত্রিপুরা ও জ্বালামুখীর পূজাবিধান আছে (২০৪ অধ্যায়)।

অগ্নিপুরাণে (অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে) গৌরী দেবীর প্রতিষ্ঠার প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এবং উমাপূজার বিবরণ ৩২৬ অধ্যায়ে উক্ত হই-য়াছে। সঙ্কট হইতে তারণ করেন বলিয়া দুর্গা নাম হইয়াছে (৩২৩ অধ্যায়)। তিনি বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেমঙ্করী, বহুভুজা নামে প্রসিদ্ধা (১২ অধ্যায়)। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দেবী গৌরীর পূজা করিবে। ইহার নাম গৌরীনবমী ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষীয় অষ্টমীতে কন্যাতে সূর্য্য ও চন্দ্র মূলা-নক্ষত্রে সংক্রম হইলে তাহার নাম অঘার্দ্দনা নবমী। তৎকালে চণ্ডা, প্রচণ্ডা, রুদ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা, অতিচণ্ডিকা, উগ্রচণ্ডা ও মহিষমর্দ্দিনীর পূজা করিবে; ইত্যাদি (১৮৫ অধ্যায়)। জয়ার্থী হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতে পটে ভদ্রকালীর মূর্ত্তি লিখিয়া এবং আয়ুধকার্ম্মুকাদিশস্ত্র ও ধ্বজাছত্রচামরাদি যাবতীয় রাজচিহ্ন স্থাপন করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে। রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া বলি-প্রদান করিয়া পরদিবস পুনরায় পূর্ব্ববৎ পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—হে ভদ্রকালি! মহাকালি! দুর্গে! দুর্গতিহারিণি! ত্রৈলোক্যবিজয়ে! চণ্ডি! মাতঃ! প্রসন্ন হইয়া আমার শান্তি ও যশোবিধান করুন। (২৬৮ অধ্যায়)।

(মাধবী, আশ্বিন) শ্রী মনীষিনাথ বসু সরস্বতী

—

রামায়ণ-যুগের যন্ত্র-বিজ্ঞান

রামায়ণের নানাস্থানে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রশালার উল্লেখ আছে। যন্ত্রবিজ্ঞানে আর্য্যভারতের সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা অপেক্ষা অনার্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল লঙ্কাই অধিক উন্নত ছিল। মানবী জ্ঞান অপেক্ষা দানবী জ্ঞানে বৈচিত্র্যের পরিচয় অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। (লঙ্কা ৩)।

অযোধ্যা ও লঙ্কা—উভয় স্থানের বর্ণনাতেই দুর্গাদির ও যন্ত্রাদির উল্লেখ আছে। উভয় স্থানের দুর্গশীর্ষেই লৌহনির্ম্মিত শত শত শতঘ্নী নামক যন্ত্র রক্ষিত হইত।

রামায়ণের টীকাকার রামানুজ শতঘ্নীকে নালিক আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া লিখিয়াছেন, রামায়ণে আগ্নেয়াস্ত্র ও নালিক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সুতরাং শতঘ্নীকে আধুনিক কামান-তুল্য আগ্নেয়-অস্ত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

কুশধ্বজের সংকাশ্যা রাজধানীতেও প্রাকারোপরি যন্ত্রফলকসমূহের উল্লেখ আছে। (রা ৭১)

লঙ্কায় রাবণের শয্যা-গৃহে যন্ত্র-চালিত পাখা ছিল। হনুমান নিশাযোগে সেই কক্ষে যাইয়া কৃত্রিমবালহস্তে বীজ্যমান পাখা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দেখিয়াছিলেন।

"বালব্যজনহস্তাভির্বীজ্যমানং সমন্ততঃ।" ৫।৫।১০

লঙ্কায় দানব শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা-রচিত শূন্যগামী "পুষ্পক" নামক একটি যান বা বিমান ছিল। পুষ্পক ছিল হংসচালিত মহাবেগশালী বিমান। লঙ্কাকাণ্ড ১২৫ সর্গ ১ শ্লোক। উহা আরোহীর ইচ্ছানুসারে, ইচ্ছানুরূপ স্থানে অপ্রতিহত গমনে বিচরণ করিত।

আকাশের উর্দ্ধদেশে উঠিয়া সেই স্থান হইতে নিম্নস্থিত জনপ্রাণী, ঘর-বাড়ীর আকৃতি কিরূপ দেখা যায়, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৬২ সর্গে তাহার বর্ণনা আছে। এগুলি পরীক্ষিত সত্য বলিয়াই মনে হয়।

সাগরে সেতুবন্ধনে কোন উচ্চ বৈজ্ঞানিক রীতি আচরিত হইয়াছিল

কি না, মহর্ষির রচনায় তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু সাগর-বন্ধনে যে যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রামায়ণে আছে। যথা—

হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষাণাংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্ব্বতাংশ্চ সমুৎপাট্য যন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ। ৫৬।৬।২২

হস্তীর ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্ব্বত-সকল উৎপাটিত হইয়া যন্ত্র-সাহায্যে (সমুদ্রে) নীত হইতে লাগিল।

সেতু যে কেবল জলে পাথর ভাসাইয়া হয় নাই, পরন্তু তাহাতে মাপ-পরিমাপেরও প্রয়োজন হইয়াছিল, তাহা তিনি দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। তাহার সংক্ষেপ বর্ণনাটি এইরূপ—প্রস্তরখণ্ডসকল প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকিলে সমুদ্রের জল উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশের দিকে উত্থিত হইতে লাগিল এবং পুনরায় অধঃপতিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক বানর সূত্র ধরিয়া সেই সেতুর সম-বিষমাদি পরীক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে বানর-শিল্পী নল ঘোরকর্ম্মা কর্ম্মীদিগের সাহায্যে সেতুবন্ধন করিতে লাগিল। (লঙ্কা ২২ সর্গ)

একস্থানে পাংশু যন্ত্রের সাহায্যে সেতু ও কূপ খননের উল্লেখ আছে। (৯।২।৮০)

রামায়ণে অর্ণবযানের উল্লেখ আছে। অর্ণব-যানের উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে। কিন্তু তাহা যন্ত্রে চালিত হইত, কি বায়ুবেগে চালিত হইত, অথবা নাবিকগণের চেষ্টায় চালিত হইত, সে সম্বন্ধে কোন আভাসই রামায়ণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন। ইহাকে রামায়ণে রাক্ষসী মায়া বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১৭।৬।৮৫)

(সৌরভ, কার্ত্তিক) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

রঙ্গ-প্রদর্শনী পদাবলী

বঙ্গের রঙ্গের কথা কত আর ক'ব।
নিত্য হয় অভিনয় দৃশ্য নব নব॥
এলেন বিলাত-ফের্তা গায়ে কোর্তাকুর্তি।
অধ গোরা অধ কালা বর্ণচোরা মূর্ত্তি॥
কুর্দয়ে দর্দুর যেন শার্দ্দূলের নাতি।
দর্পে হ্যালে কেঁচো যেন সর্পের সজাতি॥
পায়রা তোলে পাখম শিখীর দেখি শিখি।
ঠোকর দিয়া বলে কাক "কেকা ডাকো দিকি?"
নাসিকা বর্ধন করি মুষিকা সুন্দরী
কি সরেস করিণী সেজেছে আহা মরি!
ড্যালা মিছরি ফেলি থুএ' খুদে-পিঁপ্ড়েগুলি
ঝোলাগুড়ের সঙ্গে করে মরণ-কোলাকুলি॥
এই-সব দৃশ্য দেখি বনি-গিয়া জড়,
কলির চতুর্থপাদে করিলাম গড়॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কার্ত্তিক) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে—
গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নব-বন-বরিষণে
গোপনে গোপনে এলি কেয়া।
পুরবে নীরব ইসারাতে
একদা নিদ্রাহীন রাতে
হাওয়াতে কি পথে দিলি খেয়া।
(আষাঢ়ের খেয়ালের কোন্ খেয়া)
যে মধু হৃদয়ে ছিল মাখা
কাঁটাতে কি ভয়ে দিলি ঢাকা।
বুঝি এলি যার অভিসারে
মনে মনে দেখা হল তারে—
আড়ালে আড়ালে দেয়া-নেয়া।
(আপনায় লুকায়ে দেয়া-নেয়া)

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, কার্ত্তিক শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাম

নাম জিনিসটা মানুষের একটা অতি প্রিয় সম্পত্তি। সকল সম্পদ ত্যাগ করিলেও মানুষ নাম ত্যাগ করিতে পারে না। এই নামকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিবার জন্য দেশ বিদেশে কত মানুষ শক্তি সামর্থ্য ধন জন মান ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। মানুষ অতি বড় শপথ করিবার সময় বলে 'একথা যদি সত্য না হয়, তবে আমার নাম অমুকচন্দ্র অমুকই নয়।" অপমান করিবার একটি চরম উপায় মানুষের নামে কুকুর পোষা।

পুরুষের মধ্যে আপামর সাধারণ সকলেরই নিজ নামে আজীবন অধিকার থাকে। কিন্তু প্রায় কোনো দেশেই স্ত্রীলোকের নিজের সম্পূর্ণ নামে অধিকার বিবাহের পর থাকে না। ভারতবর্ষেই এমন অনেক সভ্য দেশ আছে যেখানে আজ পর্য্যন্ত বহু স্ত্রীলোকের কোনো নাম নাই। পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায় সকল পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের নাম। সকল বাড়ীর বড় মেয়েই জেঠি অর্থাৎ বড়কী, মেজ মেয়ে মাইলি, সেজ মেয়ে সাঁইলি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি। আজকালকার অতি

নব্যা মেয়েদের অনেকের নিজস্ব একটা করিয়া নাম হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষেরই কোনো দেশে বিবাহের পর মেয়েদের সমস্ত নামটাই বদ্‌লাইয়া যায়। বিবাহের পূর্ব্বে যিনি ছিলেন শ্রীমতী দুর্গাবতী বসু, তিনি যদি হরিনাথ মল্লিককে বিবাহ করিয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীরাণী মল্লিক হইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাকে চেনা দেবতার পক্ষেও কঠিন হয়। কিন্তু এমন প্রথাও ভারতে আছে। অবশ্য আজকাল কিছু কিছু বদল হইতেছে। আবার অনেক দেশ আছে যেখানে পুরুষের পারিবারিক নাম ব্যবহৃত হয় না। পিতার নাম হয়ত উদয়াচলম্, পুত্রের নাম অরুণাচলম্, কন্যার নাম পদ্মম্। এখানে যদি বিবাহের পর কন্যার নাম না বদল হয় ত একরকম চলে। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে বাস করিয়া ভদ্র লোক মাত্র মিষ্টার হইতে বাধ্য হন, সুতরাং পিতা হন মিঃ উদয়াচলম্, মাতা হন মিসেস উদয়াচলম্ পুত্রবধূ হন মিসেস অরুণাচলম্, কন্যা কখনও মিস্ পদ্মম্ কখনও মিস্ উদয়াচলম্। এক্ষেত্রে পারিবারিক এক নাম থাকার সুবিধাটা থাকে না, অথচ মেয়েদের পক্ষে নিজস্ব নামটা হারাইবার একটা সম্ভাবনা থাকে।

বাংলাদেশে মেয়েদের এই নাম সমস্যাটা চিরকালই অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এ দেশে বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে মেয়েদের নাম একই থাকিবার কথা। ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী থাকিলে বিবাহের পরেও তাহাই থাকেন। শূদ্র কন্যা হরিমতী দাসী হইলে শূদ্র বধূ হইয়াও তাহাই থাকেন। আমরা যদি ইংরেজের দেখাদেখি 'মিসেসে'র সমাদর না করিতাম তাহা হইলে আমাদের দেশে নারীর অধিকারের একটা বড় সমস্যা সহজেই সমাধান হইয়া যাইত। বাঙালী মেয়ের নামের গায়ে বিবাহিতার ছাপ মারিয়া সম্পত্তির সামিল করিয়া দেওয়ার নিয়মও এদেশে ছিল না। তাহারা সকলেই শ্রীমতী; মিস্ অথবা মিসেস্ নহে।

আজকাল দুইটি কারণে এইরূপ নাম ব্যবহারেও একটু অসুবিধা ঘটিতেছে। দাস নামটা যদিও বেশ চলিয়া যাইতেছে তবু দাসী আখ্যাটায় হীনতার গন্ধ আছে বলিয়া মানুষে ইহা নিজে ব্যবহার করিতে চায় না এবং অপরকেও লিখিতে ভয় পায়। তাছাড়া অসবর্ণ বিবাহের ফলে ব্রাহ্মণ কন্যা শূদ্রবধূ এবং শূদ্রকন্যা ব্রাহ্মণবধূ হইতেছেন। এ ক্ষেত্রেও জন্মাবধি সকলকেই দেবী না বলিলে নাম বদ্‌লাইয়া যাইবার সম্ভাবনাটা থাকিয়া যায়। ফলে সমস্ত বাঙালী মেয়ের একটি মাত্র 'শেষনাম' হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার উন্নততর যুগে খ্যাতনামা মহিলাদের নামের গোলমাল হইতে পারে। এখনি হইতেছে। ইন্দিরা দেবী এক বৎসর পূর্ব্বেও সাহিত্য-ক্ষেত্রে দুইজন ছিলেন। তবে ইহাতে আমাদের বেশী ভীত হইবার কারণ নাই। আমাদের দেশে এক পরিবারের দুটি মানুষের এক নাম রাখিবার নিয়ম না থাকাতে প্রতি পরিবারে পিতৃকুল মাতৃকুলের নাম বাদ দিয়া নাম রাখে। ফলে বাঙালীর নামের সংখ্যাই বেশী। পাশ্চাত্য দেশে পিতা মাতা পিতামহ মাতামহ প্রভৃতির নাম রাখা একটা ফ্যাশান ও গৌরবের বস্তু। ফলে Elder Pitt, Younger Pitt প্রভৃতি বিখ্যাত পিতাপুত্রের একনামও প্রায় দেখা যায়। ইহাতেও ত ওদেশের লোকের বেশী অসুবিধা হইতেছে না।

ইহা ছাড়া আর একটি কথাও বলিবার আছে। স্ত্রীলোক যতই স্বাধীনতালাভ করুন, গৃহ-সংসারেই অধিকাংশের আজীবন কাটিবে। বাহিরেই পুরুষের জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে, তবু হিন্দুস্থানী প্রভৃতি অনেক জাতির লোকের পদবীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই বেশ চলিতেছে। মিঃ হনুমান প্রসাদ, কি মিঃ মাতাদীনের পিতৃনাম কিংবা পারিবারিক নামের দরকার হয় না। সুতরাং বসু কি চক্রবর্ত্তীর গৃহলক্ষ্মী মঙ্গলা কি ক্ষেমঙ্করীর পিতৃনাম অথবা পতির নাম নিজ নামের পিছনে না জুড়িলেও চলিবে। তাঁহারা আজীবন দেবী লিখিলে ঘরের কি বাহিরের খুব বেশী ক্ষতি হইবে না, উপরন্তু নিজস্ব নাম চিরকাল বজায় রাখিবার গৌরবটা থাকিবে।

শ্রী শান্তা দেবী

রথযাত্রা

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশির কোনও রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে আসিয়াছিল।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

১ নাগরিক

মহাকালের রথযাত্রায় এবার যে রথ অচল হয়ে রইল। কিছুতেই নড়্লেন না। কা'র দোষে হ'ল তা জানি, গণৎকার গুণে' বলে দিয়েচেন।

২ নাগরিক

হয়ত কারো দোষ নেই, হয়ত মহাকাল ক্লান্ত, আর চল্‌তে রাজি নন।

১ নাগরিক

আরে বল কি? চল্‌তে রাজি না হলে আমাদের চল্‌বে কি করে'? ঐ দেখনা, রথের দড়িটা পড়ে' আছে, কত যুগের দড়ি—কত মানুষের হাত পড়েচে ঐ দড়িতে, এমন করে' ত কোনোদিন ধুলোয় পড়ে' থাকেনি।

৩ নাগরিক

রথ যদি না চলে, আর ঐ দড়ি যদি পড়ে' থাকে তাহলে ও যে সমস্ত রাজ্যের গলায় দড়ি হবে।

৪ নাগরিক

বাবা রে, ঐ দড়িটা দেখে ভয় লাগ্‌চে, মনে হচ্চে ও যেন ক্রমে ক্রমে সাপ হয়ে ফণা ধরে' উঠ্‌বে।

৩ নাগরিক

দেখ না ভাই, একটু একটু যেন নড়্‌চে মনে হচ্চে।

১ নাগরিক

আমরা যদি না নড়াতে পারি, ও যদি আপনি নড়ে' ওঠে, তাহলে যে সর্ব্বনাশ হবে।

৩ নাগরিক

তাহলে জগতের সব জোড়গুলো বিজোড় হয়ে উঠবে রে। তাহলে রথটা চল্‌বে আমাদের বুকের পাঁজরের উপর দিয়ে। আমরা ওকে নিজে চালাই বলে'ই ত ওর চাকার তলায় পড়িনে। এখন উপায়?

১ নাগরিক

ঐ দেখ্‌না, পুরুতঠাকুর বসে' মন্ত্র পড়্‌চে।

২ নাগরিক

রথযাত্রায় সব আগেই ঐ পুরুতঠাকুরের দলরাই ত দড়ি ধরে' প্রথম টানটা দিয়ে থাকেন। এবার কি শুধু মন্ত্র পড়ে'ই কাজ সার্‌বেন নাকি?

৪ নাগরিক

চেষ্টার ক্রটি হয়নি। ভোরের বেলা সেই অন্ধকার থাক্‌তে সবার আগে ওঁরাই ত একচোট টানাটানি করে' নিয়েচেন। কলিযুগে ওঁদের কি আর তেজ আছে রে?

৩ নাগরিক

ঐ দেখ্, আমার কেমন মনে হচ্চে ঐ রশিটা যেন যুগ-যুগান্তরের নাড়ীর মত দব্‌দব্ করচে।

১ নাগরিক

আমার মনে হচ্চে ঐ রথ চল্‌বে কোনো এক পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের স্পর্শ পেলে।

২ নাগরিক

আরে, রথ চালাতে পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে বসে থাক্‌লে শুভলগ্নও ত বসে' থাক্‌বে না। ততক্ষণ আমাদের মত পাপাত্মাদের দশা হবে কি?

১ নাগরিক

পাপাত্মাদের দশা কি হবে সেজন্যে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

২ নাগরিক

বলিস কি রে! পুণ্যাত্মার জন্যে এ জগৎ তৈরি হয়নি। তা হলে যে আমরা অতিষ্ঠ হতুম। সৃষ্টিটা আমাদেরই জন্যে। দৈবাৎ দুটো একটা পুণ্যাত্মা দেখা দেয়; বেশিক্ষণ টিঁক্‌তে পারে না—আমাদের ঠেলা খেয়ে বনে জঙ্গলে গুহায় তাদের আশ্রয় নিতে হয়।

১ নাগরিক

তাহলে তুমিই দড়াটা ধরে' টান দাও না, দাদা, দেখা যাক রথ এগোয়, না দড়াটা ছেঁড়ে, না তুমিই পড় মুখ থুব্‌ড়ে।

২ নাগরিক

দাদা, আমাদের সঙ্গে পুণ্যাত্মাদের তফাৎটা এই যে, গুন্‌তিতে তারা একটা দুটো, আমরা অনেক। যদি ভরসা করে' সেই অনেকে মিলে টান দিতে পারি রথ চল্‌বেই। মিল্‌তে পার্‌লেম না বলে' টান্‌তে পার্‌লেম না, পুণ্যাত্মাদের জন্যে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেম।

৪ নাগরিক

ওরে ভাই, দড়িটা মনে হল যেন নড়ে' উঠ্‌ল, কথাবার্ত্তা সাম্‌লে বলিস্ রে!

১ নাগরিক

শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রথের প্রথম টানটা পুরোহিতের হাতে, দ্বিতীয় প্রহরে দ্বিতীয় টানটা রাজার, সেও ত হয়ে গেল রথ এগোল না; এখন তৃতীয় টানটা কার হাতে পড়্‌বে?

(সৈন্যদলের প্রবেশ)

১ সৈন্য

বড় লজ্জা দিলে রে! স্বয়ং রাজা হাত লাগালে সঙ্গে সঙ্গে আমরা হাজার জনে ধরে' টান দিলুম, চাকার একটু ক্যাঁচ কোঁচ শব্দও হল না।

২ সৈন্য

আমরা ক্ষত্রিয়, আমরা ত শূদ্রের মত গোরু নই—রথটানা আমাদের কাজ নয়, আমাদের কাজ রথে চড়া।

২ সৈনিক

কিম্বা রথ ভাঙা। ইচ্ছে করচে কুড়ুলখানা নিয়ে রথটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে' ফেলি। দেখি মহাকাল কেমন ঠেকাতে পারেন!

১ নাগরিক

দাদা, তোমাদের অস্ত্রের জোরে রথ চল্‌বেও না, রথ ভাঙ্‌বেও না। গণৎকার কি গুনে' বলেচে তা শোনো নি বুঝি?

১ সৈনিক

কি বল্ ত।

১ নাগরিক

ত্রেতা যুগে একবার যে কাণ্ড ঘটেছিল, এখন তাই ঘট্‌বে।

১ সৈনিক

আরে ত্রেতাযুগে ত লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল।

১ নাগরিক

সে নয়, সে নয়।

২ সৈনিক

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড?

১ নাগরিক

তারি কাছাকাছি। সেই যে শূদ্র তপস্যা কর্‌তে গিয়েছিল, মহাকাল তাতেই ত সে দিন ক্ষেপে উঠেছিলেন। তার পর রামচন্দ্র শূদ্রের মাথা কেটে তবে বাবাকে শান্ত করেছিলেন।

৩ সৈনিক

আজ ত সে ভয় নেই, আজ ব্রাহ্মণই তপস্যা ছেড়ে দিয়েচে, শূদ্রের ত কথাই নেই।

১ নাগরিক

এখানকার শূদ্রেরা কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে শাস্ত্র পড়্‌তে আরম্ভ করেচে। ধরা পড়্‌লে বলে, আমরা কি মানুষ নই? স্বয়ং কলিযুগ শূদ্রের কানে মন্ত্র দিতে বসেচে যে তারা মানুষ। রথ যে চলে না তাতে মহাকালের দোষ কি—না চল্‌লেই ভাল। যদি চল্‌তে সুরু করে তা হলে চন্দ্রসূর্য্য গুঁড়িয়ে ফেল্‌বে। শূদ্র চোখ রাঙিয়ে বলে কিনা আমরা কি মানুষ নই? কালে কালে কতই শুন্‌ব!

১ সৈনিক

আজ শূদ্র পড়্‌চে শাস্ত্র, কাল ব্রাহ্মণ ধর্‌বে লাঙল! সর্ব্বনাশ!

২ সৈনিক

তা হলে চল ওদের পাড়ায় গিয়ে একবার কষে' হাত চালানো যাক্। ওরা মানুষ, না আমরা মানুষ, প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিই।

২ নাগরিক

রাজাকে কে গিয়ে বলেচে, কলিযুগে শাস্ত্রও চলে না, অস্ত্রও চলে না, একমাত্র চলে স্বর্ণমুদ্রা। রাজা তাই আমাদের ধনপতি শেঠজিকে তলব করেচেন। ধনপতি টান দিলেই রথ চল্‌বে এই-রকম সকলের বিশ্বাস।

১ সৈনিক

বেণের টানে যদি রথ চলে তা হলে আমরা অস্ত্র গলায় বেঁধে জলে ডুবে মর্‌ব।

২ সৈনিক

তা রাগ কর্‌লে চল্‌বে কেন? বেণের টান আজকাল সবজায়গাতেই লেগেচে। এমন কি পুষ্পধনুর ছিলেটা বেণের টানেই চঞ্চল হয়ে ওঠে। তার তীরগুলো বেণের ঘরেই তৈরি।

৩ সৈনিক

তা সত্যি, আজকাল আমাদের রাজত্বে রাজা থাকেন সাম্‌নে, কিন্তু পিছনে থাকে বেণে।

১ সৈনিক

পিছনেই থাকে ত থাকুনা, আমরা ত থাকি ডাইনে বাঁয়ে, মান ত আমাদেরই।

৩ সৈনিক

পাশে যে থাকে তার মান থাক্‌তে পারে, কিন্তু পিছনে যে থাকে ঠেলাটা যে তারি।

(ধনপতির অনুচরদের প্রবেশ)

১ সৈনিক

এরা সব কে?

২ সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো চোখের উপর লাফ দিয়ে পড়্‌চে।

৩ সৈনিক

গলায় সোনার হার নয় ত, সোনার শিকল বল্‌লেই হয়। কে এরা?

১ নাগরিক

এরাই ত আমাদের ধনপতি শেঠীর দল। ঐ সোনার শিকল দিয়ে এরা মহাকালকে বেঁধে ফেলেচে বলে'ই তাঁর রথ চল্‌চে না।

১ সৈনিক

তোমরা কি কর্‌তে এসেচ?

১ ধনিক

রাজা আমাদের প্রভু ধনপতিকে ডেকে পাঠিয়েচেন। কারো হাতে রথ চল্‌চে না, তাঁর হাতে চল্‌বে বলে'ই সবাই আশা করে' আছে।

২ সৈনিক

সবাই বল্‌তে কে রে, বাপু? আর আশাই বা করে কেন?

২ ধনিক

আজকাল যা কিছু চল্‌চে সবই যে ধনপতির হাতে চল্‌চে।

১ সৈনিক

এখনি দেখিয়ে দিতে পারি তলোয়ার তার হাতে চলে না, আমাদের হাতে চলে।

৩ ধনিক

তোমাদের হাত চালাচ্চে কে সেটা বুঝি এখনো খবর পাওনি?

১ সৈনিক

চুপ্‌, বেয়াদব!

২ ধনিক

আমরা চুপ্‌ কর্‌ব? আজ আমাদেরই আওয়াজ জলে স্থলে আকাশে তা জান?

১ সৈনিক

তোমাদের আওয়াজ? আমাদের শতঘ্নী যখন বজ্রনাদ করে' ওঠে—

২ ধনিক

তোমাদের শতঘ্নী বজ্রনাদে আমাদেরই কথা এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে, এক হাট থেকে আরেক হাটে ঘোষণা কর্‌বার জন্যে আছে।

১ নাগরিক

দাদা, ওদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে' পেরে উঠ্‌বে না।

১ সৈনিক

কি বল? পার্‌ব না!

১ নাগরিক

না, তোমাদের কোনো তলোয়ার ওদের নিমক খেয়েচে, কোনটা বা ওদের ঘুস খেয়েচে, খাপ থেকে বের কর্‌তে গেলেই তা বুঝ্‌তে পার্‌বে।

১ ধনিক

শুনেছিলেম রথের দড়িতে হাত দেবার জন্যে নর্ম্মদা-তীরের বাবাজীকে আজ আনা হয়েছিল। কি হ'ল খবর জান?

২ ধনিক

জানি বই কি। যখন এরা গুহায় গিয়ে পৌঁছল, দেখ্‌ল, প্রভু পদ্মাসনে দুই পা আট্‌কে দিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে' আছেন। সাড়াশব্দ নেই। বহুকষ্টে ধ্যান ভাঙানো হল। কিন্তু পা দু'খানা আড়ষ্ট কাঠ হয়ে গেছে, চলে না।

১ নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কি, তারা আজ ৬৫ বছরের মধ্যে একবারও চলার নাম করেনি। তা বাবাজি বল্‌লেন কি?

২ ধনিক

বলা-কওয়ার বালাই নেই। চাঞ্চল্যের অপবাদ দিয়ে জিবটাকে একেবারে কেটেই ফেলেচেন। গোঁ গোঁ কর্‌তে লাগ্‌লেন, তার থেকে যার যে-রকম খেয়াল সে সেই-রকমেরই অর্থ করে' নিলে।

১ ধনিক

তার পরে?

২ ধনিক

তার পর ধরাধরি করে' বাবাজিকে রথতলা পর্য্যন্ত আনা গেল। কিন্তু যেমনি দড়ি ধর্‌লেন রথের চাকা মাটির মধ্যে বসে' যেতে লাগ্‌ল।

১ ধনিক

হা, হা, বাবাজি নিজের মনটাকে যেমন গভীরে ডুবিয়েচেন, মহাকালের রথটাকে সুদ্ধ তেমনি তলিয়ে দিচ্ছিলেন বুঝি?

২ ধনিক

ওঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের উপবাসের ভারে চাকা বসে' গেল। একদিনের উপবাসের ধাক্কাতেই আমাদের পা চল্‌তে চায় না!

১ নাগরিক

উপবাসের ভারের কথা বল্‌চ, তোমাদের অহঙ্কারের ভারটা বড় কম নয়।

২ নাগরিক

সে ভার আপনাকেই আপনি চূর্ণ করে। দেখ্‌ব আজ তোমাদের ধনপতির মাথা কেমন হেঁট না হয়।

১ ধনিক

আচ্ছা দেখো। বাবা মহাকালের ভোগ জোগায় কে? সে ত আমাদের ধনপতি। যদি বন্ধ করে' দেয় তা হলে তাঁর যে চলা না-চলা দুই সমান হয়ে উঠ্‌বে! পেট চলা হল সব চলার মূলে।

(মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ)

ধনপতি

মন্ত্রী মশায়, আজ আমাকে ডাক পড়্‌ল কেন?

মন্ত্রী

রাজ্যে যখনি কোনো অনর্থপাত হয় তখনি ত তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে ডাক পড়ে।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার সম্ভব আমার দ্বারা তার ত্রুটি হয় না। কিন্তু আজকের সঙ্কটটা কি রকমের?

মন্ত্রী

শুনেচ বোধ হয়, মহাকালের রথ আজ কারো হাতের টানেই চল্‌চে না।

ধনপতি

শুনেচি। কিন্তু মন্ত্রী, এ-সব কাজ ত এত দিন—

মন্ত্রী

জানি, এতদিন আমাদের পুরোহিত ঠাকুররাই এ-সব কাজ চালিয়েচেন। কিন্তু তখন যে এঁরা স্বাধীন সাধনার জোরে নিজে চল্‌তেন, চালাতেও পার্‌তেন। এখন এঁরা তোমারই দ্বারে অচল হয়ে বাঁধা, এখন এঁদের হাতে কিছুই চল্‌বে না।

ধনপতি

অন্য অন্য বারে রাজা সেনাপতি রাজপারিষদ সকলেই রথের রশিতে হাত লাগাতেন, কখনো ত বাধা ঘটেনি। তখন আমরা ত কেবল চাকায় তেল জুগিয়ে এসেচি, রশিতে টান দিইনি ত।

মন্ত্রী

দেখ শেঠজি, রথযাত্রাটা আমাদের একটা পরীক্ষা। কাদের শক্তিতে সংসারটা সত্যিই চল্‌চে বাবা মহাকালের রথচক্র ঘোরার দ্বারা সেইটেরই প্রমাণ হয়ে থাকে। যখন পুরোহিত ছিলেন নেতা তখন তাঁরা রশি ধর্‌তে-

না-ধর্‌তে রথটা ঘুম-ভাঙা সিংহের মত ধড়ফড় করে' নড়ে' উঠ্‌ত। এবারে যে কিছুতেই সাড়া দিল না। তার থেকে প্রমাণ হচ্চে শাস্ত্রই বল, শস্ত্রই বল সমস্ত অর্থহীন হয়ে পড়েচে—অর্থ এখন তোমারই হাতে। সেই তোমার সার্থক হাতটি আজ রথের রশিতে লাগাতে হবে।

ধনপতি

আগে বরঞ্চ আমার দলের লোকে চেষ্টা করে' দেখুক যদি একটুখানি কেঁপেও ওঠে আমিও হাত দেব, নইলে সকল লোকের সাম্‌নে—

মন্ত্রী

কেন আর দেরি করা শেঠজি? রাজ্যের সমস্ত লোক উপোষ করে' আছে, রথ মন্দিরে গিয়ে না পৌঁছলে কেউ জলগ্রহণ কর্‌বে না। তোমার চেষ্টাতেও যদি রথ না চলে লজ্জা কিসের, স্বয়ং পুরোহিত রাজা সকলেরই চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, দেশসুদ্ধ লোক ত তা' দেখেচে।

ধনপতি

তাঁরা হলেন লোকপাল, আমরা হলুম পালের লোক; জনসাধারণে তাঁদের বিচার করে একরকমে, আমাদের বিচার করে আরেক রকমে। রথ যদি না চলে আমার লজ্জা আছে, কিন্তু রথ যদি চলে তা হলে আমার ভয়। তা হলে আমার সেই শুভাদৃষ্টের স্পর্দ্ধা কোনো লোক ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বেই না। তখন কাল থেকে তোমরাই ভাব্‌তে বস্‌বে আমাকে খর্ব্ব করা যায় কি উপায়ে?

মন্ত্রী

যা বল্‌চ সবই সত্য হতে পারে, কিন্তু তবুও রথ চলা চাই। আর বেশিক্ষণ যদি দ্বিধা কর তা হলে দেশের লোক ক্ষেপে যাবে।

ধনপতি

আচ্ছা তবে চেষ্টা করে' দেখি। কিন্তু যদি দৈবক্রমে আমার চেষ্টা সফল হয় তা হলে আমার অপরাধ নিয়ো না। (দলের লোকদের প্রতি) বল, সিদ্ধিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি

বল, জয় সিদ্ধি দেবী!

সকলে

জয় সিদ্ধিদেবী।

ধনপতি

টান্‌ব কি! এ রশি যে তুল্‌তেই পারিনে। মহাকালের রথও যেমন ভারী, রশিও তেমনি, এ ভার বহন কি সহজ লোকের কর্ম্ম! (দলের লোকের প্রতি) এস, তোমরাও সবাই এস। সকলে মিলে হাত লাগাও। আমার খাতাঞ্চি কোথায় গেল? এস, এস। এস কোষাধ্যক্ষ। আবার বল, সিদ্ধিরস্তু—টানো! সিদ্ধিরস্তু, আরেক টান। সিদ্ধিরস্তু—জোরে! নাঃ, কিছুই হ'ল না! আমাদের হাতে রশিটা ক্রমেই যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠ্‌চে।

সকলে

দুয়ো! দুয়ো!

১ সৈনিক

যাক! আমাদের মান রক্ষা হ'ল।

ধনপতি

নমস্কার, মহাকাল! তুমি আমার সহায়, তাই তুমি স্থির হয়ে রইলে। আমার হাতে যদি তুমি টল্‌তে, আমারি ঘাড়ের উপরে টলে' পড়্‌তে, একেবারে পিষে যেতুম।

খাতাঞ্চি

প্রভু, এই যুগে আমাদের যে সম্মান সমাদর ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছিল সেটার বড় ক্ষতি হল।

ধনপতি

দেখ, এতকাল আমরা মহাকালের রথের ছায়ায় দাঁড়িয়ে লোকচক্ষুর অগোচরে বড় হয়েচি। আজ রথের সাম্‌নে এসে পড়ে আমাদের সঙ্কট ঘটেচে—আশেপাশে লোকের দাঁত-কিড়মিড় অনেক দিন থেকে শুন্‌চি। এখন যদি স্পষ্ট সবাই দেখ্‌তে পায় যে, রশি ধরে' আমরাই রথ চালাচ্চি তাহলে আমাদের উপর এমন দৃষ্টি লাগ্‌বে যে বেশিক্ষণ টিঁক্‌ব না।

১ সৈনিক

যদি সেকাল থাক্‌ত তা হলে তোমার হাতে রথ চল্‌ল না বলে' তোমার মাথা কাটা যেত।

ধনপতি

অর্থাৎ তোমরা তা হলে হাতে কাজ পেতে। মাথা কাট্‌তে না-পেলেই তোমরা বেকার।

১ সৈনিক

আজ কেউ তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে না; রাজাও না। এতে বাবা মহাকালেরই মান খর্ব্ব হয়ে গেচে।

ধনপতি

সত্যি কথা বলি—যখন সবাই গায়ে হাত দিতে সাহস করত তখন ঢের বেশি নিরাপদে ছিলুম। আজ সবাই যে আমাদের মান্‌তে বাধ্য হয়েচে এরই মধ্যে আমাদের মরণ। মন্ত্রীমশায়, চুপ করে' দাঁড়িয়ে ভাব্‌চ কি?

মন্ত্রী

ভাব্‌চি সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল, এখন কোনো উপায় ত আর বাকি নেই!

ধনপতি

ভাবনা কি! যখন তোমাদের কোনো উপায় খাট্‌ল না, তখন মহাকাল নিজের উপায় নিজেই বের কর্‌বেন। তাঁর চল্‌বার গরজ তাঁরই, আমাদের নয়; তাঁর ডাক পড়্‌লেই যেখান থেকে হোক তাঁর বাহন ছুটে আস্‌বে। আজ যাদের দেখাই যাচ্চে না, কাল তারা সবচেয়ে বেশি চোখে পড়্‌বে। তার আগে আমার খাতাপত্র সাম্‌লাইগে। এস হে কোষাধ্যক্ষ, আজ সিন্ধুকগুলো একটু শক্ত করে' বন্ধ কর্‌তে হ'বে।

(ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান।)

(চরের প্রবেশ)

চর

মন্ত্রী-মশায়, আমাদের শূদ্রপাড়ায় ভারি গোল বেধে গেচে।

মন্ত্রী

কেন, কি হয়েচে!

চর

দলে দলে আস্‌চে সব ছুটে'। তা'রা বলে, বাবার রথ আমরা চালাব!

সকলে

বলে কি! রশি ছুঁতেই দেব না!

চর

কিন্তু তাদের ঠেকাবে কে?

সৈন্যদল

আমরা আছি।

চর

তোমরা ক'জনই বা আছ। তাদের মার্‌তে মার্‌তে তোমাদের তলোয়ার ক্ষয়ে' যাবে—তবু এত বাকি থাক্‌বে যে রথতলায় তোমাদের আর জায়গাই হবে না।

চর

মন্ত্রী মশায়, তুমি যে একেবারে বসে' পড়্‌লে?

মন্ত্রী

ওরা দল বেঁধে আস্‌চে বলে' আমি ভয় করিনে।

চর

তবে?

মন্ত্রী

আমার মনে ভয় হচ্চে ওরা পার্‌বে।

সৈনিকদল

বল কি, মন্ত্রী মহারাজ, ওরা পার্‌বে মহাকালের রথ টান্‌তে? শিলা জলে ভাস্‌বে?

মন্ত্রী

দৈবাৎ যদি পারে তা হলে বিধাতার নূতন বিধি সুরু হবে। নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। ভূমিকম্পে মাটির মধ্যে সেই চেষ্টাতেই ত বিভীষিকা। যা বরাবর প্রচ্ছন্ন আছে তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তরের সময়।

সৈনিকদল

কি কর্‌তে চান, আমাদের কি করতে বলেন হুকুম করুন। আমার কিছুই ভয় করিনে।

মন্ত্রী

সাহস দেখাতে গিয়েই সংসারে ভয় বাড়িয়ে তোলা হয়। গোঁয়ার্ত্তমি করে', তলোয়ারের বেড়া তুলে' দিয়েই মহাকালের বন্যা ঠেকানো যায় না।

চর

তা কি কর্‌তে হবে বলেন।

মন্ত্রী

ওদের কোনো বাধা না দেওয়াই হচ্চে সৎপরামর্শ। বাধা দিলে শক্তি আপনাকে আপনি চিন্‌তে পারে। সেই চিন্‌তে দিলেই আর রক্ষে নেই।

সৈনিকদল

তা হলে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি? ওরা আসুক?

চর

ঐ যে এসে পড়েচে।

মন্ত্রী

তোমরা কিচ্ছু কোরো না। স্থির হয়ে থাক।

(শূদ্রদলের প্রবেশ)

মন্ত্রী

(দলপতির প্রতি) এই যে সর্দ্দার! তোমাদের দেখে' বড় খুসি হলুম।

দলপতি

মন্ত্রী-মশায়, আমরা বাবার রথ চালাতে এসেচি।

মন্ত্রী

চিরদিন তোমরাই ত বাবার রথ চালিয়ে এসেচ, আমরা ত উপলক্ষ্যমাত্র। সে কি আর জানিনে?

দলপতি

এতদিন আমরা রথের চাকার তলায় পড়েচি, আমাদের দলে' দিয়ে রথ চলে' গেচে। এবার ত আমাদের বলি বাবা নিল না।

মন্ত্রী

সে ত দেখ্‌তে পাচ্চি। আজ ভোর-বেলায় তোমাদের পঞ্চাশ জন চাকার সাম্‌নে ধূলোয় লুটোপুটি করলে—তবু চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লক্ষণ দেখা গেল না। নড়্‌ল না, ক্যাঁ কোঁ করে' চীৎকার করে' উঠ্‌ল না—তাদের শুষ্কতা দেখেই ত ভয় পেয়েচি।

দলপতি

এবারে রথের তলাটাতে পড়্‌বার জন্যে মহাকাল আমাদের ডাক দেননি তিনি ডেকেচেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে।

পুরোহিত

সত্যি নাকি? কেমন করে' জান্‌লে?

দলপতি

কেমন করে' জানা যায় সে ত কেউ জানে না। কিন্তু আজ ভোর-বেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে' গেচে। ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান সবাই বল্‌চে,—বাবা ডেকেচেন।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

দেখ, বাবা, ভালো করে' ভেবে দেখ, সমস্ত সংসার যারা চালায় মহাকালের রথের রশির জিম্মে তাদেরই পরে।

দলপতি

ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও?

পুরোহিত

তা দেখ, কাল খারাপ বটে, তবু হাজার হোক আমরা ত ব্রাহ্মণ বটে?

দলপতি

মন্ত্রী-মশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও?

মন্ত্রী

সংসার বল্‌তে ত তোমরাই। নিজগুণে চল, আমরা চালাক লোকেরা বলে' থাকি আমরাই চালাচ্ছি। তোমাদের বাদ দিলে আমরা ক'জনই বা আছি!

দলপতি

আমাদের বাদ দিলে তোমরা যে ক'জনাই থাকনা, থাক্‌বে কি উপায়ে?

মন্ত্রী

হাঁ, হাঁ, সে ত ঠিক কথা।

দলপতি

আমরাই ত জোগাচ্চি অন্ন, তাই খেয়ে তামরা বেঁচে আছ; আমরাই বুনচি বস্ত্র, তা'তেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা!

সৈনিক

সর্ব্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত জোড় করে' বলে' আস্‌ছিল, "তোমরাই আমাদের অন্ন-বস্ত্রের মালিক"। আজ এ কি রকমের সব উল্টো বুলি! আর ত সহ্য হয় না।

মন্ত্রী

(সৈনিকের প্রতি) চুপ কর। (দলপতিকে) সর্দ্দার, আমরা ত তোমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। মহা-

কালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বুঝিনে, আমরা কি এত মূঢ়? তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে' দিয়ে যাও, তা'র পরে আমাদের কাজ কর্‌বার অবসর আমরা পাব।

দলপতি

আয় রে ভাই, সবাই মিলে টান দে! মরি আর বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই।

মন্ত্রী

কিন্তু সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। যে-রাস্তায় বরাবর রথ চলেচে সেই রাস্তায়। আমাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে যেন।

দলপতি

রথের পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে নেবেন, আমরা ত বাহন, আমরা কীইবা বুঝি। আয় রে সবাই! ঐ দেখ্‌চিস্ রথের চূড়ায় কেতনটা দুলে' উঠেচে, স্বয়ং বাবার ইসারা! ভয় নেই, আয় সবাই!

পুরোহিত

ছুঁলে রে ছুঁলে! রশি ছুঁলে! ছি, ছি!

নাগরিকগণ

হায়, হায়, কি সর্ব্বনাশ!

পুরোহিত

চোখ বোজ রে তোরা সবাই চোখ বোজ, ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্ত্তি দেখ্‌লে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি।

সৈনিক

ও কি ও! একি চাকারই শব্দ নাকি? না আকাশ আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌ল?

পুরোহিত

হতেই পারে না।

নাগরিক

ঐ ত, নড়্‌ল যেন!

সৈনিক

ধূলো উড়েচে যে! অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ চলেচে! পাপ! মহাপাপ!

শূদ্রদল

জয়, জয় মহাকালের জয়!

পুরোহিত

তাই ত, এ কি কাণ্ড হ'ল!

সৈনিক

ঠাকুর, হুকুম কর! আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই অপবিত্র রথচলা বন্ধ করে' দিই।

পুরোহিত

হুকুম কর্‌তে ত সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি ইচ্ছে করে' জাত খোয়ান্ আমাদের হুকুমে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

সৈনিক

তা হলে ফেলে দিই আমাদের অস্ত্র!

পুরোহিত

আর আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র!

নাগরিকগণ

আমরা যাই সব নগর ছেড়ে! মন্ত্রী-মশায় তুমি কি কর্‌বে? কোথায় যাচ্ছ?

মন্ত্রী

আমি যাচ্চি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধর্‌তে।

সৈনিক

ওদের সঙ্গে মিল্‌বে?

মন্ত্রী

তা হলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখ্‌চি ওরা যে আজ তাঁর প্রসাদ পেয়েচে। এ ত স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে' আজ কেউ মান রক্ষা কর্‌তে পারবে না, মান ওদের সঙ্গে থেকে।

সৈনিক

কিন্তু তাই বলে' ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে বাশ ধরা! ঠেকাবই ওদের। দলবল ডাক্‌তে চল্‌লুম। মহাকালের রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে।

পুরোহিত

আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে লাগ্‌তে পার্‌ব।

মন্ত্রী

ঠেকাতে পার্‌বে না। এবার দেখ্‌চি চাকার তলায় তোমাদেরই পড়্‌তে হবে।

সৈনিক

তাই সই। বাবার রথের চাকা এতদিন যতসব চণ্ডালের মাংস খেয়ে অশুচি হয়ে আছে। আজ শুদ্ধ মাংস পাবে।

পুরোহিত

ঐ দেখ, ঐ দেখ মন্ত্রী! এরি মধ্যে রথটা রাজপথ থেকে নেমে পড়েচে। কোথায় কোন্ পল্লীর উপরে পড়্বে কিছুই বলা যায় না।

সৈনিক

ঐ যে ধনপতির দল ওখান থেকে চীৎকার করে' আমাদের ডাক্‌চে! রথটা যেন ওদেরই ভাণ্ডার লক্ষ্য করে' চলেচে। ওরা ভয় পেয়ে গেচে। চল চল, ওদের রক্ষা করিগে!

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষা কর, তার পরে অন্য কথা। আমার ত মনে হচ্চে রথটা ঠিক তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে ঝুঁকেচে, ওর আর কিছু চিহ্ন বাকি থাক্‌বে না। ঐ দেখ!

সৈনিক

উপায়?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধর'সে—তা হলে রক্ষা পাবার পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর দ্বিধা কর্‌বার সময় নেই। (প্রস্থান)

সৈনিক

(পরস্পর) কি কর্‌বে? ঠাকুর, তুমি কি কর্‌বে?

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কি কর্‌বে?

সৈনিক

জানিনে, রশি ধর্‌ব, না, লড়াই কর্‌ব? ঠাকুর, তুমি কি কর্‌বে?

পুরোহিত

জানিনে, রশি ধর্‌ব, না আবার শাস্ত্র আওড়াতে বস্‌ব?

১ সৈনিক

শুন্‌তে পাচ্চ—হুড়মুড় শব্দে পৃথিবীটা যেন ভেঙেচুরে পড়্‌চে।

২ সৈনিক

চেয়ে দেখ, ওরা টান্‌চে বলে' মনেই হচ্চে না। রথটাই ওদের ঠেলে' নিয়ে চলেচে।

৩ সৈনিক

পুরুত-ঠাকুর, দেখ্‌চ রথটা যেন বেঁচে উঠেচে। কি রকম হেঁকে চলেচে। এতবার রথযাত্রা দেখেচি, ওর এরকম সজীবমূর্ত্তি কখনো দেখিনি। এতকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলেছিল, আজ জেগে চলেচে। তাই আমাদের পথ মান্‌চে না, নিজের পথ বানিয়ে নিচ্চে।

২ সৈনিক

কিন্তু গেল যে সব। রথযাত্রার এমন সর্ব্বনেশে উৎসব ত কোনোদিন দেখিনি। ঐ যে কবি আস্‌চে, ওকে জিজ্ঞাসা করনা, এ-সবের মানে কি?

পুরোহিত

আমরাই বুঝ্‌তে পার্‌লুম না, কবি বুঝ্‌তে পার্‌বে? ওরা ত কেবল বানিয়ে কথা বলে, সনাতন শাস্ত্রের কথা জানেই না।

১ সৈনিক

শাস্ত্রের কথাগুলো কোন্‌কালে মরে' গেছে ঠাকুর। তাই তোমাদের কথা ত আর খাটে না দেখি। ওদের যে সব তাজা কথা, তাই শুন্‌লে বিশ্বাস হয়।

(কবির প্রবেশ)

২ সৈনিক

কবি, আজ রথযাত্রায় এই যে সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড হয়ে গেল, কেন বুঝ্‌তে পার?

কবি

পারি বৈ কি।

১ সৈনিক

পুরুতের হাতে রাজার হাতে রথ চল্‌ল না, এর মানে কি?

কবি

ওরা ভুলে গিয়েছিল মহাকালের শুধু রথকে মান্‌লেই হল না, মহাকালের রথের দড়িকেও মানা চাই।

১ সৈনিক

কবি, তোমার কথা শুন্‌লে হঠাৎ মনে হয়, হয়ত বা একটা মানে আছে, খুঁজ্‌তে গেলে পাওয়া যায় না।

কবি

ওরা বাঁধন মান্‌তে চায়নি, শুধু চলাকেই মেনেছিল। তাই রাগী বাঁধনটা উন্মত্ত হয়ে ওদের উপর ল্যাজ আছ্‌ড়াচ্ছে, গুঁড়িয়ে যাবে।

পুরোহিত

আর তোমার শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান্ যে দড়ির নিয়ম সাম্‌লে চল্‌তে পার্‌বে?

কবি

হয়ত পার্‌বে না। একদিন ভাব্‌বে ওরাই রথের কর্ত্তা, তখনি মর্‌বার সময় আস্‌বে। দেখোনা, কালই বল্‌তে সুরু কর্‌বে, আমাদেরি হাল লাঙল চর্‌কা তাঁতের জয়। যে বিধাতা মানুষের বুদ্ধিবিদ্যা নিজের হাতে গড়েচেন, অন্তরে বাহিরে অমৃতরস ঢেলে দিয়েচেন, তাঁকে গাল পাড়্‌তে বস্‌বে। তখন এঁরাই হয়ে উঠ্‌বেন বল-রামের চেলা, হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

পুরোহিত

তখন আবার রথ অচল হলে বোধ করি কবিদের ডাক পড়্‌বে।

কবি

ঠাট্টা নয় পুরুত ঠাকুর। মহাকাল বারেবারেই রথযাত্রায় কবিদের ডেকেচেন। তারা কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পৌঁছতে পারেনি।

পুরোহিত

তারা চালাবে কিসের জোরে?

কবি

গায়ের জোরে নয়ই। আমরা মানি ছন্দ, আমরা জানি এক-ঝোঁকা হলেই তাল কাটে। আমরা জানি সুন্দরকে কর্ণধার কর্‌লেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে। তোমরা বিশ্বাস কর কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোর, বা অস্ত্রের কঠোর,—সেটা হল ভীরুর বিশ্বাস; দুর্ব্বলের বিশ্বাস, অসাড়ের বিশ্বাস।

সৈনিক

ওহে কবি, তুমি ত উপদেশ দিতে বস্‌লে, ওদিকে যে আগুন লাগ্‌ল।

কবি

যুগে যুগে কতবার কত আগুন লেগেচে। যা থাক্‌বার তা থাক্‌বেই।

সৈনিক

তুমি কি কর্‌বে?

কবি

আমি গান গাব, "ভয় নেই।"

সৈনিক

তাতে হ'বে কি?

কবি

যারা রথ টান্‌চে তারা চল্‌বার তাল পাবে। বেতালা টানটাই ভয়ঙ্কর।

সৈনিক

আমরা কি কর্‌ব?

পুরোহিত

আমি কি করব?

কবি

তাড়াতাড়ি কিছু কর্‌তেই হবে এমন কথা নেই। দেখ, ভাব। ভিতরে ভিতরে নতুন হয়ে ওঠ। তার পরে ডাক পড়্‌বার জন্যে তৈরী হয়ে থাক।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



স্মৃতির মন্দির—

মানুষের মনে যে স্মৃতি-মন্দির আছে, তাহা প্রকৃতির এক অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড। এই মন্দিরে যে কত সহস্র প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার সংখ্যা নাই। যাহার মনের এই-সমস্ত প্রকোষ্ঠ বেশ শৃঙ্খলার সহিত সাজান থাকে, তাহার স্মৃতি-মন্দিরকে একটি গোছান ভাঁড়ার-ঘর বলা চলে। কোথায় কি রহিয়াছে, কবে রাখিয়াছি আর কেনই বা রাখিয়াছি, ভাবিয়া আকুল হইতে হয় না। প্রয়োজন-মত যাহা দরকার তাহা বাহির করিয়া লইলেই হয়।



স্মৃতি-মন্দিরের দুয়ার

স্মৃতিশক্তি চালনা করিয়া বৃদ্ধি করা যায়। স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা যাহারা যত বেশী করে, তাহাদের স্মৃতিশক্তি তত প্রখর। কিন্তু স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা না করিয়া ক্রমশঃ এমন অবস্থায় আসিয়া পড়া যায় যে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কি করিয়াছি, তাহা বহুক'ষ্টে স্মরণ করিতে হয়।

পৃথিবীতে অনেকের আশ্চর্য্য স্মৃতিশক্তির কথা শোনা যায়। এমন অনেক মোকদ্দমার সাক্ষীর কথা শোনা যায়, যাহারা অনেক বৎসর পরেও কোন এক বিশেষ ঘটনার বা কথাবার্ত্তার সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিতে পারে। কোন কোন লোক কাহাকে কি কি কথা কেমনভাবে বলিয়াছে, তাহার সমস্ত আবৃত্তি করিতে পারে। যাহারা সামান্য সামান্য ব্যাপারও মনে রাখিতে পারে না, তাহাদের কাছে ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু চেষ্টার দ্বারা সবই সম্ভব হইতে পারে।

ওয়াশিংটন এবং নেপোলিয়ন তাঁহাদের বিরাট্ সৈন্যদলের হাজার হাজার লোকের নাম এবং মুখ মনে রাখিতেন এবং তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতেন। এব্রাহাম লিন্‌কল্‌ন্ জীবনে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নখদর্পণে ছিল। শিকাগোর এক খবর-কাগজ-আপিসের বালক-কর্ম্মচারী সহরের প্রত্যেকটি রাস্তার নাম, অবস্থান, ফায়ার-বিগ্রেড-আপিসগুলির নম্বর, অবস্থান, থানার ঠিকানা এবং বড় বড় সব আপিসের ঠিকানা মুখস্থ রাখিয়াছে। ইহাও বড় সহজ ব্যাপার নয়, কারণ শিকাগো সহরটি কলিকাতার দ্বিগুণ।

আমাদের দেশেও এই-রকম অনেক লোক আছেন এবং ছিলেন।

চেষ্টা করিয়া কেহ নেপোলিয়ন, রামমোহন, বা রবীন্দ্রনাথ হইতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করিয়া আমরা সকলেই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া খুব উঁচু স্তরে তুলিতে পারি। তাহাতে আমাদের এবং সমাজের অনেক লাভ হয়। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার কয়েকটি প্রকৃষ্ট নিয়ম আছে—

(১) একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে।

(২) কোন জিনিষ দেখিবার সময় সকল ইন্দ্রিয় দিয়া তাহাকে দর্শন করিতে হইবে—তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সবই মনের মধ্যে স্মৃতি-মন্দিরে গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) মনের যে ক্ষমতা দুর্ব্বল, চালনা এবং ব্যায়াম দ্বারা তাহাকে সতেজ এবং সবল করিতে হইবে।

(৪) প্রথম-দর্শনের ফল চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৫) মধ্যে মধ্যে গত-ঘটনাবলীর মনে মনে পুনরালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

(৬) নিজের স্মৃতিশক্তির উপর বিশ্বাস করিতে হইবে। কাগজে লেখা নোটের উপর ভরসা করা ঠিক নয়।



স্মৃতিমন্দির—স্মৃতি-প্রকোষ্ঠগুলি দেখিবার জিনিষ

(৭) কোন ঘটনা মনে রাখিতে হইলে—কি ঘটনা, কখন ঘটিল, কোথায় এবং কেন ঘটিল, কে কে ইহার সহিত জড়িত, ঘটনার ফল কি হইল, ইত্যাদি সবই মনে রাখিবার চেষ্টা করা দরকার।

(৮) স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে—তাহা না হইলে ইহার কোন দরকার নাই। বাজে এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয় মনে করিয়া রাখিবার তেমন দরকার নাই।

"আমার স্মৃতিশক্তি নাই" বলিয়া দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ সুনিয়মে চেষ্টা ক'রলে সকল লোকেরই স্মৃতিশক্তি সতেজ হইবেই। তবে যেমন-তেমনভাবে ইহা করিলে চলিবে না—ইহার জন্য রীতিমত সাধনা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ বরফের যুগ—

কয়েকজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, মনে হয়, কিছুদিন পরে পৃথিবীময় আর-একটা বরফের যুগ আসিয়া পড়িতে পারে। সমস্ত পৃথিবী বড় বড় বরফের চাপে ভরিয়া যাইবে এবং তাহাদের চাপে বর্ত্তমান সভ্যতার সকল রকম কীর্ত্তি লোপ পাইবে।



কাপ্তেন ম্যাক্‌মিলানের জাহাজ "বাওদোইন" বরফের মধ্যে

কাপ্তেন ডোনাল্ড ম্যাক্‌মিলান এই প্রশ্নের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। ম্যাক্‌মিলান সাহেব ১৯০৮ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত উত্তর মেরু প্রদেশে ৮ বার গিয়াছেন।



ভবিষ্যৎ বরফের যুগের কল্পিতচিত্র—মানুষের তৈরী ঘর বাড়ী কেমন করিয়া বরফে চাপা পড়িয়া যাইবে, তাহাই দেখান হইয়াছে

আমেরিকার অনেক ভূতত্ত্ববিদ্ বলিতেছেন যে আমেরিকা একটা বরফের যুগের শেষে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার আরম্ভে উত্তর-আমেরিকার ৪,০০০,০০০, বর্গমাইল জমি বরফে ঢাকা ছিল—এবং ইহা ৫০০,০০০, বছর পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। এই সময়ের মধ্যে বরফের চাপ মাঝে মাঝে অত্যধিক বাড়িয়া উঠিত, এবং এই অবস্থা প্রায় ২৬,০০০ বছর করিয়া থাকিত।



ভবিষ্যৎ বরফের যুগের লোকেরা বোধ হয় এইরকম পোষাক পরিবে

কাপ্তেন ম্যাক্‌মিলান বলেন যে আল্‌স্ পাহাড়, আলাস্কা, ইত্যাদি স্থানে বরফ কমিয়া আসিতেছে, এবং লোকালয় হইতে ক্রমশঃ দূরের প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু উত্তর মেরুপ্রদেশে গ্লেসিয়ার ক্রমশঃ আগাইয়া আসিতেছে। গত ৭০ বছরের ম্যাপ এবং বিবরণ দেখিলে ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। উত্তর প্রদেশসমূহে (আমেরিকায়) ক্রমশঃ বেশী বরফ-পাত হইতেছে। সমস্ত পাহাড় উপত্যকা বরফে ছাইয়া যাইতেছে, তাহার সঙ্গে গাছ-পালা জীব-জন্তু সব মরিয়া যাইতেছে। উত্তর আট্‌লান্টিকেও বরফের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

গ্রিন্‌ল্যাণ্ডের জমির পরিমাণ ৬০০,০০০ বর্গ মাইল, তাহার ৫০০,০০০ বর্গমাইল বরফে ঢাকা। বাকি ১০০,০০০ মাইল বরফে ঢাকিয়া গেলে তাহার জল আরো অনেক স্থানে চড়াইবে। এল্‌স্‌মেয়ার ল্যাণ্ডও ক্রমে

বরফে পূর্ণ হইতেছে। এই-সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া গেলে বরফের চাপ ক্রমশঃ সমুদ্রের জলে পড়িবে এবং বরফের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় লোকালয়ের দিকে ভাসিয়া আসিতে থাকিবে। তাহাতে যে কত জাহাজ এবং কতলোকের প্রাণ নষ্ট হইবে তাহার সংখ্যা নাই। কাপ্তেন ম্যাক্‌মিলান বলিতেছেন যে এই বরফের বিস্তৃতির গতির পরিমাণ জানিতে পারিলে হিসাব করিয়া বলা যাইবে যে আর কতদিন পরে উত্তর-আমেরিকা একেবারে বরফে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তিনি পুনরায় উত্তর-মেরুর দিকে যাত্রা করিয়াছেন—বরফের বিস্তৃতির গতি নিরূপণ করিবার চেষ্টায়। তাঁহার আশা আছে যে তাঁহার এই চেষ্টা পূর্ণ হইবে।

নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তিনি দেশের এবং মানুষের কল্যাণের জন্য বার বার নিজের জীবন বিপন্ন করিতেছেন। স্বাধীন জাতির লোক বাঁচিতে জানে বলিয়া মরিতেও জানে। বিদেশের লোক আসিয়া আমাদের গৌরীশঙ্করশৃঙ্গে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ আমরা মরার মত বসিয়া আছি।

লালমানুষদের কথা—

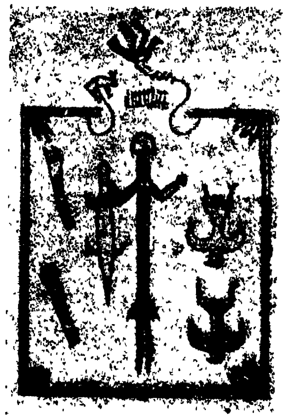
আমরা আমেরিকার লাল মানুষদের গল্প অনেক কিছুই পড়িয়াছি। এই লাল মানুষেরা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহারা যে-সমস্ত জঙ্গলে বাস করিত, ক্রমশঃ শ্বেতাঙ্গরা সে-সমস্ত দখল করিতেছে। তাহার ফলে লাল মানুষেরা ক্রমশঃ সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া লয় পাইতেছে।



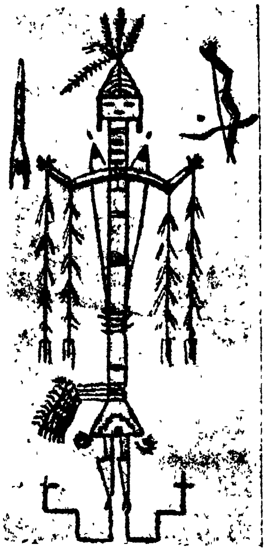
একদল লাল মানুষ

এই লাল মানুষদের মধ্যে নানাপ্রকার ভূত-প্রেত পূজার পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

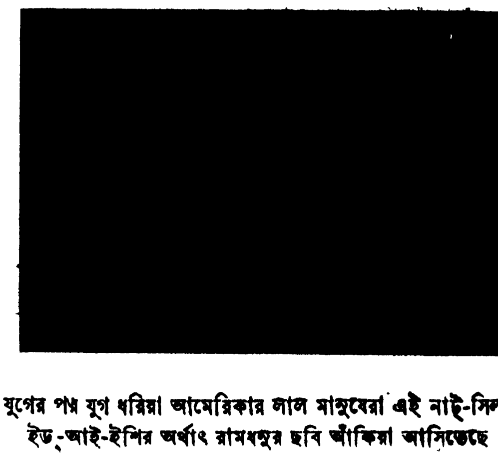
লালমানুষদের মধ্যে যাহারা বৈদ্য—তাহাদের সকলেই মানিয়া চলে। কারণ বিপদে তাহারা ভূতপ্রেতদের তাড়াইয়া দিয়া দেশে শান্তি আনে। নানারকমের মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা এই কাজ করিতে হয়। কোন উৎসব উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে নানাপ্রকারের চিত্র আঁকার পদ্ধতি আছে। এই-সমস্ত ছবি সূর্য্যোদয়ের পরেই সুরু করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সারা করিতে হয়। ইহা শাস্ত্রের বিধান—কাজেই ইহার নড়চড় হইবার জো নাই। সবরকমের রোগ শোক দুঃখ কষ্ট আনন্দ নিরানন্দের জন্য বিভিন্নপ্রকারের ছবি আঁকিবার পদ্ধতি আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই ছবি বালির উপর আঁকা হয়—তবে যদি বালিতে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে হরিণের চামড়ার উপর আঁকা হয়। কয়েকটি চিত্রের নমুনা দেওয়া হইল।



"ঈগল্ ট্র্যাপ্"—উৎসব-সময়ে এই ছবি আঁকা হয়



বালির উপর আঁকা তীর-মানুষের ছবি



যুগের পর যুগ ধরিয়া আমেরিকার লাল মানুষেরা এই নাই-সিল্-ইড্-আই-ইশির অর্থাৎ রামধনুর ছবি আঁকিয়া আসিতেছে



হাস্‌-কা-ইশি এবং দু বোয়া

কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে লালমানুষদের একটি বিশেষ উৎসব হয়। তাহাতে তাহাদের আদিম কালের নানাপ্রকার আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য হাজার হাজার লোক জমা হয়। এই উৎসবে দুইজন সর্দ্দারের ছবি তোলা হয়। একজনের নাম হাস্‌-কা-ইয়াসি—ইনি নাভাযোশ প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবয়স্ক বৃদ্ধ। আর একজন দু বোয়া (Du Bois)—সীমান্ত প্রদেশের শেষ স্কাউট্‌। এই দুইজন লোক বহুকাল ধরিয়া একে অন্যের প্রাণবধ করিবার জন্য ঘুরিয়াছিল—একে অন্যের পরম শত্রু ছিল। বর্ত্তমানে ইহারা পরম শান্তভাবে বসিয়া আছে।



সাদা জমির উপর রঙীন বালি দ্বারা আঁকা রামধনু

লালমানুষদের এই-সমস্ত ছবি, অনেকের মতে, পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এই-সমস্ত চিত্র দেখিলে প্রাচীন গ্রীস অ্যাসিরিয়ার কথা মনে হয়। চিত্রের প্রত্যেকটি রেখার মধ্যে কিছু না কিছু অর্থ আছে। কিন্তু আশা আছে শ্বেতাঙ্গ সভ্যতার স্নিগ্ধ আলোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লালমানুষদের সকল চিহ্ন ক্রমশঃ লোপ পাইবে। হয়ত দু-একটা চিত্রের নমুনা মিউজিয়মের এক কোণে টাঙ্গান থাকিবে।

দাঁতের কস্‌রত্‌—

মানুষের চোয়াল ভয়ানক শক্ত এবং জোরাল। আমরা অনেকেই সার্কাসে দেখিয়াছি যে একজন লোক দাঁতে করিয়া খুব ভারী জিনিষ মাটি হইতে উত্তোলন করে। সামান্য একটু চেষ্টা করিলে অনেকেই



গাস্‌ লেসিস্‌ দাঁতের জোরে লোহার শিক্‌ ভাঙ্গিতেছেন



গাস্‌ লেসিস্‌ দাঁতের জোরে লোহার শিক্‌ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন

দাঁতে বেশ জোর করিতে পারে, এবং খুব ভারী দ্রব্য তুলিয়া অনেককেই অবাক্‌ করিতে পারে। সামনের দাঁত অপেক্ষা পাশের দাঁতের শক্তি অনেক বেশী। হাত অপেক্ষা দাঁত দিয়া কোন জিনিষকে বেশী শক্ত করিয়া ধরা যায়। দাঁতের-ধরার ওজনও হাতের-ধরা ওজন অপেক্ষা অনেক বেশী হয়। শক্তিশালী লোকে দাঁতের সাহায্যে ৩০০ পাউণ্ড্‌ ওজন দিয়া ধরিতে পারে। সাধারণ জোরাল ব্যক্তি মাটি হইতে ২৬০ পাউণ্ড্‌ ওজনের জিনিষকে, তাহার শরীরের সমস্ত পেশীতে জোর দিয়া, তুলিতে পারে। দাঁতের ব্যবহার যত বেশী হইবে, তাহার জোর ততই বেশী হইবে। ছেলেবেলা হইতে যাহারা সকল খাদ্য দাঁত দিয়া ভাল করিয়া চিবাইয়া খায়, তাহাদের দাঁত সকল সময়েই বেশ জোরাল থাকে। দাঁতের অযত্নে অনেকেই নানাপ্রকার অন্য রোগে কষ্ট পায়। অনেকের দাঁত এত খারাপ যে বাদাম ভাঙা দূরের কথা, একটু শক্ত



পিয়ানো এবং বাদক গাস্ লেসিসের দাঁতে ঝুলিতেছে

রুটিও তাহারা চিবাইয়া খাইতে পারে না। ইহা ছেলেবয়সের অযত্নের শুভফল। অনেকে তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের দাঁত দিয়া বাদাম ইত্যাদি শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিয়া খাইতে মানা করেন। তাঁহাদের ধারণা ইহাতে দাঁত খারাপ হইতে পারে। ইহা ভুল ধারণা। শক্ত জিনিষ দাঁত দিয়া ভাঙ্গিলে মুখের এবং চোয়ালের অনেক শিরা এবং পেশী শক্ত হইবে এবং মুখের জোর বাড়িবে। জন্তুরা সকল জিনিষই দাঁতের সাহায্যে ভাঙ্গে বলিয়া তাহাদের দাঁতের এবং মুখের জোর এত বেশী।

যাহারা নরম খাবার ছাড়া অন্য কিছু খাইতে পারে না, তাহারা যদি ক্রমে ক্রমে শক্ত খাবার চিবাইয়া খাইবার অভ্যাস করে, তবে তাহাদের দাঁতের জোর ক্রমে ক্রমে বাড়িবে, সঙ্গে সঙ্গে হজম-শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে। দেখা গিয়াছে একজন লোকের দাঁতের চাপ এমনি করিয়া তিরিশ পাউণ্ড্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে—ইহাতে সময় লাগিয়াছিল মাত্র তিন-চার মাস!

যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে কিছুকাল পূর্ব্বে এক রকম বুনো বাদাম হইত—তাহা ভাঙ্গিতে প্রায় ১০০ হইতে ২০০ চাপ প্রয়োজন হইত। ঐ প্রদেশের লোকেরা ঐ বাদাম দাঁত দিয়া ভাঙ্গিয়া খাইত—সেইজন্য ঐখানের লোকেদের দাঁতের অস্বাভাবিক জোর ছিল। এখন ঐ বাদামের চাষ হইতেছে—কিন্তু তাহার খোসা এখন সামান্য চাপে নষ্ট হইয়া যায়—কাজেই আর দাঁতের বেশী জোরের দর্‌কার হয় না।

দাঁতের ব্যায়াম করিয়া দাঁতের জোর কি ভয়ানক বাড়ান যায় তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। একটা কাঠের কড়ি হইতে আট-ইঞ্চি-পোঁতা একটা লোহা দাঁত দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা বড় সোজা কথা নয়। পিয়ানো-বাদককে পিয়ানো-সমেত দাঁড়ে বসাইয়া দাঁতে করিয়া শূন্যে বেশী-কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখাও রাম-শ্যামের কাজ নয়। যিনি এই কাজ দুটি প্রায়ই করেন—তাঁর নাম গাস্‌লসিস।

দাঁত যদি নীরোগ থাকে, তবে সক্‌লেই হাড়, বাদাম ইত্যাদির মত শক্ত শক্ত জিনিষ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে পারেন, তাহাতে অপকার কিছুই হইবে না—উপকার হইবার সম্ভাবনা পুরা মাত্রায় আছে।

—

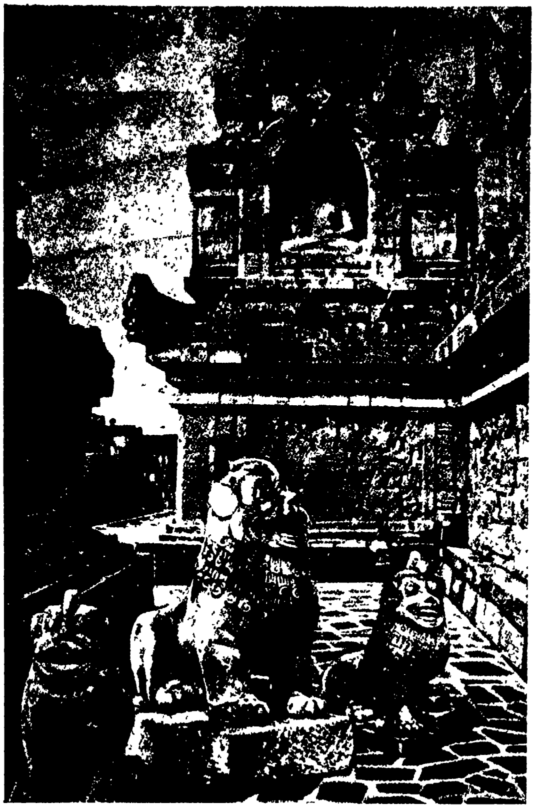
"মামির" অভিশাপ—

তুতান্‌খামেনের মামি উদ্ধার করিবার কিছুকাল পরেই লর্ড্ কার্‌নারভন্ মারা গিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও অনেক লোক বিশেষ বিশেষ মামির অধিকারী হইয়া নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট বিপদ্ আপদ্ ভোগ করিয়াছেন অনেকে আবার মারাও গিয়াছেন। এই-সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে মনে করেন যে মামিদের উপর কোন এক দৈবশক্তি ক্রিয়া করে, যাহা মামির চির-নিদ্রার ব্যাঘাতকারীকে নানাপ্রকারে বিপদে ফেলে। লোকে ভাবিয়া পায় না, যে, ৩০০০ বছর পূর্ব্বের মৃত কবরস্থিত মামি কেমন করিয়া এই মহৎ অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে, ইজিপ্টের একটি মামির বাক্সের এক টুক্‌রা কাঠ আছে—তাহা থিব্‌স্ সহরের মন্দিরের একজন পুরোহিতপত্নীর। এই কাঠের টুক্‌রা অনেক লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছে বলিয়া শোনা যায়। ইজিপ্টলজিষ্ট্‌দের মতে এই পুরোহিতপত্নী খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ অব্দে বাঁচিয়া ছিল। এই কফিনের ঢাক্‌নায় একজন মৃতা নারীর মুখ নানা-রঙে আঁকা আছে। একজন ইংরেজ প্রথমে ইহা ক্রয় করেন। কাইরো পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার হাত বন্দুকের গুলিতে উড়িয়া যায়। তার পর তিনি খবর পাইলেন তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। অবশেষে তিনি নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার সঙ্গীও মারা গেলেন। তার পর এই কফিনের বাক্সর ঢাক্‌নি একজন ইংরেজ মহিলার হাতে আসে। তাঁহাকেও নানাপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয়। একদিন একজন অতিথি এই ভদ্রমহিলার গৃহে আসেন—তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকেন। তার পর কফিনের ঢাকনি দেখিয়া তিনি চম্‌কাইয়া উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি উহা বিদায় করিয়া দিতে বলিলেন।

এই ঢাক্‌নির একখানা ফোটো তোলা হয়। ফোটোতে মূর্ত্তির চোখ দেখিয়া মনে হইত যেন তাহা একটা বিষাক্ত ঘৃণায় ভরা। এই কফিনের বাক্সর ঢাক্‌নি আরো অনেক হাত ঘুরিয়া অবশেষে মিউজিয়মে যায়। সে সেখানে কাহারো কোন অনিষ্ট না করিয়াই বাস করিতেছে।

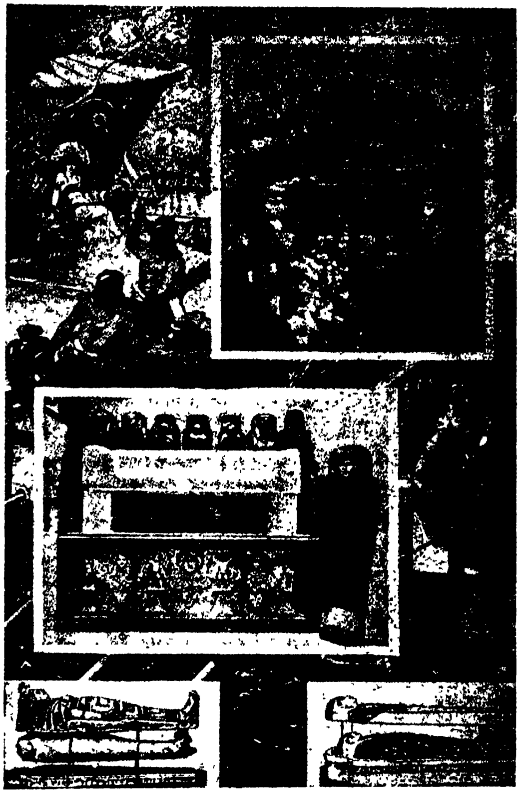
একটি কাঠনির্ম্মিত গৌতম-বুদ্ধের মূর্ত্তি সম্বন্ধে এমনি একটা কথা শোনা যায়। ভারতবর্ষে এক জাহাজের কাপ্তেন তাহা ক্রয় করেন। ইংলণ্ডে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ অকারণে জাহাজে আগুন লাগে। জাহাজের লস্করেরা বুদ্ধমূর্ত্তিকে জলে ফেলিয়া দিবার জন্য জেদ করে। যাহা হউক কোনরকমে জাহাজকে লিভারপুলে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কাপ্তেন তখন এই বুদ্ধমূর্ত্তিকে জলে ভাসাইয়া লইয়া তীরে লইয়া যান। কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কাপ্তেনের মৃত্যুর পর কাপ্তেন-দুহিতা বুদ্ধমূর্ত্তিকে ঘরে রাখেন কিন্তু চাকর-বাকরেরা গোলমাল আরম্ভ করিল। কেহ বলিল মূর্ত্তি চলিয়া বেড়ায়, কেহ বা বলিল মূর্ত্তি চারিদিকে তাকাইয়া দেখে। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও ভীত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে কোন বাহিরের লোক আসিলে সেও এই



এই বুদ্ধমূর্ত্তিকে যে কেহ স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে

মূর্ত্তি দেখিলে ভয় পাইত। অবশেষে ১৯১১ সালে এই মূর্ত্তি লণ্ডনের এক মিউজিয়মে দান করা হয়।

এক হীরা সম্বন্ধেও এইরকম কথা চলিত আছে। হীরাটির ইংরেজী নাম Hope Diamond. কোন এক হিন্দু মন্দিরের এক মূর্ত্তির কপাল হইতে ইহা খুলিয়া লওয়া হয়। ১৭ শতাব্দীতে টাভার্ণিয়ের ইহা প্রথম ইউরোপে লইয়া যান। ইউরোপে পৌছিয়াই তাঁহার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হইয়া যায়। অবশেষে তিনি এই হীরা চতুর্দ্দশ লুইকে বিক্রয় করেন। রাজা লুই ইহা তাঁহার প্রিয়পাত্রী মাদাম মনৎশেন্‌কে দান করেন। মাদাম এই হীরা পাইবার অল্পকাল পরেই রাজার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিতা হন। তাহার পর রাজকুমারী লাম্বেল্ এই হীরার মালিক হন। ফরাসী বিদ্রোহীদলের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর ফাল্‌স্ নামে একজন ফরাসী ইহা পায়। চৌর্য্য অপরাধে দণ্ডিত হইবার ভয়ে সে ইহা বিক্রয় করিয়া দেয় এবং অবশেষে সে অনাহারে মরে। ১৮৩০ সালে ইহা হেন্‌রি টমাস হোপ নামে একজন ইংরেজ ক্রয় করেন। তাঁহার পৌত্র লর্ড্ হোপ ইহার অধিকারী হইয়া নানা দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। এই হোপ ডায়মণ্ড্ কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। অনেককে ইহা সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। অনেককে পাগল করিয়াছে, অনেককে হত্যা করিয়াছে। অনেক ক্রোরপতি, বণিক্, রুশীয় রাজকুমার ইত্যাদির সর্ব্বনাশ করিয়া ইহা একজন আমেরিকান ক্রোরপতির স্ত্রীর হাতে



ইজিপ্টের রাণী ক্লিওপেট্রার কবরের দুয়ার—
এইসব এখন যাদুঘরে আছে

আসে। কিছুদিন হইল তাঁহার একমাত্র পুত্র মারা গিয়াছে। প্রাচ্য দেশের এই সমস্ত মামি, দেবমন্দিরের মূর্ত্তি ইত্যাদি দ্রব্যের মধ্যে সত্যই কোন প্রকার শক্তি নিহিত আছে কি না কেহ বলিতে পারে না; বৈজ্ঞানিকেরাও এখনও ইহার কোন ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

—

পুরাণকালের চিকিৎসা-শাস্ত্র—

ইহুদি ধর্ম্মতত্ত্ববিদেরা একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ৪০০০০ পুস্তক এবং ৪২০০ পুঁথি আছে। এই-সকল পুঁথির মধ্যে ১৪০০ খৃঃ অব্দের একজন ইহুদি বৈদ্যের লিখিত একটি পুঁথি আছে। ইহাতে প্রায় ১৩০০ রোগের ব্যবস্থা আছে।

বিছার কামড় সম্বন্ধে আছে—

যদি গাধার পিঠে চড়া অবস্থায় কোন লোককে বিছায় কামড়ায়, তবে সেই লোক যদি তৎক্ষণাৎ গাধার ল্যাজের দিকে মুখ করিয়া বসে, তবে কামড়ের জ্বালা গাধার দেহে প্রবেশ করিবে। এই ইহুদি বৈদ্য "আব্রাহাম" নামে খ্যাত। তিনি আরব-নারীদের দাঁত-মাজা সম্বন্ধে বলেন - কচি বাদাম-গাছের (যাহাতে একবারও ফল ফলে নাই) ছাল দিয়া আরব-নারীরা দাঁত মাজে। ইহাতে দাঁতের ব্যথা দূর হয় এবং দাঁত শাদা থাকে।

কানে ব্যথা সে সময়েও মাঝে মাঝে হইত। তাহার সম্বন্ধে ব্যবস্থা



ইহুদি ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌দিগের পাঠাগার

—জলপাই-গাছের সরু শিকড় জলে সিদ্ধ করিতে করিতে তাহার বাষ্প কানে লাগাইলে কানের ব্যথা দূর হয়। চুল ওঠা বন্ধ করিতে হইলে শশকের চর্ব্বি এবং মজ্জা চামড়ায় ঘসিতে হইবে।

২০টি হাঁসের ডান চোখ সঙ্গে রাখিলে পথে দস্যুভয় দূর হইবে।

অনিদ্রা রোগ দূর করিতে হইলে রোগীর বালিসের তলায় কাল-কুকুরের দাঁত রাখিতে হইবে।

পুঁথিখানি হিব্রু ভাষায় লেখা, এবং কাগজ এত পাৎলা যে তাহা পড়া বেজায় শক্ত।

—

জার্ম্মানির অর্থ-সমস্যা—

বর্ত্তমান সময়ের জর্ম্মানির অর্থ-সঙ্কটের কথা সকলেই জানেন। এই অর্থসঙ্কটের জন্ম সেখানের লোকের দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশের সচ্ছল অবস্থার তুলনা ছিল না বলিলেও চলে; কিন্তু যুদ্ধের পরে আজ সেই দেশের দুঃখ-কষ্টের তুলনা নাই। একখণ্ড রুটির জন্য লোকে হাহাকার করিয়া বেড়ায়। বাজারে আজ জর্ম্মান মার্কের কোন মূল্য নাই। এক পাউণ্ডে অর্থাৎ আমাদের দেশের ১৫৲ টাকায় আজকাল

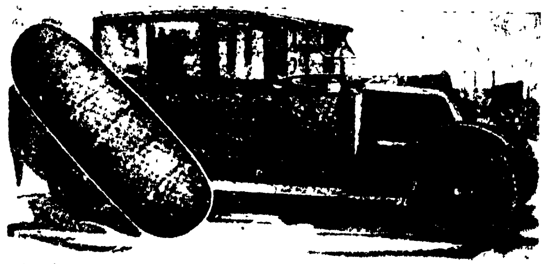


বর্ত্তমান ঘোড়ার নালের দামে ১০ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানিতে একটি ঘোড়া পাওয়া যাইত

৫ কোটী মার্ক্ পাওয়া যায়। এই অবস্থার উপর ফরাসীরা রুর-প্রদেশ দখল করিয়া



জার্ম্মানিতে একমুঠা আলুর বর্ত্তমান দামে ১০ বৎসর পূর্ব্বে এক গাড়ী আলু পাওয়া যাইত



বর্ত্তমানে একখানা রুটির যা দাম—দশ বৎসর পূর্ব্বে জার্ম্মানিতে সেইদামে একখানা মোটর-গাড়ী পাওয়া যাইত



দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনটি গরুর যা দাম ছিল—এখন সেই দামে এক ভাঁড় দুধ পাওয়াও দুষ্কর

অবস্থা আরো সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। বর্ত্তমানে-মৃতপ্রায় জর্ম্মানির উপর ফরাসীদের বর্ব্বরতা দেখিয়া অনেক সভ্যদেশ অবাক্ হইয়া গিয়াছে। বল্‌কান দেশসমূহের এবং অষ্ট্রিয়ার অবস্থাও প্রায় একইরকম। গত জুলাই মাসে সমগ্র জর্ম্মানিতে ২০,২৪১,৭৪২, ৯৬৬,০০০ মার্ক বাজারে ছিল। ৪১টি মুদ্রাযন্ত্রে ২৪ ঘণ্টা কাজ করিয়া প্রতিঘণ্টায় ১৭,৫৬৩,৮১৯, ৪২ মার্ক্ ছাপা হইত। ইহা ছাড়া এ্যালুমিনিয়মের উপর ছাপা ২১,২০০,০০০,০০০ মার্ক্ ছিল। এই সময় হাজার মার্কের কম মূল্যের কোন নোট ছাপান হইত না, কারণ তাহাতে খরচ বেশী পড়িত।

কাগজের মার্কের এই বাড়াবাড়িতে লোকজনের বেতন অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে—অবশ্য তাহাতে লাভ কিছুই হয় নাই—বরং কষ্টের মাত্রাই বাড়িয়া গিয়াছে। যাহারা যুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মান ব্যাঙ্কে মার্কের দরে টাকা জমা রাখিয়াছিল—এবং জমার সুদে আরামে দিন কাটাইত, তাহাদেরই অবস্থা বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে।

দশ বছর পূর্ব্বে জর্ম্মানিতে যে পরিবারের আয় বার্ষিক ২৫,০০০, মার্ক ছিল—তাহাদের লোকে ধনী বলিত—কিন্তু বর্ত্তমানে ঐ দামে সামান্য একটা বাজে জিনিষ ক্রয় করিতে পারা যায় না।

রাশিয়াতে এখন নোট ছাপা প্রায় বন্ধ আছে। বর্ত্তমানে রাশিয়ার একখানা ১০-রুবল্ গোল্ড-নোটের দাম বাজারে ইংরেজী পাউণ্ড্ ষ্টার্লিং অপেক্ষা বেশী বলিলেও হয়।

ছবিগুলি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, বর্ত্তমানে জার্ম্মান মার্কের মূল্য কি প্রকার।

—

মূক-অভিনয়ে পরীরাজ্যের দৃশ্য—

প্যারিসে একটি মূক-অভিনয়ে এক যাদুকরের ভূমিকা ছিল। রাজসভা বসিয়াছে—নানা দেশের দূতেরা যাওয়া আসা করিতেছে। চারিদিকে লোকজন, চোখ-ঝল্‌সানো ঝাড় লণ্ঠন। তাহার মধ্যে যাদুকর প্রবেশ করিল এবং হঠাৎ হাত নাড়িয়া দিবা মাত্র দর্শকের সামনে একটি অদ্ভুত পরীরাজ্যের দৃশ্য হাজির হইল। পরীরাজ্যের সব মূর্ত্তিগুলিই জীবন্ত এবং সচল। সোনার পাখী উড়িয়া যাইতেছে। ড্র্যাগন তাহাকে গিলিবার জন্য তাড়া করিয়াছে। ছবিতে দেখুন দৃশ্যটি কি চমৎকার।



পরীরাজ্যের দৃশ্য

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

—

আঁকা-বাঁকা নারিকেল-গাছ—

নারিকেল-গাছ সাধারণতঃ সোজাই হয়। ধান্যকুড়িয়াতে কিন্তু একটি নারিকেল-গাছ আছে তাহা সাপের মত আঁকা-বাঁকা হইয়া



আঁকা-বাঁকা নারিকেল-গাছ

দাঁড়াইয়া আছে। ইহার একটা স্থান এত বেশী বাঁকা, যে, একজন লোক সেখানে ঘোড়ায়-চড়িবার মত করিয়া বেশ বসিতে পারে। এরূপ গাছ বিরল।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সাউ

বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্‌বোধন-পত্র *

সপ্তসিন্ধু প্রদেশে সরস্বতীর যে স্তুতি একদা উদীরিত হইয়াছিল, সেই স্তুতি আমাদের সারস্বত সমাজকে পালন করুন।

যিনি স্মৃতি-জ্ঞান-বুদ্ধি-শক্তিস্বরূপিণী; যিনি সর্ব-বিদ্যাধিদেবী, জ্ঞানাধিদেবী, বাগধিষ্ঠাতৃদেবী; যিনি সংখ্যা-ব্যাখ্যা-ভ্রম-সিদ্ধান্তরূপা; তিনি বরদা হউন॥

জ্ঞান অনন্ত, বিদ্যা অসংখ্য, বাক্ অগণ্য। অতএব সরস্বতীর পূজা একার সাধ্য নয়, বহুগোষ্ঠী সমাজের প্রয়োজন।

কেহ পূজার উপচার ও মূর্তির উপাদান সংগ্রহ করেন, কেহ বিধিপূর্বক সরস্বতীর স্বরূপ ধ্যান করেন। ইঁহারা সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নীরূপে পূজা করেন। কেহ নরনারী জাতিধর্মনির্বিশেষে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মাঙ্গল্য বিলাইতে থাকেন। ইঁহারা সরস্বতীকে বৈষ্ণবীশক্তিরূপে পূজা করেন। কেহ দুঃখ ও দুর্গতি, শোক ও ভয় হইতে মুক্ত হইবার এবং সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিবার কামনায় সরস্বতী নামে দুর্গাদেবীর পূজা করেন। মহারাষ্ট্র-দেশ-সম্বলিত দক্ষিণাপথে বঙ্গের দুর্গাপূজা নাই, শারদীয়া সরস্বতী-পূজা আছে। তিনি ধ্যানময়ী হইয়া জ্ঞান, সম্যক্ বাঙ্ময়ী হইয়া বিদ্যা, কলনাময়ী হইয়া কলা। অতএব সরস্বতীর মন্দিরে প্রবেশ-অধিকার সকলেরই আছে, কেবল উপচার-পরিভ্রষ্টের নাই।

সারস্বত সমাজের অভিধেয় ও প্রয়োজন বলা হইল। বাঁকুড়ায় বিনিয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতেছি।

আমি বঙ্গের বাহিরে বহুকাল কাটাইয়া তিনবৎসর হইল বাঁকুড়ায় আসিয়াছি। আমার জন্মস্থান বাঁকুড়া-জেলার নিকটে হইলেও এখানে এত বিষয় নূতন দেখিতেছি যে সেসবের বৃত্তান্ত জানিতে স্বভাবতঃ কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। আপনাদের নিকট সেসব পুরাতন, এবং পুরাতন বলিয়া হয়ত আপনাদের জিজ্ঞাসার উদয় হয় না।

তথাপি পুরাতন যত অজ্ঞাত, নূতন তত নয়। কারণ পুরাতন অতীতে, নূতন বর্তমানে; পুরাতন পশ্চাতে, নূতন সম্মুখে। কিন্তু পুরাতনকে আশ্রয় করিয়া বর্তমানের স্থিতি। অতএব পুরাতনকে না জানিলে নূতন জানিতে পারা যায় না। এই হেতু পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস চর্চার প্রয়োজন। কে চর্চা করিবে?

সম্প্রতি বাঁকুড়াজেলার বর্তমান সীমা ভুলিয়া যান। ইহা প্রাকৃতিক নয়, পুরাতন বিভাগও নয়। উত্তর সীমায় দামোদর নদ কতকটা প্রাকৃতিক বিভাগ করিয়াছে। কিন্তু পশ্চিমে মানভূমি দক্ষিণে মেদিনীপুর, এবং পূর্বে হুগলী জেলা অল্পে-অল্পে বাঁকুড়ায় বিলীন হইয়াছে। মধ্যভারতের মালভূমির পূর্বপ্রান্তে মানভূমি, এবং মানভূমির পূর্বে বাঁকুড়া; কিন্তু কোথায় মানভূমির শেষ এবং বাঁকুড়ার আরম্ভ, তাহা ভূমি দেখিয়া বলিতে পারা যায় না। এই-রূপ দক্ষিণে, বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর ও উৎকলে বাঁকুড়া অদৃশ্য হইয়াছে। অতএব দক্ষিণে ও পশ্চিমে বাঁকুড়ার সীমাপরিবর্তনের সুযোগ ছিল। এখান-কার পাথর্যা, কাঁকর্যা, লালমাট্যা, উচুনীচু ভূমি বহুকালা-বধি বনভূমি ছিল, এবং পূর্বকালের ঝাড়খণ্ডের পূর্বভাগ হইয়াছিল। 'ঝাড়খণ্ড' শব্দের অর্থ বনভূমি।

জাঙ্গলদেশবাসী স্বভাবতঃ দারুণ হইয়া থাকে। অনুর্বরা নীরসা ভূমি, হিংস্র পশু এবং ততোধিক হিংস্র দস্যুর বিচরণভূমি হইয়াছিল। দেশের কিয়দংশের নাম ছিল, মল্লভূমি। কতকাল পরে, কে জানে; বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ দস্যুর আক্রমণ নিবারণ অভিপ্রায়ে ঘট্টপাল বা ঘাটোয়াল নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

মল্লভূমির মল্লজাতি বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এক প্রাচীন মল্লাধিপ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন।

* সমাজের আরম্ভ-সমাগমে পঠিত। স্থানে স্থানে সাহিত্যপরিষদ্, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, হিতকরী সমিতি, প্রভৃতি নামে সারস্বত সমাজ আছে। এই-সব সমাজের কার্য্যক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ তাহা এই উদ্‌বোধন-পত্র হইতে উপলব্ধ হইবে।—প্রঃ সঃ।

মনুসংহিতায় এই জাতির উল্লেখ আছে। ঝল্ল-মল্ল-ভিল্ল প্রভৃতি প্রাচীন জাতিবাচক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। বনবিষ্ণুপুরের মল্ল রাজগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। গুণ-কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন স্মৃতিকারগণ বহু অনার্য জাতিকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় গণনা করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তীও এই, বিষ্ণুপুরের রাজারা আদিতে বাগ্‌দী ছিলেন। এখানে শুনিতেছি, তাঁহারা মেট্যা জাতি ছিলেন, এবং বাঁকুড়ার মৎস্যজীবী মেট্যা জাতি আপনা-দিগকে মল্লভূমির মেট্যা বলে। অন্যত্র মেট্যা জাতি বাগ্‌দীর এক শ্রেণী বলিয়া গণ্য। বাগ্‌দীও মাছ ধরে, শিবায়নগ্রন্থে বাগ্‌দীনীকে মাছ ধরিতে দেখি। মেদিনী-পুরের বগড়ী পরগণায় বাগ্‌দীর বাহুল্য আছে। বোধ হয়, বকদ্বীপ শব্দের বিকারে ব-গ-ড়ী, অর্থাৎ যেখানে বক বিচরণ করিত। পূর্ব্বকালে এই অঞ্চল জলা ভূমি ছিল। এখনও বহুস্থলে জলা ভূমি আছে। বোধ হয় ব-ক-দ্বী-পী (অর্থাৎ বকদ্বীপবাসী) হইতে ব-গ-দী—বাগদী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এদিকে দেখি, মা-টি-য়া শব্দের সংক্ষেপে মে-ট্যা নাম। মৃত্তিজ, মাটি-জাত=মাটিয়া; এইরূপ, ভূমি-জাত=ভূমিজ বা ভূঞা। মৃত্তিজ, ভূমিজ শব্দের অর্থ আদিম অধিবাসী (indigenous)।

আমাদের ভাষার 'রাড়-বাগদী', 'রাড়-চোয়াড়ি', শব্দ দুইটি সকলেই জানে। প্রথমে মনে হয়, রা-ড় শব্দ রা-ঢ় শব্দের বিকার। তখন অর্থ হয়, রাঢ়ের বাগদী, রাঢ়ের চোয়াড়ি। কিন্তু এই অর্থ ঠিক মনে হয় না। কারণ ব্যাকরণে বাধে। তা ছাড়া, রাঢ়ের সর্ব্বত্র কিংবা অধিক স্থানে বাগদী ও চোয়াড় নাই। পরন্তু রাঢ়ের তুল্য শ্রেষ্ঠ দেশও পূর্ব্বকালে বিরল ছিল। এ কারণ মনে হয়, উভয় শব্দ দ্বন্দ্ব-সমাস-নিষ্পন্ন সহচর শব্দ, যেমন বন-জঙ্গল, থালা-বাটী ইত্যাদি। কবিকঙ্কণে এই অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সেখানে ব্যাধ বলিতেছে, "আমি গো চোয়াড় রাড়।" অতএব চোয়াড়, যেমন এক জাতির দুর্ণাম ঘোষণা করিতেছে, রাড়ও তেমন অপর এক জাতির নিন্দাবাচক নাম। সে কোন্ জাতি, কে জানে। হেমচন্দ্র কোষে সং রা-টি শব্দ আছে, অর্থ যুদ্ধ, কলহ, দ্বন্দ্ব। অতএব রাড়জাতি দ্বন্দ্বপ্রিয় ছিল।

চোয়াড় শব্দের অর্থেও প্রায় তাই বুঝায়। দস্যুকে চুয়াড় বলিত। চুরি+আড়=চুরি-আড়—চুআড় (র লুপ্ত)। খেলায় দক্ষ যে, সে যেমন খেল আড়, খেলাড়; চুরিতে দক্ষ যে, সে তেমন চুয়াড় (দক্ষ, রত অর্থে বা আড় প্রত্যয়)। ভূমিজ জাতির প্রতি চুয়াড় নাম প্রযুক্ত হইত। এই জাতি বাঁকুড়া, মানভূমি, ময়ুরভঞ্জ, কেঙঝর প্রভৃতি স্থানে অনেক আছে। ইহাদের বর্ত্তমান প্রতাপও অল্প নয়। ভূমিজ জাতি রক্তের টীকা না দিলে কেঙঝরে রাজার অভিষেক সম্পন্ন হয় না। মানভূমির বিপিন ভূঞার শৌর্য শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূমিজ ব্যতীত মৃত্তিজ জাতি থাকে। এই জাতিই কি পূর্বে রাড় নামে খ্যাত ছিল ?

মল্ল শব্দের এক অর্থ, বলিষ্ঠ, বাহুযোদ্ধা। পূর্ব্বকালে বাগ্‌দী জাতি সৈনিক হইত। মেলেরিয়া রোগের আক্রমণের পূর্বে ইহারা লাঠীআল, ডাকাইত, দরোয়ান, দিগার (দিক্‌পাল) প্রভৃতি হইত। এহেন দেশে বিষ্ণুপুরের রাজবংশের উদয় হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ কালকেতুর রাজ্যস্থাপন বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালে সেরূপ রাজ্যের অভাব ছিল না। তথাপি বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধি হেতু মনে হয়, কবিকঙ্কণ এই রাজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরের পূর্ব্বনাম কি ছিল, কে জানে। রাজারা বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুরাগী হইবার পরে রাজধানীর নাম বিষ্ণুপুর হইয়া থাকিবে।

বাঁকুড়া জেলায় দশ লক্ষ লোকের মধ্যে বাগদী প্রায় এক লক্ষ। বাউরী লক্ষাধিক। আচারে ব্যবহারে বাউরী আরও নীচ। বোধ হয়, সং ব-র্ব-র হইতে বাবরী, বাউরী নামের উৎপত্তি। বাঁকুড়ায় সাঁওতালও প্রায় এক লক্ষ। এই তিন জাতি মিলিয়া বাঁকুড়ার প্রায় পাঁচ আনা অধিবাসী।

আশ্চর্য এই, বাঁকুড়ায় এক লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এই অসভ্য বর্বর দেশে ইহাঁদের আদিপুরুষ কেন আসিয়াছিলেন, কে জানে। প্রাচীন কলিঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া পড়ে, এবং কলিঙ্গের পরেই উৎকলিঙ্গ, বর্ত্তমান উৎকল। এই হেতু বাঁকুড়ায় উৎকলীয় ব্রাহ্মণের বাস বুঝিতে পারি। কিন্তু কি সূত্রে কণৌজ

ব্রাহ্মণের আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান কর্তব্য। বাঁকুড়ার পূর্বাংশ, বঙ্গের উর্বরা সমস্থলীর সদৃশ বটে; কিন্তু সেখানে লক্ষ ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের যোগ্য ভূমি দেখিতে পাই না। বাঁকুড়া নদীমাতৃকা ভূমি নয়। মনে রাখিতে হইবে সমস্ত বঙ্গে ব্রাহ্মণ, মাত্র সাড়ে বার লক্ষ।

বাঁকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। ইহারা সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামন্তো ক্ষুদ্রভূপালঃ। ক্ষুদ্র রাজার নাম সামন্ত। বড় রাজার অধীনে, সে রাজার রাজ্যের প্রান্তে সামন্ত রাজ্য। 'রায়' উপাধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত আছে। কারণ, সং রাজন্ শব্দের বিকারে রা-য়। ওড়িষ্যার সামন্ত-রায়, সংক্ষেপে সামন্তরা, এবং মধ্যরাঢ়ের সাঁতরা, এককালে রাজবংশীয় ছিল। বাঁকুড়া জেলার সামন্তরাজ্য ছাতনায় স্থাপিত ছিল। বাঁকুড়া শহর সামন্তভূমিতে অবস্থিত। সামন্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু দেখিলে বুঝি, ইহারা আদিতে বাঙ্গালী ছিল না। কেহ কেহ বলেন, সামন্তরা ছত্রী। ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত আদি সামন্ত সাহস-ব্যবসায়ী হইয়া ছাতনায় রাজা হইয়াছিলেন।

শুনি, বিষ্ণুপুরের মল্লবংশও বঙ্গের বাহির হইতে আসিয়াছে। এইরূপ, প্রাচীন রাজাদিগের সকলেই নাকি বিদেশাগত, একজনও বাঙ্গালী ছিলেন না। শুশুনিয়া পাহাড়ে যে চন্দ্রবর্মার নাম ক্ষোদিত আছে, তিনি নব্যমতে বঙ্গের নিকটে আসিয়াছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গের ভিতরে পড়েন নাই। বঙ্গ ও উৎকল ও ছোটনাগপুরের প্রান্তস্থিত এই বনাকীর্ণ ভূখণ্ড সাহসিকের বিক্রম-প্রকাশের লীলাভূমি হইয়াছিল। কত রাজার উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, কে জানে। যেসকল গ্রামের নামে গ-ড় শব্দ যুক্ত আছে, সে সে গ্রামে এক এক রাজার আবাস ছিল। বলা-গড়, পানা-গড়, শক্তি-গড়, অসুর-গড়, বেত্র-গড়, মন্দারণ-গড়, নারায়ণ-গড় নামের ইতিহাস কে শোনাইবে? সমস্থলীতে প্রাকার ও পরিখা নির্মাণ করিয়া দুর্গ রচিত হইত, অরণ্য-বেষ্টিত হইলে গড় আরও দুর্গম হইত। স্বাভাবিক অরণ্য না থাকিলে বেউড়-বাঁশের কৃত্রিম বন দ্বারা দুর্গ রক্ষিত হইত। বাঁকুড়া জেলায় বহু গ্রামের নামে গড় নাম যুক্ত আছে।

কিন্তু মল্লভূমি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল কি? মল্লরাজত্বকালে অনেক দেবমন্দির ও বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল, রাজধানী বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতে দেশের সমৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায় না। কারণ পেটে ও পিঠে মারিয়া প্রাসাদ নির্মাণ ও তড়াগ খনন অদ্যাপি ঘটিতেছে, ইংরেজ রাজ্যে না হউক দেশী রাজ্যে বেঠি (বেগার) ধরা প্রচলিত আছে। যে দেশে প্রজার কীর্তি দেখিতে পাই না, সে দেশে লক্ষ্মীর কৃপা কই? তন্তুবায় বঙ্গের কোন্ গ্রামে না ছিল? কাংস্যকার কোন্ গঞ্জে নাই? অবশ্য সে কালে প্রজা এত ছিল না, তেমনই কৃষিযোগ্য ভূমিও অধিক ছিল না। কিন্তু কেবল কৃষিকর্ম দ্বারা, বণিক-সহায় ব্যতীত কৃষিজাত দ্বারা কোনও দেশ ধনশালী হইতে পারে না। পথ দুর্গম, বনবেষ্টিত; ঘাট দস্যুর উপদ্রুত; সার্থবাহ নির্বিঘ্নে যাতায়াত করিতে পারিত না। তা ছাড়া মল্লভূমি ধনশালী হইলে মুঘল বাদশাহের লোলুপ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত কি? বর্গীর লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি পুনঃপুনঃ চরিতার্থ হইয়াছিল বটে; বোধ হয় পূর্বভাগে ও দক্ষিণে তাহাদের দুর্নিবার অত্যাচার পর্যবসিত হইত।

ধনশালী না হইলেও মল্লভূমি দরিদ্র ছিল না। কারণ দরিদ্র দেশের খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই থাকে না। রাজানুগ্রহে সঙ্গীত কলা সমাদৃত হইয়াছিল, কিন্তু প্রজাও সে রস হইতে বঞ্চিত ছিল না। একালের মতন অন্নকষ্ট থাকিলে সে কলা এত কাল তিষ্ঠিতে পারিত না।

এখন বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ প্রায় লাগিয়া আছে, পাঁচ ছয় বৎসর পরে পরে সুভিক্ষে যায় না। লোকে বলে, সুবৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ হয়। এটা কিন্তু স্থূল কথা। এই যে উত্তর-বঙ্গের জেলাকে জেলা জলে ডুবিয়া গেল, অতিবৃষ্টি এক কারণ নহে। দেশের নদী, বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী। যদি সে প্রণালী রুদ্ধ না হয়, অতিবৃষ্টি হইলেও গ্রামকে গ্রাম পক্ষকাল ডুবিয়া থাকিতে পারে না। বাঁকুড়ায় অনাবৃষ্টি নূতন সৃষ্টি কি? যদি নূতন না হয়, তাহা হইলে সে কালেও দুর্ভিক্ষ হইত না কি? ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তর যেমন ভীষণ হইয়াছিল, বোধ হয় তেমন ভীষণ হইবার সম্ভাবনা অধিক ছিল। কারণ অজন্মা হইলে অন্য স্থানের ধান আনাইয়া প্রজারক্ষার সুগম পথ ছিল না।

নিকটবর্তী স্থানও যোগাইতে পারিত না, কারণ অনাবৃষ্টি অল্পদেশব্যাপী কদাচিৎ হয়।

এই প্রশ্ন একটু বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি। প্রথমে দেখি, অনাবৃষ্টির হেতু কি। পূর্ববঙ্গে অনাবৃষ্টি হয় না, এখানে হয় কেন? দেখিতেছি, আরব-সাগর ও বঙ্গসাগর হইতে যে দুই নীরদ বায়ুপ্রবাহ আমাদের দেশে বহিয়া থাকে, উহাদের সংঘর্ষস্থলে বাঁকুড়া অবস্থিত। শুধু বাঁকুড়া নহে, মেদিনীপুর ও ওড়িষ্যার দশাও তাই, কভু এই, কভু অই প্রবাহ প্রবল হইয়া উভয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ফলে সুবৃষ্টি, বিশেষতঃ যথাকালে বৃষ্টি, বাঁকুড়ার ভাগ্যে নাই।

কিন্তু প্রকৃতি অন্য এক বিষয়ে উদার ছিলেন। পূর্বকালে বাঁকুড়া বনভূমি ছিল। বিষ্ণুপুর নাম এখনও বনবিষ্ণুপুর নামে খ্যাত। সে জঙ্গল আর নাই। লোকে বন নির্মূল করিয়া শুখনা ডাঙ্গা ফেলিয়া রাখিয়াছে। মান্যবর মাজিষ্ট্রেট সাহেব পূর্বের বনভূমির এক মানচিত্র করাইয়াছেন। তাহাতে দেখি অধিক কাল নয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বাঁকুড়া জেলার বার আনা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তখন প্রজা এত বৃদ্ধি পায় নাই, কৃষিভূমির টান পড়ে নাই, কাঠের দর চড়ে নাই, এবং বোধ হয় বড় বড় জঙ্গল যার-তার অধিকারেও যায় নাই। এখন বৃষ্টিজল বৃক্ষমূলে আবদ্ধ হয় না, বৃক্ষদেহে রসরূপে সঞ্চিত হয় না। পড়িবামাত্র গড়াইয়া জোলে উপস্থিত হয়, কিয়দংশ ভূনিম্নগত হইয়া কাঁকর-বাহুল্যহেতু অবিলম্বে সেই জোলে আসিয়া পড়ে, পরে খাল ও নদীর বন্যা সৃষ্টি করে। অনাবৃষ্টি হইলে ইন্দ্রের দোষ, অতিবৃষ্টি হইলেও ইন্দ্রের দোষ। কিন্তু বুদ্ধিমান্ জন প্রকৃতির সহিত কলহ করে না। প্রকৃতির দানে নিজের প্রয়োজন যথাযোগ্য সাধন করে। আমাদের বুদ্ধি থাকিলে বন কাটিয়া শুখনা ডাঙ্গা করিতাম না, কিংবা নদীর দুই তীরে অবিচ্ছিন্ন বাঁধ বাঁধিয়া বনভূমির উর্বরতা-শক্তি সাগরে নিক্ষিপ্ত হইতে দিতাম না। যে মাটির উপরিভাগে পাথর কাঁকর মোটা বালি, তাহার জল কে আটকাইতে পারিবে? অন্তঃস্রোত কে রোধ করিবে? পারিত গাছে; কিন্তু তাহা নির্মূল। শুখনা পাতা ঝরিয়া পড়ে না, পাতা পচিয়া মাটি হয় না, মাটিতে রসও থাকে না। বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমাংশ সেদিন পর্যন্ত বনাকীর্ণ ছিল। এখন সেখানে পাতা পচার লেশ নাই। অনেকে জানেন, এখন সেখানে কুআতে যত হাত দোড়ী লাগে তখন তত লাগিত না।

অরণ্যধ্বংসের দ্বিতীয় ফলও ঘটিয়া থাকিবে। বায়ু শুষ্ক হইয়া থাকিবে। ভূনিম্নগত যে জল বৃক্ষ-মূল দ্বারা শোষিত হয়, কাণ্ড ও প্রকাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা-পথে উঠিয়া পত্রের নাসারন্ধ্র দিয়া তাহার অধিকাংশ বাষ্পাকারে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়। ফলে বায়ু শুষ্ক হইতে পায় না। শুষ্ক বায়ুতে দেহের রস শুখাইয়া যায়, পিপাসা বৃদ্ধি পায়, এবং পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টায় বৃক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখন মাটিতে রস থাকিলেও শস্যের পুষ্টি ও আধিক্য আশা করিতে পারা যায় না।

প্রকৃতির সহিত কলহ না করিয়াও পূর্বকালে লোকে জলস্থিতির ব্যবস্থা করিয়াছিল। যেখানে বৃষ্টি অনিশ্চিত সেখানেই পুষ্করিণী ও বন্ধে বৃষ্টিজল ধরিয়া রাখিত। বাঁকুড়ায় এখন সেসব বুজিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি উদ্ধারের উদ্যম হইতেছে, কিন্তু কেবল তদ্দ্বারা দুর্ভিক্ষের উপশম হইবে না। বস্তুতঃ, বাঁকুড়ায় দুর্ভিক্ষ হয় না। ধান চাল পাওয়া যায়, লোকে অর্থাভাবে কিনিতে পারে না। বলা বাহুল্য, অর্থের অভাব আর অন্নের অভাব, এক কথা নহে। বৃষ্টিজল সঞ্চিত থাকিলে ধান শুখাইবার শঙ্কা থাকিবে না; ধান জন্মিবে, কৃষিজীবী মাসকয়েক কর্ম পাইবে, বেতন পাইবে। ধানে ও বেতনে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তা বলিয়া ধান যে সস্তা হইবে, একথা বলিতে পারা যায় না।

অন্যদিক্ দিয়া দেখি। বর্তমানে কৃষিযোগ্য ভূমিই আমাদের একমাত্র ধন হইয়াছে। জনসংখ্যার অনুপাতে বাঁকুড়ায় এই ভূমি অল্প। লক্ষ লক্ষ লোক ভূমি-হীন। তাহাদিগকে অন্যের ভরণীয় হইয়া জীবন যাপন করিতে হয়। যখন ভূ-স্বামী ভর্তার শস্যহানি হয়, তখন ভরণীয় প্রথমে কষ্ট পায়। সাঁজায় চাষ, কি ভাগে চাষ, ভরণীয়ের পক্ষে সমান কথা। বাস্তবিক, কর্ষণোপযোগী যাবতীয় ভূমি বাঁকুড়ার যাবতীয় লোককে সমান ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকের ভাগে দুই বিঘাও পড়ে না। যদি

দুই বিঘাও ধরি, তাহা হইলে সুজন্মার বছরেও দেহের পরিশ্রমের বিনিময়ে সম্বৎসরের মাত্র গ্রাসের যোগাড় হইত, অন্য ব্যয়ের নিমিত্ত এক পয়সাও থাকিত না। বস্তুতঃ সকলের জমি নাই; যাহাদের নাই, তাহাদের পক্ষে সুবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রায় সমান। অন্য কর্ম পায় না বলিয়া তাহারা কষ্ট পায়।

সেকালেও এই অবস্থা ছিল, সুবৃষ্টি কুবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ছিল। পুষ্করিণী ও বাঁধে জল থাকিত, আর থাকিত যেখানকার ধান সেখানে, অধিক দূরে যাইত না। ইহাদের ফলে মাত্র এক বৎসরের অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষ হইত না। অনাবৃষ্টি বহুবর্ষব্যাপী হইলে রক্ষার উপায় থাকিত না। কিন্তু একই অঞ্চলে এরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটে।

তখন সকলের জমি ছিল না। কিন্তু ভরণ-পোষণের বহুবিধ উপায় ছিল। জীবিকার প্রাচীন উপায়গুলি একে একে সরিয়া যাওয়াতে আমাদের দৈন্যদশা ঘটিয়াছে। বাঁকুড়ায় এক বন হইতে কতলোকের খাদ্য সংগৃহীত হইত। অসভ্যদিগের পক্ষে বন এত মূল্যবান্ যে আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। চাষবাস নাই, স্বচ্ছন্দে পুত্রকলত্র লইয়া দিন কাটাইতেছে। যাহাদের অল্পস্বল্প চাষ আছে, তাহারা ধনবান্। এক মহুআ গাছ কত লোকের খাদ্য নির্বাহ করে। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে বাঁকুড়ায় নাকি মউলের মরাই বাঁধা হইত, এখন মউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। মৃগয়া ছিল, তাহার স্মৃতিবশে এখনও বর্ষে বর্ষে, যদিও এক দিন, বাগদীর দল মৃগয়ায় বহির্গত হয়। কিছুদিন পূর্বেও গ্রামে গ্রামে যে বিল-ভোজন, বন-ভোজন ছিল, তাহা মৃগয়ার প্রাচীন স্মৃতি। বাউরী বাগদী সাঁওতালের কষ্টের জীবন ছিল বটে, কিন্তু সে কষ্ট তাহারা অনুভব করিতে পারিত না। কত লোক সৈনিক পদাতিক ও অন্য রাজভৃত্য হইত। কত ব্যবসায় ছিল, কত কলা ছিল। খয়রা জাতি জানে না, তাহাদের পূর্বপুরুষ কত কর্মকার যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র নির্মাণ করিত। খদির নির্যাস করিত; লোহার জানে না এক কালে তাহারা লৌহকার ছিল; আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশন করিত।

বাঁকুড়ায় গোপাল জাতিও অল্প নাই। এক কালে এই জাতি হইতে বীরের উদয় হইয়াছিল। সে কালে গো ও মহিষ পালন কষ্টকর ছিল না, বনপ্রান্ত-ভূমি চারণ হইয়াছিল। এই জাতির দেহ এখনও বলিষ্ঠ ও মাংসল। এ দেহ আর থাকিবে না, দেশের গোধন শূন্য হইয়াছে। তৈলি জাতিও অল্প নাই। ইহাদের কত লোকে শকট-চালক ছিল, কে সংখ্যা করিবে? রেলপথে যাতায়াত করিতে আরাম বটে, কিন্তু পেটে শুখাইয়া আরাম ভোগ করিতেছি। এইরূপ, সেসব তাঁতী কই, কর্ম্মকার কই? তাহাদের অন্ন চিরকালের তরে মারা গিয়াছে। অথচ ভাবি, আমাদের দারিদ্র্যের হেতু কি।

সে কাল আর নাই, কিন্তু আমরা কালান্তর লক্ষ্য করিতে পারি নাই। এখন যদি বা লক্ষ্য হইতেছে, তাহাতে হতাশ হইয়া পড়িতেছি। কালবিলম্বে ঘুম ভাঙ্গিলে অবসাদ আসে। চোখের সাম্‌নে চিলে ছোঁ মারিয়া আমিষ লইয়া ছুটিয়াছে, আমরা দেখিতে পাইতেছি না, চোখ কচলাইতেছি।

বাঁকুড়াই ধরুন। এই শহরে অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে ক্ষুদ্র বাজার নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বাড়াইবার প্রয়োজন হয় নাই; পঁচিশ বৎসর পূর্বে ডাকঘরে পাঁচজন কেরানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পাঁচজনেই কার্য নির্বাহ হইতেছে। কাল দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হইতেছে, দশ পাঁচ বৎসর বিশ্রামের অবকাশ দিতেছে না। কামী ও কামিনী কয়লার খাদে ও চা-বাগানে চলিয়া যাইতেছে। নামাল দেশে শত শত গিয়া দুই দশ টাকা আনিতেছে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের পাচক ও ভৃত্য ও দাসী বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছে। চোখে না দেখিলে দেশের এই দারিদ্র্য বিশ্বাস হইত না। মুখ দেখিয়া কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র, কে ভদ্র কে নহে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বাঙ্গালীর দেহ শীর্ণ ও দুর্বল; দক্ষিণ রাঢ় মেলেরিয়ায় জর্জর; কিন্তু বাঁকুড়ায় যেখানে মেলেরিয়া নাই বা অল্প, সেখানেও এইরূপ শীর্ণ ও দুর্বল দেহ যত দেখিতেছি এত যেন কোথাও দেখি নাই। যখন শুনিলাম বাজারে পাটশাগ ওজনে বিক্রি

হয়, তখন বুঝিলাম বাঁকুড়া দরিদ্রের দেশই বটে, নইলে অখাদ্য খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত না। যখন শুনিলাম বাজারে ঝিঙ্গা চারি আনা সের বিক্রি হইতেছে, তখন বুঝিলাম বাঁকুড়াবাসী বন্য গাছের চাষ করিতেও উদাসীন। কিন্তু যখন শুনিলাম বিলাতী আলুরও সেই দর, তখন বুঝিলাম বাঁকুড়া অজ্ঞানও বটে। যাঁহারা ভদ্রলোক, যাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে গণ্য, তাঁহাদের কান্তিহীন লাবণ্যবর্জিত মলিন মুখমণ্ডল, জ্যোতির্হীন চক্ষু, অবসন্ন গতি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মনে হইয়াছে, এমন কেন ?

গত জনসংখ্যানে প্রকাশ হইয়াছে, গত দশ বৎসরে বাঁকুড়ায় দশ জনের স্থানে নয় জন হইয়াছে। যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা ইহাতেই চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আরও ভয়ানক। লোকক্ষয় দশজনে এক নয়, দুই হইয়াছে। অভাগা বাঙ্গালী ব্যতীত, হিন্দু ব্যতীত, সব জাতি বাড়িতেছে, দশ বৎসরে অন্ততঃ এক জন বাড়ে। বাঁকুড়ায় বৃদ্ধি দূরে থাক, স্থিতিও নাই, হ্রাস হইয়াছে। স্বাভাবিক ক্রমে যেখানে এগার জন দেখিতাম, সেখানে নয় জন দেখিতেছি। বলকর, পুষ্টিকর, প্রাণকর, আয়ুষ্কর আহার পাইলে এ দশা ঘটিত কি ? প্রকৃতির একি নিষ্ঠুর লীলা ; জীবন ও জীবনোপায়ের সমন্বয়ের এ কি নির্মম ব্যবস্থা !

শুধু এই নহে। কার অভিশাপে বাঁকুড়া কুষ্ঠক্ষেত্র হইয়াছে ! দেশের অন্যত্র এই পাপরোগ আছে সত্য, কিন্তু ভারতের মধ্যে বাঁকুড়ায় অধিক কেন ! বাঁকুড়ায় ছয় হাজার গ্রাম, ছয়হাজার কুষ্ঠী গণা হইয়াছিল, কত গণা হয় নাই, কে জানে। দশ বার হাজারের কম হইবে কি ? কি কারণে প্রথম বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কে জানে। তার পর কত কাল ধরিয়া বংশানুক্রমে ও সংস্পর্শদোষে রোগের বীজ ব্যাপ্ত হইয়াছে। আমরা নাকি হিন্দু; শুচি-অশুচির বিচার আমরা যেমন জানি পৃথিবীর কেহই তেমন জানে না। হায় শাস্ত্র ! কে পড়ে, কে বা মানে। কোন্ শাস্ত্রে কুষ্ঠীর সংস্পর্শ নিষিদ্ধ হয় নাই ? কোন্ স্মৃতিতে, কোন্ আয়ুর্বেদে কুষ্ঠীবংশে বিবাহ বিহিত হইয়াছে ? মূর্খ, পুত্রস্নেহে পাগল ; কিন্তু জানে না কি ভয়ঙ্কর পাপের পরিণাম ভোগ করিতে পুত্র-পৌত্রাদিকে রাখিয়া যাইতেছে। ভদ্র ইতর কাহারও দৃক্‌পাত নাই : পথে ঘাটে, জলে ডাঙ্গায়, বাজারে দোকানে, নরসুন্দরের হাতে, রজকের বস্ত্রে, রোগের বীজ ব্যাপ্ত হইতেছে। মুন্‌সিপালিটির চিন্তা নাই, ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ডের কর্তব্য নাই, কাহারও এক কপর্দক ব্যয় নাই। মেলেরিয়া, কলেরা, বসন্ত দেখা দিলে ডাক্তার ছুটাছুটি করেন। কিন্তু কুষ্ঠরোগ নিত্যসহচর হইয়া বিনাবাধায় যথাতথা বিচরণ করিতেছে। ইহাতে একজনের প্রাণ নয়, দুই পাঁচজনের নয় ; বংশকে বংশ, দেশকে দেশ সমূলে উৎসন্ন হইতেছে ; কে দেখে, কে ভাবে ?

কেহ কেহ সুধাইতে পারেন, দেশের এই অবস্থার সহিত সারস্বত সমাজের কি সম্পর্ক আছে। কিন্তু যদি সরস্বতী জ্ঞানাধিদেবী বুদ্ধিশক্তি-স্বরূপিণী, তাঁহা হইলে এই বিতর্ক উঠিতে পারে না। সারস্বতসমাজ নইলে দেশের পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস, সমাজনীতি ও অর্থনীতি, ধর্ম ও কর্ম, আচার ও ব্যবহার, রোগ ও তাপ, বিদ্যা ও কলা, বার্তা ও বৃত্তি, কে চিন্তা করিবে ? সরকারী কর্মচারীর 'রিপোর্ট' পড়িয়া আমাদের কর্ম নির্বাহ হইবে কি ? স্থূলদর্শী মনে করেন, ধনে ও মানে, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বড় হইলেই তিনি ধন্য হইলেন। তিনি ভুলিয়া যান, তাঁহার ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হইলে, প্রতিবেশী অজ্ঞান ও নীচমনা দুর্জন হইলে ক্ষেত্রফল তাঁহাকে ও তাঁহার বংশকেও ভোগ করিতে হইবে। ধনমদ, তনুমদ, বিদ্যামদ, অধিকারমদ বুঝি ; কিন্তু ইহাও জানি স্বল্পতোয়ে সফরী ফর্‌ফর করে, অগাধজলসঞ্চারী রোহিতের প্রমত্ততা নাই।

শিক্ষা বিস্তার হইলে দেশের দুর্নীতি ও দুর্গতির কিছু উপশম হইবে। কিন্তু সুফলের আশা অধিক করিবেন না। কারণ, বর্তমান শিক্ষা ইংরেজী শিক্ষা। ইংলণ্ডের ইংরেজজাতির নিমিত্ত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা। ইহার নামেই, English Education এই নামেই প্রকাশ, ইহা আমাদের দেশব্যতিরিক্ত শিক্ষা, সমাজ-বিচ্ছিন্ন শিক্ষা। বিদেশীয় শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধির কৃত্রিম মার্জনা হইতে পারে, কিন্তু প্রয়োগকালে কৃত্রিম বুদ্ধি হত হয়। ইহার বহু উদাহরণ জানা আছে। আপনাদের

হৃদ্‌গত হইবে বলিয়া বাঁকুড়া শহর হইতে একটা দৃষ্টান্ত দিই। ঘনবসতি পল্লীর মধ্যে তড়াগ-নির্মাণ, অশিক্ষিত বাউরী ও বাগদী করে নাই। পূর্বকালের নয়, নূতন নির্মিত। যাঁহারা করাইয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন নহেন, নব্য সভ্য শিক্ষিত। এমন তড়াগ যাহাকে জলপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শহরের এক নরক-কুণ্ডের ন্যক্কার-জনক মল-নালীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে! এমন স্থানে তড়াগ যেখানে বর্ষাকালে পাড়ার মলমূত্র ধৌত হইয়া তড়াগের জল বৃদ্ধি করে! সেখানে তড়াগ নয়, 'তড়ার' (তটের) প্রয়োজন ছিল। সেখানে আরাম নির্মিত হইলে পল্লীর শোভা ও স্বাস্থ্য রক্ষিত হইত। যেখানে কদাচারের বাহুল্য, বীভৎস সংক্রামক রোগের প্রাবল্য, সেখানে জীবনরূপ জলের নিমিত্ত পুষ্করিণী নহে, কূপ প্রশস্ত, নলকূপ (tube well) নিরাপদ্। সরকার হইতে স্বাস্থ্যতত্ত্বপ্রচারক নিযুক্ত হইয়াছেন। যে দেশের শহরেই, বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ অগ্রগামী ভদ্রলোকের বাস নগরেই, এই শোচনীয় কাণ্ড স্বচ্ছন্দে সংঘটিত হইয়াছে, সে দেশের গ্রামে তাঁহার স্বাস্থ্যতত্ত্ব গুহাতে নিহিত হইবে। জল যে নারায়ণ, তিনি সরকারী কর্মচারী বলিয়া এ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না, কারণ মন্ত্রটি হিন্দু পুরাণের। তিনি ব্যাধি-জনক অণুজীবের বিভীষিকা দেখাইতে পারেন, কিন্তু তাহা বস্ত্রপটেই চিত্রিত থাকিবে, হৃদয়পট স্পর্শ করিবে না।

এখন আর-এক দিক্ দেখি। প্রথমে বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করি। বাঙ্গালা ভাষা মধুর, এত মধুর যে শুধু ভারতবাসীর নয়, পশ্চিমদেশীর কানেও মধুর বোধ হয়। কিন্তু বাঁকুড়ার ভাষা এরূপ নহে। যোজনান্তে ভাষা, সত্য বটে। কিন্তু বাঁকুড়ার ভাষা শ্রুতিকটু ও রূক্ষ। ইহার কারণ পূর্বে উদ্দেশ করিয়াছি। স্বভাব ও শিক্ষা অনুযায়ী মানুষের ভাষা হইয়া থাকে, স্বভাবে দেশের গুণ পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করে। অধীর হইলে শিষ্ট ও শান্তেরও ভাষা পরুষ হইয়া পড়ে। বাঁকুড়ার ভাষা, অধৈর্যের পরিচায়ক, প্রতিপদের দ্বিতীয় অক্ষরে বল-ন্যাস করিয়া ব্যক্ত হয়। এই কারণে রূক্ষ শোনায়। বাঙ্গালা ভাষায় বলন্যাস প্রায় নাই, প্রথম স্বর দীর্ঘ; বাঁকুড়ায় দ্বিতীয়স্বর দীর্ঘ ও উদাত্ত। একবার এক ভদ্রলোক আমার এক কথার উত্তরে, 'আছে-এ' বলিয়াছিলেন। তাঁহার উদাত্ত স্বরে আমি আশ্চর্য হইয়াছিলাম। পরে, বুঝিয়াছি, বাঁকুড়ার ভাষাই এই, ভদ্রলোকটি শিক্ষিত হইলেও দেশভাষা ভুলিতে পারেন নাই ফলে যে শব্দে একটি অক্ষর আছে, সে শব্দ উচ্চারণ করিতে বাঁকুড়াবাসীকে বেগ পাইতে হয়। সং ব-ন্ধ বাং বাঁধ, বাঁকুড়ায় বাঁ- - -দ হইয়া পূর্ববঙ্গের বা- - -ত (ভাত), এবং কাটোয়ার পা- - -র (পাড়) স্মরণ করাইয়া দেয়।

গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় গুরু পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বের 'বুড়া খুড়া' এখন 'বুড়ো খুড়ো', 'চিড়া পিঠা' এখন 'চিঁড়ে পিঠে', 'রান্ধ্যা বাড়্যা' এখন 'রেঁধে বেড়ে' হইয়াছে। পূর্বের 'আইছি', 'খায়া', 'পান্য', 'আস্য' আর নাই; 'এসেছি', 'খেয়ে', 'পেলে', 'এস' হইয়া গিয়াছে। লিখিত ভাষায় এই এই রূপ প্রবেশ করিতেছে। কারণ দীর্ঘ-আকার, হ্রস্ব ওকার ও একারে পরিণত হইয়া ভাষার মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। বাঁকুড়া বঙ্গের প্রান্তে বলিয়া ভাষা-সংস্কারের সুযোগ পায় নাই।

কিন্তু এই কারণেই বাঁকুড়ার শব্দ শাব্দিকের নিকট বহুমূল্য। দক্ষিণ রাঢ়ের ভাষা, বাঙ্গালা ভাষা নামে খ্যাত। বাঁকুড়া সে ভাষার পূর্বরূপ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বহু পুরাতন শব্দ যাহা অল্পদর্শীর দৃষ্টিতে লুপ্ত বোধ হইয়াছে, বাঁকুড়া সেসব জলজীয়ন্ত। বহুকাল পূর্বে বাঙ্গালা ও ওড়িয়া ভাষা, এক ভাষার দুই ভাষা ছিল, বাঁকুড়া সেই প্রাচীন সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন রূপ দ্বারা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় সুগম হয়। বাঙ্গালা 'খুঁটা' শব্দের মূলনির্ণয়ে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। এখানে যেমন শুনিলাম 'খুনি' অমনই বুঝিলাম সং 'কূট' নয়, 'কুণিকা' নয়, সং 'স্থূণা' হইতে 'খুঁটা', 'খুঁটি'। বাং ও হিং 'গোড়' কত প্রচলিত শব্দ। এখানে 'ভোড়', আসামে 'ভোরি', এবং বাং 'ঘোড় তোলা' (জুতা), সেই এক সং 'গোহির' হইতে আসিয়াছে। ঢাকায় কলা-গাছের

থোড়ের নাম 'ভারালি', মূলে সেই শব্দ। এমন কি এই থোড় ও ধানগাছের থোড় সেই গোহির হওয়া আশ্চর্য নয়। কলাগাছের 'থোড়' এখানে 'সাঁজা', ওড়িয়াতে 'মঞ্জা'; এখানে 'মারগ', ওড়িয়াতে 'মারগ্', বাঙ্গালায় মাঙ্গা; এখানে 'ভুঁটা,', ওড়িয়াতে 'অণ্টা', অন্যত্র 'কোমর' বলে। স্ত্রীলোকের শাড়ীকে এখানে বলে 'লইতা', সং নেত্র বাং নেত বলিয়া মনে হয়। কে এই-সকল শব্দ লিপিবদ্ধ করিয়া চিরলোপ হইতে রক্ষা করিবে? কে বাঙ্গালা কোষ সঙ্কলনে সাহায্য করিবে!

যিনি প্রাচীন সাহিত্য চর্চা করিতে চান, তাঁহারও অনেক কাজ আছে। এই বাঁকুড়া হইতে রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ এবং বিষ্ণুপুর হইতে চণ্ডীদাসী শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইয়াছে! শূন্যপুরাণে ঠিক বাঁকুড়ার ভাষা নাই। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেও 'অনন্ত' নাম থাকাতে তাহার শুদ্ধতায় সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু দুই-ই অমূল্য। এইরূপ অমূল্য পুথী আরও কত আছে, কে খুজিয়া দেখিয়াছে? শুনিতেছি, ইন্দাসের অন্তর্গত সুখসায়রের সীতারাম দাসের ধর্মপুরাণ এখনও হস্তান্তরিত হয় নাই। সীতারাম দাস তিনশত বৎসর পূর্বে ছিলেন। ঘনরামের কি মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সীতারামের পুথীতে অপূর্বকথন নিশ্চয়ই আছে। কে তাহা উদ্ধার করিবে?

বাঁকুড়া হুগলী মেদিনীপুর বর্দ্ধমান জেলায় নিরঞ্জন ধর্মের বহু মন্দির আছে। কোথায় কত আছে, জানিতে পারিলে উহার আদি উৎপত্তি নির্ণয়ে সুবিধা হইত। ধর্মঠাকুরের সেবক, ব্রাহ্মণেতর জাতি হইয়া থাকে; কদাচিৎ ব্রাহ্মণকেও পূজা করিতে দেখি। ওড়িষ্যায় বহু বাউরী শূন্যবাদী। এই 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম' আমাদের কত লোকের ভয় ও ভাবনা, শরণ ও আশ্রয় হইয়া আছেন, আমরা কদাচিৎ স্মরণ করি। রূপনারায়ণ, স্বরূপ-নারায়ণ, বাঁকুড়া রায়, পঞ্চানন, কাঁকড়াবিছা, বুড়াধর্ম, প্রভৃতি বিগ্রহের নাম ও ধাম একত্র করিতে পারিলেও ধর্মের ব্যাপ্তি বুঝিতে পারা যায়। ধর্মের গাজন বুঝিতে পারি; কিন্তু শিবের ও শীতলার গাজনের হেতু কি? আমরা বাঁকুড়ায় মনসা ও ভাদু পূজার ঘটা দেখিতেছি, কিন্তু কুদ্‌রাশিনী ও অন্যান্য গ্রামদেবীর কথা কে শোনাইবে?

বাঁকুড়া জেলায় ছাতনা গ্রামে বাসলী দেবী প্রসিদ্ধ আছেন। কেহ কেহ বলেন, অমর কবি চণ্ডীদাস এই বাসলীর পূজারী ছিলেন। লোকে চণ্ডীদাসের ভিটা, রামী রজকিনীর ঘাট দেখাইয়া দেয় এবং তাহার ভ্রাতা দেবীদাসের নাম স্মরণ করে। কেহ কেহ মন্দিরগাত্রে লিখিত ১৪৭৬ শক (ইং ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) কবির আবির্ভাব-কাল বলে। ইহাতে কিন্তু চণ্ডীদাস সাড়ে তিন শত বৎসরের হইয়া পড়েন। এই কাল, মন্দির নির্মাণের বা সংস্কারের কাল। পূর্বে অপর মন্দির ছিল না, কে বলিতে পারে। কবি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু এখনও অনেক সন্দেহ আছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সন্দেহ করেন, চণ্ডীদাস নামে দুই কবি ছিলেন। আমার বিবেচনায় বাসলীসেবক বটু চণ্ডীদাস একাধিক হওয়া প্রায় অসম্ভব। নান্নুরের মাঠে ও ছাতনার গ্রামে কবির কিছু কাল কাটিয়া থাকিবে। বহু কবি সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। বীরভূমি ও পুরী, দুই স্থানই জয়দেবকে অধিকাব করিতে চায়।

ছাতনার প্রাচীন নাম বাসলীনগর। বহুকালাবধি এখানে সামন্তভূপগণের আবাস আছে। ইহাঁরা ছত্রী। তাই নাম ছত্রীস্থান বা ছাতনা, যেমন রাজপুতস্থান হইতে রাজপুতনা। কিম্বদন্তী এই, এখানে প্রথমে ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। সে বংশের শেষ রাজা বাসলীর ভক্ত হইতে পারেন নাই। ইহাতে দেবীর কোপ জন্মে, ব্রাহ্মণবংশ ধ্বংস হয়, এবং বর্তমান ছত্রীরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। আমার বোধ হয় এই কিম্বদন্তীর মূলে সত্য আছে। বাসলীদেবী চণ্ডী নামে পূজিতা হইলেও পণ্ডিতেরা অনুমান করেন তিনি বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রেশ্বরী। অতএব সেকালে ব্রাহ্মণের অভক্তি আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। হয়ত বাসলী সামন্তজাতির কুলদেবী ছিলেন, এবং পাঁচ শত বৎসর পূর্বে মন্দিরে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই অনুমান সত্য হইলে বটু চণ্ডীদাস স্বচ্ছন্দে ছাতনায় আসিতে পারেন।

ছাতনা দূরে থাক, বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি জানি না। ইহার পূর্ব নাম বাকুণ্ডা না হইলে মনে করিতাম, ধর্ম-ঠাকুর বঙ্কুরায় বা বাঁকারায় হইতে বাঁকুড়া। এখানে এখন ধর্মঠাকুর নাই। পূর্বে ছিলেন কি না, কে জানে। পাশের দ্বারকেশ্বর নদের নাম ধরুন। মহাদেবের নামে ঈশ্বর থাকে? কিন্তু দ্বারকা বা দ্বারিকা কোথায়? ভবিষ্যপুরাণে নাম, দারিকেশী। দারি, দারিকা অর্থে সন্ধি, বিদীর্ণ স্থান (a fissure); যে নদী পর্বত বিদীর্ণ হইয়া বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারকেশ্বর নদের আরম্ভ-স্থানে পর্বত নাই। দারী অর্থে বারবনিতাও আছে; এই অর্থ ধরিলে বারবনিতার কেশ-সাদৃশ্যে নদীর নাম। মূল ধরিতে না পারিলে বানান শুদ্ধ হয় না। 'দ্বা' লিখিব, কি 'দা' লিখিব, বুঝিতে পারি না। অপর নদী, গন্ধেশ্বরী। ইহার সহিত গন্ধবণিকের সম্বন্ধ আছে কি? একতেশ্বর ঠাকুর শিব বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর নামে শিব বুঝি। কিন্তু একতার ঈশ্বর শিব ছিলেন না, ছিলেন বুদ্ধ। আদিতে একতেশ্বর বৌদ্ধমূর্তি কি?

যাঁহারা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত হইতে চান তাঁহাদেরও ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। এখানে এমন অনেক গাছ আছে, যেসব নিম্ন বঙ্গে, দক্ষিণরাঢ়ে নাই। গুজরাটের বনে কবিকঙ্কণ অনেক গাছ দেখিয়াছিলেন, সেসব দামুন্যায় নাই, এখানে আছে। নিম্ন বঙ্গের পাখী ও মাছ এখানে সব নাই; তেমনই এখানকার কিরাত সর্প (ডোমনা চিতী) সেখানে কদাচিৎ দেখি।

একথা সবাই জানি, বাঁকুড়া ও নামাল দেশ এক নয়। কিন্তু জানি না, প্রত্যেকের কি গুণে কি অন্তর ঘটিয়াছে। কবি গাইয়াছেন বাংলার মাটি বাংলার জল বাংলার বায়ু পুণ্য হউক; আমরাও গাই বাংলার বায়ু পুণ্য হউক। এখানকার বায়ু স্বচ্ছ ও শুষ্ক, এমন শুষ্ক যে অগ্রহায়ণ পৌষ মাসের রাত্রির আকাশে একটি তারাও দীপ্তিহীন হয় না। স্বচ্ছ ও শুষ্ক বলিয়া এখানকার মানুষের বর্ণ মলিন। জন্মকালে যে গৌরবর্ণ, অন্যত্র যে গৌর-বর্ণ, রবিকরপ্রভাবে এখানে সে কৃষ্ণ। এই মলিনত্বের হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ফাল্গুন হইতে আষাঢ় মাস বৃদ্ধির, এবং বর্ষা হইতে শীতান্ত হ্রাসের কাল। বর্ষাকালের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এবং দক্ষিণায়নে বায়ু আর্দ্র ও রবিকর মৃদু হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালের পূর্বাহ্ণে যে রণকুয়াসা (এখানে বলে ধুন্ধু) দেখি, আবহের এই রজোলক্ষণ কে বর্ণনা করিবে? মনে করিতাম নদীবহুল পূর্ববঙ্গেই ঘূর্ণিঝড় সম্ভবে। কিন্তু এই বৎসর রেল-ষ্টেশনের নিকট হইতে যে ঝড় বহিয়াছিল তাহার শক্তি অল্প ছিল না। আর যে রক্তধূলি অপরাহ্ণে ঘূর্ণিত হইতে হইতে নৈঋত কোণ হইতে ঈশান দিকে চলিয়া যায়, যাহার ঘনতায় কোলের মানুষ চিনিতে পারা যায় না, তাহার উৎপত্তি কোথায়, পরিণাম কোথায়? তিন বৎসরে তিনবার দেখিলাম। এ বৎসর রাত্রি ৯।১০টার সময় দেখা দিয়াছিল। ১৩২৮ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে যে ধূলিবাত্যা বাঁকুড়ায় অপরাহ্ণ ৪টার সময় দেখা গিয়াছিল, রাণীগঞ্জ ও বর্দ্ধমান দিয়া গিয়া কলিকাতায় সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়াছিল। সে কি এক বাত্যা কি পৃথক্ বাত্যা একদা উত্থিত হইয়াছিল?

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এসব বুঝি বিদ্যার নিমিত্ত বিদ্যাচর্চা। আমি এই বুলি মানি না। বিনা প্রয়োজনে কোন কর্ম হয় না, বিজ্ঞানের এষণাও না। এষণায় যে আনন্দ এ স্থলে সেটির লাভই প্রয়োজন। কিন্তু পরে সে এষণা হইতে লৌকিক হিতও হইয়া থাকে। যে কৃষি হইতে আমাদের জীবিকা হইতেছে, এক প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন সে কৃষি এই গ্রীষ্মদেশে উদ্যানকর্মবিশেষ। বলা বাহুল্য উদ্যানকর্ম ও কৃষিকর্ম এক নহে। ক্ষেত্র ও বীজের যোগে শস্যের উৎপত্তি। উত্তম বীজ চাই, উত্তম ক্ষেত্রও চাই, নইলে শস্য উত্তম জন্মে না। কিন্তু ক্ষেত্র বলিতে কেবল মৃত্তিকা নহে; যে দেশে ক্ষেত্র, সে দেশের ধর্ম ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকে। বাঁকুড়ায় শীত গ্রীষ্ম প্রবল, বায়ু শুষ্ক; এই পর্যন্ত জানি, কিন্তু ক্ষেত্রের এই এই ধর্মের বশে কোন্ শস্যের কি ইষ্টানিষ্ট হয়, তাহা জানা আছে কি? মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিতে পারি, করাও হইয়া থাকে। কিন্তু আবহবিচার কোথায় হইতেছে? দুঃখ হয়, আবহ ও কৃষির, আবহ ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিচার উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বাঁকুড়ায় আবহলক্ষণ জানিবারও উপায় নাই। এদেশে অন্ততঃ আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব

হইতে যে বুদ্ধিমান ছিল; এখন এই বিজ্ঞানের দিনে, তাহাই দুই চারি স্থানে স্থাপিত আছে। পূর্বে ধ্বজারোপণ দ্বারা প্রবহদিক্ নিরূপিত হইত। এখন তাহাও দেখিতে পাই না। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, পুরুলিয়াতে আবহলক্ষণ লিখিত হইতেছে, বাঁকুড়াতেও হইত, কিন্তু স্বল্পব্যয় বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গভর্মেণ্ট্ আবহলিখন উঠাইয়া দিয়াছেন, বাঁকুড়া হাঁ না কিছুই বলে নাই। সারস্বত সমাজ থাকিলে উঠিয়া যাইত কি? মনে রাখিবেন, বহু বৎসরের এবং বহুস্থানের আবহলক্ষণ না পাইলে বিচার চলিতে পারে না।

বাঁকুড়ার ভূমি প্রাচীন, মধ্য ও পূর্ববঙ্গের ন্যায় আধুনিক নহে। ভূবিদ্যার ভাষায় বাঁকুড়া তৃতীয় যুগের, স্থানে স্থানে দ্বিতীয় যুগেরও চিহ্ন আছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারত এইরূপ প্রাচীন। কত কাল গিয়াছে, কত বৃষ্টি বাত্যা বহিয়া গিয়াছে, কত নূতন নদীনালার সৃষ্টি হইয়াছে, কত পুরাতন পাহাড় সমভূমি হইয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য বোধ হয়, বাঁকুড়া শহরের পশ্চিমভাগ দিয়া বন্যা বহিয়া যাইত, অনতিদূরে কোচপাথরের পাহাড় ছিল, তাহার খণ্ডসকল এখানে ওখানে, কোথাও বা রাশি রাশি, সঞ্চিত রহিয়াছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে পাথর্যা কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বকালে পাথর্যা কয়লা জানা ছিল না, কিন্তু সিংহভূমির খনিজ আকর সব অজানা ছিল না। লোহার জাতি আকর হইতে লৌহ পৃথক্ করিত; টাটা কোম্পানীর লৌহ আবিষ্কার নূতন কথা নহে। সিংহভূমি, তুঙ্গভূমি, শেখর-ভূমি, ধবলভূমি, বীরভূমি, বরাহভূমি প্রভৃতি নাম হইতে বুঝি এই স্থান দিয়া আর্যগণের যাতায়াত ছিল। তাঁহারা কলাকর্ম করিতেন না, কিন্তু ধাতু ও রত্ন পরীক্ষা করিতেন। সেকালে যাহা ছিল, এই নব্যশিক্ষার দিনে তাহাও যে দেখিতে পাই না।

বাঁকুড়ায় একটা বড় কলেজ, তিন চারিটা ইস্কুল আছে। এইসবে অন্ততঃ ৭০।৭৫ জন শিক্ষক আছেন। শিক্ষিত রাজকর্মচারী আছেন, শতাধিক উকীল আছেন। শতাধিক দৈনিক সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, অন্ততঃ দুইশত পাঠক আছেন। অথচ সাধারণ গ্রন্থশালা নাই! সঙ্গীত-চর্চা কিছু আছে, কিন্তু কাব্য ও পুরাণ ও ইতিহাস পাঠের প্রয়াস কই? বহু নগরে গ্রন্থশালা নাই, কিন্তু সেটা উপস্থিত প্রশ্নের উত্তর হইতে পারে না। সাহিত্যচর্চা ব্যতীত কেমন করিয়া চিত্ত সরস থাকিতে পারে, কেমন করিয়া মানসিক পুষ্টি লাভ হইতে পারে? আমরা ভাত খাইয়া বাঁচিয়া নাই; বাঁচিয়া আছি আমাদের সাহিত্যের প্রভাবে। কে আমাদের ধর্ম ও নীতি, আচার ও ব্যবহার বাঁধিয়া দিয়াছে? কে হতাশের সান্ত্বনা, উন্মার্গগামীর সংযম, তাপক্লিষ্টের শান্তি, দুঃখার্তের আশা, সঞ্চার করে? নিরক্ষর পুথী পড়িতে পারে না, কিন্তু আমাদের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের রস হইতে বঞ্চিত নহে। মানবজাতি মাত্রেই সাহিত্যের রসে জীবিত আছে। যখনই সে মানব হইয়া জন্মিয়াছে, তখনই তাহার অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের ভাবনাও জুটিয়াছে। এই যে স্মৃতি, সে স্মৃতি স্ব স্ব চরিতস্মৃতি নহে, জাতি-চরিত-স্মৃতি। বাঙ্গালীর জাতি-স্মৃতি বাঙ্গালীর নিত্য ধর্ম। ইতর প্রাণীর অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের চিন্তা নাই। তাহারা এক সহজ স্মৃতিবশে চলে। আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়া সহজস্মৃতি ব্যতীত আর-এক স্মৃতির বশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। সে স্মৃতি, জাতি-স্মৃতি। বাঙ্গালীর জাতিস্মৃতি ইংরেজের নাই, ইংরেজের স্মৃতি বাঙ্গালীর নাই। এইরূপ, হিন্দুস্থানী মারোআড়ী মরাঠী প্রভৃতির স্মৃতি বাঙ্গালীর নয়। যত জাতি তত স্মৃতি। কিংবা স্মৃতি দ্বারাই জাতিভেদ ঘটে। সাহিত্য আর কিছু নয়, জাতিস্মৃতির বাহ্যপ্রকাশ। আমরা মানব, কাজেই মানবধর্ম্মস্মৃতি আমরা পাইয়াছি; ভারতীয় বলিয়া ভারতীয় স্মৃতি এবং বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গালী-স্মৃতি পাইয়াছি। লৌকিক আচারে, সামাজিক ব্যবহারে সে স্মৃতি আমাদের পথপ্রদর্শক।

ভারতীয়স্মৃতি, আর্যস্মৃতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা না জানিলে নয়। সুখের বিষয়, বহু সংস্কৃতগ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। আমরা বাঙ্গালাভাষা দ্বারা সংস্কৃতসাহিত্যের মর্ম অবগত হইতে পারি। কিন্তু এতদ্দ্বারা সংস্কৃতসাহিত্যের রসগ্রহণ সম্যক্ হইতে পারে না। এই হেতু সারস্বতসমাজের

গ্রন্থশালায় সংস্কৃত গ্রন্থও রাখিতে হইবে। অনেকে ইংরেজী জানেন, ইংরেজী সাহিত্য বিপুল। এই এক সাহিত্য দ্বারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান সাহিত্যের সংবাদ লইতে পারি। অতএব উত্তম উত্তম ইংরেজী গ্রন্থও চাই।

কিন্তু গ্রন্থশালায় গ্রন্থ পুঞ্জীভূত হইলেই সকলের ভোগে আসে না। আপণে রত্নের প্রকাশ দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারা যায় না। যাহাতে সে রত্ন সাধারণের ভোগে আসে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গৃহপতি ও গৃহপত্নী পাঠ করুন, না করুন, বাড়ীতে বাড়ীতে গ্রন্থ পাঠাইয়া তাহাঁদিকে পাঠে উদ্‌বুদ্ধ করিতে হইবে। গ্রন্থশালার এক অঙ্গ চলনীয় না হইলে সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না।

সারস্বতসমাজ নিজের জ্ঞানৈষণা চরিতার্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। দেশে জ্ঞানবিস্তার না হইলে সমাজ তিষ্ঠিতে পারিবে না। লক্ষপতি লক্ষমুদ্রার উপর উপবেশন করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে দেশের হিতাহিত কিছুই সাধিত হয় না। বিধাতার এমনই বিধান, লব্ধ ফল দশজনে বাঁটিয়া না খাইলে আনন্দ হয় না। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং,—তাহারা তুষ্ট হইলে 'আমি'ও তুষ্ট।

পাঠশালা বসাইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে পাঠ পড়াইতে পারেন; কিন্তু যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত, যুবা ও প্রৌঢ়, তাহারা কি অধ্যয়নশীল ভবিষ্যদ্‌-বংশের আশায় বসিয়া থাকিবে? তাহাদের নিমিত্ত কি ব্যবস্থা আছে? পাঠশালা ও ইস্কুল বসুক, টোল ও কলেজ আরও হউক; ইংরেজী বিদ্যা ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রসারলাভ করুক, সারস্বতসমাজও কার্য করিতে থাকুন। মহানুভব সদয়ব্যবহার কালেক্‌টর সাহেব বাঁকুড়ায় লক্ষ্মীর আবির্ভাব নিমিত্ত যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহার যত্ন সফল হউক। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "কৃষি ও হিতকরী সমিতি" কার্যকরী হউক। কারণ নিত্য অনশনে সরস্বতীর পূজা হইতে পারে না, রোগক্লিষ্টের চিন্তার মধ্যে সরস্বতীর ধ্যান হয় না। একথাও সত্য, সরস্বতীর কৃপা নইলে লক্ষ্মী, অলক্ষ্মী হইয়া দাঁড়ান। সেদিন এক বিজ্ঞাপনে পড়িতেছিলাম, "বাঁকুড়া সম্মিলনী" বাঁকুড়াবাসীর পরস্পর সৌহার্দ কামনা করেন। সৌহার্দ কেন নাই, এবং কি উপায়ে তাহা আসিতে পারে, তাহার উল্লেখ পাই নাই। আমাদের কাম্যের অন্ত নাই; কিন্তু কামনার দৃঢ়তা কই? পরস্পর অবিশ্বাসেই বাঙ্গালী মজিয়াছে, অবিশ্বাসের কাজও করিয়াছে। কিন্তু কেন? ধর্ম হইতে কর্ম, এবং কর্ম হইতে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, দুইটা পৃথক্ করাতে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে।

"সম্মিলনীর" বিজ্ঞাপন পড়িয়া দুঃখও হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তির সম্মিলনী এখনও গ্রামীণতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এখানকার লোকে আমায় বিদেশী বলে। শুনিয়া প্রথম প্রথম হাসি পাইত। কিন্তু পরে বুঝিলাম, "বাঁকুড়া" বলিতে ইহারা বাজারটুকু মাত্র বুঝে। পাড়ার নাম অবশ্য থাকিবে, কিন্তু পাড়া বড় হইয়া যে গ্রাম, এবং গ্রাম বড় হইয়া যে জেলা, সাধারণ জনগণ ততদূর আসে নাই। দুঃখ হইতেছে, "সম্মিলনী"ও জেলার বাহিরে যাইতে পারেন নাই। গ্রামীণতার গুণ আছে। কিন্তু যখন প্রধানগুণ, পরস্পরপ্রীতি নাই, তখন দোষের ভাগই প্রকট হইয়া উঠে। বাঁকুড়াবাসী বাঁকুড়াবাসীকেই বিশ্বাস করে কই? গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বিশ্বাস কই? জীববিদ্যার একটা স্থূল কথা এই যে, উৎপীড়িত হইয়া যে জীবকে বাঁচিতে হয়, সে আত্মরক্ষার্থে প্রবঞ্চনাপরায়ণ হয়। মনে হয়, বাঁকুড়া বহু উৎপীড়িত হইয়াছে, বহুবার ঠকিয়াছে! ফলে এখন শঠে শাঠ্য সমাচরণ করিতেছে।

পূর্বে আভাসে বলিয়াছি, কেবল কৃষি দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। কেবল কৃষক দ্বারা সমাজও রক্ষা পায় না। কারু চাই, কার্মিক চাই, ব্যাপারী চাই। আশ্চর্য এই, এই বাঁকুড়ায় যেখানে নাকি দুর্ভিক্ষ নিত্যসঙ্গী, সেখানে অন্য জেলা হইতে, এমন কি বিহার হইতে, কারু ও কার্মিক আনাইতে হইতেছে! বঙ্গের সর্বত্র কারু ও কার্মিক অ-শিক্ষিত (untrained)। তদুপরি অসত্যবাদিতা, শঠতা, সময়-লঙ্ঘন, অবিনীত ব্যবহার জুটিয়া ইহাদের এবং দেশের কি অনিষ্ট হইতেছে, কিসে প্রতিকার হইবে? কলিকাতায় মারোআড়ীর স্থিতি ও প্রতিপত্তি বুঝিতে পারি। এই বাঁকুড়া গ্রামতুল্য; এখানে মারোআড়ী গায়ের জোরে ঢোকে নাই,

ব্যাপার-বুদ্ধিবলে ক্ষুদ্র স্থানেও ধনসঞ্চয় করিতেছে। কচ্ছী ঠিকাদার যোগ্য বলিয়াই এই শহরে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে। মারোআড়ী ও কচ্ছী সাধু নহে; কিন্তু ব্যাপার-সাধুতা নিশ্চয়ই আছে। বাজারে দেখি, দোকানী দোকান পাতিয়াছে, কেনা-বেচা চলিতেছে; আর উদ্ধত ব্যবহারে অভ্যস্ত বাঁকুড়ারই গ্রাহকের মুখে শুনিয়াছি, কেনা দায়। দর চড়া বলিয়া নহে, অশিষ্ট ব্যবহারে গ্রাহকের মনোবেদনা। মিষ্টি মুখের কি গুণ, দোকানীর তাহা জানা নাই।

আমার বিশ্বাস, অশিক্ষিত অশিষ্ট জনগণের ব্যবহারে আমরা যে ক্ষুব্ধ, কখনও বা ক্রুদ্ধ হই, তাহা আমাদেরই ব্যবহারের প্রতিবিম্ব। কারণ তাঁহাদের শিক্ষাদাতা আমরাই। আমাদের রেড়ো ব্যবহার বঙ্গের সর্বত্র ধিক্‌কৃত। তথাপি, স্বভাব মাথায় চড়িয়া বসিয়া আছে। কারণ বিদ্যা-শিক্ষা আর বিনয়-শিক্ষা এক নয়।

বঙ্গের এক এক জেলায় মামলা-মকদ্দমা বেশী। সেখানকার লোক হুঁদিয়া, অর্থাৎ দ্বন্দ্বপ্রিয়। পূর্বকাল হইলে তাহারা মারা-মারি, হানা-হানি করিত। অত্যাচারিত হইত বলিয়া তাহারা আত্মরক্ষার্থে হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই যে পূর্বস্বভাব, একালে ব্যক্ত হইবার সে উপায় নাই। এক উপায়, ক্ষুদ্র উপায় আছে, আদালতে মামলা করা। আমার যেখানে জন্ম, সেখানকার লোক মামলা-বাজ বলিয়া বিখ্যাত। ক্ষেত্রবিশেষে কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যও আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় হুঁদিয়া ছিলেন, তিনি দয়ারও সাগর ছিলেন। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের অমায়িকতার অবধি ছিল না। বাঁকুড়ায় নাকি মকদ্দমা কম; কিন্তু দয়া-দাক্ষিণ্য বেশী কি?

চিত্ত সরস না হইলে এগুণ সহজে আসে না। সাহিত্যরস একমাত্র রস যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা আসিতে পারে। সৎসাহিত্য হইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যদি দোকানের দোকানীকে, বাজারের মুদীকে, হাটের পসারীকে দিবাকর্মের অবসানে রামায়ণ পড়াইতে পারেন, যদি গ্রামে গ্রামে ওড়িষ্যার ভাগবতঘরের তুল্য পুরাণঘর করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশে আত্মজ্ঞান-প্রচারের সূত্রপাত হইবে। ওড়িষ্যায় এমন গ্রাম নাই, যে গ্রামে ভাগবতঘর নাই। সেখানে সন্ধ্যার পর পাড়ার ও গ্রামের শ্রোতা উপস্থিত হয়, এক পাঠক ওড়িয়া ভাগবত পাঠ করেন। ফলে নিরক্ষর বাউরীর মুখে ভাগবতের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলাদেশেও এই রীতি ছিল, রামায়ণমহাভারত পাঠ এখন বন্ধ হইয়াছে। আরও ছিল, পুণ্যবানের গৃহে পুরাণপাঠ ও কথকতা, ধনবানের গৃহে পৌরাণিক যাত্রা গান। সে-সব পুনঃপ্রচলন কে করিবে?

আমাদের শুভ এই, দেশের মানুষ এখনও, এই দুর্দিনেও, আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। ইংরেজী-শিক্ষিত জ্ঞানে বাড়িয়াছেন, কিন্তু রসে বঞ্চিত হইয়াছেন, দেশের আমোদ-আহ্লাদ সম্ভোগ করিবার শক্তি হারাইয়াছেন। ইঁহাদের তুল্য দুঃখী আর কে আছে? শিক্ষার এ কি পরিণাম! বাঁকুড়ায় বারমাসে তের পার্বণ ছাড়া কত 'পরব' আছে, কত কুটুম্বিতা কত সমাজব্যবহার আছে, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিয়াছি, কারু ও কার্মিক, যাহাদের দিন-বেতন একমাত্র সম্বল, তাহারাও দিনিকা অগ্রাহ্য করিয়া পরবে মত্ত হয়, পাঁচ ক্রোশ দূরে ভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, যাত্রাগান পাইলে ত কথাই নাই। এই রসবোধ যতদিন আছে, ততদিন তাহারা মানুষ আছে, তাহাদিগকে তুলিয়া লওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আত্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান চাই, একের অভাবে অন্য পঙ্গু হইয়া পড়ে। কি কাল পড়িয়াছে, তাহা সবাই জানে; কিন্তু কালোচিত ব্যবস্থা কি হইতে পারে, তাহা সকলে জানে না। এবিষয় ভাবিবার চিন্তিবার লোক চাই। তেমনই দেশের লোক দেশে আছে বটে, কিন্তু দেশ চেনে না। চিনাইবার লোক চাই। অর্থাৎ প্রদেষ্টা আবশ্যক। নৈশবিদ্যালয় বসুক। লিখিতে পড়িতে শিখিলে জ্ঞানমন্দিরের কুঞ্চিকা করতলগত হয়; কিন্তু মন্দির দূরবর্ত্তী হইলে, বিগ্রহ চক্ষুর অন্তরালে থাকিলে অপ্রয়োগহেতু সে কুঞ্চিকা মলাবৃত হইয়া অল্পে অল্পে অদৃশ্য হয়। অতএব বিদ্যালয়ের যোগান্ চাই; সে যোগান্ পর্যটকপ্রদেষ্টার কর্ম।

আমি আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি শঙ্কা করিতেছি। কিন্তু আশা করি, সারস্বত সমাজের কর্ম্মক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ, তাহার ক্ষীণ আভাস দিতে পারিয়াছি। অবশ্য এমন ভাবিবেন না যে এই সমাজ একদা বা অচিরে সমুদয় কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কত কি করিবার আছে, দেখিবার আছে, ভাবিবার আছে, তাহারই গোটা কয়েক উল্লেখ করিলাম। অধিকারভেদে কর্ম্মের ভেদ অবশ্য হইবে। সবাই ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দার্শনিক হইতে পারেন না। যাঁহার যে কর্ম্মে রতি, তিনি সে কর্ম্ম করিবেন। কাজেই সমাজ বা সমিতির প্রয়োজন। যে যে কর্ম্মের আভাস দিলাম, তাহা সারস্বত সমাজ করুন কিংবা অন্য নামে কেহ করুন করিতেই হইবে, কায়েন মনসা বাচা করিতেই হইবে, আজি করুন আর কালি করুন। শুধু বাঁকুড়ায় নয়, বঙ্গের, ভারতের, নগরে নগরে এক এক দল সুধী চাই। তাঁহারা লোকমত চালনা করিতে থাকিবেন। মাসিকপত্র বা দৈনিকপত্র কয়জন পড়েন, কয়জনই বা তাহা হইতে প্রেরণা পাইয়া কর্ম্মে উদ্যুক্ত হইতে পারেন?

অতএব এই সমাজের সহিত "বাঁকুড়া সম্মিলনী" কিংবা "কৃষি ও হিতকরী সমিতির" সীমা-বিবাদ থাকিতে পারে না। যদি এই দুই সমিতি একাএকা কিংবা উভয়ে দেশে আত্মজ্ঞান, কালজ্ঞান ও দেশজ্ঞান প্রচার করিতে স্বীকৃত হন, সারস্বতসমাজের আবশ্যকতা থাকিবে না। সারস্বত সমাজের বয়স এখনও একবৎসর হয় নাই; উঠিয়া গেলে কাহারও মনঃকষ্ট হইবে না। কিন্তু মনে রাখিবেন, মানবসমাজের অন্যান্য অঙ্গ ত্যাগ করিয়া এক অঙ্গ পুষ্টির প্রয়াসী হইলে একাঙ্গী বাত সঞ্চারের আশঙ্কা আছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য

সামাজিক আয় ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা দরকার।

প্রথমটি আগেই বলা হয়েছে;—যে-কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সামাজিক আয় থেকে কি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্ট হবে তা সমাজের লোকদের মধ্যে সেটি কি-ভাবে বণ্টন করা হয় তার উপর নির্ভর করে। সামাজিক আয়কে যদি মাত্রায় বিভাগ করা হয় তা হ'লে সমাজের লোকেরা নানান অনুপাতে সামাজিক আয়ের ভাগ পেলে প্রত্যেকের অংশকে মাত্রায় প্রকাশ করা যায়। যথা, রাম-বাবু পেলেন বাৎসরিক দুশ মাত্রা ভোগ্য; শ্যাম-বাবু পাঁচশ মাত্রা, রামধন পঞ্চাশ মাত্রা, জন্‌সন্ পঞ্চাশ হাজার মাত্রা, ইত্যাদি। অবশ্য সত্যকার জগতে সব-কিছুই টাকায় প্রকাশ করা হয়। এখন বিভিন্ন লোকে যে সামাজিক আয়ের অংশ উপভোগ করছে, এটা অন্য দিক্ থেকে দেখ্‌লে দেখা যায় যে সামাজিক আয় নানা-প্রকার ব্যবহারে লাগ্‌ছে। যথা, কেউ চাল অথবা আলুর সাহায্যে দেহ পোষণ করছে আর কেউ তার থেকে হুইস্‌কি তৈরী করে' দেহের সর্ব্বনাশ করছে। কোথাও সামাজিক আয়ের অংশ বেশী মাত্রায় পাওয়ার ফলে কেউ অতিভোজন করে' জীবনপাত করছে, আর অন্য কোথাও আর-কেউ অল্প পাওয়ার ফলে না-খেয়ে মারা যাচ্ছে।

আমাদের নিয়ম অনুসারে কোন ভোগ্যসমষ্টি থেকে অধিকতম প্রয়োজনীয়তা পেতে হ'লে সর্ব্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত মাত্রার (অর্থাৎ যে মাত্রা কোন্ ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রয়োজনীয়তা দেয়) প্রয়োজনীয়তা সমান হওয়া দরকার; এবং নানান্ ব্যবহারে ভোগ্য ব্যবহৃত হ'লে সর্ব্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমতার দিকে যত যায় ততই বেশী পরিমাণে প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়। যার ভাগে ভোগ্যের মাত্রা যত বেশী করে' পড়ে তার কাছে সাধারণতঃ নিজ অংশের সীমাস্থিত মাত্রার প্রয়োজনীয়তা দানের ক্ষমতা তত কম। ১০০০

টাকার আয়ের শেষ মুদ্রাটির যা প্রয়োজনীয়তা ১০ টাকা আয়ের শেষ মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং যাদের ভাগে সামাজিক আয়ের অংশ বেশী পড়ে তাদের চেয়ে যেসব লোকের ভাগে সামাজিক আয়ের অংশ কম পড়ে, তাদের ভাগের পরিমাণ বেড়ে গেলে স্বাচ্ছন্দ্য বেশী পাওয়া যাবে। অর্থাৎ দরিদ্রের (কারা দরিদ্র তা নির্ণয় করার চেষ্টার প্রয়োজন নেই) অংশে বেশী করে' ভোগ্য বা সামাজিক আয়ের অংশ দিলে ধনীকে দেওয়া অপেক্ষা তার প্রয়োজনীয়তা-দানের ক্ষমতা বেশী হবে। কেননা দরিদ্রের কাছে যদি কোন ভোগ্যের দশম মাত্রা সীমাস্থিত মাত্রা হয়, ধনীর কাছে সেই ভোগ্যের এক হাজার পঞ্চাশত্তম মাত্রা সম্ভব সীমাস্থিত মাত্রা। দরিদ্র ও ধনী দুই জনই মানুষ। কাজেই ভোগ্য ব্যবহার করে' তৃপ্তি লাভ এমন কিছু বিভিন্নভাবে তারা কর্‌তে পারে না যাতে দশম মাত্রা ও একহাজার পঞ্চাশত্তম মাত্রা সমান প্রয়োজনীয়তা দিতে পারে। কাজেই ধনীর অংশ থেকে কয়েক মাত্রা নিয়ে দরিদ্রের অংশে দিলে বেশী প্রয়োজনীয়তা সিদ্ধি হবে নিশ্চয়।

অবশ্য এরকম কর্‌লে পরোক্ষভাবে স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যেতেও পারে। যেমন সামাজিক আয়ের শুধু বণ্টনের দিক্‌ই আছে এমন নয়। কাজেই কেউ যদি শুধু বণ্টন-প্রণালীর দোষগুণ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তাঁর দ্বারা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অপকার ঘট্‌তে পারে অনেক। বণ্টন সম্বন্ধে যখন কথা বলা হয় তখন ধরে' নেওয়া হয় যে সামাজিক আয় উৎপাদন সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘট্‌বে না। যদি বণ্টন-প্রণালী পরিবর্ত্তন কর্‌তে গিয়ে উৎপাদনের দিক্‌টি খোঁড়া হ'য়ে যায় তা হ'লে লাভের চেয়ে লোক্‌সান হয়ত বেশী হবে। তর্কের খাতিরে ধরা যাক যে ধনীরাই সবকিছু উৎপাদন করে বা এমনভাবে সব কিছু উৎপাদনে সাহায্য করে যাতে তাদের উৎপাদন-ক্ষেত্রে উপস্থিতি অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এবং তাদের আয়ের পরিমাণ অথবা সামাজিক আয়ে তাদের ভাগের পরিমাণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্বন্ধে তাদের উৎসাহও পরিবর্ত্তিত হবে। এমন কি তাদের আয় শতকরা দশ কমিয়ে দিলে তাদের উৎপাদন-উৎসাহ শতকরা কুড়ি কমে' যাবে। এক্ষেত্রে তাদের ভাগ থেকে নিয়ে দরিদ্রদের ভাগ বাড়ানোর ফল হবে, সামাজিক আয়ের পরিমাণ-হানি।

তা ছাড়া সামাজিক আয়ের আর-একটা দিক্ আছে। সেটা হচ্ছে ভোগের দিক্। সব লোক ত সমাজে যা-কিছু উৎপাদিত হয় সব-কিছুর একটু একটু করে' নেয় না। সামাজিক আয়টা যেমন টাকায় প্রকাশ করা যায়, সেই-রকম ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তিসংঘ-বিশেষের অংশও টাকায় প্রকাশ করা হয়। অংশ নির্দ্ধারণ হ'য়ে গেলে অংশী তার যেসব ভোগ্য ভাল লাগে তাই টাকার বদলে যোগাড় করে' কিনে' নেয়। সে পায় সাধারণভাবে কিন্‌বার ক্ষমতা (টাকা) এবং তার বদলে নেয় ভোগ্য। কি ভোগ্য নেবে তা সাধারণতঃ তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কাজেই সামাজিক আয়ের উৎপাদন ও বণ্টন ঠিক হ'য়ে গেলেও ভোগের দিক্‌টা দেখ্‌তে হবে। ধরা যাক দরিদ্ররা উৎপাদনকার্য্যে ধনীদের চেয়ে বেশী সাহায্য করে। এবং ধনীদের অংশ থেকে কিছু নিয়ে দরিদ্রের অংশে দিলে উৎপাদন কমে' যায় না। কিন্তু দরিদ্ররা যদি উপরি অংশটুকু নিয়ে এমনভাবে ভোগ করে যাতে তাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা কমে' যায়, তা হ'লে ফলে উৎপাদন কমে' যাবে। যেমন মদ্যপান, বা বিলাসিতা। মদ্যপান কর্‌লে কার্য্যকরী ক্ষমতা কমে' যায়। বেশী মাত্রায় সামাজিক আয়ের ভাগ পেয়ে যদি দরিদ্ররা মদ্যপান সুরু করে তা হ'লে এ ক্ষেত্রে বণ্টন-প্রণালী বদ্‌লানর ফল কুফল। যথা, কোন এক স্থলে দেখা গিয়েছে যে সাঁওতাল মজুরদের মাইনে বাড়িয়ে দিলে তারা মদ খেয়ে সময় নষ্ট করে' বেড়ায় এবং কাজ কম করে। কাজেই অন্যদিক্ সম্বন্ধে কিছু না বলে' শুধু যদি বলা হয় যে সামাজিক আয়ে দরিদ্রের অংশ যদি বাড়ান যায়, ধনীর অংশ সেই পরিমাণ কমে' গেলেও তাতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বে, তা হ'লে ভুল হবার সম্ভাবনা আছে।

সামাজিক আয় উপার্জ্জন অথবা এক কথায় উৎপাদন কর্‌তে মানুষকে কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হয়। অর্থাৎ কিনা

প্রকৃতি সাধারণতঃ বিনা কষ্টে মানুষকে কিছু পেতে দেয় না। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে এই কষ্টস্বীকারেরও সম্বন্ধ আছে। একই পরিমাণ ভোগ্য উৎপাদন কর্‌তে বিভিন্ন পরিমাণ কষ্ট স্বীকার কর্‌তে হ'তে পারে। এবং সামাজিক আয় সমান থাক্‌লে ও উৎপাদন-কষ্ট বেড়ে গেলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যায়। ধরা যাক ভোগ্য শুধু একরকমই আছে ও সেটি কয়লা। সামাজিক আয় হচ্ছে ক-পরিমাণ কয়লা। কয়লা যদি অগভীর খনিতে থাকে তা হ'লে মানুষ খ-পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করে' সেই আয় উপার্জ্জন কর্‌তে পারে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপরের কয়লা ফুরিয়ে আস্‌বে এবং শীঘ্রই ক-পরিমাণ কয়লা জোগাড় কর্‌তে খ+গ-পরিমাণ কষ্ট কর্‌তে হবে। এতে 'সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যাবে অথচ সামাজিক আয় সমানই থাক্‌বে।

বুঝ্‌বার সুবিধার জন্যে আমাদের এখন কএকটি জিনিস পরিষ্কার করে' ভেবে নিতে হবে।

১। কয়েক বৎসরের সামাজিক আয় জড়িয়ে দেখ্‌লে তার এক-একটা গড়পড়তা পরিমাণ আছে। যথা উদাহরণ,

বৎসর	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
লক্ষ টাকা	১০০	১১০	১১৫	৯৫	৯০	১২০	১০০	১২৫	৮৫	১০৫

গড়পড়তা বাৎসরিক সামাজিক আয় তা হ'লে হ'ল

$$\frac{১০৪৫}{১০} = ১০৪·৫ \text{ লক্ষ টাকা}$$

২। প্রত্যেক বৎসর সামাজিক আয়ের একটা অংশ দরিদ্র লোকেরা পায় এবং ঐ কয়েক বৎসর জড়িয়ে ধর্‌লে দরিদ্রের অংশেরও একটা গড়পড়তা বাৎসরিক পরিমাণ আছে, এবং দরিদ্রের অংশের সঙ্গে সমগ্র সামাজিক আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকে। যেমন উপরোক্ত বৎসরগুলিতে দরিদ্রেরা যদি গড়ে ২০ লক্ষ টাকা পেয়ে থাকে তা হ'লে তাদের অংশ হচ্ছে গড়ে সামাজিক আয়ের প্রায় শতকরা ১৯·২৫ ভাগ। (ঠিক ১৯·২৩০৭৬%)। এই গড় পরিমাণগুলি কিন্তু সত্য সত্য কোন বৎসরই না দেখা যেতে পারে। যথা আমাদের উদাহরণে সামাজিক আয়ের গড-পরিমাণ, ১০৪ ৫ লক্ষ টাকা কোন বৎসরেই আয় হয়নি। প্রত্যেক বৎসরই গড়-পরিমাণ থেকে আসল পরিমাণ বিভিন্ন হ'তে পারে এবং অনেক সময়ই হবে। দরিদ্রের অংশের গড়-পরিমাণও সেইপ্রকার আসল পরিমাণ থেকে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বিভিন্ন হয়। প্রত্যেক বৎসরের বিভিন্নতা একত্র দেখ্‌লে তারও একটা গড়-পরিমাণ আছে। অর্থাৎ কএক বৎসর একসঙ্গে দেখ্‌লে বাৎসরিক সামাজিক আয়ের পরিমাণ সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন হয়। একটা দরিদ্রের অংশও সেইরূপ দরিদ্রের গড় অংশ থেকে একটা নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে বিভিন্ন হয়। আমাদের উদাহরণে বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকায়

বৎসর	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
	১০০	১১০	১১৫	৯৫	৯০	১২০	১০০	১২৫	৮৫	১০৫

গড়-পরিমাণ হচ্ছে ১০৪·৫ লক্ষ টাকা, সুতরাং গড়-পরিমাণ থেকে বিভিন্নতা হচ্ছে

১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম
১০৪·৫	১০৪·৫	১০৪·৫	১০৪·৫	১০৪·৫
১০০	১১০	১১৫	৯৫	৯০
−৪·৫	+৬·৫	+১১·৫	−৯·৫	−১৪ ৫

৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম	৯ম	১০ম
১০৪ ৫	১০৪·৫	১০৪·৫	১০৪·৫	১০৪·৫
১২০	১০০	১২৫	৮৫	১০৫
+১৬·৫	−৪·৫	+২১ ৫	−১৯·৫	+১ ৫ লক্ষ টাকা

সব বৎসরের বিভিন্নতার গড়-পরিমাণ হচ্ছে

$$\frac{৪·৫+৬·৫+১১·৫+৯·৫+১৪·৫+১৭·৫+৪·৫+২১·৫+১৯·৫+১·৫}{১০} = \frac{১১০}{১০} = ১১$$

সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ থেকে, বিশেষ বিশেষ বৎসরের আয়ের বিভিন্নতা নিয়ে কথা হচ্ছে। এই গড়-পরিমাণ থেকে কোন বিশেষ বৎসরের সামাজিক আয় থেকে বেশী হবে কি কম হবে সে অন্য কথা। কাজেই + ও − দুইএরই এ ক্ষেত্রে সমান দাম। এই যে গড়-পরিমাণ হ'তে বিভিন্নতা, একে আয়ের অস্থিরতা বলা চলে। আমরা দুটি জিনিস পাচ্ছি; এক, সামাজিক আয়ের অস্থিরতা, আর এক দরিদ্রের আয়ের (অর্থাৎ দরিদ্র সামাজিক আয়ের যে অংশ পায় তার) অস্থিরতা। দরিদ্রের আয়ের অস্থিরতা নির্ণয় সামাজিক আয়ের অস্থিরতা নির্ণয় করার মত করে'ই ঠিক কর্‌তে হবে। আয় অস্থির হ'লে অর্থাৎ আজ একরকম আর কাল আর-এক-রকম হ'লে কোন একটা নির্দ্দিষ্টভাবে

জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। যেমন আজ দেখ্‌লাম মাছ মাংস খাবার পয়সা আছে আর কাল দেখ্‌লাম পান্তাভাত খেয়ে থাকতে হবে। নরম বিছানায় শুয়ে ঘুমান অভ্যাস করলাম, হঠাৎ দেখ্‌লাম মাটিতে শুতে হবে। থিয়েটার, বায়স্কোপ, ক্লাব, আড্ডা প্রভৃতির ভক্ত হ'য়ে উঠ্‌লাম, এমন সময় চাঁদা দেবার অবস্থা আর রইল না। এরকম হ'লে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যায়। আবার যার আয় যত কম তার পক্ষে আয়ের অস্থিরতা তত মারাত্মক। বেশী আয় যার তার আয় কোনো সময় একটু কম হ'লে প্রথমতঃ আয়ের যে অংশটা সে জমায়, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে ও অবিলম্বে ভোগ না করে, সে দিকেই টান পড়ে। আগে খেয়ে পরে জমায়; কাজেই হঠাৎ আয় কম্‌লে তার জীবন-যাত্রায় খুব একটা নাড়া পড়ে না। আয় বাড়্‌লেও অকস্মাৎ ভোগের মাত্রা সে বাড়ায় না, জমায় বেশী। দ্বিতীয়তঃ যার আয় বেশী সে অনেক অনাবশ্যক ও অল্পাবশ্যক জিনিসে টাকা খরচ করে। আয় হঠাৎ একটু কমে' গেলে এই অনাবশ্যক ও অল্পাবশ্যক খরচগুলি আগে বন্ধ হয়। এতে খুব বেশী স্বাচ্ছন্দ্যের হানি হয় না। কিন্তু দরিদ্রের আয় বাড়্‌লে যেমন সে আগের মত আধপেটা খেয়ে বাকিটা জমায় না, একটু বেশীই খায়; তেমনি আয় কম্‌লেও পেটেই তার ধাক্কাটা সবচেয়ে জোরে লাগে। কাজেই আমরা বল্‌তে পারি যে প্রথমতঃ আয়ের অস্থিরতার পরিবর্ত্তন হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্ত্তন হয়। দ্বিতীয়তঃ আয়ের পরিমাণ যত কমে তার অস্থিরতা ততই কষ্টদায়ক হয়। এখন অবধি আমরা যা আলোচনা করেছি তা থেকে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা চলে।

১। যদি কোন কারণে মানুষের উৎপাদনকষ্ট না বেড়ে উৎপাদনশক্তি বেড়ে যায় এবং ফলে সামাজিক আয়ের গড়-পরিমাণ বেড়ে যায়, তা হ'লে, সামাজিক আয়ের বণ্টন-প্রণালী ফলে নিকৃষ্ট হ'য়ে না গেলে ও তার অস্থিরতা বেড়ে না গেলে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সাধারণতঃ বেড়ে যাবে। সাধারণতঃ বলা হচ্ছে, কেননা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য আরও নানাভাবে পরিবর্ত্তিত হতে পারে, এবং ফলে, যেমন দুয়ে দুয়ে চার হবেই হবে বলা যায় সে-রকম নিশ্চিত ভাবে কথা বলা স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলে না।

২। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ে দরিদ্রের ভাগ বেড়ে যায়, তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে' না গেলে, অথবা তার অস্থিরতা বেড়ে না গেলে সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে।

৩। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ের অস্থিরতা কমে' যায় তা হ'লে, ফলে সামাজিক আয় কমে' না গেলে অথবা বণ্টন-প্রণালী নিকৃষ্ট হ'য়ে না গেলে, সাধারণতঃ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে।

৪। যদি কোন কারণে সামাজিক আয়ের যে-অংশ দরিদ্রের ভোগে লাগে তা বেড়ে যায়, অর্থাৎ দরিদ্রের আয়ের অস্থিরতা কমে' যায়, এমন কি ফলে যদি ধনীর আয়ের অস্থিরতা সেই পরিমাণে বেড়েও যায়, তা হ'লে অন্য সব অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাক্‌লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে যাবে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

দুর্য্যোগ

গগনে গগনে দেয়া হাঁকে,
সৃষ্টিবিনাশী খর ডাকে,—
ওঠে ঝড়!
কোথা রে পথিক ত্বরা কর
—ত্বরা কর্!

পথে প্রান্তরে উড়ে ধূলি,
কোথা রে রাখাল পথ ভুলি',
বেলা যায়,—
গোধূলি-গগন-আঁধি- -য়ায়
—আঁধিয়ায়!

হে কিষাণ! ফের গৃহ পানে,
শঙ্কিতা বধূ ভয় মানে,
ক্ষণে চায়;—
পথে যেথা আঁখি মিশে যায়
—মিশে যায়!

মেঘমালা হানে জল- -ধারা,
গৃহহীন ভেবে ভয়ে সারা;
লাগে দোল্!
আজি বারি ঝরে উত- বোল্
—উতরোল্!
ভিড় লাগে আজি গাছে গাছে,
মাতাল বাদল-বায়ু নাচে;
কাঁপে ঘর!
বিভল পরাণে লাগে ডর
—লাগে ডর!
জলহীন প্রান্তর- -মাঝে
কোথাও পথিক চলে না যে,—
আঁধি- -য়ায়;
মাতামাতি আজি বরি- -ষায়
—বরিষায়!

কোথায় ভিজিছে গৃহ- -হারা
দুরু দুরু হিয়া ভয়ে সারা;—
গতি- -হীন!
আশ্রয় নাহি, গেল দিন
—গেল দিন!
একাকী কোথায় পথ- -বাসী
আশ্রয় লহ ঘরে আসি';
বারে বার
জোরে বায়ু হাঁকে কাঁপে দ্বার
- কাঁপে দ্বার!
আজি তব ঘরে দ্বার খোলা,
ঘরছাড়া কোথা পথ- -ভোলা;
ঝড়ো বায়—
শঙ্কিতা বধূ পথ চায়
—পথ চায়!
কে গো বধূ বাতায়ন- -পাশে,—
অপলক চোখে প্রিয়- -আশে?—
উদা- -সীন,—
শূন্য শয়নে রহি লীন
—রহি লীন!
কোথা অভিসারিকা বালা,
মিছে গাঁথ অভিসার- -মালা—
বাঁধ কেশ;
তিমিরা যামিনী, খোল বেশ
—খোল বেশ!
বাসক-শয়নে কোথা নারী,
মিছে বেশবাস ফেল ছাড়ি';
ব্যথা- -ভার-
বুকে উতরোল হাহা- -কার
হাহাকার!

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

বেনো-জল

পনেরো

সমুদ্রের উপর দিয়ে রৌদ্রের জ্বলন্ত বন্যা বহে যাচ্ছে—জলধির বিপুল হিন্দোলাকে কল্পনাতীত মণি-মাণিক্যে বিচিত্র ক'রে তুলে'। দুপুর-বেলায় চারিদিকে যেন এক রৌদ্রময়ী রাত্রির নির্জ্জনতা খাঁ খাঁ করছে,—কিন্তু প্রকৃতির এই অপূর্ব্ব নাট্যশালায় দর্শকের অভাবে সমুদ্র একটুও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েনি, তার মত্ত তাণ্ডবের অভিনয়, গম্ভীর স্বর-সাধনা আর প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস সমানই চলেছে—আর চলেছেই!

রতন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছে,—হাঁ, আর্টিষ্ট বটে এই সমুদ্র! আমরা মানুষ-আর্টিষ্ট, বাহবা না পেলে দমে' যাই, টিট্‌কিরি দিলে ভেঙে পড়ি. সমজদার না থাক্‌লে কাজ বন্ধ ক'রে বসি। সমুদ্র কিন্তু এ-সবের কোন ধারই ধারে না, তুমি ভালোই বল আর মন্দই বল সে তাতে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার, সে চায় খালি নিজের মনে নেচে-গেয়ে আপনাকে এই বিরাট্ বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়ে বহে যেতে। তার উৎসাহ আসে নিজের ভিতর থেকে,—বাইরে থেকে নয়। এই তো খাঁটি আর্টিষ্টের লক্ষণ! তুমি বাধা দিলেও তার নাচ-গান বন্ধ হবে না, তুমি হাততালি দিলেও সে বাড়াবাড়ি করবে না। সমুদ্রকে দেখে আমরা অনেক শিখ্‌তে পারি।

সমুদ্রের পানে চেয়ে রতন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল।

জান্‌লার ধারে ব'সে সুমিত্রা একখানা ছবির উপরে রঙের তুলি বুলিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ মুখ তুলে' ফিরে দেখে' সে বল্‌লে, "কি ভাব্‌চেন, রতনবাবু?"

রতন বল্‌লে, "বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা করছি।"

"কি-রকম?"

—"তুমি ধ্যানী-বুদ্ধের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখেছ?"

—"হুঁ, মিউজিয়মে দেখেছি।"

—"সেই মূর্ত্তির সঙ্গে কখনো সমুদ্রের তুলনা ক'রে দেখেছ?"

—"না, আপনার মত আমি ত দার্শনিক নই, অতটা কষ্টকল্পনা করবার বাতিক আমার নেই।"

"শোনো সুমিত্রা, এ একটা মৌলিক 'আইডিয়া'! ধ্যানী-বুদ্ধের শিলা-মূর্ত্তি,—নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মতন স্থির। আর এই সমুদ্র—এ হচ্চে গতি-চাঞ্চল্যের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্যে কি নিয়ে তুলনা চলে বল দেখি?"

—"আমি জানি না, আপনার পূর্ণিমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।"

পূর্ণিমার নামে রতন আহত দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে চাইলে। কিন্তু তার পরেই সহজ স্বরে বল্‌লে, "ধ্যানী-বুদ্ধের মূর্ত্তি নির্ব্বাণ লাভের জন্যে সাধনায় স্থির। আর সমুদ্রের বিশাল মূর্ত্তি গতির সাধনায় অস্থির। কিন্তু এই স্থিরতা আর অস্থিরতার মধ্যে আশ্চর্য্য একটি মিল আছে, আপন আপন সাধন-সীমার বাইরে অন্য কোন-কিছুর বিষয়েই এরা কেউ একটুও সচেতন নয়। বুদ্ধের স্থিরতাও গম্ভীর, আর সমুদ্রের অস্থিরতাও গম্ভীর। বিশ্ব-ভরা বিপ্লবেও এই স্থিরতা অস্থির বা এই অস্থিরতা স্থির হবে না।......এই দুই বৈচিত্র্যই হচ্চে জগৎসৃষ্টির মূল—এই দুই সাধনার মধ্য দিয়েই মানুষের সভ্যতা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হ'তে চাইছে। বুঝ্‌লে সুমিত্রা?"

সুমিত্রা মাথা নেড়ে বল্‌লে, "উঁহুঁ! অত বড় বড় কথা আমার এই ছোট মাথায় ঢুকবে না. রতন-বাবু! আপনার পূর্ণিমাও বোধ হয় এ-সব তত্ত্ব শুনতে রাজি হবে না।"

রতন একটু অসন্তুষ্টভাবে বল্‌লে, "বার বার তুমি পূর্ণিমার নাম করছ কেন?"

—"বার বার তাকে মনে পড়ছে ব'লে। সে যে ভারি সুন্দরী!"

রতন বিরক্তমুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

সুমিত্রা বল্‌লে, "আচ্ছা রতনবাবু, আপনি কি বলেন? সত্যিই কি পূর্ণিমা সুন্দরী নয়?"

রতন বল্‌লে, "আঃ! কি যে বাজে বক, তার ঠিক নেই!"

—"দোহাই রতনবাবু, আপনি পূর্ণিমার রূপের কিছু উপমা দিন!"

"উপমা?"

—"হ্যাঁ। এই যেমন বুদ্ধদেবের সঙ্গে সমুদ্রের তুলনা কর্‌লেন, তেম্‌নি আর কোন-কিছুর সঙ্গে তুলনা ক'রে বুঝিয়ে দিন, পূর্ণিমার রূপ কত সুন্দর! বলুন, পূর্ণিমাকে দেখ্‌তে কার মত? আকাশের চাঁদের মত, না বাগানের গোলাপের মত, না রবিবাবুর মানস-সুন্দরীর মত?"

—"সুমিত্রা, দিনে দিনে তোমার মুখ বড় বাচাল হ'য়ে উঠ্‌ছে···নাও, এখন দুষ্টুমি বন্ধ ক'রে ছবিখানা তাড়াতাড়ি এঁকে ফেল।"

—"পূর্ণিমা যে জ্যান্ত ছবি, তার কাছে এ তুলির ছবি তুচ্ছ! ...পূর্ণিমাকে আমি সুন্দরী বল্‌ছি ব'লে আপনি রাগ কর্‌ছেন কেন, রতনবাবু? সুন্দরকে সুন্দর বল্‌ব না?"

—"হঠাৎ পূর্ণিমাকে সুন্দর বল্‌বার জন্যে তোমার এতটা আগ্রহ হ'ল কেন বল দেখি?"

—"কেন, পূর্ণিমা কি সুন্দরী নয়?"

—"আমি কি সে-কথা অস্বীকার কর্‌ছি?"

—"তবে পূর্ণিমার রূপের উপমা দিতে এমন আপত্তি কর্‌ছেন কেন?"

—"উপমা আবার দেব কি?"

—"তবে কি আপনি বল্‌তে চান, পূর্ণিমার রূপের উপমা নেই?"

—"আমি কিছু বল্‌তে চাই না।"

—"না, আপনাকে বল্‌তেই হবে"—ব'লে সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বল্‌লে, "আচ্ছা, পূর্ণিমা কি আমার দিদির চেয়ে সুন্দরী?"

—"আমি জানি না।"

—"আমার চেয়ে?"

—"তুমিও সুন্দর, পূর্ণিমাও সুন্দর। কেমন, তোমার আগ্রহ মিট্‌ল ত?"

—"এ-কথা আপনি আমার সাম্‌নে চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে বল্‌ছেন।"

—"না, আমি সত্যি কথাই বল্‌ছি।"

—"কিন্তু কে বেশী সুন্দর—আমি, না পূর্ণিমা?"

—"জানি না। সৌন্দর্য্য আনন্দের জিনিষ, তা নিয়ে তুলনায় সমালোচনা চলে না।"

—"আচ্ছা, আপনি পূর্ণিমাকে খুব ভালোবাসেন,—না?"

—"আমি পূর্ণিমাকে, তোমাকে, তোমার বাবা, মা, দাদা, আর দিদিকে—সবাইকে ভালোবাসি। কেমন, আর কিছু জান্‌তে চাও কি?"

—"আচ্ছা, পূর্ণিমাকে আপনি বিয়ে কর্‌তে রাজি আছেন?"

রতন একটু সচকিত হ'য়ে সুমিত্রার দিকে চেয়ে দেখ্‌লে। এতক্ষণ সে ভাব্‌ছিল, সুমিত্রা তার স্বাভাবিক সরলতার জন্যেই বালিকার মতন অমন-সব প্রশ্ন কর্‌ছে, কিন্তু এখন তার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগান দিলে। এ সরলতার আড়ালে যেন কোন উদ্দেশ্য আছে! সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, সুমিত্রা কি তার মনের ভিতরে ছিপ্‌ ফেল্‌তে চাইছে? কিন্তু কেন?

সুমিত্রা হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, "রতনবাবু, চুপ ক'রে রইলেন যে?......ও, বুঝেছি; পূর্ণিমাকে বিয়ে কর্‌তে আপনার আপত্তি নেই।"

রতন ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লে, "না। তুমি জান, আমি গরীব, এমন অসম্ভব কথা কোনদিন আমি মনেও ভাবিনি।"

—"কিন্তু অসম্ভবও সম্ভব হ'তে পারে।"

—"সম্ভব হ'লেও আমি রাজি হব না।"

—"কেন, রতনবাবু?"

—"আমি গরীব।"

—"পূর্ণিমাকে বিয়ে কর্‌লে আপনি আর গরীব থাক্‌বেন না।"

—"না, আমি গরীবই থাক্‌তে চাই, ধনীর মেয়েকে বিয়ে ক'রে ধনী হবার সাধ আমার নেই।"

"আপনি পূর্ণিমাকে ভালোবাসেন, তবু তাকে বিয়ে কর্‌বেন না?"

—"পূর্ণিমা আমার বন্ধু, তার মধ্যে তুমি বিবাহের

কথা তুল্‌ছ কেন?.. ...আর দেখ সুমিত্রা, আমি ইচ্ছা করি না যে, এইসব বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গে তুমি কথা কও।"

—"কেন কইব না? পূর্ণিমা আপনার বন্ধু, আর আমি বুঝি আপনার কেউ নই?"

—"তুমি আমার ছাত্রী।"

সুমিত্রা মুখ ভার ক'রে আবার ব'সে পড়্‌ল। সে আজ সত্যসত্যই রতনের মনের ভিতরটা তলিয়ে দেখ্‌বার ফিকিরে ছিল, কিন্তু এত কথার পরেও তার চেষ্টা সফল হ'ল না।

খানিকক্ষণ পরে রতন বল্‌লে, "সুমিত্রা, কণারকে যাবে?"

—"সে আবার কোথায়?"

—"এখান থেকে আঠারো মাইল দূরের একটা জায়গা।"

—"সেখানে কি আছে!"

—"একটা ভাঙা মন্দির।"

—"তাই দেখ্‌তে অত দূরে কে যায়?"

—"তোমরা না যাও, আমি যাচ্ছি।"

—"একলা?"

—"না, আনন্দবাবু যাবেন, পুর্নিমা যাবেন।"

—"কবে যাচ্ছেন?"

—"পরশু।"

সুমিত্রা হেঁট হ'য়ে ছবির উপরে রং ফলাতে লাগ্‌ল।

রতন বল্‌লে, "তোমার বাবাকেও জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌ব, যদি তিনি যান।"

সুমিত্রা জবাব দিলে না।

রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখানা বই নিয়ে চেয়ারের উপরে ব'সে পড়্‌ল!......

ছবির উপরে রঙের শেষ প্রলেপ দিয়ে, সুমিত্রা উঠে' দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "ছবিখানা কেমন হ'ল দেখুন।"

রতন হাত বাড়িয়ে সুমিত্রার হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

সুমিত্রা একটু ইতস্তত ক'রে বল্‌লে, "রতনবাবু, আমিও আপনাদের সঙ্গে কণারকে যাব!"

—"হঠাৎ যে তোমার মত বদ্‌লে গেল?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আমার মত, আমি বদ্‌লাতে চাই বদ্‌লাব—যা-খুসি করব, তার জন্যে আপনার কাছে জবাবদিহি করতে যাব কেন?"

ষোলো

কিন্তু এ-বাড়ীর কেউই কণারকে যেতে রাজি হলেন না।

বিনয়-বাবুর সর্দ্দি হয়েছে, সারারাত খোলা মাঠে ঠাণ্ডা লাগাতে নারাজ। সন্তোষ চিল্কা দেখ্‌তে গিয়েছে। সেন-গিন্নির যাবার ইচ্ছা থাক্‌লেও স্বামীকে একলা রেখে যেতে পার্‌লেন না। সুমিত্রা বাধা পেয়ে মুখখানি চুন ক'রে রইল। বিনয়-বাবু তার মুখ দেখে বল্‌লেন, "আচ্ছা সুমি, তোমার যদি এতই সাধ হ'য়ে থাকে, আনন্দের সঙ্গে তুমি কণারকে যেতে পার।" বাবার হুকুম পেয়ে সুমিত্রার মুখে হাসি আর ধরে না।

মেসার্স্ বাসু-চ্যাটো-কুমারবাহাদুরদের কাছেও রতন কণারকে যাবার প্রস্তাব তুলেছিল। শুনে' মিঃ বাসু গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে নির্ব্বাক আপত্তি জানালেন, মিঃ চ্যাটো প্রচণ্ড হাস্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লেন এবং কুমার-বাহাদুরও তাঁর দেখাদেখি হাস্‌তে সুরু কর্‌লেন—যদিও নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না যে, তিনি কেন হাস্‌ছেন।

রতন বল্‌লে, "মিঃ চ্যাটো, আপনার এই দুর্ব্বোধ হাস্যের কি কোন গূঢ় রহস্য আছে? আমি ত আপনাকে মোটেই হাসাবার চেষ্টা করিনি!"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "আঠারো মাইল মরুভূমি পার হ'য়ে, সারারাত কষ্টভোগ ক'রে কণারকে গিয়ে কি দেখ্‌ব? না, শ্মশানের মধ্যে একরাশ ভাঙা পাথর! এমন পাগ্‌লামির প্রস্তাব কি হাস্যকর নয়?"

"—কেন, হাস্যকর কি-জন্যে?"

—"এতে লাভ হবে কি?"

—"ভারতীয় আর্টের চরমোৎকর্ষ দেখে' চোখকে সার্থক করতে পার্‌বেন।"

—"যে আর্ট অনেকদিন আগে ম'রে গেছে, যার মধ্যে আর জীবন নেই, নতুন সৃষ্টি নেই, যা আর বর্ত্তমানের কাজে লাগ্‌বে না, তাকে দেখে ফল কি, রতনবাবু?"

—"মিঃ চ্যাটো, আপনার মত শিক্ষিত লোকের মুখে

এ কথা শুনে' দুঃখিত হলুম। প্রথমতঃ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আর্ট্ কখনো মরে না, তা অমর, কালের চঞ্চল প্রবাহ তার কাছে এসে স্তম্ভিত হ'য়ে থ'কে। দ্বিতীয়তঃ, লাভ-লোক্‌সানের খাতা খুলে আর্টের বিচার চলে না, কারণ কোন টাঁকশালেই আজ পর্য্যন্ত আর্ট্ তৈরি হয়েছে ব'লে শোনা যায়নি। আর্ট্ আমাদের পকেট ভারী করে না, কিন্তু রসিককে স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদ দেয়। আর্ট্ আমাদেরকে আপিসের কাজে নামায় না, কিন্তু কাজের ছুটির সময়ে আমাদের মনের খোরাক যোগায়। আর্টের মধ্যে উদ্দেশ্য খোঁজ করলে আপনারা হতাশ হবেন,—আর্ট্ হচ্ছে আর্ট্—সে দালালের পণ্য, 'শেয়ার মার্কেটের শেয়ার', ব্যারিষ্টারের 'ব্রিফ', ডাক্তারের 'প্রেস্‌ক্রিপশন্', উমেদারের কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন, ছাত্রের হিতোপদেশ বা সমাজপতির হুঙ্কার নয়—আর্টের একমাত্র পরিচয় আর্ট্—ওকালতি ডাক্তারি, কেরানিগিরি ও সওদাগরি ছাড়াও যে মানুষের অন্য কাজ আছে, আর্ট্ তার সাক্ষ্য! ভারতবর্ষ যে চিরদিন পশুর মত রক্তমাংসের সাধনা বা জীবন-সংগ্রামের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে থাকেনি, ভারতের প্রাচীন আর্ট্ তারই জলন্ত প্রমাণ। কণারক আমাদের সেই গৌরবময় অতীতের একটি প্রধান কেন্দ্র, তাই আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত।"

মিঃ বাসু একটা হাই তুলে' মুখভঙ্গি ক'রে বল্‌লেন, "অতীত, কেবল অতীত! ঐই অতীত অতীত ক'রেই আমাদের জাতিটা অধঃপতনে যেতে বসেছে!"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "আমি চাই বর্ত্তমান, আমি চাই ভবিষ্যৎ! বর্ত্তমানের সাধনা কর্‌তে পেরেছে ব'লেই য়ুরোপ আজ এত বড়!"

একটা-কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত ভেবে কুমার-বাহাদুর বল্‌লেন, "নিশ্চয়!"

রতন বল্‌লে, "অতীত হচ্ছে বর্ত্তমানের সূতিকাগার, ভবিষ্যতের আশা! এমন দেশ দেখাতে পারেন, অতীতের সাহায্য না নিয়ে যে বড় হ'তে পেরেছে?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "আমেরিকা!"

—"আমেরিকা? আমেরিকা কি কোন একটিমাত্র জাতির স্বদেশ? সে তো দুনিয়ার নিখিল-জাতির সমন্বয়-ক্ষেত্র বা মিলন-ভূমি! তার অতীত তাই নিজের মধ্যেই আবদ্ধ নয়—য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে' দেখুন, আমেরিকার অতীতকে সেইখানেই পাবেন। য়ুরোপের অতীত থেকেই আমেরিকার বর্ত্তমান রসসংগ্রহ করে—কারণ আমেরিকার জন্ম হয়েছে য়ুরোপে। তাই ফি বৎসরেই হাজার হাজার আমেরিকান্ যাত্রী রোম, পম্পিআই ও গ্রীসের পার্থেননের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে ছুটে' যায়। কেবল এইটুকুতেই তারা তুষ্ট নয়, সমগ্র মানবসভ্যতার অতীতকে দেখে' শিক্ষালাভ কর্‌বার জন্যে তারা সেই সুদূর থেকে আসে ব্যাবিলনের ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে, মিশরের জীর্ণ পিরামিডের ছায়ায়, ভারতের চূর্ণ-বিচূর্ণ বিজন পরিত্যক্ত গুহা-মন্দিরের মধ্যে। আপনারা এদের কি বল্‌তে চান্?"

মিঃ বাসু নীরবে কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ কর্‌লেন, মিঃ চ্যাটো গম্ভীরভাবে ধূমপান কর্‌তে লাগ্‌লেন, এবং কুমার-বাহাদুর তাঁদের মুখরক্ষার জন্যে রতনের কথার একটা জবাব দিতে গিয়ে কোন কথাই বল্‌তে পার্‌লেন না।

বিনয়-বাবু স্তব্ধভাবে ব'সে ব'সে এই আলোচনা শুন্‌ছিলেন, এতক্ষণ পরে তিনি বল্‌লেন্, "রতন, তোমারই জিৎ, এঁরা তিনজনেই অসম্ভব-রকম হেরে গেছেন।"

মিঃ বাসু ক্রুদ্ধস্বরে বল্‌লেন, "হেরে গেছি কি-রকম?"

বিনয়-বাবু হেসে বল্‌লেন, "তর্কে মুখবন্ধ করা হারেরই লক্ষণ।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "অকারণ তর্কে সময় নষ্ট কর্‌তে আমার আপত্তি আছে। এটা যদি হারের লক্ষণ হয়, তা হ'লে আমরা অবশ্য নাচার।"

কুমার-বাহাদুর যৎপরোনাস্তি গম্ভীরকণ্ঠে বল্‌লেন, "এ-কথা আমিও স্বীকার করি। আমাদের খুসি, আমরা কণারকে যাব না। এজন্যে এত জবাবদিহির দর্‌কার হচ্ছে কেন, তা তো আমি কোনমতেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না!"

রতন হেসে বল্‌লে, "কুমার-বাহাদুর সত্যিকথাই বল্‌ছেন।"

কুমার-বাহাদুর গর্ব্বিতভাবে বল্‌লেন, "কারণ, সত্যি

কথা বলাই আমার স্বভাব। আমরা কণারকে যাব না, আর-এটা হচ্ছে আমাদের খুসি!"

রতন বল্‌লে, "নিশ্চয়! তবে কি জানেন কুমার-বাহাদুর, অন্ধ যদি হঠাৎ কঠোর প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে—'আমি চাঁদ দেখ্‌ব না', তবে সে প্রতিজ্ঞার মধ্যে কতখানি তার খুসি, আর কতখানি যুক্তি আছে, তা বিচার ক'রে না দেখ্‌লে চল্‌বে কেন?"

মিঃ চ্যাটো মুখ রক্তবর্ণ ক'রে অধীরস্বরে বল্‌লেন, "রতনবাবু, রতনবাবু! আপনি ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন কর্‌ছেন! আপনার এ-কথার অর্থ কি?"

—"অত্যন্ত স্পষ্ট, এজন্যে মানের বই খুল্‌তে হবে না" —এই ব'লেই রতন সেখান থেকে উঠে' আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

মিঃ চ্যাটো মনে মনে বল্‌লেন, "তোমার এই দর্প আরো কতদিন থাকে, আমি তা দেখ্‌বই দেখ্‌ব।"

সতেরো

ধূ-ধূ কর্‌ছে সীমাহীন মরুভূমি, চারিদিক্ মৃত্যুর স্তব্ধ হৃদয়ের মত নীরব, মাঝে মাঝে নিঝুম রাতের কানের কাছে বাজ্‌ছে শুধু ঝুম্ ঝুম্ ক'রে ঝিঁঝির ঝুমঝুমি, মাথার উপরে মেঘ-তোরণের সাম্‌নে স্বপ্নপুরীর প্রহরীর মত জেগে আছে কেবল চাঁদের উজ্জ্বল মুখ!

বালুকা-শয্যার বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত ক'রে একটি গোযান-চক্র-চিহ্নিত সঙ্কীর্ণ পথের রেখা দৃষ্টির আড়ালে কোথায় কতদূরে তলিয়ে গেছে, তারই উপর দিয়ে ছ-খানা গরুর গাড়ী ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে কর্কশ চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে এগিয়ে চলেছে।

আনন্দবাবু, রতন, পূর্ণিমা ও সুমিত্রা,—প্রত্যেকের জন্যেই এক-একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা রয়েছে। সর্ব্বপ্রথমের ও সর্ব্বশেষের দুখানা গাড়ীর ভিতরে আছে দুজন দরোয়ান ও দুজন চাকর।

খানিক পরেই রতন গাড়ীর ভিতর থেকে নেমে পড়ল। তার দেখাদেখি নাম্‌ল পূর্ণিমা। আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "ব্যাপার কি রতন, সবাই গাড়ী ছেড়ে হঠাৎ নাম্‌লে কেন?"

রতন বল্‌লে, "গরুর গাড়ী আমাদের দেহ নিয়ে যে-রকম উৎসাহে লোফালুফি খেলা সুরু করেছে, তাতে নেমে পড়াই সুবিধে বিবেচনা কর্‌ছি।"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ, আমরা সবাই বিংশ শতাব্দীর 'মোটর'-যুগের মানুষ, সত্যযুগের এ বিশেষত্ব আমাদের ধাতে সহ্য হবে কেন? আমি কিন্তু তবু গাড়ী ছাড়্‌তে রাজি নই, কারণ সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, বুড়ো হাড়ে হাঁটাহাঁটি সইবে না।"

রতন আর পূর্ণিমা গাড়ী পিছনে রেখে এগিয়ে চল্‌ল —বালির উপরে জুতো প'রে চল্‌তে অসুবিধে ব'লে শুধু-পায়ে।

একটু পরেই একটা ধারাবাহিক অস্ফুট-গম্ভীর ধ্বনি শোনা গেল—সে ধ্বনি যেন আস্‌ছে বিশ্বের হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে, শুন্‌লে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে!

পূর্ণিমা সবিস্ময়ে বল্‌লে, "ও কিসের শব্দ?"

—"মরুভূমির কান্না।"

—"মরুভূমির কান্না?"

—"হ্যাঁ, কবির কানে তাই মনে হবে। কিন্তু আসলে ও হচ্ছে সমুদ্রের হাহাকার। তৃষার্ত্ত মরুকে স্নিগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে সে যুগ যুগ ধ'রে, কিন্তু পার্‌ছে না ব'লে অশ্রান্ত হাহাকারে ফেটে পড়্‌ছে! এই হাহাকারের ভিতর দিয়েই আমাদের কণারকের শিল্প-স্মৃতিসমাধি দেখ্‌তে যেতে হবে।"

আশে-পাশে বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি, আলো-আঁধারির রহস্য গায়ে মেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, যেন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে, তাদের পায়ের তলা দিয়ে কালের অদৃশ্য স্রোত বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিকে যেন কারুরই কোন খেয়াল নেই!

পূর্ণিমা বল্‌লে, "উঃ, চারিদিক্ কি নির্জ্জন! এ নির্জ্জনতা যেন হাত দিয়ে অনুভব করা যায়!"

রতন বল্‌লে, "আমরা যেন পৃথিবীর সেই প্রথম রাত্রে ফিরে গেছি, যেদিন বিশ্বের মধ্যে একাকী ব'সে প্রকৃতি ধ্যানস্থ হ'য়ে থাক্‌ত। মাথার উপরে ঐ অনন্ত আকাশ, সাম্‌নে অনন্ত রজনী, চারিদিকে অনন্ত মরুভূমি আর ওদিকে অনন্ত সাগর, অনন্তের এই মহোৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা যেন চলেছি—"

—"সৃষ্টির সেই আদি দম্পতির মত!"

রতন চম্‌কে ফিরে দেখ্‌লে, তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সুমিত্রা।

—"সুমিত্রা?"

—"হ্যাঁ। কেমন রতন-বাবু, আমার উপমা ত ঠিক হয়েছে?"

—"তুমি যে গাড়ী থেকে নেমে এলে বড়?"

—"কেন, আপনারা নাম্‌তে পারেন, আমিও পার্‌ব না কেন?"

—"কিন্তু তোমার ঠাণ্ডা লাগ্‌তে পারে।"

—"ঠাণ্ডা ত আমার একচেটে সম্পত্তি নয়, যে আমিই কেবল একলা ভোগ কর্‌ব। তবে আপনার যদি আপত্তি থাকে ত বলুন, আমি না-হয় ফিরেই যাচ্ছি।"

—"না, না, আপত্তি আবার কিসের। তবে—"

—"তবে আমার জন্যে আপনার কবিত্ব-স্রোতে ভাঁটা পড়্‌তে পারে,—কেমন, আপনি এই কথা বল্‌তে চান ত? ভয় নেই, আমি পিছনে পিছনে খালি শ্রোতাই হ'য়ে থাক্‌ব, কোন বাধা দেব না।"

রতন আর কিছু বল্‌লে না।

পূর্ণিমা হেসে বল্‌লে, "সুমিত্রা, তুমি এত কথা শিখ্‌লে কোত্থেকে?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "জানি না। বোধ হয় গেল-জন্মে আমি তোতাপাখী ছিলুম। অন্ততঃ আমার বাবা তো প্রায়ই এ-কথা ব'লে থাকেন।"

তিনজনে পাশাপাশি চল্‌তে লাগ্‌ল—অনেকক্ষণ। রতন সুমিত্রার উপরে সত্যসত্যই চ'টে গিয়েছিল—সেই 'আদিদম্পতি'র অশোভন ইঙ্গিতের জন্যে। কাজেই কথা-বার্ত্তা আর বড় হ'ল না।......

পূর্ণিমা হঠাৎ বল্‌লে, "রতন-বাবু, দেখুন—দেখুন, কী ও-গুলো?"

—"হরিণ।"

শুনেই সুমিত্রা তাদের দিকে ছুটে' গেল। কিন্তু খানিক দূর যেতে না যেতেই হরিণের পাল একটা বালিয়াড়ির আড়ালে অদৃশ্য হ'ল। সুমিত্রা ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বল্‌লে, "হরিণগুলো ভারি দুষ্টু!"

আরো কিছুদূর এগিয়ে পূর্ণিমা বল্‌লে, "এইবার আমার পা ব্যথা কর্‌ছে, গাড়ীতে ফিরে যাই।"

রতন বল্‌লে, "তুমিও যাও সুমিত্রা।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আর আপনি?"

—"আমি এখন যাব না, আজকের এই রাত আমার বড় ভালো লাগ্‌ছে।"

—'তবে আমারও সেই মত জান্‌বেন, গাড়ীর গর্ত্তের মধ্যে এত শীঘ্র আমার ঢুক্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে না।'

পূর্ণিমা একলাই ফিরে গেল।......

আরো খানিকটা এগিয়ে সুমিত্রা পিছন ফিরে' দেখ্‌লে, বালু-প্রান্তরের মাঝখানে এক জায়গায় কতকগুলো তালগাছ—পাছে মরুভূমি ছিনিয়ে নেয় যেন এই ভয়েই—একসঙ্গে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদেরই পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে চাঁদকে—ঠিক একখানি ছবির মত!

সুমিত্রা উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠ্‌ল, "দেখুন রতন-বাবু!"

রতন ফিরে দেখে' বল্‌লে, "হুঁ, চমৎকার!"

—"কিন্তু এ দৃশ্য আরো চমৎকার হ'ত, পূর্ণিমা যদি এখানে থাক্‌ত। না রতন-বাবু!"

রতন রাগ ক'রে বল্‌লে, "সুমিত্রা, তোমার বাচালতা আর আমার ভালো লাগ্‌ছে না। তুমি ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "আমাকে যে আপনার ভালো লাগে না, আমি ত তা জানিই। আমি আস্‌বার আগে আপনি কত কথা কইছিলেন, কিন্তু আমি আসার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনি যেন মুখে তালা-চাবি দিয়ে আছেন।"

—"হ্যাঁ, তার কারণ, তুমি এসেই এমন একটা অভদ্র ইঙ্গিত করেছিলে, যার পরে আর কথা কওয়া চলে না।"

—"অভদ্র ইঙ্গিত?"

—"হ্যাঁ, অভদ্র ইঙ্গিত। পূর্ণিমা কি মনে করেছেন, তা, জানি না।"

—"ভয় নেই, পূর্ণিমা রাগ করে ত আমার উপরেই কর্‌বে, আপনার উপরে নয়। পূর্ণিমার রাগকে আপনি ভয় কর্‌তে পারেন—আমি করি না।"

রতন অত্যন্ত অধীরভাবে বল্‌লে, "সুমিত্রা! ফের তুমি ঐ সুরে কথা কইছ?"

—"হ্যাঁ, আমার খুসি, আমি এই ভাবেই কথা কইব!"

রতন দাঁড়িয়ে প'ড়ে বল্‌লে, "অমন অভদ্রভাবে আর একটি কথা বল্‌লে, তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাক্‌বে না।"

—"সম্পর্ক রাখ্‌তে না চান, রাখ্‌বেন না।"

—"বেশ!" ব'লে রতন তাড়াতাড়ি সাম্‌নের দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

খানিক পরে পিছন ফিরে' দেখ্‌লে, সুমিত্রা তার সঙ্গে নেই। প্রথমে সে ভাব্‌লে, সুমিত্রা গাড়ীতে ফিরে' গেছে। কিন্তু তার পরেই দেখ্‌লে, গাড়ীগুলোর একখানাও নজরে পড়্‌ছে না। একটা মস্ত বালির পাহাড় তার দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তার ভয় হ'ল, সুমিত্রা যদি এক্‌লা পথ ভুলে অন্যদিকে গিয়ে পড়ে! রতন ব্যস্ত-ভাবে আবার ফিরে' চল্‌ল।

কিন্তু বেশীদূর আর আস্‌তে হ'ল না, একটু এসেই রতন অবাক্ হ'য়ে দেখ্‌লে, পথের ধারেই একটা কাঁটা-ঝোপের পাশে, সুমিত্রা দুই হাঁটুর মাঝে মুখ রেখে চুপ করে' বসে' আছে!

রতন তার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "একি সুমিত্রা, এখানে এমন ক'রে বসে' কেন?"

সুমিত্রা পাথরের মূর্ত্তির মতই নিঃসাড় হ'য়ে ব'সে রইল।

—"সুমিত্রা! শুন্‌ছ? লক্ষ্মীটি, ওঠ!"

সুমিত্রা জবাব দিলে না, মুখও তুল্‌লে না!

অদূরে গাড়োয়ানদের গলা পাওয়া গেল। রতন ব্যস্ত-কণ্ঠে বল্‌লে, "ওঠ, ওঠ—সুমিত্রা! আনন্দ-বাবু যদি দেখ্‌তে পান, তা হ'লে কি ভাব্‌বেন বল দেখি?"

সুমিত্রা আস্তে আস্তে মুখ তুল্‌লে। পরিপূর্ণ চাঁদের আলোয় রতন দেখ্‌লে, সুমিত্রার চোখে ও কপালে কি চক্‌চক্ ক'রে উঠ্‌ল! অশ্রু?

রতন সবিস্ময়ে বল্‌লে, "অ্যাঁঃ, সুমিত্রা! তুমি কাঁদ্‌ছ? কেন, আমি কি তোমাকে—"

সুমিত্রা বিদ্যুতের মতন দাঁড়িয়ে উঠে' তীব্রস্বরে বল্‌লে, "কেন আপনি আমাকে বিরক্ত কর্‌ছেন? আপনার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক?"—বল্‌তে বল্‌তে সে দ্রুতপদে গাড়ীর দিকে চ'লে গেল।

রতন হতভম্বের মত সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

আধখানি চাঁদ

আধখানি চাঁদ যায় ভেসে—কার
অলস তরণী,—
কে দ্যায় পাড়ি সুদূর নীলের
স্বপন-সরণি।
মোতির নরী খোঁপায় পরি'
খেলায় যত জ্যোতির পরী,
উরস 'পরে উজল ওড়ে
জরীর ওড়নী;
নীরব নিশি—নিথর দিশি
যূথির বরণী।

আধখানি চাঁদ চায় হেসে কার
মধুর চাহনি,—
বয়ন করে মোহন মায়া
নয়ন-গাহনী।
আকাশেরি অসীম ছেয়ে
খুসীর ঝারা ঝর্‌চে যে এ,
ভুলোক ধরে পুলক-ভরে
দ্যুলোক-লাবণি;
আধখানি চাঁদ কাহার চাওয়া
নিখিল-পাবনী!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী



বাংলা

ধানের ভবিষ্যৎ—

এবার বঙ্গদেশে বৃষ্টি খুব কম হওয়ায় পল্লীবাসী জনসাধারণ খুবই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে তাহাদের কৃষি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, আমন ধান্যের আর আশা নাই, অন্যদিকে পানীয় জলের অভাব ভীষণভাবে উপস্থিত হইবে মনে করিয়া পল্লীবাসী অতীব চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। জলাভাব উপস্থিত হইলেই ব্যাধির প্রাবল্য ঘটিবে, ফলে অন্নাভাব, জলাভাবের কষ্টের উপর আবার ব্যাধির প্রবল পীড়ন আরম্ভ হইবে। —যশোহর

বন্যার কারণ—

গঙ্গা, যমুনা ও গোমতীর স্ফীত জলরাশি বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের সহস্র সহস্র দরিদ্রকে অন্নহীন, গৃহহীন করিয়াছে। উত্তরবঙ্গে যখন গত বৎসর বন্যা হইয়াছিল, তখন ভবিষ্যতের বন্যা নিবারণের জন্য কারণ অনুসন্ধানের কথা উঠিয়াছিল। রেলওয়ে লাইনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জলনিকাশের ব্যবস্থার জন্য প্রণালী-নির্ম্মাণের কথা উঠিয়াছিল। তার পর কি হইল, সাধারণে কিছু জানে না। আবার যখন বন্যা আসিবে তখন সনাতন ক্রন্দন আবার জাগিবে। বন্যার কারণ অনুসন্ধানের খোঁজ পড়িবে। লক্ষ্ণৌ-বন্যা সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া, এলাহাবাদের 'লীডার' পত্রিকা বলিয়াছেন, বন্যার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি "অনুসন্ধান-কমিটি' নিযুক্ত করা হউক। কমিটি বন্যার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে উক্ত কারণগুলি দূর করিবার ব্যবস্থা করা হউক।

যদি হোমরা-চোমরা মডারেট্ ধামাধরা দল, হুজুরের দরবারে ধন্না দিয়া পড়েন, তাহা হইলে একটা অনুসন্ধান-কমিটি নিযুক্ত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু অনুসন্ধান-সমিতির উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যখন টাকার কথা উঠিবে, তখনই কর্ত্তারা দুঃখিতভাবে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া বলিবেন 'টাকা নাই'! 'টাকা নাই' এই সনাতন উত্তরের উপর অবশ্য আর কোন তর্কই চলে না। অতএব ঐ-সব অনুসন্ধান-কমিটির ব্যর্থ অনুষ্ঠানের জন্য ভারতবাসীর পক্ষ হইতে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর মাত্র। যে জাতি নিজের ন্যায়সঙ্গত ও বিধিনির্দ্দিষ্ট অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যম প্রকাশ করে না, যাহারা নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য লজ্জিত হয় না, তাহাদের দুঃখ স্বয়ং বিধাতাও দূর করিতে পারেন না। প্রতিকারের শক্তি ও উপায় আয়ত্তের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, যাহারা আত্মশক্তিতে অনাস্থা প্রসূত ভীরুতায় সর্ব্বদা সঙ্কুচিত,—তাহাদের এই শোচনীয় অসহায় মরণ, স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে। চাঁদার টাকার মুষ্টিভিক্ষার নিকট আত্মসম্মান বিক্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপর যতদিন আমাদের ঘৃণা না জন্মিবে ততদিন এই মৃত্যুর অভিযান কিছুতেই প্রতিহত হইতে পারে না। বন্যার কারণ প্রকৃতপক্ষে এই পরশাসিত জাতির লজ্জাকর পরমুখাপেক্ষিতা; আর কিছু নহে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বেণ্ট্‌লি সাহেব বন্যার জন্য রেলওয়ে লাইনের উপর দোষ দিয়াছিলেন। আর চৌষট্টিহাজারী মন্ত্রী সুরেন্দ্রনাথ অতিবৃষ্টির উপর দোষ সমর্পণ করিয়া প্রচুর আত্মপ্রসাদে আরামে ৬৪ হাজার উপভোগ করিতেছেন।

ডাকাতি ও পুলিশ—

পুলিশ ও গুণ্ডা—পুলিশ যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডার দলও ভারী হইয়া উঠিতেছে। ১৯১৮ সালে কলিকাতায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন ২৮ জন—আর এখন হইয়াছেন ৫৬ জন। উভয়ের মধ্যে কার্য্য-কারণের কোনও সম্বন্ধ নাই কি?

—আত্মশক্তি

বাংলার ধাতুশিল্প—

বঙ্গদেশের যে সব জেলা তামা কাঁসা প্রভৃতি ধাতব তৈজসপত্র প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

বর্দ্ধমান—বনপাশ, দাঁইহাট, পূর্ব্বস্থলী, কালনা, মাটিয়ারীতে বড় বড় ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র, রান্নার জন্য পেটা হাঁড়ি প্রস্তুত হয়।

বীরভূম ও বাঁকুড়া—দুবরাজপুর নলহাটি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পাত্রসায়র প্রভৃতির বাসন প্রসিদ্ধ। বাঁকুড়া বড় বড় জলের ঘড়ার জন্য প্রসিদ্ধ।

হুগলী—বালি এবং বাঁশবাড়িয়া ও খামারপাড়াতে অতি উন্নতধরণের বাসন প্রস্তুত হয়।

মেদিনীপুর—চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, ক্ষীরাই ও ঘাটাল প্রসিদ্ধ। ঘাটালের গাড়ু এবং ক্ষীরাইয়ের থালা বিখ্যাত।

নদীয়া—নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাণাঘাট, এবং মেহেরপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

মুর্শিদাবাদ—খাগড়াই বাসন চিরবিখ্যাত। জঙ্গীপুরও এদিক্ দিয়া বেশ উন্নত। খাগড়ার গেলাস, ডিশ, বাটি বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীময় উহাদের খ্যাতি ছড়াইয়া গিয়াছে।

ঢাকা—ঢাকা জেলার বহু স্থানে কাঁসার কাজ হইয়া থাকে। লৌহজং পিত্তলের চাদরের জিনিষ প্রস্তুতের জন্য বিখ্যাত।

মৈমনসিংহ—ইসলামপুরী থালা প্রসিদ্ধ। টাঙ্গাইলের অন্তর্গত কাগমারী খুব প্রসিদ্ধ।

ফরিদপুর—পাংসা, রাজবাড়ী, সমধিক প্রসিদ্ধ।

ত্রিপুরায় বিটঘর; রাজসাহীতে নাটোরের অন্তর্গত কলম, ও বুধপাড়া প্রসিদ্ধ।

মালদহ—ইংলিশবাজার অন্তর্গত কুতুবপুরের পিতলের লোটা অতি সুন্দর। নবাবগঞ্জও প্রসিদ্ধ।

রঙ্গপুরের নিলফামারীর অন্তর্গত গোমনতীতে পিতল ও কাঁসার জিনিষ প্রস্তুত হয়।

—মোহাম্মদী

বাংলার নারী—

বাংলা দেশের হিন্দু নারীর সংখ্যা ৯৬, ৬৭, ৪৪৮ জন। ইহার মধ্যে ১৫ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবার সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ২৪, ৭৫, ৯০৬ জন।

—কল্যাণী

১৫ বৎসরের বিধবার বিবাহ দিতে গেলেও এ দেশের লোক মারিতে আসে। অথচ ইংরেজের অবিচারের প্রতিকার এখনই চাই। সুন্দর সামঞ্জস্য বটে!

দান—

শ্রীমতী হরিমতী দত্ত নূতন গৃহনির্ম্মাণের জন্য নারী শিক্ষা-সমিতিকে ২৫০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। গত বছর তিনি ঐ সমিতিকে ১০,০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

—স্বদেশ

শ্রীহট্টের বন্দরবাজারের স্বনামধন্য বণিক্ শ্রীযুক্ত জয়ারমল তুলসীয়াল মহাশয় ডাক্তার সাহেব মিঃ মেকরের হস্তে ৫০০০৲ দান করিয়াছেন। তাঁহার দানের টাকা দ্বারা শ্রীহট্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের অপারেশন গৃহ নির্ম্মিত হইবে এবং গৃহ জয়ারমল তুলসীয়াল অপারেশন রুম নামে অভিহিত হইবে। (পরিদর্শক)

—আনন্দবাজার পত্রিকা

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ে দান।—মাণিকতলা মিউনিসিপালিটী কলিকাতার জাতীয় আয়ুর্ব্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ে ১৯২৩-১৯২৪ সনের জন্য ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

—সম্মিলনী

পুরাতন প্রথায় শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করিবার জন্য কাশিমবাজারের মহারাজা 'পলিটেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট' নামে যে স্কুল খুলিয়াছেন, তাহার গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ১০১।১ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীটের শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী ভড় ৪০০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

—স্বদেশ

ঢাকা অনাথ-আশ্রম—

ঢাকা অনাথ আশ্রমে এক বৎসরের শিশু হইতে ১৮ বৎসরের ১৩টি বালক ও ১৪টি বালিকা আছে। তাহাদের অত্যন্ত বস্ত্রাভাব। বস্ত্র দান করিয়া পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় বালকবালিকাদের কৃতজ্ঞতা ও ভগবানের আশীর্ব্বাদভাজন হউন।

আশ্রমের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা অনাথ আশ্রম ঢাকা, কর্ত্তৃক বস্ত্র অথবা অর্থসাহায্য কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

স্বাধীন জীবিকার পথ—

পেয়ারা বাগান।—পেয়ারা একটি উৎকৃষ্ট ফল। বঙ্গদেশের সাধারণ পেয়ারা অতি অপকৃষ্ট। বঙ্গদেশের লোকেরা দস্তুর মতন পেয়ারার বাগান করে না। অযত্ন-সম্ভূত গাছে আর কি ভাল ফল হইবে? পশ্চিমে এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি বহু জেলায় উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা জন্মে। ঐসকল স্থানে দস্তুর মতন পেয়ারার বাগান করা হয়। কলিকাতায় সেই সকল পেয়ারা রাশি রাশি আমদানী ও বিক্রয় হইয়া থাকে। কলিকাতায় কাফ্রি পেয়ারা নামক এক জাতীয় বৃহৎ পেয়ারা আছে। কলিকাতা হইতে ১৫।২০ মাইল দূরে—রেল ষ্টেশনের নিকটে যদি কেহ পেয়ারা বাগান করেন, আর এলাহাবাদ, কাশীর বা অন্য-প্রকার বৃহজ্জাতীয় পেয়ারার চারা বা কলম রোপণ করেন, তবে বেশ লাভবান্ হইতে পারেন। ১০ হাত তফাৎ কলম বসাইলে ৮×৮=৬৪টা গাছ হইতে পারে। ২,৩ বৎসরের মধ্যেই ফলন আরম্ভ হয়। ৪।৫ বৎসর পরে বেশ ফলে। তখন গাছ প্রতি গড়ে ১০০ পেয়ারা হইলে ২৲ শ' হিসাবে ১২৮৲ টাকার পেয়ারা এক বিঘা জমিতে হইতে পারিবে। ডাল ছাঁটা, মাটি কোপাইয়া দেওয়া, জঙ্গল পরিষ্কার করা প্রভৃতি প্রধান কাজ। সুতরাং ২৮৲ খরচ পড়িলেও ১০০৲ টাকা লাভের আশা করা যাইতে পারে। ঐসকল স্থানে প্রতি বিঘা জমি ২০০৲ মূল্যে খরিদ করিলেও ২ বৎসরে জমির মূল্য উঠিয়া যাইবে। কলম না কিনিয়া পাকা পেয়ারার চাষ করিলেও চলিতে পারে। একবার গাছ জন্মিলে আর কলম করিবার অসুবিধা থাকিবে না। কেহ অন্ততঃ ৫ বিঘা জমিতে পেয়ারার বাগান করিলে বৎসরে ৫।৬ শত টাকা আয়ের উপায় হইবে। পেয়ারা বাগানের ভিতর হলুদ এবং আদার চাষ করিলে আর একটি আয়ের পথ হইতে পারে। কবে আমাদের যুবকগণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিবে, বুঝিতে পারি না।

পাতি ও কাগজীলেবুর বাগান।—বাঙ্গালাদেশের নানা জেলায় পাতিলেবু ও কাগজীলেবু বিস্তর জন্মে। ইহারও দস্তুর মতন বাগান করিলে প্রচুর লাভের আশা করা যাইতে পারে। কলিকাতায় এই উভয়প্রকার লেবু উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালার অল্প স্থানেই নিয়মিতরূপে ইহার বাগান করা হইয়া থাকে। শুনা যায়, মালদহ জেলায় পাতিলেবুর বিস্তর বাগান আছে। পশ্চিম হইতে কলিকাতায় বহু লেবু আমদানী হয়। ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমাধীন চরমান্দারী, চরপাতা, রঘুনাথপুর, কাউনিয়া প্রভৃতি গ্রামে, এবং উহার নিকটবর্ত্তী নোয়াখালী জেলায় কতকগুলি গ্রামে বিস্তর কাগজীলেবু ও কমলালেবু জন্মে। ব্যাপারী ও ফড়িয়াগণ তাহা ক্রয় করিয়া নানাদিকে চালান দিয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় বিস্তর কাগজীলেবুর বাগান আছে। ঐসকল অঞ্চলে কাগজী ও পাতিলেবুর বিস্তৃত বাগান করিলে খুব লাভবান্ হওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রায় সকল জেলাতেই পাতি এবং কাগজীলেবুর বাগান হইতে পারে। আমরা এদিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

—জোলতান

ছাপাখানার বিপদ—

অনেকেই অবগত নহেন যে, ছাপাখানার ব্যবসায়ে কিরূপ নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। বিলাতে বেকার সমস্যার ন্যায় বাঙ্গলাতেও বেকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় বেকারের সংখ্যা যতই বেশী হউক, বিলাতের বেকারের অন্ন সর্ব্বাগ্রে জুটাইতেই হইবে। বিলাত হইতে ছাপাখানাওয়ালাদের দালাল কলিকাতার বাজারে ঘুরিতেছেন, ইঁহারা এখানকার বাজার অপেক্ষা সস্তাদরে কাজ লইতেছেন, ফলে কলিকাতার বাজারে ছাপাখানার কাজের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয়ই হইতেছে। এখান হইতে বিলাতের দর হ্রাস হইবার প্রভূত কারণ আছে। আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্টের শুল্ক-আইন এই বিষয়ে তাহাদের বিশেষ সাহায্যকারী। কলিকাতার বন্দরে যে কাগজ আমদানী হয়, গবর্ণমেণ্ট্ তাহার একটা সর্ব্বনিম্ন দর বাঁধিয়া দিয়াছেন, যাহার সহিত প্রকৃত ক্রয়ের দামের কোন সম্পর্ক নাই। গবর্ণমেণ্টের এই যে নিরিখ, ইহা সম্পূর্ণ তাঁহাদের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেই দরের উপর গবর্ণমেণ্ট্ হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা হারে শুল্ক আদায় করা হয়, ফলে কাগজের দর বাজারে কমিতেছে না। ইহার ফলে এখানকার ছাপাখানার কাজের বিশেষ দর কমাইবার সুবিধা হইতেছে না,—কিন্তু বিলাত হইতে যে কাগজ ছাপিয়া আসিতেছে তাহার উপর যে শুল্ক আদায় হয়, তাহা ইনভয়েসের উল্লিখিত

দরের উপর শতকরা ৫ ৲ টাকা হিসাবে মাত্র। ইহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও ন্যায়বিগর্হিত।—(হিতবাদী)—আনন্দবাজার পত্রিকা

চর্‌কা-প্রচারের উপকারিতা—

রাজসাহীর কামারগাঁও কেন্দ্রে চর্‌কার কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। অনেক বৃদ্ধা রমণী তাঁহাদের পূর্ব্বশিক্ষানুযায়ী ১২ নম্বরের ৬০ তোলা সূতা সপ্তাহে কাটিয়া ১ ৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। বগুড়ার তালোরাতে সূতাকাটা বেশ চলিতেছে। এমন কি নয় বৎসরের বালিকাও সূতা কাটিয়া দৈনিক এক আনা উপার্জ্জন করিতেছে। বগুড়ার দক্ষিণাঞ্চলের ফসলের অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ না হওয়ায় লোকেরা দুঃখে পড়িয়া চর্‌কা চালাইতে বাধ্য হইয়াছে।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

পতিতা নারীদের সঙ্ঘ—

সম্প্রতি কলিকাতার সোনাগাছি ও রামবাগানের পতিতাগণ সম্মিলিতা হইয়া "মুক্তিসমাজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, পতিতাগণের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করাইয়া অন্যবৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য করা, পতিতাদের বালিকা কন্যারা যাহাতে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন না করিয়া কোন সদুপায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্যে পতিতাদের বালিকা কন্যাদের জন্য স্কুল, কলেজ ও বোর্ডিং স্থাপন করা প্রভৃতি। ইহা ছাড়া যে-সকল ভদ্রগৃহস্থ কন্যা বুদ্ধির ভ্রমে ও দৈবদুর্ব্বিপাকে এই পথে আসিয়া পড়ে, এই সমিতি উপদেশ দিয়া তাহাদের নিবারণ করিবে এবং ভদ্রভাবে জীবনযাপন করিতে সাহায্য করিবে। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোকের শিক্ষা, উপদেশ ও পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে।

—মোহাম্মদী

অনুকরণীয় সামাজিক সংস্কার—

বরোদায় অস্পৃশ্যতা—বরদার গাইকোবাড় স্বীয় রাজ্য হইতে অস্পৃশ্যতা দূর করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। অন্ত্যজ জাতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন এবং দরিদ্র অন্ত্যজ ছাত্রগণকে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যে তিনি চিরদিন মুক্তহস্ত। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি তাহাদিগের অনেককে রাজকার্য্যে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের সামাজিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি বিধান করিয়াছেন। তাহারা এখন নিজেরাই নিজেদের উন্নতি বিধানে অনেকটা সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে এবং মদ্যপান একেবারেই কমাইয়া দিয়াছে।

—আত্মশক্তি

বাঙালীর সাহস—

বালকের বীরত্ব—নদীয়া জেলার বালিয়াডাঙ্গা-নিবাসী এক ভদ্রলোককে একদিন বনের মধ্যে বাঘে ধরে। ভদ্রলোক প্রাণ-ভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া এক চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় বালক তাঁহাকে সাহায্য করিতে গমন করে। বালকের বীরত্বে বাঘ পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং ভদ্রলোকটিও প্রাণে প্রাণে রক্ষা পান।

—আত্মশক্তি

মৃত্যু-সংবাদ—

পরলোকে পিয়ার্সন্। ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য মিঃ পিয়ার্সন্ সম্প্রতি ইটালী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে শুনিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। মিঃ পিয়ার্সন্ বহু বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও মিশনারী কলেজে অধ্যাপক হইয়া আসেন। তিনি ছাত্রদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহাদের সহিত ভ্রাতৃবৎ আচরণ করিতেন। কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল নাকি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এইভাবে বাঙ্গালী ছাত্রদের সহিত মিশিলে প্রেষ্টিজ (ইজ্জত) বজায় রাখা শক্ত হইবে। মিঃ পিয়ার্সন্ সেদিন হইতে মিশন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। তিনি নিবেদিতার ন্যায় বাঙ্গালীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, এবং বাংলাদেশের সেবাকেই জীবনের প্রধান ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির মৃত্যুতে বাঙ্গালী মাত্রেই আজ ব্যথিত। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

—ঢাকা-প্রকাশ

৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ—বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির অধ্যক্ষ, প্রাগ্-নন্-কো-যুগের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী, দার্শনিক পণ্ডিত, বাঁকিপুরের প্রবাসী বাঙ্গালী রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর পরলোক গমন করেছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি। তাঁর পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুক।

—বিজলী

মহিলার মৃত্যু:—আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় গত ৩রা অক্টোবর বেলা একটার সময় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বোম্বাই সহরে জাতীয় কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে বাঙ্গলার মহিলা-প্রতিনিধিরূপে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দাশের সঙ্গে ইনিও উপস্থিত ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনা বিধান করুন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

অশ্বিনীকুমার দত্ত—

গত ২১ কার্ত্তিক তারিখে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের একজন যথার্থ সাধু, উদারচেতা, একনিষ্ঠ কর্ম্মী অপসৃত হইল। তাঁহার আজীবন দেশসেবা, ঈশ্বরপরায়ণ চরিত্র বাঙালীর অনুকরণের বিষয়।

সেবক

—

ভারতবর্ষ

বিহারে গান্ধী সঙ্ঘ—

সার্চ্চলাইট' সংবাদ দিতেছেন—মতিহারীতে বিহার প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় বিশিষ্ট বিশিষ্ট অসহযোগীগণ মিলিত হইয়া একটি সভা করেন। 'গান্ধী সঙ্ঘ' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান খুলিবার কথা এই সভায় স্থির হইয়াছে। কেবল মাত্র দৃঢ়সঙ্কল্প-বিশিষ্ট এবং পরীক্ষিত কর্ম্মীদিগকেই ইহার সভ্য করা হইবে। সভ্যদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে দেশের জন্য তাহারা জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত নীতির প্রচার করা এবং উহা পালন করাই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য।

রাজকোটের উন্নতি—

কাঠিয়াবাড়ের রাজকোট রাজ্য দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই উন্নতির স্বরূপটা নিম্নলিখিত তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। রাজকোট রাজ্যে মোট প্রজার সংখ্যা ৬৬০৯৩ জন, উহার ভিতর ৩০৯৯৩ জন পুরুষ ও ৩৫১০০ জন রমণী। সমস্ত প্রজার ভিতর ২৭০০০ জন বর্ত্তমানে ভোটাধিকারী। এই ভোটাধিকারীদের ভিতর ১৩০০০ রমণী আছেন।

রমণীকে এতখানি অধিকার ভারতবর্ষের আর কোথাও দেওয়া হয় নাই।

লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটির দৃঢ়তা—

লর্ড রেডিংএর আগমন উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটি এবার তাঁহাকে কোনো রকমের অভিনন্দন প্রদান করেন নাই। গত ২৫ বৎসরে লক্ষ্ণৌয়ে এরূপ ব্যাপার আর কখনও সঙ্ঘটিত হয় নাই। এমন কি জালিয়ানবাগের হত্যাকাণ্ড এবং রাউলট আইন বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড লাক্ষ্ণৌয়ে অভিনন্দন পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও মানুষের মন যে বদ্‌লাইয়া যাইতে সুরু হইয়াছে—এইগুলিই তাহার প্রমাণ।

বোম্বাই কাউন্সিলের নির্ব্বাচন—

বোম্বাই সহরের অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(১) মিঃ কে পি করিমন
(২) ডাক্তার ভেল্কার
(৩) মিঃ কে এস দাদাচান্‌জী
(৪) মিঃ জয়সুখলাল কে মেহেতা
(৫) মিঃ পুজাভাই ঠাকরসী
(৬) মিঃ এ এন সুর্ব্বে

এই ছয় জনের ভিতর মিঃ দাদাচান্‌জী এবং মিঃ সুর্ব্বে ব্যতীত আর সকলেই স্বরাজ্য দলের লোক। সুতরাং বোম্বাইএ লোকমত যে স্বরাজ্য দলকেই সমর্থন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বারাণসীতে সন্তরণ প্রতিযোগিতা—

গত ২২শে অক্টোবর কাশীর সেণ্ট্রাল সুইমিং ইউনিয়নের উদ্যোগে টিকারী ঘাট হইতে অহল্যাবাই ঘাট পর্য্যন্ত ১১ মাইল সন্তরণের প্রথম বার্ষিক প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। প্রতিযোগিতায় তিনজন বাঙ্গালীই প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। প্রথম যিনি হইয়াছেন তাঁহার নাম শ্রী কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—বয়স ১৮ বৎসর। দ্বিতীয় স্থান যিনি অধিকার করিয়াছেন তাঁহার নাম শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বয়স ১৯ বৎসর। তৃতীয়স্থানাধিকারীর নাম শ্রী ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী—বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

শারীরিক ব্যায়ামে বাঙ্গালী সকলের পিছনে পড়িয়া আছে। সুতরাং সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় তাহাদের এই দক্ষতার পরিচয় পাইয়া বাঙ্গালী মাত্রেই আনন্দিত হইবে।

সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ—

ছয় জন পার্শী যুবক সাইকেলে সমস্ত পৃথিবী তিন বৎসরে পরিভ্রমণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা বোম্বাই হইতে সাইকেলে চড়িয়া আগ্রা হইয়া দিল্লী পৌঁছিয়াছেন এবং সেখান হইতে লাহোর হইয়া সীমান্ত-প্রদেশ দিয়া কাবুল ও পারস্য যাত্রা করিবেন।

এরূপ সাহসিকতার উদাহরণ পাশ্চাত্য দেশে দুর্ল্লভ না হইলেও এদেশে এরূপ উদাহরণ সুলভ নহে। আমরা এই পার্শী যুবক কয়টিকে অন্তরের আনন্দের দ্বারা অভিনন্দিত করিতেছি।

মহীশূর-রাজ্যে শাসন-সংস্কার—

মহীশূর-রাজ্যের মহারাজা বাহাদুর বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির সংস্কার করিয়া এক ঘোষণাপত্র বাহির করিয়াছেন। এই ঘোষণা অনুসারে তাঁহার পরলোকগত পিতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এসেম্ব্লিকে ঢের বেশী ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। এখন হইতে কোনো নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিতে গেলে এই পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ জরুরী ব্যাপার ব্যতীত ব্যবস্থা-পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধানের প্রবর্ত্তন করিতে হইলেও এই সভার মত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ শাসন-সংক্রান্ত কার্য্য বা রাজ্যের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়নের প্রস্তাব পাশ মহারাজা নিজেই করিতে পারিবেন।

সাধারণতঃ ২৫০ জন সদস্য লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া ২৭৫ জন পর্য্যন্ত সদস্য গৃহীত হইতে পারিবে।

১৬ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা-পরিষদ্ গঠিত হইয়াছিল তাহার ক্ষমতাও বাড়ানো হইয়াছে। অতঃপর উক্ত পরিষদে প্রতিনিধিসংখ্যা তো বৃদ্ধি হইবেই, সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা বাড়াইবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। বাজেটের সময় এই পরিষদের খরচ-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে।

প্রতিনিধি পরিষদ্ এবং ব্যবস্থা-পরিষদের ক্ষমতাবৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে এই উভয় পরিষদেই প্রতিনিধি প্রেরণের উপযুক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। নির্ব্বাচনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে এখন যে-পরিমাণ সম্পত্তি থাকা দরকার অতঃপর তাহার অর্দ্ধেক সম্পত্তিতেই নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করা যাইবে।

মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড, তালুক-বোর্ড এবং পঞ্চায়েতের ক্ষমতা আরো বাড়াইয়া দিয়া স্থানীয় শাসন-ব্যাপারে এই-সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আরো অধিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হইবে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন—

পঞ্জাব-সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১০ই নবেম্বর অমৃতসরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিবে। পরদিন নিখিল-ভারত-নেতাদের পরামর্শ-সভা। ডাঃ কিচ্‌লু সত্যাগ্রহ কমিটির সদস্যদিগকে ১৩ই তারিখ অমৃতসরে সমবেত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন। লালা গিরিধারী লাল ও লালা রূপলাল পুরী নেতাদের এবং সদস্যগণের জন্য সকল প্রকার আয়োজন করিতেছেন।

অমৃতসরে, নিরুপদ্রব আইন-অমান্য সম্পর্কেও একটি আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনের পূর্ব্বে তাহার কাজ আরম্ভ হইবে না।

বক্তৃতার প্রতিযোগিতা—

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মালবীয় এলাহাবাদ হইতে জানাইয়াছেন—আগামী জানুয়ারী মাসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনের সময় নিখিল-ভারত-বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার তৃতীয় অধিবেশন হইবে। সেই প্রতিযোগিতায় যিনি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবেন তিনি একটি রৌপ্যনির্ম্মিত বিজয়চিহ্ন (trophy) পাইবেন। এতদ্ব্যতীত তিনজন শ্রেষ্ঠবক্তা ও মহিলা বক্তার প্রত্যেককে একটি করিয়া স্বর্ণপদক

পুরস্কার দেওয়া হইবে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ভিতর যাঁহারা এই বক্তৃতার প্রতিযোগিতা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিশদ বিবরণ জানিতে পারিবেন। রাইট্ অনারেব্‌ল্ লক্ষ্মীনারায়ণ কাজিল, ইউনিভার্সিটি পার্লামেন্ট্, বেনারস।

জেল-আইনের পরিবর্ত্তন—

জেলের আইন-কানুনের কতকগুলি সংশোধন করা হইয়াছে। জেলের ভিতর হাতকড়া পরাইবার নিয়মের কিছু রদ বদল করা হইয়াছে। অতঃপর কোন শাস্তি দিবার পূর্ব্বে কয়েদীকে ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন সেরূপ শাস্তি বহনের ক্ষমতা কয়েদীর আছে কি না। শাস্তির জন্যও নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া কয়েদী পুনঃ পুনঃ জেল নিয়ম অমান্য করিবে কেবল সেই ক্ষেত্রেই শাস্তি দেওয়া হইবে। শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে পরিশ্রমে কেহ অসমর্থ হইলে যে পর্য্যন্ত না সে কর্ম্মক্ষম হয় সে পর্য্যন্ত তাহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া হইবে। জেলে প্রবেশ করিবার পর কোন কয়েদী যদি দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৫২, ৩৫৩ বা ৩৯৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধে দণ্ডিত হয় অথবা জেলের কোন ওয়ার্ডার বা কর্ত্তৃপক্ষকে প্রহার করার জন্য দণ্ডিত হয় তাহা হইলে কারা-বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের মঞ্জুরী লইয়া তাহার দণ্ডের পরিমাণ-হ্রাস বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

বার-কমিটি—

ব্যারিষ্টার এবং উকিলদের ভিতর যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য সকাউন্সিল বড়লাট ভারত-সচিবের অনুমতি লইয়া এক কমিটি গঠন করিয়াছেন। এই পার্থক্য দূর করা কতদূর সম্ভব হইবে এবং কি ভাবে এই পার্থক্য দূর করা হইবে কমিটি তাহা লইয়া আলোচনা করিবেন। কমিটির সভাপতি হইবেন পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চীফ জাষ্টিস চামিয়ার সাহেব এবং সদস্য হইবেন—

(১) মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কাউট্‌স্ ট্রটার
(২) বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি দিন্‌শা ফার্দ্দুনজী মোল্লা
(৩) বাঙ্গালার এড্‌ভোকেট জেনারেল মিঃ এস আর দাস
(৪) বাঙ্গলা সরকারের সেক্রেটারী এইচ পি ডুবাল
(৫) ব্যারিষ্টার কর্ণেল স্যার হেনরী ষ্টানিয়ন
(৬) বোম্বাইএর উকিল সরকার সীতারাম সুন্দর রায় পাটকর
(৭) মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকিল টি রঙ্গচারিয়ার
(৮) কলিকাতা ল-সোসাইটির প্রেসিডেন্ট্ মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

কমিটির সেক্রেটারী হইবেন জে এইচ্ ওয়াইজ।
কমিটি নবেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সমবেত হইয়া প্রথম কার্য্য আরম্ভ করিবেন। তাঁহাদের রিপোর্ট ভারত-সরকারে দাখিল করিতে হইবে।

দিল্লীতে রয়্যাল কমিশন—

সিভিল সার্ভিস সম্পর্কীয় রয়্যাল-কমিশনের সভাপতি লর্ড লী, স্যার রেজিনাল্ড্ ক্রাডক এবং অন্যান্য সদস্যগণ গত ২রা নবেম্বর প্রাতে কৈশর-ই-হিন্দ্ নামক জাহাজে করিয়া বোম্বাই সহরে অবতরণ করিয়াছেন এবং সেই দিনই সন্ধ্যাকালে তাঁহারা স্পেশাল ট্রেনে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

কমিশনের প্রথম অধিবেশনের দিন সভাপতি লর্ড্ লী বলিয়াছেন—কমিশন সাতটি প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মচারীদিগকে ভারতগবর্মেন্টের কিম্বা প্রাদেশিক গবর্মেন্টের অধীন করা হইবে কি না, এ সম্বন্ধে কোনো পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে কি না, উক্ত সার্ভিসের কর্ম্মচারীদিগকে কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইবে, ইউরোপ হইতে কি পরিমাণ কর্ম্মচারী সংগ্রহ করা হইবে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমাইতে পারা যাইবে কি না। কর্ম্মচারীদের বেতন পেন্‌শন ভাতা ইত্যাদিও কমিশনের আলোচ্য বিষয় হইবে। কোন অভাব অভিযোগ আসিলেও কমিশন তাহার প্রতিকার সম্বন্ধেও বিবেচনা করিবেন।

কোকনদ কংগ্রেস—

কোকনদ কংগ্রেসের সেক্রেটারী নিম্নলিখিত বুলেটিন্ বাহির করিয়াছেন।—

কংগ্রেস মণ্ডপে মাত্র ১২০০০ লোকের স্থান হইবে। ৫০০০ প্রতিনিধি এবং ৪০০০ অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য বাদে মোট ৩০০০ দর্শকের স্থান হইবে।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদের স্থান তাঁহাদের অর্থ-সাহায্য অনুসারে নির্দ্দিষ্ট হইবে। তাঁহাদিগকে ১০০০ অথবা তদপেক্ষা বেশী, ৫০০৲, ২০০৲, ৫০৲, অথবা অন্ততঃ ২৫৲ টাকা চাঁদা দিতে হইবে।

দর্শকদের স্থানও তাঁহাদের টিকিটের মূল্য অনুসারে নিরূপিত হইবে। দর্শকদের টিকিটের মূল্য ১০০০৲, ৫০০৲, ২০০৲, ৫০৲ ও ২৫৲ টাকা হইবে। মহিলা-প্রতিনিধিদের টিকিটের সর্ব্বনিম্ন মূল্য মাত্র ১০৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছে।

দর্শকদিগকে টিকিটের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া নাম রেজেষ্ট্রি করিয়া রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। ১লা ডিসেম্বর হইতে ছাপানো টিকিট বাহির করা হইবে।

হে কংগ্রেস, 'দরিদ্রের কেহ নহ তুমি'।

হিন্দু মুসলমানে বিরোধ—

পর্ব্ব উপলক্ষে মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া হিন্দুরা যাহাতে বাজনা বাজাইয়া যাইতে না পারে নাগপুরে মুসলমানদের তরফ হইতে সেজন্য একটি প্রতিবাদ উপস্থিত করা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান নেতাগণ বিবাদের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইহার পরে ম্যাজিষ্ট্রেট মস্‌জিদের নিকট দিয়া হিন্দুদের বাজনা বাজাইয়া যাওয়া নিষেধ করিয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের এই আদেশের বিরুদ্ধে হিন্দুরা সত্যাগ্রহ করিয়া প্রত্যহ মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাজনা বাজাইয়া যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত ১৬০ জন এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। গত ৮ই নবেম্বর হিন্দুদের এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। এই শোভাযাত্রার ভিতর ডাঃ খারে, ডাঃ পরাঞ্জপে, ডাঃ চোল্‌কার, ডাঃ হেড্‌গুয়ার, শ্রীযুক্ত ওগেল, শ্রীযুক্ত ফিজেয়ার, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী, দেশমুখ প্রভৃতি জননায়কও উপস্থিত ছিলেন। পুলিশ তাঁহাদিগকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের একতরফা অন্যায় আদেশই যে হিন্দুদিগকে সত্যাগ্রহে উত্তেজিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাপারটিতে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘনীভূত হইয়া ওঠা যে কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষেই কল্যাণকর হইত না তাহা বলাই বাহুল্য। সুখের বিষয় এই বিবাদ আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

মান্দ্রাজের নির্ব্বাচন-ফল—

মাদ্রাজ সহর হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—ডাঃ সি নটেশন, মেসার্স মুদালিয়র, টনিকাচলম্ চেটী এবং বেঙ্কটাচলম্ চেটী। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন মিঃ এস সত্যমূর্ত্তি।

অকালী দলন—

অকালী আন্দোলন উপলক্ষে দলে দলে অকালীরা কারা-বরণ করিতেছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ভিতর সম্মানিত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও অভাব নাই। কয়েকজন কারারুদ্ধ অকালীর পদমর্য্যাদার পরিচয় অমৃতবাজার-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

বিদেশ

ইংলণ্ডে অবাধ-বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণ—

করদাতা মাত্রেরই শাসনপরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার যেদিন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রতন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, সেইদিন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রধারায় বিশেষ বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় করিয়া রাষ্ট্রনৈতিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্যই এই যে, নির্ব্বাচনে যে দল অধিক-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হয় সেই দলের হস্তে দেশের শাসন-ভার অর্পিত হয়। এই দলের শাসনে ব্যক্তির স্বাধীন মত স্ফূর্ত্তি পায় না; দলের মতকেই সর্ব্বদা মানিয়া চলিতে হয়। অবশ্যই কখনও কখনও শুধু একজন শক্তিধর পুরুষ দলের উপর প্রভাববিস্তার করিয়া দলের মত পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের মতের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় যে দলের নিকট ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যায়।

অনেক সময় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যে বিশেষ প্রয়োজনে দলটি গড়িয়া উঠিয়াছিল, অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেশের সে প্রয়োজন ঘুচিয়া গিয়াছে, তবুও দলটি ভাঙ্গিয়া যায় নাই। দল বাঁধিয়া প্রভুত্ব বজায় রাখিবার নেশায় দলের লোকগুলি একত্র রহিয়াছে এবং কোনও বিশেষ রাষ্ট্রধারার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা ইহাদের মধ্যে না থাকিলেও সংখ্যার জোরে ইহারা শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছে। নিজের কোনও বিশেষ লক্ষ্য না থাকাতে দেশ-শাসনের আদর্শ হীন হইয়া পড়ে ও ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ দেশের মঙ্গলের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের যে রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলি ছিল শ্রমিকদল আপন প্রভাব বিস্তার করিবার পূর্ব্বে তাহার অবস্থা কতকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আইরিশ স্বায়ত্তশাসনের অন্তর্ধানে যে মূল নীতিটি লইয়া উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলের বিরোধ ছিল তাহা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছিল। বাণিজ্য সংরক্ষণ-নীতি লইয়া যে আন্দোলন তাহাও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। সাম্রাজ্য-লিপ্সাও উভয় দলের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উভয়ের প্রভেদ বড় দেখা যাইত না, কেবল রাষ্ট্রনীতির আদর্শ লইয়া উভয়ের মধ্যে বাগ বিতণ্ডা চলিতেছিল। তাই বিশ্ব-যুদ্ধের সময় শৃঙ্খলা ও সংহতির জন্য ইংলণ্ডে যখন সমবেতভাবে রাষ্ট্র-পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হইল তখন লয়েডজর্জ্জের নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠন সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। যুদ্ধের পরে রাষ্ট্রনৈতিক চালবাজীতে লয়েড্ জর্জ্জ ক্রমাগত ফ্রান্সের নিকট হারিয়া যাওয়াতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তরুণ দল যখন লয়েড্ জর্জ্জের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, তখন হইতেই নূতন করিয়া ইংলণ্ডে দলাদলির সূচনা হইয়াছে। পুরাতন পন্থার প্রতি লোকের আস্থা না থাকাতে একটি অভিনব নীতির প্রবর্ত্তন না করিতে পারিলে দেশবাসী শ্রমিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে বুঝিতে পারিয়া রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদল আপনাদের আদর্শ নূতন ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা করিতেছেন। অবাধ-বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতি লইয়া ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনৈতিক জগতে পুরাতন বিরোধ। বিরোধে এককালে অবাধ-বাণিজ্যপন্থী উদারনৈতিকদল জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এখন ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হওয়াতে এই তর্কটি আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ড প্রধানতঃ নির্ম্মাণশিল্প ও ভারবাহী ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। কৃষিজাত দ্রব্য ইংলণ্ডে এত অধিক হইত না যে তাহা দ্বারাই ইংলণ্ডের অভাব ঘুচিতে পারে। বিনাশুল্কে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিলে সুলভে খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাইবে এবং তাহাতেই দরিদ্র লোকদের অন্নবস্ত্রের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া অবাধ-বাণিজ্য-নীতি ইংলণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল। সে সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প-সম্পত্তি অবিকশিত ছিল; কাজে কাজেই উপনিবেশের কোনও স্বার্থধারা এই প্রশ্নের সহিত জড়িত ছিল না। বর্ত্তমানকালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্য সংরক্ষণ ও তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ইংলণ্ডের একটি মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুদ্ধের অবকাশে মার্কিন ইংরেজের ভারবাহী ব্যবসা অনেকটা কাড়িয়া লইয়াছেন। ফ্রান্স রুরের কয়লার মালিক হইয়া পড়াতে শিল্পজগতে ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতেছে এবং জার্ম্মানীর ধনবৈষম্যের সুযোগ লইয়া নানাদেশের ব্যবসায়ী দেশ-বিদেশে সস্তায় জার্ম্মান মাল চালান দিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পকলার ক্ষতি করিতেছে।

নানাদিকের এই আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন ভিন্ন উপায়ান্তর নাই বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। গৃহজাত শিল্প রক্ষা করিতে হইলে বিদেশজাত শিল্পের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া দিয়া দেশজ শিল্পকে অপেক্ষাকৃত সুলভ রাখা ভিন্ন উপায় নাই বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। গৃহজাত শিল্পের পর, ইঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে-কোনও স্থানে উৎপন্ন দ্রব্যকে বিদেশীর দ্রব্য অপেক্ষা সুবিধাদরে বিক্রয়ের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য পছন্দমূলক শুল্কহার (Preferential tarril) সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন।

রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বল্ডুইন্ এই সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু বিগত নির্ব্বাচনে রক্ষণশীল দলের নেতা বোনার-ল সংরক্ষণ নীতি প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে নির্ব্বাচকগণের মত জানিবার জন্য নূতন নির্ব্বাচন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই নীতি প্রবর্ত্তন করিতে হইলে নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বল্ডুইন সাহেব সংরক্ষণ-নীতি প্রচার করাতে রক্ষণশীল দলের এক রবার্ট সেসিল ভিন্ন প্রায় সকল প্রধানেরাই তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছেন। উদারমতাবলম্বীরা কিন্তু অবাধ-বাণিজ্য-নীতির সমর্থন করিয়া সংরক্ষণ-নীতিকে বাধা দিবার জন্য দল বাঁধিতেছেন। লয়েড্ জর্জ্জ উদারনৈতিক দল পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবাধ-নীতির তিনি একজন গোঁড়া প্রতিপোষক; সেইজন্য তিনি সদলবলে আসকুইথ্ সাহেবের দলে যোগ দিলেন।

রক্ষণশীলদল বলেন যে, সংরক্ষণ-নীতি প্রবর্ত্তিত হইলে ইংলণ্ডের বেকার সমস্যা ঘুচিয়া যাইবে। শ্রমিকদল বলেন বেকার-সমস্যা সমাধানের সে পন্থা নহে। শ্রমিক-দলপতি হেণ্ডারসন্ ও র‍্যাম্‌সে ম্যাকডোনাল্ড্ সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহার ফলে ৬ই ডিসেম্বর ইংলণ্ডে আবার নূতন নির্ব্বাচন হইবে এবং সেই নির্ব্বাচনে নূতন মতবাদগুলির দ্বন্দ্ব খুব ফুটিয়া উঠিবে। দেখা যাউক ইংলণ্ডের সাধারণ অধিবাসী কোন্ মতবাদ গ্রহণ করে।

জার্ম্মানীতে আভ্যন্তরিক গোলযোগ—

যুদ্ধাবসানে ধ্বংসাবশিষ্ট জার্ম্মানীর নষ্টপ্রায় শিল্প-বাণিজ্যের

পুনরুদ্ধারের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভ করিবার জন্য জার্ম্মানীর ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের করায়ত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। র‍্যাটেনো, ষ্টাইনিস্, ক্রাপ প্রভৃতি ধনী জার্ম্মান রাষ্ট্রীয়জীবনে অল্পদিনের মধ্যেই যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই জার্ম্মানীর ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য- ও শক্তিলোলুপ রাষ্ট্রীয় নেতাদের অবিবেচনার ফলেই জার্ম্মানী বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় আসিয়া পৌছিয়াছে এই বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠাতে জনসাধারণ ইহাঁদিগকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। তাই শ্রমি। দল ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় জগতে প্রভাবশালী হইয়া উঠিতে-ছিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ-সমস্যার কোন মীমাংসা করিয়া উঠিতে না পারাতে কোনও শাসন-পরিষদ্ বেশিদিন স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিতে-ছিল না। মিত্রশক্তিবর্গের চাহিদা মিটাইতে না পারাতে যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছিল তাহার ফলে মন্ত্রীসভার পর মন্ত্রীসভার পতন ঘটিতে লাগিল এবং জার্ম্মানীর দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। ফরাসী যখন আপনার পাওনা আদায় করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া রুর অবরোধ করিয়া বসিলেন তখন জার্ম্মান্ শিল্পবাণিজ্যের এমনই দুরবস্থা হইল যে তাহার আশু প্রতিকার না হইলে জার্ম্মানীতে বৈরাজ্য ও মাৎস্যন্যায়ের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিবে বুঝিতে পারিয়া জার্ম্মান মন্ত্রী ষ্ট্রেস্‌মান্ ফ্রান্সের সঙ্গে একটি রফানিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিগত ৩০শে জুলাই এক ইস্তাহারে ফরাসী ঘোষণা করিয়া দিলেন যে রুরের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবসানের হুকুমনামা জার্ম্মান সর্কার যতদিন না দিবেন ততদিন পর্য্যন্ত ফরাসী সর্কার জার্ম্মানীর সহিত বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য কোনও আলোচনা করিবেন না। কিন্তু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অবসান ঘটিলে ক্ষতিপূরণ দাবীর পুনরালোচনা করিতে ফরাসী স্বীকৃত আছেন।

ষ্ট্রেস্‌মান্-মন্ত্রীসভা সেইজন্য রুরের সংঘর্ষের অবসান ঘোষণা করিলেন; কিন্তু ফরাসী মন্ত্রী পঁয়াকারে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিকে অবহেলা করিয়া পুরা দাবিই করিতে লাগিলেন। জার্ম্মানীতে যাহাতে গোলযোগ আরও বাড়িয়া উঠিয়া জার্ম্মান্ সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় পঁয়াকারের ইহাই অভিরুচি। অন্যদিকে ষ্টাইনিসের দল ষ্ট্রেস্‌মান্-মন্ত্রীসভার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতেছেন। ফ্রান্সের সঙ্গে ব্যবসার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য ষ্টাইনিস্ ফরাসী সর্কারের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, ফরাসী-পক্ষে সেনাপতি দেগুতের সহিত ষ্টাইনিসের এ-সম্পর্কে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে এইসব কথাবার্ত্তার ফলে ফরাসী ষ্ট্রেস্‌মান্-মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইয়া ষ্টাইনিসের প্রভুত্ব ফিরাইয়া আনিবার জন্য জার্ম্মানীর নিকট পূর্ব্বদাবীর ষোল আনাই দাবী করিতেছেন। ষ্টাইনিস্ ও পঁয়াকারে উভয়েই নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ষ্ট্রেস্‌মান শাসন-পরিষদের পতন কামনা করেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। পঁয়াকারে চাহেন জার্ম্মানীর আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা, ষ্টাইনিস্ চাহেন ব্যবসায়ীমণ্ডলের রাষ্ট্রীয় শাসনে অখণ্ড প্রভুত্ব। উভয়ের স্বার্থধারা বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য ষ্ট্রেস্‌মান্-মন্ত্রীসভার পতন ঘটান। সেইজন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়ে উভয়ের ক্ষণিক মিলন অসম্ভব নহে।

ষ্ট্রেস্‌মান্ কিন্তু জার্ম্মানীকে বাঁচাইবার জন্য খুব চেষ্টা পাইতেছেন। কঠোর নিয়মনিষ্ঠার প্রবর্ত্তন ও সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা ও সংহতি আনয়ন করিয়া নূতন জীবন প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে শক্তিধরের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ষ্ট্রেস্‌মান্ ব্যগ্র। তাই তিনি দেশের নিয়মতন্ত্রপ্রণালী কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিয়া সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া শাসন-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ভার হ্যার্ গেস্‌লারের হাতে দিয়াছেন। সাম্রাজ্য-বিরোধী যে-সমস্ত দল জার্ম্মানীতে ষড়যন্ত্র করিতেছিল শাসনভার পাইয়াই গেস্‌লার সেই-সমস্ত দলের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বৈরাজ্যবাদীদল, রাজপন্থীদল ও রাইন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-প্রয়াসী দল জার্ম্মান সাম্রাজ্যের ঐক্য নষ্ট করিয়া ফেলিবার যোগাড় করিতেছিল। এই তিন দলের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন আইনবিরুদ্ধ বলিয়া গেস্‌লার ঘোষণা করিলেন। ব্যাভেরিয়া চিরকালই রাজপন্থী। তাই ব্যাভেরিয়া গেস্‌লারের শাসন অস্বীকার করিয়া সেনাপতি ফন্ কার্‌কে আপনাদের একচ্ছত্র শাসক নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু জার্ম্মান সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার বাসনা ব্যাভেরিয়ার নাই। তাই ফন্ কার্ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ব্যাভেরিয়া রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেও জার্ম্মান সাম্রাজ্যের মধ্যেই থাকিবে। ব্যাভেরিয়া আপনার স্বাধীন সত্তা লাভ করিতে চাহেন না; সাম্রাজ্যের আদর্শ ব্যাভেরিয়া কখনই ভুলিবেন না। জার্ম্মান সাম্রাজ্যকে পূর্ব্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যাভেরিয়া চেষ্টা পাইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যাভেরিয়ার বীর রাজকুমার রুপ্রেকট কে ব্যাভেরিয়া সিংহাসনে বসাইতে চাহেন।

ফরাসীর সাহায্য পাইয়া রাইন্‌ল্যাণ্ডে স্বাধীনতা-প্রয়াসী দলও মুক্তি পাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। এই মুক্তিকামীদলের নেতা ডাক্তার ডর্টন্ রাইন্‌ল্যাণ্ডকে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ডুসেল্‌ডর্ফ্ নগর ইহাঁদের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছে। কিন্তু রাইন্‌ল্যাণ্ড্-সাম্রাজ্যপন্থীদলের ও সংখ্যাও কম নহে। তাই দুই দলে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে। কলোঁ সহর সাম্রাজ্যপন্থীদের প্রধান আস্তানা। ফরাসী-সর্কার রাইন্‌ল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা পাইতেছেন। ইংরেজ সর্কার কিন্তু এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে রাইন্‌ল্যাণ্ডে এইরূপ ব্যবস্থা ভার্সাই-সন্ধিসূত্রের বিপরীত, সেইজন্য ইংরেজ-সর্কার তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। বৈরাজ্যবাদী দলও সাক্সনি প্রদেশে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। বৈরাজ্যবাদী দলের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার জন্যে ষ্ট্রেস্‌মান স্যাক্সন-মন্ত্রীসভা দমন করিয়া ফন্ কারের হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে জার্ম্মানীতে প্রুসিয় প্রভাব কমিয়া ব্যাভেরিয়ার প্রভাব বাড়িয়া উঠিবে। তখন যুদ্ধের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠা কিছুই বিচিত্র নহে।

সাম্রাজ্য-বৈঠকে সাপ্রু—

ভারতবর্ষের আন্তরিক সাহচর্য্য লাভ করিতে না পারিলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি সামর্থ্য অনেক কমিয়া যায়। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ভারতের ধন- ও জনবল বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান ভরসা। সেইজন্য কাগজপত্রে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ইংরেজ-সর্কার বরাবরই স্বীকার করেন এবং সাম্রাজ্য-বৈঠকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূলে ভারতবর্ষ হইতে মনোনীত প্রতিনিধিও প্রেরিত হয়। যদিও এই মনোনয়ন প্রজার অভিরুচি অনুসারে হইল কি না তাহা দেখিবার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। যাহা হৌক, সাম্রাজ্য-বৈঠকে ইংরেজ-সর্কারের মনোনীত তথাকথিত ভারতের প্রতিনিধি কেহ না কেহ বরাবরই উপস্থিত থাকেন এবং আলোচনা-সভাতে ভারতের মতামত আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে ব্যক্ত করেন। সাম্রাজ্য-বৈঠকে প্রতিনিধি সর্কারপক্ষ অবশ্য নরমপন্থীদিগের (মডারেট) মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া আসিয়াছেন; তথাপি বৃটিশ উপনিবেশে ভারত-বাসীর প্রতি যে ব্যবহার করা হয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ তাঁহারা বরাবরই করিয়া আসিয়াছেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের বৈঠকে উপনিবেশের প্রতিনিধি-সমূহ ইহার প্রতিকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু ফলে কিছুই লাভ হয় নাই, বরং স্থানে স্থানে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে। একই রাজত্বের প্রজা হইয়াও ভারতবাসী যে

উপনিবেশবাসীর নিকট অস্পৃশ্য ইহা ভারতের ইজ্জতে লাগিয়াছে। তাই ইজ্জত রক্ষা করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আরম্ভ করেন তাহার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতবাসীর মার্য্যাদা বুঝিয়াছিল এবং ভারতবাসী নগরবাসীর অধিকার অনেক পরিমাণে লাভ করিয়াছিল। মহাত্মা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসার পর দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসীর মধ্যে নানা দৌর্ব্বল্যের পরিচয় পাইয়া আফ্রিকার শ্বেত অধিবাসীগণ আবার ভারতবাসীদিগকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন। আফ্রিকাবাসী বুয়র নেতা জেনারেল স্মাট্স্ কৃষ্ণকায় জাতিকে অসীমঘৃণার চক্ষে দেখেন। তাই তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ভারতবাসীর সম্বন্ধে নানা অপমানকর আইন জারি হইতে লাগিল এবং ভারতবাসীর নির্য্যাতনের সীমা রহিল না। দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতের প্রতি এই ঘৃণার ভাব আফ্রিকার বৃটিশ উপনিবেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। নেটাল ও কেনিয়া প্রদেশেও ভারতবাসীর প্রতি নিপীড়ন চলিতেছে। এই সকল অত্যাচারের অন্য প্রতিকার না পাইয়া ভারতবর্ষের তরফ হইতে সাম্রাজ্য-শিল্পপ্রদর্শনীকে পরিহার করিবার কথা উঠিয়াছে ও ভারতের আইন-মজলিসে উপনিবেশবাসীর ব্যবহারের প্রতিবাদে তুল্যরূপ ব্যবহার করিবার আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। এই-সব ব্যাপার হইতে ভারতবাসীর প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আমাদিগকে শান্ত করিবার জন্য বর্ত্তমান বৎসরের সাম্রাজ্য-বৈঠকে উপনিবেশে ভারতবাসীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হয়। ভারত-সচিব লর্ড পিল ভারতবর্ষের জন্য অনেক ওকালতী করেন। তাহার পর ভারতের মনোনীত প্রতিনিধি স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে বেশ তেজের সহিত বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার বিশেষত্ব এই যে ইহাতে ভিক্ষা বা অনুনয়-বিনয় নাই, তেজের সহিত আপনার দাবী জানানো হইয়াছে। তেজবাহাদুরের বক্তৃতার প্রধান কথা হইতেছে যে ভারতবাসী কিছুতেই তাঁহার ইজ্জত নষ্ট হইতে দিবে না। উপনিবেশসমূহের বিরুদ্ধে ভারতে যে তীব্র আন্দোলন চলিতেছে তাহার মূলে ভারতের ইজ্জত। তিনি বলেন, "আমি ভারতের ইজ্জতের জন্য লড়িতেছি। আমরা বহির্ভারতে ভারতবাসীর সম্মান অটুট রাখিবার জন্য একমন একপ্রাণে লড়িব। এই বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। আমাদের গৃহবিবাদ আছে সত্য, আমাদের মধ্যে নরম ও গরমপন্থীর মতের প্রভেদ আছে, আমাদের মধ্যে সহযোগী ও অসহযোগী, হিন্দু ও মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মতবিরোধ আছে। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে একমত। আমরা বিদেশে ভারতবাসীর সম্মান রক্ষার জন্য যে কি পরিমাণে ব্যগ্র তাহা আপনারা অবগত নহেন। আমাদের ভাষাতে একটি কথায় এই আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ইজ্জত। আমরা প্রাণ দিতে পারি তবুও ইজ্জত দিব না। ভুলিয়া যাইবেন না যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ভারতের উপর নির্ভর করে। সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে ভারতবর্ষ। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী ভারতে বাস করে এবং তাহারা অতি প্রাচীন সভ্যতার আলো বহিয়া আনিয়াছে। আমরা সাম্রাজ্যের সহিত বন্ধন অটুট রাখিয়াছি কিন্তু আমাদের সাম্রাজ্য-ভক্তি আপনাদের ব্যবহারে যদি ছুটিয়া যায় তবে আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভটি খসিয়া যাইবে। মনে করিবেন না যে আমি কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক চাঞ্চল্যপ্রয়াসী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অশান্ত মতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছি। ভারতের জনসাধারণের মধ্যেও গভীর বিক্ষোভ উঠিয়াছে। আজ গণমনেও জাগরণের সাড়া দেখা দিয়াছে।"

তেজবাহাদুরের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপনিবেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ ভারতবাসীর সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একমাত্র দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রতিনিধি জেনারেল স্মাট্স্ কোনওরূপ প্রতিকার করিতে নারাজ। স্মাট্স বলেন জীবনযাত্রার মাপকাঠি বিভিন্ন হওয়াতে দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউরোপীয়গণ ভারতবাসীর সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠে না। তাই আত্মরক্ষার্থে ইঁহারা ভারতবাসীকে সমান অধিকার দিবে না। তিনি বলেন—

"It is a case of a small civilisation, a small community finding itself in the danger of being overwhelmed by a much older and more powerful civilisation, and it is the economic competition from a people who have entirely different standards and viewpoints from ourselves. You cannot blame these pioneers, these very small communities in South Africa and Central Africa, if they put up every possible fight for the civilisation which they have started, their own European civilisation. They are not there to foster Indian civilisation—they are there to foster Western civilisation." কাজে কাজেই তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন যে "So far as South Africa is concerned, it is a question of impossibility" ভারতবাসীকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে অসম্ভব।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্র-পরিচয়

নারদ

ব্রহ্মার বরে নারদ চিরযৌবন বীণাবাদনপটু ত্রিলোক-পর্য্যটক হইয়াছিলেন।—স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণ।

ঈদের চাঁদ

পিতা বৃদ্ধ অন্ধ। কন্যা অন্ধ পিতাকে নিজের দৃষ্টি দিয়া শুভদিনের চন্দ্রোদয় দেখাইতেছে।

চারু

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিশ্বভারতী-নারীবিভাগ

আমরা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবার জন্য পাইয়াছি :—

"শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিশ্বভারতীর অন্তর্গত নারী-বিভাগ হইতে স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আপাততঃ এখানে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রকলা, বস্ত্রবয়ন এবং বই-বাঁধানো প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া চলিতেছে। সেইসঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগীপরিচর্য্যা, শাকসব্জী ফুলফলের বাগান তৈয়ারী, বিজ্ঞানবিহিত গৃহকর্ম্ম-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রীরা পারদর্শিতা লাভ করে, ইহা আমাদের ইচ্ছা। নানা কারণে পুরুষ ছাত্র-দিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা নিয়মে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্কীর্ণ পথে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের নারীদের পক্ষে এ সম্বন্ধে অবশ্যবাধ্যতা নাই। এজন্য, বুদ্ধি চরিত্র কর্ম্মপটুতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, উদারভাবে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাধা অপেক্ষাকৃত অল্প। এই সুযোগ আছে বলিয়া, ভরসা করি, নারীশিক্ষায় আগ্রহবান্ ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে যথোচিত আনুকূল্য পাইলে দেশবিদেশ হইতে উপযুক্তা শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহ করিয়া এখানে উচ্চ আদর্শের নারী-শিক্ষালয় গড়িয়া তুলিতে কৃতকার্য্য হইব। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের বিদ্যোৎসাহী বদান্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে এককালীন বা মাসিক বা বার্ষিক দান প্রার্থনা করিতেছি; আশা করি, আমাদের আবেদন বিফল হইবে না। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

—

নারীর অর্থকরী বৃত্তি

আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে, শিক্ষিতা মহিলারা শিক্ষা, চিকিৎসা, পুস্তক-রচনা, সংবাদপত্র-চালনা, ধাত্রী-বিদ্যা, পোষাক-নির্ম্মাণ, শুশ্রূষা, বস্ত্রব্যবসায়, ও সর্ব্ব-শেষে ওকালতীর কার্য্যে দেখা দিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কুলি, কণ্ট্রাক্টার, দোকানদার, কৃষিব্যবসায়ী, দুগ্ধ-ব্যবসায়ী, ধোপানী, নাপিতানী, রাঁধুনী, দাসী, প্রভৃতির কাজ করিয়া বহু রমণীকে উপার্জ্জন করিতে দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরা যে কত রকম ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন, আমেরিকান "ওম্যান সিটিজেন" পত্রে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এই পত্রে দেখি :—

"এ পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রের যে-সকল বিভাগে কেবল মাত্র পুরুষের গতিবিধি ছিল, রমণীজাতিও যে সেই-সকল বিভাগে ক্রমশ দ্রুত-গতিতে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন, মহিলা-কর্ম্মীসঙ্ঘের একটি আধুনিক পরিবীক্ষণের ফলে তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। মাল প্রভৃতির চালান বিভাগে নারী কর্ম্মীর সংখ্যা গত দশ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে; এই দশ বৎসরেই কেরাণী, রেখাক্ষর-লেখক, টাইপিষ্ট, হিসাব-রক্ষক, টেলিফোন-যন্ত্রী, শুশ্রূষাকারিণী প্রভৃতি নারীর সংখ্যা ৫০,০০ এরও বেশী বাড়িয়াছে। শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকদের ব্যবসায়েও রমণীর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে; অনেকে যন্ত্রনির্ম্মাতা, যন্ত্রচালক, রাজমিস্ত্রী, হাতিয়ার-নির্ম্মাতা, লোহা ঢালাইকর, পলস্তরাকারী, নল-মেরামত-কারী, গ্যাসযোজনকারী, এমন কি মুচি, কামার প্রভৃতির কাজেও ঢুকিতেছেন। সরকারী কাজেও ইহাদের নিয়োগ বাড়িতেছে; কারণ ইহাতে এই দশ বৎসরে ইহাদের হার শতকরা ৬০·৭ করিয়া বাড়িয়াছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জেলার কর্ম্মচারী, সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলের কর্ম্মচারী, পোষ্টমিষ্ট্রেস (ডাককর্ত্রী) প্রভৃতির সংখ্যা ছিল ২৭৫; দশ বৎসরে বাড়িয়া হইয়াছে ৬৫২; বাল অপরাধীদের ও পলাতক এবং ভবঘুরে বালক-দের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে মহিলার সংখ্যা ১৮৮ হইতে ৭৮০ হইয়াছে। এই রিপোর্টে ৮ জন আকাশযান-চালক, ৫৭ জন যন্ত্র-উদ্ভাবক, ৪১ জন এঞ্জিনিয়ার, ১৩৭ জন সৌধশিল্পী,

২ জন অরণ্য-পাল, ২৫ জন শোভন-উদ্যান-রচয়িত্রী রমণীর নাম পাওয়া যায়। রসায়নবিৎ, জহুরী, ধাতুবিদ্যাবিদ্, ধর্ম্মযাজক, নক্সানবীশ, উকীল, বিচারপতি, কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, ধর্ম্ম ও সমাজের হিতসাধক জনসেবা-ব্রতী, ব্যায়ামশিক্ষক ও নৃত্যশিক্ষকের কাজে রমণীর সংখ্যা তিনগুণ বাড়িয়াছে। কেবল মাত্র ক্ষেতমজুর, পোষাক-নির্ম্মাতা ও ভৃত্যের কাজে রমণীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছে। দাসীর কাজের হার ১৯১০ খৃষ্টাব্দের শতকরা ৩১.৩ হইতে ১৯২০তে শতকরা ২৫.৬ পর্য্যন্ত নামিয়াছে।"

দাসীর কাজটাই সকল দেশে পুরাকালে মেয়েদের প্রধান বৃত্তি ছিল। পোষাক তৈয়ারীর কাজটা পাশ্চাত্য দেশে মেয়েরাই বেশী করিত, কারণ তাহারা তৈরী পোষাক পরে। আমাদের দেশের মেয়েদের অতি অল্প লোকেই তৈয়ারী পোষাক পরে, না হইলে দেখা যাইত মজুর দাসীও পোষাক নির্ম্মাতার কাজই এ দেশে রমণীরা বেশী করে। আসামে, আরাকান জেলায় এবং কক্সবাজার মহকুমায় নারীরা অনেকে বস্ত্র-বয়নের কাজ করে। পুরাতন পথ ছাড়িয়া নূতন নূতন বৃত্তির দিকে মেয়েদের ঝোঁক হওয়াতে পাশ্চাত্য দেশে রমণীদের পুরাতন বৃত্তিসমূহে রমণীদের টান ও সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মীর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

এদেশে বৃত্তি হিসাবে না হইলেও আচার্য্য ও উপদেষ্টা রূপে ধর্ম্মযাজকের কাজ মেয়েরা করেন। খৃষ্টীয় মিশনে দেশী মহিলারা বৃত্তি হিসাবেও ধর্ম্মকার্য্য করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসিনী হিন্দু নারীরাও ঐ কাজ করেন। "ওম্যান সিটিজেন" পত্রে উল্লিখিত বহু কাজ এ দেশের রমণীরা করিতে পারেন এবং ঘরে কিছু কিছু করিয়াও থাকেন। সুবিধার অভাবে ও লোকলজ্জার ভয়ে এই-সকল সৎবৃত্তি প্রকাশ্যে অবলম্বন করিতে অনেকে দ্বিধা বোধ করেন। এই মিথ্যা লজ্জা ঘুচিয়া যাওয়া উচিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, যে, বিদ্যাসাগর-বাণীভবনের ছাত্রীরা স্যাকরার কাজ শিখিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই বেশ অগ্রসর হইয়াছেন। আমাদের দেশের মেয়েরা বৃত্তি হিসাবে কি কি কাজ করেন ও করিতে পারেন, তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করা দরকার।

—

বীরলা মহাশয়ের বদান্যতা

কলিকাতার শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বীরলা মহাশয় বিহার ও ওড়িষার প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ মেডিক্যাল কলেজ ফণ্ডে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়া প্রকৃত ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। এই অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কোন সর্ত্ত করিয়াছেন কি না জানি না। আশা করি দরিদ্র ভারতবাসীদের সেবাতেই ইহার অধিকাংশ ব্যয় করা হইবে এবং মোটা মাহিনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পুষিতে ও সুসজ্জিত ইউরোপীয় ওয়ার্ডের বিল মিটাইতে গিয়া দরিদ্রদের ভাগ্যে শূন্য পড়িবে না।

—

শ্রীযুক্ত যমুনালালের গাড়ী নিলাম

দশ টাকায় মোটরকার এবং তিন টাকায় বগী গাড়ী নিলামে চড়িলেও সেইগুলি কেহ কেনে নাই—ব্যাপারটা বিস্ময়কর নহে কি? শ্রীযুক্ত শেঠ যমুনালালের সম্পত্তি-ভুক্ত এই জিনিষ দুটি এইরূপ হাস্যকর রকম অল্প মূল্যেও ওয়ার্দ্দাতে বিক্রী করা যায় নাই। সেগুলিকে রাজকোটে পাঠানো হইয়াছে। ভারতবর্ষের লোকের আদর্শ নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের শক্তি যে একেবারেই নাই জগৎকে একথা বুঝাইতে অনেকে ভাল বাসিলেও এই সামান্য ঘটনাটিও তাহার উল্টা প্রমাণ দেয়। ভারতবাসীরা যে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে সক্ষম, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; তবে কাজটার প্রতি প্রাণের টান থাকা চাই।

—

ভারতীয় জেলখানা

স্যার আলেক্জান্দার কারডিউ মহাশয় ঈষ্ট্ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনে বক্তৃতা করিবার সময় বলিয়াছেন, যে সভ্য জগতের সমুদায় জেলখানার মধ্যে ভারতবর্ষের জেলখানাগুলি নিকৃষ্টতম। বর্ত্তমান সভ্য জগতের মতে জেলখানা অপরাধীদের সৎপথে ফিরিবার সুযোগ পাইবার স্থান। আধুনিক মানুষ সামাজিক উন্নতি সাধনের জন্যই অপরাধীকে দণ্ড দিতে চায়, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নয়। স্যার আলেক্জান্দারের মতে ভারতীয়

জেলখানাগুলি অপরাধীদের উন্নতির অপেক্ষা অবনতির সহায়তাই বেশী করে। ভারতের ইংরেজশাসনযন্ত্রের ইংরেজেরই এই প্রশংসাবাদটি অনুপম!

—

গৌরীশঙ্কর অভিযান

ইংরেজ ও আমেরিকান পৰ্য্যটকেরা গৌরীশঙ্করের দুর্লঙ্ঘ্য শিখরে আরোহণ করিবার জন্য আবার দলবদ্ধ হইতেছেন। তাঁহারা অক্সিজেনপূর্ণ একটি যন্ত্র এই অভিযানের সময় ব্যবহার করিবেন; আল্প্স্ পর্ব্বতে তাহার কার্য্যোপযোগিতার পরীক্ষা হইতেছে।

এ বিষয়ে ভারতবাসীদের কি কিছুই করিবার নাই? আমরা কি চিরকাল পরের হাতে আমাদের দেশের সকল কঠিন কার্য্যের ভার ফেলিয়া দিয়া তাহাদের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিব? ভারতের কয়েকজন ধনী মিলিয়া একদল যুবককে সুইজার্‌ল্যাণ্ডে পর্ব্বত-আরোহণ-বিদ্যায় দক্ষতা লাভ করিতে পাঠাইয়া দিলে ত পারেন। ইঁহারা ফিরিয়া আসিলে ভারতীয়ের দ্বারাই ভারতীয় পর্ব্বতশিখর আরোহণ ও আবিষ্কারের কার্য্যে এই ধনীরা সাহায্য করিতে পারেন। আমাদের যাহাতে কোনো ক্ষতি হইবে না, এমন সকল উদ্দেশ্যে বিদেশীরা আমাদের দেশে আসিলে আমরা কোনোই আপত্তি করি না; কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয়-দের পিছনে পড়িয়া থাকিতে দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। পাশ্চাত্য দেশে ধনী মাত্রেই অষ্টপ্রহর নবাবী ব্যসন ও চর্ব্বির বোঝায় ডুবিয়া খুসী হইয়া কেদারা হেলান দিয়া থাকে না। তাহারা জনসমাজের বিশেষ একজাতীয় কাজে লাগিয়া যায়। এই-সকল কাজে হাতে হাতে টাকা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরিণামে এগুলি দেশের উপকার করে। ধনীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে গোবংশের উৎকর্ষসাধন, অশ্বপালের উৎকর্ষসাধন, হাঁস মুরগীর পাল তৈয়ারী প্রভৃতি কাজে মন দেন। কেহ বা বহু কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য দেশ পর্য্যটন কি আবিষ্কারে লাগিয়া যান। ইঁহারাই অনেকে মিলিয়া বিমান-বিহার, মোটর চালনা, ঘোড়সওয়ারি, খেলা, কুস্তি ও নানা প্রকার ব্যায়ামের আদর্শ উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়া তোলেন। ইঁহারা নানাভাবে শিল্পী, কারিগর ও সাহিত্যিকের উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক হন, সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টিতেও মন দেন। এক কথায় বলিতে দেশের ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধন ও সভ্যতার বিকাশের ইঁহারা অনেকে সহায়। কিন্তু ভারতের ধনকুবেররা কি করিতেছেন? দেশের এই ধনী-সম্প্রদায় জাতির কোন্ হিতকর্ম্মে লাগিতেছেন?

—

বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা

লাহোরে বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভার একটি আশ্রম আছে। এই আশ্রমে ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রদেশের বিবাহার্থিনী বিধবারা আশ্রয় পান। সভার কার্য্যের সাহায্যের জন্য একটি মাসিকপত্রও আছে। আমরা সভার কার্য্যবিবরণীর সংক্ষিপ্তসার নীচে দিলাম:—

"ভারতবর্ষের নানা শাখা-সমিতি ও সহযোগীদের নিকট হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে, যে, ১৯২৩ অব্দের আগষ্ট্ মাসে সভার সাহায্যে ৮৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী হইতে আগষ্ট্ মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ৫৮৮টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। তাহার মধ্যে—

ব্রাহ্মণ ১১১, ক্ষত্রিয় ১২৩, আরোরা ১২৮, কায়স্থ ১৩, আগরওয়ালা ৭৬, রাজপুত ৫৩, শিখ ৫, এবং অন্যান্য জাতি ৭৯, মোট—৫৮৮।

—

মহিলা-কর্ম্মী-সংসদ্

যে-সকল ভারতীয়া মহিলা দারিদ্র্য ও আত্মীয়-বন্ধুর পীড়নে দুঃখ পান, এবং নির্ম্মম ও নৃশংস স্বামী প্রভৃতির দ্বারা লাঞ্ছিত হন, তাঁহাদের হয় দুঃখভোগেই, নয় স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন দ্বারা দিন কাটাইতে হয়। মহিলা-কর্ম্মী-সংসদ্ এই-সকল মহিলাকে কাজের সুবিধার জন্য মণ্ডলী-বদ্ধ করিতে চান। সংসদ্ কলিকাতার মূল কারখানায় মেয়েদের কাজ শিখাইয়া তাঁহাদেরই মফস্বলের শাখা কারখানায় পাঠাইতে চান। দুঃখিনী নারীরা বৃত্তিশিক্ষা দ্বারা কি করিয়া সদুপায়ে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন, তাহাই সংসদের শিক্ষার প্রধান বিষয়। মণ্ডলী গঠনের উদ্যোগী শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার মহাশয়া বহু বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া

সংসদের কাজ চালাইতেছেন। সকলের বড় অভাব অর্থের অনটন। সংসদে এখন বার তের জন মহিলা তাঁত চালানো, চরকা কাটা, সূচিশিল্প, দরজির কাজ, কাঁটার কাজ, প্রভৃতির উৎকৃষ্ট নমুনা দেখাইতেছেন। আমরা ইঁহাদের কাজের নমুনা দেখিয়াছি। জিনিষগুলি বাজারে বিক্রয় করিবার মত হইয়াছে। সংসদ্ একটি উচ্চ আদর্শ লইয়া প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আর-একটু পড়া উচিত। যাঁহারা সাহায্য করিতে চান, তাঁহারা শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদারকে, ৭৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

—

জগতের আশার কথা

আধুনিক বালকবালিকাদের মনে যে একটি সেবার ভাব জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা পরস্পর দলনে নিযুক্ত জাতিগুলির মধ্যে ভালবাসা ও পরসেবার ভাব জাগাইয়া তুলিবে এবং ফলে জগতের সুখস্বপ্ন সত্যে পরিণত হইয়া জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই বিষয়ে আমেরিকার চাইল্ড্ ওয়েল্‌ফেয়ার পত্র একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশের অনুবাদ নীচে দিলাম।

আজিকার দিনে জগতে যে একটি নূতন আশার উদয় হইয়াছে, নানাদেশের বালকবালিকারাই সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে। জগৎ সেই দিনের আশাপথ চাহিয়া আছে, যেদিন সমস্ত বিশ্বে শান্তি বিরাজ করিবে, এক জাতি আর-এক জাতিকে ভয় ও ঘৃণা করিতে ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃস্নেহে বাঁধিয়া একত্রে বাস করিবে।

আশ্চর্য্য যে এই বিশ্বব্যাপী শান্তির আশা বিগত বিশ্বসংগ্রামের সংক্রান্ত নানা ঘটনা হইতেও উদিত হইয়াছে। সেই-সব বিগত উৎকণ্ঠার দিনে যখন সকলেই বীর সেনানীদের কোনো প্রকারে সাহায্য ও সুখ দিবার জন্য যথাশক্তি খাটিতে ব্যগ্র হইয়া থাকিত, তখন আমেরিকার বিদ্যালয়ের নবীন প্রাণগুলিও সাহায্য করিবার অনুমতি চাহিল। তাহাদের 'রেড ক্রসের' সেবক-সম্প্রদায়ে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া জুনিয়ার আমেরিকান রেড ক্রস নাম দেওয়া হইল। যুদ্ধের অবসানে দেখা গেল, ইউরোপে প্রায় প্রত্যেক দেশে হাজার হাজার শিশু গৃহহারা নিবস্ত্র ও জীর্ণবাস হইয়া ঘুরিতেছে; যাহাদের বা গৃহ আছে তাহাদের মুখে হাসি কণ্ঠে কলোচ্ছ্বাস নাই, খেলাধুলা ভুলিয়া শিশুজীবনের সকল আনন্দে বঞ্চিত হইয়া তাহারা দিন কাটাইতেছে। জুনিয়ার রেড ক্রসের সভ্যেরা দেখিল যুদ্ধক্ষেত্রের কাজ শেষ হইয়া গেলেও এ ক্ষেত্রে তাহাদের জন্য কাজ পড়িয়া আছে; তাহাদের নবীন প্রাণ সে কাজের ডাকে তখনি সাড়া দিল। সেই সময়েই দেখা গেল যে দেশে ও হাঁসপাতালে পীড়িত সৈন্য, ঘরে ঘরে অভাবগ্রস্ত শিশু ও রোগী প্রভৃতির সেবার কাজ পড়িয়া আছে। এত কাজ থাকিতে কেবল যুদ্ধাবসানের খাতিরে জুনিয়ার রেড ক্রসের দল ভাঙিয়া দেওয়া স্বপ্নেও ভাবা চলে না। কাজেই তাহারা পূর্ণ উৎসাহে কাজ করিয়া চলিল। এখন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রায় ৫,০০০,০০০ বালক বালিকা ৩০,০০০ বিদ্যালয় হইতে দেশ-বিদেশের বন্ধুরূপে ঘরে বাহিরে সুখশান্তি আনিবার কাজে লাগিয়া আছে।

বিশ্বব্যাপী শান্তির সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ভাবিয়া পাইতেছেন না? বাকিটা পড়িলেই বুঝিবেন। ইউরোপের বালকবালিকাদের যখন বলা হইল যে আমেরিকার বালকবালিকাদের চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের ফলেই তাহারা অন্নবস্ত্র বিদ্যালয় পুস্তকাগার, খেলার মাঠ, খেলনা ও অন্যান্য উপহার পাইতেছে, তখন বেল্‌জিয়ম ফ্রান্স্ পোল্যাণ্ড্ চেকো-স্লোভাকিয়া এবং বল্কান্ দেশসমূহের ছেলেমেয়েরা সমুদ্রপারের তরুণ বন্ধুদের সহৃদয়তায় খুসী হইয়া কেবল যে ধন্যবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইল তাহা নয়; তাহারা বন্ধুদের যৎসামান্য উপহার দিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শুধু ইহাতে তাহাদের মন উঠিল না। তাহারাও একটা জুনিয়ার রেড ক্রসের দল গড়িবার জন্য গোলমাল বাধাইয়া দিল। তাহাদের অপেক্ষা দুঃখীও ত আছে; এই অতি-অভাগাদের সেবা তাহারা করিবে। আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ইউরোপে ২৩টি দেশের বালকবালিকারা একটি রেড ক্রস্ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহাদের পতাকায় "আমি সেবক", এই মন্ত্র লিখিত আছে। এইরূপে গত দুই বৎসরের মধ্যে এমন একটি জগৎ-জোড়া শিশু-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছে যাহারা সুযোগ পাইলেই সেবা করিতে অগ্রসর হইয়া আসে।

আমেরিকা ও ইউরোপের জুনিয়ারেরা পরস্পরের সহিত চিঠিপত্র, পুস্তক ও উপহার আদান-প্রদানের ফলে পরস্পরের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতেছে এবং উভয় দলের মধ্যে একটি স্থায়ী বন্ধুত্বের বন্ধন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। এই শিশুরা যখন পরিণতবয়স্ক নরনারী হইয়া উঠিবে, তখন তাহারা জানিবে যে অন্য দেশের নরনারীরাও তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতা গৃহ ও প্রাণকে তাহাদের মত ভালবাসে। বাল্যকালে বিদেশী বালবন্ধুদের সঙ্গে পত্র ও উপহার বিনিময়ের কথা মনে করিয়া তখনকার দিন হইতে অর্জ্জিত মনের মিলের উপর নির্ভর করিয়া সমুদয় যুদ্ধবিগ্রহ ও দুঃখদুর্গতির মূল ভয় ঘৃণা হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে তাহারা মনের দুয়ারের ত্রিসীমানায় ঢুকিতে দিবে না। নিজ নিজ দেশের ও জাতির গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া ইহারা শান্তিতে বাস করিবে কিন্তু অপর দেশ ও জাতির মধ্যেও যে শ্রদ্ধা করিবার এবং ভালবাসিবার জিনিষ আছে তাহা মনে রাখিবে। এই কথাই আলাবামার একটি জুনিয়ার এইভাবে বলিয়াছে, "জুনিয়ার রেড-ক্রস্ আমাদিগকে স্বজাতি ও ভিন্নজাতির বালকবালিকাদিগকে ভালবাসিতে ও তাহাদের মন বুঝিতে সাহায্য করে। তাই মনে হয় আমরা যখন বড় হইব তখন এখনকার মত জাতিতে জাতিতে এত বিরোধ আর থাকিবে না।" প্রায় এই কথাই সুদূর অষ্ট্রীয়ার একটি জুনিয়ার এ দেশের শিশুদের নিকট পত্রে বলিয়াছে—"জাতিতে জাতিতে মিলন ঘটাইয়া দেওয়া যে নবীনেরই কাজ তাহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই জুনিয়ার রেড-ক্রস্ সম্প্রদায় গড়া হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি যে অন্যান্য দেশেও এই কারণে সকল দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় জুনিয়ার রেড-ক্রস্ সম্প্রদায় গড়া হইয়াছে। জাতিগত দ্বেষ যতক্ষণ মানুষের মনে আছে ততক্ষণ কোনো কন্‌ফারেন্সের আন্তর্জাতিক মিলন ঘটাইবার সাধ্য নাই। অতএব এস আমরা পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করি; সব বাধা অতিক্রম করিয়া জুনিয়ার রেড-ক্রসের ভিতর দিয়া আমাদের মিলন হউক। হউক না নানা বিভিন্ন ভাষা, তবু একই গান দেশে দেশে সকলে গাহিতে কি আনন্দই না আমরা অনুভব করিব।"

এই শিশুজগতের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ হউক। তাহাদের নির্ম্মল মন যে শান্তিময় জগতের সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, তাহারাই তাহা সৃষ্টি করিয়া মানব নাম সার্থক করুক।

—

ভারতীয় পুরাতন পুস্তকালয়

ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয় সংখ্যায় অতি অল্প। এইরূপ একটি পুস্তকালয়ের বিষয় শ্রীযুক্ত সদাশিব রাও অক্টোবর মাসের ওয়েল্‌ফেয়ার পত্রে লিখিয়াছেন। পুস্তকালয়টির নাম তাঞ্জোর মহারাজা সারফোজী সরস্বতী লাইব্রেরী। শ্রীযুক্ত রাও মহাশয় বলেন,

পুস্তকালয়টি ঠিক কবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলা যায় না ; তবে এই বিষয়ে অল্প স্বল্প যেটুকু খোঁজ পাওয়া যায় তাহাতে মোটামুটি বলা চলে যে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঞ্জোরের নায়ক রাজাদের আমলে লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠিত।

প্রাসাদের উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত একটি বড় হল ঘরে লাইব্রেরীটি আছে। ঘরের সামনে একটি প্রশস্ত চারকোণা উঠান, অপরদিকে মহারাজা সারফোজীর মূর্ত্তি সম্বলিত নায়ক-দরবার-হল।

এই লাইব্রেরীটিতে তালপাতা ও কাগজে লেখা ২৫,০০০ হাজার পুঁথি আছে। পুঁথিগুলি দেবনাগরী, নন্দী নাগরা, তামিল, তেলুগু, কন্নাদ, গ্রন্থ, মলয়ালম, বাংলা এবং ওড়িয়া অক্ষরে প্রায় সকল রকম জ্ঞাতব্য বিষয়ে লিখিত। পুস্তকগুলির অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায়। এখানে প্রায় পাঁচ হাজার মুদ্রিত পুস্তকও আছে। এগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাশ্চাত্য দেশে মুদ্রিত ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান, লাটিন, ইটালীয়ান ও গ্রীক ভাষার পুস্তক। ইহা ছাড়া কতকগুলি মূল ও মুদ্রিত ছবির সংগ্রহও আছে। ছবিগুলির প্রায় সব কয়টিই ভারতীয় বিষয়ে অঙ্কিত।

—

দেশী ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ

বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখিবার সময় অনেকে বৈজ্ঞানিক নানা শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ না পাওয়াতে বিড়ম্বনা বোধ করেন। ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত জি, এম, মাধব বলিতেছেন,

"বাংলা, মারাঠী, তামিল প্রভৃতি ভারতীয় ভাষাগুলির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ শোনা যায়, যে, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মান ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষার ন্যায় এই-সব দেশীয় ভাষায় যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক শব্দ নাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে বৈজ্ঞানিক শব্দের জাতি নাই, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রার মত ইহা সকল ভাষাতেই সচল, এক ভাষা হইতে আর এক ভাষা ইহাদের জাতি না বদলাইয়া অনায়াসে গ্রহণ করেন। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরীন, জুওলজি, বটানি, কেমিষ্ট্রী, জিওলজি প্রভৃতি শব্দ জাতি নির্ব্বিশেষে সকল ভাষারই সম্পত্তি। ইংরেজী ভাষা স্বয়ংই ত গ্রীক ও লাটিন বৈজ্ঞানিক শব্দ ধার করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি গ্রীক ও লাটিন শব্দ বাদ দিলে ইংরেজী ভাষাকে ভাষা বলাই শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপীয় ভাষাগুলি যদি পরস্পরের নিকট বৈজ্ঞানিক শব্দ ধার করিতে পারে, তবে ভারতীয় ভাষাই বা তাহা করিলে ক্ষতি কি ?"

—

সর্ব্ববঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভা

২৭শে কার্ত্তিকের দৈনিক পত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে

সবিনয় নিবেদন, অদ্য ১০ই নবেম্বর ২৪শে কার্ত্তিক শনিবার বৈকালে ৪ ঘটিকার সময় ৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশন-ভবনে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য রায়ত কৃষক শ্রমজীবী আদি পল্লীপ্রজা ও তৎহিতৈষীগণের এক সভা হইবে। বিভিন্ন জেলা-সম্মিলনীর সভ্যগণের, পল্লীহিতৈষী ও সকল পল্লীবাসীগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। সার পি সি রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

কৃষক ও রায়ত সভা	শ্রীসত্যানন্দ বসু
১৩নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট,	সৈয়দ এরফান আলি
কলিকাতা	শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ
	সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়

১। পল্লীর অভাব অভিযোগ ও পল্লীসমাজ-গঠন-পদ্ধতি বিবৃত ও আলোচনা।

২। কাউন্সিল, ইঃ বোর্ড আদি স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানসমূহে ভোটদান-বিষয়ে প্রজার অজ্ঞতা ও অস্বাধীনতা।

৩। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনে প্রজার স্বত্বহানি।

৪। বন্যা, হাজা, শুকা ও স্বল্পমূল্যতায় পাটাদি চাষের ক্ষতি।

৫। ম্যালেরিয়া নিবারণ। ৬। বিবিধ।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের উন্নতি-সাধনের সর্ব্বপ্রথম পথ পল্লীসংস্কার ও পল্লীগঠনের ভিতর দিয়া হওয়া উচিত। পল্লীবাসী কৃষকদের দারিদ্র্য অজ্ঞতা ও দুঃখদুর্দ্দশা মোচন করিতে পারিলে দেশের অর্দ্ধেক দুর্গতির মূল বিনষ্ট হয়। কিন্তু সহরে বসিয়া সভাসমিতির প্রস্তাবের ভিতর দিয়া পল্লীসংস্কার করা যত সহজ, কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিয়া করা তত সহজ নয়। যাঁহারা পল্লী-সংস্কার করিতে চান তাহাদিগকে পল্লীতে বাস করিয়া পল্লীভুক্ত হইয়া পল্লীবাসীর সুখ-দুঃখের সহিত আপনাদের সুখ-দুঃখ

মিলাইয়া এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা পল্লীবাসীর অবিশ্বাসের বাধা দূর করিয়া তাহাদের প্রকৃত আত্মীয় হওয়া সম্ভব হইবে না।

এই বন্যা- দুর্ভিক্ষ- ও লুণ্ঠন-পীড়িত দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে পারিলে, সমবায় ব্যাঙ্ক্ স্থাপন করিতে পারিলে, কৃষিজীবীকে নিজ অধিকারে বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন করিতে পারিলে, জল সরবরাহের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, গ্রামের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের উন্নতি করিতে পারিলে, গো-মহিষাদির যত্ন করিতে পারিলে, পল্লীবাসীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষুধারউপযোগী প্রকৃত খাদ্য যোগাইতে পারিলে, এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল করিতে পারিলে পল্লীশ্রী যে শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পল্লীর প্রাণ যাহারা সেই বালক ও যুবকদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পল্লীপ্রীতি জাগা দরকার; নাগরিক জীবনের প্রতি প্রাণের টান অনুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে অজ্ঞ ও অসমর্থ পুরাতনপন্থী কৃষক ছাড়া সকলেই পল্লী ত্যাগ করিয়া আসিবে। সুতরাং পল্লীসংস্কার খবরের কাগজের পৃষ্ঠার বাহিরে আর অগ্রসর হইবে না। শ

—

কন্যা গুরুকুল

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ৮ই নভেম্বর দরিয়াগঞ্জে বালিকাদের গুরুকুলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। বালিকাদের শিক্ষার অভাব মোচন করিবার সকল প্রকার অনুষ্ঠানকেই আমরা সাদরে বরণ করি। আমরা আশা করি কন্যাগুরুকুল দুর্ভিক্ষপীড়িতের একমুষ্টি চাউলের মত কেবল মাত্র শিক্ষার ক্ষুধা নিবারণ করিয়াই তৃপ্ত হইবেন না; বালিকাদের অন্তঃকরণের সকল সুপ্ত সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের প্রকৃত নারীমহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহায় হইবেন। শ

—

জাতীয় শিশু সপ্তাহ

আগামী জানুয়ারি মাসে বড়লাট-পত্নী লেডি রেডিং ভারতবর্ষের নানা সহরে জাতীয় শিশু সপ্তাহ পালন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই উপলক্ষে শিশু-প্রদর্শনী মাতৃমঙ্গল-বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি হইবে।

এদেশে শিশুমৃত্যুর হার ভয়াবহ রকম বেশী। বাংলাদেশে ১৯২১ সালে হাজারকরা ২১১·৪ শিশু বালক ও হাজারকরা ২০০·৫ শিশু বালিকার মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে একটিরও বেশী মৃত্যু হইয়াছে। অথচ ১৯২৩ সালে ব্রিটিশ দ্বীপসমূহে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে হাজারকরা মাত্র ৫৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। বাংলার মৃত্যুহারই যে শুধু ভয়াবহ তাহা নহে। যাহারা জীবন-সংগ্রামে কিছুদিনের জন্য টিকিয়া থাকে, তাহারাও ক্ষীণজীবী, জড়বুদ্ধি, ভালমানুষ হইয়া কোনো প্রকারে জীবনের কয়েকটা দিন কাটাইয়া যায়। শিশুর দেহমনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং ঘরে ঘরে শিশু মড়কের অবসান করিতে হইলে, মাতার দেহ ও মন শিশু-পালনের উপযোগী হওয়া সর্ব্বাগে প্রয়োজন। এই সর্ব্বপ্রধান উপকরণের অভাবই যে-দেশে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে সে-দেশে শিশুর কল্যাণ কামনা করা চলে, কিন্তু আশা করা শক্ত। তবু নিয়মিত আহার, যথেষ্ট পরিমাণ খাঁটি দুগ্ধ, পরিচ্ছন্নতা, মুক্তবায়ু, পর্য্যাপ্ত পরিচ্ছদ, খেলা ধূলা ও আনন্দের আয়োজন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে এই ক্ষীণপ্রাণ অপুষ্টদেহ শিশুদেরও জীবনের পথে কিছু দূর আগাইয়া দেওয়া যায়। শ

—

কথা ও কাজ

এখন দেশময় স্বদেশহিতৈষণার কথা খুব শুনা যাইতেছে; কারণ, অনেক লোক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে চান বলিয়া আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবার অঙ্গীকার করিতেছেন। বাংলা দেশের ও ভারতের চেহারা দেখিলে এবং বিদেশে আমাদের মান-মর্য্যাদার কথা স্মরণ করিলে কে বিশ্বাস করিবে, যে, দেশে এত হিতৈষী ও সেবক ছিল?

যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের বর্ত্তমান কথায় ও ভবিষ্যৎ কাজে যেন মিল থাকে। যাঁহারা নির্ব্বাচিত

হইবেন না, তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন না বলিয়াই দেশের উপর রাগ করিয়া যেন দেশহিতৈষণার কথাগুলা কাজে পরিণত করিতে বিরত না হন। ব্যবস্থাপক সভায় না গেলেও যে দেশহিত করা যায়, বরঞ্চ ইচ্ছা থাকিলে বেশী হিত করা যায়, তাহা বুঝা ও বুঝান খুব সহজ।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আক্ষেপ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ভারতবর্ষের অন্য সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশী; কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্রও বৃহত্তম। কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে ভাল কর্ম্মী চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ম্মী ইহার অধ্যাপকেরা। অধ্যাপকদিগকে উপযুক্ত বেতন দিতে না পারিলে তাঁহারা অধিকতর বেতন যেখানে পাইবেন সেইখানে চলিয়া যান। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈর্ষ্যা, বা অভিযোগ, বা আক্ষেপ, বা ক্রোধ, বা আক্রোশের একটি কারণ হইয়াছে। ভাল কোন অধ্যাপক অন্যত্র চলিয়া গেলে মনের এই ভাব নানা আকারে প্রকাশ পায়। অভিপ্রায় এই, যে, ভাল অধ্যাপকেরা স্বার্থত্যাগ করিয়া কলিকাতাতেই থাকুন। তাঁহারা তাহা করিতে পারিলে নিশ্চয়ই সুখের বিষয়ই হয়। কিন্তু মানুষ আর্থিক ক্ষতিস্বীকার যে-সব কারণে করে, তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান কি না, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ বিবেচনা করিলে ভাল হয়। শিক্ষার, জ্ঞানের, চরিত্রের, ধর্ম্মনীতির, আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ কোথাও থাকিলে মানুষ এইরূপ কোন-না-কোন আদর্শের জন্য স্বার্থত্যাগ করে। গবেষণা ও জ্ঞান আহরণের অধিকতর বা অধিকতম সুযোগের জন্যও লোকে স্বার্থত্যাগ করে। কিন্তু বিদ্যাপীঠগুলির মধ্যে আদর্শ কিম্বা গবেষণাদির সুযোগ যদি সমান থাকে, তাহা হইলে বেতন যেখানে বেশী, মানুষ স্বভাবতঃ সেখানেই যায়। আবার, যদি কোন এক বিদ্যাপীঠে উচ্চ আদর্শ না থাকে, তাহা হইলে উচ্চ বেতনের আকর্ষণে অন্যত্র যাওয়াও স্বাভাবিক। যদি এমন হইত, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকেও বেশী বেতন দিতে পারেন না, কিম্বা যদি ইহার বেতনের হারের পার্থক্য যোগ্যতার পার্থক্য অনুসারী হইত, তাহা হইলেও লোকে স্বার্থত্যাগ করিত। কিন্তু মনজোগান, তোষামদ, প্রভৃতি যেখানে অন্যতম যোগ্যতা বলিয়া কার্য্যতঃ দেখা যায়, এবং যেখানে কেহ কেহ গূঢ় কারণে বেশী বেতনও পায়, সেখানে স্বার্থত্যাগের কথা উঠিতে পারে না।

আমাদের বিবেচনায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়াও যদি যোগ্যতম লোকদিগকে রাখা যাইত, তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইত; কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণতর না করিয়াও অধ্যাপক-সংখ্যা সহজেই কমান যায়, এবং বাকি অধ্যাপকদিগকে অন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমান বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু অধ্যাপকসংখ্যা বাড়াইয়া আশ্রিত-পোষণ অনুগত-সমর্থকের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল, যে, অনেকের প্রত্যাশিত বা প্রতিশ্রুত বেতন বৃদ্ধি হইতেছে না, কিন্তু নূতন অধ্যাপক নিয়োগ চলিতেছে—আর্থিক টানাটানি সত্ত্বেও চলিতেছে।

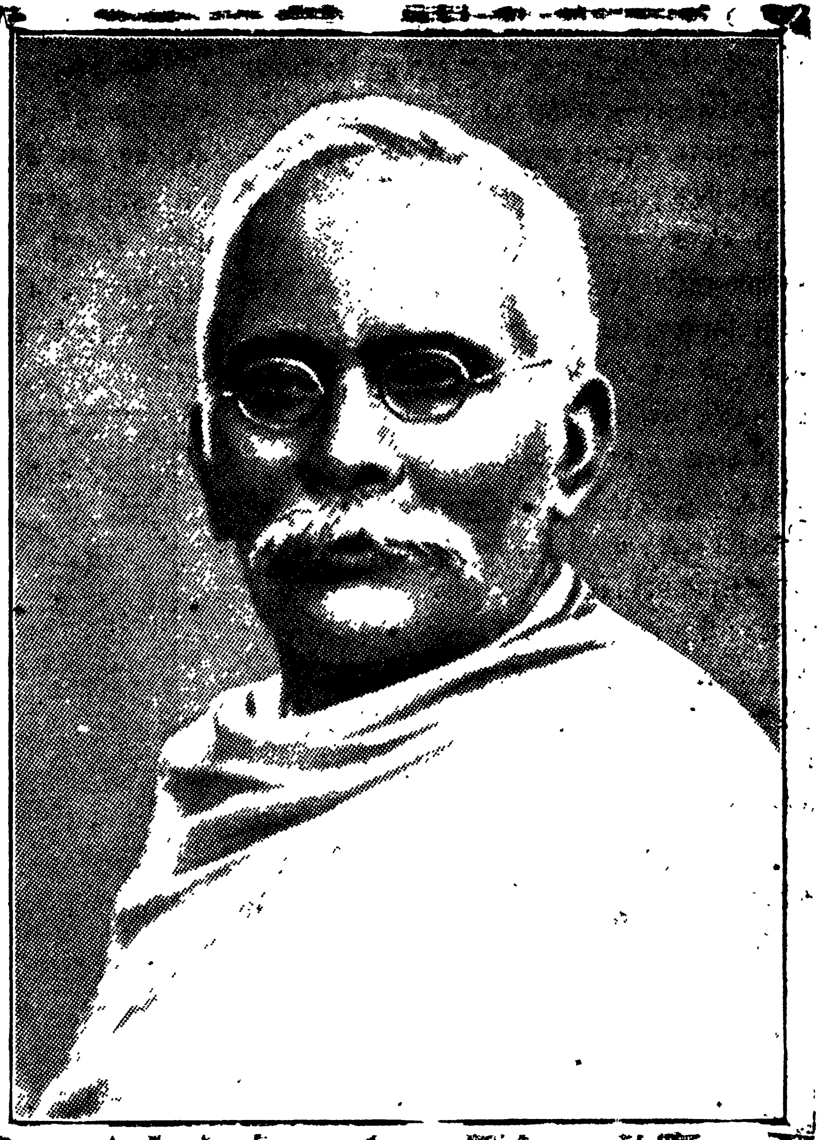
মজার কথা এই, যে, ছাত্র কমিলেও অধ্যাপক বাড়ে ও ব্যয় বাড়ে। ১৯১৯-২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্র ছিল ৮৮+৭৫=১৬৩ (একশত তেষট্টি) জন। ১৯২০-২১ সালে উহা কমিয়া হয় ৮২+৪৬=১২৮ (এক শত আটাশ) জন। ১৯১৯-২০ সালে সাঁইত্রিশ জন অধ্যাপক ছিল, পর বৎসর উহা বাড়িয়া আটত্রিশ হয়। ১৯১৯-২০ সালে অধ্যাপকদের মাসিক বেতন ছিল ৮৮২৫ টাকা; ১৯২০-২১এ উহা বাড়িয়া ৯১৭৫ টাকা হয়। অর্থাৎ ১৯২০-২১ সালে ১২৮ জন ছাত্রকে ইতিহাস পড়াইবার জন্য একলক্ষ দশ হাজার এক শত টাকা খরচ হয়!

আমরা ঐতিহাসিক না হইলেও এইটুকু বুঝি, যে, শুধু এক বাংলা দেশেরই ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা ও জ্ঞান দান করিবার জন্য এক শত অধ্যাপক নিয়োগ করা অসঙ্গত না হইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই, যে, কতগুলি যোগ্য লোককে উপযুক্ত বেতন দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কার্য্যক্ষেত্রে বরাবর রাখিতে পারেন? যখন দেখা যাইতেছে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়, যাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গেলে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিতে পারেন না, তখন

তাঁহাদিগকে যথেষ্ট বেতন দিবার জন্য অন্য দিকে ব্যয়সংক্ষেপ কেন করেন না? তাঁহারা যোগ্য লোক নহেন বলিবার জো নাই; কারণ, তাঁহারা অযোগ্য হইলে তাঁহাদের অন্যত্র গমনে অসন্তোষ আক্রোশ আদি প্রকাশ হইত না। যদি এরূপ বলা হয়, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে একজনও অনাবশ্যক অধ্যাপক নাই, তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণকে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া জানান হউক, কে কত কাজ করেন, কি কাজ করেন, কত কাজ করিয়াছেন, কি কাজ করিয়াছেন। দুই চারি জনের সার্টিফিকেট খবরের কাগজে ছাপিলে ও ছাপাইলে তাহার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয় না, যে, অন্য বহুসংখ্যক অধ্যাপকদের প্রত্যেকেই ভারী লায়েক এবং প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

—

অশ্বিনীকুমার দত্ত



অশ্বিনীকুমার দত্ত　　(আনন্দবাজার-পত্রিকার সৌজন্যে)

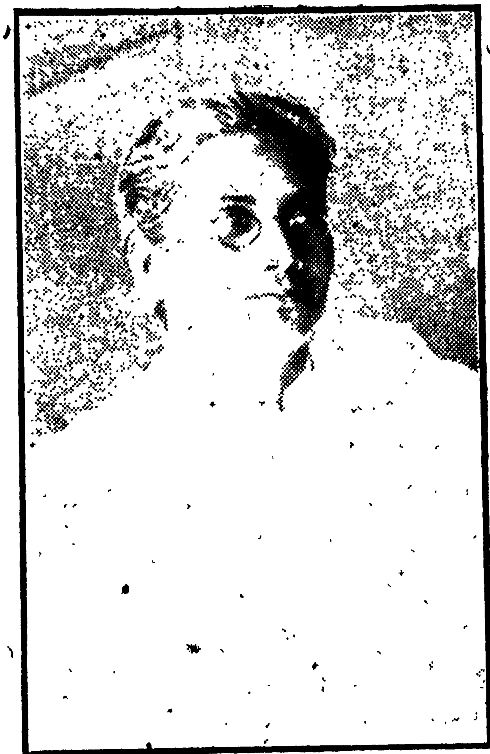
উনসত্তর বৎসর বয়সে ভবানীপুরে অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষা সমাপনান্তে ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে তাঁহার বেশ পসারও জমিয়াছিল। কিন্তু নানা প্রকারে দেশের সেবা করিবার জন্য তিনি ওকালতী ছাড়িয়া দেন। বালক ও যুবকদের প্রকৃত শিক্ষার জন্য তিনি ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে এই শিক্ষালয়ের ফল খুব ভাল হইত; কিন্তু ইহাই ইহার বিশেষত্ব ছিল না। ছাত্রদের চরিত্রের গঠন ও বিকাশের নানাবিধ চেষ্টা এখানে হইত। অশ্বিনী-বাবুর আমলে যাঁহারা ইহার সহিত যুক্ত থাকিয়া তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন, তাঁহারা এই শিক্ষালয়ের এই দিক্‌টির বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিলে দেশের কল্যাণ হইবে। অশ্বিনীকুমার আগেকার যুগের কংগ্রেসের একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। ১৯০৬ সালে বরিশালে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সের প্রতিনিধিদের মিছিল পুলিস "বৈধ লাঠি" (Regulation Lathis) চালাইয়া ভাঙ্গিয়া দেয়, তিনি তাহার অভ্যর্থনা-

কমিটির সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেসে তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাদের প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার করিত। কংগ্রেসের এক অধিবেশনে—কোথায় তাহা মনে পড়িতেছে না—তিনি অনেক "স্বদেশভক্ত"কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলালের সহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাদের মনে আছে। তিনি স্বয়ং নন্দলাল-জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। এইজন্য তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া দেশসেবা জনসেবা করিতেন না। সেই কারণেই তিনি নির্ব্বাসিত হন—বিধাতার কোন বিধি কিম্বা ব্রিটিশ প্রভুদের কোন আইন লঙ্ঘন করায় তাঁহার নির্ব্বাসন হয় নাই; নির্ব্বাসন হইয়াছিল এইজন্য, যে, বরিশালে তাঁহার প্রভাব উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল, এবং এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাগী সাহসী ও প্রেমিক জনসেবকের আবির্ভাব হইতেছিল। এই প্রভাবের একমাত্র কারণ তাঁহার অকপট মানবপ্রেম এবং অক্লান্ত জনসেবা। দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে তিনি সুশৃঙ্খলার সহিত আর্ত্তের সেবা এবং সেবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এইসব কারণে তিনি যে কেবল রাজপুরুষদের ঈর্ষ্যা ভয় ও ক্রোধের পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা নহে; ইহাতে তাঁহার শরীরও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাই এই মহাপ্রাণ সাধু-পুরুষের সেবা হইতে দেশ অনেক বৎসর বঞ্চিত থাকিয়া, আজ তাঁহার পরামর্শ এবং তাঁহার সংসর্গের অনুপ্রাণনা হইতেও বঞ্চিত হইল। কিন্তু তাঁহার জীবনের অনুপ্রাণনা রহিয়া গেল। উহা আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি। সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে তাঁহার আধ্যাত্মিক বংশধরেরা ইহার দ্বারা চিরকাল অনুপ্রাণিত হইতে থাকিবে। তিনি যেমন বাগ্মী ছিলেন, তেমনি ভক্ত ও ভাবুক ও চিন্তাশীল সুলেখকও ছিলেন। "ভক্তিযোগ" তাঁহার লেখনী-প্রসূত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

—

ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা যাঁহারা চান, তাঁহারা স্বর্গীয় ব্রজকিশোর বসু মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। তাঁহারই কন্যা শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু সর্ব্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হন। (ঐ বৎসর শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসুও বি-এ উপাধি লাভ করেন।) ইহাতে তাঁহার পিতার ও তাঁহার বিদ্যানুরাগ সূচিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার মানসিক বলেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এখন বাংলাদেশের হিন্দুসমাজেরও কোন কোন বালিকা কলেজে পড়েন, এবং বি-এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা লাভ অপরাধে শ্রীমতী কাদম্বিনী বসুকে অনেক লোকনিন্দা



ডাক্তার শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী

সহ্য করিতে হইয়াছিল। বি-এ উপাধি লাভ করিবার পর পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অনেকের বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন। নারীর পক্ষে এইরূপ নূতন কাজের শিক্ষা লাভ করিয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতেও তাঁহাকে দুর্বৃত্ত লোকদের নিন্দা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু

তিনি মানসিক বলের দ্বারা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং ইংলণ্ডে গিয়া চিকিৎসা-বিষয়ে আরও যোগ্যতা লাভ করেন। নারীদের উচ্চ-শিক্ষালাভে এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবার পথে অগ্রণী বলিয়া তিনি স্ত্রীজাতির ও নারী-হিতৈষীদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে কংগ্রেসে ও সমাজ-সংস্কার-সমিতিতে বক্তৃতা করেন। কলিকাতায় যে ট্রান্স্‌ভাল্ ভারতীয় সভা স্থাপিত হয়, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী তাহার নেত্রী হইয়া অনেক পরিশ্রম করেন। খনিতে মজুরাণীদের কাজ বন্ধ হইবার প্রস্তাব হওয়ায় তিনি ও শ্রীমতী কামিনী রায় বিহার ও ওড়িষা প্রদেশের কোন কোন খনি দেখিয়া নিজেদের মত প্রকাশ করেন। তিনি সকল দেশে নারীদের রাষ্ট্রীয়-অধিকার-লাভ-প্রচেষ্টার সমর্থন করিতেন।

—

পিয়াস´ন্-চিকিৎসালয়

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের অধ্যাপক উইলিয়ম্ উইন্‌স্‌টান্‌লী পিয়ার্সন্ মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ শান্তিনিকেতন পল্লীতে একটি চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। উহার আনুমানিক ব্যয় পঁচিশ হাজার টাকা হইবে। পিয়ার্সন্ মহাশয়ের স্বভাব এরূপ ছিল, যে, তিনি শিশু বালক যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলেরই সহিত প্রীতির সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারিতেন। যে-কেহ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন, বয়সনির্ব্বিশেষে তিনিই তাঁহাকে ভাল বাসিয়াছেন। সুতরাং মনের মধ্যে স্বভাবতই এই আশার উদ্রেক হয়, যে, ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে, তাঁহাকে যাঁহারা ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধাকে একটি বাহ্য প্রতিষ্ঠানের মূর্ত্তি দিতে সচেষ্ট হইবেন। পিয়াস´ন্ মহাশয়ের চরিত্রের একটি প্রধান ভূষণ এই ছিল, যে, তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া, যশের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, অপরের সেবা করিতেন। সংকল্পিত প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা এইরূপ সেবার ইচ্ছা চরিতার্থ হইবে।



উইলিয়ম্ উইন্‌স্‌টান্‌লী পিয়াস´ন্

পিয়াস´ন্-চিকিৎসালয়ের জন্য সাহায্য বিশ্বভারতীর অর্থসচির মহাশয়কে শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

—

জাতীয় আদর্শ

প্রত্যেক সভ্য জাতির জীবনের মধ্য দিয়া তার জাতীয় আদর্শ, তার জাতীয়তা প্রকাশ পায়। সেই আদর্শ, সেই জাতীয়তা শুধু মুখের কথায় অথবা শাস্ত্রের বচনে প্রকাশ হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত জাতীয়তা অথবা

জীবন্ত আদর্শ যাহা তাহা সর্ব্বদাই জাতির কার্য্যের ও ব্যবহারের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে যেরূপ মুখের ও শাস্ত্রের বচনে নারীগণ দেবী, শরীর মন্দির, বলহীনের আত্মা নাই, জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা শ্রেয়, ছাত্রগণ ব্রহ্মচারী এবং হিন্দুজাতি শ্রেষ্ঠজাতি; কিন্তু কার্য্যে আমরা নারীকে পুড়িয়া মরিতে বা অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করি, তাহাকে বহুক্ষেত্রে অশেষ অপমান ও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করাই, শরীরকে কদর্য্য ও নির্বীর্য্য করিয়া রাখি, শরীরে ও মনে সর্ব্বতোভাবে বলহীন হইয়া শুধু আত্মার বড়াই করি, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যের সকল পবিত্রতা উপেক্ষা করি এবং হিন্দুজাতিকে অবনতির শেষ সীমায় আনিয়া ফেলিয়া রাখি; তাহাতে বোধ হয় আমাদের জাতীয় আদর্শ মৃত ও আমাদের জাতীয়তা নাই। আমরা ব্যক্তিগত দোষগুণ লইয়াই এখন অত্যন্ত বেশীমাত্রায় ব্যস্ত; জাতীয়তা ও আদর্শবাদ আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই একটা মনভুলান মিথ্যা মাত্র। একথা অবশ্য সত্য যে আমাদের প্রকৃত জাতীয়তা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু সে তুলনায় আমাদের জাতীয় জীবনে মৃত আদর্শের বিজ্ঞাপন ও প্রচার একটু বেশী মাত্রায়ই হইয়া থাকে।

অপর কোন দেশে কিছু ভাল দেখিলেই "আমাদের মহাভারতে উহা ছিল" অথবা "আমাদের শাস্ত্রেরও ঐ একই মত" বলিয়া চীৎকার করা আমাদের একটা জাতীয় অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, যে, ঠাকুরদাদার ধন-সম্পত্তি ছিল বলিয়া ভিখারী যেমন ধনী নহে, সেইরূপ অতীতের কোলে আমাদের বর্ত্তমান জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন যে-সকল গৌরবজনক মতামত জ্ঞান ও কার্য্যকলাপ রহিয়াছে তাহাতে আমাদের অগৌরব ও অকর্ম্মণ্যতা অপ্রমাণ হইয়া যায় না।

আমাদের শাস্ত্রকারগণ সুপ্রজনন-বিজ্ঞান (Eugenics) বুঝিতেন কি না জানি না। কিন্তু কথা উঠিলে অনেক শাস্ত্রবিদ্ এখনই আসিয়া বলিবেন "বর্ত্তমান আমাদের কি শিখাইবে? বর্ত্তমান ত নবীন, তাহার জ্ঞান হইবে কি করিয়া?" নবীন কেন যে উৎকৃষ্টতর ও নূতন জ্ঞানে ও সুকার্য্যে জগৎকে সৌন্দর্য্যশালী করিতে পারিবে না তাহার প্রমাণ স্বরূপ শুধু বৃদ্ধের মনে নবীনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নাই। বৃদ্ধ রেলগাড়ী চড়িয়া তিন দিবসে অল্পব্যয়ে বৃন্দাবন যাইতে প্রস্তুত আছেন; কিন্তু এই রেলপথের সাহায্য লওয়া হইল নবীনের সেবা গ্রহণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে নবীন কিছু বলিলে তাঁহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগিবে সুতরাং "নবীন, তুমি কর্ম্মক্ষম বটে, কিন্তু তোমার জ্ঞান ও বুদ্ধির কিছু অভাব আছে"। নবীনকে বলিতেছি না যে বৃদ্ধের কাছে শিখিবার কিছু নাই। সর্ব্বত্রই শিখিবার আছে এবং কোন ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের নিকট কিছু শিখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ বার্দ্ধক্যের লক্ষণ।

বৃদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ বলিবেন "আমাদের শাস্ত্রে সুপ্রজননবিজ্ঞান বিষয়ে যাহা নাই তাহা না শিখিলেও চলে", কিন্তু তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সুপ্রজনন-জ্ঞানের অভাব ভগ্নশরীর বালিকা মাতা ও নিস্তেজ মৃতপ্রায় ও অনেকস্থলে জন্মান্ধ জন্মরুগ্ন বা অঙ্গহীন শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের মিথ্যাচরণের জীবন বিষময় করিয়া তুলিতেছে। মিথ্যাচরণ বলিতেছি কেন? যে বিশ্বাস, যে জ্ঞান জীবনের কার্য্যে দেখা যায় না তাহাই মিথ্যা বিশ্বাস, তাহাই মিথ্যা জ্ঞান। অর্থাৎ সেই বিশ্বাস বা জ্ঞান সত্য-সত্য কাহারও হৃদয়ে নাই। তাহা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে একটা বিশ্বাস ও জ্ঞানের ভাণ বা মিথ্যা অভিনয় মাত্র। সেইরূপ যে কার্য্য ও যে জীবননির্ব্বাহপ্রণালী মনের বিশ্বাস বা জ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহা মিথ্যাচরণ। আমাদের অনেক পণ্ডিতের (পণ্ডিত বলিতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝাইতেছে) আচরণ মূর্খাচরণ। মূর্খাচরণ বলিতেছি কেন? মূর্খ কে? যে জ্ঞান লাভ করে নাই সে মূর্খ এবং সে ছাড়া যাহারা জ্ঞান লাভে অনিচ্ছুক অথবা জ্ঞান লাভকে তাচ্ছিল্য করে তাহারাও মূর্খ। আমাদের শিক্ষিত-সমাজের মধ্যেও (প্রকৃত শিক্ষার অভাবে) প্রায় সর্ব্বত্র বাল্যবিবাহ, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার, নির্ব্বোধের ন্যায় সন্তান পালন, শরীরের প্রতি অত্যাচার, এক কথায়, মনের জ্ঞান যাহা বলে কার্য্যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ দৃষ্ট হয়। ইহা গেল মিথ্যাচরণ। কিন্তু ইহা ছাড়াও দেখা যায় যে

শিক্ষিত ব্যক্তি বলিতেছেন "বাল্য বিবাহে দোষ নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভুল (যদিও আমি সে বিষয় কিছু জানি না)। ৺ সার গুরুদাস বাল্যবিবাহের সন্তান। (সুতরাং বাল্য বিবাহের সন্তান মাত্রই গুরুদাসের সমতুল্য।)" বাল্য-বিবাহের একটি সুফল ফলিয়াছিল হয়ত। ইহা সত্য হইলেও ইহার চেয়ে মর্ম্মঘাতী সত্য এই যে বাল্যবিবাহের একটি নহে কোটি কোটি কুফল ফলিয়াছে এবং ফলিতেছে। ইহা গেল 'শিক্ষিত' সমাজের মূর্খাচরণের কথা।

এখানে আমাদের জাতীয় দোষগুলি দেখাইবার কারণ এই যে বর্ত্তমান কালে আমরা অপরের দোষ দেখিতে একটু বেশী মাত্রায়ই ব্যগ্র। জাতীয় অবনতির যুগে আত্মদোষ বিস্মৃত হওয়া বিপদ্জনক। জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির এখন ভাবিয়া দেখা উচিত যে তাঁহার জীবন উন্নততর না হইলে, জাতির উন্নতি সম্ভব কি না। তাঁহার শরীর ও মন আরও সুন্দর ও সুগঠিত না হইলে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তিকে দিয়াই জাতি গঠিত, জাতি নামধেয় কোন মূর্ত্তিমান্ দানব নাই যে তার উপকার জাতীয় ব্যক্তির উপকার হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে হইতে পারে। আমাদের জাতীয় আদর্শকে নূতন করিয়া জীবনের কার্য্যে দেখাইতে হইবে। সেই আদর্শে শাস্ত্রের মধ্যে যাহা কিছু ভাল আছে তাহা ত থাকিবেই, উপরন্তু বাহির হইতে নূতনতর যাহা কিছু তাহাকেও আপনার করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু জাতীয় আদর্শ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া কোন মহাপুরুষ জাতির সম্মুখে ধরিবেন এবং জাতি তাহা দেখিয়া কার্য্য করিবে ইহা সম্ভব নহে। জাতীয় আদর্শ প্রথমত কয়েকটি লোকের হৃদয়ে থাকে। তার পর ব্যক্তি হইতে গৃহে, গৃহ হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে বহুগ্রামে, এইরূপে সেই আদর্শ দেশব্যাপী বা বহুদেশব্যাপী হইয়া পড়ে। কিন্তু ক্রমশঃ প্রচারের পথে তাহার মধ্যে পরি-বর্ত্তনও হয়। একের বা কতিপয়ের অন্তরে যাহা জাগিয়া উঠে, তাহা দেশব্যাপী হইয়া গৃহীত হইতে হইলে তাহার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হয়। কিন্তু জাতীয় জীবনে সেই আদর্শ প্রকৃত রূপে গৃহীত হইতে হইলে সকল ব্যক্তিকে তাহা কার্য্যে মান্য করিতে হইবে। পরের নিকট আত্মজাহিরের অস্ত্র বা অক্ষম শরীর ও মন লইয়া পিতৃপুরুষের সাহায্যে আত্মশ্লাঘা-বোধের আনন্দলাভের উপায় স্বরূপ তাহা ব্যবহৃত হইলে কোন লাভ নাই। কোন কিছুকে তাচ্ছিল্য করিয়া সময়ের অপব্যবহার অপেক্ষা সেখানে যাহা ভাল তাহাকে গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনাদর্শকে চিরনবীন ও চির-জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা ও কার্য্যত শরীর ও মনকে সেই আদর্শের দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টাই ব্যক্তির ও জাতির প্রধান কর্ত্তব্য। অ

জাপানে ধ্বংস- ও হত্যা-লীলা

সম্প্রতি জাপানে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার তুল্য ভূমিকম্প পৃথিবীতে আর হয় নাই এসম্বন্ধে সকলেই একমত। খবরের কাগজে প্রথম যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা কিছু বাড়াইয়া বলা হইয়া থাকিলেও, আজকাল যে পূর্ব্ব হইতে সঠিক খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও এই ধ্বংস-ব্যাপার কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। একেবারে নির্ভুল হিসাব এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, আর কখনও যে পাওয়া যাইবে তাহার কোন সম্ভাবনাও নাই। মোটামুটি ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তোকিও সহরে ১১০০০০ জন, ইয়োকোহামায় ৩০০০০ জন, কামাকুরাতে ১০০০, মিউরা উপদ্বীপে ১০০০০ জন, ওদাওয়ারা ও আতামিতে ১০০০, বোসো উপদ্বীপে ৫০০০ জন—মোটের উপর ১৬৬০০০ জন লোক মারা গিয়াছে। তাহা ছাড়া ইয়োকোহামাতে৭০০০০খানি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে ও মাত্র শতখানেক বাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ইয়োকোসুকাতে ১২০০০ বাড়ীর মধ্যে মাত্র ১৫০খানা রক্ষা পাইয়াছে। তোকিওতে শতকরা ৯৩ খানি বাড়ী হয় পড়িয়া গিয়াছে, নয় আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তোকিও সহরে কোন কোন বহুতল হর্ম্ম্যের তিনতলার মেঝেয় ফাটল দেখা যাইতেছে, কিন্তু সর্ব্বনিম্ন কিম্বা সর্ব্বোচ্চ তলায় খুব কম ক্ষতি হইয়াছে দেখা যাইতেছে। তোকিও সহরে যে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল তাহাতে রাজকীয় গ্রন্থাগারের অনেকাংশই পুড়িয়া গিয়াছে ও প্রায় ৭০০০০০ খণ্ড বই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।



তোকিও সহরের ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডের পরের একটি সাধারণ দৃশ্য

এই ভীষণ প্রাকৃতিক উৎপাতের সময় জাপানীরা বিদেশী লোকদের প্রতি মোটের উপর ভাল ব্যবহারই করিয়াছে। কিন্তু কোরিয়ার অধিবাসীদিগের উপর তাহাদের যে অত্যাচারের খবর পাওয়া যাইতেছে তাহা অত্যন্ত নৃশংসতার পরিচায়ক।

জাপানের গভমেণ্ট্ এই অত্যাচারের কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু খ্যাতনামা সাংবাদিক ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড্ লিখিতেছেন যে এসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। অন্য বিদেশী লোকেরা তাঁহাকে বলিয়াছে যে তাহারা সহরে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় স্বচক্ষে কোরিয়ার অধিবাসীদিগকে হত হইতে দেখিয়াছে। এইসব হত্যার দোষ সাধারণতঃ কতকগুলি ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারী যুবকসম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপান হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়গুলিকে সেখানকার রাজসরকার সুনজরেই দেখিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক গামে ও সহরের প্রায় প্রত্যেক পাড়াতেই তাহাদের আড্ডা আছে। নানারূপ সামাজিক প্রচেষ্টাতেই সাধারণতঃ ইহাদের কাজ আবদ্ধ থাকে ও তাহারা নিজেদের নৈতিক উন্নতির জন্যও উৎসাহ দেখায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত যোদ্ধৃধর্ম্মও আদর্শরূপে তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখা হয়। সেই আদর্শের প্রেরণাতেই যে তাহারা নরহত্যা করিতে দ্বিধা করে নাই তাহা বুঝা যাইতেছে। একথা স্বীকার্য্য যে সত্য-সত্যই জাপানীদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহারা অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিল কোরিয়ার অধিবাসীরা এই ধ্বংস-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছে; আর এই যুবকসঙ্ঘ সত্যসত্যই মনে করিয়াছিল যে তাহারা নিজ লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার্থেই কার্য্য করিতেছিল।

সস্তা দামে মজুর খাটাইবার জন্য অনেক কোরিয়াবাসীকে জাপানীরা নিজেদের দেশে আনে, আর



ভূমিকম্পের পর তোকিও সহরের দৃশ্য। অধিবাসীরা নিরাশ্রয় হইয়াছে তবুও শান্ত ও পরিচ্ছন্ন



মিকম্পের পর তোকিও সহরের দৃশ্য। রাজপ্রাসাদের বাহিরে নিরাশ্রয় লোকদের জন্য প্রস্তুত কুটীরাবলী

তাহাদের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব তাহারা বরাবরই পোষণ করে। কোরিয়ার জাতীয় দলের বিদ্রোহ-প্রচেষ্টাগুলি জাপানের খবরের কাগজে এমন আকারে বাহির হইত যাহাতে জাপানী জাতির মন কোরিয়ানদের উপর আরও বিরূপ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় যত আজগুবি জনশ্রুতিকেও অনেকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আতঙ্ক সৃষ্টির সহায়তা করে। মুখে মুখে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে কোরিয়ার জাতীয় দলের লোকেরাই এই-সব অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়া দিয়াছিল। সহরের কূপের পানীয় জলও তাহারা বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল এরূপ অভিযোগও তাহাদের নামে হয়। তাহা ছাড়া অন্যান্য গুরুতর অত্যাচারের অপবাদও লোকে এই-সব কোরিয়ার অধিবাসীদের নামে প্রচার করিয়াছিল।

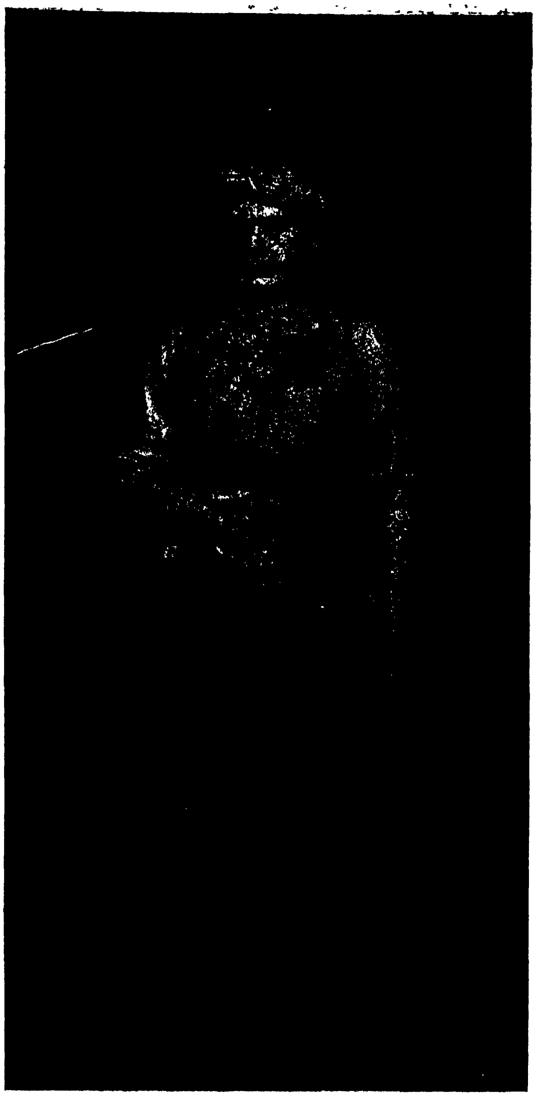
ইহা খুবই সম্ভব যে কোরিয়ার অধিবাসীদের অত্যাচারের কথাও অনেকটা সত্য। যখন তাহারা দেখিল যে জাপানের লোকেরা তাহাদের অন্ন-পানীয় বন্ধ করিয়াছে ও দেখা-মাত্রই তাহাদের প্রাণবধ করিতেছে তখন তাহারাও মরীয়া হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। অনেক বিদেশী পর্যটক মনে করেন যে কোরিয়া-বাসীদেরই বেশি দোষ। কিন্তু ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড্‌ সাহেব বলেন যে কেহই একথা বলিতে পারেন নাই যে তিনি কোন কোরীয়কে আক্রমণকারীরূপে দেখিয়াছেন। অথচ তাহাদের হত্যা করা হইয়াছে এদৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন।

প্রথম কয়েকদিন জাপান সরকার এইসব অদ্ভুত জনরব নিরাকরণ করিতে তেমন কিছুই করেন নাই। চার পাঁচদিন পরে এক বিলম্বিত ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে এইসব জনরব বিশ্বাস করিতে নিষেধ করা হয় ও কোরীয়দের প্রতি ও অন্যান্য বিদেশীয়দের প্রতি তিতিক্ষা প্রদর্শন করিতে বলা হয়। ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড্‌ বলিতে-ছেন যে সহরের কোরীয় বাসিন্দাদের খুব অল্পসংখ্যক লোকই প্রাণে বাঁচিয়াছে। যাহাদের বাহির হইতে নিঃসন্দেহে কোরীয় বলিয়া চেনা যায় না, তাহাদিগকে ভাষা পরীক্ষা দিয়া প্রমাণ করিতে হইয়াছে যে তাহারা কোরীয় নয়। চীনাদের অনেককেও এইরূপ ভাষা পরীক্ষা করিয়া কোরীয় বলিয়া সন্দেহে হত্যা করা হইয়াছে।

—

ম্হাত্রের গঠিত প্রতিমূর্ত্তি

প্রসিদ্ধ ভাস্কর শ্রীযুক্ত ম্হাত্রে লিম্বড়িরাজ্যের পরলোক-



ম্হাত্রের গঠিত লিম্বড়ি রাজ্যের পরলোকগত ঠাকুর সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি

গত রাজা ঠাকুর সাহেবের এক প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন। আমরা তাহার প্রতিরূপ প্রকাশ করিলাম।

—

আচার্য্য ভিন্‌তার্‌নিৎস্

(Dr. M. Winternitz)

প্রাগ জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাক্তার ভিন্‌তার্‌নিৎস্ এতদিন বিশ্বভারতীতে ছিলেন। তাহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতাতে সকলে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছেন যে সম্প্রতি তাঁহার বিদায় গ্রহণে তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রমণ্ডলীর সকলের বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা বিশেষ-রূপে বোধ হইয়াছে।

বিদায়-কালে কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে যে বিদায়-



আচার্য্য ভিন্‌তার্‌নিৎস্‌কে বিদায়। মধ্যস্থলে আচার্য্য ভিন্‌তার্‌নিৎস্, তাঁহার দক্ষিণে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার বামদিকে শ্রী বিধুশেখর শাস্ত্রী।



বোলপুর ষ্টেশনে ট্রেনের সম্মুখে ভিন্‌তার্‌নিৎস্ রবীন্দ্রনাথের নিকট বিদায় লইতেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীগণ বিদায় দিতে আসিয়াছেন

লিপি দিয়াছেন তাহার একস্থানে আছে, "আপনার চরিত্রের প্রতি আমাদের ভালবাসা, আপনার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার সমান হইয়া উঠিয়াছে।" আচার্য্য ভিন্‌তার্‌নিৎস্ উত্তরে বলেন, "প্রসিদ্ধ কবি গেটে বলিয়াছেন :—"প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে আর বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারা যাইবে না।" আমি বলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিল না।

"১৯২১ খৃঃ অব্দে আপনি যখন আমাদের দেশে বক্তৃতা দিতে যান তখন আমি আমার বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম, 'আপনার বক্তৃতার সাফল্য দেখিয়া আমার মনে হয়,



ভিন্‌তার্‌নিৎস্‌কে বিদায় দিবার জন্য শান্তিনিকেন আশ্রমের তরুবীথিকায় সমবেত অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলী



শান্তিনিকেতন হইতে আচার্য্য ভিন্‌তার্‌নিৎসের বিদায়।
ভিন্‌তার্‌নিৎস্‌কে ছাত্রগণ প্রণাম করিয়া বিদায় দিতেছেন। পার্শ্বে রবীন্দ্রনাথ এবং বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি দণ্ডায়মান

যে, কোন না কোন দিন সমস্ত পৃথিবী, কবি ও আদর্শ-বাদীর সহিত সার দিয়া দাঁড়াইবে।'

"তখন আমি ভাবি নাই যে দুই বৎসর পরেও পৃথিবীর অবস্থা আমার আশা পূর্ণ হইবার পথে এতটা অন্তরায় হইয়া থাকিবে।

"কিন্তু আজকার ইয়োরোপের এই অশান্তি ও এই দুর্দ্দশা দেখিয়া মনে হয় যে যাহারা পাশবিক শক্তিতে, হিংসায়, স্বার্থপর জাতীয়তায় ও জাতীয় স্বার্থপরতায় বিশ্বাস করে, তাহারা ভুল করে এবং এই-সব জিনিস কখনও আনন্দের পথে মানুষকে লইয়া যাইবে না। সব দেখিয়া শুনিয়া

মনে হয় যে বাজারের লোকেরা ঠিক বুঝে নাই—ঠিক বুঝিয়াছে কবি ও আদর্শবাদী।

"আমার মনে হয় যে আদর্শ যাহা তাহাই শুধু সত্য, তাহাই শুধু চিরস্থায়ী হইবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলিলেই জগৎ উদ্ধার হইবে না। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ যাহা তাহা মিলিলে তবেই জগতের মঙ্গল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় একজন লিখিয়াছিলেন 'কোন কোন মহাত্মা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মতামতবিনিময় স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাহাতেই যে নিশ্চয় উপকার হইবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। অসভ্যতার সহিত অসভ্যতা মিলিলে ফলে অসভ্যতাই হয়'। কথাটি সত্য।

"আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি। আমি জানি এদেশেও ইয়োরোপের মত অসভ্যতা পাশবিকতা আছে। ভারতীয় সাহিত্যে, ভারতীয় ধর্ম্মে, ভারতীয় অন্যান্য ব্যাপারে আবর্জ্জনা কিছু নাই বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। তাই বলি —এই-সকল আবর্জ্জনা আবর্জ্জনার টিনে (Dust bin) ফেলিয়া দাও এবং ভালটুকু রাখ। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ যা কিছু তাহাই রাখা হউক, তাহা না হইলে পাশ্চাত্য আবর্জ্জনার সহিত ভারতীয় আবর্জ্জনা মিলিয়া এক বিরাট্ আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইবে।" আচার্য্যের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিবার কথা।

অ

বাংলায় প্রথম আর্দ্ধসপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকেরা তাঁহাদের কাগজের আর্দ্ধসপ্তাহিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, বাংলা আর্দ্ধসপ্তাহিক কাগজ এই প্রথম। কাগজখানির দৈনিক সংস্করণ যে বেশ ভাল চলিতেছে তাহা এই নূতন উদ্যোগ হইতে বুঝা যায়।

অ

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

পূর্ব্বানুবৃত্তি

বারোর বাড়ি

১। তামেচা, করক, তেওয়র, পালট, শির, ভাণ্ডার, কোমরকাট্, সাও, উল্টাসাও, হুল, বাহেরা, গ্রীবান্।

২। বাহেরা, ফাক্, দে, করক, পৃষ্ঠ দক্ষিণ, ভাণ্ডারকাট্, অঙ্ক্, হালকুম, ভুজ, পালট্, পৃষ্ঠ উত্তর, উল্টা অঙ্ক্।

কোমরকাট্—দক্ষিণ-কোমর-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে অসি পায়ুমূল ছেদন করিয়া যায়।

ফাক্—বাম বাহুমূলের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে স্কন্ধদেশ ছেদন করিয়া বাম বাহুকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

দে—দক্ষিণ বক্ষপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে ঊর্দ্ধদিকে বাম স্কন্ধ ও গলদেশের সন্ধিস্থল ছেদন করিয়া বাহির হইয়া যায়।

পৃষ্ঠ দক্ষিণ—পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পদ শূন্যে তুলিয়া শরীর সম্মুখে অগ্রসর করাইয়া দক্ষিণ পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া আঘাত করা হয়।

ভাণ্ডারকাট্—বাম কোমর-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বক্রভাবে অসি পায়ুমূল ছেদন করিয়া যায়।

অঙ্ক্—দক্ষিণ ঊরুদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থলকে দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে আঘাত করিয়া সমগ্র দক্ষিণ পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

হালকুম্—গলদেশের দক্ষিণ পার্শ্বের পিছন দিক্ হইতে অসির উল্টা পিঠ দিয়া সরলভাবে গলদেশ ছেদন করিয়া ফেলা হয়।

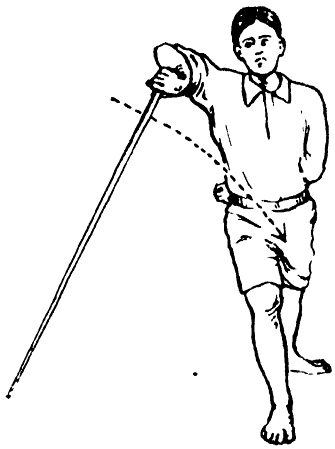
পৃষ্ঠ উত্তর—পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পদ শূন্যে তুলিয়া শরীর সম্মুখে অগ্রসর করাইয়া বাম পৃষ্ঠ ব্যাপিয়া আঘাত করিতে হয়।

উল্টা অঙ্ক্—বাম ঊরুদেশ ও শরীরের সন্ধিস্থলকে বাম পার্শ্ব হইতে বক্রভাবে নিম্নমুখে আঘাত করিয়া সমগ্র বাম পদ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা :—

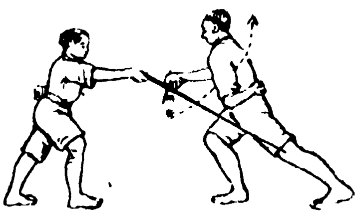
"কোমরকাট্" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ্ দক্ষিণ-বক্ষ-পার্শ্বের প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবরে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া দক্ষিণ দিকে

হেলিয়া থাকিবে।. লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে তাহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ-সমকোণে মিলিত হইবে। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।



কোমর কাট্

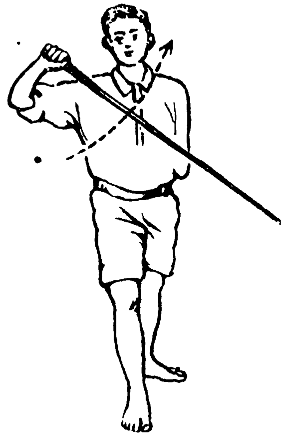
"ফাক্" আট্‌কাইবার কালে উপর হইতে হাঁকিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে সোজা নিম্নের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



ফাক্

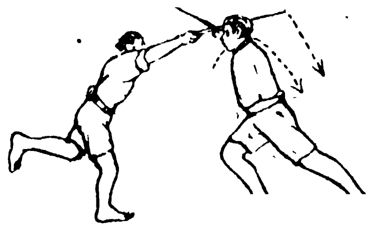
"দে" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ্ দক্ষিণ-বক্ষ-পার্শ্বের প্রায় অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে এবং ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ বরাবরে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া বাম পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে। লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে প্রায় অর্দ্ধ-সমকোণে মিলিত হইবে। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।

"পৃষ্ঠ দক্ষিণ" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ্ দক্ষিণ স্কন্ধ মোড় হইতে প্রায় চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে, চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে এবং অর্দ্ধহস্ত ঊর্দ্ধ ববাববে রাখিয়া এবং



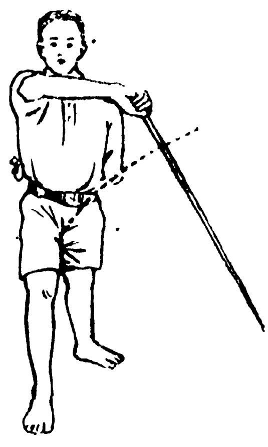
দে

লাঠিকে ভূমির সমান্তরালভাবে ধরিয়া নিম্ন হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে ঊর্দ্ধদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



পৃষ্ঠ দক্ষিণ

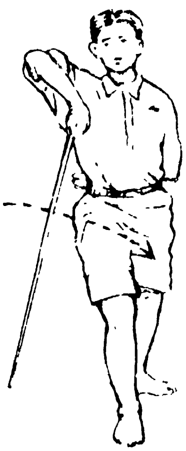
"ভাণ্ডারকাট্" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ নাভি হইতে চারি অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে এবং প্রায় চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে



ভাণ্ডার কাট

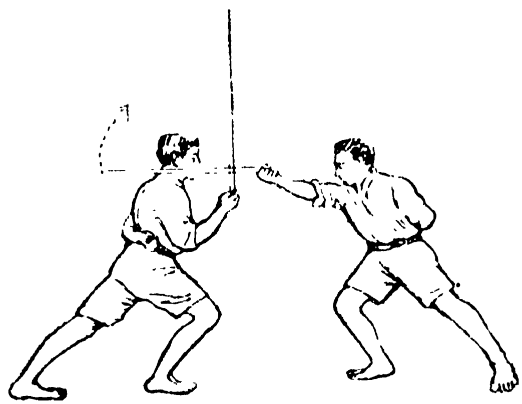
থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু বামপার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অর্দ্ধসমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।

"অঙ্ক" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ্‌ দক্ষিণ-কোমর-পার্শ্ব বরাবরে প্রায় অষ্টাদশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে। লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অর্দ্ধসমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।



অঙ্ক্

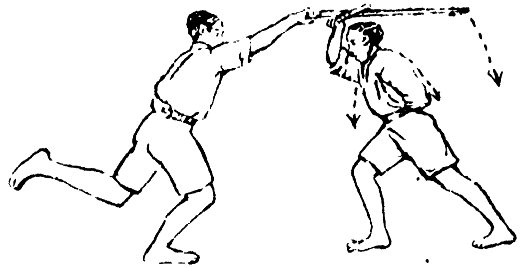
"হালকুম্" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ্‌ দক্ষিণ স্কন্ধ মোড় হইতে কিঞ্চিদধিক চারি অঙ্গুলী দক্ষিণে ও



হালকুম্

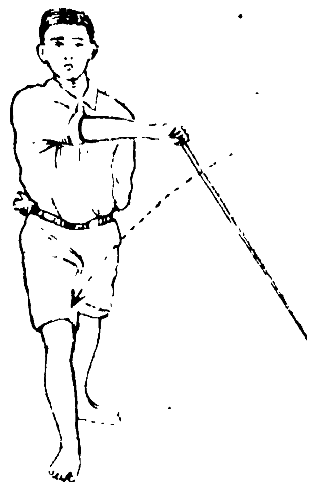
নিম্নে এবং কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধহস্ত সম্মুখে থাকিবে। লাঠি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্ব বরাবরে থাকিবে।

"পৃষ্ঠ উত্তর" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ্‌ নাসিকাগ্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে রাখিয়া লাঠিকে ভূমির সমান্তরাল করিয়া নিম্ন হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে ঊর্দ্ধ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



পৃষ্ঠ উত্তর

"উল্টা অঙ্ক" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ্‌ নাভি হইতে প্রায় চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে, লাঠির অগ্রবিন্দু নিম্নমুখ হইয়া বাম পার্শ্বে হেলিয়া থাকিবে, যেন লাঠির সমসূত্রে একটি বর্দ্ধিত রেখা কল্পনা করিলে উহা ভূমির সঙ্গে অর্দ্ধসমকোণে মিলিত হয়। সমগ্র লাঠি বক্ষের সমান্তরাল ক্ষেত্র বরাবরে থাকিবে।



উল্টা অঙ্ক

তেরোর বাড়ি

২। তামেচা, মন্, ভ্রূকুটি, উল্টাফাক্, উল্টাহালকুম্, জবেগা, উল্টাজবেগা, আসর, দিগর, ভর্জ্জা, উল্টাভ্রূকুটি, হুজুর, উল্টাহুজুর।

ভ্রূকুটি—দক্ষিণ ভ্রূ ও ভ্রূ-মধ্য বরাবরে আঘাত করিয়া অভ্যন্তরের দিকে দক্ষিণ চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়।

উল্টাফাক্—দক্ষিণ-বাহু-মূলের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে স্কন্ধদেশ ছেদন করিয়া দক্ষিণ বাহুকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়।

উল্টা হালকুম্—গলদেশের বাম পার্শ্বের পিছন দিক্ হইতে অসির উল্টা পিঠ দিয়া সরলভাবে গলদেশ ছেদন করিয়া ফেলা হয়।

জবেগা—দক্ষিণ গল-পার্শ্বের ঠিক্ মধ্য বরাবরে সরল ভাবে ছেদন করিয়া বাম-গল-পার্শ্বের ঠিক মধ্য বরাবরে অসি বাহির হইয়া যায়।

উল্টা জবেগা—বাম-গল-পার্শ্বের ঠিক্ মধ্য বরাবরে সরলভাবে ছেদন করিয়া দক্ষিণ-গল-পার্শ্বের ঠিক্ মধ্য বরাবরে অসি বাহির হইয়া যায়।

ভর্জ্জা—দক্ষিণ স্কন্ধ মোড় ও কনুইএর মধ্য বরাবরে নিম্নমুখে বক্রভাবে আঘাত করিয়া দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া ফেলা হয়।

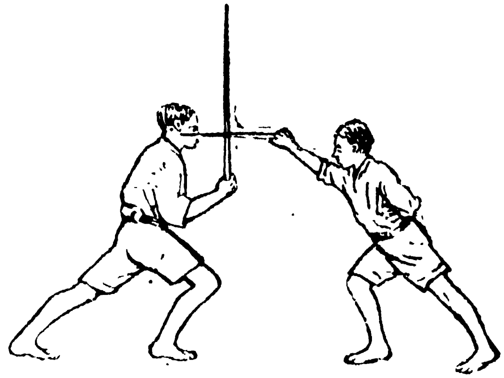
উল্টাভ্রূকুটি—বাম ভ্রূ ও ভ্রূমধ্য বরাবরে আঘাত করিয়া বাম চক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়।

হঞ্জুর—বাম স্কন্ধদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী নিম্নে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। অসির ধারের দিক্ উপরের দিকে থাকে।

উল্টা হঞ্জুর—দক্ষিণ স্কন্ধদেশের সম্মুখস্থ অস্থির এক অঙ্গুলী নিম্নে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। অসির ধারের দিক্ উপরের দিকে থাকে। শরীর অল্প পরিমাণ বামে ঘুরাইয়া মারিতে হয়।

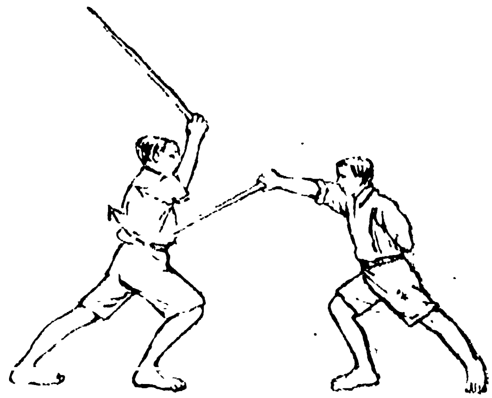
বর্ণনা :—

"ভ্রূকুটি" আট্‌কাইবার কালে হাতের মুঠ নাসিকাগ্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ বরাবরে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ঈষৎ বামে হেলিয়া থাকিবে।



ভ্রূকুটী

"উল্টা ফাক্" আট্‌কাইবার কালে লাঠি উপর হইতে হাঁকিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে আঘাত করিয়া নিম্নে ও দক্ষিণ পার্শ্বের দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



উল্টাফাক্

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস



"মুসলমানী নাম"

সম্পাদক মহাশয় আমার "মুসলমানী নাম" শীর্ষক আলোচনার একটি মন্তব্য লিখিয়াছেন। ঐ বিষয়ে আমি এখন আর বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহি না; তবে উহার স্থানে স্থানে সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিতান্ত ভুল বুঝিয়াছেন বলিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি আজীবন সর্ব্বপ্রকারের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামী পরিহারেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছি; তাই আজ আমার সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়কে ভুল ধারণা করিতে দেখিয়া বাস্তবিকই অবাক্ হইয়াছি। ভারত আমার জন্মভূমি—প্রিয় লীলানিকেতন; আমার নিকট ভারতাপেক্ষা পৃথিবীর আর কোন দেশই প্রিয় হইতে পারে না। ভারতের সব-কিছু অতি আদরের সামগ্রী। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন—"যে-সব নামে ভারতীয়ত্ব আছে, সেগুলিকে বিক্রমপুরী মহাশয় খিচুড়ী নাম বলিয়াছেন।" আমি কিন্তু ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় নামের সম্বন্ধেই একথা বলিয়াছি; ভারতীয়ত্ব আমার নিকট ইউরোপীয়ত্বের অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয় ও প্রেয়। আর আমি হিন্দুদিগকে বিশ্ববহির্ভূত ও ইউরোপীয়দিগকে বিশ্বের অন্তর্গত মনে করি নাই; আমার নিকট পৃথিবীর সব জাতির চেয়ে হিন্দু বেশী প্রীতি ও সহানুভূতি পাইতে পারে। ভারতীয় হিসাবে হিন্দুর গৌরব ও সম্মানে আমিও নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকি। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব, তাই নিরস্ত হইলাম।

মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী

সাঁওতালি গান

(ঝুমুরের * তালে রচিত)

১

আগে ছিল উজল রাত,
পরে এলো আঁধারি—
হে ননদি, এখন তুমি শুয়ো না অঙ্গনে—
অমন করে' শুয়ো না অঙ্গনে!
আঁধার-ঢাকা নিঝুম্ রাত—
নাহি আলো চাঁদারই,
এলো-মেলো ঝোড়ো হাওয়া উঠেছে কন্‌কনে।
অমন করে' শুয়ো না অঙ্গনে।
টপ্‌কে বেড়া ঢুক্‌বে চোর
না ভাঙ্‌তে ঘুমটি তোর,—
কর্‌বে চুরি তোমার সাধের তাবিজ ও কঙ্কণে।
অমন করে' শুয়ো না অঙ্গনে।
(বাঁশি—তুতু তুআ উতু তুআ তুতুর তুআ তু—)

২

দীঘির ঘাটে জল আন্‌তে হারিয়ে গেছে কানের দুল্,
হে ননদি, বোলো না দাদারে—
তোমার বোলো না দাদারে।
তোমার দাদা ক্ষেত্‌কে গেছে আন্‌তে তুলে ঝিঙের ফুল,
বোলো না দাদারে,—
তোমার বোলো না দাদারে!
শুন্‌তে পেলে তোমার দাদা বাধাবে আজ হুলুস্থুল,—
বোলো না দাদারে।
ভেঙে এনে চাঁপার ডাল
তুল্‌বে আমার পিঠের ছাল,
কেঁদে আমি মর্‌ব একেবারে,—
বোলো না দাদারে;
হে ননদি, হে ননদি, বোলো না দাদারে—।
(মাদল—ধিতাং ধিতাং তুর্‌র্ ধিতাং।)

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

* ঝুমুর একরকম নাচ। বিহার অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত। একদল যুবতী হাত ধরাধরি করে' নাচে আর গান করে, আর যুবকেরা তালে তালে বাঁশী ও মাদল বাজায়।

পুস্তক পরিচয়

সবলতা ও দুর্ব্বলতা—শ্রীমৎস্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥৹ আনা। ১৩৩০।

এই গ্রন্থে স্বামীজি সবলতা ও দুর্ব্বলতার কষ্টিপাথরে সব কাজের ধর্ম্মাধর্ম্ম কসিয়া লইয়া বিচার করিয়াছেন। সত্য মিথ্যা কি, পাপ পুণ্য কি,—এইসব নীতি-ধর্ম্মের কথা লেখকের মতে যেরূপভাবে বিচারিত হওয়া উচিত তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

বাংলার পল্লীসমস্যা—শ্রী নগেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸৹ বারো আনা। (১৩৩০)

এই পুস্তকটিতে (১) সেকাল ও একাল (২) কৃষকের দারিদ্র্য (৩) কৃষক ও জমিদার (৪) মহাজন ও কৃষক (৫) পল্লীশিল্পের ধ্বংস (৬) জলনিকাশের বাধা (৭) বাংলার জলকষ্ট (৮) গোজাতির অবনতি (৯) অরণ্যসম্পদ্ ও তাহার অপচয় (১০) পল্লীর রক্তশোষণ (১১) পল্লীসংস্কার ও সমবায়-নীতি (১২) পল্লীশিক্ষার ধারা (১৩) শিক্ষিতের পল্লীপ্রত্যাবর্ত্তন ও (১৪) পল্লীসেবক, এই কয়টি অধ্যায়ে বহু তথ্যের সাহায্যে পল্লীসমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া পরিশিষ্টেও অনেক অর্থনীতিঘটিত বিষয়ের তথ্য সংযোজিত হইয়াছে। পল্লীর অভাব-অভিযোগের কথা যাঁহারা আলোচনা করিতে চান এ পুস্তক তাঁহাদের খুব উপকারে লাগিবে। পুস্তকে মুদ্রাকরপ্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে বলিয়া পড়িতে একটু অসুবিধা হয়।

ইস্‌লাম-গৌরব—অধ্যাপক শ্রী বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ প্রণীত। প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥৹ আনা। ১৩৩০।

এই পুস্তকে অতি সংক্ষেপে ইস্‌লাম সভ্যতার ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় অন্য কোন পুস্তকে এরূপ ব্যাপকভাবে ইস্‌লামের কথা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই, কাজেই এ পুস্তকখানি বাংলা ভাষার একটি অভাব পূরণ করিয়াছে। ইহার সাহায্যে বাঙালী পাঠক ইস্‌লাম-সভ্যতার গৌরবের কথা মোটামুটি জানিতে পারিবেন।

অ

পাগলের প্রাণের কথা—শ্রী মুনীন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা। পৃঃ ১৯৫। (১৩২৯)

পুস্তকখানিতে সাধকের মুখনিঃসৃত উপদেশপূর্ণ কথা আছে। সর্ব্বত্রেই ইহার আদর হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বইখানিতে পরমহংসদেবের একখানি ছবি আছে।

পুণ্যচিত্র—শ্রী রসিকচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রকাশক ঢাকা মডেল লাইব্রেরী। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ২১৯। (১৩২৪)

কয়েকটি কিংবদন্তী ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। প্লটটি আমাদের ভালো লাগে নাই। পুস্তকখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

প্রভাবতী—শ্রী অবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ১৫৪। (১৩২৯)

ষষ্ঠীমঙ্গলের প্রভাবতীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চাঙ্ক নাটক রচিত। অবিনাশ-বাবু বইখানি বেশ সরস ভাষাতে লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির দাম একটু বেশী হইয়াছে।

সৎকথা (২য় সং)—শ্রীমৎস্বামী অদ্ভুতানন্দ শ্রীমুখ-নিঃসৃত স্বামী সিদ্ধানন্দ কর্ত্তৃক সংগৃহীত। উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। সংগ্রাহক শ্রীশ্রী লাটুমহারাজার শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীর মুখনিঃসৃত উপদেশবাক্যগুলি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ-কথামৃতের ন্যায় স্বামীজীর কথাগুলিও বেশ সরল। সুতরাং বইখানি সর্ব্বজনপাঠ্য ও সর্ব্বজনশিক্ষাপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ কাশীধামে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দিরে অর্পিত হইবে।

পুলিস-নীতি—মোলবী সমিন উদ্দিন আহম্মদ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৯২। (১৩৩০)

গ্রন্থকার বহুকাল পুলিশ-বিভাগে কার্য্য করিয়াছেন। সুতরাং পুলিশ-বিভাগ সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। গ্রন্থখানিতে "নূতন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার বাবুগণের প্রতি উপদেশ ও পুলিসের কলঙ্ক মোচনের ব্যবস্থা" আছে। পুলিশ-বিভাগের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আমরা শুনিতে পাই। পুলিশ-বাবুরা যদি এই গ্রন্থলিখিত উপদেশ-সমূহ পালন করিয়া চলেন তাহা হইলে দেশ বহু দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবে। সাধারণেও পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

গায়ত্রী—শ্রী কার্ত্তিকচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৯৬। (১৩২৯)

ইহা একখানি সপ্তাঙ্ক নাটক। গ্রন্থকার অযথা অঙ্কের সংখ্যা বাড়াইয়াছেন। ১ম, ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ অঙ্কে মাত্র একটি করিয়া দৃশ্য। এই ক্ষুদ্র নাটকে আবার সর্ব্বসাকল্যে ৫৩টি গান আছে। নাটকখানি সফল রচনা নহে।

প্রভাত

মায়াপুরী—শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২২৪ পৃষ্ঠা। পটু পটুয়া শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের পরিকল্পিত সুন্দর রঙীন প্রচ্ছদপট। দেড় টাকা।

মণীন্দ্রলালের কল্পনা-মায়াপুরীর স্বপ্নপেলব আকাশকুসুমের এগারটি স্তবক দিয়া এই মায়াপুরী সজ্জিত হইয়াছে। এগারোটি গল্পই ভাবের বৈচিত্র্যে ও নূতনত্বে, বর্ণনার লালিত্যে ও মোহনতায় পরম উপভোগ্য। মণীন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যে গল্পরচনার একটি নূতন কবিত্বরসমধুর ভাব-বিহ্বল রীতির প্রবর্ত্তক। সুতরাং তাঁহার গল্পগুলি একেবারে স্বতন্ত্র; কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁহার রচনায় জাজ্বল্যমান থাকা সত্ত্বেও ইহার ধরণ নূতন।

মুদ্রা-রাক্ষস

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রী অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



কৈলাস দেবার ছবির বিবেক
চিত্রকর শ্রীবীরেশ্বর সেন

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৩০

৩য় সংখ্যা

অথর্ব্ববেদের ঈশ্বরবাদ

অথর্ব্ববেদের অধিকাংশ স্থলেই ধর্ম্মের যে আদর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি হীন। কিন্তু দুই-এক স্থলে ঈশ্বরতত্ত্ব-বিষয়ে এমন উচ্চ কথাও বলা হইয়াছে, যাহা অপর বেদসংহিতাতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে হিরণ্যগর্ভ, বিশ্ব-কর্ম্মা, 'সেই এক' ইত্যাদি দেবতার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদের স্কম্ভসূক্তে যে ঈশ্বর-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদের ঈশ্বর-তত্ত্ব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। 'স্কম্ভ' অর্থ 'স্তম্ভ' বা "আশ্রয়"; যিনি বিশ্বভুবনের আশ্রয়, তাঁহাকেই স্কম্ভ বলা হইয়াছে। 'স্কম্ভ' বিষয়ে দুইটি সূক্ত আছে। আমাদিগের আলোচনার জন্য যে যে অংশ আবশ্যক তাহা নিম্নে অনূদিত হইল।

স্কম্ভসূক্ত (১০।৭)

(১)

তাঁহার কোন্ অঙ্গে তপঃ অধিষ্ঠান করিতেছে? কোন্ অঙ্গে ঋত নিহিত? কোথায় ব্রত? কোথায় শ্রদ্ধা? ইঁহার কোন্ অঙ্গে সত্য প্রতিষ্ঠিত?

(২)

তাঁহার কোন অঙ্গ হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে? কোন্ অঙ্গ হইতে মাতরিশ্বা প্রবাহিত হইতেছে? তাহার কোন্ অঙ্গ হইতে চন্দ্রমা মহান্ স্কম্ভের অঙ্গ পরিমাণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে?

(৩)

তাহার কোন্ অঙ্গে ভূমি প্রতিষ্ঠিত? কোন্ অঙ্গে অন্তরিক্ষ প্রতিষ্ঠিত? কোন্ অঙ্গে দ্যৌ স্থাপিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? আকাশের উর্দ্ধতর স্থানই বা কোন্ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত?

(৪)

কাহাকে পাইবার আশায় অগ্নি উর্দ্ধমুখ হইয়া প্রজ্বলিত হয়? কাহাকে পাইবার ইচ্ছায় মাতরিশ্বা প্রবাহিত হয়? আবর্ত্তনকারী পথসমূহ যাহাকে পাইবার জন্য ইচ্ছা করে এবং যাহাতে প্রবেশ করে, সেই স্কম্ভ কে? * আমাকে বল।

(৫)

অর্দ্ধমাস ও মাসসমূহ বৎসরের সহিত মিলিত হইয়া কোথায় গমন করে? ঋতুসমূহ এবং ঋতুসম্বন্ধী

* মূলে আছে "কতমঃ"। বহু বস্তুর মধ্যে "একটি"কে বুঝাইতে হইলে 'তম' প্রত্যয় হয়। সুতরাং "কতমঃ" শব্দের মৌলিক অর্থ "এ সমুদায়ের মধ্যে কোন্‌টি?"

অন্যান্য কাল যাহাতে গমন করে, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(৬)

অহ্ন (অর্থাৎ দিবা) ও রাত্রি নামক বিভিন্নরূপবিশিষ্ট যুবক ও যুবতী (কিংবা যুবতীদ্বয়) যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় সম্মিলিত হইয়া ধাবিত হয়? যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় জলসমূহ গমন করে সেই, স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(৭)

প্রজাপতি লোকসমূহকে যাহাতে স্থাপন করিয়া সেই-সমুদায়কে ধারণ করিয়া আছেন, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(৮)

প্রজাপতি যে উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট ও মধ্যমাদি নানাবিধ বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, স্কম্ভ তাহাদিগের মধ্যে কতদূর প্রবেশ করিয়াছেন? কতদূরই বা প্রবেশ করেন নাই?

(৯)

স্কম্ভ অতীতকালের কতদূর প্রবেশ করিয়াছিলেন? ভবিষ্যতের কত অংশই বা তাঁহার উদরে রহিয়াছে? তিনি এক অঙ্গকে সহস্রভাগে বিভাগ করিয়াছেন তাহার মধ্যেই বা তিনি কতটুকু প্রবেশ করিয়াছেন?

(১০)

মানবগণ যে বলেন স্কম্ভে পৃথিব্যাদি লোকসমূহ, কোশসমূহ, জলসমূহ, ব্রহ্ম (মন্ত্র) রহিয়াছে, এবং তাঁহার অভ্যন্তরেই 'সৎ' ও 'অসৎ' নিহিত আছে,—সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১১)

যাহাতে তপঃ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শ্রেষ্ঠব্রত ধারণ করে, যাহাতে শ্রদ্ধা, জলসমূহ এবং ব্রহ্ম সমাহিত, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১২)

যাঁহাতে ভূমি, অন্তরিক্ষ, দ্যৌ, অগ্নি, চন্দ্রমা, সূর্য্য ও বায়ু নিহিত, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১৩)

যাঁহার অঙ্গে ৩৩ জন দেবতা সমাহিত হইয়া আছে, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১৪)

যাঁহাতে প্রথম জাত ঋষিগণ ঋক্, যজু, মহী ও একর্ষি অবস্থান করেন, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১৫)

যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষে মৃত্যু ও অমৃতত্ব সমাহিত, যাঁহার সমুদ্র নাড়ীরূপে পুরুষে অবস্থিত, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১৬)

চারিটি দিক্ যাঁহার প্রধান নাড়ীরূপে অবস্থিত, যজ্ঞ যে স্থলে অবস্থিত থাকিয়া পরাক্রম প্রকাশ করে, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১৭)

যিনি জানেন যে পুরুষই ব্রহ্ম, তিনি পরমেষ্ঠীকে জানেন; যিনি পরমেষ্ঠীকে জানেন, তিনি প্রজাপতিকে জানেন। যিনি জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে জানেন, তিনি সেইভাবে স্কম্ভকেই জানেন।

(১৮)

বৈশ্বানর যাঁহার শির, অঙ্গিরোগণ যাঁহার চক্ষু হইয়াছিল, যাতুগণ যাঁহার অঙ্গ, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(১৯)

ব্রহ্মকে যাঁহার মুখ বলা হয়, মধু-কশা যাঁহার জিহ্বা, বিরাট্ যাঁহার উধঃ, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(২০)

যাঁহা হইতে ঋকসমূহকে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছিল, যাঁহা হইতে যজুঃসমূহকে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, সামসমূহ যাঁহার লোম, অথর্ব্বাঙ্গিরস যাঁহার মুখ,—সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(২২)

যেখানে আদিত্য রুদ্র ও বসুগণ সমাহিত, ভূত ভব্য ও সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত, সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল।

(২৩)

৩৩ জন দেবতা, সর্ব্বদা যাঁহার নিধি রক্ষা করে, (সেই স্কম্ভ কে? আমাকে বল)। হে দেবগণ! তোমরা যে ধন রক্ষা করিতেছ, তাহা এখন কে জানে?

(২৪)

যেখানে ব্রহ্মবিৎ দেবগণ জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, (সেই স্কম্ভ কে ? আমাকে বল)। যিনি তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষ জানেন, তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই বেদিতা।

(২৫)

যেসমুদায় দেবতা অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারা অতি ক্ষমতাশালী। অসৎকে স্কম্ভের এক অঙ্গ বলা হয়।

(২৬)

যেখানে (অর্থাৎ যে অঙ্গে) স্কম্ভ সেই পুরাণকে উৎপন্ন করিয়া ব্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, স্কম্ভের সেই অঙ্গকেই লোকে পুরাতন বলিয়া জানিত।

(২৭)

যাঁহার অঙ্গে ৩৩ জন দেবতা স্বীয় স্বীয় অঙ্গ লাভ করিয়াছে, কোন কোন ব্রহ্মবিৎ সেই দেবগণকে জানেন।

(২৮)

লোকে হিরণ্যগর্ভকে পরম (পুরুষ) অনির্ব্বচনীয় বলিয়া জানে। কিন্তু স্কম্ভই অগ্রে লোকসমূহের মধ্যে হিরণ্য সেচন করিয়াছিলেন (এবং সেই হিরণ্য হইতেই হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি)।

(২৯)

এই স্কম্ভেই লোকসমূহ, স্কম্ভেই তপঃ, স্কম্ভেই ঋত সমাহিত। হে স্কম্ভ ! আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে ইন্দ্রে সমাহিত।

(৩০)

ইন্দ্রে লোকসমূহ, ইন্দ্রে তপঃ, ইন্দ্রে ঋত সমাহিত। হে ইন্দ্র ! আমি জানি তুমি সমগ্রভাবে স্কম্ভে সমাহিত।

(৩২)

ভূমি যাঁহার প্রমা, অন্তরিক্ষ যাঁহার উদর, যিনি দ্যোকে মূর্দ্ধা করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(৩৩)

সূর্য্য ও পুনর্ণব চন্দ্র (যে চন্দ্র পুনঃ পুনঃ নূতন হয়) যাঁহার চক্ষু, অগ্নি যাঁহার মুখ, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(৩৪)

বায়ু যাঁহার প্রাণ ও অপান, অঙ্গিরোগণ যাঁহার চক্ষু হইয়াছিল, দিক্‌সমূহকে যিনি প্রজ্ঞানী (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার) করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(৩৫)

স্কম্ভ দ্যৌ এবং পৃথিবী এই উভয়কেই ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ অন্তরিক্ষকে ধারণ করিয়াছেন, স্কম্ভ ছয়টি দিক্‌কে ধারণ করিয়াছেন, বিশ্বভুবন স্কম্ভে প্রবেশ করিয়াছে।

(৩৮)

এক মহাযক্ষ তপস্যা-রত হইয়া ভুবনমধ্যে সলিলপৃষ্ঠে বিচরণ করেন। শাখা যেমন বৃক্ষস্কন্ধের চতুর্দ্দিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, দেবগণও তেমনি এই মহাযক্ষে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

(৩৯)

যাঁহার জন্য দেবগণ সর্ব্বদা হস্ত, পদ, বাক্য, শ্রোত্র ও চক্ষু দ্বারা অপরিমিত বলি আহরণ করেন, সেই স্কম্ভ কে ? আমাকে বল।

(৪০)

তাঁহার তমঃ অপহৃত হইয়াছে, তিনি পাপ হইতে ব্যাবৃত্ত (অর্থাৎ পৃথক্, মুক্ত) হইয়াছেন। প্রজাপতিতে যে ত্রিবিধ জ্যোতিঃ, সে জ্যোতিঃ তাঁহাতেই।

(অথর্ব্ববেদ ১০।৭)

ইহার পরের সূক্তেও (১০।৮) স্কম্ভবিষয়ক মন্ত্র আছে। ইহার প্রথম দুইটি মন্ত্র এই :—

(১)

যিনি ভূত, ভব্য এবং সমুদায়েরই অধিষ্ঠান, স্বর্গ কেবল যাঁহারই, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার।

(২)

এই দ্যৌ এবং ভূমি স্কম্ভ কর্ত্তৃক বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহা প্রাণবান্ আত্মবান্ এবং নিমিষক্রিয়াবান্—তাহা স্কম্ভেই।

এই-সমুদায় মন্ত্রে যাহা বলা হইল তাহার সারার্থ এই—

ক। দেশ ও কাল স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত। যাহা দেশে বর্ত্তমান, কালে যাহা অবস্থিত—স্কম্ভই সে সমুদায়ের প্রতিষ্ঠা। পৃথিবী দ্যৌ ও অপরাপর লোক, এবং ভূত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যৎ—সমুদায়ই স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়া

রহিয়াছে। তপঃ, ব্রত, ঋত, সত্য প্রভৃতিরও প্রতিষ্ঠা সেই স্কম্ভই। যাহা কিছু সৃষ্ট, তাহা স্কম্ভেরই অঙ্গ এবং স্কম্ভ কর্ত্তৃক বিধৃত।

খ। 'সৎ' এবং 'অসৎ' উভয়ই স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত। 'অসৎ'ও স্কম্ভের একটি অঙ্গ।

গ। অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি দেবতা স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত। ঋষি ৩৩ জন দেবতার কথা বলিয়াছেন। ইহাদের সকলেরই জন্ম আছে। ইহারা স্কম্ভের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এবং স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত।

ঘ। একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে স্কম্ভ ইন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত এবং ইন্দ্র স্কম্ভে প্রতিষ্ঠিত। ইহা দ্বারা ঋষি স্কম্ভ ও ইন্দ্রের একত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। "বৈদিক দেবগণের একত্ব" নামক প্রবন্ধে এবিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

ঙ। কয়েকটি মন্ত্রে ব্রহ্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ মন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে স্কম্ভই সর্ব্বমূলাধার। ইহাতে মনে হয় যে ঋষি স্কম্ভ ও ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করিতেন। কোন কোন মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম স্কম্ভের অঙ্গ। ইহাতে অনুমান করিতে হয় যে ব্রহ্মের স্থান স্কম্ভের নিম্নে। কিন্তু স্কম্ভকে কখনই ব্রহ্ম অপেক্ষা নিম্নতর স্থান দেওয়া হয় নাই। "ব্রহ্মবাদের সূচনা" নামক প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

চ। একটি মন্ত্রে (১০।৭।৩৮) এক মহা যক্ষের কথা বলা হইয়াছে। আত্মাকে সাধারণতঃ যক্ষ বলা হইত। বৃক্ষে যেমন শাখাসমূহ আশ্রিত হইয়া থাকে, এই মহাযক্ষেও তেমনি দেবগণ আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বলা হইতেছে স্কম্ভ আত্ম-রূপী। এস্থলে উপনিষদের আত্মতত্ত্বের বীজ পাওয়া যাইতেছে।

মন্তব্য

স্কম্ভসূক্ত বহুশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই সময়ের সামাজিক রীতি, নীতি, ও ধর্ম্মবিশ্বাস কিপ্রকার ছিল, কিভাবে রাজ্য শাসিত হইত, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঘটনা ও অবস্থা কিপ্রকার ছিল তাহা আমরা জানি না। অথচ এই-সমুদয় ঘটনা দ্বারাই প্রধানতঃ মানুষের জীবন গঠিত, চালিত ও অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। আমরা অন্য সময়ে অন্য প্রদেশে বাস করিতেছি; সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে এবং আমাদিগের জীবন বিভিন্নভাবে গঠিত ও নিয়মিত হইতেছে। এ অবস্থায় ঋষিগণের প্রাণের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ অনুভব করা সহজ নহে। তবুও চিন্তা দ্বারা যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতে হইতেছে। জগতে অনেক জাতি আছে, যাহারা একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কোন জাতির ধর্ম্মসাহিত্যেই স্কম্ভসূক্তের ন্যায় উচ্চ তত্ত্ব প্রকাশিত হয় নাই। ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছে তাহা একশ্রেণীর "দেববাদ"। "বহুদেববাদ" হইতে ইহার পার্থক্য অতি সামান্য। বহুদেববাদে দেবতার সংখ্যা বহু; একদেববাদে দেবতা একজন। কিন্তু এই 'একদেবতা' বহুদেবতাদেরই অন্যতম দেবতা। প্রথমে সাধারণতঃ অন্যান্য দেবতাকে হীন করা হয়, তাহার পরে ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করা হয়, এবং কোন কোন ধর্ম্মে ইহাদিগকে একেবারেই অস্বীকার করা হয়। এইপ্রকারে যখন কোন একদেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এবং সকলের কর্ত্তা ও অধিপতি হয়, তখনই লোকে তাহাকে ঈশ্বর বা একেশ্বর বলিয়া থাকে ('বৈদিক একেশ্বরবাদ'—প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০, দ্রষ্টব্য)।

খৃষ্টানদিগের পুরাতন বাইবেলেও এইরূপে একদেববাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথমে সকলেই বহু দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিত; তাহার পরে অপরাপর দেবতাকে অগ্রাহ্য করিয়া 'জিহোভা'কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। অপর দেবতা যে ছিল না তাহা নহে। জিহোভা নিজেই ইহাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; তবে তিনি এই আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে তাহাদিগকে কেহ পূজা করিতে পারিবে না। জিহোভার অনুবর্ত্তিগণ এইরূপে আপনার দেবতাগণকে তুচ্ছ ও জঘন্য জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিল। এইরূপে ইহুদী জাতির মধ্যে একদেববাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সৃষ্টির ক্রম এই :—

১। প্রথমতঃ অপরাপর দেবতাকে হীন বিবেচনা করা হইয়াছিল।

২। তাহার পরে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল।

৩। সর্ব্বশেষে কেহ কেহ উহাদিগকে একবারেই অস্বীকার করিয়াছিল।

এইরূপে বহু দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইল বটে, কিন্তু অবশিষ্ট এক দেবতার প্রকৃতি অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গেল। কিন্তু স্কম্ভের প্রকৃতি এপ্রকার নহে। তিনি বহু দেবতার মধ্যে অন্যতম দেবতা নহেন; এক অর্থে তাঁহাকে দেবতাই বলা যায় না। তিনি

অধিদেবতা।

সমুদায় দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার দ্বারাই নিয়মিত।

অপর দেশের ঈশ্বরবাদে বা একদেববাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে আত্যন্তিক পার্থক্য ও দূরত্ব আনয়ন করা হইয়াছে। স্রষ্টা বাস করেন স্বর্গলোকে বা এই জগতের অতীত কোন স্থানে। সেই স্থানে থাকিয়া তিনি এই সৃষ্ট জগতের পালনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। কিন্তু স্কম্ভ-সূক্তের আদর্শ অন্যপ্রকার। এই সৃষ্টজগতের সহিত স্কম্ভের আত্যন্তিক পার্থক্য নাই এবং দূরত্বও নাই। ইহা নিত্য স্কম্ভে অবস্থিত এবং ইহা স্কম্ভেরই অঙ্গ। 'স-দেব' এবং 'স-মানব' এই ব্রহ্মাণ্ড স্কম্ভেরই অঙ্গীভূত। যাহা আছে কেবল যে তাহাই স্কম্ভের অঙ্গ তাহা নহে। যাহা নহে, যাহা অসৎ, যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ তাহাও স্কম্ভের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে।

উত্তর কালে এই মতই পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মবাদে পরিণত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

যদিও বঙ্গসাহিত্য বাঙ্গালার বাহিরে সম্মানিত হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীর নিজের দেশে বঙ্গসাহিত্যের স্থান বড় উচ্চে নয়। তাহার কারণ, সাহিত্যকে এখনও আমরা জাতির গৌরবের ভূষণ বলিয়া মনে করিতে শিখি নাই, ভূতের বোঝা মাত্র বলিয়া মনে করি। দেশাত্ম-বোধে এখনও আমরা উদ্বুদ্ধ হই নাই, সমস্ত জাতির প্রাণ এখনও এক সুরের লয়ে বাঁধা হয় নাই। দেশময় ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোক ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ আহরণে ব্যস্ত। তাই এখনও আমাদের দেশে বঙ্কিম-অনুশীলন-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের দিন দেশময় সাড়া পড়িয়া যায় না।

সেইজন্য আজ বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে গেলে স্বভাবতঃই ইতস্ততঃ করিতে হয়। তাঁহাদের ঠিক্‌ভাবে দেখিবার সময় কি হইয়াছে, জাতির তথা দেশের প্রাণের সহিত তাঁহাদের যোগ কি সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইয়াছে? না, এখনও কালাবসরে আরও ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধ হইবে, এবং তখনই তাঁহাদের আলোচনার উপযুক্ত সময় হইতে পারে? এ কথার বিচার করা বড় কঠিন। এখন ভবিষ্যতের কাজ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া তাঁহাদের প্রভাব ও রচনাবলী আমাদের জীবনে যে স্থান পাইয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাইতে পারে।

নিতান্ত আদি ছাড়িয়া দিলে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের কাজ ছিল রাজসভায় স্তুতিগান ও গৃহস্থের ঘরের কথা বলা। আমাদের দেশের সাহিত্য যেমন domesticated বা ঘরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, বোধ হয় আর কোন দেশে তাহা হয় নাই। বাঙ্গালার কবিকুল হয় হুশেন শাহ ও রাজা রঘুনাথদের অবদান গাহিয়াছেন, না হয় চণ্ডী, মনসা, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি গৃহরক্ষাকর্ত্তা দেবদেবীর পূজোপাসনা

প্রচারের জন্ম সরস্বতীর বরভিক্ষা করিয়াছেন। সমস্ত কৃষ্ণলীলাকে তাঁহারা এমন একটি অন্তরাশ্রপ্রত মিলন-বিরহের ছাঁচে ঢালিয়াছেন যে স্বর্গকাম চিত্তও সে গান শুনিয়া গৃহের জন্ম উন্মুখ হয়। চণ্ডীদাস এবং অজ্ঞাত-নামা বাউল কবিদের কয়েকটি mystic গান এবং পল্লী-কবিগণের স্থানীয় গাথা (ballad) ছাড়িয়া দিলে সমস্ত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এই ঘরোয়া কথায় ভরা, বাঙ্গালীর সংসার-চিত্র তাঁহাদের সাহিত্যে কল্পনার উজ্জলালোকে দেদীপ্যমান। সেখানে রাজপুত-সাহিত্যের চারণের গান নাই, মারাঠা-সাহিত্যের নিপুণ যুদ্ধগাথা নাই, তামিল কবিগণের ভজন নাই, জীবনের দূরাগত অনন্ত-সমুদ্র-কল্লোল নাই।

এই গৃহোপাসক, সৌন্দর্য্যলিপ্সু, ভাবপ্রবণ জাতির মধ্যে যখন সহসা উনবিংশ শতাব্দীর আলোড়ন আরম্ভ হইল, তখন অতি অল্প সময়ের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এত অল্প সময়ের ভিতরে এতবড় পরিবর্ত্তন আর কোন জাতির ইতিহাসে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। বোধ হয় সমস্ত জাতির মন একটা পরি-বর্ত্তনের জন্ম উন্মুখ হইয়া ছিল বলিয়াই এই পরিবর্ত্তন এত সহজে ঘটিতে পারিয়াছিল। ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশেও বিদেশীয়-সংঘাত-জনিত এই পরিবর্ত্তন এত শীঘ্র সংঘটিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, জয়রাম প্রভৃতি হইতে ঈশ্বর গুপ্ত বেশী দূরের কথা নয়। কিন্তু তাহার মধ্যেই কেমন পরিষ্কার একটা ভেদ সূচিত হইয়াছে। কি কি নিগূঢ় কারণে এই পরিবর্ত্তন ঘটিল ঐতিহাসিক তাহার বিচার করিবেন, সাহিত্যে তাহার যে ফল ফলিয়াছে আমরা শুধু তাহারই সহিত সংশ্লিষ্ট। নূতন প্রবর্ত্তিত বিদেশীয় শিক্ষা ও পুরাতন সমাজের সংঘর্ষে দেখিতে দেখিতে আমাদের জাতিত্বের উচ্ছেদ হইল। দেশের অন্তঃস্থিত একটি নিবিড় জমাট মনের সাড়া বন্ধ হইয়া গেল। ব্যক্তিগত চিন্তা ও স্ব স্ব জীবনের পারিপার্শ্বিক বিকাশের মধ্য দিয়াই সাহিত্য রচিত হইতে আরম্ভ হইল। এই পরিবর্ত্তন যে ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই ঘটিয়া গেল, তাহা এতদিন আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই, কারণ তখনও সে আলোড়ন হইতে আমরা বাহিরে আসিতে পারি নাই। আজ কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া এই অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন বিশেষরূপেই চোখে পড়িতেছে।

এই যুগের প্রধান কবি ঈশ্বর গুপ্তই বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের হাতে-খড়ি দিয়াছিলেন। এই ঈশ্বর গুপ্তের লেখা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার সমস্ত রস-রচনা, ভক্তির গান,—সমস্তেরই অন্তরে হয় ব্যঙ্গ, না হয় শ্লেষ। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের লেখা এত ব্যঙ্গপ্রধান কেন? যে কারণে মধ্যবর্ত্তী যুগে রোমে জুভেনাল্, পার্সীউস্ প্রভৃতি লেখকের আবির্ভাব, যে কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে (Satire) ব্যঙ্গরচনার প্রাধান্য, ঠিক্ সেই কারণেই ঈশ্বর গুপ্তও ব্যঙ্গপ্রধান। জাতির মনের একটা স্থিতি ছিল না, দু'এর মাঝখানে তাহা দুলিতেছিল। একধারে অপরিণত অবোঝা পশ্চিমের ভাব, আর-একদিকে ধ্বংসাবশিষ্ট দেশের মনের ভাব। উভয়ই তাঁহার কাছে সমান ব্যঙ্গের বিষয়, কারণ, কোনটাই তাঁহার কাছে কোন কাজের নয়। দুর্গোৎসবও তাঁহার কাছে ব্যঙ্গের বিষয়, বড়দিনও তাঁহার কাছে ব্যঙ্গের বিষয়। যেখানে তিনি নিতান্ত ভাবগাম্ভীর্য্যে টলটল করিতেছেন সেখানেও ভিতরে ভিতরে একটা 'Devil who cares' কুছ-পরোয়া-নেই-ভাব নিজের কবিতাতেই তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালায় তখন স্থায়ী গৌরবান্বিত সাহিত্যের অভাব হইয়াছিল। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কবিতার এই খিচুড়ী হইতে দেশকে পরিত্রাণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন,—সুসঙ্গত, পরিষ্কার গদ্যের ভাষা সৃষ্টি করিয়া। কিন্তু ভাষা সৃষ্টি করিতেই তাঁহার সময় চলিয়া গেল, বিষয় তিনি আর দিয়া যাইতে পারিলেন না। আলেয়ার আলোর মত নিজের জীবন জ্বালাইয়া মধুসূদন যে বাণীর আরতি করিলেন, তাহাতে লোকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহার কবিগুরুগণের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার কবিতার আলোকে তাহারা মিল্টন্ দান্তে-হোমারকে চিনিয়া লইল। তাঁহার দীপ জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল। তখনকার সাহিত্য-কাননের

অন্ধকার শাখায় শুধু একটি আধটি হুতোমপেঁচার ডাক শুনা যাইতেছিল।

এই সময় বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চারিদ্দিকের এই বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে আহরণ করিয়া সাহিত্যকে প্রথম স্থায়ী করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাকে স্থায়ী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাহাকে ধীরে ধীরে গতি প্রদান করিলেন, বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিলেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র একা এ-সমস্ত কাজ করেন নাই। তাঁহার সহিত সেই সময়ে কৃতকর্ম্মা বহু সহযোগীর মিলন ঘটিয়াছিল। নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু কৃতী লেখক তাঁহার সহিত বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু-সাহিত্যে এক এক যুগে এমন ঘটে, যে, একজন না থাকিলে আর সকলের থাকা বৃথা হইয়া যায়। কিছু আগে বা পরে যাঁহারা আসেন, তাঁহারা সকলেই মধ্যবর্ত্তী একজনকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্যে সার্থকতা লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগেও তাহাই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র না থাকিলে ইঁহাদের কাহারও কার্য্যই বেশ ঘনীভূত হইয়া একত্র-সম্বদ্ধ কোন মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিত না। ফল-কথা, বঙ্কিমচন্দ্র না থাকিলে ইঁহারাও থাকিতেন কি না সন্দেহ।

এখন বুঝা যাইতেছে, এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাই তাঁহার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চারিত্রে' বঙ্কিম-চরিত্রালোচনায় সত্যই বলিয়াছেন, তিনি দশভুজার মত সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, দশহস্তে তিনি বরাভয়াদি ধরিয়া একাধারে শত্রুনিষ্পেষণ করিয়াছেন এবং সাহিত্যের বল সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন একাধারে জাতিত্ববোধহীন পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের অতীত ভুলিয়া পশ্চিমের নূতন নূতন চিন্তাধারা ও সাহিত্যকলারসে আপনাদের মনকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল এবং অন্যদিকে সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ জনসাধারণ বাহিরের আকর্ষণে ভীত হইয়া আপনার কোণটিতে ক্রমশঃই অধিকতর অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া চন্দ্রই 'মা ভৈঃ' স্বরে তাহাদের আহ্বান করিয়া একদলকে দেশের অতীতের দিকে ফিরাইয়াছেন এবং অন্যদলকে বাহিরের আলোর দিকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যাঁহারা অভিনিবিষ্টচিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বোধ হয় দেখিয়াছেন, গাম্ভীর্য্যই তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল এবং তাঁহার মুখচ্ছবিতেও তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অটল গাম্ভীর্য্যই তাঁহাকে এই বিরাট্ শক্তি দান করিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও রীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অটল স্থৈর্য্যের সহিত যতদূর সম্ভব তাহার ভাল মন্দ দুইদিক্ বিচার করিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যকলা আহরণ করিয়া, সেই গুণে ও সেই কলায় দেশীয় চরিত্রকে উজ্জীবিত করা এবং দেশীয় সাহিত্যকে ভূষিত করা তখনকার দিনে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রই পারিয়াছিলেন। অন্য অনেক মনীষী তাহার প্রবল নূতনতর টানে গা ভাসাইয়া দেশের মন হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি বঙ্কিম-যুগের সাহিত্যের মূলে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রবর্ত্তন। যে সাহিত্যের ধারা পশ্চিমে তখন প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে তাহার সাড়া তখন আমাদের দেশে সবে মাত্র নূতন পড়িয়াছে। পশ্চিমের সাহিত্যসমালোচকগণ যাহাকে রোমান্টিক্-মুভ্‌মেণ্ট্ নাম দিয়া থাকেন, বঙ্কিমযুগের সাহিত্যে তাহার দোষগুণ উভয়ই উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। বাঙ্গালায় রোমান্টিক্-মুভ্‌মেণ্টের ফল-স্বরূপ বঙ্কিমযুগের সাহিত্য কখন আলোচিত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু তাহা না করিলে তাহার দোষগুণের সহিত সমস্ত প্রকৃতি যে ধরা পড়িবে না, ইহা নিশ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলেও আমাদের সেই সাহিত্যধারার ভিতর দিয়া তাঁহাকে প্রথম বুঝিতে হইবে।

ইউরোপীয় তথা ইংরেজী সাহিত্যে যে রোমান্টিক্-মুভ্‌মেণ্ট্ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি হইতেছে, বাহিরের প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার গূঢ় মিলন-চেষ্টায়। এই চেষ্টা যে সকল স্থলে সফল হইয়াছে

অনির্দ্দেশ্য দূর সৌন্দর্য্যে লুব্ধ মন যখন প্রকৃতির সহিত মিলনের জন্ম ধাবিত হয়, তখন রাস্তার বহু খুঁটিনাটি তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যায়। রোমাণ্টিক্-মুভ্‌মেণ্টের লেখকগণেরও তাহাই হইয়াছিল। কেহ অতীতের মনোহারী পরীরাজ্যের মত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সেখানে গল্পের ঘুমন্ত রাজকুমারীর মত নূতন সৌন্দর্য্য-রাশিকে পাইয়া বাহিরের বিপুল জীবন হইতে তফাতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কেহ মানবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে গিয়া জীবনের নিবিড়তর পুষ্প-লঘু সৌন্দর্য্যরাশিকে তুলিয়া দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন। নগ্ন মানবাত্মার সহিত নিবিড়তম পরিচয় তাঁহারা প্রায় কেহই করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালায় সেই রোমাণ্টিক্-মুভ্‌মেণ্টের শ্রেষ্ঠ সাধক। তাঁহার সমস্ত লেখাতেই প্রায় আমরা জাতির অতীত আলোচনা দেখিতে পাই। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যেও ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, সীতারাম, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের অতীত-চিত্ররূপেই কবির মনে প্রথমে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের নায়ক-নায়িকার মানব-ভাগ্য তাহার পর তিনি চিন্তা করিয়াছেন। তাহার পর বাঙ্গালার সমসাময়িক চিত্র দিয়া বর্ত্তমান সমাজের ব্যর্থতায় তিনি সেই অতীতের শিক্ষাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল ইহার নিদর্শন। এবং পরিশেষে বাঙ্গালার অতীতের ভিতর দিয়া স্বকল্পিত ভবিষ্যতের পূর্ণতার একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারামে। কপালকুণ্ডলা তাঁহার এই রোমাণ্টিক্ সাধনার চূড়ান্ত ফল। কপালকুণ্ডলার মত রোমান্স্ বাঙ্গালায় আর দ্বিতীয় লেখা হয় নাই। ইহার সমস্ত উপকরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার ইহা স্থান নহে, কিন্তু তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার উপযুক্ত বটে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের এই ক্ষেত্রে সিদ্ধির তাহা শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। ইহারা যে সকলেই ইউরোপীয় রোমাণ্টিক্-মুভ্‌মেণ্টের ফল তাহার প্রধান প্রমাণ, ইহাদের সাধারণ নাম দেওয়া যাইতে পারে 'রোমান্স্'। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না হইলে আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ভব হইত না, এবং ইংরেজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক্-মুভ্‌মেণ্ট না চলিলে আমাদের দেশে 'দুর্গেশনন্দিনী' 'দেবী চৌধুরাণী'ও লেখা হইত না।

এই রোমাণ্টিক্-মুভ্‌মেণ্টের প্রধান গলদ হইয়াছিল প্রকৃত সৌন্দর্য্য-বিচারে। যে বিস্তারশীল সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ আমাদিগকে আপনা হইতে দূরে লইয়া যায়, রূপ হইতে টানিয়া অপরূপের মধ্যে ডুবাইয়া দেয়, সেই সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া বা না বুঝিয়া রোমাণ্টিক্ লেখকগণ শুধু রূপ, যাহা পটে প্রতিভাত হইতে পারে, তাহাতেই বেশী মজিয়া-ছিলেন, Beautiful ছাড়িয়া Picturesque এর জন্ম ধাবিত হইয়াছিলেন। রোমাণ্টিক্ লেখকগণের অতীত সাধনা তাঁহাদের Medievalism, তাঁহাদের দরিদ্র জীবনের সহিত সহানুভূতি, সমস্তের ভিতরেই সেই নিগূঢ় গলদটি দেখা দিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব তাঁহাতেও এই দোষ কিয়ৎ পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছিল। তাঁহার কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, রাজসিংহ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের মধ্যে ইহা বহু পরিমাণেই সংক্রামিত হইয়াছিল। রমেশ-চন্দ্রের রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাত, মাধবীকঙ্কণ প্রভৃতির ঘটনাবলী মনে করুন। পরবর্ত্তী-কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে অনেক স্থলে এইসকলের কৃত্রিমতাকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছিলেন 'তখন আমার গল্পের নায়ক সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রাজকুমারীকে লইয়া দুর্গের বাতায়ন হইতে ঝম্প প্রদানের উদ্যোগ করিতেছিল' ইত্যাদি।* তাঁহার এই গভীর শ্লেষ বুঝিতে আর কাহারও বাকি থাকে না। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং অন্যান্য কবিতাবলী, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী, এবং অন্যান্য বহু নিবন্ধকারের লেখা প্রকৃত রস বা সৌন্দর্য্যবোধ হইতে ততদূর উদ্বুদ্ধ হয় নাই, যেমন একটা অপ্রাকৃতিক বা প্রকৃতি-বহির্ভূত জীবনানুমান ও তজ্জনিত রূপপ্রকাশ-চেষ্টা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। এই চারিধারের স্বতঃ-উৎসৃত জীবনকে রসের আকারে না ধরিয়া তাঁহারা একটা

* রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ, দশম বর্ষীয়

অতীতের জীবন কল্পনা করিয়া তাহাকে নানাভাবে সাজাইয়াছিলেন। ইহা যে প্রকৃত জীবনের উচ্ছ্বাস নয় তাহার প্রমাণ ইহা কখন অন্তর্মুখী হয় নাই। চিত্রের মত তাহা সুন্দর হইয়াছিল, কিন্তু জীবনের মত নিবিড় রসোৎসারী হয় নাই। তাই আমরা দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্ররাজি দেশকালহীন মানবাত্মার পদবী ত লাভ করিতেই পারে নাই, কোন কোন স্থলে সাধারণ মানব-মানবীর পদও পায় নাই; যেমন 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপ ও শৈবলিনী, 'কপালকুণ্ডলায়' স্বয়ং নায়িকা, 'সীতারামে' রূপসী সন্ন্যাসিনী শ্রী। কেবল অনির্দ্দেশ্য কোন গল্পলোকের উচ্চতম স্তরে বসিয়া দেখিলে তাহারা পাষাণের কারুকার্য্যের মত সুন্দর দেখায়, আপাত-দৃষ্টিতে জীবন্ত বলিয়া ভ্রমও হয়, পরন্তু স্থিরভাবে দেখিলে শিল্পীর কৃতিত্বের পরিচয় দেয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে জীবনের উত্তাপের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি শুধু উপন্যাস-রচনাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। শুধু তাহা হইলে, তাঁহার স্থান আমাদের জাতির জীবনে এত উচ্চে হইত কি না সন্দেহ। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার প্রতিভার বিশেষত্ব তাহার সর্ব্বতোমুখিতা। তিনি যেমন রস-সাহিত্যে ইউরোপীয় রোমান্টিক্ মুভ্‌মেণ্টের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তেমনি ধর্ম্ম-ও সমাজ-তত্ত্বালোচনার ভিতর দিয়া তিনি ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও সমাজ-তথ্যের বহু সমস্যা আমাদের জীবনের মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বিরামহীন চিন্তারাশি দেশের জীবনধারাকে বহুদিকে বহুভাবে বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার পর তিনি যেভাবে উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, মূর্খ সকলের জীবনের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে শুধু লেখনী-সহায়ে নূতন নূতন মত ও নূতন নূতন চিন্তা দেশের মধ্যে প্রচার করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সত্যই তখনকার দিনের অদ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীহীন সাহিত্য-সম্রাট্ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল, বাঙ্গালীকে এবং তাহাদের সহিত ভারতবাসীকে বর্ত্তমান জগতের উপযোগী করা। সাহিত্যকে যেমন তিনি স্থায়ী আকার দান করিয়া পরে নূতন নূতন প্রতিভাশালী লেখকের অভ্যুদয়ের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে যেমন একটি নূতন সাহিত্যের ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তেমনই জাতীয় জীবনকেও তিনি স্থায়ী ও নূতন-ভাবে গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় সাহিত্যের যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা তাহাই ঘটিয়াছিল, সাহিত্য যেমন একধারে জাতির জীবনাদর্শে গঠিত হইতেছিল, তেমনি জীবনও সাহিত্যের নূতন নূতন আদর্শে সঞ্জীবিত অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছিল। সাহিত্য ও জীবনের এই reaction পরস্পরাপেক্ষিতা বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রতিভার, তাঁহার ক্ষমতার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রামমোহন রায়ের মত যদিও তিনি সমাজ- বা ধর্ম্ম-সংস্কারকরূপে কার্য্যক্ষেত্রে নামেন নাই, তথাপি পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙ্গালীর ধর্ম্মমত-গঠনে তখনকার দিনে তাঁহার প্রভাব বড় কম ছিল না। কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্ম্মতত্ত্ব বা অনুশীলনতত্ত্ব নাম দিয়া তিনি ধারাবাহিকভাবে যে সমাজ-গঠন ও আদর্শ-নরনারী-চরিত্র-গঠনের সম্বন্ধে প্রবন্ধাবলী লিখিয়াছিলেন, তাহা সেকালে অনেকেরই চক্ষে সমাজ- ও ধর্ম্মমত-গঠন সম্বন্ধে একেবারে নূতন পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল। আজ কালের ব্যবধানে আমরা তাহার বহু খুঁত, বহু অসম্পূর্ণতা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু তখনকার লোকে তাহাকেই জীবনের নূতন আলোক ভাবিয়া অনুসরণ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ- বা ধর্ম্মমত-গঠন সম্বন্ধে কোন নূতন কথাই বলেন নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ এবং তৎকালবর্ত্তী সময়ে ইউরোপে কাল্‌চার্-বাদ লইয়া মহাধূম পড়িয়া গিয়াছিল। একধারে কয়েকজন জার্ম্মান্ পণ্ডিত, অন্যধারে পজিটিভিষ্ট্-বেদের প্রধান ঋষি অগুস্ত্ কঁৎ মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতির উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। ইংলণ্ডেও এই আলোচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং ম্যাথ্ আরনল্ড্-প্রমুখ বহু মনীষী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ইহার সমাধান-চেষ্টা করিতে-ছিলেন। জাতিত্বের উচ্ছেদে আমাদের দেশে মনুষ্যত্ব তখন সত্যই বড় সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিয়াছিল। দু'পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবার একটা আইডিয়া-বা মনোবৃত্তি-বিকাশের আশ্রয় ছিল না। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের

গম্ভীর হৃদয়ে মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন উত্থিত হইল। এই কাল্‌চার্‌-বাদ সেই সময়ে তাঁহাকে পাইয়া বসিল। তিনি এই উপলক্ষে কতক আমাদের প্রাচীন দর্শনের তথ্যগুলিকে ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া, কতক হার্ব্বার্ট-স্পেন্‌সার প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিকগণের মত বিচার করিয়া, পজেটিভিজ্‌ম্‌ ও সাংখ্যের এক খিচুড়ি তৈয়ার করিয়া অনুশীলন-তত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব নাম দিয়া বাহির করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাতে ভুলিয়াছিলেন, এখন আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এবং অনুশীলন-তত্ত্বের কাল্‌চার্‌ (ইহা যে প্রকৃত পক্ষে কাল্‌চার্‌-বাদই, যদিও তাহাতে দর্শনের ছোপ লাগান হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি কাল্‌চার্‌ কথাটি এড়াইবার বহু চেষ্টা করিয়াও এড়াইতে পারেন নাই, শেষে তাঁহাকে ইংরেজি অক্ষরে কাল্‌চার্‌ কথাটাই বসাইতে হইয়াছে) যে একই জিনিষ ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মতে আদর্শচরিত্র কৃষ্ণের জীবনে যাহা সফল হইয়াছিল, তাহা আদর্শান্বেষী মানুষের সম্মুখে স্থাপিত করিলে তাহা দ্বারাই তাহারাও সফলতা লাভ করিতে পারিবে। তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন মানুষের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের কথা। মানুষ যে কলের পুত্তলীর মত আদর্শানুসারে সফলতা লাভ করিতে পারে না ইহা তিনি একেবারেই ভাবেন নাই। ইহা দ্বারা সার্থকতা আসিতে পারে না এমন কথা নয়, কিন্তু ইহার বাহিরেও যে সার্থকতা আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু সে সময়কার নানারূপ বিশৃঙ্খল চিন্তাধারার মধ্যে ক্ষণেকের জন্য ইহা একটি উচ্চ ও সরল আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই উপায়েই তিনি তখনকার মত জাতির অতীত চেষ্টার সহিত বর্ত্তমান চেষ্টাকে বাঁধিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তাঁহার যাহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, অর্থাৎ বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতিকে তথা ভারতবাসী জনসাধারণকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করা, তাহারই পোষকতা করিবার জন্য তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও অনুশীলনতত্ত্ব রচনা এবং প্রচার করেন। তিনিই একরকম বলিতে গেলে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় আধুনিকতা বা modernismএর প্রথম প্রবর্ত্তক। রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে তাঁহার পূরকমাত্র, যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্ভাবিত পথে তিনি এই জাতির হৃদয়কে বিশ্বজনের পথে মিলাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত লেখার ভাবেই আমরা তাঁহার এই আধুনিকতা-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা দেখিতে পাই। তিনি তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থে যে জাতির অতীত-চরিত্র আলোচনা করিয়াছিলেন, সে শুধু গল্পের প্লট বা আখ্যায়িকাভাগের সঙ্কলন জন্য মাত্র নহে। প্রাচীনের যে আভা নূতনকে উজ্জ্বল করে, তাহাকে শুধু ছায়ায় ঢাকিয়া রাখে না, সেই প্রাচীনতাকে তিনি উজ্জীবিত করিয়াছিলেন নূতনকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায় অতীতের ভিতর দিয়া তাঁহার চক্ষু পড়িয়াছিল দূর ভবিষ্যতের দিকে, বর্ত্তমান যেখানে সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। জাতির নবজাগরণ-সূচক যে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উষার বিহগকাকলীর মত তাহার কণ্ঠে জাগিয়াই মিলাইয়া গিয়াছিল, আজ যদিও তাহা কয়েক সহস্র লোকের অলসতার আবরণমাত্ররূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি অন্তর্হিত হয় নাই। কোন শুভ মুহূর্ত্তে তাহা লক্ষকণ্ঠে মঙ্গলধ্বনিরূপে আবার বাজিয়া উঠিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথকে আমি বঙ্কিমচন্দ্রের পূরক এবং সাহিত্য-সাম্রাজ্যে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া ধরিয়াছি। কিন্তু ইহা বলিলে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক বুঝান যায় না। রবীন্দ্রনাথ যদিও এখনও লিখিতেছেন, কিন্তু তাঁহার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে। নূতন পথ আর তিনি দেখাইতেছেন না। এখন তাঁহার কাজের বিচার করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ তাৎকালিক ইউরোপ হইতে উপকরণ-সকল সংগ্রহ করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যে বিন্যস্ত করিয়া তাহাকে বর্ত্তমান-সময়োপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যুগধর্ম্মের অন্তরালে যে বিশ্বমনের খেলা চলিতেছে তাহার সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিয়া তাহারই বিকাশ দেখাইয়াছেন স্বরচিত সাহিত্য- এবং সমাজতত্ত্ব-আলোচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে স্বদেশীয় সাহিত্য সমাজ ও ধর্ম্মমত গঠনের প্রয়াসে সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া

গিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে আরও উর্দ্ধে, আরও আগে চলিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বসাহিত্যরাজ্যে বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের স্থান করিয়া দিয়াছেন। এ শুধু বৃথা গর্ব্বের, parochial pride বা দেশ-শ্লাঘার কথা নহে, ইহা না নির্দ্দেশ করিলে রবীন্দ্রনাথের কৃতকর্ম্মের ফল বিচার করা সম্ভব হইবে না। তবে, তাঁহার সমস্ত কাজের বিস্তৃত আলোচনাও এখানে সম্ভব নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় যেমন ইউরোপের পঞ্চাশ বৎসর আগেকার রোমান্টিক মুভ্‌মেণ্ট্‌ প্রথম বাঙ্গলা দেশে আসিয়া নূতন রস ও কলাসৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তেম্‌নি পরবর্ত্তী যুগের ইউরোপের Neo-Romanticism, Naturalism, Impressionism এবং Symbolismএর প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এ কথা বলিলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার কিছুমাত্র নিন্দা নাই, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইউরোপের নূতন নূতন প্রবর্ত্তিত চিন্তা ও সৌন্দর্য্যরসধারায় বিশ্বমনের যে খেলা চলিতেছিল তাহা হইতে তিনি পিছাইয়া যান নাই, বরং আরও আগাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রবুদ্ধ মন ইউরোপীয় কবি ও সাহিত্যিকগণের অনন্ধভূত অনেক পথেও সৌন্দর্য্য ও রস আহরণ করিয়াছে। তিনি শুধু Naturalismএর শুষ্ক উষরতায় পথ হারান নাই, photographic truth প্রকৃতির হুবহু নকলের মধ্যে মানবের চিরন্তন সৌন্দর্য্যপ্রকাশ-চেষ্টা বিসর্জ্জন দেন নাই। যখন তিনি জীবনের কোন খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তখন তাঁহার চোখ পড়িয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত রসে। হাউপ্‌ট্‌মানের মত তিনি শুধু জীবনের কাঠাম মাপিয়াই ছাড়িয়া দেন নাই। তাহার রসও অনুভব করিয়াছেন। তিনি Neo-Romanticism বা Impressionismএর আবিলতায় গা ভাসাইয়া জীবনের স্বতঃসুন্দর অভিব্যক্তি ভুলিয়া যান নাই। তাহাকে জীবনের অপেক্ষা অধিক সুন্দর করিতে গিয়া অপ্রকৃত ছায়াময় জীবন গড়িয়া তুলেন নাই। তিনি আপনার হৃদয়-নির্দ্দিষ্ট পথে সৌন্দর্য্যের তীর্থযাত্রা করিয়াছেন, কেবল মাঝে মাঝে দূরাগত লোকান্তরের আলো তাঁহারও পথে আসিয়া পড়িয়াছে। শুধু একটি পথে কখনও তিনি আপনাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় আমরা দেখিতে পাই, তিনি কখনও objective world বা বহিঃপ্রকৃতি ছাড়িয়া বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 'বিষবৃক্ষের' প্রথমে সেই ঝড়বৃষ্টির রাত্রির কথা মনে করুন,—

"আকাশে মেঘাড়ম্বর-কারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী, কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপীসকল, সহস্র-সহস্র-খদ্যোতমালা পরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবল মাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেত-কৃষ্ণাভ মেঘ মালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল। স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবল মাত্র নববারি সমাগম-প্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে, বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুর পতনশব্দ, অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণ-শব্দ, কচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল-মোচনার্থ পক্ষ-বিধূনন-শব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দুসকলের এককালীন পতনশব্দ।"

'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর পর্ব্বতবাস মনে করুন,—

"এমন সময়ে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। রন্ধ্রশূন্য, ছেদ-শূন্য, অনন্ত বিস্তৃত কৃষ্ণাবরণে আকাশের মুখ আঁটিয়া দিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া গিরিশ্রেণী, তলস্থ বনরাজি, দূরস্থ নদী, সকল ঢাকিয়া ফেলিল। জগৎ অন্ধকার-মাত্রাত্মক—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। * * * * তুমি জড়প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই, জীবের প্রাণনাশে সঙ্কোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী,—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি, তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনাপূর্ণ-কারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, তোমাকে নমস্কার। হে মহাভয়ঙ্করী, নানারূপ-রঙ্গিণী! কালি! তুমি ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া, মস্তকে নক্ষত্র-কিরীট ধরিয়া, ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া ভুবন মোহিয়াছ, গঙ্গার ক্ষুদ্রোর্ম্মিতে পুষ্পমালা গাঁথিয়া পুষ্পে পুষ্পে চন্দ্র ঝুলাইয়াছ; সৈকত-বালুকায় কত কোটি কোটি হীরক জ্বালিয়াছ; গঙ্গার হৃদয়ে নীলিমা ঢালিয়া দিয়া, তাহাতে কত সুখে যুবক-যুবতীকে ভাসাইয়াছিলে। যেন কত আদর জান—কত আদর করিয়াছিলে। আজি এ কি! তুমি অবিশ্বাসযোগ্যা সর্ব্বনাশিনী। কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না,—তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই, কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী, সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম!'

কপালকুণ্ডলার সমুদ্রসৈকতে সন্ধ্যালোকে আবির্ভাব মনে করুন,—

"ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর

পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা ; স্তূপীকৃত বিমল-কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে, কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ, নীল-জলমণ্ডল-মধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল। * * * পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবেক। দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। * * গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব্বমূর্ত্তি ! সেই গম্ভীরনাদি বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি। * * মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ, ঘন কৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে, তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।"

এখন, সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বহিঃপ্রকৃতি ভেদ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এক পা'ও ভিতরে যান নাই। ইংরেজীতে রোমান্টিক বলিলে (রোমাঞ্চকর বলিলেও বলিতে পারেন) যাহা বুঝায়, তাহাতে তিনি সিদ্ধ-হস্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্বই এইখানে যে তিনি বহিঃপ্রকৃতি হইতে একেবারে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন বাঙ্গালার শ্যামলমাঠ পল্লীবাট খেয়াঘাটের কথা বলিতেছেন, তখন তিনি শুধু বাঙ্গালার পল্লীশ্রী দেখিতেছেন না, তিনি তাহাদের ভিতর দিয়া সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছেন। তাহাদের অন্তরলীন যে সৌন্দর্য্যরাগ তাহাদিগকে বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর্গত করিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যরাগই তাঁহার চেতনাকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার 'সোনার তরী' তাঁহার 'পসারিণী' তাঁহার এমন শতেক কবিতা তাই এমন অজানা, weird সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সমুদ্রতীরের কলগর্জ্জনধ্বনির অন্তরালে যে অনন্ত নীরবতার চেতনা, নৈশাকাশের নক্ষত্রমালার দীপ্তি হরণ করিয়া যে বিরাট্ অন্ধকারের অনুভূতি সে কেবল সেই বিশ্বপ্রকৃতির চেতনা-সমুদ্ভূত। বঙ্কিমচন্দ্রে ও রবীন্দ্রনাথে এইখানে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন এই বহিঃপ্রকৃতি ভেদ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির স্বরূপ সন্ধান করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি অবস্থা দেশ কাল লঙ্ঘন করিয়া নগ্ন মানবাত্মার নিবিড় প্রচেষ্টা অঙ্কিত করিয়া মানবজীবনের উচ্চতর স্বার্থসমূহের বিকাশ দেখাইয়াছেন। অনেকে রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালায় মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের Psychological Novelএর জন্মদাতা বলেন। ইংরেজীতে যাহাকে psychological novel বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তাহা লেখেন নাই। তাঁহার লেখা অনেক সময় psychological novelএরও গণ্ডী কাটাইয়া উচ্চতর ভাবে অনু-প্রাণিত হইয়াছে। 'গোরায়' তিনি যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'ঘরে বাইরে'তে তাহার একাংশের পরিণতি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনানুভূতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকা রচনার ব্যবধান তাঁহার 'গোরা'তেই স্পষ্ট বুঝা যায়। একজন আইরিশ্ শিশু বাঙ্গালীর ঘরে পালিত হইয়া যে সমাজের ও জীবনের নূতন নূতন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিবে, ইহা নিতান্তই আড়ম্বরহীন আখ্যায়িকা। একজন আখ্যায়িকাকার ইহাতে কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। যিনি জীবনকে শুধু বাহির হইতে দেখেন, তাহার Pomp এবং Show, আড়ম্বর ও জমক যাহার চোখে রাজশোভাযাত্রার চমক লাগাইয়া দেয়, তিনি জীবনের অন্তরালে নিরাবরণ নগ্ন যে মানবাত্মা—যাহার শুভাশুভের কল্পনায় বিশ্বজগৎ ক্ষণে ক্ষণে ভাঙ্গি-তেছে ও গড়িতেছে, তাহার খোঁজ রাখেন না। তেমন কোন আখ্যায়িকাকার যদি এই আইরিশ যুবকের ভাগ্য-বিধাতা হইতেন, তবে তিনি হয়ত বঙ্কিমচন্দ্রের ধরণেই গ্রন্থের কতক দূরে তাহার পিতা মাতা বা আত্মীয়স্বজনকে হাজির করাইয়া অশ্রুজলাভিষিক্ত দৃশ্যে "আমি 'Pat' বা 'Tom'" বা ওইরূপ কিছু একটা মিলন ও পরিচয়ের দৃশ্য আনিয়া ফেলিতেন, কত আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য চিন্তা, কত জটিল ঘটনাচক্রের মধ্যে গল্পের পূর্ণতা সম্পাদন করিতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে যে নগ্ন সুন্দর মানবাত্মার ছবিটি প্রতিভাত হইয়াছে, সে কি সে গল্পের নায়ক হইতে পারে? সে যে আপনার



"বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয়ে
জয়সিংহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ

U. Ray & Sons, Calcutta

তাহার ঘটনাচক্র! ললিতা ও সুচরিতা, বিনয় ও গোরা তাহারা যে জীবনের চিরন্তন দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আপনাদের লাভ করিতেছে, নাই সেখানে কল্পিত ঘটনার দ্বন্দ্ব, নাই মিথ্যা হা হুতাশ, অজ্ঞাত দেশের জন্য জল্পনা-কল্পনা।

'ঘরে-বাইরে'তে রবীন্দ্রনাথ আরও উচ্চে উঠিয়াছেন। 'গোরায়' যে ছবি অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল, সেখানে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আমাদের সংসারে, সমাজে, দেশে, এই ঘরে-বাহিরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। আমাদের স্ব স্ব জীবনেও এই ভিতরে-বাহিরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। ভিতর চায় এক রকম, বাহিরের দাবী অন্যরূপ। ঘরের জন্য কি বাহিরের দাবী ছাড়িতে হইবে, না বাহিরকে ছাড়িয়া ঘরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিব? এ এক কঠিন সমস্যা। দু'য়ের সামঞ্জস্য কি হয় না? রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশকে দিয়া দেখাইয়াছেন, মানুষ স্বীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই দু'য়ের দ্বন্দ্ব সে সহজে মিটাইতে পারে। বাহিরের আকর্ষণে যে গোলযোগ সৃষ্টি হয় তাহার সমাধান একদণ্ডেই হইয়া যায়, যখন আত্মপ্রতিষ্ঠায় স্থির হইয়া কেহ সে গোলযোগকেও আপনার করিয়া লইতে পারে। দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে এই যে বাহিরের ও ঘরের দ্বন্দ্ব, এরও সমাপ্তি হয় সেই আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানবাত্মার বিকাশে। যখন মোহ, লোভ, স্বার্থ, এসবের উপর করুণা তাহার কোমল মাতৃহস্ত বুলাইয়া যায়, তখন দেশ ও সমাজ চলিয়া গিয়া শুধু অন্তরের এক অসীম তৃপ্তিতে সব ভাঙ্গা জোড়া লাগিয়া যায়, সব কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব কি থামিবার? এ যে শুধু মানবাত্মার বিকাশের একটা উপলক্ষ্য। চিরকাল এ দ্বন্দ্ব চলিবে এবং চিরকাল মানবাত্মা তাহার উপর জয়লাভ করিবে। 'ঘরে-বাইরে' 'Sex duel' বা যৌন দ্বন্দ্ব আছে, 'anacrhism' বা বৈরাজ্য-তত্ত্ব আছে, বাংলার এবং জগতের সমসাময়িক চিন্তাধারার বহু ছায়াপাত আছে; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহাই তাহার অন্তর্নিহিত কথা।

এই নগ্ন মানবাত্মার বিবৃতিই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরও বহু উর্দ্ধে। তাঁহার শেষরচিত গ্রন্থাবলীতে এই জীবনের রস টলটল করিতেছে। বাহিরের-চিন্তা-মুক্ত মানবাত্মা জীবনের পথে অনন্তের তীর্থযাত্রা করিয়াছে। তাঁহার ছোট ছোট গল্পরাশিতে ইহার প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে একটি ছোট পুকুর-ঘাটের দৃশ্য, গ্রামের ধারে নদীতীরের পিছল পথ, ছায়াঢাকা আঙ্গিনায় গৃহস্থবধূর চলাফেরা, ঘাটের ধারে নৌকা বাঁধা, পদ্মার বক্ষে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঙ্গালার প্রান্তরক্রোড়শায়িত সহস্র পল্লীগ্রামের এমন সহস্র সহস্র দৃশ্যে যে একটি অপূর্ব্বানুভূত ভাব সহসা মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, তিনি তাহারই কায়া রচনা করিয়াছিলেন। যিনি সেগুলিকে শুধু বাঙ্গালার পল্লীজীবনের নিখুঁত ফোটো বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি তাহাদের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য অনুভব করেন নাই। মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন সৌন্দর্য্যপিপাসু চিত্ত বসিয়া আছে, যে তাহার নূতন আলোকে কুৎসিতকে সুন্দর করে, আবার সুন্দরকেও কুৎসিত করিতে পারে, সেই চিত্ত বিরহীর মত যাহাকে খুঁজিয়াছে, তিনি সেই সৌন্দর্য্যদেবতার পদে অর্ঘ্য দিয়াছেন কর্দ্দমাক্ত পল্লীপথের ছবিতে, নিশীথ রাতের জোনাকির আলোতে, ছেঁড়া-জামা-পরা ছেলের হাসিতে, মুখরাবধূকৃত স্বামী-তর্জ্জনে। মানুষ তখনও তাঁহার কাছে বাহিরের একটি ভাবের পট-ভূমিকা (Background), প্রতিচ্ছায়াফলক মাত্র। তার পর ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি আরও উন্মুক্ত হইয়াছে। ঘনীভূত সেই ভাবরাজ্যের উপরে তিনি মানবাত্মার গৌরব অনুভব করিয়াছেন, ভাবের ক্ষণিকতা ভেদ করিয়া তিনি মানবাত্মার অনন্ততা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং মানুষের সেই চিরন্তন সৌন্দর্য্যলিপ্সাকে বিকশিত মানবাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রে যেমন আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার অটল গাম্ভীর্য্যই—Vigour বা ওজঃ তাঁহার সাহিত্যশক্তির মূল, তেমনি রবীন্দ্রনাথে তাঁহার মোহনীয়তা, সৌন্দর্য্যবোধ, জীবনের পেলব রসানুভূতিই,—Delicacy, fineness সুকুমার সূক্ষ্ম কারুকার্য্য—সতত চঞ্চল, নব নব রূপে বিকশিত। তাঁহার উপন্যাস ও সমাজ-তত্ত্বালোচনা অপেক্ষা তাঁহার কাব্যগ্রন্থে ইহা পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। জীবনের অসীম সৌন্দর্য্যকে তিনি রূপের আকারে ধরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাহাকে সুরের

মাঝে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যখন আমরা বাহিরের রূপের দিকে চাহি, তখন নর, নারী, আলো, ছায়া, আকাশ, তরু, গিরি, নদী, ফুল, ফলের ভিন্ন-ভিন্নতার মাঝে হারাইয়া যাই, বড় জোর তাহাদের সমাবেশ-সামঞ্জস্য মাত্র দেখিতে পাই। কিন্তু সেই বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত বহির্দৃশ্যের মাঝে যে একটি একটানা সৌন্দর্য্যের ধারা বহিতে থাকে, যাহা বাহিরের সকল পৃথক্ সত্তাকে এক করিয়া, ঘনীভূত করিয়া, তাহার মাঝে থাকিয়াও তাহাকে মিলাইয়া লইয়া স্বতন্ত্র বিকাশ লাভ করে, সেই সৌন্দর্য্যধারাকে ধরিতে হইলে আমাদের অন্তরকে শুধু বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখিলে চলে না, তাহাকে বাহির হইতে ভিতরে লইয়া আসিতে হয়, ক্ষণিকতার অন্তরাল হইতে অনন্তের মাঝে প্রসারিত করিয়া দিতে হয়। তখনই প্রকৃত সৌন্দর্য্য-ভোগ সম্ভব। এই সৌন্দর্য্য-ভোগ অনন্ত ক্ষণে অনন্ত রূপে আমাদের জীবনে দেখা দিতেছে। জীবন তাহারই অনন্ত লীলায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণ হইতে শব্দে, শব্দ হইতে বর্ণে, আবার বর্ণশব্দানুসারিণী চিন্তার গূঢ় উত্তেজনায় ইহা আমাদের জীবনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন রূপে দেখা দিতেছে, জীবনকে নূতন শক্তি প্রদান করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের সেই গূঢ় আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, যখন তিনি গাহিতেছেন,—

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,
পাষাণ টুটে' ব্যাকুল বেগে ধেয়ে
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।"

যখন তিনি জানাইতেছেন 'সুরের আসন পাতিয়া তাঁহার জীবনেশ্বরকে বসাইবেন,' যখন শত বিচিত্র বর্ণে গন্ধে এই ধরণীর পানে চক্ষু মেলিয়া উদ্বেল হইয়াছেন, তখনও তিনি সেই জীবনেরই রসাস্বাদন করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ, সমস্ত জীবন একটি ছন্দে কাঁপিতে কাঁপিতে সুরের মধ্যে লয় হইয়া যাইতেছে, আবার সেই সুরের লয়ে সন্ধ্যামেঘে রং ধরিতেছে, আকাশে ভোরের আলো ফুটিতেছে। সুর ও রূপ তাঁহার কাছে এক অভিন্ন লয়ে গ্রথিত মহাজীবনের সৌন্দর্য্যের বিকাশ মাত্র। কখনও তাঁহার অন্তরের গভীর পিপাসা বাউল কবিদের সহজ সরল উচ্ছ্বাসে বাজিয়া উঠিয়াছে,—"কইতে যে চাই, কইতে কথা বাধে," "দেহ-দুর্গে খুল্‌বে সকল দ্বার,"—আবার কখন ভাবগম্ভীরহৃদয়ে প্রকাশের অতীত-প্রায় চেতনার ভাষায় গাহিয়াছেন,—

"বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই॥
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার,
পরাণসখা, বন্ধু হে আমার।

ভারতের প্রাণস্বরূপ সেই প্রাচীন বৈদিক ঋষিরই মত তিনি উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে, মেঘপাটল বন-নীল প্রকৃতির অন্তর-গহনে জীবনাতীত এক পূর্ণ জীবনের পরিচয় লাভ করিয়াছেন। তিনি বৈদিক ঋষিরই মত রহস্য মন্ত্রের উপাসক, রহস্যবাদী ঋষি, Mystic। এ যুগের কর্ম্মরোল ও ধূলা-বালিকে তিনি সেই একই মন্ত্রে মহান্ জীবনরহস্যের সুরে বাঁধিয়া দিয়াছেন। এ যুগ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে চাহিলেও করিতে পারিতেছে না।*

শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

* [চট্টগ্রাম কলেজ রিসার্চ্ সোসাইটির পাক্ষিক অধিবেশনে পঠিত]

উৎসাহ

শান্তিবাদের পক্ষে ভালরকম ওকালতি করিয়া এমার্সন্ শেষে বলিতেছেন :—

"If peace is sought to be defended or preserved for the safety of the luxurious or the timid it is a sham and the peace will be base. War is better and the peace will be broken."

অর্থাৎ, বিলাসী ও ভীরুদের সুবিধার জন্যই যদি শান্তি কামনা করা হয় তবে সেরকম শান্তির মূল্য কিছুই নাই। তেমন শান্তি মানুষের অন্তরাত্মাকে হীনতাপন্ন করে। তাহা অপেক্ষা সংগ্রামই শ্রেয়স্কর; এবং মানুষ দুদিন আগে পরে এমন শান্তির ব্যর্থ চেষ্টা পরিহার করিবেই।

আসলে কথা এই,—যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয়; colonial self-government ও নয়; পূরাপূরি independence ও নয়; মানুষের যাহা অন্তরতম আকাঙ্ক্ষার বিষয় তাহা হইতেছে সুন্দর জীবন, মহত্ত্ব। ভোগকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে জীবনে যে সঙ্কুচিত ভাব আসিয়া পড়ে, সুখের উপকরণ যাহা আছে তাহা পাছে হারাইতে হয় এই আশঙ্কায় কর্ত্তব্যের পথে চলিতে গিয়া যেই কুণ্ঠিত দৌর্ব্বল্যে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়, সেই কুণ্ঠা, সেই বীর্য্যহীন সঙ্কোচ হইতে মুক্ত জীবনযাপন করাই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় গরজ। সুখস্পৃহা এবং দুঃখকে এড়াইয়া চলিবার আকাঙ্ক্ষাই মানবাত্মার স্বাধীন স্ফূর্ত্তির পথে প্রবল অন্তরায়। এই প্রাকৃতিক প্রবৃত্তিই মানুষকে একান্তভাবে বহিঃশক্তির অধীন জন্তুজীবনের ঊর্দ্ধে উঠিতে দেয় না। এই হেতু, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিতেছেন :—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ"। আর যাহা কর কিম্বা নাই কর বীর্য্যহীনতাকে পরিহার করিতে হইবে; তাহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধম হীনতা। শান্তি ভাল জিনিস, নিষ্ঠুরতাও আদরণীয় নয়, কিন্তু তাই বলিয়া নীচতাকে স্বীকার করিবে? আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত হইতে দিবে! সে ত কিছুতেই হইতে পারে না! আরামের জন্য ও ভোগবিলাসে জীবন কাটাইয়া দিবার জন্য, হৃদয়কে কর্ত্তব্যের কঠোরতা হইতে বাঁচাইবার ইচ্ছায় যদি শান্তি চাও, তবে ধিক্ সে শান্তিকে—সে শান্তি তোমাকে হারাইতেই হইবে।

"লাগেনাকো কেবল যেন
কোমল করুণা!
মৃদু সুরের খেলায় এ প্রাণ
ব্যর্থ কোরোনা।"

মানুষের ইহাই গভীরতম প্রার্থনা; এই প্রার্থনার উত্তরে ভগবান যেরূপে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তকে দেখা দেন তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—

'লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো।"

মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্য এই উগ্রতেজা দেবতার উপাসনা করিতে হইবে,—ইহার অনুশাসন মানিয়া বুক শক্ত করিতে হইবে,—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং"ত্যাগ করিয়া নির্ম্মম কঠোর মহত্ত্বের পথে চলিতে হইবে।

এইখানেই ত্যাগ-ধর্ম্মের স্থান। ত্যাগ ত শুধু ছাড়া নয়, নিজেকে শুধু বঞ্চিত করা নয়—ইহা সহজকে ছাড়া গভীরের জন্য, আরামকে ছাড়া সত্য শান্তির জন্য, জীবনের মায়া ছাড়া ভয়হীন জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের জন্য। যুদ্ধই হউক্ শান্তিই হউক, এই ত্যাগধর্ম্মের দ্বারা যদি তাহা অনুপ্রাণিত না হয় তবে মানুষ মহত্ত্বের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইবে। মানুষের বীরত্বের পরিচয় এই ত্যাগে—এই প্রবৃত্তির অধীনতা পাশ ছেদনে। মানুষের কর্ম্মপ্রণালীর মূল্য নিরূপিত হইবে, এই বীরত্বচর্চ্চার অবকাশ উহাতে কতটা আছে তাহা দ্বারা। দার্শনিক উইলিয়াম্ জেম্‌সের ভাষায় বলিতে গেলে—

"The deepest difference practically in the moral life of man is the difference between the easy-going and the strenuous mood. When in the easy-going mood, the shrinking from present ill is our ruling consideration. The strenuous mood, on the contrary, makes us quite indifferent to present ill if only the greater ideal be attained. The ...

"মোহের বন্ধন" ছিন্ন করিতে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় না। "কার্পণ্যোপহতস্বভাবঃ" হওয়াতে অর্জ্জুনের যে কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা জন্মিয়াছিল, ভক্তিই উহা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। কৌরবদিগের কৃত অন্যায় সহিয়া যাইবার মত হীনতাও তিনি স্বীকার করিতে যাইতেছিলেন যতক্ষণ ভগবানের categorical imperative, রুদ্রদেবতার সর্ব্বনাশা ডাক তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয় নাই।

এই গীতোক্ত দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া ভারতবর্ষের কবি গাহিয়াছেন :—

"আমরা বিনাপণে খেল্‌ব না গো,
খেল্‌ব রাজার ছেলের মত।
ফেল্‌ব খেলায় ধনরতন
যেথায় মোদের আছে যত!
সর্ব্বনাশা তোমার যে ডাক
যায় যদি যাক্ সকলি যাক্,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে
খেলা মোদের কর্‌ব সারা,
তার পরে কোন বনের কোণে
হারের দলটি হ'ব হারা।"

এই ভাবের ভাবুক হইয়া—আয়র্লাণ্ডের বীর কবি পাদ্রিক পিয়ার্সও লিখিয়াছেন :—

"That no one can finely live who hoards life too jealously, that one must be generous in service and withal joyous, accounting even supreme sacrifices light."

অর্থাৎ, বাঁচিবার মত করিয়া বাঁচিতে হইলে দিল্‌দরিয়া হওয়া চাই। জীবনকে সুন্দর, সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে কৃপণতার মত এত বড় বাধা আর নাই। বিফলতার আশঙ্কা, হারাইবার ভয় যদি মনকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, ত্যাগ যদি সহজ ও আনন্দজনক না হয়, দুঃখমৃত্যুকে যদি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করা না যায় তবে বৃহৎ প্রয়াসের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, এবং তাহা করিতে না পারিলে, মানুষের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা, ভূমাকে পাইবার ইচ্ছা পদে পদে ব্যাহত হয়—সাংসারিক জীবনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া মুক্তি-পথের পথিক হওয়া যায় না। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই মানুষ এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। ভগবানে ভক্তি, আত্মসমর্পণ ইহার জন্য একান্ত আবশ্যক। আদর্শানুসারিতা এই ধর্ম্মভাবেরই বাহ্যরূপ; এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেই মানুষ নিজের আদর্শের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারে :—

"দুঃখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে' ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে।"

ভগবান্ মানুষকে অনাদি কাল হইতে বলিতেছেন :— "যুধ্যস্ব", অন্যায়ের প্রতিরোধ কর। সংসারে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য, ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্য তোমাকে এ কাজ করিতে হইবে, "যজ্ঞার্থে" এই কর্ম্ম করিতে গিয়া তোমার কাজের কি ফল হইবে,—ইহাতে তোমার নিজের কতটা ক্ষতি হইবে, তোমার কোন্ আত্মীয়-স্বজন কতটা দুঃখ পাইবে এইসব ভাবনা তুমি ভাবিতে পাইবে না। মমত্ব-বোধ-জনিত মর্ম্মান্তিক দুঃখস্বীকার করিয়াই তোমাকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। মানবাত্মাতে নিহিত এই categorical imperative এই ফলাফল-নিরপেক্ষ অলঙ্ঘ্য-নীয় বিধি মানিয়া চলাই ধর্ম্মজীবন—মানুষের সত্য-জীবন। এই ভগবদ্বাক্যকে জীবনের নিয়ামক করিয়া আইরিশ কবি ভক্তির আবেগে বলিতেছেন :—

"Lord, I have staked my soul, I have staked the lives of my kin
On the truth of Thy dreadful word. Do not remember my failures,
But remember this my faith."

কর্ম্মের ইহাই কৌশল! ভগবদ্গীতার ইহাই শিক্ষা। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি", "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" এই শিক্ষাই মার্কিন-দেশের জ্ঞানী এমার্সন্‌ও দিতেছেন নিম্ন-লিখিত কথাটিতে :—

"It is the wisdom of man in every instance of his labour to hitch his wagon to a star and see that his chore is done by the gods themselves. That is the way we are strong."

সোজা কথায়, দেবতার প্রীতিকামনায় কোন মহৎ ভাবের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া কাজ করিতে

থাকাই জীবনের সার্থকতা-সাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায়; কারণ, কেবল এই উপায়েই "স্থিতধী" হওয়া যায় এবং "স্থিতধী" অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থাতে অবিচলিত নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া প্রতিদিনের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারিলেই মানুষ ক্ষতির দ্বারা, পরাজয়ের দ্বারা আক্রান্ত হইলেও অভিভূত হয় না, এমার্সনের ভাষায়—

"Can calmly front the morrow in the negligency of that trust which carries God with it."

জীবনের যিনি প্রভু, তাঁহার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া, ভগবৎকার্য্যের নিমিত্তমাত্র হইয়া দুরূহ কর্ত্তব্যের পথে প্রশান্তচিত্তে অস্খলিতপদে অগ্রসর হইতে পারে—হারের মধ্য হইতেও আপাতপ্রতীয়মান সর্ব্বনাশের মধ্য হইতেও, সর্ব্বশক্তিমানকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে পারে :—

"এই হারা ত শেষ-হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে ;
জিত্‌ল যে সে জিত্‌ল কি না,
কে বল্‌বে তা সত্য করে' !
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাট্‌ব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।
তার পরে কি কর্‌বে তুমি
সে কথা কেউ ভাব্‌তে পারে ?"

এবং এইরূপে "দৃঢ়নিশ্চয়" হইয়া উদার আনন্দের স্বরে গাহিয়া উঠিতে পারে :—

"বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর ?
কিসেরই বা সুখ, ক'দিনের প্রাণ
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান ;
অমর মরণ রক্তচরণ নাচিছে সগৌরবে ;—
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

শ্রী মহেন্দ্রলাল রায়

ভাঙনের গান

অত্যাচারের গুরু মন্থনে উদ্‌গারি' হলাহল,
দেশে দেশে আজো অত্যাচারীর অটুট রহিল বল।
মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি অমানুষী অবিচার ;—
আজিকে নবীন যুগের প্রভাতে হবে হবে প্রতিকার।
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্ব্বল দল !
ভাঙনের পালা সুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল।

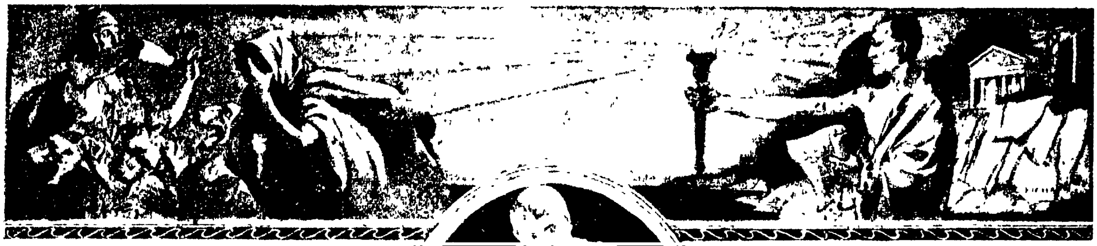
একের স্বার্থ-রথ-ঘঘরে বাজে পীড়িতের গান,
বহুর বুকের পাঁজর পিষিয়া সে রথের অভিযান।—
এদের ঘেরিয়া আছে যুগভরা অত্যাচারের শিখা,—
এই পাঁজরের তপ্ত নিশাসে জ্বলিবে মৃত্যু-শিখা !
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্ব্বল দল !
ভাঙনের পালা সুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল।

স্বার্থের সনে স্বার্থ ঠেকিয়া জ্বলে অগ্নির শিখা,
সেই সমরের বহ্নি-মাঝেও তোমার মরণ লিখা !—
মৃত্যু-দুয়ারে হানা দিলে হাতে মুক্ত কৃপাণ শত
ফিরিতে কি দাস-শৃঙ্খল-ভারে দেহভার করি' নত ?
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্ব্বল দল !
ভাঙনের পালা সুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল।

হের, দুর্ব্বল শোণিত ঢালিয়া তর্পণ করে কার—
শক্তি-পিপাসী অত্যাচারীর রাখিতে অহঙ্কার !
যুগ-যুগ-ধরি'-নিপীড়িত হিয়া ভেদি' ওঠে হাহা রব—
ধন-গর্ব্বিত অত্যাচারীর হবে হবে পরাভব।
জাগো হে পীড়িত ! অত্যাচারিত ! জাগো দুর্ব্বল দল !
ভাঙনের পালা সুরু হল আজি, ভাঙ ভাঙ শৃঙ্খল।

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায়

দশ জন বৈজ্ঞানিক

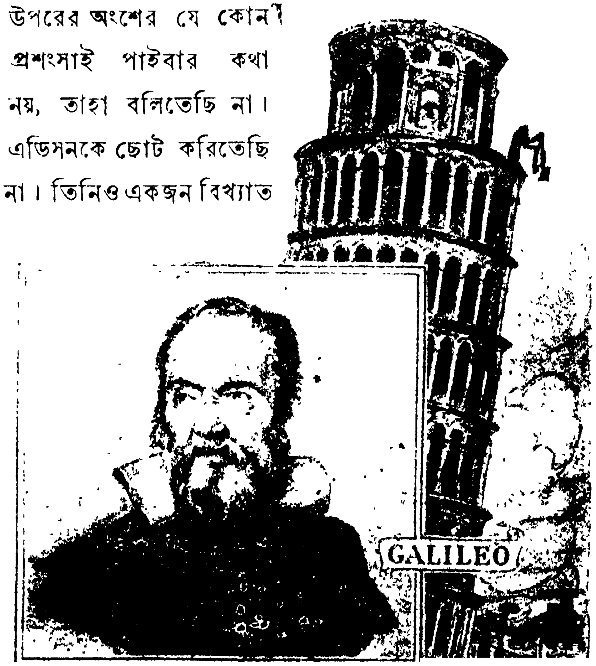


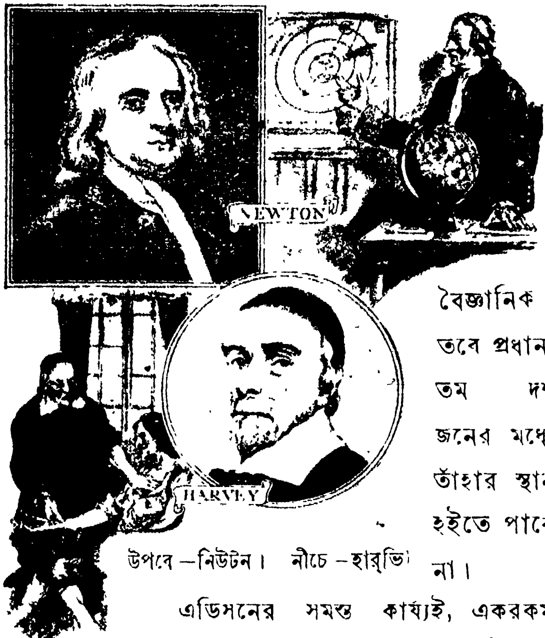


অ্যারিষ্টটল

পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে প্রধান দশ জনের নাম করা অতি কঠিন ব্যাপার। এই কথা মনে হইলেই একটি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ে। একজন দার্শনিক তাঁহার সমস্ত জীবন ধরিয়া যে-সকল চিন্তা করিয়াছিলেন, একজন স্ত্রীলোক আসিয়া দু-একটি কথায় সেইসকল চিন্তারাশির কথা শ্রবণ করিতে চায়। দার্শনিক বিস্ময়ে চুপ করিয়া ছিলেন, কোনপ্রকার উত্তর করিতে পারেন নাই।

হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেবল মাত্র দশ জনকে সর্ব্বোচ্চ আসন দান করাও অতি বিষম কথা, হঠাৎ ভাবিলেই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সাধারণ লোকের সম্মুখে "বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক" বলিলেই এমন-সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের নাম তাহাদের মনে আসে যাঁহারা বিজ্ঞানকে নানারকমের জনহিতকর এবং অন্যান্যপ্রকারের কার্য্যে লাগাইয়াছেন। এডিসনের নাম সহজেই অনেকের মনে আসিবে। অনেকেই বলিবেন এডিসন পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই হইবেন। কিন্তু এডিসন বিজ্ঞানকে কার্য্যে লাগাইয়াছেন মাত্র। যে নিয়মে এবং সূত্রে ভর করিয়া তিনি এইসকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আবিষ্কৃত নয়। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের স্কন্ধে ভর করিয়া এডিসন তাঁহার নিজের নাম করিয়াছেন। লোকে তলাইয়া দেখিতে পায় না প্রশংসাটুকু দেয়। তাজমহল দেখিতে গিয়া আমরা তাহার ভিত্তির কথা মনে করি না—কিন্তু ভিত্তিবিহীন তাজমহলের কল্পনা করা যায় কি? তাজমহলের মাটির উপরের অংশ বাদ দিয়াও ভিত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু ভিত্তি বাদ দিয়া উপরের অংশ কোথায় থাকিবে? কিন্তু তাই বলিয়া উপরের অংশের যে কোন প্রশংসাই পাইবার কথা নয়, তাহা বলিতেছি না। এডিসনকে ছোট করিতেছি না। তিনিও একজন বিখ্যাত





উপরে—নিউটন। নীচে—হার্ভি

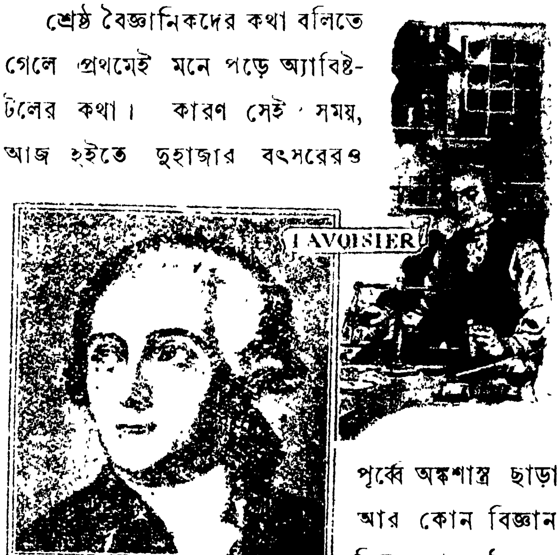
বৈজ্ঞানিক, তবে প্রধানতম দশ জনের মধ্যে তাঁহার স্থান হইতে পারে না।

এডিসনের সমস্ত কার্য্যই, একরকম বলিতে গেলে, আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম্ গিব্‌সের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং নিয়মাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই গিব্‌সের নাম শতকরা ৫০ জন আমেরিকানও জানেন কি না সন্দেহ। বিজ্ঞানে জেম্‌স্ ওয়াটের স্থানও এডিসনের মত। সকলেই জানেন যে ওয়াট্, ষ্টিম্ ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। কিন্তু ওয়াট্ও অন্যের আবিষ্কৃত সুত্রের উপর তাঁহার আবিষ্কারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, যখনই কোন-একটি নূতন বৈজ্ঞানিক নিয়ম বা সুত্র আবিষ্কার হইয়াছে—তাহার অনতিবিলম্বেই একদল বৈজ্ঞানিক নানারকম জনহিতকর এবং জন-আনন্দজনক কার্য্যে সেই সুত্রটিকে লাগাইয়াছেন। ইহাতেও মানবসমাজের কল্যাণ যে বড় কম হয় তাহা নয়। এবং এই কারণেই বোধ হয় লোকে সেইসব বৈজ্ঞানিকদের কথা বেশী জানিতে পারে এবং মনে রাখে, যাহারা সাধারণের আনন্দ এবং উপকারের জন্য কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক সুত্রগুলিকে সাধারণ কাজে লাগায়। যে লোক মিষ্ট এবং সুস্বাদু ফল বিক্রয় করে, সেই দোকানীকে চিনি, কিন্তু তাহার বাগানে কোন্ সেই ফল উৎপন্ন করিয়াছে তাহার খোঁজ আমরা কয়জনে রাখি? যাহার কার্য্যকে আমরা চোখের সাম্‌নে সহজেই এবং বেশীর ভাগ সময় দেখিতে পাই—তাহারই কথা আমরা সহজে মনে রাখিতে পারি।

এখন কথা হইতেছে, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক কাহাদের বলা হইবে। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক তাঁহাদের বলা হইবে, যাঁহারা তাঁহাদের জীবিত-কালে পৃথিবীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহাদের আবিষ্কারের ফলে পুরাতন ধারার অনেক ওলটপালট হইয়াছে এবং অনেক-কিছু মিথ্যা এবং ভুল বলিয়াও প্রমাণ হইয়াছে। তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যাঁহারা বিজ্ঞান-সৌধের এক-একটি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে অ্যারিষ্টটলের কথা। কারণ সেই সময়, আজ হইতে দুহাজার বৎসরেরও



লাভোয়াশিয়ে

পূর্ব্বে অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া আর কোন বিজ্ঞান ছিল না বলিলেও চলে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্থলে কতকগুলি মাথামুণ্ডহীন গল্পের প্রচলন ছিল।

কিন্তু অ্যারিষ্টটলের মনের মধ্যে নূতন আলোক প্রবেশ করিল। তিনি সমস্ত মিথ্যার মধ্য দিয়া সত্যকে খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে তখন এক ইচ্ছা—"আমি জানিতে চাই।" তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন—এবং জানিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি তুলনামূলক শারীরবিজ্ঞানের (anatomy) ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি নানাপ্রকার জীবজন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহাদের শরীরের অস্থি-সংগঠনের পরিচয়

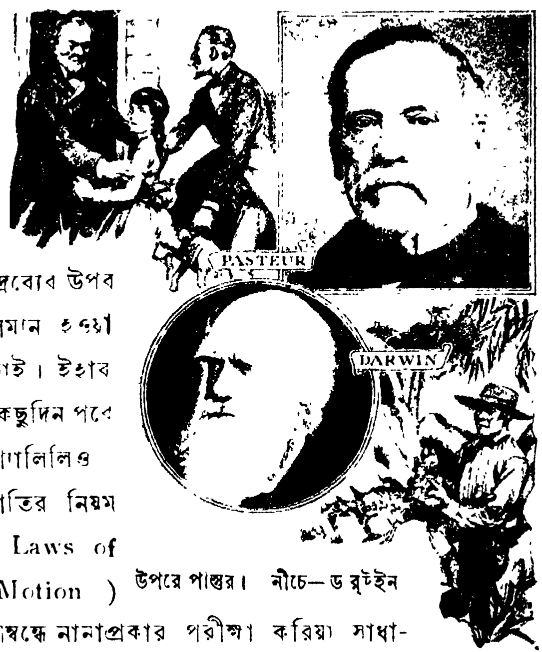


হেল্‌ম্‌হোৎস্‌

প্রদান করেন। কোন্ অস্থির কি দর্‌কার, অন্য কোন্ অস্থির সহিত তাহার কি যোগ, কেমন তাহার গঠন, ইত্যাদি অস্থি-পরিচয় অ্যারিষ্টটল প্রথমে আবিষ্কার করেন। বাদুড় এবং তিমি যে স্তন্যপায়ী জন্তু এ সংবাদ মানুষকে তিনিই প্রথম জ্ঞাপন করেন।

অ্যারিষ্টটল জন্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধে একখানি চমৎকার পুস্তক লেখেন। সেই পুস্তক আজও পড়িলে আমরা অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিতে পারি। পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষলতাদি বিষয়ে তাঁহার অতি প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি সকল পশুপক্ষীর বাহ্যিক আচার-ব্যবহার বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অবশেষে তাহাদের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া তাহাদের শরীরের ভিতর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। জীবজন্তুর আচার-ব্যবহার এবং শরীর পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন না—তাহাদের জীবন-ধারণের উপায়, তাহারা কি খায়, কেমনভাবে খায়, কেমনভাবে সন্তান পালন করে ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এইসমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি জন্তুবিজ্ঞানকে বিশেষ বিশেষ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এবং কিভাবে জীবজন্তুর বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইবে—তাহার একটি বিশেষ পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান অতিসভ্যতার দিনেও শত শত তরুণ যাত্রী সেই গ্রীক মহাজনের পথেই চলিয়াছে এবং তাহাতে সফলমনোরথ হইতেছে।

অ্যারিষ্টটলের পরেই গ্যালিলিওর নাম করিতে হয়। গ্যালিলিও বর্ত্তমান যন্ত্রবিজ্ঞানের (mechanics) পিতা। গ্যালিলিওর সময়ে লোকে বিশ্বাস করিত যে কোন উচ্চ স্থান হইতে কোন দ্রব্যের পতন-সময় তাহার ভারের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। গ্যালিলিও ইহা মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য পিসা নগরের হেলানো স্তম্ভে আরোহণ করিয়া দুইটি অসমান ভারের দ্রব্য নীচের দিকে একই সময়ে নিক্ষেপ করেন। এই কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তৎকালীন পণ্ডিত এবং ছাত্রেরা তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া উপহাস করিত। গ্যালিলিও এই তথ্য আবিষ্কার করিলেন যে বায়ুর প্রতিকূলতা বাদ দিয়া দেখিলে সকল জিনিষের পতনের বেগ সমান। ২০ হাত উপর হইতে ১০ সের ওজনের জিনিষ পড়িতে যে সময় লাগিবে, এক সের জিনিষ পড়িতেও সেই সময় লাগিবে—তবে বায়ুর প্রতিকূলতা উভয়



উপরে পাস্তুর। নীচে—ডারুইন

দ্রব্যের উপর সমান হওয়া চাই। ইহার কিছুদিন পরে গ্যালিলিও গতির নিয়ম (Laws of Motion) সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া সাধারণকে দেখান।

গ্যালিলিও টেলিস্‌কোপ তৈরী করিতেন। এইসমস্ত দূরবীণের সাহায্যে তিনি গগন-মণ্ডলের গ্রহতারকাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেন। গ্যালিলিও যে-দিন বলিলেন যে, "পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য্য ঘোরে না—সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘোরে" সেদিন সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী





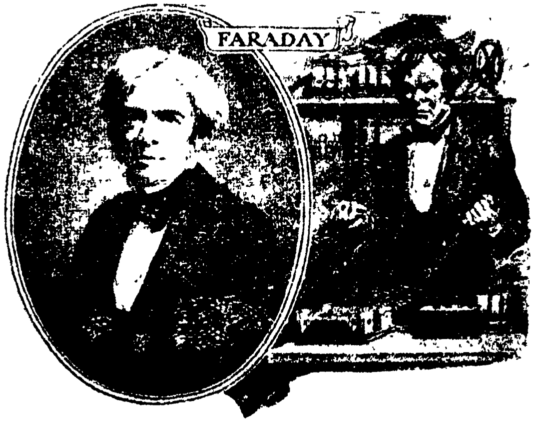
বার্ণার্ড

পড়িয়া গিয়াছিল। গ্যালিলিও যে ঘোর উন্মাদ তাহাতে কাহারো কোন সন্দেহ রহিল না। সেই সময়ের ধর্ম্মযাজকেরা বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী সৌর জগতের কেন্দ্র —সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাঁহারা সাধারণ লোকদেরও এই শিক্ষা দান করিতেন। এই-সমস্ত লোকে গ্যালিলিওকে অধার্ম্মিক এবং সমাজ-দ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এবং অবশেষে প্রাণ-দণ্ডের ভয় দেখাইয়া গ্যালিলিওকে তাঁহার মত ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করিলেন; যদিও মনে মনে তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন—"আমার কথাই ঠিক—মুখে আমি এখন উল্টা কথা বলিতেছি।"

জ্যোতির্ব্বিদ্যা গ্যালিলিওর আবিষ্কার-সমূহের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এইসমস্ত আবিষ্কারের জন্যই গ্যালিলিওর স্থান শ্রেষ্ঠ দশজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে।

গ্যালিলিওর উপর ভর করিয়া আইজাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি (Law of Gravitation) আবিষ্কার করিলেন। এই নিয়মে আমরা জানিতে পারি কেমন করিয়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের গতিবেগ সকল সময় অন্য প্রত্যেকটি দ্রব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। এখন অনেকের মনে হইতেছে যে মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম অপেক্ষাও আর একটি বড় নিয়ম আছে—তাহা আইনষ্টাইনের থিওরি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নিউটনের আবিষ্কারের দাম কমিতেছে না—কারণ আইনষ্টাইনের আবিষ্কার নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মকে খণ্ডন করিতেছে না, তাহাকে আরো জোর দিতেছে।

এই মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম আবিষ্কার করিয়া নিউটন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের একটি নূতন যুগে আনিয়া দিলেন। এই নিয়মের সাহায্যে সৌর মণ্ডলের সকল গ্রহতারকার গতির একটি পরিমাণ নির্ণয় করা হইল এবং এই নিয়মের সাহায্যে গণনা করিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা এখন বলিতে পারেন কবে এবং কোথায় কি তারকা দেখা দিবে—কবে সূর্য্যগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি হইবে। নিউটনই প্রথম দেখান কেমন করিয়া পৃথিবীর অনুপাতে সূর্য্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়, কেমন করিয়া জোয়ার-ভাঁটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। কবি পোপ বলিতেছেন—প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিয়মকানুন অন্ধকারের আবরণে ঢাকা ছিল, ঈশ্বর বলিলেন নিউটনের জন্মলাভ হউক—তাহার পরেই চারিদিকে আলোক ছড়াইয়া পড়িল।



ফ্যারাডে

সতেরো শতাব্দীতে উইলিয়ম হার্‌ভি মানুষের শরীরের মধ্যে যে রক্ত-চলাচল হয়—এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন। মানুষের ফুস্‌ফুস্ যে শরীরে রক্ত-চলাচলের জন্য পাম্পের কাজ করে, তাহা হার্‌ভি প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি এই আবিষ্কার আন্দাজে করেন নাই—ব্যাঙের পায়ে প্রথম এই রক্ত-চলাচল পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি নানারকম পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রমাণ করিলেন। এই আবিষ্কার হইবার পর চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। এই সময় লোকে যাহা-তাহা বিশ্বাস করিত। যেমন—পচা মাংস হইতে মাছি জন্মাইতে পারে—ঘোড়ার চুল হইতে কেঁচো গজাইতে পারে। কিন্তু হার্‌ভি নানা-

রকম পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন, যে, কোন জীবন্ত জন্তু স্বজাতীয় অন্য কোন জীবন্ত জন্তু ছাড়া অন্য কিছু হইতে জন্মলাভ করিতে পারে না। হার্ভি এই সমস্ত আবিষ্কারের দ্বারা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়া বর্ত্তমান চিকিৎসা-প্রণালীর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আন্তোয়ান লরাঁ লাভোয়াসিএ (Antoine Laurent Lavoisier) ফরাসী বিদ্রোহের সময় প্যারিসে বাস করিতেন। সেই সময় প্যারিসের লোকেরা "আমাদের বৈজ্ঞানিকে প্রয়োজন নাই" বলিয়া লাভোয়াসিএর ফাঁসির আজ্ঞা দেয়। তাঁহার পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রকৃত রাসায়নিক ছিল না। কেবল একদল লোক সকল ধাতুকে সোনায় পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টায় থাকিত, কিন্তু তাহাদের কার্য্যে কোন বৈজ্ঞানিক লক্ষণ ছিল না। লাভোয়াসিএ আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না। তাহার আকার এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। লাভোয়াসিএ পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রমাণ করিয়া দেন। একটি পাত্রের মধ্যে কোন দ্রব্যকে ভরিয়া, তাহার মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে কোন দ্রব্য বাহির হইতে কিম্বা প্রবেশ করিতেও না পারে,—এমন কি বায়ুও নয়। তার পর সেই পাত্রস্থিত দ্রব্যকে গরম করিয়া গ্যাসে পরিণত করিলে পর চোখে দেখা যাইবে যে পাত্র শূন্য—কিন্তু ওজন করিলে দেখা যাইবে যে গরম করিবার পূর্ব্বের ওজনের সহিত—গরম করিবার পরের ওজন সমানই আছে, কোনপ্রকার কম-বেশী হয় নাই। ইহা ওজন করিবার জন্য রাসায়নিক মানদণ্ডের জন্ম হয়। এই মানদণ্ডে অতি—অতি সামান্য ভারেরও ওজন পরিমাণ করা যাইতে পারে।

সেই সময়ের লোক মনে করিত যে phlogiston নামে একপ্রকার দ্রব্য বাহির হইয়া গেলে পর কোন জিনিষ পুড়িতে পারে। Phlogistonকে কোন রকমেই পোড়ান যায় না। লাভোয়াসিএ এই ভ্রান্তি দূর করিয়া প্রমাণ করেন যে অক্সিজেনের সাহায্যেই সব জিনিষ পোড়ে—অক্সিজেনের অবর্ত্তমানে কোন দ্রব্য আগুনে পুড়িতে পারে না। লাভোয়াসিএ বর্ত্তমান রসায়নের ———।

"কোন শক্তিই পৃথিবীতে নষ্ট হয় না," এই সত্যের আবিষ্কর্ত্তা হেল্‌ম্‌হোৎস্ (Helmholtz)। তিনি বলেন যে একপ্রকার শক্তিকে অন্য আর-একপ্রকার শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে—কিন্তু কোন শক্তিকে একেবারে নষ্ট করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। কোন শক্তি কেহ জন্ম দিতেও পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কয়লা পুড়িয়া জলকে বাষ্পে পরিণত করে। নায়াগ্রা-প্রপাতের শক্তিকে ধরিয়া মানুষ হাজার কাজে লাগাইতেছে। জল-প্রপাতের পতন-বেগকে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। এই-রকম নানাপ্রকার শক্তির অদল-বদল এবং বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লোকে নিজেদের কাজে লাগাইতে পারে। এই-সমস্তের মূলে হেল্‌ম্‌হোৎস্ রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান কালে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে যাহা-কিছু হইতেছে, সে-সকলের মূলে রহিয়াছেন—মাইকেল ফ্যারাডে। তাঁহার নানাপ্রকার পরীক্ষা এবং আবিষ্কারের জন্যই আজ আমরা টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন দেখিতে পাইতেছি। ফ্যারাডের পূর্ব্বে মানুষ বিদ্যুৎ-শক্তিকে একটা অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করিত, তাহার পরিচয় থাকিলেও তাহাকে কোনপ্রকার কাজে লাগাইবার কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। ফ্যারাডে প্রমাণ করেন যে বিদ্যুৎ-প্রবাহযুক্ত একটি তারের নিকট আর-একটি সাধারণ তার রাখিলে তাহাতেও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে। এই তথ্যের উপর ভর করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও বিদ্যুৎ তিনিই প্রথম উৎপন্ন করেন।

হার্ভি শরীরের বিভিন্ন অংশগুলিকে সকলের বোধ-গম্য করিয়া ব্যাখ্যা করেন। শরীরের ভিতরের এবং বাহিরের কোন অঙ্গের কি কাজ তাহা তিনি অতি সহজ-ভাবে সকলের সাম্‌নে ধরেন।

ক্লড বার্ণার্ড্ মানুষের শরীরের মধ্যে কিপ্রকারের রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি হয় তাহা আবিষ্কার করেন। এই সময়ের চিকিৎসকদের বিশ্বাস ছিল যে "যকৃৎ কেবল মাত্র

পিত্ত উৎপন্ন করে—অতএব যকৃতের কাজ পিত্ত উৎপন্ন করা। বার্ণার্ড প্রমাণ করিয়া দিলেন যে যকৃতের কাজ অন্যপ্রকার। শরীরের রক্তের জন্য চিনি জমা করিয়া রাখা এবং প্রয়োজন-মত তাহা রক্তের মধ্যে চালান করাই যকৃতের কাজ। ইহা প্রমাণ হইবামাত্র সেই-সময়ের বৈদ্যেরা বহুমূত্র রোগের কারণ ধরিতে পারিলেন।

বার্ণার্ডের প্রধান আবিষ্কার ductless glands-এর (নালিহীন মাংসগ্রন্থির) প্রয়োজন এবং ক্রিয়া—endrocines. তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন যে কণ্ঠার (Adam's apple) কাছে দুটি লাল দাগের উপর মানুষের শরীরের উৎকর্ষ বহু পরিমাণে নির্ভর করে। এই দুইটি glands ঠিকভাবে না থাকিলে মানুষের মন এবং শরীর, কিছুই উপযুক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। বার্ণার্ড পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করেন যে যদি অক্রিয়মান ductless glands-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিকে ভেড়ার thyroid glands অর্থাৎ গলগ্রন্থির রস পান বা তাহার শরীরে এই জিনিষ অন্তর্নিক্ষেপ (inject) করা যায় তবে সেই অপরিপক্ক মানুষকে একটি পূর্ণ-স্বাস্থ্য সবল সুন্দর মানুষে পরিণত করা যায়। এই আবিষ্কারে পৃথিবীর এবং সমস্ত মানবের যে কত বড় উপকার হইয়াছে, তাহা বলা বলা যায় না।

এইবার ডারুউইনের নাম করিতে হয়। এই বৈজ্ঞানিকের কথা বলিলেই অনেকে হয়ত ক্রুদ্ধ হইবেন, কারণ ইনি আমাদের বহু-পূর্ব্বপুরুষদের বাঁদর বা হনুমান বলিয়াছিলেন। কিন্তু ডারুউইনের যথার্থ আবিষ্কার অনেকের কাছেই অবোধ্য বলিয়া লোকে তাঁহার নাম করিলেই চটিয়া যায়।

ডারুউইন জগতের ক্রমবিকাশ তথ্য (evolution) আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার বহু পূর্ব্বেই লোকে এ কথা জানিত। কিন্তু তিনি তাঁহার নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা মানুষকে ইহা প্রমাণ করিয়া দেখান। আমরা কোন লাল-পাতাওয়ালা গাছ দেখিলেই মনে করি ইহার জন্ম আর-একটি লাল-পাতা-ওয়ালা বৃক্ষ হইতে। কিন্তু ডারুউইন প্রমাণ করিলেন বহু যুগ পূর্ব্বে এই লাল-পাতাওয়ালা বৃক্ষের পাতা মোটেই লাল ছিল না—যুগের পর যুগ ধরিয়া নানা পরিবর্ত্তন হইতে হইতে ইহার পাতা এখন আমাদের চোখের সামনে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

ডারুউইনের মৌলিক আবিষ্কার এমন কিছু নাই; কিন্তু তিনি ধৈর্য্যশীল এবং পরিশ্রমী বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি যাহা পড়িতেন বা শুনিতেন তাহার বৈজ্ঞানিক সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। একখানি পুস্তক লিখিতে তাঁহার বিশ বৎসর সময় লাগে! ইহা হইতেই বুঝা যায়, তাঁহার ধৈর্য্যের পরিমাণ কিরূপ।

ডারুউইন কলেজ ত্যাগ করিয়াই "বিগল্" জাহাজে করিয়া দেশ ভ্রমণে নির্গত হন। এই সময় তিনি এই মহাসত্য আবিষ্কার করেন যে পৃথিবীতে কোন কিছুই জন্মলাভ করিয়া মরিয়া গিয়া নিঃশেষ হইয়া যায় না। জগতের সমস্ত প্রাণসমষ্টি একটি মাকড়সার জালের মতন। বিশেষ কোন জায়গায় আঘাত পড়িলে জালের সমস্ত অঙ্গেই তাহার স্পন্দন পৌছায়।

জাহাজে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার এক স্থানে প্রস্তরীভূত একপ্রকার বর্ম্মিল জন্তু (armadillos) দেখিতে পান। যেখানে ইহা দেখেন, তাহার কিছু দূরেই জীবন্ত অবস্থায় এই জন্তুকে দেখিতে পান। শরীরের নানাপ্রকার তারতম্য ঘটা সত্ত্বেও, বর্ত্তমানের এই বিশেষ জন্তু যে ঐ প্রস্তরীভূত জন্তুর বংশধর তাহা ডারুউইন প্রমাণ করেন। ডারুউইন কখনও কোন বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি যাহা বলিতেন তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করিতেন।

ডারুউইন দেখান যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করিয়া জন্তুদের শরীরের নানারকম অদলবদল করা যায়। ক্ষুদ্র জন্তুকে বড় করা যায় এবং বড় জন্তুকে ক্ষুদ্র করা যায়। বর্ত্তমানে এই নিয়মে নানাপ্রকার নূতন মুরগীর চাষ হইতেছে—কিন্তু যাহারা এই চাষ করিতেছে, তাহারা ডারুউইনের নাম জানে কি না সন্দেহ।

ডারুউইনের পূর্ব্বে মানুষের ধারণা ছিল যে মানুষ ক্রমশঃ অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। ডারুউইন পৃথিবীতে নূতন আলোক আনিলেন, তিনি বলিলেন "মানুষ ক্রমশঃ

উচ্চস্তরে উঠিতেছে। আদি মানুষ বর্ত্তমান মানব হইতে বহু অংশে নিকৃষ্ট ছিল এবং বহু যুগ পরের মানব বর্ত্তমান হইতে আরো বহু পরিমাণে উচ্চস্তরের হইবে।"

সর্ব্বশেষে পাস্তরের নাম করা হইল—কিন্তু পাস্তরের কার্য্য অন্য সকলের কাজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন বা নিকৃষ্ট নহে। পাস্তর বলিলেন জীবন-বিদ্যার সাহায্যে (biologically) সকলপ্রকার রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাইতে পারে। পাস্তর আবিষ্কার করিলেন যে জীবন্ত জীবাণু-সকল রোগের মূল—এবং এই জীবাণু মারিবার উপায় আছে। তিনি এই উপায়ও আবিষ্কার করেন। কলেরা, জলাতঙ্ক, ডিপ্‌থিরিয়া ইত্যাদি রোগের অমোঘ ঔষধ পাস্তর আবিষ্কার করেন।

রোগের কারণ-সন্ধান-প্রণালী (theory of disease) পাস্তর একবারে বদ্‌লাইয়া দিলেন। পাস্তর রোগ-জীবাণু বধের জন্য লসিকা দ্বারা (serum treatment) টীকা দেওয়া প্রথম আবিষ্কার করেন। যে-সমস্ত মহামারী ব্যাধিতে কোটি কোটি লোক মারা যাইত, পাস্তর তাহা নিবারণ করিয়াছেন। মানব-সমাজ পাস্তরের নিকট কতখানি কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় বলা যায় না।

দশজন শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকের নাম করা হইল। ইহাঁদের মধ্যে একজনও আমেরিকান নাই। তাহার কারণ আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার তেমন কিছু করেন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানকে মানবের ভৃত্য করিবার কাজে বেশী মন দিয়াছেন ও চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে অবশ্য মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ হইয়াছে, এবং এইজন্যই বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকাতে যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ছড়াছড়ি। দশ জনের মধ্যে চার জন ইংরেজ—ইহার কারণ ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেরা ধৈর্য্যের সঙ্গে এক মনে বহু বৎসর ধরিয়া কোন বিশেষ আবিষ্কারের পিছনে লাগিয়া থাকিতে পারেন।

জীবিত কোন বৈজ্ঞানিকের নামও করা হয় নাই, কারণ, তাঁহাদের সম্বন্ধে এখন কিছু বলা সমীচীন হইবে না। তাঁহাদের কার্য্য এখনো শেষ হয় নাই।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ঘণ্টা-তিনেকের আত্মবিনোদন

(চীন হইতে ফ্রান্সে যাইবার জাহাজপথে)

(পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে)

... রাত্রি ৯টা। কাফি গৃহের অভ্যন্তরে। সমস্ত খোলা। তবু ঘরের ভিতরে বিষম গরম। কতকগুলা টেবিল পাতা, টেবিলগুলা একটু সন্দেহজনক। মদ্যের ও ব্র্যাণ্ডির গন্ধ ছাড়িতেছে। একটা সাদা ঘর; রাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রস্তরমুদ্রাঙ্কিত রঙ্গীন ছবির দ্বারা ঘরের দেওয়াল বিভূষিত। দুটি ফর্সা রং বালিকা, দুইজন সুরা-পরিবেষণের পরিচারিকা, কতকগুলা রোদে-পোড়া সাহেবের চারিদিকে কতই হাবভাব দেখাইয়া ঘোরাফেরা করিতেছে। সাদা হাত-কাটা-জামা-পরা—সাহেবরা বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষায় কথা কহিতেছে।—ভয়ানক গরম, ভয়ানক গরম; চাঁদোয়া-ছাদে ঝুলানো, পিট্রোল-দীপগুলার চারিধারে মশক ও পতঙ্গবৃন্দ বোঁ-বোঁ শব্দ করিতেছে। একটি ইংরেজ বালক একটা যান্ত্রিক পিয়ানোর হাতল ঘুরাইয়া দিল আর অমনি তাহা হইতে "অপেরা"-নাটিকার একটা পরিচিত সুর বাহির হইয়া পড়িল। এই সময় বাহির হইতে একটা কোলাহল-শব্দ আসিয়া উহাকে অনেকটা বেসুরো করিয়া তুলিল।

একটা সোজা রাস্তার সম্মুখস্থ একটা বড় গোছের খোলা জায়গা হইতে, যান-বাহনের তরঙ্গহিল্লোল ও শতসহস্র লণ্ঠন সমেত, একটা জন-স্রোত ঠেলিয়া আসিতেছে।

মনে হয় যেন কোন গ্রীষ্ম-সায়াহ্নে পারীনগরের "বুল্‌ভারে'র (Boulevard) দৃশ্য।—দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—পুতুলের পরিচ্ছদ পরিয়া লোকগুলা চলিয়াছে, গাত্র হইতে আফিম ও মৃগনাভির গন্ধ বাহির হইতেছে; তার পর, পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত, গায়ের রং হল্‌দে, বেণী ঝুলিতেছে...যাহারা বাহ্যতঃ য়ুরোপের অভিনয় করে,—খুব নিকট হইতে তাহাদিগকে নোংরা চীনার ঝাঁক বলিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে। এই দ্রুতগামী অধিকাংশ গাড়ীতেই ঘোড়ার মতো ধাবমান মানুষকে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহারা গাড়ী টানিতেছে তাহারা চীনা, নগ্নকায়, বেণীটা খোঁপার মত মাথায় জড়ানো, ফানস্ আকারের টুপি-পরা; উহারা যাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহারাও চীনা; মাথার বেণী বাতাসে দুলিতেছে, হাত-পাখা হাতে লইয়া গট্ হইয়া বসিয়া আছে। দোকান—চীনা; রঙ্গীন লণ্ঠনগুলা—চীনা; কণ্ঠস্বর, কোলাহল, বাদ-বিসম্বাদ—চীনা।—সমস্তই পীতবর্ণ, ব্যস্তসমস্ত, অতিলোভী, বাঁদুরে-ধরণের ও অশ্লীল।—ঝটিকা-গর্ভ একটা ভিজে গরম; মানুষের গায়ে ঘামের গন্ধ, গাঁজিয়া-উঠা ফলের গন্ধ, মাটির উপর সাজানো বীভৎস খাদ্যদ্রব্য; পুড়াইবার ধূপ ও পুরীষের স্তূপ;

আর সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে মৃগনাভির গন্ধ—উহা বড়ই তীব্র, স্নায়ুপীড়ক বমন-উদ্দীপক ও অসহ্য ..

এই নগরই—শিঙ্গাপুর। এই জনতার মধ্যে চলিয়াছে দেবতার মত সুন্দর কতিপয় ভারতবাসী, কতকগুলা মালাবারী, কতকগুলা মালাই, কতিপয় পার্সি, শিরস্ত্রাণ মাথায় কতিপয় ইংরেজ, সকল জাতীয় নাবিকবৃন্দ, এবং জাপানের আমদানী কতকগুলি রঙ্গিনী রমণী; কিন্তু এই চীনারূপ পিঁপড়ার ঢিবির মধ্যে উহারা যেন ডুবিয়া গিয়াছে—হারাইয়া গিয়াছে।

মধ্যকার বড় রাস্তার ধারে ধারে, বাষ্পভারাক্রান্ত চিরন্তন আকাশের নীচে, সকল রকম মন্দির উত্থিত হইয়াছে; রহস্যময় মূর্ত্তি বিশিষ্ট হিন্দুমন্দির; ভীষণ-দৈত্যদানবসমন্বিত চীনামন্দির, মুসলমান মসজিদ; প্রটেষ্টাণ্ট ও রোম্যান-সম্প্রদায়ের খৃষ্টগির্জ্জা...সমস্তই পাশাপাশি ভ্রাতৃভাবে অবস্থিত—এই চিত্তক্ষুব্ধকর ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিবার ভার ইংরেজ পাহারাওয়ালাদের উপর...

রাত্রি দশটা।—একটা কাফির আড্ডায় সঙ্গীত হইতেছে। গৃহটা কাঠের; কিন্তু উহার গঠনাদি গুরুভার ও প্রকাণ্ড পরিমাণের এবং গ্রীক-দেবমন্দিরকে উপহাস করিয়া যেন উহার স্তম্ভশ্রেণী নিরলঙ্কার কঠোরতার সহিত নির্ম্মিত হইয়াছে। হঙ্গেরীয় নারী-বাদকের একটা দল ষ্টাউস্ রচিত একটা নাচের সুর খুব কোলাহলসহকারে বাজাইতেছে, তাহার পর এক Bardlai রমণী সঙ্গীতমঞ্চের উপর উঠিয়া "বেড়ার" গান গাহিল। পক্ষী-বিক্রেতা কতিপয় ভারতীয় দোকানদার ময়না লইয়া, আশ্চর্য্যরকমের টিয়া লইয়া, হীরামন লইয়া বিয়ার-পায়ীদিগের টেবিলগুলার ভিতর দিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছে। হীরামন-গুলা বহুবর্ণ, মনে হয় যেন রং দিয়া চিত্রিত। ৪০০ হাত দূরে, কোলাহলহীন শান্ত একটা চতুষ্কোণ পরিসর-ভূমি; মিসি-বাবারা একখণ্ড শ্যামল শাদ্বল-ভূমির উপর পায়চালি করিতেছে। ঐ ভূমির ঘাস ইংরেজ ধরণে একেবারে মুড়িয়া ছাঁটা। উহার মধ্যস্থলে স্প্যানিস ধাঁচায় কালো-চূড়াওয়ালা একটা বড় গির্জ্জা।—কিন্তু বাতাসটা গুরুভারাক্রান্ত—এবং জোনাকি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে

রাত্রি ১১ টা। গাড়ী ও জনতার দুই-কদম দূরে, হিন্দুমন্দিরের অঙ্গনটা একেবারে খালি ও নিস্তব্ধ। জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে—সেই বিষুব-রেখা-প্রদেশসুলভ জ্যোৎস্না—যেন সোনালি রংএর দিনমান। এই অপূর্ব্ব আভাবিশিষ্ট আলোকের জমির উপর, মন্দিরটা স্বকীয় সারিবদ্ধ চূড়াগুলার ছবি আঁকিয়াছে। মন্দিরের নীলাভ বিশাল ছায়ার দরুণ মন্দিরকে যেন যাদুমন্ত্রবদ্ধ একটা লঘুবর্ণের জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে—যেন এখনই অন্তর্হিত হইবে। যেন উহা একটা অতি-প্রাকৃতিক রসে সর্ব্বতোভাবে পরিসিক্ত এবং উহার চতুর্দ্দিকে একটা ধর্ম্মজনিত শান্তি বিরাজ করিতেছে। বাহিরে যে জঘন্য চীন-জগৎ অবস্থিত, মনে হয় যেন সেখান হইতে আমরা বহুদূরে রহিয়াছি। দেবালয়ের উন্মুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে, কতকগুলা ঝুলানো দীপ জ্বলিতেছে। খুব পিছনে বড় বড় মাথাওয়ালা কতকগুলা দুষ্টবুদ্ধি দেবতাও দেখা যাইতেছে—তাহাদের চারিদিকে কতকগুলা অজানা বিগ্রহ; উহাদের সম্মুখে বৃন্তহীন কতকগুলা ফুল ছড়ানো রহিয়াছে—মল্লিকা ও গন্ধরাজের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত।

৩।৪ জন ভারতবাসী নবীন যুবক ঐখানে পাহারা দিতেছে; খাটো ধুতি-পরা; বালিকার মতো চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; মুখের ভাবটা বুনো ধরণের, চোখের সাদাটা দেখিতে কতকটা মিনার মত। উহাদের মুখ সুশ্রী এবং উহাদের গণ্ডদেশ শ্মশ্রুহীন; কিন্তু উহাদের গোলাকার বক্ষের উপর, ঘৃণাজনক কালো রোঁয়া গজাইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বশুদ্ধ ধরিতে গেলে, উহারা যেমন বিস্ময়-উদ্দীপক তেমনি বীভৎস; মনে হয় যেন উহারা নারী, বানর ও হরিণ হইতে প্রসূত।

দেবতাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে, উহারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত খুব খোলাখুলিভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, হাসিতেছে।

উহাদের মধ্যে একজন, কতকগুলা জুঁইফুলের মালা হাতে লইয়া গোলাপী জ্যোৎস্নার আলোকে, অঙ্গন পার হইয়া একটা অতিক্ষুদ্র নির্জন দেবালয়ের নিকট আসিল। এই মন্দিরের পুতুলটা খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হইল। এই দেবতার ৬টা বাহু, মাথায় একটা উচ্চ মুকুট; কাচের বড় বড় চোখ, মুখের ভাবটা অ-শিব ও ভীষণ, অঙ্গভঙ্গী জীবজন্তুর ন্যায়, বাঁকানো, দোমড়ানো, যন্ত্রণাব্যঞ্জক; দেবতা একাই আছেন—সঙ্গীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দীপ,—উহার সম্মুখেই জ্বলিতেছে।

কোন পশুর সম্মুখে যেরূপ তাহার খাদ্য আনীত হয়, সেইরূপ দেবতার দিকে একবারও না তাকাইয়া, সেই জুঁইফুলের থালাটি ঐ নবীনযুবক দেবতার পদতলে রাখিয়া দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। শিঙ্গাপুরের শেষ বাড়ীগুলা ও শেষ আলোকচ্ছটা আবড়ো-খাবড়ো একটা মাটির পিছনে অন্তর্হিত হইল;—একটা খোলা ময়দান—উদ্ভিজ্জে পূর্ণ। নগরের দ্বারদেশ হইতেই হরিৎশ্যামল সতেজ দুর্গম জটিল জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে—"মালাই" প্রায়দ্বীপের প্রায় সমস্ত স্থানই এই জঙ্গলে আচ্ছন্ন।

কি চমৎকার রাত্রি—কি সুন্দর। আমাদেরই মতন ওক গাছ, পপলার গাছ, ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছ—কিন্তু সবই যেন পরিবর্দ্ধিত আকারে; এবং সমস্তই বড় বড় সুরভি ফুলে আচ্ছাদিত।

আর,—পাতাবাহারেরই বা কি বাহার, তালজাতীয় বৃক্ষেরই বা কি শোভা!—এই জাতীয় গাছগুলা সকলপ্রকার আকার ধারণ করিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে, ধাতব পত্র পল্লবের মত ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; প্রথমে, বিশাল পত্রসমন্বিত নারিকেল, তারপর সুপারী-গাছ—খুব উচ্চ, জলাভূমির খাগ্‌ড়ার মত সূক্ষ্ম ও সোজা, পল্‌কা বৃন্তের অগ্রভাগে কুঞ্চিত পালকের গুচ্ছ। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক—"পর্য্যটকের তরু"। উহার বড় বড় পাতা; পেক পাখীরা যে-রূপ প্যাখম মেলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় সেইরূপ প্যাখমের ন্যায় উহার পাতাগুলা বেশ সুসমভাবে নিজবৃন্তের চারিদিকে যেন প্যাখম ছড়াইয়া আছে—মনে হয় যেন চীনের প্রকাণ্ড পর্দ্দাগুলা বনের মধ্যে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এই সমস্ত শ্যামল উদ্ভিজ্জের রং এতটা সবুজ যে, এই দ্বিপ্রহর রাত্রিতেও এই গোলাপী রংএর জ্যোৎস্নালোকে, আরও যেন বেশী সবুজ বলিয়া মনে হইতেছে।

রাস্তাটা খুব নির্জন। কিন্তু এ কি!—পল্লব-মণ্ডপের প্রান্ত হইতে, গাড়ীর লণ্ঠন দেখা যাইতেছে—দীর্ঘ-সারি বাঁধিয়া গাড়ী আসিতেছে—কিন্তু ঘোড়ার সাড়াশব্দ নাই।

আমাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। গাড়ীগুলা খুবই ছোট; প্রত্যেক গাড়ীর আরোহী সাদা পোষাক-পরা একজন ইংরেজ নাবিক;—নগ্নকায় এক চীনা গাড়ীতে যোতা,—ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইতেছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই নাবিকেরা একটা বাজির খেলা খেলিতেছে। যে প্রথমে পৌঁছিবে, সেই বাজির টাকা পাইবে। এই নাবিকেরা বেশ কায়দাদুরস্ত ও গম্ভীর; মুখের কথায় বাহবা দিয়া, হাত তালি দিয়া ধাবকদিগকে উহারা উত্তেজিত করিতেছে।

উহারা চলিয়া গেল—অন্তর্হিত হইল। আবার এই দ্বিপ্রহর রাত্রি-সুলভ রহস্যময়ী নিস্তব্ধতা আসিয়া উপস্থিত হইল। একটা মৃদু আলোকচ্ছটা তরুমণ্ডপের ভিতর দিয়া যেন ছাঁকিয়া আসিতেছে;

তরুমণ্ডপের তলায়, সবুজ কাদা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কিন্তু সময়ে-সময়ে, উজ্জ্বল চাঁদের কিরণ পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়া উপর হইতে নামিতেছে,—তাহাতে করিয়া লতাবাহারগুলা অথবা বড় বড় সুন্দর তাল-জাতীয় বৃক্ষগুলা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই গাছগুলা পরী উদ্যানের গাছের মত নিশ্চল।

ওঃ! এই নীরবতা, এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা, এই ঝিঁঝি পোকার লঘু সঙ্গীত, এই মাটির গন্ধ, গাছগাছড়ার সুগন্ধ, ফুলের সৌরভ—কি চমৎকার!

কিন্তু সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে সেই তীব্র মৃগনাভির গন্ধ—এমন কি এই বনভূমির মধ্যেও। এই মালাই-দেশে সবই মৃগনাভি-গন্ধী; এমন কি মূসিকের মত একপ্রকার নৈশ জীব—পাখীর মত হর্ষোৎফুল্ল মৃদুস্বরে—"কুইক্"! "কুইক্"! "কুইক্"! করিতে করিতে যাহারা রাস্তার উপর দিয়া প্রতি মিনিট খুব দ্রুত চলিয়া যায়—তাহারাও তাহাদের পিছনে তাহাদের মৃগনাভিসিক্ত গায়ের গন্ধ রাখিয়া যাইতেছে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাতন কলিকাতার ফৌজদারী বিচার

এ দেশে কোম্পানীর রাজ্য সংস্থাপিত হইবার কিয়ৎকাল পরে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের ব্যবস্থা অনুসারে সুপ্রীম কোর্টে ইংলণ্ডের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হইত। সুপ্রীম কোর্ট কিরূপ নিরপক্ষভাবে বিচার করিতেন তাহা মহারাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমার বিবরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজা নন্দকুমার বাঙ্গলা দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, বৈভবে অতুলনীয়, পদগৌরবে অদ্বিতীয় ছিলেন। কার্য্যদক্ষতায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তৎকালে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে এই মহারাজা নন্দকুমার ওয়ারেন হেষ্টিংসের চক্রান্তে, বলাকি দাসের নাম জাল করিয়া কৃত্রিম তমসুক প্রস্তুত করার অপরাধে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারবিভ্রাটে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত বিচার যে তৎকালে শুদ্ধ সুপ্রীম কোর্টেই হইত তাহা নহে। কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলির বিচার করিতেন। এইসমস্ত মোকদ্দমার বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিচারকগণ কোন আইনের বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইতেন না। কোন একটি কার্য্য দণ্ডার্হ কি না এবং দণ্ডার্হ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিরূপ শাস্তি পাওয়া উচিত, এইসমস্ত বিষয়ের অবধারণার ভার তাঁহাদিগের উপরে ন্যস্ত থাকিত। পদ্ধতিটি কতকটা কাজির বিচারের অনুরূপ ছিল; কিন্তু কাজির আদালতে বিশেষ অবিচার হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কারণ, কাজি ভারতবাসী; তিনি দেশের অবস্থা এবং ভারতবাসীর রীতিনীতি সমস্তই জানিতেন। কিন্তু কোম্পানীর ফৌজদারী আদালতে বিচারক থাকিতেন ইংরেজ কর্ম্মচারী, অভিযোগকারিগণ অধিকাংশ স্থলেই ইংরেজ, ফিরিঙ্গি অথবা পর্টুগীজ এবং তাঁহারা যেসকল ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিতেন, তাহারা সকলেই ইতর শ্রেণীর ভারতবাসী। এরূপ স্থলে সুবিচারের প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু সুবিচারই হউক আর অবিচারই হউক সে স্বতন্ত্র কথা। মোকদ্দমাগুলির বিবরণ পাঠ করিলে তদানীন্তন কলিকাতার ইউরোপীয় সমাজের অনেকটা আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণের নিমিত্ত কয়েকটি অভিযোগের নিষ্পত্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল:— *

১। "জন রিংওয়েল তাঁহার পাচক রজনীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী ফরিয়াদীর জনৈক ভৃত্যকে প্রহার করতঃ কার্য্যত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল। আসামী পূর্ব্বে একবার অপরাধ করায় তাহার একটি কর্ণ ছেদন করিয়া শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায়, আদেশ হইল তাহাকে দশ বেত মারিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২। এণ্ডার্সনের পিসি নাম্নী ক্রীতদাসী তাঁহার বাটী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল। চৌকিদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। আদেশ হইল, আসামীকে দশ বেত মারিয়া তাহার মনিবের নিকটে প্রেরণ করা হয়।

৩। মুনিয়া নামক একটি বালককে কলিকাতার অষ্টম বিভাগের পাইকগণ গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে। আসামী দস্যুতা অপরাধে কাছারী আদালতে অনেকবার শাস্তি পাইয়াছে। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাহাকে বিশ বেত মারিয়া তাহার প্রতি এইরূপ আদেশ হইয়াছিল, সে যেন হাওড়া পার হইয়া কলিকাতায় না আসে। সে এইক্ষণে সে আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে। আদেশ হইল তাহাকে পনর বেত মারিয়া হাওড়ার পারে প্রেরণ করা হয়।

৪। কাপ্তেন স্কট্ বেণীবাবুর নিকট একখানি শকট মেরামত করিতে দিয়াছিল। আসামী শকটখানি মেরামত করে নাই। আদেশ হইল আসামীকে দশ জুতা।

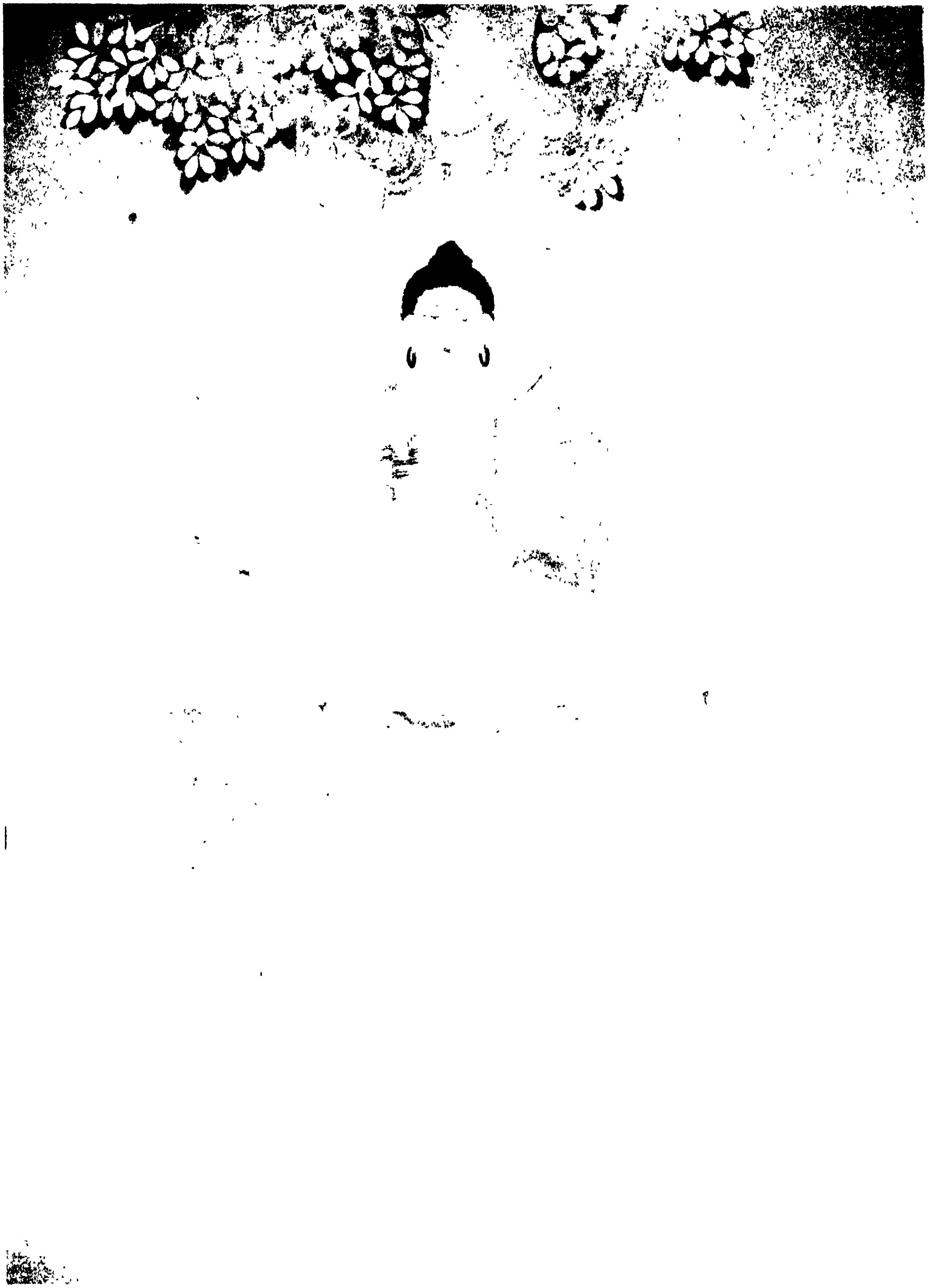
৫। কর্ণেল ওয়াট্সন রামসিংহের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী প্রতারক। সে জাতিতে নাপিত। কিন্তু সূত্রধর বলিয়া পরিচয় দিয়া ফরিয়াদীর বেতন গ্রহণ করিয়াছে। আদেশ হইল, তাহাকে পনর বেত মারা হয়। তৎপরে তাহাকে কুলীবাজারের মধ্য দিয়া কর্ণেল ওয়াট্সনের বাটী পর্য্যন্ত সে নাপিত এই কথা ঢোল সহরতের দ্বারা প্রচার করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হয়।

৬। জেকব জোসেপ তাহার পাচক তিথুনের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী তাঁহার একটি কাঁসার ঘটী আর কয়েকটি জিনিস চুরি করিয়াছে। আদেশ হইল, চোরাই মাল ফেরত না দেওয়া পর্য্যন্ত আসামীকে হরিণবাটীর জেলে আবদ্ধ রাখা হয়।

৭। রামহরি যাজ্ঞিক রামগোপালের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে আসামী একটি বালকের গলা হইতে তুলসীর মালা ছিনাইয়া লইয়াছে। আদেশ হইল দশ বেত।

৮। কর্টিব নামক পোর্টুগালবাসী তাহার বালক ভৃত্য জ্যাকের নামে একখানি রূপার চামচ চুরি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। আসামী প্রথমতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিল যে চামচখানি সে একজন দোকানদারকে দিয়াছে। দোকানদারের উপর সমন জারি হইলে সে উপস্থিত হইয়া বলিল যে সে কিছুই জানে না। তখন

* Echoes from Old Calcutta, by H. E. Busteed.



বুদ্ধদেব

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী কর্ত্তৃক অঙ্কিত

U Ray & Sons, Calcutta

আসামী অপর ব্যক্তির নাম করিয়া বলে যে চামচখানি তাহার নিকটে আছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে সেখানেও নাই। আসামী ছোটখাট একটি বদমাইস। আদেশ হইল, পাঁচ বেত।

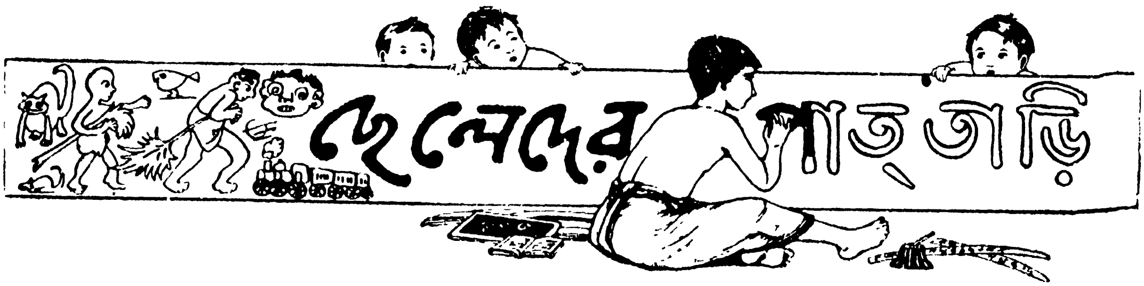
৯। ৫ই অক্টোবর তারিখে শ্যামা গোয়ালাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। অদ্য সে খালাস হইল, তাহার উপর এইরূপ আদেশ হইল যে পুনর্ব্বার যদি কেহ তাহাকে চোর বলিয়া ধরে, তাহা হইলে তাহার ফাঁসি হইবে। •

১০। বাকের মহম্মদ রামধোমির নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে আসামীর স্ত্রী ফরিয়াদীর স্ত্রী'কে গালাগালি দিয়াছে। আদেশ হইল, ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের প্রত্যেকের পাঁচ টাকা জরিমানা হয়।

১১। ফরিয়াদী ক্যাপ্টওয়েন, তাঁহার মেথরানীর নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে আসামী তাঁহার কতকগুলি পিতল চুরি করিয়া বক্তারাম নামক দোকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছে। আসামী অনেক দিন যাবৎ এইরূপ চুরি করিতেছে। এরূপ কুদৃষ্টান্তে অন্যান্য চাকরবর্গ অসচ্চরিত্র হইতে পারে। আদেশ হইল বক্তারামকে ২০ বেত ও মেথরানীকে দশ বেত মারা হউক। শাস্তি হইয়া গেলে, আসামীদ্বয়ের অপরাধ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচারের নিমিত্ত তাহাদিগকে একখানি গো-শকটে চড়াইয়া ঢোল সহরত করিতে করিতে কলিকাতার সহরের ভিতরে লইয়া বেড়ান হয়।"

কর্ণচ্ছেদন, পাদুকা-প্রহার, স্ত্রীলোকের প্রতি বেত্রাঘাত ইত্যাদি-প্রকার দণ্ডপ্রদানের ব্যবস্থা ইউরোপীয় মস্তিষ্কপ্রসূত অথবা মুসলমান গবর্ণমেণ্টের অনুকরণে কোম্পানীর আদালতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন; কারণ তৎকালে পৃথিবীর সমস্ত দেশেই অপরাধীগণের প্রতি বর্ব্বরতা প্রদর্শিত হইত। ১৭৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত ফরাসীদেশের দণ্ডবিধি আইনে অঙ্গচ্ছেদনের ব্যবস্থা ছিল। ইংলণ্ড্ দেশেরও বিচারে বর্ব্বরতা যথেষ্ট ছিল। কোন স্ত্রীলোক স্বামীঘাতিনী হইলে অথবা কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিলে তাহাকে জীয়ন্ত দগ্ধ করা হইত। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়প্রকার অপরাধীরই বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত। তদ্ভিন্ন কতকগুলি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে অপরাধীগণকে পিলারিযন্ত্রের দ্বারা শারীরিক যন্ত্রণা দেওয়া হইত। পিলারি প্রথাটি কোম্পানীর রাজ্যেও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; পরিশেষে ইংলণ্ডে রহিত হইয়া গেলে এদেশেও রহিত হইয়া গিয়াছিল। উল্লিখিত মোকদ্দমা কয়েকটির বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রবাসী ইউরোপীয়গণের ক্ষুদ্র, বৃহৎ সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা মাজিষ্ট্রেট্ স্বীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। এণ্ডার্সনের ক্রীতদাসী তাঁহার বাটী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছিল। এণ্ডার্সন তাহা জানিতেন না সুতরাং দাসীর নামে আদালতে অভিযোগও করেন নাই। চৌকিদার দাসীকে এণ্ডার্সনের বাটী হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাকে ধরিয়া এণ্ডার্সনের নিকটে লইয়া গেল না, মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিল। মাজিষ্ট্রেট্ এণ্ডার্সনের নামে শমন জারি করিলেন না, অথবা দাসী সম্বন্ধে কোন কথাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন না। তিনি চৌকিদারের সমুখে পলায়নের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসামীর প্রতি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে এণ্ডার্সনের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। এরূপ ঘটনা যদি বর্ত্তমান সময়ে ঘটিত তাহা হইলে পাঠকগণ মাজিষ্ট্রেটকে এণ্ডার্সনের বেতনভোগী কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু সে সময়ে কলিকাতাবাসী ইউরোপীয়গণ সকলেই আপনাদিগকে এক পরিবারভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তৃতীয় মোকদ্দমাটির বিবরণ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত কখন কখন আসামীর প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া তাহাকে হাওড়ার পারে পাঠাইয়া দিতেন। সে সময়ে হাওড়ার পুল ছিল না, ষ্টীমারও ছিল না, সেইজন্য মাজিষ্ট্রেট মনে করিতেন অসচ্চরিত্র ব্যক্তিকে নদীর অপর পারে পাঠাইলে সে পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়া উপদ্রব করিতে পারিবে না। কিন্তু কখন কখন আদালতের এইরূপ আদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইত; কারণ, মুনিয়া নামক বালকটি হাওড়ায় প্রেরিত হইয়াও পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিয়াছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছে সর্ব্বসাধারণের নিকট এই কথা প্রচারের নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট যে উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহা চিন্তা করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। রামসিংহ জাতিতে নাপিত, সে সূত্রধর বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কর্ণেল ওয়াট্সনের বেতন গ্রহণ করিয়াছিল। আদালত তাহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, পাছে অন্য কোন ব্যক্তি মনে করে রামসিংহ নাপিত নহে সূত্রধর, সেই জন্য ঢোল সহরতের দ্বারা তাহার জাতির পরিচয় দিতে দিতে তাহাকে মুর্গীগঞ্জ পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়া হইল। মেথরানী পিতল চুরি করিয়া বক্তারাম দোকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, উভয়েরই বেত্রদণ্ড হইল। তৎপরে উভয়কে গো-শকটে চড়াইয়া কলিকাতা সহরের প্রত্যেক স্থানে লইয়া যাওয়া হইল এবং ঢোল বাজাইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করা হইল যে ইহারা পিতল চুরি করিয়া শাস্তি পাইয়াছে। এরূপভাবে অপরাধ-প্রচারের আবশ্যকতা আমরা এইক্ষণে উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু সে সময়ে কলিকাতা একটি অতি ক্ষুদ্র সহর ছিল, লোকসংখ্যাও বেশী ছিল না সেই জন্য সম্ভবতঃ কর্ত্তৃপক্ষগণ মনে করিতেন অপরাধীগণকে শাস্তি দিয়া যদি প্রত্যেক গৃহস্থকে সতর্ক করিয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে শাস্তি দেওয়ার ফল কি? ১০ নং মোকদ্দমা নিষ্পত্তিটি অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি সেরূপ মনে করি না। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বচসা হইলে উভয়েরই স্বামী দণ্ডনীয় ইহাতে কি সন্দেহ আছে? এরূপ ব্যবস্থায় পাঠকগণ অবশ্য অসন্তুষ্ট হইবেন কিন্তু পাঠিকাগণের আপত্তি হইতে পারে না।

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ



শোধ-বোধ

পোষ মাসের শীতের রাতে একটি শীর্ণ, কদাকার কুকুরছানা সসরাম সহরের পথে অতি কাতর ক্রন্দনে পথিকদের জানাচ্ছিল যে সে অতি অসহায়। শীতে তার নড়্‌বার শক্তি ছিল না। পথ দিয়ে অনেকেই গেল, কিন্তু কেউ তার দিকে দৃক্‌পাতও কর্‌লে না। ঝঙ্গনে একটা একা সেই পথে যাচ্ছিল। পথের উপর এমন অনধিকারে বসে' থাকার জন্যে ছোক্‌রা একাওয়ালা কুকুরছানাটিকে এক চাবুক বসিয়ে দিলে। আঘাত করা যার অভ্যাস হ'য়ে গেছে তার লঘু গুরু জ্ঞান বড় থাকে না। কুকুর-ছানাটি আঘাতের বেদনায় যখন বুকফাটা আর্ত্তনাদ করে' উঠ্‌ল তখন সেই পথের পথিক ছোট একটি বালকের বুকে তার কান্নার আঘাতটা গিয়ে বড় করুণভাবেই লাগ্‌ল। বালক তখন শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ শেষ করে' বাসায় ফির্‌ছিল। এমন অত্যাচারটা কোমল-প্রাণ বালকের কাছে বড়ই খারাপ ঠেক্‌ল, কুকুরছানাটিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে সে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে। ছানাটি দরদীর হাতের কোমল স্পর্শ পেয়ে শান্ত হ'ল। কিন্তু সে শীতে বড়ই কাঁপ্‌ছিল। বালক নিজের বই-বাঁধা ন্যাক্‌ড়াটা খুলে' কুকুরের গায়ে ভাল করে' জড়িয়ে দিয়ে তাকে পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সাম্‌নের একটা বাড়ীর দালানে একটি কোণে বসিয়ে রেখে দিলে। পরে কুকুরছানাটি যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়্‌ল তখন বালক নিজের বাসায় ফিরে' গেল। কিন্তু কুকুরছানাটি বোধ হয় এমন যত্ন কারও কাছে পায়নি। তাই সে বালকটির সঙ্গ ছাড়্‌লে না। বালক যখন আপন মনে পথ চলেছিল তখন কুকুরছানাটি তারই পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। যে শীতে এতক্ষণ পথ থেকে নড়তে পার্‌ছিল না, সে এখন দয়া ও স্নেহের উত্তাপে বল পেয়ে বালকের পিছনে পিছনে তার বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে কিছু কষ্ট অনুভব কর্‌লে না। বালক বাড়ী ঢুক্‌তে গিয়ে এই অনাহুত অতিথি কুকুরছানাটিকে দেখ্‌তে পেলে। বালকের কোমল প্রাণে দয়াটা শীঘ্রই আসে। সে আহারাদির পর নিজের আহার্য্যের কিছু ভাগ কুকুরছানাটিকে এনে দিলে—আর একটা ছেঁড়া চট এনে তাকে ঢাকা দিয়ে দালানের এক কোণে রাতের মত তাকে আশ্রয় দিলে। একটা কদাকার কুকুরছানাকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া বাড়ীর কারও মঞ্জুর হ'ল না। পরদিন সকালেই কুকুর-ছানাটি বাড়ী থেকে বিতাড়িত হ'ল। কিন্তু সে বাড়ীর সুমুখ ছাড়্‌লে না। বালকটি লুকিয়ে তাকে নিজের আহা-রের কিছু কিছু ভাগ দিত।

পাঁচ মাস পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে বালকটি তার বাপ-মার সঙ্গে দেশে গেল. কুকুরটি কিন্তু সেই দোর আগ্‌লে পড়ে' রইল। ছুটির পর যখন আবার সকলে ফিরে এল তখন বাড়ী ঢুক্‌তেই প্রথম দৃশ্য যা দেখা গেল তা বড়ই ভীষণ ও আশ্চর্য্যজনক। উঠানের মাঝখানে একটা ভীষণকায় রক্তাক্ত মানুষ মরে' পড়ে' আছে—তার পাশেই কুকুরটিও মৃতপ্রায়—উঠ্‌বার বা নড়্‌বার শক্তি নেই।

তখনই পুলিশে সংবাদ দেওয়া হ'ল—পুলিশ-তদন্তে জানা গেল যে, মৃত লোকটি এক জেল-ফেরৎ চোর। কুকুরটির জন্যে একটি সোনার "মেডেল" তৈয়ারি হ'য়ে এল। কিন্তু তখন সে ঋণ শোধ দিয়ে পরপারে যাত্রা করেছে।

আচার্য্য শ্রীশ্যাম ভট্ট

—

কালিদাস

(মালাবারে প্রচলিত গল্প)

এক ছিল রাখাল, সে নিজের গরু নিয়ে রোজ মাঠে চরাতে যেত। মাঠের মাঝখানে—যেখানে দিগন্ত খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যেত, সেখানে একটা গাছের তলায় তার আড্ডা বস্‌ত। সেটা ছিল এক প্রকাণ্ড বটগাছ। বোধ হয় যেন কোন্ আদ্যিকালের বটগাছ—সে তার ডালপালা নিয়ে সেখানে নিজের বয়সের আর গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিচ্ছিল। তারই তলাতে গরুগুলো চর্‌ত, আর রাখাল তারই ছায়াতে দিব্যি আরাম করে' বসে' নিজের প্রিয় বাঁশীটি বাজাত। সে নিজের মনে বাঁশী বাজিয়ে যেত, কেউ শুন্‌ছে কি না তা ফিরেও দেখ্‌ত না। কত পথভোলা পথিক তার বাঁশী শুনে থম্‌কে দাঁড়াত, আর তার বাঁশীর কত প্রশংসা কর্‌ত, তাকে কত বাহবা দিত। রাখাল কিন্তু আপন মনে কেবল বাজিয়েই যেত, তাদের বাহবা নিতে ফিরেও চাইত না।

একদিন হ'ল কি—সে-দিন ছিল শ্রাবণের বাদ্‌লা দিন—রাখাল তার বাঁশী নিয়ে গাছতলায় বাঁশী বাজাচ্ছে, আর গরুগুলো কচি ঘাস খুঁজে খুঁজে খাচ্ছে, এমন সময়ে মুষলধারায় বৃষ্টি এল—তার সঙ্গে আবার শিলাবৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল; গরুগুলো ত ভয়ে ভয়ে বটগাছের কাছে ঘেঁসে এল, রাখালও গাছতলায় জড়সড় হ'য়ে বস্‌ল; কিন্তু বৃষ্টি আরও বাড়্‌তে লাগ্‌ল, তার সঙ্গে শিলাও খুব বড় বড় করে' পড়্‌তে লাগ্‌ল; তখন রাখাল প্রাণভয়ে সেখান থেকে দিলে এক ছুট; কিন্তু যাবে কোথায়? হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল যে কাছে ত একটা দেবমন্দির রয়েছে—সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিলে ত হয়; অম্‌নি সে ছুটে' সেই মন্দিরে আশ্রয় নিতে গেল; তার বরাত ছিল ভাল, তাই দরজাটা ছিল খোলা—সে ত তাড়াতাড়ি মন্দিরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে' দিলে; এখন হয়েছে কি—সেই মন্দিরটা হচ্ছে কালীর মন্দির—সেই সময়টা কালী কি কাজে যেন বাইরে গিয়েছিলেন; তিনি ফিরে এসে দেখেন—ওমা, মন্দিরের দরজা যে বন্ধ! তিনি ত পড়্‌লেন ভারি মুস্কিলে! দরজায় ঠেলা দেন—ভিতর থেকে বন্ধ।

দরজায় ধাকার শব্দ শুনে' সেই রাখাল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"কে?"

সেই দেবী উত্তর কর্‌লেন—"আমি কালী। তুমি কে?"

রাখাল ত ভেবে পেলে না কি উত্তর দেবে, সে বলে ফেল্‌লে—"আমি দাস।"

দেবী তখন বল্‌লেন—"আচ্ছা, তবে দরজা খোল, আমি তোমাকে বড়লোক করে' দেব।"

বড়লোক হবার লোভ রাখালের যথেষ্ট ছিল, তাই সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে' দিলে।

দেবী তখন তাকে বল্‌লেন—"ওই যে ওখানে বেল-পাতা পড়ে' রয়েছে, ওটা খাও। তা হ'লে আমার আশীর্ব্বাদে তুমি জগতে একজন বড় পণ্ডিত হ'তে পার্‌বে। আর তুমি নিজেকে দাস বলে' পরিচয় দিয়েছ বলে' তুমি জগতে 'কালিদাস' নামে খ্যাত হবে।"

সেই থেকে সেই রাখাল জগতে 'কালিদাস' বলে' পরিচিত হ'ল, আর কালে পৃথিবীর একজন বড় কবি বলে' বিখ্যাত হ'ল।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু

—

পাখীর কাজ

কত বিভিন্ন-রকমের পাখী দেখিতে পাই, তাহাদের দ্বারা আমরা অনেক উপকার পাইয়া থাকি। অনেকে হয়ত মনে করেন যে কেবল পাখী আমাদের কত সুন্দর সুরে গান শুনায় ও তাহাদের মনোহর নৃত্যাদির দ্বারা আমাদের আনন্দ দান করিয়া থাকে। কিন্তু পাখীর প্রধান কাজ অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ হইতে আমাদের শস্যাদি রক্ষা করা। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে যে কোন ক্ষেতে পঙ্গপাল, ফড়িং প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ফসল নষ্ট করিতেছে, এমন সময়ে কোন পাখী তাহার সন্ধান পাইল; এবং অচিরে অনেকগুলি পাখী আসিয়া জুটিল; দুই একদিনের মধ্যেই ক্ষেতের কীট-পতঙ্গ নাশ করিল। এইরূপে পাখীর জন্য অনেক ফসল রক্ষা পায়।

যে-সকল পাখী এই কাজ করে তাহাদের নাম বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের পরিচিত কাক বক চড়াই হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামা দোয়েল কিম্বা বুল্‌বুল্‌ প্রভৃতি সকল পাখীই অল্পবিস্তর কীটভোজী। আবার পাখীরা একরকম খাদ্যে পরিতুষ্ট থাকে না, যখন যে খাদ্য প্রচুর পায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে; শরৎকালে যখন দেওয়ালী-পোকা প্রচুর জন্মে, তখন অনেক পাখী তাহাই খাইয়া থাকে, পরে তাহারা আবার শস্য পাকিলে তাহাই খায়।

আমাদের চড়ুই প্রায় সর্ব্বভুক্‌। সহরে তাহাদের অত্যাচারের কথা সকলেই জানেন। এবার মাটীর টবে ফুলের বীজ রোপণ করিয়া একটিও গাছ তৈয়ারি করিতে পারিলাম না, কত উপায় স্থির করিয়া চড়ুইয়ের অত্যাচার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলাম, সবই বিফল হইল। ছোট ছোট চারা জন্মিলেই তাহারা খাইয়া ফেলিবে, কিছুতেই নিস্তার নাই। আবার ইহারাই গাছের পোকা-মাকড় নির্ম্মূল করিতে সিদ্ধহস্ত। কানাডা দেশে একবার ফসলে একরূপ পোকা লাগিল, কিছুতেই তাহাদের উচ্ছেদ করা যায় না। দেখিয়া শেষে এই চড়ুই সেখানে লইয়া যাওয়া হইল এবং এইরূপে ফসল রক্ষা হইল। সেদিন হইতে চড়ুই কানাডা দেশে স্থায়ী অধিবাসী হইল।

সকলেই জানেন যে ম্যালেরিয়া জ্বর মশা দ্বারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং মশা বদ্ধ জলে, যেমন ডোবা খাল প্রভৃতিতে, ডিম পাড়ে। যদি তথায় কয়েকটা হাঁস রাখা যায়, তবে আর মশা বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না, কারণ মশার ছানা হাঁসের প্রিয় খাদ্য।

ক্ষেতে নূতন লাঙ্গল দেওয়া হইলেই দেখা যায় যে, কতকগুলি বক তথায় চরিতেছে ও মৃত্তিকার কীট-গুলিকে খাইতেছে। আবার পাখীরা যে কেবল কীট-পতঙ্গ খায় তাহা নহে, ইন্দুর আদি ছোট ছোট জন্তুও খাইয়া থাকে।

পেচককে লক্ষ্মীর বাহন বলে, কারণ গোলাবাড়ীতে, যেখানে ধান থাকে, তথায় ইন্দুরে বড় উৎপাত করে। পেচক ইন্দুরের শত্রু। ইন্দুর মারিয়া পেচক গৃহস্থের লক্ষ্মীলাভের, অর্থাৎ অপচয়-নিবারণের সুবিধা করিয়া দেয়।

পাখীদের আর-একটি কাজ বড় বিস্ময়কর। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, যদি কোন স্থানে একটি পুষ্করিণী দীঘি নির্ম্মাণ করা যায় ও যদি তাহাতে বাহির হইতে জল না আসিতে দেওয়া যায় ও মাছ না ছাড়া যায় তবুও সেই পুষ্করিণীতে কিছু দিনের মধ্যেই মৎস্য আপনাআপনি জন্মে দেখা যায়। এ মৎস্য কোথা হইতে আসিল? পক্ষীরাই ইহার জন্য দায়ী। দেখা গিয়াছে যে নদীচর পাখীগুলির পায়ে যে পাঁক লাগিয়া থাকে তাহার সহিত মাছের ডিমও অনেক থাকে। পুষ্করিণী থাকিলেই পাখী আসিবে, ও তাহাদের পায়ে মাছের ডিমও আসিয়া তথায় মৎস্য-বংশ বিস্তার করে। এইরূপেই হয়ত ১৮০০০ ফুট উচ্চ মানস-সরোবরেও মৎস্যের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। জলজীবী মৎস্য এইরূপে পাখীর পা ধরিয়া হিমালয় লঙ্ঘন করিয়াছে!

শ্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

মুকুরে *

বড়লোক জমিদারের মেয়ে নেলি দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী। বড়লোকের মেয়ে, দিব্য প্রজাপতিটির মত, সেজেগুজে' দিনরাত অবাধগতিতে খেলে' বেড়াত। তার পর যৌবন যতই তার সারা শরীরখানি লাবণ্যের প্রভার অপূর্ব্ব শ্রীতে ভরিয়ে তুল্‌ছিল,—একটা ভাবনা তার মনে ততই তোলাপাড়া কর্‌ছিল,—সেটা তার বিয়ের ভাবনা। দিনরাত সে ভাব্‌ছে, যেন তার বিয়ে হয়েছে,—কেমন সুন্দর তার স্বামী—তাকে কত ভালবাসে সে—অনেক টাকাকড়ি তার—দুজনে খুব সুখে আছে—কেউ কাকেও চোখের আড়াল করতে পারে না,—একদণ্ডের তফাৎ হ'লে প্রাণ অমনি যায়-যায় হ'য়ে ওঠে। সে কত ভালবাসা—কত সুখ—কত আনন্দ; তার পর যেন তার একটি খোকা হয়েছে, ফুটন্ত গোলাপের মত; তার স্বর্গীয় হাসিতে সারা ঘরখানি আলোকিত হ'য়ে উঠেছে, তখন তার স্বামীর দিকে চেয়ে গোলাপেরই পাপ্‌ড়ীর মত পেলব খোকার সেই ঠোঁট দুখানিতে চুমো দিচ্ছে; আর সেই চুমোর সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটে লেগে গেছে তার খোকার ঠোঁটের খানিকটা হাসি, আর চোখে ফুটে বেরিয়েছে স্বর্গীয় আনন্দের এক অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস,—সে কত সুখ, কত আনন্দ। এইরকম ভেবে ভেবে সে তার ভবিষ্যৎখানি নিজের মনোমত করে

* রুষ লেখক আন্তন শেকভের Looking Glass নামক গল্প অবলম্বনে লিখিত।

বেশ রঙীন করে' আঁকছিল। আর সে ছুটোছুটি নেই, খেলাধূলো নেই—কেবল নিজের ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আঁকছে, আর মাঝে মাঝে একেবারে তন্ময় হ'য়ে যাচ্ছে।

সেদিন নববর্ষের সন্ধ্যায় সে আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে পোষাক পরছে আর তার ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের কথা ভাবছে—ভাবতে ভাবতে একেবারে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছে- বাহ্যজগতের কোন অনুভূতিই তার নেই। নিস্পন্দ হ'য়ে সে সেই আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে আছে—ভারাক্রান্ত চোখদুটি তার অর্দ্ধনিমীলিত—ঠোঁট দুখানি ঈষৎ বিচ্ছিন্ন; দেখলে বুঝতে পারা যায় না, সে ঘুমুচ্ছে কি জেগে আছে—কিন্তু সত্যই সে তখন তার ভবিষ্যতের সঙ্গে মিশে' গিয়ে আর্শিতে তারই ছবি দেখছে।

প্রথমে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে দুটি সুন্দর কমনীয় চক্ষু—মনহরণকারী তার দৃষ্টি; তার পর ধনুকের মত দুটি ভ্রূ, তার পর সমস্ত মুখটি; তার পর সমস্ত দেহখানি,—হাঁ, হাঁ, সে চিনতে পেরেছে—এই ত তার প্রিয়তম—তার স্বামী, যার সঙ্গে ভবিতব্য তাকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। সে এসে নেলির সঙ্গে কত কথা কইলে—কত হাসলে—কত ভালবাসলে তাকে। তার সঙ্গে নেলির বিয়ে হ'য়ে গেছে—কত সুখে তারা দুজনে একসঙ্গে বাস করছে—অভাব-অসুবিধার নাম তারা কখনও শোনেনি। নেলি মনপ্রাণ সব তার স্বামীকে অর্পণ করেছে। দুজনেই দুজনকে খুব ভালবাসে; কেউ কারো অদর্শন সহ্য করতে পারে না। ওঃ—সে কত সুখ—কত আনন্দ! নেলি যেন একেবারে তার স্বামীর সঙ্গে মিশে গেছে।

শীতকালের রাত্রি; সহরের রাস্তায় লোক-চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে—চারিদিক্ নিস্তব্ধ। সেই রাত্রে নেলি ডাক্তার লুকিসের দরজায় টোকা দিচ্ছে—চাকরটা বেরিয়ে আসতেই নেলি জিজ্ঞাসা করলে—ডাক্তার বাড়ী আছেন? চাকরটা চুপিচুপি বললে—ডাক্তার সারাদিন রোগী দেখে' এসে এই মাত্র শুয়েছেন, তিনি জাগাতে বারণ করে' দিয়েছেন—তাঁকে আর ডাকা হবে না।

"ডাকা হবে না?" বলে'ই নেলি ঢুকে পড়ল বাড়ীর ভিতর। তার পর অন্ধকারে এ-ঘর সে-ঘর করে' দুখানা চেয়ার উল্টে' ফেলে', দেয়ালে দুবার মাথা ঠুকে' শেষে ডাক্তারের শোবার ঘরে এসে হাজির; ডাক্তার তখন বিছানায় শুয়ে হাত দিয়ে নিজের নিশ্বাসের উষ্ণতা পরীক্ষা করছিলেন। ঘরে একটা আলো মিট্‌মিট্ করে' জ্বলছিল।

নেলি কিছু না বলে'ই মেঝেয় বসে' কাঁদতে আরম্ভ করে' দিলে। খুব খানিকটা কাঁদবার পর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাক্তারকে বললে—"আমার স্বামীর বড় অসুখ।" ডাক্তার তখন আস্তে আস্তে উঠে' হাতের উপর মাথাটা রেখে নেলির দিকে চাইতেই নেলি আবার বললে,—তখন ফোঁপানিটা অনেকটা কমে' এসেছে,—"আমার স্বামীর বড় অসুখ, দয়া করে' উঠুন শীগগির;—উঠুন।"

ডাক্তার মুখখানা বিকৃত করে' বিরক্তভাবে বললেন—"আঃ।"

"আসুন—আসুন। এক্ষুণি—এখুণি, তা না হ'লে—ওঃ। ভাবতে পারা যায় না—আপনার পায়ে পড়ি আসুন।" ক্লান্ত, বিবর্ণ নেলি তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ডাক্তারকে তার স্বামীর অসুখের কথা বলতে লাগল। আহা! তার আশা ভরসা, সুখসম্পদ্, তার বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ; এক কথায় তার যথাসর্ব্বস্ব—তার স্বামীর অসুখের কথা বলতেও তার বুকটা যেন ফেটে যাচ্ছে। তার সে করুণ কাতরোক্তিতে পাথরও নড়ে' ওঠে,—ডাক্তার কিন্তু নিশ্চল। খানিক পরে নেলির দিকে চেয়ে হাতের উপর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে', ডাক্তার বললেন.—"কাল যাব কাল।"

"অসম্ভব। তার যে টাইফাস হয়েছে,—এক্ষুণি, এই মুহূর্ত্তেই আপনাকে দরকার হ'য়ে পড়েছে, উঠুন দয়া করে'।"

"আমি এইমাত্র আসছি। আজ তিনদিন ধরে' টাইফাস রোগী দেখে' বেড়াচ্ছি—একটুও বিশ্রাম করতে পাইনি। আমি আজ নিজেই অসুস্থ হ'য়ে পড়েছি। আজ আর আমি পারব না,—কিছুতেই নয়। আমার নিজেরই টাইফাস হয়েছে।" তার পর থারমমিটার দিয়ে নিজের উত্তাপ পরীক্ষা করে' সেটা নেলির চোখের সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"এই দেখ, আমার নিজেরই টেম্পারেচার প্রায় ১০৩ ডিগ্রি। অতি কষ্টে আমি বসে' আছি,—মাফ করো, আমাকে শুতে হবে।"

ডাক্তার শুয়ে পড়লেন।

হতাশ হ'য়ে নেলি তখন ডাক্তারের পায়ে ধরে' বললে—"আপনার পায়ে পড়ি—দোহাই আপনার, একটিবার আসুন। একটু কষ্ট করুন, আপনাকে আমি পুষিয়ে দেব, টাকার জন্য আপনি ভাববেন না।"

"আঃ! কেন বিরক্ত কর? বলে'ই ত দিয়েছি, যেতে পারব না।"

নেলি তখন উঠে' দাঁড়িয়েছে। তার চোখ দুটো জলে ভরে' এসেছে—তার প্রাণের মধ্যে যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে তা কি এই ডাক্তার বুঝবে—কত ভালবাসে সে তার স্বামীকে। তার যন্ত্রণার এক অংশও যদি ডাক্তারকে বুঝান যেত, তা হ'লে ডাক্তার তার নিজের অসুখ ভুলে' গিয়ে এতক্ষণ তার স্বামীকে দেখতে ছুটত। কিন্তু কি করে' বুঝাবে সে,—সেরকম ভাষা ত সে জানে না।

শেষে লুকিস বললে—"সরকারী ডাক্তারের কাছে যাও।"

"একেবারে অসম্ভব। সে ত এখান থেকে আরও ২০ মাইল। সে সময় আর নেই; এই রাত্তিরে ঘোড়াও অতদূর যাবে না। সে হ'তেই পারে না। উঠুন, উঠুন—আপনাকে আসতেই হবে। আমাকে দেখে আপনার একটুও দয়া হচ্ছে না?"

"কি করব। আমার জ্বর; মাথা অবধি আমার ঘুরছে,—এ অবস্থায় রোগী দেখা যায় না, একথা তুমি বুঝবে না। যাও, আমায় একলা থাকতে দাও।"

"আপনি আসতে বাধ্য। যাব না, একথা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। লোকে পরের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে নিজের জীবন অবধি দিয়ে দেয়, আর আপনি পয়সা নিয়ে রোগী দেখতে যেতে চাইছেন না। কি স্বার্থপর লোক। আপনাকে আমি আদালতে হাজির করাব কিন্তু।"

ডাক্তার আবার পাশ ফিরে শুলেন। নেলি ভাবলে, এ কথাগুলো বলা তার ভাল হয়নি। এ যে ডাক্তারকে অপমান করা হ'ল। কিন্তু কি করবে সে—তার যে স্বামীর অসুখ। সংযমের কথা, ভদ্রতার কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছে। নেলি তখন ডাক্তারের পায়ের উপর মাথা রেখে রাস্তার ভিখারীর মত মিনতি করতে লাগল। অবশেষে ডাক্তার কাশতে কাশতে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে' বললেন—"আমার কোটটা?"

নেলি দেওয়াল থেকে জামাটা এনে ডাক্তারকে পরিয়ে দিয়ে বললে—"আসুন, এইবার। আপনাকে আমি পুষিয়ে দেব, আর সারা জীবন আপনার এ দয়া আমরা মনে রাখব।"

এ কি। জামা পরে'ই সে ডাক্তার আবার শুয়ে পড়লেন! নেলি ডাক্তারের চাকরকে ডেকে এনে, দুজনে ধরে' আস্তে আস্তে ডাক্তারকে তার গাড়ীতে তুলে' দিলে।

শীতের হাওয়া হু হু করে' বইছে,—রাস্তায় বরফ জমে' গেছে। গাড়োয়ানকে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে, রাস্তাটা ঠিক করে'

হবে। ঘোড়াগুলো একটু আস্তে চল্‌লেই নেলি অমনি গাড়োয়ানকে মিনতি করে' বলে—"চালাও ভাই, চালাও।" ভোরবেলা নেলি ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ী পৌঁছুল। ডাক্তারকে বাইরের ঘরে একখানা কেদারায় বসিয়ে নেলি বল্‌লে—"আপনি এক মিনিট বসুন, আমি এখনি আস্‌ছি।"

নেলি ফিরে এসে দেখে ডাক্তার সোফায় শুয়ে পড়েছেন।

"ডাক্তার, ডাক্তার!"

"আঃ। তোমনাকে বল—"

"কি বল্‌ছেন?"

"মিটিংএ সকলেই তখন বল্‌লে—ব্রাসত বলেছিল—। কে হে—? কি দর্‌কার—?"

"এ কি! ডাক্তার যে প্রলাপ বক্‌ছে। হা ভগবান্—এ কি হ'ল?"

নেলির স্বামী যখন সেরে উঠেছে, তখন তাদের অনেক দেনা। জমিদারী বাঁধা পড়েছে—ব্যাঙ্কের দেনার সুদ অবধি দিতে পার্‌ছে না। অভাবের ভাবনায় তারা স্বামী-স্ত্রীতে রাত্রে ঘুমুতে পারে না।—তার পর ছেলে মেয়ে হয়েছে ৫।৬টি। তাদের আবার আজ কারো জ্বর, কাল কারো সর্দ্দি, পরশু কারো ডিপ্‌থিরিয়া; তার পর একটি ছেলের মৃত্যু হ'ল—এই রকম নানা দুশ্চিন্তায় নেলির ক্রমশঃ বুকের অসুখ দেখা দিলে। কিন্তু স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তখনও এ-সব সহ্য কর্‌ছে। আহা তারা দুজনে স্বামীস্ত্রীতে যদি একসঙ্গে মর্‌তে পারে।

দেশে মড়ক এল। নেলি সর্ব্বদা সাবধান ও সশঙ্ক হ'য়ে রয়েছে—কিন্তু কাল মড়ক তার স্বামীকে ছাড়্‌লে না। নেলি স্বামীর পাশে বসে' এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে! তার পর কফিন ও কবরে নিয়ে যাবার অন্যান্য সরঞ্জাম সব ঘরের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে দেখে' উন্মনাভাবে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চীৎকার করে' উঠ্‌ল,—এ কি? এসব কেন?

নেলির বোধ হ'ল, তার সমস্ত বিবাহিত জীবনটাই গেল কেবল এই ঘটনাটারই একটা সুদীর্ঘ জড়ভূমিকা মাত্র।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দে নেলি চম্‌কে লাফিয়ে উঠ্‌ল,—হাতের আর্শিখানা তার ফস্‌কে তখন মেজেয় পড়ে' গেছে। সাম্‌নের আর্শিখানার দিকে চেয়ে দেখে তার সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ, গণ্ডে অশ্রুর রেখা।

একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে' নেলি তখন ভাব্‌লে—এ কি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম না কি।

শ্রী গোবিন্দপদ বিশ্বাস

ভোরের বাতাস

ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া শোফার চলিয়া গেলে শৈলজা শ্রীকান্তকে একান্তে ডাকিয়া বলিল—"শ্রীকান্ত, একটা কাজ কর্‌বি ভাই?"

"কি কাজ সেজদি?—আচ্ছা টিকিটটা কবে নিই ত আগে।"

"একটা দিনের জন্য গিরিডি হ'য়ে যাবি?"

"গিরিডি! কি দর্‌কার সেজদি?" দ্রুতগমনোদ্যত চরণযুগলকে সংযত করিয়া বিস্মিত শ্রীকান্ত ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"মেজদির সঙ্গে আর-একবার দেখা হবে। আর—"

"এর মধ্যে আর কি আবার! এই ত একমাস আগে মেজদির সঙ্গে দেখা হ'ল।"

"কিরণ-বাবু কাল গিরিডি পৌঁছেছেন। মেজদির বাসাতেই বোধ হয় উঠ্‌বেন।"

এই কথা কয়টা বলিতে শৈলজা যে লজ্জা ও দুঃখ অনুভব করিতেছিল শৈলজার ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়াই শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। বলিল—"জিতেন-বাবরা যদি রাগ করেন সেজদি। বুঝিয়ে বলতে গেলে হয়ত বিপরীত হ'তে পারে। তার পর, বাবা কি বল্‌বেন?"

"বাবা যে চিঠি লিখেছেন তাতে তাঁরা জানেন আমরা দুদিন পরে রওনা হব। তাঁদের টেলিগ্রাম না কর্‌লে ত তাঁরা জান্‌তে পার্‌বেন না। টেলিগ্রাফ্ তুই করিস্‌নে। তবে বাবা শুন্‌লে রাগ কর্‌বেন। কিন্তু যদি এখন যাওয়া না হয় তা হলে আর কিরণ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর আর বাঁচ্‌বার আশা নেই।"

"বাঁচ্‌বার আশা নেই? বল কি সেজদি!" স্তম্ভিত-প্রায় হইয়া শ্রীকান্ত কহিল।

শৈলজা ধরা গলায় বলিল—"বাঁচ্‌বেন না। নিশ্চয়ই।"

শৈলজার আর্ত্তস্বরে আহত হইয়া শ্রীকান্ত বলিল—"আচ্ছা চল সেজদি, গিরিডি হ'য়েই যাব।"

"কিন্তু বাবার বিরাগ বা রাগ সহ্য কর্‌তে হবে। তখন আমার উপর রাগ কর্‌বে না ত?"

"না সেজদি। তুমি কি আমাকে তেম্‌নিই ভাব! চল, আর দেরী করা হবে না।"

বলিয়া দ্রুত পদক্ষেপে শ্রীকান্ত টিকিট-ঘরের দিকে

অগ্রসর হইল। শ্রীকান্ত যে তাহার জন্য কতখানি ঝক্কি মাথায় করিয়া লইল তাহা ভাবিতে ভাবিতে শৈলজা ভ্রাতাকে অনুসরণ করিল।

গাড়ীতে বসিয়া শৈলজা জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাকার টিকিট করলে, শ্রীকান্ত?"

গিরিডি যাওয়াটা যে এত সহজে হইবে এ কথা বুঝি শৈলজার তখনও বিশ্বাস হইতেছিল না।

শ্রীকান্ত যেন ভরসা দিয়া কহিল—"গিরিডির।"

লিলুয়া ছাড়িয়া গেলে শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল—"সেজদি, তুমি কি করে' কিরণ-বাবুর অসুখের খবর পেলে? তিনি কি চিঠি লিখেছিলেন?"

"বাবাকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন। বাবা মাকে পড়ে' শোনাচ্ছিলেন, আমি পাশের ঘরে ছিলাম, তাই শুন্‌তে পেয়েছিলাম।"

"কি লিখেছিলেন কিরণ-বাবু?"

'লিখেছিলেন—ডাক্তার বলেছেন, জীবনের আশা নেই। গিরিডিতে কিছুদিন থেকে একবার দেখ্‌বেন। মেজদির বাসায় উঠ্‌বেন; তার পর সুবিধামত অন্য বাসায় যাবেন। যদি মন ভাল থাকে এবং শরীর কিছুদিন টিকে তা হলে ওখানেই থাক্‌বেন। ভাল না লাগ্‌লে ওখান থেকে পুরী যাবেন। যাবার পথে কল্‌কাতা হ'য়ে যাবেন।"

"বাবা বুঝি এই পত্র পেয়ে তোমায় শীগ্‌গির পাঠিয়ে দিলেন?"

অনেকখানি লজ্জা পাইয়াই শৈলজা বলিল—"তাই হবে।"

বলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। শরতের মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ। পশ্চিম দিক্ তখন অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম কিরণে রঞ্জিত হইয়া ছিল। তাহার রঙীন আভা শৈলজার ম্লান মুখের উপর পড়িয়াছিল। সে ভাবিতেছিল ও কল্পনাচক্ষে দেখিতেছিল গিরিডির একটি সুন্দর সুসজ্জিত ভবনে একজন তাহার সমস্ত গৌরব সমস্ত ক্ষমতা দিয়া জীবনের চিতা রচনা করিতেছে। সেই ত সেদিন তাহার জীবনের সূর্য্য পূর্ব্ব গগনে প্রতিভাত হইতেছিল। ইহারি মধ্যে তাহার পশ্চিম গগনে যাইবার সময় হইয়া আসিল?

ধীরে ধীরে অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল। আলোকিত গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরের অন্ধকার বড়ই গাঢ় দেখাইতেছিল। রক্তিম মেঘের কোন চিহ্ন তখন আকাশে কোথাও ছিল না।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলজা ভাবিল—হঠাৎ এমনি করিয়া কি—তাঁহার জীবনের সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছে?

কথাটা মনে হইতেই শৈলজা শিহরিয়া উঠিল।

২)

সকালে চা-পান-রত স্বামীর সঙ্গে বিরজা গৃহস্থালীর কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, এমন সময় বাহিরে চলন্ত ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ তাহাদের গেটের সম্মুখে আসিয়া থামিল বলিয়া মনে হইল।

বিরজা কান পাতিয়া বলিল—"হ্যাঁ গা, গাড়ীখানা এখানেই থাম্‌ল না?"

স্বামী ইহা অনুমোদন করিতে না করিতে বিরজা মেয়েকে বলিল—"দেখ্ তো রাণী, কে এল।"

রাণী বলিয়া মেয়েটি ঘরের ভিতরের দিক্‌কার বারান্দায় একখণ্ড পাথরের উপর ইট ঘষিয়া ঘষিয়া খেলা-ঘরের রান্নার মস্‌লা পিষিতেছিল। মায়ের কথা শুনিয়া মস্‌লা পেষা অসমাপ্ত রাখিয়া ছুটিয়া বাহিরের দিকে আসিল। একটু পরেই রাণীর মিষ্ট তীক্ষ্ণ গলা শুনা গেল—"ও মা, সেজ মাসিমা এসেছেন, ছোট মামা এসেছেন,—ও মা!"

"সত্যি নাকি! দেখি"—বলিয়া গৃহস্থালীর প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বিরজা তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে আসিলেন।

"তুমি যে রাণীর মা তা তোমার হাঁট্‌নি দেখে' স্পষ্ট বোঝা গেল"—বলিয়া বিরজার স্বামী অমরনাথ মৃদু হাসিয়া চায়ের বাটিতে একটা বড় গোছের চুমুক দিয়া জানালার দিকে সরিয়া আসিলেন।

একটু পরেই রাণী ও বিরজার পশ্চাতে শ্রীকান্ত ও শৈলজা আসিয়া অমরনাথকে প্রণাম করিল।

অমরনাথ প্রফুল্ল মুখে শৈলজার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"অত্যন্ত অতিরিক্তভাবে স্বামী-সোহাগিনী হও; হাতের লোহা এবং সোনা অক্ষয় হোক্।"

তার পর শ্রীকান্তের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন —"তুমি যুবক শীঘ্র ষোড়শী স্ত্রীর মুখ-নাড়া সহ্য করিতে ক্ষম কর।"

আশীর্ব্বাদের বেগ ও আতিশয্যে তিন ভাইবোনেই ...য়া ফেলিল। বিরজা ভাইবোনকে সাদরে বসাইয়া ...ীর পানে চাহিয়া বলিল—"সাদা কথাও এমন ভঙ্গী ...রে' বল যে মনে হবে কি একটা কাণ্ড করে' বস্‌লে।"

অমরনাথ হাসিয়া বলিলেন—"কথাটা কিন্তু তোমার ...ইয়ের অপ্রিয় হয়নি। হয় না হয় তাঁকেই জিজ্ঞাসা ...র। রামায়ণের একটা উপমা দিলেই ব্যাপারটা খুব ...জ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে। অন্ধমুনি দশরথকে শাপ দিয়েছিলেন, পুত্রশোকে তোমার মৃত্যু হবে। তাতেই তিনি আনন্দে অধীর হয়েছিলেন; যেহেতু পুত্রশোক পেতে হ'লে পুত্রলাভ অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে ষোড়শীর মুখনাড়া সহ্য কর্‌তে হ'লেই তাঁর পাণিপীড়নটা আগেই কর্‌তে হবে। কি বল শ্রীকান্ত?"

বিরজা হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা, তুমি এখন ঠাট্টা থামাও। এদের সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কই।"

"আচ্ছা, আমার তা হ'লে এখন পেন্‌সন্‌ হ'ল। পাষণ্ড শ্রীকান্ত, তোমার জন্য আমার আজ এই দুরবস্থা!"—বলিয়া কৃত্রিম কোপের সহিত অমরনাথ শ্রীকান্তের পানে ...হিলেন। সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল।

শ্রীকান্ত প্রাতঃকৃত্য সারিয়া অমরনাথের কাছে বসিয়া ...পানে প্রবৃত্ত হইল। শৈলজাকে সঙ্গে লইয়া বিরজা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। রাজায় রাজায় দেখা হয় ...বোনে বোনে দেখা হয় না। বিবাহিতা ভগ্নীদের ...হোদরাদের পরস্পর দেখা-শুনা অল্পই ঘটিয়া থাকে, তাই এই প্রবাদের জন্ম।

বিরজা অপ্রত্যাশিত ভাবে শৈলজার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল—"শৈল, হঠাৎ যে? তুই যে আবার পাটনা যাবার পথে আমার সঙ্গে দেখা করে' যাবি তা ভাবিনি।"

শৈলজা নিরুত্তর রহিল।

শৈলজার কাঁধে স্নেহভরা হাত রাখিয়া তাহার কৃশ ক্লিষ্ট অতিসুন্দর মুখের পানে চাহিয়া বিরজা বলিল—"শৈল ভাই, এত রোগা হ'য়ে গেছিস্ কেন! আবার বুঝি—"

বলিয়াই শৈলজার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া অনুশোচনায় শুদ্ধ হইয়া গেল।

"না মেজদি, ভালোই ত আছি"—কথা কয়টি শৈলজার মুখ দিয়া এমন সুরে বাহির হইল যেন এই থাকাটাই তাহার জীবনের ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিরজা দেখিল শৈলজার চক্ষু যেন কাহাকে খুঁজিতেছে। কি একটা কথা যেন সে বলি-বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছে না।

বিরজা জিদ্ করিয়া শৈলজাকে স্নানাদি শেষ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। স্নান করিয়া শৈলজা কিছু সুস্থ হইল। তাহাকে নিজ হাতে কিছু খাওয়াইয়া দুই বোনে শয্যার উপর পাশাপাশি বসিল। শৈলর একখানি হাত সস্নেহে আপনার হাতের মধ্যে রাখিয়া বলিল—"শৈল, ভাই, সত্যি করে বল্, কিরণের কোন চিঠি পেয়েছিলি তুই?"

শৈলজার বুকের শব্দ তখন এত জোরে হইতেছিল যে তাহার ভয় হইতেছিল বুঝি বা বিরজা এখনি শুনিতে পাইবে। মুখ নীচু করিয়া শৈল উত্তর দিল—"না, মেজদি।"

"তবে তুই কি ক'রে জান্‌লি কিরণের এখানে আস্‌বার কথা ছিল। চমকাস্‌নে ভাই। আসা পর্য্যন্ত তোর চোখ যে সেই একই কথা বলে' দিচ্ছে। আমার কাছে লজ্জা কেন ভাই!"

শৈল আর আপনাকে গোপন করিতে না পারিয়া কহিল—"বাবাকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাই থেকে আমি জান্‌তে পেরেছিলাম। হয়ত তিনি আর বেশীদিন বাঁচ্‌বেন না—তাই মনে করে' এখান দিয়ে হ'য়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া আর অদৃষ্টে নেই।"

বলিয়া শৈলজা বিরজার প্রসারিত বাহুর উপর ললাট রাখিয়া মুখ লুকাইল।

বিরজা সস্নেহে শৈলজার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল আর অনুভব করিতে লাগিল শৈলজার চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া অশ্রু তাহারই বাহু সিক্ত করিতেছে। শৈলজার

জন্য তাহার দুঃখ হইলেও সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া এই বিলম্বের জন্য কি কৈফিয়ৎ দিবে তাহা ভাবিয়া বিরজার মনে উদ্বেগের সীমা ছিল না।

শৈলজা একটু শান্ত হইলে বিরজা বলিল—"কিরণের কালই এখানে আস্‌বার কথা ছিল। কালই তার পত্র পেয়েছি, হঠাৎ অসুখটা বেড়ে যাওয়ায় ডাক্তারের কথা-মত কিছুদিনের জন্য আসা বন্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু শৈল, তুই আবার কেন এসব কথা ভাব্‌ছিস্ বোন? তোর চেয়ে ধৈর্য্য যে আমাদের কারও ছিল না।"

শৈলজা আপনার অশ্রুপ্লাবিত মুখ বিরজার পানে উঠাইয়া বলিল—"মেজদি, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কোরো না। আমি দিন রাত কাজ নিয়ে থাকি যাতে করে' কোন ভাবনা আমার মনে না আসে। কিন্তু মেজদি, আমার মত সামান্য একটা মেয়েমানুষের জন্য অত বড় একটা প্রাণ নষ্ট হ'তে বসেছে তা যে ভোলা যায় না!"

শৈলজার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল বালিশে মুখ লুকাইয়া শৈলজা শুইয়া পড়িল। বিরজা তাহার মাথাটিতে হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তখন অপরাহ্ণ। সম্মুখের পথ দিয়া সুসজ্জিত নর-নারী ভ্রমণে চলিয়াছে। তাহাদের হাস্য-পরিহাস, গল্প, উচ্চস্বরে কথাবার্ত্তা সব সেই ঘর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বিরজা কহিল "শৈলজা, বেড়াতে বেরুবি?"

শৈলজা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সে যাইবে না।

"চ লক্ষ্মীটি, একটুখানি বেড়িয়ে আস্‌বি। আগে এত ভালবাস্‌তিস্ বেড়াতে!"

বিশেষ করিয়া অনুরোধ করাতে শৈলজাকে সম্মত হইতে হইল।

বিরজা কহিল—"তুই একটু গা গড়িয়ে নে। আমি ততক্ষণ রাতের রান্নার একটা ব্যবস্থা করে' দিয়ে আসি। মিনিট কুড়ি পরেই কিন্তু আমি এসে ডাক্‌ব।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া

*অমরনাথ বা

বিরজা হঠাৎ

থানিকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শৈলজা স্তব্ধ হইয়া রহিল। এই যে সকলকে লুকাইয়া গিরিডি আসার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল আর রহিল কেবল ইহার একটা গঞ্জনা লোকনিন্দার সম্ভাবনা—শৈলজা শুইয়া শুইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিল পাশে একখানি বই। হাতে লইয়া পড়িল—রত্নদীপ।

প্রভাত-বাবুর উপন্যাসের মধ্যে এইখানিই শৈলজা সবচেয়ে ভাল লাগিত। প্রকৃত প্রেম যে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করিয়া তুলিতে পারে, স্বার্থপরকে স্বার্থ বলি দিতে শিখায় এই সত্যটুকু পুষ্পের সৌরভের মত তাহাকে বিমল আনন্দ দিয়াছিল। বইখানি খুলিতেই একখানি খামের চিঠি বাহির হইল। খামখানি তাহার মেজ-দিদির নামে। অনেক দিন পরে ও দুর্ব্বল হাতের বিকৃত লেখা হইলেও শৈলজা চিনিতে পারিল ইহা কিরণ-বাবুর হস্তাক্ষর। তাহার মেজ-দিদি যে চিঠির কথা বলিয়াছিল এ সেই চিঠি।

ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, শৈলজা চিঠি না খুলিয়া পারিল না। কম্পিত-হস্তে খামের ভিতর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া শৈলজা পড়িল:—

বিশ্বনাথ

কাশীধাম

১২ আশ্বিন ১৩—

মেজদিদি,

আপনাদের পত্র পাইয়াছি। আপনারা যে আমাকে সাগ্রহে আহ্বান করিবেন তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু এত ঠিক করিয়াও যাওয়া ঘটিল না। কাল যখন বাসা হইতে বাহির হইবার কথা তাহার ঘণ্টা খানেক আগে হঠাৎ মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত উঠিল। ডাক্তার বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। বাহির হওয়া হইল না।

এখনও রাণীমার দেওয়া বাসাতেই আছি। ছেলেটিকে এখন আর পড়াইতে পারি না। হয়ত আর পড়ানো উচিত নহে বুঝিয়া রাণীমা ছয় মাসের পূরা বেতনে ছুটি দিয়াছেন। গঙ্গার ধারের বাসাটিও আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ছুটির দুই মাস এখানেই কাটিয়া গি

কিরণ

াশা আছে আর বাকি চার মাসের মধ্যে সংসারের দনা-পাওনা সব মিটাইতে পারিব।

সকাল, সন্ধ্যা, ও দুপুর গঙ্গার দিকের জানালার ধারে থানার উপর কখন শুইয়া কখন বসিয়া থাকি। দেখিয়া দেখিয়া গঙ্গার কখন কি মূর্ত্তি হইবে, আকাশের রং ন কিভাবে বদলাইবে, বাতাসে কখন কি কথা ফুটিয়া বে সব যেন কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। কেহ পুরী বা ও টেয়ার, কেহ বা সিমলা বা দার্জ্জিলিং যাইতে তেছেন। কিন্তু সে-সবে আর উৎসাহ নাই। কাজনই বা কি?

এক রাতে মোটেই ঘুম আসিল না। শেষ রাতে উঠিয়া বসিয়া জীবনের বিগত ঘটনা স্মরণ করিতেছিলাম। গিরিডির কথা সবপ্রথম মনে আসিল। আপনি ত জানেন গিরিডিতেই আমার সত্যকার জীবনের আরম্ভ ইয়াছিল। সেইখানেই আপনাদের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। যেখানে জীবন একদিন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজ আবার যদি সেইখানে গিয়াই জীবনটাকে শেষ করিতে পাই তো ার চেয়ে বেশী সৌভাগ্য এখন আর কি হইতে পারে?

এই শীর্ণ দেহ ও শক্তিহীন মন লইয়া মনে হয় প্রকৃত নন্দ ও সৌভাগ্য লাভের দিন আর সেই বিগত স্মরণীয় নের চিন্তা এই দুইয়ের মধ্যে বড় বেশী প্রভেদ নাই। নক্তির তৌলে চড়াইলে হয়ত শেষেরটাই ভারি হইয়া ড়ে। তাই গিরিডি যাইবার ইচ্ছাটাই প্রবল হইয়া ঠিল।

একটি সংবাদ শুনিয়া আমার স্বল্পাবশিষ্ট দিন কয়টার ও শান্তি হারাইয়াছি। আপনাকে লেখার জন্য ক্ষমা রিবেন। আর যদি এসম্বন্ধে কিছু জানেন আমাকে জানাইবেন।

শুনিলাম শৈলজা সুখী হয় নাই। তাহাকে নাকি ঘৃণাও সহিতে হয়। এক সময়ে অন্য একজনের সহিত াহার বিবাহের কথা হইয়াছিল ইহা লইয়া সেখানে আলোচনার অন্ত নাই। আমার এক আগেকার ছাত্র শৈলজার মামাতো ভাই। সে আমাকে দেখিতে াসিয়াছিল। শুনিলাম একদিন বাড়ীসুদ্ধ লোকের সাম্‌নে শৈলজার বাক্স অনুসন্ধান করান হইয়াছিল পূর্ব্বেকার সেই লোকটার কোন চিঠি আছে কি না দেখিবার জন্য। সেই হইতে তাহার নাকি চিঠি-পত্রলেখা পড়া-শুনাকরা সব বন্ধ। শৈলজা লেখা-পড়া করিতে পাইবে না একথা আমি যে কল্পনাও করিতে পারি না। ইহার চেয়ে কঠিন শাস্তি আর শৈলজাকে দেওয়া যাইত না।

রোগশয্যায় শুইয়া আমি ত ইহার কোনই প্রতিকার খুঁজিয়া পাইতেছি না। আজ মনে হয় সত্যই যদি আপনাদের ভাই হইয়া জন্মাইতাম ও ভায়ের মত ভাল-বাসিতে অধিকার পাইতাম তাহার চেয়ে অধিক সুখের বিষয় আর কিছুই থাকিত না। আর একজন শৈলজাকে ভালবাসিয়াছিল ইহার জন্য তাহাকে আর দুঃখ পাইতে হইত না।

ভালবাসাই মানুষের পরম লাভ—তা সে যেভাবেই হউক না কেন, তাহার স্বরূপও এক, ভিন্ন নহে। মানুষ দেহটাকে লইয়া বড়ই কাড়াকাড়ি করিয়া তাহার বিভিন্ন মূর্ত্তি গড়িয়া তুলে মাত্র। ভালবাসিয়া ও ভালবাসা পাইয়া আমি প্রভূত লাভ করিয়াছি, অপরিসীম আনন্দও পাইয়াছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষতি অনেক দুঃখও সহ্য করিতেছি। আমার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে ইহার চেয়ে দুঃখ আর কি হইতে পারে?

কিন্তু আমি কি করিব? এ দুঃখ হইতে তাহাকে বাঁচাইবার কি উপায় আছে? শৈলজা সুখী হইয়াছে, তাহার আর কোন দুঃখ নাই, তাহার স্বামী, শ্বশুরবাড়ীর সকলেই তাহার মর্য্যাদা বুঝিয়াছে—একথা আজ যদি জানিতে পারি, বিশ্বেশ্বরের নাম লইয়া বলিতেছি, এই যে রোগের দুঃসহ যন্ত্রণা—যাহাতে প্রতিক্ষণ মনে হইতেছে বুকের মধ্যেকার নরম জায়গাটা তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়া কাটিয়া কাটিয়া বাহির করা হইতেছে—এও আমি হাসিমুখে সহ্য করিয়া তিল তিল করিয়া মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মরিলে বা বাঁচিয়া থাকিয়া কঠোরতম দুঃখ সহ্য করিলেও যে তাহাকে দুঃখের হাত হইতে বাঁচাইতে পারা যাইবে না এই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ। তেছে। শৈলজার

তিন বৎসর হইল সে স্বপ্নের অবসান হইয়াছে। এই তিন বৎসর একটি দিনের জন্যও কলিকাতা যাই নাই। গিরিডিতে কতবার আপনারা সকলে একত্র হইয়াছেন শুনিয়াছি, তাও কখন যাই নাই। সমস্ত অন্তরের সহিত ভাবিয়াছি শৈলজা পূর্ব্বকথা ভুলিয়া সুখী হোক। নহিলে আমার কি যাইতে ইচ্ছা হইত না, না, ইচ্ছা করিলে আমি যাইতে পারিতাম না ?

অনেক রাত্রি হইয়াছে। বাহিরের হাওয়া এখন ঠাণ্ডা—বরফের মত। দিন রাত্রি জ্বরভোগ করার জন্য এ-বাতাস বড় মধুর লাগিতেছে! এ জীবনের পর মরণও যেন এমনই সুন্দর লাগে।

যাহা আমি শুনিয়াছি আপনাকে বলিলাম। যদি কোন উপায় থাকে করিবেন। অমরদা'কে সব কথা বলিবেন। সেই স্নেহময় বিশাল বলিষ্ঠ হৃদয় ও উদ্ভাবন-শীল মস্তিষ্কে হয়ত কোন বুদ্ধি যোগাইবে।

আপনাদের প্রণাম করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমার আত্মা যেন শীঘ্র শান্তি পায়।

স্নেহাশ্রিত

কিরণ।

কাজ মিটাইয়া বিরজা যখন ফিরিল শৈলজা তখন মাটিতে লুটাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। ভূমিকম্পের বেগের মত প্রচণ্ড দুঃখ তাহার সমস্ত শরীরকে যেন কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। মাথার কাছে কিরণের হাতের লেখা চিঠিখানি খোলা পড়িয়া রহিয়াছে—যেন মাথার মণির অধিকার হারাইয়া শৈলজার দেহ-ভুজঙ্গ মর্ম্মন্তুদ দুঃখে আছাড়ি বিছাড়ি করিতেছিল।

(৩)

শৈলজা সকালের ট্রেনে চলিয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে তাহাদের তুলিয়া দিয়া আসিয়া অবধি বিরজা মনমরা হইয়া আছে।

"কেনই বা এরকম আসা। এতে মন আরও ছাই হ'য়ে যায়।"—বলিয়া বিরজা স্বামীর পানে চাহিল।

অমরনাথ বলিলেন—"তবু তো দেখাটা হ'ল।"

বিরজা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁগা, তোমার কি মনে হয় শৈলর শ্বশুরবাড়ীর ওরা জান্‌তে পারবে যে শৈল গিরিডি এসেছিল ?"

অমরনাথের বিশ্বাস যে জানিতে পারিবে। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যটুকু না কহিয়া অমরনাথ বলিলেন—"তা ঠিক বলা যায় না। তবে জান্‌তে পার্‌লেই বা ক্ষতি কি ? আমরা এখানে রয়েছি; একদিন দেরি করে' না হয় আমাদের সঙ্গে দেখা করে' গিয়েছে। তাতে আর কি দোষ হয়েছে ?"

"হ্যাঁ, তারা তোমার মত কিনা তাই কথাটা এত সহজ করে' ভেবে নেবে খন।" বলিয়া বিরজা বিমর্ষভাবে বাহিরের দিকে চাহিল।

একটু পরেই বিরজা আবার জিজ্ঞাসা করিল—"শৈল এবার যেন আরও রোগা হ'য়ে গিয়েছে। নয় ?"

অমরনাথ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন—হাঁ হইয়াছে।

"শৈল বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচ্‌বে না। কেন যে বাবা শেষটা এমন জিদ্ ধরে' বস্‌লেন তাই ভাবি"—বিরজা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল।

অমরনাথ কহিলেন—"কিরণের মায়ের দুর্ণাম সম্বন্ধে একখানা বেনামী চিঠি আস্‌তেই তিনি কিরণকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কিরণ, এ সত্যি! কিরণ সব স্বীকার কর্‌লে। তার পর থেকে ওর মনটা এমন হ'য়ে গেল যে ওদের দুজনের কথা একসঙ্গে তুল্‌তে কেউ সাহসই কর্‌লে না। তিনি যে আভিজাত্যের বড় পক্ষপাতী আর কিরণের মায়ের দুর্ণামের কথাটা যে হালিসহরে সবাই জান্‌ত!"

"বাবা এত উদার, কিন্তু এ বিষয়ে কেন যে এমন কর্‌লেন! আহা, এদের দুজনের মিলন হ'লে কি সুন্দরই হ'ত। আর এখন এদের কথা মনে কর্‌লেই চোখে জল আসে।" বিরজার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিয়াছিল।

অমরনাথ বলিলেন—"তাঁরও খুব দোষ নেই। তিনিও এতটা জান্‌তেন না। এরা দুজনে আবার বড্ড চাপা ছিল; শ্বশুর-মহাশয়ের মনে আর একটা খট্‌কা লেগেছিল। তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, কিরণ এ খবরটা ইচ্ছে করে' গোপন রেখেছিল। কিন্তু কিরণ

যে বিবাহের কথা তুল্‌বার আগে নিশ্চয়ই ও-কথা তাঁকে বল্‌ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেটা না হবার সেটা এইরকম করে' বুঝ্‌বার ভুলেই উল্‌টে যায়।"

একটা যেন দুর্যোগের সম্ভাবনায় সকাল-বেলাটা কাটিয়া গেল। না কোন কাজ, না কোন কথাবার্ত্তায় কাহারও মন লাগিতেছিল।

নামমাত্র আহারাদির পর দুপুরে অমরনাথ স্ত্রীকে মাসিকপত্রের একটা গল্প পড়িয়া শুনাইতেছেন এমন সময় বাহির হইতে ডাক আসিল—"অমরদা, অমরদা!"

"কে? যাই।" বলিয়া অমর উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। একটু পরেই ফিরিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কিরণ আসিয়া বিরজাকে প্রণাম করিয়া কোন-মতে সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

কিরণকে দেখিলে আর পূর্ব্বের কিরণ বলিয়া চট্ করিয়া চেনা যায় না।—সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ সরল দেহ কৃশ হইয়া সম্মুখের দিকে নুইয়া পড়িয়াছে। গায়ের সেই উজ্জ্বল গৌর বর্ণ একেবারে রক্তশূন্য বলিয়া মনে হইতেছে। মাথার চুল অর্দ্ধেক উঠিয়া গিয়াছে। বাকি অর্দ্ধেক অযত্নে রুক্ষ ও শীর্ণ হইয়া বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু চক্ষু দুটির অসাধারণ দীপ্তিটুকু ম্লান হয় নাই।

বিরজা বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"একি, কিরণ তুমি! কাল রাত্তিরেও যদি আস্‌তে শৈলর সঙ্গে দেখা হ'ত। তুমি আস্‌বে খবর পেয়ে কল্‌কাতা থেকে পাট্‌না যাবার পথে সে এখানে এসেছিল। আজ সকালে গেল।"

মুহ্যমান কিরণের চক্ষুদুটি চারিদিক্‌টায় একবার ভাল করিয়া চাহিয়া বুঝি দেখিয়া লইল যে আসিয়াছিল সে কোথাও কিছু ফেলিয়া গিয়াছে কি না। তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল; মাথা ঘুরিয়া গেল। অমর তাড়াতাড়ি কিরণকে ধরিয়া পাশের বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

বিরজা একখানি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে কিরণের মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। তাহার কপালে যে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিয়াছিল ক্রমে তাহা মিলাইয়া গেল। একটু পরে কিরণ চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন—"একটু সুস্থ হয়েছ?"

'হঁ্যা"—বলিয়া কিরণ উঠিয়া বসিতে গেল।

অমরনাথ বাধা দিয়া বলিলেন—"না, আরও খানিকটা শুয়ে থাকো। দুর্ব্বল শরীরে এতখানি পথ একা এসেছ। খবর দিলে আমরা ত অন্ততঃ ষ্টেশন পর্য্যন্ত যেতে পার্‌তাম।

অমরের মুখের পানে চাহিয়া কিরণ ধীরে ধীরে বলিল—"না আসাই তো আপাততঃ স্থির করেছিলাম দাদা। কিন্তু কাল সকাল থেকে অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম। কে যেন গিরিডির দিকে বড় জোরে টান্‌ছিল। তেমন টান জীবনে আর কখন অনুভব করিনি। কাশীতে থাকা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। রাত্রের ট্রেনে কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লাম। কেন যে যাচ্ছি তা তখন বুঝ্‌তে পারিনি; এখন বুঝেছি।"

কথাগুলি বলিতে যে পরিশ্রম হইয়াছিল তাহার জন্য কিরণ চক্ষু মুদিয়া আরও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিরণের মনে শুধু এই কথাটি অমৃত মধুর সঙ্গীতের মত বার বার ধ্বনিত হইতেছিল—

"শৈলজা আসিয়াছিল—শৈলজা আসিয়াছিল।"

আর এই যে আসা ইহার জন্য শৈলজাকে যে কত আয়োজন, কত ত্যাগ স্বীকার, কতখানি বিপদ্ ঘাড়ে করিতে হইয়াছিল তাহা কিরণ যেমন জানে তেমন বুঝি আর কেহই জানে না।

তবু শৈলজা আসিয়াছিল! তাহাকে একবার শেষ-দেখা দিবার জন্য নারী হইয়াও শৈলজা এতটা করিয়াছিল!

কিন্তু তবু ত দেখা হইল না!

তা না হউক। এই যে সে আসিয়াছিল, এত দুর্যোগ মাথায় করিয়া, মমতার মূর্ত্তি ধরিয়া সে যে এখানে উদয় হইয়াছিল—ইহাই কি যথেষ্ট নহে?

জীবনের পাত্র কতবার ভরিয়া উঠিয়াছে, কতবার শূন্য হইয়াছে। কিন্তু এমন অমৃতবিন্দু দিয়া তাহার পরিপূর্ণতা বুঝি আর কখন সাধিত হয় নাই। ইহার পরে

এ পৃথিবী—এই আনন্দের লীলাভূমি, এই বিগলিত দুঃখের প্রস্রবণ এখান হইতে বিদায় লইতে আর দুঃখ কি?

শুধু—ভগবান্ যেন শৈলকে তাহার এই নিষ্ফল যাত্রার দুঃখ— এই অসমসাহসিক করুণার বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন!

কিরণের মুদিত চক্ষুর প্রান্ত দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তার পর আর দুই বিন্দু, আরও দুই বিন্দু—আরও, আরও।

বড়ই ক্ষোভ ও আক্ষেপের সহিত অমরনাথের মুখ হইতে বাহির হইল—"কেন তবে কাল এলে না কিরণ!"

কিরণ তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু মেলিয়া বলিল—"অদৃষ্ট!"

(৪)

গিরিডিতে কিছুদিন থাকিবে মনে করিয়াই কিরণ বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া সমস্ত শুনিয়া তাহার গিরিডি ত্যাগ করিয়া যাওয়া বা থাকা দুইই সমান কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল।

যদি একেবারে না আসিত একরকম হইত; আসিল যদি, একটা দিন আগে কেন আসিল না—এই চিন্তা তাহাকে আরও অবসন্ন করিয়া তুলিল। তাহার শরীরও এমন হইয়া দাঁড়াইল যেন অন্ততঃ দিন দশ কোথাও যাওয়া অসম্ভব। পৃথক্ বাসার কথা কিরণ মুখেও আনিতে পারিল না। বাহিরের দিক্‌কার ঘরটি সবচেয়ে ভালো বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। স্বামী স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া কথায় গল্পে তাহাকে অন্যমনস্ক ও প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু গভীর দুঃখ যেন দাগ কাটিয়া তাহার অন্তরে বসিয়া গিয়াছিল। সে দুঃখের হ্রাস কিছুতেই বুঝি হইবার নহে।

একদিন শেষ রাত্রে বিরজার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামী ও পুত্রকন্যা সব নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রিত। খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বিরজা বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। একটু পরে উঠিয়া মাথার দিক্‌কার জানালাটা একবার খুলিয়া দিল। একরাশি স্নিগ্ধ শুভ্র ফুলের মত শীতল সুন্দর জ্যোৎস্না জানালা দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বিরজা আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল অনেকগুলি তারা নিভিয়া গিয়াছে, চাঁদও যেন একটু পরেই নিষ্প্রভ হইয়া আসিবে।

হঠাৎ একটা গানের সুর তাহার কানে আসিল। কে গুন্‌গুন্ করিয়া কি একটা করুণ সুর ধরিয়াছে। গলা যেন কিরণের বলিয়াই মনে হইল। হাঁ, নিশ্চয়ই কিরণের—কিরণের কণ্ঠ অতি সুন্দর ছিল। আগে এমন দিন ছিল না যখন কিরণের গান ব্যতীত দিন বা রাত্রি কাটিত। সে মিষ্ট সুর ভুলিবার নহে!

বিরজা ধীরে ধীরে স্বামীর গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া গানের কথা বলিল। অমরনাথ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিলেন—"হাঁ কিরণের গলা।"

"চল, কাছে গিয়ে শুনে আসি"—বলিয়া বিরজা উঠিল। সাবধানে দুয়ার খুলিয়া দুই জনে ধীরপদে আসিয়া কিরণের ঘরের কাছাকাছি দাঁড়াইল।

কিরণ জানালা খুলিয়া দিয়া জানালার কাছে একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল। জ্যোৎস্নাকে ম্লান করিয়া ভোরের আলো ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ভোরের শীতল বাতাস তাহার ললাট স্নিগ্ধ করিয়া রুক্ষ চুলগুলি উড়াইতেছিল।

বাহিরের দিকে চাহিয়া কিরণ অতি করুণ সুরে গাহিতেছিল :—

ভোরের বাতাস, কোথা ভেসে যাস্?
যাস্ বঁধুয়ার দেশে।
লুটিয়া আনিস্ কস্তুরি-বাস
মাখানো তাহারি কেশে।
পশিতে সে ঘরে যদি না পারিস্,
ওরে সে দোরের ধুলা এনে দিস্;
সেই সে ধুলার কাজল আমি যে পরিব নয়নে
কেশে!

এই হতাশের মর্ম্মভেদী সুর, আর বিরহীর সর্ব্বরিক্ত মূর্ত্তি বিরজা আর সহিতে পারিতেছিল না। চুপিচুপি আর্ত্তকণ্ঠে সে অমরনাথকে বলিল—"চল, আমি আর এ দেখ্‌তে পার্‌ছিনে।"

দুজনে যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন বিরজার দুই চোখ ছাপাইয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে

বিরজা কহিল—"দেখেছ, কিরণ সারারাত বিছানায় শোয়নি !"

অমর বলিলেন—"হঁা।"

"এ করে' আর কিরণ কদিন বাঁচবে !—হ্যাঁ গা, এর কি কোন প্রতিকার নেই ?"

বিরজা স্বামীর দিকে চাহিয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অমর বলিলেন—"এ জন্মে বুঝি নেই।"

"পরজন্মে হবে ?"

"যদি পরজন্ম থাকে নিশ্চয়ই হবে।"

"আমি শুধু ভাবি এত প্রেম সব ব্যর্থ হল !"

অমর স্ত্রীর চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন—"ব্যর্থ হয়নি। দুজনকারই হৃদয়ের এই গভীর প্রেম চির-বিরহের মধ্যে সার্থক হবে।"

দুজনেরই একসঙ্গে মনে হইল—শৈলজা এখন কি করিতেছে !

ভোরের বাতাস কি এই চির-বিরহীর প্রেমের বারতা তাহার বঁধুয়ার কাছে পৌঁছাইয়া দিতেছে না ?

শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য

নীল পাখী

ঘুম ভেঙে আজ সকালবেলা
যেই উঠেছি জাগি',
হঠাৎ এসে বাতায়নে
বস্‌ল সে এক পাখী—
অপ্‌রাজিতার একটি গুছি,
নীল মাণিকের একটি কুচি,
নীল আকাশের টুক্‌রা খানিক—
কার যেন নীল আঁখি !

আলোক এল বর্ষা-শেষের
সোনার বাণী লয়ে,
বাতাস এল শিউলি-বনের
স্বপ্ন সুবাস ব'য়ে।
নীল পাখী সে ক্ষণিক র'য়ে
আবার গেল উধাও হ'য়ে,
শরৎ-রাণীর নীলাম্বরীর
আঁচল-আভাস না কি ?

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

হেঁয়ালি

একদা এই পথে গেছে সে আন্‌মনা—
যেন সে কোথা যাবে কিছু তা' জান্‌ত না,
চরণ ফেলে যেন বেয়াড়া চঞ্চল !
ভ্রমর-কালো আঁখি কত যে আবিলতা,
বাঁধুল-ঠোঁটে ফোটে অফুর হাসি-কথা,
পরণে নীল-সাড়ী—লুটিছে অঞ্চল।

গোলাপ লাজ পায় দেখে সে গাল দু'টি,
সুকালো কেশরাশি চিবুকে বুকে লুটি'
অচেনা পথে ধায় তবু ত নির্ভীক !
'হেঁয়ালি' ব'লে তারে আদরে যদি ডাকি—
ছুটিয়া কাছে এসে এবুকে মুখ ঢাকি'
ভুলে সে গেছে আহা যাবে যে কোন্ দিক্।

এমনি দিশাহারা অবুঝ মেয়েটিরে
কে যেন বুঝায়েছে চলিতে ধীরে ধীরে—
সরমে বেধে বেধে সামালি' অম্বর ;
আমারি চোখে চোখে চাহিতে উঠে ঘামি,'
আজি এ ভীতি কেন,— আমি তো সেই আমি,
অবাধে ঢেলে-দেওয়া কই সে অন্তর ?

শ্রী জলধর চট্টোপাধ্যায়



ভূমিকম্পের কথা—

কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানে যে ভয়ানক ভূমি-কম্প হইয়া গেল তাহার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। ইহার ফলে যে কত হাজার লোক মরিল, কত কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। জাপানে ভূমিকম্প এই প্রথম নয়, পূর্ব্বে আরো অনেকবার হইয়াছে—তবে এমন ভয়ানক ক্ষতি আর কোন বার হয় নাই।

পূর্ব্বে আর-একবারের ভূমিকম্পে তোকিওর অনেক ঘর বাড়ী হোটেল হাঁসপাতাল ইত্যাদি চূরমার হইয়াছিল। তবে তোকিওর সমস্ত অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই। আর-একবার ইয়োকোহামাতে ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের জল আসিয়া পড়ে, তাহাতে প্রায় সমস্ত ঘরবাড়ী ভাসিয়া যায়, কোটি কোটি টাকার মালপত্র নষ্ট হয় এবং লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন হয়।

বহুযুগ পূর্ব্বে জাপান এসিয়া মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার পর হঠাৎ ভূমিকম্পের ফলে বর্ত্তমান জাপান এবং এশিয়ার মাঝ-খানের সমস্ত জমি বসিয়া গেল এবং তাহার স্থান সমুদ্রের জলে পূর্ণ হইয়া গেল। জাপান দ্বীপের জন্মও নাকি ভূমিকম্পের ফলে হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় জাপানে এত ঘন ঘন ভূমিকম্পের দর্শন পাওয়া যায়।

এখন বলা যাইতে পারে—জাপানীরা জাপান ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও চলিয়া গেলেই পারে—সকল সময়ে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জাপানে থাকিবার প্রয়োজন কি? ইহার একমাত্র সহজ উত্তর—জাপানীরা যাইবে কোথায়?



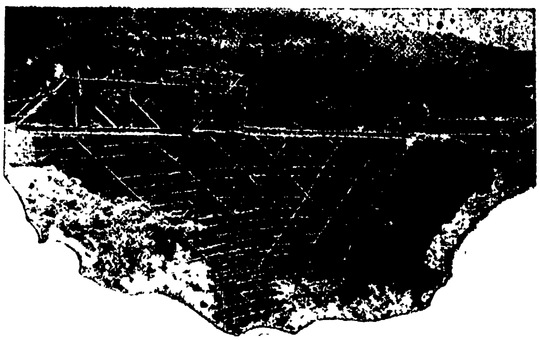
ইস্পাতের ফ্রেমের উপর এই রকম বাড়ী করিয়া, বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ার ভূমিকম্পের আক্রমণ রোধ করিবার আশা করেন

লোহার এবং কংক্রিটের বাড়ী তৈরী করিবার কথাও মনে আসিতে পারে—কিন্তু ইটপাথর এবং লোহার তৈরী বাড়ী ভূমিকম্পের সময় কত কাজের হইতে পারে তাহাও ভাবিবার কথা। ছোট ছোট কাঠের বাড়ী ভূমিকম্পের পরেও অটুট অবস্থায় দেখা গিয়াছে—কিন্তু ইট-পাথরের তৈরী বড় বড় বাড়ী সব ভাঙ্গিয়া চূরমার হইয়া গিয়াছে—দেখা যায়।

যে-সব সহরে ভূমিকম্পের ভয় আছে, সেইসব সহরে বেশী উঁচু বাড়ী তৈরী করায় বিপদ্ আছে। সেইজন্যই বোধ হয় ইয়োকোহামা ইত্যাদি সহরে প্রায় সব বাড়ীই ছোট ছোট এবং কাঠের তৈরী। তোকিও সহরেও এই ব্যবস্থা। এই কারণে সহরের ঘর বাড়ী আকাশের দিকে না বাড়িতে পারিয়া লম্বায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এত সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভূমিকম্পের হাত হইতে নিশ্চিতরূপে রক্ষা পাইবার উপায় জাপানবাসীরা এখনো বাহির করিতে পারে নাই।

ভূমিকম্প কেন হয়—তাহার সম্বন্ধে নানারকম মত আছে। একটি মতকে সকলেই একরকম সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা এই—মাটির নীচের গোলমালের জন্য উপরের মাটি ধসিয়া যায়, ফাটিয়া যায় অথবা এবড়ো-খেবড়ো হইয়া যায়—ইহার ফলে উপরের যা কিছু ঘরবাড়ী থাকে সবই পড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে নড়ন-চড়ন এত ভয়ানক হয় যে উপরের মাটি নীচে চলিয়া যায় এবং সহরের পর সহর লুপ্ত হইয়া যায়। পৃথিবীর বুকের মধ্যে সকল সময়েই আগুন জ্বলিতেছে—আগুন যখন পৃথিবীর উপরের দিকে পৌঁছায় তখনই এই কাণ্ড হয়।

জাপানের ভূমিকম্পের একটা কারণ এই হইতে পারে যে সমুদ্রের তলার জল ক্রমশঃ মাটির মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। এই জল যখন মাটির মধ্যের প্রজ্বলিত ধাতুর সঙ্গে আসিয়া লাগে তখন তাহার ফলে ভয়ানক একটা ধাক্কা মাটির উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়।



কম্পন সহ্য করিবার মত করিয়া এই রকম বাঁধ জাপানে তৈরী হয়

জাপানের পশ্চিমে তুশাকারা গহ্বর। এই গহ্বর ২৭৬০০ ফুট গভীর। এই গহ্বর, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক ভূমিকম্প-গুলির মূল কারণ। এই গহ্বরের তলায় জলের চাপ ভয়ানক বলিয়া জল সহজেই মাটির মধ্যে প্রবেশ করে।

জাপানে এইবার যে ভূমিকম্প হয়-তাহা ছয় মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। ভূমিকম্প যে জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই হইয়াছিল

তাহার প্রমাণ আছে। কারণ ভূমিকম্পের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া সহরের ভিতর প্রবেশ করিতে থাকে।

প্রকৃতি ভূমিকম্পের সাহায্যে পৃথিবীতে পাহাড়-পর্ব্বত নির্ম্মাণ করেন। ভূমিকম্প না হইলে সমস্ত পৃথিবী সমতলভূমি হইয়া থাকিত।

সমুদ্রের তলায় জলের চাপ এত ভয়ানক যে—সেই চাপের দ্বারা জলকে আকাশের গায়ে সমুদ্রের গভীরতার সমপরিমাণ উঁচে ছোড়া যাইতে পারে। তুশাকারা গহ্বরের নিম্নে জলের যে চাপ আছে সেই চাপের দ্বারা গহ্বরের সমস্ত জলকে আকাশের দিকে পাঁচ মাইল উঁচুতে ছোড়া যায়। এই চাপে জল শক্ত পাথর ভেদ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। এই জল যখন জ্বলন্ত ধাতুর গায়ে আসিয়া লাগে তখন তাহা গরম বাষ্পে পরিণত হয়। জাপানের কেবল মাত্র হণ্ড দ্বীপ নয়, অন্যান্য প্রায় সব দ্বীপগুলিই এইরকম ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রগর্ভ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র-উপকূলে এখনো খুব গভীর জল দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাতে মনে হয় যে সমুদ্র-উপকূলের পাহাড়পর্ব্বতগুলিও ভূমিকম্পের ফলে উঠিয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে ভূমিকম্প পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থানেই হয়। এ ধারণা ভ্রমাত্মক। পৃথিবীর এমন একহাত পরিমাণ স্থানও নাই, যেখানে ভূমিকম্প হয় না। এমনও দেখা যায় যে পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান মানুষের অবোধ্য কোন উপায়ে স্থিতি পরিবর্ত্তন করে। অনেক পাহাড়কে সরিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। অবশ্য এইসব স্থান পরিবর্ত্তন সাধারণ চোখে বুঝা যায় না, বৈজ্ঞানিকভাবে মাপজোক করিয়া বুঝিতে পারা যায়।



যুগের পর যুগ ধরিয়া পৃথিবীর বুকে এইসব আগুন জ্বলিতেছে।
এই প্রকার স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়

পৃথিবীর অঙ্গের এইরূপ নড়াচড়া কেবল মাত্র ভূমিকম্পের সময়ই ঘটে এমন নয়। জাপানে যে শক্তির সেদিন উচ্ছ্বাস হইয়াছিল ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যে অবরুদ্ধ শক্তি স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে ছাড়া পাইয়াছিল তাহা চাপের দরুন্ সঙ্কুচিত হইয়া এইরূপ বেগযুক্ত হইয়াছিল। অনুমান হয় যে এই শক্তি অল্প অল্প চাপের জন্য ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতেছিল, আর যখন এই আভ্যন্তরীণ চাপ পৃথিবীর আবরণের সহ্য করিবার মাত্রা ছাড়াইয়া গেল, তখনি সব চুরমার হইয়া গেল। এই আতিমাত্রিক চাপের সময় যে ভাঙন ধরে তাহাতেই সহসা ভূখণ্ডের স্থান পরিবর্ত্তন হয় ও ভূপৃষ্ঠে কম্পন অনুভূত হয়।

যদি দেখা যায় কোন এক জায়গায় পৃথিবীর আবরণের কোন অংশ উত্তর দিকে সরিয়া যাইতেছে তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠের উপরের কোন শক্তির প্রয়োগে যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। যতটা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এই বুঝা যায় যে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পরের দিকে ঝুঁকিয়া ভার-সমতা দ্বারা বিধৃত রহিয়াছে। কোন একটা জায়গা ধসিয়া গেলে কিংবা কোন পাহাড় জলস্রোতে ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে এই ভার এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিচালিত হয়। এমনি করিয়া এই ভার-সমতা নষ্ট হইয়া যায়। এই সঞ্চলন-ব্যাপার যদি বেশী জোরে ঘটে, তাহা হইলে যে অংশ নূতন ভারাক্রান্ত হইয়াছে সেই অংশ হইতে একটি শক্তিস্রোত হাল্কা দিকে প্রবাহিত হয় ও তাহাতে পৃথিবীর আবরণটার উপর টান পড়ে। ফলে হয় সে অংশ ফাটিয়া যায় নয় ধসিয়া যায় ও তাহাতেই ভূমিকম্প ঘটে।

ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ বাড়ীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দিকে নাড়া পাইয়া ফাঁক হইয়া যায়। বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনিয়ারেরা এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে যদি কোন বাড়ীকে এমনভাবে শক্ত করিয়া তৈরী করা যায় যে হাজার নাড়াচাড়াতেও বাড়ীখানি অটুটভাবে থাকে ও এক সময়ে বিশেষ একদিকেই নড়ে, তাহা হইলে সেই বাড়ী খুব সম্ভব ভূমিকম্পের পরেও অটুট থাকিবে। এইজন্য ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিক উভয়ে মিলিয়া স্থির করিয়াছেন, যে, যে দেশে সময়ে অসময়ে ভূমিকম্প হয়, সেই দেশে বাড়ী তৈরী করিবার জন্য প্রথমে কঠিন ইস্পাতের একটি শক্ত কাঠাম তৈরী করিতে হইবে। কাঠামকে যথেষ্ট পরিমাণে ভারীও করিতে হইবে। যাহা কিছু জোড়াতাড়া লাগাইতে হইবে—তাহাও বেশ শক্ত করিয়া ইস্পাতের পাতা দিয়া লাগাইতে হইবে। জোড়াতাড়া দেওয়ার জন্য যতদুর সম্ভব বেশী রিভেট বা পেরেক ব্যবহার করিতে হইবে। মোটের উপর দেখিতে হইবে যে ফ্রেমের কোন অংশ ঢিলা বা আলগা হইয়া না থাকে, এবং কাঠামর যে-কোন স্থানে আঘাত করিলে, তাহার স্পন্দন যেন কাঠামর সব জায়গায় পৌঁছায়। এই কাঠামর উপর যদি বাড়ী তৈরী করা যায়—তাহা ভূমিকম্পের পরও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। অবশ্য একেবারে স্থিরনিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—তবে যতদুর সম্ভব মনে হয়, এইপ্রকার বাড়ীতে কোন ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষার দ্বারাও ইহাই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এইসমস্ত বাড়ীতে যদি আগুন লাগে, তাহা হইলেও ফ্রেমখানি অটুট থাকে। জাপানে এই প্রথায় কতকগুলি সাততলা আটতলা বাড়ী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই টিঁকিয়া আছে—কিম্বা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ভূমিকম্পের সময় আর-একটি প্রধান বিপদ্ মানুষকে আক্রমণ করে। সহরের গ্যাস-পাইপ ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া গিয়া, তাহাতে আগুন লাগিয়া যায়। জলের নলও ফাটিয়া যায়—তাহাতে জল-প্রাপ্তির আশা নির্ম্মূল হয়। এইজন্য যে-সমস্ত সহরে ভূমিকম্পের আশঙ্কা অত্যধিক, সেই-সমস্ত সহরে এমন ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে কলের নল ভাঙ্গিয়া গেলেও সহরে ছড়াইবার জন্য প্রচুর জল পাওয়া যাইবে। জল রাখিবার স্থানগুলিও বিশেষভাবে নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে-সমস্ত স্থানে ভূমিকম্প বেশী দেখা যায়, সেই-সমস্ত বিশেষ স্থান হইতে বহু দূরে জলরক্ষা করিতে হইবে। সহরে জল প্রেরণের জন্য দুই তিনটি পাম্পিং ষ্টেশন রাখাও প্রয়োজন—অবশ্য সবগুলি একসঙ্গে কাজ করিবে না—প্রয়োজনমত যে-কোন একটি কাজ করিবে, অন্যগুলি রিজার্ভ বা সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইবে।

ভূমিকম্পের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—



অকম্পনীয় শয়নাগার—জাপানে ভূমিকম্পে গৃহহীন অধিবাসীরা বড় বড় জলের নলে ঘুমাইতেছে

জাপানে এবার যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে। জাপানের রাজকীয় ভূমিকম্প-অনুসন্ধান সমিতির অধ্যক্ষ অধ্যাপক এফ্‌ ওমোরি ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গণনা করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে ছ বৎসরের মধ্যেই কোন না কোন সময় ভয়ানক ঝাঁকানি অনুভূত হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যেরূপ ও যে সংখ্যায় কাঁপন দেখা দিয়াছিল সেই তথ্য অবলম্বন করিয়া এই গণনামূলক অনুমান করা হইয়াছে। এই জাপানী বৈজ্ঞানিক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যে, পৃথিবীর কোন এক জায়গায় কম্পন ঘন ঘন ও সংখ্যায় বেশী হইলে সেই স্থানটির প্রচণ্ড দোলায় দুলিবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এক স্থানে অনেক দিন পর পর সামান্য সামান্য একটু নড়াচড়া দেখা দিলে পরে একসময় সেই স্থানে দারুণ আন্দোলনের সম্ভাবনা আছে। কয়েক বৎসর হইতে জাপানে এই মৃদু দোলানির নিতান্ত অসদ্ভাব ঘটিতেছিল।

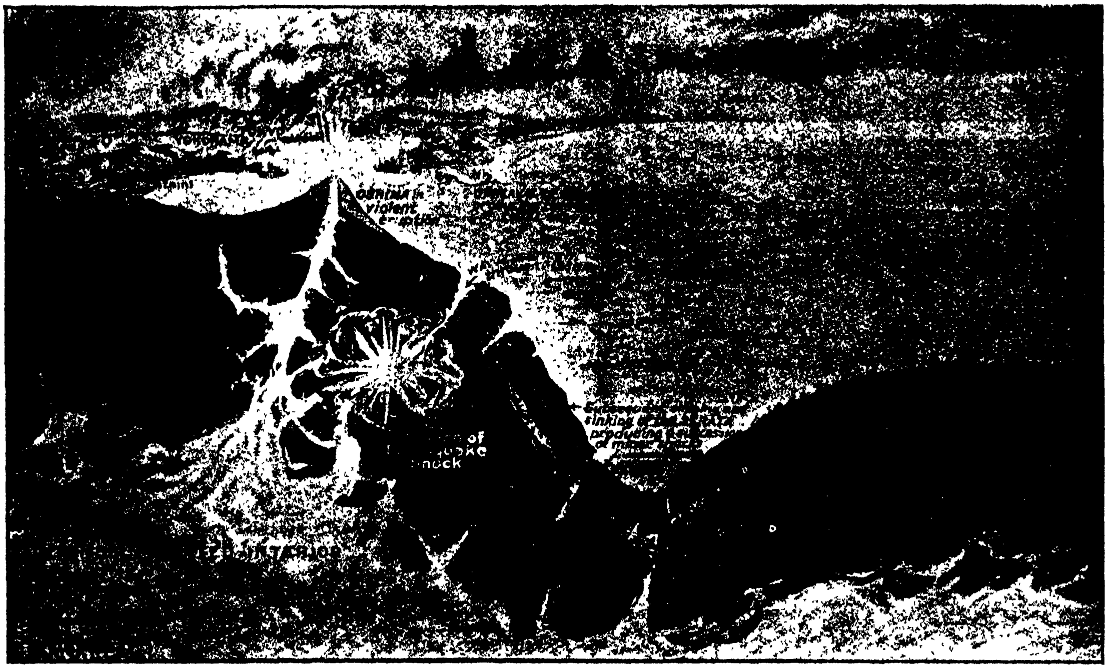
জাপানের উত্তরাংশে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় অধ্যাপক মহাশয় তাহার সহিত ভূমিকম্পের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে যখন এই অংশে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বেশী হইবে তখন তাহার ফলে ভূমিকম্প ঘটিবে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট চিলি-দেশে যে ভূমিকম্প হয় তাহার কথাও অধ্যাপক ওমোরি আগে হইতে বলিয়াছিলেন। সেই বৎসর ১৮ই এপ্রেল কালিফোরনিয়া দেশে ভূমিকম্পের পর তিনি বলেন যে তাহার পরবর্ত্তী ভূমিকম্প দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা দিবে। অচিরেই চিলির ভূ কম্প ঘটিল।

কালক্রমে বোধ হয় সকল ভূমিকম্পের কথাই গণনা করিয়া বলা যাইবে। এপর্য্যন্ত যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহাতে কিছু বলা

ভূমিকম্পের কারণ বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চিত্র—





২ ভূমিকম্পের কেন্দ্র

এখনো তত সহজ নয়, কিন্তু জাপানে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে অনুসন্ধান-কার্য্য চলিতেছে তাহাতে এমন সব নিয়ম আবিষ্কার হইতে পারে যাহার সাহায্যে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা মোটেই শক্ত হইবে না।

—

তাপহীন আলোক—

দুই বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক তাপহীন আলোক আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই আলোক নাকি মানুষের কাজের জন্য অসীম ক্ষমতার আধার হইবে।

এই বৈজ্ঞানিক নিউ জার্সির হ্যারিসন সহরে বাস করেন। তাঁহার বিজ্ঞানাগারটি দেখিবার জিনিষ। এইখানে কাজ করিতে করিতে তিনি একপ্রকার কাচের নল—অনেকটা ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের মত—প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নল হইতে ১০০-মোমবাতি-সমান আলো তিন বৎসর ধরিয়া সমানে জ্বলিবে। বাতির জন্য ব্যাটারি, তার-সংযোগ ইত্যাদি কিছুরই দরকার হইবে না। ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে আধ সের পদার্থের (matter) মধ্যে এত শক্তি নিহিত আছে যে তাহা কোটি মণ কয়লা হইতেও পাওয়া যায় না। এক টুক্‌রা পাথর, ইস্পাত, এমন কি একটা সামান্য তামার পয়সার মধ্যেও অসীম শক্তি আবদ্ধ আছে। যে মহাশক্তি সমস্ত সৌরজগৎ চালনা করিতেছে, সেই শক্তিই সামান্য সামান্য দ্রব্যের মধ্যে এইসব শক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এইসমস্ত শক্তিকে যদি মুক্ত করিতে পারা যায়, তবে মানুষের কাজ করিবার জন্য বাষ্প, বিদ্যুৎ বা কয়লা লুপ্তপ্রয়োগ হইয়া যাইবে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্ বলেন, "আমার বিশ্বাস এই শক্তি একদিন মানুষের হাতে আসিবে। ইহা হাজার বছর পরেও হইতে পারে অথবা কাল রাত্রেও ঘটিতে পারে।"



মানুষের তৈরী চোখ-ঝল্‌সানো বৈদ্যুতিক স্ফুরণ

বৈজ্ঞানিকদের মতে সমস্ত পদার্থই—সোনা, রূপা, কাঠ, পাথর, সবই—অণু-সমষ্টি; এইসকল অণু আবার পরমাণুর সমষ্টি; এইসকল পরমাণু অগণ্য স্পন্দমান ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে তাহাকে



আকাশ হইতে বিদ্যুৎ টানিয়া "ঠাণ্ডা"-বাতি নির্ম্মাণেব কাজে লাগানো হইতেছে



এইখানে ৫০,০০০ ডিগ্রী গরমে কাজ হইতেছে। ইহার বেশী গবম মানুষ কল্পনা করিতে পারে না

পরমাণু অপেক্ষা হাজারগুণ ক্ষুদ্র। ইলেকট্রন্ সমস্ত সময়েই ধাবমান, তাহাদের গতি সেকেণ্ডে ১০,০০০ মাইল হইতে ৬০,০০০ মাইল। ঘড়ির একবার টিক করিতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রন্ সমস্ত পৃথিবী ছয় বারের বেশী ঘুরিয়া আসিতে পারে। একটা বন্দুকের গুলিকে এই বেগে নিক্ষেপ করিতে হইলে ১৩৪০ পিপারও বেশী বারুদ প্রয়োজন হইবে। একটা তামার পয়সার মধ্যে যে ইলেকট্রন্-শক্তি আছে তাহা মুক্ত করিতে পারিলে ৪০,০০০,০০০ হস্ পাওয়ারের সমান হইবে। একটা শক্ত কাঁক্ড়ার খোলায় যে পরিমাণ পরমাণু-শক্তি আবদ্ধ হইয়া আছে তাহা হঠাৎ মুক্ত হইলে, পৃথিবীব সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড অট্টালিকাকে চূর্ণ কবিতে পারে।

"তাপহীন আলোক"-আবিষ্কার-চেষ্টায় যুয়ান জে টোমাডেলি বিদ্যুৎ-পাত লইয়া তাঁহার প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করেন। আকাশের বিদ্যুৎ যে হঠাৎ চম্কায় তাহার বৈদ্যুতিক চাপ (volt or electric pressure) ৫০,০০০,০০০ ভোল্ট্। কিন্তু ইহা ১/১০০ সেকেণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া যায় বলিয়া খুব কম পরিমাণ শক্তি বিকাশ হয়। মিঃ টোমাডেলি তাঁহার পরীক্ষাকালে একটি ৫,০০০,০০০, ভোল্ট্ পরিমাণ বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ করেন তাহার ব্যাস এক গজ, ইহা ৩৭ ফুট লাফ দিয়া অন্য স্থানে গিয়া পড়ে এবং ৩৯ সেকেণ্ড বর্ত্তমান থাকে।

ইহা করিতে পারিয়া তিনি তাঁহার আবিষ্কার-কার্য্যে এক পা অগ্রসর হইলেন, কারণ এই শক্তি একটি পরমাণুর শক্তি মুক্ত করিতে পারিবে এবং তাহাকে বাগাইতেও পারিবে। এই বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজলী-বাতির মধ্যের সূত্রাকার বস্তুগুলিতে কতকগুলি explosions বা সশব্দ-বিদারণ হয়। সমস্ত বাল্বের বিদারণ এক সঙ্গে হয না, বহু বৎসর ধরিয়া ইহা ঘটিতে থাকে। এই বিদারণ বাল্বের মধ্যস্থিত ধাতব-সূত্রের সংগঠনের উপর নির্ভর করে। আবিষ্কারকের মতে তড়িৎ-উৎপাদনী কারখানার বিদ্যুতে ইহা হইতে পারে না—আকাশের বিদ্যুতের দ্বারাই ইহা সম্ভবপর।

হ্যারিসন্ ল্যাবোরেটরিব কলকব্জাগুলি অতি অদ্ভুত। বিজ্ঞানাগারের বাহিরেই অনেক উঁচুতে একটি ধাতব চাক্তি রক্ষিত আছে। এই চাক্তি আকাশ হইতে বিদ্যুৎ গ্রহণ করে, এবং চাক্তি হইতে ধাতু-নির্ম্মিত তারে করিয়া বিদ্যুৎ ল্যাবোরেটরির মধ্যে আনয়ন করা হয়। ধাতব বুরুশ-সংযুক্ত একটি ঘূর্ণায়মান চৌম্বক যন্ত্রে এই বিদ্যুৎ পৌঁছান হয়।

মিঃ টোমাডেলি তাঁহার "তাপহীন বাতির" বাল্বগুলি বিশেষভাবে তৈরী করিয়াছেন। ইহার মধ্যের যে ধাতব সূত্রগুলি আছে তাহা সবুজ পাতাতে ঘসা হইয়াছে। এই পরীক্ষার সময় টোমাডেলি সাহেবকে অনেকরকম কষ্ট এবং বিপদ পার হইতে হইয়াছে। কথা নাই বার্ত্তা

দুর্ভাগ্যক্রমে কোন সময়েই তাহাদের কামড় খাইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই দেশের লোকেরা বলে যে বিষম রাগিয়া গেলে এই বিছারা আত্মহত্যা করে—আমার একথায় বিশ্বাস হয় না। "আহত বৃশ্চিক দংশে আপনার বুকে" কথাটি আমি বিশ্বাস করি না। আমি বৃশ্চিককে আহত করিয়া দেখিয়াছি—বৃশ্চিক প্রাণপণে আঘাত-কারীকেই দংশন করিবার চেষ্টা করে।

তিরিশ বছর পূর্ব্বে আমি একবার মস্কাও হইতে খিরগিজের চালু প্রদেশে যাইবার পথে ওরেনবার্গে গিয়াছিলাম। এই পথ সামারার মধ্য দিয়া গিয়াছে। ওরেনবার্গে আমাকে বাধ্য হইয়া চারচাকাওয়ালা টারানটাস গাড়ী কিনিতে হইল। আমি অরাল হ্রদের পূর্ব্ব দিয়া



রাত্রিকালে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ডোঙ্গনের দল তিব্বতী-দলের দ্বারা আক্রান্ত হইল

ডাক-রাস্তার উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথ ১২০০ মাইল—ইহা পার হইতে ১৯ দিন লাগিয়াছিল। গড়ে ১৮ মাইল অন্তর ঘোড়া বদল করিতে হইয়াছিল। ঘোড়া বদল করিবার আড্ডাগুলি সবই রুশীয়-দের হাতে, কিন্তু অশ্বচালক প্রায় সব খিরগিজ্ দেশবাসী। শুকনো এবং শক্ত রাস্তায় 'ট্রয়কা' অর্থাৎ তিন ঘোড়াতেই গাড়ী বেশ টানিতে পারে। কিন্তু পথ যেখানে খারাপ কিম্বা কর্দ্দমাক্ত সেইসব স্থানে 'চট ভোরকা' 'পারা টোরকা' অর্থাৎ চার বা পাঁচ ঘোড়ার দরকার হয়। অরাল হ্রদের তীরের বালুপথে ঘোড়াতে আমার মাল-বোঝাই গাড়ী টানিতে পারিল না—কাজেই বাধ্য হইয়া আমার টারানটাস টানিবার জন্য তিনটি উট জুতিতে হইল। সে দৃশ্য বড় চমৎকার হইয়াছিল—উটের পিঠে মানুষ, পিছনে গাড়ী—এবং তাহার পশ্চাতে ঘোড়ার দল। উট জলের মত করিয়া বালি ছড়াইতে ছড়াইতে থপ্ থপ্ করিয়া চলিতেছিল। নভেম্বর মাসে এই পথে গিয়াছিলাম। তখন হইতে মরুভূমির উপর বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। এই সময় পথের ধারের টেলিগ্রাফ-পোষ্ট্ পথিকের বড়ই উপকার করে। সমস্ত পথঘাট ঢাকা পড়িয়া যায়—পথ চিনিবার উপায় এই পোষ্টগুলি। কিন্তু খিরগিজ্ চালকেরা বলিল, শীতকালে যখন প্রবল ঝড় হয়, তখন এইখানে নিপুণ পথপ্রদর্শকেরাও পথ ভুল করে। কারণ তখন একটা টেলিগ্রাফের খুঁটি হইতে আর-একটা খুঁটি দেখা যায় না। এই সময় ঝড় থামা পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু পরিষ্কার রাত্রে এইসমস্ত পথ-প্রদর্শকেরা চোখ বন্ধ করিয়াও পথ বলিয়া দিতে পারে। আমার গাড়ী-চালক বহুদূরস্থিত কোন বস্তুকে দেখিয়া তাহা কি গাড়ী, কয় ঘোড়ার, কোনদিকে যাইতেছে, ঘোড়ার কি রং ইত্যাদি সবই বলিয়া দিতে পারিত। আমি কিন্তু দূরে, আকাশের শেষ কোণে কেবল ছোট একটা কিছু দেখিতে পাইতাম মাত্র। কিন্তু তাহা যে কি তাহা কখনই বলিতে পারিতাম না। আমার প্রদর্শক যাহা বলিত সবই মিলিয়া যাইত। এখন তাশকন্দ্ পর্য্যন্ত আমরা-ভারনবাগ রেলপথ নির্ম্মাণ করাতে রাস্তাটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাস্তাটিও নাই বলিলেই হয়।

১৮৯৭ সালে গোবি মরুভূমির মধ্য দিয়া একবার যাত্রা করিয়া ছিলাম। আমি কালগান হইতে কাইআখ্টা পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। এই পথটিও ১২০০ মাইল। এই সময় সাইবেরিয়ান্ রেলপথ কম্স্ক্ পর্য্যন্ত ছিল। সেই জন্য আমাকে স্লেজ্ ব্যবহার করিতে হয়। কাই-আখ্টা হইতে বৈকাল হ্রদের উপর দিয়া আমাকে স্লেজ্ করিয়া ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল।

কিন্তু গোবি মরুভূমির উপর দিয়া ভ্রমণ আমার চিরকাল মনে থাকিবে। সে এক অদ্ভুত গাড়ী। গাড়ীখানি ছোট—গাড়ীর সাম্‌নেই ঘোড়া নাই;—একটা লম্বা ডাণ্ডা, তাহাতে আড়াআড়িভাবে আর-একটা ডাণ্ডা, এই ডাণ্ডাকে পায়ের উপর রাখিয়া দুইজন সওয়ার ঘোড়ার লাগাম ধরে—সামনে আরো দুইজন ঘোড়সওয়ার, তাহাদের কোমরে নরম দড়ি বাঁধা—সেই দড়ি আগের ঘোড়সওয়ারদের শরীরে জড়ান থাকে। (ছবি দেখুন।) ১৫।২০ মাইল অন্তর ঘোড়া বদল হয়। একদল ঘোড়া ক্লান্ত হইলে—পাশ হইতে অন্য একদল সওয়ার আসিয়া গাড়ীর ডাণ্ডা পায়ের উপর তুলিয়া লয়। এই কার্য্যে ইহারা দক্ষ কেমন করিয়া যে এক নিমেষে এইসব করে তাহা বুঝা যায় না।

এসিয়াবাসীরা পথঘাট নির্ম্মাণ করিতে জানে না, কারণ ভগবান্ যখন মরুভূমির জন্য উট দিয়াছেন—পাহাড়পর্ব্বতের জন্য ঘোড়া দিয়াছেন তখন আর ভাল রাস্তা করিবার দরকার কি? (লেখক ভারতবর্ষ এবং এশিয়ার অন্যান্য বহু কালের সভ্যদেশ সম্বন্ধে এ কথা বোধ হয় বলিতেছেন না।)

আমি একবার একদল পথিকের সহিত ছদ্মবেশে তিব্বত প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলাম। জনপ্রাণীহীন পর্ব্বতের উপর দিয়া আমাদের পথ। মাঝে মাঝে বরফ জমিয়া আছে। রাস্তাও অতি বিপদ্জনক এবং সংকীর্ণ। কিছুদূর গিয়া আমি দুইজন মোঙ্গল অনুচরের সহিত দল ত্যাগ করিলাম। আমাদের সঙ্গে পাঁচটি খচ্চর, চারটি ঘোড়া এবং দুইটি কুকুর ছিল।

দ্বিতীয় দিনে আমরা দুইটি হ্রদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আড্ডা গাড়িলাম। এইখানে আমার ভেক এবং বেশ পূর্ণভাবে বদল করিতে হইল। রাত্রে হঠাৎ ভয়ানক ঝড় উঠিল। আমরা তাঁবুর মধ্যে কোনরকমে পড়িয়া থাকিলাম, হঠাৎ আমাদের পশুরক্ষক আসিয়া বলিল, "ডাকাত

ডাকাত আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম—কিন্তু তখন ডাকাতের দল আমাদের দুইটি ঘোড়া লইয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে—বন্দুকের গুলি ছুড়িলাম। ফলে ডাকাতেরা আরো বেগে পলায়ন করিল। ইহার পরে আমরা সব সময় সতর্ক পাহারা রাখিতাম – সেইসব রাত্রির কথা বেশ মনে আছে। আমরা পালা করিয়া পাহারা দিতাম। বৃষ্টিতে পথঘাট পূর্ণ শীতের হাওয়া তার মাঝে ভিজিতে ভিজিতে আমরা পশুদলকে পাহারা দিতাম। এইরকম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে সাচুট্সাঙ্‌পো নদী আমাদের পথে পড়িল। নদী তখন ঘোলাটে জলে পূর্ণ।

আমার সহচর সারএব লামা একটা খচ্চরে চড়িয়া আমার আগে আগে যাইতেছিল—সে নদীর কূলে আসিয়াই খচ্চর সমেত জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পিছনে আর-একটা খচ্চর ছিল, তাহার পিঠে কাপড়-চোপড় ইত্যাদির বাক্স বোঝাই করা ছিল। নদীর স্রোতের জোরে মাল সমেত খচ্চর ভাসিয়া গেল। ভাবিলাম সে আর ফিরিতে পারিবে না—কিন্তু একটু পরে দেখিলাম সে কোনমতে অপর পারে গিয়া উঠিয়াছে। আমিও জলে নামিয়া পড়িয়াছিলাম। মাঝে মাঝে জল আমার কোমর এবং ঘোড়ার গলা পর্য্যন্ত উঠিতেছিল—একবার আমার ঘোড়ার পা ফস্‌কাইয়া গেল। অনেক কষ্টে সে আমাকে লইয়া পরপারে পদার্পণ করিল।

কয়েকদিন পরে আমরা একজায়গায় গিয়া তাঁবু ফেলিলাম। সেখান হইতে দূরে আরো বারোটি তাঁবু দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। সকাল বেলার তিনজন তিব্বতী আসিয়া সারএব লামার সহিত কথা-বার্ত্তা বলিল। তাহারা একদল ইয়াক-শিকারীর নিকট শুনিয়াছিল যে একদল শ্বেতাঙ্গ তিব্বতের দিকে আসিতেছে। তাহারা আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনকে শ্বেতাঙ্গ বলিয়া সন্দেহ করিল।

রাত্রিবেলায় তাহারা আপনাদের তাঁবুর চারিদিকে ঘিরিয়া আগুন জ্বালিয়া পাহারা দিতে লাগিল। পরের দিন সকালে দেখিলাম চারিদিকে ঘোড়সওয়ার আসিতেছে, তাহারা তাহাদের তলোয়ার খুলিয়া আমাদের দেখাইয়া বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।

এম্‌নিভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা কাম্বা বোম্বো আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি আর এক পা তিব্বতের দিকে অগ্রসর হও, তবে তোমার গলা কাটা যাইবে।'

আমার আর ভরসা হইল না—তিনজনে বৃহৎ শত্রুদলের সঙ্গে লড়াই করা অসম্ভব বলিয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলাম।

বিজ্ঞান-গোয়েন্দা—

শার্লক্ হোম্‌স্ এবং দুপ্যাঁ দুইজন বিখ্যাত গোয়েন্দার কথা গল্পে পাঠ করিয়াছি। ঐ দুইজন অদ্ভুত উপায়ে অপরাধী চোর-ডাকাত-খুনেদের ধরিতে পারিতেন। দোষী ব্যক্তি এই পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন শার্লক্ হোম্‌সের হাত হইতে তাহার নিস্তার পাইবার জো নাই। এ সমস্ত গেল উপন্যাসের কথা। আমেরিকাতে এখন অপরাধী ধরিবার কাজে সত্যিকার শার্লক্ হোম্‌স্ হইয়া উঠিয়াছে বিজ্ঞান।

এখন অপরাধী এবং পুলিশ এই দুইজনে সব সময়েই যুদ্ধ চলিয়াছে। চোর-ডাকাতেরাও বিজ্ঞানের সাহায্য পুরা মাত্রাতেই গ্রহণ করিতেছে। এখন কে কাহারে কে জিতে বলা সহজ নয়।



আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত টিপ সই-বিশারদ
ফ্রেড্ স্যাণ্ড্‌বার্গ

চোর-ডাকাতেরা এখন মোটর, এয়ারোপ্লেন, মোটর-বোট ইত্যাদি সব-কিছুরই ব্যবহার করিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে অপরাধ-বিজ্ঞান গণিতশাস্ত্রের মত সঠিক হইয়া উঠিয়াছে।



জানলার সার্সিতে আঙুলের দাগ রাসায়নিক উপায়ে স্পষ্ট করা হইতেছে

কিছুদিন পূর্ব্বে নিউজার্সিতে একদল পুলিশ একজন পাকা-চোরকে ব্যাঙ্কলুঠের অপরাধে ধরিতে যায়। অপরাধীর দুয়ারে ধাক্কা দিবামাত্র সে দুয়ার খুলিল এবং পুলিসের দলকে দেখা মাত্র পিস্তলের গুলিতে দুইজনকে হত্যা করিল এবং আর-একজনকে বিষম আহত করিয়া বাড়ীর মধ্যে একটা গুপ্তস্থানে গিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ

গোয়েন্দা-ছাত্রদের মানুষ চিনিবার শিক্ষা দেওয়া হয়। কে কি রকম প্রকৃতির লোক তাহা জানিতে পারিলে তাহার সহিত সেইমত কথা-বার্ত্তা চালাইবার ব্যবস্থা করা সহজ হইয়া উঠে।



র‍্যাডিওতে চারিদিকে খবর ছড়ান হইবা মাত্র পুলিস মোটর সাইকেলে চড়িয়া অপবাধীর পিছন লইবে—সঙ্গে মেসিনগানও আছে

হাতে বন্ধ করিল বটে—কিন্তু কেমন করিয়া তাহাকে ধরা যায়—পুলিস দুয়ার খুলিতে গেলে মরিবার ভয় আছে, কারণ চোরের হাতে পিস্তল আছে এবং সে যে হত্যা করিতেও পিছপাও নয় তাহাও সকলে দেখিয়াছে। একমাত্র উপায় তাহাকে অনাহারে মৃতপ্রায় করিয়া ধরা—কিন্তু তাহাও বহুকালসাপেক্ষ। এইখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে চোরকে ধরা হইল। একজন গোয়েন্দা দুয়ারটাকে কোনরকমে একটু ফাঁক করিয়া চোর-কুঠরির মধ্যে একটা কাঁদন্‌-গ্যাসের বোমা ফেলিয়া দিল। একটু পরে চোর মহাশয় কাঁদিতে কাঁদিতে পুলিশের হাতে ধরা দিল।

শারীর-সংস্থান-বিজ্ঞান (anatomy), পদার্থ-বিজ্ঞান, এবং মনোবিজ্ঞান অপরাধ-বিজ্ঞানের বিশেষ সহায়।

মাটিতে পায়ের দাগ দেখিয়া, তাহা পরীক্ষা করিয়া অপবাধীর শরীর কিপ্রকার, সে লম্বা না বেঁটে ইত্যাদি অনেক-কিছুই বলা যায়।

পায়ের দাগ দেখিয়া অপরাধী ধরা শক্ত বটে, কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান তাহাও সম্ভব করিয়াছে। পায়েব মাপ দেখিয়া হয়ত কয়েকজন লোককে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করা হইল। তার পর মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে যথার্থ অপরাধীকে ধরা যাইবে।

ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান বর্ত্তমান গোয়েন্দাব একটি প্রধান অস্ত্র (আমাদের দেশের পণ্ডিত গোয়েন্দা এবং পুলিশের কথা বলিতেছি না—তাহারা কোন বিজ্ঞানের ধার ধারে না, কেবল লাঠি-বিজ্ঞান একটু আধটু প্রয়োগ করিতে পারে, তাও ভয়ে ভয়ে)।

কিছুকাল পূর্ব্বে নিউইয়র্কের একটি বড় ব্যাঙ্কের তোষাখানা হইতে একটি বহুমূল্য পুলিন্দা চুরি হয়। একজন গোয়েন্দার উপর চোর ধরিবার ভার পড়িল। যে চারজন লোক তোষাখানায় যাওয়া আসা করে গোয়েন্দা তাহাদের নিজেব ঘরে আনিল। ২০ মিনিট পরে অপরাধী তাহাব অপরাধ স্বীকার করিল।

মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এই কাজটি ঘটিল। অপরাধীকে সামনে বসাইয়া গোয়েন্দা নানারকম প্রশ্ন করিতে লাগিল অবশেষে প্রকৃত অপরাধী উপায়ান্তর না দেখিয়া অপরাধ স্বীকার করিল। সব লোককেই যে একরকম প্রশ্ন করিতে হয় এমন কোন আইন নাই। অপরাধীর প্রকৃতি বুঝিয়া তাহার সহিত সেইরকম কথাবার্ত্তা

পুলিসেব আরো নানাপ্রকার কাজ এইখানে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোন লোকের পিছু লওয়া, অপরাধীর চেহাবাব বর্ণনা জানা থাকিলে ভিড়ের মধ্যেও তাহাকে বাছিয়া লওয়া ইত্যাদি সবই শিখান হয়।

আঙ্গুলের দাগ হইতে অপরাধী ধরা পড়ে। নানা উপায়ে এই আঙ্গুলের দাগকে, জানালার কাচ, বা অন্ত কোন দ্রব্যের উপর স্পষ্ট করিয়া ফোটানো যায় এবং তাহার ফোটো তোলাও যায়। রেডিও ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এই দাগের এবং অনেক সময় অপরাধীর ছবিও, খুন বা ডাকাতি ঘটিবার কয়েক মিনিটেব মধ্যেই দেশের সমস্ত সহবে ছড়াইয়া দেওয়া যায়।



অপরাধী সত্য বলিতেছে কিম্বা মিথ্যা কহিতেছে তাহা এই কলে ধরা পড়িবে

রসায়ন এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র অপরাধী ধরিবার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করে। রক্তের দাগ ইত্যাদি, জালিয়াতের কালী এবং কাগজ পরীক্ষা এবং আরো অনেকপ্রকার আরক ঔষধাদি, যাহা অপরাধী ব্যবহার করে, তাহার পরীক্ষা অনুবীক্ষণ এবং রসায়নের সাহায্য বিনা

ধরাইয়া দিয়াছে। মাইক্রোস্কোপের নীচে ধরিলে বুঝিতে পারা যায় যে একজন লোকের বিভিন্ন কলে টাইপ করা কতকগুলি লেখার মধ্যেও যথেষ্ট সাম্য আছে। বিশেষ বিশেষ অক্ষরের উপর বিশেষ প্রকার চাপ বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

একপ্রকার কল আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে তাহা বেশ সহজে বুঝা যাইবে। কলটি সাক্ষীর বা অপরাধীর বুকে লাগাইয়া দিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে। মিথ্যা বলিলে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের এবং ফুস্‌ফুসের শব্দ এবং কার্য্য বদ্‌লাইয়া যাইবে। সত্য বলিলে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। যত বড় পাজী বা বদ্‌মায়েস হউক না কেন, কোন মিথ্যা বা তৈরী-করা কথা বলিতে গেলেই একটু মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়—এই চেষ্টা কলে ধরা পড়িয়া যায়।

তবে চোর ডাকাত এবং অপরাধীরাও চুপ করিয়া বসিয়া নাই—তাহারাও পুলিস এবং গোয়েন্দা ঠকাইবার জন্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিতেছে। এখন বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে লড়াই চলিতেছে।

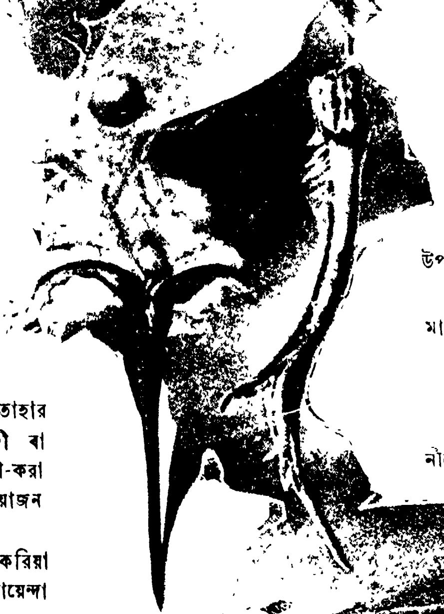
চলন্ত-চিত্রে পোকামাকড়—

পোকামাকড়রা কোন দিন মনে করে নাই যে মানুষ একদিন বায়স্কোপের জন্য তাহাদের ছবি তুলিবে। পোকামাকড়দের জীবনধারণ-প্রণালী, তাহাদের ঘরবাড়ী তৈরী কেমন করিয়া হয়, তাহারা কেমন করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করে ইত্যাদির ছবি তোলা হইয়াছে। বায়স্কোপের ছবিতে এইসব পোকামাকড় হাজারগুণ বড় দেখায়—তাহাদিগকে ভীষণ দৈত্য বলিয়া মনে হয়।

মাকড়সার ছবি অতি ভয়ানক দেখায়। তাহার জালের এক প্রান্তে সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তার পর মাছি পড়িলে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইয়া মাছিকে চিরবন্দী করে তাহা দেখিবার জিনিষ। যখন পোকা-মাকড়কে আক্রমণ করে, তখন মাকড়-সাকে অতিশয় সাহসী এবং বীর বলিয়া মনে হয়; কিন্তু জালের কাছে মানুষ দেখিলে মাকড়সা আর অগ্রসর হয় না—জাল হইতে দূরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

পোকামাকড়ের ছবি তোলা বড় শক্ত ব্যাপার। আলোর তেজ যদি সামান্য বেশী হয়, তাহা হইলে পোকারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে অথবা দূরে সরিয়া যাইবে। এমন পোকাও আছে যাহারা তীব্র আলোকে মরিয়া যায়, অথবা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়—সেইজন্য এইসব পোকামাকড়দের ফিল্ম্‌ তুলিবার জন্য একপ্রকার ঠাণ্ডা বাতি ব্যবহার হয়। পোকামাকড়ের আবাস







উপরে- কেজো মৌমাছির লোমশ মাথা

মাঝখানে— বাঁমদিকে, মৌমাছির থলি

ডানদিকে, মৌমাছির জিহ্বা

নীচে— লাল পিঁপড়াকে পাশ হইতে কেমন দেখায়

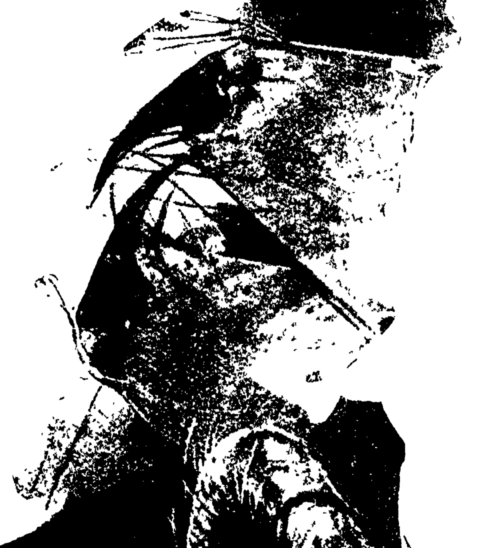
তাহাতে আলোকিত হয়—কিন্তু তাহারা ভয় পায় না। পোকা-মাকড়েব ছবি তোলার আরো নানাপ্রকার অসুবিধা আছে। ক্যামেরার "ফোকাস" ঠিক-করা ভয়ানক শক্ত ব্যাপার।

এই পোকামাকড়ের ফিল্ম্ দেখিয়া আমরা অনেক-কিছু নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারিব। পোকামাকড়জগতেব ঘটনা আমাদের চোখের সামনে সহজে ফুটিয়া উঠিবে। অনেকে মাকড়সা দেখিতে খারাপ বলিয়া হত্যা করে—কিন্তু নানাপ্রকার কীটপতঙ্গ হত্যা করিয়া মাকড়সা মানুষের অনেক কল্যাণ করে। পোকা-মাকড়েরা মানুষের মত স্বার্থপর নয়, তাহারা পরস্পরের সহ-যোগিতা অনেক বিষয়েই করে। তাহারা নিজ জাতিদেব সাহায্যও অনেক করে। তাহাদের কার্য্য দেখিলে তাহা-দিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হয়।

পোকামাকড়ের ফিল্ম দেখিয়া আমরা যথেষ্ট নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে পারিব।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়







উপরে—মাইক্রোস্কোপে মাকড়-সাকে যেমন দেখায়

মাঝখানে—মাকড়সার ভয়ানক ঠোঁট

নীচে—মাকড়সার মাথার এবং মুখের সম্মুখদৃশ্য

রাজপথ

[১৫]

একটা বিশেষ কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে সুরেশ্বরকে কয়েকদিনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সে তাহার তাঁতঘরের জন্য একজন সুদক্ষ তাঁতী লইয়া আসে। সে কয়েকদিন ধরিয়া তিনজোড়া সূক্ষ্ম খদ্দরের শাড়ীতে বিচিত্র পাড় তৈয়ার করিতেছিল। শাড়ীগুলি তাঁত হইতে নামার পর সুরেশ্বর তিন জোড়াই গৃহে লইয়া আসিল।

মাধবী গৃহকার্য্যে রত ছিল। সুরেশ্বর অন্বেষণ করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া বলিল, "মাধবী, দেখ্ দেখি, বিশ্বাস হয় কি যে এ আমাদের তাঁতে বোনা কাপড় ?"

মাধবী বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "সত্যি দাদা, চমৎকার হয়েছে! ঢাকাই শাড়ীর পাড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন হয়নি।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "ঢাকার কারিগর দিয়ে কাজ করালে ঢাকাই শাড়ীর চেয়ে খারাপ কেন হবে রে ?"

সপ্রশংস নেত্রে কাপড়গুলি নাড়িতে নাড়িতে মাধবী বলিল, "কত করে' পড়্তা পড়্ল দাদা ?"

সুরেশ্বর বলিল, "দশটাকা সাত আনা জোড়া।"

মনে মনে হিসাব করিয়া মাধবী কহিল, "তা হলে এগার টাকা বার আনা বিক্রী। তা মন্দ কি ? সস্তাই ত হ'ল দাদা। তিন জোড়াই দোকানে পাঠিয়ে দাও, আজই বিক্রী হয়ে যাবে।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "একজোড়া তোর জন্যে রাখ্‌ব মাধবী।"

মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, দাদা, এত ভাল কাপড় বাড়ীতে রেখে কি হবে ? একে ত মেয়েরা খদ্দর পর্‌তেই চায় না—এ রকম ভাল কাপড় পেলে তবু একটু পর্‌তে চাইবে।"

সুরেশ্বর কহিল, "তা হোক মাধবী, খদ্দর ভিন্ন তুই যখন আর কিছু পরিস্‌নে, একজোড়া ভাল কাপড় থাকা দর্‌কার। কোথাও যাওয়া আসা আছে।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা ছাড়া বিপিন বোসের বাড়ী থেকে যদি কেউ তোর তল্লাসে আসে তখন ত একটা ভাল কাপড় চাই!"

বিপিন বোসের বাড়ীর উল্লেখে মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রহস্য এইটুকু ছিল যে বিপিন বোস নামে কোনও প্রৌঢ় ধনী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পত্নী হারাইয়া তৃতীয় বারের জন্য বিহ্বল হইয়া মাধবীর পাণিগ্রহণের প্রয়াসী হইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল সুরেশ্বর তাহাকে আসন গ্রহণেরও অবসর দেয় নাই, কিন্তু তদবধি সুবিধা পাইলেই সে বিপিন বোসের উল্লেখ করিয়া মাধবীকে ক্ষেপাইতে ছাড়িত না।

মাধবী আরক্ত-স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া কপট ক্রোধের সহিত কহিল, "ফের যদি ও-কথা বল্‌বে দাদা তাহলে ভাল হবে না বল্‌ছি!" তাহার পর সহসা কোথাকার কোন্ সূত্র কেমন করিয়া অবলম্বন করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদা, একজোড়া কাপড় সুমিত্রাকে দাও না কেন ?"

এবার সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইল। বিপিন বোসের কথার উত্তরে সুমিত্রার কথায় এমন একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ব্যক্ত ছিল যে সুরেশ্বর কোনরূপেই তাহা হইতে রক্ষা পাইল না। সে লজ্জিত মুখে কহিল, "সুমিত্রাকে দিয়ে কি হবে ?" তাহার পর তাড়াতাড়ি কহিল, "তা দিলেও হয়। তবে বিনামূল্যে নয়; বিক্রী কর্‌তে হবে। এখন তার এমন একটু রং ধরেছে যে পয়সা দিয়েও বোধহয় একজোড়া খদ্দর কিন্‌তে পারে।"

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "তবে তাই ভাল, পরখ করে' দেখ কেনে কি না।"

কয়েকদিন পূর্ব্বে সুমিত্রাকে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিতে দেখিয়া সুরেশ্বর আনন্দ প্রকাশ করিলে সুমিত্রা সদর্পে যে কথা বলিয়াছিল তাহা সুরেশ্বরের মনে পড়িল। একবার মনে হইল এত শীঘ্র পরীক্ষা করিতে যাওয়া হয়ত নিরাপদ

হইবে না। প্রতিযোগিতার কথা একবার কোনরূপে মনে হইলে সুমিত্রা প্রবলভাবে প্রতিকূল হইয়া উঠিবে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লোভ আশঙ্কাকে পরাজিত করিল।

অপরাহ্নে সুরেশ্বর একজোড়া শাড়ী লইয়া সুমিত্রাদের গৃহে উপস্থিত হইল। সুরমা কয়েক দিন হইতে শ্বশুরালয়ে গিয়াছে। জয়ন্তী দ্বিপ্রহরে কোনও আত্মীয়ের গৃহে গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। এবং প্রমদাচরণ তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

সুরেশ্বরের আগমন-সংবাদ পাইয়া সুমিত্রা বাহিরে আসিল।

সুমিত্রাকে দেখিয়া সুরেশ্বর করযোড়ে নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল,—"আজ আর অভ্যাগত নই; আজ আমি ব্যবসাদার, বিক্রি কর্‌তে এসেছি।"

সুমিত্রা স্মিতমুখে ঔৎসুক্য সহকারে কহিল, "তাই নাকি? কই দেখি কি বিক্রী কর্‌তে এসেছেন?" তাহার পর সুরেশ্বরের পার্শ্বে রক্ষিত বস্ত্রের বাণ্ডিলটা দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া লইয়া বলিল, "এই বুঝি? খুলে দেখ্‌ব?"

"দেখুন।"

বাণ্ডিল খুলিয়া খদ্দরের শাড়ী দেখিয়া প্রথমটা সুমিত্রার মুখ ঈষৎ মলিন হইয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই সে হাস্যপ্রফুল্লমুখে কহিল, "চমৎকার শাড়ী ত! এ কি আপনার তাঁতে বোনা?"

সুরেশ্বর হৃষ্টমুখে কহিল, "হ্যাঁ, আমাদের তাঁতেই বোনা। কাপড়টা বাস্তবিকই ভাল হওয়াতে একজোড়া আমার বোন মাধবীর জন্যে কিনেছি। আর একজোড়া আপনার জন্যে এনেছি। যদি ইচ্ছা হয় বা দর্‌কার থাকে ত রাখ্‌তে পারেন।" বলিয়া সুরেশ্বর উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ঠিক ব্যবসাদারের মত কথাগুলো বল্‌ছিনে?"

স্মিতমুখে সুমিত্রা কহিল, "যখন দরদস্তুর কর্‌বেন তখন বুঝ্‌তে পার্‌ব ব্যবসাদারের মত কথা কন্ কি না; এখন ত বিশেষ কিছু বুঝ্‌তে পারছিনে।" তাহার পর বস্ত্রাংশে বিদ্ধ একখণ্ড কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "এই কি দাম?"

সুরেশ্বর কহিল, "হ্যাঁ।"

"একখানা কাপড়ের, না জোড়ার?"

"জোড়ার।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "জোড়ার? খুব সস্তা ত! একখানা কাপড়ের এই দাম হলেও আমি সস্তা মনে কর্‌তাম।" তাহার পর আরক্ত মুখে ইতস্ততঃ ভাবে কহিল, "কিন্তু এত সস্তা হলেও আমার নেওয়ার পক্ষে অসুবিধা আছে।"

সুরেশ্বর মৃদুস্মিতমুখে কহিল, "তা হলে বিনামূল্যে নিলে যদি অসুবিধা না হয়, তাই নিন!"

একটা কথা সুমিত্রার জিহ্বাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তাতে আপনার লাভ কি হবে?"

সুরেশ্বর তেমনি স্মিতমুখে সহজ ভাবে বলিল, "লাভ কি সংসারে একই রকম আছে? টাকা আনা পয়সার লাভটাও লাভ বটে, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় সবচেয়ে মোটামুটি লাভ। মানুষের হিসাবের খাতা শুধু যে কাগজেই তৈরী হয় তা নয়।"

সুমিত্রার আনত-আরক্ত মুখে সিঁদুরিয়া মেঘে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে সে কহিল, "কিন্তু সে রকম হিসাবের খাতা ত আমারও থাক্‌তে পারে।"

উৎফুল্ল হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা যদি থাকে তা হলে ত কোন গোলই নেই! অনুগ্রহ করে' কাপড় জোড়া গ্রহণ করে' দয়ার হিসাবে কিছু খরচ লিখে দিন।"

এবার সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "কথায় আপনার সঙ্গে ত পার্‌বার যো নেই!"

সুরেশ্বর সহাস্য মুখে কহিল, "তা যদি না থাকে ত কাপড় জোড়া রেখে যাই?"

মাথা নাড়িয়া সুমিত্রা বলিল, "না।"

"কেন, আত্মমর্য্যাদায় বাধ্‌বে?"

"বাধ্‌তে পারে। বাধা কি অন্যায়?"

"না, অন্যায় নয়, যদি না আত্মমর্য্যাদার চেয়েও বড় কিছু জিনিষ মনের মধ্যে প্রবল থাকে!"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ পাংশু হইয়া

গেল। আত্মমর্য্যাদার চেয়ে বড় জিনিষের দ্বারা সুরেশ্বর কোন্ জিনিষ বুঝাইতে চাহে তাহা মনে মনে অনুমান করিয়া তাহার বিস্ময়চকিত চিত্ত প্রবল উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল। কথা না কহিয়া নীরব থাকিলে অবস্থাটাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোলা হইবে বুঝিতে পারিয়াও সে নতনেত্রে বাক্যহারা হইয়া বসিয়া রহিল।

সুমিত্রার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখ্‌ছি আপনাকে ভারি বিব্রত করে' তুলেছি; কিন্তু দেশ কি রকম বিব্রত সেটা মনে করে' আশা করি আমার আজকের এ উৎপীড়নটুকু ক্ষমা কর্‌বেন।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। সে আর্ত্ত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা আমাকেই আপনি কর্‌বেন, কারণ আপনার এ সামান্য উপরোধটুকু রাখ্‌তে পার্‌লাম না। কিন্তু কেন পার্‌লাম না, তা শুন্‌বেন কি?"

অনুৎসুকভাবে সুরেশ্বর বলিল, "যদি আপত্তি না থাকে ত বলুন।"

সুমিত্রা বলিল, "আপনার এ কাপড়খানা কিন্‌তে হলে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাবা বিপন্ন হবেন, এ ত আপনি জানেন। আমার নিজের ত আলাদা পয়সা নেই।"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "চেষ্টা কর্‌লে আপনি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারেন, কিন্তু এ বাড়ীতে সেটা সম্ভব হবে না।"

এই অপবাদে আহত হইয়া সুমিত্রা প্রশ্ন করিল, "কি সম্ভব হবে না, সুরেশ্বর-বাবু?"

সুরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, "নিজে উপার্জ্জন করে' দাম দেওয়া সম্ভব হবে না। আমরা চরকা বিক্রী করি, ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি একটা চরকা নিয়ে সুতো কেটে অনায়াসে তাই থেকে কাপড়ের দামটা শোধ কর্‌তে পারেন। আমার বোন মাধবী বোধ হয় পনের দিন চরকা কেটে এরকম একজোড়া কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সুমিত্রা কহিল, "আপনার বোন হয় ত পারেন, কিন্তু আমি পারিনে।"

সুরেশ্বর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "তা যেন পারেন না কিন্তু আলাদা পয়সা আপনার থাক্‌লে কি কর্‌তেন? কিন্‌তেন?"

সুরেশ্বরের এই সুদূরপ্রসারী দুর্নিবার অনুসন্ধিৎসা সুমিত্রার ভাল লাগিল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বিরক্তি-বিরূপ মুখে বলিল, "তা জেনে কি হবে আপনার?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "আর কিছু না হোক একটা কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।"

আরক্ত মুখে সুমিত্রা কহিল, "আমাকে আপনাদের দলে টান্‌তে পেরেছেন কি না এই কৌতূহল ত? আচ্ছা, আমাকে দলে টান্‌তে পার্‌লেই কি আপনাদের স্বরাজ লাভ হবে?"

সুরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল, "সবটা হবে না; আপনি যতটুকু আট্‌কে রেখেছেন ততটুকু হবে।"

এই তিরস্কারের আঘাতে ও অপমানে সুমিত্রার কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। সে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "দেখুন সুরেশ্বর-বাবু, স্বদেশী প্রচার করা যদি আপনার ব্রত হয় তা হলে এবাড়ীর আশা আপনি ত্যাগ করুন। এ বাড়ীতে আপনি কিছু কর্‌তে পার্‌বেন না।"

শুনিয়া সুরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "বাইরের আকার যদি সব সময়েই ভিতরের অবস্থার পরিচয় হ'ত তা হলে বারুদের ভিতর থেকে কখনও অগ্নিবর্ষণ হোত না। অতএব আপনাদের বাড়ী দেখে আশাহীন হবার কোন কারণ নেই। স্বদেশী প্রচার যদি আমার ব্রত হয় তা হলে জান্‌বেন আপনা-দের বাড়ীতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না, উদ্‌যাপনই হবে। আচ্ছা, তা হলে আসি।" বলিয়া সুরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই সময়ে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ একবার দেখিয়া লইয়া সুরেশ্বরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "স্বদেশী প্রচার যে তোমার

ব্রত নয় তা আমি জান্‌তে পেরেছি, সুরেশ্বর; কিন্তু কেন তুমি আমাদের পিছনে এমন করে' লেগেছ বল দেখি, আমাদের ত কোন অপরাধ নেই। চোর আমরা নই, কিন্তু তুমি যদি আমাদের চোর বানিয়ে বিপদে ফেল্‌তে চেষ্টা কর তাতে কি তোমার ভাল হবে?"

সুরেশ্বর বিকট-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া ক্ষণকাল জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "আমি ত এসব কথার মানে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে!"

জয়ন্তী তেমনি উদ্ধত ভাবে কহিলেন, "আচ্ছা মানে তোমাকে আমি পরে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এইটাই কি তোমার উচিত হচ্ছে? এই সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন এসে আমার মেয়েকে এমন করে' ক্ষেপিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করা? সে ত আর ছেলেমানুষ নয়, আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে!"

এই দূষিত অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে কোনও প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, "যখন-তখন আসি, তা বলা যায় না, কারণ অধিকাংশ স্থলেই আপনারা যখন ডেকেছেন তখন এসেছি। কিন্তু তার পরে আপনার যা অভিযোগ তার কোন উত্তর আমি দিতে চাইনে।"

"আচ্ছা, তা না চাও নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি কোন উত্তর দেওয়া দর্‌কার মনে কর না?" বলিয়া জয়ন্তী একখানা রেজেষ্ট্রি-করা খাম সুরেশ্বরের হস্তে দিয়া কহিলেন, "চিঠিখানা পড়ে' দেখ।"

সুরেশ্বর খাম হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া আদ্যন্ত পাঠ করিল, এবং পাঠান্তে পুনরায় খামের মধ্যে পূরিয়া জয়ন্তীকে প্রত্যর্পণ করিয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, "আপনি ত এসব বিশ্বাসই করেছেন। কিন্তু আপনিও কি একথা বিশ্বাস করেন?" বলিয়া সে সুমিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সুমিত্রা তাহার বেদনাহত ব্যথিত মুখ কোনও প্রকারে উত্থিত করিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "কি কথা বলুন?"

"এই চিঠির কথা? অর্থাৎ আমি একজন গোয়েন্দা, 'স্পাই'; আমার এই খদ্দরের পোষাক ছদ্মবেশ, আর আমার স্বদেশ-প্রেম লোককে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্যে কপট অভিনয়?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "না, আমি এর একবর্ণও বিশ্বাস করিনে! কিন্তু আপনি গোয়েন্দা হয়ে কপট অভিনয় কর্‌লেও আমার প্রাণে যেটুকু স্বদেশ-ভক্তি জাগিয়েছেন তা খাঁটি জিনিস; তার জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

জয়ন্তী সুমিত্রার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "মিছামিছি বাচালতা কোরো না, সুমিত্রা!"

সুমিত্রা সে কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন সুরেশ্বর-বাবু সে কথা আমি একটুও ভুলিনি। কিন্তু আমি আজ আপনাকে তার চেয়ে অনেক বেশী অপমানের হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। এবাড়ীতে আর আপনি আস্‌বেন না তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু দয়া করে' একটা ভাল চর্‌কা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আপনার উপদেশ-মত কাপড়ের দাম শোধ কর্‌ব। কাপড়টা আমাকে দিয়ে যান।" বলিয়া সুরেশ্বরের হস্ত হইতে সুমিত্রা বস্ত্রের বাণ্ডিলটা টানিয়া লইল।

সুমিত্রার এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া সুরেশ্বরের মুখ হর্ষে এবং বিস্ময়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে শান্ত-স্মিতমুখে বলিল, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন সুমিত্রা! তুমি যেমন করে' আজ আমার মান রাখ্‌লে এর বেশী আর কি করে' রাখা যায় তা আমি জানিনে! তুমি শুনে রাখ, আমার মনে আর কোন দুঃখ কোন গ্লানি নেই! সেদিন তোমার খদ্দর-পরা অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখে যে আশা জেগেছিল তা যে এত শীঘ্র এমন করে' সফল হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভুলো না সুমিত্রা, আমাদের দেশের বড় দুরবস্থা! তুমি শুধু তোমার জননীরই কন্যা নও, দেশমাতারও তুমি কন্যা।"

তাহার পর জয়ন্তীর দিকে ফিরিয়া সুরেশ্বর বলিল,

"দেখুন, আমি বাস্তবিকই গোয়েন্দা নই; গোয়েন্দার চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী।— একজন দীন দরিদ্র স্বদেশ-সেবক! আপনি আমার উপর যে কারণেই হোক বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু তবুও দয়া করে' আমার একটা প্রণাম নিন্। কারণ, আপনি সুমিত্রার মা!"

তাহার পর নত হইয়া জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া সুরেশ্বর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

[১৬]

দাহ এবং দীপ্তি একসঙ্গে লইয়া তুবড়ি যেমন করিয়া জ্বলিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া সুরেশ্বরের মন বেদনা ও আনন্দ একসঙ্গে বহন করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অপমানের গ্লানিতে যাহা একদিকে নিদারুণভাবে পুড়িতে থাকিল, আনন্দের প্রভায় তাহাই অপরদিকে ভাস্বর হইয়া উঠিল! পথে বাহির হইয়া সুরেশ্বর মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট্ অতিক্রম করিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ পার হইয়া বেচু চেটার্জীর ষ্ট্রীটে বিমানবিহারীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু ক্ষণমাত্র তথায় দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইবা মাত্র একটা দক্ষিণগামী ট্রাম-গাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

কর্জ্জন-পার্কে সুরেশ্বর যখন প্রবেশ করিল তখন শীতকালের সন্ধ্যার ধূসর আবরণে চারিদিক্ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, এবং সেই অস্পষ্টতার মধ্যে চতুর্দ্দিকে ক্রম-বর্দ্ধনশীল দীপাবলি নীলাম্বরীর গাত্রে চুম্‌কির মত একে একে ফুটিয়া উঠিতেছিল। বাগান তখন জনবিরল হইয়া আসিয়াছিল, কাজেই সুরেশ্বর সহজেই একটা শূন্য বেঞ্চ্ অধিকার করিয়া উপবেশন করিল।

উত্যক্ত কর্ণ এবং উত্তপ্ত চক্ষুকে রাজপথের কোলাহল এবং দৃশ্যবৈচিত্র্যের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সুরেশ্বর তাহার অধীরোদাত্ত হৃদয়কে কতকটা শান্ত করিয়া লইল। প্রজ্বলিত অঙ্গার যেমন ধীরে ধীরে তাহার কৃষ্ণবর্ণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রভাময় হইয়া উঠে, তাহার চিত্ত ঠিক সেইরূপে জয়ন্তী-প্রদত্ত মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া সুমিত্রার কল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আজ সে সুমিত্রার নিকট হইতে যে মহামূল্য সম্পদ্ লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহা যে শুধু লাভ করিয়াছে তাহাই নয়, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া লাভ করিয়াছে। প্রহরী স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে রাজনন্দিনী তাহার কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিয়াছে! নিমজ্জিত চিত্তে সুরেশ্বর সুমিত্রার সেই রোষদীপ্ত আরক্ত মূর্ত্তি এবং অকুণ্ঠিত সতেজ বাক্য স্মরণ করিতে লাগিল, এবং যতই স্মরণ করিতে লাগিল ততই সুমিত্রার সেই প্রদীপ্ত সুন্দর মূর্ত্তি তাহার সংগ্রাম-সাধনার বিজয়বধূর মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। মনে হইল আজ তাহার তপস্যার শুষ্ক কঠোর প্রাঙ্গণে সিদ্ধি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার তৃণ-মৃত্তিকার দেবী-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার হইয়াছে!

সুরেশ্বরের এই অপরিমিত আনন্দ অকারণ নহে, এবং সুমিত্রার নিকট হইতে সে যতটুকু লাভ করিয়াছে তাহাতেই পরিনিবদ্ধ নহে। যে অখণ্ডের বোধ অতীন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়ের মধ্যে নিত্য-বর্ত্তমান আছে, মানুষ খণ্ডের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার সন্ধান পায়। রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির মত সুরেশ্বর সুমিত্রার মধ্যে বিশ্ববিজয়িনী অচিন্তনীয় মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। বাঙ্গালা দেশের পাঁচকোটি নরনারীর মধ্যে একটি মাত্র ডেপুটি-দুহিতার চিত্তজয়ের মতই অদ্যকার ঘটনা সামান্য বলিয়া তাহার মনে হইল না।

সমস্ত গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইয়া লঘুচিত্তে সুরেশ্বর যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন মাধবী একরাশ তুলা লইয়া পাঁজ প্রস্তুত করিতে করিতে আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছিল। সুরেশ্বর তাহার কঠিন নাগরা জুতা নিম্নতলেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, দূর হইতে মাধবীকে অতি নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সন্তর্পণে নিকটে আসিয়া তাহার বেণী ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিয়া মাধবী কহিল, "তা বুঝ্‌তেই পেরেছি যে দাদা ভিন্ন আর কেউ নয়।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই ত! দাদা বুঝ্‌তে পার্‌লে লোকে অতখানি চমকে ওঠে কিনা!"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "দাদা বুঝ্‌তে পার্‌লেও লোকে

চম্‌কে ওঠে ! বোঝা আর চম্‌কানোর মধ্যে ভাব্‌বার সময় থাকে না !" তার পর সুরেশ্বরের সানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "তোমায় যে এত খুসী দেখ্‌ছি দাদা ? সুমিত্রা কাপড়-জোড়া কিনেছে বুঝি ?"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "তা কিনেছে, কিন্তু শুধু কেনেই নি মাধবী, খুব ভাল রকম দাম দিতে রাজী হয়েছে !"

মাধবী আগ্রহ সহকারে বলিল, "কি রকম শুনি ?"

সুরেশ্বর কহিল, "বলেছে চরকায় নিজে সুতো কেটে, সুতো বিক্রী করে' দাম শোধ কর্‌বে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া মাধবীর মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল।—"একেবারে এতটা উন্নতি ! এত বিশ্বাস হয় না দাদা, অতিভক্তি নয় ত ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "না রে, না, তা নয়। কয়লার খনির মধ্যে সুমিত্রাকে পাওয়া গিয়েছে বলে'ই মনে করিস্ নে যে সে আসল হীরে নয়। ভগবান্ তাকে ছিল্‌তে আরম্ভ করেছেন ; এরি মধ্যে সে চক্‌চকে হয়ে উঠেছে !"

মাধবী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, দাদা, সুমিত্রার মা কোনরকম আপত্তি কর্‌লেন না ? তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন ?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "ছিলেন বই কি ! তিনি ছিলেন বলে'ই ত হ'ল রে ; নইলে কাপড়-জোড়া ত ফিরিয়েই নিয়ে আস্‌ছিলাম।"

সবিস্ময়ে মাধবী কহিল, "কেন ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "শুন্‌লে মনে হয়ত দুঃখ পাবি তাই ভেবেছিলাম সব কথাটা তোকে বল্‌ব না। কিন্তু এতটা যখন শুন্‌লি তখন সবটাই শোন্।" বলিয়া সুরেশ্বর অনুপূর্ব্বকাহিনী মাধবীকে খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া মাধবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর বলিল, "দেবতাকে দানব বল্‌লে যে পাপ হয় তোমাকে 'স্পাই' বল্‌লে সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা শুনে দুঃখ খুবই পেলাম। কিন্তু একদিন এ দুঃখ নিশ্চয়ই যাবে। কবে, জান দাদা ?"

সুরেশ্বর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে ?"

ক্রুদ্ধ স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "যে দিন তুমি সুমিত্রাকে এবাড়ীতে নিয়ে আস্‌বে সেই দিন !"

গভীর বিস্ময়ে সুরেশ্বর কহিল, "আমি সুমিত্রাকে এ বাড়ীতে নিয়ে আস্‌ব ? কেমন করে' মাধবী ?"

মাধবী তাহার আরক্ত মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া বলিল, "বিয়ে করে' !"

"বিয়ে করে' ?"—অপরিমেয় বিস্ময়ে সুরেশ্বর ক্ষণ-কাল স্তব্ধ হইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পুনরায় মাধবীর বেণী নাড়িয়া দিয়া বলিল "তোর মত আর একটি পাগল যদি ভূভারতে থাকে মাধবী ! বিয়ে করার যে প্রথা আজকাল চলিত আছে সে প্রথায় ত সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি আগেকার রাক্ষুসে প্রথায় গভীর রাত্রে প্রমদা-বাবুর বাড়ী গিয়ে যুদ্ধ করে' সুমিত্রা-হরণ করি ত স্বতন্ত্র কথা ! কিন্তু তা' ত হবে না। জানিস্ ত আমাদের মন্ত্র হচ্ছে অনুৎপীড়ক অসহযোগ।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

মাধবী কহিল, "তা আমি জানি নে ; কিন্তু এ তুমি দেখে নিয়ো দাদা, সুমিত্রার মাকে একদিন তোমাকেই বরণ করে' ঘরে তুল্‌তে হবে। আমার কথা সেদিন তুমি মনে কোরো।"

আরও কয়েকবার মাধবীকে পাগল বলিয়া, এবং আরও কয়েকবার তাহার বেণী আকর্ষণ করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল। কিন্তু লৌহ যেমন চুম্বকের দেহ-সংসক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে মাধবীর বাক্য সেদিন সুরেশ্বরের চিত্তে আট্‌কাইয়া রহিল, শুধু জাগ্রতাবস্থায় নহে, নিদ্রার মধ্যেও।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



দময়ন্তী

চিত্রকর শ্রীউমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

অদৃষ্ট-চক্র

১ম পরিচ্ছেদ

স্বাগত

গলায় বগ্‌লশ-আঁটা, বৃহৎ, বলিষ্ঠকায় একটা কুকুর নবদ্বীপের ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। সন্ধ্যা হইয়াছে। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের আলো জ্বালা হইতেছে, গাড়ী আসিতে বিলম্ব নাই। লোক-সমাগমে ষ্টেশন সর-গরম।

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইলে লোকজন নামা-ওঠা করিতে লাগিল, কুলী ডাকিতে লাগিল, গাড়ী খুঁজিতে লাগিল, নানারূপ ফেরীওয়ালা নানাছাঁদে হাঁকিতে লাগিল,—কুকুরটা ব্যস্তভাবে শুঁকিতে শুঁকিতে গাড়ীর ধারে ধারে পাশ কাটাইয়া চলিল—যেন কাহার সন্ধান করিতেছে। এমন সময় সকল কোলাহল ছাপাইয়া কে ডাকিল—"জোসেফ্"।

কুকুরটা তৎক্ষণাৎ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। ছুটিয়া গিয়া নাচিয়া, লাফাইয়া, এক শ্যামবর্ণ নধরকান্তি বলিষ্ঠ-কায় যুবকের গায়ে ভর দিয়া উঠিয়া, তাহার মুখের দিকে মুখ বাড়াইয়া, লেজ নাড়িয়া, নানা ভঙ্গীতে আদর ও অভ্যর্থনা জানাইতে লাগিল। যুবক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া, ঘাড় চাপ্‌ড়াইয়া হুকুম করিল—"আগে সেলাম।"

অমনি সেই বৃহদাকার কুকুরটা যুবকের সামনে পায়ের উপর মাথাটা নোয়াইয়া দিল। পর মুহূর্ত্তেই উঠিয়া হাঁ করিয়া প্রভুর প্রতি চাহিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল।

যুবক হাতের ব্যাগ হইতে একটা ছোট লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর রাখিয়া হুকুম করিল—"বাড়ী চল"। জোসেফ তৎক্ষণাৎ আলোটা মুখে তুলিয়া লইয়া রেল-লাইনের ধারে ধারে আগে আগে চলিল।

২য় পরিচ্ছেদ

প্রভাবতীর বড় সুখ

মণিলাল আজ বড় হৃষ্টচিত্তে বাটী আসিতেছিল। তাহার বন্ধু ব্রজগোপাল টেলিগ্রাম করিয়াছে যে নির্ব্বিঘ্নে তাহার একটি পুত্রসন্তান প্রসূত হইয়াছে। কত ভাবনাই যে ছিল! প্রভাবতীর পিতৃকুলে এমন কেহ নাই যে এই প্রথম বারটির জন্যও লইয়া যায়। আর মণিলালের সংসারে তো কেবল মাত্র প্রভাবতী আর জোসেফ্। একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল আর তাহার স্ত্রী।

কলিকাতায় কর্ম্ম করিতে হয়,—উকীলের মুহুরীগিরি। বাল্যকালে পড়া-শুনা বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান। তাহার উপর কুকুরটা যেদিন নিঃসহায় শৈশবে, শীতের রাত্রে, করুণ ক্রন্দনে প্রাণ আকৃষ্ট করিল, সেদিন হইতে লেখাপড়া একেবারে মাথায় উঠিল। তাহাকে খাওয়ান ধোয়ান, কসরৎ শিখান-তেই সকাল-সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। অবশ্য জোসেফের দ্বারা এখন তদনুরূপ উপকার পাওয়া যায়। সে দিবারাত্র যমদূতের মত বাড়ী পাহারা দেয়, ছাতে জিনিষপত্র শুকাইতে দিলে আগুলিয়া বসিয়া থাকে,—হনুমানের উৎপীড়ন হইতে গাছ পালা রক্ষা করে,—চিঠি লিখিয়া দিলে ডাকঘরে গিয়া সামনের পা-দুটা তুলিয়া ডাকবাক্সে ফেলিয়া আসিতে পারে, এমনি কত কি করে। আদরও পাইত সে যথেষ্ট। স্বামী-স্ত্রীতে যেন একটা সন্তানের মত তাহার যত্ন করিত। আর প্রভাবতীর সতের-আঠারো বৎসর বয়স হইল এত দিনেও সন্তান কোলে পায় নাই।

প্রভাবতীর বড় সুখ, ভরা যৌবনে একটা মাধুরী যেন দেহটাতে আঁটিয়া উঠিতেছে না, স্বামীর সোহাগ—অপর্য্যাপ্ত, গৃহের একমাত্র অধীশ্বরী—গরীব গৃহস্থের পক্ষে টাকাকড়িও রোজগার মন্দ হইত না, তাহার উপর আবার ভগবান্ তাহার কোলে আজ এ কী উপহার পাঠাইলেন! এ আসিয়াই যে এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে

হৃদয় ভরিয়া দিল; এ কাঁদিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে,—বক্ষে ধরিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়।

—

৩য় পরিচ্ছেদ

খুব বাহাদুরী

খোকা পাশের ঘরে দোলায় শুইয়া কাঁদিতেছে। প্রভাবতী বলিল—"আরে ছেলে কাঁদ্‌চে, যাও—সকল সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না।"

মণিলাল বলিল—"আরে ছেলে একটু কাঁদুক না, ডাক্তার ব'লেছে কাঁদ্‌লে ফুসফুসের জোর বাড়ে।"

প্রভাবতী—"তুমি এখন একটু রাস্তা দাও দিকি, বক্তৃতাটা পরে কোরো।"

মণিলাল হাত তুলিয়া দুয়ার আগুলিয়া ছিল। সে বলিল—"তুমি পান-দুটো আগে মুড়ে' দাও দিকি, ছেলের কাছে পরে যেও।"

প্রভাবতী—"দেখ্‌বে মজা?"

মণিলাল—"দেখ্‌বে মজা?"

প্রভাবতী বোধ হয় মাথায় একটা মতলব আঁটিতেছিল। সে গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া আবার কহিল—"তবে দেখ্‌বে মজা।"

মণিলাল বলিল—"হাঁ দেখ্‌ব, দেখাও।"

প্রভাবতী ফস্ করিয়া মণিলালের বগলে কাতুকুতু দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, আবার পিছন হইতে একটা কড়া রকমের চিম্‌টিও কাটিয়া দিল। মণিলাল ঠকিয়া গিয়া দাঁত খিঁচাইল। প্রভাবতী তাহার উত্তরে একটু মিষ্টি করিয়া ছোট রকম জিভ ভ্যাঙাইয়া চলিয়া গেল। বুদ্ধির প্রাখর্য্যে উদ্ভাসিত, ওই কৃষ্ণতার চক্ষু দুটির উপর কালো টিপখানি কেমন মানাইয়াছে; বাঁকা কবরীর নিম্নভাগে, চূর্ণ কুন্তলের মধ্যে ওই গ্রীবার অংশটুকুর কত শোভা! মণিলাল নিজেই পান মুড়িতে বসিল। সুপারি খিলির ফাঁক দিয়া পড়িয়া যায়, চুণখয়েরের দাগ হাতে লাগিয়া যায়, মুড়িয়া রাখিবামাত্র আবার হাত-পা খুলিয়া পানগুলা যেন উপহাস করে, লবঙ্গ গাঁথিতে গেলে পানের অঙ্গ ছিঁড়িয়া লবঙ্গ আল্‌গা হইয়া পড়ে ও পানগুলা হাঁ করিয়া বলে—"থাক আর বাহাদুরিতে কাজ নেই।"

প্রভাবতী অলক্ষ্যে আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল। সে স্বামীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—"থাক আর বাহাদুরীতে কাজ নেই, একটা মজা দেখ্‌বে এস।"

মণিলাল এই চতুরা স্ত্রীটিকে বুদ্ধিতে কোন কালে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার উপর টাট্‌কা একবার ঠকিয়া সে একটু অবিশ্বাসের সহিত বলিল—"কি মজাটা আগে বলোই না।" প্রভাবতী টানাটানি না কমাইয়া বলিল—"শীগ্‌গির শীগ্‌গির আগে ওঠো, আগে ওঠো"।

মণিলাল আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "চালাকী নয় ত?"

প্রভাবতী জানালার বাহির হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া দেখাইল—জোসেফ খোকার দোলার দড়িটা মুখে লইয়া আস্তে আস্তে দোল দিতেছে, খোকা চুপ করিয়াছে!

মণিলাল নিম্নস্বরে কহিল, "তুমি শিখিয়েছ?"

প্রভাবতীও নিম্নস্বরে উত্তর দিল—"না, আজকেই দেখ্‌ছি ও নিজে নিজে মতলব খাটিয়েছে, কাঁদ্‌লে আমি দোল দিয়ে থামাই দেখে কিনা।"

মণিলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া জোসেফের ঘাড় চাপ্‌ড়াইয়া বলিল—"বলিহারি জোসেফ, খুব বাহাদুরি, খুব বাহাদুরি।"

জোসেফ লেজ নাড়িয়া, হাঁ করিয়া, জিভ বাহির করিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া প্রভুর দিকে চাহিল।

—

৪র্থ পরিচ্ছেদ

এত সুখ সহিল না

এত সুখ সহিল না। তিন মাসের শিশুটি রাখিয়া প্রভাবতী অকালে স্বর্গারোহণ করিল। হঠাৎ দুই তিন দিনের দমকা-জ্বরে কেমন করিয়া কি হইয়া গেল; মণিলাল ভাল বুঝিতেও পারিল না ভাল করিয়া চিকিৎসা করাইবার সুযোগও পাইল না। মাথায় তাহার আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। একে দুর্ব্বিষহ শোক, তাহার উপর এই অপোগণ্ড শিশুর লালনপালনের সমস্যা! ব্রজগোপালের স্ত্রী খোকাকে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ব্রজগোপাল বড় জ্বালাইল। সে কোন প্রাণে আবার

বিবাহ দেওয়ার জন্য পাইয়া বসিয়াছে! ব্রজগোপালের স্ত্রীর বড় কষ্ট হইতেছে সত্য। নিজের সংসার সাম্‌লাইয়া, অত কচি ছেলের ষোলআনা ভার সহা সোজা কথা নহে।

ব্রজগোপাল দেখিল এই অছিলায় জোর না করিলে ভবিষ্যতে আর মণিলালকে সংসারী করা যাইবে না। একটি পাত্রীও কি ভগবান্ জোগাইয়া রাখিয়াছিলেন!

সরোজবাসিনীর পিতা সামান্য চাকুরী করিতেন। তিনি পেন্‌শন্ লইয়া গৌর-গঙ্গার স্থান বলিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, কন্যার বিবাহের চেষ্টা করিতে করিতে তাঁহার কাল পূর্ণ হইল। বিবাহ দেওয়া হইল না। বিধবা মোক্ষদা বড়ই বিপদে পড়িলেন। কন্যার বিবাহ দেওয়া কি নিঃসহায়া স্ত্রীলোকের সাধ্য! অপরিচিত দেশ, কাহাকেই বা অনুরোধ করা যায়, কেই বা ভার লয়। বৎসরের পর বৎসর ঘুরিয়া যায় মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীর আহার নিদ্রা ত্যাগ হইয়া আসে। ব্রজগোপালের মাতার সহিত গঙ্গাজল পাতান ছিল। মোক্ষদা ঠাকরুণ তাঁহাকেই ধরিয়া বসিয়া আছেন, যদি কোন উপায় হয়।

ইতিমধ্যে মণিলালের এই বিপদ্ ঘটিল। সরোজকে বাড়ীতে আনাইয়া ব্রজগোপাল দেখিল। ব্রজগোপালের স্ত্রী ত' তখনই ছেলে কোলে দিয়া সরোজকে বলিয়া দিল—"দেখো ভাই, বিনা কষ্টে সোনার চাঁদ মিল্‌ল ব'লে যেন কখন অনাদর কোরো না। যে ওকে ফেলে' গেছে, ওর জন্যে মৃত্যু-শয্যাতেও তার শান্তি ছিল না।"

কচি প্রাণের বাঁধনটুকুর জন্য মণিলাল এক দিনের তরে প্রাণ ভরিয়া শোক করিতে পাইল না। আবার সংসারের কঠিন পরিহাসের মধ্যে গা ঢালিয়া দিয়া খোকার জন্য নূতন মা আনিতে হইল। সে যে মরিবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—"দেখো আমার ছেলে যেন অবহেলায় মারা না যায়।" এমন কি কুকুরটাকে পর্য্যন্ত ডাকিয়া বলিয়াছিল—"জোসেফ, খোকা রইল, তুই দেখিস্।" একথা কি সে বিকারের ঝোঁকে বলিয়াছিল? জোসেফ কি বুঝিয়াছিল? কে জানে এই মার প্রাণ! এই অপত্য-স্নেহ! মৃত্যুতেও অতৃপ্তি—। কই শেষ সময়টা মণিলালের কথা ত তেমন করিয়া ভাবিল না।

মণিলাল যখন সরোজের হাতে খোকাকে সঁপিয়া দিয়া বলিল, "এ তোমারই পেটের সন্তান," সরোজ তাহার বহু পূর্ব্বে তাহাকে চুমু খাইয়া, ভালবাসিয়া, তাহার মা হইয়া বসিয়া ছিল।

—

৫ম পরিচ্ছেদ

জোসেফের দুর্গতি

মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে জামাই বাড়ী পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। সরোজ ছেলে মানুষ, সে কি আর একা ঘর করিতে পারে, না সমর্থ বয়সে তাহাকে একা ফেলিয়া রাখা যায়। জামাই আগে প্রতি সপ্তাহে বাটি আসিতেন, ইদানীং তাহাও বন্ধ করিয়াছেন।

মোক্ষদা নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, গৌরাঙ্গ দর্শন করেন, কুকুরের আদর তিনি বোঝেন না। কুকুর ছোঁয়া গেলে তাঁহাকে আবার স্নান করিতে হয়। কুকুরটাও কি এমন বেয়াড়া গা! যখন তখন ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটার কাছে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে কেন বল ত? মুখখানা দেখিয়াছ? যেন ছেলেটাকে গিলিয়া খাইতে চায়। বাধ্য হইয়া সেটাকে তাড়াইতে হয়। জোসেফের আর সে খাওয়ার পারিপাট্য নাই,—কোন দিন একমুঠা ভাত পায়, কোনদিন তাও পায় না। সে চুরি করিয়া যখন তখন খোকার কাছে গিয়া বসিয়া থাকে কেন? তাহাকে পাহারা দেয়? না তাহাকে ভালবাসে? খোকা তাহাকে দেখিলেই হাত পা নাড়িয়া খেলা করে, হোঁ হোঁ করিয়া সাড়া দেয়। জোসেফ কি তাই এই অপরিচিতাদের হাতে খোকাকে ফেলিয়া রাখিতে চাহে না?

খোকার যত্ন মোক্ষদা ঠাকরুণ সরোজের অনিচ্ছার উপর জোর করিয়া করিতেন। দেখ না দেখ খানিক বাসি দুধ, কি ঠাণ্ডা, মাছি-বসা, আঢাকা দুধ গিলাইয়া দেওয়া, হঠাৎ বাদ্‌লার দিনে স্নান করাইয়া দেওয়া, এ সকল মোক্ষদা ঠাকরুণ করিতে ভালবাসিতেন। সরোজ রাগ করিলে বলিতেন—"তোর কি সেই বয়স মা, না তুই এ সব কখন ক'রেছিস? আমি যে কদিন আছি, তোর

কেন কষ্ট করতে হবে! আহা দায়ে প'ড়েই ত সতীনের কাঁটার উপর তোকে দিতে হয়েছে, নইলে জামাই কি আর তোর যুগ্যি হ'য়েছেন," বলিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, কর্ত্তা যে-সকল ভাল ভাল সম্বন্ধ করিয়াছিলেন তাহার ফর্দ্দ আওড়াইতেন।

মণিলালও অনেক দুঃখে বাড়ী-আসা বন্ধ করিয়াছিল। বাড়ী আসিলেই মোক্ষদা ঠাকুরাণী প্রভাবতীর পরিত্যক্ত গহনাকাপড়গুলার দাবী করিয়া প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিতেন, এবং সেই সূত্রে যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিতেন তাহা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার ন্যায় জ্বালা দিত। খোকা এখন মানুষের দিকে চাহিয়া হাসিতে শিখিয়াছে, "হোঁকি, হোঁকি" করিতে শিখিয়াছে। মণিলালের প্রাণ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, প্রভাবতীর মত মুখের ভাব, তাহারই মত মুখের চাহনী,—বুক ফাটিয়া তাহার উদ্দেশেই চোখের জল গড়াইয়া পড়ে। ছেলে বুকে চাপিয়া ধরিলে বুক জুড়ায় ত বটে। একথা সে যখন বলিত তখন ভাল বিশ্বাস হইত না;—এখন সে যদি থাকিত তাহা হইলে—; আবার বুঝি বুক ভাসিয়া যায়।

মণিলালের বিশ্বাস হইয়াছে, খোকার প্রতি সরোজের স্নেহটা অকৃত্রিমই বটে। তাই শাশুড়ীর উপর যখন বিরক্তি বাড়িতে লাগিল, বাড়ী আসাও তখন বন্ধ হইয়া আসিল। ব্রজগোপাল আর আগের মত খবর লইতে পারে না। মোক্ষদা অসন্তুষ্টা হন। পুরুষ মানুষের মেয়ে মানুষের বাড়ী যখন তখন যাতয়াত করা ভাল দেখায় না।

—

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আর কত সয়?

সরোজ বলিল—"মা, তুমি অন্ততঃ ব্রজ-বাবুর বাড়ী খবর দাও। ছেলের আমার চেহারা দেখে' বুক যে শুকিয়ে যাচ্ছে।'

মোক্ষদা বলিলেন—"দেখ্ সরোজ, তোর বড় বাড়াবাড়ি। আমি কি চুপ ক'রে ব'সে আছি; পীরতলার ফকিরের ঔষধটা দুদিন দেখা হ'ল, আজ না হয় রামপদ সাধুর জলপড়াটা সন্ধ্যার সময় খেয়ে আসবে। রক্ত আমাশয়ে ডাক্তার বদ্যি কি ক'র্‌বে? ব্রজগোপালই হৈ চৈ ক'রে কতকগুলো ডাক্তার বদ্যি জড়ো করা ছাড়া কি হাত দিয়ে ঠেলে' রোগ সারিয়ে দেবে?"

সরোজের প্রাণ ছটফট করে। মা কিছুতেই কথা শোনে না। মণিলালের ঠিকানাও জানা নাই, আর শিরোনাম লিখিবার কৌশলও ত জানা নাই। ওদিকে ছেলে যেন দিন দিন কালীর মূর্ত্তি হইয়া যাইতেছে!

শেষে একদিন সরোজ মনের ক্ষোভে বলিল—"মা আমি মাথা খুঁড়ে মর্‌ব যদি তুমি ব্রজ-বাবুকে না ডেকে আন্‌বে।"

মা আপন মনে বকিতে বকিতে ব্রজ-বাবুকে ডাকিতে গেলেন। "সতীনের কাঁটার উপর এত দরদ! মেয়ের অনাছিষ্টি।"

ব্রজগোপাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিল, এবং তাঁহার মুখে অবস্থা শুনিয়া মণিলালকে টেলিগ্রাফ করিল।

জোসেফ আজ কিছুতেই খোকার ঘর হইতে বাহির হইতেছে না। মোক্ষদা পুনরায় স্নান করা স্বীকার করিয়া তাহাকে প্রাণপণে ঠেঙাইতেছেন, সে বসিয়া বসিয়া কেঁউ কেঁউ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে কিন্তু একপাও নড়িতেছে না। দুম্ দাম্ শব্দে পিঠের উপর লাঠি পড়িতেছে, পিঠ বুঝি ভাঙিল।

সরোজ রাগিয়া কাঁদিয়া বলিল—"দোহাই মা, মরার ওপর আর খাঁড়ার ঘা দিও না, ওকে ঘরে থাকতে দাও, গোপাল আমার চ'ম্‌কে উঠ্‌চে দেখেও কি তোমার দয়া হচ্ছে না? তুমি কি মানুষ না পাষাণ?"

ব্রজগোপাল স্ত্রীকে লইয়া আসিয়া সরোজের কাছে বসাইয়া দিল। মণিলাল আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না। জোসেফ শবদেহের পিছু পিছু গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল। মোটে সাতমাসের শিশু, গঙ্গার বালির মধ্যে তাহাকে প্রোথিত করিয়া ব্রজগোপাল ফিরিয়া আসিল।

রাত্রে মণিলাল বাড়ী আসিল। জোসেফ কিন্তু আদর জানাইতে কাছে আসিল না। একবার দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াই সরিয়া পড়িল।

ব্রজগোপাল ছুটিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে। মণিলাল কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় খোকার পরিত্যক্ত দোলাটির কাছে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। সে সহজভাবে কথা

বার্ত্তা কহিতেছে দেখিয়া ব্রজগোপালের ভিতর ভিতর ভয় করিতেছে। এমন সময় জোসেফ অতি কষ্টে খোকার শবদেহটা ঘাড়ের কাছে ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে আনিয়া প্রভুর পায়ের কাছে শয়ন করাইয়া দিল।

সরোজ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া "গোপল রে—বাবা আমার!" বলিয়া ধড়াস করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। মণিলাল যেন হাত পা ভাঙিয়া জোসেফের পাশে পড়িয়া গিয়া বলিল—"জোসেফ, বাবা, দেখা করিয়ে দিলি।" ব্রজগোপাল প্রত্যুৎপন্নমতি-সহকারে তাড়াতাড়ি মৃতদেহ ঢাকিয়া আবার উঠাইয়া লইয়া দাহ করিতে গেল।

—

৭ম পরিচ্ছেদ

চিহ্ন-লোপ

মণিলালের ভিটায় তালা পড়িয়াছে। সরোজের সদাই মূর্চ্ছা হয়। মোক্ষদার রাত্রে গা ছম্-ছম্ করে। মণিলালের বাটী ছাড়িয়া তিনি নিজ বাটীতে চলিয়া আসিয়াছেন। মায়ে ঝিয়ে আর বনে না। সরোজ বড় খিট্‌খিটে হইয়াছে। সদাই ঝগড়া করে, চট্‌পট্ শুনাইয়া দেয়। কুকুরটাকে ব্রজগোপাল লইয়া আসিয়াছিল। সে কিন্তু থাকে নাই। প্রায়ই দেখা যাইত সে গঙ্গার বালুচরে ইতস্ততঃ শুঁকিয়া শুঁকিয়া যেন কিসের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার খাওয়া-দাওয়াও যেন বন্ধ, ক্রমশঃ যেন শীর্ণ, শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল।

ব্রজগোপাল লিখিল—"জোসেফ ঘরে থাকে না, খায় না; কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু কয়েক দিন হইতে তাহাকে আর দেখিতে পাইতেছি না।"

এই পত্র পাইয়া মণিলাল বহুদিন পরে আবার বাড়ী আসিল। বাড়ীর মধ্যে আগাছার জঙ্গল হইয়াছে, রোয়াকের ফাটলে ফাটলে গাছ গজাইয়াছে, ধুলা ময়লা আবর্জ্জনায় পা ফেলিবার জায়গা নাই। খোকার ঘরের দুয়ারের সামনে জোসেফ মৃতবৎ পড়িয়া আছে। তখনও প্রাণ ছিল। মণিলাল যখন "জোসেফ, বাপ আমার" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, জোসেফ তখন অতিকষ্টে মাথাটা তুলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভুর কোলে মাথাটা রাখিল। মরিবার আগে আর-একবার মুখ নাড়িয়া প্রভুর ডাকের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

ব্রজগোপালের পুত্র আলো লইয়া আসিল। তাহার পিছনে আবছায়ায় একটি স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া দাঁড়াইল না? মণিলালের কি মাথার ঠিক ছিল না? নহিলে সে যে মূর্ত্তির দিকে না চাহিয়াই "প্রভা, আর কি দেখ্‌তে এলে ভাই" একথা বলিবে কেন? সরোজও কি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিল? নহিলে সে ব্রজগোপালের সাম্‌নে অমন করিয়া মাথার কাপড় ফেলিয়া স্বামীর পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে পারিবে কেন?

দুজনের আজ দ্বিতীয় বার পুত্রশোক।

শ্রী রণজিৎকুমার ভট্টাচার্য্য

সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠির ব্যবহার ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কয়েকটি উপায়

(১)

সামাজিক আয় মাপ্‌বার মাপকাঠি হচ্ছে টাকা। অর্থাৎ সামাজিক আয় কত, তা প্রকাশ করা হবে টাকায়; এবং সমাজের সব লোকের বা লোকসংঘের (কোম্পানী ইত্যাদির) সবসুদ্ধ কত টাকা আয় হ'ল, তাই দিয়ে মোট সামাজিক আয়ের (যা আসলে একটি ভোগ্যসমষ্টি মাত্র) পরিমাণ জানা যাবে। টাকাটা একটা মাপকাঠিমাত্র এবং মানুষের কাজের সুবিধার জন্যই তার সৃষ্টি। কা নিজেই একটা ভোগ্যবস্তু তা ঠিক; কিন্তু সে শুধু এই কাজের সুবিধা করে' দেয় বলে'; সুতরাং

টাকার তৃপ্তিদানক্ষমতা শুধু পরোক্ষভাবেই আছে একথা বলা চলে। অবশ্য এমন দুর্লভ উদাহরণ জোগাড় করা যায়, যেখানে টাকা সাক্ষাৎভাবেও ভোগ্য; যেমন, যদি কেউ অনেক টাকা এক সঙ্গে দেখে' আনন্দ পায় (কৃপণ প্রভৃতি) অথবা কেউ যদি বালিসের বদলে টাকার থলি মাথায় দিয়ে ঘুমায়। এদের কাছে টাকাই ভোগ্য। এসব স্থলে ব্যাপারটা একটা অস্বাভাবিক রকম মানসিক অবস্থার ফল। অযথা টাকার গাদা করে' রেখে যদি কোন পাগল আনন্দ পায়, সে আনন্দ নিয়ে ব্যাধিবিজ্ঞান (Pathology) আলোচনা করতে পারে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞান, সচরাচর যা ঘটে' থাকে বা দেখা যায়, তারই আলোচনা করে। সমুদ্রের জলরাশির গতি নিয়ে যার কার্‌বার, সে যদি দেখে যে সমুদ্রের জল কোন কারণে উত্তর দিকে যাচ্ছে, অথচ কয়েক ফোঁটা জল কোন শুশুক বা মাছের লাফালাফির ফলে দক্ষিণে ছিটকে পড়্‌ল, তা হ'লে সে তা দেখে'ও দেখে না। তার কাছে বিশেষ করে' কয়েক ফোঁটা জলের গতির মূল্য কিছু নেই। সেইরকম সাধারণ গুণ ও গতি নিয়েই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবিজ্ঞানের কার্‌বার, অসাধারণ ও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রকে বাদ দিলেও সাধারণ সত্যগুলি সত্যই থাকে। টাকা যদি টাকার কাজ ছাড়া অন্য কাজ করে তবে আমরা সে ক্ষেত্রে তাকে টাকা বল্‌ব না। যথা, কোন জাতির কোন মানুষ যদি একটা পিয়ানো বিছানা পাত্‌বার জন্য ব্যবহার করে, তা হ'লে পিয়ানো বাজিয়ে সেই জাতির কি পরিমাণ আনন্দ লাভ হচ্ছে জান্‌তে হ'লে সে হিসাব থেকে ঐ পিয়ানোরূপ পালঙ্কটি বাদ পড়্‌বে।

মাপকাঠি যদি নিজে সমান না থাকে ত তা দিয়ে মাপা একটু শক্ত হ'য়ে পড়ে। গজকাঠি যদি আজ কিছু লম্বা আর কাল কিছু খাট হ'য়ে যায় তা হ'লে সেই গজকাঠি দিয়ে মাপা একটু অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। একজন তাঁতী যদি সেই গজকাঠি ব্যবহার করে' বলে যে গত বছর আমি ২০০ গজ কাপড় বুনেছিলাম, এবছর ২৫০ গজ বুনেছি তা হ'লে তার কথার মূল্য কি তা বলা শক্ত। গজ-কাঠি যদি আগেরই সমান লম্বা থাকে, তা হ'লে বলা যায়, যে, তাঁতি শতকরা ২৫ পরিমাণ কাজ বেশী করেছে। গজকাঠি যদি আবার গজ প্রতি ৯ ইঞ্চি (২৫%) খাট হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে সে কাজ আগেরই সমান করেছে। আর যদি গজ-কাঠি গজ প্রতি ৯ ইঞ্চি লম্বা হ'য়ে গিয়ে থাকে, তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে, যে, সে আগের চেয়ে ঢের বেশী কাজই করেছে—২৫০ গজ কাপড় বুনেনি, বুনেছে ৩১২·৫ গজ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে, মাপকাঠি নিজে স্থির না থাক্‌লে তা দিয়ে মাপা শক্ত এবং কোনো উপায়ে মাপ-কাঠির অস্থিরতার পরিমাণ নির্ণয় করতে না পার্‌লে মাপা জিনিসের যথার্থ পরিমাণ কি তা বোঝা শক্ত। কিন্তু মাপকাঠি কি হারে বাড়্‌ছে কম্‌ছে তা জানা থাক্‌লে তা দিয়ে কাজ চালান যায়। এমন কি মোটা-মুটি জানা থাক্‌লেও মোটামুটি কাজ চলে।

সমাজে যে ভোগ্য অদল-বদল করা হয়, তা টাকার সাহায্যেই করা হয়। অর্থাৎ মোদক সন্দেশের বদলে জামা জোগাড় করার জন্য সন্দেশপ্রয়াসী দর্জ্জির খোঁজে বার হয় না; যে কেউ সন্দেশ চায়, তাকেই টাকার বদলে সন্দেশ দিয়ে দেয় এবং যে কেউ জামা বিক্রি কর্‌তে রাজি থাকে, তার কাছে টাকার বদলে জামা নেয়। সমাজে এরকম যত অদল-বদল হয়, সব টাকার সাহায্য নিয়েই হয়। একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না হ'লেও মোটামুটি সত্য। এখানে টাকা বল্‌তে, কোন বিশেষ মুদ্রা বোঝাচ্ছে না, তা মনে রাখ্‌তে হবে। যা কিছু টাকার কাজ করে, সবই টাকা বলে' ধরে' নিতে হবে। (চেক্, হুণ্ডি প্রভৃতিও টাকা।) একটা টাকার বদলে একবার কিছু কেনা কিম্বা বেচা হ'লে, সেই টাকাটা তার কাজ একবার করলে ধর্‌তে হবে। আর সমাজে যত কেনা-বেচা হয়, তাকে সমাজের সমগ্র ব্যবসায় বলে' ধর্‌তে হবে। কোনো নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসায়ের জন্য কত টাকা প্রয়োজন হবে, তা সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসায়ই দেখিয়ে দেবে। কেন না কি পরিমাণ ব্যবসায় হ'ল টাকার ভাষাতেই তা প্রকাশ করা হবে। যেমন, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবসায় ১০০ লক্ষ

টাকার ব্যবসায় হ'তে পারে। এর জন্য ১০০ লক্ষ টাকা দর্কার হবে। অর্থাৎ সমাজে যদি ১০০ লক্ষ টাকা সত্যই থাকে, তা হ'লে সে পরিমাণ ব্যবসায়ের জন্য সে টাকাকে মাত্র একবার টাকার কাজ কর্তে হবে। অর্থাৎ সেই ১০০ লক্ষ টাকা মাত্র একবার কেনা-বেচার সূত্রে হাত বদ্লাবে। কিন্তু প্রত্যেক টাকাই (আগেই বলেছি, টাকা অর্থে ভারতে প্রচলিত রৌপ্যখণ্ড মাত্র নয়, তা মনে রাখা দর্কার। যা-কিছু টাকার কাজ করে, তাই এক্ষেত্রে টাকা।) বৎসরে বহুবার হাত বদ্লায়। এবং এক টাকা যদি দশবার হাত বদ্লায়, তা হলে সেই টাকাটা দশ টাকার কাজ কর্লে ধর্তে হবে। অর্থাৎ বাৎসরিক ১০০ লক্ষ টাকা পরিমাণ ব্যবসায় চালাবার জন্য ১০০ লক্ষ টাকা বছরে একবার হাত বদ্লালেও চলে, আবার দশ লক্ষ টাকা বছরে দশ বার হাত বদ্লালেও চলে। সুতরাং কোন্ বছর সমাজে কত টাকা আছে, তা ঠিক কর্তে হ'লে শুধু টাকার সংখ্যাটা জান্লেই হয় না; তার ভ্রমণের বেগ, অর্থাৎ তা বৎসরে কবার হাত বদ্লায়, তাও জান্তে হয়। টাকা বছরে দশবার হাত বদ্লালে তার **বাৎসরিক ভ্রমণের বেগ** দশ বল্তে হবে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে, টাকার সংখ্যাকে তার বাৎসরিক ভ্রমণের বেগ দিয়ে গুণ কর্লে ব্যবসাতে খাটান টাকার বাৎসরিক পরিমাণ পাওয়া যায়।

টাকার বদলে সব জিনিস পাওয়া যায়। যদি চালের বদলে সব কিছু পাওয়া যেত, তা হ'লে কোন কারণে, চালের পরিমাণ বেড়ে গেলে সব কিছুর বদলে বেশী বেশী মাত্রায় চাল পাওয়া যেত। সেইরকম, কোন কারণে টাকার পরিমাণ বেড়ে গেলে, সব কিছুর জন্যেই বেশী টাকা পাওয়া যাবে—অর্থাৎ সব জিনিসের দাম বেড়ে যাবে বা টাকার কেন্বার ক্ষমতা কমে' যাবে। কিন্তু যে-সব জিনিস টাকার বদলে পাওয়া যায়, তার পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেলে সেরকম হবে না। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ শতকরা ২৫ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ২৫ বেড়ে গেলে জিনিসের দাম বাড়্বে না এবং টাকার কেন্বার ক্ষমতা সমানই থাক্বে। টাকার কেন্বার ক্ষমতা কি, তা ঠিক কর্তে হলে টাকার পরিমাণকে ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে ভাগ কর্তে হবে, অর্থাৎ টাকার সংখ্যা × টাকার ভ্রমণের বেগ ÷ ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ = টাকার কিন্বার ক্ষমতা। টাকাব সংখ্যা যদি হয় ট ও তার ভ্রমণের বেগ ট ভ্র এবং ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণকে যদি ব বলা যায় তা হ'লে টাকাব কিন্বার ক্ষমতাকে $\frac{\text{ট} \times \text{ট ভ্র}}{\text{ব}}$ এর সমান বলা চলে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে, টাকার কেন্বার ক্ষমতার পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ তিন দিক্ দিয়ে হ'তে পারে। এক, ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গিয়ে (অনাবৃষ্টি, বন্যা, পঙ্গপাল, মড়ক, মহামারী, জাহাজডুবি, যুদ্ধ, ব্যাঙ্ক্ ফেল, রাষ্ট্রবিপ্লব ইত্যাদি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কোনো কারণে—ভোগ্য উৎপাদন কমে' যেতে পারে। পরস্পরের উপর বিশ্বাস কমে' গেলে অথবা জিনিসের দাম কোনো কারণে খুব অস্থির হ'য়ে উঠ্লে ভোগ্য কেনা বেচা কমে' যেতে পারে; আবার নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কারণে ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বেড়েও যেতে পারে।) দ্বিতীয়তঃ টাকার সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হলে টাকার কেন্বার ক্ষমতা পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে। (যথা বেশী বা কম টাকা টাঁকশাল বা ছাপাখানা থেকে বেরতে পারে, চেক ও হুণ্ডির ব্যবহার কম বেশী হ'তে পারে, ইত্যাদি।) তৃতীয়তঃ, টাকার ভ্রমণবেগ বা গতিশীলতা বেড়ে' বা কমে' যেতে পারে। (যথা লোকের অভ্যাস অল্প অল্প করে' বদ্লে এমন হতে পারে, যে, টাকা পাওয়া মাত্র খরচ করাই রীতি হয়ে দাঁড়াবে; অথবা মাসান্তে দাম দেওয়ার নিয়ম উঠে' গিয়ে সাপ্তাহিক দাম দেওয়ার নিয়ম সুরু হ'তে পারে। ব্যাঙ্ক্ বা অন্য ধার দেবার জায়গাগুলি আরও সহজে ও কম সুদে ধার দিতে পারে। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বাড়্লে ইহা হওয়ার সম্ভবনা বাড়ে। এ সবের উল্টা রকমও হ'তে পারে।)

এখন ক্রীতবিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ, টাকার সংখ্যা

ও টাকার ভ্রমণবেগ, এসবের কোনটিই যে একলা একলা বদ্‌লাবে, এমন নয়। সব কটিই একসঙ্গে বদ্‌লাতে পারে। কোন্‌টির পরিমাণ কত ছিল এবং কত হ'ল, তা নির্ণয় কর্‌তে গেলে অনেক গোলমাল। আমাদের শুধু জানা দর্‌কার যে আমরা যে টাকার মাপকাঠি ব্যবহার করে' সামাজিক আয় মাপ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি সেই মাপকাঠিটি নিজেই বদ্‌লায় কি না এবং ক্ষেত্রবিশেষে বদ্‌লেছে কি না। টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বদ্‌লেছে কি না, তা জান্‌বার উপায় টাকা কতটা কিন্‌তে পার্‌ত এবং কতটা কিন্‌তে পার্‌ছে, তাই তুলনা করে' দেখা। যেসব জিনিস বা ভোগ্য সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচা হয়, টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার বিচার কর্‌তে হ'লে সেইগুলির প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী। কোনো একটা জিনিস বদ্‌লেছে কি না ঠিক কর্‌তে হ'লে তার কোনো একটা অবস্থা-বিশেষ থেকে সুরু কর্‌তে হবে, অর্থাৎ অমুক সময় যা ছিল, তা থেকে অন্যরকম হয়েছে কি না, এইরকমভাবে দেখ্‌তে হবে। টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বাড়্‌ল কি কম্‌ল বা স্থির রইল, তা দেখ্‌তে হ'লে প্রথমতঃ সবচেয়ে বেশী কেনা-বেচা হয় এমন জিনিস দেখে' একটা তালিকা কর্‌তে হয়; যথা চাল, ডাল, ময়দা, আটা, ঘি, তেল, কাপড়, বাড়ীভাড়া, রেলভাড়া, শিক্ষার খরচ, ঔষধ ইত্যাদি। তালিকা কি রকম হবে, তা, সমাজটি কিপ্রকার ও তার লোকের আচার-ব্যবহার কিপ্রকার, তার উপর নির্ভর কর্‌বে। এইরকম একটা ভোগ্য-সমষ্টির যদি প্রত্যেকটির সমান পরিমাণ ধরে' (যে-ভাবেই হোক) তাদের দামগুলি যোগ করে' বলা হয়, যে, "এই ভোগ্য-সমষ্টি যদি অন্য কোন সময়ে কিন্‌তে এর দুগুণ দাম লাগে, তা হ'লে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে জান্‌তে হবে"; অথবা আর-এক সময় উক্ত ভোগ্য-সমষ্টি কিন্‌তে যদি অর্দ্ধেক দাম লাগে, তা হ'লে যদি বলি, "টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা দুগুণ বেড়ে গেছে," তা হ'লে ভুল হবে। তালিকায় যদি শুধু ক-চাল, ক-ডাল, ক-কাপড়, ক-ঘরভাড়া ও ক-জুতা থাকে এবং তার দাম যদি চাল-একটাকা ডাল-একটাকা কাপড়-একটাকা, ঘরভাড়া-একটাকা ও জুতা-দশটাকা হয়; তা হলে ঐ ভোগ্য-সমষ্টির জন্য টাকা লাগ্‌বে -১+১+১+১+১০ =১৪। অতঃপর যদি জুতার দাম দুগুণ হ'য়ে যায় ও অন্য সব-কিছুর দাম অর্দ্ধেক হ'য়ে যায়, তা হ'লে সেই ভোগ্য-সমষ্টি কিন্‌তে লাগ্‌বে ॥০+॥০+॥০+॥০+২০=২২ অর্থাৎ ১৪র প্রায় দুগুণ। এখন কি বল্‌তে হবে—যে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা প্রায় অর্দ্ধেক কমে' গিয়েছে এবং তার থেকে কি এই সিদ্ধান্ত কর্‌তে হবে যে সামাজিক আয় যদি টাকায় এবার ২০০ লক্ষ হ'য়ে থাকে তা হ'লে আগেকার যে ১০০ লক্ষ টাকা পরিমাণ সামাজিক আয় ছিল, এবারকার আয় তার প্রায় অর্দ্ধেক হ'য়ে গেছে? নিশ্চয়ই না; কেননা লোকে চাল, ডাল, কাপড়, ঘরভাড়া ইত্যাদিতে যত খরচ করে, জুতাতে তত করে না। কাজেই শুধু জুতার খাতিরে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার দুর্নাম হ'লে চল্‌বে না। কেনা-বেচার দিক্‌ থেকে জুতার গুরুত্ব চাল ডাল কাপড় ও ঘরভাড়ার গুরুত্বের সমান নয়। এই কারণে আমাদের ভোগ্যসমষ্টিতে প্রথমতঃ বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসগুলিকেই ধর্‌তে হবে এবং তার পরে তার ভিতর যেগুলির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব বেশী সেগুলির পরিমাণও তালিকায় সেই অনুপাতে বেশী রাখ্‌তে হবে। তা না হ'লে কোনো একটি ভোগ্যের দাম কম-বেশী হলে, টাকার কেন্‌বার ক্ষমতায় (সাধারণভাবে) যে হ্রাস বা বৃদ্ধি দৃষ্ট হবে, সেটা সত্য অবস্থার পরিচায়ক হবে না। যে জিনিসটার কেনা-বেচা যত বেশী হয়, তার দামের পরিবর্ত্তন টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার পরিবর্ত্তনে তত বেশী সাহায্য কর্‌বে। ভোগ্যের তালিকায় চিঁড়েমুড়ির সমান দাম হ'লে হবে না। ওজন করে' জিনিষগুলি তালিকার মধ্যে দিতে হবে। ওজনের নিক্তি হবে জিনিসের ব্যবহার বা কেনা-বেচা কত হয় তার পরিমাণ। এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে। তালিকায় কি কি জিনিস ধরা হবে? কোন্‌টিকে তালিকায় কি পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হবে? জিনিসের দাম খুচরা দাম, না পাইকারী দাম ধরা হবে? কোনো বছর যেসব জিনিস প্রয়োজনীয় থাকে, অন্য বছর যদি সেইগুলিই প্রয়োজনীয় না থাকে বা একই অনুপাতে প্রয়োজনীয় না থাকে তা হ'লে কি করা হবে? একই নামে ক্রীত জিনিস দুই বৎসরে ভিন্ন জিনিস হ'লে কি

হবে ? (১৯১০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকার এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের অধিকার কি একই জিনিস ? আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, যাতে একই নামে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি হয়েছে।) কিন্তু এইসব প্রশ্নের বা এই জাতীয় আর যা প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, তার উত্তর দেওয়া সংক্ষেপে সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের ব্যাপারটা কি হয়, তাই জেনেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে, কিভাবে হয় এবং তাতে দোষ কি, কি হ'তে পারে, সেসব প্রশ্নের আলোচনা বৃহৎ পুস্তকেই সম্ভব।

কোনো বছর যদি একটা তালিকা করে' দেখা যায় যে তালিকাভুক্ত জিনিসগুলির দাম (টাকায়) একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ হয়েছে, এবং অন্য এক বছর যদি সেই তালিকার ভোগ্যসমষ্টির দাম প্রথম বছর থেকে বিভিন্ন হয়, তা হ'লে প্রথম বছরের দামকে ১০০ বলে' ধরে' নিয়ে দ্বিতীয় বছরের দামটি সেই অনুপাতে কষে' বার করতে হবে।

যথা :—

১ম বৎসর

পরিমাণ	ভোগ্য	টাকার মূল্য
১০	ক	১৫
১৫	খ	২০
৫	গ	১০
১২	ঘ	১৬
১৪	ঙ	১৪
২	চ	২
৩	ছ	৩
ভোগ্য-সমষ্টি		৮০ টাকা

২য় বৎসর

১০	ক	২০
১৫	খ	২৫
৫	গ	৮
১২	ঘ	২২
১৪	ঙ	২৪
২	চ	২
৩	ছ	৫
		১০৬

তালিকাটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বছরে যা কিন্‌তে ৮০৲ লেগেছিল, দ্বিতীয় বছর তার দাম হ'ল ১০৬৲। প্রথম বছরকে যদি আরম্ভ বৎসর বলা যায়, তা হ'লে ৮০৲কে ১০০ ধর্‌তে হবে। তা হ'লে দ্বিতীয় বৎসর টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা ধর্‌তে হবে ৮০ : ১০৬ :: ১০০ : ক (এবৎসর টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা) $= \frac{১০৬ \times ১০০}{৮০}$ = ১৩২·৫। অর্থাৎ এবৎসর, আরম্ভ বৎসরে যা ১০০ টাকায় পাওয়া যেত তা কিন্‌তে ১৩২॥০ লাগ্‌ছে। তা হ'লে টাকার দ্বিতীয় বৎসর কিন্‌বার ক্ষমতা শতকরা প্রায় ৩৩ করে' কমেছে এই ধর্‌তে হবে। এই জাতীয় সংখ্যাগুলিকে সূচক-সংখ্যা (Index number) বলা হয়। এই জাতীয় সংখ্যা দিয়ে যে শুধু টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা জানা যায় তা নয়; এগুলি দিয়ে আরও অনেক-কিছু জানা যায়। যেমন ধরা যাক, কোন একটা কারবারে মজুরদের মাইনে বাড়ান হয়েছে শতকরা ৫০৲ হিসাবে। এখন সেটা শুধু একটা টাকার বাড়্‌তি। মজুররা ত আর টাকা খাবেও না, পরবেও না, বা টাকা দিয়ে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবে না। এই টাকা দিয়ে তখন কি কেনা যায়, তাই দিয়ে দেখ্‌তে হবে তাদের মাইনে কত বেড়েছে। যদি আগের কম মাইনে দিয়ে তারা ক-পরিমাণ ভোগ্য কিন্‌তে পার্‌ত এবং এখন যদি ৫০ বেশী মাইনে দিয়ে সেই একই পরিমাণ ভোগ্য কিন্‌তে পারে, তা হ'লে মাইনে বেড়ে লাভটা কোথায় হ'ল ? যদি ৫০ বেশী মাইনের সাহায্যে ২৫% বেশী ভোগ্য কেনা যায় তা হ'লে লাভ কিছু হ'লেও ৫০ হ'ল না। আর যদি আগে যা পাওয়া যেত এখন তার ৭৫% মাত্র পাওয়া যায়, তা হ'লে **টাকার মাইনে** বাড়্‌লেও **আসল মাইনে** কম্‌ল। সামাজিক আয় মাপ্‌বার সুবিধার জন্য যে সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হবে এ-সব ক্ষেত্রে অবশ্য তা দিয়ে কাজ হবে না। বিশেষ করে' মজুররা কি কি জিনিস কেনে, এবং তার মধ্যে কোন্ জিনিস বেশী কেনে বা কম কেনে, দেখে', আলাদা একটা তালিকা করতে হবে, এবং সেই তালিকা-ভুক্ত জিনিস কিন্‌তে আগে ও পরে কত টাকা

লাগ্‌ত ও লাগে, দেখে' স্থির করতে হবে, মজুরের পক্ষে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বেড়েছে কি কমেছে। ঘড়ি, ঘোড়া, মোটর-কার, বড় বাড়ীর ভাড়া, বহুমূল্য খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির দাম বদ্‌লালে তার একটা সাধারণভাবে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতার দিক্‌ থেকে মানে আছে; কিন্তু বিশেষ করে' মজুর বা আর-কোনো দলভুক্ত ব্যক্তিদের উপার্জ্জনের টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা বদ্‌লেছে কি না জান্‌তে হ'লে, তারা কি কেনে এবং কি পরিমাণে কেনে তা আগে জান্‌তে হবে।

সূচক-সংখ্যা জানা থাক্‌লে সামাজিক আয় মাপ্‌বার সুবিধা হয় বলা হয়েছে। অর্থাৎ মাপকাঠি কিভাবে নিজে বদ্‌লাচ্ছে জানা থাক্‌লে তা দিয়ে মাপা সম্ভব হয়। আজ-কাল নানা জায়গায় যেসকল সূচক-সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাতে সব জায়গাতেই একটা আরম্ভ বৎসর বা সময় ধরে' নেওয়া হয়, অর্থাৎ অমুক বৎসর যদি ১০০ ছিল তা হ'লে পরবর্ত্তী অন্য অন্য বৎসরে ১০০+ক অথবা ১০০—ক হয়েছে। এইভাবেই টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা জ্ঞাপন করা হয়। শতকরা কি হারে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা বদ্‌লেছে জানা থাক্‌লে টাকায় প্রকাশিত সামাজিক আয়ের আসল মূল্য জানা আর শক্ত থাকে না। কেবল একটা গোলমাল আছে, সেটা বিশেষ করে' আলোচনা করা দর্‌কার। প্রত্যেক বছরই নূতন নূতন ভোগ্যের আবিষ্কার হয় এবং পুরাতন ভোগ্যের নাম না বদ্‌লালেও তার স্বভাব অনেকস্থলেই এত বদ্‌লে যায় যে মাঝে অনেক বছরের ব্যবধান পড়্‌লে, কোন দুই তালিকাতে নামে একই ভোগ্যসমষ্টি থাক্‌লেও কাজে তা বিভিন্ন জিনিস বুঝায়। প্রথম ক্ষেত্রে পুরাতন তালিকার যতই গুণ থাকুক না কেন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মূল্যহীন ও অকেজো হ'য়ে দাঁড়ায়. যেমন, যদি খনির কয়লার যুগের আগে কোনো তালিকায় সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব কাঠ-কয়লাকে দেওয়া হ'য়ে থাকে এবং যদি পরে (কয়লার খনির কয়লা পাওয়ার পরে) কাঠ-কয়লায় দাম ১০০ গুণ বেড়ে গিয়ে থাকে তা হ'লে তার ফলে সূচক-সংখ্যায় হয়ত এই দেখা যাবে যে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা খুবই কমে' গিয়েছে; অথচ হয়ত নূতন করে' তালিকা কর্‌লে তাতে কাঠকয়লা জায়গাই পাবে না এবং খনিজ কয়লা সেই স্থান অধিকার করার ফলে টাকার কেন্‌বার ক্ষমতাও অত কম মনে হবে না। এক্ষেত্রে এরকম তুলনার দামই নেই। এরকম ক্ষেত্রে প্রথমে প্রথম বছরের সূচক-সংখ্যার সঙ্গে কাছাকাছি কোনো বছরের সূচক-সংখ্যার তুলনা করতে হয়, তার পর এই দ্বিতীয় বছরের একটা সূচক-সংখ্যার সঙ্গে তার একটা কাছাকাছি কোনো বছরের সূচক-সংখ্যার সম্বন্ধ ঠিক করতে হয়। অতঃপর এইভাবে ক্রমে এগিয়ে চলে' যতক্ষণ না শেষ বছরের সঙ্গে প্রথম বছরের সম্বন্ধ নির্ণয় হ'য়ে যায় ততক্ষণ ক্রমশঃ এগিয়ে চল্‌তে হয়। যেমন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের তালিকার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে' তার সঙ্গে ১৮৮৫ খৃঃ অঃ তুলনা করে' যদি দেখা যায় যে ১২৫ হয়, তা হ'লে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের একটা তালিকা করে' তার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে' আবার তার সঙ্গে ১৮৯০এর তালিকার তুলনা করতে হয়। যদি দেখা যায় এতে ১১০ হ'ল তা হ'লে ১৮৯০এর সংখ্যা ১৮৮০র সংখ্যার ১০০ : ১১০ :: ১২৫ : ক = (১১০ × ১২৫)/১০০ = ১৩৭'৫। এখন ১৮৯০এর একটা তালিকার মোট পরিমাণকে ১০০ ধরে' ১৮৯৫এর সংখ্যার সঙ্গে তুলনায় যদি তার দাম ৮০ হয়, তা হ'লে ১৮৮০ তুলনায় ১৮৯৫এর সংখ্যার দাম হবে ১০০ : ৮০ :: ১৩৭'৫ : ক ∴ ক = (৮০ + ১৩৭'৫)/১০০ = ১১০। এইরকম-ভাবে শেষ অবধি হয়ত দেখা যাবে যে ১৮৮০র তুলনায় ১৯২০তে টাকার কিন্‌বার ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ১০০ : ১৮০ অর্থাৎ শতকরা ৮০ কম। (১৮৮০তে ১০০ টাকায় যা কেনা যেত ১৯২০তে তা কিন্‌তে ১৮০ টাকা লাগে অর্থাৎ টাকার কেন্‌বার ক্ষমতা সেই অনুপাতে কমেছে।)

এইরকম ধাপে-ধাপে এগোবার মানে আগে হঠাৎ লাফ দেওয়ার যে-সব দোষ দেখান হয়েছে সেগুলি দূর করার চেষ্টা। ৫ বছর করে' ধাপ না নিয়ে বছর বছর নিলে আরো ভাল। প্রত্যেক বছর নূতন করে' তালিকা করাতে ভুলগুলি গোড়াতেই ছেঁটে দেওয়া সম্ভব হয়; অনেক বছর ধরে' জমে' জমে' তারা মিথ্যার আকার নিতে আর পার্‌বে না। আমাদের উদাহরণের কাঠকয়লা আস্তে আস্তে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব হারিয়ে শেষে তালিকা থেকে বাদ পড়ে' যাবে। এইভাবে তুলনা

করাকে শৃঙ্খল-পদ্ধতিতে (chain method) তুলনা করা বলা চলে। মাপকাঠিকে মাপা নিয়ে আরও অনেক কিছু গোলমাল আছে, কিন্তু তার ভিতর যাওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব হবে না।

(২)

সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক ব্যক্তিদের মনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ বলে' একটা এমন কোনো জানোয়ার নেই যে সে ভোগ্য-সম্ভোগ করে' স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে। ব্যক্তিই হচ্ছে সমাজের বোধশক্তির যন্ত্র ও কেন্দ্র। ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য বা সুখ ভোগ করার শক্তির উপরেই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে; শুধু ভোগ্যসমষ্টি একটা থাকলেই হয় না। ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য-আহরণ-ক্ষমতা না থাকলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক উপকরণ মাঠে মারা যায়। একটা ভাল ছবি বা একটা ভাল গান কি একটা বাজনা বুঝে' উপভোগ করতে শিক্ষার প্রয়োজন হয়। শুধু লাইব্রেরীতে পুস্তক থাকলেই হয় না, পড়্‌বার ক্ষমতা না থাকলে তা থেকে কোনো স্বাচ্ছন্দ্য কেউ পাবে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার আর-একটা বড় উপায় হচ্ছে, নানা উপকরণ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য আহরণ করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা। সামাজিক শক্তির কতকটা ব্যক্তির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যে খরচ করলে তার থেকে অনেক উপকার পাওয়া যায়। সেইপ্রকার শারীরিক উন্নতিও অবশ্য প্রয়োজনীয়। সুস্থ সবল শরীর ছাড়া স্বাচ্ছন্দ্য কোথায়? জ্বরাক্রান্ত কি সুখলাভের উপকরণ পেলেও সুখী হ'তে পারে? যার সর্ব্বদা মাথা ধরে তার কি কিছুতে আনন্দ আছে? এখন, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন কি-ভাবে হ'তে পারে তা দেখ্‌তে হবে। দুইটি প্রধান উপায়ে এই কার্য্য সাধন করা যায়:—একটি মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উৎকর্ষ সাধন; আর একটি যোগ্য লোক ছাড়া অযোগ্য লোকের বংশবৃদ্ধি নিবারণ, অর্থাৎ জীববিজ্ঞানসম্মতভাবে ভবিষ্যৎ বংশের পিতা-মাতা বাছাই করা। দ্বিতীয় উপায়ে সমাজ থেকে খারাপ অংশটুকু বাদ দেওয়া যাবে আশা করা যেতে পারে, অর্থাৎ অর্দ্ধবুদ্ধি, অল্পবুদ্ধি, উন্মাদ, জন্মগত মাতাল বা বংশানুক্রমিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত, অকেজো ভিক্ষুক (pauper) অপকর্ম্মী দুর্জ্জন ইত্যাদিকে সমাজ থেকে এইভাবে অনেকটা দূর করে' দেওয়া যায়। বাছাই-করা বীজে যেমন ফসল ভাল হয়, সেইরকম বাছাই-করা পিতামাতায় ভবিষ্যৎ জাতি উন্নত হয়। বিজ্ঞান আমাদের দেখিয়েছে যে পৃথিবীতে প্রথম প্রথম যখন জীবন সুরু হয়, তখন প্রাণীরা অতি নিকৃষ্ট ধরণের ছিল। কোন রকমে প্রকৃতির কাছ থেকে পুষ্টি আহরণ করে' দেহ ধারণ করতে পারে ও বংশ বিস্তার করতে পারে এইরকম প্রাণীতেই সেই বহুপুরাতন কালে পৃথিবী পূর্ণ ছিল। আকৃতি-গত পার্থক্য উদ্ভিদে ও প্রাণীতে খুব ছিল না। অনেক স্থলে প্রাণী চলাচল-শক্তি-রহিত ছিল। পুরুভুজ শাঁখ শামুক প্রভৃতি জলের বাসিন্দা-রাই পৃথিবীর আদিমকালে রাজত্ব করত।

তার পর ক্রমে ক্রমে চিংড়ি কাঁকড়া ও নানাপ্রকার অদ্ভুত জলচরেরা পৃথিবীতে এল। তখন শুধু জলেই প্রায় পৃথিবী ঢাকা ছিল। স্থলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নানা-প্রকার জানোয়ার (উভচর জলচর খেচর ও সর্ব্বচর) পৃথিবীতে এল; বর্ত্তমানে তারা লুপ্ত হয়েছে। তার পর কত জাতীয় প্রাণী এল আর গেল তার ইয়ত্তা নেই—শেষে এলাম আমরা।

প্রাণী-জগতে নূতন নূতন ধরণের জীবের বিবর্ত্তন হ'ল কিপ্রকারে? এবিষয়ে বিজ্ঞান বলছে যে জীব-জগতে এমন তিনটি প্রবল শক্তি সব সময় বর্ত্তমান রয়েছে যার জন্যে নিকৃষ্ট জাতের প্রাণী থেকেই অপেক্ষাকৃত ভাল জাতের প্রাণীর উদ্ভব হচ্ছে। একে বলে প্রাণী-জীবনের ক্রমবিকাশ। এই শক্তিগুলি হচ্ছে, ১। জীবন-সংগ্রাম (Struggle for Existence), ২। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (Natural Selection) এবং ৩। বংশানুক্রমিকতা (Heredity)। জীবন-সংগ্রাম ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন হয় এইভাবে:—অনেক রকম ও বিভিন্নগুণসম্পন্ন বহু প্রাণী যদি কোনো জায়গায় থাকে, তা হ'লে সেই জায়গার অবস্থা কারুর প্রাণ-ধারণের পক্ষে সুবিধাজনক ও কারুর প্রাণ-ধারণের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। যার প্রতি পারি-

পার্শ্বিক অবস্থা সদয় (অর্থাৎ সেইপ্রকার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অন্যের তুলনায় যে সহজে জীবন ধারণ কর্‌তে পারে) তাকে যেন প্রকৃতি ভবিষ্যৎ জাতির পিতামাতারূপে নির্ব্বাচন কর্‌ছেন, কেননা যার প্রতি পারিপার্শ্বিক অবস্থা সদয় নয়, তার পক্ষে জীবনধারণ শক্ত এবং জীবন ধারণই যদি কেউ না করে, তা হ'লে তাকে দিয়ে বংশরক্ষা হওয়া আরো শক্ত। ক্রমে ক্রমে তার জাতি লোপ পেয়ে যাবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বল্‌তে জল বাতাস খাদ্য শত্রু ইত্যাদি সবই বোঝায়। ধরা যাক্, কোনো অবস্থায় যদি খাদ্য গাছের ডগায় থাকে এবং সব জন্তুরাই যদি গাছে উঠ্‌তে অক্ষম হয় তা হ'লে যে জাতীয় জন্তুর গলা লম্বা তার পক্ষে বাঁচা সে অবস্থায়, অন্যের তুলনায়, সহজ হবে। তাড়া করে' যদি খাদ্য সংগ্রহ কর্‌তে হয় বা পালিয়ে যদি অনবরত প্রাণ বাঁচাতে হয় তা হলে বেগবান্ জন্তুই সহজে বাঁচ্‌বে। বেগবান্‌কে প্রকৃতি নির্ব্বাচন কর্‌লেন বল্‌তে হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বেঁচে থাক্‌তে অক্ষম যে, সে ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে এবং অপেক্ষাকৃত সক্ষমই বংশবিস্তার করে' বেঁচে থাক্‌বে। এই যে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম বা জীবন-সংগ্রাম, এ শুধু প্রকৃতির সঙ্গে না, পরস্পরের সঙ্গেও। অপেক্ষাকৃত বলবান্ বলহীনকে পৃথিবীর কোল থেকে দূর করে' দেবার চেষ্টা সতত কর্‌ছে এবং সেই আদিম কাল থেকেই পৃথিবী বলহীনের লভ্য নয়। জীবনসংগ্রামে সেই রক্ষা পায় বা জয়ী হয়, যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও শত্রুকে জয় কর্‌তে পারে।

এখন দেখ্‌তে হবে যে বলবানের জয় হ'লেই ভবিষ্যৎ জাতি বিগত জাতির চেয়ে বলবান্ হবে কেন? এর উত্তরে বিজ্ঞান বলে, যে সন্তান তার দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীতে তার পূর্ব্বপুরুষদের অনুগমন করে। একে বলে বংশানুক্রমিতা। বংশানুক্রমিতার গুণে, যদি অপেক্ষাকৃত বলবান্ বা গুণবান্‌ই শুধু বংশবৃদ্ধি কর্‌তে পায় তা হ'লে ভবিষ্যৎ জাতির মধ্যে অধিক-সংখ্যক লোক বলবান্ ও গুণবান্ হয়।*

কাজেই আমরা দেখ্‌ছি, যে, প্রাণী-জগতে ক্রমবিকাশ ঐ তিন শক্তির জোরেই হচ্ছে। ঐ শক্তিগুলিই আছে কেন, এ প্রশ্ন কর্‌লে তার উত্তর দেওয়া শক্ত, তবে বিজ্ঞান 'কেন'র উত্তর দেয় না, সে উত্তর দেয় দর্শন। বিজ্ঞান শুধু 'কি করে' হয়,' তাই খুঁজ্‌তে ব্যস্ত।

মানব-সমাজে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নির্ব্বিবাদে হ'তে পারে না। তার কারণ জীবনসংগ্রামে মানুষ ঠিক জানোয়ারের মত আচরণ করে না,* পরস্পরকে সাহায্য করে'ই সাধারণতঃ সকলে বেঁচে থাক্‌তে চেষ্টা করে সমাজে কার্য্যবিভাগ (division of labour) করে' মানুষ এমনভাবে জীবন কাটায়, যে, প্রায় কেউই অপরের সাহায্য ছাড়া বাঁচ্‌তে পারে না। কাজেই সর্ব্বক্ষেত্রে অধিক-গুণসম্পন্নই যে শুধু বংশ বিস্তার করে, তা নয়। এমন কি সমাজের নিকৃষ্ট অংশের লোকেরাই বংশ-বিস্তারে সবচেয়ে অগ্রগণ্য হয়। কাজেই কৃত্রিম অবস্থায় পড়ার ফলে মানব-জাতির ক্রমোন্নতিও অনেকটা মানব-জাতিরই হাতে পড়েছে।

* জীব-জগতে থেকে থেকে কোনো অজানা কারণে নূতনগুণসম্পন্ন জীব জন্মগ্রহণ করে। নূতন গুণ তাকে বলা যায়, শুধু বংশানুক্রমিতা যার কোনো কারণ দেখাতে পারে না। প্রকৃতি শুধু গুণবান্‌কে নির্ব্বাচন করে, জীবন-সংগ্রামও তাই করে। স্বোপার্জ্জিত গুণ (acquired character) বংশানুক্রমিকভাবে সন্তানকে দেওয়া যায় না, বিজ্ঞান বল্‌ছে। অধ্যাপক জে এ টম্‌সনের মতে কোন কোন ক্ষেত্রে এক পুরুষ অবধি স্বোপার্জ্জিত সৎ বা অসৎ গুণ সন্তানকে দেওয়া যায় কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষে আবার তা সন্তান থেকে লোপ পেয়ে যায় (Prof. J. A. Thompson, Heredity)। শুধু বংশগত গুণই সেভাবে দেওয়া যায়। তবে এই নূতন নূতন গুণ আসে কোথা থেকে? কে জানে? এই নবগুণবিশিষ্ট প্রাণীরা (mutations) কোনো কোনো স্থলে এইসব গুণ বংশানুক্রম ভাবে সন্তানকে দিতে পারে। ক্রমবিকাশে নবগুণ-বিশিষ্টতাও তার কাজ করে। এবং তার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

* "In place of ruthless self-assertion, social progress demands self-restraint; in place of thrusting aside or treading down all competitors, it requires that the individual shall not merely respect, but shall help, his fellows, its interest is directed not so much to the Survival of the Fittest as to the fitting of as many as possible to survive. It repudiates the gladiatorial theory of existence." T. H. Huxley. অর্থাৎ মানব-জাতির আদর্শ শুধু সর্ব্বাপেক্ষা বলবানের জীবনধারণ ও দুর্ব্বলের বিনাশ নয়। বরং মানবের আদর্শ দুর্ব্বলকেও জীবনধারণে সক্ষম করিয়া তোলা। শুধু উপযুক্ততমের রক্ষণ ততটা প্রয়োজনীয় নয়; যতটা প্রয়োজনীয় অধিকতম ব্যক্তিকে উপযুক্ত করিয়া তোলা।

আমাদের দেশে ভবিষ্যৎ জাতির স্বাচ্ছন্দ্যের উপর দৃক্‌পাত না করে', অজ্ঞান ও নির্ব্বোধের মতই লোকে বংশবিস্তার করে' থাকে। আমেরিকার অনেক স্থলে অত্যন্ত বুদ্ধিহীন (idiots), উন্মাদ (lunatics) ও জন্মগত দুর্জ্জনকে (habitual criminals) বংশ-বিস্তারে অসমর্থ করে' দেওয়া আইনসঙ্গত করা হয়েছে। কোন কোন দেশে বিবাহের অনুমতিপত্র পাবার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে সকলে বাধ্য হয়। তার কারণ বংশগত ব্যাধি (Hereditary disease) কারুর থাক্‌লে তাকে বংশ বিস্তার করতে না দেবার চেষ্টা। বংশগত ব্যাধি কি কি এবং রোগ-বিশেষ বংশগত কি না, তা এখানে আলোচ্য নয়। কথাটা এই যে যে-সব ব্যাধি পিতামাতার থাক্‌লে সন্তানের হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী, সেইসকল রোগগ্রস্ত বংশের বিস্তার হওয়া সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্‌ থেকে বাঞ্ছনীয় নয়। যাদের রোগ থাকে, তাদেরও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হয় এবং সমাজে রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা বেশী থাক্‌লে সুস্থ লোকদেরও মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয়। রোগ বলাতে শারীরিক ব্যাধি বোঝায় না, মানসিক ব্যাধিও তার মধ্যে ধরা হয় (বংশগত অত্যল্পবুদ্ধিতা, উন্মাদ অবস্থা, অস্বাভাবিক বৃত্তি ইত্যাদি)। শরীর ও মন যে-সব বংশের লোকদের জন্মগতরূপে ব্যাধিগ্রস্ত, সেইসকল বংশের লোক ভবিষ্যৎ জাতিতে যত কম থাক্‌বে, ভবিষ্যৎ জাতির সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য ততই বাড়্‌বে। অবশ্য কোন্‌ কোন্‌ শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বংশানুক্রমিক তা বলা শক্ত, তবে কতকগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ নেই এবং সেই-গুলি সম্বন্ধে আইন থাকা উচিত।

কেউ বল্‌তে পারেন, যে ব্যাধিগ্রস্ত বংশে কি অতি-মানব (super-man or genius) জন্মায় না? হ্যাঁ, জন্মায় কখন কখন, কিন্তু তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী জন্মায় রোগগ্রস্ত সাধারণ মানব। এই হাজার হাজার রোগী সমাজে না জন্মালে সমাজের যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হবে, দুই একটি অতিমানব জন্মালেও তার শতাংশের এক অংশ স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়্‌বে না। কবে এক অতি-মানবের আবির্ভাব হবে এই আশায় হাজার হাজার লোককে জীবন্মৃত করে' সমাজের দুঃখ বাড়াতে হবে কি? তা ছাড়া এইরকম বংশের বিস্তারে দুঃখ যে বাড়্‌বে এটা নিশ্চিত এবং অতি-মানব আস্‌বে কি না তা এখনও অনিশ্চিত; কেবল সম্ভাবনা আছে মাত্র। এবং ব্যাধিগ্রস্ত বংশে সুস্থ বংশাপেক্ষা অধিক অতিমানব জন্মায় একথা কেহ প্রমাণ করেনি। বরং সুস্থবংশেই অতিমানবের সংখ্যা অধিক। সুতরাং অতিমানব পেতে হ'লে রোগবিস্তার বন্ধ করে' স্বাস্থ্যবিস্তার চেষ্টাই অধিক সুবুদ্ধির লক্ষণ। কোন্‌ দিকে নজর দিয়ে কাজ কর্‌ব আমরা? অবশ্য এসব বিষয়ে আইন-প্রণয়নে অনেক ব্যাঘাত আছে। কোন্‌ পিতা-মাতার রোগ জন্মগত এবং কার রোগ স্বোপার্জ্জিত, কোন্‌ রোগ বংশানুক্রমিক এবং কোন্‌টি নয়, এসব ঠিক করা শক্ত এবং বিজ্ঞান এখনও এসব দিকে বেশী অগ্রসর হয়নি। তবে আইনের সাহায্য ছাড়াও ব্যক্তি যদি সামাজিক কর্ত্তব্য-বোধে চারিদিক্‌ দেখে' তবে বিবাহ করেন এবং সন্দেহ-স্থলে সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে সাবধান হন, তা হ'লেও অনেকটা কাজ হয়। মোট কথা, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জাতির উৎকর্ষসাধন প্রয়োজন এবং তার একটা উপায়, বংশ বাছাই করে' ভবিষ্যৎ জাতির উন্নতি-সাধন।

কোনো একটা সমাজের লোকেরা শরীর ও মনের দিক্‌ দিয়ে গুণবান্‌ বা নিগুর্ণ হয় দুটি কারণে। প্রথমতঃ জন্মগত কারণে এবং দ্বিতীয়তঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় গুণে বা দোষে। প্রথমটি নিয়ে অনেক-কিছু বলা হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বল্‌তে ব্যক্তির বাইরে যে-কোন তথা সমুদয় কারণ বা অবস্থাকেই ধরা যায়। জন্মস্থানের স্বাস্থ্য, খাদ্য, জীবনযাত্রার প্রণালী, শিক্ষা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, সামাজিক রীতি-নীতি, পারিবারিক আচার-ব্যবহার, বন্ধু-বান্ধব, রাষ্ট্রীয় অবস্থা ইত্যাদি সব কিছুই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়ে। শিশু যতদিন মাতৃগর্ভে বাস করে, ততদিনও যে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার হাত থেকে মুক্ত থাকে তা নয়। মা যদি মদ খায়, তা হ'লে শিশুর অপকার হয়। মা যদি না খায়, অখাদ্য খায়, বা অতিরিক্ত খায়, তাতেও শিশুর অপকার হয়। মায়ের ভিতর দিয়ে হ'লেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার ছাপ জন্মের আগেও

শিশুর গায়ে মেরে দেয়। তা ছাড়া পিতামাতার উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতার অভাব নানাভাবে থাক্‌তে পারে (যথা বংশগত ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা)। আবার বয়স-গত ও অন্যান্য অবস্থাগত অক্ষমতাও থাক্‌তে পারে। যেমন অল্পবয়স্ক পিতামাতার সন্তান কচিৎ সবল ও সুস্থ হয়। রুগ্ন বা দুর্ব্বল অবস্থায় সন্তান উৎপাদনের ফলও খারাপ হয়। মাতাল অবস্থার সন্তানও বেশীর ভাগ সময় ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে জন্মায়। এইসবই পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য হচ্ছে, ধরা হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল না হ'লে অতিবিশুদ্ধ, পবিত্র, নীরোগ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বংশের সন্তানও রুগ্ন, কুচরিত্র ও অল্পবুদ্ধি হ'য়ে বেড়ে উঠ্‌তে পারে। এক পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আবার দ্বিতীয় পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। দ্বিতীয় পুরুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রথম পুরুষের পারি-পার্শ্বিক অবস্থার জন্মদাতা বল্‌লেও বেশী ভুল হয় না।* কাজেই যদি ভাল বংশের সন্তান পুরুষের পর পুরুষ খারাপ লোক হ'য়ে বেড়ে ওঠে তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমই থাক্‌বে। যে-সব জীববিজ্ঞান (Biology) ও সুজাত-বিজ্ঞানের (Eugenics) সেবকেরা ভাবেন, যে, শুধু বংশ-বাছাই করে'ই সমাজের সব দুঃখ দূর করা যায় বা বাছাই করাই সমাজসংস্কারের একমাত্র পথ, তাঁরা ভুলে' যান, যে, বাছাই করে' শুধু আমরা উৎকৃষ্ট ধরণের **অভূমিষ্ঠ শিশুই** পাব—তার পর শিশু কিপ্রকার মানুষ হ'য়ে উঠ্‌বে, তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সমাজের লোকদের যে-সব দোষগুণের উপর নির্ভর করে, তার বেশীর ভাগই আবার স্বোপার্জ্জিত,—বা স্বোপার্জ্জিত হ'তে পারে। নীরোগ বংশের লোকেরা প্রত্যেক পুরুষেই নিজদোষে রুগ্ন হ'য়ে পড়্‌তে পারে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বংশের লোকেও শিক্ষার দোষে অল্পবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি হ'য়ে যেতে পারে। মাৎলামি করে' সমাজের লোকে সকলে সব স্বাচ্ছন্দ্য জলে দিতে পারে। কাজেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি না করলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব। এই উন্নতির চেষ্টার ক্ষেত্রে—শিক্ষা, খাদ্য ও রন্ধন-প্রণালী, পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি, রোগ চিকিৎসা বা নিবারণ, বাসস্থানের স্বাস্থ্যোন্নতি, বাল্যবিবাহ-নিবারণ, শিশুর শরীর ও মনের উৎকর্ষ-সাধন-চেষ্টা, কুনীতি ও কুঅভ্যাস দূর করা ইত্যাদি সব-কিছুই রয়েছে। কেউ-কেউ ভাবেন যে শিশু-মৃত্যুর ফলে জাতের দুর্ব্বল অংশ মরে' গিয়ে সবলটুকুই থাকে এবং ফলে জাতি ক্রমেই সবল হয়। এটাও ভুল; কেননা শিশুমৃত্যু জাতের দুর্ব্বল অংশটুকু ছেঁটে বাদ দেয় না শিশুমৃত্যুতে শুধু দুর্ব্বল **শিশুরাই** বাদ পড়ে' যায় এবং দুর্ব্বল শিশু এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি এক জিনিস নয়।*

শিশু-অবস্থায় নানা কারণে কেউ কেউ দুর্ব্বল থাকে; সেইসব কারণ দূর হ'য়ে গেলেই তারা সবল মানুষ হ'য়ে বেড়ে ওঠে। কাজেই শিশুমৃত্যু দূর করলে জাতের দিক থেকে লাভ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী; বিশেষতঃ, শিশুমৃত্যুর কারণ দূর করলে সঙ্গে সঙ্গে যৌবন-কালাবধি লোকের যা রোগ হয় তারও অনেক লাঘব হবে, কেননা অনেক ক্ষেত্রে একই কারণে রুগ্নশিশুর যৌবনে মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্ট হয়।

মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের পরেই শিক্ষার স্থান। শিক্ষার অভাবে বা দোষে স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ থাক্‌লেও মানুষ তা ব্যবহার করে' সুখলাভে অক্ষম হয়। এক কথায় বল্‌লে বলা যায়, যে, শিক্ষার অভাবে মানুষের রসগ্রাহিতা কমে' যায়। তা ছাড়া সুশিক্ষার অভাবে সমাজে অপরাধ বাড়ে, সাধারণভাবে কার্য্যকরী ক্ষমতা কমে' যায়, সুশৃঙ্খলা কমে' যায়; এক কথায়, লোক যদি না সুশিক্ষিত হয় তা হ'লে পরোক্ষভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের লাঘব হয়। পারিবারিক রীতি-নীতির দোষে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, মনের

---

*"Environment as well as people have children." Pigou—*Economics of Welfare*, p. 98.

* The mortality of infancy is selective only as regards the special dangers of infancy and its influence scarcely extends beyond the second year of life, whilst the weakening effect of a sickly infancy is of greater duration.

Suggestion of Mr. Yule.
cd, 5263, 1909—10

বিস্তার কমে' যায়। এসবগুলি না থাক্‌লে মানুষের কার্য্যশক্তিও কমে' যায় আর তার স্বাচ্ছন্দ্যও কমে' যায়। * কাজেই দেখ্‌ছি যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিজ্ঞানের দিক্ থেকে, শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষণ, স্বাস্থ্যবর্দ্ধন, সমাজসংস্কার, দুর্নীতি দমন, রাষ্ট্রীয় সংস্কার, ইত্যাদি এবং এইসবগুলির সব দিক্‌ই আলোচ্য বিষয়। সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটি বুঝিয়ে লিখ্‌তে গেলে বিশাল এক লাইব্রেরী হ'য়ে দাঁড়ায়। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য সামাজিক সব-কিছুর ফল। কাজেই ব্যাপারটি ভাল করে' আলোচনা করা এক বিরাট্ ব্যাপার। এইসব দিক্ থেকে যে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বাড়ে, তা বেশীর ভাগ সময়ই অপরিমেয়। আমরা এখন শুধু পরিমেয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আলোচনা করব। অর্থাৎ পরিমেয় সামাজিক আয়, তার বণ্টন, উৎপাদন ও ভোগ, এইগুলির বিষয়ই বল্‌ব। এবিষয়ে আরও অনেক বল্‌বার আছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, পরিমেয় সামাজিক আয় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্দ্দেশ করে এবং তা ছাড়া পরিমেয় সামাজিক আয় পরিমেয় বলে'ই তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্ভব। সামাজিক আয় (১) ও তার অস্থিরতা (২), সামাজিক আয়ে দরিদ্রের অংশ (৩) ও সেই অংশের অস্থিরতা (৪)—এখন এই চারিটি জিনিস আমাদের চোখের সাম্‌নে রাখ্‌তে হবে। কোন কারণে যদি (১) প্রথমটি বাড়ে এবং অন্য-গুলি স্থির থাকে, তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বে। (২) দ্বিতীয়টি যদি কমে এবং অন্যগুলি স্থির থাকে, তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বে। (৩) তৃতীয়টি যদি বাড়ে ও অন্যগুলি স্থির থাকে, তা হ'লেও ফল তাই; এবং (৪) চতুর্থটি যদি কমে এবং অন্যগুলি স্থির থাকে, এমন কি দ্বিতীয়টি যদি সেই সঙ্গে সেই অনুপাতে বাড়েও তা হ'লেও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌বে। কিন্তু কোন কারণ এক সঙ্গে সবগুলিকেই আক্রমণ কর্‌তে পারে—এবং তা একভাবে নাও কর্‌তে পারে। অর্থাৎ একই কারণে সামাজিক আয় ও তার অস্থিরতার এবং দরিদ্রের অংশ ও তার অস্থিরতার বিভিন্নরূপ পরিবর্ত্তন হ'তে পারে।

কতকগুলি জিনিস আছে, যাতে স্পষ্টভাবেই সামাজিক আয় বেড়ে যায়। যেমন, আবিষ্কার (খনি, নূতন দেশ, নূতন প্রাকৃতিক দ্রব্যভাণ্ডার ইত্যাদি) ও উদ্ভাবনা (যেমন সহজে কাজ হয় বা বেশী কাজ হয় এমন যন্ত্রের উদ্ভাবনা, সামাজিক উৎপাদনা শক্তির অপচয়নিবারণের উপায়-উদ্ভাবন বা সুশৃঙ্খলা বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন, যথা ব্যাঙ্ক-স্থাপন, বা বিশাল কার্‌খানা-স্থাপন ইত্যাদি, সমবায় বা যৌথ কার্‌বার, কার্‌খানায় এবং যন্ত্রের সাহায্যে দুই কিস্তিতে শ্রমজীবী নিয়োগ করে' বেশী কাজ আদায় করা ইত্যাদি)। উৎপাদনের উপকরণ তিনটি—

* সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সমাজের লোকসংখ্যার আর-একটি সম্বন্ধ আছে। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক্‌তে হ'লে মানুষের অন্ততঃ একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ ভোগ্য প্রয়োজন হয়। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণটি কি তা স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে নির্দ্দেশ করা সম্ভব। সে যাই হোক্, ভোগ্য উৎপাদন ক্রমশঃ যে হারে বাড়ান সম্ভব, সমাজে লোক-সংখ্যা তার চেয়ে বেশী হারে বেড়ে চলে। অর্থাৎ ভোগ্যের পরিমাণকে দুগুণ করে' আন্‌তে যা সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা দুগুণের বেশী হ'য়ে যাওয়া সম্ভব। নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার সাহায্যে কোনো কোনো সময় ভোগ্য-উৎপাদন খুব বেশী হারে বেড়ে যায়; কিন্তু সেক্ষেত্রেও জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশী। এর উপর যদি আবার জনসংখ্যা সংখ্যায় বাড়্‌লেও গুণে না বাড়ে, অর্থাৎ যদি লোকে বংশ-পরম্পরায় নির্গুণ হ'য়ে আসে (যেমন অনেক স্থলে আমাদের দেশে হয়েছে) তা হ'লে গোলযোগ আরও বাড়ে। সামাজিক আয়ের তুলনায় লোকসংখ্যা অতিরিক্ত হ'য়ে গিয়ে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য কমে' যায়। এঅবস্থায় যে সব কারণে লোকসংখ্যা বিপদ্‌জনকরূপে বেড়ে চলে সেগুলি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে নিবারণ করা দরকার। বিবাহের বয়স যত বাড়ান যায়, একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা বাড়ে তত কম। অজ্ঞানের মত পরিবারবৃদ্ধি লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আর-একটি কারণ। পরিবারপালন-ক্ষমতা না থাক্‌লে বিবাহ করা দোষাবহ। একান্নবর্ত্তী পরিবারগুলি এই দিক থেকে দোষাবহ। কেননা এইসব পরিবারে অক্ষম লোকে বিবাহ কর্‌তে ভরসা পায়, পরের স্কন্ধে জীবনযাপন করার সুবিধা থাকায়। তা ছাড়া (ভালভাবে খাইয়ে, পরিয়ে, শিক্ষা দিয়ে) যেসংখ্যক সন্তানাদি পালন করার ক্ষমতা আছে, তার বেশী সন্তান উৎপাদনও সামাজিক পাপ। আদর্শ সমাজে বহুসন্তানবান্ অক্ষম লোককে অপরাধীরূপে গণ্য করা উচিত। আত্মনির্ভরশীলতা সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির একটি প্রধান উপকরণ। একান্নবর্ত্তী পরিবার সেই আত্মনির্ভরশীলতা নষ্ট করে। সমাজের লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধির চেয়ে গুণবৃদ্ধির দর্‌কার বেশী; বিশেষতঃ যে-সব দেশে যথেষ্ট বা অত্যধিক লোক (প্রকৃতিদত্ত জিনিসগুলি ভোগ বা ভোগ্য উৎপাদনার্থে ব্যবহার করার পক্ষে ও সমাজগঠনের পক্ষে), সে-সব দেশে কথাটা বেশী করে' খাটে। আমাদের দেশে বিশেষ করে' লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা, তাদের গুণবৃদ্ধির দিকে অধিক নজর দেওয়া উচিত। কি উপায়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায়, বা কি উপায়ে দূষণীয় ধরণের একান্নবর্ত্তিতা দূর করা যায়, বা কি উপায়ে আয়ের তুলনায় বৃহৎ পরিবার না হয়, তা এখানে আলোচ্য নয়।

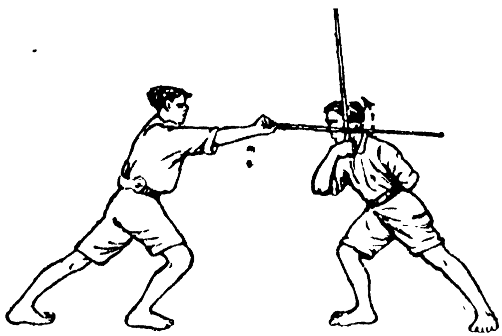
প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন—কিভাবে ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায় মানুষ কিভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'লে সবচেয়ে বেশী কাজ দিতে পারে, এবং রাষ্ট্র (State) কিভাবে কাজ করলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতে পারে; এই প্রশ্নগুলিরও গুরুত্ব অনেক। আমরা অতঃপর একে একে উপরোক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব। এগুলি কিভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সহায়তা করে এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার সারাংশ কি, তা দেখতে হবে। তা ছাড়া কি কি কারণে দরিদ্রের সামাজিক আয়ের অংশ বাড়ে কমে, কিভাবে সামাজিক আয় ও দরিদ্রের অংশের অস্থিরতা বাড়ে কমে, তাও আমাদের দেখতে হবে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

তেরোর বাড়ির—

"উল্টা হালকুম্" আটকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম স্কন্ধ-মোড়ের ঈষৎ বাম ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে।



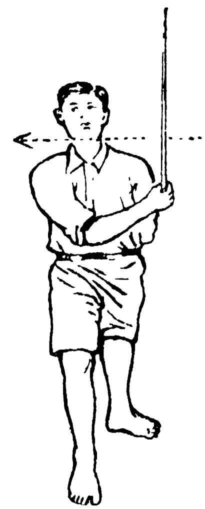
উল্টা হালকুম্

"জবেগা" আটকাইবার কালে হাতের মুঠা দক্ষিণ স্কন্ধ-মোড়ের ঈষৎ দক্ষিণ ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে।

"উল্টা জবেগা" আটকাইবার কালে হাতের মুঠা বাম স্কন্ধ মোড়ের ঈষৎ বাম ও নিম্নে এবং প্রায় ষোড়শ অঙ্গুলী সম্মুখ ভাগে থাকিবে। লাঠি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ভূমির উপরে লম্বভাবে থাকিবে।



জবেগা

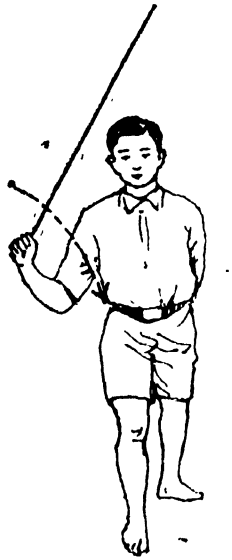


উল্টা জবেগা

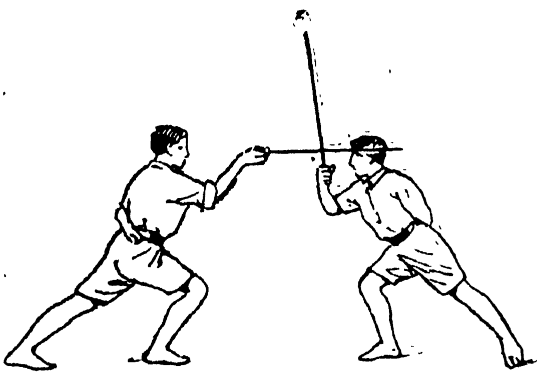
"ভর্জ্জা" আটকাইবার কালে হাতের মুঠার বৃদ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ স্কন্ধ মোড়ের প্রায় দশ অঙ্গুলী দক্ষিণে ও নিম্নে এবং প্রায় চতুর্দ্দশ অঙ্গুলী সম্মুখে থাকিবে।

"উল্টা ভ্রূকুটি" আটকাইবার কালে হাতের মুঠা নাসিকাগ্রের অর্দ্ধহস্ত সম্মুখ ভাগে থাকিবে এবং লাঠির অগ্রবিন্দু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া ঈষৎ দক্ষিণে হেলিয়া থাকিবে।

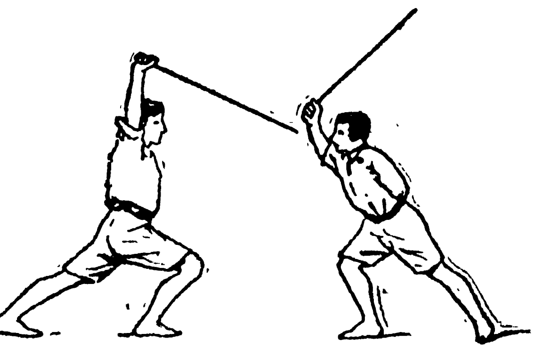
"হুঞ্জরের" প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক্ বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে।



ভর্জ্জা



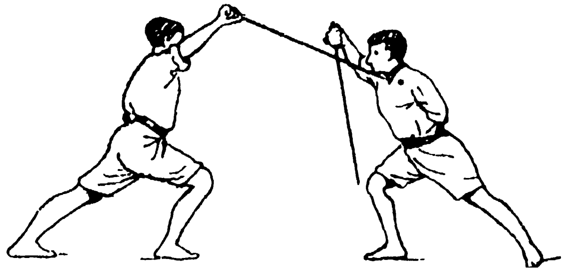
উল্টা ভ্রূকুটি



হঞ্জুর

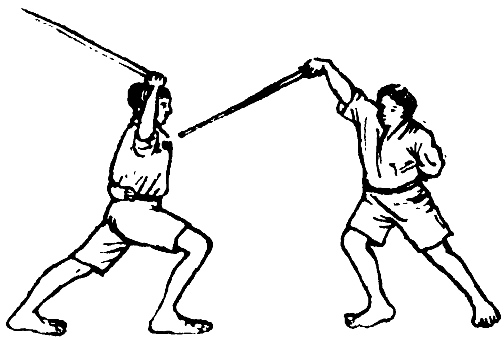
প্রকারান্তর :—

অথবা নিজ লাঠিকে নিম্নমুখ রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিম্নের দিক্ হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে উর্দ্ধে ও নিজ বাম দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।



হঞ্জুর প্রকারান্তর

"উল্টা হঞ্জুর"এর প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু নিজ বাম দিক্ দিয়া উপরে তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিকে দূর করিয়া দিতে হইবে



উল্টা হঞ্জুর

চৌদ্দর বাড়ি—

১। গ্রীবান, বাহেরা, চাকি, হাতকাটি, শির, মন্, কোমর, আসর, সাকেন্, ধুনিয়া করক্, পোস্‌ৎপা, সাগু, ধুনিয়া পালট্, ইয়কুমা।

ধুনিয়াকরক্—দক্ষিণ পদের ভিতর দিকের গাঁঠের নিম্নের সীমানা হইতে নীচের দিকের অংশে আঘাত করিয়া বক্রভাবে উর্দ্ধদিকে পদ-সন্ধিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

পোস্‌ৎপা—পায়ের পাতার মধ্য-দেশ বরাবর দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়।

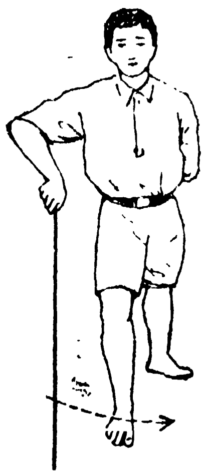
ইয়কুমা—বাম স্কন্ধ-দেশের সম্মুখস্থ অস্থির ভিতরে অসির অগ্রবিন্দু ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। অসির ধারের পিঠ উপর দিকে থাকে।

বর্ণনা :—

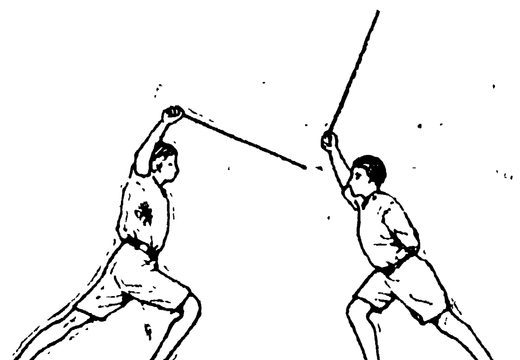
"ধুনিয়াকরক্" আট্‌কাইবার কালে পুরোবর্ত্তী পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর অর্দ্ধ হস্ত বামে ও সম্মুখে লাঠির অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে।

"পোস্‌ৎ পা" আট্‌কাইবার কালে পুরোবর্ত্তী পদের বৃদ্ধাঙ্গুলীর কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ হস্ত দক্ষিণে ও সম্মুখে লাঠির অগ্রবিন্দু ভূমিতে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন করিয়া ধরিতে হইবে।


ধুনিয়া করক্

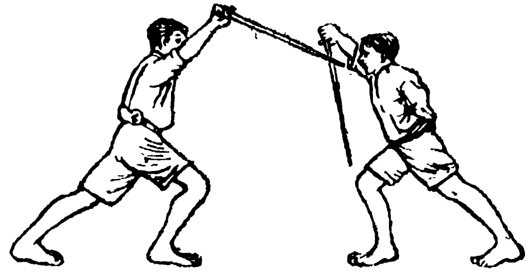

পোস্‌ৎপা

"ইয়কুমা" র প্রতিকারকল্পে লাঠির অগ্রবিন্দু উপরে তুলিয়া হাঁকিয়া আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে নিজ দক্ষিণ দিক্ বরাবর বাহির করিয়া দিতে হইবে।


ইয়কুমা

প্রকারান্তর :—

অথবা নিজ লাঠিকে নিম্নমুখ করিয়া রাখিয়া অগ্রবিন্দু ঈষৎ নিজ দক্ষিণ দিকে হেলাইয়া নিম্নের দিক হইতে আঘাত করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠিকে ঊর্দ্ধে ও নিজ বামদিকে দূর করিয়া দিতে হইবে।


ইয়কুমা প্রকারান্তর

শৃঙ্গসহ যে কোনও ঠাটে দাঁড়াইয়া লাঠি কোমরের সমান্তরাল এবং শৃঙ্গ বক্ষের সমান্তরাল করিয়া ধরিতে হইবে। ইহাই সেই সেই ঠাটের "কেল্লাবন্দি"।

পনরর বাড়ি খেলিবার কালে অভিবাদনের আঘাত করিয়া অপর হস্তে লাঠি ও শৃঙ্গ একত্রে ধরিয়া পরে হস্ত স্পর্শ ও অভিবাদন সমাপ্ত করিতে হইবে।

পনরর বাড়ি—

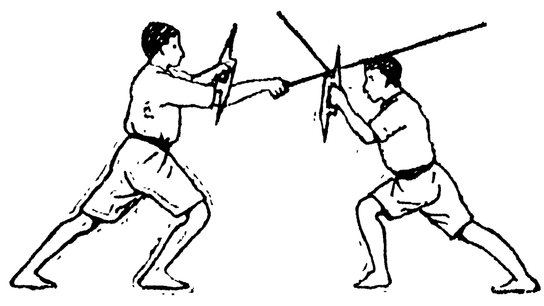
(শৃঙ্গ সহিত)

ঠাট—দোয়াঙ্গ।

১। তেওয়র +, হাতকাটি।, শিফরকা দাও ¦, চাপ্‌কা ¦, হাতকাটি পেশ ¦, হাতকাটি পোস্ত ¦, কণ্ঠা +, হিমাএল +, শির + কোঠ ¦, ভুজ +, ভর্জ্জা ¦, তামেচা ¦, বাহেরা ¦, সাও্ +।

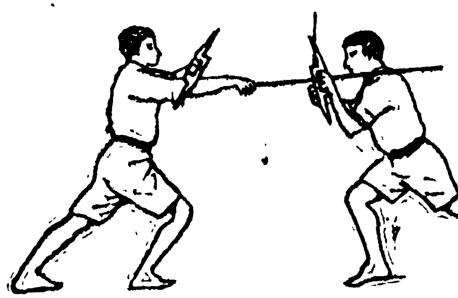
শিফরকা দাও—বাম হস্তের হাতকাটি।

শিফর—ঢাল বা শৃঙ্গ।

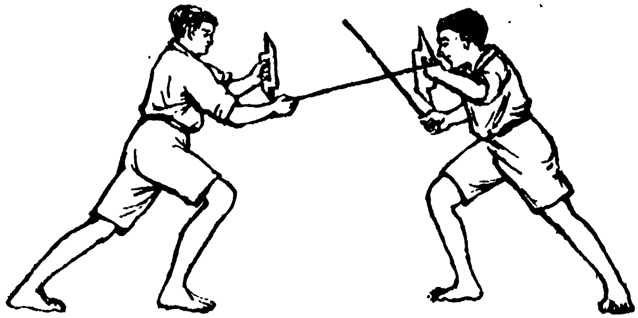

শিফরকা দাও

ছাপ্‌কা—হস্তের কানার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতিরেকে অপর চারিটি অঙ্গুলীর সন্ধিগুলি একত্রে কাটিয়া ফেলা হয়।

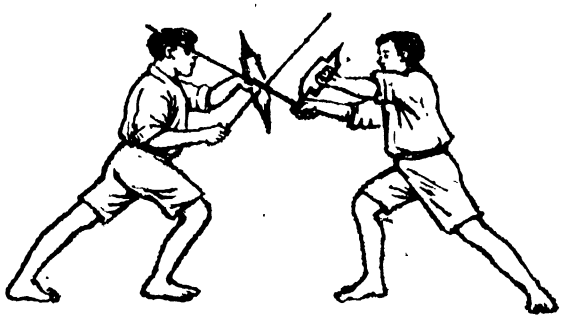
হাত কাটি পেশ—হস্ততালুর দিকের হস্তের কব্জি।



চাপ্‌কা

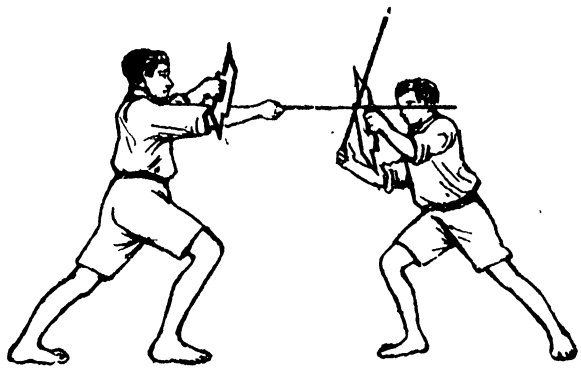


কণ্ঠা

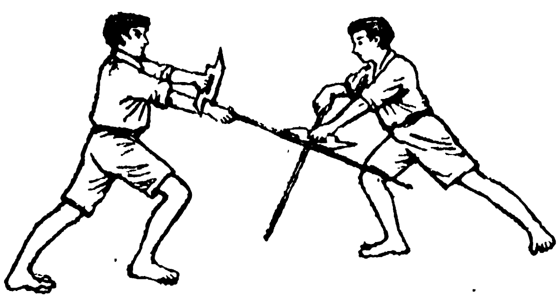


হাতকাটি পেশ

হাতকাটি পোস্‌ৎ—হস্তপৃষ্ঠের দিকের হস্তের কব্জি।



ঠোক্‌



হাতকাটি পোস্‌ৎ

কণ্ঠা—নিজ দক্ষিণ দিক্ হইতে থাকিয়া হস্ত কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অসির অগ্রভাগ দ্বারা কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

ঠোক্—যে হস্তে অসি ধৃত থাকিবে, সেই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলা হয়।

বর্ণনা—

যে আঘাতগুলির সঙ্গে "+" চিহ্ন রহিয়াছে তাহা কেবল শৃঙ্গ দ্বারা আট্‌কাইতে হইবে। যে আঘাতগুলির সঙ্গে "+̣" চিহ্ন রহিয়াছে তাহা শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া আট্‌কাইতে হইবে। শৃঙ্গদ্বারা আট্‌কাইবার কালে সাধারণতঃ শৃঙ্গকে প্রতিপক্ষের আঘাতের গতির দিকের সঙ্গে সমকোণ করিয়া ধরিতে হইবে। শৃঙ্গ ও লাঠি একত্র করিয়া আট্‌কাইবার কালে সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বদাই শৃঙ্গ লাঠির সম্মুখে থাকিবে।

সম ঘাত (শ্যাম ঘাত)

শ্যাম ঘাত খেলিবার সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ ভারি লাঠি ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাহাতে আঘাতের তীব্রতা সাধনে শক্তি জন্মিয়া থাকে। শ্যাম ঘাত খেলাতেই দ্রুত ও অতি দ্রুত চালনা অভ্যাস করিতে হইবে। অমসৃণ ঈষৎ ভারী লাঠি সহ দক্ষতার সহিত অতি দ্রুত শ্যাম ঘাত খেলায় রত থাকিতে পারিলে প্রত্যক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।

শ্যামঘাত খেলিবার কালে উভয়কে পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার করিয়া যাইতে হইবে এবং সমস্ত আঘাতই গরদেশে প্রয়োগ করিয়া তরাসে টানিয়া আনিতে হইবে। প্রত্যেকটি ধারাই কতিপয়সংখ্যক বার বাম হস্তে খেলিয়া পরে দক্ষিণ হস্তে সমসংখ্যক বার খেলিতে হইবে। এবং পরে যিনি

প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতিপক্ষ প্রথম আরম্ভ করিবেন এবং পূর্ব্বের সম সংখ্যক বার খেলিবেন এইরূপ উভয় হস্তেই করিবেন।

প্রথম ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ।

১। গ্রীবান, হাতকাটি।
২। গ্রীবান, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
৩। গ্রীবান, বাহেরা, হাতকাটি ভাণ্ডার।
৪। গ্রীবান, সাকেন্, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
৫। গ্রীবান, পোস্‌ৎপা, সাকেন্, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
৬। গ্রীবান, ভুজ, পোস্‌ৎপা, সাকেন, বাহেরা. হাতকাটি, ভাণ্ডার।
৭। গ্রীবান, মন্, ভুজ, পোস্‌ৎপা, সাকেন, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার
৮। গ্রীবান, আসর, মন, ভুজ, পোস্‌ৎপা, সাকেন, বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।
৯। গ্রীবান, তামেচা, আসর, মন্, ভুজ, পোস্‌ৎপা, সাকেন, বাহেরা হাতকাটি, ভাণ্ডার।
১০। গ্রীবান, পালট্, তামেচা, আসর, মন্, ভুজ, পোস্‌ৎপা, সাকেন্ বাহেরা, হাতকাটি, ভাণ্ডার।

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ।

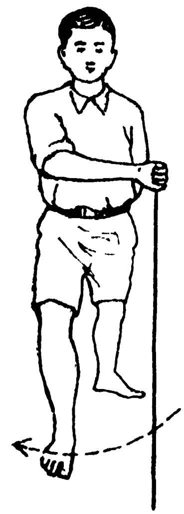
১। হিমাএল, হাতকাটি।
২। হিমাএল, হাতকাটি, কোমর।
৩। হিমাএল, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
৪। হিমাএল, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
৫। হিমাএল, উল্টাপোস্‌ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
৬। হিমাএল, ভর্জ্জা, উল্টাপোস্‌ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
৭। হিমাএল, দে, ভর্জ্জা, উল্টাপোস্‌ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
৮। হিমাএল, সাকেন্, দে, ভর্জ্জা, উল্টাপোস্‌ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
৯। হিমাএল, বাহেরা, সাকেন্, দে, ভর্জ্জা, উল্টা পোস্‌ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।
১০। হিমাএল, করক, বাহেরা, সাকেন, দে, ভর্জ্জা, উল্টা পোস্‌ৎপা, আসর, তামেচা, হাতকাটি, কোমর।

উল্টা পোস্‌ৎপা—পায়ের পাতার মধ্যদেশ বরাবর বামপার্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়।

তৃতীয় ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ।

১। গ্রীবান, তামেচা।
২। গ্রীবান, তামেচা, পালট্।
৩। গ্রীবান, আসর, তামেচা, পালট্।
৪। গ্রীবান, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।



উল্টা পোস্‌ৎপা

৫। গ্রীবান, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
৬। গ্রীবান, পোস্‌ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
৭। গ্রীবান, সাকেন্, পোস্‌ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট।
৮। গ্রীবান, বাহেরা, সাকেন্, পোস্‌ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
৯। গ্রীবান, ভাণ্ডার, বাহেরা, সাকেন্, পোস্‌ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।
১০। গ্রীবান, হাতকাটি, ভাণ্ডার, বাহেরা, সাকেন্, পোস্‌ৎপা, ভুজ, মন্, আসর, তামেচা, পালট্।

চতুর্থ ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ।

১। হিমাএল, বাহেরা।
২। হিমাএল, বাহেরা, করক।
৩। হিমাএল, সাকেন্, বাহেরা, করক।
৪। হিমাএল, দে, সাকেন্, বাহেরা, করক।
৫। হিমাএল, ভর্জ্জা, দে, সাকেন, বাহেরা, করক।
৬। হিমাএল, উল্টা পোস্‌ৎপা, ভর্জ্জা, দে, সাকেন্, বাহেরা, করক।
৭। হিমাএল, আসর, উল্টা পোস্‌ৎপা, ভর্জ্জা, দে, সাকেন্, বাহেরা, করক।
৮। হিমাএল, তামেচা, আসর, উল্টা পোস্‌ৎপা, দে, ভর্জ্জা সাকেন্, বাহেরা, করক।
৯। হিমাএল, কোমর, তামেচা, আসর, উল্টা পোস্‌ৎপা, দে, ভর্জ্জা, সাকেন্, বাহেরা, করক।
১০। হিমাএল, হাতকাটি, কোমর, তামেচা, আসর, উল্টা পোস্‌ৎপা, দে, ভর্জ্জা, সাকেন্, বাহেরা, করক।

পঞ্চম ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

১। হিমাএল, দে।
২। হিমাএল, দে, কোমর।
৩। হিমাএল, দে, কোমর, আসর।

ষষ্ঠ ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

১। গ্রীবান, মন্।
২। গ্রীবান, মন্, ভাণ্ডার।
৩। গ্রীবান, মন্, ভাণ্ডার, সাকেন।

সপ্তম ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

১। শির, করক্।
২। কোমর, শির, করক্।
৩। তেওয়র, কোমর, শির, করক্।
৪। তেওয়র, উল্টা শির, কোমর, শির, করক্।
৫। তেওর, অঙ্ক্, উল্টা শির, কোমর, শির, করক্।
৬। তেওয়র, ভর্জ্জা, অঙ্ক্, উল্টা শির, কোমর, শির, করক্।

অষ্টম ক্রম (শৃঙ্গ সহ)

ঠাট—দোয়াঙ্গ

১। সাণ্ড্, পালট্।
২। ভাণ্ডার, সাণ্ড্, পালট্।
৩। চাকি, ভাণ্ডার, সাণ্ড্, পালট্।
৪। চাকি, শির, ভাণ্ডার, সাণ্ড্, পালট্।
৫। চাকি, উল্টা অঙ্ক্, শির, ভাণ্ডার, সাণ্ড্, পালট্।
৬। াকি, ভুজ, উল্টা অঙ্ক্, শির, ভাণ্ডার, সাণ্ড্, পালট্।

বিষম-ঘাত (মিল বাট)

বিষম-ঘাত-পর্য্যায়ে বামে লিখিত আঘাতগুলি এক জনে প্রয়োগ করিবে, প্রত্যেকটি আঘাতের উত্তরে প্রতিপক্ষ সেই আঘাতটির দক্ষিণে লিখিত আঘাতটির প্রয়োগ করিবে এবং প্রথম ব্যক্তির শেষ আঘাতটির প্রয়োগ হইয়া গেলে পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম হইতে আরম্ভ করিবে এবং প্রথম ব্যক্তি উত্তরের আঘাত-গুলির প্রয়োগ করিবে। প্রথমে বাম হস্তে ক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ হস্তে ক্রীড়া করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ

(মার্)	(জবাব)
গ্রীবান	পালট্।
বাহেরা	করক্।
তামেচা	ভাণ্ডার।
গ্রীবান	গ্রীবান (এয়াদা)।

মার = আক্রমণ ; জবাব = উত্তর।

এয়াদা = প্রথম হইতে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির ও প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাত পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট—একাঙ্গ

(মার্)	(জবাব)
হিমাএল	করক্।
তামেচা	পালট্।
বাহেরা	ভাণ্ডার।
হিমাএল	হিমাএল (এয়াদা)।

তৃতীয় ক্রম

ঠাট—দোয়াঙ্গ

(মার্)	(জবাব)
তামেচা	মোঢ়া।
শির	শির।
বাহেরা	ভাণ্ডার।
কোমর	শির।
ভর্জ্জা	উল্টা মোঢ়া।
করক	শির।
শির	তামেচা (এয়াদা)।

চতুর্থ ক্রম

ঠাট—দোয়াঙ্গ

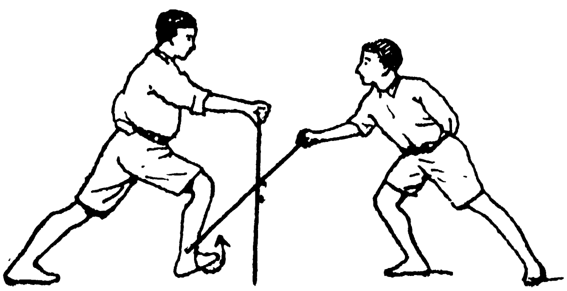
(মার্)	(জবাব)
বাহেরা	উল্টা মোঢ়া।
সাণ্ড্	সাণ্ড্।
তামেচা	কোমর।
ভাণ্ডার	সাণ্ড্।
ভুজ	উল্টা মোঢ়া।
পালট্	সাণ্ড্।
সাণ্ড	বাহেরা (এয়াদা)।

পঞ্চম ক্রম

ঠাট—পথরী

(মার্)	(জবাব)
তামেচা	পালট্ !
ভর্জ্জা	শিব।
ভাণ্ডার	বাহেরা।
মোঢ়া	শিব্।
ভুজ	উল্টা মোঢ়া।
চাকি	বাহেরা।
গ্রীবান	সাণ্ড্।
করক	মোঢ়া।
পালট্	গ্রীবান।
হালকুম্	ফাক্।
পাগ্	চাকি।
সাকেন্	শির।
শির	তামেচা (এয়াদা)।

পাগ্—প্রতিপক্ষ পুরোবর্ত্তী পদের গোড়ালিতে ভর করিয়া পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উল্টা-পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। ধুনিয়া পালটের ন্যায় আট্‌কাইতে হইবে।



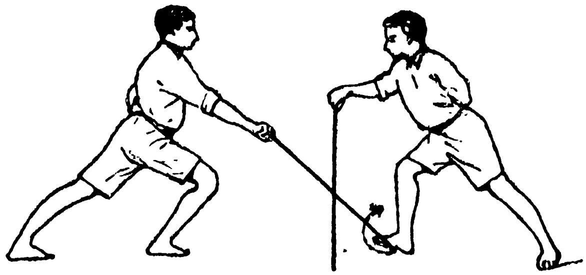
পাগ্

ষষ্ঠ ক্রম

ঠাট—পাথরী

(মার্)	(জবাব)
বাহেরা	করক।
ভুজ	সাণ্ড্।
কোমর	তামেচা।
মোঢ়া	সাণ্ড্।
ভর্জ্জা	উল্টা মোঢ়া।
তেওয়র	তামেচা।
হিমাএল	শির।
পালট	মোঢ়া।
করক	গ্রীবান।
উল্টা হালকুম্	উল্টা ফাক।
উল্টা পাগ্	তেওয়র।
আসর	সাণ্ড্।
সাণ্ড্	বাহেরা (এয়াদা)।

উল্টা পাগ্—প্রতিপক্ষ পুরোবর্ত্তী পদের গোড়ালিতে ভর করিয়া পায়ের পাতা উপরে তুলিলে অসির উল্টা পিঠ দ্বারা পদতলের মাঝামাঝি বরাবর প্রতিপক্ষের বাম পার্শ্ব হইতে কাটিয়া ফেলা হয়; ধুনিয়া করকের ন্যায় আট্‌কাইতে হইবে।



উল্টা পাগ্

চতুর্ম্মুখী

প্রথমে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে। পরে সমসংখ্যক বার দক্ষিণ-হস্তে লাঠি ও বামহস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে। উভয়কেই একত্রে প্রত্যেকটি আঘাতের সমান-ভাবে লাঠি দ্বারা প্রয়োগ ও শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিকার করিতে হইবে। চতুর্ম্মুখী পর্য্যায় হইতে বাহেরার অভিবাদন করিতে হইবে।

প্রথম ধারা

গ্রীবান, শির, ভুজ, দে, পাগ্, চাকি, সাণ্ড্, ভাণ্ডার, তেওয়র, কবক, পালট্, ভর্জ্জা।

বর্ণনা :—

"ভুজ" মারিয়া লাঠিকে প্রতিপক্ষের শৃঙ্গের সহিত ঘেঁষিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া আনিয়া "দে" মারিতে হইবে।

"পাগ" মারিয়া তরাসে টানিয়া লাঠি পিছন্ দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া চাকি মারিতে হইবে।

"সাণ্ড্" মারিবার কালে শৃঙ্গ বাম পার্শ্ব হইতে ঘুরাইয়া মাথার উপর দিয়া আনিয়া প্রতিপক্ষের আঘাত

আট্‌কাইবার নিমিত্ত নিজ লাঠির সম্মুখে আনিতে হইবে, সুতরাং নিজ লাঠি নিজ শৃঙ্গের সহিত সংলগ্ন হওয়াতে "সাগুের" আঘাত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রতিপক্ষের লাঠি নিজ শৃঙ্গ ও লাঠির মধ্যে পতিত হইবে। কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ লাঠি ও নিজ শৃঙ্গ একত্রিত করিয়া আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইতে নাই।

"পালটু" প্রভৃতি নিম্নের দিকের আঘাত প্রয়োগ-কালে বামপদ একটুকু সম্মুখে আসিবে, পরে যথাস্থানে যাইবে এবং ঐ সঙ্গে-সঙ্গেই পরের আঘাত প্রয়োগ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় ধারা

হিমাএল, সাগু, ভর্জ্জা, মন্, উল্টা পাগ্, তেওয়র, শির, কোমর, চাকি, পালট্, করক, ভুজ।

তৃতীয় ধারা

বাহেরা, উল্টা মোঢ়া, ভাণ্ডার, শির, তামেচা, ভর্জ্জা, সাগু, ভুজ, মোঢ়া, চাকি, তেওয়র, গ্রীবান।

চতুর্থ ধারা

তামেচা, মোঢ়া, কোমর, সাগু, বাহেরা, ভুজ, শির, ভর্জ্জা, উল্টা মোঢ়া, তেওয়র, চাকি, হিমাএল।

পঞ্চম ধারা

বাহেরা, পোস্‌ৎপা, দে, উল্টা মোঢ়া, হিমাএল, ভাণ্ডার, কোমর, শির, পালট্, তামেচা, মোঢ়া, পাগ্, চাপ্‌নি, চাকি, সাগু, করক, গ্রীবান, মন্, তেওয়র, ভুজ, আসর, সাকেন, হাতকাটি, অন্তর, দিগর।

বর্ণনা :—সমস্ত আঘাতই গরদেশে, প্রয়োগ করিতে হইবে। "পাগ্" ও এস্থলে তরাসে টানিয়া আনিতে হইবে না।

"হাতকাটি" মারিয়া লাঠি প্রতিপক্ষের মাথার উপর দিয়া আনিয়া নিজ দক্ষিণ দিক্ হইতে নিজ মাথার উপর দিয়া আনিয়া অন্তর মারিতে হইবে।

ষষ্ঠ ধারা

তামেচা, উল্টা পোস্‌ৎপা, মন্, মোঢ়া, গ্রীবান, কোমর, ভাণ্ডার, সাগু, করক, বাহেরা, উল্টা মোঢ়া, উল্টা পাগ্, দিগর, তেওয়র, শির, পালট্, হিমাএল, দে, চাকি, ভর্জ্জা, সাকেন, আসর, হাতকাটি, উল্টা অন্তর, চাপ্‌নি।

গহ্বর (গোহার)

বহুলোকের মধ্যে পতিত হইয়া আত্মরক্ষার প্রয়োজন হইলে "গহ্বর"-পর্য্যায়ে দক্ষতা লাভের দর্‌কার হইয়া থাকে।

প্রথমে কতিপয় শিক্ষার্থী প্রত্যেকে এক লাঠির দূরত্বে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইবে, পরে পূর্ব্বের অভ্যস্ত কোনও একটি "ঘাতে"র ধারা কিম্বা শ্যামঘাত অথবা বিষম-ঘাতের যে-কোনও ক্রমের প্রথম আঘাতটি কোনও একজনে তাহার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করিবে, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ আঘাতটি আট্‌কাইয়া তাহার পরের আঘাতটি তাহার অপর-পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে মারিবে; এইরূপে ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া আসিয়া খেলা চলিতে থাকিবে।

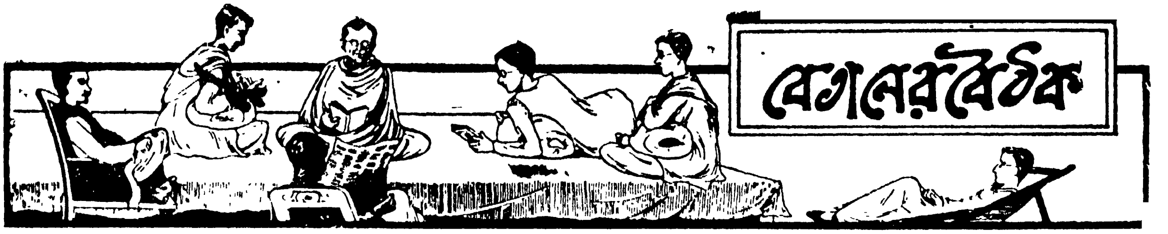
"ঘাত" প্রভৃতির যে ধারাটি মনোনীত করিবে তাহার মধ্যে আঘাতের সংখ্যা এবং যে কয়জন লোক দাঁড়াইবে তাহাদের সংখ্যা, এই দুই সংখ্যার মধ্যে যেন কোন সাধারণ গুণনীয়ক না থাকে; তাহা হইলেই প্রথম আঘাতটি ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যেকের উপরেই পড়িতে থাকিবে।

পরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একজন মণ্ডলের কেন্দ্রে দাঁড়াইবে এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি মণ্ডলের একজনকে আঘাত করিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তির পর্য্যায়ানুযায়ী আঘাতের প্রতিকার করিবে, এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া খেলা চালাইতে থাকিবে।

দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই এবং মণ্ডলের দক্ষিণ ও বাম উভয় আবর্ত্তেই এইরূপে অভ্যাস করিতে হইবে। পরে মণ্ডলের সীমানায় চারি জন কিম্বা পাঁচ জনের অধিক থাকিবে না, এবং কেন্দ্রস্থিত ব্যক্তি অতি দ্রুত চালনায় সকলের সঙ্গে খেলিতে থাকিবে। সাধারণতঃ একসঙ্গে চারিজনের অধিক এক ব্যক্তিকে সফলতার সহিত আঘাত করিতে পারে না। এইরূপে পর্য্যায়-ক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রে থাকিয়া দক্ষতা অর্জ্জন করিবে।

ক্রমশঃ

শ্রী পুলিনবিহারী দাস



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৫৮)

বুদ্ধদেব

এক সাহেবের সম্পাদিত ফাহিয়ানের ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক লিখিয়াছেন যে বর্ত্তমানে জানা গিয়াছে যে ভারতের বুদ্ধদেব বাস্তবিকপক্ষে কোন রাজার পুত্র ছিলেন না। এবিষয়ে কেহ প্রকৃত তথ্য জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(১৫৯)

ভারতবর্ষে সিমেণ্ট্ কার্‌খানা

আমাদের দেশে কোথাও স্বদেশী সিমেণ্ট্ ফ্যাক্টরী (বিলাতী মাটীর কার্‌খানা) আছে কিনা? থাকিলে তাহা কোথায়, সংখ্যায় কতগুলি ও তথায় দেশীয় লোককে শিক্ষানবিশরূপে গ্রহণ করা হয় কিনা?

শ্রী পান্নালাল দাস

(১৬০)

ভারতবর্ষে খড়িমাটীর পাহাড়

ভারতবর্ষে কোথাও খড়িমাটীর পাহাড় কিংবা কার্‌খানা আছে কি-না? যদি থাকে, কোথায়? পেন্সিল্ চক্ তৈয়ারী করিবার প্রণালী কোন্‌খানে শিক্ষা করা যায়?

শ্রী অবনীমোহন দাসগুপ্ত

(১৬১)

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা কতদিনের প্রাচীন? বৈদিকযুগে কি এই উপাসনা প্রচলিত ছিল? যদি না ছিল তবে কোন্ সময়ে ইহা প্রচলিত হয়? এই উপাসনা কোন্ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক ও নৈতিক মঙ্গলের জন্য কতদূর সঙ্গত এবিষয়ে কেহ আলোচনা করিয়াছেন কি?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ সিংহ বেদান্তভূষণ

(১৬২)

ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ

হিন্দুরা যে জাপান, যাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, সিংহল ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহার সবিশেষ বিবরণ কোন্ পুস্তকে পাওয়া যায়?

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

শ্রী যদুনাথ মণ্ডল

(১৬৩)

"মধ্যস্থের" প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক কে?

১২৭৯ সালে কলিকাতা ২০১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট "মধ্যস্থ" মুদ্রাযন্ত্র হইতে "মধ্যস্থ" নামক একখানা সুসম্পাদিত সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। "মধ্যস্থের" প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক কে ছিলেন? উহার বার্ষিক মূল্য কত ছিল?

শ্রী রাধাচরণ দাস

(১৬৪)

বঙ্গদেশে সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকা

বঙ্গভাষায় এপর্য্যন্ত সঙ্গীতবিষয়ক কতগুলি পত্রিকা বাহির হইয়াছে,—তাহাদের প্রত্যেকের সম্পাদকের নাম কি এবং কার্য্যালয় কোথায়? ইহাদের মধ্যে কয়খানা অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে?

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬৫)

সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত

প্রক্ষিপ্ত-অংশ-বিবর্জ্জিত সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারতের কোন সংস্করণ আছে কিনা এবং বাংলাভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের এমন কোন অনুবাদ আছে কি না যাহাতে মূল সংস্কৃতের যথাযথ অনুসরণ করা হইয়াছে?

শ্রী ত্রিপুরাচরণ ঘোষ

(১৬৬)

একাদশী তিথিতে অন্নগ্রহণ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদিলীলার পঞ্চদশ অধ্যায়ে লেখা

যায় যে চৈতন্যদেব—তখন বিশ্বম্ভর মিশ্র, নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত—তাঁহার মাতাকে একাদশীর দিন অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন।

"প্রভু কহে, একাদশীতে অন্ন না খাইবা।
শচী কহে না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"

ইহার অর্থ কি? নবদ্বীপের ন্যায় স্মার্ত্ত-প্রধান স্থানে কি ব্রাহ্মণ বিধবা একাদশীর দিন অন্নগ্রহণ করিতেন? সমগ্র বঙ্গদেশেই কি ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল? অথবা শ্রীহট্টীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে ঐ আচার ছিল, এবং মহাপ্রভু নিজে উক্ত সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার মাতা ঐ প্রথামত চলিতেন? শ্রীহট্টীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে ঐ প্রথা কখনও প্রচলিত ছিল বা বর্ত্তমানে আছে কি?

শ্রী যতীশচন্দ্র বাগ্‌চী

(১৬৭)

ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা

বঙ্গদেশে কিম্বা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায় কোথায় ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিবার বিদ্যালয় আছে? কিরূপ যোগ্যতা থাকিলে ঐ-সকল বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া যায়?

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সরকার

(১৬৮)

রোটাস্‌গড়

সেরশাহ কর্ত্তৃক রোটাস্‌গড় বিজয়ের ইতিহাস কোন্‌ গ্রন্থে পাওয়া যায়?

রোটাস্‌গড় কোন্‌ সময়ে কি অভিপ্রায়ে ও কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল?

মণিলাল মাইতি

(১৬৯)

হরিতকী-রক্ষা

পোকার উপদ্রব হইতে কাঁচা হরিতকী রক্ষা করিয়া কি উপায়ে বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী করা যাইতে পারে?

শ্রীমতী শান্তিলতা সেন

(১৭০)

নীলকণ্ঠ পাখী

দুর্গাপূজার সময় বিজয়ার দিন যে, নীলকণ্ঠ পাখী ছাড়া হয়, ইহার কোনো কারণ আছে কি?

শ্রী সরযূ রায়

(১৭১)

প্রিভি-কাউন্সিলের ভারতীয় সভ্য

'প্রিভি-কাউন্সিলে'র প্রথম ভারতীয় সভ্য কে?

শ্রী সরসীকুমার রায়চৌধুরী

(১৭২)

পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান পুস্তকালয়

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ পুস্তকালয়ের নাম কি? উহা কোথায় অবস্থিত? উহার পুস্তকের সংখ্যা কত? ভারতের মধ্যেই বা কোন্‌ পুস্তকালয়টি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ? উহাতে কত পুস্তক আছে?

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৭৩)

বঙ্গদেশে অনাথ-আশ্রমের সংখ্যা

বাংলাদেশে আজ পর্য্যন্ত বিকলাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য লোকদিগের জন্য, অনাথ ও নিরাশ্রয় বালকবালিকাদিগের জন্য এবং অনাথা দুঃস্থা ও পতিতা স্ত্রীলোকদিগের জন্য কতগুলি সভা, সমিতি, আশ্রম বা সাহায্য-ভাণ্ডার আছে, তাহাদের ঠিকানা কি এবং পরিচালকগণের নাম কি?

শ্রী নগেন্দ্রনাথ দে

(১৭৪)

সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা-সংক্রান্ত পুস্তক

সংস্কৃত ভাষায় উদ্ভিদ্‌-বিদ্যার কোনো পুস্তক আছে কি না? তাহার নাম কি?

শ্রী জীবনলাল দাশগুপ্ত

(১৭৫)

বোতাম তৈরী

বোতাম তৈরী করিবার জন্য নারিকেলের মালাকে কি ভাবে নরম করিতে হয়? ঝিনুক হইতে বোতাম তৈরী করিতে হইলে ঝিনুককে কিভাবে নরম করিতে হইবে?—কি দিয়া উভয় জিনিষ পালিশ করিলে ভাল বোতাম হইবে?

শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র পাল

—

মীমাংসা

(৪৯)

রুদ্রাক্ষ ও তাম্রমুদ্রা

তাম্রমুদ্রার উপর রুদ্রাক্ষ স্থাপন করিয়া তদুপরি আর-একটি তাম্রমুদ্রা স্থাপন করিলে সংঘর্ষণ (friction) দ্বারা উৎপন্ন একপ্রকার বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাব হয়। এই পরীক্ষা ভল্‌টা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত Electrophorus নামক যন্ত্র কর্ত্তৃক পরীক্ষার ন্যায়। আবার সঞ্চালনী-শক্তি-বিশিষ্ট-পদার্থগাত্রের যে যে অংশ অধিক বহির্গত থাকে কিংবা যে যে অংশের ন্যুব্জতা তীক্ষ্ণ, সেই সেই অংশে বৈদ্যুতিক ঘনতা (electric density) অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে; এবং যে যে অংশের উত্তানতা অধিক সেই সেই অংশে অল্প পরিমাণে থাকে। বৈদ্যুতিক পদার্থের দ্বারা পূর্ণীকৃত একটি পদার্থের নিকটবর্ত্তী বায়ুপরমাণু-সকলও তাহার সংস্পর্শে আক্রান্ত হয় এবং প্রতিনিবৃত্তি (repulsion) ভোগ করে। বায়ুপরমাণু যত অধিক থাকে বৈদ্যুতিক ঘনতাও তত অধিক হয়। তীক্ষ্ণ ও বহির্গত অংশে ঘনতা অধিক থাকে এবং এই এই অংশে প্রতিনিবৃত্তিও অধিক। এই নিমিত্ত আক্রান্ত বায়ুপরমাণু ঐ পদার্থের বৈদ্যুতিক আক্রমণের সহিত তাড়িত হয়। এইসকল তীক্ষ্ণ অংশের বায়ুপরমাণু একটি পশ্চাদপসারী প্রতিঘাত (backward reaction) দান করে। এই প্রতিঘাতেই ঐ রুদ্রাক্ষ নিবৃত্ত-বায়ু-প্রবাহের বিপরীত দিকে চালিত হয়। যদি ঐসকল তীক্ষ্ণ অংশ মোম্‌ কিম্বা এইরূপ অপর কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত করা যায় তবে ইহা আর ঘুরিবে না। Dey's Electricity—page 142, 'action of points', এবং Watson's Physics, p. 672, 'Electrophorus' দেখুন।

শ্রী সনৎকুমার দত্ত

(৭৩)

সাদা পাথরের বাসন সাফ

জলমিশ্রিত নাইট্রিক্ এসিড্ (Dilute Nitric Acid) দ্বারা ধৌত করিলে ময়লা সাদা পাথরের বাসন পরিষ্কৃত হয়। একটি লাঠিতে এক টুকরা বস্ত্র জড়াইয়া ঐ অল্পশক্তি এসিডে ভিজাইয়া ক্ষিপ্রহস্তে সমভাবে বাসনে মাখাইতে হইবে। পরে পরিষ্কার জলে এবং সাবানে ধৌত করিতে হইবে। ইহাতে কিন্তু বাসনে পালিশ থাকিলে তাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তখন পালিশ পাথর কিংবা ঝামা দ্বারা ঘষিয়া পালিশ করিতে হইবে।

শ্রী ফণীন্দ্রনাথ নাগ

(৯১)

ভাদ্রমাসে কলাগাছ

ভাদ্রমাসে কলাগাছ পুঁতিলে কলাগাছ প্রায়ই মরিয়া যায়—এ প্রবচনে কোনো পৌরাণিক ইতিহাস নাই। 'রাবণ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে রাবণবংশের ন্যায় প্রচুর কলাগাছ বুঝাইবার জন্য। ভাদ্র মাসে কলাগাছ পুঁতিলে যে কলাগাছ মরিয়া যায় তাহার আরও কয়েকটি প্রবচন আছে ; যথা—

"কলা রু'লে ভাদ্রমাসে
নির্ব্বংশ হয় সবংশে।"

অর্থাৎ ভাদ্রমাসে কলাগাছ বসাইলে সমুদয় নষ্ট হইয়া যায়।

'সিংহ মীন বর্জ্জে'
কলা খাবে আর্জ্জে।"

ভাদ্র (সিংহ) ও চৈত্র (মীন) ব্যতীত সকল মাসেই কলা-গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। [Agricultural Sayings in Bengal, by R. L. Banerji, ৪১ পৃষ্ঠা দেখুন।]

শ্রী সনৎকুমার দত্ত

(১০৩)

ঘাটু গান

ঘাটু গান সাধারণতঃ মৈমনসিংহ জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে এবং শ্রীহট্ট ও কুমিল্লা জিলার গীত হইয়া থাকে। নেত্রকোণা অঞ্চলেও ঘাটুগানের বেশ প্রচলন আছে। ঘাটু গান জিনিসটা পুরোপুরি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। কে এই গানের প্রবর্ত্তক তাহা ঠিক জানা যায় না। বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের ভিতর ইহা আবদ্ধ থাকায় ইহার ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবে 'লালা' নামক কোন্ এক ব্যক্তি নাকি ইহার প্রথম রচয়িতা। এই লালার বাস বিহার প্রদেশের কোনো স্থানে ছিল। এইজন্য ঘাটু গানে অনেক হিন্দী, ব্রজ বুলী এবং কিছু কিছু মৈথিলী ভাষার কথা প্রচলিত আছে। ঘাটু গানের সঠিক বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলে বঙ্গের প্রাচীন লোক-ইতিহাসের কতক উপাদান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়। বর্ত্তমানেও ঘাটু গানে প্রাচীন নর্ত্তকীগানের নৃত্যপদ্ধতি অনেকটা অবিকৃত অবস্থাতেই আছে। আমার বিনীত নিবেদন,—ঘাটুগানপ্রচলিত স্থানসমূহের, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট অঞ্চলের, সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসেবী সহৃদয় ব্যক্তিগণ যদি দয়া করিয়া স্ব স্ব স্থানের প্রচুর ঘাটু গান সংগ্রহ করিয়া নিম্নঠিকানায় আমার নিকট পাঠাইয়া দেন, তবে গবেষণা কার্য্যের ও বাংলা প্রাচীন লোক-ইতিহাস আবিষ্ক্রিয়ার যথেষ্ট সাহায্য করা হয়। আশা করি আমার এঅনুরোধ ব্যর্থ হইবে না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও মুক্তালতাতে ঘাটু গানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

শৈলেন্দ্রনাথ রায়

গৌরী লাইব্রেরী নেত্রকোণা ময়মনসিংহ

এই গান কোথা হইতে আসিল কে প্রথম রচনা করিল, তাহা কেহই বলিতে পারে না। লোকে বলে—'এই গান পূব দিক হইতে আসিয়াছে।' বঙ্গে যে এককালে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল—এই গান হইতে তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। কারণ এই গান কেবল রাধার বিষয় লইয়া রচিত এবং এই গানের স্থায়ী ভাব কৃষ্ণবিরহ।

এই গানের বিশেষত্ব এই যে পদাবলী বা কীর্ত্তনের মত ইহা গীত হয় না। গায়কগণ চারিধারে উপবেশন করে। একটি 'ছোকরা'কে (এই 'ছোকরা'র লম্বা চুল রাখিতে হয়) নানা আভরণে ভূষিত করিয়া ঠিক রাধার মত সাজাইয়া আসরে নামাইয়া দেওয়া হয়। সে নানাপ্রকার অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া রাধার যে সময় যে ভাব হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শন করে। এই ছোক্‌রাকে 'ঘাটু' বলে। 'ঘাটু' হইতেই এই গানের নাম 'ঘাটু'র গান হইয়াছে।

শ্রী ফণীন্দ্রকুমার অধিকারী

(১১১)

"ডিম ফুটাইবার যন্ত্র"

ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে এবিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারিবেন।

"বকুল"

(১১২)

কাশীজোড়ার রাজা রাজনারায়ণের রাজত্বকাল ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।

কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তীর স্ব-রচিত "শীতলামঙ্গল" পালার একস্থানে উল্লেখ আছে,—

"শীতলার পদতলে কবি নিত্যানন্দ বলে
সাকিন কানাইচকে ঘর।"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিত্যানন্দের বাসস্থান মেদিনীপুর জিলার অন্তঃপাতী কানাইচক গ্রামে অবস্থিত ছিল। উক্ত গ্রাম কাশীজোড়া পরগণারই অন্তর্ভুক্ত। ইঁহার পূর্ব্ববাস কোথায় ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১১৫)

গজ্‌নির সুল্‌তান মামুদের ভারত আক্রমণ-সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই স্ত্রীলোকের কেশপাশে ধনুকের ছিলা প্রস্তুত করার ঐতিহাসিক প্রমাণ পরিস্ফুট হইবে।

শ্রী যশোদাকিঙ্কর ঘোষ

(১১৬)

জাপানে শিক্ষা

গত ২৭শে জুলাই Hindustan Association of Japan হইতে যে চিঠি পাইয়াছি, তাহা হইতে নিম্নের খবর দেওয়া গেল। সাধারণের অবগতির জন্য অমৃত-বাজার পত্রিকায় Indian Students in Japan শীর্ষক প্রবন্ধে উহা প্রকাশিত হয়।

জাপানে গিয়া যাহারা নূতন কোন কারিগরি শিক্ষালাভে ইচ্ছুক, প্রথমতঃ জাপানী ভাষায় তাদের দখল থাকা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা ওখানে গিয়া শিক্ষা করিয়া লইতে কষ্ট হয়। জাপানী ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার সাহায্যে জাপানে শিক্ষা দেওয়া হয় না। এখান

অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্র বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত কলেজসমূহে শিক্ষা পাইতেছে। ভূমিকম্পের পর কি হইয়াছে জানা যায় নাই।

(১) Agricultural College of Tokyo, Imperial University.

(২) The Tokyo Impeiial Sericultural College.

(৩) Tokyo Higher Technical College.

Agricultural Collegeএ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়ান হয়। তিন বৎসর প্রত্যেক বিষয় পড়ার পর ডিগ্রির জন্য পরীক্ষা দিতে হয়।

(১) Agriculture (a) Proper (b) Politics and Economics.

(২) Agricultural Chemistry.

(৩) Forestry (৪) Veterinary Medicine (৫) Fishery.

The Tokyo Sericultural College কোন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে। উহাতে (১) Sericulture Proper (২) Mulberry Cultivation (৩) Filature Theory and Practice—প্রত্যেক বিষয় তিন তিন বৎসর অধ্যয়ন করিতে হয়।

Higher Technical Collegeএ (১) Dyeing and Weaving (২) Applied Chemistry (৩) Mechanical Engineering (৪) Electricity (৫) Ceramics (৬) Industrial Designs and (৭) Architecture—প্রত্যেক বিষয় তিন তিন বৎসর শিক্ষা করিতে হয়।

১লা এপ্রিল নূতন সেশন্ আরম্ভ হয়। ভারতীয় ছাত্রগণকে বিশিষ্ট ছাত্রভাবে গণ্য করা হয়। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে প্রকৃত ছাত্র হওয়া যায়। ভারতীয় যে-কোন বিদ্যালয়ের অন্ততঃ Intermediate in Science or Artএ পাশ করা হইলেই হয়। বিশিষ্ট ছাত্রদিগকে কোন ডিগ্রি দেওয়া হয় না।

ভর্ত্তি হইতে লাগে (Admission fee) Agricultural Collegeএ ৫ ইয়েন ও বাৎসরিক ফি ৭৫ ইয়েন। Sericulture এবং Higher Technical Collegeএ ৫ ইয়েন ভর্ত্তি-ফি এবং ৫০ ইয়েন বাৎসরিক ফি। এতদ্ভিন্ন থাকা খাওয়া ইত্যাদির খরচও মাসিক ১০০ হইতে ১২৫ ইয়েন।

গত মহাযুদ্ধের পর হইতে জাপানে থাকা-খাওয়া বড়ই ব্যয়-বহুল হইয়াছে। নিজের খরচ চালাইবার মতন উপার্জ্জনের সুযোগ পাওয়া দুর্ঘট। কেহ যেন সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া ওখানে না যান। অনেক ছাত্র ওখানে গিয়া শেষে বড়ই কষ্ট সহ্য করেন। সাধারণত ১০০ ইয়েন আমাদের ১৫০৲ সমান, কিন্তু বর্ত্তমানে উহা প্রায় ১৭০৲ টাকার উপরে উঠিয়াছে।

আমাদের কাছে যে Prospectus আছে কেহ লিখিলে পাঠাইয়া দিতে পারি। নিম্নের ঠিকানায় তিন আনা পরিমাণ ডাক-খরচ পাঠাইলে সকল খবর জানা যায়। ভারতীয় ছাত্রদের ঠিক ঠিক খবর প্রদানের জন্য এই অনুষ্ঠান।

Hony. Secretary,
Hindustan Association of Japan
Post Box No. I,
Shibuya Tokyo, Japan.

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

৫৭ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট কলিকাতা

(১২০)

নীলনদের ইতিহাস

প্রাচীন হিন্দুগণ যে নীলনদের অস্তিত্বের বিষয় বিশেষরূপ অবগত ছিলেন তাহা সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সিস্ উইলফোর্ড্ নামক ভারতীয় সৈনিক বিভাগের একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী আমাদের জ্ঞান-গোচর করেন। বিশিষ্ট কোন পুরাণের বিশেষ কোনো অংশ হইতে প্রাচীন হিন্দুদের নীলনদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগতির বিষয় জানা যায় না; পরন্তু, সমস্ত পুরাণগুলি যত্নসহকারে পাঠ করিলে আমরা যে কএকটি ভৌগোলিক বর্ণনা পাই তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে প্রাচীন হিন্দুগণ নীলনদের বিষয় অবগত ছিলেন। যেমন, মিশ্রদেশের প্রসঙ্গে আমরা নীলনদের উল্লেখ পাই। আধুনিক মিশর দেশ (Egypt) এই মিশ্র শব্দ হইতে আসিয়াছে। আরও, ঐ দেশের লোককে "শ্যামমুখ বর্ব্বর" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে ঐপ্রকার লোক অদ্যাপি ঐ দেশে দেখা যায়। মনে রাখা দরকার যে ঐতিহাসিক অনুগম (Generalization) মাত্র একটি বর্ণনার উপর নির্ভর করে না; কেবল মাত্র একটি বিবরণ হইতে আমরা একপ জটিল সমস্যার কোন স্থির মীমাংসা করিতে পারি না। উইলফোর্ড্ সমস্ত পুরাণ হইতে নীলনদের বর্ণনা তাঁহার প্রবন্ধে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। (Asiatic Researches, Vol. III, 1791)। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এসম্বন্ধে Journal of the Discovery of the Source of the Nile, Sept. 1860, এবং মডার্ন্ রিভিউএ (১৯১৫) অধ্যাপক কাশীপ্রসাদ জায়সওয়ালের প্রবন্ধ দেখিতে পারেন।

অরুণ দত্ত

(১২১)

বাংলার স্বাধীন হিন্দুরাজা

যতদূর মনে হয়, বাংলার প্রথম স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিলেন সিংহবাহন (বা সিংহবাহু)। ইহাঁর রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক)। ইহাঁরই পুত্র বিজয় সিংহ সাত শত সৈন্য লইয়া সিংহলে যাত্রা করেন ও সিংহল জয় করিয়া তথায় বাঙালী উপনিবেশ স্থাপন করেন।

অরুণ দত্ত

(১২২)

"ভূ-পর্য্যটক মার্টিনেট্"

আমেরিকাবাসী ভূপর্য্যটক (Globe-trotter) মিঃ হিপোলাইট "মার্টিনেট" ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে আমেরিকার United Statesএর Seattle (সিয়াট্ল্) নগর থেকে তাঁর ভুবন-ভ্রমণের যাত্রা সুরু করেন। এবং যথাক্রমে ইংলণ্ড, হলণ্ড, বেল্জিয়াম্, সুইজারলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, আল্বেনীয়া, গ্রীস্, ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটেমিয়া, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন।

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চীনদেশের য়ুনান প্রদেশে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অনাহারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্রী বনবিহারী মুখোপাধ্যায়

(১৩০)

কবি হরিশ্চন্দ্র শাহ

উত্তর-ভারতে হরিশ্চন্দ্র শাহ নামে একজন কবির কবিতা [illegible]

যায়। তন্মধ্যে একজন পাঞ্জাবের অন্তর্গত সোঁবরাওয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতৃবাসভূমি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে। ইঁহার জীবনী সাধারণের নিকট একরূপ অস্পষ্ট অবস্থায় আছে। কানপুর-নিবাসী আমার জনৈক কারাবন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোকর্ণনাথ মিশ্র গত বৎসর কবি হরিশ্চন্দ্রের একখানি হিন্দীভাষায় লিখিত আত্মচরিত দেখাইয়াছিলেন। তাহার বাংলা অনুবাদ আমার নিকটে আছে। সেই পুস্তক হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা অতি শিশুকালে মাতাপিতার সহিত সোঁবরাওয়ে চলিয়া আসেন। তাঁহার পিতা নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ঐশ্বর্য্যশালী কোনও এক সুবর্ণ-বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার নবাবের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ১৩৮৭ শকে সমস্ত ধনৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পিতামহ ও পিতামহী তাঁহার পিতাকে লইয়া পাঞ্জাবে পলাইয়া আসেন। "ভজন", "মহব্বত", "আখের" ও "ছাদি" নামক কয়েকখানি প্রেম-কবিতার গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। গয়া সংস্কৃত-চতুষ্পাঠীর জনৈক অধ্যাপকের নিকট জানিয়াছিলাম যে তিনি কবি হরিশ্চন্দ্রের কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়াছেন—ছাপাইবার ইচ্ছা আছে। ইহা ছাড়া গুরুমুখী ভাষায় লিখিত তাঁহার দুইখানি বই সাধু কৃপাল সিংহের নিকট দেখিয়াছি। ঐ পুস্তকের একখানিতে আছে যে তাঁহার পিতামহ বাংলা হইতে পলাইয়া এখানে আসিয়া "দত্ত" উপাধি ত্যাগ করিয়া "শাহ" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। গয়া অঞ্চলে তাঁহার রচিত বহু গান এখনও চলিত আছে।

দ্বিতীয় কবি হরিশ্চন্দ্র শাহর পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না—মধ্যপ্রদেশে ইঁহার রচিত অনেকগুলি গান শুনিতে পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশের স্থানীয় কিংবদন্তীতে জানা যায়—এ হরিশ্চন্দ্র একজন পাগল ছিলেন—তাঁহার নাম ধাম ঠিকানা কেহই জানিত না। মধ্যপ্রদেশের সহিত পাঞ্জাবের হরিশ্চন্দ্রের কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৩১)

জাফ্রানের চাষ

ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ভিন্ন নিম্নলিখিত স্থানেও জাফ্রান জন্মে। যথা—বেলুচিস্তান, ত্রিবাঙ্কুর, রাজপুতানা, মালাবার-উপকূল, নীলগিরি।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

জাফ্রাণ-(crocus. N. O. Irideoe) ফুলের সৌন্দর্য্যে সকলেই বিমোহিত। সৌন্দর্য্যের জন্য কেহ কেহ ইহাকে স্বর্গীয় পুষ্প (flower of paradise) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আমাদের এই নিম্নপ্রদেশ ইহার চাষের উপযোগী নহে। পার্ব্বত্য অঞ্চলেই ইহাদের চাষ করিতে হয়। ইহারা নানা-জাতীয়। নিম্নপ্রদেশে শীতকালে সবুজ-গৃহে (green-house) দুই এক জাতির চাষ হইতে পারে। কিন্তু স্থায়ী হয় না, বর্ষাকালে মূল পচিয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ইহাদের পরমবৈরী। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে, পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে, কুমায়ুন, দেরাদুন, মুসৌরী, দার্জ্জিলিঙ্ ও নীলগিরির কাছে ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হয়। ইয়োরোপের প্রায় সকলদেশেই ইহা জন্মিয়া থাকে। কাশ্মীরে ও পারস্য দেশে ইহার প্রচুর চাষ হয়। এই চাষ খুব লাভজনক।

শরৎ ব্রহ্ম

(১৩২)

চীনা-বাদাম-চাষ

চীনা-বাদাম (arachis hypogoea) মাদ্রাজ প্রদেশেই খুব বেশী পরিমিত জায়গায় চাষ করা হয়। বাংলার বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলাতেও বর্ত্তমানে খুব চাষ হইতেছে। সবরকম মাটিতেই ইহার চাষ হইতে পারে। তবে নিম্ন জমিতে সুবিধা হয় না। এঁটেল মাটিতে (argillaceous soil) চাষে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে কোন পুস্তক বাংলায় নাই।

Leaflet No. 1 of 1916. Agriculture Department, Bengal ও প্রবাসী, ১৩২৫ সাল, ২য় খণ্ড—চীনাবাদাম, ৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শরৎ ব্রহ্ম

(১৩৯)

"ব্যায়াম-শিক্ষার বিদ্যালয়"

ভারতবর্ষে ব্যায়াম-শিক্ষার প্রধান বিদ্যালয় বাঙ্গালোরে (Bangalore)। এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ—অধ্যাপক কৃষ্ণরাও। ইনি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইনি বাঙ্গালোরে বহু ছাত্রকে ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন ও ভারতে প্রত্যেক দেশের যুবকদিগকে চিঠিপত্রের সাহায্যে উপদেশ ও ব্যায়াম শিক্ষা দিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে বিস্তারিত খবর সত্বর জানিতে পারিবেন।

Prof. M. V. Krishna Rao,
Director of Physical Culture Institute,
P.O. Basavangudi,
Bangalore city.

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

বাঙ্গালার বিখ্যাত বলী (আমাদের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন) কাপ্তেন শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত আই, এম্, এস্, মহাশয়, সম্প্রতি ১০১ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ঠিকানায় একটি ব্যায়াম-শিক্ষা-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। বিস্তারিত বিবরণ তাঁহার নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বরোদায় 'শ্রী জুম্মাদাদা ব্যায়াম-মন্দিরে' সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীতে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রফেসার মাণিক রাও এই ব্যায়াম-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। এই ব্যায়াম-মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে, এখানে ভারতবর্ষের নিজস্ব ব্যায়াম-পদ্ধতি এবং ইউরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ব্যায়াম-পদ্ধতি—এই দুইপ্রকারের ব্যায়াম-পদ্ধতিই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে যদি কাহারও জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তিনি এই বৎসরের (১৯২৩) গত মার্চ মাসের ওয়েল্‌ফেয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত, An Institute of Physical Culture নামক প্রবন্ধটা দেখিতে পারেন।

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

(১৪০)

পীঠস্থান

"অট্টহাসে চৌষ্টপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরবস্ তত্র সর্ব্বাভিষ্টপ্রদায়কঃ॥"

উদ্ধৃত পীঠমালার শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ভৈরবের নাম বিশ্বেশ,

দেবীর নাম ফুল্লরা। প্রশ্নকর্ত্তা কিন্তু কেতুগ্রাম-অট্টহাসের ভৈরবের নাম বিশ্বেশ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত ভৈরবের সহিত তন্ত্রোক্ত ভৈরবের নাম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তন্ত্রোক্ত ভৈরবই প্রামাণিক বেশী। সুতরাং বিশ্বেশ-ভৈরব যেখানে আছেন, সেই স্থান কখনই পীঠস্থান হইতে পারে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত ভৈরব কোন্ গ্রামে অবস্থিত আছেন? উহার মীমাংসার একমাত্র উপায়—যাঁহারা তীর্থভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের তত্তৎ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ-সমুদয় পাঠ করা বা তাঁহাদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করা। তাই আমি ঐরূপ এক ব্যক্তির "তীর্থবিবরণ" হইতে দেখাইতেছি যে, লাভপুর গ্রামেই মহাপীঠ অবস্থিত। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—"লাভপুর গ্রামে সতীর ওষ্ঠ পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম ফুল্লরা, ভৈরবের নাম বিশ্বেশ। লাভপুর লুপলাইন-আমুদপুর ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল ব্যবধান।"—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ।" ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, লাভপুরেই পীঠস্থান অবস্থিত।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৪১)

"কুস্তিশিক্ষার পুস্তক"

একজন বিখ্যাত আমেরিকান কুস্তিগিরের পুস্তকের নাম ও কোথায় পাওয়া যায়, নীচে দিলাম।

"Wrestling Guide" by Hakensmith and Jenkin.

(i) S. Roy & Co., 11-1 Esplanade, Calcutta.

(ii) Thacker Spink & Co., Calcutta.

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

কুস্তি সম্বন্ধে একখানি ইংরেজী বইএর নাম—

Handbook of Wrestling by Hugh F. Leonard. শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র রায়ের 'স্বাস্থ্য ও শক্তি' নামক পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় দু'এক কথা লেখা আছে।

মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন শাহজাদপুরী

(১৪২)

প্রপিতামহের সম্বোধনবাচক বাংলা শব্দ

আজকাল বাঙ্গালীর প্রপিতামহকে সম্বোধন করার বালাই বড় নাই; কাজেই সম্বোধন-পদেরও উদ্দেশ পাওয়া ভার। আমরা প্রাচীন লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে প্রপিতামহকে "বড় বাপ" বা "বুড়া ঠাকুরদাদা" বলিয়া সম্বোধন করা হইত।

শ্রী মনোমোহন রায় ও
শ্রী গৌরচন্দ্র নমদাস

পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে প্রপিতামহকে "পো-বাবা" ও প্রপিতামহীকে "ঝি-মা" বলিয়া সম্বোধন করে।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে প্রপিতামহকে "তাঐ মহাশয়" বলিয়া সম্বোধন করা হয়, এবং তৎপত্নীকে 'মাঐমা' বলিয়া ডাকা হয়।

শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ
শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্ত-জায়া
শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী

আমাদের দেশে (?) প্রপিতামহকে "পো-মহাশয়" বলিয়া ডাকা হয়।

শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

প্রপিতামহকে মেদনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে 'বড়া বাবা' বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

(১৪৪)

মান্ধাতার আমল

মান্ধাতা সত্যযুগের একজন অতি পরাক্রমশালী সূর্য্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি। "মান্ধাতার আমল" বলিলে বহু প্রাচীন কাল বুঝায়। কাজেই লোকে বহুকাল হইতে কোন কিছু বলিয়া বা করিয়া আসিতেছে এরূপ বুঝাইতে হইলে "মান্ধাতার আমল" বলিয়া থাকে।

গচিহাটা পাব্লিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ

মান্ধাতা অতিপ্রাচীনকালের রাজা ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেও আরও অনেক রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার নামই অতি প্রাচীনত্বদ্যোতক হইয়াছে কেন? আমার মনে হয় মান্ধাতার জন্মই ইহার কারণ। তাঁহার জন্ম একটু অদ্ভুত রকমের, এবং তিনি সাতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলেন। প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞাদি করিয়া অবশেষে ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সাতিশয় শাসন দ্বারা এক দিনেই সসাগরা ধরা পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব ছিল।

মান্ধাতা ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যুবনাশ্ব। তিনিও ভূরিদক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার কোন সন্তান জন্মিল না। তখন তিনি অমাত্যের উপর রাজভার অর্পণ করিয়া যথাশাস্ত্র সংযত হইয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একদা রাত্রিতে উপবাস-ক্লেশে সাতিশয় ক্লিষ্ট ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভৃগুমুনির আশ্রমে গমন করিলেন। ঐ যামিনীতে মহাত্মা ভৃগুনন্দন মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র-নিমিত্ত এক যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞস্থলে কলসের মধ্যে মন্ত্রপূত সলিল রাখিয়াছিলেন। রাজমহিষী ঐ কলসের জল পান করিয়া শক্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, মহর্ষিগণ এই স্থির করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর ঐ কলস সংস্থাপনপূর্ব্বক অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। পিপাসাশুষ্ককণ্ঠ নরপতি যুবনাশ্ব বারংবার অতি উচ্চৈঃস্বরে জল চাহিলেন। শুষ্ককণ্ঠ হওয়ায় তাঁহার স্বর অস্পষ্ট ছিল, কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। তার পর জল অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি সেই যজ্ঞবেদীস্থ কলসের মন্ত্রপূত শীতল জল পান করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে ভার্গবাদি মুনিগণ জাগরিত হইয়া কলস জলশূন্য দেখিতে পাইলেন। যুবনাশ্ব সেই জল পান করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "আপনি অতি অন্যায় কাজ করিয়াছেন, এবং ইহার ফলভোগ আপনাকেই করিতে হইবে। নিয়তি অনিবার্য্য। আপনিই তপোবলসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন। ইহার অন্যথা হইবে না।" মহর্ষিগণ মহারাজ যুবনাশ্বের প্রসব নিমিত্ত বিধিমত ব্যবস্থা করিলেন। শতবৎসর পরে মহীপাল যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া সূর্য্যসম প্রভা-সম্পন্ন মহাতেজা এক কুমার বহির্গত হইল। তৎপরে ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বালকের পানের নিমিত্ত নিজের প্রদেশিনী বালকের মুখে দিয়া বলিলেন "মাং ধাস্যতি" আমার এই প্রদেশিনীর রস পান করিয়া জীবন ধারণ করিবেন। এই নিমিত্ত দেবগণ তাঁহার নাম মান্ধাতা রাখিলেন।

এই রাজা মান্ধাতার জন্ম পুরুষের উদরে হইয়াছিল। যুবনাশ্বই তাঁর পিতা ও মাতা। তিনিও অতি প্রাচীন কালের ত্রিভুবনবিজয়ী মহাবল পরাক্রান্ত নৃপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য জন্মের জন্যই এবং এইপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা যেই সময় ঘটে সেই

সময় অতীব প্রাচীন কাল বলিয়াই এবং কোন একটি ঘটনার পুরাতনত্ব বুঝাইতে হইলেই লোকে মান্ধাতার আমল বলিয়া থাকে।

৺কালী সিংহের মহাভারতের বনপর্ব্বের ষড়্‌বিংশত্যধিক-শততম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী

কৃত্তিবাসের রামায়ণে আছে—

আদিপুরুষের নাম হইল নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর পুত্র তিন জন॥
ব্রহ্মা হইতে উদ্ভব সকল চরাচর।
পুত্র তাঁর জন্মিল মরীচ গুণধর॥
মরীচের নন্দন কশ্যপ নাম ধরে।
তাঁর পুত্র সূর্য্য ইহা বিদিত সংসারে।
সূর্য্যের হইল পুত্র মনু তাঁর খ্যাতি।
মনু হইতে জন্মিলেক বহু নরপতি॥
ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা, হরিশ্চন্দ্র নৃপবর।

যোগীন্দ্র বসু বি-এ, সম্পাদিত রামায়ণ, ৫ম পৃঃ

আর হর্ষচরিতে আছে :—

ভরতাজ্জুর্ন-মান্ধাতৃ-ভগীরথ-যুধিষ্ঠিরাঃ।
সগর-নহুষশ্চৈব সপ্তৈতে চক্রবর্ত্তিনঃ॥

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে মান্ধাতা অতি প্রাচীন রাজা। তাঁহার পূর্ব্বে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর রাজা আর কেহ হন নাই। মান্ধাতার প্রাচীনত্ব এবং প্রবল পরাক্রম হইতেই প্রবাদবাক্যের উৎপত্তি। শ্রী বিরজানাথ ভট্টাচার্য্য

(১৪৬)

সবচেয়ে বড় গাছের পাতা

আমাদের দেশের কলা-গাছের পাতাই উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌দের হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ পাতা। ভিক্‌টোরিয়া রেজিয়া নামক বিখ্যাত পদ্মপত্রের দীর্ঘতম ব্যাস ১৫ ফুট বলিয়া জানা গিয়াছে।

শ্রী সুশীলকুমার ঘোষ দস্তিদার

যতদূর জানা গিয়াছে ভিক্‌টোরিয়া রেজিয়ার পাতা অপেক্ষা বড় পাতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ্‌। ইহার পাতার ব্যাস ১২ ফুট পর্য্যন্ত হইতে শোনা গিয়াছে। ফুলও প্রায় ১ ফুট—১॥০ ফুট পর্য্যন্ত চওড়া হয়।

আমাদের দেশে এইপ্রকার এক জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম "কাঁটা-পদ্ম" (Euryale Ferox)। পূর্ব্ববাঙ্গালায় এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অপেক্ষা বড় পাতা ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দীর্ঘতম ব্যাস প্রায় ২॥০ ফুট পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিক্‌টোরিয়া রেজিয়া কিংবা "কাঁটা-পদ্মর" পাতা উভয়ই গোলাকার। "কাঁটাপদ্ম" গাছ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে।

শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

(১৪৭)

"কোন কাতে শোওয়া উচিত"

দুইজন বিশেষজ্ঞের মত নিম্নে দিলাম।

Prof. M. V. Krishna Rao, Director, Physical C. Institute, Bangalore, বলেন—The posture of the body has much to do with obtaining sound, healthy sleep. A person should not lie in a curled-up, cramped position, and never on the back. The right side is the most suitable to repose upon, because when the body is in that posture the stomach is enabled to gravitate the food more rapidly into the intestines; also the liver does not press so heavily upon the top of the bowels.

Prof. Mohun C. R. D. Naiduর "Handbook to Health Chart and The Coming Man" পুস্তকে লেখা আছে—Do not sleep on your back. To prevent this habit put a small stone in a towel and tie it to the back. Sleep inclining on the left side and rise from opposite side.

নিগমানন্দস্বামীর "যোগীগুরু" পুস্তক পাঠ করিলে জানা যায়, যে কোন্ কাতে শোওয়া উচিত ও তাহার ফল কি হয়।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র দে

বাম কাতে শোওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল এবং উহাই বিজ্ঞান-সম্মত। উহার কারণ এই :—উদরের ডান পার্শ্বে প্লীহা এবং বাম পার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত। যকৃৎ পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। উহা হইতে একপ্রকার পাচক-রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়। তাহার ফলে, হজম-ক্রিয়া অতি সহজেই সুসম্পন্ন হয়। কিন্তু প্লীহাতে তাদৃশ ক্ষমতা বর্ত্তমান নাই। তদবস্থায় উহাকে ভুক্তদ্রব্য দ্বারা আরও ভারাক্রান্ত করিলে, পরিপাক-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত জন্মিয়া স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইতে পারে। উহাকে খালি রাখাই যুক্তিযুক্ত। একারণ ডান পার্শ্বে শয়ন করা বিজ্ঞানসম্মত নহে; বাম পার্শ্বে শয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত। তাহার ফলে ভুক্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়। অধিকন্তু প্লীহাতেও তখন আর কোন চাপ পড়িতে পারে না।

উপরোক্ত কারণ ভিন্নও আর-একটি কারণে বাম কাতে শোওয়া সঙ্গত। যোগশাস্ত্রমতে নাড়ী ৩টি—পিঙ্গলা (ডান-নাক—উহার এক নাম সূর্য্য) ঈড়া (বাম-নাক—চন্দ্র) ও সুষুম্না। দিবাভাগে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে। উহার সহিত পাকস্থলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একারণ ডান-নাসিকা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস চলিবার কালে আহার করিলে সহজে পরিপাক হইয়া থাকে। রাত্রিকালে ঈড়া দ্বারা (বাম নাক) শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে থাকে। ঐ সময়ে বাম-কাতে শুইলে ভুক্ত-দ্রব্য সহজে পরিপাক হইয়া অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ জন্মিবার আশঙ্কা থাকে না। একারণ বাম কাতে শোওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৪৯)

বৌদ্ধ

	বৌদ্ধ	একশত অধিবাসীর মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা
ব্রহ্মদেশ	১১২০১৯৪৩	৪৫'০৬
বঙ্গদেশ	২৬৫৬০৪	'৫৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৫০৫	
যুক্ত প্রদেশ	৪৪৮	
পাঞ্জাব	৩২৩০	'০২
মধ্যপ্রদেশ ও বিহার	২৮	
উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ	●	
বেলুচিস্তান	১৬০	'০৪

	বৌদ্ধ	একশত অধিবাসীর মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা
মাস্রাজ	১২১৬	
বোম্বাই	১৮০৬	·০১
আসাম	১৩১৬২	·১৭
আজমীর মাড়বার	১	
দিল্লী	৬	
কুর্গ	১৪	·০১
আন্দামান নিকোবর	২৬৫২	৯·৭৯
মোট ব্রিটিশ ভারতবর্ষ	১১৪৯০৮১৫	৪·৬৫
দেশীয় রাজ্য		
আসাম—মণিপুর	৩৫৮	·০৯
বড়োদা	১	
বাংলা দেশীয়-রাজ্য	১০১৫৫	১·১৩
বিহার ও উড়িষ্যা	১২৪৩	·০৩
বোম্বাই	৪৪	
মধ্যভারত	১০	
হায়দ্রাবাদ	১০	
কাশ্মীর	৩৭৬৮৫	১·১৪
মান্দ্রাজ দেশীয়-রাজ্য	৪২	
মহীশূর	১৩১৯	·০২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১১৬	·২১
পঞ্জাব	২৬৮২	·০৬
সিকিম	২৬৭৮৮	৩২·৭৮
মোট দেশীয়-রাজ্য	৮০৪৫৩	·১২
ভারতবর্ষে মোট বৌদ্ধ	১১৫৭১২৬৮	৩.৬৬

	বৌদ্ধ	প্রতি ১০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে বৌদ্ধের সংখ্যা-বৃদ্ধি	শতকরা
১৯০১ সালে	৯৪৭৬৭৫৯	৩২২	
১৯১১ „	১০৭২১৪৫৩	৩৪২	+ ১৩·১
১৯২১ „	১১৫৭১২৬৮	৩৬৬	+ ৭·৯

বৌদ্ধ বিধবার সংখ্যা ৬৭২৯১৩

ব্রহ্মদেশ বাদে ভারত-সাম্রাজ্যে যত বৌদ্ধের বাস তাহার শতকরা ৭৪·৬ জন বাংলা দেশে বসে করে। বাংলা প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট বৌদ্ধের সংখ্যা ২৭৫৭৫৯; ইহার মধ্যে পুরুষ ১০৪৬৫৯, স্ত্রী ১৩৫১০০।

১৮৮১ সালে বাংলা দেশে ১৫৫১০২,

১৮৯১ সালে ১৯৩৬৪৫,

১৯০১ সালে ২১৬৫০৬,

১৯১১ সালে ২৪৬৮৬৬ বৌদ্ধের বাস ছিল।

গত চল্লিশ বৎসরে বাংলা দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা শতকরা ৭৭৮ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কোন্ বিভাগে কত বৌদ্ধের বাস তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

বর্দ্ধমান বিভাগ	১৬২	চট্টগ্রাম বিভাগ	১৯৩২৬৮
প্রেসিডেন্সি „	৩৬৬৮	কুচবিহার	৮
রাজসাহী „	৫২১০৪	ত্রিপুরা রাজ্য	১০১৪৭
ঢাকা „	১০৪০২		

শ্রী রামানন্দ কর

(১৫০)

ইক্ষুর পোকা

কেরোসিন তেল দ্বারা যে-কোন পোকা নষ্ট করা যাইতে পারে, কিন্তু অমিশ্র কেরোসিন অত্যন্ত উগ্র বলিয়া ইহাতে গাছের পাতা মরিয়া যায়। এইজন্য উহাকে জল ও সাবানের সহিত মিশাইয়া ক্ষীণ করিয়া লইতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থকে ইংরেজীতে Kerosene emulsion কহে। উহা দ্বারা কীটদষ্ট গাছের গোড়া ভিজাইয়া দিলে নিশ্চয়ই কীট নষ্ট হইবে। প্রস্তুত-প্রণালী।—অৰ্দ্ধ পাউণ্ড বার্-সাবান ১ গ্যালন জলের সহিত ফুটাইয়া আগুনের উপর হইতে নামাইয়া উহাতে ২ গ্যালন কেরোসিন তেল ঢালিয়া একটি কাঠি দ্বারা খুব নাড়িয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লও। ইহার ১ ভাগের সহিত ৬—১০ ভাগ জল মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।

গচিহাটা পাব্লিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ

১। ইক্ষু কাটিবার পর জমিতে যে পাতা ও অন্যান্য জিনিষ পড়িয়া থাকে, তাহাতে সামান্য জলের ছিটা দিয়া পরে আগুন দ্বারা পোড়াইয়া দিলে সেই জমিতে কখনও পোকার উপদ্রব হইবে না। তাদৃশ জমিতে ইক্ষুর ফলন অধিক পরিমাণেই হইয়া থাকে।

২। জমিতে কীড়া-জাতীয় পোকা জন্মিলে, মাটী হইতে ঐ পোকা উঠাইয়া কেরোসিন-মিশ্রিত জলে ফেলিয়া রাখিলে পোকা মরিয়া যায়। ইহাতে অসুবিধা হইলে, মিশ্রিত জল জমিতে ছিটাইয়া দিবেন। কীড়া শুঁয়াপোকায় পরিণত হইবার পূর্ব্বে আলকাৎরা দ্বারা ডিম্ব নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত।

৩। চূনের জল, কেরোসিন-মিশ্রিত জল, তামাক-পাতা-ভিজান জল, ফিট্‌কারীর জল বা হুকার বাসী জল জমিতে ছিটাইয়া দিলে, সেই জমিতে আর পোকা থাকিতে পারে না। পোকা মরিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য যে, উল্লিখিত জল ইক্ষু গাছের পাতায় ছিটানও একান্ত আবশ্যক।

৪। তুঁতের জল ও কর্পূরের জল ছিটাইয়া দিলেও পোকা মরে।

৫। পোকা-ধরা পাতা ও ডাঁটায় তামাকের গুল-ভিজান জল সহ সামান্য কর্পূর ও সাবানের জল মিশাইয়া লাগাইলে পোকার উৎপাত নিবারিত হয়।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৫২)

মাখন রক্ষা করার উপায় কি ?

১। মাখনের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে, সহজে নষ্ট হইতে পারে না। মাখনের পরিমাণ যাহা হইবে, লবণের পরিমাণ তাহার তিন ভাগের এক ভাগ হওয়া চাই। পাত্রে মাখন এমনভাবে রাখিবেন—যাহাতে মুখ হইতে ১ ইঞ্চি স্থান খালি থাকে। তাহার পর, ঢাক্‌নির দ্বারা মুখ ভালরূপে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

২। বহুদিন হইল, একখানি বহিতে দেখিয়াছি, টিনের মধ্যে মাখন রাখিতে হইলে, উহাতে মাখন রাখিয়া উপরে কিছু Tartaric Acid ও সোডা-মিশান জল ঢালিয়া মুখটি ঝালাই করিয়া রাখিলে, শীঘ্র নষ্ট হয় না।

৩। একটু কড়া গরম রাখিলেও ভাল থাকিতে পারে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মাখনের সঙ্গে খানিকটা লবণ মিশাইয়া ঠাণ্ডাজলে রাখিলে কুড়ি-বাইশ দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকিবে। মাঝে মাঝে জল বদ্‌লাইতে হয়। খুব বেশীদিন রাখিবার প্রয়োজন হইলে, টিনের পাত্রে কিম্বা এইরূপ সুবিধামত পাত্রে, ভালরূপে বায় নিষ্কাশিত করিয়া রাখিলে বহুদিন পর্য্যন্ত থাকিবে। পরীক্ষিত।

শ্রী শোভারাণী রায়

২ ভাগ লবণের সহিত একভাগ চিনি ও একভাগ সোরা মিশ্রিত করিবে। ইহাতে মাখন-দিলে-খারাপ হয় না। এক পাউণ্ড্ পরিমিত মাখনে ১ আউন্স উক্ত দ্রব্য দিবে। মাখনে দুর্গন্ধ হইলে ১ ড্রাম সোডা তাহাতে দিবে।

একটি টিনে মাখন, টিনের উপরে এক ইঞ্চি স্থান খালি রাখিয়া, পূর্ণ করিবে। তাহার উপর বাজারের গুড়া লবনে পূর্ণ করিয়া একটি টিনের ঢাক্‌নিতে উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া গালার মোহর করিবে। ইহা বহুদিন মাখন টাট্‌কা রাখিবার সহজ এবং সুলভ উপায়।

টাট্‌কা মাখন লইয়া কাপড়ে নিংড়াইয়া যতদূর সম্ভব জলশূন্য করিবে। পরে মাখনগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটি কাচের বোতলে ঠাসিয়া উপরে কর্ক্ দিয়া মোমে বন্ধ করিবে। একটি জলপূর্ণ হাঁড়িতে উক্ত বোতল রাখিয়া অগ্নিতাপে জল ফুটাইয়া লইবে। এই উপায়ে মাখন ছয়মাস টাট্‌কা থাকে।

শ্রী উপেন্দ্রকিশোর দাস

(১৫১)

সাদা জীরার চাষ

বেহার অঞ্চলে সাদা জীরার চাষ হয়। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাদারাম হইতে কোনও বন্ধুর দ্বারা জীরার বীজ সংগ্রহ করিয়া রোপণ করিয়াছিলাম। নিম্নবঙ্গের আদ্রতার জন্য গাছ তেমন ঝাড়াল ও অধিক-ফলপ্রদ হয় নাই। মৌরী, ধ'নে, রাঁধুনী প্রভৃতির ন্যায় ইহার বীজ কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়; আবাদ-প্রণালীও এই-সমস্ত ফসলের অনুরূপ। দোকানে যে সাদা জীরা পাওয়া যায় তাহা অঙ্কুরিত হয় না। বীজ-জীরার দাম বাজারে বিক্রীত জীরার দাম অপেক্ষা তেমন বেশী নয়। শুষ্ক ও উচ্চ ভূমিতে আবাদ করিলে উহা আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ করণ

যুক্ত প্রদেশের আগ্রা জেলায় সাদা জীরার চাষ হয় এবং বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় আমদানী হয়। চেষ্টা করিলে আগ্রা জেলায় সাদা জীরার বীজ পাওয়া যায়।

শ্রী রামানুজ কর

(১৫২)

চালের পোকা

১। চা-খড়ির গুঁড়া চালের সাথে মিশ্রিত করিয়া রাখিলে চালে পোকা ধরার ভয় থাকে না। দোকানদার অথবা যাহারা রাশী কারবার করে তাহারা এইভাবে সরু দামী চাল রাখিয়া পুরাতন করিয়া থাকে।

২। চালের সাথে নিমপাতা মিশাইয়া রাখিলে পোকা ধরে না।

৩। চালের ভিতর রসুন রাখিয়া দিলেও পোকার হাত হইতে চাল রক্ষা করা যায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায়ে গৃহস্থগণ সহজে চাল রক্ষার উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

শ্রী চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ ও
শ্রীমতী প্রীতিকণা দত্তজায়া

১। চাউলের সঙ্গে ছাই মিশাইয়া রাখিলে তার পোকা ধরিবার আশঙ্কা থাকে না।

২। ফিট্‌কারীর জল, চুনের জল, কর্পূরের জল বা হরিদ্রার জল চাউলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিলে, কখনই সেই চাউলে পোকা ধরিতে পারে না।

৩। সপ্তাহে একবার করিয়া চাউল রৌদ্রে দেওয়া একান্ত আবশ্যক।

৪। যে হাঁড়িতে চাউল রাখা হয়, সেই হাঁড়ির তলায় প্রথমে কয়েকটা নিম-পাতা দিয়া চাউল রাখিতে হইবে। মাঝে মাঝে চাউলের মধ্যেও ২।১টা করিয়া পাতা দিতে হইবে। তাহার পর হাঁড়ির মুখটি ভালরূপে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে পোকার আক্রমণ নিবারিত হয়।

৫। কুলা দ্বারা চাউলের কুঁড়া খুব ভালরূপে ছাড়াইয়া রাখিলে, পোকার আশঙ্কা কম থাকে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শ্রী কমলকামিনী দেবী

চাউল ভাল করিয়া ঝাড়িয়া তাহার সহিত নিমপাতা মিশাইয়া কোনও পাত্রের ভিতর বায়ুশূন্য-ভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে বাহিরের সহিত কোনওপ্রকার সংস্রব না থাকে। তাহা হইলে চাউলে আর পোকা লাগিবে না। কিন্তু প্রতিবৎসর একবার করিয়া রৌদ্রে দিয়া মুখ বন্ধ পাত্রে রাখিয়া দিতে হইবে।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সরকার

চাউল উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া বড় বড় মাটির জালায় কিংবা বাঁশের পাত্রে (বাঁশের পাত্র হইলে গোবর দ্বারা লেপিয়া লইতে হইবে) রাখিয়া উপরে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া ছাই ছড়াইয়া রাখিলে ইহার ভিতর পোকা প্রবেশ করিয়া চাউল নষ্ট করিবার আর কোনই আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ, কোন পোকারই নিশ্বাস লইবার জন্য নাক নাই; শরীরের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট কতকগুলি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলি দ্বারাই উহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য চলে। ছাই কিংবা অন্য কোন সূক্ষ্ম গুঁড়ায় এই ছিদ্রগুলির মুখ বন্ধ হইয়া গেলে শরীরের ভিতর বায়ু চলাচল করিতে না পারাতে পোকা মরিয়া যায়। শাকসব্জীর গাছে পোকা ধরিলে ছাই ছড়াইয়া দেওয়ারও ইহাই অর্থ। চাউল বাহির করিবার সময় উপর হইতে আস্তে আস্তে ছাইগুলি সরাইয়া ফেলিলেই চলিবে।

শ্রী মনোমোহন রায় ও
শ্রী গৌরচন্দ্র মনদাস

চাউল বা অন্যান্য শস্য অনেকদিন পোকার অত্যাচার হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত। যথা—

১। গোলাজাত করিবার পূর্ব্বে ২।৩ দিন খুব শক্ত রোদ লাগাইতে হইবে।

২। গোলায় তুলিবার পূর্ব্বে দেখিবে যে তাহাতে কোন আবর্জ্জনা বা অন্য কোনরূপ শস্য নাই, যাহার ভিতর পোকা লুকাইয়া থাকিতে বা জন্মিতে পারে।

৩। পোকাধরা শস্য কদাচ গোলায় রাখিবে না। কারণ একটি মাত্র পোকা হইতে উহার বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে যে অল্পকালের মধ্যে গোলার সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

৪। গোলা-ঘরের চতুর্দ্দিক্ উত্তমরূপে ঝাঁটা হওয়া উচিত; নচেৎ অন্যত্র হইতে পোকা আসিয়া শস্যে প্রবেশ করিতে পারে।

৫। চাউলের সহিত চুন, সফেদা ইত্যাদি মিশাইয়া রাখিলে পোকা ধরিতে পারে না।

৬। গোলা হইতে চাউল মাঝে মাঝে নামাইয়া রোদে দেওয়া উচিত।

৭। কার্‌বন্-বাইসাল্‌ফাইড্ নামে একপ্রকার বিষাক্ত উগ্র আরক আছে, ইহা খোলা থাকিলে বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। পোকাধরা শস্যে এই বিষাক্ত বাষ্প লাগাইলে সমস্ত পোকা, এমন কি পোকার ডিম থাকিলে উহাও নষ্ট হইয়া যায় অথচ ইহাতে শস্যের কোনই হানি

হইবে না। চারিদিক আঁটা একটি ঘর বা পাত্রে শস্য ঢালিয়া এই বাষ্প ২৪ ঘণ্টা কাল বন্ধ রাখিতে হইবে। ১৫ ঘন-ফুট পাত্রে বাষ্প যোগাইতে ১ আউন্স্ আরকের দরকার। কিন্তু কারবন্-বাই-সাল্‌ফাইডের বাষ্প সামান্য আগুনের স্পর্শে জ্বলিয়া উঠে। আলো, জ্বলন্ত চুরুট, সিগারেট বা অন্য কোন-প্রকার আগুন লইয়া সেখানে গেলে বিপদ্ হইতে পারে; কাজেই এসম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা লওয়া উচিত।

গচিহাটা পাব্লিক লাইব্রেরীর সভ্যগণ

(১৫৫)

মাঘ মাসে মূলা খাওয়া নিষেধ

খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় বাক্য আছে, তাহাতে তিথিভেদে ও মাসভেদে খাদ্যাখাদ্য বিচার আছে। শরীররক্ষার জন্যই এই-সমস্ত বিধি-নিষেধ। তার পর মাঘ মাসে মূলা পরিপক্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে মূলার স্বাদ পূর্ব্ববৎ থাকে না। এই সময়ে মূলা খাইলে অম্লরোগাদি জন্মে। পরিপক্ব মূলা খাইলে তাহা পরিপাক করা কষ্টকর হয়। আরও বিশেষ কারণ এই যে এই সময়ে মূলা খাইলে মূলার বীজ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকিতে পারে না। তাই ভবিষ্যৎ ফসলের আশায় এই পরিপুষ্ট ও পরিপক্ব মূলা ভক্ষণ না করাই লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি। মাঘ মাসে মূলা খাওয়ার প্রথা থাকিলে বিক্রয়-কারীরা অর্থ পাওয়ার আশায় ভাল ভাল মূলা বিক্রয় করিয়া ফেলিত আর অকর্ম্মণ্য ও খারাপ গাছের বীজ রাখিত। ইহার ফলে আগামী বৎসরে ভাল মূলা হইতে পারিত না। পুষ্ট গাছের বীজ হইতে যে গাছ জন্মে, তাহা ভাল হয়, আর অপুষ্ট গাছের বীজে খারাপ ফসল জন্মে। ইহা সকল শস্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এবং ইহা কৃষিবিজ্ঞান-সম্মত কথা।

শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র দেবশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী

(১৫৬)

ছাপান্ন গাঁই

ক। শাণ্ডিল্য গোত্রে (ভট্টনারায়ণ-বংশ) ষোলটি গাঁই, যথা—বন্দ্য, কুসুম (বা কুসুমকুলী), দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষালী, বটব্যাল, পরিহা (বা পারি), কুলকুলী, কুশারি, কুলভি, সেয়ক (বা সেক), গড়গড়ি, আকাশ, কেশরী, মাস (বা মাসচটক), বসুয়ারি ও করাল।

খ। কাশ্যপ গোত্রে (দক্ষ-বংশ) ষোলটি গাঁই, যথা—চট্ট, অম্বুলী (বা আমরুলিক), তৈলবাটী, পোড়ারি, হড় গুড়, ভূরিষ্ঠাল, পাকড়াশী, পুষলী, মূলগ্রামী, কয়ারী, পলশায়ী, পীতমুণ্ড, সিমলায়ী, ভট্ট ও পালধি।

গ। সাবর্ণ গোত্রে (বেদগর্ভ বংশ) বারটি গাঁই, যথা—গাঙ্গুলি, পুংসিক, নন্দী, ঘণ্টা, কুণ্ড, সয়ারিক, সাটো, দায়ী, নায়ী, পারী, বালী ও সিদ্ধল।

ঘ। বাৎস্য গোত্রে (ছান্দড়-বংশে) আটটি গাঁই, যথা—কাঞ্জিবিল্লী (বা কাঞ্জীলাল), মহিন্তা, পূতিতুণ্ড, পিপলাই (বা পিপ্পলী), ঘোষাল, বাপুলি, কাঞ্জারী ও শিমলাল।

ঙ। ভরদ্বাজ গোত্রে (শ্রীহর্ষ-বংশ) চারিটি গাঁই, যথা—মুখটী, ডিংসী (বা ডিংসাই), সাহরী ও রায়ীগাঁই।

১৬+১৬+১২+৮+৪=৫৬।

(১) শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি পাঁচটি গোত্রীয় বন্দ্য, চট্ট, মুখুটী প্রভৃতি ছাপান্ন গ্রামীণ ব্রাহ্মণগণের বংশধর ভিন্ন নিষ্ঠাবান্ সদ্ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে নাই—শ্লোকটির সোজাসুজি অর্থ যদি এই হয় তাহা হইলে বারেন্দ্র বৈদিক ও সাতশতী, বঙ্গদেশে প্রচলিত এই তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ইহার মধ্যে পড়েন না। সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে অপারগ বলিয়া নিস্তেজ ব্রাহ্মণরূপে সমাজে গণ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের নাম এ শ্লোকে বাদ পড়িবারই কথা। শ্লোকটি যখন রচিত বা প্রচলিত হইয়াছিল তখন বৈদিকগণ বোধহয় এদেশে আসেন নাই কিম্বা অল্পদিন মাত্র আসিয়াছেন, তখনও উপনিবেশিকরূপে পরিগণিত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের নামোল্লেখ না থাকা বিশেষ দোষের নহে। কিন্তু বারেন্দ্রগণের নাম এশ্লোকে না থাকা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ যে বংশে জন্মিয়াছেন তাঁহারাও সেই বংশের সন্তান, রাঢ়ীয়গণের যে যে গোত্র তাঁহাদেরও সেই সেই গোত্র আছে, তবে তাঁহাদের গাঁইগুলি পৃথক্। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে প্রত্যেকের একটি করিয়া সহোদর ভ্রাতা ও একজন করিয়া কায়স্থ ভৃত্য আসিয়াছিলেন। বারেন্দ্রগণ সেই ভ্রাতা পাঁচটির বংশধর। যাজ্ঞিক পঞ্চ-ব্রাহ্মণের বংশধরগণ যেমন রাঢ়ে রাজদত্ত গ্রাম পাইলেন, তাঁহাদের পাঁচজনের পাঁচ ভ্রাতার বংশধরগণও তেমনই বরেন্দ্রভূমে রাজ-সকাশ হইতে গ্রাম পাইয়াছিলেন। রাজদত্ত পৃথক্ গ্রামের নামে বারেন্দ্রগণের পরিচয় হইল। সুতরাং বারেন্দ্রগণের গাঁইগুলি রাঢ়ী ছাপান্ন গাঁইএর অতিরিক্ত হইলেও উভয়ে একই বংশের সন্তান, ব্রাহ্মণ্যে অধিকার উভয়েরই সমান।

৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধনির্ণয় নামক পুস্তকে এই শ্লোকটি বিদ্বেষজনিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মনোমালিন্য হইলে ভ্রাতারা পরস্পরের কুৎসা করেন এ ঘটনা সংসারে বিরল নহে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণের মধ্যে এরূপ ঘটা অসম্ভব নহে। (সম্বন্ধ-নির্ণয় ২১ পৃঃ)।

(২) কান্যকুব্জ হইতে আগত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের বংশধর বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দিবেন তাঁহাদিগকে অবশ্য অবশ্য উপরে লিখিত ছাপান্ন গাঁই মধ্যে পড়িতে হইবে—এরূপ অর্থও করা যায়। (সঃ নিঃ ২১ পৃঃ) বারেন্দ্রগণ সম্বন্ধে তাহা হইলে এ শ্লোক খাটে না, মাত্র রাঢ়ী সমাজে প্রযোজ্য। কিন্তু সেখানেও উহা প্রয়োগ করায় একটু অন্তরায় আছে।

ছাপান্ন গাঁইএর তালিকায় বাৎস্য গোত্রে (ছান্দড় বংশে) যে আটটি গাঁইএর উল্লেখ করিয়াছি ঐ বংশে তাহার অতিরিক্ত পূর্ব্বগ্রামী, চোৎখণ্ডী ও দীঘল নামে তিনটি অতিরিক্ত গাঁই আছে।

ছান্দড়ের নয় পুত্র ও দুই পৌত্র ছিল। তাঁহার পুত্রেরা যখন রাজ-সকাশ হইতে গ্রাম লাভ করেন তখন একটি পুত্র ও পৌত্র-দুইজন হয় উপস্থিত ছিলেন না, না হয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। উঁহারা তিন জন পরে রাজার নিকট হইতে তিনখানি পৃথক্ গ্রাম পাইয়া সেই গ্রামীণ বা গাঁই বলিয়া পরিচিত হন। (সঃ নিঃ ক্রোড়পত্র ২১ পৃঃ) এই নূতন গাঁই তিনটি, ছাপান্ন গাঁই মধ্যে পরিসংখ্যাত না হইলেও, রাঢ়ী-শ্রেণীর মধ্যে সংযুক্ত। (সঃ নিঃ ২১ পৃঃ) কুলে, শীলে, মানে, মর্য্যাদায় ইঁহারা পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান গাঁইগুলির সমতুল্য। সুতরাং ঠিক-মত হিসাবে রাঢ়ী সমাজে গাঁই-সংখ্যা উনষাট, ছাপান্ন নহে।

সাতশতী-ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত গোত্রগুলির মধ্যে বশিষ্ঠ ও পরাশর নামে দুইটি গোত্র আছে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় সাত-শতীদেরও গাঁই ছিল। কিন্তু সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ বলিয়া রাঢ়ী-বারেন্দ্রের জনসমাজে যেরূপ সম্মান ও প্রতিষ্ঠা ছিল, তাঁহাদের সেরূপ ছিল না। ইহার কারণ পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি।

উত্তর কালে সাতশতী কুলের যে-সকল সন্তান সর্ব্ব বিষয়ে সদ্গুণ-সম্পন্ন ছিলেন তাঁহাদিগকে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রগণ আপনাদের মধ্যে উঠাইয়া লন। প্রথম অবস্থায় সাতজন মাত্র পরিগৃহীত হন। তাহার মধ্যে পাঁচজন বারেন্দ্র বংশের ও দুইজন রাঢ়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। [illegible]

করিয়াছিলেন। এই নিয়মানুসারে সাতশতী ব্রাহ্মণগণ বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া বিনয়াদি সদ্গুণ-প্রভাবে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-কুলে মিলিত হইয়াছিলেন। (সঃ নিঃ ২৮৮ পৃঃ)

যে দুইজন (বা ঘর) সাতশতী রাঢ়ী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বোধহয় বশিষ্ঠ ও পরাশর গোত্রীয় ছিলেন।

শ্লোকটি সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত আছে। উহাতে শেষের লাইনে বশিষ্ঠের স্থানে সাতশতী আছে।

শ্রী সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৫৭)

গ্রন্থকীট

উক্ত কীট নিবারণের কোনও সহজ উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। উগ্রগন্ধ ন্যাপ্‌থালিন বা কর্পূর প্রভৃতি দিয়া সুফল না পাইবার কথা। কারণ কীটগুলির ঘ্রাণশক্তি আছে কিনা সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে মতভেদ আছে।

পুস্তকগুলি আল্‌মারী হইতে মাসে অন্তত একবার বাহির করিয়া প্রত্যেকখানি কয়েক সেকেণ্ডের জন্যও যদি ভিতরের পাতা খুলিয়া নাড়াচাড়া করা হয় তাহা হইলে কীটের আক্রমণ হইতে অনেকটা রক্ষা করা যায়। কষ্টসাধ্য হইলেও ইহাই একমাত্র উপায়। যে-সব পুস্তকের রীতিমত ব্যবহার আছে তাহা পুরাতন বা পূর্ব্ব হইতে কীটদষ্ট হইলেও তাহাতে পুনরায় কীট লাগে না। কিন্তু নূতন পুস্তকও ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলে মাস কয়েকের মধ্যেই তাহা কীট-কবলিত হয়।

আল্‌মারীতে বন্ধ না করিয়া খোলা র‍্যাকে পুস্তক রাখিলে কীটদষ্ট হইবার ভয় অনেকটা কম। এটিও পরীক্ষিত।

শ্রী সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আল্‌মারীতে পুস্তক রাখিলে যে পোকা জন্মায় তাহা অনেক সময় ন্যাপ্‌থালিন দিলেও নষ্ট হয় না। তবে ইহা অপেক্ষা সুন্দর একটি দেশী উপায় আছে। আল্‌মারীতে পুস্তক রাখিয়া তাহার নীচে নিমপাতা রাখিয়া দিলে পুস্তকে পোকা ধরিতে পারে না। ইহা আমরা আমাদের দেশের লাইব্রেরীতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

শ্রী হীরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী

ঘর-মুখো

সাঁঝের আগেই কাজের ছুটি,—ভাইয়া বাজা মুরলী—
আমি'ল যা আনন্দেতে বিকট 'সেরিং' জুড়্‌লি!
গান্ থামা তুই, মুরলী বাজ', আমি বাজাই মাদ্‌লা,—
ঘর-মুখো চল্, ঘর-মুখো চল্,—আস্‌ছে নেমে বাদ্‌লা।
বিজন-বনে বস্তি মোদের,—চল্ রে ছুটে' ভাইয়া—
পথ চেয়ে আজ থাক্‌বে 'বহু', থাক্‌বে বুড়ী মাইয়া;
সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে ঘরে আকুল হ'য়ে থাক্‌বে—
চল্‌তে পথে কর্‌লে দেরী—ভাব্‌বে তারা ভাব্‌বে।
হপ্তা পরে মিল্‌ল ছুটি—কয়লা-কাটা বন্ধ,
উঠ্‌ছে হাসির হর্‌রা ভীষণ, বুক-ছাপা আনন্দ;
খোস্-মেজাজে চল্‌ব মোরা, নাইক কোনো চিন্তা,—
(মাদল) তাধিন্ ধিন্, তা ধিন্ ধিন্, ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ তা।

"এতোয়ারের" ছুটি রে কাল, তাই ত এত ফূর্ত্তি—
তাই ত এত গানের বহর,—দিল্‌দরিয়া মূর্ত্তি!
পড়্‌বে বিজন পথের ধারে পাহাড় নদী জঙ্গ্‌লা—
ভয় কি তাতে?—আমরা দুজন,—নান্‌কু এবং মঙ্গ্‌লা।
হয়ত পথে নাম্‌বে বাদল, হয়ত হবে রাত্রি,
হয়ত পথে ভিজ্‌বে দুজন বন-গাঁ-মুখো যাত্রী;
ডাক্‌বে হুঁড়ার বিকট রবে, বল্‌ব তারে—'আয় না,'
মঙ্গ্‌লা মাঝি, নান্‌কু মাঝি—কিছুতে ভয় পায় না।
গানের তালে চরণ ফেলে', মাদল-বাঁশীর সঙ্গে—
নাচ্‌ব তাধিন্—হাস্‌ব হো হো,—চল্‌ব ছুটে' রঙ্গে;
হপ্তা পরে একটি দিবস স্বাধীন, মোরা স্বাধীন,—
(মাদল) ধিন্ ধিন্ তা, ধিন্ ধিন্ তা, তা ধিন্ ধিন্, তা ধিন্।

শ্রী সুনির্ম্মল বসু

পুস্তক পরিচয়

পথের সাথী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। শিশির পাব্লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। ২৬৮ পৃষ্ঠা। রেশমী কাপড়ে বাঁধা। দুই টাকা।

যতীন্দ্রমোহন বিখ্যাত কবি। এবার তিনি উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই—

ললিত সপরিবারে ষ্টিমারের যাত্রী। ষ্টিমার চড়ায় আট্কাইয়া অচল। ললিত অসহায়-প্রকৃতির লোক, তাঁর স্ত্রী উমাতারা ততোধিক। ললিত শিশুপুত্রের দুধের জন্য ব্যস্ত হইয়া ষ্টিমারে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিল একটি ছেলে চা-সত্র খুলিয়া চা খয়রাত করিতেছে। উভয়ে আলাপ এবং অভয়ের অভয় দান। ললিতের সঙ্গে তাহার ভাগিনেয়ী মল্লিকা ছিল; মল্লিকা ও অভয়ে মিলিয়া রন্ধন উপলক্ষ্যে চিত্তবন্ধন। অভয় কর্ম্মী ছেলে; সে বেশ সপ্রতিভ চট্পটে। কলিকাতায় ফিরিয়াই অভয় দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে মফঃস্বলে গেল। সেখানে অভয়ের সঙ্গী অতুল একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে কুড়াইয়া আনিল, তাহার নাম রাধারাণী। তাহারা তিনজনে দুর্ভিক্ষসাহায্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইরূপ একত্র বাসের ঘনিষ্ঠতার ফল হইল—রাধারাণী ভালোবাসিল অভয়কে এবং অতুল ভালোবাসিল রাধারাণীকে—চিরন্তন ত্রিভুজের জটিলতা। অভয় একটু ক্ষ্যাপাগোছ উদাসীন প্রকৃতির লোক, এবং একটু আত্মম্ভরিও বটে। মল্লিকা যে তাহাকে ভালোবাসে তাহা জানিয়াও তাহার উহাকে পাইবার জন্য ব্যস্ততা ব্যগ্রতা নাই। এদিকে জগদীশ নামে একটি যুবক মল্লিকাকে পাইবার জন্য সাধু অসাধু কোনো চেষ্টাই বাদ দিতেছে না। অভয় নিরাশ্রয় রাধারাণীকে মল্লিকাদের বাড়ীতে আনিয়াই রাখিয়াছিল; তাহার প্রতি হিংসার দুর্ব্বলতার এক মুহূর্তে মল্লিকা জগদীশকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু যখন জগদীশের সঙ্গে তাহার বিবাহ স্থির হইয়া গেল তখন মল্লিকা নিজের ভুল বুঝিয়া নিজে উপযাচিকা হইয়া অভয়কে পত্র লিখিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে অনুরোধ জানাইল। অভয় তখন বাড়ীতে; পত্র পাইয়াও তার ব্যস্ততা নাই; সে দুর্ভিক্ষসাহায্যের কাজে ব্যস্ত। তার পর অভয়ের মাতৃবিয়োগ হইল। যখন সে কলিকাতায় ফিরিল তখন মল্লিকা মনোভঙ্গে মৃত্যুশয্যায়; অভয়ের অবহেলা হইতে যম তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন। অভয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মল্লিকার মৃত্যু হইল। তখন শোকার্ত্ত অভয় মনে করিল—যে ভুল সে একবার করিয়াছে, তেমন ভুল আর সে করিবে না—হুকুম করিয়া রাধারাণীর সহিত অতুলের বিবাহ দিয়া দিল। অভয়ের হুকুম বলিয়া রাধারাণী অতুলকে বিবাহ করিতে আপত্তি করিল না; এবং অতুল ত রাধারাণীকে চায় বলিয়াই রাধারাণী যে অভয়কে ভালোবাসে তাহা জানিয়াও জানাইল না। ইহাদের বিবাহের পর যখন অভয় অতুলের মুখ হইতেই জানিল যে রাধারাণী তাহাকেই ভালোবাসে, তখন তার অনুতাপের অন্ত রহিল না। এই ব্যাপারের সঙ্গে সম্পর্কিত না হইলেও পুস্তকের মধ্যেকার একটি প্রধান চরিত্র বিধু—সেও ললিতের বিধবা ভাগিনেয়ী. বড় দুঃখী ...

অভয় যখন সর্ব্বহারা হইয়া পথে বাহির হইল, তখন তার পথের সাথী হইল এই দিদি বিধু।

বইখানি প্রথম-রচনা হিসাবে মন্দ হয় নাই। প্লট ভালো, চরিত্রগুলির পরিস্ফুটনের সম্ভাবনীয়তা ছিল; কিন্তু চরিত্রগুলি পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। বর্ণনায় বৈচিত্র্যের অভাবে রচনা একঘেয়ে লাগে, পড়িবার আগ্রহ উদ্রিক্ত হয় না, গল্পের নিজের টানে পড়িয়া যাওয়া হয় না, জোর করিয়া পড়িতে হয়। কবির উপন্যাসে প্রকৃতি ও হাসি একরকম বাদ পড়িয়া গিয়াছে—এইটাই বেশী আশ্চর্য্য ও অশোভন ঠেকে। জগতে শুধু বয়স্ক মানুষই নাই—শিশু আছে, পশুপক্ষী আছে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যলীলা আছে। ললিতের খোকা আছে, কিন্তু সে রঙ্গক্ষেত্রের একজন অভিনেতা নয়। জগৎটা নিরবচ্ছিন্ন গম্ভীরমুখ লোকদের হিতসাধনমণ্ডলী যে নয়, কবি-ঔপন্যাসিক সে পরিচয় দিতে পারেন নাই।

মাধবী—শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ২২৫ পৃষ্ঠা। সাধারণ সংস্করণ দেড় টাকা, রাজসংস্করণ দুই টাকা।

এখানি ঐতিহাসিকের লেখা সামাজিক উপন্যাস—সোনার পাথরবাটি। মাধবী ও প্রবোধ উপন্যাসের নায়ক নায়িকা। মাধবী স্ত্রীস্বাধীনতার চরম আদর্শ পালনে বদ্ধপরিকর—যাহাকে সে ভালোবাসে ও যে তাহাকে ভালোবাসে এই দুজনে স্বাধীন সর্ব্বনিরপেক্ষভাবে মিলিত হইবে, স্ত্রী বলিয়াই সে সমাজ বা প্রিয়জনের অধীনতা স্বীকার কোনো রকমেই করিবে না; তাহার দয়িত বল্লভ যে লোক, তাহার সহিত সে কেবলমাত্র প্রেম ও প্রণয়ের যোগেই মিলিত হইবে ও থাকিবে, কৃত্রিম সামাজিক বিধি বিবাহ-অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়; দয়িতকে সে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিবে না; সে তার পিতৃকুলের পদবী বদ্লাইয়া স্বামীর পদবী গ্রহণ করিবে না; তাহার ঘর করিতে যাইবে না; সে নিজে স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিয়া নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজের খরচ চালাইবে; সন্তান হইলে তাহাদের পালনের ব্যয় ও দায়িত্ব উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইবে। এই অসামাজিক আদর্শ অনুসারে মিলিত হইল মাধবী ও প্রবোধ। তার ফলে প্রবোধ ধনী পিতার ত্যাজ্যপুত্র ও সমাজে নিন্দিত হইল। মাধবীর সন্তান-সম্ভাবনা হইলে সে সমাজে ধিক্কৃতা হইতে লাগিল। তখন তাহারা দুজনে বিদেশে গেল। সেখানে হঠাৎ প্রবোধ মারা গেল এবং মাধবীর জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হইল। সে কোথাও চাকরী পায় না, সম্মান পায় না, সে খবরের কাগজে লিখিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করে। এই সংগ্রামে তার রূপ যৌবন স্বাস্থ্য সব গেল। যে ডাক্তার বিদেশে প্রবোধের চিকিৎসা করিয়াছিল সে মাধবীকে বিবাহ করিতে উৎসুক হইল, কিন্তু মাধবী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। যে মেয়ে এখন মাধবীর একমাত্র অবলম্বন, সেও সমাজে অপমানিতা হওয়াতে মাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বৃদ্ধ দাদামশায়ের কাছে চলিয়া গেল। এইরূপে সর্ব্বশূন্যা মাধবীর জীবনের অবসান হইল, তথাপি সে স্বীকার করিল না যে সে কিছু অন্যায় করিয়াছে। সে নিজের আদর্শের কাছে

সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে ভালো ফুটিয়াছে প্রবোধের পিতা দৃঢ়চরিত্র বৃদ্ধ ডাক্তার। প্রবোধের চরিত্র মোটেই খোলে নাই। মাধবীর ছবিও বেশ জীবন্ত হইয়া উঠে নাই, মাধবী যেন লেখকের তত্ত্বমূর্ত্তি হইয়াছে, কেবল বড় বড় বক্তৃতার সমষ্টি। লেখকের শিক্ষিতা মহিলার স্বভাব ও আচরণ সম্বন্ধে মোটেই অভিজ্ঞতা নাই; এজন্য মাধবীর ছবি—ছবি ঠিক বলা যায় না, কারণ তাহা ফুটে নাই,—মাধবীর আচরণের বিবরণ স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক অসঙ্গত অশোভন অভদ্র হইয়াছে;—যখন স্থিরও হয় নাই প্রবোধ তাহাকে জীবনসঙ্গিনী বলিয়া সমাজনিরপেক্ষ হইয়া গ্রহণ করিবে কিনা, তখনই সাধারণ পার্কে বসিয়া মালীর সামনে মাধবীর আচরণ নিতান্তই নিন্দনীয় অশ্রদ্ধেয়। ইহাতে লেখকের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়াছে—মাধবীর চরিত্র এমনভাবে অঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল যে সামাজিক জীব পাঠক-পাঠিকার সহানুভূতি সে জোর করিয়া আদায় করিবে। যাই হোক, শেষে লেখক সমাজেরই জয় দেখাইয়াছেন, যদিও সমাজের সঙ্কীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা এবং মাধবীর উদারতা ও দৃঢ়তা পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে। বইখানির প্লট সম্পূর্ণ নূতন ও অসমসাহসিক; সমাজের একটা মস্তবড় সমস্যা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে; সমাজ যে ইহার সমাধান কিরূপভাবে করিবে তাহা ভবিতব্যতাই জানে; কিন্তু লেখক অপ্রস্তুত সমাজের সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত করিয়া নিজের ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।

চালচিত্র—শ্রী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রীযুক্ত কে এম্ কোনার এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১০ বোবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৭ পৃষ্ঠা। দেড় টাকা।

এই চালচিত্র পূজার আনন্দ-প্রতিমার কাঠাম; ইহাতে বাক্যের বর্ণে গল্পের ছবি আছে বারোটি—দ্বাদশজন বিখ্যাত পটুয়া ইহার অঙ্গ-প্রসাধন করিয়াছেন—(১) শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরাকুণি—রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী, (২) শ্রী জলধর সেন, ততঃ কিম্, (৩) শ্রী সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায়, নিশির স্বপ্ন, (৪) শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়, ফুল, (৫) শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরব নিবেদন, (৬) শ্রী প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মুশাফের, (৭) শ্রী সরোজনাথ ঘোষ, চন্দ্রালোক, (৮) শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য, পাখাকুলি, (৯) শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রাজকন্যা, (১০) শ্রী মণীন্দ্রলাল বসু, লতিফের শান, (১১) শ্রী অমরেশ সিকদার, ছবির দাম, (১২) শ্রী মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অন্ধকারের অভিসার।

এই বইখানিতে বারোটি নামজাদা লেখকের বারোটি গল্প একত্র ছাপা হইয়াছে। ইহার কাগজ উত্তম, ছাপা ভালো, প্রচ্ছদপট আঁকা নামজাদা পটু পটুয়া শ্রী চারুচন্দ্র রায়ের। বইখানি শোভন ও সুন্দর হইয়াছে। লেখার দোষগুণের বিচারে ক্ষান্ত রহিলাম, কারণ তাহা হইলে তুলনায় সমালোচনা করিতে হইত।

নবগ্রহ—শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৭৬ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধা। দেড় টাকা।

এই পুস্তকে নয়টি ছোট গল্প সংগৃহীত হইয়াছে। গল্পগুলি সুলিখিত।

চিত্রে ভাববৈচিত্র্য—শ্রী তারকনাথ বাগ্‌চী ও শ্রী দেবকণ্ঠ সরস্বতী। বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৮ গুলুওস্তাগরের লেন, কলিকাতা। ফুল্‌স্ক্যাপ্ আট-পেজী আকার। রেশমী কাপড়ে বাঁধা, সোনার জলে নাম ছাপা। আড়াই টাকা।

বাগ্‌চী-মহাশয় বিবিধ বেশভূষা ও ভাবভঙ্গীর সাহায্যে বিবিধ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ছবি তুলাইয়াছেন; এক-একটি বিষয় অভিনয় করিতে একাধিক লোকের আবশ্যক হইয়াছে, সেই একাধিক লোকের ভূমিকা একা বাগ্‌চী মহাশয়ই গ্রহণ করিয়াছেন এবং ফোটোগ্রাফীর কৌশলে একজনের ছবিই একসঙ্গে জুড়িয়া বহুজনের অভিনয় প্রকাশ করিয়াছেন; একই চিত্রে তিনি পুরুষ ও স্ত্রী দুই রূপে দু-তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন। এই বহুরূপী বিদ্যায় তিনি বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, ছবিগুলির অধিকাংশই স্বাভাবিক ও সবগুলিই কৌতুককর ব্যঙ্গচিত্র হইয়াছে। আমাদের বেশী ভালো লাগিয়াছে—হারমোনিয়ম-বাদক, খোল-বাদক, করতাল-বাদক, বেহালা-বাদক, উড়ে চাকর, এবং সব-সে সেরা প্রোফেসার জগবন্ধু। সরস্বতী-মহাশয় গদ্যে পদ্যে এইসব ছবির একটি করিয়া পরিচয় লিখিয়াছেন, পরিচয়গুলিও সরস সুলিখিত হইয়াছে—পদ্যের ছন্দ ও মিল নিখুঁত এবং ভাবব্যঞ্জনাও উত্তম হইয়াছে। চিত্রে ও বাক্যে মিলিয়া একটি সমঞ্জস ভাবদ্যোতনা প্রকাশ পাইয়াছে।

The Village Gods of South India: By The Right Reverend Henry Whitehead, D. D, Bishop of Madras. Association Press (Y. M. C. A.), 5 Russell Street, Calcutta. কাপড়ে বাঁধা বইএর দাম তিন টাকা; কাগজের মলাটওয়ালা বইএর দাম দুই টাকা।

এই পরম উপাদেয় বইখানিতে দক্ষিণ-ভারতের গ্রাম্যদেবতার ইতিহাস পূজাপদ্ধতি প্রভাব ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা ও ছবি আছে। যাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা ও অনুসন্ধান করেন তাঁহাদের পক্ষে ত এই পুস্তকখানি অত্যাবশ্যক; যাঁহারা সাধারণ পাঠক, তাঁহারাও ইহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতির পরিচয় এবং হিন্দুর দেবদেবীর অসংখ্যত্ব ও বৈচিত্র্য দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিবেন। বইখানি ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার সহিত লেখা; পরধর্ম্মের কুসংস্কারের প্রতিও কোথাও শ্লেষ-বিদ্রূপ ত নাই-ই, অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পায় নাই। বইখানি বিশেষ মূল্যবান্।

The Hindu Religious Year: By M. M. Underhill, B. Litt., Association Press (Y. M. C. A.) 5, Russell Street, Calcutta. দাম দু-টাকা, তিন টাকা।

এই পুস্তকে মহারাষ্ট্রদেশপ্রচলিত পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব, কালপরিমাণ, সৌর চান্দ্র বৎসর, মাস, অধিমাস, মলমাস, গ্রহণ, শুক্রের উদয়াস্ত, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন, শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষ, সংক্রান্তি, বার, ঋতু, তিথি, যোগ, ব্রত, পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ, পশুপূজা, বৃক্ষপূজা, সরীসৃপপূজা, জড়পূজা, মেলা, তীর্থ ইত্যাদির বিবিধ বর্ণনা আছে। একই হিন্দুসমাজের প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন সংস্কার ও বিশ্বাসের পরিচয় এই পুস্তক হইতে পাওয়া যায়। ইহা হিন্দুর ক্রিয়াকর্ম্মের একখানি পঞ্জিকা বিশেষ; শুষ্ক পঞ্জিকা নয়, বিবিধ-উপাখ্যান-সম্বলিত বহুলতথ্যপূর্ণ সরস রচনা। লেখক আশ্চর্য্য অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে মহারাষ্ট্র হিন্দুসমাজের পালপার্ব্বণ অনুষ্ঠান বিশ্বাস সংস্কার প্রভৃতির তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। লেখক ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার সহিত সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, কোথাও পরধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই। এই বইখানি ধর্ম্মতত্ত্বের তুলনামূলক অধ্যয়নের বিশেষ আবশ্যক উপাদান হইয়াছে। সুতরাং ইহা হিন্দু অহিন্দু সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকার নিকট সমাদৃত হইবার দাবী রাখে।

Poems by Indian Women: Edited by Margaret Macnicol. The Heritage of India Series. Association Press, 5, Russell Street, Calcutta Paper, Re. 1, cloth 1-8 1923.

ভারতীয় নারীদের কবিতা। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের

সকল প্রদেশের নারী-কবিদের জীবন এবং কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকের গোড়ার দিকে একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কোন্ কবি, কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন এবং কি ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন তাহা জানিতে পারা যায়। পুস্তকখানি যদিও খুবই সংক্ষিপ্ত, তাহা হইলেও যাঁহাদের বেশী পড়িবার অবসর নাই অথবা যাঁহারা বড় বই পড়িতে চান না, তাঁহাদের কাছে এই বইখানির আদর হইবে। কবিদের লেখার নমুনা স্বরূপ প্রত্যেকেরই দু-একটি করিয়া কবিতার ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদে মূল কবিতার ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে বটে, তবে এই অনুবাদেও আমরা কবিদের কবিত্বের কিছু পরিচয় পাই। বিভিন্ন প্রদেশের নারী-কবিদের কবিতাগুলি সেই বিশেষ প্রদেশের কোনো পণ্ডিত লোককে দিয়া অনুবাদ করাইলে আরো ভালো হইত বলিয়া মনে হয়। বইখানির ছাপা, কাগজ ইত্যাদি বেশ ভাল হইয়াছে।

মুদ্রারাক্ষস

নীহার (উপন্যাস)—শ্রী হরিশচন্দ্র দে, ৫০ নং আলীপুর রোড, আলীপুর। ছয় আনা।

চলনসই।

চিরকুমার (উপন্যাস)—শ্রী মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম-এ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা। শ্রাবণ ১৩৩০।

বইখানি পড়িতে একরকম মন্দ লাগে না, তবে মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে। বইখানিকে অনাবশ্যক বেশী বড় করা হইয়াছে; বাজে অংশ বাদ-সাদ দিয়া বইখানিকে আরো সুখপাঠ্য করা যাইতে পারে। বাঁধাই, ছাপা, কাগজ ভাল হয় নাই।

ছোট ছোট গল্প—শ্রী যোগীন্দ্রনাথ বসু। ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি। এক টাকা চার আনা। ১৩৩০।

যোগীন্দ্র-বাবুর বইয়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার দরকার নাই। এই ছোট গল্পগুলি কেবল ছেলে মেয়ে নয়—অনেক বুড়ারও পড়িতে বেশ ভাল লাগিবে। তবে বইএর ছবিগুলি আরো ভাল করা উচিত ছিল। একখানি ছবি ছাড়া আর কোনটিকেই ভাল বলা চলে না। "দিঙ্নাগাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে তাল ও বেতাল"—ছবিখানি বেশ ভাল বলা যাইতে পারে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

প্রাণ-প্রতিষ্ঠা (উপন্যাস)—শ্রী শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ব্যানার্জ্জি গাঙ্গুলী এণ্ড কোং, কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস্ কলিকাতা। দেড় টাকা।

"বিজলী"তে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। লেখক উপন্যাসের ছলে অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন। বিশেষতঃ গ্রাম সংস্কার সম্বন্ধে অনেক তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে উপদেশ বড় শক্ত এবং জটিল হইয়া উঠিয়াছে, সাধারণ পাঠকের তাহা ভাল না লাগিবার কথা। উপন্যাসের প্লটও মামুলি ধরণের। তবে লেখকের উদ্দেশ্য সাধু, কারণ বই-বিক্রির আয় সেনহাটী কৃষ্ণচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউটকে দেওয়া হইবে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভালই হইয়াছে।

অরুণার বিয়ে (উপন্যাস)—শ্রী নীহাররঞ্জন দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ এবং এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্সের দোকানে পাওয়া যায়। এক টাকা। আশ্বিন, ১৩৩০।

পুস্তকের মলাটের উপর চারুচন্দ্র রায়ের আঁকা একখানি চমৎকার প্রচ্ছদপট। সমস্ত পুস্তকের মধ্যে ঐখানিই বিশেষ করিয়া চোখ ও মন হরণ করে।

উপন্যাসখানি মামুলি, তবে পড়িতে মন্দ লাগে না। লেখক একটি বিশেষ ভুল কথা লিখিয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্বে কোন যুবকের সঙ্গে তাহার হইতে-পারে-পত্নী গাড়ীতে করিয়া কোন বয়স্কা আত্মীয়া বা আত্মীয়কে না লইয়া কোথাও যায় না। কোন সমাজেই এ প্রথা নাই। উপন্যাস বলিয়া যা-তা লেখা চ'লে না। এই উপন্যাসের নায়ক এক স্থানে নায়িকাকে গাড়ীতে করিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন—নায়ক-মাতা ভাবী বধূ দেখিবেন বলিয়া। বরের বাড়ীর লোকেরাই কন্যার গৃহে গিয়া কন্যা দেখিয়া আসে। ভাবী-বধূ তাহার ভাবী-শাশুড়ীকে নিজেকে দেখাইতে যায়, এমন কথা কোথাও শুনি নাই। তবে আমরা শুনি নাই বলিয়া যে তাহা হইতে পারে না, এমন কথাও বলিতে পারি না।

বইখানির বাঁধাই এবং ছাপা বেশ ঝরঝরে।

বিধবা বা কলঙ্কিনী (সামাজিক উপন্যাস)—শ্রী হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত। ১৭ নং নেবুতলা লেন, কলিকাতা। আট আনা। ১৩৩২ সাল।

উপন্যাস হিসাবে ভাল লাগিল না, তবে লেখক আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের কতকগুলি অনাচার এবং অনিয়ম লোকের সামনে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা সার্থক হউক এই কামনা করি।

সরল-হোমিও-ভৈষজ্যাবলী—শ্রী খগেন্দ্রনাথ বসু। লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৩৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।

হোমিওপ্যাথিক মতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের এই বই-খানি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতে পারে। নানাপ্রকার রোগের লক্ষণ এবং তাহার ঔষধের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। যে-কোন লোক এই বইখানি পড়িলে উপকার পাইবেন। এবং হোমিও-ডাক্তার না হইয়াও চিকিৎসা করিতে পারিবেন। হোমিও চিকিৎসকের কাছেও এই পুস্তকখানির আদর হইবে আশা করি। পুস্তকখানির ছাপা এবং কাগজ আরও একটু ভাল হওয়া প্রয়োজন।

দেয়ালি (কবিতার বই)—শ্রী প্রমথনাথ বিশি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

কবিতাগুলি পড়িতে বেশ লাগিল। কয়েকটি কবিতা বেশ উঁচু ধরণের। কবি কবিতাগুলির নামকরণ না করিয়া পাঠকদের একদিকে ফাঁকি দিয়াছেন, আর একদিকে ভাল করিয়াছেন। কারণ কবিতা লেখা অপেক্ষা কবিতার নামকরণ সত্যই শক্ত ব্যাপার। এই তরুণ-কবির কবিতাগুলি আজকাল মাসিক পত্রের অনেক কবির কবিতা অপেক্ষা সুখপাঠ্য। কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের দৈন্য নাই, ভাষারও সৌন্দর্য্য আছে। কতকগুলি কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছায়া দেখা যায়—তাহাতে অবশ্য দোষের কিছু নাই। দু-একটি কবিতা বাদ দিলে বইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ছাপা ও কাগজ ভাল।

গ্রন্থকীট

বিপ্লবের বলি (প্রথম ভাগ)—যতীন্দ্রনাথ। বি প্র ভাণ্ডার, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর হইতে শ্রী বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—সরস্বতী লাইব্রেরী, ৯ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য অলিখিত।

পুস্তকখানির নাম যতীন্দ্রনাথ হইলেও ইহাতে যতীন্দ্রনাথ মুখো-

পাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবপন্থীদের জীবনবৃত্তান্ত আছে। ইহার কোনটি বা কেতাবী ভাষায় লেখা, কোনটি বা চলতি ভাষায় লেখা। একই পুস্তকে ভাষার অসমতা বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া ভাষায় প্রাদেশিকতা দোষ বহুস্থলে আছে ও বর্ণাশুদ্ধির জন্য পড়িতে বাধে। ৫১ পৃষ্ঠায় সামছুল আলমের জায়গায় সামছুল হুদার নাম লেখা হইয়াছে। পুস্তকখানির কাহিনী-অংশটুকু বেশ কৌতূহলজনক, ব্যাখ্যান-অংশটুকু বড় নীরস।

সংসারী—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পুস্তক—ডাক্তার এন্ সি ব্যানার্জ্জী প্রণীত। চতুর্থ সংস্করণ। সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹। ১৩৩০।

বইখানির পূর্ব্বসংস্করণের পরিচয় এই পত্রিকায় দেওয়া হইয়াছিল। নূতন সংস্করণে পুস্তকের উপযোগিতা আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংসার চালাইতে 'সংসারী' কাজে লাগিবে।

অ

জার্ম্মান্‌সমাজে গরমের ছুটি

(১)

গ্রীষ্মকালে সহর ছাড়িয়া বাহিরে কিছুকাল কাটানো জার্ম্মানির মধ্যবিত্ত লোকদের একটা দস্তর দেখিতেছি। উকিল, ডাক্তার, ব্যাঙ্কার, ব্যবসায়ী, ইস্কুল-মাষ্টার, লেখক, চিত্রকর, গায়ক, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর নরনারীকেই ছুটির আরাম ভোগ করিতে দেখা যায়।

এই উপলক্ষ্যে ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ভিতর একটা নয়া আন্দোলন দেখা দিয়াছে। বহু জার্ম্মান্ ছাত্রছাত্রী ফিন্‌ল্যাণ্ডে গিয়াছে, জুগোস্লাভিয়ায় গিয়াছে, সুইডেনে গিয়াছে, ইংল্যাণ্ডে গিয়াছে। তাহাদের পরিবর্ত্তে জার্ম্মানিতে বেড়াইতে আসিয়াছে ফিন্‌ল্যাণ্ডের, জুগোস্লাভিয়ার, সুইডেনের এবং ইংল্যাণ্ডের ছাত্রছাত্রী।

ছাত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে অথবা কোনো ছাত্রপরিষৎ বা যৌবনসম্মিলনীর তরফ হইতে। গবমেণ্ট্, রেল-জাহাজ কোম্পানী এবং জনসাধারণের সংগৃহীত চাঁদা তহবিল হইতে ছাত্রছাত্রীদিগকে পর্য্যটনের খরচপত্রে কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়া থাকে।

ভারতের প্রদেশে প্রদেশে এইরূপ ছাত্রবিনিময়ের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। গুজরাটের যুবকেরা বাংলায়, যুক্তপ্রদেশের লোকেরা মহারাষ্ট্রে, বাংলার ছাত্রছাত্রীরা মান্দ্রাজে, মান্দ্রাজের পর্য্যটকেরা পঞ্জাবে কয়েক সপ্তাহ কাটাইতে অভ্যস্ত হউন। পর্য্যটনবৃত্তি স্থাপন করিবার জন্য ভারতের প্রাদেশিক জননায়কগণের পক্ষে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিবার দিন আসিয়াছে।

(২)

ছুটির সময়টা—তিন চার সপ্তাহ—সুখে স্বচ্ছন্দে বিনা মানসিক পরিশ্রমে কাটানো প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জার্ম্মান্ নরনারী শরীর-চর্য্যার অঙ্গ বিবেচনা করিয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার এক প্রধান উপায় স্বরূপ মফঃস্বলে বাস করাটা সমাদৃত হয়। খাওয়া, বেড়ানো, ঘুমমারা, কুস্তীকসরৎ করা ছাড়া গ্রীষ্মাবকাশে অন্য কোনো কাজ ইহাদের চিন্তায় স্থান পায় না।

এই অভ্যাস ইংল্যাণ্ডে, আমেরিকায়, ফ্রান্সেও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই অভ্যাস একদম নাই একথা বলা চলে না। তবে স্বাস্থ্য, শক্তি, শারীরিক উৎকর্ষ, উদ্বেগহীন আনন্দময় জীবন, খেলাধূলা ইত্যাদির দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি আজও প্রচুর পরিমাণে পড়ে নাই একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

জুন্, জুলাই, আগষ্ট্, সেপ্টেম্বর্ মাসের ভিতর লাখ লাখ জার্ম্মান্ নরনারী নিজেদের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া কোনো দূর পল্লীতে যাইয়া বসবাস করে। কেহ দুই সপ্তাহের জন্য, কেহ চার সপ্তাহের জন্য, কেহ ছয় সপ্তাহের জন্য, ইত্যাদি। এমন কি প্রত্যেক শনিবার রবিবার—কি শীতে কি গ্রীষ্মে—বার্লিন শহরের অগণিত লোক নিকটবর্ত্তী মফঃস্বলে "নিষ্কর্ম্মা"র জীবন কাটাইতে চলিয়া

যায়। প্রকৃতির আবেষ্টনে খোলা মাঠে খোলা আকাশে দশ বার ঘণ্টা কাটানো প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই জার্ম্মান মাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অনুসারে কাজ করা হইয়া থাকে।

(৩)

ভারতের যুবা বুড়াদের মধ্যে দুইচার জন হয় ত শহরের বাহিরে হাঁটিয়া নিজ নিজ জেলার দশবিশ মাইল স্বচক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু এই ধরণের জেলা-পর্য্যটন, পল্লী-পর্য্যবেক্ষণ জার্ম্মানির মধ্যবিত্ত সমাজে হর্‌দম চলিতেছে।

জার্ম্মানির বন কানন নদী সরোবর পাহাড় উপত্যকা সবই পায়ে হাঁটিয়া দেখিয়া বেড়াইয়াছে এমন যুবকযুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া লাখ লাখ আছে। ঘাড়ে একটা থলের ভিতর কিছু কাপড়চোপড় আর খাদ্যদ্রব্য বহিয়া বনভ্রমণ করিতে বাহির হওয়া গ্রীষ্মে বহুলোকেরই "স্বধর্ম্ম" বিশেষ।

কাজেই দেখিতে পাই উচ্চশিক্ষিত জার্ম্মান নরনারীরা স্বদেশের প্রত্যেক সৌন্দর্য্যময় জনপদের খবর রাখে। হ্রদ, উপবন, গাছগাছড়া, শিকারের জানোয়ার কিছুই ইহাদের অজানা থাকে না। রেল ষ্টীমার ইত্যাদির যুগে পায়ে হাঁটিয়া দেশ দেখা উচ্চশিক্ষিত ভারত-সন্তানের পক্ষে একটা নূতন কিছু মনে হইবে।

বস্তুতঃ জার্ম্মানরা যতটুকু রেলে যাওয়া আবশ্যক সেটুকু ফুরাইলেই "পায়দলে" হ্রদ-পরিক্রম, বন-পরিক্রম, পাহাড়-পরিক্রম সুরু করে। মধ্যযুগের ভারতে এবং ইউরোপে তীর্থযাত্রীরা যেরূপ করিত, আজকালকার দিনেও জার্ম্মানরা প্রকৃতি-প্রেমের টানে সেইরূপ করিতেছে। নবীন ভারতের পক্ষে এই প্রকৃতি-পরায়ণতা হাতে পায়ে নূতন করিয়া শিখিবার আয়োজন করা কর্ত্তব্য।

(৪)

জার্ম্মানির সমুদ্রকূল অতি সামান্য মাত্র। কিন্তু তাহার প্রত্যেক পল্লীই জার্ম্মান নরনারীর পরিচিত। সমুদ্রে সাঁতার কাটা, সাগরের কিনারায় হাঁটিয়া হাওয়া খাওয়া ভারতেও নেহাৎ অজানা নয়। কিন্তু এদিকে ভারতীয় মধ্যবিত্তের নজর আরও বেশী পড়া দরকার।

জার্ম্মানির পাহাড়গুলা নেহাৎ নীচু। কিন্তু কোনো পাহাড়ই জার্ম্মান পর্য্যটকদের চিন্তায় তুচ্ছ নয়। অধিকন্তু ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে যাইয়া আল্‌প্‌স্‌ পাহাড়ের ঘাড় মট্‌কানো বহু জার্ম্মানেরই সাধ। ভারতবর্ষে এই ধরণের পাহাড়-পর্য্যটন এখনো সুরু হয় নাই। সিম্‌লা, দার্জ্জিলিঙের পাহাড়ী-শহরে বেড়াইতে যাওয়া ত "বাবুগিরি" মাত্র।

জার্ম্মানরা তাহাদের বন-কাননের সবিশেষ তারিফ করে। বাস্তবিক পক্ষে বনসম্পদ জার্ম্মানিতে বিদেশীর পক্ষে একটা অভিনব স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের খনি বিশেষ। পাইন, লিণ্ডেন, মেপ্‌ল্‌ ইত্যাদির বন জার্ম্মানির প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন আটদশ ঘণ্টা এই-সকল বনে কাটাইয়া রাত্রিকালে নিকটবর্ত্তী কোনো কুঁড়েতে শুইয়া থাকিবার জন্য হাজার হাজার লোক লালায়িত। এই ধরণের বনভ্রমণ ভারতে বোধ হয় আজও দেখা দেয় নাই।

বার্লিনের আশেপাশে দেড় দুই ঘণ্টার রেলপথের মধ্যে সাগরসদৃশ হ্রদের বা সরোবরের সংখ্যা অনেক। বার্লিন্‌কে বাস্তবিক পক্ষে হ্রদ-কানন-বেষ্টিত নগর বলিলে কোনো অত্যুক্তি করা হইবে না। এই-সকল হ্রদের চারিদিক হাঁটিয়া দেখা গ্রীষ্মকালে জার্ম্মানদের এক বড় কাজ। জার্ম্মানির নদীতে-নদীতে, হ্রদে-হ্রদে খালের সাহায্যে যোগাযোগ আছে। কাজেই একমাত্র জলপথেই গোটা জার্ম্মানি দেখা সম্ভব।

(৫)

লড়াই থামিবার পর হইতে জার্ম্মানিতে "যৌবন-আন্দোলন" সুরু হইয়াছে। খেলাধূলা কুস্তীকস্‌রৎ এই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ। বেশভূষায়, খাওয়াদাওয়ায় সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনও এক বিশেষত্ব। পল্লীভ্রমণ, বন-পরিক্রম, পাহাড়-পর্য্যটন ইত্যাদি প্রকৃতি-পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠান এই যৌবন-আন্দোলনেরই সামিল।

জার্ম্মান্‌ গবর্মেণ্ট্‌ বিশত্রিশ বৎসর ধরিয়া মজুরদের

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য নানাপ্রকার আইন করিয়াছেন। তাহার আনুষঙ্গিক স্বরূপ জার্ম্মানির বিভিন্ন জনপদে হাস্‌পাতাল, আরোগ্যশালা ইত্যাদি গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্‌কারী অথবা বে-সর্‌কারী বীমা-সমিতির লোকজনেরা বিনা পয়সায় অথবা কম পয়সায় এই-সমুদয় আরোগ্যশালায় অতিথি হইতে পারে।

জীমেন্স্‌-শুকের্ট্‌ ইত্যাদি জার্ম্মানির বড় বড় শিল্প-কার্‌খানার অধীনেও এই ধরণের আরোগ্যশালা পরিচালিত হয়। কার্‌খানার মজুরদিগকে স্বাস্থ্যের জন্য ঐ স্থানে পাঠানো হইয়া থাকে।

অধিকন্তু একমাত্র ব্যবসায়ের জন্যও বহু আরোগ্যশালা জার্ম্মানির সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলা হোটেল বিশেষ। তবে চিকিৎসকের অধীনে পরিচালিত হয় বলিয়া রোগীরাও এইখানে বসবাস করিলে নিজ নিজ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। অধিকন্তু হাস্‌পাতালের আস্‌বাব যন্ত্রপাতি সবই এই-সকল হোটেলে যথারীতি রক্ষিত হয়। কাজেই বিনা উদ্বেগে রোগীরা কয়েক মাস কাটাইতে পারে।

(৬)

ট্যিরিঙ্গেন এবং স্যাক্‌সনি প্রদেশদ্বয়ের পাহাড়ী বন জার্ম্মাণ সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। এই-সকল অঞ্চলে আরোগ্যশালা কাজেই অনেক। অধিকন্তু জার্ম্মানির নানা অঞ্চলের জল নানাপ্রকার রোগের ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। এই জলমাহাত্ম্যে বহুসংখ্যক পল্লী স্বাস্থ্য-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। এই ধরণের জনপদকে "বাড" বা স্নানাগার বলে। দূর বিদেশের লোকও—কেহ পেটের অসুখের জন্য, কেহ পায়ের গিঁঠের ব্যথার জন্য—এই "বাডে' স্নান করিতে আসে।

মেক্‌লেন্‌বুর্গ্‌ প্রদেশের হ্রদ ও কাননগুলা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। ফন্টানে নামক জার্ম্মানির একজন আধুনিক গদ্যলেখকের রচনায় এই জনপদের প্রকৃতিসম্পদ্‌ চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। বিলাতের "লেক্‌ ডিষ্ট্রিক্ট্‌" যেরূপ, মেক্‌লেন্‌বুর্গের ফ্রিষ্টেন্‌ব্যর্গ অঞ্চলও সেইরূপ। এই অঞ্চলে কয়েকটা সর্‌কারী বেসর্‌কারী আরোগ্যশালা আছে। অধিকন্তু ব্যবসায়ী-চিকিৎসকের অধীনেও "সানাটোরিয়াম্‌" কায়েম করা হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বাড়ীটা "শ্লস" বা রাজপ্রাসাদ ছিল সেইখানে এই আরোগ্যশালা চলিতেছে। এখানে বসবাস করিয়া বনে হরিণ শিকার করা চলে, হ্রদে মাছধরাও সম্ভব। তাহা ছাড়া, পাইনের হাওয়া ত সর্ব্বদাই বহিতেছে।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

বেনো-জল

আঠারো

মরুভূমির বুকের উপরে পরীর স্বপনের মতন অপূর্ব্ব এক তপোবন—ফলে-ফুলে শ্যামতলায় মনোরম। কণারকের কালো দেউলের ভাঙা ললাটের উপরে সূর্য্যের প্রথম হাসির আল্‌পনা ফুটে উঠেছে। মানুষ এই সূর্য্য-মন্দিরকে আজ ত্যাগ ক'রে গেছে বটে, দেবতা কিন্তু এখনো তাঁর প্রাচীন আশ্রমকে ভুল্‌তে পারেন-নি, তাই এখনো প্রতিদিন তিনি সারাবেলা এই মন্দিরের দিকে স্থির ও নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকেন এবং যে বিগ্রহশূন্য শিল্প-বিচিত্র রত্নবেদীর তলায় আর একটি ভক্তের মাথাও নত হয় না এবং একটি পূজার ফুলও নিবেদিত হয় না, আজও তার উপরে প্রত্যহ তিনি নিজের আলোক-হস্তের পবিত্র স্পর্শ সস্নেহে বুলিয়ে দিয়ে যান!

মানুষ ভুলেছে, কিন্তু বনের পাখী ভোলে-নি! কণারকের বিজন শ্যামলতা তাদের স্তবগানে সুমধুর হয়ে উঠেছে।......ডাক-বাংলোর আঙিনায় আনন্দ-বাবু একখানা ইজি-চেয়ারের উপরে চুপ ক'রে ব'সে আছেন এবং তাঁর সাম্‌নে মরুভূমির বিশুষ্ক তৃষা সাগরের অনন্ত নীলিমার দিকে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছে।

আনন্দ-বাবু অভিভূত কণ্ঠে বল্‌লেন, "রতন, তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব!"

রতন বল্‌লে, "কেন বলুন দেখি?"

—"এমন স্বর্গের সন্ধান দিয়েছ ব'লে। এই ভাঙা দেউলের প্রাচীন স্মৃতি, মরুর বুকে এই কল্পনাতীত শ্যামলতা, আকাশের এই অগাধ নীলিমা, সূর্য্যের এই অবাধ আলো, বনের পাখীর এই স্বাধীন গান আর প্রভাতের এই অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা,—এরা সমস্ত মিলে আমাকে একেবারে বিভোর ক'রে তুলেছে! আর যে আমার ফির্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না!—স্বর্গ, স্বর্গ, এই তো স্বর্গ!"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "কিন্তু বাবা, এ স্বর্গে মশার অত্যাচার বড় বেশী, কাল সারারাত আমাদের ঘুম হয়-নি, সে-কথা কি এখনি ভুলে গেলে?"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "আজ-সকালের এই আনন্দের প্রলেপে কালকের রাতের কষ্ট আমার তুচ্ছ মনে হচ্ছে।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "কিন্তু আমি যে ভুল্‌তে পার্‌ছি না, বাবা; দেখনা আমার গায়ে এখনো মশার হুলের স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে! আজ রাত্রে আমি আর কিছুতেই স্বর্গবাস কর্‌তে রাজি নই।"

কিন্তু মশার এমন সুতীক্ষ্ণ হুলও আনন্দ-বাবুর আনন্দকে কিছুমাত্র দমাতে পারে-নি। তিনি মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বার বার উচ্ছ্বসিত স্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "চমৎকার জায়গা, চমৎকার জায়গা! রতন, সেকালে এখানে যারা মন্দির গড়েছিল, তারা সকলেই নিশ্চয় কবি ছিল!"

রতন বল্‌লে, "খালি এখানে কেন আনন্দ-বাবু, ভারতের প্রাচীন শিল্পীরা সর্ব্বত্রই কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইলোরা, অজন্তা, এলিফান্টা, কারলী, সালসতী, সাঞ্চী, ভরত, সারনাথ, গান্ধার, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, বুদ্ধগয়া—এ-সমস্তই প্রকৃতির কোলের ভিতরে সাজানো আছে। একালেই শিল্পীরা হয়েছে সহরের দোকানদারের মত—কিন্তু সেকাল ছিল কবিত্বের যুগ, আসল আর্টিষ্টের জন্ম সম্ভব হয়েছিল তাই তখনকার দিনেই।……কিন্তু সুমিত্রাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, সে কোথায় গেল?"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "সে বেড়াতে যাচ্ছি ব'লে ঐদিক্‌পানে গিয়েছে। আচ্ছা রতন-বাবু, কাল সকাল থেকে সুমিত্রা এমন মন-মরা হয়ে আছে কেন, বল্‌তে পারেন? যে মানুষ হর্‌বোলার মতন দিন-রাত বুলি না কেটে থাক্‌তে পারে না, তার মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয় কি?"

সুমিত্রার মুখ কেন যে বন্ধ হয়েছে, রতন তা ভালো-রকমই জানে। পরশু রাতের সেই ব্যাপারের পর থেকে সুমিত্রা আর রতনের সঙ্গে একটিও কথা কয়-নি—এমন-কি পূর্ণিমার সঙ্গেও সে আর ভালো ক'রে কথা কইছে না। সকলের মধ্যে থেকেও নিজেকে সে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছে। আসল কারণ এখনো কেউ ধর্‌তে পারে-নি বটে, কিন্তু রতন বেশ বুঝ্‌লে যে, সুমিত্রার এই অশোভন ব্যবহার আরো বেশীক্ষণ স্থায়ী হ'তে দেওয়া উচিত নয়। তার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন কর্‌বার জন্যে রতন উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "আপনারা বসুন, আমি সুমিত্রাকে খুঁজে নিয়ে আসি।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "শীগ্‌গির আস্‌বেন, নইলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

বাংলোর হাতা থেকে বেরিয়ে, রতন চারিদিকে তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজ্‌লে, কিন্তু সুমিত্রাকে কোথাও দেখ্‌তে পেলে না। তখন সে ভাব্‌লে, সুমিত্রা এতক্ষণে বোধ হয় অন্য পথে বাংলোতে ফিরে গিয়েছে।……সে আন্‌মনে ভাঙা মন্দিরগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল; ওদিকে চা যে ঠাণ্ডা হচ্ছে সে খেয়াল আর মোটেই রইল না।

মন্দিরের আপাদমস্তক জুড়ে লতা-পাতা-ফুল, পশু-পক্ষী আর পাথরে-গড়া জনতা ভিড় ক'রে আছে——শিল্পীর বিচিত্র পরিকল্পনায় সেই জড় শিলাস্তূপ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে! শত শত ভাবের খেলা, অগুন্তি ভঙ্গীর লীলা, রূপ ও ছন্দের মেলা; মন্দিরের যতটুকু টিকে আছে, ততটুকুর সূচ্যগ্রপরিমাণ স্থানের মধ্যেই যেন প্রজাপতির পাখ্‌নার মত অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের বাহার! এক শূন্যচুম্বী প্রকাণ্ড মন্দিরকে এমনভাবে ক্ষুদে' ক্ষুদে' তৈরি কর্‌তে যে কি বিপুল ধৈর্য্যের আবশ্যক, রতন অবাক্ হয়ে তা ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

মন্দিরের টঙে গুম্বজের তলায় অনেকগুলো বড় বড়

মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলোকে একবার ভালো ক'রে পরখ করবার জন্যে রতন উপরে উঠল···সেখান থেকে চারিদিকে দেখা গেল সীমাহীন ধূ-ধূ করছে বালু-প্রান্তর, পৃথিবী যেন তার সমস্ত শ্যামল সম্পদ্ ফেলে অসীমের উদ্দেশে বিবাগী হয়েছে! দূরে—দিক্‌চক্রবালরেখার পাশে ঠিক যেন একটি নীল-পেন্সিলের দাগ টেনে সূর্য্যকরদীপ্ত সমুদ্র কোথায় চ'লে গেছে! দূর থেকে সমুদ্রের বিশালতা আর বুঝ্‌বার যো নেই, তাকে মনে হচ্ছে একটি সুদীর্ঘ নদীর রেখার মত!...রতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কল্পনায় দেখ্‌তে লাগ্‌ল সেদিনের সেই হারিয়ে-যাওয়া চিত্রকে,—মহাসাগরের লক্ষ লক্ষ তরঙ্গ যে-দিন গম্ভীর মেঘমল্লারে উচ্ছ্বসিত হয়ে, প্রচণ্ড আবেগোল্লাসে কণারকের অর্ক-মন্দিরের পাষাণ-সোপান-তলে এসে মাথা নত ক'রে লুটিয়ে পড়্‌ত!···

প্রধান মন্দির কবে ভেঙে পড়েছে, এখন কেবল মন্দিরের নীচের সামান্য অংশ টিকে আছে—উপর থেকে সেখানটা দেখ্‌তে মস্ত একটা কূপের গর্ভের মত। রতন আস্তে-আস্তে তার মধ্যে নাম্‌ল। ভগ্ন-মন্দির-গর্ভে এখনো মসৃণ পাথরের রত্নবেদী দেবতাশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেদীর দিকে দুই পা এগিয়েই রতন সচমকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল...সেইখানে, বেদীর গায়ে ঠেসান্ দিয়ে, চুপ ক'রে ব'সে আছে সুমিত্রা—ঠিক যেন পাথরের পটে আঁকা পাথরেরই এক প্রতিমার মতন!...তার মুখ বিষণ্ণ, আর দুই চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দুই গাল ব'য়ে গড়িয়ে পড়্‌ছে!

অবাক্, স্তম্ভিত হয়ে রতন দাঁড়িয়ে রইল।

সুমিত্রাও রতনকে দেখ্‌তে পেয়েছিল, কিন্তু সে কোন কথা কইলে না—এমন-কি তার মুখেরও কোনরকম ভাবান্তর পর্য্যন্ত হ'ল না।

এখানে এমন ভাবে এ-সময়ে সুমিত্রাকে যে দেখ্‌তে পাবে, একথা রতন স্বপ্নেও ভাবে-নি! আর, প্রাণের কী লুকানো ব্যথা তার দুই চোখকে আজ এমন সজল ক'রে তুলেছে! রতন জান্‌ত, বয়স হ'লেও সুমিত্রা বালিকা মাত্র! বালিকার মতই সে নির্ব্বিচারে যা মুখে আসে তাই ব'লে ফেলে, ঝগ্‌ড়া করে, আড়ি করে, আবার গায়ে প'ড়ে ভাব করে,—কিন্তু এবারে তার কি হয়েছে? পরশু রাতে, কণারকের মাঠে সে অমন হঠাৎ রেগেই বা গেল কেন, আর বার বার আড়ালে এসে এ-রকম ক'রে তার কাঁদ্‌বারই বা কারণ কি? সে তো সুমিত্রাকে বিশেষ কিছু বলে-নি, কেবল তার অন্যায় মুখরতার জন্যে মৃদু ভৎর্সনা করেছে মাত্র। এর চেয়ে ঢের বেশী কড়া কথা সুমিত্রা তো কতবার হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।···

রতন মনে মনে এম্‌নি সব তোলাপাড়া করছে, ততক্ষণে সুমিত্রা আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। তার পর কোন কথা না কয়েই সেখান থেকে চ'লে যেতে উদ্যত হ'ল।

রতন তাড়াতাড়ি তার সাম্‌নে এগিয়ে এসে বল্‌লে, "যেও না সুমিত্রা, দাঁড়াও।"

সুমিত্রা দাঁড়িয়ে প'ড়ে নির্ব্বাক্‌ভাবে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

রতন বল্‌লে, "সুমিত্রা, তুমি কাঁদ্‌চ কেন?"

সুমিত্রা মাটির দিকে চোখ নামিয়ে খানিকক্ষণ নীরব থেকে বল্‌লে, "রতন-বাবু, আপনারা আজকে কি কণারকেই থাক্‌বেন?"

—"হ্যাঁ, আনন্দ-বাবুর তো ইচ্ছা তাই।"

—"কিন্তু আমার আর এখানটা ভালো লাগ্‌ছে না।"

—"বেশ, আনন্দ-বাবুকে তোমার কথা জানাব।"

—"হ্যাঁ, জানাবেন—আমি আজ্‌কেই যেতে চাই।"

—"কিন্তু তুমি আমার কথার তো কোন জবাবই দিলে না!"

—"কি কথা?"

—"কেন তুমি আমার উপরে রাগ ক'রে আছ? কেন্ তুমি কাঁদ্‌ছ?"

—"আমি আপনার উপরে রাগ করি-নি।"

—"রাগ কর-নি! তবে তুমি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছ কেন?"

—"কারণ আপনার কথা কইবার লোকের অভাব নেই।"

সুমিত্রা এখনো তাকে আঘাত দিতে ছাড়্‌ছে না।

কিন্তু সে আঘাত গ্রাহ্য না ক'রেই রতন বল্‌লে, "বেশ, মান্‌লুম। কিন্তু তোমার এ কান্নার কারণ কি?"

—"আমি কাঁদ্‌চি কেন, তা জান্‌বার কোন অধিকারই আপনার নেই। ক্ষমা করুন, আর-কিছু আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না, এখন পথ ছেড়ে একটু স'রে দাঁড়ান।"

রতন নিজের উদ্দীপ্ত ক্রোধের আবেগকে দমন ক'রে বিনা বাক্যব্যয়ে সুমিত্রার সুমুখ থেকে একপাশে স'রে গেল, সুমিত্রার ভাষা আজ আর সে বালিকার কথার মতন তুচ্ছ ব'লে মনে করতে পার্‌লে না।

উনিশ

নীচের ঘরে বসে' বিনয়-বাবু খবরের কাগজ পড়ছেন, এমন সময়ে মিঃ চ্যাটো আর-একটি অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্‌লেন।

বিনয়-বাবু খবরের কাগজখানা রেখে বল্‌লেন, "আসুন, মিঃ চ্যাটো।"—তার পর জিজ্ঞাসু চোখে আগন্তুকের দিকে তাকালেন।

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "মিঃ সেন, ইনি আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখার্জ্জী, কল্‌কাতা পুলিসে সি-আই-ডি বিভাগের সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর, আপাততঃ আমাদেরই মত এখানে 'চেঞ্জের' জন্যে আছেন। একটি বিশেষ দরকারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

বিনয়-বাবু পুলিসকে ভারি ভয় করতেন—বিশেষ সি-আই-ডি বিভাগকে। তিনি একটু ত্রস্ত স্বরে বল্‌লেন, "আমার সঙ্গে ওঁর কিসের দরকার?"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "দরকার ওঁর নয়—দরকার আপনারই।"

বিনয়-বাবু একটু বিস্মিত হয়ে বল্‌লেন, "আমার দরকার?"

—"হ্যাঁ। নিবারণ-বাবুর মুখে এমন একটা কথা শুন্‌লুম, যা আপনার জানা উচিত মনে করি। বিপদ্‌ আস্‌বার আগেই সাবধান হওয়া ভালো। তাই এঁকে সঙ্গে ক'রে এনেছি।"

বিনয়-বাবুর বিস্ময় তো বাড়্‌ল বটেই, সেই সঙ্গে তাঁর মনে বিলক্ষণ ভয়েরও সঞ্চার হ'ল। যে দিন-কাল পড়েছে কিসে কি হয় কিছুই তো বলা যায় না! তিনি ব্যস্ত ভাবে বল্‌লেন, "বিপদের কথা কি বল্‌ছেন, মিঃ চ্যাটো? কিসের বিপদ্‌? আমার বাড়ীতে ডাকাত পড়্‌বে নাকি?"

নিবারণ সহাস্যে দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে, "আপনি অনেকটা আঁচ করতে পেরেছেন দেখ্‌ছি!"

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিনয়-বাবু বিবর্ণমুখে বল্‌লেন, "বলেন কি মশাই?"

মিঃ চ্যাটো তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন, "মিঃ সেন, একেবারে অতটা চঞ্চল হবেন না, আগে সব কথা শুনুন।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "বলেন কি মিঃ চ্যাটো, এমন কথা শুনেও চঞ্চল হব না?"

নিবারণ বল্‌লে, "মিঃ সেন, আপনার বাড়ীতে বাইরে থেকে ডাকাত পড়্‌বে না, সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ডাকাত বাইরে থেকে পড়্‌বে না তো আকাশ থেকে পড়্‌বে মশাই?"

নিবারণ দ্বিতীয়বার দন্তবিকাশ ক'রে বল্‌লে, "ব্যাপার অনেকটা সেই-রকমই বটে। আপনার বাড়ীতে বাইরে থেকে ডাকাত এইজন্যে পড়্‌বে না যে বাড়ীর ভিতরেই আপনি ডাকাত পুষে রেখেছেন।"

বিনয়-বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বল্‌লেন, "বাড়ীর ভিতরে আমি ডাকাত পুষে রেখেচি! কী বল্‌ছেন আপনি?"

—"আমি ঠিক কথাই বল্‌ছি। ডাকাত আপনার বাড়ীর ভিতরেই আছে।"

—"কে সে?"

—"রতন।"

বিনয়-বাবু ভাব্‌লেন, তিনি ভুল নাম শুন্‌লেন। তাই আবার সুধোলেন, "কি বল্‌লেন?"

—"রতন।"

এবারে বিনয়-বাবু উচ্চস্বরে হাস্য না ক'রে পার্‌লেন না। হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বল্‌লেন, "মশাই, রতনকে যদি ডাকাত বলেন, তাহ'লে আমাকে আপনি গুণ্ডা বল্‌লেও আমি কিছুমাত্র আপত্তি প্রকাশ করব না।"

মিঃ চ্যাটো গম্ভীর মুখে বল্‌লেন, "দেখুন মিঃ সেন, অন্ধবিশ্বাস কোথাও ভালো নয়। আগে সব কথা শুনুন, তার পর অবিশ্বাস কর্‌তে হয় কর্‌বেন!"

বিনয়-বাবু সহাস্য মুখেই বল্‌লেন, "আচ্ছা, আমি শুন্‌ছি। দেখা যাক্, এই দারুণ কৌতুকটা আপনারা কতটা চরমে টেনে নিয়ে যেতে পারেন। নিবারণ-বাবু, রতন যে ডাকাত, এটা আপনি কি ক'রে আবিষ্কার কর্‌লেন?"

নিবারণ বল্‌লে, "আপনি ঠাট্টা কর্‌ছেন? করুন, আমি কিন্তু সত্য কথাই বল্‌ছি—খালি তাই নয়, আমার কথা যে সত্য, প্রকাশ্য আদালতে তা প্রমাণ হয়ে গেছে।"

বিনয়-বাবু সচমকে বল্‌লেন, "প্রকাশ্য আদালতে? আপনার কথার অর্থ কি?"

—"কল্‌কাতায় রতনকে ডাকাতী মাম্‌লার আসামী রূপে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল।"

বিনয়-বাবু বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হয়ে নিবারণের মুখের পানে নির্ব্বাক্ ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

নিবারণ তাঁর ভাবগতিক দেখে তৃতীয়বার দন্তবিকাশ করে বল্‌লে, "সে আজ প্রায় দু-বছরের আগেকার কথা। কল্‌কাতায় এক ব্যবসায়ীর দোকানে ডাকাতী ক'রে আরো কতকগুলো ছোক্‌রার সঙ্গে রতন ধরা পড়ে। আজকাল রাজনৈতিক ডাকাতির ফ্যাসান উঠেছে জানেন তো, এও তাই।"—

বিনয়-বাবুর মনের উপরে নিবারণের কথাগুলো কি-রকম কাজ করেছে তা আন্দাজ কর্‌বার জন্যে মিঃ চ্যাটো মনোযোগের সঙ্গে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "বিচারে রতনের কি হ'ল?"

—"অবশ্য, বিচারের ফলে রতন সে-যাত্রা কোন গতিকে বেঁচে যায়।"

বিনয়-বাবু উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্বরে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, সে তো ছাড়া পাবেই, রতন কি কখনো ডাকাত হ'তে পারে?"

নিবারণ বল্‌লে, "না, মিঃ সেন, খালাস পেলেও রতনের নির্দ্দোষিতা-প্রমাণিত হয়-নি।"

—"নিশ্চয় সে নির্দ্দোষ ব'লেই খালাস পেয়েছে।"

—"রতন খালাস পেয়েছে কেবল প্রমাণ-অভাবে। হাকিম তাকে নির্দ্দোষ ব'লে স্বীকার করেন-নি। তার মত তার আর-এক সঙ্গীও সে-যাত্রা খালাস পেয়েছিল, কিন্তু পরে আর-এক মাম্‌লায় ধরা পড়ে' এখন জেল খাট্‌ছে। রতনের উপর থেকে এখনো আমাদের সন্দেহ যায়-নি, আমরা তার সমস্ত গতিবিধির সন্ধান রাখি। তার পিছনে সর্ব্বদাই আমাদের চর ঘুর্‌ছে। সে যে এখানে এসেছে, কল্‌কাতা থেকে এখানকার পুলিস-বিভাগকে যথাসময়ে সে খবর জানানো হয়েছে। এখানকার সাহেবরাও তার বিরুদ্ধে অনেক কথা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানিয়েছে। রতন সাংঘাতিক লোক। হয় শীঘ্রই তাকে ফের গ্রেপ্তার করা হবে, নয় তাকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "এসব ব্যাপার আপনার জানা উচিত মনে ক'রেই নিবারণ-বাবুকে আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছি।"

বিনয়-বাবু দুঃখিতভাবে চুপ ক'রে রইলেন।

নিবারণ বল্‌লে, "মিঃ সেন, আপনাকে আমি আগে থাকৃতে সাবধান ক'রে দিচ্ছি, রতন এখানে থাক্‌লে আপনি বিপদে পড়্‌তে পারেন।"

চমকিত স্বরে বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "কেন, আমি বিপদে পড়্‌ব কেন?"

—"প্রথমতঃ আপনার বাড়ীতে খানাতল্লাসী হ'তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রতন কোন কারণে ধরা পড়্‌লে আপনাকেও পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়্‌তে হবে।"

মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "সেটা আপনার নামের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর হবে, বুঝ্‌তে পার্‌ছেন কি?"

নিবারণ বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

বিনয়-বাবু চিন্তিত ভাবে বল্‌লেন, "আনন্দ এখানে নেই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি? মিঃ চ্যাটো, আপনি আমাকে কি কর্‌তে বলেন?"

—"আপনার কর্ত্তব্য তো খুবই সোজা।"

—"সোজা?"

—"হ্যাঁ। রতনকে বিদায় ক'রে দিন।"

বিনয়-বাবু নিরুত্তর হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

মনে মনে হেসে মিঃ চ্যাটো বল্‌লেন, "কোথাকার

একটা উড়ো-আপদকে ঘাড়ে ক'রে কেন আপনি বিপদে পড়্‌বেন? আপনি দেশের আর দশের মধ্যে একজন মান্য গণ্য লোক, আপনি যদি পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়েন, খবরের কাগজওলারা তা হলে ধূনোর গন্ধে মনসার মত নেচে উঠ্‌বে, আপনার নাম দিয়ে যা-খুসি তাই লিখ্‌বে,—মিঃ সেন, হাতীকে পাঁকে ফেল্‌বার জন্যে পৃথিবীর উৎসাহের অভাব কোন দিনই হয়-নি!"

—"সব বুঝ্‌ছি, মিঃ চ্যাটো, বুঝ্‌ছি। কিন্তু—" বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে, বিনয়-বাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। তিনি যে কতটা বিচলিত হয়েছেন, সেটা তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে মিঃ চ্যাটো বিলক্ষণই বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

বিনয়-বাবুর পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে না যেতেই পাশের ঘরের দরজার পর্দ্দা সরিয়ে কুমার-বাহাদুর আত্মপ্রকাশ কর্‌লেন।

মিঃ চ্যাটো বিজয়ী বীরের মত গর্ব্বিত অথচ নিম্ন-স্বরে বল্‌লেন, "আজ আমার ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছি!"

কুমার-বাহাদুর একগাল হেসে বল্‌লেন, "পাশের ঘর থেকে আমি সমস্ত শুনেছি!"

ক্রমশঃ

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

একটি আদর্শ গ্রাম

[আদর্শ গ্রাম কিরূপ হওয়া উচিত, কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম; এবং আদর্শের দিকে কোন গ্রাম অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে জানিতে পারিলে তাহার সচিত্র বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। তদনুসারে "স্থল" গ্রামের বৃত্তান্ত মুদ্রিত হইল। —প্রবাসী-সম্পাদক।]

গত বৎসরের পৌষমাসের প্রবাসীতে বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পল্লীর যে কল্পিত চিত্র দিয়াছেন, বঙ্গের প্রত্যেকটি পল্লীকে ঐরূপে গড়িয়া তোলা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইলেও চার-পাঁচখানি গ্রাম লইয়া ঐরূপ এক-একটি আদর্শ পল্লীকেন্দ্র স্থাপন করা অসম্ভব মনে হয় না। মানুষ কোন সময়েই ঠিক আদর্শে উপনীত হইতে পারে না। কারণ, সে যত উন্নত হইতে থাকে, তাহার আদর্শও তত উন্নত হইতে থাকে। অতএব, আদর্শের দিকে সতত অগ্রসর হইবার অবিরাম চেষ্টা দ্বারা মানুষের সজীবতা প্রমাণিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের পল্লীগুলির অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীসমূহের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। পূর্ব্ববঙ্গে যে-সব গ্রামে জমিদারগণের বাস আছে সেখানে দুই-একটি বিদ্যালয় বা উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান থাকিতে প্রায় দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই যত্ন ও উদ্যমের অভাবে নূতন প্রতিষ্ঠান ত হয়ই না, বরং পুরাতনগুলির অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। প্রধানতঃ পল্লীতে উপার্জ্জনের পথ না থাকায় এবং শিক্ষা বিস্তার না হওয়াতেই দরিদ্রেরা উপার্জ্জন-উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গতিসম্পন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় সুখ-সুবিধার জন্য পল্লী ত্যাগ করিয়া সহরগামী হইতেছেন। পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে পল্লীবাসীর অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ সুবিধা এবং পল্লীসমাজের জড়তা ও অবসাদ দূর, করিয়া বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান ও আন্দোলনের সৃজন করিতে হইবে। শিক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, স্বাস্থ্যোন্নতি, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি যে-সব লক্ষণ মানবজীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টির পরিচায়ক, সেগুলি যাহাতে একসঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে তাহার উত্তম ব্যবস্থা করা চাই। বক্তৃতা- বা প্রবন্ধ-যোগে প্রচার অপেক্ষা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলে অধিক ফল হওয়া সম্ভব। আমাদের পল্লীতে কয়েক বৎসরের চেষ্টায় যেরূপ কার্য্য হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উন্নতির জন্য যে নীতি অনুসরণ করা হইতেছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

প্রাকৃতিক বিবরণ—যাতায়াতের সুবিধা

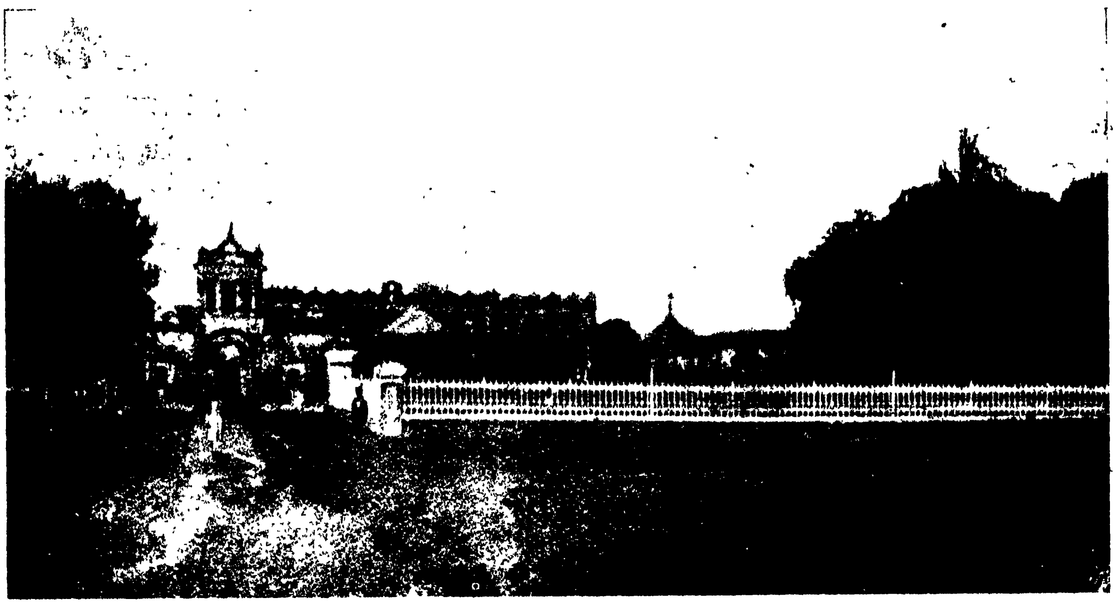
স্থল-গ্রামে যাতায়াতের পথ

বারেন্দ্রভূমের সর্ব্বপ্রধান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কেন্দ্র "স্থল" গ্রাম পাবনা জেলায় সিরাজগঞ্জ মহকুমার মধ্যে বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র-নদের (যমুনা নদীর) পশ্চিম কূলে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ ও গোয়ালন্দ হইতে গোয়ালন্দ-বাহাদুরাবাদ সার্ভিসের ষ্টীমার যোগে এখানে যাতায়াত করিতে হয়। ষ্টেশনের নাম স্থল ষ্টীমার ঘাট। পার্শ্ববর্ত্তী স্থল-বসন্তপুর স্থল-নওহাটা গ্রামের নামও এই স্থল গ্রামের নাম হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে বিস্তৃত মাঠ আছে, বিশুদ্ধ বায়ুর আদৌ অভাব হয় না। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তান। প্রসিদ্ধ পাকুড়াশী বোর্ডের ও সিরাজগঞ্জ লোকাল বোর্ডের সভ্য থাকিয়া জেলা-বোর্ডের ও জনসাধারণের সেবায় ব্রতী আছেন। তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক যত্ন ও চেষ্টাতেই তাঁহাদের গ্রামটি বঙ্গের অন্যতম আদর্শ পল্লীকেন্দ্ররূপে সুপরিচিত হইয়াছে।

প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলির বিবরণ

গ্রামের সদর রাস্তা উচ্চ ও প্রশস্ত। ষ্টীমার-ঘাট, হাটবাজার, রেজেষ্টারী অফিস্, পোষ্টাফিস্, থানা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় স্থানে যাতায়াতের এইটিই প্রধান সড়ক। সড়কের ধারেই জমিদারদিগের বাড়ী ও বাগান এবং দক্ষিণে সংলগ্ন সেই ময়দান। এই স্থানের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য মফঃস্বলের অনেক সহরেও দেখা যায় না।



স্থল জমিদার-বাড়ী

জমিদারগণ গ্রামের মালিক। বহু পূর্ব্ব হইতে এই জমিদার-বংশ জনসাধারণের হিতকল্পে নানা-প্রকার আন্দোলনে যোগদান করিয়া দেশের উন্নতিসাধন করিয়া আসিতেছেন। ইংরেজী ১৮৭৬ সনে রোড্‌সেস্ কমিটির সময় হইতেই এই বংশের নায়কগণ স্বায়ত্তশাসন-আন্দোলনে যোগদান করিয়া বরাবর পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট্

সাধারণ গ্রাম্য পথ

বর্ষাকালে প্রতিবৎসরই এঅঞ্চলে জলপ্লাবন হয়। সেই সময় স্থল-পথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের দ্বারা সড়কের খালের উপর একটি উত্তম পাকা সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ষ্টীমার-ঘাট ও অন্যান্য স্থানে

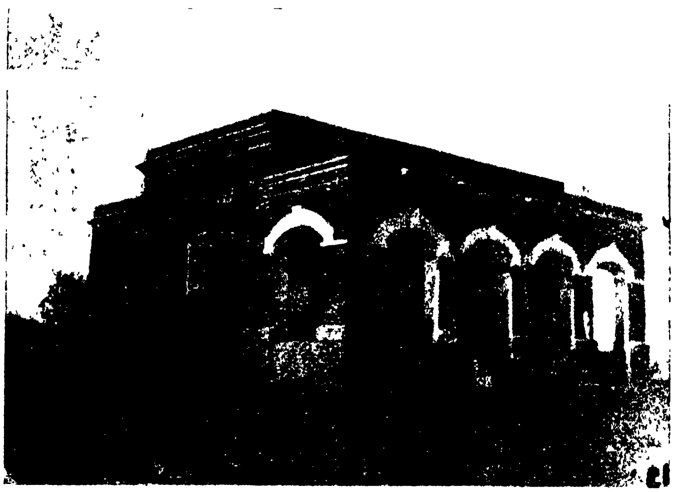
যাতায়াতের জন্য চারখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া খাটে ও পাল্‌কী প্রভৃতি পাওয়া যায়।

পোষ্টাফিস্

বহু পূর্ব্ব হইতেই গ্রামে পোষ্ট-অফিস্ ছিল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে চারিটি ব্রাঞ্চ্ অফিস্ সহ সেটি সব্-অফিসে পরিণত হয়। টেলি-গ্রাফ্ অফিস্ স্থাপনজন্য জমিদারগণ সাধারণের পক্ষ হইতে গ্যারাণ্টি-বণ্ড্ প্রদান করিয়াছেন। সত্বর অফিস্ খোলার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

স্থল ডাক-বাংলা

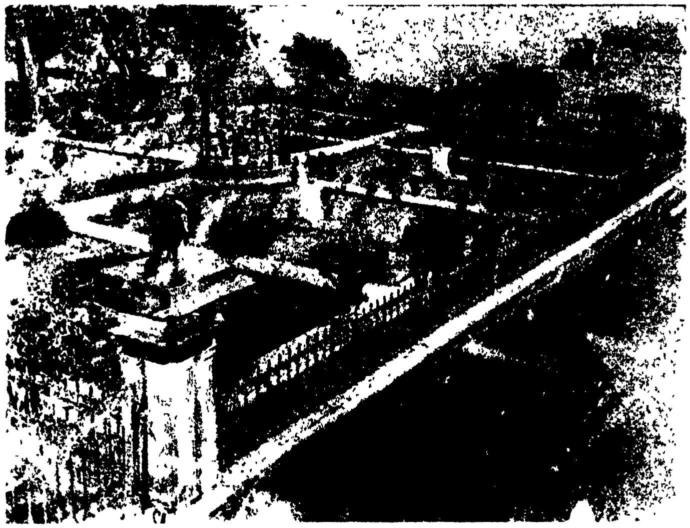
জেলার এই অঞ্চলের রাজকীয় পরিদর্শন উপলক্ষে রাজকর্ম্মচারীদিগের থাকিবার জন্য ইংরেজী ১৯১৫ সনে পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড সদর রাস্তার ধারে একটি বৃহৎ পাকা ডাকবাংলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।



স্থল ডাক বাংলা

স্থল রেজিষ্ট্রেশন্ অফিস্

এই ডাক-বাংলার নিকটেই স্থল সব্-রেজেষ্ট্রী অফিস্ ও থানা অবস্থিত। রেজেষ্ট্রী অফিস্‌টি ১৯০৭ সনে স্থাপিত হইয়া ক্রমশই উন্নতি লাভ করিতেছে।



শারদাবাস

শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান

ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রামের শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে বহু পূর্ব্ব হইতেই স্থানীয় জমিদারগণ যত্ন লইয়া আসিতেছেন। পার্শী ও সংস্কৃত শিক্ষার আমলে গ্রামে একটি পার্শী মোক্তব ও দুইটি বৃহৎ টোল ছিল।

দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তনের প্রারম্ভেই ইংরেজী ১৮৬১ সনে ৺ শ্রীমন্ত পাকড়াশী মহাশয় বোয়ালিয়া (রাজসাহী) হইতে সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পরেই ইংরেজী ১৮৬৪ সনে গ্রামে স্থল-পাকড়াশী ইন্‌স্‌টিটিউশন্ নামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরেজী ১৮৯৪ সনে এই বিদ্যালয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। জমিদারগণ এই বিদ্যালয়ের স্থান, গৃহ, আস্‌বাব ইত্যাদি প্রদান করিয়া এবং দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের পরিচালন-ভার কমিটির হস্তে ন্যস্ত আছে। ছাত্রদিগের অনুশীলন-সমিতি ও খেলার সুব্যবস্থা আছে।

ছেন। সমবায় পদ্ধতিতে মহিলাদিগের মধ্যে কুটীরশিল্প প্রচলনের ব্যবস্থা হইতেছে।



স্থল পাকড়াশী ইনস্টিটিউশন্

শোভারাম বিদ্যাপীঠ

ইং ১৯১৮ সনে জমিদারগণ পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিতে স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী নামে একটি টোল স্থাপন করিয়া সুন্দর গৃহ ও সুশিক্ষিত অধ্যাপক সহ নির্দ্দিষ্ট ব্যয়-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে বর্ত্তমানে ২০।২২টি ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। পরিচালন-সমিতি এই বিদ্যা-লয়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া একটি আধুনিক বিদ্যাপীঠ গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিয়াছেন।

অন্যান্য নানা বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গ্রামে দুইটি

ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এই বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজসাহী বিভাগে এবং পাবনা জেলায় ম্যাট্রিকুলেশন ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই বিদ্যালয়ের যে ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তাঁহাকে "দুর্গা-নাথ পাকড়াশী বৃত্তি" দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ প্রস্তুত হইতেছেন।



ব্রজেন্দ্রলাল বালিকা-বিদ্যালয়

স্ত্রী-শিক্ষা এবং গৃহশিল্প

ইংরেজী ১৯১২ সনে স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রলাল পাকড়াশী মহাশয়ের স্মৃতিতে গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়টি জেলা বোর্ডের সাহায্য পাইয়া স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার করিয়া আসিতেছে। ইহা ছাড়া নিজ নিজ গৃহে অনুশীলন দ্বারা গ্রামস্থ অনেক ভদ্রমহিলা হোমিও-প্যাথিক গৃহচিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা, সুতাকাটা, সেলাইয়ের কাজ, কার্পেটের কাজ প্রভৃতি গৃহশিল্পে পারদর্শী হইয়া-

প্রাইমারী স্কুল আছে। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করি-বারও চেষ্টা হইতেছে।

ইংরেজী ১৯০২ সনে ইয়ংম্যান্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গ্রামে গঠিত হইয়াছিল। গ্রন্থশালা সহ খেলার ব্যবস্থা ও গ্রামের হিতানুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিয়া এই সমিতি উত্তম কার্য্য দেখাইয়াছে। লাই-

ব্রেরী ও পাঠাগার সহ "স্থল বাণীমন্দির" নামে একটি ক্লাব রেজেষ্ট্রী করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে।

স্থল-সমাজ পত্রিকা

গত ৮ বৎসর যাবৎ কলেজের ছাত্রগণ গ্রীষ্ম ও পূজা-অবকাশে "স্থল-সমাজ" নামে একখানি সচিত্র ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন।

শারদীয় সম্মিলন

প্রতিবৎসর পূজার সময় গ্রামবাসীদিগের একটি শারদীয় সম্মিলন হয়। তদুপলক্ষে যুবকগণ আবৃত্তি, স্তোত্র পাঠ, গানবাজনা ও কৌতুকাভিনয় করে।



স্থল শোভারাম চতুষ্পাঠী

নাট্য-সমাজ

বাঙ্গলা ১২৮৫ সনে "স্থল আদি আর্য্য রঙ্গভূমি" নামে একটি নাট্য-সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। তদবধি এই রঙ্গমঞ্চে রাজা ও রাণী, প্রতাপাদিত্য, জনা, সাজাহান, পাণ্ডব-গৌরব, বলিদান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাটক সুচারুরূপে অভিনীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রতিবৎসরই গ্রীষ্ম ও পূজা-অবকাশে অভিনয় করা হয়।

গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা-বিদ্যায় গ্রামে অনেকেই বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

সভা সমিতি প্রভৃতির অধিবেশন জন্য কোনও পাব্লিক হল নাই বটে, কিন্তু জমিদার-বাটীতে চারটি বৃহৎ নাটমন্দির আছে। তাঁহারাই অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাসমিতির অধিবেশন, বক্তৃতা ও নাট্যাভিনয়, প্রভৃতি উপলক্ষে স্থান-দান ও অন্যান্য সাহায্য করিয়া থাকেন। ভবিষ্যতে বাণী-মন্দিরে সভা-সমিতি ও বক্তৃতার স্থান রাখার ব্যবস্থা হইবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণ

সাধারণ স্বাস্থ্য



ভরা বর্ষায় 'বড়কুমের' দৃশ্য

গ্রামে স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল থাকে। ঋতু-বিশেষে জ্বর ও সংক্রামক রোগের সাময়িক আক্রমণ দেখা যায় মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গ্রামে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব হয় না। সর্ব্বসমেত গ্রামে পাঁচটি পুকুর আছে, তন্মধ্যে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত "বড় কুম" একটি বৃহৎ দীঘি। সাধারণে এই স্থানের জলই সদাসর্ব্বদা ব্যবহার করে। গ্রামটি বঙ্গের নিম্নভূমিতে অবস্থিত। কাজেই প্রতিবৎসর বর্ষার প্লাবনে ধৌত হইয়া যায়। সে-সময়ে পুকুরগুলিও জলমগ্ন হইয়া পড়ে। এই সময়ে বড়কুমের যে মনোরম দৃশ্য হয় তাহার চিত্র দেওয়া হইল।

জলাশয় ও চিকিৎসালয়

গ্রামের পূর্ব্বপাড়ায় ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের একটি বৃহৎ ইঁদারা আছে।

ইংরেজী ১৯২০ সনে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গ্রামে জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ৺ বিনোদলাল পাকড়াশী মহাশয়ের পুত্রগণ চিকিৎসালয়ের স্থান ও পিতার স্মৃতিতে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। চিকিৎসালয়ে আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত সুযোগ্য ডাক্তার আছেন। ইহা ছাড়া গ্রামে দুইজন কবিরাজ দুইজন য়্যালোপ্যাথিক ও তিনজন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক আছেন।

অর্থোন্নতি

গ্রামে থাকিয়া অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করিবার জন্য নানা-প্রকার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে ও হইতেছে। গ্রামে ৫টি জমিদারী কাছারী ও একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। তাহাতে অনেক কর্ম্মচারী ও শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তা ছাড়া ইং ১৯০৭ সন হইতে একটি সব্-রেজেষ্টারী অফিস্ স্থাপিত হওয়ায় বহুসংখ্যক কেরানী ও প্রায় ৩০টি লোক দলিল লেখার কার্য্যে নিযুক্ত আছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে চার বৎসর যাবৎ গ্রামে স্থল ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক্টি ৪ বৎসর কার্য্য করিয়া দুই বৎসর যাবৎ শতকরা ১৫৲ হারে ডিভিডেণ্ড্ দিতেছে। ব্যাঙ্কে তীর্থবাসীদিগের স্থায়ী আমানতের উপর অধিক সুদ দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ডিরেক্টর বোর্ডে সুদক্ষ সজ্জন ব্যক্তি থাকায় ব্যাঙ্কের সুনাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমানত বৃদ্ধি পাইতেছে।

বয়ন বিদ্যালয়

পাবনা জেলায় বহু তাঁতীর বাস, বিশেষতঃ সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রায় ৫০ হাজার বস্ত্রশিল্পীর বাস। মিহী ধুতি, শাড়ী ও মস্‌লিন থানের উপর মুগা ও জরির কাজ করিয়া এই-সকল তাঁতী উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য দেখাইয়াছে। মধ্যযুগে কিছুদিন তাঁতীগণ বয়নশিল্প ত্যাগ করিয়াছিল। তৎপরে শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় জেলা-বোর্ডের মেম্বর থাকিবার সময় তাঁহার যত্নে ইং ১৯২০ সনে স্থলগ্রামে একটি ভ্রমণশীল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বহুসংখ্যক তন্তুবায় উন্নত প্রণালীর বয়নবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইয়াছে। তাহার পর হইতেই তাঁতীদের অদম্য উৎসাহ দেখা দিয়াছে। তাহারা সকল অসুবিধা দূর করিয়া উন্নত প্রণালীর ব্যবসাপদ্ধতি দ্বারা পল্লীর অর্থোন্নতি সাধনের ও বেকার সমস্যা মোচনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, এম্-এ,বি-এল্, মহোদয়ের নেতৃত্বে স্থল উইভিং এণ্ড্ স্পিনিং কোম্পানী নামে একলক্ষ টাকা মূলধনের একটি লিমিটেড্ কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। এই কোম্পানীর কারখানায় একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় ও বিদেশাগত অনেক যুবক বয়নশিল্প দ্বারা বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শিবেশ-বাবুর স্বকীয় তত্ত্বাবধানে কোম্পানীটি উন্নতি লাভ করিতেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানী সর্ব্বভারতীয় প্রদর্শনী উপলক্ষে কলিকাতায় অতি সস্তাদরে সুন্দর বস্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া একটি সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছে। সিরাজগঞ্জ স্বদেশী ইন্ডাষ্ট্রিয়াল্ একজিবিসনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আর-একটি পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। কোম্পানীটি অল্পদিনের মধ্যেই উন্নতিশীল হওয়ায় সাধারণে সাগ্রহে অংশ ক্রয় করিতেছে। কোম্পানীটির এইরূপ উন্নতি দেখিয়া ২৫ লক্ষ টাকা মূলধনে সিরাজগঞ্জে একটি কটন মিল্‌স্ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিতেছে। সম্ভবতঃ সত্বরই উহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইবে।

গ্রামে ৩।৪টি মুদীখানা আছে বটে, কিন্তু সস্তাদরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া মিউনি-সিপালিটীর নিয়মে হাটবাজার পরিচালন, আলো-প্রদান ও অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে "স্থল ষ্টোর্স্" নামে একটি লিমিটেড্ কোম্পানী খোলা হইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ মহকুমায় বহু তাঁতীর বাস এবং সূতা বিক্রয়ের বৃহৎ দুইটি হাট আছে, কিন্তু পাকা রংএর কোন কারখানা এঅঞ্চলে নাই। সেজন্য নানারূপ অসুবিধা বোধ হইত। শ্রীযুক্ত তারেশচন্দ্র পাকড়শী মহাশয়

"কেশোরাম মিল্‌স্‌" হইতে রং করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং স্থল সায়েণ্টিফিক্ ডাই ওয়ার্ক্‌স্ নামে একটি কারখানা খুলিয়াছেন। যন্ত্র ও উপকরণ কতক কতক আসিয়াছে।

স্বর্গীয় ডাক্তার ক্ষীরোদলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল পূর্ব্বে "স্থলবসন্তপুর মেডিক্যাল হল্" নামে একটি ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। উহা সুপরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

জমিদারী ব্যবসা নানা কারণে শত অসুবিধায় ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেগুলি দূর করিয়া যৌথ উদ্যমে সরঞ্জামী কমাইয়া ও অন্যব্যবসা যোগ করতঃ ইহাকে উন্নত করিতে বাংলা দেশে প্রায় ২৫।৩০টি জমিদারী কোম্পানী গঠিত হইয়া সবেগে চলিতেছে। স্থলগ্রামেও শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় জমিদারী ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট্ ট্রাষ্ট্ লিঃ নামে ঐরূপ আদর্শে একটি কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। স্থানীয় কোম্পানীগুলি সাধু ব্যক্তি দ্বারা সুপরিচালিত। ইহার অনেকগুলির মধ্যে ৫ হাজার হইতে লক্ষ টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে মনে হয়। ইহা ছাড়া এখানে শস্য-বাঁধাই-ও চালানী, পাটের কাজ, সুতার ব্যবসা, কৃষি, জমিদারী, তালুকদারী, কোম্পানী পরিচালন, কুটীরশিল্প, দেশলাই সাবান, বোতাম তৈরি, প্রভৃতি নানা কার্য্যের সুযোগ আছে। নিকটে ৫।৬ মাইলের মধ্যে ৮।১০টা হাট আছে। আধুনিক রুচির যৌথ কাজ ও সমবায়-প্রথায় আস্থাবান্ কোন ব্যক্তি পল্লীতে অল্প সরঞ্জামী-ব্যয়ে ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক থাকিলে এই কোম্পানীর সহায়তা লাভ করিতে পারিবেন।

গ্রামের চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার মহাশয় চিত্রশিল্পের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। আমাদের প্রকাশিত সমস্তগুলি আলোক-চিত্রই শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এতদ্ভিন্ন গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে বাজার আছে। বাজারে মনোহারী জিনিষ, জামা কাপড়, জুতা, ছাতা, ঘড়ি, সাই-কেল মেরামত, মহাজন ও দর্জ্জি প্রভৃতির দোকান আছে।



স্থল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ ব্যাঙ্কের ও জমিদারী ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট্ ট্রাষ্টের অফিস-গৃহ

গ্রামে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের কারখানা, কুটীরশিল্প, ডেইরীফার্ম্মিং, জোতদারী ও সমবায় কৃষিসমিতি প্রভৃতি গঠন করিয়া পল্লীর অর্থোন্নতিকল্পে গ্রামস্থ শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণ চেষ্টা করিতেছেন।

গ্রামে এই-সমস্ত যৌথ ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ছাপার কার্য্যাদি ভিন্ন স্থান হইতে করিতে হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এখানেই একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। শিল্পী শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে একটি ছাপাখানা খুলিবার চেষ্টা হইতেছে।

আজকাল অনেক ধনবান্ সজ্জন পল্লীপ্রেমিক ভদ্র-বংশীয় ব্যক্তি সুসঙ্গযুক্ত পল্লী খোঁজ করিয়া অল্পই পাইয়া থাকেন। স্থল গ্রামের মধ্যে ও পার্শ্ববর্ত্তী ২।৩ মাইলের মধ্যে মাঠযুক্ত চমৎকার স্থান আছে। কোন ধনবান্ ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিজে বসবাসের সুবিধা করিয়া লইতে পারেন।

নৈতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান

স্থলে পাকড়াশী জমিদারগণ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের

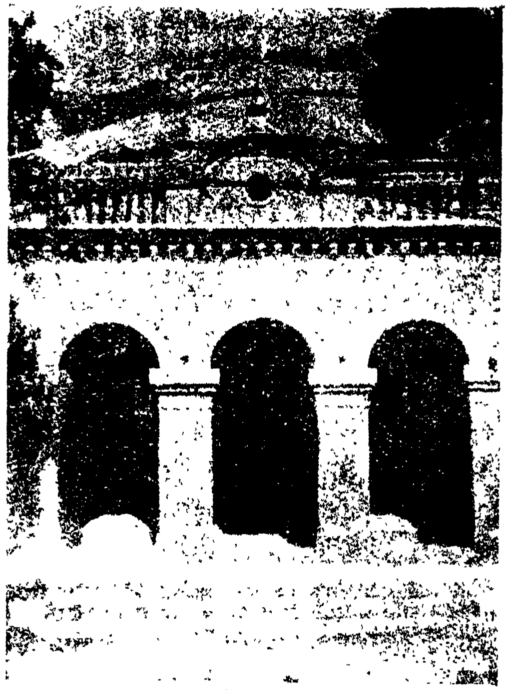
বংশধর। তাঁহারা বহু সদাচারী উচ্চবংশীয় কুলীন ও অন্যান্য ভদ্রসন্তানগণকে আশ্রয় দিয়া নিজগ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের সদনুষ্ঠান, আতিথ্য ও সামাজিক সৌজন্যের প্রভূত সুখ্যাতি রহিয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ দেব

প্রাচীনকাল হইতেই গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মনোহর দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিবৎসর দোলপূর্ণিমার সময় এই বিগ্রহের প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ মেলা হয়। পাবনা জেলার প্রধান মেলার মধ্যে ইহা অন্যতম। ইহাতে প্রায় ৬।৭ হাজার লোকের সমাগম হয়।

গৌরাঙ্গ-মন্দির

কথিত আছে যে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর পার্শ্বদ ৬৪ মোহান্তগণের অন্যতম শ্রী কবিচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ তদীয় শ্রীপাটে এই দুই দারুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে তাঁহার বংশধরগণ দুর্দ্দান্ত মুসলমানগণের অত্যাচার হইতে ঐ বিগ্রহ রক্ষা



শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ পাকড়াশী জমিদার মহাশয়ের বদান্যতায় নির্ম্মিত

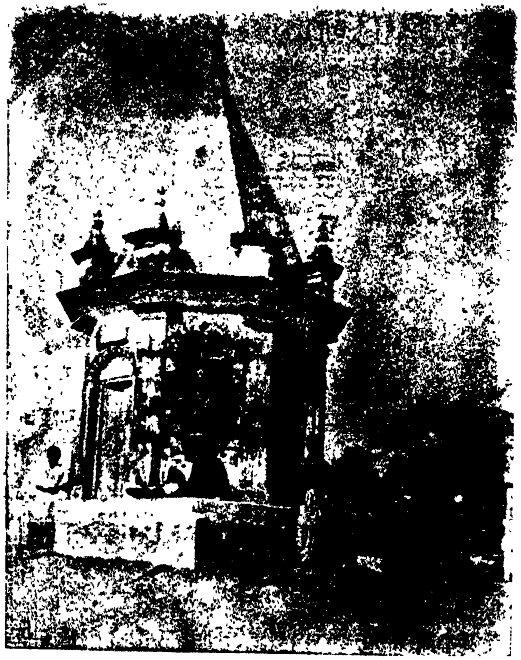


শ্রীশ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ

করিবার জন্য নৌকাপথে পলায়ন করিয়া রাজসাহী জেলার নানাস্থান ভ্রমণকরতঃ বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত তপসীবাড়ী গ্রামে কিছুকাল বাস করেন। অতঃপর নাটোর রাজদরবার হইতে বর্ত্তমান স্থলগ্রামে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি লাভ করিয়া এই গ্রামে আসিয়া বিগ্রহ সহ স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। সেও প্রায় ২৫০ শত বৎসরের কথা। গৌরাঙ্গদোলের মেলাও ঐ সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত সারদা-প্রসাদ পাকড়াশী জমিদার মহাশয় এই বিগ্রহের জন্য একটি বৃহৎ পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় গঠিত এই মূর্ত্তি প্রধান বৈষ্ণব মাত্রেই দেখিতে আসেন। এজন্য এস্থান একটি বৈষ্ণব-তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ দেবের মূর্ত্তি

জমিদারগণ দুইটি প্রস্তরময়ী কালীমূর্ত্তি এবং শিবস্থাপন করিয়া প্রাঙ্গণস্থ মনোরম মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির



শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর মন্দির



শ্রীশ্রীশ্রী দয়াময়ী কালীমন্দির

দ্বারা নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেব বিগ্রহের সেবার পালা অনুসারে অতিথি-সেবার ব্যবস্থা আছে। দয়ামযী ও জয়কালী প্রতিমা এবং গৌরাঙ্গ ও গোবিন্দদেব বিগ্রহের মূর্ত্তির ন্যায় সুশ্রী ও চিত্তাকর্ষক মূর্ত্তি অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

বারোয়ারী পূজা

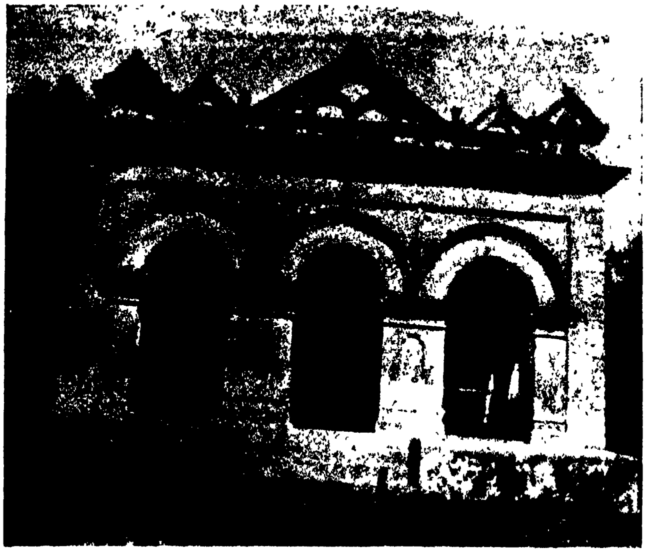
গ্রামে আরও ৮খানি নিত্যসেবার (শিব, নারায়ণ প্রভৃতির) ব্যবস্থা আছে। এতদ্ভিন্ন ৩ খানি বারোয়ারী পূজার আসন আছে এবং পর্য্যায়ক্রমে বারোয়ারী পূজা হইয়া থাকে। গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে স্থানীয় মুসলমানদের উপাসনার জন্য একটি জুম্মা-মস্‌জিদ্‌গৃহ স্থাপিত আছে।

হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা ও হরিবাসর

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের উদ্যোগে ৭বৎসর হইল "স্থল হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা" নামে একটি হরিসভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা কলিকাতার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর "পাবনা শাখা"রূপে গৃহীত। প্রতি শনিবারে সভার অধিবেশনে নিয়মিত ভাগবত পাঠ,



শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ



শ্রীশ্রীজয়কালী মন্দির

কথকতা ও কীর্ত্তনাদি হয়। বৈশাখী সংক্রান্তিতে বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তন, রসকীর্ত্তনাদি ও মহোৎসব হয়। বিভিন্ন স্থানের কীর্ত্তন সম্প্রদায় ও হরিসভা এই উৎসবে যোগদান করে। স্থানীয় একদল মুসলমান সম্প্রদায় তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া হরিসভার সহিত একতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে।

অল্পদিন হইল গ্রামস্থ যুবকগণ শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা সমিতি নামে স্থানীয় নানাবিধ হিতসাধনের জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। রুগ্নের সেবা আর্ত্তত্রাণ বিপন্নের সাহায্য প্রভৃতি সদনুষ্ঠান করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ প্রভৃতি অনেক কার্য্য এই সমিতি গ্রহণ করিয়াছে।

গ্রামস্থ অধিবাসীগণ অধিকাংশই একবংশ-সম্ভূত ও আত্মীয়তা-বন্ধনে আবদ্ধ। গ্রামবাসীগণের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকিলেও দোল-দুর্গোৎসব, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য-উপলক্ষে পরস্পরের সহায়তা ও সহানুভূতি পাওয়া যায়। পরস্পরের এই নির্ভরশীলতাই "স্থল"গ্রামের একটি বিশেষ গৌরবের বিষয়।

গ্রামে টেনিস্ ক্লাব আছে। নিয়মিত খেলা হয়। ফুটবল ক্রীকেট প্রভৃতি খেলার ব্যবস্থা আছে। কাপ, শিল্ড্ প্রভৃতি প্রতি-যোগিতা-মূলক খেলাও হয়।

শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির সময় মহা-সমারোহে পদ্মা পূজার নৌকা-বাইচ হয়। তদুপলক্ষে প্রায় পাঁচশত নৌকার সমাগম হইয়া থাকে। ইহাদের দুইটি পুরস্কার দেওয়া হয়। ফাল্গুন মাসে গৌরাঙ্গ-দোলের মেলার সময় ঘোড়-দৌড় হয়।

যে-সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হইল সেগুলির উন্নতিকল্পে ক্রমে ক্রমে চেষ্টা করা হইতেছে এবং নূতন প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলার জন্য যুবকবৃন্দ যত্নবান্ আছেন।

উপসংহারে আমাদের নিবেদন এই যে আমাদের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান অপেক্ষাও গ্রামের হিতসাধন-কল্পে সুনিয়ন্ত্রিত কোন অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা দেশে অবশ্যই আছে। পাঠক-পাঠিকাগণ এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইয়া তাঁহাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানের আদর্শের আদান-প্রদানের সুযোগ দিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

"নারী-সমস্যা"

হঠাৎ যদি এই দেশের কোনো বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে জগতের কোন্ কোন্ প্রকারের জ্ঞানলাভের, কোন্ কোন্ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের, কোন্ কোন্ রাজপথ উদ্যান ও দেশ ভ্রমণের এবং নিজ জীবনের কোন্ কোন্ কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের থাকা উচিত, তাহা হইলে সম্ভবত তিনি বলিবেন, জগতের সকল-রকম জ্ঞানলাভের, সকল নির্ম্মল আনন্দ উপভোগের, সর্ব্বদেশ ভ্রমণের ও, প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, নিজ জীবনের সকল কাজে স্বমত প্রতিষ্ঠার অধিকার মানুষের থাকা উচিত। এই অধিকার আমাদের নাই বলিয়া, শুনিতে পাই, অনেকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্বদেশ উদ্ধারে লাগিয়া গিয়াছেন। সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকেই যদি 'মানুষ' শব্দের সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উত্তরে আমরা যে কথা শুনিব, তাহাতে নারীকে মানুষ মনে না করিবার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ন্যায়শাস্ত্রে এইপ্রকার লোকদের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর বিবাহ ও বৈধব্যের কথা উঠিলেই ইহাঁদের অধিকাংশের বুদ্ধিভ্রংশ হইতে দেখা যায়। কাজেই 'নরসমস্যা' বলিয়া যদিও কোনো কথার সৃষ্টি হয় নাই, তবু 'নারীসমস্যা'র কথা শুনিতে শুনিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়।

উচ্চাঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার যে প্রয়োজন আছে, স্বাধীনতা যে সকল মানবের অর্থাৎ নারীরও জন্মলব্ধ সম্পত্তি, এবং বাল্যবিবাহের, বিশেষতঃ বাল্যমাতৃত্বের, ফলে যে নারীর দেহ মন ও ভবিষ্যৎ বংশের বহু ক্ষতি হয়, এসকল কথা এদেশেও আর নূতন নয়। যাঁহার মস্তিষ্কে কিছু সার পদার্থ আছে, হৃদয়ে স্নেহ প্রেম আছে এবং নিজহিত ও পরহিতের দিকে দৃষ্টি আছে, তিনিই এ-সকল কথার সত্যতা মনে মনে স্বীকার করেন। কিন্তু মনে মনে যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশ, কেহ বা দেশাচারের ভয়ে, কেহ বা শারীরিক ও মানসিক জড়তা ও আলস্যের বশে, কেহ বা আজন্ম গতানুগতিক হওয়ার ফলে, কেহবা স্বার্থের দায়ে, কেহবা "সনাতনপন্থী"* বলিয়া পূজা পাইবার লোভে, কেহ বা দেশের ভালমন্দ সমস্তই দেশভক্তির আতিশয্যে শিরোধার্য্য করিবার উৎসাহে, মুখে এবং কার্য্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। উপরন্তু বহু অর্দ্ধশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত নর-নারী, দেশের কি ক্ষতি করিতেছেন তাহা না বুঝিয়া, নিজেদের অজ্ঞানকে জ্ঞান মনে করিয়া, কাগজে কলমে যুক্তিহীন আবল-তাবল লিখিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতির পথে নব নব বাধা সৃষ্টি করিয়া নারীসমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের লেখনীপ্রসূত এই-সব অপূর্ব্ব সন্দর্ভে দূরদৃষ্টি কোথাও নাই, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চিহ্নও দেখা যায় না, পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য অনেক স্থলে পাওয়া যায় না, এবং প্রামাণ্য দৃষ্টান্তের একান্তই অভাব। বাজে গল্প ও উড়ো খবরের উপর বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ পারিবারিক জীবনের কয়েকটি দৃষ্টান্তকে সম্বল করিয়া এবং 'বটতলা'র গল্পের উচ্চশিক্ষিতার নমুনাকে সত্য মনে করিয়া বৈঠকী গল্প করা চলে, কিন্তু দেশব্যাপী বড় বড় সমস্যার সমাধান যে করা যায় না, তাহা ইহাঁরা ভুলিয়া যান। এই-সব প্রবন্ধের ফলে, আমাদের দেশের মাসিক-পত্রের পাঠকপাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা অর্দ্ধশিক্ষিত, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ভ্রান্ত মত ও মিথ্যা সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেশের অল্পশিক্ষিত পাঠকদের অধিকাংশেরই ধারণা ছাপার অক্ষরে যে কথা লেখা থাকে, তাহা প্রায় বেদবাক্যের কাছাকাছি সত্য; তদুপরি যদি দুই চারিটা দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বচন এবং গোটা কয়েক খ্যাতনামা লোকের নাম জোড়া থাকে, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

কিছুদিন হইল কয়েকটি মাসিক-পত্রে প্রায় প্রতি-

* সনাতন পন্থা সম্বন্ধে লোকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদ ও উপনিষদ্ প্রধানতম; স্মৃতি ও পুরাণ তাহার পরবর্ত্তী। সুতরাং যাঁহারা ঔপনিষদিক ধর্ম্ম না জানিয়া বা না মানিয়া পৌরাণিক ধর্ম্ম মানেন ও স্মৃতির অনুসরণ করেন, তাঁহারা "সনাতনপন্থী" নাম পাইতে পারেন না।

মাসেই এইরূপ যুক্তিতর্কহীন ভ্রান্তিপ্রমাদপূর্ণ প্রবন্ধাদি দেখা যাইতেছে।' লেখকলেখিকার রচনা দেখিলে বোধ হয়, আমাদের দেশে বুঝি বা অন্তত দুচার লাখ মেয়েই হাতা-বেড়ি ফেলিয়া শাম্‌লা মাথায় দিয়া উকিল ব্যারিষ্টার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বসিয়াছেন, কম করিয়া ১০।১৫ হাজার অন্তঃপুরিকা হয়ত বুট্‌ ও বনেট্‌ পরিয়া রাজপথে দিবারাত্রি টহল দিয়া বেড়াইতেছেন, দেশব্যাপী স্কুলে কলেজে মেয়ে আর ধরে না, আফিসে আদালতে মহিলা কর্ম্মচারীর ভিড়ে হাঁটা-চলা দুষ্কর এবং ঘরে ঘরে মাতৃস্নেহবঞ্চিত শিশুপাল দিবারাত্রি মুখব্যাদান করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। তাই সদয়হৃদয় লেখক-লেখিকারা দেশের এই ঘোর দুর্গতি নিবারণ করিবার জন্য দুই হাতে কলম লইয়া সব্যসাচী হইয়া সমরে নামিয়াছেন। কিন্তু হায় রে বিড়ম্বনা! এই শিশুমাতৃক নিরক্ষর দেশের মুষ্টিমেয় বালিকার "বোধোদয়" ও "ষ্টেপ বাই ষ্টেপ্‌"এর বিরুদ্ধে এ বিরাট্‌ অভিযান কেন?

স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতা যৌবনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যা লইয়া এই-সকল লেখক-লেখিকার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছে। সকলগুলির সপক্ষের যুক্তি দেখানো এবং বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা একসঙ্গে সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা স্ত্রীশিক্ষাকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিয়া ক্রমশ অন্যান্য বিষয়ে কিছু বলিব।

সভ্য জগতে মানুষ জন্মাবধি নানা শিক্ষার ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠে; একেবারে শিক্ষাবিহীন হইয়া আধুনিক জগতে কোনো মানুষেরই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। শিক্ষা, সু হউক, কু হউক, অল্প হউক, বিস্তর হউক, মানুষের জীবনের একটি অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীলোকও যখন মানুষ, তখন সংসারে টিঁকিয়া থাকিবার জন্যই তাঁহারও যে কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, ইহা অতিবড় "সনাতনপন্থী"ও স্বীকার করিবেন। তর্ক হইতেছে শিক্ষার মাত্রা ও প্রকার লইয়া। একের মতে যাহা অল্প শিক্ষা, অন্যের মতে তাহাই অতিরিক্ত; একের কাছে যাহা সু, অন্যের কাছে তাহাই কু। তবে প্রমাণটা যুক্তির সাহায্যে না দিয়া বাক্যজাল বিস্তার দ্বারা দিলে মানুষে মানিয়া লইতে আপত্তি করিতে পারে।

শিশুকে হাত ধরিয়া চলিতে শিখানো, আবৃত্তি করাইয়া কথা বলিতে শিখানো, গুরুজনের দেখাদেখি আচার ব্যবহার, ভালমন্দ বিচার শিখানো, সব-কিছুই শিক্ষা। যে-কোনো উপায় অবলম্বন করিয়া মানুষের মনোলোকের সুপ্ত সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে (কুশিক্ষা হইলে অসৎ প্রবৃত্তিসমূহকেও) জাগাইয়া তোলা হয়, অস্ফুট গুণসকল বিকশিত করিয়া তোলা হয়, নব নব চিন্তার ধারা মনে আনিয়া দেওয়া হয়, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি করা হয়, বোধ ও বিচার-শক্তি শাণিত ও মার্জ্জিত করা হয়, সুরুচি গড়িয়া তোলা হয় এবং ব্যবহারিক জীবনে মানুষকে সংযত শোভন ও আত্মনির্ভরশীল হইতে সক্ষম করা হয়, তাহাই শিক্ষা। কিন্তু এ জগতে শিক্ষার বিষয় এত অসংখ্য ও বিচিত্র যে প্রত্যেক মানুষকে মুখে মুখে মোটামুটি সকল শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রপ্রতি দশ বিশ হাজার গুরুর প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া, দেশবিদেশ হইতে সেই-সকল গুরু সংগ্রহ করিতে মানুষের প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। এবং যে-সকল গুরু পার্থিব জগৎ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শিক্ষার স্বাদ হইতে মানুষকে আজীবন বঞ্চিত থাকিতে হয়। অতীতের জ্ঞানসম্ভারকে সভ্য মানুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানের মানুষ ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া বংশধরদের দান করিয়া যাইতেছে। মানুষ যদি গুরুরূপে অতীতকে এক দিনের জন্যও অস্বীকার করিত, তবে জগদ্‌ব্যাপী এই সভ্যতা এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। এই সভ্যতার ধারা বজায় রাখিবার জন্য ও শিক্ষাকে সহজ করিবার জন্য অক্ষর পরিচয় ও পুস্তক পঠন ও লিখন এবং ক্রমশঃ আরো নানা নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়কে বর্ত্তমান জগৎ শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং বর্ত্তমানে যদিও পুস্তকপাঠ ও শিক্ষা শব্দ-দুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবু প্রচ্ছন্নরূপে এই কথাটা মানুষের মনে সর্ব্বদাই থাকে, যে, লিখন ও পঠন ব্যাপারটা প্রকৃত শিক্ষার সোপান মাত্র। মানুষ মানুষের নিকটই শিক্ষা পায়, অক্ষর ও পুস্তক কেবল একের নিকট হইতে আর-এক জনের নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দেয় মাত্র। অবশ্য,

প্রকৃতির নিকট হইতেও মানুষ শিক্ষা পায় ; তাহা এখানে ধরিলাম না।

আমাদের দেশের এক দল মানুষ আছেন, আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে কিম্বা যাত্রা কথকতা প্রভৃতি হইতে মৌখিক শিক্ষায় যাঁহাদের আপত্তি নাই, কিন্তু অক্ষরপরিচয়ে বিষম আপত্তি। দুইটার মধ্যে বাস্তবিক ঐকান্তিক আকাশ-পাতাল প্রভেদ যে কি, তাহা তাঁহারা নিজেরাও বোঝেন না, পরকেও বুঝাইতে পারেন না। কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে শিক্ষা হয় তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের বেলাতেই যত গোলমাল। পুস্তক প্রচারের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতে যদি ঘরে ঘরে গ্রামোফোনের রেকর্ড্ বিলি করা হয়, কিম্বা রেডিওর সাহায্যে লোককে ঘরে বসিয়া বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, উপদেশ, ও গান শুনাইবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে "সনাতন-পন্থীরা' কি অন্দরমহলে এইরূপ বন্দোবস্ত হইতে দিবেন? না, এক সনাতন মানুষ ছাড়া, নব আবিষ্কৃত কোনো যন্ত্রের সাহায্য লইতে তাঁহাদের আপত্তি? বায়োস্কোপের সাহায্যে শিক্ষাও ত চোখের সাহায্যে শিক্ষা; কিন্তু অনেক নিরক্ষর মহিলা বায়োস্কোপ দেখিয়া থাকেন।

আধুনিক লেখকলেখিকাদের কাহারও কাহারও ধারণা যে যতদিন পর্য্যন্ত হিন্দুনারীর অক্ষর পরিচয়, বিশেষ করিয়া ইংরেজী অক্ষর পরিচয়, না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রত্যেকে একাধারে সতী, লক্ষ্মী, সীতা, সাবিত্রী, পদ্মিনী, অহল্যাবাঈ, লক্ষ্মীবাঈ হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করেন; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে এবিসিডির সাক্ষাৎ পান, অমনই সকল গুণ গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়া "সখের মেম সাহেব" হইয়া উঠেন। আশ্চর্য্য, যে হিন্দুনারী "কত শত রাবণ দুর্য্যোধনের" প্রলোভন এড়াইয়া কর্ত্তব্য-পথে অবিচলিত হইয়া আছেন, কত ঝঞ্ঝা-ঝড়েও 'প্রাতে অঙ্গনে গোবর-ছড়া' দিতে বিরত হন না, যে হিন্দুনারী পুরুষকে অঞ্চল-চাপা না দিয়া "জাগাইয়া চেতন করিয়া দিতেছেন," যে হিন্দুনারী শত শত "শয়তানের শয়তানী পদ্মিনীর মত পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেছেন," যে হিন্দুনারী 'অবরোধ প্রথা' "বিধবা বিবাহ" প্রভৃতি 'বাজে চিন্তার' দিকে ঘৃণাভরেও মন দেন না, সেই হিন্দুনারীই সামান্য দুইখানা বর্ণ-পরিচয় ও ইংরেজী প্রাইমারের ধাক্কায় সকল কর্ত্তব্য ভুলিয়া কুপথের পঙ্কিলতায় গড়াইয়া পড়িতেছেন!! শুধু তাহাই নহে, মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় যাঁহারা শত শত রাবণদুর্য্যোধন-মর্দ্দিনী, দৈনিক-পত্রের পৃষ্ঠায় দেখা যায় তাঁহাদেরই অনেকে গ্রামে গ্রামে কাপুরুষ ও পাষণ্ডের হাতে অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা; মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠায় যে বঙ্গনারী সেবা-পরিচর্য্যায় পুরুষের 'সকল জ্বালা যন্ত্রণা' জুড়াইয়া দিতেছেন, আদম-সুমারীর রিপোর্টে দেখা যায় তাঁহারাই প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া, কলেরা, ক্ষয়কাশ, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতির নির্ম্মম হাতে স্বামীপুত্রকে তুলিয়া দিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। আদর্শমাতা বঙ্গরমণীর ক্রোড় হইতে প্রতি বৎসর দুইটি নয় দশটি নয়, ৫০।৬০ লক্ষ দুগ্ধপোষ্য শিশু যমালয়ে চলিয়া যাইতেছে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরের নিম্নবয়স্ক ৫৯,৭৬,৫২৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।* মাসিক-পত্রে দেখিতে পাই, 'ভীরু পুরুষ নারীর অঞ্চলের শরণ লইলে, হিন্দুনারী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে জাগাইয়া চেতন করিয়া দিয়াছে।' কিন্তু বাস্তব জগতের খোঁজ লইতে গেলে দেখা যায়, গ্রামে গ্রামে পুরুষ, দারোগা চৌকিদার জমিদার মহাজন, সকলের পদচিহ্ন বুক পাতিয়া লইতেছেন, ঘরে নারী অঞ্চল দিয়া তাহারই ধূলা ঝাড়িতেছেন। সহরে পুরুষ বড়-সাহেবের হুমকি, ছোট-সাহেবের গালাগালি, বড়-বাবুর লাঞ্ছনা, গুণ্ডা এবং গাঁটকাটার ছোরা, পুলিসের রুল, গোরার চাবুক, সকলই মহাবৈষ্ণবের মত মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইতেছেন এবং অধিকাংশ নারী স্বামীর আদর্শে পুত্রকে তৈয়ার করিয়া তুলিবার আশায় সকল-প্রকার পুরুষোচিত ব্যায়াম হইতে তাহাকে সযত্নে সরাইয়া 'জীবন-যুদ্ধের উপযোগী' করিয়া গড়িয়া তুলিতে অভিলাষী! খেলার মাঠে ফিরিঙ্গির হাতে লাঞ্ছিত জাতভাইকে ফেলিয়া সহস্র পুরুষ যখন উর্দ্ধশ্বাসে নারীর অঞ্চলের

* এত অধিক শিশুমৃত্যু অবশ্য কেবল মাতাদের দোষেই হয় না; কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, দেশে যথেষ্ট সুশিক্ষিতা ধাত্রী থাকিলে এবং মাতা এবং তাঁহার সম্পর্কীয়া মহিলারা সূতিকাগার ও শিশুপালন সম্বন্ধে সুশিক্ষিতা হইলে অনেক শিশুর মৃত্যু নিবারিত হইত।

শরণ লইতে দৌড় দেন, তখন কয়জন নারী তাঁহাদের ফিরাইয়া দিয়াছেন জানিতে পারি কি? পথে একটা গুণ্ডার ছোরার ভয়ে রাস্তার দুই ধারের পুরুষ যখন দরজায় হুড়্কা দিয়াছেন, তখন কয়জন নারী দ্বার খুলিয়া স্বামীপুত্রকে বিপন্নের উদ্ধারের কাজে পাঠাইয়াছেন, শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হয়। "হিন্দুনারী কখনও অন্যায় ও ভণ্ডামি সহ্য করিতে পারে নাই।" তাই আহারে-বিহারে, কথায় কাজে, হাঁটিতে চলিতে, পুরুষদের 'নিষ্ঠাবত্তা'র আর অন্ত নাই। কলিকাতার রাস্তার দুই ধারে চায়ের দোকানের বাহুল্য দিন দিনই বাড়িতেছে। সেখানে নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর জঠরে কত যে কুক্কুট-বংশের অবতংস নিত্য যাইতেছে তার ঠিকানা নাই। ট্রামের গাড়ীতে কণ্ডাক্টারের সঙ্গে কোম্পানীকে ঠকাইতে কত সাত্ত্বিক পুরুষ প্রত্যহ জল্পনায় মাতিতেছেন, তাহার হিসাব নাই। ধর্ম্মপ্রাণ কত ধুরন্ধর যে কলিকাতার স্থান-বিশেষে নিশাচরবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাহারই বা কে ঠিকানা রাখে? দেবীনামধেয়া কত হিন্দুনারী যে শাশুড়ী ননদ ও স্বামী প্রভৃতির প্রীতির আতিশয্যে আদালত ও যমালয়ের শরণ লইতেছেন, তাহাও প্রতিদিনের দৈনিক-পত্রের ফাইল ঘাঁটিলেই দেখা যায়। আমাদের ঘরে ঘরে "যে-সব পদ্মিনী শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিতেন" বলিয়া মাসিক-পত্রের লেখিকাদের কাছে শুনি, আজকাল খবরের-কাগজে দেখি তাঁহারা পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবার আশায় কিম্বা স্বামীকে চরিতার্থ করিবার সদুদ্দেশ্যে যখন-তখন কেরোসিন গায়ে ঢালিয়া নিজেরাই পুড়িয়া মরিতেছেন। (১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৩৫৫০টি রমণী বাংলা দেশে আত্মহত্যা করিয়াছে।) "অবরোধ-প্রথাও" নাকি আমাদের মধ্যে নাই," তাহা "পূর্ব্বে মুসলমান নবাব বাদ্শার হারেমে * ছিল।" তবে রেলপথে সঙ্গী পুরুষের মুখ না দেখিয়াই আহ্বান শুনিয়া প্রতারকের পিছনে গাড়ী ছাড়িয়া নামিয়া যায়, এরূপ স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় সত্য ঘটনা কোন্ দেশের? পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসার ভয়ে বা লেডি ডাক্তারের অভাবে ক্ষয়কাশ, সূতিকা ও নানা স্ত্রীরোগে ভুগিয়া অকালে মাতৃহীন অপোগণ্ড শিশুদের ফেলিয়া পরলোকযাত্রা করে কাহারা? বাহিরে আসিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিবার লজ্জায় সন্তান সহ আত্মহত্যা করিয়াছিল কোন্ দেশের মেয়ে? উচ্চ প্রাচীর ও বন্ধ জানালার উৎপাতে বিধাতার বায়ু বিষ হইয়া প্রাণবধ করে কোন্ দেশের মেয়েদের? গাড়ীর অভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বাধা পাই-তেছে কোন্ দেশে? অবরোধ-প্রথা সহরে এবং ভদ্র-লোকদিগের মধ্যেই বেশী। সহরের মৃত্যুর হার তুলনা করিলে দেখিবেন, কলিকাতায় হাজারে যেখানে ২৮·৪ পুরুষের মৃত্যু হয় সেখানে ৪৬·১ স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়। অথচ মোট মৃত্যুর হার বাংলা দেশে পুরুষের হাজারকরা ৩০·৬ এবং স্ত্রীলোকের ২৯·৭। শুনা যায় জীবিত মানুষের চেয়ে ভূতের গতিবিধি বেশী দ্রুত ও ব্যাপক। তাই বোধ হয় নবাবের হারেমের মৃত অবরোধ-প্রথা ভূতযোনি লাভ করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেহ হয়ত বলিবেন, যে, হিন্দুনারীর এই যে-সকল অবনতির দৃষ্টান্ত দৈনিক-কাগজের পৃষ্ঠায় এবং আদম-সুমারীর রিপোর্টে দেখা যায়, তাহা আধুনিক শিক্ষারই ফল; এই শিক্ষা না থাকিলে হিন্দু নারী সতী, সাবিত্রী, পদ্মিনী ও লক্ষ্মীবাঈর মতই ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেন। কিন্তু সেন্সস্ রিপোর্টেই দেখা যায়, যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দেও পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্কা নারী বাংলা দেশে হাজারকরা ২১জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানেন, অর্থাৎ চিঠি লিখিতে ও পড়িতে পারেন। ইঁহারা উচ্চশিক্ষিতা নহেন, "ইব্সেন্ ব্রাউনিং কীট্সের লেখা, Tolstoyএর deal সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেন না," এমন কি "ইংরেজীনবীশ"ও নহেন। বাংলা দেশে পাঁচ বৎসরের উর্দ্ধ-বয়স্কা দশহাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে মাত্র তেইশজন ইংরেজী পড়িতে ও লিখিতে জানেন। সুতরাং প্রতি দশ হাজারে বাকি ৯৯৭৭ জন স্ত্রীলোকের সাবিত্রীর মত যমালয় হইতে স্বামী-পুত্রকে ফিরাইয়া আনিবার, পদ্মিনীর মত শয়তানের শয়তানী পুড়াইয়া ফেলিবার, সীতার মত রাবণ দলন করিবার, জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান গড়িবার এবং

* "অসূর্য্যম্পশ্যারূপা," "অন্তঃপুরিকা," প্রভৃতি কথাগুলি তাহা হইলে আরবী কিম্বা ফারসী!

ভীরু পুরুষকে জাগাইবার ক্ষমতা থাকা উচিত। কিন্তু তাহাই কি আমরা ঘরে ঘরে দেখিতেছি? না, যা-কিছু দেখিতেছি, তাহাই "পূর্ব্বেকার নবাব-বাদ্শার হারেমের স্বপ্ন" ও ভবিষ্যতের ইংরেজী শিক্ষার মায়ার কুহক? "তথাকথিত এম-এ, বি-এ পাশ উচ্চশিক্ষিতা ভগিনী"র সংখ্যা আমাদের দেশের নারীসংখ্যার তুলনায় ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। "বই নাড়া-চাড়া করিয়াই" যাঁহারা নিজেদের উচ্চশিক্ষিতা মনে করেন, তাঁহারা যে "মারাত্মক ভুল" করেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইব্‌সেন ও ব্রাউনিংএর ধুলা ঝাড়িলেও যত বিদ্য হয়, বাল্মীকির রামায়ণের ধূলা ঝাড়িলেও ঠিক্ ততখানিই বিদ্যা হয়। ধুলা ঝাড়া সকল ক্ষেত্রেই ধূলা ঝাড়া। "তথাকথিত উচ্চশিক্ষিতা" ও "প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু-নারীর" ওড়ানো ধূলার বহর দেখিয়া তাঁহাদের কাহারও বিদ্যার বিচার করিলে চলিবে না।

বাংলাদেশে নারীর প্রকৃত অবস্থা যাহা, তাহা আমাদের সকলেরই লজ্জার বিষয়। তাহার বর্ণনায় গৌরবও নাই, আনন্দও নাই। কিন্তু কল্পনার আবরণ দ্বারা তাহা লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা অধিকতর লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

কোনো কোনো "প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু-নারী" নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, রমণীদের কাজ "সন্তানদের গড়িয়া তোলা, জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা পীড়িত আত্মীয়ের পরিচর্য্যা করা, স্বামীর চিত্ত-বিনোদন করা, গৃহস্থালীর কার্য্য দেখা,—তৎসঙ্গে দেশীয় শিল্পের প্রসার, অবসর-মত কাব্য-সাহিত্য চর্চ্চা করা ইত্যাদি।" ধরা যাক্, স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য এই কয়টি মাত্র ও এই কয়টিতেই তাঁহাদের সকল আনন্দ নিহিত,—এক কথায়, গৃহই তাঁহাদের সমস্ত জীবনের একমাত্র কেন্দ্র। এই গৃহধর্ম্ম পালন করিতে হইলে কি কি বিদ্যা জানা উচিত, তাহা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা যাক।

রমণীর প্রথম কর্ত্তব্য সন্তানদের গড়িয়া তোলা ও জীবন-যুদ্ধের উপযোগী করা। এই সন্তান যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন হইতেই তাহার যত্নের আবশ্যক। মাতা কি খাইলে, কেমন অবস্থায় থাকিলে, কতখানি পরিশ্রম করিলে, মানসিক কোন্ কোন্ উত্তেজনার হাতে পড়িলে, কতখানি বিশুদ্ধ বা বদ্ধ বায়ুতে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে, কোন্ বয়সের হইলে এবং কিরূপ চিন্তাদি করিলে গর্ভস্থ সন্তানের কি কি হিত অহিত হয়, প্রত্যেক ভাবী মাতার তাহা জানা উচিত। কিন্তু ঠাকুর-মা ও দিদিমার হাতে শিক্ষিতা কয়জন বঙ্গরমণী তাহা জানেন?

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কোথায় সূতিকা-গৃহ হইবে, কি কি শোধক দ্রব্য লাগিবে, কোন্ যন্ত্র অবশ্য-প্রয়োজন হইবে এবং লোক না পাইলে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পর কেমন করিয়া তাহাকে পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে, তাহাকে কি রকম শীত ও আতপে রাখা উচিত, কেমন করিয়া স্তন্যদান ও স্নানাদি করানো উচিত, মায়ের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, ইহাও জানা দরকার। কয়জন ঠাকুর-মা ও দিদিমা এইসব শিক্ষা দিতে পারেন? চক্ষে ত দেখা যায়, বহু ঠাকুর-মা দিদিমা প্রসূতিকে প্রসবের পূর্ব্বে পোড়া মাটি প্রভৃতি খাওয়াইয়া, অপর্য্যাপ্ত আহার দিয়া, পরে ভিজা মাটিতে ছেঁড়া মাদুরে শোয়াইয়া বাঁশের চাঁচাড়ি দ্বারা সদ্যজাত শিশুর নাড়ী কাটিয়া অশোধিত ছেঁড়া কাপড়ে জড়াইয়া ফেলিয়া ধনুষ্টঙ্কারের কবলে অহরহ মাতাপুত্রকে যমালয়ে পাঠাইতেছেন। পেঁচোয় পাওয়া নাম দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু পেঁচোকে যে ঠাকুর-মা দিদিমারা নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়া সন্তান উৎসর্গ করেন, তাহা তাঁহাদের জানা পর্য্যন্ত নাই। এ-সকল উড়ো কথা নয়, খাঁটি সত্য কথা।

শিশুর যখন বয়স বাড়িতে থাকে, তখন মাতাই তাহার সর্ব্বপ্রধান সঙ্গী। সেই সময় জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে মাতাই তাহাকে বহু কু ও সু শিক্ষা দেন। মাতার নিজের যদি কোনো শিক্ষাই না থাকে, তাহা হইলে সুশিক্ষা দেওয়া কঠিন। শিশুর মনে কৌতূহল অদম্য। এই কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া শিশুর জ্ঞানপিপাসা বাড়াইতে ও তাহার বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করিতে হইলে মাতাকে অসংখ্য ছোট বড় বিষয় জানিতে হয়। কিন্তু "সনাতন" মাতারা কি তাহা জানেন? তাঁহারা যে প্রশ্নের উত্তর

নিজেই জানেন না, তাহা শিশুকে কি বুঝাইবেন ? "ফের্ কথা, থাম্ বল্‌ছি, পাকা ছেলে," অথবা, "জ্বালালে লক্ষ্মী-ছাড়া", প্রভৃতি সুমধুর উত্তরে তাঁহারা শিশুর কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া অজ্ঞাতসারে চিরতরে তাহার জ্ঞানস্পৃহা ঘুচাইবার চেষ্টা করেন। জীবনযুদ্ধের উপযোগী সন্তান গড়িতে হইলে মাতাকে যে দেহমনের কত বর্ম্ম, কত আয়ুধ অনুক্ষণ সন্তানের জন্য জোগাইতে হয়, কেবলমাত্র স্তন্যদায়িনী মাতারা কি তাহার খোঁজ রাখেন ?

রমণীর দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—আত্মীয়-স্বজন, বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও পীড়িতের সেবা যত্ন করা। কিন্তু কোন্ বয়সের মানুষের দিনে কতবার কি খাদ্য খাইতে হয়, কি রোগে কি পথ্য করিতে হয়, নানাবিধ পথ্য রন্ধন কি করিয়া করিতে হয়, নানাবিধ রোগীর শুশ্রূষা কেমন করিয়া করিতে হয়, চিকিৎসক হাতের কাছে না থাকিলে রোগীকে লইয়া কখন্ কি করিতে হয়, জীর্ণ-শীর্ণ মানুষকে কি খাইতে দিতে হয়, অতিরিক্ত চর্ব্বি-বহুল মানুষকেই বা কেমন খাদ্য দিতে হয়, ইহার খবর কয়জন রমণী জানেন ? অন্নপ্রাশনের দিন হইতে সুরু করিয়া শ্মশানযাত্রার দিন পর্য্যন্ত সেই মান্ধাতা-প্রবর্ত্তিত খাদ্যই সুস্থ অসুস্থ সকল বাঙ্গালী খাইয়া চলিয়াছে, তাহাতে তাহাদের দেহের কি ক্ষতি কি বৃদ্ধি হইতেছে গৃহিণীরা কি তাহার খোঁজ রাখেন ? শুধু স্বহস্তে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেই হয় না, প্রিয়জনকে অমৃত জ্ঞানে আবর্জ্জনা বা বিষ দিতেছেন কিনা, সে টুকুও জানা চাই। পীড়িতের সেবা করার পূর্ব্বে আত্মীয়গণ যাহাতে পীড়িত না হন, সেইটা দেখা দর্‌কার। সুতরাং গৃহে সকলে স্বাস্থ্যতত্ত্বের নিয়ম পালন করিতেছে কি না এবং পানীয় আহার্য্য পরিচ্ছদ শয়ন ও নিদ্রার ঠিক্ স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা হইতেছে কি না, দেখিতে হইবে। বঙ্গনারী কি তাহা ঘরে ঘরে দেখিতেছেন ?

তৃতীয় কর্ত্তব্য—স্বামীর চিত্তবিনোদন করা। যাঁহার সুকণ্ঠ আছে, কি বিধিদত্ত আরো কোনো গুণ আছে, তিনি অল্প আয়াসেই এক-র্য্যের খানিকটা করিতে পারেন। কিন্তু যিনি এসব সম্পদে বঞ্চিত, তাঁহাকে কথায়, কাজে, ব্যবহারে, গল্পে ও আদরে যত্নে স্বামীকে আনন্দ দিবার চেষ্টা করিতে হয়। স্বামী যে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ব্যবসায়, ব্যায়াম, ক্রীড়া কি ভ্রমণে আনন্দ পান, দিদিমার ছাত্রী স্ত্রী যদি তাহার কিছুই না বুঝেন, তবে স্বামীর মনের একটা দিক্ তাঁহার নিকট চিররুদ্ধ থাকিয়া যায়; স্বামীর প্রিয় উপায়ে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে স্ত্রী ত পারেনই না, উপরন্তু যে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার অভিন্নহৃদয় হইবার কথা, তাঁহার হৃদয়ের একটা কক্ষই তাঁহার অজানা থাকিয়া যায়। চিত্তবিনোদনের আর-একটা উপায় ছোট বড় সকল দিক্ দিয়া মানুষের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করা। যে স্ত্রীর রেখা ও বর্ণ-বিন্যাসের জ্ঞান আছে, তিনি নিজ ও সন্তানসন্ততির পোসাকে পরিচ্ছদে এবং গৃহসজ্জায় তাহা ফলাইয়া স্বামীর চক্ষুকে আনন্দ দান করিতে পারেন; যাঁহার সুর-জ্ঞান আছে, তিনি কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে কর্ণকে তৃপ্তি দিতে পারেন; যাঁহার আতিথ্যবিদ্যা জানা আছে, বাক্যবিন্যাসের ক্ষমতা আছে, তিনি অতিথি অভ্যাগত আনিয়া গৃহকে আনন্দময় করিতে পারেন। কিন্তু এ সকল বিদ্যাই শিক্ষা-সাপেক্ষ।

চতুর্থ কর্ত্তব্য—গৃহস্থালীর কার্য্য দেখাও শিক্ষা না থাকিলে হয় না। যে গৃহে ধন-ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার গৃহিণীকে দাস-দাসী নির্ব্বাচন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিতে হয়। সারাক্ষণ দাসের দাস সাজিয়া অনেক ধনী-গৃহিণী ঝি-চাকরের পিছনে লাগিয়া থাকিয়া যে দিন কাটান, অথবা তাহাদের হাতে সর্ব্বস্ব ফেলিয়া লুণ্ঠন ও বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখান, দাসদাসীকে শিক্ষা দিতে জানিলে তাহা ঘটিত না।

নিপুণা গৃহিণীর অর্থনীতি, হিসাবরক্ষণ-প্রণালী, ভবিষ্যতের খরচের খস্‌ড়া তৈরি, উদ্যানপালন, গোপালন, দুগ্ধ সংরক্ষণ, অল্প আয়ে সংসার চালানো, বিনা ভৃত্যেও অবসর সৃষ্টি, এক উপায়ে দুই কার্য্য সিদ্ধি, নষ্ট দ্রব্যের পুনরুদ্ধার, অপচয় নিবারণ প্রভৃতি নানা বিদ্যা জানা থাকা দর্‌কার। গৃহধর্ম্ম ছেলেখেলা নয়, তাহাতেও বৈজ্ঞানিকের মত সাধনা করিয়া শিখিবার বহু জিনিষ আছে। সাংসারিক ব্যবহারের সকল জিনিষের উৎকর্ষ

অপকর্ষ, বাজারদর, গৃহনির্ম্মিত ও ক্রীত জিনিষের প্রভেদ প্রভৃতিও জানিতে হয়। বুদ্ধি মার্জ্জিত ও শাণিত না হইলে, এই-সকল বিদ্যা শিক্ষা ও অনুশীলন না করিলে এবং নানা জায়গায় যাওয়া আসা না থাকিলে এত জ্ঞান থাকা সম্ভব হয় না। আদর্শ গৃহকর্ত্রীর কমসম করিয়া পঞ্চাশ ষাটটা বিদ্যা জানা থাকা দরকার। উপরে যে-সকল বিদ্যার উল্লেখ করিলাম তাহা ছাড়াও খাদ্যের পুষ্টি ও মূল্যের তুলনামূলক জ্ঞান, পচনশীল খাদ্য নির্ব্বাচনক্ষমতা, পাইকারি খরিদের সুবিধা ও উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান, সমবায় প্রথার সাহায্যে ব্যয়সঙ্কোচ, বৈজ্ঞানিক উপায় ও যন্ত্রের সাহায্যে অল্পশ্রমে অধিক কার্য্য করিবার জ্ঞান, সময়ের ফলমূল অকালের জন্য টাট্‌কা অবস্থায় সঞ্চয় করিবার জ্ঞান, রন্ধনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী, খাদ্যে ও বস্ত্রাদিতে ভেজাল ধরিবার ক্ষমতা, গরম ও ঠাণ্ডা কাপড়ের সুবিধা অসুবিধা ও সৌন্দর্য্য, কাপড় কাচা, ইস্ত্রী করা, দাগ তোলা, রিপু করা, রং করা, পোষাক কাটা ছাঁটা, প্রভৃতি বহু জ্ঞান গৃহিণীর নিত্যকার্য্যে দরকার হয়।

স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুসন্তানগণ জীবনের অধিকাংশ সময় গৃহেই কাটায়; সুতরাং বাসগৃহ কি রকম পল্লীতে, কিরূপ বায়ু ও আলোক চলাচলের উপযুক্ত স্থানে হওয়া উচিত, তাহাও স্ত্রীলোকের জানা দরকাব। গৃহ-সজ্জা ও সংস্কারের জ্ঞান, গৃহের ভাড়া ও সুবিধার তুলনা-মূলক জ্ঞান, মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গৃহের আব-হাওয়ার প্রভাব কি প্রকার, তাহাও জানিতে হইবে। সাংসারিক আয়ের কতখানি অংশ খাওয়া-পরা, শিক্ষা, আনন্দলাভ, দান ধ্যান সঞ্চয় ও ভ্রমণ প্রভৃতিতে ব্যয় করিলে প্রকৃত বুদ্ধিমানের কাজ হয়, তাহাও গৃহিণীকেই স্থির করিতে হইবে।

শুধু গৃহধর্ম্ম পালন করিবার জন্যই স্ত্রীলোকের এইরূপ নানা জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। পরিবারের দুইটি চারটি ঠাকুরমা কিম্বা দিদিমা'র নিকট এত শিক্ষা সম্ভব নহে। একে ত দিদিমারা নিজেরাই অতিসামান্য শিক্ষাই পাইয়াছেন, তাহার উপর তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও কেবল দুই একটি পরিবার সম্বন্ধে। তাঁহারা ভাল যাহা শিখাইতে পারেন, তাহা অবজ্ঞেয় নহে; কিন্তু তাহা যথেষ্টও নহে। এই বৈজ্ঞানিক যুগে যখন কোটি কোটি মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে বিজ্ঞান, পুস্তকপ্রচার, বায়োস্কোপ, রেডিও প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা অতি সুলভ করিয়া দিতেছে, তখন চোখ বুজিয়া তাহা ফিরাইয়া দিয়া একমাত্র দিদিমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকা কি অতিবড় মূর্খের কাজ নয়? স্কুলকলেজের শিক্ষার যাঁহারা বিরোধী, তাঁহারা হয়ত বলিবেন উপরোক্ত বিদ্যাসকল স্কুলকলেজে শিক্ষা দেওয়া হয় না; সুতরাং সেখানে শিক্ষালাভ করা বৃথা। আধুনিক স্কুল-কলেজ-গুলি আদর্শ নয় জানি, কিন্তু সেজন্য সেগুলিকে বর্জ্জন না করিয়া সংস্কার করাই দরকার। যতদিন সংস্কার না-ও হয়, ততদিন অশিক্ষার চেয়ে সামান্য শিক্ষাও ভাল। দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ দুধকলা না পাইলে ক্ষুদ-কুঁড়া ফেলিয়া দেয় না। আধুনিক শিক্ষা আর কিছু না শিখাইলেও বাংলা ইংরেজী সংস্কৃত পড়িতে শিখাইয়াও মানুষের প্রভূত উপকার করিয়াছে। স্কুলে কলেজে যে বাংলা ইংরেজী পড়িতে শিখিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে এবং সুযোগ পাইলে স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় বিদ্যা নিজ চেষ্টাতেই শিক্ষা করিতে পারে। মানুষ যে-কোন ভাষা ও বিদ্যাই শিক্ষা করুক না কেন, তাহাতে তাহার অপকার অপেক্ষা উপকারই বেশী হয়। তাহার জ্ঞান ও আনন্দ লাভের ক্ষেত্র প্রত্যেক নবার্জ্জিত বিদ্যার সহিত বিস্তৃতি লাভ করে।

সংসারধর্ম্ম পালনের পর বহু স্ত্রীলোকেরই অবসর থাকে। এই অবসর-কালটা নিজের ও পরিবার-পরি-জনের পক্ষে সুখকর ও আনন্দময় করিয়া তুলিবার জ্ঞান থাকা স্ত্রীলোকের দরকার। যে পরিবারে অর্থাভাব আছে, সেখানে অবসর-কালে অর্থকরী বিদ্যার চর্চ্চাই বুদ্ধির কাজ। যেখানে তাহা নাই, সেখানে কেবল শিল্প ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিলেও চলিতে পারে। আমাদের দেশের অনেক লেখকলেখিকার মতে কুটীর-শিল্প অর্থাৎ সুতা কাটা, তাঁত বোনা, পোষক তৈয়ারি করা, মোজা গেঞ্জি বোনা প্রভৃতি করিলে মেয়েরা সহজেই কিছু অর্থ উপার্জ্জন ও সৎকার্য্যে অবসর যাপন করিতে পারিবেন।

একথা সত্য। কিন্তু সকলরকম গৃহশিল্পেরই শিক্ষা করার প্রয়োজন আছে; চরকা-কাটাতেও কিছু আছে। "নবাবের হারেমের যে-অবরোধ প্রথার ভূত" বাংলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে, তাহার কল্যাণে দর্জি, ছুতোর, তাঁতী, ধোপা, শালকর, ময়রা, স্যাকরা প্রভৃতির কাছে কাজ শেখা মেয়েদের পক্ষে কঠিন। তা-ছাড়া, সকল-প্রকার গৃহশিল্পই বৈজ্ঞানিকযুগে পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তা হইয়া উঠিয়াছে, কলের প্রতিযোগিতায় সস্তায় কাজ না করিলে বিকায় না। যে-সব কাজে কেবল শিল্পীর নৈপুণ্যেরই দাম, তাহাতে আবার শিক্ষার প্রয়োজন খুবই বেশী। কিন্তু এই-সব শিল্পের বিষয়ে বাংলা পুস্তক প্রায় নাই, অথচ ইংরেজী বিস্তর আছে। সুতরাং ইংরেজী শিখিলে ও মাপ জোক প্রভৃতির জন্য কিছু অঙ্কশাস্ত্র ও বিজ্ঞানাদি জানা থাকিলে এক্ষেত্রেও সুবিধা হয়। না জানিলে প্রতিযোগিতায় টিঁকিতে ত পারিবেনই না, অসম্পূর্ণ শিক্ষার ফলে অপটু হাতের জিনিষ কেহ কিনিবে না, শিল্প চর্চ্চার ফলে লাভের চেয়ে লোক্‌সান বহুত বেশী হইবে। মানুষের বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় যত সজাগ ও পর্য্যবেক্ষণে পটু হয়, সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই সে তত সফল হয়। সেইজন্য বুদ্ধি, চক্ষু, কর্ণ, হস্ত প্রভৃতিকে দক্ষ করিতে হইলে বহু বিদ্যার সাধনা প্রয়োজন।

অনেক লেখকলেখিকার বিশ্বাস, মেয়েরা স্কুলকলেজে পড়িলে, বিবাহিতা ও অবিবাহিতা সকলেই ঘর সংসার ফেলিয়া স্কুলমাষ্টারী ওকালতী কেরানীগিরি বা ডেপুটি-গিরি করিতে যাইবেন। যে দেশে একটি মাত্র কুমারী ওকালতী করিবার অনুমতি পাইয়াছেন এবং যে দেশের ত্রিসীমানায় কোনো মহিলা ডেপুটিগিরি করেন নাই, সে দেশের কল্পনাকুশল ঔপন্যাসিকরা বাস্তবে এতখানি উপন্যাসের রং ফলাইয়া যুদ্ধে না নামিলেই পারিতেন। তবু যখন নামিয়াইছেন, তখন বলা যাইতে পারে, শিক্ষিতা বাঙ্গালী রমণীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র বাংলার বালিকা-বিদ্যালয়গুলিতে যদি লেখিকা খোঁজ করেন ত দেখিবেন, শিক্ষয়িত্রীরা অধিকাংশ কুমারী, সামান্য অংশ বিধবা এবং অতি অল্প কয়েকজন সধবা। সধবাদের মধ্যে আবার অধিকাংশ নিঃসন্তান, কয়েকজন বয়স্ক সন্তানের জননী এবং মাত্র দুই দশজন শিশু সন্তানের জননী। একজন মানুষে দৃষ্টান্ত দিয়া যে সমষ্টির বিচার করা চলে না, তাহা এই সকল লেখিকার লেখায় অনেকবারই দেখা যায়; অথা ইঁহারা নিজেরাই "একটি লেডি ডাক্তারের মুখে শোন তাঁহার নিজ-জীবনের একটি গল্পকে" সম্বল করিয়া যুে নামেন। কুমারী শিক্ষয়িত্রীরা অধিকাংশই বিবাহের প চাকরী ছাড়িয়া দেন, অবস্থায় না কুলাইলে বা সংসারে অসুবিধা হয় না দেখিলে কেহ কেহ বিবাহের পরে চাকরী করেন; লেখিকার এ সংবাদ যে জানা নাই তাহা মনে হয় না, তবুও তিনি তাহা গোপন করিয় গিয়াছেন। আমেরিকায় স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ প্রসার, পৃথি-বীর অল্প দেশেই সেরূপ হইয়াছে। তবু আমেরিকার "ওম্যান সিটিজেন" পত্রে দেখি—

> "পঞ্চাশ বৎসর পরে আমেরিকান্ গৃহসংসার আধুনিক গৃহে তুলনায় অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক ও কার্য্যকর হইবে। ভবিষ্যতে মেয়েরা নিজেরা সংসারের কাজে আরো অনেক বেশী সময় দিবেন গৃহকর্ম্ম আর নীচ কাজ থাকিবে না। ভবিষ্যতে গৃহকর্ম্মকে মানু শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিবে। বিবাহিত রমণীদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনের একটা বিশেষ কালের সমস্ত সময়টাই ঘরসংসার গড়িতে ব্যয় করিবেন। সন্তানসন্ততির জন্ম ও পালনের কালটায় প্রায় সমস্ত চিন্তা ও সময়ই গৃহধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিবেন। মানসিক, আর্থিক ও ও শারীরিক সকল দিক্ দিয়াই মেয়েরা জীবনের সন্তান-ধারণ যুগটায় গৃহের অনুরক্ত হন। মেয়েরা নিজেদের কাজ ও সন্তানের যত্ন নিজেরাই করিবেন, দরকার-মত গৃহকর্ম্ম, রন্ধন, সন্তানপালন ও অন্যান্য কাজে শিক্ষিত বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবেন।"

বিবাহের পূর্ব্বে এবং সন্তানসন্ততি বড় হইয়া গেলে মেয়েরা যদি গৃহের বাহিরে কোনো অর্থকরী বিদ্যার অনুসরণ করেন, কি দেশ- ও সমাজ-হিতকর কার্য্য করেন, তাহাতে দেশের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই ত বেশী হইবে। বিবাহিত জীবনেও অবসরকালে অর্থ উপার্জ্জন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে সম্ভব। শিক্ষা ও বিবেচনা থাকিলে সংসারের ক্ষতি না করিয়াও তরুণী মাতারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গৃহকর্ম্ম করিলে গৃহিণীদের অবসরও বাড়িবে, সুতরাং বাহিরের কাজ করিবার বেশী সুবিধাও হইবে।

অনেকে "এই চাকরীসমস্যার দিনে" শিক্ষিতা রমণীদের "পুরুষের সহিত ভিড় করিয়া" সমস্যা

জটিলতর করিতে মানা করিতেছেন। আমাদের দেশে চাকরীসমস্যা যে ক্ষেত্রে, সেই কেরানী-কুল-শোভিত আপিষ-আদালতে বাঙ্গালী মেয়ের দেখা এখনও পাওয়া যায় নাই; লেখিকা অযথা কেন ভয় পাইতেছেন জানি না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদেই শিক্ষিতা বঙ্গরমণীদের অধিকাংশকে দেখা যায়। এই কাজে আরও বহু রমণীর যে প্রয়োজন আছে, তাহা সকলেই জানেন, এমন কি "সনাতনপন্থীরা" নিজেরাও তাহা স্বীকার করেন। লেডি ডাক্তারের ও শিক্ষিতা ধাত্রীর ও শুশ্রূষাকারিণীর কার্য্যক্ষেত্র ত সমস্ত দেশ জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রোজ্‌গারী মেয়েদের গালি দিতে গিয়াও 'সনাতনপন্থী'দের তাহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যে-সকল কাজে কেবল মেয়েদের চাহিদাই বেশী এবং উপযুক্ত মেয়ের অভাবে যে-সব কাজ আমাদের দেশে ভালভাবে হইতে পারিতেছে না, শিক্ষিতা মহিলারা স্বভাবত সেই-সব কাজে বেশী যাইবেন এবং তাহা হইলেই পুরুষদের 'চাকরী-সমস্যা' জটিলতর না হইয়া দেশ ও সংসারের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইবে। (ভুল যে কেহ করিবেন না, এমন কথা বলিতেছি না; ভুল করিয়া ঠকিয়াই মানুষ ঠিক্ পথে যাইতে শিখে।) শুশ্রূষা, ধাত্রীবিদ্যা, দন্ত-চিকিৎসা, চক্ষু-চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-তত্ত্বাবধান, হাসপাতাল-পরিদর্শন, স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা, শিশু-শিক্ষা, ব্যায়াম-শিক্ষা, ফোটোগ্রাফী, পোষাকের নক্সা করা, নারী-শিল্পভাণ্ডার স্থাপন, সংবাদপত্রাদিতে লেখা, নারীহিতৈষী পত্র চালনা, অনাথাশ্রম গঠন, পুস্তক রচনা, সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া, বোর্ডিং পরিচালন, ভদ্র ও উচ্চদরের হোটেল পরিচালন, গোশালাপ্রতিষ্ঠা, শাক-শব্জির বাগান করা, স্থাপত্য, গহনা নির্ম্মাণ ও নক্সাকরা, অন্ধাশ্রম ও আতুরাশ্রমের তত্ত্বাবধান, দোকানে মহিলা খরিদ্দারের জিনিষ যোগানো, বাল-অপরাধীর তত্ত্বাবধান, মহিলা মক্কেলের ওকালতী, সমাজহিতসাধন, পতিতোদ্ধার, উন্মাদের সেবা প্রভৃতি অসংখ্য কাজ আমাদের দেশে যাহা হওয়া উচিত মেয়েদের সাহায্যের অভাবে তাহা হইতে পারিতেছে না। এই-সকল কাজ বিশেষ করিয়া মেয়েদেরই কাজ। ইহাতে তাঁহারা লাগিলে ভীড় বাড়ানো হইবে না, প্রকৃত কার্য্য উদ্ধার করা হইবে।

ধাত্রীবিদ্যা ও শিক্ষাদান পুরাকালে মহিলাদের কাজ ছিল বলিয়া অনেকের বর্ত্তমানেও তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু পুরাকালে ত মহিলারা মাসিকপত্রে উপন্যাস লিখিতেন না, প্রবন্ধ লিখিয়া পুরুষের সঙ্গে ঝগড়াও করিতেন না; তবে কোনো কোনো মহিলা মাসিক পত্রের আড়াল হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়াছেন কেন? বর্ত্তমান ও অতীত বলিয়া দুইটা কাটাছাঁটা বিভাগ কালের মধ্যে নাই। অতীতে এমন দিনও ছিল যখন পুরুষ ও নারী কাঁচা মাংস খাইতেন, গাছের বল্কল পরিতেন, আরো অতীতে বিবস্ত্র থাকিতেন, সামাজিক কোনো প্রথা মানিতেন না; কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল নিয়ম বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। উন্নত মানুষ পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করিতে ভয় পায় না। অতীতে রমণী ব্যারিষ্টারী করেন নাই বলিয়া ভবিষ্যতে তাঁহার ব্যারিষ্টারীর ভয়ে মূর্চ্ছা যাইবার কোনো যুক্তি-সঙ্গত কারণ নাই। "নারীর ইজ্জত্ রক্ষা নারীরই কাজ" ইঁহারা বলেন; তবে মহিলা উকীল হইলে ক্ষতি কি? মহিলার মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য, কাপুরুষের হস্তের লাঞ্ছনা হইতে, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর ছ্যাঁকা পোড়া হইতে উদ্ধার করিতে, চক্রীর চক্র হইতে বাহির করিতে, মহিলার স্বার্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে, মহিলা উকীল ব্যারিষ্টারই ত বেশী সক্ষম হইবেন। যাঁহারা নিজেদের "সেকেলে" বলিয়া বড়াই করিয়া "একেলে" শিক্ষাকে গালি দেন, তাঁহারা যদি খুঁটাইয়া দেখেন ত দেখিতে পাইবেন, জীবনযাত্রা-পথে সাবিত্রী দ্রৌপদী কুন্তী দময়ন্তী শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি সকলের সঙ্গেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ রাখিয়া তাঁহারা নিত্য চলিতেছেন।

শিক্ষার মধ্যে কোন্‌টা যে হিন্দুজনোচিত আর কোন্‌টা যে "মেম-সাহেবী", কোন্‌টা যে "মেয়েলি" আর কোন্‌টা যে "পুরুষালি" তাহাও বুঝাইয়া বলা দরকার। স্কুল-কলেজে মেয়েরা সচরাচর ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, দর্শন, ইত্যাদি কয়েকটি জিনিষ পড়ে, যাহা ঠিক্ বাসন-মাজা কিম্বা ঘরঝাঁট দেওয়ার মত "মেয়েলি" বিদ্যা নয়। কিন্তু ইহার কোনোটার গায়েই ত পুরুষত্বের ছাপ দেওয়া

নাই। অন্য দিকে আবার, রাঁধাবাড়া, বাসন-মাজা ও ঘর ঝাঁট দেওয়ার কাজও অসংখ্য পুরুষ করে। ভাবিয়া দেখিলে দেখিবেন, মহাভারত বা রামায়ণও অংশত ইতিহাস, "সনাতনপন্থীরা" মহিলাদের তাহা পড়িতে বলেন; তীর্থদর্শন-ধর্ম্মের যাঁহারা এত পক্ষপাতী, পুস্তকে ভূগোল পড়িলেই তাঁহাদের জাতি যাইবে না; বাজারের হিসাব রাখিতে হইলেও অঙ্কের প্রয়োজন যখন হয়, তখন উচ্চ গণিত পড়িলেই স্ত্রী পুরুষ হইয়া যাইবেন না; বেদ বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল স্মৃতি শ্রুতি পড়িলে যদি স্ত্রীলোক পুরুষ না হন, ত হেগেলের দর্শন পড়িলেও হইবেন না।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আরো অনেক লেখকলেখিকা অনেক আবোল-তাবোল প্রলাপ বকিয়াছেন, সকলগুলির উত্তর এক প্রবন্ধে দেওয়া শক্ত। এখানে কেবল একজন লেখকের উর্ব্বরমস্তিষ্ককল্পিত শিক্ষিতা রমণীর বর্ণনার কথা বলিয়া শেষ করিব। লেখকের মতে বেথুন-কলেজের শিক্ষার পরিবর্ত্তে মহাকালী-পাঠশালার শিক্ষার প্রচলন ঘরে ঘরে হইলেই বাংলা স্বর্গরাজ্য হইয়া উঠিবে। মহাকালী-পাঠশালার নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; উহা যে-প্রশংসার যোগ্য তাহা অবশ্যই উহাকে দেওয়া উচিত। কিন্তু মহাকালী-পাঠশালার এমন সব ভক্ত থাকিতেও তাহা যে কেন ভূতলে স্বর্গ না আনিয়া অকালে স্বর্গযাত্রা করিতে বসিয়াছে, তাহা তাঁহারাই জানেন। লেখক একজন মহাকালী-পাঠশালার ছাত্রীর শিবপূজা শাশুড়ীভক্তি ও অন্নপূর্ণাত্বের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বেথুন-কলেজের শিক্ষিতাকে পাঠককে "কল্পনা" করিয়া লইতে বলিয়াছেন। বাস্তবকে যে "কল্পনা-চক্ষে" দেখিয়া সমালোচনা করিতে হয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। লেখকের কল্পিতা শিক্ষিতা বধূ প্রথম তাঁহার কল্পলোকে প্রবেশ করিলেন বুট্ ও বনেট্ পরিয়া, তাহার পর অশুচি হস্তে পূজার সামগ্রী ছুঁইয়া ও আরো অনেক অঘটন ঘটাইয়া শাশুড়ীকে খানসামা করিয়া লেখকের মস্তিষ্ক-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা পাত করিলেন। শাশুড়ীকে খানসামা করিতে যদিও কোনো শিক্ষিতাকে দেখি নাই, তবু ধরা যাব শাশুড়ী পুত্র ও পুত্রবধূকে পরিবেষণ করিয়া কোথাও খাওয়াইয়াছেন। হিন্দুনারী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পতি-পুত্রকন্যাকে খাওয়ানোটা চিরকাল গৌরবের বস্তু মনে করেন, পথের কাঙ্গালকে রাঁধিয়া খাওয়ানোও তাঁহার কাছে শ্লাঘার বিষয়। তবে বেচারা বধূ এমন কি অপরাধ করিল, যে, তাহাকে যত্ন করিয়া পরিবেষণ করিয়া খাইতে দিলেই শাশুড়ীর সম্ভ্রমের হানি হইবে? বেথুন-কলেজের শত শত ছাত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বনেট্ কাহাকেও পরিতে দেখি নাই, বুটও দুই চারিটি 'দুগ্ধপোষ্য' বালিকা ছাড়া কাহারও পায়ে দেখি নাই। (ঐ বয়সের নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর বাড়ীর বালিকাদিগকেও বুট পরিতে দেখিয়াছি।) তাঁহাদের মধ্যে শতাধিককে স্বহস্তে রন্ধন করিতে দেখিয়াছি এবং এক জনেরও হিষ্টীরিয়া আমি দেখি নাই; কিন্তু অগণিত নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরও হিষ্টীরিয়া হয়। প্রাতঃকালে বৌমার শয্যাপার্শ্বে চায়ের পেয়ালা হস্তে যে শাশুড়ীরা আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা কোন্ থিয়েটারের ভূমিকায় নামিয়াছিলেন জানিতে পারিলে বেথুন-কলেজের ছাত্রীরা বাধিত হইবেন।

বাংলাদেশই ভারতবর্ষের সবটা নয়, বাঙ্গালী হিন্দুই একমাত্র হিন্দু বা নিষ্ঠাবত্তম হিন্দু নহেন। অন্য অনেক প্রদেশের হিন্দুমহিলাদিগকে চাম্‌ড়ার জুতা পরিতে দেখিয়াছি। তাহার গড়ন অবশ্য দেশী রকমের, কিন্তু তাহার জায়গায় বুট পরিলেই যে বড় বেশী অপরাধ হয়, এরূপ মনে হয় না। বাঙ্গালী হিন্দু পুরুষেরা ত ঠনঠনে বা তালতলার চটির পরিবর্ত্তে বুট পরেন। তাহাতে ত হিন্দুত্ব লোপ পায় না।

বাজে কথার উত্তর না দিয়াও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথা এখনও আছে। বারান্তরে সে-সব কথা ও যৌবনবিবাহ স্ত্রীস্বাধীনতা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি "নারী-সমস্যা"র অন্যান্য দিক্ লইয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী শান্তা দেবী

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলের কাজ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচন শেষ না হইয়া গেলে বুঝা যাইবে না, কোন্ দলের কত লোক ইহার সভ্য হইলেন। স্বরাজ্য দলের নেতারা বলিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে গবর্ণ্মেণ্টের নিকট পূর্ণ স্বরাজ্যের দাবী করিবেন। এই দাবী মঞ্জুর হইলে ভাল, নতুবা তাঁহারা গবর্ণ্মেণ্টের সকল কাজের বিরোধিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগুলি অচল করিয়া দিবেন।

যদি স্বরাজ্য দলের এত বেশী লোক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন, যে, সরকারী সভ্য, মনোনীত সভ্য এবং মডারেট সভ্যেরা দল বাঁধিয়াও সংখ্যায় তাঁহাদের চেয়ে বেশী না হন, তাহা হইলে স্বরাজ্য দল বিরোধিতা দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে পারিবেন। কিন্তু তখনও গবর্ণ্মেণ্টের কাজ অচল হইবে না। গবর্ণর-জেনারেল নিজের ভারতশাসন-সংস্কার আইন অনুযায়ী ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা কাজ চালাইতে পারিবেন। কিন্তু ভারতশাসন-সংস্কার আইনের উদ্দেশ্য এই, যে, ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। স্বরাজ্যদলের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে আইনের ঐ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে পারিলে স্বরাজ্যদলের ঘোষিত প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, বলা যাইতে পারে।

কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা অচল হইলে এবং বড়লাট নিজের আদেশ দ্বারা শাসন-কার্য্য চালাইতে বাধ্য হইলে স্বরাজ্যদলের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এমন বলা যায় না। তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য "স্বরাজ" লাভ। ব্যবস্থাপক সভার যতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার আছে, তাহাকে স্বরাজ বলা যায় না; তাহা সামান্য। দেশের লোকের অধিকাংশেরই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা নাই, অতি অল্পসংখ্যক লোকের আছে। তাঁহারা যে-সব প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন, তাঁহাদের ক্ষমতাও কম। সুতরাং ইহা ঠিক্, যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভাগুলির দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও ঠিক্, যে, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের ক্ষমতা যত কমই হউক, কিছু ক্ষমতা তাঁহাদের আছে, এবং গণতন্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। যদি ব্যবস্থাপক সভা অচল হইয়া যায়, তাহা হইলে নির্ব্বাচকদের প্রতিনিধিদের এই ক্ষমতাটুকুও থাকিবে না।

ইহার ফল দুই প্রকার হইতে পারে। তাহার আলোচনা করিবার আগে দেখা যাক্, গবর্ণর-জেনারেল স্বরাজ্যদলের স্বরাজের দাবী গ্রাহ্য করিলে কি ফল হইতে পারে। এই দাবী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাবের আকারে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রস্তাবটির পক্ষে অধিকাংশ সভ্য মত দিলে উহা গবর্ণর-জেনারেলের নিকট যাইবে। সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল উহার অনুমোদন করিতে পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্তু তিনি অনুমোদন করিলেই ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইবে না। ভারতবর্ষকে আইনের দ্বারা স্বরাজ দিবার মালিক ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট। বড়লাট তাঁহার অনুমোদন সহ প্রস্তাবটি ভারত-সচিবকে পাঠাইবেন। সকৌন্সিল ভারতসচিবের উহা পছন্দ হইলে তিনি উহা ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় উপস্থিত করিবেন। মন্ত্রীসভা উহার অনুমোদন করিলে বর্ত্তমান ভারতশাসন আইন আবশ্যক-মত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি আইনের খস্ড়া প্রস্তুত করিয়া তাহা পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিবেন। পার্লেমেণ্টে ঐ খস্ড়া আইনে পরিণত হইলে তদনুযায়ী স্বরাজ ভারতবর্ষ পাইতে পারিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, নূতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল স্বয়ং কিম্বা অন্যান্য দলের অবিলম্বে-স্বরাজ-প্রার্থী সভ্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইলেও, আরো অনেক অনুকূল অবস্থা ঘটিলে, তবে আইনের পথে স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। যাহা এতগুলি "যদির" উপর নির্ভর করে, তাহার বেশী প্রত্যাশা না করাই ভাল।

যদি সকৌন্সিল গবর্ণর-জেনারেল স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে স্বরাজ্যপ্রার্থীরা ব্যবস্থাপক সভার কাজ অচল করিতে চেষ্টা করিবেন। সে চেষ্টা সফল হইলে, বড়লাট নিজের আইনসঙ্গত ক্ষমতা অনুসারে রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইতে থাকিবেন। কিন্তু এভাবে কাজ চালাইতে হইলে তাহাকেও এক হিসাবে গবর্ণ্মেণ্টের পরাজয় বলিতে হইবে। সুতরাং বরাবর এই প্রকারে কাজ না চালাইয়া ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইন এমন ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে ব্যবস্থাপক সভা পুনরায় অচল না হয়।

এই পরিবর্ত্তন দুই প্রকারের হইতে পারে। এক হইতে পারে, যে, ব্যবস্থাপক সভাগুলি বাস্তবিক আরো গণতান্ত্রিক হইবে, উহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরো বাড়িবে। কিম্বা এরূপ হইতে পারে, যে, গণতান্ত্রিকতার মুখোসটা আরো মোহজনক করিয়া ব্যবস্থা আসলে এমন করা হইবে, যাহাতে সভ্যদের ব্যবস্থাপক সভাকে অচল করিবার ক্ষমতা এখনকার চেয়ে খুব কম হয়, কিম্বা লুপ্ত হয়। কি যে হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

কিন্তু নূতন ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল বেশ পুরু না হইলে, এই সমস্ত জল্পনাই বৃথা হইবে।

—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের যত সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, ঐ দলের লোকেরাও বোধ হয় তত আশা করেন নাই; অন্য লোকদেরও অনুমান ইহা অপেক্ষা কম ছিল।

এই দলের চেষ্টা এতটা সফল হইবার কারণ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়াছে। দল হিসাবে স্বরাজ্যদল এখন পর্য্যন্ত দেশের জন্য কিছুই করেন নাই। সুতরাং দেশহিতসাধনে তাঁহাদের কৃতিত্বের জোরে তাঁহারা এতটা সফলতা লাভ করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। ব্যক্তি হিসাবেও স্বরাজ্যদলের নির্ব্বাচিত অনেক সভ্য তাঁহাদের পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপেক্ষা অযোগ্য লোক। সেইজন্য আমাদের অনুমান এই, যে, প্রধানতঃ গবর্ণ্মেণ্ট্‌ এবং তাহার পর মন্ত্রীদের দল দেশের লোকদের বিরাগভাজন বলিয়া বিরোধী স্বরাজ্যদলের এতটা জিত হইয়াছে। যে ও যাহা আমাদের বিদ্বেষভাজন, তাহাকে কেহ বিনষ্ট করিবে বলিলে স্বভাবতই তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে। গবর্ণ্মেণ্টের বিরুদ্ধে একটা রব তুলিয়া দিয়া কার্য্য উদ্ধার করার ফিকিরটা মোটেই নূতন নয়; অথচ সব দেশেই লোকে ইহাতে আগেও ভুলিয়াছে, ভবিষ্যতেও ভুলিবে। এই বাংলা দেশেও, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনেক গলদ আছে ও সংস্কারের প্রয়োজন, সে কথাটা আশুবাবু ও তাঁহার দল চাপা দিয়া ফেলিলেন এইরূপ রব তুলিয়া, যে, গবর্ণ্মেণ্ট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। গবর্ণ্মেণ্টের সেরূপ কুমৎলব থাকিলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষগুলা গুণে পরিণত হয় না। কিন্তু গবর্ণ্মেণ্টের প্রতি লোকের যে রাগ বরাবর আছে, তাহাকে আরো বাড়াইয়া দিয়া ঐ দোষগুলার দিক্‌ হইতে মানুষের দৃষ্টি আশু-বাবুর দল অন্য দিকে চালিত করিলেন।

স্বরাজ্যদলের আংশিক জয়ও এই-প্রকারের একটা চা'লের দ্বারা লব্ধ হইয়াছে। গবর্ণ্মেণ্ট্‌ খারাপ, মন্ত্রীরা খারাপ লোক, গবর্ণ্মেণ্টের আংশিক সমর্থকেরাও খারাপ লোক; অতএব, গবর্ণ্মেণ্ট্‌-পক্ষের পূরাপূরি বিরোধীরা অবশ্য ভাল লোক ও যোগ্য লোক—ন্যায়শাস্ত্রের অননুমোদিত এইরূপ ধারণার বশে, গবর্ণ্মেণ্টের দলের লোক নহেন, অথচ মডারেট দলেরও লোক নহেন, গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কাজেরই বিরোধিতা করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন, যোগ্য ও সৎ এরূপ লোক নির্ব্বাচিত না হইয়া কোন কোন স্থলে তদপেক্ষা অযোগ্য এমন লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, যাঁহাদের একমাত্র বা প্রধান যোগ্যতা এই, যে, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাকে ও গবর্ণ্মেণ্ট্‌কে গুঁড়া করিয়া ফেলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

স্বরাজ্যদলের প্রধান কোন কোন ব্যক্তির প্রভাব এবং লোকপ্রিয়তাও ঐদলের আংশিক জয়ের একটি কারণ।

স্বরাজ্যদলের বিপক্ষেরা বলেন, যে, ঐদলের লোকদিগকে জিতাইবার জন্য উহার কর্ম্মীরা অনেক মিথ্যাচরণ প্রভৃতি করিয়াছেন। ইহা সত্য কথা। দল হিসাবে বলিতে গেলে, বোধ হয় কোন দল সম্বন্ধেই ইহা

বলা যায় না, যে, উঁহার কর্ম্মীরা মোটেই অসত্যের প্রশ্রয় দেয় নাই বা মিথ্যাচরণ করে নাই—যদিও ইহা সত্য, যে, ব্যক্তিগত হিসাবে কোন কোন সভ্যপদ-প্রার্থী কোনও গর্হিত উপায় অবলম্বন করেন নাই বা করান নাই। স্বরাজ্যদলের কর্ম্মীরা বেশী অন্যায় করিয়াছেন, কিম্বা অপর দলের কর্ম্মীরা করিয়াছেন, অথবা কে কি কি ও কত অন্যায় করিয়াছেন, আমরা তাহা জানিবার চেষ্টা করি নাই। এইজন্য এবিষয়ে অধিক কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি না।

যাঁহারা আপনাদিগকে স্বরাজদলভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়া কাজ হাসিল করিয়াছেন, তাঁহারা যে সকলেই ঐদলের লোক নহেন, কেহ কেহ কেবল কার্য্যসিদ্ধির জন্য নিজেকে ঐ দলভুক্ত বলিতেছেন, তাহা আগে হইতেই অনুমিত হইয়াছিল। সেই অনুমান যে সত্য ইতিমধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কাজ আরম্ভ হইলে আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ নিজেকে স্বরাজ্যদল-ভুক্ত না বলিলেও স্বরাজ্যদলের সাহায্যে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহার প্রতিদানস্বরূপ সভায় গিয়া কিরূপ কাজ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন, তাহাও জানিতে বেশী বিলম্ব হইবে না।

মনে রাখিতে হইবে, যে, স্বরাজ্যের দাবী করিবার স্থান ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা, প্রাদেশিক সভা তাহার স্থান নহে; প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের একমাত্র কাজ, সভার সব কাজের বিরুদ্ধাচরণ করা। সরকারী ও সরকারের সমর্থক লোকদের প্রস্তাব, বিল, প্রভৃতির বিরোধিতা ত তাঁহারা করিবেনই; অধিকন্তু স্বতন্ত্র (Independent) কোন সভ্য কিছু ভাল আইনের খসড়া বা প্রস্তাব উপস্থিত করিলে তাহারও বিরোধিতা স্বরাজ্যদল করিতে বাধ্য। কেন না, এরূপ ভাল কিছুর সমর্থন যদি উঁহারা করেন, এবং যদি তদ্দ্বারা ঐ আইন পাস্ বা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে প্রমাণিত হইয়া যাইবে, যে, ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা সামান্য কিছু দেশহিত হইতে পারে। কিন্তু স্বরাজ্যদল যাহা ভাঙিতে চান, তাহার দ্বারা দেশের কিছু উপকার হইতে পারে, কার্য্যতঃ ইহা প্রমাণ হইতে দেওয়া স্বরাজ্যদলের ধ্বংসপ্রয়াস-নীতিকে বলবৎ করিবে না।

প্রত্যেক কাজেরই বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, যে, তাঁহাদের দলের সংখ্যা এমন নয়, যে, তাঁহারা সকল বা অধিকাংশ স্থলে এই নীতিকে জয়যুক্ত করিতে পারেন। সুতরাং, তাঁহাদের ভাঙিবার বা অচল করিবার প্রতিজ্ঞা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না।

মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রস্তাব বা আইনের খসড়া সভার নিকট উপস্থাপিত হইবে, যাহা দেশহিতকর। এরূপ ক্ষেত্রেও স্বরাজ্যদলের লোকেরা তাঁহাদের বিরোধ ও ধ্বংসনীতির অনুসরণ করিবেন কি? যদি করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এরূপ আচরণের এই ব্যাখ্যা হওয়া বিচিত্র নহে, যে, তাঁহারা দেশের ভাল কখন্ করিবেন বা করিতে পারিবেন, তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু আপাততঃ তাঁহারা দেশহিতে বাধা দিতেছেন। তাহা হইলে তাঁহাদের লোকপ্রিয়তা কতকটা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের ঘোষিত নীতির অনুসরণ না করিয়া দেশহিতকর প্রস্তাব ও বিলের সমর্থন এবং অহিতকর প্রস্তাব ও বিলের বিরোধিতা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত মডারেট্ দলের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচিত্ত লোকদের কোন প্রভেদ থাকিবে না; এবং তাহা হইলে তাঁহারা যে রব তুলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহা লোকে ভণ্ডামি বলিবে। ইতিমধ্যেই মান্দ্রাজের স্বরাজ্যদলের মিষ্টার সত্যমূর্ত্তি বলিয়াছেন, "রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিবর্ত্তনীয় কর্ত্তব্যতালিকায় বিশ্বাস করি না।" মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভাকে স্বরাজ লাভের উপায়-স্বরূপে ব্যবহার করিতে উদ্যোগী কোন দলের অভ্যুদয় হইলে স্বরাজ্যদল তাঁহাদের নীতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন, ইহাও তিনি বলিয়াছেন।*

* "But, as a practical politician, I do not believe in permanent unchangeable political programmes. If, for example, in Madras, the "Justice" party with its reactionary and communalistic ideals is to be replaced by a *really progressive noncommunal party pledged to use the Council for the attainment of Swara* nd

বাংলা দেশের স্বরাজ্যদলের মুখপত্র "ফরওয়ার্ড্"ও বলিয়াছেন, কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা কোন কার্য্য প্রণালীকেই অতি নীচ মনে করিবেন না।

স্বরাজ্যদল মত বা কার্য্যপ্রণালী যতই পরিবর্ত্তন করুন না, যতক্ষণ তাঁহারা লোককে বুঝাইতে পারিবেন, যে, গবর্ণ্মেণ্টের বিরোধী তাঁহাদের সমান আর কেহ নাই, ততক্ষণ তাঁহারা বহুলোকের প্রিয় থাকিবেন। কথায় বলে, জনসাধারণ কোন কথা দীর্ঘকাল মনে করিয়া রাখে না; যে যখন যত প্রচণ্ড হুজুক তুলিতে পারে, তাহারই জিত হয়। লোকদেখান কিছু একটা কবিবার ও বলিবার, কাজ হাসিল করিবার জন্য পূর্ব্বাপর-সঙ্গতিকে অগ্রাহ্য করিবার, এবং উচ্চনীতিকে প্রয়োজন-মত পদদলিত করিবার ক্ষমতা স্বরাজ্যদলের কর্ত্তৃপক্ষের আছে—যে-কোন রাজনৈতিক বা অন্য দল জয়কেই একমাত্র বা পধান লক্ষ্য করে, তাহাদেরই এই ক্ষমতা জন্মিতে পারে। কিন্তু এই পথের পথিকদের জিত হইলেও লোকহিত তাহাদের দ্বারা হয় না। তাহারা হারিয়া যাইবার ভয়ে ধর্ম্ম এবং লোকহিতকে বলি দিতেও পারে।

ভবিষ্যতে যদি সংঘবদ্ধ অন্য কোন দল স্বরাজ্যদল অপেক্ষাও গবর্ণ্মেণ্ট-শত্রু বলিয়া কার্য্যতঃ আপনাদিগকে প্রমাণ করিতে পারেন, অন্ততঃ সেইরূপ ধারণা লোকের মনে জন্মাইতে পারেন, তাঁহাদেরও অল্পকালস্থায়ী জিত হইবে। কিন্তু যাঁহারা দেশহিত চান, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাভূয়িষ্ঠতার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া দেশের লোকের জ্ঞান, মানসিক শক্তি, চরিত্রবল এবং দৈহিক স্বাস্থ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে থাকুন।

—

মন্ত্রী কাহারা হইবেন?

এবার বাংলাদেশের মন্ত্রী কাহারা হইবেন, তাহা লইয়া জল্পনা ও অনুমান পথে ঘাটে বৈঠকখানায় ও খবরের কাগজে চলিতেছে, এবং নানা গুজব রটিতেছে। কেহ কেহ এরূপ কথা প্রচার করিতেছেন, যে, তাঁহাদের সম্মতি লইবার জন্য লাট সাহেবের লোক তাঁহাদের বাড়ী হাঁটা-হাঁটি করিতেছে। যাঁহারাই মন্ত্রী হউন তাঁহারা জানিয়া রাখুন, যে, তাঁহারা বৎসরে চৌষট্টিহাজার টাকা বেতন লইবেনই, যদি এরূপ জেদ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকিবে না। জোগাড়-যন্ত্র করিয়া তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় বেতনহ্রাসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাইতে পারেন, কিন্তু তাহার দ্বারা লোকের বিরাগ ও অশ্রদ্ধা এড়াইতে পারিবেন না। লোকের বিরাগ ও অশ্রদ্ধাকেও অগ্রাহ্য করা উচিত, যদি তাহা কোন মহৎ কর্ত্তব্যের অনুসরণ বশতঃ করিতে হয়; কিন্তু টাকার লোভ সেরূপ মহৎ কোন জিনিষ নয়। বৎসরে ৬৪,০০০ বেতন দিবার মত অবস্থা বাংলদেশের নয়।

—

ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কর্ত্তব্য

অনেক দেশের ব্যবস্থাপক সভার কাজের নিয়ম এরূপ, যে, নির্ব্বাচিত সভ্যেরা যে নীতির সমর্থন করিয়া নির্ব্বাচকদের ভোট পাইয়াছেন, সভায় গিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, নির্ব্বাচকরা পুনর্ব্বার নির্ব্বাচনের সময়ের আগে সভ্যদিগকে তাঁহাদের এরূপ আচরণের প্রতিফল দিতে পারেন না। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভা-গুলিরও নিয়ম এইরূপ। যিনি যে দলের লোক বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তিনি যদি সে দল ছাড়িয়া অন্য দলে যোগ দেন, যাহা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহা যদি না করেন, তাহা হইলেও তিন বৎসর তিনি সভ্য থাকিবেনই; নির্ব্বাচকগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারিবেন না। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপরই এখন নির্ভর করিতে হইবে।

সুইট্জার্ল্যাণ্ডে ও অন্য কোন কোন দেশে নির্ব্বাচিত সভ্যেরা এরূপ যথেচ্ছ আচরণ করিতে পারেন না। সেখানে রেফারেণ্ডমের (referendumএর) নিয়ম থাকায়, কোন প্রস্তাব বা আইনের খস্ড়া সম্বন্ধে নির্ব্বাচক-দের মত লওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ, এদেশে কিম্বা বিলাতে যেমন কোন প্রস্তাব বা বিল সভার সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে সভ্যদের মত অনুসারেই তাহা মঞ্জুর

---

practically accepting the Swarajya Party's programme in its spirit, it will be for the party to consider, what its attitude should be. I will not venture to say more."

না-মঞ্জুর হয়, সুইট্জারল্যাণ্ডে তাহা না হইয়া দেশে যে-সব লোক সভ্যদিগকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখেও প্রস্তাব বা বিলটি উপস্থিত করা যাইতে পারে। তাহা করা হইলে দেশের এই-সব লোক যে দিকে মত দেন, তদনুসারেই কাজ হয়।

আমাদের দেশে যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ রেফারেণ্ডমের নিয়ম প্রবর্ত্তিত না হইতেছে, ততদিন সভ্যদের কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং লোকনিন্দার ভয়ের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। সেইজন্য যাঁহারা কৌন্সিল এবং কৌন্সিলের কাজে খুব গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁহাদের স্থানীয় সভাসমিতিতে এবং খবরের কাগজে সভ্যদের ব্যবহারের নিরপেক্ষ সমালোচনা হওয়া খুব দরকার।

ব্যবস্থাপক সভার সমুদায় সভ্যই সমগ্র দেশের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে বাধ্য। তা ছাড়া, যিনি যে স্থানের বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাহার হিতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি তাঁহাকে রাখিতে হইবে।

প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী যত সামান্য ভাবেই আমাদের দেশে থাকুক না, প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর মূল নীতি অনুসৃত হওয়াতেই ব্যবস্থাপক সভাগুলির জন্ম হইয়াছে। সভ্যেরা যে ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে পারিয়াছেন, তাহা ঐ প্রতিনিধিতন্ত্র প্রণালীর জোরে। অতএব সমুদয় নির্ব্বাচিত সভ্যের একটি কর্ত্তব্য এই, দেশের লোকদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার হ্রাস না পাইয়া যাহাতে বৃদ্ধি পায় এই চেষ্টা করা। এখন যত লোক নির্ব্বাচক আছেন, ভবিষ্যতে তাহা অপেক্ষা আরো বেশী লোক নির্ব্বাচক হইলে ভাল হয়। তা ছাড়া, নির্ব্বাচকদের অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকেও সভ্যদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

যাঁহারা মিউনিসিপালিটি হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা না কমে এবং মিনিসিপালিটির আয়ব্যয়ের ও কাজের উপর উহার করদাতাদের ক্ষমতা না কমে—বরং বাড়ে। যাঁহারা ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে যেন বোর্ডের ক্ষমতা না কমিয়া বরং বাড়ে, এবং বোর্ডের আয়ব্যয় ও কাজের উপর করদাতাদের ক্ষমতা না কমিয়া বাড়ে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাহাদিগকে যেমন একদিকে দেখিতে হইবে, যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতার হ্রাস না হয়, তেমনি অন্যদিকে দেখিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর নির্ব্বাচকদিগের ক্ষমতা না কমিয়া আরও বাড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়রূপ নির্ব্বাচনক্ষেত্রের বিষয়ই বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদিগকে নির্ব্বাচন করেন গ্রাজুয়েটগণ। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাজুয়েটের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের উপর পরোক্ষ রকম ক্ষমতাও নাই; বর্ত্তমান নিয়মে থাকিতে পারেও না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য কয়জন সদস্য মাত্র অল্পসংখ্যক গ্রাজুয়েট দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু আইন এরূপ হওয়া উচিত, যাহার বলে অধিকাংশ গ্রাজুয়েট অধিকাংশ সদস্যকে নির্ব্বাচন করিতে পারেন, এবং বিনিপয়সায় কিম্বা মূল্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় মিনিট রিপোর্ট্ আদি পাইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃত সমুদয় কাজ সম্বন্ধে ওয়াকীব্-হাল থাকিতে পারেন। সব প্রদেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের দেখা উচিত, যে, যে গ্রাজুয়েটসমষ্টির ভোটে তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইলেন, সেই গ্রাজুয়েটসমষ্টির বিদ্যালয়ের কাজের উপর ক্ষমতা যেন বাড়ে। গ্রাজুয়েটদের ক্ষমতা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দোষ ঢুকিযাছে। জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ অধ্যাপকমণ্ডলী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ। এরূপ অধ্যাপক যাঁহারা আছেন তাঁহাদের দ্বারা লোকহিত হইতেছে। পণ্ডিতম্মন্য এবং সাহিত্য-চোরদের দ্বারা অনিষ্ট হইতেছে। যিনি অর্থনীতি-বিভাগে নোট লিখাইতে গিয়া "they restored to barter" লিখাইতে চান কিন্তু শেষে ছাত্রদের সংশোধন গ্রহণ করিয়া বলিতে বাধ্য হন, "আচ্ছা বাবারা, 'they resorted to barter'ই লেখ", তদ্বিধ ব্যক্তিও অধ্যাপক আছেন।

মিউনিপালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির ক্ষমতা বৃদ্ধি যাহাতে হয়, তাহা দেখাই প্রতিনিধিদের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। ঐ-সকল প্রতিষ্ঠান যাহাতে নিজনিজ কর্ত্তব্য করেন, একমাত্র দেশহিতেই লক্ষ্য রাখিয়া

কাজ করেন, তদ্রূপ ব্যবস্থা না থাকিলে তাহা প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করাও প্রতিনিধিদের কর্ত্তব্য।

—

নির্ব্বাচন ও গোবধ

স্বরাজ্যদলের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুইই আছেন। গোঁড়া হিন্দুরা গোবধ চান না; মুসলমানের গোবধে আপত্তি নাই—কাহারও কাহারও বরং জেদ আছে যে গোবধ করিতেই হইবে। এ অবস্থায় স্বরাজ্যদল, দল হিসাবে, গোবধ নিবারণ বা প্রবর্ত্তন কোন বিষয়েই কিছু বলিতে পারেন না—বিশেষতঃ যখন তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে ভাঙিতে বা অচল করিতেই সভায় যাইতেছেন, অন্য কিছু কাজ করিতে বা অন্য কোন কাজে বাধা দিতে যাইতেছেন না।

কলিকাতার বড়-বাজারের নির্ব্বাচনে কিন্তু একজন পদপ্রার্থীকে গোভক্ষক ও অন্যকে গোরক্ষক বলিয়া প্রচার করিয়া স্বরাজ্য দল জিতিয়াছেন। অবশ্য জয়ের ইহাই সম্ভবতঃ একমাত্র কারণ নহে। যিনি পরাজিত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের অবিচারিত সমর্থক ও একান্ত খয়েরখা বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি থাকাতেও তিনি লোকের বিরাগভাজন ছিলেন। কিন্তু যে দলের প্রধান প্রধান কোন কোন লোকের সর্ব্ববিধ "নিষিদ্ধ" মাংস-ভক্ষণ সুপরিজ্ঞাত, সেই দলের পক্ষে, "গোজাতি বিপন্ন, দোহাই রক্ষা কর," রব তোলা হাস্যকর। আমরা মৎস্যমাংসাহারী নহি, সুতরাং গোবধেও উৎসাহ নাই, ছাগাদি বধেও উৎসাহ নাই; বরং গবাদি বধ হ্রাস হওয়াই প্রার্থনীয় মনে করি। কিন্তু গোজাতির এবং অন্ততঃ মানবজাতির শিশুদের কল্যাণের জন্যই ইহাও বলা দরকার মনে করি, যে, গোরক্ষক বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিলেই কিম্বা গোরক্ষিণীসভার দলভুক্ত হইলেই গোরুর হিত হয় না। আমাদের এই বাংলাদেশে খাইতে না দেওয়া এবং অন্য নানা প্রকারে যত নিষ্ঠুরতা গোরুর উপর করা হয়, সেই প্রকার নিষ্ঠুরতা গোভক্ষকদের দেশে হয় না। এই কারণে, বাংলাদেশে গোবংশের অবনতি হইতেছে, ভাল গোরু লোপ পাইতেছে। আমরা গোবধ করা মন্দ মনে করি। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুরা ভুলিয়া যান, যে, কেবল জবাই করিলেই গোবধ করা হয় না; অযত্ন করিয়া, প্রহারাদি করিয়া খাইতে না দিয়া গোরুর আয়ু হ্রাস করিলেও গোবধ করা হয়। গোরক্ষা করিবার উৎসাহে দাঙ্গা করিয়া মনুষ্যবধ কেহ কেহ করে; কিন্তু তাহার দ্বারাই প্রমাণ হয় না, যে, দাঙ্গাকারীরা গোরুর খুব যত্ন করেন এবং গোজাতির আয়ুর্বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। গোখাদকের দেশ সুইট্‌জার্ল্যাণ্ড্‌ হইতে টিনের কৌটায় ভরা ঘন দুধ আসে, আর হিন্দু-বাঙালী-প্রধান সহর কলিকাতায় সাত আনায় এক সেরের কম দামে খাঁটি গোদুগ্ধ পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি, গোখাদক লণ্ডন শহরে গোরক্ষক কলিকাতার বড়-বাজার অপেক্ষা সস্তায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায়।

যাহা হউক, স্বরাজ্যদল যখন নিজেকে গোরক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের নিকটে এই দাবী করা অন্যায় হইবে না, যে, তাঁহারা গোবংশের উন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিবেন।

—

জাতীয় উন্নতির উপকরণ

বর্ত্তমানকালে জাতীয় উন্নতির কথা সকলের মুখেই শুনা যাইতেছে এবং অনেকের মনেই এই বিষয়ে নানা প্রকার ধারণা আছে। যে-সকল ব্যক্তি জাতীয় উন্নতির কথা লইয়া চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১। যাঁহারা ভাবেন যে জাতীয় উন্নতি একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থা এবং **বাহিরের বিঘ্ন** না থাকিলেই, স্বভাবের নিয়মের তাড়নায় জাতি উন্নতির পথে ক্রমশঃ আগুয়ান হইবে। ২। যাঁহারা ভাবেন, যে, জাতীয় উন্নতি জাতির কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশীলতার প্রকাশ মাত্র, অর্থাৎ শুধু বাহিরের অন্তরায় দূর হইলেই উন্নতি আপনা হইতে আইসে না, উন্নতি গড়িয়া তুলিতে হয়।

এই দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীতও অনেকে আছেন যাঁহারা উভয় উপায়ই প্রয়োজনীয় মনে করেন; অর্থাৎ ইঁহাদিগের মতে বাহিরের বিঘ্ন দূর হইলে তবেই জাতীয় কর্ম্মকুশলতা ও চিন্তাশীলতা স্বভাবজাত হইতে এ পর্য্যন্ত

লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইঁহারাও কর্ম্মকুশলতা এবং চিন্তাশীলতাকেই জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে বাহিরের বিঘ্ন দূর করা অপেক্ষা উচ্চতর আসন দান করেন, কেননা বিঘ্ন দূর করিতে হইলেও এই দুইটির প্রয়োজন রহিয়াছে।

ধরা যাউক, যে, যে-কোন উপায়ে হউক, বাহিরের লোক আমাদিগের কার্য্যে আর কোন বাধা দিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু বাহিরের বিঘ্ন দূর হইলেই কি দেশের লোকের অকস্মাৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইবে? রাষ্ট্র আপনার হস্তে আসিলেই কি জাতীয় উন্নতি নিশ্চিত হইয়া যায়? স্বাধীন দেশ মাত্রই কি সর্ব্বক্ষেত্রেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আবাসভূমি?

ইহা অবশ্য ঠিক যে সকল দুঃখ, সকল দারিদ্র্য অপেক্ষা পরাধীনতা মানুষকে অধিক পীড়িত করে; কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না, যে, পরাধীনতা শেষ হইলেই সকল দুঃখের অবসান হয়। একটি বিশাল জাতির সুখ দুঃখ নানান্ অবস্থার উপর নির্ভর করে এবং স্বাধীনতা তাহার মধ্যে সর্ব্বারম্ভে প্রয়োজন হইলেও স্বাধীনতাই সব নহে। জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের গুণের উপর নির্ভর করে এবং সেইজন্য জাতীয় স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়—উৎকৃষ্ট শিক্ষক, উৎকৃষ্ট অর্থনীতিজ্ঞ, উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, উৎকৃষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট পণ্ডিত ও উৎকৃষ্ট সাহিত্যকলাবিদ্। এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তিগণই জাতিকে যথার্থ উন্নতির পথে লইয়া যান।

ব্যক্তি যেমন **স্বাধীনভাবে** মূর্খের ন্যায় যথেচ্ছাচার করিয়া জহন্নামে যাইতে পারে, জাতিও তেমনই অথবা আরও দ্রুতবেগে অধঃপতনের পথে আগুয়ান হয়, যদি না তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তি যথেষ্ট থাকেন।

আমাদিগকে দিবারাত্রি স্বাধীনতার কথা ভাবিতে হইবে; কিন্তু ইহাও ভাবিতে হইবে, যে, কি করিয়া আমাদের জাতির সকল লোককে সুশিক্ষা দান করা যায়, কি করিয়া জাতীয় ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়, কি করিয়া ব্যক্তি শক্তিশালী সুস্থ ও বুদ্ধিমান্ হয়, কি করিয়া জাতীয় ধনসম্পত্তি এরূপ ভাবে ব্যবহার করা যায় যাহাতে জাতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য অধিকতম হয়, কি করিয়া জাতির গৃহে গৃহে স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও সুখ শান্তি আনয়ন করা যায়, ও কি করিয়া এই জাতি জগতের জাতিসভাস্থলে উপস্থিত হইয়া বলিতে পারে, "আমারও কিছু দিবার আছে, আমি শুধু লইতে আসি নাই।"

আজকাল দেশে ইংরেজবিদ্বেষের ফলে আত্মদোষ-বিস্মৃত অথবা আত্মদোষকে জোর করিয়া গুণ বলিয়া প্রমাণ করিতে বিশেষ চেষ্টিত লোক দেখা যাইতেছে। যথা, কোথাও কোথাও দেখিতেছি, যে, বাল্যবিবাহ ভাল, হিন্দুনারীর আপনার ঠাকুরমা ও অন্যান্য গুরুজন ব্যতীত জগতের অপর কাহারও নিকট শিখিবার বিশেষ কিছু নাই, আধুনিক শিক্ষা সকলকে অপদার্থ করিয়া দেয়, ইত্যাদি নানা প্রকার মত প্রচার চেষ্টা হইতেছে। **জ্ঞান ও সত্য কোন জাতির নিজস্ব নহে,** তাহা জগতের। আমরা যদি জাতিবিশেষকে না ভালবাসি, তাহাতে বলিবার বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু যদি সেই জাতির মধ্যে ভাল যাহা-কিছু তাহাকেও আত্মশ্লাঘা অথবা অহঙ্কারের খাতিরে বর্জ্জনীয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে তাহা আমাদিগেরই দোষ। উন্নত জাতির জন্য উন্নত ব্যক্তির প্রয়োজন। ব্যক্তি অযোগ্য ও নির্গুণ থাকিলে জাতিও সেইরূপই হইবে। ইহা জানিয়াও যদি আমরা পুরাতনের ভূতের দোহাত্ম্যে জাতীয় উন্নতির পথ ছাড়িয়া অধোগমন করি, তাহা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

বাল্য বিবাহ ভাল কি মন্দ, তাহার বিচার দিদিমা কি বলিয়াছেন, তাহা দিয়া, অথবা কোন ব্যক্তি-বিশেষ বাল্যবিবাহের সন্তান কি না, তাহা দিয়াও হইবে না। বিজ্ঞানকে তাহার উত্তর দিতে বলা হউক।

শিক্ষিতা নারী অশিক্ষিতা অথবা অল্পশিক্ষিতা অপেক্ষা অধিক কর্ম্মকুশল ও উপযুক্ততর মাতা কি না, তাহার উত্তর **সত্য জীবন** হইতে পাওয়া যাইবে। জাতীয় ধনসম্পত্তির উৎপাদন-কার্য্য ও তাহার সম্ভোগ যথাযথরূপে হইতেছে কি না, তাহাও চক্ষু খুলিয়া দেখা হউক এবং তাহার প্রতিকার প্রয়োজন ও সম্ভব হইলে, সেই চেষ্টা করা হউক। **আধুনিক** শিক্ষার

দোষ ধরিবার পূর্ব্বে দেখা হউক ব্যাপারটি আধুনিক হইলেও **শিক্ষা** কি না এবং তাহা না হইলে যথার্থ আধুনিক শিক্ষার উপকারিতা আছে কি না বিচার করিয়া উপযুক্ত বোধ হইলে সেইরূপ ব্যবস্থা করা হউক।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে চীৎকার ও আস্ফালন একটু অতিরিক্ত মাত্রায় হইতেছে। যে জাতির লোকেরা ক্ষুধার অন্ন, শীত ও লজ্জানিবারণের বস্ত্র, রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা, সামাজিক উৎপীড়নের প্রতিকার, অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক ও নিরাশায় আশার চিহ্ন কোথাও পায় না, সে দেশের লোকের উদ্দামতা ও বড়াই করা ত্যাগ করিয়া স্থির চিত্তে সকল দিক্ দেখিয়া সত্য অবলম্বন করিয়া নূতন পুরাতন সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে নূতন ও উৎকৃষ্টতর জাতি গঠনের দিকে মন দেওয়া উচিত। অ

—

লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল

ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা বাহিরের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাহিরের প্রতিযোগিতা সর্ব্বক্ষেত্রে সুনীতিসঙ্গত ভাবে চলিতেছে না, এবং ভারতের লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাও নূতন বলিয়া নবজাত শিশুর ন্যায় পরিণতবয়স্ক কারবারের সহিত প্রতিযোগিতায় বর্ত্তমানে সক্ষম নহে। শিশুকে যেমন বয়স্কের সহিত ধস্তাধস্তি করিতে দিলে তাহা, প্রথমত, নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হয়, ও, দ্বিতীয়ত, শিশু পরাস্ত হইলেও তাহাতে তাহার কোন প্রকার অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না; সেইরূপ যে-সকল জাতীয় ব্যবসা নূতন আরম্ভ হইয়াছে সেই-সকল ব্যবসাকে বাহিরের ব্যবসাদারের হস্ত হইতে রক্ষা না করিলে নির্ব্বোধের ন্যায় জাতীয় অপকার সাধন করা হয় এবং নবজাত ব্যবসা পরিণতবয়স্ক ব্যবসার সহিত প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইলেও তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ হয় না।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা ভারতবর্ষে খুবই ভালমতে গড়িয়া উঠা উচিত। পুরাতন কালে ভারতের উক্ত ব্যবসাতে কি প্রকার প্রতিপত্তি ছিল, তাহার বর্ণনা ছাড়িয়া দিলেও, দেখা যাইতেছে, যে, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিবার প্রাকৃতিক উপকরণ ভারতে যথেষ্ট রহিয়াছে ও এরূপ সহজলভ্য ভাবে রহিয়াছে, যে, তাহা ব্যবহার করা খুবই সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য। প্রধান উপকরণ অসংস্কৃত খনিজ লৌহ এবং কয়লা ভারতে প্রচুর ও পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থানে পাওয়া যায়। ইহা একটি খুবই সুবিধাজনক অবস্থা।

কিন্তু লৌহ ও ইস্পাতের কারবার ভাল করিয়া করিতে হইলে আরো কতকগুলি বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। এইগুলির অভাবে ব্যবসার লাভ কমিয়া যায় অথবা খরচ বাড়িয়া যায়। এই-সকল অবস্থা, কিছুকাল ধরিয়া ব্যবসা না চালাইলে আইসে না এবং সেই কারণেই লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা প্রথম প্রথম অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থাপিত পরজাতীয় কারবারের হস্ত হইতে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

এই-সকল সুবিধাজনক অথবা অবশ্যপ্রয়োজনীয় অবস্থার মধ্যে প্রধান—পর্য্যাপ্ত মূলধন, উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ও পরিচালনা এবং উপযুক্তরূপ শিক্ষিত শ্রমজীবী। ভারতবর্ষে তিনটির কোনটিই বর্ত্তমানে নাই। এই ব্যবসাতে পর্য্যাপ্ত মূলধন অর্থে যাহা বুঝায় তাহা ভারতের কোন কারবারের নাই। একটি ভাল রকম লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা চালাইতে হইলে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে শুধু একটি কারখানা চালাইয়াও যথেষ্ট অল্প খরচে এই ব্যবসা চালান সম্ভব হয় না। অনেকগুলি কারখানা এক পরিচালনার অধীনে চলিলে অনেক সুবিধা হয়। উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ও পরিচালনা বহু পরিমাণে উপযুক্ত মূলধনের উপর নির্ভর করে; কিন্তু তাহা ব্যতীতও (ভারতে দুর্লভ অথবা বহুব্যয়লভ্য) বিশেষরূপে শিক্ষিত কর্ম্মচারীর অভাবে পরিচালনা নিকৃষ্ট হয়। শ্রমজীবীগণ শিক্ষিত না হইলে এই ব্যবসাতে বিশেষ অসুবিধা হয়। অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত শ্রমজীবীর সাহায্যে কার্য্য চালাইতে হইলে লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনব্যয় অতিরিক্ত হইয়া পড়ে এবং সেই কারণে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা কঠিন হইয়া আসে। কিন্তু শ্রমজীবীকে শিক্ষাদান এইক্ষেত্রে বিশেষ কষ্টসাধ্য। লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় যে-সকল শ্রমজীবী কার্য্য

করে, তাহাদিগের কার্য্যদক্ষতা প্রায় পুরুষানুক্রমিক। অর্থাৎ অল্পবয়স হইতে এইরূপ কার্য্যের আবহাওয়ায় মানুষ না হইলে উপযুক্তরূপ দক্ষতালাভ সম্ভব হয় না। এবং ভারতে সেরূপ সুবিধাজনক শিক্ষার উপযুক্ত অবস্থা প্রায় ২৫।৩০ বৎসর ধরিয়া এইরূপ কারখানা না চলিলে হইবে না। ততদিন ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের কারবারে শ্রমজীবীর খরচ কিছু অধিক হইবে।

বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষিত হইলে এই ব্যবসাতে মূলধন আরও সহজে ও অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে; কেন না সংরক্ষিত ব্যবসা অধিক লাভজনক হয়। ফলে বন্দোবস্ত ও পরিচালনা উৎকৃষ্টতর হওয়া সম্ভব হইবে এবং কিছুকাল পরে উচ্চ কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবীর খরচও কমিয়া আসিবে। তখন সংরক্ষণ ব্যতীতও এই ব্যবসা দাঁড়াইতে পারিবে। বাহিরের প্রতিযোগিতা শুধু যে বয়সজনিত শক্তিতে শক্তিশালী তাহা নহে। বাহিরের কারবারীর মূলধন অধিক, বন্দোবস্ত ও পরিচালনা উৎকৃষ্টতর এবং (কার্য্যের তুলনায়) শ্রমিক অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়লভ্য; কিন্তু ইহা ব্যতীত **সাময়িক** ধরণের কতকগুলি সুবিধায় তাহাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রথমতঃ, অনেক বাহিরের ব্যবসাদারের কলকব্জা যন্ত্রপাতি যুদ্ধের সময়ের অত্যধিক লাভের পয়সায় খরিদ করা। ফলে তাহাদের উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে কলকব্জা- ও যন্ত্রপাতি-ঘটিত ব্যয় ভারতের ব্যবসাদারের তুলনায় অতিশয় অল্প।

দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন দেশের গবর্ণমেণ্ট লৌহ ও ইস্পাতের কারবারীকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। যথা, বেলজিয়ামের কারবারী প্রতি টন লৌহ ও ইস্পাত **রপ্তানির** জন্য ৩০ ফ্রাঙ্ক করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য লাভ করে। কোন কোন দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার এত অস্বাভাবিক-রকম অল্প, যে, সেই-সকল দেশের ব্যবসাদার পরের দেশে জিনিষ বিক্রয় করিতে কোনই কষ্ট পায় না। দেশের মুদ্রা অপর জাতীয় মুদ্রার বিনিময়ে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিলে যে ক্ষতি হয় তাহা সমস্ত জাতির ক্ষতি; অর্থাৎ এইরূপ নিচু হারে মুদ্রা বিনিময় করিয়া জাতির সকল লোক রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জন্য ক্ষতি স্বীকার করিতেছে। ইহাও এক-প্রকার গবর্ণমেণ্টের সাহায্য বলিলেও চলে।

বিশাল-আকার কারখানা ও অসংখ্য দ্রব্য একত্রে প্রস্তুত করিলে দ্রব্য-পিছু খরচ কম হয়। অর্থাৎ ১০০টি জিনিষ করিতে জিনিষ-পিছু যাহা খরচ হয়, ১ লক্ষ জিনিষ করিতে তাহা অপেক্ষা জিনিষ-পিছু অনেক অল্প খরচ হয়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত মূল্যে যে-পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষাও অধিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়; এবং উপযুক্ত মূল্যে যাহা বিক্রয় হয় তাহা বিক্রয় করিয়া বাড়তি যাহা-কিছু তাহা জলের দরে দূর দেশের বাজারে ছাড়া হয়। ইহাকে পরের স্কন্ধে বাড়তি চাপান বলা যায়। অথবা শুধু বোঝাই-করা বলিলেও চলে (Dumping —গাদা করা)। ইহাতে মোট লাভ অধিক হয় এবং অনেক স্থলে দূর দেশের ব্যবসাদারকে এইরূপ দুষ্ট প্রতিযোগিতায় ঘায়েল করিয়া অবশেষে তাহার বাজারে চড়াও করিয়া বসিয়া একাধিপত্যের জোরে অধিক মূল্য হাঁকিয়া, পূর্ব্বকার অল্প মূল্যে জিনিষ বিক্রয়ের ক্ষতি (?) সুদে আসলে পোষাইয়া লওয়া হয়।

বিদেশীর সুবিধার খাতিরে ভারতে সংরক্ষণ-নীতির আদর না থাকায় **ভারতবর্ষ সারা জগতের বাড়তি মাল ছাড়িবার বাজার।** ইহার ফলে ভারতের ব্যবসাদার দুষ্ট প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইরূপ নানান্ কারণে ভারতবর্ষের লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসাদারগণ লৌহ ও ইস্পাতের উপর সংরক্ষক মাশুল বসাইতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। লৌহ ও ইস্পাত সকলপ্রকার আধুনিক কারবার ও কারখানার ভিত্তিগত ব্যবসা (Basic Industry)। যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা না থাকিলে বর্ত্তমান জগৎ অচল হইয়া যাইবে এবং যন্ত্র ও কলকব্জার মূলে রহিয়াছে লৌহ ও ইস্পাত। সুতরাং যাঁহারা আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে চান, তাঁহারা

সর্ব্বাগ্রে এই ব্যবসাটিকে গড়িয়া তোলা প্রয়োজন মনে করেন। ভারতের দারিদ্র্যের মূলে রহিয়াছে মানুষের শ্রমের অব্যবহার ও দুর্ব্ব্যবহার। এই দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে প্রয়োজন, সকলকে কার্য্যে লাগান ও সকলের শ্রম যথাযথ ব্যবহার করা। কিন্তু সকল-প্রকার কারখানাজাত দ্রব্য আমরা আমাদিগের এক মাত্র সম্বল প্রকৃতির দানের পরিবর্ত্তে বাহিরের ব্যবসা-দারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। ফলে আমাদিগের নিজের খাদ্যের অনটন ঘটে এবং দেশের অর্দ্ধেক লোক শ্রমশক্তির অব্যবহার অথবা কুব্যবহার করিয়া অর্দ্ধাহারে ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় কালযাপন করে। সকলপ্রকার কারখানার সৃষ্টি এদেশে একান্ত আবশ্যক। কারখানার সৃষ্টি বলিতে যেন কেহ তৎক্ষণাৎ নিকৃষ্ট ও শ্রমজীবী-উৎপীড়নের লীলাভূমি কারখানার কথা না ভাবেন। **কারখানাও সকলের জন্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় হয় ও হইতে পারে।** আমাদের লক্ষ্য সেইরূপ কারখানা—বিলাতী ধরণের অথবা আমেরিকান্ ধরণের কোন বন্দোবস্তের প্রতি আমাদের টান নাই।

লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসা সফল না হইলে এই নবযুগ ভারতে আসিবে না এবং সেইজন্যই এই ব্যবসা-টিকে সর্ব্বাগ্রে বাড়াইয়া তোলা আবশ্যক। একবার দাঁড়াইয়া গেলে আপনার শক্তিতেই ইহা জগতের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে; কিন্তু দাঁড়াইতে সময় লাগিবে এবং সেইজন্য সাময়িক-ভাবে এই ব্যবসাটিকে সংরক্ষণ করা উচিত। কি পরিমাণ মাশুল বসাইলে বিদেশী লৌহ ও ইস্পাত ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অক্ষম হইবে, আমরা তাহার আলোচনা করিব না, কেন না, তাহার আলোচনা বিশেষজ্ঞের কার্য্য। কিন্তু ইহা বলা যায় যে মূল্য ধরিয়া শতকরা ২০ টাকা মাশুলের কমে কিছু কাজ হইবে না। তাতার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার মালিকগণ শতকরা ৩০এরও অধিক মাশুল প্রয়োজন মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে বে-বন্দোবস্ত ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগ শুনা যায়।

একদল ইংরেজ লৌহ ও ইস্পাতের সংরক্ষণ প্রয়োজন মনে করে না। তাহাদের মতে ইহাতে লৌহ ও ইস্পাতের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া সকল ব্যবসায়ের অনিষ্ট হইবে। কিন্তু তাহারা একথা বলে নাই, বলিতে পারিবেও না, যে বাহিরের ব্যবসাদার চিরকাল ধরিয়া অল্পমূল্যে উক্ত দ্রব্য-গুলি ভারতকে সরবরাহ করিবে। দেশীয় ব্যবসাদার প্রতি-যোগিতার বাহিরে চলিয়া গেলে, বিদেশীরা পুনর্ব্বার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অন্যান্য কারণে ব্যয় বৃদ্ধি হইলে যখন আমাদিগের নিকট বিদেশী ব্যবসাদার পুরামাত্রার দাম এবং তাহারও উপর কিছু আদায় করিয়া লইবে, তখন এই-সকল ইংরেজ আমাদিগকে রক্ষা করিবে না। ইয়োরোপীয়গণ পুনর্ব্বার যুদ্ধে লিপ্ত হইলে যখন আমাদিগের লৌহ ও ইস্পাত জুটিবে না, তখনও ইহারা আমাদিগকে রক্ষা করিবে না।

আমাদের আশা আছে, যে, সময়ে ভারতেই যথেষ্ট ও সস্তায় ইস্পাত ও লৌহ প্রস্তুত হইবে। তখন আমরা নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াইতে সক্ষম হইব। এই-সকল ইংরেজ তাহাতে বিশ্বাস করে না। কেনই বা করিবে? ইংরেজ আজ জগতে লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে অন্যজাতীয়ের নিকট পরাস্ত। ভারত তাহার শেষ আশা। তাহার পক্ষে এদেশে যথেচ্ছ মূল্যে যাহা খুসী বিক্রয় করা চলে। ইহা আমাদিগের **প্রকৃত দাসত্ব**।

বাস্তবিকও ভারতবর্ষে লৌহ ও ইস্পাত এবং তন্নির্ম্মিত জিনিষ বিদেশ হইতে যত আসে, তাহার অধিকাংশ বিলাত হইতে আসে। এমন লাভের ব্যবসা ইংরেজ ছাড়িবে কেন? সংরক্ষক মাশুল বসিলে ইংরেজের এই লাভের ব্যবসা যাইবে বলিয়াই ইংরেজেরা সংরক্ষক মাশুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।

অ

—

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

শরীরধারণের জন্য যে কয়টি জিনিষের প্রয়োজন, মানুষ তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করে। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও বস্ত্রের অভাব হইলে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। তাই এই কয়টি জিনিষের কথা মানুষের মনে সবার আগে আসে। জগতে জন্মলাভ করিয়া মানুষ জীবনটাকে

নানাদিক্ দিয়া উপভোগ করিতে চায় বলিয়া শরীরটা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ; আধ্যাত্মিক, মানসিক বা শারীরিক যে-কোনো প্রকার আনন্দই চাই না কেন, শরীরটা ভাল না থাকিলে কোনটাই গ্রহণ করা যায় না। একথা আমরা সকলেই জানি কিন্তু অনেকেই জানি না এবং মানি না, যে, শরীরটাকে কেবলমাত্র কোন প্রকারে রক্ষা করিলে শুধু যে জীবনের বহু আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা নহে, জীবনটাই অনেক স্থলে নিজের ও পরিবার-প্রতিবাসীর কাছে একটা নিরানন্দের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

আনন্দই মানুষেব জীবনের কেন্দ্র। আমরা জ্ঞান-পিপাসা, লোক-হিতৈষণা, স্বদেশ-প্রীতি, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, ভগবৎভক্তি বা আর যে-কোনা নামেই মানুষের জীবনের কর্ম্মপ্রেরণাকে অভিহিত করি না কেন, সকলের মূলেই আনন্দ রহিয়াছে। এই আনন্দ-রস আকণ্ঠ পান করিতে হইলে সুস্থ দেহ ও মনের প্রয়োজন। সুস্থ মনও বহু পরিমাণে সুস্থ দেহের উপরই নিভর করে। সুতরাং এক দিক্ দিয়া বলা যাইতে পারে, মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী তিনি যিনি মানুষকে সুস্থ শরীর ধারণ করিতে সক্ষম করেন। মানুষের জ্ঞান, প্রেম, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রভৃতির সহিত মানুষের দেহের প্রতি শিরা, স্নায়ু, অস্থি, মাংস, চর্ম্ম, পেশী, মেদ ও রক্তকণা প্রভৃতির যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহা বুঝিলে দেখা যায়, যে, শরীর সর্ব্বাংশে সুস্থ, পূর্ণতা-প্রাপ্ত ও আদর্শানুরূপ হইলে মানুষের মানসিক গুণাবলীও পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায়।

সুতরাং মানুষের সমাজে চিকিৎসকের স্থান অতি উচ্চ স্থান, এবং তাঁহার কর্ত্তব্যও অতি উচ্চ দরের। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, যে, চিকিৎসকের যাহা মুখ্য কর্ত্তব্য তাহা অপেক্ষা গৌণ কর্ত্তব্যের দিকেই তাঁহার নিজের ও সাধারণ মানুষের নজর বেশী। কি করিয়া সুস্থ দেহ লইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিতে পারে এবং বড় হইয়া আজীবন সুস্থ জীবন যাপন করিতে পারে সেই উপদেশ মানুষকে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, রোগীকে নীরোগ করার কর্ত্তব্য দ্বিতীয়স্থানীয়। কারণ রোগ একবার হইলে জীবনের যে কয় দিন মানুষ রোগ ভোগ করে সে কয়টা দিন জীবনের আনন্দলাভ হইতে বঞ্চিত ত সে হয়ই, তা ছাড়া ভবিষ্যতেও তাহার শরীর আর আদর্শ শরীর না থাকিতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমানে চিকিৎসক ও জনসাধারণের মধ্যে যে চুক্তি আছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লই, তাহাতে চিকিৎসকের মুখ্য কর্ত্তব্যটির দেখাও আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আমরা জানি, গৃহে কাহারও রোগ হইলে টাকা দিয়া ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য থাকিলে তিনি আসিয়া রোগীকে নিরাময় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য। কিন্তু রোগ না হইবার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। যদি কোনো দেশে এমন ব্যবস্থা থাকিত যে সুস্থ মানুষ বছরে কিম্বা মাসে চিকিৎসককে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিবে এবং পীড়িত হইয়া পড়িলে ডাক্তার বিনা পয়সায় চিকিৎসা ত করিবেনই, উপরন্তু ডাক্তারের কোনো ত্রুটি ধরা পড়িলে অর্থদণ্ড দিবেন, তাহা হইলে ডাক্তারের মুখ্য কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টিটাই প্রথমে যাইত।

এই রকম নিয়ম হয়ত বর্ত্তমানের অতি জটিল-জীবন-যাত্রা-পথের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অন্যান্য আর কয়েকটা নিয়ম সকল দেশেই থাকা উচিত। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য অনেক দেশে ধনী ও দরিদ্র উভয়কেই সমান অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইতে হয়। মানুষের স্বাস্থ্য কিম্বা জীবনের মূল্য ধনের আধিক্য কিম্বা স্বল্পতার উপর নির্ভর করে না। ধনীর স্বাস্থ্যহানি হইলে তাঁহার যতখানি দুঃখ ও ক্ষতি হয়, দরিদ্রের তাহা অপেক্ষা কম ত হয়ই না, অনেক সময় বেশীই হয়। সুতরাং নিজ স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসককে পাইতে ইচ্ছা দরিদ্রেরও হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অর্থাভাবে দরিদ্রকে হয় কুড়ানো উপদেশেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, নয় চিকিৎসকের করুণার উপর নির্ভর করিতে হয়। মানুষকে অন্যের করুণার ভিখারী হইতে বাধ্য করিলে তাহার আত্ম-মর্য্যাদার লাঘব করা হয়। তাই "ইন্‌কম্ ট্যাক্সে"র মত প্রতি রোজগারী মানুষের আয় অনুযায়ী একটা ডাক্তারের "ফী" নির্দ্দিষ্ট থাকিলে তাহাকে কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া

থাকিতে হয় না। নিজ আয় অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ একটা অর্থের বিনিময়ে প্রত্যেক মানুষ যদি বৎসরে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বার সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা নিজ নিজ শরীর পরীক্ষা করাইবার ও স্বাস্থ্যপালন ও উন্নতির উপদেশ পাইবার অধিকারী হয়, ত, সুস্থদেহের আনন্দ মানুষের পক্ষে বহু সুলভ নয়। "ইন্‌কম্‌ট্যাক্স" যেমন অতি অল্প আয়ের মানুষকে দিতে হয় না, তেমনি অতি অল্প আয়ের মানুষের এই নির্দ্দিষ্ট ডাক্তারের ফীটাও বাদ যাওয়া উচিত। বিনা ফীতেই বৎসরে কয়েকবার ডাক্তারের পরামর্শ পাইবার অধিকার তাহাদের থাকিবে। নীরোগ অবস্থাতে ডাক্তারকে ডাকিতে এখনও মানুষ পারে, কিন্তু তাহাতে অর্থব্যয় রোগচিকিৎসার সমানই করিতে হয়। অতএব রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগ নিবারণের চেষ্টা, সুস্থ থাকার চেষ্টা, সুলভে হওয়ার ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এই ব্যবস্থাগুলি চিকিৎসক ও রোগ্‌গ্রাহী জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে করিতে পারেন। তা ছাড়া অন্যান্য অনেক দেশের মত সরকারের তরফ হইতেও বিনা পয়সায় কিম্বা নির্দ্দিষ্ট পয়সার বিনিময়ে সর্ব্বদা চিকিৎসা পাইবার এবং বিশেষ করিয়া রোগ নিবারণ করিবার ও পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লাভের অধিকার মানুষকে দেওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসককে নির্দ্দিষ্ট একটা বেতন দিয়া কোন পল্লী কি গ্রামের ভার দিয়া এই সর্ত্ত করা যাইতে পারে, যে, বৎসরের শেষে সেই পল্লী বা গ্রামের স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ অনুসারে তাঁহাকে আরো অর্থ দেওয়া হইবে। তাঁহার পল্লীতে যত কম মানুষের মৃত্যু হইবে, যত রোগীর সংখ্যা কম হইবে, যত আদর্শ সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা বেশী হইবে, ততই তাঁহার আয় বাড়িতে থাকিবে।

কিন্তু তাহা না হইয়া বর্ত্তমানকালে যত রোগের মড়ক হয়, যত স্বাস্থ্যভঙ্গ ও অঙ্গহানি হয়, ততই চিকিৎসক সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন। শ

—

শিশুর জীবনে পুস্তকের স্থান

ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিবার নানা উপায় আনন্দ দেওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে "চাইল্ড্‌ ওয়েল্‌ফেয়ার" পত্র বলিতেছেন :—

"শিশুকে যতরকম উপহার দেওয়া যাইতে পারে, তাহার মধ্যে পড়িবার অভ্যাসের মত বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে আনন্দদায়ক এবং জীবন সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে সক্ষম উপহার আর কিছু নাই। শিশুকে যদি পড়িবার অভ্যাস করাইতে পার, এবং ভাল মন্দ দেখিয়া ঠিক্ পথে সেই অভ্যাসটি চালাইতে শিখাইতে পার, তবে তাহাকে চিরকৃতজ্ঞ রাখিবার উপযুক্ত কিছু একটা সম্পদ্ দান করা হইবে।

"পুস্তক শিশুর জীবনের নিত্য সঙ্গী হওয়া উচিত। কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই পুস্তকাবলীর সম্পর্ক অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলা উচিত নয়। পড়াটা যে একটা কর্ত্তব্য, একটা বোঝা, এই ধারণা শিশুর মনে হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। পড়িয়া যে মজা ও আনন্দ পাওয়া যায়, সুখে সময় কাটানো যায়, এই বিশ্বাসটাই মনে ভাল করিয়া বসাইয়া দিতে হইবে। পড়াটা যেন শিশুর কাছে বাস্তবিক সুখকর হয়, তাহা হইলেই দিনের মধ্যে পড়িবার সময়টা তাহার কাছে প্রার্থিত সম্পদের মত মনোহর বোধ হইবে। এটা করা বাস্তবিক কিছু শক্তও নয়। পুস্তকে বাস্তবিকই মজা ও আনন্দ আছে। জগতে যেমন বিচিত্র মন বিচিত্র আনন্দ খোঁজে, তেমনি বিচিত্র পুস্তক বিচিত্র আনন্দ জোগায়। বালক কি বালিকার জীবনের এমন কোন কাজ কি জিনিষই নাই বলা যায়, যাহার ক্ষেত্রকে পুস্তকের পাতার মধ্যে আনিয়া ফেলা যায় না। এমন কোন সুখস্বপ্ন নাই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই যাহাতে পুস্তক সাহায্য করিতে না পারে ; শিশুর জীবন ত স্বপ্ন ও উচ্চাভিলাষেরই মেলা। পুস্তক শত শত পথ দিয়া শিশুজীবনের আনন্দ বাড়াইয়া তুলিতে পারে।" শ

—

সুশিক্ষিতা পরিচারিকা

অনেকের ধারণা "মেম্‌সাহেব্‌রা" নিজগৃহেরও কোনো

কাজে কাল কাটাইয়া দেন। কিন্তু বাস্তবিক নিজ নিজ গৃহকর্ম্ম ত আজকালকার অভাবের দিনে অনেকেই করেন, তা-ছাড়া পরের কাজও যে করেন, তাহার প্রমাণ ১০ই নবেম্বরের টাইমস্ এডুকেশান্যাল সাপ্লিমেণ্ট্ দেখিতে পাই।—

"ডেম্ মেরিয়েল্ ট্যাল্‌বট্, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের নারীসমিতির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তিনি লণ্ডনে অষ্ট্রেলিয়ান্‌দের কোনো সভায় অতিথিরূপে আসিয়া বলিয়াছিলেন, যে, যদিও ইংলণ্ডে চাকরচাকরানীর অত্যন্ত অভাব দেখা যায়, তবু উপনিবেশসমূহের অভাবের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। তিনি বলেন, পনেরটি ইংরেজ বালিকা শীঘ্রই সমুদ্রপারে চাকরানীর কাজ করিতে যাইবেন, ইঁহারা সকল দিক্ দিয়াই ইংরেজ রমণীদের গৌরবের বস্তু। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেল্টেন্‌হ্যাম্- ও গার্টন্-কলেজের ছাত্রী। দেশে ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র নাই বলিয়া ইঁহারা বিদেশে যাইতেছেন।"

শ

—

অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গত অগ্রহায়ণ মাসে, বাংলা ও ইংরেজী পাটীগণিতের প্রণেতা বলিয়া বাংলা এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে সুপরিচিত অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এম্-এ পাস্ করিবার পর কলিকাতায় সিটিকলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সেখান হইতে তিনি আলিগড় কলেজের গণিতের অধ্যাপক হইয়া যান। আলিগড়ে তিনি আটাশ বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া হিন্দুমুসলমান সকলের প্রীতি অর্জ্জন করেন ও যশস্বী হন। অনেক নামজাদা ও বিদ্বান্ মুসলমান তাঁহার ছাত্র। তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ মৌলানা শৌকৎ আলি ও মৌলানা মহম্মদ আলি অন্যতম। যাদববাবুকে বাল্যকালে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মৈমন্‌সিংহে যখন তিনি এক আত্মীয়ের বাসায় আশ্রয় পাইয়া হার্ডিং মিড্‌ল্ স্কুলে ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার বয়স বার বৎসর। সেই বয়সে আরো কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে পালা করিয়া তাঁহাকে সেই



অধ্যাপক যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আত্মীয়ের বাসায় সমস্ত পরিবারের রন্ধন করিতে হইত। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন সংগ্রাম কঠোরতর হইয়া উঠে। দুটি ভাই, দুটি ভগিনী, ও মাতা, পাঁচজনের ভার তাঁহার উপর পড়ে। যাহা হউক, তিনি বহুকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পান। তাহার পর অবৈতনিক ছাত্র হইয়া ও গৃহশিক্ষকতা করিয়া তিনি কঠোর শ্রম দ্বারা এণ্ট্রেন্‌স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান। ইহার পরও বরাবর বৃত্তি পাইয়া তিনি এম্-এ পর্য্যন্ত পাস্ করেন। "শেষ জীবনে সম্পদ্‌লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ পাইয়া তিনি দরিদ্রের দুঃখমোচনে চিরযত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলি তিনি প্রার্থী যে-কোন গরীব ছাত্রকে বিনামূল্যে দান করিতেন।" মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

—

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদপত্রলেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব লিপিদক্ষতা ছিল। তিনি বাংলা, ইংরেজী, ও

হিন্দী তিন ভাষায় কাগজ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক সব রকম কাগজের সম্পাদকতা তিনি করিয়াছিলেন। সংবাদপত্র সম্পাদন ও তাহাতে লেখা ছাড়া তিনি উপন্যাসও লিখিয়াছিলেন। বাংলা-ভাষায় একখানি সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসও তিনি লিখিয়া-ছিলেন। তাহা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ উৎপাদন করিবে, এই ওজুহাতে গবর্ণমেণ্ট্ তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন।

—

ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর বেতনবৃদ্ধি

ভারতবর্ষের সরকারী চাকরীগুলি দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—সামরিক ও অসামরিক। অসামরিক চাকরীগুলি আবার দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—সাম্রাজ্যিক বা সমগ্রভারতীয়, এবং প্রাদেশিক। সাম্রাজ্যিক বা সমগ্রভারতীয় অধিকাংশ চাকরীতে ইংরেজরা নিযুক্ত আছেন। এই চাকুরেদের অধিকাংশকে সচরাচর সিভি-লিয়ান্ বলা হয়। ইহাঁরা কলেক্টর্, জজ্, মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি হন, এবং কখন কখন অন্যান্য বিভাগের বড় কাজগুলিও ইহাঁরা দখল করেন।

যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধের পর জিনিষপত্রের দাম বাড়ায় অন্যান্য সকল লোকের খরচ যেমন বাড়িয়াছে, চাকুরেদেরও খরচ তেমনি বাড়িয়াছে। কিন্তু বড় চাকুরে যারা, তাদের তেমন কিছু কষ্ট হয় নাই যেমন ভারতের বহুকোটি গরীব সাধারণ লোকদের হইয়াছে। ইংরেজদের মধ্যে যাঁহারা বলেন, যে, ভারতবর্ষ ক্রমশঃ ধনী হইতেছে তাঁহারাও সচরাচর ভারতবাসীর গড় আয় জনপ্রতি বার্ষিক পঞ্চাশ-ষাট টাকার বেশী বলেন না। কিন্তু অনেক লোকের বাৎসরিক আয় পঞ্চাশ-ষাট অপেক্ষা বেশী; সুতরাং গড় আয় পঞ্চাশ-ষাটের মানে এই, যে, বিস্তর লোকের আয় পঞ্চাশ-ষাটেরও কম, কাহারও কাহারও কোন আয়ই নাই। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে পরান্ন-জীবীর সংখ্যা খুব বেশী। যাহা হউক, ৫০।৬০ টাকার কম আয়ের লোক এদেশে বহুকোটি আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ সামান্য পেয়াদা চাপরাসী কনষ্টেবলের বার্ষিক বেতন পঞ্চাশ-ষাটের অধিক—উপরি পাওনাটা ছাড়িয়াই দিলাম। সুতরাং ইহা খুব জোর করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, জিনিষপত্র মহার্ঘ হওয়ায় এদেশে অনেক কোটি সাধারণ লোকের যেরূপ কষ্ট হইতেছে, নিম্নতম শ্রেণীর সরকারী চাকুরেদেরও সেরূপ কষ্ট হয় নাই। উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম চাকুরে-দের অন্নবস্ত্রের কষ্ট ত নিশ্চয়ই হয় নাই, উদ্বৃত্ত ও সঞ্চয় পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়াছিল মাত্র। কিন্তু যে বহু কোটি লোক কাহারও চাকুরে নয়, তাহারা ত কাহাকেও বলিতে পারে না, "আমাদের খরচ বাড়িয়াছে, অতএব আয় বাড়াইয়া দাও।" কিন্তু যাহারা সরকারী চাকুরে তাহারা তাহাদের মনিব গবর্ণমেণ্ট কে বলিয়াছিল, "বেতন বাড়াইয়া দাও।" বেতন বৃদ্ধি এবং ছুটি ও পেন্‌স্যনাদির সুবিধার জন্য চীৎকার উচ্চতম শ্রেণীর চাকুরেরা অর্থাৎ সমগ্র-ভারতীয় চাকুরেরা (যাহাদের অধিকাংশ ইংরেজ) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়াছিল। তদনুসারে তাহাদের বেতনাদি বৃদ্ধি এক দফা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে তাহারা যুদ্ধের আগেকার সময়ের চেয়ে মোটামুটি শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী পাইতেছে। কিন্তু এই অসামরিক উচ্চতম চাকুরেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহে। তাহারা এরূপ গোলমাল করিতে থাকে যেন তাহাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। তাহাদের মতে দারিদ্র্যই তাহাদের একমাত্র দুঃখ নহে। নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, তাহারা বলে, তাহাদের ক্ষমতা মান ইজ্জৎ প্রভাব কমিয়াছে, কৈফিয়ৎ দিতে হয় বেশী, লোকে সমালোচনা করে বেশী, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে কিনা, পেটে খাইলে পিঠে সয়, এই নীতি অনুসারে তাহারা বেশী টাকা পাইলে এইসব অত্যাচার সহ্য করিতে রাজী আছে!

এই প্রকার সোরগোল হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট্ তাহাদের (অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহারা নিজেই নিজেদের) দুঃখ-দুর্দ্দশার বিষয়ে তদন্ত করিয়া প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission) বসাইয়াছেন। লর্ড লী তাহার সভাপতি বলিয়া তাহার নাম লী কমিশন। ইহার সভ্যেরা ভারতের সব প্রদেশে সাক্ষ্য লইয়া বেড়াইতেছেন।

অসামরিক সমগ্রভারতীয় চাকরোদের বেতন বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে দেখিয়া সামরিক অফিসারেরাও আগেই কাঁদুনী গাহিয়া রাখিয়াছেন, "উহাদিগকেই যদি সব দিয়া দাও, তাহা হইলে আমরা কি পাইব?" অতএব, ইহা নিশ্চিত, যে, অসামরিক বড় চাক্‌রোদের বেতনাদি বাড়া স্থির হইয়া গেলেই সামরিকেরা নিজেদের দাবী খাড়া করিবেন।

এদিকে আর-একটা কথাও যুদ্ধের সময় ও পরে উঠিয়াছে, যে, সিভিল সার্ভিসের জন্য যোগ্যতম ব্রিটিশ যুবকেরা আর পরীক্ষা দেয় না। তাহার কারণ এই বলা হইতেছে, যে, খরচের তুলনায় সিবিলিয়ানদের বেতন এখন আর আগেকার মত নাই এবং তাহাদের সুখ সুবিধা প্রভাব কর্তৃত্ব কমিয়াছে। কিন্তু অন্য যে-সব কারণ আছে, তাহা বলা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রাণনাশ অঙ্গহানি অসামর্থ্য হওয়ায় যে মোটের উপর যোগ্য যুবকের সংখ্যাই কমিয়াছে, সে কথাটা এবং এইরূপ আরও প্রধান প্রধান কথা চাপা দেওয়া হইতেছে।

যাহা হউক, ইহা যদি সত্যও হয়, যে, এখনকার বেতনাদিতে যোগ্যতম ইংরেজ আর পাওয়া যাইবে না, তাহা হইলেও কি আমাদিগকে, যত বেশী টাকাই হউক দিয়া, ইংরেজ রাখিতেই হইবে? গোড়ার কথা হইতেছে আয় বুঝিয়া ব্যয়। তাতার লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার প্রধান কর্ম্মচারী পেরিন্ সাহেবের বেতন বড় লাটের চেয়ে বেশী। ধরিয়া লওয়া যাক্, তিনি অতিবড় যোগ্য লোক। কিন্তু কোন গ্রামের বা শহরের কামারশালের কাজ চালাইবার জন্য যদি কেহ বলেন, যে, ঐ বড়লাটের-অধিক-বেতনভোগী আমেরিকান্ মিষ্টার পেরিনের দরের লোক লইতেই হইবে, নতুবা চলিবে না, তাহা হইলে সে কথাটাকে কেহ কি বিবেচকের কথা বলিবে? প্রতি বৎসর দেখা যাইতেছে, ভারতের বজেটে অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের খস্‌ড়ায় ঘাট্‌তি পড়িতেছে। সামরিক ব্যয় কমাইবার জন্য কমিশন বসাইয়াও এমন কিছু ব্যয়সংক্ষেপ হয় নাই যাহাতে আয় ব্যয় সমান রাখা যায়। যে দেশের অবস্থা এইরূপ, সেই দেশের লোককে এই কথা বলা, যে, "তোমাদের জন্য ইংলণ্ড্ উৎকৃষ্টতম লোক ভিন্ন দিবেন না," উপহাসের মত শুনায়, অথবা কেতাবী ভাষায় "বলপূর্ব্বক গ্রহণের" মত শুনায় বলিলেও চলে। আমরা বলি, তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে স্বাধীনতা স্থাপনের এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়া লড়িয়াছ এবং আমাদের দেশেরও লক্ষ লক্ষ লোককে লড়াইয়াছ, আমাদিগকে দেড় শত কোটি টাকা "স্বেচ্ছাকৃত দান" করাইয়াছ;—আমাদিগকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও না কেন, যে, আমরাই স্থির করিব, যে, কত ইংরেজ কর্ম্মচারীর সাহায্য আমাদের দরকার এবং কি দরের ইংরেজের মজুরী আমরা যোগাইতে পারি? হইতে পারে, যে, আমরা যত টাকা দিতে পারি, তাহাতে যোগ্যতম ইংরেজকে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু আমাদের যে টাকা নাই; আমাদিগকে নিরেস মালেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। ডাল পুরী দুধ বলা খাইবার পয়সা যাহার নাই, শাক ভাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

বেশী টাকা বেতন দিলেই যে যোগ্যতম লোক পাওয়া যায়, ইহা সব স্থলে ঘটে না। কর্ম্মচারী মনোনয়ন, নির্ব্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্র প্রশস্ততর করিলে কম টাকাতেও খুব ভাল লোক পাওয়া যায়। ভারতবাসী শতকরা এতটির বেশী চাকরী পাইবে না, এমন কেন বলা হইতেছে? এইরূপ ব্যবস্থা কর না কেন, যে, **অবাধ** প্রতিযোগিতায় যাহারা যোগ্যতম হইবে তাহারাই জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে চাকরী পাইবে? যোগ্যতার শারীরিক মানসিক খুব উচ্চ মাপকাঠি (standard) রাখ না কেন? এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় যোগ্যতম লোক যত টাকায় পাওয়া যায়, সেইটাই বেতনের সাধারণ হার স্থির করিয়া বিদেশীদিগকে শতকরা পঁচিশ টাকা বেশী দাও না কেন?

উত্তরে তোমরা বলিবে, ভারতীয়েরা নিকৃষ্ট জাতি, তাহাদের পরাধীনতাই নিকৃষ্টতার প্রমাণ, তাহারা দেশের কাজের **কর্ত্তা ও পরিচালক** হইতে পারে না; অতএব শ্রেষ্ঠ জাতির লোক চাই, ইত্যাদি। যে কোন রকমের কাজ করিবার সুযোগ ভারতীয়েরা পাইতেছে তাহাতেই তাহারা যোগ্যতা দেখাইতেছে, এ তর্ক না হয় নাই তুলিলাম—এবং ইহার উত্তরেও বলা যায়, যে, ভারতীয়েরা যে অন্যের প্রদত্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে

বাধ্য হইতেছে, নিজেদের সুযোগ নিজেরাই করিয়া লইতে পারিতেছে না ইহা তাহাদের নিকৃষ্টতার অন্যতম প্রমাণ। আমরা বলিব ইংরেজরাই ত পৃথিবীর একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও স্বাধীন জাতি নহে; গত মহাযুদ্ধে আমেরিকান্ ফরাসী ইংরেজ ইতালীয় জাপানী সহযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। জাপানীরা শ্বেতকায় নহে ও এসিয়ার লোক, অতএব কোন না কোন রকমের নিকৃষ্টতা তাহাদের আছে। শ্বেতকায়দের এই অহঙ্কার মানিয়া লইলেও, শ্বেতকায় স্বাধীন শক্তিশালী জাতি কয়েকটি ত থাকে? তাহাদের মধ্য হইতে, আমরা যত টাকা দিতে পারি, সেই টাকায় যোগ্যতম লোক বাছিয়া লইতে দাও না কেন? জাপানীরা প্রথম প্রথম এবং এখনও তাহাদের শিক্ষার ও কাজ চালাইবার সাহায্যের জন্য নিজেদের বিবেচনা- ও প্রয়োজন-মত আমেরিকান্ জার্ম্মান ফ্রেঞ্চ্ ইংরেজ সব রকম লোক নিযুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে। তাহাতে তাহারা সস্তায় ভাল লোক পাইয়াছে। আমাদিগকেও এই প্রকারে ভাল লোক বাছিয়া লইতে দাও না কেন? যেখানে ভারতীয়দের পুরা ক্ষমতা, সেখানেও ত তাহারা প্রয়োজন-মত ইংরেজ ও অন্য শ্বেতকায় নিযুক্ত করে। ইংরেজ বা অন্য শ্বেতকায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ আমরা বরং কাজ মাটি করিব তবু কোন শ্বেতকায়কে নিযুক্ত করিব না, এরূপ জেদ ও নিবুদ্ধিতা আমাদের নাই।

আমাদের কথার উত্তর ইংরেজ দিবেন না; কিন্তু যদি দেন, তাহা হইলে তাঁহারা বলিতে পারেন, "আমরা তোমাদিগকে পরাজিত করিয়াছি, আমরা তোমাদের প্রভু; অন্য কোন শ্বেতজাতি তোমাদিগকে পরাজিত করে নাই ও তোমাদের প্রভু নহে। অতএব লুটের ভাগ তাহারা কেন পাইবে?" ইহার উত্তরে আমরা বলিব, "ঠিক্, ঠিক্, অতি ঠিক্!!! কিন্তু তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বাধীনতা স্থাপন, সর্ব্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি বুলি ছাড়িয়া দাও।"

ভারতীয় চাকরীগুলার বেতন যেমন বাড়িয়াছে, প্রাদেশিকগুলারও বাড়িয়াছে। যে-সব শ্রেণীর দেশী লোক চাকরীজীবী বা চাকরীর প্রত্যাশা রাখে, তাহারা এমন কোন ব্যবস্থা চায় না যাহা দ্বারা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তাহাদের পাওনায় বা পাওনার আশায় হাত পড়িতে পারে। আমরাও চাকরীজীবী ও চাকরী-প্রত্যাশী "ভদ্র" শ্রেণীর লোক। কিন্তু শ্রেণীগত স্বার্থ অপেক্ষা সকল শ্রেণীর স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, বড়। সেইজন্য আমাদের সকলেরই উচিত দেশের অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা যাহাতে হয় সেই চেষ্টা করা।

যুদ্ধের আগেও ভারতবর্ষে উচ্চ উচ্চতর ও উচ্চতম শ্রেণীর চাকরীগুলির বেতন দেশের অবস্থা হিসাবে অত্যন্ত বেশী ছিল। যুদ্ধের পরের বর্দ্ধিত বেতনগুলিও দেশের আয়ের অনুপাতে অত্যন্ত বেশী। সব স্থলে ধনী ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে চলিবে না, যদিও অনেক শ্রেণীর চাকরীর বেতন ইংলণ্ড্ অপেক্ষা ভারতে বেশী। এসিয়ার জাপানের সহিত তুলনা করুন। জাপানীদের আয় ভারতীয়দের চেয়ে বেশী। জাপানে জীবন ধারণের ব্যয় ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী। অথচ সেখানকার সর্ব্বোচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী প্রধান মন্ত্রী মাসে দেড় হাজার টাকা বেতন পান, অন্যান্য মন্ত্রীরা পান এক হাজার করিয়া। প্রধান বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি তার চেয়েও কম বেতন পান। সুতরাং আমাদের দেশে কাহারও বেতন যে সাধারণতঃ এক হাজার টাকার বেশী হওয়া উচিত নয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ধনী আমেরিকাতেও সাধারণতঃ উচ্চ চাকরীগুলির বেতন ভারতীয় সেই-সব শ্রেণীর চাকরীর বেতন অপেক্ষা কম। এ-সব কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। দৈনিক "হিন্দুস্থান" বিস্তৃততর-ভাবে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন।

এখন যত বেতন দেওয়া হয়, তার চেয়ে কম বেতন দিলেই হাকিমরা জজরা ঘুস লইবে, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। তিন শত টাকার মুন্সেফ্ ঘুস্ লয়েন না, কিন্তু ৫৪০০ টাকার কোন এক চাকরে ঘুস্‌খোর, একথা বাংলাদেশে রাষ্ট্র। অভাবে পড়িলে মানুষ দুষ্কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু অভাব আপেক্ষিক শব্দ। চরিত্রই প্রধান জিনিষ। যে হেড্ কন্‌ষ্টেবল থাকিতে ঘুস্ লইত, সে উচ্চতর কাজ পাইয়াও ঘুস্ লয়।

লী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া সাক্ষীরা কেবল যে বেশী বেতনের দাবী করিতেছে, তাহা নয়।

"আমাদের উপর মন্ত্রীদের প্রভুত্ব থাকা উচিত নয়, আমাদের কাজ বা আমাদের বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের কিছু বলিবার বা করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়," ইত্যাকার কথাও শুনা যাইতেছে। তাহা হইলে বল না কেন, "ভারতশাসনসংস্কার জিনিষটা যত ভুয়ো, আমরা তাহাকে তার চেয়েও ভুয়ো করিতে বদ্ধ-পরিকর"? প্রতিনিধিতন্ত্র-শাসনপ্রণালী যে-সব দেশে প্রচলিত আছে, সর্ব্বত্রই গবর্ণমেণ্টের কাজের সকল বিভাগের আয়ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভার কর্ত্তৃত্ব আছে, সকলেরই কাজের আলোচনা করিবার অধিকার প্রতিনিধিদের আছে। ভারতবর্ষকে সৃষ্টিছাড়া দেশ মনে করিলে চলিবে না।

এরূপ তর্কও উঠিতেছে, যে, অমুক শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের বেতন বাড়াইলে মোটে এত হাজার বা এত লক্ষ টাকা ব্যয় বাড়িবে, দেশের সমগ্র আয় ও ব্যয়ের তুলনায় ইহা সামান্য। কিন্তু অনেকগুলা তিল একত্র করিলে তালের সমান হয়, "রাই কুড়াইয়া বেল" হয়, সমুদ্র জলবিন্দুর সমষ্টি; সব চাকুর্‌য়েই যদি বলেন, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন, তাহা হইলে সকলের দাবীর সমষ্টি বড় কম হইবে না, এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পণ্যদ্রব্য-উৎপাদনব্যবস্থা, বাণিজ্য, জাহাজনির্ম্মাণ, প্রভৃতির সমুচিত ব্যবস্থা করিবার মত টাকা কোন কালেই জুটিবে না।

—

বাণিজ্য-জাহাজ

ভারতের মাল রপ্তানি এবং এদেশে বাহিরের জিনিয আমদানি এবং মানুষের যাতায়াত বিদেশী জাহাজে, প্রধানতঃ ইংরেজদের জাহাজে, হয়। তা ছাড়া, ভারত-সাম্রাজ্যেরই এক বন্দর হইতে অন্য বন্দর পর্য্যন্ত যাত্রী ও মাল চলাচলও প্রধানতঃ বিদেশীদের জাহাজে হয়। এই শেষোক্ত কাজটি ভারতীয়দের টাকায় ক্রীত ও নির্ম্মিত তাহাদের জাহাজেই হওয়া উচিত কি না, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি বসিয়াছে। নানা স্বাধীন দেশের উপকূলে জাহাজ চালান আইন দ্বারা সেই সেই দেশের লোকদের একচেটিয়া করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের দেশেও যে ইহা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারত-উপকূলে জাহাজ চালান আইনতঃ ভারতীয়দের একচেটিয়া না হইলে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর দুষ্ট প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয়েরা কখনও এই কাজে প্রবৃত্ত হইতে বা টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। গত বৎসর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত টি ভি শেষগিরি আইয়ার এবিষয়ে যে আইনের খসড়া উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আমরা তাহার সমর্থক।

—

পরলোকগত কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার

মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ "হিন্দু" পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক প্রায় এক বৎসরকাল রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। গত ১২ই ডিসেম্বর সকালবেলা তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আয়াঙ্গার মহাশয় জীবনের প্রথমভাগে কয়েম্বাটোরে ওকালতি করিতেন, পরে মান্দ্রাজে আসেন। তাঁহার সম্পাদিত ফৌজদারী-কার্য্যবিধি-আইনের একটি টীকা-সংবলিত সংস্করণ আছে। "হিন্দু" পত্রিকাখানি পূর্ব্বে জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। ১৯০৫ সালে আয়াঙ্গার মহাশয় তাহা কিনিয়া লন। এই কয় বৎসর যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়া কাগজখানিকে ইংরেজী ভাষায় লিখিত দেশীয় সংবাদপত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার স্বাধীন মতবাদ গভর্মেণ্টকে চিরদিনই ব্যতিব্যস্ত করিয়া আসিয়াছে। যুদ্ধের সময় কাগজখানিকে ইংলণ্ডে যাইতে দেওয়া হইত না, অথচ আয়াঙ্গার মহাশয়কে গভর্মেণ্টের খরচায় ইয়োরোপের যুদ্ধভূমিতে ও ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আয়াঙ্গার মহাশয় বরাবরই জাতীয়-দলভুক্ত ছিলেন। নাগপুর কংগ্রেস হইতে তিনি অসহযোগনীতি প্রচারে যোগ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে সিভিল্-ডিস্ওবিডিয়েন্স-কমিটি ভারত পরিভ্রমণ করিয়া তথ্য সংগ্রহ করে, আয়াঙ্গার মহাশয় তাহার সভ্য ছিলেন। তিনি কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে মত দেন। ইহার পরেই তিনি অসুখে পড়েন ও এতদিন ভুগিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

অ, ঘ



বিদেশ

ইংলণ্ডে নির্ব্বাচনের ফল—

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ-নীতিকে আশ্রয় করিয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সহিত অন্যান্য রাষ্ট্রনৈতিকদলের মধ্যে যে বিরোধ ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহার ফলে ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকেরা কোন্ মতকে সমর্থন করিতে প্রস্তুত তাহা স্থিরনিশ্চয়তার সহিত জানিবার জন্য ইংলণ্ডে নূতন নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। মূলতঃ এই নির্ব্বাচনে অবাধ-বাণিজ্য বনাম সংরক্ষণের লড়াই হইলেও ধনাধিক্যানুসারে বর্দ্ধিত হারে কর নির্দ্ধারণ করা উচিত কিনা এই প্রশ্নও নির্ব্বাচকদিগের সম্মুখে শ্রমিকদল উপস্থিত করিয়াছিলেন।

নির্ব্বাচনের ফলে দেখা যাইতেছে যে এপর্য্যন্ত ২৫৯ জন রক্ষণশীলদলের, ১৮৮ জন শ্রমিকদলের, ১৪৮ জন উদারনৈতিকদলের এবং ৮ জন স্বাধীনমতাবলম্বী প্রতিনিধি মহাসভাতে প্রেরিত হইয়াছেন। কয়েকটি স্থানের নির্ব্বাচন-সংবাদ এখনও আসে নাই। বিগত নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদলের ৩৪৫ জন, শ্রমজীবীদলের ১৪১ জন, উদারনৈতিকদলের ৬১ জন, লয়েড জর্জ্জের অনুগত জাতীয়-উদারনৈতিকদলের ৫৫ জন ও স্বাধীনমতাবলম্বী ৮ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই অবাধবাণিজ্যনীতিকে সংরক্ষণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া লয়েড জর্জ্জের জাতীয়-উদারনৈতিকদল অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের বিরোধ ভুলিয়া গিয়া অ্যাস্‌কুইথের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কাজে-কাজেই এই নির্ব্বাচন-ব্যাপারে উদারনৈতিকদল সর্ব্বত্রই একযোগে কাজ করিয়াছেন। বিগত নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদল সংখ্যায় এত অধিক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধে যদি অন্যান্য সব দল একযোগে দাঁড়াইত তথাপি রক্ষণশীলদলের প্রাধান্য বজায় থাকিত। কিন্তু এই নির্ব্বাচনে যদিও রক্ষণশীলদল সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে তথাপি তাহা এত অধিক নহে যে শ্রমিক ও উদারনৈতিকদলের মিলিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। শেষোক্ত এই দুইদল সংরক্ষণনীতির বিরোধী। কাজে-কাজেই সংরক্ষণনীতি যে ইংলণ্ড গ্রহণ করে নাই তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। নির্ব্বাচনের ফলাফল হইতে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি যে ক্রমশঃ শ্রমিকদলের হস্তে গিয়া পড়িতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বিগত নির্ব্বাচনে শ্রমিকদল যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা হইতেই ইহা প্রথম বুঝা গিয়াছিল যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ আর গতানুগতিক পথে চলিতে বড় রাজি নহে। তাই শ্রমিকদলের শাসন-পদ্ধতি কিরূপভাবে চলে তাহা দেখিবার জন্য জনসাধারণের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে। এই নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর এই মানসিক অবস্থাটি আরও প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। নির্ব্বাচনে রক্ষণশীলদল ৮৫টি পদ হারাইয়াছেন। শ্রমিকদল ৪৬টি পদ নূতন অধিকার করিয়াছেন এবং উদারনৈতিকদল ৪১টি পদ নূতন লাভ করিয়াছেন। শ্রমিকদল এইবারও সংস্থিতিসম্পন্ন বিরুদ্ধদল-রূপেই পরিগণিত হইবেন। তবে শ্রমিক ও উদারনৈতিকদলের সম্মিলিত আক্রমণের ভয়ে যদি কোনও রক্ষণশীল নেতা মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সম্মত না হন তবে শ্রমিক নেতার নেতৃত্বাধীনে শ্রমিক ও উদারনৈতিকদলের সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হইতে পারে। কিন্তু সে পথে অন্তরায় অনেক। শ্রমিকদল যে-সমস্ত শ্রমিক আইন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থাতে যে-সমস্ত নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া উদারনৈতিক দলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ধনাধিক্যানুসারে বর্দ্ধিত হারে কর-নির্দ্ধারণ-নীতি উদারনৈতিক দল কখনই গ্রহণ করিবেন না। এই-সমস্ত বিচার করিয়া রাষ্ট্রবেত্তাগণ মনে করেন যে লর্ড ডার্ব্বির নেতৃত্বাধীনে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার প্রতি ইংলণ্ডের শাসনভার ন্যস্ত হইবে। বল্‌ড্‌উইন্ সাহেবের প্রধান মন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ দেশের লোকের তাঁহার প্রতি যে আস্থা নাই তাহা নির্ব্বাচনফলে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু সে মন্ত্রীসভাও যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে এরূপ মনে হয় না। নূতন মন্ত্রীসভার পতন হইলে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রথা-অনুসারে সংস্থিতি-সম্মত বিরুদ্ধবাদীদলের উপর শাসনভার অর্পিত হয়। সুতরাং অচিরেই যে শ্রমিকদলের হস্তে ইংলণ্ডের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লক্ষ্য করিয়া দেখিবার কয়েকটি বিষয় নির্ব্বাচনে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলের রক্ষণশীলগণ একেবারে ভোট পায় নাই; পক্ষান্তরে শ্রমিক ও উদারনৈতিকদল বহু ভোট পাইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে রক্ষণশীল দলেরই প্রতিপত্তি ছিল; কিন্তু এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে উদারনৈতিক দল আশ্চর্য্যরূপ জয়লাভ করিয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদলের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার ভারতীয় পার্শী সাপুরজি সাক্‌লাৎবালা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। যে-সব জননায়ক এইবার পরাজিত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উইন্‌স্টন্ চার্চ্চিল, আর্থার হেণ্ডারসন্, স্যার অ্যালফ্রেড্ মণ্ড্, স্যামার গ্রিন্‌উড, হিল্টন ইয়ং, উইলিয়াম ওয়াট্‌সন, স্যার মৌস্ বেনেট, ওয়াল্‌টার রান্সিম্যানের পরাজয় খুব উল্লেখযোগ্য। বিগত নির্ব্বাচনে মাত্র দুইজন মহিলা নির্ব্বাচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুইজন মহিলা, লেডি অ্যাষ্টর ও শ্রীমতী উইন্‌ট্রিংহাম এবারও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহারা ছাড়া আরও কয়েকটি মহিলা এইবার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। রক্ষণশীলদলের ডাচেস্ অফ্ অ্যাথল্, উদারনৈতিকদলের লেডি টেরিংটন ও কুমারী র‍্যাথ্‌বোন, শ্রমিকদলের কুমারী জুলন্, শ্রীমতী মার্গারেট বন্‌ফিল্ড ও কুমারী এস্ লরেন্স্ নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছেন।

চীনে নূতন গোলযোগ—

উত্তর চীনের গণতন্ত্রবিরোধী স্বেচ্ছাচারী অধিনায়ক উপাইফুর আক্রমণ হইতে দক্ষিণ চীনের গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ডাক্তার সান্-ইয়েটসেন অবসরে কালযাপন না করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টায় দক্ষিণ চীনে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে

এবং অরাজকতা বিদূরিত হইয়া শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। চতুর রাজনীতিক সান্ দেখিলেন যে শাসন-ব্যবস্থা সুন্দররূপে প্রবর্তন করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন, অথচ অর্থাগমের সর্ব্বপ্রধান উপায় যে বাণিজ্য-কর তাহা বিদেশীর হস্তে। ইউরোপীয় বণিক্ সভ্যতা-বিস্তারের অছিলায় যখন বাণিজ্য বিস্তার করিতেছিল তখন লাভের আশাতে চীনে অহিফেন-চালানী কারবার চালাইবার চেষ্টা পায়। তখন চীন সরকার তাহাতে বাধা দিলে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। সে যুদ্ধে চীনকে হার মানিতে হইয়াছিল। তাহার পর আরও কয়েক-বার যুদ্ধ বাধিয়া উঠে এবং সুশিক্ষিত পাশ্চাত্য সেনানীর নিকট চীন বার বার পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সেই সময় সন্ধিসর্ত্তে বৈদেশিক শক্তিবর্গ যুদ্ধ-ঋণপরিশোধ ও বক্সার-বিদ্রোহের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বাণিজ্য-শুল্ক হস্তগত করিয়া লন। ক্যাণ্টন্ প্রভৃতি কয়েকটি বন্দর সন্ধি-বন্দর নামে পরিচিত হয় এবং এই-সব বন্দরের সকল ভার বিদেশীর হস্তে থাকে। সান্ বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছেন যে বিদেশীয় হস্ত হইতে রাজস্বের এই প্রধান উপায়টিকে কাড়িয়া লইতে না পারিলে চীনের মঙ্গল নাই। তাই তিনি ক্যাণ্টন্ বন্দর বিদেশীয়ের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, চীনকে পঙ্গু করিয়া রাখিবার জন্য বৈদেশিক শক্তিবর্গের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিতে হইলে শুল্ক আদায়ের যে অধিকার অন্যায়ভাবে বিদেশীয় শক্তিবর্গ চীনের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন তাহা চীনকে ফিরাইয়া লইতেই হইবে। এইজন্য নবীন চীনকে বিরাট্ অভিযানের আয়োজন করিতে হইবে। হয়ত বিদেশীয় শক্তিবর্গের সম্মিলিত আঘাতে চীন পরাভূত হইবে; তখন রাশিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া চীন যে বিশ্বের সহিত মহা-সমরে প্রবৃত্ত হইবে তাহাতে যে ভীষণ সংহারলীলার সৃষ্টি হইবে তজ্জন্য ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জই দায়ী। তিনি বিশ্বাস করেন যে এই বিশ্বযুদ্ধে চীন জয়লাভ করিবে ও প্রাচ্য দেশীয় এক অভিনব গণতন্ত্র কালে বিশ্বে শান্তি আনিবে। সেই অভিনব গণতন্ত্রের বর্ত্তিকা বহন করিয়া আজ চীন প্রাচ্যের মঙ্গলের জন্য অমিতবিক্রমে লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

ভারতবর্ষ

রবীন্দ্রনাথের শফর—

বহু সামন্ত রাজার নিমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছেন। গত ১২ই নবেম্বর তিনি রাজকোটের দরবার গৃহে বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু লোক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন। ধ্রাঙ্গধ্রার মহারাজা ২৫,০০০; পোরবন্দরের মহারাজা ২০,০০০; মার্ভির ঠাকুর সাহেব ১০,০০০ দান করিয়াছেন। গত ২৮শে নবেম্বর রবীন্দ্র-নাথ জামনগরে পৌঁছিয়াছেন। জামসাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি বিশ্বভারতী-ভাণ্ডারে ৫০,০০০ টাকা দান করিবেন। এপর্য্যন্ত বিশ্বভারতী-ভাণ্ডারে মাত্র ১,৩৫,০০০ টাকা উঠিয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের খাম্-খেয়ালী—

যুক্ত-প্রদেশের গবর্মেণ্ট সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, তথাকার মিউনিসিপ্যালিটিগুলি বড়লাট এবং গবর্ণর ছাড়া আর কাহারো অভিনন্দনে অর্থব্যয় করিতে পারিবেন না। গত ২১শে নবেম্বর এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের এক সভায় এআদেশ অগ্রাহ্য করিবার উদ্দেশ্যে এক প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন মৌলানা শৌকত আলী সেখানে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইবে। সেজন্য ৫০ টাকা ব্যয়ও মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কুম্ভ-মেলার সেবা-সমিতি—

আগামী মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইবে। যাত্রীদের চিকিৎসা, বাসস্থান-নির্ণয় এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য এলাহাবাদের সেবা-সমিতি একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই দলে স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকারেরই স্বেচ্ছা-সেবক গ্রহণ করা হইবে।

এই-সমস্ত জনহিতকর কার্য্যের জন্য ৫০০ উৎসাহী স্বেচ্ছা-সেবক এবং ১৫০০০ টাকার প্রয়োজন। আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে সেবা-সমিতির কাজ আরম্ভ হইবে। টাকা পয়সা সমস্ত—বি মনোমোহন দাস ব্যাঙ্কার ও ট্রেজারার সেবা-সমিতি, রাণীমণ্ডী, এলাহাবাদ এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট্ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন পণ্ডিত মালবীয়জী, এবং সাধারণ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু।

অকালী আন্দোলনে সামন্তরাজাদের অনুরোধ—

পাঞ্জাবের অকালী পত্রে প্রকাশ—কাশ্মীরের মহারাজা, ঝিন্দের মহারাজা এবং হায়দ্রাবাদের নিজাম বড়লাটকে জানাইয়াছেন—নাভার মহারাজকে পুনরায় গদিতে বসাইয়া অকালী আন্দোলন শান্ত করিয়া দেওয়া হউক। তাঁহারা নাকি বড়লাটকে ঐ প্রকার অনুরোধ জানাইবার জন্য অন্যান্য সামন্ত-রাজাদেরও পত্র লিখিয়াছেন।

হিন্দু অনাথ-আশ্রম—

হায়দ্রাবাদে হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে একটি হিন্দু অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনাথ-আশ্রমের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। তন্মধ্যে প্রতাপগড়ের রাজা ৫০,০০০, মহারাজা স্যার কিষেণপ্রসাদ ৫০০০, এবং শ্রীযুক্ত বামনদাস নায়ক ৫০০০, টাকা দিয়াছেন।

মৌলানা হস্‌রৎ মোহানীর অবস্থা—

পুণার সংবাদে প্রকাশ য়ারবেদা জেলে হস্‌রৎ মোহানীর উপর নাকি খুব নির্য্যাতন হইতেছে। তাঁহাকে একটি নির্জ্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে আলো প্রদানেরও কোনো ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাঁহাকে খুব অল্পই পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া হয়। যে দুই-একখানা পুস্তক তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল জেলকর্ত্তৃপক্ষ তাহাও কাড়িয়া লইয়াছেন।

কলিকাতা 'টুরিষ্ট্' ক্লাবের অভিযান—

কলিকাতা টুরিষ্ট্ ক্লাবের সদস্যগণ গত বৎসর সাইকেলে সাতদিনে কলিকাতা হইতে কাশী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এবার তাঁহারা কলিকাতা হইতে ১৫৩১ মাইল দূরবর্ত্তী পেশোয়ারের অভিমুখে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু পিপ্‌লীতে ডাকাতের আক্রমণে একজনের মাথা সাংঘাতিক রকমে আহত হওয়ায় তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। মোটের উপর তাঁহারা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড দিয়া ১১ দিনে ১০৪ ঘণ্টায় ১০২৮ মাইল গিয়াছিলেন।

পণ্ডিত বাজপেয়ী—

গত ৫ই ডিসেম্বর পণ্ডিত বাজপেয়ী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুর মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। অথচ পণ্ডিতজী দীর্ঘকাল হইতে রোগে ভুগিতেছিলেন তাঁহার অস্বাস্থ্যের জন্যই বহু পূর্ব্বে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল

কিন্তু ভারতের ন্যায়পরায়ণ গবমেণ্টের সাহসে ও ন্যায়পরতায় তাহা ঘটে নাই।

ধলার হাতে কালার মৃত্যু—

পুণা সহর হইতে তিনজন গোরা সৈনিক ৮ মাইল উত্তরে কোনো গ্রামে শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা একটা জলাশয়ে বন্য হংস শিকার করে এবং একজন গ্রামবাসীকে সেই শিকার সংগ্রহ করিয়া আনিতে আদেশ দেয়। কিন্তু জলাশয়টি দামে পরিপূর্ণ ছিল। তাহাতে নামা বিপজ্জনক মনে করিয়া লোকটি আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে সৈনিকপ্রবরদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে এবং তাহারা লোকটিকে প্রহার করিতে থাকে। প্রহৃত ব্যক্তির চীৎকারে সেইস্থানে অনেকগুলি লোক জমে। ক্রমে উভয় পক্ষের ভিতর বচসা সুরু হইয়া যায়। ওয়াকার নামক একজন সৈনিক ইহার পর গুলি করিয়া একজন গ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা এদেশে নূতন নহে। পদাঘাতে যখন এদেশের লোকের প্লীহা ফাটে তখন হাতে বন্দুক থাকিলে তো কথাই নাই। এ জাতি একে কাপুরুষ, তাহার উপর নিরস্ত্র। সুতরাং প্রায়শ্চিত্তের বিধান যে তাহার এইরূপ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

অন্ধের প্রতি কারাদণ্ড—

আহমদাবাদের আমরেলীর জনৈক অন্ধ কবির প্রতি সম্প্রতি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য ভালো স্বভাবের এক মুচলেখা দিতে বলা হইয়াছিল—তিনি তাহা না দেওয়ায় তাঁহার প্রতি উপরি-উক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে এক কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন যে, বিকলাঙ্গের জন্য তাঁহার প্রতি কোনো প্রকার করুণা না করিয়াই যেন তাঁহাকে দণ্ডিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে পৃথক্ ভাবে রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই অন্ধ কবির অপরাধ—তিনি সাধারণ সভায় স্বদেশী সঙ্গীত গান করিতেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

বাংলা

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা—

গত ১৯২১-২২ সালের বাঙ্গালার শাসন সম্বন্ধীয় রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে আলোচ্য বর্ষে অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বেশ ভালই হইয়াছে। পূর্ব্বে যেমন রক্ষণশীল সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের একান্ত বিরোধী ছিলেন, এখন সে ভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

এখন প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব জন্মিয়াছে। বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য বঙ্গদেশে পূর্ব্বে মোট ১২১৯৯ বিদ্যালয় ছিল। আলোচ্যবর্ষে আরও ৮১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবৎসর লোকের আয় তেমন না থাকায় ছাত্রীসংখ্যা ৩৪০৫৩৬ হইতে ৩৩৩৮৭০তে নামিয়া যায়।

আলোচ্য বর্ষে মোট ১৩৩জন পর্দ্দানশীন ছাত্রী এবং তাহাদের ৫৮জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। শিক্ষা প্রদানের নিয়মের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বসমেত ১৩টি মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষালয় ছিল। সেগুলির ছাত্রীসংখ্যা ২১৩। আবশ্যক অনুযায়ী শিক্ষয়িত্রী পাওয়া যাইতেছে না। আরও শিক্ষয়িত্রী প্রয়োজন।

—এডুকেশন গেজেট

চরমনাইর অত্যাচার তদন্ত—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গত ৩০এ জুনের একটি সভায় এই-সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করেন। কমিটি মোট ৭০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তাহারা খুন, বলপ্রয়োগ, নারীর লজ্জা-সরম নাশ, অপমান, প্রহার, লুটপাট, ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রভৃতির সাক্ষ্য দেয়। রিপোর্টে প্রকাশ যে গাইজুদ্দির মৃত্যু সম্পর্কে পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষের সাক্ষীরাই বলে যে তাহারা স্বচক্ষে কতকগুলি পুলিসের লোককে মৃতব্যক্তিকে মাঠের মধ্য দিয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া সেখানে ফেলিয়া রাখিতে দেখিয়াছে। ১১টি বলপ্রয়োগের সুস্পষ্ট সাক্ষ্যও পাওয়া গিয়াছে; উৎপীড়িতের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। এবং অনেক নারী ও তাহাদের আত্মীয়গণ যে-সমস্ত ঘটনাকে মাত্র লজ্জাহানিকর বা অশ্লীলভাবে অত্যাচার করা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহার মধ্যেও যে বাস্তবিক পক্ষে বলপ্রয়োগের ব্যাপার অনেক আছে এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। লুটতরাজ ও গৃহধ্বংস প্রভৃতি অতি ভীষণ অপরাধ সন্দেহ নাই। কিন্তু রমণীগণের প্রতি যে অমানুষিক পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এ-সমস্ত তার তুলনায় নগণ্য। সাক্ষীগণের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে ১৮ই মে ও ১৫ই জুনে পুলিশগণ ঠিক উন্মত্ত কুকুরের মত ব্যবহার করিয়াছে।

—বন্দেমাতরম্

বাংলার পুলিশ—

	১৯২১	১৯২২
১। দাঙ্গাহাঙ্গামা	৬১৩	৯৪৬
২। ডাকাতি	৭১৬	৮৯৬
৩। রেলওয়ে হইতে মাল হারান ও চুরীর সংখ্যা	৩৭৩৬	৫৫৮৮
৪। পুরস্কৃত পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা	৬৪৬৮	৬৪০৩
৫। আদালতের বিচারে দণ্ডিত পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা	২৪৭	২৩৪
৬। পুলিশের জন্য ব্যয়	১৪৭ লক্ষ	১৪৮ লক্ষ টাকা
থানার সংখ্যা	৬৮৮	
নিম্নতমবিভাগে পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা		২৪১০২

—সারথি

আত্মরক্ষার উপায় নাশ—

১৯২৩ সালের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯২৪ সালের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছোরা, বর্শা, লাঠি, বন্দুক অথবা অন্য কোনও অস্ত্র লইয়া কলিকাতা সহরে অথবা সহরতলীতে সাধারণ স্থানে গমন করা নিষিদ্ধ করিয়া "কলিকাতা গেজেটে" একটি ইস্তাহার বাহির হইয়াছে। যে ছড়ি, ভূমি হইতে বহনকারীর কটিদেশ অপেক্ষা উচ্চ এবং যাহার ব্যাস ½ ইঞ্চির বেশী, তাহাই এই ইস্তাহার-অনুসারে লাঠি বলিয়া গণ্য হইবে।

—সোনার বাংলা

সেবক

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রী ...



নাতির স্মৃতি

চিত্রকর শিল্প-সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রাধিকারিণী শ্রীমতী মায়া রায়ের সৌজন্যে।

U. Ray & Sons, Calcu

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ
২য় খণ্ড

মাঘ, ১৩৩০

৪র্থ সংখ্যা

আমাদের লক্ষ্য

আজ আমি যে কথাটি বল্‌বার জন্য আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছি তার ভিতরে নূতন কিছু না থাক্‌লেও সেটা কেবল আমার পুঁথিপড়া বিদ্যাপ্রসূত নয়, কতকটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-জাতও বটে। এজন্য প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতার নামান্তর যে অতিরিক্ত বিনয়, তার ভাণ না করে' আমি সরলভাবে আপনাদের নিকট নিবেদন কর্‌তে পারি যে, সে কথাটি বল্‌বার আমার যৎসামান্য অধিকার আছে। আমার বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষেপেই বল্‌বার চেষ্টা কর্‌ব, এবং দু-একটি উদাহরণ দ্বারা সেটা ফুটিয়ে তুল্‌বার প্রয়াস পেলে আশা করি তা' অপ্রীতিকর হলেও অপ্রাসঙ্গিক বলে' বিবেচিত হবে না।

সকলেই জানেন, যে, পাশ্চাত্য জগতে যৌবনের প্রারম্ভে কি কৈশোর বয়সেই, যখন মানসিক বৃত্তিগুলি নমনীয় থাকে এবং কাহার কোন্ বিষয়ে প্রবণতা আছে ও সিদ্ধিলাভ সহজ এটা বুঝা যায়, তখন পিতামাতা ছেলেদের জীবিকা অর্জ্জন ও উন্নতি সাধনের পথ নির্দ্দিষ্ট করে' দেন। অল্প বয়সে তারা লক্ষ্য স্থির করে' নেয় বলে'ই একাগ্রতার সঙ্গে স্ব স্ব লক্ষ্য অনুসরণ করে' অনেকদূর অগ্রসর হতে পারে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—সুতরাং জগতের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে' পাশ্চত্য যুবকগণ নিতান্তই হাবুডুবু খায় না। সর্ব্বদাই যে তারা এরূপ লক্ষ্য স্থির করে' পথ চল্‌তে থাকে তা নয়, লক্ষ্যভ্রষ্টও অনেক সময়েই হয়ে থাকে, তবে আমাদের মধ্যে লক্ষ্যের অভাবে যতটা শক্তির অপচয় ঘটে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে ততটা হয় না। আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অনেক সঙ্কীর্ণ, গম্য পথের সংখ্যাও অনেক কম এবং সেগুলি ঋজু অপেক্ষা কুটিলই বেশী, সুতরাং আমাদের নির্ব্বাচনের অবসর বেশী নেই—অধিকাংশ ভদ্রযুবককেই এক সনাতন ওকালতির ধ্রুবতারা অনুসরণ করে' সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়, একথা অনেকাংশে সত্য হলেও, আমাদের প্রকৃতিগত জড়তা ও নূতনের প্রতি অনাস্থা এবং পিতৃ-পিতামহ-প্রদর্শিত সন্মার্গ পরিত্যাগ করে' কোন অপরিচিত অনিশ্চিত অভিনব পথে চল্‌তে একান্ত অনিচ্ছা যে আমাদের নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রকে কতকটা অপ্রসর করে' রেখেছে, সেবিষয়ে সন্দেহ কর্‌বার কারণ নেই।

যাহোক, আজ এসম্বন্ধে কোন তর্ক উথাপন করা

আমার উদ্দেশ্য নয়। মেনেই নেওয়া গেল যে, আমাদের কার্য্যক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ এবং তার উপর আমাদের কোন হাত নেই এবং যে পরিমাণে আমাদের রাস্তা খোলাসা হয়েছে, সেই পরিমাণে আমরা নানাদিকে অগ্রসর হতেও পেরেছি। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে আমরা যে পথ ধরে' চলি সে পথেও অনেক সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নিজেদের অনর্থক সাফল্য থেকে বঞ্চিত করি;—এটা যে জাতিহিসাবে আমাদের কত বড় একটা লোক্‌সান, তা বুঝাবার চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য।

ওকালতি, ডাক্তারি, প্রভৃতি অল্প কয়েকটি অর্থকরী বিদ্যাই মাত্র আমাদের আয়ত্ত—এটা স্বীকার করলেও আমরা কি দেখ্‌তে পাই? বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে আমরা যখন স্ব স্ব জীবিকা অর্জ্জনের পথে বাহির হই, তখন গোড়া থেকেই আমাদের আক্ষেপ হয় কেন আমাদের পসার জমে' উঠ্‌ল না। 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্য' এ কথাটির মূলে যে সত্যটি আছে, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ব্যতীত যে নিপুণ ভিষক্ বা আর কিছু হওয়া যায় না, সেটা আমরা ভুলে যাই। যতদিন পসার জমে না উঠে, ততদিন নিজ নিজ অধীত বিষয়ে নব নব তথ্য, নূতনতর আবিষ্ক্রিয়া গুলির সঙ্গে যোগ সাধনের চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে যে কাজ দেখ্‌তে পারে, জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি ভাল করে' আয়ত্ত করবার প্রয়াস পেয়ে বিফল-মনোরথ হলেও যে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়, এ কথাগুলি কদাচিৎ আমাদের মনে স্থান পায়। অধীত-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন ত দূরের কথা, সারস্বত মন্দিরের বাইরে এসে পুস্তকস্থ যে বিদ্যার বলে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের অধিকার পেয়েছি, তাই ভুলে যেতে সুরু করি এবং তাস পিটিয়ে বড়ের চাল দিয়ে 'হেসে নাও দুদিন বৈ ত নয়' নীতির অনুসরণ করে', সুদীর্ঘ অবসরটাকে জগদ্দল পাথরের মত বুকে চেপে বস্‌তে না দিয়ে, লঘু স্বচ্ছ শারদীয় অভ্রের মত নীলাকাশের গায় উড়ে যেতে পারলে আমরা পরম আরাম উপভোগ করি, একথা অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকের পক্ষেই খাটে।

অনেকে বল্‌তে পারেন, পেটে খেলে পিঠে সয়, বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং; যতদিন দারুণ বুভুক্ষা জঠরকে পীড়া দিতে থাকে, ততদিন একনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চ্চা পোষায় না। কিন্তু যদি বুঝ্‌তাম যে 'হা অর্থ যো অর্থ' করে' কেবল হা-হুতাশ করতে থাকলে, কিম্বা খেলে বেড়িয়ে গল্পগুজব করে' সময়টাকে কাটিয়ে দিলে, আমাদের ভাগ্যে সেই অমরবাঞ্ছিত রৌপ্যচক্র-লাভ ঘটবে, তাহলে কোন কথাই ছিল না। বরঞ্চ এইটাই সত্য যে, যদি আমাদের দৈন্যের অবকাশে কঠোর শ্রমশীলতা দ্বারা আমরা অধীতবিদ্যার উৎকর্ষসাধনে তৎপর হই, তাহলে আমাদের আয়াস-ও-অনুশীলন-লব্ধ বিশিষ্টতা বেশী দিন চাপা থাক্‌বে না, এবং তার উপযুক্ত মজুরী না মিল্‌লেও আর্থিক হিসাবেও সেটা কোন দিন লাভজনক হয়ে দাঁড়াবে। সেই শুভ মুহূর্ত্তের জন্য অলসভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকলে তার আগমন সুদূরপরাহত হবে। তার জন্য কঠোর সাধন দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে, দীর্ঘ অভিসার-সাজে সজ্জিত হতে হবে। সময়ের এরূপ সদ্ব্যবহার থেকে নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বেড়ে যাবে, মনের স্নায়ুগুলি সতেজ ও দৃঢ় হবে; বাইবেলের ভাষায় বল্‌তে গেলে, ভগবদ্-দত্ত যে talentটি, যে পুঁজিটি, নিয়ে আমরা সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলাম, তাকে সুদে খাটিয়ে বাড়াতে পেরেছি বলে' একটা অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করব।

প্রতি মাস-কাবারে নির্দ্দিষ্ট বেতন পেয়ে দৈনিক উপার্জ্জনের চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারা যে কত বড় মুক্তি, সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু সেই অর্থ-চিন্তা-রূপ বাহ্য দাসত্ব থেকে মুক্তি যদি আমাদের আলস্য বাড়ায়, মানসিক জড়তা বেশী করে' এনে দেয়, তা হলে সে মুক্তিটাই একটা ভীষণ বন্ধনে পরিণত হয়। যদি এই জড়তাই চাক্‌রি-জীবনের বিশেষত্ব হয়, তবে সে বন্ধনের শৃঙ্খল দ্বারা আপনাদের অধিকাংশের কর কলঙ্কিত হয় নি বলে' আক্ষেপ করবার কোন কারণ দেখ্‌তে পাই না। বস্তুতঃ দারিদ্র্য কথাটাই হচ্ছে আপেক্ষিক। স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়া বা না হওয়া কারও প্রকৃতিগত, কারও নয়। বাণীর শ্রেষ্ঠ সেবকগণ—যাঁদের নাম জগতে অমর হয়ে আছে—আর্থিক হিসাবে প্রায় কেউই বড়লোক ছিলেন না। কবি হেমচন্দ্রই সে কথা বলে' গিয়েছেন;—

'হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও রাঙ্গাচরণ,
সেই সে দরিদ্র হবে।'

কিন্তু অর্থসম্পদ্‌বিহীন হয়েও ত তাঁরা কেউই বাগ্দেবীর সেবাব্রত ত্যাগ করেন নি। তার হেতু এই যে, মানুষ কেবল রুটি খেয়েই বাঁচে না—অন্নময় কোষের স্থূল আবরণের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও আনন্দের সূক্ষ্ম কোষগুলি নিহিত রয়েছে, তারাই আমাদের জীবনী-শক্তির পুষ্টি-সাধন করে।

অতএব পেটে ভাল করে' খেতে না পেলেও এমন একটা রসাস্বাদনের শক্তি অর্জ্জন করা যায় যা মনটাকে সর্ব্বদা নবীন, উদ্যমশীল, আশান্বিত, উৎসাহপূর্ণ করে' রাখে; তাকে নীরস, মৃতপ্রায়, নিরুদ্যম ও ভগ্নোৎসাহ হতে দেয় না। এটা কি একটা পরম লাভ নয়? কঠোপনিষদের ভাষায়, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই যখন শ্রেয় অপেক্ষা প্রেয়কে বরণ করে' নিয়ে 'বিত্তময়ী সৃঙ্কা' অর্থাৎ পথে মজ্জমান হয়ে পড়ি, তখন যদি এমন একটা অননুভূত অপূর্ব্ব রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর হয় "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"—সেটা কি এতই তুচ্ছ যে তার জন্য তাস পাশা গল্পগুজব ছেড়ে কিঞ্চিৎ সাধনা করতে পারি না? নচিকেতা ত তার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করেছিলেন; এমার্সন প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীগণ সেই উপাখ্যান থেকে মানসিক খাদ্য সঞ্চয় করে' পুষ্টিলাভ করেছেন।

হয়ত কেউ বলে' বসবেন, এটা ত ধর্ম্মের কথা, তত্ত্বের কথা হচ্ছে; তবে কি আমাদিগকে যৌবনেই যোগী হতে হবে নাকি? আমার উত্তর এই, আমি আপনাদিগকে তত্ত্বকথা শুনাতে আসিনি, আমি স্বপ্নেও সে যোগ্যতা দাবী করি না—কিন্তু আমাদের দেশে 'ধর্ম্ম' 'সাধন', 'যোগ' এই কথাগুলি যেরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে সাধারণতঃ প্রযুক্ত হয়ে থাকে, আমি আপনাদিগকে সেই সঙ্কীর্ণ পারিভাষিক অর্থ পরিহার করে' সেগুলিকে একটু ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করতে বলছি মাত্র। আমি এই বলতে চাই যে, কেবল 'পরাবিদ্যা'-বিষয়ে নয়, 'অপরাবিদ্যা'-সম্পর্কেও আপনাদিগকে 'যোগী' হতে হবে, 'সাধনা' করতে হবে, যাঁর যেটা 'স্বধর্ম্ম'—অর্থাৎ যিনি যে-বিষয়ে নিপুণ তাঁকে সেটায় পারদর্শিতা ও যোগ্যতা অর্জ্জন করার জন্য যত্নশীল হতে হবে। এরূপ করতে পারলেই তবে পরিণত বয়সে আপনাদের সাধনা সিদ্ধিলাভ করবে, 'স্বধর্ম্মে' অর্থাৎ নিজ নিজ ক্ষমতার আয়ত্তাধীন বিষয়ে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে দেশকে সমাজকে জগৎকে যার যেটুকু দেবার তিনি ততটুকু দিতে পারবেন, এবং যতখানি সার্থকতা তাঁর ভগবদ্-দত্ত প্রতিভার অধিগম্য, ততখানি সার্থকতা অর্জ্জন করে' নিজে কৃতকৃতার্থ হতে পারবেন। নতুবা ব্যর্থতার নিষ্ফল অনুশোচনায় জীবন্মৃত ভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে' থাকতেই তিনি পছন্দ করবেন।

লাটিন ভাষায় একটি কথা আছে tedium vitae এবং ফরাসি ভাষায় আর-একটি কথা আছে joie de vivre। প্রথম কথাটির অর্থ হচ্ছে জীবনে অপ্রীতি এবং দ্বিতীয় বাক্যটির মানে হচ্ছে বেঁচে থাকবার স্ফূর্ত্তি। আমাদের জীবনে অবসাদের ভাবটা বড়ই সুস্পষ্ট। সাংখ্যদর্শন-মতে জীবন দুঃখময়—সংসার কুপিতফণিফণাচ্ছায়াতুল্য। আমাদের কবি গাহিয়াছেন, 'সংসারে শান্তির আশা মরীচিকায় যথা জল।' এই অতি প্রাচীন হিন্দুজাতি যুগযুগান্তরের দুঃখবাদের সাধনায় ও সহস্র বৎসরের পরপদলেহনের ফলে এমনই মৃতপ্রায় নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে যে, এর তুহিনশীতল শোণিতে জীবন্ত জাতির তপ্ত রক্তধারা প্রবাহিত করতে চেষ্টা করা আকাশকুসুমেরই মত স্বপ্ন মাত্র বলে' মনে হয়। আমরা সর্ব্বদা ত্রিবিধ তাপে তাপিত—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিভীষিকাগুলি নিত্য আমাদের চক্ষের সমক্ষে নৃত্য করছে, হাঁচি-টিকটিকির ভয়ে আমরা সদা মুহ্যমান, বেঁচে থাকবার আমাদের এতই সাধ যে পাঁজিপুঁথি না ঘেঁটে আমরা এক পা নড়ি না। অথচ অদৃষ্টের কি তীব্র পরিহাস যে ওলাওঠা, মহামারী, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি লোকক্ষয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি আমাদিগকে যেমন পেয়ে বসেছে, জগতের আর কোন জাতিকে এমন সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ করতে পারে নি। আমাদের বৈদিক সাহিত্যে সর্ব্বদাই এই কথাটি দেখা যায়,—'শতায়ুর

বৈ পুরুষঃ', 'জিজীবিষেচ্ ছতং সমাঃ'—মানুষের পরমায়ু একশত বৎসর, কিন্তু অধুনা এ-কথাটি ম্লেচ্ছ জাতির সম্বন্ধে যেরূপ সত্য, আমাদের পক্ষে ঠিক তার বিপরীত। শৈশব-মৃত্যু, অকালমৃত্যু, প্রভৃতি মূল্যবান্ অধিকারগুলিতে আমাদের একচেটিয়া স্বত্ব; অন্য কোন সভ্যজাতি এ-সব বিষয়ে আমাদের কাছে এগুতে পারে না। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে লিখে গিয়েছেন—'নক্ষত্রমতিপৃচ্ছন্তম্ বাল্মমর্থোঽতিবর্ত্ততে'—যে বালোচিতবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি বেশী পরিমাণে নক্ষত্রজিজ্ঞাসু হয়, অর্থ তাকে অতিক্রম করে' যায়, অর্থাৎ কিনা, যাঁরা খুব গ্রহনক্ষত্র মেনে চলেন, তাঁদের ভাগ্যে ধনলাভ ঘটে না। কিন্তু আমরা এখন আর সে-সব কথা মানিনে। আমাদের বাহিরে যে বিরাট্ জড়জগৎ বিস্তৃত রয়েছে, সর্ব্বদা আমরা তাকে ভয় করে' অতি সন্তর্পণে নিজের ধিক্কৃত ক্ষুদ্র প্রাণটি বাঁচিয়ে চল্‌বার চেষ্টা করি—

'অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায়, তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়!'

সংসারের অনিত্যতার চিন্তায় মনে কাল্‌চে ধরে' গেছে, সর্ব্বদা মোহমুদ্গর বৈরাগ্যশতক আওড়াচ্ছি এবং শান্তি স্বস্ত্যয়ন লক্ষ্মীপূজা শনিপূজা কিছুই বাদ দিচ্ছি না। কিন্তু লক্ষ্মী পলায়ন করেছেন, শনি কায়েম হয়ে বসেছে, আর আমরা 'ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি' হয়ে আছি।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহের দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাদের লোকগুলি যেন এক-একটা উল্কাপিণ্ড—উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, তেজ, নির্ভীকতার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি। Joie de vivre—জীবনে প্রীতি, প্রাণের স্পন্দন, বেঁচে থাকার স্ফূর্ত্তি, তাদের ভাবে, কথায়, কার্য্যে, শতধারায় ঠিক্‌রে পড়্ছে। বৃদ্ধ বয়সেও খেলা কর্‌ছে,—আমাদের মত অলস জীবনের জড়তা দূর কর্‌বার জন্য ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে নয়, প্রাণের অফুরন্ত স্ফুরণের নৈত্যিক বাহ্য প্রকাশের প্রেরণায়—আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন গুরুতর মানসিক শক্তির লীলাখেলা দেখাচ্ছে, যাতে করে' জগৎ স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে। 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ,' 'নাত্মানং অবসাদয়েৎ' —গীতাকার এই উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যগুলি যেন তাদের জন্যই লিখে গিয়েছিলেন। বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের বেদান্তধর্ম্মকে এখন practical (কেজো) কর্‌তে হবে অর্থাৎ যে 'বিগতভীঃ' মন্ত্রের উদাত্ত বাণী বেদান্তের শ্রেষ্ঠ দান, সেটাকে পুঁথির পাতা থেকে খসিয়ে এনে জীবন-যুদ্ধের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে হবে এবং তার সঙ্গে পাশ্চাত্য humanitarianism অর্থাৎ লোকহিতব্রত যোগ করে' 'সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ' গীতার এই মহান্ আদর্শকে অধ্যাত্মজগৎ থেকে নামিয়ে এনে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কাজে লাগিয়ে এক নব বেদান্তধর্ম্ম স্থাপন কর্‌তে হবে—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু' প্রভৃতি মন্ত্রকে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর্‌তে হবে, যা বেদান্তসূত্রের শারীরিকভাষ্যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও কর্‌তে সাহস পাননি—কারণ 'ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ'—তিনিও এই নীতির সমর্থন কর্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন। আমি মহাত্মা বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে' আমার যুবক বন্ধুদিগকে আহ্বান করে' বিনীতভাবে বল্‌ছি, তাঁরা এই সামাজিক ভেদবুদ্ধি দূরীকরণ রূপ বৈদান্তিক লোকহিতব্রত গ্রহণ করুন, তাঁদের এই লক্ষ্য হোক, এতে জীবিকা অর্জ্জনের পথ রুদ্ধ হবে না, কিন্তু এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা ও সাধনা চাই, তাতে আত্মনিয়োগ কর্‌তে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যৌবনে দাও রাজ-টীকা'—বাস্তবিক সকল মহৎ আদর্শের বীজ যৌবনেই উপ্ত হয়ে থাকে, যার লক্ষ্য যৌবনে বিশিষ্টতা লাভ করেনি সে পরিণত বয়সে কদাচিৎ তা ফলিয়ে তুল্‌তে সক্ষম হয়—অতএব এই ব্রত গ্রহণের পক্ষে যৌবনই প্রকৃষ্ট সময়। মিসেস্ ব্রাউনিং বলেছেন—

'An ignorance of means may minister
To greatness, but an ignorance of aims
Makes it impossible to be great at all.'

"মহত্ত্বলাভের উপায় জানা না থাক্‌লেও মহৎ হওয়া যেতে পারে, কিন্তু উচ্চ লক্ষ্যের অজ্ঞতা থাক্‌লে মহৎ হওয়া অসম্ভব।"

লক্ষ্য স্থির থাক্‌লে উপায়ের জন্য ভাব্‌তে হবে না, উপায় আপনি আপনার পথ খুঁজে নেবে।

এই মহৎ ব্রতে বিফলতার আশঙ্কায় কেউ যেন ভীত

না হন। আমাদের গীতাকারই ত বলেছেন, কর্ম্মে আমাদের অধিকার আছে, ফলে নয়। বহু পাশ্চাত্য মনীষী বলেছেন, বিফলতা লজ্জার বিষয় নয়, আদর্শের ক্ষুদ্রতাই লজ্জাকর। বিফলতার উপরই ত সাফল্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। যাদৃশী ভাবনা, সিদ্ধি ততটা না হলেও কতকটা তদনুরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর্থিক উন্নতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে, এবং সেটা কিছু বিশেষ বড় কথা নয়। দেহরক্ষা করলেই অনেক তথাকথিত বড়-মানুষের স্মৃতি সমাধিপ্রাপ্ত হয়। 'সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।' একথা অতি সত্য যে, মহৎ যাহার চেষ্টা ঈশ্বর তাহার সহায়। রবীন্দ্রনাথের সুন্দর ভাষায়,

'তোমার পতাকা যারে দাও তারে
বহিবারে দাও শকতি!
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি!'

আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা গভীর মোহ যে অতীতপ্রীতি, সেটা, যে জাতীয় জড়তা বা tedium vitæর বিরুদ্ধে আমি আপনাদিগকে যুদ্ধঘোষণা করতে বল্‌ছি, তাকে মজ্জাগত করে' রেখেছে। অতীতপ্রীতির একটা ভাল দিক্ আছে, সেটাকে আমি নিন্দা করছি না। যে জাতির পূর্ব্বপুরুষের উপর শ্রদ্ধা না থাকে, তার নিজের উপরও আস্থা কমে' যায়। আত্মসম্মানজ্ঞান উদ্বুদ্ধ না হলে তাকে দিয়ে কোন মহৎ কাজের আশা করা যায় না। কিন্তু কোন দিন আমরা পোলাও কালিয়া খেয়েছিলাম বলে' আজও প্রতি উদ্গারে তার মহিমাকীর্ত্তন করতে গেলে জগৎ-সমক্ষে আমাদিগকে হাস্যাস্পদ হতে হয়। ইংরেজ জাতি ত একথা বল্‌তে একটুও কুণ্ঠাবোধ করে না যে, দুহাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারত যখন সমগ্র জগতে সভ্যতার আলো বিকিরণ করছিল, তখন তারা উল্কিপরা নগ্নগাত্রে শাখা-মৃগের ন্যায় গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত। বর্ত্তমানে যে তাদের গৌরব করবার অনেক সামগ্রী আছে, তাই তাদের দৃষ্টি একান্ত অতীতনিবদ্ধ নয়। আমরা ভুলে যাই, কবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে যে কথাটি বলে' গিয়েছেন—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
নচাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

"যা কিছু পুরাতন তাই ভাল নয়, কাব্য নূতন হলেই কিছু মন্দ হয় না, সাধু ব্যক্তি পরীক্ষা করে' দু'এর একটি গ্রহণ করেন; মূঢ় যে, সে-ই কেবল পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি হয় অর্থাৎ পরের মুখে ঝাল খায়।" বৃহস্পতি তাঁর ধর্ম্মসূত্রে বলে' গিয়েছেন, কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করে' কর্ত্তব্যনির্ণয় করা ঠিক নয়, যেহেতু যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি ঘটে। যে যুগে এসকল কথা সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, সেটা ছিল স্বাধীন চিন্তার যুগ। তখন আমাদের বুদ্ধি রাষ্ট্রীয় কিংবা সামাজিক দাসত্বের চাপে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়েনি। এখন আমাদের স্বাধীন চিন্তা লোপ পেতে বসেছে।

"অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এ যে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন!
* * * *
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা' যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!"

রাজনৈতিক আন্দোলন জিনিষটা এখন দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে, এবং বিলেত থেকে আমদানি সকল জিনিষের মধ্যে ঐ একটি বস্তুর আবশ্যকতা আমরা ভাল করে'ই উপলব্ধি করতে শিখেছি। সুতরাং রাজনীতি-ক্ষেত্র থেকেই ২।১টা উদাহরণ দেওয়া যাক্। সিড্‌নি স্মিথ্ আক্ষেপ করে' বলেছিলেন, সকল বিদ্যাই অনুশীলন-সাপেক্ষ বলে' আমরা মনে করি, কেবল এক রাজনীতি ছাড়া; সেখানে সকলেই স্বয়ংসিদ্ধ ও অশিক্ষিতপটু। যখন তিনি এ-কথা বলেছিলেন, ইংলণ্ডের সে যুগ অনেক কাল অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর কথাটা আমাদের পক্ষে এখনও অনেকটা খাটে। সংসারে যেমন পর-নিন্দার মত মুখরোচক আর কিছু নেই, সেইরূপ স্বজাতির দোষের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে' অন্যজাতির দোষোদ্-ঘাটনের চেষ্টাটাও অতি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ সেই পর যখন বিদেশীর আকারে আমাদের মাথার উপর চেপে

বসে' রয়েছে, এবং ক্ষীরসরননীটা তাদেরই ভোগে লাগ্‌ছে, আমরা একটু জলো দুধ খেয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌তে বাধ্য হচ্ছি, অনেকের ভাগ্যে তাও জুট্‌ছে না। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে, তাদের গালাগালি দিয়ে যা ফল, তার চেয়ে অনেক বেশী ফল লাভ হবে নিজেদের দোষগুলি বুঝে' সেগুলি দূর কর্‌বার চেষ্টা করলে। নিজেরা শক্তিশালী হয়ে যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌তে না পার্‌লে ঘাড়ের কোন ভূত ত নাম্‌বে না। একটাকে নামাতে পার্‌লেও যে আর-একটা উড়ে এসে জুড়ে' বস্‌বে। কিন্তু সেদিকে আমাদের কয়জনের লক্ষ্য আছে? মহাত্মা গোখ্‌লে বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যও অনেক শিক্ষা, অনেক অনুশীলনের দর্‌কার;—সর্‌কারী নানাবিধ বিবরণী ও সংখ্যাবিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে' ভারতের ইতিহাস, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস, রাজনীতি ও অর্থনীতি-বিষয়ক মূল সূত্রগুলি, ভারতের ও অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রগঠনপ্রণালীর তুলনামূলক সমালোচনা, ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে লব্ধপ্রবেশ হতে পার্‌লে, এবং সর্ব্ববিধ সামাজিক, অর্থ-নৈতিক এবং রাষ্ট্রিক ব্যাপারে যোগদান করে' সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ করে' তুল্‌তে পার্‌লে, তবেই আদর্শ রাজনীতিবিদ্‌ হওয়া যায়, এবং রাজদর্‌বারে বসে' অকাট্য যুক্তির দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রমপ্রমাদগুলি খণ্ডন করা যায়। তিনি নিজেকে এই আদর্শে গড়ে' তুলেছিলেন বলে'ই জন্‌ মর্লি ও লর্ড্‌ কার্জ্জন প্রভৃতি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্‌গণ তাঁকে সম্মান কর্‌তেন, এবং লর্ড্‌ কার্জ্জনের ন্যায় বাগ্মীও বলেছিলেন, it is a pleasure to cross swords with him—তাঁর সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার আসরে বসে' বাদানু-বাদ করে' তৃপ্তি লাভ হয়। দেশে এরূপ একদল কর্ম্মীর নিতান্তই আবশ্যক, যাঁরা রাজনীতিচর্চ্চায় জীবন অতি-বাহিত কর্‌বেন, এবং তজ্জন্য দীর্ঘ সাধনার দ্বারা নিজকে তৈরি করে' নেবেন, তাহলেই রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা প্রতিষ্ঠালাভ কর্‌তে পার্‌ব। এটা তিনি বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পেরেছিলেন বলে'ই Servants of India Society 'ভারতসেবক-সঙ্ঘ' নামক একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের জন্য যে-সব নিয়মাবলী প্রস্তুত করে' গিয়েছেন, তা ঠিক যেন আমাদের কোন শঙ্করমঠ বা গুরুকুলের আশ্রমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পড়ে' দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বেন। লর্ড্‌ সিংহ বলেছেন, এরূপ একটি সেবকসঙ্ঘ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান অভাব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এরূপ আশ্রম স্থাপিত হয়েছে, এবং সেখানে যে-সব লোক তৈরি হয়ে উঠ্‌ছে, তারা তত্তৎ প্রদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহজেই প্রতিষ্ঠালাভ কর্‌ছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই অবসরবিনোদন-কল্পে আল্‌বোলার ধূম উদ্গিরণ কর্‌তে কর্‌তে কিংবা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের রাজ-নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হল ভেবে, কেবল কণ্ঠনালীর জোরে রাষ্ট্রিক ব্যাপারে দলপতির আসন গ্রহণ কর্‌তে অগ্রসর হই, এবং ইংরেজ জাতির নিন্দা কীর্ত্তনে ঘনঘন করতালির শব্দে যখন আসর মুখরিত করে' তুলি, তখন সত্য সত্যই জীবন ধন্য মনে করি।

আয়ব্যয় (finance), মুদ্রাবিজ্ঞান (currency), বিনি-ময় (exchange) প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ক'জন বিশেষজ্ঞের আসন দাবী কর্‌তে পারেন, সেটা ভেবে দেখ্‌বার বিষয়। ভারতের রাজস্ব-সচিব স্যার্‌ বেসিল ব্ল্যাকেট বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই বণিক্‌-সভার অধিবেশনে এসম্বন্ধে কি বলেছেন শুনুন:—

"I believe that on sound financial principles and administration depends more almost than on anything else the happy emergence of India as a self-governing dominion of the British Commonwealth of nations. For this reason the problems we are discussing deserve the close attention and study of all who are working for India's political future. But they must be studied scientifically and singlemindedly as subjects of a highly technical and complex nature, not simply as a happy hunting ground in which to find weapons to attack the Government."

এর ভাবার্থ এই যে, ভারতে স্বরাজ্য স্থাপন, খাঁটি রাজস্বনীতি নির্ব্বাচন ও তার প্রয়োগের উপর যতটা নির্ভর করে, এমন আর কিছুর উপর নয়। ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎকে ভাল কর্‌বার জন্য যাঁরা চেষ্টা কর্‌ছেন, আয়-ব্যয় ও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁদের গভীর অভিনিবেশ

আবশ্যক। কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত জটিল বিষয় জেনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একাগ্রতার সঙ্গে সে-সকল বিষয় অধ্যয়ন ও অনুশীলন কর্‌তে হবে, কেবল গবর্মেণ্ট্‌কে আক্রমণ কর্‌বার অস্ত্র খুঁজ্‌বার উদ্দেশ্যে ঐ-সকল ক্ষেত্রে নেচে কুঁদে বেড়ালে চল্‌বে না। অনেকে বল্‌বেন, গবর্মেণ্টের সহায়তার অভাবেই ত আমাদের শিক্ষালাভ ঘটে না। একথা সত্য হলেও, যতদিন আমরা এ-সকল বিষয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হতে না পার্‌ব, ততদিন রাজনীতিক্ষেত্রে কিছুতেই আমরা যোগ্যতার দাবী কর্‌তে পার্‌ব না। দাদাভাই নৌরোজী, ওয়াচা প্রভৃতি বোম্বাই অঞ্চলের নেতাগণ ইংরেজের সাহায্য ব্যতিরেকেই ত উক্ত বিষয়গুলিতে পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। গবর্মেণ্টের রাজস্বনীতি সম্বন্ধে যোগ্য সমালোচনা কয়খানি দেশীয় কাগজে দেখ্‌তে পাওয়া যায়? এ-সকল বিষয়ে ইংরেজ-পরিচালিত কাগজগুলি থেকেই অনেক সময় আমাদিগকে লোকমত সংগ্রহ কর্‌তে হয়, কারণ আমাদের মধ্যে এসব তত্ত্বের 'বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ'। মোট কথা আমাদিগকে second best দ্বিতীয় হলে চল্‌বে না, the very best সকলের সেরা হতে হবে—এই লক্ষ্য অনুসরণ করে' রাজনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের গড়ে' তুল্‌তে হবে। মনে রাখ্‌তে হবে, বর্ত্তমান জগতে অন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দ্বিতীয়ের স্থান নেই।

বস্তুতঃ আমরা ভুলে যাই যে, আমাদের এই যে যুগ-ব্যাপী দাসত্ব, এই জাতীয় কলঙ্ক কেবল আত্মাপরাধ-বৃক্ষের ফল মাত্র। তা যদি না হত, তবে ত ভগবান্‌ আমাদেরই ন্যায় সাদা চামড়ার ভয়ে ভীত, এটা স্বীকার কর্‌তে হত। আমরা স্বরাজ্য পেলেই যোগ্য হয়ে উঠ্‌ব, এটা যদি সত্য হয়, তবে ভগবানের ত এটা মস্ত অবিচার যে তিনি আমাদিগকে এতকাল স্বরাজ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন!

আমাদের কোন দোষ নেই, অথচ আমরা পরাধীন অধঃপতিত হয়েছি, এমনটি হলে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকে না। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন যে পরাধীনতা আমাদের আত্মকৃত ব্যাধি, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবে মরেছি। যে একতা, মৈত্রী, অভেদবুদ্ধি, বীর্য্য, স্বার্থত্যাগ, মহৎ আদর্শ, স্বেচ্ছাচার-ও-পরপীড়ন-বিমুখতা, দেশাত্ম-বোধ প্রভৃতি নৈতিক গুণগুলি ব্যতীত কোন জাতি কখনও জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা কর্‌তে পারেনি—দীর্ঘ কাল ধরে' আমাদের মধ্যে সেগুলির অভাব বেড়ে যাচ্ছিল বলে'ই ত আমাদের এত অধঃপতন। এখনও সেই ভেদ-বুদ্ধি কতটা দূর হয়েছে? বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট বাহাদুর মান্দ্রাজে আদি-দ্রাবিড় মহাজন-সভায় যে কথাগুলি বলেছেন, তা আমাদের প্রণিধান-যোগ্য:—

"None can deny that these social restrictions and limitations are a formidable obstacle to unity and progress in India. They have also unfortunately repercussions beyond India itself......signs are not wanting that these class disabilities lessen the prestige of India as a country in the eyes of foreign nations also."

অর্থাৎ—একথা কেউ অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না যে, এদেশে যে-সকল সামাজিক বিধিনিষেধ ও সঙ্কীর্ণতা প্রচলিত আছে, সেগুলি জাতীয় একতা ও উন্নতির ভীষণ অন্তরায়; দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের বাহিরেও তারা প্রতিঘাত উৎপাদন করে। সামাজিক কতকগুলি অধিকার থেকে শ্রেণীবিশেষকে বঞ্চিত করার দরুন্‌ ভারত যে বৈদেশিক জাতিসমূহের নিকট সম্মান হারাচ্ছেন তার অনেক লক্ষণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ভগবানের রাজ্যে কিছুকালের জন্য অসতের জয় সতের ক্ষয় না হয় এমন নয়। বিশ্বনিয়মের নিগূঢ় রহস্য বিশ্বস্রষ্টা ভিন্ন আর কারও সম্যক্‌রূপে ভেদ কর্‌তে চেষ্টা করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবে মোটের উপর 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' এই বাক্যটির উপর বিশ্বাস না থাক্‌লে ধর্ম্মই বা কি, কর্ম্মই বা কি, 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই লোকায়ত-নীতি অনুসরণ করে' জীবনটাকে চালিয়ে দেওয়াই ত ঠিক। যাহোক, আমার কথা হচ্ছে এই যে, যেমন আত্মিক ক্ষেত্রে তেমনই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, ('স্বরাট্‌' শব্দটি যে বৈদান্তিক পরিভাষা থেকে গৃহীত এ-কথাটি সকলে জানেন কিনা জানি না), স্বরাজ্য-সিদ্ধির জন্য কঠোর সাধনার আবশ্যক। সেই সাধনাই আমাদের মধ্যে একদল যুবকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সে সাধনা কি?

—না আমাদের গোড়ার গলদগুলি দূর কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে নিজেকে ও দেশকে প্রস্তুত করে নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Nationalism স্বাজাতিকতা গ্রন্থে যে বলেছেন, আমরা সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপর আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চাই, এটা কি সত্য নয়? বড়ই অপ্রিয় বলে' এসব কথার ভিতর আমরা সহজে প্রবেশ কর্‌তে চাই না, কিন্তু উটপক্ষীর ন্যায় চোখ বুজে থাকলেই ত আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতার কারণগুলি দূর হবে না। মহাত্মা গান্ধি এটা ভালরূপই জান্‌তেন বলে' অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে তাঁর জাতিসংগঠন-কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন দিয়েছিলেন। কিন্তু অসহযোগপন্থী মফস্বলের একটি সুপরিচিত দৈনিক পত্রে আমি দেখেছি, তার সম্পাদক লিখেছেন, যে, গান্ধি মহারাজ স্বয়ং বেণেবংশোদ্ভূত, সুতরাং তাঁর পক্ষে এ-কথা বলা খুবই স্বাভাবিক হলেও অভিজাতবংশজাত হিন্দু-সমাজের নেতাগণকে তিনি যা বল্‌বেন তাই তাদের নির্ব্বিচারে গ্রহণ কর্‌তে হবে এমন কোন কথা নেই! সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যনির্ব্বাচন জন্য সর্ব্বত্র যে আন্দোলনের বন্যা বহে গিয়েছে, তাতে শ্রেণী, সমাজ, জাতি, class, community and race প্রভৃতি নিয়ে ভেদমূলক যতগুলি সংস্কার আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে, সেই সংস্কারগুলির দোহাই দিয়ে, উপস্থিত কার্যসিদ্ধির জন্য, কত তথাকথিত 'জাতীয়'-পতাকাধারী স্বেচ্ছাসেবক ও তাদের নেতৃবৃন্দ কত কথাই না বলেছেন! এতে জাতীয় ঐক্যসাধনের মূলে যে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে, ঐ বস্তুটি যে আরও সুদূরপরাহত হয়ে পড়্‌ছে, বাস্তবিক এরূপ দোহাই দেওয়া যে ঘোরতর জাতিদ্রোহিতা, ক্ষণিক উত্তেজনার মোহে এই স্থূল কথাটা কি অনেকেই বিস্মৃত হননি? প্রতিপক্ষের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ, ভোটদাতাগণের মনের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তারের সর্ব্ববিধ প্রয়াস, অহিংসাবাদী অসহযোগপন্থী ও সহযোগপন্থী উভয়দলের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান দেখা গিয়েছে। আর-একটি অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুন্‌তে পাচ্ছি—'হিন্দু স্বরাজ্য সদস্য', 'মুসলমান স্বরাজ্য সদস্য'। এটা যেন ঠিক কাঁঠালের আমসত্বের মত। স্বরাজ্যে ত কোন জাতিভেদ চল্‌তে পারে না—সকলেই ভারতবাসী, ভারতমায়ের সন্তান। যে পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের রাজনৈতিক জীবন গড়ে' উঠ্‌ছে, তাদের মধ্যে স্বদেশের অধিবাসী মাত্রই স্বজাতি,—হোক না কেন সে প্রটেষ্টাণ্ট, রোমান্ ক্যাথলিক বা ইহুদি। রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রথমতঃ দেশ, তার পর ধর্ম্ম। যতদিন আমাদের দেশাত্মজ্ঞান এতটা প্রবল না হয়েছে যে আমাদের রাষ্ট্রচৈতন্য ও জাতীয় ঐক্যবোধ ব্যক্তিগত ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পেরেছে, ততদিন আবার স্বরাজ কোথায়? এটাও আমাদের মনে রাখা উচিত, যে, যদি ফরোয়ার্ড্ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট কার্য্যনীতিই আমাদের অভীপ্সিত হয়—"no method is too mean if it advances the nation's plans to reach its goal"—যে-কোন উপায় জাতীয় উদ্দেশ্য অনুসরণে আমাদিগকে সাহায্য করে, যতই নীচ হোক না কেন, আমাদিগকে তা অবলম্বন কর্‌তে হবে—তা হলে ইংরেজের কুটিল নীতির দোষ ধরি কি বলে'? আমাদের যে আধ্যাত্মিক spiritual সভ্যতার জয়গানে দিগন্ত নিনাদিত হয়ে ওঠে, তার পরিণাম কি এই? বস্তুতঃ যদি আমাদের মূললক্ষ্যগুলি ঠিক থাকৃত, তাহলে এই মোটা কথাটা এরূপভাবে আমরা ভুলে যেতে পার্‌তাম না।

আমি জানি এ-সকল কথা আমাদের নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর, সুতরাং যাঁরা লোকপ্রিয় জননায়ক হতে চান, তাঁরা এগুলি এড়িয়ে চলেন। বাঙ্গালী senti-mental ভাববিলাসী জাতি; কোন একটা উত্তেজনার প্রবল আবেগ যখন তার বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে ওঠে তখন যে-কেউ তার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, ধূর্জ্জটির অলকনিঃসৃত জাহ্নবীর প্লাবনে ঐরাবতের ন্যায় তাকে একেবারে ভেসে যেতে হয়। তথাপি দেশে এমন একদল লোক চাই, যারা ভগবানের শ্রেষ্ঠদান যে বিচারবুদ্ধি, লোকপ্রিয় হওয়ার জন্য তাকে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত নয়, যারা মানসিক দাসত্বকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন দাসত্ব বলে' বিবেচনা করে। জেম্‌স্ রাসেল্ লাউয়েলের বিখ্যাত কবিতাটি আপনারা সকলেই পড়েছেন:—

"They are slaves who will not choose
Hatred, scoffing and abuse,
Rather than in silence shrink
From the truth they needs must think,
They are slaves who dare not be
In the right with two or three."

অর্থাৎ—

দাসত্বের অতি হেয় এই ত লক্ষণ,
নিন্দা ঘৃণা অপযশ না করি' বরণ
যে সত্য মানসে মম হয় প্রতিভাত
প্রকাশ্যে ঘোষিতে তারে হই সঙ্কুচিত ;
দুই বা তিনের সঙ্গে সত্যপথে যেতে
দাসতুল্য সেই, যার ভয় জাগে চিতে।

এতক্ষণ রাজনীতির কথা বলা গেল। আমি আর্দ্রকের ব্যবসায়ী, অর্ণবপোতের সংবাদে আমার আবশ্যক কি, অনেকেই মনে মনে অবশ্য এ-কথা জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন। সুতরাং এবিষয়ে আর বাগ্-বিস্তার না করে' এই বলে'ই ক্ষান্ত হওয়া যাক যে, অনেক সময় যারা খেলে তাদের চেয়ে দর্শকবৃন্দ ভাল করে' খেলাটা দেখ্‌তে পায়। যারা ক্রীড়ক, তারা স্ব স্ব ভূমিকা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, মোটের উপর খেলাটা কি রকম চল্‌ছে, সেটা দেখ্‌বার তাদের অবসর থাকে না। এইজন্য রাজনীতি-ক্ষেত্রে একদল চিন্তাশীল দর্শকেরও আবশ্যক আছে, এবং দীর্ঘকাল যাবৎ আমার নিভৃত গৃহ-কোণে আরাম-কেদারায় বসে' আমি পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে রাজনীতিচর্চ্চাটা করে' আস্‌ছি। তবে এটা সত্য যে সাহিত্যসেবাই আমার প্রকৃত প্রিয়বস্তু, তাতে আমি যে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করি, আর কিছুতেই তেমন নয়। সুতরাং সেইদিক্ দিয়ে আমাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে' আজকার মত আমার বক্তব্য শেষ করব।

বলা আবশ্যক, আমি কোন সঙ্কীর্ণ অর্থে 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যবহার করি নি। জন্ মর্লি এক স্থলে সাহিত্যের এই সংজ্ঞাটি দিয়েছেন :—

"The master organon for giving men the precious qualities of breadth of interest and balance of judgment; multiplicity of sympathies and steadiness of sight; ...literature being concerned...to diffuse the light by which common men are able to see the great host of ideas and facts that do not shine in the brightness of their own atmosphere."

এর ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে পদ্ধতি অনুস[রণ] করে' আমাদের মন প্রসার লাভ করে ও বিচার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হয় ; কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থগুলিতে [নি]জ্জিত না থেকে আমরা নানা বিষয়ের সহিত সহানুভূতি দ্বারা যোগ স্থাপনে আগ্রহবান্ হই এবং আমাদের স্থির দৃষ্টি লাভ হয় ; আমাদের মানসক্ষেত্রে যে-সকল ভাব ও তথ্য স্বয়ম্ভাত হয় না,—সে-সকল বিষয়ে যে বৃত্তির সাহায্যে আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি, সেই পদ্ধতি ও সেই বৃত্তি যে উপাদান অবলম্বনে বিকাশলাভ করে, তাকেই সাহিত্য বলা চলে। সুতরাং সাহিত্যের এই সংজ্ঞার মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান সকলই অনুস্যূত। এই যে সম্যগ্‌দর্শন যেটা সৎসাহিত্যানুশীলনের চরম ফল ও বিশেষত্ব, এটা কি পরম সাধনার বস্তু নয় ? এই আদর্শ কি আমাদের অন্ত-র্নিহিত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করার পক্ষে প্রচুর নয় ? সত্য বটে, ইহা সহজলভ্য নয়, স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় না। কিন্তু কোন সাধনার জন্যই ত রাজকীয় রাস্তা তৈরি নেই। 'সহজিয়া' মত ও 'সহজিয়া' সম্প্রদায় বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সাধনকে কি গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করেছিল, সেটা ত ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞের নিকট অপরিচিত নেই। বিবেকানন্দ বজ্রগম্ভীরনির্ঘোষে পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে সাবধান করে' দিয়েছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। ফাঁকি ধরা পড়্‌বেই, মেকি কিছুদিন চল্‌লেও বেশী দিন চল্‌বে না। অতএব যাঁরা সাহিত্যের অন্তরঙ্গ অনুভূতি-গুলির সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ করতে চান, তাঁদের গোড়া থেকেই লক্ষ্য স্থির করে' চল্‌তে হবে। সর্ব্ববিধ আমোদ প্রমোদ থেকে আপনাকে বঞ্চিত রেখে, চক্ষু কোটরগত করে' গ্রন্থকীট হয়ে অকালবার্দ্ধক্যকে বরণ করে' নিতে হবে, আমি একথা বল্‌ছি, এটা যেন কেউ মনে না করেন। জীবনটাকে সরস রাখ্‌তেই হবে, রোমান্ কবি টেরেন্সের ভাষায় বল্‌ব, মানুষ আমি, অতএব মানবের সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টা ও সুখদুঃখের সঙ্গে আমার যোগ রক্ষা করে' চল্‌তে হবে। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই কর্ম্মজীবন ছাড়া আর-একটা জীবন আছে, যা, তার প্রাণটিকে

সঞ্জীবিত রাখে, সেটাকে তার ভাবরাজ্য বা ভাবময় জীবন বলা চলে। আমাদের সাধারণ কর্ম্মজীবন আমাদের জীবিকাসংস্থানের উপাদান সংগ্রহ করে' দেয়, আমরা সতত যে 'ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তয়া' জর্জ্জরিত থাকি, তা যোগানই ওর প্রধান কাজ। কিন্তু কর্ম্ম যখন দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বেষ্টনীকে অতিক্রম করে' উন্নততর ক্ষেত্রে বিচরণ কর্‌তে চায়, তখন আমাদের ভাবময় জীবনই তার এবং মনের খোরাক যুগিয়ে থাকে। যে-সকল উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ আমাদের মগ্নচৈতন্যে সুপ্ত অবস্থায় লীন হয়ে থাকে, আমি যে ব্যাপক অর্থে 'সাহিত্য' শব্দ ব্যবহার করেছি, তার আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারাই সেগুলি জাগ্রত হ'য়ে আমাদের ভাব ও কর্ম্মের উপর একটা উন্নততর প্রভাব বিস্তার কর্‌তে সক্ষম হয়। কতকগুলি মহৎ আদর্শের সঙ্গে পরিচয় ও তার অনুশীলন ব্যতিরেকে সম্যগ্‌দৃষ্টি লাভ হয় না। যে বস্তুর ভিতর দিয়ে ঐ মহৎ আদর্শগুলি আমাদের মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত হয়, তাকেই আমি সাহিত্যের উপাদান বলি। ম্যাথ্যু আর্নল্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীগণ এরূপ সাহিত্য-সেবালব্ধ মানসিক অবস্থাকে culture (কাল্‌চার্) বলে' বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' এই কাল্‌চারেরই প্রাধান্য দিয়ে গিয়েছেন। মানুষের সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্যক্ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধন এর উদ্দেশ্য। গ্রীকজাতির এই আদর্শ ছিল, এবং আধুনিক পাশ্চাত্যজাতিগণ মানসিক উত্তরাধিকারসূত্রে তার কতকটা লাভ করেছেন। আমাদের শিক্ষা ও সাধনা অনেকটা একদেশদর্শী, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তি ও পরলোক-তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত। যে-সকল জাগতিক ব্যাপার নিয়ে আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে কার্‌বার কর্‌তে হয়, সে-সকল প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা উদাসীন। স্কুল-কলেজে এসকল বিষয়ে আমরা যেটুকু পড়ি, তা কেবল অর্থোপার্জ্জনের খাতিরে। আমাদের মনের উপর সেগুলি কোন স্থায়ী দাগ রেখে যায় না। সুতরাং মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও সমন্বয়ের সাধনা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যে মাত্রাজ্ঞানের অভাব আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তাকে অনেকাংশে পঙ্গু করে' রেখেছে, 'কাল্‌চার্' ব্যতীত তার দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সকলকেই যে একই নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে হবে, সকলেই যে সাহিত্যচর্চ্চা কর্‌বে, তা নয়। তবে জনসাধারণের বুদ্ধি-বৃত্তিকে কিয়ৎপরিমাণে মার্জ্জিত করে' তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞান প্রচার কর্‌তে হলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই আত্মোৎকর্ষসাধন-চেষ্টার ব্যাপকতা লাভ করা বিশেষ দর্‌কার। নতুবা আমরা কেতাবে পড়্‌ব এক, কাজে কর্‌ব অন্যরূপ—আমাদের বিচারবুদ্ধি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হবে না এবং দেশের অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বিপুল জনসঙ্ঘকে আমরা ঠিক্ পথে চালাতে পার্‌ব না। কেননা সকল বিষয়েই এ-কথা বলা চলে না—'জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ'। অনেক সময় আমার ধর্ম্ম কি, অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে আমার কর্ত্তব্য কি, সেটা জানিনে বলে'ই আমার প্রবৃত্তিকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করে' যা অকরণীয় তাকেই কর্ত্তব্য বলে' মেনে নি। আমাদের দেশে এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটে' থাকে, এবং এ'কেই আমি জাতীয় জীবনে শক্তির অজস্র অপচয়—national inefficiency রূপ একটা শোচনীয় ট্র্যাজেডি বলে' বর্ণনা করেছি।

যে সাবিত্রীমন্ত্র আজও আমাদের ঘরে ঘরে উদীরিত হয়ে থাকে, বিশ্বমানবের প্রার্থনা আর কোথাও এত উচ্চ গ্রামে গ্রথিত হয়েছে বলে' আমার জানা নেই। প্রার্থনা বল্‌তে সবলের নিকট দুর্ব্বলের কাতর ক্রন্দনই আমরা সাধারণতঃ বুঝে থাকি। প্রগাঢ় ভক্তি, একনিষ্ঠ বিশ্বাস, ঐকান্তিক নির্ভর এর উপাদান, ঈশ্বরে পরানুরক্তি এর প্রাণ। কিন্তু কোথাও কি এরূপ ধ্যান শুনা গিয়েছে, যে সবিতৃদেব আমাদের ধীশক্তি প্রচোদিত করেন, তাঁর বরেণ্য ভর্গ অর্থাৎ তেজকে আমরা ধ্যান করি? ধীশক্তির বিকাশ, তার সবিতাসদৃশ অমিততেজকে ধ্যানে উপলব্ধি করা—এই না আমাদের প্রার্থনার বিষয়? যে জাতি জ্ঞানের মহিমা ও গরিষ্ঠতা এরূপ ভাবে বুঝেছে, তার অধঃপতিত সন্তান আমরা সেই জ্ঞানালোক থেকে এতই সরে' পড়েছি যে, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা ইউরোপের Dark Ages বা তমসাচ্ছন্ন যুগের সঙ্গে তুলিত হয়, আর পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী গেটে প্রভৃতি 'Licht, mehr licht!' 'Light—more light!'

'আলোক, আরো আলোক' বলে' যেন আমাদেরই ভারতের সনাতন গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে করতে জ্ঞানপথে অমৃত-লোকে প্রয়াণ করেন! এটা কি আমাদের কম পরিতাপের কথা? বন্ধুগণ, আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জাতীয় অবনতির চরমসীমায় উপনীত হয়েছি। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার হ্যাভেল ও ডাক্তার কুমারস্বামী প্রভৃতির রচিত গ্রন্থগুলি পড়্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন, জ্ঞানবিজ্ঞান শিল্প ললিতকলা সকল বিষয়েই আমরা কত দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ থেমে গিয়েছি, জ্ঞানের বর্ত্তিকা নিবে গিয়েছে। আবার সেই বর্ত্তিকাহস্তে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে হবে; কেন না 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে'। যদি পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে আমরা সাম্যের দাবী করতে চাই, তবে কেবল রাজনীতি নয়, অন্যান্য যে-সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতা লাভ রাজনীতি অপেক্ষা অনেক কঠিন, সে-সকল উন্নততর বিষয়ের চর্চ্চায় আমাদিগকে আত্মনিয়োগ করতে হবে—এ পথে আমাদের জীবনে হয়ত আমরা সামান্যই সিদ্ধিলাভ করতে পার্‌ব—হয়ত আমাদের জীবিতকালে মানসিক স্বরাজ্য-সিদ্ধি ঘটে' উঠবে না—কিন্তু তা' বলে' পশ্চাৎপদ হব না। কবি সত্যই বলেছেন,

জীবনে যত পূজা
হল না সারা,
জানি হে জানি তাও
হয় নি হারা।

আমাদেরই প্রদর্শিত পথে আমাদের ভবিষ্য বংশধরগণ অনেকটা অগ্রসর হতে পার্‌বে, এবং তাদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই আমাদের তপস্যা সিদ্ধিলাভ করবে। তখন আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক সর্ব্ববিধ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে—বহুধা বিভক্ত হিন্দুজাতি পুনরায় একত্র সংবদ্ধ হয়ে, হিন্দু মুসলমান উভয়ে মিলে স্বরাজ্যের যে স্থায়ী সৌধ নির্ম্মাণ করবে, কোন বৈদেশিক শক্তি সেটা ভেঙ্গে ফেল্‌বার কল্পনাও করবে না—'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে'। "দর্শক"

(বিগত ১লা পৌষ তারিখে মাদারিপুর পাব্লিক লাইব্রেরী গৃহে পঠিত)

[মফস্বলের যে ক্ষুদ্র সহরে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল, সেখানে অসহযোগ-আন্দোলন খুবই প্রবল ছিল, এবং জেলে যাওয়াটা অত্যন্ত সংক্রামক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উক্ত আন্দোলনের স্থানীয় প্রধান নেতা, যিনি বাস্তবিক স্বার্থত্যাগের অনেক পরিচয় দিয়েছেন, সভায় উপস্থিত ছিলেন। রচনা পাঠান্তে তিনি এই বলে' তার সমালোচনা করেছিলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে সকলকেই যোগ দিতে হবে, তার পর যোগ্যতা অর্জ্জনের পথ আপনি খুলে যাবে—জলে না নাম্‌লে সাঁতার শেখা যায় না। শেষোক্ত কথাটি সত্য মেনে নিয়েও আমি এই বল্‌তে চাই, যার ফুস্‌ফুস্ দুর্ব্বল, তাকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার পূর্ব্বে বায়ুকোষ কার্য্যক্ষম করে' নিতে হবে—যেমন ক্রিকেট্ ম্যাচ্ খেল্‌তে হলে পূর্ব্বে প্র্যাক্‌টিস করে' নিতে হয়। আর সকলকেই যে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে এতবড় জুলুমই বা কেন? হিন্দুধর্ম্মে ত অধিকারীভেদের ব্যবস্থা কথায় কথায় শুন্‌তে পাওয়া যায়—রাজনৈতিক ব্যাপারে তা খাট্‌বে না কেন? তিনি আর-একটি কথা বলেছিলেন যা নিতান্তই ভ্রান্ত বলে' আমি মনে করি—আমরা যতই যোগ্য হয়ে উঠ্‌ব, ততই নাকি বৈদিশিক রাজশক্তি আমাদিগকে দমিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করবে। এরূপ চেষ্টা করলেও তার বিফলতা নিশ্চিত, এবং যোগ্যতার যে একটা নৈতিক প্রভাব আছে, তা আমাদের প্রভুদের মনের উপরও কার্য্য করবেই করবে। যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য যে কঠোর সাধনার দর্‌কার, তাকে ফাঁকি দিয়ে সহজে স্বরাজলাভের প্রয়াস পেলে আমরা নিজেকে বঞ্চিত করব মাত্র। জনৈক বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ভুক্ত নবীন সন্ন্যাসী প্রবন্ধ শুনে বলেছিলেন যে, এসব বাজে কচ্‌কচির সঙ্গে জীবনের লক্ষ্যের কোন সম্পর্ক নেই, কারণ সেই লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি, এবং তা নাকি এক মুহূর্ত্তে লাভ করা যায়। যে প্র্যাক্‌টিক্যাল্ বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেদান্তধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিবেকানন্দ প্রাণপণ করে' গিয়েছেন, তাঁর প্রশিষ্যবর্গ এখন সে লক্ষ্য হারিয়ে, প্রচলিত লোকমতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও যোগ্যতার অভাবে পুনরায় পঙ্গু হয়ে পড়্‌ছেন, ও মুক্তির স্বপ্ন নিয়েই জীবনটাকে সার্থক করে' তুল্‌বার অলীক চেষ্টায় জাতীয় শক্তির অপব্যয়

করুছেন। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের সামাজিক ভেদবুদ্ধিদূরীকরণরূপ যে লক্ষ্য আমি আমার যুবকবন্ধুগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিলাম, সে সম্বন্ধে কেউ একটি কথাও বল্‌লেন না—আমাদের রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন এবিষয়টি নীরবে চাপা দিয়ে যাওয়া হয়, সভাতেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। কেবল জনৈক বক্তা আমার সমর্থন করুতে উঠে যখন বলেছিলেন যে, হিন্দুমুসলমানের পরস্পর হিংসা এখনও আমরা ভুল্‌তে পারিনি, তখন উপস্থিত একমাত্র শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের করতালি সভার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করেছিল। প্রবন্ধপাঠের অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর নিকট থেকে আমি একখানি চিঠি পেয়েছিলাম, তিনি যা লিখেছিলেন তাতে আমাদের জান্‌বার ও ভাব্‌বার অনেক কথা আছে। তিনি মফস্বলে সফরে গিয়ে এক শিক্ষিত মুসলমান দারোগার ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াতে না পেরে এক রাত্রির জন্য তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেন। এতে তাঁর হিন্দু কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গের মনে এরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল যে, তা দেখে তিনি লিখেছেন—হায়রে আমার দুর্ভাগা দেশ! আবার ঐ মুসলমান ভদ্রলোকটির সঙ্গেই নানাবিষয়ে আলাপ করে' তিনি বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন—Scratch a Mahomedan and you will find a fanatic অর্থাৎ অন্ধ গোঁড়ামিতে তাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর ও আমার উভয়েরই অভিজ্ঞতা এই যে, শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোককে কোন হিন্দু বন্ধু প্রীতি-ভোজনে নিমন্ত্রণ করুলে, ধীরে ধীরে গলনালীছেদনরূপ সনাতন মুসলমান রীতিতে পশুটিকে হনন করা হয়েছে কি না এটা না জেনে তাঁরা তার মাংস ভক্ষণ করুতে প্রস্তুত নন। ইস্‌লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করুলে হিন্দুনারীকে বিবাহ করুতে মুসলমান কখনও পশ্চাদ্‌পদ হন না, কিন্তু মুসলমান রমণীকে ধর্ম্মান্তরিত করে' নিয়ে কোন হিন্দু তাকে বিবাহ করুতে চাইলে মুসলমানগণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন। কেন না তাঁদেরই ন্যায় প্রচার দ্বারা তাঁদের স্বধর্ম্মীকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আর্য্যসমাজ যে "শুদ্ধি"-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করুছেন, মুসলমানসমাজ তার ঘোরতর বিরোধী। সম্প্রতি এক ধনী বৈষ্ণবের গৃহে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধে জনৈক দেশবিশ্রুত বক্তার বক্তৃতা শুন্‌তে গিয়ে দেখা গেল, উপস্থিত মুসলমান কৃষকদিগকে সভামণ্ডপের বাইরে বস্‌তে দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যদেব এ দৃশ্য দেখ্‌লে কি বল্‌তেন? 'যবন' হরিদাসের আখ্যায়িকা কি কেবল উপাখ্যানের বস্তু হয়েই থাকবে? স্থানীয় নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সহিত মুসলমানের বিবাদ হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব বলে' পরিগণিত হয় না, তখন নমঃশূদ্র অন্ত্যজজাতি মাত্র; যদিও রাজনৈতিক নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত তারা বহুমানাস্পদ। আবার কৌতুক ও পরিতাপের বিষয় এই যে, যে নমঃশূদ্র সম্প্রদায় অধুনা সামাজিক উচ্চস্তরের জাতির সঙ্গে সাম্যের দাবী করেন, তাঁরাই আবার পরস্পরের মধ্যে উচ্চ-নীচ শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং সেই-সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পাংক্তেয়তা নাই। নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের 'জাতে তুলে' নেওয়ার কথা ত নমঃশূদ্র নেতাগণ কল্পনাতেও স্থান দেন না; প্রচলিত সামাজিক প্রথানুসারে যাঁরা সমাজের শীর্ষস্থানীয়, কেবল তাঁদের সঙ্গে সমতা লাভের জন্যই তাঁরা ব্যগ্র। এইরূপ ভেদবুদ্ধি যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। দেশের সকল লোকের অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করুবার কুসংস্কারজাত যে ঘোরতর অন্তরায়গুলি বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলি আমরা যতদিন দূর করুতে না পারুছি, ততদিন 'একতা' শব্দটি নিতান্তই নিরর্থক নয় কি? আমাদের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যা কিছু একতা, তা কেবল সমভাবে পরকর্ত্তৃক নির্য্যাতনের ফল। এটা একতার একটা উপায় হলেও স্থায়ী উপায় নয়। সামাজিক ভেদবুদ্ধি দূরীকরণ ব্যতীত স্থায়ী একতার সম্ভাবনা নেই। আহারসাম্যই এখনও আমাদের নিকট এত সুদূরপরাহত, বিবাহসাম্যের ত কথাই নেই। অথচ যাদের দৃষ্টান্তে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে' তুল্‌তে চাই, সেই ইংরেজজাতি ফরাসি বা জার্ম্মান মহিলা বিয়ে করে বলে' ত জাতীয়তা হারায় না, সন্তানাদিও সম্পূর্ণ পিতৃজাতিক হয়ে ওঠে, পিতৃবংশের জন্য মাতৃবংশের সঙ্গে যুদ্ধ করে' প্রাণ দেয়। যে-সকল মোগল-সম্রাট রাজপুত রমণীর গর্ভ-জাত, তাঁরা ত কেউ অমুসলমান

ছিলেন না। আমাদের হিন্দু বিধবাদের ন্যায় আচারনিষ্ঠা জগতে আর কোন জাতির মধ্যে নেই বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। বিধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ তাঁদের মধ্যে যত প্রবল, হিন্দু পুরুষদের মধ্যে ততটা নয়। তথাপি এই হিন্দু বিধবাদের মধ্যে যাঁরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও চিরাগত রীতিনীতি ও অভ্যাসগুলির আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য ত বেশী দিন আবশ্যক হয় না। এতেই দেখা যায় যে এ-সকল বাহ্য আচার ও বিধি-নিষেধের বন্ধন যতটা অচলপ্রতিষ্ঠ ও দুরতিক্রম্য বলে' আমরা মনে করি, সেগুলি বাস্তবিক ততটা নয়, সেগুলি ঝেড়ে ফেল্‌তে কেবল মানসিক ভাবের ঈষৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক মাত্র। বলা বাহুল্য, আমি সদাচারের কথা বল্‌ছি না, অর্থ-শূন্য ও অনিষ্টকর প্রথাগুলির কথাই বল্‌ছি। যদি অন্যোন্যের প্রতি সন্দেহটা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব করে' নিয়ে, ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনগুলি যার যার নিজস্ব রেখে, অনাবশ্যক বহিরঙ্গ সম্বন্ধে বন্ধনটা কতকটা শিথিল করে' দিয়ে, বিসম্বাদী মনটাকে একটুখানি পরস্পরাভিমুখী করে' দেওয়া যায়, তা হ'লে বাহ্যানুষ্ঠানের পার্থক্যগুলি আমাদের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন করে' রেখেছে, সেটাকে ভূমিসাৎ করতে বেশী বেগ পেতে হয় না। এটা বেশ দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমাজে একবার একটা কিছু চালিয়ে নিতে পারলে সেটা বেশ চলে' যায়। আভিজাত্যগর্ব্বিত রাজপুত-মহিলাদের মোগল-অন্তঃপুরে প্রবেশ-প্রথাটা বেশ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল; শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ অসবর্ণ বিবাহ করে'ও এবং নিজের পরিবারে চালিয়েও দেশবন্ধুর সম্মানিত পদে আসীন, অনেক নিম্নজাতি উপবীতী হয়েছে বলে' তাদের হিন্দুত্বের দাবী অগ্রাহ্য হয় না; কালাপানি পার হলে আজকাল আর জাতি যায় না;—কেবল একটা গভীর inertia বা জড়তার অচলায়তন আমাদের পথ জুড়ে রয়েছে। যদি দেশের কতকগুলি শিক্ষিত ভদ্রলোক একসঙ্গে সেটাকে একটা ধাক্কা দিতে সাহস পান, তা হলে হিন্দুয়ানীর দাবী সম্পূর্ণ বজায় রেখেই পংক্তিভোজন ও বিবাহক্ষেত্রে সাম্যনীতি অবলম্বন করে' প্রকৃত জাতি-সংগঠনের সহায়তা করতে পারেন। এ কথাগুলি বলার বিশেষ আবশ্যক হয়েছে এজন্য যে, এখন আর হিন্দু মুসলমান একান্ত পৃথক্‌ থেকে স্বরাজ্যের কল্পনা করলে চল্‌বে না। মহম্মদ ঘোরী ও মহম্মদ গজ্‌নবীর পূর্ব্বে সম্রাট্‌ হর্ষবর্দ্ধনের যুগে, সে কল্পনা সম্ভবপর ছিল, যদিও তখন ভারতে বৌদ্ধসমস্যা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। ভারত জুড়ে এখন হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করছে, এখন একে অন্যকে অতিক্রম করে' রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন দেখ্‌লে তাকে বাতুল ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না।* সুতরাং ধর্ম্মসম্বন্ধে পার্থক্য থাকলেও অন্যান্য সভ্য জাতির ন্যায়, সামাজিক হিসাবে হিন্দুমুসলমানকে এক হতে হবে। যদি হিন্দু-মুসলমান উভয়ে মিলিত হয়ে, ধর্ম্মগত স্বরাজ্যের ব্যর্থ কল্পনায় কাল অতিবাহিত না করে', "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" "যে বিশাল প্রাণ" জন্মলাভ করবে, তার অনুপ্রেরণায় এক বিরাট্‌ ভারতীয় জাতি গঠনে প্রস্তুত হয়ে সর্ব্বপ্রকার অস্বাভাবিক মানব-রচিত কৃত্রিম বাধাবিঘ্নগুলি দূর করার সমবেত চেষ্টায় একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করেন, তবেই প্রতিকূল রাজ-শক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বরাজ্যলাভ সম্ভবপর হবে; নতুবা জাতীয় একতা যে অর্থশূন্য প্রলাপে মাত্র পর্য্যবসিত হবে, এর থেকে অধিকতর স্বতঃসিদ্ধ কথা আর কিছু আমার জানা নেই।]

"দর্শক"

* কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী এইরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন:—"One thing is certain and it is this, that neither can the Hindus exterminate Musalmans today, nor can the Musalmans get rid of the Hindus", ইত্যাদি। প্রবন্ধলেখক কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে অগ্রহায়ণ মাসে উপরের কথাগুলি লিখেছিলেন।

ঝাড়খণ্ডে বাঙ্গালী উপনিবেশ

দেওঘর বা দেবগৃহ ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত। রাঢ় দেশে যেমন তারকেশ্বর, ঝাড়খণ্ডে তদ্রূপ বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথ এই নাম লইবার এবং পীঠস্থান হইবার বহু পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। এখানে সতীর হৃৎপিণ্ড পতিত হইয়াছিল। তন্ত্রচূড়ামণিতে আছে—"হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ, দেবতা জয়দুর্গাখ্যা।" এখানে বৈদ্যনাথ শিব, দেবী জয়দুর্গা। এই পীঠস্থান মহাভৈরবের নাম হইতে বৈদ্যনাথ নামে প্রথিত হইয়াছে। বৈদ্যনাথের মন্দিরাদি মহারাজা জরাসন্ধের "দেবগৃহ" নামক দেবালয়ের একান্তে প্রতিষ্ঠিত। দেওঘরের জলসাগর সরোবর জরাসন্ধের "জরা-সাগর" বলিয়া কথিত হয়। দেবগৃহের মন্দিরোপকণ্ঠস্থ "মানস" এবং "শিবগঙ্গা" নামক সরোবরদ্বয় রাবণ কর্ত্তৃক খনিত বলিয়া পাণ্ডারা ইহাদের প্রাচীনত্ব এবং মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকেই বলেন মানস-সরোবর মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সমগ্র সাঁওতাল-পরগণার মধ্যে তীর্থক্ষেত্র বৈদ্যনাথ-ধাম একটি বাঙ্গালীবহুল স্থান। এখানকার উপনিবেশ অতি প্রাচীন। প্রায় পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় বাণীকান্ত মুখোপাধ্যায় সন্তানাদি না হওয়ায় মনের কষ্টে কাশীবাসী হইতে মনস্থ করিলে, তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়, তিনি যেন বৈদ্যনাথ মহাদেবের পাণ্ডাগিরি ও সেবা করিবার জন্য বৈদ্যনাথ ধামে বাস করেন। স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া বাণীকান্ত জন্মস্থান শান্তিপুর ত্যাগ করিয়া দেবগৃহ-(দেওঘর) বাসী হন। ইনিই দেওঘরের প্রথম বাঙ্গালী উপনিবেশিক বলিয়া উক্ত হন। বাণীকান্তের দুই পুত্র—নীলাম্বর ও কৃপারাম। বাণীকান্ত মহাদেবের স্বপ্নাদেশে চক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করেন। তদবধি ইঁহার বংশধরগণ মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে চক্রবর্ত্তী পদবীতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহার বংশীয় ১৪ ঘর মতান্তরে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩ ঘর চক্রবর্ত্তী; তন্মধ্যে দুই ঘর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এক ঘর চট্টোপাধ্যায় "ঠাকুর" উপাধি পরিচয়ে বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগিরি করিতেছেন। বর্ত্তমান চক্রবর্ত্তী উপাধিটি পাণ্ডাগণের মধ্যে জয়-বিজয় চক্রবর্ত্তী, রাখাল চক্রবর্ত্তী, সারদা চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভোলা চক্রবর্ত্তী, রামানাথ চক্রবর্ত্তী, রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী এবং গিরিশ চক্রবর্ত্তীর নামে আমরা পাইয়াছি। শেষোক্ত পাণ্ডাঠাকুরের নিকট আমরা তাঁহাদের বংশ-পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

বাণীকান্তের পর ৺জগৎরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়া জেলা হইতে কাশীবাস করিতে বাহির হইয়া বৈদ্যনাথ দর্শনার্থ এখানে আসেন; কিন্তু পূজার পর বৈদ্যনাথ দেবের আদেশে এখানেই বসবাস করেন এবং পূর্ব্বাগত বাণীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৃহে বিবাহ করেন। তিনি লালাবাবুর পিতামহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তরফ হইতে সেবাইত নিযুক্ত হইয়া মন্দিরে পূজা পাঠ করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনো পাকপাড়ার সিংহ-বাবুদের নিকট হইতে দৈনিক ২ টাকা বৃত্তি পান। জগৎরাম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এই বিষয়ে দলিল আছে। তিনিই বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে 'ঠাকুর' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ অতঃপর 'ঠাকুর' বলিয়াই পরিচিত। এই বংশীয় ৮৬-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ পাণ্ডা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঠাকুরের (বন্দ্যোপাধ্যায়) নিকট তাঁহাদের উপনিবেশের বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষ্ণরাম, মণিরাম, জীৎরাম, গোবিন্দরাম এবং তিনি (উমেশচন্দ্র) প্রায় সকলেই পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তীদের গৃহে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ রাণীগঞ্জের নিকট নিমচা গ্রামে তপাদার উপাধিধারী চট্টোপাধ্যায় বংশে এবং বর্দ্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি জেলায় বিবাহ করিয়া থাকেন।

এই বাঙ্গালী পাণ্ডাদিগের গৃহে মেয়েরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা ও হিন্দীতে এবং পুরুষরা বিশুদ্ধ হিন্দীতে এমন কি মেয়েদের সহিতও হিন্দীতে কথা বলেন। পশ্চিমা পাণ্ডাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান না থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে পকান্ন ভোজন ও শবদেহ বহনাদি

আচার প্রচলিত আছে, ভাতের চলন নাই। পাণ্ডা উমেশ ঠাকুর বাঙ্গালায় কিন্তু হিন্দী উচ্চারণে বলিলেন, "মন্দিরের মধ্যে হাম্‌রা সত্তবান্‌ আছি।" তিনি আরও বলিলেন যে পাণ্ডা রাসবিহারী চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঁচ শ বৎসরের দলিল আছে, তাহারও বহু পূর্ব্বে তাঁহারা দেওঘরে আসিয়াছিলেন।

এখানে কনোজ মৈথিল ও বাঙ্গালী পাণ্ডাদের মধ্যে বাঙ্গালী পাণ্ডাদের নিজস্ব কুড়িখানি ভদ্রাসন আছে। হিন্দুস্থানী পাণ্ডাদের ৬০০ বাড়ী আছে। পাণ্ডাদের ১৩ ঘর হইতে ৩৬০ ঘর এবং এখন তাহা হইতে হাজার ঘর হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালী পাণ্ডাদের আকার-প্রকার বেশভূষা হইতে তাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। কথা-বার্ত্তা হইতেও ধরিবার জো নাই। কারণ হিন্দুতীর্থের সকল শ্রেণীর পাণ্ডাই এক-একজন বহু-ভাষাবিৎ।

ইংরেজ-শাসন এখানে প্রবর্ত্তিত্‌ হইবার পর হইতে যিনি উপযুক্ত বলিয়া সাধারণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইতেছেন, তিনিই প্রধান পাণ্ডার স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন।

বৈদ্যনাথের মন্দিরে জলঘড়ি দেখিয়া পেটা-ঘড়ি বাজাইবার প্রথা মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন হইতে প্রচলিত আছে। ঘড়িদার কালাচাঁদের পিতামহ প্রথম ঘড়িদার ছিলেন। তিনি বাণীকান্তের পর এখানে আসেন।

বাণীকান্তের বংশে যাঁহার নিকট যজমানী খাতাপত্র ৯০০ সাল হইতে রক্ষিত হইয়াছে, তিনি বলেন তাঁহাদের অন্যান্য জ্ঞাতিদের নিকট আরও পুরাতন সময়ের খাতাপত্র পাওয়া যায়।

এক শতাব্দীর অধিক পূর্ব্বে বর্দ্ধমান হইতে ৺ প্রসন্ন-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া দেওঘরে একটি মণিহারির দোকান করেন। ইহাই এখানে বাঙ্গালীর প্রথম দোকান। ক্রমে প্রসন্ন-বাবু বাড়ীঘর চাষ আবাদ প্রভৃতি করিয়া বৈদ্যনাথেই স্থায়ী হন। তাঁহার পর প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ট্রেডিং কোম্পানী গঠিত হয়। জনৈক মাড়বারীর দোকান ক্রয় করিয়া এই কোম্পানী স্থাপিত হয়, তখন তাহার নাম ছিল "স্বদেশী ভাণ্ডার"। ১৩১৩ সালে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শে ঐ নামের পরিবর্ত্তে "বৈদ্যনাথ ট্রেডিং কোম্পানী" নাম দেওয়া হয়।

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া-সব্‌ডিবিসন-নিবাসী পরলোগত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুলিশের সব্‌ইন্‌স্পেক্টর হইয়া বৈদ্যনাথে আসেন এবং প্রথমে থানায় থাকিয়া পরে ভৈরব-বাজারে বাস করেন। তিনি গৃহবিবাদের ফলে একখানি গামছা মাত্র লইয়া বাটীর বাহির হন এবং বীরভূমে আসিয়া জনৈক ভদ্রলোকের বাটীতে রন্ধন-কার্য্য করিয়া দিনপাত করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বাঙ্গালা লেখাপড়াও শিখিতে থাকেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আপনার বাটীতে লইয়া যান। তিনি বীরভূমের মোক্তার ছিলেন। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি মাতুলালয় হইতে পুনরায় পলায়ন করিয়া বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণনগরে গিয়া রাইটার কনেষ্টবলের কার্য্য লাভ করেন। পরে তাঁহার সংবাদ পাইয়া কাটওয়া হইতে আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে চাহেন। কিন্তু তিনি বাড়ী না গিয়া শীঘ্রই তথা হইতে এক মাইল পশ্চিমে জামতাড়ার সাহানা গ্রামের ফাঁড়ীতে হেড্‌ কনেষ্টবল হইয়া যান। ইহার কিছুদিন পরে সব্‌ইন্‌স্পেক্টরের পদে উন্নীত হইয়া তিনি দেওঘরে আসেন। ইহার দশ বৎসর পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সাঁওতাল-বিদ্রোহ হয়। তিনি এই বিদ্রোহ-দমনকারীদের অন্যতম ছিলেন। এই বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের মধ্যে এরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইবার উপক্রম করে। মহেশ-বাবু অমানুষিক চেষ্টা ও কৌশল দ্বারা তাহা নিবারণ করেন। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য তিনি গবমেণ্ট্‌ হইতে বিশেষভাবে প্রশংসিত হন। সাঁওতাল-বিদ্রোহীদ্বয় দিল্‌বর মাঝি ও মন্‌দিল মাঝিকে কেহ বহু চেষ্টাতেও ধৃত করিতে পারে নাই, কিন্তু মহেশ-বাবু তাহাদিগকে ধরিয়া দেন। বিদ্রোহীদের ফাঁসি হয়। তাহাতে মাঝিদ্বয়ের কয়েকজন সাঁওতাল অনুচর ক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু গবমেণ্ট্‌ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তিনি অব্যাহতি লাভ করেন। সাঁওতাল-বিদ্রোহের দ্বাদশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গোরা সৈন্যদিগের রসদ দেওয়া ও হিফাজত করার জন্য প্রধান সেনাপতির নিকট হইতে তিনি প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন। পুলিশের কর্ম্মচারিগণের উপর বিদ্রোহীদের বিশেষ কুদৃষ্টি ছিল। সব্‌ইন্‌স্পেক্টর মহেশ-বাবু তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গৃহ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে পলায়ন করেন। তিনি একটি বন্দুক মাত্র সঙ্গে লইয়া দেওঘর হইতে প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ফুলঝুরী পাহাড়ে লুকাইয়া থাকেন। তাঁহার সমস্ত টাকাকড়ি—প্রায় ৬০ হাজার টাকা—ছোট্‌কী নাম্নী এক হিন্দুস্থানী দাসীর জিম্মায় রাখিয়া যান। বিদ্রোহ-দমনের পর তিনি গৃহে ফিরিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সেই দাসীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বস্তা দাসী তদবধি তাঁহার পরিবারভুক্তা হইয়া স্বীয় ভরণপোষণের চিন্তা হইতে মুক্ত হয় এবং বাসের জন্য একটি ভদ্রাসন পুরস্কার

স্বরূপ লাভ করে। মৃত্যুকালে সেই বাটী আবার বৃদ্ধা মহেশ-বাবুর বংশধরদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এখানে বসন্ত রোগ সংক্রামক হইয়া মহেশ-বাবুর পরিবারবর্গকে আক্রমণ করায় তাঁহার স্ত্রী, এক ভাইঝি ও দুইটি ভাইপো একদিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহাতে মহেশ-বাবু পাগলের মত হইয়া পুলিশের কর্ম্ম ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন একস্ট্রা এসিষ্টাণ্ট্ কমিশনরের বেঞ্চ্ ক্লার্কের কর্ম্ম করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দেন। কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ছিলেন না। অচিরেই চিনি ও লবণের কার্‌বার আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন।

এই মহকুমার অন্তর্গত করো নামক একটি গ্রাম আছে। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের কৃষ্ণনগর হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে বাঙ্গালীরা আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। এক্ষণে করোর আদি বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীত্ব হারাইয়াছেন ও স্থানীয় লোকদের সহিত চাষ-বাস করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। করোর আদি আচার্য্য মহাশয় রামেশ্বর তর্কালঙ্কার তিন শতাব্দীর পূর্ব্বে আগত উপনিবেশিকদিগের সমসাময়িক। মহেশ-বাবু এই করো গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধা আজিও জীবিতা আছেন। মহেশ-বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রত্রয়ের মধ্যে বর্ত্তমান বাবু দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্থানীয় মোক্তার। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেওঘর এবং কুণ্ডার মধ্যবর্ত্তী প্রায় ৩০০ একর অর্থাৎ প্রায় সহস্র বিঘা পরিমাণ নিম্ন জলাভূমি স্থানে স্থানে জঙ্গলে পরিবৃত ছিল। ঐ ভূখণ্ড মহেশ-বাবু মহন্ত মেঘনাথ পুরীর নিকট হইতে মকররী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন এবং সমস্ত জঙ্গল কাটাইয়া তাহাতে করহনী ধান্যের আবাদ করেন। এই হেতু ঐ স্থানের নাম "করণীবাদ" হইয়াছে। এই করণীবাদ ভুলক্রমে অনেকে করণীবাগ কহিয়া থাকেন। এখানে বহু বাঙ্গালী ও মাড়বারীর বাস হইয়াছে।

এদেশে মহেশ-বাবুর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথের মন্দিরে দৈনিক বন্ধনী অর্থাৎ সরকারী পূজার পূর্ব্বে পাণ্ডা ছাড়া অন্য কোন লোক ঠাকুর স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু ইঁহার পরিবারবর্গের সে অধিকার আছে, প্রধান পুরোহিত স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরীনন্দ ওঝা ইঁহার বংশধরগণকে এ অধিকার দিয়া গিয়াছেন। মহেশ-বাবু বন্দুকচালনায় সুদক্ষ ছিলেন, অতি উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ছিলেন। একদিন ৬০ মাইল পথ অশ্বারোহণে গিয়া তৎক্ষণাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং আর একদিন বীরভূম হইতে অশ্বারোহণে দেওঘর গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মহেশ-বাবু মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তাঁহার সমসাময়িক ঘটওয়াল বৈদ্যবংশীয় তিনকড়ি রায় সাঁওতাল-বিদ্রোহের পূর্ব্বে শিমরাতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের পর রামলাল কবিরাজ মহাশয় বাঁকুড়া তিলোড়ী হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। ঝোঝাগড়ীতে আজিও তাঁহার বাড়ী আছে। তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজের সহপাঠী ছিলেন। তাঁহাদের প্রায় সমসাময়িক বাবু প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪-পরগণা হালিসহর হইতে আসিয়া আদালতের মুহুরী হন।

রোহনী গ্রামে ও তাহার নিকট কয়েকঘর বাঙ্গালী বহুদিন হইতে বাস করিতেছেন। রিখিয়ায় একটি বাঙ্গালী উপনিবেশ গঠিত হইয়াছে। রোহনী ষ্টেটের জনৈক বাঙ্গালী ম্যানেজার বহুদিন হইতে এখানে আছেন। তিনি দেওঘরের সর্দ্দার পাণ্ডার নিকট হইতে "শিক্‌দার" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার কেদারনাথ সেন, বাবু শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী পুরানদাহায় আছেন। এখানে স্বনামধন্য স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়দিগের একখানি ভদ্রাসন আছে। বাঙ্গালী তান্ত্রিক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মানন্দজী ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় চোল পাহাড়ে বাস করিতেন। রাণাঘাটের অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রামচরণ চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গুরু প্রসিদ্ধ বালানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্য "তপোবন" পাহাড়ে আশ্রম করিয়া দিয়াছেন, ইহা তীর্থস্থানের ন্যায় অসংখ্য যাত্রীর দর্শনীয় হইয়া আছে। চৌধুরীমহাশয় করণীবাদে তাঁহার স্বকীয় জমীতে আর-একটি আশ্রম ও শিবমন্দির করিয়া দিয়াছেন।

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস বোধ হয় "বঙ্গাধিপ-পরাজয়"। দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহী জমিদার প্রতাপাদিত্য রায়কে বঙ্গের অধিপতি বলা কতদূর সঙ্গত তাহা বিচার করিবার সময় এখন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই বোধ হয় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনি দক্ষিণ-বঙ্গ ও তাহার সমুদ্র-উপকূলের ঘটনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া পরে উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে "বঙ্গাধিপ-পরাজয়" উপন্যাস হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের কায়স্থ-রাজবংশের ইতিহাস-রূপেই বঙ্গসাহিত্যে গৃহীত হইয়া আসিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক লেখকগণ, উপাদান থাকিলেও, নূতন-গ্রন্থ-রচনাকালে তাহা ব্যবহার করেন না; এইজন্যই "প্রতাপাদিত্য" নাটকে গঞ্জালিশ "রডা" নামে বিখ্যাত এবং বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের "ডিসুজা ডিক্রুজ এবং পোর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের মগবন্ধুগণের" নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গাধিপ-পরাজয়, উপন্যাস কি ইতিহাস সে-সম্বন্ধে এখন মতদ্বৈধ আছে; সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'-কেই ক্রমপর্য্যায়ে দ্বিতীয় স্থান দিতে হয়।

সাহিত্যরথীদিগের মতে উপন্যাস হিসাবে দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহে; তথাপি ঐতিহাসিক উপন্যাস কিরূপে রচিত হওয়া উচিত, দুর্গেশনন্দিনী তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের যে মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালেব লেখকগণ প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি সেই সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। দুর্গেশনন্দিনীর কৎলু খাঁ, ওস্মান খাঁ, জগৎসিংহ ও মানসিংহ একদিন বাস্তবজগতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের সময় ও সেই যুগের প্রধান ঘটনাবলী ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। উপন্যাস-রচনা-কালে গ্রন্থকার নাম-বৈষম্য বা ঘটনা-বৈষম্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এইজন্যই দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে কথাসাহিত্যের হিসাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না হইলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ইতিহাস দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—আধুনিক ও প্রাচীন। আধুনিক ইতিহাস বর্ত্তমানের কথা লিপিবদ্ধ করিতে পারে না, কারণ বর্ত্তমানের কার্য্যাবলীর প্রকৃত কারণসমূহ এখনো প্রচ্ছন্ন। নেপোলিয়ানের জীবদ্দশায় বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উভয় পক্ষের ঐতি-হাসিকগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নেপো-লিয়ানের বংশ ও প্রাচীন ফরাসী রাজবংশ সিংহাসন-চ্যুত হইলে তাহার অধিকাংশ মিথ্যা প্রমাণ হইয়া প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। আওরঙ্গজেব জীবিত থাকিতে তাঁহার রাজ্যের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হয় নাই, তাঁহার মৃত্যুর দ্বিশত বৎসর পরে সেই-সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হইয়াছিল। এইজন্যই আধুনিক ইতিহাসও বর্ত্তমানকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। দেশভেদে ইতিহাসের কতটা আধুনিক, কতটা প্রাচীন, তাহার প্রভেদ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বের ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস এবং খৃষ্টাব্দের শেষ সহস্র বৎসরের ইতিহাস মধ্যযুগের। ইহার মধ্যেও প্রকার-ভেদ আছে। প্রাচ্যে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব-ইতিহাস প্রাচীন ইতিহাস এবং মোগল-(মুগল বা মোঙ্গোল) বিজয়ের পরবর্ত্তী ইতিহাস আধুনিক। এই আধুনিক যুগ হইতে ভারত-মহাসাগরে ফিরিঙ্গি বণিকের অমানুষিক অত্যাচারকাহিনী ও ফিরিঙ্গি বণিক্‌সম্প্রদায়-সমূহের অধিকার লাভের কথা বর্জ্জনীয়। এই সাধারণ বিভাগত্রয়ের মধ্যে আমাদের দেশের উপন্যাস-লেখকেরা আধুনিক ও মধ্যযুগের উপাদান অবলম্বন করিয়াই কথা-সাহিত্য

রচনা করিয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র "মৃণালিনী"তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মৃণালিণী যখন রচিত হইয়াছিল তখন মগধে হিন্দু বা বৌদ্ধ কে রাজা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র তাহা জানিতেন না; সে যুগের প্রধান ঐতিহাসিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও তাহা জানিতেন কি না সন্দেহ; তখন মগধের সঙ্গে গৌড়ের কি সম্বন্ধ ছিল তাহাও কেহ জানিত না; সেইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মগধ-রাজপুত্রের নাম হেমচন্দ্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন যতটুকু ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দিরের চত্বরে গোবিন্দপাল দেবের নামযুক্ত শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ক্রমপর্য্যায়ে গোবিন্দপালের স্থান তখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম পাদে নেপালরাজ্যের গ্রন্থাগারে ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত গোবিন্দপাল দেবের নামযুক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থের পুষ্পিকাসমূহ আবিষ্কৃত হইলে গোবিন্দপালের কাল ও স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একটি নামের অভাবে "মৃণালিনীর" অঙ্গহানি হয় নাই। ধর্ম্মাধিকার পশুপতি, চৌরোদ্ধরণিক শান্তশীল প্রভৃতি নাম, দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রাজকর্ম্মচারীদিগের নাম, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস হইতে গৃহীত হইয়াছিল; সুতরাং ঐতিহাসিকের নিকট "মৃণালিনী" সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া যে কয়খানি উপন্যাস রচিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ইহার প্রধান কারণ গ্রন্থকারদিগের আলস্য। প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগের কথা সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, শিলালিপি বা তাম্রশাসনও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সুতরাং তাহা পড়িতে বা বুঝিতে বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয় না। প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় ও ইংরেজী ভাষায় বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এই যুগে উপাদানের অভাব নাই, নাম তারিখ ঘটনাবলী সমস্ত সহজে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। এই যুগে মুসলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, তাহার উপর এই যুগের মুসলমান ঐতিহাসিক একদেশদর্শী, সুতরাং তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে বিশ্বাসযোগ্য অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা—মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন, কারণ তাহা তুর্কী আরব্য অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত। এই-সকল কারণেই এক রাজপুতনা ব্যতীত ভারতবর্ষের অপর অপর প্রদেশের মধ্যযুগের ইতিহাস উপন্যাস-লেখকের নিকট সহজে বোধগম্য নহে।

ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাস মোগল ঐতিহাসিকের কৃপায় ও ইংরেজ অনুবাদকের দয়ায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সীতারাম ও রাজসিংহ সম্বন্ধে কাহারো কোন আপত্তি নাই, যদিও অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের ন্যায় মনস্বী লেখক রাজপুতনার গিরিরন্ধ্রপথে সপরিবার বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে বন্ধন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি রাজসিংহ আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই। "দেবীচৌধুরাণী" "আনন্দমঠ" ও "চন্দ্রশেখর" আধুনিক ঐতিহাসিক যুগের বহির্ভূত, কারণ ইংরেজ বণিকের অধিকার-যুগের ইতিহাস রচিত হইবার প্রকৃত সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং "দেবীচৌধুরাণী" বা "চন্দ্রশেখরকে" ঐতিহাসিক উপন্যাস-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারা যায় না। "আনন্দমঠ" উপন্যাস কি রূপক তাহার বিচার এখনো হয় নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ বৎসর পর্য্যন্ত যে-সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়াই বোধ হয়। সুপরিচিত গ্রন্থকর্ত্তাদের লিখিত উপন্যাসে বিসদৃশ নাম বা ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে-সমস্ত উপন্যাস রচিত হইয়াছে, তাহাতে সকল সময়ে ইতিহাসের মর্য্যাদা

অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। আধুনিক কথা-সাহিত্যের যুগে ঐতিহাসিকের আখ্যানের আদর নাই, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রচনাও কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধা হারাইয়াছে।

সেইজন্য কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা স্থগিত ছিল না এবং এখনও নাই। শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান শতাব্দীতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুই-একখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ইঁহাদের রচনায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা বর্ণনায় ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ নাই। উপন্যাস হিসাবে হরিসাধন-বাবুর "কঙ্কণচোর" অথবা শচীশ-বাবুর "রাজাগণেশের" স্থান বাঙ্গালা সাহিত্যে কোথায় তাহা নির্দেশ করিবার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না, কেবল যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আমি জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকি তাহারই খাতিরে কতকগুলি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। "কঙ্কণচোরের" ভূমিকায় শ্রদ্ধাস্পদ হরিসাধন-বাবু লিখিয়াছেন, "চিরকাল মোগল-পাঠানের ঘটনা-সম্পর্কীয় উপন্যাস লিখিয়া আসিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালের উপন্যাস-রচনায় আমার এই প্রথম উদ্যম।" গ্রন্থের আরম্ভেই দেখা গেল, যে, চিত্রে অশ্বপৃষ্ঠে যে রাজমূর্ত্তি আছে তাহা উনবিংশ শতাব্দীর অথবা বিংশ শতাব্দীর রাজপুত-বেশধারী যুবার মূর্ত্তি। যীশুখৃষ্টের জন্মের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা বা প্রজা, ধনী বা দরিদ্র—কেহই এইরূপ পোষাক পরিত না। একথা কেবল আমিই বলিতেছি না, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কেহই এবিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তিনিই একথা বলিতে বাধ্য হইবেন। রাজার পশ্চাতে যে দুই জন অশ্বারোহী চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালার গবর্ণর সাহেবের শরীররক্ষীদের আদর্শে শিল্পী তাহাদের চিত্রিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আফগান কুল্লা ও আফ্রিদী পাগড়ী তখনো ভারতবর্ষে চলে নাই এবং আকবরের রাজ্যকালে রোশেনিয়া জাতির বিদ্রোহের পূর্ব্বে চলিয়াছিল কি না সন্দেহ। চৌরদ্ধরণিক যে পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছে তাহা অনেকটা লক্ষ্ণৌয়ের নব নাগরের ভাবে এবং সহিসের আকার বিংশতি শতাব্দীর পদস্থ ইংরেজের সহিসের মত। কথাটি বলা নিতান্তই আবশ্যক, তাহা না হইলে একথার উত্থাপন করিতাম না। কারণ অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতার কোন একটি থিয়েটারে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" নামক নাটকের অভিনয় উপলক্ষে আমার এক আত্মীয় আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, হরিসাধন-বাবুর মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রথিতযশা গ্রন্থকারের লিখিত গ্রন্থে যখন এই জাতীয় চিত্র বাহির হইয়াছে তখন রাজার এইরূপ পোষাক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর রাজবেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে পোষাক হরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের লোকে সে পোষাক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্যবহার করিত না, সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহার ব্যবহার অচিন্তনীয়। হরিসাধন-বাবুর গ্রন্থে এমন অনেক জিনিষ আছে যাহা গ্রন্থকার ইচ্ছা করিলে অতি সামান্য চেষ্টায় সংশোধন করিতে পারিতেন। যেমন মহাপ্রতীহার শব্দের পরিবর্ত্তে কোটোয়াল শব্দের প্রয়োগ, নালন্দ স্থলে নলান্দা এবং খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক চাণক্যকে দিয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের আলোচনা। হরিসাধন-বাবু যদি কলিকাতা মিউজিয়ম্ বা ইম্পীরিয়াল্ লাইব্রেরীতে গিয়া স্বয়ং অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন অথবা যাঁহারা প্রাচীন ইতিহাসের চর্চ্চা করেন তাঁহাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেন তাহা হইলে তাহার উপন্যাসে এই জাতীয় ভুল বা কালানুচিতত্ব-দোষ থাকিত না। চাণক্যকে দিয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পড়ানো যীশুখৃষ্টকে বা বুদ্ধকে দিয়া অস্কার্ ওয়াইল্ড্ বা হাইন্‌রিক্ ইব্‌সেনের গ্রন্থ পড়ানোর মত দেখায়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা বিসদৃশ দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না।

ভূতপূর্ব্ব এবং অধুনা সিংহাসনচ্যুত সাহিত্যসম্রাট্ ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "রাজা গণেশ" নামক ঐতিহাসিক

উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে। এখন বাঙ্গলা দেশে 'অশ্লীলতা-বিবর্জ্জিত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ দেখিলেই বুঝা উচিত যে, রচনাহিসাবে গ্রন্থকারের কিছু মূল্য আছে; তাহা না থাকিলে উপন্যাসের বাঙ্গালী পাঠিকা কখনই দুইহাজার বই কিনিয়া পড়িতেন না। "রাজা গণেশ" ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—প্রথম উদ্দেশ্য, উপন্যাসের আকারে ঐতিহাসিক সত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ঐতিহাসিক ঘটনার আবরণ দিয়া একটা নূতন গল্প রচনা। প্রথম উদ্দেশ্য রাজা গণেশে সিদ্ধ হয় নাই, কারণ গ্রন্থকার ছাপা ইংরেজী বা বাঙ্গালা ইতিহাসে রাজা গণেশ বা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাও পাঠ করেন নাই। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যও সফল হয় নাই, কারণ তিনি রাজা গণেশ ও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের ইতিহাসের কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ব্লক্‌ম্যানের Contributions to the History and Geography of Bengal কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় ইংরেজী ১৮৭০-৭৫ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল; ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "গৌড়ের ইতিহাসের" দ্বিতীয়খণ্ড ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল তথাপি ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পুনর্মুদ্রিত "রাজা গণেশের" তৃতীয় সংস্করণে "সুল্‌তান সৈয়ফ উদ্দীন আসলতান" নামক ইংরেজী আরবী পারশী ও বাঙ্গলা ভাষা মিশ্রিত অসম্ভব নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বিনা কারণে বাঙ্গালা ভাষার উপরে এতটা অত্যাচার করিবার কি প্রয়োজন আছে? "আসলতান" কোন রাজার নাম নহে, শচীশ-বাবু বোধ হয় কোন ইংরেজী গ্রন্থে "অস্-সুল্‌তান" নামক আরবী কথাটি পাঠ করিয়া নিজের ইচ্ছামত তাহাকে বাদশাহের নামের একটা অংশ করিয়া লইয়াছেন। ইহার কৈফিয়ৎ তাহার দেওয়া উচিত। সিকন্দর শাহের পুত্রের পুরা নাম গিয়াস-উদ্দীন আজম্‌শাহ্, তাঁহার পুত্রের নাম সৈফ্-উদ্দীন হম্‌জা শাহ্। এই নাম যখন "সৈয়ফ্-উদ্দীন আসলতান" আকার ধারণ করিয়া বাঙ্গালী উপন্যাস-লেখকের উপন্যাসে অবতীর্ণ হইয়াছে তখন আমার মত পেশাদার প্রত্নতত্ত্ব-ব্যবসায়ীরও তাহা চিনিয়া লওয়া কষ্টকর। সমস্ত মুসলমানী নামই এমন বিকৃত হইয়াছে যে তাহা চিনিয়া ওঠা কঠিন। ঐতিহাসিক উপাখ্যানও বিশ্বাসযোগ্য নহে। হম্‌জা শাহের পুত্রের নাম "আলিন সা" নহে, এ নামে ইলিয়াস্ শাহের বংশে কোন ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। হম্‌জা শাহের পুত্রের নাম বায়াজিদ্ শাহ্, রিয়াজ্-উস্-সালাতীন্-প্রণেতা বলেন যে, বায়াজিদ্ জারজ পুত্র। গণেশের উত্থান এবং তাঁহার পুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের মধ্যে যে ঐতিহাসিক সমস্যা নিহিত আছে, উপন্যাসে অবশ্য কেহ তাহার সন্ধান করিতে যায় না; কিন্তু যে লেখক মুদ্রিত গ্রন্থ পড়িয়া রাজার নাম স্পষ্ট পড়িতে পারেন না, তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের আকারে আখ্যানকে রচনা করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হন কেন? "রাজা গণেশ" নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাদটীকায় কতকগুলি অসত্য প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদ ঐতিহাসিক মাত্রেরই আবশ্যক। তিনটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলাম,—(১) পাঠান রাজত্বকালে "খাঁ", "খাঁ সাহেব", "সিংহ" উপাধি ছিল। শুধু ভাদুড়ী চক্রের অধিপতি "খাঁ সাহেব" উপাধি পাইয়াছিলেন। (পৃঃ ১১) (২) বন্দুক বিশেষ। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে সে সময় দেশে বন্দুক বা কামান ছিল না। জালাল্-উদ্দীনের সময়ে কামান প্রথম দেখা যায়। তাহার নামাঙ্কিত আগ্নেয়াস্ত্র গৌড়ের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। (পৃঃ ৩৪) (৩) পাল, সেন রাজাদের সময়ে রমণীরা ঘাগ্‌রা পরিধান করিত। পাঠান কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর দেশ যত দরিদ্র হইয়া পড়িতে লাগিল, ততই স্ত্রীলোকেরা ঘাগ্‌রা ছাড়িয়া পাটের পাছড়া পরিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশীয় রমণীরা তখনও রেশমের প্রস্তুত ঘাগ্‌রা পরিতেন। (পৃঃ ১৩৫)

তিনটিই ঘোর অসত্য। "রায়" হিন্দু উপাধি। সিংহও হিন্দু উপাধি। "খাঁ" ও "খাঁ সাহেব" মুসলমানের উপাধি, হিন্দু যবনদোষগ্রস্ত না হইলে এই উপাধি গ্রহণ করিত না।

জালাল্‌উদ্দীনের সময় কামান ছিল না এবং তাঁহার নামাঙ্কিত আগ্নেয়াস্ত্র বাঙ্গলার বা ভারতবর্ষের কোনস্থানে

আবিষ্কৃত হয় নাই এবং পাল ও সেনরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা ঘাগ্‌রা পরিত কি না তাহার কোন প্রমাণ নাই। শচীশ-বাবু কোন্ অধিকারে এই জাতীয় অসত্য বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলন করিতে গিয়াছিলেন?

আর দুইখানি গ্রন্থের নাম করিয়াই এপ্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে। প্রথমখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিরচিত "বেনের মেয়ে" এবং দ্বিতীয়খানি স্বর্গগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "ডঙ্কানিশান"। শাস্ত্রী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী এখন কেবল এ-কেলে 'গণিকাতন্ত্রের' উপন্যাস পড়িতেছেন। এক-বার সে-কেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদ্‌লাইয়া লউন না কেন?" তাঁহার "বেনের মেয়ে" উপন্যাস নহে, ইহা ইতিহাসের এসেন্স্, শর্করা-মণ্ডিত গুটিকা, পাঠ করিবার সময় নীলমণি চক্রবর্ত্তী অথবা "আর ডি বন্দ্যো"র গলাতেও সময়ে সময়ে আট্‌কাইয়া যায়। সহজিয়া-বাদের এমন সুন্দর সুললিত ম্যানুয়েল আর নাই। যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা বৌদ্ধ দর্শনের পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে কিন্তু বাঙ্গলা দেশের পাঠিকা হয় তো ইহাকে মোটেই উপন্যাস বলিতে রাজী হইবেন না। এই গ্রন্থে একটি নায়িকা এবং একটি প্রচ্ছন্ন নায়ক আছে বটে, কিন্তু তাহাদের প্রেম জন্মিয়াছিল কি না, তাহা "ভাষা" পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ও "খণ্ডনাখণ্ডখাদ্যম্" না পড়িলে বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইবে না। আমি স্বয়ং এজাতীয় গ্রন্থ একখানিও পড়ি নাই, সুতরাং সে-কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। "বেনের মেয়ে" ঐতিহাসিক সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত। সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদের গীতাবলী আবিষ্কার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কীর্ত্তিস্তম্ভমালার অন্যতম। ইহাতে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম আছে, একথা বলিতে কেহ ভরসা করিবে না। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ অমূল্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় বাগ্‌দী জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন; বোধ হয় সেই প্রসঙ্গে সপ্তগ্রামের রূপা বাগ্‌দী, রাজা রূপনারায়ণ সিংহ হইয়া উঠিয়াছিল। তবে ইহা সুবর্ণ-বণিক্ জাতির বল্লাল-চরিত ও পুড্যাগ্রামের ভট্টভট্টের দেববংশের মত ঐতিহাসিক বিদ্রূপ কি না, সাধারণের সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার কিছু নাই।

সত্যেন্দ্রনাথের "ডঙ্কা-নিশান" অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।* সম্পূর্ণ হইলে ইহা বাঙ্গালাসাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস হইত। যে-সকল কথার অর্থ সহজে বুঝিতে পারা যায় না তাহা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। নাম, উপাধি, পারিপার্শ্বিক ঘটনা—সকল বিষয়েই ইতি-হাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। এমন উপাদেয় উপন্যাস অনেক দিন পড়ি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, সুতরাং অপরের বলিতে দোষ নাই, এখনকার বাঙ্গালী কেবল গণিকাতন্ত্রের উপন্যাসই পড়িতে চান। যদি কেহ ঐতি-হাসিক উপন্যাস পড়িতে চান, তবে তিনি যেন সত্যেন্দ্র-নাথের অসম্পূর্ণ উপন্যাসখানাই পাঠ করেন এবং বিক্রয় হইবার আশা না থাকিলেও যদি কেহ বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন তাহা হইলে কবি সত্যেন্দ্রনাথের এই উপন্যাসখানি তাঁহার আদর্শ হইবার যোগ্য।

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

* প্রবাসীতে প্রকাশিত।

ভারতের উপকূলস্থ "মাহে"* নগর

(পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে)

১

একটি প্রশান্ত ক্ষুদ্র দেশ,—মাথার উপর তাল-বৃক্ষের খিলান-মণ্ডপ। এই খিলান-মণ্ডপটি অব্যবচ্ছিন্ন ভাবে সটান চলিয়াছে: নীচে মানুষ ও পদার্থসমূহ। অতিকায় তালবৃক্ষপুঞ্জের রন্ধ্রের মধ্য দিয়া অতি-কষ্টে একটু আকাশ দেখা যাইতেছে এবং সেখান হইতে আলোক-কিরণ নামিয়া আসিতেছে। তালগাছগুলা জড়াজড়ি করিয়া আছে—ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আছে। কতকগুলি গাছ যেন প্যাপোম ছড়াইয়া

* Mahe (উচ্চারণ মায়ে) ফরাসী উপনিবেশ—মান্দ্রাজ উপকূলে—কালিকটের উত্তরে।

আছে; আর কতকগুলি গাছ কুঞ্চিত পালকগুচ্ছের মত যেন সাজানো রহিয়াছে এবং খুব নীচে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এই তরুমণ্ডপটি উচ্চ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে—দীর্ঘ ও ভঙ্গুর বৃন্তগুলা উহাকে ধারণ করিয়া আছে। এই বৃন্তগুলা খাগ্‌ড়ার মত নমনীয়। একটা চিরন্তন ছায়ার মধ্যে, একটা স্বচ্ছ হরিৎ রাত্রির মধ্যে, লোকেরা চলাফেরা করিতেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ৫টার সময়, জাহাজ হইতে বালুবাশির উপর নামিয়া পড়িলাম। একটা শীর্ণকায় নদীর মুখ। আমি সুদূর হইতে—শেষপ্রান্তিক এসিয়া হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছি। ভারতের এই মোহিনী শোভা, এই উজ্জ্বল প্রভা আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। এই-সমস্ত অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয় সামগ্রী আবার পাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। যে নদী দিয়া আমি আসিলাম, সূর্য্য অস্তগামী হইলেও সমস্ত নদীকে কিরণে রঞ্জিত করিয়াছে; কতকগুলি তালবৃক্ষ সূর্য্যের করস্পর্শে আশ্চর্য্যরকম সোনালি হইয়া উঠিয়াছে এবং মনে হইতেছে আকাশ যেন সোনার ধূলায় সমাচ্ছন্ন। আমার ডিঙ্গি তীরে ভিড়িতেছে দুই নদীর তটদেশে, বিশাল সবুজ পর্দ্দার মত এইসব তালগাছের নীচে, কতকগুলি লোক দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছে। উহারা সাদা লাল অথবা হলদে বসনে আচ্ছাদিত হইয়া, দেবতার মত চমৎকার ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা, এবং তাহাদের গাছপালা, তাহাদের দেশ, তাহাদের আকাশ, সমস্তই মনে হয় যেন একটা দেব-দ্যুতিতে পরিস্নাত।

একটা বারাণ্ডাওয়ালা গৃহ—সাদা ধপ্‌ধপে,—সবুজ-জানালা-খড়খড়ি বিশিষ্ট—জলের ধারে, অন্তরীপের মত একটা শৈলখণ্ডের উপর স্থাপিত। সুন্দর বাড়ীটি, খুব পুরাতন,—ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের; এই ছায়া-নিবিড় উপনিবেশটি এই কোম্পানীর শাসনাধীনে ছিল।

বালুভূমির উপর দিয়া কয়েক পা গিয়াই একটা নিম্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলাম—এই উদ্যান এই গৃহেরই সংশ্লিষ্ট। উদ্যানের মাথার উপরে—যেমন সর্ব্বত্র—সবুজ গাছপালার খিলান-মণ্ডপ প্রসারিত। এই মধুর ছায়াতলে আসিয়া মনে হয় যেন এক পরীর উদ্যানে আসিয়াছি;—নানাপ্রকার অজ্ঞাত ফুল, ফুলের মত পাতা-পল্লবও সমুজ্জ্বল ও নেত্রাকর্ষক;—বেগুনী লাল, সাদা ও হলদে-ফুট্‌কি-দেওয়া—বিচিত্র বর্ণের; যেন চিত্রকরের স্বেচ্ছানুসারে নানা বর্ণে চিত্রিত। সেকালের ধরণে বাগানের ভিতর ছোট ছোট গলি-পথ, পাথরের বেঞ্চি শেওলা পড়িয়া সবুজ হইয়া গিয়াছে। ভূসম্পত্তির মালিক মরিয়া গেলে কোন পল্লী যেরূপ হয়—এই উদ্যানটি যেন সেইরূপ জীর্ণ ও পরিত্যক্ত আকার ধারণ করিয়াছে।

বাগানে প্রবেশ করিয়া, ফটকের দরজাটা আবার বন্ধ করিয়া দিলাম। রাস্তার মত একটা-কিছু যেন আমার সম্মুখে:- এই রাস্তাটা অতিকষ্টে তালীবন ভেদ করিয়া চলিয়াছে: দেখিলে মনে হয় যেন দক্ষিণ ফ্রান্সের আমাদের কোন গ্রামকে স্থানান্তরিত করিয়া এখানে বসানো হইয়াছে এবং বিষুব-রেখাবর্ত্তী প্রদেশ-সুলভ শক্তিশালী রস ইহাকে একেবারে পিষিয়া ফেলিবে; বড় বড় তালগাছ ছায়ার মধ্যে অবস্থিত; কিন্তু উহাদের মাথা এখনও অস্তগামী সূর্য্যের দ্বারা কনক-রঞ্জিত; এবং এই ছোট ছোট গৃহগুলি, উহাদের ঊর্দ্ধোত্থিত দীর্ঘ বৃন্তগুলার কাছে কি নীচুই মনে হয়! এখানে একটি ছোট নগর-দালান আছে; উহার উপর তে-রঙা নিশান উড়িতেছে, লাল জামা গায়ে, তাম্রবর্ণ সিপাহিরা ফটকের সম্মুখে পাহারা দিতেছে; এখানে অদ্ভুত রকমের একটা ছোট হোটেল আছে—কোন্ মুসাফিরদের জন্য কে জানে; একটি ছোট পাঠশালা আছে, ছোট ছোট কতকগুলি দোকান আছে; এই দোকানে ভারতবাসীরা কলা ও গরমমশলা কেনে। তাহার পর, আর কিছুই নাই; উহারই জের স্বরূপ কতকগুলা দীর্ঘ তরুবীথি বরাবর প্রসারিত হইয়া হরিৎপুঞ্জের গভীর দেশে বিলীন হইয়া গিয়াছে; মাটির রং রক্তাভ, উহাতে পড়িয়া শাখাপল্লবের রং যেন আরও উজ্জ্বল ও অলৌকিক আকার ধারণ করিয়াছে। উপরে যেখানে মধ্যে মধ্যে তালীবন একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে সেইখানকার আকাশের ফাঁকগুলা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে এবং খুব গভীর বলিয়া মনে হইতেছে। রাস্তার দুইধারে যে-সব তালগাছের পালকগুচ্ছ দুলিতেছে, সেই নমনীয় গাছগুলার মধ্যে, বাজপাখীর ঝাঁক কর্কশস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ক্রমাগত যাওয়া আসা করিতেছে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, জীবজন্তুদের মধ্যে, উদ্ভিদ্‌দিগের মধ্যে, একটা জীবন-তরঙ্গ যেন উথলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু উহার মধ্যে নিমজ্জিত ক্ষুদ্র নগরটি যেন মৃত।

এইসব ছায়াময় পথে যে সকল লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা সকলেই সুশ্রী শান্ত উদার-প্রকৃতি; উহাদের বড় বড় মখ্‌মলের চোখ—সেই কালো রহস্যময় চিত্তবিমোহন ভারতীয় চোখ। বক্ষদেশ অর্দ্ধনগ্ন; উহাদের শরীর প্রাচীন গ্রীসীয় ধরণে সাদা কিংবা লাল মস্‌লিন্-কাপড়ে আচ্ছাদিত। রমণীগণ দেবীর ন্যায় সাজসজ্জায় বিভূষিত; উহাদের পীতাভ সুন্দর কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে,—গ্রীক্ মার্ব্বেলের যেন প্রায়-অতিবর্দ্ধিত তাম্র-প্রতিরূপ বলিলেও হয়। পুরুষদের ফোলানো বুক, শরীরের গড়ন রমণীদিগেরই মত পাত্‌লা, কেবল কাঁধ অপেক্ষাকৃত চওড়া; নীলকৃষ্ণ শ্মশ্রু, প্রাচীন গ্রীক্ ধরণে কুঞ্চিত। আমাদের চাষাদের মত উহারা ফরাসীতে "বোঁ জুর" বলে; এবং ঐ কথা বলিবার সময়, তাহারা আমাদেরই নিজের লোক এই মনে করিয়া, উহাদের মুখে একটা গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পায়। উহাদের ইচ্ছা একটু দাঁড়াইয়া আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহে। যাহারা আমাদের ভাষায় একটু কথা কহিতে পারে, তাহারা একটু হাসিয়া যুদ্ধের সম্বন্ধে, চীন দেশের ব্যাপারাদি সম্বন্ধে, কথা আরম্ভ করিয়া দেয়। বলে—"আমাদের নাবিক, আমাদের সৈনিক" ... ইহা অনপেক্ষিত ও অদ্ভুত। হাঁ, উহারা যেন এইখানে ঠিক ফ্রান্সেই আছে। তখন আমার মনে পড়িল, একবার, (Saigon) সাইগোঁর আদালতে কি-একটা অপরাধে অপরাধী একজন ভারতবাসীর বিচার চলিতেছিল; বিচারক কর্সিকান্ ম্যেজিষ্ট্রেট, অসভ্য জ্ঞানে সেইভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করায়, সে উত্তর দিয়াছিল:—"তোমাদের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে আমরা ফরাসী হইয়াছি ..."

এখানে একরকম ঢাকা শকট দেখা যায়—উটের মত কুব্জ-বিশিষ্ট দুইটা সাদা গরুতে টানিয়া লইয়া যায়; উহাদের অদ্ভুতরকম নিষ্প্রভ লম্বা মুখ। এপ্রদেশের ইহাই একমাত্র যান-বাহন; উহারা টেলিচারি কিংবা কোনানোরে চড়নদার লইয়া যায়। ঐ দুইটি সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী ইঙ্গ-ভারতীয় নগর। সহরের রাস্তার মত, অনেকগুলা চওড়া চওড়া রাস্তা, তালীবনের ভিতর দিয়া আড়া-আড়ি ভাবে চলিয়া গিয়াছে। প্রায় সব রাস্তাই মাটির ভিতরে নিমজ্জিত—তাই, আরও আর্দ্র ও ছায়া-নিবিড়। উহাদের দুই ধারে যে মাটির ঢিবি আছে, তাহা সুন্দর পাতা-বাহারে ও সুন্দর শৈবালে মণ্ডিত। এখানকার ঘননিবিড় অরণ্যের মধ্যে,—"মায়ে" যে সময় একটা বড় নগর ছিল, সেই সময়ে তাহার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়! চৌদ্দ লুই আমলের ফটকের ভগ্নাবশেষ, টানা-পুলের ভগ্নাবশেষ। ফলতঃ এই উপনিবেশের মধ্যে যাহা কিছু পুরাতন—আজিকার দিনে,—সমস্তই পরিত্যক্ত। আমাদের পাশ্চাত্য নগরদিগের ন্যায় উহারও একটা অতীত আছে। উহার গৌরবান্বিত শতাব্দীর স্মৃতিগুলি,—যাহা এক্ষণে উদ্ভিজ্জশ্যামল শব-আচ্ছাদনে আবৃত

হইয়া চির-নিদ্রায় নিমগ্ন,—মনের মধ্যে একটা বিষাদের ভাব আনিয়া দেয়।

পথ-চলতি লোকেরা বিভিন্ন জাতের, ও বিভিন্ন বর্ণের : কেহ কেহ শুধু শ্যামবর্ণ ; তাদের বড় বড় চোখের সাদাটায় একটু নীলিমার আভা দেখা যায় ; আর কতকগুলি লোক প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, মুখে একটা বুনো ভাব ; কিন্তু তারাও দেখিতে সুশ্রী,—সেই অতুলনীয় ভারতীয় সৌন্দর্য্য তাহাদের মুখেও লক্ষিত হয়। এই দেখ কতকগুলি লোক (নিশ্চয়ই দেশের গণ্যমান্য) য়ুরোপীয় পোষাক-পরা ; আমরা যখন তাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন তাহারা একটু ঢিমা চালে চলিতে লাগিল—শিশুদের মত তাদের ভাবটা এই যে—আমরা তাহাদিগকে একবার চাহিয়া দেখি। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ পোষাকে উহাদিগকে আদৌ মানাইতেছিল না। বিশেষত স্ত্রীলোকেরা যেরূপ সাজসজ্জা করিয়াছিল, তাহা দেখিলে না হাসিয়া থাকা যায় না ; কিন্তু তাদের যে সুন্দর চোখের দৃষ্টি—সেই দৃষ্টির খাতিরে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম—এবং আমাদের মনে হইল যেন আমাদের যাত্রা-পথে কতকগুলি রহস্যময় অন্ধকারের ফুল কুড়াইয়া পাইলাম। সেই চিরন্তন-সবুজ তালীবন-মণ্ডপের ছায়া-তলে দেশীয় লোকদের গৃহ ; গৃহের চারিদিকে কলাগাছ, পুষ্পিত "লান্‌তানা", লাল "হিবিস্‌কস্‌" ;—যে-সকল উদ্ভিজ্জ কোন উদ্যানকে মনোমুগ্ধকর করিতে পারে, তাহা সমস্তই আছে। এই ছোট-ছোট গৃহের সাদা দেওয়াল, শার্সি হীন জানালা,—চওড়া-চওড়া গরাদে দিয়া বন্ধ ; নিবিড় শাখাপল্লবের দরুণ গৃহের ভিতরটা অতি কষ্টে দেখা যায় ; ভিতরটা নগ্ন ও প্রায় খালি। কিন্তু সব সময়েই একটা টেবিলের উপর একটা ঝিনুকের দোয়াৎ ও কতকগুলা কাগজ থাকে ;—সেইখানে বসিয়া উহারা লেখে—কতকগুলা সাদামাটা চলতি বিষয়ের কথা ; কিন্তু সেই কথার পুরাতন শব্দগুলি পৃথিবীর আদিম কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ; এবং আমাদের পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের মূল অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাদের মহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা এক্ষণে উহার অনুশীলনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

...দিবস চলিয়া যাইতেছে, দিনের আলো স্পষ্ট নামিয়া পড়িয়াছে। এখনো কিছু স্বর্ণরাশি ইতস্তত তালগাছের মাথায় গড়াইয়া চলিয়াছে ; তাহার পর এই শেষ প্রতিবিম্বচ্ছটা যখন নিবিয়া গেল তখন আবার "হরিৎরাত্রি" সর্ব্বত্র ঘনাইয়া আসিল—তখন এই বিজন-স্তব্ধ তরু-বীথির মধ্যে কেমন একটা বিষাদের ভাব আসিয়া পড়িল। আমার কাছ দিয়া একটি বালিকা চলিয়া গেল—তার গাল দুটি ঈষৎ তাম্রাভ, নীল রং-এর য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিয়াছে। তাহার যেরূপ অপ্রচলিত ঢং-এর সাজসজ্জা, ছিপ্‌ছিপে পাত্‌লা গড়ন, কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো চুল, তাহাতে সেকালের উপন্যাসের পীতবর্ণ "ক্রেওল" রমণীদের ভাবটা আমার মনে আসিল,—যেন কোন "ভর্জিণী", যেন কোন "কোরা"। তাই একটা বিষাদময় ঔৎসুক্য সহকারে তাহাকে আমি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এই ভারতীয় বালিকাটি নিশ্চয় খুব গরিব ; কেননা, সে নিবিড় গাছপালার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, ঘন পল্লবে ঢাকা একটা কুটীরের মধ্যে সুর্‌সুর্ করিয়া ঢুকিয়া পড়িল এবং লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন সেই বিজন আকাশের নিস্তব্ধতা ও অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইল ...

পথের আলো ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে ; এই সময় একজন পুরুষ, মৃগ-সুলভ নিস্তব্ধ লঘুতা সহকারে, প্রায় আমার গা-ঘেঁসিয়া আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। এ আর এক জাতের লোক, আরও আদিম কালের মানব-জাতির কোন এক শাখার লোক। প্রায় নগ্ন, কোমরে ছুরী ঝোলানো, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ভালুকের মত শক্ত ঘন লোমে তার বক্ষদেশ আবৃত। জাহাজের মাস্তুলের চেয়েও লম্বা ও সোজা একটা প্রকাণ্ড তালগাছের কাছে আসিয়া সে থামিল। এবং হাত পা চালাইয়া খুব তাড়াতাড়ি গাছ বাহিয়া উঠিতে লাগিল—যেন ঐ গাছের উপরে একটা কি জরুরি কাজ রাতারাতি শেষ না করিলে চলিবে না—আশ্চর্য্যরকম বানরের মত চটুল লোকটা। এরই মধ্যে খুব অন্ধকার হইয়া পড়িয়াছে—এই অন্ধকারে তালীবনের মধ্যে সে আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িল ...

শেষ গোধূলিতে, আমার ডিঙ্গিতে উঠিবার জন্য যখন আমি ফিরিয়া আসিলাম ; তখন কতকগুলি বালক, এক প্রকার ঘাসে-বোনা হাতপাখা, কমলা-লেবু, তীব্রগন্ধী রজনীগন্ধা ফুলের তোড়া বিক্রী করিবার জন্য আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের লম্বা চুল, আঁটা-সাঁটা ধুতি কোমরে জড়ানো।

দাঁড়ের কএক আঘাতেই, আমরা নদীর এই ক্ষুদ্র-নমুনাটিকে অতিক্রম করিয়া, সাগরে আসিয়া পড়িলাম। তখন সমুদ্র আমাদের সম্মুখে হরিৎ-ঝিনুকের বিজনতার মত প্রসারিত হইল—এই ঝিনুকের প্রতিবিম্বচ্ছটা অতীব পরিবর্ত্তনশীল—প্রতিবিম্বগুলা নিজেই যেন স্বয়ম্প্রভ হইয়া উঠিবে এইরূপ ভাব ধারণ করিল।

যে পুষ্পগুচ্ছগুলি বালকেরা আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছিল, অন্ধকারে তাহার গন্ধ আরও বেশী তীব্র বলিয়া মনে হইতেছে—অন্যান্য অপ্রীতিকর গন্ধের সহিত ডাঙ্গা জমি যতই দূরে সরিয়া যাইতেছে ততই এই গন্ধের তীব্রতা আরও অনুভূত হইতেছে। আমাদের যাত্রাপথে জলের উপর এই রজনীগন্ধার গন্ধ রাখিয়া যাইতেছি।

দিক্‌চক্রবাল,—নিম্নে একটু লাল, তার পর বেগ্‌নী, তার পর সবুজ, তার পর ইস্পাতের রং, ময়ূরের রং—এইরূপ ইন্দ্রধনুর ন্যায় স্তবকে স্তবকে রঞ্জিত হইয়াছে। তারাগুলা এরূপ ঝক্‌ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে যে মনে হয় যেন আজ রাত্রে বুঝি উহারা পৃথিবীর খুব নিকটে আসিয়াছে—সেই সীমাবিন্দু পর্য্যন্ত আসিয়াছে, যেখানে অস্তমান সূর্য্যের সুস্পষ্ট গোলাপী কিরণচ্ছটা এখনো নীল-গগন-মণ্ডলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এইবার রাত্রি সমাগত - কিন্তু তথাপি যেন আলোক-উৎসবের একটা ঐন্দ্রজালিক আলোকে সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত

গানের ছন্দের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের সাদৃশ্য কোথায় ও পার্থক্য কোথায় সে-বিষয়ে একটু আলোচনা কর্‌ব। সকলেই জানেন যে যদিও কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে ভাবগ পার্থক্য অপরিসীম, তথাপি তাদের মধ্যে কোথাও একটু যোগ যেন রয়ে গেছে; কাব্য-জগতের দিক্‌চক্রবাল যেখানটিতে নিজেকে নিজে অতিক্রম করে' গিয়ে অনন্তকে স্পর্শ করেছে ঠিক্ সেখানটিতেই সঙ্গীত-লোক সুরু হয়ে অনন্ত ভাব-জগতে প্রসারিত হয়ে গেছে। কাব্যের শক্তির যেখানটিতে শেষ সীমা, সেখানটিতেই সে সঙ্গীত-রাজ্যের পরিধিতে সংলগ্ন হয়ে আছে, কিন্তু কিছুতেই সে ওই পরিধির ভিতরে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে না। কাব্যশক্তির লক্ষণই হচ্ছে এই যে কাব্য প্রধানত বাক্ ও অর্থের সাহায্যে প্রথমে মানসলোকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরে ওই মনোজগতের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিজাত অনন্তরূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে' রূপের অতীত অসীম সৌন্দর্য্য-লোকের দিকে ইঙ্গিত কর্‌তে থাকে; সেখানটিতেই আমাদের মন কাব্যের বচনকে অতিক্রম করে' গিয়ে কাব্যের অনির্ব্বচনীয়তাকে স্পর্শ করে' অগাধ আনন্দের মধ্যে মগ্ন হয়ে সার্থকতা লাভ করে, আর সেখানটিতেই কাব্যের ধ্বনি এবং ছন্দও হিসাবের রাজ্যকে অতিক্রম করে' কেবলি সঙ্গীতের সুর ও লয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার তীব্র আগ্রহে ও আকুলতায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে সঙ্গীত-শক্তির আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়া এর প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। সঙ্গীত প্রথমেই কথাকে অতিক্রম করে' গিয়ে মনকে অনির্ব্বচনীয়তার নিবিড় আনন্দস্পর্শে সাফল্য দান করে; পরে কথার ও ভাবের রাজ্যসীমায় এসে পৌছে' কথা ও ভাবকে অনির্ব্বচনীয়তা ও অনন্তের মহিমায় স্পন্দিত করে' তোলে এবং কথাকে চিরন্তনতা ও অসীমের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে অমরতা দান করে। সুতরাং দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে কাব্যের গতি বহু কথা ভাব এবং রূপের থেকে অনন্ত অরূপ অনির্ব্বচনীয়তার আনন্দ-জগতের দিকে; কাব্যের গতি সীমা ও বহুত্বের জগৎ থেকে অনন্ত অনির্ব্বচনীয়তার দিকে আরোহণ। কিন্তু সঙ্গীত অনন্ত অনির্ব্বচনীয়তার আনন্দ-জগৎ থেকে সীমা ও রূপের জগৎকে ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ কর্‌তে থাকে; সঙ্গীতের গতি কথা ও রূপের জগৎকে অরূপ অনির্ব্বচনীয়তার দিকে উৎকর্ষণ। কাজেই কাব্য চায় সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে' সার্থকতা লাভ কর্‌তে, আর সঙ্গীত চায় কাব্যকে আপন অন্তরের অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মণ্ডিত করে' সার্থকতা দান কর্‌তে। এই নিগূঢ় সত্যটিকে আপনার কবিচিত্তে উপলব্ধি করে'ই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।"

কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দিক্ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্যের আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত। আমাদের উদ্দেশ্য বাহ্য গঠনের দিক্ থেকে কাব্য ও সঙ্গীতের রচনা-প্রণালীর সাদৃশ্য ও পার্থক্যের আলোচনা করা; কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোন্ ঐক্য-ভূমিতে পরস্পরের সাযুজ্য লাভ করেছে আমরা সেইটেই দেখ্‌তে চেষ্টা করব। প্রথমেই মনে রাখ্‌তে হবে গানেই হোক, বা কাব্যেই হোক, ছন্দ কোনোটারই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়; গানে এবং কাব্যে উভয়েতেই ছন্দ গৌণ, মুখ্য-উদ্দেশ্যরূপ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সে সহায়ক বা বাহন মাত্র। কিন্তু যেহেতু কাব্য ও সঙ্গীত কোনো একটি সীমারেখায় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হয়ে থাক্‌লেও তারা স্বরূপত সৌন্দর্য্য-লোকের দুটো বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে গেছে, সেজন্যে তাদের বাহন ছন্দগুলোও কোনো একটি সামান্য ক্ষেত্রে পরস্পর মিলিত হয়েও দুটো বিভিন্ন পথেই আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে। কাব্যে ছন্দের উদ্দেশ্য কাব্যের

কথা ও ভাবকে সৌন্দর্য্যসুষমায় মণ্ডিত করে' কথা ও রূপকে অনির্ব্বচনীয়তা ও অরূপের মধ্যে মুক্তি দেওয়া। গানে ছন্দের উদ্দেশ্য গানের অরূপ নিবিড় আনন্দ-রসকে কথার মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে মনের আয়ত্তের মধ্যে পৌঁছিয়ে দেওয়া। কাব্যের ছন্দের কারবার প্রধানত কথাকে নিয়ে, কিন্তু কথার অতীত অরূপ অসীমের দিকে তার ব্যঞ্জনা। গানের ছন্দের উদ্দেশ্য কথার অতীতকে আভাসে ইঙ্গিতে মনের গোচরে ফুটিয়ে তোলা, কিন্তু কথার অতীতকে কথার মধ্যেই মূর্ত্তি দান করা তার সাধনা। সহজেই বোঝা যাচ্ছে যেহেতু কথার অতীত সুরকে ফুটিয়ে তোলাই গানের ছন্দের প্রতিজ্ঞা, সেজন্যেই গানের ছন্দের সাধনা কাব্যের ছন্দের চাইতে ঢের বেশি বৃহত্তর ও মহত্তর। কথাকে একটা বিশেষ ভাবে দুলিয়ে দিয়ে তার ভিতরকার ভাবকে ঝঙ্কৃত করে' অনির্ব্বচনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে' দেওয়াই কাব্যের ছন্দের কাজ; কিন্তু গানের ছন্দকে সুরের সূক্ষ্মতম ধ্বনিস্পন্দনকেও যথাযথরূপে মুক্তি দিয়ে অথচ আকৃষ্ট করে' মনের পরিধির মধ্যে এনে পৌঁছিয়ে দিতে হয়। সুতরাং গানের ছন্দে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, এমন কি সঙ্গীতের সুরের যথার্থ স্বরূপটিকে বিশ্লেষণের বা হিসাবের সীমার মধ্যে আনা অসম্ভব বল্‌লেই হয়। কিন্তু কাব্যের ছন্দে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। যদিও কাব্যে ছন্দ ধ্বনিকে নব নব বিচিত্র উপায়ে তরঙ্গিত করে' ভাবকে ওই ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে লীলায়িত করে' মনের স্তরে স্তরে স্পন্দিত করে' তোলে, তথাপি কাব্যে ভাব বা বাগর্থই মুখ্য, ছন্দ বা বাগর্থের বাহন ধ্বনির নিয়ন্ত্রণ-রীতি গৌণ। কথাকে নাড়াচাড়া করে' তার ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই কাব্য-ছন্দের উদ্দেশ্য, এবং এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই তার সার্থকতার অবসান। কাজেই কাব্যে ধ্বনির নিয়ামক ছন্দ-শাস্ত্রের পরিধি সংকীর্ণ; ধ্বনিলীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্ত প্রক্রিয়াকে কাল তথা মনের গোচর করা কাব্য-ছন্দের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গানের ক্ষেত্রে ছন্দের পরিধি আর ধ্বনিলীলার পরিধি সমায়তন; ধ্বনিলীলার সূক্ষ্মতম থেকে সর্ব্বপ্রকার প্রকাশকে ফুটিয়ে তোলাতেই গানের ছন্দের সার্থকতা। সুতরাং গানের ক্ষেত্রে ছন্দশাস্ত্র ও ধ্বনিশাস্ত্র সমপরিসর, এবং সেজন্যেই গীত-ছন্দের বিকাশভঙ্গী এত বিচিত্র ও অফুরন্ত। যা হোক, গীত-ছন্দের এই অফুরন্ত বিকাশভঙ্গীর আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সূক্ষ্মতার দিক্ দিয়ে গানের ছন্দ কাব্য-ছন্দকে প্রথম সোপানেই ছাড়িয়ে গেছে বটে, কিন্তু এই প্রথম সোপানটিতেই একটি অতি ক্ষুদ্রপরিসর সামান্য ভূমিতে এই দুই ছন্দ পরস্পরের সাযুজ্য লাভ করেছে। অথচ ঐ ক্ষুদ্র ভূমিটুকুর মধ্যেও ঐ দু'ছন্দের গতিলীলা কত বিভিন্ন দিকে তাই দেখাতে চেষ্টা করব। গানের ছন্দ সুরের ক্ষীণতম ও সূক্ষ্মতম আবেগকেও ফুটিয়ে তুল্‌তে চায়, সেজন্য গীত-ছন্দের বিভাগ উপবিভাগ অনেক এবং তার পারিভাষিক সংজ্ঞাও অল্প নয়। কাব্য-ছন্দের উদ্দেশ্য অত ব্যাপক ও গভীর নয় বলে' তার বিভাগ ও পারিভাষিক শব্দ গীত-ছন্দের তুলনায় অনেক কম। তথাপি পরস্পরের আংশিক সাদৃশ্য হেতু উভয় শাস্ত্রেই কতকগুলো সামান্য পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়। আমরা এ শব্দগুলির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ এবং উক্ত দু শাস্ত্রে এদের অর্থগত তারতম্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে'ই কাব্য- ও গীত-ছন্দের আলোচনায় নিবৃত্ত হব। কাব্য ও সঙ্গীত উভয় ক্ষেত্রেই মাত্রা লয় যতি ও তাল এ ক'টা পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার হয়। আমরা একে একে এ ক'টা পরিভাষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

মাত্রা ও লয়

প্রথমেই মাত্রার কথা বলা প্রয়োজন। কবিতায় মাত্রা শব্দটি খুবই সাধারণ বা স্থূলভাবে ব্যবহৃত হয়; কবিতার মাত্রার খুব সূক্ষ্ম হিসাব রাখা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু গানে মাত্রার অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন; তিলার্দ্ধ ব্যতিক্রমেও গানের সুরের ধারা বাধা পায়, কাজেই রস-ভঙ্গ হয়। কবিতার ধ্বনিরও কালের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করার উদ্দেশ্যে মাত্রার হিসাব রাখ্‌তে হয়; কিন্তু তদুপরি কবিতায় স্থায়িত্ব-ভেদে মাত্রার কোনো প্রকার-ভেদ নেই। কবিতায় সব মাত্রাই এক জাতীয়

ও সমান স্থায়ী। কিন্তু গানে সব মাত্রা সমান ভাবে চলে না, তার গতির বিচিত্র ভঙ্গী ও লীলা আছে। সুতরাং কবিতার মাত্রা একঘেয়ে ও একরঙা; কিন্তু গানের মাত্রার স্বরূপ বিচিত্র। সেজন্যেই কবিতা গানের তুলনায় অনেকটা একঘেয়ে শুন্‌তে হয়। এসম্বন্ধে যথাস্থানে আরো দু-একটা কথা আলোচনা কর্‌ব। এখন গানের মাত্রা ও কবিতার মাত্রার পার্থক্যটি বিশদ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

দুটো বিশিষ্ট উপায়ে গানের মাত্রা কবিতার মাত্রা থেকে পার্থক্য ও আভিজাত্য লাভ করে' শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। প্রথমত, কবিতায় অক্ষরগুলোর মাত্রার তারতম্য বিশেষ নেই, সবগুলো অক্ষরই প্রায় একমাত্রায় একভাবেই প্রবাহিত হয়ে চলে। আমরা আগেই দেখেছি কবিতার অক্ষরগুলো হয় একমাত্রিক নয় দ্বিমাত্রিক হবে; অন্যথা হবার জো নেই।

ঁ ঁ
জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে—
ঁ
তুমি বিচিত্ররূপিণী।——রবীন্দ্রনাথ

এখানে কেবল চিহ্নিত অক্ষরগুলো দ্বিমাত্রিক, বাকি সবগুলো একমাত্রিক। সর্ব্বত্রই এই রকম। কবিতায় কোনো বর্ণের দুয়ের অধিক বা একের কম মাত্রা থাকে না। কিন্তু গানে একেকটি বর্ণ ত্রিমাত্রিক চতুর্মাত্রিক প্রভৃতি বহুমাত্রিক তো হতে পারেই, আবার অন্যদিকে একেকটি বর্ণ অর্দ্ধমাত্রিক সিকিমাত্রিক প্রভৃতি অনেক প্রকার ভগ্নমাত্রিকও হ'তে পারে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে এই মাত্রাবৈচিত্র্যের ফলে ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত) তরঙ্গিত হয়ে উঠে; মধ্যে মধ্যে দ্বিমাত্রিক বর্ণের অস্তিত্ব-হেতুই মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ওরকম গতিভঙ্গীতে দুলে উঠ্‌তে পারে, নতুবা এ ছন্দ একেবারে একঘেয়ে হয়ে পড়্‌ত। উপরের পদ্যাংশটি পড়্‌লেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে; শুধু তিনটি গুরু স্বরের প্রভাবেই এ ছন্দের সুরটা কেমন তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। ঠিক্ এই কারণেই গানের সুরপ্রবাহ এমন বিচিত্র উপায়ে নৃত্যপরায়ণ হয়ে উঠ্‌তে পারে। কিন্তু কবিতায় কোন্ বর্ণ গুরু এবং কোন্ বর্ণ লঘু হবে তা পূর্ব্ব থেকেই নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে বলে' ছন্দ-রচয়িতার স্বাধীনতা কম, কেবল লঘু গুরু বর্ণের সন্নিবেশ-কৌশলের উপরেই তাঁর কৃতিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু গানে মাত্রা-পরিমাণ নির্দ্দেশ করা সম্বন্ধে সুর-রচয়িতার প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তা ছাড়া তাঁর স্বাধীনতার ক্ষেত্রের পরিসরও খুব বেশি; তিনি সিকি মাত্রা বা তার নীচু থেকে চার মাত্রা বা তার উর্দ্ধেও বিচরণ কর্‌তে পারেন। কিন্তু কাব্য-ছন্দ-রচয়িতার শুধু একমাত্রিক এবং দ্বিমাত্রিক বর্ণ নিয়েই কার্‌বার; সুতরাং তাঁর বিচরণ-ভূমি অতি সংকীর্ণ। কবিতায় একটি বর্ণ এক মাত্রার কম বা দু মাত্রার বেশি হতে পারে না; কিন্তু গানে একটি বর্ণ সিকি-মাত্রিক থেকে বহু-মাত্রিক হতে পারে। সেজন্যই গানের গতি-বৈচিত্র্য কবিতার চাইতে ঢের বেশী। যেখানে কয়েকটি সিকি-মাত্রিক বর্ণ একত্র হয়েছে সেখানে গানের ধ্বনি-প্রবাহ অত্যন্ত খরগতি; যেখানে একেকটি বর্ণের পরিমাণ অর্দ্ধমাত্রা, সেখানকার গতি অনেকটা মন্থর; আবার যেখানে একেকটি বর্ণই বহু-মাত্রা-ব্যাপী সেখানে সুরের গতি খুব বেশি ধীর এবং গম্ভীর। এইরূপে মাত্রা-বৈচিত্র্যে সুরের গতিবেগ অতি অদ্ভুত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যে-কোনো একটি গানের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌লেই গানের মাত্রা-বৈচিত্র্যের এই অসীম শক্তি ধরা পড়্‌বে। গানে মাত্রা-বৈচিত্র্যের আরেকটি গৌণ ফল প্রতি পাদের অন্তর্গত অক্ষর-সংখ্যার অসমতা। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পাদের অক্ষর-সংখ্যা খুবই অনিয়মিত; গুরু স্বরের আধিক্য বা অল্পতা হেতু অক্ষর-সংখ্যা কমে কিংবা বাড়ে।

ঁ ঁ
স্নিগ্ধ সজল মেঘ-কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রথম ছত্রে দুটো গুরু স্বর অক্ষর-সংখ্যা কমিয়ে তেরো করেছে; দ্বিতীয় ছত্রে ওরকম গুরু স্বর নেই বলে' অক্ষর-সংখ্যা পনেরো। কিন্তু উভয় ছত্রেই মাত্রা-সংখ্যা সমান অর্থাৎ পনেরো। গানের এক

পাদের সঙ্গে আরেক পাদের অক্ষর-সংখ্যার পার্থক্য আরো অনেক বেশি হতে পারে। যেখানে ভগ্ন-মাত্রিক বা অল্প-মাত্রিক বর্ণ বেশি সেখানে অক্ষর-সংখ্যাও বেশী; কিন্তু বহু-মাত্রিক বর্ণের আধিক্যে অক্ষর-সংখ্যা অনেক কমে' যায়।

এই তো গেল গানে মাত্রার গুণন-বিষয়ক বা ভগ্নাংশ-বিষয়ক প্রকার-ভেদ। দ্বিতীয় প্রকার ভেদ হচ্ছে মাত্রার স্থায়িত্ব নিয়ে। প্রথমেই মাত্রার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করার সময়েই বলা হয়েছে যে কালের দিক্ দিয়ে ধ্বনি-পরিমাণের একক বা unitকে মাত্রা বলা হয়। একটি লঘুস্বর বা লঘুস্বরান্ত ব্যঞ্জন বর্ণ (যথা অ,ই, বা ক,খ) উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সে সময়-পরিমাণকে একমাত্রা বলে' অভিহিত করেছি। মাত্রার এ সংজ্ঞা কাব্য ও সঙ্গীত উভয়েই সমভাবে খাটে। এই একমাত্রা-কালের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণকে দু মাত্রা বা তিন মাত্রা, এবং তার অর্দ্ধেক বা সিকি পরিমাণ কালকে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকি মাত্রা বলব। গানে দেড়মাত্রা প্রভৃতিরও ব্যবহার আছে। কিন্তু গানে মাত্রা-পরিমাণের আরো সূক্ষ্ম বিচার করা প্রয়োজন। একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাকে এক মাত্রা বা মাত্রার একক বলে' অভিহিত করেছি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই মনে সংশয় জাগ্‌বে এ সংজ্ঞা ঠিক হল কি না; কেননা একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে কত সময় লাগ্‌বে তার তো কোনো স্থিরতা নেই। বস্তুত ওই সংজ্ঞাটি আপেক্ষিক; কারণ, ওটা বিভিন্ন সময়ে একই ব্যক্তির অথবা একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির উচ্চারণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আমি হয়তো এখন রেগে বা অন্য কোনো ব্যস্ততায় খুব দ্রুতগতিতে কথা বল্‌ছি আবার হয়তো অন্য সময়ে নিস্তেজ অবসন্ন হয়ে খুব ধীরে ধীরে কথা বলব। সুতরাং আমার কথার এক মাত্রার সময়-পরিমাণের কোনো স্থিরতা নেই,—ব্যস্ততার সময় এক মাত্রার উচ্চারণে যে সময় লাগে, ধীরতার সময় তার পরিমাণ দেড়গুণ কি দ্বিগুণ পর্য্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং মাত্রার কোনো নিরপেক্ষ সংজ্ঞা হল না। যদি বলা যায় যে বিশেষ ব্যস্ততা বা ধীরতা বাদ দিয়ে স্বভাবত অনুত্তেজিত বা অনবসন্ন অবস্থায় আমার এক বর্ণের উচ্চারণে যে সময় লাগে সেইটেই মাত্রার যথার্থ নিরপেক্ষ পরিমাণ, তথাপি ঠিক্ হবে না। কারণ, সকল লোকে সমান গতিতে উচ্চারণ করে না; এক বর্ণের উচ্চারণে আমার যে সময় লাগে অন্যের ঠিক্ সে সময় লাগে না,—কারো বেশি লাগে, কারো কম লাগে। সুতরাং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মাত্রা-পরিমাণ নির্ণয়ের উপায় কি? প্রশ্নটার উত্তর দেবার আগে ওটাকে আরো একটু বিশদ করে' বুঝিয়ে বলা দরকার, কেননা এর উপরেই কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের একটা প্রধান পার্থক্য নির্ভর করে। মনে কর কেউ একটা গান করছে। এখন গানটির প্রত্যেক বর্ণের বিভিন্ন মাত্রা-পরিমাণ নির্দ্দেশ করা আছে, কোনোটার সিকি মাত্রা, কোনোটার দেড় দুই তিন বা চার ইত্যাদি। এস্থলে গায়কের দুটো বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। প্রথমত দেখতে হবে যেন গানের আদ্যন্ত সর্ব্বত্র মাত্রার সমতা রক্ষা হয়; অর্থাৎ গানের প্রথমেই এক মাত্রা যতটুকু কাল স্থায়ী হয়েছে গানের শেষ পর্য্যন্ত যেন মাত্রার ওই স্থায়িত্ব-কালের স্থিরতা বা সমতা (uniformity) রক্ষা হয়, এবং ভগ্ন-মাত্রা ও গুণ-মাত্রাগুলোর স্থায়িত্বও যেন এককের স্থায়িত্বের সমানুপাতিক হয়। মাত্রার এই সমতার উপরেই সমগ্র গানটির ধ্বনি-প্রবাহের গতি-সাম্য নির্ভর করে। ধ্বনি-প্রবাহের এই গতি-সাম্যকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে লয় নামে অভিহিত করা হয়। যদি লয় ঠিক্ না থাকে অর্থাৎ গানের গতি যদি সর্ব্বত্র সমান না হয়ে কোথাও দ্রুত কোথাও বিলম্বিত হয় তবে সঙ্গীতের সমস্ত মাধুর্য্যই নষ্ট হয়ে যায়। ধ্বনির এই গতি-সাম্য বা লয়ই সঙ্গীতের মাধুর্য্যের মূল কারণ। সুতরাং দেখা গেল যে প্রতিমাত্রার স্থায়িত্ব-কাল যথানুপাতে সুনির্দ্দিষ্ট হলেই সমগ্র সঙ্গীতটির লয়ও স্থির হয়ে যায়। এখন আমরা লয়ের এ সংজ্ঞা দিতে পারি যে সঙ্গীতের আদ্যন্ত সর্ব্বত্র মাত্রার কাল-পরিমাণের সমতা বা সমানুপাত রক্ষা করাকেই লয় বলে। দ্বিতীয়ত, মাত্রার সমতা রক্ষা হলে লয় ঠিক থাকে বটে, কিন্তু একটি মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উদিত হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে যাদের কিছুমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে তারাই জানে যে শুধু লয় ঠিক্ থাকলেই

গানের মাধুর্য্য সম্পূর্ণ রক্ষা হয় না. লয়ের গতিবেগের ক্রমও (rate) নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার ; কোনো গান দ্রুত লয়ে এবং কোনো গান বিলম্বিত লয়ে গীত হলেই ভালো শোনায়। সুতরাং যে গান দ্রুত লয়ে গীত হবে সে গানের মাত্রাও অল্পক্ষণ স্থায়ী হবে, আবার বিলম্বিত লয়ে গাওয়া হলেই মাত্রার স্থায়িত্ব-কালেরও বৃদ্ধি হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতে মাত্রার কোনো বাঁধাবাঁধি স্থায়িত্বকাল নির্দ্দিষ্ট নেই, গান-ভেদে মাত্রা-পরিমাণও বিভিন্ন হয়। সঙ্গীতে ধ্বনিপ্রবাহের এই গতিক্রম বা লয় অনেক প্রকার হতে পারে ; কোনো গান দ্রুত লয়ে, কোনো গান অতিদ্রুত, বিলম্বিত, অতিবিলম্বিত, ঈষৎ-বিলম্বিত বা মধ্য লয়ে গাওয়া হয়। কিন্তু এ বিশেষণ-গুলো সবই আপেক্ষিক শব্দ, এগুলো গায়ক বা শ্রোতার শ্রুতিশক্তির উপর নির্ভর করে। আমি যে লয়টিকে দ্রুত মনে করছি তুমি হয়তো তাকেই মধ্য বা বিলম্বিত মনে করতে পার। সুতরাং গানের লয় বা গতিক্রম বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রুতিরুচির উপর নির্ভর করে বলে এ লয় ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হয়। যাতে এ ভিন্নতা না হয়ে সর্ব্বত্র লয়ের সমতা রক্ষা হয় সেজন্যে অনেক সময় মাত্রামাণ (metronome) নামক যন্ত্রের সাহায্য লওয়া হয়। ওই যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি মাত্রার স্থায়িত্ব-কাল সুনির্দ্দিষ্ট করা যায়, সুতরাং গানের সর্ব্বত্র গতিসাম্য বা লয় এবং ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে গতিক্রম বা লয়ের প্রকার-ভেদও স্থির থাকে। যাহোক, এবিষয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন আমরা কবিতায় এই মাত্রা ও লয়ের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তাই দেখ্তে চেষ্টা করব। (ক্রমশঃ)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

সম্পাদকির বিপদ্

'গোলক' কাগজের সম্পাদকের নাম গৌরচরণ বসু। বয়সে প্রবীণ—দাঁড়ি গোপ যে পাকা এবং মেজাজ যে কড়া—এই প্রবীণতার জন্যেই। পাকা সম্পাদক—লেখার মধ্যে ঝাঁজ বেশ থাকে। আর যাকে খোঁচা দেওয়া হয়—তার পেটে খোঁচা বেশ কোঁৎ করে' লাগে। গৌর-বাবু কাগজখানার জন্যে অনেক পয়সা খরচ করেছেন। এমন একটা সময় গেছে, যখন গৌর-বাবু সমস্ত দিন রাত্রি আপিস এবং প্রেসেই কাটিয়েছেন। গত দু-বছর থেকে কাগজের আয় একটু বেড়েছে—এখন আর গৌর-বাবুকে তত বেশী খাটতে হয় না।

হঠাৎ একটা গোলমাল মাঝখানে এসে পড়্ল—যার জন্যে গৌর-বাবুর "গোলকে'র কাট্তি কমে' গেল। সহরের কে একজন হরি-বাবু আর-একখানা কাগজ বার করল—তার নাম হ'ল "চন্দ্র"। চন্দ্রের দাম গোলকের চেয়ে কম—অথচ গোলকে যে খবর যেমন ভাবে থাকে চন্দ্রেও সেই-সব তেমনি ভাবেই পাওয়া যায়। গৌর-বাবু দেশের বড় বড় সব সহরে লোক রেখে, তাদের মাইনে দিয়ে নানা খবর আনাতেন। গৌর-বাবুর বড় প্রেস। গৌর-বাবুর আপিসে এবং প্রেসে অনেক লোক দিন রাত্রি খাটে—সব সময় গম্‌গম্ করে। গৌর-বাবু দিন রাত কড়া চোখে এবং চটা মেজাজে সব কাজ দেখে বেড়ান। 'চন্দ্র'-কাগজের প্রেস একটা টিনে-ছাওয়া ঘরে। সেই প্রেসে জন দশেক লোক কাজ করে—প্রেস মাত্র একটা। আপিস আর প্রেস এক জায়গাতেই। হরি-বাবুর প্রেসে এবং আপিসে দিনে কোন কাজ হয় না। যা কাজ হয় কেবল রাত্রে—তাও দশটার পর আরম্ভ হয়। অথচ মজা এমন যে হরি-বাবুর কাগজের কাট্তি গৌর-বাবুর কাগজের চেয়ে কম ত হ'লই না—বরং মাসে মাসে বেশ বেড়েই যেতে লাগ্ল। লোকে দাম কম দিয়ে হরি-বাবুর কাগজে সব খবরই পায়—কাজেই তারা আর ভাল দাম দিয়ে গৌর-বাবুর কাগজ কিন্‌বে কেন।

চন্দ্র-সম্পাদক হরি-বাবু কাগজ বার কর্‌বার আগে মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাট্রিন্-ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। তার পর তাঁর নামে ঘুস নেবার একটা নালিশ হয়—

তা সেটা নাকি মিথ্যা। তা যা হোক—কর্ত্তারা গরিব হরি-বাবুকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। গৌর-বাবু ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটির একজন কমিশনার—তিনি ইচ্ছে করলে নাকি হরি-বাবুকে কাজে রাখ্‌তে পার্‌তেন। কিন্তু তিনি বল্‌লেন—"চোরকে পাব্‌লিক কাজে রাখ্‌তে আমার ঘোর আপত্তি আছে।" হরি-বাবু গৌর-বাবুর ওপর চটে' গেলেন। এবং আর কোথাও কোনো রকম স্থবিধে কর্‌তে না পেরে সম্পাদক হয়ে বস্‌লেন।

হরি-বাবুর কাগজ পড়ে' সবাই বল্‌তে লাগ্‌ল—"হরি-বাবুর ল্যাট্রিন্-ইন্‌স্পেক্টারের" কাজ গিয়ে ভালই হয়েছে। ওঁর যে এত বিদ্যে—তা না হলে কেউ কোনো দিন জান্‌তেও পার্‌ত না। গৌর-বাবু আবার ওঁকে চোর বলেন কোন্ হিসেবে? গৌর-বাবু ত ডাকাত! আমাদের কাছ থেকে এতদিন দু'পয়সার কাগজের জন্যে চার পয়সা করে' নিয়েছেন"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গৌর বাবু ব্যাপার কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর কাগজের সব খবর হরি-বাবুর কাগজে কেমন করে' যে যায়—এ তাঁর বুদ্ধির অগম্য বলে' মনে হল। প্রথম তাঁর মনে হল যে হয়ত তাঁরই কোনো লোক গোপনে চন্দ্র-সম্পাদককে খবর বিক্রি করে। সবাইকে সন্দেহ কর্‌তে কর্‌তে গৌর-বাবুর এমন অবস্থা হল যে নিজের স্ত্রীকেও তিনি মাঝে মাঝে সন্দেহ কর্‌তেন।

রাত্রে একদিন গৌর-বাবু কি একটা খস্‌খস্ শব্দ শুন্‌তে পেলেন। কান খাড়া করে' তাঁর মনে হল যে শব্দটা তাঁর দেরাজ থেকে আস্‌ছে।

আস্তে আস্তে তিনি উঠে বস্‌লেন। তার পর শক্ত করে' লাঠিটা বাগিয়ে ধরে' দুয়ারের দিকে গেলেন। দুয়ারের কাছে গিয়ে পাশের ঘরের দেরাজের কাছে দেখ্‌লেন যে কে একজন তাঁর কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌ছে। গৌর-বাবুর মনটা হঠাৎ বেজায় খুসী হয়ে উঠ্‌ল। মনে ভাব্‌লেন—এতদিনে ধরেছি—দাঁড়াও বাবা, আমার ফাইল চুরি করা—হুঁ!

তার পর গৌর-বাবু হঠাৎ দুয়ারের শিকল বন্ধ করে' দিয়ে বাড়ীর অন্য সবাইকে চীৎকার করে' ডাক্‌তে আরম্ভ করে' দিলেন। কাছেই প্রেস এবং আপিস, সবাই ছুটে এল—ডাণ্ডা এবং আলো নিয়ে। সকলের মুখে খুব একটা উত্তেজনার ভাব এই মনে করে' যে—এতদিন পরে আসল চোর ধরা পড়্‌লে কর্ত্তা আর-সবাইকে অনাবশ্যক সন্দেহ হতে রেহাই দেবেন।

লোকজন সব এসে পড়্‌লে গৌর-বাবু দুয়ারের দু'পাশে সবাইকে বেশ সার দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন। জানালার নীচেও দু' জন করে' লোক ডাণ্ডা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, চোর যদি লাফ দেয় তাকে পিটিয়েই তার দফা সেরে দেবে—হাঁ—একেবারে। কেউ কেউ বল্‌ল যে পুলিশ ডেকে আনা ভাল, কারণ চোরটা কোনো রকম শব্দ কর্‌ছে না, হয়ত তার হাতে পিস্তল আছে। গৌর-বাবু বল্‌লেন—চোরকে আগে ধরে' তার পর পুলিশ ডাকাই ভাল।

গৌর-বাবু তাঁর দু-নলা বন্দুটিকে বাগিয়ে ধর্‌লে পর আস্তে আস্তে দুয়ার খোলা হ'ল। সকলে দেখ্‌ল ঘরের কোণে জড়সড় হয়ে সর্ব্বাঙ্গে কাপড় মুড়ি দিয়ে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গৌর-বাবু এক লাফে তার কাছে গিয়ে তাকে ঝপাত্ করে' জড়িয়ে ধরে' একদম বাইরে টেনে আন্‌লেন। লোকরা তখন সবাই ডাণ্ডা হাতে চোরকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—পাছে সে পালায়। তার পর গৌর-বাবু যেই চোরের মুখের কাপড় জোর করে' টেনে খুলে দিলেন আর তার মুখে আলো পড়্‌ল, অমনি সবাই হঠাৎ চোঁ-চাঁ দৌড় দিল! গৌর-বাবুর হাতের বন্দুকটা পড়ে' গেল এবং হঠাৎ তার থেকে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়ে ছাতের কোণের জলের টবে লাগ্‌ল এবং টব ফুটো হয়ে গিয়ে তার জল ফিন্‌কি দিয়ে ছুটে এসে গৌর-বাবুর দাড়ি এবং চুল আপ্লুত কর্‌তে লাগ্‌ল।

গৌর-বাবু উদাসভাবে আপনার ঘরে চলে' গেলেন।

চোর আর কেউ নয় গৌর-বাবুর বড় ছেলের বউ—রাত্রে ছেলে কাঁদ্‌ছিল বলে' একটা মোমবাতি আর দেশলাইয়ের জন্যে শ্বশুরের ঘরে এসেছিল। ছেঁড়া কাগজও কিছু নেবার ইচ্ছে ছিল—জ্বালিয়ে দুধ গরম কর্‌বার জন্যে।

এর পর গৌর-বাবু তিন দিন অন্দরে যান নি। পুত্রবধূ তবুও বাপের বাড়ী চলে গেল।

গৌর-বাবু এর পর থেকে একটু সাবধান হ'লেন। সন্দেহ হলেই কিছু করেন না। কিন্তু চেষ্টা যতই করুন না কেন—চোরকে বা হরি-বাবুর কাগজে তাঁর কাগজের সব খবর কেমন করে' যায় এ তিনি কোনো রকমেই ধরতে পারলেন না। তাঁর চটা মেজাজ আরও যেন চটে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। কোনো কারণ নেই সেদিন প্রেসের দারোয়ানকে অনাবশ্যক ঘা-কতক দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন। আর একদিন আপিসের গোপাল-বাবুকে সন্দেহ করে' তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। অনেক পুরানো লোক গেল—নতুন লোক এল, তাতে কাজের আরো গোলমাল হতে লাগ্‌ল—গৌর-বাবুর মেজাজও আরো খারাপ হতে লাগ্‌ল। শেষে একদিন প্রেসের দেড়ে কালীওয়ালাকে বিশেষ-কিছু-ঘনিষ্ঠ সম্বোধন করার জন্য সে গৌর-বাবুর মাথায় একটিন নীল কালী ঢেলে দিয়ে চলে' গেল।

এদিকে হরি-বাবুর 'চন্দ্রের' কাট্‌তি বেড়ে চলেছে। গৌর-বাবু এখন আর বাড়ীতে প্রায়ই থাকেন না—প্রেসেই সব সময় থাকেন। তাঁর সাম্‌নেই সব কাজ হয়। প্রেসের মধ্যেই লোকজনদের খাবার ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রেসের গেটে খুক্‌রি কোমরে বেঁধে গুর্‌খা দারোয়ান—কোনো লোক কোনো রকমের কাগজ নিয়ে বাইরে যেতে পারে না—সব গৌর-বাবুকে দেখিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

তবুও কিছুতেই কিছু হয় না। চন্দ্রের কাট্‌তি বেশ হতে লাগ্‌ল—গোলকের অবস্থা ক্রমশ মন্দ হয়েই চল্‌ল।

শেষে গৌর-বাবু একদিন করলেন কি—কতকগুলো বিষয়ে ছোট ছোট নোট নিজে লিখ্‌লেন। নিজে তার প্রুফ দেখ্‌লেন—নিজের সাম্‌নে ম্যাটার প্রেসে চড়্‌ল।

মনে করলেম চন্দ্রকে এবার জব্দ করেছি। পরের দিন দেখ্‌লেন যে গোলকের "নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্র" ইত্যাদি সবই "চন্দ্রে"ও ছাপা হয়েছে।

গৌর-বাবু ভেবে পান না—এ কি রকম করে' হতে পারে। "চন্দ্র" আর "গোলক" একই সঙ্গে বেরয়। কাজেই এ হতে পারে না যে 'চন্দ্র' 'গোলক' থেকে নকল করে।

প্রেসে গৌর-বাবু লোকজনের উপর পাহারা দেবার জন্যে লোক রাখ্‌লেন দুজন—এবং নিজে তিনি সেই দুজন লোকের উপর চোখ রাখ্‌লেন।

গৌর-বাবু একদিন দুপুরে খেতে বাড়ী গেছেন—তাঁর ঘরে ঢুকেই তিনি দেখ্‌লেন যে তাঁর সেজ ছেলে কি-একটা কাগজ পড়্‌ছিল, তাঁকে দেখেই হঠাৎ কাগজ-খানা নিয়ে দৌড় দিল।

গৌর-বাবুর মনে হল পয়সার জন্য লোকে সবই করতে পারে। ছেলেও বাবার সর্ব্বনাশ করতে পারে। বাবাও যে পারে না তাও নয়। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে গজেন নিশ্চয়ই তাঁর দেরাজ থেকে কাগজপত্র চুরি করে' চন্দ্র-সম্পাদককে বিক্রি করে। কি করবেন ভাব্‌ছেন এমন সময় দেখ্‌লেন গজেন তার চটি তাড়াতাড়িতে পরে' যেতে পারে নি। তখন গৌর-বাবু করলেন কি—একটা কম্বল জড়িয়ে দুয়ারের অন্ধকার কোণে চুপ্ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গা ঘামে ভিজে গেল। গজেন আর যেন আসেই না। এই রকম ভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেল। গজেন এদিকে করেছে কি—খানিকক্ষণ বাইরে বেড়িয়ে—"বাবা এতক্ষণে বাইরে গেছেন" মনে করে'—পা টিপে টিপে যেই ঘরে পা দিয়েছে—অমনি তার ঘাড়ে কম্বল-জড়ানো গৌর-বাবু গিয়ে পড়্‌লেন। গজেন 'বাবা রে' বলে' অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। গৌর-বাবু তখন কম্বল ছেড়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর সমস্ত গা দিয়ে দরদর করে' ঘাম পড়্‌ছে। রাগে তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বল্‌ছে। গোলমাল শুনে গৌর-বাবুর স্ত্রী, বড় ছেলে রমেন, মেয়েরা এবং চাকর-বাকর দু-একজন এসে দাঁড়িয়েছে। গৌর-বাবু চেঁচিয়ে তাঁর স্ত্রী থাকহরিকে বল্‌লেন—তোমার গুণের ছেলের কাণ্ড দেখ—আমার সর্ব্বনাশ এমনি করে'ই করছে—।

থাকহরি বল্‌লেন—কি সর্ব্বনাশ? হ্যাঁ—গা, তোমার কি করেছে গজা?

"এই দেখনা কি সর্ব্বনাশ"—বলে'ই গৌর-বাবু গজেনের পকেট থেকে টেনে একটা কাগজ মোড়া অবস্থায় বার করলেন—। কাগজখানা বার করে'ই সোজা করে' ধরে' জোরে জোরে পড়্‌তে আরম্ভ করলেন—:

"প্রাণ-প্রতিম-প্রিয়তম-রাজ্ঞামণি-ওগো-আমার—"এই-টুকু পড়ে'ই গৌর-বাবু কাগজখানা ফেলে দিয়েই সেখান থেকে চলে' গেলেন গম্ভীর ভাবে। রমেনের মুখখানা তখন একটা দেখ্‌বার জিনিষ্। মুখখানায় তখন—ইলেক্‌সনে ইলেক্‌টেড-না-হওয়া-মালসীর মুখের ভাব, বাছুর-মরা গরুর মুখের ভাব, রায়-বাহাদুরের সঙ্গে সাব্‌ডেপুটি-বাবুর কথা না বলার দুঃখ, পরীক্ষায়-ফেল-করা বিড়ি-খেকো লম্বা-টেরীওয়ালা ছেঁড়া-চটি-পায়ে বকা ছেলের অন্তর-বেদনা ইত্যাদি সবই মেশানো ছিল।

গৌর-বাবু চলে' যেতেই সে মোড়া কাগজখানা নিয়েই অন্য ঘরে চলে' গেল। যাবার সময় মাটিতে-শোওয়া গজেনকে চোখের চাউনিতে বলে' গেল—দাঁড়াও, দেখাবো তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে পরের চিঠি পড়ার মজা—।

চিঠিখানা গৌর-বাবুর বড় পুত্র-বধূর, অর্থাৎ রমেনের স্ত্রীর। গজেনের রোগই ছিল—দাদাকে বৌদি কি লেখে তাই লুকিয়ে পড়া এবং সেই আদর্শে ভবিষ্য প্রেয়সীকে চিঠি লেখা শেখা।

গৌর-বাবু এর পর থেকে আরো সাবধান হলেন। প্রেসের মধ্যেই তাঁর আপিস করলেন—এবং যতসব দর্‌কারী কাগজপত্র সব আপিসেই রাখ্‌তেন। সমস্ত রাত তাঁর প্রায় না ঘুমিয়েই কাট্‌ত। যাই একটু তন্দ্রা আস্‌ত, অমনি গৌর-বাবুর মনে হত—কে বুঝি কাগজপত্র নিয়ে চলে' যাচ্ছে বাইরে—অমনি তাঁর ঘুম ভেঙে যেত।

ভোর তিনটা—টিপ্ টিপ্ করে' বৃষ্টি পড়্‌ছে—গৌর-বাবু তাঁর চেয়ারে চুপ করে' বসে' আছেন আর তামাক খাচ্ছেন। প্রেসের লোকরা সব কাজে ব্যস্ত—কারণ আজকাল খুব ভোরেই কাগজ বেরোয়। এমন সময় গৌর-বাবু দেখ্‌লেন প্রেসের সামনের রাস্তার ডাষ্ট্‌বিন থেকে একটা লোক যা কাগজপত্র পে'ল সব কুড়িয়ে নিয়ে গেল। গৌর-বাবু মনে করলেন—কোনো গরীব লোক ময়লা কাগজ বেচে দিন গুজরান করে। তাকে দেখে গৌর-বাবুর একটু কষ্টও হল, আহা বেচারী, ভিজে ভিজেই পেট চালাবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু এই রকম যখন কয়েকদিন উপরো-উপরি গরীব লোকটাকে দেখ্‌লেন, তখন তাঁর মনে কেমন একটা সন্দেহ হল।

কয়েক দিন পরে গৌর-বাবু কতকগুলো সংবাদ নিজে তৈরী কর্‌লেন। তার দু-একটা নমুনা:—

(১) মহারাজা গজেন্দ্রচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হইবে।

(২) গবর্ণর সাহেব পদত্যাগ করিয়াছেন—কারণ জানা যায় নাই।

(৩) জাষ্টিস্ বোসের হৃদ্‌রোগে গত কল্য বৈকালে মৃত্যু হইয়াছে।

(৪) পুলিশ সাহেব, উকিল ভজহরি-বাবুকে কেবল লাথি-মারা নয়, অপমানও করিয়াছেন—এই অজুহাতে পুলিশ সাহেবের নামে নালিশ রুজু হইয়াছে।

(৫) কাল বেলা তিনটার সময় টাউন হলে মিটিং হইবে—মৌলানা রম্‌জান সাহেবের মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ হইবে।

(৬) চায়না ব্যাঙ্ক্ ফেল হওয়াতে সহরের প্রসিদ্ধ ধনী রামখেলন কাঁইয়া দেউলিয়া হইয়াছেন। আজ চায়না ব্যাঙ্ক্ বেলা তিনটার সময় টাকা-গচ্ছিত-কারীদের শতকরা ১৲ করিয়া দিবে।

এই-রকমের আরো নানা রকমের খবর তৈরী ও কম্পোজ করা হল। তার পর প্রুফ দেখা হল। সেই-সমস্ত দেখা-প্রুফ একটু পরে ডাষ্ট্‌বিনে ফেলে দেওয়া হল। তার পর কম্পোজ-করা ম্যাটার গৌর-বাবু ভেঙে ফেল্‌তে বল্‌লেন। প্রেসের লোকেরা মনে কর্‌ল বাবুর মাথার দোষ হয়েছে।

এদিকে কিন্তু আর-একদল লোক অন্য ঘরে বসে' পরের দিন কাগজে যা যাবে সব কম্পোজ কর্‌ল। সেই-সমস্ত খবর ইত্যাদির প্রুফ দেখা হয়ে গেলে পর ম্যাটার যখন প্রেসে চড়্‌ল তখন গৌর-বাবু সমস্ত দেখা-প্রুফ নিজের সাম্‌নে পুড়িয়ে দিলেন।

সেইদিন রাত্রে আবার সেই গরীব-বেচারী লোকটা ডাষ্ট্‌বিনের কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে গেল।

যথাসময়ে দুখানা কাগজ বেরল। ফেরিওয়ালারা চারদিকে খুব হৈ চৈ কর্‌তে কর্‌তে "চন্দ্র" বিক্রি কর্‌তে লাগল। সেদিন 'চন্দ্র' বেজায় বিক্রি হল।

গৌর-বাবু 'চন্দ্র'খানা হাতে পেয়েই দেখ্‌লেন গোলকের কোনো খবরই তাতে নেই। "চন্দ্রে" রয়েছে তাঁর হাতের তৈরী সব নিছক মিথ্যা খবরগুলো।

সেদিনকার "চন্দ্রে" প্রকাশিত খবরগুলো একেবারে বাজে। কারণ—(১) মহারাজা গজেন্দ্রচন্দ্রের জমিদারী নিলাম হবার কোনো কারণ নেই—এবং কোনো কালেও তা হবে না।

(২) লাট সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপার স্বপ্নে হতে পারে, বাস্তবে নয়।

(৩) জাষ্টিস্ বোস সেদিনও আস্ত বেঁচে আছেন এবং রীতিমত আদালত কর্‌ছেন।

(৪) ভজহরি-বাবু পুলিশ সাহেবের বন্ধু।

(৫) টাউন হলে কোনো বক্তৃতা হবার কথা নেই, তা ছাড়া মৌলানা রম্‌জান সাহেবের জেল কোনো কালেও হয় নাই। তার উপর সেবার তিনি খাঁ সাহেবী বক্‌সিশ পাইয়াছেন।

(৬) চায়না ব্যাঙ্ক্ ফেল করার কথা একেবারে বাজে।

সেদিন বেলা যত বাড়্‌তে লাগ্‌ল—হরি-বাবুর আপিসে ততই লোকজনের ভীড় হতে লাগ্‌ল। কেউ হরি-বাবুকে মারতে চায়, কেউ দাড়ি ছিঁড়্‌তে চায়, কেউ বা তাঁকে জলে চোবাতে চায়। এক একজন মানুষের আকৃতি, প্রকৃতি এবং রুচি এক এক রকমের। সকলেই আপন আপন রুচি অনুসারে হরি-বাবুর ব্যবস্থা করতে চায়। যাদের নামে বাজে খবর বেরিয়েছিল তারা সবাই মিলে হরি-বাবুকে হেঁই-মারে-কি-তেঁই-মারে।

এদিকে চায়না-ব্যাঙ্কের দরজায় হাজার হাজার লোক জমা হয়ে গেছে—সবাইকার মুখে হাহাকার। ব্যাঙ্কের কর্ত্তারা অবাক্ হয়ে গেলেন এমন ব্যাপার দেখে। তার পর সব ব্যপার দেখে শুনে লোকজনদের অনেককে টাকা দিয়ে অনেককে বুঝিয়ে বাড়ী পাঠালেন এবং শেষে পুলিশকেস্ কর্‌লেন 'চন্দ্রে'র নামে।

ব্যাপার যখন অনেক দূর গড়িয়েছে—তখন চন্দ্র-আপিসে পুলিশ-সাহেব একদল পুলিশ নিয়ে হাজির হল। সে অনেক কষ্টে লোকজনের ভীড় ঠেলে হরি-বাবুকে কোনো কথা বল্‌বার অবসর না দিয়ে একেবারে সোজা হাজতে চালান কর্‌ল।

হরি-বাবুর নামে নালিশ হয়েছে গোটা বারো।

তবে গৌর-বাবু অনেক কষ্টে হরি-বাবুকে জেল থেকে বাঁচালেন। হরি-বাবু প্রেস ইত্যাদি সব বিক্রি করে' অন্য কোথাও চলে' গেলেন। লোকে বলে বিদেশে তিনি সাইকেল্ এবং ষ্টোভ্ মেরামতের দোকান করেছেন।

তা সত্বেও, গৌর-বাবুর আপিসের নিয়ম হল—প্রেসের কোনো রকম কাগজপত্র—প্রুফ্ ত দূরের কথা—বাইরে ফেলা হবে না, এবং এর জন্যে বিশেষ করে' একজন লোক রাখা হল। তার নাম হচ্ছে হুঁশিয়ার সিং, তাই মাইনে হল সাড়ে ন'টাকা এবং সে দিনরাত্রি একটা খাটিয়ার উপর ঘুমোয় প্রেসের সাম্‌নে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

চীন দেশে চুরিচামারির শাস্তিই হচ্ছে গলায় মস্ত ভারি একটা কাঠের চাকা পরিয়ে রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়ান। এই চাকাটার সর্‌কারী নাম হচ্ছে ক্যাং। একদিন এক জন চীনাকে এই ক্যাং গলায় দিয়ে রাস্তায় বেড়াতে দেখে তার বন্ধু জিজ্ঞাসা কর্‌লে—"ব্যাপার কি?" সে বল্‌লে—"আরে ভাই, রাস্তায় এক গাছা দড়ি পড়েছিল তাই কুড়িয়ে নেওয়াতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছি।" বন্ধুটি তার ডবল পয়সার মতন গোল গোল দুটি চোখ বিস্ফারিত করে' বল্‌লে—"দেশ দিন দিন অরাজক হল দেখ্‌ছি—দড়ি নেওয়াতেহ এত কঠিন শাস্তি!" চীনা বল্‌লে—"তা ঠিক নয়, তবে দড়িটার একধারে একটা বলদও বাঁধা ছিল কি না।"

শ্রী বীরেশ্বর বাগছী

মুক্তিপ্লাবন

ওমরের খুব নাম-ডাক শুনে গ্রীসের রাজা তাঁর বার্ত্তা নিতে সভা হতে দূত পাঠিয়েছেন। ওমরের সন্ধানে দূত এসে হাজির। রাজপ্রাসাদ নেই, শাস্ত্রী নেই, পুরজনের কলরব নেই; আছে কেবল বিধবাবেশে অসীমপ্রসারিণী মরুস্থলী ও তার মাঝে মাঝে খোর্ম্মা-গাছ। রাজসদনের চিহ্নই যখন চোখে পড়্‌ল না, তখন বার্ত্তাহর একজন পথের মেয়েকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওগো বাছা, ওমর খলিফার ভবন কোথা?" মেয়েটি বল্‌ল, "তিনি তো মাঠে ঐ খোর্ম্মা-তলায় শুয়ে রয়েছেন।" কথা শুনে দূত তো কিছুই ঠাওর কর্‌তে পার্‌লেন না, ভাব্‌লেন, মেয়েটি বুঝিবা ঠাট্টা কর্‌ল। যা হোক তিনি ঐ গাছটির দিকেই চল্‌লেন। খানিকদূর যেতেই দেখেন, গাছতলাতে চেটাইয়ের উপর কে যেন শুয়ে আছে; গায়ে তাঁর ছেঁড়া তালি-দেওয়া কাপড়—ফকীরের বেশ; কিছুতেই তাঁর মনে নিচ্ছে না যে ঐ দর্‌বেশই ওমর খলিফ। তখনও ওমর ঘুমিয়ে আছেন, মূর্ত্তির সে দীনতা ভেদ করে' কি এক অসামান্য তেজ ফুটে বা'র হচ্ছিল, তাতে তাঁর মত বড় বড় রাজসভাচারী দূতরাজকেও অভিভূত করে' ফেল্‌ল। এমন সময়ে ঘুম থেকে উঠে ওমর নিজ পরিচয় দিলে তাঁর সন্দেহ অপনোদন হ'ল; সামান্যক্ষণ আলাপেই দূত বুঝ্‌তে পার্‌লেন কেন সেই দীনতার অবতার সর্ব্বসাধারণের হৃদয়জয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। দরিদ্রাদপি দরিদ্র প্রজার সাথে সমান জীবন কাটিয়ে ভগবানের চরণে ব্যক্তিগত পার্থিব বাসনা সঁপে' দিয়ে ইস্‌লামমণি ওমর খলিফ ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের মন্ত্রে গণতন্ত্রের জীবন্ত মহান্ আদর্শ রেখে গিয়েছেন।

পৃথিবীর আর-এক ধারে আর-এক সময়ে এই-রকম আর-একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এক দুপুর রাতে গণতন্ত্রের অগ্রদূত আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সুসন্তান এব্রাহাম লিন্‌কল্‌ন্ প্রেসিডেণ্টের ঘরে নিদ্রিত; এক বৃদ্ধা সে রাতে বিপদে পড়েছে, সে সেই অসময়ে আবেদন নিয়ে প্রেসিডেণ্টের ঘরে এসে হাজির। তিনি তখনই উঠে বৃদ্ধার বিপদুদ্ধারের ব্যবস্থা করে' দিলেন। লিন্‌কল্‌ন্ বড় পদ পেয়েও আত্মবিস্মৃত হননি; তিনি তাঁর কাজ ও চরিত্রের দ্বারা রাজকীয় ক্ষমতার বর্ম্ম ভেদ করে' আমেরিকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আপনার জন হয়েছিলেন; যিনি আমেরিকার বিশাল যুক্তরাজ্যের সভাপতি বা কর্ণধার হয়েও নিজেকে জনসাধারণেরই একজন, আর কাজে চিন্তায় ও কথায় নিজেকে সাধারণের সামান্য ভৃত্য জ্ঞান করে' গৌরব অনুভব কর্‌তেন, সেই নরদেবতার চরিত্রগরিমায় ক্ষমতার সিংহাসনে আরূঢ় পশুবলদৃপ্ত কোন্ মানুষের না উচ্চশির স্বতঃই নত হয়?

সমাজজীবনেই বা কি, ব্যক্তির জীবনেই বা কি, আত্মা যতক্ষণ নিজেই নিজের প্রভু হতে না পার্‌ছে, ততক্ষণ তার শান্তি কোথায়? গণতন্ত্র বা Democracy জাতির ও সমাজের সর্ব্বাঙ্গে মুক্তি দেওয়ার একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা-মূলক প্রয়াস; সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে একটা অধ্যাত্ম আদর্শের দিকে সমাজকে চালানর প্রয়াস মানব-ইতিহাসে সেদিন সুরু হয়েছে মাত্র। গণতন্ত্রই যে সমাজের সকল রোগের ঔষধ, সকল-দুঃখ-অপহারী, এটা আশা করা অন্ততঃ এর বর্ত্তমান অবস্থাতে অন্যায়; গণতন্ত্রের মহান্ উদ্দেশ্য এখনও সকল জায়গায় সফল হয় নি; তাই বলে' যে এর ভবিষ্যৎ চিত্র আঁধারময় তা বলা বাতুলতামাত্র; সফলতা-বিফলতার মধ্য দিয়েই শেষ বিজয় খুবই সম্ভব ইহারই। প্রাচীন আথেনীয় (গ্রীক) বা আজ পর্য্যন্ত সুইজার্‌ল্যাণ্ডে প্রচলিত গণতন্ত্র (Direct Democracy) হ'তে আরম্ভ করে' (Executive) শাসনপরিষদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ও খর্ব্ব কর্‌তে নিত্য-উপায়-উদ্ভাবনশীল নব প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বা Representative Democracy (যার আদর্শ হ'ল ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্র) পর্য্যন্ত সবই সেই প্রয়াসের ইতিহাস।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের উপর অধুনা সাধারণের আস্থা কমে' আস্‌ছে; কারণ প্রতিনিধিরা জাতির সাধারণ ইচ্ছাকে কার্য্যে ঠিক পরিণত কর্‌তে পারেন না; অনেক

সময়ে তাঁদের কাজ জাতির সাধারণ ইচ্ছার বিপরীতগামী হতেও দেখা যায়। সুইজার্‌ল্যাণ্ডের সিধা গণতন্ত্রকে সেজন্য আজকাল অনেকে আদর করছেন। সে দেশ ছোট ছোট ক্যাণ্টনে বিভক্ত। এই ক্যাণ্টন্‌গুলিতে মাত্র একটি করে' জনসভা আছে, হাউস্ অব্ লর্ড্‌সের মত দ্বিতীয় কোন সভা নেই। তবে সখ্যবন্ধে সকল ক্যাণ্টনের কেন্দ্র-স্থানীয় একটি দ্বিতীয় সিনেট সভাও আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট ক্যাণ্টনের লোকেরা প্রকৃতির কোন একটি রম্যস্থানে সকলে সমবেত হয়ে বিরাট্ সভা করে' তাতে কোন নূতন আইন তৈয়ারীর প্রস্তাবের জন্য আবেদন করে; একে বলে "ইনিশিয়েটিভ্"; আর দেশের গভর্ণ্‌মেণ্টের গঠন বা Constitution সম্বন্ধে কোন বদল করতে হলে সমগ্র দেশের জনমণ্ডলীর অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব তুল্‌তে হয়; এ'কে বলে রেফারেণ্ডাম্; আর সর্ব্বসাধারণে একত্র মিলে রাজ্যসংক্রান্ত কোন বিষয়ে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বা মন্ত্রীগণ কোন্ নীতির অনুসরণ করবেন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করাকে "প্লেবিসাইট্" বলে। রাজ্যসম্পর্কীয় ব্যাপারে প্রতিনিধির সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই মতামত প্রকাশ করাতে বিশেষ অসুবিধা হয় না যদি সমগ্র দেশকে এক-একটি ছোট গণ্ডীতে পরিণত করা যায় ও প্রতি গণ্ডীতে একই সময়ে সভার ব্যবস্থা হয়।

এখন প্রাচীন এথেন্স্ ও আধুনিক সুইজার্‌ল্যাণ্ডের দুই-রকমের সিধা গণতন্ত্রের কথা বলি। এ দুটিকে গণতন্ত্রের নিখুঁত আদর্শ বলে' ধরা হয়। এদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এই যে আথেনীয় বা গ্রীক গণতন্ত্রে শান্তি-স্থাপন, যুদ্ধঘোষণা, নৌবিভাগ ও সেনা-রক্ষা, উপনিবেশ সম্পর্কীয় ও আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ বিষয় জনসভায় নিষ্পত্তি হত, আইন তৈয়ারীতে সাধারণ সভার হাত ছিল না। কিন্তু সুইস্ গণতন্ত্রে ঠিক তার উন্টা; আইন প্রণয়নাদি সকলের সমবেত সভাতে হয়; পক্ষান্তরে রাজকার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে জনসাধারণের প্রভাব তাদৃশ লক্ষিত হয় না—কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে আর আর জনতন্ত্র-শাসিত দেশের কর্ম্মচারী হতে বিভিন্ন ও অধিকতর স্বাধীন। প্রত্যেক গভর্ণ্‌মেণ্টেরই তার মূলনীতির বিপক্ষে অবস্থিত অন্য প্রভাবের দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হওয়া তার স্থায়িত্বের পক্ষে মঙ্গলজনক, এতে অনুসৃত মূলনীতির মাত্রা অতিরিক্ত হতে পায় না; যেমন জনতন্ত্রমূলক শাসনের সঙ্গে আম্‌লা-তন্ত্রের কিঞ্চিৎ সংমিশ্রণ থাকাতে সুইস্ গণতন্ত্রে সমতা রক্ষিত হয়েছে। সুইস্ গণতন্ত্রের পরস্পরবিরোধী নীতির সমন্বয় সাধন ছাড়া তার সফলতার আরও অনেক কারণ আছে; দেশটা ছোট, আর সেই-রকম ছোট ছোট দেশের পক্ষে গণতন্ত্র ভাল; বড় বড় দেশের পক্ষে গণতন্ত্র সফল করতে হলে সেখানে রাষ্ট্রসখ্য নীতির (federal principle) অনুসরণ করতে হয়।

ম্যাকিয়াভেলি, রুসো প্রভৃতির মতে বড় বড় দেশের পক্ষে রাজতন্ত্র শাসনই প্রশস্ত; কিন্তু আমরা বলি সেখানে সখ্যবন্ধের প্রয়োগে গণতন্ত্র শাসনও বেশ চালান যেতে পারে; এ নিয়মে সমগ্র দেশকে কতকগুলি ষ্টেটে ভাগ করে' নিয়ে প্রতি ষ্টেট্ জনতন্ত্র-শাসিত করতে হয়; ষ্টেট্‌গুলি সখ্যবন্ধ বা federationএর অন্তর্ভূত থাকে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থা।

একতাই বল; এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সখ্যবন্ধ-প্রণালী। সখ্যবন্ধ বা federationএর নিয়ম হচ্ছে এই যে কেন্দ্র, central বা federal গভর্ণ্‌মেণ্টের হাতে যুদ্ধ-ঘোষণা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, দেশরক্ষা, সন্ধি প্রভৃতির মত সমগ্র-দেশ-সম্পর্কীয় ব্যাপার পরিচালনার ক্ষমতা রাখা হয়; আর স্থানীয়, local বা state গভর্ণ্‌মেণ্টের উপর বাকী অনেক মোটা স্থানীয় বিষয় সম্পর্কের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়; এতে স্থানীয় বা local গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌গুলি প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তাতে কাজও ভাল হয় কেন্দ্র বা central গভর্ণ্‌মেণ্টের কাজ তাদের মধ্যে লাগাম ধরে' বসে' থাকা ও বিদেশের সঙ্গে কার্‌বার রাখা। সখ্যবন্ধ প্রণালীতে ষ্টেট্‌গুলির উপর বেশী ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়; যে পর্য্যন্ত না তারা অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করে সে পর্য্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যে স্বাধীন। এই ষ্টেট্‌গুলিতে প্রতিনিধিতন্ত্র আইনসভা, মন্ত্রীসভা ও মন্ত্রীসভার শিরঃস্থানীয় কার্য্যাধ্যক্ষ, গভর্ণর বা সভাপতি থাকেন, অর্থাৎ ষ্টেট্ গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌গুলিতে এক-একটা স্বতন্ত্র গণতন্ত্রমূলক রাজ্যের সকল রকম আনুষঙ্গিক জিনিস

ও আস্‌বাব থাকে। সমস্ত ষ্টেটের প্রতিনিধি মিলে কেন্দ্র-গভর্ণ্‌মেণ্টের আইনসভা অর্থাৎ মন্ত্রীসভা ও সভাপতি নির্ব্বাচন করে। সভাপতি রাজ্যের কর্ম্মচারীদের পাণ্ডা; যদিও তিনি ও মন্ত্রীরা জনপ্রতিনিধিদের মধ্য হ'তেই গৃহীত, তথাপি তাঁরা চাকরীজীবী কর্ম্মচারী নন। মার্কিন্ যুক্ত-রাজ্যের ব্যাপার প্রায় এই রকমই। কিন্তু কানাডার একটু বিশেষত্ব আছে; সেখানে ষ্টেট্ গভর্ণ্‌মেণ্ট্, কেন্দ্র বা central গভর্ণ্‌মেণ্ট্, আইনসভা মন্ত্রীসভা প্রভৃতি সকলই আছে, কেন্দ্র-গভর্ণ্‌মেণ্টে প্রধান মন্ত্রীও আছেন; কিন্তু কানাডা তো যুক্তরাজ্যের মত একেবারে মুক্ত নয়, তাই সেখানকার রাষ্ট্রের উপরে ব্রিটিশ আধিপত্যের নিদর্শনরূপে, কার্য্যতঃ অধিকন্তু, একজন ব্রিটিশ গভর্ণর থাকেন; ইনি বিশেষ কিছু ক্ষমতা পরিচালন করেন না। সম্প্রতি কানাডাকে আরও একটু স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়েছে; কানাডা যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য-সন্ধি করেছে। তা ছাড়া ব্রিটিশ গভর্ণর কানাডার পার্লামেণ্টের গ্রহণীয় হওয়াও চাই, এমন কথাও উঠেছে। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রজাতন্ত্রেও ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি জনসভার কাজে বাধা দেন না, বা জনসভাতে পাশ-করা কোন আইন তাঁর ভেটো বা নাকচ করার ক্ষমতা থাকলেও তিনি সে ক্ষমতা পরিচালন করেন না, বা করতে সাহস পান না। আর আমাদের শাসন-সংস্কারের ভারতে গভর্ণর জেনারেলের ভেটো করার ক্ষমতা এমনই অবাধ ও অপ্রতিহত যে এটা যখন-তখন সম্মিলিত জনমতকে অগ্রাহ্য করে' কোন নূতন আইন পাশ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাকচ করতে পারে। সেদিন লবণশুল্কের অতিবৃদ্ধির বিষয়ে এটা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। (এই উপনিবেশ-গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌গুলির অর্দ্ধ-নিজস্ব নিশান আছে; নিশানে ব্রিটিশ "ইউনিয়ান্ জ্যাক্" ও তার কোলে ঔপনিবেশিক স্বাধীন পতাকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এখানে এটা উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-শাসন-সংস্কারে ভারতের জন্য এরূপ কোন নিশানের প্রস্তাব নাই)।

প্রজাতন্ত্র গভর্ণ্‌মেণ্টের জননী বিলাতের গভর্ণ্‌মেণ্টের গড়ন (constitution) বিষয়ে অনেক কথা বলার আছে; তার আলোচনার স্থান এখানে হবে না। তবে গভর্ণ্‌মেণ্টের সর্ব্বেসর্ব্বা পার্লামেণ্ট্ মহাসভার কথা একটু বল্‌ব। হাউস্ অব কমন্স্ ও হাউস্ অব্ লর্ড্‌স্ এই দুইএ মিলিয়ে পার্লামেণ্ট্ বলা হয়; এরাই আইনের কর্ত্তা। কিন্তু সাধারণতঃ পার্লামেণ্ট্ বল্‌তে লোকে হাউস্ অব্ কমন্স্ ও সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের সভাই বুঝে। অভিজাত সম্প্রদায় বা লর্ড্‌স্‌দের সভাকে হাউস্ অব্ লর্ড্‌স্ বলে। কমন্স্ সভায় সাত শতেরও বেশী সভ্য আছে। সারা দেশটা হতে সভ্য নির্ব্বাচন করে' পাঠান হলে কমন্স্ সভায় যে দলের জনবল বেশী দেখা যায় সেই দলের থেকে সকলের চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিকে ডেকে রাজা প্রধানমন্ত্রীত্ব দেন। প্রধান মন্ত্রী নিজের সহকর্ম্মী অন্যান্য বিভাগীয় মন্ত্রীদের নাম রাজসদনে প্রস্তাব করলে সেইমত নিয়োগ হয়। প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর পারিষদেরা রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকরী সভা (cabinet বা executive) গঠন করেন। তিনি ও তাঁর সভা কমন্স্ সভার কাছে দায়ী; মন্ত্রীরা সেখানে দলে পুষ্ট; অন্যান্য দলের লোক সাধারণতঃ আর-একটা দল পাকিয়ে মন্ত্রীদলের কাজের সমালোচনা করে; এই সমালোচনা রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ আবশ্যক। সমালোচনার দলকে গভর্ণ্‌মেণ্টের অপোজিশান্ বা প্রতিপক্ষ বলে।

পার্লামেণ্টে সভ্যেরা কোন নূতন আইনের প্রস্তাব করতে চাইলে সেটা বিলের আকারে কমন্সে তিনবার পড়তে হয়। প্রথম দুবার পড়া হ'লে প্রস্তাবটি সমস্ত হাউস্ অব্ কমন্স্‌কে কমিটিতে পরিণত করে' সেখানে তার এক-এক অংশ ধরে' আলোচনা ছাঁটকাট করা হয় ও ভোটে গ্রাহ্য হলে পর গ্রহণ করা হয়। তার পর একদিন ঐ বিল সমস্ত হাউস্ অব্ কমন্সের বিবেচনাধীন থাকে। বিবেচনার শেষে উহা আবার তিনবার কমন্সে পড়া হয়। এর পর বিল লর্ড্‌সে যায়; সেখানে সর্ব্বসমেত তিনবার পড়ার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন না হলে রাজকীয় অনুমোদনে আইনে পরিণত হয়। কিন্তু লর্ড্‌স্ সভা কোন পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করলে বিল কমন্সে ফিরে যায়। তখন তার পুনর্বিবেচনা আরম্ভ হয়। অনেক সময়ে কমন্সে দুবার বিল পড়া হলে সমস্ত হাউসের কমিটিতে তাকে ফেলা

হয় না; কমন্সের অনেকগুলি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে; সেগুলি মন্ত্রীদের পক্ষীয় ও সমালোচনাকারী প্রতিপক্ষের লোক নিয়ে গড়া। এ ব্যবস্থাতে হাউস্ একই সময়ে অনেকগুলি কমিটিতে ভাগ হয়ে অনেক কাজ করতে পারেন; এতে সময় সংক্ষেপ হয়। পার্লামেণ্টে বাজেট্ আলোচনা ও টাকা সরবরাহ ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিরা বিভাগীয় মন্ত্রীদের উপর বেশ একটু কর্ত্তৃত্ব করার অবসর পান।

গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র তিনটি—সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা—অধ্যাত্মরসে সিঞ্চিত হলেই প্রাণময় হয়ে উঠে। আধ্যাত্মিক জীবন তথা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেই এগুলির সার্থকতা হয়, প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র এযাবৎ যন্ত্র বা পদ্ধতির গণ্ডীর মধ্যে বেশী আবদ্ধ হয়ে পড়াতে, তার আবিষ্কারের দিকেই বেশী ঝোঁকাতে তেমন বিকশিত হতে পারছে না। আর এক কালে প্রাচীতে দরবেশী গণতন্ত্রের মন্ত্র মুসলমানের কাজে ও জীবনে প্রথম কয়েক দিনের জন্য জয়যুক্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে ও পরবর্ত্তী সময়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ব্যক্তিগত স্বার্থে কলুষিত হওয়াতে তা স্থায়ী হতে পারে নি। সুতরাং ভাবকে ধরে' রাখতে হ'লে তার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও যন্ত্র-পদ্ধতিরও বিশেষ রকম দরকার আছে। তবে সাফল্য বিষয়ে এ দুএরই বিকাশে সামঞ্জস্য থাকার দরকার; কোনটিই আরটিকে অবহেলা করে' আগুয়ান হ'তে পারে না।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মানে রাজশক্তিকে নষ্ট করা নয়; এর মানে হচ্ছে এই যে প্রকৃত রাজ-ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় রাজকার্য্যনির্ব্বাহকদের (executive) হাত হতে জন-সাধারণের হাতে নেওয়া; অবশ্য রাজক্ষমতা জনসাধারণের করতলগত হলে executiveএর যে কাজ থাকবে না তা নয়, executive কর্ম্মচারীরা তখন জনসাধারণের ছন্দানুবর্ত্তন করবেন অর্থাৎ সাধারণের প্রভুভাবে না চলে' ভৃত্য-ভাবে চলবেন। Executiveএর যথেচ্ছ ক্ষমতা খর্ব্ব করা সম্ভব হয় কখন? সকলে মিলে যখন দেশের ও কড়ি রাজস্বের আদায়ে ও ব্যয়ে বেশ একটু কর্ত্তৃত্ব করতে পায়, তখনই গণতন্ত্র খানিকটা সম্ভব হয়। এই অমোঘ অস্ত্র তাদের হাতে থাকতে executive বেশী প্রভুত্ব পেতে পারে না। সমগ্র একটা দেশের লোকসংখ্যা খুব বেশী, এ কারণে ও অন্য কারণে সকলেই কর্ত্তৃত্বের অধিকার প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করতে পায় না। পছন্দসই প্রতিনিধি নিজেদের মধ্যে থেকে মনোনীত করে' তাঁরা তাঁদের সাধারণ ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করেন; যোগ্য প্রতিনিধিরা তাঁদের সভায় বসে' আইনকানুন তৈরী ও টাকাকড়ি খরচের ব্যবস্থাদি করেন। রেলওয়ে, ষ্টীমার-লাইন, নৌবিভাগ, সেনাবিভাগ প্রভৃতির উপর সাধারণের কর্ত্তৃত্ব না থাকলে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলি অবাধ হতে পায় না; চাঁদপুরের গুলির ব্যাপারে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হয়েছিল। জাতি তার চরিত্রে চিন্তায় ও চলাফেরায় মুক্ত হ'তে না পারলে স্বাধীনতা প্রকাশের কোন বাহ্যযন্ত্র, এখানে গণতন্ত্র-শাসন, জাতিকে মুক্তি দিতে পারে না; যন্ত্র কতকটা এ পথের সহায় বটে, কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাসলব্ধ বন্ধন বা মুক্তিই ফলাফল নির্ণয়ে বেশী প্রভাবশালী; তাই গণতন্ত্রের উদ্বোধনে দাসসুলভ বুদ্ধি ও চিন্তায় প্রাথমিক স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতালাভ আবশ্যক; পরে সেই স্বাতন্ত্র্য বাস্তবের মধ্যে প্রাণবান্ হয়ে, সত্য হয়ে, রাজনৈতিক সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ফুটে ওঠে। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, বক্তৃতা ও সভাসমিতি করার বিষয়ে স্বাধীনতা প্রভৃতিকে আমরা গণতন্ত্রের দান না বলে' তার সহায়ক বলব; এগুলির আরম্ভ ইংল্যাণ্ডে অভিজাত-সম্প্রদায় বা লর্ড্‌দের প্রভাবকালে; তা হ'লেও এগুলি বিনা গণতন্ত্রের মন্ত্র পূর্ণবিকাশ লাভ করে না। এখানে বিলাতের Habeas Corpus Actএর কথা একটু বলি। Executive বা শাসন-পরিষৎ যে-কোন ব্যক্তিকে উপযুক্ত কারণ বিনা আটক করলে, এই নিয়ম অনুসারে বিচারক Habeas Corpus Writ বা'র করে' তাকে খালাস করতে পারেন। বিলাতে এই আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য কতকটা নিরাপদ্ করা হয়েছে। দেশব্যাপী অরাজকতা প্রভৃতি দুর্বি-

প্রজাসাধারণের কয়টি অতিসাধারণ অধিকার সাময়িক ভাবে লোপ পায়; Reign of Law বা "ধর্ম্মের দ্বারা দেশশাসন" তখন কিছু সময়ের জন্য শিকেয় তোলা থাকে। অরাজকতা হেতু আইনের এই তিরোভাবকে ইংরেজীতে American Civil Liberty নামক পুস্তকের লেখক লিবার্ বলেছেন police rule বা পুলিস-শাসন। তার পর এভাবে martial law বা সামরিক আইন জারি করে' ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ আইনের চোখে সঙ্গত নয় বলে' দুর্ঘটনা ঘটার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে Indemnity Act নামে এক অসাধারণ আইনের আশ্রয় নিতে হয়, এতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারী যথেচ্ছ-ক্ষমতা-পরিচালনকারী কর্ম্মচারীদের কাজ আইনসঙ্গত করে' নেওয়া হয়। যদি ঐ আইন পাশ করা না হয় তা হলে ঐ রাজকর্ম্মচারীরা সাধারণ আইনের আমলে ধরা পড়েন। তাঁদের হাতের জলশুদ্ধি করে' নিতেই এই ব্যবস্থা।

গণতন্ত্রের সার্থকতা শুধু যন্ত্রের নামেতেই শেষ নয়; গণতন্ত্রের সার্থকতা বাস্তবের প্রাণে, জাতীয় চরিত্রে, রাজনৈতিক জীবনে চলাফেরা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। নিজের দেশের রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ জীবনপ্রবাহে বাধা না দিয়ে আত্মা স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী হ'লেই এবং দেশের ও রাজ্যসংক্রান্তবিষয়ে আত্মবোধ হ'লে, আত্মা সাধারণ ইচ্ছার মধ্য দিয়ে কাজে চরিতার্থ ও প্রকটিত হ'লে গণতন্ত্রের অধ্যাত্মতা সফল হয়; আত্মার শুধু বাঁচ্‌লেই হ'ল না, সুখে বাঁচা চাই। প্রতি অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে তার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হোক বা না হোক, তার ব্যক্ত ও মুক্ত থাকার দর্‌কার; নিজ বাসভূমে জাতীয় আত্মা পরবাসী হ'লে, পিঞ্জরাবদ্ধ থাকলে, বাইরের সঙ্গে অর্থাৎ দেশের বাহ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে জীবনের সম্বন্ধে মাখামাখিভাবে পূর্ণবিকশিত হয়ে না উঠ্‌তে পার্‌লে, সেগুলির সাথে তার আপনা-আপনির ভাবনা জাগ্‌লে গণতন্ত্রের বড়াই করা চলে না; এমন প্রাণহীন জিনিস চাঁদের আলোয় জলভ্রমের মত।

ভারত-শাসন-সংস্কারে আমাদের রাজনৈতিক অধিকার কি ও কতটুকু এখন তার একটু আলোচনা করি। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট্ তারিখে পার্লামেন্টে মাননীয় মণ্টেগু সাহেব ব্রিটিশরাজের পক্ষ হতে ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশভারতকে সাম্রাজ্যের অঙ্গবিশেষ বলে' গণ্য রেখে ক্রমে তাকে প্রজাসাধারণের কাছে দায়িত্ব-মূলক শাসনপ্রণালী দেওয়াই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম লক্ষ্য। এই ঘোষণা অনুসারে প্রথমে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট্‌গুলিকে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হয়; ক্রমে সেগুলিকে পূরাপূরি স্বায়ত্তশাসিত করে' ষ্টেট্‌-গভর্ণ্‌মেণ্টের মত করাই উদ্দেশ্য; আপাততঃ প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট্‌গুলিতে আধা-ব্রিটিশ আধা-দেশীয় করে' কাজ আরম্ভ হয়েছে।

ব্রিটিশ আধখানা—গভর্ণর ও তাঁর শাসন-পরিষৎ (executive council) দ্বারা গঠিত; তিনি ভারত-সচিবের (Secretary of State) মধ্য দিয়ে বিলাতের পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী। আর দেশীয় আধখানা—দেশীয় জনমন্ত্রীদের দ্বারা গঠিত; আইন-সভ্যদের মধ্য হতে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোক বেছে নিয়ে মন্ত্রীসভা গড়া হয়। আইন-সভার সভ্যেরা আবার তাঁদের নির্ব্বাচক জনসাধারণের বা ভোটার্‌দের এক-একটা নির্ব্বাচন-গণ্ডী বা electorate হতে প্রেরিত প্রতিনিধি। তাঁরা এই ভাবে সভাতে তাঁদের কাজের জন্য দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি কর্‌তে বাধ্য, নতুবা পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে ভোট পাওয়ার আশা অতি কম থাকে। গভর্ণরের শাসন-পরিষৎ (executive council) আর তার সঙ্গে জোড়াদেওয়া দেশী মন্ত্রীদের সভা—এ দুয়ের মিলনে হ'ল কতকটা শাদাকালোয় হরিহর-মিলন; প্রমথ-বাবুর "দুইয়ার্কী" নামে এই ইঙ্গিত আছে; বিলাতের ক্যাবিনেট্ মন্ত্রীসভা যেমন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা (executive), প্রাদেশিক গভর্ণ্‌মেণ্টে যুগলসভার সভ্যেরা—গভর্ণ্‌মেণ্ট্-পক্ষীয় হোন আর জনসাধারণের লোক হোন—মোটামুটি হিসাবে ক্যাবিনেটের সভ্যদের মত গভর্ণ্‌মেণ্টের মন্ত্রী।

ক্যাবিনেট্-সভ্যের সহকারী সম্পাদক বা আণ্ডার্-সেক্রেটারী আছে; তাঁকে পার্লামেণ্টারী আণ্ডার্-সেক্রেটারী বলা হয়; তিনি ক্যাবিনেট্-মন্ত্রীর দলের লোক ও মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; তিনিও পার্লামেণ্টের

নির্ব্বাচিত সভা ; সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক উদীয়মান রাজনৈতিকরাই এই আণ্ডার্-সেক্রেটারীর পদ পেয়ে থাকেন ; পার্লামেণ্টারী আণ্ডার্-সেক্রেটারীরা 'মিনিষ্ট্রি' নামে আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় মন্ত্রীসভার সভ্য, তবে তাঁরা ক্যাবিনেটের অন্তর্ভূত নন; মিনিষ্ট্রি প্রধানতঃ ক্যাবিনেটের সভ্যদের ও এই শ্রেণীর আণ্ডার্-সেক্রেটারীদের নিয়ে গড়া; ক্যাবিনেটের সভ্যেরা শাসন-নীতি নির্দ্ধারণ করেন, মিনিষ্ট্রির অপর সভ্যেরা সেই নীতি অনুসারে কাজ করেন ; সুতরাং পার্লামেণ্টারী আণ্ডার্-সেক্রেটারীকে বিভাগের কাজকর্ম্মও কিছু দেখ্‌তে শুন্‌তে হয়; কিন্তু তাঁর প্রধান কাজ হ'ল তিনি পার্লামেণ্টের লর্ড্‌স্ বা কমন্স্ যে সভা বা হাউসের সভ্য তাঁর কর্ত্তার (বা ক্যাবিনেট-মন্ত্রীর) হয়ে সেখানে জবাবদিহি করা। আমাদের ভারত-সচিব (Secretary of State) ক্যাবিনেট্ সভার সভ্য; তিনি কমন্সের লোক হলে লর্ড্‌সে বস্‌তে পারেন না। সে-ক্ষেত্রে একজন লর্ড্‌স্ সভার সভ্য তাঁর আণ্ডার্-সেক্রেটারী বা সহকারী হয়ে সেখানে তাঁর বিভাগের জন্য জবাবদিহি করেন। কিন্তু কোন লর্ড্ ভারত-সচিব বা তাঁর সহকারী হলে তিনি দর্‌কার-মত উভয় সভাতেই বল্‌তে পারেন। পার্লামেণ্টারী আণ্ডার্-সেক্রেটারীরা পার্লামেণ্ট্ অর্থাৎ স্থায়ী আণ্ডার্-সেক্রেটারীদের থেকে বিভিন্ন; দ্বিতীয়োক্তরা কোন পার্টি বা দলের লোক নন, সুতরাং মন্ত্রীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এ শ্রেণীর সহকারীদের পদত্যাগ করতে হয় না; এঁরা মন্ত্রীদের অধীনে এক এক বিভাগে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কর্ম্মচারী। ক্যাবিনেটের মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্য পার্লামেণ্ট্ তথা দেশের কাছে দায়ী; কিন্তু গভর্ণ্‌মেণ্টের সাধারণ নীতির জন্য তাঁরা সকলে এক যোগে দায়ী ; দ্বিতীয় প্রকারের দায়িত্ব প্রথাই ক্রমে বাড়্‌তে দেখা যাচ্ছে—সেটা কতকটা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একতা রাখার চেষ্টা হ'তেই জাত।

ভারতের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা বা ক্যাবিনেটে দুরকম সভ্য আছেন, এক রকম হলেন কাউন্সিলার (Executive Councillor) আর এক রকম হলেন জনমন্ত্রী (popular Minister)। প্রথমোক্তরা গভর্ণ্‌মেণ্ট্-পক্ষীয় মন্ত্রী, তাঁদের আমরা পারিষদ্ বল্‌তে পারি। জনমন্ত্রীদের হাতে যে বিভাগগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হ'ল শিক্ষা স্বাস্থ্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পল্লীসমিতি শিল্প ও আবগারী। এগুলিকে হস্তান্তরিত (Transferred) বিষয় বলা হয়েছে। আর গবর্ণ্‌মেণ্টের পারিষদ্‌দের হাতে যে বিষয়গুলি রইল সেগুলি—আইন বিচার পুলিস ও রাজস্ব বিভাগ। এদের রক্ষিত (Reserved) নাম দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক ক্যাবিনেট্ বা যুগল-সভাগুলিতে যদি গভর্ণ্‌মেণ্ট্-পক্ষীয় অংশে বিলাতী পারিষদ্ (Councillor) হন একজন, দেশী পারিষদও হবেন একজন; আর দেশী আধ-খানাতেও মোট পারিষদ্‌দের সংখ্যার 'পাষাণ ভাঙ্‌তে' দুজন জনমন্ত্রী নিয়োগ করার চেষ্টা সাধারণতঃ করা হয়; বর্ত্তমানে বাংলার শাসন পরিষদে (Executive Council) চারজন সভ্য আছেন; এর মধ্যে দুজন ইংরেজ আর দুজন বাঙালী; আর জন-মন্ত্রী তিন জন নেওয়া হয়েছে; গভর্ণর পারিষদ্ ও জনমন্ত্রী-সভা এই দুইএর মাঝামাঝি এবং কার্য্যতঃ উপরে অধিষ্ঠান করছেন।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে রক্ষিত (Reserved) বিষয়ের জন্য গভর্ণর বিলাতের পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী; যদি কোন রক্ষিত বিষয়ে আইন-সভা টাকা মঞ্জুর না করেন বা কমিয়ে দেন আর তাতে যদি ঐ বিভাগের কার্য্য-কুশলতার হানি হওয়ার আশঙ্কা থাকে তো গভর্ণর আইনসভার মতের বিরুদ্ধে টাকা দিতে পারেন। শাসন-সংস্কার আইন বা ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের নির্দ্দেশ অনুসারে এই ক্ষমতা শুধু নামে মাত্র গভর্ণরের নেই, তিনি দর্‌কার বুঝ্‌লে এর রীতিমত ব্যবহার করতে পারেন। বঙ্গীয় আইন-সভার শীতের অধিবেশনগুলির শেষে গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে সভাভঙ্গের ঘোষণাকালে গভর্ণর লর্ড্ রোনাল্‌ড্‌শে সংরক্ষিত পুলিস প্রভৃতি বিভাগে আইন-সভা ২৩ লক্ষ টাকা বাজেটে কমানতে গভর্ণরের ক্ষমতার বিষয়ে দুচার কথা বলেন। অবশ্য জনমন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত বিভাগে সভা টাকা না দিলে মন্ত্রীরা যদি বুঝেন যে ঐ টাকার অভাবে তাঁদের বিভাগের কাজ চালান অসম্ভব হবে, তা হলে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব সভার ঘাড়ে

ফেলে পদত্যাগ কর্‌তে পারেন; সভা হ'তে তখন এমন নূতন মন্ত্রী গৃহীত হবেন যিনি সভার কথামত চল্‌তে ও কাজ চালাতে পার্‌বেন। রক্ষিত বিষয়ে এরূপ সম্ভব নয়, কারণ গভর্ণর সে-সকল বিষয়ে বিলাতে পার্লামেণ্টের কাছে দায়ী, তিনি তো স্থানীয় আইন-সভার কাছে দায়ী নন; তাঁর জনমন্ত্রীদের মত পদত্যাগের কথাই আস্‌তে পারে না। হস্তান্তরিত বিষয়ে তো কথাই নেই, রক্ষিত বিষয়েও আইন-সভার মতকে যতটা বজায় রেখে চলা যায় ততই ভাল ব'লে বোধ হয়। হস্তান্তরিত ও রক্ষিত বিষয়গত তারতম্য কম লক্ষিত হ'লেই মঙ্গল।

মন্ত্রীদের সংখ্যা বাড়ানতে দেশের লোকের আপত্তি দেখা যায়। তাঁদের আপত্তির কারণ ব্যয়বাহুল্যের ভয়। অবশ্য মন্ত্রীরা বেতন কম নিলে বা নামে মাত্র নিলে বর্ত্তমান খরচেই আরও বেশী মন্ত্রীর নিয়োগ চল্‌তে পাবে। শাসন-সংস্কারে কাউন্সিলার, জনমন্ত্রী, সেক্রেটারী প্রভৃতি আস্‌বাবে ব্যয়বাহুল্য অনিবার্য্য। মন্ত্রীর সংখ্যা কম হ'লে ক্ষমতাপ্রিয়তা বা autocracyর প্রশ্রয় পাওয়ার ভয় থাকে। শাসন-পরিষদে (Executive) মন্ত্রী বা সভ্য যত বেশী থাকে ততই ভাল, অবশ্য খুব বেশী আবার ভাল নয়; কারণ অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে। জনতন্ত্র-শাসনে ব্যয়বাহুল্য একটু হয়েই থাকে। সে জনতন্ত্র প্রাণবান্ হ'লে দেশের জন-সাধারণের সঙ্গে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রাণের মিল ঘট্‌লে উভয় পক্ষেরই ভাগ্য এক সূত্রে বাঁধা থাক্‌লে লোকে তার জন্য খরচের বিলাসিতাটা হাস্‌তে হাস্‌তে বইতে পারে। কানাডা প্রভৃতি অন্যান্য স্বশাসিত দেশে মন্ত্রীদের সংখ্যা এখানকার চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তাঁদের বেতন বেশী নয়।

বাংলার আইন-সভায় ১৪১ জন সভ্য নির্দ্ধারিত হয়েছে; তার মধ্যে শতকরা ৭০ জন অর্থাৎ প্রায় শতাবধি নির্ব্বাচিত সভ্য। আইন-সভার সভ্য হিসাবে এখানে বেতনের বন্দোবস্ত নেই; বিলাতে ও কানাডায় তা আছে। ব্রহ্মদেশের শাসন-সংস্কারে আইন-সভাতে শতকরা ৬০ জন নির্ব্বাচিত সভ্য রাখার কথা হয়েছে। বাংলার ন্যায় এত বড় দেশে আইন-সভার জন্য ১৪১ জন সভ্য অত্যন্ত কম; জনসংখ্যাহিসাবে গ্রেট্-ব্রিটেন ও বাংলা প্রায় সমান,—গ্রেট্-ব্রিটেন্ বল্‌তে আয়ার্‌ল্যাণ্ড্‌কেও বুঝায়; আয়ার্‌ল্যাণ্ড্ পৃথক্ হওয়ার আগে গ্রেট্-ব্রিটেনের পার্লামেণ্টের কমন্স্ সভাতে প্রায় সাত শত জন সভ্য ছিল; সেখানে ভোট দেওয়ার অধিকার আমাদের এখানকার চেয়ে অনেক বেশী লোকের আছে; আমাদের এখানে জনসংখ্যার তুলনায় ভোটারের সংখ্যা কম; ভোটারের তুলনায় ব্রিটেন্ ও আমাদের বাংলায় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির অনুপাত কম নয়; বিলাতে ১০,০০০ ভোটারের জন্য একজন সভ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, এখানে ৯০০০ ভোটারের পক্ষে একজন প্রতিনিধি দেওয়া হয়েছে। এখানে মোট ভোটারের সংখ্যা কম থাকাতে প্রতিনিধিও সে অনুপাতে কম; আসল কথা হচ্ছে এই যে ভোটারের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী করা উচিত ছিল। প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী হ'লেই নির্ব্বাচন-ব্যাপার নিয়ে দেশময় বেশী সাড়া পড়ে' যেত আর তাতে প্রথম দফা স্বায়ত্তশাসনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য—যা হচ্ছে জনতন্ত্র-শাসনের মূলতত্ত্ব লোককে শিখিয়ে নেওয়া—অধিকতর সফল হত।

রোড্-সেস্, চৌকীদারী ট্যাক্‌স্ ও মিউনিসিপ্যাল রেটের একটা নির্দ্দিষ্ট হার দেওয়ার উপর ভোটের ক্ষমতা নির্ভর করে। সাত বছরের পুরানো গ্র্যাজুয়েটও ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন। এই ভোট দেওয়ার অধিকার পূর্ব্বোক্ত যে-কোন একটি বিষয় হ'তেই জন্মে; একাধিক বিষয় হ'তে এই অধিকার জন্মালেও একাধিক ভোটের অধিকার হয় না; বাংলায় এক-একটা জেলা ধ'রে এক একটা নির্ব্বাচন-গণ্ডী (electorate) গড়া হয়েছে; জনসংখ্যা অনুসারে মোটামুটি ভাবে এক-এক জেলা হ'তে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি নির্দ্ধারিত হয়েছে। মিণ্টোমর্লি শাসন-সংস্কারে এরকম কিছু ছিল না; সে নিয়মে সাধারণ লোকে পল্লীতে ও সকলে সোজাসুজিভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার পায় নি। তখন কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটি ও ব্যবসায়ী সভা প্রভৃতি

নির্ব্বাচনের অধিকার পেয়েছিল; সে নির্ব্বাচন-ব্যাপার পর্দ্দার আড়ালেই হয়ে যেত, দেশে তার সাড়া পাওয়া যেত না। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার আইনে চাষী শ্রমজীবী ব্যবসায়ী দোকানী অন্যান্য ব্যবসায়ের লোক এবং সহরবাসী ও পল্লীবাসী সকলকে আইন-সভার সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য ভোটের অধিকার পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী দেওয়া হয়েছে। সত্য কথা বল্‌তে গেলে মিণ্টোমর্লি সংস্কারের লক্ষ্য ঠিক গণতন্ত্র শাসনের সূত্রপাত করার দিকে ছিল না। গণতন্ত্রের অত্যাবশ্যক জিনিস নির্ব্বাচন-গণ্ডী (electorate) তখন বাস্তবিক কোন কিছু ছিল না, এখন তা কিছু হয়েছে। এই ইলেক্‌টরেট বা নির্ব্বাচন-গণ্ডী গণতন্ত্রের অট্টালিকার ভিত্তি। এদেশে শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী ও পল্লীবাসী। এদের মধ্যেই নির্ব্বাচন-অধিকারের বহু-প্রসার সমস্যার বিষয় ছিল। লেখাপড়া অনেকেই জানে না, সেজন্য নির্ব্বাচনের অধিকার বা ভোটের ক্ষমতা দিতে লেখাপড়ার কথা ধরা হয় নি। দুদশ জনও যাতে অধিকার পায় সেই মৎলবে আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ খুব কমই ধরা হয়েছে। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী, মুসলমান সম্প্রদায় ও মান্দ্রাজের অব্রাহ্মণদের জন্য বিশেষ নির্ব্বাচন-বিধির প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। সাধারণ নির্ব্বাচন-প্রথায় এই সম্প্রদায়গুলি মনের মত প্রতিনিধি নাও পেতে পারেন—এই আশঙ্কায় এই বিশেষ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গের ব্যবস্থাপক বা আইন-সভাতে এক জন প্রেসিডেণ্ট্ বা সভাপতি শাসন-সংস্কারের প্রথম চার বছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন; এই সভাপতি বিলাতের হাউস্ অব্ কমন্সের স্পিকারের মত; তবে স্পিকার সভ্যদের দ্বারা সভ্যদের মধ্য হতেই নির্ব্বাচিত হন; আমাদের সভার সভাপতি এবারের মত বাইরে হতে গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হলেন; ইনিও বেতনভোগী; চার বছর পরের থেকে সভাপতি সভ্যদের মধ্য থেকে সভ্যদের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হবেন। তাঁদের এই প্রথম দশায় পার্লামেণ্টের কাজ চালানর সম্বন্ধে ভাল-রকম অভিজ্ঞতা ও ধীরতার অভাব হতে পারে—এই আশঙ্কায় যিনি সাবধানতার সঙ্গে কাজ চালাতে পারবেন এমন একজনকে বাইরে হতে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বিলাতে কমন্স্ সভায় স্পিকারের ক্ষমতা সর্ব্বোপরি; বিভাগীয় মন্ত্রীরাও ঐ সভার সভ্য হলেও সভার মধ্যে তাঁরা স্পিকারের কথা শুনতে বাধ্য। আমাদের এখানেও সভাপতির ক্ষমতা বেশীই দেওয়া হয়েছে। এখানে এক ডেপুটী সভাপতি সভ্যগণের মধ্য হতে নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। বিলাতের হাউস্ অব্ কমন্স্ সভা, মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্য যে টাকা চান সে টাকা মঞ্জুর করার আগে, কমিটিতে পরিণত হয়; এই কমিটিতে বাজেট বা দেশের বিভিন্ন বিভাগের খরচের কথা আলোচনা হয়; এ সময় স্পিকার আর সভাপতি থাকেন না, আর-একজনকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হয়; কিন্তু বাংলার আইন-সভায় এ ব্যবস্থা এখনও হয় নি; সভাকে কমিটিতে পরিণত না করে'ই বাজেট আলোচনা হয়। বিলাতে হাউস্ অব্ কমন্স্ই টাকা মঞ্জুর করার কর্ত্তা; বাংলার আইন-সভায় কোন কোন বিষয়ে এই নীতি কতকটা চালানর চেষ্টা হচ্ছে।

ভারত-গভর্ণ্‌মেণ্ট্ যে কয়টা আয়ের বিষয় বাংলা গভর্ণ্‌মেণ্ট্‌কে ছেড়ে দিয়েছেন তাতে বাংলার বার্ষিক ব্যয় চল্‌ছে না; প্রায় দেড় কোটি টাকার স্বল্পতা নিয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। পাটের রাজস্ব শুধু বাংলা হতেই আদায় হয়। এতে আয় প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে টাকাটা ভারত-গভর্ণ্‌মেণ্টের রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত বলে' ধরা হচ্ছে। প্রাদেশিক গভর্ণ্‌মেণ্টে দেশীয় দলের মন্ত্রীদের উপর যে বিভাগগুলির ভার দেওয়া হয়েছে সেগুলির কাজ ভাল চল্‌লে দেশে স্বায়ত্তশাসনের পথ খুলে যায়; মরা জাতির ধড়ে জীবন-সঞ্চার করতে হ'লে নিশ্চয়ই প্রথমে শিক্ষা শিল্প ও স্বাস্থ্যের দিকে ঝোঁক দিতে হয়; বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন পাশ হয়েছে; যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট্‌বোর্ড্ ইচ্ছা করলেই কাজ আরম্ভ করতে পারেন; কিন্তু অর্থাভাব। শিল্পবিভাগেও উন্নতির জন্য রেল্‌ওয়ে, ষ্টীমার প্রভৃতি হাতে থাকার দরকার। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ সুরু হয়েছিল মাত্র। লর্ড্ রোনাল্ড্‌শের চেষ্টায় দেশের মধ্যে দু-একটি ছোট জায়গা বেছে

নিয়ে খাল কাটা ও ডোবা বিল ভরাট করা হচ্ছিল। এসব বিভাগে কাজ কর্‌বার ঢের আছে; কিন্তু টাকার অভাব এদিকে যত বেশী অন্য দিকে তত নয়। বাংলার মোট আয়ের শতকরা ৩৫৲ মাত্র ঐ কয়টি বিভাগের জন্য রাখা হয়েছে। বাকী টাকা পুলিস বিচার প্রভৃতি সংরক্ষিত বিষয়ের জন্য রাখা হয়েছে। যে বিভাগগুলির কার্য্যতৎপরতার উপর শাসন-সংস্কারের সফলতা বেশী নির্ভর কর্‌ছে সেগুলিই বিশেষ অভাবগ্রস্ত; ভারত-গভর্ণমেণ্টের বাজেটেও বেশীর ভাগ টাকা সেনা-বিভাগে দেওয়া হয়েছে। বাংলার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। ঋণ গ্রহণ বা নূতন করস্থাপনের দ্বারা এই অর্থের সংগ্রহ হতে পারে; এক্ষেত্রে ঋণই সমীচীন বোধ হয়, তা অদূর ভবিষ্যতে শোধ হওয়ার আশা আছে।

বাংলার আইন সভায় যে-সকল মন্তব্য বা resolution পাশ হবে টাকাকড়ির অবস্থা বা অন্য কোন কোন বিষয়ে বিবেচনা করে' জনমন্ত্রী বা পারিষদ্ সেগুলি গ্রহণ করতেও পারেন বা নাও পারেন। Reserved বা সংরক্ষিত বিষয়ে পারিষদ্ বা গভর্ণমেণ্ট্‌পক্ষীয় মন্ত্রী মন্তব্য গ্রহণ কর্‌তে যতদূর সম্ভব চেষ্টা কর্‌বেন; অবশ্য transferred বা জনমন্ত্রীর কর্ত্তৃত্বাধীন বিষয়ে মন্তব্য অপেক্ষাকৃত বেশী গৃহীত হবে আশা করা যায়। মন্তব্য গৃহীত হলেও তা কার্য্যে পরিণত করা না-করা টাকার অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে টাকা গভর্ণমেণ্ট্‌কে জনসভার কাছে চাইতে হয়। ঐ বাজেট কিছুদিন আলোচনার বিষয়ীভূত থাকে; আলোচনার সময়ে সভ্যেরা suggestion আকারে কোন কোন বিষয়ে মতামত দিতে পারেন; যেমন তাঁরা বল্‌তে পারেন, অমুক বিষয়ে অত না দিয়ে অত দিলে ভাল হত, ইত্যাদি। কিন্তু এই সময়ে দেওয়া suggestion বা মতামত মন্ত্রীরা অনুসরণ কর্‌তে বাধ্য নন। তবে এর পর যখন বাজেটে এক-একটা বিষয় ধরে' গভর্ণমেণ্ট্ বা মন্ত্রীরা নিজ নিজ বিভাগের জন্য টাকা চান তখন প্রতিনিধিরা ঐ-সব বিষয়ে টাকা মঞ্জুর নাও কর্‌তে পারেন বা কম টাকা মঞ্জুর কর্‌তে পারেন, সুতরাং এই অস্ত্র প্রতিনিধিদের হাতে থাকাতে মন্ত্রী ও পারিষদেরা সভ্যদের মতামত অন্য সময়েও অগ্রাহ্য করার সাহস খুব বেশী পান না। সভ্যেরা এই অর্থমঞ্জুরের বা money-votingএর সময় খরচ কাট্‌তে ও বাদ দিতে পারেন, কিন্তু বাড়াতে পারেন না, কারণ তা হ'লেই টাকাবাড়ানর প্রশ্ন এসে পড়ে। ভারতীয় আইন-সভায় বাজেটের টাকা মঞ্জুর উপলক্ষ্যে মিঃ নর্টন্ বিচার-বিভাগ হতে কিছু টাকা কেটে ঐ-টাকায় দিল্লীতে আইন-সভার সভ্যদের ব্যবহারের জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্ট্-পক্ষের উত্তরে বলা হয় যে মিঃ নর্টনের প্রস্তাবটি গভর্ণমেণ্ট্ পক্ষের কেউ কর্‌তে পারতেন, কিন্তু আর কোন সাধারণ সভ্য পারেন না। একটা নূতন বিষয়ে টাকা দেওয়ার মানেই এই দাঁড়ায় যে ঐ বিষয়ে একেবারে শূন্য টাকা থেকে অতটা বাড়ান বা ঐ বিষয়ে নূতন টাকা চাওয়া; ঐ টাকা চাইতে কেবল মন্ত্রীরাই পারেন।

বিলাতে পার্লামেণ্ট্ সভা বা হাউস অব কমন্সে সকল মন্তব্য পাশ হলেও গৃহীত নাও হতে পারে। Simultaneous Civil Service পরীক্ষার বিল ১৯০৬ সালে কমন্সে পাশ হলেও গৃহীত হয় নি। বাজেট আলোচনার সময়ে টাকা মঞ্জুরের জন্য ভোট লওয়ার আগে সমস্ত হাউস কমিটিতে পরিণত হয়,—পরামর্শমূলক আলোচনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা। আমাদের প্রাদেশিক সভা ও ভারত-গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভাতেও টাকা মঞ্জুরের জন্য ভোটের ক্ষমতা সভ্যদের দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সভাতে এই ক্ষমতা সংরক্ষিত বিষয়ে রাজ্যরক্ষা শান্তিরক্ষা প্রভৃতির খাতিরে কতকটা সীমাবদ্ধ, জনমন্ত্রীদের হাতে ন্যস্ত বিষয়ে ততটা সীমাবদ্ধ নয়। প্রাদেশিক সংরক্ষিত বিষয়ে টাকা মঞ্জুরের যে ক্ষমতা সভ্যদের আছে সেই-রকম ক্ষমতা ভারতীয় আইন-সভাকে দেওয়া হয়েছে। প্রাদেশিক সভার জন্য সভ্যদের মধ্যে থেকে গড়া একটি হিসাব-পর্য্যবেক্ষক-সমিতি মঞ্জুর-করা অর্থের যথাযথ প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি রাখেন।

একটা সাধারণ তহবিল হতে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত

বিষয়ে টাকা খরচ করা হবে। প্রতি বছর গভর্ণমেণ্ট্-পক্ষীয় ও জনপক্ষীয় মন্ত্রীরা যুক্ত অধিবেশনে পরামর্শ করে' ঐ টাকা ভাগ করে' নেবেন। জনসাধারণের মন্ত্রী ও গভর্ণমেণ্টের পারিষদ্—এ দুইএর পদমর্য্যাদা সমান হবে। তবে জনমন্ত্রীদের বেতন-নির্দ্ধারণ আইন-সভা হ'তে হবে; গভর্ণরের বেতন একটা consolidated fund বা পাকা তহবিলের অন্তর্গত থাক্‌বে; তাতে আইন-সভা হাত দিতে পারবেন না। বাজেট আইন-সভায় পাশ হয়ে গেলে গভর্ণর ও তার পর ভারত-সচিব (Secretary of State) অনুমোদন কর্‌লে Ordinance-এর দ্বারা পাশ হ'তে পারবে।

যদি গভর্ণর জনমন্ত্রীর কথা না শুনেন তো মন্ত্রী পদত্যাগ কর্‌তে পারেন বা পদে থাক্‌তেও পারেন। যদি তিনি পদ না ছাড়েন তো সেটা আইন-সভার সভ্যেরা পছন্দ না কর্‌লে অনেক উপায়ে তাঁরা তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য কর্‌তে পারেন। এটা নিতান্ত কম ক্ষমতা নয়। দেশের পক্ষে হিতকরী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আইন জনপ্রতিনিধিরাই সভাতে পাশ কর্‌বেন; তাঁরা তা না কর্‌লে দেশের লোকের আস্থা হারাবেন ও পরবারের নির্ব্বাচনে তাঁদের উপযুক্ত ভোট না পাওয়ারই সম্ভাবনা।

ভারত-গভর্ণমেণ্ট্ আপাততঃ কেবল পার্লামেণ্টের কাছেই দায়ী; জনসাধারণের কাছে দায়িত্ব বলে' কোন কিছু তাদের নেই; সুতরাং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট্-গুলির মত এখানে দু-শরিক হয় নি; জনসাধারণের আধা অংশ ও ব্রিটিশ-রাজের আধা ভাগ—এ ভাবে ভারত-গভর্ণমেণ্ট্‌কে এখনও ভাগা দেওয়া হয় নি। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে অনেক বিষয় ছেড়ে দেওয়াতে ভারত-গভর্ণমেণ্টের হাতে যা বাকী আছে তা সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দুভাগে ভাগ না কর্‌লেও চলে এই বিবেচনায় প্রাদেশিক নীতি এখানে অনুসৃত হয় নি। ভাইসরয়ের বা বড়লাটের পরিষদে (Executive Councilএ) তিনজন সরকারী ও তিনজন বেসরকারী দেশী সভ্য আছেন।

ভারতীয় আইন-সভা এখন হ'তে বরাবর জনসাধারণের নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারা গঠিত হবে। Indirect Election বা পরোক্ষ নির্ব্বাচনের সাহায্যে প্রাদেশিক সভান্তর হ'তে প্রতিনিধি নিয়ে গড়া হবে না। এ ব্যবস্থা ভাল। এখানে নিম্নসভায় ১৪৪ জন সভ্যের মধ্যে ১০৩ জন নির্ব্বাচিত সভ্য আর মনোনীত সভ্যের এক তৃতীয়াংশ বেসরকারী সভ্য, হওয়া চাই। এই সভার সভাপতি এখন বড়লাট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। আর এক বছর পরে সভ্যগণই তাঁদের মধ্যে থেকে সভাপতি নির্ব্বাচন কর্‌বেন। আর ভারতীয় আইন-সভার উপরিতন সভা হ'ল কতকটা বিলাতের লর্ড্‌স্ সভার মত। এর নাম কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্। এখানে ৬০ জন সভ্য থাকেন; তার মধ্যে ৩৩ জন নির্ব্বাচিত ও ২৭ জন মনোনীত; এই ২৭ জনের মধ্যে ২০ জনের বেশী সরকারী সভ্য থাক্‌তে পারেন না। এখানে বড়লাট সভাপতিত্ব কর্‌তে পারেন না। এই সভাতেও নির্ব্বাচন-নীতি চালান হয়েছে; তা লর্ড্‌সে নেই, সেখানে মাত্র কয়েকজন আইরিশ ও স্কচ্ পিয়ার্ বা লর্ড্ অভিজাত বা লর্ড্‌দের মধ্য হ'তে গৃহীত হন। উচ্চ ও নিম্ন আইন-সভার এ দুটি ভাগ থাকাতে কতকগুলি সুবিধাও আছে। তার মধ্যে একটি সুবিধা এই যে একটি মাত্র সভা হর্ত্তা কর্ত্তা হ'লে তাড়াতাড়ি আইন পাশ হওয়ার যে ভয় থাকে আইন গৃহীত হওয়ার আগে পর পর দুটি সভায় আইন পাশ হওয়ার নিয়ম থাকাতে একটু ধীরতার সঙ্গে সকল দিক্ ভেবে কোন একটা নূতন আইন তৈয়ার হওয়ার বা নূতন কিছু পরিবর্ত্তনের সম্ভব হয়।

নিম্ন ও উচ্চ সভা কোন আইন পাশ কর্‌লে তা বড়লাটের অনুমত হ'লে গৃহীত হয়। এই দুই সভাই বাজেট আলোচনা কর্‌তে পারেন। নিম্ন সভাকে বাজেট আলোচনার পর টাকা মঞ্জুরের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; উচ্চ সভাকে তা দেওয়া হয় নি; নিম্ন সভা কোন বিষয়ে টাকা দিতেও পারেন নাও পারেন। এ বিষয়ে তার ক্ষমতা কতকটা হাউস অব্ কমন্সের মত। রাজ্যসংক্রান্ত ঋণের সুদ্ বেতন পেন্‌শান রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি কতকগুলি রক্ষিত (reserved) বিষয় ছাড়া আইন-সভা অন্য সকল বিষয়ে ভোট দিতে পারেন।

ভারত-গভর্ণমেণ্ট্ তথা ভাইস্‌রয় ভারত-সচিব বা Secretary of Stateএর কাছে দায়ী। তাঁরা ভারতের জনসাধারণের কাছে দায়ী নন, পূর্ব্বেই বলেছি। ভারত-সচিব বিলাতের পার্লামেণ্ট্ মহাসভা তথা বিলাতের জনসাধারণের কাছে দায়ী; তাঁর সভার নাম ইণ্ডিয়া কাউন্সিল। এই সভা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র পেন্‌শানপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের দ্বারা গঠিত ছিল। এই কর্ম্মচারী সকলেই অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান। ঐ সময়ে ভারতীয় মুসলমান একজন ও হিন্দু একজন সদস্য নেওয়া হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিন জন ভারতবাসীকে ঐ সভার সদস্য করা হয়।

পার্লামেণ্টের লর্ড্‌স্ ও কমন্স্ এই দুই সভা হতে সভ্য নিয়ে একটা কমিটি গড়া হয়েছিল। এই কমিটির অনুমোদন অনুসারে অদূর ভবিষ্যতে তিনের বেশী ভারতীয়কে ভারত সচিবের সভার সভ্য করা স্থির হয়। সভ্যদের কাজ হবে সচিব মহাশয়কে পরামর্শ দেওয়া। যে সকল ক্ষেত্রে আইন-সভাগুলি, বড়লাট ও তাঁহার পারিষদেরা (councillors) একমত, সেখানে ভারতসচিব হস্তক্ষেপ করবেন না। নূতন সংস্কার-আইনে এই ধার্য্য হয়েছে।

সম্প্রতি 'ভাইস্‌রয় (রাজপ্রতিনিধি) ও গভর্ণর জেনারল' এই নাম বদ্‌লিয়ে শুধু গভর্ণর-জেনারল এই নাম রাখার প্রস্তাব হয়েছে। কারণ সংস্কার-আইনে রাজপ্রতিনিধিত্ব গভর্ণর-জেনারল ছাড়া গভর্ণরেরও কিছু বর্ত্তায়; তাই গোলমালের হাত এড়ানর জন্য ভাইস্‌রয় বা রাজপ্রতিনিধি নামটাই তুলে দেওয়ার কথা চলেছে।

এখন দেশে প্রাণবান্ গণতন্ত্রের সৃষ্টি করতে হলে শুধু শাসন-সংস্কারে চল্‌বে না; এই রকম আরও সংস্কার এসে যদি একটা পুরোপুরি স্বায়ত্ত-শাসনের যন্ত্র এনে আমাদের সাম্‌নে ফেলে যায় তাতেও প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকাশ হবে না—যদি না আমাদের অন্তরে ও বাইরে সকল কাজে চলা-ফেরার মধ্যে মুক্তির ভাব জাগে। কারণ বাইরে থেকে কেউ মুক্তি দিতে পারে না, কেবল যন্ত্র দিতে পারে; আবার, আমাদের অন্তরের মুক্তি আপনা হতেই বাইরের সঙ্গে প্রাণের যোগে পূর্ণ-বিকশিত ও প্রফুল্ল হয়; এটা বাস্তবিক ঘট্‌লে আমাদের প্রাণে প্রাণে হাড়ে হাড়ে মুক্তির হাওয়া বইবে, কাউকে তখন বলে' দিতে হবে না "এই তোমার স্বাতন্ত্র্য, এই তোমার আলো।" সুতরাং অধ্যাত্ম গণতন্ত্রের উদ্বোধনের কাজ বেশীর ভাগ আমাদের নিজের মধ্যেই,—আত্ম-শোধনে, গৃহস্থালী-পরিমার্জ্জনে; আসন পাতা হলেই দেবতা তাতে আপনা হতেই নেমে আস্‌বেন। বাহ্য বিকাশের ভাবনা এখন ভাব্‌বার নয়, সুতরাং নিজের অন্তর-শোধনে কারও সঙ্গে ঠোকাঠুকির ভয় থাকা অন্ততঃ উচিত নয়। জাতীয়ভাবে, ব্যাপকভাবে এই মানসিক উন্নয়ন বাহ্যিক বিপ্লব বিনাও শুধু আত্মিক প্রলয়ের মধ্যে দিয়েও সম্ভবে। এখন কান্নাকাটি খুঁটিনাটি ঝগ্‌ড়াঝাঁটি ছেড়ে সবাইকে কোমর বেঁধে কাজে নাম্‌তে হবে; যিনি যে দিক্ দিয়ে পারেন কাজ করে' যাবেন। দেশের সর্ব্বত্র পল্লীতে নগরে আশার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে; নিজে বিশ্বাসী হয়ে সকলের প্রাণে বিশ্বাস ঢেলে দিতে হবে; সকলের প্রাণে আত্মসম্মান দেশপ্রীতি ও দেশের জন্য গৌরববোধ জাগিয়ে তুল্‌তে হবে, তাদের বুঝাতে হবে দেশের কাজেই ও সকলের মঙ্গলের মাঝেই ব্যক্তি-বিশেষের মঙ্গলের বীজ নিহিত। লোকে যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখে—কি খাদ্যসংস্থানে কি শিল্পবিষয়ে কি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিষয়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখনকার উপায় কেবল প্রচারের কাজের মধ্যে। অনবরত দেশের অবস্থা, অন্যান্য সৌভাগ্যশালী দেশের লোকের অবস্থার খবরাখবর, পৌর-কর্ত্তব্য ও পৌর আদর্শ, রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে বহুল আলোচনার দরকার। অন্যান্য দেশের অবস্থা বিবেচনা তারা যতই করবে ততই তারা নিজের মধ্যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগ্‌ড়াঝাটি হিংসা দ্বেষ ভুলে যাবে ও অপর জাতির তুলনায় তাদের অভাব বুঝ্‌তে পেরে আত্মোন্নতিতে তৎপর হবে। এজন্য সভাসমিতি বক্তৃতা কথকতা বা মুকুন্দ-দাসের যাত্রার মত অভিনয়াদির দ্বারা জনশিক্ষার প্রসার করা যেতে পারে। খবরের কাগজ বর্ত্তমান রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচারের পক্ষে বেশ উপযোগী। এই কাজে নেমে আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের অভাবে হাজার উঁচু ভাব এনে জগৎকে দিলেও তা টেকে না; তার অভাবেই

যেমন চৈতন্যের ভাবময় ধর্ম্মের বিকৃতি এখন ঘটেছে। সেজন্য প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র স্থাপন করে' করে' কাজ করে' যেতে হবে, অর্থাৎ কাজ স্থায়ী করতে গেলে কর্ম্মশৃঙ্খলার organisationএর খুবই দরকার আছে। কৃষক, শ্রমজীবী, শিক্ষক, শিল্পী, সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর মধ্যেই অর্থাৎ সামাজিক অংশবিশেষগুলির নিজেদের ভিতরেও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার বহুল প্রয়োজন। এই-সকল সঙ্ঘের যতই প্রতিষ্ঠা হয় ততই রাষ্ট্রীয় মঙ্গল ও শান্তি হয়। কারণ, রাষ্ট্র বা state—ধর্ম্মাধিকরণ, ধর্ম্মসভা, কলেজ, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি সমাজ-জীবনের কতকগুলি মূল সঙ্ঘ নিয়ে—একটা মহাসঙ্ঘ বই আর কিছুই নয়; সর্ব্বোচ্চ সঙ্ঘ ষ্টেটের মধ্যে অনেক ছোট ছোট সমাজ বা সঙ্ঘ এইভাবেই লুকিয়ে আছে। এখন সমাজজীবনের জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজ অবাধ করতে হলে নব নব সঙ্ঘ সামাজিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত করে' তুলতে হবে। সুতরাং সঙ্ঘ-বন্ধনের দ্বারা কাজে আগুয়ান হয়ে চলতে হবে, নইলে কাজ টিকবে না। এই ভাবেই আমাদের জাতীয় আত্মার মুক্তিপ্লাবনকে বাহিক বাঁধ দিয়ে রক্ষা করে' বহমান করে' নিয়ে যেতে হবে ও তাকে মত্ততা থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে।

এরকমে সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে মুক্তি-জয় ফুটে উঠলে জাতীয় আত্মা অপ্রতিহত ও অবাধ হয়। মানুষই এ-যুগের দেবতা; তাকে নিয়েই সব; তাকে চেপে রেখে নয়, তার বিকাশ ও মুক্তি দিয়েই যুগের সকল সাধনার সিদ্ধি; আত্মজ্ঞান ও কর্ম্মে সামঞ্জস্য লাভ করে' সামাজিক মুক্তির ভিতরে চরিতার্থ হওয়াই, নবযুগের মানুষের লক্ষ্য। সুতরাং তার জীবনের লক্ষ্য অনুসারেই আসন্ন গণতন্ত্রের সামাজিক যন্ত্রের লক্ষ্য স্থির হবে, জাতি ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সকলের অধ্যাত্ম-প্রয়াস সফলের এ-দিনে যুগ যুগায়িত সাধারণ ইচ্ছার পরিণতি করতেই এ-যুগের মানুষ আজ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে নিজ স্থান অধিকার করবেন; তাঁর সুরেই সমাজ-যন্ত্রের সুর বাঁধা হয়ে যাবে; যন্ত্রের গর্ভে তখন প্রাণের হিল্লোল খেলে যন্ত্রকে স্পন্দিত বেগবান্ ও প্রাণময় করে' তুলবে; শাসক-শাসিতভাব ধরা হতে মুছে গেলে দরবেশী গণতন্ত্রের ভ্রাতৃপ্রেমে সারা ধরা জাগবে।

শ্রী প্রফুল্লকুমার সরকার

উৎকণ্ঠিতা

(কবীর)

এই বিবশিত তনু মন মোর
যৌবনে ঢল-ঢল—
দিয়েছে আমারে প্রিয়ের বারতা,
তাই চিত চঞ্চল!

পেয়েছি সে লিপি, তাই তাঁর লাগি
মালাখানি গাঁথি' আছি নিশা জাগি;
মিলন-আশায়, বল, কত কাল
রহিব গো, পথ চাহি!

ওগো অবিনাশী, ওগো প্রিয়তম,
ক্ষয়-ভয় আছে সময়ের মম,—
তোমার ত তাহা নাহি!

হে অনাদি, তব ত্বরা নাহি তাই,
গেলে তব ক্ষণ কোন ক্ষতি নাই;
নিঃস্ব করি এ যৌবন যাবে,
কেমনে সহিব বল।

শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

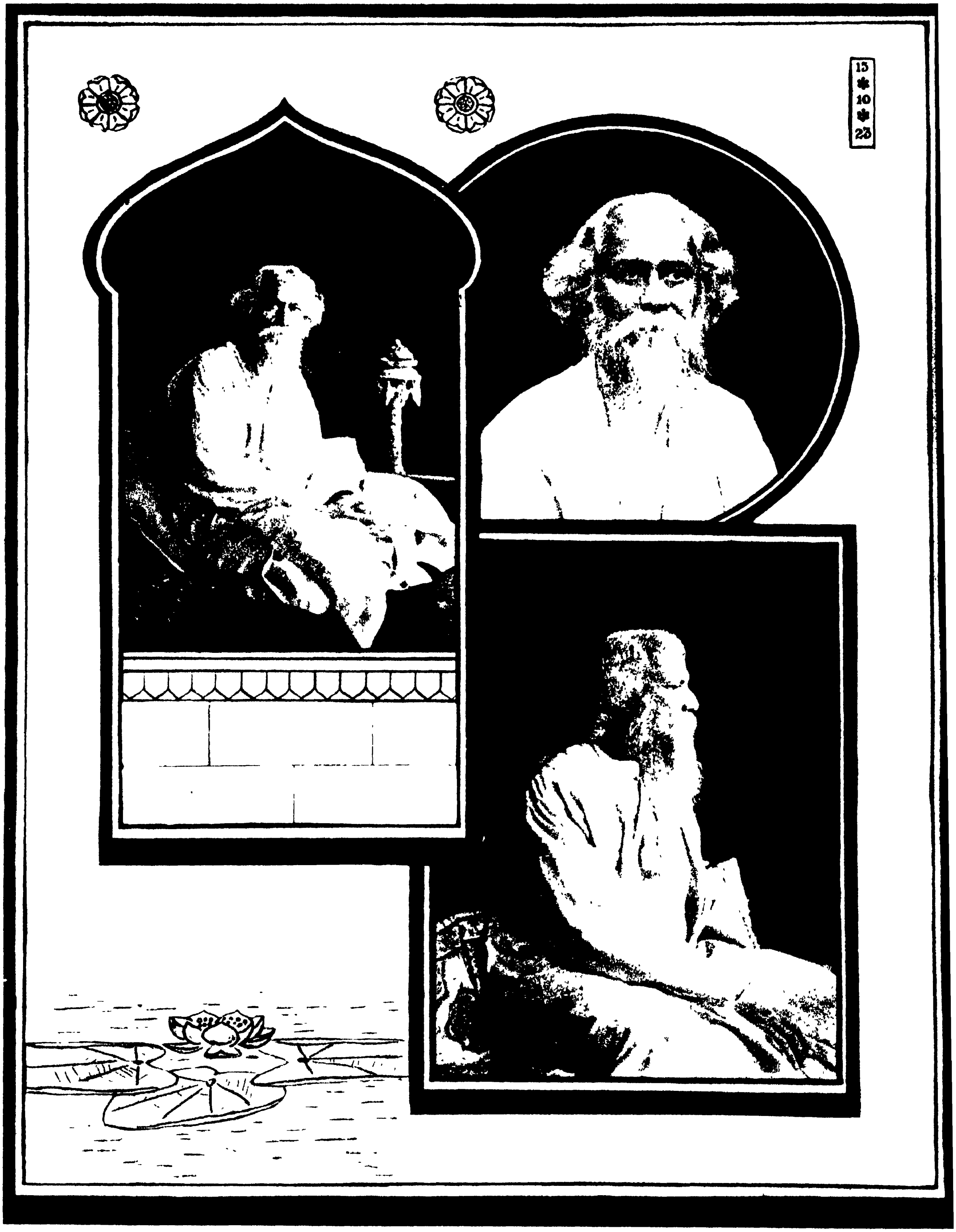
ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যান্

শুভক্ষণে হে মহান্ কবি,
বসি' বসি' একরঙা ছবি
সাজাইলে মানবের মনের গুহায়;
প্রাণ দিলে, ভাষা দিলে তায়।

অপূর্ব্ব সে সাম্যসাম, অপূর্ব্ব সে আনন্দের গীত।
বিশ্ববাসী হ'ল বিমোহিত।
আনন্দের জয়-ভেরী উঠিল বাজিয়া।
রহিয়া রহিয়া
প্রাণহীন দেশে তার আসিছে আভাস।
তাই মোরা পাই যে আশ্বাস।

তোমার সে গীত যেন বহ্নি-মুখে শিখার মতন।
তোমার সে বাণী যেন প্রলয়ের জীমূত-গর্জ্জন।
বিশ্বেরে জেনেছ সত্য নিজের স্বদেশ,—
নাই হিংসা, নাই কোনো দ্বেষ।
অকাতরে কুণ্ঠাহীন গাহিয়াছ শুধু সাম্য-সাম।
হে গণ-তান্ত্রিক কবি, ভারতের লও গো প্রণাম।

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী



শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল মহলানবিশের সৌজন্যে



গান

নিশীথ রাতের প্রাণ
কোন্ সুধা যে চাঁদের আলোয়
আজ করেছে পান ॥
মনের সুখে তাই
আজ গোপন কিছু নাই,
আঁধার ঢাকা ভেঙে ফেলে
সব করেছে দান।
দখিন হাওয়ায় তার
সব খুলেছে দ্বার।
তারি নিমন্ত্রণে
আজি ফিরি বনে বনে,
সঙ্গে করে এনেছি এই
রাত-জাগা মোর গান ॥

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

গান

এই শ্রাবণ-বেলা বাদলঝরা
যূথীবনের গন্ধে ভরা।
কোন্ ভোলা-দিনের বিরহিণী
যেন তারে চিনি চিনি,
ঘন বনের কোণে কোণে
ফেরে ছায়ার ঘোম্‌টা-পরা ॥
কেন বিজন বাটের পানে
তাকিয়ে আছি কে তা জানে।
যেন হঠাৎ কখন অজানা সে
আসবে আমার দ্বারের পাশে,
বাদল সাঁঝের আঁধার মাঝে
গান গাবে প্রাণ-পাগল-করা।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

তীর্থ

কালীঘাটে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখ্‌লাম। তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত বণিক্ আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজ্‌রাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মত মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর করেছিল। তাই এই নদী পুণ্য-নদী বলে' গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে' গণ্য হয়েছিল। কেন? কেননা, এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধস্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোট ছোট নদী তো ঢের আছে—তাদের ধারার তীব্রতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারার এই বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে নি; মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহায্য করে নি। সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হ'ল না। যেখান দিয়ে বড় বড় নদী বয়ে গিয়েছে, সেখানে কত বড় বড় নগর হয়েছে—সে-সব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এই-সব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ্ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে' থাকেন। এই গঙ্গাও তেমনি এক সময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল, তেমনি আর একদিক্ দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা।

তাহলে আমরা দেখ্‌লাম এই পবিত্রতা কোথায়? কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড় ক্ষেত্রে এসে মানুষের সঙ্গে মিলেছে—আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম্ম নেই যাতে করে' তা পবিত্র হ'তে পারে।

কিন্তু যখনি তার ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হ'ল, তখনি তার গভীরতাও কমে' গেল। গঙ্গা দেখ্‌লাম, কিন্তু চিত্ত খুসী হ'ল না। যদিও এখনো লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে সেটা তাদের অভ্যাস মাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই।

আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। একসময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়-সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা' তা' সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে' ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হ'ল? তার কারণ, বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল, ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে' দিয়েছে। যদি তার পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অন্ন পরিবেষণের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝ্‌তে হবে তা'

আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড় করতে পারে? না তার মন্দির পারে?

আমাদের একথা মনে রাখ্‌তে হ'বে পুণ্যধর্ম্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হ'বে। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলে'ই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে—যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না; সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে' যাবার জন্যে, থাক্‌বার জন্যে নয়। যেমন কল্‌কাতার বড়-বাজার—সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না। সেখানে লাভলোক্‌সানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কল্‌কাতায় জন্মেছি—সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ী আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে' মনে করতে পার্‌ছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেন্ট্‌ দেখে বড় বড় বাড়ী ঘর দেখে তার কি হবে? ওখানে কার আহ্বান আছে? বণিক্‌রাই কেবল সেখানে থাক্‌তে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে—সেখানে কি হয়? সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে, সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেল্‌বার জন্যে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

যে জীবনে কোনো বড় প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে-জীবন ভরে' উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে-জীবনের কোন প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে' তার মধ্যে থাকে! কি করে' তারা মনে তৃপ্তি পায়।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, অগ্রহায়ণ)

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

পাল বংশের রাজত্বকালে বাংলার অবস্থা

নেপালে গিয়ে শুনলাম কলেজ-লাইব্রেরী আছে, তাতে অনেক পুঁথি আছে। দেখ্‌তে গিয়ে দেখি পুঁথি আছে ১৫০০ বৎসর আগেকার, হাতের লেখা। ১৯০৭ সালে রামচরিত পেলাম। রামচরিত ভীষণ বই, ৪ সর্গ, তার প্রত্যেক কবিতায় এক দিকে রামায়ণ আর এক দিকে রামলীলা। কিছুই বোঝা গেল না। খসড়া ঠিক করে' ছাপ্‌তে ১০ বৎসর লেগেছে।

এই রামপাল-চরিত বইখানার প্রথম সর্গে ৩৬টি কবিতা আছে, তায় তিন পুরুষের ইতিহাস আছে। বিগ্রহ (?) পাল ও তার দুই ছেলে রাজত্ব করেছিল। রামপাল-চরিতে ৫০।৬০ বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায়। বোধ হয় একাদশ শতাব্দীতে গৌড়ে খুব প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, ২ জন বড় বড় রাজা ১০০ বৎসর রাজত্ব করেন। একজনের নাম গাঙ্গেয় দেব, আর একজনের নাম কর্ণচেদী। এঁরা বাঙ্গালার অনেক অংশে বিহার স্থাপন করেছিলেন, বীরভূমেও করেছিলেন, আর আর দেশেও করেছেন। বীরভূমে এঁদের উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়, মিথিলায় বহু উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। রামপাল কর্ণচেদীকে তাড়িয়ে দূর করে' দিয়ে সমস্ত দেশে রাজত্ব করেছিলেন। সেজন্য রামপালকে বলে কলিকালের রাম, সন্ধ্যাকর নন্দী কলিকালের বাল্মীকি। এই রাজত্বের বিবরণ কতক উৎকীর্ণ লিপিতে, কতক রামপাল-চরিতে পাওয়া যায়, আর কোন জিনিষে পাওয়া যায় না—আর পাওয়া যায় তিব্বতে, তার খানিক ইতিহাস তিব্বত থেকে রুশিয়ায়, রুশিয়া থেকে জার্ম্মানিতে, জার্ম্মানি থেকে ইংলণ্ডে গেছে। সে-সকল বই থেকে কিছু কিছু পাওয়া যায়। এর থেকে আমাদের ইতিহাস হল। কিন্তু পাল বংশের আইন, ইতিহাস, সাহিত্য সম্বন্ধে বই আছে; সে বই অধিকাংশ আমাদের দেশে নেই, আছে নেপালে।

নাথদের খুঁজে খুঁজে মূলগ্রন্থ পেলাম, সেখানার নাম "মহাকৌল-জ্ঞানবিনির্ণয়।" নাথপন্থী যারা আছে তারা একেবারে বৌদ্ধ নয়, এরা কৌল। কৌল-সম্প্রদায়ের অনেকে শৈব; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ভিতরও অনেকে আছে। এই কৌল সম্প্রদায়, যাদের আমরা নাথ বলি, তাদের উৎপত্তি চন্দ্রদ্বীপে। চন্দ্রদ্বীপ—বরিশাল জেলা। সেখানে অনেক জেলে ছিল, সে জেলেদের উপাধি ছিল কৈবর্ত্ত কেবট ধীবর। মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হলেন, মহাদেবের স্ত্রী পার্ব্বতী জ্ঞান বিতরণ করেন। জ্ঞান হারিয়ে গেলে—খোঁজ খোঁজ—কোথাও পাওয়া গেল না। অনেক বইতে লেখে জ্ঞান কৌলধর্ম্ম। তাই ত জ্ঞান কোথায় গেল? পার্ব্বতী বল্লেন—অমুক জায়গায় আছে।—তবেই হয়েছে! কার্ত্তিক সেটা সমুদ্রের জলে ফেলেছে। সমুদ্রের জলে পাওয়া গেল না। বড় বড় মৎসেন্দ্র ধীবর ছিল, তারা জাল পাত্‌ল। শেষে একটা মস্ত মাছ ধরা হল। তার পেট চিরে জ্ঞান বের করল। মহাদেব বল্লেন, জ্ঞান কাউকে দিবে না, কার্ত্তিকও যেন টের না পায়। কিন্তু আবার কার্ত্তিক সেটা জলে ফেলে দিল। এবার খেয়ে ফেল্ল প্রকাণ্ড এক তিমি মাছ। মহাদেব জাল টান্‌লেন, কিন্তু মাছ উঠে না; যে জ্ঞানের বলে মহাদেব হয়েছেন সে জ্ঞান যখন নেই, কি করে' মাছ উঠবে? শেষে পার্ব্বতী সেটাকে উঠালেন। তার পেট থেকে জ্ঞান বেরুল। তখন মৎস্যেন্দ্রের দল জ্ঞান পেল। এটা অনেক আগে সপ্তম শতাব্দীর শেষে কি ৮ম শতাব্দীর গোড়ায়। বইখানি একাদশ শতাব্দীর। সুতরাং আমি বুঝি এই, নাথ যারা বলে তারা কৌল-ধর্ম্মাবলম্বী শৈব। দক্ষিণ ভারতে হিন্দুস্থান পাঞ্জাব ও নেপালে অনেক শৈব আছে; কিন্তু এই নাথ-সম্প্রদায় বরিশালের বাইরে কেবল কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে আছে। এই নাথেরা বৌদ্ধ নাথদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মিশে গিয়েছে; সে মিশার থেকে তাদের বাহির করা কঠিন। আমরা ৮৪ জন নাথের উল্লেখ পাই। এই ৮৪ জনের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই আমাদের কৌল নাথ, কতকগুলি বৌদ্ধ—বৌদ্ধেতে আর শৈবে কতকটা মিলামিলি হয়ে গেছে।—এ হ'ল প্রথম জিনিষ -পালেদের আগে।

তার পর পালেরা উপস্থিত হল। রাজা ধর্ম্মপালের সময় দুই দল হয়েছিল। এই দুইদলে ৭ম শতাব্দীতে ক্রমাগত ঝগড়া কাটাকাটি মরামারি চল্‌ছিল। ঝগড়া বেশী হলে যে দল হারল তারা চীন মঙ্গলিয়ায় চলে' গেল। খুব যখন ঝগড়া সে সময় ধর্ম্মপাল বাংলা দেশের, উত্তর ভারতের, রাজা হলেন। তিনি দেখ্‌লেন এই ঝগড়া মিটাতে হবে; সেজন্য চন্দ্রভাগ (?) পণ্ডিতকে ধর্‌লেন। তিনি বল্লেন, দেখ, এই ঝগড়া মিটিয়ে দেব। অদ্ভুত উপায়ে ঝগড়া মিটালেন। মূল গ্রন্থের দুই টীকা ছিল, দুই টীকা একত্রিত করে' তিনি এক টীকা করলেন। সে টীকায় এই ঝগড়া মিটে গেল। কিন্তু আর একটা জিনিষ এসে হাজির হল। এই যে শৈব ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়েছে, এই শৈব ধর্ম্মের অনেক জিনিষ বৌদ্ধ ধর্ম্মে পাই; প্রথম জিনিষ মহাসুখবাদ।

দেশে একজন রাজা ছিলেন, তিনি মহাসুখবাদ'এর মধ্যে বজ্রযান মত প্রচার করেন। তাঁর পুত্র সিংহলে ও জামাই তিব্বতে প্রচার করতে গেলেন, মেয়ে দেশে রইল; ছেলে জামাই মেয়ে বজ্রযান পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিল। বজ্রযানের কথা এই—নির্ব্বাণ পেলে কি অবস্থা হবে? বুদ্ধ বল্‌তেন জিজ্ঞাসা ক'র না, তুমি জন্ম জরা মৃত্যু এ বুঝ্‌তে পারলেই নিশ্চিন্ত থাক, তার বাইরে যাবার কোন দরকার নেই। কিন্তু মন তাতে তৃপ্তি লাভ করল না, ক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে

নাগার্জ্জুন বল্লেন—শূন্য হয়ে থাকবে। কথাটা মনে গেল বটে, কিন্তু কেউ চায় না শূন্য হয়ে থাক্তে; নরকে যাব সেও ভাল, কিন্তু শূন্যে থাক্তে কেউ রাজী নয়। ফলে আর-একটা মত হ'ল, শূন্য হয়ে থাকবে, কিন্তু জ্ঞান থাকবে। এই মহাসুখবাদ মত এল, আমার জ্ঞানে শূন্যই চাই। —আস্তে আস্তে শঙ্কর এই থেকে নিয়ে মায়াবাদ সৃষ্টি করলেন। বৈষ্ণবেরা শঙ্করকে, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে; কিন্তু শঙ্কর প্রচ্ছন্ন নয়, স্পষ্ট বৌদ্ধ ছিলেন।—তখন বজ্রযানের সৃষ্টি হল। স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ধর্ম্ম; ধর্ম্ম সাধনার জন্য স্ত্রী চাইই।—এই ভাবে ধর্ম্মবিপ্লব চল্তে লাগ্‌ল। বজ্রযান, মহাযান, বেদান্ত ও অন্যান্য মত হ'ল। এই-সবের একখানা বই আমার কাছে আছে, পূর্ব্ববঙ্গে বিজয় বলে' একজন বৌদ্ধ যোগী ছিলেন, তিনি লিখেছেন, ১২২৫ সালে। সে বইএ এই-সব কথা পরিষ্কার লেখা আছে—ধর্ম্মের এই-সব কথা—বৌদ্ধদের ধর্ম্মে, আমাদের ধর্ম্মে কি ছিল এই-সব কথা। পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এল। তাদের কতকগুলি লৌকিক আচার বৌদ্ধদের ব্যাপারে পরিণত হয়ে উঠেছে। নানা কারণে তারা আমাদের সঙ্গে জড়িত হল, নিজেদের ধর্ম্ম প্রচার করতে লাগ্‌ল। সে ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম নয়, সে ধর্ম্ম বৈদিক জিনিষের চেয়ে অনেক ছোট—গৃহস্থালীর ধর্ম্ম; সেটা তারা নিল, নিয়ে বই আরম্ভ করল। আমাদের যা ছিল, তারা সে সব কথা বলে নি, তারা বৌদ্ধদের কথা বলেছে, বলা উচিত, কারণ বৌদ্ধরা তখন প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণেরা যখন প্রবল হল, তারা সব বই লিখ্‌তে আরম্ভ করল; কি করে' গৃহস্থালী আচার বিচার দশবিধ সংস্কার ইত্যাদি শাস্ত্রমত কাজ করতে হয়—এসকল বই লিখ্‌তে আরম্ভ করল, চমৎকার বই। ভবদেব ভট্ট বড় পণ্ডিত, রাঢী শ্রেণী সামবেদী ব্রাহ্মণ; হলধর মিশ্র, এঁরা সমাজ বাঁধ্‌বার জন্য বড় বড় বই লিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের চর্চ্চা আরম্ভ হল। বৌদ্ধেরা সংস্কৃত বল্‌ত, বাংলাও বল্‌ত, কিন্তু কোন ভাষাই জান্‌ত না। তারা বল্‌ত আমরা শাস্ত্রবাদী নই, বিবেকসিদ্ধ না হলে কোন শাস্ত্রই মানব না। তারা প্রথমা বিভক্তির স্থানে পঞ্চমী, পঞ্চমীর স্থানে দ্বিতীয়া, একবচনের স্থানে বহুবচন, পুংলিঙ্গের স্থানে ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করত। এতে এমন ক্ষতি করেছে যে এখন আমরা তার অর্থ করতে পারি না। মূলকথা এই, নাথেদের উৎপত্তি পূর্ব্ববঙ্গে। আর ব্রাহ্মণেরা সমাজ বাঁধ্‌বার জন্য যা দরকার, করেছেন। কিন্তু বজ্রযান-সহজযানের সময় দেশের লোকের অবস্থা কি ছিল বিশেষ জানা যায় না; তারা সমাজে সে-ভাবে ছিল যে-ভাবে বৌদ্ধেরা নেপালে আছে। বৌদ্ধেরা আমাদের আচার বিচার মান্‌ত না, কতক কতক মান্‌ত, কখন কখন গোঁটাও দিত, দেবতা একেবারে মান্‌ত না, সব আমি নিজে, অহং। যখন দেবতার ধ্যান করতে হবে—আমরা বলি মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন, তারা বল্‌বে আমি অমুক দেবতা হয়েছি, আমার চার হাত পাঁচ মাথা দশ পা বেরিয়েছে, আমি অমুক দেবতা হয়েছি। এ দুটা জিনিষে কত তফাৎ। আমরা দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, ওরা তা করে না—নিজে চেষ্টা করে দেবতা হতে। এরা বুদ্ধকে গুরু বলে' মানে। নেপালের লোক দুই ধর্ম্ম অবলম্বী—দেবভজা আর গুরুভজা God-worshipper আর manworshipper. গুরুভজা গুরু হতে চায়, গুরু হয়ে হয়ে শেষে বজ্রযানে এসে দাঁড়ায়। এরা দেহাত্মবাদী। এই দেহই সব, এ দেহে ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণে স্বর্গ নরক আছে।—আমাদের দেশে যারা ভিক্ষা করে তারা বৌদ্ধদের শেষ চিহ্ন। এরা দেহকে বড় মনে করে। এই দেহকে মানে, আর কিছু মানে না। এই ত হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধদের তফাৎ; এ তফাৎ বড় বেশী তফাৎ,—World within world. সেকালে দেবতা অপেক্ষা মানুষের ক্ষমতা বেশী ছিল। যাঁরা রাজা ছিলেন, বৌদ্ধ রাজা, তাঁরা সকল ধর্ম্মের লোককে যার যেমন গুণ তার তেমন পুরস্কার দিতেন; ব্রাহ্মণের হাতে বিচার দিয়েছিলেন, আইন জিনিষ ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। বৌদ্ধ রাজা যেখানে ছিল সেখানে আইন হিন্দুর হাতে ছিল, কিন্তু বিচারের মধ্যে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য করতে দিত না; বুদ্ধদেব যে-বন্দোবস্ত করেছিলেন, সেখানে তা বাহাল ছিল, আইন ব্রাহ্মণদের হাতে থাকাতে আধিপত্য কতকটা তাদের হল। পালদের সময় একটা শুভকর ব্যাপার হয়, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণদিগকে তারা খাতির করতে আরম্ভ করল। দুই জায়গায় তাদেরকে ১৫৬ খানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর-একদল ব্রাহ্মণ ছিল, তারা শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণ। শাকদ্বীপের বর্ত্তমান নাম সিথিয়া, পারস্যের উত্তরে পূর্ব্ব তুর্কীস্থান প্রভৃতি নিয়ে এক বড় দেশ, ইউরোপীয় রাশিয়ার কাছে পর্য্যন্ত। ভগবান্ পবিত্র সূর্য্যের উপাসনা করবার জন্য যাদবেরা সেখান থেকে কতকগুলি ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন। নানা কারণে শাকদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মণ আসে। শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ছিল, তারা আমাদের বেদ জান্‌ত না, সূর্য্যের উপাসনা করত, তারা নক্ষত্রের গতিবিধি, জ্যোতিষবিদ্যার চর্চ্চা করত, আবশ্যক হলে ঠিকুজী করত। শাকদ্বীপের ব্রাহ্মণদেরকে আমরা আচার্য্য বলি।

ব্রাহ্মণেরা বড় বড় যজ্ঞ করতেন, যজ্ঞের বাহুল্য ছিল, তাঁরা দশবিধ সংস্কার নিয়ে থাক্‌তেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ আরও কতকগুলি প্রতিষ্ঠা নিয়ে তাঁরা থাক্‌তেন। পাল রাজাদের সময় তান্ত্রিক নিয়ম ছিল না, তন্ত্রের উল্লেখ ছিলেন না। আগমবাগীশ প্রভৃতি দশ জন লোক ষোড়শ শতাব্দীতে বৌদ্ধতন্ত্র নিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে ঢুকাতে চেষ্টা করেন। সেখানেও কানে মন্ত্র দেওয়া হত। তাঁদের মধ্যে তিনজন লোক ক্ষমতাপন্ন ছিল, তাঁদের নাম ত্রিগুণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, পূর্ণানন্দ। তাঁদের একজনের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিল, তারা এই জিনিষ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে ঢুকাতে লাগ্‌ল। তন্ত্র জিনিষ একেবারে বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গীভূত না হলেও বৌদ্ধ মতের অনুকূল ছিল। তন্ত্র-উপাসনা করতে গেলে আমি শিব হয়েছি, শক্তি হয়েছি এরূপ বল্‌তে হয়। আমি শক্তি চাই, একথা তারা বলে না। আমরা বলি আমাদের পুত্র দাও, আরোগ্য দাও। তারা বলে আমরা তাই হয়েছি। সেইটা বৌদ্ধ। এই রকম করে' ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-সমাজে ঢুক্‌তে লাগ্‌ল।

নেপালে দেখি বৌদ্ধ আর হিন্দু রয়েছে; তারা পরস্পর অনাচরণীয়, বৌদ্ধ যেখানে যাবে ব্রাহ্মণ সেখানে যাবে না, বৌদ্ধ জল নিলে ব্রাহ্মণে সে জল নেবে না, বৌদ্ধ যে কুয়ার জল ব্যবহার করবে ব্রাহ্মণ সে কুয়ার জল ব্যবহার করবে না, ঘরে এলে জল ফেলে দেয়। আমাদের দেশে যাদের অনাচরণীয় জাত মনে করি, তারা বোধ হয় এককালে বৌদ্ধ ছিল, সেইজন্য অনাচরণীয় হয়েছে; তখন তারা আমাদের সঙ্গে মিল্‌তে চেষ্টা করে নি, তারা প্রবল ছিল, পালরাজগণের সময় তারা প্রবল ছিল, তারা ব্রাহ্মণদের ঢুক্‌তে দিত না। আর এক কথা তারা বল্‌ত—ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করছে। একথা ঠিক নয়। দুই ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক অনাচরণীয় ছিল, যেমন মুসলমানেরা আর আমরা আছি; বৌদ্ধ আর হিন্দুতে সে রকম অনাচরণীয় ভাব ছিল। সে সময় অর্থাগম খুব ছিল, নানা প্রকারে লোক অর্থাগমের উপায় করত, নানা দেশে যেত। পাল-রাজাদের সময় তিব্বত বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে যায়। পাল রাজাদের সময় বৌদ্ধেরা মঙ্গোলিয়া দখল করে; আর বর্ম্মা শ্যাম জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করতে যায়। লঙ্কাদ্বীপে অনেক লোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করতে যায়। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্বর্ণযুগ ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম খুব জেঁকে উঠেছিল, লোক উদ্যোগী ছিল, কোন দেশে যেতে ভীত হত না, ব্যবসা-বাণিজ্যে

ধন অর্জ্জন করত। জাতি-বিচার ছিল না ; কেবল ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল। বৌদ্ধদের জাত-বিচার নেপালে পাওয়া যায়। পাল-রাজাগণের সময় জাতবিচার ছিল না, পাল-রাজাদের সময় কেবল কৈবর্ত্তদের মন্ত্র দেওয়া হত না ; তারা মাছ মারত, যারা মাছ মারে তাদের কেমন করে' মন্ত্র দেবে ? কৈবর্ত্তেরা যতক্ষণ না মাছ মারা ব্যবসা ত্যাগ করে, ততক্ষণ তাদের বৌদ্ধ করতে পারবে না এই ছিল নিয়ম। এইজন্য কৈবর্ত্তেরা হয়ে গেল ছোট। শিব এসে তাদের রক্ষা করলেন, তারা কৌল হল। কৈবর্ত্তেরা অধিকাংশ কৌল। এই রকম করে' করে' পালবংশের সময়ের সামাজিক ইতিহাস কিছু দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু ভাল করে' কথাটা বল্‌বার সময় এখনো উপস্থিত হয় নি। বিগ্ন-চরিত থেকে অনেক ইতিহাস বেরুবে। কোন কোন দেশে বড় পুরাতন তাস আছে, তার ছবি থেকে এটা ঠিক হল আমাদের দশ অবতার এখন যেমন মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ, হাজার বৎসর পূর্ব্বে তা ছিল না, অন্য রকম ছিল ; এই তাস যদি ফেলে দিতাম তা হ'লে এ ইতিহাস পাওয়া যেত না। এই রকম ভাবে ইতিহাস বের কর্‌বার চেষ্টা করতে হবে, কেবল ঠিক করা চাই চোখ। তা'হলে সব জায়গা থেকে ইতিহাস বেরুবে।

(প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক) শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

—

লক্ষ্মী

বৈদিক উষাই পৌরাণিক লক্ষ্মী। বেদে অনেক স্থলে উষা সূর্য্য-প্রিয়ারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বৈদিক বিষ্ণু সূর্য্যের নামান্তর মাত্র। সুতরাং সূর্য্যপ্রিয়া বৈদিক উষা বিষ্ণুপ্রিয়া পৌরাণিক লক্ষ্মী হইয়াছেন।

গ্রীক্ রোমীয় উষার ন্যায় বৈদিক উষারও রথ আছে। শ্রীসূক্তে শ্রীকে 'অশ্বপূর্ব্বা' 'রথমধ্যা' বলা হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক শ্রী জলধি-দুহিতা, মন্থনকালে সমুদ্র হইতে উৎপন্না। গ্রীক্ উষা সমুদ্র হইতে অশ্বযুক্ত শকটে আরোহণ করিয়া প্রভাতগগন রঞ্জিত করিয়া আসিতেন। বেদে সমুদ্র বলিতে অনেক স্থলে অন্তরীক্ষ বুঝাইত, সেই হিসাবে উষা সমুদ্রদুহিতা।

বৈদিক স্ত্রী-দেবতা'গণের মধ্যে উষার আসন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে, অথচ পৌরাণিক যুগে উষার উল্লেখ নাই, পুরাণে সে সুবর্ণকিরণ একেবারে নির্ব্বাপিত। সেই উষা পুরাণে একেবারে লুপ্ত হন নাই, তিনি লক্ষ্মীরূপে এখনও বিরাজ করিতেছেন। উষাকে বেদে বাজিনী-বতী বা অন্নবতী বলা হইয়াছে। লক্ষ্মীও অন্নদাত্রী।

লক্ষ্মীর একটি নাম শ্রী। ঋগ্বেদে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় রূপ ও ঐশ্বর্য্য অর্থে 'শ্রী' কথাটি পাওয়া যায়, কিন্তু তথায় শ্রী বলিয়া কোন দেবীর উল্লেখ নাই। এখন শ্রী বা লক্ষ্মী দেবীর নিকট লোক প্রচুর শস্য অন্ন বস্ত্র ধন-সম্পদের জন্য প্রার্থনা করে। বৈদিকযুগে আর্য্যগণ প্রচুর শস্য ও পার্থিব সম্পদের জন্য পুরন্ধি ধিষণা প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। এখনকার আর্থিক অনাটনের দিনে লোকে বহুপুত্র কামনা করিতে সাহস করে না। কিন্তু আর্য্যগণের তখন লক্ষ্য ছিল, কিরূপে দলপুষ্টি হয়, অনার্য্য শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ও সাংসারিক কার্য্যে সহায়তার জন্য পুত্রের আবশ্যকতা তাঁহারা অনুভব করিতেন এবং সেইজন্য তাঁহারা উপাস্য দেব-দেবীগণের নিকটে পুত্রলাভের প্রার্থনা জানাইতেন। কুহূ ও সিনী-বালীর নিকট তাঁহারা সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন, এরূপ বর্ণনা আছে। অথর্ব্ববেদে আছে, তাঁহার সম্পদ্ ও বীরপুত্রের জন্য কুহূর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুপত্নী বলিয়া কাহারও উল্লেখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদের শেষ অংশের একটি সূক্ত সুপ্রজননের জন্য বিষ্ণু ও সিনীবালীর নিকট প্রার্থনা। বোধ হয় সেই জন্য অথর্ব্ববেদে সিনীবালীকে বিষ্ণুপত্নী বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগের বিষ্ণুপত্নী শ্রী বা লক্ষ্মীর নিকট সন্তান সুপ্রসবের জন্য বা বহু সন্তান লাভের জন্য প্রার্থনা কেহ করে না। বৌদ্ধযুগে যক্ষিণী হারিতী সে ভার লইয়াছিলেন ; আধুনিক যুগে জন্তলা রাক্ষসী, পাঁচুঠাকুর ও ষষ্ঠীদেবী তাহা লইয়াছেন। তথাপি লোক আশীর্ব্বাদ করিবার সময় 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভে'র কথা এখনও উল্লেখ করে। শ্রীসূক্তে দেখা যায়, প্রার্থনাকারী ধন ধান্য গো-হস্তি-রথ-অশ্ব ও আয়ু প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-পৌত্রের জন্যও কামনা জানাইতেছেন, কারণ পুত্র-পৌত্রও ত সম্পৎ-সৌভাগ্যের চিহ্ন।

শাঙ্খ্যায়নগৃহ্যসূত্রে ও শতপথ-ব্রাহ্মণে শ্রী দেবী হইয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বহুকেশবতী 'শ্রী'র উল্লেখ আছে। শাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে বিষ্ণু, অনুমতি, অদিতি প্রভৃতি দেবীগণের মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণেও শ্রী দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন—তথায় তাঁহার ধন-সম্পদ্ ঐশ্বর্য্য সবই আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রী সম্বন্ধে যে কাহিনীটি বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে আছে প্রজাপতি প্রজা সৃজন করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। তিনি তপ করিতে করিতে শ্রান্ত হইলে শ্রী তাঁহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। (গ্রীক্ দেবেন্দ্র জিউসের মস্তক হইতে এথেনা দেবীর উদ্ভব ইহার সহিত তুলনীয়।) শ্রী দীপ্তিমান্ অবয়বে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিলেন। সেই শোভাময়ী আলোর প্রতিমা দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা হইল, তাঁহাকে নিধন করিয়া তাঁহার শোভাসম্পদ্ কাড়িয়া লইবেন। প্রজাপতি দেবগণকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "শ্রী স্ত্রীলোক, লোকে স্ত্রীহত্যা করে না।" প্রজাপতি শ্রীকে প্রাণে না মারিয়া তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবার পরামর্শ দিলেন। পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইলা না। অগ্নি তাহার অন্ন লইলেন, সোম তাঁহার রাজ্য, বরুণ তাঁহার সাম্রাজ্য, মিত্র তাঁহার ক্ষত্র, ইন্দ্র তাঁহার বল, বৃহস্পতি তাঁহার ব্রহ্মতেজ, সবিতৃ তাঁহার রাষ্ট্র, পূষা তাঁহার ঐশ্বর্য্য, সরস্বতী তাঁহার পুষ্টি এবং ত্বষ্টা তাঁহার রূপ লইলেন। পরে শ্রী প্রজাপতির পরামর্শে যজ্ঞ করিয়া ঐ-সকল দেবতাকে আহ্বান করিলেন ; এবং তাঁহারা যাহা যাহা লইয়াছিলেন, তুষ্ট হইয়া, সব শ্রীকে একে একে ফিরাইয়া দিলেন।

শ্রীসূক্ত শ্রী দেবীর উদ্দেশে রচিত। ঠিক বৈদিক যুগে ইহা রচিত না হইতে পারে, কিন্তু সেইজন্য ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে চলিবে না, কারণ বৃহদ্দেবতাগ্রন্থে মন্ত্রদ্রষ্ট্রী বা সূক্ত-প্রণেত্রীগণের নামের মধ্যে শ্রীর নাম পাওয়া যায়। পৌরাণিকযুগে ও বৌদ্ধযুগে শ্রী প্রধান দেবীগণের মধ্যে পরিগণিতা। পৌরাণিক বৃত্তান্ত-অনুসারে সমুদ্রমন্থন হইতে শ্রীর উৎপত্তি। (গ্রীক্‌দিগের প্রেম-সৌন্দর্য্যের দেবী এফ্রোডাইটিও Aphrodite সমুদ্রফেন হইতে উৎপন্না।) মহাভারতে আছে, মন্থন-কালে শ্বেতপদ্মাসীনা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উদ্ভূত হইলেন। রামায়ণে বারুণীর নাম আছে বটে, কিন্তু শ্রীর নাম নাই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, শ্রী ভৃগু ও খ্যাতির কন্যা এবং ধর্ম্মের পত্নী। তাহার পর যখন রুষ্ট দুর্ব্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হইলেন, দেবগণ দানবহস্তে পরাজিত হইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণুর পরামর্শে সমুদ্রমন্থন করিয়া দেবগণ পুনরায় শ্রীকে পাইলেন।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতে সাগর হইতে লক্ষ্মীর উৎপত্তির যে বর্ণনা

আছে, তাহা বাস্তবিকই কবিত্বময়। বিষ্ণুপুরাণে আছে, ধন্বন্তরির পর স্ফুরৎকান্তিমতী বিকসিত-কমলে-স্থিতা পঙ্কজহস্তা শ্রীদেবী সাগর হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষিগণ শ্রীসূক্তে তাঁহার স্তব করিলেন। বিশ্বাবসু আদি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার সম্মুখে গান করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গা আদি নদী তাঁহার স্নানার্থ জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। দিগ্‌গজ-সকল হেমপাত্রস্থিত বিমল জল লইয়া সর্ব্ব-লোকমহেশ্বরী সেই দেবীকে স্নান করাইতে লাগিল। ক্ষীরোদ সাগর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অম্লানপঙ্কজমালা প্রদান করিল। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিলেন। দেবী স্নাতা, ভূষণভূষিতা ও দিব্যমালাম্বরধরা হইয়া সর্ব্বদেব-সমক্ষে হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা আরও কবিত্বময় এবং আরও বিস্তারিত। কান্তিপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল রঞ্জিত করিয়া দেবী বিদ্যুন্মালার ন্যায় আবির্ভূতা হইলেন। মহেন্দ্র তাঁহাকে অদ্ভুত আসন আনিয়া দিলেন, শ্রেষ্ঠ নদীগণ মূর্ত্তিমতী হইয়া হেমকুম্ভে পবিত্র জল দিল। ভূমিদেবী অভিষেচন-উপযোগী ওষধি সকল, গোগণ পঞ্চগব্য এবং বসন্ত মধুমাসের উৎপন্ন উপহাররাজি প্রদান করিলেন। গন্ধর্ব্বকণ্ঠোচ্চারিত মঙ্গলপাঠ, নটীগণের নৃত্যগীত, মেঘের তুমুলনিস্বনে বাদ্যযন্ত্র-বাদন, দিগ্‌গজগণ কর্ত্তৃক পূর্ণকলস হইতে জলবর্ষণ ও দ্বিজগণ কর্ত্তৃক সূক্তবাক্য উচ্চারণ—এই-সকলের মধ্যে ঋষিগণ দেবীর অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিলেন। তাহার পর দেবীর সজ্জা। সমুদ্র পীত কৌশেয়বাস, বরুণ মধুমত্ত ভ্রমরগুঞ্জরিত কুসুমদাম, বিশ্বকর্ম্মা বিচিত্র ভূষণ, সরস্বতী হার, ব্রহ্মা পদ্ম এবং নাগগণ কুণ্ডল দিলেন। তাহার পর ভ্রমরগুঞ্জিত মালা লইয়া নূপুরশিঞ্জিত চরণে হেমলতার ন্যায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেবী নারায়ণের গলে সেই মালা প্রদান করিয়া অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে লজ্জা-বিভাসিত স্মিতবিস্ফারিত লোচনে তাঁহার বক্ষে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তাহার পর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লক্ষ্মীচরিত্র যেমন অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, দেবী যেন কোন বঙ্গগৃহস্থের কুলবধূ। তিনি নারায়ণের পত্নী—গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার সপত্নী। পুরাণকার সপত্নী-গণের কলহ ও তাহার মধ্যে লক্ষ্মীর অবিচল শান্তভাব বর্ণনা করিয়াছেন; লক্ষ্মীচরিত্র আদর্শ বধূচরিত্র। কলহ-রতা দুই সপত্নীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের কলহ শান্তি করিতে গিয়া লক্ষ্মী বিনাদোষে সরস্বতী কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইলেন। লক্ষ্মী কাহাকেও অভিশাপ দিলেন না, তাঁহার সপত্নীযুগল পরস্পরকে শাপ প্রদান করিলেন। অভিশাপের কাণ্ড শেষ হইলে পর নারায়ণ লক্ষ্মীর উপর সুবিচার করিয়া গঙ্গাকে শিবের নিকট এবং সরস্বতীকে ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করিতে চাহিলেন। এখনও লক্ষ্মী লক্ষ্মী, তিনি স্বামীকে সপত্নী-দ্বয়ের উপর প্রসন্ন হইবার জন্য অনুনয় করিলেন। গুণমুগ্ধ স্বামী তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রার্থনা রক্ষা করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগের লক্ষ্মীচরিত্রের তুলনা নাই। পুরাণকারগণ দুঃসাহসী। লক্ষ্মীর স্বাভাবিক নম্রতার জন্য তাঁহাদের সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। ফলে, দেবীভাগবতের গ্লানিকর বৃত্তান্ত। লক্ষ্মীর ভ্রাতা উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যখন সূর্য্যপুত্র রেবন্ত আসিতেছিলেন, তখন অশ্ব ও অশ্বারোহীর প্রতি একান্তে দৃষ্টিপাত করিতে লক্ষ্মী নারায়ণ কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইলেন। লক্ষ্মীকে অশ্বীরূপ ধারণ করিতে হইল। তাহার পর অশ্বরূপী বিষ্ণুর ঔরসে তাঁহার পুত্র হয়। অশ্বরূপধারণের কাহিনীটি বৈদিক সূর্য্য-সরণ্যু বা পৌরাণিক সূর্য্য-সংজ্ঞার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত। বৈদিক সূর্য্য ও বৈদিক বিষ্ণু একই দেবতা। পুরাণের যুগেও বিষ্ণু ও সূর্য্য উভয়েই আদিত্য। সুতরাং দেবী-ভাগবতের কাহিনীটি রচনা করিতে বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। তাহার পর মহাদেব যে লক্ষ্মীর শাপমোচন করিলেন, তাহা দ্বারা শিবের ক্ষমতা প্রমাণের চেষ্টা হইয়াছে। দেবীভাগবতকে একখানি শাক্ত ও সেই হিসাবে শৈব পুরাণ বলা যাইতে পারে। শৈব পুরাণে শিবের মাহাত্ম্য দেখাইবার চেষ্টা যে সমগ্র কাহিনীটি রচনার কারণ, ইহাও বলা যাইতে পারে।

কোন্ কোন্ স্থলে মানব কি কি অনুষ্ঠান করিলে শ্রী তাহার গৃহে অধিষ্ঠান করেন, তাহার বিবরণ মহাভারতের লক্ষ্মীবাসব-সংবাদে আছে। সিরি কালকণ্ণী জাতকে সিরি (শ্রী)ও প্রায় তাহাই বলিতেছেন। বৌদ্ধযুগে সিরি বা সিরি-মা দেবতা একটি উপাস্য দেবী। সিরি-কালকণ্ণী জাতকে সিরি উত্তরদিক্‌পাল ধৃতরাষ্ট্রের দুহিতা; পশ্চিমদিক্‌পাল বিরূপাক্ষের দুহিতা কালকণ্ণী। কালকণ্ণীকে কথাবার্ত্তায় আমাদের অলক্ষ্মী বলিয়া মনে হয়। যেখানে লোভ, দ্বেষ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, যেখানে পরনিন্দা, মূর্খতা, ঘৃণা, সেইখানেই কালকণ্ণী বা অলক্ষ্মী। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডের এক স্থলে কালকর্ণী ও অলক্ষ্মীর একত্রে উল্লেখ আছে। পদ্মপুরাণে স্বর্গখণ্ডে আছে, সমুদ্রমন্থনকালে অলক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করেন; তাহার পর লক্ষ্মীর উদ্ভব হয়। অলক্ষ্মী বৈদিক নিঋর্তির পৌরাণিক রূপান্তর।

আমাদের দেশে ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসে লক্ষ্মীপূজা হয়। এতদ্ব্যতীত আশ্বিন মাসে পূর্ণিমায় কোজাগর লক্ষ্মীপূজা হয়। শ্যামাপূজার দিন অমাবস্যায় কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে এবং ঐ দিন কোন কোন গৃহস্থের বাড়ী প্রথমে অলক্ষ্মীর পূজা হইলে পরে অলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া লক্ষ্মীপূজা হয়।

শারদীয়া পূর্ণিমাতে যে লক্ষ্মীপূজা হয়—যাহার প্রচলিত নাম কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা—তাহা এখনও হিন্দুর নিকট একটি প্রধান পর্ব্ব। পূজনীয় স্মার্ত্ত-শিরোমণি রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া এই তিথির করণীয় কার্য্যের বিধান দিয়া গিয়াছেন। কোজাগর-পূর্ণিমাতে লক্ষ্মী ও ঐরাবতস্থিত ইন্দ্রের পূজা এবং সকলে সুগন্ধ ও সুবেশ ধারণ করিয়া অক্ষক্রীড়া করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে; কারণ, নিশীথে বরদা লক্ষ্মী বলেন, "কে জাগরিত আছে? যে জাগরিত থাকিয়া অক্ষক্রীড়া করে, তাহাকে আমি বিত্ত প্রদান করি। নারিকেল ও চিপিটকের দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিবে এবং বন্ধুগণের সহিত উহা ভোজন করিবে।" যে নারিকেলের জলপান করিয়া অক্ষক্রীড়ায় নিশি অতিবাহিত করে, লক্ষ্মী তাহাকে ধন দান করিয়া থাকেন।

আশ্বিন-পূর্ণিমায় এই কোজাগর লক্ষ্মীপূজা একটি বহু প্রাচীন উৎসবের সহিত জড়িত। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে শরৎকালে শস্য কর্ত্তন হইলে সীতা-যজ্ঞ হইত এবং তাহাতে সীতা এবং ইন্দ্র আহূত হইতেন। পারস্কর-গৃহ্যসূত্রে এই স্থানে সীতাকে ইন্দ্রপত্নী বলা হইয়াছে; কারণ, সীতা লাঙ্গলপদ্ধতিরূপিণী শস্য-উৎপাদয়িত্রী ভূমিদেবী; ইন্দ্র বৃষ্টি-জলপ্রদানকারী কৃষিকার্য্যের সুবিধাদাতা দেব। পূর্ব্বে সীতা-যজ্ঞে ইন্দ্র আহূত হইতেন বলিয়া তিথিতত্ত্বে কোজাগর-পূর্ণিমায় ইন্দ্রের পূজার বিধি আছে। লক্ষ্মী যে সীতার রূপান্তর, তাহা রামায়ণাদি গ্রন্থে বার বার বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও লক্ষ্মীর যে-মূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, লক্ষ্মীর হস্তে ধান্যমঞ্জরী। তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর একটি ধ্যানে লক্ষ্মীর হস্তে শালিধান্যের মঞ্জরী। এখনও লক্ষ্মীপূজার সময় কাঠায় ভরিয়া নবীন ধান্য দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীসূক্তে লক্ষ্মী হিরণ্যবর্ণা, আবার পদ্মবর্ণা বলিয়া বর্ণিতা। তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর ধ্যানে দেবী বালার্কদ্যুতি, সিন্দূরারুণকান্তি, সৌদামিনী-

সন্নিভা। তিনি নানালঙ্কারভূষিতা। তিথিতত্ত্বে আদিত্যপুরাণ হইতে লক্ষ্মীর যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে তিনি গৌরবর্ণা। তাঁহার হস্তসংখ্যা এবং হস্তে তিনি কি কি ধারণ করিয়া থাকিবেন, এই দুইটি বিষয়ে অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। দেবী কোথাও দ্বিহস্তা, কোথাও বা চতুর্হস্তা, কোথাও বা তিনি ষড়্‌ভুজা বা অষ্টভুজা। আবার এক স্থানে মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজারূপে কল্পিত হইয়াছেন। এই মহালক্ষ্মী মহাকালীমূর্ত্তির অনুরূপ বিকাশ। কোন কোন স্থলে লক্ষ্মীপূজায় যে বলিদানের বিধি আছে, তাহা বোধ হয় এই মহালক্ষ্মীর পূজা।

তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত আদিত্যপুরাণ অনুসারে লক্ষ্মীর হস্তে পাশ, অক্ষমালা, পদ্ম ও অঙ্কুশ। লক্ষ্মীর প্রত্যেক মূর্ত্তিকল্পনাতেই হস্তে পদ্ম থাকে। কোন কোন মূর্ত্তিতে হস্তে বসুপাত্র (রত্নপূর্ণ পাত্র) স্বর্ণপদ্ম ও মাতুলুঙ্গ (লেবু) থাকে। কমলার হস্তধৃত লেবুই কমলা-লেবু নামে অভিহিত হইয়াছে কি না, তাহা বলা যায় না। অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মীর হস্তে যথাক্রমে অক্ষ, স্রক্, পরশু, গদা, কুলিশ, পদ্ম, ধনু, কুণ্ডিকা (কমণ্ডলু) দণ্ড, শক্তি, অসি, চর্ম্ম, জলজ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শন (চক্র)। শুক্রনীতিসার অনুসারে লক্ষ্মীর এক হস্তে বীণা, দুইটি হস্তে বর এবং অভয়মুদ্রা থাকিবে। তথায় আর-একটি হস্তে লুঙ্গফলেরও উল্লেখ আছে। লুঙ্গফল সম্ভবতঃ মাতুলুঙ্গ। মূর্ত্তিবিশেষে দেবীর এক হস্তে শ্রীফল থাকিবে, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীফল সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক কাহিনী আছে যে, একদা শিব-পূজাকালে একটি পদ্মের অভাব ঘটায় লক্ষ্মী মুকুলিত পদ্মসদৃশ আপনার একটি স্তন কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। মহাদেবের বরে তাহাই বিল্ব বা শ্রীফল হয়। মৎস্যপুরাণে বর্ণিত লক্ষ্মী-মূর্ত্তির হস্তে পদ্ম ও শ্রীফল। এইটি গজলক্ষ্মীমূর্ত্তি। দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা, দুইটি হস্তী দেবীর উপর জলবর্ষণ করিতেছে।

বিষ্ণুমূর্ত্তিসহ যে লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা দ্বিহস্তবিশিষ্ট। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়' নামক পুস্তিকা হইতে জানা যায় যে, বাসুদেব, ত্রৈলোক্যমোহন, নারায়ণ প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তিতে লক্ষ্মীমূর্ত্তিও আছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ-মূর্ত্তিতে দেবী নারায়ণের বাম অঙ্কের উপর উপবিষ্ট এবং কোন কোন স্থলে তাঁহারা হস্ত দ্বারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নিপুরাণ হইতে জানা যায়, লক্ষ্মী বরাহরূপধারী বিষ্ণুর পদতলে উপবিষ্টা থাকেন। অনন্তশায়িনী বিষ্ণুমূর্ত্তিতে বিষ্ণু নাগের উপর শয়ান এবং লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। অগ্নিপুরাণের হরিশঙ্কর-মূর্ত্তিতে নারায়ণ জলশায়ী অবস্থায় বামপার্শ্বে শয়ান। ইহাঁর শরীরের এক অংশ রুদ্র (মহাদেব)-মূর্ত্তি এবং অপর অংশ কেশব (বিষ্ণু)-মূর্ত্তির লক্ষণযুক্ত এবং মূর্ত্তিটি গৌরী ও লক্ষ্মীমূর্ত্তিসমন্বিত। ভারতবর্ষে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও তাহাদিগের উপাস্য দেব-দেবীগণের মধ্যে ঐক্য-সম্পাদনের চেষ্টা ছিল। সেই সেই চেষ্টার ফলে হরিশঙ্কর মূর্ত্তি ও মহালক্ষ্মী মহাকালী মহাসরস্বতীমূর্ত্তি।

চিত্রে লক্ষ্মীর বাহন পেচক দেখা যায়। ইহার কারণ ঠিক বলা যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী অনুসারে দেবগণের যে বাহন, তাঁহাদের শক্তিরূপিণী দেবীগণেরও সেই বাহন। সুতরাং বৈষ্ণবীর বাহন গরুড়; সেই হিসাবে লক্ষ্মীর বাহন গরুড় হওয়া উচিত ছিল। পেচককে গরুড়ের স্ত্রী-সংস্করণ বলিয়াই বোধ হয়। এথেন্সের পুরলক্ষ্মী বা রক্ষয়িত্রী এথেনা দেবীর প্রিয় পক্ষীও পেচক।

দেবী-ভাগবতে আছে যে, লক্ষ্মী নানা মূর্ত্তিতে নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন। স্বর্গধামে তিনি স্বর্গলক্ষ্মী, এই লক্ষ্মীর অভাবে ইন্দ্র শ্রী-ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রাজভবনে তিনি রাজলক্ষ্মী, এইজন্যই পরমভাগবত গুপ্তরাজগণ মুদ্রায় লক্ষ্মীচিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আর মর্ত্ত্যলোকে তিনি গৃহলক্ষ্মী—এই মূর্ত্তিতে তিনি এখনও হিন্দুগৃহে বিরাজ করিতেছেন।

(মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ)

শ্রী ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়

—

ময়মনসিংহের মেয়েলী সঙ্গীত

মেয়েলী সঙ্গীত অসংখ্য। সেই-সব সংখ্যাহীন গীতাবলী আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, পূজার মাল্‌সী, ব্রতের গীত, প্রাতঃস্নানের গান, বিবাহের গীত, সহেলা, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়নের গীত, স্নান-কামানের গীত, বর-বধূর যাত্রার গীত, পঞ্চামৃত, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণের গীত, বরশয্যার গীত, ইত্যাদি বহুবিধ গীত মেয়েলী সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া, সীতা-সাবিত্রী শ্রীরাধিকার বারমাসী, রামের বনবাস, নিমাইয়ের সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ।

নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার গায়িকা স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহারা উপযুক্ত-মত বেতন লইয়া বিবাহাদি উৎসবের বাড়ীতে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাৎসল্য-রস-সংপৃক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাই সেই কীর্ত্তনের বিষয়। ইহাকে "খেলাকীর্ত্তন" বা "গোপিনী কীর্ত্তন" বলে। এই গোপিনী বা খেলা-কীর্ত্তন মেয়েলী সঙ্গীত।

ভাটি অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা "ধামালি" বা "ধামাইল" বলিয়া একপ্রকার গীত গাইয়া থাকেন; সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিরচিত রূপানুরাগের পদ। শ্রীকৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গই "ধামাইল" গীতের বিষয়।

দশ, পনর, কি বিশ-পঁচিশ জন স্ত্রীলোককে মুক্ত প্রাঙ্গণে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া, তালে তালে করতাল দিয়া নাচিয়া নাচিয়া ধামালি গাইতে হয়। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে "ধামালি" গাইতে দেখা যায় না। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি "ধামাইল" লিখিয়া দিতেছি।

"গৌর বরণ, রূপের কিরণ, লাগল নয়নে।
(লাগল নয়নে সজনী, লাগল নয়নে)॥
আমার গৌর অপরূপ, কোটি-মন্মথ-স্বরূপ,
সজনী, কখন চক্ষে দেখি না এরূপ,
গোরা আড়-নয়নের চাউনি দিয়ে পরাণ ধরিয়া টানে।
যদি গৌর কুল পাই, আমার এই কুলের কাজ নাই,
সজনি, তিন কড়ার মূল্য কুলে দিলাম ছাই,
আমি গৌর কুলে কুল মিশায়ে, সজনি, র'ব্বো রব তাঁর চরণে।
ভেবে জয়মঙ্গলে কয়, আমার গৌর রসময়,
সজনি, রসে মাখা তনুখানি হয়,
গোরার রসে ডুবুডুবু আঁখি, একদিন চেয়েছিল আমার পানে।"

মেয়েলী সঙ্গীত গীতি-সাহিত্যের প্রায় অর্দ্ধাংশই সরস করিয়া রাখিয়াছে। এই-সমস্ত গীতাবলী কাহার রচিত, তাহার কোন নামের ভণিতা নাই। তবে যে-সকল পুরুষের গান মেয়েরা আপনার করিয়া লইয়াছেন, এবং বৈষ্ণব-কবি-রচিত যে-সকল পদাবলী মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে, তাহার দু-একটিতে রচকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতগুলি পল্লীর স্ত্রীকবি কর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব পদাবলী এবং পুরুষের গান বাছিয়া পৃথক্ করিয়া লইলেও, খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত সংখ্যায় অল্প হইবে না। হিন্দুধর্ম্মের যাবতীয়

শুভানুষ্ঠানেই মেয়েলী সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। কতকগুলি গীত বিধ্যুক্ত মন্ত্রের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। সেগুলি না গাইলে নয়; নচেৎ শুভকার্য্য অঙ্গহীন হইয়া যায়।

যদিচ মেয়েলী সঙ্গীতের অনেক স্থলে বর্ণ-মিত্রতার অভাব কিম্বা রচনা সৌন্দর্য্যশূন্য, তথাচ স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইয়া রাগিণীর মধুরতায় গীতগুলি মধুর হইতেও সুমধুর হইয়া উঠে, ভক্ত ভাবুকের নয়নাশ্রু আকর্ষণে সমর্থ হয়, হৃদয়ের পরতে পরতে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-বৈচিত্র্যের প্লাবন খুলিয়া দেয়, মানুষকে টানিয়া আর-এক রাজ্যে লইয়া যায়।

মেয়েলী সঙ্গীতের ভাষা ও রচনা বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ভাষা-রচনার মত উজ্জ্বল না হইলেও স্বাভাবিক কবিত্বের স্ফুরণ-শূন্য নহে। প্রাচীন পল্লীভাষায় রচিত মেয়েলী সঙ্গীতসমূহ ভাষা-দোষ-দুষ্ট না হইয়া বরঞ্চ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যে সমধিক উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বাংলা-সাহিত্যের একটি অঙ্গ বলিয়া এই গীত-রত্নগুলি বাণী ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য।

বিবাহের গীতের মধ্যে গালি দেওয়ার একরকম গীত আছে। সেই গালির গীতে এবং বিবাহের কোন কোন গীতে অল্পাধিক পরিমাণে অশ্লীলতার ভাঁজ আছে। বিবাহ-বাড়ীতে পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষীয় আত্মীয়-স্বজনের উপরেই অল্পাধিক পরিমাণে গালি বর্ষিত হইয়া থাকে। আগন্তুক নাপিত ধোপা, এমন কি, পুরোহিত ঠাকুরকে পর্য্যন্ত ভাগ লইতে হয়। নাপিত, বর কিম্বা বধূকে কামাইতে বসিল, মেয়েরা গান ধরিলেন,—

"আমার সোনার চাঁদকে কামাইতে
নবদ্বীপের নাপিত আইসাছে।
হাত ভালা কামাও নাপিত, হাতের দশ নৌখ রে।
পাও ভালা কামাও নাপিত, পায়ের দশ নৌখ রে।
মুখ ভালা কামাও নাপিত, পূর্ণমাসীর চান্দ রে।
মাথা ভালা কামাও নাপিত, ডাব নারিকল রে।
ভালা কইরা কামাইলে, পাইবে জমী বাড়ী রে।
ভালা না হইলে নাপিত, খাইবে জুতার বাড়ি রে।"

পুরোহিত নান্দী-মুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করাইতে যেই বসিলেন,—অমনি মেয়েরা গীত ধরিলেন,—

"বাছাই নান্দীমুখ করে,—শুভ কার্য্য করে।" ইত্যাদি। এই গীতটি গাইয়াই ধরিলেন বামুনকে,—

"উন্দ্‌রা বান্দ্‌রা বামুন রে, কত কলা লাগে রে,
যত কলা লাগে রে, দিব জামাইর মায়েরে।" ইত্যাদি।

পূজার মালসী গীত হইবার সময় আজকাল মধ্যে মধ্যে আমরা অন্দর-মহল হইতে কবিওয়ালাদের ডাকসুর এবং স্বর্গীয় সাধক কবি রাম-প্রসাদের গলা শুনিতে পাই।—

"কালিকে, ওমা ভব-পালিকে, বাঙ্গালীকে নিও না আসাম।
তুমি আদ্যাশক্তি, ভগবতী,
সন্তানের প্রতি হইও না বাম॥" ইত্যাদি।
"মা, মা, বলে' আর ডাক্‌ব না।
ছিলাম গৃহবাসী, বানাইলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ আউলাকেশী,—
দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা মৈলে কি তার ছেলে বাঁচে না॥" ইত্যাদি।

জল-ভরার গীতে বৈষ্ণব কবিদের প্রাচীন রূপানুরাগের পদই অধিক। আধুনিক পল্লীকবিদেরও রসাল অনেক পদ জল-ভরায় স্থান পাইয়াছে। যথা,—

"গৌররূপ লাগিল নয়নে।
আমি কুক্ষণে চাহিয়াছিলাম গো,—
গৌরচান্দের পানে॥
কলসীতে নাই রে পানী, আমি গিয়াছিলাম সুরধনী,
গৌর কেবা না শুনি শ্রবণে।
একদিন জলের ঘাটে দেখে তারে মরেছি পরাণে॥
গৌর থাকে রাজপথে,—
তোমরা কেও যাইও না জল আনিতে গো,
দেখ্‌লে তারে মরিবে পরাণে,
শেষে আমার মত ঠেক্‌বে লোবা,
গোপালচান্দে ভণে॥" ইত্যাদি।

এগুলি খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীত নহে। খাঁটি মেয়েলী সঙ্গীতসকল বহুকাল পূর্ব্ব হইতে পূজার ব্রতে সহেলায় ও বিবাহাদিতে মন্ত্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। তাহার কোন পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন নাই, একসুরে একটানে চলিয়াছে।

কার্ত্তিক পূজার গীতের বয়স নির্ণয় করা অসাধ্য। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সুরে যে ভাষায় চলিয়া আসিতেছে, এখনও সেইরূপই আছে। যথা,—

"বুলে আরে কার্ত্তিক যাইবাইন,
অভিলাসে এরো, কে কে যাইবা।
সঙ্গে লো ঠমকী রাধা, কে কে যাইবা।
ঘর থাক্যা রামের পিসী বুলে –
আমি এরো আমি যাইবাম সঙ্গে লো,
ঠমকি রাধা, আমি যাইবাম॥" ইত্যাদি।

সন্ধ্যার সময় হইতে আরম্ভ হইয়া পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত সারা রাত্রি ভরিয়া নানারকমের গীত কার্ত্তিকপূজায় গীত হয়। নমুনা-স্বরূপ একটা বাঘের গীত লিখিয়া দিতেছি—

"বাঘা কান্দে রে, বাঘুনীর লাগিয়া, বাঘা কান্দে রে।
বাঘা বুলে বাঘুনী এই না পথে যাইও।
নবীনের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও॥'

এইরূপ 'হারুর গরু দেখ্যা, রামনাথের গরু দেখ্যা ছেলাম জানাইও।' অর্থাৎ ব্রতে যতজন মেয়েলোক থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বাটীস্থ একজনের নামোল্লেখ করিতে হইবে। নতুবা বাঘ রাগ করিয়া গরু মারিয়া ফেলিবে।

এই-সকল প্রাচীন মেয়েলী সঙ্গীতের ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্বের অস্পষ্ট রেখাপাত আছে। প্রাচীন কালে ময়মনসিংহ যে জঙ্গলময় ছিল, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর উৎপাতও যে বেশী ছিল, প্রাগুক্ত বাঘের গীতে তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। এখনও রাখালেরা বাড়ী বাড়ী মাগিয়া "বাঘের ব্রত" করে।

বিবাহের একটি গীতে কন্যা পণ-প্রথার প্রমাণ দিতেছে।

"তোর বাপে লো কন্যা বড় দুঃখু খৈছে,
বড় দুঃখু খৈছে;—তোরে জুক্যা লো কন্যা
টাকা বাটা লৈছে।
তোর টাকা রে কুমার, তোর সঙ্গে আইছে;
তোর সঙ্গে আইছে।
আমার বাপে রে কুমার, দেশের বেবার লইছে।
তোর বাপে লো কন্যা, বড় দুঃখু খৈছে,
বড় দুঃখু খৈছে।
তোরে জুক্যা লো কন্যা শঙ্খ-শাড়ী লইছে॥
তোর শঙ্খ-শাড়ী রে কুমার, তোর সঙ্গে আইছে।

তোর সঙ্গে আইছে।
আমার বাপে রে কুমার, দেশের বেবার লইছে ॥"

ময়মনসিংহের ছোট ছোট বালিকারাও পুতুল-বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের অনেক গীত শিখিয়া ফেলে। এবং মধুর কণ্ঠে অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় গাইয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলে। বধূ-পুতুলটিকে পাল্কীতে তুলিয়া উলুধ্বনি পূর্ব্বক বালিকারা গলাগলি দাঁড়াইয়া গাহিতেছে,—

"পুৎলা যাও গো জামাইর ঘরে।
তিন দিন ধইরা আইছুন জামাই,
রইছুইন ফুলের তলে ॥
ফুলের তলে ঝামুর ঝুমুর, কলার তলে বিয়া,
কইত্যা আইছুইন ছাওয়াল জামাই,
মড়ুক মাথাত দিয়া ॥
আদরে আদরে বাবা,—আগে দিছ বিয়া।
এখন কেনে কান্দ বাবা, গামছা মুখ দিয়া ॥"

বসন্তকালে স্ত্রীলোকেরা বসন্ত রায়ের ব্রতের পূর্ব্বে, সপ্তাহ কাল "উত্তম" পূজা করিয়া থাকেন; আমাদের নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণই "উত্তম"। তাঁহারই আর-এক নাম "বসন্তরায়"।

বসন্তকালের অপরাহ্ণ বেলায় কুমারী কন্যাগণ দ্রোণ ধুস্তুর পলাশ মন্দার ভাণ্ডীর প্রভৃতি নানা জাতীয় বাসন্তী কুসুমে ডালা সাজাইয়া লইয়া বিল্ব কদম্ব নিম্ব অভাবে অন্য কোন বৃক্ষমূলে সন্ধ্যাকালে উত্তমের পূজা করেন। ফুলের ডালায় ছোট ছোট মাটির ঢেলা এবং ধান্য দুর্ব্বাও থাকে। কুমারীরা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ফুল ঢেলা এবং ধান্য দূর্ব্বা উত্তমোদ্দেশ্যে বৃক্ষমূলে দিয়া প্রণাম করেন। উত্তম পূজার মন্ত্র যথা,—

"উত্তম ঠাকুর ভালা। আমি কালা।
উত্তম ঠাকুর ভালা। ঠাকুর-দাদা কালা ॥
উত্তম ঠাকুর ভালা। আমার বাবা কালা ॥" ইত্যাদি।

বাটীস্থ ভাই ভগিনী পিতা মাতা সকলকেই 'কালা' বলিতে হয়। কেবল উত্তম ঠাকুর কাল হইয়াও ভাল।

পূজা সমাপন করিয়া মেয়েরা সেই পূজিত বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া গীত ধরেন,—

১। "কে তুল রে ফুল রাজবাড়ীর মাঝে।
ঠাকুর-বাড়ীর ঝী গো আমি ফুলের অধিকারী।
(কে তুল রে ফুল,)
আগা ধইরা তুল ফুল, মাঝে ভ্যাঙ্গা পড়ে।
(কে তুল রে ফুল,)
সাজি ভইরা তুলে ফুল, খোপা ভইরা পরে।
(কে তুল রে ফুল)
সাত ভাইয়ের বইন গো আমি,
ফুলের অধিকারী। (কে তুল রে ফুল)।"

২। "কুঞ্জের মাঝে কে রে, কুঞ্জের মাঝে কে?
নন্দের ছাইলা কালাচান্দ কৃষ্ণ এসেছে ॥
এক দেউরী দুই দেউরী তিন দেউরীর পরে।
তিন দেউরীর পরে গিয়া পাইলাম ঠাকুরের লাগ রে ॥
(কুঞ্জের মাঝে কে?)
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইলাইন একটুক্ পান।
রাধিকারে দেখইন ঠাউক্ রে পুন্নমাসীর চান ॥
(কুঞ্জের মাঝে কে?)
কুঞ্জে গিয়া ঠাকুর কৃষ্ণ খাইল একটুক্ গুয়া।
রাধিকারে দেখইন্ ঠাউক রে পিঞ্জরের সুয়া ॥
(কুঞ্জের মাঝে কে?)।"

বসন্তরায়ের ব্রতের গীত আর অতিসার ব্রতের গীত প্রায়ই একই রকম। ঠাকুরের নিকট দৈন্যোক্তিই অধিক।

"খোপের কৈতর,—উয়াপে খাইল,—
ঠাকুর অতিসার,—কি দিয়া পূজিব?
গাছের কলা,—বাদুড়ে খাইল,—
ও ঠাকুর অতিসার, কি দিয়া পূজিব?
আউটার দুধ,—বিলাইয়ে খাইল,—
ঠাকুর অতিসার, কি দিয়া পূজিব?।" ইত্যাদি।

(সহেলা বা সই পাতার গীত।)

১। চলিলা কমলা গো—সহেলা পাতিবারে।
চিড়া-গুড়া লৈল কমলা,—ডাইলারে ভরিয়া ॥
কলা চিনি লৈল কমলা, পাইলারে ভরিয়া।
পান গুবারী লৈল কমলা - বাটারে ভরিয়া ॥
পুষ্প দূর্ব্বা লৈল কমলা,—সাজিরে ভরিয়া।"

২। "লঙ্গ-ফুলের মালা রে বেদনী সইয়ের গলে।
সীথার সিন্দুর বদল করে,—তানা দুইয়ে সইয়ে।
হাতের শঙ্খ বদল করে, তানা দুইয়ে সইয়ে।
আয়না কাকই বদল করে, তানা দুইয়ে সইয়ে ॥"

(বন-দুর্গাপূজার গীত।)

"ভক্তিভাবে পূজিবাম তোমারে গো,—
বন-দুর্গা,—(ভক্তিভাবে,—)
হংস কৈতর দিবাম, জুলুঙ্গা ভরিয়া গো,
বন-দুর্গা,—(ভক্তিভাবে,—) ইত্যাদি।"

১। (পূজার মালসী।)
"কহে শম্ভু সেনাপতি,
রণে ভঙ্গ দিও না—
বধিলে ত ব্রহ্মময়ী,—
ভবে জন্ম আর হবে না।

(দেবীর প্রতি।)

দুর্গে দুর্গে, ওমা দুর্গে, তারিণী দুঃখহারিণি
বনের মধ্যে কর যুদ্ধ, আউলাইয়া মাথার (:
কৈ যাও গো মা কৈলাসেশ্বরী—
ত্যাজ্য কইরে কৈলাসপুরী
কি ভাইবে মা ভববাণী,
চলেছ গো একাকিনী।
জানি জানি ওমা তারা,
তুমি শিবের নয়নতারা,—
তোমাকে হইয়ে হারা
বাঁচবে না গো শূলপাণি।"

এই গীতটি অতি সুন্দর। নাগ মুক্তারামের দুর্গা-পুরাণ হইতে পদ-ভঙ্গাবস্থায় আসিয়া মেয়েলী সঙ্গীতে মিশিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তবে "শুম্ভ" স্থলে "শম্ভু" হইয়াছে।

২। ওমা বসন পৈর। ধ্রু
বসন পৈর বসন পৈর মা গো, বসন পৈর তুমি।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা পদে দিব আমি ॥
পাতালে আছিলা মা গো, হয়ে ভদ্রকালী।
মহীরাবণ কর্ল্লো পূজা, দিয়ে নরবলি ॥
মাথায় সোনার মুকুট ঠেক্যাছে গগনে।
মা হইয়া উলঙ্গ কেন—বালকের সনে ॥

বাম হস্তে রুধির-ভাণ্ড—ডাইন হস্তে অসি।
কাটিয়া অসুরের মুণ্ড কর্চ্চ রাশি রাশি॥
জিহ্বায় রুধির-ধারা, গলে মুণ্ডমালা।
হেটমুখে চাইয়া দেখ্ মা পদতলে ভোলা॥"

৩। "দুর্গা আমার বিপদ্-বিনাশিনী।
জয়তারা তারিণী মা গো হিমালয়-নন্দিনী।
মা গো তোমার পদে করে স্তুতি, রাম রঘুমণি॥
ব্রহ্মা হৈলেন পুরোহিত, রাম হৈলেন যজমান।
কত ব্রহ্মা ভগবতীর পূজার বিধান॥
শঙ্খ লাগে, সিন্দুর লাগে, রজত কাঞ্চন।
কুমকুম্ কস্তুরী লাগে,—আগর চন্দন॥
সপ্তমী পূজিলেন ব্রহ্মা, সপ্ত উপচারে।
ভোগ নৈবিদ্যি দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে॥
অষ্টমী পূজিলেন ব্রহ্মা, অষ্ট উপচারে।
বিল্বপত্র দিলেন ব্রহ্মা,—হাজারে হাজারে॥
নবমী পূজিলেন ব্রহ্মা নব উপচারে।
মেষ-মৈষ দিলেন ব্রহ্মা, হাজারে হাজারে॥"

ময়মনসিংহ শাক্তপ্রধান স্থান। মা ভগবতীর দুয়ারে মহিষ-পাঁঠা বলি দিলে তিনি অতিশয় প্রীতিলাভ করেন। এই বিশ্বাসের বশীভূতা আমাদের গৃহলক্ষ্মীগণ সর্ব্বদাই কাহিলে কাতরে দেবীর দুয়ারে জোড়া পাঁঠা, জোড়া মহিষ মানসিক করেন। মেয়েদের এই দৃঢ় বিশ্বাসের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, ব্রহ্মাও রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবে হাজারে হাজারে মেষ মহিষ বলি দিতে বাধ্য হইলেন।

৪। বিবাহের গীত।
"শুভ ক্ষণে আনিল গৌরীরে ও কি ওরে,
ইন্দ্র ধরিল ছাতি, বেদ পড়ে প্রজাপতি,
নটেতে মঙ্গল ধ্বনি করে॥
ওকি ওরে, অন্তঃপট করি দূর, দশ বাহু করি যোড়,
প্রণাম যে করিল বিশেষে।
ওকি ওরে, তুলাতুলি সপ্তবার, জয়ধ্বনি জোকার,
মশাল জ্বলিছে চাইরে পাশে॥
ওকি ওরে, শিবের মুকুট মাথে, ফুল ছিটায় বাম হাতে,
নামাইল, ছায়া-মণ্ডপ ঘরে।
ওকি ওরে, দেখিয়া গৌরীর মুখ, শিবের মনে কৌতুক,
পঞ্চমুখে হাসে মহেশ্বরে॥
ওকি ওরে, তবে সাত পাক ফিরি, পার্ব্বতী আর ত্রিপুরারি,
রৈল পূর্ব্ব পশ্চিম মুখে।
ওকি ওরে, জিনিয়া সে কোটি ভানু দোঁহার সুন্দর তনু,
হেন রূপ দেবগণে দেখে॥"

৫। বিবাহের গীত।
"পুষ্কুর্ণীর চাইর পারে,
চাম্পা নাগেশ্বর,
ডাল ভাঙ্গ, পুষ্প তুল,
বিদেশী নাগর।
দেখা দে লো রায়ের ভগ্নী,
দেখা দে আমারে,
কত টেকার অলঙ্কারে শোভিব তোমারে?
লক্ষ টেকার গয়না হৈলে, না শোভে আমারে।
তোমার হাতের বাজু হৈলে, শোভিবে আমারে।"

৬। বরবধূর যাত্রা-সময়ের গীত।
"চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই;
মা রৈছেন্ বৌ-ঘরা পাতিয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
ভগ্নী রৈছে ময়ূর পাখা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই, আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
পিসী রৈছেন্ ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।
চল কন্যা দেশে যাই আর বিলম্বের কার্য্য নাই,
(আমার) মামী রৈছেন্ ঘৃতের বাতি লৈয়া।"

৭। বর বধূ বাড়ীতে পঁহুছিলে গীত।
"তুমি যে গেছলা রে বাছাই, নবীন শ্বশুর-দেশে,
নবীন শ্বশুর-দেশে।
তোমার শ্বশুর-শাশুড়িয়ে কি কি দান কচ্ছে?
দিছিল একটা শালের গো যোড়া,
তারে থৈয়া আইছি, তারে পৈয়া আইছি,
তোমার বধূরে লৈয়া দেশে চল্যা আইছি॥" ইত্যাদি।

কন্যাকে জামাতার সঙ্গে যাত্রা করাইয়া দিবার সময় স্ত্রী-পুরুষ সকলেই এক কূল-কিনারা-শূন্য করুণ-রসের সমুদ্রে ডুবিয়া পড়েন। তখন মেয়েরা পদ্মা-পুরাণের কবি নারায়ণদেবের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক সাহে রাজার স্ত্রী সুমিত্রার কথায় বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস নিবৃত্তি করেন।

৮। "ও ঝী গো, কেমনে বঞ্চিবা জামাইর ঘর।
বিপুলাকে কোলে করি, সুমিত্রা স সুন্দরী,
সকরুণে কান্দয়ে বিস্তর॥
সদায় ঘুমের ভুলা, ভাল মন্দ না বুঝিলা,
(ও ঝী গো,) জামাই তোমারে যাবে লইয়া।
সাত পুত্র আছে মোর, রূপে গুণে বিদ্যাধর,
তাতে মোর নাহি এত দয়া॥
পদ্মা সনে যার বাদ, জীবনের নাহি সাধ,
কেমনে রব বুকে পাষাণ দিয়া।
নিশিকালে নিদ্রা যাইও, সকালে মা জাগিও.
গুরুজনে সেবিও মন দিয়া॥
শতেক বৎসর জীও, সাত পুত্রের মা হইও,
পাকা চুলে পরিও সিন্দূর।
মানিও স্বামীর কথা, না করিও অন্যথা,
কইও কথা অতি সুমধুর॥
(বিপুলার উক্তি।)
(মা গো) সাত ভাই কুশলে রউক, বাপের কল্যাণ হউক,
(মা গো) তুমি থাকো জন্মের আয়োরাণী।
যদি সে কান্দহ মাও, আমার মস্তক খাও,
(মা গো) কন্যা হৈলে হয় পরাধিনী॥"

এই গীতটি গাইবার সময় গায়িকা স্ত্রীগণের এবং অপরাপর পুরুষ সকলের মুখই বাৎসল্যের অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া পড়ে।

৯। বর-বধূর পাশা-খেলার গীত।
"আজু কি আনন্দ! ধ্রু
কি আনন্দ হৈল আজু রস-বৃন্দাবনে।
মদনমোহন খেলে পাশা, মনমোহিনীর সনে॥ ইত্যাদি

১০। একটি জল-ভরার গীত।
"তোমরা দেখ্ছনি সজনী সই জলে।
মদনমোহন, বংশীবদন, কদম্বেরি তলে॥" ইত্যাদি

(সৌরভ, অগ্রহায়ণ) শ্রী বিজয়নারায়ণ আচার্য্য

রামায়ণে রত্নের ব্যবহার

রামায়ণে রাজগৃহাদির, পোষাক-পরিচ্ছদের, তৈজস-পত্রের ও অন্যান্য বর্ণনায় নানা প্রকারের রত্নাদির উল্লেখ আছে।

রামায়ণে নিম্নলিখিত রত্নগুলির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহা-নীলমণি, ইন্দ্রনীল, বারিসম্ভব মণি, নীলকান্ত, পদ্মরাগ, বিদ্রুম (প্রবাল), বৈদূর্য্য, মরকত, মুক্তা, স্ফটিক, বজ্রমণি বা হীরক, শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণ শিলা ইত্যাদি।

তখন ইন্দ্রনীল নামক মূল্যবান্ প্রস্তর খোদিয়া শিল্পীরা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিত। অযোধ্যার রাজপথের পার্শ্বে পার্শ্বে ইন্দ্রনীল-প্রস্তরের মূর্ত্তি (Statue) স্থাপিত ছিল।—তত্রেন্দ্রনীল-প্রতিমা প্রতোলীবর-শোভিতাঃ॥ ১৮।২।৮

রাবণের পুষ্পক রথে মূল্যবান্ ইন্দ্রনীল ও মহানীল-নির্ম্মিত বেদিকা ছিল।—ইন্দ্রনীল-মহানীল-প্রবর-বেদিকাম্। ১৬।৫।৯

সীতা রামের যে-চূড়ামণি সযত্নে অভিজ্ঞান স্বরূপে রাখিয়াছিলেন, সেই চূড়ামণিটি ছিল—'বারিসম্ভবঃ' অর্থাৎ সমুদ্ররত্ন (সু ৪০-৮ শ্লোক)।

রাম-ভবনের দ্বারসমূহ ছিল—প্রবাল ও মণি-মুক্তা খচিত।—মণি-বিদ্রুম-তোরণম্...মুক্তামণিভিরাকীর্ণং।

রাবণের রথখানাও ছিল—হেমজাল-বিততং মণি-বিদ্রুম-ভূষিতম্। ৩।৬।১১

রাবণের সিংহাসনগুলির কোন-কোনটি ছিল বৈদূর্য্যমণি খচিত, কোনটি বা ছিল মরকতময়। (ল ১১)

রাবণের শয্যাগৃহের পর্য্যঙ্কটি বৈদূর্য্য মণির সহিত হস্তীদন্তের সমাবেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দান্ত-কাঞ্চন-চিত্রাঙ্গৈর্ বৈদূর্য্যৈশ্চ বরাসনৈঃ। ২।৫।১০

আজকাল যেমন হীরক অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়, রামায়ণের যুগেও তাহা সেইরূপে ব্যবহৃত হইত। হীরক-খচিত অলঙ্কার (সু ১০), হীরক-খচিত বর্ম্ম (ল ৭০) প্রভৃতির উল্লেখ রামায়ণে আছে। লঙ্কার রাজপ্রাসাদগুলিও বজ্রমণিতে বা হীরকখণ্ডে শোভিত ছিল।—বজ্র-বৈদূর্য্য-চিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈদৃষ্টিমনোরমৈঃ। ৮।৪।৫৫

লঙ্কার চতুর্দ্দিকে যে স্বর্ণপ্রাচীর ছিল, সেই স্বর্ণপ্রাচীরও ছিল—মণি-বিদ্রুম-বৈদূর্য্য-মুক্তা-বিরচিতান্তরম্। ১৪।৬।৩

স্ফটিকের ব্যবহার লঙ্কায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। স্ফটিক কাঁচ নহে। প্রাচীনকালে কৈলাশ পর্ব্বতে, বিন্ধ্য পর্ব্বতে ও লঙ্কাদ্বীপে স্ফটিক উৎপন্ন হইত। কৈলাশ পর্ব্বতে শুভ্রস্ফটিক ছিল, দুই নামে পরিচিত—সূর্য্যকান্ত মণি ও চন্দ্রকান্ত মণি। সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে যে প্রস্তর-মণি হইতে অগ্নি নির্গত হইত, তাহার নাম ছিল সূর্য্যকান্ত মণি; আর চন্দ্রকিরণসম্পাতে যাহা হইতে বারি নিঃসৃত হইত তাহার নাম ছিল—চন্দ্রকান্ত মণি। কৈলাশ পর্ব্বত এইরূপ মূল্যবান্ স্ফটিকের জন্মস্থান হেতু এখনও তাহা স্ফটিকাচল বলিয়া পরিচিত।

লঙ্কার প্রাসাদ, চৈত্য, দেবায়তন—সমস্তই ছিল স্ফটিকপ্রভাবে প্রভাবিত। লঙ্কার অনেক তৈজস-পত্রও স্ফটিকনির্ম্মিত ছিল। মণিময় স্ফটিক পানপাত্রের উল্লেখ লঙ্কার বর্ণনায় আছে (সু ১০)। স্ফটিক খোদিয়াই বোধ হয় এই-সকল পাত্র প্রস্তুত করা হইত এবং তাহাতে মণিমুক্তা বসান হইত।

(সৌরভ, অগ্রহায়ণ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

—

জৈন তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধদেব

জৈনদের তীর্থঙ্কর শ্রেণীর চতুর্ব্বিংশতিতম ও শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান বা মহাবীর স্বামী।

বুদ্ধদেব পঞ্চবিংশতিতম ও শেষ বুদ্ধ।

পার্শ্বনাথ স্বামীর মতাবলম্বী সন্ন্যাসীদের নিগন্থ (নির্গ্রন্থ, গ্রন্থিহীন, বন্ধনহীন) বলিত ও গৃহস্থদের শ্রাবক বলিত। এই সম্প্রদায় ঋষভ দেব স্থাপন করেন। পার্শ্বনাথ স্বামীর সময় খৃঃ পূঃ ৮৭৮—৭৭৮।

বর্দ্ধমান স্বামী ও বুদ্ধদেব প্রায় সমসাময়িক।

	বুদ্ধদেব	বর্দ্ধমান স্বামী
জন্ম	খৃঃ পূঃ ৫৫৭	৫৯৯ (চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী)
দীক্ষা	৫২৭-৫২৮	৫৭০ (অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা দশমী)
জ্ঞানলাভ	৫২১	৫৫৭ (বৈশাখ শুক্লা দশমী)
মোক্ষ	৪৭৭	৫২৭ (কার্ত্তিক অমাবস্যা)

বর্দ্ধমান স্বামীর মোক্ষ-বৎসরে বুদ্ধদেব গৃহত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অনেক সিদ্ধান্ত একই প্রকার, কিন্তু কোন কোন স্থানে মারাত্মক প্রভেদ আছে। ঐ প্রভেদ কালের প্রভেদ বা সংস্কার।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী, পৌষ) শ্রী অমৃতলাল শীল

ঘরে

ঘরে হেরি চলিয়াছে বঞ্চনার পালা,—
প্রত্যেক বাঙ্গালী-নারী হতেছে বঞ্চিত।
শিক্ষা নাই—স্বাস্থ্য নাই; হৃদয়ের জ্বালা
অহরহ পলে-পলে হতেছে সঞ্চিত।

হে নবীন, ঘরে নাই যাহা তুমি চাও,
সেথা আছে অজ্ঞতার অভিশাপরাশি।
আজি বৃথা দ্বারে দ্বারে সাম্যগান গাও—
বুঝিবে না একবর্ণ তব পিসী-মাসী।

সে দোষ ত কারো নহে; তোমারি সে দোষ।
তোমাদের মুখ চাহি' তারা রহে বাঁচি'।
সব দ্বার দেছ রুধি'—করে নাই রোষ—
বলেছে সন্তোষভরে, 'মোরা বেশ আছি'।

আর কত ইহাদের রাখিবে ঠকায়ে?
রাত্রি গেছে—রৌদ্র ওই এসেছে ঘনায়ে।

শ্রী হেমচন্দ্র বাগচী

মরা-মা

ঘুমিয়েছিলাম বড্ড গভীর ঘুমের ঘোরে,
শ্মশান-ঘাটে নদীর দিকে শিয়র করে'।
ঘুমিয়েছিলাম মিশিয়ে গিয়ে মাটির সনে,
জলের ছলচ্ছলধ্বনির কলস্বনে।
দুপুর-রাতে সেই শাড়ী আর সেই সিঁদুরে
জেগে উঠে হঠাৎ শুনি কান্না দূরে!
মেয়ে কাঁদে—আমার নন্দরাণীর গলা—
কী যে করুণ কাতর স্বরে,—যায় না বলা!
"মাগো আমার, আজকে রাতে আয় না মাগো,
একলা আছি কেউ কাছে নেই, দেখে যাগো!
কেউ করে না—একটু এসে আদর কর,
আর-একটা যে মা এয়েছে নতুনতর!
অন্ধকারে একলা শুয়ে ভয় যে করে!
নেই বিছানা—হয় না যে ঘুম মাটির 'পরে।
পেট জ্বলে যে দিনে-রাতে ক্ষুধায় মরি—
কেমন করে' বল্না মাগো ঘুমিয়ে পড়ি?"
অসাড় অঘোর ঘুমিয়েছিলাম মরণ-ঘুমে—
কান্না শুনে ঘুম যে ভাঙে শ্মশান-ভূমে!

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে—
ঘুমিয়েছিলাম,—আবার দেখি নয়ন খুলে'
আঁধার ধরা,—চাঁদের মুখে রক্ত কেন?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদ্‌ছে যেন!
গেলাম হেঁটে শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে',
বাড়ীর ভিতর এলাম শেষে খিড়কী খুলে—
ঘরটিতে তার ঘুটঘুটে কী অন্ধকার!
তাইতে তবু শাদা দেখায় মুখ আমার!
"ওমা মাগো!—এই যে তোমার পেইছি দেখা!
ভয় করে যে মুখের পানে চাইতে একা!
মুখে তোমার রক্ত যে নেই, চোখ যে ঘুমায়!"
ভয় গেল তার একটু হাসি একটি চুমায়।

মাথায় দিলাম হাত বুলিয়ে, গান শুনিয়ে
ছড়ার সুরে, দিলাম দোলা বক্ষে নিয়ে।
"অমনি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো!
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখ্‌ছি না গো!"
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপ্‌তে হ'ল—
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে প'ল!

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,
নন্দা আছে বুকের উপর মুখটি থুয়ে;
মুখে তাহার রক্ত যে নাই একটুখানি,
তবু কেমন ঘুমিয়ে হাসে নন্দরাণী!
এমন সময় শিশুর করুণ কণ্ঠস্বরে
ঘুম ভেঙ্গে যায়, প্রাণের ভিতর কেমন করে!
সে যে আমার ছেলের গলা – আমায় ডাকে—
ন্যাওটা ছেলে পঞ্চু আমার ডাক্‌ছে কাকে!
"ওরা মারে—গায়ে আমার বড়ই ব্যথা—
দুষ্টু বলে' গাল দি ওদের—সত্যি কথা!
দেয় না খেতে—ক্ষুধায় জ্বলি দিবস-রাতি—
ইচ্ছে করে পালাই কোথা, নেই যে সাথী!"
ঘুমিয়েছিলাম স্বপনবিহীন মরণ-ঘুমে,
ভাঙ্‌ল তবু সে ঘুম আমার শ্মশান ভূমে।

নিবিয়েছিল চিতার আগুন নদীর কূলে,
ঘুমিয়েছিলাম,—আবার দেখি নয়ন খুলে,
আঁধার ধরা, চাঁদের মুখে রক্ত কেন?
তারার চোখে জলের ফোঁটা—কাঁদ্‌ছে যেন!
গেলাম চলে' শীর্ণ মুখে ঘোমটা তুলে—
ঘরের ভিতর এলাম শেষে খিলটি খুলে'।
"ওমা মাগো, এই যে তোমার পেইছি দেখা,
ভয় করে না তোমার পানে চাইতে একা;
নাও কোলে নাও, খাও না চুমু গালের 'পরে—
বড় কাহিল, অবশ দেহ ব্যথার ভরে!"

শক্ত ছেলে—ভয় পেলে না, উঠ্‌ল হেসে!
আহ্লাদে হাত বুলিয়ে দিলাম মাথায় কেশে।
বুকে তুলে দুই গালে তার দিলাম চুমা,
গানের সুরে কইনু কানে—'এবার ঘুমা'।
"অমনি করে' গুন্‌গুনিয়ে গাও না মাগো—
ঘুম এসেছে, চক্ষে যে আর দেখ্‌ছি না গো!"
চুমু খেলাম—কান্না তখন চাপ্‌তে হ'ল,
বাছা আমার ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে প'ল!

সেই শ্মশানে নদীর কূলে ছিলাম শুয়ে,—
ছেলে মেয়ে এক বুকেতে ঘুমায় দু'য়ে।
ঘুমিয়েছিলাম—হঠাৎ জেগে ভয় যেন পাই,
আর-দুটিরে ঘুম থেকে আর জাগাই নি তাই!
কচি ছেলের কান্না শুনি অন্ধকারে—
বোল ফোটেনি, চিঁ চিঁ করে' ডাক্‌ছে কারে?
ও যে আমার কোলের ছেলে—খোকার গলা—
নেহাৎ কচি—বোল ফোটেনি—হায় অবলা!
কেউ দেখে না, নেয় না তারে—বাছা আমার!
মায়ের বুকের দুধ না পেয়ে বাঁচে না আর!
ঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি খিলটি খুলে,
দেখি খোকন শুকিয়ে গেছে—নিলাম তুলে,
কত করে' থাম্‌ল বাছার ফুঁপিয়ে-ওঠা,
মুখে দিলাম হাড়-বেরোনো বুকের বোঁটা।

সেই রাঙা-চাঁদ দিচ্ছে উঁকি আকাশ থেকে—
পাংশু হ'ল আমার চাঁদের সে-মুখ দেখে!
চুমায় চুমায় কান্না আমার চাপ্‌তে হ'ল,
খোকন তখন ঘুমিয়ে প'ল ঘুমিয়ে প'ল!

ঘুমিয়ে প'ল, নেতিয়ে প'ল'—আর সাড়া নেই,
শুইয়ে দিলাম মেঝের উপর অন্ধকারেই!
হাত-পা'গুলি সমান করে' দিলাম রেখে,
গায়ের উপর দোলাইখানি দিলাম ঢেকে।
ছুটে দেখি আর-এক ঘরে—স্বামীর পাশে
সতীন ঘুমায়—তারই কেবল ঘুম না আসে!
দেখেই আমার চিন্‌লে, তবু লাগ্‌ল ধাঁধাঁ,
সেই আঁধারে মুখ যে আমার দেখায় শাদা!
চোখে-চোখে যেমন চাওয়া—কী চীৎকার!
জানি তখন, ঘুম হবে না আর যে তার!
চুপে—চুপে ফিরে এলাম সেই শ্মশানে,
খানিক পরেই খোকায় তারা সেথায় আনে।
বড় দু'জন দুই পাশেতে—কাছে কাছে—
খোকন আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে আছে।
আমরা সবাই ঘুমাই জলের কলস্বনে,
ঘুম হবে না এক সে জনার এই জীবনে!*

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

* একটি ইংরেজী কবিতার অনুকরণে।

চালপড়া

চালপড়ার নাম অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন। পাঠশালে যখন পড়িতাম তখন বার কয়েক চালপড়া খাইবার সৌভাগ্যও আমার হইয়াছে। কোন বালকের পুস্তকাদি অপহৃত হইলেই, আমাদের বিজ্ঞ গুরুমহাশয়টি এই চালপড়ার হাঙ্গামা করিয়া বসিতেন। কোন জিনিষ চুরি হইলে, পল্লীগ্রামে এখনও চালপড়া খাওয়াইবার ভয় দেখান হয়। যে চুরি করিয়াছে, চালপড়া খাওয়াইলে নাকি তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠে এবং আসল চোর ধরা পড়ে।

চালপড়ার প্রবাদটি আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু ওই জিনিষটা খাওয়াইয়া চোর ধরিতে কেহ স্বচক্ষে দেখেন নাই, বোধ হয়। তা ছাড়া এই চালপড়া জিনিষটা কি? ইহার মূলে কোন সত্য আছে, না গল্প মাত্র? কত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা বলেন, "ও একটা ভয় দেখাইবার ফন্দি।"

প্রাচীনকালে ভারতে শাস্ত্রানুমোদিত পরীক্ষার দ্বারা দোষী নির্দ্দোষী স্থির করা হইত। শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ নয়

প্রকার পরীক্ষার উল্লেখ আছে। গত শ্রাবণের প্রবাসীতে ভারতের প্রাচীন বিচার-পদ্ধতি শীর্ষক প্রবন্ধে উক্ত নয় প্রকার পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে।

এই নয় প্রকার পরীক্ষার মধ্যে চালপড়া বা তণ্ডুল-পরীক্ষা একটি। যথা :—

"ধটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষঞ্চ পঞ্চমম্।
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলাঃ প্রোক্তাঃ সপ্তমং তপ্তমাষকম্।
অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।"

—বৃহস্পতি।

কাত্যায়ন ও দিব্যতত্ত্বে আবার এই নয় প্রকার পরীক্ষার প্রয়োগ-বিধি ও মন্ত্রাদি বিস্তৃত বর্ণন আছে। সামান্য চাউল উত্তমরূপে ধুইয়া শুষ্ক হইলে, দেবতার স্নান-জলে একটি নূতন মাটির পাত্রে উহা এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন বিচারক শুচি হইয়া বসিবেন এবং চোরের দলকে স্নান করাইয়া পূর্ব্বমুখে বসাইবেন। পরে একখানি ভূর্জ্জপত্রে বা অশথ-পাতায় এই মন্ত্র লিখিবেন,—

আদিত্য-চন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তং॥

এই মন্ত্র-লেখা পাতা পর পর এক-একজনের মাথায় রাখিয়া, উক্ত ভিজান চাউল সামান্য চর্ব্বণ করিতে দেওয়া হয় এবং অন্যত্র একখানি অশথ-পাতায় চর্ব্বিত চাউল রাখিতে বলা হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সকলকে এই নিয়মে চাউল চিবাইতে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে যাহার চর্ব্বিত চাউলে রক্ত দেখা যাইত, সেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইত। চাউল চর্ব্বণ করিবার সময় দোষী ব্যক্তির তালু শুষ্ক হইয়া যাইত এবং সে কাঁপিতে থাকিত।

শ্রী বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়

সামাজিক আয়বৃদ্ধির আয়োজন

যে ভোগ্য-সমষ্টিকে সামাজিক আয় বলা হয়, তা উৎপাদিত হয় তিনটি উপকরণের সাহায্যে :—প্রকৃতি, মানুষ, ও মূলধন। সামাজিক আয় বাড়াতে হলে এই উপকরণগুলির পরিমাণ (আলাদা আলাদা বা একসঙ্গে) বা ভোগ্য-উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াতে হয়। প্রকৃতির কোনো সঞ্চিত ধন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে' থাকলে তাকে খুঁজে বের করা (যেমন, খনি, অকর্ষিত জমি, বা অল্প চেষ্টায় ব্যবহারযোগ্য হয় এমন জমি, জলশক্তি, ইত্যাদি), মানুষের শক্তির অপচয় নিবারণ করা, মানুষের লুকান ক্ষমতা-গুলিকে ফুটে উঠ্‌বার সুযোগ দেওয়া, মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা বা অপচয় নিবারণ, ইত্যাদি নানা ভাবে সামাজিক আয় বৃদ্ধির আয়োজন করা যেতে পারে। সামাজিক আয় বৃদ্ধির তিনটি উপায় সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ করা যায়।

১। আবিষ্কার, ২। উদ্ভাবনা, ৩। সংরক্ষণ।

আবিষ্কার বল্‌তে অজানা অবস্থায় অব্যবহৃত ভাবে যে-সব ভোগ্য বা তার উপকরণ পড়ে' ছিল, তাকে কাজে লাগান বুঝায়। যেমন কোন্ নদীতে মাছ আছে তা আবিষ্কার করা, বা এমন কোনো জলপ্রপাত খুঁজে বের করা যার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা যায়, অথবা কোন্ ঝরণার জলে ঔষধের কাজ হয় আবিষ্কার করা, ইত্যাদি। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই আবিষ্কারকে উদ্ভাবনার সাহায্যে কাজে লাগাতে হয়। তবুও আবিষ্কারকে আলাদা করে' ধরাই উচিত। আবিষ্কারের জন্য সমাজের উচিত, কোথায় কি আছে দেখে খুঁজে বেড়াবার লোক নিযুক্ত করা। খনিজ পদার্থ কোথায় কি আছে, জলশক্তি কোথায় কিরূপ আছে, স্বাভাবিক অবস্থায় কোথায় কোন্ ভোগ্যের ভাণ্ডার পড়ে' আছে, এই-সব খোঁজ করে' বের করাই এদের কাজ হবে।

তার পর উদ্ভাবনা। যন্ত্রের উদ্ভাবনা, উপায়ের উদ্ভাবনা, ব্যবহারের উদ্ভাবনা, সবই উদ্ভাবনা। মানুষের বুদ্ধি সর্ব্বদাই অল্পশ্রমে কাজ সারবার উপায় খুঁজ্‌ছে। এই থেকেই যন্ত্রের উৎপত্তি। পুরাকালে, দিনের পর দিন লিপে

একখণ্ড বই হ'ত; আর আজ, ৭ দিনে ১০,০০০ খানা বই বের করা অতি সাধারণ কাজ। এক্ষেত্রে মানুষ নিজের শক্তি সাক্ষাৎ ভাবে কাজে লাগাচ্ছে না। প্রথমে শক্তি দিয়ে তৈরী করছে যন্ত্র, তার পর যন্ত্র মানুষের জায়গা নিয়ে কাজ করে' দিচ্ছে। আজকাল যন্ত্র তৈরী করার যন্ত্রেরও অভাব নেই। মানুষ শুধু মানসিক শক্তি খরচ করে, প্রকৃতি যন্ত্ররূপ ধারণ করে' মানুষের কাজ বাকিটুকু সবই করে' দেয়। নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে' মানুষ সমান খরচে বেশী কাজ করে' নিচ্ছে। উদ্ভাবনা যন্ত্রেরও হ'তে পারে, কার্য্যপ্রণালীরও হ'তে পারে। যেমন ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণ ও উপায়গুলি নানা ভাবে ব্যবহার করা যায়। ক-পরিমাণ প্রকৃতি (অর্থাৎ প্রাকৃতিক জিনিস) ক-পরিমাণ মানুষ (অর্থাৎ মানুষের শ্রম, মানসিক বা দৈহিক) ও ক-পরিমাণ মূলধন দিয়ে খ পরিমাণ ভোগ্য উৎপাদন হয়; আবার ½ক-পরিমাণ প্রকৃতি, ½ক পরিমাণ মানুষ ও ২ক-পরিমাণ মূলধন দিয়েও খ-পরিমাণ ভোগ্য পাওয়া যেতে পারে। হয়ত ২ক প্রকৃতি+২ক মানুষ+২ক মূলধন ২½খ ভোগ্য দান করবে। হয়ত ১০ক প্রকৃতি+৫ক মানুষ+১০ক মূলধন ১৫খ ভোগ্য উৎপাদন করবে। কি উপায় বা প্রণালী অবলম্বনে সব চেয়ে বেশী লাভ হবে, মানুষের উদ্ভাবনা-শক্তি সর্ব্বদা তাই দেখ্‌ছে। কি উপায়ে অপব্যয় ও অপচয় নিবারণ করা যায়, তা ঠিক করাও উদ্ভাবনার কাজ। কারখানায় কোনো বস্তু প্রস্তুত করতে গিয়ে সব সময়ই আনুষঙ্গিক নানা বস্তু বেরিয়ে পড়ে; যেমন গ্যাস্ তৈরী করতে কোক্, আলকাৎরা ও কার্‌বন্, বা তক্তা তৈরী করতে কাঠের গুঁড়া। এ-সব আনুষঙ্গিক দ্রব্য-গুলির (Bye products) সদ্ব্যবহার করতে পার্‌লে লাভ আছে। এও উদ্ভাবনার ক্ষেত্র। এক মণ তেল পুড়িয়ে একটা চুল্লী জ্বল্‌তে পারে; আবার সমানই তাপ দেয় এমন চুল্লীর উদ্ভাবনা হ'তে পারে যাতে মাত্র আধ মণ তেল পুড়্‌বে। তেল না হয়ে কয়লাও হ'তে পারে।

ভোগ্যকে যেমন ভোগীর পক্ষে সহজলভ্য করে' দিলে ভোগ্যের স্বাচ্ছন্দ্যদান-ক্ষমতা বেড়ে যায় (যথা, 'নদীতে মাছ আছে ধরে' খাও গিয়ে' না বলে' 'এই নাও মাছ' বল্‌লে মাছ খাওয়ার সুখ বেড়ে যায়) তেমনি ভোগ্য উৎপাদনের উপকরণগুলিকেও সহজলভ্য করতে পার্‌লে লাভ আছে। মানুষকে যদি সব সময় "কোথায় ধান, কোথায় কয়লা, কোথায় পাট, কোথায় লোহা, কোথায় মূলধন," ইত্যাদি চীৎকার করে' ঘুর্‌তে হয় তা হ'লে উৎপাদন-কার্য্য শক্ত হয়ে পড়ে। ঠিক কাজের জায়গায় ও সময়ে যদি উৎপাদনের উপকরণগুলি পাওয়া যায়, তা হ'লে কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে (এক বছর, ছমাস, যাই হোক) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ দিয়ে বেশী ভোগ্য উৎপাদিত হ'তে পারে। অর্থাৎ কি না, উৎপাদনের উপকরণগুলি অচল অটল হ'লে সামাজিক আয়ের ক্ষতি হয়। কোনো জায়গায় লোহা অসংস্কৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তা গলিয়ে বিশুদ্ধ লোহা বের করার জন্য কয়লাও পাওয়া যায়; অথচ যদি শ্রমজীবীরা সেখানে না যেতে চায়, বা গোড়ার বন্দোবস্ত ও কাজ সুরু করার মত মূল-ধন না পাওয়া যায় বা বহুকষ্টে পাওয়া যায়, তা হ'লে সামাজিক আয়ের দিক্ থেকে ক্ষতি হবে। কাজেই সামাজিক আয়ের সুবিধার দিক্ থেকে উৎপাদনের উপকরণগুলির অচল ভাব যত কমে' আসে ততই ভাল। অর্থাৎ উপকরণের সচলতার উপর তার কার্য্যকারিতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে-কোন কাজে উপকরণ-গুলি কি কি হারে ব্যবহৃত হবে এবং শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত কি তা ঠিক করতে উদ্ভাবনা-শক্তির দরকার। সাধারণ ভাবে উপকরণগুলিকে সচল করে' তুল্‌তেও উদ্ভাবনা-শক্তির প্রয়োজন। মূলধন ধার দেবার জন্যে যে-সব বন্দোবস্ত আছে (যেমন ব্যাঙ্ক, লোন আফিস ইত্যাদি; মহাজন কাবুলিওয়ালারাও বাদ পড়ে না), সেগুলি মূলধনকে সচল করে' তোলে। আবার সংবাদ-প্রকাশ, দ্রুতগামী ট্রেন, ইত্যাদি, এরাও কাজের জায়গায় ও সময়ে উপকরণ-গুলিকে পৌঁছে দেবার সাহায্য করে। যেমন কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে লোকে কাজের জায়গায় রেলগাড়ী চড়ে' হাজির হয়। নূতন খনি আবিষ্কৃত হয়েছে শুন্‌লেই বা সংবাদপত্রে পড়্‌লেই সেই দিকে সামাজিক মূলধন ও মানুষ ছুটতে সুরু করে। শিক্ষার অভাবে অজ্ঞানতা বশতঃ

অনেক সময় লোকে নির্ব্বোধের মত মূলধন অকেজো অবস্থায় ফেলে রাখে ও শ্রম করতে সক্ষম হয়েও এবং সমাজে কার্য্যাভাব না থাক্‌লেও লোকে নিজের বাসস্থানে কাজবিহীন অবস্থায় কষ্ট পায়। শিক্ষা মানুষের মনকে উদ্যোগী ও সজাগ করে' তোলে; শিক্ষাই মানুষকে অনেক দূর অবধি দেখ্‌তে শেখায়। **শিক্ষার বিস্তার মূলধন ও মানুষকে সচল করে' তোলে।** উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল করে' তুল্‌তে হলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশে মূলধন সচরাচর বিনা কাজে ও কোনো ফল প্রসব না করে' পড়ে' থাকে। মূলধন সচল করে' তুল্‌তে হলে আরও ব্যাঙ্কের প্রয়োজন, এবং সেই-সব ব্যাঙ্ক্ জাতীয় কার্‌বারগুলিকে মূলধন সরবরাহ করে' বাড়িয়ে তুলবে। শ্রমজীবীকে সচল করে' তুল্‌লে ও শিক্ষা দিলে, নানা প্রকার কাজে সহজেই কার্য্যক্ষম লোক পাওয়া যাবে এবং ফলে সামাজিক আয় বেড়ে চল্‌বে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই বছরের বেশীর ভাগ সময় বসে' থাক্‌লে সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি অসম্ভব। কাজেই সমাজের প্রধান সম্পত্তি যে মানুষের শ্রম তার অপচয় নিবারণ সর্ব্বাগ্রে দর্‌কার।

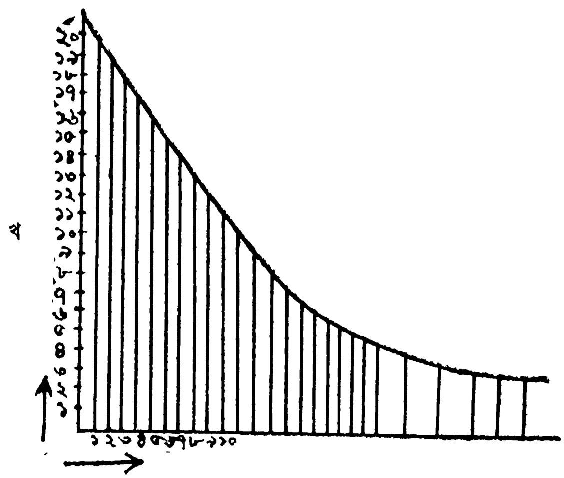
সুশৃঙ্খল ও সংঘবদ্ধভাবে কাজ কর্‌লে কাজ বেশী হয়। এই সুশৃঙ্খলতা ও সংঘবদ্ধতাও উদ্ভাবনার ফল। কার্‌বারের আয়তন, শিল্প অনুসারে, ছোট বড় হলে কাজ কম খরচে হয়। যেমন ছবি আঁকার কাজ—হাজার খানেক চিত্রকর এক ঘরে বসে' কেউ আকাশটুকু আঁক্‌ছে, কেউ জলটুকু আঁক্‌ছে, কেউ গাছগুলি আঁক্‌ছে, এ প্রকারে শ্রমবিভাগ করে' হয় না। ছবিতে, চিত্রকরের মনের ভিতর যে ভাব আছে, তাই রংএর ও রেখার সাহায্যে ব্যক্ত হয় বলে' তাতে শ্রমবিভাগ চলে না। একজনের সৌন্দর্য্যবোধ অপরের চেয়ে এমন ভিন্ন রকমের হতে পারে, যে, দুইয়ের মিশ্রণে কদর্য্যতা সৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু অন্য কোনো শিল্পে শ্রমবিভাগ ও বৃহৎ আয়তনের কার্‌খানাই শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত হতে পারে। যেমন গ্যাস্ প্রস্তুত। এক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক গৃহস্থ কতকখণ্ড কয়লা নিয়ে গ্যাস তৈরী করবার চেষ্টা করে, তা হলে গ্যাসের জন্য খরচ হবে অসম্ভব রকম। এক্ষেত্রে অনেক লোক ও অনেক মূলধন একত্র করে' বহু পরিমাণ কয়লা জোগাড় করে' গ্যাস্ প্রস্তুত কর্‌লে গ্যাস্ সস্তায় হবে এবং আনুষঙ্গিক মালগুলিও বিক্রয় করে' ব্যবসা আরও লাভবান্ হবে। বলাই বাহুল্য, যে, এই-সব ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের কেউ শুধু কয়লা বইবে, কেউ চুল্লী ঠিক রাখ্‌বে, কেউ অন্য কাজ কর্‌বে, অর্থাৎ শ্রম বিভাগ করে' কাজ হবে। তার পর কি ভাবে বেতন দিলে কাজ ভাল পাওয়া যায়, কি পরিমাণ বেতন দিলে শ্রমজীবী কর্ম্মক্ষম থাকে, কি ধরণে ব্যবসা কর্‌লে বৃহৎ আয়তনের কার্‌বার সম্ভব হয় (যৌথ কার্‌বার, সমবায় ইত্যাদি), কি ভাবে শ্রমজীবীদের কাজ করালে যন্ত্র (মূলধন) হতে বেশী কাজ পাওয়া যায়, কতক্ষণ কাজ কর্‌লে ও কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌লে কর্ম্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, ইত্যাদি ঠিক কর্‌তেও উদ্ভাবনাশক্তির ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন।

সামাজিক সম্পত্তি যেটুকু আছে, যা থেকে সমাজের উপকার স্থায়ী ভাবে হতে থাকে, সেটুকুর সংরক্ষণ দর্‌কার। যেমন বন জঙ্গল সংরক্ষণ, নদী ভরাট না হয়ে যায় দেখা, বা মানুষের স্বাস্থ্য ও সকল প্রকার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা, ইত্যাদি।

শেষ কথা এই, যে, আবিষ্কার, উদ্ভাবনা ও সংরক্ষণ, সাধারণতঃ সবই পরস্পরের সাহায্যে হয় এবং সবগুলিই সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে প্রয়োজনীয়। কোন্‌টি বেশী, কোন্‌টি কম, আলোচনায় লাভ নেই। উৎপাদনের উপকরণগুলি (প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন) কি ভাবে ব্যবহার কর্‌লে তাদের দ্বারা সব চেয়ে বেশী উৎপাদন করা যেতে পারে এবং তাদের সচল (অর্থাৎ ঠিক্ স্থানে ও কালে পাওয়ার উপায়) করে' তুল্‌বার কি কি ব্যবস্থা সমাজে আছে, দেখ্‌বার আগে ভোগ্যের দাম (টাকায়) কি ভাবে সমাজে নির্দ্দিষ্ট হয়, তা দেখা দর্‌কার। দাম কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে—মূল্য নয়—তার কারণ মূল্য কথাটির সঙ্গে লোকে সাধারণতঃ প্রয়োজনীয়তার একটা সম্বন্ধ আছে বলে' ধরে' নেয়। পাছে প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য নিয়ে গোলমাল হয়, সেইজন্য যে পরিমাণ টাকা কোনো

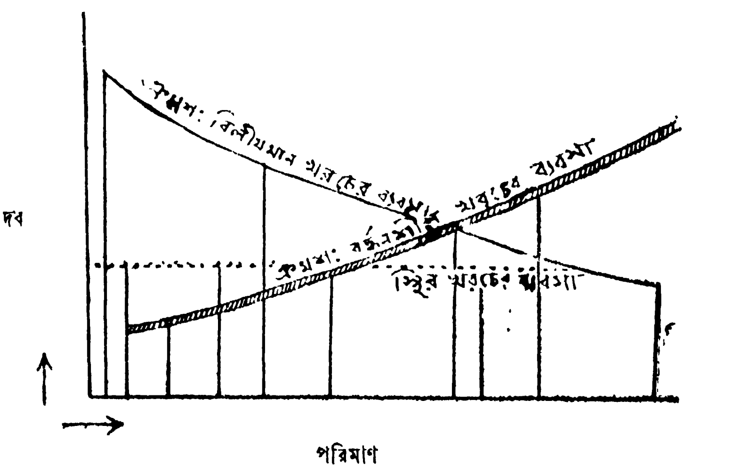
জিনিস কিন্‌তে লাগে তাকে জিনিসের দাম বলা হবে। একটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা (বা ব্যবহারিক মূল্য) কি, তা তার দাম দিয়ে বিচার করা যায় না। যেমন হাওয়ার দাম (আর্থিক বা বদলে পাওয়ার মূল্য) কিছুই নেই, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। নুনের দাম খুবই কম, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। জলের দাম কোনো স্থলে কিছুই না, কোথাও খুব কম কিছু, কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা খুবই আছে। দাম কি হবে তা দেখ্‌তে গেলে জিনিসটা **লোকে চায় কি পরিমাণে** এবং জিনিসটা **আছে কি পরিমাণে**, এই দুই দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে হবে। অর্থাৎ হাওয়া চায় লোকে খুবই, কিন্তু যত চায় তার চেয়ে বেশী হাওয়া পাওয়া যায়, কাজেই তার দাম নেই। দাম অর্থাৎ যা **দিয়ে** কিছু নেওয়া অথবা অদল-বদল করে' জিনিস নেওয়া যায়। কিন্তু যে জিনিস অজস্র, অপর্য্যাপ্ত চার দিকে রয়েছে তার জন্যে লোকে কিছু দিতে যাবে কেন? কাজেই হাওয়ার দাম নেই। কিন্তু সোনার দাম আছে খুব। কারণ লোকে যে পরিমাণ সোনা চায় তার চেয়ে সোনা আছে ঢের কম। কাজেই সোনার বদলে সব চেয়ে বেশী দিতে যারা রাজি ও সক্ষম তারাই শুধু সোনা পায়। এক কথায়, জিনিসের দাম ঠিক হয় জিনিস **কিন্‌বার ইচ্ছা** (demand) এবং জিনিস **বেচ্‌বার ইচ্ছা** (supply), এই দুই শক্তির জোরে। ইচ্ছা দুই ক্ষেত্রেই সক্রিয় (active) হওয়া দরকার। অর্থাৎ শুধু মনে মনে পাবার ইচ্ছা বা বাসনা, কিন্‌বার ইচ্ছা নয়। সে ইচ্ছা টাকার ভাষায় প্রকাশ করা দরকার অর্থাৎ কিনা বলা দরকার যে "এই পরিমাণ জিনিসের জন্য আমি এই পরিমাণ টাকা দিতে **রাজি ও সক্ষম** আছি"। বেচ্‌বার ইচ্ছাও সেই ভাবে প্রকাশিত হওয়া দরকার অর্থাৎ বিক্রেতাকে বল্‌তে হবে, "এই পরিমাণ জিনিস এই পরিমাণ টাকা পেলে আমি সরবরাহ করতে রাজি ও সক্ষম আছি।" ক্রমশঃ-বিক্ষীয়মান প্রয়োজনীয়তার নিয়ম অনুসারে যতই ভোগ্যের পরিমাণ বাড়ান যায় ততই তার প্রয়োজনীয়তা কমে' আসে। কাজেই ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তা ২ক-পরিমাণ জিনিসের প্রয়োজনীয়তার অর্দ্ধেকের বেশী। ৩ক-পরিমাণ জিনিস ক-পরিমাণ জিনিসের তিনগুণের **কম** প্রয়োজনীয়তা দেবে। যে জিনিস প্রয়োজনীয়তা দেবে কম, তা কিন্‌বার ইচ্ছাও হয় কম; কাজেই কোনো লোক কোনো জিনিসের (ভোগ্য) কি কি পরিমাণ কি কি দামে কিন্‌তে ইচ্ছুক তা লিখ্‌লে পরিমাণের সঙ্গে দাম কমে' আস্‌বে। যথা এক সের ঘি যদি কেউ ৫ টাকা সের হিসাবে কিন্‌তে ইচ্ছুক থাকে, তা হলে সে দুই সের ঘি ৪ টাকা (ধরা যাক) সের হিসাবে কিন্‌তে ইচ্ছুক হবে; তিন সের ঘি ৩ টাকা হিসাবে, ৪ সের ২ টাকা হিসাবে, ৫ সের ১৷৹ হিসাবে, ৬ সের ১।৹ হিসাবে, ইত্যাদি।

তার কিন্‌বার ইচ্ছার একটা ছবি আঁকা চলে।

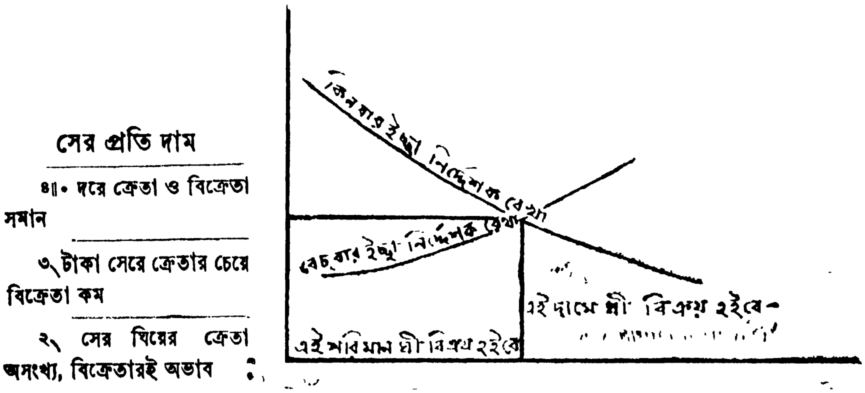


ছবিতে ক-রেখাটির উপর জিনিসের পরিমাণ দেখান হচ্ছে এবং পরিমাণ যতই ডান দিকে যাচ্ছে ততই বেড়ে যাচ্ছে; আর খ-রেখাটির উপর টাকার দাম দেখান হচ্ছে। জিনিসের পরিমাণ থেকে সের প্রতি দামের সমান উঁচু করে' রেখা টান্‌লে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সেরদর দেখিয়ে এক-একটা রেখা টানা যায়। এখন রেখাগুলির মাথা আর-একটি রেখা টেনে জুড়ে দিলে সেই রেখাটি ব্যক্তিবিশেষের সেই জিনিস কিন্‌বার ইচ্ছা-নির্দ্দেশক রেখা হবে। অর্থাৎ তা থেকে বুঝা যাবে ব্যক্তিবিশেষ কি কি দামে কি কি পরিমাণ ভোগ্য কিন্‌তে রাজি

আছে। এই জাতীয় রেখাগুলি সাধারণতঃ সর্ব্বদাই নিম্নগামী হয়। সমাজের সব লোকের ভোগ্য-বিশেষ কিন্‌বার ইচ্ছা নির্দ্দেশক রেখাগুলি উপরি উপরি বসালে একটা গড়ে বাজারের (অর্থাৎ বাজারে যারা কিন্‌তে যায় তাদের একত্র) কিন্‌বার ইচ্ছা নির্দ্দেশক রেখা পাওয়া যায়। এমন লোকও এদিক্ ওদিক্ দুচার জন থাকে যারা দাম বেশী কম দিতে ইচ্ছুক হয়; কিন্তু সাধারণ ভাবে বাজারের সকল খরিদ্দারের ইচ্ছা নির্দ্দেশক একটা রেখা পাওয়া যায়। কেউ যেন না ভাবেন, যে, বাস্তব জীবনে রেখা টেনে কাজ হয়। দর-দস্তর করা বা বেশী দাম মনে হলে না-কেনা ইত্যাদির ভিতর দিয়েই বাজার (অর্থাৎ ক্রেতাসমষ্টি) তার কিন্‌বার ইচ্ছা জানিয়ে দেয়। কেবল বুঝ্‌বার সুবিধার জন্যে আমরা সেই ইচ্ছাকে এঁকে দেখাবার চেষ্টা কর্‌ছি। এখন বিক্রেতার দিক্‌টা দেখা যাক। বেচ্‌বার ইচ্ছার যদি একটা ছবি আঁকা যায় তা হলে তার আকৃতি নানা প্রকার হতে পারে। কোনো কোনো জিনিস একই দরে যে-কোনো পরিমাণে সরবরাহ করা যায়। কোনো কোনো জিনিসের দর, যতই পরিমাণ বাড়ে, ততই বেড়ে যায়; আবার কোনো কোনোটির দর পরিমাণের সঙ্গে কমে' যায়। তার কারণ জিনিস তৈরী কর্‌তে খরচ কি হয় তা সেই জিনিসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। হয়ত ১ লক্ষ মণ ধান উৎপাদন কর্‌তে যা খরচ হয়, চাষযোগ্য জমি কমে' এলে ২ লক্ষ মণ কর্‌তে তার তিন গুণ খরচ হয়। ১০০ মণ মাছ ধর্‌তে যা কষ্ট বা খরচ ২০০ মণ ধর্‌তে তার ৪ গুণ খরচ বা কষ্ট হতে পারে। আবার ক-পরিমাণ গ্যাস, সুচ, সুতা, ছুরিকাঁচি, শিশি বোতল, তৈরী কর্‌তে যা খরচ হয় তার চারগুণ কর্‌তে গেলে খরচ চারগুণের কম হতে পারে। কারণ প্রকৃতির কাছ থেকে ভোগ্য আদায় (বা আহরণ) যেখানে হয় সেখানে ভোগ্যের পরিমাণের তুলনায় চেষ্টার (কষ্ট বা খরচের) পরিমাণ উত্তরোত্তর বেশী হারে বেড়ে চলে। আবার যন্ত্রের সাহায্যে যেখানে ভোগ্য উৎপাদন করা হয় বা যে-সব ভোগ্য উৎপাদনে আনুষঙ্গিক দ্রব্য অনেক কিছু উৎপাদিত হয়, (যেমন গ্যাসের আনুষঙ্গিক দ্রব্য, কোক কয়লা, আলকাৎরা ইত্যাদি) বা যেখানে শ্রমবিভাগে কাজ সহজ হয়ে আসে এবং তার ক্ষেত্র আছে, সেইসব স্থলে উৎপাদন উত্তরোত্তর সহজ হয়ে আসে; অর্থাৎ ভোগ্যের পরিমাণ যতই বেশী হয় বা কার্‌বারের আয়তন যতই বাড়ে, ততই প্রতি ভোগ্যের এককে (unitএ) উৎপাদনের খরচ কম হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম বেশী যাই হোক খরচ সমান হারে হয়। যে-সব ব্যবসাতে খরচ ক্রমে বেড়ে যায়, সেগুলিকে **ক্রমশঃ-বর্দ্ধনশীল খরচের ব্যবসায়** বলা চলে; যেমন কোনো কোনো প্রকার চাষবাস জাতীয় ব্যবসায়। আবার যে-সব ব্যবসাতে খরচ ক্রমে কমে' আসে, সেগুলিকে **ক্রমশঃ-বিলীয়মান খরচের ব্যবসায়** বলা চলে (যেমন কার্‌খানার প্রস্তুত প্রায় সব জিনিসই, বিশেষ করে' যেগুলিতে প্রকৃতিজাত অসংস্কৃত উপকরণের খরচই সব খরচের বেশীর ভাগ নয়)। আবার অন্য ব্যবসায় আছে যাতে খরচ জিনিসের পরিমাণের সঙ্গে বদ্‌লায় না। এগুলি **স্থির খরচের ব্যবসায়**। এখন, বেচ্‌বার ইচ্ছার রেখা নির্ভর করে ভোগ্যের উৎপাদন কোন্ নিয়মের অধীন, তার উপর। স্থির খরচের ব্যবসায়ে যে-সব ভোগ্য উৎপাদিত হয়, সেইসব ভোগ্য যে-কোনো পরিমাণেই হোক না কেন সরবরাহ করতে দর



একই হবে। কিন্তু বর্দ্ধনশীল খরচে যে-সব ভোগ্য উৎপাদিত হয়, সেগুলির জন্যে বর্দ্ধনশীল হারে বিক্রেতা দাম চাইবে। আবার বিলীয়মান খরচে যে-ভোগ্য উৎপাদন হয়, সে-ভোগ্যের দর পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে কমে' যাবে। এছাড়া আর-এক প্রকার অবস্থা হতে পারে যাতে খরচ পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে কখনো বাড়ে, কখনো কমে, আবার কখনো স্থির থাকে। এক্ষেত্রে দরও ঐরূপ অনির্দ্দিষ্ট গতিতে বাড়্‌বে, কম্‌বে বা স্থির থাকবে। সব বিক্রেতার বেচ্‌বার ইচ্ছা নির্দ্দেশক রেখাগুলি একসঙ্গে উপরি উপরি রাখ্‌লে সাধারণ বা বাজারের * বেচ্‌বার ইচ্ছা নির্দ্দেশক রেখা পাওয়া যায়। কেন্‌বার ইচ্ছার রেখার উপর বেচ্‌বার ইচ্ছার রেখা স্থাপন কর্‌লে তারা কোনো স্থলে বা একের অধিক স্থলে মিলিত হবে।



ঘিএর পরিমাণ

উপরের ছবিতে ঘিএর দাম কোন্ ঘিয়ের বাজারে কত হবে দেখান হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে একশত সের ঘি ২৲টাকা সের দরে বিক্রয় কর্‌তে ইচ্ছুক লোক থাক্‌লেও সেই দরে সেই বাজারে ১২শত সের ঘিয়ের ক্রেতা আছে। কাজেই যদিও ঐ দরে ঘি বিক্রি হয়ে যায়, তবুও অনেকে ঘি কিন্‌তে পাবে না বা যতটা চায় ততটা পাবে না। কাজেই বিনা ঘিতে রান্না করার চেয়ে লোকে দাম একটু একটু করে' বাড়াবে। ৩৲টাকা সেরে ক্রেতারা কিন্‌তে ইচ্ছুক হবে ৯শত সের ঘি; কিন্তু বিক্রেতারা বিক্রয় কর্‌তে ইচ্ছুক হবে মাত্র ৫ শত সের। কাজেই ৩৲টাকা সের দাম হবে না; কেননা অনেকে এখন বেশী দামে ঘি কিন্‌তে ইচ্ছুক থাক্‌বে। ৪৲টাকা সেরে ৮ শত সের ঘির ক্রেতা জুটবে, কিন্তু মাত্র ৭ শত সের ঘির বিক্রেতা থাক্‌বে। কিন্তু ৪॥০ টাকা সেরে ৭৭৫ সের ঘি লোকে কিন্‌তে চাইবে। আবার লোকে ঐ দামে ঠিক ততটুকু ঘিই বিক্রয় কর্‌তে রাজী হবে। কাজেই ঘির দাম ৪॥০ টাকা সের হবে। বাজারের অবস্থা উপরোক্ত রকম হলে আর কোনো দামই **স্থায়ী দাম** (stable price) হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য অবস্থা বদ্‌লালে দামও বদ্‌লাবে। ঘি খাওয়া বেড়ে গেলে বা কমে' গেলে, ঘি প্রস্তুতের খরচা বেড়ে গেলে বা কমে' গেলে কিন্‌বার ও বেচ্‌বার ইচ্ছা নির্দ্দেশক রেখাগুলিও বদ্‌লে যাবে এবং দামও দিন কতক অস্থির ভাবে উঠে নেমে নতুন কোনো একটা স্থায়ী অবস্থা লাভ কর্‌বে। স্থায়ী দাম কি অবস্থায় কি রকম হবে, তা নিয়ে আলোচনা না করে' আমরা এখন অন্য বিষয় আলোচনা কর্‌ব। দাম ঠিক কি করে' হয় এবং তার যে দুটি দিক্ আছে (কেনার ও বেচার), তা আমরা দেখ্‌লাম। আরও দেখ্‌লাম যে জিনিস উৎপাদনের কষ্ট স্বীকার বা খরচ জিনিসের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে একক প্রতি (per unit) কখনও বাড়ে কখনও কমে এবং কখনও বা সমানই থাকে। মানুষ ও মূলধনের সাহায্য অপেক্ষা প্রকৃতির সাহায্য যে-সব উৎপাদনে বেশী লাগে (যেমন

* বাজার বল্‌তে স্থানবিশেষ বুঝায় না। নানান্ ভোগ্যের বাজার নানান্ স্থান ও কাল জুড়ে অবস্থিত। যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সঙ্ঘ এমন ভাবে সকলে সকলের সঙ্গে কাজ কর্‌তে পারে যে দর-দস্তুর করে' যাচাই ও প্রতিযোগিতার ফলে কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোনো নির্দ্দিষ্ট ভোগ্য সেই সঙ্ঘের মধ্যে একই দরে বিক্রি হয়, সেই সঙ্ঘ সেই ভোগ্যের বাজার। যে-ভোগ্য যত বহুকাল স্থায়ী, সর্ব্বত্র আদৃত, বিশদরূপে বর্ণনার ও শ্রেণীবিভাগের উপযোগী (১নং তুলা, অমুক কোম্পানীর ডিবেঞ্চার শেয়ার, ক-শ্রেণীর শালের তক্তা মাপ থগ), দূরে নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত, সেই ভোগ্যের বাজার তত বিস্তৃত। যেমন:-তুলা, সোনা, রূপা, গম, পাট, নানা প্রকার কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদির বাজার পৃথিবী জুড়ে। আবার মাছের বাজার খুবই সংকীর্ণ। কোনো বাজারে যে কেউ কাউকে ঠকায় না তা নয়, কিন্তু আমরা মোটামুটি বল্‌তে পারি, যে, কোনো ভোগ্যের বাজারে সময়বিশেষে সেই ভোগ্যের দর সব বিক্রেতার কাছেই সমান।

চাষবাষ, মাছধরা ইত্যাদি), তাতে সাধারণতঃ খরচ ক্রমে বেড়ে' চলে। যে-সব ব্যবসায়ে প্রকৃতি অপেক্ষা মানুষ ও মূলধন লাগে বেশী, তাতে খরচ ক্রমে কমে।

অতঃপর আমরা নানা ব্যবসায়ের মধ্যে, সামাজিক সম্পত্তিতে যেটুকু 'প্রকৃতি', 'মানুষ' ও 'মূলধন' আছে, তা কি ভাবে বিভাগ ও ব্যবহার করলে সবচেয়ে বেশী ভোগ্য উৎপাদিত হয়, তাই দেখ্‌ব। আরও দেখ্‌ব সব উপকরণগুলিকে কি করে' বেশী সচল এবং কার্য্যকারী করে' তোলা যায়, তাই। মানুষ বল্‌তে অতঃপর অনেক স্থলে শ্রমজীবী বুঝ্‌তে হবে। শ্রম যে করে, সেই শ্রমজীবী হবে। তাকে ইট বইতে হবে, বা অন্য কোনো রকম দৈহিক শ্রম করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। শ্রম মস্তিষ্কেরও হতে পারে, শরীরেরও হতে পারে।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

উদ্বোধন

তুমি শুধুই আমার হবে,—
আমি রইব তোমার হ'য়ে ?
তোমার মনেই থাকো তবে ;
কাজ নেইকো আমার হ'য়ে।
আমার সুখেই আমার দুখেই
রইবে চেয়ে আমার মুখেই,
মদির মোহের নিদের মতন
মোরেই কি এ রাখ্‌বে ঘিরে ?
রুদ্ধ গৃহের গোপন কোণে
মোরেই নিয়ে থাক্‌বে কি রে ?

হা প্রেয়সী ! হা মোহিনী !
হা রূপসী !—মুগ্ধা নারী !
জানো না কি বিশ্ব-নাড়ীর
সঙ্গে মোদের যুক্ত নাড়ী ?
ল'য়ে ধূলো খেলা মিছাই
ব'য়ে যাবে বেলা কি ছাই,
বিশ্ব-বেলার বালুর কণা
রইব মোরা বিশ্ব ছাড়ি ?
বনের পাখী রইব খাঁচায়
নিসর্গেরি দৃশ্য ছাড়ি ?

বিশ্ব-বাসীর প্রতিবেশী
আয় ছুটি' আয় বিশ্ব-পথে,
আয় দেখি আয় কাঁদিয়া যায়
কোন্ অভাগা নিঃস্ব পথে।
কে, ভাসে কে চোখের জলে,
টানিয়া নে বুকের তলে,
বিশ্ব-দুখে বিশ্ব-শোকে
আয় ছুটি' আয় সঙ্গ দিতে ;—
বিশ্ব-সুখের মহোৎসবে
আয় ছুটি' আয় সঙ্গ নিতে।

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী



"বাঁকুড়া সারস্বতসমাজের উদ্‌বোধন-পত্র"

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্‌বোধন পত্র" প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি দুইটি বিষয় না জানিয়া না শুনিয়া নিজের ইচ্ছা-মত যাহা তাহা লিখিয়াছেন।—

১। মৃত্তিজ, মাটি-জাত = মাটিয়া; এইরূপ, ভূমি-জাত = ভূমিজ বা ভূঞা। মৃত্তিকা, ভূমিজ শব্দের অর্থ আদিম অধিবাসী।

২। আর লিখিয়াছেন—"বাঁকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। ইহারা সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত। সামন্তো ক্ষুদ্রভূপালঃ। ক্ষুদ্র রাজার রাজ্যের প্রান্তে সামন্ত রাজ্য। রায় উপাধিতেও রাজত্ব প্রকাশিত আছে। কারণ সং রাজন্ শব্দের বিকারে রা-য়। ওড়িস্যার সামন্ত রায়, সংক্ষেপে সামন্তরা, এবং মল্লরাঢ়ের সাঁতারা, এককালে রাজবংশীয় ছিল। বাঁকুড়া জেলার সামন্তরাজ্য ছাতনায় স্থাপিত ছিল। বাঁকুড়া সহর সামন্তভূমিতে অবস্থিত। সামন্তদিগের মুখমণ্ডল, বিশেষতঃ চক্ষু দেখিলে বুঝি, ইহারা আদিতে বাঙ্গালী ছিল না। কেহ কেহ বলেন সামন্তরা ছত্রী। ইহা অসম্ভব নহে। হয় ত আদি সামন্ত সাহস ব্যবসায়ী হইয়া ছাতনায় রাজা হইয়াছিলেন।"

যোগেশ-বাবু যদি দয়া করিয়া মেদিনীপুর জেলার তমলুক, কাঁথি, অঞ্চলে যাইয়া একবার দেখিয়া আসেন, তাহা হইলে তিনি জানিতে পারিবেন সামন্তরা ভূঞা কি জাতি বা তাহাদের চাল চলন কি। মুসলমান রাজত্বের ভূঞা উপাধি তমলুকের রাজাদের ছিল। সামন্তরা উপাধি ময়নাগড়ের রাজাদের। আদি রাজাদের নাম কালিন্দী রাম সামন্ত; কিন্তু বর্ত্তমান রাজাদের উপাধি বাহুবলীন্দ্র। উৎকলের খণ্ডাইত বা মহানায়ক ইত্যাদি বঙ্গীয় চাষীকৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য ইত্যাদির জাতির সন্তক, অর্থাৎ চিহ্নেরও উপাধি এক; ইহারা সকলে মাহিষ্য। মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অনেক প্রাচীন জমিদার ভূঞা সামন্তরাংশ আছেন। তাঁহারা সকলে প্রায় বিষ্ণু-উপাসক, তবে কেহ কেহ শক্তি-উপাসকও আছেন। তাঁহাদের দ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ প্রতিপালিত হইতেছেন। কিন্তু যোগেশ-বাবু তাঁহাদিগকে বলেন "একটা নূতন জাতি", আদিম অধিবাসী। আশ্চর্য্য বটে। মাহিষ্যগণ পূর্ব্বকালে যুদ্ধপ্রিয় ছিল। বর্ত্তমানকালে কৃষিপ্রিয়।

ভারতে মাহিষ্যগণের বর্ত্তমান উপাধি নিম্নে দিলাম।—

বাহুবলীন্দ্র, গজেন্দ্র-মহাপাত্র, গজপতি, গড়নায়ক, মহারথ, নায়ক, রণঝাঁপ, রণসিংহ, সেনাপতি, মহাপাত্র, ভূপতি, মহানায়ক ভূঞা, ভূমিপ, ভূপাল, জানা, হাজারা, সামন্ত, শতরা, দলই, আষক বা আদক, দৈশিক, দলপতি, চৌধুরী, মাইতি, সিংহ, বাঘ, হাতী, মহিষ, গিরি, তুঙ্গ, কপাট, কাজলী, কাঞ্জি, মেটা, মাঝি, খাঁড়া, দণ্ডপাট, পাত্র, পট্টনায়ক, কোটাল, বীরা, সমরী, ধাবক, সেনী, পাজা, সিংলী, মল্ল, রাজপুত, মহান্ত, ঘোড়া, তালুকদার, নায়েব, মজুমদার, পুরাকায়স্থ, ক্ষেত্রী, বাহুবল, রাউৎ, হালদার, মৌলিক, সর্দ্দা, স্তম্ভভেদি, দৌবরীক, রায়, মঙ্গরাজ, অশ্বপতি, নরপতি, পতাকী, সন্তরাণ, বেরা, দিণ্ডা, বক্সি, প্রধান, মণ্ডল, করণ, বর, কর, ধাড়া বা ধর, সিকদার, বৈদ্য, মহাস্তি, মানা, খাঁ, কয়াল, বৈতালিক, বিশ্বাস, জোয়দার, কুইতি, দেশমুখ্য, সরকার, ইত্যাদি।

আবার কেহ কেহ বলেন নিম্নলিখিত ১৯টি উপাধি মাহিষ্য জাতির প্রধান।—

সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাপাত্র, হাজরা, মণ্ডল,
ছত্রপতি, গজপতি, রায়, মহাবল।
সামন্ত, সাঁতারা, ভূঞা, প্রধান, মাইতি,
চৌধুরী, বিশ্বাস, বীর, গিরি, সেনাপতি।

আবার মাহিষ্য-কুলার্ণবে লিখিত আছে—মাহিষ্য আদি উপাধি সাতটি

"সামন্ত শতরা চৈব ভূমিপশ্চ ভূপালকঃ
জানা মানাদকো সপ্ত আদিম গৃহমুচ্যতে ॥"

যোগেশ-বাবু সামন্তরাকে যে নূতনজাতি মনে করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। তাঁহারা দেশভেদে ভাষাভেদে একটা নূতন জাতি হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মাহিষ্য। যেমন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তুর্কা-গড়ের রাজা জমিদারগণ মাহিষ্যগণের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদান করেন বা মাহিষ্য। কিন্তু ঐ তুর্কাগড়ের জ্ঞাতিগণ পুরীজেলা রথীপুরে বাস করেন। তাঁহারা ক্ষেত্রিগণের সঙ্গে কন্যা আদান প্রদান করেন বা করিতেছেন। যোগেশ-বাবু কি করিয়া ইহাদিগকে আদিম জাতি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। মাহিষ্য জাতি ক্ষেত্রীবর্ণের অন্তর্গত মাহিষ্য।

যোগেশ-বাবুকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।—

১। তমলুকের ইতিহাস (সেবানন্দ ভারতী প্রণীত)। ২। ভ্রান্তি-বিজয়, ৩। সিদ্ধান্ত সমুদ্র, ৪। আর্য্যপ্রভা, ৫। মাহিষ্য-প্রকাশ, ৬। মাহিষ্যবিবৃতি, ৭। মাহিষ্যতত্ত্ববারিধি, ৮। ইংরেজিতে দি মাহিষ্য।

পুস্তকগুলি পাইবার ঠিকানা ৬৪নং পুলিস হাঁসপাতাল রোড, (ইটালি) কলিকাতা।

শ্রী শশিভূষণ মাইতি

উত্তর

ইহার উত্তর অতি সংক্ষেপে দেওয়া যাইতে পারে। এক এক উপাধি বহু জাতির মধ্যে আছে, এবং যে ব্যক্তি যে জাতির অন্তর্গত মনে করে, তাহাকে সে জাতির লোক স্বীকার করিতে হইবে। বাঁকুড়ায় যাহারা সামন্ত নামে আখ্যাত তাহারা নিজদিগকে মাহিষ্য বলে। এখানে 'রায়' প্রায় জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ, 'মেট্যা' নামও জাতিবাচক। হুগলী জেলায় সে জাতি 'বাগ্‌দী' শ্রেণীতে গণ্য। মানভূমের বিপিন, ভূমিজ। কিন্তু লোকে তাহাকে বিপিন ভূঞা বলে। এইরূপ, ওড়িষ্যায় ভূমিজ ও ভূঞা এক। কেহ ইহাদিকে মাহিষ্য বলে না।

ভূমিজ শব্দ সংস্কৃত বলিয়া মনে হয়। আদিম অধিবাসী অর্থও আসে। জাত, বিশিষ্ট প্রভৃতি অর্থে বাঙ্গলা ভাষায় ইয়া প্রত্যয় হয়। ভূমি + ইয়া = ভূমীয়া – ভূঞা, অর্থাৎ ভূমি জাত, ভূমি-বিশিষ্ট। দ্বিতীয় অর্থে ভূঞা বর্ত্তমান জমিদার; বঙ্গের দ্বাদশভূঞার নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এইরূপ শব্দবিচারে, মাটি + ইয়া = মাটীয়া — মাট্যা — মেট্যা; অর্থাৎ মৃত্তিজ বা মৃত্তিস্বামী।

আমি জাতিবিচার করি নাই। বাঁকুড়ার দারিদ্র্যের হেতু খুঁজিতে গিয়া বার্ত্তা দেখিতে হইয়াছে এবং সে কারণে জাতির নাম আসিয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

প্রতিবাদ

অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের "বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্বোধন-পত্রে" কয়েকটি ভ্রমপূর্ণ কথা ছাপা হইয়াছে। ঘন-বসতি পল্লীর মধ্যে তিনি যে তড়াগের উল্লেখ করিয়াছেন বাঁকুড়ায় (Carmichael Tank) কারমাইকেল্ ট্যাঙ্ক্ সম্বন্ধে এই উক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারা যায়। "জীবনরূপ জলের জন্য" এই পুষ্করিণী খনন করা হয় নাই। জলের কল তাহার পূর্ব্বে ঐ স্থানে হইয়া সে অভাব দূর করিয়াছিল। ঐ খানে ১২।১৪ বিঘা ভূমি ব্যাপিয়া একটি অস্বাস্থ্যকর ডোবা ও নীচু স্যাঁতসেঁতে জমী ছিল। নিত্য শত শত লোকে ঐ স্থানে মলত্যাগ করিত। স্বাস্থ্যতত্ত্ব উদাসীন ঐ জনবহুল পল্লীর লোকে ডোবাগুলির বিষ-তুল্য জল ব্যবহারে বিরত থাকিত না। সময়ে সময়ে তজ্জন্য কলেরা বসন্তাদি সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঐ স্থানে হইয়া সহরে ব্যাপ্ত হইত। স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া ভবিষ্যতে মড়ক নিবারণ যাহাতে হয় তাহার জন্য মধ্যস্থলে যেখানে ২।৩টি বড় ডোবা ছিল ঐ পুকুরটি সেইখানে কাটিয়া সেই মাটিতে চারি দিকের ডোবা ও নীচু জমীগুলি ভরাট করান হইয়াছিল। যে আবার নির্ম্মাণের উপদেশ শ্রদ্ধেয় যোগেশ বাবু দিতেছেন, তৎসম্বন্ধেও সকলে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে ঐ প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হইয়াছে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু করিবার সামর্থ্য ও উপায় ছিল না। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথাপি আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। এই তড়াগকে "জলপূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে শহরের এক নরককুণ্ডের হৃৎকারজনক মলনালীর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে" ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করা চলে না। সংযোগস্থলটি একবার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় মলনালীর জল মানুষে চেষ্টা করিয়া লইয়া গেলে তবেই ঐ পুষ্করিণীতে পড়িবে। সেরূপ করিতে কেহ পায় না। বর্ষাকালে যে দিন অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় মলনালী ও রাস্তা বেশ পরিষ্কাররূপে ধৌত হইয়া যাইবার পর বৃষ্টির জল পুষ্করিণীতে লইয়া যাইতে পায়। "বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পাড়ার মলমূত্র ধৌত হইয়া জল-বৃদ্ধি' করিতে পারে না, তাহার বন্দোবস্ত আছে। তবে পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ নিবারণ না করিলে তাহা ধৌত হইয়া জলে পড়া অনিবার্য্য।

"বাজারে ঝিঙ্গা চারি আনা সের বিক্রি হইতেছে, বাঁকুড়াবাসী বস্তু গাছের চাস করিতে উদাসীন বলিয়া" নয়। যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী বলিয়া নূতন ঝিঙ্গা বাজারে আনিলে শীতকালে কিছুদিন দাম বেশী থাকে। যে বাজারে প্রত্যহ ৮ ১০ মণ ঝিঙ্গা বিক্রয় হয় সেখানে নূতন আমদানীর সময় কোন কোন দিন ২।৪ সের ঝিঙ্গা বিক্রির জন্য আনিলে চারি আনা সের বিক্রি হওয়া বিচিত্র নয়। সকল স্থানেই নূতন শাকসব্জী এমনই অগ্নিমূল্যে প্রথম প্রথম বিক্রয় হয়।

"বিলাতী আলুরও সেই দর", কিন্তু সেই সময় নয়, ঝিঙ্গা যখন চারি আনা সের মূল্যে বিক্রি হয়। শীতের শেষে ঝিঙ্গার দর যখন চারি আনা, বিলাতী আলুর তখন এক আনার বেশী দাম নয়।

"অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র বাজার নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা বাড়াই-বার প্রয়োজন হয় নাই", কারণ তৎকালে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আবশ্যকের অতিরিক্ত বড় করিয়া বাজার নির্ম্মাণ হইয়াছিল। বিশ বৎসর আগে দেখিয়াছি ক্রেতা-বিক্রেতার অভাবে এই বাজারে অনেকস্থান খালি থাকিত। কিন্তু আজকাল স্থান সঙ্কুলন হয় বলা চলে না, রাস্তাগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া বিক্রেতারা স্থান পায় না। "পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাকঘরে পাঁচজন কেরানী নিযুক্ত ছিল, এখনও পাঁচজনেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে" এ সংবাদ যোগেশ-বাবু কোথায় পাইলেন জানি না। ২০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, মনে হয় না তখনও ৭।৮ জনের কম কেরানী ছিল। অনুমান ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে স্থানের অসঙ্কুলন জন্য ডাকঘরের আফিস গৃহ আয়তনে দ্বিগুণ বৰ্দ্ধিত করিতে দেখিয়াছি। আবার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বেও কিছু বাড়িয়াছে। এখন কেরানীর সংখ্যা যাহা দেখিতে পাওয়া যায় ১৪।১৫ জনের কম নয়। ইহা ছাড়া লাল-বাজারে অনেক দিন হইল একটি শাখা অফিস খুলিতে হইয়াছে। একটি সাব্-অফিস-ইহার সম্ভাবনা আছে—কিন্তু ব্যয়-সঙ্কোচ চলিয়াছে বলিয়া এখন স্থগিত আছে।

শ্রী সুজয়গোপাল দত্ত

উত্তর

উদ্‌বোধন পত্রে বাঁকুড়া শহর সম্বন্ধে দুইচারিটা কথা বলিয়াছি। প্রতিবাদ হইতে বুঝিতেছি, অপ্রিয় হইলেও সত্য কথা লিখিয়াছি। ১। কোন্ তড়াগ লক্ষ্য হইয়াছে, তাহা প্রতিবাদকারী ধরিতে পারিয়া-ছেন। অতএব আমার বর্ণনা কাল্পনিক নহে। মলনালীর জলও তাহাতে পড়ে, বর্ষাকালে পড়ে অন্য কালে পড়ে না। চারি পাড় উঁচু নহে, পাড়ার পানে। চারি পাড়ের লোকের ঘনবসতি, স্থানে স্থানে পায়খানা আছে। পাড়ে ও পাড়ের পাশায় লোকের মলমূত্র ত্যাগের স্থানও জুটিয়াছে। বর্ষাকালে পাড়া-ধোয়ানি পুকুরেই পড়ে। মনে রাখিতে হইবে বর্ষাকালে কলেরা আমাশয় প্রভৃতি রোগ জন্মে। সকালে দেখি নাই, বিকাল-বেলা দেখিয়াছি মেয়েরা কলসী কলসী জল লইয়া যায়। সে জল কি করে? আমাদের অনেকের জ্ঞান আছে যে দুই এক ঘটা গায়ে জল শুদ্ধ হইলেই বর্ত্তমান স্বাস্থ্যবিদ্যার অনুশাসন পালিত হইল।

আমি "কারমাইকেল টেঙ্কের" পূর্ব্ব ইতিহাস জানি না, বাঙ্গালী-পাড়ায় এই বিদেশী নাম কেন রাখা হইয়াছে তাহাও জানি না। কিন্তু জানি কলের জল পর্য্যাপ্ত নহে, সুলভও নহে। মানুষ স্বভাবতঃ অলস, নইলে লোকে পচা জল না লইয়া দূরে সদর রাস্তা হইতে কলের জল লইয়া যাইত। দণ্ডের ভয় দেখাইয়া মানুষের আলস্য ঘুচাইতে পারা যায় না। বাঁকুড়ায় ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। গন্ধেশ্বরী নদীর যে স্থান হইতে কলের জল আসিতেছে, মুনিসিপালিটির নিষেধ সত্ত্বেও সে-স্থান বিষ্ঠা-ক্ষেত্র হইয়াছে। অতএব জলের ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যে ইচ্ছা করিলেও লোকে তাহা দূষিত করিতে পারিবে না। কারমাইকেল টেঙ্কের জলের বর্ণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, জল পচা। কারণ কি?

মেদিনীপুর বর্দ্ধমান হুগলী প্রভৃতি পুরাতন শহরে পচা ডোবা আছে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া লোকে ঘর-বাড়ী করে নাই, পাশের রাস্তা ক্রমশঃ উঁচু হইয়া বাড়ীর জল-নিকাশে বাধা ঘটিবে, ভাবে নাই। স্বাস্থ্যবিধানও দুরূহ হইয়াছে। যে মুনসিপালিটি পারিতেছে পচা ডোবা ভরাইয়া দিতেছে, পথ ঘাট চওড়া করিতেছে। বাঁকুড়া শহর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ক্ষুদ্র। কিন্তু ক্রমশঃ পুরাতন ও বর্দ্ধিত হইবে। অতএব এখন হইতে ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি কল্পনা করিয়া স্বাস্থ্যকর নগর নির্ম্মাণের ধারা বাঁধিয়া কর্ম্ম না করিলে মুনসিপালিটিকে বিপন্ন হইতে হইবে। বৃষ্টিজল নিকাশের পথ, মল-মূত্র-নালীর পথ ঠিক করা নগর মাত্রেরই কঠিন সমস্যা। বাঁকুড়ার ভূমি উঁচু নীচু। গৃহনির্ম্মাণের দ্বারা নীচু জমি

ভরাট হইয়া যাইতেছে, পূর্ব্বের স্বাভাবিক জলনিকাশে বাধা পড়িতেছে। কার্‌মাইকেল টেঙ্ক কাটাইয়া এইরূপ বাধা ঘটিয়াছে কি না, দেখি নাই। যদি পূর্ব্বে সেখানে ডোবা ছিল, নীচু জমি ছিল, তাহা হইলে বোধ হয়, এখন এই পুকুরে পাড়ার জল জমিয়া থাকে। বাঁকুড়ায় পচা এঁধো ডোবা দেখিয়াছি। মাটি দিয়া ভরাইতেই হইবে। কার্‌মাইকেল টেঙ্কের জল পচিয়া গিয়াছে। হয়, উহার চারি পাড়ের বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিয়া উহাকে আরামে পরিণত করিতে হইবে। না হয়, পাড়ার জলের জন্য পথ খুলিয়া দিয়া উহাকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিতে হইবে। দুই কল্পেই অর্থব্যয়। শুনিয়াছি, কাটাইতে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে, উহার দোষ সংশোধন নিমিত্ত পরে আর কত টাকা লাগিবে ভাবিবার কথা।

২। প্রতিবাদে অন্য যে তিনটি বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহার উত্তর অনাবশ্যক। কারণ প্রত্যেকেই বাঁকুড়ার আলস্য, নিশ্চেষ্টতা, কষ্টসহিষ্ণুতা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ডাকঘরের কথা বলি। আমি তখন বাঁকুড়ার ব্যাপার জানিতাম না। মনি-অর্ডার পাঠাইতে গিয়া আমার পত্রবাহক পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিত, বলিত ডাকঘরে এত ভিড় যে সেদিন কাজ হইতে পারিল না। এইরূপ বার বার শুনিবার পর একদিন নিজে গিয়া ডাকঘরের বারাণ্ডায় ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিলাম, মনি-অর্ডার পাঠাইতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল কেরাণীর ক্ষিপ্রতার অভাবে লোকের ভিড় হইতেছে। পরে বুঝিলাম তাঁহার দোষ দিলে চলিবে না, মানুষের কর্ম্ম-সামর্থ্যেরও সীমা আছে। একদিন নয়, দুইদিন নয়; এক ঘণ্টা নয়, আধ ঘণ্টা নয়; প্রত্যহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই কর্ম্ম করিতে করিতে, হয় নির্জীব যন্ত্র, নয় পাগল হইবার কথা। টাকা-কড়ির কর্ম্ম; বুদ্ধি জাগ্রত রাখিতে হয়। নইলে ভুল; ভুলের পর ভৎর্সনা, ভৎর্সনার পর জরিমানা, জরিমানার পর বেতন হ্রাস বা কর্ম্মহানি, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভীষিকার স্রোত প্রবল। অন্যদিকে মাসের শেষে কয়েকটা টাকা—যাহাতে অতিকষ্টে দিনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। ফলে পাগলামি, অর্থাৎ মেজাজ খিট্‌-খিটা হইয়া পড়ে, অধিকার-মদের মত্ততার লোভ জন্মে। দৈব হউক, স্বকর্ম্ম হউক, নিজের প্রতি অসন্তোষ, খিট্‌-খিটা ব্যবহারে প্রকাশিত হয়। আর, অধিকার-মদ নীচে যত, উপরে তত নয়। কনষ্টবলের যত, দারোগার তত নয়; দারোগার যত, ডেপুটী হাকিমের তত নয়; এইরূপ অধিকার অল্প হইলে মত্ততা অধিক হয়, আইনের ধারা প্রচণ্ড হইয়া উঠে। কারণ, ব্যাপ্তির অভাবে তৃপ্তি অল্প পরিসরে আবদ্ধ হয়। উৎকোচ গ্রহণ, তৃপ্তির আর-এক পথ। উপরি পাওনার প্রবল আকাঙ্ক্ষার প্রধান হেতু এই। দোকানে খরিদ্দারের যত ভিড় হয়, দোকানীর মুখে হাসি, বাক্যে বিনয় তত ফুটিয়া উঠে। কিন্তু রেলষ্টেশনের টিকিটকাটা বাবুর, আদালতের মামলা-মুহুরীর চিত্ত কাজের ভিড়ে অপ্রসন্ন হইয়া উঠে। কড়া হুকুমে, ঘুষ বন্ধ হইতে পারে না, অবিনয়ও অন্তর্হিত হয় না। বেতনের সঙ্গে কমিশনের অর্থাৎ উপরি লাভের আশ্চর্য্য গুণ ইংরেজ ব্যবসায়ী বিলক্ষণ বুঝে। ইংরেজ সরকার বুঝেন না কেন? ইত্যাকার চিন্তা চলিতেছে, এমন সময় শুনিলাম, "তিনটা বেজেছে, আজ আর হবে না।" তখনও আট দশ জন প্রার্থী দাঁড়াইয়া; দুই এক জন আমার আগে আসিয়াছিল। "তিনটা",—এই ধ্বনির নিকট যুক্তি চলে না, কাল ও সাগর-বেলা কাহারও অপেক্ষায় থাকে না। লোক-গুলি বিরক্ত-মিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। একজনের উক্তি শুনিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছিলাম। "চিরকালই এক!" কারণ মনি-অর্ডার-বাবুর দোষ নাই, দোষ তাহার নিজের। কাল এক নয়, নিত্য-পরিবর্ত্তিত: সে মনে করিতেছিল এক।

প্রতিকার জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিয়াছিলেন, "লোকে কষ্ট ভুগিয়াও কিছু বলে না, আমরা কি করিব। পঁচিশ বছর আগে পাঁচ জন কেরাণী ছিল, এখনও পাঁচ জন।" কর্ত্তারা আমাদের কথা শোনেন না, বলেন Public complaint কই।

ঠিক কথা, Public complaint কই? কষ্টসহিষ্ণুতা আমাদের বার আনা কষ্টের কারণ। কষ্ট লাঘবের উপায় চিন্তা করি না; মনে করি জন্মিলে যেমন মরণ আছে, দুঃখভোগ তেমনই স্বাভাবিক।

অসাড় দেশে সাড়া পাইলে আনন্দ হয়, প্রতিবাদ পাইয়া আমার আনন্দ হইতেছে। আমি ভুল লিখি, আর যাহাই লিখি, কিছুই যায় আসে না। যায় আসে দুঃখ-অনুভবের অভাবে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

—

"বাংলায় প্রথম আর্দ্ধসপ্তাহিক"

আনন্দবাজারের পূর্ব্বে কয়েকখানি অর্দ্ধসাপ্তাহিক কাগজ বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, যথা:—

ধূমকেতু (২৩শে শ্রাবণ ১৩২৯),
বিশ্ববাণী, সুনীতি (চট্টগ্রামের)।

বাহার

চট্টগ্রামের "সুনীতি" পত্রিকাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম আর্দ্ধসপ্তাহিক (?), উহা ১৩২৯ সালের প্রথম হইতে প্রকাশিত।

শ্রী করুণাশেখর দত্ত

অগ্রহায়ণের 'প্রবাসীতে' বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত শিরোনামায় 'অ' লিখিয়াছেন:—

"আনন্দ-বাজার পত্রিকার পরিচালকেরা তাঁহাদের কাগজের আর্দ্ধ-সপ্তাহিক সংস্করণ বাহির করিতে মনস্থ (?) করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানি, বাংলা আর্দ্ধসপ্তাহিক (?) কাগজ এই প্রথম।......"

......আনন্দবাজারের পূর্ব্বে অন্যূন ৫খানা বাংলা অর্দ্ধসাপ্তাহিক পত্র বাহির হইয়াছিল:—

(১) সমাচার-চন্দ্রিকা (১৮২২)। (২) রসরাজ (১৮৩৯)। (৩) সংবাদসুজনরঞ্জন (১৮৪০)। (৪) সংবাদ-রত্নাকর (১৮৪৭) (৫) ধূমকেতু (১৯২২)।

এ-ছাড়া আরো যে ২।১ খানা ছিল না, তা' বলা যায় না।......

শ্রী রাধাচরণ দাস

[পত্রলেখক মহাশয়েরা একটু মনোযোগ দিয়া মন্তব্যটি পড়িলেই বুঝিতে পারিতেন যে এখানে দৈনিক কাগজের আর্দ্ধসপ্তাহিক সংস্করণের কথা বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র আর্দ্ধসপ্তাহিক কাগজের কথা বলা হয় নাই। দৈনিক কাগজে যে লেখাগুলি বাহির হয়, সেইগুলি একত্র করিয়া সপ্তাহে দুইবার একটি সংস্করণ বাহির করার রীতি ইংরেজী কাগজের (যথা বেঙ্গলীর ও অমৃতবাজারের) আছে। বাংলা দৈনিক কাগজের এইরূপ সাপ্তাহিক সংস্করণ আছে (যথা বসুমতীর, হিতবাদী যতদিন দৈনিক ছিল ততদিন হিতবাদীর), কিন্তু আর্দ্ধসপ্তাহিক সংস্করণ যতদূর জানি বোধ হয় ছিল না। অগ্রহায়ণের প্রবাসীর স্বল্প-পরিসর মন্তব্যটির আগে-পরের বাক্যে সংস্করণ কথাটি আছে, কিন্তু মন্তব্যটির মধ্যে 'এ ধরণের' কথাটি পড়িয়া গিয়া বোধ-সৌকর্য্যের হানি ঘটাইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

শেষের পত্রলেখক সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় দিয়া আমাদের ব্যবহৃত "আর্দ্ধসপ্তাহিক" ও 'মনস্থ' পদ দুইটিকে নিজেই সংশয়-চিহ্নে অঙ্কিত

প্রযুক্ত 'অর্দ্ধসাপ্তাহিক' পদই অশুদ্ধ, আমাদের প্রযুক্ত 'আর্দ্ধসপ্তাহিক' ও তাহার বৈকল্পিক রূপ 'অর্দ্ধসপ্তাহিক' এই দুইটিই ব্যাকরণ-সম্মত। 'অর্দ্ধাৎ পরিমাণস্ত পূর্ব্বস্ত তু বা; 'নাতঃ পরস্ত' (পাণিনি ৭-৩-২৬ ও ২৭)। মনঃস্থই যে আদিম সংস্কৃত রূপ তাহা কে না জানে, কিন্তু বাংলায় মনস্থই উচ্চারণতঃ ও অভিধানতঃ শিষ্টপ্রয়োগ বলিয়া স্বীকৃত। (দ্রষ্টব্য—রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ অভিধান, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ও সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা শব্দকোষ।)]

"অ"

—

গৌড় ব্রাহ্মণ

গৌড় ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আজকাল "প্রবাসী' "বঙ্গবাণী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলিতে আলোচনা চলিতেছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আশ্বিন মাসের "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় 'বাঙ্গালীর জাতি পরিচয়' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধ কার্ত্তিক সংখ্যা "প্রবাসী" পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়াছেন "বাঙ্গালার কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ইহারা কেহই খাঁটি বাঙ্গালী নহে। ইহারা কান্যকুব্জ হইতে আমদানী-করা মানুষ। স্কন্দপুরাণ অনুসারে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের পরে পুনঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার কালে দশবিধ ব্রাহ্মণ মান্য ও গ্রাহ্য হইয়াছিলেন; আর্য্যাবর্ত্তের পঞ্চ গৌড় এবং দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চ গৌড়ের মধ্যে গৌড় উৎকল মৈথিল সারস্বত এবং কান্যকুব্জ এই পঞ্চ শ্রেণীর মান্য। গৌড় ব্রাহ্মণই খাঁটি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ অথচ এখন বাঙ্গালাদেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবেন না।" এদিকে শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "ব্রাহ্মণ-ইতিহাস" নামক পুস্তকের ৩৪শ পৃষ্ঠায় কান্যকুব্জ হইতে আগত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে 'গৌড ব্রাহ্মণ' বলিয়াছেন। বঙ্গদেশে খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানে আছেন কি না এবং বর্ত্তমানে কোন্ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ তাহাই আলোচ্য। যে সময়ে মনুসংহিতার রচনা হয় সে সময় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাবাস হয় নাই; তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গ ভিন্ন বঙ্গদেশে দ্বিজাতিগণের গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় রাজগণের আবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রয়োজনবশতঃ সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। মনু মহারাজের নিষেধ বাক্যের প্রতিষেধ হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমসেন পৌণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেনকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। অতএব ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বসবাস হইয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রাকালে অঙ্গে বঙ্গে ও কলিঙ্গে যজ্ঞীয়গিরিশোভিত সতত-দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্য্যক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন, যথা—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণম্ এত্য বৈ॥
ঋষিভিঃ সমুপযুক্তং যজ্ঞীয়-গিরি-শোভিতম্।
উত্তরং তীরম্ এতদ্ ধি সততঃ-দ্বিজ-সেবিতম্॥"—বনপর্ব্ব।

কলিঙ্গদেশ গঙ্গানদীর মোহানা হইতে কৃষ্ণানদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (Indian Shipping, p. 144)। মহাভারতীয় যুগের অবসানে ও কলির প্রারম্ভে মাহিষ্যরাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক তাম্রলিপ্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিন্নাবয়ব কলিঙ্গরাজ্যের সীমা সুবর্ণরেখা নদীর দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।

"অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকা।"—হরিবংশ

অতএব তাম্রলিপ্তের পার্শ্বেই কলিঙ্গ দেশ ছিল দেখা যাইতেছে। তাম্রলিপ্ত রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার পর কলিঙ্গ দেশের উত্তরাংশ স্বাধীন হইলে "উৎকলিঙ্গ বা উৎকল" স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইয়াছিল।

পৌরাণিক যুগের পর খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সাঙ্ ভারত-ভ্রমণে আসিয়া দেখিয়াছিলেন যে দক্ষিণ বঙ্গের রাজধানী তমলুক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে আলোকিত ছিল। বৌদ্ধমঠ অপেক্ষা পঞ্চগুণাধিক হিন্দু দেবমন্দিরের উচ্চচূড়ায় সুশোভিত ছিল।

এই-সমস্ত দেবমন্দিরের সেবক ব্রাহ্মণগণ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই তমলুকের পূর্ব্ব-গৌরব-গাথা গাহিয়াছেন। এই তমোলুক হইতেই মাহিষ্য রাজন্যবর্গ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ সহ সমগ্র ভারত-সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী আর্য্যজাতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় পর্য্যটক ফাহিয়ান খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মবিদ্বেষী বহু সংখ্যক হিন্দুব্রাহ্মণ দেখিয়া যান। ইঁহারাও গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ-বংশধর।

ভারতে দশপ্রকার ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে, যথা—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড় মৈথিলোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়ঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গ। গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিডাঃ পঞ্চ বিন্ধ্যাদক্ষিণবাসিনঃ॥—স্কন্দপুরাণ

সারস্বত কান্যকুব্জ গৌড় মৈথিল ও উৎকল ব্রাহ্মণগণ বিন্ধ্যগিরির উত্তরদিগ্বাসী পঞ্চগৌড়ী আর কর্ণাট তৈলঙ্গ গুর্জ্জর অন্ধ্র ও দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণদিগ্বাসী পঞ্চদ্রাবিড়ী।

রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ঠাকুরগণের পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণ পঞ্চক যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই, যখন বঙ্গের সামন্তরাজ শ্যামলবর্ম্মদেব তাঁহার শাকুন-সত্র সম্পাদন করিবার জন্য পাশ্চাত্য বৈদিক ঠাকুরগণের আদিপুরুষ শুনক-গোত্রীয় যশোধর মিশ্র মহাশয়কে আহ্বান করেন নাই, এমন কি মুসলমান-দুন্দুভি দিল্লীর দ্বারে যখন প্রতিধ্বনিত হয় নাই এবং গজনির মামুদ ভারত আক্রমণ করিবার জন্য সিন্ধুনদী অতিক্রম করিতেও সাহসী হন নাই, সেই সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আর্য্য-সমাজের কর্ণধার ছিলেন!

৮ম শতাব্দী হইতে পালবংশীয় রাজাধিরাজ গোপালদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ১১শ শতাব্দীতে মদনপাল পর্য্যন্ত গৌড়রাজলক্ষ্মী পাল-বংশের অঙ্কশায়িনী ছিলেন। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বেদপারগ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ বংশাবলীক্রমে পাল-রাজবংশের মন্ত্রী ছিলেন। দিনাজপুরের গরুড়-স্তম্ভে ২৮টি শ্লোকে উক্ত মন্ত্রীবংশের ক্ষমতা ও যশোগাথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও তখন বৌদ্ধধর্ম্মের খর-স্রোতের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল এবং ধীরে ধীরে সাধারণের মনে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। তাই দেখিতে পাই বৃহস্পতি-তুল্য কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রুসংহার-কারী নানা-সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চিরকল্যাণকামী শ্রীশূরপাল নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুত হৃদয়ে নতশিরে পবিত্র (শান্তি) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণদিগের নীতি-কৌশলে পালরাজগণ নৃপহস্তীর মদজলসিক্ত শিলাসংহতিপূর্ণ নর্ম্মদার জনক বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া মহেশ-ললাটশোভিত ইন্দুকিরণে-উদ্ভাসিত হিমাচল পর্য্যন্ত এক সূর্য্যের উদয়াস্তকালে অরুণরাগে রঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ্য-শক্তির আশ্রয় না লইলে পাল-

ব্রাহ্মণগণের উপায়ান্তর ছিল না ; এমনকি তাঁহার মন্ত্রীর অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন এবং মন্ত্রী সভাস্থ হইলে অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী মহার্হ আসন প্রদান করিয়া নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিত ভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণগণও পালবংশের ইষ্টদেব বুদ্ধদেবকে শ্রীভগবানের দশ অবতারের মধ্যে অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। তাই আমরা জয়দেব গোস্বামীকৃত দশ অবতারের স্তোত্র মধ্যে দেখিতে পাই—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব-ধৃত-বুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে।

প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচনক্রমে এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া প্রজা-শক্তির সাহায্যে সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিপুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রবলপরাক্রমশালী নরপাল দেবপাল-দেবও তদীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সম্মুখে সচকিত ভাবে কি কারণে উপবেশন করিতেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায় যে প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক দেবপালের পিতামহ গোপালদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণই প্রজাপুঞ্জের অধিনায়ক থাকিয়া রাজ-নির্ব্বাচনকারী (King-maker) ছিলেন। এই পালবংশের শেষ রাজা মদনপালের মহিষী চিত্রমতিকার শিথিলহস্ত হইতে বিজয়সেন গৌড়ের শাসনদণ্ড বিচ্ছিন্ন করিয়া সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আদিশূর যে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন তাহা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিতেছেন।

অতএব সেন-বংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-গণ সতেজে সসম্মানে বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাজ সুদেবের সময়ের বহুপূর্ব্বকাল হইতে গৌড়ে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল এবং একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা পূর্ণ প্রতাপে সমাজের কর্ত্তা ছিলেন। সেইসমস্ত ব্রাহ্মণের বংশ এক্ষণে কোথায়? রাঢ়ী বারেন্দ্র পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ এই কথা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেন না। কারণ তাঁহারা কয়েক শত বৎসর মাত্র বঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণ-বংশ যে একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, আজ তাহাদের একটি অঙ্কুর মাত্র জীবিত নাই, ইহা অসম্ভব কথা। ৫জন ব্রাহ্মণ দ্বারা ৯০০ শত বৎসরের মধ্যে যদি সমগ্র বাঙ্গালা ভারাক্রান্ত হইতে পারে, তাহা হইলে মহাভারতীয় যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পাল-রাজগণের শাসন-কাল পর্য্যন্ত যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদের পূর্ণ সজীবতা দেখাইয়া গিয়াছেন তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে একবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ এবং অসম্ভব। এই প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। পাঁচকড়ি বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমাদের সকল কথার মিল হইয়াছে, একটি কথার মিল হয় নাই। সেই কথাটি এই যে "বাঙ্গালা দেশে একটিও গৌড় ব্রাহ্মণ পাইবে না"।

কি কারণে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটিও খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না তাহাই এইবারে আলোচ্য।

এক্ষণে ইতিহাসের আলোকে দেখা যাউক—গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণ-বংশ কোথায় কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন। যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয় কার্য্য ব্রাহ্মণের পালনীয়। অতএব গৌড় ব্রাহ্মণ কাহাদের যাজন করিতেছেন?

মাহিষ্য-জাতির আশ্রয়ে গৌড়ের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশ অদ্যাবধি কালযাপন করিতেছেন। এইবারে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজের কিঞ্চিৎমাত্র আলোচনা করা যাউক। উক্ত গৌড় ব্রাহ্মণ বর্ণ-ব্রাহ্মণ নহেন। বর্ণ-ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ৫ গোত্র হইতে বহির্গত হইয়া অন্ত্যজ ও জলাচরণীয় জাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন,—যেমন কলু, বাগ্দী, শৌণ্ডিক, মুচি, জালিক (ধীবর) প্রভৃতি জাতিগণের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ কনোজাগত পঞ্চগোত্র-সম্ভূত ব্রাহ্মণ-বংশ-ধারা। কিন্তু মাহিষ্য পুরোধাগণ পঞ্চগোত্র রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত নহেন। তাঁহারা শাণ্ডিল্য, ঘৃত-কৌশিক, রথুঋষি, কাত্যায়ন হংসঋষি, মৌদ্গল্য, পুণ্ডরিক, গৌতম, কর্ণ, কাশ্যপ ও আলম্যায়ন প্রভৃতি আরও অনেক গোত্র-সম্ভূত প্রাচীন ঋষিবংশ-জাত। তাঁহারাই বঙ্গের আদি গৌড় ব্রাহ্মণ। রাঢ়ী বারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিন্ধ্যগিরির উত্তরদিগ্বাসী পঞ্চগৌড়ের অন্যতম কান্যকুব্জীয় শাখা বঙ্গে নবাগত উপনিবিষ্ট সম্প্রদায়। শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কথাই বলিয়াছেন। তবে যে কেন তিনি গৌড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না তাহার উত্তরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দে প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যায় "লক্ষ্মণ সেনের সময়" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "রামপালের মৃত্যুর পর পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন শিথিল হইলে বিজয়-সেন বরেন্দ্রে পদক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বল্লাল সেন সত্যই কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠাতা কি না তাহার সত্য প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৌলীন্য-প্রথা সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের বহু-শতাব্দী পরে কয়েকজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। যদি কোন দিন প্রমাণ হয় যে, সত্য সত্যই বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রাচীন অভিজাত সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও প্রাচীন পাল রাজবংশের পক্ষপাতী দেখিয়া বিজয় সেন ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে আভিজাত্য সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তৎপুত্র বল্লাল সেনের সময়ে আদিশূর ও পঞ্চ ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া নূতন অভিজাত্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত-প্রায় না হইলে এই নবজাত সম্প্রদায় টিকিত কি না সন্দেহ। দৈববলে শত্রুপক্ষ নিহত হইলে পাদপহীন দেশে আভিজাত্যের নবজাত বৃক্ষ বৃহদাকার প্রাপ্ত হইয়া দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।"

পাল বংশীয় রাজগণ যে মাহিষ্য জাতি এবং তাঁহাদের বংশাবলী যে এখনও ঢাকা জেলায় ভাকুর্ত্তা ও কোণ্ডাগান্ধারগড়ে বর্ত্তমান আছে, রায় বাহাদুর ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "প্রবাসী" পত্রিকায় এই কথা লিখিয়াছেন। পাল-রাজগণের মন্ত্রিবংশ যে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তাহা আমি মৎপ্রণীত "ভ্রান্তিবিজয়" পুস্তকে এবং সন ১৩০৮ সালের আষাঢ় সংখ্যার "ভারতবর্ষে" প্রতিপন্ন করিয়াছি। সেনবংশের অভ্যুদয়ে মাহিষ্য জাতি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। বিজিত মাহিষ্যজাতির পক্ষপাতী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে জেতা সেনবংশ এবং সেনানুগৃহীত জাতিগণ ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন; কত মিথ্যা কিম্বা চাতুরী প্রচার করিয়া সাধারণের সম্মুখে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণকে অপদস্থ করিয়া আসিতেছেন। এইজন্যই বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয় একটিও খাঁটি গৌড় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইতেছেন না।

শ্রী হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

—

পাহাড়ী মেয়েদের নাম

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে 'নাম' প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"পাহাড়ীদের মধ্যে দেখা যায় সকল পরিবারের মেয়েদেরই এক ধরণের



যাত্রী



বর-বধূ

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিল ।

নাম। সকল বাড়ীর বড় মেয়েই জেঠি, মেজ মেয়ে মাইলি, সেজ মেয়ে সাঁইলি, ছোট মেয়ে কাঞ্চি।" এই ধারণাটি একেবারেই ভুল। আমাদের মধ্যেও প্রথমা কন্যাকে বড়, মধ্যমাকে মেজ, তৃতীয়াকে সেজ এবং কনিষ্ঠাকে ছোটই বলা হইয়া থাকে। তবে পাহাড়ীদের এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু, আমরা 'বড়' 'মেজ' সেজ' বা 'ছোট' বলিয়া কাহাকেও ডাকি না, কিন্তু ইহারা তাহা করে। এগুলিকে 'নাম' বলা যায় বলিয়া আমার মনে হয় না। ইহাদের প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক মেয়েরই একটি করিয়া নিজস্ব নাম আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজন বোধ না করিলে সে নামে ইহাদিগকে ডাকে না। শুধু মেয়েদের বেলায় নয়, পুরুষদের বেলায়ও ইহার কোনও ব্যতিক্রম হয় না; তাহাদিগকে 'জেঠা' 'মায়লা' 'সাঁয়লা', 'কাঁয়লা,' 'অন্তরে' 'যন্তরে' 'মন্তরে' 'কাঞ্ছা' ইত্যাদি ক্রমেই ডাকা হয়। বিবাহের পরে ইহারা মেয়েদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লজ্জা বোধ করে। সেইজন্য মেয়ের স্বামী যদি শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় এবং তাহার পদবী যদি 'সুনুয়ার' হয় তাহা হইলে বিবাহের অব্যবহিত পরেই মেয়ে সে পিতার বড় মেজ ছোট যে মেয়েই হউক না কেন 'জেঠি সুনুয়ারনী' বলিয়া অভিহিতা হয়। অবশ্য ইহা কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং 'সুনুয়ার' জাতির পক্ষেই নহে; পরন্তু যে-কোন পুত্র এবং যে-কোন জাতির মধ্যেই এইরূপ হয়।

প্রবন্ধে আছে, "ছোটি মেয়ে কাঞ্চি," কথাটা 'কাঞ্চি' নহে, "কাঞ্ছি"।

পরিশেষে বক্তব্য, যদি নেপালবাসী 'নেপালী' এবং দার্জ্জিলিং-প্রবাসী 'নেপালী' ছাড়া অন্য কোনও 'পাহাড়ী'দের কথা প্রবন্ধে লেখা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার এ প্রতিবাদ নিরর্থক, কারণ অন্য স্থানের 'পাহাড়ী'দের সম্বন্ধে কিছু জানার সৌভাগ্য আমার আজ পর্য্যন্তও হয় নাই।

শ্রী বারিদকান্তি বসু

বেনো-জল

বিশ

বৈকালের পরেই সকলে আবার পুরীর দিকে যাত্রা করলেন।

আনন্দ-বাবুর মোটেই এত তাড়াতাড়ি ফেরবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুমিত্রা যখন বার বার অভিযোগ করতে লাগল যে, তার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, সে আর এক ঘণ্টাও এখানে থাকতে রাজি নয়, তখন তাঁকে বাধ্য হয়েই ফিরতে হ'ল।

গরুর গাড়ী পুরীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল, আনন্দ-বাবু তখনো কণারকের শ্যামল ছবির পানে পিপাসী চোখে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু সে ছবির স্নিগ্ধ রং সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখতে দেখতে নিঃশেষে মুছে গেল; আনন্দ-বাবু দুঃখিতভাবে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, "শুনছ রতন?"

পাশের গাড়ী থেকে রতন সাড়া দিলে, "আজ্ঞে?"

—"আবার আমরা কণারকে আসব!"

—"বেশ তো, আমার তাতে কোনই আপত্তি নেই।"

—"কিন্তু এবারে আর আমি শাস্ত্র-বাক্যে অবহেলা করব না।"

—"তার মানে?"

—"শাস্ত্র বলছেন 'পথে নারী বিবর্জ্জিতা'। কথাটা ভারি খাঁটি হে! এই দেখনা আমাদের সঙ্গে মেয়েরা না থাকলে তো এত শিগ্‌গির পাততাড়ি গুটোতে হ'ত না!"

পূর্ণিমা শুনতে পেয়ে অন্য গাড়ী থেকে বললে, "এ তুমি অন্যায় বলছ বাবা! কণারকে আসতে আমার কোনো আপত্তি নেই, আমার আপত্তি ঐ মশাদের জন্যে!"

আনন্দ বাবু বললেন, "কিন্তু আমি সেজন্যে আপত্তি করছি না কেন? তার কারণ, আমি হচ্ছি পুরুষ, আর তুমি হচ্ছ নারী! অতএব ভবিষ্যতে কণারকের পথে তুমি 'বিবর্জ্জিতা' হবে: বুঝেছ? এই আমার প্রতিজ্ঞা!"

পূর্ণিমা হাসতে হাসতে বললে, "আচ্ছা বাবা, তুমি দেখে নিও, ভবিষ্যতে আমি একটি মশারি সংগ্রহ ক'রে নিশ্চয়ই তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করব!"

গাড়ীর ভিতরে ব'সে ব'সে তিনজনে এমনি কথাবার্ত্তা কইতে কইতে এগিয়ে চললেন,—কিন্তু সে কথাবার্ত্তায় সুমিত্রা একেবারেই যোগ দিলে না। গাড়ীর ভিতরে দুই চোখ মুদে চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে সে খালি এক কথাই ভাবছে—কখন্ এ পথ শেষ হবে, কখন্ এ পথ শেষ হবে!

খানিক পরে চাঁদ উঠল। পূর্ণিমা বললে, "রতন-বাবু, আসুন এইবারে আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়ি।"

রতন গাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে দেখলে, মরুভূমির বিশুষ্ক অসীমতাকে স্নিগ্ধ ক'রে বালিয়াড়ির শিখরের পর

যাচ্ছে—সে প্রবাহের মধ্যে তার প্রাণ-মন তখনি বিপুল পুলকে সাঁতার দিতে চাইলে, কিন্তু তার পরেই কি ভেবে সে বল্‌লে, "না, আজ আর আমার হাঁট্‌তে সাধ যাচ্ছে না।"

* * *

পরের দিন সকাল বেলায় বেড়িয়ে ফিরে এসেই বিনয়-বাবু দেখ্‌লেন, সুমিত্রা আঙিনার উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, "সুমি! তুই কখন এলি ?"

সুমিত্রা বল্‌লে, "এই সবে আস্‌ছি, বাবা!"

—"কিন্তু আজ তো তোদের ফের্‌বার কথা ছিল না!'

—"না, আমি একরকম জোর ক'রেই চ'লে এসেছি!"

—"জোর ক'রে ? কেন, কণারক কি তোর ভালো লাগ্‌ল না ?"

—"কণারক খুব ভালো জায়গা, বাবা!"

—"তবে যে বল্‌ছিস্‌, জোর ক'রে চলে' এসেছিস্‌ ?"

—"হ্যাঁ, রতন-বাবুর সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমি আর কখনো কথা কইব না!"

বিনয়-বাবু সবিস্ময়ে বল্‌লেন, "রতনের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া হয়েছে! কেন রে ?"

—"তিনি বোধ হয় ভাবেন, আমার কোনো আত্ম-সম্মান নেই!"

বিনয়-বাবু চম্‌কে উঠ্‌লেন। নীরবে কিছুক্ষণ সুমিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে, গম্ভীর স্বরে তিনি বল্‌লেন, "রতন কি তোমাকে অপমান করেছে ?"

—"ঠিক অপমান না করুন, রতন-বাবু আমাকে বড় তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করেন।"

—"কি রকম ?"

—"সে অনেক কথা, বাবা! রতন-বাবুর কাছে আমি আর ছবি-আঁকা শিখ্‌ব না।"—এই ব'লেই সুমিত্রা চ'লে গেল।

বিনয়-বাবু খানিকক্ষণ সেইখানে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পর আস্তে আস্তে নিজের ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন, অত্যন্ত চিন্তিত মুখে।......

দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর রতন একটু নিশ্চিন্ত দিবা-নিদ্রার আয়োজন কর্‌ছে, এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, বিনয়-বাবু তাকে ডাক্‌ছেন।

রতন গিয়ে দেখ্‌লে, বিনয়-বাবু গম্ভীরমুখে ঘরের ভিতরে পায়চারি কর্‌ছেন।

রতন বল্‌লে, "আপনি আমাকে ডেকেছেন ?"

বিনয়-বাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে।"

রতন একখানা চেয়ারের উপরে গিয়ে বস্‌ল। বিনয়-বাবুও তার সাম্‌নের চেয়ারে ব'সে পড়্‌লেন, কিন্তু কিছুই বল্‌লেন না।

খানিকক্ষণ পরে রতন বল্‌লে, "আপনি কি বল্‌বেন বল্‌ছিলেন না ?"

বিনয়-বাবু কেমন বাধো-বাধো গলায় বল্‌লেন, "হ্যাঁ! তোমাকে আমি—" কিন্তু এই পর্য্যন্ত ব'লেই থেমে পড়্‌লেন।

রতন একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "আপনি অতটা 'কিন্তু' হচ্ছেন কেন, বিনয়-বাবু ?"

—"কথাটা বড়ই গুরুতর রতন, কি ক'রে তোমাকে বল্‌ব বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।"

রতন অবাক্‌ হয়ে বিনয়-বাবুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বিনয়-বাবু আরো খানিকটা ইতস্ততঃ ক'রে শেষটা বল্‌লেন, "রতন, তুমি কি কখনো আদালতে আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছিলে ?"

রতন চম্‌কে উঠ্‌ল। এতক্ষণে সে বুঝ্‌লে, বিনয়-বাবুর বক্তব্য কি!......আস্তে আস্তে সে বল্‌লে, "হ্যাঁ। একবার আমাকে আসামী হ'তে হয়েছিল বটে।"

—"ডাকাতি মাম্‌লায় ?"

—"আজ্ঞে হাঁ।"

—"পরে তুমি প্রমাণ অভাবে খালাস পাও বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ ব'লে প্রতিপন্ন হও-নি ?"

—"এও সত্যি কথা।"

—"এখনো তোমার ওপরে পুলিসের নজর আছে ?"

—"হাঁ, আর এইজন্যেই আমি কোথাও চেষ্টা ক'রেও চাকরি পাই-নি।"

—"তাহলে আমি যা শুনেছি মিথ্যে নয়?"—এই ব'লে বিনয়-বাবু আবার দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন।

রতন বল্‌লে, "কিন্তু কার মুখে আপনি এ-সব কথা শুন্‌লেন?"

—"কাল পুলিসের একজন লোক আমার এখানে এসেছিল।"

রতন উত্তেজিত ভাবে বল্‌লে, "এখানেও পুলিস এসেছিল? বিনয়-বাবু, এই পুলিস নির্দ্দোষকেও অপরাধী ক'রে তোলে। পুলিস একবার যাকে সন্দেহ করে, সে বেচারীর অপরাধী হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কারণ, সে সুপথে থাক্‌লেও পুলিসের নির্দ্দয় ষড়যন্ত্রে সমাজে সে পতিতের মতন ব্যবহার পাবে, সৎপথে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় থেকেও বঞ্চিত হবে। কাজেই শেষটা তাকে হতাশ হয়ে আবার কুপথে পদার্পণ করতে হয়। এ অন্যায় বিনয়-বাবু, অন্যায়! পুলিস কি কখনো আমাকে শান্তি দেবে না?"

বিনয়-বাবু দুঃখিত স্বরে বল্‌লেন, "রতন, তোমাকে বিশ্বাস ক'রে আমি আমার পরিবারের মধ্যে স্থান দিয়েছি, কিন্তু তোমার জীবনের এই ইতিহাস তুমি তো আমাকে জানাও নি!"

রতন আহত কণ্ঠে বল্‌লে, "কেন বিনয়-বাবু, আমার ইতিহাস আগে জান্‌লে আপনিও কি আমাকে ত্যাগ করতেন?"

—"এখানে ত্যাগ করার কোনো কথাই হচ্ছে না। কিন্তু আমার কাছে এমনভাবে আত্মগোপন করা তোমার উচিত হয় নি।"

রতন বিদ্যুতের মতন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। তার পর অধীরস্বরে বল্‌লে, "বিনয়-বাবু, বিনয়-বাবু! আপনি কি আমাকে ডাকাত ব'লে মনে করেন?"

—"না। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছে যে, হয়তো যৌবনের চাপল্যে কুসঙ্গে মিশে—"

—"থাক্ বিনয়-বাবু, আর বল্‌বেন না। এ বড় আশ্চর্য্য যে, এতদিনেও আপনি আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না!"

—"শোনো রতন, অধীর হয়ো না। কাল পুলিসের এক লোক আমাদের যথেষ্ট ভয় দেখিয়ে গিয়েছে। ...

কথাও বলেছে যে, তোমার জন্যে আমারও পুলিস-হাঙ্গামে জড়িয়ে পড়্‌বার সম্ভাবনা আছে। আমার বন্ধুরা তো পরামর্শ দিচ্ছেন যে—"

বাধা দিয়ে রতন উদ্ধত স্বরে বল্‌লে, "আপনার বন্ধুদের আমি চিনি, সুতরাং তাঁরা যে কি পরামর্শ দিচ্ছেন তাও আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি।......হাঁ, বন্ধুদের পরামর্শ আপনি অগ্রাহ্য করবেন না, বিনয়-বাবু! তা'হলে হয়তো পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে"—বল্‌তে বল্‌তে রতন দরজার দিকে অগ্রসর হল।

—"রতন, রতন, শোনো। কোথায় যাচ্ছ?"

—"কল্‌কাতায়।"

বিনয়-বাবু ব্যস্তভাবে এগিয়ে রতনের একখানা হাত ধ'রে বল্‌লেন, "আমি কি তোমাকে কল্‌কাতায় যেতে বল্‌ছি, রতন?"

বিনয়-বাবুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অভিমানে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে রতন বল্‌লে, "না, আমি ডাকাত, আমি এখানে থাক্‌লে আপনি বিপদে পড়্‌বেন," ব'লেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনয়-বাবু অত্যন্ত কাতর ও অসহায়ের মতন হ'য়ে একখানা চেয়ারের উপরে ব'সে পড়্‌লেন।

একুশ

কণারকে যাওয়া থেকে আসা পর্য্যন্ত তিন দিন পথশ্রমে আর অনিদ্রায় রতনের শরীর যারপরনাই শ্রান্ত হয়েছিল, তার পর আবার এই অভাবিত আঘাত। ঠিক বিশ্রামের সময়েই তাকে নিরাশ্রয়ের মত আবার কল্‌কাতায় যেতে হবে।

আনন্দ-বাবুর কথা মনে হ'ল। রতন একবার ভাব্‌লে কল্‌কাতায় যাবার আগে খাণিকক্ষণের জন্যে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লে হয়।......কিন্তু বিনয়-বাবুর বাড়ী-ছাড়ার ইতিহাস শুন্‌লে তিনিও যদি শেষটা ভয় পান? না, দর্‌কার নেই কোথাও গিয়ে—সে গরিব, সহায়হীন, ধনীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌লেই তাকে এম্‌নি আঘাত পেতে হবে।

রতন তাড়াতাড়ি নিজের জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিতে

বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগল, ভবিষ্যতেও বরাবর এমনি একলা থাকবে, তার জীবন সমাজের জন্যে নষ্ট হয় নি—সমাজ হচ্ছে ধনীদের খেলাঘর, সেখানে তার কিসের দরকার?

তার ব্যাগের ভিতরে সুমিত্রার আঁকা খানকয়েক ছবি ছিল। ছবিগুলোর উপরে সে একবার চোখ বুলিয়ে গেল। এই অল্পদিনেই সুমিত্রার আঙুল বেশ নিপুণ হয়ে উঠেছে, কোনো কোনো ছবির রেখা দেখলে বাস্তবিকই সুখ্যাতি করতে হয়, আরো কিছুকাল তার শিক্ষাধীনে থাকলে সুমিত্রার হাতের কাজ অনেকটা নিখুঁৎ হয়ে উঠ্ত। এই-সব কথা ভাবতে ভাবতে রতন ছবিগুলিকে টেবিলের উপরে এমন ভাবে রেখে দিলে যাতে ক'রে সে চলে গেলে পর এ ঘরে ঢুকলেই সুমিত্রার চোখ তার উপরে পড়ে।......সুমিত্রার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে হ'ত, কিন্তু সে উপায়ও তো নেই! সুমিত্রা যে তার সঙ্গে আগেই কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছে!

গোছগাছ শেষ ক'রে রতন নিজের মোট তুলে নিয়ে অগ্রসর হ'ল। তার পর দরজাটা খুলতেই ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল—সুমিত্রা!

রতন অবাক্ হয়ে দু' পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

সুমিত্রা বললে, "কোথায় যাচ্ছেন?"

যে সুমিত্রা আজ তিনদিন ধ'রে তার সঙ্গে কথা কয় নি, এমন সময়ে তার দেখা পাবার আশা রতন মোটেই করে নি। সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, বিস্মিতের মতন।

সুমিত্রা হাসিমুখে বললে, "রতন-বাবু, এ তিনদিন আপনার সঙ্গে আমার আড়ি ছিল। আজ আবার ভাব করতে এসেছি।"

রতন মৃদুকণ্ঠে বললে, "শুনে সুখী হলুম।"

—"কিন্তু আপনি মোট ঘাড়ে ক'রে কোথায় যাচ্ছেন বলুন দেখি?"

—"তোমার বাবার কাছে সে কথা শুনো। এখন পথ ছাড়ো।"

—"আমি পথ ছাড়তে আসি নি, রতন-বাবু।"

—"তার মানে?"

—"আমি পথ আগলাতে এসেছি।"

—"কেন?"

—"বলছি। আগে মোট নামান্।"

—"না, দয়া ক'রে ছেলেমানুষী কোরো না, আমাকে যেতে দাও।"

—"কোথায় যাবেন, পূর্ণিমার কাছে?"

—"আবার তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?"

—"সত্যি বলছি, রতন-বাবু, আমি ঠাট্টা করছি না।"

—"আমাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না, আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, সব কথা তোমার বাবার কাছেই জানতে পারবে।"

—"আমি সব কথা শুনেছি রতনবাবু, কিন্তু আমার উপরে আপনি কেন এত নিষ্ঠুর হচ্ছেন?"

—"সুমিত্রা, তোমার পরে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি?"

—"নইলে এমন ক'রে চ'লে যেতে চান?"

—"তুমি যখন সব কথাই জানো, তখন কেন আমি যাচ্ছি তা কি তুমি জানো না?"

—"জানি। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না।"

—"তবু আমাকে যেতে হবে।"

—"আমি যেতে দেব না।"

—"তুমি!"

—"হ্যাঁ, রতন-বাবু, আমি—আমি, আমি আপনাকে যেতে দেব না!"

—"সে কি সুমিত্রা!"

—"আপনি গেলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব!"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হয়ে সুমিত্রার মুখের পানে রতন চেয়ে রইল।

সুমিত্রা আবেগ-ভরে বলতে লাগল, "ভাবছেন আমি ছেলেমানুষী করছি? না, রতন-বাবু, তা নয়! আপনি যদি বলেন, এখুনি আমি আপনার সঙ্গে চ'লে যেতে পারি—কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না। আপনি কি তাই চান? চুপ ক'রে রইলেন কেন—বলুন, বলুন। আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না"—বলতে বলতে তার দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রুর ধারা উছলে পড়ল—সে দুই হাতে নিজের মুখে ঢেকে, সেইখানে, রতনের পায়ের কাছে ধুপ্ ক'রে ব'সে পড়ল।

তার পরেই পায়ের শব্দে চম্‌কে, মুখ থেকে হাত সরিয়ে দেখ্‌লে—রতন ঠিক ঝড়ের মতই ছুটে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাটির উপরে আছ্‌ড়ে প'ড়ে একান্ত আর্ত্তস্বরে সুমিত্রা ব'লে উঠ্‌ল—"যাবেন না রতন-বাবু, যাবেন না, যাবেন না!"

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

"নারী-সমস্যা"

অনেক লোকের ধারণা, যে, টাকা-কড়ি ফল-মূল ঔষধ-পত্র অথবা হাতী-ঘোড়ার মত স্বাধীনতা একটা-কিছু জিনিষ যাহাতে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার নাই; তবে দর্‌কার বোধ করিলে উপরওয়ালারা ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষকে তাহা অল্পবিস্তর দান করিতে পারেন। একটা বিদেশী জাতি আমাদের জাতিকে স্বাধীনতা দিবে কি না-দিবে ভাবিতে বসিলে আমাদের রাগ হয়; আমরা বলি, আমাদের স্বাধীনতা কি উহাদের লোহার সিন্দুকের মোহর যে কৃপা করিয়া উহারা না দিলে আমরা পাইব না। অথচ নিজেদের ঘরে বসিয়া আমরা সর্ব্বদাই মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি, "তাই ত, স্ত্রীলোককে কি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত?" স্ত্রীলোক নিজেও ভাবিয়া পাইতেছেন না, যে, তাঁহার জীবন সম্বন্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা করিবেন কি না; পুরুষও ভাবিয়া পাইতেছেন না, স্ত্রীলোককে বিধিদত্ত মস্তিষ্কটার সদ্ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত কি-না। কিন্তু এই কথাটা উভয়েই ভুলিয়া যান, যে, স্বাধীনতা একটা দেনা-পাওনার জিনিষ নয়, মানুষের দেহ মন মস্তিষ্কের মত ইহাও মানুষ ভগবানের নিকট হইতেই লইয়া আসিয়াছে। নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে দেহ মন কি মস্তিষ্ককে মানুষ যেমন নিজেই নষ্ট করিতে পারে, ইহাকেও তেমনি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে; পরের অত্যাচারে মানুষ যেমন অঙ্গহীন কি জড়বুদ্ধি হইতে পারে, তেমনি পরাধীনও হইতে পারে। পরে যখন মানুষের কোনো অঙ্গহানি বা শারীরিক কোনো ক্ষতি ঘটায়, তখন তাহার শরীরটা পরের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয় না; পরে কাহারও স্বাধীনতা হরণ করিলেও পরকেই মালিক বলিয়া মানিয়া লইতে কেহ বাধ্য হয় না।

কি পুরুষ কি নারী—মানুষ মাত্রই স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। "পুরুষ-স্বাধীনতা" কিম্বা "স্ত্রী-স্বাধীনতা" কাহারও অপরকে দিবার অপেক্ষা ভগবান্ কিম্বা প্রকৃতি রাখেন নাই। তবে স্ত্রী ও পুরুষ বহু ক্ষেত্রে অপরের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতা হেলায় হারাইয়াছেন, কেহ বা নিজ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া "স্বাধীনতা" নামের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছেন।

স্বাধীনতা ও অধিকার সম্বন্ধে আমাদের দেশের বহু লেখকলেখিকার বহু ভ্রান্ত ধারণা আছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন, যে, স্ত্রীজাতিকে যে-সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা না হয়, সেইখানেই তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া স্বভাব ও প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিয়া পথভ্রষ্ট হন। সমাজ অথবা আইন স্ত্রীজাতিকে যে-সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত এখনও করেন নাই, সেই-সকল অধিকারের দাবীই স্ত্রীজাতি সর্ব্বদা করিতেছেন কি না, একথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। পুরুষের উদাহরণ দিয়া এই কথাটা সহজেই বোঝান যায়। আমাদের দেশের আধুনিক সমাজ কিম্বা আইন পুরুষ মাত্রকে অবিবাহিত থাকিবার অথবা সন্ন্যাসী হইবার অধিকার দিয়া রাখিয়াছে; অর্থাৎ তাঁহারা যদি বিবাহ না করেন, সন্ন্যাসী হন, তাহাতে সমাজ কিম্বা আইন বাধা দিবে না। কিন্তু কার্য্যত দেখা যায়, অধিকাংশ পুরুষই তাঁহাদের এই অধিকার অনুসারে চিরকুমার থাকিতে বা সন্ন্যাসী হইতে ভুলিয়া যান। তবে মেয়েদের এই অধিকারটা হইতে বঞ্চিত না করিলেই যে তাঁহারা সকলে কুমারী থাকিবেন, এমন মনে করিবার কিছু কারণ আছে কি? যে গৃহকর্ম্ম নারীর প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া পরিচিত,

তাহাতেও ত পুরুষের হস্তক্ষেপ করায় শাস্ত্রে অথবা আইনে মানা নাই; কিন্তু এই অধিকারের সদ্ব্যবহার করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে পুরুষকে সর্ব্ব স্থলে বা অধিকাংশ স্থলে ত দেখা যায় না। পত্নীর মৃত্যুতে একাদশীর উপবাস ও ব্রহ্মচর্য্য পালন ত পুরুষকে করিতে শাস্ত্রকার কি আইনকর্ত্তা বারণ করেন নাই; তবে এদিকেই বা তাঁহাদের দৃষ্টি এত কম কেন ?

মানুষের অধিকার মানুষ সুবিধা ইচ্ছা শক্তি কর্ত্তব্য ও পছন্দ-মত সকল দিক্ দেখিয়া খাটায়। সকল মানুষের সকল কাজ করিবার ইচ্ছা সুবিধা শক্তি ও সময় না থাকিতে পারে। কিন্তু ঠিক্ কোন্ মানুষটির কোন্ কাজ করিবার মত অবস্থা হইবে কি না-হইবে, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া কেহ বলিতে পারে না; কোনো একটা জাতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায় না। সুতরাং অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিবার স্পর্দ্ধা না রাখিয়া মানুষকে নিজ স্বভাব ও শক্তি প্রভৃতি অনুসরণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়াই সভ্য সমাজের নিয়ম হওয়া উচিত। নিজ অধিকার অনুসারে কাজ করিতে গিয়া মানুষ যাহাতে নিজের ও অপরের কোনো ক্ষতি না করে, তাহা দেখিবার জন্য আধুনিক মানুষের শিক্ষিত মস্তিষ্ক আছে, স্বার্থবুদ্ধি আছে, আইন আদালত আছে, মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণীত বহু নিয়ম আছে, সামাজিক বন্ধন ও আচার ব্যবহার আছে। পাছে সে নিজের কিম্বা অপরের ক্ষতি করে এই ভয়ে তাহাকে জন্মাবধি জেলখানার কয়েদী করিয়া রাখিবার দরকার নাই।

সচরাচর একটা তর্ক শোনা যায়, যে, গৃহের বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের উপরে ত উঠিতেই পারেন না, এমন কি সমকক্ষও হইতে পারেন না। "রাজনীতি-ক্ষেত্রে, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সর্ব্বত্রই পুরুষ নারীর অনেক উপরে স্থান লাভ করিয়া আছে।" সুতরাং যে ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার উপায় আছে তাহা ফেলিয়া বৃথা আয়ু ও শক্তি ক্ষয় করিয়া পঞ্চম শ্রেণীর পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি হইবার চেষ্টা কেন ? ব্যাস, বাল্মীকি, ভিক্টর হিউগো, শেক্সপীয়ার, র‍্যাফেল, চাণক্য, কি বিস্‌মার্ক্ হইবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা যখন নাই, তখন সামান্য চুনো-পুঁটি হইবার জন্য এ-সকল ক্ষেত্রে নারীদের প্রবে লাভের অধিকারের দাবী করিয়া কি হইবে ?

ধরা যাক, বহির্জ্জগতের কোনো কার্য্যক্ষেত্রেই না পুরুষের মত উচ্চদরের সৃজনী শক্তি ও প্রতিভার পরি দিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না; অর্থাৎ সব শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান্ পুরুষদের প্রতিভার তুলনায় সর্ব্বশ্রে প্রতিভাশালিনী নারীদের প্রতিভা অতিক্ষীণপ্রভ এ সংখ্যায়ও এই-সকল নারী ঐজাতীয় পুরুষদের অপে অনেক কম। সমগ্র পুরুষজাতি ধরিয়া যদি বিচার কি তাহা হইলে দেখিব, সাধারণ মানুষের তুলনায় জগতে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালেই অসাধারণ ও উচ্চদরের প্রতিভ বান্ মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। জগতের ইতিহাস যতদি হইতে লিখিত হইয়াছে, ততদিন যে কোটি কোটি পুরু পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয় জন অতিমানব ও মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন হিসা করিয়া দেখাইতে খুব বেশী সময় লাগে না। কোটি পুরুষ প্রতি ইঁহাদের সংখ্যা কত সামান্য হইবে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। অথচ মানুষের সৃষ্টিকাল হইতে পুরুষ শিক্ষার ও কর্ম্মক্ষেত্রের সুযোগ পাইয়া আসিতেছে নারীরা সেরূপ এবং ততটা সুযোগ আগে ত পানই নাই, এখনও পাইতেছেন না। সুতরাং জগতে একজন নারীও যদি শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় না দিয়া থাকেন, তবে এই হিসাব দেখিবার পর তাহাতে নারীদের লজ্জা কি দুঃখের খুব বেশী কারণ থাকিবে না। সর্ব্ববিধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রতিভাবান্ ও অমরকীর্ত্তিমান্ পুরুষের সংখ্যা যদি এত কম হয়, তাহা হইলে সুযোগহীনা নারীর অমরকীর্ত্তি না-থাকাটা লজ্জা দুঃখ বা বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্তু প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও নারীর অমরকীর্ত্তি আছে। এত অল্প পুরুষ জগতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সত্ত্বেও সমস্ত পুরুষজাতির বহির্জ্জগতের সমস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষালাভ অনুশীলন ও অর্জ্জিত বিদ্যা দানে কেহ আপত্তি করে না; কারণ সমস্ত পুরুষ জাতির কোন্ অংশ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিভার উদয় হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না এবং জগতে মুষ্টিমেয় মহামানব লইয়াই মানুষের জীবনচক্র চলে না। মহামানবগণ

যে মহা মনীষার কীর্ত্তি যুগে যুগে অগ্নিশিখার মত এক একবার এক এক স্থানে জ্বালিয়া দিয়া যান, তাহাকে সাধারণ মানুষই তাহার ক্ষুদ্র প্রতিভার সাহায্যে নিত্য ব্যবহারের বস্তু করিয়া তুলে। আকাশের বিদ্যুৎকে মানুষের করায়ত্ত যিনি করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকে আতপদান, আলোকদান, ইন্ধনস্থানীয় হওয়া, বার্ত্তা-বহন, শকটচালন, প্রভৃতি নানা কার্য্যে যাঁহারা লাগাইয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভার মূল্য জগতের কাছে কিছু কম নয়। আবার ইঁহাদের উদ্ভাবিত উপায় শিখিয়া যাঁহারা কাচের বাতি, লোহার পাখা, ট্রামের লাইন, টেলিগ্রাফের তার তৈয়ারি করিতেছেন, খাটাইতেছেন এবং দরকার-মত তাহার নানা উন্নতিসাধন করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভা আরো ক্ষীণ বলা যাইতে পারে; কিন্তু সংসারক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিভার এই সামান্য প্রকাশও কি অত্যন্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ নহে? প্রতিভা জলকণার মত সাগরে, নদীতে, নির্ঝরে, মেঘে, বৃষ্টিতে, বাষ্পে, যেখানে যতটুকুই থাকুক না কেন, সদ্ব্যবহার করিলে ততটুকু সুফলই দিবে এবং এই কণা-সংগ্রহের সমষ্টি পরিণামে সাগরের বারিরাশি অপেক্ষা কম হইবে না।

মাতৃস্নেহ জগতে যতখানি আদর্শস্থানে পৌঁছাইতে পারিয়াছে—পিতৃস্নেহ তেমন পারে নাই। যশোদা, মেনকা, মেরী, অন্নপূর্ণা, কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃরূপের বহু প্রকাশ মানুষের ধর্ম্মজীবনের সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বহু দৃষ্টান্তও আছে। পাতিব্রত্যে নারী যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, পত্নীপ্রেমে পুরুষ তাহা দেখাইতে পারেন নাই। ভক্তিতে নারী যেমন নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, পুরুষ তাহা পারেন নাই। সুপ্রিয়া যেমন করিয়া বুদ্ধের করুণাকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিলেন, শ্রীমতী যেমন করিয়া রক্তের অক্ষরে ভক্তির গাথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাহা পারেন নাই। আজও স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতাকে কেহ ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। স্নেহ প্রেম ও ভক্তির নিকট নিজ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকে নারী যেমন নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছে, পুরুষ তাহা পারেন নাই। কিন্তু প্রেম ভক্তি ও বাৎসল্যের ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর নিকট পরাজিত হইলেও ইহার দাবী তাঁহারা ছাড়িয়া দেন নাই। জগতে মাতৃস্নেহের পাশে পিতৃস্নেহের উচ্চ স্থান আছে; পিতা স্নেহ করিলে, মাতার কার্য্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, কেহ মনে করেন না; সন্তানও পিতৃস্নেহকে অনাবশ্যক কোনো দিন ভাবে নাই; পতিব্রতার প্রেমের পাশে পত্নীপ্রেমিকের প্রীতির স্থানও তুচ্ছ নয়। ভক্তিমতীর ভক্তির পাশে ভক্তেরও স্থান আছে। সংখ্যায় অল্প হইলেও এই-সকল ক্ষেত্রে মূল্য কমিয়া যায় না। জগতে সতী সাবিত্রী বহু থাকিতে পারেন কিন্তু শিবের প্রেম তাহাতে ম্লান হইয়া যায় নাই; যশোদা, মেরী মাতা, মেনকা, কি কৌশল্যা সংখ্যায় অনেক বেশী বলিয়া দশরথের বাৎসল্য তুচ্ছ করিবার নয়। সুতরাং, একজন অহল্যাবাঈ, একজন ঝান্সীর রাণী, কি একজন জোয়ান্ অব্ আর্ক্ অথবা একজন ম্যাডাম কুরী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উৎকর্ষ অস্বীকার করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। অথবা ভবিষ্যতে একজনও যাহাতে না হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই।

নারীর যদি সৃজনী শক্তি নাই থাকে, তবু পুরুষের সৃষ্টিশক্তির প্রকাশে ত সে সাহায্য করিতে পারে। সুর শিক্ষার ফলে নারী যদি সুর সৃষ্টি করিতে না পারে, তবু কণ্ঠ- ও যন্ত্র-সঙ্গীতে সুরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ত দেখাইতে পারে। বিজ্ঞান-রাজ্যে কোনো নূতন আবিষ্কার যদি নারী নাই করিতে পারে, তবু ফলিত-বিজ্ঞানের সাহায্যে জগৎসংসারের বহু কার্য্যসিদ্ধি ত সে করিতে পারে। জগতে যে মানুষ যে ক্ষেত্রে নূতন কোনো আবিষ্কার করে নাই, কিংবা আশ্চর্য্য মৌলিকতা দেখায় নাই, তাহাকে যদি সেই ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইত, তাহা হইলে জগৎসংসার চালাইবার জন্য ভগবান্ কোটী কোটী সাধারণ মানুষের সঙ্গে দুই চারিটি নিউটন গ্যালিলিও হোমার বাল্মীকি না সৃষ্টি করিয়া কোটী মহামানবেরই সৃষ্টি করিতেন। মানুষের যে-কোনো তুচ্ছ দানই মানুষের কাজে লাগে, কর্ম্মজগতে

তাহারই মূল্য আছে। যদি দেখা যাইত, পুরুষ-কেরানীর জায়গায় স্ত্রী-কেরানী রাখিবামাত্র হিসাবে দুই আর দুইয়ে ছয় লেখা হয়, কিম্বা পুরুষ-ডাক্তারের জায়গায় স্ত্রী-ডাক্তার ডাকিবামাত্র রোগীকে দুধের বদলে কার্বলিক এসিড খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, তবে স্ত্রীর কার্য্যকে বৃথা এবং অনিষ্ট-কর বলিবার অধিকার আমাদের থাকিত। কিন্তু সাধারণ কাজ যখন একই ভাবে চলে, তখন নৈয়ায়িকের লড়াই করিয়া তাহার মূল্য কিছুতেই কমাইয়া দেওয়া যায় না। মানুষের প্রতিভা ও বুদ্ধির মাপ অনুসারেই যদি তাহাকে অধিকার দিতে হয়, তবে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের চেয়ে নির্ব্বোধ পুরুষের অধিকার কম হওয়া উচিত। এই মাপ অনুসারেও বহু পুরুষের অধিকার হরণ ও বহু নারীকে অধিকার দান করা চলে। যে দেশে মানুষ যেমন বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, তাহাকে তেমনি অধিকার দিয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কট্‌ল্যাণ্ডকে ইংলণ্ড্ অপেক্ষা অধিক, কি জার্ম্মানীকে ফ্রান্স্ অপেক্ষা অধিক অধিকার দিতে হয়। স্ত্রীলোক পুরুষের "সমকক্ষ" হইতে পারেন না বলায় একটা ভুলও আছে। নারী যদি সকল ক্ষেত্রে ঠিক পুরুষের প্রতিচ্ছবি হইতেন, তাহা হইলে ত তাঁহারা পুরুষই হইতে পারিতেন। একজন পুরুষও ত ঠিক্ আর-একজন পুরুষের মত হন না, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজের মত হন ;—ব্যাস বাল্মীকির মত হন নাই, শেক্স্‌পীয়র হোমরের মত হন নাই ; ইঁহারা কেহ কাহারও ঠিক্ সমকক্ষ হন নাই। ফরাসী বারাঙ্গনা জোয়ান্ অব্ আর্ক্ প্রাণ দিয়াছেন স্বাধীনতার জন্য,স্পার্টান্ বীর লিওনিডাসের ঠিক সমকক্ষ হইয়া উঠিবার উৎসাহে নয়। মৈত্রেয়ী মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য নারী হইয়াও সংসারসম্পদ্ দূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য হইবার দুরাশার বশে নয়। নারীর মনে যদি কোনো কর্ম্মপ্রেরণা থাকে, তবে তাহা অপর কাহারও সহিত তুলনায় ওজন না করিয়াও জগতের কার্য্যে লাগিতে পারিবে। নারীর প্রতিভা যদি কাব্য সাহিত্য ও শিল্পে বিকশিত হইতে চায়, তবে তাহা সামান্য হইলেও নারীকে নিজেকে এবং অপরকে কিছু আনন্দ দিবে। তাহা না হইলে, যাঁহারা বলেন, বাঙালী মেয়ের কাছে "একঘেয়ে প্রেমের গল্প ইত্যাদি" ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না, তাঁহারাই প্রতিমাসে নানা মাসিক পত্রিকায় "প্রেমের গল্প" লিখিয়া ছাপাইতেন না।

বহির্জগতের কোনো কর্ম্মক্ষেত্রেই নারী পুরুষের সমান অথবা অধিক উৎকর্ষ দেখাইতে পারে না, ইহা বলা আজকালকার দিনে আর শোভা পায় না। এই ভ্রান্ত মতটিকে পাশ্চাত্যদেশে ত বহুকাল অসত্য বলিয়া প্রমাণ করা হইয়া গিয়াছে, আমাদের দেশেও হইয়াছে। তবু যাঁহারা সে বিষয়ে কোনো খোঁজ না লইয়াই কলিকাতার কলেজে শিক্ষিতা দশ বিশটি বাঙালী মেয়েকে ব্যাস বাল্মীকি নিউটন গ্যালিলিও, কি চাণক্য বিস্‌মার্ক্ হইতে না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য কিছু বলা দরকার। সত্য বটে আমাদের দেশের "তথাকথিত দশবিশ জন উচ্চশিক্ষিতা নারী" এবং "প্রকৃত শিক্ষিতা হিন্দু নারী'র মধ্যে খুব অল্প দুই একজন মাত্র "একঘেয়ে প্রেমের গল্প কবিতা বা এক আধটা স্বদেশী গান ছাড়া" জগৎকে বেশী কিছু দান করিতে পারেন নাই; কিন্তু তাহার দ্বারাই কি নারীশক্তির অক্ষমতা প্রমাণ হয়? আমাদের দেশের দিদিমা ঠাকুরমারা তাঁহাদের প্রতিভার বিকাশের সহায়তা করিতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও গভীর ব্যাপক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই বলিয়াই আমাদের দেশের মেয়েরা খুব বেশী কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই দেশটি ছাড়াও পৃথিবীর মানচিত্রে আরো দেশ দেখা যায়, সেখানকার মেয়েরাও মেয়েই। তাঁহারা নিজেদের প্রতিভার শক্তির ও মৌলি-কতার কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন, চোখ মেলিয়া দেখিলেই ত আমাদের ভুল ভাঙিয়া যাইত।

সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া যে সর্ব্বগ্রাসী সমরানল কয় বৎসর পূর্ব্বে জ্বলিয়াছিল, আমাদের দেশের নারী-হিতৈষীরা বোধ হয় তাহার কথা ইতিমধ্যেই ভুলিয়া যান নাই। তখন ঘর সংসার পুত্রকন্যা স্ত্রী ভগ্নী মাতা সকলকে ফেলিয়া, বাণিজ্য ব্যবসায় শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্যের চর্চ্চা ভুলিয়া, চিকিৎসা সেবা অন্নসংস্থান বস্ত্র যোগান দূরে ঠেলিয়া,—এককথায় সভ্যজগতের সমস্ত কর্ত্তব্য দায়িত্ব

আনন্দ ও জ্ঞানানুশীলন পিছনে রাখিয়া, পূর্ণবয়স্ক নীরোগ ও শক্তিমান্ পুরুষমাত্রই যে যুদ্ধদানবের সর্ব্বনাশী অগ্নিলীলার ইন্ধন যোগাইতে ছুটিয়াছিল, একথা কি শিক্ষিত মানুষমাত্রই জানেন না? কিন্তু সমস্ত পুরুষশক্তির এই নির্ম্মম অবহেলার ফলে ইউরোপের বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিশু ও নারীগণ কি জহর-ব্রত করিয়া একসঙ্গে পুড়িয়া মরিয়া বিরহবেদনা ও সংসারভার মোচন করিয়াছিল? যুদ্ধশেষে ভগ্নহৃদয় অবসন্ন অঙ্গহীন পীড়িত ক্ষুধিত তৃষিত নিরানন্দ ও স্নেহভিক্ষু পুরুষগণ কি দেশে দেশে ফিরিয়া আসিয়া সংসারচক্রকে স্তব্ধ ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া হতাশায় ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল? বর্ত্তমান ইউরোপের চল্‌তি ইতিহাস ত সে সাক্ষ্য দেয় না। এই বিরাট্ মহাদেশের জটিল জীবনযাত্রা-পথের সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়াছিল ইউরোপের নারীরা; তাহারা ক্ষুধিতের অন্ন যোগাইয়াছিল, বস্ত্রহীনের বস্ত্র বুনিয়াছিল, নিরানন্দের হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিয়াছিল, বাণিজ্যব্যবসায়, আপিস-আদালত, যানবাহন, কলকব্জা, চিকিৎসা-সেবা, দেনা-পাওনা, কাগজপত্র হিসাবনিকাশ, সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধানই তাহারা করিয়াছিল। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্প ব্যবসায় রক্ষা ও বাণিজ্য চালনার কার্য্যে মেয়েরা যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহার রিপোর্টে অ্যাড্‌জুটাণ্ট্-জেনারেল-টু-দি-ফোর্সেজ্ বলিতেছেন, "প্রায় সমস্ত কার্য্যক্ষেত্রেই মেয়েরা যে পুরুষের স্থান দখল করিয়া সফলতা দেখাইতে পারে, তাহা তাহারা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।" বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকে বলেন, "কলকব্জার কাজে মেয়েরা পুরুষের অপেক্ষা অধিক ক্ষিপ্রতা ও নিপুণতা দেখাইয়াছেন।" কেহ বলেন, "অল্প মাহিনায় স্ত্রীলোক পুরুষের অপেক্ষা অধিক কাজ দেয়। তাহাদের হাত ও আঙুল সকল রকম কাজের অধিকতর উপযোগী।" "উইমেন্‌স ওয়ার্ ওয়ার্ক্" বলেন, "যে ১৭০১ রকম কাজে মেয়েদের লাগানো যায়, তাহার সবগুলিতেই মেয়েরা পুরুষের মত ভালভাবে কাজ চালাইতে পারে; কোনো কোনোটায় মেয়েরা আরো বেশী ভাল কাজ করে।" যুদ্ধের মালমশলা তৈরির কাজও মেয়েরাই যুদ্ধের সময় করিয়াছিল। এই বিভাগের ফরাসী-মন্ত্রী বলেন, "ফরাসী কার্‌খানার মতে ছোট ছোট কাজে মেয়েরা সকল জায়গাতেই পুরুষের মত জিনিষ তৈরি করে, অনেক স্থলে মেয়েদের তৈরি জিনিষ ভাল হয়। ভারি কাজে মেয়েদের সুবিধামত কলকব্জা পাইলে মেয়েরা প্রায় পুরুষের সমান কাজই দেয়।" ইটালীও এই সাক্ষ্যই দেয়। ইহা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের সেবা ও চিকিৎসা মেয়েরা করিয়াছে। অ্যাম্বুল্যান্সের মেয়েরা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ও বিপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া মৃত আহত ও পীড়িত সৈনিকদের কুড়াইয়া বেড়াইয়াছে। অনেক স্থলে আহত অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিয়া মহিলা চিকিৎসকই সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধের প্রথম মাসেই এক জার্ম্মানীতেই ৭০,০০০ রমণী শুশ্রূষাকারিণীর কাজ করিবার জন্য ব্যবস্থাপকসভার দরজায় আবেদন লইয়া আসিয়াছিলেন। ইটালিয়ান্ সমরসচিব বলিয়াছিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁস্‌পাতালসমূহে মেয়েদের কাজ করিতে দিয়া আমরা ২০,০০০ সৈন্যকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইতে পারিব।" ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট্ ফন বর্ণষ্টর্ফ বলিয়াছিলেন, "যে জাতির নারীগণ শ্রেষ্ঠ, এ যুদ্ধে তাহারাই জয়লাভ করিবে।" উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শুধু মেয়েরাই দশহাজারবকম নূতন উদ্ভাবনার জন্য পেটেণ্ট্ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অবশ্য এসমস্তই সাধারণ মানুষের কাজ। শ্রেষ্ঠ প্রতিভা কি মহামানবের মনীষার কথা এখানে বলা হইতেছে না। উচ্চ দরের প্রতিভার পরিচয়ও যে বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা দিতেছেন, তাহার উদাহরণ দেওয়া যায়। হইতে পারে সংখ্যায় তাঁহারা পুরুষের সমান নহেন। "রসায়নশাস্ত্রে মাদাম কুরী, পদার্থ-বিজ্ঞানে হার্থা এয়ার্টন, জ্যোতিষতত্ত্বে কেরোলিন হর্শেল ও লেডি হগিন্স, ভূ-প্রোথিত অঙ্গারীভূত ও প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে মারী ষ্টোপস্ প্রভৃতি অনেক মহিলা বিজ্ঞানজগতে নূতন আলোকপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।" সাহিত্যজগতে স্যাফো, জর্জ্জ এলিয়ট্, সেল্‌মা লাগেরলফ্ প্রভৃতি বহু মহিলা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। নাট্যজগতে মহিলারা অনেকস্থলে কৃতিত্বে পুরুষকে পিছনে

ফেলিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাজগতে মন্তেসোরী যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সমস্ত জগৎ আজ তাঁহার কাছে ঋণী।

এইরূপ আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে চেষ্টা করিলাম না। সংখ্যায় অল্প হইলেও ইহাঁদের প্রতিভা জগৎকে আনন্দ ও জ্ঞান দিয়াছে। ইহাঁরা যদি এই-সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভে বঞ্চিত থাকিতেন, তাহা হইলে জগৎও ইঁহাদের অমূল্য দানের উপকার ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিত।

স্ত্রীলোক ও পুরুষের প্রতিভাকে ঠিক একই-প্রকারের মাপকাঠিতে মাপিয়া একই ছাঁচে ঢালিয়া বিচার করিলে এই-রকম ফল পাওয়া যায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই স্ত্রীলোকের মানসিক শক্তির বিকাশ বিভিন্ন রূপ ধারণ কবিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারও সে-সকল স্থানে বিভিন্ন-রকম হওয়া দরকার। শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতির ভিতর দিয়া নারী-প্রতিভা ভবিষ্যতে যে-ভাবে বিকশিত হইবে, তাহাকে সকল ক্ষেত্রে পুরুষোচিত মাপকাঠি দিয়া মাপিলে ঠিক ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার হইবে না। আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশেও নারী এখনও নিজপথ হয়ত ঠিক খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই; কারণ সকল দেশেই বহির্জগতের পথ অন্বেষণে নারী অল্পদিন মাত্র বাহির হইয়াছেন। তাই প্রথম প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহারা পুরুষদের প্রবর্ত্তিত পথে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। হইতে পারে, এই পথ চলার ব্যাপারে কোনো দিন তাঁহারা নিজেদের জন্য নূতন-রকম পথ আবিষ্কার করিবেন, যে পথের শেষে তাঁহারা হয়ত এমন সকল সৌন্দর্য্য ও জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারিবেন যাহা পুরুষোচিত মাপকাঠির মাপে ঠিক পুরুষের অর্জ্জিত বিদ্যার তুল্য হইবে না, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু নূতনত্ব বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য থাকিবে যাহা পুরুষ দেখাইতে পারেন নাই এবং সেইজন্যই তাহা অমূল্য হইবে। গৃহসংসারের মধ্যে নারীর পাশে পুরুষের স্থান আছে; কিন্তু নারীকে মানুষ গৃহের যে অঙ্গরূপে দেখে, পুরুষকে তাহা দেখে না; আত্মীয় স্বজন, পুত্র কন্যা, দাস দাসী, অতিথি অভ্যাগত, সকলের সঙ্গেই গৃহকর্ত্তারও সম্পর্ক আছে, গৃহিণীরও আছে। কিন্তু গৃহিণীর এই সম্পর্কের পরিচয়টি যে-ভাবে প্রকাশ পায়, গৃহস্বামীর সম্পর্কের পরিচয় ঠিক্ সে-ভাবে প্রকাশ পায় না। গৃহকর্ত্তার ব্যবহার ঠিক্ গৃহিণীর মত হইল না বলিয়া কেহ দুঃখ প্রকাশও করে না, গৃহকর্ত্তাকে বাতিলও করিয়া দিতে চায় না। তেম্‌নি বহির্জগতের সহিত নারীর সম্পর্কের প্রকাশ ঠিক্ পুরুষের মত, মাত্রায় ও গুণে এক না হইলে কিছু ক্ষতি নাই, বিভিন্নতাটাই তাহার সৌন্দর্য্য। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রমণী অদ্বিতীয় সমর-সচিব না হইয়া যদি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু কারণ আছে কি? চিকিৎসা-জগতে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠতম অস্ত্রচিকিৎসক না হইয়া শিশুজীবনের উৎকর্ষ সাধন কিম্বা মানসিক ব্যাধি মোচন যদি করেন, তাহাতে জগতের দুঃখভার বাড়িবে কি? শিল্প-জগতে প্রবেশ করিয়া র‍্যাফেলের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-পথের সকল উপকরণগুলি সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়া মানুষের জীবন আর-একটু আনন্দময় করিলে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে কি?

রাষ্ট্র বাণিজ্য ব্যবসায় প্রভৃতি বর্ত্তমান জগতের বিরাট্ বিরাট্ যন্ত্রগুলিকে পুরুষ ও স্ত্রী ঠিক একই চক্ষে দেখে না। যেখানে যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই এই-সকল যন্ত্রের নিকট-সম্পর্কে আসিয়াছে, সেইখানেই তাহাদের দৃষ্টির বিভিন্নতা ধরা পড়িয়াছে। পুরুষ যেখানে শুধু যন্ত্রটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কলকব্জারূপে মানুষকে দেখিয়াই খুসী হইয়াছে, নারী সেখানে যন্ত্রটাকে উপেক্ষা করিয়া মানুষটাকে আগে দেখিয়াছে। পুরুষ অপরাধীরূপ বিকল যন্ত্রকে সায়েস্তা করিবার জন্য জেলখানারূপ আর-একটা যন্ত্র স্থাপন করিলেন, ক্ষুদ্র মানুষগুলার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল না। কিন্তু নারী এলিজাবেথ ফ্রাই মানুষের এই দুর্গতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, "এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হতভাগ্যদের দুঃখ দুর্গতি মোচনের উপায় চিন্তাতে" মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন; তাঁহারই চেষ্টাতে কারা-সংস্কার বিষয়ে পালিয়ামেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পুরুষ জগতের দুঃখের কথা ভাবেন না একথা বলিতেছি না; বহু বিশ্বজোড়া দুঃখমোচনে তাঁহারাই অগ্রণী হইয়াছেন; বলিতেছি, তাঁহারা বৃহৎ একটা সুবিধার অন্তরালে

ছোট ছোট দুঃখকে দেখিতে পান না। কিন্তু ছোট এতটুকু শিশুকে বড়র চেয়ে অনেক বড় করিয়া দেখা যাহার কাজ, তাহার চোখে এই-সব "ক্ষুদ্র যাহা, ক্ষুদ্র তাহা নয়।" কারখানা দোকান বাজারে যে-দেশের মেয়েরা বেশী কাজ করে, সে-দেশে শোনা যায় মেয়েরা অতি অল্পদিনেই একটা কাজ ছাড়িয়া আর-একটা কাজের সন্ধানে ঘুরিয়া ফেরে। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, "এই ঘোরা-ফেরা বেশী মাহিনার আশায় মোটেই নয়।" মেয়েদের চোখে যে কাজ দেখিতে ভাল লাগে না, যে কাজে রুচি সৌন্দর্য্যবোধ পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বলিদান করিতে হয়, যে কাজ অপ্রীতিকর ও যেখানে কাজের দোসরদের বন্ধুরূপে পাওয়া যায় না, সে কাজ মেয়েরা করিতে চায় না। হইতে পারে, নারীশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করিলে নারীর এইরূপ মনের গতির ফলে বহির্জগতের কর্ম্মক্ষেত্রগুলি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করিবে, সুরুচি ও সুনীতির পরিচয় দিবে, মনকে প্রফুল্ল করিবে এবং মানুষের বন্ধুবৃদ্ধি করিবে।

নারী-প্রতিভা বিকাশের যথেষ্ট সুবিধা যে পায় নাই, তাহা ইতিহাসের দিকে তাকাইলেই বুঝা যাইবে। যে-কোনো দেশ ধরিয়াই বিচার করি না কেন, দেখিব, পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক শিক্ষালাভ করিতেছেন অতি অল্পকাল। যেখানেও বা ইতিহাসের গোড়ার দিকে কিছু পরিমাণ রমণী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন দেখা যায়, সেখানেও সেই সুদূর অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যবর্ত্তী একটা বিরাট্ কাল মেয়েরা শিক্ষা বিনাই জীবন যাপন করিয়াছেন। বহু অধিকারেও তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে বঞ্চিত।

অনেকে মনে করেন, "সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি এই যুগ যুগান্তর" যে মেয়েরা গৃহকোণে পুরুষের "অধীনতায়" অথবা আশ্রয়ে সকল অধিকার ত্যাগ করিয়া কাটাইয়াছেন, এই সত্যটাই তাঁহাদের বহির্জগতের অধিকার লাভে অক্ষম বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও বলিবার অনেক থাকে। সৃষ্টিটা যতদিন আদিম অবস্থায় ছিল, ততদিন প্রকৃতিরূপিণী নারীদের সৃষ্টি ও সংসার গুছাইতে, পারিবারিক জীবন গড়িয়া তুলিতে এবং সন্তানকে একান্তভাবে নিজ চেষ্টায় পালন করিয়া তুলিতেই সমস্ত প্রতিভা বুদ্ধি শক্তি ও সময় ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতির সহিত সৃষ্টির শৃঙ্খলা আনয়নে নারীর কাজ কমিয়া আসিয়াছে। গৃহসংসার ও সন্তান নারীর মনকে বহুল পরিমাণে মুক্তি দিয়াছে। ভবিষ্যতে আরো দিবে। এই মুক্ত মন ও শক্তির ত একটা ক্ষেত্র চাই। সামান্য একটা উদাহরণেই এ কথাটা বুঝাইয়া বলা যায়। সৃষ্টির আদিযুগে মানুষ বনে হিংস্র জীবদের সঙ্গে একই জায়গায় বাস করিত। তখন সন্তানপালন মানে ছিল বাঘ ভালুক নরখাদক প্রভৃতি সকলের হাত হইতে শিশুকে বাঁচাইয়া অনুক্ষণ তাহাকে চোখে চোখে রাখিয়া তদুপরি তাহার সমস্ত প্রয়োজন মিটান। তার পরের সভ্যযুগেও গৃহিণীকে ক্ষেত হইতে ফসল আনিতে হইত, নদী হইতে জল আনিতে হইত, দুগ্ধ দোহন করিতে হইত, সূতা কাটিতে হইত, ধান ভানিতে হইত, ইন্ধন সংগ্রহ করিতে হইত, আরো কত সহস্র খুঁটিনাটি কাজ নিজহাতে করিয়া লইতে হইত। কিন্তু এই শ্রমবিভাগ ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যখন কল খুলিলে বিছানার পাশে জল পাওয়া সম্ভব, বৈদ্যুতিক সুইচ্ টিপিলেই উনান জ্বালান চলে, রান্না চড়াইয়া দশ মাইল দূরে বেড়াইতে গেলেও পুড়িয়া যাইবার ভয় নাই, তখন যে-সব স্ত্রীলোক এতখানি অবসর পাইবেন, তাহা লইয়া তাঁহারা করিবেন কি? অবশ্য সব জায়গার সকল নারীর এ অবস্থা এখনও হয় নাই। কিন্তু ক্রমে হইবে; এবং এখনই সকল সভ্যদেশে কতকগুলি নারীর অবসর আদিমযুগের নারীর অবসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

তাহার উপর সৃষ্টিব্যাপারে পূর্ব্বে প্রতিদম্পতির যত সন্তান থাকার প্রয়োজন ছিল, এখন তাহা নাই; কারণ পৃথিবী বাড়ে নাই কিন্তু মানুষ বাড়িয়া চলিয়াছে। এ ক্ষেত্রে পরিবার ছোট হইলে এবং বিবাহ বেশী বয়সে করিলে মেয়েদের অবসর আরো বাড়িয়া যাইবে। কতক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতার সংখ্যা বাড়িবে, কেহ কেহ চিরকুমারী থাকিবেন, বিধবা নারীও থাকিবেন। সুতরাং

মেয়েদের বহির্জগতের অধিকারে বঞ্চিত করিলে এতখানি উদ্বৃত্ত শক্তি হয় অপব্যয় হইবে, নয় মরিচা পড়িয়া নষ্ট হইবে। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ স্ত্রীলোকের ভারমুক্ত মন ও অবকাশের খোরাক জোগাইবার জন্যই ত তাঁহাদের সকল অধিকার দিতে হইবে। শৃঙ্খলিত দেহমনে স্ত্রীলোক যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, মুক্ত অবস্থায় তাহার অপেক্ষা বেশী দেওয়াই স্বাভাবিক। তাঁহার মানসিক শক্তি ও প্রতিভাকে পূর্ব্বে যেখানে কেবল সংসাররচনায় লাগাইয়াছিলেন, নারী এখন তাহার কিয়দংশ বহু পরিমাণে অন্য কাজে দিতে পারিবেন। যে সমাজে কোনো শক্তির অপচয় হয় না, কোনো মানুষ দান না করিয়া গ্রহণ করে না, সেই ত অর্থনীতির মতে আদর্শ সমাজ। কিন্তু আমাদের ধনীর ঘরে ঘরে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদেরও ঘরে অনেক নারীকে কি জীবনটা বৃথা নষ্ট করিতে দেখিতেছি না? সমাজ-দেহের এতখানি শক্তির অপচয় না করিয়া অবসরপ্রাপ্ত রমণীরা পূর্ব্বে যে সময়টায় নদী হইতে জল আনিতে যাইতেন এখন সেই সময়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কলের ট্যাক্স্ দিতে পারিবেন। যে সময়ে উনানে গোবর লেপিয়া কাঠ কয়লা ঘুঁটে কেরসিন ঘাঁটিয়া রন্ধন করিতেন, সেই সময়ে উপার্জ্জন করিয়া বৈদ্যুতিক চুল্লী ব্যবহার করিতে পারিবেন। এরূপ অবস্থা এখনও অধিকাংশের হয় নাই; কিন্তু কাল-ক্রমে হইবে। এবং এখনই কাহারও কাহারও হইয়াছে।

নারীর গৃহকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলেও বহির্জগতে তাঁহার অধিকার থাকা দরকার। সন্তানকে নীরোগ সুস্থ ও সবল রাখিতে হইলে শুধু মায়ের নিজের ঘরটি সুন্দর হইলেই হয় না; সহর, প্রতিবাসী, রাস্তাঘাট, দোকানবাজার, সবেরই উন্নতি দরকার। ধনীর ও শিক্ষিতের ঘরের সন্তানকেও যে প্লেগে কলেরায় মরিতে দেখা যায়, বাহির হইতে রোগ কুড়াইয়া আনা তাহার কারণ নয় কি? মায়ের যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে তিনি সেই অধিকারের ফলে দোকানে ভেজাল বন্ধ, সহরের রাস্তা ঘাট পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করিতে পারেন। পুরুষ যে এ কাজ করিতে পারেন না, তাহা নয়। তবে, পুরুষ ত ছেলেকে ভাত মাখিয়া খাওয়াইতে কি রাত্রি জাগিয়া সেবা করিতেও পারেন; তবু মাতাকেই এই কাজ করিতে হয় কেন? আসল কথা এই, যে, বহির্জগতেও মাতৃস্নেহের এরূপ কার্য্যক্ষেত্র আছে, যেখানে পুরুষেরা এখনও বিশেষ-কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মদ্যপ পিতা পুত্র ও স্বামীর অত্যাচারে ও অবহেলায় রমণীর সোনার সংসারই ছাই হইয়া যায়। পুরুষ এখানে নিজ সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে রমণীরও সর্ব্বনাশ করে। রমণীর যদি রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকে, তবে তিনি দেশ হইতে এই বিষ চিরতরে দূর করিয়া দিতে পারেন। বর্ত্তমান জগতে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে ও অন্যান্য অনেক দেশে মদ্যপানের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম হইয়াছে, মেয়েরাই তাহার প্রধান উদ্যোগী, এবং সে সংগ্রামে বহু স্থলেই তাঁহারা জয়ী হইয়াছেন। আমরা মুখে যাহাই বলি না কেন, দরিদ্র রমণীকে পেটের দায়ে ঘর ছাড়িয়া কলে কারখানায় কয়লাখনিতে ও পথে ঘাটে অন্ন উপার্জ্জন করিতে যাইতে সকল দেশেই হয় এবং হইবে। কিন্তু ইহাদের স্বার্থের দিকে চাহিবার অধিকার যদি ইহাদের ও অন্য নারীদের না থাকে, তবে দুর্ব্বল দেহ ও অধীন মনের ফলে বহু লাঞ্ছনা ভোগ ইহাদের করিতে হইবে। মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকার থাকিলে দুর্ব্বল নারীর দেহমন লজ্জা-সম্ভ্রম এবং জাত ও অজাত সন্তানের দিকে মেয়েরা জাগ্রত দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন। বহু দেশে মেয়েরা ইহা করিতেছেনও; কারখানার মেয়েদের জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের মেয়েরা অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। নিউজীলণ্ডে প্রসূতির ও শিশুর ধাত্রী, শুশ্রূষাকারিণী, চিকিৎসক এবং ঔষধ ও খাদ্য সরকার হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

পৃথিবীতে দেশে দেশে কালে কালে বহু সমরানল জ্বলিয়াছে। রাষ্ট্র কি বাণিজ্য-যন্ত্রের স্বার্থে এই আগুনে পুরুষ নিজে পুড়িয়া মরিয়াছে, কত শত শত মায়ের সোনার সংসার ছারখার করিয়া তাহারা তাঁহাদের অভিশাপ কুড়াইয়াছে। যুদ্ধ-যন্ত্রের পেষণে শুধু যে মায়ের সন্তান, ভগিনীর ভ্রাতা, পত্নীর স্বামী ও কন্যার পিতা পিষ্ট হইয়া মরিয়াছে তাহা নহে, রমণীর দেহ মন ও লজ্জা-সম্ভ্রম বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছে; তাহার উপর তাহাকে একই

হাতে ঘর ও বাহিরের পরিশ্রম করিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম ও সৈনিকের রসদও জোগাইতে হইয়াছে। পুরুষ যুদ্ধের নেশায় মাতিয়া যে দুঃখ সহজে সহ্য করিয়াছে, রমণীকে গৃহকোণে বিষাদের ভারে নুইয়া পড়িয়া তাহার দ্বিগুণ দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের নিদারুণতা রমণীর প্রাণে পুরুষের অপেক্ষা বহুগুণ বেদনা দিয়াছে। হইতে পারে, ইহার ফলে স্বাধীন রমণীরা একদিন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জ্জ বলিয়াছিলেন, "রমণীরা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পুরুষের সমান অধিকার পাইলে জাতিতে জাতিতে শান্তি স্থাপনের সহায়তা করিবেন এবং এই যে ভীষণ যুদ্ধের জন্য আমরা দুঃখ করিতেছি, তাহার পুনরাভিনয় নিবারণ করিবেন। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় হইয়াছে। মেয়েরা ভোট দিবার অধিকার পাইয়া যদি জগতের ইতিহাসে একটা যুদ্ধও কমাইয়া দিতে পারেন, তবে ভগবান্ ও মানুষের চক্ষে তাঁহাদের এ অধিকার সার্থক হইবে।" ইতি মধ্যেই "শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য নারীদের অন্তর্জ্জাতিক সংঘ" (International League of Women for Peace and Liberty) এই ক্ষেত্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের যা কিছু কাজ, সবই মেয়েরা করেন।

স্ত্রীলোক যখন দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তখন তাহাকে আবর্জ্জনার মত ঘর হইতে ঝাঁটাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! কিন্তু পুরুষের দুর্নীতির ফলে সে নিজেকে ত নষ্ট করেই, সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্ত্রীপরিবারেরও বহু দুর্দ্দশা করে। অপরের পাপে ভদ্র স্ত্রীলোকের এই যে লাঞ্ছনাভোগ, মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিলে ইহা বহু পরিমাণে দূর করা যায়। অনেক সভ্য দেশে তাহা হইতেছে।

মেয়েদের কেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, সেই পুরানো কথাটা মোটামুটি বলিতেই এতখানি জায়গা লাগিল; অন্য দু-চারিটা কথার মাত্র উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব। অনেকে মনে করেন, "মানুষের মনটাও গৃহে অর্থাগম অপেক্ষা স্ত্রীর নিকট স্নেহ-সহানুভূতির অধিকতর প্রত্যাশী।" গৃহে অর্থ থাকিলে স্ত্রীর নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ অপেক্ষা স্নেহ প্রেম বেশী আদরের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে হতভাগ্য পঠদ্দশা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পিতামাতার আদেশে একটি স্ত্রী গলায় গাঁথিয়াছে, এবং বিশ টাকা উপার্জ্জন করিবার পূর্ব্বে চারিটি শিশুর পিতা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীর স্নেহ-সহানুভূতি চোখের জলের রূপে স্বামীকে অভিষিক্ত না করিয়া যদি অর্থ রূপে ক্ষুধায় অন্ন জোগায়, তাহাতে কি গৃহসংসারটা বড়ই তিক্ত হইয়া উঠিবে? "মাহিনার টাকার চেয়ে প্রেমময়ী পত্নীর হাতের সেবা স্বামীর পক্ষে অধিকতর লোভনীয় হওয়া স্বাভাবিক সন্দেহ নাই।" কিন্তু যে প্রেমময়ীর হস্ত ছাড়া সেবা করিবার আর কোনো উপকরণ নাই, সে যদি পীড়িত, দরিদ্র, অথবা বহুপরিবারভারাক্রান্ত স্বামীর সেবার উপকরণ নিজে সংগ্রহ করে, অথবা ধনী হইয়াও অবসরের সময় উপার্জ্জন করিয়া স্বামীকে তাহার প্রিয় সামগ্রী উপহার দেয়, তাহাতে ত তাহার স্বামীর গৌরব বোধ করা উচিত।

অনেকে মনে করেন, "মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জিত করিয়া শাস্ত্র তাঁহাদের স্বাধীনতার পথে কাঁটা গাড়িয়া দেন নাই।" "পিতা, পতি, পুত্র, সৎ হইলে তাঁদের মধ্যে নারীর শিক্ষা-দীক্ষা ও মনের স্বাধীনস্ফূর্ত্তি আবার সেই-রকম হইতে পারে।" সংসারে সৎ মানুষ এত ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যাইতেছে না, যে, প্রত্যেক নারীর ভাগ্যেই পিতা পতি ও পুত্রগণ সকলেই সৎ হইবেন। ভাগ্যগুণে, হয় সাধু পিতা, কিম্বা সৎ পতি, একজন মাত্রও, যদি সকল নারীর কপালে জুটিত, তাহা হইলে সংসারে বহু দুঃখ দূর হইয়া যাইত। তাহা যখন ঘটে না, তখন নারীর স্বাধীনতাটুকুও হরণ করিয়া তাহার মাথার দুঃখের বোঝা আর-একটু ভারী করিয়া দিবার কি প্রয়োজন আছে? পিতা, পতি ও পুত্র সৎ হইলে ত আর স্ত্রীলোক সাধ করিয়া কাঁটা-গাছে চুল জড়াইয়া তাহাদের সহিত কলহ করিয়া "স্বাধীনতা" দেখাইবে না। অথবা যদি স্বভাবের দোষে কোনো রমণী তাহা করেও, তাহা হইলে পায়ে শিকল বাঁধিয়া তাহাকে মধুরভাষিণী সুবিনীতা করা যে কত কঠিন, তাহা এই শাস্ত্রপ্রপীড়িত দেশেও আমরা ঘরে ঘরেই দেখিতেছি।

কেহ কেহ মনে করেন, প্রাচীনভারতে অর্থাৎ বৈদিক-যুগেও নারী "স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিতা" ছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা "প্রথিতনাম্নী শৌর্য্যবীর্য্যশালিনী মহিমময়ী" হইতে পারিয়াছিলেন। "স্বাতন্ত্র্যবর্জ্জিতা" বলিতে কি কি বোঝায়, ঠিক জানি না। কিন্তু মনু প্রভৃতি স্মৃতি ও সংহিতাকারের আইন মানিয়া চলিলে স্ত্রীলোকের যে অবস্থায় থাকিতে হয়, বৈদিকযুগের নারীর সে অবস্থা ছিল না। অতি প্রাচীন যুগে ভারতনারীর অধিকার বহুক্ষেত্রে ব্যাপ্ত ছিল বলিয়াই তাঁহারা কিছু কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছিলেন; তৎপরবর্ত্তী যুগে সে-সব অধিকারে বঞ্চিত হইয়া খ্যাতি কি শৌর্য্যবীর্য্য কিছুই তাঁহারা, সাধারণতঃ, পূর্ব্বের মত দেখাইতে পারেন নাই। মনু বলিয়াছেন, "স্ত্রীদিগের পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই"; কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন, "ঋগ্বেদে এরূপ কোনও উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং স্ত্রীগণ পতির সহিত একত্র যজ্ঞ করিতেছেন এবং বনিতাগণ যজ্ঞে নিযুক্ত আছেন, এইরূপ বহু উক্তি বহু মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।" ঋগ্বেদের মন্ত্ররচনার কালে বহু নারী আজীবন অবিবাহিতা থাকিতেন। "ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত নারী-ঋষিগণের উল্লেখ দেখা যায়:—ঘোষা, সূর্য্যা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, অপালা, ইন্দ্রাণী বা শচী এবং সর্পরাজ্ঞী প্রভৃতি। ইহাঁরা সকলেই ঋক্ বা মন্ত্র রচনা করিয়া ঋষিপদবাচ্যা হইয়াছিলেন।" "বিশ্ববারা কেবল যে মন্ত্র রচনা করিয়াই জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু অগ্নির স্তব উচ্চারণ করিয়া ঋত্বিকেরও কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বিশ্ববারা নারী, অথচ তিনি হোতা, তিনি উদ্গাতা, তিনি অধ্বর্য্যু এবং তিনি স্বয়ংই তাঁহার কৃত যজ্ঞের ব্রহ্মা। পাঠক এস্থলে স্পষ্ট দেখিতেছেন, বৈদিক যজ্ঞাদি কার্য্যের সমস্ত অধিকার নারীতে বর্ত্তমান।" (অবিনাশচন্দ্র দাস।)

বৈদিক যুগের পরেও হারীতস্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, পূর্ব্বে কুমারীদের ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা বেদাদি পাঠ ও আলোচনা করিতেন; সদ্যোবধূরা গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। উভয়েরই উপনয়ন হইত। ব্রহ্মবাদিনীরা স্বাধ্যায়, সমিধ্ আহরণ ও ভিক্ষাচর্য্যায় অধিকারী ছিলেন ইঁহারা আজীবন কুমারী থাকিতেন। গার্গী, সুলভ রামায়ণের শবরী, ভবভূতির উত্তরচরিতের আত্রেয়ী, ইহাঁ সকলেই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। উত্তররামচরিতে দেখিতে পাই, আত্রেয়ী লবকুশ প্রভৃতি পুরুষ ছাত্রদের সহিত প্রতি দ্বন্দ্বিতা করিয়া পড়িতেন, এক আশ্রম হইতে আর-এক আশ্রমে পাঠের সুবিধার জন্য আপনি চলিয়া যাইতেছে ইত্যাদি। মনু প্রভৃতির বহু শাসনই আধুনিক হিন্দু সুবিধাবাদের জন্য অথবা অন্য নানা কারণে মানেন না সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য লোপের বেলায়ই বেশ কড়াকড়ি করিবার উৎসাহও না দেখাইলে পারেন।

শাস্ত্রে, বিবাহে অর্থগ্রহণ পাপ; স্ত্রীধন হরণের ফ নরকবাস; ছাত্রজীবনে বিবাহ নিষিদ্ধ; সপিণ্ডা কন্ বিবাহ নিষিদ্ধ; হীনক্রিয়, নিষ্পুরুষ, নিশ্ছন্দ ও যক্ষ্ম কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত পরিবারে বিবাহ বারণ। কি বিবাহে অর্থ গ্রহণ না করিলেই আজকাল খবরে কাগজে নাম উঠে, ও ছাত্রজীবনে বিবাহে আপত্তি করিলে মা-বাবার প্রতি সম্মান দেখান হয় না। সপিণ্ড বিবাহও অনেক স্থলে চলে; হীনক্রিয়ের ও নিশ্ছন অর্থাৎ মূর্খের অর্থ সহ কন্যা গ্রহণ প্রায়ই দেখা যায় অন্যান্য নিষেধও গ্রাহ্য করিতে ব্যস্ত কম লোকে নিষ্পুরুষ পরিবারের কন্যা কোথাও অবিবাহিত বসিয় থাকে না; বরং শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে ভাবী জামাই-দের ঘোড়দৌড় লাগিবার সম্ভাবনা ঘটে। প্রাপ্ত-যৌবনা কন্যাকে তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া নিজ ইচ্ছামত পতিবরণ করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক লেখকলেখিকাদের মতে স্বমতে বিবাহ একটা লজ্জার বিষয়।

আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করাও স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্হিত নয়, বরং গৌরবের বিষয় বলিয়াই যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা পুরুষের সহিত "প্যারেড করিয়া যুদ্ধ শিক্ষা করাতে" কেন আপত্তি করেন, জানি না। যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াইয়া পুরুষের বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করা যায়, তবে তাহার পূর্ব্বে এই প্রকৃত পুরুষোচিত বিদ্যাটা পুরুষের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিখিয়া

রাখিলে ত জয়লাভের সম্ভাবনাটা বাড়ে বই কমে না। "স্বধর্ম্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য" যদি কোনো মহিলা আত্মহত্যা করিয়া "তৃণ খণ্ডের ন্যায় অনায়াসে" পুড়িয়া না মরিয়া শত্রুনিধন করিয়া জয়লাভ করিতে পারেন, কিম্বা প্রাণ ও মান একত্রে রাখিবার চেষ্টাটাও অন্তত করেন, তবে আমি ত তাঁহাকেই অধিক সম্মান করি।

"স্বাধীনতা" কথার অর্থেই বোঝা যায়, ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। যে-দেশের পুরুষমানুষদের ঘাড়ের উপর মাথা থাকিতে দিনে-দুপরে নারীহরণ ও নারীর উপর অত্যাচার হয়, সে-দেশে নারীকে পুরুষের অধীনে বা আশ্রয়ে রাখিয়া নিরাপদ রাখার কল্পনাটা ভীষণ ও ক্রূর উপহাস। যে মানুষ নিজেকে নিজে শাসন করিতে ও রক্ষা করিতে শিখিয়াছে, তাহার কোনো উপরিওয়ালার প্রয়োজন হয় না। পরের শাসন মানুষের পায়ে বেড়ি পরাইতে পারে, চক্ষু অন্ধ করিয়া দিতে পারে, মনের প্রদীপে ছাই চাপা দিতে পারে, কিন্তু মানুষ গড়িয়া দিতে পারে না। মুক্ত মন, জাগ্রত দৃষ্টি, ও পূর্ণ অধিকারই মানুষকে নিজ পথে নিজ প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিতে সহায়তা করে। মানব জাতির অর্দ্ধাংশেরই কি কেবল লক্ষ্য লাভ করা দরকার?

শ্রী শান্তা দেবী

রাজপথ

[১৭]

সুরেশ্বর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর সুমিত্রা ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে, দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহা রোধ করিতে লাগিল।

কন্যার আচরণে জয়ন্তী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও চিন্তিত হইলেও উপস্থিত অবস্থায় সে-ভাব মুখে প্রকাশ করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। কণ্ঠস্বর যথা-শক্তি কোমল করিয়া তিনি বলিলেন, "সুরেশ্বরকে নিয়ে ক্রমশঃ একটু অসুবিধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, সে যখন সহজেই গেল তখন এ ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে তুলো না, সুমিত্রা।"

সুমিত্রা তাহার আনত-আর্দ্র নেত্র উত্থিত করিয়া কহিল, "এ'কে তুমি সহজে যাওয়া বলছ, মা? তোমার দারোয়ান দিয়ে সুরেশ্বর-বাবুকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে' দিলে কি এর চেয়ে বেশী হত বলে' তোমার মনে হয়?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখ অসন্তোষের ছায়াপাতে অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, 'নিজের মান যে নিজে নষ্ট করে, তার মান কেউ রাখ্‌তে পারে না!"

ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, "নিজের প্রাণ বিপন্ন করে' যিনি তোমার মেয়ের মান রেখে-ছিলেন, তিনি নিজে মান রাখ্‌তে পারেন না এ কথা কি তুমি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস কর?"

এই উপকার-প্রাপ্তির উল্লেখে মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া জয়ন্তী বিদ্রূপ-বিকৃত স্বরে কহিলেন, "কবে কোন্ যুগে কি করেছিল না-করেছিল বলে' চিরদিনই সে হাতে মাথা কাটবে না কি? তুমি জানো, সুরেশ্বরের সঙ্গে তোমার এই মেলা-মেশার জন্যে বিমান এ বাড়ীতে আসা কমিয়ে দিয়েছে?"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুমিত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল জয়ন্তীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর কঠিন স্বরে বলিল, "তাই বুঝি তোমরা সুরেশ্বর-বাবুর এ বাড়ীতে আসা বন্ধ কর্‌বার জন্যে এই মিথ্যা অপবাদের ষড়যন্ত্র করেছ?"

সুমিত্রার এ কথায় বিশেষরূপ চিন্তিত হইয়া জয়ন্তী

তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার সুমিত্রা, বিমানকে তুমি এবিষয়ে কোনো কথা বোলো না! এ চিঠির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"কেমন করে' তুমি জান্‌লে যে তাঁর সম্পর্ক নেই?"

"এ একজন কোন্ হরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছে—একেবারে অন্য হাতের লেখা। চিঠি নিয়ে তুমি দেখ্‌তে পার" বলিয়া জয়ন্তী পত্রখানা সুমিত্রার দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

সুমিত্রা হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "চিঠি আমি দেখ্‌তে চাই নে, কিন্তু এ চিঠি যে বিমান-বাবু লেখান নি তা তুমি কি করে' জান্‌লে?"

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "যে-রকম করে'ই হোক আমি তা জানি।"

"তা হলে কে এ চিঠি লিখেছে তাও বোধহয় তুমি জান?"

এই কঠিন প্রশ্নে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া জয়ন্তী বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সুমিত্রার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, "লক্ষ্মীটি সুমিত্রা, এ কথা নিয়ে মিছিমিছি গোল করিস্ নে! আমি তোর মা, আমার কথা বিশ্বাস কর, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তুই ছেলেমানুষ, তাই সব কথা বুঝ্‌তে পারছিস্ নে!'

"সত্যি-সত্যিই বুঝ্‌তে পারছি নে!" বলিয়া উচ্ছলিত অশ্রু রোধ করিতে করিতে সুমিত্রা ড্রয়িং-রুম হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিজ কক্ষে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার এতক্ষণের যত্ন-নিরুদ্ধ দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তাহার অবসন্ন ক্লিষ্ট দেহ একটা ইজিচেয়ারে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং নেত্র হইতে অসংরুদ্ধ তপ্ত অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ঝরিতে লাগিল। তাহার পর বহু ক্ষণ পরে সে যখন বর্ষাবিধৌত আকাশের মত তাহার দুঃখ-পরিসিক্ত হৃদয়ের মধ্যে অবলোকন করিবার অবকাশ পাইল, দেখিল নিভৃত-নিহিত কোন্ বস্তুর উজ্জ্বল প্রভায় তাহার ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত দুঃখ ও গ্লানি কখন অলক্ষিতে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! সুরেশ্বরকে সে যে-সকল কথা বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে সুরেশ্বর তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা সে মনে মনে বারম্বার আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং যতই আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিল যে বাক্যের সাহায্যে পরস্পরে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছে, বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঘটনাস্থলে জয়ন্তী প্রবেশ করায় যতটুকু পরিতাপের কারণ ঘটিয়াছিল জয়ন্তী প্রবেশ না করিয়া সেদিনকার ঘটনা পরিসমাপ্ত হইলেই মোটের উপর অধিকতর পরিতাপের কারণ ঘটিত।

সন্ধ্যার পর বিমানবিহারী নিয়মিত বেড়াইতে আসিয়াছিল। ড্রয়িং-রুমে আর সকলেই সমবেত হইয়াছিল, শুধু সুমিত্রা আসে নাই। দ্বিপ্রহরে প্রমদাচরণ বেদান্ত-ভাষ্যের যে-অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন তাহা দ্বিতীয়বার আলোচনা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বিমানবিহারীকে বুঝাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু বিমানবিহারী সে কূট প্রসঙ্গের মধ্যে মনঃসংযোগ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অনাগ্রহ-ভরে শুধু তাহা শুনিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই-একটা অসংলগ্ন বাক্যের প্রয়োগে কোনো প্রকারে আলোচনায় যোগ রাখিয়া চলিয়াছিল।

সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর প্রমদাচরণের নিকট বেদান্ত-ভাষ্যের লোভে যে বিমানবিহারী উপস্থিত হয় নাই, এবং প্রমদাচরণ যে তাহার লক্ষ্য নহেন, উপলক্ষ্য, একথা প্রমদাচরণ বুঝিতে না পারিলেও জয়ন্তীর বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তাই অদূর-ভবিষ্যতের এই ডেপুটি-জামাতার মনোরঞ্জনার্থে জয়ন্তী বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা, সুমিত্রা এখনও এলো না কেন? তাকে ডেকে নিয়ে আয় ত, বিমানকে দুচারখান গান শোনাবে।"

এই প্রস্তাবে বিমানবিহারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল অসহিষ্ণুতা হইতে মুক্ত হইয়া বেদান্ত-ভাষ্যের আলোচনার প্রতি সহসা এমন মনোযোগী হইয়া উঠিল যে শাস্ত্রানুশীলনে জয়ন্তীর এই বিঘ্নসম্পাদনের জন্য প্রমদাচরণ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং ক্ষীণ



অনন্তের লীলা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত।

প্রতিবাদার্থে মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "আজ না হয় গান থাক্, আমরা এই আলোচনাটাই শেষ করি।"

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া কহিল, "রক্ষে কর! তোমার ও নীরস শাস্ত্রচর্চ্চা আজ বন্ধ থাক্! সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে বিমানেরই বা এ-সব ভাল লাগ্‌বে কেন?"

বিমানবিহারী বিলক্ষণ-রূপেই জানিত যে প্রতি-যোগিতায় জয়ন্তীর সহিত প্রমদাচরণ পারিয়া উঠিবেন না; যে মুহূর্ত্তে সুমিত্রা উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই বেদান্ত-ভাষ্য বন্ধ করিতে হইবে। তাই সে জয়ন্তীর কথার উত্তরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এমন কথা বলিল যাহাতে মনে হইল যে বেদান্তভাষ্য ভিন্ন সে অপর কিছুই চাহে না, এবং সে সন্ধ্যায় তাহার একমাত্র অভিলাষ ছিল বেদান্তভাষ্যের চর্চ্চা করা।

কিন্তু ক্ষণ পরে বিমলা যখন ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে সুমিত্রার মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া আছে, আসিতে পারিবে না এবং সেই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া প্রমদাচরণ সবিস্তারে বেদান্তভাষ্য আলোচনা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বিমানবিহারী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিরস কণ্ঠে কহিল, "আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে; আজ তা হলে এখন আসি।"

প্রমদাচরণ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কিন্তু আমাদের আলোচনাটা ত শেষ হল না, মাঝখানেই রয়ে গেল!"

বিমান মৃদু হাসিয়া কহিল, "বাকিটা আর-একদিন শেষ করা যাবে, আজ একটু দর্‌কার আছে।"

ক্ষুণ্ণমনে প্রমদাচরণ কহিলেন, "আচ্ছা, তাহলে থাক্।"

বিমান প্রস্থান করিলে জয়ন্তী অদ্যকার ঘটনাটা কতকটা পরিবর্ত্তন, কতকটা পরিবর্জ্জন, এবং কতকটা পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রমদাচরণকে জানাইলেন।

সমস্ত শুনিয়া প্রমদাচরণ মনের মধ্যে গভীর ভাবে ব্যথিত হইলেন। মস্তকের কেশের মধ্যে দশ-বারো মিনিট দ্রুতবেগে হস্ত সঞ্চালন করিয়া অবশেষে জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ভুল করেছ, জয়ন্তী। আমরা ত মানুষ নিয়েই চিরকালটা কাটিয়েছি, মানুষ আমরা চিনি। সুরেশ্বর কখনই তা নয়!"

জয়ন্তী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "শেষ দশ বৎসর তুমি ত সেক্রেটারিয়াটে কেরাণীগিরি করেছ! তুমি আবার মানুষ চেন কি?"

এই অভিযোগের পর প্রমদাচরণের আর কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না, তিনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। জয়ন্তী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি মানুষ চিন্‌তে পার; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ চিনি। সুরেশ্বরের এবাড়ীতে আসা বন্ধ না করলে তোমার মেয়ের পক্ষে ভাল হত না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে।"

"ভাল হলেই ভাল।" বলিয়া প্রমদাচরণ আসন ত্যাগ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

[১৮]

জয়ন্তীর সহিত সুরেশ্বরের সংঘর্ষের পর তিন চার দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যোদ্ধা যেমন সমর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পরম সন্তোষ ও পুলকের সহিত নিজের অস্ত্রসমূহ নাড়িয়া-চাড়িয়া পর্য্য-বেক্ষণ করে, সুরেশ্বর ঠিক সেইরূপে এ কয়েক দিন তাহার তাঁত ও চরকা লইয়া প্রায় সমস্ত সময় কাটাইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এতদিন যাহা শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিত, সুমিষ্ট তরল অনুরাগে সিক্ত হইয়া এখন তাহা সরস হইয়া উঠিয়াছে! চরকা ধরিয়া বসিলে সুরেশ্বরের হাত হইতে আর মোটা সুতা বাহির হয় না; কেমন করিয়া প্রাণের আবেগটুকু অঙ্গুলীর টিপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, টিপ দিলেই তাহা হইতে রাশি রাশি মিহি সুতা অবলীলাক্রমে বাহির হইতে থাকে আর মনে হয় কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র বয়নার্থে তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। যত-গুলি তাঁত নামিতেছে, সুরেশ্বর প্রত্যেকটিতেই মিহি সুতা চড়াইতেছে এবং সেই শাড়ীগুলির পাড়ের রং ও প্যাটার্নের জন্য ঢাকার কারিগরের সহিত পরামর্শ ও আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে।

দ্বিপ্রহরে তারাসুন্দরী নিজ কক্ষে বসিয়া মহাভারত পড়িতেছিলেন, এবং সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা-ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছিল।

কথায় কথায় মাধবী বলিল, "দাদা, সুমিত্রা একটা চরকা পাঠিয়ে দিতে বলেছিল, কই দিলে না ত?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "চরকা দেওয়া ত শক্ত নয়, পাঠিয়ে দেওয়াই শক্ত! কয়েক দিনই ত ভাব্‌ছি, কিন্তু কোনো উপায়ই ঠাওরাতে পার্‌ছি নে।"

মাধবী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "এক কাজ কর্‌লে হয় না? একখানা চিঠি লিখে কানাইকে দিয়ে একটা চরকা যদি পাঠিয়ে দাও?"

মাধবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লেই হয়েছে! গিন্নীর চোখে যদি পড়ে তাহলে কানাই যাবে পুলিশে আর চরকা যাবে উনোনে! গিন্নীকে টপ্‌কে একেবারে সুমিত্রার হাতে পৌছে দিতে হবে। একবার সুমিত্রার হাতে পৌছলে তখন নিশ্চিন্তি। সুমিত্রাকে গিন্নী সহজে পেরে উঠ্‌বেন না, সে গিন্নীর চেয়ে অনেক শক্ত।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে মাধবী পুনরায় চরকা কাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর অকস্মাৎ একটা কথা খেয়াল হওয়ায় চরকা বন্ধ করিয়া আগ্রহ সহকারে বলিল, "একটা উপায় আছে, দাদা?"

"কি?"

সহাস্য-মুখে মাধবী বলিল, "তুমি যদি অনুমতি দাও আমি নিজে গিয়ে সুমিত্রাকে চরকা দিয়ে আস্‌তে পারি। আমি যেন চরকা বিক্রী করে' বেড়াই সেই পরিচয়ে গিয়ে সুমিত্রাকে একটা চরকা দিয়ে আস্‌ব। তারা বড় লোক, দাম যদি দ্যায় দাম নেবো; আর দাম যদি দিতে না পারে তখন অগত্যা তোমার পরিচয় দিয়ে বিনা-মূল্যেই চরকা দিয়ে আস্‌ব।"

বিস্মিত-স্মিতমুখে সুরেশ্বর কহিল, "বলিস্ কি রে, সুমিত্রা? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে চরকা দিয়ে আস্‌তে পার্‌বি?"

মাধবী সহাস্য-মুখে বলিল, "নিশ্চয়ই পার্‌ব! তোমাদের স্বরাজ লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পার্‌ব না?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"আমার বোন বলে' তোকেও যদি অপমান করে? যদি স্পাই বলে?"

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সুমিত্রার মার কাছে তোমার বোন বলে' আমি পরিচয় দেবো না। একখানা বন্ধ-গাড়ীতে দু-তিনটে চরকা নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে সুমিত্রাদের বাড়ীতে উপস্থিত হব। প্রথমে এমনি গিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা কর্‌ব, তার পর চরকার কথা বলে' তাকে রাজি করে' একটা চরকা গাড়ী থেকে আনিয়ে নেবো।"

"যেমন অবলীলাক্রমে বলে' গেলি, ব্যাপারটা ঠিক তেমন সহজ নয় মাধবী!"

মাধবী গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "কিন্তু খুব শক্ত বলে'ও ত আমার মনে হচ্ছে না। একজন ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে একটি মেয়েকে একখানি চরকা দিয়ে আসা। সে মেয়েটি আবার নিজেই চরকা পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।"

কথাটা প্রথমে কৌতুক-পরিহাসের আকারেই উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ কথায় কথায় বাস্তব হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। মাধবীর কথাটা একেবারে উপেক্ষণীয় বলিয়া সুরেশ্বরের আর মনে হইল না। এমন কি ইহা ভিন্ন উপায়ান্তরও আর নাই বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল। অপর পক্ষে মাধবী এই কৌতুকপ্রদ কার্য্য সম্পাদন করিবার উৎসাহ ও উদ্বেগ ভোগ করিবার জন্য ক্রমশঃ প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ব্যাপারটায় এমন একটু রঙ্গ ও সাহসিকতার কথা ছিল যে তাহার উত্তেজনা মাধবীকে প্রবলভাবে প্ররোচিত করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, যে বিচিত্র পদার্থটি তাহার দাদাকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত করিয়াছে তাহাকে দেখিয়া আসিবার একটা কৌতূহলও ছিল।

সুরেশ্বর একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "সহজভাবে যদি কাজটা করে' আস্‌তে পারিস তা হ'লে না হয় তাই কর্। যাস্ ত কবে যাবি? আজই?"

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "এখনই। তুমি রামদীন কোচ্‌মানের একখানা গাড়ী আনিয়ে দাও, আর আমার সঙ্গে কানাই চলুক। আমি ততক্ষণ মা'র মতটা নিয়ে আসি।"

"মা যদি সুমিত্রাদের বাড়ী তোর একলা যাওয়ায় আপত্তি করেন?"

"সে আমি যতটুকু বলা দর্‌কার তা ব'লে মার মত করিয়ে নেবো।" বলিয়া মাধবী তারাসুন্দরীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল; এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা'র মত করিয়েছি। তুমি গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা কর।"

গাড়ী আসিলে মাধবী সুরেশ্বরকে বলিল, "কোন্ চরকাটা সুমিত্রাকে দেবে, দাদা?"

যতগুলা চরকা গৃহে উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে সুরেশ্বরের হাতের চরকাটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুরেশ্বরের মনে মনে ইচ্ছা হইতেছিল সেই চরকাটাই সুমিত্রাকে পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু কোন্ দিক্ হইতে কেমন একটা সঙ্কোচ আসিতেছিল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছিল না; তাই মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে সে-ই মাধবীকে প্রশ্ন করিল, "তুই কি বলিস্? কোন্‌টা দেওয়া যায়?"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "আমি বলি তোমার নিজের হাতের চরকাটা দাও। তুমি নিজে নূতন একটা চরকা ঠিক করে' নিতে পার্‌বে, সুমিত্রা এই প্রথম চরকা অভ্যাস কর্‌বে, তার পক্ষে একটা ভাল চরকা দর্‌কার।"

মাধবীর কথায় সুরেশ্বরের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল; সে মৃদু স্মিতমুখে বলিল, "তোর চরকাটাও ত মন্দ নয়, সেইটেই দে না কেন?"

মাধবী বলিল, "আমার চরকার চেয়ে তোমার চরকাটা অনেক ভাল। তা ছাড়া তোমার চরকাটা সুমিত্রার হাতে ভাল চল্‌বে।" বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

মাধবীর পরিহাসে কপটক্রোধ-ভরে সুরেশ্বর বলিল, "তোর মাথা হবে! এ ত আর বিপিন-বোসের মোটর-কার নয় যে তুই চড়্‌লেই বোঁ বোঁ করে' চল্‌বে।"

মাধবী রুষ্ট-স্মিত মুখে বলিল, "না দাদা! একটা ভাল কাজে যাচ্ছি এখন যা-তা কথা বলে' যাত্রা নষ্ট কোরো না!"

"বিপিন-বোসের সে গুণও আছে না কি রে?"

"নেই?"

"তুই এত খবর নিলি কবে, মাধবী?"

"যাও! বেশী ফাজ্‌লামী কোরো না। আমার এখন নষ্ট কর্‌বার মত সময় নেই।" বলিয়া মাধবী পুরাতন ভৃত্য কানাইকে ডাকিয়া সুরেশ্বরের চরকা ও অপর একখানি চরকা গাড়ীর ভিতরে চড়াইয়া দিতে বলিল।

সুরেশ্বর আর কোনো আপত্তি করিল না, চরকা দুটি লইয়া কানাই প্রস্থান করিলে, শুধু বলিল, "আমার ভারি যত্নের চরকাটি বিলিয়ে দিচ্ছিস্, মাধবী।"

"তার জন্যে তুমি একটুও দুঃখিত নও!"

"গুণ্‌তেও জানিস্ না কি রে?"

"জানি!" বলিয়া মাধবী একটি ছোট ডালায় তুলার পাঁজ ভরিয়া লইতে বসিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, "এগুলি বৌ-দিদিকে উপহার দিয়ে আস্‌ব।"

একথায় সুরেশ্বরের হাস্য-প্রফুল্ল মুখ সহসা গম্ভীর হইয়া গেল। সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "না, না, মাধবী! ঠাট্টাটাও সীমার মধ্যেই রাখিস্! সুমিত্রা একজন ভদ্রলোকের মেয়ে; তার ওপর আমাদের যখন কোনো সম্পর্কের দাবী নেই, তখন তাকে নিয়ে যথেচ্ছা ঠাট্টা কর্‌বার আমাদের কোনো অধিকার নেই!"

এ তিরস্কারে মাধবীর প্রসন্ন মুখে কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটিল না। সে তেমনি হাসিমুখে বলিল, "জানি আমি সুমিত্রা ভদ্রলোকের মেয়ে, আর জানি আমি তাকে বউদিদি করে' নিতে পার্‌ব, তাই তাকে বউদিদি বল্‌ছি।"

গভীর বিস্ময়ে সুরেশ্বর বলিল, "তুই করে' নিতে পার্‌বি?"

সহাস্যমুখে লঘু-ভাবে মাধবী কহিল, "হ্যাঁ, আমিই করে' নিতে পার্‌ব।"

"কি করে'?"

"যেমন করে' পারি। সে যখন কর্‌ব তখন দেখো। এখন বাড়ীটা কানাইকে ভাল করে' বুঝিয়ে দেবে চল।"

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া চিন্তিত-মুখে সুরেশ্বর কহিল, "দেখিস্ মাধবী, সেখানে গিয়ে যা'-তা' কথা বলে যেন হাল্‌কা হয়ে আসিস্ নে!

মাধবী হাসিয়া বলিল, "না গো না, সে ভাবনা তোমার নেই। খুব ভাল ভাল কথা বলে' ভারী হয়ে-ই আস্‌ব। এখন চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

কানাইকে সর্ব্ববিষয়ে উপদেশ দেওয়ার পর মাধবীকে

গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া সুরেশ্বর আর দ্বিতলে না গিয়া বৈঠকখানার ঘরে গিয়া বসিয়া একটা ইংরেজী সংবাদপত্রের জন্য লিখিত কোনো প্রবন্ধের প্রুফ্ দেখিতে বসিল। মনটা একটু বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দুই চারি ছত্র প্রুফ্ দেখিতে দেখিতেই তন্মধ্যে মনোযোগ বসিয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে বাহিরে দ্বারের সম্মুখে কে ডাকিল, "সুরেশ্বর আছ?"

কণ্ঠস্বর বিমানবিহারীর মত মনে হইল; কিন্তু সে সুরেশ্বর বলিয়া ডাকে না, সুরেশ্বর-বাবু বলিয়া ডাকে; তাই "আছি" বলিয়া সাড়া দিয়া সুরেশ্বর সকৌতূহলে দ্বার খুলিয়া দেখিল বিমানবিহারীই দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর বন্ধুত্বের সম্বোধনকে স্বীকার করিয়া লইয়া প্রফুল্লমুখে আগ্রহসহকারে বলিল, "এস, এস, ভিতরে এস।"

ভিতরে আসিয়া উভয়ে আসন গ্রহণ করিলে সুরেশ্বর বলিল, "তার পর? কি খবর?"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "খবর আর কি? সুমিত্রার হুকুম তামিল কর্‌তে এসেছি।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাকিমেও হুকুম তামিল করে না কি?"

বিমানবিহারী বলিল, "হাকিমে সব রকম কুকার্য্য করে।"

"উপস্থিত কি কুকার্য্য কর্‌তে এসেছ শুনি?"

বিমান বলিল, "তুমি সুমিত্রাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এসেছ; এখন তার জন্যে তোমার কাছ থেকে একটি চরকা কাঁধে করে' নিয়ে যেতে হবে।"

সুরেশ্বর মনে মনে একটু চমকিত হইয়া উঠিল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্মিতমুখে বলিল, "কাঁধে করে' রাজপথ দিয়ে ডেপুটি চরকা নিয়ে গেলে ডেপুটিগিরি টিক্‌বে?"

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি আর সুমিত্রা, দুজনে যে রকম পিছনে লেগেছ ডেপুটি-গিরি টেঁকে কি না সন্দেহ!"

সুরেশ্বর বলিল, "তা হলে আমাদের দুজনকেই বর্জ্জন কর না, ডেপুটি-গিরিই থাক্।"

"তোমাদের দুজনের একজনকেও বর্জ্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কথাটা আজকে খোলাখুলিভাবে সাদা কথায় তোমাকে বুঝিয়ে যাব। তার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "এই শীতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল!"

বিমানবিহারী মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "বিপদে পড়্‌লে মানুষে এর চেয়েও গুরুতর কাজ করে! তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন জল ছেড়ে ঘোল না খেতে হয়!"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে জল আনিতে ভিতরে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চীন-সম্রাটের কর-ভারে প্রজারা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সাহস করে' সম্রাটের সামনে কেউ কিছু বল্‌তে পার্‌ছিল না। অবশেষে একজন সভাসদ্ এমন ভাবে কথাটি সম্রাটের কাছে বল্‌ল যাতে তাকেও সম্রাটের বিরাগভাজন হতে হ'ল না, অথচ দেশেরও ঢের মঙ্গল হল। উক্ত সভাসদটি একদিন সম্রাটের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে একখানা ভারি কাল মেঘের উপর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল। সম্রাট্ দেখে বল্‌লেন—'এখনই ফিরে যাওয়া দর্‌কার, নয়ত ভিজ্‌তে হবে।' সভাসদ্ আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল—'সেকি! ও মেঘ সহরে ঢুক্‌তেও সাহস পাবে না—কিচ্ছু ভয় নেই।' সম্রাট্ কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন; সভাসদ্ উত্তর দিল—'যদি গোস্তাকী করে' চীন-রাজধানীতে ঢোকেন তবে ওঁর কাছ থেকে দস্তুরমতন খাজনা আদায় করে' নেওয়া হবে।'

কথাটা সম্রাট্ বুঝ্‌লেন;—তার পরেই অনুসন্ধান করে' সমস্ত জান্‌লেন। ফলে প্রজার করভার অর্দ্ধেক কমে' গেল।

শ্রী বীরেশ্বর বাগ্‌ছী

পঞ্চশস্য

একুশ-মাথাওয়ালা খেজুরগাছ—

২৪ পরগণার অন্তর্গত বাদুড়িয়া থানার নিকট আরশুলা গ্রামে এই গাছটি এখনও বর্ত্তমান আছে। গাছটিকে প্রথম ছয় বৎসর "কাটিয়া" রস লওয়া হইয়াছিল, তাহার দাগ ছবিতেও বেশ প্রত্যক্ষ। সপ্তম বৎসরে গাছ কাটিবার সময়ে শিউলি দেখিতে পায় যে গাছের মাথার কাছে ছোট ছোট অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। দেখা সত্ত্বেও সে রীতিমত গাছ কাটে। বাড়ীতে আসিয়া তাহার জ্বর হয় ও তাহার পর দিবসে তাহার



একুশ-মাথাওয়ালা খেজুরগাছ

মৃত্যু হয়। তদবধি, গাছটিতে কোন অজানা দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া, লোকে গাছটি আর কাটে না। ফড়কী গাছগুলা যথেষ্ট মোটা, ইচ্ছা করিলে সেগুলা কাটিয়া রস বাহির করা যায়।

প্রবোধচন্দ্র সাউ

—

সমুদ্র-জগতের কথা—

সমুদ্রের তলায় নানা-প্রকার জন্তু বাস করে। এই-সব সমুদ্রতল-বাসীদের দেখিলে গাছপালা বলিয়া ভ্রম হইবার কথা এবং অনেকের তাহা হয়ও। সমুদ্রে উপরের দিকে নানা-প্রকার জলীয় লতাপাতা ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু যত নীচে নামা যায়, ততই গাছপালা কমিতে থাকে এবং অবশেষে একেবারে লোপ পাইয়া যায়। কতকগুলি ছবি দেওয়া হইল—এই ছবিগুলি হেলিগোল্যাণ্ডের জীবতত্ত্বানুসন্ধানের পরীক্ষাগারের বৈজ্ঞানিকেরা বহু পরিশ্রম এবং কষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এই জন্তুগুলিকে অগভীর জলে আনিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে, এবং জলের মধ্যে ফোটো তোলাও বিশেষ সহজে হয় নাই।

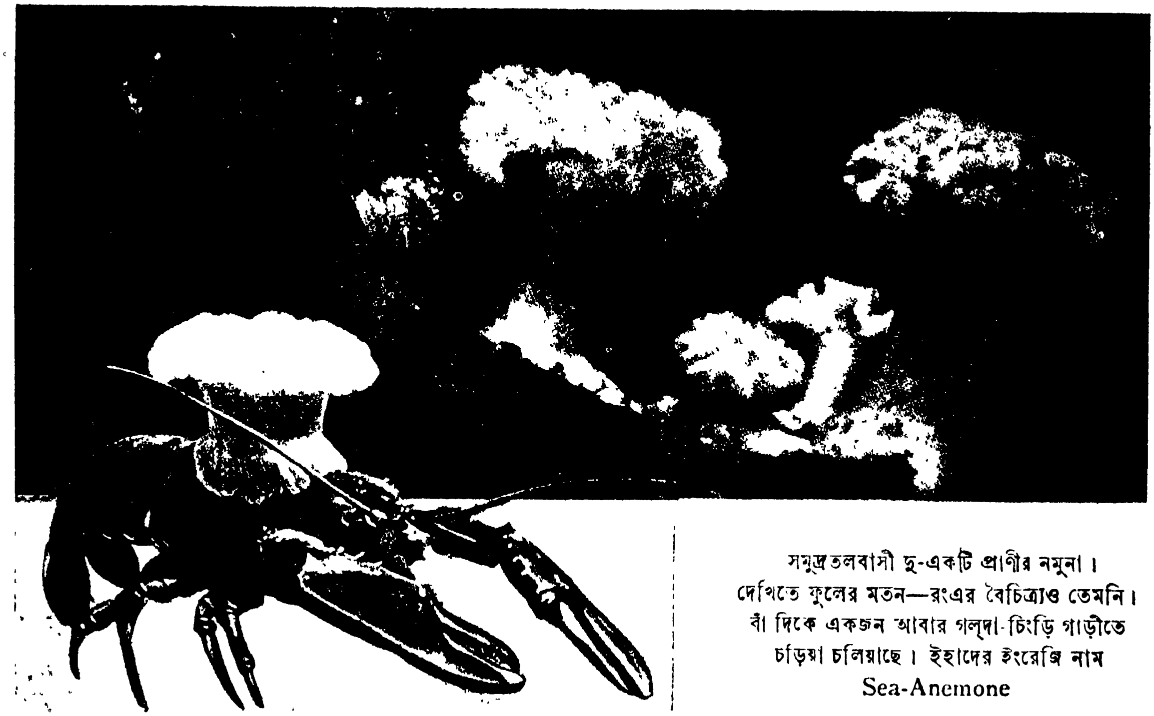


সাগরিকা (Widowed Sea-Anemone) - দলছাড়া হইয়া একলা বাস করে বলিয়া এই নাম। গাছের মত দেখিতে কিন্তু মাথায় চুলের ঝুঁটিতে ছোট ছোট প্রাণী পড়িলে তাহার মরণ হয়—চুলগুলিতে বিষ আছে

মোটর-জগতের কথা—

মোটরে রান্না

মোটর-কারের সামনে মোটর-ইঞ্জিন থাকে। এইখানেই মোটরের সব কলকব্জা এবং এই স্থানটি ধাতব ঢাকনির দ্বারা ঢাকা থাকে। জেমস্ ই জেড্ ফাউল নামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়স্ (Preuss) নামক স্থানের এক ব্যক্তি একটি অভিনব উনান তৈয়ার করিয়াছেন। [illegible]



সমুদ্রতলবাসী দু-একটি প্রাণীর নমুনা। দেখিতে ফুলের মতন—রংএর বৈচিত্র্যও তেমনি। বাঁ দিকে একজন আবার গল্‌দা-চিংড়ি গাড়ীতে চড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের ইংরেজি নাম Sea-Anemone



কম্পাস্‌ জেলিফিস্‌। দেখিতে বিট বা বিলাতি মূলার মত—

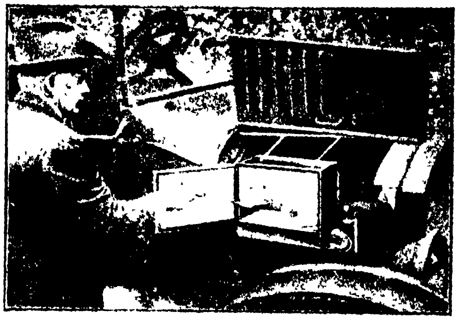


সি-কিউকাম্বার্‌ বা সমুদ্রের শশা। ইহারা তারা মাছের খুড়তত ভাই, সে কাছেই রহিয়াছে, বহুদিনের পর দেখা বলিয়া বাক্যালাপ করিতেছে

ইঞ্জিনের ভিতর ফিট্‌ করা থাকে। কফি, ষ্টু, ডিম-সিদ্ধ ইত্যাদি গাি চলিতে চলিতে তৈয়ার করা যাইতে পারে। উনানের জন্য যে তা' প্রয়োজন তাহা মোটর-ইঞ্জিন হইতেই পাওয়া যায়।

মোটরে করিয়া যাঁহারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের পে

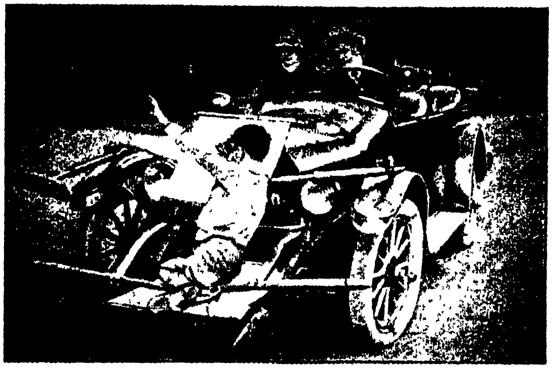
উঠে নাই; কিন্তু দিন অপেক্ষা করিলে এই উনান পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।



মোটরের রান্নার উনান

নূতন-ধরণের মোটর গাড়ী

আমাদের দেশে হাজার হাজার লোক মোটর-কাব, রেলগাড়ী ইত্যাদির সাম্‌নে পড়িয়া অকালে এবং অসময়ে প্রাণ হারায় বা এমন-ভাবে আহত হয় যাহাতে বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মরাই শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের লোকসংখ্যা নাকি অতি প্রচুর, সেই-জন্যেই হয়ত আমাদের দেশের প্রাণের বাজারদর সস্তা। যে, মানুষ চাপা দেয়, তার হয়ত ১৩৲ জরিমানা হয় এবং যে চাপা পড়ে সে হয় মরিয়া যায়, নয় ৫৲ শরীর-মেরামতি খরচা পায়। এ দেশের কর্ত্তাদের কিন্তু এই-সমস্ত দুর্ঘটনা বন্ধ করিবার কোনো চেষ্টা নাই।

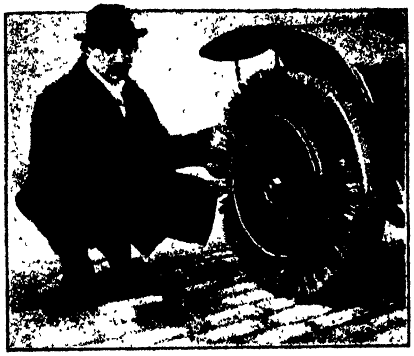


সাম্‌নে-পড়া-লোক-বাঁচান কল। লোকটি অসহায় অবস্থায় নিরাপদ স্থানে পড়িয়া গেল এবং মরে নাই দেখিয়া হয়ত অবাক্ হইয়া গেল

মোটরওয়ালারাও এ-বিষয়ে বিশেষ কিছু চিন্তা করে না। কারণ দর্‌কার নাই। যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা কিন্তু বসিয়া নাই। তাহারা নিত্যই নব নব আবিষ্কার করিয়া তাহাদের জীবনের সুখ শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইবার চেষ্টায় রত আছে। মোটর-দুর্ঘটনা অতি-রিক্ত হওয়াতে তাহারা মোটরের সাম্‌নে একপ্রকার কল বসাইয়াছে। মোটরের সাম্‌নে এই কলের সঙ্গে কোনো লোকের ধাক্কা লাগিবা মাত্র কল হইতে দুইটি হাতল সড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া আসে এবং সাম্‌নে স্থিত ব্যক্তিকে মোটরের সহিত যুক্ত দুইটি ক্যাম্বিশ স্ট্রেচারের উপর টানিয়া লয়—ইহার দ্বারা এই হয় যে সাম্‌নেস্থিত ব্যক্তির মোটরের কোনো শক্ত অংশের সহিত সংঘর্ষণ হয় না—কাজেই সে আহত হয় না। কলের হাতল এবং স্ট্রেচারও এমনভাবে স্থিত যে মোটরের সাম্‌নে যেরকমভাবেই লোক গিয়া পড়ুক না কেন, সে রক্ষা পাইবেই, তাহার মরিবার কোনো আশঙ্কাই নাই।

কাদা-আট্‌কান চাকা

মোটর-কারের চাকাটি দেখুন। এই চাকা যখন রাস্তার জল-কাদার উপর দিয়া চলিবে তখন আপনার বা আপনার মাস্‌তুতো ভাইএর গায়ের রঙীন পাঞ্জাবী এবং লালপেড়ে কাপড়ের উপর কাদা ছিটাইয়া যাইবে না। প্যারিসে এক ভদ্রলোক চাকার গায়ে বুরুশ লাগাইয়া এইটি তৈয়ার করিয়াছেন।



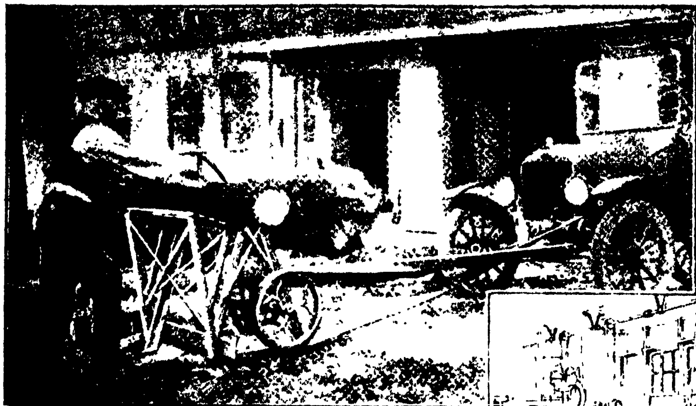
মোটবের কাদা-আট্‌কানো চাকা

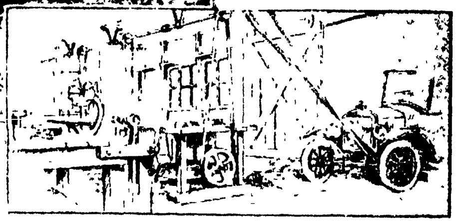
কার্‌খানার কাজে ফোর্ড-গাড়ী

মোটরের ষ্টার্টিং-ক্র্যাঙ্কের কাছে একটি চাম্‌ড়ার পেটি লাগাইয়া কেমন করিয়া মোটর-কারকে ঘরের কাজে লাগানো যাইতে পারে ছবিতে তাই দেখানো হইতেছে। মোটরকে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা মোটর-ইঞ্জিনের গঠন এবং কেমন করিয়া চলে ইত্যাদি সব জানেন তাঁহারা ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন। এইরকম একটি ফোর্ড-ইঞ্জিনের দ্বারা ছোট একটি কার্‌খানার কাজ চালানো যাইতে পারে, আবার বিকাল-বেলায় কার্‌খানার পোসাক ছাড়িয়া মোটর চড়িয়া হাওয়া খাওয়াও চলিতে পারে।

কাচের ফুল—

শিকাগোর জীবতত্ত্বের মিউজিয়ামে কাচের দ্বারা নানা-প্রকার ফুল তৈয়ারী হয়, যাহা দেখিলে প্রকৃতির তৈরী ফুলের অপেক্ষা বেশী সুন্দর বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকটি ফুলকে এত কষ্ট এবং পরিশ্রম এবং দক্ষতা স্বীকার করিয়া করিতে হয় যে তাহাকে আসলের সহিত মিলাইয়া দেখিলে কোনো প্রকারে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইবে না। আসল এবং নকল একেবারে হুবহু একই প্রকার। ফুলের ডাঁটা, পাপ্‌ড়ি, রেণু, রং ইত্যাদি সবই সত্যিকার রূপে ফুটিয়া উঠে, দেখিলে একেবারে সজীব বলিয়া মনে হয়। এই-সমস্ত ফুল দেখিয়া সত্যিকার ফুলের সম্বন্ধে নানা-প্রকার শিক্ষালাভ করা যায়। কোনো কোনো ফুলের পরাগ, রেশমী সূতা অপেক্ষাও





ফোর্ড মোটরের সাহায্যে কেমন ভাবে কারখানার কাজ চলে দেখুন। বাঁ দিকে করাত কল, ডান্ দিকে ছোট কারখানা চলিতেছে

তাহাদের চোখে দেখাও যায় না, এই-সমস্ত পুষ্প-বৃক্ষকে অণুবীক্ষণের তলায় রাখিয়া তাহার নকল তৈয়ারী করা হয়। ফুলের রংও নকল ফুলে স্বাভাবিক-ভাবেই পাওয়া যায়।

দক্ষিণ আমেরিকা হইতে একটি কামান-গোলা (Cannon-ball) নামক বৃক্ষ শিকাগোতে চালান দেওয়া হয়। চালানের পূর্ব্বে, প্রথমে বৃক্ষটির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং গঠন প্রণালী খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করা হয়, তাহার পর ঐ বৃক্ষের ফোটো লওয়া হয়। তাহার পর বৃক্ষের মাথার উপরের সমস্ত পাতা ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত ডাল পালা নম্বর দিয়া কাটিয়া বিভিন্ন বাক্সে প্যাক্ করা হয়। এবং ফল, ফুল এবং কিছু পাতা অবিকৃত



শিল্পী যন্ত্র সাহায্যে নকল ফল ফুল তৈরী করিতেছে



আসল পাতা এবং ফুল দেখিয়া শিল্পী নকল পাতা-ফুল তৈরী করিতেছে

পুষ্প—তাহা নির্ম্মাণ করিতে শিল্পীর অসীম কুশলতার প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ফুল এবং তাহার গাছ এত ছোট হয় যে সব সময়

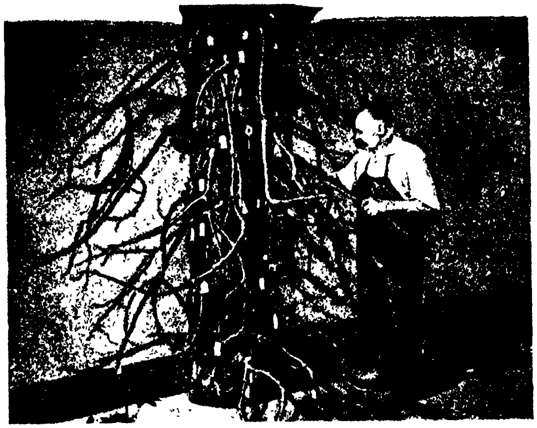
রাখিবার জন্য আরকে ডুবাইয়া রাখা হয়। যে-সমস্ত অংশ সহজে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, তাহাদের প্ল্যাষ্টারের ছাঁচ তৈরী করা হয়, এবং সেই সঙ্গে ছাঁচের উপর সত্যকার বৃক্ষের অনুরূপ রংও দেওয়া হয়। এই-সমস্ত হইয়া গেলে পর খণ্ড খণ্ড অবস্থায় গাছটিকে চালান দেওয়া হয়। শিল্পীরা সমস্ত অংশ-গুলিকে সামনে রাখিয়া আর-একটি সম্পূর্ণ নকল বৃক্ষ নির্ম্মাণ করে, তাহা দেখিলে কেহ নকল বলিয়া বুঝিতে পারে না। বড় বৃক্ষ তৈরী করিতে হইলে গাছের গুঁড়ি রোদ-জল খাওয়ান সিজন্ড্ কাঠ খুদিয়া করিতে হয়। তাহার পর ইস্পাতের ছাপে চাপিয়া, সবুজ রবারের মত একপ্রকার পদার্থ হইতে গাছের পাতা তৈরী করিতে হয়।

এই-সমস্ত ফল ফুল এবং গাছ-পালা এমন স্থানে রক্ষা করা হয়, যাহাতে দেখিবামাত্রই মনে হয় যে ইহারা স্বাভাবিকভাবেই সেই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা যে মানুষের সৃষ্টি, এ কথা কেহ কল্পনা করিবার অবসর পায় না।

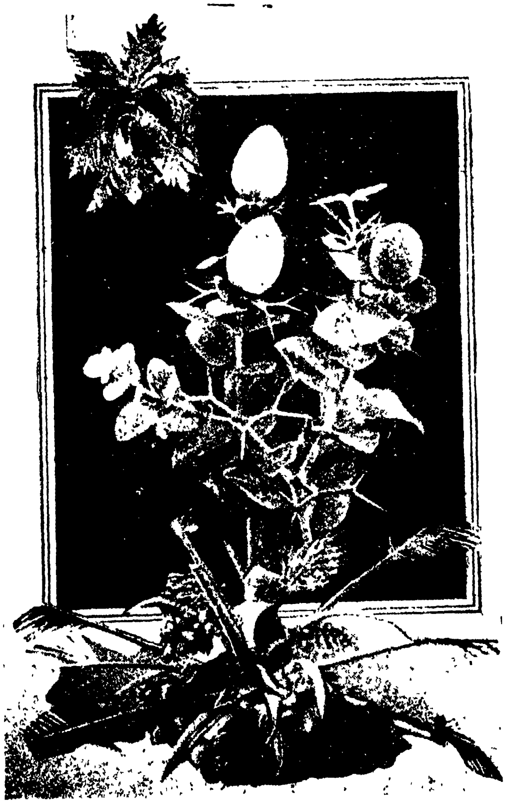
এই-সমস্ত তৈরী করিতে হইলে শিল্পীকে অনেক সময় খুব ভাল করিয়া উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব পাঠ করিতে হয়। তাহা না হইলে সময় সময় কাজ অচল হইয়া যায়। অনেক সময় শিল্পীকে দূর দেশে গিয়া কোনো বিশেষ বৃক্ষ সম্বন্ধে সকল তথ্য বেশ করিয়া দেখিয়া এবং শিখিয়া আসিতে হয়। এই-সমস্ত না দেখা থাকিলে নকল বৃক্ষকে সত্যকার বৃক্ষের হুবহু করিয়া তৈরী করা সম্ভব হয় না।

ফল-ফুলের বৃক্ষে • পাখী মৌমাছি বা অন্য কোনপ্রকার কীট পতঙ্গ নাই, এ কথা ভাবিতেও কেমন লাগে। সেইজন্য বৃক্ষকুঞ্জ তৈরী করিয়া তাহার ফুলে নকল কীট পতঙ্গ মৌমাছি ইত্যাদি বসাইতে হয়। অনেক গাছে পাখী এবং পাখীব বাসাও বসাইতে হয়। এই-সমস্ত হইয়া গেলে পর কুঞ্জের কাছে গিয়া দাঁড়াইলে মনে হয় প্রকৃতির তৈরী কোনো সুন্দর স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। নানা-রকম জন্তুও এইরকমভাবে তৈরী করিয়া কুঞ্জ-মধ্যে রক্ষা করা হয়।

আসলের সহিত নকলের একমাত্র তফাৎ—নকল ফুলের গন্ধ নাই, নকল ফুলেব রস নাই, নকল মৌমাছি গুন্‌গুন্ করে না এবং হুল ফুটায় না। নকল পাখী গান করে না। এই-সব নকল জিনিষে প্রাণ ছাড়া সবই পাওয়া যায়।



ক্যানন্-বল গাছটির একটি একটি ডাল কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া এবং নম্বর দিয়া চালান দেওয়া হয়—শিল্পীর হাতে সে আবার সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে



একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষ—দেখিলে নকল বলিয়া ধরিবার কাহারো সাধ্য নাই—রংএ এবং ঢঙে একেবারে আসলের যমজ ভাই



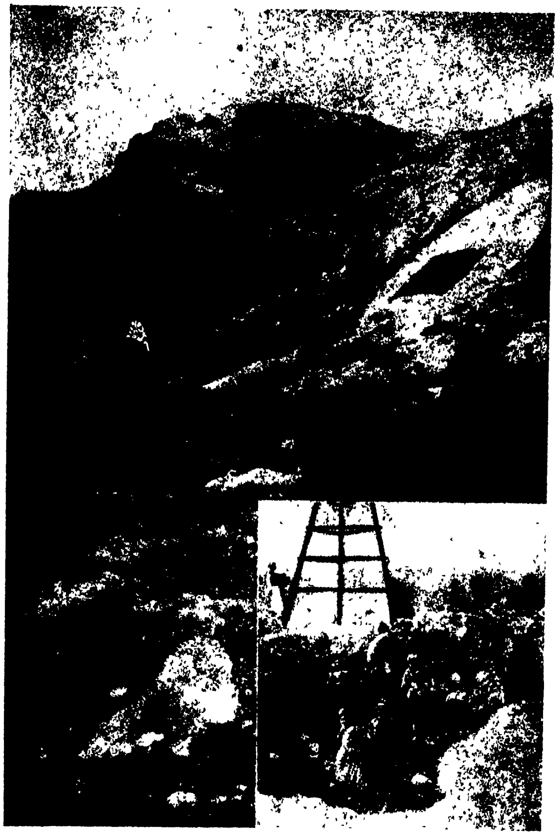
আসল গাছের অবিকল নকল—ইহার কেবল একটি অভাব, সে রস-গন্ধহীন

প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কার—

মাটির তলায় হাজার হাজার বছর পূর্ব্বকার সভ্যতার কত চিহ্ন বর্ত্তমান আছে তাহার সংখ্যা নাই। মানুষ যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার সংখ্যা অতি সামান্য—এখনও যে কত প্রাচীন সহর ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ মাটির তলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই-সমস্ত সহব ইত্যাদি বর্ত্তমান কালের ইতিহাস আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বের—তাহাদের বয়স নির্ণয় করা সকল সময় সহজ হয় না। এখন অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই-সমস্ত আবিষ্কারের কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের এক-একটি আবিষ্কারে মানুষ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যায়।

দুই হাজার বছরের পূর্ব্বে লঙ্কাদ্বীপে অনুরাধাপুর নামে এক বিশাল সহর ছিল। এই সহরটি ধ্বংস হইয়া মাটি-চাপা পড়ে। সম্প্রতি একদল বৈজ্ঞানিক এই সহরটি আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইজিপ্টের আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সমুদ্রের তলে নানা-প্রকার পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে, জলের নীচে বহুকাল



এই সমস্ত ঢিপির তলে বহুযুগের পূর্ব্বের সহর এবং সভ্যতার চিহ্ন ঢাকা আছে—ডান দিকে নীচে একদল লোক এই সমস্ত আবিষ্কারে খনন কার্য্য করিতেছে



ইজিপ্টে হাজার হাজার বছর পুর্ব্বের সভ্যতার প্রমাণ আবিষ্কার —উপরে সীমাহীন মরুভূমি

পুর্ব্বের নির্ম্মিত একটি বন্দর আছে। প্রাচীন ফ্যারাওগণ নাকি এই বন্দর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এসিয়াতে যে সমস্ত খননকার্য্য হইতেছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকদের মতে আরো অনেক আশ্চর্য্য আবিষ্কার হইবে।

কিছুকাল উত্তর ইজিপ্টের উর নামক স্থানে একটি মন্দির মাটির তলায় পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটি নাকি মাটির নীচে আবিষ্কৃত সকল মন্দির ইত্যাদি অপেক্ষা পুরাতন। এই সহর হইতেই বাইবেলে বর্ণিত আব্রাহাম নামক এক অতি সভ্য লোকের আগমন হয়।

আমেরিকার মানুষের অগম্য গভীর বন-প্রদেশে, প্যাটাগোনিয়ার জলাভূমিতে, মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি ইত্যাদি অনেক স্থানেই হাজার হাজার বছর পুর্ব্বেকার সভ্যতার অনেক-কিছুই মাটির তলায় পাওয়া যাইতেছে।

মেক্সিকো-উপত্যকায় যে-সকল প্রত্নতত্ত্ববিদের দল এইসব কাজ করিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, এইখানে পর পর পাঁচটি সভ্যতার উত্থান এবং পতন হয়। সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সভ্যতার চিহ্নস্বরূপ যে-সব ঘর বাড়ী মন্দির ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহা মাটির উপর হইতে ৪০ ফুট নীচে। এই স্থানের আরো দক্ষিণে আর-একটি সভ্যতার উত্থান হয়। ৩০০ হইতে ৬০০ শতাব্দীর মধ্যে এই সভ্যতার পতনের সঙ্গে, ইহাদের পুর্ব্বের হাজার হাজার বছরের যে কত চিহ্ন লোপ পাইয়াছে, তাহা কল্পনা করা যায় না।

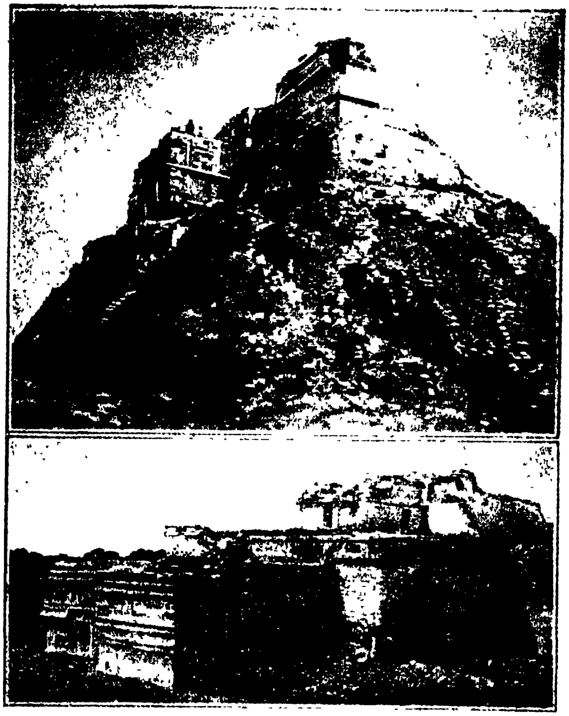
অন্ধকার গভীর গুহার মধ্যে, বড় উচ্চ স্তূপের তলায় এবং মানুষের অগম্য অন্যান্য নানা স্থানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের আবিষ্কারের যে কত কি আছে তাহা বলা যায় না। এক-এক স্থানে এমন সমস্ত রঙীন চিত্র পাওয়া গিয়াছে যাহা বর্ত্তমান শিল্পীর শ্রেষ্ঠ চিত্রকেও হার মানায়। মণি-মাণিক্য-খচিত এমন অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, যাহার মূল্য এক রাজার সমস্ত রাজ্য বিক্রয় করিলেও পাওয়া যায় না।

কে জানে, আমাদের এই সভ্যতাও হয়ত একদিন বহু যুগ পরে সভ্যতার-পলির বহুস্তর নিম্নে পড়িয়া থাকিবে, এবং তখনকার দিনের অতি-অতি সভ্য লোকেরা মাটির নীচে খনন করিয়া আমাদের ট্রাম লাইন, এয়ারোপ্লেন, জাহাজ, কামান, ঘর বাড়ী ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া হয়ত বিস্ময়ে অবাক্ হইবে এই মনে করিয়া, যে, ওঃ বিংশ শতাব্দীর লোকেরাও ত বেশ সভ্য ছিল, কারণ আমাদের সময়কার খেলনার কিছু কিছু তাহাদেরও জানা ছিল।

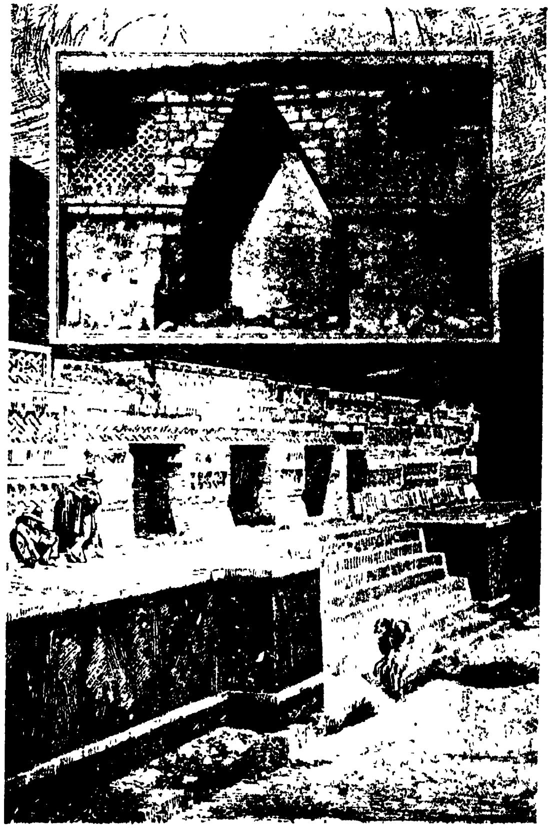
—

বৃক্ষবাসীদের কথা—

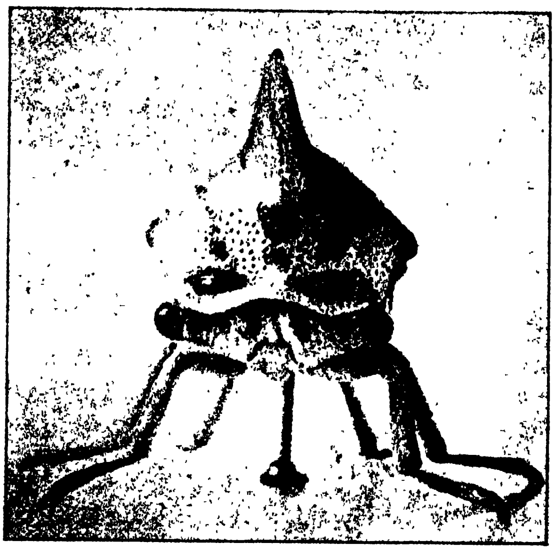
পৃথিবীতে কত রকম পোকা-মাকড়, এবং তাহাদের রূপ যে কত অপরূপ তাহা বলা যায় না। কতকগুলি পোকা অতি ক্ষুদ্র, তাহাদের



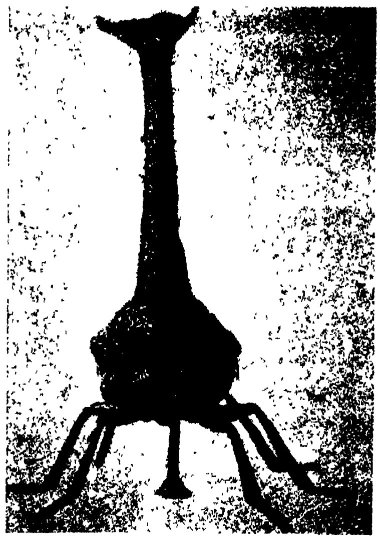
মাটির এবং বালির স্তূপ খনন করিয়া আবিষ্কৃত দুর্গ এবং মন্দিরাদি



মেকিস্কোতে মাটির নীচে প্রাপ্ত প্রাচীর এবং তোরণদ্বার, এই-সব হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়



চশমাধারী ফড়িংবাবু—ইনি দক্ষিণ ব্রেজিলের





অদ্ভুত ফড়িং—চিত্রকরের খেয়াল-খুসির চিত্র অঙ্কনকেও পরাজিত করিয়াছে। ইনি ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়া বেড়ান



অদ্ভুত ফড়িং—ইনিও ব্রেজিলে গাছে গাছে লাফাইয়া বেড়ান

বিশেষভাবে দেখিতে হইলে অণুবীক্ষণের প্রয়োজন। কয়েক প্রকার গাছ-ফড়িং আছে তাহাদের দেখিতে অপরূপ। এইরকম কয়েকটি ফড়িংএর মডেল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মডেলগুলি মোমের এবং সেগুলি নিউ-ইয়র্কের এক যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই মোমের ফড়িংগুলি দেখিবার জিনিষ, কারণ এত বড় করিয়া এ-পর্য্যন্ত কেহ ইহাদের মডেল নির্ম্মাণ করেন নাই। এই মডেল দেখিয়া ইহাদের দেহের অতি অদ্ভুত এবং বিচিত্র গঠনের এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মডেলগুলি কীট-জগতের অনেক নূতন খবর দিবে।

ফড়িংরা গাছের এবং পাতার রস খাইয়া দিন যাপন করে। তাহাদের একপ্রকার সরু লম্বা ঠোঁট আছে। এই ঠোঁটে কতকগুলি কুঁচি আছে। গরমদেশের ফড়িংদের এই কুঁচিগুলি বহু বর্ণের হয়। ইহাদের চারিটি চোখ, দুটি বড় বড় এবং নীচে দুটি ছোট। ফড়িংদের চাউনি ক্লান্ত এবং অবসন্ন। অনেক ফড়িংএর চোখের এবং মাথার নীচে একটি দাগ থাকে, তাহাতে ফড়িংবাবুকে চশমা-পরা বলিয়া মনে হয়। ইহাদের ডানাও চারিটি, দুটি বাহিরের দিকে এবং দুটি ভিতরের দিকে। বাহিরের ডানাদুটি ছোট এবং স্বচ্ছ, অন্য দুটি পার্চমেণ্টের মত। পিছনের পা দুটি সামনের পা অপেক্ষা লম্বা এবং এই পায়ের সাহায্যেই ফড়িং তাহার শরীরের তুলনায় খুব উঁচুতে লাফাইতে পারে।

এই-সব ফড়িংদের বক্ষস্থলের গঠন অতি অদ্ভুত। একটু বড় হইলে অনেকপ্রকার ফড়িংএর বক্ষ হইতে একটি শিং বাহির হয়। এই শিং আকারেপ্রকারে এমন বিদ্‌কুটে যে প্রাণিতত্ত্ববিদেরা ইহাদের গঠন এবং বর্দ্ধন কেমনভাবে হয়, তাহা অনেক সময় কোনো রকমেই বুঝিতে পারেন না। এই-সব অদ্ভুত শিং দেখিলে পুরাকালের প্রস্তরীভূত অনেক স্তন্যপায়ী জন্তুদের শিংএর কথা মনে হয়। দক্ষিণ এবং মধ্য আমেরিকার ফড়িংদের মধ্যে এইরকম বেশী দেখা যায়। কোনো-প্রকার ফড়িংএর পিঠের উপরভাগ দাড়ি কামাইবার ক্ষুরের মতন। কোনো ফড়িংএর শিং লম্বা তাহার ডগায় একটি বল আছে, কোনোটি তলোয়ারের মতন আবার কোনোটি বা ছোরার মতন। কত রকমের হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না।

অনেকপ্রকার ফড়িংএর গড়নের দৈনিক পরিবর্ত্তন হয়। আজ হয়ত তাহার ডানা নাই, কাল সকালে দেখিব তাহার দুইটি ডানা গজাইয়াছে, পরশু দেখিব তাহার একটি শিংও হইয়াছে। কবে যে কি নূতন পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা কেহ বলিতে পারিবে না।

ছবির নীচে কয়েকটি ফড়িংএর পরিচয় দেওয়া হইল। এই ছবিগুলি হাজার হাজার বিভিন্ন ফড়িংএর মাত্র চারটির উদাহরণ।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক পরিচয়

বেদবাণী—শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রী সুধীরচন্দ্র সরকার। এম্ সি, সরকার এণ্ড সন্স, ৯০।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। পৃঃ ৯+৭+৩৫৯+২৬ ; মূল্য ৩৲।

এই গ্রন্থ ঋগ্বেদ-বিষয়ক। ইহার প্রথমেই "প্রবেশক"। এই অংশে বেদ-বিষয়ে অনেক তথ্য আছে। ঋগ্বেদ রচনার কাল, বৈদিক সাহিত্য, ঋগ্বেদের ঋষি, সূক্ত ও দেবতা, ঋষিগণের আদিমনিবাস, বৈদিক সমাজ, নীতি, ও সভ্যতা ইত্যাদি অনেক বিষয় এই প্রবেশিকাতে বর্ণিত হইয়াছে।

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, বৈদিক সাহিত্যে তাহাই দেবতা। এই অর্থে ইন্দ্র, অগ্নি বরুণাদি যেমন দেবতা, তেমনি অরণ্যানী প্রস্তর অশ্ব মণ্ডূক শ্রদ্ধা স্বপ্ন প্রভৃতিও বৈদিক দেবতা।

এই গ্রন্থে এই-প্রকার প্রায় প্রত্যেক দেবতার বিষয়েই অন্ততঃ একটা সূক্ত অনূদিত হইয়াছে, কোন কোন স্থলে একাধিক সূক্তও দেওয়া হইয়াছে; দুই-একটি স্থলে অনাবশ্যক বোধে কোন কোন ঋক্ পরিত্যক্তও হইয়াছে। ঋগ্বেদে বালখিল্যসহ ১০২৮টি সূক্ত,; ইহার মধ্য হইতে গ্রন্থকর্ত্তৃদ্বয় ৮৯টি সূক্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সুবিবেচনা ও বিচক্ষণতার সহিত এই সূক্তসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। যে যে বিষয়ে সূক্ত গৃহীত হইয়াছে তাহার কয়েকটি এই—সৃষ্টিতত্ত্ব; অগ্নি ইন্দ্রাদি দেবতা; নদী ওষধি অরণ্যানী প্রভৃতি; গো অশ্ব মণ্ডূকাদি; মায়া, মন্যু, মন প্রভৃতি; দুঃস্বপ্ন, সপত্নী প্রভৃতি; দান, দক্ষিণা, দ্যূত, মৃত্যু, বিবাহ, পিতৃলোক, যম ইত্যাদি।

প্রথমে প্রত্যেক দেবতার বিবরণ, তাহার পরে সেই দেবতা-বিষয়ক সূক্তের পদ্যে অনুবাদ। দেববিবরণ লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সূক্ত অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

বঙ্গ-ভাষায় এই-প্রকার পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থ প্রকাশে একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইল। এজন্য আমরা গ্রন্থকর্ত্তৃদিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। সাধারণ পাঠক যে-সমুদায় বিষয় জানিবার জন্য ঋগ্বেদ পাঠ করিতে চাহেন, এই গ্রন্থে সে সমুদয়ই বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। যাঁহারা বৈদিক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইতে চাহেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে সমগ্র ঋগ্বেদ পাঠ করা সহজও নহে, এবং আবশ্যকও নহে। চারু-বাবুর 'প্রবেশক' ও দেব-বিবরণ এবং প্যারী-বাবুর অনুবাদ পাঠ করিলেই বেদবিষয়ে পাঠকগণের সাধারণ জ্ঞান হইবে।

গ্রন্থ নির্ভুল হয় নাই। চারু-বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন—"ইন্দ্রের নাম অবেস্তাতেও আছে; সেখানে ইনি অসুর, বৃত্রহন" (পৃঃ ৭৪)।

প্রকৃত কথা এই—অবস্তাতে অসুরই পূজ্য এবং দেবগণ ঘৃণা ও বিদ্বেষের বস্তু। ঋগ্বেদের প্রাচীনতম অংশে ঋষিগণ উপাস্য-দেবগণকে অনেক স্থলে 'অসুর' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশে এবং উত্তর কালে অসুরগণকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বস্তু বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ইন্দ্রই 'অসুরঘ্ন'। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঋগ্বেদেও কয়েকটি স্থলে ইন্দ্রকে অসুর বলা হইয়াছে (৩।৩৮।৪ ; ৮।৭৯।৬ বালখিল্যবাদে ১০।৯৬।১১ ; ১০।৯৯।১২)। অবস্তাতে কেবল দুইটি স্থলে ইন্দ্রের নাম পাওয়া যায় (বন্দীদাৎ ১০।৯ ; ১৯।৪৩)। এই উভয় স্থলেই ইন্দ্র একজন দেবতা এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের বস্তু। কিন্তু অবস্তাতে বৃত্রঘ্ন ('বেরেথ্রঘ্ন') অতি পূজনীয়। ইহার উদ্দেশে যত সম্পাদন করা হইত (যশ্‌ৎ ১৪)। অবস্তার ইন্দ্র অসুরও নহেন, বৃত্রঘ্নও নহেন।

কবি সূক্তানুবাদে কোন কোন স্থলে অসাবধান হইয়াছেন। যেমন দ্যাবাপৃথিবীর বন্দনাতে (১।১৮৫) দ্বিতীয় ঋকে অনুবাদ করা হইয়াছে—"পিতার কোলেতে" (পৃঃ ২০৮)। কিন্তু মূলে আছে "পিত্রোঃ উপস্থে"—ইহার অর্থ "মাতা-পিতার ক্রোড়ে"। ঐ অংশেরই পঞ্চম ঋকে 'যুবতী' 'স্বসারা' এই দুইটি কথা আছে সাধারণতঃ "যুবতী" অর্থ 'দুইজন যুবতি' এবং 'স্বসারা' অর্থ 'দুই ভগিনী'। প্যারীমোহন-বাবুও এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যুবতী=যুবক ও যুবতী ; স্বসারা—ভ্রাতা ও ভগিনী। একশেষ দ্বন্দ্বে এই-প্রকারে পদ সিদ্ধ হইতে পারে। এস্থলে দ্যৌ শব্দ পুংলিঙ্গ এবং পৃথিবী স্ত্রীলিঙ্গ; এইজন্যই এই-প্রকার অর্থ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। তবে এ-প্রকার অর্থ বিচারগম্য। সাধারণ পাঠকের উদ্দেশ্যে যে-কোন অনুবাদেই সিদ্ধ হইবে।

একটা সূক্তের অনুবাদ (১০।১৩৩) স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের তীর্থসলিল হইতে গৃহীত।

গ্রন্থের 'নিদর্শনী' ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপিনী ; ইহাতে পাঠকগণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

যে-সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিলে বৈদিকতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এই পুস্তকের "প্রমাণ-পঞ্জীতে" সে-সমুদায়ের নাম দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্ম ও সভ্যতার সাধারণ তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন। গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। আশা করি ইহার বিশেষ আদর হইবে।

মনুষ্যত্ব-লাভ—প্রণেতা শ্রী সত্যাশ্রয়ী। প্রকাশক শ্রী পঞ্চানন মিত্র, এম্-এ, পি-আর-এস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পৃঃ ২৩২ (৫½"×৩½")। মূল্য ১৷০।

পুস্তিকাতে এই-সমুদায় বিষয় আলোচিত হইয়াছে—

(১) আত্ম-পরিচয়ে বাহ্যভূমি। (২) আত্ম-পরিচয়ে অভ্যন্তর ভূমি। (৩) জীবন-যজ্ঞে পথ-নির্দ্দেশ। (৪) শিক্ষার্থী ও শিক্ষক। (৫) শিক্ষার্থী ও সংসর্গ। (৬) আদর্শ দর্শন।

শেষ অধ্যায়ে গৌতম-বুদ্ধ কবীর লুথার যীশু নিত্যানন্দ প্রভৃতি-

গ্রাম বিবেকানন্দ রাজা-রামমোহন ও হজরত মহম্মদ বিষয়ে দুই-একটি কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন ঘটনা ঐতিহাসিক নহে। তিনি লিখিয়াছেন – এই উক্তিটি যীশুর—'হে পিতঃ, এই অবোধেরা কি করিতেছে তাহা জানে না। আপনি 'ইহাদিগকে ক্ষমা করুন।' (পৃ ১৯০)। যাঁহারা বাইবেল-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ তাঁহারা সকলেই বলেন এই অংশ যীশুর উক্তি নহে; এই অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইংরেজী বাইবেলের নূতন সংস্করণেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।

গ্রন্থে এই-প্রকার আরও ভুল আছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

পাথরের দাম—শ্রী মাণিক ভট্টাচার্য্য, বি-এ, বি-টি, প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্—আট আনা সংস্করণ। আশ্বিন ১৩৩০।

মাণিক-বাবুর গল্পগুলির রচনা বেশ ঝরঝরে তকতকে। সকলেরই পড়িতে ভাল লাগিবে। বইখানির বাঁধাই এবং ছাপা খারাপ।

বেড়াল ঠাকুরঝি—শ্রী বিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রণীত। এম্, সি, সরকার এণ্ড্ সন্স্, ৯০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা। ১৩৩০।

রবীন্দ্রনাথ বইখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এগুলি…প্রতিদিনের ঘরকন্নার হাঁড়ি-কুঁড়ির অন্তরের কথা।… এই গল্পগুলির যে চেহারা পাওয়া যায় তাহার বিশেষ রস আছে এবং তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য।"

আমাদের দেশের রূপকথার সংখ্যা প্রচুর, কিন্তু তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বিভূতি-বাবু কতকগুলি রূপকথাকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। যদিও এই বইটি ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা, তবুও বুড়ারাও এ বইখানি পড়িয়া সুখ পাইবেন।

বইখানির ছাপা বাঁধাই এবং কাগজ সবই খুব চমৎকার হইয়াছে। বইখানির ছবিগুলিও বেশ হইয়াছে, তবে মাঝে মাঝে দু-একটি ছবি বড় অস্পষ্ট হইয়াছে। বইখানির বহুল প্রচার হইবে আশা করি। উপহার দিবার পক্ষে বইখানি খুব উপযোগী হইয়াছে।

গ্রন্থকীট

মরীচিকা—শ্রী খগেন্দ্রনাথ বসু, কাব্যবিনোদ প্রণীত। শ্রী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক দৌলতপুর হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ১০৩। মূল্য আট আনা। ১৩৩০।

ছোট গল্পের বই। বইখানিতে সাতটি ছোট গল্প আছে, যথা:—(১) প্রত্যাবর্ত্তন, (২) আমিনা, (৩) মৃত্যু-মিলন, (৪) কর্ত্তব্যের ডাক, (৫) হরিশ ডাক্তার, (৬) রক্তের লিখন, (৭) বিধবা। গল্প-গুলি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

পত্রাবলী (সচিত্র)—ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ হইতে স্বামী মহাদেবানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা। পৃঃ ১৩৩। ১৩২৯।

ঢাকার রামকৃষ্ণ মঠ স্বামী প্রেমানন্দের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজী সাধারণের আধ্যাত্মিক মঙ্গল-কামনায় তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণের নিকট যে-সকল পত্র লিখিয়াছেন, এই পুস্তকখানিতে সেই পত্রের কয়েকখানি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বইখানিতে অনেক উপদেশ-পূর্ণ কথা আছে।

স্বর্গীয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়-জীবনী—শ্রী রজনী-কান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। পৃঃ ৮৬। ১৩৩০।

স্বর্গীয় নীলরতন-বাবু নানাস্থানে শিক্ষকতা করিয়াছেন। তাঁহার জনৈক শিক্ষক-বন্ধু কর্ত্তৃক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। নীলরতন-বাবু চণ্ডীদাসের বহু অনাবিষ্কৃত পদাবলী আবিষ্কার ও সম্পাদন করিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।

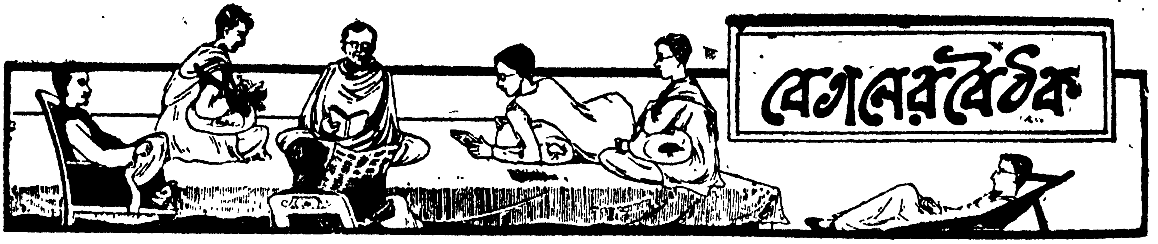
স্বাধীনতার স্বরূপ—শ্রী প্রিয়কুমার গোস্বামী প্রণীত। শ্রী হিমাংশুকুমার রায় কর্ত্তৃক ঢাকা সরস্বতী লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। পৃঃ ৯৯। মূল্য বারো আনা। ১৩৩০।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় socialism বা সার্ব্বজনীন সাম্য-সমাজের কোন সম্ভাবনা আছে কি না—গ্রন্থকার তাহাই আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা অতি সরল। পুস্তকখানি সাধারণের পক্ষে সুখবোধ্য হইয়াছে।

প্রভাত

মাদারিপুর পাব্লিক লাইব্রেরির ১৯২২-২৩ সালের কার্য্য বিবরণী।

ঢাকা বিভাগে যে তিনটি পুস্তকালয় সরকারী রিপোর্টে প্রশংসালাভ করিয়াছে। তাহার দুটি ঢাকানগরে অবস্থিত, এবং মাদারীপুর লাইব্রেরি তাহাদের অন্যতম। এই হিতকর অনুষ্ঠানটির অক্লান্তকর্ম্মা নীরব সেবক শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর সেন, বি-এল। লাই-ব্রেরির হলগৃহটি সুন্দর, তাহাতে বসিয়া পড়া শুনা করার সুবন্দোবস্ত আছে। এখানে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ে বক্তৃতা হইয়া থাকে, তাহাতে বেশ লোক-সমাগম হয়। আমাদের মফস্বলের রাজনৈতিক-আন্দোলন-মুখরিত আত্মসংস্কারপ্রয়াসবর্জ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমা-গুলিতে জ্ঞানার্জ্জনের এইরূপ কতকগুলি ছোট-খাট কেন্দ্র স্থাপিত হইলে ভিতর দিক্ হইতে সত্যকার জাতিগঠনের অনেকটা সহায়তা হয় সন্দেহ নাই।



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সেবিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের স্বেচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৭৬)

"উলুধ্বনি"

বাংলায় হিন্দুদের সমস্ত শুভ কার্য্যেই মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়া থাকে। বাংলা ভিন্ন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগের মধ্যে এই রীতি আছে কি না? উলুধ্বনি আর্য্যদের মধ্যে কোন্ যুগে কি উপলক্ষে প্রথম প্রচারিত হয়? পার্ব্বতীয়দের মধ্যে এই প্রথা আছে কি?

কুমারী বীণাপাণি রায়

(১৭৭)

ভীষ্মের মৃত্যু-তিথি

মহাভারতের যুদ্ধের সময় নিশ্চয়রূপে স্থির হয় নাই। ভীষ্মের মৃত্যু শুক্লাষ্টমীর দিন ধরা হয়। তিনি পতনের পর ৫৮ দিন বাঁচিয়াছিলেন, ৫৯তম দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ২৯ দিন ১২ ঘণ্টাতে এক চান্দ্র মাস হয়, অর্থাৎ ৫৯ দিনে পূর্ণ দুই মাস হয়। শুক্লাষ্টমীর দিন মৃত্যু হইলে দুই মাস পূর্ব্বে শুক্ল নবমীতে তাঁহার পতন হইয়াছিল। সে দিন যুদ্ধের দশম দিন ছিল। তাহার চার দিন পরে [যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে] রাত্রে যুদ্ধ হইয়াছিল। সেদিন শুক্লা ত্রয়োদশী হওয়া উচিত। কিন্তু সন্ধ্যার পর অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়া অর্জ্জুন সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রেই ঘুমাইতে বলিয়াছিলেন। ত্রিযামা রজনী গত হইলে চন্দ্রোদয় হইল ও যুদ্ধ আরম্ভ হইল। [দ্রোণপর্ব্ব। দ্রোণবধ-পর্ব্বাধ্যায়। ১৮৫ অধ্যায়] অতএব সেদিন কৃষ্ণাত্রয়োদশী ছিল। ভীষ্মের মৃত্যু শুক্লা অথবা কৃষ্ণাষ্টমী ঠিক জানিতে পারিলে অয়নগতি হিসাব করিয়া উত্তরায়ণের সময়, অতএব যুদ্ধের সময় পাওয়া যাইতে পারে। কোনও পাঠক অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্য করিলে বাধিত হইব।

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১৭৮)

ভারতের তামাক

ইতিহাসে জানা যায় ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সম্রাট্ আকবরের সময় ভারতবর্ষে তামাক আমদানী হয়। হিন্দুরা শবদাহের পর চিতার উপর তামাক সাজাইয়া দিয়া থাকে। দেওয়ার কারণ কি? ইহা কি শাস্ত্রানুমোদিত বা লোকাচার? কোন্ সময় হইতে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে এরূপ প্রথা আছে কি না?

শ্রী যতীন্দ্রচন্দ্র দেবরায়

(১৭৯)

নদীর উৎপত্তি-ক্ষেত্র

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধু এই-সকল নদনদীর উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে কোথায় প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়?

শ্রী সত্যভূষণ সেন

(১৮০)

রাজসাহীর বিদ্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণ

ষ্টুয়ার্ট কৃত বাঙ্গলার ইতিহাসে মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালে রাজসাহীর বিদ্রোহী জমিদার উদয়নারায়ণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পরে ইনি পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন এবং তাঁহার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া নাটোরের রাজা রামজীবনকে দেওয়া হয়। এই উদয়নারায়ণের রাজধানী কোথায় ছিল? পুঁঠিয়া অথবা তাহেরপুরের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল কি? প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখ করিলে বাধিত হইব।

যতীশচন্দ্র বাগচী

(১৮১)

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোডে নদী

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড দিয়া পেশোয়ার যাইতে হইলে পথে কি কি নদী পড়ে? নদীগুলির নাম কি এবং সে-গুলিতে সেতু আছে কি না?

শ্রী আশুতোষ দত্ত

মীমাংসা

(১৬০)

খড়ীমাটী

Dehri Rohtas Light Railwayএর তিলথু নামক ষ্টেশনের সম্মুখস্থ পাহাড়ের কোন অংশে প্রচুর পরিমাণে খড়ীমাটী পাওয়া যায়।

শ্রী কুমুদকুমার সাধু

(১৬৬)

চৈতন্যচরিতামৃতে একাদশীপ্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পৌষ মাসের প্রবাসীতে কোন প্রশ্নকর্ত্তা যে-সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। মূল চৈতন্যচরিতামৃতে ব্যাপারটি এই ভাবে লিখিত হইয়াছে।

একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম।
প্রভু কহে মাতা মোরে দেহ এক দান॥
মাতা কহে তাহা দিব যে তুমি মাগিবা।
প্রভু কহে একাদশী অন্ন না খাইবা॥
শচী বোলে না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হইতে একাদশী করিতে লাগিলা॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই ঘটনার উপর 'তৎকালে নবদ্বীপের ন্যায় স্মার্ত্তপ্রধান স্থানে বিধবাগণ একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতেন কি না' ইত্যাদি প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ, শচীদেবী তখন আদৌ বিধবা নহেন, জগন্নাথ (পুরন্দর) মিশ্র তখনও জীবিত। উপরি-উদ্ধৃত অংশের পরবর্ত্তী অংশ পাঠ করিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। উপরি উদ্ধৃত অংশের ঠিক্ অব্যবহিত পরেই এইরূপ লেখা আছে—

তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা লাগি বিভা দিতে মিশ্রের হইল মন॥
বিশ্বরূপ শুনি ঘর হইতে পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা॥
শুনি মিশ্র পুরন্দর দুঃখী হইল মন।
তবে পিতামাতার যে কৈল আশ্বাসন॥ ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যায়।

এই-সমস্ত ঘটনার বহুদিন পর—
"কথোদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, ১৫শ অধ্যায়।

মিশ্র যে বিশ্বরূপের সন্ন্যাস করিবার পরও জীবিত ছিলেন তাহা 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল', 'অমিয়নিমাইচরিত' প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব গ্রন্থেই উক্ত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে সে-সকল উদ্ধৃত করিলাম না। আলোচ্য ঘটনা বিশ্বরূপের সন্ন্যাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, কাজেই জগন্নাথ যে সে সময়ে জীবিত ছিলেন এবং শচীদেবী তখনও বিধবা হন নাই ইহা ধ্রুব। চৈতন্যদেব তাঁহার মাতার সধবা অবস্থাতেই তাঁহাকে অন্ন খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে একাদশীতে যে তখন উপবাস প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব একাদশীর দিনে জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতের বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করিতে চাহিয়া বলিতেছেন—

একাদশী উপবাস ত্যজিল দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

পুরুষগণ যে সময়ে একাদশীর উপবাস করিতেন তখন বিধবাগণ করিতেন না, ইহা অবিশ্বাস্য। তাহার পর আরও কথা আছে।—বিপ্রদ্বয় নিমাইয়ের এই অদ্ভুত যাচ্ঞায় কহিতেছেন—

(দুই বিপ্র বোলে) মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমনে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর।
কেমনে বা জানিল নৈবেদ্য বহুতর॥ ইত্যাদি

শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়।

'শ্রীহরিবাসর' কথাটি ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। কেবল যে এই বিপ্রদ্বয়ই একাদশীর উপবাস করিতেন তাহা নহে—একাদশীর দিন সর্ব্বসাধারণের জন্যই "শ্রীহরিবাসরের" ব্যবস্থা ছিল এইরূপই অর্থবোধ হইতেছে। যাহাই হউক "চৈতন্যচরিতামৃতের" উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে তৎকালে বিধবাগণের একাদশীতে অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই মনে আসিতে পারে না। পরন্তু যে কালে একাদশীতে পুরুষগণের পক্ষেও "শ্রীহরিবাসরের" ব্যবস্থা ছিল সে সময়ে বিধবাগণও যে উপবাস-ব্রত পালন করিতেন, ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান। বলা বাহুল্য 'শ্রীহরিবাসর' কথাটির বাংলা ইডিয়ম্ অনুযায়ী অর্থ 'উপবাস'।

শ্রী তারাপদ লাহিড়ী

শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার মাতাকে যখন একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মাতা শচীদেবী "বিধবা" ছিলেন না। উক্ত ঘটনা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের নয় বৎসর বয়সে উপনয়নের সময় ঘটে, জগন্নাথ মিশ্র তখন শুধু জীবিতই ছিলেন না—স্বয়ং আচার্য্য হইয়া পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী-মন্ত্র দিয়াছিলেন। উপনয়নের কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পর জগন্নাথমিশ্রের মৃত্যু হয়। ঐ সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব "নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতও ছিলেন" না—কারণ, দুই বৎসর পর পিতৃহীন অবস্থায় তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ পড়া আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। নয় বৎসর বয়সে তাঁহার পড়াশুনাতে বরং নানারূপ অমনোযোগিতার কথাই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মুরারি-গুপ্তের করচা, অমিয় নিমাইচরিত ও Lord Gouranga দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার সধবা মাতাকেই একাদশীতে অন্নগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন—কারণ একাদশীতে উপবাস করা হিন্দু-শাস্ত্রমতে একটি সাত্ত্বিক লক্ষণ। সধবা, বিধবা, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী সকলকেই শাস্ত্র একাদশীতে উপবাস করিতে আদেশ করিতেছেন, শচীদেবী সধবা অবস্থাতেই একাদশীতে উপবাস করিতে আরম্ভ করিলেন—বহু সধবাই তখন এইরূপ করিতেন।

ভৃগু-ভানু-দিনোপেতা সূর্য্যসংক্রান্তি-সংযুতা।
একাদশী সদা পোষ্যা পুত্র-পৌত্র-বিবর্দ্ধিনী।

—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নিস্ তথৈব চ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োর্ উভয়োর্ অপি॥

—আগ্নেয়ে।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশের পুরুষদিগকে আর একাদশীতে বাধ্যতামূলক উপবাস করিতে হয় না—কেবল উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাকেই বাধ্যতা-মূলক উপবাস করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্থানেই উপবাসে অশক্ত হইলে রাত্রিতে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা আছে। বরেন্দ্রভূমিতে

শ্রীহট্টে ও আসামের কয়েকটি স্থানে শিশু বিধবাই হউক আর বৃদ্ধ বিধবাই হউক সকলকেই নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টেও শাস্ত্রীয় উপদেশের সম্মান রক্ষিত ছিল। "রত্নমালিকা" নামক গ্রন্থের হস্ত-লিখিত পুরাতন পুঁথিতে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্র, রোগী ক্ষীণাঙ্গী ও অন্যান্য কারণে অসমর্থ ব্যক্তিকে একাদশীতে উপবাস করিতে নিষেধ করিয়া ফল মূল দুগ্ধ জল প্রভৃতি গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন, যথা—"অশক্তং প্রতি নারদীয়ে। অনুকল্পো নৃণাং প্রোক্তঃ ক্ষীণিনাং বরবর্ণিনি।"—বায়ুপুরাণ। উপবাস-নিষেধে তু কিঞ্চিদ্‌ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ। ন দুষ্যেদ্ উপবাসেন উপবাসফলং লভেৎ। উপবাস-নিষেধাসমর্থয়োর ভক্ষ্যপ্রকারম্ আহ নারদীয়ম্। মূলং ফলং পয়স্ তোয়ম্ উপভোগ্যং ভবেচ্ ছুভম্ ন ত্বেবং ভোজনং কৈশ্চিদ্ একাদশ্যাং প্রকীর্ত্তিতম্।"

—রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বম্।

অন্যদিকে অশক্ত-পক্ষে রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজনের ব্যবস্থাও শাস্ত্র দিতেছেন। তবে সে হবিষ্যান্ন তুলসী-সংযুক্ত হওয়া চাই, যথা—

"বায়ু পুরাণে। নক্তং হবিষ্যান্নম্ অনোদনম্ বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরম্ অথাম্বু চ আজ্যং। যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্তম্ অত্রোত্তরম্ উত্তরঞ্চ। ফলাহারাদাবাপি তুলসী-রহিতত্বে দোষম্ আহ গরুড়পুরাণম্।"

—রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বম্।

একাদশীর উপবাসে অশক্ত হইলে যে হবিষ্যান্ন করার ব্যবস্থা আছে স্মৃতিশাস্ত্রে তাহার একটি দফা আছে, যথা—

"হবিষ্যান্নম্ আহ স্মৃতিঃ। হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যম্ মুদ্গাস্ তিলা যবাঃ। কলায়কঙ্গু নিবারা বাস্তুকং হিলমোচিকা। ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈন্ধব সামুদ্রে গব্যে চ দধি সর্পিষী। পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্র হরিতকী। তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী। কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্যগুড়ম্ ঐক্ষবং। অতৈলপকং মুনয়ো হবিষ্যান্নং বিদুর্ বুধাঃ॥"

—রঘুনন্দনকৃত তিথিতত্ত্বম্।

শুষ্ককণ্ঠ, মৃতপ্রায়, অশক্ত বালবিধবা ও অশীতিপর বৃদ্ধা বিধবাকে একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতে হইবে ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের ত্রিসীমাতেও নাই। শ্রীহট্ট, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, প্রভৃতি অঞ্চলে উহা একরূপ দেশাচার হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "একাদশী" এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে এ বিষয় সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য

শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৬৭)

ইলেক্‌ট্রিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ারিং

কলিকাতার মাণিকতলায় মুরারীপুকুর রোডে বেঙ্গল টেক্‌নিকেল ইন্‌স্টিটিউটে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার পাঠক্রম (course) বেশ উচ্চ ও সুদক্ষ অধ্যাপকগণ অতি যত্নের সহিত ছাত্রদিগকে শিখাইয়া থাকেন। বিলাতের ও আমেরিকার কলেজের কোর্স্ এখানে পড়ান হয়, তবে কোন ফলিত তড়িৎবিজ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয় পড়ান হয় না। কলেজ এখন অস্থায়ীভাবে এখানে আছে, খুব সম্ভব এই গরমের সময় যাদবপুরে যাইবে। সেখানে হাতে-কলমে শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটির প্রবেশিকা অথবা তাহার অনুরূপ কোন পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান থাকিলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হওয়া যায়। বিশেষ বিবরণ কলেজে পাওয়া যায়।

শ্রী মণিভূষণ মজুমদার

(১৭১)

প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য

প্রিভি কাউন্সিলের প্রথম ভারতীয় সভ্য রাইট্ অনারেবল্ সৈয়দ আমীর আলী। ইনি বাঙ্গালী মুসলমান। কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী বর্ত্তমানে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারপতির কার্য্য করিতেছেন।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

(১৭২)

বৃহত্তম পুস্তকালয়

ফ্রান্স্ দেশের পারী নগরে বিব্লিওতেক্ নাৎশিওনাল নামক পুস্তকালয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পঁয়ত্রিশ লক্ষ পুস্তক ও এক লক্ষ বিশ হাজার হস্তলিখিত গ্রন্থাদি ঐ পুস্তকালয়ে ছিল। ২১ জন ইংরেজ অধ্যাপকের মুখে শুনেছি ইংলণ্ডের ব্লুমসবেরী নগরে মণ্টেন্ হাউসে অবস্থিত ব্রিটিশ মিউজিয়াম পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত দুই পুস্তকালয়ই তাঁরা দেখেছেন। তাঁরা বলেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অনেক ছোট ছোট এক-এক বিষয়ের পুস্তক একত্রে বাঁধিয়ে খরচ কমান হয়েছে বলে' বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের উপর ছিল না। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ভারতের শ্রেষ্ঠ পুস্তকালয়।

শ্রী মৃণ্ময়গোপাল দত্ত

ভারতের মধ্যে তাঞ্জোরের গ্রন্থাগার এবং বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে প্রায় ২ লক্ষ মুদ্রিত পুস্তক ও ১৩৫০ খানি পুঁথি আছে।

গচিহাটা পাব্লিক-লাইব্রেরীর সভ্যগণ

—

ভ্রম-সংশোধন

পৌষ মাসের প্রবাসীর ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ১৪৭ নং প্রশ্নের উত্তরে "উদরের 'ডান' পার্শ্বে" স্থলে উদরের 'বাম' পার্শ্বে হইবে এবং "'বাম' পার্শ্বে যকৃত অবস্থিত" স্থলে 'ডান' পার্শ্বে যকৃত অবস্থিত হইবে।



বাংলা

বাংলার হিন্দু কৃষক কোথায় গেল ?—

১৯২১ সালের হিসাব অনুসারে দেখা যায় বাঙ্গলার জনসংখ্যা ৪,৭০৫.৪২, ৬২ ; তন্মধ্যে হিন্দু ২,০৮,০৯১৪৮, মুসলমান ২৫৪,৮৬,১২৪। বাঙ্গলার কৃষকসংখ্যা ৩,০৫,৪৩,৫৭৭। তন্মধ্যে হিন্দু ১,০১,৭৯,৫০৫, মুসলমান ১,৯৭,২১,৮৫১। ১৯১১ সালের হিসাবে দেখা যায় বাঙ্গলার কৃষকসংখ্যা ছিল ২৯৭৪৮৬৬৬ ; তন্মধ্যে হিন্দু ১০৪৫০২৫৮, মুসলমান ১৮৭১৯৬৯। দশ বৎসরে হিন্দু-কৃষকের সংখ্যা ২৭০৭৫৩ কম হইয়াছে। কিন্তু দশ বৎসরে মুসলমান কৃষকের সংখ্যা ১০০২১৫৯ বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালার হিন্দুদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু-কৃষক কমিল কেন এবং মুসলমান কৃষক বাড়িল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কি আবশ্যক মনে করেন না ?

হিন্দু কৃষকের সংখ্যা কমিল কেন তাহার কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি।

(১) হিন্দু-কৃষক অনেকেই বিবাহ করিতে পারে না ; পণ না দিলে কন্যা পাওয়া যায় না ; টাকার অভাবে অনেকেই অবিবাহিত থাকে ; সুতরাং তাহাদের বংশ লোপ পাইতেছে।

(২) হিন্দুর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলন নাই। প্রৌঢ় বয়সে যাহারা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে তাহারা ৮।১০ বৎসরের কন্যা বিবাহ করে ; সন্তান হওয়ার পুর্ব্বেই স্ত্রীকে বিধবা করিয়া পরলোক যাত্রা করে। সুতরাং যাহারা বিবাহ করিতে পারে, তাহারাও বংশ বৃদ্ধি করিতে পারে না।

(৩) যদি বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিত, তবে প্রৌঢ় বয়সে কৃষকেরা বিধবার পাণিগ্রহণ করিতে পারিত এবং পুত্র কন্যা রাখিয়া এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পারিত।

(৪) বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকিলে কন্যাপণ উঠিয়া যাইত ; সুতরাং কৃষকদের বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইত না।

বঙ্গের হিন্দু-কৃষকদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধি করিতে হয়, তবে অবিলম্বে বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে সকলের দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া উচিত।

(৫) হিন্দু কৃষকেরা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় না। হিন্দু-কৃষকদের অনেকেরই গাভী নাই ; সুতরাং দুধ, দই, ঘি খাইতে পায় না। অপর দিকে প্রায় সমস্ত মুসলমান-কৃষক গাভী পালন করে। গৃহজাত দুধের কিয়দংশ বিক্রয় করে, অপরাংশ নিজেরা পান করিয়া থাকে। মুসলমানেরা দিবসের কার্য্য অবসানে মাছ ধরে, হিন্দু প্রায়ই তাহা করে না। মুসলমান পুষ্টিকর মাংসাদি আহার করে, হিন্দুর তাহার সুবিধা নাই। সুতরাং হিন্দু-কৃষক দুর্ব্বল, মুসলমান সবল। মুসলমান সবল দেহ লইয়া যেরূপ উৎকৃষ্ট চাষ করিতে পারে, হিন্দু দুর্ব্বল দেহে তাহা পারে না। কাজেই মুসলমান-কৃষকের যেরূপ আয় হিন্দুর সেরূপ নয়। দরিদ্রতা হিন্দুকৃষকধ্বংসের আর-এক কারণ।

(৬) হিন্দু-কৃষক পুরুষানুক্রমে একই বাড়ীতে বাস করে, বহু-কালের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা ও বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গল তাহার আবাস-ভূমিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে। অধিকাংশ মুসলমান-কৃষক এক বাড়ীতে বহুদিন থাকে না। তাহাদের বাড়ীতে বৃক্ষাদিও বেশী নাই। তাহারা সচরাচর নদীর নূতন চরে যাইয়া বসতি স্থাপন করে। সুতরাং তাহাদের দেহ হিন্দুকৃষকের মত শীঘ্রই জরাজীর্ণ হয় না।

(৭) হিন্দু-কৃষক তাহার দুর্ব্বল দেহে এক বিঘা জমিতে যত শস্য উৎপাদন করে, মুসলমান-কৃষক তদপেক্ষা বেশী উৎপাদন করিয়া থাকে, সুতরাং কৃষিকার্য্যে মুসলমানের যত লাভ হয়, হিন্দুর তত হয় না। হাটবাজারে হিন্দু যে মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতে চায়, মুসলমান তাহা অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রতি-যোগিতায় হিন্দু হারিয়া যাইতেছে ; সুতরাং বাধ্য হইয়া অনেক হিন্দু-কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিতেছে।

হিন্দু-কৃষক লোপ হওয়ার কতকগুলি কারণ উল্লেখ করিলাম। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কারণ আছে। হিন্দু-কৃষকের সংখ্যা হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ যে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলন না করিলে বাংলা দেশে যে হিন্দু-কৃষকের চিহ্নমাত্র থাকিবে না এতদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যদি হিন্দু-কৃষক রক্ষা করা উচিত মনে হয়, তবে বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যগণ আর কালবিলম্ব না করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে আরম্ভ করুন। —সঞ্জীবনী

জাতি অনুযায়ী শিক্ষা—

৫ হইতে উর্দ্ধ বয়স্ক প্রতি সহস্র স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতদের জাতি ও সংখ্যা :—

বৈদ্য ৬৬২, আগরওয়ালা (কলিকাতা) ৫৪২, ব্রাহ্মণ ৪৮৪, কায়স্থ ৪১২, সুবর্ণ-বণিক্ ৩৮৩, গন্ধ-বণিক্ ৩৪৪, সাহা ৩৪২, ভারতবাসী খৃষ্টান ২৮৮, বারুই ২২৯, তেলি ২২৫, কামার ২০২, সদ্‌গোপ ২০০, সুঁড়ি ১৮৮, যুগী ১৭৬, তাঁতি ১৬৮, নাপিত ১৫২, কলু ১৫২, বৈষ্ণব ১৪২, পোদ ১৩৮, শূদ্র ১৩৭, চাষী কৈবর্ত্ত ১৩১, সূত্রধর ১২১, গোয়ালা ১১৯, কুমার ১১৬, কাপালী ১১৫, টিপরাই ৯১, মগ ৮৯, ধোবা ৮৮, নমঃশূদ্র ৮৫, পাটনী ৭০, জালী কৈবর্ত্ত ৬৮, রাজবংশী ৬৫, নিকারী ৬২, চাকমা ৫৮, সেখ ৫৭, টিয়র ৫৪, জোলা ৫২, ভুঁইমালী ৫১, মালো ৪৮, কোচ ৩৮, চামার ৩৫, কুলু ৩৪, বাগ্‌দী ২৪, ভুঁইয়া ২৪, মুচী ২২, বাউরী ৭, সাঁওতাল ৫।

৫ হইতে উর্দ্ধ-বয়স্ক এক সহস্র পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা (হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি)—

সাল	১৯০১	১৯১১	১৯২১
পশ্চিমবঙ্গ (বর্দ্ধমান বিভাগ)	২১৪	২১৬	২৩০

মধ্যবঙ্গ (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)	১৭৮	২০৩	২৩২
উত্তর বঙ্গ (রাজসাহী ও কুচবিহার বিভাগ)	৫৯	১১১	১৩৪
পূর্ব্ববঙ্গ (ঢাকা বিভাগ)	১২১	১৩৬	১৫৪
চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ত্রিপুরা রাজ্য	১৩৬	১৪২	১৬৯
সমগ্র বঙ্গ	১৪৭	১৬১	১৮২

শিক্ষার বিস্তৃতি

বয়স ৫ হইতে ঊর্দ্ধে।

১৯০১-১৯১১	১৯১১-১৯২১
শতকরা ১ জন বৃদ্ধি	শতকরা ৬ জন বৃদ্ধি
„ ১৫ „	„ ১৪ „
„ ১৭ „	„ ২১ „
„ ১২ „	„ ১৩ „
„ ১২ „	„ ১১ „
„ ৯ „	„ ১৩ „

—সঞ্জীবনী—যশোহর

"নিম্ন" জাতির সংখ্যা হ্রাস—

হিন্দু সমাজের বহু নিম্ন জাতি ও অনুন্নত জাতি কিরূপভাবে ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে, আমরা তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি

জাতির নাম	১৯১১-২১	১৯০১-১১	১৯০১-২১
বাগ্‌দী	—১১·৮	—০·০	—১১·৯
বারুই	৪·৩	৮ ৮	১৩·৫
বাউরী	—৩·৪	১·২	—২·২
ভুঁইমালী	—১০·৯	৩·০	—৮ ২
ভুঁইয়া	—১২·৮	৩৮·৯	২১·১
মজ	—১২·৩	৭·৭	—৫·৫
চাষাধোবা	—৭৭·৪	৯৫ ৩	—৫৫ ৮
ধোবা	—০·৩	১·৬	১·৪
ডোম	—১৩·৬	—৬·৮	—২৪ ৮
দোসাধ	—১২·৫	৪৭ ৯	২৯·৪
গোয়ালা	—৯·৭	১·১	—৮·৫
হাড়ি	—১৪·৩	—৩·৮	—১৭·৭
যুগী	১·৩	৫ ৩	৬·৮
চাষী কৈবর্ত্ত	৩·৪	৯·৫	১৩·২
জেলে কৈবর্ত্ত	১৭·৬	২৩·১	৪৪·৮
কলু	—১৪·০	—২·৫	—১৬·২
কপালী	—২·৯	—৭·৫	১০·৬
কুমার	—২·১	৪·২	২·০
কুর্ম্মী	২·৬	১৪·৮	১৭ ৯
মালাকার	—১০·৬	৯·২	—২·৪
ময়রা	—৩·৮	—১·৩	—৫·১
মুচি	—৮·৩	৯ ৩	০·৩
নাপিত	—০·৭	৩·৬	২·৮
পাটনী	—৩০·৭	০·১	৩০·৬
পোদ	৯·৭	১৫·৫	২১·৬
সদ্‌গোপ	—৩·১	—১·৬	—৪·৬
সাঁওতাল	—৪·২	৯·৯	৫·২
সোণার (স্বর্ণকার)	—১৬·৫	—৫·৪	—২১·০
শূদ্র	—৩৪·১	—১৯·৯	—৪৭ ২
সূত্রধর	—৫·৬	৪·৩	—০·৯
তাম্বুলী	—৫·৪	—৭·৬	—১২·৬
তাঁতি	—১·০	৩·২	২·১
তেলি ও তিলি	—১৪· ১	৩·৮	—২·০
তিয়র	—১৮ ৪	০·৮	—১৭·৭

এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি নিম্নবর্ণের হিন্দু জাতি তাহাদের প্রধান প্রধান বাসভূমিতে কেমন ভাবে কমিয়াছে দেখুন—

জাতির নাম	বাসস্থান	শতকরা হ্রাস ১৯০১—২১
আগুরী	বর্দ্ধমান-বাঁকুড়া-হাওড়া	—১৩·৬
চাঁই	মুর্শিদাবাদ-মালদহ-রাজসাহী	—৯·৪
চাসাতী	মালদহ	—৩৩·৩
ধানুক	মুর্শিদাবাদ মালদহ	—২০ ৯
গঙ্গাই	মালদহ দিনাজপুর	—৭·০
হদি	ময়মনসিংহ	—১৪·৫
হাজঙ্	ঐ	—১০·০
কন্দরা	মেদিনীপুর	—৮ ২
কান্তা	ঐ	—৫৬·৬
খেন	দিনাজপুর-জলপাইগুড়ি-রঙ্গপুর	—১২·৩
কোনাই	বীরভূম	—১·৬
কোড়া	বর্দ্ধমান-বীরভূম-বাঁকুড়া	—২১·০
কোটাল	বর্দ্ধমান	—১.৬
মেচ	জলপাইগুড়ি	—৫১·৮
নাগর	মালদহ	—১৫·৬
নায়ক	বাঁকুড়া-মেদিনীপুর	—৬২·২
পুণ্ডরী	বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-মালদহ	—৪০·৪
রাজু	মেদিনীপুর	—১১·৭
সীমান্ত	বাঁকুড়া	—৯৫·৪

—আনন্দবাজার-পত্রিকা

নারীর স্বাবলম্বনের উপায়—

"বঙ্গনারী"-সম্পাদিকা শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার লিখিতেছেন—

আজকাল প্রায় সকল নারীই বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে জানেন, কিন্তু সেই-প্রকার লেখা-পড়ায় উপার্জ্জনের কোনও সুযোগ ছিল না। সম্প্রতি ২৫ নং বাদুড়বাগান লেনের নারী-শিল্পাশ্রমে এই শ্রেণীর নারীদিগকে কম্পোজিটারী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৩ মাস শিক্ষা করিলেই কাজ করিতে পারা যাইবে। যে-সকল নারী কাজ শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েকটিকে উপযুক্ত বেতন দিয়া "বঙ্গনারী"-প্রেসে গ্রহণ করা হইবে।

যিনি কাজ করিতে ইচ্ছা করেন, নিজে আসিয়া সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

—ত্রিপুরা-হিতৈষী

কলিকাতার পুরুষ ও নারী—

কলিকাতা সহরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যার অনুপাত অত্যন্ত অস্বাভাবিক। খাস কলিকাতার প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় মাত্র

৪৭০ জন স্ত্রীলোক, হাওড়াতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫২০ জন স্ত্রীলোক এবং ২৪-পরগণা ও সহরতলীতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৬১৪ জন স্ত্রীলোক। বাঙ্গলার মফঃস্বল সহরে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৮১৬ জন। যে-সমস্ত মফঃস্বল সহরে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্র বা কল-কারখানা আছে, সেই-সব স্থানে আবার স্ত্রীলোকের সংখ্যা কলিকাতা সহরের মতই কম,—প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৫৩৭ জন। টিটাগড়, কাঁচড়াপাড়া, বজবজ প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৪৩৬ হইতে ৪৪০ জনের মধ্যে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বাঙ্গলার স্ত্রীলোকেরা, যে-কোন কারণেই হোক, অধিকাংশই গ্রামে বাস করে; সহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে বা কল-কার্‌খানার কাজে এখনও এদেশে স্ত্রী-মজুরের আমদানী, পাশ্চাত্য দেশের মত হয় নাই।

স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা তুলনা করিতে গিয়া আর-একটা ব্যাপার চোখে পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রায় সর্ব্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। ইউরোপে যুদ্ধের পর অবশ্য স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বেশী বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও ঐ-সব দেশে পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যাই বেশী ছিল। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে তাহার বিপরীত অবস্থা। এমন কি ৪০।৫০ বৎসরের সেন্সাস্ তুলনা করিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালা সহরে ও মফঃস্বলে স্ত্রী-সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বাড়িতেছে না, কমের দিকেই যাইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে ব্যাপারটি অনেকটা বুঝা যাইবে—

প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা

	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৮৯১
কলিকাতা সহর	৪৭০	৪৭৫	৫০৭	৫২৬
২৪-পরগণা ও সহরতলী	৬১৪	৬৫৬	৬৮০	৭৭২
হাওড়া	৫২০	৫৬২	৫৭৭	৬৫৪
মফঃস্বলের ব্যবসা				
বা কল-কারখানা সহর	৫৩৭	৫৮২	৬০৫	৬৮৫
সাধারণ মফঃস্বল সহর	৮১৬	৮৪১	৮৬৯	৯০৩
সমগ্র বঙ্গ	৯৩৪	৯৪৫	৯৬০	৯৭৩

(১৮৮১ সালে সমগ্র বঙ্গের স্ত্রী-সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ৯৯৪ জন ও ১৮৭২ সালে ৯৯২ জন ছিল।)

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পুরুষের তুলনায় স্ত্রী-সংখ্যা কমিতেছে। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইহা কোন জাতির পক্ষে সুলক্ষণ নহে। উন্নতিশীল জাতিদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র স্ত্রী-সংখ্যা বেশী দেখা যায়। আমাদের দেশে ইহার ব্যতিক্রম জাতির জীবনী-শক্তির অভাব সূচনা করিতেছে।

এই সঙ্গে আর-একটি ব্যাপারও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিলেও, ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। হিন্দু-স্ত্রীলোকদের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে দেখা যায়। বিগত দশ বৎসরে ২০ হইতে ২৫—এই বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা (প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায়) ৩৬৬ হইতে ৩৮৫ বাড়িয়াছে, ২৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়সে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৩৫ হইতে ৩৬৭ বাড়িয়াছে এবং ৩০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৩৫৭ হইতে ৩৬৯ বাড়িয়াছে। ফিরিঙ্গী বা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও স্ত্রী-সংখ্যা কিছু বাড়িয়াছে। সহরের উত্তরাঞ্চলে শ্যামপুকুর, কুমারটুলি জোড়াবাগান এবং জোড়া-সাঁকো অঞ্চলে হিন্দু-স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে; অন্যদিকে পার্ক ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া টেরেস এবং কলিঙ্গবাজারে ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোকের সংখ্যা বাড়িয়াছে।

উপরে যাহা দেখাইলাম, তাহার রহস্য বুঝিতে হইলে আর-একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। যে সহরে পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত কম, সেখানে দুর্নীতি ও বেশ্যা-বৃত্তির আধিক্য হইবেই। সমস্ত কলিকাতা সহরে ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ৪৯৮১১৩ বা ৫ লক্ষ জন; তার মধ্যে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ১০৩৩৯৭ জন বা ১ লক্ষের কিছু উপরে! ইহাদের মধ্যে, কলিকাতায় ৮৮৭৭, সহরতলীতে ৬৪১ এবং হাওড়ায় ১২৯৬ জন স্ত্রীলোকের নাম প্রকাশ্য বেশ্যা বলিয়া লেখা হইয়াছে। বাদবাকী কত স্ত্রীলোক যে "অপ্রকাশ্য, বেশ্যা", বা "হাফ্ গেরস্ত", তাহা অনুমানেই বুঝা যায়। ধরিতে গেলে সহরে প্রকৃতপক্ষে বেশ্যার সংখ্যা প্রতি ১৮ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে ১ জন। এক সম্প্রদায়ের লোক "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়; ইহাদের স্ত্রীলোকের অনেকেই বেশ্যাবৃত্তি করিয়া জীবনধারণ করে। কলিকাতা সহরে 'জাত-বৈষ্ণবদের' মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১১৫৯ জন ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের 'জাত বৈষ্ণব' স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১১৭০ জন এবং ৪০এর উপরে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় ১৪৫৮ জন। এই-সমস্ত অধিকবয়স্কা 'জাত বৈষ্ণব' স্ত্রীলোকগণই ঝি, পানওয়ালী, 'বাড়ীওয়ালী' প্রভৃতির ব্যবসা করে। ফিরিঙ্গীদের মধ্যেও পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশী দেখা যায়। যাঁহারা কলিঙ্গবাজার প্রভৃতি অঞ্চলের খবর রাখেন, তাঁহারা ইহার রহস্য বুঝিতে পারিবেন। —আনন্দবাজার-পত্রিকা

কালাজ্বরের অত্যাচার—

ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এখন একমাত্র পল্লীগ্রামে নিবদ্ধ নহে, কলিকাতায়ও কালাজ্বর দেখা দিয়াছে। ১৯২২ সালে কলিকাতায় ৬০০০ লোক কালাজ্বরে ভুগিতেছে বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণকে জানাইয়াছেন। সরকার আশঙ্কা করেন যে ইহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিলে আগামী ৫।৬ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার লোকসংখ্যা শতকরা ৬০ হইতে ৮০ জন কালাজ্বরে আক্রান্ত হইবে।

এখন বঙ্গদেশে প্রায় ২।৩ লক্ষের পর রোগী কালাজ্বরে ভুগিতেছে। ১৫টি জেলার জেলাবোর্ড্ কালাজ্বর চিকিৎসার জন্য বিশেষ কেন্দ্র খুলিয়াছে। ত্রিপুরা ৮, ফরিদপুর ১৫, মালদহ ৮ এবং রাজসাহীতে ১২টি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বঙ্গদেশে (কলিকাতার বাহিরে) প্রায় ৯০০ চিকিৎসালয় আছে, সমস্তগুলিতেই কালাজ্বরের কেন্দ্র হইতে পারে। এবৎসর গবর্ণমেণ্ট্ কালাজ্বর নিবারণ কল্পে দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিবেন বলিয়া প্রকাশ। যথায় জীবন-মরণ-সমস্যা তথায় গবর্ণমেণ্ট এত কার্পণ্য প্রকাশ করিতেছেন কেন? —যশোহর

দান ও সদনুষ্ঠান—

স্যার সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভারতের টেরিটোরিয়াল ফোর্সে এক লক্ষ এবং ছাত্রগণের দৈহিক উন্নতি সাধন কল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আর এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।—যশোহর

অনাথ-আশ্রমে দান।—কলিকাতার মুসলমান অনাথ-আশ্রমের সাহায্যকল্পে নিজাম ১০০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

মহিষাদলের রাজার দান।—মেদিনীপুর কলেজের বাটী নির্ম্মাণ

ফণ্ডে মহিষাদলের রাজা পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকায় বি-এস-সি শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি রাখিবার ঘর নির্ম্মিত হইবে।—সম্মিলনী

তমলুকে বয়ন-বিদ্যালয়।—তমলুক হ্যামিল্টন্ হাই স্কুলের সহিত একটি বয়ন-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। তমলুকের ভূতপূর্ব্ব সবডিবিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মজুমদার ইহার উন্নতি-কল্পে ৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সবডিবিশনাল অফিসার শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত মহাশয়ও ৪৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। জেলাবোর্ড হইতে মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য পাইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।—নীহার

সদনুষ্ঠান।—সম্প্রতি কালীঘাটে ৺কালীমাতার মন্দিরের সন্নিকটে একটি ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণের জন্য স্যার শ্রীযুক্ত হরিরাম গোয়েন্কা পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি টাকাটা কলিকাতা কর্পোরেশনে জমা দিয়াছেন।—২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর এক শাখা পাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার হিতসাধন মণ্ডলীর সুযোগ্য সম্পাদক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র পাবনা গমন করিয়া তথায় জনহিতকর কার্য্যে সাধারণের উৎসাহ জাগ্রত করিয়াছিলেন। শীতলাইএর জমিদার ও অন্যান্য বহু লোক বিনা পয়সায় কালাজ্বরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম চেষ্টা দেখিয়া লর্ড লিটন্ হিতসাধন মণ্ডলীর কার্য্যের সাহায্যের জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভবানীপুর ৩১ নং কালীঘাট রোডস্থিত নিখিল ভারত অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয় আশ্রমের পক্ষ হইতে জানাইতেছেন যে, আশ্রমে সম্প্রতি নিম্নলিখিত রূপ দান পাওয়া গিয়াছে।—শ্রীযুক্ত যৌথ মনাজী জোহার ২০০৲; কলিকাতা মিউনিসিপালিটী ১২৭।৵০; পান্নালাল দে ১৫০৲; কুমারকৃষ্ণ মিত্র ২০০৲; গৌরচন্দ্র লাহা ১০০৲; চুনিলাল মতি লাল ৫১৲; মোট ৮১৮।৵০। দেশের সহৃদয় ভদ্র মহোদয়গণ এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

কর্পোরেশনের সভায় চেয়ারম্যান্ জানান যে কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিজ নামে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কর্পোরেশনের হস্তে ২৫,০০০৲ ও তাঁহার মাতার নামে একটি মাতৃ নিবাস 'মেটার্নিটী হোম' স্থাপনের জন্য তাঁহার সমস্ত ভূসম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অনুমান ৭৫,০০০৲ দান করিয়াছেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা

বিখ্যাত স্বদেশী যাত্রাওয়ালা মুকুন্দ দাস মশাই তাঁর গুরু অশ্বিনী-কুমারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্বরাজ সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের জন্য এক হাজার টাকা দান করেছেন। —বিজলী

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাইকপাড়ার সদাশয় জমিদার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয় সম্প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের স্থায়ী বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য, সাঁওতাল পরগণার দেওঘর সহরের প্রান্তভাগে ৬০ বিঘা পরিমাণ জমি শ্রী রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। —আনন্দবাজার পত্রিকা

শোক-সংবাদ—

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবী বাবু দাশরথি সান্যাল মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ বরাহনগর নামক স্থানে বাবু দাশরথি সান্যালের জন্ম হয়। শৈশবে তাঁহার আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না; সুতরাং নানা বাধা-বিঘ্ন সত্বেও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ফৌজদারী মোকদ্দমায় একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীবী হইয়া উঠেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্বদেশী মামলায় তিনি দেশবাসীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।—সোণার বাংলা

শ্রীযুত সূর্য্যকুমার অগস্তি পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীযুত অগস্তি একজন ষ্টাটুটারী সিভিলিয়ান্ ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার উন্নতি সংশ্লিষ্ট সকল কার্য্যেই তিনি যোগদান করিতেন। ১৯২২ সালে মেদিনীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর্ মাসে মহাত্মা গান্ধী যখন মেদিনীপুরে যান তখন মেদিনীপুরবাসীর পক্ষ হইয়া শ্রীযুত অগস্তি তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।—বন্দেমাতরম্

যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ নলিনীনাথ রায় মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র ৩০ বৎসর বয়সেই তিনি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যশোহরের প্রায় প্রত্যেক জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিতই তাঁহার আপ্রাণ যোগ ছিল। তিনি দেশ হইতে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। —যুগবার্ত্তা

সমাজের কথা—

বিপরীত ছুঁৎমার্গ।—"আনন্দবাজার পত্রিকা" বলেন,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইণ্টারমিডিয়েট্ কলেজ হোষ্টেলের বাড়ীতে, আমাদের বিশুদ্ধ উঁচুদরের হিন্দু-ঘরের ছেলেরা, মুসলমান-ভাইদের সঙ্গে এক ঘরেই বসবাস করেন। হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির এটা খুব ভাল আদর্শ সন্দেহ নাই। কিন্তু নমঃশূদ্র ছেলেদের সেখানে বসবাস করিতে দেওয়া হয় না। তাহা হইলে ঐ বিশুদ্ধ হিন্দু-সন্তানদের ছুঁৎমার্গ রূপ পরম আধ্যাত্মিক আচরণের ব্যাঘাত হয়। যদি কোন নমঃশূদ্র বিদ্যার্থী উঁচু জাতের ছেলেদের সঙ্গ পাইতে চায় তবে ধর্ম্ম ও নামটা বদলাইতে হইবে। ছুঁৎমার্গ ব্যাধিটা যে কি প্রকার, এই দৃষ্টান্ত থেকে কতকটা বুঝা যায়। —সম্মিলনী

সম্প্রতি গোন্দলপাড়ার ব্রাহ্মণদের এক সামাজিক সভা হইয়াছিল। গোন্দলপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধ-ক্রমে তথাকার ব্রাহ্মণ সমাজের সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রামস্থ তাবৎ ব্রাহ্মণদিগকে ঐ দিন প্রাতঃকালে স্বীয় গৃহে আহ্বান করিয়া বিলাতফেরতদিগের সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য আলোচনার ব্যবস্থা করেন। সভায় গ্রামের যুবক বৃদ্ধ সকল ব্রাহ্মণই উপস্থিত হইয়াছিলেন। নানারূপ আলোচনার পর সভায় স্থির হইয়াছে—(১) বিলাত-যাত্রা কোনরূপ দোষাবহ নহে; বিলাত যাইয়া কেহ অন্যায় কাজ করেন না। (২) সমাজে থাকিবার জন্য বিলাতফেরতকে কোন-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। (৩) বিলাতফেরত লোক সমাজে থাকিতে চাহিলে তিনি সমাজপতিকে সেই কথা জানানমাত্র সমাজপতি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের এক সভা আহ্বান করিবেন; সেই সভায় বিলাতফেরত এইমাত্র জানাইবেন যে তিনি সমাজে থাকিতে চান। সমাজে থাকিবার জন্য তাঁহার এই উক্তিই যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। আমরা সভার মন্তব্যগুলিতে অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। আসামের কয়েকটি ব্রাহ্মণ সমাজও সম্প্রতি অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের কর্ত্তারা এই সকল ম্লেচ্ছ-কাণ্ডের কোন সংবাদ রাখেন কি?

—সম্মিলনী

গ্রামবাসীদের সৎসাহস—

ত্রিপুরা জেলার কসবা থানার [illegible]

জন ডাকাত ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। ডাকাতেরা নগদে এবং গহনাপত্রে ৩৮০০্ টাকা লইয়া পলাইতেছিল। এমন সময় গ্রাম-বাসীরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে। ডাকাতদের কাছে বন্দুক ছিল, বোমা ছিল, রামদা প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাহাতে ভীত না হইয়া জোট বাঁধিয়া ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই চালায় এবং ৫ জন ডাকাতকে ঘায়েল করে; ইহাদের মধ্যে দুইজনকে তাহারা তখনই ধরিয়াছিল, পরে আর-একজন ধরা পড়িয়াছে। এই গ্রামবাসীরা ডাকাতের দলকে আক্রমণ করিয়া প্রকৃত সৎসাহস দেখাইয়াছে। এমন সৎসাহসের অভাবেই আমরা অধিকাংশ সময় বিড়ম্বিত হই। বাংলাদেশে এখনও এমন গ্রাম আছে যেখানকার লোকে "ডাকাত পড়িল" শুনিলে ধরে পালায়।... এই-সকল দুর্ব্বৃত্তকে সায়েস্তা করিবার জন্য আমাদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে—এইজন্য আমরা গ্রামরক্ষী সমিতি গঠনের উপর এতটা জোর দিয়া থাকি।—স্বরাজ

— সেবক

—

ভারতবর্ষ

৪৩ মাইল সাঁতার—

এলাহাবাদে হিন্দুস্থান সুইমিং এসোসিয়েসন্ নামে সন্তরণকারীদের এক সমিতি আছে। সেই সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বালক সম্প্রতি প্রয়াগের ত্রিবেণী ঘাটের এক মাইল দূরে সোমেশ্বর হইতে ১৯ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরিয়া ৪৩ মাইল গঙ্গার উপর সাঁতার দিয়াছিলেন। তাঁহার এ সাহসিকতা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে। ইনি নাকি ইংলিশ্ চ্যানেল্ অতিক্রম করিবারও সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কাকিনাড়া কংগ্রেস—

অন্ধ্রদেশে কাকিনাড়া সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মৌলানা মহম্মদ আলি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পরিগৃহীত হইয়াছে।

(১) কংগ্রেসের অধিবেশন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হইবে। নির্দ্ধারিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে কংগ্রেস ডাকিতে হইলে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-কমিটি পূর্ব্বে যথারীতি বিজ্ঞাপন দিবেন। প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটির অধিকাংশের অনুমোদন অনুসারেও কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহূত হইতে পারিবে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এই অধিবেশনের স্থান এবং সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন এবং কংগ্রেসের নিয়মানুসারে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিবেন। পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ এক প্রদেশ বলিয়া ধরা হইবে এবং সেই অনুসারে কংগ্রেসের প্রদেশের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইবে। প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যগণ উক্ত কমিটির অধীনস্থ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রত্যেক প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিকে তাঁহাদের কার্য্যের বাৎসরিক রিপোর্ট ৩০ নবেম্বরের মধ্যে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয়-সমিতির নিকট দাখিল করিতে হইবে। প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দিনের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের চাঁদা দিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহারাই কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে যোগদান করিতে পারিবেন। ১লা জানুয়ারী হইতে চাঁদা দিবার বৎসর আরম্ভ হইয়া ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত উহা বাহাল থাকিবে।

(২) পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু প্রস্তাব করেন—দিল্লী-কংগ্রেসে



মৌলানা মহম্মদ আলি

গঠিত কমিটি ভারতের জাতীয় চুক্তিপত্র এবং বাংলার জাতীয় চুক্তিপত্র সম্বন্ধে দেশের মতামত সংগ্রহ করিয়া আগামী মার্চ্চ মাসের ৩১শে তারিখের ভিতর নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-সমিতির নিকট এসম্বন্ধে একটি রিপোর্ট দাখিল করিবেন। এবং নিখিল-ভারত-রাষ্ট্রীয়-সমিতি এ-সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। উক্ত কমিটির সভ্য সর্দ্দার মহাতাবসিং কারারুদ্ধ থাকায় তাঁহার স্থানে জশিবালের সর্দ্দার অমরসিংকে সভ্য নির্ব্বাচিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ এই প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করিয়া বলেন, এই প্রস্তাবের ভিতর হইতে "বাংলার জাতীয় চুক্তি" এই কথা কয়েকটি তুলিয়া দেওয়া সঙ্গত। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে কথা কয়েকটি তুলিয়া দিয়াই প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে।

(৩) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য্য-সাধনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়াছে।

(৪) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি অপমানসূচক ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ভারত হইতে বিদেশে শ্রমিক পাঠানো একেবারে বন্ধ করার জন্য দেশবাসীকে পরামর্শ দেওয়া সঙ্গত এবং এই উদ্দেশ্যে সমস্ত বিষয় ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিকে এক সব্-কমিটি নিযুক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা উচিত।

(৫) শ্রীযুক্ত রাজগোপাল আচারিয়ার প্রস্তাব করেন—(ক) কলিকাতা

নাগপুর আহমদাবাদ গয়া এবং দিল্লীতে যে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এই কংগ্রেস তাহা পুনরায় গ্রহণ করিতেছেন। দিল্লী-কংগ্রেসে কাউন্সিলে প্রবেশ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাতে লোকের মনে স্কুল কলেজ আদালত এবং কাউন্সিল বর্জ্জন সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া একটি সন্দেহের উদয় হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেস আবার ঘোষণা করিতেছেন যে এসম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। (খ) কংগ্রেস দেশবাসীর নিকট এই আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন বরদোলীতে গৃহীত গঠনমূলক কার্য্যতালিকা অনুসরণ করেন এবং আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হন। (গ) এই কংগ্রেস প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিগুলিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, দ্রুত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কমিটিগুলি যেন অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

(৬) কংগ্রেসের কার্য্যের পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের কার্য্যকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রদেশে প্রদেশে কার্য্যালয় গঠন করিতে হইবে। ঐ সকল কার্য্যালয়ে বেতনভুক্ কর্ম্মচারী থাকিবেন।

(৭) মৌলানা শৌকৎ আলির প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে একটি নিখিল ভারত-খদ্দর বোর্ড গঠন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শেঠ যমুনালাল বাজাজ বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং মৌলানা শৌকৎ আলি অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র খদ্দর প্রচলন এবং সাধারণ ভাণ্ডার হইতে যে বরাদ্দ আছে তাহার অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করাই এই বোর্ডের উদ্দেশ্য হইবে। এই বোর্ড প্রাদেশিক-কংগ্রেস-কমিটিগুলির সহিত মিলিয়া কাজ করিবেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত খদ্দর-প্রতিষ্ঠানগুলির উপর পরিদর্শন-ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়াও নূতন নূতন খদ্দর-প্রতিষ্ঠান খুলিতে যত্নবান হইবেন।

(৮) শ্রীযুক্ত বিনায়ক দামোদর সভারকারকে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখায় গবর্মেণ্টের উপর দোষারোপ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৯) আগামী বৎসরের কংগ্রেসের অধিবেশন কর্ণাটকে হওয়ার জন্য কর্ণাটক যে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা গৃহীত হইয়াছে।

(১০) একটি প্রস্তাবে কেনিয়া-প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং কেনিয়া কংগ্রেসের ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে ভারতের পক্ষ হইতে কেনিয়া-প্রবাসীদিগকে আন্তরিকতা জানাইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

(১১) একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, গুরুদ্বার প্রবন্ধক-কমিটি এবং অকালীদের বিরুদ্ধে গবর্মেণ্টের কার্য্যাবলী যাবতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং অহিংস-অসহযোগের বিরুদ্ধে অভিযান। কংগ্রেস সমগ্র দেশবাসীকে অর্থ ও লোকজনের দ্বারা অকালীদের সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

খিলাফৎ কন্‌ফারেন্স—

মৌলানা শৌকৎ আলি এবার কাকিনাড়ায় খিলাফৎ কন্‌ফারেন্সের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় যে সব প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে নিম্নে তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

(১) খিলাফৎ সভা এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দাবী করিতেছেন।—(ক) তুরস্ক-সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। (খ) থ্রেস প্রত্যর্পণ। (গ) স্মার্ণা ও এশিয়া-মাইনরের উপকূল প্রত্যর্পণ। (ঘ) জজিরৎ-উল-আরবের স্বাধীনতা ও রক্ষা।

লোজানের সন্ধিতে এই দাবীগুলির প্রথমটি মাত্র পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু জজিরৎ উল আরবের রক্ষার দাবী এখনো পূর্ণ হয় নাই। এই সভা



মৌলানা শৌকৎ আলি

স্পষ্টভাবে এবং শেষবার ঘোষণা করিতেছেন যে, আরবের সকল প্রদেশকে স্বাধীন ও সুরক্ষিত করিতে হইবে। সমস্ত মোস্‌লেম-জগৎ এজন্য যথাসাধ্য সংগ্রাম করিবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত শান্ত হইবে না।

(২) এই সভা জাতীয় চুক্তি ও স্বরাজ্যদলের চুক্তির নিম্নলিখিত মূল নীতিগুলি স্বীকার করিয়া লইতেছেন। (ক) লোকসংখ্যা অনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। (খ) যে সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অল্প সে সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে হইবে। (গ) ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলির ভিতর সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের সমস্ত খিলাফৎ কমিটি ও অপরাপর মুসলমান সমিতিগুলি জাতীয় চুক্তি ও স্বরাজ্যদলের চুক্তি এই দুই চুক্তির সম্যক্ আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মতামত প্রাদেশিক-খিলাফৎ-কমিটির সাহায্যে এক সাব্-কমিটির কাছে প্রেরণ করিবেন। এই সাব্-কমিটিকে

আবার ১৯২৪ সালের ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে কেন্দ্রীয়-খিলাফৎ-কমিটির কাছে রিপোর্ট দিতে হইবে। সাব্-কমিটির সদস্যগণের নাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আবুল সদর বাবিলী ও আই এ কে শেরওয়ানি।

(৩) স্বরাজলাভ করা মুসলমানদের রাজনৈতিক ও ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য।

(৪) হিন্দুমুসলমানের ঐক্য-বন্ধন সুদৃঢ় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। উভয় সম্প্রদায়ই যেন উভয় সম্প্রদায়ের পুণ্যস্থানগুলি রক্ষার জন্য যত্নবান্ হন। দাঙ্গাকারীরা যে সম্প্রদায়ের লোকই হোক্ না কেন, তাহাদিগকে বাধাদানের চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

(৫) খিলাফৎ-কমিটিগুলির পুনর্গঠনের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-কমিটির উপর ভার দেওয়া হইবে এবং জজিরৎ-উল-আরব ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য মাসিক ও বাৎসরিক চাঁদা এবং এককালীন দানের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(৬) আর্য্যসমাজ প্রচারকার্য্যের জন্য বেতন দিয়া লোক রাখিয়া থাকে। সেইরূপ বেতনভুক্ খিলাফৎ কর্ম্মীও নিযুক্ত হওয়া দর্কার।

বোর্সাদে সত্যাগ্রহ—

বোম্বাই-গভর্মেণ্ট্ গুজরাটের কায়রা জেলার বোর্সাদ তালুকে নিগ্রহ-পুলিশ-ট্যাক্স্ বসাইয়াছিলেন। ঐ তালুক, ট্যাক্স্ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়া স্থানে স্থানে সত্যাগ্রহ আশ্রম খুলিয়াছে। এই আন্দোলনে বল্লভভাই পটেল অধিনায়কত্ব করিতেছেন। বোর্সাদ তালুকের অধিবাসীরা জাতিতে অধিকাংশই 'ধারালো'। তাহাদের কয়েকজন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা, তাহারা স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী বহু তালুকের ভয়ের কারণ। বোম্বাই-সর্কার সেইজন্য এই তালুকে নিগ্রহ-পুলিশ মোতায়েন করেন। কয়েকজন গুণ্ডা যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই প্রায়শ্চিত্তের জন্য দরিদ্র জন-সাধারণকে ট্যাক্সের ভার বহন করিতে বলা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর মতই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং জনসাধারণের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই লোকে সত্যাগ্রহ করিয়া ট্যাক্স্ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। 'ভয়েস্ অব্ ইণ্ডিয়া' জানাইয়াছেন যে, এই অপরাধে সর্কারী কর্ম্মচারীরা লোকজনের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করিতেছেন। কিন্তু স্থানীয় শ্রমিকেরা এই-সব বাজেয়াপ্ত-করা জিনিষপত্র বহন করিতেছে না। ফলে নিগ্রহ-পুলিশদের দ্বারাই সেগুলি বহাইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে। দর্বার শ্রীগোপাল দাস দেশাই তাঁহার ১০নং সত্যাগ্রহ-ইস্তাহারে পুলিশের লোকজনকে কুলীর কাজ করিতে নিষেধ করিয়া কেবল মাত্র পুলিশের কর্ত্তব্য পালন করিতেই অনুরোধ করিয়াছেন)

গত ২২শে ডিসেম্বর বোর্সাদে অনেক লোকের জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য কোনো ইস্তাহার পূর্ব্বে জারি করা হয় নাই। বাজেয়াপ্ত জিনিষপত্রের মূল্যের হিসাব প্রায়ই করা হয় না। সময় সময় রসিদও দেওয়া হয় না। বাজারে জিনিষপত্র বাজেয়াপ্ত করিবার সময় সেগুলি বহন করিবার নিমিত্ত পুলিশ মোটর-গাড়ী সঙ্গে লইয়া ঘুরিয়া থাকেন, কিন্তু চালকের অভিজ্ঞতার অভাবে সেদিন তিনটি শিশু চাপা পড়িয়া জখম হইয়াছে।

গত ২২শে ডিসেম্বর খাণ্ডেশ্বরের কয়েকজন খৃষ্টিয়ান চামারের জিনিষ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাহারা কোন পাদ্রীর চিঠি লইয়া কলেক্টারের সঙ্গে দেখা করে। উক্ত খৃষ্টিয়ানদের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তি ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

পালজ নামক স্থানে একজন দরিদ্র চামারের দেয় পাঁচ টাকা ট্যাক্সের জন্য কুড়ি টাকা মূল্যের একটি গরু বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

পরে (৮।১।২৪ তারিখে) খবর পাওয়া গিয়াছে যে সত্যাগ্রহের জয় হইয়াছে, গভর্মেণ্ট্ নিগ্রহ-পুলিশ সরাইয়া ট্যাক্স্ মকুফ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

খিলাফৎ-প্রতিনিধি—

সর্ব্ব-ভারত-খিলাফৎ-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতবাসী মুসলমানদের মত ব্যক্ত করিবার জন্য আঙ্গোরায় একদল প্রতিনিধি প্রেরিত হইবে। হাকিম আজ্‌মল খাঁ সেই দলের মুখপাত্র হইবেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:—মৌলানা মহম্মদ আলি, ডাঃ আন্সারি, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মোতিলাল বা জহরলাল নেহ্রু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মৌলানা মুএজ্জন আলি (সম্পাদক)। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে ইঁহারা যাত্রা করিবেন।

মুসলমান মহিলা-কন্ফারেন্স্—

সম্প্রতি আলিগড় সহরে মুসলমান মহিলাদের একটি কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। হায়দ্রাবাদ, বোম্বাই, পঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশের বহু মুসলমান মহিলা এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের মিসেস্ মমতাজ ইয়ারজঙ্গ সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কন্ফারেন্সে মুসলমান-সমাজ-সংস্কার-সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। একটি প্রস্তাব হইতেছে এই—দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সমস্ত মুসলমান বালিকা স্কুলে গিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিবে। মুসলমান-সম্প্রদায়ের ভিতর বহুবিবাহ এখনও প্রচলিত আছে। এই প্রথার প্রতিবাদ করিয়া, এক পত্নী থাকিতে কোনো মুসলমানেরই দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করা সঙ্গত নহে, এই মর্ম্মে আর-একটি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দেশী শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার করিয়া দেশী শিল্পের উন্নতি করিবার জন্য চেষ্টা করা উচিত, এই মর্ম্মেও কন্ফারেন্স্ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

নারীদের জাগরণ ভিন্ন কোনো জাতিরই উন্নতি সম্ভবপর নহে। মুসলমান নারীদের জাগরণের পূর্ব্বাভাস সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়েরই উন্নতির অগ্রদূত—তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অধিবেশন—

লক্ষ্ণৌ সহরে ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনুন্নত জাতির প্রতি হিন্দু-সমাজের সহানুভূতি প্রদর্শন নিখিল-ভারত-হিন্দু-সংগঠন, কলিযুগে আপদ্ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, হিন্দু-সমাজের প্রতি সাধুদের কর্ত্তব্য, মাল্কানা রাজপুতদের শুদ্ধিক্রিয়া, ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

জাতীয় চুক্তিপত্র—

কংগ্রেসের সাব্-কমিটি 'Indian National Pact' নাম দিয়া একটি প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপি তৈরী করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) ভারতের জন্য স্বরাজ লাভ ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়েরই অপরিবর্ত্তনীয় উদ্দেশ্য। প্রত্যেক স্বাধীন জাতি তাহার নিজের দেশে যে সব সুবিধা ও অধিকার ভোগ করে স্বরাজ ভারতবর্ষে সেই-সব সুবিধা ও অধিকার প্রদান করিবে।

(২) স্বরাজ গবর্মেণ্ট্ গণতন্ত্রমূলক হইবে এবং তাহা বিভিন্ন

প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সমূহের এক সম্মিলিত রাষ্ট্র হইবে। বিভিন্ন রাজনীতিক দলের প্রতিনিধিরা সম্মিলিত হইয়া এই গবর্মেণ্টের রীতি নীতি স্থির করিবেন।

(৩) হিন্দুস্থানী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে। উহা দেবনাগরী বা উর্দ্দু যে-কোন অক্ষরে লেখা চলিবে।

(৪) সকল সম্প্রদায়কে ধর্ম্ম সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ ধর্ম্ম বিজ্ঞান, পূজাপদ্ধতি, ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্ম-সমিতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হইবে। এই স্বাতন্ত্র্য সম্প্রদায়সমূহের একটা বৈধ অধিকার হইবে। এ অধিকারে গবর্মেণ্ট্ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উল্লিখিত অধিকার ভোগ করিতে হইবে। কেহ অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য বলপ্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

(৫) কোনো ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাত করা হইবে না। সরকারী অর্থ কোনো ধর্ম্মের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হইবে না।

(৬) স্বরাজ গবর্ণমেণ্ট্‌কে ভিতরের বা বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হিন্দুমুসলমান-প্রমুখ সকল সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য হইবে।

(৭) বর্ত্তমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা যেরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তাহাদের রাজনৈতিক বোধ ও দায়িত্বজ্ঞান এখনও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে নাই এ-কথা স্মরণ রাখিয়া, যে সকল সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম, আরো কিছুদিন তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া চলিতে হইবে। এজন্য স্বরাজ গবর্মেণ্টের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণের স্বতন্ত্র রকম ব্যবস্থা থাকিবে।

(৮) ইদুজ্জোহা পর্ব্ব ব্যতীত মুসলমানেরা গোহত্যা করিতে পারিবেন না। সে সময়েও গোহত্যা এমন ভাবে করিতে হইবে, যেন হিন্দুদের মনে কোনরূপ আঘাত না লাগে।

(৯) স্থানীয় মিলন-পরিষদ্ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত পূজার সময়ে ব্যতীত ধর্ম্মস্থানের সম্মুখে গান বাজনা করা চলিবে না।

(১০) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিছিল যদি একই তারিখে বাহির হয় তবে স্থানীয় মিলন পরিষদ্ মিছিলগুলির জন্য বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

(১১) দুর্গোৎসব, মহরম, রথযাত্রা, শিব-দেওয়ান্ প্রভৃতির সময় যাহাতে কোনো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য প্রাদেশিক ও স্থানীয় সম্মিলিত-পরিষদ্ নিযুক্ত করিয়া আপোষ ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা করা হইবে।

(১২) সমস্ত প্রাচ্যজাতির এক সমবায় গঠন করিতে হইবে। এ সমবায়ের উদ্দেশ্য—প্রতীচীর অর্থগৃধ্নুতা হইতে আত্মরক্ষা করা এবং প্রাচ্যের শিক্ষাশিল্প প্রভৃতিকে উৎসাহিত করা।

ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পণ্য বয়কট্—

বোম্বাই গিরগাঁওয়ের জেলা-কংগ্রেস-কমিটি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের পণ্য বয়কটের জন্য রীতিমত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। স্থানীয় স্বরাজ্য পার্টি ও ন্যাশনালিষ্ট মিউনিসিপ্যাল পার্টিও সে ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের সর্ব্বত্র এই বয়কট্ ব্যবস্থা অনুসারে আন্দোলন চালানো হইবে।

বিধবা-বিবাহ—

লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক-সভার উদ্যোগে গত নবেম্বর মাসে ভারতের সর্ব্বত্র ৬১টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। ইংরেজী বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে নবেম্বর মাসের শেষদিন পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে মোট ৭৭৩টি বিধবার বিবাহ হইয়াছে। পরিণীতা বিধবাদের ভিতর পঞ্জাবের ৫৯৫টি, উত্তরপশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশের ৪টি, সিন্ধুর ৩০টি, দিল্লীতে ২৭টি, যুক্তপ্রদেশের ৮০টি, মাদ্রাজের ৫টি, বাংলার ১১টি, এবং বোম্বায়ের ২১টি।



স্যার্ আলি ইমাম

স্যার আলি ইমাম—

'ভয়েস অব্ ইণ্ডিয়া'তে প্রকাশ, স্যার আলি ইমাম পুনরায় নিজাম-রাজ্যের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট্ হইবেন। অতঃপর বেরার প্রদেশ ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত বিলাতে আবেদন আর নিবেদনের থালা বহিয়া বেড়াইবেন স্যার্ আলি ইমামের বদলে স্যার্ কে জি গুপ্ত। স্যার্ আলি ইমামের কাজের দক্ষিণা হইবে মাসিক ১৫০০০ টাকা। ইহা অত্যন্ত অধিক বেতন। প্রবল-পরাক্রান্ত জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ইহার দশমাংশ অর্থাৎ মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতন পান।

পদুকোটায় নূতন ব্যবস্থাপক সভা—

পদুকোটা ব্যবস্থাপক অ্যাড্‌ভাইসরী কাউন্সিল উঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যবস্থাপক সভা করা হইবে। এই সভায় স্ত্রীলোকদিগকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইবে। অনেক মহিলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ-প্রার্থী হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের চীনযাত্রা—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অল্প দিনের ভিতরেই একদল ভারতীয় পণ্ডিত সহ চীন জাপান সুমাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বহুল দেশ পরিভ্রমণে গমন করিবেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এবিষয়ে নাকি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথের জন্য অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছেন।

রায়বাহাদুর শেঠ বলদেও দাস বিরলা বিশ্বভারতীর জন্য বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গোমাংস আম্‌দানীর স্কীম—

শ্রীযুক্ত জসাওয়ালা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ভারতবর্ষে গোমাংস আম্‌দানী করা সম্বন্ধে একটি স্কীম খাড়া করিয়াছিলেন। এবিষয়ে গত ১৩ই ডিসেম্বর নিখিল-ভারত-গো-রক্ষা-সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতিতে

আলোচনা হইয়া গিয়াছে। সমিতির মতে এই স্কীম অর্থনীতির দিক্ হইতে অসুবিধাজনক হইবে এবং উহাতে গো-হত্যা সম্বন্ধে অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইবে। ফলে ভারতে গোহত্যা বৃদ্ধিই হইবে। এইসব দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া সম্মিলনী স্কীমটি গ্রহণ করেন নাই।

মহাত্মার স্বাস্থ্য—

বোম্বে ক্রনিকল সংবাদ দিতেছেন যে, শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ গান্ধী গত ১৮ই ডিসেম্বর জেলে মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মহাত্মার যেরূপ শারীরিক অবস্থার কথা শোনা যাইতেছে তাহা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পূর্ব্বে তাঁহার দেহের ওজন ১২ সের কমিয়া গিয়াছিল, পরে আবার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শেষোক্ত সংবাদে প্রকাশ যে তাঁহার দেহের ওজন বর্ত্তমানে মোটে ৯৬ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪৮ সের মাত্র। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার ওজন ১০৮ পাউণ্ড ছিল, কিছুদিন পরে ৩ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়। শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল মহাত্মার স্বাস্থ্যের সংবাদ অবগত হইবার জন্য বোম্বাই সরকারের নিকট নাকি পত্র লিখিয়াছেন। মহাত্মার ডাক্তার তালবারকার এবং কানুগাও মহাত্মার ডাক্তারী পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন এই অভিমত ব্যক্ত করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট পত্র দিয়াছেন। কিন্তু কেহই এপর্য্যন্ত উত্তর পান নাই।

ব্রহ্মের শিক্ষা-ব্যবস্থা—

ব্রহ্মদেশে ইংরেজী স্কুল খুলিবার সময় আর বর্ণ-বৈষম্য রাখা হইবে না বলিয়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐ নীতি অনুসারে তাঁহারা ইউরোপীয় শিক্ষানবীশ ও অনাথদের বৃত্তি এবং ইউরোপীয় বেতন-ভাণ্ডার তুলিয়া দিবেন। ইউরোপীয়দের জন্য আর বিশেষ বৃত্তি থাকিবে না এবং রেঙ্গুন আকিয়াব মৌলমীন ও মান্দালয়ে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য নূতন বোর্ড্ গঠিত হইবে।

নাগরিক প্রহরী—

দিল্লীর স্পেশাল কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে বোম্বাই গিরগাঁওয়ের জেলা-কংগ্রেস-কমিটি "নাগরিক প্রহরীদল" নামক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ডাক্তার সবর্‌কার্ সে বোর্ডের সভাপতি হইয়াছেন। স্থানীয় জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সদস্যরা উক্ত স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দিতে পারিবেন। ড্রিল, লাঠি খেলা, সাঁতার, সাইকেল চড়া, আহতের প্রাথমিক শুশ্রূষা, এম্বুল্যান্সের কাজ প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটির সৎসাহস—

অন্ধ্রদেশের কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি, কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে মৌলানা মহম্মদ আলি এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সেখানে গমন করিলে, তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন।

গত ১৯২১ সালে কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি মহাত্মা গান্ধীকে অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ফলে সরকার হইতে আদেশ দেওয়া হয় যে, সরকারের অনুমতি না লইয়া এই-সব কাজে অর্থব্যয় করিলে তাহা মঞ্জুর করা হইবে না। সরকারের এই আদেশ অমান্য করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি সেই বৎসরেই পুসিফুট জনসনকে অভিনন্দিত করেন—তাহাতে চারি টাকা ব্যয় হয়। এই চারি টাকার ব্যাপার লইয়া এখনও গবর্মেণ্টের সহিত মিউনিসিপালিটির চিঠি লেখালেখি চলিতেছে। তাহার পর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন যখন অন্ধ্রদেশ পরিভ্রমণে বাহির হন তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এক অভিনন্দন পত্র মুদ্রিত হয়। এপর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গবর্মেণ্ট্ এই-সমস্ত বিল মঞ্জুর করেন নাই। এসমস্ত সত্ত্বেও কাকিনাড়া মিউনিসিপ্যালিটি মৌলানা মহম্মদ আলিকে এবং চিত্তরঞ্জনকে আবার অভিনন্দিত করিয়া বিশেষ সৎসাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

রতন টাটার দান—

পরলোকগত স্যার রতন টাটা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে দানের জন্য যে তহবিল রাখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৫ মাসে ২,৬৮,৭০০ টাকা দান করা হইয়াছে। ইহার ভিতর ২৮,০০০ টাকা ধরমপুর যক্ষ্মা-হাঁসপাতালের জন্য; ৩০,০০০ টাকা নাগপুর মিওর হাঁসপাতালের জন্য; ২৮,৫০০ টাকা আহমদাবাদ রতন টাটা অনাথ-আশ্রমের জন্য; ২৫০০০ টাকা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীর জন্য; ২০,০০০ টাকা জমশেদপুর টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য; ২১০০০ টাকা লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্‌সে সমাজবিজ্ঞানের একটি ক্লাস খুলিবার জন্য; ২০,০০০ টাকা জাপানের ভূমিকম্পে সাহায্যের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

খৃষ্টিয়ান সম্মিলন—

সম্প্রতি বাঙ্গালোরে নিখিল-ভারত-খৃষ্টিয়ান-সম্মিলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মিঃ কে টি পাল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনে কেনিয়া ব্যাপারে ব্রিটিশ জাতি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আর-এক প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া জাতীয় একতার জন্য হিন্দু-মুসলমানের সহিত খৃষ্টিয়ানদিগকে এক যোগে কাজ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক পৃথক্ নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধেও এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়

—

বিদেশ

ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের নবসমন্বয়—

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের চাপে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে চুক্তির মিলন নানা ভাবে নানা সময়ে হইয়া আসিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে এইরূপ মিলন হইতে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-জীবনে একটি নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নীতি ইতিহাসে Balance of Powers অর্থাৎ শক্তিপুঞ্জের সামর্থ্যের সমতাসাধন নীতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নেপোলিয়ানের পরিচালনায় যখন ফ্রান্সের পক্ষে বিশ্বজয় সম্ভবপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল তখন তাহার গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ইংরেজ ও প্রাসিয়ার মধ্যে এইরূপ একটি মিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর শক্তিপুঞ্জ পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিবার জন্য নানারূপ চুক্তির মিলন ঘটাইয়াছেন, কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধির পর আর সে মিলন টিঁকিয়া থাকে নাই। রুশশক্তি যখন প্রবল ছিল তখন তাহার ভারত-অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্ক-শক্তিকে প্রবল রাখা সুবিধাজনক বোধ হওয়াতে ইংরেজ তুরস্কের সহিত মিত্রতা করিয়া আসিয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়াকে প্রবল করিয়া রুশের সহিত অন্যান্য স্লাভজাতির মিলনের বাধা সৃষ্টি করিবার জন্য ফরাসী ও ইংরেজ অষ্ট্রীয়ার প্রতিপোষকতা এক সময় খুবই করিয়াছিলেন। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর যখন রুশশক্তি হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল তখন আর ইংরেজের তুরস্ক ও অষ্ট্রীয়ার সহিত প্রীতি রাখিবার বিশেষ

প্রয়োজন রহিল না। অপর দিকে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠাতে ইংরেজ ও ফরাসীর পক্ষে জার্ম্মানীর শক্তি যাহাতে আর বৃদ্ধিলাভ করিতে না পারে তাহার উপায় করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিল। প্রাচ্যে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনের মানসে জার্ম্মানী তুরস্কের সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করিয়া সার্ব্ব-মোস্‌লেম (pan-Islamic) আন্দোলনের প্রতিপোষকতা করিতে লাগিলেন। প্রাচ্যে জার্ম্মানীর প্রভুত্ব বিস্তারে ইংরেজ ফরাসী ও রুশ বিব্রত হইয়া উঠিলেন। জার্ম্মানীর বলবৃদ্ধি ফ্রান্স্ রাশিয়া ও ইংরেজের স্বার্থের প্রতিকূল হওয়াতে উক্ত তিন শক্তি পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এই তিন শক্তির সম্মিলিত প্রভাবকে খর্ব্ব করিবার জন্য জার্ম্মানী আবার অষ্ট্রীয়া ও ইতালীর সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে ত্রিমিত্রমিলনের (Triple Alliance) গতি ত্রয়ী (Triple Entente) রাষ্ট্রনীতির বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল। এই দুইটি সম্মিলিত শক্তির স্বার্থের ধারা বিপরীতগামী হওয়াতেই বিগত বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বিশ্বযুদ্ধের ফলে রাষ্ট্রধারায় যে নূতন আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে, শক্তিপুঞ্জের পরস্পরের মধ্যে যে সন্দেহ জাগিয়াছে, স্বার্থের যে সংঘাত বাধিয়া উঠিয়াছে তাহাতে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নূতন সমন্বয় একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। স্বার্থের দায়ে আবার নূতন করিয়া মিলন এবং নববিরোধের সৃষ্টি হইতেছে। লৌহ, তৈল এবং কয়লার মালিকানা লইয়া যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে তাহার ফলে যে কালে একটা নূতন হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিবে তাহা বুঝিতে পারিয়া শক্তিপুঞ্জ আপনআপন বলবৃদ্ধির উপায় খুঁজিতেছেন; তাহার ফলে নূতন দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে।

ফ্রান্স্ ও ইতালীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা পরস্পরকে বিপরীত পথে বহুদিন হইতে চালিত করিতেছে। ভূমধ্যসাগরের প্রভুত্ব লইয়াই ইতালী ও ইংরেজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা জাগিয়া উঠাতে ইংরেজ ইতালীর প্রতিকূল। সেইজন্য ইতালী সোভিয়েট্ রাশিয়ার সহিত হৃদ্যতা করিবার জন্য ব্যাকুল। রুশ ও ইতালীর মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রপাত হইতে দেখিয়া ফ্রান্স্ ইউরোপের বাজারে আপনার প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পোল্যাণ্ড্ যুগোস্লাভিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সংক্রান্ত কতকগুলি রফা করিয়া বসিলেন। মধ্য ইউরোপের এই রাজ্যগুলির কাঁচামাল বন্ধক রাখিয়া ফ্রান্স্ ইহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন।

ইতালী যে সমস্ত স্থান হইতে তাহার নির্ম্মাণ-শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করিত, ফ্রান্স্ একে একে সে-সমস্ত দেশকে হাত করিয়া লওয়াতে ইতালীর সন্দেহ জন্মিয়াছে যে ফ্রান্স্ ইতালীর ব্যবসা-বাণিজ্যকে ধ্বংস করিবার মতলব আঁটিয়াছে। ইতালীর এপোকা (Epoca) নামক সংবাদপত্র যাহা বলিয়াছেন তাহার অনুবাদ ইংরেজী কাগজে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে—"France is gradually laying hands on all the sources of raw materials in Europe and she is barely concealing her desire to starve Italian Industries. Even if France is more generous than she is expected to be, no supplies of raw material can compensate Italy for the break-up of the equilibrium of Europe and the establishment of a French power as wide as the continent." শুধু যে কাঁচামালের অভাব হইবার ভয়ে ইতালী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন শক্তি-সমূহের সমতা নষ্ট করিয়া ফ্রান্স্‌কে এমনই প্রবল পরাক্রান্ত করিয়া তুলিবে যে তাহার শক্তিকে প্রতিহত করা শক্তিপুঞ্জের সাধ্যে কুলাইবে না বলিয়া ইতালীর মহা আতঙ্ক হইয়াছে। আর ইতালী মনে করে যে ইতালী ও রুশের ভবিষ্যৎ সামরিক যোগাযোগের অন্তরায় হইবার উদ্দেশ্যে মিলনের পথে একটি প্রাচীর গড়িয়া তুলার অভিসন্ধিতেই চেকোস্লোভাকিয়ার সহিত ফ্রান্সের মিলনের এত প্রয়াস।

ইংরেজও ফ্রান্সের এই মিলন-প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত বেশী রকম মাতামাতি বলিয়াই সন্দেহ করেন এবং ইংরেজের বিশ্বাস যে ইহার অন্তরালে ফ্রান্সের নিশ্চয় কোনও গোপন অভিসন্ধি রহিয়াছে। তাই ফ্রান্স্‌কে চাপিয়া রাখিবার জন্য ইংরেজ টিউটন জাতির সহিত একটি মিলন সংঘটন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন এবং অর্থাভাবের অজুহাতে ফ্রান্স্ যে ইংলণ্ডের যুদ্ধঋণ এতদিন শোধ করেন নাই তাহা আদায় করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন। ইংরেজ বলেন যে ফ্রান্সের যদি অর্থেরই অনাটন তবে মধ্যইউরোপীয় রাজ্যসমূহকে ঋণদান ফ্রান্সের পক্ষে সম্ভব কিরূপে হইল?

এদিকে লোজান-বৈঠকে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়া তুরস্কের বলভরসা অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে। মুস্তাফা কামালের পরিচালনায় নবীন তুরস্ক অতি আশ্চর্য্যরূপ দক্ষতার সহিত অতিদ্রুত গতিতে উন্নত হইয়া উঠিতেছে। সমাজ- ও রাষ্ট্র সংস্কারে মুস্তাফা কামাল তাঁহার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের গোঁড়ামী হইতে রাষ্ট্রীয় আচার-ব্যবহারকে মুক্ত করিয়া অতি উদার ভিত্তির উপর নূতন শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া তুরস্কের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। ধর্ম্মগুরু খলিফার শাসনের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া শাসন-পরিষদে গণপ্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে। ব্যবস্থাপরিষদের এক নূতন আইনের বলে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং রমণীর রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সম্পূর্ণ আধুনিক প্রণালীর উন্নতিকর বিধিসমূহ একে একে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে তুরস্ক সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠজাতিসমূহের পর্য্যায়ভুক্ত হইবার দাবী করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

কামালের ন্যায় চতুর রাজনীতিক বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইউরোপীয় শক্তি-সমন্বয়ের বিরুদ্ধে একাকী আঁটিয়া উঠা তুরস্কের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, এমনকি সার্ব্ব-মুসলমান আন্দোলন যদি কোনও দিন সফল হয় তাহা হইলেও সম্মিলিত শ্বেতকায় জাতির বিপক্ষে মোস্‌লেম জগৎ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। তাই হাঙ্গেরি ও অষ্ট্রীয়াকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে কামাল চেষ্টা পাইতেছেন। হাঙ্গেরি ও অষ্ট্রীয়ার অর্থাভাবে শাসন পরিচালন করা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছিল; দেশময় অরাজকতা দেখা দিয়াছিল। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ইহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন না দেখিয়া তুরস্ক সরকার ঋণদান করিয়া এই দুইটি রাজ্যকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং যাহাতে আবার এই রাজ্যে লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসে তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছেন। মোটামুটি চারিটি বিপরীত স্বার্থের ধারা ইউরোপীয় রাষ্ট্র-নীতির মধ্যে বর্ত্তমানযুগে প্রবাহিত হইতেছে। প্রথম—ফরাসী ও মধ্য-ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মিলন, দ্বিতীয়—ইতালী ও রুশের মিলন-প্রচেষ্টা, তৃতীয়—ইংরেজ ও টিউটন জাতির মধ্যের প্রীতির বন্ধন, চতুর্থ—তুরস্কের সহিত অষ্ট্রীয়া ও হাঙ্গেরির মিলন। এই চারিটি শক্তিপুঞ্জের স্বার্থের সংঘাত যে রোষ ও ক্ষোভ জাগাইয়া তুলিবে, যে দ্বেষ হিংসা ও ঈর্ষার বহ্নি জ্বালাইবে তাহা শান্তিহারা ইউরোপকে কোন্ মৃত্যুর মুখে লইয়া যাইবে কে জানে।

জাতিতে জাতিতে এই যে বিদ্বেষ-বিষ ফুটিয়া উঠিতেছে এই বিষ

সমাধান করিবার ভার ভারতের উপর। মহাত্মা গান্ধীর মন্ত্রে দীক্ষিত ভারত কি মহামানবের মিলনতীর্থ হইয়া উঠিবে না?

ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় অবস্থা—

নূতন নির্ব্বাচনের ফলে রক্ষণশীল দল জয়ী হইলেও এত অধিক-সংখ্যক সভ্য প্রেরণ করিতে তাহারা সমর্থ হয় নাই যে শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলের সম্মিলিত আক্রমণ হইতে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রথা অনুসারে শ্রমিক দলই সংস্থিতি-সম্পন্ন বিরুদ্ধবাদী দল। বর্ত্তমান শাসন-পরিষদের পতন হইলে রাষ্ট্রীয় বিধি অনুসারে শ্রমিক দলের উপরই ইংলণ্ডের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হওয়া উচিত।

বিপ্লবপন্থী এই শ্রমিক দলের সম্বন্ধে পুরাতন দলের নেতৃবর্গের একটা ভীতি আছে। শ্রমিক দলের শাসনে দেশের ভীষণ অমঙ্গল সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া, শ্রমিক দল দেশের কর্ণধার যাহাতে না হইতে পারেন তাহার জন্য অনেকেই উদারনৈতিক নেতা অ্যাসকুইথকে বল্ড্‌উইন্ মন্ত্রীসভার সমর্থন করিতে অনুরোধ করেন। অ্যাসকুইথ্ কিন্তু রক্ষণশীল দলের সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি বলেন যে বাণিজ্য সংরক্ষণ নীতি অথবা ধনাধিক্যানুসারে বর্দ্ধিত হারে কর নির্দ্ধারণ নীতির সমর্থন দেশ করে নাই; কাজে-কাজেই তিনি এ দুইটির কোনটিরও সমর্থন করিবেন না। কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বাধীনে ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রীয় নীতি যেরূপ দুর্ব্বলতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে তাহাতে বিশ্বের দরবারে ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি এক-প্রকার নাই বলিলেই হয়। এইরূপ দুর্ব্বল শাসন-তন্ত্রকে বজায় রাখিবার সহায়তা তিনি কিছুতেই করিতে পারেন না, কিন্তু শ্রমিক দল যদি বেশ ধীর ভাবে শাসন-ভার পরিচালন করেন তাহা হইলে উদারনৈতিক দল তাহাদের সমর্থন করিবেন।

শ্রমিকদলপতি র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ বলিতেছেন যে, শাসন ভার পাইয়া শ্রমিক দল অবিবেচকের ন্যায় কোনও কাজ করিবেন না। তাঁহারা বেশ ধীর ভাবেই ইংলণ্ডের মঙ্গল বিধানের জন্য চেষ্টা করিবেন। শ্রমিক দল স্থির করিয়াছেন যে মহাসভার কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য জগতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সম্রাট্ যে বক্তৃতা দেন তাহা আলোচিত হইবার সময় বর্ত্তমান মন্ত্রীসভার প্রতি মহাসভার আস্থাহীনতা জ্ঞাপন করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন; যদি উদারনৈতিক দল এই প্রস্তাবের প্রতিপোষকতা করেন তবে রক্ষণশীল দলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পরাজিত হইলে বল্ড্‌উইন্ মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। তখন শ্রমিক দলের প্রতি শাসনের ভার অর্পিত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু লর্ড রদারমিয়ারের কর্ত্তৃত্বাধীন যে সমস্ত রক্ষণশীল-মতাবলম্বী সংবাদপত্র আছে তাহারা একটি নূতন সুর তুলিয়াছে। ইহারা বলে যে র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের হস্তে ইংলণ্ডের শাসনভার পড়িলে অদূর ভবিষ্যতে যে বিপদ্ ইংলণ্ডে ঘনাইয়া উঠিবে তাহার কথা স্মরণ করিয়া পরাজয়ের বেদনা ভুলিয়া উদারনৈতিক দলকে সমর্থন করা রক্ষণশীল দলের কর্ত্তব্য। লণ্ডন সহরের রক্ষণশীল দলের সভা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অপর পক্ষের কাহার হস্তে শাসন-পরিষদ্ গঠনের ভার দেওয়া হইবে সে-সম্বন্ধে ইংলণ্ডের চিরাচরিত বিধি অনুসারে পদত্যাগের অনতিপূর্ব্বে বল্ড্‌উইন সাহেবের সম্রাটের সহিত যে মন্ত্রণা হইবে তাহাতে সংস্থিতিকে উপেক্ষা করিয়াও যেন বল্ড্‌উইন সাহেব উদারনৈতিক নেতা অ্যাসকুইথ্ সাহেবকে আহ্বান করিতে উপদেশ প্রদান করেন। সম্রাট্ কিন্তু পদত্যাগ-করা মন্ত্রীর মতানুসরণ করিতে বাধ্য নহেন। শ্রমিক দলের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে কাপুরুষের ন্যায় এইরূপ অন্যায় আচরণ দ্বারা যদি আট্‌কাইয়া রাখার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় দলাদলিতে সম্রাটের সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্বের দোষ অর্পিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া রক্ষণশীল দলের অনেকে আবার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লর্ড্ বিভারব্রুকের পরিচালিত ডেলি এক্স্‌প্রেস পত্র শ্রমিক দলকে এইরূপ ভাবে আট্‌কাইয়া রাখার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছে। এইরূপ অন্যায়ভাবে শ্রমিক দলকে শাসনাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে রাজ্যতন্ত্রের বিপদ সম্ভাবনা আছে বলিয়া ইহার বিশ্বাস।

কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায় হইতে লোক বাছাই করিয়া শাসন-পরিষদ্ গঠন করা শ্রমিকদলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ কিন্তু মন্ত্রীসভা গঠনের ভার পাইবার আশু সম্ভাবনা দেখিয়া ইতিমধ্যেই সে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; নিয়োগের আদেশ পাইলে যাহাতে শাসন-পরিষদের প্রত্যেক বিভাগেই উপযুক্ত লোক নিয়োজিত হয়েন তাহার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে শ্রমিক-মন্ত্রীসভাতে ভারত-সচিব হইবেন কর্ণেল জোসিয়া ওয়েজ্‌উড, পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার পাইবেন সিড্‌নি ওয়েব ও অর্থ-সচিব হইবেন ফিলিপ স্নোডেন। লর্ড সভার সরকারী প্রতিনিধি হইবেন লর্ড্ হ্যাল্‌ডেন ও তাঁহার সহকারী হইবেন লর্ড্ পার্‌মুর। আর্থার হেণ্ডার্‌সনকে মহাসভাতে নির্ব্বাচিত করিয়া লইবার চেষ্টা হইবে। ক্লাইনিস, ল্যান্‌স্‌বেরি, টমাস, স্যার প্যাট্রিক হেষ্টিংস্ ও হেণ্ডার্‌সনকে মন্ত্রীসভাতে গ্রহণ করা হইবে।

লর্ড্ গ্রে, লর্ড্ বাক্‌মাষ্টার, মিষ্টার সি আর বাক্‌স্টন প্রভৃতি যে-সব উদারনৈতিক নেতা উদারনৈতিক দলকে সার্ব্বভৌমিক উদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন তাঁহারাও শ্রমিক দলের সহিত একযোগে কাজ করিতে পারেন এবং মন্ত্রীসভায় ইঁহাদের স্থান হওয়াও সম্ভব।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—

রয়টার গুজব রটাইয়াছিল যে এই বৎসর একজন ভারতবাসী খুব-সম্ভব সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইবেন। কিন্তু এ বৎসর সাহিত্যের পুরস্কার পাইয়াছেন আইরিশ কবি উইলিয়াম বট্‌লার ইয়েট্‌স্।

ইয়েট্‌সের কবিত্ব এতদিন পর্য্যন্ত তেমন সমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বের দরবারে ইহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ নোবেল পুরস্কার পাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সময় সময় তেমন অসামান্য প্রতিভা না থাকিলেও যদি কোনও সাহিত্যসেবী তাঁহার দেশের সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমাদৃত করিবার জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। মিস্ত্রাল প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন না। কিন্তু প্রভেন্সাল প্রদেশের গ্রাম্য সাহিত্য ইঁহার প্রভাবে এমনই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে যে বিশ্বের সভাতে প্রভেন্সাল ভাষার আদর হইয়াছে যথেষ্ট। সেইজন্য নোবেল কমিটি তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া অভিনন্দিত করেন। কেল্‌টিক জাতীয় অভ্যুত্থানের ঋত্বিক্ কবিবর ইয়েট্‌স্‌কেও আইরিশ জাগরণের পুরোহিত বলিয়াই আজ এই সম্মান প্রদত্ত হইয়াছে।

ইয়েট্‌সের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কবি সিন্‌জে, লেডি গ্রেগ্‌রি, পাড্‌রেইক ওকনোর, জর্জ্জ্ রাসেল, জর্জ্জ মুর প্রভৃতি সাহিত্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের সাহচর্য্যে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইয়েট্‌স্ আইরিশ জাতীয় অভিনয়শালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাব্যে সাহিত্যে শিল্পে জাতীয় ভাব ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ইহাঁরা তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। আজ আইরিশ জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং বিশ্বের দরবারে আইরিশ সাহিত্য অভিনন্দিত হইয়াছে। কিন্তু যে বন্ধুসভা আয়ার্‌ল্যাণ্ডে নব আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছিলেন আজ তাঁহাদের

সাহিত্যসাধনা নিভিয়া আসিয়াছে। সিন্‌জে জীবিত নাই, রাসেল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, লেডি গ্রেগ্রারি অবসর-সুখ সম্ভোগ করিতেছেন, পাড্‌রেইক ওকোনর শিশু-দিগের মনোরঞ্জনার্থ গল্পরচনায় ব্রতী হইয়াছেন।

ভাগ্যবিধাতা কিন্তু ইয়েট্‌সের প্রতি সুপ্রসন্ন। আইরিশ স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই নানারূপ রাজসম্মান লাভ ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। ডাব্‌লিনের টি নিটি কলেজ হইতে ইনি ডক্টর অব্‌ লিটারেচার অর্থাৎ সাহিত্যাচার্য্য উপাধি লাভ করিয়াছেন। আইরিশ মহাসভার সভ্যরূপে মনোনীত হইয়া সুকুমার-কলাসচিব (minister of fine arts) হইয়াছেন।

যখন ইংরেজ-সরকারের সহিত আইরিশ জাতীয় দলের রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষ চলিতেছে তখন ইংলণ্ডেশ্বরের বিশেষ আগ্রহে প্রধান মন্ত্রী লয়েড্‌ জর্জ্জ ইয়েট্‌স্‌কে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহেন; কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক ইয়েট্‌স্‌ দেশবৈরীর এই আদর প্রত্যাখ্যান করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার প্রথম পুস্তক The Wandering of the Oisin প্রকাশিত হয়। Celtic Twilight, Countess Kathaleen ও Land of Heart's Desire নামক পুস্তকত্রয়ই অন্যান্য পুস্তক হইতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইনি একজন ভক্ত এবং রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজ-পাঠক-মণ্ডলে পরিচিত করাইতে যাঁহারা প্রথমে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ইয়েট্‌স্‌ তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান।

আইরিশ জাতীয় অভিনয়শালার প্রতিষ্ঠা-রজনীতে ইঁহার কাউন্টেস ক্যাথারিন নামক নাটক অভিনয় হয়।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর ভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

দ্বিতীয় অধিবেশন

প্রয়াগ

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সুনীল আকাশের নীচে কালিন্দীর হরিৎ-ক্ষেত্র-সুশোভিত তীরের উপরিস্থ মনোহর টুকার-হলে পৌষের মধ্যাহ্ন রবির সুমধুর উষ্ণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া সহস্র পরিমিত নর-নারী ও বালক-বালিকা লইয়া বন্দেমাতরম্‌ উদ্বোধন-সঙ্গীত ও বাগ্‌দেবী-বন্দনার পর এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অবসর-প্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি সার্‌ শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই অধিবেশনের পৃষ্ঠপোষকরূপে প্রতিনিধিগণ ও অপর অভ্যাগত ভদ্রমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা করেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাষার সংরক্ষণের জন্য এবং পরস্পরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এতদিন যে এরূপ কোন চেষ্টা হয় নাই সেজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

অতঃপর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজের অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি বলেন—"অদ্যকার এই জনহিতকর অনুষ্ঠান এদেশবাসী বাঙ্গালীর এক অক্ষয় কীর্ত্তি।" তাঁহার মতে পরস্পরের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়া প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা একান্ত আবশ্যক; এবং সাহিত্য-চর্চ্চাই ইহার প্রধান উপায়, কেন না "পৃথিবীতে যত জাতি উন্নত হইয়াছে তাহাদের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তাহাদের উন্নতি ও সভ্যতার মূলে একমাত্র সাহিত্যচর্চ্চা।" জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যদি সামাজিক উন্নতিও সংগঠিত হইতে পারে তাহা হইলে তিনি মনে করেন এই সম্মিলন মহিমামণ্ডিত হইতে পারিবে। এই অভিভাষণের পর অধিবেশনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক যুক্ত-প্রদেশের প্রধানতম হিসাব-রক্ষক (accountant general) দেওয়ান বাহাদুর রাজমন্ত্রী প্রবীণ শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার স্বরচিত ভাবপূর্ণ এক কবিতা আবৃত্তি করিয়া সম্মিলনের অভি-নন্দন করেন। তাঁহার মতে মাতৃসেবার জন্য প্রবাসী বাঙ্গালী অদ্য সমবেত হইয়াছে এবং যাহারা এই কার্য্যের জন্য অবসর করিতে পারে না তাহারা বাঙ্গালী নামের অযোগ্য।

অতঃপর কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য মহাশয় এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্মকথা, ইহার জীবনের উদ্দেশ্য এবং সিদ্ধিলাভের উপায় প্রাঞ্জলভাবে দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে রসাত্মক ভাষায়

বর্ণন করেন। "বিগত ফাল্গুন মাসে হিন্দু সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বারাণসী নগরীতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এই সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ভাব-বিনিময় দ্বারা পরস্পরের উন্নতি-সাধন এবং প্রবাসী বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালার ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখাই এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য।" তাঁহার মতে "প্রধানতঃ চাকুরিই বাঙ্গালীকে বঙ্গের বাহিরে আকৃষ্ট করিয়াছে। রাজশক্তির সহৃদয়তা ও সাহায্য ব্যতীত চাকুরিজীবীর আর্থিক সামাজিক বা পারমার্থিক উৎকর্ষ-সাধন বর্ত্তমান যুগে সম্ভবপর নহে। সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া বিংশ শতাব্দীতে সভ্যজগতের কোথাও কোন সম্প্রদায় জন্মগত অধিকারও লাভ করিতে পারে নাই। সম্প্রদায়-বিশেষের অভাব-অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিতে হইলে সম্মিলিত স্বরে আন্দোলন করা ইদানীং একটা প্রথা হইয়া উঠিয়াছে। এই-সকল কথার সত্যতা উপলব্ধির জন্য বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বল্পসংখ্যক বিদেশী বণিক্‌দিগেরও প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু সম্প্রদায় বা জাতির হিসাবে অগ্রণী ও অসংখ্য হইলেও এ-সকল প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর সে অধিকার নাই। পক্ষান্তরে বাঙ্গালা দেশে কেবল ইংরেজদিগের নহে, অবাঙ্গালী মাড়োয়ারী প্রভৃতি সম্প্রদায়-বিশেষেরও তত্রত্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। কোনরূপ সর্ব্বজনস্বীকৃত বাঙ্গালী-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ছিল না বলিয়া এবং বাঙ্গালীর জন্মগত উদ্যমশীলতার অভাব-বশতঃই প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে সামাজিক সুখ সুবিধা হইতেও প্রবাসীকে বিশেষ ভাবে বঞ্চিত হইতে হয়। ধনীদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে পুত্র-কন্যার বিবাহ এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রবাসে একমাত্র রাজার জাতিই নিজ মাতৃভাষার প্রচলন রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ক্রয় বিক্রয় বিদ্যালয় ও কার্য্যস্থল সর্ব্বত্রই প্রবাসী বাঙ্গালীকে হয় প্রাদেশিক ভাষা নয় রাজভাষা ইংরেজী ব্যবহার করিতে হয়। জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কোথাও যখন বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন হইতেছে না তখন অপরিহার্য্যভাবে প্রাদেশিক ভাষাই প্রবাসী বাঙ্গালী সন্তানের মাতৃভাষা-স্বরূপ হইয়া পড়িতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালী যদি এরূপে মাতৃভাষা বিস্মৃত হইয়া যায় তাহা হইলে বাঙ্গালার সহিত তাহাদের ভাবধারা স্থির থাকিতে পারে না, কেননা ভাষা-বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে, ভাষার ভিতর দিয়াই লোক ভাবিতে শিখে। এ-সকল সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে প্রবাসীর প্রতিনিধিগণকে একত্র হইয়া ভাবিতে হইবে। অদ্যাবধি প্রবাসী বাঙ্গালীর কোনরূপ সম্মিলন-ক্ষেত্র ছিল না; এই অচিরপ্রসূত সাহিত্য-সম্মিলনকে পরিপোষণ করিতে পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর সে অভাব দূরীভূত হইতে পারে।"

ইহার পর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করেন যে অসুস্থতাবশতঃ নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুপস্থিত এবং প্রস্তাব করেন যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের সমর্থনে এই প্রস্তাব স্বীকৃত হয়। অতঃপর তর্কভূষণ মহাশয় নির্ব্বাচিত সভাপতির অনুপস্থিতিতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। এলাহাবাদস্থ অশোক-স্তম্ভের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া তিনি বলেন যে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে এ-সকল প্রদেশের সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থও বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্যাদির লীলাক্ষেত্র। বাঙ্গালীর অক্ষয় কীর্ত্তি এ-সকল প্রদেশের অপরাপর স্থানেও আছে। এজন্য অহঙ্কার করা উচিত নহে; গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক। এ-সকল-প্রদেশ-বাসীর সহিত বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া যাহাতে বাঙ্গালী নিজের বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, সে উপদেশই তিনি সকলকে দিতে চাহেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নিবেদন' নামক অভিভাষণ শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ

মুখোপাধ্যায় ভাবপ্রবণতার সহিত পাঠ করেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ পরে মুদ্রিত হইবে।

ইহার পর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে অভ্যর্থনা-সমিতির উপস্থিত সভ্যগণ ও অভ্যাগত প্রতিনিধিগণ লইয়া বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি গঠিত হয়। পক্ষান্তরে এই সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ লইয়া 'সম্মিলনের নিয়মাবলী [সংগঠন', 'আলোচ্য প্রস্তাবসমূহ নির্দ্ধারণ' ও 'প্রাপ্ত প্রবন্ধসমূহ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণার্থ' তিনটি শাখা সমিতি গঠিত হয়। সায়াহ্ন সাত ঘটিকা হইতে টুকার-হলে সান্ধ্যসম্মিলন হয়। শাখা সমিতির সিদ্ধান্ত-সকল পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ নয় ঘটিকার সময় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির এক সাধারণ অধিবেশনে মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত আলোচিত হয়।

পরদিবস ১১ই পৌষ অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা 'বঙ্গ আমার জননী আমার' এই সঙ্গীতের পর অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে সভার প্রারম্ভেই উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা-সচিব রাজা পরমানন্দের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং এই সভার মন্তব্য সরকার বাহাদুর ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে প্রেরণ করিবার জন্য কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অতঃপর প্রাপ্ত প্রবন্ধ সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ উপলক্ষে কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় জ্ঞাপন করেন, যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার দেওয়ার যে প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে স্বীকৃত হইয়াছিল তাহা বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং প্রাচুর্য্য হিসাবে বিষয়-বৈচিত্র্য কম থাকায় প্রাপ্ত প্রবন্ধ-সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় নাই; সময়ের অভাব-বশতঃ ১৪টি মাত্র প্রবন্ধ সর্ব্বসমক্ষে পঠিত হইবে। সুদূর দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ হইতে 'উর্দ্দু' নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় প্রতিনিধি-রূপে এই সভায় উপস্থিত, এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে প্রতিনিধিগণ ও অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য-গণের আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয়।

সাড়ে চারি ঘটিকার সময় সঙ্গীতের পর পুনরায় সাধারণ সভার কার্য্যারম্ভ হয়। নির্ব্বাচিত বক্তা শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয়ের অনুপস্থিতি-বশতঃ ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এরূপ সম্মিলনের সার্থকতা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় বলেন যে "মিলনের দ্বারাই প্রাণের সঞ্চার হয় এবং বিভিন্ন ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি ও রক্ষাতেই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব।"

ইহার পর কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির নির্দ্ধারিত নিয়মাবলীর ও প্রস্তাবসমূহের আলোচনা করিতে সভাকে আহ্বান করেন। বহু আলোচনার পর মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এই সম্মিলনের স্থায়ী নাম "প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন" সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত হয় এবং রেজেষ্টারি করিবার জন্য অনুমোদিত হয়। আপাততঃ প্রয়াগেই কেন্দ্রস্থল করিয়া একাদশ জন নিম্নলিখিত সদস্য লইয়া এক পরিচালক-সমিতি নির্ব্বাচিত হয়।

১। সভাপতি—শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায়।
২। সহকারী সভাপতি—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ।
৩। কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত হরিমোহন রায়।
৪। সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নলিনবিহারী মিত্র।
৫। " "—শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
৬। সাধারণ সভ্য—শ্রীযুক্ত বামনদাস বসু (প্রয়াগ)।
৭। " "—শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেন (লক্ষ্ণৌ)।
৮। " "—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন (কানপুর)।
৯। " "—শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কাশী)।
১০। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব।
১১। বর্ত্তমান অধিবেশনের কার্য্যাধ্যক্ষরূপে আধি-কারিক সদস্য—শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার আচার্য্য।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বর্গীয় অশ্বিনী-কুমার দত্ত, ৺ পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও ৺ মনোরমা দেবীর মৃত্যুতে সভা শোক

প্রকাশ করেন এবং কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহশয়ের অসুস্থতা-বশতঃ অনুপস্থিতির জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহার আরোগ্যলাভার্থ ৺ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোসক মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে সভাপতি, ইউয়িং কৃশ্চিয়ান কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ, অভ্যাগত প্রতিনিধিবর্গ ও স্বেচ্ছা-সেবকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সান্যাল ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর প্রতিনিধিগণের পক্ষ হইতে সুচারুরূপে অধিবেশনের কার্য্য সম্পাদনের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি, কার্য্যাধ্যক্ষ, স্বেচ্ছাসেবকগণ, সঙ্গীতকারকগণ ও স্থানীয় উপস্থিত মহিলাবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। "এমন বিরাট্ সম্মিলনের কার্য্য এত ধীরভাবে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন" বলিয়া কার্য্যাধ্যক্ষ ও অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট আনন্দ প্রকাশ করিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহার শেষ বক্তব্যে বলেন যে "এরূপ সভা সম্মিলন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে—প্রবাসী বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে জাগরণ ও বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা।" কিন্তু এরূপ জাগরণের মধ্যে পাশ্চাত্য অনুকরণ দেখিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন, কেননা তাহাতে বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাঁহার মতে ধর্ম্মের ভিতরে সামঞ্জস্য আনয়নের চেষ্টাতেই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। তিনি ভাগবত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়া দেন যে "প্রাণী-দেহ ও জীব-শরীর মাত্রই ভগবদ্-বিকাশের আধার, মানবশরীর-সৃষ্টিতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে। শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া জীব-জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করাতেই সেই ভগবৎ-সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে। জাতীয় গৌরব-বোধ থাকা উচিত হইলেও এই জাতীয় জাগরণের দিনে বাঙ্গালীর পক্ষে আত্মশ্লাঘা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়"—এই অনুরোধ সভাতে জানাইয়া তিনি আপনার বক্তব্য শেষ করেন।

অবশেষে শ্রীযুক্ত ননীলাল দে মহাশয় দ্বারা 'ভারত আমার, ভারত আমার' এই সঙ্গীতের পর প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

শ্রী প্রসন্নকুমার আচার্য্য

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিশ্রঘাত

মিশ্রঘাত খেলিবার কালে সর্ব্বদাই "হাতকাটি" সুরক্ষিত রাখিতে হয়। সেইহেতু সাধারণতঃ শৃঙ্গ প্রায় সর্ব্বদাই দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধের সম্মুখে রাখিতে চেষ্টা করিতে হয়, এবং প্রায় সর্ব্বদাই স্বীয় শৃঙ্গ প্রতিপক্ষের লাঠির অগ্রগতির প্রতিরোধ-কল্পে তৎসম্মুখ বরাবরে ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়।

"মিশ্রঘাত"-সম্পর্কিত পাঠক্রম-মধ্যে যে আঘাত-গুলির সঙ্গে "+" চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের প্রতিরোধ শৃঙ্গ দ্বারা করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে "++" চিহ্ন যোজিত থাকিবে তাহাদের প্রতিরোধ শৃঙ্গ ও লাঠি উভয় একত্র করিয়া করিতে হইবে; যে আঘাতগুলির সঙ্গে কোন চিহ্নই যোজিত থাকিবে না তাহাদের প্রতিরোধ শুধু লাঠি দ্বারাই করিতে হইবে।

শিক্ষাভ্যাস-কালে প্রত্যেকটি ক্রমই প্রথমে দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে; পরে বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া সমসংখ্যকবার খেলিতে হইবে; তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে

এক ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও বাম হস্তে শৃঙ্গ এবং অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া প্রত্যেকটি ক্রম অভ্যাস করিবে। প্রত্যেকটি ক্রমই পর্য্যায়ক্রমে সমসংখ্যকবার দক্ষিণ ও বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া খেলিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+	১। গ্রীবান+
২। হাতকাটি	২। হাতকাটি
৩। কোমর, শির+	৩। কোমর, শির+

(বিপরীতারম্ভ)

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+	১। গ্রীবান+
২। হাতকাটি	২। হাতকাটি
৩। চাপ্‌নি, ভুজ, শির+	৩। চাপ্‌নি, ভুজ, শির+

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

এ স্থলে "শির"এর প্রতিকার লাঠি দ্বারা কিম্বা শৃঙ্গ দ্বারা উভয় রকমেই হইতে পারে।

তৃতীয় ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+	১। গ্রীবান+
২। কোমর	২। কোমর
৩। হিমাএল্+	৩। হিমাএল্+
৪। ভাণ্ডার, মোঢ়া, সাও্+	৪। ভাণ্ডার, মোঢ়া, সাও্+

(বিপরীতারম্ভ)

চতুর্থ ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+	১। গ্রীবান+
২। হাতকাটি	২। হাতকাটি
৩। অন্তর+	৩। অন্তর+
৪। কোমর, উল্টামোঢ়া+	৪। কোমর, উল্টামোঢ়া+,
৫। শৃঙ্গবাহী‡	৫। শৃঙ্গবাহী‡
৬। চাকি+	৬। চাকি+

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

শৃঙ্গবাহী = শিফর্‌কাদাঁও

পঞ্চম ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)		(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+		১। গ্রীবান+
২।	ভাণ্ডার+ (চৌমুখী)	
৩।	বাহেরা+ (চৌমুখী)	
৪। দিগর		৪। শির+

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

"শিরের" প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠি স্বকীয় বাম দিক্ হইতে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে।

ষষ্ঠ ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+	১। গ্রীবান+
২। বাহেরা‡, তামেচা‡	২। বাহেরা‡, তামেচা‡
৩। চাপ্‌নি	৩। সাও্+
৪। আসর	৪। উল্টামোঢ়া+, কোমর
৫। হাতকাটি+	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

হাতকাটির প্রয়োগ নিমিত্ত লাঠির অগ্রবিন্দু পিছন হইতে উপরে তুলিয়া মাথার উপর দিয়া ঘুরাইয়া স্বকীয় বাম দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

সপ্তম ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হিমাএল্+	১। হিমাএল্+
২। ভুজ+	২। ভুজ+
৩। আসর্	৩। আসর্
৪। উত্তর আনি	৪। তরাস

(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

"উত্তর আনির" প্রতিকার কল্পে নিজ লাঠি নিম্নমুখ করিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিম্নের দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

অষ্টম ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। তেওয়র+	১। তেওয়র+
২। ভর্জ্জা‡, উল্টামোঢ়া ‡, বাহেরা ‡,	২। ভর্জ্জা‡, উল্টামোঢ়া ‡, বাহেরা ‡
৩। সাকেন্	৩। হালুকুম ‡, কোমর, হাতকাটি পোস্ৎ+
৪। ভুজ+	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

এ স্থলে "হাতকাটি পোস্ৎ" অসিপৃষ্ঠ দ্বারা প্রয়োগ করিতে হইবে।

নবম ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটি পেশ ‡	১। শৃঙ্গবাহী ‡
২। উল্টামোঢ়া ‡	২। চাকি+
৩। শির+	(বিপরীতারম্ভ)

দশম ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ্

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হিমাএল্+	১। হিমাএল্ +
২। মন্+	২। মন্+
৩। চাকি+, চাপ্নি, শৃঙ্গবাহী ‡	৩। চাকি+, চাপ্নি, শৃঙ্গবাহী ‡
৪। গ্রীবান+	৪। গ্রীবান+
৫। হুল	৫। (তরাস)
	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

এ স্থলে "হুলের" প্রতিকার-কল্পে নিজ লাঠি নিম্নমুখ রাখিয়া প্রতিপক্ষের লাঠির নিম্নের দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

একাদশ ক্রম

ঠাট্ দোয়াঙ্গ

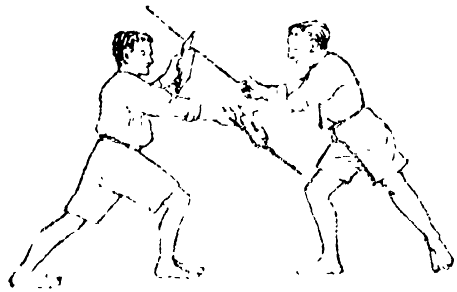
(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+	১। গ্রীবান+
২। শৃঙ্গবাহী ‡	২। শৃঙ্গবাহী ‡
৩। উল্টামোঢ়া ‡, অঙ্ক্	৩। উল্টামোঢ়া ‡, অঙ্ক্
৪। মোঢ়া, কোমর+	(বিপরীতারম্ভ)

দ্বাদশ ক্রম

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। আনি	১। (তরাস) চাকি+
২। হাতকাটি অধঃ ‡	২। হুল (জার্ব্ব)
৩। ভুজ+	৩। ভুজ +
৪। পালট (আলীঢ়) +	৪। (আলীঢ়) শির +
৫। (ঠাট্) হালুকুম ‡	(বিপরীতারম্ভ)

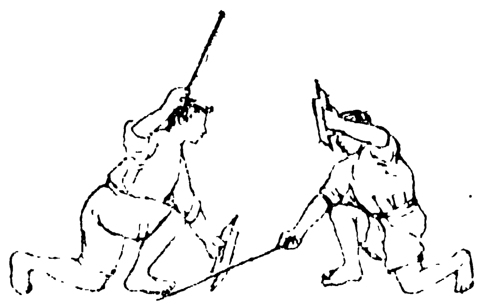
বর্ণনা:—এ স্থলে "আনির" প্রতিকার-কল্পে নিম্ন দিক্ হইতে, কিন্তু "হুলের" প্রতিকার-কল্পে উপর দিক্ হইতে আঘাত করিতে হইবে।

হাতকাটি অধঃ—হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকে মণিবন্ধে আঘাত।



হাতকাটি অধঃ—বাম দিকে লোক আঘাত করিতেছে

আলীঢ়—বাম হাঁটু, জঙ্ঘা ও পদ পশ্চাৎ দিকে ভূমিতে বিন্যস্ত, দক্ষিণ পদ সম্মুখে ভূমিতে স্থাপিত, জঙ্ঘা ভূমির উপরে লম্ব বরাবরে এবং জানুসন্ধি ভঙ্গ করিয়া সমগ্র উরুদেশ ভূমির সমান্তরালে, ও শরীর ভূমির উপর প্রায় লম্ব বরাবরে ঈষৎ সম্মুখে ঝুঁকিয়া থাকিবে।



আলীঢ় (পালট)

ত্রয়োদশ ক্রম

ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। (অবনমন) গল আনি+	১। (তুরন্ত) হাতকাটি+
২। (তুরন্ত) কণ্ঠা	২। (অবনমন) করক
৩। (উভয়ে) তামেচা	

(উভয়ে অবনমন)

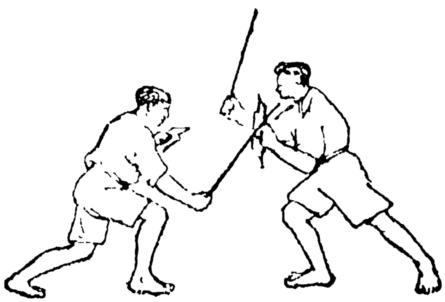
৪। (উভয়ে) চাপ্‌নি+ (চৌমুখী)
৫। শির　　(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

অবনমন=শরীর অপসারিত করিয়া (সাধারণতঃ বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া) প্রতিপক্ষের আঘাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া।

তুরন্ত=তন্মুহূর্ত্তে।

"গল-আনি"=কণ্ঠনালী ও মস্তকের সন্ধিস্থলের সম্মুখ বরাবরে অসির অগ্রবিন্দু বক্রভাবে ঊর্দ্ধমুখে মস্তক-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।



গল—আনি

কণ্ঠার প্রতিকার-কল্পে শরীর একটু পিছনে অপসারিত করিয়া "অবনমন" করিতে হইবে।

চতুর্দ্দশ ক্রম

ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ্‌

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান+	১। গ্রীবান +
২। হাতকাটি	২। হাতকাটি
৩। মন্‌ +	৩। মন্‌ +
৪। কোমর	৪। কোমর
৫। পালট্‌	৫। পালট্‌
৬। পোস্‌ৎপা	৬। পোস্‌ৎপা
৭। হিমাএল্‌+	৭। হিমাএল্‌ +
৮। হাল্‌কুম	৮। (অবনমন)
৯। শির	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

"হাল্‌কুম" প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত অসি ভূমির সমান্তরাল ভাবে নিজ বাম পার্শ্বের পিছনে লইয়া হস্তের মুষ্টি ঘুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা যথাস্থানে আঘাত করিতে হইবে।

পঞ্চদশ ক্রম

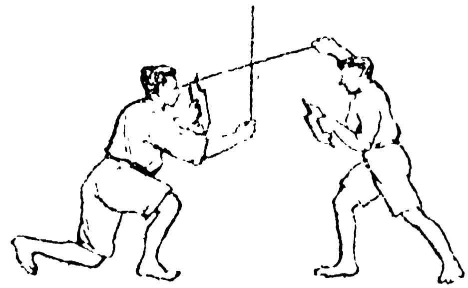
ঠাট্‌ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। কোমর+	১। জবেগা+
২। চাপ্‌নি	২। শৃঙ্গবাহী ‡
৩। আনি দক্ষিণ চক্ষু	৩। (ঊর্দ্ধতরাস) (অবনমন) হিমাএল্‌
৪। (অবনমন) শির	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

আনি দক্ষিণ চক্ষু=দক্ষিণ চক্ষুর মধ্যে আনির ন্যায় প্রয়োগ।

ইহার প্রতিকার-কল্পে লাঠি নিম্নমুখ হইতে ক্রমে ঊর্দ্ধমুখ করিয়া নিম্নের দিক্‌ হইতে আঘাত করিয়া (ঊর্দ্ধতরাসে) প্রতিপক্ষের লাঠি ঈষৎ ঊর্দ্ধে ও তাহার বামে দূর করিয়া দিতে হইবে।



আনি দক্ষিণ চক্ষু

ষোড়শ ক্রম

ঠাট্‌ দোয়াঙ্গ্‌

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। আনি	১। হাতকাটি+
২। শৃঙ্গবাহী‡	২। শৃঙ্গবাহী, বাহেরা+, করক
৩। শির+, কোমর, দিগর, হিমাএল্‌+	৩। চাকি+
৪। শির+	(বিপরীতারম্ভ)

সপ্তদশ ক্রম

ঠাট্‌ গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভর্জ্জা‡	১। (তুরন্ত) অঙ্ক্‌
২। হাতকাটি‡, শৃঙ্গবাহী‡, ছাপ্‌কা‡	২। তুরন্ত ধুনিয়াকরক, চাপ্‌নি।
৩। (তুরন্ত) মন্‌ (তুরন্ত) উল্টাহাল্‌কুম	৩। (তুরন্ত তরাস) (তুরন্ত) চাকি+
৪। (তুরন্ত) শির+	(বিপরীতারম্ভ)

অষ্টাদশ ক্রম

ঠাট্ পাখ্‌রী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। চাপ্‌নি (ধাঁধা) (তুরন্ত) অন্তর+	১। অন্তর+
২। উল্টা জবেগা (ধাঁধা)	২। (অবনমন)
৩। আসর্	৩। (তুরন্ত) দো
৪। (সশৃঙ্গে) (লাঠি অভ্যন্তরে) হাতকাটি পেশ ও গ্রীবানা	৪। (সশৃঙ্গে প্রতিকার) (লাঠি বহির্দ্দিকে) (বিপরীতারন্ত)

বর্ণনা :—

"ধাঁধাঁ"=কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঘাত করিবার ভাণ করিয়া অন্যত্র আঘাত করা, কিম্বা করিবার উদ্যোগ করা।

"সশৃঙ্গে" আঘাতের প্রয়োগ কিম্বা প্রতিকারের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিপক্ষের লাঠি হস্তচ্যুত করার চেষ্টার অভিসন্ধি হেতু লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া হস্ত চালনা।

উনবিংশ ক্রম

ঠাট্ পাখ্‌রী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শৃঙ্গবাহী	১। তামেচা
২। উল্টাহাল্‌কুম্+ তেওয়র (তরাস) + শির (ধাঁধা) (আচক্রবা) উদর+ (সহ) (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) উল্টামোড়া+	২। (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) রোক্‌সার+ (সহ) ছাপ্‌কা
৩। চক্রিকা (দ্বিসম্ভব)	৩। চক্রিকা (দ্বিসম্ভব)
৪। সাকেন (দ্বিসম্ভব)	৪। সাকেন্ (দ্বিসম্ভব)
৫। শির্+	(বিপরীতারন্ত)

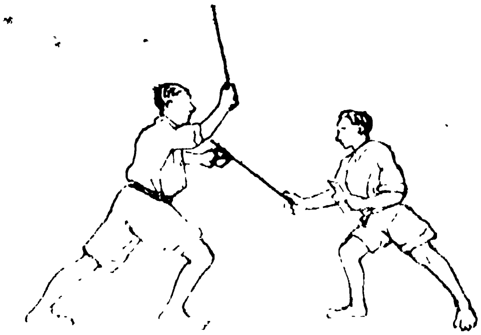
বর্ণনা :—

"আচক্র বা"=হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া অসির অগ্রভাগ দ্বারা আঁচড় অর্থাৎ "তরাসে" ক্ষুদ্র আঘাত। উদর=বুক-পাত হইতে নাভি পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলা।

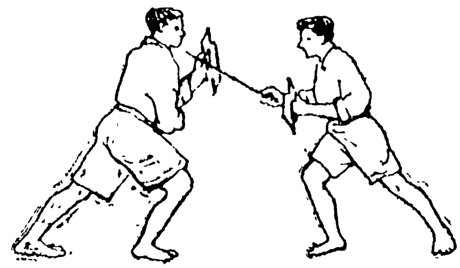
রোক্‌সার=কর্ণমূলের নিম্ন হইতে দক্ষিণ গলদেশে চোয়ালের অস্থির সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া ফেলা।

চক্রিকা=বাম মস্তক পার্শ্বের অস্থি যে-স্থলে নিম্নের দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তথায় আঘাত করিয়া দক্ষিণ কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্নে ছেদন করিয়া অসি নির্গত হইয়া যাইবে।

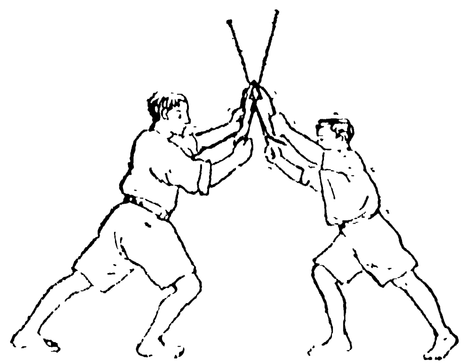
দ্বিসম্ভব=লাঠি ও শৃঙ্গ একত্র করিয়া প্রতিপক্ষের



উদর



বোক্‌সার



চক্রিকা (দ্বিসম্ভব)

কোনও আঘাত প্রতিহত করিয়া ঐরূপ একত্র অবস্থাতেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করার অভিপ্রায়ে।

বিংশ ক্রম

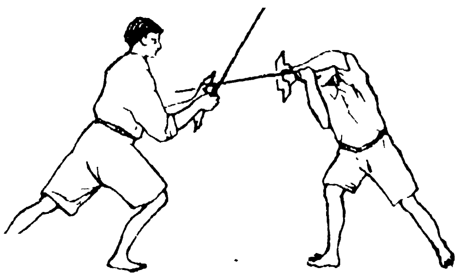
ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটি পূর্ব্বা (অসিকে নিম্নমুখে নিজ দক্ষিণ দিকে একটু ঝুলাইয়া বাম দিক্ হইতে তুলিয়া ঘুরাইয়া অসিপৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে)	১। ভর্জ্জা+, উল্টাহাল্‌কুম+ (পশ্চাদ্বর্ত্তী পদ পুরোবর্ত্তী, পদের পশ্চাতে লইয়া অসি-পৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে)

২। কণ্ঠা (ধাঁধাঁ), তামেচা +, পালট (আলীঢ়)	২। উল্টামোটা +, চাপ্‌নি (তরাস), হাতকাটি পেশ (ধাঁধঁ), হস্কুব ‡
৩। (গুরু বন্ধন)	৩। (অনুমোক্ষণ) (বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

হাতকাটি পূর্ব্ব = হস্তের মণিবন্ধের বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকে আঘাত।



হাতকাটি পূর্ব্ব

গুরুবন্ধন = নিজ শৃঙ্গ ও অসি দ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে জোরে চাপিয়া ধরা।

অনুমোক্ষণ = নিজ শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসি ও শৃঙ্গকে ঠেলিয়া ধরিয়া "গুরুবন্ধন" হইতে নিজ অসিকে মুক্ত করিয়া আনয়ন।

একবিংশতি ক্রম

ঠাট্‌ গোমুখ

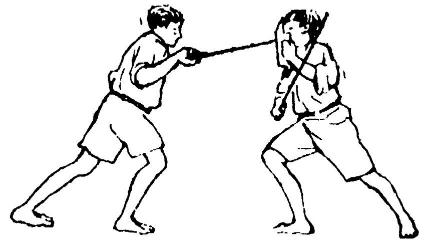
(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। বাহেরা +, বুচ্‌ (তরাস) (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) অধর + (অভিযান স্থিতি)	১। উত্তরচক্ষু আনি ‡
২। (গুরু বন্ধন)	২। (অনুমোক্ষণ) পালট্‌, চির (তরাস) জবেগা (তরাস) +
৩। (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) চাকি +	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

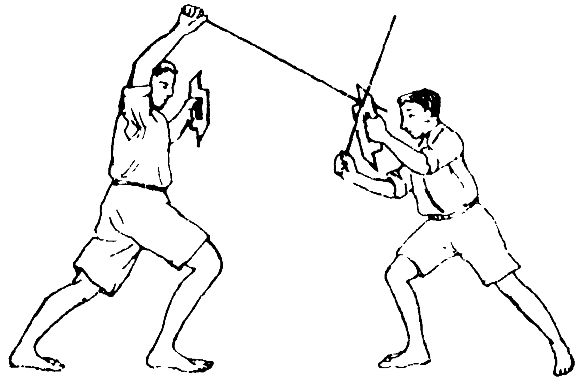
"অধর" = প্রতিপক্ষের দক্ষিণ দিক্‌ হইতে অধরোষ্ঠ ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে।

অভিযান স্থিতি = কিল্লাবন্দী।

উত্তর চক্ষু আনি = বাম চক্ষুর মধ্যে 'আনির' ন্যায় প্রয়োগ।



অধর (আচক্রবা)



নেত্রোপরি উত্তর আনি

দ্বাবিংশ ক্রম

ঠাট্‌ একাঙ্গ্‌ পাথ্‌রী

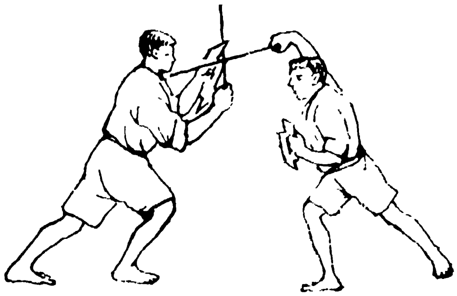
(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। (জার্ব্ব) ভজ্জা (ধাঁধাঁ), ভর্জ্জা ‡	১। সাকেন
২। (তুরন্ত) তেওয়র + (প্রতিপক্ষের পালট পার্শ্ব হইতে অসিকে নিজ শিরোপরি তুলিয়া "শির" মারিবার ভাণ করিয়া পুনরায় বামাবর্ত্তে নিজ শিরোপরি ঘুরাইয়া) (আচক্রবা, অসিপৃষ্ঠে) ঠোক্‌ ‡	২। উল্টাহালুক্‌ম্‌ + (পশ্চাৎ-স্থিত পদ পুরোবর্ত্তী পদের পশ্চাতে লইয়া অসিপৃষ্ঠ দ্বারা আঘাত করিতে হইবে)
৩। শৃঙ্গবাহী ‡	৩। শৃঙ্গবাহী ‡
৪। চাকি ‡	৪। (অসি নিজ শিরোপরি ঘুরাইয়া) হিমাএল্‌
৫। গলবিন্দু ‡	৫। (গুরুবন্ধন)
৬। (অনুমোক্ষণ)	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা :—

একাঙ্গ্‌ পাথ্‌রী = একাঙ্গের ঠাটে দাঁড়াইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী পদের অঙ্গুলীতে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে।

(প্রথম আরম্ভকালে জার্ব্বে ভর্জ্জার প্রয়োগের ভাণ করিয়া অসির গতি ঘুরাইয়া পুনরায় ভর্জ্জাতেই আঘাত করিতে হইবে।)

গলবিন্দু—গলদেশ ও বক্ষস্থলের সন্ধিমূলে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।



গলবিন্দু

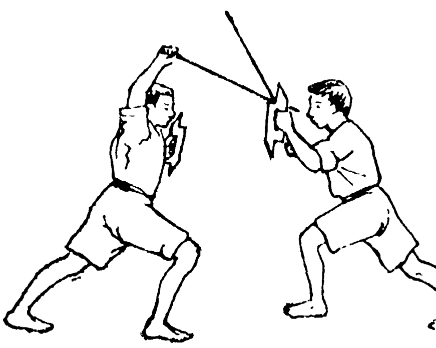
ত্রয়োবিংশ ক্রম

ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। উল্টাইয়ক্মা ⁞, হাতকাটি +, উত্তর চক্ষু আনি ¦, শৃঙ্গবাহী ‡	১। দক্ষিণ চক্রিকা, শৃঙ্গবাহী (ধাঁধাঁ) হাতকাটি +, গ্রীবান ‡ (লাঠি শৃঙ্গের সম্মুখে)
২। সাকেন্	২। পৃষ্ঠদক্ষিণ ⊦, (পশ্চাদ্বর্ত্তী পদ শূন্যে)
৩। (প্রতিপক্ষের কোমর-পার্শ্ব হইতে অসি নিম্ন মুখে তুলিয়া) গ্রীবান্ (ধাঁধাঁ), ভাণ্ডার +	৩। তামেচা ⊦
৪। ভ্রুকুটী	৪। (অবনমন, উভয়ে) (আলীঢ়) বাহেরা
৫। (তুরন্ত) (আলীঢ়) বাহেরা +	(বিপরীতাবস্থ)

বর্ণনা :—

উল্টা ইয়কৃমা—দক্ষিণ স্কন্ধদেশের অস্থির এক অঙ্গুলী ঊর্দ্ধে অসির অগ্রবিন্দু প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে।



উল্টা ইয়কৃমা

দক্ষিণ চক্রিকা—দক্ষিণ মস্তক পার্শ্বের অস্থি যে স্থলে নিম্নের দিকে বক্র হইতে আরম্ভ করিয়াছে তথায় আঘাত করিয়া বাম কর্ণমূলের দুই অঙ্গুলী নিম্নে ছেদন করিয়া অসি নির্গত হইয়া যাইবে।



দক্ষিণ চক্রিকা

চতুর্ব্বিংশ ক্রম

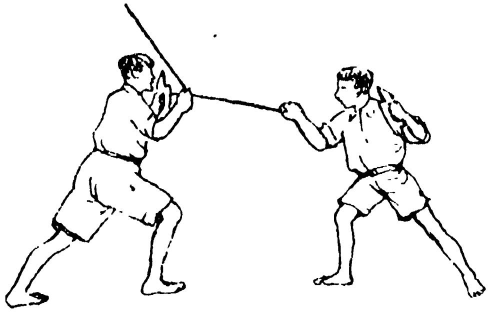
ঠাট্ পাথরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটি +	১। বাহেরা +
২। দে +	২। পৃষ্ঠ উত্তর ¦ (পশ্চাদ্বর্ত্তী পদ শূন্যে)
৩। হাল্কুম +, চাকি (তরাস) +, হুল্	৩। শৃঙ্গবাহী (ধাঁধাঁ) উল্টা রোক্সার্ +
৪। ভুজ (ধাঁধাঁ), (আচম্বা) উত্তর অধর +	৪। (অবনমন) দক্ষিণ চক্ষু আনি ‡
৫। বাহেরা (ধাঁধাঁ), উল্টা ভ্রুকুটী +	৫। তামেচা (ধাঁধাঁ), উল্টা হাল্কুম্ +, চির্ (বিপরীতাবস্থ)

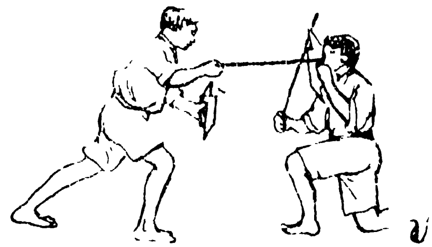
বর্ণনা :—

উল্টা রোক্সার—কর্ণমূলের নিম্ন হইতে বামগলদেশে চোয়ালের অস্থির সংযোগ-স্থলকে ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে।

উত্তর অধর—প্রতিপক্ষের বাম দিক্ হইতে অধরোষ্ঠ ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে।



উল্টা রোক্‌সার



উত্তর অধর

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

বিবিধ প্রসঙ্গ

"ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই"

"বেঙ্গলী" পত্রিকায় দেখা গেল, দেশবন্ধু দাশ কাকিনাড়া নিখিলভারত ছাত্রসমিতির অধিবেশনে বলিয়াছেন, "Everybody must have freedom. I want my freedom. I want the right to do what I think is best to my province," ইত্যাদি। অর্থাৎ "প্রত্যেকের স্বাধীনতা চাই। আমি আমার স্বাধীনতা চাই। বাংলা দেশের পক্ষে যাহা ভাল মনে করি, আমি তাহা করিবার স্বাধীনতা চাই।" ফরাসি সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুই বলিয়াছিলেন, "l'etat ? c'est moi !" "রাষ্ট্র ? আমিই ত রাষ্ট্র !" দেশবন্ধুর কথায় আমাদের সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুইর কথা মনে পড়ে। বাংলাদেশের পৌনে পাঁচ কোটি অধিবাসীর স্বাধীনতা বলিতে দেশবন্ধু যে তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তাঁহার নিজের স্বাধীনতা বুঝেন, এটা নিতান্ত কষ্ট-কল্পনা নয়। তাঁহার বাধ্য ও অনুগত মুষ্টিমেয় স্বরাজ্য-সদস্যদিগকে লইয়াই স্বগৃহে বসিয়া তিনি হিন্দু-মুসলমান-মীমাংসাপত্র বা রফানামা প্রস্তুত করিয়াছেন; সুতরাং ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক, যে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা চতুর্দ্দশ লুইর আদর্শ হইতে বিভিন্ন নহে।

কাকিনাড়া হইতে দেশবন্ধু যে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে, স্বরাজ্য দল একটি খস্‌ড়া রফানামা প্রস্তুত করিয়াছেন মাত্র, এবং "if any scheme is better than the one put forward by the Swarajya party, the Provincial Congress Committee and every Association must accept it।" অর্থাৎ দেশের লোকে যদি অন্য কোন উৎকৃষ্টতর রফানিষ্পত্তির প্রস্তাব উপস্থিত করে, তবে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি এবং প্রত্যেক সমিতি অবশ্য তাহা গ্রহণ করিবেন। অথচ কাকিনাড়া ছাত্র-সম্মিলনে তিনি বলিয়াছেন, "I shall not be crushed by a central organisation even of the Indian National Congress" অর্থাৎ জাতীয় মহা-সমিতির কোন কেন্দ্রীয় সংঘ যে তাহাকে পিশিয়া ফেলিবে, এটা তিনি সহ্য করিবেন না। তিনি জাতীয় মহা-সমিতির আদেশ মান্য করিবেন না, অথচ প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির আদেশ অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবেন, এটা কতদূর সম্ভবপর, তাহা বিবেচ্য। তবে প্রাদেশিক সমিতির নির্দ্ধারণটি দেশবন্ধুর মনোমত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা

স্বীকার্য্য। তাঁহার প্রচারিত রফানামার কোথায়ও একথা দেখিতে পাই না, যে, উহা একটি খসড়া মাত্র। তিনি constructive scheme চাহেন, অর্থাৎ এমন প্রস্তাব চাহেন, যাহা হিন্দু-মুসলমানের একতা সম্পাদনের সহায়তা করে। শ্রীযুক্ত আন্‌সারি ও লাজপত রায় মহাশয়-দ্বয়ের উপর এরূপ একটি national pact বা জাতীয় মীমাংসাপত্র প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত ছিল, এবং তাঁহারা কাকিনাড়া কংগ্রেসে যে খসড়াটি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে দেশবন্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দু-মুসলমানের পৃথক্ নির্ব্বাচন-নীতি সম্বন্ধে মণ্টেগু সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ২২৯ প্যারাগ্রাফে বলিয়াছেন, "it is difficult to see how the change from this system to national representation is to occur" অর্থাৎ এই ভেদমূলক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন হইতে জাতীয় নির্ব্বাচন-নীতিতে কি প্রকারে পৌছান যায়, তাহা বুঝা শক্ত। ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া, হিন্দুমুসলমান ভোটদাতাগণের একটি মিলিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া, প্রত্যেক হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধির উভয়ধর্ম্মাবলম্বী ভোটার দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিলে, কালক্রমে মুসলমান ও হিন্দুর স্থায়ী মিলনের পথ উন্মুক্ত থাকিবে, অথচ আপাততঃ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের নির্দ্ধারণানুসারে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের বাঞ্ছিত পৃথক্ নির্ব্বাচন-ক্ষেত্রও রুদ্ধ হইবে না। ইহাই প্রকৃতপক্ষে একমাত্র constructive scheme অর্থাৎ জাতিগঠনোপযোগী প্রস্তাব। দেশবন্ধু যদি ভেদমূলক নির্ব্বাচনপ্রথার গণ্ডী ব্যবস্থাপক সভায় আবদ্ধ রাখিয়া মুসলমান সভ্যদিগকে এরূপে তাহার গতিপরিবর্ত্তন করিতে সম্মত করিতে পারিতেন, তবেই মুসলমান 'স্বরাজ্যসভ্য' নাম সার্থক হইত, এবং তাঁহারা যে তাঁহার স্বরাজ্যদলভুক্ত, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার রফা-নিষ্পত্তির ফলে পৃথক্ নির্ব্বাচন-ক্ষেত্র কেবল ব্যবস্থাপক সমিতির কক্ষে আবদ্ধ না থাকিয়া গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন-কেন্দ্রগুলিতে পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; যে দলাদলি ও ভেদনীতি কেবল বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় সভাগৃহে প্রবেশলাভে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা এখন দেশময় প্রসারিত হইয়া সর্ব্বত্র ঈর্ষ্যাদ্বেষের ধূমায়িত বহ্নিকে প্রদীপ্ত দাবানলে পরিণত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। এই কারণে ও অন্যান্য বহু সঙ্গত কারণে প্রবীণ হিন্দু কংগ্রেসনেতাগণ দেশবন্ধুর প্রস্তাবিত মীমাংসার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলাদেশে স্বরাজ্যদলে প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ কেহই নাই, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহাদের অধিকাংশই অখ্যাতনামা। স্বরাজ্যদলের বাহিরে আর কোন হিন্দু নেতা দেশবন্ধুর রফানিষ্পত্তির সমর্থন করেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। তথাকথিত মুসলমান স্বরাজ্যসদস্যগণকে স্বীয় দলে রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু ঈদৃশ রফানামায় সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নহে। নিজের দলের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাহার দেশবাসীদিগের প্রকৃত স্বার্থ বলি দিয়াছেন, স্বরাজ্য-সভ্যগণ ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর হিন্দুগণই এরূপ মনে করিতেছেন।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অবশ্যই চাই, কিন্তু তিনি প্রকৃত পক্ষে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা চাহেন না, তিনি চাহেন স্বীয় দলের স্বাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি নিজের যা খুসি তাই করিবার অধিকার। রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতার দাবী করিলে দলগঠন করা চলে না; সেইজন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতকটা খর্ব্ব করিয়া দলের ঐক্য ও কার্য্যকরী শক্তি রক্ষা করা হয়। Party system বা দল গঠনের ও তদ্দ্বারা কার্য্য পরিচালনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথা বলা যায়; তবে এখানে মোটামুটি ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে, যতক্ষণ দলের বা সম্প্রদায়ের মত ব্যক্তিগত বিবেক বা বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া না উঠে, ততক্ষণ সঙ্ঘমতের নিকট আত্মমত বিসর্জ্জন না করিলে দল গড়িয়া তোলা যায় না। কিন্তু দল গড়িতে গিয়া কাহারও বিবেক বা ন্যায়বুদ্ধিকে বলিদান করা সঙ্গত নহে। দেশের কল্যাণকে দলের ক্ষুদ্র স্বার্থের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে দিলে দেশকে ত বঞ্চনা করা হয়ই, দলও বেশী দিন টিকিয়া থাকে না; কারণ

পরিণামে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। এক্ষেত্রে সেই সত্য এই, যে, হিন্দুমুসলমানের মিলন ব্যতীত স্বরাজ্য-সিদ্ধির অন্য পথ নাই এবং communal representation অর্থাৎ ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের নীতির বিস্তৃতি সেই মিলনের সেতু নহে, তাহার ঘোরতর অন্তরায়।

২১ পৌষ ১৩৩০। "মফস্বলবাসী"

—

সরকারী চাকরীর ভাগ

দেশে যাহারা সংখ্যায় বেশী, তাহারা নিজেদের সংখ্যার অনুপাতে সরকারী চাকরী পাইতে ইচ্ছা করিলে সে ইচ্ছাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না; তাহা খুবই স্বাভাবিক। সে-সম্বন্ধে কোন তর্কবিতর্কের প্রয়োজন নাই। কি উপায়ে তাহারা অধিকাংশ সরকারী চাকরী পাইতে পারে, কেবল তাহাই বিচার্য্য।

ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ রাষ্ট্রীয় হিসাবে যাহাকে বাংলা দেশ বলেন, আসল বাংলা দেশ তাহা অপেক্ষা বড়। যে ভূখণ্ডে বাংলা ভাষাই অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা, আসল বাংলা আমরা তাহাকেই বলি। এই আসল বাংলার শতকরা কয়জন হিন্দু কয়জন মুসলমান, তাহার বিচার না করিয়া, আমরা ইরেজের রাষ্ট্রীয় বাংলা-দেশকেই বাংলা বলিয়া ধরিয়া লইয়া দেখিতেছি, এখানে শতকরা ৫৩·৫৫ জন অধিবাসী মুসলমান। স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে কথা হইয়াছে, যে, মুসলমানদিগকে শতকরা ৫৫টি সরকারী চাকরী দিতে হইবে। এখন দেখা দরকার, যে, শতকরা ৫৫টি সরকারী চাকরী পাইবার মত যোগ্যতা মুসলমান সম্প্রদায়ের আছে কি না।

কিন্তু এরূপ কথা তুলিলেই মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে তর্ক উঠিতে পারে, "যোগ্যতার কথা কেন তোল? আমরা দলে পুরু; অতএব আমাদের যোগ্যতা কম হইলেও বেশীর ভাগ চাকরী আমাদিগকে দেওয়া উচিত।"

কোন্‌ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হাতে কত টাকার কত চাকরী গেল, বা কাহার হাতে কত ক্ষমতা গেল, এরূপ ভাগাভাগি রেষারেষির ভাব হইতে আমরা এই বিষয়টির বিচার করিতে অনিচ্ছুক। আমরা দেখিতে চাই, কিরূপ বন্দোবস্তে সমগ্র দেশ স্বাস্থ্যে জ্ঞানে ধনে শক্তিতে উন্নত হয়। তাহার আলোচনা করিতে গেলে অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দরকার। তাহার আগে একটা গোড়ার কথা বলি।

—

সব কাজেই যোগ্যতা চাই

ছোট বা বড়, সামান্য বা মহৎ, যে-কোন কাজই মানুষ করিতে চাক, তাহাতে সেই কাজের উপযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা, ক্ষমতার প্রয়োজন। যিনি কেবল কামারের কাজ জানেন, তিনি কুমারের কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল লাঠি চালাইতে জানেন, তিনি গোলন্দাজের কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল দিয়াশলাই ফেরী করিতে পারেন, তিনি দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে পারেন না; যিনি কেবল চীনের বাসনে জলখাবার পরিবেষণ করিতে পারেন, যিনি চীনের বাসন তৈরী করিতে পারেন না, তিনি কেবল শিক্ষকতা বা কেরানীগিরি করিতে পারেন, তিনি চিকিৎসা বা এঞ্জিনিয়ারিং করিতে পারেন না; যিনি কেবল গাড়োয়ানের কাজে দক্ষ, তিনি জাহাজের সেরাং বা মাল্লার কাজ করিতে পারেন না; যিনি কেবল চিকিৎসা জানেন, তিনি জজিয়তী করিতে পারেন না; এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক ওকালতী করিতে কিম্বা রাজমিস্ত্রী অধ্যাপকতা করিতে পারেন না; যিনি কেবল সঙ্গীতের ওস্তাদ্‌, তিনি যোদ্ধা ও সেনাপতির কাজ করিতে পারেন না; ইত্যাদি।

লেখাপড়া-জানা-সাপেক্ষ যে-সব কাজ আছে, তাহার মধ্যে কেরানীগিরি এবং মাষ্টারীকেই সাধারণতঃ লোকে খুব সোজা কাজ মনে করে। কিন্তু কেরানীগিরির জন্যও যে-সব পরীক্ষা লওয়া হইত বা হয়, তাহাতেও যাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ রকম শিক্ষা ও জ্ঞান বেশী, তাহারাই প্রতিযোগিতায় কাজ পাইত বা পায়। ইহাও জানা কথা, যে, কেরানীগিরিতেও ভাল কেরানী মন্দ কেরানী আছে। সুতরাং ইহা বুঝিতে বেশী কষ্ট হয় না, যে, ভাল-রকম কেরানীগিরি করাও যার তার সাধ্যায়ত্ত নহে। শিক্ষকতা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, ইহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান চাইই, অধিকন্তু

শিক্ষাদান-পদ্ধতি, শিশু, বালকবালিকা ও তরুণবয়স্ক ব্যক্তিদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানকে প্রয়োগ করিবার দক্ষতা চাই। এইজন্য পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে শিক্ষাদান (pedagogy) একটি বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান-সমষ্টি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উহা শিখাইবার জন্য বিস্তর শিক্ষালয় আছে, এবং উহার সম্বন্ধে প্রভূত আলোচনা ও গবেষণা হইতেছে।

কেরানীগিরি ও মাষ্টারী ছাড়া যে-সব সরকারী কাজ আছে, তাহাতে ত সাধারণ শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়া বিশেষ-রকম শিক্ষা ও জ্ঞান চাইই। যেমন, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষা, এঞ্জিনিয়ারিং, পশুচিকিৎসা, কৃষির উন্নতিসাধন, বিচার, ভূতত্ত্ব ও খনিজসম্বন্ধীয় কাজ, অরণ্য-বিভাগের কাজ, কল-কারখানা বিভাগের কাজ, স্থলযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ, আকাশযুদ্ধ, ইত্যাদি।

পুলিসের কাজ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর পুলিস কর্ম্মচারী-দের কাজ, সমাজে এখনও হেয় বিবেচিত হয়। তাহার কারণ সম্বন্ধে বিচার না করিয়া বলা যাইতে পারে, যে, পুলিসের কাজ, এমন কি নিম্নতম পুলিসের অর্থাৎ কন্‌ষ্টেবলের কাজ, করিতে হইলেও সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশের পুলিসের অন্য সব সভ্যদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অক্ষমতার একটা প্রধান কারণ তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার অভাব বা অল্পতা। কন্‌ষ্টেবলের কাজও যে-সে ভাল করিয়া করিতে পারে না।

গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে, এবং আগেও জানা ছিল, যে, যাহাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তাহারা সৈন্যসংখ্যা, অর্থবল, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের অন্য সরঞ্জাম, ইত্যাদিতে সমকক্ষ হইলেও, যে পক্ষের সৈন্যেরা বেশী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌, জিৎ সাধারণতঃ তাহারই হয়। এখানেও শিক্ষার প্রাধান্য দেখা যাইতেছে।

অতএব, সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে, যে, অন্য সব-রকম কাজের মত, সরকারী চাকরীও যে-রকমেরই হউক না, তাহাতে তদনুরূপ যোগ্যতার আবশ্যক। যোগ্যতার মধ্যে চারিত্রিক শক্তি আছে, স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে, শিক্ষা দ্বারা মার্জ্জিত বুদ্ধি আছে, সাধারণ ও বিশেষ শিক্ষা ও জ্ঞান আছে। মোটের উপর বলা যায়, যে, যোগ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয় শিক্ষার উপর। কতক শিক্ষা পরোক্ষভাবে পরিবার ও প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে লব্ধ হয়, বাকী শিক্ষালয় হইতে এবং পুস্তকাদি হইতে লব্ধ হয়।

—

ইতিহাসের সাক্ষ্য

এখন ইতিহাসের কথা বলি। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরাই যখন প্রধানতঃ ভারত-বর্ষের অধিবাসী ছিলেন, তখন তাঁহারা ও তাঁহাদের রাজারা বা শাসনকর্ত্তারা এমন ভাবে দেশের কাজ ও সমাজের কাজ চালাইতে পারেন নাই, যাহাতে দেশের সকল শ্রেণীর অধিবাসীদিগের সর্ব্ববিধ শক্তির বিকাশ হইতে পারে, এবং সকলের সমবেত শক্তি দেশহিত ও দেশরক্ষার কাজে প্রযুক্ত হইতে পারে। ভারতের প্রাচীন যুগ বলিতে বহুশতাব্দী বুঝায়। তাহার প্রত্যেক শতাব্দীতে দেশের প্রত্যেক অংশেই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক গঠন এবং উভয়ের কার্য্য সম্পাদনের রীতি এক-রকম ছিল না। কিন্তু মোটামুটি ইহা বলা যায়, যে, জাতিভেদ-প্রথা থাকার দরুন্‌, দেশের লোকদের মধ্যে যে-কেহ যে-কোন কাজ করিতে ইচ্ছুক, শক্তি ও যোগ্যতা থাকিলে সে তাহা করিতে পাইবে, এরূপ রীতি ভারতে সে পরিমাণে ছিল না, যে পরিমাণে উহা বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য দেশ-সকলে আছে। সেইজন্য দেশরক্ষার কাজ রাজাদের ও ক্ষত্রিয়দের ছাড়া যে অন্যদেরও কাজ, এই ধারণা জন্মে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাতি-ভেদ-প্রথা-রূপ কৃত্রিম প্রথা মানব-প্রকৃতিকে নষ্ট করিতে বা চাপা দিতে পারে না বলিয়া, আমরা ভারতের অতীত ইতিহাসে শূদ্র রাজা, ব্রাহ্মণ রাজা, প্রভৃতি দেখিতে পাই। মধ্যযুগে যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়াছিল, তখন, কেবল ক্ষত্রিয়েরাই রাজা ও যোদ্ধা হইবে, এই নিয়মের ব্যতিক্রম দ্বারা হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের এখানে মোটামুটি বক্তব্য এই, যে, হিন্দু জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতিদের দেশরক্ষার অক্ষমতার একটি কারণ এই, যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যোগ্যতমের আদর হইবে, এই আদর্শ স্থাপন করিবার চেষ্টা না করায় তাঁহারা অযোগ্য হইয়া পড়িয়া-

ছিলেন। সেই কারণে বিদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কমসংখ্যক মুসলমানেরা আসিয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। মুসলমানেরাও, দেশকে নিজের করিয়া লইয়া, সকলের সর্ব্ববিধ শক্তির বিকাশের ব্যবস্থা করিয়া, সকলকে সর্ব্ববিধ শক্তি বিকাশের সুযোগ দিয়া যোগ্যতমের আদর করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনের অধিকার দিতে পারেন নাই। এইজন্য মুসলমান রাজারা ও তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা বিধাতার তুলদাঁড়িতে অযোগ্য বিবেচিত হন। ইংরেজ বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজা হইয়াছিল এইজন্য, যে, মোটের উপর তাহাদের যোগ্যতা বেশী ছিল।

সংক্ষেপে, আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, রাষ্ট্রীয় ছোট বড় কাজ চালান, দেশের ছোট বড় কাজ চালান, যথাযোগ্য ভাবে যার-তার দ্বারা হয় না; কাহাকেও কোন একটা কার্য্যক্ষেত্রের সবটার বা কতকটার মালিক করিয়া দিলেই যে সে ঠিকমত কাজ চালাইয়া মালিকত্ব রাখিতে পারিবে, ইহা মনে করা খুব ভুল। হিন্দু জৈন বৌদ্ধ ত ভারতের সব কার্য্যক্ষেত্রের মালিক ছিল; কিন্তু সে মালিকত্ব গেল কেন? অযোগ্যতার জন্য। মুসলমান ভারতের অধিকাংশ প্রদেশের রাষ্ট্রীয় কার্য্যক্ষেত্রের মালিক ছিল। তাহা গেল কেন? অযোগ্যতা হেতু। মরাঠা ভারতের অনেক প্রদেশের প্রভু হইয়াছিল। প্রভু থাকিতে পারিল না কেন? অযোগ্যতার নিমিত্ত। ইহাই মোটামুটি উত্তর। জ্ঞান অর্জ্জন ও দানের, ধর্ম্ম আচরণ ও ধর্ম্মোপদেশ দানের পুরাপুরি অধিকার (শতকরা ৫৫ অংশ নহে) শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণের; রাজকার্য্য ও যুদ্ধের পূরা অধিকার (শতকরা ৫৫ অংশ নহে) শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয়ের। কিন্তু এসব কার্য্যক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম্মের ও জাতির (caste-এর) লোকেরাও বহু শতাব্দী হইতে ভাগ বসাইতে সমর্থ হইয়াছে কেমন করিয়া? অধিকতর যোগ্যতার দ্বারা। মুসলমান যখন এদেশ জয় করিলেন, তখন তিনি সরকারী কাজের শতকরা ১০০টিই, ৫৫টি নহে, স্বধর্ম্মীকে দিতে সমর্থ, ও অধিকারী ছিলেন; কিন্তু প্রভুত্বের সময়ও তাহা দিতে পারেন নাই। কারণ সব কাজ মুসলমানের দ্বারা চালাইবার মত নানা-প্রকারের শক্তি দক্ষতা যোগ্যতা মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। এইজন্য অনেক বড় বড় কাজ আওরংজীব বাদশাও হিন্দুকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান-শাসনকালের শেষ দিকে যখন মৈসূরের হিন্দুরাজবংশকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হাইদার আলী ও টিপু সুল্‌তান রাজত্ব করেন, তখনও তাঁহাদের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন পূর্ণিয়া—একজন হিন্দু। বঙ্গের শেষ নবাবদের রাজত্ব-কালেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা প্রভৃতির পদে যাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক হিন্দুর নাম দৃষ্ট হয়। আজকালকার দিনেও দেখিতে পাই, যখন কিছু কাল পূর্ব্বে বঙ্গের কোন কোন মুসলমান ধর্ম্মনেতা মুসলমান জমীদারদিগকে হিন্দু কর্ম্মচারী ছাড়াইয়া তাহাদের জায়গায় মুসলমান কর্ম্মচারী রাখিতে বলেন, তখন সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। আফগানিস্থানের বর্ত্তমান সুযোগ্য আমীরেরও একজন প্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান নিরঞ্জনদাস হিন্দু; কারণ সম্ভবতঃ আমীর তাঁহাকেই এই কাজের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করেন।

অতএব, আমরা ইহাই বলিতে চাই, যে, মুসলমানেরা শতকরা ৫৫টি কেন, শতকরা ৮০টি সরকারী কাজই প্রাপ্ত হউন, তাহাতে কোনই আপত্তি নাই; কিন্তু যোগ্যতা দ্বারা তাঁহারা উহা প্রাপ্ত হউন। যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য তাঁহাদিগকে শিক্ষা লাভের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হউক। সেইসঙ্গে হিন্দু সমাজের যে-সব জা'ত মুসলমানের চেয়েও শিক্ষায় পশ্চাদ্বর্ত্তী তাঁহাদিগকেও সুযোগ দেওয়া হউক।

—

হিন্দুদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

একজন শিক্ষিত মুসলমান খবরের কাগজে লিখিয়াছেন, যে, হিন্দুরা সব আফিস্ দখল করিয়া বসিয়াছে; তাহাদের বড়-বাবুরা যোগ্য মুসলমানকে চাকরী না দিয়া কেবল হিন্দুকেই চাকরী দেয়। কোন হিন্দু চাকর্‌্যের বা অনেক হিন্দু চাকর্‌্যের এইরূপ দোষ নাই, ইহা আমরা বলিতেছি না। মুসলমান চাকর্‌্যেদেরও অনেকের এই দোষ

আছে—কম, বেশী বা সমান আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু, কোন কোন স্থলে হিন্দু বা মুসলমান পক্ষপাতী হইলেও, সুবিস্তৃত দেশের হাজার হাজার চাকরীতে হিন্দুর পক্ষপাতিতায় মুসলমানরা যোগ্যতা সত্ত্বেও ঢুকিতে পারিতেছে না, ইহা নিতান্তই বাজে কথা (তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি);—বিশেষতঃ যখন কাজ দিবার আসল মালিক অধিকাংশ স্থলে ইংরেজ, এবং ইংরেজ কেবলই হিন্দুর অনুকূলে পক্ষপাতিত্ব করে, ইহা সত্য নহে।

স্বরাজ্য-দলের চুক্তিপত্রের স্থূল মর্ম্ম এই, যে, সর্কারী কাজের শতকরা ৫৫টি মুসলমান এবং ৪৫টি হিন্দু পাইবে। সর্কারী কাজ উচ্চ ও নিম্ন নানা রকমের আছে। এই কার্য্যবিভাগটাকে অনেকটা হিন্দুর বর্ণাশ্রম অনুযায়ী কার্য্যবিভাগের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হিন্দুর শাস্ত্র বলেন, রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ আদি রাষ্ট্রীয় কাজ ক্ষত্রিয়ের। স্বরাজ্য-দল বলিতেছেন, রাজ্যশাসন, রাষ্ট্রীয় কার্য্য সম্পাদন, দেশরক্ষা ইত্যাদি কাজের অর্দ্ধেকের উপর মুসলমানের; বাকি, অর্দ্ধেকের কম, হিন্দুর। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম হিন্দুর শাস্ত্রীয় কার্য্যবিভাগ মানে নাই বলিয়া বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী কার্য্যবিভাগ পুস্তকের পাতায় মাত্র আবদ্ধ হইয়া আছে; প্রাকৃতিক নিয়ম যোগ্যতমেরই অনুকূল বলিয়া স্বরাজ্য-দলের ফতোয়াও মানিবে না। যোগ্যতা অনুসারে হিন্দু মুসলমান প্রত্যেকেই ৪৫টি বা ৫৫টির বেশী বা কম পাইবে।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যে, সর্কারী কাজের যোগ্যতার ভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষা যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, সর্কারী কাজও তাহারা সেই পরিমাণে পাইবে। কোন কোন স্থলে হিন্দুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব হইয়া থাকিলেও, মোটের উপর যে অবিচার হয় নাই, তাহার একটা পরোক্ষ কিন্তু অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিতেছি। চিকিৎসা বিভাগের সর্কারী চাকরীতে নিযুক্ত ডাক্তার অপেক্ষা বেসর্কারী এলোপ্যাথী হোমিওপ্যাথী হাকিমী কবিরাজী প্রভৃতি নানা মতের চিকিৎসকের সংখ্যা ঢের বেশী। ১৯২১ সালের বঙ্গের সেন্সস্ রিপোর্ট্ অনুসারে চিকিৎসাদি কাজে নিযুক্ত কর্ম্মী ও পোষ্যের মোট সংখ্যা ১,৭৭,৩৬৯। তাহার মধ্যে ১,৪১,৩২৫ হিন্দু; ৩১,৭১৮ মুসলমান (অন্যান্য ধর্ম্মের লোকদের উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক)। হিন্দু অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু চিকিৎসাদি কাজে যত হিন্দুর জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাহার সিকি মুসলমানেরও হয় না। এখানে কেহ বলিতে পারিবেন না, যে, কেহ পক্ষপাতিত্ব করিয়া মুসলমানদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছে।

আইনের ব্যবসাও একটি "স্বাধীন" ব্যবসা। বঙ্গের ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে দেখিতে পাই, মোট ব্যারিষ্টার, উকীল, কাজী, মোক্তার ও রেভিনিউ এজেন্টের ও তাহাদের পোষ্যদের মোট সংখ্যা ৫৬,৯১৯। ইহার মধ্যে হিন্দু ৫০,৭৩১; মুসলমান ৫,৬০২। বঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশী; তাহারা হিন্দুদের চেয়ে মোকদ্দমাও কম করে না। অথচ আইনব্যবসায়ী মুসলমানের সংখ্যা ঐ-ব্যবসায়ী হিন্দুর চেয়ে খুব কম। উকীল ব্যারিষ্টারের মুহুরী, দর্‌খাস্ত-লেখক প্রভৃতির সংখ্যা মোট ৩০,৮৪০; তন্মধ্যে হিন্দু ২৬,১৮০, মুসলমান ৪,৫৭৭।

ধর্ম্মব্যবসায়ীর সংখ্যাও ধরুন। এই কাজে মুসলমান মুসলমানকে এবং হিন্দু হিন্দুকেই নিযুক্ত করিতে বাধ্য। মুসলমানের ধর্ম্মকর্ম্ম হিন্দু পুরোহিতের দ্বারা হইতে পারে না, এবং গবর্ণ্মেণ্ট্ কোন পরীক্ষা লইয়াও কোন্ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মব্যবসায়ী কে হইবে, ঠিক করিয়া দেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন-প্রকার পক্ষপাতিত্বের কথা উঠিতে পারে না। ধর্ম্মব্যবসায়ীর মোট সংখ্যা ৩,২০,৪৬৫। তাহার মধ্যে ২,৭৬,৫০৪ হিন্দু; ৩৮,০৯৩ মুসলমান।

অতএব, মোটামুটি দেখা গেল, যে, যে-সব "স্বাধীন" ব্যবসার কাজে অল্প বা বেশী লেখাপড়া জানা দর্‌কার, এবং যাহাতে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্বের কথা উঠিতে পারে না, বরং যাহাতে যোগ্যতাই টিকিয়া থাকিবার ও উন্নতি করিবার প্রধান উপায়, তাহাতে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা ঢের বেশী।

—

শিক্ষাসাপেক্ষ স্বাধীন ব্যবসায় ও সরকারী চাকরীর ভাগ

এখন দেখা যাক্, মুসলমানেরা অবাধ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপরিলিখিত কাজ-সকলে যতটা ভাগ পাইয়াছেন, কাহারও পক্ষপাতিত্বের দরুন্ সরকারী চাকরীর ভাগ তার চেয়ে কম পাইয়াছেন কি না।

সেন্সস্ রিপোর্টে সরকারী কাজকে দুটা প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—সরকারী বল বিভাগ (Public Force) এবং সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহ বিভাগ (Public Administration)। সরকারী বলের চারিটি ভাগ—স্থল-সৈন্য, নৌসৈন্য, আকাশসৈন্য, পুলিস্। সরকারী বল বিভাগে মোট সংখ্যা ১,৭৭,৬৫৭ ; হিন্দু ১১৩,০২৫, মুসলমান ৫৭,১৫১। কার্য্যনির্ব্বাহ বিভাগে মোট সংখ্যা ১,৪৪,২৬৯ ; হিন্দু ১,০৭,০৭২, মুসলমান ৩২,৪১৮।

আমরা উপরে দেখিয়াছি, এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথী ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, টীকাদার, কম্পাউণ্ডার, ধাত্রী, প্রভৃতির কাজ দ্বারা যত হিন্দুর জীবিকা নির্ব্বাহ হয় তাহার সিকি মুসলমানেরও জীবিকা নির্ব্বাহ তাহার দ্বারা হয় না। কিন্তু সরকারী বল ও সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহ, সরকারী চাকরীর এই দুই প্রধান বিভাগের দ্বারা যত হিন্দু পালিত হয়, তাহার সিকি অপেক্ষা অনেক বেশী মুসলমান পালিত হয়। অতএব, এই দুই ক্ষেত্রে মোটামুটি মুসলমানের যোগ্যতা অবহেলিত হয় নাই। উপরে আরো দেখিয়াছি, আইন-ব্যবসায়ে যত হিন্দু পালিত হয়, তাহার নবম অংশ মুসলমান পালিত হয়। সরকারী চাকরীতে মুসলমানের অনুপাত ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। উকীলের মুহুরী ইত্যাদি হিন্দু যত, মুসলমান তাহার সিকি। কিন্তু মুসলমান সরকারী চাকর্যে হিন্দু সরকারী চাকর্যের সিকির চেয়ে ঢের বেশী।

অতএব, দেখা যাইতেছে, শিক্ষাসাপেক্ষ "স্বাধীন" ব্যবসার ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতায় মুসলমান নিজের যোগ্যতার জোরে যে স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছেন, সরকারী চাকরীতে (হিন্দুর পক্ষপাতিত্ব মানিয়া লইলেও) তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থান পাইয়াছেন। সুতরাং ইহা নিশ্চিত, যে, যদি চাকরী-দাতা কোন কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা মুসলমানের অনুকূলে করিয়াছেন, প্রতিকূলে নহে।

—

রুশিয়ার দৃষ্টান্তের উপদেশ

রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবে সাম্রাজ্য বিলুপ্ত, অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ও মূলধনীরা ক্ষমতাচ্যুত এবং খুব বেশী পরিমাণে নিহত হইয়াছিল। যাহারা কৃষিকার্য্য, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও অন্যবিধ দৈহিক শ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা হয় এবং এক নূতন রকমের সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হইতে দিবার কোন ইচ্ছা ত তাহাদের ছিলই না; তাহারা ঐ শ্রেণীর লোকদের কোন সাহায্য লইবার ইচ্ছাও করে নাই। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল, কোন কোন কাজ ঐ শ্রেণীর লোকের সাহায্য ভিন্ন চলে না, তখন তাহারা তাহাদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। রুশিয়ার এই বল্‌শেভিক্‌রা কেবল যে সংখ্যায় অন্য সব রকমের অধিবাসীদের চেয়ে খুব বেশী ছিল, তাহা নহে; তাহারা বিপ্লবের দ্বারা সর্ব্বেসর্ব্বাও হইয়াছিল। তথাপি তাহারা সব রকম কাজ হস্তগত করিয়াও চালাইতে না পারিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইল। ইহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয়, যে, সব কাজ দখল করিবার ক্ষমতা ঘটনাচক্রে হস্তগত হইলেও সব কাজ করিবার মত যোগ্যতা না থাকিলে তাহা নিজেদের হাতে রাখা যায় না। সেইরূপ, শতকরা ৫৫টি সরকারী কাজ বাঙ্গালী মুসলমানরা হস্তগত করিবার ক্ষমতা পাইলেও, তাহার সবগুলি ভাল করিয়া করিবার মত যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য লোক মুসলমান-সমাজে এখন নাই। তাঁহারা বলিতে পারেন, "স্বরাজ পাইতেও ত দেরী আছে; ততদিনে যথেষ্ট যোগ্য লোক আমাদের মধ্যে হইবে।" তাহার উত্তরে বলি, যোগ্য লোক যথেষ্ট হইলে কাজও তাঁহারা যথেষ্ট পাইবেন; কারণ, এখনই ত (উপরিলিখিত সেন্সস্ হইতে গৃহীত অঙ্কগুলি দ্বারা দেখান হইয়াছে, যে,) মুসলমানেরা

তাঁহাদের সম্প্রদায়ের যোগ্যতার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী সরকারী কাজ তাঁহারা করিতেছেন। সুতরাং এখন হইতেই কাজ ভাগাভাগি সম্বন্ধে ঝগড়া বাধান উচিত নহে। তা ছাড়া, কাগজে দেখা গেল, মুসলমানেরা স্বরাজের অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত নহেন; শীঘ্রই ইংরেজ-রাজত্বকালেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহাদের তরফ হইতে এই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইবে, যে, বঙ্গের সব সরকারী কাজের শতকরা ৫৫টি তাঁহাদিগকে দেওয়া হউক।

—

অমুসলমানেরা চাকরীর ইচ্ছা ছাড়ুন

বস্তুতঃ, গবর্ণমেণ্টের কূটনীতির জয়ের জন্য মুসলমানদের ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করা যদি এখন বা অন্য কোন সময়ে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উহা গৃহীত হইবে। এইজন্য হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সরকারী চাকরীর প্রত্যাশা যাঁহারা যতটা করেন, তাহা এখন হইতেই ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। আর, বরাবর ত অন্য নানা কারণেও চাকরী না করিয়া স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিতে দেশহিতৈষীরা সুপরামর্শ দিয়া আসিতেছেন। মাড়োয়ারীরা চাকরীর প্রত্যাশা করে না। তাহাদের টাকা ও ক্ষমতা কম নয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে ভাটিয়া, কচ্ছী, সিন্ধী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী, প্রভৃতিরাও আসিয়া বঙ্গে ধনশালী হইতেছে। মাড়োয়ারীদের ও ইঁহাদের অনেকে মূলধন লইয়াও আসে নাই। অতএব মূলধনহীন বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত লোকদের চাকরী না করিয়াও অন্নের সংস্থান করা অসম্ভব নহে। মুসলমানেরা যোগ্যতম না হইয়াও যদি এখন অনেক বৎসর সমুদয় চাকরী বা শতকরা ৭০।৮০টি চাকরী পাইতে থাকেন (কারণ, এইরূপ বেশী সংখ্যায় তাঁহাদিগকে চাকরী না দিলে সব চাকরীর শতকরা ৫৫টি তাঁহাদের হস্তগত হইতে বহু বিলম্ব ঘটিবে), তাহা হইলে উহা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর না হইলেও, অমুসলমান শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এক হিসাবে শাপে বর হইতেও পারে, কারণ, তাঁহারা বাধ্য হইয়া স্বাধীন জীবিকার চেষ্টা করিবে, অনেকে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবে, এবং মোটের উপর তাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও স্বাধীনচিত্ততা বাড়িবে। মুসলমানরা কিছুদিন চাকরীর সুখ ভোগ করিবার পর তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হিতৈষী মনীষীরাও স্বাধীন জীবিকার সপক্ষে আন্দোলন জুড়িবেন।

—

শিক্ষার বিস্তৃতি ও চাকরীর অংশ

উপরে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, যে, আমাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা অনুসারে সরকারী কাজের ভাগ হওয়া উচিত নয়; যে সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ, সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে চাকরী করিবার ইচ্ছা থাকিলে, শিক্ষার বিস্তৃতির অনুপাতে চাকরী তাহারা স্বভাবতই পাইয়া থাকেন।

এখন আমরা দেখিতে চাই, মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ, সে অনুসারে তাঁহারা যথেষ্ট চাকরী পাইতেছেন কি না। সাধারণতঃ ২০ ও তদূর্দ্ধ বয়সের লোকেরাই চাকরী করেন, এবং আজকাল নিম্নতম শ্রেণীর কোন কোন কাজ ছাড়া ইংরেজী না জানিলে কোন চাকরী পাওয়া যায় না। অতএব, আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ২০ ও তদূর্দ্ধ বয়সের লিখনপঠনক্ষম ও ইংরেজী-জানা লোক বাংলাদেশে কোন্ সম্প্রদায়ে কত আছেন।

ঐ বয়সের লিখন-পঠনক্ষম পুরুষ		ঐ বয়সের ইংরেজী-জানা পুরুষ	
মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু
৯,১৭,৬৬০	১৮,৫৫,৫৭৬	৮১,৮০৩	৩,৭৭,৮৫৬

এই তালিকায় দেখিতেছি, মুসলমানেরা মোট লোকসংখ্যায় হিন্দুদের চেয়ে খুব বেশী হইলেও, তাহাদের মধ্যে চাকরীর বয়সের কেবলমাত্র মাতৃভাষায় চিঠি লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ পুরুষ হিন্দুদের অর্দ্ধেকের চেয়েও কম। ইংরেজী-জানা চাকরীপ্রার্থী লোক আজকাল বিস্তর থাকায় শুধু মাতৃভাষায়-লিখনপঠনক্ষম লোকদের চাকরী পাওয়া আজকাল সুকঠিন। পাইলেও তাহারা কনষ্টেবলীর

মত নিম্নশ্রেণীর কাজই পায়। পুলিসের ছোট বড় সব কাজে হিন্দু কর্ম্মী ও পোষোর সংখ্যা ১,১০,৪১৬, মুসলমান ৫৬,৬৬৭, গ্রাম্য চৌকীদারীতে হিন্দু ৭৯,৮২৬, মুসলমান ৪৪,৪৫৩। অর্থাৎ উভয় রকম কাজেই মুসলমান হিন্দুর অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী। কেবলমাত্র মাতৃভাষা-লিখন-পঠনক্ষম চাকরীর বয়সের মুসলমান পুরুষ হিন্দুদের অর্দ্ধেকেরও কম। সুতরাং ঐরূপ শিক্ষার উপযোগী সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি অবিচার হয় নাই। ইংরেজের সরকারী চাকরী করিবার প্রধান যোগ্যতা ইংরেজীর জ্ঞান। চাকরীর বয়সের ইংরেজী-জানা মুসলমান পুরুষদের সংখ্যা হিন্দুদের ঐ বয়সের ইংরেজী-জানা পুরুষদের সংখ্যার সিকিরও অনেক কম। কিন্তু সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহ (Public Administration) বিভাগসকলে হিন্দু ১,০৭,০১২, মুসলমান ৩২,৪১৮, অর্থাৎ হিন্দর সিকির অনেক বেশী। মুসলমানেরা মনে করেন, পুলিসের কাজে তাঁহাদের যোগ্যতা বেশী। পুলিসবিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, গ্রাম্য চৌকীদারীর অর্দ্ধেকের বেশী তাঁহাদের হাতে; উচ্চতর সমুদয় কাজের মধ্যে ৩০,৫৯০ হিন্দু; ১২,২১৪ মুসলমান, অর্থাৎ হিন্দর এক তৃতীয়াংশেরও বেশী।

দেখা গেল যে, শিক্ষার বিস্তৃতি দ্বারা যোগ্যতার পরিমাপ করিয়া তদনুসারে সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে মুসলমানের প্রতি অবিচার করা হয় নাই। বরং তাঁহাদের মধ্যে চাকরীর বয়সের লোকের শিক্ষিত অনুপাতে তাঁহারা চাকরী বেশীই পাইয়াছেন।

—

চারিত্রিক যোগ্যতা

আমরা পূর্ব্বে সরকারী চাকরীর যোগ্যতার বিষয় আলোচনা করিবার সময় বলিয়াছি, যে, সৎচরিত্রও যোগ্যতার একটি অঙ্গ। অর্থাৎ কাহাকেও চাকরী দিতে হইলে সে পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সত্যবাদী কি না, নেশা করে কিম্বা করে না, ঘুষ লইতে পারে কি পারে না, ইত্যাদিও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এখন একটা কথা উঠিতে পারে, যে, মুসমানেরা লেখাপড়ায় কিছু নিরেস হইলেও হিন্দুদের চেয়ে চরিত্রাংশে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ কিম্বা নিকৃষ্ট বা সমান, তাহা বলিবার মত যথেষ্ট ব্যাপক ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা আমাদের নাই। তবে, আমরা কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি প্রবাসীতে জেল-বিভাগের রিপোর্ট্ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি, চরিত্র-বিষয়ে মুসলমানদিগের কোন সম্প্রদায়গত শ্রেষ্ঠতা নাই। সুতরাং শৈশব হইতে পরোক্ষ ও সাক্ষাৎ রকমের সর্ব্ববিধ সুশিক্ষা পাইলে মুসলমানের যেমন সচ্চরিত্র হইবার সম্ভাবনা, হিন্দুরও তেমনি সম্ভাবনা, ইহার বেশী কিছু বলিতে পারি না।

আমাদের হাতের কাছে বঙ্গের ১৯২১ সালের জেল-রিপোর্ট্ রহিয়াছে। তাহাতে দেখিতেছি, ঐ সালে অপরাধ করিয়া যে ২৮২১৭ জনের কারাদণ্ড হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৫৫'৬২ জন মুসলমান, ৪০'৩১ জন হিন্দু। বঙ্গের মোট অধিবাসীদের মধ্যে ৫৩'৫৫ মুসলমান, ৪৩'৭২ হিন্দু। সুতরাং অপরাধপ্রবণতা মুসলমানদের মধ্যে বেশী দেখা যাইতেছে। শুধু বাংলা দেশেই যে এইরূপ দেখা যায়, তাহা নহে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ১৯২২ সালের জেল রিপোর্ট্ হইতে নীচের তালিকাটি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের সমুদয় অধিবাসীর এবং জেলখানাগুলির অধিবাসীর শতকরা কয়জন কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা দেখান হইয়াছে।

	সমগ্র অধিবাসী।	জেল-অধিবাসী		
		১৯২০	১৯২১	১৯২২
খৃষ্টিয়ান	০'৩৮	০'২২	০'২৯	০'২৬
মুসলমান	১৪'৩৮	১৭'২৭	১৭'৯৯	১৮'২৩
হিন্দু	৮৫'০৮	৮২'৫১	৮১'৭২	৮১'৫১

অনাবশ্যক বোধে অন্যান্য প্রদেশের অঙ্ক দিলাম না।

—

মুসলমানবহুল জেলাসমূহে শিক্ষার বিস্তার

জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল তাঁহার "চিন্তা ও বিচারের স্বাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধে কোরান্ শরীফ্ হইতে একটি বচনের এই ইংরেজী অনুবাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

"A ruler who appoints any man to an office, when there is in his dominion another man better qualified

for it, sins against God and against the State." Quoted in *The Indian Messenger*.

অর্থাৎ, যে শাসনকর্ত্তা তাঁহার রাজ্যে যোগ্যতর লোক থাকিতে অন্য কাহাকেও কোন পদে নিযুক্ত করেন, তিনি ঈশ্বরের ও রাষ্ট্রের নিকট অপরাধী হন।

কোরানজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার মূল আরবী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। আফ্‌গানিস্তানের বর্ত্তমান আমীর যে হিন্দু দেওয়ান নিরঞ্জনদাসকে রাজস্ব-বিভাগের খুব উচ্চ কাজ দিয়াছেন, আকবর যে টোডর মল, মানসিংহ প্রভৃতিকে, আওরংজীব যে জয়সিংহ প্রভৃতিকে, হায়দরআলী ও টিপু সুল্‌তান যে পূর্ণিয়াকে উচ্চ রাজকার্য্য দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ কোরান্-শরিফ্-নির্দ্দিষ্ট এই নীতি অনুসারে দিয়াছিলেন।

বঙ্গের যে-সকল জেলায় মুসলমানদের সংখ্যা বেশী, তথায় ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে শিক্ষার বিস্তার কিরূপ হইয়াছে, তাহা দেখিলে, শতকরা ৫৫টি সরকারী কাজ মুসলমানদিগকে দেওয়া কোরান্ শরীফের উপদেশ অনুযায়ী হইবে কি না বুঝা যাইবে।

	সমুদয় অধিবাসীর প্রতি দশ হাজারে		মোট লিখনপঠনক্ষম		মোট ইংরেজী-জানা	
জেলা	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান	হিন্দু	মুসলমান
নদিয়া	৩৯১১	৬০১৮	৭৩১১৫	২১৭৭৬	২০২৩৫	২৭৬২
মুর্শিদাবাদ	৪৫০৫	৫৩৫৭	৬২০৮১	২৫৪৯০	১৩২৭২	২৬৬০
যশোর	৩৮১১	৬১৭৬	৮১৫২৪	৪৯৫২৫	১৩৪৮৫	৩৩২৫
রাজশাহী	২১৩৭	৭৬৫৪	৩৭০২৫	৪২৪০২	৭৩১১	২৯১৬
দিনাজপুর	৪৪০৯	৪৯০৭	৫৫৯৫৩	৭৫৭৩৫	৬৫০৩	৩৬৭৯
রংপুর	৩১৫৫	৬৮০৩	৬৮১০৮	৭৪৮৬৬	৯৩৩৫	৫৭৮৯
বগুড়া	১৬৫৪	৮২৪৯	২৪৭৪৩	৬৪৫০১	৫৭৩৩	৬১৩৪
পাবনা	২৪০৫	৭৫৮৩	৫২৪২২	৬৮৩৭৯	১৩১৩০	৫৭৯৩
মালদহ	৪০৬৩	৫১৫১	২৭২১৮	১৯০৪৪	৩৬০৮	১৮৮৬
ঢাকা	৩৪২০	৬৫৩৬	১৮৩৪১৯	৭৭৫১৩	৪২৮৪৭	১০৭৬৬
মৈমনসিং	২৪২৭	৭৪৯১	১৪৫৫০৩	১০০২৯৯	৩০৮৩৫	১৪৪৯৬
ফরিদপুর	৩৬২৫	৬৩৪৬	১২৫৯৪৭	৪৮১০৫	২৫৮৫৫	৫৫৯৩
						৫৫৯৪
বাখরগঞ্জ	২৮৭৫	৭০৫৫	১৬৪৭৭৫	১৩৩৭৫৫	২৪৮৫২	৬৪০৪
ত্রিপুরা	২৫৭৯	৭৪১২	১২৪৫০৪	১১৪৪২১	২০৩৮০	১১৭৮৪
নোয়াখালি	২২৩৫	৭৭৫৭	৩৫৫৮১	৫৮৫৮৫	৭৫০৪	৫০৭০
চট্টগ্রাম	২২৫৮	৭২৮১	৬০৪৫৪	৪৯৫৯৭	১২৮১০	৫৫০৬

বঙ্গের ষোলটি জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী। মোট মুসলমান লোকসংখ্যার আধিক্য সত্ত্বেও ইহার মধ্যে ১১টি জেলার মুসলমান লিখনপঠনক্ষমের সংখ্যা হিন্দু লিখনপঠনক্ষম অপেক্ষা কম। যে পাঁচটিতে মুসলমান লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা হিন্দু লিখনপঠনক্ষমের মোট সংখ্যা অপেক্ষা বেশী, তাহার মধ্যে, রাজশাহীতে সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান শতকরা ৭৬, হিন্দু ২১; দিনাজপুরে মুসলমান ৪৯, হিন্দু ৪৪, রংপুরে মুসলমান ৬৮, হিন্দু ৩১; বগুড়ায় মুসলমান ৮২, হিন্দু ১৬; নোয়াখালিতে মুসলমান ৭৭, হিন্দু ২২।

ষোলটি মুসলমানপ্রধান জেলার মধ্যে এক মাত্র বগুড়ায় ইংরেজী-জানা মুসলমানের সংখ্যা ইংরেজী-জানা হিন্দুর চেয়ে ৪০১ জন মাত্র বেশী; কিন্তু বগুড়ার শতকরা ৮২ জন অধিবাসী মুসলমান, কেবল মাত্র শতকরা ১৬ জন হিন্দু। উহার মোট মুসলমান লোক-সংখ্যা ৮,৬৪,৯৯৮; হিন্দু ১,৭৪,৪৬৬।

ইংরেজের সরকারী চাকরীর যোগ্যতার প্রধান অংশ ইংরেজী ভাষার জ্ঞান। মুসলমানেরা তাহাতে অনগ্রসর বলিয়া তাঁহারা সরকারী কাজ সংখ্যায় কম পান, কিন্তু পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতির অনুপাতে তাঁহারা তাঁহাদের পাওনা অপেক্ষা বেশীই পাইয়া থাকেন। শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি তাঁহাদের মধ্যে আরো হইলে তাঁহারা আরো কাজ পাইবেন। দেশের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য সরকারী শিক্ষার বন্দোবস্ত

যাহা আছে, তাহার সুবিধা হইতে সরকার তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই, অন্য সকলের মত তাঁহারাও সেই সুবিধা ভোগ করিতে পারেন। অধিকন্তু তাঁহাদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থাও আছে, যে ব্যবস্থা, তাঁহাদেরই মত এবং তাঁহাদের চেয়েও শিক্ষায় অনগ্রসর কোন কোন শ্রেণীর হিন্দুর ও ভূতপূজকদের জন্য নাই। সকলের জন্য শিক্ষার বরাদ্দ না কমাইয়া যদি মুসলমানদেব শিক্ষার আরো সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা সুখী বই অসুখী হইব না; কারণ তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত দেশের ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রভূত কল্যাণ হইবে।

—

সরকারী চাকরী দ্বারা কত লোক পালিত হয়

সেন্সস্ রিপোর্টে দেখিতে পাই, সরকারী চাকরীতে বাংলাদেশে মোট কর্ম্মী ও পোষ্যের সংখ্যা ৩,২১,৯২৬। ইহার মধ্যে গ্রাম্য চৌকীদার এবং মিউনিসিপালিটী ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ প্রভৃতির কর্ম্মচারীদিগকেও ধরা হইয়াছে। বাংলাদেশের মোট লোকসংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২। ইহা হইতে সরকারী চাকর ও তাহাদের পোষ্যদিগকে বাদ দিলে ৪,৭২,৭০,৫৩৬ জন লোক বাকী থাকে। সুতরাং সরকারী চাকরীর দ্বারা বাস্তবিক খুব অল্প লোকই পালিত হয়। তাহা লইয়া সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মনো-মালিন্য জন্মান অত্যন্ত স্বার্থপরতা ও মূর্খতার কাজ।

সত্য বটে, এদেশে বহুশতাব্দীব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা বশতঃ এবং লোকদের পণ্যশিল্প ও অন্য বহুবিধ স্বাধীন ব্যবসা খুব বেশী না থাকায়, সরকারী চাকরীটাকে লোকে অন্যান্য সভ্য এবং গণতন্ত্র দেশের চেয়ে বেশী দরকারী ও মূল্যবান্ মনে করে। তা ছাড়া, বিদেশী সরকারী চাকরেয়া যেমন আপনাদিগকে সর্ব্বসাধারণের চাকর অর্থাৎ সেবক মনে না করিয়া প্রভু মনে করে, সেইরূপ দেশী চাকরেয়াও (বিশেষতঃ পুলিস ও হাকিমেরা) আপনাদিগকে দেশের অন্য লোকদের সেবক মনে না করিয়া প্রভু মনে করে। সর্ব্বসাধারণেও দাস-বুদ্ধি বশতঃ তাহাদিগকে মনিব বলিয়া মানিয়া লওয়ায় সরকারী চাকরীর গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা বাড়িয়া গিয়াছে ও বজায় আছে। কিন্তু বাস্তবিক চাকরী যত বড়ই হউক, পরিচারকের কাজ মাত্র। অন্য সভ্য দেশ-সকলে, বিশেষতঃ যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, চাকরেয়-দিগকে চাকরেয় বলিয়াই অন্য লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয় না। আমাদের দেশেও, বাস্তবিক যখন রাষ্ট্রীয়, বাণিজ্যিক, ও শিল্পবিষয়ক স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন সরকারী চাকরেয়রা নিজেদের প্রকৃত স্থান ও ওজন বুঝিয়া ভারিক্কী চা'ল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

আপাততঃ আমরা দেখিতেছি, যে, বঙ্গের কেবল-মাত্র মুসলমানেরাই যদি সব সরকারী চাকরী পান, তাহা হইলে হিসাবটা দাঁড়ায় এইরূপ। বাংলায় মুসলমানের মোট সংখ্যা ২,৫৪,৮৬,১২৪। ইহার মধ্যে সরকারী চাকরীর দ্বারা ৩,২১,৯২৬ জন কর্ম্মী ও পোষ্য পালিত হইলে বাকী থাকে ২,৫১,৬৪,১৯৮। মুসলমানেরা সরকারী চাকরীগুলি সব পাইলেও এই আড়াই কোটিরও অধিক মুসলমানকে অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অতএব, তাঁহারা যেন মনে না করেন, যে, কেবলমাত্র সরকারী চাকরী পাওয়া না-পাওয়ার উপরই তাঁহাদের জীবন-মরণ মান-ইজ্জত প্রভাব-প্রতিপত্তি উন্নতি-অবনতি নির্ভর করিতেছে। সওয়া তিন লাখ লোকের জীবিকার কথা অপেক্ষা আড়াই কোটি লোকের জীবিকার কথা ভাবাই বুদ্ধিমানেব কাজ।

অন্যদিকে, যদি বাঙালী হিন্দুরাই সব চাকরী পান, তাহা হইলেও হিসাবে এই দাঁড়ায়, যে, মোট বাঙালী হিন্দু ২,০৮,০৯,১৪৮ জনের মধ্যে মাত্র ৩,২১,৯২৬ জন সরকারী চাকরীর দ্বারা পালিত হইবে; বাকী ২,০৪,৮৭-২২২ জন হিন্দুকে অন্য উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে। সেইজন্য সরকারী চাকরীগুলা হাতছাড়া হইবার দুর্ভাবনায় বুদ্ধিমান্ কোন হিন্দু যেন দুই কোটির উপর হিন্দুর জীবিকা নির্ব্বাহ কেমন করিয়া ভাল ভাবে হইতে পারে, সে চিন্তা করিতে ভুলিয়া না যান।

ইহা সত্য কথা, যে, সরকারী উচ্চ কাজ যাহারা করে, তাহাদের হাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গল অনেকটা নির্ভর

করে। কিন্তু স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে "চাকরো"-রাজ ত থাকিবে না।

এখানে বলা দরকার, সরকারী ডাক্তার, সরকারী অধ্যাপক, প্রভৃতি কতকগুলি চাকরোকে সেন্সাস্ রিপোর্টে সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহ বিভাগে না ধরায়, মোট সরকারী চাকরোদের এবং তাহাদের পোষ্যদের সংখ্যা কিছু কম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের সকলকে ধরিলেও সংখ্যা ৪ লাখের উপর হইবে না।

—

ভিন্ন ভিন্ন পেশায় হিন্দু-মুসলমানের ভূয়িষ্ঠতা

বস্তুতঃ, সরকারী চাকরীর ভাগ লইয়া এই যে হিন্দু-মুসলমানের ভাগ-বাটোয়ারার তর্কবিতর্ক, ইহাতে ইংরেজী-জানা মুসলমানেরা তাঁহাদের ক্ষুদ্র শ্রেণীগত স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া বুঝিতেছেন; তাঁহারা সবাই চাকরী পাইয়া গেলেও বাকী আড়াই কোটির অধিক মুসলমানের অন্নসমস্যা যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। চাকরীপ্রত্যাশী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের সম্বন্ধেও এই মন্তব্য অনেকটা প্রযোজ্য; কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষে যতটা প্রযোজ্য, ততটা নহে। তাহার কারণ বলিতেছি। শিক্ষিত মুসলমানেরা অশিক্ষিত দরিদ্রতর মুসলমানদের ভাবনায় অধীর হইয়া পড়িতেছেন না, বলিলে বিন্দুমাত্রও অন্যায় কথা বলা হয় না; কারণ, আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি, দুর্ভিক্ষে, ভূমিকম্পে, ঝড়-তুফানে, জলপ্লাবনে, মহামারীতে যখনই মুসলমানপ্রধান কোন জেলা বা জেলাসমষ্টি বিপন্ন হয়, তখন জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিপন্নদিগকে সাহায্য দান করে প্রধানতঃ বা কেবলমাত্র হিন্দুরা। এরূপ কাজে মুসলমান কর্ম্মী ও দাতাদের সংখ্যা বরাবরই খুব কম দেখা যায়। অথচ, চাকরীর দাবী কিম্বা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিত্বের দাবীর বেলায় সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের নামে সিংহের ভাগটি দাবী করিতে এই কর্ত্তব্যবিমুখ শিক্ষিত মুসলমানরা খুবই তৎপর। শিক্ষিত হিন্দুরা সর্ব্বসাধারণের হিতসাধনে যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগী না হইলেও মুসলমান অপেক্ষা অধিক মনোযোগী।

যাহা হউক, এসব হক্ কথা লিখিলে শিক্ষিত মুসলমানদের আত্মসংশোধন না করিয়া চটিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশী। চটাইবার ইচ্ছা আমাদের নাই। অথচ সত্য গোপন করাও উচিত নহে বলিয়া কিছু লিখিলাম। এখন আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি।

সেন্সস্ রিপোর্টে দেখিতে পাই, সাধারণ মুসলমান চাষীর সংখ্যা সাধারণ হিন্দু চাষীর সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ; হিন্দু চাষীর সংখ্যা কমিয়াছে, মুসলমান চাষীর সংখ্যা বাড়িয়াছে; কিন্তু জমীদার, তালুকদার, পত্তনীদার, প্রভৃতিদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের প্রায় দ্বিগুণ ও বড় জমীদার প্রায় সকলেই হিন্দু। এইসব তথ্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই জানা ও মনে রাখা উচিত। মোগলরাজত্বকালেও অনেক বড় বড় হিন্দু ভূস্বামী ছিলেন, কিন্তু বড় মুসলমান জমীদারও অনেক ছিলেন। সেন্সস্ রিপোর্টে বড় মুসলমান জমীদার বেশী না থাকার দুটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম, মুসলমান উত্তরাধিকার আইন অনুসারে সম্পত্তি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম ভাগে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে, প্রথম প্রথম জমীদারী বিক্রী হইয়া যাইবার আইন (Sale Laws) অনুসারে অনেক জমীদারদের চতুর হিন্দু কর্ম্মচারীরা ঐ সুযোগে উহা কিনিয়া লয়। সেন্সস্ রিপোর্টে ইহাও লিখিত হইয়াছে, যে, পুরাতন অনেক হিন্দু জমীদার-বংশেরও এই-প্রকারে পতন ঘটে; কিন্তু প্রায় সব স্থলেই ক্রেতারা ছিল হিন্দু। এই-সব কথা সত্য হইলে ইহার মধ্যেও মুসলমানদের এক-রকমের অযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তাঁহাদের হিন্দু কর্ম্মচারীরা যদি এতই দুর্বুদ্ধি ও চতুর ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা সেকালে মুসলমান কর্ম্মচারী রাখিলেই পারিতেন। কিন্তু শুনিতে পাই, একালেও মুসলমান জমীদারেরা অনেক স্থলেই হিন্দু কর্ম্মচারী রাখেন। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানদের চেয়ে ধূর্ত্ত ইহা স্বীকার করিলেও, তাহারা যে যোগ্যতায়ও শ্রেষ্ঠ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কারণ,

অযোগ্য ও ধূর্ত্ত লোককে কেহ চাকরী দেয় না; কিন্তু লোকে যোগ্য পর্ত্ত বিধর্ম্মী লোককেও চাকরী দিতে কখন কখন বাধ্য হয়, যদি স্বধর্ম্মী যোগ্য লোক না পায়।

কৃষি ছাড়া অন্য অনেক রকম বৃত্তি ও পেশায় হিন্দুদের সংখ্যা বেশী। কিন্তু কতকগুলি কাজে মুসলমান বেশী। যথা, আসবাব এবং গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় কাজ, গাড়োয়ানের কাজ, নদীর ষ্টীমারের কাজ, নৌকার মাঝির কাজ, সমুদ্রগামী জাহাজে লস্করের কাজ, কলিকাতা বন্দরে জাহাজের মালখালাসী নৌকার কাজ, দরজী মাংসবিক্রেতা দপ্তরী, এবং ছাপাখানার জমাদার প্রভৃতির কাজ, চাম্‌ড়ার ব্যবসা, ইত্যাদি। গাড়ী নৌকা প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসাতেও মুসলমান-প্রাধান্য আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবসাতে হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমানের তিন গুণ।

হিন্দুরা কতকগুলি পরায়ত্ত চাকরী লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে। কিন্তু জমীই হইতেছে আসল সম্পত্তি; এবং যে উহা চাষ করে, কালক্রমে সে যে উহার মালিক হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং চাষের কাজ হিন্দুর হাত হইতে মুসলমানের হাতে চলিয়া যাওয়ায় হিন্দুর বেকুবী ও অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

—

যোগ্যতা অনুসারে চাকরী না দেওয়ার ফল

ছোট বা বড়, সরকারী কাজ যে-রকমেরই হউক না, তাহা যোগ্যতমের দ্বারা করাইলে যেমন ভাল হয়, কম যোগ্যের দ্বারা করাইলে তেমন হইবে না। অতএব, যোগ্যতাকেই প্রধান স্থান না দিয়া ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে অধিকাংশ সরকারী কাজ বিলি করিলে, দেশের কাজ কিছু খারাপ কিম্বা খুব খারাপ হইবে। ইহার কুফল দেশের লোককে ভুগিতে হইবে; এবং দেশের লোকের অধিকাংশই মুসলমান বলিয়া মুসলমান-দিগকেই বেশী ভুগিতে হইবে। সরকারী চাকরীর সবগুলিই যদি মুসলমানেরা পান, তাহা হইলেও জোর চারি লক্ষ মুসলমানের আর্থিক সুবিধা হইবে; কিন্তু কুফল ভুগিতে হইবে বাকী আড়াই কোটির উপর মুসলমানকে। দু'কোটির উপর হিন্দুকেও যে কুফল ভুগিতে হইবে, তাহা মুসলমান নেতারা না হয় গ্রাহ্য নাই করিলেন।

শিক্ষার উপর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অতএব, ধর্ম্মনির্বিশেষে যোগ্যতমকে চাকরী না দিলে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি হইবে কি না, তাহাও বিবেচ্য। মুসলমান যদি হিন্দুর সমান উচ্চশিক্ষা না পাইয়াও চাকরী পান, তাহা হইলে উচ্চশিক্ষা লাভের চেষ্টার একটা কারণ মুসলমানদের মধ্যে কম প্রবল হইবে। উচ্চতর শিক্ষা পাইয়াও হিন্দু যদি দেখে যে তাহা অপেক্ষা কম শিক্ষিত মুসলমান চাকরী পাইতেছে, তাহা হইলে তাহারও উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহ কমিতে পারে। অতএব ধর্ম্ম অনুসারে চাকরী ভাগ করিলে উভয় সম্প্রদায়েরই শিক্ষার ক্ষতি হইবে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান লাভ, শুনিতে ভাল এবং উহা উচ্চ আদর্শও বটে। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ সব রকম চেষ্টারই পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা করে, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণীসকল হইতে মুসলমান আমলে এবং তাহার পরেও অনেকে মুসলমান হইয়াছে। তাহার একটা প্রবল কারণ, হিন্দু-সমাজে অনেক জা'ত অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় বিবেচিত হয়; কিন্তু তাহারা মুসলমান হইলে তাহাদিগকে অন্য মুসলমানেরা অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় মনে করে না। ইহা একটা মস্ত সামাজিক সুবিধা। এই-সব জা'তের লোকসংখ্যা অনুসারে চাকরী তাহারা কখনও পায় নাই; উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও কখন বলেন নাই, যে, যেহেতু তাহারা সংখ্যায় অনেক, অতএব তাহারা শিক্ষায় অনগ্রসর হইলেও শতকরা এতগুলি চাকরী তাহাদের পাওয়া উচিত। তাহাদের মধ্যে অনেক জা'ত শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে বেশী অগ্রসর, কোন-কোনটি বা মুসলমানের চেয়েও কম অগ্রসর। কিন্তু বেশী বা কম অগ্রসর, যাহাই তাহারা হউক, চাকরীর একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ তাহারা পাক্, হিন্দু স্বরাজ্য-সভ্যেরা ইহা বলেন নাই, বলিবেনও না। হিন্দু স্বরাজ্যবাদীরা তাহাদের অস্পৃশ্যতা অনাচরণীয়তাও কার্য্যতঃ দূর করিতেছেন না। কিন্তু তাহারা মুসলমান হইলে তাহাদের অস্পৃশ্যতাও ঘুচে, চাকরীর একটা

নির্দ্দিষ্ট ভাগও তাহারা পাইবে। সুতরাং স্বরাজ্যদলের হিন্দু সভ্যেরা হিন্দুসমাজের এইসকল শ্রেণীর লোক-দিগকে কি কার্য্যতঃ বলিয়া দিতেছেন না, যে, "তোমরা মুসলমান হইয়া যাও; তাহা হইলে তোমাদের সামাজিক ও আর্থিক উভয় সুবিধাই হইবে" ?

এরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে, যে, মুসলমানদিগের অসন্তোষ দূর করিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণে তাহা-দিগকে সরকারী চাকরী দেওয়া উচিত। মুসলমান কেন, সব সম্প্রদায়ের লোককেই ন্যায্য ও বৈধ উপায়ে সন্তুষ্ট করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু শিক্ষিত ও যোগ্যতম হিন্দুর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য অহিন্দুকে চাকরী দিলে হিন্দুর অসন্তোষও যে বাড়িবে, তাহাও বিবেচ্য। বাংলায় হিন্দুরা সংখ্যায় কম বটে, কিন্তু তাহাদের অসন্তোষ তুচ্ছ ও অবজ্ঞেয় মনে করা উচিত নয়। মর্লী-মিণ্টো শাসনসংস্কার হিন্দু আন্দোলনের জোরেই হইয়াছিল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রধানতঃ হিন্দু আন্দোলন। তাহাতে সরকারকে বিচলিত হইতে হইয়াছিল। বোমার উৎপাত, এবং রাজনৈতিক খুন ও ডাকাতি হিন্দু অসন্তোষের ফল। তাহাও সরকার তুচ্ছ মনে করিতে পারেন নাই। আমরা অবশ্য সরকারী চাকরী যথেষ্ট পরিমাণে না-পাওয়াটাকে একটা জীবন-মরণের ব্যাপার মনে করি না; তাহার জন্য বিপ্লবচেষ্টারও দরকার দেখি না। কিন্তু বেকার-সমস্যা প্রধানতঃ চাকরীজীবী মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুদের সমস্যা। এই সমস্যাকে আরও উৎকট করিয়া তোলা রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক হইবে কি না, বিবেচনার বিষয়। কালক্রমে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগ্য ও যোগ্যতম লোকের সংখ্যা বাড়িবে। ক্রমশঃ তাঁহারা নিশ্চয়ই বেশী করিয়া সরকারী চাকরী পাইতে থাকিবেন, এবং হিন্দুরাও ক্রমশঃ অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিবে। এইরূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনে কোন সমস্যার উদ্ভব হইবে না। শিক্ষিত বেকারের দল বাড়িলে তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে-সকল সাধু উপায় অবলম্বন করিতে পারে, চাষ তাহার অন্যতম। কিন্তু চাষে ক্রমশঃ মুসলমানের আধিপত্য বাড়িতেছে। শিক্ষিত হিন্দু, মুসলমান চাষীকে চাষের কাজে আইনসঙ্গত ভাবে কিয়ৎ পরিমাণেও বেদখল করিলে তাহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সন্তোষ বাড়িবে কি ?

দেশের শিক্ষালয়গুলিতে যোগ্যতম লোক রাখা দরকার। সরকারী তহবিল হইতে শিক্ষার জন্য যত টাকা দেওয়া চলে, তাহাতে যতদূর যোগ্য লোক পাওয়া সম্ভব, নিযুক্ত করা উচিত। নতুবা শিক্ষার সম্যক্ উন্নতি হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষাদাতা নিয়োগের সময় কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচার না করিয়া ধর্ম্মের বিচার করিলে, সরকারী শিক্ষালয়গুলির উৎকর্ষ রক্ষিত হইবে না, বরং কমিবে। অন্য দিকে বেসরকারী শিক্ষালয়গুলি ধর্ম্মের বিচার করিয়া লোক রাখিতে বাধ্য না থাকায়, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। সুতরাং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা হারাইয়া ছাত্র কম পাইবে ও অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিবে। তখন সেগুলি বহু ব্যয়ে বাঁচাইয়া রাখা কি সরকারী টাকার অপব্যয় হইবে না ? অথচ, না রাখিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অসন্তোষ জন্মিবে। এই উভয়-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র উপায়, সকল সম্প্রদায়কে বলা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্ম্মীর নিয়োগ ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যোগ্যতমেরই হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, অতএব সকলে নিজ নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধির দিকে মন দিতে থাকুন।

বিচার-বিভাগেও যোগ্যতম লোক রাখা দরকার। অবিচারে মানুষের বড় অনিষ্ট হয় এবং অসন্তোষ বাড়ে। মুসলমানের সংখ্যা বেশী বলিয়া যোগ্যতম বিচারক না রাখিলে তাঁহাদের অনিষ্ট ও অসন্তোষই বেশী হইবে। অথচ ধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে গেলে যোগ্যতম লোক রাখা চলিবে না। তা ছাড়া, প্রতি বৎসর একটিনি করিবার ও পাকা মুন্সেফ হইবার জন্য যতগুলি এম্-এ বি-এল্ দরকার হয়, তাহার রকম দশ আনা বার আনা চৌদ্দ আনা এম্-এ বি-এল্, অন্ততঃ শুধু বি-এল্, কি মুসলমান-সমাজ পাস্ করেন ?

অসহযোগীদের, সুতরাং স্বরাজ্যদলেরও লোকদের, সরকারী শিক্ষালয় ও আদালতগুলিকে অশ্রদ্ধেয় ও অকেজো করিবার অভিপ্রায় আছে বটে। যোগ্যতম

লোক না রাখিয়া ধর্ম্মের বিচার করিয়া লোক রাখিলে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে বটে।

আরও অনেক সরকারী কার্য্যবিভাগ আছে, যাহাতে বিশেষ-রকম জ্ঞানের, উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। নানাবিধ বিজ্ঞানে এম্-এস্‌সি, ডি-এস্‌সি, পাস্, এমনকি বিএস্‌সি পাস্‌ও, যথেষ্টসংখ্যক মুসলমান করেন না। বি-ই পাস্‌ও যথেষ্টসংখ্যক করেন না। ডাক্তারী এম্-বি, এম্-ডিতেও তদ্রূপ। অতএব বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান-সাপেক্ষ নানা বিভাগে যথেষ্টসংখ্যক কর্ম্মী যোগাইতে মুসলমান সম্প্রদায় এখন অসমর্থ। চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু যোগ্য না হইয়াও চাকরী পাইলে সে চেষ্টার কারণ প্রবল হইবে না।

—

বঙ্গে বিধবাবিবাহ

পুরুষ ও নারী উভয়ের প্রতি ন্যায্য অপক্ষপাত ব্যবহারের অনুরোধে, নরনারীর স্বাভাবিক সমান অধিকার রক্ষার অনুরোধে, সামাজিক পতিব্রতা রক্ষার জন্য, বঙ্গের নানা শ্রেণীর হিন্দুর এবং সমগ্র হিন্দুসমাজের সংখ্যাহ্রাস নিবারণ করিবার জন্য, দয়াধর্ম্মের অনুরোধে, বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ খুব প্রচলিত হওয়া উচিত। এইজন্য সামান্য যে দু একটি বিধবার বিবাহ হইতেছে, তাহাও আমরা সুলক্ষণ ও সুখের বিষয় মনে করি। মেদিনীপুরের বিধবা-বিবাহ সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি-এল্ লিখিয়াছেন ঃ—

"মেদিনীপুরে একটী বিধবা-বিবাহ সমিতি গত এপ্রিল মাসে স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির চেষ্টায় অদ্য পর্য্যন্ত ৫টী বিধবার বিবাহ হইয়াছে। গত ২৩।১১।২৩ তারিখে ভঞ্জভূম পরগণার আঙ্গুয়া গ্রামে একটী বাল্য-বিধবার বিবাহ হইয়াছে। পাচরা গ্রামের শ্রীমান্ হরিপদ মহাপাত্র ঐ বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। বর ও কন্যা পক্ষের বহু জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব উপস্থিত ছিলেন এবং হিন্দু শাস্ত্রমতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর ও কন্যা উভয়ে সদ্‌গোপ জাতীয়। বিবাহস্থলে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ সকলে বিধবা-বিবাহের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। সত্বর আরও একটী বিধবার বিবাহ হইবার আশা আছে। অর্থাভাবে সমিতির কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না। দেশের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। কুসংস্কারান্ধ ব্যক্তিগণ পদে পদে বাধা দিতেছে। ৫টী বিবাহ মধ্যে সদ্‌গোপ ২টী, গোপ ১টী, নাপিত ১টী, মাহিষ্য ১টী।"

আনন্দবাজার-পত্রিকায় নীচের সংবাদটি বাহির হইয়াছে।

"ত্রিপুরা রাজ্যের আগড়তলায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র লস্কর মহাশয়ের ভগ্নী ৭ বৎসর বয়সেই স্বামীহারা হয়। সম্প্রতি উক্ত রাজ্যের জনৈক কর্ম্মচারীর সহিত এই বালবিধবার বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মহারাজার আনুকূল্য ও অর্থ-সাহায্যেই এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়াছে। মহারাজা স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।"

—

শিশুমঙ্গল সপ্তাহ

কেমন করিয়া শিশুদের মঙ্গল সাধন করা যায়, কিরূপে তাহাদিগকে সুস্থ সবল রাখিয়া তাহাদের অকালমৃত্যু নিবারণ করা যায়, সে বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য কলিকাতায় ১২ই মাঘ হইতে ১৯শে মাঘ পর্য্যন্ত একটি প্রদর্শনী হইবে। ইহাতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা যথাসম্ভব দেখাইবার চেষ্টা হইতেছে। রোগের প্রথম অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, পীড়িত অবস্থায় কেমন করিয়া শুশ্রূষা করিতে হয়, শিশুদের খাদ্য কেমন করিয়া তৈরী করিতে হয়, ইত্যাদি প্রতিদিন দেখান হইবে। মিস্ বেণ্ট্‌লী শিশুহিতসাধন বিষয়ে একটি নাটক রচনা করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে তাহা বায়োস্কোপের সাহায্যে দেখান হইবে। অন্তঃপুরিকাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি দিন রাখা হইবে। সুস্থ সবল শিশুদের মেলা প্রদর্শনীর শেষ দিন হইবে।

—

বাংলার মন্ত্রী

এবার বাংলার তিন মন্ত্রী হইয়াছেন, মৌলবী এ কে ফজলল্ হক্, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, এবং মিঃ এ কে আবু আমেদ গজনবী। ফজলল্ হক্ সাহেব শিক্ষামন্ত্রী, গজনবী সাহেব কৃষি ও শিল্পের মন্ত্রী এবং মল্লিক সাহেব স্বায়ত্তশাসন ও স্বাস্থ্যের মন্ত্রী হইলেন। মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্র এবং নবাব নবাব আলী চৌধুরী মন্ত্রী হইবার আগে যতটা দেশহিতৈষণা ও কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, ফজলল্ হক্ সাহেব ও গজনবী সাহেব তাহা অপেক্ষা কম দেখান নাই। সুতরাং তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব লাভে মন্ত্রী-পদের অসম্মান হইল না। তবে মন্ত্রীরূপে তাঁহাদের কৃতিত্ব কিরূপ হইবে, এখন বুঝিবার ও বলিবার সম্ভাবনা নাই। অবশ্য তাঁহাদের চেয়ে যোগ্য লোক দেশে অনেক আছেন। কিন্তু হয় তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন

নাই, নয় তাঁহারা মন্ত্রী হইতে রাজী হন নাই, কিম্বা গবর্ণর তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক বা অন্যবিধ কারণে মনোনীত করেন নাই। স্যার্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত হন নাই; সুতরাং তাঁহার সহিত মল্লিক সাহেবের তুলনার প্রয়োজন নাই। ইহাঁর চেয়ে যোগ্য লোকও দেশে আছেন। ইনিও মন্ত্রী হইয়া কি করিতে পারিবেন, না দেখিলে বিশ্বাস নাই। তবে যদি এই তিন ব্যক্তি বার্ষিক চৌষট্টি হাজার টাকা শোষণ না করিয়া অল্প কিছু কমও লইতে রাজী হন, তাহা হইলে তাহাও একটা কীর্ত্তি হইবে বটে। প্রবল-পরাক্রান্ত জাপান-সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাসিক দেড় হাজার এবং অন্য মন্ত্রীরা মাসিক হাজার টাকা বেতন লইয়া থাকেন। সুতরাং ম্যালেরিয়ায় ছারখার এবং ভারতগবর্ণ্‌মেণ্টের দয়ায় শূন্যতহবিল বাংলা দেশের মন্ত্রীরা যদি মাসিক পাঁচ হাজার লইয়া খুচরা কয়েকটা টাকাও ছাড়িয়া দেন, তাহা বাঙালী দেশভক্ত মন্ত্রীর পক্ষে কম দয়া হইবে না। শুনা যায়, সে-কালে বড় ঘরানা যে-সব ইংরেজ সৈনিক বিভাগে অফিসারের কাজ করিতে আসিত, তাহাদের কেহ কেহ বেতনের অর্থের নোট কখানা পকেটে পুরিয়া চলিয়া যাইত, টাকা রেজকী পয়সা পাই কেরানী চাপ্‌রাসীরা লইত। মন্ত্রী মহাশয়েরা এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মাসিক ৩৩৩।৶৪ পাই বাংলা দেশের গরীব প্রজাদিগকে মাপ করিলে খুব অনুগ্রহ করা হইবে। তাহা হইলে বুঝিব, জাপানী মন্ত্রীরা মাসিক হাজার টাকা লন, ইহাঁরা লন, মাসিক পাঁচ হাজার মাত্র; অতএব জাপানী মন্ত্রীদের অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ স্বদেশপ্রেম বাঙালী মন্ত্রীদের জন্মিয়াছে; এবং তাহাতে দেশের লোক পুলকিত হইবে! আগেকার বারের মন্ত্রীরা বার্ষিক ৪৮০০০ মাত্র আত্মসাৎ করিয়া বাকী ষোলহাজার দেশহিতে লাগাইবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন হিসাব পাওয়া গেল না। এইজন্য এবার বার্ষিক ষোল হাজারের পরিবর্ত্তে বার্ষিক চারি হাজার টাকার ভিক্ষা জানান যাইতেছে।

—

জাতীয় উন্নতি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহার

আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমানে জাতীয় উন্নতি লইয়া চিন্তা ও আলোচনা খুবই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। নানান্ মুনির নানান্ মত, কথাটির সত্যতা প্রমাণের সুযোগ এরূপ আর কখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই ভুল ধারণা রহিয়াছে দেখা যায়। মতামত প্রকাশ-কালে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মানুষ, চিন্তার সহিত ভাল লাগা না-লাগার যে বিশেষ পার্থক্য আছে, একথা ভুলিয়া যায়। আমার কি ভাল লাগে অথবা না লাগে, অর্থাৎ কোন কিছুকে আমার হৃদয় কি ভাবে গ্রহণ করে, তাহার সহিত আমার চিন্তার ধারার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকা উচিত নহে। পৃথিবী গোল না হইয়া ত্রিকোণ হইলে কাহারো কাহারো হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য, পৃথিবী ত্রিকোণ, ইহা কাহারও ভাবা উচিত নহে। বাস্তবিক ঐরূপ অসঙ্গত ধারণা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মনে না থাকিলেও, ঐ-প্রকার গোলযোগ অনেকের মনেই হইয়া থাকে। আমরা যখন বলি, "আমার মনে হয় অমুক জিনিষ ভক্ষণ করিলেই শরীর ভাল হয়", তখন কি আমরা চিন্তা-শক্তি ব্যবহার করিয়া কথাটি বলি? একটি আবছা মনোভাবকে চিন্তা বলিয়া ভুল করি বলিলেই যথার্থ বলা হয়। আমার মনে হয়, অর্থে, আমি চিন্তা করিয়া ইহা মনে করি, একথা বুঝায় না। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই আমাদের এই ভুল ধারণা বর্ত্তমান। চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, এই জ্ঞানের অভাবই বহু ভুল ধারণা ও অবিবেচনার মূল। বাহিরের ঘটনা মানুষের মনে কি-প্রকার অনুভূতির সৃষ্টি করিবে, তাহা নির্ভর করে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তাহার শিক্ষা ও পরিবেষ্টনী প্রভৃতি নানান্ কিছুর উপর। হিন্দু যে গোবধ পাপ মনে করে এবং মুসলমান যে করে না, ইহাতে প্রমাণ হয়, যে, গোবধ সম্বন্ধে ভারতীয় মানবের মনোভাব চিন্তার দ্বারা চালিত নহে; জন্মাবধি শিক্ষা ও অন্যান্য কারণের প্রভাবেই হিন্দু ও মুসলমানের মনে একই বিষয়ে বিভিন্ন-প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। মানুষের বিশ্বাস বিশেষ করিয়া এই-প্রকার

শিক্ষা ও অন্যবিধ প্রভাবের ফল। ভারি জিনিষ মস্তকে পড়িলে আঘাত লাগে, এই বিশ্বাস বিশ্বের সর্ব্বত্র সত্য বলিয়া গৃহীত হয়; কেননা ইহাঁর বিপরীত শিক্ষা বা উদাহরণ জগতে নাই। দুই আর দুইএ চার না হইয়া তিন অথবা পাঁচ, হয় একথাও ভরসা করিয়া এ জগতের কোন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে না। অতিমানবেরা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের কথা এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। মোটর-চালক যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, কলকব্জা সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস সর্ব্বক্ষেত্রে সমান। কোন মোটরচালকই বিশ্বাস করে না, যে, 'ব্রেক্' কষিলে গাড়ী আরও দ্রুতগামী হয়, অথবা তৈলের অভাবই এঞ্জিন চলিবার পক্ষে অনুকূল। বিজ্ঞান এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে জগতের সকল শিক্ষিত মানবের মধ্যে একমত দেখা যায়। তাহার কারণ এই-সকল ক্ষেত্রে মানুষ **অনুভূতিকে চিন্তা বলিয়া ভ্রম করে না।**

কিন্তু যিশু আবার আসিবেন, অথবা আসিবেন না; গোবধ ভাল অথবা মন্দ; মানুষের নিজের মত আগে, না তাহার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত লোকমত অথবা গুরুর মত আগে; ভারতীয় মানব নিজের অদৃষ্ট নিজের হাতে রাখিবে, অথবা ইংরেজের হাতে রাখিবে, স্ত্রীলোকগণ মানুষ কি না; মানুষের আত্মা আছে কি না; ইত্যাদি নানা বিষয়ে মানুষ **মত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করে না কিন্তু চিন্তা করিতে চাহে না।** ইহার কারণ, মানুষের উপর **অনুভূতির অত্যাচার।** বেচারা বাঙালী কিছুতেই খুসী হইয়া ভাবিতে পারে না, যে, কাজ করিবার পক্ষে ধুতি পাঞ্জাবী শ্রেষ্ঠ পোষাক নহে, ফেনগালা ভাত শ্রেষ্ঠ আহার্য্য নহে, বাল্যবিবাহ দূষণীয় ও জাতীয় আত্মহত্যার সামিল, স্ত্রীলোকদিগকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা তাহাদের শরীর ও মন উভয়ের পক্ষেই অপকারী, সত্য কথা যে ভাষাতেই লিখিত হউক তাহা সত্য, ইত্যাদি। তাহার মন কিছুতেই শুনিতে চাহে না, যে, তাহার অনুভূতি তাহাকে ভুল বুঝাইতেছে। নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করার মতই, নিজ অনুভূতিকে মিথ্যাবাদী বলিতে মানুষের অহমিকায় আঘাত লাগে। কাজেই চিন্তা ও যুক্তিকে, দিদিমা, ঠাকুরমা, বিবেক, ভালমন্দজ্ঞান, প্রভৃতি নানান্ ছদ্মবেশধারী অনুভূতির খাতিরে বর্জ্জন করিয়া বাঙালী দ্রুতবেগে অহমিকার মোটরগাড়ী হাঁকাইয়া আত্মহত্যার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নানান্ বিষয়েই দেখা যাইতেছে, যে, বাঙালী নিজের পূর্ব্বশিক্ষা, পারিপার্শ্বিক, সমাজ ও কুসংস্কার ইত্যাদি হইতে জাত অনুভূতিগুলির দোহাই দিয়া অবিবেচনা ও নির্বুদ্ধিতা দোষে দুষ্ট হইতেছে। জ্ঞানের উপর সকল বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্ভর করে। আমরা জ্ঞান সত্ত্বেও জ্ঞানবিরুদ্ধ কার্য্য ত করিয়া থাকিই; বহুক্ষেত্রে আবার জ্ঞানকেই অস্বীকার করি। কুশিক্ষা ও কুসংস্কারলব্ধ অনুভূতিগুলিকে প্রশ্রয় দিবার জন্য এ এক বিরাট্ আয়োজন। কিন্তু ফলে আমাদের জাতীয় উন্নতির কথা দূরে থাকুক, দুর্গতি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে।

বর্ত্তমান কালে আমরা মতামতের মূল্য বিচার করিবার পূর্ব্বে যেন দেখি যে উক্ত মতামত জ্ঞান ও চিন্তার উপরে নির্ম্মিত, অথবা শুধু মানসিক অনুভূতির প্রকাশ। অ

—

জাতীয় আদর্শের গঠন-প্রণালী

বাংলা ভাষায় একটি কথা আছে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ব্যক্তি অথবা জাতি কি আদর্শ অনুসারে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে, তাহা বলিতে গেলে এই কথাটি ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। কোন ব্যক্তি কখনও একাঙ্গসুন্দর হইতে চাহে না তাহা নহে; কোন কোন জাতিও সেইরূপ আংশিক সৌন্দর্য্যের অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহা সাধারণত ব্যক্তির বা জাতির আদর্শের অসম্পূর্ণতার ফল। ব্যক্তিবিশেষ শীর্ণ দেহ ও অগাধ পাণ্ডিত্যের একত্র সংস্থাপনকে আদর্শ মনে করিতে পারেন। অপর কেহ কোন একটি বিশেষ বিষয় মাত্র লইয়াই জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত কাটাইতে পারেন। জাতিবিশেষ শুধু অর্থের জন্য সকল শক্তি ও চেষ্টা ব্যয় করিতে পারে। কিন্তু আদর্শ জীবন, ব্যক্তিগতই হউক অথবা জাতীয়ই হউক, কদাপি এইরূপ একাভিমুখী ও একাঙ্গসুন্দর হইতে

পারে না। কেহ বলিতে পারেন, যে, কার্য্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হইলে একাগ্রচিত্তে একটি বিষয় লইয়া পড়িয়া না থাকিলে সফলকাম হওয়া যায় না। কিন্তু কার্য্যবিশেষ উত্তম অথবা উৎকৃষ্টতম রূপে সাধন করাই **জীবনের** উদ্দেশ্য নহে। ব্যক্তি অথবা জাতি যন্ত্র নহে, যে, তাহা হইতে যত কার্য্য আদায় হইবে, ততই তাহার মূল্য। জীবনের মূল্য তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপর নির্ভর করে। সঙ্গীতে আনন্দ নাই, খাদ্যের উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা বিচার করিবার ক্ষমতা নাই, সাহিত্যে ও শিল্পে অনুরাগ নাই, বর্ণবিন্যাসের সৌন্দর্য্য বা কদর্য্যতা বুঝিবার ক্ষমতা নাই, পরকে নিজের মনের কথা বুঝাইবার অথবা পরের মনের কথা নিজে বুঝিবার ক্ষমতা নাই, ইত্যাদি নানা দোষে দুষ্ট যে ব্যক্তি বা জাতি, তাহার মাছ ধরিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, অথবা সে অসম্ভব রকম অল্প আয়াসে পরস্ব আত্মসাৎ করিতে পারে, বা খনি হইতে অতি দ্রুত কয়লা উত্তোলন করিতে সক্ষম, বলিয়া তাহাকে আদর্শ ব্যক্তিত্ব বা জাতীয়তার ক্ষেত্রে খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হইবে কি? জাতীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বাভিমুখী হওয়া প্রয়োজন, একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু উহা সর্ব্বাভিমুখী হইলেই কি জাতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া গড়িয়া উঠিবে?

সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য জিনিষটির একটি বিশেষত্ব আছে। অঙ্গবিশেষ সুন্দর হইলেই যে তাহা অন্য অঙ্গের সহিত একত্র স্থাপিত হইলেও সুন্দর থাকিবে ও দেখাইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, যে, দুধ ও আলতা মিশ্রিত বর্ণ এবং নিটোল শালপ্রাংশু মহাভুজ, মানুষের বাহুর সৌন্দর্য্যের আদর্শ। ঐরূপ একখানি বাহু শীর্ণ শ্যামবর্ণ ও প্লীহাগ্রস্ত শরীরে স্থাপন করিলে কি তাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে? গোময়লিপ্ত প্রাঙ্গণে কি কারুকার্য্যময় মর্ম্মর-বেদী শোভা পায়? উহাকে শুধু স্বস্থানচ্যুত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। দরিদ্রের কুটিরে কি মর্ম্মর-সোপান নির্ম্মাণ সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচায়ক? **সর্ব্ব অঙ্গের সহিত সঙ্গতিবিশিষ্ট না হইলে কোন অঙ্গের সৌন্দর্য্যের কোন অর্থ হয় না।**

জাতীয় আদর্শ গড়িয়া তুলিতে হইলে অন্ধ অনুভূতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চলিলে সৌন্দর্য্যের পরিবর্ত্তে কদর্য্য অসামঞ্জস্যের আবির্ভাব হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। নির্ব্বিকার চিত্তে চিন্তাশক্তির ব্যবহার ও পৃথিবীর সকল জ্ঞান সমান আদরের সহিত পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিলেই আদর্শের ক্ষেত্রে এই সঙ্গতি সম্ভব। জাতির জাতীয়তার প্রকাশ নানান্ কার্য্যের ভিতর দিয়া হয়। কোথাও জাতি ঐশ্বর্য্য উৎপাদনে উৎসুক, কোথাও শক্তি সঞ্চয়ে ব্যগ্র, কোথাও জ্ঞান আহরণে আত্মবিস্মৃত, কোথাও বা জগতের মঙ্গল-সাধনে স্বার্থত্যাগে যত্নবান্। অপরদিকে আবার কোন জাতি কোথাও পরস্ব অপহরণে আগুয়ান, অথবা হিংস্র স্বার্থপরতায় উন্মত্ত।

আমরা যে নূতন জাতি গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছি, তাহার সকল ব্যবহার, সকল কার্য্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য প্রয়োজন। তাহা না হইলে, আমাদের অবস্থা "পরহিতার্থে" পরস্বগ্রাসী ও "সভ্যতার সেবার্থে" বর্ব্বরতায় নিমগ্ন পাশ্চাত্য জাতিগুলির মতই হইবে।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুসমঞ্জস জাতীয়তা সৃজনে উন্নত কল্পনা-শক্তির প্রয়োজন। সে কল্পনায় জাতীয়তার সকল রূপের একত্র দর্শন পাওয়া যাইবে। যে-সকল শিল্পী তাজ-মহল পার্থেনন্ প্রমুখ স্থাপত্য-ঐশ্বর্য্যের স্রষ্টা তাঁহারা কল্পনায় উহাদিগের সম্পূর্ণতাই দেখিয়াছিলেন। খণ্ড খণ্ড করিয়া কল্পনা করিলে স্থাপত্যসৌন্দর্য্য সম্ভব হয় না। অথবা কেহ-বা একটি আদর্শ চূড়া, কেহ-বা একটি আদর্শ খিলান নির্ম্মাণ করিল; এরূপ করিয়াও কার্য্য হয় না। সঙ্গীতের রচয়িতা কখন খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার রচনার কথা কল্পনা করেন না। অথবা নানান্ লোকে মিলিয়া মহাকাব্য লিখন সম্ভব হইলেও, সে কাব্যে সৌন্দর্য্য কত দূর পাওয়া যাইবে, তাহা বলা যায় না। নানান্ ব্যক্তির কল্পনাপ্রসূত মাল মসলা ব্যবহার করিতে হইবে; কিন্তু সমগ্রটির সৌন্দর্য্য শেষ অবধি অনেক মন ঘুরিয়া কোন এক মহতী কল্পনার কোলে ফুটিয়া উঠিবে। জাতীয়তার সৌন্দর্য্য খাপছাড়া ভাবে শ্রমবিভাগ করিয়া লভ্য নহে।

বর্ত্তমান ভারতে সূক্ষ্মবুদ্ধি অঙ্গবিশ্লেষক অনেক দেখিতেছি। কিন্তু প্রকৃত মহাশিল্পীর সেই অভিব্যাপী কল্পনা এখনও দেখি নাই। অ

—

ডাক্তার মুইর ও কুষ্ঠ চিকিৎসা

বাংলা দেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা কুষ্ঠ রোগের আধিক্য দেখা যায়; অথচ বাংলা দেশে এই রোগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত অথবা এই রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষরূপে দুর্লভ। এই রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা যে শুধু জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায়, তাহা নহে; ডাক্তার ও অন্যান্য চিকিৎসাজীবীরাও অজ্ঞানতা-মুক্ত নহেন। ফলে কাহারও কুষ্ঠব্যাধি হইলে প্রথমতঃ সে রোগের প্রথম লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারে না, যে, তাহার কুষ্ঠ হইয়াছে; সুতরাং যে সময় চিকিৎসা করিলে ব্যাধি দূর করা সম্ভব, সে সময়ে চিকিৎসা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যথাসময়ে চিকিৎসা করিলে যে এই রোগের কবল হইতে মুক্তি লাভ সম্ভব, তাহাই বা কয় জন জানে? সচরাচর দেখা যায়, যে, কুষ্ঠরোগ হইয়াছে ভ্রমে লোকে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, কিন্তু চিকিৎসক অথবা অন্য কেহ তাহাকে বলিতে পারিতেছে না, যে, তাহার কুষ্ঠ হয় নাই। ইহাও, এই রোগ সম্বন্ধে যে অজ্ঞানতা সর্ব্বত্র দেখা যায়, তাহার ফল।

ডাক্তার মুইর কুষ্ঠ রোগ সম্বন্ধে চর্চ্চা করিয়া ও সাধারণের নিকট কুষ্ঠরোগ চর্চ্চার ফলাফল জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথম অবস্থায় কুষ্ঠব্যাধি সারান যায় এবং রোগটি যতদূর দুরারোগ্য ও সংক্রামক বলিয়া সাধারণের ধারণা, তাহা সত্য নহে। তাঁহার মতে এই রোগটি জগৎ হইতে দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চিকিৎসকদিগের নূতন করিয়া শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। তাহার পর জনসাধারণকেও এই বিষয়ে জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। রোগের প্রথম লক্ষণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে এখনও খুবই অল্পসংখ্যক চিকিৎসকের কোনরূপ পরিষ্কার ধারণা আছে। ইহার জন্য ডাক্তার মুইর বলেন, যে, অনেকগুলি কুষ্ঠ-চিকিৎসাকেন্দ্র রাখিলে সর্ব্বদিক্ হইতে সুবিধা হইবে। এই-সকল চিকিৎসাকেন্দ্র হইতে চিকিৎসকদিগকে কুষ্ঠ-রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা হইবে এবং জনসাধারণের নিকটও এই রোগের সম্বন্ধে সত্যাসত্য প্রচার করা হইবে। এই রোগ দুরারোগ্য ও ভীষণরূপ সংক্রামক নহে জানিলে রোগ গোপন ও অবহেলা করা অনেক দূর নিবারিত হইবে আশা করা যায় এবং সাধারণের ও গবর্ণ্‌মেণ্টের সাহায্য পাইলে শীঘ্রই ভারতবর্ষ হইতে ইহা দূর হইবে এইরূপ আশা করা যায়। অ

—

ইন্‌সুলীন ও বহুমূত্র

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা-জগতের একটি স্মরণীয় ঘটনা ইন্‌সুলীন আবিষ্কার। দুরারোগ্য বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা ইন্‌সুলীন সাহায্যে এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সফলতার সহিত হইয়াছে, যে, তাহা প্রায় যাদুকরের মায়ার মতই। রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত, ধীরে ধীরে নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় ইন্‌সুলীন চিকিৎসার ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাহাকে সতেজ করিয়া তোলা হইতেছে। এমন কি, রোগী অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে নীত হইয়াও ইন্‌সুলীনের গুণে আরোগ্য লাভ করিতেছে।

ইন্‌সুলীন হঠাৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুকালব্যাপী গবেষণার ফলেই ইহা পাওয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে বহুমূত্র রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব। এখানে ইন্‌সুলীন ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই পথে কয়েকটি বিঘ্ন আছে। প্রথমত, এখানের চিকিৎসক-গণ এখনও এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। দ্বিতীয়ত, আম্‌দানী-করা ইন্‌সুলীন নষ্ট হইয়া যাইবার খুবই সম্ভাবনা। হৃতশক্তি ইন্‌সুলীন ব্যবহারে লাভ না হইলে, লোকের ইহার উপর আস্থা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যাহাতে ভাল অবস্থায় ইন্‌সুলীন আম্‌দানী করা ও ব্যবহারের পূর্ব্ব অবধি রক্ষা করা যায়, তাহার চেষ্টা ভারতবর্ষে হওয়া দরকার। বর্ম্মার পাস্তুর ইনষ্টিটিউ-টের অধ্যক্ষ মেজর টেলর ও ডাঃ ডাগ্‌লাস এই বিষয়ের চর্চ্চা করিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে একটি প্রবন্ধ

লিখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষে আরও ইনস্থলীন আমদানী করিবার পূর্ব্বে দেখা দরকার—

১। তাজা ইনস্থলীন কি ভাবে পুরাতন ইনস্থলীন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

২। বিশেষ করিয়া শীতল ভাবে রক্ষিত অবস্থায় আমদানী করিলে কি লাভ হয়।

৩। তাহার পর কত দিন অবধি শীতল রক্ষণ (Cold Storage) করিলে ইহার গুণ বজায় থাকে।

৪। কি প্রকার অবস্থায় রক্ষিত হইলে ইহা উৎকৃষ্ট থাকে, কিসে নিকৃষ্ট হইয়া যায়।

এই-সকল প্রশ্নের মীমাংসা ও ইনস্থলীন বিক্রয়ের স্থবন্দোবস্ত না হইলে, এইরূপ চিকিৎসার প্রসার ও আদর এদেশে সম্ভব হইবে না।

অ

—

স্বরাজ্য-চুক্তি ও মুসলমান সম্প্রদায়

মুসলমানদিগের সভাসমিতিগুলি স্বরাজ্যচুক্তির সমর্থন করিতেছেন, এবং বলিতেছেন, যে, উহাতে মুসলমানদিগকে যে অংশ দিবার কথা হইয়াছে, তাহার এক কণা কমও তাঁহারা লইবেন না। অধিকন্তু তাঁহারা হিন্দুদিগকে ও তাঁহাদের মুখপত্রসমূহকে সাবধান করিতেছেন ও শাসাইতেছেন, যে, যেন তাঁহারা এই চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করেন।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। স্বরাজ্য দলের সভ্যেরা দেশের লোকের নিকট হইতে এরূপ চুক্তি করিবার কোন ক্ষমতা পান নাই। তাঁহারা দেশের লোকের সহিত পরামর্শ না করিয়াই এই অবিবেচনার কাজটি করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন কংগ্রেস্ ও হিন্দু-সমাজ কর্ত্তৃক উহা গৃহীত না হওয়ায়, চুক্তিটিকে লোকমত-সংগ্রহার্থ খসড়া মাত্র বলিলে চলিবে না। বাস্তবিক উহা খসড়া নহে; খসড়া হইলে উহা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটি দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া কংগ্রেসের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইত না। এখন মুসলমানরা স্বভাবতই মনে করিবেন, যে, তাঁহাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইতেছে। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতা হিন্দুসমাজ করিতেছেন না, কারণ তাঁহারা কখনও এই চুক্তিতে মত দেন নাই, চুক্তি করিবার ক্ষমতা কাহাকেও দেন নাই, খবরের কাগজে ছাপা হইবার আগে চুক্তির কথা তাঁহারা জানিতেন না। বেকুবী ও বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেহ করিয়া থাকে, ত, তাহা স্বরাজ্যদলের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা।

পৃথিবীর সব জাতিই স্বার্থপর, পরার্থপর জাতি (nation) কোথাও নাই। সেইরূপ পরার্থপর সম্প্রদায়, শ্রেণী, বা সমাজও কোথাও নাই। সবাই যে যতটা পারে আদায় করিয়া লয়। ইহা আধ্যাত্মিক আদর্শের বিরুদ্ধ বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মানবসমষ্টি এখনও সম্মিলিতভাবে আধ্যাত্মিক আদর্শ অনুসারে চলিতে শিখে নাই।

চাকরীর অংশ বিষয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য বলিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় এ-বিষয়ে ধীর ভাবে আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য, হিন্দুদিগকে বলি তাঁহারা মুসলমানদের উপর চটিবেন না, কারণ স্বরাজ্য-সভ্যেরাই ত এই অনর্থ ঘটাইয়াছেন। হিন্দুরা অনেক স্থলে হুজুকে মাতিয়া, খুব যোগ্য লোক থাকিতেও, যাঁহাকে চেনেন না এমন লোককেও ভোট দিয়া কৌন্সিলে পাঠাইয়াছেন—এই আশায় যে তাঁহারা গবর্ণ্মেণ্ট্কে অচল ও চুরমার করিয়া দিবেন। এখন এই অবিবেচনার ফল তাঁহারা ভুগুন; মুসলমানের উপর রাগ করিলে কি হইবে?

মুসলমানদিগকেও বলি, হিন্দুদের উপর রাগ করা ও তাঁহাদিগকে শাসান ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, সমগ্র হিন্দু সমাজ এই চুক্তির জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহে। মুসলমানগণ ইহাও বিবেচনা করিবেন, যে, তাঁহাদের নিজের যে-যে পেশায় প্রাধান্য আছে, হিন্দুরা তাহাতে বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে চাহিলে তাঁহারাও ত উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইবেন? স্থতরাং সরকারী কতকগুলা চাকরী হিন্দুদের হাতছাড়া হইলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর হিন্দুরা স্বভাবতঃ উদ্বিগ্ন হইতে পারেন।

হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বলি, দেশে তাঁহারা ছাড়াও মানুষ আছে, ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। তাহারা

সংখ্যায় কম হইলেও ভারতীয়, এবং মহৎ কাজ করিয়াছে। তাহাদের কথা ভুলিলে চলিবে না।

আমরা কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের এরূপ আর্থিক লাভালাভের দিক্ দিয়া এ বিষয়টির আলোচনা করি নাই, করা বাঞ্ছনীয়ও মনে করি না; যাহাতে সমগ্র বাংলাদেশের ও উহার অধিবাসী পৌনে পাঁচ কোটি বাঙালীর স্থায়ী কল্যাণ হয়, সেইরূপ ব্যবস্থারই আমরা পক্ষপাতী। যে যে-কাজের যোগ্যতম, অবাধে সে তাহা করিতে পাইবে, এই নীতি অনুসরণ ভিন্ন কোন জাতির স্থায়ী কল্যাণ নাই। ইহা আমরা ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছি। সংখ্যাধিক্য কিম্বা বলাধিক্য-বশতঃ সব রকম কাজ হস্তগত হইলেও, মুসলমানেরা কিম্বা হিন্দুরা, অথবা ভারতীয় হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পার্সী শিখ খৃষ্টিয়ান্ প্রভৃতিরা সম্মিলিত ভাবে ভারতের সব-রকমের রাষ্ট্রীয় কাজ, কলকারখানা রেল ষ্টীমার খনি প্রভৃতির কাজ, এখনই সব নিজেরা চালাইতে পারিবেন না, তাঁহারা নিজে সমর্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য লোকদের সাহায্য লইতে হইবে। অতএব, অধৈর্য্য ভাল নয়; সকলেই যোগ্যতম হইয়া জীবনের সকল বিভাগের কাজ যিনি যতটা পারেন, ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণে করিতে থাকুন।

—

কংগ্রেসে সভাপতির বক্তৃতা

এবারকার কংগ্রেসে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীর বক্তৃতা অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল; কিন্তু উহাতে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাতব্য এবং আলোচনার যোগ্য কথা অনেক আছে। অভিভাষণটির রচনারীতিও উৎকৃষ্ট।

হিন্দুমুসলমানের মিলন ও সদ্ভাব ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় এবং অন্যবিধ উন্নতিও অসম্ভব। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ মৌলানা সাহেব বলেন, যে, অধিকাংশ ঝগড়া দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সামান্য কারণে ঘটে; উভয় সম্প্রদায়ের লোকে একটু ঔদার্য্য ও পরমতসহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে সমস্যার সমাধান ও সদ্ভাব রক্ষিত হইতে পারে। সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য সভাপতি মহাশয় কতকগুলি প্রস্তাব করেন; যথা, আপোসে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য উভয় ধর্ম্মের সম্মিলিত সদ্ভাবসম্পাদিকা সমিতি, কংগ্রেস্-প্রতিষ্ঠানগুলির ও সংবাদপত্রগুলির অবিরাম সাবধানতা ও সতর্কতা, চাকরীতে এবং ব্যবস্থাপক সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সভাসমিতিতে সাম্প্রদায়িক দাবী গ্রাহ্য করা সম্বন্ধে সদাশয়তা, ইত্যাদি।

মৌলানা সাহেব মনে করেন, যে, সাম্প্রদায়িক আলাদা প্রতিনিধি থাকায় হিন্দুমুসলমানের ঐক্য শীঘ্র স্থাপিত হইবে। আমরা মনে করি, যে, হিন্দু ও মুসলমানের বর্ত্তমান মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আলাদা প্রতিনিধি থাকা কিছুকাল পর্য্যন্ত দরকার। কিন্তু তাঁহাদের নির্ব্বাচন সম্মিলিত হিন্দুমুসলমান নির্ব্বাচকসমষ্টি দ্বারা হইলেই, কালক্রমে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমুদয় প্রতিনিধি সমুদয় নির্ব্বাচক দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, এবং তখন পৌরজানপদ অধিকার ও কর্ত্তব্য (citizenship) সম্পূর্ণরূপে জাতীয় (national) হইবে, সাম্প্রদায়িক (communal) থাকিবে না।

অহিংসা সম্বন্ধে মৌলানা সাহেব বলেন, তিনি মুসলমান, এবং ইস্লাম্ ধর্ম্ম অনুসারে বিশ্বাস করেন, যে, যুদ্ধ একটি অতিবড় অকল্যাণ, কিন্তু যুদ্ধ অপেক্ষাও অমঙ্গলকর জিনিষ আছে; আবশ্যক হইলে তাহা নিবারণ করিবার জন্য যুদ্ধ করা উচিত; যখন শত্রু অস্ত্র বল ভিন্ন অন্য কোন যুক্তি বুঝিবে না, তখন মুসলমান যুদ্ধ দ্বারাই সে যুক্তির নিরসন করিবে। "কিন্তু আমি মহাত্মা গান্ধীর সহিত কাজ করিতে রাজী হইয়াছি, এবং যতদিন তাঁহার সঙ্গে যুক্ত থাকিব ততদিন আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র বল প্রয়োগ করিব না। এবং আমি স্বেচ্ছায় এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছি; কারণ আমি মনে করি, যে, অস্ত্র বল প্রয়োগ ব্যতীতও আমরা জয় লাভ করিতে পারি। ৩২ কোটি লোকের পক্ষে অস্ত্র বলের ব্যবহার নিন্দার বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হওয়া উচিত। যদি অস্ত্র বলের দ্বারা জয় লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা জাতির সকল শ্রেণীর দ্বারা লব্ধ জয় হইবে না, কিন্তু প্রধানতঃ যোদ্ধা শ্রেণীদের দ্বারা লব্ধ জয় হইবে। কিন্তু তাহারা পৃথিবীর অন্য সব দেশ অপেক্ষা এদেশে অন্য সব শ্রেণীর লোক-সকল হইতে বেশী বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর

সম্বন্ধবিহীন। আমাদের স্বরাজ সকলের-"রাজ" হওয়া চাই (কেবল যোদ্ধা-"রাজ" হইলে চলিবে না); এবং তাহা হইতে হইলে স্বরাজ সকলের স্বেচ্ছাকৃত আত্মোৎসর্গ ও আত্মবলিদান দ্বারা লব্ধ হওয়া চাই। তাহা না হইলে আমাদিগকে, কেবল স্বরাজ লাভের জন্য নহে, স্বরাজ রক্ষার জন্যও যোদ্ধা শ্রেণীদের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু ইহা আমাদের করা চলিবে না। (কারণ, যাহাদের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহারা কালক্রমে প্রভু ও অত্যাচারী হইয়া উঠে।) অধিকতম লোকের ন্যূনতম ত্যাগের দ্বারা স্বরাজ লাভ করিতে হইবে, ন্যূনতম লোকদের অধিকতম আত্মবলিদানের দ্বারা নহে। যেহেতু অহিংস অসহযোগের জাতিগঠনাত্মক অনুষ্ঠানসমষ্টির ফলদায়কতায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সেইজন্য আস্র বল প্রয়োগের জন্য আমার হৃদয় লালায়িত নহে। এই গঠনমূলক অনুষ্ঠানসমষ্টি আমাদিগকে জয়ী করিতে যদি নাও পারে, তাহা হইলেও, আমি জানি, স্বেচ্ছায় প্রফুল্লচিত্তে দুঃখ সহ্য করিলে তাহাই সফল আস্র বল প্রয়োগের জন্য উৎকৃষ্টতম প্রস্তুতি হইবে। কিন্তু, ঈশ্বরেচ্ছায়, আমরা যদি মন প্রাণ দিয়া কাজ করি এবং যদি জাতিকে গঠনমূলক অনুষ্ঠানগুলির জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করিতে পারি, তাহা হইলে উহা আমাদিগকে সিদ্ধির আশায় নিরাশ করিবে না।"

—

স্বরাজ জাতির নিকট কি দাবী করে ?

মৌলানা মহম্মদ আলি বলেন, "আমাদের যে পনের লক্ষ ভারতীয় জা'তভাই অপরের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, তাহারা প্রাণ দিতে গিয়াছিল, এবং অনেকে প্রাণ দিয়াওছে। (আমরা আমাদের নিজেদের জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাহাদের মত ত্যাগ করিতেছি কি ? করিতে প্রস্তুত আছি কি ?) অহিংস অসহযোগ আমাদের কাছে যে সামান্য ত্যাগ চায়, তাহা হইতে পিছপাও হওয়া কি আমাদের উচিত ? আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যসমষ্টি জাতীয় কাজের আরম্ভ মাত্র; এবং স্বরাজ লব্ধ হইবার পর সৈনিকদের চেয়েও বেশী ত্যাগ থাকার আমাদিগকে করিতে হইবে। কোন একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রাণ দেওয়া বেশী কঠিন নয়। সকল দেশে সকল যুগে মানুষ ইহা করিয়াছে, এবং কখন কখন অতি তুচ্ছ কারণে করিয়াছে। কোন উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জীবন ধারণ করা, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত তাহার জন্য ব্যয় করা, এবং প্রয়োজন হইলে, তজ্জন্য দুঃখভোগ করা—ইহাই কঠিনতর কাজ। যে লক্ষ্যের জন্য আমাদিগকে জীবন ধারণ ও যাপন এবং দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, তাহা, ভারতবর্ষে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন।"

—

গোবধ

মৌলানা সাহেব গোবধ সম্বন্ধে অনেক খাঁটি কথা বলিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎকে রূপক ভাষায় কামধেনু বলিবার পূর্ব্বেই "আমার ভাই ও আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে, গোবধের সঙ্গে আমরা কোন সম্পর্ক রাখিব না; আমি জানি হিন্দু ভাইদের চোখে গাভী কিরূপ ভক্তির পাত্র। তখন হইতে আমাদের বাড়ীতে চাকরেরাও গোমাংস ভোজন করে না, এবং আমাদের স্বধর্ম্মীদিগকে এইরূপ করিতে অনুরোধ করা আমাদের কর্ত্তব্য মনে করি। গো কোর্‌বানী আমার ভাই ও আমি কখন করি নাই, সকল দর্‌কারের সময় ছাগ বলি দিয়াছি।"

তাহার পর তিনি বলেন, যে, "দরিদ্রতর নগরবাসী মুসলমানদের গোমাংস প্রধান খাদ্য; ছাগ ও মেষ মাংসের মূল্য খুব কমাইতে না পারিলে খাদ্যের জন্য গোবধ একেবারে বন্ধ করা যাইবে না। আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি, যে, বেশীর ভাগ গাভী হিন্দুদের সম্পত্তি। গাভী দুধ দেওয়া বন্ধ করিলেই তাঁহারা যদি উহা বিক্রয় না করেন, তাহা হইলে গোবধ অনেক কমিতে পারে। গাভী রক্ষার জন্য ছাগল ও ভেড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করাইবার নিমিত্ত মেষছাগব্যবসায়ীদিগকে উৎসাহ দিতে পারা যায়।" পরিশেষে তিনি সকলকে, বর্‌দাস্ত করা এবং ত্যাগস্বীকার করা, এই দুইটি বিষয়ে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন।

আমাদের মনে হয়, কোন পক্ষেরই অবুঝ হওয়া উচিত নয়। হিন্দুর মনের ভাব বুঝিয়া মুসলমানদের যথাসম্ভব কম গোবধ এবং নিভৃত স্থানে গোবধ করা কর্ত্তব্য। অন্য দিকে, দরিদ্রতর মুসলমানের খাদ্য এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক বলিয়া উহা একেবারে আইন দ্বারা বন্ধ করাইবার চেষ্টা করাও হিন্দুদের উচিত নহে। বাংলা দেশের বাহিরে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ মাছ মাংস খান না। বাংলা দেশের হিন্দুদের সব জাতির লোক মাছ মাংস ভক্ষণে এবং দুর্গা-পূজা কালী-পূজা প্রভৃতিতে ছাগ বলিদানে অভ্যস্ত। সেই কারণে অন্যান্য প্রদেশের ব্রাহ্মণ ও অন্য কোন কোন নিরামিষভোজী জাতির পক্ষে বঙ্গের ব্রাহ্মণদের মৎস্যমাংস ভোজন এবং ছাগ বলিদান একেবারে বন্ধ করিবার চেষ্টা অনুচিত হইবে। ইহাও মনে রাখা উচিত, যে, অতীত কালে এক সময়ে ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে গোমেধ যজ্ঞ এবং খাদ্যের জন্য গোবধ প্রচলিত ছিল।

—

"বদ্‌মাষ সম্প্রদায়"

মৌলানা সাহেবের একথা ঠিক, যে, বদ্‌মাষরা হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, তাহারা এক আলাদা সম্প্রদায়। কারণ ইহা সত্য, যে, হিন্দুর ধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম, কোন ধর্ম্মই বদ্‌মায়েষী করিতে বলে না। ইহার উপর আমরা একটা কথা বলিতে চাই। যখনই যেখানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবে, তখনই সেই স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতারা যেন স্থির করেন, যে, দাঙ্গায় লিপ্ত অধিকাংশ বদ্‌মাষ কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যখনই দেখা যাইবে, যে, কোন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বেশীর ভাগ বদ্‌মাষকে জন্ম দিয়াছে, তখনই সেই সেই সম্প্রদায়ের নেতা ও ধর্ম্মোপদেষ্টারা যেন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের স্থায়ী চেষ্টা করিতে থাকেন।

—

"শুদ্ধি" ও সংঘবন্ধন

"শুদ্ধি" এবং হিন্দুদের সংঘবদ্ধ হইবার চেষ্টাতে মৌলানা সাহেব কোন দোষ দেখেন নাই; কিন্তু তিনি বলেন, যে, অন্ত্যজ অনুন্নত জাতি-সকলের উন্নতির জন্য ও তাহাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবার জন্যই যেন হিন্দুরা এই-সকল চেষ্টা করেন, দল পুরু করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য যেন না করেন।

মৌলানা সাহেবের একথা সত্য, যে, খৃষ্টিয়ান্ মিশনারীরা যে হাজার হাজার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে খৃষ্টিয়ান্ করিতেছেন, তাহাতে হিন্দু কাগজওয়ালারা চীৎকার করেন না, কিন্তু মুসলমান্‌রা তাহাদিগকে মুসলমান করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহারা চেঁচাইবেন। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, মুসলমানেরাও খৃষ্টিয়ান্ পাদ্‌রীদের অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে খৃষ্টিয়ান্ করিবার চেষ্টায় বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া চীৎকার করেন নাই, কিন্তু আর্য্যসমাজী ও হিন্দুদের "শুদ্ধি" প্রচেষ্টায় উত্তেজিত হইয়াছেন। মৌলানা সাহেব এই কথাটি বলেন নাই। তিনি তাঁহার অভিভাষণে অনেক স্থলেই নিরপেক্ষভাবে উভয় দিক্ দেখিয়া কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থলে দুই দিক্ দেখিতে পারেন নাই।

সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে, খৃষ্টিয়ান্ পাদ্‌রী ও মুসলমান মোল্লাদের স্বধর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টার একটা প্রধান প্রভেদের উল্লেখ করিতে হইবে। খৃষ্টিয়ান্ পাদ্‌রীরা যাহাদিগকে বাপ্তাইজ্ করেন, তাহাদের সাধারণ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন করিবার ও তদ্দ্বারা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় সেরূপ কিছু করেন না। ফলে আমরা দেখিতে পাই, যে, নিরক্ষরতা ও ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের অমূল্য উপদেশ-সকল সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং প্রয়োজন অনুসারে ধর্ম্মান্ধতা ও ধর্ম্মোন্মত্ততা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে যতটা দেখা যায়, অন্য কোন সম্প্রদায়ে ততটা দেখা যায় না। নিরক্ষরতা ধরুন। নীচের তালিকা ১৯২১ সালের বঙ্গের সেন্সস্ হইতে গৃহীত। সংখ্যাগুলি স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির সম্মিলিত সংখ্যা।

ধর্ম্ম	হাজারে লিখনপঠনক্ষম	হাজারে ইংরেজী-জানা
হিন্দু	১৫৮	৩২
মুসলমান	৫৯	৬
দেশী খৃষ্টিয়ান	২৩৬	১১১

ব্রাহ্ম	৮২১	৬১৬
বৌদ্ধ	৯৬	৯
ভূতপূজক	৭	০·৩

(শিক্ষার অভাব প্রভৃতি কারণে) মুসলমানদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা যে বেশী, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

অতএব, ধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যদি কেবল পার্থিব কারণেও লোকে খৃষ্টিয়ান্ করিবার চেষ্টায় না চেঁচাইয়া নামে-মাত্র-মুসলমান করিবার চেষ্টায় বিচলিত হয়, তাহাতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়।

মৌলানা সাহেব এই প্রসঙ্গে একজন ধনী প্রভাবশালী মুসলমান ভদ্রলোকের যে প্রস্তাবটি কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তাহাতে আমরা সায় দিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, আদিম-নিবাসী জাতিসকল ও হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ জাতিসকল যে-সব অঞ্চলে বাস করে, তাহা হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকেরা তাঁহাদের কর্ম্মীর এবং হস্তেস্থিত টাকার পরিমাণ অনুসারে এক এক বৎসর বা দীর্ঘতর কালের জন্য ভাগ করিয়া লউন। হিন্দুর অংশে যে-সব জায়গা পড়িবে, সেখানে হিন্দু নির্দ্দিষ্ট-কাল কাজ করিবেন; মুসলমানও তদ্রূপ নিজের অংশে কাজ করিবেন। নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থানের অনুন্নত লোকদিগকে তাঁহারা নিজ নিজ সমাজের সামিল করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন। এরূপ ভাগাভাগিটা কতকটা প্রবল জাতিদের সমুদয় পৃথিবীর দুর্ব্বল "অসভ্য" জাতিদিগকে "ম্যাণ্ডেট্" দ্বারা ভাগ করিয়া লওয়ার মত শুনায়। সাঁওতাল বা গোঁড় যদি বলে, আমি হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টিয়ান্ কিছুই হইব না, তাহা হইলে তাহাকে উক্ত কোন সম্প্রদায়ের গ্রাস ও হজম করিবার কি অধিকার আছে? তা ছাড়া, একই স্থানের কতক সাঁওতাল বা চামার বা হাড়ি উন্নত-হিন্দু হইতে, কতক মুসলমান হইতে, কতক খৃষ্টিয়ান্ হইতে, কতক বৌদ্ধ হইতে চাহিতে পারে। কেবল একটি ধর্ম্মের আলোক ঐ স্থানে ধরিয়া অন্য ধর্ম্মের আলোক আট্‌কাইবার অধিকার কাহারও আছে কি? তা ছাড়া, নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এক সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ কোন স্থানে কাজ করিয়া যদি চলিয়া যান, ও পরে অন্য ধর্ম্মের লোকেরা সেখানে গিয়া নিজের দল পুরু করিতে চান, তাহা হইলে কি নূতন করিয়া ঝগড়া বাধিবে না?

ধর্ম্মপ্রচার-ক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার ভাগাভাগি চলিতে পারে না।

—

স্বরাজ ও বিদেশীর আক্রমণ

মৌলানা মহম্মদ আলীর মতে, ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত হইলে তাহাতে মুসলমানদের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। স্ব-রাজ কিম্বা সর্ব্ব-রাজের মধ্যে স্ব-ধর্ম্মও উহ্য আছে। ইস্‌লাম ইহা বলেন না, যে, দিল্লীতে মোগলের সিংহাসনে একজন মুসলমানকেই বসিতে হইবে। তা ছাড়া, সকলেই জানেন, পৃথিবীর প্রবলতম মুসলমান রাষ্ট্রে রাজসিংহাসন আর নাই, তথায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক খাঁটি মুসলমান অতীত কালের পৃথিবীর বড় বড় মুসলমান-সাম্রাজ্যের কথা সেরূপ গৌরবের সহিত স্মরণ করেন না, যেরূপ গৌরবের সহিত খিলাফতের প্রথম ত্রিশ বৎসরের কথা স্মৃত হয়, যখন খলিফাগণ সাধারণতন্ত্রের প্রধান সেবক ছিলেন।

এই-সকল কথা হইতে বুঝা যায়, যে, মৌলানা সাহেবের মনের ঝোঁক সাধারণতন্ত্রের দিকে।

ভারতীয় মোস্লেমদের সাহায্যে আফগানিস্থানের ভারত আক্রমণ করিবার আশঙ্কা সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে, ওটা একটা জুজু মাত্র। তিনি বলেন, স্বরাজ লব্ধ হইবার পর যদি কোন বিদেশী (যে ধর্ম্মেরই হউক) ভারত আক্রমণ করিতে সাহসী হয়, তিনি তাহা হইলে ভারতীয় সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইবেন, এবং নিশ্চয়ই পলাতক হইবেন না।

তাঁহার মতে হিন্দুরা যদি-বা স্বরাজ-সংগ্রামে ক্ষান্ত হন, তাহা হইলেও মুসলমানেরা স্বরাজের জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে, এবং স্বরাজ লব্ধ হইলে হিন্দুদিগকেও তাহার ফলভাগী করিবে।

—

স্বরাজের অর্থ

স্বরাজের অর্থ যে হিন্দুর প্রভুত্ব ও মুসলমানের দাসত্ব, কিম্বা মুসলমানের প্রভুত্ব ও হিন্দুর দাসত্ব নহে, তাহা

তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তিনি আরও বলেন, উভয় সম্প্রদায়েরই লোকের বুঝা উচিত, যে, কেহ কাহাকেও নির্মূল করিতে পারিবে না। হিন্দুরা মুসলমানকে নির্মূল করিতে চাহিলে, যখন মহম্মদ বিন্ কাসিম্ সিন্ধুদেশে পদার্পণ করে, তখন করা উচিত ছিল; মুসলমানরা হিন্দুকে ধ্বংস করিতে চাহিলে তাহারা যখন ভারতে প্রবলতম ছিল, তখন করা উচিত ছিল। অতএব এখন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে সকলের জন্য স্বরাজের চেষ্টা করিতে হইবে, নিজের প্রভুত্ব ও অন্যের দাসত্বের জন্য নহে। মুসলমান হিন্দুর মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিন্, তিনি বিদেশী মুসলমানেরও আক্রমণে বাধা দিবেন; হিন্দুও মুসলমানের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করুন, যে, হিন্দুর সংখ্যাধিক্যের মানে মুসলমানের দাসত্ব নহে। "আমার নিজের কথা এই, যে, আমি বর্ত্তমান প্রভুদের পরিবর্ত্তে বরং হিন্দুর দাসত্ব করিতে রাজী আছি; কারণ তদ্দ্বারা আমার স্বধর্ম্মী পঁচিশ কোটি লোকের দাসত্ব নিবারণ করিতে পারিব,—যাহাদের দাসত্ব এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যপূজা একার্থক।"

—

সংস্কৃত কলেজ ও তাহার অধ্যক্ষতা

আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় জীবনের উপর স্থাপিত এবং তাহা হইতে বিবর্ত্তিত। বর্ত্তমানকে বুঝিতে হইলে, তাহার শ্রেষ্ঠ অংশকে সংরক্ষিত, বিকশিত ও বর্দ্ধিত করিতে হইলে অতীতের শ্রেষ্ঠ অংশকেও জানিতে বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানে মন্দ যাহা, তাহা বর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও, তাহার মূল বা বনিয়াদ প্রাচীনের কিছুর মধ্যে আছে কি না, দেখিতে হইবে। অতএব, আমাদের অতীতকে জানা কেবল যে ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজন তাহা নহে, আমাদের সমগ্র সভ্যতার সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্যও আবশ্যক, তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্যও আবশ্যক। এই অতীতের সাক্ষ্য প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে,প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতিতে আছে; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আছে প্রাচীন সাহিত্যে। সুতরাং আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন যে একান্ত আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। সাহিত্য শব্দটি আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। পালি সাহিত্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ না করিলেও তাহার অনুশীলনও আমাদের অভিপ্রেত।

বাংলা দেশে যে-সকল টোল আছে, তাহাতে সংস্কৃতের চর্চ্চা হয় বটে। কিন্তু টোলগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে। এক-একটি টোলে একটি বা দুটি বা তিনটি বিষয়ের অধ্যাপনা ২।১ জন অধ্যাপক স্বতন্ত্র ভাবে করেন। কোথাও কোথাও এক-একটি বিষয়ের গভীর ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাত্রেরা লাভ করে, কোথাও কোথাও তাহাও করে না। কিন্তু এক-একটি বিষয়েরও ভাল পুস্তকসংগ্রহ টোলগুলিতে কচিৎ দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া, যেখানে ব্যাকরণ অধীত হয়, তাহা ব্যাকরণের জন্যই হয়; স্মৃতি বা কাব্য বা ন্যায়ও এই প্রকারে স্মৃতি বা কাব্য বা ন্যায়ের জন্যই অধীত হয়। একটি বা একাধিক বিষয়ের জ্ঞানের আলোকপাত অপর বিষয়গুলির উপর প্রায় হয় না, সকল বিষয়গুলির জ্ঞানের পরস্পরসাপেক্ষতা উপলব্ধ ও প্রদর্শিত হয় না, এবং সমুদয়ের জ্ঞানের সমষ্টি দ্বারা সমগ্র অতীতকে জানিবার বুঝিবার সমালোচনা করিবার ও অতীতের গর্ভ হইতে রত্ন উদ্ধার করিবার চেষ্টা হয় না। ম্যুজিয়মে বিলুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল বা বিলুপ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ্-দেহের অংশবিশেষের প্রস্তরীভূত নমুনা রক্ষিত হইয়া যেমন অশিক্ষিতেরও কৌতুকাবহ হয়, আমরা সংস্কৃত পালি প্রভৃতি সাহিত্যকে তদ্রূপ কিছু মনে করি, এ ধারণা যেন কাহারও না হয়। কেন না, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে জ্ঞানের, সাত্ত্বিকতার, আধ্যাত্মিক অনুভূতির, এরূপ অনেক নিদর্শন আছে, যাহা এখনও কোথাও অতিক্রান্ত হয় নাই।

এই-সকল কারণে, এমন অন্ততঃ একটি বিদ্যাপীঠ থাকা দরকার যেখানে প্রাচীন সাহিত্যের সকল শাখা অধীত হইবে, তাহার অধ্যাপনার জন্য যোগ্য অধ্যাপকসকল থাকিবেন, এবং সকল শাখার সমুদয় মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তক যথাসম্ভব সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইবে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ এরূপ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে না হইলেও তাহাকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাইতে পারে।

যে-সব কলেজে পাশ্চাত্য নানা বিদ্যার সহিত সংস্কৃতও অধীত হয়, তথায় সংস্কৃতের গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান লব্ধ হইতে পারে না। কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বয়ং আর দশটি বিষয়ের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা সংস্কৃতের যেরূপ অনুশীলন ও তাহার যেরূপ পুস্তকসংগ্রহের কথা বলিতেছি, তাহা করিতে পারেন না।

সংস্কৃত কলেজেও কেবল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীন ধরণের পণ্ডিতমণ্ডলী থাকিলে চলিবে না। তাহার কারণ, যাঁহারা কেবল সংস্কৃতেরই চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহাদের জ্ঞান গভীর ও স্বস্ববিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইলেও, আধুনিক জগতের জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাসিত নহে। অন্য দিকে আবার প্রাচীন ধরণের পণ্ডিতেরাও একান্ত প্রয়োজনীয়। অধ্যাপক টিব (Thibaut) একবার মহা-

মহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, যে, "আমরা সাবেক ধরণের এদেশী পণ্ডিতদের সাহায্য না লইয়া কাজ করিতে পারি না।" অতএব, সাবেক ধরণের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা অবশ্যই থাকিবেন। কিন্তু আধুনিক জ্ঞানবিশিষ্ট বিদ্বান্ ও মনীষীও চাই। তাহার কারণ বলিতেছি।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আবিষ্কার। এশিয়ার প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডে এবং দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল। জাপানের কোন কোন মঠে এমন সংস্কৃত বহি পাওয়া গিয়াছে, যাহা ভারতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিব্বতী ও চীন ভাষায় এমন সংস্কৃত বহির অনুবাদ আছে, যাহার মূল ভারতে এখন আর নাই। মধ্য এশিয়ায় বালুকাচ্ছন্ন ভূগর্ভপ্রোথিত বহু নগরে ও জনপদেও সংস্কৃত বা তাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত সাহিত্যের এবং ভারতীয় শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্য এশিয়ায় এমন আর্য্যভাষার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যাহা এখন পৃথিবী হইতে লয় পাইয়াছে। যব দ্বীপ, বলি দ্বীপ, প্রভৃতিতে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের নিদর্শন রহিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীনতম বর্ণমালা ভারতীয়। আনাম শ্যাম কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিদ্যমান। বর্ত্তমান ভারতের সীমার মধ্যে ও বাহিরে শিলালিপির উদ্ধার ও তাহার সাহায্যে প্রাচীন ভারতেতিহাসে আলোকপাতও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা করিয়াছেন।

এই-সকল কারণে, পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষার জ্ঞান যাঁহার বা যাঁহাদের আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কি প্রণালীতে গবেষণা করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদির কাল নির্ণয় করেন, কেমন করিয়া প্রক্ষিপ্তের ও মূলের বিচার করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন বিদ্যার সকল শাখার পরস্পর সাহায্যে নানা অমূল্য সত্য আবিষ্কার ও তথ্য নিরূপণ করেন, কেমন করিয়া প্রাচীন গ্রীস ও রোম, প্রাচীন চীন তিব্বত ও জাপান, প্রাচীন মিসর, প্রাচীন আসীরিয়া, বাবিলন পারস্য, প্রভৃতির সভ্যতা দর্শন সাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা কেমন করিয়া করেন, ইত্যাদি বিষয় যিনি বা যাঁহারা জানেন, এরূপ লোকও সংস্কৃত কলেজে থাকা একান্ত আবশ্যক। নতুবা, ইহা শুধু একটি বৃহৎ টোলে পরিণত হইবে। কিন্তু, বৃহৎ টোলের প্রয়োজন নিশ্চয়ই থাকিলেও শুধু তাহাই আদর্শের অনুরূপ হইবে না।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিবার লোক কিরূপ হওয়া আবশ্যক বলিয়াছি। তাঁহাকে ব্রাহ্মণ হইতেই হইবে, হিন্দু হইতেই হইবে, ভারতীয় হইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ, ইহারও ইতিহাসে দেখিতে পাই, ইহা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হইবার পর প্রথম প্রথম যখন ইহা কেবল টোলের মত সংস্কৃতেরই অধ্যাপনা করিত, তখন ইহার ভার ছিল একটি কমিটির হাতে, এবং তাহার সেক্রেটরী, প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষের কাজ করিতেন। ভারতীয় এবং বিদেশী, হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান্, উভয় রকম লোকই কখন না কখন সেক্রেটরী ছিলেন। ভারতীয় সেক্রেটরী ছিলেন, রামকমল সেন, বৈদ্য; রাধাকান্ত দেব, কায়স্থ; রসময় দত্ত, কায়স্থ। তত্ত্বাবধায়ক ও পরিচালকের নাম সেক্রেটরীর পরিবর্ত্তে প্রিন্সিপ্যাল্ বা অধ্যক্ষ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতে। কাউয়েল্ সাহেব, খৃষ্টিয়ান্, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, কায়স্থ, প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছিলেন। সুতরাং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে হিন্দু হইতে হইবে, বা ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এরূপ কোন নিয়মও নাই, নজীরও নাই। এবং ইহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ট্যাক্স্ হইতে পরিচালিতও হয় না। সেইজন্য আমরা বলি, গবর্ণ্মেণ্ট এই কলেজের জন্য যত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত, এবং তাহার মধ্যে যত টাকা অধ্যক্ষের বেতন দিতে প্রস্তুত, সেই টাকায় জাতিধর্ম্মবর্ণনির্বিশেষে যোগ্যতম লোক নিযুক্ত করুন।

আমরা যে যে কারণে পাশ্চাত্য ও আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও দুএকজন অধ্যাপক নিয়োগ আবশ্যক মনে করি, সেই সেই কারণে ছাত্রদিগকেও শুধু সংস্কৃত ও পালি না শিখাইয়া পাশ্চাত্য কোন কোন ভাষা ও বিদ্যা শিখান প্রয়োজন। অবশ্য, ব্রাহ্মণপণ্ডিতবংশীয় যে-সকল ছাত্র কেবল সংস্কৃত বা সংস্কৃত ও পালি শিখিতে চান, তাঁহাদিগকে ইংরেজী বা অন্য কোন পাশ্চাত্য ভাষা বা পাশ্চাত্য কোন বিদ্যা শিখিতে বাধ্য করা হইবে না।

—

উদারনৈতিকদিগের কন্‌ফারেন্স্

মডারেট্ নামটা ঠিক্ তাঁহাদের লক্ষ্য ও রাষ্ট্রীয় মতের পরিচায়ক নহে বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে লিবার্‌্যাল বা উদারনৈতিক বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বার্ষিক কন্‌ফারেন্স্ এবার পুনায় হইয়াছিল। স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে প্রথমে বিগত সাম্রাজিক মন্ত্রণাসভায় তাঁহার কার্য্যের বিষয় বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে তিনি জেনারেল স্মাট্‌সের জেদে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাহা সত্য। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ধরা পড়িয়াছেন জেনারেল স্মাট্‌স্; শ্বেতচর্ম্মী ব্রিটিশসাম্রাজ্যভুক্ত সব শেয়ালের এক

না, জেনারেল্ স্মাট্‌স্ জোরে হুক্কা-হুয়া করায় দোষটা তাঁহারই হইয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ ত ভারী সহানুভূতি-সম্পন্ন; কিন্তু, আমরা স্বদেশে স্বায়ত্তশাসক নহি, এই অছিলায় যে ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে আমাদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হয় না, তাহার মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য ব্রিটিশসিংহ ভারতে পূরা স্বায়ত্তশাসন কেন প্রবর্ত্তিত করেন না?

সাপ্রু মহাশয় বলিয়াছেন, যে, অসহযোগীরা মনে করেন, যে, কেবল তাঁহারাই স্বরাজ চান। তাহা নহে; উদারনৈতিকেরাও স্বরাজ চান। নূতন আমলের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম বৎসরেই ভারতে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করা হইয়াছিল। ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ তাহা ভারত সচিবকে জানাইয়াছিলেন। ভারত-সচিব যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তাহার মৎলবটা পরিষ্কার বুঝা যায় নাই।

অবশ্য কেবল অসহযোগীরাই স্বরাজ চান, ইহা ঠিক্ নহে। কিন্তু দাবীর মাত্রায় ও পরিমাণে প্রভেদ আছে। উদারনৈতিকগণ পুনা কন্‌ফারেন্সেও এবিষয়ে যে প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে রাষ্ট্রীয় সকল বিভাগে প্রাদেশিক পূরা দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ভারতীয় যে দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চাহিয়াছেন, তাহাতে সামরিক বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগগুলি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের হাতেই থাকিবে বলিয়া মত দিয়াছেন। আমাদের বোধ হয়, অসহযোগীরা এই রকমের অঙ্গহীন স্বরাজ চান না; অনেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই চান।

উদারনৈতিকরা যে সেনাবিভাগে খুব শীঘ্র শীঘ্র ভারতীয়তাপাদন (Indianisation) চান, তাহাও বলা কর্ত্তব্য। পুনা কন্‌ফারেন্সে তাঁহারা এবিষয়ে একটি প্রস্তাব ধার্য্য করিয়াছেন।

—

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ

ভারতবর্ষের লোকদের নিজের বাণিজ্য-জাহাজ থাকা উচিত কি না, এবিষয়ে দেশের লোকদিগকে সরকারের সাহায্য ও উৎসাহ দেওয়া উচিত ও আবশ্যক কিনা, এই সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য গবর্ণ্‌মেণ্ট্ এক কমিটি বসাইয়াছেন। এদেশে কমিটি ও কমিশন বসান হয়, অধিকাংশ স্থলে কোন একটা প্রয়োজনীয় কাজে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত, কিম্বা উহা না-করিবার অছিলা বা ওজুহাত বাহির করিবার জন্য, কিম্বা ব্যাপারটাকে বৃহৎ সাক্ষ্যসংগ্রহপুস্তক ও রিপোর্টের দ্বারা চাপা দিবার নিমিত্ত।

বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইংরেজের তরফ হইতে বেশ মজার



সার্ তেজ বাহাদুর সাপ্রু

মজার সাক্ষ্য দেওয়া হইতেছে। সকলের সাক্ষ্যের আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না; কেন না, আমরা স্বায়ত্তশাসন, স্বরাজ বা আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিবার আগে, জাহাজ নির্ম্মাণে যথোপযুক্ত সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ পাইব না, ইহা নিশ্চিত। ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর পক্ষ হইতে বলা হইতেছে, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যজাহাজ ও রণতরী দ্বারাই ভারতের সব কাজ চলিতে পারে। তা পারে বৈ কি! নতুবা আমাদের আম্‌দানী ও রপ্তানীর সব মাল জাহাজে বহন করিয়া আমাদের কোটি কোটি টাকা গ্রাস করিবার এবং আমাদের শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টাতে বাধা দিবার সুবিধা হইবে কেমন করিয়া? আরো বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ; উহার সরকারী তহবিল হইতে জাহাজ নির্ম্মাণে সাহায্য বা রণতরী নির্ম্মাণ চলিতে পারে না। কিন্তু যখন ব্রিটিশ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কোটি কোটি টাকা নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের জন্য খরচ করে, যখন ১৫০ কোটি টাকা ভারতের "স্বেচ্ছাকৃত দান" বলিয়া আদায় করা হয়, যখন সামরিক ও সিবিল্ কর্ম্মচারীদের মোটা বেতন আরো মোটা করা হয়, যখন নূতন নূতন প্রাদেশিক বিভাগ

স্থাপন, নূতন রাজধানী নির্মাণ, প্রভৃতিতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, তখন ত ভারতবর্ষ গরীব বিবেচিত হয় না! যখন তর্ক উঠে, যে, ব্রিটিশ-শাসনে ভারতবর্ষ গরীব না ধনী হইতেছে, তখন ত বলা হয়, ভারতবর্ষ খুব ধনী হইতেছে! এই সেদিনও বোম্বাইয়ের গবর্ণর স্যার্ জর্জ্জ্ লইড্ কার্য্যভার ত্যাগের প্রাক্‌কালে বক্তৃতা করেন, যে, ভারতবর্ষ খুব ধনী হইতেছে, এবং বড় কর্ম্মচারী-দিগকে আরও বেতন দিবার ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে!

ইংরেজের পক্ষ হইতে এরূপ সাক্ষ্যও দেওয়া হইয়াছে, যে, ভারতবাসীরা, বিশেষতঃ হিন্দুরা, বড় খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে; সুতরাং তাহারা জাহাজের অফিসার বা সাধারণ কর্মী হইবার যোগ্য নহে! কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের বিচার সত্ত্বেও ত বিস্তর ভারতীয় ইউরোপ আমেরিকা জাপানে শিক্ষালাভ করিয়াছে ও করিতেছে, বিস্তর ভারতীয় বিদেশে ব্যবসা করিতেছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী ভারতীয় আফ্রিকায় আমেরিকায় ফিজিতে মরীচ-দ্বীপে মালয়ে শ্রমিকের কাজ করিতেছে। প্রাচীন ভারতের লোকদের নিজের জাহাজ ছিল। তাহাতে তাহারা বহু দূর দেশে যাইত। কোম্পানীর আমলের কিছুদিন পর্য্যন্তও ভারতীয়দের জাহাজ ছিল। ইংরেজরা স্বার্থপরতা-বশতঃ ভারতীয় জাহাজের উচ্ছেদ সাধন করে। এক শূকরমাংস ছাড়া অন্য খাদ্য মাংসে অন্ততঃ ভারতীয় মুসলমানদের ত আপত্তি নাই। হিন্দুরা সামুদ্রিক জীবনের অযোগ্য বিবেচিত হইলেও অন্ততঃ ভারতীয় মুসলমানেরা যোগ্য হইয়া উঠিলেও আমরা আনন্দিত হইব। তাঁহারা ত সেরাং লস্কর প্রভৃতির কাজ দক্ষতা ও সাহসের সহিত করিয়া থাকেন।

ইংরেজ তরফের আর এক ধাঁচের সাক্ষ্য এই, যে, নাবিকের জীবন বড় ঝঞ্ঝাট বিপদ্ ও কষ্টের জীবন; মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর ভারতীয়রা কি এরূপ আটপিঠে, সাহসী, ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারিবে? অতএব, আগে কতকগুলি যুবককে জাহাজে করিয়া নানা দূর দেশে লইয়া যাওয়া হউক। যদি তাহাদের এরূপ জীবন ভাল লাগে, যদি তাহাদের নানা মাত্রার শীতাতপ সহ হয়, যদি দীর্ঘপ্রবাস সহ হয়, তাহা হইলে না হয় তাহাদিগকে জাহাজের অফিসারের শিক্ষা দিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

আমরা বলি, আমাদের যুবকেরা যদি গৌরীশঙ্করের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় এখন উঠিতে নাই পারে, তাহা হইলে কি নিম্নতর শৃঙ্গেও তাহারা উঠিবে না? সুমেরু বা কুমেরু-গামী জাহাজে তাহারা যাইতে পারিবে না বলিয়া কি জাপান ফিলিপাইন পর্য্যন্তও যাইতে পারিবে না? করাচী হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্তও জাহাজ চালাইতে পারিবে না?

বাণিজ্যজাহাজের ব্যবসাকে দুটা ভাগে ভাগ করা যায়; ভারতীয় নদীর এবং ভারত-উপকূলের ব্যবসা, এবং দূর-বিদেশগামী জাহাজের ব্যবসা। আমরা উপকূলের ও ভারতীয় নদীর ব্যবসা হইতে আরম্ভ করিতে চাই। অন্য অনেক সভ্য দেশে আভ্যন্তরীন নদীর এবং উপকূলের ব্যবসা আইন দ্বারা তত্তদ্দেশীয় ও জাতীয় লোকদের একচেটিয়া করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারতেও আমরা সেইরূপ চাই। এবং তাহার জন্য সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ যাহা প্রয়োজন, তাহা দিবার মত টাকা ভারতীয় রাজকোষে আছে ও থাকা উচিত। অপব্যয় নিবারণ করিলে সদ্ব্যয়ের টাকা সব সময়েই পাওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান্ মার্কেণ্টাইল্ মেরীন্ কমিটি নামক এই কমিটির সমক্ষে বাংলা দেশের মিঃ এস্ এন্ বন্দ্যো এবং মিঃ যোগেন্দ্রনাথ রায় বেশ স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া ইংরেজরা দেশী বাণিজ্য-জাহাজের ব্যবসা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে ও নষ্ট করে। মিঃ বন্দ্যোর সত্য কথা কমিটির সভাপতি স্যার আর্থার ফ্রুমের মতে আপত্তিজনক হওয়ায় তাঁহাকে জেরা করা হয় নাই। রায় মহাশয়ের কোন একটি উক্তি আপত্তি-জনক মনে হওয়ায় ফ্রুম্ তাঁহাকে উহা প্রত্যাহার করিতে বলেন। রায় মহাশয় তাহা করেন নাই। ঠিকই করিয়া-ছেন। তোমাদের মনের মত কথা না বলিলেই তাহা আপত্তিজনক হয়।

—

নেপাল ও ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্

ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ নেপালের সহিত এক নূতন সন্ধি করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য নেপালের নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহে শান্তি রক্ষণ। নেপাল ভারতের ভিতর দিয়া যত ইচ্ছা অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যাইতে পারিবে। তাহাতে নেপাল খুব সামরিক বলশালী হইবে।

চীনে এখনও গৃহবিবাদ আছে বটে; কিন্তু কাল-ক্রমে চীন সুশৃঙ্খল ও সবল হইবে। তিব্বত স্বয়ং কিম্বা চীনের অধীন বা সহযোগীরূপে সামরিক সজ্জায় সজ্জিত থাকিলে ভয়ের কারণ হইতে পারে। রুশিয়ার বল্‌শেভিক্ গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ত চায়ই, যে, সব দেশে রুশিয়ার মত সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-প্রকার নানা কারণে ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ দেশের উত্তর দিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য নেপালের সহিত এই সন্ধি করিয়া থাকিবেন। নেপালের গুর্খা সৈন্যের সাহায্যে, কল্পিত ভবিষ্যৎ-ভারতবিপ্লব-দমনেচ্ছাও ইহার মূলে থাকিতে পারে।

কিন্তু যে গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ভয়প্রযুক্ত নিজের প্রজাদিগকে উচ্চতম সামরিক শিক্ষায় ও সজ্জায় বঞ্চিত রাখিয়া

দুর্ব্বল রাখে, অথচ নিকটস্থ রাজ্যকে প্রবল হইতে সাহায্য করে, তাহাকে বুদ্ধিমান্ ও ন্যায়কারী বলা যায় না। আফগানিস্থানকেও ত ভারতবর্ষ বহু বৎসর টাকা দিয়াছিল। তাহার ফল কিরূপ হইয়াছে ?

—

ব্যারিষ্টার ও উকীল

উকীলদের উপর ব্যারিষ্টারদের যে একটা কৃত্রিম শ্রেষ্ঠতা আছে, তাহা লোপের চেষ্টা হওয়ায় ব্যারিষ্টার-দের পক্ষ হইতে অনেক বাজে কথা বলা হইতেছে। বস্তুতঃ, সুবিচারের জন্য আমাদিগকে কেন যে চিরকাল ইংলণ্ডে-শিক্ষিত লোক আম্‌দানী করিতে হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই। এখানে যদি আইন শিক্ষার কোন ত্রুটি থাকে, ত, তাহা সুধ্‌রাইয়া লওয়া হউক। হাইকোর্টের অরিজিন্যাল সাইডে যদি এটর্ণীদের মধ্য-বর্ত্তিতা ব্যতিরেকে উকীল ও অন্য আইনজ্ঞেরা কাজ করিতে পান, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে কাজ হয়, বিচারও কিছু খারাপ হয় না।

—

ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল

লক্ষ্ণৌ নগরে ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের গত অধিবেশনে অবনত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি, হিন্দুদিগের সংঘবদ্ধ হওন, আপদ্-ধর্ম্ম, মালকানা রাজপুতদিগের 'শুদ্ধি,' প্রভৃতির আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইংরেজী "resolution" কথাটির বাংলা সচরাচর "প্রস্তাব" করা হয়। কিন্তু উহার প্রাথমিক অর্থ "প্রতিজ্ঞা"। যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না, তাহারা জগতের সর্ব্বত্র অমানুষ বিবেচিত হয়। এই জন্য জানিতে কৌতূহল হয়, ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের সভ্যেরা ও শ্রোতারা অবনত জাতিদের প্রতি সহানুভূতি কিরূপ আচরণ দ্বারা, কি কাজ দ্বারা, কোন্ কোন্ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান দ্বারা দেখাইতে চান। ভূয়ো কথার কোন মূল্য নাই; অধিকন্তু তাহা মানুষকে হাস্যাস্পদ ও অশ্রদ্ধার পাত্র করে।

—

যৌগিক ও আত্মিক সভা

কাকিনাড়ায় সমগ্রভারতীয় যৌগিক ও আত্মিক সভার অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত ভি ডি রাও তাঁহার অভিভাষণে বলেন, যে, মানুষ যদি বুঝিতে পারে, যে, মৃত্যু বলিতে সাধারণতঃ যাহা মনে হয়, মৃত্যু বাস্তবিক তাহা নয়, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশসেবকদিগকে মৃত্যুভয় অতিক্রম করিতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অনেকেই পালন করিতে পারে।

মানুষের "স্ব" তাহার আত্মা। আত্মার মৃত্যু নাই। সকল দেশের ধার্ম্মিক লোকেরা ইহা বিশ্বাস করেন। পরলোকগত আত্মার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া ইহা প্রমাণ করিবার নানা চেষ্টা হইতেছে। ইউরোপ আমেরিকায় এই যোগ সত্য কিনা, যোগলব্ধ বার্ত্তা সত্য কি না, ইহার মধ্যে কোন প্রতারণা আছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য নানা বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইতেছে। এদেশে সেরূপ কিছু হইতেছে না। একেবারে কিছু বিশ্বাস না করা যেমন দোষ, বিনাপ্রমাণে সহজেই যা-তা বিশ্বাস করাও তেমনি একটা দুর্ব্বলতা।

—

হিন্দুদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির কন্‌ফারেন্স্

হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতির যে-সব কন্‌ফারেন্স্ হয়, তাহাতে সেই সেই জাতির উন্নতির জন্য নানা-প্রকার প্রস্তাব ধার্য্য হয়। ইহা দোষের বিষয় নহে, আহ্লাদেরই বিষয়। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরের কন্‌ফারেন্সে আগেকার বৎসরের প্রস্তাবগুলি অনুসারে কাজ কতটুকু হইল, তাহার একটি রিপোর্ট পঠিত হওয়া উচিত। যেমন ধরুন, সুবর্ণ-বণিক কন্‌ফারেন্সে এবার স্থির হইয়াছে, যে, বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা নিবারণ করিতে হইবে, এবং গ্রামের নানাবিধ উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সম্ভবতঃ এইরূপ প্রস্তাব ইঁহাদের এবং অন্য কোন কোন জাতির কন্‌ফারেন্সে আগেও ধার্য্য হইয়াছিল। সুতরাং দেখা উচিত, যে, আগেকার বৎসরের প্রস্তাবগুলি কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। কোন কাজ না হইলে শুধু প্রস্তাব ধার্য্য করিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু যদি অল্প কাজও হয়, তাহা হইলে তাহা জাতির সকল লোককে জানাইলে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। বিভিন্ন জাতির কন্‌ফারেন্সের পূরা রিপোর্ট্ খবরের কাগজে বাহির হয় না। এইজন্য এইসব কথা আমরা আন্দাজী লিখিতেছি। আগেকার বৎসরের রিপোর্ট্ এই-সকল কন্‌ফারেন্সে পঠিত হইয়া থাকিলে তাহা সুখের বিষয়।

—

ইংরেজ খুন

দৈনিক কাগজে দেখিতেছি, ২৭ পৌষ শনিবার সকালে এক বাঙ্গালী যুবক কলিকাতায় একজন ইংরেজকে গুলি করিয়াছে। ইংরেজটি গুলি খাইয়া পড়িয়া যাইবার পরও হত্যাকারী তাহাকে আরও ছয় বার গুলি করে বলিয়া খবর বাহির হইয়াছে। পলায়ন করিবার সময়ও ঘাতক কয়েক জনকে গুলি করে, এবং শেষে ধরা পড়ে। কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, নিহত ইংরেজকে এক-

জন উচ্চপদস্থ পুলিস্-কর্ম্মচারী মনে করিয়া ঘাতক তাহাকে মারিয়াছে, এবং সে বিপ্লবপ্রয়াসী দলের একজন প্রধান লোক। এসব কথা সত্য কি না, বলা যায় না।

দেশে যত খুন হয়, তাহার সবগুলিই শোচনীয়; কিন্তু সবগুলির সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা দর্‌কার হয় না। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, প্রভৃতি কারণে যে-সব খুন হয়, তাহাও গর্হিত কাজ। আকস্মিক অনভিপ্রেত খুনও মধ্যে মধ্যে হয়। সে সমস্তই দুঃখের বিষয়। ইংরেজ যখন লঘুচিত্ততা-বশতঃ, দেশী লোকের প্রাণের মূল্য কম এবং দেশী লোককে মারিলে প্রাণদণ্ড হয় না দেখিয়া, কোন দেশী লোককে বধ করে, তাহাও অতি গর্হিত ও শোচনীয় দুষ্কর্ম। ভারতীয় লোক ইংরেজকে মারিলেও তাহা কখন কখন ব্যক্তিগত কারণে হইতে পারে। অন্যান্য খুনের ন্যায় তাহা গর্হিত ও শোচনীয় দুষ্কর্ম। কিন্তু এসকল স্থলে জাতিবিদ্বেষ ও রাজনৈতিক কারণের অনুমান সহজেই পুলিসের ও ইংরেজদের মনে আসে, এবং কখন কখন তাহা সত্যও হইতে পারে। এইজন্য বলা দর্‌কার, যে, এইরূপ কারণে খুন করাও গর্হিত ও শোচনীয় কাজ। তা ছাড়া ঘাতক ধরা পড়িলে তাহার প্রাণ ত যায়ই, অধিকন্তু অন্য বিস্তর দেশী লোক সন্দেহভাজন ও নির্যাতিত হয়। এরকম কাজে কোন বীরত্বও নাই, ইহাতে দেশের কোন উপকারও হয় না, এবং হইতে পারে না। দস্তুরমত যুদ্ধ করা ধর্ম্মসঙ্গত কি না, সে বিষয়ে তর্কবিতর্ক চলিলেও, দেখা গিয়াছে, যে, পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জন্য সফল যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ খুনের সঙ্গে যুদ্ধের সাদৃশ্য নাই, এবং স্বাধীনতা-যুদ্ধের ফললাভ এরূপ খুনের দ্বারা লব্ধ হইতে পারে না, কোন দেশে হয় নাই। ফলের কথা এইজন্য বলিতেছি, যে, ফল যাহাই হউক না, খুন জিনিষটাই খারাপ, ইহা অনেকে বুঝে না ও স্বীকার করে না; এই হেতু এইরূপ খুনের সমর্থকদিগকে বলা দর্‌কার্ এবং দেখান দর্‌কার, যে, এইরূপ খুন দ্বারা দেশের মঙ্গল হয় না।

—

শিক্ষয়িত্রী-সম্মিলন

গত ১৩ই পৌষ ঢাকায় বালিকাবিদ্যালয়সমূহের শিক্ষয়িত্রীদিগের সম্মিলনে সভাপতির কাজ করিবার ভার প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তব্য সুচিন্তিত হইয়াছিল। মিউনিসিপালিটী-সকলের অন্তর্গত স্থান-সকলের বাসিন্দা বালিকাদিগের শিক্ষাদান বাধ্যতামূলক করিবার একটি প্রস্তাব সম্মিলনে গৃহীত হয়। ইহা হওয়া উচিত।

সর্ব্বভারত-ছাত্রসম্মিলন

কলিকাতার সর্ব্বভারত-ছাত্রসম্মিলনের সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, ছাত্রেরা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া স্বরাজসাধনার সাহায্য করিতে পারে। ছাত্ররা স্কুল কলেজ ছাড়িয়া কিরূপ স্বরাজ সাধনা করিয়াছিল ও করিতেছে, তাহা ত দেখা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশের দল তাহাদের শিক্ষারও ত কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অতএব, এখন এসব বোল চা'ল ছাড়িয়া দিলে হয় না?

—

অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ

প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র এবং অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার শিক্ষা ইংলণ্ডে হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডিত্য গভীর এবং নানা-সাহিত্যব্যাপী ছিল। তিনি সুকবি ছিলেন। তাঁহার ইংরেজী কবিতা ঠিক্ ইংরেজ সুকবিরই মত ছিল, বিদেশীর লেখা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি বিদ্যাচর্চ্চা লইয়াই থাকিতেন, এবং অতি অনাড়ম্বর লোক ছিলেন; নিজেকে লোকের সাম্‌নে খাড়া করিবার ইচ্ছা ও প্রয়াস তাঁহার ছিল না। এইজন্য অনেকে তাঁহার অস্তিত্ব এবং নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। কত বড় বিদ্বান্ ও কত বড় অধ্যাপক তিনি ছিলেন, তাহা অনেকে জানিতেনও না। স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি ৫৫ বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই পেন্‌শ্যন্ লইয়াছিলেন।

—

"আনন্দবাজারে"র অর্দ্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার অর্দ্ধসাপ্তাহিক সংস্করণ দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইহাতে সপ্তাহের খবর, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতার প্রতিলিপি, প্রভৃতি ত থাকেই, অধিকন্তু হিন্দুজাতির হ্রাসের কারণ, স্ত্রীলোকদের মধ্যে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাব, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত সমাজ-সেবা প্রভৃতির মত অতি হিতকর প্রবন্ধও থাকে। দেশবিদেশের ভারতীয় দেশভক্তদের ছবি এবং মুসলমান-জগতের সংবাদ প্রকাশে ইহার খুব উদ্যোগিতা আছে।

মুসলমান মহিলাদের কন্‌ফারেন্স্

এবারকার মুসলমান মহিলা-কন্‌ফারেন্সে একজন পুরুষের বহুপত্নী গ্রহণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। ইহা ত হওয়াই চাই। তুরস্কে বহুবিবাহ আইনবিরুদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের মুসলমান নারীরাই কি ঘুমাইয়া থাকিবেন?



ময়ূর

চিত্রকর শ্রীসারদাচরণ উকিল

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ ২য় খণ্ড	ফাল্গুন, ১৩৩০	৫ম সংখ্যা

প্রবাসী বাঙালীদিগের প্রতি আমার নিবেদন

আমি কথা দিয়াও আপনাদের সহিত মিলিত হইতে না পারায় সাতিশয় লজ্জা ও বেদনা অনুভব করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমার অনুপস্থিতির কারণ প্রয়াগস্থ কোন কোন বন্ধু অবগত আছেন। শরীরের রুগ্ন ও ভগ্ন অবস্থাই ইহার কারণ।...

আমার শরীর যদিও কলিকাতায়, তথাপি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের সহিত যোগ দিতেছি জানিবেন। আমি তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। আমার জীবনের বহু দুঃখশোক ও আনন্দের স্মৃতি এলাহাবাদের সহিত জড়িত। আমাকে এখনও আপনাদেরই এক-জন মনে করিলে কৃতার্থ হইব।...

বঙ্গের বাহিরের বাঙালী আমরা কেমন করিয়া বাংলার সভ্যতা ও চিন্তার ধারার সহিত যোগ রক্ষা করিতে পারি, বাঙালীর বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারি, তাহার উপায় চিন্তা আমরা অনেকেই কখন কখন করিয়া থাকি। সেইজন্য এই বিষয়ে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।

আমরা মানুষ, আমরা এশিয়াবাসী, আমরা ভারত-বর্ষীয়, আমরা বাঙালী। রোমক কবি টেরেন্স্ (Terence) বলিয়াছেন, "Homo sum; humani nihil a me alienum puto". "আমি মানুষ; যাহা কিছু মানবীয়, তাহার কিছুরই সহিত আমি নিজেকে সম্পর্কবিহীন মনে করি না।" আমরাও মানুষ; অতএব মানুষের যত শক্তি বৃত্তি ও গুণ আছে, সকলগুলিতেই আমাদিগকে উৎকর্ষ লাভ করিতে হইবে।* নতুবা বাঙালীর বিশেষত্ব আমরা রক্ষা করিতে পারিব না। আমরা যদি অমানুষ হই, তাহা হইলে বাঙালীত্ব রক্ষার কথা উঠিতেই পারে না।

আমরা এশিয়ার মানুষ। এশিয়ার মানুষের বিশেষত্ব কি কি, তাহা নির্দ্দিষ্ট করা সহজ নহে, এবং তাহা করিবার ক্ষমতা ও সময় আমার নাই। আমি কেবল একটা কথা এই বলিতে চাই, যে, এশিয়ার মানুষদের, ইতিহাসের প্রারম্ভকাল, এমন কি প্রাগৈতিহাসিক সময় হইতে, একটি বিশেষত্ব এই দেখা গিয়াছে, যে, তাহারা বাহিরের অপেক্ষা ভিতরের জিনিষকে, দেহ অপেক্ষা আত্মার কল্যাণ ও আনন্দকে, অধিকতর আবশ্যক ও গৌরবসম্পন্ন মনে করিয়াছে। এই কারণে আমরা

* প্রয়াগে, উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধি-বেশনে পঠিত।

দেখিতে পাই, পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মের উদ্ভব এশিয়াতে হইয়াছে; অন্যান্য দেশ ও মহাদেশ তাহাদের ধর্ম্ম এশিয়া হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

অতএব আমরা বাঙালীরা যদি এশিয়াবাসীর প্রধান বিশেষত্ব রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বাহিরের জিনিষের মোহে-আসক্তিতে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না; আমাদিগকে ভিতরের ঐশ্বর্য্যে, অন্তরের কল্যাণে, হৃদয়মনের উৎকর্ষে, আত্মার আনন্দেও মনোনিবেশ করিতে হইবে। আমি কাহাকেও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছি না। বাহিরের জিনিষের প্রয়োজন আছে। আত্মার কল্যাণ বিকাশ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের জন্যও বাহিরের অনুকূল অবস্থার একান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বাহিরের যাহা কিছু তাহা ভৃত্য মাত্র, সহায় মাত্র, পরিচারক মাত্র; অন্তরাত্মাই প্রভু। বাহির তাহার সেবা করিবার মাত্র অধিকারী; উহা প্রভুর আসন দখল করিতে পারে না; করিলে অকল্যাণ হয়।

আমরা ভারতবর্ষীয়। অতএব ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্বের কথাও বলি। পৃথিবীর আর কোনও দেশ নাই, যেখানে ভারতবর্ষের মত হিন্দু জৈন বৌদ্ধ জরথুস্ত্রীয় ইহুদী খৃষ্টীয় মুসলমান প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। আমাদের দেশে সংঘর্ষ সংগ্রাম মারামারি কাটাকাটি আগে হইয়া গিয়াছে, এখনও হয়; কিন্তু মোটের উপর আমরা যতটা পরমত-সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য্য অবলম্বন করিয়া সকলের মধ্যে যেরূপ সামঞ্জস্য বিধান করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পৃথিবীর কোন দেশে কোন জাতি তাহা করে নাই। আমার বিশ্বাস, জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় সভ্যতায় মৈত্রী- ও সামঞ্জস্য-বিধান-সমস্যার সমাধান ভারতবর্ষই করিবে; ভারতবর্ষ তাহা না করিলে আর কেহ পারিবে বলিয়া এখন মনে হইতেছে না—ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে কেহ বলিতে পারে না। আমরা বাঙালীরা ভারতবর্ষীয় বলিয়া, জাতিতে জাতিতে সভ্যতায় সভ্যতায় মিলনসাধনের এই মহৎ প্রচেষ্টায় আমাদেরও স্থান এবং কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

শেষ কথা, বাঙ্গালীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে। যোগ্যতা ও সময়ের অভাব বশতঃ আমাদের সমুদয় বিশেষত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা আমি করিব না। দুই একটি কথা মাত্র বলিব।

জীব ও জড়ের একটি প্রধান প্রভেদ এই, যে, জীব আত্মরক্ষার জন্য অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ করিতে পারে, পরিবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে, জড় তাহা পারে না। যে জীব যে পরিমাণে নিজেকে পরিবেষ্টক অবস্থার সহিত যতটা খাপ খাওয়াইতে পারে, সে তত বাঁচিবার উপযুক্ত হয়। এই খাপ খাওয়াইবার শক্তি ভারতবর্ষীয় অন্য কোন জাতির নাই বলিতেছি না; কিন্তু কোন কোন দিকে বাঙ্গালীর আছে ইহাই বলিতেছি। পাশ্চাত্যের সহিত যখন সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, তখন বাঙ্গালী পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে এবং তাহার সহিত আপনাকে সমঞ্জসীভূত করিতে বিরত থাকে নাই; ভারতের অন্য কোন কোন জাতি ও সম্প্রদায় বিরত ছিল। অবশ্য, আমরা যে এক সময়ে অতিরিক্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা আতিশয্য-দোষ। এরূপ ভুল ও দোষ পরিবর্ত্তনের যুগে সব দেশেই হয় বটে, তাহা হইলেও ইহা বর্জ্জনীয়। কোন কোন বিষয়ে আমরা পাশ্চাত্যের সহিত সংস্পর্শ ও সংঘর্ষের উপকার এখনও যথেষ্টরূপে লাভ করিতে পারি নাই—যথা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে, এবং দৈহিক শ্রমের গৌরব বোধে। এই এই বিষয়ে আমরা ক্রমে উন্নতি করিতেছি।

সুস্থ সবল মানুষের লক্ষণ এই, যে, সে নিজের দেহ-মনের পুষ্টির জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজের দেহ-মনের অঙ্গীভূত করিতে পারে। অসুস্থ মানুষের দৈহিক ও মানসিক অজীর্ণতা হয়, গ্রহণ ও নিজস্বীকরণের ক্ষমতা তাহার কম থাকে।

পাশ্চাত্য যখন জোর করিয়া আমাদের দ্বারে ধাক্কা দিল, তখন তাহার মধ্যে যাহা ভাল তাহা লইবার জন্য বাঙ্গালী প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর শিরোমণিরা ভিখারীর মত লইবার জন্য ব্যগ্র হন নাই; সুস্থ সবল মানুষের মত লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলি, রামমোহন রায় নিঃস্ব ভিখারীর মত পাশ্চাত্যের দ্বারে উপস্থিত হন নাই। তিনি প্রাচ্য, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার গৌরবমণ্ডিত উদার ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় ও মিলন সাধন করিয়া ভবিষ্যতের পূর্ণতর মানব-সভ্যতার বিকাশসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। একজন পাদরী এশিয়াবাসীদিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া আক্রমণ করায় তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"Before 'A Christian' indulges in a tirade about persons being 'degraded by *Asiatic* effeminacy' he should have recollected that almost all the ancient prophets and patriarchs venerated by Christians, nay even Jesus Christ himself,...... were ASIATICS, so that if a Christian thinks it degrading to be born or to reside in *Asia*, he directly reflects upon them."

অন্য এক সময়ে অন্য একজন বিদেশী খৃষ্টিয়ান, ভারতবাসীরা বুদ্ধির আলোকের (ray of intelligenceএর) জন্য ইংরেজদের নিকট ঋণী, তাঁহাকে এই কথা বলায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন :—

"If by the "Ray of Intelligence" for which the *Christian* says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude; but with respect to *Science, Literature*, or *Religion*, I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history it may be proved that the World was indebted to *our ancestors* for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners."

মনে রাখিতে হইবে যে রামমোহন যখন এই কথা লিখিয়াছিলেন, তখন ভারতে প্রত্নতত্ত্বের ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা ও আলোচনা প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দূরে ঠেলিয়া না রাখিলে উহা আমাদিগকে গ্রাস করিবে, আমাদের প্রাচ্যত্ব ভারতীয়ত্ব বাঙ্গালীত্ব থাকিবে না, এই ভয় রামমোহনের মনে উদিত হয় নাই। তিনি ইস্‌লামিক ইহুদী খৃষ্টীয় বৌদ্ধ—প্রাচ্য প্রতীচ্য সব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করিয়া তাহা নিজের করিবার সাহস ও শক্তি রাখিতেন। অন্য দিক্ দিয়া, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রভৃতি কোন বাঙালী মনস্বীই পাশ্চাত্যের ভয়ে মনের সদর দরজায় হুড়কা আঁটিয়া দেন নাই। সব মানুষের যাহা, তাহা আমারও, জ্ঞান ও সত্যে দেশভেদ জাতিভেদ নাই—বাঙ্গালী মনস্বীরা এই মন্ত্র অনুসারেই জীবনকে নিয়মিত করিয়াছেন। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের আত্মিক ঐশ্বর্য্য আপনার করিবার সাহস, পৌরুষ ও শক্তি বাঙালী মনস্বীদের বরাবরই দেখা গিয়াছে।

মানসিক বদ্‌হজমী বাঙালী মনস্বীদের হয় নাই। তাঁহারা যাহা লইয়াছেন, তাহাকে নিজস্ব করিয়া বাঙালীত্ব ভারতীয়ত্ব প্রাচ্যত্ব দিয়াছেন। এই যে গ্রহণ করিয়া নিজের করিবার ক্ষমতা, ইহা বাঙালীর আছে। এই কারণেই দেখিতে পাই, বাঙালী অন্য ভারতীয় জাতিদের চেয়ে মানসী সৃষ্টি বেশী করিয়াছেন; যদিও উহা বিদেশী সভ্য জাতিদের সৃষ্টির তুলনায় সামান্য। বাঙালীর সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে পাশ্চাত্যের প্রভাব আছে। ইহাতে কোনই লজ্জা নাই। ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মেন্, কোন্ সাহিত্য শিল্প প্রভৃতির উপর বিদেশী প্রভাব নাই? ভারতবর্ষের আধুনিক সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প যে বহুপরিমাণে বাঙালীর সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প—এখানেই বাঙালীর কৃতিত্ব ও গৌরব।

বাঙালীর মানসিক আতিথেয়তা আছে। নানা দেশের জাতির যুগের ভাব চিন্তা আদর্শ বাঙালী গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যেমন আমরা সকলেই পোষাকে অল্প বা বেশী বহুরূপী সাজিলেও মোটের উপর বাঙালীর চেহারার ও পরিচ্ছদের বিশেষত্ব আছে, তেমনি নানা দেশ ও কাল হইতে আহৃত ভাব চিন্তা আদর্শের ধারার মধ্যেও বাঙ্গালীর অন্তরের চেহারা বুঝা যায়। আমরা পাশ্চাত্য অনেক দেশের লোকের মত, যেমন নূতন ধাঁচের পোষাক পরা মানুষকে ঢিল ছুড়ি না, তেমনি

পরদেশী ভাব ও চিন্তা আদর্শ মাত্রকে বর্জ্জন করি না; —যদিও কেহ কেহ তাহা করিতে ও করাইতে চান।

প্রথম হিড়িকে যখন বাঙালীর ছেলেরা স্কুল কলেজ ছাড়িতে চায় নাই, শুনিয়াছি তখন মহাত্মা গান্ধী পরিহাস করিয়া বাঙালীদিগকে 'education-mad' 'শিক্ষা-পাগল' বলিয়াছিলেন। আমাদের স্কুল-কলেজসকলে অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত আদর্শস্থানীয় শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয় বটে; কিন্তু শিক্ষালাভের জন্য আত্যন্তিক আগ্রহ নিন্দা বা লজ্জার বিষয় নহে। জ্ঞানলাভের জন্য বাঙালীর এই আগ্রহ ভালই। ইহার সহিত স্বরাজ্য-লাভের আগ্রহের কোন বিরোধ নাই। ব্যক্তিগত "স্ব"-রাজ্য-সিদ্ধি বা সমষ্টিগত স্বরাজ্যসিদ্ধি অজ্ঞানীর দ্বারা হইতে পারে না। শিক্ষার বিকৃতি আমাদিগকে নকলনবীসের জাতি করিয়াছে বটে; কিন্তু কেবলমাত্র দোকানদারের জাতি হইলেও তাহাও গৌরবের বিষয় হইত না। বঙ্গের ধন পৃথিবীর নানা বিদেশী জাতি এবং ভারতবর্ষের নানা জাতি আহরণ করিয়া ধনী হইতেছে, অথচ আমরা ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছি, ইহা আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় বটে। কিন্তু অর্থ-করী বিদ্যার দ্বারাই এই লজ্জা ও ক্ষোভ দূর করিতে হইবে, অজ্ঞতা দ্বারা নহে। এখনই দেখা যাইতেছে, যে, অনেক সরকারী ও বেসরকারী কারখানায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিশিষ্ট দেশী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বাঙালীদেরও সম্মানিত স্থান হইতেছে। আধুনিক পণ্যশিল্পে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানের প্রয়োজন খুব বেশী। এই দুই বিজ্ঞানে বাঙালী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বাঙালীর এই প্রতিভা ও জ্ঞানের সহিত বাঙালীর মূল-ধনের সংযোগ হইলে বাঙালী পণ্যশিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে। এই দিকে প্রবাসী বাঙালীদিগকে তাঁহাদের সমুদয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

সেই সভ্যতাই স্থায়ী এবং মানুষকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিতে পারে, মানুষের হিতসাধন করিতে পারে, যাহা সর্ব্বতোমুখী ও সর্ব্বাঙ্গীণ। ধর্ম্ম সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প দর্শন প্রভৃতি সকল দিকে লক্ষ্য থাকিলে, যেরূপ সভ্যতার বিকাশ হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। মানুষ সত্য চায়, জ্ঞান চায়, মানুষ শক্তি চায়, মানুষ শিব শুভ মঙ্গল চায়, মানুষ আনন্দ শুচিতা শ্রী সৌন্দর্য্য চায়। কোন সভ্যতাতে ইহার কোনটির অভাব হইলে, তাহা অঙ্গহীন, অস্থায়ী, মানবের কল্যাণ সাধনে অক্ষম হইবে। বাঙালীর সকল দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, বলিতে পারি না; কিন্তু ভারতীয় অন্য কোন জাতি বাঙালীর চেয়ে এবিষয়ে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন, মনে হয় না। ধর্ম্ম বিষয়ে দেখা যায়, বঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন চেষ্টা হইয়াছে; খৃষ্টীয় ধর্ম্মে ভারতীয়তা আনয়নের চেষ্টা হইয়াছে; সত্যপীর পূজাদি দ্বারা মুসলমান ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের মিলন চেষ্টা হইয়াছে; বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে ওআহাবী ও ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টা হইয়াছে; বহু শতাব্দীর পরে নূতন করিয়া বৌদ্ধ বিহার কলিকাতাতেই নির্ম্মিত হইয়াছে ও বৌদ্ধধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে; ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্ভব বঙ্গেই হইয়াছে; পরমহংস রামকৃষ্ণের আবির্ভাব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর কার্য্যারম্ভ বঙ্গেই হইয়াছে; নব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারচেষ্টাও বঙ্গে হইয়াছে। নানাদিকে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ও নারীর অধিকার স্থাপনের চেষ্টা বঙ্গেই আরব্ধ হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় পরে কার্য্যকালে বাঙালী পিছাইয়া পড়িয়াছে।

সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাসাদিতে বাঙালীর কৃতিত্ব, জগতের সভ্য জাতিদের তুলনায় সামান্য হইলেও, অন্য ভারতীয় জাতি অপেক্ষা কম নহে। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

নানা সভ্য দেশে, শিক্ষিত পুরুষ ও নারী যদি চিত্রকলা ও সঙ্গীতের কিছুই না জানেন, যদি এই দুই ললিত কলার রস আস্বাদনেও সমর্থ না হন, তাহা হইলে তাহা লজ্জার বিষয় বিবেচিত হয়। কারণ লেখাপড়া জানার মত এগুলিও কাল্‌চ্যারের (oultureএর) অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। কেন-না, সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কনাদি ললিতকলা-বিলাসীর ও অলসের আমোদের জিনিষ মাত্র নহে, মনুষ্যত্বের বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং তাহার চিহ্নও বটে। ভারতবর্ষে আধুনিক যুগে এক সময়ে সঙ্গীত ভদ্রসমাজের সম্ভোগ্য থাকিলেও উহার চর্চ্চা ভদ্রমহিলারা



উত্তরভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে সম্মিলিত ব্যক্তিগণ

করিতেন না, ভদ্র পুরুষদের মধ্যেও উহার বেশী প্রচলন ছিল না; অথচ বাগ্‌দেবী সরস্বতী বীণাবাদিনী! বর্ত্তমান সময়ে পুরুষদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চ্চা ত বাড়িয়াছেই, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও গীতবাদ্যের চর্চ্চা দৃষ্ট হইতেছে। আধুনিক ভারতে বিচিত্র সুরের এবং নানা ভাব-ও রস-পূর্ণ এত গান রবীন্দ্রনাথের মত কেহই রচনা করেন নাই। তিনি সুরের রাজা। চিত্রকলা সম্বন্ধেও বক্তব্য এই, যে, এখন চিত্রকরেরা আর পটুয়া বলিয়া অবজ্ঞাত হন না। সমাজে পেশাদার চিত্রকরদেরও সম্মানিত স্থান হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, বহু শিক্ষিত ও ভদ্র পুরুষ ও মহিলা নিজের আন্তরিক ভাব ও আদর্শ প্রকট করিবার জন্য কিম্বা চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, চিত্রকলার অনুশীলন করিয়া থাকেন। প্রতিবৎসর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় রীতিতে অঙ্কিত চিত্রের ও মূর্ত্তির দুটি প্রদর্শনী কলিকাতায় হয়। "রূপম্" নামক উচ্চ অঙ্গের একটি ললিতকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। মাসিকপত্রাদিকে চিত্রশোভিত করিবার রীতিও প্রচলিত হইয়াছে,—যদিও অনেক জঘন্য চিত্রও মুদ্রিত হইতেছে। চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত শিখাইবার আয়োজনও একাধিক স্থানে আছে। অতি উৎকৃষ্ট ভদ্র অভিনয় দ্বারা নাট্যানন্দ দিবার উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার দ্বারা বহুবার হইয়াছে। বিশ্বভারতীর কলাভবনে দেশী নানা শিল্পের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন চেষ্টা হইতেছে। এইসকল চেষ্টা যথেষ্ট নহে, কিন্তু আরম্ভ হিসাবে আশাপ্রদ।

লালা লাজপৎ রায় বাঙালীপূজক নহেন; কিন্তু তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে, পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী ছেলেদের প্রশস্ত কাল্‌চ্যার (culture) নাই; তাহারা কেবল পরীক্ষা পাস করে, চিত্র সঙ্গীত অভিনয় আবৃত্তি, এসবের ধার ধারে না; বাঙালীর ছেলেরা এবং কতকটা মরাঠারা এবিষয়ে ভাল।

বাঙালী সভ্যতার ও কাল্‌চ্যারের এই যে নানা দিকে গতি, ইহা শুভ লক্ষণ। আমি বাঙালীর স্তাবক নহি। "প্রবাসী"তে আমাদের নিজেদের দোষোদ্‌ঘাটন খুবই করিয়া থাকি। কিন্তু কেবল দোষ দেখাইয়া একটা অবসাদ ও নৈরাশ্য উৎপাদন করা উচিত নয়। শুভলক্ষণগুলিও মনে রাখিয়া আশান্বিত ও উদ্যমশীল হওয়া আবশ্যক। আমরা প্রবাসী বাঙালীরাও যেন বঙ্গের সভ্যতা কাল্‌চ্যার ভাব চিন্তা ও আদর্শের ধারার সহিত যোগ রাখিতে পারি, এই চেষ্টা সর্ব্বদা করিতে হইবে।

বাংলাদেশে যাতায়াত পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইয়াছে। বঙ্গের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান এবং কুটুম্বিতা স্থাপন- ও-রক্ষা সহজতর হইয়াছে। বাংলার বহি, বাংলার সাময়িক পত্র, বাংলার খবরের কাগজ, এখন আমরা সহজেই (এলাহাবাদে রবিবার ও ডাকঘরের অন্য ছুটির দিন ছাড়া!) নিত্য পাইতে পারি। এইরূপ নানা উপায়ে বঙ্গের সহিত যোগ রক্ষা সহজ হইয়াছে। অবশ্য, ছাপাখানার কৃপায়, অনেক আবর্জ্জনা ও অশুচি কুৎসিৎ জিনিষও চড়াও করিয়া আমাদের ঘরে ঘরে আসিতেছে। আটকাইবার উপায় সব সময়ে করা যায় না; কিন্তু মানসিক ও বাহ্য সম্মার্জ্জনীর ব্যবহার সকল সময়েই করা যায়, এবং করা উচিত।

বাঙালীত্ব রক্ষা-প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। বাঙালীত্ব চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট আকৃতি- ও অবয়ব-প্রাপ্ত অপরিবর্ত্তনীয় একটি কোন গুণ আদর্শ ছাঁচ বা ধাঁচ নহে। বাঙালী যেমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত স্থিতিশীল জাতি নহে, তেম্‌নি বাঙালীত্বও পূর্ণতাপ্রাপ্ত নিখুঁত অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ এবং গুণাদি নহে। বাঙালীর উন্নতি-অবনতি হইতে পারে, বাঙালীত্বেরও উন্নতি-অবনতি প্রসার-সঙ্কোচ হইতে পারে। বাঙালী যেমন উন্নত মহৎ শক্তিশালী উদার হইবে, বাঙালীত্বও তেম্‌নি জগতে বরেণ্য ও অনুসরণীয় হইবে। বাংলার ভিতরের ও বাহিরের আমরা সব বাঙালীই এই প্রার্থনা করি।

বাঙালীকে উদার মহৎ শক্তিশালী উন্নত করিবার পক্ষে প্রবাসী বাঙালীদেরও কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সুযোগও আছে। প্রাচীন ও নবীন সব শিক্ষাপদ্ধতিতেই দেশভ্রমণের প্রয়োজন ও ফলদায়কতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থী জ্ঞানার্থী নানা আশ্রমে বিদ্যা-

পীঠে ও পণ্ডিতসভায় যাইতেন। তীর্থদর্শন ত ছিলই। জার্ম্মেনীতে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প-কেন্দ্রে শিল্পকেন্দ্রে ঘুরিয়া বেড়ানো, শিক্ষিতসমাজে সুপরিজ্ঞাত। বস্তুতঃ, নিজের দেশ ছাড়া অন্য আরও স্থান না দেখিলে মানুষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় না, মানুষ কূপমণ্ডুক থাকিয়া যায়। কথিত আছে, একবার মানস সরোবরের এক রাজহংস বঙ্গের এক ডোবায় আসিয়া পড়ে। ডোবার পাতি হাঁস মরালকে মানস-সরোবরে কি আছে জিজ্ঞাসা করায় মরাল তথাকার নীল শতদল প্রভৃতির বর্ণনা করে। ডোবার পাতি হাঁস তাহার রস গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করে, সেখানে শামুক গুগ্‌লি আছে? মরাল বলে, নাই। তাহাতে পাতিহাঁসের দল হি হি করিয়া হাসিয়া তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। যাহারা চিরকাল নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র জিনিষ লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, তাহারা ডোবাকে সমুদ্র এবং উইঢিবিকে হিমালয় মনে করিতে পারে। দেশভ্রমণ এই কূপমণ্ডূকতা দূর করিতে পারে। আমরা প্রবাসী বাঙালীরা কার্য্যগতিকে বাংলা ছাড়া অন্য স্থানেরও অভিজ্ঞতা লাভ করি; বরং কেহ কেহ বাংলাদেশকেই কম জানি চিনি।

এই হেতু, প্রবাসী বাঙালীরা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সাহিত্য, ভিন্ন ভিন্ন সমাজের রীতিনীতি, বিচিত্র শিল্পকলা, প্রভৃতির অভিজ্ঞতা বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা সহজে অর্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু দেখিবার চোখ শুনিবার কান চাই, অনুসন্ধিৎসা চাই; সর্ব্বোপরি চাই শ্রদ্ধা ও প্রীতি। আমরা যদি মনে করি, আমাদের অজ্ঞাত-সারে মনের কোণেও যদি এই বিশ্বাস লুক্কায়িত থাকে, যে, আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি, সর্ব্বগুণাধার, আমাদের কাহারও কাছে কিছুই শিখিবার নাই, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া আসিলেও আমাদের কোন উপকার হইবে না। কিন্তু আমরা প্রবাসী বাঙালীরা যদি অনুসন্ধিৎসু বিনীত শ্রদ্ধান্বিত ও প্রীতিমান্ হই, তাহা হইলে নানা দেশে-প্রদেশে নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া সমগ্র বাঙালী জাতিকে উদারতর এবং অধিকতর জ্ঞানবান্ করিয়া বাঙালীত্বের প্রসার ও গভীরতা বর্দ্ধন করিতে পারিব।

এমন এক সময় ছিল, শুনিয়াছি, যখন প্রবাসী বাঙালীরা বঙ্গের বাঙালীদের পরিহাস উপহাস ও অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন। ইহা সত্য, যে, বহু পূর্ব্বে ইংরেজ শাসনকালের প্রারম্ভে, যে-সব বাঙালী যুবক শিক্ষার অল্পতা বা অন্য কোনপ্রকার অবস্থাবৈগুণ্যবশতঃ বঙ্গে উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না, প্রধানতঃ তাঁহারাই "বিদেশে" যাইতেন। কিন্তু এইসব যুবক পণ্ডিত না হইলেও, একটা কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, তাঁহাদের স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর-শীলতা, পৌরুষ ছিল। যাহারা অনিশ্চিতকে ভয় করে না, যাহারা অজ্ঞাতের সম্মুখীন হইবার সাহস রাখে, তাহারা মানুষ হিসাবে খাটো নয়। নিজের ঘরের কোণে একটু স্থান পাওয়া বা করিয়া লওয়া সোজা; কিন্তু ঘরের বাহিরে গিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারা এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করা কঠিনতর কাজ। যে-সব ইংরেজ বিদেশে গিয়া প্রথমে বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা, সাম্রাজ্য স্থাপন দ্বারা, ইংলণ্ডের শক্তি ও সম্পদ্ বাড়াইয়াছে, তাহারাও অক্সফোর্ড্ কেম্ব্রিজের ডি-এস্ সী, পি-এইচ্ ডি ছিল না। তাহাদের অনেকের স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না; সে-বিষয়ে তাহারা প্রশংসনীয় বা অনুকরণযোগ্য নহে বটে; কিন্তু তাহাদের সাহস ও পুরুষকার নিশ্চয়ই ছিল এবং তাহা প্রশংসার যোগ্য। বহু পূর্ব্বের প্রবাসী বাঙালীদিগের সহিত এইসকল ইউরোপীয়ের তুলনা আমি করিতেছি না। আমি কেবল দৃষ্টান্তস্থলে তাহাদের উল্লেখ করিলাম। এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত দিবার আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই, যে, পাণ্ডিত্যের যেমন মূল্য আছে, তেম্নি স্বাবলম্বনের, সাহসের, পুরুষকারের, প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তিরও মূল্য আছে। এবং এই শেষোক্ত গুণগুলিতে বহুপূর্ব্বের প্রবাসী বাঙালীরা হীন ছিলেন না।

সেদিন বহুদিন হইল গত হইয়াছে। বহুবৎসর হইতে, বাঙালীদের মধ্যে বরেণ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, অনেক গ্রন্থকার, অনেক বিচারপতি, অনেক চিকিৎসক, অনেক ঐতিহাসিক, অনেক বৈজ্ঞানিক, অনেক ব্যবসায়ী, অনেক ধর্ম্মোপদেষ্টা ও লোকহিতসাধক—

জীবনের নানা বিভাগে কৃতী অনেক ব্যক্তি, বঙ্গে যেমন আছেন, বঙ্গের বাহিরেও তেম্‌নি আছেন। এখন আর আমরা কেবল মাত্র "মায়ে-তাড়ান, বাপে-খেদান, ডাংপিটে ছেলের" দল নহি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন যেমন বিদ্বান্ ও কৃতীর সংখ্যা বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণে আমরা আমাদের স্বস্বনিবাসভূমিতে লোকহিতসাধনের কেন্দ্র অধিকতররূপে হইতে পারিতেছি কি না, তাহা ভাবা উচিত। কারণ, যদিও প্রথম যুগের বাঙালীরা অনেকে শিক্ষায় ও পাণ্ডিত্যে হীন ছিলেন, এবং টাকা রোজগার করিবার জন্যই মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারা নানাস্থানে দেশহিতকর কার্য্যে অগ্রণীদের অন্যতম ছিলেন, ইহা ভুলিলে চলিবে না। এই প্রয়াগেই সর্‌কারী কলেজ স্থাপনের প্রথম উদ্যোগীদের মধ্যে বাঙালী ছিলেন; লাহোরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ও সূচনা একজন বাঙালী করিয়াছিলেন। আগেকার প্রবাসী বাঙালীদের এই বিশেষত্ব সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হওয়া প্রার্থনীয়।

আমাদের এই বঙ্গসাহিত্যসম্মিলনটি উত্তরভারতীয়। দক্ষিণ ভারতের কোন ইতিহাস নাই, কিম্বা দক্ষিণ ভারত ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে কখনও কোন প্রধান স্থান অধিকার করে নাই, এমন নয়; এরূপ অপ্রকৃত কথা বলিলে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে। কিন্তু ইহা ঠিক্, যে, বহুপ্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই—প্রধানতঃ উত্তর ভারত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এবং উহাকে অনেকটা গঠন করিয়াছে। উত্তর ভারতের এই পুবাকালীন ঐতিহাসিক প্রাধান্যের কারণ নির্ণয়ের উপযুক্ত স্থান ও সময় ইহা নহে। এই প্রাধান্যের উল্লেখমাত্র করিয়া, আমি বলিতে চাই, যে, আমরা উত্তর ভারতে থাকি বলিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা ও অধ্যয়ন করিবার, উহা লিখিবার আমাদের বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। যাঁহারা মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে থাকেন, তাঁহাদেরও তৎসম্পর্কীয় ভারতেতিহাস অনুশীলন ও রচনা করিবার সুযোগ আছে। সকল অঞ্চলেরই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার কোন কোন প্রবাসী বাঙালী করিয়াছেন। ঐতিহাসিক স্থানসকল দেখিয়া ইতিহাস লিখিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে। বহু পারসী ও দেশভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক উপকরণ, বহু চিত্র মূর্ত্তি, মুদ্রা, প্রভৃতি এখনও অনাবিষ্কৃত ও অমুদ্রিত রহিয়াছে। বাংলা দেশে দেশী রাজ্য মাত্র দুটি আছে; তাহাও ক্ষুদ্র, এবং তাহাদের ঐতিহাসিক গৌরব কম। উত্তর ভারতে বহু দেশী রাজ্য আছে। তাহাদের অনেকগুলি ইতিহাসপ্রথিত। তাহাদের গ্রন্থাগারে ও দপ্তরে এখনও বহু অমূল্য ঐতিহাসিক উপাদান আছে—যদিও গভীর পরিতাপের বিষয় এই, যে, বহুগ্রন্থ ও অন্য কাগজপত্র কীট ও কাল ধ্বংস করিয়াছে। অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহারও উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। বঙ্গের বাঙালী অপেক্ষা এবিষয়ে প্রবাসী বাঙালীর সুযোগ যেমন বেশী, দায়িত্বও তেম্‌নি অধিক। কেহ কেহ এই কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তৃত, সুতরাং কর্ম্মীও আরো অনেক চাই।

উত্তর ভারতে দেশী রাজ্য থাকায় কেবল যে ঐতিহাসিক উপাদান প্রাপ্তির সুযোগই বেশী, তাহা নহে। এক-একটি রাজ্যের প্রধান প্রধান কাজ চালাইবার সুযোগও এখানে আছে। আমি প্রধানতঃ ক্ষমতালাভ, অর্থলাভ, বা প্রভুত্ব করার দিক্ দিয়া একথা বলিতেছি না। কার্য্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভের এবং রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় কার্য্যদ্বারা দিবার সুযোগ উত্তর ভারতে আছে, ইহাই বলিতেছি। জয়পুরে, বড়োদায়, কোচীনে, মৈসূরে, এবং আরো দুই একটি রাজ্যে বাঙালী এই পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী কেরানী অবজ্ঞার পাত্র নহেন, কারণ তিনিও খুব দর্‌কারী কাজ করেন; সুতরাং সম্মান ও আদরের যোগ্য। বাঙালী শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, এঞ্জিনীয়ার, ব্যবহারাজীব, বিচারপতি, শিক্ষাপরিচালক, গ্রন্থকার,—ব্যবসায়ী, ধর্ম্মোপদেষ্টা, জনসেবক,—প্রভৃতি সকলেই আমাদের গৌরবস্থল। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যে যে আরো রাষ্ট্রপরিচালক থাকা বাঞ্ছনীয়, তাহাও স্বীকার

করিতে হইবে। কেবল বহির সাহায্যে রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া যায় না। কার্য্যক্ষেত্রে শিখিয়া শিখাইতে হইবে। যাঁহারা এইপ্রকারে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতার ফল গ্রন্থে নিবিষ্ট করিলে ভাল হইত। ভবিষ্যতেও যদি কোন কোন অভিজ্ঞ বাঙালী ইহা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

ইতিহাস ব্যতীত উত্তরভারতে নৃতত্ত্ব (anthropology), জাতিতত্ত্ব (ethnology), সমাজবিজ্ঞান (sociology), নানাবিধ শিল্প, নানাবিধ শ্রামিক ও বাণিজ্যিক সংঘ, (trade guilds and craftsmen's guilds) প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের সুযোগ আছে। এদিকে একেবারেই দৃষ্টি পড়ে নাই, এমন নয়; কিন্তু আরো কর্ম্মী চাই, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের নানা নিদর্শন, মুদ্রা আদি প্রত্নতত্ত্বের নানা উপাদান নানাস্থানে বিস্তর রহিয়াছে। তাহার সংগ্রহও কেহ কেহ কিছু করিয়াছেন। এই সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে।

হিমালয় পর্ব্বত ও পার্ব্বত্য অঞ্চল বনস্পতি ওষধি ভেষজ প্রাণী শিলা—নানা ঐশ্বর্য্যের সম্ভারে মণ্ডিত। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে এইসকল উপকরণ হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় নানা পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হইতে পারে। বিদেশী লোকেরা ক্রমশঃ তাহা করিতেছে। হিমালয়-পার্ব্বত্য-অঞ্চলের জলের শক্তি (water-power) আমরা কি কাজে লাগাইতে পারি না? উপযুক্ত স্থানে আমরা কি ফলের উদ্যান রচনা করিয়া লাভবান্ হইতে পারি না? নানা ওষধি বনস্পতি আদি হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারি না? নানা বৃক্ষ হইতে কাগজ দিয়াশালাই প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারি না? উত্তর ভারতের অনেক স্থান হইতে পাথরিয়া কয়লার খনিসকল বহুদূরে অবস্থিত, অথচ ঐসকল স্থান অরণ্যানী শোভিত পার্ব্বত্যদেশের নিকটবর্ত্তী। ঐসকল স্থানে কাষ্ঠ হইতে লভনীয় নানা রাসায়নিক দ্রব্য নিষ্কাশনের এবং কাঠের কয়লা উৎপাদনের নিমিত্ত কাঠ চোয়াইবার (wood distillation-এর) কারখানা আমরা কি স্থাপন ও পরিচালন করিতে পারি না? বাঙালীর মস্তিষ্ক নিকৃষ্ট নহে, নানা পণ্য শিল্পের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও কাহারও কাহারও আছে; খুব ধনী লোক আমাদের মধ্যে না থাকিলেও যৌথ কারবার চালাইবার মত টাকা, পরস্পরের উপর বিশ্বাস, দল বাঁধিবার ক্ষমতা, এবং সততা কি আমাদের নাই? সাহিত্যসম্মিলনের কাজের সহিত এসব কথার কোন সম্পর্ক নাই মনে হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জাতীয় কার্য্যক্ষেত্র ও জাতীয় অভিজ্ঞতা যত দিকে যত বাড়িবে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সাহিত্যের বিশালতা, বৈচিত্র্য ও প্রসারও তত বাড়িবে। এই জন্য নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন কাজে বাঙালীদের প্রবৃত্ত হওয়া দরকার।

বাংলা সাহিত্যের ও বাঙালীর সাহিত্যের সহিত যোগ রক্ষা যে আমরা সহজেই করিতে পারি, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমরা প্রবাসী বাঙালীরা শুধু কি যোগই রাখিব? আমরাও নিশ্চয়ই কেহ কেহ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারি। মৃত ও জীবিত অনেক প্রবাসী বাঙালী তাহা করিয়াছেন। বাংলা বহি লিখিয়া অনেকে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। যাঁহারা ইংরেজীতে বহি লিখিয়াছেন, তাঁহারাও, বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট না করিলেও, বাঙালীর সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছেন। বাঙালীর লিখিত যে-কোন ভাষার বহিকে আমি বাঙালীর সাহিত্য বলিতেছি। তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হইয়াছে ও হইবে—বাংলা গ্রন্থকারেরা ঐসকল ইংরেজী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন ও লইবেন।

যেসকল প্রবাসী বাঙালীর স্বতন্ত্র ভাবে বহি লিখিবার ক্ষমতা বা সুযোগ নাই, তাঁহাদের অনেকে অনুবাদ দ্বারা বঙ্গের সাহিত্যসম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইংরেজী সাহিত্য বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা বিশাল, বিস্তৃত ও মূল্যবান্। তথাপি ইংরেজরা শুধু বাংলা বহি নহে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সব ভাষারই কোন-না-কোন বহির ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, যে-সব ভারতীয় বা অন্যদেশীয় আদিম জাতির কোন লিখিত সাহিত্য নাই, তাহাদেরও গান, গল্প, গাথা, উপকথা ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদ বিষয়ে আমাদের বোধ হয় একটা ভ্রান্ত অহংকার বা

আলস্য কিম্বা উভয়ই আছে। আমরা হয়ত ভাবি, যে, যেহেতু আধুনিক বাংলা সাহিত্য আধুনিক অন্য ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা কোন কোন দিকে উৎকৃষ্ট, অতএব অন্য প্রদেশের আগেকার ভারতীয় সাহিত্য হইতেও আমাদের কিছুই লইবার নাই। কিন্তু বহুঐশ্বর্য্যশালী ইংরেজী সাহিত্যের জন্য যদি হিন্দী গুজরাতী মারাঠী উর্দ্দু পঞ্জাবী তেলুগু তামিল হইতে অনুবাদ করিবার যোগ্য জিনিষ ইংরেজ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই-সব দেশী ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার যোগ্য জিনিষ নিশ্চয়ই আছে। তাহা বাছিয়া অনুবাদ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা প্রবাসী বাঙালীদের আছে। নানক কবীর দাদূ তুলসীদাস রবিদাস গরীবদাস প্রভৃতি বহু-সংখ্যক মধ্যযুগের সাধুসন্তের বাণী বাংলায় অনুবাদিত হইলে বাঙালী জাতি বিশেষ উপকৃত হইবে। উত্তর ভারতের উপকথা, গাথা, বারব্রত কথা, আল্‌হা খণ্ডের মত যুদ্ধকাব্য, প্রভৃতি বাংলা ভাষায় নিবদ্ধ হওয়া উচিত। অবশ্য দক্ষিণের তুকারামের অভঙ্গ, প্রভৃতি যে অনুবাদিত হইয়াছে, তাহা উত্তরভারতীয় এই সম্মিলনে কেবল উল্লেখ করিলেই চলিবে।

কেবল লেখকেরাই যে জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, তাহা নহে। মানবজীবনের যতপ্রকার কাজে মানুষের যতপ্রকার চেষ্টা উদ্যম অধ্যবসায় ধৈর্য্য সাহস সহিষ্ণুতা প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সকলের দ্বারাই জাতীয় জীবনের উদ্যম, আশা, ব্যাপ্তি, গভীরতা, বৈচিত্র্য, বিশালতা, শক্তি, সাহস, স্ফূর্ত্তি, আনন্দ, বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজা-বেথের যুগের বণিক্‌রা, নাবিকরা, যোদ্ধারা, ভৌগোলিক আবিষ্কর্ত্তারা, সকলে সাহিত্যিক অমর কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। কিন্তু রাণী এলিজাবেথের যুগের ইংরেজী সাহিত্যের উৎকর্ষ, বিশালতা, গভীরতা ও শক্তি যে সেই যুগের ইংরেজ-জীবনের ব্যাপ্তি বৈচিত্র্য উদ্যম সাহস ও শক্তির পরোক্ষ ফল, তাহাতে সন্দেহ কি? তখনকার ইংরেজ লেখকরা ত শুধু নিরাশ প্রণয়ের হা-হুতাশের, শিশু নায়ক-নায়িকার প্রেমের, কাব্য লিখিয়া যান নাই। একা শেক্স্‌পীয়রের নাটকগুলিতেই কি আশ্চর্য্য চরিত্র-ও-ঘটনা-বৈচিত্র্য। ইংরেজ জাতি তখন নানা কাজ, নানা চিন্তা, নানা উদ্যম, নানা আবিষ্কার করিয়াছিল, নানা আদর্শের কথা ভাবিয়াছিল, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য তাহাদের হইয়াছিল; এইজন্য তখনকার ইংরেজী সাহিত্য এত সমৃদ্ধ ও বিচিত্র। ভিক্টোরিয়ার যুগের সাহিত্যও এবম্বিধ কারণে সমৃদ্ধ।

জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জাতি বড় হইলে সাহিত্যও বড় হয়। আবার ভগবৎকৃপায় প্রতিভাশালী লেখক কোন জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইলে, তিনিও নিজের জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন, বড় করিতে পারেন।

নানা দেশে নানা সমাজে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া যদি কোন জাতি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে, যদি তাহাদের উদ্যমশীলতা বাড়ে, তাহা হইলে পরোক্ষভাবে তাহাদের সাহিত্যও বড় হয়, লাভবান্ হয়। ইহার একটি দেশী দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতবর্ষের এক কোটি আটষট্টি লক্ষ লোক গুজরাতী ভাষায় কথা বলে; কোন-না-কোন রকমের হিন্দী ভাষায় আট কোটির উপর লোক কথা বলে। অথচ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্য আধুনিক হিন্দী সাহিত্য অপেক্ষা সমৃদ্ধ। শুধু কি তাই; আধুনিক গুজরাতীতে এমন কোন কোন রকমের বহি আছে, যাহা বাংলা সাহিত্যেও নাই। অথচ বাংলা ভাষায় কথা বলে চারিকোটি তিরাশি লক্ষ লোক—গুজরাতীর চারিগুণেরও বেশী। গুজরাতীদের এই সাহিত্যিক কৃতিত্বের একটি কারণ এই, যে, গুজরাতীভাষী পারসী ভাটিয়া বোরা প্রভৃতি বণিক্ ও অন্যবিধ লোকেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং অনেক বিদেশেও যাতায়াত ও বিষয়কর্ম্ম করে। এই বিশেষত্বটির উল্লেখ করিয়া গুজরাতী সুলেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল মোহনলাল ঝাভেরী মহাশয় "The Wandering Gujarati" "ভ্রমণশীল গুজরাতী"-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

বাঙালীরাও যত দেশে যত রকম কাজে যাইবে, তাহাদের সাহিত্যও তত বড় হইবে। প্রবাসী বাঙালীরা এইপ্রকারে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে তাঁহাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারেন।

ধর্ম্মভাব ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা সকল দেশের সাহিত্যেরই একটি মূল উৎস। বাংলা সাহিত্যেরও একটি মূল উৎস বাংলার নানা ধর্ম্মপ্রচেষ্টা। মনসা-পূজা ও শিবপূজার দ্বন্দ্ব হইতে বেহুলার উপাখ্যান প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি। কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামপ্রসাদের পদাবলী, কালী-কীর্ত্তন, প্রভৃতি শাক্ত প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত। বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর সংখ্যা করাই কঠিন। তাহার পর আধুনিক সময়ে খৃষ্টীয় মিশনারী কেরী প্রভৃতির দ্বারা, ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বারা, রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর দ্বারা, নববৈষ্ণব মতাবলম্বীদের দ্বারা বাংলা সাহিত্য অল্প বা অধিক পরিমাণে অনুপ্রাণিত, গঠিত, সৃষ্ট, সমৃদ্ধ হইয়াছে। রামমোহন যে আধুনিক লিখিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রবর্ত্তক, তাহা সাধারণতঃ স্বীকৃত হইয়া থাকে। অক্ষয়কুমার দত্ত যে তত্ত্ববোধিনী সভার সংশ্রবে বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্য্য-শালী করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের স্থান ধর্ম্মোপদেষ্টাদের মধ্যেই সাধরণতঃ নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু পরে বাংলা সাহিত্যেও তাঁহাদের সম্মানিত স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক বলিয়া সুবিখ্যাত, কিন্তু তিনি শেষ জীবনে নব হিন্দুধর্ম্ম প্রচার ইচ্ছায় উপন্যাসাদি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে, ধর্ম্ম যে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উৎস, একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক সময়ে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন। তাঁহার সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কার চেষ্টার মূলে যে গভীর ধর্ম্মভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের সমুদয় লেখার মধ্যে ও মূলে ধর্ম্মভাব ও লোকহিতচেষ্টা রহিয়াছে।

এসব কথা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। প্রবাসী বাঙালী আমাদিগকেও মনে রাখিতে হইবে, ধর্ম্মভাব মনকে উদ্বুদ্ধ আলোড়িত আলোকিত করিলে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উদ্ভব হয়। অতএব ধর্ম্মভাব দ্বারা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। সংকীর্ণ অর্থে যাহাকে ধর্ম্মসাহিত্য বলে, আমি তাহার কথা বলিতেছি না। সাধারণতঃ প্রশস্ততর অর্থে যাহাকে সাহিত্য বলে, তাহার কথাই বলিতেছি।

আমরা যে যে অঞ্চলে বাস করি, তথাকার লোক-দের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হইবে, ইহা ত সোজা সাংসারিক অর্থেও সহজবোধ্য। রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য সাধনের জন্য যে ইহা প্রয়োজন, ইহাও সর্ব্বদা কথিত হয়। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যে, বাংলা সাহিত্য প্রবাসী বাঙালীর দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে হইলে, ইহা একান্ত আবশ্যক, যে, আমরা প্রবাসের স্থান-সকলের আদি অধিবাসীদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখি। নতুবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন এংলোইণ্ডিয়ানরা প্রায়ই শ্রেষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্য রচনা করিতে পারেন নাই, তেমনি প্রবাসী বাঙালীরাও শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য রচনা করিতে পারিবেন না। এবিষয়ে আমি অক্টোবর মাসের এসিয়াটিক রিভিউয়ে ষ্টান্‌লী রাইস্ (Stanley Rice) সাহেবের লেখা এংলোইণ্ডিয়ান ঔপন্যাসিকদের (Anglo-Indian Novelists) সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। মিষ্টার রাইস্ বলেন :—

"To them [Anglo-Indian Novelists] India is simply Anglo-India as represented by the dances, the dinners, the polo matches, and the races of some gay place. The Plains which are the real India are just a kind of sweltering desert, where of course it is infernally hot and where thunder-storms roll up bringing a breathless air and not a drop of rain, and where men work with bloodshot eyes and a terrible weariness at uncongenial tasks, slaving, not as in real life, with an absorbing interest in the work for its own sake and without thought of reward, but for the woman of their heart who is probably having a more or less "good time" in England or in the ever blessed Hills. India to these writers is the handful of British men and women and if the men are not in the Army, why of course they are in the Civil Service, which naturally includes the Public Works Depart-

ment, Forests, and the rest. The world is divided into soldiers and others; so why not? The aim of every right-minded civilian is to rise in his profession so that he may escape the fiery torment of the horrible Plains and be caught up to the delight of the Hills. The population of India is negligible; it is simply and comprehensively "the native element," generally rather unpleasant, often malicious, and always incomprehensible. Indians flit in and out like shadows, soft-footed butlers creep about verandahs in snowy turbans and murmur that dinner is ready; saices and dak-bungalows and ayahs are peppered over the dish to season it, and now and again a mystery with fierce eyes and a skinny arm obligingly provides the sensation. One does not go to such books as these for Indian colour. For all that it matters the scene might just as well be laid in Nigeria or Zululand; only as it happens Simla is in India and is more attractive to the novelist in search of colour. Novelists of this kind need not detain us."

ইংরেজ লেখকেরা শুধু ইংরেজদের সম্বন্ধেই গল্প উপন্যাস কাব্য বা অন্যবিধ বহি লেখেন না; অন্য জাতিদের সম্বন্ধেও লেখেন। যে যে স্থলে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নাই, সে-সব স্থলে তাঁহাদের বহিগুলা ভাল হয় না। আমরা যদি কেবল বাঙালীর জীবন ও বাংলা দেশ লইয়াই গল্প উপন্যাস কাব্য ও অন্যবিধ বহি লিখি, তাহা হইলে আমাদিগকে সংকীর্ণসীমায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। তাহাতে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য না বাড়িতে পারে। আমাদের মধ্যে অবরোধ প্রথা বিদ্যমান থাকায় এম্‌নিই ত আমাদের সাহিত্য কতকটা একঘেয়ে। যদি প্রবাসী বাঙালীরা প্রবাসী বাঙালী জীবন লইয়াই লেখেন, তাহা হইলে ত বিষয় আরো সংকীর্ণ হইবে, এবং লেখা একঘেয়ে হইতেও পারে। নব নব অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা, নব নব সমাজের কথা, নূতনতর সামাজিক সমস্যার কথা, সাহিত্যে আনিতে হইলে বাঙালী-সমাজের বাহিরে যাইতে হয়। তাহার সুযোগ প্রবাসী বাঙালীদের আছে। অতীতকালের হিন্দু ও বৌদ্ধকীর্ত্তির, মধ্যযুগের মুসলমান মরাঠা শিখ কীর্ত্তির স্থানগুলিতে প্রবাসী বাঙালীরা থাকেন। এইসকল স্থানের সহিত সংপৃক্ত বিষয়ে বহি তাঁহারা লিখিলে ভাল হয়। যিনি সারনাথ দেখেন নাই, বুদ্ধ-গয়া দেখেন নাই, রাজগৃহ দেখেন নাই, তিনি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু লিখিলে, তাহা খুব ভাল না হইতে পারে। তাজ না দেখিয়া শাহাজাহানের জীবনসংশ্লিষ্ট কিছু লিখিলে তাহা শ্রেষ্ঠ রচনা না হইবার সম্ভাবনা।

আমরা যদি আধুনিক হিন্দুস্থানী পঞ্জাবী নেপালী প্রভৃতি সমাজ সংপৃক্ত কিছু লিখিতে চাই, তাহা হইলে শ্রদ্ধান্বিত ও প্রীতিমান্ এবং সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া লিখিতে হইবে। দোষ দেখিব না, দেখাইব না, তাহা নহে। কিন্তু কেবল নাক সিঁট্‌কাইয়া ও মুখ ভ্যাংচাইয়া কখন কোন বড় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। যে উত্তর-ভারতে ব্যাস বাল্মীকি জনক বুদ্ধ অশোক জন্মিয়াছিলেন, যেখানে উত্তরকালে নানক কবীর তুলসীদাস গুরুগোবিন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল, তথায় এখন শ্রদ্ধা করিবার, ভালবাসিবার, আনন্দ পাইবার, কিছু নাই, ইহা হইতে পারে না। নিশ্চয়ই এইসব দেশে এখনও শ্রদ্ধা করিবার ও ভালবাসিবার জিনিষ আছে। নিশ্চয়ই এখানে সাধারণ জনগণের মধ্যে মানব-হৃদয়ের সদ্‌গুণাবলী বিদ্যমান আছে। কেবল এখানকার বাহ্যপ্রকৃতিতে, কেবল এখানকার অতীতসাক্ষী ধ্বংসাবশেষ বা এখনও-বিদ্যমান মানবের কীর্ত্তিসমূহে নহে, পরন্তু বর্ত্তমানে-জীবিত মানবমণ্ডলীর মধ্যেও বিধাতার লীলা প্রকট হইতেছে, তাহাদের মধ্যেও তিনি নিজ সত্য সুন্দর শিব রূপ প্রকাশ করিতেছেন।

আমরা যত আমাদের অবাঙালী প্রতিবেশীদিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়া, সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া, আপনার জন মনে করিয়া, প্রবাসে আনন্দ পাইব, বাংলা সাহিত্য সাক্ষাৎ- ও পরোক্ষভাবে তত সমৃদ্ধ হইবে।

যে ভাষায় যত লোকে কথা বলে, তাহার সাহিত্য তত বড় হইবার সম্ভাবনা। যে সাহিত্য যত লোকে পড়ে, তাহার সমৃদ্ধি বাড়িবার তত সম্ভাবনা। এখন বাংলা প্রায় পাঁচ কোটি লোকে বলে। ইহারা বাঙালী।

কিন্তু শিক্ষিত আসামী ও ওড়িয়া মাত্রেই বাংলা বলিতে ও পড়িতে পারেন। অনেক শিক্ষিত বিহারীও পারেন। সমগ্র আসামে ও ওড়িষাতে বাংলার প্রচলন হইবার সম্ভাবনা খুবই ছিল; রাজনৈতিক কারণে তাহা হইতে পারে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতার অলক্ষিত প্রসার ও ব্যাপ্তি দ্বারা অনেকটা কাজ হইতেছে। সমগ্র বিহারেও বাংলা সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারিত। না হওয়ার মূলে রাজনৈতিক কারণ আছে; কিন্তু ইহার জন্য আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাব, সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের অভাবও যে কিয়ৎপরিমাণে দায়ী, তাহা অস্বীকার করা যায় না। হিন্দী না হইয়া বাংলা কেন বিহারের সাহিত্যিক ভাষা হইতে পারিত, তাহার কারণ বলিতেছি। ১৯০১ এর সেন্সস্ রিপোর্টের প্রথম ভল্যুমের ৩১৮ পৃষ্ঠায় আছে :—

"The face of the Bihari is ever turned towards the north-west; from Bengal he has only experienced hostile invasions. For these reasons, the language of Bihar has often been considered to be a form of the "Hindi" said to be spoken in the United Provinces, but really nothing can be farther from the fact. In spite of the hostile feeling with which Biharis regard everything connected with Bengal, their language is a sister of Bengali, and only a distant cousin of the tongue spoken to its west. Like Bengali and Oriya, it is a direct descendant of the old Magadha Apabhramsa."

তা ছাড়া, ইহাও সকলেই জানেন, যে, মৈথিলী অক্ষর ও বাংলা অক্ষর মূলে ঠিক্ এক। বিদ্যাপতিকে মিথিলার লোকেরা ও আমরা উভয়েই নিজেদের কবি মনে করি। অতএব, হয় বিহারী ভাষাই বিহারের সাহিত্যিক ভাষা হইয়া পুস্তকে সাময়িক পত্রে খবরের কাগজে শিক্ষালয়ে আদালতে ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক ছিল; নতুবা বাংলারই ঐ স্থান পাওনা ছিল। কিন্তু হিন্দী ঐ স্থান পাইয়াছে। ইহার জন্য রাজনৈতিক কারণ দায়ী; আমরাও কিছু দায়ী। যাহা হউক, বঙ্গীয় শিক্ষা জ্ঞান ও সভ্যতার অলক্ষিত প্রসার- ও ব্যাপ্তি-প্রযুক্ত, এখনও বাংলা সাহিত্য পাঁচ কোটি অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের দ্বারা অধীত হইতে পারে। তাহাতে উহার শক্তি ও সমৃদ্ধি বাড়িবে। আমরা বাংলা সাহিত্যে যত আত্মিক শক্তি নিয়োগ করিয়া যত গভীরতা, উদারতা, গাম্ভীর্য্য, শক্তি, আনন্দ উহাতে নিহিত করিতে পারিব, উহা তত বড় সাহিত্য হইবে। তা ছাড়া, আমরা নিজ নিজ জীবন ও কার্য্যের দ্বারা যত বেশী অবাঙালী লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিব, আমাদের সাহিত্যও তত বেশী লোকের আদরের জিনিষ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি অপরকে না দিলে অপরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সহানুভূতি পাওয়া যায় না। অতএব আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল চাই, প্রসার চাই, প্রতিষ্ঠা ও শক্তি ও প্রভাবের বৃদ্ধি চাই, তাহা হইলে মনে রাখিয়া চলিতে হইবে—

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

"লঘুচেতা লোকেরা মনে করে অমুক আমার আপনার জন, অমুক পর; কিন্তু উদারচরিত ব্যক্তিগণ পৃথিবীর সকলকেই আত্মীয় মনে করেন।"

৯ই পৌষ, ১৩৩০।
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৩।

[এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত ফোটোগ্রাফ্ এলাহাবাদের ফোটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত ডি এন্ রায় কর্ত্তৃক গৃহীত এবং তাঁহার সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বেনো-জল

বাইশ

বিনয়-বাবুর বাড়ী ছেড়ে রতন পাগলের মতন বেরিয়ে এল।

তখন বেলা তিনটে হবে। চারিদিকে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। সমুদ্রের তীরের বালি তেতে আগুন হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু সেই অগ্নিকণাচূর্ণের মতন বালুকা-রাশির উপর দিয়েই রতন হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে চল্‌ল—তার মনের অবস্থা তখন এম্‌নি আশ্চর্য্য যে, কোন-রকম জ্বালা-যন্ত্রণাই সে বুঝ্‌তে পার্‌লে না, বা আমলে আন্‌লে না!

আনন্দ-বাবুর বাড়ীর সাম্‌নে এসে, অভ্যাসমত সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল। বাড়ীর ভিতর থেকে একটা এস্‌রাজের সুর ভেসে এল—রতন বুঝ্‌লে, পূর্ণিমা বাজাচ্ছে। মিনিটখানেক সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে, আবার সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্‌ল।

সমুদ্রের ধারের সর্ব্বশেষ বাড়ীখানা যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্তব্ধভাবে রোদ পোয়াচ্ছে আর নীল জলের অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস শুনছে, রতন ক্রমে সেইখানে এসে পড়্‌ল। বাড়ীখানার অবস্থা দেখেই বোঝা গেল, অনেকদিন থেকেই সেখানা খালি প'ড়ে আছে। তারই পিছনে গিয়ে রতন নিজের মোট নামিয়ে, তার উপরেই ধুপ ক'রে ব'সে পড়্‌ল।

একটা অভাবিত সত্য তার মনের ভিতরটা একেবারে ওলট-পালট ক'রে দিয়েছে! অবশ্য, এর আগেও মাঝে মাঝে নানা কারণে এই সত্যটাই অস্পষ্ট আব্‌ছায়ার মতন তার মনের কোণে কোণে উঁকিঝুঁকি মেরেছে বটে, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে সে তাকে আর কোনো দিন বুকের মাঝে অনুভব করেনি! আজ এখনো বারংবার সে নিজের পায়ের কাছে সেই যাতনা-বিকৃত অশ্রু-সিক্ত মুখখানিকে দেখ্‌তে পাচ্ছে, আর সেই আর্ত্তস্বরও তার কানের কাছে থেকে থেকে ধ্বনিত হ'য়ে উঠছে—"আমাকে ছেড়ে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেব না!"

ভালোবাসে, ভালোবাসে,—সুমিত্রা তাকে ভালোবাসে! আর এ ভালোবাসা এমনি প্রবল যে তার সঙ্গে সে পৃথিবীর সর্ব্বস্ব ছেড়ে চ'লে আস্‌তে পারে।

এমন বিপুল ভালোবাসা তার ঐটুকু তরুণ প্রাণের মধ্যে কি ক'রে ধর্‌ল—সমুদ্রের উচ্ছ্বাস কি এতটুকু পাত্রের ভিতরে ধ'রে রাখা যায়? এ প্রেমকে গ্রহণ করা ত দূরের কথা—ধারণা করার শক্তিও যে তার নেই! তাই সে সুমিত্রার সুমুখ থেকে পাগলের মতন ছুটে পালিয়ে এসেছে!

কল্পনায় সুমিত্রা যা সহজ ভেবেছে, বাস্তব-জীবনে তা কত অসম্ভব, কত অসঙ্গত! সবে এই তার প্রথম যৌবন, নিশ্চিন্ত জীবনের মধ্যে সংসারের কঠোর দণ্ডের আঘাত কখনো সে স্বপ্নেও অনুভব করতে পারেনি, তাই মনের ঝোঁকে এত সহজে বল্‌তে পার্‌লে, তার সঙ্গে সে বাপ-মাকে ছেড়ে চ'লে আস্‌বে! সমাজকে যে চেনে সেই-ই জানে—এ কত বড় ভয়ানক প্রস্তাব! এমন প্রস্তাবে সে কি রাজি হ'তে পারে? পালিয়ে আসা ছাড়া তার পক্ষে উপায় কি?

রতন মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, জীবনে আর কখনো সেন-পরিবারের ছায়াও মাড়াবে না। নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে বিনয়-বাবু যদি কোনদিন তাকে ফের আহ্বান করেন, তা হ'লেও সে আর ফিরে' যাবে না। কারণ সুমিত্রার সঙ্গে তার মিলন অসম্ভব! সুমিত্রা ধনীর মেয়ে, আর সে পথের ভিখারী! কাঞ্চন-কৌলীন্যের মধ্যে প্রেম কি তার খেলাঘর বাঁধ্‌তে পারে? এতে বিনয়-বাবুও রাজি হবেন না, সেও নয়। যে নিজের পেট চালাতে না পেরে আত্মহত্যাকেও কামনা করে, বিবাহ যে তার পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা!

বালিকা সুমিত্রা! তার এ প্রেম প্রথম বসন্তের

উদ্দাম খেয়াল মাত্র—কিছুদিনের অদর্শনে তার এ খেয়াল কোথায় মিলিয়ে যাবে, তখন আজকের এই দুর্ব্বলতা হয়ত তার নিজের কাছেই দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হবে! পালিয়ে গিয়ে এই দুঃস্বপ্ন থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে ব'লে ভবিষ্যতে সে মনে মনে রতনকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ না দিয়ে পারবে না!

কিন্তু সেও যে সুমিত্রাকে ভালোবেসেছে! এ প্রেম এতদিন সে সন্তর্পণে অন্তরের অন্তরালে গোপন ক'রে রেখেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যে চোখের ভাবেও তা প্রকাশ হ'তে দেয়নি—কারণ ভালোবেসেই সে সুখী ছিল, সুমিত্রাও যে তাকে ভালোবাসে, এ ত সে জানত না! সুমিত্রাকে কখনো পাবে না বুঝেও তার মন আজ এই ভেবেই খুসী হয়ে উঠ্‌ল—সুমিত্রাও তো তাকে ভালোবাসে, তাই-ই যথেষ্ট—তাই-ই যথেষ্ট! সে দূরে দূরান্তরে চ'লে যাবে, এ জন্মে আর কখনো সুমিত্রাকে দেখ্‌তে পাবে না, তবু সে তার স্মৃতিকেই নিরন্তর পূজা করবে—যেমন ক'রে পূজা করে অন্ধ ভক্ত, দেবীপ্রতিমাকে চোখে না দেখেও!

হঠাৎ রতনের চোখ পথের উপরে পড়্‌ল, দূর থেকে কে একজন লোক এইদিকেই আস্‌ছে—পরনে তার সাহেবী পোষাক। রতনের মনে হ'ল, তাকে মিঃ চ্যাটোর মত দেখ্‌তে! সে তখনি উঠে' দাঁড়াল এবং মোটটা তুলে' নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়্‌ল!......

যথাসময়ে ষ্টেশনে এসে রতন ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এখন সে কোথায় যাবে? কল্‌কাতায়?......না, কি হবে আর সেখানে গিয়ে, কি টানে আবার সেই কল্‌কাতায় যাবে? তার পক্ষে এখন সব দেশই সমান! খানিক ভেবে রতন ঠিক করলে, দিন-কতক মান্দ্রাজের দিকেই বেড়িয়ে আসা যাক্—ভাগ্য-দেবতা সেখানে আবার তার সঙ্গে নতুন কি খেলা খেলেন, পরখ ক'রে দেখ্‌তে ক্ষতি কি?

রতন টিকিট-ঘরের দিকে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু দু'পা এগিয়েই সচমকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল! সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলে, টিকিট-ঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিনয়-বাবু, আনন্দ-বাবু আর পূর্ণিমা! তাঁরা যে তাকেই ধরতে এখানে এসেছেন, একথা বুঝ্‌তে তার বিলম্ব হ'ল না। সে তখনি একরকম দৌড়েই ষ্টেশন থেকে বেড়িয়ে পড়্‌ল। তার পর পথের উপর দিয়ে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলেছে, হঠাৎ পিছন থেকে কে তার একখানা হাত চেপে ধ'রে ব'লে উঠ্‌ল—"রতন, রতন!"

এত ক'রেও ধরা পড়্‌ল ভেবে রতন হতাশভাবে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু তার পরেই সবিস্ময়ে সে ব'লে উঠ্‌ল—"একি তুমি, অক্ষয়!"

"—কি আশ্চর্য্য দেখা! এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ?"

সে-কথার কোন জবাব না দিয়ে রতন বল্‌লে, "অক্ষয়, তুমি এখানে কোথেকে?"

—"আমি যে কটকেই কাজ করি। একদিনের জন্যে পুরীতে এসেছি, কালকেই ফিরে যাব। কিন্তু তুমি এখানে কেন? মোট ঘাড়ে ক'রে যাচ্ছই বা কোথায়?"

—"মাদ্রাজে।"

—"মাদ্রাজে? কেন, সেখানে চাকরি-টাকরি কিছু কর নাকি?"

—"না। জানই ত অক্ষয়, চিরদিনই আমি বোহিমিয়ান্, দুনিয়ায় নিজের মনের খেয়ালে একলাটি ঘুরে' বেড়াবার ছুটি পেলে আমি আর কিছুই চাই না—মাদ্রাজে যাচ্ছি নিরুদ্দেশ হ'য়ে।"

অক্ষয় বিস্মিত-স্বরে বল্‌লে, "সে কি হে রতন! তুমি কি এখনো বিবাহ করনি, তেম্‌নি একলাই আছ?"

—"বিবাহ? ভগবান্ করুন, ও প্রবৃত্তি যেন আমার কখনো না হয়, বিধাতা যখন একলাই আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন বুঝ্‌তে হবে যে তাঁর একান্ত ইচ্ছা এই, আমি যেন একলাই থাকি। একলা থাকার কত আনন্দ তা কি তুমি জান, অক্ষয়?"

—"খুব জানি, তোমার চেয়ে ভালো ক'রেই জানি।"

—"কি ক'রে তুমিও কি এখনো একলা আছ?"

—"না, একলা থাকলে আমি একাকিত্বের আনন্দ এমন ক'রে বুঝ্‌তে পার্‌তুম না। একলা থাকার আনন্দ মানুষ প্রথম বুঝ্‌তে পারে বিবাহ ক'রে, দোক্‌লা হ'য়ে।"

—"আমি কিন্তু ও-সত্যটি বিবাহ না ক'রেই বুঝ্‌তে

পেয়েছি। তাই 'আমি একলা চলেছি এ ভবে!' আমার জীবন কয়েদীর জীবন নয়, আমি বাতাসের মতন স্বাধীন, আর এই বিশ্ব আমার স্বদেশ!"

—"রতন, তুমি দেখ্ছি ঠিক তেমনিটিই আছ, একটুও বদ্‌লাওনি। কিন্তু ছন্নছাড়ার মত এমন দেশ-বিদেশে ছুটে' বেড়ান, সেইটেই কি বড় ভালো?"

—"বল্লুম ত, আমার দেশ-বিদেশ নেই—

'সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!'"

দুজনে চল্‌তে চল্‌তে অনেক দূর এগিয়ে পড়েছিল। অক্ষয় বল্‌লে, "বেশ, তা হ'লে আপাততঃ কটকে আমার ওখানে গিয়ে দিনকতক ঘর বাঁধ্‌বে চলো না! কতকাল তোমাকে দেখিনি, আজ তোমাকে পেয়ে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে!"

রতন বল্‌লে, "তা হ'লে আমাকে পেয়ে খুসি হয়, পৃথিবীতে এমন বন্ধু আমার এখনো আছে! ভাই অক্ষয়, তোমার প্রস্তাবে আমার কোনই আপত্তি নেই।"

—"তবে আজই আমার সঙ্গে এস। তোমাকে আমি ছাড়্‌ব না, তুমি অনায়াসেই আবার ডুব মার্‌তে পার।"

রতন হেসে বল্‌লে, "এ প্রস্তাব আরো ভালো। কারণ পুরীর বাসা আমি তুলে' দিয়ে এসেছি।"......

অক্ষয় আর রতন বাল্যবন্ধু—স্কুলে ও কলেজে একসঙ্গে পড়েছে। মাঝে অনেকদিন ছাড়াছাড়ির পর এই তাদের প্রথম দেখা।

তেইশ

একটি মানুষের অভাবে আনন্দ-বাবুর আর পুরী ভালো লাগ্‌ছে না।

এমানুষটির ভিতরে যে কি মধু ছিল,—তার সঙ্গে যে একবার মিশেছে আর সে তাকে ভুল্‌তে পারেনি। গানে গল্পে, আলোচনায় ও নির্ভীক স্পষ্ট মতামতে সকলকেই সে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল, প্রবাসের দীর্ঘ অবকাশকে মধুর ক'রে তুলেছিল, হঠাৎ আজ মাঝখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে সকলের মনকেই সে বিমর্ষ ক'রে দিয়েছে।

রতন চলে' যাওয়াতে আনন্দ-বাবুর মনে হ'ল, তিনি যেন এক নিকট আত্মীয়ের অভাব অনুভব কর্‌ছেন।

সেদিন মেয়েকে ডেকে তিনি বল্‌লেন, "পূর্ণিমা আমার আর পুরীতে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আমারও নেই, বাবা!"

—"কেন মা?"

—"দিনগুলো ভারি একঘেয়ে লাগ্‌ছে!"

—"লাগ্‌বেই ত মা, রতন নেই—এই একঘেয়ে দিনগুলোকে বিচিত্র ক'রে তুল্‌বে কে? ছি, ছি, এমন অন্যায় করে' তাকে তাড়ালে!"

—"বিনয়-কাকা ত তাঁকে এমন কিছু বলেননি, রতন-বাবু যে নিজেই ভুল বুঝে' চলে' গেছেন, বাবা!"

—"না, এব্যাপারে বিনয়ের ততটা দোষ নেই বটে! আমি বেশ বুঝ্‌ছি, রতনের বিরুদ্ধে একটা রীতিমত ষড়যন্ত্র হয়েছে।"

—"ষড়যন্ত্র? সে কি, বাবা?"

—"হুঁ, ষড়যন্ত্র। এ ঐ চ্যাটো আর কুমার বাহাদুরের কীর্ত্তি না হ'য়ে যায় না। তারা রতনকে দু'চোখে দেখ্‌তে পার্‌ত না। বিনয়ের উচিত ছিল, রতনকে কিছু বল্‌বার আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা। রতন অভিমানী ছেলে, একটুতেই আহত হয়, কাজেই বিনয়ের সামান্য ইঙ্গিতও সে সহ্য কর্‌তে পারেনি।"

পূর্ণিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, "কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রে চ'লে যাওয়া কি রতন-বাবুর উচিত হয়েছে বাবা?"

—"মা, তুমি রতনকে বুঝ্‌তে পারনি। সে যে গরীব, আর গরীবরা যে ধনীদের আলাদা জাত ব'লে মনে করে! সে ভেবেছিল, আমার এখানেও সে ভালো ব্যবহার পাবে না, কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক্ হচ্ছি, সে গেল কোথায়?"

—"আমার ত মনে হয় তিনি কল্‌কাতায় গিয়েছেন। কিন্তু বাবা, তাঁর সম্বন্ধে যে-সব কথা শুন্‌ছি—"

আনন্দ-বাবু বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বল্‌লেন, "সব মিথ্যে, সব মিথ্যে! এ-সব কথার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। পুলিশ নিশ্চয় ভুল ক'রে তাকে ধ'রেছিল,

তাই তাকে ছেড়ে না দিয়ে পারেনি। এমন ভুল তো পুলিশ আকৃসারই কর্‌ছে!"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা বাবা, কবে আমরা কল্‌কাতায় যাব?"

—"এই হপ্তাতেই। কিন্তু কল্‌কাতায় গিয়েও রতনকে কি আর দেখ্‌তে পাব?"

পূর্ণিমা উদ্বিগ্নমুখে বল্‌লে, "কেন, বাবা?"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "প্রথমত, সে হয়ত কল্‌কাতায় যায়নি। তার পর, কল্‌কাতায় গেলেও সে যদি আর দেখা না দেয়? জানিস্ ত মা, রতনের দারিদ্র্যের ঝাঁক কতটা বেশী! অর্থকষ্টে প'ড়ে সে আত্মহত্যা কর্‌তে গিয়েছিল, তবু ধনী মাতুলের গলগ্রহ হ'তে রাজি হয়নি! এই দারিদ্র্যের ঝাঁকেই সে হয়ত আর আমাদের ছায়াও মাড়াবে না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে, তিনি দুঃখিতভাবে পূর্ণিমার মাথার উপর একখানি হাত রেখে বল্‌লেন, "কিন্তু রতনকে আমি ত ছাড়্‌তে পার্‌ব না, আমি যে তোকে তার হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাই!"

পূর্ণিমার মুখ লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

কল্‌কাতায় যাবার আগের দিনে পূর্ণিমা, সেন-পরিবারের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেল।

সেন-গিন্নী ও সুনীতির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর পূর্ণিমা জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কাকী-মা, সুমিত্রাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না কেন?"

সেন-গিন্নী বল্‌লেন, "আজ ক'দিন থেকেই সুমি'র শরীর ভালো নেই, দিন-রাত বিছানাতেই শুয়ে থাকে, ঘর থেকে বেরুতে চায় না। যাওনা, তার সঙ্গে দেখা ক'রে এস, পাশের ঘরেই আছে।"

পাশের ঘরে গিয়ে পূর্ণিমা দেখ্‌লে, বিছানার উপরে ব'সে সুমিত্রা জান্‌লা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। তার আ-বাঁধা চুলের বেণী পিঠের উপরে লুটিয়ে পড়েছে, মাথাটা উস্কখুস্ক রুক্ষ,—মুখের ভাব বিমর্ষ।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "সুমিত্রা, কাল আমরা কল্‌কাতায় যাচ্ছি।"

—"কেন?"

—"পুরী আর ভালো লাগ্‌ছে না।"

—"রতন-বাবু তোমাদের চিঠি লিখেছেন?"

—"না।"

সুমিত্রা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পূর্ণিমার মুখের পানে নীরবে তাকিয়ে রইল।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "রতন-বাবু চিঠি লিখ্‌লে তোমাদেরও লিখ্‌তেন।"

সুমিত্রা বল্‌লে, "তোমরা থাক্‌তে তিনি আমাদের চিঠি লিখ্‌বেন কেন?"

সুমিত্রার কথার অর্থ পূর্ণিমা কিছুই বুঝ্‌তে না পেরে চুপ ক'রে রইল।

সুমিত্রাও আর কিছু বল্‌লে না।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "তোমার কি অসুখ হয়েছে, সুমিত্রা? কণারক থেকেই ত তোমার শরীর ভালো নেই দেখ্‌ছি।"

সুমিত্রা ম্লান হাসি হেসে, অন্যমনস্কের মতন বল্‌লে, "হুঁ, কণারক থেকেই আমার অসুখ সুরু হয়েছে।"

—"অসুখটা কি?"

—"জানি না।"

পূর্ণিমা আরো খানিকক্ষণ ব'সে রইল, কিন্তু সুমিত্রা আর কোন কথা কইলে না দেখে সে আস্তে আস্তে উঠে' দাঁড়াল।

সুমিত্রা বল্‌লে, "চল্‌লে?"

—"হ্যাঁ, আবার কল্‌কাতায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আশা করি তখন তোমাকে সুস্থ দেখ্‌ব।"

সুমিত্রা আবার একটু বিষাদ-মাখা হাসি হেসে বল্‌লে, "তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা না হ'তেও পারে।"

পূর্ণিমা বল্‌লে, "আজ তুমি কি আবল-তাবল বক্‌ছ বল দেখি?"

—"আবল-তাবল বকা আমার স্বভাব, তা কি তুমি জান না?"

—"ও স্বভাব বদ্‌লে ফেল। আমি এখন আসি ভাই!"

—"এস।"

পূর্ণিমা দরজার কাছ বরাবর গেছে, সুমিত্রা হঠাৎ তাঁকে ডেকে বল্‌লে, "হাঁা, আর একটা কথা।"

পূর্ণিমা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, "কি ?"

—"কাছে এস।"

পূর্ণিমা আবার সুমিত্রার কাছে দাঁড়াল।

সুমিত্রা আচম্‌কা তার একখানা হাত চেপে ধরে' বল্‌লে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পারি ?"

পূর্ণিমা অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, "একথা কেন তুমি বল্‌ছ ?"

—"আমি তোমাকে বিশ্বাস ক'রে একটা কথা বল্‌ব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, সে-কথা তুমি অন্য কারুকে বল্‌বে না ?"

—"আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি।"

—"কল্‌কাতায় গেলে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই রতন-বাবুর দেখা হবে।"

—"হ'তে পারে।"

—"তা হ'লে রতন-বাবুকে বল্‌বে, তিনি আমাকে যে অপমান ক'রে গেছেন, তার জন্যে এজীবনে আমি তাঁকে আর ক্ষমা কর্‌ব না !"

—"রতন-বাবু তোমাকে অপমান ক'রে গেছেন ? এ কি কথা !"

—"আর-কিছু জান্‌তে চেয়ো না"—ব'লেই সুমিত্রা বিছানার উপরে শুয়ে প'ড়ে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একখানা গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে ফেল্‌লে !

পূর্ণিমা নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হ'য়ে সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

"মাহে"-নগর

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

চারিটার সময় যখন আমার নির্দ্দিষ্ট পাহারার কাজ শেষ করিলাম তখন আমাদের জাহাজের সমস্ত নৌকাই চলিয়া গিয়াছে। তাই আজ ডাঙ্গায় যাইবার জন্য একটা দেশী ডোঙ্গা ভাড়া করিতে হইল। এইসকল ডোঙ্গা, জাহাজের দড়ি-দড়া প্রভৃতি সরঞ্জামের জন্য কতক-গুলা নারিকেল লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছে।

এই ডোঙ্গাটা লম্বা, পাত্‌লা, তীরের মতো গঠিত, ও "খামখেয়াল"। (এইসব স্থৈর্য্যহীন নৌকাগুলা বাতাসের এক দমকাতেই ভাড়িয়া যায় কিংবা উল্টাইয়া যায়, তাই নাবিকেরা এইরূপ নৌকাকে "খামখেয়াল" নৌকা বলে)। এই ডোঙ্গাটা এরই মধ্যে জলে ভরিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট উল্লম্ফী তরঙ্গ ঠেলিয়া কতকগুলা বোটিয়া-দাঁড়ের সাহায্যে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে; যাইতে সবশুদ্ধ এক ঘণ্টারও বেশী লাগিবে।—

সে ত আরো খারাপ! যাই হোক আমি ত ডোঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম—বেশ যুৎ করিয়া বসিয়া লইলাম।—এই চাঁচাছোলা খোলটা এতটা চওড়া যে, কোনপ্রকারে বসিতে পারা যায়।

আমরা খুব চীৎকার করিয়া যাত্রা করিলাম; বায়ু-উৎক্ষিপ্ত জল-কণায় আমাদের কাপড় ভিজাইয়া দিল। কিন্তু কিয়দ্দুর গিয়াই মনে হইল—বোটিয়া-দাঁড়ীরা যেন কি ভাবিতেছে, তাহারা থামিয়া পড়িল। প্রথমে উহারা ইচ্ছা-সুখেই আমাকে আরোহীরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন, আরও বেশী দূরে যাইবার পূর্ব্বে, তাহারা জানিতে চাহিল, আমি তাহাদিগকে কত টাকা দিব।···

আমি যখন তাহাদিগকে এক টাকা দিব বলিলাম— কিংবা আরও বেশী, যদি তাহারা শীঘ্র দাঁড় টানিয়া যায়, তখন তাহাদের উৎসাহের আর সীমা রহিল না। তাহারা আমার মাথার উপর একটা ছাতা ধরিল, আমাকে হাত-পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল—এমন-কি গান গাহিয়াও আমাকে আমোদ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যে ভারতবাসী আমাকে গান শুনাইবার ভার লইয়াছে, সে আমার মুখামুখী হইয়া উবু হইয়া বসিল,—আমার খুব কাছে—খুবই কাছে—এত কাছে যে আমার আর নড়িবার-চড়িবার জো নাই। আমরা দুজনে জলের মধ্যে বসিয়া আছি সরু ডোঙ্গার শেষপ্রান্তে—হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হইতেছে।

যে-সকল ছোট ছোট ঢেউ আমাদের চারিদিকে নৃত্য করিতেছে, আমাদের চোখ তাহাদের অপেক্ষাও নীচু; আমরা তাহাদের মধ্যে ঘুরপাক দিতেছি।—বেশ ঘনিষ্ঠভাবে বলিলেও হয়। জলের উপর শুইয়া থাকিবার মতো, সন্তরণকারীর মতো, খুব নীচু হইতে ঐ ঢেউগুলা দেখিতেছি। এমন উজ্জ্বল রং—মনে হয় যেন নীলবড়ির রস ঢালিয়া দিয়াছে। কখন-কখন ঢেউগুলা আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতা-কারে আসিয়া ও-দিক্‌কার সুন্দর হরিৎ রেখা কিয়ৎকালের জন্য ঢাকিয়া ফেলিতেছে— ঐ হরিৎ রেখাই ভারতভূমি।

ভারতবাসীর গানগুলা বড়ই দীর্ঘ, ক্রমাগত ফিরিয়া-ফিরিয়া আরম্ভ হয়। বোটিয়া-দাঁড়িরা জলের উপর দাঁড়ের আঘাত করিয়া, গানের সহিত সঙ্গত করিতে লাগিল। যতটা সম্ভব আমার কাছে সরিয়া আসিয়া লোকটা গান গাহিতে লাগিল, খুব মুখব্যাদান করিয়া, শুভ্র দন্তপাঁতির শেষ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিয়া সে আমার মুখের সামনে

চীৎকার করিতে লাগিল। আমার গালের উপর তাহার নিঃশ্বাস অনুভব করিতে লাগিলাম—সেই নিঃশ্বাস হইতে সর্পসুলভ একপ্রকার মৃগনাভি-ধরণের গন্ধ বাহির হইতেছিল। গানের কোন কোন অংশ গান নহে—দ্রুত ঝাঁকুনীর সহিত একপ্রকার হাঁক্-ডাক্; এই সময়ে খুব তাড়াতাড়ি তাহার দাঁতে দাঁতে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল—মনে হইল যেন লোকটা কাঁপিতেছে। এই সময়ে তাহার মুখের ভাবটা অতি ভীষণ হইয়া উঠে। দেখিতে সুশ্রী হইলেও, তখন তাহাকে একটা বড় বানর বলিয়া মনে হয়।

আমার চির-অভ্যাস অনুসারে ছোট নদীতে প্রবেশ না করিয়া, —সাগর-বেলাভূমিতে, তরঙ্গভঙ্গের মধ্যে, ধীবরদিগের যে গ্রামটি অবস্থিত, সেই গ্রামের সম্মুখে গিয়া ধীবরদের সহিত দেখা করিব। কিন্তু না, আজ দেখা করা হইবে না—বোটিয়া-দাঁড়ের খুব সজোর আঘাতে আমরা বেশ দ্রুত চলিয়াছি—নীল তরঙ্গের উপর দুলিতে দুলিতে চলিয়াছি। আমাদের মাথার উপর সূর্য্য জ্বলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে।...

তরঙ্গভঙ্গ, বেলাভূমি! ভারতবাসীরা আবার খুব হাঁক ডাক দিয়া সকলেই জলের ভিতর নামিয়া পড়িল; তাহাদের ডোঙ্গাটা ডাঙ্গার উপর আছড়াইয়া ফেলিল; সিঁড়ির গরাদের মতো উহারা বাহু বাড়াইয়া দিল, তরঙ্গফেনোচ্ছ্বাসের মধ্যে আমি লাফাইয়া পড়িলাম।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা।—সূর্য্য এরই মধ্যে সমুদ্রের উপর ঢলিয়া পড়িয়াছে—নীচু হইতে তালতরুপুঞ্জদিগকে রশ্মিচ্ছটায় উদ্ভাসিত করিয়াছে। উহাদের দীর্ঘ ধূসর বৃন্তগুলার উপর যেন জ্বলন্ত আগুনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আলোকটা বরাবরই সোনালি রঙের হইয়া থাকে, কিন্তু এই সময়ে উহার রং রক্ত-রঞ্জিত সোনালি হইয়াছে; প্রভাতকালের ও দিনমানের সোনালি রং অপেক্ষা এবং আরও চমৎকার। আমাকে দেখিবার জন্য বনভূমির নিম্নদেশ হইতে তিনজন লোক বাহির হইয়া আমার দিকে অগ্রসর হইল। শুভ্র-শ্মশ্রুধারী দুইজন বৃদ্ধ, বেশ মহৎভাববিশিষ্ট মুখশ্রী, আমাদের চার্চ্চের সেন্ট্‌দিগের মতো পরিচ্ছদ; আর একটি তরুণী, আবক্ষ-কণ্ঠ-অনাবৃত—অপূর্ব্ব সুন্দরী—মাথার উপর একটা ফলের টুক্‌রী আছে।

এই চমৎকার নাট্যদৃশ্যের ভিতর হইতে, এই স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণচ্ছটার মধ্যে, যখন তাহাদিগকে আসিতে দেখিলাম, তখন খুব সুদূর প্রাগৈতিহাসিক অতীত কালের কোন দৃশ্য দেখিতেছি বলিয়া মনে হইল। এইরূপেই পূর্ব্বকালে জগতের আদিমযুগের মূর্ত্তি আমার কল্পনার চক্ষে প্রতিভাত হইত; উহা কি সুন্দর ও প্রশান্ত!—সেই সময়ে জীব ও পদার্থসমূহের একটা অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশ পাইত—যাহা এক্ষণে আর আমরা দেখিতে পাই না।

গোধূলি সময়ে, ছায়াময় বীথি-পথে, বিনা-উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। এইসব রাস্তা গবর্ণমেণ্ট-হাউস পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রবিবারের সায়াহ্নে, এবং এই প্রায়-য়ুরোপীয় অঞ্চলে, রবিবারের পোষাক পরিয়া লোকেরা বেড়াইতেছে—হিন্দুদিগের ফরাসী পরিচ্ছদ, পুরুষেরা লম্বা-কোর্ত্তা পরিয়াছে, রমণীরা পালক ও পুষ্পভূষিত টুপি পরিয়াছে। ইহা মনে করাইয়া দেয়—ফ্রান্সের সমস্ত ছোট-ছোট নগরে, সায়ংকালীন "ভেস্‌পার"-উপাসনার পর স্বেচ্ছা-ভ্রমণ। এ ভারি আশ্চর্য্য,—সময়-বিশেষে, সকল দেশের মধ্যেই একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। যেহেতু, সর্ব্বত্রই ব্যাপারগুলা একই-রকমের, যেহেতু, মানবজাতি এক, ও পৃথিবী ক্ষুদ্র।

যাহারা আপন-আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া, মাছির মত আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে সেইসব বালকদের মধ্য হইতে দুইজনকে বাছিয়া লইয়া, উহাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা অনুসারে, আমার পথপ্রদর্শকরূপে উহাদিগকে আমার কাছে-কাছে রাখিতে স্বীকৃত হইলাম। উহারা দুই ভাই—বয়স ১২ বৎসর; উহারা ফরাসী ভাষায় বলিল:—"দেখুন মহাশয়, আমরা অনাথ, অত্যন্ত গরীব; আপনার যাহা ইচ্ছা আমাদের কিছু ভিক্ষা দিবেন, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট হব।" ফরাসী বলে নিতান্ত মন্দ নয়; তবে বিনা, একটা অদ্ভুতরকমের ঝোঁক দিয়া, টানিয়া-টানিয়া উচ্চারণ করে। উহারা বেশ ভদ্র, এবং মনে হয়, বাস্তবিকই খুব দরিদ্র। পরিধানে শুধু ছেঁড়া কুটিকুটি খাটো ধুতি।—এই স্থির হইল, উহারা আমার ভ্রমণ-পথে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে,—একজন আমার বাম পার্শ্বে, আর-একজন দক্ষিণ পার্শ্বে—আমার প্রস্থানকাল পর্য্যন্ত।

এইসব বড় বড় তাল গাছের তলায়, রাত্রি প্রায়ই দ্রুত আসিয়া পড়ে! এই একমাত্র রাস্তায়, এবং যে-সব পথ গবর্ণমেণ্ট হাউসের কাছাকাছি গিয়াছে—সেই রাস্তায়ও এইসব পথে, কাঠদণ্ড-প্রান্তে কতকগুলা পেট্রোল-তৈলের লণ্ঠন জ্বালান হইল। ইহাতে করিয়া ক্ষুদ্র ফরাসী নগরের এই অলীক সাদৃশ্যটা মাহে-নগরে যেন একটা পূর্ণতা লাভ করিল—কেবল হরিৎশ্যামল শোভাসম্পদটা বিদেশী রহিয়া গেল।

একরকমের বীথি আছে—খুব বড়; এখানে আলো জ্বালান হয় না, এখনো দিনের আলো আছে—কেননা এই জায়গাটা অন্তত ১০০ গজেরও বেশী চওড়া; যেন তালীবনের মধ্যে, ঋজুভাবে কাটিয়া বাহির-করা একটা ফাঁকা জমি। এই রাস্তাটা ইংরেজ-অধিকৃত জমি পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই বৃহৎ রাস্তার ঠিক মাঝখানে, পথ চল্‌তি লোকদের জন্য আলের মতো একটা খুব সরু পথ। (দুই ধারের বাকি অংশে জলপূর্ণ প্লাবিত ধানের ক্ষেত।)—এবং আজ সায়াহ্নে এইখানে এই আলের পথে, মাহের লোকেরা খোলা-হাওয়ায় বেড়াইতেছে। ইহারা তালীবনের নীচে অষ্টপ্রহর বাস করে; এইখানেই আসিয়া নিশ্চয়ই একটু তাজা হইয়া উঠে। এই গোধূলি সময়ে, এইসব ধানের ক্ষেত ফসলের পূর্ব্বে আমাদের ফ্রান্সের ক্ষেতগুলা যেরূপ দেখিতে হয় কতকটা সেইরূপ দেখিতে। এই পদচারীদিগের মধ্যে অনেকেরই য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ; তাই এইসমস্ত মিলিয়া পল্লীগ্রামের রবিবারের ভাবটা মনে আনিয়া দেয়। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে আমাদের ফরাসী গ্রামসমূহে জুনমাসের সায়াহ্নে যেরূপ লোকেরা অলসভাবে পদচারণ করে, সেইরূপ পদচারণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই দেখ, স্কুলের "ভগিনী" নামধেয় "ননেরাও" চলিয়াছে—উহাদের পিছনে, ভারতীয় ছোট ছোট মেয়ে—দুইজন-দুইজন করিয়া সারি বাঁধিয়া কায়দাদুরস্তভাবে চলিয়াছে। আমি খুব কাছাকাছি উহাদের ভিতর দিয়া গেলাম—কেননা পাশে সরিবার পথ নাই। উহাদের ক্ষুদ্র বক্ষদেশ ইহারই মধ্যে একটু গড়িয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র শরীরের সমস্ত গঠনভঙ্গীও নিখুঁত সুন্দর। একে-একে সকলেই আমার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল।—সুন্দর চোখ কালো অতলস্পর্শের মতো সুগভীর। ঐ চোখ্‌গুলি আমাকে যেন এই কথা বলিতে লাগিল:—

হাস্‌ব বলেই আমরা বিজ্ঞ হয়েছি, লিনেন্ কাপড়ের টুপি মাথায় পরেছি; হাস্‌ব বলেই কেননা ও ত বেশীদিন টিঁক্‌বে না; আমাদের শরীরে নাচওয়ালী ও অপ্সরার রক্ত চল্‌ছে; অল্প সময়ের মধ্যেই একটু বড় হ'য়ে উঠ্‌লেই আমরা "উড়ন্ত" ভাব ধারণ কর্‌ব।

উহারা বেশ সুশৃঙ্খলভাবে নিঃশব্দে চলিয়া গেল। দূর হইতে উহাদিগকেও আবার ননের মতো দেখিতে হইল। এই বেচারী "ভগিনীরা" একটা ছোটখাটো রকমের শোভা যাত্রা করিয়া চলিয়াছে—দেখিতে ভারি মজার। কিন্তু কিছুকাল পরে এই মেয়েদের লইয়া উহাদিগকে একটু ভুগিতে হইবে।

এই ফাঁকা জায়গা, যাহার ভিতরে আমরা পদচারণা করিতেছিলাম, ইহার প্রত্যেক ধারে তালীবনের সীমাপ্রান্ত একটা জমকালো কালো পর্দ্দার মতো প্রসারিত—এইখানে ইহারই মধ্যে ঘনঘোর রাত্রি আসিয়াছে; ঝিঁঝিঁ-পোকা ডাকিতেছে; আকাশের রংএ একটা অসাধারণ বেগ্‌নী-আভা, যেন বাঙ্গালার রং-মশাল জালান হইয়াছে। এবং যে-সকল তারা ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, মনে হয় যেন লাল জমির উপর ছোট ছোট সবুজ আগুন।

কাল, এইসব অঞ্চলে, আমার কতকগুলি বন্ধু জুটিয়াছিল; আমি আজ আবার তাহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। তালীবনের কিনারায়, দুই বৃদ্ধ ভারতবাসীর কলা ও গরম-মশলার একটি ছোট্ট দোকান আছে। এইসকল জিনিষ তাহাদের নিকট উহারা বিক্রয় করিবে। লোকবসতি হইতে বিচ্ছিন্ন উহাদের ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখ দিয়া কেহই যাতায়াত করে না। উহাদের গৃহ এবং যেখানে কয়েকজন পদচারী রহিয়াছে সেই আল-পথের মাঝে একটা ধানের ক্ষেত। আমার দুই নিত্যসঙ্গীর সহিত এইখানে উপনীত হইলাম; উহারা আমাকে চিনিতে পারিল, এবং তখনি আমার আহারের জন্য ভাল ভাল কলা বাছিয়া দিল। তাহার পর, দরজার সম্মুখে একটা মাদুরের উপর আমাকে বসাইল। ঝোলান ল্যাম্পটা জালান হইল।

—ল্যাম্পটা তাঁবার এবং উহার আকার-গঠন প্রাচীন-ধরণের—উহা হইতে অনেকগুলা ডাল বাহির হইয়াছে; মনে হয় যেন একটা তারা জ্বলিতেছে।

বড় বড় বৃক্ষের পাদদেশে এই অতিক্ষুদ্র নগণ্য কুটীরটি ধাপে-ধাপে উত্থিত মন্দিরের মত ছয়টা প্রস্তর-স্তরের উপর স্থাপিত। এই-সব ধাপের উপর আমার দুই পথপ্রদর্শক আমার নীচে বসিল। এখন আর-কিছু দেখা যাইতেছে না। আলি-পথের উপর পথচলতি লোক খুব বিরল হইয়া পড়িয়াছে—কেবল কতকগুলা অস্পষ্ট আকৃতি দেখা যাইতেছে—কালো কিংবা সাদা। আকাশে এখনো গোলাপী ও লোহিত রং রহিয়াছে; উপরে সমস্ত তারা জ্বলিতেছে। এবং এই আলোর উপর একসারি কালো পালকের আকারে তালীবনের সীমাপ্রান্তটা যেন কর্ত্তিত হইয়াছে। ধান-ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বত্রই ঝিল্লীর রব শুনা যাইতেছে। বেশ একটু ঠাণ্ডা হইয়াছে। পতঙ্গ ও মশা আসিয়া ঝোলান ল্যাম্পের চারিদিকে গুঞ্জন করিতেছে। লম্বা হাতল-বিশিষ্ট একটা চামচ দিয়া, সময়ে সময়ে ল্যাম্পে একটু একটু করিয়া নারিকেল তৈল ঢালা হইতেছে। ওখান দিয়া প্রায় কেহই যাতায়াত করিতেছে না। জায়গাটা খুবই নির্জ্জন হইয়া পড়িল। কিন্তু কতকগুলি ছেলে আমাকে দেখিতে আসিল; ইহারা কোথা হইতে বাহির হইল জানি না—নিশ্চয়ই আমাদের পিছনকার তালীবন হইতে। উহারা আমার দিকে চোখ তুলিয়া ধাপের উপর আমার পায়ের কাছে বসিল। প্রতি মুহূর্ত্তে আরও ছেলে দলে দলে আসিতে লাগিল—নিঃশব্দে নগ্নপদে। খুব হাল্‌কা-ভাবে ছুটিয়া আসিল। সাদা পরিচ্ছদ উহাদের শ্যামল অঙ্গের উপর, বাতাসে উড়িতেছে। বড় বড় নৈশ পতঙ্গের মতো, বড় বড় ফড়িংএর মতো উহারা আসিয়া বসিয়া পড়িল। এখন প্রায় ২০ জন—আমার নীচে সারি সারি বসিয়া। তালতরুর দীর্ঘ কালো কালো পাখা নৈশ আকাশকে কাটিয়া বিভক্ত করিয়াছে এবং লাল আভাটুকু মরিয়া মরিয়া শেষে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। তৃণভূমির উপর যেরূপ সাদা ধোঁয়া ভাসিয়া বেড়ায়—সেইরূপ একটা ঠাণ্ডা বাষ্প ধানের ক্ষেত হইতে উঠিয়া সমস্ত বীথি-পথে প্রসারিত হইল।

সেই ছোট ছেলেগুলি, আপনাদের মধ্যে, ভারতীয় ভাষায় খুব আস্তে ফিস্‌ফিস্ করিয়া কথা কহিতে লাগিল—নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়া তাহাদের যে ধারণা হইয়াছে তাহাই বলাবলি করিতেছিল। তাহার পর আমি, বেশ বুঝিতে পারিলাম, আমাকে চমক্ লাগাইবার জন্য কি একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে, পরে পুরস্কারস্বরূপ কিছু পয়সা চাহিবে।—না জানি বিষয়টা কি? ..

হঠাৎ উহাদের মধ্যে একজন—দশবৎসর মাত্র বয়স—উঠিয়া দাঁড়াইল, উপরে উঠিল, একটু কাশিল, যেন কি-একটা কবিতা আবৃত্তি করিবে; তাহার পর, টিয়াপাখীর মতো মোটা কর্কশ হাস্য-জনক স্বরে সুরু করিল:—

প্রবল যুক্তিই জেনো যুক্তির প্রধান
এখনি আমরা তাহা করিব প্রমাণ…

ওঃ! সত্যই উহারা আমাকে চমক্ লাগাইয়া দিয়াছে। এটা এরূপ অপ্রত্যাশিত ও মজার যে, আমি যদি একলা না থাকিতাম, তাহা হইলে পাগলের মতো হাসিয়া কুটিকুটি হইতাম, কিন্তু আমি এখন একলা—মনে-মনেই হাসিলাম।

এই আবৃত্তিটা আমার উপর কি কাজ করিয়াছে, তাহাই দেখিবার জন্য উহারা আমাকে খুব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কবিতার বাকী অংশ উহারা জানে না; তাই Black birdএর মতো একটা গানের গোড়াটা শিশ্‌ দিয়াই হঠাৎ যেন থামিয়া পড়িল; উহাদের স্কুলে উহারা ঐ পর্য্যন্তই শিখিয়াছে…আমার বাচ্চা গাইড্‌ দুইজন আমাকে বলিল, দুই চারি আনা পয়সা উহাদিগকে বক্‌শিস্‌ দিলে ভাল হয়।

এই ছেলেগুলো আমাদের ভাষার কথা কহিতেছে, আমাদের দেশের লোক মনে করা একটা সম্মানের বিষয় মনে করিতেছে—এটা ভারি অদ্ভুত।

আমি এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন এই কালো জায়গাটায় একটু বিষণ্ণতা আসিতে সুরু করিয়াছে, তা ছাড়া এইসব পাথরের উপর বসিয়া, সাদা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, আমার একটু শীত বোধ হইতেছে। এইসব ক্ষুদে "ফরাসীদের" নিকট হইতে বিদায় লইলাম। উহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল কিন্তু আমি আমার সেই ক্ষুদে পাণ্ডা দুইজনকেই সঙ্গে রাখিলাম। উহাদিগকে একটা-কিছু কাজে লাগাইবার জন্য, আমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাছাকাছি কোথাও কোন মন্দির দেখিবার আছে কিনা; আমি ত কোথাও একটি মন্দির দেখিতে পাই নাই।

একটা মন্দির খুবই নিকটে আছে। যদিও রাত্রি, সেইখানে উহারা আমাকে এখনি লইয়া যাইবে। এটা উহাদের নিজ ধর্ম্মের মন্দির, "Tiss" মন্দির (কেননা এই বালক দুইটি না খৃষ্টান, না-মুসলমান)। ইহারা Tiss। Tiss জিনিষটা কি, তাহা না জানার ভাবটা আমার মুখে প্রকাশ পাওয়ায় উহারা খুব আশ্চর্য্য হইল এবং এই শব্দটি আবার পুনরাবৃত্তি করিল।

আমাদের মাথার উপর ঝুঁকিয়া একটা কালো উচ্চ দেয়ালের মতো কাঠের তক্তা ঝুলিতেছিল, প্রথমে আমরা তাহারই কিনারা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এক-প্রকার ঢিবির গড়ানে অংশের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। অন্ধকারের মধ্যে আমাদের পা পিছ্‌লাইয়া মধ্যে মধ্যে ধানক্ষেত্রের জোলো কাদার মধ্যে বসিয়া যাইতেছিল। তাহার পর একটা সরু পথের মতো একটা-কিছুর ভিতর দিয়া, একটা নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম; আমরা তালতরুমণ্ডপের নীচে আসিয়া পড়িলাম—ঘোর রাত্রির মাঝে—নিছক রাত্রির মাঝে আসিয়া পড়িলাম। ঠিক যেরূপ শান্ত স্তিমানবু

দুইটা ছোট কুকুর কোন অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আমার বাচ্চা পাণ্ডাদ্বয়ের প্রত্যেকেই আমার এক-একটা হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। চোক বাঁধা থাকিলে কোনো ব্যক্তি যেরূপ-ভাবে চলে, আমি সেইরূপ—ইতস্ততোভাবে পদক্ষেপ করিতে লাগিলাম। উহারা খুব সাবধানে, দক্ষতাসহকারে পথের ঠিক মাঝখানে আমাকে রাখিয়া দিতেছিল। উহাদের নিজের পা কিনারায় বড় বড় গাছপালায় জড়াইয়া যাইতেছিল, অথবা গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছিল। এই নিবিড় পত্রপল্লবের মধ্যে, যেন একটা কি আমাদের সম্মুখ দিয়া পলাইয়া গেল। গিরগিটি কিংবা পাখী কিংবা ঘুমাইতেছিল এমন কোন পশু। আমাদের ভয় হইল। কখন কখন আমার মনে হইতেছে, ক্ষুদে পাণ্ডাদ্বয় একটা খুব সরু তক্তার উপর দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছে, অথচ উহাদের পা জলের মধ্যে ঝপ্ ঝপ্ করিয়া পড়িতেছে। পথের উপর দিয়া একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইতেছে—তাহার উপর একটা ছোট সাঁকো। এরূপ ঘনঘোর অন্ধকার যে, আমার চোখ বজিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। ডালপালা তৃণের ফ্যাকড়া, আমার মুখের উপর যেন চাবুক মারিতেছে। আর সেই চিরন্তন মৃগনাভিসিক্ত তপ্ত গন্ধ,—যাহা মাটি হইতে উত্থিত হয় এবং বনজঙ্গলে প্রবেশ করিবামাত্র যাহার দরুন্ একটু কষ্ট পাইতে হয়।

উহারা বলিল, আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তখন আমি চাহিয়া দেখিলাম, এবং পত্রপল্লবের ভিতর দিয়া দেখিতে পাইলাম, অনেকটা আলো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, এমনভাবে কম্পিত হইতেছে যেন এখনি নির্ব্বাপিত হইবে।—এইসব আলোকরশ্মি এমন মিট্‌মিটে ধরণের, এরূপ ক্ষুদ্র যে, মনে হয় যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র অনলশিখা কীটগাত্র হইতে নিঃসৃত হইতেছে। তা ছাড়া এই আলোগুলা বেশ সমানভাবে স্থাপিত; দেখিলে মনে হয় যেন একটা বড় দাবা-খেলার ছক্,—যাহার প্রত্যেক কোণ জোনাকির আলোকে আলোকিত।

উহারা বলিল—এই সেই মন্দির, ইহার সম্মুখ ভাগটা এইরূপ অদ্ভুতধরণে আলোকিত হইয়াছে।

বনের ভিতরকার একটা পরিষ্কার ফাঁকা জায়গায় আমরা প্রবেশ করিলাম। উপর হইতে তারার আলো নিপতিত হইতেছে। বনের ঘনঘোর অন্ধকার ও শ্বাসরোধী নিবিড়তার পর, মনে হইল, এই স্থানটা একটু যেন আরাম ভোগ করিতেছে। আমাদের সম্মুখেই মন্দিরটি রহস্যময় দীপালোকে আলোকিত, এই আলোক অননুভবনীয় নৈশ বায়ুর প্রত্যেক নিঃশ্বাসে কম্পিত হইতেছে এবং অবিরত নির্ব্বাপিত হইতেছে। এই মন্দিরটি অতি সামান্যরকমের, খুব নীচু, কীটদষ্ট পুরাতন কাঠের একটা কুটীর মাত্র। তক্তার দেওয়ালের ভিতর একপ্রকার লোহার চামচ, হাতলের দ্বারা, ঢুকাইয়া দেওয়া হয়—সমান-সমান অন্তরে,—ছাদ পর্য্যন্ত। প্রত্যেক চামচে তেল ভরিয়া দেওয়া হয়, এক-একটা মোমের পলতে এই তেলে ডোবানো থাকে—তৃণ-বৃন্তের মতো সরু। শেষে এই পলতেটা পুড়িয়া যায়।......

চারিদিকে জনমানব নাই, ভিতরেও কোন লোক নাই, কেননা দ্বার অর্গল-বদ্ধ। তবে কে আসিয়া, এমন ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র আলোক-গুলি জ্বালাইয়া দেয়?—এইসব আলোকের পরমায়ু ত মনে হয়, কয়েক মিনিট মাত্র। কোন্ গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য, এইসব ক্ষণিক আয়োজন? আমার বাচ্চা-পাণ্ডারা এসম্বন্ধে বেশী কিছু খবর দিতে পারিল না। উহারা শুধু বলিল:—"সন্ধ্যার সময় প্রায়ই এইরকম করা হ'য়ে থাকে. যখন কিছু চাহিবার আবশ্যক হয়...

টুপ্ টুপ্ করিয়া দীপগুলা নিবিয়া যাইতেছে; আবার এখনি কালো রাত্রি আসিয়া পড়িবে।

তাহার আগেই আমার বাচ্চারা আমাকে মন্দিরের ভিতরটা দেখাইতে ইচ্ছা করিল, মন্দিরের পুতুলগুলা দেখাইবে বলিল। তখনি উহারা পুরাতন দরজাটা ঠেলিতে লাগিল—দরজায় লোহা-লক্কড়ে উহাদের আঙ্গুল ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। দরজাটা প্রতিরোধ করিল—কাজেই ছাড়িয়া দিতে হইবে। দেওয়ালের মুমূর্ষু আলোগুলা ক্রমাগতই নিবিয়া যাইতেছে। এখন কি করা যায়? ভাল ভাল পুতুল দেখান আর হইবে না।

উহারা বলিল—উহাদের বদলে, অন্ততঃ একটা পুরাতন পুতুল আমাকে দেখাইবে। এই পুতুলটা মন্দিরের পিছনে আবর্জ্জনার মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; এটাও উহারা আর খুঁজিয়া পাইল না...আ! এই যে,...আমি পুতুলটা দেখিতে পাইয়াছি, অন্তত এইরূপ পুতুল বলিয়াই অনুমান করিতেছি; একটা ভীষণ দৈত্যের আকৃতি—ঐখানে মাটিতে উবু হইয়া বসিয়াছে—দেয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়া।—একটা শেষাবশিষ্ট ছোট পলিতা এখনো জ্বলিতেছিল, ঐ পলিতা লইয়া (হাত পুড়িবার আশঙ্কা সত্ত্বেও) উহারা পুতুলটার থুতির নীচে ধরিল; ঐ আলোকে, আমি রূঢ়ধরণে গঠিত একটা ভীষণ মুখ দেখিতে পাইলাম;—সারিসারি দুইপাটি দাঁত;—একটা কপাল এবং ঘুন্‌ধরা দুইটা চোখ। উহার পাশে, খোদাই কাজের আর কতকগুলা মূর্ত্তির টুক্‌রা ঘাসের উপর পড়িয়া আছে—ভাবে বোধ হয় কতকগুলা রাক্ষস-মূর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ—কতকগুলা জজ্বা, কতকগুলা চিবুক।

আর-একটা জিনিস দেখাবার আছে, শীঘ্র, শীঘ্র। বেশ দেখা গেল, উহারা এই জায়গায় অন্ধি-সন্ধি সব জানে। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ পাণ্ডাটি খুব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—আঙ্গুলগুলা তেলে ভরিয়া গিয়াছে। উহারা চামচগুলার মধ্য হইতে, কতকগুলা পলিতার আগা বাছিয়া লইল যাহা এখনো জ্বালাইতে পারা যাইবে। এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইল—তাহার পর উপরে উঠিয়া ছাদের বর্গার নীচেটা হাত ড়াইতে লাগিল...অবশেষে যাহাকে খুঁজিতেছিল, তাহার উপর হস্ত স্থাপন করিল।—একটা কাঠের ক্ষুদ্র রাক্ষস,—রূঢ়-ধরণের, ক্ষয়গ্রস্ত, মানুষের শরীরের উপর অস্পষ্টরকমের একটা হাতীর মাথা। উহারা দুই জনেই উহার মুখের সামনে হাসিতে লাগিল; তাহার পর, তাড়াতাড়ি আবার উহার গর্ত্তের মধ্যে উহাকে ঢুকাইয়া দিল। ঐখানে করে কি, এই দেবতাটা? পাখীদের নীড়ের সঙ্গে, ছাদের নীচে কেন বাস করিতেছে?...

উহারা আরও কতকগুলা ছোট পলিতা খুঁজিয়া পাইয়াছে। আমাদের যাত্রা-পথে, একটার পর একটা জ্বালাইতে লাগিল; উহাদের আলোকে আমরা বনভূমি পার হইয়া সেই বড় রাস্তায় গিয়া পড়িব—যেখান হইতে আমরা যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম।

এই অদ্ভুত পলিতাগুলা মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে; এই আলোয় আমরা মধ্যে মধ্যে পাতার মতো একটা-কিছু দেখিতে পাইতেছি। একটা তাল-গাছের তলা দেখিতে পাইতেছি কিংবা অন্ধকারে সবুজের ভিতর হইতে হঠাৎ-বিচ্ছিন্ন আর্কিডের কোন ফুল দেখিতে পাইতেছি।

তাহার পর, শেষাবশিষ্ট সলিতাটা পুড়িয়া গেলে, উহা ঘাসের উপর উহারা ছুড়িয়া ফেলিল। আবার আমাদের সেই পূর্ব্বাবস্থা—ছয়টা চোখ একত্র করিয়াও এখন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমার পাণ্ডারা "ভ্যাবাচাকা খাইয়া" আমাকে একটা দুষ্প্রবেশ জঙ্গলের মধ্যে লইয়া গেল। এমন একটা জায়গায়—যেখানে আমার পা রহিয়াছে জলের ভিতর, আর আমার শরীর জড়াইয়া গিয়াছে ডালপালার মধ্যে।

যা হোক কোনপ্রকারে কষ্টেসৃষ্টে সেখান হইতে বাহির হইয়া সভ্য-অঞ্চলের সুন্দর সোজা গলি-পথের মধ্যে আবার আসিয়া পড়িলাম।

এইসকল বীথি-পথে বড় বড় অনল-শিখা এক-প্রকার দোলন-গতি সহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে,—দেখা যায়। এই দোলন-গতি উহাদিগকে অবিরত উস্‌কাইয়া দেয়। পথচলতি লোকেরা, ভারতের প্রাচীন রীতি অনুসারে, এইসকল আলো জ্বালাইয়া থাকে, প্রজ্বলিত ডালপালার গুচ্ছ হাতে লইয়া চলিতে চলিতে, লম্বাভাবে দোলাইতে থাকে; ঐ দোলনে নিবো-নিবো আগুন আবার জ্বলিয়া উঠে। এই আগুনের দীপ্তিচ্ছটা সব দিকেই ছড়াইয়া পড়ে; এবং উহাদের পশ্চাতে একটা সুগন্ধি ধূম রাখিয়া যায়।

নদীর উপর আমার নৈশ ভ্রমণের জন্য প্রতিদিন সায়াহ্নে আমার ডিঙ্গি নদীর মুখে আসিয়া থাকে। আসিতে এখনো অন্ততঃ ঘণ্টা-খানেক বিলম্ব আছে।

আমার আর-কিছুই করিবার নাই। আমার বাচ্চা পাণ্ডাদিগের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিয়াছি—উহাদিগকে আর আমার দর্‌কার নাই। কিন্তু উহারা শেষ পর্য্যন্ত আমার নিকটে থাকিতে চাহিতেছে—নিঃস্বার্থভাবে, কেবল ভালবাসার টানে।

একটা বৃহৎ চতুষ্কভূমি আবিষ্কার করা গিয়াছে; তাহার মাঝখানে একটা গির্জ্জা। এইখানকার একটা গাছের তলায় একটা পাথরের বেঞ্চি আছে। একটা অসাধারণ ব্যাপার এই যে,—এই গাছটা তালগাছ নহে, কিন্তু রাত্রিকালে এই গাছটা আমাদের ফ্রান্সের সুন্দর ওক-গাছের মতো দেখিতে। এইখানে ডিঙ্গীর অপেক্ষায় আমি বসিয়া রহিলাম। আমার পাশে আমার বাচ্চা সঙ্গীরা।

আরো অন্যান্য গাছ কালো পর্দ্দার মতো এই চাতালের চারিদিক্ ঘিরিয়া আছে। ছোটখাটো জিনিষ কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই জায়গাটার কোন একটা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। নক্ষত্র-খচিত নভোমণ্ডলের নীচে, গির্জ্জাটা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—কেমন ধব্‌ধবে সাদা, কেমন প্রশান্ত! আমার শৈশবে কোন-একটা গ্রামে যখন গ্রীষ্মকাল যাপন করিতাম, উহা সেই গ্রামটিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এই দুটি বাচ্চা যাহারা আমার কাছে রহিয়াছে ইহারা আমাদের ভাষায় আমার নিকট গল্প বলিতেছে। আমাদের চাষার ছেলেরা উহাদের মতো এমন ভাল করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। তৃণপুঞ্জ হইতে বেশ একটা সুগন্ধ বাহির হইয়াছে, ঝিল্লীরব শুনা যাইতেছে; আমাদের জুন্-রাত্রির দীপ্তমহিমার মধ্যে যেরূপ দেখা যায় সেইরূপ...আহা! সেই সুন্দর তারাময়ী রাত্রি, সেই প্রশান্ত রাত্রি, সেই মধুর আলোকোজ্জ্বল রাত্রি, সেই অতি চমৎকার রাত্রি!...আর এই পাথরের বেঞ্চি, যাহার উপর এই সুমধুর শান্তির মধ্যে আমি বিশ্রাম করিতেছি, ইহা একটা দূরদেশে অবস্থিত—যে-দেশে ঘটনাচক্রে আমি একদিনের জন্য আসিয়াছি, এবং যে দেশে আমি আর কখনো ফিরিয়া আসিব না, তথাপি এ-বড় অদ্ভুত, ইহার মতো আর একটা বেঞ্চিতে, বহুদিন পূর্ব্বে, সুন্দর তারকাময়ী রজনীতে আমি বসিয়াছিলাম।

অন্ধকারের মধ্যে এই বিশ্রাম, এই কবোষ্ণ বায়ু, এই ঘাসের সুগন্ধ, এইসমস্ত স্পষ্টরূপে আমাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, আমার জীবনের সেইসব প্রথম গ্রীষ্মরজনী, বনভূমির নিকটস্থ সেইসব মাঠ ময়দান!...আমাদের সম্মুখের রাস্তা দিয়া লোকেরা ঘাস ঘেঁসিয়া চলিয়াছে। আমরা উহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না; উহা-দের পরিচ্ছদও নির্ণয় করিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত উহাদের "শুভরাত্রি" অভিবাদন শুনিতে পাইতেছি। গরুর গাড়ীও চলিয়াছে। গাড়োয়ানরা পদব্রজে চলিয়া গরুদিগকে হাঁকাই-তেছে। এই উদ্ভট-ধরণের শকট, এই লম্বামুখো বিদেশী পশুবৃন্দ; বড় বড় চোখ, কাণে কাণ-বালা এইসব শ্যামাঙ্গ ভারতবাসী—এইসমস্ত ছাড়া আর-কিছুই দেখা যায় না। আমাদের দেশে মাঠময়দান হইতে যে সব শকট ফিরিয়া আসে, উহাদের সহিত এই শকটের সাদৃশ্য আছে।

আরও এইরূপ বলা যাইতে পারে, আঙ্গুরের ফসল ও শস্যের ফসল কাটিয়া আমাদের দেশে যে-সব শকট ফিরিয়া আসে ইহা কতকটা সেই ধরণের...এই বিদেশী গাছ-তলায় বসিয়া—(ইহাই যেন আমার জন্মভূমির সেই ওক-গাছ) আমি একটু একটু করিয়া ক্রমশঃ স্বদে-দেশের স্বপ্ন-কল্পনার মধ্যে ডুবিয়া পড়িতেছি;—আমার মাথার উপরে কালো ডালপালার ভিতর দিয়া, কতকগুলা ছোট ছোট জিনিষ ঝিক্-মিক্ করিতেছে—উহা কতকগুলা তারা। কত পুরাতন কথা আমার স্মৃতির মধ্যে জমা হইয়াছে,—বহু দূর হইতে আমার প্রথম শৈশবের সেইসব গ্রীষ্মকালের স্মৃতি আমার নিকট সনির্ব্বন্ধভাবে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে।

এই সময়ে, ইহা খুবই নিশ্চিত,—আমাদের দেশের গ্রীষ্মকালগুলা ম্লানাভ ছিল না, ক্ষণস্থায়ী ছিল না। উহা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইত, উহাদের একটা প্রশান্ত দীপ্তি ছিল,—যাহা এক্ষণে উহারা হারাইয়াছে। আমার বেশ মনে পড়ে, জুনের গোধূলিগুলার একটা কবোষ্ণ মদালসভাব ছিল—এবং রাত্রির একটা স্বচ্ছতা ছিল!...অন্ধকারের মধ্যে যেন একপ্রকার রহস্যময় কিরণচ্ছটা ছড়াইয়া পড়িত—আজি-কার এই রাত্রির মতো!...আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম এইসব কথা; কিন্তু আবার আমার চারিদিকে ঐসমস্ত দেখিতে পাইতেছি।—চিনিতে পারিতেছি...কেবল, আমার জন্মভূমির জোনাকী পোকারা ঘাসপালার মধ্যে চুপ করিয়া থাকিত; কিন্তু এখানে উহারা উন্মত্তভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে; উহাদের (Phosphorus) ভাস্বর-বাষ্পের ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গগুলিতে আকাশ ভরপুর; এই পার্থক্য-টাই যাহা ধরিতে পারা যায়—অবশিষ্ট আর সমস্তই একই-রকমের; কিন্তু সেকালের এইসব সুন্দর গ্রীষ্মকাল কে নিভাইয়া দিতে সমর্থ হইল? এবং বর্ষাকালের সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ব্বে যাহা আমাকে মুগ্ধ করিত, সেইসব জিনিষের মোহনীয়তা আমি কি করিয়া ভুলিয়া গেলাম? আমার মাথার ভিতর যাহা সমস্তই প্রায় মুছিয়া গিয়াছে, তাহার রেখা অতিকষ্টে সময়ে সময়ে আবার ফুটিয়া উঠে...আজিকার ম্লানাভ, স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মরাত্রি—আর পূর্ব্বে যে গ্রীষ্মরাত্রি আমাকে মাতাইয়া তুলিত এই উভয়ের মধ্যে কতটা প্রভেদ...

অতি দূরে, ঢাক-বাদ্যের মত কি যেন একটা শব্দ শুনিতে পাইতেছি; তাহার একটু পরেই, কর্কশ কণ্ঠের গান, এক-প্রকার দ্রুতধরণের "কোরস্" সঙ্গীত। পরিশেষে, হঠাৎ তরুরাজির কালো পর্দ্দার ভিতর একটা বড় রাস্তা উদ্ঘাটিত হইল, উহার পশ্চাদ্‌ভাগটা জ্বলন্ত মশালের আলোয় আলোকিত; মশালগুলা মানব-বাহুর দ্বারা আন্দোলিত হইতেছে।

গান ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইল। এক-দল লোক আসিয়া পৌঁছিল। এক্ষণে, বীথির সমস্ত খিলান-মণ্ডপটা দেখা যাইতেছে—একটা তাল গাছের খিলান-মণ্ডপ। এইসব লোক চলিতে চলিতে যাহা দাঁড়াইতেছে সেইসব অগ্নিশিখার দ্বারা তরুমণ্ডপের তলদেশটা আলোকিত। আমার সেই বাচ্চারা বলিল, "মোসিএ, এটা একটা বিবাহ উৎসব—আমাদের ধর্ম্মের একটা বিবাহ-উৎসব, "মোসিএ, Tissএর বিবাহ-উৎসব, ওখানে গিয়ে আমরা দেখ্‌তে পারি?"

ওখানে যেতে হবে? না, আমার দেখিবার তেমন ঔৎসুক্য নাই। এই বিবাহ-উৎসবটা আমার সমস্ত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমি এখন স্বপ্ন দেখিতে চাহি।

এই যে, উহারা খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে; আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে। মিশরীয় শোভাযাত্রার মতো কতকগুলা ডাণ্ডার আগায় একপ্রকার হাত-পাখা। বড় বড় আতপত্র বিভব-আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ভরা-রাত্রিকালেও বর-কন্যার মাথার উপর খুলিয়া ধরা হইয়াছে। মশালের পরিবর্ত্তনশীল আলোকে, জ্বলন্ত ডালপালার অনলশিখায় লোকদিগকে দেখা যাইতেছে, উহাদের পরিচ্ছদ দেখা যাইতেছে। সুন্দর গ্রীবাদেশ প্রায় অনাবৃত রাখিয়া, শ্যামল কাঁধের উপরে যদৃচ্ছা-ক্রমে একটা সাদা মস্‌লিনের চাদর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; ধনুকের মতো বাঁকা বক্ষদেশ, শীর্ণ কটি-দেশের উপর বিন্যস্ত রহিয়াছে; আঁটসাঁট ধূতি উরোতের উপরে লাগিয়া আছে। ভারতের রুচি অনুসারে পোষাক-পরিচ্ছদ দৃষ্টি-আকর্ষক বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। বর-কনে হাত ধরাধরি করিয়া কিংবা কটিবন্ধে কটিবন্ধে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে; দেখিলে মনে হয় যেন প্রেমের জ্বলন্ত বাসনা-মদে প্রমত্ত, চীৎকার কোলাহল ও বাজনা-বাদ্যে প্রমত্ত। উহারা উন্মত্তভাবে গান গাহিতেছে, মাথা পিছন দিকে ঝুঁকিয়া আছে; বড় বড় মুখের 'হাঁ' উন্মুক্ত। নিকট হইতে শুনিলে, উহাদের গানের তীব্র স্বরলহরীতে কান যেন ফাটিয়া যায়…

না, বিবাহ-উৎসব দেখিবার জন্য উহাদের পিছনে পিছনে যাইতে আমার ইচ্ছা নাই। উহাদিগকে একেবারেই যদি না দেখিতাম ত ভাল হইত। কারণ আমার স্বপ্নের যে "মোহিনী" ছিল তাহা খুবই বিরল এবং বড়ই মধুর। আমি সত্যসত্যই যেন আপনাকে ক্ষুদ্র শিশু বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম, সেই সুমধুর, অনির্ব্বচনীয় প্রথম-গ্রীষ্মরজনীর ধারণাগুলি আবার ধরিতে পারিয়াছিলাম। এখন আমি আবার যাহা হইয়াছি—এবং পূর্ব্বে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে,—এই উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান।

এখন এই বেঞ্চির উপর বসিয়া থাকিয়াই সেইসব বিলুপ্ত-স্মৃতি আবার ধরিতে ইচ্ছা করিতেছি…

অসম্ভব! উহাদের শরীরের মৃগনাভিমিশ্রিত গন্ধ আকাশকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে; উহাদের শব্দ কোলাহল, সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে।

আমার দেশের ও শৈশবের ক্ষুদ্র স্বপ্নটি অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার মাথার ভিতর তবে আর কি অবশিষ্ট রহিল? আমার জীবন-প্রভাতের যাহা-কিছু নবীন, যাহা-কিছু মধুর সমস্তই চিরকালের মতো শেষ হইল।—এখানে ইহা ত ভারতভূমি; এখন আমি আছি ভারতের মধ্যে, শ্যামল-বক্ষোবিশিষ্ট ভারতের মধ্যে, কালো সুন্দর মখমল্-নেত্র ভারতের মধ্যে—উত্তপ্ত, উদ্দাম-উদ্ভিজ্জ-শালী, দীপ্তি-মহিমান্বিত ভারতের মধ্যে! …বেশ! তবে আমি উহাদিগকেই অনুসরণ করিব, আচ্ছা বিবাহ-উৎসবটা দেখিতে যাইব …

(সমাপ্ত)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌদ্ধ যুগের সাজা

সে-কালে নানারকম শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। যেমন—দোষীকে হাঁটু পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ান হ'ত, হাতীর পায়ের তলায় ফেলে দেওয়া হ'ত, সাপের মুখে ছেড়ে দেওয়া হ'ত, পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে' দেওয়া ও বুকে পাথর বা গলায় কলসী বেঁধে জলে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ত।

আড়াই হাজার বছর আগে যখন বুদ্ধদেব তাঁর অহিংসা ধর্ম্ম প্রচার করতেন, তখন আবার যে-রকম শাস্তি প্রচলিত ছিল তা অতি অদ্ভুত ও নির্দ্দয়তার পরিচায়ক। তার বিবরণ আমরা বৌদ্ধ-গ্রন্থে (যেমন মঝ্‌ঝিম নিকায়ে ১৩ সুত্তে ও অঙ্গুত্তরনিকায়ে ত্রিকনিপাতে) পাই।

ভগবান্ বুদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম্মোপদেশ দিতে দিতে বলেছেন—"দেখ ভিক্ষুগণ, এই যে লোকে সিঁদ কাটে, গ্রাম লুঠ করে, দল বেঁধে ডাকাতি করে, রাহাজানি করে, সামাজিক নানাপ্রকার উপদ্রব করে—এর মানে কি জান? এর মানে হচ্ছে, সেইসব লোক একটা বদ্-ইচ্ছা পূর্ণ করে' নিজেদের খুসি করে। কিন্তু এতে হয় কি? রাজা যখন তাদের উপদ্রব টের পেয়ে তাদের ধরে' নিয়ে যান, তখন বিচারে তাদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা করেন। কাউকে চাবুক বা বেত, কিম্বা ছোট ডাণ্ডা ("অদ্ধদণ্ড কেহি",—আধুনিক পুলিশের রুল) দিয়ে তাড়না করেন, কারো বা হাত অথবা পা এবং হাত পা দুই-ই ছেদন করে' দেন, কারো কারো বা কান নাক অথবা কান নাক দুই-ই কেটে ছেড়ে দেন। রাজা আর কি করেন? "বিলঙ্গথালিকং" করেন, "সঙ্খমুণ্ডিকং" করেন, "রাহুমুখং" করেন, "জ্যোতিমালিকং" করেন, "হত্থপজ্জোতিকং" করেন, "এরকবত্তিকং" করেন, "চীরকবাসিকং" করেন, "এণেয়্যকং" করেন, "বলিসমংসিকং" করেন, "কহাপণং" করেন, "খারাপতচ্ছিকং" করেন, "পলিঘপরিবত্তিকং" করেন, "পলালপীঠকং" করেন; আবার কাউকে বা গরম তেলে ভাজেন, কাউকে কুকুর দিয়ে খাওয়ান, কাউকে শূলে দেন, কারো বা মাথা কেটে দেন। এইসব দণ্ডে কেউবা মরে, কেউ বা মরণ-দুঃখ পায়। এই হরেক রকম শাস্তির হরেক রকম দুঃখ লাভ করে। এই দুঃখ পাওয়ারও কারণ ঐ নিজেদের খুসি হওয়ার চেষ্টা করা।"

বলা বাহুল্য যে "বিলঙ্গথালিক" হ'তে "পলালপীঠক" পর্য্যন্ত সবগুলি একটি একটি সাজার নাম। সেগুলি কিরকম করে' দেওয়া হ'ত তার একটা বিবরণ

বুদ্ধঘোষ দিয়েছেন। তার মোটামুটি ভাব ব্যাখ্যা করা গেল।

পূর্ব্বের "অদ্ধদণ্ডক" মানে চার হাত মাপের বেশ শক্ত একটা "দণ্ড" নিয়ে তাকে মাঝখান থেকে ভেঙে ফেলে' তার দুই দুই হাত ক'রে নিয়ে অপরাধীর পিঠে (জয়ঢাকের মত) পিটান।"

"বিলঙ্গথালিক"—বিলঙ্গ হালুয়ার মত একরকম খাবার। থালিক মানে থালা। এই বিলঙ্গ তৈরী করতে হ'লে থালার যেমন অবস্থা হয় অপরাধীর মাথার খুলি-টাকেও তেম্‌নি অবস্থায় পরিণত করা হচ্ছে এই দণ্ডের কাজ। অপরাধীর মাথার খুলি কপালের কাছ থেকে চটিয়ে তুলে' ফেলে', একটা জ্বলন্ত লোহার গোলা সাঁড়াশী ('সণ্ডাসেন') দিয়ে ধরে' মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে। তখন ঐ গরমের চোটে মাথার ঘিলু গলে' গলে' পড়্‌তে থাক্‌বে।

"সঙ্খমুণ্ডিক"—ঠোঁটের পাশ থেকে কানের নীচে দিয়ে চারি-ধারে সমান করে' চামড়া কেটে ফেলে' সমস্ত চুল এক জায়গায় করে' গেরো দিয়ে তার মধ্যে একটা লাঠি চালিয়ে দিয়ে উপর দিকে টান্‌তে টান্‌তে চামড়া-সুদ্ধ চুল উপ্‌ড়ে ফেলে, তার পর চামড়হীন মাথাটাকে মোটা মোটা কাঁকর দিয়ে ঘসে মেজে ধুয়ে ('ততো সীসকটাহং থূল সক্ধরাহি ঘংসিত্বা ধোবন্তা') একবারে শাঁখের মত সাফ্‌ করে' দিতে হবে। (সম্ভবতঃ বড় বড় চুলওয়ালা লোকদের জন্য এই শাস্তি বিহিত ছিল।)

"রাহুমুখ"—অপরাধীর মুখ হাঁ করিয়ে যাতে মুখ বুজ্‌তে না পারে এজন্য একটা লোহার ঠেকো দিয়ে পরে একটা প্রদীপ জ্বেলে মুখের মধ্যে রাখা হ'ত। (রাহু যখন চন্দ্র-সূর্য্যকে গ্রাস করে তখন তার মুখের মধ্যে আলো হয় বলে' এই দণ্ডের নাম রাহুমুখ)। মতান্তরে—ঠোঁটের দুই পাশ থেকে চিরে' কান পর্য্যন্ত মুখের হাঁ বাড়িয়ে দেওয়ার নাম "রাহুমুখ", কেননা রাহুর হাঁ ছোট হ'লে চল্‌বে কেন ?

"জ্যোতিমালিক"—জ্যোতির মালা পরান। সমস্ত শরীরে তৈলে-ভেজা ন্যাক্‌ড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া।

"হত্থজ্জোতিক"—কেবলমাত্র হাতে তেলে-ভেজা নেকড়া জড়িয়ে প্রদীপের মত ("দীপং বিয়") করে' জ্বালা। অপরাধের এটা লঘু দণ্ড, অনেক সময় প্রাণটা বেঁচে যায়।

"এরকবত্তিকং"—গলার কাছ থেকে চাম্‌ড়া ছাড়িয়ে পায়ের গোড়ালির কাছে ফেল্‌তে হবে। তার পর দড়ি দিয়ে অপরাধীকে বেঁধে "রথটানা" গোছ করতে হবে, আর অপরাধী নিজের চাম্‌ড়া নিজের পায় জড়িয়ে হোঁচট্‌ খেতে থাক্‌বে ("সো অত্তনোব বক্কবট্টে অক্কসিত্বা অক্কসিত্বা পততি")।

"চীরকবাসিক"—উপর দিক্‌ থেকে চামড়া কোমর পর্য্যন্ত আর কোমর থেকে চামড়া গোড়ালী পর্য্যন্ত ঠিক দু'খানা কাপড়ের মত করে' ছাড়ানো।

"এণেয়ক'—বাহুর মাঝে আর হাঁটুতে লোহার সিক বিঁধে মাটিতে শূল পুঁতে তাতে অপরাধীকে ফেলে চারিধারে আগুন জেলে দেওয়া হ'ত। (এণেয্য মানে কিন্তু মেড়া, আমাদের দেশে ফাল্গুন মাসে 'ম্যাড়া পোড়া' বলে' একটা আগ্নেয়-উৎসব করা হয়; তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে কিনা বিবেচ্য।)

"বলিসমংসিক"—দুইমুখো বঁড়শী গায়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে চামড়া মাংস ও শিরাগুলি টেনে ছেঁড়া।

"কহাপণ"—ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোমর থেকে আরম্ভ করে' কার্ষাপণ পয়সার মত ছোট ছোট করে' টুক্‌রো টুক্‌রো মাংস ছিঁড়ে নেওয়া।

"খারায়তচ্ছিক"—অস্ত্র দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে' কুঁচি ("কোচ্ছেহি"—with brush) দিয়ে নুন প্রভৃতি ক্ষার দ্রব্য মাখান।

"পলিঘপরিবত্তিক"—অপরাধীকে কাৎ করে' মাটিতে শুইয়ে তার কানের মধ্যে দিয়ে লোহার সিক চালিয়ে মাটিতে পুঁতে পরে অপরাধীর পা ধরে' ঘানিগাছের মত ঘোরান।

"পলালপীঠক"—চামড়া আগে ছাড়িয়ে তার পর প্রহার করতে করতে হাড়গোড় চূর্ণ করে' যখন দেহটা মাংসপিণ্ডরূপে পরিণত হবে তখন ঐ চামড়ায় পুরে চুল দিয়ে বেঁধে দিব্য একটি গাঁঠ্‌রী তৈরী করা হ'ত। অবশ্য চাম্‌ড়া শরীর থেকে একবারে আলাদা করা হ'ত না।

এই সাজার সম্বন্ধে বলা হয়েছে দক্ষ জল্লাদ ('ছেকো কারনিকো"—expert executioner) হ'লে এই সাজা দিতে পারত। তখন রাজাদের কাছে এইসব কাজের জন্য অনেক ঘাতক থাক্‌ত। তারা তাদের এই কাজের দক্ষতা-অনুসারে বেশীকম বেতন পেত।

এই দণ্ডগুলি অনেকেই সজ্ঞানে ভোগ করতে পেত না; দণ্ড শেষ হওয়ার আগেই দণ্ড্য ভবলীলা শেষ করে' ফেল্‌ত। কিন্তু তার দেহটার উপর যথাবিধান 'দণ্ডকক্ষ' চল্‌তে থাক্‌ত।

সবচেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, বুদ্ধদেবের করুণাময় উপদেশ আর বীভৎস দণ্ড একই সময়ে একই দেশে বিরাজমান ছিল।

শ্রী নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

বৌদ্ধদিগের প্রেত-তত্ত্ব

পেতবত্থু এবং তাহার ভাষ্যে প্রেতের আলোচনা। প্রেত সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণাকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে পেতবত্থুর শরণাপন্ন হওয়া দরকার। কারণ এই গ্রন্থখানিতে প্রেত সম্বন্ধে অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চিপুর নামক স্থানের ধর্ম্মপাল, গ্রন্থখানির ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যে মূলগ্রন্থে যে-সব গল্পের কেবলমাত্র ইঙ্গিত আছে সেই-সব গল্পের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম্মপাল এই-সব গল্প বৌদ্ধ ইতিকথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র শোনা গল্পই যে এই-সব ইতিকথার ভিত্তি তাহা নহে, সিংহলের মঠসমূহে যে-সমস্ত পুরাতন ভাষ্য (অট্‌ঠ-কথা) সংরক্ষিত আছে তাহার ভিতরেও এগুলির উল্লেখ আছে। খৃষ্টপর পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের কতকগুলি বিশেষ অংশের অট্‌ঠকথাকে সিংহলী ভাষা হইতে পালিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্ম্মপালের দ্বারা বাকী অট্‌ঠ-কথার অনেক অনূদিত হয়। পেতবত্থু এই-সমস্ত অনুবাদের ভিতরকার একখানি গ্রন্থ।

সুতরাং গ্রন্থখানিতে যে-সমস্ত গল্প লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা ধর্ম্মপালের কল্পনা-প্রসূত মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তাহা প্রাচীন কাল হইতে বৌদ্ধ ইতিকথার ভিতর দিয়া সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। এই-সব গল্পের তিনটির সঙ্গে বুদ্ধঘোষ-প্রণীত ধম্মপদ-অট্‌ঠ-কথার তিনটি গল্পের আশ্চর্য্যজনক মিল আছে। সুতরাং মনে হয় ধর্ম্মপাল এবং বুদ্ধঘোষ উভয়েই সিংহলী অট্‌ঠ-কথার ভিতর হইতে তাঁহাদের গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১) ধর্ম্মপাল তাঁহার গল্পগুলি ধম্মপদ-অট্‌ঠ-কথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া মিঃ বার্লিংগেম্ তাঁহার "Buddhist Legends" নামক গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উভয়েই এক স্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন—এই মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মপালের অট্‌ঠ-কথা প্রেত সম্বন্ধে নানা রকমের তথ্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং এই বইখানি লইয়া ভাল-রকমে আলোচনা করিলে আত্মা সম্বন্ধে এবং প্রেত-লোক সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধারণা সহজেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। এই কারণেই ধর্ম্মপালের পেতবত্থু হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রেতের বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে। ধর্ম্মপালের এই গ্রন্থখানি 'পালি টেক্‌স্ট্ সোসাইটি' কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলেও এখন পর্য্যন্ত কোনো আধুনিক ভাষায় উহা ভাষান্তরিত হয় নাই।

ক্ষেত্তূপমা পেত (প্রেত)

ভাষ্যে এই প্রেতটি জনৈক শ্রেষ্ঠি-পুত্রের অশরীরী আত্মারূপে উক্ত হইয়াছে। ইহার পিতা বুদ্ধের জীবিতকালে প্রাচীন মগধের রাজধানী রাজগৃহের একজন প্রভূত-ধনশালী বণিক ছিলেন। এই প্রভূতধনশালী বণিকের সে ছাড়া আর কোনো সন্তানসন্ততি ছিল না। পিতা-মাতা মনে করিতেন যে তাঁহাদের ধনভাণ্ডারে এই পুত্রটির জন্য অপরিমিত সম্পদ্ সঞ্চিত থাকিবে, দৈনিক সহস্র মুদ্রা হিসাবে ব্যয় করিলেও সে তাহা নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া তাঁহারা পুত্রটির শিক্ষা সম্পূর্ণরূপেই অবহেলা করিলেন। ফলে কোনো শিল্পই সে আয়ত্ত করিতে পারিল না। তার পর সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একটি সুন্দরী এবং সদ্বংশজাত কন্যার সহিত তাহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করা হইল। কন্যাটি সুন্দরী এবং সদ্বংশজাত হইলেও বুদ্ধের উপদেশের প্রতি তাহার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। এই পত্নীর সহিত শ্রেষ্ঠিপুত্রের দিন কেবলমাত্র অসার আমোদ-প্রমোদেই অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার পিতা-মাতাও পরলোকে গমন করিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর সে সর্ব্বদা এমন সব দুষ্ট লোকের দ্বারা পরিবৃত থাকিত যাহারা ঠকাইয়া তাহার অর্থ অপহরণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। গায়ক, অভিনেতা বা এই জাতি

অন্যান্য বিলাস-সঙ্গীদিগকে অকাতরে দান করিয়া তাহার সমুদয় অর্থ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল। অথচ কখনও সে ভ্রমবশতঃ কোনো ধর্ম্মকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত না। অবশেষে সে এরূপ ভাবে নিঃস্ব হইয়া পড়িল যে, উপায়ান্তর না থাকায় উক্ত নগরের এক অনাথ-শালায় আশ্রয় লইয়া সে ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতে লাগিল। সহসা একদিন একদল দস্যুর সহিত তাহার পরিচয় হইতেই দস্যুরা তাহাকে দস্যুবৃত্তি এবং চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ প্রদান করিল। সে তাহাদের দলে যোগদান করিল বটে, কিন্তু প্রথম অভিযানের দিনই কোনো বস্তু অপহরণ করিবার পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া গেল। রাজা বিচার করিয়া তাহার মস্তকটি দেহচ্যুত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহাকে যখন বধ-মঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন নগরের সুন্দরী সুলসা একদা-মহাধনী এবং দানশীল এই যুবকটির অবস্থা অবলোকন করিয়া দয়ার দ্বারা বিচলিত হইয়া মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মচারীকে অনুরোধ করিল। সে তাহাকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন এবং পানীয় জল প্রদান করিল। ঠিক সেই সময় জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে কোনো মহৎ দানের দ্বারা তাহাকে দানের পুণ্য অর্জ্জন করিবার সুযোগ দিবার নিমিত্ত তাহার নিকট মহা-মোগ্গল্লান ভিক্ষা-পাত্র হস্তে উপস্থিত হইলেন। বণিক্-পুত্র মনে করিল জীবনের এই শেষ মুহূর্ত্তে এই পানীয় এবং মিষ্টান্নের তাহার আর প্রয়োজন নাই, সুতরাং সে কোনোরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া সমস্ত পানীয় এবং আহার্য্য মহামোগ্গল্লানকে উপহার প্রদান করিল। ইহার পর তাহার মুণ্ড দেহচ্যুত করা হইল। মহামোগ্গল্লানের মত একজন মহানুভব থেরকে এই-রূপ দানের দ্বারা সে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার ফলে দেবতাদের বাসস্থান দেবলোকে জন্মগ্রহণ করাই তাহার উচিত ছিল। কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে সুলসা তাহাকে একটা দানের অবসর প্রদান করিয়াছে বলিয়া তাহার মন সুলসার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গিয়াছিল। আর এই কৃতজ্ঞতার চিন্তা তাহার হৃদয় সুলসার প্রতি ভালবাসাতেও পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। এই ভালবাসার ফলেই তাহাকে বহু নিম্নস্তরে একটি বটবৃক্ষে প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সুলসার প্রতি তাহার আসক্তির এইখানেই শেষ নহে। একদিন সুলসা তাহার আবাসস্থান বটবৃক্ষের নিম্নে আসিলে সে তাহার ভৌতিক মায়ার দ্বারা অন্ধকার এবং ঝড়ের সৃষ্টি করিয়া বসিল এবং তাহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। এই অবস্থায় প্রেতটি এক সপ্তাহকাল তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া পরে বেলুবন-বিহারে যেখানে জনতার কাছে বুদ্ধ বক্তৃতা করিতেছিলেন সেই জনতার এক প্রান্তে রাখিয়া আসিয়াছিল।

(Petavatthu Commentary, P.T.S., pp. 1-9)

শূকরমুখ পেত

কস্সপ নামে বুদ্ধের সময় একজন ভিক্ষু ছিল। সে দেহকে সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিল বটে, কিন্তু বাক্ তাহার মোটেই সংযত ছিল না। সে তাহার সহধর্ম্মী ভিক্ষুদিগকে যথেচ্ছা তিরস্কার করিত এবং অযথা তাহাদের কুৎসা রটনা করিত। মৃত্যুর পর নরকে সে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের সময় রাজ-গৃহের নিকট গিজ্ঝকূটে তাহার আবার নবজন্ম লাভ হয়। যে কর্ম্মফল ভোগ করা তখনও তাহার অবশিষ্ট ছিল তাহার ভোগ পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার তাহার বিরাম ছিল না। তাহার দেহের বর্ণ ছিল স্বর্ণের মত উজ্জ্বল, কিন্তু মুখের আকৃতি ছিল শূকরের মত। মহাত্মা নারদ গিজ্ঝকূট পর্ব্বতে বাস করিতেন। একদিন অতি প্রত্যুষে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন তখন এই শূকর-মুখ প্রেতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার দেহ স্বর্ণের মত উজ্জ্বল; তাহার ভিতর হইতে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে; কিন্তু তোমার মুখ শূকরের মত। ইহার কারণ কি?" প্রেত উত্তর করিল—"দেহে আমার সংযমের অভাব ছিল না, কিন্তু বাক্ অত্যন্ত অসংযত ছিল। সুতরাং আমার দেহ উজ্জ্বল মুখ শূকরের মতন হইয়াছে। হে নারদ, তুমি আমার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছ। সুতরাং বাক্যে অসংযত হইয়া

শূকরের মত মুখ প্রাপ্ত হইও না।" জাতকসমূহেও এই গল্পটির উল্লেখ আছে।

(Petavatthu Commentary, P. T. S, pp. 9—12)

পূতিমুখ পেত

কস্‌সপ বুদ্ধের সময় ভদ্রবংশীয় দুইজন যুবক ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি গ্রাম্য মঠে অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের ভিতর বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল অতি দৃঢ়। আর-একজন ভিক্ষু অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তাহাদের মঠে আগমন করিল। স্থানটির সুখ সুবিধা এবং আহার্য্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য্য দেখিয়া এই নবাগত ভিক্ষুটির মনে পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু দুইজনকে বিতাড়িত করিয়া একা সেই বিহারটি অধিকার করিয়া বসিবার অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। সে উভয়ের ভিতর এমন একটা বিরোধের সৃষ্টি করিল যে তাহারা উভয়েই বিহার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরেই সেই মন্দবুদ্ধি ভিক্ষুটি মারা যায়। মৃত্যুর পর সে তাহার পাপের জন্য অবীচি নামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। অন্য দুইজন থের ভ্রমণ করিতে করিতে আবার একদিন পরস্পর মিলিত হইল। নিজেদের কথা ব্যক্ত করিতেই তাহারা বুঝিতে পারিল তাহাদের মনোমালিন্য সেই দুষ্টবুদ্ধি ভিক্ষুর কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহারা পুনর্ব্বার বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইল এবং পুনরায় তাহাদের নিজেদের বিহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পরে তাহারা 'অরহত' হইয়াছিল।

এক বুদ্ধের তিরোধান হইতে অন্য বুদ্ধের জন্মের মধ্যবর্ত্তী সময়টা নরকে বাস করিবার পর প্রেতটি গৌতম বুদ্ধের সময় পৃথিবীতে পাপের বাকী অংশটুকু ভোগ করিবার জন্য সে-নরক হইতে বাহির হইয়া আসে এবং পূতিমুখ প্রেত নাম লইয়া রাজগৃহে অবস্থান করিতে থাকে। মহাত্মা নারদ একদা গিজ্ঝকূট পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিবার সময় তাহার দেখা পান এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"চেহারায় তুমি পরম রূপবান্, তোমার বাসস্থান আকাশে। কিন্তু তোমার মুখে ভীষণ দুর্গন্ধ, তাহাতে কীটসমূহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অতীতকালে তুমি এমন কি পাপ করিয়াছ যাহার জন্য তোমাকে এই শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে?" প্রেত উত্তর করিল—"আমি একজন অসাধু ভিক্ষু ছিলাম, বাক্ আমার মোটেই সংযত ছিল না। বাহিরের আচরণে আমি যোগী-ঋষির মত ছিলাম, সেইজন্য আমার চেহারাটা এত সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু আমার মুখের এই দুর্গন্ধও আমার নিজেরই কর্ম্মফল। বাক্যে যে আমি অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ ছিলাম এখন তাহারই ফল ভোগ করিতেছি।"

(Petavatthu Commentary, P. T. S., pp. 12—16)

পিট্ঠধীতলিক পেত

শ্রাবস্তী নগরে অনাথপিণ্ডিকের পৌত্রীর ধাত্রী তাহাকে একটি খেলার পুতুল উপহার প্রদান করিয়াছিল। পৌত্রীটি এই পুতুলটির সহিত খেলা করিত এবং তাহাকে কন্যার মত মনে করিত। একদিন খেলিতে খেলিতে এই পুতুলটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে 'আমার কন্যা মরিয়া গেল'—বলিয়া বালিকাটি এমন ভাবে ক্রন্দন আরম্ভ করিল যে তাহাকে কেহই সান্ত্বনা দিতে পারিল না। অবশেষে ধাত্রী বালিকাটিকে অনাথ-পিণ্ডিকের নিকট লইয়া গেল। তিনি তখন বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুপরিবৃত হইয়া বসিয়া ছিলেন। অনাথপিণ্ডিক তাহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে মৃত কন্যার উদ্দেশ্যে তাহার দান-ধ্যানের ব্যবস্থা করা উচিত। পরের দিন বুদ্ধ একটি মাধ্যাহ্নিক ভোজে নিমন্ত্রিত হইলেন। তিনি সেখানে অনাথপিণ্ডিকের দানের ব্যবস্থা সমর্থন করিয়া কয়েকটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, মৃত আত্মীয়ের আত্মা গৃহ-দেবতা বা অন্য দেবতা যাহার উদ্দেশ্যেই দান করা হোকনা কেন, দাতা নিজেও তাহার দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় করেন। এবং দান-গ্রহণ-কারীরও উপকার করা হয়। শোক দুঃখ এবং ক্রন্দনের দ্বারা প্রেতেরা কিছুমাত্র উপকৃত হয় না, তাহা কেবলমাত্র জীবিত আত্মীয়দেরই দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। (Petavatthu Commentary, pp. 16-19.)

তিরোকুড্ড পেত

বহু পূর্ব্বে—প্রায় ৯২ কল্প পূর্ব্বে কাশিপুরী নামে একটি নগর ছিল। তাহার রাজার নাম ছিল জয়সেন এবং রাণীর নাম ছিল শিরিমা। এই রাণীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব ফুস্‌স নামে এক সন্তান হয়। পুত্রটি সম্মাসম্বোধি অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জনের দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি তাঁহার পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বদাই বলিতে শোনা যাইত যে "বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ, এ-সমস্তই আমার। ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় বস্ত্র খাদ্য শয্যা এবং ঔষধ এই চারিটি বস্তুর দানের অনুমতি আমি আর কাহাকেও প্রদান করিব না।" সুতরাং রাজার অন্যান্য পুত্রেরা বুদ্ধকে অর্ঘ্য দান করিবার কোনো সুযোগই পাইত না। অবশেষে এই ব্যাপারে রাজার অনুমতি লাভের জন্য তাহারা একটি কৌশলের আবিষ্কার করিল। সীমান্তের অধিবাসীদিগকে তাহারা বিদ্রোহের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এই-সব লোকেরা যখন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল তখন তাহারাই আবার প্রেরিত হইল তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য।

যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসার পরে রাজা যখন তাহাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন তখন বুদ্ধ এবং তাঁহার ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদানের অধিকার চাওয়া ছাড়া তাঁহারা আর কোনো পুরস্কার প্রার্থনা করিল না। রাজা অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাদিগকে তিন মাসের জন্য অধিকার প্রদান কবিলেন। প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থা শেষ করিয়া তাহারা বুদ্ধকে তাহাদের নবনির্ম্মিত বিহারে লইয়া গেল এবং তাঁহাকে যথাবিহিত পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান করিল। ইহাদের ভিতরেও আবার কেহ কেহ সময়ের অল্পতার জন্য নিজেদের নামে বুদ্ধকে উপহার প্রদান করিতে না পারিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। এই অসন্তুষ্ট লোকেরা অবশেষে ভ্রাতাদের দান-ধ্যানের ব্যাপারে বাধা জন্মাইতে সুরু করিয়া দিল। কখনো বা তাহারা অর্ঘ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, কখনো সেগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়া দিত। অবশেষে তাহারা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইল যে একদিন দরিদ্রাশ্রমে অগ্নি সংযোগ করিতেও ইতস্ততঃ করিল না। এই-সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকেরাই তাহাদের দুষ্কৃতির জন্য নরকে প্রথমে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পর কস্‌সপ বুদ্ধের সময় তাহারা আবার প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও তাহাদিগকে কখনো কোনো উপহার প্রদান করিত না। অবশেষে একদিন কস্‌সপ বুদ্ধের নিকটে গিয়া তাহারা আত্মীয়-স্বজনের এই অবহেলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন—গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিম্বিসারের রাজত্ব-কালে তাহাদের নামে বলির অর্ঘ্য অর্পিত হইবে, আর এই বিম্বিসার পূর্ব্বজন্মে তাহাদেরই আত্মীয় ছিল। সুতরাং রাজা বিম্বিসার যখন বেলুবন-বিহারটি বুদ্ধকে এবং তাঁহার শিষ্যগণকে উপহার দেন, এই প্রেতেরা মনে করিয়াছিল, বিম্বিসারের অর্জ্জিত পুণ্যের কিয়দংশ তাহাদেরও ভাগে পড়িবে। কিন্তু তাহাদের সে আশা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়াছিল। এইরূপে নিরাশ হইয়া তাহারা রাত্রিতে এরূপ ভীষণ কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল যে ভীত বিম্বিসার বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কোলাহলের অর্থ কি?" বুদ্ধ তাঁহাকে উত্তর দিলেন—"তোমার পূর্ব্বজন্মের জনকত আত্মীয় প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারাই আশা করিতেছিল তুমি যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ তাহার ভাগ এই-সব প্রেতদিগকেও বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহারা তাহারই বলে দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। কিন্তু তুমি তাহা দাও নাই। সুতরাং তাহারা হতাশ হইয়া এই কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে।" ইহার পর বুদ্ধের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া নৃপতি বিম্বিসার সমস্ত সঙ্ঘকে এক বিরাট্‌ ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন এবং এই সৎকাজের পুণ্য তিনি প্রেতগণকেই অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজার এই পুণ্যকার্য্যকে সমর্থন করিতে গিয়া বুদ্ধদেব তিরোকুড্ডসুত্তম্‌ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহার সারমর্ম্ম এই যে, মানুষ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে উপকার এবং অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে তাহারই কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তর্পণ করিয়া থাকে। (Petavatthu Commentary, pp. 19-31.)

পঞ্চপুত্রখাদক পেত

শ্রাবস্তীর অনতিদূরে একজন গৃহস্থ বাস করিত। তাহার পত্নী ছিল বন্ধ্যা। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহাকে নিঃসন্তান দেখিয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু এই গৃহস্থটির পত্নীর প্রতি সুগভীর প্রেম ছিল। সুতরাং বন্ধুবান্ধবদের এই অনুরোধ উপরোধ তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। অবশেষে বংশলোপ পায় দেখিয়া পত্নী নিজে স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে চারিদিক্ হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া গৃহস্থ একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া আসিল। কিছুদিন পরেই এই দ্বিতীয় পত্নীটির দেহে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা হইতে দেখিয়া প্রথম পত্নী মনে মনে ভাবিল, 'সন্তান প্রসব করিলেই তো সপত্নী গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিবে'। এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে ঈর্ষারও অবধি রহিল না। অবশেষে তাহার ঈর্ষা মাত্রা ছাড়াইয়া এতদূর উঠিল যে সে একজন পরিব্রাজকের সাহায্যে সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করাইল। এই পরিব্রাজকটিকে সে খাদ্য এবং পানীয় উপহার দিয়া পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়াছিল। দ্বিতীয় পত্নীর পিতা-মাতা কন্যার গর্ভ নষ্ট হওয়ার কথা শুনিয়া প্রথম পত্নীর বিরুদ্ধে ভ্রূণ-হত্যার অভিযোগ উপস্থিত করিল। কিন্তু সে অপরাধ অস্বীকার করিয়া শপথ করিয়া বসিল যে, সে যদি সত্যসত্যই অপরাধী হয় তবে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় জ্বলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি করিয়া সন্তান ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা ছাড়া অন্যান্য নানা রকমের দুঃখ-দুর্দ্দশার হাত হইতেও সে যেন মুক্তি লাভ করিতে না পারে। এই স্ত্রীলোকটিই তাহার পাপের জন্য মৃত্যুর পর তাহার স্বগ্রামের অনতিদূরে কুৎসিত-দর্শন (দুর্ব্বর্ণরূপ প্রেতী) প্রেতিনী হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিল। সে পানীয় এবং আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। প্রাতে পাঁচটি পুত্রকে এবং সন্ধ্যায় পাঁচটি পুত্রকে সে প্রহার করিত এবং তাহাদের মাংস আহার করিত। তথাপি তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। বস্ত্রের অভাবে তাহার সর্বদেহ উলঙ্গ থাকিত। আর মাছি এবং ক্রিমিতে পরিপূর্ণ সেই দেহ হইতে অসহ্য দুর্গন্ধ নির্গত হইত। একদা আটজন থের শ্রাবস্তীতে ভগবান্ বুদ্ধের কাছে গমন করিবার সময় পথে এই প্রেতিনীটিকে দেখিতে পাইন। তাঁহারা তাহার এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সে তাঁহাদের কাছে তাহার জীবনের ইতিহাস বিবৃত করে। (Petavatthu Commentary, pp. 31-35.) তাহার দুঃখে বিচলিত হইয়া তাঁহারা সেই প্রেতীর পূর্বস্বামী গৃহস্থের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহস্থ তাঁহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয়ের দ্বারা অভ্যর্থনা করিলেই তাঁহারা এই সৎকার্য্যের পুণ্য তাহার পত্নীর নামে উৎসর্গ করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করায় অবশেষে সে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

সপ্তপুত্রখাদক পেত

এক সময়ে এক গৃহস্থের সাতটি পুত্র ছিল। এই পুত্রেরা সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিল। পুত্রদের সঙ্গে গৃহস্থের পত্নী স্বামীকে অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করায় গৃহস্থ পুনরায় বিবাহ করেন। এই দ্বিতীয় পত্নীটি অন্তঃসত্ত্বা হইলে প্রথম পত্নী ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহার গর্ভ নষ্ট করাইয়াছিল। এই পত্নীই অবশেষে সপ্তপুত্রখাদক প্রেতের গল্পাংশের অন্তর্গত। (Petavatthu Commentary, pp. 36-37.)

গোণ পেত

শ্রাবস্তীর এক গৃহস্থ পরলোকে গমন করিলে তাহার পুত্র পিতৃশোকে অভিভূত হইয়া তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলকেই তাহার পিতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। কিছুই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। লোকটির এই দুর্দশার কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ একদিন স্বয়ং তাহার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে বুদ্ধকেও তাহার পিতা কোথায় এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। বুদ্ধ উত্তরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি তোমার এই জন্মের পিতার সম্বন্ধেই জানিতে চাও, না পূর্ব্বজন্মসমূহে যাঁহারা তোমার পিতা ছিলেন তাঁহাদের

কথাও জানিতে চাও ?” এই উপায়ে তিনি যুবকের পিতৃ-শোকাতুর বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন ভিক্ষুরা তাঁহাদের নিজেদের ভিতর এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন বুদ্ধ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন—এই যুবকের বিক্ষুব্ধ চিত্তকে তিনি এই প্রথম শান্ত করিতেছেন না, পূর্ব্বজন্মেও তিনি এরূপ কাজ করিয়াছেন। বুদ্ধ অতঃপর নিম্নলিখিত গল্পটি বিবৃত করিলেন। অতীত কালে বারাণসীতে এক গৃহস্থের পিতা কালের আহ্বানে পরলোকে গমন করেন। গৃহস্থ পিতৃশোকে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল—তাহার নাম সুজাত। সুজাতের বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধারতীক্ষ্ণ। শোকাচ্ছন্ন পিতার চিত্তকে শান্ত করিবার উপায় স্থির করিয়া সে সহরের বাহিরে চলিয়া আসিল। সেখানে ক্ষেত্রের ভিতর একটি বলীবর্দ্দ মৃতাবস্থায় পড়িয়া ছিল। সে কিছু বিচালী কিছু ঘাস ও খানিকটা জল সংগ্রহ করিয়া সেই মৃত বলীবর্দ্দের মুখের কাছে সেগুলি স্থাপন করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ গলাধঃকরণ করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিল। পথ-যাত্রীরা ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া প্রথমে তাহার এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কি জানিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে কাহারো প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রদান করিল না। তাহারা তখন তাহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক স্থির করিয়া তাহার পিতাকে গিয়া জানাইয়া আসিল যে তাহার পুত্রটির মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। পিতা পুত্রের এতাদৃশী অবস্থার কথা শুনিয়া ছুটিতে ছুটিতে মাঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সে এইরূপ পাগলের মত ব্যবহার করিতেছে কেন। পুত্র উত্তর করিল—“পাগল আমি, না আপনি, সে-সম্বন্ধে আমি এখনও কৃতনিশ্চয় হইতে পারিতেছি না। আমি তবু এমন একটি বলদকে ঘাস জল গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি যাহার মাথা এবং পা—যাহার সমস্ত দেহটাই আমার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। কিন্তু আমার পূজনীয় পিতামহদেবের দেহের হাত পা বা মাথা কোনো অংশই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যাহার কিছুই পশ্চাতে পড়িয়া নাই আপনি তাহারই জন্য শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিভ্রংশ যে আপনারই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।” পুত্রের এই যুক্তি শ্রবণ করিয়া পিতার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি বালক সুজাতকে তাহার এই জ্ঞান ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। প্রভু বুদ্ধই তখন সুজাত রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (Petavatthu Commentary, pp. 38-42.)

মহাপেশকার পেত

বারোজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট হইতে কম্মট্‌ঠান ব্রত গ্রহণ করিয়া এমন একটি বাসস্থানের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন যেখানে বস্ত্র সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা একটি সুন্দর বনভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বনভূমির পাশে যে গ্রামখানি অবস্থিত তাহাতে এগারো ঘর পেশকার অর্থাৎ তন্তুবায়ের নিবাস। পেশকারেরা যখন জানিতে পারিল যে ভিক্ষুরা নির্জ্জনে বিনা বাধায় কম্মট্‌ঠান সাধনার জন্য উপযুক্ত আবাস-স্থানের অনুসন্ধান করিতেছেন তখন তাহারা তাঁহাদিগকে সেইখানেই বাস করিবার জন্য আহ্বান করিল এবং বনের ভিতর তাঁহাদের জন্য কুটীরও তৈয়ার করিয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবার লোকের অভাব হইল না। পেশকারদের ভিতর যে ব্যক্তি প্রধান সে গ্রহণ করিল দুইজন ভিক্ষুর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার, বাকী দশজনের ভার গ্রহণ করিল বাকী পেশকারগণ। প্রধানের স্ত্রীর ভিক্ষুদের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। সুতরাং ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইতে বিস্তর অসুবিধা হইতে লাগিল। পত্নীর এই ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া পেশকার-প্রধান তাহার ছোট ভগ্নীটিকে গৃহে আনিয়া তাহার হাতেই কর্ত্তৃত্বের সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিল। ভিক্ষুদের প্রতি এই বালিকার শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। সুতরাং এবার তাঁহাদের সেবা এবং যত্ন যথারীতি সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে বর্ষাঋতু অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পেশকারেরা প্রত্যেক ভিক্ষুককেই একখানি করিয়া বস্ত্র উপহার প্রদান করিল। এই ব্যাপারে প্রধানের পত্নী রুষ্ট হইয়া উপহাস করিতে করিতে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—যে খাদ্য এবং

পানীয় তুমি শাক্যপুত্র সন্ন্যাসীদিগকে উপহার দিয়াছ, পরলোকে তাহা যেন তোমার ভাগ্যে বিষ্ঠা মূত্র এবং পুঁজের আকার ধারণ করে এবং বস্ত্রখানি যেন জ্বলন্ত লৌহে পরিণত হয়।

কালে পেশকার-প্রধান বিন্ধ্যাটবীতে শক্তিমান্ বৃক্ষ-দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী মৃত্যুর পর বিন্ধ্যাটবীর নিকটবর্ত্তী একটি স্থানেই প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। নগ্ন-দেহে কুৎসিত-মূর্ত্তিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় উৎপীড়িত হইয়া একদিন সেই প্রেতিনী বৃক্ষ-দেবতার নিকটে আসিয়া অন্ন পানীয় এবং বস্ত্রের প্রার্থনা জানাইল। দেবতা স্বর্গ-সুলভ বস্ত্র খাদ্য এবং পানীয় সংগ্রহ করিয়া তাহার হাতে প্রদান করিতেই খাদ্য এবং পানীয় বিষ্ঠা মূত্র এবং পুঁজে পরিণত হইল, এবং বস্ত্র-খণ্ডকে পরিধান করিতে না করিতেই তাহা জ্বলন্ত লৌহ খণ্ডের মত তাহার সারা দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিল। যন্ত্রণায় সে আর স্থির থাকিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

একজন ভিক্ষু বর্ষাঋতু প্রবাসে কাটাইবার পর বিন্ধ্যা-টবীর পথে বুদ্ধ-দর্শনে চলিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গী ছিল একদল বণিক্। এই বণিকের দল রাত্রিতে পথ চলিত এবং দিনে ছায়া-শীতল বনের নিরালায় বিশ্রাম করিত। একদিন ভিক্ষু যখন গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন বণিক্‌দল তাহাকে ফেলিয়া প্রস্থান করিল। বনের ভিতর ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যে গাছে সাধু তন্তুবায়ের আত্মাটি বাস করিত তিনি সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষ-দেবতা তাঁহাকে দেখিয়াই মানুষের দেহে তাহার নিকট আগমন করিয়া শ্রদ্ধা এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। ঠিক সেই সময়ে তাঁহার পত্নী প্রেতিনীও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং খাদ্য পানীয় ও বসনের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। কিন্তু জিনিষগুলি তাহার হাতে দিতে না দিতেই সেগুলির চেহারা একমুহূর্ত্তে বদ্‌লাইয়া গেল। ভিক্ষু এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃক্ষদেবতা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাই তাঁহার কাছে বর্ণনা করিলেন এবং প্রেতিনীকে এই দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি দানের কোনো উপায় আছে কি না তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষু বলিলেন, তাহার পক্ষ হইতে যদি কোনো ভিক্ষুকে খাদ্য পানীয় এবং বসন দান করা হয় এবং সে দান যদি সে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করে, তাহা হইলে এই নির্য্যাতনের হাত হইতে মুক্তি লাভ করা তাহার পক্ষে কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। বৃক্ষ-দেবতা ভিক্ষুর উপদেশ অনুসারে কাজ করিয়াছিলেন এবং দুই-খানি বস্ত্র ভিক্ষুর হাতে দিয়া প্রভু বুদ্ধের কাছেও প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই হতভাগ্য রমণীটি দুর্ভাগ্যের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, pp. 42-46.)

খলাত্য পেত

একদা বারাণসীতে এক পরম রূপবতী রমণী বাস করিত। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব যেমন সুন্দর ছিল, তাহার দেহের বর্ণও ছিল তেমনি চমৎকার। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল তাহার চুল। তাহার কটিতট বেষ্টন করিয়া যে মেখলা শোভা পাইত তাহাকেও এই গাঢ় ঘন কৃষ্ণ এবং সুদীর্ঘ কেশপাশ অতিক্রম করিয়াছিল। বহু যুবকের চিত্ত তাহার এই কেশপাশের সৌন্দর্য্যের বন্ধনে বাঁধা পড়িত। তাহার এই সৌভাগ্যে কয়েকজন রমণী অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া পড়িল এবং ঔষধের দ্বারা তাহার এই কেশরাশি ধ্বংস করিবার জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়া পড়িল। তাহার একটি পরিচারিকাকে উৎকোচের দ্বারা বশীভূত করিতেও তাহাদের বিশেষ বিলম্ব হইল না। পরিচারিকাটি তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটা তীব্র ঔষধ তাহার গঙ্গা-স্নানের সময় সে যে চূর্ণ ব্যবহার করিত তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। সেই চূর্ণ মাখিয়া গঙ্গায় অবগাহন করিতে সে যেমন মাথা ডুবাইয়াছে অমনি তাহার সমস্ত চুল শুষ্ক-পত্রের মত ঝরিয়া পড়িল। কেশদাম হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার মূর্ত্তি এত কুৎসিত হইয়া গেল যে ক্ষোভে লজ্জায় সে আর নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। নগরের বাহিরে তৈল এবং মদ্যের ব্যবসায় করিয়া সে তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিল। একদিন সে কতকগুলি লোককে সুরা-পানের জন্য আমন্ত্রণ করিল এবং তাহারা সুরা পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িলে তাহাদের বস্ত্রাদি অপহরণ করিল।

একদা এক অরহত ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি এই রমণীর দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র সে তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিয়া আনিল এবং তৈলের দ্বারা প্রস্তুত উত্তম খাদ্যসমূহ তাঁহার সম্মুখে পরিবেশন করিল। অরহত তাহার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া খাদ্যসমূহ আহার করিলেন। তিনি যখন আহার করিতেছিলেন, রমণীটি তখন তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার মাথার উপর ছত্রদণ্ড ধারণ করিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে সে সুন্দর বেশরাশির জন্য প্রার্থনা করিতেও ভুলিল না। ভাল এবং মন্দ কার্য্যের জন্য পরজন্মে তাহার স্থান সমুদ্রের উপরে একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত বিমানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রার্থনা অনুসারে সে অপূর্ব্ব বেশবাসের অধিকারিণী হইয়াছিল বটে, কিন্তু নগ্ন অবস্থায়। অন্যদিকে তাহার দেহে কোনরূপ আচ্ছাদন ছিল না। এইরূপে তাহাকে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার অবস্থা ঠিক একইরূপেই ছিল। তাহার পর অবশেষে যখন বর্ত্তমান বুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন তখনও শ্রাবস্তীর একশত জন বণিক তাহার বিমানকে বিস্তৃত সমুদ্রের ভিতরেই অবস্থান করিতে দেখিয়াছে। তাহারা সুবর্ণভূমিতে বাণিজ্যের জন্য যাইতেছিল। পথে বিপরীত বাতাসে তাহাদের জাহাজ ইতস্ততঃ বিতাড়িত হইতে থাকে। সেই সময় বণিকেরা মহাবিস্ময়ে ঐ স্বর্ণবিমানকে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার ভিতরের অধিবাসীকে বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করেন। উত্তরে বিমানচারিণী তাঁহাকে জানাইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অনাচ্ছাদিত, সুতরাং সে বাহির হইয়া আসিতে লজ্জিত হইতেছে। ইহার পর বণিক্ তাঁহার উত্তরীয়খানি উপহার স্বরূপ অর্পণ করিয়া সেই বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদন করিয়া তাহাকে বাহির হইয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিমানচারিণী উত্তর দিল এরূপ ভাবে কোনো উপহার তাহাকে অর্পণ করিলে সে উপহার তাহার নিকট কখনো পৌঁছিবে না। উপহার তাহার নিকট পৌঁছাইতে হইলে জাহাজের উপর যদি কোনো সাধু এবং বিশ্বাসী উপাসক থাকেন তবে তাঁহাকেই এই উপহার প্রদান করিতে হইবে এবং সেই দানের পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করিতে হইবে। বণিক্ সেইরূপ দানের ব্যবস্থা করিয়া দানের পুণ্য তাহার নামে উৎসর্গ করিতেই বিমানচারিণী সুন্দর বেশে সুসজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া আসিল। পুণ্যকার্য্য এইরূপ অপূর্ব্ব ফল প্রসব করিতে দেখিয়া বিস্মিত বণিকেরা তাহাকে তাহার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে তাহার পাপ এবং পুণ্য উভয়বিধ কর্ম্মের কথাই তাঁহাদের কাছে ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে খাদ্য এবং পানীয় প্রদান করিল এবং শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট কিছু উপহার লইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। বণিকেরা শ্রাবস্তীতে যাইয়া তাহার নামে বুদ্ধের পূজা-অর্চ্চনা করিয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধ প্রেতিনীর এই পুণ্যকার্য্যের অনুমোদন করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে তাবতিংস স্বর্গের স্বর্ণপ্রাসাদে তাহার পুনর্জ্জন্ম লাভ ঘটিয়াছিল। (Petavatthu Commentary, P. T. S., pp. 46-53.)

শ্রী বিমলাচরণ লাহা

আধ্যাত্মিক খুড়ো

ফুল ফুটে' ঝরে' যায় দুনিয়ার রীতি
আজ যার সুরু হয় কাল তার ইতি।
বিয়ে হ'ল আশ্বিনে রায়েদের মেয়ে
বিধবা সে হ'য়ে গেছে পৌষ মাস যেতে!
হরিঘোষ গাইটিরে দিত খোল-খুদ,
বাছুরটি মারা গেল হ'ল নাক দুধ!

—এইরূপ নানা কথা আধ্যাত্মিক
ভেবে ভেবে শেষে খুড়ো করলেন ঠিক,—
"সুদ যত বাকী আছে এই বেলা হায়
তাগাদার তাড়া দিয়ে করে' নিই আদায়!
সোজায় না দেয় যদি আদালতে যাই,
তাতে যদি দেখি তবু তাড়াতাড়ি পাই।
তাড়াতাড়ি করা ভাল—নেই কিছু ঠিক
মায়াময় দুনিয়ায় সকলই অলীক!"

"বনফুল"

মেঘ-মল্লার

(১)

দশপারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখ্‌বার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশপারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকর নানারকমের সুন্দর সুন্দর ফুলের গহনা গড়ে' মেয়েদের কাছে বেচ্‌বার জন্য এনেছিল; একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী দামী রেশ্‌মী শাড়ী বেচ্‌বার জন্য এনেছিল—তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ্‌-বাজীয়ে আস্‌বেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধরে' খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার কর্‌তে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মন্দিরের উঠানে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ কর্‌লে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুকপ্রিয়া মেয়ে জমে' গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হ'য়ে উঠ্‌ল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য কর্‌ছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ্‌-বাজীয়ে ধরা পড়েন। অনেক-ক্ষণ ধরে' দেখ্‌বার পর তার চোখে পড়্‌ল—একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্য থেকে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে' তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ কর্‌তে তিনি হাত উঁচু করে' প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত কর্‌লেন।

বাইরে আস্‌তে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "আমি অবন্তীর গাইয়ে সুরদাস, তুমি আমাকেই খুঁজ্‌ছিলে না?"

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য্য হ'ল। তার মনের কথা ইনি জান্‌লেন কি করে'?

প্রদ্যুম্ন সসম্ভ্রমে জানালে, হাঁ সে তাঁকেই খুঁজ্‌ছিল বটে।

প্রৌঢ় বল্‌লেন, "তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে দেখা না করে' আস্‌তাম না। তোমাকেও ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।"

"আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন?"

"নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে, জান?"

"হ্যাঁ, জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্ব্বে থাক্‌তেন না?"

"তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোনো একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তুমি এখানে কোথায় থাকো?"

"এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাক্‌বেন?"

"সে তোমাকে বল্‌ব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।"

প্রদ্যুম্ন প্রণাম করে' বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল, তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ী ফির্‌ছিল। প্রদ্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্ততঃ ধাবিত হ'ল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে' দ্রুতপদে নাম্‌তে লাগ্‌ল। আচার্য্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রদ্যুম্নের মধ্যে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশী চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য করে' তাকে একটু বেশী শাসনের মধ্যে রাখ্‌তে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত করে' বিহারে ফির্‌লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?

বাঁক ফির্‌তেই বাঁ পাশের পাহাড়ে আড়ালটা সরে' গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রদ্যুম্ন দেখ্‌লে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফির্‌ছিল। আরও দূরে একখানা শাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিগের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হ'য়ে আস্‌ছিল, চারিধারে তার পীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্‌কা করে' টানা।

হঠাৎ পেছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধরে' কে ঈষৎ টান্‌লে।

প্রদ্যুম্ন পেছন ফিরে' চাইতেই যে কাপড় ধরে' টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে' গেল। সে কিশোরী, তার দোলন-চাঁপা রংএর ছিপ্‌ছিপে দেহটি বেড়ে' নীল শাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ান।

প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ের সুরে বলে' উঠ্‌ল, "কখন তুমি এসেছিলে, সুনন্দা! আমি তোমাকে এত খুঁজ্‌লাম, কৈ দেখ্‌তে পেলাম না ত?"

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল, তার পর সে একটু অভিমানের সুরে বল্‌লে, "আমাকেই খুঁজ্‌তে যেন এখানে এসেছিলে আর কি? যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি?"

"সত্যি বল্‌ছি সুনন্দা তোমাকেও খুঁজেছি। নাম্‌বার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি; তুমি কাদের সঙ্গে এলে?"

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আস্‌ছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়্‌তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নাম্‌তে লাগ্‌ল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এঅবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু করে' সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌ল।

সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল হ'তে তরলতর হ'তে হ'তে হঠাৎ কখন জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক প্রদ্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙ্‌ল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাঁছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি করে'? আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে' তাকে ভৎর্সনা কর্‌লেই বা কি করা যাবে? এ-রকম রাত্রে যে যুগযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে' উঠে, তার অবাধ্য মন যে এইসব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে মহাকোট্‌ঠী বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানস-সুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে' বেড়ায়, এর জন্যে সেই কি দায়ী!

দশপারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে' উঠ্‌ল, উৎসব-প্রত্যাগত নরনারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। প্রদ্যুম্নের গতি আরো দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর-একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্‌কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখ্‌লে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিক্‌চিকে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে' তার সর্ব্বাঙ্গে আলো আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে বলে' উঠ্‌ল, "আর-একটু হ'লেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চলে' যেতে অথচ আমায় দেখ্‌তে পেতে না!"

সুনন্দাকে দেখে' প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুসী হ'ল, মুখে বল্‌লে, "নাঃ তা আর দেখ্‌ব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে? আর না দেখ্‌তে পেলেই বা কি? আমি তোমার উপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বল্‌ছি।"

সুনন্দা বল্‌লে, "দোষ কর্‌লেন নিজে আবার রাগও কর্‌লেন নিজে। সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে?

তা না যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি করে' ? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।"

প্রদ্যুম্ন বল্লে, "তুমি বড় মানুষের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বল্‌ছিলে ?"

সুনন্দা বল্লে, "যাও! আর মিথ্যে ভাণে দরকার নেই। কি কথা মনে করে' দেখ। সেই সেদিন বল্লে না ?"

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে বলে' উঠ্‌ল, "বুঝ্‌তে পেরেছি, সেই বাঁশী ?"

সুনন্দা অভিমানের সুরে বল্লে, "ভেবে দেখ বলেছিলে কি না। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে বসে' আছি। একে ত এলেন বেলা করে' তার উপর —যাও।"

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠ্‌ল। বল্লে, "আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখ্‌তেই পেয়েছিলে ত আমায় ডাক্‌লে না কেন ?"

সুনন্দা বল্লে, "আমি কি একা ছিলাম ? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি ? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি করে' ডাক্‌ব ?"

প্রদ্যুম্ন বল্লে "আচ্ছা ধরে' নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বল্‌চ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণ্-বাজীয়ে আস্‌বেন; তুমি ত জানো, আমার অনেকদিন থেকে বীণ্ শেখ্‌বার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায় ?"

সুনন্দা বল্লে, "বাবা ৩।৪ দিন হ'ল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।"

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠ্‌ল, বল্লে, "ওহো তাই! নইলে আমি ভাব্‌চি এত রাত পর্য্যন্ত সুনন্দা কি—"

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বল্লে, "চুপ্ চুপ্ তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই ? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে !"

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বল্লে, "এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে বলে' দেব নিশ্চয়—"

সুনন্দা রাগের সুরে বল্লে, "দিও বলে'। এম্‌নি আমি মন্দিরে আরতি পর্য্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।"

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে' নিলে তার পর বল্লে, "আচ্ছা থাক্, বলে' দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই—আমার সঙ্গেই আছে—সত্য বল্‌চি তোমায় শোনাবার জন্যেই এসেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজ্‌ছিলাম, বীণ্‌টা ভাল করে' শিখ্‌ব বলে'।"

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়্‌ল। সে বাঁশী বাজালে বটে কিন্তু সে যেন ভাসা ভাসা সুরের সঙ্গে, তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। আরও কতবার তারা দুজনে নির্জ্জনে কতবার বসেছে প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুন্‌তে সুনন্দা ভাল বাস্‌ত বলে'। প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আস্‌ত বাঁশীটি সঙ্গে আন্‌ত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্য দিয়ে কত দিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এরকম নিরুৎসাহ ভাব ত সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি।

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আস্‌ছিল সেই জীর্ণ-পরিচ্ছদ-পরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম্ম শীর্ণদর্শন ! পুরাতন পুঁথির ভূর্জ্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং !

(২)

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্ত্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপ-খোপের বাস। নিষ্কট-

বর্ত্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড়-একটা কেউ আস্‌ত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় ৭।৮ মাস হ'ল সেখানে বাস কর্‌ছেন। তাঁরই দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আস্‌ত-যেত বলে' মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভাল আছে।

অর্দ্ধ অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ কর্‌লেন, তার পর বল্‌লেন, "চল বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।"

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভাল করে' দেখ্‌লেন, তার পর যেন আপন মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "হবে, তোমার দ্বারাই হবে। আমি তা জান্‌তাম।"

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্ত্তি দূর থেকে ভেবে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে' গেল। সে লক্ষ্য কর্‌লে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হ'লেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বল্‌লেন, "আমি ভাব্‌ছিলাম তুমি আজ আস্‌বে।—হাঁ তোমার পিতা ত একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?"

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে, "একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।"

সুরদাস উৎসাহের সুরে বল্‌লেন, "পারা ত উচিত। তোমার বাবাকে জান্‌ত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি-উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণ পত্র আস্‌ত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশীতে বেশ মেঘমল্লার আলাপ কর্‌তে পার?"

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে, "বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘমল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।"

সুরদাস বল্‌লেন, "কই, দেখি তুমি কেমন শিখেছ।"

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাক্‌ত। কখন কোন্ সময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা ত যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগ্‌ল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন করে' রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুল-ফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্নারাতের মর্ম্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে' পড়্‌ছে, তার বাঁশীর গানে সে রস যেন মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে' বল্‌লেন, "ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশী কথা নয়। বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমিই পার্‌বে, এ আমি আগেও জান্‌তাম।"

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল।

অন্যান্য দু' এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুরদাস তাকে বল্‌লেন, "শোনো প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বল্‌ব বলে' পূর্ব্বেও আমি তোমাকে খোঁজ করেছিলাম; তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে যে একথা তুমি কারু কাছে প্রকাশ কর্‌বে না।"

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে একদিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বল্‌বেন?

সে বল্‌লে, "কি কথা না শুনে' কি করে'—"

সুরদাস বল্‌লেন, "তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হ'লে আমি তোমাকে বল্‌তাম না।"

কি কথা জান্‌বার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে সুরদাসের কথা কারু কাছে প্রকাশ কর্‌বে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো—তার সাম্‌নেই বড় মাঠ? ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীন কালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল। শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ করে' সকলেই ওই মন্দিরে আগে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না করে' ব্যবসা আরম্ভ কর্‌তেন না। সে অনেকদিনের কথা; তার পর মন্দির ভেঙে চুরে' ওই ঢিবিতে দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে বসে' আষাঢ়ী

পূর্ণিমার রাতে মেঘমল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এসংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাঁকে আন্‌তে পারা যায় তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত-সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বল্‌ছিলাম সাম্‌নের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা করে' দেখ্‌ব। তুমি কি বল ?"

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হ'য়ে গেল। তা কি করে' হয় ? আচার্য্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্ত্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখ্‌তে পাওয়া—একি সম্ভব ?

প্রদ্যুম্ন চুপ করে' রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "এতে কি তোমার অমত আছে ?"

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "সে জন্যে না। কিন্তু আমি ভাব্‌ছিলাম এটা কি করে' সম্ভব যে—"

সুরদাস বল্‌লেন, "সে-বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সাম্‌নের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা করে' রাখি।"

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলে কেমন একরকম হ'য়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বল্‌লে, "আচ্ছা রাখ্‌বেন, আমি আসব।"

সুরদাস বল্‌লেন, "বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার করে' এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে বলে' দেব।"

প্রদ্যুম্ন আর-একবার সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়্‌বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তার পর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরলে।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং! শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য্য বসুব্রত বলেন বটে...

(৩)

ভদ্রাবতী নদীর ধারের শাল-পিয়াল-নক্তমাল বনে সে-বার ঘনঘোর বর্ষা নাম্‌ল। সারা আকাশ জুড়ে' কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘ-বরণ চুলের রাস এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট্-রজনীর ঘনান্ধকার, তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জ্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারি-বর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎ চমক, তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত !

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর মাঠে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক্ তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান করে' এসে বস্ত্রপরিবর্ত্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝ্‌তে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে করে' এনেছিলেন তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বল্‌লেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাল্‌লেন। তাঁর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়্‌ল। ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখ্‌বার জন্যে তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে অন্ধকার রাতে একজন প্রায় অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাক্‌বার ভয়ের দিক্‌টা তার একেবারেই চোখে পড়্‌ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল।

সুরদাস বল্‌লেন, "প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের উপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।"

তাঁর চোখের কেমন-একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রত্যুম্নের ভাল লাগ্‌ল না। তার পর সে বসে' একমনে বাঁশীতে মেঘমল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সাম্‌নের মাঠটায় কিছু দেখ্‌বার উপায় নেই। শাল-বনের ডাল-পালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শাল বনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার-শষ্প-শয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে।—শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সাম্‌নের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হ'য়ে গেল। প্রত্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখ্‌লে মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত-ভাবে তাঁর অপূর্ব্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্ম কোন্ স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণ-মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্দ্ধ-লুক্কায়িত মণি-মেখলায় দীপ্তিমান্, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে···হাঁ এই তো দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গল ঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা সৃষ্টি-মুখী হ'য়ে উঠ্‌ছে, এঁর আশীর্ব্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী!

প্রত্যুম্ন চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে দেবীর মূর্ত্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হ'য়ে পড়্‌ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হ'য়ে বইতে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ প্রত্যুম্নের কেমন-একটা মোহের ভাব দূর হ'ল না। সে যা দেখ্‌লে এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙ্‌ল। সুরদাস বল্‌লে, "আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন আমার কথা মিথ্যা নয় দেখ্‌লে ত?"

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন হ'তে লাগ্‌ল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রত্যুম্ন দেখ্‌লে তাঁর চোখ দুটো যেন অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল, পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে তা কেমন হলদে রং-এর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এরকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হ'তে অনেকটা সময় লাগ্‌ল। তার পর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা, নিবিড় হ'য়ে জড়াজড়ি করে' আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হ'য়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুত পদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়্‌ল বনের মধ্যে একস্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথমে সে ভাব্‌লে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাক্‌বে, কিন্তু ভাল করে' লক্ষ্য করে' দেখে' সে বুঝ্‌লে যে সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয় বরং ...কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে' পড়্‌ল। যে পিপ্পল-গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আস্‌ছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রত্যুম্ন অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একি! এঁকেই ত সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী ত!

অদ্ভুত! সে দেখ্‌লে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে সেই অপরূপদ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে' বেড়াচ্ছেন, জোনাকীপোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয়, তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেম্‌নি এক-রকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে, আর-একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্দ্ধ-নিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাত্‌ড়ে পার হবার

পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিপ্পল-গাছগুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নার মত!

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাব্‌লে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এপর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে একি কাণ্ড?

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হ'য়ে দ্রুত হাঁটুতে হাঁটুতে যখন সে-বিহারের উদ্যানে এসে পৌঁছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে' সে স্বপ্ন দেখ্‌লে, ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তিনি যতই উপরে উঠ্‌বার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হ'য়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত করে' দিচ্ছে...ব্যথিতদেহা, বিপন্না; বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে' একটা বড় মাছ দাঁত বার করে' হিংস্র হাসি হাস্‌ছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত।

(৪)

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে' বল্‌লে। আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মাঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে' বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। জিজ্ঞাসা করলেন, "একথা আগে জানাওনি কেন?"

"তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—"

"বুঝেছি। তবে এখন বল্‌তে এসেছ কেন?"

"এখন আমার মনে হচ্ছে আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।"

পূর্ণবর্দ্ধন একটুখানি কি ভাব্‌লেন, তার পর বল্‌লেন, "এইরকম একটা-কিছু ঘট্‌বে তা আমি জান্‌তাম। পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরা না করতে পারে এমন কোনো কাজই নেই—আর আমি বেশ দেখ্‌ছি প্রদ্যুম্ন, যে তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল হবে।—তুমি কালরাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী কর্‌বার সহায়তা করেছ।"

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্দ্ধন বল্‌লেন, "এইসব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখ্‌বার জন্যই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু—যাক্— তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি? আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখ্‌তে কিরকম বল দেখি?"

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্দ্ধন বল্‌লেন—"আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বল্‌চ, তার নাম সুরদাসও নয় বা তার বাড়ী অবন্তীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্য্যসিদ্ধির জন্যে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে।"

প্রদ্যুম্ন অধীরভাবে বলে' উঠ্‌ল, "কিন্তু আপনি যে বল্‌ছেন—"

পূর্ণবর্দ্ধন বল্‌লেন, "সে ইতিহাস বল্‌ছি শোনো। নদীর ধারে যে সরস্বতী-মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু শত বৎসর পূর্ব্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাক্‌ত, তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে সে গায়কটি মেঘমল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হ'য়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হ'য়ে উঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ায় পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়কে মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস

মেঘমল্লারে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতীদেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হ'য়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তার পর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকেই প্রার্থনা করে' বসে। সরস্বতী দেবী বলে-ছিলেন, তাঁকে পাওয়া নিগুর্ণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্য্যতঃ তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, কিন্তু সেজন্য অনেক জীবন ধরে' সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিতা হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে' দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেও জানেন। আমি অনেকদিন তার পর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কি না, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।"

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে' গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আস্ছিল :—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ,
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবং বদী মহাসমনো।

যেতে যেতে সে দেখ্লে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় আমগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণ-চর্ম্মের আসনে বসে' বোধ হয় কি আঁক্ছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘট্‌ল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখ্‌লে সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্য্যন্তও নেই! দু-একটা যবাগূ পানের ঘট, আগুন জ্বালাবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুক্‌নো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক্-ওদিক্ ছড়ান পড়ে' আছে।

সেই দিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না বলে' চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

(৫)

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে' বলেছিল সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশ যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে' আস্‌বে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশ-মত ভগবান্ তথাগতের মূর্ত্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হ'য়ে ছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম করে' তিনি যে মূর্ত্তি গড়ে' তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্ত্তি কি মগধের দুর্দ্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্ত্তি, তা সে-দেশের লোক ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছে না।

তক্ষশিলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দ্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ করে' উঠ্‌তে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়্‌তে আরম্ভ করেছেন।

মহাকোট্‌ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করে'ও মনের মত করে' এঁকে উঠ্‌তে না পেরে বিরক্ত হ'য়ে ওদিক্ একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চ্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে

একটা নির্জ্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তে একটা বড় বট-গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশের মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মতো জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে' আছে, অনেক বন্যহংস তার জলে খেলা করছে।

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মতো জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘট কক্ষে এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে' তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার এদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে' উঠল—এই ত! এই ত তিনি! ভদ্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই ত পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নারাতে এঁকেই ত সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতিমলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে' তার মনে আর কোন সন্দেহ রইল না যে এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ করে' বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে, তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চলে' এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে' চলে' যান—সে রোজ বসে' দেখে।

(৬)

এইরকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ করে' বসে' আছে, সেই সময়ে দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশী জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে' অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তার পর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন, "ফুলটা আমায় তুলে' দেবে?"

"দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।"

"কি বলো?"

"আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।"

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিলে। বললেন, "আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাকগে ফুল!"

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ করে' ওপারে গেল।

দেবী বললেন, "তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ বসে' থাক, না?"

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে, "হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল আনতে আসেন।"

দেবী হাসিমুখে বললেন, "ওই পাহাড়ের উপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।"

হঠাৎ দেবী যেন কেমন একপ্রকার বিহ্বল-চোখে চারিদিকে চাইলেন। তার পর পাহাড়ের গায়ের কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পেছনে পেছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটা ছোট কুটীর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেবী বন্ধদুয়ার খুলে' ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বললেন, "এস"।

প্রদ্যুম্ন দেখ্‌লে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনি কি এখানে একা থাকেন ?"

দেবী বল্‌লেন, "না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে করে' এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চলে' যান, ৫।৬ দিন পরে আসেন। তুমি এখানে বসো।"

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ করে' তাকে যবাগূ পান কর্‌তে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মতো, এমন সুস্বাদু যবাগূ সে পূর্ব্বে কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল যদি আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কথা সত্য হয় আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেচে তা ইন্দ্রজাল না হয় তবে এই ত দেবী সরস্বতী তার সাম্‌নে। তার জান্‌বার কৌতূহল হ'ল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন।

সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন ? আপনার দেশ কোথা ?"

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সূপ ও অন্ন পরিবেষণে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে' বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "আমার কথা বলছ ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় পড়ে' ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। সেই থেকে এখানেই আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা আমার মনে পড়ে না।"

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তের বনরেখার মাথায় সূর্য্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন, বোধ হয় মনে এল না। হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপ্‌ড়ীর মত চোখদুটি বেয়ে ঝর্‌ঝর্ করে' জল ঝরে' পড়্‌ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সাম্‌নে অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখ্‌লেন। বল্‌লেন,"খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী করে' খেতে দেব। সকালে যেও।"

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আস্‌ছিল।...ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধূলারও যোগ্য নয়, সে-দেশের পথের ধূলো এমন কি পুণ্য করেছে, মা, যে তুমি সেখানে পড়ে' থাক্‌তে যাবে ?

খাওয়া শেষ হ'লে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে' উঠ্‌ল, বল্‌লেন, "থাকো না কেন রাত্রে ? আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।"

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আপনার এখানে একা রাত্রে থাক্‌তে ভয় করে না ?"

"খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুল্‌তে পারিনে। ঘুম হয় না, সমস্ত রাত বসেই থাকি।"

প্রদ্যুম্নের হাসি পেলে, ভাব্‌লে রাত্রে একা থাক্‌তে ভয় করে বলে' পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখ্‌তে চান। সে বল্‌লে, "আচ্ছা রাত্রে থাক্‌ব।"

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় বসে' কাটালে। দেবীও কাছে বসে' রইলেন। বল্‌লেন, "এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আস্‌তে পারিনে, ঘরের মধ্যে বসে' রাত কাটাই।"

দেবীর ব্যাপার দেখে' প্রদ্যুম্ন অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল। হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, কিন্তু এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিষ।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাট্‌ল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী বলে' দিলেন, "সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।"

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে বসে' কুটীরের দিকে চেয়ে পাহারা রাখ্‌ত। তার তরুণ, বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে' রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ পনর দিন কেটে গেল।

এক একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাতে একা গান কর্‌ছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে

গান প্রাণধারায় আদিম ঝর্‌ণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকা-দের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন্ পথিক তারার গান।

(৮)

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বল্‌লে, "তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা ব'ল্‌ছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান কর্‌ছে।"

শুনে' ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে সে পুকুরের ধারে উপস্থিত হ'ল। দেখ্‌লে সত্যই গুণাঢ্য পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান কর্‌তে নেমেছেন। সে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে' উপরে উঠে' প্রদ্যুম্নকে দেখে' কেমন যেন হয়ে গেলেন। বল্‌লেন, "তুমি এখানে?"

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "আমি এখানে কেন তা বুঝ্‌তে পারেন-নি?"

গুণাঢ্য বল্‌লেন, "তুমি এখন বল্‌ছ বলে' নয় প্রদ্যুম্ন, আমি একাজ কর্‌বার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতিরাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বল্‌ছে তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যেই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে ইচ্ছা কর্‌লে আমি যাকে ইচ্ছা বাঁধ্‌তে পারি, কিন্তু আন্‌তে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধনের শক্তি থাক্‌লেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্য আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জান্‌তাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আস্‌বেনই. এলে তার পর মন্ত্রে বাঁধ্‌ব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা কর্‌বার কৌতূহলেই আমি একাজ করি।"

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "এখন?"

গুণাঢ্য বল্‌লেন, "এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আস্‌ছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব্ব মন্ত্রের বিরোধী-শক্তিসম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।"

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "উপায় নেই কেন?"

"যে ছিটিয়ে দেবে সে চির-কালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। আমার পক্ষে দুদিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ মৃত্যুর পর হয়ত পরজগৎ আছে কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর? তা আমি পার্‌ব না।"

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দুটির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাক্‌তে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্ম্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগ্‌ল। সে ভাব্‌লে—একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দুখানিতে একটা কাঁটা ফুট্‌লে তা তুলে' দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বল্‌লে, "চলুন আপনার সঙ্গে যাব। আমায় সে মন্ত্রঃপূত জল দেবেন।"

গুণাঢ্য বিস্ময়ে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "বেশ করে' ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ—"

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "চলুন আপনি।"

(৯)

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্ত্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য বল্‌লেন, "প্রদ্যুম্ন, আর-একবার ভালো করে' ভেবে দেখ, কোনো মিথ্যা আশায় ভুলো না। এ থেকে তোমায় উদ্ধার কর্‌বার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হ'য়ে যাবে; বেশ বুঝে' দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্ম্মল অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।"

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?—কিছু না, চলুন।"

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল তখন রোদ বেশ পড়ে' এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে

ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ করে' বসে' ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আস্‌তে দেখে' তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বল্‌লেন, "এস, এস। আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।" তার পর তিনি দুজনকে খেতে দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে কুটীরের মধ্যে চলে' গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "কই, আমায় সে মন্ত্রপূত জল দিন তবে ?"

গুণাঢ্য বল্‌লেন, "সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত ?"

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "আমায় আর কিছু বল্‌বেন না, জল দিন।"

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান করে' দুজনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল, তখন সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই। বেতস-বনে ছায়া নেমে আস্‌ছে, রাঙা সূর্য্য আবার উরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে' পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে' উঠ্‌ল।

তার পর তিনি ঘট-কক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আন্‌তে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বল্‌লেন, "আমি এখান থেকে আগে চলে' যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।"

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে' বল্‌লেন, "আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—"

তিনি কুটীর মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে' নিলেন। তার পর সরু পথ বেয়ে বেতবনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চলে' গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রদ্যুম্ন চারিদিক্ চেয়ে বসে' বসে' ভাব্‌লে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা—বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে বসে' বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়ত প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাব্‌ছেন,—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্য দেখ্‌তে তার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। ঐ পূব্-আকাশে নবমী চাঁদ কেন উজ্জ্বল হয়েছে ? মগধ যাবার রাজপথের গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠ্‌ল, বেতবনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময় সে দেখ্‌লে – দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে' আস্‌ছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল ; দেবীকে আস্‌তে দেখে' সে তা হাতে তুলে' নিলে।

দেবী কুটিরের সাম্‌নে এলেন, তাঁর হাতে অনেক-গুলো আধ-ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সন্ন্যাসী কোথায় ?"

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "তিনি আবার কোথায় চলে' গেলেন। আজ আর আস্‌বেন না।"

তার পর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে' বল্‌লে, 'মা, না জেনে তোমার উপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্য একটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হ'য়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।"

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বল্‌লে, "শুনুন, আপনি বেশ করে' মনে করে' দেখুন দেখি আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন ?"

দেবী বল্‌লেন, "কেন, আমি ত বিদিশার পথের ধারে—"

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতার মত দেবী যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন…

প্রদ্যুম্ন দৃঢ়হস্তে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সাম্‌নে বাতাসে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠ্‌ল ; সঙ্গে

সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার আকাশে বদ্ধআঁখি বাতায়নপথবর্ত্তিনী তার মা!

(১০)

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সুমন্তদাসের মেয়ে। পিতামাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হ'য়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারু সঙ্গে সে তেমন মিশ্‌ত না, সর্ব্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকৃত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জ্জন পাষাণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন-মনে প্রায়ই কি ভাব্‌ত, মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আস্‌তে দেখ্‌লে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকৃত যেন কতদিন আগে তার প্রিয় আবার আস্‌বে বলে' চলে' গিয়েছিল, তারই আস্‌বার দিন গুনে' গুনে' এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ-চাওয়া···প্রতি-সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখী হ'য়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাব্‌ত বিকালে আস্‌বে, বিকাল কেটে গেলে ভাব্‌ত সন্ধ্যায় আস্‌বে—দিনের পর দিন মাসের পর মাস এ-রকম কত সকাল সন্ধ্যা কেটে গেল,—কেউ এল না... তবু মেয়েটি ভাব্‌ত আস্‌বে···আস্‌বে কাল আস্‌বে... পাতার শব্দে চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখ্‌ত—এতদিনে বুঝি এল ?

(১১)

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ত। কোথা-কার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকান এক অর্দ্ধ-ভগ্ন পাষাণ মূর্ত্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে শির্‌শির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণ মূর্ত্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে' গেছে। সে অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে' কেবলই বাজ্‌ছে মেঘমল্লার!...

ভোরে উঠে' রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেত —কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্ত্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!···

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীন স্পেন

(১)

স্পেনও চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। বিগত বিশ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া স্পেনের নরনারীর কোনো সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পরাজিত হইবার পর স্পেন একদম কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। সেই পরাজয়ের ফলেই এসিয়ার ফিলিপিন্ দ্বীপগুলা স্পেনের হাত হইতে যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে।

বিগত মহাযুদ্ধের সময়েও স্পেন নিঝুম মারিয়া পড়িয়া-ছিল। কিন্তু মাস-কয়েক ধরিয়া স্পেনে জাগরণ দেখা গিয়াছে। মরক্কোর মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের ধাক্কায় স্পেনের লোকেরা জাগিয়া উঠিয়াছে বুঝিতেছি। এই জাগরণের আন্দোলনে মাথা তুলিয়াছেন সেনাপতি দ'রিভেরা। ইঁহাকে ইয়োরোপ আমেরিকার রাষ্ট্রিকেরা ইতালীর মুসোলিনির সঙ্গে তুলনা করিতেছে। স্পেনের যুবক-সমাজেও 'ফাসি'-পন্থী ন্যাশনালিষ্ট আন্দোলন দেখা দিয়াছে। যুবক স্পেন স্বদেশে শক্তি-কেন্দ্র-শিল্প-শক্তি এবং ধনশক্তি গড়িয়া তুলিতে উদ্যোগী। বিদেশে একটা "বৃহত্তর স্পেন" গড়িয়া তোলাও যুবক স্পেনের সাধনার লক্ষ্য দেখা যাইতেছে।

(২)

দ'রিভেরা স্পেনের রাজশক্তিকে প্রবল করিয়া তুলিতেছেন। কার্টাগেনা শহরে ১৮৯৮ সালের মৃত

ফৌজ নাবিকদের কবর পরিদর্শন করিবার জন্য ইনি রাজা ও রাণীকে লইয়া যান। সেইখানে ইঁহাদের সবিশেষ সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। গোটা দেশের লোক রাজ-দম্পতীকে জাতীয়তার প্রতিমূর্ত্তিরূপে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

রাজা ও রাণী তার পর স্পেন ছাড়িয়া ইতালী পর্য্যটনে বাহির হন। এই ঘটনায় এক ঢিলে অনেক পাখী মারা হইয়াছে। দ'রিভেরার কৃতিত্ব স্পেনের কাগজে কাগজে চরম প্রশংসা পাইতেছে।

স্পেনের রাজবংশ ক্যাথলিক মতের খৃষ্টান। ইতালীতে রোমের ক্যাথলিক ধর্ম্মগুরু পোপ স্পেনের রাজদম্পতীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া গোটা খৃষ্টান জগতে স্পেনের ইজ্জৎ বাড়াইয়া দিয়াছেন।

(৩)

ইতালীর রাজবংশও ক্যাথলিক বটে। কিন্তু পোপের সঙ্গে ইতালীর নরপতির বনিবনাও ছিল না। এই বনিবনাও কায়েম করিয়া রাষ্ট্রীয় ঐক্য বাড়াইবার জন্য ইতালীর ফাসিষ্টরা একজন ক্যাথলিক রাজার সাহায্য খুঁজিতেছিল। পুরাণা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারীর বাদশা ক্যাথলিক ছিলেন। কিন্তু সেই বংশ যুদ্ধের ফলে লোপ পাইয়াছে।

কাজেই মুসোলিনির নজর ছিল স্পেনের দিকে। দ'রিভেরার সাহায্যে ইতালীয়ান্‌রা স্পেনের রাজা-রাণীকে স্বদেশে অতিথিরূপে পাইয়া তাঁহাদের দ্বারা "হ্বাটিকান" (পোপের দরবার) ও "কিরিনাল" (রাজ-দরবার) এই দুইএর বিবাদ মিটাইয়া লইতে পারিয়াছে। এইজন্য দ'রিভেরাকে তারিফ করিয়া ইতালীয়ান্‌রা স্পেনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। যুবক স্পেন ইতালীর প্রশংসা পাইয়া আরও জোরের সহিত জগতে "বৃহত্তর স্পেন" গড়িবার আন্দোলনে মাতিতেছে।

(৪)

স্পেন ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম উপদ্বীপ। আর ইতালী এই সাগরেরই মধ্য উপদ্বীপ। এই দুই উপদ্বীপের লোকেরা যদি একটা সমঝোতা করিয়া বসে' তাহা হইলে ইহারা ফ্রান্সকে কোণঠাসা করিতে পারে। ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য-তরী, রণতরী এবং ভারতপথও বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে।

ইতালীতে বেড়াইবার সময় দ'রিভেরা অথবা কোনো স্প্যানিশ কর্ম্মচারী এই ধরণের রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ সম্বন্ধে টুঁ পর্য্যন্ত করেন নাই। ইতালীর এবং স্পেনের সকল কাগজেই কেবলমাত্র বলা হইয়াছে যে দুই জাতির ভিতর ল্যাটিন রক্তের এবং ল্যাটিন সভ্যতার স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। সেই সম্বন্ধটাই পাকাইয়া তোলা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।

কিন্তু প্যারিসের "ম্যাতাঁ" দৈনিক জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন :—"তাহা হইলে ম্যাড্রিডের 'এল দেবাই' কাগজে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের স্পেন-ইতালীয় গুপ্ত সন্ধিটার কথা আলোচনা করা হইতেছে কেন?" সেই সন্ধিটা নাকি জার্ম্মাণ মন্ত্রিবর বিস্মার্ক ফ্রান্সকে রাষ্ট্রমণ্ডলে একলা কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার জন্য ঘটাইয়াছিলেন।

(৫)

ভূমধ্যসাগর বৃটিশসাম্রাজ্যের পক্ষে ভারত-পথ। এদিকে উত্তর আফ্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ করিতে হইলে দক্ষিণ ইয়োরোপের সকল দেশকেই এই পথের শরণ লইতে হয়। স্পেনের মরক্কো, ফ্রান্সের আল্‌জিরিয়া ও টুনিস্ এবং ইতালীর ত্রিপোলি সবই ভূমধ্যসাগরের রণতরীর উপর নির্ভর করে।

লণ্ডনের "টাইম্‌স্" বলিতেছেন :—"স্পেনের অল্প পূর্ব্বদিকে বালিয়ারিক দ্বীপগুলা স্প্যানিশদেরই মুল্লুক। এই দ্বীপগুলায় যদি পল্টনের ও জাহাজের কেন্দ্র কায়েম করা হয় তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরের জলপথ বিষম সঙ্কটা-পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। আর ইতালী এবং স্পেন যদি একমত হয় তাহা হইলে এই সাগরে বিদেশী যে-কোন রাষ্ট্রকে মাথা নীচু করিয়া চলিতেই হইবে।" বস্তুতঃ তাহা হইলে কম-সে-কম ফ্রান্সের পক্ষে আলজিরিয়া এবং টুনিস রক্ষা করা বিশেষ কঠিনই হয়।

(৬)

স্পেন হইতে এক ব্যক্তি জুরিখের "নয়েৎসির ৎসাইটুঙ" কাগজে একটা চিঠি লিখিয়াছেন। লেখক বলিতেছেন, রোম হইতে মাদ্রিদে পৌঁছিয়া দ'রিভেরা

প্রকাণ্ড সভায় জানাইয়াছেন যে, মিনর্কা দ্বীপের মাহন বন্দরে একটা উড়ো জাহাজের ডিপো গড়িবার বন্দোবস্ত চলিতেছে; এই ডিপো হইতে নিয়মিতরূপে ইতালীতে, স্পেনে এবং মরক্কোয় উড়োজাহাজ চলাফেরা করিবে।"

দ'রিভেরা রোমে থাকিবার সময় ফাসিষ্টদের বড় আফিসে কয়েকবার দেখা দিয়াছিলেন। ইতালীর আদর্শ, মুসোলিনির মহত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি ইতালীয়ান সমাজে বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াও তিনি "ল্যাটিন" জাতির গৌরব এবং মুসোলিনির কীর্ত্তি শতমুখে প্রচার করিতেছেন। যুবক স্পেন তাতিয়া উঠিতেছে।

মুসোলিনি এবং দ'রিভেরা দুয়ে মিলিয়া "বৃহত্তর ল্যাটিন" জগতের ফন্দি আঁটিয়াছেন। আটলান্টিকের অপর পারে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার যেখানে যেখানে স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত আছে সেই-সকল দেশের সঙ্গে স্পেনের বন্ধুত্ব কায়েম করিবার দিকে নজর পড়িয়াছে। শীঘ্রই স্পেনের রাজদম্পতী দ'রিভেরার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকায় শফরে বাহির হইবেন শুনা যাইতেছে। এই-সকল দেশে গণতন্ত্রের স্বরাজ কায়েম হইবার পূর্ব্বে স্পেনই তাহাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিল। সেই পুরানো স্মৃতিটা যুবক স্পেনের সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। আজকাল অন্ততঃপক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ যাহাতে ঐসকল দেশে পাকিয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা করা স্পেন এবং ইতালী দুইদেশের ফাসিষ্টদেরই সমবেত স্বার্থ।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

কৈকেয়ী

(১)

[দশরথ, কুলপুরোহিত, পৌর-নর-নারীগণ প্রভৃতি সকলের কাতরতা অগ্রাহ্য করিয়া হিংস্র অটলতার সহিত কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন।]

বলে বলুক মন্দ লোকে, নেইক লজ্জা, নেইক ভয়;
কিসের আবার মান অপমান? লভেছি আজ কাম্য জয়,
জয় লভেছি আত্মপ্রসাদ!—বহু দিনের বাঞ্ছা মোর
পূর্ণ যে আজ, তৃপ্ত এ বুক!—দুখের নিশা আজকে ভোর!
লক্ষ কথা বল্‌বে সতীন,—বলুক, তাতে ভয় কি পাই?—
তাই বলে' কি টল্‌বে এ মন? নেইক মনে ভয়ের ঠাঁই।
থাঁড়ার মত রূপ দিয়ে যেই জয় করেছে রাজার মন
তার আশা বল্ রুধ্‌বে কে বা? মন কবে তার কেই দমন?
আজ যা ভাবি কাল তা করি, অপূর্ণ নয় মনের সাধ;—
কৈকেয়ীকে দাবিয়ে দেবে? ঘট্‌বে যে তার বিষম বাদ।
চোদ্দ বছর ঠিক সে গোনা, একটি দিনও কমৃতি নয়;
রামকে ভালোবাস্‌তে পারি, তাই বলে' কি কর্‌ব লয়
মোর ভরতের পরম সুদিন আশার মুখে চাপিয়ে ছাই?
কৈকেয়ী নয় তেমন মেয়ে, লজ্জা তাহার নেইক নাই।
নাই গ্লানি তার, চায় না সুনাম, চায় মেটাতে প্রাণের আশ;
রাজার বেশে ভরত!—কী সুখ!—হৃদয় ভরে কী উল্লাস!
তাই দেখে' ত জুড়োবে প্রাণ, সুখ সে পরম অগাধ সুখ!—
সেই সুখেরি স্বপন আমার ভাসায় গ্লানি, বাঁধ্‌ছে বুক—
বাঁধ্‌ছে বুকে কর্‌তে বিলোপ সব অপবাদ, সব ঘৃণা;
আমায় বলে স্বার্থে ভরা?—কে রয় আপন সুখ বিনা?
যুদ্ধক্ষত—কৈকেয়ী তা চুমুক সেবুক সারিয়ে দিক!
উপহার তার নেইক কিছুই?—ধিক্ দশরথ, কথায় ধিক্!
মনটা যদি এতই চপল, কর্‌লে কেনই প্রতিজ্ঞা?
দেবো বলে' চাও ঠকাতে? কুণ্ঠা দিতে দেবার যা?
কৈকেয়ী নয় তেমন নরম গলাবে তায় চোখের জল!
বল্‌লে, দেবো, তাই চেয়েছি;—এতেই হলাম কপট খল?
হই না কপট, হলাম বা খল,—ঘৃণাই যদি, যাও ছেড়ে;
আমার ভরত রাজ্য পাবে—এ সুখ নেবে কেই কেড়ে?
মান্‌বে শাসন, কর্‌বে সে ভয়?—কৈকেয়ী সে পাত্র নয়!
চিরদিন যে জয় পেয়েছে আজ নেবে সে পরাজয়?
কাণাকাণি উগ্র কথা চোখের জলে টল্‌বে না,
যতই ছড়াও রোষের সে বিষ কৈকেয়ী তায় মর্‌বে না।

রাজার রাণী, নইত দাসী, বল্‌বে যে যা শুন্‌ব তাই ?
রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার মাতাও হ'তেই চাই।
সতীনের প্রেম—চাই নাক তা ; স্বামীর সোহাগ—
পেলাম ঢের ;
আত্মীয়েরি ভালোবাসা ?—যাক্ তা চুলোয়, আস্‌বে ফের,
সবই ফিরে' আস্‌বে সেদিন আস্‌বে যে-দিন সুদিন মোর,
ধুয়ে মুছে কর্‌ব বিলোপ এ হিংসা দ্বেষ আঁখির লোর।
রামের হবে রাজ্যাভিষেক, ভরত আমার রইল দূর,
কাঁটা সে কি ?—তাড়িয়ে দিলে তাকে হ'তে রাজ্যপুর ?
ফন্দী তোমার সব বুঝেছি, সব চাতুরী, দশরথ !
কাঁটা ভেবে সরাও তারে,—কাঁটায় তোমার ভর্‌ব পথ।
মন্থরা ! তুই ঠিক বলেছিস, রামকে দিয়ে রাজ্য-দেশ
আমায় এরা কর্‌বে নীচু, শাস্‌বে আঁখি রাঙিয়ে বেশ ;
শোধ নেবে সব হিংসা যত, কর্‌বে আমায় গর্ব্বহীন।
কেমন করে' হয় তা দেখি।—কৌশল্যা আর সব সতীন—
পায়ের নীচে রাখ্‌নু যাদের আমায় তারা দল্‌বে পায় ?
কৈকেয়ী এ ক্রূর নাগিনী, ছোবল দিতে সুখ সে পায়।
না, না, আমার নেইক ত প্রেম, রামকে ভালোবাস্‌ব না,
পরের ছেলে ভালোবেসে নিজের ছেলে ঠেল্‌ব না।
পুত্রশোকে মর্‌বে রাজা, কাতর হবে প্রজার দল
রাম গেলে বন।—ভরতকে কি আন্‌ল টেনে বানের জল ?
সে যদি হয় রাজা, তাতে দুঃখ বুড়োর হয় কিসে ?
প্রজাই এত কাতর কিসে ? রাজার ছেলে নয় কি সে
ভরত আমার ? আছি য'দিন দেখ্‌ব কেমন কে পারে
রুখ্‌তে তারি রাজা হওয়া।—কর্‌ব আমি ঠিক তারে
অযোধ্যা-রাজ-সিংহাসনের একচ্ছত্র রাজার রাজ ;
কৈকেয়ী নয় কোমল মেয়ে,—ইচ্ছা যা তার হয় তা কাজ।
কাঁদুক বুড়ো, কাঁদুক সতীন, কাঁদিয়ে আমায় কর্‌বে সুখ !
আমার মুখে ঢাল্‌বে কালি ?—কর্‌ব কালো সবার মুখ !

(২)

[দশরথের মৃত্যুর পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া ভরত কৈকেয়ীকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করেন এবং তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কৌশল্যার নিকট গমন করেন।]

স্পর্দ্ধা আমার !—আছেই ত তা, থাক্‌বে ত এই অহঙ্কার ;
সাধ করেছি যখন যা তা ঠিক করেছি ; সাহস কার
রুখ্‌তে মোরে, ঠেল্‌তে মোরে ?—মানুষ আমি জন্তু নই !
কিন্তু ভরত ভৎর্সনা করে !—শুনুনু তাও ? কারেই কই ?
আমায় বলে রাক্ষসী সে ! আমায় বলে স্বার্থপর !
আমায় বলে পিশাচী সে ! সাপের সমান বিষধর !
আর যে বলে বলুক এসব ; ভরত ! তুইও বল্‌বি সেই ?
বুকের রক্তে কর্‌নু মানুষ,—তার কি কোনই মূল্য নেই ?
কর্‌ব আমি তোর অশুভ ?—কেমন করে' বুঝ্‌লি তাই ?
সৎ-মা হ'ল আমার সেরা ? আমার মুখে ঢাল্‌লি ছাই !
যাহার জন্যে সব সয়েছি সে আজ মোরে দল্‌ল পায় !
স্বামীর সোহাগ ত্যাগ করেছি, সতীন-সোহাগ—
ছাড়্‌নু তায় ;
দাসদাসীদের মৌন ঘৃণা, অযোধ্যারি রোষের বিষ
তোর তরে যে সইনু সবি ! তুই আজ মোরে এ কি দিস্ !—
সেই অবজ্ঞা ! সেই হলাহল ! সেই অনাদর ! অপমান !
সব পীড়া প্রাণ সইতে পারে, তোর অপমান সয় না প্রাণ !
পেটের ছেলে হাতের মানুষ, সেই ভরত আজ এ কি তুই !
শুভই যা তা ভাব্‌ছি সদা ;—একটি যে তুই, নেইক দুই !
সিংহাসনে তোরে, মাণিক, দেখ্‌ব সে যে অগাধ সাধ ;
সব আশা মোর নিভিয়ে দিলি ? ঘটিয়ে দিলি কী প্রমাদ !
দুঃখ ঘৃণা সইনু সবি, ভাব্‌নু পাবি রাজ্যধন,—
সেই সুখে মোর রইল পরাণ, হর্ষে ভরা রইল মন।
সে ভরত আজ ত্যাগ করেছে, সে বলেছে—রাক্ষসী !
রাখ্‌নু চেপে যে-সব ব্যথা আজ উঠে সব উচ্ছ্বসি'।
যাক অযোধ্যা যাক রসাতল, আয় রে প্রলয় গর্জ্জে' আয় !
আমার স্বপন ভগ্ন যখন প্রাসাদ কেন, কে আর চায় ?
যাক ভেসে যাক আজকে রাতে অযোধ্যাদেশ লুপ্ত হোক্,
লুপ্ত হোক্ ও হাজার লোকের ঘৃণায়-ভরা ক্রুদ্ধ চোখ !
কৈকেয়ীকে কাঁদিয়েছে আজ ভরত তারি পেটের পুত ;
যে চোখে কেউ জল দেখেনি সে চোখে জল—শোকের দূত।
কাঁদ্‌ব আমি, নেই দুখ তায়, এ কান্নারি সঙ্গে আজ
যত্নে-রাখা এ রাজ্যপাট যাক রে নেমে পাতাল মাঝ।
আজকে হ'তে কৈকেয়ী সে ভাব্‌বে তাহার ছেলেই নেই।
ভরত—সে ত শত্রু তারি !—মরেছে সে, নেইক সেই।
নেবে না সে রাজ্য ও ধন, আন্‌তে রামে ছুটবে বন ;
আপন মাকে এই অপমান কর্‌লে ভরত !—কী ভীষণ !

দুঃখ সয়ে যার তরে আজ কিনৃনু আমি বিপুল সুখ,
বুক দিয়ে যায় করৃনু মানুষ, সে এই আমার রাখ্‌ছে মুখ!
যে গর্ব্ব মোর দাঁড়িয়েছিল উচ্চশিরে আকাশ-গায়,
ভরত!— তারে নুইয়ে ধূলায় কর্‌লি গুঁড়া অবজ্ঞায়!

(৩)

[ঘৃণায় ও বিদ্রূপে জর্জ্জরিতা কৈকেয়ী প্রাসাদ-কোণে গোপনে অনুতাপে চতুর্দ্দশ বৎসর কাটাইয়াছিলেন। রামের অযোধ্যায় ফিরিবার সময় তাঁহার অনুতাপ প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠে। মূল বাল্মীকির রামায়ণে উল্লেখ না থাকিলেও কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—রাম 'মা' বলিয়া না ডাকিলে বিষাক্ত লাড়ু খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন, কৈকেয়ী এমন প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলেন।]

চোদ্দ বছর রাম গেছে বন,—আস্‌ছে নাকি
কাল সে ফিবে,—
বাহন তারি কোন্ হনুমান জানিয়ে গেল। কালকে কি রে
এই পোড়া মুখ তুলব আমি সেই সে রামের চোখের 'পরে,
হিংসা-বিষে জ্বলিয়ে যারে তাড়িয়ে দিনু সুখের তরে?—
তাড়িয়ে দিনু গহন বনে,—রাজ্য-সুখ ও স্নেহের সুখ
সকল কেড়ে করৃনু [illegible], শাস্তি দিনু কঠোর দুখ।
চোদ্দ বছর প্রতিটি দিন রামের ব্যথা বাজ্‌ল মোর
পাষাণ বুকে; বনচারী তার নয়নের তপ্ত লোর
অগ্নিবিন্দু সমান আমার বুকের মাঝে রাত্রিদিন
বোধ করেছি, জ্বালিয়ে দেছে, পুড়িয়ে মোরে করৃলে ক্ষীণ।
সেদিন আমি ভুলিনি যে—আমিই যেদিন পাঠাই বনে
সাশ্রু চোখে মোরই কাছে বিদায় নিলে মোর চরণে!
তখন মনে দিইনি আমল তার সে কাতর করুণ ছবি,
ভরত আমায় ছাড়্‌লে যেদিন, সেদিন হ'তে বুঝ্‌নু সবি
রামের বেদন, তার সে ছবি রইল জেগে ব্যথার সাথে,—
সে ব্যথা মোর নিত্য সাথী স্বপ্নে জেগে দিনে রাতে।
ছাড়্‌লে সতীন, পৌরনারী, ছাড়্‌লে দাসী, রাখ্‌লে দূরে
ক্রূর নাগিনী কৈকেয়ীরে শিউরে ভয়ে বিজন পুরে।
বিরাট্ পুরীর একটি কোণে বরৃনু কঠোর নির্জ্জনতা,
দিনের পরে দিন চলে' যায়,—বক্ষে জমে বিরাট্ ব্যথা।
ক্রূর নাগিনীর বিষের সে দাঁত ভাঙ্‌লে ভরত—
জানবে কে তা?
পুড়্‌ছে গরল দুখের দাহে, বুঝ্‌লে না কেউ, কেউ না হেথা!
রাম-বনবাস-ষষ্ঠ-দিনে দশরথ ত ত্যজ্‌লে দেহ,
ভরত দিলে ভর্ৎসনা মোরে, রইল কে আর করৃতে স্নেহ?
কার কাছে আর দাবী আমার, কার কাছে মোর গর্ব্ব রবে—
শাসিয়ে যারে ভুলিয়ে যারে কৈকেয়ী তার কাম্য লবে?
সেদিন হ'তে নেই কেহ নেই, রইনু কোণে ঘৃণ্য একা;
লক্ষ লোকের মনে কেবল হিংসা আমার রইল লেখা!
হিংসামূলে ঘুণ ধরেছে, বোঝেনি তা কেউ দরদী;
কেউ আসেনি জান্‌তে কি তাপ করৃছে শোষণ নিরবধি।
আপন-গড়া দুঃখ আমার আপন হ'য়েই রইল নিতি,—
জান্‌লে না কেউ,—পেলাম শুধু নিদয় ঘৃণা, নিদয় ভীতি।
বনে বনে রাম ঐ ঘোরে দুঃখে ক্লেশে,—আমার হিয়ায়
সে ব্যথা যে বাজ্‌ল কী ঘোর কী পীড়াময়—
বুঝ্‌বে কে তায়?
আমায় সে যে 'মা' বলেছে—সে কথা কি ভুল্‌তে পারি?
পাষাণ ছিনু সে এক দিনে,—তাই বলে' কি নইক নারী?
ছয় ছটা দিন পাশের ঘরে দশরথের আর্ত্তরবে
প্রাণ গলেনি,—আশায় ছিনু প্রাণের ভরত বস্‌বে যবে
অযোধ্যারি সিংহাসনে, মিট্‌বে আমার সকল গ্লানি;
তার পরে সব উল্টে' গেল,—ভরত দিলে বজ্র হানি'!—
সেই আঘাতে গর্ব্ব গুঁড়, সেই আঘাতে বুঝ্‌নু আঘাত
রামের বুকে দিলাম যাহা—ঘট্‌ল যাহে রাজার নিপাত।
গভীর রাতে রোজ মনে হয়—দাঁড়িয়ে যেন সেই দশরথ
সাম্‌নে আমার ক্রুদ্ধ চোখে কট্‌মটিয়ে,—করৃবে যে বধ!
চম্‌কে শুনি, ঘুম ভেঙে যায়, পাঁজর-ভাঙা সেই সে ধ্বনি
দশরথের সেই সে বিলাপ,—বুক কাঁপে মোর, প্রহর গণি!
মূর্ত্তিমন্ত এস রাজা জীবন লয়ে দাঁড়াও ভুঁয়ে—
সব অপরাধ করৃব স্বীকার, চাইব ক্ষমা চরণ ছুঁয়ে।
বসনহীনা ভিখারিণীর নগ্ন গায়ে বৃষ্টি-ধারা
যেমন বেঁধে, তেম্‌নি যে রে রামের নিশাস তীব্র প্যারা
আমার বুকের চামড়া ভেদি' মর্ম্মমাঝে বেদন তোলে!
অনশনে রাম যে বনে,—সে কথা কি এ মন ভোলে?
চোদ্দ বছর 'মা' বলেনি ভরত আমায়—পাইনি কোলে,
সকল স্নেহ সব অভিমান বক্ষে জমে' উতল দোলে!
হিংসা যত উচ্চাভিলাষ বিলুপ্ত মোর, কান্না খালি
রূপ নিয়েছে অগাধ স্নেহের—সঁপ্‌ব কারে এ মোর ডালি?

কী অপমান আমার হবে ভাব্‌লে না তা, ছুট্‌ল ভরত
রামকে হেথায় ফিরিয়ে নিতে ;—কিন্তু রামের উদার দরদ
মোর অপমান রক্ষা করে' চাইলে নাকো রাজ্য পেতে,—
সে কথা যে আমার মনে জাগ্‌ল কত দিনে রেতে।
সেই ত আমার স্নেহের ভাজন, সেই ক্ষমাবান্, দুঃখে সুখী,
কাঁদন আমার স্নেহ আমার তারেই দেবো—দুখের দুখী।
কাল সে ফিরে' আস্‌বে ঘরে, কিন্তু যদি 'মা' না বলে'
আমায় যদি নাই ডাকে সে, ঘৃণায় ছেড়ে যায় সে চলে' ?—
কোন্‌খানে ঠাঁই থাক্‌বে আমার ? কোন্ সুখে আর
বাঁচ্‌তে চাবো ?
মর্‌ব খেয়ে—এই রেখেছি বিষের লাড়ু খাবই খাবো।
কৈকেয়ী নাম ঘুচ্‌বে তবে, মুছ্‌বে সবার পথের কাঁটা,
তার বেদনা তারই সাথে বিলীন হবে—পাঁজর-ফাটা !
কিন্তু জানি এমন নিদয় নয় ত সে রাম—নয় ত কঠোর,
আস্‌বে সে ঠিক আমার পাশে,—বাঁধ রে আশা,
রে চিত্ত মোর !

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত

আমরা দেখেছি গানে মাত্রার সমতা (অর্থাৎ ধ্বনির গতি-সাম্য) এবং ধ্বনির গতিক্রম গানের লয় ও লয়ের প্রকার-ভেদকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ঐ গতিক্রম বা লয়ের দ্রুততা ও ধীরতা ভেদে মাত্রারও স্থায়িত্বকাল পরিবর্ত্তিত হয়। কবিতায় এসমস্ত সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন হয় না। প্রথমত, কবিতায় গানের মত মাত্রার কাল-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করে' দেওয়া অনাবশ্যক। সঙ্গীত-শাস্ত্রে মোটামুটিভাবে এক মাত্রার একটি কাল-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই বটে ; কিন্তু প্রত্যেকটি বিশেষ গানে এক মাত্রা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা নির্দ্দেশ করে' দিতে হয় ; —লয় দ্রুত হ'লে মাত্রা অল্প স্থায়ী হয়, লয় মন্থর হ'লে মাত্রার স্থিতিকাল বেড়ে যায়। একটি লঘু স্বরের উচ্চারণে যে সময় লাগে তাই একমাত্রার পরিমাণ, এটি সাধারণ সংজ্ঞা এবং এ সংজ্ঞা সঙ্গীতে ও কাব্যে সমভাবে খ টে। কিন্তু গানে লয়-ভেদে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণ-কাল বাড়্‌তেও পারে কম্‌তেও পারে এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রে মাত্রা পরিমাণের বাড়্‌তি-কম্‌তির সূক্ষ্ম হিসাব রাখ্‌তে হয়। কিন্তু কাব্য-ছন্দে তা নয়। কবিতায় ধ্বনির গতি-সমতা (অর্থাৎ লয়) এবং গতিক্রমে (অর্থাৎ লয়-ভেদের) গণনা করা হয় না ; সুতরাং লয়-ভেদে কবিতা বিশেষে মাত্রা-পরিমাণেরও বাড়্‌তি-কম্‌তি গণ্য হয় না। অর্থাৎ 'কবিতায় সকল প্রকার ছন্দেই মাত্রা-পরিমাণ মোটামুটি স্থির থাকে বলে'ই ধরে' নেওয়া হয়, সুতরাং এক মাত্রা বল্‌তে যে কতটা কাল বুঝায় তার হিসাব রাখা হয় না। কাজেই কবিতায় মাত্রার সংজ্ঞাটা অনেকটা অস্পষ্ট ও অনির্দ্দিষ্টই থেকে যায়; একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকালই এক মাত্রা, সে কালটুকুতে কত অনুপল বা পল বুঝায় তার হিসাব রাখা কাব্যের ছন্দে নিষ্প্রয়োজন বলে'ই গণ্য হয়।

কিন্তু তা হ'লেও গীত-ছন্দের মাত্রা ও লয় সম্পৃক্ত বিশেষত্বগুলোর সহিত কাব্য-ছন্দের যে কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই তা নয়। কারণ উভয় ছন্দই ধ্বনি এবং ধ্বনি-শাস্ত্রকে অবলম্বন করে'ই আপন আপন অস্তিত্ব রক্ষা কর্‌ছে। কাজেই এদুয়ের মধ্যে খানিকটা সামান্য ধর্ম্ম আছে। কাব্য-ছন্দেও যে সঙ্গীত-ধর্ম্ম অন্তত অতি অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে, কোনো-একটি কবিতার যথারীতি আবৃত্তি কর্‌লেই এতথ্যটি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু কবিতায় সঙ্গীতের প্রকৃতি উপলব্ধি কর্‌তে হ'লে খুব তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। একটু নিগূঢ়ভাবে দেখ্‌লেই কবিতায় ও সঙ্গীতের মাত্রা ও লয়-সম্পর্কীয় লক্ষণ-গুলো লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবিতায় এ লক্ষণগুলো স্পষ্ট ব্যক্ত নয় ; কারণ, পূর্ব্বেই বলেছি গানে ধ্বনির যত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কর্‌তে হয় কবিতায় তত প্রয়োজন হয় না।

প্রথমত, লয়ের কথা। আপাতত কবিতায় লয়ের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না বটে, এবং কাব্য ছন্দ-শাস্ত্রে লয়ের কথা আলোচিতও হয় না বটে, কিন্তু তথাপি যথাযথরূপে কবিতা আবৃত্তি কর্‌তে হ'লে লয় রক্ষা করা আবশ্যক অর্থাৎ সমগ্র কবিতাটা সমান গতিতে আবৃত্তি করা প্রয়োজন। গানে লয় সম্বন্ধে যতটা সচেতন ও সচেষ্ট থাকৃতে হয় কবিতা আবৃত্তি করায় সময় ততটা প্রয়াস আবশ্যক হয় না বটে; তবু আবৃত্তি করার সময় যদি প্রতিমাত্রার স্থিতিসাম্য অর্থাৎ লয় ঠিক না থাকে তবে আবৃত্তি সুন্দর হয় না, প্রতিপদেই শ্রুতিকটুতা-দোষ ঘটে। সেজন্যে কবিতার ক্ষেত্রে লয় শব্দের ব্যবহার না হ'লেও আবৃত্তিকারকের স্বাভাবিক শ্রুতিরুচির প্রখরতা ভেদে লয়ের পার্থক্য হেতু ব্যক্তি ভেদে কবিতার আবৃত্তি মধুর ও কটু হয়। শ্রুতিরুচির পুনঃ পুনঃ চর্চ্চা দ্বারা লয় রক্ষা করার ক্ষমতা আয়ত্ত হ'যে গেলেই আবৃত্তি মার্জ্জিত ও সুন্দর হয়।

দ্বিতীয়ত, ধ্বনির গতিক্রম বা লয়-ভেদের কথা। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই—দেখা যাবে যে সব কবিতাই সমান লয়ে আবৃত্তি কর্‌লে ভালো শোনায় না, কোনো কবিতা একটু দ্রুত লয়ে এবং কোনো কবিতা একটু ধীর লয়ে আবৃত্তি কর্‌লেই শ্রুতিমধুর হয়। কাজেই দেখা যায় কবিতায়ও ধ্বনির গতিক্রম ভেদে লয়-ভেদ হয়। যদিও ছন্দ শাস্ত্রে এসমস্ত সূক্ষ্ম ভেদের প্রতি কোনো লক্ষ্য রাখা হয় না এবং ধ্বনির গতিক্রমের কোনো হিসাব রাখা হয় না, তথাপি কবিতায় ও ধ্বনির যে অল্প-বিস্তর লীলা-বৈচিত্র্য আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকৃতে পারে না; কারণ কানই আপনি রুচির উপর নিভর করে' এবিষয়ে সাক্ষ্য দান করে।

তৃতীয়ত, মাত্রার কথা। দেখা গেল যে কবিতা-ভেদে লয়েরও দ্রুততা মন্থরতা প্রভৃতি ভেদ হ'য়ে থাকে। তাই যদি হয় তবে কবিতা-ভেদে মাত্রারও স্থিতিকাল পরিবর্ত্তিত হয়, কারণ মাত্রার স্থিতিকালের উপরেই লয়ের গতিক্রম নির্ভর করে। সুতরাং খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখ্‌লে কাব্য-ছন্দ-শাস্ত্রেও মাত্রার একটা অপরিবর্ত্তনীয় স্থিতি-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নেই; কবিতা-ভেদে ও আবৃত্তিকারক ভেদে মাত্রা-পরিমাণও একটু এদিক্ ওদিক্ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে থাকে। দ্রুত-আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা যতক্ষণ স্থায়ী হবে ধীর-আবৃত্ত কবিতায় মাত্রা তার চেয়ে বেশি স্থায়ী হবে, একথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু তা হ'লেও ছন্দ-শাস্ত্রে মাত্রার এ পরিবর্ত্তনশীলতা গণ্য নয়, গণনা করা অনাবশ্যক। কেননা—কবিতায় লয়-ভেদ ও সেজন্য মাত্রার এ পরিবর্ত্তন অতি সামান্য এবং শ্রুতির উপর তার ক্রিয়াফলও বেশী নয়; তা হ'লেও শ্রোতা ও পাঠকের অলক্ষ্যে এই মাত্রা ও লয়ের প্রকার-ভেদ আবৃত্তিকালে কবিতা বিশেষকে মধুর ও কর্কশ করে' তোলে। কিন্তু গানে লয়ের গতিবেগ ও মাত্রার এ পরিবর্ত্তনের উপরে গানের প্রকৃত স্বরূপ ও শ্রুতি-মধুরতা খুব বেশি নির্ভর করে এবং এজন্যেই গানে এগুলোর খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম হিসাব রাখ্‌তে হয়।

এক্ষণে আমরা দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টাকে আর-একটু বিশদ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব। আশা করি দৃষ্টান্তগুলো থেকেই পাঠক বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, যদিও কাব্য-ছন্দের ক্ষেত্রেও ধ্বনির মাধুর্য্য ও সার্থকতা আসলে সুরের লয় ও মাত্রার স্থিতি-পরিমাণের উপর অনেকটা নির্ভর করে তথাপি তাদের ক্রিয়াফল কার্য্যত এতটা অকিঞ্চিৎকর যে ছন্দশাস্ত্রে তাদের হিসাব রাখা অনাবশ্যক। প্রথমত মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তই দেখা যাক।—

যুগে যুগে অভিসার করি' লঘুপক্ষে,
নাই লীলা দেবতার অনিমেষ চক্ষে;
আকাশের দুই তীর হ'তে নাহি দিই থির,
টিঁকি নাকো পৃথিবীর সীমাঘেরা বক্ষে।

আকাশের ফুল মোরা, দ্যুতি মোরা দ্যুলোকে,
স্বপনের ভুল মোরা ভুল-ভরা ভূলোকে।
চরণে হাজার হিয়া কেঁদে মরে গুমরিয়া,
ধূলি হ'তে ফুল নিয়া পরি মোরা অলকে।

—সত্যেন্দ্রনাথ

এটা চতুর্মাত্রিক ছন্দের দৃষ্টান্ত। এ ছন্দে ঘন ঘন যতি পড়ে, এবং পড়্‌লেই বোঝা যাবে এ ছন্দের স্বাভাবিক লয় দ্রুত। পঞ্চমাত্রিক ছন্দের লয়ও দ্রুত বটে. কিন্তু এ ছন্দের চাইতে কিছু মন্থর। যথা—

জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কেন দুর্গমে,
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু জড়-জঙ্গমে।

অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা কর আবিষ্কার,
সত্য পথ-যাত্রী ওগো তোমায় করি নমস্কার।

—সত্যেন্দ্রনাথ

ষণ্মাত্রিক ছন্দের গতি আরো মন্থর। যথা—

সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা ;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদী-তীরে ধীরে দিলেন দেখা।
* * * *
মনে হ'ল মোর নব জনমের
উদয়-শৈল উজল করি'
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি'।

—রবীন্দ্রনাথ

কেবল যে ছন্দ-ভেদেই লয় দ্রুত বা মন্থর হয় তা নয়, রচনা-ভেদে একই ছন্দের লয়ে অনেক পার্থক্য হ'তে পারে। আরেকটা ষণ্মাত্রিকেরই নমুনা দিচ্ছি, পাঠক দেখ্‌তে পাবেন রচনা-ভেদে এটার লয় পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তি ক'টির চাইতে কত বেশী ধীর। যথা—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিছ ফুল-কাননে,
দ্যুলোকে ভূলোকে বিলসিছ চল-চরণে,
তুমি চঞ্চল-গামিনী।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্ত বর্ণের সাহায্যে ধ্বনি-প্রবাহ যেমন বৈচিত্র্য লাভ করে, স্বরবর্ণের বাহুল্যে তেমতি মন্থর (কিন্তু একঘেয়ে) হ'য়ে ওঠে। এবার স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দেব। এ ছন্দ স্বভাবতই নৃত্যপরায়ণ ও দ্রুতগতি। কিন্তু এ ছন্দেও মন্থর ও গম্ভীর কবিতা রচনা করা যায়। যথা —

পিছল পথে নাইক বাধা, পিছনে টান নাইক মোটে,
পাগ্‌লা ঝোরার পাগল নাটে নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে!
লাফিয়ে পড়ে ধাপে ধাপে, ঝাঁপিয়ে পড়ে উচ্চ হ'তে
চড়্‌চড়িয়ে পাহাড় ফেঁড়ে, নৃত্য ক'রে মত্ত স্রোতে ;
* * * *
গুহার তলে গুম্‌রে কেঁদে, আলোয় হঠাৎ হেসে উঠে',
ঐরাবতের বৈরী হ'য়ে কৃষ্ণ মৃগের সঙ্গে ছুটে,
স্তব্ধ বিজন যোজন জুড়ে' ঝঞ্ঝা-ঝড়ের শব্দ ক'রে,
অসাড় প্রাচীন জড় পাহাড়ের কানে মোহন মন্ত্র প'ড়ে.

পরাণ ভ'রে নৃত্য ক'রে মত্ত ছিলাম স্বাধীন সুখে,
ছন্দছাড়া আজকে আমি যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে ;
যাচ্ছি ম'রে মনের দুখে পূর্ব্ব সুখে স্মরণ ক'রে ;
ঝারির মুখে ঝরার মতন শীর্ণ ধারায় পড়্‌ছি ঝ'রে।

— সত্যেন্দ্রনাথ

এইখানে ছন্দ যেন পাগ্‌লা ঝোরার মতোই উন্মত্ত হ'য়ে নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে ছুটে চলেছে। কিন্তু এই চতুঃস্বরের ছন্দেই কেমন ধীরগতির গম্ভীর কবিতা রচনা করা যায় তা নিম্নের ক'টি ছত্র পড়্‌লেই বোঝা যাবে। যথা—

ভাব-সাধনার এই ভুবনে এস তোমার নূতন বাণী ল'য়ে,
বিরাজ কর ভারত-হিয়ার ভক্ত-মালে নূতন মণি হয়ে ;
ব্যথা-ভরা চিত্ত মোদের—খানিক ব্যথা ভুল্‌ব তোমায় হেরি' ;
সত্য-সাধন নিষ্ঠা শিখাও, বাজাও গভীর উদ্বোধনের ভেরী।

—সত্যেন্দ্রনাথ

কিন্তু দু'স্বরের ও তিনস্বরের ছন্দের অত্যন্ত ত্বরগতি,—সে ছন্দকে গাম্ভীর্য্য ও মন্থরতা দান করা একরকম অসম্ভব বল্‌লেই হয়। এদিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে অক্ষরবৃত্তই গম্ভীর ভাবের সবচেয়ে উপযুক্ত বাহন, একথা পূর্ব্বেই বিশদরূপে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এ-স্থলে অক্ষর বৃত্তের আরো দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ; পাঠক পূর্ব্বের মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন এ ছন্দের লয় কত ধীর-গতিতে চলে। যথা—

হে আদি জননী সিন্ধু, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
এক মাত্র কন্যা তব কোলে। তাই তন্দ্রা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্র সম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অম্বরে, মহেন্দ্র-মন্দির পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল গানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর, আলিঙ্গনে সর্ব্ব অঙ্গ ঘিরে'
তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি', নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধরি', সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।

—রবীন্দ্রনাথ

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি'
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!
আদিম বসন্ত-প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডান হাতে সুধা-পাত্র, বিষ-ভাণ্ড লয়ে' বাম করে ;
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়েছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি' অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত দুটোতে সমুদ্রের গভীর এবং গম্ভীর গর্জ্জনধ্বনি যেমনভাবে প্রতিধ্বনিত করা হয়েছে অক্ষরবৃত্ত ছাড়া অন্য ছন্দে তা সম্ভব হয় না।

যা হোক্, এখন আবার আমাদের আসল কথার অবতারণা করা যাক। পূর্ব্বোদ্ধৃত সবগুলো দৃষ্টান্ত একে একে পড়ে' গেলে আপনা থেকেই এ সত্যটা মনে জেগে উঠ্‌বে যে, সব কবিতা সমান গতিতে বা সমান লয়ে পড়া যায় না বা পড়্‌লে ভালো শোনায় না। এক-এক ছন্দের কবিতা এক-একটা বিশেষ লয়ে পড়্‌লেই যেন তাদের ভিতরকার সমস্ত ভাব-সৌন্দর্য্য ভাষার ও ছন্দের ভিতর দিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠে। কবিতা-ভেদেও লয়ের পার্থক্য হয়; অর্থাৎ কোনো কবিতার যতি ও তাল যেন অত্যন্ত ব্যস্ত ও দ্রুত এবং লয়ও তখন গতির আবেগে উন্মত্ত হ'য়ে ছুট্‌তে থাকে; আবার অন্য কবিতায় যতি ও তাল যেন এক-একটা বিশাল তরঙ্গের মত অনেকক্ষণ পরে উত্থিত হ'য়ে মনকে স্তম্ভিত করে' দিতে থাকে এবং লয়ও যেন আপন গুরুগম্ভীর ও মন্থর গতিতে মনকে কোন্ অকুল সমুদ্রের অতল গভীরতার মধ্যে তলিয়ে দিতে থাকে। লয়ের এই গতিবেগের পার্থক্যে মাত্রারও স্থিতিকালের পার্থক্য হয়, একথা আগেই বুঝান হয়েছে। মাত্রাবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রথম দৃষ্টান্তটির তুলনা কর্‌লেই টের পাওয়া যাবে যে, একটার এক-একটি বর্ণ—যতক্ষণ স্থায়ী হয় আর-একটার এক-একটি বর্ণ—তার চাইতে বেশী স্থায়ী হয় এবং একথাও টের পাওয়া যাবে যে, এপার্থক্য এত সূক্ষ্ম ও এত পরিবর্ত্তনশীল যে তাকে হিসাবের মধ্যে কিছুতেই আনা যায় না। এজন্যেই কাব্য-ছন্দে মাত্রার স্থায়িত্ব-ভেদের কোনো গণনা করা হয় না এবং সুবিধার জন্যে সব কবিতারই মাত্রাকে সমকাল স্থায়ী বলে' গণ্য করা হয়। কিন্তু গান-ভেদে মাত্রার স্থায়িত্বভেদ খুবই প্রচুর এবং মাত্রার এ পরিবর্ত্তনশীলতা কোনো নিয়ম মেনে চলে; সেজন্যে সঙ্গীতশাস্ত্রে তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিসাব রাখা প্রয়োজন হয়।

আশা করি এতক্ষণে আমরা কবিতায় ও গানে লয় ও মাত্রার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তার পার্থক্য পাঠকের নিকট অনেকটা স্পষ্ট করে' তুলতে পেরেছি। এক্ষণে কাব্যে ও গানে যতি ও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে'ই এ প্রসঙ্গ শেষ কর্‌ব। কিন্তু সে আলোচনা করার পূর্ব্বে কবিতার মাত্রা সম্বন্ধে আরো কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে মাত্রা সম্বন্ধে যা বলেছি তা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধেই বিশেষভাবে খাটে; সুতরাং মাত্রাবৃত্তের মাত্রা বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বলার দর্‌কার নেই। কিন্তু অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা-নির্ণয় ও মাত্রার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা সঙ্গত। কেবল কাব্য-ছন্দের দিকেই যদি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তা হ'লে অক্ষর-ও স্বরবৃত্তে মাত্রা-নির্ণয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কেননা ওই দুটি ছন্দ মাত্রা-পরিমাণের উপর নির্ভর করে' রচিত হয় না,—মাত্রাই ও-দুটি ছন্দের নিয়ামক নয়। মাত্রাবৃত্তে কিন্তু মাত্রা-পরিমাণের উপরেই ছন্দের স্বরূপ ও সার্থকতা নির্ভর করে এবং এজন্যই এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত বলে' অভিহিত করা হয়েছে। এসমস্ত কথাই ছন্দের নাম-করণের সময়েই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু কেবল কাব্যছন্দের দিকে দৃষ্টি না রেখে যদি গানের ছন্দটাও আমাদের চোখের সাম্‌নে রাখি তা হ'লে অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দেও মাত্রা নির্ণয় করা আবশ্যক হ'য়ে উঠে। কেননা ওই দুটি ছন্দে রচিত গান যখন সুরে লয়ে গাওয়া হয় তখন এদেরও মাত্রার হিসাব রাখা প্রয়োজন; গানের কথা যে শুধু মাত্রাবৃত্তেই রচিত হয় তা ত নয়ই,—বরং অধিকাংশ গানের কথাই সচরাচর স্বরবৃত্তে বা অক্ষরবৃত্তে রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু গাইতে হ'লেই যখন মাত্রা ও লয়ের হিসাব রাখ্‌তে হয় তখন গানের তরফ থেকে এ-দুটি ছন্দেও কি করে' মাত্রা নির্ণয় করা সঙ্গত তাই দেখাতে চেষ্টা কর্‌ব। কিন্তু একথা এস্থলে বলে' রাখা উচিত যে, এ দুটি ছন্দের যে সব কবিতা সুরে লয়ে গাওয়া যায় কেবল সে-সব কবিতারই যে শুধু গানের পরিমাপে মাত্রা নির্ণয় করা যায় তা নয়; যে-সব কবিতা গাওয়া হয় না সেগুলোরও মাত্রার হিসাব গানের পরিমাপে করা যায়, এইটুকুই আমার

বক্তব্য। দৃষ্টান্ত দিলেই একথা পরিষ্কার হবে। যথা—

+ + . .

"বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ।"

এটা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা। এ পংক্তিটিতে আঠারোটি অক্ষর আছে। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত-ছন্দের রীতি অনুসারে এখানে বিশটি মাত্রা পাওয়া যাবে, কেননা চিহ্নিত স্বর দুটোকে মাত্রাবৃত্তে দ্বি-মাত্রিক বলে' ধর্‌তে হবে। কিন্তু গানের রীতি অনুসারে এখানে মাত্রাও বিশটি বলে'ই গণ্য কর্‌তে হবে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে একমাত্রা এমন একটি আদর্শ কালপরিমাণ যা সকল কবিতাতেই সমভাবে খাটে; মোটামুটিভাবে একটি লঘু স্বরের উচ্চারণকালই এ ছন্দের সেই আদর্শকাল; এবং এ আদর্শ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনীয় বলে' ধরে' লওয়া হয়। কিন্তু গানে এ আদর্শকালটি গান-ভেদে পরিবর্ত্তিত হয় এবং কোথাও দীর্ঘ-ক্ষণ-স্থায়ী, কোথাও অল্পক্ষণ-স্থায়ী হয়; সুতরাং মোট কালপরিমাণ বেড়ে গেলেও মাত্রাসংখ্যা স্থিরই থেকে যায়। কবিতায় ও-হিসাবটা অনেকটা চালান যায়। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিই,—

"কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা"

এখানে অক্ষর-সংখ্যা চোদ্দ। কিন্তু মাত্রা-সংখ্যা কত সেইটেই হচ্ছে প্রশ্ন। প্রথমেই দেখা যায় এখানে গুরুস্বর ছটি এবং লঘুস্বর আটটি। সুতরাং চোদ্দটি লঘুস্বরের উচ্চারণে যে-সময় লাগে উক্ত পংক্তিটি যথাযথ রূপে উচ্চারণ কর্‌তে তার চেয়ে বেশী সময় লাগ্‌বে তা সহজেই বোঝা যায়। সুতরাং একটি লঘুস্বরের উচ্চারণে সাধারণত যে সময় লাগে সেই অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শকালটিকে একক ধরে', হিসাব কর্‌লে উক্ত পংক্তিতে মাত্রা-সংখ্যা চোদ্দ ত নয়ই, বরং বিশ; কেননা এখানে ছ'টি গুরু বা দ্বিমাত্রিক এবং আটটি লঘু বা একমাত্রিক স্বর আছে। এটি হ'ল কাব্য-ছন্দের হিসাব। কিন্তু গানের হিসাবের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে বল্‌তে হবে এখানে মাত্রাসংখ্যাও বিশটি; কিন্তু ছন্দ এখানে ধীর লয়ে চল্‌ছে বলে' এখানে মাত্রা-পরিমাণও সাধারণ একক মাত্রার চাইতে কিছু বেশী। আরো একটু বিশদ করিছ। একটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

"হাজার হাজার | বছর কেটেছে | কেহ ত কহেনি | কথা
ভ্রমর ফিরেছে | মালতী-কুঞ্জে, | তরুরে ঘিরেছে | লতা"।

এ-দৃষ্টান্তের সঙ্গে ঠিক্ এক লয়ে, অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তের ধরণে নিম্নের পংক্তিটি পড়ুন—

কুন্দ-শুভ্র। নগ্ন-কান্তি। সুরেন্দ্র-বন্। দিতা।

পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন এর প্রথম তিন পাদে ছ'টি করে' মাত্রা আছে, এবং শেষ পাদে দু মাত্রা। সবসুদ্ধ বিশটি মাত্রা। পড়ার ধরণ থেকেই বোঝা যাবে উপরের তিনটি পংক্তিতেই বিশ মাত্রা করে' আছে। সুতরাং তৃতীয় ছত্রটিতে কেমন করে' বিশ মাত্রার হিসাব পাওয়া যায় তা সহজেই দেখা গেল। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে এখানে মাত্রার একক পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ-স্থানীয়, অর্থাৎ এক লঘুস্বরের উচ্চারণের সমস্থায়ী। এখন আবার সেই ছত্রটিই অক্ষরবৃত্তের তালে আবৃত্তি করুন।

কুন্দ-শুভ্র নগ্ন-কান্তি। সুরেন্দ্র বন্দিতা।

পড়্‌লেই বোঝা যাবে এ ছন্দ কেমন ধীর-গম্ভীর লয়ে চলেছে; অর্থাৎ এর লয় মন্থর। এখন সমগ্র পংক্তিটা পড়্‌তে মোট যে-পরিমাণ সময় লেগেছে তাকে চোদ্দটি অক্ষরের মধ্যে সমভাগে পরিবেষণ করে দিন; তা হ'লে প্রত্যেক অক্ষরের ভাগে যে সময়টুকু পড়েছে তাকেও এক হিসাবে অর্থাৎ গীত-ছন্দের হিসাবে একমাত্রা বলা যায়। এহিসাবে এখানে চোদ্দটি মাত্রা আছে, কিন্তু এর প্রত্যেকটি মাত্রা অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ-কাল অর্থাৎ একটি লঘুস্বরের স্বাভাবিক উচ্চারণ-সময়ের চাইতে একটু বেশী হবে। অতএব দেখা গেল এক হিসাবে উক্ত ছত্রটিতে বিশ মাত্রা এবং আর-এক হিসাবে চোদ্দ মাত্রা আছে, এবং বলা বাহুল্য দ্বিতীয়প্রকারের মাত্রা প্রথমপ্রকারের মাত্রার চাইতে ওজনে কিছু বেশি হবে। যদি লেখা হ'ত—

কুসুম- ধবল-রূপ | সুরেশ-পুজিতা

তা হ'লে এখানে অক্ষর-সংখ্যা তো চোদ্দ হ'তই, মাত্রা-সংখ্যাও চোদ্দই হ'ত এবং গীত-ছন্দ ও কাব্য-ছন্দের হিসাবে এস্থলে মাত্রা-পরিমাণের কোনো পার্থক্য থাকৃত না। আশা করি এতক্ষণে কাব্য-রীতি ও সঙ্গীত-

রীতিতে মাত্রার আদর্শ ও পরিমাণ স্পষ্ট হয়েছে। এবার একটা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত দিই। যথা—

আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্র মুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
—রবীন্দ্রনাথ

কাব্য-ছন্দের রীতিতে হিসাব করলে এখানে প্রথম পংক্তিতে বিশ ও দ্বিতীয় পংক্তিতে বাইশ মাত্রা পাওয়া যাবে। অথচ গানের রীতিতে হিসাব করলে উভয় পংক্তিতেই ষোলটি করে' মাত্রা গুনতে হবে। প্রত্যেকটি হলন্ত বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরবর্ণের উপরে নির্ভর করে' তাকে ওজনে একটু ভারী করে' তুলছে এবং তাতে প্রতিমাত্রার পরিমাণ একটু বেড়ে যাচ্ছে মাত্র। সুতরাং গানের হিসাবে এখানে মাত্রা- ও স্বর-সংখ্যা সমানই ধরতে হবে। এবিষয়ে অনেক বলা হয়েছে; আর বৃথা বাক্য-ব্যয় করার দরকার নেই। কিন্তু একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমরা গানের রীতিতে কোনো ছত্রের যে মাত্রার হিসাব করেছি সেটাকে যেন কেউ প্রকৃত গানের মাত্রা বলে' মনে না করেন। তা মনে করলে ভুল হবে, কেননা গানে সুর-রচয়িতার ইচ্ছা অনুসারে এক-একটি বর্ণ তিন চার প্রভৃতি বহু মাত্রা ব্যাপী হ'য়ে সুর অনেক প্রসারিত হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু কবিতার প্রত্যেক বর্ণের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হ'য়েই আছে এবং কোনো বর্ণেই দু' মাত্রার বেশি থাকতে পারে না। সুতরাং কবিতার মাত্রা গানের মাত্রার চাইতে স্বভাবতই অনেক কম হ'য়ে থাকে। সুতরাং এ বিস্তৃত আলোচনার সার-মর্ম্ম হচ্ছে এই যে, কাব্যের ছন্দের রীতিতে হিসাব করলে মাত্রার একক বা আদর্শ-কাল-পরিমাণ অপরিবর্ত্তনীয় অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমান এবং বর্ণের গুরুত্বের উপরেই তার সংখ্যা সম্পূর্ণ নির্ভর করে; কিন্তু গানের ছন্দের রীতিতে হিসাব করলে মাত্রার একক পরিমাণ—কবিতা-ভেদে বাড়ে বা কমে, এবং অক্ষরবৃত্তে অক্ষর-সংখ্যার এবং স্বরবৃত্তে স্বর-সংখ্যার পরিমাণ সমানই থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

এলোরা

অজন্তা হইতে এলোরা একশত মাইলের পথ। দাক্ষিণাত্যের উপত্যকার উপর দিয়াই পথটি চলিয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারেরা বলেন, খুব অল্প খরচে একটি মোটর-চলাচলের রাস্তা অজন্তা হইতে এলোরা পর্য্যন্ত অনায়াসে নির্ম্মিত হইতে পারে।

এলোরা রোড্ ষ্টেশন হইতেই এলোরা যাওয়ার সুবিধা। ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে মন বিস্ময়ে ভরিয়া উঠে—প্রাচীন শিল্পীদের আশ্চর্য্য কলাকৌশলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। একদিকে গ্রীষ্মে জলশূন্য নদীগর্ভ—অপর দিকে বিস্তৃত পর্ব্বত-শ্রেণী। বর্ষায় যেখানে ভীষণ কল্লোলময়ী তরঙ্গিণী দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া যায়—গ্রীষ্মে তার কি কঠোর শুষ্কতা!

দৌলতাবাদ হইতে পাহাড়ের গায়ে উৎরাই পথে, ৬।৭ মাইল গেলে রোজা গ্রামে পৌঁছান যায়। এই গ্রামেই সম্রাট্ আওরঙ্গজীবের সমাধি আছে। আওরঙ্গাবাদ হইতে এলোরা যাওয়ার পথ একটু বিপদ্জনক; খুব কষ্টে পার্ব্বত্য পথের নীচে নামিতে হয়, সেই স্থানেই পাহাড়ের গায়ে এলোরা গুহা। এলোরার প্রকৃত নাম বেলুর। উচ্চারণের দোষে এলোরা হইয়াছে। মোটর একেবারে কৈলাস গুহার সম্মুখে দাঁড়ায়। কি কল্পনাকুশল অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য ছিল এই শিল্পীদের, যাঁহারা নীরস পাথর কাটিয়া এমন সুশ্রী ও সুশোভন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাহাড় তিন ভাগে ভাগ করিয়া লইয়া এইসকল গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এলোরার দক্ষিণে বৌদ্ধ গুহাসমূহ, মাঝখানে কৈলাস ও হিন্দুদিগের দেবতাদের মন্দিরগুলি এবং বাম দিকে ইন্দ্র-সভা প্রভৃতি জৈন মন্দিরাদি।

একাধারে শিল্পী কবি ও ইঞ্জিনিয়ার না হইলে এলোরার

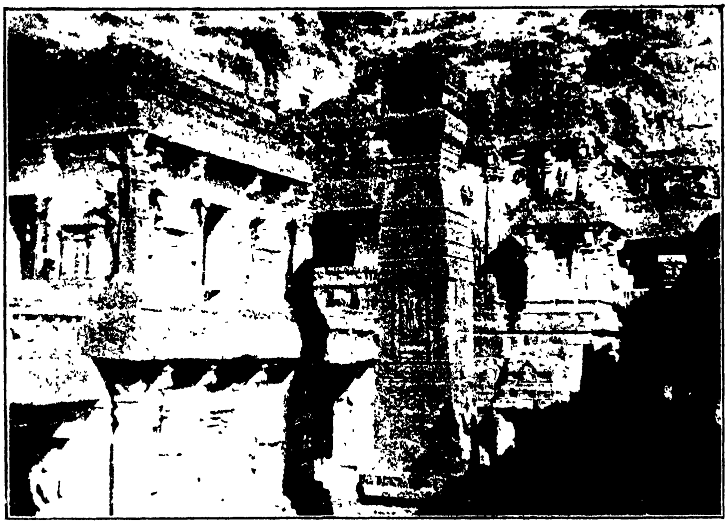


এলোরার বৃহৎ কক্ষের আভ্যন্তরিক দৃশ্য

জাতি সেখানে বাস করিত। এই কক্ষগুলিতে দর্শনীয় বিষয় বিশেষ কিছুই নাই।

"সুতার-কা-ঝোঁপড়া" অথবা সূত্রধরের গৃহ একটি বিশাল বৌদ্ধ মন্দির। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাতা। বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি এলোরায় পূজিত হইত, আজ পর্য্যন্ত সূত্রধরদের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মার পূজা হয়।

গুহাগুলি কান্‌হেড়ি, ভাজা, কার্‌লা প্রভৃতি গুহার ধরণেই নির্ম্মিত। উপরে বিস্তৃত ছাদ—প্রবেশদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বিগ্রহের আসন পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্তম্ভশ্রেণী। প্রাচীন ইতালীয় গির্জ্জাগুলিও এই ধরণে নির্ম্মিত। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে সেগুলি ভারতীয় আদর্শে নির্ম্মিত। লোকের বিশ্বাস স্তম্ভ-গাত্রের মূর্ত্তিগুলি বিশ্বকর্ম্মার প্রিয় অনুচরদিগের প্রতিকৃতি। দেব-শিল্পী তাঁহার অক্লান্তকর্ম্মা সহচরগণের কর্ম্মকুশলতার নিদর্শনস্বরূপ এইগুলি মন্দির-গাত্রে খোদিত করাইয়া তাঁহার সহচরদিগকে অমর করিয়া গিয়াছেন। এই সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠটির অভ্যন্তর ভাগ ৪৩

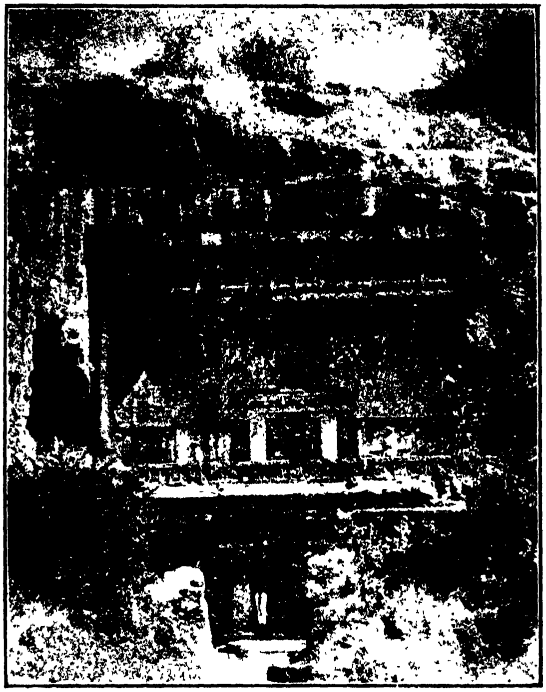


কৈলাসগুহা—এলোরার ভিতরের এক অংশের দৃশ্য

গুহাবলীর সম্যক্ বর্ণনা করা যায় না। কি চমৎকার শিল্পকলার বিকাশ! তাহার কিয়দংশ বর্ণনা করিতেও যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন।

গুহাসমূহের সাজসজ্জার আড়ম্বর অত্যন্ত অধিক। দেওয়ালে স্তম্ভগাত্রে ছাদে সর্ব্বত্রই বিচিত্র দেব-দেবী, পশু-পক্ষী অথবা জীব-জন্তুর একক অথবা সমষ্টির মূর্ত্তি বিদ্যমান। কৈলাস ও ইন্দ্রসভায় অজন্তার ন্যায় দেওয়াল-চিত্র আছে। অনেক দিনের মুসলমান অত্যাচারে সে সমুদয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। একটির পর একটি ধর্ম্ম মত কিভাবে কাল-ধর্ম্মে বিলোপ পাইয়াছে এই চিত্রগুলি দেখিলে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মূর্ত্তি, কোথাও বা হিন্দু দেবদেবী আবার কোথাও বা অসংখ্য জৈন বিগ্রহ।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন প্রকোষ্ঠাবলী খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেগুলির নাম ধেড়্‌বারা অথবা অবনত জাতির বাসস্থান। ধেড়্ নামক এক শ্রেণীর



সুতার-কা-ঝোঁপড়া—বহির্ভাগের দৃশ্য



সুতার-কা-ঝোপড়া—আভ্যন্তরিক দৃশ্য

ফুট প্রস্থ ৩৪ ফুট উচ্চ এবং ৮৬ ফুট গভীর। যে যুগে ডিনামাইট হয় নাই, রেলপথের কোন চিহ্ন ছিল না, সে যুগে যে কি করিয়া এই বিশাল পাথরের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পাথরে মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

'ডু'থাল ও 'টিন'থাল নির্ম্মাণে শিল্পীদের আশ্চর্য্য দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ডু'থাল দ্বিতল; 'টিন'থাল ত্রিতল। প্রতিগৃহতলই কারুকার্য্য-শোভিত।

কৈলাস-গুহা সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন। এলোরার গুহা-সমূহের মধ্যে কৈলাস-গুহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষের গুহাগুলির মধ্যে কৈলাস-গুহাই বৃহত্তম। ইহার কলা-কৌশল অন্য সকলগুলিকে ম্রিয়মাণ ও নিষ্প্রভ করিয়াছে। একটি ১লক্ষ গজ পাহাড় কাটিয়া উহার মধ্যে ৩০০ শত ফুট লম্বা, ১৫০ ফুট চওড়া ও ১০৭ ফুট উচ্চ একটি গুহা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে কৈলাস-গুহা নাম প্রদান করা হইয়াছে। সেই অসমতল পাহাড়ের বুকেই কোথাও হস্তী কোথাও বা দেব-দেবী মূর্ত্তি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। যদিও অধিকাংশ মূর্ত্তিই মুসলমানেরা নষ্ট করিয়াছে তথাপি তাহাদের ধ্বংসাবশেষ হইতেই শিল্পীদের কলা-কৌশল হৃদয়ঙ্গম হয়।

কৈলাসে ঢুকিবার পথেই তোরণ। তোরণের সম্মুখ-ভাগ পাথর দিয়া গাঁথা কিন্তু পশ্চাদ্‌ভাগ সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের গাত্রদেশ হইতে খুদিয়া বাহির-করা। এই তোরণ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে একটা প্রকাণ্ড চত্বরের মধ্যে পৌছান যায়। সেই চত্বরের একদিকে তোরণ, বাকী তিন দিকে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের গায়ে খোদা একতলা ও দোতলা বারান্দা। সেই বারান্দার পিছনের দেওয়াল-গাত্র তেত্রিশ কোটি দেবতার মূর্ত্তিতে ভরা। নিজাম নিজাম আলির সময়ে মূর্ত্তিগুলির কতক ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। চত্বরের মাঝখানে সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের গা খুদিয়া দুইটি বাড়ী তোলা হইয়াছে। ইহার প্রথমটি একতলা—ইহা নন্দী অর্থাৎ শিবের বৃষভ-বাহনের মন্দির। এই মন্দিরটি দেখিলে বোম্বাইয়ের দক্ষিণ অংশে



'টিন্‌'থাল-গুহা

অর্থাৎ বেলগাঁও বা ধারবাড় জেলার হিন্দু ও জৈন মন্দিরের কথা মনে হয়। দ্বিতীয় মন্দিরটি দ্বিতল ইহা শিবের মন্দির। নন্দীর মন্দির হইতে উপরে উঠিবার সোপানাবলী আছে। উপরে একটি অন্ধকার ঘরে শিবলিঙ্গ এখনও শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে পূজিত হইয়া থাকেন। ইহার সম্মুখে অন্ধকার নাটমন্দির, এবং সেই নাটমন্দিরের তিনদিকে অর্দ্ধমণ্ডপ বা বারান্দা। এইসকল বারান্দার ছাদে অজন্তার চিত্রের মত হাজার বৎসর পূর্ব্বে আঁকা নানা রংএর চিত্র এখনও স্পষ্ট আছে, কিন্তু পায়রা ও বাদুড়ে এই চিত্রগুলি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এই বিশাল মন্দির একখানি পাথর হইতে খুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহার দেওয়াল স্তম্ভ ছাদ সমস্তই একখানি পাথরের।

পাথর হইতে কাটিয়া বাহির-করা এতবড় মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। কৈলাসের শিব-মন্দিরের আসল দ্রষ্টব্য পদার্থ—ইহার তিন দিকের পাথরে খোদা চিত্রাবলী। মন্দিরটির নীচের তলা নিরেট এবং ইহার তিন দিকে তিনটি চিত্র আছে। ডান দিকের চিত্রটি রাবণের কৈলাস-হরণ। নিত্য লঙ্কা হইতে ইষ্ট দেবতা মহাদেবের পূজা করিতে কৈলাসে যাইতে রাবণের কষ্ট হইত বলিয়া সে শিবের অনুমতি লইয়া কৈলাস পর্ব্বত উঠাইয়া লঙ্কায় আনিতে চাহিয়াছিল। এই চিত্রে রাবণ কৈলাস পর্ব্বত জড়াইয়া ধরিয়া তুলিতেছে। কৈলাস পর্ব্বতের পশুপক্ষী, মহাদেবের অনুচরেরা, এমন কি স্বয়ং পার্ব্বতী পর্য্যন্ত ভয়ে ব্যাকুল হইয়াছেন। ভয়াবহ্বলা পার্ব্বতী মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, তাঁহার মুখের ভাবটি এমন সুন্দর যে তাহা ভারতের শিল্পে অতুলনীয়। বোম্বাইয়ের কাছে এলিফ্যাণ্টা পর্ব্বত গুহায় কৈলাস-হরণের চিত্র আছে; কিন্তু তাহা কৈলাস-গুহার কৈলাসহরণের চিত্রের মত সজীব নহে।

অপর দিকে ত্রিপুরবধের চিত্র।



মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য

চার ঘোড়ার রথে চড়িয়া শিব স্বয়ং ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার সারথি, চারিদিকে পৃথিবীতে, আকাশে, স্বর্গে ত্রিপুরাসুরের অসংখ্য অনুচর

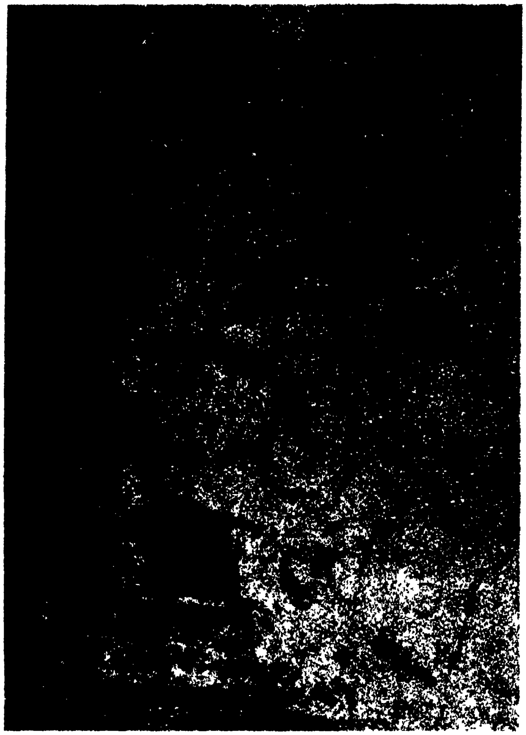


যুদ্ধের দৃশ্য—কৈলাস-গুহা

মহাদেবের উপর অস্ত্র বর্ষণ করিতেছে। আর একদিকে শিবের অন্ধকাসুর-বধ মূর্ত্তি। শিব প্রত্যালীঢ় পদে দাঁড়াইয়া দুই হাতে ত্রিশূল ধরিয়া অন্ধকাসুরকে বিদ্ধ করিতেছেন। শিবের আট হাত- কোনো হাতে অসি কোন হাতে নরকপাল। আকাশে দেব-দেবী গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, শিবের পদতলে শিবের অনুচরবৃন্দ এবং চারিদিকে দেব-সৈন্য ও অসুর-সৈন্য। অন্য এক স্থানে শিবের বিবাহ।

অপর এক স্থানে কালারি বা যমান্তক মূর্ত্তি। মার্কণ্ডেয় ঋষি স্বল্পায়ু লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার মৃত্যু হইবার কথা। এই কারণে মার্কণ্ডেয় ঋষি মহাদেবের আরাধনায় রত হইলেন। এদিকে ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় স্বয়ং যম তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। ঋষিপ্রবর ভয়ার্ত্ত হইয়া মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছেন। ভক্তের আকুল আহ্বানে মহাদেব মূর্ত্তির ভিতর হইতে বাহির হইয়া যমরাজকে পদাঘাত করিতেছেন। এই উপাখ্যানটি এই প্রস্তর মূর্ত্তিতে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

কৈলাস-গুহার নিজ গর্ভ-গুহার দক্ষিণ দিকের প্রাচীর-গাত্রে শিবের জটা হইতে গঙ্গানদীর উদ্ভব দৃশ্য। এই মূর্ত্তিতে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের উপাখ্যান দেখান হইয়াছে। গঙ্গানদী শিবের জটা হইতে বহির্গত হইয়া ভগীরথের মস্তকে পতিত হইতেছে। তৎপরে ভগীরথের গা বাহিয়া গঙ্গা সগর পুত্রদের উদ্ধার করিয়াছেন, সগরপুত্রগণ মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেছেন।



কৈলাস-হরণ



কালারি মূর্ত্তি, কৈলাস-গুহা



ত্রিপুরান্তক-মূর্ত্তি, কৈলাস গুহা



সুরাঙ্গনা, কৈলাস গুহা



সুব্রহ্মণ্য   হর-পার্ব্বতীর বিবাহ   পার্ব্বতীর তপস্যা

রামেশ্বর গুহার পশ্চিমের দেওয়ালে খোদিত চিত্র



কল্যাণসুন্দর মূর্ত্তি—কৈলাস-গুহা (হর-পার্ব্বতীর বিবাহ)

কার্ত্তিকেয়র জন্ম বৃত্তান্তের ভিন্ন ভিন্ন আখ্যান আছে। কৈলাস গুহার সুব্রহ্মণ্য মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। মূর্ত্তিটির দক্ষিণ হস্তের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কার্ত্তিকেয়র এই হস্তেই শক্তি-অস্ত্র ছিল। তাঁহার বাম হস্তের নিকট ময়ূর রহিয়াছে। মূর্ত্তিটির উভয় পার্শ্বে দেবানুচর দণ্ডায়মান। ইহাদের মধ্যে একটি দক্ষ প্রজাপতির মূর্ত্তি। কার্ত্তিকেয়র বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতেছে, কর্ণে নানাপ্রকারের কুণ্ডল দুলিতেছে। মস্তকে ভামণ্ডল-বেষ্টিত করণ্ড-মুকুট রহিয়াছে। কৈলাস-গুহা এইরূপ শিবের উপাখ্যানের চিত্রে ভরা।

ভগীরথও কৃতজ্ঞতাপ্লুতহৃদয়ে মহাদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। শিবের বাম পার্শ্বে উমা মূর্ত্তি ও মস্তকোপরি কয়েকটি দেবতা।

এই গুহার অপর এক স্থানে সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তি। কার্ত্তিকেয় দাক্ষিণাত্যের দেবতা। এই দেবতার জন্ম-পরিচয় রামায়ণের বালকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে।

এলোরার নির্ম্মাণ ও নির্ম্মাতাদিগের সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডবেরা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্য ইহা নির্ম্মাণ করেন। পাণ্ডবেরা এক রাত্রিতে এই বিরাট্ কার্য্য শেষ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবানের নিকট একটি বর প্রার্থনা করেন যে, তিনি যেন কোন-এক বিশেষ রাত্রিকে সর্ব্বাপেক্ষা

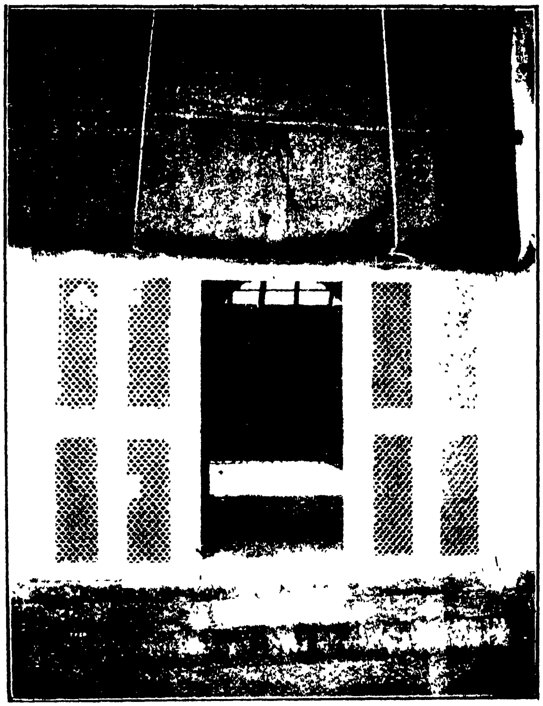


রামেশ্বর-গুহার জৈনমূর্ত্তি

দীর্ঘ করেন। কথিত আছে, সেই সুদীর্ঘ রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই এলোরার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। বিশ্বকর্ম্মা এই বিরাট্ কার্য্যের নক্সা করিয়া দেন, ভীম ইহা নির্ম্মাণ করেন। কার্য্য-শেষে পঞ্চপাণ্ডব সমস্ত জগতে এই বিরাট্ কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া বেড়ান।

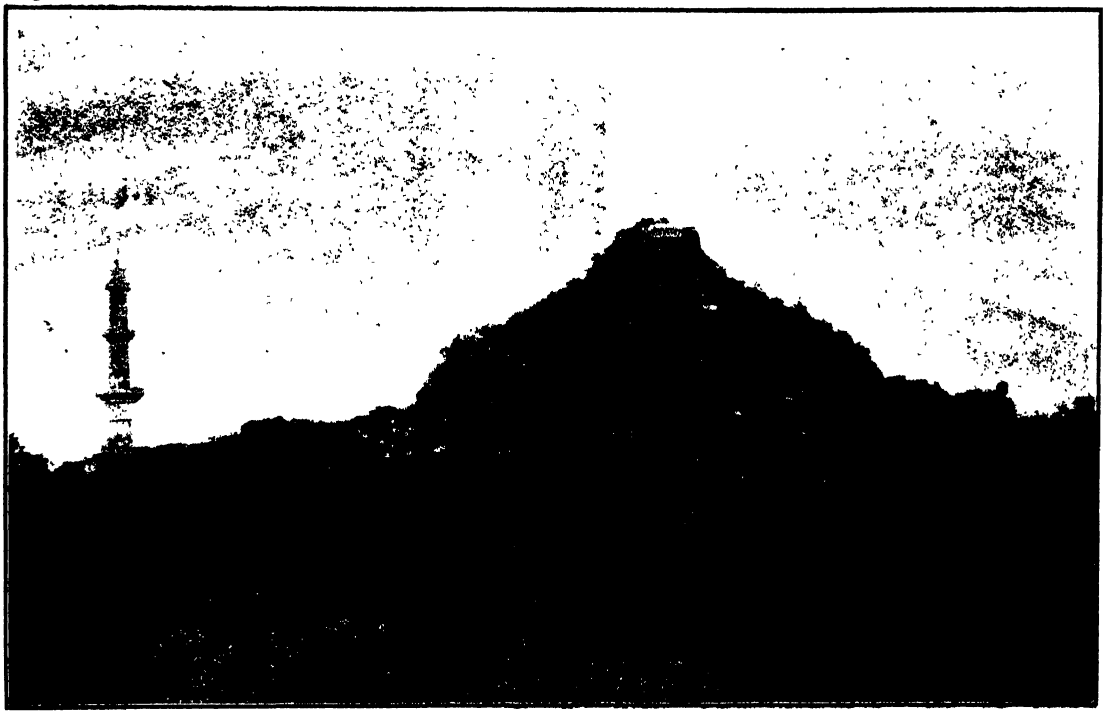
অন্য এক প্রবাদ আছে, যে, হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত এলিচপুরের রাজা এলু দীর্ঘকাল দুশ্চিকিৎস্য রোগে ভুগিয়া এলোরার সন্নিকটস্থ কোন পুকুরের জল ব্যবহার করিয়া রোগমুক্ত হন এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তিনিই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঐ রাজার আদেশানুক্রমে দৌলতাবাদেও ঠিক এলোরার আদর্শে একটি মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং একটি প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ দ্বারা দৌলতাবাদ ও এলোরা যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, যে, দেওগড়ের রাজকন্যা এই সুড়ঙ্গ-পথেই দিল্লীশ্বরের অনুচরগণ কর্ত্তৃক ধৃত হন। বর্ত্তমানে সেই সুড়ঙ্গ-পথের কোন চিহ্নও বিদ্যমান নাই।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে বর্ষাবাস করিতে হয়। এই বর্ষাবাস তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) বিহার (Temple), (২) রাত্রি-স্থান (Dormitory), (৩) ভোজন-স্থান (Refectory)। অনেকে বলেন এলোরার গুহাগুলী প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বর্ষাবাসরূপে ব্যবহৃত হইত।

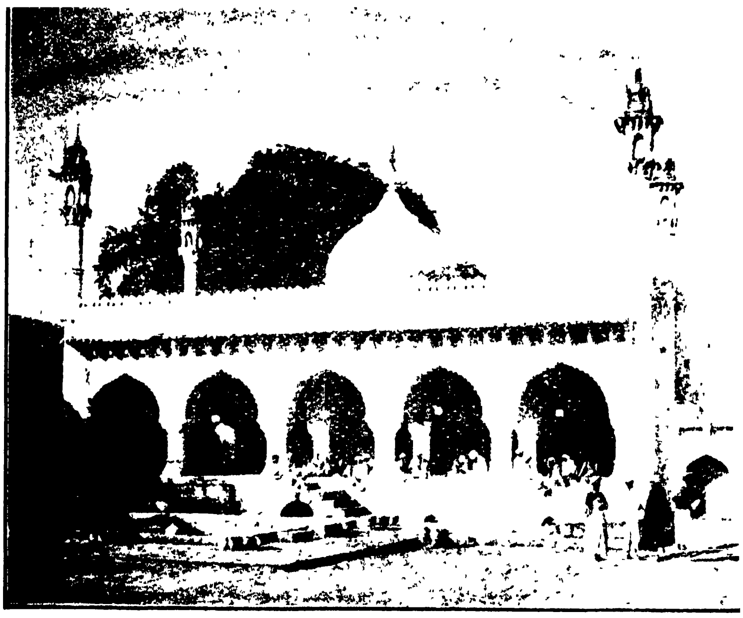


আওরঙ্গজীবের প্রিয় পবিত্র স্থান

এলোরার অর্দ্ধবৃত্তের বামদিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে সমস্ত গুহাগুলি জৈনদের। এই গুহাগুলির মধ্যে ইন্দ্রসভাই প্রধান। ভারতবর্ষে জৈনদের গুহা-মন্দির বড়-একটা দেখা যায় না। বিজাপুর জেলায় বাদামী তালুকে একটি জৈন গুহা-মন্দির আছে। ইহা ভিন্ন কারলা, কান্হেরী, অজন্তা, মণ্ডপেশ্বর, ধামনার, বাগ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গুহামন্দিরগুলি হিন্দুদের অথবা বৌদ্ধদের। পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকট খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি পর্ব্বতে যতগুলি গুহা আছে সেগুলি সমস্তই জৈন। এলোরার জৈন-গুহাগুলি এক কৈলাস-গুহা ছাড়া আর সমস্ত গুহা অপেক্ষা বড়। জৈনদের ছোট ছোট দুই



দৌলতাবাদের দুর্গ



সৈয়দ জৈনুদ্দিনের মস্‌জিদ—আওরঙ্গাবাদ

চারিটি গুহা যে না আছে তাহা নহে। বড় জৈন গুহাগুলি এক-একটি প্রকাণ্ড মন্দির। তাহাতে গর্ভগৃহ (sanctuary), নাটমন্দির, জগমোহন, ভোগমণ্ডপ প্রভৃতি তিনটি বা চারিটি ভাগ আছে।

কল্পনায় ইন্দ্রসভা কৈলাসের মত বিশাল। জৈনদের মূর্ত্তিতে কৈলাসের "বাস্‌-রিলিফ" বা দেওয়ালে খোদা তোলা ছবির ন্যায় চিত্র-কারুকার্য্য না থাকিলেও ইহার প্রত্যেক জায়গায় এমন সুনিপুণ ও সূক্ষ্ম কাজ আছে, যে তাহা ভারতবর্ষের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। নিজাম দরবার প্রত্যেক গুহায় যাইবার নিমিত্ত ছোট ছোট রাস্তা তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন।



আলমগিরী মস্‌জিদ—আওরঙ্গাবাদ

নতুবা জৈন-গুহাগুলিতে যাইতে বিশেষ কষ্ট হইত, কারণ জৈন-গুহাগুলি মন্‌মাদ্‌-আওরঙ্গাবাদ রোড্‌ হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। বড় বড় জৈন গুহাগুলি দ্বিতল। সেগুলির বারান্দার রেলিংএর প্রস্তরে চমৎকার কারুকার্য্য আছে। তাহার নকল করিতে বর্ত্তমানে প্রতি-বর্গফুটে হাজার টাকার বেশী খরচ হয়।

যে পথ দিয়া 'শিবচন্দ্রকলা' পর্ব্বতে উঠিতে হয় তাহা অত্যন্ত বন্ধুর। ঐ পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া রোজার দিকে তাকাইলে মনে হয় একেবারে হিন্দু যুগ হইতে মুসলমান যুগে আসিয়া পড়িয়াছি। চতুর্দ্দিকে আওরঙ্গজীবের দক্ষিণবাসের স্মৃতিচিহ্ন-বিজড়িত মস্‌জিদ্‌ ও অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। আওরঙ্গজীবের সমাধি-মন্দির অত্যন্ত অনাড়ম্বর; তাহার পার্শ্বেই মুসলমান সাধু ও ফকিরদের সমাধি।

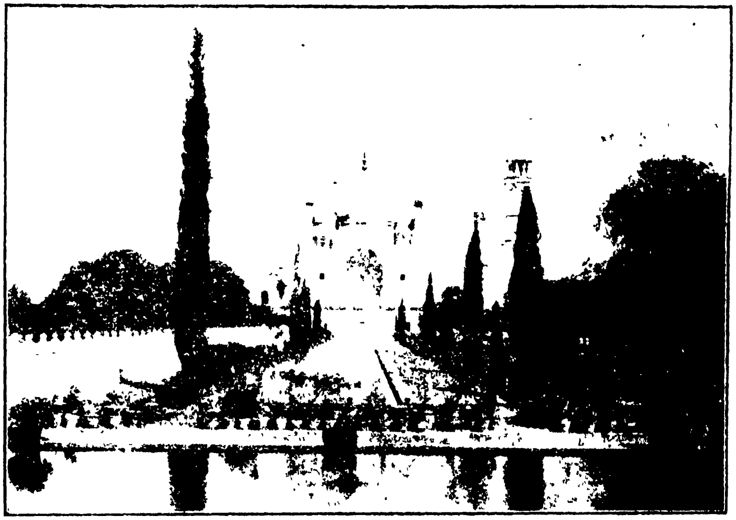
রোজাতে আধুনিক ধরণে নির্ম্মিত নিজাম বাহাদুরের একটি অতিথিশালাও আছে। সেখানে থাকিবার সর্ব্ব-প্রকার সুবিধা আছে এবং সেখান হইতে সর্ব্বত্রই সহজে যাতায়াত করা যায়।



আওরঙ্গাবাদে জল রাখিবার ঘর

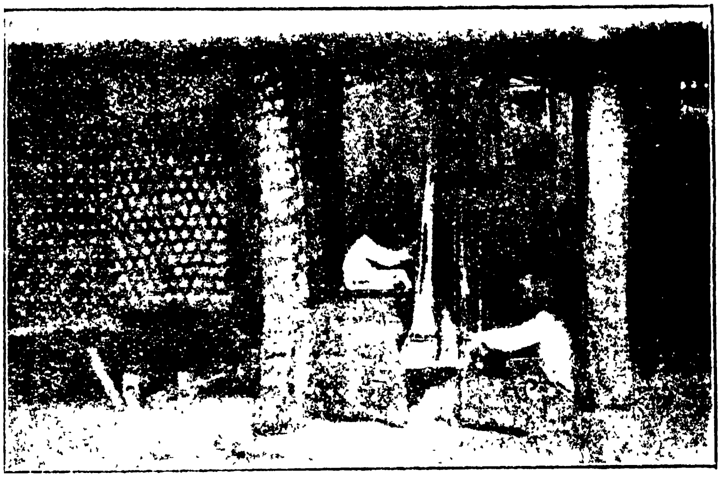
রোজা হইতে দৌলতাবাদের পথে পাহাড়ের গায়ে এক বিরাট্‌ দুর্গ আছে। ঐ-দুর্গ চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতদ্বারা দৃঢ় প্রাকারে বেষ্টিত। কোন শত্রু তথায় সহজে প্রবেশ-লাভ করিতে পারিত না। দুর্গের চতুর্দ্দিকে গভীর পরিখা ছিল এবং পরিখা-মুখে দুর্গদ্বারে এক অগ্নিকুণ্ড সর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকিত। কিন্তু দৈবের এমনই গতি যে এই দুর্ভেদ্য দুর্গটি অতি সামান্য কারণে শত্রু হস্তগত হইয়াছিল। দুর্গাধিকারী হিন্দু রাজা যখন সংবাদ পাইলেন যে, দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানেরা দুর্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে তখন তিনি সৈন্যদের রসদ জোগাইবার জন্য

চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। ঐ-সকল অনুচরেরা যথাসময়ে অজস্র খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দুর্গে জমা করিল। কিন্তু যখন মুসলমানেরা দুর্গ আক্রমণ করিল তখন দেখা গেল ঐ-সকল বস্তা লবণে ভরা, তাঁহাতে অন্য কোন আহার্য্য নাই। অনাহার-ভয়ে ভীত হইয়া সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করাতে এই দুর্ভেদ্য দুর্গ শত্রুহস্তগত হয়।



বিবিকা-মাক্‌বারা—আওরঙ্গাবাদ

এই প্রসঙ্গে আওরঙ্গাবাদের সামান্য একটু বৃত্তান্ত দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। আওরঙ্গাবাদে শিল্পকলার দিক্ হইতে দর্শনীয় বিশেষ কিছুই নাই। এমন কি আওরঙ্গজীবের রাজপ্রসাদও অত্যন্ত অনাড়ম্বর, কেবল যে মস্‌জিদের ধারে বসিয়া আওরঙ্গজীব স্বহস্তে কোরান্ নকল করিয়া বিক্রয় করিতেন সে-মস্‌জিদ্‌টি দর্শনীয়। আওরঙ্গজীবের আদর্শ ছিল যে প্রত্যেক ব্যক্তি—রাজাই হৌক আর ভিক্ষুকই হৌক—নিজে উপার্জ্জন করিয়া খাইবে; তিনি নিজ জীবনে তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। আওরঙ্গজীবের প্রাসাদের ধারেই সহরের জল সরবরাহের যন্ত্রাদি ছিল। মালিক অম্বার ঐ যন্ত্র আবিষ্কার করেন।



আওরঙ্গাবাদের একটি তাঁতের কারখানা

আওরঙ্গাবাদ প্রস্রবণে ভরা। তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারেরা জল লইয়া খেলা করিতে ভালবাসিতেন। একটি মস্‌জিদের সম্মুখে ১৯টি প্রস্রবণ ছিল। ইঞ্জিনিয়ারেরা এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে কোনটি সোজাসুজি কোনটি বক্রভাবে আবার কোনটি বা ধীরে ধীরে একই স্থানে জল দিবে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন জল বন্ধ হইয়া যায় তখন নিজাম সরকারের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভাবনানী ঐ-জলের উৎস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। বহু চেষ্টার ফলে তিনি আওরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদের মধ্যে এক পর্ব্বতে এক বিরাট্ জল সরবরাহের চৌবাচ্চা আবিষ্কার করেন। ঐ-স্থান হইতে জল-স্তম্ভ বাহিয়া উপরে যাইত এবং পরে নিম্নে পড়িত। আওরঙ্গাবাদের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান বিবি-কা-মাক্‌বারা অথবা দৌরানিয়া বেগমের সমাধি। দৌরানিয়া বেগম আওরঙ্গজীবের প্রিয় মহিষী ছিলেন। যদিও সম্রাট্ আগ্রার তাজ-মহলের অনুকরণে উহা নির্ম্মাণ করান, তথাপি তাজের

সৌন্দর্য্যের সহিত কোন ক্রমেই ইহার তুলনা করা যাইতে পারে না।

অনেকেই আওরঙ্গাবাদের মন্দিরাদির কথা জানেন না। আওরঙ্গাবাদের মন্দিরাদি সাজসজ্জায় ভরা। এখানকার চিত্রসমূহের সহিত অজন্তার চিত্রাবলীর তুলনা হইতে পারে। অধিকাংশ মন্দিরাদিতেই ঘটনামূলক বহু চিত্র আছে। কোনো ছবিতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইতে কোনো ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হইতেছে, কোথাও বা সাপ অথবা হাতীর মুখ হইতে কাহাকেও উদ্ধার করা হইতেছে; ইত্যাদি চিত্রিত হইয়াছে। কোনো ছবিতে দেখান হইয়াছে দেবী কালীর হাত হইতে একটি শিশু রক্ষার জন্য অন্য এক দেবতা মায়ের কোলে শিশুটি রক্ষা করিতেছেন। কোথাও বা পূজারত নর-নারী মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে।

এই যন্ত্রের যুগে, ধীরে ধীরে ঐ সমস্ত লোপ পাইতেছে। যেখানে প্রাচীন মস্‌জিদের গম্বুজাদি দৃষ্ট হইত আজ সেখানে কলের চিম্‌নী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। যেখানে প্রত্যুষে আজানের পবিত্র ধ্বনি উত্থিত হইত সেখানে আজ কাপড়ের কলের বাঁশীর শব্দে সজাগ হইতে হয়। কালের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! *

শ্রী প্রভাত সান্যাল

* মডার্ন্ রিভিউএ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সন্তনিহাল সিংহের প্রবন্ধ-অবলম্বনে।

গণেশ ও দনুজমর্দ্দন

বাঙ্গালা দেশের রাজা গণেশের নাম অনেকের কাছেই সুপরিচিত, ইতিহাসের নাম শুনিলে যাঁহারা শিহরিয়া উঠেন অবশ্য তাঁহারা বাদে। রাজা গণেশ, Blochmann's Contributions to the History and Geography of Bengal,* Beveridgeএর রাজা কান্‌স প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "গৌড়ের ইতিহাস" ২য় খণ্ডে, ৺ দুর্গাচন্দ্র সান্যালের "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" প্রথম খণ্ডে ও আমার "বাঙ্গালার ইতিহাস" ২য় ভাগে রাজা গণেশের পরিচয় দেওয়া আছে। এতদ্ব্যতীত লব্ধপ্রতিষ্ঠ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রাজা গণেশ সম্বন্ধে একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। গণেশের পুত্র যদু, যদুমল্ল বা যদুনারায়ণের নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি নাটকও আছে। রাজা গণেশ গৌড়ের একজন মুসলমান বাদশাহকে মারিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, একথা ৺ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ঈশান নাগরের "অদ্বৈত-প্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পুরুষ নরসিংহ, নারিয়াল-রাজা গণেশের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারই পরামর্শ মতে গণেশ গৌড়ের মুসলমান বাদশাহকে মারিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন।* রাজা গণেশ যখন হিন্দু ছিলেন তখন তাঁহার নিশ্চয় একটা জাতি ছিল, কিন্তু তিনি কোন্ জাতিভুক্ত ছিলেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গণেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা সন্দেহ ছিল; কারণ গণেশের নামাঙ্কিত কোন প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। গণেশকে একজন বিদ্রোহী জমিদার বলিয়াই বোধ হয়। তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই মুসলমানের যেরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল তাহাতে গণেশ যে হিন্দু থাকিয়া প্রকাশ্যভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করা কঠিন। যে-সময়ে রাজা গণেশ জন্মিয়াছিলেন সেই সময়ে আর-একজন হিন্দু বাঙ্গালা দেশে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিয়া নিজের

* Journal of the Asiatic Society o Bengal, 1817—75, p. 1.

* ৺ রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত গৌড়ের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৫।

নামে বাঙ্গালা অক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় টাকা ছাপাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীদনুজমর্দ্দন দেব। মুসলমানের ইতিহাসে, অর্থাৎ—"তারিখ ই-ফেরেস্তা" ও "রিয়াজ-উস-সালাতীন"এ এই দনুজমর্দ্দনের নাম পাওয়া যায় না। ইনি ১৩৩৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪১৬-১৭ খৃঃ বাঙ্গালা দেশে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন এবং পাণ্ডুনগর, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম নামক তিনটি স্থানে তাঁহার টাঁকশাল ছিল। মুসলমান বিজয়ের পরে নিজ বাঙ্গালা দেশে, অর্থাৎ—কুঁচবিহার, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি অনার্য্য-শাসিত প্রদেশগুলি বাদ দিলে বর্ত্তমান বাঙ্গালার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহাতে কোন হিন্দুরাজা নিজের নামে টাকা ছাপাইতে ভরসা করেন নাই। প্রতাপাদিত্য রায় নিজের নামে টাকা ছাপাইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেকথা সম্ভবতঃ মিথ্যা। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে রামরাম বসু প্রভৃতি লেখকগণ অনেক মিথ্যা কথাই বলিয়া গিয়াছেন এবং সেইজন্য তাঁহাদের কোন কথা নূতন প্রমাণের সমর্থন না পাইলে বিশ্বাস করা উচিত নহে। মুদ্রা ছাড়া এই দনুজমর্দ্দনের অস্তিত্বের অপর কোন প্রমাণ নাই। ১৮০৭ খৃঃএর পূর্ব্বে "গৌড়-বিবরণ" রচয়িতা ক্রেটনের (Creighton) মৃত্যু হইয়াছিল এবং ১৮১৭ খৃঃ প্রকাশিত ক্রেটনের গ্রন্থে দনুজমর্দ্দন দেবের একটি মুদ্রার চিত্র আছে।* ১৩১৭ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়ার আদীনা মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব্বাংশের দুই ক্রোশের মধ্যে একজন সাঁওতাল কৃষক হলকর্ষণকালে দনুজমর্দ্দন দেবের আর-একটি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল এবং এই মুদ্রাটি মালদহের উকিল, ৺ রাধেশচন্দ্র শেঠের হস্তগত হইয়াছিল।† ১৯১১ খৃঃ খুলনা জেলায় বাসুদেবপুর গ্রামে জনৈক মুসলমান সমাধি-খনন-কালে দনুজমর্দ্দনের আর-একটি রজত মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল। দৌলতপুর হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে উপহার প্রদান করিয়াছেন।* ১৯১৩ খৃঃ মুর্শিদাবাদ জেলার কোন স্থানে দনুজমর্দ্দনের আরও একটি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার পরে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রণীত Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal নামক গ্রন্থে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দনুজমর্দ্দন রাজা গণেশের অপর নাম। ভট্টশালী-মহাশয় দনুজমর্দ্দন বা রাজা গণেশ সম্বন্ধে নূতন কোন প্রমাণই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, অথচ তিনি কেমন করিয়া এত বড় একটা গুরুতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে অতি সংক্ষেপে সেই সময়ের বাংলা দেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা উচিত।

তোগলক বংশীয় ফিরোজ শাহ ৭৫২ হিঃ (১৩৫১-৫২ খৃঃ) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে শমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা। কেহ কেহ বলেন যে, ইলিয়াস শাহ ৭৪০ হিঃ অর্থাৎ ১৩৩৯ খৃঃ বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে তিনি ৭৪৩ হিঃ পশ্চিম বঙ্গে রাজা হইয়াছিলেন।† শামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহের পরে তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ এবং পৌত্র গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহ বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আজম শাহের পরে তাঁহার পুত্র সৈফউদ্দীন হমজা শাহ ও পৌত্র দ্বিতীয় শামসউদ্দীন বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পরে শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ শাহ ও আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামক বাঙ্গালা দেশের দুইজন স্বাধীন সুলতানের অস্তিত্বের প্রমাণ তাঁহাদিগের মুদ্রা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বায়াজীদ শাহের সহিত ইলিয়াস শাহের বংশের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। "রিয়াজ-উস-সালাতীনে" দেখিতে পাওয়া যায় যে, দ্বিতীয় শামসউদ্দীনের প্রকৃত নাম শিহাব-

* Creighton's Ruins of Gaur, p. 11.

† রঙ্গপুর-সাহিত্যে-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭০-৭৪।

* প্রবাসী, ১৩১৯, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৬।

† Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, p. 21.

উদ্দীন এবং তিনি সৈফউদ্দীন হমজা শাহের পালিত বা দত্তক পুত্র।* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ নামক শিহাবউদ্দীন বায়াজীদ শাহের এক পুত্রের নাম আবিষ্কার করিয়াছেন। † শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ হইতে আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ পর্য্যন্ত ছয় পুরুষের ছয় জন ৭৮ চান্দ্র বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে রাজা হইয়াছিলেন। শেষ রাজা আলা-উদ্দীন ফিরোজ শাহ ৮১৭ হিজিরাব্দে (১৪১৪-১৫ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। ইহার পরেই জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামক আর-একজন মুসলমান রাজার অধিকার আরম্ভ হয়। তিনি বাঙ্গালাদেশের একজন প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং ৮৩৪ হিজিরাব্দে (১৪৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে) চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ‡

এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ-পাদে ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের আবির্ভাব হইয়াছিল। গণেশ সম্বন্ধে মুসলমান-রচিত ইতিহাসে এবং হিন্দুর কিম্বদন্তীতে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারা যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল লিখিত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থ তাঁহার নব-প্রকাশিত পুস্তকের নানা স্থানে গ্রহণ করিয়া প্রকৃত ইতিহাস কতদূর দূষিত করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ রচনা-কালে (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) সান্যাল মহাশয়ের গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত বলিয়া উহার কোন অংশ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই এবং ইতিহাসের হিসাবে গ্রন্থখানি অত্যন্ত অসার ও মিথ্যা-পরিপূর্ণ বলিয়া উহার আলোচনাও করি নাই। কিন্তু ভট্টশালী-মহাশয় তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে বারম্বার সান্যাল মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া আমাকে সান্যাল মহাশয়ের "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসের" বিশ্লেষণ করিতে বাধ্য করিয়াছেন। ভট্টশালী-মহাশয় লিখিয়াছেন—The anecdotes of the Bhaturia Zemindars, as recorded by Mr. Sanyal, are extremely interesting and though they are likely to contain exaggerations and fables, being mainly based on tradition and social chronicles or Kula Panjikas, they are sure to possess a back-ground of truth and as such deserve a thorough investigation.* শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মত শিক্ষিত ব্যক্তি কেমন করিয়া ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যালের অলীককাহিনীপূর্ণ গ্রন্থখানিকে "সত্যের ভিত্তির উপরে স্থাপিত" বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না। ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকা অনুসারে তাঁহার "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" রচনা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থ-রচনা-কালে ইংরেজী ও বাঙ্গলায় লিখিত বাঙ্গলার ইতিহাসগুলি যে তিনি অধ্যয়ন করেন নাই তাহার প্রমাণ তাহার গ্রন্থের মধ্যেই পাওয়া যায়। Stewart's History of Bengal প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। গোলাম হোসেন সলীমের রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। মালদহ-নিবাসী স্বর্গগত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর "গৌড়ের ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ ১৩১৫ বঙ্গাব্দের "বাঙ্গালা সামাজিক ইতিহাসের" প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে সান্যাল মহাশয় এই তিনখানি গ্রন্থের একখানিও পাঠ করেন নাই।

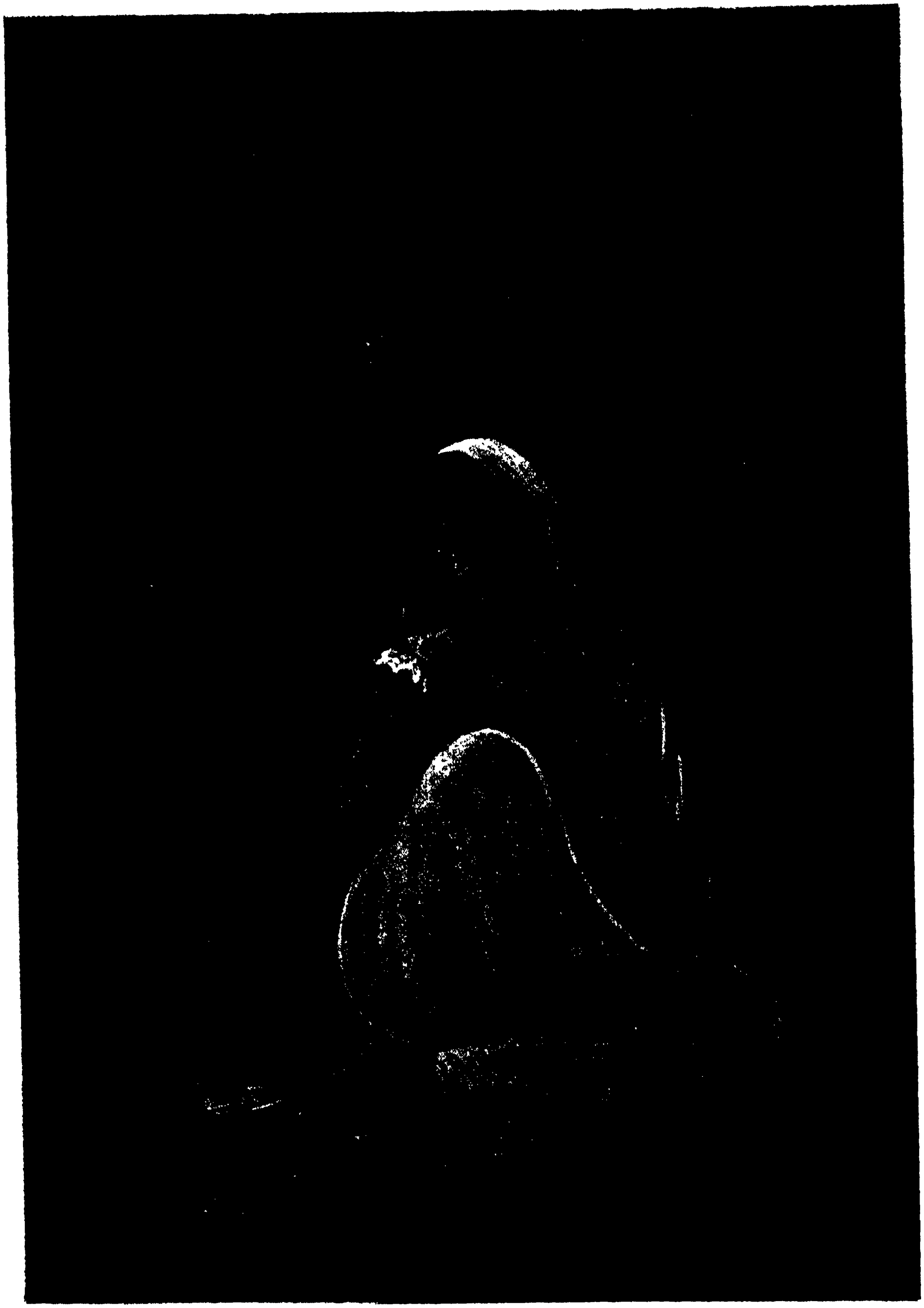
সান্যাল মহাশয়ের মতে "বাঙ্গালা দেশ মুসলমান অধি-কারভুক্ত হইলে, দেড় শত বৎসর কাল দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল। তাহার পর বিকৃতবুদ্ধি মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে সাম্রাজ্য ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। সুবায় সুবায় নবাবেরা স্বাধীন হইয়াছিল। বাঙ্গালার নবাব সমসউদ্দীন

* Riyaz-us-Saltatin, Eng. Trans. Cal. 1902, p. 112.

† Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, p. 107.

‡ Catalogue of Coins in the Indian Museum Calcutta, vol. II, pt. 2, p 163. no. 110.

* Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, etc p. 80.



স্মৃতি-সম্পুট

চিত্রকর শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক।” সমস্-উদ্দীনের পূর্ব্বে যে, গিয়াস্উদ্দীন্ বলবনের বংশের ছয় জন স্বাধীন রাজা গৌড়দেশ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, এ কথা সান্যাল মহাশয় জানিতেন না এবং তাঁহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষভাগে সান্যাল মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাঁহা পাঠ করিলে ঐতিহাসিক মাত্রেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইবে।—

“ময়জুদ্দীনের বংশধরেরা সকলেই অলস বিলাসী এবং অকর্ম্মণ্য ছিল। একটাকিয়ার ভাদুড়ীরাই তাহাদের রাজত্ব চালাইত। সেই অকর্ম্মণ্য গৌড় বাদশাগণ আপনাদের শরীর ও উপপত্নী-প্রকোষ্ঠ (রঙ্গমহল) রক্ষার জন্য কতকগুলি খোজা (ক্লীব) এবং হাব্শী (কাফ্রি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শেষে সেই হাব্সীগণ শম্স্উদ্দীনের বংশ ধ্বংস করিয়া নিজেরাই বাদ্শা হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করিত। দূরবর্ত্তী প্রদেশের জমীদার ও শাসকগণ তাহাদিগকে রাজস্ব দিত না। এই অরাজক অবস্থা চারি বৎসর ছিল। তাহার পর সৈয়দ হোসেন শা বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান প্রবল লোকদিগকে হস্তগত করিয়া গৌড়ের সম্রাট্ হইলেন। এবং হাব্সীদিগের অধিকাংশ হত্যা করিলেন। অবশিষ্ট লোকদিগকে দাক্ষিণাত্যে তাড়াইয়া দিলেন।”*

সান্যাল মহাশয় যাঁহাকে বাঙ্গালার নবাব শমস্উদ্দীন বলিয়াছেন তিনি কখনও নবাব উপাধিধারী ছিলেন না এবং কোন কালে তোগ্লকবংশীয় দিল্লীর বাদশাহ্-দিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এই রাজার প্রকৃত নাম শমস্উদ্দীন ইলিয়স শাহ্ এবং তিনি ৭৪০ হইতে ৭৫৯ হিজিরাব্দ পর্য্যন্ত,† (১৩৩৯—১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই শমস্উদ্দীনের বংশ দুইবার গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিল। ৭৪০ হিজিরায় (১৩৩৯ খৃঃ) শমস্উদ্দীন গৌড়-রাজ্য জয় করেন। তাঁহার বংশধর ৮১৭ হিজিরায় (১৪১৪ খৃঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা গণেশ নিজে গৌড়ের রাজা হইয়াছিলেন। গণেশের বংশ তিন পুরুষ পরে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল এবং ৮৪৬ হিঃ শমস্-উদ্দীন ইলিয়স শাহের বংশজাত দ্বিতীয় নসীরউদ্দীন মহ্মুদ শাহ্ গৌড়রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।* ইহার বংশজাত জলালউদ্দীন ফতেশাহ্ ৮৯৩ হিজিরায় (১৪৮৭ খৃঃ) নিহত হইলে হাব্সীগণ গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিয়াছিল।†

সুলতান শাহ্জাদা বার্বগ্, সৈফউদ্দীন ফিরোজশাহ্, নসীরউদ্দীন মহমুদ শাহ্ (তৃতীয়) ও শমস্উদ্দীন মজঃফর শাহ নামক চারিজন হাব্সী রাজার পরে আমূলের সৈয়দ বংশীয় আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ ৮৯৯ হিজিরায় (১৪৯৩ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। এই হোসেন শাহ্ কেমন করিয়া শমস্উদ্দীন ইলিয়স শাহের পৌত্রের পরবর্ত্তী রাজা হইতে পারেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

সান্যাল মহাশয়ের মতে এক গৌড় বাদশাহের পুত্র আজিম শাহ ও নসেরিৎ শাহ। এই গৌড় বাদশাহ্কে, তাহা বোধ হয় সান্যাল-মহাশয় নিজেই জানিতেন না।‡ তাঁহার গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই যখন সৈয়দ হোসেন শাহের কথা বলা হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে, সান্যাল-মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত এই আজিম শাহ ও নসেরিৎ শাহ এই হোসেন শাহের পুত্র। এই দুইজন রাজাকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জাতীয় রাজা গণেশের সমসাময়িক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সান্যাল-মহাশয় যে কূট তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মীমাংসা বেতাল ব্যতীত আর কেহই করিতে পারিবেন না। রাজা গণেশের

* বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ৬২।

† বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৯৯।

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১১।

† বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ২২৮।

‡ সান্যাল মহাশয়ের গ্রন্থে “সৈয়দ হোসেন শাহের” নামের পরেই দেখিতে পাওয়া যায় “অল্প দিন মধ্যেই গৌড় বাদশাহের মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় বেগমের পুত্র আজিম শাহ বয়সে ছোট ছিলেন এবং ছোট বেগমের পুত্র নসেরিৎ শাহ বয়সে বড় ছিলেন। উভয়েই সম্রাট্ উপাধি ধারণ করিলেন।” পৃঃ ৭০। অথচ ভট্টশালী-মহাশয় ধরিয়া লইয়াছেন যে, এই দুইজন সৈফউদ্দীন হমজাশাহের পুত্র। (Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal)

পুত্র জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ ৮১৮ হিজিরায় (১৪১৫ খৃঃ) স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজা গণেশকে ১৪১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লোক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অথচ এই রাজা গণেশকে সান্যাল-মহাশয় ৯২৫ হিজিরায়, অর্থাৎ—১৫১৯ খৃষ্টাব্দে মৃত হোসেন শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি ধরিয়া লইয়াছেন। গণেশের পৌত্র শমস্‌উদ্দীন আহমদ শাহ, সান্যাল-মহাশয়ের মতানুসারে ফরীদউদ্দীন শের শাহের সমসাময়িক ব্যক্তি। আহ্‌মদ শাহের রাজ্য ৮৪৬ হিজিরায় (১৪৪২ খৃষ্টাব্দে) শেষ হইয়াছিল।* এবং শেরশাহ এই ঘটনার একশত বৎসর পরে, ৯৩৯ হিজিরায় (১৫৩২ খৃঃ) রাজ্যারম্ভ করিয়াছিলেন।†

"আহমেদ শাঃ সাত বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সাসারামের জায়গীরদার শের শাঃ প্রবল হইয়া গৌড় আক্রমণ করিল। আঃমেদ যুদ্ধে নিহত হইলেন। ভাদুড়ী বংশের বাদশাহী বায়ান্ন বৎসরে শেষ হইল।" বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

হোসেন শাহ্‌ এবং গণেশ ও শমস্‌উদ্দীন আহ্‌মদ শাহ্‌ ও ফরীদউদ্দীন শেরশাহ্‌কে সমকালীন ব্যক্তি বলিয়া সান্যাল-মহাশয় যে ঐতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহাই তাঁহার গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে।

গত অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া কতকগুলি দুষ্ট লোক ক্রমাগত কুলপঞ্জিকা ও বংশপরিচয় জাল করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ সরলচিত্ত ঐতিহাসিকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া আসিতেছে। অ-মুসলমান একজন নূতন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইলেই এইসমস্ত কৃত্রিমকর তাহাকে কায়স্থ অথবা অন্য কোন জাতি হইতে উৎপন্ন প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে এবং তদুপলক্ষে সম্প্রদায়বিশেষের আঢ্য-

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১।

† বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ, পৃঃ ৩১৮।

ব্যক্তিগণের নিকট যথোপযুক্ত অর্থলাভ করে। এই-জাতীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক রচিত বটুভট্টের দেববংশ নামক গ্রন্থকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অকৃত্রিম বলিয়া কি বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে দেখাইয়াছি।*

এইসকল দুষ্ট লোকের রচিত কৃত্রিম গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রাজা গণেশকে কায়স্থ জাতীয় স্থির করিয়া বলেন "উত্তর বঙ্গে দিনাজপুরের রাজা গণেশের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। দিনাজপুর জেলাস্থ রাইগঞ্জ থানার মধ্যে রাজা গণেশের একতম রাজধানী গণেশপুর বিদ্যমান। এই গণেশপুর হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত রাজা গণেশ নির্ম্মিত সুপ্রাচীন রাস্তা রহিয়াছে। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ইনি 'দত্তখান' নামে পরিচিত।" † অথচ ৺ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল কাশী 'কানস্' জাতীয় যে কয়টি লোক পাইয়াছেন তাহাদিগের সকলকেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ করিয়া তুলিয়াছেন।

১। শিখাই সান্যালের পুত্র ফৌজদার কংসরাম সান্যাল।‡

২। একটাকিয়ার রাজা গণেশ নারায়ণ খাঁ *

৩। কুল্লুকভট্টের বংশজাত রাজা কংসনারায়ণ।†

মোগল-বিজয়ের পূর্ব্বে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী স্বীকার করিতেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ রাজধানীর নিকট বাস করিতেন না বলিয়া প্রথমে মুসলমান রাজার অধীনে চাকরী পান নাই। ইহাই ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু রাজা গণেশ উত্তর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কি বারেন্দ্র ছিলেন তাহার প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এবং

* বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথমভাগ, প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ১২৮—৩১।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, (কায়স্থ কাণ্ডের প্রথমাংশ) পৃঃ ৩৬৮।

‡ বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ৫৩।

* ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬৯

† ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১০৯

আধুনিক কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের যে কোন মূল্যই নাই তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা কালে প্রমাণ করিতে হইয়াছিল।*

দনুজমর্দ্দন দেব ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে কায়স্থজাতীয় নেতারা নবাবিষ্কৃত বটুভট্টের দেববংশ নামক কুলগ্রন্থ "আবিষ্কার" করিয়া এই দুই জন রাজাকে কায়স্থ জাতির অধিকার-ভুক্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের অকৃত্রিমত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলাম বলিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় এই কুলগ্রন্থের অকৃত্রিমত্ব বিষয়ক এক সুদীর্ঘ বিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কুলগ্রন্থ-প্রিয়, তিনি সকল গ্রন্থকেই অকৃত্রিম বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত এবং সাধারণতঃ প্রমাণগুলি পরীক্ষা করেন না। বটুভট্টের দেববংশে লেখা আছে যে মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দ্দনের পিতা। যে দুষ্ট ব্যক্তি এই গ্রন্থখানি জাল করিয়াছিল সে আমারই এক প্রবন্ধে পড়িয়াছিল যে, মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ ১৩৩৬ শকাব্দ এবং দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার তারিখ ১৩৪৯ শকাব্দ। মহেন্দ্র দেব যখন দনুজমর্দ্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা তখন তিনি দনুজমর্দ্দনের পিতা না হইয়া আর কোথায় যান। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার তারিখ পড়িতে আমি যে ভুল করিয়াছিলাম সে কথা বটুভট্টের দেববংশের 'আসল' গ্রন্থকার জানিতেন না, পরে H. E. Stapleton নামক পূর্ব্ববঙ্গের একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী মহেন্দ্র দেবের অনেকগুলি মুদ্রা আবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, তাহার কোনটিই ১৩৪০ শকাব্দের পূর্ব্বে মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। তখন বুঝিতে পারা গেল যে মহেন্দ্র দেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী রাজা এবং ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ মালদহে মহেন্দ্র দেবের যে মুদ্রাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দ। বটুভট্টের দেববংশের যে অংশটিতে মহেন্দ্র দেবকে দনুজমর্দ্দনের পিতা বলা হইয়াছে সেই অংশটি আর এতখানা প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এখনও বলেন নাই যে, "পূর্ব্বের পুথিখানি সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়াছিল," কিন্তু একথা বলিবার সময় হইয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালার ইতিহাস, রাজা মাত্রেরই কায়স্থ বংশে জন্মের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইয়া বারেন্দ্র উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্ট-শালী মহাশয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, তিনি কেবল বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য প্রবন্ধ রচনা করেন না, ইংরেজীতে তাঁহার অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে; সুতরাং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু যে ভাষায় ও যে ভাবে নূতন রাজার নাম আবিষ্কৃত হইলেই তাঁহাকে কায়স্থ বংশের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন সেই ভাবে ও সেই ভাষায় আত্মপ্রকাশ ভট্টশালী মহাশয়ের পক্ষে সম্ভব নহে সুতরাং তাঁহাকে ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল রচিত অলীক কাহিনীসমূহের আশ্রয়ে আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছে। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থের সমালোচনা করিবার সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এই বিষয়ে কটাক্ষপাত করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।* ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যালের মতে রাজা গণেশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং ভট্টশালী মহাশয়ের মতে রাজা গণেশের অপর নাম দনুজমর্দ্দন।

ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে,—

১। শিহাবউদ্দীন বায়াজিদ শাহের মৃত্যুর পরে রাজা গণেশ বাঙ্গালা রাজ্য জয় করিয়া নিজে রাজা হইয়াছিলেন এবং মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

২। মুসলমান সাধু নূর কুতব-উল-আলেম সেইজন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ শার্কীকে বাঙ্গালা রাজ্য আক্রমণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

* বাঙ্গালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম সংস্করণ, পরিশিষ্ট (ঙ), পৃঃ ১২৮—৩৭।

* "Our author's critical acumen is not sufficiently awake against D. C. Sanyal's gossip."—Modern Review, April, 1923, p. 469.

ইব্রাহিম শাহ দ্রুতগতিতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশে পৌঁছিয়াছিলেন।

৩। ইব্রাহিম শাহের আগমনে ভয় পাইয়া রাজা গণেশ শেখ নূর কুতব-উল-আলমের শরণাগত হইয়া তাঁহার পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যদু মুসলমান হইয়া জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ নামে বাঙ্গালার রাজা হইয়াছিলেন।

৪। যদু মুসলমান হইলে নূর কুতব-উল-আলম ইব্রাহিম শাহকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

৫। ইব্রাহিম শাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই রাজা গণেশ পুনরায় বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিয়া, যদুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় হিন্দু করাইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।*

ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে রিয়াজ-উস-সালাতীনের মতই সম্পূর্ণ সত্য এবং রাজা গণেশ যখন দ্বিতীয়বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন দনুজমর্দ্দন উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ :—

১। ৮১৭ হিজিরায় শিহাব উদ্দীন বায়াজীদ শাহের মৃত্যু হইয়াছিল ও তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত বর্ষে মুদ্রিত তাঁহার রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

২। ৮১৮ হিজিরায় যদু জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ্ নামে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ৮১৯ হিজিরায় তাঁহার মুদ্রিত রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।†

৩। ৮২০ হিজিরায় চট্টগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম ও পাণ্ডুনগর টাঁকশাল হইতে মুদ্রিত দনুজমর্দ্দনের রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৮২১ হিজিরায় পাণ্ডুনগরের টাঁকশালে মুদ্রিত দনুজমর্দ্দনের রজতমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

৪। ৮২১ হিজিরায় পাণ্ডুনগর ও চট্টগ্রামের টাঁকশালে মুদ্রিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

৫। ৮২১ হিজিরা হইতে জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ভট্টশালী-মহাশয় বলিয়াছেন যে, ৮২০ ও ৮২১ হিজিরায় দনুজমর্দ্দনের মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল। কথাটি এক হিসাবে মিথ্যা, কারণ দনুজমর্দ্দনের যতগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিতেই হিজিরাব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। এপর্য্যন্ত দনুজমর্দ্দন দেবের যতগুলি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকলগুলিতেই শকাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩৩৯ শকাব্দ ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবারে শেষ হইয়াছিল। সুতরাং ১৩৩৯ শকাব্দ ৮১৯ হিজিরায় আরম্ভ হইয়াছিল, কারণ ৮১৯ হিজিরা ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৮ই তারিখে শেষ হইয়াছিল। সুতরাং ১৩৩৯ শকাব্দের শেষ দেড় মাস মাত্র, ১৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ্চ ৮২০ হিজিরায় পতিত হইয়াছিল। এইরূপে গণনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৩৪০ শকাব্দ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ শুক্রবার আরম্ভ হইয়া ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মার্চ্চ শেষ হইয়াছিল। অতএব ইহাও ৮২০ হিজিরার দ্বিতীয় মাসে আরম্ভ হইয়াছিল। ৮২০ হিজিরা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শেষ হইয়াছিল, এবং ১৩৩৯ শকাব্দের ন্যায় ১৩৪০ শকাব্দ ও ৮২১ হিজিরার দ্বিতীয় মাসে শেষ হইয়াছিল।*

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ভট্টশালী-মহাশয় ১৩৩৯ শকাব্দকে ৮২০ হিজিরা ও ১৩৪০ শকাব্দকে ৮২১ হিজিরা, কেবল নিজের সুবিধার জন্য ধরিয়া লইয়াছেন। দনুজমর্দ্দন দেবের ১৩৩৯ শকাব্দে যে-সকল মুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল সে-সমস্তই যে ৮২০ হিজিরার অর্থাৎ—১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৬শে মার্চ্চের মধ্যে এবং দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের যেসকল

* Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal, p. 111.

† Coins and Chronology etc etc. p. 113.

* এইসমস্ত বৎসরের আরম্ভ ও শেষ দিন গণনার জন্য H. N. Wright রচিত Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, Pt. II.দ্রষ্টব্য।

মুদ্রা ১৩৪০ শকাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেগুলি যে ৮২১ হিজিরার, অর্থাৎ ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে জানুয়ারীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছিল একথা কেহই বলিতে ভরসা করিবেন না, কারণ সমস্ত বৎসর ছাড়িয়া কেবল শেষের পাঁচ সপ্তাহে টাঁকশালে টাকা ছাপা হইত, একথা কোন ইতিহাসে বা শিলালিপিতে লেখা নাই। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার তারিখ নিজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বদ্‌লাইয়া শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে, পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকের অযোগ্য। ৮১৮ ও ৮১৯ হিজিরায় মুদ্রিত জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং যে দনুজমর্দ্দন ৮১৯ হিজিরায় মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করাইয়াছিলেন তিনি এই জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহের পিতা রাজা গণেশ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। স্বজাতির প্রীতি, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীকেও অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেইজন্যই তিনি ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যালের প্রেতাত্মার অন্তরালে থাকিয়া নবাবিষ্কৃত রাজা দনুজমর্দ্দনকে রাজা গণেশের সহিত এক করিয়া লইয়া তাঁহাকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজভুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টায় ছিলেন।

ভট্টশালী-মহাশয়ের গ্রন্থে চিত্তস্থিরতার একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একস্থানে গোলাম হোসেন সলিমকে বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় স্থানে সেই ব্যক্তির রচিত ইতিহাসকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাস করিয়াছেন:—(১) And the Riyaz gave him a reign of only 9 years and some months.*

(২) The reader will at once perceive that the account of the Riyaz is substantially correct.†

তৃতীয় স্থানে ভট্টশালী-মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "It was thus that Ganesh came to occupy the throne of Bengal and ruled wisely for seven years.* রিয়াজ-উস-সালাতীনে দেখিতে পাওয়া যায়, The rule and tyranny of that heathen lasted seven years.† গোলাম হোসেন সলিম রচিত রিয়াজ-উস-সালাতীন নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রমাণাভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে-স্থলে অন্য প্রমাণ আছে সে-স্থানে রিয়াজের প্রমাণ বিচার না করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। যদি ভট্টশালী-মহাশয়ের মত ধরিয়া লওয়া যায় যে, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌কে মারিয়া গণেশ নিজে রাজা হইয়াছিলেন এবং জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহ্‌ শারকীর ভয়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া নিজ পুত্রকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করাইয়া রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং ইব্রাহীম শাহ্‌ চলিয়া গেলে যদুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে ১৩৩৯ শকাব্দে দনুজমর্দ্দন নাম বা উপাধি গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় বার গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ১৩৪০ শকাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল এবং যদু প্রথমে মহেন্দ্র দেব উপাধি গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন ও পরে দ্বিতীয়বার মুসলমান হইয়া জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ্‌ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; তাহা হইলেও রিয়াজের উক্তি সত্য বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, কারণ আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌ ৮১৭ হিজিরায় (২৩শে মার্চ্চ ১৪১৪ হইতে ১৩ই মার্চ্চ ১৪১৫) গৌড়ের বাদশাহ্‌ ছিলেন এবং ভট্টশালী-মহাশয়ের মতে যদু দ্বিতীয় বার মুসলমান হইয়া ৮২১ হিজিরায় (৮ই ফেব্রুয়ারী ১৪১৮ হইতে ২৮শে জানুয়ারী ১৪১৯) নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্বের কথা জানিতে হইলে রিয়াজ-উস-সালাতীনের কথা বিশ্বাস করা চলে না, কারণ এই চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে গণেশের সাত বৎসর-ব্যাপী রাজ্য কোন মতেই প্রবিষ্ট করা যায় না।

দনুজমর্দ্দন কে ছিলেন সে-সম্বন্ধে ভট্টশালী-মহাশয় নূতন প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং মুদ্রাতত্ত্বের প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ৮১৭ হিজিরায় আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহের পরে ৮১৮

* Coins and Chronology etc. etc. p. 72.

† Ibid, pp. 113—14.

* Ibid, p. 86.

† Riyaz-us-Salatin (Eng. Trans.), p. 117.

হিজিরায় জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহ গৌড়-রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ শাহের ৮১৮, ৮১৯ ও ৮২১ হিজিরার মুদ্রা আছে; কেবল ৮২০ হিজিরার মুদ্রা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, কেবল এক বৎসরের মুদ্রার অভাবে তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ ও দ্বিতীয়বার মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা অনুমান করা বিংশতি শতাব্দীতে ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যন্ত অসঙ্গত। যখন একই বৎসরের হিন্দু রাজা দনুজমর্দ্দন দেব ও মুসলমান রাজা জলালউদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তখন এই দুইজনকে পরস্পরের বিরোধী বলিয়াই ধরিয়া লওয়া সঙ্গত।

দনুজমর্দ্দন বোধ হয় কায়স্থ বংশজাত, কারণ বাঙ্গলার ঐতিহাসিক-গগনে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু-প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপের এক কায়স্থ বংশ দনুজমর্দ্দনকে বন্ধু বলিয়া দাবী করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের দাবী গ্রাহ্য হইবার এবং বটুভট্টের দেববংশের দাবী অগ্রাহ্য হইবার একমাত্র কারণ এই যে, সে-সময়ে কুলশাস্ত্র এত অধিক পরিমাণে জাল হইতে আরম্ভ হয় নাই।*

শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

* Dr. James Wise on The Bara-Bhuyas of Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1874, pt. i.; রোহিনীকুমার সেন প্রণীত "বাক্‌লা"; পৃ ১৫৭।

কামনা

হে মোর দেবতা প্রভু, মম চিত্তমাঝে
প্রকাশিত হও তব মহিমার সাজে।
ব্যথা দিয়ে দুঃখ দিয়ে হিয়ারে আমার
আঘাতে আঘাতে কর মহৎ উদার।
শক্তি মোরে দাও প্রভু, যেন চিত্তে মম
মানবে বরিতে পারি মোর ভ্রাতা সম।
শত্রুমিত্র ভেদাভেদ ভুলি' যেন, নাথ,
কল্যাণে মিলিতে পারি সকলের সাথ।
দারিদ্র্য? কেন সে র'বে? কেন অত্যাচার
তোমার দয়ার রাজ্যে? কেন অবিচার
সুন্দর ভুবনে তব? হে আমার প্রভু,
প্রেম-মাঝে হিংসা কেন জেগে রয় তবু?

দূর কর দূর কর সর্ব্ব আবর্জ্জনা,
সকলের হ'য়ে মাগি তোমারি মার্জ্জনা।

হুমায়ুন কবির

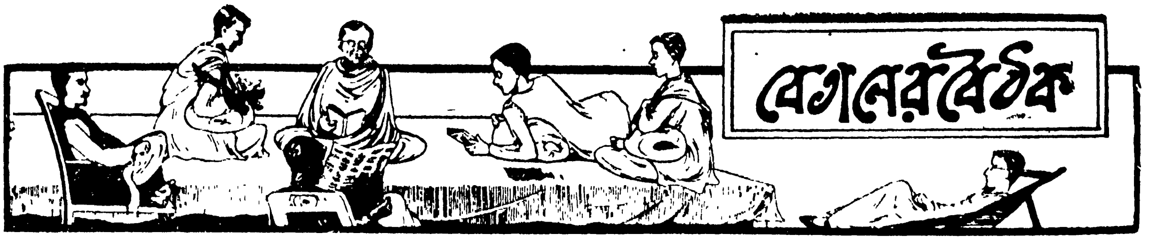
নাম

(Coleridge)

প্রিয়ারে আমার সুধা'নু একদা,—"ওগো মোর প্রাণ-প্রিয়া,
কাব্যে তোমায় করিব প্রকাশ বল কোন্ নাম দিয়া?—
ললিতা, কুন্দ, জ্যোৎস্না, সরলা,
নীলিমা, নমিতা, মীনা কি মুরলা,
মানসী, লতিকা, ছায়া, বীণা, লীলা,—বল যাহা চায় হিয়া।"

প্রেমে ও সোহাগে গলিয়া আমার প্রিয়া কহে শুনি'তাই,—
"যা লাগে তোমার ভাল বলি' মোর মতামত কিছু নাই।—
হোক সে ললিতা, কুন্দ কি বীণা,
মানসী, নীলিমা, ছায়া, লীলা, মীনা;
তোমারি বলিয়া ভাষ' যদি তবে আর-কিছু নাহি চাই।"

শ্রী অজিতকুমার সেন



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৮২)

ভারতে কাপড়ের কল

ভারতের কোন্ কোন্ কাপড়ের কল ভারতীয়ের দ্বারা এবং কোন্-কোন্‌গুলি বিদেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত? বাঙ্গালীর পরিচালিত কল কোন্-কোন্‌টি?

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(১৮৩)

"উর" শব্দটি কোন ভাষার?

গত মাঘ মাসের প্রবাসীর ৫২৬ পৃষ্ঠায় আছে, ইজিপ্টের উর নামক স্থানে মাটির তলায় একটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই সহর হইতেই বাইবেলে বর্ণিত আব্রাহাম নামক এক অতি সভ্য লোকের আগমন হয়। বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেণ্টে আছে যে উর নগর ইউফ্রেটীস নদী-তীরে বেবিলোনিয়ার রাজা নেবুকড্‌নেজারের রাজধানী ছিল। রাজ-পুরোহিতের এক পুত্রের নাম আব্রাম। পুরোহিত আপন অবসর সময়ে মাটির ঠাকুর-মূর্ত্তি গড়িতেন ও হাটে বিক্রয় করিতেন। একদিন শিশু আব্রাম প্রশ্ন করিল—আপনি এই মূর্ত্তি নিজে গড়িয়া তাহাকে প্রণাম করেন কেমন করিয়া? পিতা বালককে ভর্ৎসনা করিয়া, ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু বালকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আব্রাম বাল্যাবধিই মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে সাধারণ দেশবাসীকে উপদেশ দিত। বড় হইলে, আব্রাম একদিন মন্দির রক্ষা করিতেছিল, সে-দিন নগরের বাহিরে এক উৎসবে যোগ দিতে নগরবাসীরা গিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা বড় মূর্ত্তিটির কাছে একটি কুঠার রহিয়াছে, ও অন্য মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলির এই দশা দেখিয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। তাহারা আব্রামকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল—"তোমরা তখন উৎসব দেখিতে গিয়াছিলে, আমি একা মন্দির-দ্বারে বসিয়াছিলাম। দেখিলাম, এক বৃদ্ধা একটি সন্দেশ মন্দির-দ্বারে রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহার যাইবার পর মূর্ত্তিরা সন্দেশ খাইবার জন্য ঝগড়া করিতে লাগিল। তখন বড় মূর্ত্তিটি ঐ কুঠার দিয়া সকলকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলিল ও স্বয়ং সন্দেশটি খাইয়া ফেলিল।" এই গল্প শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল ও বলিল—"মূর্ত্তির কি মারিবার ক্ষমতা আছে?' আব্রাম বলিল—"তাহার যদি কোন ক্ষমতাই নাই তবে তাহার পূজা কর কেন?" এ প্রশ্নের কেহই উত্তর দিতে পারিল না। রাজা সংবাদ পাইয়া আব্রামকে আগুনে পোড়াইয়া মারিতে আজ্ঞা করিলেন। আব্রামের হাত পা বাঁধিয়া আগুনে ফেলা হইল। আগুনে কেবলমাত্র তাহার বাঁধনের দড়ি পুড়িল আর কোনও ক্ষতি হইল না। আব্রাহামের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। তখন আব্রাম আপনার পত্নী ও ভ্রাতার পুত্র লুতকে সঙ্গে লইয়া উর নগর ত্যাগ করিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে ইজিপ্টে গিয়া কিছুকাল ছিলেন। পশ্চিম এশিয়াতে আব্রাম [আব্রাহাম বা ইব্রাহীম] আদি একেশ্বর-বাদ-স্থাপক। কোরাণে আছে যে আল্লাতালার আজ্ঞা-মত জব্রঈল আদি মানব আদমকে ঈশ্বরোপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কালে আদমের সন্তানেরা মূর্ত্তি-পূজক হইয়া পড়িল। তখন আব্রাম আবার একেশ্বর-বাদ স্থাপন করিলেন। আবার জীব-মূর্ত্তিপূজক হইলে, মহম্মদ একেশ্বর-বাদ স্থাপন করেন। বাইবেলে আব্রামের দুই পুত্রের উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠ ইশ্‌মাঈলের বংশে সমস্ত আরববাসী ও হজরৎ মহম্মদের জন্ম হইয়াছে। কনিষ্ঠ ইস্‌হাকের বংশে য়িশুখৃষ্টের জন্ম হইয়াছে।

বাইবেলে উর একটি নগরের নাম হইলেও ভাষাতত্ত্ববিৎরা বলেন, উর শব্দের অর্থ "নগর"। বোধ হয় উর শব্দের পূর্ব্বে অন্য-একটা শব্দ ব্যবহার করা হইত। দক্ষিণ দেশে আহমদ নগরকে লোকে কেবলমাত্র নগর বলিয়া থাকে। সেইরূপ বোধ হয় এ নগরকেও উর বলিত।

ভারতেও এশব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে যে মহিসুর নামক দেশ ও নগর আছে সে শব্দটি মহিষ+উর=মহিষ নামক অসুরের নগর। মহিসুর নগরে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গার মূর্ত্তি

আছে। দেশের লোকে বলে ঐখানেই মহিষ থাকিত ও দেবী তাহাকে ঐ স্থানেই বধ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে উর শব্দটি কোন্ ভাষার শব্দ। যদি সংস্কৃত অথবা দ্রাবিড় কোন ভাষার শব্দ হয় তবে ইউফ্রেটিস তীরে বা ইজিপ্টে কখন্ ও কেমন করিয়া গিয়াছে? যদি ইহুদীদের হিব্রানী ভাষার শব্দ হয় তবে দক্ষিণ ভারতের শাক্তরা কোথায় পাইল?

শ্রী অমৃতলাল শীল

—

মীমাংসা

(১৩২৯ সালের ৩২ নম্বর প্রশ্ন)

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর

গত বৎসর শ্রাবণ মাসে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কোথায়? তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—(১) সাহেবেরা বলেন যে আসামের গৌহাটিই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। (২) মহাভারতের সভাপর্ব্বে ২৬৩ অধ্যায়ের ৭-৯ শ্লোকে দেখা যায় যে অর্জ্জুন হস্তিনাপুর হইতে উত্তর দিকে গিয়া প্রথমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তকে পরাজিত করেন এবং পরে আরও উত্তরে গিয়া কাশ্মীর জয় করেন। (৩) বনপর্ব্বের ২৫৩ অধ্যায়ে ৪।৫ শ্লোকে দেখা যায় যে কর্ণও উত্তর দিকে গিয়া প্রথমে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভগদত্তকে এবং পরে কাশ্মীর জয় করেন। (৪) রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৪২ সর্গে ৩০।৩১ শ্লোকে দেখা যায়—সুগ্রীব বলিতেছেন যে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে ৬৪ যোজন দূরে সমুদ্র মধ্যে বরাহ পর্ব্বতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অবস্থিত। সেখানকার রাজার নাম নরক।

সুতরাং তিনটি পৃথক্ এবং পরস্পর অতিদূরবর্ত্তী স্থান প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। এইজন্যই বৈকুণ্ঠ-বাবু জানিতে চাহিয়াছিলেন যে প্রকৃত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর কোন্‌টা।

বৈকুণ্ঠ-বাবুর জিজ্ঞাসার উত্তর আমি নিম্নে দিতে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কেবল যে সাহেবেরাই গৌহাটি, কামাখ্যা বা কামরূপকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিয়া মনে করেন তাহা নহে। কালিকা পুরাণে এবং কালিদাসের রঘুবংশের চতুর্থ অধ্যায়ে রঘুর দিগ্বিজয়ে ও লৌহিত্য নদীতীরস্থ গৌহাটিকেই প্রাগ্‌জ্যোতিপুর বলা হইয়াছে। মহাভারতের সময়ে অর্থাৎ আমাদের দেশীয় পণ্ডিতদিগের মতে পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অথবা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ৩৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যে আর্য্যেরা পাঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিকদিগের মত নহে। ইহা ভিন্ন আরও একটা বিবেচ্য কথা আছে। কুরু পাণ্ডবদের মধ্যে সন্ধিস্থাপনের জন্য কৃষ্ণের চেষ্টা যখন বিফল হইল তাহার অল্পদিন পরেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে ভগদত্ত যে গৌহাটীতে থাকিয়া হস্তিনাপুর হইতে প্রেরিত সংবাদ পাইয়া বহু হস্তী লইয়া ন্যূনাধিক ১৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী হস্তিনাপুরে গিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দিবেন, তাহাও অসম্ভব। বিশেষতঃ কালিকা পুরাণই হউক বা কালিদাসের উক্তিই হউক তাহা রামায়ণ বা মহাভারতের কথার বিরোধী হইলে কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং গৌহাটি যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নহে ইহা নিশ্চিত। ইহাতে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ হইতে পারে না।

এখন বিচার্য্য বিষয় এই যে, রামায়ণের কথা সত্য, না মহাভারতের কথা সত্য। রামায়ণের কথা যে প্রকৃত নহে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর যদি সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী দ্বীপ হইত তাহা হইলে ভগদত্ত সেখান হইতে তাঁহার বড় বড় হাতী সমুদ্র পার করাইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন কিরূপে? কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে, সুগ্রীব অসভ্য বর্ব্বর দেশের লোক ছিলেন সুতরাং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের ভৌগোলিক স্থানটা জানিতেন না বলিয়া রামায়ণ-কার তাঁহার মুখ দিয়া এই ভুল কথা বলাইয়াছেন। সুগ্রীবের উক্তির মধ্যে যদি নরক রাজার উল্লেখ না থাকিত তাহা হইলে এই যুক্তি অতি সুন্দর বলিয়াই মানিয়া লওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি রামের সমসাময়িক লোক হইয়া রাম হইতে অন্তত দুইতিন শত বৎসরের পরবর্ত্তী কৃষ্ণের সমসাময়িক নরকাসুরের নাম জানিলেন কিরূপে? যদি তাঁহার কথাই সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার কয়েক শত বৎসর পরবর্ত্তী কৃষ্ণেরই বা নরক রাজাকে বধ করিবার সম্ভাবনা কি? যাঁহারা ওএবর এবং হুইলরের মতানুবর্ত্তী হইয়া বলেন যে, মহাভারতের ঘটনার বহু পরে রামায়ণের ঘটনা ঘটিয়াছিল তাঁহারা অনায়াসেই এই মত দিবেন যে, রামায়ণের বৃত্তান্ত মহাভারতের অনেক পরে। যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছিল অথচ যখন তাহার এবং নরক রাজার সামান্য স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট ছিল তখনই রামায়ণের বৃত্তান্ত রচিত হইয়াছিল সুতরাং রামায়ণের কথাই ভুল। কিন্তু অধিকাংশ লোকই ওএবর এবং হুইলরের মত মানেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে প্রচলিত রামায়ণের বহু স্থলে এই মর্ম্মের উক্তি আছে যে, "বৃদ্ধ বাল্মীকি এইরূপ বলেন"। স্বয়ং বাল্মীকির এইরূপ লেখা অসম্ভব। ইহা হইতে অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত এই যে আদিরামায়ণ লুপ্ত হইয়াছিল। তাহারই স্মৃতি লইয়া নূতন এক ব্যক্তি বাল্মীকি নাম ধারণ করিয়া মহাভারতের বহু পরে এখনকার প্রচলিত রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, যাহাতে মূল রামায়ণের কথা ব্যতীত অপর বহু কথা সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। তিনি যখন লিখিয়াছিলেন তখন নরক রাজা ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নামের অতি ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র ছিল। অন্য পক্ষে মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিক কথা আছে। নরক সেখানকার রাজা ছিলেন, ভগদত্ত তাঁহার পুত্র ছিলেন, তাঁহার ভগিনী ভানুমতীকে দুর্য্যোধন বিবাহ করেন। তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যোগ দেন। যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার অর্জ্জুন ও একবার কর্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষে গিয়া সেই দেশ জয় করেন। এসমস্ত কথা মিথ্যা হইতে পারে না। রামায়ণে কিন্তু প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও নরক রাজার নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। এইসকল পর্য্যালোচনা করিয়া মহাভারতে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষকে দিল্লীর উত্তরে অবস্থিত বলা হইয়াছে তাহাই অবশ্যগ্রাহ্য।

কালিদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন এবিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তিনি যে কামরূপকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর বলিয়া মনে করিতেন ইহা তাঁহার বাঙ্গালীত্বের অন্যতম প্রমাণ। কেমনা বাঙ্গালী ও আসামীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরই কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল। গৌহাটির প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখাইয়া এখনও সেখানকার লোকে বলে যে, সেখানে ভগদত্তের রাজধানী ছিল। এইসকল জনশ্রুতি, কালিদাসের বিশ্বাস এবং কলিকাপুরাণের উক্তি এসমস্তই কি মিথ্যা? যদি মহাভারতের কথা সত্য হয় তাহা হইলে উল্লিখিত জনশ্রুতি মিথ্যা বই আর কি হইতে পারে? বলিদ্বীপের অধিবাসীরা সেখানকার একটা স্থান দেখাইয়া বলিয়া থাকে যে সেখানেই কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধ হইয়াছিল। দিনাজপুরের জনশ্রুতি এই যে, দিনাজপুরেরই প্রাচীন নাম মৎস্য দেশ ছিল। অথচ মহাভারতের মতে রাজপুতানায় জয়পুরের প্রাচীন নামই মৎস্য দেশ। মণিপুরের লোকের বিশ্বাস এই যে, উহাই মহাভারতোক্ত মণিপুর।



রিক্তা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু।

U. RAY & SONS, CALCUTTA

এবং মণিপুরের রাজাদেরও বিশ্বাস যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। অথচ মহাভারতের মণিপুর দক্ষিণাপথে। ভীষ্মক রাজা ছিলেন বিদর্ভের রাজা এবং কৃষ্ণ তাঁহার কন্যা রুক্মিণীকে বিবাহ করেন; কিন্তু আসামের জনশ্রুতিতে বলে ভীষ্মক ছিলেন সদীয়ার রাজা। বাণ রাজার বাড়ী ছিল পাতাল নামক এক দেশের শোণিতপুর নামক নগরে এবং সেখানেই কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গিয়া বাণের কন্যা উষাকে বিবাহ করেন। অথচ আসামের জনশ্রুতি অনুসারে তেজপুরেরই পূর্ব্ব নাম ছিল শোণিতপুর এবং বাণ সেখানেই রাজত্ব করিতেন। মহাভারতে দেখিতে পাই যে জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবেরা বারণাবত হইতে পলায়ন করিয়া দুই দিন পদব্রজে গিয়া হিড়িম্ব নামক অসুরকে বধ করেন। কিন্তু আসামের জনশ্রুতি বলে যে, হিড়িম্বের বাসস্থান ছিল ডিমাপুর। এইসকল জনশ্রুতির মূলে যেমন সত্যের লেশমাত্র নাই গৌহাটির প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতিতেও কিছুমাত্র সত্য নাই। কোন হিন্দুই বোধ হয় মহাভারত, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতির প্রমাণ ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া জনশ্রুতির প্রমাণ স্বীকার করিবেন না।

শ্রী বীরেশ্বর সেন

(৪৯)

রুদ্রাক্ষ ও তাম্রমুদ্রা

দুইটি তাম্রমুদ্রার মধ্যবর্ত্তী হইলে রুদ্রাক্ষ ঘুরিবার কারণ যাহা দেখান হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। দুইটি রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রার মধ্যে ধরিলেও রুদ্রাক্ষটি ঘুরিয়া থাকে। তদ্রূপ দুইটি মসৃণ প্রস্তরখণ্ড বা কাচের মধ্যেও ঘুরে। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন যে, যে-কোন মসৃণ সমতলবিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের মধ্যে রুদ্রাক্ষ, বাণলিঙ্গ, পাকা আমড়ার পুরষ্ট আঁটি, কুশমূল অথবা সাধারণ এক খণ্ড এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পাথর রাখিয়া একটু চাপ দিলেই কোন-না-কোন দিকে দুই চারি পাক ঘুরিয়া যাইবে; রুদ্রাক্ষের উন্নত অংশগুলি উচ্চলতায় সমান নহে এবং সেগুলি বাড়া কলমের ন্যায় একটু করিয়া ট্যারচা। মসৃণ পৃষ্ঠদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া একটু চাপ পাইলেই মসৃণ সমতল পৃষ্ঠ সর্ব্বোন্নত অগ্রদেশ হইতে গড়াইয়া পড়িবার কালে রুদ্রাক্ষের একটি ঘূর্ণন-গতি হয় এবং তাহাতেই ২।১ পাক ঘুরিয়া যায়। ইহাতে বিদ্যুতের কোন সম্পর্কই নাই। অধিকন্তু রুদ্রাক্ষের উপর ও নীচেকার যে দুইটি দিক্ সমতল পৃষ্ঠে লগ্ন থাকে তাহার দুই পার্শ্বের ভার অসমান হইলে ত নিশ্চয়ই শীঘ্র শীঘ্র দুই চারি পাক ঘুরিবেই ঘুরিবে।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

প্রশ্নকর্ত্তা বলিতেছেন যে একটি রুদ্রাক্ষকে দুইটি তাম্রমুদ্রার মধ্যে ধারণ করিলে সেটি ঘুরিতে থাকে। উত্তরদাতা এই বিষয় সম্পূর্ণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া উত্তর লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ঘটনা প্রকৃত ধরিয়া কল্পনার সাহায্যে এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, ঐরূপে ধারণ করিলে রুদ্রাক্ষ সব সময়ে ঘোরে না, কোন কোন সময়ে একটু ঘোরে। কেবল তাম্রমুদ্রা কেন, দুই খণ্ড কাচের মধ্যে ধরিলেও ঐরূপ ঘুরে। রুদ্রাক্ষে অনেকগুলি উঁচু উঁচু বিন্দু আছে। যদি চাপিবার সময় তাম্রমুদ্রাদ্বয় বা কাচখণ্ডদ্বয় এমন দুইটি বিন্দুতে লাগে যে তাহাদের সর্ব্বদিকে রুদ্রাক্ষের সমান অংশ নাই, তাহা হইলে ভারী দিকটা নীচের দিকে আসিতে যে-টুকু ঘোরা দরকার কেবল সেইটুকুই ঘোরে, ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে না।

স

(১৪৫)

গোয়ীচন্দ্র উত্থানসী

গদাধর ভট্টের কুলগ্রন্থী ২২৬—২২৯,২২৩ – ২৩৫ও৩১৪—৩৫৯ শ্লোকে 'বিদাম্বর' গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইনি স্বয়ং দ্রাবিড় দেশ হইতে আসিয়া 'কুতুবপুর প্রদেশান্তর্গত' বৃন্দাবনপুর গ্রামে বাস করেন। মাহিষ্যবন্ধুগণের নিকট না জানিতে পারিলেও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মেদিনীপুরের সেন্সাস্ রিপোর্ট হইতে জানা যায় কুতুবপুর উক্ত জেলার অধুনা-বিলুপ্তশ্রী প্রাচীন মাহিষ্য (কৈবর্ত্ত) রাজ্য। গোয়ীচন্দ্র শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় সামবেদী এবং আদিবৈদিক শ্রেণীর সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হন। তাঁহারা ইঁহাকে 'অগ্রমান্তমগ্রপূজ্য' রূপ মর্য্যাদা দান করেন। বেদবেদাঙ্গপারদর্শিতার জন্য ইনি 'ব্যাস আখ্যা' প্রাপ্ত হন। মেদিনীপুরের এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ 'ব্যাসাক্ত' নামে এইজন্য অভিহিত। কাহারও কাহারও ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এই যে ইনি মধ্যশ্রেণীসম্ভূত।

ইনি এবং ইঁহার বংশোদ্ভূত 'ভট্টাচার্য্যাভিধো মহান্' বংশীবদন সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের 'সুনির্ম্মলা' টীকা-টিপ্পনী প্রস্তুত করেন। এই বংশ নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

ময়নার রাজা হেরম্বানন্দ বাহুবলীন্দ্রের নেতৃত্বে তত্রত্য সেবক-সম্মিলনীর যত্নে যে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে তাহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমার নিকট আসিয়াছে। উহাতে দেখা যায় দ্রাবিড় হইতে পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র আনয়নকারী রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই আনীত বিপ্রগণের পুত্রাদি উল্লেখকালে কুলগ্রন্থীতে গোয়ীচন্দ্রের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

(১৫৮)

বুদ্ধদেব যে রাজার পুত্র ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সে রাজা কোনও বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন না। তিনি কেবলমাত্র শাক্য-বংশীয়দের রাজা ছিলেন। শাক্য-বংশীয়দের রাজ্যে কেবলমাত্র একটি নগর—কপিলবস্তু—ছিল। নগরটি প্রাচীর-বেষ্টিত ও সুরক্ষিত ছিল। নগরের চারিদিকে শাক্যদের চাষের বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল। দিনমানে তাহারা আপন আপন ক্ষেত্রে চাষ করিত ও রাত্রে নগরে প্রবেশ করিত। যাহাদের ক্ষেত্র নগর হইতে দূরে, অতএব যাহারা প্রত্যহ যাতায়াত করিতে পারিত না, তাহারা চাষের সময়ে ক্ষেত্রেই কিছুদিন বাস করিত, কিন্তু তাহাদের স্ত্রীপুত্রাদি ও মূল্যবান্ বস্তু নগরের মধ্যে গৃহেই থাকিত। নগরে শাক্যবংশীয় ছাড়া অন্য বংশীয় অধিবাসী ছিল না। গ্রামবাসী জাতি-প্রজার মত গ্রহণ না করিয়া রাজা কিছুই করিতে পারিতেন না।

কপিলবস্তুর পশ্চিমে কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তীনগর। বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগের অল্প কিছুকাল পরে শ্রাবস্তীরাজ প্রসেনজিৎ একটি শাক্যদুহিতা বিবাহ করিয়া শাক্যদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। শাক্যরা প্রসেনজিতের বংশকে হীন ও আপনাদের বংশকে কুলীন বলিত; সেইজন্য শাক্যরা প্রসেনজিৎকে কন্যাদান করিতে স্বীকৃত হইল না। কিন্তু প্রসেনজিৎ প্রথমাবধি বড় রাজা ছিলেন ও দিন দিন তাঁহার রাজ্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছিল দেখিয়া শাক্যরা প্রকাশ্যে অমত করিতে সাহস করিল না। তাহারা মহানমন নামক এক শাক্যের একটি দাসীর গর্ভজাতা কন্যাকে কুলীন শাক্য কন্যা বলিয়া প্রসেনজিৎকে দান করিল। এই কন্যার গর্ভে বিরূঢ়ক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার কোন শাক্য

যুবরাজ বিরুদ্ধককে দাসী-পুত্র বলিয়া বিদ্রূপ ও অপমানিত করিয়াছিল। সেই সূত্রে বিরুদ্ধক শাক্যদের পূর্ব্ব ছলনা জানিতে পারিয়াছিলেন ও সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার পর শাক্যদের নির্ম্মূল করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজ্য পাইয়া বিরুদ্ধক শাক্য নগর অবরোধ করিলেন। শাক্যরা নগরের দ্বার ছাড়িয়া দিলে তিনি শাক্যকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকে বধ করিলেন। তখন বুদ্ধদেবের বৃদ্ধাবস্থা। বিরুদ্ধকের আক্রমণ-কালে মাত্র একজন শাক্য কুরুক্ষেত্রে ছিল। সে কপিলবস্তু ধ্বংসের পর, আধুনিক কাবুলের কাছে স্বাত নদীর (Swat river) তীরে গিয়া বাস করিয়াছিল।

তিব্বতদেশীয় ত্রিপিটকের রকহিল (Rockhill) কৃত ইংরেজি অনুবাদ হইতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১৫৯)

ভারতবর্ষে সিমেণ্ট কারখানা

(১) ওড়িষ্যা সিমেণ্ট কোং লিঃ, মূলধন ৭৪৭ হাজার টাকা, কটক জেলায় গড়মধুপুর ষ্টেশনের নিকট কারখানা অবস্থিত। ম্যানেজিং এজেণ্টস্ বার্ড কোং, কলিকাতা।

(২) বন্দী পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট লিঃ, মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। বন্দীরাজ্যে B. B. & C. I. রেলের লাখেরী ষ্টেশনে কারখানা অবস্থিত।

(৩) ইণ্ডিয়ান্ সিমেণ্ট কোং লিঃ, নাভসারী ভবন, বোম্বে ফোর্ট। মূলধন ৬০ লক্ষ টাকা।

(৪) বিলাসপুর লাইম এণ্ড সিমেণ্ট কোঃ লিঃ, বিলাসপুর জেলার আকলতারা ষ্টেশনে কারখানা অবস্থিত।

(৫) সি পি পোর্টল্যাণ্ড এণ্ড সিমেণ্ট কোং লিঃ, জব্বলপুর জেলায় কিমোর রেল ষ্টেশনের নিকট কারখানা অবস্থিত।

(৬) জব্বলপুর পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট কোং লিঃ, মধ্য প্রদেশে মেগাওনে কারখানা অবস্থিত।

(৭) পাঞ্জাব পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট কোং লিঃ, মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা। পাঞ্জাবের Wah (ওয়া) ষ্টেশনের নিকট কারখানা অবস্থিত।

(৮) লাইম এণ্ড সিমেণ্ট ওয়ার্কস্, দেরাদুন।

(৯) পালামৌ জেলায় জপলা ষ্টেশনের নিকটে মার্টিন কোম্পানী ৮০ লক্ষ টাকা মূলধনে সিমেণ্টের বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন।

শ্রী রামানুজ কর

(১৬০)

ভারতবর্ষে খড়িমাটির পাহাড়

বাঁকুড়া সহরের দুই মাইল দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ ধারে খড়িমাটির খাদ আছে।

শ্রী রামানুজ কর

(১৬১)

তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত উপাসনা

আমাদের দেশের সমুদয় তন্ত্রশাস্ত্রই শিবপ্রোক্ত। উহা অতীব প্রাচীন বলিয়াই লোকের দৃঢ় ধারণা। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সমুদয় তন্ত্রকেই প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে কতকগুলি তন্ত্র অত্যন্ত আধুনিক (কেননা, ঐ সকল তন্ত্রে ইংরেজ জাতি ও লণ্ডন-নগরের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়)। ঐসমুদয় আধুনিক তন্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় যেন উহাদের বয়স ৩০০ বৎসরের অধিক নহে, ফলতঃ তন্ত্রশাস্ত্র মাত্রেই আধুনিক নহে। অথর্ব্ববেদ, গোপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে তন্ত্রশাস্ত্রের কথার উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন ভিতারিব পাষাণস্তম্ভে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্ত সম্বন্ধে তন্ত্রের বিবরণ খোদিত আছে। স্কন্দগুপ্ত ২০০ খৃঃ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্কন্দ-গুপ্তের পূর্ব্বেই তন্ত্রশাস্ত্র বিদ্যমান ছিল। অতএব তন্ত্রশাস্ত্র যে প্রাচীন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা আমরা তন্ত্রোক্ত উপাসনাকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলিতে পারি।

বৈদিক যুগে এই উপাসনা প্রচলিত ছিল কি না, তাহার সঠিক বিবরণ নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, বেদে যে রুদ্র দেবতা ও শক্তির কথার উল্লেখ আছে, তাঁহারাই পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে (খৃঃ পূর্ব্ব ১০০০—৩০০০ অব্দ) মহাদেব ও কালী ও রূপভেদে দুর্গা প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। আমাদেরও এই ধারণা।

তন্ত্রোক্ত উপাসনা কোন্ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা হলপ করিয়া কিছু বলা যায় না। তবে এসম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, তন্ত্রোক্ত উপাসনার কতকগুলি তন্ত্রমন্ত্র পাতঞ্জল দর্শনের এবং পূর্ব্বমীমাংসার ছাপ আছে বলিয়া অনুমিত হয়। বাহুল্যভয়ে ঐ সমুদয় শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিতে বিরত থাকিলাম।

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে ঈশ্বরানুরক্ত করাই বোধ হয় এই উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলতঃ সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই উপাসনার সৃষ্টি। উহাকে শারীরিক ও মানসিক বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সোপানস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বেদই তন্ত্র, তন্ত্রই বেদ, বেদ যত দিনের তন্ত্রও ততদিনের—পৌর্ব্বাপর্য্য নাই। বৈদিক যুগেও তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল প্রচার ছিল। বেদ ও তন্ত্র উভয়কেই শ্রুতি বলে। শ্রীমদ্ভাগবত, বৃহত্তম পুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, কল্কিপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে তন্ত্রের প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে—

অভেদপ্রত্যয়ো যস্তু জীবস্য পরমাত্মনা।
তত্ত্ববোধঃ স বিজ্ঞেয়ো বেদতন্ত্রাদিভির্মতঃ॥

মনুর টীকায় হারীত বচন—

"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকীতি চ।"

উপনিষদাদিতেও তন্ত্রের প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে তন্ত্র-শ্রুতি আছে। বৈদিক অনেক ঋষি তন্ত্রমার্গী ছিলেন।

কলিযুগের জন্য তন্ত্র বিশেষভাবে প্রযোজ্য, সুতরাং যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ তন্ত্রমতেই নিষ্পন্ন হয়।

জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য ও যোগসাধন—ইহাই তন্ত্রের দর্শন এবং মোক্ষলাভই ইহার চরম সাধন। দর্শনাদি যাহা জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় ও উপদেশ তন্ত্রে আছে।

তন্ত্রের 'আচার ও ভাব' পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে জীবের নৈতিক উন্নতিই ইহার ক্রম, সুতরাং সামাজিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী।

৺পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় এসম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'সাধন-কল্পলতিকা নামক পুস্তকে তন্ত্রের সর্ব্ববিষয়ের বিশদ আলোচনা আছে।

শ্রী মৃগাঙ্কনাথ রায়

তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব খুব সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-যুগের অবনতির সময়ে। এই অনুমান যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে উহা প্রায় ১৫০০ শত বৎসরের পুরাতন। পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন পুস্তকে তন্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি দেখিয়াছি মনে পড়ে :—

'গৌড়েনোৎপাদিতাঃ বিদ্যাঃ
মৈথিলৈঃ প্রবলীকৃতাঃ।
কচিৎ কচিৎ মহারাষ্ট্রে
গুর্জ্জরে প্রলয়ং গতাঃ॥'

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'তন্ত্রের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহে এবং Arthur Avalon-এর তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ হইতে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

শ্রী বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

রংপুর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "সাহিত্য-সংহিতা" নামক মাসিক পত্রিকায় সন ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় যে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন তাহাতেই সন্তোষজনক মীমাংসা আছে। পুরাণে বর্ণিত আছে—সুরতরাজা লক্ষ বলি দিয়া মহামায়ার অর্চনা করিয়াছিলেন—সে সত্যযুগের কথা। তার পর ত্রেতাযুগে ভগবান্ রামচন্দ্র রক্ষরাজ রাবণের নিধন-কামনায় মহামায়ার অর্চনা করিয়া সকলকাম হইয়াছিলেন। দ্বাপরে কংস মহারাজ মহামায়ার নিকট কৃষ্ণ বলরামকে বলি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অতএব নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, বৈদিক যুগে তান্ত্রিক উপাসনার বাহুল্য না থাকিলেও উহা তাৎকালিক ধর্ম্ম-জগতে প্রচলিত ছিল।

হিন্দুসমাজে শৈব শাক্ত সৌর গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসক শ্রেণী তন্ত্রোক্ত বিধানেই উপাসনা করিয়া থাকেন, কারণ উপনিষদ্ যেমন অপৌরুষেয় বেদের শীর্ষভাগ, তন্ত্রশাস্ত্রও তদ্রূপ তাঁহার মন্ত্রাংশ। তন্ত্রে উপাসনা ব্যতীত ক্রুর কর্ম্মাদির বিধান আছে, তাহাও অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদেরই অংশবিশেষ বলা যায়। একারণে বেদ ও তন্ত্র উভয়ই আগম নামে অভিহিত।

অধুনা অনেক তন্ত্র অপ্রকাশ অবস্থায় আছে। প্রকাশিত তন্ত্রমধ্যে কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবীয় তন্ত্র, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, সনৎকুমার তন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি তন্ত্র বৈষ্ণবগণও সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীনত্ব হেতু বর্ত্তমানকালে উহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

শ্রী ভবকালী দত্ত

(১৬২)

ভারতের বাহিরে হিন্দু উপনিবেশ

হিন্দুগণ যে জাপান, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস্ প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারা যাইবে। যথা :—

১। বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত "প্রাচীন সভ্যতা"।
২। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী"।
৩। ইন্দুভূষণ দে মজুমদার লিখিত "মার্কিন মুলুক"।
৪। ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত "নানা প্রবন্ধ"।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Indian Shipping and Maritime Activities of the Ancient Hindus পুস্তকে এসম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ আছে। শ্রী প্রভাত সান্যাল

(১৬৩)

অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল—"মধ্যস্থের" প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক ছিলেন বিক্রমপুরের ত্রৈলোক্যনাথ বিদ্যানিধি। বার্ষিক মূল্য ছিল দুই টাকা।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৬৫)

সংস্কৃতে রামায়ণ ও মহাভারত

প্রক্ষিপ্ত-অংশবর্জ্জিত সংস্কৃত রামায়ণের মধ্যে "বঙ্গবাসী সংস্করণ রামায়ণ" আছে। উহাতে মূল সংস্কৃতের যথাযথ বঙ্গানুবাদও দেওয়া আছে। "হিতবাদী কার্য্যালয়" হইতে মূল রামায়ণের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

মহাভারতের মধ্যে "নীলকণ্ঠ কৃত" টীকা সমেত মহাভারত আছে। উক্ত মহাভারতও অনেকাংশে খাঁটী। এপর্য্যন্ত মহাভারতের যতগুলি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতই মূল সংস্কৃত মহাভারতের যথাযথ অনুবাদ। ইহা অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ বাঙ্গালায় আর নাই।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৬৭)

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী মণিভূষণ মজুমদার মহাশয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের বিবরণ দিয়াছেন।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে তথ্যাংশ (theory) এবং ব্যাবহারিক (practical) অংশ উভয়ই ভালভাবে শিখান হয়।

এখানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখাইবার জন্য উপযুক্ত অধ্যাপক আছেন এবং তাঁহারা যথেষ্ট যত্ন লইয়া শিক্ষা দেন। এখানে অনেক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিও আছে। এখানে দুইরকমের পাঠ্যক্রম আছে; উপাধি (B. Sc) ও ডিপ্লোমা। উপাধির জন্য I. Sc. ও ডিপ্লোমার জন্য প্রবেশিকা পাশ হইলে চলে, তবে তাহা অপেক্ষা বেশী পড়িয়া আসিলে সুবিধা হয়।

প্রফুল্লকুমার মিত্র

(১৭৪)

সংস্কৃত ভাষায় "উদ্ভিদ্‌বিদ্যা" (Botany) এই নামে কোনও গ্রন্থ ছিল কি না এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত না হইলেও চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞদের প্রণীত গ্রন্থে ও তন্ত্রশাস্ত্রের কতকগুলি গ্রন্থে উদ্ভিদ্-বিদ্যার বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা পাওয়া যায়।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

(১৭৫)

বোতাম তৈয়ারী

নারিকেলের মালার ও ঝিনুকের বোতাম পালিশ করিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর মাছের বড় আঁশ সংগ্রহ করিয়া তাহা শুকাইয়া সেই শুক্‌না আঁশ দ্বারা নারিকেলের মালা ও ঝিনুক শিরিষ-কাগজের ন্যায় ঘষিয়া লইলে সুন্দররূপে পালিশ হইয়া যায়।

ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারী করিবার কল কিনিতে পাওয়া যায়। ঐ কলের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু বোতাম প্রস্তুক

করা যায়। নিম্নলিখিত স্থানে অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত বিবরণ এবং তৎসঙ্গে কলও কিনিতে পাওয়া যাইবে। যথা—

১। বাসন্তী বট্‌ন্ এণ্ড কোং, সাহাজিয়াল নগর, ঢাকা।
২। ঢাকা বট্‌ন্ ম্যানুফ্যাক্‌চারী কোং ৭৫ লয়াল ষ্ট্রীট, ঢাকা।
৩। জলি বাট্‌ন্ এণ্ড কোং, দয়াগঞ্জ, ঢাকা।
৪। গুপ্ত এণ্ড কোং, ৪৫১ হ্যারিসন্ রোড, কলিকাতা।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

(১৮১)

গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে নদী

কলিকাতা হইতে পেশোয়ার যাইতে হইলে, পথে যে-যে নদী পড়িবে এবং কোন্-কোন্ নদীতে পুল আছে বা নাই, সেই সমুদয় নদীর মধ্যে যেগুলি আমার জানা আছে, সেইগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—

১। ফল্গু-নদী—পুল নাই।
২। শোন-নদ—পুল আছে (রেলওয়ে)।
৩। গঙ্গা-নদী—নাই।
৪। যমুনা-নদী—পুল আছে।
৫। ইরাবতী-নদী—নাই।
৬। সিন্ধু-নদ—নাই।
৭। কাবুল-নদী—নাই।

শ্রী রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিদ্রোহী কবি মধুসূদন

[কবি মধুসূদন দত্তের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে—১২ই মাঘ ১৩৩০]

হে বিদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল, হে বাংলার দুরন্ত সন্তান !
মাননি শাসন কোনো, চূর্ণ করি' নিষেধ-পাষাণ—
সমাজ-বাঁধন ভাঙি', করি' ভেদ ধর্ম্মের নিগড়
উন্মত্ত-চরণ-ভরে চলেছিলে চির-অগ্রসর !
ছুটেছ আশার পিছে,—সে আশা কভু বা মরীচিকা—
ক্ষণেকে মোহিয়া আঁখি ক্ষণ পরে যাহা বিভীষিকা !—
তারি পিছে ছুটে' গেছ উদ্দাম অবোধ বাধাহীন ;
ভেঙে গেছে মোহ কত, তবু মোহ হয়নিক ক্ষীণ।
যে আশা ছুটেছ ধরি' মেটেনিক সে তোমার আশ,
তবু চির-অভিলাষী, তবু ছিল উল্লাস-উচ্ছ্বাস !
শান্ত বঙ্গ-গৃহে স্নিগ্ধ জ্বল নাই প্রদীপের শিখা,
বৈশাখের মেঘে তার দীপ্ত তুমি বিদ্যুতের লিখা !
হে দুরন্ত দৃপ্ত কবি ! বিদ্রোহ-পাগল সেই প্রাণ
নৃত্যতালে প্রসারিয়া করি' দিলে নব-গতি-মান্
ক্ষীণা সে কাব্যের নদী—শৈবালে জঞ্জালে হত-বল
সনাতন অবসাদে, পুরাতন-উপলে বিহ্বল।
বিশ্ব-সাগরের বার্ত্তা তারি গতি করি' আহরণ
শীর্ণা ভাষা-তটিনীতে জাগাইলে প্রাণের নর্ত্তন !
বাল্মীকি ব্যাসের সাথে মিলাইলে ভার্জ্জিলে হোমারে,
কৃত্তিবাস কাশীদাস জেগে উঠে প্রতীচ্য-হুঙ্কারে !
বঙ্গের শঙ্খের সাথে বেজে উঠে পশ্চিমের ভেরী,
কাব্যের চরণ হ'তে খসে' পড়ে জড়তার বেড়ী !
নিত্য নব আশা পানে ছুটেছিলে উন্মাদ সমান ;
এক আশা বঙ্গ-ভাষা তাতে তব একান্ত ধেয়ান !
আজ ভাবি—সেই ভালো, নৈরাশ্যে নৈরাশ্যে বল লভি'
ব্যগ্র আশে পূরিয়াছ আমাদের আশা তুমি, কবি !
যে তৃপ্তি খুঁজেছ নিতি পেলে তাহা হ'য়ে যেত শেষ,
অতৃপ্ত আবেগে তবে কে দেখাত সুখের উদ্দেশ ?
তুমি রচি' গেছ পথ বনদল উপাড়িয়া বলে,
আজি সে পথের পরে রবির অমল জ্যোতি জ্বলে।
দেব-ত্রাস মধু দৈত্য নাশে যেই সে মধুসূদন,—
বাংলার কাব্যের কক্ষে তুমি কবি জড়তা-দলন !
সমাজে দলেছ পায়ে, স্বধর্ম্মে ভেঙেছ দৃঢ় হাতে ;
দরদ দিয়েছ তবু জাতির অভাব-বেদনাতে ;—
মাতৃ-ভাষা-জননীরে, হে দরদী, রাখনিক দূরে—
প্রাণরসে পুষ্ট তারে করিয়াছ নিত্য চিত্ত-পুরে।
মুক্তি পেল বদ্ধ যাহা সুপ্তি-মাঝে শুনি' মেঘনাদ ;
নবছন্দে নেচে এল নবীনের বিচিত্র সংবাদ !
আজি তব জন্ম-দিনে নমস্কার, বিদ্রোহী মহান্ !
নমস্কার সে বিদ্রোহে যে বিদ্রোহ আনিল কল্যাণ !

শ্রী প্যারামোহন সেনগুপ্ত



অদ্ভুত বৃক্ষ—

ফরাসী দেশের একখানি বৈজ্ঞানিক প ত্রে বৃক্ষের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে একদল ভ্রমণকারী ফ্রান্স হইতে আফ্রিকায় গমন করেন। উদ্দেশ্য নানা জায়গা পর্য্যটন করিয়া নূতন কিছু আবিষ্কার করা। তাঁহারা নানা জনপদ ও পর্ব্বত পরিদর্শন করিয়া চাড নামক হ্রদের (Lake Chad) নিকটে এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পান এবং তাঁহারাই এই বৃক্ষ ফ্রান্স দেশে আনয়ন করেন।

যে স্থানে এই বৃক্ষ প্রথম পাওয়া গিয়াছিল, সে স্থানের অধিবাসীগণ কৌড়ী (Kauris) নামে খ্যাত। তাহারা এই বৃক্ষকে 'আম্বাক্' বলে। এই বৃক্ষ অযত্নসম্ভূত এবং কয়েকমাসের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিখণ্ডকে গভীর অরণ্যে পরিণত করে। এক বছরে এক বৃক্ষ প্রায় ১৬ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং এই দৈর্ঘ্যের ভিতরে বৃক্ষের শাখা মোটেই বহির্গত হয় না। মোটাও প্রায় ৪।৫ ফুট হইয়া থাকে। পাতাগুলি অনেকটা আমাদের দেশের লজ্জাবতীর (Mimosa) পাতার ন্যায়। এই নিমিত্ত উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই বৃক্ষকে লজ্জাবতী শ্রেণীভুক্ত (Mimosa order) করিয়াছেন। ২।৩ বছর পর পর একপ্রকার বড় বড় পীত রংয়ের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য এই যে এত বড় দীর্ঘ ও মোটা বৃক্ষ শোলা অপেক্ষাও হাল্‌কা। শুষ্ক শোলার আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) ০'২০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু এই 'আম্বাক্' বৃক্ষের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ০'১ এবং অনেক দিন জলে থাকার পর ০'২৮ পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই কাঠ এত হাল্‌কা হইলেও কেহ মনে ভাবিবেন না যে ইহা শোলার ন্যায় নরম এবং অনায়াসে ভাঙিয়া ফেলা যায়। ইহার তন্তুগুলি (Fibres) এত ঘন এবং শক্ত যে ইহা হইতে তক্তা প্রস্তুত হইতে পারে। স্থানীয় অধিবাসীগণ এই বৃক্ষের তক্তা দ্বারা দরজা, টেবিল, বাক্স ইত্যাদি প্রস্তুত করে। এই তক্তার নৌকা খুব দ্রুত চলে এবং বাতাস কিম্বা ঝড়ে ডুবিয়া গেলেও জলমগ্ন হয় না; কৌড়ীগণ কখন কখন একখণ্ড তক্তা দেহের সঙ্গে বাঁধিয়া বড় বড় নদী জল ঠেলিয়া উত্তীর্ণ হয়।

এই বৃক্ষের পক্ষে দক্ষিণ ফ্রান্স্ ও আল্‌জেরিয়ার জল-বায়ু বেশ অনুকূল। ঐসকল স্থানে এই বৃক্ষের চাষ এখন অনেকেই করিতেছে।

—

কাষ্ঠে সুরাসার—

করাতের গুঁড়া ও কাঠের পরিত্যক্ত অংশ হইতে যে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে, ইহা সাধারণের নিকট আশ্চর্য্যজনক হইলেও, বৈজ্ঞানিকের নিকট কিছুই নূতন নহে। অনেক বৈজ্ঞানিক এবং ডাক্তার এই গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করিবার প্রণালী পর্য্যন্ত কেহই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিছুদিন হইল সুইডেনবাসী এক ডাক্তার ইহা উদ্ভাবন করিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন এবং জগতেরও মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখিলেন যে, কাষ্ঠ হইতে cellulose তৈরী করিলে যে Sulphite অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ কাঠের অংশ থাকে। এই Sulphite এতদিন কোন কাজেই লাগিত না, বৃথাই নষ্ট হইত। কিন্তু, ইহার ভিতরে শর্করা, গ্লুটেন, এসেটিক নাইট্রোজিনাস যৌগিক পদার্থ, ট্যানিন্ প্রভৃতি পদার্থ থাকিত। ডাক্তার ঠিক করিলেন যে এই Sulphiteকে Calcium carbonate দ্বারা neutralise করার পরে yeast দ্বারা উহাকে অতি সহজেই সুরাসারে পরিণত করা যাইতে পারে। তার পর, distillation দ্বারা উহা সম্পূর্ণ পৃথক্ করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। এই নিয়মে ১০০ শত গ্যালন lye হইতে অথবা প্রতিটন Cellulose হইতে ১৪ গ্যালন সুরাসার সংগ্রহ হইয়া থাকে।

এই উপায়ে যে সুরাসার পাওয়া যাইবে তাহার মূল্য বাজার অপেক্ষা অল্প হইবে। মূল্য অল্প হইলে লাভ এই হইবে যে, ডাক্তারী ঔষধের মূল্য কমিবে। Sweedish পণ্ডিত জগতের কত বড় যে একটা উপকার করিলেন, তাহা আমরা পরে বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে এইপ্রকার কত যে জিনিষ বৃথা নষ্ট হইয়া যায় কে তাহার খবর রাখে? Bye-production বলিয়া একটা জিনিষের কথা আমরা মোটেই ভাবি না।

আমাদের শিক্ষিত লোকরা যদি চাকুরীর জন্য যেখানে সেখানে খোসামোদ না করিয়া দেশের জিনিষগুলিকে কিপ্রকারে অর্থোৎপাদন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করেন তবে আত্মসম্মান বজায় থাকে, অন্নবস্ত্র সমস্যারও মীমাংসা হয় এবং দেশের ধন-সম্ভারও বৃদ্ধি হয়।

শ্রী শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম

—

কুকুরের নাকের ছাপ—

Alfortএ যে The French Veterinary College আছে তার জনৈক অধ্যাপক বলেন যে, কুকুরের জাতি-বিভাগ এবং কুকুর সনাক্ত করতে হ'লে ভবিষ্যতে Bertillon প্রথার প্রয়োগ করা দরকার। এই প্রথা অপরাধীদের প্রতি প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। Bertillon প্রথায় মানুষের বুড়ো আঙ্গুলের এবং কুকুরের বেলায় পায়ের ছাপ নেওয়া হয়। কুকুরের পায়ের ছাপ নেওয়া তিনি সমীচীন বলে' মনে করেন না, কেননা কুকুরের খাবার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা যেমন খুব বেশী অনিষ্টের সম্ভাবনাও তেম্‌নি। সেইজন্য অধ্যাপক Dechambre মহোদয় বলেন যে কুকুরের নাকের ডগার ছাপ নেওয়া হোক। কুকুরের নাকের ডগায় পুরু চামড়া থাকার দরুন্ রেকর্ড করার পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলে' তিনি মনে করেন। তিনি বলেন যে অল্পদিন পরেই পারীতে একটা মোকদ্দমার বিচার হবে তাতে এই বিষয়টি সাধারণের সাম্‌নে স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। একটা কুকুরের আকৃতি এমন বদ্‌লে ফেলেছে যে সে যে কোন জাতের কুকুর তা এখন ঠিক করে' উঠা দায়। অই কুকুরটি সত্যই যে-জাতের কুকুর নয় তাকে সেই জাতের বলে' ধরা হচ্ছে।

আজকাল নাকি পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা আক্‌সার এইরূপ করে' থাকে।

—

কৃত্রিম কাঠ—

একজন নরওয়ে বিজ্ঞানবিৎ এক নয়া ধরণের কৃত্রিমকাঠ তৈরী করার উপায় আবিষ্কার করেছেন। করাত-গুঁড়ো ও রাসায়নিক কয়েকটি পদার্থের সংমিশ্রণে এই কাঠ তৈরী হয়। এর ৫০ পঞ্চাশ ভাগই হচ্ছে করাত-গুঁড়ো। এই সংমিশ্রণে অত্যধিক চাপ দিলে যে জিনিষ তৈরী হয় আসল কাঠের সব গুণগুলিই তার আছে। আপেক্ষিক গুরুত্ব আসল কাঠেও যা এই কৃত্রিম কাঠেও তাই। ওক-কাঠের মত এ কাঠ শক্ত। একে র‍্যাঁদা করা, করাত করা, ছ্যাঁদা করা, পেরেক মারা, রং করা, কিম্বা পালিশ করা সবই চলে। মোটের উপর আসল কাঠে যেরূপ যন্ত্রাদি দিয়ে ছুতোরের সবরকম কাজ করা যায় সেরূপ সব কাজই এতে চলে। জলে নষ্ট হয় না, আবার রাসায়নিক পদার্থ থাকার দরুন্ পচ্‌তে পারে না। আসল কাঠ যে-উত্তাপে পোড়ে তার চেয়েও বেশী উত্তাপে এই কাঠ পোড়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে আসল কাঠের চেয়ে কৃত্রিম কাঠ এই বিষয়ে টেক্‌কা মেরেছে।

—

বলার সঙ্গে সঙ্গে টাইপ—

একজন সুয়িস্ আবিষ্কারক একটা অদ্ভুত কল বের করেছেন। সে কলটি নাকি ডিকটাফোন'-অপেক্ষা সরেশ। এমনকি তিনি দাবী করেন যে আর নাকি টাইপিষ্টদের মোটেই দর্‌কার হবে না। আগে শর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্টকে যা বল্‌বার বলে' দিলে তিনি টুক টুক করে' লিখে নিতেন এবং তার পরে টাইপ করে' নিতেন।

তার পর ডিক্‌টাফোনের আবিষ্কার হয়। এতে Shorthandএর কোনও দর্‌কার হয় না। যা বল্‌বার তাতে বল্‌লে আস্তে আস্তে সবই অবিকল লেখা হ'য়ে যেতে থাকে। তার পর সেগুলি একজন টাইপিষ্ট টাইপ করে' নিতে পারেন। এইপ্রকারের কল এখন নানা-রকমের লোক ব্যবহার কর্‌ছেন—তিনি কি সাহিত্যিক, কি শিক্ষক এবং কি ব্যবসাদার। কিন্তু এই সুইস্ আবিষ্কারটি যদি সফল বলে' প্রমাণিত হয় তা হ'লে যুগান্তর উপস্থিত হবে এবং আর মোটেই টাইপিষ্টদের দর্‌কার হবে না, কারণ বলার সঙ্গে সঙ্গেই কথাগুলি কলে টাইপ হ'য়ে যেতে থাকে। অবিশ্বাস্য বলে' যদিও আমাদের বোধ হচ্ছে তথাপি এটি এমন যুগ যে যুগে যত সব অবিশ্বাস্য অদ্ভুত কাণ্ড সত্য বলে' প্রমাণিত হচ্ছে।

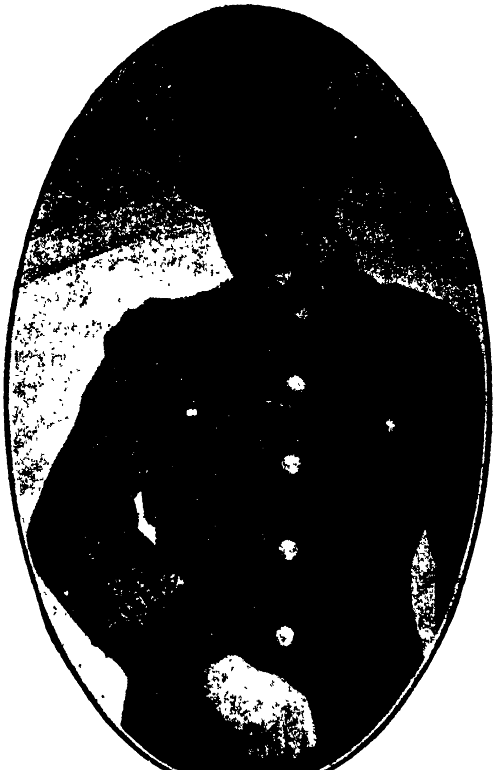
শ্রী শশিভূষণ বারিক

—

বেতারের কথা—

আমাদের দেশে বেতার-বার্ত্তা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ লোকেই প্রায় কিছুই জানেন না—কারণ ভারতবর্ষে বেতার টেলিগ্রাফি শিখিবার কোন বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়। আমেরিকাতে আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে বেতার বসিয়াছে এবং এই বেতার-বার্ত্তার সাহায্যে আমেরিকান্‌রা যে কতপ্রকার কাজ করিতেছে, তাহার কোন সংখ্যা নাই।

রাস্তায় পুলিস দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সঙ্গে বেতার-কলকব্জার সরঞ্জাম আছে, সহরের কোথায় কি দুর্ঘটনা ঘটিল, সে-ঘটনা ঘটিবার মুহূর্ত্ত-কাল পরেই খবর পাইয়া সে সেইখানে হাজির হইল। অপরাধীর



পুলিসের হাতে র‍্যাডিও-সেট, সহরের সব খবর সে বেতার-কলে রাখিতে পারে



বাগানে চা পান করিতে করিতে বেতারের সাহায্যে ঐক্যতান বাদন শ্রবণ

পলায়ন-সংবাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে সহরের এবং দেশের নানা স্থানে ছড়াইয়া দেওয়া হইল—অপরাধীর পলায়ন অসম্ভব হইল। রোগী বিছানায় শুইয়া শুইয়া বেতারের সাহায্যে সুমধুর-মৃদু সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে—এই সঙ্গীত হয়ত বহুদূর হইতে তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছাইতেছে। ইহাতে রোগীর রোগযন্ত্রণা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়।

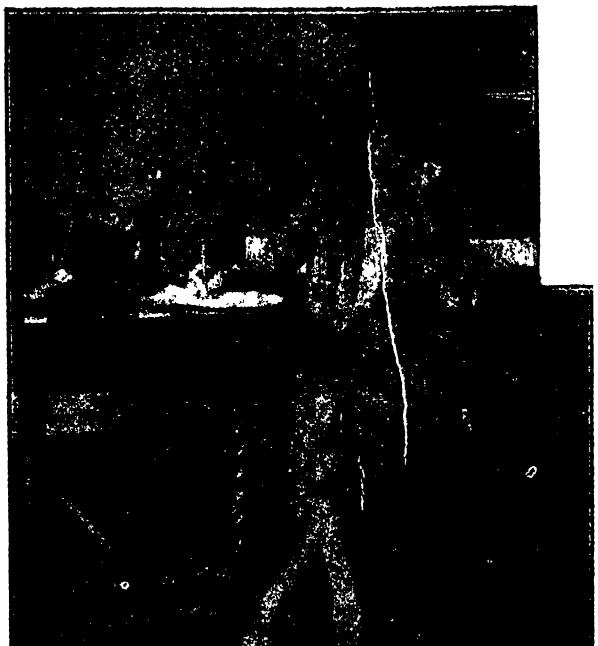
ছোট ছেলে মেয়েরা ঘুমাইবার আগে উপকথা শুনিতে ভালবাসে। বিশেষ একস্থান হইতে উপকথা র‍্যাডিওর সাহায্যে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া হয়—র‍্যাডিও-ফোনের চোঙ্গা হইতে উপকথাটি ছেলে মেয়েদের কানে আসিয়া পৌঁছায়-তাহারা নির্ব্বাক্-আনন্দে তাহা উপভোগ করে। ঘরে ঘরে আর গল্প বলিবার জন্য দিদিমা দাদামহাশয়ের প্রয়োজন হয় না। তাঁহারা সেই সময়টুকু মনের আনন্দে পান-দোক্তা গড়গড়া খাইয়া কাটাইতে পারেন।



আংটিতেও র‍্যাডিওর কল

র‍্যাডিওর আবিষ্কারের পূর্ব্বে নৃত্যগীত করিবার সময় গান বাজনার জন্য টাকা দিয়া আয়োজন করিতে হইত। এখন আমেরিকাতে আর নৃত্যশালায় লোক রাখিয়া বাজনা বাজাইবার বন্দোবস্ত করিতে হয় না—র‍্যাডিওর সাহায্যে বিশেষ কোন এক স্থান হইতে গান বাজনা সকল নৃত্যশালায় র‍্যাডিও-ফোনে পাঠান হয়। সেই বাজনার তালে তালে সকলে নৃত্য করিতে থাকে।

বহুদূরে কোথাও কনসার্ট বাজিতেছে—আপনি বন্ধুদের লইয়া চা খাইতে খাইতে বাগানে বসিয়া বেতারের সাহায্যে তাহা শ্রবণ করিতে পারেন। দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার খবর ইত্যাদিও যেখানে ইচ্ছা বসিয়া পাওয়া যায়, সঙ্গে অবশ্য একটি বেতার খবর ধরিবার (wireless receiving set) কল থাকা চাই। ব্যবসায়ীরা বড় বড় সহর হইতে দূরে থাকিয়াও বাজার দর ইত্যাদি সবই সহরবাসীর সঙ্গে একই সময়ে জানিতে পারে, তাহাদের আর ডাকের জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। সবরকম খবর ইচ্ছামত যখন তখন পাওয়া যাইতে পারে।



মহিলা-রিপোর্টার পায়ের গার্টারে র‍্যাডিও রিসিভিং সেট লাগাইয়া যে কোন সময় হেড্ আপিসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে পারে (ডান পা দেখুন)



ঘুমাইবার পূর্ব্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা র‍্যাডিও ফোনে উপকথা শুনিতেছে

এই বেতার খবর বা গান-বাজনা শুনিবার সেটগুলি খুব যে প্রকাণ্ড তা নয়। ছবি দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, দু-একটি বেতার-কল কত ক্ষুদ্র। আমেরিকার অনেকে দেশলাইএর এবং ক্ষুরের ছোট্ট ছোট্ট বাক্সে র‍্যাডিও খবর ধরিবার সেট তৈয়ার করিয়াছেন। একজন আবার সকলকে টেক্কা দিয়া তাহার আংটিতে একটি র‍্যাডিও সেট বসাইয়াছেন।

আমেরিকাতে যখন একটা কোন হুজুগ উঠে, তখন তাহা ছেলে বুড়া সবাইকে মাতাইয়া তোলে। র‍্যাডিও এখন আমেরিকার হুজুগ। এখন পৃথিবীর আর কোন দেশে র‍্যাডিওর এত উন্নতি হয় নাই। ইংলণ্ডে সবেমাত্র বে-সরকারী লোকদের র‍্যাডিও সেট বসাইবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকাতে বোধ হয় ৩০,০০০, হাজারেরও বেশী বেসরকারী লোকের বেতার সেট আছে। এই সরকারী লিষ্টের বাহিরেও, হয়ত অনেকের আছে, তাহাদের সংখ্যা এই ৩০,০০০ এর মধ্যে ধরা হয় নাই।

একটি র‍্যাডিও সেট সম্পূর্ণভাবে ঘরে বসাইতে বিশেষ কোন খরচ নাই—৩০ টাকা হইতে ৬০ টাকা খরচে একটি র‍্যাডিও সেট ঘরে বসাইতে পারা যায়।

ইহাতে অবশ্য আমাদের আনন্দ করিবার কিছুই নাই, কারণ আমাদের দেশে বেতার ইত্যাদির কোন জঞ্জাল নাই। এবং

কোন ব্যক্তি সেতার শিখিতে চাহিলে তাহার চাওয়াই সার হইবে।



ছাতায় বেতারের খবর ধরিয়া পথের মাঝে লোকজনকে নতুন নতুন খবর শোনান যায়

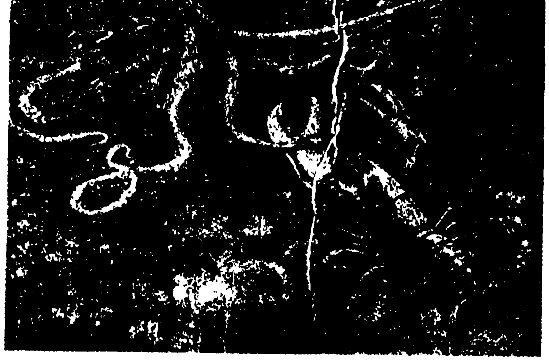
সমুদ্র-জগতের কথা—

গতবারের প্রবাসীতে কতকগুলি সামুদ্রিক অদ্ভুত প্রাণীর কথা বলিয়াছি। এবার আরো একটি বিচিত্র প্রাণীর বিষয় লিখিব। জলের উপরের দিকে নানা রংএর মাছ, হাঙ্গর ইত্যাদি সমুদ্রে দেখা যায়। কিন্তু একটু গভীর জলে এইসমস্ত জন্তুর সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ভীষণ এবং অদ্ভুত জানোয়ার দেখা যায়। ডুবুরিরা এইসমস্ত জন্তুর সাম্‌নে অনেক সময়ে বিপদে পড়ে এবং প্রাণ হারায়। হাঙর, কুমীর ইত্যাদি জন্তু এই সমুদ্র জন্তুর কাছে নিরীহ বলিয়া মনে হইবে। অক্টোপাস বা অষ্টপাদের কথা অনেকে উপকথায় পড়িয়াছেন, কিন্তু ইহা উপকথার মত অসত্য নয়। যাহারা এই ভীষণ অক্টোপাসের সাম্‌নে পড়িয়াছে, তাহারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

শিকার সুবিধামত স্থানে পাইলে অক্টোপাস তাহাকে তাহার পা বা শুঁড় দিয়া আস্তে আস্তে জড়াইয়া ধরে। তাহার এই শুঁড়গুলির শক্তি ভয়ানক, অনেক সময় ধৃত ব্যক্তির পাঁজরার হাড় ইহার চাপে গুঁড়া হইয়া যায়। সমুদ্রের নানারকম প্রাণী এই অক্টোপাসের হাতে মারা যায়। অক্টোপাসের ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইলে এবং অন্য কিছু না পাইলে সে দিনে এত বেশী পরিমাণ মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি খাইয়া ফেলে, যে, স্থানীয় বাজারে ঐসব জিনিষের দর



ডাক্তার মোটরকারে বসিয়া রোগীর খবর লইতেছেন



গভীর জলে অক্টোপাস যমের মত তাহার শিকারের ঘাড়ে গিয়া পড়ে

চড়িয়া যায়। অক্টোপাসও অনেক সময় ধৃত হইয়া খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। বেচারা যদি হঠাৎ অল্পজলে বালিতে আসিয়া পড়ে তাহার অবস্থা বড় খারাপ হয়। শক্ত মাটি পাইলে সে এমনভাবে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে যে তাহাকে সেখান হইতে জীবন্ত অবস্থায় নড়ান যায় না।

ডুবুরিদের অক্টোপাস ছাড়া হাঙ্গরের অত্যাচারও কম পোহাইতে হয় না। আয়ার্ল্যাণ্ডের উপকূলে নিমজ্জিত লরেন্টিক্ জাহাজের মধ্যস্থিত ১২০,০০০,০০০ টাকা মূল্যের সোনা উদ্ধার করিতে গিয়া একদল ডুবুরি কিরকম বিপদে পড়িয়াছিল, ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। জাহাজটি জলের ৯০ ফুট নীচে পড়িয়াছিল। এত কষ্ট করিয়াও তাহারা মাত্র ৩০টি গোল্ড্-বার উদ্ধার করিতে পারিয়াছিল। একটি বারের মূল্য ২০,০০০ টাকা হইতে ৪০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত হয়।



নিমগ্ন জাহাজের রত্ন উদ্ধারে নিযুক্ত ডুবুরিরা হাঙ্গরের দ্বারা আক্রান্ত

কাচের কথা—

আজকালকার সভ্যতার দিনে কাচের প্রয়োজন নানাপ্রকারে এবং নানাভাবে হয়। কাচের জন্ম বোধ হয় ৮০০০ বছরেরও পূর্ব্বে মিশরে প্রথম হয়। কাচের ওপর রং ফলাইয়া নানাপ্রকার চিত্র ইত্যাদি অঙ্কন বহু শতাব্দী পূর্ব্বে চীন দেশেই প্রথম হয় বলিয়া মনে হয়।

রঙীন কাচ প্রথমে দামী দামী হীরা জহরতের বদলে ব্যবহার করিবার জন্যই ব্যবহার হইত। পূর্ব্বকালের ইয়োরোপের আমীর ওমরাহেরা তাঁহাদের অশ্বদের নানাপ্রকার কাচের অলঙ্কারে সাজাইতেন। কাচের অন্যান্য-প্রকার ব্যবহার, যেমন শার্সি, গেলাস, বাটী, ইহার বহুকাল পরে আরম্ভ হয়।

মধ্যযুগে আবিষ্কার হয় যে কাচের ওপর রৌপ্য-দ্রব দিয়া তাহা আগুনের তাপে রাখিলে কাচ হরিদ্রা বর্ণের হয়। এই সময় গির্জ্জায়, এবং বিদ্যাপীঠে কাচের উপর নানাপ্রকার চিত্র আঁকিয়া জানালায় এবং দুয়ারে লাগান হইত। সেই সময়ের এইপ্রকারের অনেক চমৎকার চমৎকার চিত্র আজও দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়কার ধনীরা দেশবিদেশ হইতে শিল্পী আনিয়া এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এইসমস্ত করিতেন। প্রথম প্রথম কেবল নানা-রংএর কাচ পাশাপাশি বসাইয়া সাজান হইত, তার পর ক্রমশ নানা-প্রকার দৃশ্যাবলীর চিত্র-অঙ্কন সুরু হয়। এবং ইহার কিছু দিন পরে শিল্পী নানাপ্রকার চিত্র ফরমাস-মত কাচের উপর অঙ্কন করিতে সক্ষম হয়। ইয়োরোপে এই সময় নানাপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহের জন্য এই শিল্প কিছুকালের জন্য একরকম মরিয়া যায়, তার পর আবার আরম্ভ হয়।

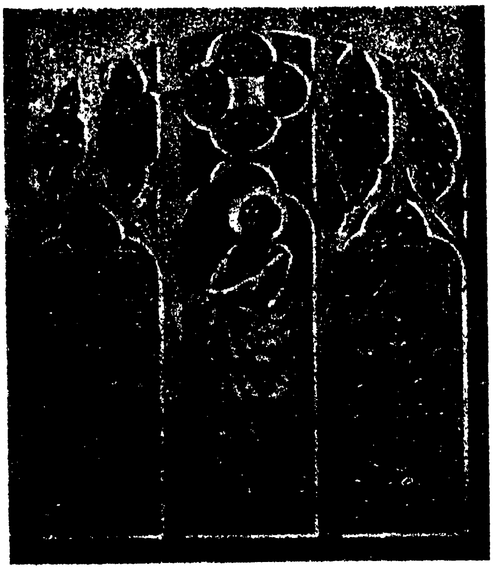
বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপে যেসমস্ত কাচের উপর চিত্র ইত্যাদি দেখা যায়, তাহা কোন শিল্পীর কাজ তাহা ঠিক করিয়া কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাহার উপর কোন নাম নাই। তবে



সমুদ্রের তলায় অক্টোপাস গভীর চিন্তায় নিমগ্ন



ইয়োরোপের একটি গির্জ্জায় কাচের উপর ধর্ম্মবিষয়ক ছবি—আসল ছবিটি রঙীন



একটি জানালার ছবি

এক এক দল শিল্পীর এক এক ধরণের চিত্র-অঙ্কন-পদ্ধতি ছিল, তাহা চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

মধ্য-যুগের ধনীরা অনেক সময় তাঁহাদের গৃহের বড় বড় জানালার এবং দুয়ারের কাচের উপর তাঁহাদের মূর্ত্তি অঙ্কন করিবার জন্য শিল্পী নিযুক্ত করিতেন। এইপ্রকারে তাঁহারা তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহাদের মূর্ত্তিগুলি আসল চেহারার সঙ্গে একটুও মিলিত না এবং সময় সময় অতি অদ্ভুত হইয়া যাইত। শিল্পীরা প্রথমে কাগজের উপর ছবি আঁকিয়া পরে তাহা কাচে ফলাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু এইপ্রকারে ছবির হুবহু মিল হইত না।

বর্ত্তমান কালেও শিল্পীরা কাগজের উপর ছবি আঁকিয়া তাহা ভাল করিয়া কাটিয়া কাচের উপর আঠা দিয়া লাগাইয়া দেয়। তাহার পর নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাচের উপর সেই ছবির নকল ছাপ পড়ে। ইহাতে ছবিটি বিকৃত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কাচ কাটিবার জন্য ইস্পাতের বদলে হীরা ব্যবহার হয়।

—

পাহাড় ধসান—

দক্ষিণ আমেরিকার সাগর-কূলে একটি সহরের অনেকখানি স্থান একটা পাহাড় দখল করিয়াছিল। সহরের লোক সংখ্যা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সহরের আয়তন বৃদ্ধি করিবার দরকার হইল। তখন একদল ঠিকাদার পাহাড়টাকে কাটিয়া ফেলিবার কথা পাড়িল। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল যে সমস্ত পাহাড়টাকে



জলের তোড়ের সাহায্যে পাহাড় ধসান হইতেছে

কাটিতে আট বছর লাগিবে এবং খরচ অসম্ভবরকম বেশী হইবে। তখন একদল ইঞ্জিনিয়ার হাইড্রলিক পাম্পের সাহায্যে পাহাড়টাকে ধসাইয়া নীচের সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া দিবেন স্থির করিলেন। পাহাড়টা এখন প্রায় সবই ধসিয়া গিয়াছে। পাহাড়ের উপরে একটি প্রাচীন মঠ ছিল, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মোটর-চেয়ার—

ছবিতে দেখুন বৃদ্ধাটি কেমন আরামে একটা চাকাওয়ালা চেয়ারে বাগানে বেড়াইতেছেন। এই চাকাওয়ালা চেয়ার কাহাকেও ঠেলিতে হয় না—মোটরের সাহায্যে চলে। চাকা ঘুরাইবার ফিরাইবার জন্য



বৃদ্ধা মোটর-চেয়ারে উদ্যান বিহার করিতেছেন

একটি হাতল বৃদ্ধার কোলের কাছে দেখুন। গাড়িখানির বেগ ঘণ্টায় ৬ হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত হয়। কলকব্জার বিশেষ কোন হাঙ্গামা নাই। এই গাড়ী এখনো বাজারে উঠে নাই।

—

সাবানের ফেনার খেলা—

সরু চোঙার ডগা একটু সাবান-জলে ডুবাইয়া আস্তে আস্তে ফুঁ দিলে বেশ বড় বড় বুদ্‌বুদ্ করা যায়—ইহা আমাদের দেশে অনেকেই জানেন। এইরকম বুদ্‌বুদ্ ছোট টেনিস্ বলের মত বড় করিতে হইলে সরু কাচের নল ব্যবহার করাই প্রশস্ত—কারণ কাচের নলে সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদ্‌কে ইচ্ছামত নানাপ্রকার আকারের করা যায়।



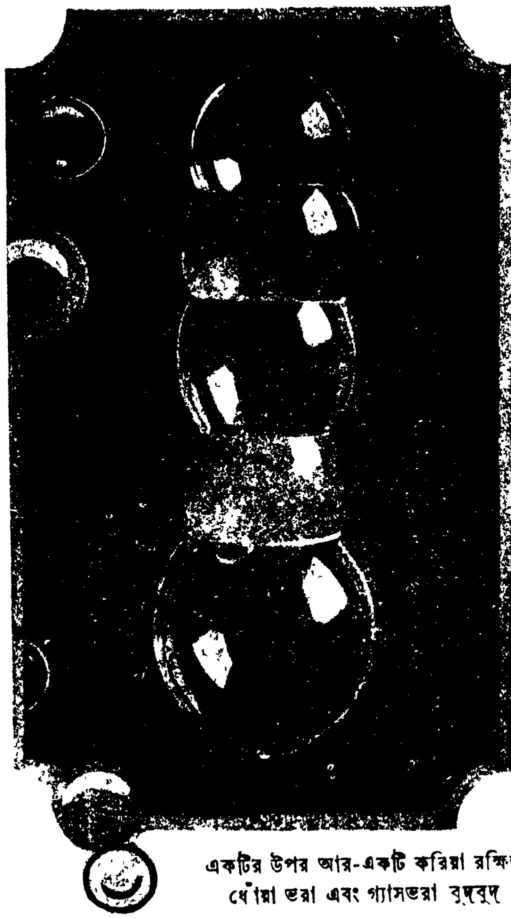
দুইটি বুদ্‌বুদ্ একত্র মিলিত অবস্থায়

ফেনা তৈয়ার করিবার একটি নিয়ম আছে সাবান [illegible]

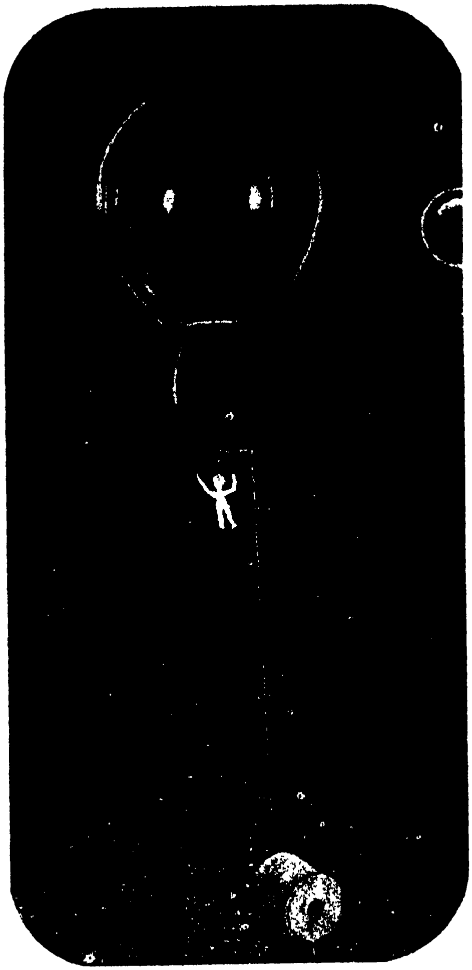
ছুরি দিয়া চাঁচিয়া চাঁচিয়া একটি পেয়ালায় জমা করিতে হইবে।



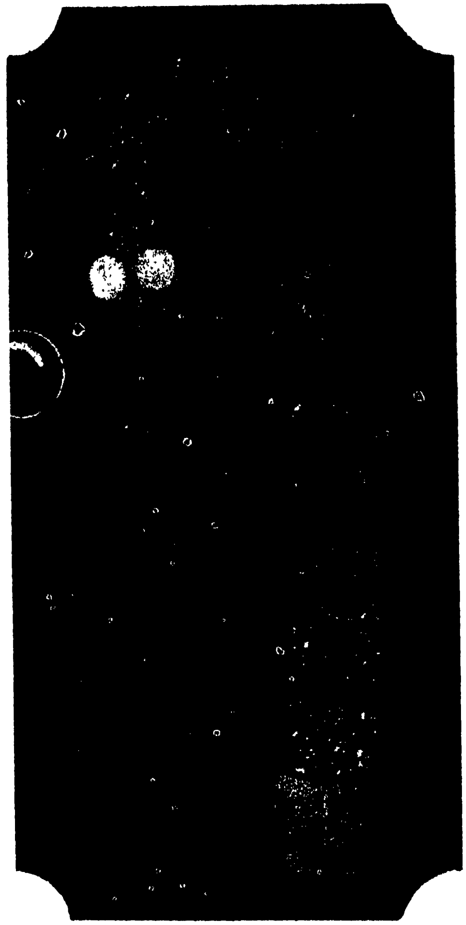
ছোট ছেলের কোঁক্‌ড়া চুলে বুদ্‌বুদের মুকুট



একটির উপর আর-একটি করিয়া রক্ষিত ধোঁয়া ভরা এবং গ্যাসভরা বুদ্‌বুদ্



বন্দী বুদ্‌বুদ্‌, রীলের সূতা ছাড়িয়া উপরে উঠান যায়, এবং সূতা টানিয়া নামান যায়



বুদ্‌বুদের সাপ—মাথায় ধোঁয়া-ভরা দুটি বুদ্‌বুদ্‌কে সাপের দুটি চোথ বলিয়া মনে হয়

সাবানের গুঁড়া বেশ খানিকটা জমা হইলে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া কিছুক্ষণ ঘাঁটিতে হইবে। বেশ ভাল করিয়া ঘাঁটা হইলে পর ঐ সাবান-গোলা জলকে আধ ঘণ্টা স্থির করিয়া রাখিতে হইবে। হয়ত সমস্ত সাবান জলে গুলিবে না, পাত্রের তলায় কিছু পড়িয়া থাকিবে—কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই।

নানারকমের নল বাজারে পাওয়া যায়—খড়ের নলেও বুদ্‌বুদ্‌ তৈরী করার খেলা বেশ হয়। এইবার কয়েকরকম বুদ্‌বুদ্‌ খেলার কথা বলিব।

দুইজন দুইটি নলে দুইটি বুদ্‌বুদ্‌ তৈয়ার করিয়া সাম্‌না-সাম্‌নি দাঁড়াইয়া বুদ্‌বুদ্‌ দুটিকে গায়ে গায়ে লাগাইয়া ফুঁ দিলে দু'টি মিলিয়া গিয়া একটি বুদ্‌বুদ্‌ হইয়া যাইবে। অনেক সময় গায়ে গায়ে লাগাইয়া একটু চাপ দিবারও দরকার হয়। একটু সাবধানতার সঙ্গে এই কাজ করিতে হয়, কারণ তাহা না হইলে বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া যাইতে পারে। বুদ্‌বুদ্‌ দুইটি মিলিয়া গেলে পর ফুঁ দিতে দিতে নল দুটিকে আস্তে আস্তে তফাৎ করিতে হইবে—ইহাতে মিলিত বুদ্‌বুদ্‌টি বেশ প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে।

একটা নল হইতেও এইরকম বড় বুদ্‌বুদ্‌ তৈয়ার করা যায়—কিন্তু তাহা হাওয়াতে উড়াইবার পক্ষে মুস্কিল হয়। বুদ্‌বুদ্‌ যখন হাওয়াতে ভাসে তখন তাহাকে খুব ধারাল ছুরি দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। পাখার হাওয়া দিয়া ভাসমান বুদ্‌বুদ্‌কে নানা-প্রকার অদ্ভুত আকারও দেওয়া যায়।

ধোঁয়া-ভরা বুদ্‌বুদ্‌ তৈয়ার করা শক্ত হইলেও বেশ চমৎকার দেখিতে হয়। সিগারেটের ধোঁয়া মুখের মধ্যে লইয়া তাহাকে নলের মধ্যে দিয়া আস্তে আস্তে সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়। এই বুদ্‌বুদ্‌কে যদি কোন ছোট ছেলের কোঁকড়া চুলের ওপর সাবধানে ফেলিতে পারা যায় তবে তাহা দেখিতে অতীব মনোহর হয়। চুল ভিজা থাকিলে বুদ্‌বুদ্‌ ফাটিয়া যাইবে এই জন্য খটখটে শুক্‌না চুলের উপর ইহা করিতে হইবে।

উলের কাপড়ের উপর বুদ্‌বুদ্‌ অনেক ক্ষণ থাকে। এইরকম



খেলানের উপরে গ্যাস-ভরা জেপেলিন এবং তাহার তলায় ধোঁয়া-ভরা দুটি আকাশ-নৌকা— একটি প্যারাসুটও আছে দেখুন—। ইহার মাঝখানে দেশলাইএর জ্বলন্ত কাঠি দিলে কি হয় পরের ছবিতে দেখুন—



জেপেলিন পুড়িয়া গেল প্যারাসুটও ক্রমশ নীচে নামিয়া আসিতেছে



উড়ো-জাহাজ ধোঁয়ার আড়ালে শত্রু জাহাজের কবল হইতে নিজের জাহাজ রক্ষা করিতেছে

কোন কাপড়ের উপর যদি ধোঁয়া-ভরা বুদ্‌বুদ এবং এম্‌নি বুদ্‌বুদ পাশাপাশি রাখা যায়, তবে দুইটি বুদ্‌বুদ ধাক্কা লাগিয়া এক হইয়া যাইবে এবং ধোঁয়া-ভরা বুদ্‌বুদের ধোঁয়া মিলিত বড় বুদ্‌বুদের ভিতর নানাপ্রকার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করিতে করিতে প্রবেশ করিবে। ইহা করিতে হইলে সাবান খুব ভাল করিয়া গুলিতে হইবে এবং ঘর অতিরিক্ত গরম যেন না হয়, ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উলের দস্তানা পরিয়া বড় বুদ্‌বুদকে লইয়া পিংপং খেলা চলিতে পারে, তবে বুদ্‌বুদকে খুব আস্তে আস্তে এবং অনাবশ্যক জোর না দিয়া আঘাত করিতে হইবে।

বুদ্‌বুদের মধ্যে গ্যাস ভরিয়াও নানারকম চমৎকার দেখিতে বুদ্‌বুদ তৈয়ার করা যায়। ধোঁয়া-ভরা এবং গ্যাস-ভরা বুদ্‌বুদ উপরা-উপরি রাখিতে পারিলে বেশ চমৎকার দেখিতে হয়।

ভিজা তারে বুদ্‌ বুদ আট[illegible] থাকে এইরকম তারের উপর

ছোট ছোট বুদ্‌বুদ্‌ রাখিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত জিনিষ করিতে পারা যায়। তারের সাহায্য না লইয়াও ছোট ছোট বুদ্‌বুদ কোন গোল পাত্রের উপর জমা করিতে পারিলে তাহা বেশ লম্বা হইয়া উঠে, এবং ক্রমশ নিজের ভারে নুইয়া পড়িতে থাকে, তখন তাহা দেখিতে সাপের মত হয়। সাপের মাথায় দুইটি ধোঁয়া-ভরা বুদ্‌বুদ ঠিক মত রাখিতে পারিলে তাহা সাপের চোখ হয়। এইরকম বুদ্‌বুদের সাপ বা তোরণ ইত্যাদি করিতে হইলে গ্যাস-ভরা বুদ্‌বুদই প্রকৃষ্ট, তাহাতে ফল ভাল হয়।

গ্যাস-ভরা বড় বুদ্‌বুদের মধ্যে রেশমী সুতাও লাগাইয়া দেওয়া যায়, এই রেশমী সুতায় আবার একটি ছোট কাগজকে প্যারাসুটের আকারে বাঁধিয়া দিলে বুদ্‌বুদটিকে একটি আকাশ-জাহাজ বলিয়া মনে হয়।

সাবান-গোলা পেয়ালার মধ্যে গ্যাসের নল প্রবেশ করাইয়া দিলে, পেয়ালা হইতে সাবানের বুদ্‌বুদ আপনা-আপনিই উপর দিকে উঠিতে থাকিবে। দরকারমত গ্যাস ছাড়িতে এবং বন্ধ করিতে পারিলে সাবানের ফেনার বুদ্‌বুদ অনেক উঁচু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে।

—

উড়ো জাহাজের নতুন কাজ—

সমুদ্রে অনেক সময় যুদ্ধ-জাহাজ শত্রু যুদ্ধ-জাহাজের সাম্‌নে পড়ে' নানারকমে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। এখন বিপদ্‌গ্রস্ত জাহাজকে ধোঁয়ার উপর পর্দার আড়ালে রক্ষা করিবার এক নতুন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। উড়ো জাহাজ যুদ্ধ জাহাজের আগে আগে ভীষণভাবে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে যায় এই ধোঁয়া ক্রমশ এত ঘন এবং গভীর হইয়া উঠে যে শত্রু জাহাজ পরদার আড়াল ঢাকা জাহাজের কোন সন্ধানই পায় না। একটি এরোপ্লেন ১ মিনিটে ৯৫ ফুট উঁচু করিয়া ১ মাইল স্থান এইরকম ঘন ধোঁয়ায় আবৃত করিতে পারে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রীশিক্ষা

আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কিছু লিখ্‌তে আহূত হয়েছি। দেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কেতাবের অভাব নেই। যে কেউ বাংলায় দু' অক্ষর লিখ্‌তে পারেন, তিনিই নারীধর্ম্ম সম্বন্ধে বই লিখে' হাতে-খড়ি দিয়ে থাকেন। তাতে আমরা দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কিরূপে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী তৈরী কর্‌তে হয়, গান-বাজনা শিল্প-কলা প্রভৃতি শেখান যায়, যেন বারো বৎসরে বিয়ে হ'লেই পতি দেবতা নগদ বরপণ ও কয়েকভরি সোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" বিনা ক্লেশে লাভ কর্‌তে পারেন, তার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এটা একবারও কেউ মনে করে' দেখেন না যে, প্রকৃতির নিয়ম বলে' একটা জিনিস আছে সেটাকে কিছুতে লঙ্ঘন কর্‌বার জো নেই, এবং যদিও মেয়েদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণতঃ পুরুষদের অপেক্ষা অল্প বয়সে বিকাশলাভ করে, তথাপি দ্বাদশ বৎসর বয়সে মস্তিষ্কের পরিণতি অসম্ভব, অধিকাংশ শিক্ষণীয় বিষয়ে তখনও তারা বালিকা মাত্র। তাদের মাথায় সে-সকল বিষয় তখন কিছুতে ঢুকতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা কথাটাই ছেলেখেলা হ'য়ে দাঁড়ায়, যদি বারো বৎসরের মধ্যে সেটা সমাপ্ত কর্‌তে হয়।

কোন বিখ্যাত ফরাসী লেখক সত্যই বলেছেন, স্ত্রীজাতির স্থান কোথায়—এইটি হচ্ছে প্রত্যেক দেশে সভ্যতার মাপকাঠি। আমাদের দেশে নারীদের অবস্থাটা মনুই নির্দ্দেশ করে' দিয়ে গিয়েছেন—'ন সা স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' —অর্থাৎ চিরকালই তাকে বাপ ভাই ছেলের অধীন হ'য়ে থাকৃতে হবে। এই সনাতন নীতিটির যাতে ব্যতিক্রম না ঘটে, এজন্য নারীজাতিকে আমরা এরূপভাবেই রেখেছি যে বাস্তবিক এখন তারা স্বাধীনতার যোগ্যও নয়। ফ্রেডেরিক হ্যারিসন্‌ তাঁর Realities and Ideals নামক গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা বল্‌তে যদি কয়েকটি আধুনিক ভাষার মোটামুটি জ্ঞান এবং কয়েকটি ললিত কলায় দক্ষতামাত্র বুঝায়, তবে

"This truly Mahometan or Hindu view of woman's education is no longer openly avowed by cultured people of our own generation."

অর্থাৎ, সেটা হ'ল হিন্দু ও মুসলমানদের উপযুক্ত আদর্শ, পাশ্চাত্য সভ্যজগতের নয়। নারী-জাতি সম্বন্ধে আমরা আমাদের উচ্চধারণার যতই বড়াই করি না কেন, সংস্কৃত কোটেশন্‌-কণ্টকিত রাশি রাশি প্রবন্ধ লিখে' সে-বিষয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের যতই চেষ্টা করি না কেন, একজন ভারতবন্ধু ইংরেজ লেখক স্ত্রীজাতি-সম্পর্কে

আমাদের সভ্যতাকে কতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন দেখ্‌তে পাচ্ছেন। তবু তিনি জান্‌তেন না যে, "a moderate knowledge of some modern languages and a few elegant accomplishments" আমাদের উচ্চশিক্ষিতা নারীদেরও অতি অল্পসংখ্যকেরই আছে, এবং তাদের পক্ষে এতটা উচ্চশিক্ষা আমাদের অধিকাংশ পুরুষের ধাতে সয় না ও কল্পনায়ও স্থান পায় না, যেহেতু পুরুষদের নিজেদের মধ্যেই সেটা অবিদ্যমান।

জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌ থেকে আরম্ভ করে' রোমানিস, হাক্স্‌লি, লেকি, ফ্রেডেরিক হ্যারিসন, জন্‌ মর্লি প্রভৃতি লেখকগণ স্ত্রীজাতির সঙ্গে পুরুষজাতির তুলনামূলক সমালোচনা করে' যে-সকল মন্তব্য লিখে' গিয়েছেন, এবং আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা ও চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন ভারতীয় রমণী-জাতি সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিখেছেন, প্রচুর অবকাশ থাক্‌লে সে-সব কথার অবতারণা করে' পুরুষ ও স্ত্রী জাতির রীতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করা যেত; কিন্তু আজকাল মাসিকপত্রাদিতে 'নারী-সমস্যা' সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিত হওয়ায়, আমার সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পারিনি বলে' আফ্‌শোষের কোনো কারণ নেই। তবে যখন কিছু বল্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছি তখন খুব সংক্ষেপে দু'একটি কথা বল্‌তে চাই।

পূর্ব্বোক্ত অধিকাংশ লেখকদের মতে, এক মাতৃত্বই স্ত্রীজাতিকে পুরুষের তুলনায় জীবনযুদ্ধে কতকটা অপটু করে' রাখ্‌বে, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে স্ত্রীজাতি যে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ কর্‌তে পার্‌বে না এসম্বন্ধে যুক্তিতর্ক অনাবশ্যক বিবেচনা করি। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীপ্রকৃতি একে অন্যের পরিপোষক—বিরুদ্ধ নহে, সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে কেহ শ্রেষ্ঠ কেহ নিকৃষ্ট, একথা বলা চলে না। একদিকে মাতৃত্ব যেমন নারীকে দুর্ব্বল করে' রেখেছে, অপর পক্ষে উহাই ত আবার শিশুশিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছে। মাতৃত্ব নারীর মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে মহীয়সী করেছে একথাটাও সত্য, কিন্তু এটা বল্‌তে বড়ই ভয় হয়, কারণ একবার একথা এনে ফেল্‌লে সমাজে আমাদের মেয়েদের উচ্চস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে এত নিছক কল্পনা-বিজৃম্ভিত কথা শুন্‌তে পাওয়া যায় যে, কানে তালা লেগে যায় এবং আমাদের দেশের পুরুষদের আত্মপ্রতারণা-শক্তি দেখে' বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়।

স্নেহ-মমতা দয়া-দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থতা আত্মত্যাগ ধৈর্য্যতিতিক্ষা ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি যে-সকল নৈতিক গুণ মানবের বিশেষত্ব, এবং তার আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টিসাধনের অনুকূল, মাতৃত্বের মধ্য দিয়েই সেগুলি সহজে বিকাশলাভ করে; কিন্তু সেই বিকাশের জন্য ক্ষেত্র তৈরি থাকা চাই—অকালমাতৃত্ব নিবারণ করা চাই। সুশ্রুত বলেছেন, অল্প বয়সে সন্তান হ'লে সেগুলি মারা যাবে, না মর্‌লেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হবে, সুতরাং অত্যন্ত বালাকে সন্তান-জননী হ'তে দেবে না; কিন্তু আমরা ঘরে ঘরেই ত এই নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে, দেখ্‌তে পাই। যে বালিকা খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌বে, তার মাতৃত্বের মর্য্যাদাই বা কোথায়, মহিমাই বা কি!

'নাই মামার থেকে কানা মামাও ভাল', এই নীতি অনুসরণ করে' আমাদের পাড়াগাঁয়ের বালিকা বিদ্যালয়-গুলি চল্‌ছে। আমি যদিও এরূপ একটি ইস্কুলের সম্পাদকতা করেছি এবং আর-একটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, তথাপি এগুলিকে আমি খুব স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তাম বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কেন দেখ্‌তাম না, তা পরে বল্‌ছি। তবে সেখানে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েগুলি কি বিপুল উৎসাহভরে সেজেগুজে' এসে গান কর্‌ত, পদ্যপাঠ পদ্যমালা প্রভৃতি আবৃত্তি কর্‌ত, তা' দেখ্‌তে আমার বড়ই ভাল লাগ্‌ত; আর মনে একটা গভীর বিষাদ ও দুঃখ হ'ত এই বলে' যে, এই কচি মেয়েগুলিকে আর দুদিন পরেই অন্তঃপুরের খাঁচায় পুরে' রাখ্‌বার ব্যবস্থা হবে, হয়ত অনেকের ইতিমধ্যেই বিবাহের প্রস্তাব চল্‌ছে এবং সেটা পাকা হ'লেই ইস্কুল থেকে নাম তুলে' নেওয়া হবে। অতি অল্পব্যয়ে অথবা বিনাব্যয়ে, উপোষ করে', পরম উল্লাসে ও পুলকের সঙ্গে বাড়ীর বালিকাদের যে-সকল ব্রত-নিয়ম উদ্‌যাপন কর্‌তে

দেখেছি, তাতে আমার কেবলই এই মনে হয়েছে,—এদের জীবনেও খেলাধূলা স্ফূর্ত্তি নির্দ্দোষ আমোদের কত আবশ্যক আছে, কত অল্প এদের প্রাণের সরসতা সঞ্জীবিত রাখা যায়. কিন্তু হায় আমাদের দেশ, ততটুকু আনন্দও এদের ভাগ্যে বেশী দিন জুটে উঠে না।

ইস্কুলগুলিকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তাম না এজন্য যে, এখানে পড়াশুনা খুব কমই হ'ত। উচ্চ শ্রেণীতে সব সময় ছাত্রী থাকত না, সূচীকার্য্যও সামান্যই শিক্ষা হ'ত। রাণব্রুক উইলিয়ম্‌স্ সাহেবের বার্ষিক বিবরণীতে দেখতে পাই, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশে ভদ্রশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কত অনাদর অর্থোপার্জ্জনের জন্য পুরুষদের বিদ্যাশিক্ষা করা অত্যাবশ্যক, মেয়েদের রোজ-গার কর্‌তে হয় না সুতরাং তাদের লেখাপড়া শেখা অনাবশ্যক,—এই ভাবটি আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল। ভদ্রঘরে অধুনা মেয়েদের চিঠিপত্র লিখ্‌তে হয় বলে' বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া দর্‌কার, বাজার-হিসাবটা রাখ্‌তে হয় বলে' যোগ-বিয়োগ অঙ্কটা শেখা দর্‌কার। বাংলা-দেশে হাজার-করা মাত্র একুশটি মেয়ের বিদ্যাশিক্ষা বড়-জোর এতদূর অগ্রসর হয়েছে এই বিদ্যাটুকু আয়ত্ত কর্‌বার জন্য বালিকা-বিদ্যালয়ের বিশেষ আবশ্যকতা আমি দেখ্‌তে পাই না—ঘরে বসে'ই একরকম করে' একাজটা চল্‌তে পারে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি, মধ্য ও উচ্চবিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগস্থাপনের সেতু বলে' বিবেচিত না হয়, তবে তার বিশেষ কি প্রয়োজন?

আমি দেখেছি, বালিকা-বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণ-সভায় কোনো বিবাহিতা কিম্বা ১৪।১৫ বৎসর-বয়সের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী—ঐ বয়সে কোনো মেয়ে ইস্কুলে পড়্‌ছে, এটা ত প্রায় চিন্তার অগোচর উপস্থিত থেকে সঙ্গীত কি কোন উচ্চবিষয়ে রচনা পাঠ বা আবৃত্তি কর্‌লে ত সভাস্থ সভ্যগণ তা নিয়ে বাড়ী গিয়ে অশোভন ও বিপরীত সমালোচনা কর্‌তে কুণ্ঠিত হন না। বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী একেই পাওয়া যায় না, তার পর যদি দৈবাৎ জুটে' যায়, তবে তাদের রীতিনীতি চরিত্র সম্বন্ধে উচ্চপদস্থ ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি-দের মুখে একান্তই কল্পনাপ্রসূত এমন সব কথা শুনেছি যে, সেগুলি উক্ত মহিলাদের কানে পৌঁছলে তদ্দণ্ডেই তাঁরা চাকরি ছেড়ে পলায়ন কর্‌তে বাধ্য হতেন। মনে মনে আমরা আমাদের সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীদের বিশ্বাস করি না—তাই অত শীঘ্র বিয়ে দিয়ে ফেল্‌তে চাই, এবং বয়স্কা স্বাধীনজীবিনী মহিলা দেখ্‌লে তার নীতি সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হই। এবিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন ইঙ্গিতে যা বলেছেন, তাতে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট কর্‌তে হয়। কমিশন বলেছেন—

"Until men learn the rudiments of respect and chivalry towards women who are not living in zenanas, anything like a service of women teachers will be impossible."

স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে আমাদের পুরুষগণ মনে মনে এই যে গভীর সন্দেহ পোষণ করেন, এটা যতদিন না দূর হবে, ততদিন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা সুদূরপরাহত থাক্‌বে

যৌন প্রবৃত্তিকে সংযম দ্বারা লোকহিত-ব্রতে নিয়োগ করে', প্রকৃতির নিয়ম যে সৃষ্টিরক্ষা, তা পালন কর্‌বার জন্য অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ আবশ্যক। বিবাহিত না হ'লে কি পুরুষ কি স্ত্রী কারু চরিত্র পূর্ণতা লাভ করে' সুগঠিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে না, সাধারণতঃ একথা মানি। উচ্চশিক্ষিতা অবিবাহিতা কোনো কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে তুলনায়, অল্পশিক্ষিতা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কোনো কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতা থেকে আমি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। তা' বলে' সকলকেই যে বিয়ে কর্‌তে হবে তার কোনো মানে নেই, এবং উচ্চ শিক্ষা দ্বারা চিত্তবৃত্তিগুলি মার্জ্জিত করার সুফল বিবাহ-ক্ষেত্রে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌লে সোনায় সোহাগা হয়, এটা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই।

আমাদের পুরুষদেরই কর্ম্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, মেয়েদের ত কথাই নেই। কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে সুবিধা ও সুযোগ আছে, বা তা শীঘ্র হওয়ার সম্ভব, সেইসব ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষালাভের প্রচুর অবসর দেওয়া উচিত নয়, একথা আমি মান্‌তে প্রস্তুত নই। আমি মেয়েদের জীবিকা-অর্জ্জনের প্রসঙ্গ তুল্‌ব না, তাদের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে দু'একটি

মাত্র কথা বলে' আমার এই যৎসামান্য বক্তব্য শেষ করব।

জন্ মলি বলেছেন, মেয়েরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণমনা। বিলেতেই যদি এরূপ অবস্থা, তবে আমাদের দেশের মেয়েদের কথা খুলে' বলা অনাবশ্যক। পুরুষদের মহৎ প্রয়াসগুলি অনুসরণ করবার মত যোগ্যতা পাশ্চাত্য মহিলাদের মধ্যেও অনেকেরই নেই—কিন্তু আমাদের মেয়েরা তা বুঝ্তে কিম্বা বুঝে' তার সঙ্গে সহানুভূতি করতেও অক্ষম। উইলিয়ম্ জেম্‌স্ তাঁর মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে বলেছেন যে, মেয়েরা কুড়ি বৎসরেই মানসিক ক্ষেত্রে বুড়ো হয়, অর্থাৎ তার পর আর তাদের মনের বিকাশ হয় না। আর ঐ বয়সের পুরুষদের মনের অবস্থা জেলিবৎ তরল ও স্থিতিস্থাপক থাকে বলে' তারা তখনও অনেক নূতন নূতন তথ্য গ্রহণ করতে পারে। পাশ্চাত্য নারীদেরই যদি এই দশা, তবে আমাদের মেয়েদের কথা একবার ভেবে দেখুন। অথবা ভেবে দেখ্‌বারই বা কি আবশ্যকতা, ঘরে ঘরে তাকিয়ে দেখ্‌লেই ত হয়। বিচার-বুদ্ধি বলে' যে একটা জিনিষ, ইংরেজীতে যাকে reason rationality বা judgment বলে, সেটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে একেবারে নেই বল্‌লেই চলে। সর্ব্বদা তাঁরা খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে চলেন, যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না, যদিও তর্কযুদ্ধে পশ্চাৎ-পদ না হ'তে পারেন। গোঁড়ামি কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস বিচার-মূঢ়তা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের পুরুষরাই ত পাশ্চাত্য নারীদের পশ্চাতে পড়ে' আছেন, আবার আমাদের মেয়েরা আমাদের আরও পশ্চাতে টেনে রাখ্‌ছেন। রাশ্‌ব্রুক উইলিয়ম্‌স্ সাহেব সত্যই বলেছেন,—

> "The traditional conservatism of the Indian home closes and bars the innermost sanctuary of Indian life to those new ideas which must penetrate far and wide if the political and social aspirations of the country are to be attained."

অর্থাৎ কিনা, যে-সকল নূতন ভাবগুলি খুব একটা বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রসার লাভ না করলে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি কার্য্যে পরিণত হ'তে পারে না, ভারতীয় অন্তঃপুরের চিরাগত রক্ষণশীলতার ফলে, জাতীয় জীবনের নিভৃততম কক্ষে সেগুলির প্রবেশাধিকার নেই। ইস্কুল-কলেজে পড়ে' দেশ-বিদেশে ঘুরে', সভাসমিতিতে যোগদান করে' আমাদের দেশের পুরুষদের বিচার-বুদ্ধি যেটুকু খুলে' যায়, আবার বাড়ী এসে মা ভগ্নী গৃহিণীর সনাতন রীতিনীতি আচার-ব্যবহার প্রথা-পদ্ধতির আব্‌হাওয়ার মধ্যে পড়ে,' অল্পদিনের মধ্যেই তা লোপ পায়। সুতরাং জাতি হিসাবে দু'দশ পুরুষেও আমাদের সমাজ-শরীরে কোন নূতন ভাব বদ্ধমূল হ'তে পারে না। বালিকা-বিদ্যালয়ে দু'পাতা পড়ে'ই আমাদের মেয়েরা এসব বিষয়ে একেবারে উন্নত হ'য়ে উঠ্‌বেন, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। কাগজে পড়ে' আমাদের দেশে কয় জন যুবকের বিচার-বুদ্ধি দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'য়ে থাকে? তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশই ত সনাতন রীতি অনুসরণ করে' গতানুগতিক-ভাবে জীবন যাপন করে' থাকেন। বস্তুত বিচার-বুদ্ধির বিকাশ বড়ই কঠিন সাধনাসাপেক্ষ। মেয়েরা অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভ করলেই আমাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ থেকে সনাতন রীতিনীতিগুলি অচিরাৎ অন্তর্দ্ধান করবে, এরূপ আশঙ্কা যেন কেউ না করেন। তবে পুরুষদের মধ্যেও যেমন কতক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধি মার্জ্জিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার প্রভাবে কতকটা সেরূপ হবে, সন্দেহ নেই। যতদিন তা না হয় ততদিন ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব দাম্পত্য-জীবনকে দুর্ব্বহ করে' রাখ্‌বে।

অতএব মেয়েদের উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করতে না পারলে তাদের শিক্ষা সফল হবে না, বরঞ্চ "অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী" হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যেহেতু কেবল নাটক নভেল পড়ে' মেয়েদের স্বাভাবিক ভাব-প্রবণতা বেড়ে যাবে, তারা আত্মঘাতী হবার নব নব রোমাণ্টিক্ উপায় খুঁজে' বের করবে। নাটক নভেলও আবার বেছে বেছে পড়া হয় শুনেছি, অর্থাৎ যেখানে কেবল নায়ক-নায়িকার প্রেমের কথা থাকে, কেবল সেগুলিই পড়া হয়, দু'চারটি যুক্তি বা তত্ত্বকথা বা সুচিন্তিত মন্তব্য বা চরিত্র-বিশ্লেষণ যদি কোথাও থাকে, তবে সেগুলি নাকি সযত্নে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং আমার

কথা এই যে, দেশময় ছাত্র-শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে ছাত্রী-শিক্ষারও তদ্রূপ ব্যবস্থা হোক, উচ্চশিক্ষার পথ তাদের নিকটও অবাধ ও উন্মুক্ত করে' দেওয়া হোক, দাক্ষিণাত্যের স্থায় উত্তরাখণ্ডেও অবরোধ-প্রথা শিথিল করে' দেওয়া হোক, মেয়েদের বিয়েটা অনেক পিছিয়ে দেওয়া হোক, যৌবন-বিবাহের দরুণ যদি 'ল্যভ-ম্যাচ' ও অসবর্ণ বিবাহ এসে পড়ে তবে তাদের সাদরে বরণ করে' নেওয়া হোক'—মহর্ষি বাৎস্যায়নের মতে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ হেতু গান্ধর্ব্ব বিবাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বিধবাদের শিক্ষা ও আবশ্যক মত তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা করা হোক, যেহেতু সেটা তাদের নিজের জন্য যতটা আবশ্যক, তাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ও বন্ধ্যাত্ব নিবারণ দ্বারা জাতিক্ষয় থামাবার জন্যও ততটা প্রয়োজন, এমন কি নিতান্ত আবশ্যক স্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদেরও ব্যবস্থা করা হোক। নারী-সমস্যা বড়ই জটিল, স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে এতগুলি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি এসে পড়বেই। আর বর্ণপরিচয়ই যদি স্ত্রীশিক্ষার সীমা হয়, তবে বালিকা বিদ্যালয়গুলির বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখ্‌তে পাই না। মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দিলেই ঘরে ঘরে সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী গড়ে' উঠ্‌বে না, যেমন শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে যেখানে সেখানে রাম লক্ষণ ভীষ্ম দ্রোণ দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তবে মেয়েদের উন্নতির সঙ্গে সমস্ত জাতিটার উন্নতি হবে; নতুবা আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু হ'য়ে থেকে বাকী অঙ্গটাকে অক্ষম ও জড় করে' রাখ্‌ছে ও রাখ্‌বে। 'দেবী' বলে' 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" বলে', মেয়েদের গৃহ-কোণে সরিয়ে কোণঠাসা করে' রাখ্‌লে চল্‌বে না। আমরা চাই

> "A creature not too bright or good
> For human nature's daily food"

এমন সুগৃহিণী যে আমাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার পক্ষে আবশ্যক পুষ্টিকর মানসিক খাদ্য জুগিয়ে দিতে পারে, নিজেরা মনুষ্যত্ব লাভ করে' আমাদের পুরুষদের মানুষ করে' তুল্‌বার সাহায্য কর্‌তে পারে। দেব বা দেবী কেবল পুঁথিপত্রের সাহায্যে তৈরি হয় না, সেটা যার যার ভগবদ্দত্ত প্রকৃতি অনুসারে হ'য়ে থাকে। আমরা চাই এরূপ স্ত্রীশিক্ষা, যা আমাদের মেয়েদের ধীশক্তি সুমার্জ্জিত করে' বিচার-বুদ্ধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে' মনে মনে মহৎ আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়ে, প্রবৃত্তিগুলিকে সৎপথে চালিত করে' তাদের পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় কর্ত্তব্য পালনে উপযোগী করে' তুল্‌বে।

শ্রী জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা

উভয় হস্তে লাঠি কিম্বা অসি

নিম্নলিখিত ক্রমগুলির মধ্যে বন্ধনীর অন্তর্গত "দ" অক্ষরে দক্ষিণ হস্ত ও "বা" অক্ষরে বাম হস্ত বুঝিতে হইবে।

যে আঘাতটি-সম্পর্কিত বন্ধনীর মধ্যে "দ" প্রথমে, তাহার প্রয়োগ দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; যে আঘাতটির সম্পর্কিত বন্ধনীর মধ্যে "বা" প্রথমে, তাহার প্রয়োগ বাম হস্তে করিতে হইবে; যে স্থলে "দ" শেষে, তথায় প্রতিকার দক্ষিণ হস্তে করিতে হইবে; এবং যে স্থলে "বা" শেষে তথায় প্রতিকার বাম হস্তে করিতে হইবে।

প্রথম ক্রম

ঠাট্‌ উত্তর গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভর্জ্জা (বা, দ)	১। শির (বা, দ)
২। কোমর (বা, দ)	২। তেওয়র (বা, দ)
৩। অক্‌ (বা, দ)	৩। শির (বা, দ)
৪। কোমর (বা, দ)	৪। শির (বা, দ)
৫। করক (বা, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

বর্ণনা:—

উত্তর গোমুখ—বাম পদ সম্মুখে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে করিয়া গোমুখের অনুরূপ ঠাট্‌। (অন্যান্য "উত্তর ঠাট্‌"-গুলি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম)।

দ্বিতীয় ক্রম

ঠাট্ গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভর্জ্জা (দ, বা)	১। শির (দ, বা)
২। কোমর (দ, বা)	২। তেওয়র (দ, বা)
৩। অঙ্ক্ (দ, বা)	৩। শির (দ, বা)
৪। কোমর (দ, বা)	৪। শির (দ, বা)
৫। করক দ, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

তৃতীয় ক্রম

ঠাট্ উত্তর গোমুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভুজ (বা, দ)	১। সাও (বা, দ)
২। ভাণ্ডার (বা, দ)	২। চাকি (বা, দ)
৩। উল্টা অঙ্ক্ (বা, দ)	৩। সাও্ (বা, দ)
৪। ভাণ্ডার (বা, দ)	৪। সাও্ (বা, দ)
৫। পালট্ (বা, দ)	(বিপরীতামম্ভ)

চতুর্থ ক্রম

ঠাট্ গে মুখ

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। ভুজ (দ, বা)	১। সাও্ (দ, বা)
২। ভাণ্ডার (দ, বা)	২। চাকি (দ, বা)
৩। উল্টা অঙ্ক্ (দ, বা)	৩। সাও্ (দ, বা)
৪। ভাণ্ডার (দ, বা)	৪। সাও্ (দ, বা)
৫। পালট্ (দ, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

পঞ্চম ক্রম

ঠাট্ উত্তর রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। পালট্ (বা, বা)	১। সাও্ (দ, দ)
২। গ্রীবান্ (বা, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

ষষ্ঠ ক্রম

ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। পালট্ (দ, দ)	১। সাও্ (বা, বা)
২। গ্রীবান্ (দ, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

সপ্তম ক্রম

উত্তর রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। করক (বা, বা)	১। শির (দ, দ)
২। হিমাএল (বা, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

অষ্টম ক্রম

ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। করক (দ, দ)	১। শির (বা, বা)
২। হিমাএল (দ, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

নবম ক্রম

ঠাট্ উত্তর পাথ্রী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান্ (বা, বা)	১। আসর্ (দ, বা)
২। তেওয়র (বা, দ)	২। জবেগা (দ, দ)
	(বিপরীতারম্ভ)

দশম ক্রম

ঠাট্ পাথ্রী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। গ্রীবান্ (দ, দ)	১। আসর্ (বা, দ)
২। তেওয়র (দ, বা)	২। জবেগা (বা, বা)
	(বিপর তারম্ভ)

একাদশ ক্রম

ঠাট্ উত্তর পাথরী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হিমাএল (বা, বা)	১। সাকেন (বা, দ)
২। চাকি (বা, দ)	২। উল্টা জবেগা (দ, দ)
	(বিপরীতারম্ভ)

দ্বাদশ ক্রম

ঠাট্ পাথ্রী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হিমাএল (দ, দ)	১। সাকেল (দ, বা)
২। চাকি (দ, বা)	২। উল্টা জবেগা (বা, বা)
	(বিপরীতারম্ভ)

ত্রয়োদশ ক্রম

ঠাট্ উত্তর রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটি পেশ্ (বা, দ)	১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)
২। উল্টা মোড়া (বা, দ)	২। চাকি (বা, দ)
৩। শির (বা, দ)	৩। গ্রীবান্ (বা, দ)
৪। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)	৪। উল্টা মোড়া (বা, দ) আনি (বা, বা)
৫। মোড়া (বা, বা) কোমর (বা. দ)	৫। আনি (বা, বা)
৬। চাকি (দ, দ)	৬। হাতকাটি অধঃ (বা, দ)
৭। হল (দ, বা)	
৮। ভুজ (চৌমুখী) (দ, বা)	
৯। পালট্ (দ, বা)	
১০। শির (চৌমুখী) (দ, বা)	
১১। হাতকাটি (দ, বা)	১১। হাতকাটি (দ, বা)
১২। ভাণ্ডার (চৌমুখী) (দ, বা)	
১৩। বাহেরা (চৌমুখী) (বা, দ)	
১৪। দিগর (বা, বা)	১৪। দিগের (দ, বা)
১৫। শির (দ, দ,)	বিপরীতারম্ভ

চতুর্দ্দশ ক্রম

ঠাট্ রাউটী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। হাতকাটিপেশ (দ, বা)	১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)
২। উল্টা মোড়া (দ, বা)	২। চাকি (দ, বা)
৩। শির (দ, বা)	৩। গ্রীবান্ (দ বা)
৪। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)	৪। উল্টা মোড়া (দ, বা) আনি (দ, দ)
৫। মোড়া (দ, দ) কোমর (বা, দ)	৫। আনি (দ, দ)
	—
৬। চাকি (বা, বা)	৬। হাতকাটি অধঃ (দ, বা)
৭। হুল (বা, দ)	—
৮। ভুজ (চৌমুখী) (বা, দ)	
৯। পালট্ (বা, দ)	—
১০। শির (চৌমুখী) (বা, দ)	
১১। হাতকাটি (বা, দ)	১১। হাতকাটি (বা, দ)
১২। ভাণ্ডার (চৌমুখী) (বা, দ)	
১৩। বাহেরা (চৌমুখী) (দ, বা)	
১৪। দিগর (দ, দ)	১৪। দিগর (বা, দ)
১৫। শির (বা, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

পঞ্চদশ ক্রম

ঠাট্ উত্তর পাখ্‌রী

আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)	১। হাতকাটি (বা, বা)
২। মোড়া (দ, বা)	২। তেওয়র (বা, দ)
৩। সাণ্ড্ (দ, বা)	৩। হিমাএল (বা, বা)
৪। হাতকাটি (দ, বা)	৪। মোড়া (দ, বা) দক্ষিণ আনি (দ, বা)
৫। মোড়া (দ, বা) কোমর (বা, বা)	৫। দক্ষিণ আনি (দ, বা)
৬। তেওয়র (দ, বা)	৬। শৃঙ্গবাহী (দ, দ)
৭। চির (বা, দ)	—
৮। ভর্জ্জা (চৌমুখী) (বা, দ)	
৯। করক (বা, দ)	—
১০। সাণ্ড্ (চৌমুখী) (দ, বা)	
১১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)	১১। শৃঙ্গবাহী (বা, দ)
১২। কোমর (চৌমুখী) (বা, দ)	
১৩। তামেচা (চৌমুখী) (দ, বা)	
১৪। চাপ্‌নি (বা, বা)	১৪। চাপ্‌নি (দ, বা)
১৫। সাণ্ড্ (বা, দ) হাতকাটি (বা, বা)	(বিপরীতারম্ভ)

ষোড়শ ক্রম

ঠাট্ পাখ্‌রী

(আক্রমণ)	(প্রত্যাক্রমণ)
১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)	১। হাতিকাটি (দ, দ)
২। মোড়া (বা, দ)	২। তেওয়র (বা, দ)
৩। সাণ্ড্ (বা, দ)	৩। হিমাএল (দ, দ)
৪। হাতকাটি (বা দ)	৪। মোড়া (বা, দ) দক্ষিণ আনি (বা, দ)
৫। মোড়া (বা, দ) কোমর (দ, দ)	৫। দক্ষিণ আনি (বা, দ)
৬। তেওয়র (বা, দ)	৬। শৃঙ্গবাহী (বা, বা)
৭। চির (দ, বা)	
৮। ভর্জ্জা (চৌমুখী) (দ, বা)	—
৯। করক্ (দ, দ)	
১০। সাণ্ড্ (চৌমুখী) (বা, দ)	
১১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)	১১। শৃঙ্গবাহী (দ, বা)
১২। কোমর (চৌমুখী) (দ, বা)	
১৩। তামেচা (চৌমুখী) (বা, দ)	
১৪। চাপ্‌নি (দ, দ)	১৪। চাপ্‌নি (বা, দ)
১৫। সাণ্ড্ (বা, দ) হাতকাটি (দ, দ)	(বিপরীতারম্ভ)

নির্ঘাত

মিশ্রঘাতের অষ্টম ক্রম শেষ হইলেই ক্রমে সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাতের অভ্যাসও আরম্ভ করিতে পারা যায়। নির্ঘাত অভ্যাস-কালে প্রথমে দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ও বাম হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে, পরে পূর্ব্বানুরূপ প্রচেষ্টা সহ সম ক্লান্তি অবধি বাম হস্তে শৃঙ্গ ও দক্ষিণ হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে হইবে। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে একজন দক্ষিণ হস্তে লাঠি ও অপর হস্তে শৃঙ্গ এবং অপর ব্যক্তি বাম হস্তে লাঠি ও দক্ষিণ হস্তে শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পূর্ব্বানুরূপ সম ক্লান্তি অবধি ক্রীড়া করিতে হইবে। পরে পর্য্যায়ক্রমে শুধু এক-এক হস্তে লাঠি ধারণ করিয়া নির্ঘাত অভ্যাস করিতে হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ান্তর্গত পাঠগুলির শিক্ষাভ্যাসের বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ঘাত-সম্পর্কে যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং অসিবিদ্যা-সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ প্রায় সম্পূর্ণ-রূপেই নির্ভর করিয়া থাকে।

নির্ঘাত-সম্পর্কে কোন বিধি-নির্দ্দিষ্ট পাঠের স্থিরতা নাই, এবং অধিকাংশস্থলেই বিভিন্ন শিক্ষার্থীর নিমিত্ত বিভিন্নরূপ উপদেশেরই প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাই সদ্‌গুরুর উপদেশানুযায়ী পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, অনুশীলন, অধ্যবসায় ও নিদিধ্যাসন সহযোগে ক্রমাগত অভ্যাস দ্বারাই নির্ঘাতে দক্ষতা জন্মিয়া থাকে। তবে

অভ্যাসকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে।—

১। হস্তদ্বয় সর্ব্বদাই সুরক্ষিত রাখিতে হয়।

২। শরীর ও গতির ভঙ্গী সর্ব্বদাই সুদৃঢ় ও বিশুদ্ধ রাখিতে হয়।

৩। কদাচ অন্যমনস্ক হইতে নাই।

৪। হস্তদ্বয় পরস্পরে কদাচ যেন অতি সন্নিকটে কিম্বা অতি ব্যবধানে না হইয়া পড়ে। দ্রুত চালনা-কালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলেও প্রতিপক্ষের অসিবেগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তন্মুহূর্ত্তেই অসি-বেগের দ্বারা ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে হয়, এবং এবিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়।

উভয় হস্তের ব্যবধান সাধারণতঃ দেড় হস্ত ও এক হস্তের মধ্যে রাখিতে পারিলেই শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

৫। হস্তদ্বয়ের কফোণি (কনুই) কদাচ যেন একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া না যায়।

৬। হস্তদ্বয়ের ব্যবধানের মধ্যদেশে কদাচ যেন প্রতিপক্ষের অসি কিম্বা শৃঙ্গ প্রবেশ করিবার অবসর না পায়।

৭। কদাচ যেন এক হস্ত কোমরের নিম্নে ও অপর হস্ত মস্তকের উপরে অথবা এক হস্ত শরীরের দক্ষিণ পার্শ্বে ও অপর হস্ত শরীরের বাম পার্শ্বে প্রতিহত হইয়া না থাকে।

৮। সর্ব্বদাই উভয় হস্তের গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অসি ও শৃঙ্গ চালনা করিতে হয়, নতুবা স্বকীয় আঘাতেই স্ব হস্ত ও শরীর আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কিম্বা হস্তদ্বয়ের গতি প্রতিহত হইয়া পড়িতে পারে; সেই-হেতুই বিচার করিয়া কখনও শৃঙ্গ অসির সম্মুখে কখনও বা অসির পশ্চাতে ঘুরাইতে ফিরাইতে হয়। সাধারণতঃ কোন হস্তই নিষ্ক্রিয় রাখিতে নাই।

৯। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত হীনবল হইলেও তাচ্ছিল্য-সহকারে কোনরূপ সতর্কতার লাঘব করিতে নাই।

১০। কদাচ স্বকীয় যোগ্যতা অতিক্রম করিয়া আস্ফালন ও স্পর্দ্ধা দেখাইতে যাইতে নাই।

১১। শৃঙ্গ দ্বারা প্রতিপক্ষের অসিকে প্রতিহত না করিয়া কদাচ "চির" "হুল" "আনি' প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে নাই। অনবধানতা-বশতঃ "চির". "হুল" প্রভৃতির প্রয়োগ করিতে গেলে নিজ হস্ত ছিন্ন হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

১২। অসিবেগের ক্রমধারা অনুযায়ী সহজ গতির অনুসরণ-সহযোগেই প্রতিপক্ষের অরক্ষিত স্থান-সমূহে আক্রমণ হেতু আঘাতের প্রয়োগ করিতে হয়। (Proceed through shortest cuts.) বিশৃঙ্খল আক্রমণে ও আঘাতে সুফল না হইয়া কুফলই অধিক হয়।

১৩। যাহাতে অল্প সময় মধ্যে অধিক আঘাতের প্রয়োগ-মাত্রার আধিক্য সম্ভবপর হইতে পারে, তদনুরূপেই হস্ত-চালনা দ্বারা অসি-বেগ সুরক্ষিত রাখিতে হয়। (Maximum strokes in minimum time.)

১৪। নিরবচ্ছিন্ন সমবেগসম্পন্ন দ্রুতগতি (swift uniform and continuous motion) হইতেই আঘাতের গুরুত্ব ও তীব্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুরু আঘাতই কার্য্যকারী; লঘু আঘাতে সময়- ও শক্তি-ক্ষয় মাত্র।

১৫। আক্রমণ প্রারম্ভে "হাতকাটি" কিম্বা "চক্ষু" (প্রধানতঃ "হাতকাটি") আক্রমণের উপক্রম কিম্বা ভাণ করিয়া পরে আক্রমণ আরম্ভ করিতে হয়; অথবা প্রতিপক্ষের অসির, কিম্বা অসি ও শৃঙ্গের কোনরূপ বাধা জন্মাইয়া আরম্ভ করিতে হয়।

১৬। যে হস্তে প্রতিপক্ষ অসি ধারণ করিবে, আক্রমণ-সহযোগে সেই পার্শ্বে পতিত হইতে পারিলেই যথেষ্ট সুবিধা হয়।

১৭। সর্ব্বদাই প্রতিপক্ষের দুর্ব্বলতা ও ছিদ্র বুঝিয়া আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়, সেই-হেতুই সুযোগমতে "ধাঁদার" প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার শিষ্টতা ও উদারতা ভুলিয়া যাইতে হয়, নতুবা নিজেকেই প্রতি-হত হইতে হয়।

[সর্ব্বপ্রকার অনবধানতা ও সতর্কতার ব্যভিচারই

ছিদ্র বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ যে-কোনরূপ অপারগতার নামই দুর্ব্বলতা।]

১৮। দ্রুত চালনায় আঘাতের পর আঘাতের প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপক্ষকে প্রমাদগ্রস্ত করিতে পারিলেই তাহার ছিদ্র ও দুর্ব্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে।

১৯। কৌশলক্রমে প্রতিপক্ষের দক্ষিণ ও বাম হস্তকে তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে অপসারিত করাইয়া হস্ত আক্রমণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেই আশু শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়।

২০। প্রতিপক্ষের আক্রমণে অস্থির হওয়ার উপক্রম হইলেই চক্ষু আক্রমণ দ্বারা তাহাকে বিহ্বল করিতে হয়। সময়ে সময়ে শৃঙ্গ দ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া "হাতকাটি", "হুল", "আনি" প্রভৃতির প্রয়োগ-সহযোগে কিম্বা "অভিযান স্থিতির" ভঙ্গী-সহযোগে প্রতিপক্ষের বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলেও সুফল পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ অসিধারীগণ সাধারণতঃ "বিনোদ" ও "যুযুৎসু"র প্রয়োগেই নিষ্কৃতি পাইয়া থাকেন।

২১। হস্ত, গ্রীবা, মস্তক, হৃদয়, বস্তি ও মর্ম্মস্থল-সকল লক্ষ্য করিয়াই প্রধানতঃ আঘাতের চেষ্টা দেখিতে হয়। ঐসমস্ত স্থলে নিশ্চিতরূপে গুরু আঘাত করিতে পারিলেই প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হইবে।

২২। প্রতিপক্ষের আঘাত অতিক্রম করিয়া কোনও মর্ম্মস্থলে তাহাকে নিশ্চিত গুরু আঘাত করিতে পারিলেই সাধারণতঃ নিঃশঙ্ক হওয়া যায়। বিশুদ্ধতা-সম্পন্ন আক্রমণই আত্মরক্ষার প্রধান উপায়। প্রতিপক্ষ আক্রমণের অবসর না পাইলে আর শঙ্কা কোথায়?

২৩। কদাচ পশ্চাৎপদ হইতে নাই। প্রতিপক্ষ পশ্চাৎপদ হওয়ার উপক্রম করিলেই শরীর সুরক্ষিত রাখিয়া আক্রমণ-সহযোগে তীব্র গতিতে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

২৪। দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির প্রতিযোগিতা হইলে সময়ে সময়ে খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিকে এক লম্ফে শূন্যে উঠিয়া, "অভিযান স্থিতির" ভঙ্গী ঠিক রাখিয়া, এবং প্রতিপক্ষের অসি ও শৃঙ্গকে প্রতিহত করিতে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া, তীব্র গতিতে প্রতিপক্ষের অতি সন্নিকটে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয়।

২৫। প্রতিপক্ষ লম্ফ সহযোগে অগ্রসর হওয়ার উপক্রম করিলে, শরীর অবনত করিয়া "অবনমন" সহযোগে অগ্রসর হইতে হইতে, অগ্রবিন্দু পশ্চাৎ দিকে করিয়া অসি মস্তকের উপরে ধারণ করিয়া ধারের অংশ দ্বারা "চির" প্রয়োগ করিতে পারিলে কিম্বা পদদ্বয়ে আঘাত করিতে পারিলে সুফল পাওয়া যায়।

২৬। চক্ষু আক্রান্ত হইলেই প্রতিকারের সঙ্গে সঙ্গে "অবনমন" সহযোগে তীব্রগতিতে আক্রমণ সহ শত্রুর উপরে প্রবল বেগে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা দেখিতে হয়।

২৭। দক্ষিণ হস্তের "হুল" "আনি" প্রভৃতির আক্রমণের প্রতিকারকল্পে সাধারণতঃ "অবনমন" সহযোগে নিজ বাম পার্শ্বে শরীর অপসারিত করাইয়া প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিতে হয়; অথবা "হাতকাটির" প্রয়োগ করিতে হয়। (বাম হস্ত সম্বন্ধেও তদনুরূপ)।

২৮। সুযোগ অনুসারে শৃঙ্গ দ্বারাও মর্ম্মস্থলে আঘাত করিতে হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর দিকের শৃঙ্গের বিন্দু দ্বারা "হুল" "আনি" প্রভৃতির অনুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দিকের বিন্দু দ্বারা "ছুরিকার" (বাঁকের) অনুরূপ আঘাত প্রয়োগ করিতে হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

প্রকৃত সংঘর্ষকালে পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়ম-প্রণালী ও সতর্কতাগুলির বিচার করিবার অবসর পাওয়া অসম্ভব; কিন্তু শিক্ষাভ্যাসকালে এইসমস্ত সতর্কতা-প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারিলে প্রকৃত সংঘর্ষকালে আপনা হইতেই পূর্ব্ব শিক্ষা, অভ্যাস ও সংস্কারের সমষ্টিভূত প্রভাব প্রতিভাত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সাহায্য করিয়া থাকে। তবে জয়লাভ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরই আয়ত্তাধীন।

(ক্রমশঃ)

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

ব্যবসাগত লাভ ও সামাজিক লাভ

(১)

ব্যক্তি যদি নিজের সুবিধা বুঝে' কাজ করে এবং তার স্বাধীনতায় যদি হস্তক্ষেপ করা না হয় তা হ'লে সকল ব্যক্তি নিজের সুবিধা বুঝে' কাজ কর্‌লে সামাজিক উন্নতি সুবিধা-মত হবে, এই ধরণের একটা ভুল ধারণা অনেকের মনে আছে। * সামাজিক সুবিধা তত বেশী হবে, যত বেশী সামাজিক আয় বেড়ে চল্‌বে; কিন্তু ব্যক্তির আত্মসুবিধা-বোধ (self-interest) সব সময় সামাজিক আয় না বাড়াতেও পারে। ব্যক্তির ক্ষমতা সাধারণতঃ দুইভাবে ব্যবহৃত হয়। ১। ভোগ্য উৎপাদনে, ২। ভোগ্য আহরণে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে, যদি প্রকৃতিকে একটি আম গাছ বলে' ধরা হয় আর যদি একদল ছেলেকে মনুষ্যজাতি বলা যায়, তা হ'লে সামাজিক আয় হবে কতকগুলি আম। এখন প্রত্যেক ছেলেই যদি আমের ফসল বৃদ্ধি ও গাছ থেকে আম পাড়ায় মন দেয়, তা হ'লে সামাজিক আয় বাড়্‌বে, কিন্তু কয়েকটি ছেলে যদি অপরের পাড়া আম কিছু কিছু সংগ্রহ করে' নিজেদের কাছে রাখে, অর্থাৎ **সামাজিক আয়ের দিকে নজর না দিয়ে শুধু নিজেদের আয়ের দিকেই নজর দেয়**, তা হ'লে সামাজিক আয় কমে' যাবে। উৎপাদন না করে' শুধু আহরণে (বা অপহরণে) যত বেশী সামাজিক শ্রম খরচ হয়, সমাজের ক্ষতি ততই বে হবে। কাজেই ব্যক্তির আত্ম-সুবিধাবোধ যে সামা আয় উৎপাদনের উপকরণ-গুলিকে সব সময় সমা দিক থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে লাগাবে, এমন কোন কথা নেই। এমন অনেক কাজ ও ব্যবসায় আছে যাতে সামাজিক লাভ খুবই বেশী অথচ তাতে কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য † কখনও শক্তি ব্যয় কর্‌বে না, কেননা তাতে **সে ব্যক্তির** লাভ নেই বা খুব কম আছে। এসব ক্ষেত্রে সমাজই সংঘবদ্ধভাবে অনেক কাজ করে' থাকে। যেমন, সহর বা দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা, ডাক ও তারে খবর পাঠাবার বন্দোবস্ত, শান্তি রক্ষার জন্য পুলিস ও সৈন্য রক্ষা, সাধারণের মানসিক উন্নতির জন্য পাঠাগার, অবৈতনিক পাঠশালা, জাদুঘর, চিড়িয়া-খানা ইত্যাদি স্থাপন। এসবগুলির দিকে সামাজিক শক্তি কমই যেত, যদি সমাজ ব্যক্তির আত্মসুবিধা-বোধের উপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে' থাকৃত। সামাজিক স্বাচ্ছ-ন্দ্যের জন্য সংঘবদ্ধভাবে অনেক কাজ কর্‌তে হয় এবং না কর্‌লে সমাজের অশেষ দুর্গতি হয়। অজ্ঞানতা, পরাধীনতা ইত্যাদি কারণে **অনেক সময় সমাজ নামে থাক্‌লেও কাজের বেলা না থাকার সামিল** হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশ তার একটি উদাহরণ। এইরকম ক্ষেত্রে **যে কারণে সমাজ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা কর্‌তেও অক্ষম, সেই কারণ সর্ব্বাগ্রে দূর করা দর্‌কার।** তা নইলে, কি করে' সমাজ সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি কর্‌তে পারে, তা জেনে কোন ফল নেই।

সামাজিক আয় যে-সব উপকরণের সাহায্যে উৎপাদিত হয়, সেগুলিকে তিন ভাগে আগেই বিভাগ করা হ'য়েছে; প্রকৃতি, মানুষ ও মূলধন। কেউ যেন না ভাবেন, যে, উপকরণগুলির একটি ভাণ্ডার আছে এবং তার থেকে ইচ্ছামত কিছু কিছু বার করে' নিয়ে সামাজিক আয় প্রতি বৎসর সৃষ্ট হয়। উপকরণগুলি এবং আয়, দুইই অনবরত আস্‌ছে আর যাচ্ছে। এদের একটি ভাণ্ডারের সঙ্গে তুলনা না করে' একটি প্রবাহের সঙ্গে তুলনা কর্‌লে অনেকটা ঠিক হয়। উপকরণের প্রবাহ ক্রমাগত উপ-করণ নিয়ে আস্‌ছে। নূতন জমি হচ্ছে, আবার জমি লোপ পেয়েও যাচ্ছে; জমির উর্ব্বরতা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, আবার বাড়্‌ছে; কোথাও মাছ ধরার নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে, কোথাও মাছ লোপ পেয়ে যাচ্ছে; খনি আবিষ্কৃত

---

* এই ধারণার বশবর্ত্তী লোকেরা ইয়োরোপে *Laissez Faire* অথবা leave alone school of thinkers নামে পরিচিত।

† অবশ্য এখানে বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীদের কথা ধরা হচ্ছে না।

হচ্ছে, পুরান খনি খালি হ'য়ে যাচ্ছে ; নূতন নূতন উপায়ে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে, ইত্যাদি। মানুষ মরছে জন্মাচ্ছে, তার কর্ম্মক্ষমতা বাড়্ছে কম্‌ছে, তার সংখ্যাও বাড়্ছে, কম্‌ছে, ইত্যাদি। মূলধন নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, আবার সৃষ্ট হচ্ছে ; পুরান যন্ত্র ক্ষয়ে যাচ্ছে, নূতন যন্ত্র তৈরী হচ্ছে, পুরান বাড়ী ভাঙ্ছে, নূতন বাড়ী হচ্ছে ; পুরান সহর, বন্দর, পথ, ঘাট, মালগুদাম সবই ভাঙ্ছে গড়্ছে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষণের জন্য এমন বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, যাতে উপকরণের প্রবাহ অপ্রতিহত থাকে। সমাজের কর্ত্তব্য শুধু বর্ত্তমানবংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিই নেই, ভবিষ্যৎবংশীয়দের প্রতিও তার কর্ত্তব্য আছে। আর সামাজিক আয়ও একটি প্রবাহের মত আস্‌ছে ও ভুক্ত হচ্ছে। **বাৎসরিক** আয় কাজের সুবিধার জন্য বলা হয়, তা না হ'লে এক্ষেত্রে বৎসরের কোন মূল্য নেই। সময়ের স্রোতের মধ্যে থেকে থেকে দিনের খুঁটি, মাসের বয়া ও বৎসরের বাঁধ মানুষ লাগালেও সময়ের স্রোত অবাধগতিতে চলে। সময়কে মানুষ তার সসীম কল্পনা দিয়ে ধর্‌তে, বুঝ্‌তে চেষ্টা করে ; তাই সে সময়ের প্রবাহে বাঁধ, বয়া, খুঁটি ইত্যাদি বসাতে চায়। কিন্তু সময়ের মধ্যে সে-সব নেই ; আছে মানুষের মনে। বৎসরের শেষে যে আবার নূতন করে' উপকরণ জোগাড় ও আয় উপার্জ্জন সুরু হয় না, তা বলাই বাহুল্য। উপকরণপ্রবাহের নানা অংশ সতত নানা ভোগ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে ; এবং আমরা, কোন-একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটা ভোগ্য উৎপাদিত হচ্ছে, তাকে বাৎসরিক সামাজিক আয় বল্‌ছি।

এই উপকরণের প্রবাহ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ব্যবহারকে বিভিন্ন ব্যবসায় বলা চলে। কোন ব্যবসায়ে যত মাত্রা উপকরণ ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে যে মাত্রা থেকে সবচেয়ে কম লাভ হয়, তাকে সেই ব্যবসায়ের সীমাস্থিত মাত্রা বলা চলে। এই সীমাস্থিত মাত্রা থেকে যা "নেট" লাভ (অর্থাৎ খরচ বাদে ছাঁকা লাভ যেটুকু), তাকে সীমাস্থিত "নেট" লাভ বলা চলে। কোন ব্যবসায়ে সীমাস্থিত মাত্রা থেকে যা নেট লাভ হয়, তা সেই ব্যবসায়ের দিক্ থেকে দেখ্‌লে একপ্রকার হ'তে পারে, আবার সামাজিক দিক্ থেকে দেখ্‌লে আর একপ্রকার হ'তে পারে। নেট লাভ মানে হচ্ছে, সেই লাভটুকু উৎপাদন কর্‌তে গিয়ে বাস্তব জিনিষ খরচ, কষ্ট স্বীকার এবং অন্যান্য ক্ষতি যা হ'য়েছে তা মোট লাভ থেকে বাদ দিয়ে যা থাকে সেইটুকু। এখন ব্যবসায়-বিশেষের দিক্ থেকে বাস্তব জিনিষ (কাঠ, খড়, ইট, লোহা, ধান ইত্যাদি) ও কষ্ট স্বীকার (গরমে কাজ করা, ধূলা খাওয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারখানায় বসে' থাকা ইত্যাদি) যে পরিমাণ হয়, সামাজিক দিক্ থেকে হয়ত সেই পরিমাণেই হয়। কিন্তু অন্যান্য ক্ষতি ব্যবসায়ের দিক্ থেকে যা হয়, সামাজিক দিক্ থেকে তার চেয়ে কম বেশী হ'তে পারে। যেমন রেল-লাইন স্থাপনের জন্য লোহা ও মজুরী খরচ ব্যবসায়িক ও সামাজিক দুই দিক্ থেকেই সমান হবে ; কিন্তু সামাজিক দিক্ থেকে রেল-লাইনের বাঁধের জন্যে যদি ম্যালেরিয়া হয় ও লোকের বাড়ী ঘর স্যাঁৎ-সেঁতে হ'য়ে যায়, অথবা ধোঁয়ায় লোকের কষ্ট হয়, তা হ'লে সেগুলিকে ক্ষতির মধ্যে ধর্‌তে হবে। আবার শীঘ্র চলাচল সুবিধার জন্য যদি ব্যবসায়-বাণিজ্য বাড়ে, লোকের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, বা দুর্ভিক্ষ নিবারণের সুবিধা হয় (রেল-লাইনগুলি দুর্ভিক্ষের কারণও হ'তে পারে) তা হ'লে সেগুলি কোম্পানীর লাভের খাতায় না দেখা গেলেও সামাজিক লাভের হিসাবে স্থান পাবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিগত বা ব্যবসায়গত লাভ লোক্‌সান ও সামাজিক লাভ লোক্‌সানের মধ্যে তফাৎ আছে।

কোন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত উপকরণের সীমাস্থিত মাত্রা থেকে সেই ব্যবসায়ের যা নেট লাভ হয়, তাকে সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ বলা চলে এবং সেই নেট লাভটুকু উৎপাদনে পরোক্ষভাবে সামাজিক যা ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে সেগুলি তাতে বা তা থেকে যোগ-বিয়োগ করে' সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ স্থির হবে। সীমাস্থিত নেট লাভ বা নেট উৎপাদন স্থির কর্‌তে হ'লে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে, তার নেট উৎপাদনের চেয়ে অল্প একটু (বুঝ্‌বার সুবিধার জন্য একমাত্রা বলা যাক) বেশী উপকরণের নেট উৎপাদন কত বেশী তা ঠিক কর্‌তে হবে। যেটুকু বেশী সেইটুকু হচ্ছে সীমাস্থিত নেট লাভ।

এইটুকুর দাম যা তাই হচ্ছে, সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের দাম। অবশ্য ঐটুকু বেশী উৎপাদন করতে গিয়ে উৎপাদন খরচ বা ক্রেতাদের কিন্‌বার ইচ্ছা বদ্‌লে যেতে পারে। কাজেই প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের দামের মধ্যে যা তফাৎ বা ব্যবসায়ীর লাভে যা তফাৎ তাকে সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের দাম ব'লে ধরা যায় না। আমরা আগেই বলেছি, যে-কোন পরিমাণ উপকরণ যদি নানা ব্যবহারে লাগান যায়, তা হ'লে সর্ব্বক্ষেত্রে সীমাস্থিত প্রয়োজনীয়তা সমান হ'লে সেই উপকরণসমষ্টি থেকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়তা পাওয়া যায়। এখন সমাজের যে পরিমাণ উপকরণ আছে (প্রাকৃতিক উপকরণ, শ্রমশক্তি ও মূলধন), তা নানা ব্যবসায়ে লাগে। সামাজিক আয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হবে যদি সব ব্যবসায়ে উপকরণ ব্যবহারে সীমাস্থিত **সামাজিক** নেট লাভ সমান হয়; ব্যবসাগত নেট লাভ নয়, সামাজিক নেট লাভ। কেননা, ডাকাতিতে শ্রমশক্তি ও মূলধন (বন্দুক, ছুরি, ছোরা, লাঠি, সড়্‌কি, নৌকা, ঘোড়া, ইত্যাদি) ব্যবহার করলে ব্যবসায়গত নেট লাভ অর্থাৎ ডাকাতদের লাভ খুবই বেশী, কিন্তু সামাজিক লাভ বা আয়বৃদ্ধি তাতে কিছুই হয় না; বরং ডাকাতিতে ধনক্ষয় হ'তে পারে এবং সম্ভোগ অনিশ্চিত হওয়ায় লোকের ধন উৎপাদনের ইচ্ছা কমে' যেতে পারে। সমাজে যদি শুধু একপ্রকারই ভোগ্য উৎপাদিত হত, অর্থাৎ সামাজিক আয় মানে যদি ভোগ্যবিশেষের কোন পরিমাণ হত, এবং নানা উপায়ে যদি সেই একই ভোগ্যটি উৎপাদিত হ'ত, তা হ'লে যদি কোন উপায়বিশেষে উপকরণ ব্যবহৃত হলে সীমাস্থিত নেট উৎপাদন অন্য সব উপায় অপেক্ষা দশগুণ হত, তবে অন্য উপায়ে উপকরণ ব্যবহার না ক'রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই উপায়ে ব্যবহার ক'রে সীমাস্থিত নেট উৎপাদন অন্য উপায়ের সীমাস্থিত নেট উৎপাদনের সমান হয় ততক্ষণ সামাজিক আয় বেড়ে চল্‌ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে নানা ব্যবসায়ে অসমান সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ হ'লে, উপকরণ স্থান পরিবর্ত্তন (অর্থাৎ ভিন্ন ব্যবসায়ে লাগ লে) করলে, সামাজিক আয় বাড়্‌বে। অবশ্য ধরে' নেওয়া হচ্ছে, যে, এই স্থান পরিবর্ত্তন বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তনের জন্য কোন সামাজিক ক্ষতি হয় না। কিন্তু আসলে উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করলে তাতে ক্ষতি আছে। যেমন, শ্রমশক্তি বা শ্রমজীবীকে যদি অন্য ব্যবসায়ে লাগ্‌বার জন্য আগ্রা থেকে মান্দ্রাজ যেতে হয় তা হ'লে যাবার খরচ ত আছেই, যাত্রাপথে বিনা কাজে সময় নষ্ট আছে, ব্যবসায় পরিবর্ত্তনে অভ্যাস পরিবর্ত্তন করতে হ'লে কর্ম্মকুশলতার হানি আছে, নিজ বাসভূমি ছেড়ে গেলে সামাজিক ও আর্থিক সম্বন্ধ (যেমন দোকান চেনা থাকার ফলে ধার পাওয়া, বা পথ ঘাট জঙ্গল জানা থাকায় বিনা পয়সায় উনুনের কাঠ কুড়িয়ে আনা ইত্যাদি) বিচ্ছেদের ফলে ক্ষতি ইত্যাদি আছে। অথবা জমিতে নূতনরকম ফসল লাগাবার জন্য খরচ নানাপ্রকার হ'তে পারে, বা নূতন কার্য্যে অনভ্যাসের ফলে কার্য্যকরী শক্তি কমে' যেতে পারে ইত্যাদি। রেল-লাইনের লোহা খুলে' এনে অন্য কাজে লাগালে প্রথমতঃ রেল লাইন বসাতে যে শক্তি খরচ হয়েছিল তার অপচয় হয় এবং নূতন ব্যবহারে লাগাতে গিয়ে লোহাও কিছু নষ্ট হ'তে পারে; দ্বিতীয়তঃ লোহা ব'য়ে অন্যত্র নিয়ে যেতে খরচ আছে, ইত্যাদি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে, উপকরণকে এক ব্যবসায় থেকে আর-এক ব্যবসায়ে লাগাতে খরচ আছে।

ক এবং খ এই দুই ব্যবসায়ে (বা একই ব্যবসার ভিন্ন স্থানে) উপকরণ ব্যবহারে যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক নেট লাভ (অর্থাৎ সীমাস্থিত মাত্রা থেকে বাৎসরিক যা নেট আয় বা লাভ হয়) বিভিন্ন-রকম হয়, ক থেকে খ-এ যদি সীমাস্থিত বাৎসরিক নেটলাভ গ পরিমাণ বেশী হয়, এবং যতটা উপকরণ স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তন করলে দুই ব্যবসাতেই (বা স্থানে) সীমাস্থিত বাৎসরিক নেট লাভ সমান হয়, ততটা উপকরণ ক থেকে খ-এ নিয়ে যেতে যদি খরচ হয় ঘ এবং ঘ কে এই কার্য্যে না লাগিয়ে অন্যভাবে ব্যবহার করলে এর থেকে যদি বাৎসরিক আয় হয় ঙ, তা হ'লে গ, ঙ অপেক্ষা বেশী না হ'লে উপকরণকে ব্যবসা বদ্‌লি করে' লাভ নেই। গ, ঙ অপেক্ষা কম হ'লে এরকম স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তনে ক্ষতি হ'বে। কাজেই দেখ্‌ছি, যে স্থান বা ব্যবসায় পরিবর্ত্তনের খরচ যা হয়, তার বাৎসরিক পরিমাণ (কেননা উপকরণ ব্যবহারেও

বাৎসরিক আয় যা হয়, তাই সামাজিক আয়ে ধরা হয় অর্থাৎ সাধারণভাবে যত টাকা খরচ হয় তার বাজার দরে যা সুদ হয় তাই,) এবং ব্যবসায়গুলির সীমাস্থিত বাৎসরিক নেট আয় বা লাভ তুলনা করে' দেখে' তবে উপকরণ নিয়ে টানাটানি করা উচিত। এবং এই খরচের অস্তিত্বের জন্য সীমাস্থিত নেট লাভ নানা ব্যবসায়ে সব সময় বিভিন্ন থাকে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে সকল ব্যবসায়ে সীমাস্থিত **সামাজিক** নেট লাভ সমান হ'লে বা খরচের কথা মনে করে' সমানের দিকে যতদূর সম্ভব গেলে সামাজিক আয় ও স্বাচ্ছন্দ্য সবচেয়ে বেশী হ'বে। যে-সব কারণ উৎপাদনের উপকরণগুলিকে অচল বা বহুকষ্টে সচল করে' রাখে, সেগুলি সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরায়। কোন ব্যবসায়ে লাভ কিরকম তা জান্‌তে হ'লে শিক্ষার দর্‌কার, বেশী লাভের জায়গায় উপকরণ পাঠাতে হ'লে (শ্রমজীবীর ক্ষেত্রে, নিজে যেতে হ'লে) সাহস ও আত্মনির্ভরশীলতার দর্‌কার। সচলতার পথে বিঘ্ন আরও অনেক কিছু আছে; যেমন শীঘ্র গমনের সুবিধার অভাব, ভাষার অন্তরায়, এ খাব না, সে খাব না বলা, নূতন অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, অন্য স্থান ও ব্যবসায় সম্বন্ধে বেশী মাত্রায় সন্দেহ থাকা, ভাল আইনের অভাব (যেমন জমি হাত বদ্‌লাতে পারে না ইত্যাদি) ইত্যাদি। এইসব অন্তরায় দূর করা দর্‌কার এবং সহায়গুলি জোগাড় করা দর্‌কার। তা ছাড়া সামাজিক সম্পত্তি ঠিকভাবে ব্যবহার করা অসম্ভব। এ-ক্ষেত্রে আবার ভুল শিক্ষার বিপদ্ অনেক। যেমন, মান্দ্রাজে বেশী মাইনে পাবে বলে' কোন শ্রমজীবী আগ্রা থেকে মান্দ্রাজ যেতে পারে, কিন্তু তার আসা একটা ভুল খবরের উপর গড়া হ'তে পারে। ফলে পুনরাগমন এবং যাতায়াতের খরচ ও সময় নষ্ট। কেউ মূলধন ভুল ব্যবসায়ে ফেলে', জুয়াচোরদের লাভ বাড়িয়ে দিতে পারেন। কেউ হুজুগে মেতে মরুভূমিতে পাটের চাষ সুরু কর্‌তে পারেন; আবার কেউ জলাভূমিতে চা বাগান কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারেন। এ সবই সামাজিক সম্পত্তির অপচয়। কোন্ ব্যবসায়ে কিরকম লাভ হয় তা জানাও শক্ত। যৌথ কার্‌বারে লাভ অবশ্য সাধারণে কতকটা বুঝ্‌তে পারে, কিন্তু আসল মূলধন যত টাকা এবং শেয়ার যত টাকার ছাপা হয়, তাতে অনেক সময়ই বিশেষ তফাৎ থাকে। যেমন কেউ ১০০৲ টাকার শেয়ার ছাপালে ১ লক্ষ; অর্থাৎ ১০০,০০০ × ১০০ = ১০০০০০০০, কোটি টাকার কাগজ বেরল। তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার শেয়ার গেল যাঁরা কোম্পানী ফাঁদ্‌লেন তাঁদের পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ। ১০ লক্ষ গেল যাঁরা শেয়ার বাজারে বিক্রি কর্‌বেন তাঁদের কমিশনরূপে ইত্যাদি। কাজেই শেষ অবধি কোম্পানীর **আসল** মূলধন হয়ত দাঁড়াল ৭৫ লক্ষ অথবা ৫০ লক্ষ মাত্র। এখন বাৎসরিক লভ্যাংশ হ'ল শতকরা ১০৲ টাকা অর্থাৎ ১ লক্ষ ১০০৲ টাকার শেয়ারে লাভ দেওয়া হ'ল ১০০০০০ × ১০ = ১০,০০০০০ টাকা। এটা আসলে ৭৫ লক্ষের অথবা ৫০ লক্ষের উপর লাভ অর্থাৎ আসলে লাভের হার এই কোম্পানীর হচ্ছে শতকরা ১৩ টাকা ৫৩ আনা কিম্বা ২০ টাকা। অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য লোকে ঐ কোম্পানীর লাভের হার কমই ভাব্‌বে এবং সামাজিক মূলধনের যতটা ঐ ব্যবসায়ে যাওয়া উচিত, তা যাবে না। এ ছাড়া আরও নানা উপায়ে ঠিক্ লাভের হার চেপে রাখা হয়। তার উপরে সাধারণ ব্যক্তিগত কার্‌বারের লাভ ত কেউ জান্‌তেই পায় না। কোন্ ব্যবসায়ে লাভ কিপ্রকার, এ বিষয়ে আরও জ্ঞান বিস্তার করার সুবিধা হ'লে সামাজিক আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নানা ব্যবসায়ে সীমাস্থিত নেট লাভ অসমান থাকার আর-একটি কারণ উপকরণের এককের আয়তন বৃদ্ধি (Imperfect divisibility or largeness of the unit of any resource)। মূলধন দিয়ে এটা বোঝা সহজ। ধরুন মূলধনের একক যদি ১০০০৲ টাকা হয়, অর্থাৎ ১০০০৲ টাকার কম বা এক হাজারের ভগ্নাংশ কেউ যদি কিছুতে না দিতে পারে, তা হ'লে ১০০০৲ হাজার টাকার কম মূলধন স্থান পরিবর্ত্তন কর্‌লে যদি সামাজিক লাভের আশা থাকে, ত সে পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। যৌথ কার্‌বারে সামাজিক লাভ হয় এই জন্য, যে, খুব অল্পপরিমাণ

মূলধনও ইচ্ছা-মত এক ব্যবসায় থেকে অন্য বা যে-কোন ব্যবসায়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে ১০৲ টাকার শেয়ারও দুর্লভ নয়। যদি ১০০০৲ টাকার কম কেউ কোন ব্যবসায়ে ফেল্‌তে না পারত তা হ'লে সামাজিক মূলধনের অনেকাংশ নিষ্কর্ম্মা হয়ে পড়ে' থাকৃত। শ্রমশক্তির একক হচ্ছে বেশীর ভাগ স্থলে ব্যক্তি অর্থাৎ একজন লোক। আধজন লোক ত আর শ্রমশক্তি সরবরাহ করতে পারে না, কাজেই এর চেয়ে কম আয়তন শ্রমশক্তির একক হ'তে পারে না। কিন্তু যদি কোথাও একদল লোকের কম লোক কোন কাজে না লাগান যায়, লাগাবার জন্যে পাওয়া না যায়, তা হ'লে শ্রমশক্তির একক ব্যক্তিসংঘ হ'য়ে দাঁড়ায়। যেমন, যদি শ্রমজীবী তার পরিবার ছাড়া নড়তে না চায়, তা হ'লে যে ক্ষেত্রে একজন মাত্র বেশী লোক নিয়োগ করে' উৎপাদন বাড়ান যায়, সে ক্ষেত্রে সে উৎপাদনবৃদ্ধি সম্ভব হবে না। এ ছাড়া যদি একক মিশ্র হয়, অর্থাৎ মূলধন, মানুষ ও প্রকৃতি যদি আলাদা আলাদা পাওয়া না যায়, শুধু সম্মিলিতভাবে পাওয়া যায়, তা হ'লে যেখানে শুধু মূলধন বাড়িয়ে লাভ হয় বা শুধু শ্রমশক্তি বাড়িয়ে লাভ হয়, ইত্যাদি, সে-সব স্থলে লাভের পথ বন্ধ হ'য়ে যাবে। যেমন, শ্রমজীবী যদি বলে, আমার টাকা খাটাবার সুযোগ না দিলে আমি কাজ করব না, বা মহাজন যদি বলে, আমার জমি চাষ না করলে টাকা ধার দেব না, বা শুধু মূলধন দিতে রাজি এমন লোককে যদি বলা হয় যে ব্যবসার লাভ-লোকসানের দায়িত্বও তোমায় নিতে হবে, তা হ'লে কোন স্থলেই সুবিধা-মত কাজ হ'বে না। আজকাল অনেক যৌথ কারবার এমনভাবে অনেক শেয়ার বার করে, যে, নানা-শ্রেণীর শেয়ার-ক্রেতাকে নানা-পরিমাণ লাভ-লোকসানের দায়িত্ব নিতে হয়। এইসব স্থলে কোম্পানীর কোন শেয়ার-লভ্যাংশ সবার আগে পায়, কোন শ্রেণীর শেয়ারের শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ ঠিক করা হয় এবং সেই সুদ না দিয়ে কোম্পানী আর কিছুতে লাভের টাকা ব্যবহার করতে পারে না, অথবা ঠিক সময় সুদ না দিলে কোম্পান ফেল্ হ'য়ে যায় এবং আদালতে সর্ব্বাগ্রে বা অন্য শেয়ার-ক্রেতার অগ্রে প্রথমোক্ত শ্রেণীর শেয়ার-ক্রেতাদের দাবী গ্রাহ্য হয়, ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্ট্ টাকা ধার করার সময় শুধু মূলধনই নেয়, দায়িত্ব কারুর স্কন্ধে চাপাতে চায় না। অনেক রেল কোম্পানীর শেয়ার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট অনেক সময় নিজে দায়িত্ব নেয়। দায়িত্বভার গ্রহণ ও মূলধন সরবরাহের মধ্যে তফাৎ আছে বলে' অনেকে দায়িত্বভার গ্রহণকে সামাজিক আয় উৎপাদনের চতুর্থ উপকরণ বলেন। (uncertainty-bearing) লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে এবং ব্যাঙ্ক তাদের সুদ দেয়। এ-ক্ষেত্রে বড় বড় ব্যাঙ্ক-এর সঙ্গে যাঁরা কারবার করেন, তাঁরা শুধু মূলধনই দেন। অবশ্য বেশী সুদে অনেক অজানা, কমজানা, নূতন ও খ্যাতিহীন ব্যাঙ্ক্ টাকা নেয় এবং সে-ক্ষেত্রে টাকা যে দেয়, সে ব্যাঙ্কের স্থিরতার ও ব্যবসায়ের দায়িত্বও কিছু নেয়। ব্যাঙ্ক্ আবার অনেক স্থলে টাকা অপরকে দেয় এবং অল্পকালের (অনেক ব্যাঙ্ক্ বেশী-কালের জন্যেও) জন্যে হ'লেও নানা ব্যবসায়ের দায়িত্বের অংশ ঘাড়ে করে। ব্যাঙ্ক মূলধন সচল করে, এবং শুধু মূলধন যারা সরবরাহ করতে রাজি, তাদের কাছ থেকে মূলধনই শুধু নেয়। তার পর নিজের দায়িত্বে টাকা অপরকে দেয়। এদিক্ থেকে ব্যাঙ্ক্-এর একটা খুব বেশী সামাজিক মূল্য আছে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, যে, ব্যবসায় সম্বন্ধে সঠিক খবর বিস্তার করা এবং উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচল করা ও অমিশ্র ও অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হবার সুবিধা দেওয়ার উপর সামাজিক আয় অনেকটা নির্ভর করে। আর দেখা যাচ্ছে, যে, চলাচল যত সহজে হয়, ততই সীমাস্থিত নেট লাভ সব ব্যবসায়ে সমান হওয়ার সম্ভাবনা। এবং এই সমতা যত বেশী পাওয়া যাবে, অন্য-সব অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকলে, (অর্থাৎ পরোক্ষভাবে ও সামাজিক, আয়, আয়ের উপকরণ ও স্বাচ্ছন্দ্য অক্ষত থাকলে,) সামাজিক আয় ততই বেশী হবে। সামাজিক নেট লাভ ও ব্যবসায়গত নেট লাভে তফাৎ আছে আগেই বলা হয়েছে। যে-ব্যবসায়ে বেশী লাভ, মানুষ সেই দিকেই যাবে। এই দিক্ থেকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সামাজিক

উপকরণের একাংশের শ্রেষ্ঠ বিভাগের পথে একটি অন্তরায়। অনেক স্থলে অন্য কাজে শ্রমশক্তি লাগালে সামাজিক আয় বাড়্‌লেও, শ্রমজীবী নিজের জাতের কাজ ছাড়্‌তে চায় না; কারণ তার জাতে বিশ্বাস বা সামাজিক উৎপীড়নের ভয় আছে। মূলধনের সহজ গতিবিধিও ঐ কারণে আট্‌কাতে পারে। ব্রাহ্মণ তার মূলধন চাম্‌ড়ার ব্যবসায়ে না লাগাতে চাইতে পারে এবং তাতে সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ সব ব্যবসায়ে সততার দিকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে সামাজিক আয় সবচেয়ে বেশী হবার সম্ভাবনা থাকৃত যদি সীমাস্থিত সামাজিক নেট লাভ, সীমাস্থিত ব্যবসায়গত নেট লাভের সমান হ'ত। ঐ দুই যতই পৃথক্ হবে, ব্যক্তির আত্মসুবিধাবোধের সাহায্যে সামাজিক উপকরণগুলির নানান্ ব্যবসায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিভাগও ততই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াবে।

অনেক ব্যবসায় বা কাজ আছে, যাতে ব্যবসায়-গত লাভ সামাজিক লাভের চেয়ে কম। আবার অনেক কাজ বা ব্যবসায় আছে যাতে ব্যবসায়গত লাভই বেশী। যদি কেউ কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে তা হ'লে অপরে তার সাহায্যে লাভ করে' নেবে এবং ফলে সামাজিক লাভ ব্যবসায়গত লাভ অপেক্ষা বেশী হবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি কিছু না করে, তা হ'লে আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে লোকে মন দেবে কম। কেননা কাজের ফসল অন্যের ভোগে গেলেও কাজ কর্‌বে শুধু সাধু ও সন্ন্যাসীরা এবং পৃথিবীতে তাঁদের সংখ্যা দুর্ভাগ্যক্রমে বড়ই কম। রাষ্ট্রীয় আইন অনুসারে নিজের আবিষ্কারে নিজের অধিকার বজায় রাখা যায় এবং উদ্ভাবনা পেটেন্ট্ করা যায় অর্থাৎ অন্যে ব্যবহার বা নকল কর্‌লে সে, হয় আবিষ্কারককে একটা লাভের অংশ দিতে বাধ্য হয়, নয় শাস্তি পায়। জমির উর্ব্বরতা বাড়াবার জন্যে চেষ্টা যে করে তার প্রজাস্বত্ব যদি অল্পকাল স্থায়ী হয়, তা হ'লে তার চেষ্টার ফলভোগ অপরে অনেকটা কর্‌বে; এ-ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যদি তাকে তার ন্যায্য অধিকার বজায় রাখ্‌তে সাহায্য না করে তা হ'লে অনেক ক্ষেত্রে জমির উর্ব্বরতা বাড়া দূরে থাকুক, কমে' যাবে। অনেক দেশে প্রজাকে তাড়াবার সময় জমিদারকে জমির প্রজাকৃত উন্নতির জন্য প্রজার ক্ষতিপূরণ কর্‌তে হয়। এরকম বন্দোবস্ত না থাক্‌লে ব্যবসায়গত লাভ সামাজিক লাভের চেয়ে কম হ'য়ে যায় এবং সে ব্যবসায়ে লোকে যেতে চায় না। আবার অন্য অনেক ব্যবসায়ে (যেমন মদের ব্যবসায়) সামাজিক লাভ ব্যবসায়গত লাভের চেয়ে কম হয়। কাজেই রাষ্ট্র সেইসব ব্যবসায়ের পথে বাধা-স্বরূপ কর বসাতে পারেন অথবা তাদের লাভের অংশ নিয়ে সামাজিক উন্নতির কাজে লাগাতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্র যদি সে টাকা অপব্যয় করেন অর্থাৎ এমনভাবে ব্যয় করেন যাতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয় না তা হ'লে রাষ্ট্র কর্ত্তব্য পালন কর্‌ছেন বলা যায় না। অনেকের মতে কার্‌খানার ধোঁয়ায় সামাজিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয় বলে' একটা চিমনি-কর বসান উচিত। সে-দিক্ থেকে দেখ্‌লে যে-সব ব্যবসায় নানা-ভাবে সামাজিক অস্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করে, তাদের সবগুলিকেই বিশেষ করে' কর দিতে বাধ্য করা উচিত। এমন অনেক ব্যবসায় আছে, যাতে সামাজিক লাভ খুব হ'লেও ব্যবসায়গত লাভ কম। যেমন নূতন রেল-লাইন, (যাকে অবলম্বন করে' নূতন জায়গায় লোকে বসবাস কর্‌তে যাবে, বা ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু কর্‌বে) ডাকের বন্দোবস্ত, জল-সরবরাহ, সহরের ও দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদি। এসব কাজ বেশীর ভাগ সময় রাষ্ট্রকে কর্‌তে হয় বা অন্যে রাষ্ট্রের সাহায্যে করে। সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য-বর্দ্ধনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ কি কি বিষয়ে থাকা দর্‌কার তার আলোচনা অল্প কয়েক পৃষ্ঠায় সম্ভব না হ'লেও এখানে একটা বিষয়ে কিছু বলা দর্‌কার। অনেক সময় কোন-একটা ব্যবসায় একজন বা অল্প কয়েক জন মাত্র ব্যবসাদারের হাতে এসে পড়ে, অর্থাৎ সেই ব্যবসায় দ্বারা উৎপাদিত ভোগ্য শুধু ঐ কয়েক জনই সর্‌বরাহ কর্‌বে এমন অবস্থা দাঁড়ায়। আমরা জানি বাজারে খুব বেশী মাল ছাড়্‌লে দর সাধারণতঃ কম পাওয়া যায়। কাজেই শুধু অল্প কয়েক জনের বা একজনের হাতে মালবিশেষ সর্‌বরাহের ভার থাক্‌লে, যে-পরিমাণ মাল বিক্রি কর্‌লে মাল প্রস্তুতের খরচের তুলনায় সবচেয়ে বেশী দর পাওয়া

যায় শুধু সেই-পরিমাণ মালই তারা তৈরী কর্‌বে। তাতে সীমাস্থিত ব্যবসাগত নেট লাভ অন্য ব্যবসায়ের চেয়ে সাধারণতঃ ঢের বেশী থাক্‌বে। অর্থাৎ চেষ্টা করে' কম মাল বাজারে ছেড়ে কোন ব্যক্তির বা কয়েক ব্যক্তির লাভ হবে বটে কিন্তু সামাজিক উৎপাদন শক্তি ঠিক যে অনুপাতে সব ব্যবসায়ের মধ্যে বিভক্ত হ'লে সামাজিক আয় সব-চেয়ে বেশী হ'ত তা হবে না। এই জাতীয় অবস্থাকে ব্যবসায়ে একাধিকার (monopoly) বলা যায়। এই একাধিকার সম্পূর্ণও হ'তে পারে অথবা অসম্পূর্ণও হ'তে পারে। কোন ভোগ্যের সর্‌বরাহ যদি সম্পূর্ণরূপে কোন ব্যক্তি বা সংঘের উপর নির্ভর করে তা হ'লে তাকে সম্পূর্ণ একাধিকার বলা যায়; আবার যদি সেই ভোগ্যের সর্‌বরাহের এমন একটা অংশ মাত্র কোনো ব্যক্তি বা সংঘের হাতে থাকে যে অংশ কমিয়ে বাড়িয়ে বাজার দর বাড়ান কমান যায়, তা হ'লে সে ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ একাধিকার আছে বলা যায়। যেমন, কারুর হাতে সমস্ত সর্‌বরাহের অর্দ্ধেক যদি থাকে তা হ'লে নিজের অংশের পরিমাণ শতকরা ২৫ পরিবর্ত্তন করলে সমস্ত সর্‌বরাহের শতকরা ১২৷৷৹ পরিবর্ত্তন হবে। তার ফলে যদি একক প্রতি (per unit) নেট লাভ ১ থেকে বেড়ে ১৷৷ হ'য়ে যায়, তা হ'লে ঐরকম করে' সর্‌বরাহের পরিমাণ কমিয়ে সর্‌বরাহকারীর লাভ আছে। কেননা, আগে ১০০ খণ্ডে যদি ১০০ নেট লাভ হ'ত, এখন ৭৫ খণ্ডে ৭৫ × ১৷৷ = ১১২৷৷৹ হয়। এ গেল ব্যবসাগত লাভ; তা ছাড়া আর একটা দিক্ আছে। সামাজিক শক্তি ঐ ব্যবসায়ে যদি অবাধে ব্যবহৃত হ'তে না পারে তা হ'লে অন্য অল্প লাভের ব্যবসায়ে সেই শক্তি ব্যবহৃত হবে। ফলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য যতটা হওয়া উচিত তা হবে না। কি উপায়ে কোন কোন ব্যবসায়ে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘ-বিশেষ একাধিকার স্থাপন করে, তা ভাল করে' বল্‌বার স্থান নেই; কিন্তু মোটা-মুটি বলা যায় যে সাধারণত কার্‌বারের আয়তন ক্রমশঃ বাড়িয়ে বা অপরের সঙ্গে কার্‌বার মিলিয়ে সমস্ত বা অধিকাংশ সর্‌বরাহ লোকে আয়ত্তাধীন করে'। যেসব দ্রব্যের ব্যবহার মূল্যবৃদ্ধি হ'লেও বেশী কমে না, (যেমন নুন, চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাদি অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি) সেগুলির সর্‌বরাহে একাধিকার হ'লে সর্‌বরাহের পরিমাণ না কমিয়েই যথেচ্ছা দাম ক্রেতার কাছ থেকে আদায় করা যায়। অনেক সময় এক বা কয়েক-জন মূলধনী লোক (Capitalist) বাজারের সব মাল কিনে' ফেলে, বিক্রি করা না করা নিজের বা নিজেদের হাতে এনে ফেলে অর্থাৎ Corner করে। তখন তারা যা খুসি দাম আদায় করে। এতে সাধারণ লোক ও ভবিষ্যৎ সর্‌বরাহের কনট্রাক্টধারীরাই (যারা একটা নির্দ্দিষ্ট দরে, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন জিনিষের একটা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ সর্‌বরাহ করার দায়িত্ব নেয়) বেশীর ভাগ জব্দ হয়! এইজাতীয় আরও নানাপ্রকার ক্ষতিজনক একাধিকারের (injurious monopolyর) উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু একাধিকার থাক্‌লেই যে তা অনিষ্টজনক হবে এমন কথা নেই। অনেক ব্যবসায়ে যতই কার্‌বারের আয়তন বাড়ান যায় ততই উৎপাদন সহজ হ'য়ে আসে। (এইসব ব্যবসায়ে ক্রমশঃ বিলীয়মান খরচের নিয়ম অথবা increasing returns কার্য্যকর-ভাবে দেখা যায়।) এমন ব্যবসায়ে যদি (খরচের তুলনায়) ন্যায্য দামে জিনিষ বিক্রয় করা হয় তা হ'লে সামাজিক লাভ বই ক্ষতি হবে না।

বৃহদায়তন কার্‌বারের গুণ অনেক। প্রথমেই দেখ্‌ছি শ্রমবিভাগ ও তার ফলে কর্ম্মপটুতার বৃদ্ধি। একটা কার্‌বারে যদি বোতল তৈরী হয় এবং সব লোকই যদি কাচ গলান থেকে সুরু করে' ঝুড়িতে বোতল রাখা অবধি সব-কিছু কর্‌তে থাকে তা হ'লে যত সহজে কাজ হবে এবং ঘণ্টায় যত বোতল তৈরী হবে তার চেয়ে অনেক বেশী হবে যদি কেউ শুধু চুল্লি ঠিক রাখে এবং কেউ গলান কাচ বের করে' আনে আর কেউ ফুঁ দিয়ে বোতলকে আকৃতি দেয়, ইত্যাদি। এতে একই কাজ ক্রমাগত করার ফলে সেই কাজটুকু করার ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং নানা কাজ করলে যে ক্রমাগত মাথা খাটিয়ে কাজ করতে হয়, সেটি না হওয়ায় শ্রমলাঘবও হয়।

নানা ব্যবসায়ে কার্য্য বা শ্রমবিভাগ নানাপ্রকার হ'তে পারে। কোন কোন কাজে খুব বেশী হ'তে পারে; যেমন যেসব জিনিষ নানা জিনিষ বা খণ্ড জুড়ে'

তৈরী হয়। (বেশীর ভাগ কল, যন্ত্র ইত্যাদি) এতে খণ্ডগুলিকে নির্দ্দিষ্ট মাপের ও উপকরণের তৈরী করা স্থির করে' এমন কি ভিন্ন ভিন্ন কার্‌খানায় ভিন্ন ভিন্ন অংশ তৈরী করে', এক জায়গায় জুড়ে' কাজ অনেক কম খরচে করা সম্ভব হয়। যেমন সস্তার ঘড়ির অংশগুলি অনেক সময় আমেরিকায় যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী হ'য়ে সুইৎজারল্যাণ্ডে আসে এবং সেখানে সেগুলিকে একত্র সংযুক্ত করে' ঘড়ি তৈরী হয়। বৃহৎ কার্‌বারের গুণ আলোচনা বিশদভাবে হওয়া অল্পস্থানে সম্ভব নয়, কাজেই এখন তার দুই একটি দোষ বলা যাক। প্রধান দোষ হচ্ছে ব্যবসায়বুদ্ধি বা সাধারণভাবে কার্য্যদক্ষতা নষ্ট হ'য়ে যাওয়া। বৃহৎ কার্‌খানায় কাজ করা যন্ত্রের মত কাজ করা। তাতে সাধারণ ক্ষমতাগুলি নষ্ট হ'য়ে যায়। যা বলে তাই করে' নিজে ভেবে কাজ করার ক্ষমতা চলে' যায়। কাজেই এর ফলে সময়ে সামাজিক ক্ষতি হ'তে পারে। তার চেয়ে হয়ত উৎপাদনের পরিমাণ কম হ'লেও ছোট ছোট কার্‌বার সমাজের কর্ম্মকুশল লোকের সংখ্যা অক্ষুন্ন রাখে বলে' তার সামাজিক মুল্য বেশী। কিন্তু ব্যবসায়সংক্রান্ত শিক্ষালয় স্থাপন করে' অনেক সময় সে অভাব দূর হয়। এটা রাষ্ট্রের কাজ। তার পর নির্দ্দিষ্ট মাপ ও উৎকর্ষের দ্রব্য উৎপাদন করলে এবং প্রত্যেক অংশের জন্য যন্ত্রের ব্যবহার সুরু করলে অনেক সময় দ্রব্যের ব্যবহার্য্যতার দিক্ দিয়ে উন্নতির দিকে নজর থাকে না। তবে অনেক জিনিষের এরূপ উন্নতির আশা খুবই কম (যেমন স্ক্রু, বোল্ট্, নাট্, ইত্যাদি) এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনেকটা সকলকে উন্নতির দিকে নজর রাখ্‌তে বাধ্য করে। তার পর যেমন অন্য ক্ষেত্রে কর্ম্মবিভাগ হয় তেম্‌নি জিনিষের উন্নতি কিসে হয় তা দেখ্‌বার জন্যেও বিশেষজ্ঞ লোককে মাইনে দিয়ে রাখা হয় ও রাখা সম্ভব। এতে হয়ত শেষ অবধি লাভ খুবই বেশীই হয়। অতঃপর আমরা শ্রমজীবী ও মুলধনজীবী সম্বন্ধে কিছু বলে' শেষ করতে চাই। মূলধন যে সংরক্ষিত শ্রমের ফলমাত্র, তা আগেই বলা হয়েছে। মূলধন বিনা উৎপাদন যে প্রায় অসম্ভব, তা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

রাজপথ

(১৯)

পাঁচ মিনিট পরে সুরেশ্বর ফিরিয়া আসিল, এক হস্তে একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন এবং অপর হস্তে এক গ্লাস জল।

মিষ্টান্নের রেকাব দেখিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, "তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল! এ যে তাই হ'ল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টান্ন কোনো হিসাবেই আস্‌তে পারে না।"

মিষ্টান্নের রেকাব ও জলের গ্লাস বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তা আস্‌তে পারে। 'জল' শব্দটা আমাদের বাংলাদেশে তত সরল নয়, একটু জটিল। তাই জল খাচ্ছি মুখে বল্‌লেও অনেক সময়েই আমরা সন্দেশ-রসগোল্লা খেয়ে থাকি। এমন কি কোনো কোনো জল-খাবারের দোকানে জল একেবারেই পাওয়া যায় না, শুধু খাবারই পাওয়া যায়। জলযোগ কথাটার মধ্যে খাবার কথাটার কোনও যোগ না থাক্‌লেও খাবারটাই তার প্রধান উপকরণ!"

বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে জল চাইলে তাড়াতাড়ি আধখানা বেল নিয়ে আস্‌বার কোনও কারণ থাকে না। আমি গ্লাসটাই চেয়েছিলাম, রেকাবটা চাইনি। রেকাবটা ক্ষুধার আর গ্লাসটা তৃষ্ণার পরিচায়ক। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুটো পৃথক্ জিনিস, তা মান কিনা?"

দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা দিয়া বাঁকা-ভাবে সূর্য্যের কিরণ আসিয়া বিমানবিহারীর গাত্রে পড়িতে-ছিল; জানালাটা একটু ভেজাইয়া দিয়া সুরেশ্বর বলিল,

"ক্ষুধা তৃষ্ণা পৃথক্ জিনিস তা মানি, কিন্তু দুটো এমন নিবিড়ভাবে পাশাপাশি বাস করে যে, অনেক সময়ে উভয়কে পৃথক্ করা কঠিন হয়। কিন্তু আমি ত পৃথক্‌ভাবেই দুটো জিনিসের ব্যবস্থা করেছি, তোমার যেমন প্রয়োজন হয় গ্রহণ করতে পার।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল; বলিল, "তুমি ত বল্‌লে যেমন প্রয়োজন হয়; কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার চেয়েও যে প্রবল আর-একটা জিনিস দেহের মধ্যে রয়েছে সে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা করে না, তার হিসাব করেছ কি?"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "লোভের কথা বল্‌ছ ত? কিন্তু লোভ ত দেহে থাকে না, মনে থাকে।"

"যেখানেই থাক—উপস্থিত আমি তার কাছে হার মান্‌লাম।" বলিয়া বিমানবিহারী মিষ্টান্নের থালাটা টানিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিয়া দিল। এবং সেই অবসরে সুরেশ্বর তাহার ইংরেজী প্রবন্ধের খাতা ইত্যাদি বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিল।

তোমরা ত আজকাল নানারকম শক্তির সাধনা করছ সুরেশ্বর, এই মনোবিহারী লোভের হাত থেকে কি করে' রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বল্‌তে ..." বলিয়া বিমানবিহারী আহার বন্ধ করিয়া জলের গ্লাস লইতে হাত বাড়াইল।

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "একটা উপায় হচ্ছে লোভের বস্তুকে দৃষ্টির অন্তরালে নিক্ষেপ করা। ও-দুটো সন্দেশ খেয়ে ফেলো, ফেলে রেখো না। পড়ে' থাক্‌লেই লোভটাকে জাগিয়ে রাখ্‌বে।"

নিরুপায় হইয়া একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু শাস্ত্র বল্‌ছে লোভে পাপ।

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু পা... হজমের শক্তি থাক্‌লে পাপে মৃত্যু হবে না। দেখ্‌ছ না, আজ-কাল পরিপাক কর্‌বার দিন পড়েছে। পাহাড়-পর্ব্বত নদ-নদী দেশ-প্রদেশ পরিপাক হ'য়ে যাচ্ছে, আর তুমি চিনি আর ছানার নরম দুটো সন্দেশ পরিপাক কর্‌তে পার্‌বে না! লোভ বর্জ্জন কর্‌বার তুমি উপায় খুঁজ্‌ছ, কিন্তু লোভটা এখনকার সভ্য সমাজে আর হেয় বস্তু নয়। আজকালকার মতে লোভ হচ্ছে লাভের প্রবর্ত্তক হেতু।"

"তবে লোভের দ্বারা লাভই করা যাক। কিন্তু অজীর্ণ হ'লে তুমি দায়ী।" বলিয়া বিমানবিহারী অবশিষ্ট সন্দেশটাও তুলিয়া লইল।

সুরেশ্বর বলিল, "অজীর্ণের অবস্থা উপস্থিত হ'লে অপাচ্য অংশটা উদ্গিরণ করে' দিয়ো, তা হ'লে স্বাস্থ্যও নষ্ট হবে না, যশও অর্জ্জন করবে। ত্যাগের মহিমায় গ্রহণের কালিমা ঢাকা পড়ে' যাবে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "সভ্যসমাজকে তুমি একটু বিশেষ রকম চিনেছ, সুরেশ্বর।"

"আমি চিনেছি বলে' যদি তোমার বিশ্বাস হ'য়ে থাকে তা হ'লে তোমারও চিন্‌তে বাকি নেই।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

আহার সমাপন করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিমানবিহারী সুরেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া বসিল। জানালা দিয়া আকাশের অংশ দেখা যাইতেছিল। দুই বন্ধু ক্ষণকাল ... মেঘের চলাচলের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

... শুরু করিল বিমানবিহারী। বলিল, "একটা ... যায় সমস্ত সরঞ্জাম সুমিত্রা তোমার কাছে ... চাইলে কে তার কাছে এসে শুধু চাইলেই হবে। ... জিনিসটা এত সুলভ যে চাইলেই পাওয়া যায় তা আমি ... না।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে বলিল, "কিন্তু চাওয়া জিনিসটাই ত সুলভ নয়, অর্থাৎ সহজ নয়। ... যে চাওয়া, তার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, পাওয়ারই সেটা নামান্তর। ... command শব্দটার মধ্যে যে কল্পনাটুকু আছে তা আমার বেশ ভাল লাগে। চাইতে জান্‌লে অভীষ্ট বস্তু দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়।"

বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, "অভীষ্ট বস্তু দ্বারের কাছে হাজির হ'লে ভালই হ'ত, তা হ'লে আর বহন

করবার জন্যে আমাকে তোমার দ্বারে হাজির হ'তে হ'ত না।"

সুরেশ্বর বলিল, "অভীষ্ট বস্তু সম্ভবতঃ এতক্ষণ সুমিত্রার দ্বারে হাজির হয়েছে; কিন্তু তুমি যে আমার দ্বারে এসে হাজির হয়েছ, তা হয়ত তুমি আমার অভীষ্ট বস্তু বলে'।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু কিনা সে বিচার পরে করব; কিন্তু তুমি সুমিত্রাকে চর্কা পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ ব'ন, অর্থাৎ বহন করান। তুমি ভাগ্যবান্, তোমার বোঝা অপরে বহন করে' নিয়ে গেছে। অতএব তোমার আর কোন ভয় নেই, তোমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।"

সুরেশ্বরের পরিহাসের প্রতি কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া বিমানবিহারী সবিস্ময়ে কহিল, "কাকে দিয়ে চর্কা পাঠিয়েছ?"

সুরেশ্বর কহিল, "কাকে দিয়ে পাঠিয়েছি তা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পাঠিয়েছি তা ঠিক।"

এ-সংবাদে বিমানবিহারী বিশেষ আনন্দিত হইল না। সুমিত্রার মনস্তুষ্টির জন্য যে-কার্য্যের ভার সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা সম্পাদন করিতে না পারায় সে মনে-মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল। সুরেশ্বরের আবির্ভাবের পর হইতে সুমিত্রার চিত্তের গতি যে, ক্রমে ক্রমে একটু বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা বিমানবিহারীর অপরিজ্ঞাত ছিল না। ... পূর্ব্বে প্রধানতঃ যে জিনিসটা, অর্থাৎ ... ডেপুটি ... সকলকে, মায় সুমিত্রাকে, মুগ্ধ করিত, এখন তাহাই সুমিত্রার নিকট একটা অপকর্ষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহাও বিমানবিহারী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। অপ্রতি-হত শক্তিগতির জন্য তড়িৎ যেমন স্বল্পতম প্রতি-রোধের রেখায় নিজেকে প্রবর্ত্তিত করে, অভীষ্ট-লাভের অভিপ্রায়ে বিমানবিহারীও তেম্‌নি অবিরোধের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুমিত্রার মনের গতির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, অগ্রসর হওয়া যে কঠিন তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; তাই চাকরী এবং চর্কার সংস্কার পরস্পর বিসংবাদী হইলেও সে সুমিত্রার অনুরোধে সুরেশ্বরের নিকট হইতে চর্কা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল যে ইতিপূর্ব্বেই সুরেশ্বর সুমিত্রাকে চর্কা পাঠাইয়া দিয়াছে তখন সুমিত্রাকে সন্তুষ্ট করিবার এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে মনে-মনে ঈষৎ দুঃখিত হইল।

বিমানবিহারীর নিরুৎসাহ ভাব লক্ষ্য করিয়া সুরেশ্বর বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কিন্তু তুমি এত চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লে কেন তা'ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে! সুমিত্রাকে চর্কা পাঠান অন্যায় হয়েছে কি?"

সুরেশ্বরের কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বিমান তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, অন্যায় হবে কেন? কখন তুমি পাঠালে তাই ভাব্‌ছি; সুমিত্রা ত আজ সকালেই আমাকে এ-প্রকার কথা বলেছে।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, কারণ আমি পাঠিয়েছি তোমার আস্‌বার আধ ঘণ্টা আগে।"

একটা কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া লইয়া হাস্যো-দ্ভাসিত-মুখে বিমান কহিল, "তুমি বল্‌ছিলে সুরেশ্বর, আমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে; কিন্তু আমি মনে কর্‌ছি কি জান? ডেপুটিগিরিতে ইস্তফা দেবো।"

সুরেশ্বর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ইস্তফা দেবে? কেন বল ত?"

"কতকটা তোমারই জন্যে।"

"আমারই জন্যে? আমি ত কখন তোমাকে চাকরী ছাড়্‌তে অনুরোধ করিনি!"

বিমানবিহারী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না তা কর-নি; কিন্তু সুমিত্রাকে তুমি যে-রকম তালিম করে' তুল্‌ছ তাতে চাকরী রাখা আর চল্‌বে না দেখ্‌ছি!" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "আর-একটু স্পষ্ট করে' না বল্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।"

বিমানবিহারী সহাস্যমুখে কহিল, "প্রায় একবৎসর থেকে একরকম স্থির হ'য়ে আছে যে সুমিত্রার সঙ্গে আমার

বিয়ে হবে। কাল স্থির হয়েছে যে ফাল্গুন মাসের কোনো শুভ-দিনে আমরা দু'জনে মিলিত হব। মতের মিল না হ'লে মনের মিল কি করে' হবে বল? তোমার প্রভাব সুমিত্রার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসেছে যে তাকে নড়াবার আমার ক্ষমতা নেই। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, ইচ্ছেও নেই। তাই মনে করছি আমার মতটাই তোমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব, আর তাই আজ এসেই তোমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের দুজনের এক জনকেও বর্জ্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

কথাটা শুনিতে শুনিতে সুরেশ্বর নিজের মধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। বয়লার যেমন বাষ্পের প্রচণ্ড বেগ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া থাকে, তেম্‌নি নিরুপদ্রবে সমস্ত উত্তেজনাটা চাপিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর বলিল, "এতদিন একথা আমাকে জানাওনি কেন? জানালে বোধ হয় ভাল কর্‌তে।"

বিমান স্মিতমুখে বলিল, "কেন, তা হ'লে কি হ'ত?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে আমার আচরণটা তোমাদের দু'জনের মধ্যে হয় ত একটু ভিন্নরকমের হ'ত।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে বিমানবিহারী বলিল, "ভিন্নরকমের না হ'য়েও কোন ক্ষতি হয়নি; তোমার আক্ষেপ কর্‌বার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌ব, সুরেশ্বর?"

মৃদু-স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "বল, যদি কোনো ক্ষতি না হয়।"

"না, কোনো ক্ষতি হবে না। এক সময়ে তোমার আচরণে আমি বাস্তবিকই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। তুমি সুমিত্রার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে আরম্ভ করেছিলে যে ভয় হ'ত দস্যুর হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করে' অবশেষে তুমি নিজেই না তাকে অপহরণ কর!" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

মুখ একটু অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া সুরেশ্বর কহিল, "তার পর এখন সে সন্ত্রাস গেছে?"

"গেছে। এখন বুঝেছি যে সন্ত্রাসের কোন কারণই ছিল না।" বলিয়া বিমান পূর্ব্বের মত হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর গম্ভীর-স্মিতমুখে বলিল, "নিজের বুদ্ধির উপর অতটা বিশ্বাস কোরো না, ভাই। একটু সতর্ক থেকো।"

বিমানবিহারী কহিল, "না, আমি এবার বিশ্বাস করে'ই নিশ্চিন্ত থাক্‌ব স্থির করেছি, সতর্ক হ'লেই দেখেছি ভয় ভাবনা অনেকরকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। বিশ্বাসে মিলে সুমিত্রা, তর্কে বহু দূর; তর্ক কর্‌লেই সুমিত্রা দূরে সরে' যায়। অতএব সতর্ক আর হব না।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "চল সুরেশ্বর, সুমিত্রাদের বাড়ী বেড়িয়ে আস্‌বে চল। তুমি ত কয়েক দিনই সেখানে যাওনি।"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, "বিয়ের রাত্রির আগে আর সেখানে পদার্পণ করাই হবে না।"

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, "কেন?"

সহাস্য মুখে সুরেশ্বর কহিল, "কি জানি লোকে যদি লোভী বলে' সন্দেহ করে।"

"তা কখনো কর্‌বে না। তুমি যে নির্লোভ তা সকলেই জানে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিমানবিহারী প্রস্থান করিল।

(২০)

বিমলাকে লইয়া জয়ন্তী ভবানীপুরের কোনও আত্মীয়-গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার পর তথা হইতে ফিরিবেন। সুমিত্রাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য জয়ন্তী পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু সুমিত্রা যায় নাই, ওজর-আপত্তি করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল।

বেলা তখন দুইটা। সুমিত্রা নিজ কক্ষে অলসভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, 'মেজ দিদিমণি, একটি মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।"

সুমিত্রা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ঔৎসুক্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় রে?'

"এই যে বাইরেই।" বলিয়া দাসী হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বারাণ্ডা দেখাইয়া দিল।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মাধবীকে দেখিতে পাইল। দেখিল একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের সুন্দরী মেয়ে রেলিংএ ভর দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখা হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ হইয়া গেল। সুমিত্রা এই সুদর্শনা অপরিচিতা তরুণীর দিকে বিস্মিত নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং মাধবী তাহার পরম কৌতূহলের বস্তুটির অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া বাক্যহারা হইয়া গেল। তৎপরে একই সময়ে এই পরস্পর-বিমুগ্ধ দুইটি তরুণীর মুখে প্রীতি-প্রসন্ন মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

মাধবীর শান্ত কমনীয় মূর্ত্তি এবং খদ্দরের শুভ্র পরিচ্ছন্ন বেশ দেখিয়া সুমিত্রার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে সাগ্রহে সহাস্যমুখে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, আসুন, ভিতরে বস্‌বেন চলুন!" বলিয়া মাধবীকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া সযত্নে বসাইল।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে, তাই সুমিত্রা তাহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়া মাধবী বলিল, "আমি এসেছি চর্‌কা বিক্রী কর্‌তে। যদি দর্‌কার থাকে ত দেখ্‌তে পারেন, আমার সঙ্গেই গাড়ীতে চর্‌কা আছে।"

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া সুমিত্রা পরিচয়ের জন্যই ব্যগ্র হইল। বলিল, "আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?"

মাধবী মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল যে, পারতপক্ষে পরিচয় না দিয়াই চর্‌কা দিয়া যাইবে। তাই মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "খুব বেশী দূরে নয়; নিকটেই আমি থাকি।"

"নিকটেই? আপনার নামটি জান্‌তে পারি কি?"

মাধবী পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল, "নাম আমার জানাবার মত কিছুই নয়। সাধারণ বাঙালী মেয়ের আর পরিচয় কি বলুন?"

মাধবীর এই আত্মগোপনের প্রয়াস দেখিয়া সুমিত্রা মনে-মনে একটু বিরক্তি বোধ করিল। বলিল, "তা হ'লেও সকলেরি একটা পরিচয় আছে ত! অবশ্য পরিচয় দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে।"

মাধবী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "দেখুন, শুধু ত ইচ্ছেই নয়; দর্‌কার বলেও' ত একটা কথা আছে। আমার পরিচয় দেবার এমন কোনও দর্‌কার আছে কি? আমি ত এসেছি শুধু চর্‌কা বিক্রী কর্‌তে।"

এবিষয়ে আর আগ্রহ না দেখাইয় সুমিত্রা বলিল "না, দর্‌কার কিছুই নেই, এম্‌নি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। বাড়ীতে কেউ এলে পরিচয় না নেওয়াটা অভদ্রতা; আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচয় নেওয়াও সেই অভদ্রতা।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমার একটা চর্‌কার দর্‌কার আছে, কিন্তু—"বলিয়াই সুমিত্রা থামিয়া গেল।

মাধবী সুমিষ্ট হাস্য হাসিয়া কহিল, "তবে আর কিন্তু কি? আমার কাছে একটা চর্‌কা নিন। খুব ভাল একখানা চর্‌কা আমার কাছে আছে; বাজারে অমন একখানা চর্‌কা সহজে পাবেন না।"

সহসা সুমিত্রা মাধবীর বামস্কন্ধের উপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "বাজারে পাওয়া যাবে না এমন চর্‌কা আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, তবে আনান্, দেখি কিরকম সে চর্‌কা।"

সুমিত্রা উঠিয়া বারাণ্ডায় গিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকাকে আহ্বান করিল, এবং সে উপস্থিত হইলে মাধবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একে অনুগ্রহ করে' বলে' দিন কোন্ চর্‌কাটা নিয়ে আস্‌বে।"

মাধবী পরিচারিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "কালো রংএর বার্ণিশ-করা একটা চর্‌কা আছে, সেইটে নিয়ে এস। আর ছোট একটা ডালা আছে, সেটাও।"

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে সুমিত্রা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভয় হয়, পাছে বলেন সে কথার কোনও দর্‌কার নেই। তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আপনাদের কি চর্‌কার কার্‌বার আছে?"

মাধবী মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, কার্‌বার নেই। তবে মাঝে মাঝে ভদ্র পরিবারে আমরা চর্‌কা বিক্রী করে' বেড়াই।"

কথাটা অসত্য নহে। সর্ব্বপ্রথম যখন স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে চর্‌কার প্রবর্ত্তন হয় তখন কোনও মহিলা-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া মাধবী কখন-কখন অন্য মহিলাদের সহিত বাড়ী বাড়ী চর্‌কা বিক্রয় করিয়া ফিরিয়াছে। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া মাধবী সুমিত্রার প্রশ্নের এই উত্তর দিল।

সুমিত্রা পুনরায় মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "দেখুন, আমি এই প্রথম চর্‌কা কিনেছি। চর্‌কা চালাতে আমি জানিনে। আপনি আমাকে চর্‌কা চালান শিখিয়ে দেবেন ত' ?"

মাধবী আগ্রহভরে কহিল, "দেব বই কি! চর্‌কা চালান শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব।"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "কিন্তু একদিনেই কি শিখে' নিতে পার্‌ব ? মাঝে মাঝে যদি দয়া করে' আপনি আসেন তা হ'লে বড় ভাল হয়! তা নইলে বৃথা কিনে কি হবে বলুন ?"

মাধবী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, না, বৃথা হবে কেন? একদিন দেখিয়ে দিলেই আপনি বুঝে' নিতে পার্‌বেন; তার পর অভ্যাস কর্‌লে আপনিই আয়ত্ত হ'য়ে আস্‌বে।"

দাসী চর্‌কা ও তুলা লইয়া উপস্থিত হইল।

চর্‌কাটা হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে সুমিত্রা বলিল, "বাঃ, বেশ চমৎকার দেখ্‌তে ত? আচ্ছা কালো রং কেন দিয়েছেন ?"

মাধবী উত্তর দিল, "কালো রং পেছনে থাক্‌লে সাদা সুতো ভাল দেখা যায় বলে'।"

চর্‌কাটা দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকের কোণে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার নাম সুমিত্রা, তা আপনি জানেন ?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমি তা জানি।"

"জানেন ? তাই বুঝি চর্‌কার কোণে আমার নামের প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন ?" বলিয়া সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

চর্‌কার দক্ষিণ কোণে সুরেশ্বর তাহার নামের আদ্যাক্ষর 'সু' পরিচ্ছন্নভাবে ছুরি দিয়া খুদিয়া রাখিয়াছিল। সে-কথা মাধবীর একেবারেই মনে ছিল না! সুমিত্রার প্রশ্নে মনে-মনে বিশেষরূপে পুলকিত হইয়া সে বলিল, "ও-টা আমি খোদাই করিয়ে আনিনি; ভগবান্‌ই খোদাই করিয়ে রেখেছেন! মিল যখন হবার হয় তখন এমনি করে'ই হয়!"

"কি করে' হয় ?"

মাধবী সাহাস্যে বলিল, "এমনি অক্ষরে অক্ষরে মিল হয়।"

মাধবীর কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ মাধবীর প্রতি তুলিয়া সে কহিল, "আবার মানুষে যখন ধরা পড়ে তখন এমনি কথায় কথায় ধরা পড়ে!"

সশঙ্কচিত্তে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল "কে ধরা পড়ে ?"

সুমিষ্ট হাস্যে সমস্ত মুখখানা লেপন করিয়া সুমিত্রা বলিল, "মাধবী ধরা পড়ে! নিজের পরিচয় নিজের কাঁধে বয়ে' এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে, সে ধরা পড়ে!"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া বিস্ময়বিহ্বল-নেত্রে মাধবী ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া নিজের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর শাড়ীতে বিদ্ধ স্বর্ণ ব্রোচের উপর হাত দিয়াই হাসিয়া ফেলিল। এই ব্রোচটিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল 'মাধবী'। সজ্জা করিবার সময়ে অভ্যাসানুযায়ী সে যখন এই বহু-ব্যবহৃত অলঙ্কারটি পরিধান করিয়াছিল তখন একেবারেই খেয়াল হয় নাই যে, ইহার মধ্যে তাহার নাম লিখিত আছে!

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুইটি পরস্পর-প্রত্যাশী হৃদয় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল। একই মাধ্যাকর্ষণ যেমন দুইটি বিভিন্ন স্রোতস্বতীকে টানিয়া টানিয়া সংযুক্ত করিয়া দেয়, তেম্‌নি সুরেশ্বরের আকর্ষণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই দুইটি তরল প্রাণকে ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর করিয়া অবশেষে একেবারে এক করিয়া দিল। দুইটি

ডালের দুইটি ছিন্ন স্থল একত্র মিলিত হইলে যেমন কলমের জোড় লাগিয়া যায়, তেম্‌নি সুরেশ্বরের সদ্য-অপমান-জনিত যে ক্ষত এই দুইটি তরুণীর মর্ম্মস্থলে ছিল তাহা একত্র হইবামাত্র দুইটি চিত্তকে যুক্ত করিয়া রস-প্রবহন আরম্ভ হইয়া গেল। তাই মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরেই এই দুইটি নবানুরাগিণীর মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে কথাবার্ত্তা হওয়া সম্ভবপর হইল।

সুমিত্রা সন্তোষপ্রফুল্ল মুখে বলিল, "তোমাকে দেখে'ই ভাই মাধবী, এমন একটা ভালবাসা পড়ে' গিয়েছিল যে কি বল্‌ব! তাই তুমি যখন নিজের পরিচয় লুকোবার চেষ্টা কর্‌ছিলে তখন ভারি রাগ হচ্ছিল! তার পর হঠাৎ তোমার ব্রোচের উপর দৃষ্টি পড়্‌তেই সব কথা পরিষ্কার হ'য়ে গেল! কেমন! এখন জব্দ ত?"

মাধবী সুমিত্রাকে বাহুর মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া স্মিত মুখে বলিল, 'খুব জব্দ! কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশী জব্দ হব, যে-দিন তুমি আমাদের বাড়ী গিয়ে দাদার পাশে চেলী পরে' দাঁড়াবে!"

সুমিত্রা আরক্তমুখে মাধবীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "যাও ভাই, তুমি বড় ফাজিল!"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "জমার চেয়ে খরচ বেশী কর্‌লে ফাজিল হয়। আমি ভাই কথা জমিয়ে রাখ্‌তে পারিনে, খরচই বেশী করে' ফেলি! তা তুমি যদি পছন্দ না কর ত মুখ বন্ধ করে' গম্ভীর হ'য়েই থাক্‌ব।" বলিয়া মাধবী কপট গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিল।

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া সহাস্যমুখে কহিল, "না, না, তোমাকে মুখ বন্ধ করে' গম্ভীর হ'তে হবে না, কিন্তু তাই বলে' যা' তা' কথা বোলো না।"

মাধবী তেম্‌নি গম্ভীরভাবে বলিল, "এসব তুমি যা' তা' কথা বল?—দাদা তোমাকে ভালোবাসেন, এ যা' তা' কথা?"

"আঃ, আবার ঐসব কথা!" বলিয়া সুমিত্রা মাধবীকে পুনরায় একটু ঠেলিয়া দিল।

"আচ্ছা, তবে থাক, আর বল্‌ব না, মুখ বন্ধ কর্‌লাম। চল, তোমাকে চর্‌কা চালান শিখিয়ে দিই।" বলিয়া মাধবী উঠিয়া চর্‌কা ও ডালা লইয়া ঘরের মেজেতে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। সুমিত্রাও আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল।

চর্‌কার বিভিন্ন অঙ্গগুলির ক্রিয়া ও কার্য্য মাধবী একে একে সুমিত্রাকে বুঝাইতে লাগিল। তাহার পর চর্‌কার লৌহশল্যে একটা তুলার পাঁজ যুক্ত করিয়া লইয়া সে দ্রুতগতিভরে রাশি রাশি সুতা কাটিতে লাগিল।

এত সহজে এরূপ সুতা প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সুমিত্রা বিস্ময়ে ও উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল।

"কি চমৎকার মাধবী! আমাকে শিখিয়ে দাও না, ভাই! আমি পার্‌ব?"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "দেশকে আর দাদাকে যে ভালবাসে তার হাতে চর্‌কা ঠেক্‌লেই সুতো বেরুবে। তুমি দাদাকে ভালোবাস, সুমিত্রা?"

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আবার আরম্ভ হ'ল? খুব মুখ বন্ধ কর্‌লে ত, মাধবী!"

মাধবী চর্‌কার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল, "তোমাদের বাড়ীর জলের কলের প্যাঁচ ক্ষয়ে' যেতে কখন দেখনি, সুমিত্রা? যতই টিপে' দাও না কেন জল বেরোতেই থাকে? অবশেষে দড়ি না বাঁধ্‌লে আর জল বন্ধ হয় না। আমার মুখও যদি বন্ধ কর্‌তে চাও তা হ'লে দড়ি দিয়েই বেঁধে দাও। কিন্তু চর্‌কায় হাত দিয়ে আমি কখন মিথ্যে কথাও বলিনে, ফাজিল কথাও বলিনে। এই চর্‌কা সম্বন্ধে আমি যে কথাটা বল্‌ব সেটা মন দিয়ে শোনো।"

অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাধবী আবার বলিতে আরম্ভ করিল—"এই চর্‌কাটি দাদার অতিশয় যত্নের জিনিস, সুমিত্রা। অনেক চর্‌কা অনেক দিন ধরে' বেছে বেছে এটি তিনি মনের মত করে' নিয়েছেন। এ-চরকায় তিনি কাউকে হাত দিতে দেন না, কিন্তু তোমার হাতে এটি চিরদিনের জন্যে তিনি দান করেছেন। এ চর্‌কাটি তুমি যত্নে রেখো, আর কাজে লাগিয়ো।"

তাহার পর পুনরায় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চর্‌কা চালাইতে চালাইতে মাধবী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—"তোমার ব্যবহারের শাড়ী করাবার জন্যে এই চর্‌কায় দাদা এই কয়েক দিনে কত সুতো কেটে রেখেছেন, সুমিত্রা!

দাদা ভারি চাপা মানুষ, আমার ঠিক উল্টো, কোন কথাই বল্‌তে চান না। কিন্তু তোমাকে তাঁর এই অতিযত্নের চর্‌কাটি দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝ্‌তে পেরেছি কত গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন।"

তাহার পর সহসা চর্‌কা বন্ধ করিয়া সুমিত্রাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল,"এ কি সুমিত্রা! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন, ভাই? তোমার মনে এমন দুঃখ হবে জান্‌লে আমি কখনই এসব কথা তোমাকে বল্‌তাম না!"

এ অনুতাপ-প্রকাশে অশ্রু কিছুমাত্র বাধা না মানিয়া বাড়িয়াই গেল। তখন ব্যস্ত হইয়া মাধবী সুমিত্রাকে শান্ত করিতে লাগিল।

সুমিত্রা প্রকৃতিস্থ হইলে মাধবী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তোমার দুঃখ আমাকে জানাবে না ভাই, সুমিত্রা?"

সুমিত্রা অশ্রু মার্জ্জিত করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ তুমি প্রথম এসেছ, আজ তোমার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করা ঠিক হবে না, ভাই। তুমি আমাকে চর্‌কা চালান শিখিয়ে দাও।"

মাধবী কিন্তু তেমন পাত্রীই নহে। ধীরে ধীরে সমস্ত কথাই সুমিত্রার নিকট হইতে জানিয়া লইল।

সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল ভাবিতে লাগিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, 'নাঃ, এ কিছুতেই হ'তে দেওয়া হবে না। যদি দরকার হয় বিমান-বাবুকে আমি অনুরোধ করব যাতে তিনি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি না হন। বিমান-বাবু ভদ্রলোক; কখনই তিনি এবিষয়ে অবিবেচনার কাজ করবেন না।"

সুমিত্রা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, "না, না, মাধবী, বিমান-বাবুকে তুমি কোনো কথা বোলো না। তাতে খারাপ হবে।"

মাধবী বলিল,"বেশ তা হ'লে তুমি নিজে শক্ত হোয়ো। তুমি যদি শক্ত হ'য়ে হাল ধর্‌তে পার সুমিত্রা, আমি ঠিক দাঁড় বেয়ে তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।" বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং চর্‌কা চালানর কৌশল সুমিত্রাকে যথাসম্ভব শিখাইয়া দিয়া মাধবী প্রস্থান করিল।

যাইবার সময়ে দুই বাহুতে সুমিত্রার গলবেষ্টন করিয়া ধরিয়া সে বলিয়া গেল, "আমি তোমার আজীবন সুখ-দুঃখের সখী হলাম, সুমিত্রা। দর্‌কার হ'লেই মনে কোরো।"

মাধবী প্রস্থান করিলে সুমিত্রার মনে হইল তাহার বদ্ধ-জমাট ঘরের জানালা খোলা পাইয়া হঠাৎ যেন বসন্তের এক ঝলক অবাধ উদ্দাম হাওয়া বহিয়া চলিয়া গেল! শুধু বহিয়াই গেল না, তাহার মন-নিকুঞ্জের সহস্র কোরক ফুটাইয়া দিয়া গেল। তাহার চিত্তবীণায় গভীর ঝঙ্কার জাগাইয়া দিয়া গেল।

অননুভূতপূর্ব্ব আবেশে সুমিত্রার মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল! সুরেশ্বরের নামের প্রথম অক্ষর যে তাহার নামেরও প্রথম অক্ষর, তাহা এপর্য্যন্ত এমনভাবে একদিনও মনে হয় নাই। চর্‌কার সম্মুখে বসিয়া সেই সযত্ন-খোদিত অক্ষরটির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সুমিত্রার মন দুলিতে আরম্ভ করিল। মনে হইল তাহা যেন শুধু বর্ণমালার একটি অক্ষরমাত্রই নহে, যেন প্রবল শক্তিসম্পন্ন কোন্ বীজমন্ত্র!

ক্ষণকাল তন্দ্রাবিমুগ্ধ থাকার পর সুমিত্রা অঞ্চলে গলদেশ বেষ্টিত করিয়া চর্‌কায় মাথা ঠেকাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল; তাহার পর তাহার পড়িবার টেবিলের একধার মুক্ত করিয়া সযত্নে চর্‌কাটি তথায় উঠাইয়া রাখিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



"ঐতিহাসিক উপন্যাস"

গত মাঘ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে বঙ্কিম-বাবুর কয়েকখানি উপন্যাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি ইতিহাসের মর্য্যাদার হানি করিয়াছেন। এখানে আমি শুধু 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'রাজসিংহ' সম্বন্ধেই ইহা বলিলাম। রাখাল-বাবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে তাঁহার 'মত পেশাদার প্রত্নতত্ত্বব্যবসায়ী' যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া তিনি জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন তাহারই খাতিরে, তাঁহার প্রবন্ধের প্রতিবাদ প্রেরণ করিতে স্বভাবতই আমার ভয় পাওয়া উচিত। কিন্তু 'আমার স্থির বিশ্বাস' স্বয়ং বঙ্কিম-বাবু, ও 'ঐতিহাসিক সত্য আমার দিকে।"

দুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে রাখাল-বাবু বলেন, "উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের...মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীর কৎলু খাঁ, ওস্‌মান খাঁ, জগৎসিংহ ও মানসিংহ এক-দিন বাস্তব জগতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহাদের সময় ও সেই যুগের প্রধান ঘটনাবলী ইতিহাসে স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে। উপন্যাস-রচনা কালে গ্রন্থকার নাম-বৈষম্য বা ঘটনা-বৈষম্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। এইজন্যই "দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মধ্যে কথাসাহিত্যের হিসাবে উচ্চপদ প্রাপ্ত না হইলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে কিন্তু বঙ্কিম-বাবু নিজেই বলিতেছেন, "যে তিনি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেন নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।" বঙ্কিম-বাবুর উপন্যাসের ঐতিহাসিক তত্ত্ব গবেষণা করিবার পূর্ব্বে রাখাল-বাবু অন্তত 'ভূতপূর্ব্ব এবং অধুনা সিংহাসনচ্যুত' সাহিত্য-সম্রাটের লিখিত মূল্যবান্ ভূমিকা-গুলিও কি পড়া উচিত বিবেচনা করেন নাই?

বর্ত্তমান বিশ্বসভ্যতার নানা-বিভাগে আমাদের স্বদেশবাসী যে কয়েকজন মহাত্মা স্ব স্ব সাধনা ও প্রতিভার বলে বঙ্গদেশের—তথা ভারতবর্ষের জন্য স্থায়ী গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্যতম। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে বা ভারতের বাহিরে ভারতীয় মোগল-যুগের ইতিহাসে তাঁহার মত অধিকার আর কাহারও নাই। তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীতে "বঙ্গের শেষ পাঠানবীর" প্রবন্ধে দুর্গেশনন্দিনীর মূল আখ্যানভাগের ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া বর্ত্তমানে রাখালবাবুর যে ধারণা, তাহার প্রকৃততত্ত্ব বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। 'বাঙ্গালার ইতিহাস'-লেখক যে তাহা পাঠ করেন নাই, ইহাতে কি বাঙ্গালী পাঠকের দুঃখ বোধ করা অস্বাভাবিক?

'রাজসিংহের' বিষয়ে বঙ্কিমবাবুর অতি উচ্চ ধারণা। তিনি "অত্যন্ত স্বজাতিপক্ষপাতী; হিন্দুদ্বেষক মুসলমান ইতিহাস-লেখকদের বাদ দিয়া ভিনিসীয় চিকিৎসক মানুচী, টড্, ও অর্ম্মের অনুকরণ করিয়াছেন।" আবার বঙ্কিমবাবু বলেন যে, "এই তিন জাতীয় ইতিহাসে পরস্পরের সহিত অনৈক্য আছে। ইহাদের মধ্যে কাহার কথা সত্য, কাহার কথা মিথ্যা, তাহার মীমাংসা দুঃসাধ্য। অন্তত একার্য্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ।"

রাখাল-বাবু এই পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন কি না আমরা জানি না, কিন্তু তিনি নিজেই "যদিও" দিয়া (এই 'যদিও'—অর্থ কি?) বলিতেছেন, যে, "অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের ন্যায় মনস্বী লেখক রাজপুতানার গিরিরন্ধ্রপথে সপরিবারে বাদ্‌শাহ্ আওরঙ্গ-জেবকে বন্ধন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি (এই তথাপি—অর্থ কি?) রাজসিংহ আধুনিক উপন্যাসের ন্যায় অস্বাভাবিকতা-দোষ দুষ্ট হয় নাই।"

এ-বিষয়ে বঙ্কিম-বাবু বলেন যে তিনি "রন্ধ্রমধ্যে ঔরঙ্গজেব যে অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা লিখিয়াছেন, অর্ম্ম ঐরূপ লিখেন।" ইত্যাদি।

রাখাল-বাবু বঙ্কিম-বাবুর প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে "এই যুগের মুসলমান ঐতিহাসিক এক-দেশদর্শী, সুতরাং তাহার প্রমাণ বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত ইতিহাসে গ্রহণ করিতে হইলে বিশ্বাসযোগ্য অপর প্রমাণ দিয়া সমর্থন করাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়প্রকারের প্রমাণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন, কারণ তাহা তুর্কী আরব্য অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত।"

রাখাল-বাবু বলেন যে "মুসলমান ঐতিহাসিক একদেশদর্শী।" বঙ্কিম-বাবুরও সেই মত। কিন্তু আবার বলেন যে "এই যুগে মুসলমান-রচিত ইতিহাসাবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।" ইহাও কি একদেশদর্শী মুসলমান ঐতিহাসিকদের কারসাজি?

রাখাল বাবু নিজেই ঐতিহাসিক, কাজেই তিনি নিশ্চয় আমাদের চেয়ে বেশী জানেন, যে আমাদের সেরা ঐতিহাসিক যদুনাথ-বাবু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস লিখিয়াছেন কিনা। তুর্কী ভাষায় ভারতের ইতিহাস আছে কিনা জানি না, কিন্তু তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানদের রাজভাষা পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন করা কিছুই কঠিন ব্যাপার নহে। বাঙ্গালী আজ চীনা ও জাপানী ভাষা আয়ত্ত করিতেছেন। কিন্তু মেকলের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত অফিস-আদালতে যে-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-ভাষায় লিখিত ইতিহাস পাঠ বিশেষ শ্রমসাপেক্ষ নহে। যাহা হউক যদুনাথ-বাবু শুধু যে কেবল পারস্য ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত ইতিহাস অধ্যয়ন করিবার শ্রম-কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা নহে, পরন্তু পৃথিবীর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে রক্ষিত প্রাচীন ইতিহাসের উপাদানসমূহ অনেক অর্থ-ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

রাখাল-বাবু বলেন যে "রাজসিংহ অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই।" কিন্তু বঙ্কিম-বাবু বলেন যে ঔরঙ্গজেব প্রভৃতির "সম্বন্ধে যে-সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে।" "বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকত রক্ষা করিবার জন্য কল্পনা-প্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।" আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আমাদের দেশে হকিন, রো, বার্নিএ,

টাভেরনিয়ে প্রভৃতির লেখা ইতিহাসের উপাদান হইতে পারে, সুতরাং উপন্যাসও যদি ইতিহাসের স্থান অধিকার করে, তাহাতে ক্ষোভের কারণ কি ?

রাখাল-বাবু বলেন যে "ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে,—প্রথম উদ্দেশ্য, উপন্যাসের আকারে ঐতিহাসিক সত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ, এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ঐতিহাসিক ঘটনার আবরণ দিয়া একটা নূতন গল্প রচনা।"

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিম-বাবুর নিজের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। ইহা রাখাল-বাবু যদি স্বীকার না করেন? ঠিক বটে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে নাম-বৈষম্য নাই। 'স্থান-বৈষম্য'ও নাই—থাকিলেও তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। বিশেষতঃ রাখাল-বাবু নিজেও তাহা উল্লেখ করেন নাই। ঘটনা-বৈষম্য?—আমরা কিছু বলিব না। যদুনাথ-বাবু এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বে লিখিত প্রবন্ধে বলেন, "ইতিহাস কাব্য নহে। ঐতিহাসিক শুষ্ক সত্য অনেক সময়েই কাব্যে অঙ্কিত মনোহর কল্পনার চিত্রপট দূর করিয়া দেয়। কুমার জগৎসিংহ যৌবনে অতিমাত্রায় মদ খাইয়া প্রাণত্যাগ করেন। উসমান বঙ্গীয় পাঠানদের মধ্যে শেষ বীর রাজা; অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়া রণ-ক্ষেত্রে হত হন।" এখন রাখাল-বাবু কি বলিতে চাহেন? বঙ্কিম-বাবু বার বার বলেন, "ইতিহাস, ইতিহাস; উপন্যাস, উপন্যাস।" সুতরাং কোনো উপন্যাসে কখনও কি রাখাল-বাবুর নির্দ্দেশিত প্রথম উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে?

এমন কি রাজসিংহের ঐতিহাসিক সত্যতার বিষয় বঙ্কিম-বাবুর যে ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, তাহার আজকাল কত মূল্য আছে, রাখাল-বাবু স্বীকার না করিলেও ইতিহাস কখনও অস্বীকার করে না। মানুচি, টড্ বা অর্মের লেখার মূল্য কত, অনেকেই জানেন।

বঙ্কিম-বাবু রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলেন যে "এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম। এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।" ইহা শুধু তাঁহার বিনয়-বচন নহে—তাঁহার গ্রন্থাবলী ইতিহাসের অনুসন্ধানী আলোতে ফেলিলেই রাখাল-বাবু তাহা বুঝিতে পারিবেন। যদিও বঙ্কিম-বাবু বলেন যে "ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে," কিন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক একথা কখনও স্বীকার করিবেন না। কারণ বঙ্কিম-বাবুর নিজের কথায় বলিতে গেলে, "উপন্যাস-লেখক, সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন।"

ইতিহাস সম্বন্ধে গ্যেটের ধারণা যাহাই হউক, এমার্সনের লিখিত যে মন্তব্যটিতে প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে কার্লাইলের ধারণা বিবৃত হইয়াছে যাঁহারা তাঁহার সমর্থন করেন, তাঁহারা নিশ্চয় বঙ্কিম-বাবুর কথাকে একটু বদ্লাইয়া বলিবেন যে "কোন স্থানেই উপন্যাস ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না।"

পরিশেষে রাখাল-বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের "দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক ঘটনার আবরণ দিয়া একটা নূতন গল্প রচনা।" ইহাই সম্ভবপর এবং এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের অভাব অতি অল্প ভাষায়ই আছে।

কাজী মোহাম্মদ বক্‌স্

'সীতারামের' ঐতিহাসিকত্ব

গত মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' সম্বন্ধে অনবধানতাবশতঃ 'কাহারও কোন আপত্তি নাই' বলিয়াছেন। ষ্টুয়ার্টস্ কৃত বহুজন-বিদিত বাঙ্গালার ইতিহাসে সীতা-রামের ঘটনাটি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর শাসন-কালে বাদশাহ বংশের ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব আবু তোরাপ ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। বাদশাহ বংশের সহিত আত্মীয়তা হেতু তিনি নবাবকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিতেন না। এইজন্য নবাব কোনরূপ সাহায্য দান না করিয়া তাঁহাকে মহম্মদপুরের খ্যাত দস্যু সীতারামকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আদেশ দেন। তোরাপ অগত্যা অল্প কয়েকজন বরকন্দাজ লইয়া দস্যু-দমনে গমন করেন। সীতারাম ফৌজদারের পদগৌরব ও তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাতের ফল কি তাহা সবিশেষ জানিলেও স্বীয় অনুচরবর্গকে অতর্কিত আক্রমণের আদেশ দিয়া স্বয়ং তোরাপের মস্তক ছেদন করেন। তোরাপের প্রতি সাবধান দৃষ্টি রাখিবার জন্য নবাবের উপর দিল্লীর আদেশ ছিল; কিন্তু তাঁহারই কৌশলে ফৌজদার নিহত হইলেন। এই সংবাদ কোনরূপে দিল্লীতে পৌঁছাইলে সমূহ বিপদ্ বুঝিয়া যাহাতে সীতারাম পলায়ন করিতে না পারেন তজ্জন্য নবাব মহম্মদপুর পরগণার চতুর্দ্দিকস্থ জমিদার-গণের উপর অতি সত্বর কড়া হুকুম জারি করিয়া সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক স্ত্রী, পরিবার ও সহচরগণ সহ সীতারামকে বন্দীকৃত অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি অন্যান্য দস্যু সহ সীতারামকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শূলে আরোপণ করাইয়া এবং তদীয় স্ত্রী ও পরিবার-বর্গকে মুর্শিদাবাদের প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় করেন ও আবু তোরাপের প্রতিশোধমূলক রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠাইয়া অব্যাহতি পান।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' ও 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে মনস্বী ঐতিহাসিক যদু-বাবুর সহিত একমত হইয়া সত্য ইঙ্গিত করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের অতিস্তুতি মূলে কোন কিছু না বলায় এবং সকলকে বঙ্কিমমতাবলম্বী বলায় আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

শ্রী অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

"গৌড়-ব্রাহ্মণ" ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

গত মাঘ মাসের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "গৌড়-ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি কথার প্রতিবাদ করিতে গিয়া কতকগুলি ইতিহাস-বিগর্হিত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের দোহাই দিয়া পালবংশীয় রাজগণকে মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত জাতি সাব্যস্ত করিয়াছেন। দীনেশ-বাবু কিছুকাল পূর্ব্বে ঐরূপ ধারণাই পোষণ করিতেন এমন কি "প্রবাসী"তে ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন; কিন্তু ঢাকা মিউজিয়মের একটি রহস্য উদ্ঘাটনের পর হইতেই শুধু দীনেশবাবু কেন সমস্ত ঐতিহাসিকই ঐরূপ ভ্রান্ত মতকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা জানিয়া লজ্জিত হইলাম কেবল "ভ্রান্তি বিজয়" প্রণেতা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভ্রান্তি এপর্য্যন্তও ভাঙ্গে নাই।

সন ১৩২৮ সালের আষাঢ় সংখ্যার "ভারতবর্ষে" হরিশবাবু এই বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ জ্যোতিঃস্মৃতিব্যাকরণতীর্থ মহাশয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পত্র লিখেন। দীনেশ-বাবুও অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট শ্রাবণ মাসেই (১৩২৮) একখানি

পত্র লিখেন। পাঠকগণ সেই সুদীর্ঘ পত্রের অংশবিশেষ পাঠ করিলেই প্রকৃত ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিবেন। পত্রখানি এই-রূপ—"কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে, সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালবংশীয় ছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে সাভারে প্রাপ্ত "হরিশ্চন্দ্র"নামাঙ্কিত…একখানি ইষ্টক সংগৃহীত হইয়া ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছিল। সম্প্রতি মিঃ ষ্টেপল্‌টন্ এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন যে, ঐ ইষ্টকখানি সম্পূর্ণরূপেই জাল এবং অবিশ্বসনীয়। যে-সমস্ত প্রমাণে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে এবং ময়নামতী গানের গোবিন্দচন্দ্রকে আমরা পাল-বংশীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, নবাবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে সে-সকল প্রমাণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত ভট্টশালী ও মিঃ ষ্টেপল্‌টন্ 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় যে প্রাচীন প্রস্তরলিপির একটি প্রতিলিপি প্রদান করিয়াছেন তাহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সাভারের রাজা বৈদ্যবংশীয় ছিলেন, যদিও তিনি হিন্দুমতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁহার প্রপিতামহ ছিলেন রাজা ভীমসেন, তৎপুত্র ধীমন্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করাতে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় স্বদেশ ত্যাগপূর্ব্বক সাভারে আগমন করেন। এবং কিরাতদিগকে পরাজয় করিয়া বংশাই নদীর উপকূলবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ অধিকার করেন। ধীমন্তের পুত্র রণবীর হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বহুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র কুবেরের মত ধনশীল হইয়াও বৃদ্ধবয়সে ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক রাজর্ষি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্র একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারই শিলালিপি হইতে উক্ত বিবরণ সংকলিত হইল। শিলালিপির মূল সংস্কৃতগুলি ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া চিঠি লিখেন যে, কৈবর্ত্তেরা সাভারের রাজবংশীয় বলিয়া কি সূত্রে পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের এই দাবীর কোন প্রকৃত ভিত্তি আছে কিনা। আমি দেখিলাম অনেকেই তাঁহাদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কাহারও কাহারও মত 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু আমি উক্ত সাহেবকে লিখিয়াছিলাম যে, এই দাবী নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পারে যে-হেতু হরিশ্চন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষেরা এক সময়ে বৈদ্যজাতীয় হইলেও তাঁহারা ধর্ম্মত্যাগী হওয়াতে স্বীয় সমাজে শেষে গৃহীত হন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অপর কোন জাতির সঙ্গে মিশিতে হইয়াছিল। সাভারের নিকটবর্ত্তী নান্নার ও জয়মণ্ডপ প্রভৃতি গ্রামে কৈবর্ত্তগণ অত্যন্ত প্রতাপশালী। কৈবর্ত্তেরা বলেন হরিশ্চন্দ্রের পুত্র না থাকাতে রাজ্য ভাগিনেয়গণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু শিলালিপিতে দেখা যাইতেছে যে, হরিশ্চন্দ্রের পুত্র মহেন্দ্রও সাভারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ হরিশ্চন্দ্রের পরে কোন রাজা অপুত্রক থাকায় কৈবর্ত্ত বংশীয় ভাগিনেয়গণ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপেই হউক এই সূত্রে কৈবর্ত্তদিগের নিজদিগকে পালবংশীয় বলিয়া ঘোষণা করার কোনও প্রমাণই পাওয়া যাইতেছে না। আমি সর্ব্বতোভাবে মাহিষ্য জাতির উন্নতি কামনা করিয়া থাকি, তাঁহারা যদি ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে আমি সুখী হইব, কিন্তু অসত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করা "তাসের ঘর" নির্ম্মাণের ন্যায়। যদি তাঁহারা কোন বংশাবলী বাহির করেন তাহার উপর কোন জোর দেওয়া চলে না যেহেতু ঘরে ঘরে আমাদের যে-সব বংশাবলী আছে তাহার মধ্যেই নানা-রূপ গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষ ব্রাহ্মণাদি কয়েক জাতির মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁহাদের বংশাবলীর কতকটা মূল্য আছে অপর সকল জাতির সেরূপ বংশাবলী রাখার সম্ভাবনা ছিল না ষ্টেপল্‌টন্ সাহেব দেখাইয়াছেন, অদ্বৈতাচার্য্যের তিন জায়গা হইতে তিন রকম বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে। কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নাই। কুলীন ছাড়া অপর কাহারও বংশাবলীর কিছু মাত্র নিশ্চয়তা নাই। বিশেষ ৪০।৪২ পুরুষ পর্য্যন্ত বংশাবলী কৈবর্ত্তদের ঘরে যথাযথভাবে থাকা একরূপ অসম্ভব। অন্ততঃ ৩০০ বৎসরের প্রাচীন কোনও কাগজে কিংবা তালপত্রে যদি সেই বংশাবলীর কতকাংশ পাওয়া যায় তবে তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, অন্যথায় নহে।"

হরিশবাবু, দীনেশবাবুর উপর নির্ভর করিয়াই পালরাজগণকে মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত বলিয়াছেন। পাঠকগণ দীনেশবাবুর পত্রখানির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। পালরাজগণ যে মাহিষ্য বা কৈবর্ত্ত ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের গৌড়লেখমালা প্রভৃতি বাংলার প্রামাণ্য ইতিহাসই একথার বিরোধী। কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দী মহাশয়ের রামচরিতে দ্বিতীয় মহীপাল ও রামপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ত্ত প্রজাদের কত বিদ্রোহের কাহিনীই না বর্ণিত আছে! শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের গৌড়রাজমালায়ও ঐসব কাহিনী আছে। বল্লালচরিতে আবার রাজাহীন পালগণকে ক্ষত্রিয়াধম ও কৈবর্ত্তগণকে নৌজীবী, হলজীবী, জালজীবী হীনশূদ্র বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সারনাথের ভগ্নস্তূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি, মুঙ্গেরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা, গৌড়রাজমালা ও রামচরিত প্রভৃতি পাঠে জানা যায় পালবংশীয় রাজাদের সঙ্গে ভারতীয় বিভিন্ন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। সে-দিন আবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল কলেজ লাইব্রেরীর হাতে-লেখা পুঁথি পড়িয়া বলিলেন, "পালরাজাদের সময় কেবল কৈবর্ত্তদের মন্ত্র দেওয়া হ'ত না ; তারা মাছ ধরত, যারা মাছ মারে তাদের কেমন করে' মন্ত্র দেবে! কৈবর্ত্তেরা যতক্ষণ না মাছ মারা ব্যবসা ত্যাগ করে, ততক্ষণ তাদের বৌদ্ধ করতে পারবে না এই ছিল নিয়ম। এইজন্য কৈবর্ত্তেরা হ'য়ে গেল ছোট"।—প্রবর্ত্তক, কার্ত্তিক ১৩৩০।

পালবংশীয় রাজগণ যে কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য ছিলেন না প্রতি ছত্রে ছত্রে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। পালরাজগণের মন্ত্রীগণ নাকি কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ছিলেন হরিশবাবু এরূপ কথাও লিখিয়াছেন। নিজ সমাজের গৌরব বাড়াইতে গিয়া ঐতিহাসিকের চক্ষে একরূপ উপহাসাস্পদই হইয়া পড়িয়াছেন। পালরাজ বংশের মন্ত্রিগণ যে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহা গয়া জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপিতেই প্রমাণিত হইয়াছে।* মানরাজগণের সভা পণ্ডিতগণের সহিত গৌড়ের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের যে বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল একথা তাহাতে স্পষ্টই আছে। অন্যদিকে মুঙ্গেরে প্রাপ্ত (শকরাজাদের মুদ্রার অনুরূপ) বিগ্রহ পালের মুদ্রা ও রিয়াজুল † নামক এক মুসলমান ঐতিহাসিকের ইতিহাস হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে পালরাজবংশ শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।‡ হরিশ-বাবুর এ-সব বিষয় অবিদিত থাকিলে আমরা

* গয়া জেলায় এমন কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই যাহাতে লেখা আছে যে পালরাজাদের সকল মন্ত্রীই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিল। —প্রবাসীর সম্পাদক

† রিয়াজুল বলিয়া কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই। উহার নাম রিয়াজ উস-সালাতীন এবং এই গ্রন্থের কথা হিন্দু রাজ্যের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য নহে।—প্রবাসীর সম্পাদক

‡ পালরাজারা যে জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন একথা কোন ইতিহাসে বা শিলালিপিতে পাওয়া যায় না। ক্ষত্রিয় বংশীয় চেদী

অনুরোধ করি তিনি যেন গৌড়ের প্রামাণ্য ইতিহাসগুলি একবার পাঠ করেন।

শ্রী দীনবন্ধু আচার্য্য
শ্রী গৌরহরি আচার্য্য

—

নাম

অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে (২১৪-১৫ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী বাঙ্গালী মেয়েদের (বিবাহিতা অবিবাহিতা নির্ব্বিশেষে) নামের পিছনে 'দেবী' শব্দ সংযুক্ত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বলিবার আছে। প্রথমেই বলিয়া রাখি, যে উদ্দেশ্য হইতে এই প্রস্তাবের উদ্ভব তাহার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্ত্রী-স্বাধীনতাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে হইলে নারীকে সর্ব্বাবস্থায় তাহার নাম অপরিবর্ত্তিত রাখিবার অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীনাথ বসুর কন্যা দুর্গাবতী বসু হরিনাথ মল্লিককে বিবাহ করিয়া দুর্গাবতী মল্লিক হইয়া যান (বাংলা দেশে লক্ষ্মীরাণী মল্লিক হন না)। তাহাকে আশৈশব দুর্গাবতী দেবী নাম দিয়া শ্রদ্ধেয়া লেখিকা এই সমস্যা মিটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা খুব উৎকৃষ্ট উপায় মনে হয় না। এদেশের প্রাচীন যুগে নাম অনেক সহজ ছিল এবং স্ত্রীলোকের নামের পিছনে পিতা কিম্বা পতির পদবী যোজনা করা হইত না—যথা, সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি। বর্ত্তমান সময়েও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে পিতার সহিত পুত্রকন্যার নামের সাদৃশ্য নাই। এবং "অনেক জাতির লোকের পদবীহীন নামটুকু মাত্র লইয়াই বেশ চলিতেছে"। লেখিকার প্রবন্ধ হইতে জানিতে পাই, তাহা হইলে স্ত্রীলোক মাত্রের নামের সহিত 'দেবী' এই কৃত্রিম শব্দের dead uniformity সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? দুর্গাবতী বিবাহের পূর্ব্বে এবং পরে 'শ্রীমতী দুর্গাবতী' থাকিলে ক্ষতি ক আছে? অথবা বিবাহের পরও যদি পতির পদবী গ্রহণ না করিয়া পিতার পদবী অর্থাৎ 'বসু' লইয়াই থাকেন তাহাতে ক্ষতি কি? 'দেবী' যেমন 'মল্লিক' নহে 'বসু' ও তেমনি নহে; সুতরাং হরিনাথ মল্লিকের স্ত্রী দুর্গাবতী বসু থাকিলে আপত্তির কারণ কি? 'দেবী' শব্দ ব্যবহারে অহিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে এবং তজ্জন্য তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু পদবীহীন কিম্বা পিতার পদবীযুক্ত নাম (বিবাহিতা মেয়ের) ব্যবহারে কোন সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণ নাই। স্বাধীনতা- ও স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী বাঙ্গালী মহিলাগণ এই নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করুন; ইহাতে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

শ্রী দীনেশচন্দ্র চৌধুরী

—

"ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই"

মাঘের প্রবাসীতে "মফঃস্বলবাসী" স্বরাজ্যদলের চুক্তিপত্রের রচয়িতা শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যক্তিগত মত সূচিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান নিবন্ধে দাশ মহাশয়ের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচক যে কিরূপ ভ্রান্ত মত পোষণ করেন, তাহা প্রদর্শিত হইল।

সমালোচক বলেন যে "রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁহার (দেশবন্ধুর) ধারণা চতুর্দ্দশ লুইর আদর্শ হইতে ভিন্ন নহে।" ফরাসী সম্রাট্ চতুর্দ্দশ লুই বলিয়াছিলেন, আমিই ত' রাষ্ট্র" (L'etat c'est moi)—কিন্তু দেশবন্ধুর কোন্ কথা হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজেকেই রাষ্ট্র বলিয়া ধারণা করেন? সমালোচকের তাহা দেখাইয়া দেওয়া দরকার। তাঁহার কোনো কার্য্য হইতে যে ইহার প্রমাণ আসে না তাহা পরে দেখান গেল। দেশবন্ধু বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি চান জনসাধারণের স্বরাজ। এই কথা গয়াকংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁহার অভিভাষণে আছে। তিনি বরাবর ব্যক্তিত্ব চাহিয়াছেন, socialism ও centralization তাঁহার কার্য্য-পদ্ধতির বাহিরে। তা ছাড়া নিজের দেশের পক্ষে কেহ যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেকের আছে। সাধারণ ব্যক্তিরও যেমন ও-স্বাধীনতা আছে, তেমনি দাশ-মহাশয়েরও আছে। যে-সকল সদস্য উক্ত রফানামাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন তাঁহাদেরও আছে। দেশকে ইহা গ্রহণ করিবার অনুরোধের অধিকারও সকলের আছে। মিঃ দাশ ও তাঁহার সহযোগিগণ তাহাই করিয়াছেন। তাঁহারা এই চুক্তিপত্র দেশের উপর চাপাইয়া দিতে চাহেন না। এই স্থলে এই বক্তব্য যে "must accept it" দুইপ্রকার অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে,—প্রথমতঃ নৈতিক অথবা দৈহিক বাধ্যতা অর্থে; কিন্তু must শব্দের অপর অর্থ বক্তার মতের নিশ্চিততা জ্ঞাপন করে। সমালোচকেরা এই দ্বিতীয় অর্থ কেন গ্রহণ করিতেছেন না, তাহা বোঝা যায় না।

কংগ্রেসে গৃহীত জাতীয় চুক্তিপত্র সম্বন্ধে 'মফঃস্বলবাসী' বলিতেছেন, "উহা সর্ব্বাংশে দেশবন্ধুর প্রস্তাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" কিন্তু একথা ভুলিয়া গেছেন যে ঐ চুক্তিপত্রকে মূল সূত্র বলিয়া ধরিয়া বঙ্গীয় প্যাক্ট গাঁথা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাতীয় চুক্তি-পত্রে লোক-সংখ্যানুসারে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন এই বিধান দেওয়া হইয়াছে; আর বঙ্গীয় মীমাংসাপত্রে দাশ মহাশয় খোলাখুলিভাবে এই নীতি অনুযায়ী শতকরা হার (৫৫০০ মুসলমান ও ৪৫০০ হিন্দু) কষিয়া দিয়াছেন।

সমালোচকের মতে "তথাকথিত মুসলমান স্বরাজ্য-সদস্যগণকে স্বীয় দলে রাখিবার জন্য বাধ্য হইয়া দেশবন্ধু ঈদৃশ রফানামায় সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নহে।" একথা সংক্ষেপে খণ্ডন করা যায়। হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই বোধ জন্মে যে fusion দ্বারা হিন্দু মুসলমানের একতা প্রতিষ্ঠার আশা করা বাতুলতা মাত্র। অতএব federation দ্বারা এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। চুক্তিপত্রে তাহাই করা হইয়াছে। আইন করিয়া গোবধ বন্ধ করা যাইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক ঘটনা হইতে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আইন দ্বারা গোরক্ষার প্রস্তাব করাতে বাঁকুড়ার কোন গ্রামে বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। অতএব হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্থাপন করিতে গেলে উভয় দলকেই কিঞ্চিৎ লাঘব স্বীকার করিতে হইবে। দেশবন্ধু এই মত দ্বারা চালিত হইয়াছেন। "নিজের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তিনি দেশবাসীর স্বার্থ বলি দিয়াছেন।" কিন্তু মুসলমানরাও কি আমাদের দেশবাসী নহেন? মুসলমানদের communal representation দিলে কি হিন্দুর স্বার্থ নষ্ট হইয়া যায়? দেশবন্ধুর প্যাক্টে কি মুসলমানের tyranny হইতে হিন্দুর রক্ষার ব্যবস্থা নাই? পরিশেষে সমালোচক বলেন যে "দেশবন্ধু সর্ব্বোপরি চান আপনার যা খুসী তাই করিবার

প্রভৃতি অন্য রাজবংশের সহিত পালরাজাদের বিবাহ-সম্বন্ধ ছিল বটে কিন্তু তাঁহারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন না। রাজার সহিত রাজকন্যার বিবাহ চিরদিনই হয়। অনার্য্য কোচবিহারের রাজবংশী জাতীয় রাজা ৺জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপের সহিত মিশ্রিত মারাঠা জাতীয় মাম্লাজিরাও গায়কোয়াড়ের কন্যার বিবাহ হইয়াছে, এই দুই জাতিই এখন ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেন। কিন্তু ইঁহাদিগকে পবিত্র আর্য্যবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলিতে কেহই ভরসা করেন না।

অধিকার।" ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস! দেশবন্ধু চাহেন তিনি যাহা ভাল বলিয়া মনে করেন তাহা দেশের সমক্ষে উপস্থিত করিবার অধিকার।

হিন্দু-মুসলমান চুক্তিপত্র নিখুঁত না হইতে পারে। ইহাকে গ্রহণ করা বা প্রত্যাহার করা জাতির হস্তে নিহিত। নিরপেক্ষ পাঠক দেখিবেন যে মিঃ দাশ কিছুমাত্র "বিচার-বুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া" এই খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন কিনা। লুই চতুর্দ্দশের সহিত তাঁহারা তুলনা করা আরও গর্হিত।

অরুণ দত্ত

—

চাকরী সম্বন্ধে স্বরাজ্যচুক্তি

স্বরাজ্য-চুক্তি বা হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট্ লইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একটু বাড়াবাড়ি করিতেছেন। যেমন কোন মুসলমান সংবাদ-পত্রে একজন পত্র-প্রেরক হিন্দুদিগকে 'rabid' বা পাগল কুকুরের মত বলিয়াছেন এবং 'তাহা হইলে তোমার স্বরাজকে সেলাম' good-bye to your swaraj এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আর যাঁহারা স্বরাজ্য-চুক্তিতে সম্পূর্ণ একমত নহেন তাঁহাদিগকে হিন্দুদের বেতন-ভোগী বলিয়া গালি দিয়াছেন। বঙ্গ-বিচ্ছেদের আন্দোলনের সময় পরলোকগত ভারতের সুসন্তান আবদুল রসুল সাহেবকেও অনেক মুসলমান হিন্দুদের ভাড়াটিয়া আন্দোলনকারী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। পরে কিন্তু তাঁহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় প্রবাসীতে উভয় সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও অনেকে 'চাকরী গেল' 'সর্ব্বনাশ হ'ল' বলিয়া অত্যন্ত চীৎকার করিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনে বাধা জন্মাইতেছেন। যখন উভয় জাতিকে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এদেশে থাকিতেই হইবে তখন অভদ্র ভাষা ব্যবহার করিয়া নিজের অভদ্রতা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। মুসলমান ভাইদের চাকরী সম্বন্ধে এত দূর জেদ করা ব্যক্তিগতভাবে আমি না-পছন্দ করি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বরং জেদ করা যায়। আমরাও কি হিন্দুর মত চাকরীসর্ব্বস্ব জাতি হইয়া যাইতে চাই? ব্যবসা বাণিজ্য কি আমাদের জাতিগত উন্নতির পথ হইতে পারে না? আমরাও কি "গোলামের জাতি শিখেছ গোলামী" এই শ্রেণীতে যাইতে চাই? হিন্দুর যেমন জোর করিয়া বা আইন করিয়া মুসলমানদিগকে গোবধ বন্ধ করাইতে যাওয়া অনুচিত মুসলমানদেরও একলাফে (উপযুক্ত না হইয়াই) গঙ্গা পার হইতে যাওয়ার চেষ্টা করা অন্যায়। অবশ্য হিন্দুদেরও চাকরী সম্বন্ধে একটু বেশী স্বার্থপরতা হইতেছে বা হইতেছিল বলা খুব সত্য। সম্পাদক মহাশয়ও এই বিষয় খুব ন্যায়ভাবে বিচার করিয়া লেখেন নাই মনে হয়। আর-একটু উদারতা কি দেখাইতে পারিতেন না?

সৈয়দ মোহসেন

স্বরূপ

(কবীর)

কেমন করিয়া স্বরূপ তাঁহার
বুঝাব তোমারে আমি ;—
রূপ নাই তাঁর বলিব কেমনে,
তিনি যে আমার স্বামী!
'বাহিরের ন'ন'— বলি যদি আমি,
জগৎ লজ্জা পাবে ;
'ভিতরে আছেন'— এ কথা বলিলে
কেবা প্রত্যয় যাবে ?
ভিতর বাহির অচিৎ ও চিৎ—
দুই পাদপীঠ তাঁর ;

তিনি অগোচর তিনিই গোচর,
বাক্য মেনেছে হার!
জলভরা ঘট ডুবাইয়া জলে
রেখেছেন যেন তিনি ;
ভিতর বাহির জলময় তার,—
প্রভেদ কেমনে চিনি ?
শিব তিনিই সে তিনিই আবার
এ ভুবনঈশ্বর ;
নাম ধরি' তাঁর ভিন্ন করিয়া
কে করিবে তাঁরে পর ?

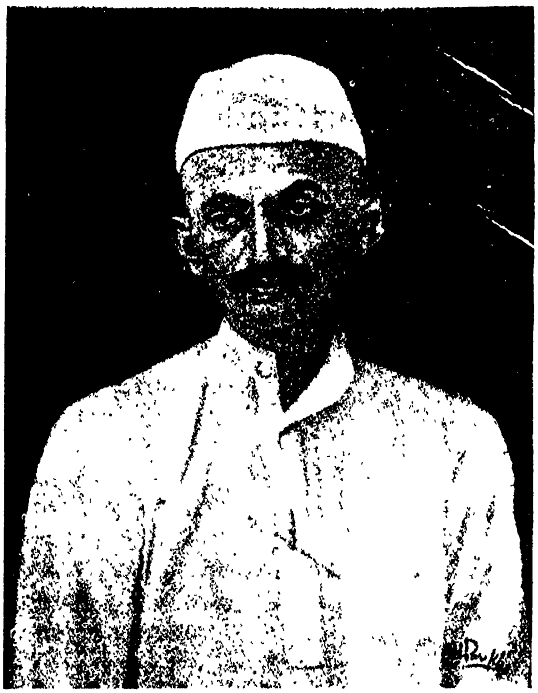
শ্রী গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধীর কারামোচন

মহাত্মা গান্ধীর কারামোচন সংবাদে আনন্দিত হইয়াছি। সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্রই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করুন।

কৌন্সিল্ প্রবেশ সম্বন্ধে তিনি কি মত প্রকাশ বা কার্য্যের সূচনা করিবেন, এখন সে-বিষয়ে কোন কল্পনা জল্পনা ও অনুমান করা অনাবশ্যক মনে করি।



মহাত্মা গান্ধী

এ-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই, যে, তাঁহার কারামোচনে জাতিগঠনমূলক কার্য্যে কেহ কেহ অধিকতর অনুরাগী হইবেন। সম্ভবতঃ এ-বিষয়ে অনেকের প্রাণে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইবে।

অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণকে মহাত্মা জাতিগঠনমূলক কার্য্যাবলীর মধ্যে প্রথম স্থান দিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারকেরা বহুবৎসর পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়াছিলেন, যে, নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর লোকদের জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী অবজ্ঞা ও ঘৃণা দূরীভূত না হইলে আমরা কখনও একজাতি হইতে পারিব না। কিন্তু তাঁহাদের কথায় বেশী লোক কান দেন নাই;—কেন দেন নাই, তাহার আলোচনা এখন করিব না। মহাত্মা গান্ধী নিজেকে সনাতনহিন্দুধর্ম্মাবলম্বী মনে করেন ও বলিয়া থাকেন। তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে একটি রাজনৈতিক প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার মহৎ চরিত্র, এবং এই বিষয়ে তাঁহার কথা অনুযায়ী কাজ, সর্ব্বসাধারণের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এইসকল কারণে, যাঁহারা কোন কালে সমাজসংস্কারের সমর্থন করিতেন না, তাঁহারাও অন্ততঃ কথায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রয়োজন স্বীকার করেন। মহাত্মা যদি তাঁহাদের কথায় ও কাজে সঙ্গতি সাধন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হইবে; এবং ইহা তাঁহার জীবনের একটি প্রধান কীর্ত্তি হইবে।

জাতিগঠনের জন্য এবং রাষ্ট্রীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের নিমিত্ত হিন্দুমুসলমানের মিলনও কম আবশ্যক নহে। এই হেতু ইহাও গঠনমূলক কার্য্যাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পানদোষ নিবারণ ও সংযত ব্যবহার, কার্পাসবৃক্ষ রোপণ, চর্‌কা, হাতের তাঁত ও খদ্দরের প্রচলন, গ্রামের লোকদিগকে গ্রামের ও দেশের অন্য লোকদের হিতের জন্য সংঘবদ্ধ করা, কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ ও কংগ্রেসের অনুমোদিত সকলরকম কাজের অনুষ্ঠান, প্রভৃতি সমুদয় গঠনমূলক কাজে, মহাত্মা গান্ধীর কারামোচনে নূতন উৎসাহ আসিবে বলিয়া আশা করিতেছি।

—

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার

বাংলার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সকলে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গীণ, এমন কথা কেহ বলেন না। কিন্তু যেমন আমাদের দৈনিক আহার্য্য দ্রব্য যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর এবং রন্ধন শ্রেষ্ঠ না হইলেও আমরা নিত্য আহার করিয়া থাকি, সেইরূপ বর্ত্তমান শিক্ষার পদ্ধতি এবং শিক্ষণীয় বিষয়সকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় না হইলেও আমরা সন্তানদিগকে বর্ত্তমান শিক্ষালয়সকলে পাঠাইয়া থাকি। যেমন খাদ্যসংস্কার ও রন্ধন-সংস্কারের প্রয়োজন, তেম্‌নি শিক্ষাসংস্কারেরও প্রয়োজন। কিন্তু যেমন খাদ্যসংস্কার ও রন্ধনসংস্কার সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ উপবাসী থাকেন না, বা থাকিবার পরামর্শও দেন না, সেইরূপ শিক্ষাসংস্কারও সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত সন্তানদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলিতে পারে না।

ছেলেদের পক্ষে যেমন এইসব কথা সত্য, মেয়েদের পক্ষেও তেম্‌নি ইহা সত্য। ইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছেলেদের শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান নহে বলিয়া যেমন ছেলেদের শিক্ষা আমরা বন্ধ রাখি নাই; তেম্‌নি ঐ শিক্ষায়তনগুলি মেয়েদের শিক্ষার ঠিক্ উপযোগী না হইলেও মেয়েদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলে না। অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যাহা জ্ঞানলাভ, জীবনযাত্রানির্ব্বাহ এবং চরিত্রগঠনের জন্য ছেলে মেয়ে উভয়েরই সমান শিক্ষণীয়। তদ্ভিন্ন ছেলে বা মেয়েদের বিশেষভাবে শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ও আছে।

মেয়েদেরও যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দরকার, তাহা অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও দেশাচার ও লোকাচারনিষ্ঠ হিন্দুগণ কাজে বা কথায় স্বীকার করিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও চিন্তাশীল লোকেরা এখন নারীদের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন।

বারাণসীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় বিশেষভাবে হিন্দুদেরই শিক্ষায়তন। উহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় দেশাচার ও লোকাচারনিষ্ঠ এবং শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি উহার গত উপাধিবিতরণ সভায় বলেন, যে, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীগণ একই শ্রেণীতে একই কক্ষে একই অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করেন; বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ বণিক্ শ্রীযুক্ত খাটাউ মাকন্‌জি মহাশয়ের বদান্যতায় শীঘ্রই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস নির্ম্মিত হইবে, এবং তাহাতে একশত ছাত্রীর স্থান হইবে। দেশের লোকেরা স্ত্রীশিক্ষায় যথেষ্ট মনোযোগী নহেন বলিয়া মালবীয় মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন।

নারীদের উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আর একজন শাস্ত্রজ্ঞ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের মত উদ্ধৃত করিব। তাহা আরও উৎসাহজনক। কারণ মালবীয় মহাশয় সম্বন্ধে কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন, যে, তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও আচারনিষ্ঠ হইলেও, পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। অধিকন্তু, তিনি নারীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী বাঙালী হিন্দুসমাজেরই লোক; পূর্ব্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। গত পৌষ মাসে প্রয়াগে উত্তরভারতীয় বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলেন:—

> সাহিত্যই জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত ভিত্তি—জননী বঙ্গভূমিতে বিরাট ভাবের বন্যা বহিয়াছে, সেই বন্যার প্রবাহে যে বিরাট বিশ্ববিস্ময়কর বাঙ্গলা-সাহিত্য-সাগর ক্রমেই উদ্বেল ভাব ধারণ করিতেছে, সেই মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্য উত্তরভারত-প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবভাগীরথী সৃষ্টি করিতে হইবে। উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন ভগীরথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মঙ্গল-শঙ্খ-ধ্বনি করিবার জন্য ত্রিবেণীসঙ্গমে অবগাহন করিয়াছে—এই শঙ্খের গভীর ধ্বনিতে যদি প্রবাসী বাঙ্গালীর হৃদয়ে সাড়া পড়ে তবে তাহাই আমাদিগের নব জাতীয় জীবনের জাগরণ হইবে। প্রবাসে বাঙ্গালীর এই নব জাগরণ যেন কেবল পুরুষের জাগরণেই পরিণত না হয়। জাতীয় সাহিত্যের দ্বারা জাতীয় জীবন সংস্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কুললনাগণের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন একান্ত আবশ্যক। প্রবাসী বাঙ্গালী কবিই আমাদিগকে প্রথমে শিখাইয়াছেন, প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে তিনিই প্রথমে গাহিয়াছেন—
>
> "না জাগিলে আর ভারত ললনা—
> এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"
>
> আমার মনে হয় আমাদের এই সাহিত্যসম্মিলনের—এই উত্তর-ভারতের রাজধানী প্রয়াগে বাঙ্গালী মহিলাদিগের জন্য একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উচ্চবিদ্যালয় বা কালেজ স্থাপনই সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হওয়া উচিত। কেবল বৎসরান্তে মিলিত হইয়া সুচিন্তিত কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ

বা শ্রবণ করিলেই যে আমরা কৃতকৃত্য হইতে পারিব তাহা নহে, নূতন করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিবার প্রধান উপকরণ হইতেছে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি। সেই শিক্ষার প্রসার স্ত্রীজাতির মধ্যে যত অধিক পরিমাণে হইবে তত শীঘ্র আমরা সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকে অধিক বেগে অগ্রসর হইতে পারিব,—ইহাই হইল ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র, ইহা ভুলিয়াছি বলিয়াই আজ আমরা এই হীন দশায় উপনীত হইয়াছি। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিকার মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"।

—এই মনুবচনে 'অতিযত্নতঃ' এই পদটির প্রতি নিপুণভাবে লক্ষ্য করা উচিত।"

শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির অসম্পূর্ণতা দূরীকরণ এবং সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন অবশ্যই করিতে হইবে; কিন্তু শিক্ষা বর্জ্জন করিলে বা বন্ধ রাখিলে চলিবে না।

তর্কভূষণ মহাশয় প্রয়াগে বাঙালী মহিলাদিগের জন্য যে উচ্চ বিদ্যালয় বা কালেজ স্থাপন করিতে বলিয়াছেন, জগৎতারণ বালিকা বিদ্যালয়ের সম্যক্ উন্নতিসাধন করিলে তাহাই ঐরূপ শিক্ষালয়ে পরিণত হইবে। উত্তর ভারতীয় বাঙালীগণ ইহার প্রতি মনোযোগী হউন।

—

অন্ধ্র জাতীয় কলাশালা

অন্ধ্র জাতীয় কলাশালার চিত্রশিল্পবিভাগ দেড় বৎসর হইল খোলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। সুখের বিষয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার উন্নতি আশাপ্রদ হইয়াছে। প্রথম বৎসরে কলিকাতার প্রাচ্যচিত্রপ্রদর্শনীতে সেখান হইতে ১৯খানি ছবি প্রেরিত হয়—সাতখানি ছাত্রদের, বারোখানি অধ্যক্ষের আঁকা। দ্বিতীয় বৎসরে তাঁহাদের ৩৬খানি ছবি প্রদর্শিত হয়—ছাত্রদের ১৯খানি, অধ্যক্ষের ১৭খানি। দ্বিতীয় বৎসরের ছবিগুলির সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি শিল্পীমণ্ডলী নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

"তোমার এবং তোমার ছাত্রবর্গের লিখিত চিত্রাবলী দেখিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইলাম। আমরা সকলে দিন দিন তোমার ও তোমার শিষ্যগণের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি।

"তোমার রচিত 'মনসা,' 'ষষ্ঠীমাতা,' 'বিশ্বকর্ম্মা,' ও 'শ্রীচৈতন্য' এবারে প্রদর্শনীতে আমাদের ও সাধারণের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইল; ইহাতে আমরা নিজেদেরও গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি।

"তোমার কল্যাণ হোক্। বৃদ্ধি লাভ কর। সিদ্ধিরস্তু শিবংচাস্তু—মহালক্ষ্মীঃ প্রসীদতু।"

বাঙালীর সংখ্যা

বাঙালীর সংজ্ঞা দুইরকম হইতে পারে। বাংলাদেশে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে বাঙালী বলা যায়; আবার, যাহারা বাংলা ভাষায় কথা বলে, বাংলা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের নিবাস যেখানেই হউক, তাহাদের নাম বাঙালী। কিন্তু বাংলাদেশে এমন অনেক লোক স্থায়ী-বা অস্থায়ী-ভাবে বাস করে, যাহারা জাতিতে বা ভাষায় বাঙালী নহে। অন্যদিকে, ইংরেজের শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য যে ভূখণ্ডকে বাংলা বলিয়া চিহ্নিত ও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, প্রাকৃতিক বাংলাদেশ তাহা অপেক্ষা বড়, ও তাহার বাহিরেও বিস্তৃত; এবং বঙ্গের বাহিরেও জাতিতে ও ভাষায় বাঙালী অনেক লোক বাস করে। এইজন্য বাংলা যাহাদের ভাষা, তাহাদিগকেই বাঙালী নামে অভিহিত করা ভাল।

১৯২১ সালের গণনা অনুসারে ভারতসাম্রাজ্যে ৪৯২৯৪০৮৯ অর্থাৎ প্রায় পাঁচকোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলিত। ১৯১১ সালের গণনায় ইহাদের সংখ্যা ৪৮৩৬৭৯১৫ ছিল। অতএব দশ বৎসরে বাঙালীর সংখ্যা ৯২৬১৮৪ বাড়িয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, বাঙালীর সংখ্যা শতকরা দুইজনও বাড়ে নাই।

ইংরেজের শাসনসৌকর্য্যার্থ ভারতবর্ষ যে-সকল প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন্‌টিতে কত বাঙালী ১৯১১ ও ১৯২১ সালের গণনা অনুসারে ছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখাইতেছি।

বাঙালীর সংখ্যা

প্রদেশ	১৯১১	১৯২১
এডেন	০	০
আজমের মেড়োআরা	২৯১	৪০৯
আণ্ডামান নিকোবর	১৬৪৮	১২১৩
আসাম	৩২২৪১৩০	৩৫২৫২২০

প্রদেশ	১৯১১	১৯২১
বালুচীস্তান	০	০
বাংলা	৪১৮৯৯২১০	৪৩০৭১৩৩৪
বিহার-ওড়িষা	২১৮৬০২০	১৫৬৮১৩৮
বোম্বাই	১৭৫২	৩৭২০
ব্রহ্মদেশ	২৮৪৩১০	৩০১০৩৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২৩৮৬	৩৩৯৮
কূর্গ	০	০
দিল্লী	—	২৬৭১
মান্দ্রাজ	১১৬৬	১২৮২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০	২১৭
পঞ্জাব	২১১৬	২০৫৩
আগ্রা অযোধ্যা	২২৫০০	২৩১৬০
আসাম দেশীরাজ্য (মণিপুর)	৪৭৪	৭০৩
বালুচীস্তান " "	০	০
বড়োদা "	০	০
বঙ্গ " "	৬৬৬৬১৮	৬৯৮০৬০
বিহার-ওড়িষা " "	১০৮৯২৪	৮৮৮৫২
বোম্বাই " "	০	০
মধ্যভারত এজেন্সী	৮৯৪	৬৩৬
মধ্যভারত দেশীরাজ্য	১৫৪	১৪৮
গোয়ালিয়র	—	২৬২
হায়দরাবাদ	১৯৪	০
কাশ্মীর	০	০
মান্দ্রাজ দেশীরাজ্যসমূহ	০	০
কোচীন	০	০
ত্রিবাঙ্কুড়	০	১১২
মৈসূর	০	০
উ-প সীমান্ত " "	০	০
পঞ্জাব " "	০	১২৮
রাজপুতানা এজেন্সী	৬.৯	৬০৫
সিকিম	০	০
আগ্রা-অযোধ্যা দেশীরাজ্যসমূহ	১১২	২৯৪

আণ্ডামানে বাঙালীর সংখ্যা হ্রাস সন্তোষের বিষয়। যদি বাঙালী কখনও ঐ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ঔপনিবেশিক বাঙালীদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে, তাহাও সন্তোষের বিষয় হইবে। বালুচীস্তানে একজনও বাঙালী ছিল না, দেখা যাইতেছে। যে যে প্রদেশে বাঙালীর উল্লেখ নাই, সেখানে বাঙালী বাস্তবিকই ছিল না, কিম্বা থাকিলেও তাহাদিগকে "অন্যান্য ভাষা"-(other languages) ভাষীদের মধ্যে ফেলা হইয়াছে, বলা যায় না। এখন যদি কোন বাঙালী সেখানে থাকেন, তিনি এবিষয়ে কিছু লিখিলে আহ্লাদিত হইব। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯১১ সালে কোন বাঙালী ছিল না, ১৯২১এ সেখানে তাহাদের সংখ্যা ২১৭ কেমন করিয়া হইল, তাহা তথাকার কোন প্রবাসী বাঙালী লিখিলে বাধিত হইব।

১৯১১ সালের গণনার সময় দিল্লী স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল না, ১৯২১ সালে ছিল। এইজন্য ১৯১১ সালে দিল্লীর স্বতন্ত্র উল্লেখ ছিল না। বড়োদায় এখন বাঙালী আছেন, জানি। কিন্তু ১৯১১ বা ১৯২১ কোন সালেই তাঁহাদের কোন উল্লেখ নাই কেন, তথাকার বাঙালীরা বলিতে পারিবেন। নিজামের রাজ্য হায়দরাবাদে ১৯১১ সালে ১৯৪ জন বাঙালী ছিলেন, এখনও অন্ততঃ কয়েকজন বাঙালী সেখানে আছেন; অথচ হঠাৎ তাঁহাদের সংখ্যা শূন্যে পরিণত কেমন করিয়া হইল, এ প্রশ্নের উত্তর হায়দরাবাদপ্রবাসী কোন বাঙালী দিতে পারিবেন। ১৯১১ সালের তালিকায় গোয়ালিয়র রাজ্যের স্বতন্ত্র উল্লেখ ছিল না। ১৯২১এ সেখানে ২৬২ জন বাঙালী দেখা যাইতেছে। ১৯১১তে ত্রিবাঙ্কুড়ে কোন বাঙালীর উল্লেখ নাই, ১৯২১এ ১১২ জন দেখা যাইতেছে। পঞ্জাবের দেশীরাজ্যসমূহে ১৯১১তে বাঙালীর উল্লেখ নাই, ১৯২১এ তাহাদের সংখ্যা ১২৮।

বিহার-ওড়িষায় দশ বৎসরে ৬১৭৮৮২ জন এবং বিহার-ওড়িষার সামিল দেশীরাজ্যসমূহে ২০০৭২ জন বাঙালী কেন কমিল, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। ১৯২১ সালের বিহার-ওড়িষা সেন্সস্ রিপোর্টে ইহার কারণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য দিতেছি।

পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্ব-অংশে যে অপভাষা (dialect) কথিত হয়, তাহাকে কিষণগঞ্জিয়া বলে। ৬০৩৬২৩ জন লোক এই ভাষায় কথা বলে। ১৯১১ সালে এই অপ-ভাষাকে বাংলার অপভ্রংশ বলিয়া ধরা হইয়াছিল ; ১৯২২-এ উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। কিষণগঞ্জ মহকুমার সব্-ডিবিজন্যাল অফিসারের মতে উহা হিন্দী ; এইজন্য উহাকে হিন্দী বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাঁর মাতৃভাষা সম্ভবতঃ কোনরকমের হিন্দী বা বিহারী, কিম্বা ইংরেজী ; হয়ত এই কারণে তিনি বাংলার বিরুদ্ধে রায় দিয়াছেন। যাহা হউক, ঐ মহকুমার হিন্দীভাষী ও বাংলাভাষীদের দ্বারা ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষা, মাতৃসাহিত্য-চর্চ্চা, এবং সামাজিক প্রতিপত্তি যত বাড়িবে, তাহাদের ভাষার প্রসারও তত বাড়িবে। এই মহকুমার কথা ছাড়িয়া দিলে, মোটের উপর বিহারে বাংলাভাষীর সংখ্যা সামান্যরকম বাড়িয়াছে। বিহার-ওড়িসায় গণিত অধিকাংশ বাঙালী প্রবাসী বাঙালী নহে। কারণ উহাদের ১৬৫৬৯৯০ জনের মধ্যে ১৫৩০১১১জন অর্থাৎ শতকরা ৯২.৩ জন বঙ্গ ও বিহার-ওড়িষার সীমাস্থিত জেলাগুলিতে ও দেশী রাজ্যগুলিতে বাস করে। এইসব স্থান প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত, ইংরেজের সুবিধার জন্য বিহার-ওড়িষার সামিল করা হইয়াছে। বিহার-ওড়িষার ঠিক প্রবাসী বাঙালী সওয়া লক্ষ (১২৬৮৮০) লোককে বলা যাইতে পারে। ওড়িষার দেশীরাজ্যসকলে বাংলাভাষীর সংখ্যা কমিয়াছে : ইহার অধিকাংশ হ্রাস ময়ূরভঞ্জে হইয়াছে।

—

বঙ্গের অবাঙালীর সংখ্যা

বিহার-ওড়িষা এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের এবং আরো কোন কোন স্থানের লোকদের অনেকে মনে করে, যে, বাঙালী তাহাদের দেশ লুটিয়া খাইতেছে। এই ধারণা ভ্রান্ত। বঙ্গের বাহিরে কোথায় কতজন বাঙালী আছে, তাহা উপরের তালিকায় দেখাইয়াছি। এখন নীচের তালিকায় দেখুন, বাংলা ভিন্ন অন্যভাষাভাষী কত লোক বঙ্গে বাস করে। অসভ্য সাহিত্যবিহীন আদিমনিবাসীদের ভাষাগুলি প্রায় সবই বাদ দিলাম।

ভাষা।	ভাষীর সংখ্যা।
আরাকানী	৫৩০২৯
অসমিয়া	৯১৫
ভোটিয়া	১৫২৯৯
ব্রহ্মদেশীয়	১৯৭১৬
পূর্ব্বপাহাড়ী (খাস্)	৯২২৯১
মরাঠী	২৬৫১
নেওয়ারী	৮২৩৭
ওড়িয়া	২৯৩৭০০
পঞ্জাবী	৪৯০৪
পষ্‌তো (কাবুলী)	১৭৩৪
রাজস্থানী	১৬৫৮৪
সিন্ধী	২৩৪
তামিল	৩৪৮৮
তেলুগু	২৪৫১৩
হিন্দী	১১৭৫৮৯৮
আরবী	৪৬২
আর্মানী	১৯১
চীন	৪৫০০
হীব্রু	৬২২
জাপানী	৩৭৬
ফারসী	৫৮৬
ইংরেজী	৪৬৩৭৮
ফরাসী	১৩০
গ্রীক	৭১
ইতালীয়	৪৬
পোর্তুগীজ্	২৯৫

—

আসামে বাঙালী

আসামের মোট অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। তাহার মধ্যে বাঙালী সওয়া ৩৫ লক্ষের উপর, এবং অসমিয়া-ভাষী সওয়া ১৭ লক্ষের উপর। বাঙালীরা সবাই আগন্তুক নহে। বঙ্গের সন্নিহিত জেলাগুলি প্রাকৃতিক বঙ্গের অন্তর্গত। শ্রীহট্ট শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব-পুরুষদের পিতৃভূমি ছিল। আসামের যে-সব জেলা

বঙ্গের সন্নিহিত নহে, তাহাতেও বহুসংখ্যক বাঙালী বাস করিতেছে।

—

ভারত সাম্রাজ্যের বাহিরে বাঙালী

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের বাহিরে পৃথিবীর কোথায় কত বাঙালী আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কোন পুস্তক হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। দূর দূর দেশে যাঁহারা থাকেন, তাঁহারা ঠিক্ তথ্য সংগ্রহ করিয়া বাংলাদেশের কাগজে লিখিলে বাঙালীরা জানিতে পারে।

—

বঙ্গে আগমন ও তথা হইতে বহির্গমন

১৯২১ সালের মানুষগুন্তিতে দেখা গিয়াছিল, যে, বঙ্গের বাহির হইতে ১৮,৩৯,০১৬ জন মানুষ বঙ্গে আসিয়াছে, এবং ৬,৮৬,১৯৫ জন বঙ্গের বাহিরে গিয়াছে। কোন্ প্রদেশ হইতে কত মানুষ বাংলায় আসিয়াছে, তাহা নীচে দেখান গেল।

প্রদেশ	আগন্তুকের সংখ্যা
বিহার-ওড়িষা—	১২,২৭,৫৭৯
আগ্রা-অযোধ্যা—	৩,৪৩,০৯৫
আসাম—	৬৮,৮০২
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—	৫৪,৮১০
রাজপুতানা—	৪৭,৮৬৫
মাদ্রাজ—	৩২,০২৪
পঞ্জাব ও দিল্লী—	১৭,৭১৫
সিকিম—	৪,০৫৭
ব্রহ্মদেশ—	২,৩৬১
নেপাল—	৮৭,২৮৫
ইউরোপ—	১৩,৩৫৬
চীন—	৩,৮৫৬

বিহার-ওড়িষার কিম্বা আগ্রা-অযোধ্যার বা অন্য কোন প্রদেশের ভাষাভাষী যত লোক বাংলাদেশে আছে, তাহাদের সংখ্যার সহিত ঐ ঐ প্রদেশ হইতে আগত লোকদের সংখ্যা মিলিবে না। কারণ অনেক অবাঙালীর জন্মভূমি বাংলা, সুতরাং তাহাদিগকে আগন্তুক বলিয়া ধরা হয় নাই; কিন্তু ভাষা অনুসারে গণনার সময় তাহাদের ভাষা অনুসারে তাহাদের গুন্তি হইয়াছে।

বাংলাদেশ হইতে মানুষ গিয়াছে—

আসামে—	৩,৭৫,৫৭৮
ব্রহ্মে—	১,০৬,০৮৭
বিহার-ওড়িষায়—	১,১৬,৯২২
আগ্রা-অযোধ্যায়—	১৮.৬৩৪
মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে—	৩,২৭৪
রাজপুতানায়—	৭৭৪
মান্দ্রাজে—	৩,৩৪৮
পঞ্জাব ও দিল্লীতে—	৫,৯৫০
বোম্বাইয়ে—	৮,৪৭০
সিকিমে—	১,৫৬৬

যাহারা বাংলাদেশ হইতে অন্যত্র গিয়াছে, তাহাদের সকলকে বাঙালী মনে করিলে ভুল করা হইবে। উপরের তালিকা হইতে কেবল ইহাই জানা যায়, যে, বহির্যাত্রীদের জন্মস্থান বাংলা দেশ। তাহাদের মধ্যে কত জন বাঙালী, কতজন নহে, তাহা জানিবার উপায় নাই। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী কতজন আছে, তাহা কেবলমাত্র ভাষা অনুসারে গণনার ফল হইতেই জানা যায়। তাহা আগে এক তালিকায় দেখাইয়াছি।

যাহা হউক, সমুদয় বহির্যাত্রীকে বাঙালী বলিয়া ধরিলেও দেখা যায়, যে, বিহার-ওড়িষা, আগ্রা-অযোধ্যা, নেপাল, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, রাজপুতানা, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব ও দিল্লী, ইউরোপ, বোম্বাই, সিকিম এবং চীনের যত মানুষ বাংলা দেশে অন্ন করিয়া খায়, তত বাঙালী ঐ ঐ দেশে অন্ন করিয়া খায় না।

—

ধর্ম্মসম্প্রদায়-সমূহের লোকসংখ্যা

সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যে ১৮৮১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি কিরূপ হইয়াছে, নীচের তালিকায় তাহা দেখান হইল।

শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি (বৃঃ=বৃদ্ধি, হ্রাঃ=হ্রাস।)

	১৯১১-১৯২১	১৯০১-১৯১১	১৮৯১-১৯০১	১৮৮১-১৮৯১	১৮৮১-১৯২১
হিন্দু	হ্রাঃ ·৫	বৃঃ ৫·০	হ্রাঃ ·৩	বৃঃ ১০·১	বৃঃ ১৪ ৯
আর্য্যসমাজী	বৃঃ ৯২·১	বৃঃ ১৬৩ ৪	বৃঃ ১৩১·৩	...	...
ব্রাহ্ম	বৃঃ ১৬·১	বৃঃ ৩৫·৯	বৃঃ ৩২·৭	বৃঃ ১৬৫·৯	বৃঃ ৪৫৬·৯
শিখ	বৃঃ ৭·৪	বৃঃ ৩৭·৩	বৃঃ ১৫·১	বৃঃ ২·৯	বৃঃ ৭৪·৭
জৈন	হ্রাঃ ৫ ৬	হ্রাঃ ৬·৪	হ্রাঃ ৫·৪	বৃঃ ১৫·৯	হ্রাঃ ৩·৫
বৌদ্ধ	বৃঃ ৭·৯	বৃঃ ১৩·১	বৃঃ ৩২·৯	বৃঃ ১০৮·৬	বৃঃ ২৩৮·৫
ইরানীয় (পার্সী)	বৃঃ ১·৭	বৃঃ ৬·৩	বৃঃ ৪·৭	বৃঃ ৫·৩	বৃঃ ১৯·২
মুসলমান	বৃঃ ৫·১	বৃঃ ৬·৭	বৃঃ ৮·৯	বৃঃ ১৪·৩	বৃঃ ৩৭·১
খৃষ্টিয়ান	বৃঃ ২২·৬	বৃঃ ৩২·৬	বৃঃ ২৮ ০	বৃঃ ২২·৬	বৃঃ ১৫৫·২
ইহুদী	বৃঃ ৩ ৮	বৃঃ ১৫·১	বৃঃ ৬·০	বৃঃ ৪৩·১	বৃঃ ৮১·৩
আদিমজাতীয়	হ্রাঃ ৫·১	বৃঃ ১৯ ৯	হ্রাঃ ৭·৫	বৃঃ ৪১·২	বৃঃ ৪৮ ৮

১৯১১-২১ দশকে সমগ্র-ভারতে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে। বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা সামান্য বাড়িয়াছে। হিন্দুদের বৃদ্ধি জন্ম দ্বারা হয়, এবং আদিম নিবাসীদিগকে হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া হয়। হিন্দুদের হ্রাস হয়, প্রধানতঃ খৃষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষার দ্বারা, শিখ ও আর্য্যসমাজে দীক্ষার দ্বারা, এবং কিয়ৎপরিমাণে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ দ্বারা। এইরূপ একটি ধারণা চলিত আছে, যে, হিন্দুদের জীবনী শক্তি ও উৎপাদিকা শক্তি মুসলমানদের চেয়ে কম। তা ছাড়া, যেসব প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ছিল, সেখানে ১৯১১-২১ দশকে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপ বেশী হইয়াছিল। এইসব কারণে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়াছে। হিন্দুদের জীবনী শক্তি ও উৎপাদিকা শক্তি কম কিনা, এবং কম হইলে তাহার কারণ কি, তদ্বিষয়ে হিন্দুদের গবেষণার প্রয়োজন। বাল্যমাতৃত্ব এবং চিরবৈধব্য হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি যথেষ্টরূপ না হওয়ার দুটি কারণ। মৃত্যুর হারও মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বেশী। নীচে তাহা দেখান হইল।

হাজারকরা মৃত্যুর হার।

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান।
১৯১১	৩৩·৪	২৯·৫
১৯১২	৩০·৪	২৭·৬
১৯১৩	২৯·০	২৮·৪
১৯১৪	৩০·১	৩০·২
১৯১৫	২৯·১	৩২·০
১৯১৬.	২৯·২	২৮·৩
১৯১৭	৩৩·৩	৩১·৯
১৯১৮	৬৪·৬	৫৬·১
১৯১৯	৩৬·৪	৩৩·৬
১৯২০	৩১·০	৩০·০

ভারতীয় মুসলমানদের একতৃতীয়াংশ বঙ্গে বাস করে, এবং তথায় তাহারা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর পূর্ব্ব অঞ্চলেই বেশীর ভাগ বাস করে। তাহাদের পঞ্চমাংশ পঞ্জাবে বাস করে। মোটের উপর উহা স্বাস্থ্যকর প্রদেশ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচীস্থানের শতকরা ৯০ জন মুসলমান, কাশ্মীরের রকম বারো আনা মুসলমান। এইসব অঞ্চল স্বাস্থ্যকর। অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, এবং প্রায়ই সহরে বাস করে; সেইজন্য, শহরে গ্রাম অপেক্ষা চিকিৎসার সুবিধা অধিক থাকায়, তাহারা এইসব প্রদেশে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মরিয়াছে কম। বিধবাবিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, হিন্দুদের মত খুব অল্পবয়সে তাহাদের বিবাহ হয় না, ইত্যাদি কারণেও তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হিন্দুদের চেয়ে অধিক হইয়া থাকে।

জৈনরা অনেকে এখনও আপনাদিগকে হিন্দু মনে করে, হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করে, এবং তাহাদের উৎসব পর্ব্বাদিতে যোগ দেয়। গত কুড়ি বৎসরে জৈন ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন-চেষ্টা প্রবল হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও, ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যায় জৈনগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় সেন্সসে তাহাদের সংখ্যা কম হইয়াছে কিনা, বলা যায় না। পঞ্জাব ও বোম্বাইয়ের সেন্সস্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌রা এইরূপ সন্দেহ করেন বটে। হিন্দুদের মত জৈনদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ও বিধবাবিবাহ অপ্রচলিত। তা ছাড়া, তাহারা বেশীর ভাগ যেসব প্রদেশে বাস করে, সেইসব প্রদেশে লোকসংখ্যার হ্রাস হইয়াছে। এইসকল কারণে তাহাদের ক্রমিক হ্রাস হইতেছে।

ব্রাহ্মদের শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী হইয়াছে। কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে, যে, বাস্তবিক সংখ্যায় তাহারা খুব বাড়িয়াছে; প্রকৃত কারণ এই, যে, তাহাদের সংখ্যা

কম, সুতরাং ২।৪ জন বাড়িলেই শতকরা বৃদ্ধি খুব বেশী হয়। যেমন, কোন সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১০ হইতে বাড়িয়া ৫০ হইলে তাহার বৃদ্ধি শতকরা ৪০০ হয়; কিন্তু কোন সম্প্রদায় এক কোটি হইতে বাড়িয়া এক কোটি দশলক্ষ হইলে শতকরা বৃদ্ধি দশ মাত্র হয়। অথচ প্রথম স্থলে মোট ৪০ জন মাত্র লোক বাড়িয়াছে, দ্বিতীয় স্থলে দশ লক্ষ বাড়িয়াছে। আর্য্যসমাজীদের সংখ্যা ব্রাহ্মদের চেয়ে অনেক বেশী; কিন্তু হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানদের তুলনায় তাহাদেরও সংখ্যা খুব কম; সেই জন্য তাহাদেরও শতকরা বৃদ্ধি ব্রাহ্মদের মত অধিক দেখাইতেছে। ভারত-সাম্রাজ্যে ১৯২১ সালে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকসংখ্যার তালিকা নীচে দিলাম।

ধর্ম্ম।	লোক সংখ্যা।
হিন্দু	২১৬২৬০৬২০
আর্য্য	৪৬৭৫৭৮
ব্রাহ্ম	৬৩৮৮
শিখ	৩২৩৮৮০৩
জৈন	১১৭৮৫৯৬
বৌদ্ধ	১১৫৭১২৬৮
পারসী	১০১৭৭৮
মুসলমান	৬৮৭৩৫২৩৩
খৃষ্টিয়ান	৪৭৫৪০৬৪
ইহুদী	২১৭৭৮
আদিমজাতীয়	৯৭৭৪৬১১
অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী	১৮০০৪

"ব্রাহ্ম" ও "ব্রাহ্মণ" কথা-দুটির উচ্চারণ একরকম বলিয়া, অনেক ব্রাহ্ম আপনাদিগকে হিন্দু মনে করেন বলিয়া, এবং কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মদের সংখ্যা ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী গণনাকারীরা কম করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া, তাহাদের সেন্সসের সংখ্যা নির্ভুল নহে। তাহার কিছু প্রমাণ দিতেছি। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে ব্রাহ্মের সংখ্যা মোট চারিজন দেখান হইয়াছে। ইহা হাস্যকর ভুল। শুধু বোম্বাই শহরেই আমাদের জানা ব্রাহ্ম ৪ জন অপেক্ষা বেশী আছে। সিন্ধু প্রদেশে অনেক ব্রাহ্ম আছে, অথচ সেন্সসে তাহাদের সংখ্যা শূন্য দেখান হইয়াছে।

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশী মন্তব্য

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি সম্বন্ধে বিদেশে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে। তাহার মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিব।

বিলাতের ডেলী মেল বলেন, যে, মিষ্টার গান্ধীকে বিনা সর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই; কোনপ্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। ডেলী মেল গান্ধী মানুষটিকে চিনেন না, তাই এমন কথা বলিয়াছেন। মুক্তির পর মহাত্মা তাহাতে উল্লসিত হন নাই—সে কথা পরে বলিতেছি; কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বেও যখন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহিত হাঁসপাতালে দেখা করিতে গিয়াছিলেন, তখন মুক্তির কথা উঠায় গান্ধী মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, যে, কারা-মোচনের জন্য কোনপ্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ হওয়ার কথা উঠিতেই পারে না এবং তিনি খালাস পাইলেও গবর্ণ্মেণ্টের সহিত তাঁহার বর্ত্তমান বিবাদ থাকিবে—অবশ্য যতদিন না স্বরাজ লব্ধ হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরের টাইম্‌স্ কাগজ এই কথা তুলিয়াছেন, যে, বুঅর যুদ্ধের পর বুঅর নেতা বোথা, স্মাটস্ প্রভৃতি যেমন ইংরেজদের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিতেছেন, মিষ্টার গান্ধী এখন ইংরেজদের সহিত সেইরূপ সহযোগিতা করিবেন কিনা। এমন কথাটা বিলাতী কোন কাগজ বলিলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইত না; কারণ ইংরেজরা সাধারণতঃ আমাদিগকে এরূপ অপদার্থ মনে করে, যে, আমাদিগকে অতি সামান্য কোন অধিকার দিয়া তাহারা তাহার প্রতিদানে অনন্ত কৃতজ্ঞতা, অপরিসীম বাধ্যতা এবং কায়মনোবাক্যে সহযোগিতার আশা অনায়াসেই করিতে পারে। কিন্তু সকল মানবের সাম্যবাদী আমেরিকান্‌দের মধ্যে কেহ একথা বলিলে আপাততঃ বিস্ময়েরই উদ্রেক হয়। কিন্তু, কথায় বলে, কোনও রুশীয়ের গায়ে একটা আঁচড় দিলেই দেখিতে পাইবে, যে, সে তাতারজাতীয়। সেইরূপ, আমেরিকাবাসী ইংরেজের বংশধররা এবং অন্যজাতীয় আমেরিকান্‌রাও সাধারণতঃ অশ্বেত লোকদিগকে অবজ্ঞা করে। সেই জন্য বুঅরেরা যুদ্ধের পর কি পাইয়াছিল, এবং আমরা

ভারতশাসনসংস্কার আইন দ্বারা কি পাইয়াছি, তাহা না ভাবিয়া ও তুলনা না করিয়াই নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ওরূপ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। বুঅর যুদ্ধের পর দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছে। আমরা সমগ্রভারতের সকল রাষ্ট্রিয় বিভাগের কর্ত্তা হওয়া দূরে থাক্, কোন একটা প্রদেশের সমুদয় আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও কর্তৃত্ব লাভ করি নাই। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপনিবেশিকদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের সহিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকারের যখন তুলনাই হয় না, তখন তাহাদের নেতাদের ব্যবহারের সহিত আমাদের নেতাদের ব্যবহারের সাদৃশ্য বা ঐক্য আশা করা উচিত নয়। এরূপ আশা যে করা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়, যে, শ্বেতকায়দের মতে শ্বেতকায়েরা ষোল আনা অধিকার পাইয়া যেরূপ প্রতিদান করে, ভারতীয়েরা সাড়ে তিন পাই পাইয়াও সেইরূপ প্রতিদান করিতে বাধ্য।

বুঅর নেতাদের সহযোগিতাও চমৎকার। ভারতীয়েরা ব্রিটিশসাম্রাজ্যের স্বশাসক অংশগুলিতে গেলে কিরূপ ব্যবহার পাইবে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য কমিটি-নিয়োগে আর সবাই রাজী হইল, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি জেনার‍্যাল্ স্মাট্‌স্ রাজী হইলেন না—যদিও কমিটি নিযুক্ত হইলেই যে ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শ্বেতকায়দের সমান অধিকার দেওয়া হইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই।

—

মুদ্রার ক্রয়শক্তি ও আন্তর্জাতিক বিনিময়ের হার

বহু পুরাকালে মানুষ বেশী ক্রয়বিক্রয় করিত না। যাহা কিছু অল্প ক্রয়বিক্রয় মানুষের প্রয়োজন হইত, তাহা সাক্ষাৎভাবে দ্রব্য বিনিময় করিয়াই চলিত। যথা, কর্ম্মকার অস্ত্রের বিনিময়ে খাদ্য দ্রব্য অথবা বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া লইত। সেই সময়ে এইরূপ দ্রব্য বিনিময় করিয়া জীবনযাপন সম্ভব ছিল; তাহার কারণ, মানুষের ব্যবহার্য্য দ্রব্যের সংখ্যা তখন অল্পই ছিল এবং যাহা প্রয়োজন তাহা প্রায় সকলেই নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়া লইত। কিন্তু মানুষ ক্রমেই নূতন নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া নিজের জীবন জটিলতাময় করিয়া তুলিতে লাগিল এবং ফলে শীঘ্রই প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রস্তুত নানা দ্রব্য আহরণ না করিয়া জীবনযাপনে অক্ষম হইয়া পড়িল। এই অভাবপূরণের ব্যাপার শীঘ্রই এরূপ জটিল হইয়া উঠিল, যে, সাক্ষাৎভাবে দ্রব্য বিনিময় করিয়া তাহার সমাধান অসম্ভব হইয়া উঠিল। যথা, চর্ম্মকার দেখিল, যে, তাহার পক্ষে নিজের সকল অভাব নিজে পূরণ করাও (যথা, চাল, ডাল, তেল, নুন, জামা, কাপড়, বাসন, ঔষধ, অলঙ্কার, অস্ত্র, ; যন্ত্র, আস্‌বাব প্রভৃতি সংগ্রহ) যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ চর্ম্মদ্রব্য লইয়া নানা স্থানে চর্ম্মদ্রব্য-গ্রহণেচ্ছুক অপর-দ্রব্য-উৎপাদকের সন্ধান করিয়া তাহাদের নিকটই সাক্ষাৎ বিনিময়ের সাহায্যে নিজ অভাবপূরণও অসম্ভব। সাক্ষাৎ বিনিময়ের অসুবিধার ফলে বিনিময়োপায়ের, অথবা যে-সকল বস্তুর পরিবর্ত্তে সমাজস্থিত সকলেই সকল দ্রব্য দান বা গ্রহণে প্রস্তুত হইবে সেইসকল বস্তুর, সৃষ্টি। মুদ্রা এইসকল বিনিময়োপায়ের ক্রমবিকাশের ফল। মুদ্রার সাহায্যে মানুষ বর্ত্তমানে সকলপ্রকার ক্রয় বিক্রয় করে। যথা শ্রমিক তাহার শ্রম মুদ্রার পরিবর্ত্তে বিক্রয় করে। ইহা মাহিনা নামে পরিচিত। ধনিক তাহার ধন মুদ্রার (সুদের) পরিবর্ত্তে অপরকে অল্প বা অধিক কালের জন্য বিক্রয় করে, ইত্যাদি। মুদ্রার কোন যথার্থ মূল্য অথবা নিজস্ব প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও চলে; এমন কি বর্ত্তমান কালে বহুক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময় সহজসাধ্য করা প্রভৃতি কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। অধিক স্থলেই মুদ্রা কাগজখণ্ড মাত্র। ইহা ব্যতীত অন্য অনেক-প্রকার মুদ্রার যথার্থ মূল্য অপেক্ষা ক্রয়শক্তি অধিক। যথা, একটি রূপার টাকায় যে-পরিমাণ রূপা আছে, সেই পরিমাণ রূপা ক্রয় করিতে এক টাকা অপেক্ষা কম অর্থের প্রয়োজন হয়। মুদ্রার ক্রয়শক্তি তাহার নিজস্ব মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়ার কারণ তাহার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা। যদি মুদ্রার সংখ্যা অপ্রতিহতভাবে বাড়িয়া যাইবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে তাহার ক্রয়শক্তি তাহার যথার্থ মূল্যের সমান

হইয়া দাঁড়াইত। প্রায় সকল দেশেই মুদ্রার সংখ্যার উপর হস্তক্ষেপ করা ও তাহা সীমাবদ্ধ করা হয়। অথবা তাহা সোনার সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। যথা, মান মুদ্রায় (ষ্টাণ্ডার্ড্ কয়েনে) কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা থাকিবে, অথবা মান মুদ্রার পরিবর্ত্তে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সোনা মুদ্রক (গবর্ণ্মেণ্ট্ অথবা অপর কেহ) দিতে বাধ্য থাকিবেন।

মুদ্রার ক্রয়শক্তির উপরই বলিতে গেলে তাহার মুদ্রাত্ব নির্ভর করে; এবং এই ক্রয়শক্তি ঠিক রাখা বিশেষ শক্ত ব্যাপার। কেননা, শুধু মুদ্রার সংখ্যা ঠিক রাখিলেই তাহার ক্রয়শক্তি ঠিক থাকে না। সমাজে যত ক্রয়বিক্রয় হয়, তাহার তুলনায় মুদ্রার সংখ্যা ঠিক থাকা প্রয়োজন। যথা, অধিক ক্রয়বিক্রয় হইলে অধিক মুদ্রার প্রয়োজন; নচেৎ ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় মুদ্রা কম হইয়া যাইলে তাহার ক্রয়শক্তি বাড়িয়া যাইবে, অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রার মূল্য কমিয়া যাইবে। ক্রয়বিক্রয়ের তুলনায় মুদ্রা অধিক হইয়া গেলে মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমিয়া যাইবে, অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় মূল্য বাড়িয়া যাইবে। স্থতরাং মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইলে প্রয়োজনমত মুদ্রার সংখ্যা কমাইতে বা বাড়াইতে পারা প্রয়োজন। মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরিবর্ত্তিত না থাকিলে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ লাঘব হয়। যথা, ৫০৲ টাকা বেতনের কেরানী হঠাৎ দেখিতে পারেন, যে, তাঁহার বেতনের টাকায় আর পূর্ব্বের মত জীবনযাপন সম্ভব হইতেছে না; ব্যবসাদার দেখিতে পারেন, যে, সকল দ্রব্য অকস্মাৎ দুর্ম্মূল্য হইয়া যাওয়ায় তাঁহার চুক্তি রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণসংশয় হইতেছে; অথবা মুদ্রার ক্রয়শক্তি বাড়িয়া গিয়া দেনাদারের সর্ব্বনাশ ও পাওনাদারের পৌষমাস হইতে পারে। মুদ্রার ক্রয়শক্তি কমিতে স্বরু করিলে (অর্থাৎ সকল দ্রব্যের মুদ্রায় মূল্য বাড়িতে স্বরু করিলে) বেতনভোগী ও নির্দ্দিষ্ট আয়ের মালিকদিগের অবস্থা বিশেষ খারাপ হয়। এই জাতীয় লোকও সংসারে আছে অনেক। কাজেই মুদ্রার ক্রয়শক্তি অপরিবর্ত্তিত রাখিবার চেষ্টা সকল দেশেই হয় ও হওয়া উচিত। ইহা ব্যতীত মুদ্রার ক্রয়শক্তির পরিবর্ত্তনের সহিত বেতনের পরিমাণের পরিবর্ত্তন চেষ্টাও প্রায় সর্ব্বত্রই হয়। কেবল ভারতবর্ষে এ বিষয়ে চেষ্টা অল্পই হইয়াছে। এমন কি দেখা যায়, যে, সাধারণভাবে সকল দ্রব্যের মূল্য ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ১৮৭১ খৃঃ অঃ অপেক্ষা শতকরা ৫০ বাড়িয়াছিল; কিন্তু বেতনের হার কিছু বরং কমিয়াছিল। ১৮৯২ খৃঃ অব্দেও সকল দ্রব্যের মূল্য ১৮৭১ খঃ অব্দের তুলনায় শতকরা ৪০ এর অধিক বাড়িয়াছিল। কিন্তু বেতন বাড়িয়াছিল মাত্র শতকরা ১০। যুদ্ধের সময় ও পরেও অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির সহিত বেতনবৃদ্ধির কোন সামঞ্জস্য থাকে নাই। কিন্তু বেতনভোগী প্রভৃতির কষ্টের লাঘব করিবার চেষ্টা করিবে কে? এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের প্রায় সকল শক্তিই ইংলণ্ডের মুদ্রার সহিত আমাদের দেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার অপরিবর্ত্তিত বা যতদূর সম্ভব স্থির রাখিবার জন্য ব্যয় করা হয়। এই আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের হার ঠিক রাখিবার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পুঁজি বা ফণ্ড আছে। টাকা মুদ্রণের লাভ হইতেই এই পুঁজির সৃষ্টি। ইহার সাহায্যে পাউণ্ডের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার ও টাকার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাউণ্ড দিবার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে টাকার ক্রয়শক্তি অপরিবর্ত্তিত রাখিবার চেষ্টা বিশেষ আমরা দেখি না। তাহার কারণ, দেশাভ্যন্তরস্থিত বাণিজ্য অপেক্ষা ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যের প্রতি গভর্ণ্মেণ্টের অধিক আসক্তি। টাকার ক্রয়শক্তি স্থির রাখিবার চেষ্টা ভাল করিয়া হইলে সম্ভবতঃ এক সঙ্গে দুই দিক্ রক্ষা হয়, কিন্তু আমাদের গভর্ণ্মেণ্টের তাহা হইলে বোধ হয় 'প্রেষ্টিজ্' ও 'পলিসি' বজায় থাকে না। অ

—

নোটের মালিকের সম্পত্তি বিক্রয়

ভারতবর্ষে যত নোট আছে, তাহার মালিকগণ পড়িয়া দেখিবেন, যে, নোটের উপর উহার পরিবর্ত্তে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার অঙ্গীকার লিখিত আছে। যথা, ১০৲ টাকার নোটের উপর লিখিত আছে, যে, ভারত গভর্ণ্মেণ্ট্ উহার পরিবর্ত্তে দশ টাকা দিতে প্রস্তুত

আছেন। নোটের সুবিধা এই, যে, গভর্ণমেণ্ট্ মূল্যবান্ সোনা রূপা হাতে হাতে ঘুরাইয়া নষ্ট না করিয়া, তাহা কোন কেন্দ্রে বা কয়েকটি কেন্দ্রে মজুত রাখিয়া, তাহার পরিবর্তে নোট ছাপাইয়া চালাইলে প্রথমতঃ কম ক্ষতি হয় ও দ্বিতীয়তঃ (যুদ্ধ ইত্যাদি) আকস্মিক প্রয়োজনের সময় সামাজিক ধন-সম্পত্তি একত্র মজুত অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত সত্যকার সোনা-রূপার পুঁজির তুলনায় অধিক পরিমাণে নোট ছাপাইয়া গভর্ণমেণ্ট্ গোপনে সামাজিক সম্পত্তির উপর ভাগ বসাইতে পারেন ও খুব সহজেই পারেন; কেননা, সকল নোটের মালিক কদাপি একত্রে নোট ভাঙ্গাইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হন না। যথা, ১০০৲ টাকার নোট চালাইলে ৪০।৫০ টাকার সোনা-রূপা মজুত রাখিলেই যথেষ্ট। সচরাচর গভর্ণমেণ্ট্ নোটের টাকা দিবার জন্ম রক্ষিত পুঁজির অনেকাংশই, সুদ পাওয়া যায় এইরূপ খতে ও কাগজে রাখেন; কিন্তু সোনার পুঁজি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিও তাঁহাদের নজর থাকে। কিন্তু সম্প্রতি তাঁহাদের অন্যপ্রকার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তাঁহারা এই পুঁজির সোনার কতক অংশ বিক্রয় করিতেছেন। যে-পরিমাণ বিক্রয় করিতেছেন, তাহাতে কোন বিপদ্ আছে কিনা, তাহা আমরা দেখিতেছি না। শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন, যে, অল্পে যাহা সুরু হয়, ক্রমে তাহাই অধিক মাত্রায় হইয়া সর্ব্বনাশ করিতে পারে। তাঁহাদের মতে বর্ত্তমানে সোনা বিক্রয় করিলে লাভ আছে। কিন্তু এই সোনা নোটের মালিকের সম্পত্তি, গবর্ণমেণ্টের নহে। তাঁহাদের ইহা লইয়া লাভের ব্যবসায় করিবার ন্যায়ত অধিকার নাই। ইহা ব্যতীত সোনা বিক্রয় এসময়ে আমাদের জাতীয় দিক্ হইতে নিবুর্দ্ধিতার কার্য্য। অল্প লাভের খাতিরে নোটের মূল্য বজায় রাখিবার পুঁজি কম করিয়া ফেলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ড নিজে কেন তাহার বিশাল সোনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া বিক্রয় করে না? ১৯২০ খৃঃ অব্দে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ডের নোট-বিভাগের ১৩০,০০০,০০০ পাউণ্ডেরও অধিক সোনা পুঁজি ছিল। সে-সময়ে উহা বিক্রয় করিলে ৬০০,০০০,০০ পাউণ্ডেরও অধিক লাভ হইত। সমস্ত পুঁজি যদি সুদওয়ালা ওয়ার লোনে রাখা যাইত তাহা হইলেও ইংলণ্ডে বাৎসরিক ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড লাভ হইত। কিন্তু ইংলণ্ডের সেরূপ ইচ্ছা হয় নাই। ১৯১৮ খৃঃ অঃ হইতে ইংলণ্ডের সোনার পুঁজি ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। যথা—

১৯১৮	জানুয়ারী	৫০,০০০,০০০	পাউণ্ড
১৯১৯	"	৮০,০০০,০০০	"
১৯২০	"	৯১,০০০,০০০	"
১৯২১	"	১২৮,০০০,০০০	"

১৯২০র জানুয়ারী হইতে ১৯২১ এর জানুয়ারী অবধি সোনা ক্রয়ের খরচ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু এই সময়েও ৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ডের সোনা ইংলণ্ড তাহার পুঁজিতে যোগ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের মায়া নিজের প্রতি মায়া অপেক্ষাও অধিক। অতএব আমাদের অবস্থা বিশেষ খারাপ বলিয়া ধারণা হয়।

অ

—

ভ্লাডীমির লেনিন্

রুষিয়ার রাষ্ট্রগুরু লেনিনের মৃত্যু হইয়াছে। লেনিন্ রুষিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রধান নেতা ছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্বে দারুণ বিপ্লবের মধ্যেও রুষিয়া আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে। অনেককাল যাবৎ ইনি রোগ ভোগ করিতেছিলেন। মাঝে দুই এক বার ইঁহার ভুল মৃত্যুসংবাদও বাহির হইয়াছিল। লেনিনের মৃত্যুতে রুষিয়া একটি অসাধারণ শক্তিমান্ লোক হারাইল।

লেনিন্ ১৮৭০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্কুল ইন্স্পেক্টর্ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলেকজাণ্ডার বিপ্লববাদী ছিলেন ও ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় তাঁহার ফাঁসী হয়।

ভ্লাডীমির লেনিন্ কাজান ইউনিভার্সিটিতে আইন পড়িতে যান, কিন্তু বিপ্লবকারীদিগের সহিত কারবার করার জন্য তাঁহাকে সেখান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে গমন করেন ও সেখান হইতে আইন পাস করেন। তিনি বেণী দিন

আইনজীবী থাকিতে পারিলেন না। আবার বিপ্লবী-দিগের দলে যোগ দিলেন এবং শীঘ্রই ধৃত হইলেন ও পলায়ন করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন।

১৯০৫ খৃঃ অব্দের বিপ্লবের সময় লেনিন্‌কে আবার সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে দেখা গেল। কিন্তু বিপ্লব সফল না হওয়ায় তিনি অদৃশ্য হইলেন।

১৯০৬—১৬ এই কয়েক বৎসর লেনিন্ দেশের বাহিরে বাস করেন। এই সময়ে তাঁহার লিখিত কয়েকটি পুস্তিকার খুব প্রচার হয়। লেনিন্ আধুনিক বস্তুতন্ত্রবিরোধের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁহার দুইখানি পুস্তকে তিনি ভক্তি, ধর্ম্ম ও ধ্যানরসিকদিগকে জনসাধারণের অনিষ্টকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার মতে বাস্তব ঐশ্বর্য্য মানবের উন্নতির সহায়ক, সংহারক নহে।

লেনিনের জীবনে দুইটি জিনিষ ক্রমাগত ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। প্রথম, তাঁহার নিজের লাভ ও ক্ষতির দিকে দৃষ্টির অভাব ও তাঁহার স্বার্থত্যাগ; এবং দ্বিতীয়, তাঁহার সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে তীক্ষ্ণবুদ্ধি। কাহারও কাহারও মতে তিনি নিজের প্রভুত্ব সর্ব্বত্র খাটাইতে চেষ্টা করিতেন; এবং ইহাই নাকি তাঁহার একমাত্র চিন্তা ছিল। বস্তুতঃ ইহার পরিচয় তাঁহার জীবনে খুব পাওয়া যায় না। ইহা তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাঁহার মত ও আচরণের সমালোচনা সংক্ষেপে করা যায় না।

অ

—

খুনের জন্য দুঃখপ্রকাশ

সেদিন ইংরেজদের একটা সভায় একজন ইংরেজ বক্তৃতা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করে, অমুক ভারতীয় নেতা মিঃ আর্নেষ্ট্ ডের হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন কি? এই লোকগুলার আস্পর্দ্ধা ও বেয়াদবির সীমা নাই। তোমাদের স্বজাতীয় কত লোকে যে কত ভারতীয়কে ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত খুন করিয়াছে, তাহার জন্য তোমাদের নেতারা কখনও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে?

প্রকাশ্যভাবে দুঃখ প্রকাশ না করিলেই যে খুনের সমর্থন করা হয়, তাহা কোন্ ন্যায়শাস্ত্রে বা আইনে বলে?

মহাত্মা গান্ধীর চিঠি

কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলীকে মহাত্মা গান্ধী যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "গবর্ণ্মেণ্ট্ অকালে, আমার পীড়ার জন্য, আমাকে মুক্তি দেওয়ায় আমি দুঃখিত। এরূপ মুক্তি আমাকে সুখী করিতে পারে না, কারণ আমি মনে করি, যে, বন্দীর পীড়া তাহার মুক্তির হেতু হইতে পারে না।"

গান্ধী মহাশয় কোনপ্রকার সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া মুক্ত হইতে রাজী হইতেন, ইহা কল্পনা করা যায় না; কিন্তু এরূপ অঘটন ঘটিলে, কেবল মাত্র তাহাই আমাদের নিরানন্দের কারণ হইত, সেইজন্য তিনি যে প্রকারে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অসুখী হই নাই, সুখী হইয়াছি। কিন্তু ইহাও বলা দরকার, যে, এই মুক্তিতে আমাদের গৌরব বোধ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা যদি স্বরাজ লাভ করিয়া নিজের শক্তিতে তাঁহাকে কারামুক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেই গৌরব বোধ করিতাম, এবং তাহাতে আমাদের সুখের মাত্রাও পূর্ণ হইত।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রমাহাত্ম্য, তাঁহার প্রবর্ত্তিত স্বাধীনতা, তাঁহার নির্দোষিতা, ও প্রচেষ্টার ন্যায্যতা ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, এবং তাঁহার কার্য্য ও উপদেশ যে নিরুপদ্রব তাহা বুঝিয়া গবর্ণ্মেণ্ট্ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেও তাহা পূর্ণ আহ্লাদের বিষয় হইত; যদিও এক্ষেত্রেও আমাদের কোন কৃতিত্বগৌরব থাকিত না।

হাঁসপাতালে এখন তাঁহাকে বেশী লোকে দেখিতে গেলে তাঁহার আরোগ্যলাভে বিলম্ব হইবে। সুতরাং যাঁহারা তাঁহাকে শীঘ্র জাতীয় কার্য্যক্ষেত্রে পুনরবতীর্ণ দেখিতে চান, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা দমন করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই কথা তিনি বলিয়াছেন। "বন্ধুদের স্নেহের আদর ও উপলব্ধি আমি বেশী করিতে পারিব, যদি তাঁহারা, যিনি যে সার্ব্বজনিক কাজে ব্যাপৃত আছেন, সেই কাজে, বিশেষতঃ চর্‌কায় সুতা কাটিতে, অধিকতর সময় ও মনোযোগ দেন।"

"আমার মুক্তি আমাকে কোন আরাম দিতেছে না।

মুক্তির পূর্ব্বে জেলের নিয়ম পালন এবং দেশসেবার জন্য অধিকতর উপযুক্ত হইবার জন্য সাধনা ব্যতীত আমার অন্য কোন দায়িত্ব ছিল না; কিন্তু এক্ষণে আমি এমন একটি দায়িত্বের বোধে অভিভূত হইতেছি, যাহার অনুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহের যোগ্যতা আমার নাই। অভিনন্দনের অজস্র টেলিগ্রাম আসিতেছে। আমার দেশবাসীদের আমার প্রতি স্নেহের যে-সব প্রমাণ আমি পাইয়াছি, এগুলি তাহারই সমর্থক। ইহাতে আমি স্বভাবতঃ সুখ ও সান্ত্বনা লাভ করিতেছি। কিন্তু অনেক টেলিগ্রামে আমার মুক্তির পর আমার দেশসেবা হইতে এরূপ ফললাভের আশা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহাতে আমি স্তম্ভিত হইতেছি। আমার সম্মুখে যে কাজ রহিয়াছে, তাহা করিতে আমি কিরূপ অনুপযুক্ত সেই চিন্তায় আমার মাথা হেঁট হইতেছে।"

তাহার পর তিনি বলিতেছেন, যে, দেশে হিন্দু মুসলমান শিখ্ পারসী খৃষ্টিয়ান্ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মিলন ভিন্ন স্বরাজের কথা কেবল কথা মাত্র —সম্পূর্ণ-ব্যর্থ। "আমরা যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চাই, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধনের সৃষ্টি করিতে হইবে। আমার মুক্তিতে ভগবান্‌কে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন সকলের মধ্যে ঐক্যে পরিণত হইবে কি? কোন চিকিৎসা বা বিশ্রাম অপেক্ষা তাহা আমাকে অধিকতর শীঘ্র সুস্থ করিয়া তুলিবে। জেলে থাকিতে যখন আমি কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমানে মনকসাকসির সংবাদ শুনিয়াছিলাম, তখন আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়াছিল। যে বিশ্রাম করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে, তাহা বিশ্রাম হইবে না, যদি অনৈক্যের বোঝার চাপ আমার হৃদয়ের উপর থাকে। যাঁহারা আমাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের সকলকে আমি আমাদের সকলের বাঞ্ছিত ঐক্যের জন্য সেই ভালবাসা প্রয়োগ করিতে অনুরোধ করি। আমি জানি ঐক্য সম্পাদন কঠিন কাজ; কিন্তু **"আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে কোন কাজই কঠিন নয়।** আসুন, আমরা আমাদের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করি এবং তাঁহার শরণাপন্ন হই; তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। দুর্ব্বলতা হইতে ভয় জন্মে, ভয় হইতে পরস্পরে অবিশ্বাস জন্মে। আসুন, আমরা উভয়েই ভয় পরিহার করি। কিন্তু আমি জানি, যে, আমরা যদি একজনও ভয় হইতে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের ঝগড়াও থামিবে। বস্তুতঃ, আমি মনে করি, যে, আপনি কংগ্রেসের সভাপতি থাকিবার সময় সাম্প্রদায়িক মিলনের জন্য যাহা করিতে সমর্থ হইবেন, সেই কৃতিত্বের দ্বারাই আপনার কার্য্যকালের সফলতা নিষ্ফলতার বিচার হইবে। আমি জানি আমরা পরস্পরকে ভাইয়ের মত ভালবাসি। এইজন্য আপনাকে আমার উদ্বেগের অংশী হইবার নিমিত্ত এবং রোগের সময়টা আমাকে অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা মনে যাপন করিতে সমর্থ করিবার জন্য আপনাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

গান্ধী মহাশয় বার্দোলীর গঠনমূলক অনুষ্ঠানাবলিতে অধিকতর বিশ্বাসী হইয়াছেন। চর্‌কাকেই তিনি ক্রমশঃ-বর্দ্ধমান জাতীয় দারিদ্র্য বিনাশের একমাত্র উপায় মনে করেন। আমরাও অন্যতম প্রধান উপায় মনে করি। তিনি বলেন, যে, চর্‌কায় মন দিলে ঝগড়া বিবাদ করিবার অবসর থাকিবে না। "গত দুই বৎসরে কঠোর চিন্তার জন্য যথেষ্ট সময় ও নির্জ্জনতা আমি পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমি বার্দোলীর কার্য্য-ব্যবস্থায় দৃঢ়তর বিশ্বাসী হইয়াছি—জাতিতে জাতিতে ঐক্য, চর্‌কায় মনোযোগ, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ, এবং স্বরাজলাভের উপায় ও স্বরূপ চিন্তা, কথা ও কার্য্যে অহিংসা ও নিরুপদ্রবতায় বিশ্বাসী হইয়াছি। উক্ত ব্যবস্থা অনুসারে অন্তরের সহিত পূর্ণমাত্রায় কাজ করিলে নিরুপদ্রব অবাধ্যতার প্রয়োজন হইবে না, এবং আমার আশা এই, যে, ইহা কখনও দর্‌কার হইবে না। কিন্তু ইহাও আমার বলা উচিত, যে, নির্জ্জনে প্রার্থনার সহিত চিন্তা করার পর নিরুপদ্রব অবাধ্যতার ফলদায়কতা ও ধর্ম্মসঙ্গততায় আমার বিশ্বাস কমে নাই। জাতীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলে এইরূপ অবাধ্যতা করা প্রত্যেক মানুষের ও জাতির কর্ত্তব্য ও

অধিকার বলিয়া আমি এখন যেরূপ বিশ্বাস করি, তদপেক্ষা অধিক বিশ্বাস কখনও করিতাম না। আমার দৃঢ় ধারণা এই, যে, যুদ্ধ অপেক্ষা এইরূপ অবাধ্যতায় অনিষ্টের আশঙ্কা কম; এই অবাধ্যতা সফল হইলে উভয় পক্ষেরই উপকার হয়, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী ও পরাজিত উভয়েরই অমঙ্গল হয়।

"আপনি কৌন্সিল প্রবেশ বিষয়ে আমার কোন মত প্রকাশ করিবার আশা অবশ্য করিবেন না—যদিও আমি কৌন্সিল্, আদালত, এবং সরকারী স্কুল বর্জ্জন বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করি নাই।"

তাহার পর তিনি বলিয়াছেন, যে, যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য কৌন্সিল্-বর্জ্জন আজ্ঞা তুলিয়া লইবার পক্ষে মত দিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়া তিনি মত প্রকাশ করিবেন। তিনি মডারেট্ বন্ধুদের নিকট হইতেও অভিনন্দন পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছেন। "তাঁহাদের সহিত অসহযোগীদের কোন ঝগড়া থাকিতে পারে না। তাঁহারাও দেশের হিতৈষী এবং তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে দেশের সেবা করেন। আমরা যদি তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত মনে করি, তাহা হইলে কেবল বন্ধুভাব এবং ধৈর্য্যসহকারে যুক্তি প্রয়োগ দ্বারাই তাঁহাদিগকে নিজদলে আনিতে পারিব, গালাগালি দ্বারা নহে। বস্তুতঃ, আমরা ইংরেজদিগকেও আমাদের বন্ধু বলিয়া মনে করিতে চাই, তাঁহাদের সহিত শত্রুবৎ আচরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভুল বুঝিতে চাই না। আমরা এখন ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্টের সহিত যে বিরোধে ব্যাপৃত আছি, তাহা শাসনপদ্ধতি ও-প্রণালীর বিরুদ্ধে ইংরেজ মানুষগুলির বিরুদ্ধে নহে। আমি জানি আমরা অনেকে ইহা বুঝিতে এবং এই প্রভেদ সর্ব্বদা মনে রাখিতে সমর্থ হই নাই; এবং যে পরিমাণে আমরা অসমর্থ হইয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের ঈপ্সিতের ক্ষতি করিয়াছি।"

—

মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ

স্বরাজ্য দল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদের প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন। উহার প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার কটন্ উহা উপস্থিত করিতে দিতে রাজী হন নাই। মান্দ্রাজের ও মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাদ্বয়ে ঐ-প্রকার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে গবর্ণ্মেণ্টের পরাজয় হইয়াছিল। সেইজন্য এখন ব্যবস্থাপক সভার নিয়মাবলীর মানে বদ্‌লিয়া গেল! যাহা হউক, যাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ ও তথায় বক্তৃতাদি করিবার কষ্ট স্বীকার সার্থক মনে করেন, কটন্ সাহেবের ব্যাখ্যাটা ঠিক্ কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার উপায় থাকিলে তাহা করাও তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

—

আনন্দ-উৎসব ও কঠোর কর্ত্তব্য

মহাত্মা গান্ধীর মুক্তিতে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, বড় বড় সভার অধিবেশন, নগরসংকীর্ত্তন, দীপমালায় নগর ও গ্রামের শোভা সম্পাদন প্রভৃতি হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু উল্লাসের উত্তেজনা থামিয়া গেলে যে অবসাদ আসিবে, তাহার প্রতিকার কি করা হইতেছে? কলিকাতার এক সভায় বিদেশী বস্ত্র দাহও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দেশী বস্ত্র উৎপাদনে ও ব্যবহারে ত এরূপ কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। আনন্দ-উৎসব অনাবশ্যক কিম্বা অনিষ্টকর নহে, কিন্তু তাহা বার্দোলীর গঠনমূলক ব্যবস্থা-পালনের স্থান অধিকার করিতে পারে না।

—

ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রনায়ক উইল্‌সন্

মহাযুদ্ধের সময় যিনি আমেরিকার রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, সেই প্রেসিডেণ্ট্ উইল্‌সনের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। ইউরোপের মহাশক্তিপুঞ্জের মত নিজ রাজ্যবৃদ্ধির কুমতলব লইয়া আমেরিকা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় নাই। উইল্‌সন্ জাতিতে জাতিতে সেইরূপ ব্যবহার স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, যেরূপ ব্যবহার সভ্য মানুষ কোন সভ্য রাষ্ট্রে করিয়া থাকে। সভ্য দেশে এক জনের সহিত আর এক জনের বিবাদ হইলে তাহারা মারামারি না করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির নিমিত্ত আদালতের আশ্রয় লয়। জাতিতে জাতিতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ হইলেও যাহাতে

যুদ্ধ না হইয়া আন্তর্জাতিক আদালতে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিবাদ ভঞ্জন হয়, উইল্‌সন্ তদনুরূপ ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষুদ্র বা অনুন্নত বা অসংঘবদ্ধ জাতিদিগকে প্রবল জাতিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যাহাতে পদানত করিয়া রাখিতে না পারে, তদ্রূপ ব্যবস্থাও তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীব্যাপী হউক, ইহা তাঁহার হৃদ্গত আকাঙ্ক্ষা ছিল। সমুদ্রে সকল সময়ে সকল জাতি যাহাতে অবাধে বাণিজ্য-জাহাজ চালাইতে পারে, তিনি এরূপ নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার আন্তর্জাতিক আদর্শকে তিনি বাস্তবে পরিণত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, উহা এখনও স্বপ্নবৎ অবাস্তবই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বপ্নেরও মূল্য আছে; উহা মানুষকে বাস্তবের দিকে লইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রবলের সামরিক দম্ভের দিনে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায় ও মানবিকতার আদর্শ স্থাপন করিতে যিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, মানবজাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

—

লর্ড্ রেডিঙের ভ্রূকুটি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রাক্কালে মিঃ র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের নিকট হইতে মান্দ্রাজের "হিন্দু" কাগজের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা এক বাণী বা সন্দেশ (মেসেজ্) আদায় করেন। তাহাতে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্ মহাশয় অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, যে, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া ভারতীয়েরা কোন অধিকার আদায় করিতে পারিবে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান বৎসরের অধিবেশনের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় লর্ড্ রেডিংও বলিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ জাতি তাহাদের ইচ্ছা এবং বিচারের বিরুদ্ধে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষকে শাসনসংস্কার দিতে অস্বীকার করিবে। আমরা বলি, ভয় না পাওয়াটা ব্রিটিশ জাতিরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; ভারতবর্ষের লোকেরাও মনে করিতে পারে, যে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের সঙ্কল্পিত কার্য্য-পদ্ধতি হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে; তাহারাও ভয়ে নিরস্ত হইতে নারাজ হইতে পারে। আর, ব্রিটিশ জাতির মোড়লেরা যে বার বার বলিয়া থাকেন, "আমরা ভয়াই না, আমরা ভরাই না," ইহাতেই কি অন্তর্নিহিত ভয়ের আভাস পাওয়া যায় না? ব্রিটিশ জাতি ভয়ে কখন কিছু করে নাই, ইহাও সত্য নহে। দূর অতীতের ইতিহাস ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, যে, এই সেদিন কেনিয়ার কয়েক হাজার শ্বেত ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের ভয় দেখাইয়াছিল বলিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা তথাকার ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের সম্বন্ধে ন্যায্য ব্যবস্থা করিতে পারিল না। অবশ্য আমরা এরূপ মনে করি না, যে, বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কয়েক হাজার শ্বেত ঔপনিবেশিকের বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মন্ত্রীসভার এই ভয় ছিল, যে, কেনিয়ার ঐ শ্বেত ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে গোরা সৈন্য পাঠাইলে গোরারা যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বূঅর ও ব্রিটনেরা কেনিয়ার ঔপনিবেশিকদের সহিত যোগ দিতে পারে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের আল্‌ষ্টার্ প্রদেশবাসী ইংরেজরা আইরিশ্ স্বাধীন রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইতে অস্বীকার করে; তাহারা পুনঃ পুনঃ বলে, যে, তাহাদিগকে আইরিশ্‌দের সহিত যুক্ত করিতে চাহিলে তাহারা বিদ্রোহ করিবে। বিদ্রোহের জন্য তাহারা কার্সনের নেতৃত্বে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং সৈনিকদিগকে যুদ্ধশিক্ষাদানও করিয়াছিল। ফলে, আল্‌ষ্টার্ এখনও আয়ার্ল্যাণ্ডের অবশিষ্ট অংশ হইতে স্বতন্ত্র রহিয়াছে।

অতএব, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করা যায়; কিন্তু, ইহা অবশ্য স্বীকার করা যায়, যে, যাহারা ভয় দেখায়, তাহারা ইংরেজ জাতীয়, অন্ততঃ শ্বেতকায়, হইলে নিশ্চিত ফললাভের সম্ভাবনা আছে, অন্যেরা ভয় দেখাইলে ফললাভ না হইতেও পারে।

ভারতবর্ষের লোকেরা, কিম্বা তাহাদের মধ্যে কোন গণনার যোগ্য দল, ব্রিটিশ জাতিকে ভয় দেখাইয়া কাজ আদায় করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই ধারণাটাই ভুল। বংলাদেশে যে দুএকটা রাজনৈতিক খুন হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে দল থাকিলেও, তাহা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের পর আবির্ভূত বিপ্লবী দলের মত প্রভাবশালী নহে। শেষোক্ত

বিপ্লবীদের মধ্যে খুব বুদ্ধিমান্ ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক ছিল, এবং তখন দেশের বিস্তর লোকের তাহাদের সহিত সহানুভূতি ছিল। এখন যদি দল থাকে, তাহার লোকসংখ্যা কম, পূর্ব্বেকার দলের মত মানুষও ইহাদের মধ্যে নাই; এবং আগেকার বিপ্লবীদের কার্য্য-কলাপের পরিণাম দেখিয়া দেশের লোকদের মধ্যে যাহাদের বিপ্লবানুকুল মতি ছিল তাহাদেরও এ বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, যে, বোমা ও রিভল্ভার্ দ্বারা খুন করিয়া দেশ স্বাধীন হইতে বা কিছু রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিতে পারিবে। অতএব হনন বা তদ্রূপ কোন উপদ্রব দ্বারা ভারতীয়েরা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে চায়, ইহা ভুল ধারণা।

কিন্তু ইহা সত্য, যে, ভারতীয়দের মধ্যে মডারেটরাও এখন আর বিশ্বাস করে না, যে, ব্রিটিশ জাতির ন্যায়-বোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই রাষ্ট্রীয় শক্তি পাওয়া যাইবে। মডারেট্ নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার বাঙ্গালোরের বক্তৃতায় বলিয়াই দিয়াছেন, যে, ব্রিটিশ জাতির ন্যায়বোধকে জাগাইতে হইলে আরও দু' একরকমের বোধেও ঘা মারা দরকার, দেখান দরকার যে তাহারা ন্যায্য কাজ না করিলে তাহাদের কি ক্ষতি বা অসুবিধা হইতে পারে; তাহা হইলে নানা "বোধ" মিলিত হইয়া ব্রিটিশ জাতিকে সুবুদ্ধি করিতে পারে।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে যখন যে দল প্রবল হয়, তখন তাহারাই হয় গবর্ণ্মেণ্ট্। এই দলের নিকট কাজ আদায় করিতে হইলে অবস্থাভেদ অনুসারে কার্য্যপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হয়। একটা প্রণালী হইতেছে অবস্-ট্রাক্শন্ বা বাধা প্রদান। আইরিশ্ নেতা পার্নেল ইহার ওস্তাদ্ ছিলেন। ইহা একটা কন্‌ষ্টিটিউশ্যনাল্ বা বৈধ উপায়। ভারতবর্ষের স্বরাজ্যদল এই উপায় অবলম্বন করিতেছেন। ইহাতে সিদ্ধি লাভ হইতে পারে বা নাও পারে। কিন্তু ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ বা রেডিং ইহাকে একটা ভারি গর্হিত পদ্ধতি বলিয়া ভারতীয়দিগকে বুঝাইতে কেন বৃথা চেষ্টা করিতেছেন? কেন বৃথা ভয় দেখাইতেছেন, যে, ঐ পদ্ধতি পরিত্যক্ত না হইলে, উহা সমগ্র-ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতে অনুসৃত হইলে, শাসনসংস্কারের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিস্তার বাধা পাইবে? পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাষ্ট্রীয় মত যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট্ ভারতবর্ষেও আর পিছাইতে পারিবেন না, অগ্রসর হইতেই হইবে। এবং ভারতবর্ষের লোকেরা এখন আর ব্রিটিশ জাতির কৃপার, মর্জ্জির, বা ন্যায়বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের সংঘবদ্ধ একতা, সাহস ও শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে। এখন তাহারা ভয়ে পশ্চাৎপদ হইবে না। কিন্তু তাহারা, ধর্ম্মবুদ্ধির প্রেরণাতেই হউক, কিম্বা সুবিচার-নির্দ্দিষ্ট নীতির অনুসরণেই হউক, কিম্বা উভয় কারণেই হউক, উপদ্রব ও হিংসার পথে যাইবে না; অন্য উপায়ে ব্রিটিশ জাতিকে সুবুদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।

—

স্যার্ ম্যাল্‌কম্ হেলীর বক্তৃতা

ভারতবর্ষে সত্বর পূরা দায়ী গবর্ণ্মেণ্ট্ বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বশাসক অংশগুলির মত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার জন্য প্রারম্ভিক কাজ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া একটি প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে। প্রথম দিন কিছু বক্তৃতা হইয়া আলোচনা স্থগিত আছে। বুধবার ১লা ফাল্গুন আলোচনা আবার চলিবে। গবর্ণ্মেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার্ ম্যাল্‌কম্ হেলী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি দায়ী গবর্ণ্মেণ্ট্ এবং কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়ন্‌গুলির মত স্বশাসক গবর্ণ্মেণ্টের মধ্যে প্রভেদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, যে, ব্রিটিশ গবর্ণ্মেণ্ট্ দায়ী গবর্ণ্মেণ্ট্ দিতে চাহিয়াছেন, ডোমিনিয়ন্‌গুলির মত গবর্ণ্মেণ্ট্ নহে, যদিও তাঁহার মতে প্রথমটি হইতে দ্বিতীয়টিতে ক্রমে পৌঁছান যাইতে পারে। এই প্রভেদের বিচার না করিয়া আপাততঃ হেলী সাহেবের অন্য দু-একটা কথার উল্লেখ করি।

তিনি অনেক ভারতীয় নেতার মত উদ্ধৃত করিয়া বলেন, যে, তাঁহারা কেহ দশ কেহ পনের বৎসর পরে, এবং সকলেই ক্রমে ক্রমে, দায়ী গবর্ণ্মেণ্ট্ লাভে রাজী ছিলেন; তবে এখন কেন শীঘ্রই উহা চাওয়া হইতেছে? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। আমরা

ভারতীয় নেতাদের উক্তির এই অর্থ বুঝিয়াছিলাম, যে, "গবর্ণমেণ্ট্ বলুন দশ বা পনের বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী গবর্ণমেণ্ট্ স্থাপিত হইবে, তাহা হইলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।" কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কখনও এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই, এখনও দিতেছেন না। তাঁহাদের "গবর্ণমেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট" নামধেয় আইনেও এরূপ প্রতিশ্রুতি নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কেবল এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে, যে, নূতন ব্যবস্থাপক সভাগুলির আরম্ভ হইতে দশ বৎসর পরে পার্লেমেণ্ট অনুসন্ধান করিবেন, যে, ভারতবাসীরা অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইবার যোগ্য হইয়াছে কিনা। যোগ্য বিবেচিত হইলে তাহারা আরও কিছু পাইবে, নতুবা পাইবে না—এমন কি যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা কাড়িয়া লওয়াও একেবারে অসম্ভব নহে। ভূতপূর্ব্ব অন্যতম প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্ ত বলিয়াই-ছিলেন, যে, ইংরেজপূর্ণ সিবিল্ সার্বিস্ রূপ ইস্পাতের কাঠামো ভারতবর্ষকে চাঙ্গা রাখিবার জন্য চিরকালই থাকিবে।

অতএব হেলীর যুক্তিটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে—"তোমরা বলিয়াছ যে তোমরা, ক্রমে ক্রমে, দশ বা পনের বৎসরের অবসানে, দায়ী গবর্ণমেণ্ট্ পাইলে সন্তুষ্ট হইবে; অতএব তোমরা তোমাদের সেই কথার দ্বারা সত্যবদ্ধ আছ ও থাকিতে বাধ্য; কিন্তু আমরা কখনও কথা দিই নাই, এবং দিবও না যে আমরা দশ বা পনের বৎসর পরে নিশ্চয়ই দায়ী গবর্ণমেণ্ট্ স্থাপিত করিব।" কিন্তু চুক্তি ত কখন একতরফা হয় না। ইংরেজ যদি প্রতিশ্রুতি দিতেন, তাহা হইলে আমরাও চুক্তিবদ্ধ থাকিতাম। কিন্তু তাঁহারা কোন প্রতিশ্রুতিই দিবেন না, আর আমরা ১৫ বৎসর হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিব, ইহা হইতে পারে না।

দেশের নেতারা দেখিতেছেন, যে, দেশ নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও দেশবাসী লোকেরা বুদ্ধিমান্ এবং নিজেদের স্বার্থ বুঝে, এবং দেশে অপ্রত্যাশিত অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তর লোকের রাষ্ট্রীয় বোধ জন্মিয়াছে। সুতরাং যদিই আমরা ১০।১৫ বৎসরের মিয়াদে আগে সন্তুষ্ট হইবার কথা বলিয়া থাকি, তাহা এখন ভ্রম বলিয়া বুঝিতেছি। এখন আমরা তাহা অপেক্ষা শীঘ্র জাতীয়-আত্মকর্তৃত্ব চাই।

হেলী বলেন, দায়ী গবর্ণমেণ্ট্ চাহিলেই ত প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। দেশী রাজ্যসমূহ, ইউরোপীয় বণিক্, সামরিক ও অসামরিক চাকুরিয়া-সম্প্রদায় (অর্থাৎ সার্ভিসেজ্), সংখ্যায় কম নানা শ্রেণী ও সম্প্রদায়, প্রভৃতির সম্মতি লইতে হইবে। চমৎকার কথা! ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট্ যত রকম আইন, নিয়ম, সন্ধি, যুদ্ধ, প্রভৃতি করেন, তাহাতে ইহাদেব সকলেরই মত লইয়া থাকেন কি? দেশী রাজ্যসকল সম্বন্ধে যে-সব কাজ বা ব্যবস্থা করেন, তাহাতে ব্রিটিশ ভারতের লোকদের মত্ লওয়া হয় কি? তাহাতে হয় না। সুতরাং আমাদের সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার বেলায় দেশী রাজ্যগুলির অসম্মতির বাধা কেন উত্থাপন করা হইবে? দেশীরাজারা ত এরূপ বিষয়ে ইংরেজের হাতের পুতুল হইবেই; তাহাদিগকে যেমন নাচিতে বলা হইবে, তাহারা সেইরূপ নাচিবে। ইংরেজ বণিক্ এবং ইংরেজ চাকুরিয়ারা ত বর্ত্তমান সামান্য অধিকার ভারতীয়রা পাওয়াতেই অসন্তুষ্ট; আমাদের আরও অধিক অধিকার পাওয়ার বিপক্ষে তাহারা হইবেই। সংখ্যায় কম সম্প্রদায়ের কতকগুলা লোককে ইংরেজের মতানুবর্ত্তী করাও খুব সহজ। অতএব, হেলী যে-সব লোকের সম্মতিক্রমে আমাদের দায়ী গবর্ণমেণ্ট্ প্রাপ্তির কথা তুলিয়াছেন, তাহাদের **সকলের** সম্মতি কলিযুগে হইবার সম্ভাবনা নাই।

তাহার পর হেলী দেশরক্ষার কথা তুলিয়াছেন। 'ডোমিনিয়ন্-পদবীর মানে ডোমিনিয়ন্‌গুলির মত সৈন্য-দল।" হেলী জিজ্ঞাসা করেন, ফৌজের সকল শাখার সকল শ্রেণীতে ভারতীয় অফিসারদের দ্বারা চালিত ভারতীয় সৈন্যদল আছে কি? এই প্রশ্নের মধ্যে যে ঘৃণাকারজনক ভণ্ডামি রহিয়াছে, তাহা একেবারেই অসহ্য। কোম্পানীর আমলেও ভারতীয় সৈন্য ও ভারতীয় অফিসার ফৌজের যে-সব শাখায় ও শ্রেণীতে ছিল, এখন তাহা নাই। দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরস্ত্র রাখা হইয়াছে। ভারতবাসীরা যে সামরিক নানা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সেটা কি তাহাদের দোষ, যে তাহা-

দিগকে সেই ওজুহাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাও? ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ যদি শীঘ্র শীঘ্র ভারতীয়দিগকে ফৌজের সকল শাখার ও বিভাগের কাজ শিখাইয়া ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর এবং বৃহত্তর হইতে বৃহত্তম দলের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতাম, হেলীর কথাটার মধ্যে বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর-কিছু আছে—সারবান্‌ কিছু আছে।

বক্তৃতার শেষে হেলী বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর দোষ-ত্রুটি কিছু আছে বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করেন, এবং গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ তাহা সংশোধনের জন্য প্রাদেশিক গবর্ণ্‌-মেণ্ট্‌গুলির মত লইতে ও তদন্ত করিতে প্রস্তুত আছেন, বলেন। এই কৃপাকটাক্ষের জন্য বহু বহু ধন্যবাদ।

—

রেডিং রাজবন্দীদের কাগজ দেখিবেন

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় লর্ড্‌ রেডিং তিন নম্বর রেগুলেশ্যন অনুসারে মানুষকে বন্দী করার সমর্থন মামুলী যুক্তি দ্বারা করিয়া এই আশ্বাস দেন, যে, তিনি নিজে সব কাগজপত্র দেখিবেন। আমরা ইহাতে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। তিনি ইংলণ্ডের খুব বড় একজন আইনজীবী ছিলেন, তথাকার প্রধান প্রাড্‌বিবাক হইয়াছিলেন। তিনি জানেন, যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং বা উকীল দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন বা আরোপিত দোষ ক্ষালনের প্রকাশ্য সুযোগ না দিলে সুবিচার হয় না বলিয়াই সকল সভ্য দেশে বর্ত্তমান বিচার-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ও তাহার পক্ষের আইনজীবীর অসাক্ষাতে প্রমাণ পরীক্ষা দ্বারা ঠিক সত্যনির্ণয় হইতে পারে না। এই কারণে, আমরা মনে করি, লর্ড্‌ রেডিং গোপনে এক তরফা কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে রাজী হইয়া নিজের অসম্মান নিজেই করিয়াছেন।

—

শান্তি শৃঙ্খলা ও আইনের মর্য্যাদা

গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ যখনই কোন "বেআইনী আইনের" বলে লোকদের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখনই বলেন, আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, দুর্বৃত্ত লোক-দিগকে দণ্ড দিতে হইবে, ইত্যাদি। লর্ড্‌ রেডিংও তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় এইরূপ কথা বলিয়াছেন। আমরা বলি, তথাস্তু; কিন্তু কে যে দুর্বৃত্ত, কে যে আইনের মর্য্যাদা, শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিতেছে, তাহা সভ্য-রীতি অনুসারে বিচার দ্বারা স্থির করা হউক, তাহার পর যত ও যেরূপ দরকার শাস্তি দেওয়া হউক।

আর-একটা কথা এই, যে, সাধারণ আইন, বে-আইনী আইন, বিচারপূর্ব্বক শাস্তি, বিনাবিচারে শাস্তি, ডায়ারী কাণ্ড, চরমনাইরের আসুরিক ব্যাপার, এসব ত বহুকাল হইতে আছে ও চলিতেছে; কিন্তু এসব সত্বেও শান্তি, শৃঙ্খলা ও আইনের মর্য্যাদা লোকে ভঙ্গ করিতেছে। এঅবস্থায় শাক্ত নীতির সমর্থকেরা অবশ্য বলিবেন, গবর্ণ্‌মেণ্ট্‌ যথেষ্ট শক্ত হন নাই, আরও বল-প্রয়োগ করুন, তাহা হইলেই সব থামিয়া যাইবে। তদুত্তরে জিজ্ঞাস্য এই, রুশিয়ায় সাম্রাজ্যের আমলে যেরূপ শাক্ত নীতির প্রয়োগ হইয়াছিল, আয়াল্যাণ্ডে বহু বৎসর ধরিয়া যেরূপ আসুরিক ব্যাপার চলিয়াছিল, তাহা যথেষ্ট কিনা? কিন্তু রুশিয়াকে সম্রাট্‌ বলপ্রয়োগে ঠাণ্ডা করিতে পারেন নাই; নিজেই সবংশে নষ্ট হইয়াছেন এবং সাম্রাজ্য লুপ্ত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডকেও ইংরেজ স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইতিহাসের এইসকল কাহিনী আলোচনা করিয়া আমাদের এই ধারণা হইয়াছে, যে, আসুরিক শাক্ত নীতির অনুসরণ জনগণ করিলে তাহা যেমন দোষ, শাসকেরা করিলেও তাহা সেইরূপ দোষ। দুর্বৃত্তের শাস্তি অবশ্য হওয়া চাই—বিচারের পরে হওয়া চাই। কিন্তু মানুষ কেন আইনভঙ্গ করে, তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিষ-বৃক্ষের মূল নষ্ট করাও চাই। শাসকেরা যদি বলেন, আমরা কেবল বলের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় ব্যাধির প্রতীকার করিব, তাহা হইলে তাঁহাদের চেষ্টা ত ব্যর্থ হইবেই, অধিকন্তু প্রতিক্রিয়ার নিয়মে ইহা অন্য পক্ষের মনেও বলের উপাসনার চিন্তা আনিয়া দিতে পারে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক বন্দী ও রাজ-বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার প্রস্তাব এবং নিগ্রহ আইন রদ করিবার প্রস্তাব ধার্য্য হওয়ায় সরকার পক্ষ ও

বেসরকারী ইংরেজ পক্ষ হইতে প্রশ্ন হইয়াছে, যে, গবর্ণমেণ্ট্ এইসকল প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিলে প্রস্তাবক ও সমর্থকগণ কি এরূপ কথা দিতে পারেন, যে, দেশে রাজনৈতিক খুনখারাবী আর হইবে না? তাহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য করা যাইতে পারে, যে, ঐ-সব প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিতে না বলিয়া যদি আমরা গবর্ণমেণ্ট্কে বলি, "আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করুন; কিন্তু তাহা হইলে আপনারাই কি দেশে রাজনৈতিক খুনখারাবী ডাকাতী হইবে না বলিতে পারেন?" বস্তুতঃ দেশের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক, এবং শিক্ষাবিষয়ক অবস্থা ও ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, পুলিসের গুপ্তচরদের প্ররোচনা থাকিবে, অথচ কোন উপদ্রব ঘটিবে না, এমন প্রতিশ্রুতি কেহ দিতে পারে না। নাম করিয়া দু'দশজনের কথা বলিলে বরং বলা যায়, যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সদাচরণের জন্য দায়ী হইলাম, কিন্তু কোটি কোটি লোকদের মধ্যে কেহই নিজের মস্তিষ্ক-বিকৃতি দুর্বুদ্ধি বা উত্তেজনার বশে কিম্বা অপরের প্ররোচনায় আইনভঙ্গ করিবে না, এরূপ কথা দিবার ক্ষমতা কোন মানুষের নাই, অতিমানব কেহ থাকিলে তাহার কথা স্বতন্ত্র।

ইহা আমরা স্বীকার করি, যে, আমাদের মত সাধারণ লোকদের এবং নেতাদের—সকলেরই দেশকে নিরুপদ্রব ও অহিংস করিবার চেষ্টা করা উচিত। মহাত্মা গান্ধী খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট্ তাঁহাকে দু'বৎসর জেলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন! তা ছাড়া, চর মনাইরে যেরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছে, সেরূপ কাণ্ডে মরা মানুষেরও রক্ত গরম হয়। সরকার পক্ষ হইতে এবিষয়ে যথেষ্ট প্রতিকার-চেষ্টা হয় নাই।

—

হিন্দু মহাসভা

প্রয়াগে গত ২০শে মাঘ হইতে হিন্দু মহাসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার অভি-ভাষণে বলেন, যে, অস্পৃশ্য জাতিদিগকে সমাজে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দিবার সময় আসিয়াছে। খবরের কাগজে এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য পড়িয়া বুঝা গেল না, যে, মালবীয়জীর মতে এই যথাযোগ্য স্থানটি কি। "অস্পৃশ্য" জাতির লোক খৃষ্টিয়ান্ বা মুসলমান হইলে ঠিক অন্য খৃষ্টিয়ান্ বা মুসলমানদের মত "স্পৃশ্য" ও "আচরণীয়" হয়; সামাজিক ক্রিয়াকলাপে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, ভগবদারাধনায় তাহাদের স্বধর্ম্মী অন্য লোকদের সমান অধিকার ও স্থান হয়। সুতরাং হিন্দু সমাজের নেতারা যদি মনে করেন, যে, "অস্পৃশ্যে"রা তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত সামান্য কিছু পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত হইয়া আছেন। ধর্ম্মবুদ্ধি বলে, "অস্পৃশ্য"দিগকে পুরামাত্রায় মানুষ বলিয়া গণ্য কর; সাংসারিক বুদ্ধিও বলে, তাহাদিগকে পুরামাত্রায় মানুষ বলিয়া গণ্য কর। তাহা না করিলে হিন্দু সমাজ অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

মহাসভার অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে বর ও কন্যার বিবাহের বয়স বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ন্যূনতম বয়স কত ধার্য্য হইল জানিতে পারি নাই। কন্যার বয়স অন্ততঃ ষোল হওয়া উচিত।

"অস্পৃশ্যেরা" সাধারণ সভায় স্থান পাইবে, যে-সব স্কুলে অহিন্দু বালকবালিকারাও পড়ে সেখানে স্থান পাইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। কিন্তু যেখানে কেবল হিন্দু বালকবালিকারা পড়ে, সেখানে কি তাহারা পড়িতে পাইবে না? দেবমন্দিরের মালিকদিগকে এই-রূপ অনুরোধ করা হইয়াছে, যে, তাঁহারা যেন "অস্পৃশ্য"দিগকে বিগ্রহ দর্শনের যথাসম্ভব সুবিধা দেন। হিন্দুব্যতীত অন্য ধর্ম্মের লোকেরা নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত সকল শ্রেণীর লোকদিগকে সাক্ষাৎ ভগবদারাধানার অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন; তাহার তুলনায় মহাসভার অনুগ্রহ অকিঞ্চিৎকর। আজকালকার দিনে অনুগ্রহে সন্তুষ্টই বা থাকিবে কে এবং কতদিন? এখন সব মানুষই মানবিক অধিকার চাহিতেছে, এবং তাহা ন্যায্য, স্বাভাবিক ও ধর্ম্মসঙ্গত।

মহাসভা সর্ব্বসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন, যেন "অস্পৃশ্য"গণের জল আহরণের কষ্ট দূর হয়, এবং আবশ্যক হইলে তাহাদের জন্য আলাদা কূপের বন্দোবস্ত যেন

করা হয়। বাতাসটাকে একচেটিয়া করিবার ক্ষমতা মানুষের না থাকায় ভালই হইয়াছে। তথাপি এবিষয়েও মানুষ যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিয়াছে। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরিকাগণ বিশুদ্ধ বাতাস ততটা পান না, যতটা পুরুষেরা পায়। অনেক অঞ্চলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর স্থান-সকলে বাস করিতে বাধ্য হয়। তথাকার বাতাস ভাল নয়।

হিন্দু ধর্ম্মের মতসকলে বিশ্বাস করিলে যে-কোন অহিন্দু হিন্দু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রচলিত ব্রাহ্মণাদি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না, স্থির হইয়াছে। ইহাও মন্দের ভাল, কিন্তু সন্তোষজনক নহে। বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্য এইসব লোকের স্থান বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে রাখিয়াছিলেন।

মহাসভা "অস্পৃশ্য"দের উপবীত ধারণ, তাহাদের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ এবং তাহাদের সহিত একত্র ভোজনের বিরোধী। কিন্তু সবগুলিই ত চলিতেছে। বেদ ছাপা হইয়া গিয়াছে, এবং তাহা হিন্দুর সব জাতি এবং নানা দেশ মহাদেশের অহিন্দুরাও উচ্চারণ করিতেছে। ব্যর্থ মত প্রকাশে ফল কি?

—

লুম্বিনী উদ্যান

লুম্বিনী উদ্যানে বুদ্ধদেবের জন্ম হইয়াছিল, তাহার সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিবার কথা উঠিয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রস্তাবের সমর্থন করি। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য করা হইবে, ভারতের উপকার হইবে, এবং এই দেশের সহিত সমগ্র বৌদ্ধ জগতের সংস্পর্শ বর্দ্ধিত হইবে।

—

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শুল্ক

দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লার উপর শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ধার্য্য হওয়ায় ভালই হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেন্ট সাধারণ জাহাজ-ভাড়া অপেক্ষা সস্তায় তথাকার কয়লা এদেশে আনিবার জন্য জাহাজের মালিকদিগকে রাজকোষ হইতে সাহায্য দিয়া থাকে। এইপ্রকারে ভারতীয় কয়লার ব্যবসার ক্ষতি করা হইতেছিল। ইহার প্রতিকার অবশ্যকর্ত্তব্য।

—

পতিতার উদ্ধার

আমরা অবগত হইয়াছি যে, মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে পতিতা নারীদিগকে লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। সাধারণতঃ স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক, বিদ্যালয়ের ছাত্র, অসহযোগপন্থী স্বেচ্ছাসেবকের দল, মেথর, চামার প্রভৃতি "অস্পৃশ্য" জাতি, এবং গণিকাবৃন্দ, এইসকল শোভাযাত্রার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হিন্দুজাতির পুরাণ-ইতিহাসে দেখা যায়, সমাজে বারাঙ্গনাগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। বিজয়-অভিযান, বিবাহাদি পারিবারিক গৃহকর্ম্ম ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, উৎসব ও দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা উপস্থিত থাকিত। সুতরাং বর্ত্তমান সমাজে এই প্রথার পুনঃপ্রচলন যে হিন্দুজাতির পক্ষে অশাস্ত্রীয়, একথা বলা যায় না। কিন্তু এই লুপ্ত প্রথাটির নূতন করিয়া প্রবর্ত্তন কতদূর সঙ্গত ও হিতকর, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক।

শুনিয়াছি, পতিতাগণ স্বদেশহিতকল্পে মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকে। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং, অমেধ্যাদপিকাঞ্চনম্'। সুতরাং যদি কেহ স্বরাজ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া তজ্জন্য স্বেচ্ছায় কিছু দান করেন, তাহা হইলে দাতানির্ব্বিশেষে তাহা গ্রহণীয়, স্বরাজ্যপন্থীগণ একথা বলিতে পারেন। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে অশূদ্রপ্রতিগ্রাহিতা না থাকিলেও, যাহাকে মনে মনে ঘৃণা করি অথবা ঘৃণার পাত্র বলিয়া মনে করি, অথবা যাহার অর্থ কোন প্রকাশ্য জঘন্য বৃত্তিদ্বারা অর্জ্জিত বলিয়া জানি, তাহার নিকট প্রতিগ্রহ কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচ্য। তাহাদের দান গ্রহণ করিলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে প্রকাশ্যে 'আচরণীয়' বা 'চল্' করিয়া লইতে হইবে, যদি তাহারা এই দাবী করিয়া বসে, তখন তাহা অগ্রাহ্য করা কঠিন হইয়া পড়ে।

সত্য বটে, পাপকেই ঘৃণা করা উচিত, পাপীকে নহে।

যে গভীর সমবেদনায় অনুপ্রাণিত হইয়া টমাস্ হুড্ তাঁহার Bridge of Sighs নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন—

'Alas for the rarity
Of Christian charity
Under the sun !'

এবং রবীন্দ্রনাথ 'পতিতা'র মুখে বলাইয়াছেন

'দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি
নিয়ে গেল সব মাটির ঢেলা'।

তাহা অতি শ্রদ্ধার জিনিষ। ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখিয়া পতিতা নারী বলিয়াছিল, যে, পূত ব্রহ্মচারী ঋষিকুমার তাহার অন্তরের দেবতাকেই দেখিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সে নবীন জন্ম লাভ করিয়াছিল, এবং বলিতে সক্ষম হইয়াছিল—

'তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া র'বে,—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে।'

বস্তুতঃ যিনি পতিতা নারীর মধ্যে ভগবানের স্বরূপ দেখিতে পান, সেই মহাপুরুষই পতিতোদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিতে সক্ষম। বুদ্ধ হইতে পারিলেই বারবনিতা আম্রপালীর গৃহে আতিথ্যগ্রহণ ও তাহাকে নারীসংঘের নেতৃত্বপদে আসীন করিতে পারেন। যীশু এই দেহকে ভগবানের মন্দির বলিয়া জানিতেন, এবং সাধারণ লোকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সেই মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করা কত কঠিন তাহা বুঝিতেন বলিয়াই ম্যাড্‌লীনের প্রতি তাঁহার উদার আচরণ বিশ্বচিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

পতিতা রমণীর পাতিত্যের জন্য সমাজই বহুল পরিমাণে দায়ী, ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের দেশে সমাজ স্ত্রীজাতিকে শিক্ষায় বঞ্চিত রাখিয়া, অপরিণত বয়সে তাহার ইচ্ছা বা মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, তাহার বিবাহ দেয় এবং অকালবৈধব্যের কোন বৈধ প্রতিকারের ব্যবস্থা করে না। এরূপ স্থলে প্রেমের স্বপ্ন বা প্রবৃত্তির তাড়না যদি কাহাকেও কুপথে পরিচালিত করে, তাহাকে সৎপথে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ বা সুবিধা দেওয়া সমাজের অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু এইসকল পতিতাদের উদ্ধারব্রত গ্রহণ বড় কঠিন কাজ—সেজন্য স্বয়ং সংযমী ও পবিত্রচেতা হওয়া আবশ্যক, সমাজশরীরের দুষ্টক্ষতগুলি অস্ত্রোপচার দ্বারা দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার সাহস, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, ত্যাগস্বীকারপ্রবৃত্তি ও আগ্রহ চাই। নতুবা আগুন লইয়া খেলাইতে চাওয়া উচিত নয়, নিবাইতে গিয়া পুড়িয়া মরিবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। কারণ, গীতাকার বলিয়াছেন—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ! প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥"

শোভাযাত্রায় যে পতিতাদিগকে সর্ব্বলোকচক্ষুর গোচর করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা হয় তাহারা কেহ স্বীয় বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; পূর্ব্বেও তাহাদের যে জীবিকা ছিল, পরেও তাহাই থাকে। যে আত্মবিক্রয়রূপ ব্যবসায় দ্বারা তাহারা জীবিকা-সংস্থান করে, তাহা যে অত্যন্ত পাপজনক ও গর্হিত, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। যাহারা নীতিবিরুদ্ধ জঘন্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যতদিন তাহারা সেই বৃত্তি পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহাদের অস্পৃশ্য থাকাই সমাজের পক্ষে হিতকর। মেথর ও গণিকাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে মেথরদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। মেথরগণ যে কাজ করে, তাহা সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহাতে কোন নৈতিক দোষসংস্পর্শ নাই। মেথর বলিয়াই তাহাদিগকে অশুচি মনে করা অন্যায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে তাহাদের বৃত্তি অন্য সর্ব্ববিধ সাধুবৃত্তির সঙ্গে গণিত হইবার যোগ্য। যাহারা জাতিহিসাবে কোন পাপাচরণ করে না, কেবল এরূপ বৃত্তি অনুসরণ করে, যাহা লৌকিক আচারে হেয় ও অপবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধেই অস্পৃশ্যতা ন্যায়বিরুদ্ধ। বারবনিতা-বৃত্তি কেবল লোকমতানুসারে হেয় নহে, নৈতিক হিসাবেও উহা হেয়তম। পতিতাদিগকে শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্য তাহাদের চরিত্রসংশোধন নহে। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগকে 'চল্' করিয়া লওয়া ন্যায়বিরুদ্ধ ও দুর্নীতির পরিপোষক।

ইহা খুবই সত্য যে সমাজে যাহারা সাধু বলিয়া পরিচিত এবং যাহাদের প্রকাশ্য বৃত্তি নিন্দনীয় নহে,

তাহাদের মধ্যেও অনেকে অসাধু উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করে, অথবা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন কলুষিত। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, তাহারা তাহাদের অসাধু চেষ্টা ও পঙ্কিল জীবন সাধারণতঃ গুপ্ত রাখিতেই যত্নপরায়ণ হয়, তাহার বহিঃপ্রকাশ নিতান্ত লজ্জাজনক মনে করে, অনেক স্থলে তাহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইলে তাহাদের যথেষ্ট সামাজিক গ্লানিও ভোগ করিতে হয়, কেহ কেহ এরূপ স্থলে লজ্জায় আত্মঘাতীও হইয়া থাকে। সমাজে ধর্ম্মের নামে বহু অধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ভাক্ত ও ভণ্ডদল তাহাদের ভণ্ডামির খোলস ত্যাগ করিয়া তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত করিতে লজ্জা বোধ না করিলে সেটা কি সমাজদেহের পক্ষে অধিকতর স্বাস্থ্যকর হইত? কথা আছে, Hypocrisy is the homage which vice pays to virtue। "পুণ্যের প্রতি পাপ ভণ্ডামি দ্বারা শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।" পুণ্যের প্রতি বাহ্যিক শ্রদ্ধা প্রকাশও আবশ্যক, নতুবা পাপের 'নিলাজ নিঠুর লীলা'র সমক্ষে পুণ্যের নির্ম্মল শুভ্র স্থিরজ্যোতি একান্ত পরিম্লান হইতে পরিত।

রাজনীতি ও যৌননীতি পৃথক্ হইলেও একেবারে পৃথক্ নয়, কারণ মানব-মন বিভিন্ন ছিদ্রহীন কক্ষায় বিভক্ত নহে। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা রাজনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী; গণিকাসংস্পর্শ নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষক. সুতরাং গণিকাদের রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় যোগদান নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। বেশ্যা বলিয়াই ইহাদের দেহমন অপবিত্র, কিন্তু মেথর বলিয়াই মেথরের দেহমন অপবিত্র নহে। সুতরাং মেথর অস্পৃশ্য নহে। কিন্তু যতদিন বেশ্যাবৃত্তি ইহাদের অবলম্বনীয়, ততদিন ইহারা অস্পৃশ্য।

অবশ্য একথা বলিয়া ইহাদিগকে দূর করিয়া রাখিলেই ইহাদের প্রতি কর্ত্তব্য করা হইল না। সমাজ ইহাদের জন্য সাধুপথে থাকিয়া জীবনধারণের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য, এবং যে-সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি সমাজের এই কর্ত্তব্যজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে পতিতাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসার্হ। যে-সকল পুরুষ পতিতা নারীদিগকে প্রথম পাপপথে লইয়া যায় এবং পরে সেই পথ ছাড়িতে না দিয়া নিজের ভোগোপকরণ করিয়া রাখে, সমাজ তাহাদিগকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করে না, এই অভিযোগ খুবই সত্য। ইহার প্রধান ও প্রথম কারণ, স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার চিরাগত প্রথা। গৌণ কারণের মধ্যে বলা যাইতে পারে, যে, ঈদৃশ দুর্নীতিপরায়ণ পুরুষদিগের কলুষিত চরিত্র গণিকাদের ন্যায় কোন বৃত্তিবিশেষ দ্বারা স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হয় না। এবং সম্ভবতঃ মাতৃত্বসম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহাদের দুর্নীত পুরুষদের অপেক্ষা সমাজের পক্ষে বেশী অহিতকর বিবেচিত হয়। কিন্তু পতিতা স্ত্রীলোকদিগকে এবিষয়ে চরিত্রহীন পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার দিতে গেলে 'উল্টা বুঝিলি রাম' হইবে।

আসল কথা, পুরাণে'তিহাসের যুগে যে-কারণে রাজদরবারে এবং অন্যবিধ উৎসবে বেশ্যাসমাগম নিষিদ্ধ ছিল না, অধুনা সেই কারণেই রাজনৈতিক শোভাযাত্রায় তাহারা আহূত, এবং স্থলবিশেষে আদৃত, হইতেছে বলিয়া মনে হয়। সুসজ্জিত (যদিও অনেক স্থলেই দেশীয় বস্ত্রে নহে) সুকণ্ঠ সুন্দরী গায়িকার মুখে স্বদেশী সঙ্গীত অনেকের চিত্তহারী হয়, এবং শোভাযাত্রার একটি প্রধান অঙ্গ জনবহুলতা—ইহাদের সহায়তায় সাফল্য লাভ করে। পাশ্চাত্য দেশে "সাফ্রেজেট"গণ শোভাযাত্রা বাহির করেন বটে; কিন্তু তথায় ভদ্রমহিলাগণ অন্তঃপুরিকা নহেন সুতরাং তাঁহাদের শোভাযাত্রায় সামাজিক আদর্শের খর্ব্বতা হয় না কিম্বা দুর্নীতিও প্রশ্রয় পায় না। কিন্তু এই গ্রাম্যপ্রধান দেশে মাত্রাজ্ঞান (moderation, sense of proportion) স্বভাবতঃই কম, আমরা সহজেই চরমপন্থী হইয়া পড়ি; সেইজন্যই দেখা যায়, ভদ্রমহিলাগণ প্রায়ই অসূর্য্যম্পশ্যা, আর পতিতা নারী রাজনৈতিক উৎসবে সমাদরে গৃহীতা—যাহা অত্যন্ত ডিমক্রাটিক্ পাশ্চাত্য দেশেও দেখা যায় না—অথচ পতিতাদের উদ্ধার-বিষয়ে সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'চাল' ছাড়া চলে না, ইহা সত্য হইলেও, এরূপ 'চালে' দেশে উন্নতি অথবা অধোগতির পথ সুপ্রশস্ত হইবে, সকলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রম



আশ্রমের চিকিৎসাধীন রোগীদের অবস্থা- বালক-বালিকার সংখ্যাই অধিক

উত্তর-বঙ্গ-সেবাশ্রমের কর্ম্মীরা রাজসাহী জেলায় বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পূর্ণ উদ্যমে সেবা-কার্য্য চালাইতেছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় নাটোর মহকুমায় একটি কালাজ্বর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৯০টি রোগী চিকিৎসাধীন আছে; প্রতিদিনই নূতন নূতন রোগীর সমাগম হয়। একমাত্র নাটোর মহকুমাতেই দুই হাজারের উপর কালাজ্বরের রোগী আছে। ইহাদের চিকিৎসার জন্য অন্ততঃ ১৫টি গ্রাম্য-কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এই জেলার অন্যান্য মহকুমাতেও কালাজ্বরের রোগীর সংখ্যা অল্প নহে। সাধারণের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই দুর্ভাগ্যদের জীবনরক্ষার কোনই উপায় নাই। আমরা আশা করি জনসাধারণ যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া কর্ম্মীদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন ও লোক-সেবায় সহায় হইবেন। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যানন্দের নিকটে (পোঃ নওগাঁ, জেলা রাজসাহী) সাহায্য পাঠাইতে হইবে।



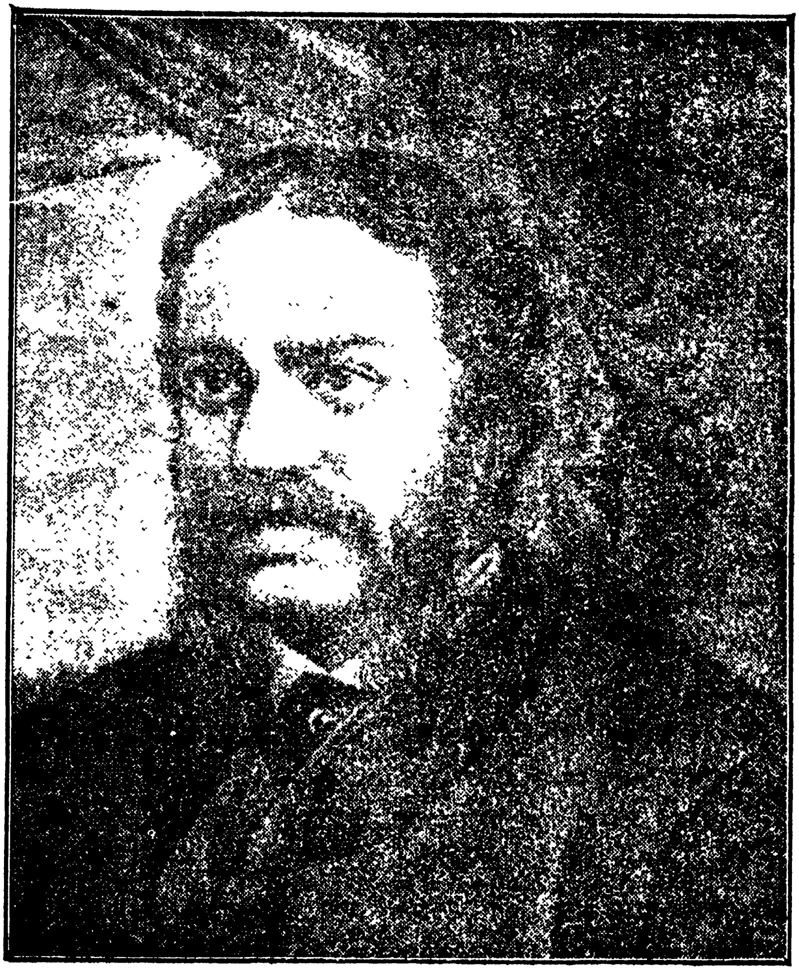
আশ্রমের চিকিৎসাধীনে রোগীরা ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভ করিতেছে



আশ্রমের চিকিৎসক সমবেত রোগীদিগকে ইন্‌জেক্‌শন দিতেছেন

মাইকেল মধুসূদন দত্তের শাতবার্ষিক জন্মোৎসব

১২৩০ সালের ১২ই মাঘ মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। এবৎসর তাঁহার জন্মের শতবৎসর পূর্ণ হইল। এই উপলক্ষে তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য কলিকাতায় দুই জায়গায় সভার আয়োজন হইয়াছিল—প্রথমটি হিন্দুস্কুলে ও দ্বিতীয়টি সাহিত্য-পরিষদে। হিন্দুস্কুলের সভাস্থলটিকে ছাত্র এবং শিক্ষকেরা পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর-



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

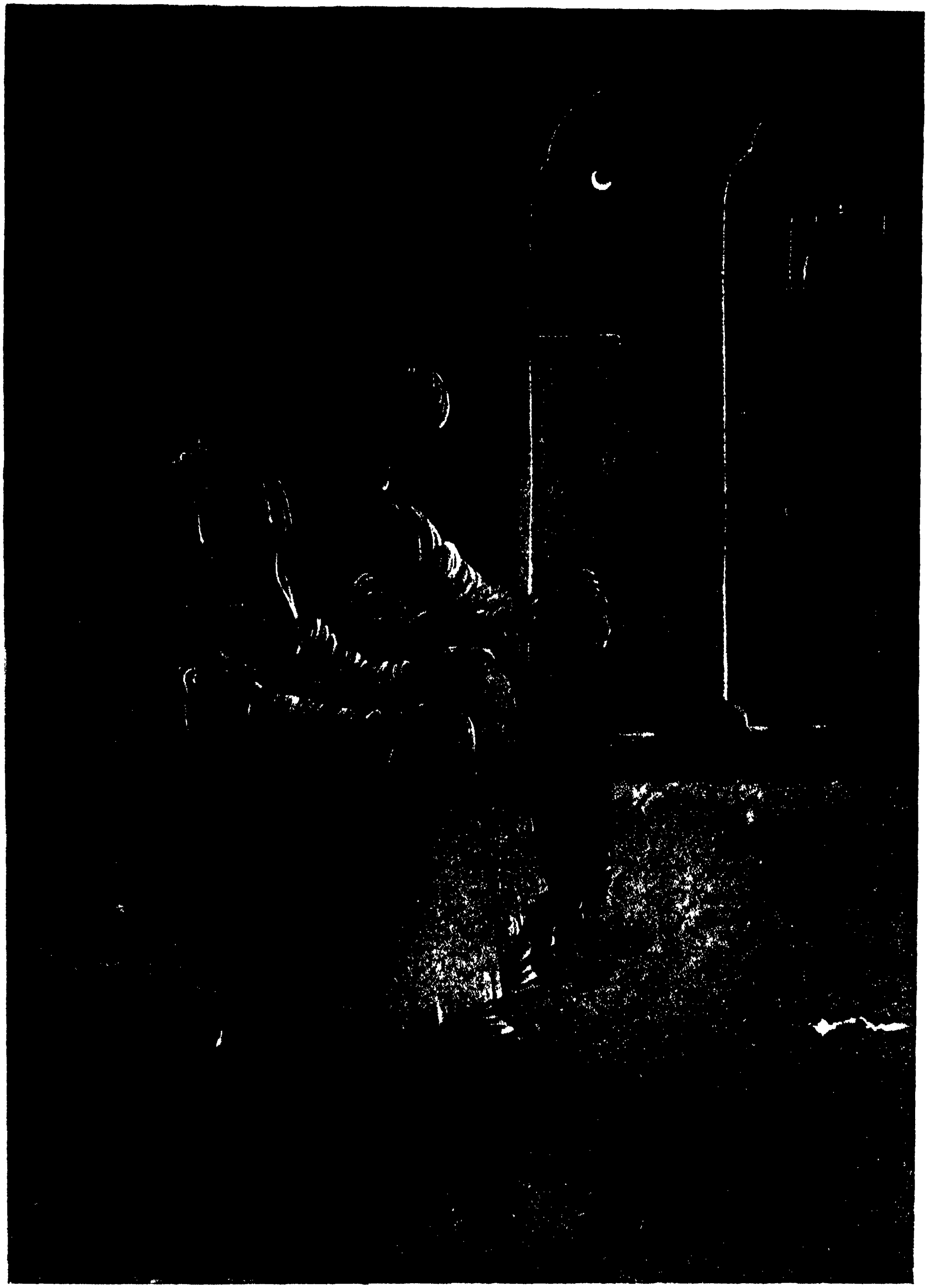
প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে মাইকেলকে সশরীরে দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় আরো বলেন যে গত গ্রীষ্মের সময় তিনি সাগরদাঁড়ীতে কবির জন্মস্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তিনি বুঝিলেন যে প্রকৃতিই মাইকেলকে একজন বড় কবি হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তিনি কোন কাগজে পড়িয়াছিলেন যে পুত্ররূপেই হউক আর স্বামীরূপেই হউক আর ব্যবহারাজীবরূপেই হউক জীবিতকালে মাইকেল বড় একগুঁয়ে ও বেয়াড়া ছিলেন। কিন্তু তাঁর কবিত্বের বেয়াড়ামিই

তাঁহাদের সাহিত্যকে নূতন সম্পদ্ দিয়া গেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখুয্যের সমর্থনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে হিন্দুস্কুল মধুসূদন-স্মৃতিসমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে ও এই সমিতি মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। সভাপতি মহাশয় সভাস্থলে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের পাণ্ডুলিপি দেখান। এই পাণ্ডুলিপি মাইকেল ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। যতীন্দ্রমোহন উহা সযত্নে বাঁধাইয়া পরমশ্রদ্ধার সহিত নিজের গ্রন্থাগারে রাখিয়াছিলেন। এই পাণ্ডুলিপির সবটাই মধুসূদনের স্বহস্তে লিখিত নয়, খানিকটা তাঁহার সংস্কৃত-পণ্ডিতের লেখা।

ঐ দিন সাহিত্যপরিষদে যে সভা হয় সে সভায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবির জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় কবির জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাস্থলে কবির উদ্দেশে রচিত কয়েকটি কবিতাও পঠিত হয়।

আধুনিক বাংলার প্রথম বড় কবি মধুসূদনের স্মৃতির উদ্দেশে আহূত সভার আয়োজন যে ইহা অপেক্ষা ভাল করিয়া করা উচিত ছিল তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু আয়োজনই সব নয়, এ-সব বিষয়ে লোকের আগ্রহের অভাবই বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার জিনিষ। আমাদের জাতীয় জীবনের স্রোত যে কত মন্দবেগে বহিতেছে তাহা ইহা হইতেই বোঝা যায়। অন্যদেশ হইলে এরূপ একটা ঘটনায় দেশব্যাপী উৎসব লাগিয়া যাইত; কবি যেখানে যে-স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেখানে দেশের অনেকে সমবেত হইতেন। কিন্তু তাহা হইল কই! মধুসূদন এককালে হিন্দুস্কুলের ছাত্র ছিলেন তাই হিন্দুস্কুল একটু আয়োজন করিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালীর ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা আছে সেখানে নমোনম করিয়া কোনরূপে কবির মানরক্ষা করা হইল। কিন্তু হিন্দুস্কুল ছাড়াও এই কলিকাতারই অন্যান্য স্থানের সহিত কবির স্মৃতি বিজড়িত আছে। আর ত কেহ কিছু করিল না। তিনি এখানে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতেন; সেখানে কোন সাড়া শব্দ হইল কই। কবি পুলিশকোর্টে দোভাষীরূপে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন ও ব্যাঙ্ক্শালের স্থানান্তরিত পুলিশ-কোর্টের ভিতর এখনো তাঁহার চিত্র আছে। সেখানেও কবির জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার কালে কেহ ইহা বলিয়া একবার গর্ব্বও প্রকাশ করিল না যে, কবি একদিন আমাদের এই আদালতে কাজ করিতেন। গ্রীক পুরাণ-কথায় লিখিত আছে যে, সঙ্গীত কবিতা প্রভৃতি কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাতৃদেব অ্যাপোলো একবার নয় বৎসর কাল অন্য ন্য মেষ-পালকের সঙ্গে ফেরাএ নগরের কাছে অ্যাড্‌মেটাসের মেষ চরাইয়াছিলেন। পরে যখন অ্যাপোলো সেখান হইতে তিরোহিত হন তখন মেষপালকেরা তাঁহার স্মৃতি লইয়া কত গর্ব্ব করিত। "এইখানে এই পাথরের উপর তিনি বসিতেন, এম্নি করিয়া বাঁশী বাজাইতেন" এইসব কথা বলিয়া ও স্মরণ করিয়া তাহারা কত গর্ব্ব ও সুখ অনুভব করিত। আমাদের মধুসূদন একদিন বার-লাইব্রেরী ও পুলিশ আদালতরূপ মরুভূমিতে মক্কেল চরাইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে এখনকার মক্কেল-চারকগণের তাঁহার স্মৃতি-বিজড়িত গর্ব্ব ও তৎসম্পর্কিত সুখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। তাঁহার জন্মস্থান সাগরদাঁড়ী গ্রামে সমগ্র বঙ্গবাসীর তীর্থযাত্রা হওয়া দূরে থাকুক সামান্য একটু মেলা কিম্বা অন্য কোন উৎসব দ্বারা এই স্মরণীয় দিনটিকে সেখানকার পল্লীর একটানা জীবনস্রোতে চিহ্নিত করিবার কোনরূপ আয়োজনের কথা এখন পর্য্যন্ত শোনা যায় নাই। কলিকাতার সংবাদপত্র মহলেও খুব বেশী আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। যে অমৃতবাজার এককালে 'ছুছুন্দরীবধ কাব্য' প্রকাশ করিয়া কবির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে যোগ দিয়াছিল সেই অমৃতবাজার কবির প্রশংসা-সূচক দু'তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন ও বাংলা আনন্দবাজার একটি বিশেষ আলোচনাপূর্ণ সংখ্যা বাহির করিয়াছিলেন এই যা সুখের বিষয়!

শ্রী অশ্বিনীকুমার ঘোষ



মুসাফের-খানায়

চিত্রকর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

২৩শ ভাগ, ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৩০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল ?

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পারো তুমি ?
শোননি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, "আহা, আহা,"
সকল বন-ভূমি ?
শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপন-ধরা
শিথিল মন্থর
"কে এল" বলি' তরাসি' উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি'।
অশোক-বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি ?"
মর্ম্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে
"শোন গো, শোন শোন।"
শ্যামা না জানে প্রভাতী-গানে কি নামে তারে ডাকে
আছে কি নাম কোনো ?
কোকিল শুধু মুহুমুহু
আপন মনে কুহরে কুহু
ব্যথায় ভরা বাণী।
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, "জানি কি, তারে জানি ?"

আমের বোলে কি কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি'
অসহ উচ্ছ্বাসে।
আপন মনে মাধবী ভণে কেবলি দিবারাতি
"মোরে সে ভালোবাসে।"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
ক্ষ্যাপার মত বহিছে কা'রে
"বল ত কি যে করি ?"
শিহরি' উঠি' শিরীষ বলে, "কে ডাকে মরি, মরি।"

কেন যে আজি উঠিল বাজি' আকাশ-কাঁদা বাঁশী
জানিস্ তাহা নাকি ?
রঙীন যত মেঘের মত কি যায় মনে ভাসি'
কেন যে থাকি' থাকি' ?

অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস্ খুঁজি';
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস্ না যে তাই ত লাগে ধাঁধা।

পুলকে-কাঁপা কনক-চাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে যার নাড়া,
এমন করে' কুঞ্জ ভরে' সহজে তাই ত সে
দিয়েছে তা'রে সাড়া।
সহসা বন-মল্লিকা যে
ছুঁয়েছে তারে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই যে তুমি, এই যে তুমি" আঙুল তুলে' বলে।

পেয়েছে তা'রা, গেয়েছে তা'রা, জেনেছে তা'রা সব
আপন মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধা-বিহীন তানে।
ওদের সাথে জাগ্ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্ সে ছবি,
ভাঙুক মোহ-ঘোর!
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক্ না ভরে' ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা, বাজ্!
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে দুলে', কবি,
ফুরালো তোর কাজ!
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস্ ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক্ টুটি'॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উপনিষদের ব্রহ্ম

উপনিষৎসমূহ সমসাময়িক নহে; ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ঋষির মত বর্ণিত হইয়াছে; এমন কি একই উপনিষদে ভিন্ন ভিন্ন ঋষির মত পাওয়া যায়। আবার একই ঋষি যে সর্ব্বত্র একই মত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও নহে। সাধারণ লোক এই সমুদায় বিষয় কিছুই জানে না। পণ্ডিতগণের মধ্যেও এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের চিন্তার অন্তরালে এই ভাব লুক্কায়িত রহিয়াছে যে, উপনিষদের মত একই। ভাষ্যকারগণ এবং টীকাকারগণ এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রুতিতে শ্রুতিতে কোন বিরোধ নাই। এইপ্রকার হইবার প্রধান কারণ সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতার উপদ্রবে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া দুরূহ হইয়াছে। "আমার সম্প্রদায়কে উপনিষদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে"—যতদিন এইপ্রকার ভাব থাকিবে, ততদিন উপনিষদের প্রকৃত ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব হইবে না। সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মতানুসারে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে সাম্প্রদায়িকতাকে অতিক্রম করিতে হইবে।

প্রাচীনকালে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ ও সামবেদ এই তিনখানা বেদকেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা হইত। এইজন্য বেদের নাম ছিল "ত্রয়ী"। উত্তরকালে অথর্ব্ববেদকেও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এখন আমরা বলি চতুর্ব্বেদ। মহাভারতকার বলিয়াছেন, "বেদাঃ বিভিন্নাঃ"। বেদসমূহের নামই যে কেবল ভিন্ন তাহা নহে, ইহাদিগের উদ্দেশ্যও ভিন্ন এবং মতও ভিন্ন। কেবল তাহাই নহে; এক-এক বেদেরই বহু শাখা। মতভেদের জন্যই এই সমুদায় শাখার সৃষ্টি। সুতরাং সামঞ্জস্য

করিবার চেষ্টা করা বৃথা। আমরাও অন্যায়রূপে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা করিব না।

আমাদিগের আলোচ্য বিষয় "উপনিষদের ব্রহ্মবাদ"। আমরা সাম্প্রদায়িকতার অতীত হইয়া এবং ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ঋষির ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

যাজ্ঞবল্ক্যের মত

অনেকে মনে করেন, উপনিষৎসমূহের মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষৎই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। যাজ্ঞবল্ক্য এই উপনিষদের প্রধান ঋষি। তিনি ব্রহ্ম-বিষয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সূক্ষ্ম ও জ্ঞানগর্ভ। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহারই মতামত আলোচনা করা যাউক।

মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ

(বৃহঃ ৪।৫ ; ২।৪)

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের অন্যতরা পত্নী। বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবার সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা উপনিষদের দুইটা স্থলে (৪।৫ ; ২।৪) বর্ণিত আছে। এই দুইটা অংশেরই নাম "মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ"। উভয় ব্রাহ্মণেই ভাষা অধিকাংশ স্থলেই এক ; দুই-একটি স্থলে যে পার্থক্য আছে, তাহা গুরুতর নহে।

আত্মাই ব্রহ্ম

এই ব্রাহ্মণে আত্মাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। উপনিষদের যুগে 'ব্রহ্ম' ও আত্মা শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইত আমরা পূর্ব্বে দুইটা প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিয়াছি। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ স্থলেই 'ব্রহ্ম' শব্দ গুণবাচক। যিনি সর্ব্বমূলাধার, যাঁহা হইতে এই সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং যাঁহাতে এই সমুদায় লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন—কোন্ বস্তু ব্রহ্ম ? তিনি কে, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ? যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, আত্মাই সেই বস্তু ; আত্মাই সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ; অর্থাৎ আত্মাই ব্রহ্ম।

আত্মা এক

আমরা সচরাচর জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য করিয়া থাকি ; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য এপ্রকার কোন পার্থক্য করেন নাই। তিনি সর্ব্বত্রই "আত্মা" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, কোন স্থলে 'আত্মা' শব্দের অর্থ 'জীবাত্মা' এবং কোন স্থলে অর্থ 'পরমাত্মা'। ইহার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া ব্যাখ্যাকর্ত্তৃগণ বিষম বিপদে পড়িয়াছেন এবং নানা মতের উদ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ অতি সরল। আত্মা একই ; কোন স্থলে আমরা বলি জীবাত্মা, কোন স্থলে বলি পরমাত্মা। কিন্তু উভয় স্থলেই আত্মা এক ভিন্ন দুই নহে।

আবার আমরা বলি মানব বহু, এবং এক-এক মানবে এক-এক আত্মা। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, মানব বহু হইতে পারে, কিন্তু আত্মা একই। ভিন্ন ভিন্ন মানবে যে আত্মা দেখিতে পাই তাহা বহু নহে ; একই আত্মা বহু মানবে প্রকাশিত হইয়াছে। কি প্রকারে এক আত্মা বহু রূপে প্রকাশিত হইল বা প্রকাশিত হইতে পারে, যাজ্ঞবল্ক্য তাহার বিচার করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্য বলিয়াছেন যে, আত্মা একই এবং এই আত্মাই ব্রহ্ম। মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে তিনি এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে ব্যাখ্যাত হইল।

আত্ম-প্রীতি

যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বপ্রথমেই বলিলেন, যে, জগতে বহু বস্তু মানবের প্রিয় হয়। পতি জায়া পুত্র বিত্ত পশু ব্রাহ্মণ ক্ষত্র স্বর্গাদিলোক দেবগণ বেদসমূহ ভূতসমূহ এবং সর্ব্ব বস্তুকেই মানুষ ভালবাসে। এস্থলে ঋষির মনে এইপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল—মানুষ এই সমুদায়কে কেন ভালবাসে ? আত্মপ্রীতির জন্যই কি এসমুদায়কে ভালবাসে ? অথবা মানুষ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়া, সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রীতিনিরপেক্ষ হইয়া, কেবল বিশ্বপ্রীতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই জগৎকে প্রীতি করে ? আত্মপ্রীতি কি ইহার কারণ ? কিংবা ইহার কারণ বিশ্বপ্রীতি ?

ঋষি নিজেই ইহার উত্তরও দিয়াছেন। মানুষ অপরের প্রতি প্রীতিবশতঃ অপরকে ভালবাসে না, আত্ম-প্রীতির জন্যই অপরকে প্রীতি করে।

মূলে আছে "আত্মনঃ কামায়"। ইহার অর্থ 'আত্ম-কামের জন্য অর্থাৎ আত্ম-প্রীতির জন্য'। সচরাচর

'আত্মপ্রীতি' শব্দের দুইটি অর্থ করা হয়—(১) পরমাত্মার প্রতি প্রীতি ; (২) নিজের প্রতি প্রীতি।

এস্থলে প্রথম অর্থ কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না। লোকে পরমাত্মার প্রতি প্রীতিবশতঃ কখন পশু ধন বা অপরাপর বস্তুকে প্রীতি করে না। নিজের সুখের জন্যই পশু ধন ও অপরাপর বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে। 'কি করা উচিত' এস্থলে সে-প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। প্রশ্ন এই—"এ জগৎ লোকের প্রিয় হয় কেন?" ইহার উত্তর—"আপনাকে ভালবাসে বলিয়াই লোকে বিত্তাদি ভালবাসে, আপনার সুখের জন্যই বিত্তাদি করে।"

'আত্মা' শব্দ অতি অদ্ভুত। ইহা পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে ইহার অর্থ 'স্বয়ং' 'আপনি' 'নিজ' ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত অংশে ইহা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ এস্থলে 'আত্ম-প্রীতি' অর্থ 'নিজের প্রতি প্রীতি'।

এখানে বলা আবশ্যক যাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে পরমাত্মা বা জীবাত্মা বা 'নিজ' 'আপনি' ইত্যাদি কোন অর্থের বিষয়েই চিন্তা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন 'আত্মা'। তিনি বুঝিয়াছেন আত্মা এবং বুঝাইয়াছেন আত্মা। তিনি সর্ব্বত্রই দেখিয়াছেন এক আত্মা। আমরাই বিচার করিয়া বুঝিতেছি এবং বলিতেছি এস্থলে 'আত্ম-প্রীতি' অর্থ 'নিজের প্রতি প্রীতি'।

আত্মাই লক্ষ্য

"আত্ম-প্রীতির জন্যই জগৎ প্রিয় হয়"—ইহা বিস্তৃত-ভাবে বর্ণনা করিয়া ঋষি বলিতেছেন—"অরে! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।" তাঁহার যুক্তির ক্রম এই—

(১) আত্ম-প্রীতির জন্যই জগৎ প্রিয় হয়।

(২) সুতরাং এই আত্মা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু।

(৩) সুতরাং এই আত্মাকেই দর্শনাদি করিতে হইবে।

প্রথম কথাই এই—"নিজেকে প্রীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়।" যাহাকে লোকে 'নিজ' বা 'আপন' বা 'আমি' বলে, প্রকৃত পক্ষে তাহা আত্মাই। সুতরাং "নিজেকে প্রীতি করা" অর্থ "আত্মাকে প্রীতি করা"। "নিজেকে প্রীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়"—ইহার অর্থ "আত্মাকে প্রীতি করে বলিয়াই জগৎ প্রিয় হয়"।

দ্বিতীয় কথা এই— যাহার জন্য জগৎ প্রিয় হয়, তাহা নিশ্চয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু।

শেষ কথা এই— এই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু, ইহাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

অর্থাৎ আত্মাকেই দর্শন শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

সমুদায়ই আত্মা

ইহার পরে ঋষি বলিলেন, যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় স্বর্গাদিলোক দেবগণ দেবসমূহ এবং ভূতসমূহকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করে, ব্রাহ্মণাদি সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহার পরে ঋষি বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণ জাতি, এই ক্ষত্রিয় জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেবতাগণ, এই বেদসমূহ, এই সমুদায় ভূত—এসমুদায়ই আত্মা!"

তিনটি উপমা

ইহার পরে তিনটি উপমা দ্বারা ঋষি বুঝাইয়াছেন যে, আত্মাকে অবগত হইলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবগত হওয়া যায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত এই :—

"যেমন তাড্যমান দুন্দুভি হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কেবল দুন্দুভি গ্রহণ করিলে কিংবা দুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়; যেমন বাদ্যমান শঙ্খ হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গ্রহণ করিলে কিংবা শঙ্খবাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়; যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গ্রহণ করিলে কিংবা বীণা-বাদককে গ্রহণ করিলেই ঐ শব্দ গৃহীত হয়; ইহাও তেমনি (অর্থাৎ আত্মাকে গ্রহণ করিলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গৃহীত হয়)।"

যখন কোন যন্ত্র বাজান হয়, তখন সেই যন্ত্র হইতে পৃথক্ পৃথক্ বহু স্বর নির্গত হয়। কিন্তু এক-একটি

স্বরকে যদি পৃথক্-পৃথক্-ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার কোন অর্থই হয় না। যদি বাদকের মনোগত ভাব জানা যায়, তাহা হইলেই বুঝা যায়, এসমুদয় স্বর পৃথক্ পৃথক্ নহে, ইহাদিগের মধ্যে একত্ব রহিয়াছে; বিশেষ উদ্দেশ্যে এইসমুদয় স্বর উৎপাদিত হইয়াছে এবং এসমুদায়ের বিশেষ অর্থ আছে।

কিংবা এইসমুদয় বাদ্যযন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব যদি অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যভাবে স্বর-তত্ত্ব বুঝা যাইতে পারে। জগতের বস্তুসমূহও এইপ্রকার। এক-একটি বস্তুকে পৃথক্-ভাবে বিচার করিলে ইহার কোন অর্থই হয় না। যদি মনে করা যায়, প্রত্যেক বস্তুই স্বতন্ত্র, তাহা হইলে ইহা উদ্দেশ্যবিহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন বুঝা যায় এইসমুদায় বস্তু আত্মা হইতে উৎপন্ন, আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত, একসূত্রে গ্রথিত ও পরস্পর সম্পর্কিত; এবং যখন সেই আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তখনই বুঝা যায় এ জগতের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, এবং ইহা গভীর অর্থ-পূর্ণ। বাদককে কিংবা বাদ্যযন্ত্রকে জানিলে যেমন স্বর-সমূহের অর্থ জানা যায়, আত্মাকে জানিলেও তেম্নি এ জগৎকে অবগত হওয়া যায়।

সৃষ্টি

ইহার পরে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি বুঝাইতেছেন যে, বেদাদি শাস্ত্রও সেই আত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

"যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, তেম্নি, হে মৈত্রেয়ি, ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা উপনিষৎসমূহ শ্লোকসমূহ সূত্রসমূহ ব্যাখ্যানসমূহ, অনুব্যাখ্যানসমূহ—এ সমুদায়ই সেই মহদ্ভূত হইতে নির্গত হইয়াছে, এ সমুদায় ইহা হইতেই নিশ্বসিত হইয়াছে।"

আত্মাই একায়ন

'একায়ন' শব্দের অর্থ "একগতি" অর্থাৎ গমাস্থল বা মিলনস্থল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি বুঝাইতেছেন যে, আত্মাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একায়ন।

"সমুদ্র যেমন সমুদায় জলের একায়ন, ত্বক্ যেমন স্পর্শের একায়ন, নাসিকাদ্বয় যেমন গন্ধের একায়ন, জিহ্বা যেমন রসের একায়ন, শ্রোত্র যেমন শব্দের একায়ন, মন যেমন সঙ্কল্পের একায়ন, হৃদয় যেমন বিদ্যার একায়ন, হস্তদ্বয় যেমন সমুদায় কর্ম্মের একায়ন, পদদ্বয় যেমন সমুদায় গতির একায়ন, বাক্‌সমূহ যেমন সমুদায় বেদের একায়ন—তেম্‌নি আত্মাও এই সমুদায়ের একায়ন।"

সৈন্ধবের উপমা

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"যেমন সৈন্ধবখণ্ড অন্তর-রহিত বাহ্যরহিত এবং একমাত্র রসঘন,—তেম্‌নি এই আত্মা অন্তর রহিত বাহ্যরহিত এবং একমাত্র প্রজ্ঞানঘন।"

এই বাহ্যজগৎ ভেদযুক্ত এবং বৈচিত্র্যময়। অন্তর-জগতেও ভেদ রহিয়াছে। মনের মধ্যে কত চিন্তা, কত ভাব, কত ইচ্ছা! যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন— "আত্মা প্রকৃতভাবে এপ্রকার ভেদযুক্ত নহে। ইহা অন্তর্বাহ্য-ভেদরহিত, ইহা একাকার একরস, প্রজ্ঞানঘন।"

আমাদের দেশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই ভাবকে বিশদ করিবার জন্য নানাপ্রকার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া থাকেন। বৃক্ষের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। বৃক্ষ বস্তুটি এক, কিন্তু এক হইলেও ইহার বিভিন্ন অঙ্গ আছে— যেমন মূল কাণ্ড ত্বক্ পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি। এই সমুদায় অঙ্গ পরস্পর পৃথক্। বৃক্ষ এক হইলেও ইহাতে ভেদ রহিয়াছে। কিন্তু আত্মার কোন অঙ্গও নাই— আত্মাতে কোন ভেদও নাই।

আত্মার সংজ্ঞা

ইহার পরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—"(এই আত্মা) এইসমুদায় ভূত হইতে (জীবাত্ম-রূপে) উত্থিত হইয়া সেই-সমুদায়েই আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (অর্থাৎ চৈতন্য) থাকে না।"

এস্থলে ঋষি জীবাত্মার উৎপত্তির কথা বলিতেছেন। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ঋষি এস্থলে আত্মার উৎপত্তির কথা বলিতেছেন না; আত্মা জীবাত্মরূপে প্রকাশিত হয়—এই কথাই এখানে বলা হইতেছে। তিনি আরও বলিতেছেন যে, মৃত্যুর পরে জীবাত্মার আর সংজ্ঞা থাকে না। ঋষি যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে,

মৃত্যুর পরেই "আত্মার নির্ব্বাণ মুক্তি"। এস্থলে ক্রমমুক্তি বা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা হইল না।

আত্মা অদ্বৈত

"মৃত্যুর পরে আর সংজ্ঞা থাকে না" ইহা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন—"ভগবান্ আমাকে মোহের মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। আমি ইহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

মৈত্রেয়ী যাহা বলিয়াছিলেন, এখনও অধিকাংশ লোক সেই কথাই বলিবে। যাজ্ঞবল্ক্যের মত সত্য না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার মত অবোধ্য বা মোহকর নহে। তিনি এইভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন:—

"আমি মোহজনক কিছু বলি নাই। এই আত্মা অবিনাশী ও উচ্ছেদবিহীন।"

ইহার পরে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে:—

"যে-স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে (যত্র দ্বৈতমিব ভবতি) সেই স্থলে একজন অপরকে দর্শন করে, এক অপরকে আঘ্রাণ করে, এক অপরকে আস্বাদন করে, এক অপরকে শ্রবণ করে, এক অপরকে অভিবাদন করে, এক অপরকে মনন করে, এক অপরকে স্পর্শ করে, এক অপরকে জ্ঞাত হয়। কিন্তু ইহার নিকট যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কিরূপে কাহাকে দর্শন করিবে? কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে? কিরূপে কাহাকে আস্বাদন করিবে? কিরূপে কাহাকে অভিবাদন করিবে? কিরূপে কাহাকে স্পর্শ করিবে? কিরূপে কাহাকে অবগত হইবে? যাঁহা দ্বারা সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কিরূপে জানিবে?

এই আত্মা 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়); ইনি অগৃহ্য, ইহাকে গ্রহণ করা যায় না; ইনি অশীর্য্য, ইনি শীর্ণ হয়েন না; ইনি অসঙ্গ, কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না; ইনি অবদ্ধ, ইনি ব্যথা প্রাপ্ত হয়েন না এবং হিংসিত হয়েন না।"

উপদেশের শেষ কথা:—"বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিবে?" (বৃহ ৪.৫; ২।৪) এখানে যাজ্ঞবল্ক্য ঘোর অদ্বৈতবাদের কথা বলিলেন। তাঁহার মতে আত্মা হইতে পৃথক্ এবং দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। আত্মার বাহিরে যেমন কোন বস্তু নাই, আত্মার অভ্যন্তরেও কোন প্রকার ভেদ নাই। এইপ্রকার আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি কিছুই সম্ভব নহে। যেখানে দ্বিতীয় বস্তু সেইখানেই দর্শন শ্রবণাদি সম্ভব হইতে পারে। আমরা এই পৃথিবীতে বাস করিতেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে। দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের পক্ষে দর্শনাদি সম্ভব হইয়াছে। জগতে যদি দ্বিতীয় বস্তু না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের দর্শনাদি কার্য্যই হইত না। কল্পনা কর জগতে আর-কোন বস্তুই নাই, আছে কেবল আমার দেহ। এস্থলে চক্ষু দ্বারা দেহের অপরাপর অঙ্গ দর্শন করা সম্ভব। দেহে ভেদ আছে, দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আছে; এইজন্যই চক্ষু অপরাপর অঙ্গকে দেখিতে পারে। কিন্তু দেহে যদি অপরাপর অঙ্গ না থাকিত, দেহ যদি কেবল চক্ষুময় হইত অর্থাৎ জগতে যদি কেবল একখানা চক্ষুই থাকিত—তাহা হইলে সেই চক্ষু কাহাকে দর্শন করিত? এই কল্পিত চক্ষুর বিষয়ে যাহা সত্য, আত্মার পক্ষেও ঠিক তাহাই সত্য। দ্বিতীয় বস্তু নাই, সেইজন্য আত্মার পক্ষে দর্শন শ্রবণ মননাদি কার্য্য সম্ভব হইতে পারে না।

আমরা যাহাকে "সংজ্ঞা" বা চৈতন্য বলি, তাহা দ্বৈত-মূলক। যতক্ষণ দ্বিতীয় বস্তু আছে, ততক্ষণই "সংজ্ঞা"। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবীতে আছি, ততক্ষণই আমাদিগের এই ভ্রম হয় যে "দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে"। তাঁহার ভাষা এই:—

"যত্র দ্বৈতম্ ইব ভবতি"

অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় বস্তু আছে এই-প্রকার ভ্রম হয়। "ইব" শব্দ ব্যবহার করিয়া ঋষি বুঝাইতেছেন যে, দ্বৈতজ্ঞান ভ্রমাত্মক। মৃত্যুর পরে আত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হয়; তখন আর দ্বিতীয় বস্তু আছে বলিয়া ভ্রম হয় না। 'সংজ্ঞা' যখন দ্বৈতমূলক এবং মৃত্যুর পরে যখন আত্মার নিকট দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, তখন আত্মার পক্ষে সংজ্ঞা থাকা অসম্ভব। এইজন্যই ঋষি বলিয়াছেন, "মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না"। এই আত্মাকে বর্ণনা করিতে হইলে কেবল বলিতে হয় 'নেতি' 'নেতি' (ইহা নয়, ইহা নয়)।

জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়

'নেতি' 'নেতি' দ্বারা যাঁহাকে বর্ণনা করিতে হয়,

তাঁহাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। এবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য এই-প্রকার বলিয়াছেন :—

(১) যাহা দ্বারা সমুদায় জানা যায়, তাহাকে কি-প্রকারে জানিবে ?

(২) বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিবে ?

এই দুইটি বাক্যই একার্থ-প্রকাশক। ইহার অর্থ বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্য এস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা দর্শনশাস্ত্রের একটি গভীর তত্ত্ব। ইহা সহজ-বোধ্য নহে, এইজন্য এবিষয়ে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক।

যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত :—

"বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না"। ইহা যদি সত্য না হয় কল্পনা করা যাউক—"বিজ্ঞাতাকে জানা যায়"। যাহাকে জানা যায়, তাহা জ্ঞেয় বস্তু। যখন কল্পনা করিয়া লওয়া হইল যে, বিজ্ঞাতাকে জানা যায় তখন এই বিজ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুরূপে পরিণত হইল। যাহা ছিল বিজ্ঞাতা তাহা হইল এখন জ্ঞেয় বস্তু। এস্থলে এই জ্ঞেয় বস্তুর এক নূতন জ্ঞাতা সৃষ্টি হইল। এইরূপে যদি এই দ্বিতীয় বিজ্ঞাতাকেও 'জ্ঞেয়' বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তৃতীয় এক বিজ্ঞাতা আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমরা যতই অগ্রসর হই না কেন, সর্ব্বোপরি একজন বিজ্ঞাতা থাকিবেই। এই বিজ্ঞাতাকে কখনই 'জ্ঞেয়' বলিয়া কল্পনা করা যায় না।

প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারেই একজন বিজ্ঞাতা আছে। এ বিজ্ঞাতাকে জানিবে কে ? যে জানিবে সেই যে বিজ্ঞাতা। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতেই হইবে যে—"বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না"।

কিন্তু অনেকে বলেন, আমরা বুঝিতেছি "বিজ্ঞাতাকে জানা যায়"—ও যুক্তি শুনিব কেন ? এপ্রকার আপত্তির মূলে যে কিছু সত্য নাই তাহা নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঘটনায় একজন বিজ্ঞাতা ছিল। তাহার কথা স্মৃতিতে রহিয়া গিয়াছে। আমরা সেই স্মৃতির ঘটনার বিজ্ঞাতা। কিন্তু কল্পনা করিয়া লই আমরা বিজ্ঞাতাকেই জানিতেছি। আমরা বিজ্ঞাতাকে জানি না, আমরা বিজ্ঞাতার শব ব্যবচ্ছেদ করি।

আত্মার জ্ঞাতৃত্ব

আমরা দ্বৈতমূলক জগতে বাস করিতেছি। এই-প্রকার জগতে দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান ইত্যাদি সমুদায় কার্য্যই সম্পন্ন হইতেছে। আত্মাই এস্থলে দ্রষ্টা শ্রোতা ও বিজ্ঞাতা।

কিন্তু ঋষি বলিয়াছেন, দ্বৈত-জ্ঞান ভ্রান্তিমূলক। আত্মা যখন স্ব-রূপে বিরাজ করেন তখন দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না। সুতরাং আমরা বলিতে পারি না—"আত্মা এই অবস্থায় দর্শন করেন, শ্রবণ করেন এবং জানেন।" সুতরাং এই আত্মাকে তখন দ্রষ্টা শ্রোতা বা বিজ্ঞাতা বলা যাইতে পারে না। তবে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাকে কেন বিজ্ঞাতা বলিলেন ? ইহার প্রথম উত্তর এই যে, দ্বৈতমূলক জগতে আত্মাই বিজ্ঞাতা। যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র (বৃহঃ ৪.৩) ইহার দ্বিতীয় উত্তর দিয়াছেন। আত্মা স্বভাবতই দ্রষ্টা, শ্রোতা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি। দর্শনাদির বস্তু না থাকিলেও আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি জ্ঞানাদি লুপ্ত হয় না। এইজন্যই আত্মাকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতাদি বলা হইয়াছে। অন্য-ভাবেও ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আত্মা অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় বস্তু নাই ; সেইজন্য আত্মা দর্শন করে না, শ্রবণ করে না এবং জানে না। কিন্তু দ্বিতীয় বস্তু যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই আত্মা দর্শন করিতে পারিত, শ্রবণ করিতে পারিত, জানিতে পারিত, ইত্যাদি। যখন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, তখনও আত্মার দৃষ্টি শ্রুতি ও জ্ঞানাদি বিলুপ্ত হয় না ; এ-সমুদায় নিত্যই বর্ত্তমান থাকে ; ইহাই আত্মার প্রকৃতি। এই অর্থেই যাজ্ঞবল্ক্য আত্মাকে দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি বলিয়াছেন।

এই আত্মা বিজ্ঞাতা। কিন্তু বিজ্ঞাতাকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করা যায় না। ইহার বিষয় কেবল বলা যায়— "নেতি", "নেতি"।

উপসংহার

'মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণ' আলোচনা করিয়া আমরা এই সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইতেছি।—

১। আমরা বলি বহু　　এবং বহু আত্মা। আবার 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা' এতদুভয়ের মধ্যেও

পার্থক্য দেখি। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের মতে আত্মা একই। মানবাত্মায় মানবাত্মার কিংবা মানবাত্মায় পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই।

২। একমাত্র আত্মাই বর্ত্তমান; আত্মা হইতে পৃথক্ বা দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই।

৩। আত্মার অভ্যন্তরে ও বাহিরে কোন ভেদ নাই। অন্য ভাষায় বলা যাইতে পারে— আত্মা যেমন বাহ্য-রহিত, তেম্‌নি অন্তর-রহিত।

৪। ভ্রান্তিবশতই লোকে মনে করে এই জগৎ রহিয়াছে। যতক্ষণ এই জগৎ, ততক্ষণই দর্শন শ্রবণাদির কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মা যখন 'স্বরূপ' প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, সুতরাং তখন দর্শন শ্রবণাদি সম্ভব হয় না।

৫। আমরা যাহাকে 'সংজ্ঞা' বা চৈতন্য বলি, তাহা দ্বৈতমূলক। যখন দ্বৈত-রূপ ভ্রম অপসারিত হয়, তখন আত্মার সংজ্ঞা থাকে না।

৬। স্ব-রূপ অবস্থাতে আত্মা অদ্বিতীয় সত্তারূপে অবস্থিতি করে। তখন বিজ্ঞান দর্শন শ্রবণাদির কোন বিষয় থাকে না। কিন্তু তখনও আত্মার বিজ্ঞান দৃষ্টি শ্রুতি প্রভৃতি বিলুপ্ত হয় না। এইজন্য বলা হইয়াছে আত্মা নিত্যই দ্রষ্টা শ্রোতা বিজ্ঞাতা ইত্যাদি।

৭। এই বিজ্ঞাতাকে জানা যায় না। যতক্ষণ আত্মাকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করি, ততক্ষণই আমরা বলিয়া থাকি "আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে"। যখন প্রকৃত জ্ঞান হয়, যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন আর দর্শন শ্রবণাদির উপদেশ বা কার্য্য সম্ভব হয় না।

৮। আত্মার পারমার্থিক সত্তা কোনপ্রকারেই বর্ণনা করা যায় না। ইহার বিষয়ে একমাত্র উপদেশ "নেতি", "নেতি"।

মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মশব্দের ব্যবহার করেন নাই। তিনি ব্যবহার করিয়াছেন "আত্মা" শব্দ। এই আত্মাকেই তিনি ব্রহ্মত্ব অর্পণ করিয়াছেন।

অপরাপর স্থলে তিনি যে-ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

ধন-বিজ্ঞানে নৃতত্ত্বের কথা

(ফরাসী পোল লাফার্গ অবলম্বনে)

(১)

একএক দলে ত্রিশ-চল্লিশ জনে মিলিয়া "স্যাহেজ"রা দেশ হইতে দেশান্তরে বিচরণ করিত। যখন যেখানে খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ জুটিত, তখন সেখানে তাহারা কিছুকালের জন্য ডেরা গাড়িত।

মর্গান্ বলেন:—"সাগরের কিনারায় কিনারায় স্যাহেজরা আহার্য্য ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দরিয়ার দুই কূল ধরিয়াও স্যাহেজদের অভিযান অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

আফ্রিকার বুশম্যান এবং সিংহলের হেন্দাজাতি এখনও এইরূপ বিচরণের যুগেই রহিয়াছে। শিকার করিয়া ইহারা যে-সকল জানোয়ার দখল করে, এমন কি সেইগুলা সম্বন্ধেও ইহারা "নিজস্ব" বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া যে যে জমিনের উপর ইহাদের শিকার চলে সেই সমুদয়কেও ইহারা নিজ সম্পত্তিরূপে বিবেচনা করিতে শিখে নাই। বলা বাহুল্য শিকারের ভূমি ভূসম্পত্তির অতি প্রাথমিক রূপ মাত্র।

আদিম মানব জমি চষিতে জানে না। শিকার করিয়া এবং মাছ ধরিয়া সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। বনের ফল মূল এবং জানোয়ারের দুধ তাহার খাদ্য-দ্রব্যের তালিকায় বড় স্থান অধিকার করে। কাজেই অল্প-পরিমাণ জমিতে তাহার সকলপ্রকার অভাব মোচন হইতে পারে না। জানোয়ার চরাইবার জন্যই

বিস্তৃত ভূখণ্ডের দরকার হয়। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে এক-এক জন স্যাম্বেজের নিজ ভরণ-পোষণের জন্য কমসে-কম তিন বর্গ মাইল জমি লাগে।

যেই লোকসংখ্যা বাড়িতে থাকে অম্‌নি জমি ভাগাভাগি করিবার দরকার উপস্থিত হয়। প্রথম প্রথম জমি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথমতঃ জানোয়ার চরাইবার মাঠ। দ্বিতীয়তঃ শিকারের বন। দুইপ্রকার জমিই গোষ্ঠী বা জাতির সমবেত যৌথ সম্পত্তি বিবেচিত হইত। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জ্ঞান অনেক পরবর্ত্তী কালে জন্মিয়াছে।

আমেরিকার ওমাহা জাতির লোকেরা বলে:—"আগুন এবং জল যেমন জমিও তেমন। এইগুলা কেনা-বেচা সম্ভব নয়।"

নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিরাও বিবেচনা করে যে জমি কেনা-বেচার জিনিষ নয়। এমন কি যখন গোটা জাতি মিলিয়া একটা ভূখণ্ড বেচিবার জন্য প্রস্তুত হয় তখনও যেই একটা নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখনই মূল্য বৃদ্ধি দাবী করা তাহাদের দস্তুর। ইহারা বলে:—"আমরা নিজেদের অধিকার বিক্রী করিয়াছি বটে, কিন্তু অজাত এবং ভবিষ্যতে যে-সকল লোক জন্মিবে তাহাদের অধিকার ত আমরা বেচি নাই।"

এইরূপ সম্পত্তিজ্ঞানের জটিলতা ছাড়াইয়া উঠিতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য নিউজীল্যাণ্ড গবর্মেণ্টকে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছে। গবমেণ্ট জমি কিনিয়া থাকে বটে। কিন্তু একবারে দাম চুকাইয়া কেনা-বেচার নিষ্পত্তি হয় না। গবর্মেণ্ট একটা বার্ষিক খাজানার মতন কিছু কিছু দিয়া চলে। এই বার্ষিক দামে প্রত্যেক নবজাত শিশুর হিস্‌সা রক্ষা পায়।

ইহুদি সমাজে এবং সেমিটিক্ জাতীয় নরনারীর লেন-দেনেও ব্যক্তিগত ভূমির জ্ঞান প্রচলিত ছিল না। "ওল্ড্ টেষ্টামেণ্ট্" নামক বাইবেল গ্রন্থাংশের লেভিটিকুস্ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত নিয়ম দেখিতে পাই:—"জমি কোনো দিনই বেচা হইবে না। জমিটা আমার, তোমরা বিদেশী এবং আমার অতিথি মাত্র।" এই গেল ভগবানের বাণী।

খৃষ্টানরা তাহাদের ভগবানের বাণী শুনে নাই। ভগবানের বিধিনিষেধকে ইহারা মুখে মুখে সম্মান করে বটে, কিন্তু ইহাদের আসল ভক্তিশ্রদ্ধার ও পূজার বস্তু হইতেছেন প্রবলপ্রতাপ "পুঁজি" বাহাদুর।

ভূমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থাৎ "স্বত্ব" এই জ্ঞান জগতে ছড়াইয়া পড়িতে এমন কি গজাইয়া উঠিতেই অনেক সময় লাগিয়াছে। মানব-জাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এ এক বিপুল আয়াসসাধ্য ঘটনা।

দক্ষিণ আমেরিকার ফ্যুয়েগিদের যৌথ শিকার-ভূমির চারিদিকে যোজন যোজন বিস্তৃত অনধিকৃত জমি পড়িয়া থাকে। প্রাচীন রোমান্ সেনাপতি সীজার বলেন:—"সুয়েহ্বি এবং জার্ম্মান্ সমাজে একটা বিশেষ গর্ব্বের কথাই এই যে, তাহাদের নিজ নিজ সীমানার চারি-দিকে সুবিস্তৃত জনপদ অনধিকৃত থাকে।"

স্যাম্বেজ এবং বর্ব্বর লোকেরা এই ধরণের অধি-কারীহীন ভূমিখণ্ড দিয়া নিজ যৌথ সম্পত্তিগুলা ঘেরিয়া রাখে। এই উপায়ে কোনো "বিদেশী"কে অর্থাৎ বিজাতীয় লোককে নিজ ভূমির উপর পা-মাড়ানো হইতে রক্ষা করা হয়। স্যাম্বেজ বিচারে বিদেশী নিজ সীমানায় পা মাড়াইলেই শিকারযোগ্য জানোয়ার বিশেষ। "উদাসীনীকৃত" অধিকারীহীন ভূমি-মণ্ডল না থাকিলে স্যাম্বেজরা অহরহ পরস্পর শিকার করিয়া পরস্পরের ধ্বংস সাধন করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই।

হেক্কেহেল্ডার বলেন যে, উত্তর আমেরিকার রেড্-স্কিনরা নিজ জমির চৌহদ্দির ভিতর কোনো বিদেশীকে পাইলে তাহার নাক কান কাটিয়া তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহারা এই 'সূর্পনখা'র মারফত বলিয়া পাঠায় যে, আবার যদি কোনো লোককে তাহারা পাকড়াও করিতে পারে তাহা হইলে তাহারা ইহার মাথার খুলি চাঁছিয়া ছাড়িয়া দিবে।

ইয়োরোপের মধ্যযুগে জমিদারতন্ত্র চলিতেছিল। সেই ফিউড্যাল-পন্থী জমিদার-মহলে বয়েৎ প্রচলিত ছিল এই:—"জমি যার লড়াই তার"। অর্থাৎ জমির উপর পা মাড়াইলেই বিদেশী লড়াইয়ের বস্তু। তখনকার

দিনে এই কারণে শিকারের জমি লইয়াই পাশাপাশি নবাব জমিদারেরা দিনরাত লাঠালাঠি করিত।

এই যে অনধিকৃত ভূমিমণ্ডল ইহাই পরবর্ত্তীকালে পাশাপাশি অধিবাসী জাতিদের বাজারে পরিণত হয়। আগে যে জমি দাগ দিয়া রাখা হইয়াছিল, বিদেশীদের নিরুদ্বেগে চলাফেরা করিবার জন্য, পরে সেই জমিই সওদা বিনিময় কেনাবেচা এবং বন্ধুত্ব বন্ধনের কেন্দ্র-রূপে গড়িয়া উঠে।

১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বৃটন্ জাতির এক জমিদার স্থানীয় রাজা হ্যারল্ড্ ক্যাম্প্রিয়ান্‌দিগকে খুব উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দিয়াছিল। হ্যারল্ড্ ছিল স্যাক্‌সন্। স্যাক্‌সন্‌রা অনেক-বার ক্যাম্প্রিয়ান্‌দের ঠেঙ্গা খাইয়াছে। হ্যারল্ডের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ক্যাম্প্রিয়ান্‌রা এই বলিয়া সন্ধি করে যে, অফার্ বাঁধের পূর্ব্ব দিকে ইহাদের কেহ সশস্ত্র দেখা দিবে না; যদি দেয় তাহা হইলে স্যাক্‌সন্‌রা তাহার ডান হাত কাটিয়া ফেলিবে। স্যাক্‌সন্‌রাও সেই সঙ্গে কতকগুলা বাঁধ তৈয়ারি করে। অফার্ বাঁধ আর এই বাঁধের ভিতরকার জমিন উদাসীনীকৃত অনধিকৃত জমিন বলিয়া পরিগণিত হয়। এইখানে স্যাকসন্ এবং ক্যাম্প্রিয়ান্ জাতীয় সওদাগরেরা আসিয়া হাট-বাজার করিত।

নৃতত্ত্ববিদেরা বিশেষ আশ্চর্য্যের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন যে, স্যাম্বেজ-সমাজে মেয়ে-পুরুষের জীবন খুব বেশী আলাদা আলাদা। অনেকের বিশ্বাস এইরূপ ভাগাভাগি অবাধ মেলামেশা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। সাবেক কালে ভাইয়ে বোনে এই সংসর্গ চলিত। তাহা নিবারণ করার জন্য মেয়ে পুরুষের মধ্যে অবাধ আনাগোনার নিয়ম তুলিয়া দেওয়া অসম্ভব নয়।

"সুনীতি" "শীল" ইত্যাদির প্রভাবে স্ত্রী-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। পরে কাজকর্ম্ম "নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি" খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা ইত্যাদি কারণে সেই পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায় এবং গভীর হইয়া উঠে। সহজেই ইহা বোধগম্য যে, পুরুষের হাতে ছিল আহার্য্য সংগ্রহ করা এবং তাহার রক্ষণা-বেক্ষণ ও তদ্‌বির করা। অপর পক্ষে স্ত্রী থাকিত রান্নাবাড়ার কাজে, কাপড়চোপড় তৈয়ারী করিবার ধান্দায়। আর গৃহস্থালী দেখা দিবার পর তাহার সকল কাজেই ছিল স্ত্রীজাতির অধিকার।

অষ্ট্রেলিয়ার কুনাই জাতীয় একজন লোক ইংরেজ পাদ্রী পর্য্যটক ফিজন্‌কে বলিয়াছিল:—"পুরুষ শিকার করে, মাছ ধরে, লড়াই করে,—আর বসিয়া থাকে।" অর্থাৎ এই তিন কাজের বাহিরে যা-কিছু সবই স্ত্রীর কর্ত্তব্য।

স্ত্রীপুরুষের এই সামাজিক ভাগাভাগি বা স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যকে কার্ল মার্ক্‌স্ "শ্রম-বিভাগের" প্রাথমিক রূপ বিবেচনা করেন। স্ত্রী-পুরুষের শ্রমবিভাগে সম্পত্তি বা ধন-দৌলত খানিকটা স্ত্রীর অধিকারে, খানিকটা পুরুষের অধিকারে।

পুরুষ শিকারী এবং যোদ্ধা। ঘোড়া আর অস্ত্রশস্ত্র তাহার সম্পত্তি। গৃহস্থালীর হাঁড়িকুঁড়ি এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য সরঞ্জাম সবই স্ত্রীর সম্পত্তি। এই-গুলা ঘাড়ে অথবা মাথায় বহিয়া সে চলাফেরা করে, ঠিক তাহার ঘাড়ের শিশু যেমন তাহারই সম্পত্তি। শিশুর বাপ কে অনেক সময়ে তাহা অজ্ঞাত। মা-ই শিশুর মালিক। শিশুর মতন এইসব গৃহস্থালীর সরঞ্জামও স্ত্রীর সম্পত্তি এবং বোঝা।

চাষ-আবাদ সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষের ভাগাভাগি আরও বাড়িয়া যায়। জমি ভাগাভাগিও চাষ-আবাদের দরুনই জগতে প্রথম দেখা দেয়। পূর্ব্বে যে জমি গোটা জাতি বা গোষ্ঠীর সমবেত সম্পত্তি ছিল, চাষ প্রবর্ত্তিত হইবা মাত্র সেটা নানা টুকরায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

চাষবাসের আমলেও পুরুষ যোদ্ধা এবং শিকারীই থাকে। কৃষি-কার্য্যে মন দেয় স্ত্রী। কখনো কখনো শস্য কাটার সময় পুরুষ আসিয়া স্ত্রীকে সাহায্য করে মাত্র।

যে-সকল সমাজে পশুপালন প্রচলিত, পুরুষ সেই-সকল সমাজে জানোয়ারের তদ্‌বির করে। চাষের কাজে সে ভিড়ে না। বস্তুতঃ সেই সমাজে চাষের চেয়ে পশু-পালন উচ্চতর কাজ বিবেচিত হয়। অবশ্য জানোয়ার চরানো যে চাষের চেয়ে সহজ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আফ্রিকার কাফ্রিদের বিবেচনায় জানোয়ার চরানো সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় কাজের মধ্যে পরিগণিত। গাভীকে ইহারা বলে "কালো মুক্তা"।

চাষবাস "আর্য্য" জাতিপুঞ্জের সাবেক আমলে নিন্দাজনক "ছোটলোকের" কাজ বিবেচিত হইত। প্রাচীন ভারতের আইনে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের পক্ষে কৃষিকার্য্য নিষিদ্ধ ছিল। মনু বলেন (দশম অধ্যায়):—"সুধীগণের চিন্তায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চাষে লাগা নিন্দনীয়। কেননা হালের লোহার খোঁচায় ভূমির সঙ্গে জীবের গায়েও ঘা লাগে।"

একটা জিনিষ যে ব্যবহার করে সে-ই তাহার মালিক। ভূমি ব্যবহার করিত সাবেক কালে কাহারা? নারীরা। এইজন্য নারীদের অধিকার ছিল ভূমিতে। ভূমি সম্বন্ধে ব্যক্তিগত একতিয়ার বা নিজস্বের জ্ঞান জগতে দেখা দিবা মাত্র নারীরা ইহার প্রথম মালিক হইয়াছিল।

জগতের যেখানে যেখানে মাতৃ-রক্তের জোরে পারিবারিক বন্ধন গড়িয়া উঠে সেখানে ভূমি নারীরই সম্পত্তি। প্রাচীন মিশরে, ভারতে নায়ার সমাজে, আফ্রিকায় তুয়ারেগ মহলে এবং পিরিনীজ পাহাড়ের বাস্ক্ জাতির ভিতর ভূমিকে "স্ত্রীধন"-রূপে বিবেচিত হইতে দেখিতে পাই। গ্রীক দার্শনিক আরিষ্টটলের আমলে স্পার্টা জনপদের দুই-তৃতীয়াংশ জমি "স্ত্রীধন" ছিল।

আর-একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। পরবর্ত্তী কালে ভূমির জোরে লোকেরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং সমাজে মর্য্যাদা পাইয়াছে। কিন্তু সাবেক-কালে এই ভূমিই পরাধীনতার মূল ছিল। নারীরা আবাদের কড়া কাজে নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য হইত। এই কষ্টকর কাজ হইতে তাহারা মুক্তি পাইয়াছিল কখন? যখন জগতে গোলাম চাষী বা দাসত্ব-প্রথা দেখা দেয়। স্ত্রীজাতির গোলামীর জায়গায় তখন সুরু হয় চাষীদের গোলামী।

কৃষি-কার্য্যের প্রবর্ত্তন মানব-সমাজে অনেক নূতন ঘটনা ঘটাইয়াছে। ইহার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। গোলামীর অভ্যাসে স্ত্রীজাতিকে কষ্টসহ এবং নরম করিয়া ফেলা হইয়াছে। পরে দাস-মজুরি, খত-মজুরি ইত্যাদি নানাবিধ শ্রমিক গোলামি-জগতে হাজির হইয়াছে।

জমি ভাগাভাগি হইবা মাত্র সর্ব্বত্রই একসঙ্গে নিজস্ব জ্ঞান অর্থাৎ সম্পত্তি-স্বাতন্ত্র্য দেখা দেয় নাই। যৌথ সম্পত্তির ধারণা অনেক দিনই বজায় ছিল। যতদিন এই ধারণা টিকিয়াছিল ততদিন জমিগুলার চাষবাসও সমবেতরূপেই অনুষ্ঠিত হইত।

আলেকজাণ্ডেরের সেনাপতি নেআর্কাস্ সমসাময়িক পঞ্জাব সম্বন্ধে বলেন:—"ভূমিগুলা দলে দলে চষা হয়। দলে থাকে গোটা জাতি অথবা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বহু লোক। বৎসরের শেষে ফসলগুলা সকলের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়।" এই গেল খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর কথা।

মধ্যে আমেরিকার ইউকাটান্ দেশের চাষ সম্বন্ধে পর্য্যটক ষ্টিফেন্ বলেন:—"মায়া নামক ইণ্ডিয়ানরা সমবেতরূপে জমির উপর সম্পত্তি ভোগ করে। প্রায় একশ জনে মিলিয়া জমি চষে। ফসল ভাগাভাগি করা হয়।"

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকো প্রদেশের টাও নামক এক ইণ্ডিয়ান পল্লী হইতে ১৮৭৭ খৃঃ মিলার মর্গ্যান্‌কে লিখিয়াছিলেন:—"প্রত্যেক পুয়েবলো বা ভিহিতেই একটা করিয়া ভুট্টার ক্ষেত আছে। এইটা লোকেরা সকলে মিলিয়া চষে। ফসল জমা করিয়া রাখা হয় একটা যৌথ-গোলায়। দুর্ভিক্ষের সময়ে গরীবেরা এই গোলা হইতে অন্ন লাভ করে। গোলা থাকে কাশিক বা শাসনকর্ত্তার জিম্মায়।"

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশে—স্পেন কর্ত্তৃক ধ্বংস-সাধনের পূর্ব্বে—চাষ ছিল এক বিপুল জাতীয় মহোৎসব বিশেষ। সকাল হইবা মাত্র দুর্গ-চূড়া হইতে নরনারী-দিগকে ডাকা হইত; আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে মিলিয়া পোষাকী কাপড় পরিয়া অলঙ্কারে সাজিয়া জমি চষিতে লাগিয়া যাইত। চাষের সঙ্গে সঙ্গে গান চলিত। চাষীদের গানের 'মুদ্রা' থাকিত 'ইঙ্কার' রাজগণের স্তুতি-প্রশংসা। প্রেস্কট প্রণীত 'পেরু-বিজয়' গ্রন্থে জানা যায় যে, চাষীরা মহা উল্লাসে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিত।

সীজার বলেন:—"সুয়িহিরা ছিল জার্ম্মান্‌দের ভিতর সব্‌সে সেরা লড়াইপ্রিয় ও মজবুদ জাতি, (ভারতীয় যৌধেয় জাতির মতন 'ক্ষত্রিয়দের ক্ষত্রিয় বিশেষ')। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন একশ গ্রাম হইতে একশ জনকে লড়াইয়ে পাঠাইত। যাহারা গ্রামে থাকিত তাহারা এই যোদ্ধাদিগকে ভরণপোষণ করিত। পর বৎসর যোদ্ধারা দেশে ফিরিয়া চাষে লাগিত আর চাষীরা যাইত লড়িতে। এইরূপে লড়াইয়ের সঙ্গে চাষের অদল-বদল ঘটিত এবং দুই-ই চলিত এক সঙ্গে।"

স্ক্যাণ্ডিনাহ্বিয়ান্‌দের সমাজেও এইরূপ যৌথ লড়াই এবং যৌথ চাষের ব্যবস্থা ছিল। লড়াইয়ের মাঠ হইতে ফিরিয়াই ইহারা স্ত্রীদিগকে ফসল কাটার কাজে সাহায্য করিত।

যৌথচাষের রীতি জগতে অনেক দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এমন কি আদিম যুগের যৌথ ধনদৌলতের প্রথা লোপ পাইবার পরও কৃষিকর্ম্মে সমবেত প্রথা রহিয়া গিয়াছিল।

রুশিয়ার পল্লীতে পল্লীতে খানিকটা জমি মিরের জমি নামে পরিচিত। এই জমি চষে পল্লীবাসীরা সমবেত-ভাবে। ফসল পল্লীবাসীদের ভিতর ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য জনপদে জমিগুলা চষা হয় সমবেত-ভাবে। কিন্তু ফসল কাটিবার পূর্ব্বেই চাষ-করা জমি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেওয়া হয়।

রুশিয়ার 'ডন্' জনপদের কোথাও কোথাও ঘাসের ভূমিগুলা প্রথমেই ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হয় না। গোটা মাঠ একত্রে তদ্বির করা হয়। ঘাস কাটাও হয় একত্রে। ভাগবাটোয়ারা অনুষ্ঠিত হয় সর্ব্বশেষে। বন-জঙ্গল পরিষ্কার করাও হয় সমবেত-ভাবে। চাষ-আবাদের ভূমিতেও যৌথ চষা এবং খোঁড়া প্রচলিত।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জে একসঙ্গে দল বাঁধিয়া অনেকগুলা লোক জমিন তৈয়ার করে। এক-এক দলে চার পাঁচজন করিয়া কাজ করিতে মোতায়েন থাকে। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া মাটি খুঁড়িবার শিক। ইহারা সকলে মিলিয়া দুই ফুট ব্যাসওয়ালা পরিধির মাটি খুঁড়িতে সচেষ্ট হয়। যখন প্রত্যেক দলের প্রায় ১৮ ইঞ্চি গভীর মাটি নরম হইয়া আসে তখন শিক-গুলার জোরে গভীরতম জমিনের মাটি উপরে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করা হয়। এইরূপে সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কমসে-কম আঠার ইঞ্চি খুঁড়িয়া সর্ব্বত্র গভীর চাষের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

স্কট্‌ল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডার সমাজেও এইধরণের মাটি খোঁড়া প্রচলিত আছে। উপর-বিবৃত রীতি-অনুসারে নৃতত্ত্ববিৎ গম্ এই কথা বলেন।

সীজারের বর্ণনায় জানা গিয়াছে জার্ম্মানরা বৎসর বৎসর লুটপাটের অভিযানে বাহির হইত। লুটের ধন সম্ভবত সকলের ভিতরই বাঁটিয়া দেওয়া হইত। যাহারা চাষের জন্য ঘরে বসিয়া থাকিত তাহারাও এই ধনে বঞ্চিত হইত না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গ্রীকেরাও এইরূপ ডাকাইতি করিত। ইহারা ছিল জলদস্যু। ভূমধ্য সাগরকে ইহারা উত্তমথুত্তম করিয়া ছাড়িয়াছিল। লুটপাট করিয়া ইহারা পাহাড়ের ডগায় অবস্থিত দুর্গে পলাইয়া আসিত। স্ক্যাণ্ডিনাহ্বিয়ান্‌দের জল-দুর্গের মতন এই গ্রীক দুর্গাবাস-গুলাও একপ্রকার দুর্ভেদ্য ছিল।

একটা গ্রীক গানের এক টুকরা আজও সেই প্রাচীন জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। গানের বীর বলিতেছেন:—"এক বিপুল বল্লম আমার সম্পদ্। তলোয়ারেও আমার জোর। তাহার উপর শরীরের দুর্গস্বরূপ আছে এক ঢাল। এই দিয়াই আমি জমি চষি আর ফসল তুলি আর আঙ্গুরের রস শুষি। এইগুলার প্রতাপেই লোকে আমায় ম্নোয়াদের (গোলামদের) প্রভু বলিয়া মানে। যার যার এই বল্লম আর ঢাল নাই তারা আসুক আমায় কুর্ণিশ করিতে। আমি তাদের মহারাজ।"

ডাকাইতি আর জলদস্যুগিরি মান্ধাতার আমলে এক বড় পেশা। হোমারের "অডিসি" গ্রন্থে নেষ্টর তাহার অতিথি তেলেমাকুস্‌কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—"আপনি কি জলদস্যু?" ইহা একটা গৌরবের কথাই ছিল, নিন্দার নয়।

এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক সোলন্ জলদস্যুগিরি বিদ্যায় যুবাদিগকে পোক্ত করিয়া তুলিবার জন্য একটা বিদ্যা-

পীঠই কায়েম করিয়াছিলেন। গেইয়াস্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ নামে সেটা পরিচিত। ঐতিহাসিক থুসিডিডিস্ বলেন—"সেকালে জলডাকাইতি বেশ সম্মানজনক ব্যবসা বিবেচিত হইত।"

ডাকাইতরা ডাঙ্গায় নামিয়া হাতের কাছে যাহা পাইত তাহাই লইয়া চম্পট দিত। নরনারী জানোয়ার ফসল আস্‌বাব হাঁড়িকুঁড়ি কিছুই বাদ পড়িত না। পুরুষেরা গোলামে পরিণত হইত। মেয়েরা থাকিত পুরুষদের চৌকিদারস্বরূপ। গোলামরা বিজেতাদের জমি চষিত।

ক্রীট দ্বীপের নগরগুলা এই ধরণের ডাকাইত বীরগণের উপনিবেশস্বরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। অ্যারিষ্টটলের আমল পর্য্যন্ত প্রত্যেক নগরেই গোলামের দল জমির চাষে বাহাল থাকিত। জমিগুলা অবশ্য ছিল খাসমহাল। গোলামদিগকে বলিত ম্নোতি। সর্‌কারী জমিন এবং সর্‌কারী গোলাম ছিল গ্রীকদের যৌথ বা সমবেত সম্পত্তি। সেইরূপ গ্রীক নগরের আর-এক অঙ্গ সর্‌কারী বা যৌথ ভোজ। যৌথ খানাপিনার বিবরণ হেরাক্লিডেসের গ্রন্থে পাওয়া যায়। অন্যান্য লেখকও এই বারোয়ারীতলার ভোজন-ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক সমাজে দুই শ্রেণীর গোলাম ছিল:—প্রথম, সর্‌কারী গোলাম; দ্বিতীয় ব্যক্তিগত গোলাম। সর্‌কারী গোলামের সকলকেই সর্‌কারী জমি চষিতে বাহাল করা হইত না। অনেককে পেয়াদা আরদালি দফাদার ইত্যাদি শাসন-বিভাগের নিম্নতর কোঠায় নকরি দেওয়া হইত।

বিলাতী রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির ট্র্যান্‌জ্যাকশ্যান্‌স্ কেতাবের ১৮৩০ সালের খণ্ডে হজসন্ মান্দ্রাজ শহরের ত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমের এক পল্লীর কথা বিবৃত করিয়াছেন। এই পল্লীর চাষীরা তাহাদের কাজে সর্‌কারী গোলামের সাহায্য পাইত। মান্দ্রাজে যে এইরূপ 'সর্‌কারী গোলাম' ছিল তাহার প্রমাণ কি? পল্লীবাসীরা নিজ পল্লীতে যে-সকল একৃতিয়ার ভোগ করিত সেইগুলা বিক্রী করিবার সময় অথবা বন্ধক রাখিবার সময় সহকারী চাষীদের ভাগ্যও নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইত। কাজেই এই সহকারী চাষীদিগকে পল্লীবাসীদের সাধারণ বা যৌথ সম্পত্তির এক অংশ বিশেষ বিবেচনা করা যাইতে পারে। মধ্যযুগের ভারতীয় শহরে এবং পল্লীতে যৌথ গোলামি প্রচলিত ছিল।

যেদিকেই তাকাই সর্ব্বত্র ভূমি-সম্পত্তি অথবা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য সম্বন্ধে সম্পত্তি, জানোয়ার সম্পত্তি, গোলাম সম্পত্তি,—সকলপ্রকার সম্পত্তিই গোটা জাতি গোষ্ঠী বা দেশের যৌথ সম্পত্তি ছিল। মানবজাতির শৈশব এই সমবেত ধনদৌলতের ব্যবস্থায় পরিপুষ্ট হইয়াছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম ধনসাম্য লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে সম্পত্তি ব্যক্তিগত। জমিদার রাজরাজড়া পুঁজিজীবী ও অন্যান্য ধনবান্‌দের আওতা এড়াইয়া প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষী আজও কিছু কিছু খাড়া আছে। আজকালকার খাসমহালগুলা সেই মান্ধাতার আমলের আর্থিক ব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে।

"উৎকর্ষের যুগে" সাবেক কালের ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সত্য। কিন্তু পুরানা ভাঙ্গিয়া ফেলাই সভ্যতার যুগের একমাত্র মানবকীর্ত্তি নয়। একটা নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলাও এই যুগের এক কৃতিত্ব।

মান্ধাতার আমলের সমবেত ধনদৌলত জগতে আর একপ্রকার দেখা যায় না বটে, কিন্তু খানিকটা জটিলতর এবং উন্নততর সর্‌কারী বা যৌথ সম্পত্তি জগতে দেখা দিয়াছে। মানবজীবনের অন্যান্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতন সুখস্বচ্ছন্দতার যন্ত্র বা বাহনস্বরূপ এই যে ধনদৌলত তাহাও নিত্যনূতন ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া রূপে-রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর্থিক সভ্যতার ইতিহাসে ভাঙন এবং গড়ন রূপভেদের দুই দিক্‌ই লক্ষ্য করিতে হইবে। নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় গবেষণা সুরু করিলে ধনবিজ্ঞান-সেবীরা "অথাতঃ সুখজিজ্ঞাসা"র ইতিহাসে মানবচরিত্রের এবং মানবসমাজের অনেক গভীরতর তথ্য ও নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিবেন।

শ্রী বিনয়কুমার সরকার

সমাজ-সেবায় গাইকোয়াড়

যে-সকল উদার-হৃদয় ভারতবাসী সমাজের অবনত শ্রেণীর লোকদের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন বরোদার গাইকোয়াড় তাঁহাদের অন্যতম। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রাজ্যের অন্ত্যজদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয়। তাঁহা'র সহস্র সহস্র প্রজাকে সমাজের তথাকথিত কুলীনগণ কর্ত্তৃক নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে



মহারাজা সায়াজীরাও গাইকোয়াড়

নিষ্পেষিত হইতে দেখিয়া মহারাজা তাহাদের দুর্দ্দশা মোচন করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন ও তখন হইতেই তিনি তাহাদের উন্নতির জন্য নানাদিক্ দিয়া নানা-প্রকারে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। তখন তিনি সবেমাত্র সাবালক হইয়া রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সুযোগে তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ রাজ্যের প্রজাদের অভাব অভিযোগ অবগত হইবার ও তাহাদের সহিত সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত সফরে বহির্গত হন। এই সময় তিনি দেখিতে পান যে হতভাগ্য অন্ত্যজেরা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার নিকৃষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য করা হয়। তাহারা গ্রামের নিকৃষ্টতম অংশে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে বারো মাস অভাবের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন-



মহারাণী চিমনবাই গাইকোয়াড়

যাপন করে। পচা ডোবা ভিন্ন অন্য কোন জলাশয় হইতে তাহারা পানীয় জল আনিতে পারে না। সাধারণ পাঠশালায় তাহাদের পুত্র-কন্যা পড়াশুনা করিতে পারে না।

মহারাজা গাইকোয়াড় স্থির করিলেন যে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করা আবশ্যক। শিক্ষায় অগ্রসর না হইলে তাহারা তাহাদের নিজেদের দুর্দ্দশার



পণ্ডিত আত্মারাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ

কথা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু হিন্দুরা তাহাদের বিদ্যালয়ে এই অস্পৃশ্যদিগকে অধ্যয়ন করিতে দিতে নারাজ। কাজেই তাহাদের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা করিতে হইল।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজার উদ্যোগে অবনত শ্রেণীদের জন্য দুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তখন বরোদা-রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অন্ত্যজদের নিমিত্ত সহৃদয় মহারাজা অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে পুস্তকাদিও রাজসরকার হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করা হইল।

কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে তাহাদের জন্য বেশী পাঠশালা স্থাপন করা সম্ভবপর হইল না। কৌলীন্য-গর্ব্বে-গর্ব্বিত হিন্দুরা চিরকালই তাহাদের পূজা পাইয়া আসিতে চায়। কাজেই তাহারা শিক্ষকতা করিতে অস্বীকার করিল। স্কুলসমূহের হিন্দু পরিদর্শক-রাও নানা উপায়ে যাহাতে এই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার না হয় এইরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু মহারাজা দমিবার পাত্র নহেন। তিনি উপযুক্ত মুসলমানদিগের হস্তে এইসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার ও পরিদর্শনের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু এই উপায়েও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হইল না। শিক্ষকেরা আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করিত না, কাজেই অন্ত্যজেরা আশানুরূপ উন্নত হইল না।

অবশেষে মহারাজা ঘোষণা করিলেন যে, যে-সকল ব্রাহ্মণ শিক্ষক অন্ত্যজদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবেন তাঁহাদিগকে বেতন ছাড়া শতকরা ৫০৲ টাকা ভাতা দেওয়া হইবে। পরিদর্শকদিগের উপরও নোটিশ জারি করা হইল যে তাহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইবে। ইহাতেও বিশেষ ফল হইল না। বরোদা, নভসরাই, আমরেলী ও পত্তন



বরোদা কলেজ

সহরে অন্ত্যজদের নিমিত্ত চারিটি ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয় খোলা হইল। এখানে তাহাদিগকে বাসস্থান ও অন্যান্য খরচা রাজসরকার হইতে প্রদান করিবার ব্যবস্থাও করা হইল। কিন্তু ছয় বৎসর যত্ন সত্ত্বেও এই চেষ্টা সফল হইল না।

গাইকোয়াড়ের সঙ্কল্পও অচল। এতবার বিফলমনোরথ হইয়াও তিনি আরব্ধ কার্য্যটি পূর্ণউদ্যমে চালাইতে লাগিলেন। ১৯০৫ সালে মহারাজা সমগ্র বরোদা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে শিক্ষকদের শৈথিল্যেই অন্ত্যজদের বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ তাহারা হৃদয়ের সহিত অন্ত্যজদিগকে উন্নীত করিবার চেষ্টা করে নাই—তাহারা কেবল কলের মতন কাজ করিয়া তাহাদের প্রাপ্যবেতন হজম করিয়াছে। মহারাজা এইবারে একজন প্রকৃত ও ত্যাগী কর্ম্মীর সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন।

মহারাজা এই কার্য্যের জন্য পণ্ডিত আত্মারামকে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। পণ্ডিতজী আর্য্য সমাজভুক্ত ও সে সময়ে (১৯০৭ ৮) পাঞ্জাবে পারিআদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। মহারাজা তাঁহার উপর অন্ত্যজদের শিক্ষার ভার প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য গাইকোয়াড় এইবার উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই এই মহৎ কার্য্যটি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পণ্ডিত আত্মারাম অতি অল্পকাল মধ্যেই অন্ত্যজদের হৃদয় জয় করিলেন।

পণ্ডিতজী বরোদা পৌছিবার অনতিকাল পরেই সহরের নিকটবর্ত্তী একটি স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে একটি বৃহৎ বাঙ্গলো নির্ম্মাণ করাইলেন। এই বাঙ্গলোটির চারিধারে বিস্তীর্ণ মাঠ ছিল। এখানে তিনি অন্ত্যজদের নিমিত্ত বোর্ডিং ইস্কুল স্থাপন করিলেন। তিনি প্রথমে অন্ত্যজদের পল্লী হইতে বুদ্ধিমান্ বালকবালিকাদিগকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আনিয়া ভর্ত্তি করিলেন। এখানে তাহাদের অবগাহনের নিমিত্ত ভাল পুষ্করিণীর বন্দোবস্ত হইল,

তাহাদের পরিষ্কার পরিধেয় বস্ত্র দিবার ব্যবস্থা হইল এবং তাহাদিগের নিমিত্ত ভাল ভাল খাদ্যের আয়োজন করা হইল। তাহারা জীবনে কখনও এরূপ সুখ উপভোগ করে নাই। ইহা ভিন্ন যখন তাহারা দেখিল যে একজন উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক তাহাদের মধ্যে আপনার জনের মত বাস করিতেছেন তখন তাহারা পণ্ডিতজীর একান্ত অনুগত হইয়া পড়িল। এরূপে সকলপ্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ক্রমে ক্রমে পণ্ডিতজী তাহাদের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিলেন।

এই বিদ্যালয়ের সাফল্য দর্শনে মহারাজা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পত্তন গ্রামে ঐরূপ আর একটি বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করাইলেন এবং শীঘ্রই নবসরাইএ আর-একটি বিদ্যালয় খোলা হইল। এইসকল বিদ্যালয়ের পরিচালনা-ভার উৎসাহী সমাজ-সেবকদের উপর অর্পিত হইল। তাঁহারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না; তাঁহারা অন্ত্যজদিগকে নানাভাবে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে যত্নবান্ হইলেন।

পণ্ডিত আত্মারামের নেতৃত্বে এইসকল উৎসাহী সমাজ-সেবক বরোদার অনুন্নত জাতিদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীকে বর্ত্তমানে বরোদার স্কুল পরিচালনার ভার হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছে —বর্ত্তমানে সে কার্য্য তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পণ্ডিত শান্তিপ্রিয় পরিচালনা করিতেছেন। পণ্ডিতজী এক্ষণে বরোদা রাজ্য ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কার্য্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

যে-সমস্ত স্থানে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষকদের শৈথিল্যে অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল সে-সকল স্থানে বর্ত্তমানে সুন্দরভাবে পাঠশালা চলিতেছে। পণ্ডিতজী ও তাঁহার অধীনস্থ অক্লান্ত কর্ম্মীদের প্রচেষ্টাতেই যে এইবারের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

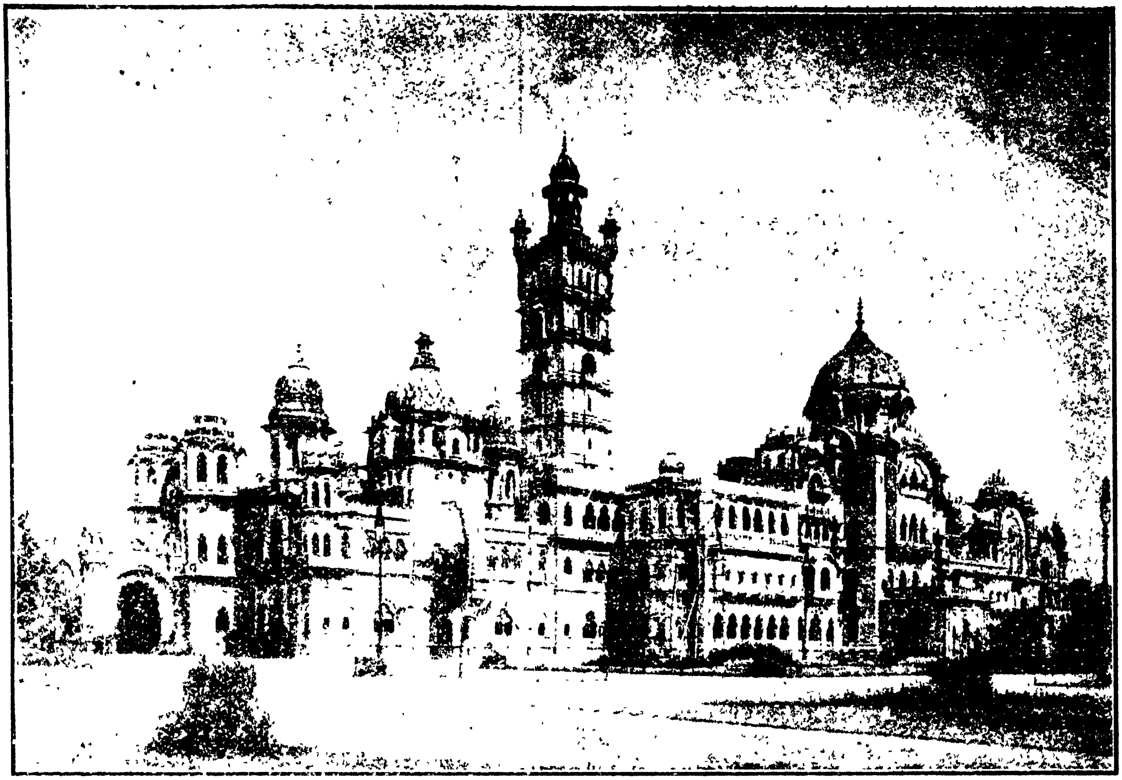
এইসকল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান প্রণালীও নূতন ধরণের। ছাত্রছাত্রীদিগকে সাধারণ লেখাপড়া ব্যতীত ধর্ম্ম শিক্ষাও দেওয়া হয়। ইহাদিগকে লইয়া Boy Scout



বরোদা রাজ্যের দেওয়ান—স্যার্ মানুভাই মেটা

ও Girl Guide এর দলও গঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের প্রত্যেককে সমাজ সেবায় দীক্ষিত করিয়া তোলা হইতেছে। তাহাদিগের ব্যায়ামের প্রতিও শিক্ষকেরা দৃষ্টি রাখেন। বালিকারা সেলাই ও অন্যান্য সূচী-কর্ম্মের শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি করিয়া পাঠাগার ও তর্কসভা আছে।

১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় এইসকল বিদ্যালয়ের কার্য্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কারণ



লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ

অন্ত্যজদিগের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কাজেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তাহাদিগকে বেশী সহ্য করিতে হয়। আবার ১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে বরোদারাজ্যে মড়ক লাগিল তখনও এইসকল অনুষ্ঠানের কাজ ভালোরূপে চলে নাই কারণ দারিদ্র্য-নিবন্ধন অন্ত্যজেরাই এই মহামারীতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুগিয়াছিল। তবুও এই দুই-বারের আক্রমণে অন্ত্যজেরা পণ্ডিতজীর শিক্ষার ফলে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলে এই দুই মহামারীতে তাহাদিগকে যে নির্ম্মূল করিয়া দিত তাহার সন্দেহ নাই।

মহারাজা অন্ত্যজদের মধ্যে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই। বরোদার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহে ও কলেজে অন্ত্যজ বালকদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। মহারাজের দানের সাহায্যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটি অন্ত্যজ বালক বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী উপাধি পাইয়াছে ও সম্প্রতি সরকারী বৃত্তি লইয়া একটি অন্ত্যজ বালক আমেরিকার কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে।

অন্ত্যজদের পুরোহিতদিগের শিক্ষার (ইহারা গারোদা নামে অভিহিত) জন্যও রাজ-সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় আছে।

বরোদার গাইকোয়াড় প্রতিবৎসরই অন্ত্যজ বালক-বালিকাদিগকে নিজ প্রাসাদে আহ্বান করিয়া ভোজ দেন। যাহারা এতদিন অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য ছিল রাজা তাহাদিগকে মতিবাগ প্রাসাদে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আহ্বান করিয়া আনন্দ-সহকারে তাহাদিগের আবৃত্তি-পাঠ শ্রবণ করেন। কিন্তু পূর্ব্বে যদি কোন অন্ত্যজ এইসকল মন্ত্র শ্রবণও করিত তবে তাহাদিগের কর্ণে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত। গাইকোয়াড় ও মহারাণী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অন্ত্যজ বালকদিগকে লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদে আহ্বান করেন এবারে তাহারা বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে ও

হোম যজ্ঞ করে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে গাইকোয়াড় হিন্দু বালক-বালিকা ও অন্ত্যজ বালক-বালিকাদিগকে একত্রে আহ্বান করাইয়া ভোজ দেন।

এইরূপে মহারাজা জাত্যভিমানী কুলীনদিগকে ক্রমে ক্রমে ইহাদিগের সহিত একতা-সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে ইহাদিগকে রাজকার্য্যেও নিয়োগ করা হইতেছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৪২ জন অন্ত্যজ সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। এক্ষণে সমস্ত স্কুল কলেজেই তাহাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী আদালতে, পুস্তকাগারে ও হাঁসপাতালেও তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মিঃ শিবরাম নামক একজন অন্ত্যজকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন গাইকোয়াড় মিঃ আম্বেদকার নামক অন্য একজন অন্ত্যজকে ঐ পদে মনোনীত করেন। মিঃ আম্বেদকার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম অন্ত্যজ উপাধিধারী। এইরূপে অস্পৃশ্যদিগকে আইন মজলিসে বসিবার অধিকার দিয়া গাইকোয়াড় তাহাদের অভাব-অভিযোগ মোচনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু বরোদার হিন্দুরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহারা অন্ত্যজদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তাহারা নানা-প্রকারে অন্ত্যজদিগকে লোকচক্ষে হীন করিবার চেষ্টা করে। এতদিনে কেবল দুইটি অন্ত্যজের সহিত মিশ্রবিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

যদিও মহারাজার আদেশে সমস্ত সরকারী বিদ্যালয়েই অন্ত্যজদের প্রবেশাধিকার আছে—তথাপি অনেক ক্ষেত্রেই এই আইন লঙ্ঘন করা হয়। যতদিন মহারাজা এইসকল বিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া না দেন ততদিন এইপ্রকার কুলীন পরিচালকদের সমুচিত শিক্ষা হইবে না।

বরোদার সমবায় সমিতির ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত সেবকলাল পারেখ একজন বিশিষ্ট হিন্দু। তিনি অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছেন। কৃষি ও বয়ন বিভাগে যাহাতে তাহারা উন্নতি করিতে পারে এবিষয়ে শ্রীযুক্ত পারেখ যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার চেষ্টায় ইহাদের মধ্যে ৩৮টি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পারেখ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের অন্নসমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন।



শ্রী নানাজী দেবিজী মাকওয়ানা

এক্ষণে দুই চারটি অন্ত্যজ যুবকও নিজেদের দুর্দ্দশা মোচনের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা পানদোষ নিবারণ কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। মিঃ মুলজি ভুধরদাস অন্ত্যজ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া বর্ত্তমানে একটি শ্রমজীবী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। আমেদাবাদের বিখ্যাত মহিলা শ্রমিক-নেত্রী শ্রীযুক্তা অনসূয়া বাই এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করেন। মিঃ ভুধরদাস একটি শ্রমজীবী সঙ্ঘও স্থাপন করিয়াছেন। ধনী কলওয়ালাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট



অন্ত্যজদের ধর্ম্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী ও অন্ত্যজ বয় স্কাউট্ দল

করিয়া তাহারা এই সঙ্ঘের সাহায্যেই জীবন ধারণ করিয়াছে। এই সঙ্ঘের চেষ্টায় কয়েকটি নৈশ বিদ্যালয়ও খোলা হইয়াছে। অন্ত্যজ পুরোহিত লালাজী শর্ম্মা গারোদার সাহায্যে মিঃ ভুধরদাস "অন্ত্যজধারক" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

লালাজি অন্ত্যজদের জন্য কয়েকটি শ্রমিক বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টায় আছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক লক্ষ টাকা চাঁদা সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইয়াছেন। কিন্তু এযাবৎ তিনি ঐ টাকা তুলিতে সক্ষম হন নাই। তিনি আমেদাবাদে একটি সেবাশ্রম স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অর্থাভাবে এই আশ্রমের কার্য্যের প্রসার হইতেছে না।

নব্‌সরাইতে শ্রীযুক্ত তুলসীদাস মূলদাস ও তাঁহার পত্নী অন্ত্যজদের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা একটি বালকদের স্কুল ও একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছেন।

অন্ত্যজের উন্নতির জন্য নানাজী মাক্‌ওয়ানা যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিতেছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। নানাজী, বরোদা লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ (কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পুত্র) মিঃ নিউটন দত্তের বাড়ীর ভৃত্য। সে তাহার প্রভুর উৎসাহে নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে ও নিজেই তাহার অবৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করে। এই পুস্তকাগারে সরকারী সাহায্যও প্রদত্ত হয়।

অন্ত্যজেরা সাধারণ হোটেলে থাকিতে পায় না। নানাজী নিজেদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দানবীর মহারাজার সাহায্যে একটি ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছে। এই ধর্ম্মশালাটি রেল ষ্টেশনের নিকটে খোলা হইয়াছে। সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের দেওয়ান স্যার্ মনুভাই মেটা এই অনুষ্ঠানটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে বরোদারাজ্যে সকল বিভাগেই ব্যয়-সংক্ষেপের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। অন্ত্যজদের উন্নতির বিরোধী রাজকর্ম্মচারীরা অন্ত্যজদের শিক্ষার ব্যয় কমাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। অন্ত্যজদের উন্নতিকল্পে বৎসরে আনুমানিক এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হয়। কাজেই এই অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়টিতে সামান্য

ব্যয়সংক্ষেপ করিলে যে রাজসরকারের বিশেষ সুবিধা হইবে না.তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

তথাকথিত কুলীন সরকারী কর্ম্মচারীরা গাইকোয়াড়ের নিকট নিবেদন করিতেছে যে বর্ত্তমানে অন্ত্যজেরা সাধারণ স্কুলেই পড়িতে পারে। কিন্তু একথা সকলেই জানে যে অবনত শ্রেণীদের বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া গেলে হিন্দুদের স্কুলে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

মহারাজা গাইকোয়াড় তাঁহার তথাকথিত কুলীন প্রজাদের কথা প্রত্যক্ষভাবেই জানেন। সুতরাং তিনি তাহাদের দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন না বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। অবনত জাতিরা তাঁহার এই উদারতার জন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিবে।

শ্রী প্রভাত সান্যাল

ফুল-দোল

এক

শুনিয়াছি, পূর্ব্বে নাকি সেখানে নীলের চাষ-আবাদ চলিত। এখন সেস্থান শাল, তমাল, মহুয়া, হরিতকী, পলাশ ইত্যাদি নানাপ্রকার বৃক্ষলতাদি-পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে, শীর্ণা সিঙ্গারণ নদীটি পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনও তেম্‌নি বনের মাঝে ধীরে-ধীরে বহিতেছে। নীল কুঠীর যে-সব প্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকায় বল-দর্পী বড়-সাহেব বাস করিতেন, সেগুলা এখন জীর্ণ পঞ্জরাস্থি-সম্বল অবস্থায় নতশিরে ধূলায় মিশিতেছে। এবং সাহেবের পরিবর্ত্তে সম্প্রতি সেখানে বন্য শৃগালের দল, তাহাদের অপ্রতিহত রাজত্ব বিস্তার করিতেছে। উৎপীড়িত এবং উৎপীড়ক, উভয় সম্প্রদায়ের পদধূলি বক্ষে ধরিয়া লাল কাঁকরের যে প্রশস্ত পথখানি তাহারই পাশে নির্ব্বিকার মহাদেবের মত ধূলি-শয্যা রচনা করিয়া পড়িয়াছিল,—সে যদিও আজ প্রকৃতির করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তথাপি কচিদূর্ব্বাঘাস-গুলি তাহার রক্ত-রাঙা বুকের উপর বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই। কত শত নিরীহ শ্রমজীবীর রক্তে রাঙা এই পথরেখা,—নীলকুঠীর বহুবিধ অনাচার-অত্যাচারের কাহিনী আজিও স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত সবুজের গায়ে রক্ত-নিশান উড়াইয়া বাঁচিয়া আছে!

সেদিন অপরাহ্ণে এক সাঁওতাল যুবক পুনুকা, এবং এক সাঁওতাল-যুবতী সুখী, ফুল তুলিবার জন্য এই বনে আসিয়া প্রবেশ করিল। নিকটস্থ একটা কয়লা-কুঠীর কুলি-ধাওড়া হইতে তাহারা আসিয়াছে। আগামী কল্য তাহাদের বসন্তোৎসব আরম্ভ হইবে এবং সেইজন্য তাহারা আজ হইতে পুষ্প-চয়নে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সম্মুখে নীল-কুঠীর ভাঙা দেওয়াল বাহিয়া নাম-না-জানা কি একটা বন-লতার গাছ উঠিয়াছে এবং ফুলে-ফুলে সারা দেওয়ালটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে,—এমন কি, গাছের পাতাগুলি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। সেদিকে সুখীর নজর পড়িতেই, সে তাড়াতাড়ি সেইখানে ছুটিয়া গিয়া, হাত হইতে প্রথমে তাহার বাঁশের ঝুড়িটা নামাইল এবং মুগ্ধনেত্রে সেই গোলাপী রঙের ফুলগুলির পানে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। এদিকে ঠিক এই সময়টায় পশ্চিমদিগন্ত হইতে সূর্য্যাস্তের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে এই পুষ্প শোভিত ভগ্ন প্রাচীরের উপর প্রতিফলিত হইয়া স্থানটাকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। সসঙ্কোচে ফুলের একটি গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে সুখী তাহার খোঁপায় গুঁজিল। ভাবিল, সব ফুলগুলা তুলিয়া এখনই তাহার ঝুড়িটা ভর্ত্তি করিয়া লইবে কিনা। নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া লইয়া গাছটাকে একেবারে হতশ্রী করিয়া দিতে সে যেন একটুখানি সঙ্কোচবোধ করিতেছিল। যৌবন-বেদনাময় সুন্দরীর বুকের তলায় কোথায় যেন ব্যথা বাজিতেছিল।

ডানদিকের ঝোঁপের ভিতর পাতার ভিড় ঠেলিয়া, পুন্‌কা তখন অন্য ফুলের সন্ধানে প্রবেশ করিয়াছে। সুখী একবার সেইদিক পানে তাকাইয়া দেখিল, ঘন পত্র পল্লবের ভিতর সে যে কোন্ খানে অদৃশ্য হইয়া গেছে, দেখিতে পাওয়া যায় না। ভাবিল, পুন্‌কা ফিরিতে-না-ফিরিতে এই সুন্দর ফুলগুলি দিয়া সে যদি তাহার ঝুড়িটা ভর্ত্তি করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সে হয়ত অবাক্ হইয়া যাইবে।

সুখী একটি একটি করিয়া ফুলগুলি তুলিয়া তাহার ঝুড়িতে ফেলিতে লাগিল। কিন্তু একটা মধুমক্ষিকা ফুলের থোপার ভিতর কোথায় লুকাইয়াছিল,—পট্ করিয়া তাহার হাতের একটা আঙুলে হুল বিঁধিয়া দিতেই সুখী চমকিয়া উঠিল।

উঃ! বলিয়া হাতের আঙুলটা চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, পুন্‌কা, ও পুন্‌কা!…

পুন্‌কা বেশী দূরে যায় নাই। অনতিদূরে একটা ঝুম্‌কা গাছে ফুল ফোটে নাই বলিয়া তাহার তলার মাটিটা খুঁড়িয়া দিয়া সেখানে জল দিবার ব্যবস্থা করিতেছিল। ইহা তাহাদের উৎসবের একটা রীতি। আজ ফুল তুলিতে আসিয়া যদি কোনও বন্ধ্যা গাছ কাহারও নজরে পড়ে,—যদি দেখা যায় কোনও অযত্ন-বর্দ্ধিত গাছে ফুল ফুটে নাই, ফল ধরে নাই, তাহা হইলে তাহার তলার মাটি ভালো করিয়া খুঁড়িয়া দিয়া, তাহাতে জল সেচন করিতে হয়।

হঠাৎ সুখীর ব্যাকুল আহ্বান কানে যাইতেই, হাতের কাজ ফেলিয়া পুন্‌কা বৃক্ষ-লতাদির অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল।

অস্ত-সূর্য্যের কনক-কিরণ পাতে সুখীর নিটোল-সুন্দর কালো মুখখানি হিঙুল-বরণ হইয়া উঠিয়াছিল। বন-ফুল-সৌরভের স্নিগ্ধ আমেজে স্থানটা একেবারে মশ্‌গুল্ হইয়া উঠিয়াছে। পুন্‌কা আনন্দাতিশয্যে কহিয়া উঠিল, ই রে বাপ্!...ই যে মেলা ফুল সুখী!......বাঃ!…আঁ্যা! ই কি, তুঁই অমন্ কর্‌ছিস্ যে? হাতে তোর্ কি হ'ল? বলিয়া পুন্‌কা তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই সুখী-বলিল, মোধ্ মাছিতে বিঁধে' দিলেক্। —উঃ!

কই দেখি? বলিয়া পুন্‌কা ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, ডান হাতের একটা আঙুল সঙ্গে সঙ্গে ফুলিয়া উঠিয়াছে।

পায়ের তলার একমুঠা দুর্ব্বাঘাস ছিঁড়িয়া লইয়া পুন্‌কা জোরে-জোরে সুখীর বেদানার্ত্ত অঙ্গুলির উপর ঘসিয়া দিয়া বলিল, বাস্! আর কিছুই কর্‌তে হবেক্ নাই,—এখনই ভাল হঁয়ে যাবেক্।—লে, বোস্ এইখানে।

ধীরে-ধীরে সুখীর গলা জড়াইয়া একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর তাহারা পাশাপাশি বসিয়া পড়িল।

সুখী তাহার মাথাটা পুন্‌কার বুকের উপর এলাইয়া দিয়া মুখ ভার করিয়া বলিল,—হঁ, বড় জ্বল্‌ছে যে!

সুখীর হাতখানা তখনও পুন্‌কা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছিল। এইবার আঙুলটা নিজের ঠেঁটের উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না, না,- জ্বল্‌বেক্ নাই, দ্যাখ্ তুঁই!

এই বসন্ত সন্ধ্যায় মনে হইতেছিল যেন সমগ্র বনানীর নব-যৌবন ফিরিয়াছে! বৃক্ষ চূড়ায় কচি কিশলয়ের উপর সূর্য্যরশ্মি ঝিক্‌মিক করিতেছিল।

নানাবর্ণে চিত্র-বিচিত্র কয়েকটি ছোট পাখী অস্পষ্ট কলরব করিতে করিতে তাহাদের চোখের সম্মুখে উড়িয়া গেল।

পুন্‌কা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল হ'ল!

সুখী তাহার বুকে মাথা রাখিয়া তরুণের বক্ষ-স্পন্দন অনুভব করিতেছিল। কহিল, হঁ,—আর একটুকু।

কিয়ৎক্ষণ পরে পুন্‌কা সসঙ্কোচে ডাকিল, সুখী!

সুখী ধীরে ধীরে চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল, উঁ।

—কাল ফুল্-পরব্; লয়?

—হঁ।

—কাল আমরা খুব ফুর্ত্তি কর্‌ব, কি বল্ সুখী? বলিয়া পুন্‌কা ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুখীর মুখের নিকট নিজের মুখখানা লইয়া গেল।

সুখী ঈষৎ হাসিল মাত্র।

বনের ভিতর হইতে আম্রমুকুল এবং ঘাস-ফুলের তীব্র গন্ধ দম্‌কা বাতাসে ভাসিয়া আসিল।

পুন্‌কা আর একটু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া সুখীর হাত দুইটা সজোরে চাপিয়া ধরিল।

ধেৎ। বলিয়া সুখী ধড়্‌মড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিল। আড়্‌চোখে তাহার দিকে একবার কটাক্ষ হানিয়া তাড়াতাড়ি তাহার পরিত্যক্ত ফুলের ঝুড়িটার নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, আয়, আয়, পুন্‌কা, ফুল তুলি— না হ'লে রাত হঁয়ে যাবেক।

—হোক কেনে। জোস্না রাত বেটে। বলিয়া পুন্‌কা ধীরে-ধীরে উঠিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া বলিল, তুই ভারি দুষ্টু। মাত্‌লা হ'লে হয়ত কিছুই বল্‌থিস্‌ নাই।

মাত্‌লা তাহাদের স্বজাতি এবং প্রতিবেশী। বয়স বেশী হইলেও তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, এবং সেই জন্য সুখীর বাবা তাহারই সহিত সুখীর বিবাহ দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু সুখীর ইচ্ছা নিঃস্ব হইলেও পুন্‌কাকেই বিবাহ করে, তাই মাত্‌লার নাম শুনিয়া সুখী রাগিয়া উঠিল। একটা ফুলের থোপা পুন্‌কার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, হাঁরে, থাল্‌ভরা!—উয়ার্‌ নাম কর্‌বি ত' এই আমি চল্লম্‌।

সুখী সত্যসত্যই অভিমান করিয়া চলিয়া যাইতেছিল পুন্‌কা বলিল, যা কেনে, তুখে কে লেহর্‌ কর্‌ছে।

সুখী কিয়ৎদূর চলিয়া গেলে, পুন্‌কা জোরে জোরে বলিল, একা যাস্‌ না সুখী, ভালয় ভালয় বল্‌ছি,—শিয়াল্‌ খেপেছে, কাম্‌ড়াই দিবেক্‌।

সুখী পিছন্‌ ফিরিয়া বলিল, আমাকে কাম্‌ড়াবেক্‌, বেশ কর্‌বেক্‌,—তুর কি?

না, না, মিছে করে' বল্‌লম সুখী, আয়,—রাগ করিস্‌ না, ছি বলিয়া পুন্‌কা দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। সুখী তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া অভিমানভরে কহিল, যা, তুর্‌ তার ভার লাগে নাই। আমি যাব।

পুন্‌কা আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিল। জোর করিয়া ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারি-

পুন্‌কা হাসিয়া বলিল, তুঁই আমার জোর্‌কে ল. সুখী, কেনে মিছে টানাটানি কর্‌ছিস। চল্‌-চল্‌ অ বল্‌ব নাই।

সুখী এইবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, হুঁ,—কিস্‌কে!

তাহার পর উভয়ে আসিয়া তাড়াতাড়ি ফুলে ফুলে ঝুড়িটা বোঝাই করিয়া লইল। সুখীর মাথায় ঝুড়িটা দিয়া বনপথ ধরিয়া তাহারা ধাওড়ার দিকে ফিরিল।

নির্ম্মেঘ নির্ম্মুক্ত নীল আকাশ বাহিয়া পূর্ণিমা সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার ধারা গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল।.. পশ্চাতে তন্দ্রাভিভূত বনানী পড়িয়া রহিল।

বন পার হইয়া কতকগুলা বাঁশ ঝোঁপের ধারে ধারে তাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে।

পুন্‌কা বলিল, আমার ভয় লাগে সুখী, কাল তুর্‌ বাবা হয়ত মাত্‌লার সথে তুর্‌ বিয়ার ঠিক্‌ কর্‌বেক। উয়ার চাষ আছে, পাঁচ-ছ' বিঘা জমি আছে, পঁচিশটা মুর্‌গী আছে। আমার ত' উ-সব কিছুই নাই। আমি যে বড় গরীব সুখী, তাথেই ভয় লাগে।

সুখী কিছুই বলিল না। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। কথাটা চাপা দিবার জন্য দূরে একটা শৃগাল দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—হুঁ দ্যাখ্‌ এক্‌টা শিয়াল।

তাহার পর উভয়েই নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ প্রান্তরের উপর দুই জোড়া পদশব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা যায় না। রহিয়া রহিয়া দূরে কুলি-ধাওড়া হইতে একটা মাদল বাজিয়া উঠিতেছিল।

একটা পথের বাঁকে আসিয়া পুন্‌কা বলিল, তা হ'লে আমি যাই।...

—হুঁ, যা।

—কাল ঠিক্‌ আস‌

—হুঁ

দুই

পুন্‌কা ধাওড়ায় ফিরিয়া যে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করিল, তাহা বেশ ভাল বলিয়া বোধ হইল না। দেখিল, তাহাদের কুটীরের দরজায় তাহার বৃদ্ধ পিতা চুপ্‌টি করিয়া বসিয়া আছে,—তাহার ডান-পায়ের হাঁটুর উপর কি একটা গাছের কতকগুলা পাতা বাঁধিয়া পুরু করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পুন্‌কার বৃদ্ধা মাতা তাহার পার্শ্বে বসিয়া আহতস্থানে ধীরে ধীরে আগুনের সেক দিতে সুরু করিয়াছে। ইহারই মধ্যে এমন কি-ব্যাপার ঘটিয়া গেল, জানিবার জন্য কৌতূহল জাগিতেই তাহার মা বলিয়া উঠিল,—তুর্ দায়ে বুড়া বাপ্ মার খেঁয়ে খেঁয়ে মরুক, আর তুঁই যা খুশী তাই কর।

—কেনে, কি হ'ল ?

পুন্‌কার বৃদ্ধ পিতা তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল,—সেই কাব্‌লিওয়ালা এসেছিল,—চারটি টাকা পাবেক, তাথেই—

—তাথেই তুথে ঠেঁঙাই দিয়ে গেল নাকি ?

—হঁ কি করব বল। তুঁই ঘরে ছিলি নাই।

পুন্‌কা বিষণ্ণবদনে চৌকাঠের নিকট দাঁড়াইয়া সেই নিষ্ঠুর কাবুলিওয়ালার এই নির্ম্মম ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। সে ঘরে থাকিলে হয়ত এই শক্তিসামর্থ্যহীন বুড়ার গায়ে হাত দিতে সে পিশাচের সাহস হইত না।

পুন্‌কাকে এইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বুড়া বলিল,—ভেবে আর কি হবেক্ পুন্‌কা, যা খাগা যা।

...কটা হাঁড়িতে ভাত রাঁধা ছিল।

...বড় থালায় ঢালিয়া দুই ভাগ

মা হাঁ হাঁ করিয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—তুরা খা,—আমার আছে।

পুন্‌কা বুঝিতে পারিল যে, সে মিথ্যা বলিতেছে; কাজেই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের ভাগের অর্দ্ধেক-গুলা ভাত থালায় ফেলিয়া রাখিয়া সে উঠিতে যাইতেছিল। তাহার মা বলিল,—আমার মাথার কিরা পুন্‌কা,—তুঁই সবগুলি খা। তুর্ পেট ভরে নাই।

—হঁ, ভরেছে। আমি আর খেতে লারব।

—খুব পারবি পুন্‌কা! আমার মাথার কিরা,—আমার রক্তে চান্ করিস্ যদি না খাস্।

পুন্‌কা রাগের ভাণ করিয়া জোরে জোরে বলিয়া উঠিল,—তরকারী নাই, কিছু নাই, নুন্ দিঁয়ে আমি অতগলা ভাত গিল্‌তে লারব-লারব-লারব। হ'ল ?—বলিয়া পুন্‌কা থালাটা সরাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

মাতা পুত্রের এই দুঃখময় স্নেহের লড়াই দেখিয়া, বৃদ্ধ পিতার মুখের গ্রাস পেটে যাইতেছিল না। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ভাতগুলা গিলিতে লাগিল।

দৈন্য-প্রপীড়িত তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারের কথা ভাবিতে ভাবিতে পুন্‌কা সন্ধ্যা-রাত্রেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বুকভরা বেদনা লইয়া পরদিন প্রত্যূষে সে তাহার মলিন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিতেই দেখিল, তাহার বৃদ্ধা মাতা শেষ রাত্রে উঠিয়া ইহারই মধ্যে কখন তাহাদের কুটীর এবং তাহার অঙ্গনটুকু অতি সুন্দরভাবে ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া, গোবরের নাতা দিয়া তাহার উপর কয়েকটি ফুল ছড়াইয়া রাখিয়াছে।

হাঁটুর উপর হাত দুইটা সংবদ্ধ করিয়া পুন্‌কা বসিয়া বসিয়া একদৃষ্টে উঠানে ছড়ান ফুলগুলার দিকে তাকাইয়া রহিল। আজ তাহাদের উৎসবের দিন!...কিন্তু পেটে ...হাদের দুবেলা দুমুঠা অন্ন পড়ে না, তাহাদের আবার বলিয়া ...সের ? সে তাহার বৃদ্ধ পিতার নিকট শুনি- মুখখানা ...—তাহারা যখন সংঘবদ্ধ হইয়া বনে জঙ্গলে, পাহা- ...ড়ের ধারে বাস করিত, যখন তাহাদের পাতার কুটীরে অভাব-অনটন ছিল না, যখন তাহারা এতখানি ...সভ্য হইতে পারে নাই, এবং যখন তাহাদিগকে

সামান্য অর্থের দায়ে পড়িয়া পড়িয়া কাবুলিওয়ালার মার খাইতে হইত না, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া নাচিত, গাহিত, উৎসব করিত। অর্দ্ধভুক্ত ক্ষুধার্ত্ত পুন্‌কার মনে হইতে লাগিল, ফুলগুলা তাহার দিকে চাহিয়া উপহাস করিতেছে।...আজ হয়ত উৎসবে নাচিতে গিয়া তাহার ক্ষীর্ণ দুর্ব্বল পদদ্বয় টলিয়া টলিয়া পড়িবে,—গাহিতে গিয়া তাহার ক্ষুৎ-পিপাসা-কাতর কণ্ঠে বাক্‌ সরিবে না,—তবু আজ উৎসবের বিড়ম্বনা!...সঙ্গে সঙ্গে সুখীকে মনে পড়িল। আজ তাহার সেখানে যাইবার কথা!...

যদি সুখীর বাবা মাৎলার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত ঠিক করিয়া ফেলে তাহা হইলে গায়ের জোরে সুখীকে জয় করিতে হইবে।

ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলাকে পা দিয়া মাড়াইয়া পুন্‌কা বাহির হইয়া যাইতেছিল। তাহার মা বলিল,—আজ পরবের দিনে আর খাদে যেঁয়ে কাজ নাই, পুন্‌কা। কারু ঘরে চাল-ডাল ধার-ধোর করে' এনে আজকার দিনটা চালাই।

ঘরের ভিতর হইতে তাহার বৃদ্ধ পিতা বলিয়া উঠিল,—হাঁ, আর পরবের দিনে গুষ্টিশুদ্ধ কাবেলের মার খা।

পুন্‌কা হন্‌ হন্‌ করিয়া সোজা খাদের দিকে চলিয়া গেল।

তিন

বেলা তখন প্রায় একটা। কিন্তু খাদের নীচে বুঝিবার উপায় নাই, বেলা একটা, কি রাত্রি একটা। চারিদিকে গভীর অন্ধকার থম্‌ থম্‌ করিতেছে,—মাত্র যে-সব স্থানে কুলিরা কাজ করিতেছিল, সেই-সব জায়গায় এক-একটা কেরোসিনের ডিবে, মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। তাহাতে আলো হওয়া অপেক্ষা বরং পার্শ্বস্থ অন্ধকারটা বেশ ভালো করিয়া জমাট বাঁধিয়াছে।

আজ 'পরবের' দিনে অধিকাংশ সাঁওতাল কুলি-কামিনেরা কাজ করিতে আসে নাই। কাজেই খাদের নীচে গোলমাল কিছু কম। পুন্‌কা যেখানে কয়লা কাটিতেছিল, সেখানে গোলমাল একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। তাহার সহিত আরও দুই জন বাউরী কুলি কাজ করিতেছিল।

পুন্‌কা দেখিল, সেই সকাল হইতে প্রাণপণে কয়লা কাটিয়াও তাহার রোজ্‌গার এখনও পাঁচ আনার বেশী হয় নাই। অথচ, সকাল হইতে না খাইয়া এইটুকু পরিশ্রমেই তাহার হাত দুইটা কেমন যেন অবশ হইয়া আসিতেছে,—কাজ করিতে তেমন মন সরিতেছে না। যদি কোনও রকমে বৈকাল পর্য্যন্ত খাটিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে হয়ত একটা টাকা রোজ্‌গার করিবে,—কিন্তু তাহাতেও ত তাহার কিছুই হইবে না। অতি কষ্টে তাহাদের তিনটি প্রাণীর দু' বেলা খাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু সেই কাবুলিওয়ালা? কথাটা ভাবিতেই তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।—কাল তাহার বৃদ্ধ পিতাকে সে মারিয়া গেছে,—আজ হয়ত তাহার বুড়ী মায়ের গায়েও হাত তুলিবে! এতক্ষণ হয়ত তাহারা কাহারও বাড়ীতে চারিটি চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে, কিংবা হয়ত—

—আজ না উৎসবের দিন!...কথাটা ভাবিতেও তাহার কষ্ট হইতেছিল। হাতের কয়লা-কাটা গাঁইতি-খানা এক পার্শ্বে নামাইয়া রাখিয়া, পুন্‌কা তাহার ক্লান্ত অবসন্ন শরীর লইয়া একটা কাটা কয়লার চাপের উপর বসিয়া পড়িল। পাতাল-গহ্বরের সেই বিভীষিকাময় গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শুষ্ক কঠিন কয়লাস্তরের গায়ে গায়ে নানা-রঙের নানা-জাতীয় ফুল যেন নিমেষেই ফুটিয়া উঠিল। বনমল্লিকা যুঁই চামেলি চাঁপা করবী ভুমিচম্পা ঝুম্‌কা পলাশ মহুয়া বাবলা,—আরও কত কি!.....তাহার মধ্যে আর-একখানা কুসুম-সুকুমার তরুণীমুখের প্রতিচ্ছবি! সে হয়ত' এতক্ষণ চন্দ্রমল্লিকার সাতনলী হার গলায় দোলাইয়া, চামেলী চাঁপায় কবরী বাঁধিয়া, ঝুম্‌কা-ফুলের কর্ণাভরণ এবং বাব্‌লা-ফুলের নাকছাবি পরিয়া, তাহারই আশা-পথ প্রতীক্ষায় অথির চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর, সে কিনা আজ এই উৎসবের দিনে অন্ধকার মৃত্যু-গহ্বরে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রাণ দিতেছে। তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি হাসি গান উৎসব আনন্দ,—পেটের দায়ে, দুর্ভিক্ষ-

রাক্ষসীর প্রবল তাড়নায় কোথায় কোন্ দিক্ দিয়া যে অন্তর্হিত হইয়া গেছে, কে জানে? এ কি বেদনা,—এ কি দুর্ভোগ!…

নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্ত কয়েকটা থালায় ভাত বাঁধিয়া জন দুই-তিন বাউরী কুলি রমণী গান গাহিতে গাহিতে সেইদিকেই আসিতেছিল। অগ্রবর্ত্তিনীর হাতে একটা কেরোসিনের 'মগ' জ্বলিতেছে। কিন্তু পুনুকার জন্ত কে-ই বা আনিবে, আর কি-ই বা আনিবে? তাহার মনে হইতেছিল, এই মেয়েগুলার মাথা হইতে একটা থালা কাড়িয়া লইয়া পেট ভরিয়া খায়।

এমন সময় পশ্চাৎ দিক্ হইতে তাহার আবরণহীন উন্মুক্ত পৃষ্ঠের উপর একটা স-বুট পদাঘাত পড়িতেই পুনুকার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পড়িতে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল,—কুঠীর ভীমকায় ম্যানেজার সাহেব যমদূতের মত তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতেছে। মুহূর্ত্তেই তাহার কল্পনার স্বর্গরাজ্য বাতাসে মিলাইল। উৎসবের আলোহাসি তাহার চোখের সম্মুখে নিমেষেই যেন 'ফস্' করিয়া নিভিয়া গেল এবং সেই পাতালপুরীর আঁধার গুহায় কঠিন কয়লার স্তরগুলা বেশ স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

পুনুকা ধীরে ধীরে তাহার পরিত্যক্ত গাঁইতিটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় কাজ করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেব চলিয়া গেল, কিন্তু এবার তাহার গাঁইতি থামিল না। কঠিন কয়লার উপর তাহার ইস্পাতের গাঁইতিখানা 'খং' 'খং' শব্দে বারে বারে তীব্র আর্ত্ত নাদ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল,—এই খাদের ভিতরে বহুবিধ আপদ্-বিপদ্, নিরীহ কুলিদিগকে গ্রাস করিবার জন্ত ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহাকে ত গ্রাস করে না! তাহার মত অনেক লোক এই পাতালপুরীতে পেটের জন্ত প্রাণ দিয়াছে,—এখন তাহাদের মৃত আত্মাগুলা জাগিয়া উঠিয়া, যদি তাহাকে এই অন্ধকারের মধ্যে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাদের সঙ্গী করিয়া লয়, তাহা হইলে তাহার বেদনার্ত্ত প্রাণের শত ধন্তবাদে তাহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানায়।…এক মুহূর্ত্তে কি সমস্ত ওলটপালট হইয়া যাইতে পারে না? সে চাহিতেছিল, এমন একটা কিছু, যাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রলয়ের সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পে সমস্ত বসুধা টলমল করিয়া উঠুক, উপরের গ্রাম নগর লইয়া সমস্ত খাদের চালটা মাথার উপর খসিয়া পড়ুক, খাদের ভিতর আগুন ধরিয়া যাক, অগ্নি-বরণী নাগনাগিণীর মত অন্ধকার গুহার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতে থাকুক! খাদের উপরে,—যেখানে জাগ্রত জগতের নর-নারীর মধ্যে সভ্যতা-অসভ্যতার দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতেছে, যেখানে ধনী-নির্ধনের, প্রবল এবং দুর্ব্বলের, উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িতের সংঘর্ষ সুরু হইয়াছে,—যেখানে দুর্ব্বলের রক্তে রাঙা প্রবলের বিজয়-নিশান, উৎপীড়িতের বুকের উপর প্রোথিত হইয়া আছে, সেখানে গ্রহ তারা চন্দ্র সূর্য্য সমস্ত নিভিয়া যাক,—উল্কাপাতে অগ্নি-বর্ষণ হইতে থাকুক,—তাহার মত উপবাসী গরীবের দল যেখানে তপ্ত ধূলিশয্যায় ছটফট করিয়া তিলে তিলে মরিতেছে, তাহারা একেবারেই মরিয়া যাক!…

পুনুকার হাতের অস্ত্র ঠং ঠং খং খং করিয়া অবিশ্রান্তভাবে কয়লা কাটিয়া চলিতেছিল। মুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিবার অবসর নাই,—কথা কহিবার সময় নাই। কান দুইটা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে,—নাক দিয়া উষ্ণ শ্বাস বহিতেছে, সর্ব্ব শরীর ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে!

এদিকে ঠিক এই সময়ে খাদের উপরে উৎসব সুরু হইয়াছিল। ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে এবং পুরুষরমণীর সর্ব্বাঙ্গে ফুলের ছড়াছড়ি। বর্ণে গন্ধে হাসিতে গানে আমোদে আহ্লাদে, তাহারা যেন দেহ-মনের সমস্ত গ্লানি আজ ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে। গাছে গাছে ফুলের দোল্‌না টাঙাইয়া পুরুষরমণী দুলিতেছে,—ছেলে মেয়েরা পুষ্পাভরণে ভূষিত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে,—সুবিন্যস্ত-কবরী যুবতীগণ ফুলের গহনা পরিয়া হেলিয়া দুলিয়া গান ধরিয়াছে। যুবকগণ কর্ণমূলে কণ্ঠে ফুলের মালা দুলাইয়া আড়বাঁশীতে বেহাগের বেদনা সাধিতেছে। সকলের নৃত্য-গীত

আনন্দ-কলরব যেন সপ্তমে চড়িয়াছে,—আজ যেন তাহারা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়া পৃথিবীর সমস্ত রস, সমস্ত সৌন্দর্য্য শোষণ করিয়া লইবে, কাহারও কোনও ক্ষুধা আজ অতৃপ্ত থাকিবে না।

সুখীর বাবা আজ মাৎলার সহিত তাহার বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছিল। মাত্র সুখীর একটুখানি সম্মতির অপেক্ষা। সে কিন্তু ইতস্ততঃ করিতেছিল; কারণ, পুন্‌কা যে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে-সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় ছিল না। সুখী জানিত পুন্‌কা আসিয়াই মাৎলার হাত হইতে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইবে,—সেও আর কোন কথা না বলিয়া তাহার-সহিত উধাও হইবে। এ বিবাহ সে কখনই হইতে দিবে না। পয়সা না থাকুক, পুন্‌কার গায়ের জোর ত আছে! একটা আম-গাছের তলায় বসিয়া সুখী এইসব কথাই ভাবিতেছিল। কয়েকজন যুবতী অনেকক্ষণ হইতে তাহাকে সেখান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কেহই তাহাকে উঠাইতে পারিল না—গালাগালি খাইয়া সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইল।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় অথচ পুন্‌কা আসে না। সুখী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। এতদিন ধরিয়া তাহাদের এত কথা হইল, এত প্রতিশ্রুতি, এত ভালোবাসা, এসব কি তবে কিছুই নয়! এতকাল ধরিয়া কি পুন্‌কা তাহার সঙ্গে মিথ্যা অভিনয় করিয়া আসিয়াছে! কিন্তু সে-কথা সে বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া? ক্রমে পুন্‌কার উপর তাহার যেন একটু একটু রাগ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, দুই হাত দিয়া তাহার নিজের চুলগুলা ছিঁড়িয়া ফেলে, ফুলের গহনাগুলা টানিয়া ছিঁড়িয়া পায়ে দলিয়া এখান হইতে পলাইয়া যায়! ক্ষণে ক্ষণে চারিদিকে তাহার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সুখী পুন্‌কার সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু প্রতিবারেই সে-দৃষ্টি মাৎলার উপর পড়িয়া যেন চাবুক খাইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই উৎসব-ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার পরিচিত অপরিচিত সকলেই আছে, শুধু সে যাহাকে চায়, সে নাই!

উৎসবের উদ্দাম স্রোত ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। পুন্‌কার আসিবার আর-কোন আশা-ভরসা নাই। মাৎলা অধীর হইয়া উঠিয়াছিল,—উৎসবের আনন্দ তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।

সুখীর বাবা সুখীকে একবার যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া গেল।

পুন্‌কার উপর দুরন্ত অভিমানে সুখীর আকণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সেই উত্তেজনার মুহূর্ত্তে সে আর কোনও কথা ভাবিতে পারিল না,—ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া মাৎলার নিকট গিয়া দাঁড়াইল। এইবার সুখীর বাবা ঈষৎ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল এবং দশজন মাতব্বর যোগ-মাঝির (দলপতি) সম্মুখে মাৎলার হাতে তাহাকে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

সুখীর শ্বাস-প্রশ্বাস তখন অত্যন্ত দ্রুত বহিতেছে; রাগে উত্তেজনায় তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাঁদিতে পারিতেছে না।

মাৎলা হাসিতে হাসিতে তাহাকে পার্শ্বস্থ গাছের তলায় বসাইয়া বলিল,—লে, মদ খাই।

মাৎলার সঙ্গে বসিয়া উন্মাদিনীর মত সুখী প্রাণপণে মদ গিলিতে সুরু করিল।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদ খাদের নীচে পুন্‌কার নিকট না পৌঁছিলেও সে এইরূপ একটা-কিছু অনুমান করিয়া লইতেছিল, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কিছু ভাবিতে পারিতেছিল না। সমস্ত চিন্তার পথ তাহার নিকট আজ রুদ্ধ হইয়া গেছে।

বৈকালের দিকে একে-একে সকলেই খাদ হইতে উঠিয়া যাইতেছিল। পুন্‌কা ভাবিল, তাহার উঠিয়া কাজ নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার শরীরের শেষ রক্তবিন্দুটুকু হিম-শীতল না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজ করিবে!

কিয়ৎক্ষণ পরে, কি একটা কথা মনে হইতেই পুন্‌কা আর ক্ষণ-বিলম্ব না করিয়া, একহাতে কেরোসিনের 'মগ' এবং অন্য হাতে গাঁইতিটা কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া, উর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে 'চানকের' দিকে ছুটিতে

আরম্ভ করিল। ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর গিয়া বাতিটা ফস্ করিয়া নিভিয়া গেল। পুন্‌কা কিন্তু থামিল না, সেই অন্ধকারের মধ্যেই চেনা পথ ধরিয়া আবার ছুটিল। সম্মুখে 'মেন্ গ্যালারির' লাইনের উপর একটা ফাঁকা টব-গাড়ী পড়িয়া ছিল। অন্ধকারে সেটা দেখিতে না পাইয়া পুন্‌কা হুমড়ি খাইয়া তাহার উপর পড়িতেই, ঝড়াং করিয়া গাড়ীটা লাইনের উপর সরিয়া গেল। সেও মাথা গুঁজিয়া লাইনের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। কোন রকমে ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পুন্‌কা আবার হাঁটিতে লাগিল। নিকটেই খাদের মুখে আলো দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। দু' তিনজন বাউরী কুলি উপরে উঠিবার জন্য 'লিফ্‌ট্-কেজে'র উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচের ঘণ্টাওয়ালা 'কেজ্' উঠাইবার ঘণ্টা দিতে-না-দিতে পুন্‌কা ছুটিয়া গিয়া 'কেজে' প্রবেশ করিল, ঘণ্টা দিতেই খাদের 'চানক্' বাহিয়া কেজ্‌খানা উঠিতে লাগিল।

কাঁধের গাঁইতিটা নামাইয়া, পুন্‌কা একপাশে একটা লোহার শিক্ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পার্শ্বস্থিত বাউরী যুবক পুন্‌কার মুখের পানে তাকাইয়া কহিল,—এই পুন্‌কা! তুর্ কপালে লোহু কিসের?

পুন্‌কা বাঁ-হাত দিয়া কপালটা একবার মুছিয়া লইতেই দেখিল, খানিকটা কাঁচা রক্ত হাতে লাগিয়া আসিয়াছে। বলিল,—উ কিছু লয়। টব্-গাড়ীতে কাটা গেল।

পুন্‌কা অন্যমনস্কভাবে গম্ভীরমুখে 'কেজে'র বাহিরে তাকাইয়া ছিল। কূপ-গহ্বরের মত চানকের চারিদিকে কয়লা পাথর ও মাটির স্তর ভেদ করিয়া বর্ষাধারার মতই ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে!

কিয়ৎক্ষণ সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, তাহাদিগকে লইয়া 'লিফ্‌ট্'খানা ঝড়াং করিয়া উপরের মুখে আসিয়া লাগিল। সর্ব্বাগ্রে পুন্‌কা বাহির হইল। খাদ-সরকারের নিকট 'টিপ্' করাইয়া সে খাজাঞ্চির নিকট দৌড়িল। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের রোজ্-টার মাত্র একটি টাকা লইয়া পুন্‌কা মাতালের মত টলিতে টলিতে ধাওড়ার দিকে ফিরিতেছিল। বেলা-শেষের রক্তিম আলোটুকু ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে!

রাস্তার দুইপাশে সাঁওতালদের কুলি-ধাওড়াগুলা দেখিলে মনে হয়, 'পরবে'র জের এখনও বোধ হয় থামে নাই। দু' এক স্থানে নাচ-গান তখনও চলিতেছিল।

অদূরে একটা বাগানের পাশে, চারিটা শাল-গাছের খুঁটি দিয়া ছান্‌লাতলার মত একটা উৎসব-গৃহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। অসংখ্য ঝরাপাতা এবং শুক্‌নো ফুলে সে-স্থানটা একেবারে ভরপুর হইয়া আছে। পুন্‌কা চলিতে চলিতে সেইখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। নিকটেই কয়েকজন বাউরী ও কোঁড়া কুলিকামিন মদ খাইয়া হল্লা করিতেছিল।

পুন্‌কা তাহাদের একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ইখানে কি হঁয়েছিল রে?

—বা, আজ তুদের পরবের দিনে তুঁই ছিলি কোথা?

—খাট্‌তে গেইছিলি নাকি?

পুন্‌কা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হঁ।

যে-লোকটা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল, সে টানা-টানা স্বরে বলিয়া উঠিল,—আ, কি আক্কেল রে? মাৎলা আজ মদ খাওয়াঁই খাওয়াঁই ভূত করে' দিলেক্।

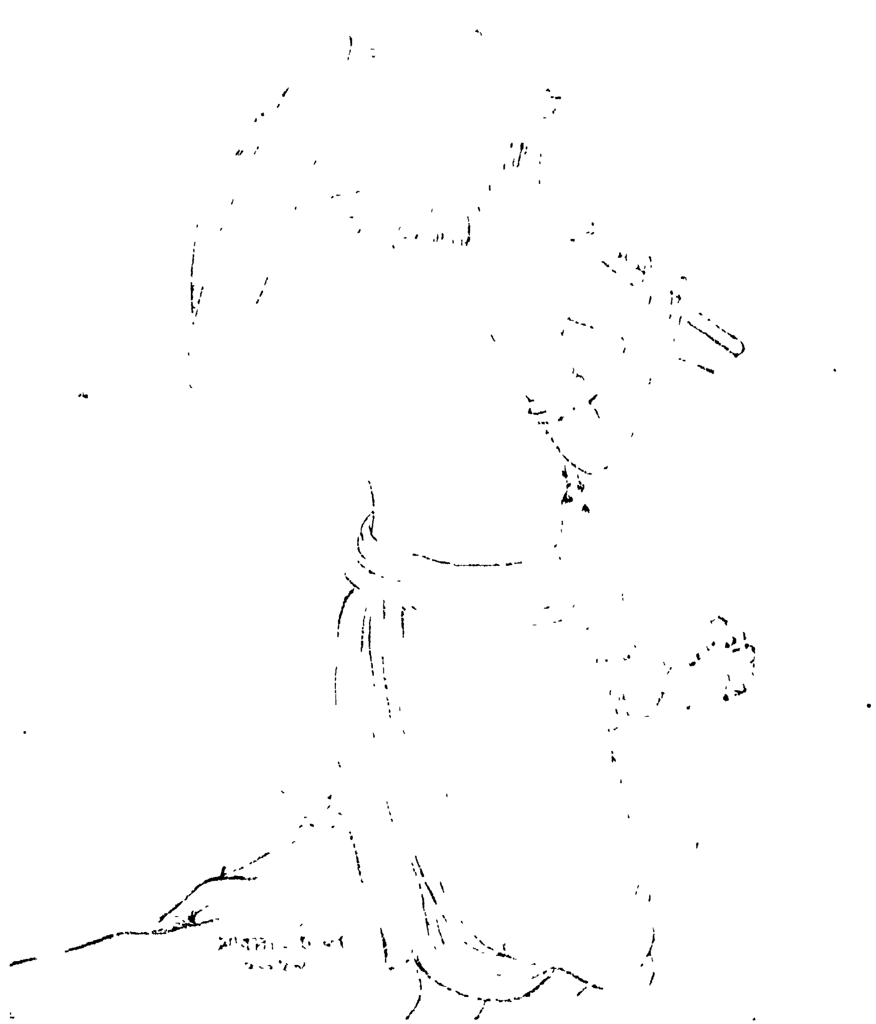
পাশের লোকটার গায়ের উপর পড়িয়া সে বলিল,—আর মদ আছে ত দে কেনে উয়াকে একটুকু।

—না, না, একদম নাই মাইরি। ছাখ কেনে খালি হঁয়ে গেইছে।—বলিয়া মদের হাঁড়িটা সে একবার নাড়া দিয়া দেখাইয়া দিল।

মদ না খাইয়াই পুন্‌কা টলিতেছিল। বলিল,—না, আমি মদ খাব নাই।—মাৎলা কেনে খাওয়ালেক রে?

—বা তাও জানিস্ না! সুখীর সঁথে যে উয়ার বিয়া হ'ল।—বলিয়া লোকটা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই বিকট হাসির হা হা শব্দ পুন্‌কার বুকে ছুরি হানিল। সে আর তাহাদের কোন কথা শুনিল না। বাগানের পথে পথে সে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইতেই দেখিল, একটা গাছের তলায় আরও কতকগুলা ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। সেদিকে তাকাইতে পুন্‌কা হঠাৎ থামিয়া গেল। এ ফুল গতকল্য সন্ধ্যায় তাহারাই নীলবন হইতে তুলিয়া আনিয়াছে!



রাখাল

চিত্রকর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ উকিলের সৌজন্যে

U. RAY & SONS CALCUTTA

পুনুকার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার চোখের সম্মুখে যেন বিরাট্ অন্ধকার থম্ থম্ করিতেছে! পথ নাই, ভাবিবার পর্য্যন্ত কোনও পথ নাই! একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া, পুনুকা ডান-হাতের তর্জ্জনী দিয়া তাহার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল। ঘামের সঙ্গে তাহার কপালের খানিকটা রক্ত ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ফুল-গুলার উপর ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু পুনুকা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। গোলাপী ফুলের উপর কাঁচা খুন্ জমাট বাঁধিয়া গেল। কয়েকটা ফুলের উপর দিয়া সে মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছিল। কোমল ফুলগুলা পায়ের নীচে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল।

কয়েক পা অগ্রসর হইয়া গোটাকতক ঝুম্কা ও বাব্লা ফুল পুনুকা কুড়াইয়া লইল। সে ভাবিল, এই ঝুম্কা-ফুলটি সে বোধ হয় কানে পরিয়াছিল, আর এই বাব্লা-ফুলটি নিশ্চয়ই তার নাক-ছাবি! ফুলগুলি আপন হাতের মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া পুনুকা কিয়দ্দূর চলিয়া আসিবার পর, তাহার মনে হইতে লাগিল, হাতের মধ্যে সে যেন একমুঠা জ্বলন্ত আগুন চাপিয়া ধরিয়া আছে। ফুলগুলা সে পথের ধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। আবার পথ চলিতে চলিতে একটা মর্ম্মভেদী দুঃখ-নিরাশা পুনুকার বুকের তলে হাহা করিয়া উঠিতে লাগিল।

উৎসবশেষে সকলেই যেন অতিরিক্ত ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হইয়া চুপ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুষ্পের সমস্ত সুগন্ধ দক্ষিণ-বাতাসে উড়িয়া গেছে, বাঁশীর সঙ্গীত থামিয়াছে,—মাদলের শব্দ নীরব হইয়াছে, হাসি গানের আনন্দ উচ্ছ্বাস আর যেন কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না,—কাহারও মুখে কথা নাই,—নীরব বিশ্বপ্রকৃতি, আকাশ-বাতাস, সব যেন এ-উহার পানে চাওয়া-চাওয়ি কানাকানি করিতেছে!

ধাওড়ায় ফিরিয়া পুনুকা কাহাকেও কোন কথা বলিল না। বৃদ্ধ পিতার পায়ের নিকটে তাহার রোজ্গারের টাকাটা ছুড়িয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিল, একটা বিরাট্ কালো মেঘে চাঁদটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রাহুর গ্রাস হইতে যেন তাহার আর মুক্তি নাই!

অন্ধকার,—শুধু গাঢ় অন্ধকার যেন চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে! কোনও দিকে কোনও পথের সন্ধান পাওয়া যায় না,—এই অন্ধকার আবর্ত্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রলয়ের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়া থাকা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

খাঁচার পাখীর মত একটা অশান্ত আক্ষেপ পুনুকার বুকের ভিতর গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

শ্রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়

রকমারি

স্ত্রী স্বামীকে বল্লেন—"আমাদের মেয়েটির নাম রাখা যাক্ লীলা, কি বল?"

লীলা নামটা স্বামীর কেমন ভাল লাগ্ল না, কিন্তু মেয়ের নাম নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন আগ্রহ বা অবসরও তাঁর ছিল না। সোজা সে কথাটা বলে' স্ত্রীর বিরাগভাজন হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে না করে' তিনি হেসে বল্লেন—"খাসা নাম হয়েছে!—দ্যাখ, আগে যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল তারও নাম ছিল লীলা। প্রথমটা তাকে খুবই ভালবেসেছিলাম—বেচারা কলেরায় মারা গেল কিনা, তাই শেষে তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল। অবশ্য তোমাকেও খুব ভালবাসি—তার চেয়েও বেশী।"

স্ত্রী অনেকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে বসে' থাক্লেন। শেষে কঠোরস্বরে বল্লেন—"না, ওর নাম রাখ্লাম ছায়া—আজ থেকে ওকে ছায়া বলে' ডাক্তে হবে, মনে থাকে যেন।"

স্বামী "যে আজ্ঞা" বলে' হাস্তে লাগ্লেন।

শ্রী বীরেশ্বর বাগছী

নূরজহান ও জহাঙ্গীর

[মহবৎ খাঁ নূরজহানের শত্রুতায় ভীত হইয়া সম্রাটের কাবুল-যাত্রাকালে হঠাৎ শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন। কথিত আছে, এই সময়ে একবার তিনি সম্রাট্‌কে মন্ত্রণায় বশ করিয়া এবং কতকটা বাধ্য করিয়া নূরজহানের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষর করাইয়া লন। অতঃপর সম্রাজ্ঞী উক্ত আদেশপত্র হস্তে লইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।]

স্থান—কাবুলের পথে বাদ্‌শাহী শিবির। কাল—মধ্যাহ্ন।

বিস্তৃত গালিচার 'পরে বাদ্‌শাহের গদি। সম্মুখে বহুমূল্য থাকায় নানাবিধ কাবুলি-মেওয়া, স্বর্ণপাত্রে শরবৎ ও মদিরা। বাদ্‌শাহ নিভৃতে বিশ্রাম করিতেছেন। গালিচার একপ্রান্তে খোলা কানাতের ফাঁক দিয়া খানিকটা রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, এবং দূরে নীল আকাশের নীচে তুষার-ধবল গিরি-শ্রেণী দেখা যাইতেছে। মহবৎ খাঁ এইমাত্র প্রবেশ করিয়া বাদ্‌শাহকে নূরজহানের আগমন-চেষ্টা জানাইলেন, ও নীরবে আজ্ঞাবহ অনুচরের মত একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার মুখ যেমন তেজোব্যঞ্জক, তেমনি বিষণ্ণ-গম্ভীর।

জহাঙ্গীর

মহবৎ, তুমি বড় বে-অকুফ্! হাতে দিয়ে পরোয়ানা—
এই বাদ্‌শাহী-পাঞ্জার ছাপ, ফের তারে ডেকে আনা!
আমার হুকুমে বিশ্বাস নেই, বিশ্বাস হ'ল তারে!
বীর বটে, তবু মাথায় মগজ কিছু নাই একেবারে!
এ-কাজ করিতে দুইবার ভাবে!—তবেই হয়েছে সারা!
এ যে একেবারে মরীয়ার কাজ!—চোখ বুজে' ছুরী মারা!
বেহেশ্‌ত্ চাও ত চেয়োনা সে-মুখে—নহে সে নূরজহান!
জাহান্নামের নূর বটে সেই!—সুন্দর শয়তান!
আল্লার নাম জপ কর, আর তলোয়ার রাখ সিধা,
দূর কর যত হিসাব-নিকাশ, বিচারের মুসাবিদা!
এসব কি ফুল? গুল্-আস্‌রফি?—ফুলে কাজ নাই আজ!
রোদ ঢেলে হোক্ লাল-গালিচায় খুন্-খারাবির সাজ!
চাহি না বরফ, শরবৎ মিঠা, খরমুজা কাশ্মীরী—
দিল্ করে' দাও শরাবে দরাজ—দেখাব বাদ্‌শাগিরি!...
ঠিক বটে, তার বহুৎ কসুর!—মাফ কিছুতেই নয়;
খস্রুকে খুন সেই করায়েছে—তারি কাজ নিশ্চয়!
খুরম আজিও বিদ্রোহী হয়ে দিকে-দিকে পলাতক,
তারি ফন্দীতে তুমিও নারাজ,—আমি কি আহাম্মক!
আমি রাজা, যার এত কোটী প্রজা মুখ চেয়ে মরে বাঁচে,—
আমি কিনা ফিরি যোড়-হাতে এক রমণীর পাছে পাছে!
আর কথা নয়,—ঠিক, মহবৎ! বড় তুমি হুঁশিয়ার!
এমন সময়ে এমন বন্ধু সত্যই পাওয়া ভার!...

কাল রাতে এক স্বপন দেখেছি তাজ্জব আজ্‌গবি!—
আমারই কেল্লা লাহোর যেন সে—তারি মত এক ছবি!
মাঝখানে তার মস্ত মিনার—আকাশে ঠেকেছে মাথা!
এত উঁচু,—তবু জমিন্ হ'তে সে সমান সোনায় গাঁথা!
নীচে চারিদিকে আলো-আব্‌ছায়া, আস্‌মানে একরাশ
কিসের আতশ?—দেখি, তার সেই মিনার-চূড়াতে বাস!
হঠাৎ একটা হাতী কোথা হ'তে ছুটে এসে দেয় ঠেলা,—
থাম ভেঙে গেল, আলো নিবে গেল! এমনি তামাসা-খেলা!
জেগে উঠে তবু ভয় হ'ল মনে! এ যে বড় বিপরীত!
পাগ্‌লা হাতীর এক ঠেলাতেই ভেঙে গেল তার ভিত!
না, না, ভালো নয়! খাঁ সাহেব, তুমি কি বল? কেমন লাগে?
আমার মাথা ত গোলমাল করে, শরাবের নেশা ভাগে!
কথা কও না যে! বড় বেতমিজ!—
আরে, আরে!—একি! একি!
মহবৎ! ধর! সরাও পেয়ালা!—সেই আসে, ওই দেখি!
এয় খোদা! এই পেয়ালার বিষ লাল করে শুধু চোখ,—
ওর পানে চেয়ে নীল হয় খুন!—এত বিষ গুল্-রোখ!
জোয়ানী সাবাস্!—সেই কালো চোখ—কালো-জহরের ছুরী
ছেঁড়া-কলিজার খুন্-মাখা সেই ঠোঁটের গোলাব-কুঁড়ি!
এতকাল পরে এ-রূপ কোথায় ফিরে পেল আরবার?
আরে, আরে!—এই জান্‌খানা টেনে চিরদিন জেরবার!

* *

মেহেরুন্নিসা! এ বেশে এমন অসময়ে আগমন?
হুকুম ছিল না—আদব ভুলেছ? ভালো নাই মোর মন!

শাহ-বেগমের ইজ্জৎ কোথা? ওড়্‌নাও গেছে ঘুচে'!
খালি পায়ে সেই জুতাটুকু!—বুঝি শরম ফেলেছ মুছে?

নূরজহান

কার ইজ্জৎ আলী-হজ্‌রত? হাসি পায় শুনি' কথা!
এত অভিমান শিখিলে কোথায়? কে শিখাল চতুরতা?
সেলিম কখনো সেলাম শেখেনি, ছিল শুধু শাহজাদা—
জহাঙ্গীরের প্রেম যত বড়, ছল নয় তার আধা!
মুখে-বুকে এক!—মোগলের মান সেই রাখিয়াছে জানি,
ইরাণের মেয়ে বিদেশী মেহের তাই ছিল অনুমানি'।
আজ এতদিনে একি পরিচয়!—বুকে এক, মুখে আর!
নূতন পীরের নূতন মুরিদ!—বাহবা, চমৎকার!
বাদ্‌শার সাথে বেগমের দেখা—বড় তার ইজ্জৎ!—
এখনো সমুখে দাঁড়াইয়া তাই গোলাম মহব্বৎ!
তামাসার কথা ভালো নাহি লাগে, সে সময় আজ নাই,
বুকে যাহা ছিল, মুখ ফুটে তার কিছু কয়ে যেতে চাই।
শাহ-বেগমের নাম শুনে আজ ঘৃণা হয় আপনারে!
ভিখারিণী কোনো প্রজার মতও আসি নাই দর্‌বারে!
জীবনের প্রভু ছিল যেই মোর—মৃত্যু-মূরতি তার
ভেটিবার তরে, রমণীর এই দীনহীন অভিসার।
স্বামী বটে, তবু আজ আমি তাঁর নই যে সীমন্তিনী—
ঘরে নয়, আজ মশানে চলেছি!—কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
খুলিয়াছি তাই,—জীবনে আব্রু,—মরণে পর্দা নাই!—
দুনিয়ার শেষে কার কাছে লাজ?—ওড়্‌না পরিনি তাই।
মরণের ঘাট পিছল নহে কি? জানো না কি জাঁহাপনা?
কতটুকু পথ? কি কাজ পরিয়া জুতা সে জরীতে-বোনা?
বেয়াদবি যদি হয়ে থাকে তবু, দাও তারো তরে সাজা,
মরণের বাড়া সাজা আছে জানি, তাই দাও তবে রাজা!

জহাঙ্গীর

বৃথা অভিমান মেহের! তোমার স্বামী শুধু নই, নারি,
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে আমি, সে কথা ভুলিতে পারি!
ঘোর অপরাধে অপরাধী তুমি—রাজ্যেরি দুষমন্‌!
ন্যায়ের সূক্ষ্ম-বিচারে তোমার মৃত্যুই নিরূপণ!
তার লাগি' বৃথা দুষিও না মোরে—

নূরজহান

থাক্ থাক্, বুঝিয়াছি—
ওই মুখে এই মিথ্যা শুনিয়া না মরিতে মরিয়াছি!
যে আসনে বসে' দণ্ড ধরেছে আক্‌বর হুমায়ুন,
তুর্কীর চূড়া বাবরের নামে দাম যার দশগুণ—
আজ তার মান রাখিবার তরে মিথ্যার আশ্রয়!
অসহায়া এক নারীর সমুখে সত্য বলিতে ভয়!
এত কাপুরুষ ছিল না সেলিম—মেহেরের মনোচোর!
হায় নারী, একি জীবনের ভ্রম! এই কি পুরুষ তোর!
অপরাধ মোর যত বড় হোক্, তারো চেয়ে অপরাধী
দাঁড়ায়ে সমুখে,—রাজ-বিদ্রোহী! রাজারে রেখেছে বাঁধি'!
জল্লাদ কোথা? শূল পোতে নাই? মরা-মহিষের খালে
সিলাই করিয়া, রোদে রাজপথে ফেলে নাই এতকালে!
এই দুনিয়ার বাদ্‌শা যে তুমি, সে কথা ভুলিতে পারি—
ভুলিতে পারি না—যেজন নফর তুমি যে গোলাম তারি!

জহাঙ্গীর

কহিও না আর! চুপ কর! একি পাগলের চীৎকার!
মহবৎ তবু কথাটি কহেনি, বীর সে নির্ব্বিকার!
জানি মিছা-কথা, বন্ধু, তোমার মনে নাই কোনো পাপ—
কোনো কথা এর লই নাই মনে, করিও না অনুতাপ।
কি কথা বলিতে আসিয়াছ, নারি,—শেষ করে' লও সব,
গালি দিও নাক' অকারণ মোরে, কেন মিছা কলরব?
এসে থাক যদি মাফ চাহিবারে, বল তবে সেই কথা,
নহিলে আরো যে কঠিন হবে সে—ব্যথার উপরে ব্যথা!

নূরজহান

হা মোর কপাল! এতখনে বুঝি এই হ'ল পরিচয়!
মাফ চাহিবারে আসিয়াছি আমি—এতই মরণ-ভয়!
এই পরোয়ানা পায়ে দ'লে ছিঁড়ে, ফিরে' দিতে আমি চাই!—
মহবৎ! ওই বন্দী না তুমি বাদ্‌শা—শুনিতে পাই?
তোমার হুকুম মানিবে কি আজ দিল্লীর সুল্‌তানা!
তুমি হবে তার জানের মালিক!—খুন কর—নাই মানা!
পরোয়ানা কেন? ছুরী হানো! এই বুক পেতে দিই আমি,
নারীহত্যার পাতক তোমার—সাক্ষী তাহারি স্বামী!...

মরণের ভয় করি না যে, তাই আসিয়াছি, প্রিয়তম,
তোমারি ও-হাতে সঁপিতে এসেছি আজি এ জীবন মম।
বল শুধু তুমি—আপনার মুখে, স্বাধীন-মনের বলে—
জীবনের বোঝা নিতেছ তুলিয়া নিজেরি হাতের তলে!
বল, তুমি নও বাদ্‌শা এখন—এ দাসী বেগম নয়,
প্রাণের সহজ অধিকারে তুমি কর মোর পরিচয়!
বল, সুখী হবে—রাখো মিছা কথা, দোহাই তোমার স্বামী!
বল শুধু মোরে, 'মেহের, তোমার মরণে বাঁচিব আমি'।
সেই আশ্বাসে আসিয়াছি ছুটে, লাইলীর মেয়ে ফেলে—
যারে কোলে নিয়ে সেদিনও লড়েছি, ঝিলামের স্রোত ঠেলে,
হাতীর উপরে—আনে মহবৎ—একদিকে তারে ঢাকি',
আর-দিকে ধনু, যতখন তূণে একটিও তীর বাকি।
সেও তোমা লাগি'—ভেবেছিনু, বুঝি বড় প্রয়োজন মোরে,
জানিনি তখনো, এমন বন্ধু জুটেছে কপাল-জোরে!
আজও তাই ফের জানিতে এসেছি—তোমারি কি
প্রয়োজন?
বল একবার! শুনি' সেই কথা শান্ত হউক মন। ......

মনে পড়ে সেই খুশ্‌রোজ-রাতি? সুর্মা-কেনার ছলে,
মোতি-মস্‌লিন-জহরত্‌ ফেলে চাহিলে ওড়্‌না-তলে।
হেসে কহিলেন রাকিয়া-বেগম,—"উহার নমুনা নাই,
রংমহলের রং নয় ওযে, ও-কাজল কোথা পাই?
তবু চিনে রাখ—তুমি যে হুনরী!—দেখ দেখি ভালো
কিনা,
এর চেয়ে ভালো—মর্মরে ফোটে কালো-পাথরের মিনা?
এমন নরম ছায়াখানি পড়ে 'সোরু' তরুটির মূলে—
ঘাসের জাজিমে জ্যোৎস্না-চাদরে—যমুনার উপকূলে?"
মুখ খুলে দিয়ে, থুঁতি তুলে ধরে', চাহিলেন রাজ-মাতা,
চোখে-চোখে সেই একবার চেয়ে, ঢুলে' নুয়ে প'ল মাথা!
তুমি চলে' গেলে, বিবশ-বিভল, পাণ্ডুর বেদনায়!
শুনিনু, সেলিম শাহজাদা সেই!—হারাইনু চেতনায়!
সেই দিন হ'তে মেহের মরেছে, সে-মরণ আজি শেষ!
এখনো আঁখিতে দেখ আছে কিনা জীবনের মোহ-লেশ?
চাও একবার!—মিনতি তোমায়, কোন ভয় নাই আর!
এখনো কি হয় খুশ্‌রোজ-খেলা, বাদ্‌শাহ দুনিয়ার?
খেয়ালি-ফানুসে কত রঙ ধরে যৌবন-যাদুকর!—
লজ্জা কি তায়? কুৎসিতও হয় মনোহর সুন্দর!
একদিন যারে ভালো লেগেছিল, বেসেছিলে তায় ভালো,
হয়ত তারেই মনে হয়েছিল—এই 'জগতের আলো'!
আজ যদি তার রূপের প্রদীপে পলিতায় পড়ে কালি,
রংমহলের দুধের দেয়ালে কলঙ্ক লাগে খালি—
নিবাইয়া দাও আপনার হাতে—ডেকো না চেরাগ্‌চীরে!
যে-হাতে জ্বেলেছ তাহারি হাওয়ায় শেষ কর শিখাটিরে!
আঁচ লাগিবে না, তাপ নাহি তায়! জ্বালা কোথা জুড়াবার?
দেখ,—হাসিতেছি, এ হাসিতে নেশা এখনো কি লাগে আর?

জহাঙ্গীর

ভয় করে, নারি, আজও ভয় করে!—চেয়ো না অমন করে'!
সেলিম মরেনি, মেহের মরিলে তবে ত যাইবে মরে'!
মেহের, তোমার অ-মলিন রূপ!—পরীরাও ফিরে চায়!
আজও মনে হয়, সেই খুশ্‌রোজ ওই চোখে চমকায়!
কোথা হ'তে এলে, মরু-মঞ্জরী, আগ্রার উদ্যানে?
ও-রূপের ছায়া পেয়ালায় পড়ে' আগুন লাগাল প্রাণে!
ছিল যে মাতাল, মদেরি নেশায় দিনরাত মশ্‌গুল—
পাগল করিয়া দিলে কেন তারে?—একি নসীবের ভুল!
বাদ্‌শার ছেলে বিকাইয়া গেনু এক বস্‌রাই গুলে!
খোদার বান্দা বুত্‌-পরস্ত্‌—আখেরের ভয় ভুলে'!
কোথায় ইমান পৌরুষ গেল? কি মোহিনী জানো, নারি!
মোগলের তখ্‌ৎ ফুলদানী হ'ল! কালো-চোখ্‌ তরবারি!
রুটি ও পেয়ালা সার হ'ল শুধু—স্বপনে কাটাই দিবা!
রাজ্যের খোঁজ মালিক রাখে না, বাড়িছে প্রলয়-বিভা!
নফর করেছে নজরবন্দী, কাল দাঁড়াবে সে বুকে!—
কার তরে আজ এ দশা আমার? মজেছিনু কোন্ সুখে?
সেই সুখ আজও উথলিয়া ওঠে, ওই মুখে যদি চাই!
দোজোখ্‌ বেহেশ্‌ত্‌ এক হয় দেখি, জ্ঞান-হারা হ'য়ে যাই!
আমি অপরাধী—এ কথাও ঠিক!—কি হ'ল?
কাঁদিছ! ছি!—
শুনিছ না কিছু!—ওই দিকে চেয়ে অমন ভাবিছ কি?

নূরজহান

কিছু নয়!—শুধু ওই ফুলগুলা—গুল্‌-আস্‌রফি বুঝি?
বাংলা-মুলুক মনে পড়ে' যায়, কি যেন হারিয়ে খুঁজি!

ওরি মত মোর সোনেলা গোলাব ফুটিত বর্দ্ধমানে,
কি জানি কেন যে—ওই রং চোখে হুহু করে' জল আনে!
তাই তুলেছিনু হঠাৎ কেমন!—শুনি নাই শেষ-কথা,
গোস্তাখী মাফ কর একবার, না জেনে দিয়েছি ব্যথা!

জহাঙ্গীর

আমার ভাগ্যে এই ছিল শেষ!—মহবৎ! মহবৎ!
ভরা-দুপুরেই দিন ডুবে যায়!—ঝুটা তেরি শর্‌বৎ!
পেয়ালার পর পেয়ালা ভরেছি—বেহুঁশ করেনি দিল্!
মাথাও ঘোরে না, রক্তের জোশ্ বাড়ে না যে একতিল!
যাক্! সব যাক্! লাথি মেরে ভাঙো! কর সব চুরমার!
কাজ নাই মোর বাদ্‌শাহী তখ্‌ত্—দিল্লীর দর্‌বার!
ঘোড়া নিয়ে এস—খুরে ক্ষয় করি সারা হিন্দুস্থান!
শহর-কেল্লা জ্বালাইয়া দিয়া রাঙাইব আস্‌মান!
তৈমুর! আজ তোমার বংশে খুনের পিপাসা নাই!
বিষের জ্বালায় বুক জ্বলে, তবু বসে' থাকে এক ঠাঁই!
যেথা যত আছে সুন্দর মুখ—কাটিয়া পাহাড় কর!
কালো-চোখ সব ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া হাজার থলিতে ভর!
মস্‌জিদ্ হোক্ ঘোড়া-ঘর, আর হারেম কসাই-খানা!
আল্লার নাম করে যদি কেউ, টুঁটি কেটে কর মানা!...
বুক ফেটে যায়! এও কি আমার শাস্তির শেষ নয়!
ওরে হতভাগী! নাই তোর মুখে এতটুকু বিস্ময়!
চেয়ে আছ তবু অচপল চোখে, দয়া নাই মনে তোর!
রাক্ষসী! আমি সব দিয়েছি যে! তবুও আমিই চোর!...
মহবৎ! আমি তোমার মতন দেখিনি শিকারী-বীর—
এত বড় এই বাঘের পাঁজরে তুমিই বিঁধিলে তীর!
তবে আর কেন? বাঘেরে ধরিয়া বাঘিনীরে ছেড়ে দাও!

নূরজহান

ছি-ছি, ছি-ছি! এই দাঁড়াইনু আমি, নড়িব না এক পা'ও!
কেন অপমান কর আপনার? তোমারি হুকুম ঠিক!
—মহবৎ তারে ফিরাইয়া দিবে! ধিক্ তায়, ধিক্! ধিক্!

* *

মরিতে চাহিনি একদিন বটে—এমনি সে পরোয়ানা
পেয়েছিনু, সে যে পাঁচ-আঙুলেই রক্তের সই-টানা!
সঙ্গে আহার দিয়েছিল ছুরী—জ্যোৎস্নায় তুলে ধরি'
দেখি সে কঠিন ইস্পাতময় অশ্রু পড়িছে ঝরি'!—
সেদিন পারিনি, বড় সাধ হ'ল বাঁচিবারে পুনরায়,
সারারাত তাই বুকে করি' শেষে ফেলে দিনু দরিয়ায়!
পিছনে যেন কে চুলে ধরি' মোর, তুলে নিয়ে গেল টানি'—
তারি বেদনায় মুরছিয়া ফের জাগিলাম রাজরাণী!
ভিখারীর মেয়ে মেহেরের ভালে তুমি দিলে রাজটীকা—
মোতিমহলের শামাদানে জ্বলে আলেয়ার আলো-শিখা!
রূপের রূপায় কেবা কিনিয়াছে সব-সেরা দৌলত?—
তোমার তাজের কোহিনূর নয়—হৃদয়ের সেলামত্!
রূপের কদর জানি খুব জানি!—তস্‌বীরে হয় আঁকা,
রূপ সে বিকায় কানা-কড়িতেই, তস্‌বীর লাখ-টাকা!
কেউ ঝরে' যায়, কেউ বা লুকায় অশ্রুর কুয়াসায়!
বাঁদী-হাটে কেউ শিকলিতে বাঁধা, হতাশ নয়নে চায়!
মেহেরের চেয়ে অনেক রূপসী রূপের পসরা নিয়া
দ্বারে-দ্বারে কেঁদে ফিরে গেছে এই ধরণীর পথ দিয়া!
নূরজহানের রূপ বড় নয়—বড় ওই বুকখানা!
তাই মানি নাই আর-একজনের মরণের পরোয়ানা!...

হে মোর বিধাতা! নিয়তি আমার! দরদী গো নির্দ্দয়!
জনমের মত ঘুচাইয়া দাও তোমার প্রেমের ভয়!
মরিয়াও আমি মরিব কি সখা!—ঘুমাইতে পাব সুখে?
কবরে আমার ভালো করে' দিও পাথর চাপায়ে বুকে!
যদি কোনোদিন আবার কখনো নাম ধরে' ডাকো তায়—
মাটির মাঝারে মরা-দেহ উঠি' বসিবে যে পুনরায়!
দোহাই তোমার!—যা'-কিছু বিচার শেষ কর এই বেলা,
বল, বল, এই প্রাণটারে নিয়ে সাঙ্গ হ'ল কি খেলা?

জহাঙ্গীর

ভালো করে' কাঁদো!—ঢাকিও না মুখ, এত শোভা মরি মরি!
হাহা করে প্রাণ, তবু মনে হয় দেখে লই আঁখি ভরি'!
ওই মুখ যবে জলে ভেসে যাবে আল্লার দর্‌বারে,
'রোজ-কিয়ামত্'-ভেরীর আওয়াজ থেমে যাবে একেবারে!
যত পাপ, 'গোনা'—দুনিয়ার যত বান্দার বেইমানি—
মাফ হয়ে যাবে! শয়তান এসে দাঁড়াইবে যোড়পাণি!...
মহবৎ, তুমি পাথর বনেছ! কোনো কথা নাই মুখে!
এত বে-দরদ্! কলিজায় দোল দেয় নাকি ওই বুকে?

এখনো দাঁড়ায়ে কি দেখিছ বীর? আরো কি বিচার চাও?
বলিও না কিছু—আর বলিও না! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও!
আদেশ নহে সে, মিনতি আমার!—কি ভাবিছ মহবৎ?

মহবৎ খাঁ
যেমন আদেশ বান্দার 'পরে—তাই হোক্ হজ্‌রত্‌!

শ্রী মোহিতলাল মজুমদার

মেঘে রৌদ্র

সে-দিন রাস-পূর্ণিমা। কবে কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে আপন অস্তিত্বহারা গোপবধূরা মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের করুণা-কণা লাভ করিয়াছিল, তাহারই মধু স্মৃতির উৎসব। ভক্তি-আপ্লুত নয়নে আনন্দের অঞ্জন মাখিয়া বহু দূর গ্রাম হইতে অসংখ্য নরনারী মদনপুরে রাস দেখিতে আসিয়াছিল। নানা পত্র-পুষ্পে শোভিত হইয়া মদন-গোপালজীর রাসমঞ্চখানি বনবিমোহন কুঞ্জেরই আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহার উপর নহবতের করুণ রাগিণী হৃদয়ের কোন্ কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া ব্যক্তিমাত্র-কেই কি-এক অজানা ভাবের আবেশে উন্মাদ করিয়া তুলিতেছিল। সে-রসে উন্মত্ত হইয়া নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছিল। আলোকের বন্যায় স্নান করিয়া ধরিত্রীও অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছিল; বুঝি বা দিবসগুণে স্বর্গ-মর্ত্ত মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল।

শিলাখণ্ডের যুবরাজ পট্টবস্ত্র-পরিহিত চন্দন-চর্চ্চিত উদয়াদিত্য নগ্নপদে মন্দির-পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। অকস্মাৎ কোথা হইতে বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। আর অগ্রসর হওয়া চলিল না। সুরের মোহ তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিল; তিনি তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ললিত-মধুর কণ্ঠে কে সেই সুর-লহরীর সহিত সুর মিলাইয়া গান ধরিল। স্বরে কি তীব্র মাদকতা! সঙ্গীতে কি অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা! যুবরাজ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় গায়িকার অন্বেষণে অগ্রসর হইলেন।

(২)

বাপীতটে বসিয়া রাসলীলার গান গাহিতে গাহিতে গায়িকা লগ্নাজিতা আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। উদয়া-দিত্য ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গান শেষ হইল। শ্রোতা ও গায়িকা উভয়েই নীরব; বহুক্ষণ কাহারও মুখে কথা সরিল না। লগ্নাজিতা প্রকৃতিস্থ হইয়া পিছনে চাহিতেই নয়নে নয়ন মিলিল। সে বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি? এখানে কেন?"

উদয়াদিত্য বলিলেন—"দেবী! এ অধীনের নাম উদয়াদিত্য; লোকে আমায় শিলাখণ্ডের যুবরাজ ব'লে জানে। মন্দিরে যাবার ইচ্ছায় বেরেয়েছিলুম, কিন্তু আপনার সুকণ্ঠের আকর্ষণই আমাকে পথভ্রান্ত করে' এখানে টেনে এনেছে।"

যুবতীর মস্তকস্থিত গোলাপের আভা যেন তাহার গণ্ডদ্বয়ে ফুটিয়া উঠিল। সে নতমস্তকে বসনাঞ্চল অঙ্গুলিতে জড়াইতে জড়াইতে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"অধীনার সৌভাগ্য!"

"এ স্বর্গ-মূর্চ্ছনার কি এইখানেই শেষ করলেন?"

"যুবরাজের অভ্যর্থনার কি এই স্থান? যদি দয়া করে' এ অভাগিনীর কুটীরে পদধূলি দেন, আমি সাধ্যম আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করব।"

"কিন্তু বিনা পরিচয়ে আপনার সঙ্গে যাই কি করে'?"

"পরিচয় পেলেই কি যাবেন?"

"আপত্তির কারণ না থাক্‌লে যেতে পারি।"

"তবে শুনুন, আমি পতিতা।"

অকস্মাৎ সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকে যেমন শিহরিয়া উঠে, যুবরাজ তেমনই ভয়ে সরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারিত হইল—"প-তি-তা!"

"হ্যাঁ, আপনাদের মত ধনীর লালসা-বহ্নিতে আপনাকে আহুতি দিয়ে আজ আমি ঘৃণিতা, পতিতা।"

যুবরাজ কথা কহিলেন না; পশ্চাৎ ফিরিয়া গমনোদ্যত হইলেন।

রমণী এ উপেক্ষা সহ্য করিতে পারিল না; আহতা ভুজঙ্গীর মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্র শ্লেষপূর্ণকণ্ঠে বলিল —"দাঁড়ান। এতই যদি ঘৃণা, তবে এতক্ষণ পতিতার মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছিলেন? রূপ?"

"না। যার কণ্ঠে এমন প্রাণমাতান সঙ্গীত হৃদয়-মন্দিরের গোপন কপাট খুলে' দিতে পারে, আমি শুধু শ্রদ্ধামুগ্ধ নেত্রে তারই মহীয়সী মূর্ত্তির দিকে চেয়েছিলুম। নইলে রূপ? সে ত তুচ্ছ! যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে যার ধ্বংস হয়, তার মোহে ভুলে যাব আমি এত বড় পাগল নই।"

সত্যের এ তীব্র কশাঘাত লম্নাজিতা সহ্য করিতে পারিল না। ক্ষণেক বিমূঢ়-নেত্রে বক্তার দিকে চাহিয়া রহিল; তার পর শুষ্ককণ্ঠে বলিল—"মানলুম আপনি ভালো, আপনি সাধু। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, যার কণ্ঠের নামামৃত আপনাকে বিমোহিত করেছিল, তার অন্তরের দেবতাকে পদদলিত করে' যাবার আপনার কতটুকু অধিকার? আর-একটা কথা—যেচে এসে একজন মানুষকে অপমান করায় পৌরুষেয় নয়; তা সে যত বড়ই হীন হোক্।"

যুবরাজের অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। একবার তিনি স্থির-দৃষ্টিতে রমণীর দিকে চাহিলেন; তার পর বলিলেন —"আর-কিছু বল্‌বার নেই বোধ হয়; আমি যেতে পারি?"

যুবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বহুকষ্টে সে বলিল—"যান্। কিন্তু এটা অবিশ্বাস করবেন না যে, পতিতারাও মানুষ; তারাও ভালো হ'তে পারে। বাইরের আচরণটা বলুষিত হ'লেও, ভিতরটা তাদের একেবারে কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে যায় না। চেষ্টা করলে বিবেককে জাগিয়ে তুলে' সংসার-পথে তারাও মাথা উঁচু করে' দাঁড়াতে পারে।"

যুবরাজ সে-কথার কোন উত্তর দিলেন না; দেখিতে দেখিতে বন বীথির অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রমণীর হৃদয়ে ভীষণ ঝড় উঠিল। সে অপলক নেত্রে যুবরাজের গমন-পথের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার অসংযত মনটাকে গুটাইয়া আনিয়া বীণার তারের সহিত সংযোগ করিতে চেষ্টা করিল। চির-অভ্যস্ত হস্তে সুরের মূর্চ্ছনা জাগিলেও প্রাণ কিন্তু তাহাতে সাড়া দিল না। বিরক্তিতে অস্থির হইয়া সে তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বীণাটিকে দূরে জলে নিক্ষেপ করিল। বুঝি অতীত জীবনটাও সেই-সঙ্গে বিসর্জ্জন দিল।

(৩)

প্রভাত-বায়ু চঞ্চল গতিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। শিশির-সিক্ত দূর্ব্বাদলের উপর সূর্য্য-কিরণ পতিত হইয়া, মসৃণ মখ্‌মলে রূপালী কারুকার্য্যের মত চক্‌মকে শোভা ধারণ করিয়াছিল।

অবন্তীপুরের বৌদ্ধ-মঠাধ্যক্ষ সিদ্ধাচার্য্য নিবিষ্টচিত্তে উদ্যানে পদচারণা করিতেছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে নারীকণ্ঠে কে ডাকিল—"প্রভু!"

সন্ন্যাসী নয়ন ফিরাইলেন। বৃক্ষ-পত্রাবলীর বক্ষ চিরিয়া দুরন্ত তপন রমণীর কুসুম-পেলব মুখের উপর তীব্রভাবে পড়িয়াছিল। অলোকসামান্যা রূপবতীর প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। স্নেহভরে কহিলেন—"কি মা?"

"অভাগিনী মঠে একটু স্থান ভিক্ষা করতে এসেছে; আশা মিট্‌বে কি?"

"কেন মা, তুমি কি আশ্রয়হারা?"

যুবতীর মুখখানি সহসা মলিন হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল—"সত্যকার আশ্রয় আমার কোন দিনই ছিল না!"

"তবে এতদিন ছিলে কোথায়?"

"ছিলাম কোথায়?"—যুবতী শিহরিয়া উঠিল। কি এক অসহ্য যন্ত্রণায় তাহার বাক্‌শক্তি লোপ পাইল। সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বলতে যদি কষ্ট হয়, তবে থাক্ মা।"

রমণীর মুখে হাসি দেখা দিল; কিন্তু সে-হাসিতে আনন্দ উৎপাদন করে না; প্রাণ কাঁদাইয়া তুলে। সে দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে কহিল—"বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু ভাবতে আমার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। যদিও আজ সে পাপপুরী ছিন্ন-কন্থার মত ত্যাগ করে' এসেছি,

তবু কই সে স্মৃতির হাত ত এড়াতে পারলুম না। বলতে পারেন প্রভু, পাপিনীর উপায় কি? কিসে আমি শান্তি পাব?"

"অনুতাপই সত্য। অনুতাপই তোমাকে পরম শান্তির অধিকারিণী করবে মা। প্রভু অবলোকিতেশ্বর নিশ্চয়ই দয়া করবেন। কিন্তু একটা কথা—হৃদয়ের এ মর্ম্মান্তিক বেদনা চেপে রেখে, লোকসেবায় আপনাকে বিলিয়ে দিতে পারবে ত?"

"যে এতদিন চির-নিরানন্দের মধ্যে নিমজ্জিত থেকেও আনন্দের অভিনয়ে লোককে মুগ্ধ রাখতে পেরেছিল, আর যাই হোক, তার হৃদয়টা তত কোমল নয় প্রভু! তিনি দয়া করলে, অবশ্যই এ কাজে আমি অপারগ হব না।"

"তাঁর করুণা যে লাভ করে, সেই কেবল তোর মত উদ্‌ভ্রান্ত বেশে ছুটে আসতে পারে। আয় মা, আমার সাধ্য কি যে তোর স্রায্য অধিকার থেকে তোকে বঞ্চিত করি।"

যুবতী আচার্য্যের অনুসরণ করিল; প্রবেশ-দ্বারের নিকটে আসিয়াই কিন্তু সে পিছাইয়া দাঁড়াইল; দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"ভেবে দেখলুম, আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন?"

"পতিতার সংস্পর্শে মন্দির অপবিত্র হ'য়ে যাবে। না, না, আমি ফিরে যাই।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া রমণীর মস্তকে হস্ত রক্ষা করিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"ভুলে যাচ্ছিস কেন মা, তিনি ব্যথাহারী। তোর আমার মত ব্যথিতের জন্যই তিনি ধরায় এসেছিলেন। তা ভিন্ন যত বড় পাপই কেন কর না, এটা সর্ব্বদা মনে রেখো, আত্মা পরম পুরুষেরই অংশ। তাকে হেয় ভাবলে, সেই পরম পুরুষকেই হেয় ভাবা হয়।"

রমণী আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না; ধীরে ধীরে আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিল।

(৪)

শত শত সুগন্ধ-তৈলের প্রদীপ গৃহখানি উজ্জ্বল করিয়াছিল; অজস্র পুষ্প ধূপ ও গুগ্‌গুলের গন্ধ তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অপার্থিব ভাব জাগাইয়া তুলিতেছিল। প্রস্তর-বেদিকার নিম্নে বসিয়া লগ্নাজিতা বুদ্ধদেবের মর্ম্মর-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া তন্ময়-চিত্তে 'পিটক' গাথা পাঠ করিতেছিল—

"ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি,
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।"
"যথিন্দখীলো পঠবিংসিতো সিয়া,
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিয়ো,
তথূপমং সপ্‌পুরিসং বদামি।"
"সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দা পসংসাসু ন সমীঞ্জতি পণ্ডিতা।" *

সিদ্ধাচার্য্য বাহির হইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন—"মা!"

লগ্নাজিতা শুনিতে পাইল না; যেমন একমনে স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল, তেমনি করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় ডাকিলেন—"মা লগ্নাজিতা!"

এবার তাহার কর্ণে সন্ন্যাসীর আহ্বান পৌঁছিল। সে কহিল—"কি প্রভু?"

"পথে বোধ হয় কা'কে সর্প-দংশন করেছে। সংবাদ পেয়েই আমি যাচ্ছিলুম; পাছে তুমি অভিমান কর, তাই খবর দিতে এসে এ-সময় বিরক্ত করলুম।"

লগ্নাজিতা অমিতাভের পদমূলে মস্তকস্পর্শ করাইল। পরে সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া কহিল—"ও কথা বলবেন না। সেবাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য, প্রভু! আর সত্য বলতে কি, সেবায় আমি যত তৃপ্তি পাই, বোধ হয় আর কিছুতে এত আনন্দ পাই না। চলুন, বিলম্বে অনিষ্ট ঘটতে পারে।"

সন্ন্যাসী একবার প্রশংসাপূর্ণদৃষ্টিতে রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে তাহার অনুসরণ করিলেন।

* * * *

* স্তুতিনিন্দা লাভালাভ প্রভৃতি লোকধর্ম্মে যাঁহার চিত্ত বিকম্পিত নয়, যিনি শোকহীন অহঙ্কার-হীন এবং নিষ্পাপ, তিনিই সুমঙ্গল প্রাপ্ত হন।......চতুর্দ্দিকের বাত্যাবিক্ষোভে দৃঢ়প্রোথিত শৈলস্তম্ভ বিচলিত হয় না। সৎপুরুষও সেইরূপ কাম-ক্রোধাদির ঝঞ্ঝাবাতে বিচলিত নহেন।...ঘনসন্নিবিষ্ট শৈল-শ্রেণী বায়ু-প্রবাহে কখনও বিচলিত হয় না, পণ্ডিতজনকেও সেইরূপ নিন্দা-প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে না।"

যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সিদ্ধাচার্য্য পরীক্ষায় বুঝিলেন, সর্প-দংশনই সত্য। তিনি শীঘ্র-হস্তে কি-একটা শিকড় রোগীর নাসিকার নিকট ধরিলেন। রোগী একবার শিহরিল; পরক্ষণে যেমন অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনই রহিল। সন্ন্যাসীর মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি রোগীর অনুচরদিগকে বলিলেন—"যদি কেউ ক্ষতস্থান শোষণ করে' বিষ নির্গত করতে পার, তবে বোধ হয় রোগী বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারে; কিন্তু বিলম্ব করলে চল্‌বে না। তোমাদের মধ্যে কে মহাপ্রাণ আছ, এগিয়ে এস।"

কেহই অগ্রসর হইল না। সন্ন্যাসী একবার সেই মরণ-ভীত লোকগুলির দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন; তার পর নিজেই অগ্রসর হইলেন। লগ্নাজিতা বাধা দিয়া কহিল—"প্রভু! সেবাধর্ম্মের পরম আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করেন কেন? অনুমতি করুন,—দাসীই আপনার নিয়োগ-মত কার্য্যে অগ্রসর হোক্।"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"পাগলিনী, এ জীবন-মরণের সমস্যা! এতে আমি তোমায় কিছুতেই অনুমতি দিতে পারব না।"

"আপনার শ্রীমুখেই ত শুনেছি প্রভু, দেহ ক্ষণভঙ্গুর! এর প্রতি আসক্তি রাখ্‌লে জীবন কখনই সার্থকতা লাভ করে না। তা ছাড়া যে শাশ্বত-ধর্ম্ম-লাভের আশায় আপনাকে সমর্পণ করেছি, আজ যখন তা লাভ করবার শুভ-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়েছে, তখন তা থেকে আপনাকে বঞ্চিত রাখি কেন?"

সন্ন্যাসী আর প্রতিবাদ করিলেন না। উদাসস্বরে কহিলেন—"তবে তাই হোক্ মা, তর্ক করে' আমি তোর মহৎ ধর্ম্মে বাধা দিতে চাই না। তবে সাবধান, চিকিৎসা ও সেবা করতে এসেছ, জীবন দিতে নয়, এ কথাটা মনে রেখো।"

(৫)

দুই দিবস অতীত হইয়াছে। লগ্নাজিতা মৃত্যু-শয্যায়। মানবের ইচ্ছার উপর যে অদৃশ্যচারীর ইচ্ছা আছে, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে আজ সে চির-সমাধির কোলে আপনাকে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। যথেষ্ট সাবধানতা সত্ত্বেও বিষের হাত সে একেবারে এড়াইতে পারে নাই। সেবা ও চিকিৎসাগুণে দুইদিন কাটিলেও, আজ সে আশা-নিরাশার পরপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মায়াজয়ী সিদ্ধাচার্য্যের অন্তর বিষণ্ণ, নয়ন অশ্রুপূর্ণ। তিনি গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি যন্ত্রণা হচ্ছে মা?"

"কিছুই নয়, গুরুদেব!"

"তবে এখন কিরূপ অনুভব করছ?"

"আনন্দ! শান্তি!"

"তোমার অভীষ্ট-কার্য্য সফল হয়েছে! রোগী অনেকটা সুস্থ; আজ সে তার গন্তব্য-পথে চলে' যাবে।"

ব্যথা-মলিন বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লগ্নাজিতা স্মিতমুখে কহিল—"ভগবান্ তাঁকে দীর্ঘায়ু করুন। আজ পাঁচ বৎসর পরে কি জানি কেন আমার অতীত জীবনের কথা মনে হচ্ছে! কি মনে হচ্ছে জানেন, প্রভু?"

"কি হচ্ছে, মা?"

"মনে হচ্ছে—আমার ঘুমিয়ে-পড়া অন্তর-দেবতার দুয়ার এম্‌নি দিনে কে যেন এসে ধাক্কা দিয়ে খুলে' দিয়েছিল। তাই প্রাণে একটা দুর্জ্জয় বেদনার ভার পোষণ করে' ছুটতে ছুটতে আপনার চরণ-প্রান্তে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। শান্তি যে পাইনি তা নয়, কিন্তু তার মধ্যেও কি-এক বেদনা বুকের মাঝে অহরহ চেপে বসেছিল, আজ আর সেটা খুঁজে' পাচ্ছি না। মন বল্‌ছে—'তার সব হিসাব-নিকাশ শেষ হ'য়ে গেছে; জমাও নেই, খরচও নেই'।"

সন্ন্যাসী কোন কথা কহিলেন না। লগ্নাজিতা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—"কেবল সাধ হচ্ছে, এসময় একবার যদি তাঁর দেখা পেতুম। তা হ'লে, তা হ'লে বুঝি আর কোন আকাঙ্ক্ষাই থাকত না! তাঁর পায়ে ধরে' বলতুম—'হে আমার নমস্য! হে আমার অন্তরের শিক্ষক! হে আমার গুরু! তুমি আমায় বিষ দাওনি, অমৃতের সন্ধান বলে' দিয়েছ; মোহ দাওনি, ত্যাগ দিয়ে আমার জীবনের কালিমাটাকে ধুয়ে মুছে খাঁটি করে' দিয়েছ; ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণা দিয়ে, আমার আজন্মের বদ্ধ-সংস্কারটাকে পুড়িয়ে ছাই করে' দিয়েছ। সে-দিন বুঝ্‌তে না পেরে

তোমায় কত তিরস্কার করেছিলুম। এস অপরাধিনীকে ক্ষমা কর।"

সহসা দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই লগ্নাজিতা শিহরিয়া উঠিল। তাহার গণ্ডদ্বয় অসম্ভবরূপ রক্তিম আভা ধারণ করিল। সে নীরব নিস্পন্দের ন্যায় পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া আগন্তুক অপলক-নেত্রে লগ্নাজিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"এতক্ষণ বাইরে থেকে তোমার সব কথাই শুনেছি, ভগ্নী। কিন্তু, ক্ষমা চাইবার কোন কাজ ত তুমি করনি, বরং আমিই আজ তোমার কাছে নতমস্তকে ক্ষমার ভিখারী। সে-দিন অবিশ্বাসের কাজল চোখে লেপে তোমার উপর অন্যায় দোষারোপ করেছিলুম; তাই প্রভু আজ আমায় জীবন-মরণের সমস্যায় ফেলে, সে ভ্রম ভেঙ্গে দিলেন। আর দিলেন—যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিনের জন্য একটা তীব্র অনুশোচনা।"

লগ্নাজিতা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল—"প্রভুর কৃপায় আজ আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়েছে, না-চাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি আমায় যে এতটা পাইয়ে দিলেন, এ করুণা শুধু তাঁতেই সাজে! অনুশোচনা কেন ভাই? আমি ত তোমার জন্য এ জীবন উৎসর্গ করিনি; সেবাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাই সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছি। আশীর্ব্বাদ কর, জন্মজন্মান্তরে যেন এম্‌নি করে' পরের জন্য জীবন ত্যাগ কর্‌তে পারি।"

যুবরাজ কথা কহিতে পারিলেন না; তাঁহার নয়ন-আসার লগ্নাজিতার হস্ত ভিজাইয়া দিল। লগ্নাজিতা বলিল—"ছি ভাই, আনন্দের দিনে এমন উতলা হ'য়ো না। ভগ্নীর উপর যদি যথার্থই সহানুভূতি এসে থাকে, তুমিও দরিদ্রের সেবায় আত্মোৎসর্গ কর; তাতেই ভায়ের উপযুক্ত কাজ করা হবে।" তার পর গুরুর দিকে ফিরিয়া প্রশান্তকণ্ঠে কহিল—"প্রভু! একটি কথা জান্‌তে সাধ হচ্ছে; এ দীনা কি নির্ব্বাণের অধিকারিণী?"

সন্ন্যাসী এতক্ষণ নির্ব্বাক্ হইয়াছিলেন; এবার গাঢ়স্বরে বলিলেন—"ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌বার আগে, নিজের মনকে প্রশ্ন কর্‌লেই পার্‌তে, মা। বাসনার নির্ব্বাণ—তা ত সাম্‌নেই হ'য়ে গেল; অন্তরের নির্ব্বাণ-দ্যুতি যে তোমার চোখে-মুখে ফুটে রয়েছে। মারের সাধ্য কি যে ওই পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে।"

লগ্নাজিতার নয়নজ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছিল। গুরু-বাক্য তাহার বদনে তৃপ্তির রেখা ফুটাইয়া তুলিল। বহু কষ্টে সে হস্ত উত্তোলন করিয়া সিদ্ধাচার্য্যকে প্রণাম করিতে গেল, কিন্তু সমর্থ হইল না। সন্ন্যাসী তাহা বুঝিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন—"থাক্ মা, আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ কর্‌ছি।"

অতি কষ্টে লগ্নাজিতা বলিল—"অন্তরে নির্ব্বাণ-আলোক প্রজ্জ্বলিত করে' তাপসী গৌতমী প্রভু অমিতাভের চরণে যে আত্মনিবেদন করেছিলেন, সেই পবিত্র গাথা আমায় একবার শ্রবণ করান। সিদ্ধাচার্য্য উদাত্তস্বরে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

"বুদ্ধবীর নমোত্যত্থু সব্বসত্তানমুত্তম্।
যো মাং দুক্‌খা পমোচেসি অঞ্ঞং চ বহুকং জনং।
সব্ব দুক্‌খং পরিঞ্ঞাতং হেতুতণ্হা বিসোসিতা।
অরিয়ট্‌ঠঙ্গিকো মগ্‌গো নিরোধো ফুসিতো ময়া॥
মাতা পুত্তো পিতা ভাতা অয্যিকা চ পুরে অহুং।
যথা ভুচ্চং অজানন্তী সংসারিহং অনিচ্চিসং॥
দিট্‌ঠোহি মে সো ভগবা অন্তিমোযং সমুস্সযো।
নিকৃথীনো জাতি সংসারো নত্থি দানি পুনর্ভবো॥" *

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুদূত লগ্নাজিতার জীবনের উপর মরণের যবনিকা টানিয়া দিল। সন্ন্যাসীর সে গভীর স্বরও যেন দূরে, বহুদূরে ছড়াইয়া লগ্নাজিতার আত্মাকে অমৃত-লোকের পথ দেখাইয়া চলিল। উদয়াদিত্য পরম শ্রদ্ধার সহিত মরণাহতার শয্যায় মস্তক অবনত করিল।

শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* "হে বুদ্ধদেব! হে সর্ব্বজীবশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার! কেবল আমাকে নহে, বহুজনকে আপনি দুঃখমুক্ত করিয়াছেন। এখন আমি সর্ব্বদুঃখপরিজ্ঞাত এবং দুঃখের হেতুভূত তৃষ্ণাও এখন আমার বিশুষ্ক—বিদূরিত। এখন আমি আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ অবলম্বনে নির্ব্বাণ-সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি মাতা পুত্র পিতা ভ্রাতা আর্য্য হইয়া কতবারই সংসারে আসিয়াছি। যথাজ্ঞানের অভাবে বার বার আমায় সংসারে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু এবার আমি জ্ঞাননেত্রে আপনাকে দর্শন করিয়াছি। সুতরাং এই আমার শেষ দেহ-ধারণ। এইবার আমার জন্মশেষ; আর আমার পুনরুৎপত্তি নাই। বহু জন্মান্তরের পর জন্মের হেতু তৃষ্ণাকে চিনিয়াছি, আর তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সুতরাং আমি এখন মুক্ত—অর্হৎ।"

গৌতমের গৃহত্যাগ

স্তব্ধ আষাঢ় পূর্ণিমা রাত নিথর নিঝুম—করুছে সাঁসাঁ!
কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষা!
শান্তি নিবিড়, শান্তি অটল, শান্তি কঠোর মৃত্যু যেন!
কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন।
কেবল চাঁদের চোখটা জ্বলে, তাও সে ক্ষণে পড়ছে ঢুলে'।
মত্ত মানুষ ধরায় আছে—একথা মন যায় যে ভুলে'!
চাঁদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোৎস্না-রাতি!
শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে জ্বলছে নাকো একটি বাতি।
স্তব্ধ পুরী,—হাস্যধ্বনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা,
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ-আরাব, নর্ত্তকীদের উচ্ছলতা,
আরতি-সাম,—সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্ গভীরে!
ঘরে ঘরে সুপ্ত জনের জাগছে আরাম-নিশ্বাস ধীরে।
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজ-প্রাসাদে নেইক সাড়া!—
শয্যা 'পরে কে ঐ নড়ে, কে ঐ নড়ে নিদ্রাহারা!
অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে,
তারই পাশে গৌতম ও যে নিদ্রাবিহীন চোখ্‌টি মেলে'!
কি ব্যথা তার বাজ্‌ছে বুকে? কিসের দুখে রাত্রি জাগে?
কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন? নিদ্রা কেনই তুচ্ছ লাগে?—
দুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্য-ব্যথা, জরার ব্যথা
ঐ বুকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা।
বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছটফটিয়ে উঠ্‌ছে পাখী!
নিদ্রা নাহি নিদ্রা নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি' থাকি'।
উঠ্‌ল যুবা, প্রাণ যে জ্বলে, বস্‌ল উদাস শয্যা 'পরে,
গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে!
জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌ল যুবা আকাশ-গায়ে জ্বলছে তারা,—
অসীম দেশের আভাস দিয়ে ডাকছে কি রে বল্‌ছে কারা?

ঘুমায় শিশু দেখ্‌ল যুবা, আঁকড়ে তারে যশোধরা,—
একটি শিশু হেথায় সুখে, লক্ষ শিশু হোথায় ধরা
দুঃখে ক্লেশে পিষ্‌ছে নিতি, তাদের হোথা দেখ্‌বে কেবা?
এই শিশুরি সমান মূঢ় রইল ধরায় অজ্ঞ যেবা,
পথ দেখাবে কে রে তারে, হাতটি ধরে' তুল্‌বে তারে,
দুঃখ-ভরা জগৎ হ'তে লবে তারে সুখের পারে?

ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর দুল্‌ছে ঝড়ে,
মানুষ-তরী ডোবে ডোবে,—রাখ্‌বে কে তায় হালটি ধরে'?
বেদন-নত ভূতলশায়ী লক্ষ জনার ক্ষুব্ধ কানে
মুক্তি-অভয়কে দেবে রে?—উঠ্‌বে সবাই সবল প্রাণে!
বাজে বাজে বিষম বাজে বক্ষে ব্যথায় ডাঙশ হানে;
দাঁড়ায় যুবা শয্যা-পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে।

পুরীর পাষাণ প্রাচীর ভেদি' ডিঙিয়ে এসে সুখ-নিগড়ে,
জায়ার প্রীতি ছাপিয়ে ঢেকে, নর্ত্তকী-গান চূর্ণ করে'
কেমন করে' সকল ব্যথা ঐ বুকেতে লাগ্‌ল এসে?—
গোপন ব্যথা গোপন কাঁদন এল কি হায় হাওয়ায় ভেসে?
পায়নি কি ঠাঁই, পায়নি রে বাস এই এ যুবার বক্ষ বিনে?
হাজার হাজার বরষ ধরে' খুঁজ্‌ছিল কি রাত্রে দিনে
এই বুকেরি শীতল আবাস?—বুকটি আজি কেন্দ্র সম
সব বেদনা আঁকড়ে ধরে,—নমনীয় পরম কম।
চোখ ছেপে তার অশ্রু আসে, বুক ছেপে তার কাঁদন দোলে,
বেদন-উতল দাঁড়িয়ে যুবা নিথর নিশার শান্ত কোলে!

যৌবন এই, প্রেমের লীলা, যশোধরার মধুর হাসি,
এই যে দোঁহার অটুট বাঁধন - জরায় সবি ফেল্‌বে গ্রাসি';
যশোধরার দীপ্ত রূপে জরার আঁধার ফেল্‌বে ছায়া,
এই যে সবল শক্ত আমি নুইয়ে যাব কুব্জ-কায়া!
মৃত্যু শেষে আস্‌বে কঠোর টান্‌বে ধরে' সবার কেশে;
কেউ রবে না, কেউ পারে না জিন্‌তে তারে সর্ব্বনেশে!
হাসে মানুষ হর্ষ করে, জানে না সে হাসির পিছে
লুকিয়ে আছে বিষম কাঁদন, সুখ যা বলে সে যে মিছে!
সেই কাঁদনের বেদন পিয়ে বেদন-জয়ী মুক্তি-গাথা
কে দেবে রে ক্লিষ্ট ধরায়, কে হবে রে ক্লেশের ত্রাতা?
জাগ্‌ল যুবার ক্লিষ্ট মনে শায়ক-বেঁধা সেই সে পাখী,
জীর্ণ বুড়ার নুইয়ে চলা, বস্ত্রে শবে নে যায় ঢাকি'!—
গিরগিটি খায় পিঁপড়ে ফড়িং, গিরগিটিরে সাপ সে গিলে,
সেই সাপেরে কামড়ে খেল দৌড়ে এসে একটা চিলে;
মানুষ মারে ছাগ ও মাছে,—এই ত ধরা!—হিংসা-নীতি
চল্‌ছে কঠোর; নেইক দয়া, নেই করুণা, নেইক প্রীতি!

এই ত জগৎ মিথ্যা বিপুল—জগৎ বিরাট্ মিথ্যা ঘেরা,
চাই আলো চাই, চাই রে আলো, আঁধার বড়, আঁধার ভেরা!
কে ঘোচাবে এ হিংসা-দ্বেষ, কে তাড়াবে নির্দ্দয়তা?
ব্যাকুল যুবা কক্ষে ঘোরে, বক্ষে জমে ব্যাকুল ব্যথা।

এই ত রাত্রি, এই অবসর, তারায় চাঁদে বল্‌ছে মোরে—
বেরিয়ে পড়ো বেরিয়ে পড়ো, আর কি সুযোগ পাবি ওরে?
হয় মিশে থাক্ মিথ্যা মায়ায়, প্রিয়ার প্রেমে থাক্ রে মিশি';
নয় চলে' আয় জগৎ-বুকে, এই ত সুযোগ—নীরব নিশি!
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন—হোথায় ধূলি কাঁকর-ভরা;
হেথায় বিলাস, নর্ত্তকী-গান—হোথায় রোদে পুড়্‌ছে ধরা;
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ—হোথায় মানুষ জ্বল্‌ছে তাপে;
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ—হোথায় দুখে দল্‌ছে দাপে;—
কোন্‌টা নিবি কোন্‌টা নিবি? তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে—
হবি রাজা না ভিখারী?—দাঁড়াব ভাই সবার পাশে!
দুর্ব্বলেরি বক্ষ দলে' ঘুর্‌বে না মোর রথের চাকা,
শোণিত-আশী রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা।
দুর্ব্বলেরে বল দেবো রে, দুখীর হব সুখের কামী,
মুছিয়ে শোণিত দানব অভয় আমি আমি এই এ আমি।
রাজ-আভরণ নিয়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গ-ভূষণ;
শয্যা কোমল বিঁধ্‌ছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন;
রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে;
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে।
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত—
মুছ্‌ব আমি সকল শাসন, মুছ্‌ব আমি সকল ক্ষত।
ঐ আসে রে ঐ আসে রে, ঐ যে শুনি কাতর ধ্বনি,—
পুত্রহারা কাঁদছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি!

নিদ্রাবিধুর যশোধরা দীর্ঘশ্বাসে ফির্‌ল পাশে,
থম্‌কে দাঁড়ায় ব্যাকুল যুবা, বক্ষ তাহার কাঁপ্‌ল ত্রাসে!—
হায় রে নারী, হায় মোহিনী! আমায় তুমি বাঁধ্‌লে ডোরে,
অঝোর দিলে প্রণয় প্রীতি, কিন্তু তবু বুক যে পোড়ে!
পুত্র দিলে শ্রেষ্ঠ যা সুখ, তবুও ব্যথা ঘুচ্‌ল না যে
সব স্নেহ প্রেম ছাপিয়ে, প্রিয়া, এ কোন্ ব্যথা বক্ষে বাজে!
একলা তোমার থাক্‌ব শুধু?—কর কর আমায় ক্ষমা,
বিপথ মাঝে কাঁদ্‌ছে যে নর—বুঝ্‌বে নাকি অনুপমা?
সবায় আমি চাইছি প্রিয়া, তোমায় আমি ছাড়্‌ছি নাকো,
সবায় পেয়ে তোমায় পাবো, ঘুমাও প্রিয়া, শান্ত থাকো;
জগৎ-জনে কর্‌ছে যে ভিড়—এই এ বুকে আস্‌ছে সবে,
সবায় সেথা দেবো নিবাস, সবার সাথে তুমিও রবে।
একটি চুমা তোমার মুখে, একটি চুমা শিশুর মুখে,—
এই নিয়ে আজ দাও গো বিদায়, বেরিয়ে পড়ি দুখের বুকে
দুখের মাঝে দুঃখে বুঝে দুঃখ হ'তে নিঙ্‌ড়ে সুধা,
হর্‌ব আমি সবার দুখে, মিটিয়ে দেবো সবার ক্ষুধা।

মৌন দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুত্রে হেরে,—
যায় বড় সাধ আঁকড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে।
হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,—না, না, একি! আবার মায়া?
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধ কায়া!
যাই চলে' যাই, যাই চলে' যাই, যাচ্ছি আমি, শোনো শোনো,
দুঃখী ওগো ব্যথিত ওগো, আর ভাবনা নাইক কোনো।
পাওনি প্রীতি? পাওনি দয়া? আমি সবায় প্রেম বিলাব,
প্রেমের আলোয় প্রেমের সুধায় দুখ মুছাবো শোক তাড়াব।
রাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাস্‌ব সবায় ঘুরিয়ে আঁখি,—
এই কি রে সুখ!—হায় অভাগা!—প্রেম দিয়ে যে রাখ্‌ব ঢাকি';
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আন্‌ব পথে,
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো,—বাঁচ্‌বে মানুষ শঙ্কা হ'তে।
সুপ্ত থাকো, তৃপ্ত থাকো, যশোধরা আমার প্রিয়া,
কিন্‌লে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া।

স্তব্ধ আবার দাঁড়ায় যুবা,—আকাশ পানে আবার দ্যাখে,
দিক্-ভোলান চাঁদের আলো ডাকে যেন ঐ যে ডাকে।
অবাধ অঝোর দিকে দিকে চাঁদের আলো কেবল হাসে,—
মুক্তি আছে, মুক্তি পাব, হৃদয় ভরে কী উল্লাসে!

যাই অসীমে, যাই অশেষে. নেইক রে আর বাঁধা-ধরা,
বক্ষে তুফান দু'কূল ছাপে,—এ যে বাঁধন-চূর্ণ-করা!

দ্বার খুলে' যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ার ভরে
ডাক্‌ল যেন। দাঁড়ায় যুবা। আবার সে যে ফির্‌ল ঘরে।
ঐ না নড়ে যশোধরা!—ঐ যে শিশু, আহা!—আহা!
ছাড়্‌ব এদের? চির জনম? কেমন করে' সইব তাহা?
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগ্‌ল গায়ে নিশার হাওয়া,
ডাক্‌ল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নেই? হয় না যাওয়া!
ছাদের 'পরে বেরিয়ে যুবা, হের্‌ল আকাশ—নেইক সীমা,
মৌনা নিশীথিনীর বুকে শব্দ নাহি—অচল ভীমা!
অসীম আলোর প্লাবন চলে—অশেষ আলো, উদার আলো।
এত আলোয় দুখ ঘোচে না? কেমন করে' মুছ্‌ব কালো?
বিশ্বে অসীম এত কি টেকি আমি কি ধর্‌তে পারি?
আমার হিয়ার ক্ষুদ্র বাসে তাই আছে প্রেমের বারি?

ফির্‌ল যুবা, ফির্‌ল ঘরে, বস্‌ল ধীরে শয্যা-শেষে;
পার্‌ব নাকি? পার্‌ব নাকি? অশ্রুতে গাল যায় রে ভেসে!

আবার এল উতল হাওয়া—দুল্‌ল ব্যথার সাগর জোরে;
কে রাখে রে? কিসে মায়া? প্রাণ যে আবার উঠ্‌ল ভরে'
যুক্ত করে দাঁড়ায় যুবা যশোধরার চরণ-মূলে,
শেষ দেখা সে দেখ্‌ল প্রিয়ায় দেখ্‌ল ছেলেয় দেখ্‌ল ভুলে'!
যশোধরার শয্যা ঘিরে' ঘুর্‌ল সে ধীর তিনটি বারে।—
কেঁদো নাকো, ফির্‌ব আমি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে।
যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রিয়া যাই, বিদায় বিদায়, আসি আসি,
তোমায় আমি ভালোবাসি, জগৎ-জনে ভালোবাসি!

ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে;
জগৎ তারে ডেকে দিয়ে ছ ব্যথার টানে প্রেমের টানে।

শ্রী প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আইন্‌-ই-আক্‌বরীর এক পৃষ্ঠা

আবুল ফজ্‌ল অকবরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি আইন্‌-ই-আক্‌বরীর লেখক। আইন্‌-ই-আক্‌বরীতে জিনিসের মণ বা সেরের মূল্য দামে ধরা আছে। দাম সেকালের তাম্রমুদ্রা পয়সার ন্যায়। এক দামের ওজন ১ তোলা ৮ মাসা; ৪০ দামে এক টাকা হয়। টাকার হিসাবে জিনিসের দর দেওয়া গেল।

গম ১ মণের দাম ৮ আনা
যব " " ৶৪ "

অনেকপ্রকার চাউলের উল্লেখ আছে, মুখমীন, মুখ বাস প্রভৃতি।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	চাউলের	মণ	২৸০ টাকা,
ময়দা	একমণের	দাম	॥৴০
আটা	"	"	।৵০
ঘি	"	"	২॥৵০
ভাল পরিষ্কৃত চিনি	"	"	৬৲
মিছরী	"	"	৫॥০
মধ্যম চিনি	"	"	২৸০

নিকৃষ্ট চাউলের মূল্য প্রতিমণ ৶৪ আনা

হরিদ্রা	একমণের	দাম	১০.	টাকা
গোলমরিচ	"	"	১২৲	"
লবণ	একমণের	দাম	।৵১০	
তৈল	"	"	২৲	

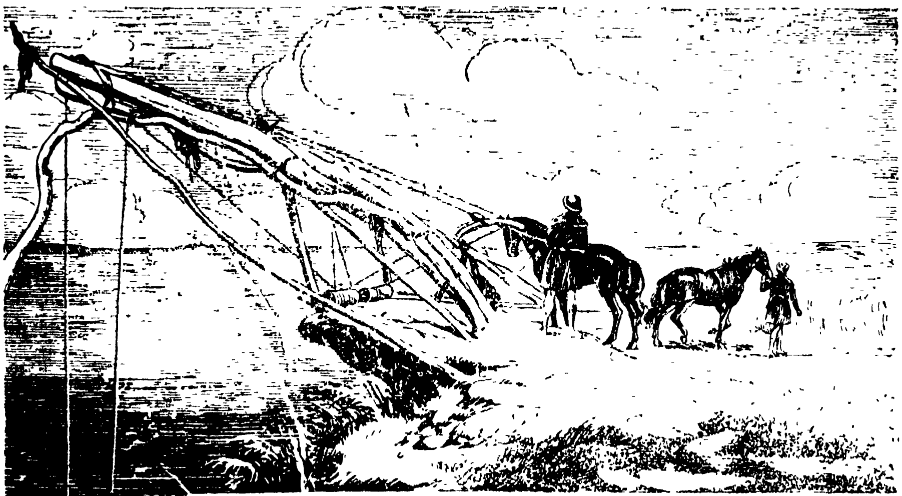
হিজরী ৯৮২ অব্দে আবুল ফজ্‌ল অকবরের রাজ-সভায় আসেন। ১৩৩০ অব্দের দরের সহিত ঐসময়ের দরের তুলনা করিলে মনে হয় "হায়রে সে কাল!"

বর্ত্তমান দর :—

গম	একমণের	দাম	৫৲	টাকা
যব	"	"	২॥	"
চাউল (উৎকৃষ্ট)		"	১০॥	"
" (মধ্যম)		"	৮৶০	"
ময়দা	"	"	৮।০	"
আটা	"	"	৭৸৵০	"
ঘি	"	"	৮৮-৯৮৲	"
তৈল	"	"	২১৸৵০	"
চিনি (সাদা ভাভা)		"	১৫৲	"
" (পরিষ্কৃত ভাল)		"	২৫॥০	"
মিছরী	"	"	২৪৲	"
লবণ	একমণের	দাম	৩।০	টাকা
হরিদ্রা	"	"	৪২৲	"
গোলমরিচ	"	"	২১৲	"

শ্রী কুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়





উচ্চ তীর হইতে, এশিয়ার অনেক স্থানে, এইপ্রকারে ঘোড়ার সাহায্যে সমুদ্র হইতে জল তোলা হয়

এসিয়ার পথেবিপথে (৩)—

স্ভেন হেডিনের কথা প্রবাসীতে দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে। এইবার তাঁহার আরো কতকগুলি ভ্রমণ-কাহিনীর কথা বলিব। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী তাঁহার কথাতেই বলিব।

"১৯০৬ সালে আমি যে বার তিব্বত অতিক্রম করি, সেইবার এক সময় লেক লাইটেনের তীরে বাসা বাঁধিয়াছিলাম। এই হ্রদটি খুব প্রকাণ্ড, ইহা কাপ্তান ওয়েল্‌বি ১৮৯৬ সালে আবিষ্কার করেন এবং নামকরণ করেন। আমরা যেখানে বাসা বাঁধিয়াছিলাম সে স্থানটি ভয়ানক। লোকজন নাই—গরুঘোড়ার খাইবার ঘাসও সেখানে পাওয়া দুষ্কর। একদিন সকালে দেখিলাম আমাদের দলের আটটি ঘোড়া এবং খচ্চর মরিয়া গিয়াছে।

"আমি এই হ্রদের একটি নক্সা তৈয়ারী করিব স্থির করিয়াছিলাম সেইজন্য সঙ্গে একটা collapsible boat সঙ্গে লইয়াছিলাম। ১৯০৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, ভৃত্য রহিম আলিকে লইয়া নৌকায় করিয়া হ্রদের মাঝখানের দিকে চলিতে লাগিলাম। সমস্ত হ্রদকে একটা আয়নার মত স্বচ্ছ মনে হইতেছিল। হ্রদের একদিকে লাল পাহাড়ের শ্রেণী; তাহার ছায়া জলে পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল—এই ইটের মত লাল পাহাড়ের মাথায় যেন শুভ্র বরফের মুকুট। হ্রদের জলে ইহার ছায়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

"নৌকায় চড়িবার পূর্ব্বে আমার দলের অন্য সব লোককে ভারবাহী পশুদের লইয়া হ্রদের পূর্ব্বদিকে যাইয়া বাসা বাঁধিতে বলিয়া দিলাম। স্থির করিলাম, অন্ধকার হইবার পূর্ব্বেই আমরা পূর্ব্ব উপকূলে পৌঁছিয়া বিশ্রাম লাভ করিব

"আমার জল মাপিবার দড়ি ২১৩ ফুট লম্বা ছিল। কিন্তু হ্রদের মাঝখানে এই দড়ির সাহায্যে তল পাওয়া গেল না। রহিম আলি বলিল—এই হ্রদের তল নাই—। তীর হইতে হ্রদের স্বচ্ছ জল দেখিয়া আমরা হ্রদের পরিমাণ সম্বন্ধে আন্দাজ ভুল করিয়াছিলাম। আমরা দক্ষিণ তীরে আসিয়া অবতরণ করিলাম দ্বিপ্রহরে। সেখানে তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু আহার করিয়া আবার নৌকায় আরোহণ করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্ব্ব কূলের দিকে নৌকা টানিতে লাগিলাম। আমি নক্সা করিতে ব্যস্ত—এমন সময় রহিম আলি ভীতকণ্ঠে বলিল—পশ্চিমে ঝড় দেখা যাইতেছে, একটু পরেই বোধ হয় আমাদের উপর আসিয়া পড়িবে।

"আমি পশ্চিম দিকে চাহিলাম—সে দৃশ্য ভয়ানক! হল্‌দে রংয়ের মেঘ ধূলা মাখিয়া যেন আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে দূর হইতে মনে হইতেছিল যেন বড় বড় পাশ বালিশ তীরের মত বেগে গড়াইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। রহিম বলিল—এখন তীরে নামিলে কেমন হয়? আমি বলিলাম—না, তুমি পাল খাটাও, আমরা হাওয়ার বেগে আগাইয়া যাইব।

"রহিমের ছোট পালখানা খাটান হইতে না হইতে ঝড় আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। আয়নার মত স্বচ্ছ হ্রদ তখন অন্যরূপ ধরিয়াছে। জল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, যেন সকলে মিলিয়া আমাদের গ্রাস করিবার আয়োজন করিতেছে। ক্রমশঃ ঝড় বাড়িয়া চলিল। নৌকাও তখন ঝড়ের মুখে তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। রহিম হঠাৎ সব



তল-বিহীন হ্রদে স্ভেন হেডিনের নৌকা ঝড়ের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে

ছাড়িয়া দিয়া 'আল্লা আল্লা' বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিল। মাঝে মাঝে চড়া দেখিতেছিলাম—এই চড়ায় যদি নৌকা একবার লাগে তবে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যাইবে। আমি রহিমকে চীৎকার করিয়া বলিলাম—"চারিদিকে চোখ রাখ যেন চড়ায় নৌকা না লাগে।" রহিম তখন মড়ার মতন পড়িয়া আছে।

"ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবশেষে দূরে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ শুনিতে পাইলাম। আরও একটু পরে দেখিলাম তীরে হ্রদের ঢেউ লাগিয়া এই শব্দ আসিতেছে। আমি দেখিলাম আর একটু বিলম্ব করিলে নৌকা তীরে লাগিয়া চূর্ণ হইবে, আমরাও তাহার সঙ্গী হইব। রহিমকে বলিলাম—লাফ দিয়া জলে পড়, নৌকা ধর—সে তখন মড়ার মত। আমি তাহাকে ধরিয়া জলে ফেলিয়া দিলাম, তখন তাহার জ্ঞান হইল। আমরা দুইজনে তখন কোমর জলে দাঁড়াইয়া নৌকাকে ঢেউএর হাত হইতে বাঁচাইলাম। এইখানে হ্রদের জল জমাট না হইলেও আমাদের গায়ে যে জল লাগিতেছিল তাহা তৎক্ষণাৎ জমিয়া যাইতেছিল।

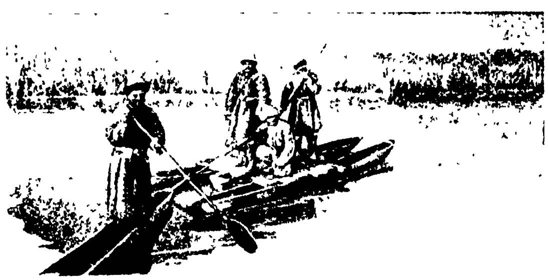
"আমাদের ফিরিতে দেরী হইতেছে দেখিয়া মশাল লইয়া আমাদের সন্ধানে লোক বাহির হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে একজন আমাদের কাছে আসিয়া পড়িল। তাহার মশালের আলোক আমাদের প্রাণে আশার আলোক দান করিল।

১৯১৬ সালে যুদ্ধের সময় আমার বন্ধু ফন্ ডার গোল্‌জ্ পাশা (von der Goltz Pasha) আমাকে বাগদাদে নিমন্ত্রণ করেন। গোল্‌জ্ পাশা তুর্কী দেশের সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন। এইবার ইউফ্রেটিশ নদীতে তীব্র স্রোতের মুখে আমি একবার ভেলার উপর চড়িয়া বিহার করিয়াছিলাম।

"বেশ হইতে আগমন করিয়া দুইটি নৌকা ক্রয় করিলাম। এই দেশে দুইটি নৌকাকে এক সঙ্গে বাঁধিয়া লওয়া হয়—তাহাতে নৌকা সমান থাকে এবং সহজে ওলটপালট হয় না। নৌকার উপর ছোট একটি কেবিন মত করিয়া লইলাম। চারজন মাঝি মাল্লা এবং একজন



স্ভেন হেডিন্ অশ্বারোহণে হ্রদ পার হইতেছেন। দূরের পাহাড় লাল রংএর, উহার মাথায় বরফের মুকুট



তুর্কী-নৌকা, দুইটি নৌকাকে বাঁধিয়া একখানি ভেলার মত করা হয়

পুলিস লইয়া যাত্রা শুরু করিলাম। এইখানেও আমি নক্সা করিতেছিলাম। হঠাৎ আবার ঝড় উঠিল—আমাদের নৌকাও তীরের মত ছুটিয়া চলিল। আমার কেবিন কোথায় যে উড়িয়া গেল জানি না।—সব চুপ চাপ। একটু নিশ্চিন্ত হইব মনে করিতেছি এমন সময় আবার গুড় গুড় করিয়া সমস্ত আকাশ যেন আমাদের উপর আসিয়া পড়িল। কামানের মত শব্দ করিয়া বিদ্যুৎপাত হইতে লাগিল। মনে হইল এবার আমার সকল সমাপ্ত হইল। কিন্তু বাঁচিয়া গেলাম। ঝড় থামিয়া গেল। সমস্ত জিনিষপত্র ত্যাগ করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে কেবল মাত্র

প্রাণটুকু লইয়া ডাঙ্গায় উঠিলাম। ঝড় মাত্র ১৭ মিনিট ধরিয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক মিনিট সময়কেই যেন বহু যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল এবং বোধ হয় আর ৩ মিনিট ঝড় থাকিলে আমরা এবং নৌকা সবই চূর্ণ হইয়া যাইত।"

—

হস্তী-সীল—

গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপে (Guadalupe Islands) শুঁড়ওয়ালা একপ্রকার জীব বাস করে ইংরেজিতে ইহাদের elephant seal বলা হয়। ইহাদের শুড়গুলি জলে ভেজে না অর্থাৎ অতিরিক্ত তেলতেলে, জল লাগিলেও গড়াইয়া ঝরিয়া যায়। শুঁড়টি ইহারা যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে। এই শুঁড়টি না থাকিলে ইহাদের সহিত সাধারণ সীলের কোন তফাৎ থাকিত না এবং এতদিনে বোধ হয় মানুষের অত্যাচারে ইহাদের বংশ লোপ পাইত। এই হস্তী সীল খেয়ালমত এই শুঁড়টিকে মুখের মধ্যে ভরিয়া দিয়া হাওয়া ভরিয়া শিঙার শব্দের মত একপ্রকার শব্দ করিতে পারে।

গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও এই হস্তী-সীলের দেখা পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। এই দ্বীপটি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়ার ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। দ্বীপটি ২০ মাইল লম্বা এবং ৬ মাইল চওড়া। দ্বীপটির জন্ম সামুদ্রিক ভূমিকম্পের ফলে হয়। দ্বীপটিতে নানাপ্রকার অদ্ভুত জীবজন্তু বাস করে, তবে তাহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

হস্তী সীলের দল এক সময় উত্তর মেরু প্রদেশের নিকট বহু পরিমাণে বাস করিত, কিন্তু তিমি শিকারীদের হাতে ইহারা অল্পকাল মধ্যেই প্রায় লোপ পাইবার অবস্থায় পৌঁছায়। হস্তী-সীল হত্যা করিয়া তাহারা একপ্রকার তেল বাহির করিত। শিকারীদের জ্বালায় অস্থির হইয়া বোধ হয় কতকগুলি হস্তী-সীল এই জন মনুষ্যহীন দ্বীপে আসিয়া আশ্রয় লয়। বর্ত্তমান সময়ে মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট ওব্রেগণ আইন করিয়া দিয়াছেন যে কেহ গোয়াডালিয়ুপ দ্বীপে অনুমতি বিনা যাইতে পারিবে না এবং এই দ্বীপের তীর হইতে সমুদ্রের তিন মাইলের ভিতর কেহ হস্তী-সীল হত্যা করিতেও পারিবে না। কেহ এই নিয়ম ভাঙ্গিলে তার ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা আছে।



হস্তী-সীলের দল সমুদ্র উপকূলে বিশ্রামলাভ করিতেছে, মানুষকে তাহাদের কোন ভয়ডর নাই



মুখের মধ্যে শুঁড় গুঁজিয়া হস্তী-সীল শিঙার মত শব্দ করিতেছে

হস্তী-সীলদের দেখিলে মনে হয়, সারা জীবন ধরিয়া অখণ্ড বিশ্রাম লাভই ইহাদের বাঁচিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষকে তাহাদের কোনপ্রকার ভয়ডর নাই। তীরে যখন তাহারা দল বাঁধিয়া রোদ পোহায়, তখন তাহাদের মাঝখানে যদি একদল লোক লাফাইতে বা দৌড়াইতে থাকে তাহাদের আলস্য-বিশ্রামের কোনপ্রকার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা অতি নির্ব্বিকার চিত্তে রোদ পোহাইতে থাকে। তাহাদিগকে এই সময় দেখিলে মরা বলিয়া মনে হয়। কেহ যদি তাহাদের পিঠে দুই চারিটা চড় চাপড় দেয়, তাহাও তাহারা গ্রাহ্য করে না।

ইহাদের এই শুঁড়টির যে কি প্রয়োজন তাহা কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ এখনও বলিতে পারেন নাই। বড় মদ্দা হস্তী-সীলের শুঁড়টি ষোল ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। শিঙ্গা-বাজানর মত শব্দ করা ছাড়া এই শুঁড়টির আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

মদ্দা হস্তী-সীলগুলির সংখ্যার অনুপাতে মনে হয় যে সর্ব্বসমেত ইহাদের সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় হাজার হইবে। শিকারীদের হাত হইতে



কেন তাড়াতাড়ি মিছে গোলমাল—
হস্তী-সীলের মুখ দেখিয়া যেন তাই মনে হয়

ইহাদের বাঁচাইতে পারিলে এই অদ্ভুত জন্তুগুলিকে চিরকাল বাঁচাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

—

মোমের মানুষ—

আমরা পাথরের তরী মানুষের প্রতিমূর্ত্তি অনেক দেখিয়াছি—ইহারা হুবহু মানুষের মতন দেখিতে না হইলেও বহু পরিমাণে একরকম দেখিতে হয়। একজন শ্বেতাঙ্গ শিল্পী কতকগুলি মোমের মানুষ তৈয়ার করিয়াছেন—তাহারা দেখিতে হইয়াছে অবিকল মানুষের মতন। তাহারা যে জীবন্ত মানুষ নয়—ইহা কোনরকমেই বুঝিবার উপায় নাই। তাহাদের পাশে যদি অন্য কতকগুলি লোককে দাঁড়

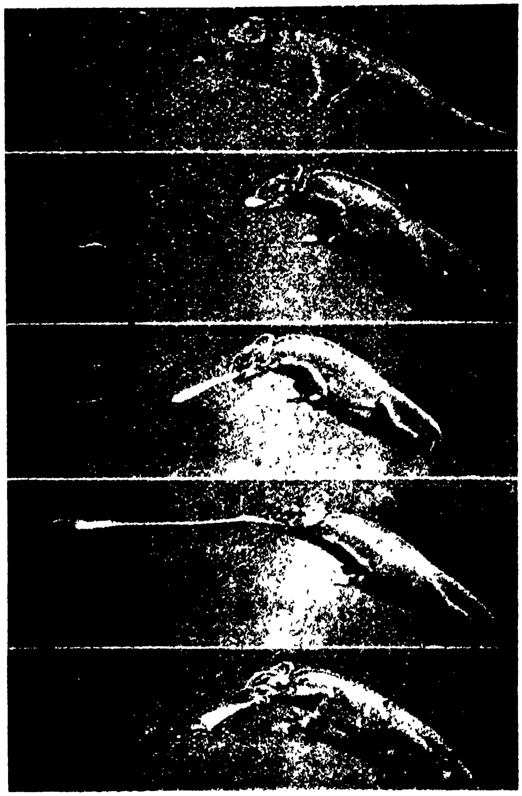


আসল নকল চিনিবার যো নাই—বাঁদিকের প্রথম এবং ডানদিকের শেষ দুইজন জীবন্ত মানুষ, বাকী সব মোমের তৈরী

করাইয়া দেওয়া যায়, তবে কে মানুষ এবং কে মানুষ নয়, তাহা আমরা কেহই বলিতে পারিব না। এইসমস্ত পুতুল-গুলিকে কোটপ্যান্ট টাই ইত্যাদি পরাইয়া দুয়ারের সামনে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুষ্টবুদ্ধি কোন লোক যদি ঘরের কাছে আসে, না বলিয়া কোন দ্রব্য লইবার জন্য, তাহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইবে।

"বহুরূপী"

আমাদের দেশের অনেকেই ঝোপঝাড়ে বহুরূপী দেখিয়াছেন। কিন্তু এই বহুরূপী কেমন করিয়া তাহার আহার্য্য সংগ্রহ করে তাহা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। বহুরূপীর জিভটিই তাহার শিকার ধরিবার একমাত্র অস্ত্র এবং সহায়। এই জিভটি বেশ লম্বা এবং ইচ্ছামত মুখ হইতে বাহির করিয়া নানাদিকে ছোড়া যাইতে পারে। দরকার মত জিভটাকে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারা যায়।



বহুরূপীর পোকা শিকার করিবার পদ্ধতি—
জিহ্বার ক্রম-বহিষ্করণ দেখিবার জিনিষ

গাছের এক ডালে বসিয়া আর-এক ডালে কোন পোকা ধরিতে হইলে, বহুরূপী এত তাড়াতাড়ি তাহার জিভ বাড়াইয়া পোকাটিকে ধরিয়া ফেলে যে খালি চোখে তাহা দেখিবার কোন উপায় নাই। Slow speed cameraর ছবিতে এই বহুরূপীর শিকার ধরা ব্যাপারটি সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

—

ফার্-গাছের কেয়ারী

মেক্সিকো সহরের কাছে এক উদ্যানের একদল মালী কতকগুলি ফারগাছকে এমনভাবে কাটিয়া ছাঁটিয়া এবং তারের বেড়ায় বাঁধিয়া সাজাইয়াছে যে তাহাদের সবুজ মর্ম্মর বলিয়া মনে হয়। কতকগুলি গাছকে সেতুর আকারে সাজান হইয়াছে, কতকগুলিকে আবার সারি সারি থামের মত করিয়া সাজান হইয়াছে। সমস্ত



ফার্‌-ব্রিজ—দেখিলে একটা সেতু বলিয়া মনে হয়



ফার্‌-গাছের সারি দেখিলে মর্ম্মর-স্তম্ভ বলিয়া মনে হয়

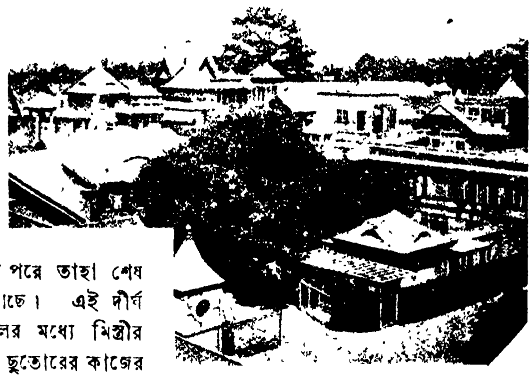
গাছগুলিকে দূর হইতে দেখিলে পাথরের তৈরী বলিয়া মনে হয় ; আকারে-প্রকারেও গাছগুলি অসমান নয়। মালীদের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয়।

স্পুক্‌ প্রাসাদ—

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া সহরে স্পুক্‌ প্রাসাদ নামে এক প্রাসাদতুল্য চারতলা বাড়ী আছে। বাড়ীখানির মালিক একজন মহিলা। আজ হইতে ৩৯ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাসাদখানি নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, এবং এত কাল পরে তাহা শেষ হইয়াছে। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে মিস্ত্রীর এবং ছুতোরের কাজের বিরাম ছিল না—প্রত্যেকদিনই কাজ চলিত।



কতকগুলি ফার্‌-গাছের দৃশ্য



স্পুক্‌ প্রাসাদের একটি দৃশ্য—এই প্রাসাদখানিকে দেখিলে একটি গ্রাম বলিয়া মনে হয়

পৃথিবীর মধ্যে এত প্রকাণ্ড এবং গোলমেলে সাধারণ লোকের বসতবাটী নাই বলিলেই হয়। বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে খরচ পড়িয়াছে মোট ২০,০০,০০০ টাকা। বাড়ীখানিতে ১৪৪ টি কামরা আছে, দুয়ারের সংখ্যা ২০০০, জানালা ১০,০০০, সমস্ত জানালাগুলিতে ১৫০,০০০ খণ্ড সার্সির প্রয়োজন হইয়াছে। বাড়ীখানি তৈরী হইয়াছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মালমশলাতে। কোন বাজে বা রদী জিনিস বাড়ীখানির কোন অংশেই ব্যবহার করা হয় নাই।

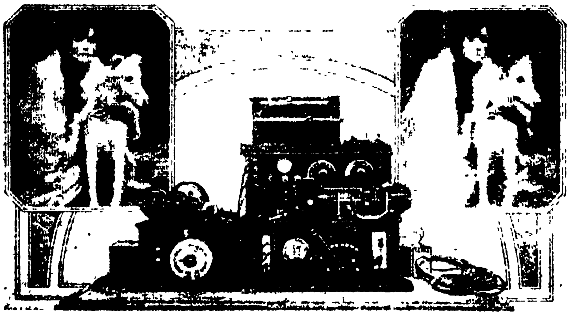


স্পুক্-প্রাসাদের আর-একটি দৃশ্য

যে ভদ্রমহিলা এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন—(কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে) তিনি জানিতেন যে তাঁহার জীবিত কাল মধ্যে এই কাজ সমাপ্ত হইবে না। বাড়ীটিতে লোকজন থাকিত—কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কামরা এবং উঠান ছাড়া তাহারা বাড়ীর অন্য কোন অংশে যাইতে পারিত না। এ-সম্বন্ধে সকল সময় কড়া পাহারা থাকিত। সমস্ত বাড়ীখানির বিভিন্ন অংশে ওঠানামা করিবার জন্য অগণ্য সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলির এক-একটি ধাপ ২॥ ইঞ্চি করিয়া উচ্চ এবং ১৮ ইঞ্চি করিয়া চওড়া। সিঁড়িগুলি সোজাভাবে কোথাও নাই, এঁকিয়া বেঁকিয়া নানা-ভাবে আছে। খুব বিশেষভাবে পরিচিত না হইলে যে কোন লোক বাড়ীখানির মধ্যে পথ হারাইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে পারে।

সমস্ত প্রাসাদ বহু মূল্যবান্ চিত্রে এবং দ্রব্যে সাজান আছে। বাড়ীতে বিদ্যুতের তারের সংখ্যা এত বেশী এবং তাহা এত গোলমেলে যে কোন তারটির যোগ কোন বাতি বা পাখার সঙ্গে, তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ স্থির করিতে পারে নাই। বাড়ীর কোন লোকে জানে না, এত বড় বাড়ী কোন প্রয়োজনে বা উদ্দেশে তৈরী করা হয়। বাড়ীখানি নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্য একমাত্র গৃহস্বামিনী জানিতেন। প্রাসাদের অনেক অংশ নির্ম্মাণ শেষ না করিয়াই রাখা হইয়াছে—এবং এই অসমাপ্ত কাজগুলি ইচ্ছাকৃত বলিয়া মনে হয়। বাড়ীখানিকে আগুনের হাত হইতে রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত আছে। চোরডাকাতের কবল হইতে সোনা-রূপার জিনিষ রক্ষা করিবার জন্য অনেক গুপ্ত কক্ষ এবং সিন্দুক আছে।

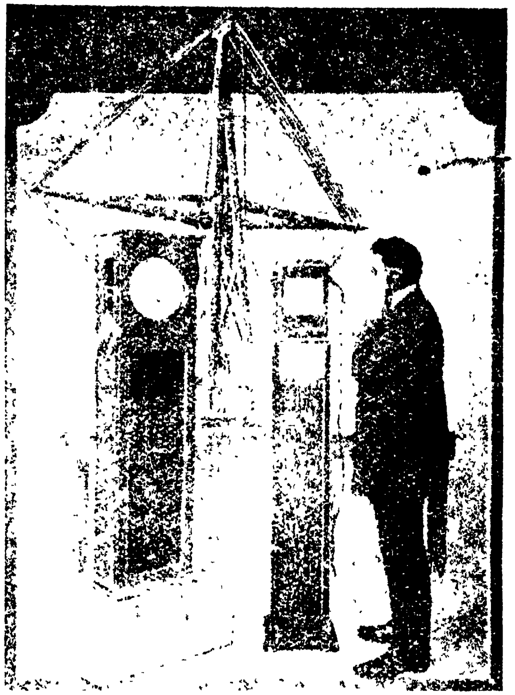
প্রাসাদের প্রধান তোরণদ্বার গৃহস্বামিনীর বাসকালে নাকি মাত্র তিনবার খোলা হয়। বাড়ীর মধ্যে সমস্ত আয়োজন ছিল, কাজেই সাধারণ কাজে কাহাকেও বাহিরে যাইতে হইত না।



র‍্যাডিও ফোটোর নমুনা, বাঁদিকে আসল ফোটো এবং ডানদিকে র‍্যাডিওর সাহায্যে যে ছবি উঠিয়াছে

র‍্যাডিওর কথা—

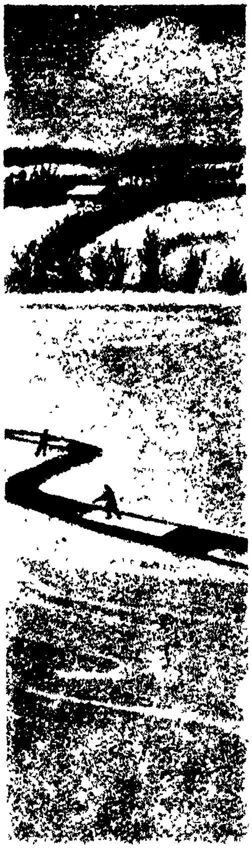
পাশ্চাত্য জগতে র‍্যাডিও সাহায্যে আজকাল অনেক কাজই হইতেছে।



বেতারের সাহায্যে ঠিক সময় ধরিয়া ঘড়ি ঠিক করা হইতেছে



জার্ম্মান্ পুলিসের মাথায় বেতার-সেট্—এই বেতারের সাহায্যে সে সব সময় হেড আপিসের সঙ্গে যোগ রাখে



মাঝের বরফ কাটিয়া যে খাল কাটা হয়, তাহা দূর হইতে কেমন দেখায় দেখুন

র‍্যাডিও ফোটোর চলনও আজকাল খুব বেশী হইয়াছে। র‍্যাডিও ফোটো তুলিবার জন্য দুইটি কল থাকে একটি কলে ফোটো পাঠান হয় এবং আর একটিতে সেই ফোটো ধরা হয়। কলগুলি বেশ মাঝারী-ধরণের এবং প্রয়োজন-মত যে কোন স্থানে বহন করিয়া লওয়া যায়। এই কলের সাহায্যে হাজার মাইল ব্যবধানেও ফোটো তোলা যায়। ছবি দেখিলে ব্যাপারটি একটু বোঝা যায়।

জার্ম্মানিতে বর্ত্তমান সময়ে র‍্যাডিওর সাহায্যে দেশের সমস্ত সরকারি অফিস রেলওয়ে স্কুল কলেজ ইত্যাদির সময় ঠিক করা হয়। এই কাজের জন্যে দুটি সেণ্ট্রাল্ ষ্টেশন আছে। একটি বার্লিনের কাছে এবং আর একটি দূর একটা পাহাড়ের চূড়ার উপর। নিয়ম করা হইয়াছে যে, যে সময় চারিদিকে ঠিক-সময়ের খবর ছড়ান হইবে সেই সময় সাত মিনিট জন্য সমস্ত র‍্যাডিও অফিস বা খবর ছড়ান কল বন্ধ থাকিবে। র‍্যাডিওর কোড খবর ধরিয়া ঠিক করিয়া সময় ঠিক করিতে হয়। সময় ধরিবার এবং চারিদিকে ছড়াইবার (broadcasting) কল কব্জার গঠন ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই একটি সেণ্ট্রাল ষ্টেশন হইতে বেলা ১টা এবং রাত্রে একটার সময় চারিদিকে টাইম সিগন্যাল দেওয়া হয়।

জার্ম্মানির কয়েক জায়গায় পুলিসম্যানেরা পিঠে বেতার-সেট বহন করিয়া লইয়া বেড়ায়। এই বেতার খবর ধরিবার কলটি দেখিতে জবড়জঙ্গ হইলেও ভারী নয় এবং ইহা বহন করিতে কোন কোন কষ্ট বা অসুবিধা নাই। সমস্তই কনেষ্টবলের পিঠে এবং বুকে বেশ শক্ত করিয়া চামড়ার পেটি দ্বারা বাঁধা থাকে। হেড্ অফিস বা অন্য কোন স্থান হইতে যে কোন সময় এবং যে কোন স্থান হইতে সহরের সকল খবর পুলিশম্যান এই কলের সাহায্যে পাইতে পারে।

—

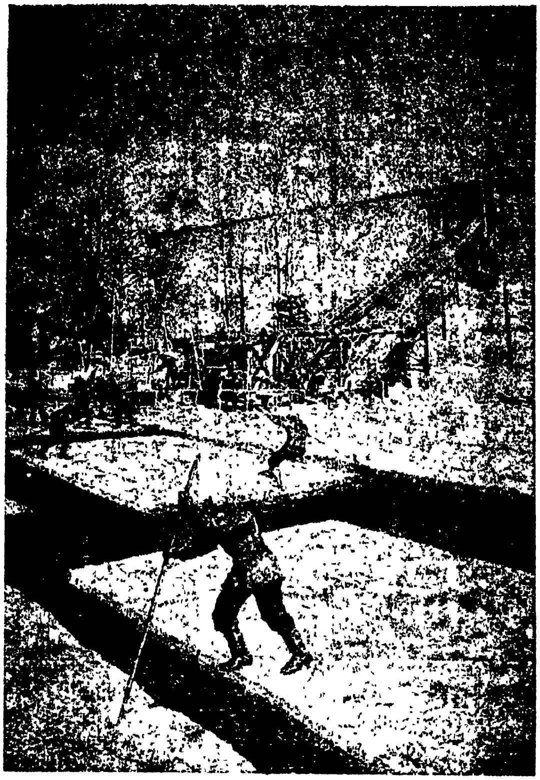
বরফের চাষ—

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২০,০০০,০০০, টন বরফ জমাট পুকুর হ্রদ ইত্যাদি হইতে কলের করাতের সাহায্যে কাটিয়া ব্যবসার জন্য চালান্ দেওয়া হইয়া থাকে। এই বরফ লোকেদের খাইবার জন্য বিশেষ ব্যবহার হয় না, রেল গাড়ী, জাহাজ কলকারখানা ইত্যাদিতে নানারকম কাজেই বেশী ব্যবহার হয়। পুকুর হ্রদ ইত্যাদি হইতে বরফ কাটিয়া আনিয়া গুদাম ঘরে তাহাদের বোঝাই করা হয় এবং দরকার-মত বিশেষ বিশেষ স্থানে চালান দেওয়া হয়।



ঘোড়ার-টানা করাতের সাহায্যে হ্রদের বরফ চাক্‌লা করিয়া কাটা হইতেছে

হ্রদ বা পুকুরের জল যখন মানুষ এবং কলের ভার সহিবার মত শক্ত হয় তখন তাহার উপর হইতে তুষার ঝাঁটাইয়া ফেলা হয় এক একটা বড় হইয়া গেলেই বরফের উপর হইতে তুষার চাঁচিয়া ফেলা হয়, কারণ বরফের উপর এক পর্দ্দা তুষার পাত হইলে নীচের বরফ উপযুক্ত পরিমাণ পুরু হইতে পারে না।



হ্রদের মাপের খাল দিয়া চাব্‌লা-বরফ ভেলার মত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে

পুকুর বা হ্রদের মাঝখানে যে বরফ জমে তাহা সবচেয়ে পুরু, পরিষ্কার এবং ভাল হয়, কারণ পুকুরের মাঝখানে আগাছা বা অন্য কোনপ্রকার আবর্জ্জনা প্রায়ই থাকে না। জমাট হ্রদের মাঝে বরফ, কল বা হাতের সাহায্যে কাটিয়া, একটি সরুখাল মত করিয়া লওয়া হয়। তার পর কলের করাতের সাহায্যে বরফকে চওড়া চওড়া ফালি করিয়া কাটা হয়।

বড় বড় হ্রদে একটা একটা ফালিকে ১০০ ফুট লম্বাও করা হয় এবং মাঝখানের খালের জলের ওপর দিয়া ঐসমস্ত বরফের ফালিকে ভেলার মত ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তার পর কলের সাহায্যে ঐসমস্ত বরফের টুকরাকে নির্দ্দিষ্ট মাপে টুকরা করিয়া কাটিয়া গুদাম ঘরে তোলা হয়। আরম্ভ হইতে শেষ কার্য্যটি পর্যন্ত সবই কলেই হয়। অনেক সময় বরফগুলির দুইটি টুকরার মাঝখানে একটি করিয়া করকোটের পাত রাখা হয়, ইহাতে দুইখণ্ড বরফ জোড়া লাগিয়া যায় না। এইসমস্ত গুদাম ঘরে করাতের গুঁড়া ব্যবহার করা হয় না, কারণ করাতের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহা আট নয় বছরের ভিতর গুদামঘরের দেওয়াল নষ্ট করিয়া দেয় এবং গুদাম ঘর অকেজো করিয়া দেয়। বরফের গাদার উপর কিছু খড় কিম্বা building paper বিছাইয়া দিয়া বরফ বেশ ভাল করিয়া রক্ষা করা হয়।

এই বরফ কাটিয়া চালান্ দেওয়ার ব্যবসা সব বছর সমান লাভজনক হয় না, কারণ কোন্ বছর কি পরিমাণে শীত পড়িবে-না-পড়িবে, তাহাও জানা থাকে না। কিন্তু হ্রদের খুব নিকট হইতে যদি বরফ কাটিয়া রেলগাড়ীতে বোঝাই দেওয়া যায়, তবে লোকসান হইবার আশঙ্কা কম। কোন বছর শীত বেশী পড়িলে এবং বরফ যদি খুব বেশী পুরু হয় তবে দরকার মত বরফ কাটিয়া লইয়া আগামী বছরের জন্য বরফ সঞ্চয় করিয়া রাখা যাইতে পারে। বড় বড় হ্রদে যেখানে বরফ অতিরিক্ত পুরু হয় সেইসব ক্ষেত্রে মজুর না লাগাইয়া কলের সাহায্যে বরফ কাটা তোলা ইত্যাদি করিতে পারিলে খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অভিন্ন

(কবীর)

মস্‌জিদ্‌ই যদি খোদার ডেরা, ত
　　অন্য মুলুক কার ?
রাম যদি শুধু তীর্থে মূর্ত্ত,—
　　কে রাখে বাহির আর ?
পূর্ব্ব দিক্‌টা হরির ত ?—আর,
　　পশ্চিম আল্লার ?
আর সব দিক্—সে সব কাহার ?
　　এ বুঝা বড়ই ভার।
মস্‌জিদ্‌ই যদি খোদার ডেরা, ত
　　অন্য মুলুক কার ?

হিয়ার ভিতর, ওরে, খুঁজে দেখ,
　　বুঝে দেখ একবার,
এখানে করীম, এখানেই রাম,—
　　এই কথাটাই সার!
যত নর-নারী, হে মোর দেব্‌তা,
তুমিই সে-সব—তোমারি রূপ তা;
কবীর কে ?—সে যে আল্লা-রামের
　　সন্তান!...এটা স্থির,
তিনিই আমার গুরুজী এবং
　　তিনিই আমার পীর!

শ্রী রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী



গান

মন চেয়ে রয়, মনে মনে
হেরে' মাধুরী।
চোখ দুটো তাই কাঙাল হয়ে
মরে না ঘুরি॥
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে
বাজ্‌ল বাঁশুরি;
রূপের কোলে ঐ যে দোলে
অরূপ মাধুরী॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের' পরে।
হাতের ধরা ধর্‌তে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই
করিনে চুরি;
ধরা-দেওয়া ধন সে ত নয়—
অরূপ মাধুরী॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে—
আয় রে চলে'।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে॥
মাঠের বাঁশি শুনে' শুনে'
আকাশ খুসি হ'ল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো,
খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসী ধরে নাগো, ঐ যে উথলে॥

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

মনে রাখিও

বাঙলা শঙ্করাচার্য্যের বিধান মানে না; বাঙলা মিতাক্ষর মানে না; বাঙলা যে আভ মানে ভারতের কোন হিন্দুসমাজ তা' মানে না; বাঙলায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাঙলায় পরমহংস দেবের জন্ম; কর্ত্তাভজা, তন্ত্র, ব্রাহ্মধর্ম্ম এইসব বাঙলারই সামগ্রী। বাঙলার সাহিত্য জগৎ-বরেণ্য হইয়াছে; বাঙলার সর্ব্বতোমুখী মেধা দুনিয়ার ঈর্ষার বস্তু হইয়াছে। বেদান্তের গৌরব যে আজ জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীরই কীর্ত্তি।

বাঙ্গলার ধর্ম্ম বলিতে যা-কিছু তাহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি, সে তাহা কাহারও কাছে ধার করে নাই; যেখানে ধার করিয়াছে, সে নিজের মতো করিয়া অদল বদল করিয়া তবে প্রয়োগ করিয়াছে।

চিরদিন বাঙ্গালী তাহার এই বিশেষত্ব রাখিয়া চলিবে, তাহাতে কেহ সন্তুষ্টই হউক আর অসন্তুষ্টই হউক, কেননা সে ত আপনার হারাইতে পারে না। তাহার বিশেষত্ব হারাইলে সে মরিবে।

বাঙ্গলার হিন্দু, ভারতীয় হিন্দু হইতে ভিন্ন; ভারতীয় হিন্দু বহুকাল হইতে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, বাঙ্গালীও ভারতের হিন্দুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে। বাঙ্গালী এই পার্থক্যের চিহ্নস্বরূপ বহুদিন হইল তাহার টিকি কাটিয়া ফেলিয়াছে। শুধু চীনে নহে ভারতবর্ষেও টিকি দাসত্বের চিহ্ন; চীনে হয়ত টিকি মান্দারিনের দাসত্বের পরিচায়ক—ভারতবর্ষে টিকি শঙ্করমঠের দাসত্বেরপরিচায়ক—সে চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গলার হিন্দুচিরদিন স্বাধীন।

এই কথা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলকেই মনে রাখিতে বলি। ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্দুর ধর্ম্মনেতৃত্ব বাঙ্গালী মানিবে না, ভুঁইয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারের কথা দূ'র।

(প্রবর্ত্তক, পৌষ) শ্রী চারুচন্দ্র রায়

—

বর্ণমালার অব্যবস্থা

বর্ণমালী ভায়াদের বিদ্যা গো অগাধ!
আবর্জ্জনা জড়া'বার প্রধান ওস্তাদ॥
কর্মকার্য্যটিকে করি' কর্ম্মকার্য্য মস্ত।
বিদ্যা ফলাবার পথ করেন প্রশস্ত॥
"বর্ধন" বেরোলে মুখে (মায়া নাই মোটে!)
বর্দ্ধন করেন তা'কে চাবুকের চোটে॥
"কোনো জন' লিখিতে হইলে প্রয়োজন,
"কোন জন" লেখেন, বলেন "কোনো জন"॥
হাত তাঁদের ব্যথা করে লিখ্‌তে যেন "কোনো"।
এসেছেন গুরুদেব, কী বলেন শোনো॥

নেপথ্যে॥ গৃহে যাঁ'ন চলি সবাই স্ব স্ব।
গাধাকে পিটিলে হবে না অশ্ব॥
"অবশ্য হবে" বলিয়া গুরু
সেয়া উপদেশ করিলা সুরু॥

ভাষাচার্য্যের উপদেশ।

লিখেছ তো ঢের পুঁথি—প'ড়েছ বিস্তর।
তেলা শিরে দিচ্ছ তেল—এ কোন্ শাস্তর॥
কর্মের ম-য়ে মফলা অকর্ম্মের শেষ।
কার্য্যের য-য়ে যফলা অকার্য্য বিশেষ॥

আর্যের পৈতা তো জানি—শুদ্ধ মন প্রাণ।
য-ফলা পৈতায় তাঁর (j), কী বাড়িবে মান॥
আর "ত" দিলে, আত এ, ছাড়িবে আর্ত্তরব।
আর "দ" চাপাইলে পিঠে মরিবে গর্দ্দভ॥
আহার কমানো ভাল ক্ষুধা হ'লে দুষ্ট।
অর্দ্ধে দিয়া অর্দ্ধচন্দ্র অর্ধে থাকো তুষ্ট।
কর্কশ নিনাদে অ্যাকে কান ঝালাপালা।
দ্বিগুণ কর্কশ করি, বাড়ায়ো না জ্বালা॥
অর্চ্চনার ঘটা এ যে বড্ড জমকালো।
শুদ্ধমতি ভকতের অর্চনা-ই ভাল॥
অর্জ্জনের পেট ফুলি' হইয়াছে ঢাক।
কাজ নাই তাহাতে, "অর্জন" বেঁচে থাক্!
গর্ব গর্ভ চলন সবা'রই কিছু কিছু।
এ গর্ব্বগর্ভে'র মাথা হ'ল বোলে নীচু!
তিন শ'র তিন তরো উচ্চারণ খাঁটি।
আনাড়ি'র হাতে পড়ি' সব হৈল মাটি।
মুখোষের জনক পষ্টই মুখকোষ।
বাংলা অভিধানে ঢুকি' হয়েছে মুখোশ॥
খোলোষের জনক স্খলিত কোষ পষ্ট।
অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট।
লেখা আছে খোলশ, ওকারও নাই ল-য়ে।
দেখিয়া ভাষাবিদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলয়ে॥
আশ্রম-বেচারী পড়ি' এঁদের কবজে,
আষ্রম (Ashram) বনিয়া যায় ইংরাজি কাগজে॥
ভাষাবিদ্ বুধ-মাঝে যাঁহারা উত্তম
ইংরাজি সি-যোগে তাঁরা লেখেন আশ্রম (Acram)
আশ্রমের শ-এর যে করে শব্দ লোপ,
কেমনে এড়া'বে সে গো শঙ্করের কোপ॥
অ্যাতো শাস্ত্র জানেন জানেন না এটা কী?
আশ্রমের শ-দেবতা স্বয়ং পিনাকী!
ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত যে-সব বাঙ্গালী
জানেন সকলই তাঁরা! জানেন না খালি—
কা'কে বলে তালব্য মূর্দ্ধন্য কা'কে বলে।
খোষ'কে খোশা'ন্ তাই ষ'কে দিয়া জলে॥
ষ ভাসে চক্ষের জলে—এই হয় লভ্য।
"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলে শ তালব্য॥
জ্যেষ্ঠ শ মেঝোর মতো মূরধন্য না ত।
ছ যেমন শ তেমনি, দুই-ই তালু-জাত॥
মূর্দ্ধন্য ষ কোলে করি' সুখে থাক্ ষষ্ঠ
শ্রীনাথের শ'র গায়ে ছ'র ছায়া পষ্ট॥
শ্রীনাথকে বোল্যে ছিরু শুনায় না মন্দ।
ষিরু (Shiru) বলে মুখে যার বারুণীর গন্ধ॥
শ-ত্রয়ের উচ্চারণ কিরূপ কাহার—
শুনিবারে চাও যদি বলি শুন সার :—
দন্ত আর মূর্দ্ধ এই দুদিক্ সামলি,
উচ্চারিবে তালব্য শ মধ্যপথে চলি'॥
"সুশিষ্য", বোল্‌ব শুন্‌বে, বলি আমি কারে?
"সুশিষ্য" যে বিধিমতো উচ্চারিতে পারে॥
আমার যা বলিবার বলিলাম তাহা।
তোমরা না যদি বোঝো নাহি তবে রাহা!
বলিল মহাদিগ্‌গজ "সমস্তই বুঝি।"
উঠি দাঁড়াইয়া তবে বলিলা গুরুজি :—
না বুঝে "বুঝেছি" বলা মস্ত যাঁর রোগ,
যাচিয়া বুঝানো তাকে মিছে কর্ম্মভোগ
না যদি বোঝেন তিনি ক-খ শিখুন কাঁচি।
না যদি উল্টা বোঝেন, তা হ'লেই বাঁচি॥
শুভ হোক্। ফুরাইল বক্তব্য আমার।
আবার আসিব যবে ইচ্ছা হবে মা'র॥

হিত বাক্যের তিতো ফল

বর্ণমালি-ভিমরুলের বর্ণমালা-চাকে,
ঘা দিয়া একেলাচার্য্য বিধির বিপাকে,
ভুগিলা দ্বাদশ মাস যে ঘোর যাতনা—
আর কেহ হ'লে তাঁকে বাঁচিতে হ'ত না॥
একদা শিষ্যেরা আসি কৈলা নিবেদন :—
"বলিছে সভা'র মাঝে বর্ণমালি গণ
'অর্থ নাই ছাই ও কেবলি শব্দ-জাল!
পোছে না কেউ ওঁ'কে তাই ঝাড়িলেন ঝা'ল'॥"
এত শুনি' গুরুদেব বলিলা "বলুক্ তা!
ছড়ায়ো করেছি দোষ ব্যানাবনে মুক্তা॥"

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

যোগ

আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্ম্মসাধনার একটি বিশেষ প্রণালী ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটি বিশেষ দিক্ আমাদের পিতামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব সে একটি বিশেষ সম্পদ্, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের পক্ষেই।

বিজ্ঞানে সত্যসাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন করে' মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধি লাভ করচে, সন্দেহ নেই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পশ্চিমদেশবাসীরা নিজের অধ্যবসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করচেন তাঁরা কেবল নিজেদের নয় সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ শক্তি দান করচেন।

ভারতের যে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট হ'য়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব ভারতবাসীর আছে। যে-সাধনার ধারা ভারতের চিত্ত-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েচে, তাকে যদি মোহবশত লুপ্ত হ'তে দিই, তা হ'লে আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্যকে বঞ্চিত করব।

সাধারণত পশ্চিমের মানুষ বলে' থাকে—চলাটাই লক্ষ্য, পাওয়াটা লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিষ কিছু আছে কিনা সে-সম্বন্ধে সেখানে সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে নেওয়া, চল্‌তে চল্‌তে টুক্‌রো টুক্‌রো জিনিষ জমিয়ে তোলা, এইটে হচ্চে সেখানকার কথা। সেখানকার প্রধান বন্দোবস্ত রাস্তার বাতি জ্বালিয়ে চলা, ঘরের প্রদীপ জ্বালান নয়।

ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে' এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম



গান

মন চেয়ে রয়, মনে মনে
হেরে' মাধুরী।
চোখ দুটো তাই কাঙাল হয়ে
মরে না ঘুরি॥
চেয়ে চেয়ে, বুকের মাঝে
গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে
বাজ্‌ল বাঁশুরি;
রূপের কোলে ঐ যে দোলে
অরূপ মাধুরী॥
কুলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের' পরে।
হাতের ধরা ধর্‌তে গেলে
ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই
করিনে চুরি;
ধরা-দেওয়া ধন সে ত নয়—
অরূপ মাধুরী॥

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েচে—
আয় রে চলে'।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
হাওয়ার নেশায় উঠ্‌ল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে॥
মাঠের বাঁশি শুনে' শুনে'
আকাশ খুসি হ'ল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো,
খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠ্‌ল জেগে
ধানের শীষে শিশির লেগে,
ধরার খুসী ধরে নাগো, ঐ যে উথলে॥

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মনে রাখিও

বাঙ্গলা শঙ্করাচার্য্যের বিধান মানে না; বাঙ্গলা মিতাক্ষর মানে না; বাঙ্গলা যে জাত মানে ভারতের কোন হিন্দুসমাজ তা' মানে না; বাঙ্গলায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম, বাঙ্গলায় পরমহংস দেবের জন্ম; কর্ত্তাভজা, তন্ত্র, ব্রাহ্মধর্ম্ম এইসব বাঙ্গলারই সামগ্রী। বাঙ্গলার সাহিত্য জগৎ-বরেণ্য হইয়াছে; বাঙ্গলার সর্ব্বতোমুখী মেধা ভুমিরায় ঈর্ষার বস্তু হইয়াছে। বেদান্তের গৌরব যে আজ জগতের সমক্ষে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালীরই কীর্ত্তি।

বাঙ্গলার ধর্ম্ম বলিতে যা-কিছু তাহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি, সে তাহা কাহারও কাছে ধার করে নাই; যেখানে ধার করিয়াছে, সে নিজের মতো করিয়া অদল বদল করিয়া তবে প্রয়োগ করিয়াছে।

চিরদিন বাঙ্গালী তাহার এই বিশেষত্ব রাখিয়া চলিবে, তাহাতে কেহ সন্তুষ্টই হউক আর অসন্তুষ্টই হউক, কেননা সে ত আপনার হারাইতে পারে না। তাহার বিশেষত্ব হারাইলে সে মরিবে।

বাঙ্গলার হিন্দু, ভারতীয় হিন্দু হইতে ভিন্ন; ভারতীয় হিন্দু বহুকাল হইতে তাহাকে একঘরে করিয়াছে, বাঙ্গালীও ভারতের হিন্দুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছে। বাঙ্গালী এই পার্থক্যের চিহ্নস্বরূপ বহুদিন হইল তাহার টিকি কাটিয়া ফেলিয়াছে। শুধু চীনে নহে ভারতবর্ষেও টিকি দাসত্বের চিহ্ন; চীনে হয়ত টিকি মান্দারিনের দাসত্বের পরিচায়ক—ভারতবর্ষে টিকি শঙ্করমঠের দাসত্বেরপরিচায়ক—সে চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া বাঙ্গলার হিন্দুচিরদিন স্বাধীন।

এই কথা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সকলকেই মনে রাখিতে বলি। ভিন্ন প্রদেশের কোন হিন্দুর ধর্ম্মনেতৃত্ব বাঙ্গালী মানিবে না, ভূঁইয়ার ব্রাহ্মণ জমিদারের কথা দূ'রে।

(প্রবর্ত্তক, পৌষ) শ্রী চারুচন্দ্র রায়

বর্ণমালার অব্যবস্থা

বর্ণমালা ভায়াদের বিদ্যা গো অগাধ!
আবর্জ্জনা জড়া'বার প্রধান ওস্তাদ॥
কর্ম্মকার্য্যটিকে করি' কর্ম্মকার্য্য মস্ত।
বিদ্যা ফলাবার পথ করেন প্রশস্ত॥
"বর্ধন" বেরোলে মুখে (মায়া নাই মোটে!)
বর্দ্ধন করেন তা'কে চাবুকের চোটে॥
"কোনো জন" লিখিতে হইলে প্রয়োজন,
"কোন জন" লেখেন, বলেন "কোনো জন"।
হাত তাঁদের ব্যস্ত করে লিখ্‌তে যেন "কোনো"।
এসেছেন গুরুদেব, কী বলেন শোনো॥

নেপথ্যে॥ গৃহে যাঁনি ছুলি সবাই স্ব স্ব।
গাধাকে পিটিলে হবে না অশ্ব॥
"অবশ্য হবে" বলিয়া গুরু
সেরা উপদেশ করিলা সুরু॥

ভাবাচার্য্যের উপদেশ।

লিখেছ তো ঢের পুঁথি—প'ড়েছ বিস্তর।
তেলা শিরে দিচ্ছ তেল—এ কোন্ শাস্তর॥
কর্মের ম-রে মফলা অকর্ম্মের শেষ।
কার্যের য-রে যফলা অকার্য্য বিশেষ॥

আর্যের পৈতা তো জানি—শুদ্ধ মন প্রাণ।
য-ফলা পৈতায় তাঁর (য), কী বাড়িবে মান ॥
আর "ত" দিলে, আত এ, ছাড়িবে আর্ত্তরব।
আর "দ" চাপাইলে পিঠে মরিবে গর্দ্দভ ॥
আহার কমানো ভাল ক্ষুধা হ'লে দুষ্ট।
অর্দ্ধে দিয়া অর্দ্ধচন্দ্র অর্ধে থাকো তুষ্ট।
কর্কশ নিনাদে অ্যাকে কান ঝালাপালা।
দ্বিগুণ কর্ক্শ করি, বাড়ায়ো না জ্বালা ॥
অর্চ্চনার ঘটা এ যে বড্ড জম্‌কালো।
শুদ্ধমতি ভকতের অর্চনা-ই ভাল ॥
অর্জ্জনের পেট ফুলি' হইয়াছে ঢাক।
কাজ নাই তাহাতে, "অর্জন" বেঁচে থাক্‌!
গর্ব গর্ভ চলন সবা'রই কিছু কিছু।
এ গর্ব্বগর্ব্ভের মাথা হ'ল বোলে নীচু!
তিন শ'র তিন তরো উচ্চারণ খাঁটি।
আনাড়ি'র হাতে পড়ি' সব হৈল মাটি।
মুখোষের জনক পষ্টই মুখকোষ।
বাংলা অভিধানে ঢুকি' হয়েছে মুখোশ ॥
খোলোষের জনক খলিত কোষ পষ্ট।
অভিধানে ঢুকি, তার জাতি হ'ল নষ্ট।
লেখা আছে খোলশ, ওকারও নাই ল-য়ে।
দেখিয়া ভাষাবিদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলয়ে ॥
আশ্রম-বেচারী পড়ি' এঁদের কবজে,
আষ্‌রম (Ashram) বনিয়া যায় ইংরাজি কাগজে ॥
ভাষাবিদ্ বুধ-মাঝে যাঁহারা উত্তম
ইংরাজি সি-যোগে তাঁরা লেখেন আশ্রম (Acram)
আশ্রমের শ-এর যে করে শত্ব লোপ,
কেমনে এড়া'বে সে গো শঙ্করের কোপ ॥
অ্যাতো শাস্ত্র জানেন জানেন না এটা কী?
আশ্রমের শ-দেবতা স্বয়ং পিনাকী!
ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত যে-সব বাঙ্গালী
জানেন সকলই তাঁরা! জানেন না খালি—
কা'কে বলে তালব্য মূর্দ্ধন্য কা'কে বলে।
খোষ'কে খোশা'ন্ তাই ষ'কে দিয়া জলে ॥
ষ ভাসে চক্ষের জলে—এই হয় লভ্য।
"ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলে শ তালব্য ॥
জ্যেষ্ঠ শ মেঝোর মতো মুরধন্য না ত।
ছ যেমন শ তেমনি, দুই-ই তালু-জাত ॥
মূর্দ্ধন্য ষ কোলে কয়ি' সুখে থাক্ ষষ্ঠ
শ্রীনাথের শ'র গায়ে ছ'র ছায়া পষ্ট ॥
শ্রীনাথকে বোল্যে ছিরু শুনায় না মন্দ।
ষিরু (Shiru) বলে মুখে যার বারুণীর গন্ধ ॥
শ-য়েদ্যের উচ্চারণ কিরূপ কাহার—
শুনিবারে চাও যদি বলি শুন সার:—
দন্ত আর মূর্দ্ধ এই দুদিক্ সামলি,
উচ্চারিবে তালব্য শ মধ্যপথে চলি' ॥
"সুশিষ্য", বোল্‌ব শুন্‌বে, বলি আমি কারে?
"সুশিষ্য" যে বিধিমতো উচ্চারিতে পারে ॥
আমার যা বলিবার বলিলাম তাহা।
তোমরা না যদি বোঝো নাহি তবে রাহা!
বলিল মহাদিগ্‌গজ "সমস্তই বুঝি!"
উঠি দাঁড়াইয়া তবে বলিলা গুরুজি:—
না বুঝে "বুঝেছি" বলা মস্ত যাঁর রোগ,
যাচিয়া বুঝানো তাকে মিছে কর্ম্মভোগ
না যদি বোঝেন তিনি ক-খ শিখুন কাঁচি।
না যদি উল্টা বোঝেন, তা হ'লেই বাঁচি ॥
শুভ হোক্। ফুরাইল বক্তব্য আমার।
আবার আসিব যবে ইচ্ছা হবে মা'র ॥

হিত বাক্যের তিতো ফল

বর্ণমালি-ভিমরুলের বর্ণমালা-চাকে,
ঘা দিয়া একেলাচার্য্য বিধির বিপাকে,
ভুঞ্জিলা দ্বাদশ মাস যে ঘোর যাতনা—
আর কেহ হ'লে তাঁকে বাঁচিতে হ'ত না ॥
একদা শিষ্যেরা আসি কৈলা নিবেদন:—
"বলিছে সভা'র মাঝে বর্ণমালি গণ
'অর্থ নাই ছাই ও কেবলি শব্দ-জাল!
পোছে না কেউ ওঁ'কে তাই ঝাড়িলেন ঝা'ল' ॥"
এত শুনি' গুরুদেব বলিলা "বলুক্ তা।
ছড়ায়ে করেছি দোষ ব্যানাবনে মুক্তা ॥"

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, পৌষ) শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

যোগ

আমাদের দেশের সাধকেরা ধর্ম্মসাধনার একটি বিশেষ প্রণালী ও লক্ষ্য অবলম্বন করেছিলেন। আধ্যাত্মিক সত্যের একটি বিশেষ দিক্ আমাদের পিতামহদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। অতএব সে একটি বিশেষ সম্পদ্, কেবল আমাদের পক্ষে নয়, সকল মানুষের পক্ষেই।

বিজ্ঞানে সত্যসাধনার একটি বিশেষ পন্থা আছে। এই পন্থা অবলম্বন করে' মানুষ একটি বিশেষ সিদ্ধি লাভ করচে, সন্দেহ নেই। অতএব এই বিজ্ঞানের পন্থাকে যে পশ্চিমদেশবাসীরা নিজের অধ্যবসায় দ্বারা প্রশস্ত ও বাধামুক্ত করচেন তাঁরা কেবল নিজেদের নয় সমস্ত মানুষকে একটি বিশেষ শক্তি দান করচেন।

ভারতের যে পন্থা তারও একটি সিদ্ধি আছে। অতএব সচেষ্ট হ'য়ে এই পন্থাকে নিরন্তর প্রশস্ত রাখার একটি বিশেষ দায়িত্ব ভারতবাসীর আছে। যে-সাধনার ধারা ভারতের চিত্ত-শিখর থেকে প্রবাহিত হয়েচে, তাকে যদি মোহবশত লুপ্ত হ'তে দিই, তা হ'লে আমরা নিজে বঞ্চিত হব, অন্যকে বঞ্চিত করব।

সাধারণত পশ্চিমের মানুষ বলে' থাকে—চলাটাই লক্ষ্য, পাওয়াটা লক্ষ্য নয়। চরম পাবার জিনিস কিছু আছে কিনা সে-সম্বন্ধে সেখানে সন্দেহ রয়ে গেছে। দিনের মজুরী দিনে দিনে চুকিয়ে নেওয়া, চল্‌তে চল্‌তে টুক্‌রো টুক্‌রো জিনিষ জমিয়ে তোলা, এইটে হচ্চে সেখানকার কথা। সেখানকার প্রধান বন্দোবস্ত রাস্তায় বাতি জ্বালিয়ে চলা, ঘরের প্রদীপ জ্বালান নয়।

ভারতে এই চলমান সংসারের অন্তরে একটি পরম সত্যকে স্বীকার করা হয়েছিল এবং সেই সত্যকে নিজের মধ্যে পাওয়াই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে' এখানে গণ্য হয়েছে। এই পরম

সত্যে পৌঁছবার যে প্রণালীটি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছিল সেটি কি? এক কথায় তাকে নাম দেওয়া হয়েছে যোগ।

ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতচিত্তে বিশেষ অভিমুখিতা যে কি তা এই যোগ শব্দের দ্বারাই জানা যায়; সেই কথাটাকে একটু স্পষ্ট করে' বুঝে' নেওয়া চাই।

যে-সত্যকে মানুষ সাধারণত ঈশ্বর নাম দিয়ে থাকে সেই সত্যের সঙ্গে সম্বন্ধস্থাপনের বিধিকেই আমরা ধর্ম্ম বলি।

কোনো কোনো ধর্ম্মে বলে এই সম্বন্ধের বিশুদ্ধতা অনুসারে আমরা বিশেষ পুরস্কার পেয়ে থাকি। সেই পুরস্কারকে কখনো পুণ্য বলি, স্বর্গ বলি, কখনো পরিত্রাণ বলি। যাই বলি না কেন, এর একটা বাহ্য মূল্য আছে।

ঈশ্বর বিধাতা, তাঁর বিধান পালন করার দ্বারা আমরা তাঁর প্রসন্নতা পাই, সেই প্রসন্নতায় আমাদের কল্যাণ। অতএব বিধাতার বিধানপালনে যে ধর্ম্ম সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় করবার একটা হিসাব পাওয়া গেল।

এই পন্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের পন্থার এক জায়গায় মিল আছে। বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ এই যে, বিশ্বের অমোঘ নিয়মগুলিকে যদি আমরা জানি এবং তাদের যদি মানি তা হ'লে আমরা শক্তিলাভ করি, ঐশ্বর্য্য লাভ করি। নিয়মের জগতে নিয়ন্তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্চে দণ্ড-পুরস্কারের ভয়ে ও লোভে দেওয়া ও পাওয়ার সম্বন্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দেওয়া-পাওয়া হচ্চে বস্তুনীতিগত, আর ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে সেটা কর্ত্তব্যনীতিগত। ধর্ম্মবিহিত এই কর্ত্তব্যনীতি কোথাও বা শাশ্বত সত্যের অনুগত কোথাও বা কৃত্রিম আচারগত। যেখানে তা শাশ্বত সত্যের বিরোধী নয় সেখানে মানুষ তা' পালন করে' কল্যাণ লাভ করে; যেখানে তা কৃত্রিম আচারমাত্র সেখানে তাকে আশ্রয় করে' মানুষ দুর্গতির জালে জড়িয়ে পড়ে; আমাদের দেশে পদে পদে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী তার প্রমাণ পেয়ে আসচি। এই আচারকে ধর্ম্ম বলা, আর জাদুবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা একই কথা।

কিন্তু ভারতবর্ষ যাকে পরম সত্য বল্‌চে, যাতে উত্তীর্ণ হবার প্রণালী হচ্চে যোগ, তার সঙ্গে পাওয়ার সম্বন্ধ নেই হওয়ার সম্বন্ধ। বস্তুত সত্য হওয়া ছাড়া সত্যকে পূর্ণভাবে পাওয়ার কোনো অর্থই থাকে না।

বিধাতাকে প্রসন্ন করার সাধনায় একটি কর্ত্তব্যনীতির পদ্ধতি আছে। কিন্তু যোগের মধ্যে সেই কর্ত্তব্যনীতির কাজ কোথায়?

কাজ আছে; যোগ মানে বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেওয়া। কোন্ ব্যবধান বিচ্ছেদ আনে? রিপুর ব্যবধানে। কাম ক্রোধ লোভ-মোহকে ঘুচিয়ে ফেল্‌তে পার্‌লে তবেই সত্যের পূর্ণতাকে নিজের মধ্যে পাওয়া সম্ভব। পাপ যে পাপ তাহার প্রধান কারণ হচ্চে মানুষের সত্য হওয়ার পক্ষে পাপই প্রধান বাধা। পাপ হচ্চে সেই অবরোধ যার দ্বারা আমার আমি স্রোতে আটকা পড়ে' বিশ্বের পথে অসীমের অভিমুখে যেতে পারে না, মানুষ যোগ থেকে ভ্রষ্ট হয়। যেহেতু পরম সত্যের মধ্যে মানুষকে সম্পূর্ণ সত্য হ'তে হবে এই-জন্য মানুষের পাপমুক্ত হওয়া চাই।

মানুষের দুটো দিক্। একদিকে সে স্বতন্ত্র, আর একদিকে সে বিশ্বতন্ত্র। আহারে-ব্যবহারে-সঞ্চয়ে কর্ম্মচেষ্টায় এই স্বাতন্ত্র্য আমাকে বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। একে বাঁচাতে গেলে বিশ্বের নিয়মকে মানা চাই। নইলে চারিদিকের টানে ধূলিসাৎ হ'তে হবে। এই নিয়মকে আপনার আয়ত্ত করে' স্বাতন্ত্র্যকে বলিষ্ঠ করে' তোলা য়ুরোপের স্বভাবগত। এ'তে বিশ্বনিয়মের সঙ্গে ক্রমাগত তাকে বোঝাপড়া করতে হয়।

ভারতবর্ষ সত্যের সেই দিকে ঝোঁক দিয়েচে যে-দিকে মানুষ বিরাট্। এই যে বিশ্বের মধ্যে আমি বিরাজ করচি এ'কে যে পরিমাণে আপন না করব সেই পরিমাণেই আমি অসত্য থাকব। সমস্তের মধ্যে প্রবেশ করে' তবে আমার পূর্ণতা হবে।

সেই প্রবেশের মানে এই নয় যে, আয়তনের দ্বারা বিশ্বকে অধিকার করা। সেই আয়তনের দিকে সীমার কোথাও শেষ নেই। বস্তুত অফুরান সীমা অসীম নয়। বিশ্বের সত্যের মধ্যে প্রবেশই বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ।

একখানা গ্রন্থকে তার বস্তুপরিমাণ আর শব্দ-পরিমাণের দ্বারা পরিমাপ করতে গেলে সেই বোঝা দুঃসাধ্য বৃহৎ হ'য়ে পড়ে। তার মূল-তত্ত্বটির রস পাবামাত্র সমস্তই পাওয়া যায়।

যা-কিছু সমস্তর মধ্যে এই প্রবেশের প্রয়াস ও প্রণালী হচ্চে যোগ। কিন্তু পূর্ব্বেই আভাস দিয়েচি সমস্ত মানে সমষ্টি নয়। তাকে ওতপ্রোত করে' এবং অতিক্রম করে' যে সত্য বিরাজ করে সেই ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশই যোগের লক্ষ্য।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

এই যে যোগ এ মনের কর্ম্ম নয়। মন আপনার সঙ্গে পরের ভেদ ঘটিয়ে সংসার-যাত্রার কাজ চালায়। যোগসাধনার প্রধান অঙ্গই হচ্চে মনকে ভোলা। যারই সঙ্গে যোগে মনের ব্যবধান ঘুচে' যায় তারই সম্বন্ধে আত্মার গভীর আনন্দ ঘটে। কারণ আত্মা বাধামুক্তরূপে সেখানে আপনাকে প্রসারিত করে।

নিজেরই সামান্য অভিজ্ঞতা দ্বারা এটা দেখা গেছে যে, সম্মুখবর্ত্তী কোন একটি গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে এক-এক সময়ে গাছের সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তার ভেদ যেন লুপ্ত হ'য়ে যায়। সেই অবস্থা অচৈতন্যের অবস্থা নয়, কিন্তু নিবিড় চৈতন্যের আনন্দময় অবস্থা। গাছের তথ্যঘটিত বিচার তখন প্রবল থাকে না। তখন আমার মধ্যে যে একটি "আছি" আছে, সেই "আছি" গাছের মধ্যে সমতান হয়ে বাজে। তার আনন্দ হচ্চে সত্যকে আপন করার আনন্দ।

আত্মার এই যোগের পথে মনকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়। কোনো কিছু অর্জ্জনে মন কর্ত্তা নয়; উপলব্ধিতে মন কর্ত্তা। যাকে আমরা বাইরে রাখি তাই অর্জ্জন, যা অন্তরের জিনিষ তাই উপলব্ধি। এই অর্জ্জনের রাজ্য হচ্চে অঙ্কশাস্ত্রের রাজ্য। এখানে সংখ্যা এবং আয়তন এবং ওজন। এখানে সংগ্রহ এবং সঞ্চয় কেবলি পরিমাণের পথে এগোতে থাকে। কোথাও তার পর্য্যাপ্তি নেই। সেখানে শত যে সে দশশতের এবং দশশত লক্ষের দিকে অন্ধের মত চল্‌তে থাকে।

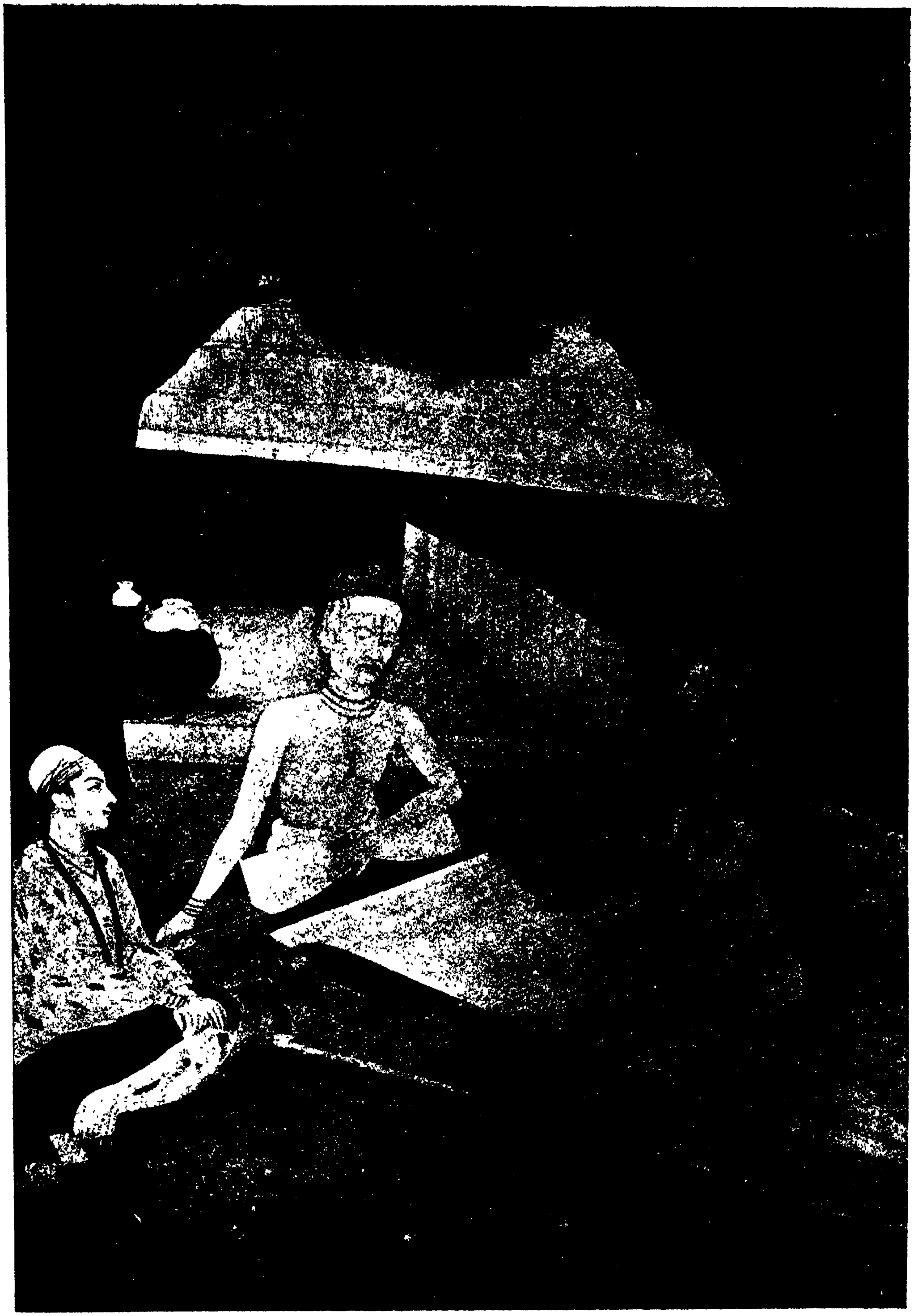
উপলব্ধির রাজ্য হচ্চে পরিমিতির অতীত রাজ্য। এইজন্য সেখানে পৌঁছনর মধ্যে সমাপ্তি আছে, অথচ সমাধা নেই। সেখানে আত্মা আপন পূর্ণতার স্বাদ পায়। এই পূর্ণতার অব্যবহিত অনুভূতিই আনন্দ। তাই কথা উপনিষদে বলেচে—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

(শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, পৌষ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামায়ণে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় জ্ঞান

রোগের সহিত চিকিৎসার সম্বন্ধ। রোগের প্রকার আধুনিক কালে যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রাচীন কালে তত ছিল না। প্রাচীন সাহিত্যে অকাল মৃত্যুর কথা খুব অল্প পাওয়া যায়। রামায়ণে মাত্র একটি স্থানে অকাল মৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে, তাহা রাজা দশরথের বাণে অন্ধ মুনির পুত্রের ঘটিয়াছিল।



কবীর (প্রাচীন চিত্র)

শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ মহাশয়ের সৌজন্যে

U. RAY & SONS CALCUTTA.

"রাজার দোষেই অকাল মৃত্যু ঘটে" দশরথের এই কৃত ঘটনাটি হইতেই—এই প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি কিনা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

সে-কালে যে লোক দীর্ঘজীবী হইত এবং সমাজ যে রোগ-শোক-প্রপীড়িত ছিল না, তাহা রামায়ণের নানা বিষয়ের বর্ণনাতেই অবগত হওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে মানুষের পরমায়ুর পরিমাণ সম্বন্ধে অনেক আজগুবী কথা জনশ্রুতিতে যেমন আছে ধর্ম্মগ্রন্থাদিতেও তেমন প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত আছে।

আমাদের পঞ্জিকাসমূহে লিখিত আছে, ত্রেতা যুগে মানব-দেহের আকার ছিল—চতুর্দ্দশ হস্ত পরিমিত, আর সেই দেহের আয়ুর পরিমাণ ছিল—দশ সহস্র বর্ষ। রামায়ণেরও বহু স্থলেই এরূপই সহস্র সহস্র বর্ষের উল্লেখ আছে। বাইবেলের আদিপুস্তকেও এইরূপ আছে। আমাদের পুরাণসমূহেও আছে।

বৈদিক সাহিত্যের আলোচনায় এবং রামায়ণের আদিস্তরের আলোচনায় কিন্তু সাধারণ মানব যে এক দেহে এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে তাহা অবগত হওয়া যায় না।

চতুর্দ্দশ হস্ত দীর্ঘও যে মানব-দেহ থাকিতে পারে, তাহাও শোনা যায় না। রাম খুব দীর্ঘ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বাহু 'আজানুলম্বিত' ছিল এবং পরিমিত হস্তে তিনি চার হাত দীর্ঘ ছিলেন। হনুমান অশোক-বনে সীতার নিকট তাঁহার শরীর-বিভাগের যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—"চতুষ্কলশ্চতুর্লেখশ্চতুষ্কশ্চতুঃ সমঃ"।—১৮।৫।৩৫।

বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ্ রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যে শত বৎসরই দীর্ঘ জীবনের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঋগ্বেদে হিম শরৎ বসন্ত প্রভৃতিকে বর্ষ অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবং মনুষ্যের দীর্ঘ জীবনের আভাস এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ—১।৬৪।১৪।

আমরা যেন শতবর্ষজীবী পুত্র পোষণ করি।

ধত্তেশতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ।

জীবেমঃ শরদঃ শতম্।

"দাতা শতং জীবতু"। ইত্যাদি।

এইরূপ শতবর্ষ পরমায়ু নির্দ্দেশের আভাস আছে। রামকে দশরথ রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, এই সংবাদ মন্থরা নিতান্ত ভগ্ন-হৃদয়ে কৈকেয়ীকে প্রদান করিলে কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন :—

সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্। ১৫

ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবম্ বর্ষশতং পরম।

পিতৃ পৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ॥ ১৬

সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে।

ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে॥ ১৭।২।৮

কুব্জে তুমি দুঃখিত কেন? ভরতও যে শত বর্ষ পরে পিতৃ-পিতামহ-গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন, ভাবী কল্যাণের নিদানস্বরূপ এই সুখকর ব্যাপার উপস্থিত; তুমি পরিতাপ করিতেছ কেন?

অন্যত্র, সীতা রামের সংবাদ অবগত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে হনুমানকে বলিয়াছিলেন :—

"এতি আনন্দো নরং বর্ষশতাদপি"। ৬। সু ৩৪

মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে শত বর্ষের পরেও আনন্দ অনুভব করে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ দেখিতে পাওয়া যায়—ইতরার পুত্র মহিদাস মৃত্যুকে ধিক্কার দিয়া ১০৬ বৎসরকেই খুব দীর্ঘায়ু বলিয়া মনে করিতেছেন। ৩।১৬।৭

রামায়ণে যে দশসহস্র বর্ষকাল রাম জীবিত থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক যুগের প্রক্ষিপ্ত। শত বর্ষে মৃত্যু হওয়াই তখন কাল-মৃত্যু ছিল।

সাধনা দ্বারা এখনও যেমন লোক দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে, তখনও তাহা পারিত। সাধক জীবনের সহিত সাধারণ জীবনের পার্থক্য সকল কালেই আছে, সকল দেশেই আছে।

শত বৎসরের পূর্ব্বে মৃত্যুকে সেকালে অকাল মৃত্যু বলিত। যুদ্ধাদি ব্যতীত বা দৈব ঘটনা ব্যতীত তখন অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বোধ হয় খুব অল্প ছিল।

সেকালে যে ব্যাধি ছিল না, তাহা নহে; সামান্য সামান্য ব্যাধিও ছিল, সামান্য সামান্য বৈদ্যও ছিল। আর একটি এমন সাধারণ শরীর উপসর্গ যাহা শারীর ধর্ম্মের ব্যত্যয় হইলেই প্রকাশ পাইতে পারে। এই শব্দটির উল্লেখ রামায়ণে আছে। যদিও যে স্থানে আছে, তাহা মানুষের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। যথা :—

"জ্বরাতুরো নাগইব ব্যথাতুর॥"

"কামজ্বরের" উল্লেখও রামায়ণে আছে।

ব্যাধি ও বৈদ্যের উল্লেখ রামায়ণে এইরূপভাবে আছে। কৈকেয়ী ক্রোধাগারে আশ্রয় লইলে রাজা দশরথ তাঁহাকে ক্রোধের কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছেন—

ভূমৌশেষে কিমর্থং ত্বং ময্যকল্যাণ-চেতসা।

ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনী॥ ২৯

সান্তনে কুশলা বৈদ্যাস্তভিতুষ্টাশ্চ সর্ব্বশঃ।

সুখিতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষ্ব ভামিনি॥ ৩০।২।১০

অর্থ :—কেন তুমি ভূতাবিষ্টের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া আছ? যদি তোমার কোন ব্যাধি হইয়া থাকে, বল, আমার গৃহে অনেক সুদক্ষ বৈদ্য আছে, তাহারা তোমাকে আরোগ্য করিবেন।

ভূতাবেশের বিশ্বাস যে অতি প্রাচীন, রাজা দশরথের এই উক্তি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

লঙ্কাবাসীরাও সন্ধ্যার পর একটা পিঙ্গলবর্ণ বিকটাকার পুরুষের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইত। (স ৩৫)

রামায়ণে অস্ত্র-চিকিৎসা প্রচলনের যে সামান্য আভাস আছে তাহা এইরূপ; সীতা অশোক বনে বন্দিনী অবস্থায় বলিতেছেন—

তস্মিন্নরনা গচ্ছতি লোকনাথ গর্ভস্থজন্তোরিব শল্যকৃন্তঃ।

নুনঃ মমাঙ্গান্ চিরাদন ঘঃ শৈঃশিতৈশ্ছেৎস্যতি রাক্ষসেন্দ্র॥ ৬।৪।২৮

রাবণ আমাকে যে সময় দিয়াছেন, যদি এই সময় মধ্যে লোকনাথ রাম আসিয়া আমাকে উদ্ধার না করেন, তবে প্রসূতিকে রক্ষা করিবার জন্য শাণিত অস্ত্র দ্বারা যেরূপ গর্ভস্থ জ্রূণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করা হয়, রাক্ষস জীবিতাবস্থায় আমার সেই অবস্থা করিবে।

সীতার এই উক্ত হইতে গর্ভস্থ শিশুকে অস্ত্র-সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিয়া যে প্রসূতিকে রক্ষা করিবার বিধান অতি প্রাচীন সমাজেও প্রচলিত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ প্রাচীন অস্ত্র চিকিৎসার উল্লেখ আমরা সুশ্রুতেও দেখিতে পাই। সুশ্রুত গ্রীক্ আক্রমণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সুশ্রুত অপেক্ষা চরক প্রাচীন। কিন্তু এই দুইখানা গ্রন্থের কোন খানারই আভাস রামায়ণে নাই।

যাঁহারা মনে করেন, সুশ্রুতের শল্যশাস্ত্রের আলোচনা গ্রীক্ প্রভাবের ফল, তাঁহারা রামায়ণের এই উল্লেখটির বিষয়েও একটু লক্ষ্য করিবেন।

শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে সেকালে কোন আলোচনা হইত না তাহা মনে হয় না।

যকৃৎপ্লীহং মহৎ ক্রোড়ং হৃদয়ঞ্চ সবন্ধনম্। ৪০।৫।২৪, ইত্যাদি উক্তি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে কোথায় কোনটির স্থান তাহা নির্দ্দেশ করা তখন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

কোন ব্যাধির নাম ও তাহার কোন ঔষধের উল্লেখ রামায়ণে বিশেষ নাই। ঔষধির মধ্যে মৃত-সঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী অমৃত ইত্যাদি কয়েকটি ঔষধের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অমৃত পানে মানুষ দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিত। বিশল্যকরণী দ্বারা বোধ হয় রক্তস্রাব বন্ধ করা ও ঘা শুষ্ক করান হইত। লক্ষণের শক্তিশেলাঘাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মড়কের কথা উপমাস্থলে এক স্থানে রামায়ণের আছে। (অ ৪৮)

রামায়ণে ধাতু হইতে কোন ঔষধ ব্যবহারের উল্লেখ একেবারেই নাই।

রামায়ণে সৌপর্ণ বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই সৌপর্ণ সাধনায় চক্ষুর দিব্য জ্যোতি লাভ হইত। সম্প্রতি এই সাধনা-প্রভাবে দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। (কি ৫৯)

আত্মহত্যার চিন্তা তখনও সমাজে ছিল। শোক-দুঃখে ইহা স্বাভাবিক চিন্তা এবং অতি প্রাচীন চিন্তা।

স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্‌ধাবনকারী রামের আর্ত্তস্বর শুনিয়া সীতা লক্ষ্মণকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিয়া শেষে বলিয়াছিলেন ঃ—

গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষণ।
অবন্ধিষ্যেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমেদেহমাত্মনঃ॥ ৩৭
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। আ—৪৫

জল অনল উদ্‌বন্ধন ও বিষ এই কয়টিই আত্মহত্যা সাধনের উপায় বলিয়া সীতার মুখে কবি দেখাইয়াছেন।

হনুমান ও সীতা অন্বেষণে নিরাশ হইয়া এইরূপ চিন্তাই করিয়াছিল। যথা—

বিষমুদ্বন্ধনং বাপি প্রবেশং জ্বলনস্য বা।
উপবাসমথো শস্ত্রং প্রচরিষ্যন্তি বানরাঃ। ৩৬।৫।১৩

এখানে উপবাস এবং শস্ত্র প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়।

জল অগ্নি ও অনশন আশ্রয়ে ঋষিরাও যে দেহ ত্যাগ করিতেন, তাহা আমাদের শাস্ত্রে আছে। উহাকে শাস্ত্রে আত্মহত্যা বলা হয় নাই; ইচ্ছা-মৃত্যু বলা হইয়াছে। শরভঙ্গ ও মাতঙ্গশিষ্যগণের অগ্নিতে প্রবেশের কথা রামায়ণে আছে। তাহা এইরূপ ইচ্ছা-মৃত্যু। এইরূপ ইচ্ছা মৃত্যুর উপদেশ এক বিধবা গৃহস্থ বধুকেও পদ্মপুরাণকার দিয়াছেন। (পদ্মপুরাণ, পাতাল, ৬৫।৬৯ শ্লোক।)

রামায়ণে "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের উল্লেখ আদিকাণ্ডের ৪৫ সর্গে আছে। ইহা পৌরাণিক সাগর মন্থনসম্বন্ধীয় একটি পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়। ইহার আলোচনা প্রক্ষিপ্ত-নির্দ্দেশ অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

(সৌরভ, পৌষ) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার

বাংলা ছন্দ ও সঙ্গীত

যতি ও তাল

এক্ষণে আমরা যতিও তাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বল্‌ব। কবিতায় বা গানে সুরের ক্ষণিক নিস্তব্ধতাকেই যতি বা বিরাম বলে,—জিহ্বা যেখানে স্বভাবতই একটু বিশ্রাম করে তা'কে যতি বলে। "যতি র্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানম্" (ছন্দোমঞ্জরী)। প্রথমেই একটা কথা মনে রাখা দর্‌কার যে ধ্বনির বা সুরের বিরাম হ'লেও কালের বিরাম হয় না, কাল চল্‌তেই থাকে। সুতরাং বর্ণকে আশ্রয় করে' যে ধ্বনি প্রবাহিত হ'তে থাকে শুধু তারই যে মাত্রা বা কাল-পরিমাণ আছে তা নয়, যতির ও মাত্রা বা কাল-পরিমাণ আছে। কিন্তু কাব্যছন্দে এ যতি বা বিরামকালের হিসাব রাখা নিষ্প্রয়োজন; কাজেই কাব্যে যতির মাত্রা-পরিমাণ গণ্য করা হয় না। কিন্তু যাঁরা নূতন নূতন ছন্দ রচনা করেন তাঁদের পক্ষে ধ্বনিতত্ত্বের এসব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন; তাতে নব নব ছন্দ উদ্ভাবনার সহায়তা হয়। সাধারণভাবে ছন্দের আলোচনার ক্ষেত্রে এসব সূক্ষ্ম হিসাব রাখ্‌তে হয় না বটে; নূতন নূতন সৃষ্টি কর্‌তে গেলেই এসব সূক্ষ্মতত্ত্বের সংবাদ রাখা প্রয়োজন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যথা—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল পর টানি দিল ঝিল্লীস্বর
ঘন যবনিকা।

—রবীন্দ্রনাথ

উদ্ধৃত শ্লোকটি পড়্‌লেই বোঝা যায় যে একটি পাদের আবৃত্তি শেষ হ'য়ে গেলে আরেকটি পাদ সুরু করা পর্য্যন্ত খানিকক্ষণ থেমে থাকৃতে হয়, এ সময়টুকুই ধ্বনি-বিরতি বা যতির মাত্রা-পরিমাণ। কিন্তু কবিতায় এ সময়টুকুর হিসাব রাখার বিশেষ প্রয়োজন নেই, যদিও গানে তার স্বার্থকতা যথেষ্ট আছে। অবশ্য কবিতায়ও এই যতিটুকু ধ্বনির চাইতে এতটুকু কম প্রয়োজনীয় নয়, এই যতি ও গতিকে নিয়েই সমগ্র কবিতাটার সার্থকতা। কারও প্রয়োজনীয়তা কম নয়। তবে কবিতায় যতিকালটুকুর হিসাব না রাখ্‌লেও চলে, ধ্বনির গতির হিসাব

রাখ্‌লেই—বিরতি আপনি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যায়। কিন্তু গানে সুরের স্থায় সুরের বিরামের দিকেও যথেষ্ট সতর্ক থাক্‌তে হয়, এইটুকু আমার বক্তব্য। দ্বিতীয়ত উপরের কবিতাটি থেকেই বোঝা যাবে যে কবিতায়ও যতি সর্ব্বত্র সমান নয়, কোথাও তার স্থিতি-কাল কিছু বেশী; কোথাও কিছু কম। উপরের কবিতাটিতেই প্রত্যেক পংক্তিতে প্রথম দুটো যতিতে যতক্ষণ থামতে হয় তৃতীয় যতিতে তার চেয়ে বেশী থামতে হয়। এরূপ সর্ব্বত্রই দেখা যাবে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিই। যথা—

সংসারে সবাই যবে | সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা | পলাতক বালকের মত—
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে | একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর-বনগন্ধবহ | মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি ! | —ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? | কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎজনে ? | কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল ? | কোন অন্ধ কারা-মাঝে। জর্জ্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায় ? , স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হ'তে | রক্ত শুষি' করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া।

—রবীন্দ্রনাথ

এ পংক্তিগুলি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। এখানে কোথাও চার, কোথাও ছ', কোথাও আট এবং কোথাও দশ অক্ষরের, পরে যতি পড়েছে। এরকম যুগ্মসংখ্যক বর্ণের পরে যতি পড়াই এ ছন্দের প্রকৃতি। আরো দেখা যায় প্রত্যেক পংক্তির অন্তেই যতি বা বিরাম আছে; শুধু অক্ষরবৃত্ত কেন প্রত্যেক ছন্দেই পংক্তিশেষে যতিপড়া অনিবার্য্য, নতুবা ছন্দ রচনাই হয় না। পংক্তি শেষের যতি কোনো চিহ্নে চিহ্নিত করিনি, কিন্তু পংক্তি-মধ্যস্থ যতি একেকটি দণ্ড-চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। প্রথমতই এ যতিগুলোকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়, কতকগুলো ভাবগত যতি আর কতকগুলো ছন্দগত যতি। যেখানে কবিতার অর্থের মধ্যেই একটি ছেদ রয়েছে স্বভাবতই সেখানে একটি যতি পড়েছে; আবার যেখানে অর্থের বা কবিতার ভাবের বিরতি নেই এমন অনেক স্থলেও যতি হয়েছে ছন্দের দাবীতে। প্রথমপ্রকারের যতিকে ভাবগত যতি এবং দ্বিতীয়প্রকারের যতিকে ছন্দগত যতি বলেছি। (এ সম্বন্ধে যথাস্থানে আরো কয়েকটি কথা বল্‌তে হবে) দ্বিতীয়ত, আরেক দিক্ থেকেও যতিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। যেখানে ভাবগত যতির সম্ভাবনা আছে সেখানে ছন্দগত যতিও অবশ্যই থাকা চাই। সেজন্য যেখানে ভাবগত যতি থাকে সেখানে ধ্বনির পূর্ণ বিরতি হয়, এরকম যতিকে পূর্ণ যতি বল্‌ব। আর যেখানে শুধু ছন্দগত ধ্বনিবিরতিমাত্রই আছে ভাবের বিরতি নেই সেখানে বিরামকাল বেশি স্থায়ী নয়; এপ্রকার যতিকে অর্দ্ধযতি বল্‌ব। তা ছাড়াও আর-এক প্রকার যতি আছে তাকে ঈষদ্-যতি নামে অভিহিত করা যায়। এ যতির কথা পরে যথাস্থলে বল্‌ব।

গানেই হোক্ বা কবিতায়ই হোক্ এই যতিস্থাপনের বৈচিত্র্যই তালের সৃষ্টি করে। পূর্ব্বেই বলেছি ধ্বনির গতি এবং বিরতিই ছন্দকে সার্থক করেছে; গতি এবং যতি যত নব নব উপায়ে পরস্পরকে অভিব্যক্ত করে' তুল্‌তে পারে ততই নূতন নূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়। গতি ও যতির বিভিন্ন সন্নিবেশের ফলেই ধ্বনির তরঙ্গলীলার উদ্ভব হয়। গানে বা কবিতায় ধ্বনির এই তরঙ্গ লীলা-টাকেই তাল বলা যায়। কাব্যে এবং সঙ্গীতে উভয়ত্রই এই তালের নানারকম হিসাব রাখ্‌তে হয়, এবং এই হিসাবের উপরেই উভয় ছন্দশাস্ত্র বিশেষভাবে নির্ভর করে। তাল জিনিষটা কিন্তু আসলে সুর বা ধ্বনি মোটেই নয়; সুর বা ধ্বনির গতিভঙ্গীটাকেই তাল বলা হয়। কত বিচিত্র উপায়ে ধ্বনির উত্থান পতন বা গতি বিরতি সাধিত হয় তা নির্ণয় করে' তাকে হিসাবের মধ্যে ধরে' রাখাই তালের কাজ। ধ্বনির একবার উত্থান বা গতি থেকে পরবর্ত্তী পতন বা বিরতি পর্য্যন্ত যে মাত্রা-পরিমাণ বা কাল, তাকেই গানে এক-একটি তাল বিভাগ বলা যায়; এবং গানে যা তালবিভাগ, কবিতায় তাকেই পদ বা পাদ বলেছি। বলা বাহুল্য যদিও একইপ্রকার হিসাব থেকে গানের তালবিভাগ ও কবিতার পাদের উৎপত্তি হয়েছে তথাপি এ দুটো জিনিষ কখনই এক নয়। এ দুয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এবং ঐ পার্থক্যের হেতু গানে ও কবিতায় মাত্রা-আদর্শের অনৈক্য। এ

অনৈক্যের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা বিশদ কর্‌ছি। যথা—

(আমার) নিশীথ-রাতের | বাদল ধারা।
এসহে গোপনে।
—রবীন্দ্রনাথ

এটা স্বরবৃত্ত ছন্দ। এক যতি থেকে আর-এক যতি পর্য্যন্ত যে অংশ তাকে পাদ বলা হয় এবং এখানে প্রতি-পাদে চারটি স্বর আছে। সবসুদ্ধ এখানে চোদ্দটি স্বর আছে, সুতরাং এক হিসাবে চোদ্দ মাত্রা আছে বল্‌তে পারি। প্রতিপাদে চার মাত্রা। কিন্তু গানের সুরের ধারায় যখন এ কথাগুলো বয়ে' চল্‌বে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদ্‌লে যাবে; অনেক জায়গায় মাত্রা বেড়ে যাবে, সুতরাং পাদগুলোও নূতন আকার ধারণ কর্‌বে। যথা—

আমার | নি • শীথ | রা • তে র | বা • দ ল |
ধা • রা • | • • এ স | হে • • • | • • গো প |
নে • • • | • •

এখানে বিন্দু চিহ্নগুলো অতিরিক্ত মাত্রা জ্ঞাপক। দেখা যাচ্ছে কবিতার একমাত্রিক বর্ণ গানে দ্বিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক এবং ষণ্মাত্রিকও হয়েছে এবং পাদ সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। কবিতায় ছিল চোদ্দ মাত্রা, গানে হয়েছে চৌত্রিশ মাত্রা। কবিতায় ছিল চার পাদ, গানে আট পাদেরও বেশি হয়েছে। কবিতায় ও গানে উভয়েই প্রতিপাদে চার মাত্রা আছে বটে, কিন্তু উপরের বিভাগ-গুলোর দিকে চোখ বুলোলেই টের পাওয়া যাবে প্রতি-পাদে বর্ণগুলোর বিন্যাসের মধ্যে কি বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এর চাইতে আরো অনেক বেশি বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু সব জায়গায়ই যে এমনটি হয়ে থাকে তা নয়। কোনো কোনো জায়গায়—কবিতার ও গানের পাদসংখ্যা ও মাত্রা-সংখ্যা ঠিক সমানই থেকে যায়। যথা—

কাঁপিছে দেহলতা থর থর,
চোখের জলে আঁখি ভর ভর।
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝর ঝর
তোমার আঁখি পরে ভর ভর।
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতিছত্রে তিনটি করে পাদ আছে; প্রথম পাদে তিন মাত্রা এবং বাকি দুই পাদে চার মাত্রা করে' আছে। গানেও তাই, এস্থলে গানে ও কবিতায় তফাৎ নেই। যা হোক, আমাদের কথা হচ্ছিল এই যে ধ্বনির এক যতি থেকে আর-এক যতি পর্য্যন্ত যে অংশ, তাকে যেমন, কবিতায় পাদ বলা হয় এবং তার গঠনের উপরেই যেমন কবিতার গঠনটি নির্ভর করে; তেম্‌নি সুরের এক ভঙ্গী থেকে আর-এক ভঙ্গী পর্য্যন্ত অংশকে তালবিভাগ বলা হয় এবং এ তালবিভাগের উপরেই গানের গঠনপ্রণালী নির্ভর করে। একটি পাদ বা তালবিভাগের মধ্যে ক'টি মাত্রা থাকে তার হিসাব থেকেই গানের বা কবিতার তালের বহুপ্রকার ভেদ হ'য়ে থাকে। প্রথম গানের কথাই ধরা যাক। গানে প্রথমতই তালের তিনপ্রকার রূপ দেখা যায়। কোনো গানে চার মাত্রার পরেই তাল দিতে হয়; এরকম তালকে চতুর্মাত্রিক বা সমপদী-তাল বলা যায়। আবার কোনো গানে তিন মাত্রার পরেই তাল দিতে হয়; এ তালকে ত্রিমাত্রিক তাল বা অসমপদী তাল নামে অভিহিত করা যায়। আবার কোনো কোনো গানে তালবিভাগের মাত্রা সংখ্যার সমতা নেই; একবার তিন মাত্রার পরে আর-এক বার দু মাত্রার পরে তাল দিতে হয়, অথবা একবার তিন মাত্রার আবার চার মাত্রার পরে তাল দিতে হয়। এরকম তালকে বিষমপদী তাল বলা যায়। পূর্ব্বের সঙ্গীতের দৃষ্টান্ত-দুটোর মধ্যে প্রথমটি চতুর্মাত্রিক বা সমপদী এবং দ্বিতীয়টি বিষমমাত্রিক বা বিষমপদী তালের দৃষ্টান্ত। আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা

(১)
জা • গর | পে • যায় • | বি • ভাব | রী • • • |
এটা চতুর্মাত্রিক তাল।

(২)
দে • শ | দে • শ | ন • ন্দি | ত ক রি | ম • ন্দ্রি | ত ত ব |
ভে • • | রী • • |
এটা অসমপদী বা ত্রিমাত্রিক তাল।

(৩)
মা • তৃ | মন্ • | দি র | পু • ণ্য | অ ঙ্ • | গন | ক র
ম | হো • | জ্জ্বল | আ • জ | হে • |

এখানে যথাক্রমে তিন, দুই এবং দুই-এর পরে তাল হবে। সুতরাং তাল বিষমপদী। গানের এ তিন-প্রকার তালের আবার বহুপ্রকার উপবিভাগ ও বহু নাম আছে। আমাদের ও-সমস্ত কথার আলোচনার বিশেষ

কোন প্রয়োজনই নেই। আমরা এখন কবিতার তালের সঙ্গে উক্ত তিনপ্রকার তালের কি সাদৃশ্য আছে তাই আলোচনা করব। কাব্যছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণের উপর তালের এইপ্রকার ভেদের খুব বেশি প্রভাব আছে। তালের দিকেই সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখ্‌লে ছন্দের সম্পূর্ণ নূতন আর-একরকম শ্রেণীভাগ ও নামকরণ কর্‌তে হয়। এই নূতন শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ কেমন হবে তাই এখন দেখ্‌তে চেষ্টা করব। প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে গানের রীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে মাত্রার যে আদর্শ পূর্ব্বেই নির্ণয় করেছি তাকেই কাব্যেও মাত্রার একমাত্র আদর্শ বলে' ধর্‌লে ছন্দের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটি প্রধান ধারাই থাকে না। এবং সঙ্গীত-আদর্শের এই মাত্রার উপরে নির্ভর করে'ই যদি কবিতার পাদের প্রকারভেদ নির্ণয় করা যায় তবে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে ছন্দের তিনটি প্রধান শ্রেণী পাওয়া যাবে, যথা সমপদী ছন্দ, অসমপদী ছন্দ এবং বিষমপদী ছন্দ। দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টা বুঝ্‌তে সোজা হবে। যথা—

(১)

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি' জীর্ণজরা,
বহি' বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।

—রবীন্দ্রনাথ

আমাদের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে এ'কে অক্ষরবৃত্ত দ্বিপদী ছন্দ বল্‌ব; কারণ সাধারণ শ্রুতিতে এখানে প্রতিপংক্তিতেই আট অক্ষরের পরে একটি ও ছয় অক্ষরের পরে একটি যতি পড়েছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তালের হিসাবে এটার অন্য নাম হবে। প্রথমত সঙ্গীত আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌লে এখানে প্রতিছত্রে চোদ্দ অক্ষর না বলে' চোদ্দ মাত্রা বল্‌তে হবে। দ্বিতীয়ত, খুব প্রখর তাল-শ্রুতির উপর নির্ভর করলে এখানে প্রত্যেক চার মাত্রার পরেই একটি ছেদ রেখা টান্‌তে হবে এবং ফলে এটার আকৃতি অন্যরকম হ'য়ে যাবে। এটা দাঁড়াবে এরকম—

হা রে নিরা | নন্দ দেশ, | পরি' জীর্ণ | জরা,
বহি বিজ্ঞ | তার বোঝা, | ভাবিতেছ | মনে
ঈশ্বরের | প্রবঞ্চনা | পড়িয়াছে | ধরা
সুচতুর | সূক্ষ্ম দৃষ্টি | তোমার ন- | য়নে।

সুতরাং এ ছন্দটা হ'ল সমমাত্রিক অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ। এ ছন্দের এরকম বিশ্লেষণের মধ্যে একটা খুব সার্থকতা আছে; কারণ এর দ্বারাই এ ছন্দের (যাকে সাধারণত পয়ার বলে'ই অভিহিত করা হয়) উৎপত্তির ইতিহাসের দিকে একটা গভীর ইঙ্গিত ফুটে' ওঠে। পূর্ব্বেই আমি বলেছি স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকেই অক্ষরবৃত্তের উৎপত্তি হয়েছে এবং চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার চৌদ্দ স্বরের স্বরবৃত্তের বিকার মাত্র। স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চার স্বরের পরেই একটি করে যতি থাকে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার ও গানের সুরের প্রভাবে ওই যতির সংখ্যা কমে' গিয়ে অর্থাৎ স্বরবৃত্তের পাদগুলো আরো ঠেসে গিয়ে এই পয়ারের উৎপত্তি হয়েছে। উক্ত বিশ্লেষণেই ওই চতুঃস্বরপাদ ও পরবর্ত্তী গানের প্রভাবের ইঙ্গিতটা টের পাওয়া যায়। পয়ার শব্দটি পদচার শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে, রবিবাবুর এ কথাটি সত্য হ'লে পয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার যুক্তিগুলো আরো দৃঢ়তা লাভ করে। যা হোক্‌, অক্ষরবৃত্তের প্রায় সর্ব্বত্রই গোড়ায় এই চতুর্মাত্রিক তালের সন্ধান পাওয়া যাবে। আর-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

(২)　আজিকে হ | য়েছে শান্তি—
জীবনের | ভুল ভ্রান্তি
　সব গেছে | চুকে।
রাত্রিদিন | ধুক্‌ ধুক্‌
তরঙ্গিত | দুঃখসুখ
　থামিয়াছে | বুকে।

—রবীন্দ্রনাথ

এখানেও ওই চতুর্মাত্রিক তাল অনায়াসেই ধরা পড়ে। এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে এই চতুর্মাত্রিক তালের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

(৩)　লুকিয়ে ছিল | যে মর্য্যাদা | নারীর হৃদয়- | তলে,
উঠ্‌ল জাগি দিগ্বিজয়ী বীরের অটুট বলে।
যুক্তকরে অশ্রুমাখা দিব্য হাসি হেসে',
কর্‌ল বরণ অগ্নিদেবে নব বধূর বেশে।

—করুণানিধান

এছন্দের কবিতায় চতুর্মাত্রিক তালের স্বচ্ছন্দগতি। পূর্ব্বে পয়ারের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়্‌লেই বোঝা যায় সেটা কতখানি আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে। অবশ্য অক্ষরবৃত্তের যে অভিজ্ঞাত্য আছে সে সম্বন্ধে আগেই

অনেক কথা বলেছি। এখন মাত্রাবৃত্তের একটা চতুর্মা-ত্রিক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা:—

(৩) এস তু- | ষের দেশে | এস কল | হাস্তে,
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্তে,
ধূসরের ঊষরের কর তুমি অন্ত
শ্যামলিয়া ও-পরশে করগো শ্রীমন্ত,
ভরা ঘট নিয়ে এস ভরসার ভর্ণা;
ঝর্ণা।

—সত্যেন্দ্রনাথ

চতুর্মাত্রিক তালের যে ক'টা দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তার থেকে এ কথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে-গানের রীতিতে কাব্য-ছন্দের এরকম শ্রেণী বিভাগ কর্‌লেও আমাদের পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ অব্যাহতই থেকে যায়। কারণ সমপদী, অসমপদী বা বিষমপদী, যেরকম তালই হোক্ না কেন প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিনটে প্রকারভেদ হবেই। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্তগুলো পরীক্ষা কর্‌লেই এর যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে। সুতরাং কাব্যছন্দের শ্রেণীভাগ করার সময় কাব্যের ভাষার বৈশিষ্ট্য ও তালের প্রকারভেদ এ-ছুটো বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য রাখা দরকার। আমরা শ্রেণী ভাগ করার সময় তাই করেছি, কিন্তু কাব্যের ভাষা বৈশিষ্ট্যেরই প্রাধান্য দিয়েছি। কারণ গানে শুধু তালের উপর লক্ষ্য রেখেই শ্রেণীবিভাগ করা হয়, ভাষার রচনা-প্রণালীর দিকে দৃষ্টি থাক্‌লে না বল্‌লেই হয়। কিন্তু কাব্যে রচনা-বৈচিত্র্যই সর্ব্বাগ্রে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ জন্যেই ভাষার রচনা-বিধিকেই প্রাধান্য দিয়ে ছন্দকে প্রধানত অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত ক'রেছি; তালকেই প্রাধান্য দিয়ে সর্ব্বপ্রথমেই ছন্দকে সম, অসম ও বিষম এই তিন ভাগে বিভক্ত করিনি, রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরেই তাল বা তালবিভাগের প্রাধান্য। গানের ক্ষেত্রে যা তালবিভাগ, কাব্য ছন্দের ক্ষেত্রে তাই পাদবিভাগ। সুতরাং অক্ষরবৃত্ত প্রভৃতি প্রধান শ্রেণীর পরেই পাদ রচনার বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য স্বীকার করে' চতুরক্ষর পাদ, অষ্টাক্ষর পাদ, চতুর্মাত্র পাদ, পঞ্চমাত্র পাদ, চতুঃস্বরপাদ প্রভৃতি উপবিভাগ করেছি। ছন্দের শ্রেণী ভাগ করার সময়েই একথা বলেছি। সুতরাং এখানে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এখন অসমমাত্রিক তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা—

(১) আজি কি তোমার মধুর মূরতি—
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জল-ধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী—
শরৎকালের প্রভাতে।

- রবীন্দ্রনাথ

এটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। অম্‌নি পড়ে' গেলে প্রত্যেক ছ' মাত্রার পরে একটা করে' যতি পাওয়া যায়। কিন্তু আরো একটু লক্ষ্য করলে এই ছ' মাত্রার প্রত্যেকটি পাদের ঠিক মধ্যস্থলে একটা করে' সূক্ষ্ম ছেদ-চিহ্ন আবিষ্কার করা যায়; প্রত্যেক তিন মাত্রার পরেই একটা ঈষদ্-যতি বা একটুখানি সুরের বিরতি যেন শ্রুতিশক্তির কাছে ধরা দেয়। বস্তুত খুব তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে দেখ্‌লে বল্‌তে হয় যে তিন-তিনটি মাত্রার এক-একটি ক্ষুদ্র পাদ বা মাপকাঠির সাহায্যেই এ ছন্দ রচিত হয়; এরকম ছুটো মাপ কাঠিতেই এর একপাদ হয়। সে জন্যই এই ষণ্মাত্রিক ছন্দের কবিতায় প্রতিপাদে তিন মাত্রার পরেই একটা ঈষদ্-যতির অস্তিত্ব অনুভূত হয় এবং এটাই এছন্দের স্বরূপ। তবে কোথাও কোথাও কোনো পাদের মধ্যবর্ত্তী এই ঈষদ্ যতিটি প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তটিতেই এর নমুনা আছে—যথা—

+ + +

"মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর" এবং "মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী"; এখানে চিহ্নিত তিনটি জায়গায় পাদমধ্যবর্ত্তী ছেদ বা ঈষদ্ যতিটি কানে ধরা দেয় না, ছুটো ক্ষুদ্র ভাগ একত্র জোড়া লেগে গিয়ে ওই যতি-ছেদটি বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। কিন্তু তবু ওই ঈষদ্ যতি থাকাটা এর যথার্থ প্রকৃতি এবং তিন মাত্রার মাপ কাঠিটাই এর ভিতরের গঠনের আসল আদর্শ। এই ঈষদ্ যতির

সাহায্যেই এছন্দের তাল রক্ষা হ'য়ে থাকে। এজন্যই এছন্দকে ত্রিমাত্রিক বা অসমপদী তালের ছন্দ বলেছি। উক্ত দৃষ্টান্তটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অসমপদী তালের নমুনা। এবার স্বরবৃত্ত ছন্দ থেকে অসমপদী তালের একটা উদাহরণ দেব। যথা—

ওই সিংহল দ্বীপ | সুন্দর, শ্যাম | —নির্ম্মল তার | রূপ
তার কণ্ঠের হার লঙ্গর ফুল, কর্পূর কেশ-ধূপ ;
আর কাঞ্চন তার গৌরব, আর মৌক্তিক তার প্রাণ,
আর সম্বল তার বুদ্ধের নাম, সম্পদ্ নির্ব্বাণ।
—সত্যেন্দ্রনাথ

গানের রীতিতে এখানে প্রতিপদে তিনটি করে' মাত্রা পাওয়া যাবে, যদিও বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের ভাষায় একে মাত্রাবৃত্ত না বলে' স্বরবৃত্ত বলেছি। তিন মাত্রার মাপ-কাঠিতে রচিত হয়েছে বলে'ই একে ত্রিমাত্রিক বা অসমপদী তালের ছন্দ বল্‌ব। অক্ষরবৃত্তে এতালের দৃষ্টান্ত এই,—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি-পাষাণ কেঁদে গলে' যাক্,
মুখ তুলে' আজি চাহ রে।
—রবীন্দ্রনাথ।

এছন্দে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র অনেক বিখ্যাত কবিতা লিখে' গেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথমত অক্ষরবৃত্তে এই অসমপদী তালের অনেক কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে এতাল ভাল শোনায় না, যেখানে যুক্তবর্ণ উপস্থিত হয় সেখানেই পদে পদে তালভঙ্গ হয়, শ্রুতি-কটুতা দোষ হয়। এই তথ্যটি লক্ষ্য করে'ই রবীন্দ্রনাথ বাংলায় মাত্রাবৃত্তের প্রবর্ত্তন করেছেন ; মানসীতে তিনি সর্ব্বপ্রথম যুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বরকে দ্বিমাত্রিক বলে' ধরে' এ নতুন ছন্দ ব্যবহার করতে সুরু করেন। এখন অসমতালের ছন্দ সর্ব্বদাই মাত্রাবৃত্তে রচিত হ'য়ে থাকে ; অক্ষরবৃত্তে অসমতাল সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হ'য়ে গেছে। আর-একটা উদাহরণ দিচ্ছি, রবীন্দ্রনাথের "প্রভাত সঙ্গীত" থেকে। পাঠক পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন এরচনাটা মার্জ্জিত শ্রুতি-রুচির উপর কতখানি অত্যাচার করে।

বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মর মর মৃদু তান,
চারি দিক্ হ'তে কিসের উল্লাসে
পাখীতে গাহিবে গান॥

এখানে যুক্তবর্ণগুলো যেন গুরুভার প্রস্তরখণ্ডের মত সুর-প্রবাহের গতি রোধ করে' দাঁড়িয়ে আছে ; আমাদের ছন্দ-চেতনাও যেন সে গুরুভারে নিপীড়িত হচ্ছে। সুতরাং এভারটাকে যদি একটু লঘু করে' দেওয়া যায় তবেই ছন্দের স্রোত আবার অবাধগতিতে বয়ে চল্‌বে,—

বায়ু-হিল্লোলে ধরে পল্লব
মর মর মৃদু তান,
চারিদিক্ হতে কি যে উল্লাসে
পাখীরা গাহিছে গান।

কাব্যে বিষম তালটা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই শোভা লাভ করে। সেজন্যে অক্ষরবৃত্তে বা স্বরবৃত্তে এতালের ছন্দ সচরাচর রচিত হয় না। বিষম তাল অনেকরকম হ'তে পারে। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি ; যথা—

(১) বিপদে মোরে | রক্ষা কর, | এ নহে মোর | প্রার্থনা,
বিপদে আমি | না যেন করি | ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে প্রতি পাঁচ মাত্রার পরেই যতি আছে। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম শ্রুতির নিকট প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পরেই একটা যতির আভাস ধরা পড়্‌বেই। সুতরাং আসলে এখানে তিন মাত্রার অসমপদের সঙ্গে দু' মাত্রার একটা সমপদের যোগেই পাঁচ মাত্রার এক-একটি পদ রচিত হয়েছে। এই অসম ও সম তালের মিশ্র তালকেই বিষম তাল বলা হয়েছে।

(২) জড়ায়ে আছে বাধা, | ছাড়ায়ে যেতে চাই, |
ছাড়াতে গেলে ব্যথা | বাজে।
মুক্তি চাহিবারে তোমার কাছে যাই
চাহিতে গেলে মরি লাজে।
—রবীন্দ্রনাথ

এটা সপ্তমাত্রিক ছন্দ অপূর্ণ চৌপদী ছন্দ; কারণ প্রথম তিন পদে সাতটি করে' মাত্রা ও শেষ পদে দুটো মাত্র মাত্রা আছে। কিন্তু এর তাল বিষম, কারণ প্রতি-পাদেই তিন মাত্রার পরে একটা ঈষৎ যতি আছে। এ যতি প্রত্যেক পাদকে একটি তিনমাত্রার অসমভাগ এবং

আর-একটি চার মাত্রার সমভাগে বিভক্ত করেছে। সে-জন্যই তাল বিষমপদী।

(৩) জীবনে যত পূজা | হল না সারা.
জানি হে জানি তাও | হয়নি হারা |

—রবীন্দ্রনাথ

এটা সপ্তমাত্রিক অপূর্ণ দ্বিপদী ছন্দ; কারণ প্রথম পাদে সাত ও দ্বিতীয় পাদে পাঁচ মাত্রা আছে। কিন্তু প্রতিপাদেই তিন মাত্রার পর একটি ঈষৎ যতি দুটো অসমান ভাগ সৃষ্টি করেছে। অতএব বিষম তাল।

(৪) গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা, ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি';
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর সাতটি যেন পোষা পাখী।

—রবীন্দ্রনাথ

এছন্দের তাল অতি বিচিত্র। প্রত্যেক পংক্তিতে যথাক্রমে তিন বার পাঁচ, তিন বার দু' মাত্রা রয়েছে। কিন্তু একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখা যাবে এছন্দটা এর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ তৃতীয় দৃষ্টান্তটির সম্প্রসারণ মাত্র। তৃতীয় দৃষ্টান্তের সাত পাঁচের অপূর্ণ দ্বিপদীর সঙ্গে সাত দু'য়ের আর-একটা দ্বিপদ যোগ কর্‌লেই এ ছন্দ পাওয়া যায়। সুতরাং এছন্দের যথার্থ স্বরূপ হ'চ্ছে এ রকম—

গাহিছে কাশীনাথ | নবীন যুবা,
ধ্বনিতে সভাগৃহ | ঢাকি',
কণ্ঠে খেলিতেছে | সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা | পাখী।

এ স্বরূপটি একটি অতিরিক্ত মিলের সাহায্যে বিশেষভাবে ফুটে' উঠেছে নীচের দৃষ্টান্তটিতে।—

কোশল-নৃপতির তুলনা নাই,
জগৎ জুড়ি' যশোগাথা;
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই,
দীনের তিনি পিতামাতা।

—রবীন্দ্রনাথ

বলা বাহুল্য এখানেও বিষম তাল। আর-একটি বিষম তালের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

(৫) ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত;
অটবী-বায়ু-বশে উঠিত সে উছাসি'।
কখনো ফুল দু'টি আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে' পড়িত রে নিশাসি'।

—রবীন্দ্রনাথ

এটা বিপর্য্যস্ত সপ্তমাত্রিক দ্বিপদী ছন্দের দৃষ্টান্ত। রবি-বাবুর কবিতায় এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত ছাড়া এছন্দ আর কোথাও দেখিনি। প্রতিপংক্তিতে সাত মাত্রার দুটো পাদ আছে। প্রত্যেক পাদ আবার ঈষৎ যতির দ্বারা দু-ভাগে বিভক্ত। কিন্তু এ বিভাগের মধ্যে সন্নিবেশ-বিপর্য্যয়ের দ্বারা বেশ একটু বৈচিত্র্য হয়েছে; প্রত্যেক পংক্তিতেই প্রথম পাদ তিন-চার ও দ্বিতীয় পাদ চার তিন মাত্রায় ছিন্ন হয়েছে।

এতক্ষণে আমরা তালের দিক্ থেকে ছন্দের প্রধান তিন ভাগ,—সম, অসম এবং বিষম ছন্দের আলোচনা করেছি। পূর্ব্বেই বলেছি গানে তাল-বিভাগের অন্তর্গত কথার লঘুত্ব-গুরুত্ব-ভেদে লয়-ভেদে তালের অনেক প্রকার ভেদ আছে। তার আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। কবিতায়ও পাদের অন্তর্গত স্বরবর্ণগুলোর লঘুত্ব-গুরুত্ব ভেদে তালের নানারকম উপবিভাগ হ'য়ে থাকে। তাতে কোনো তাল আদিগুরু, মধ্যগুরু, অন্তগুরু প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে থাকে। ছন্দের শ্রেণীবিভাগ করার সময় এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং এস্থলে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা স্মরণ রাখা দর্‌কার যে তালের এরকম উপবিভাগ স্বরবৃত্ত ছন্দেই হ'তে পারে। অক্ষরবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরকম বৈচিত্র্যের অবসর নেই। স্বরবৃত্ত ছন্দে স্বরের লঘুত্ব-গুরুত্ব-ভেদে তালের যে বৈচিত্র্য সাধিত হয় তাকেই কাব্যের ভাষায় ছন্দস্পন্দন নামে অভিহিত করেছি। কাব্যের ক্ষেত্রে ছন্দের এ স্পন্দন বা নৃত্য-লীলাটার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। সবাই জানেন যে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার মূল প্রণালী নির্ণয় কর্‌তে গিয়ে জড়বিজ্ঞান সর্ব্বত্র কতকগুলো বিচিত্র স্পন্দন বা আণবিক চঞ্চল নৃত্যপরায়ণতাই আবিষ্কার করেছে। ধ্বনি-তত্ত্বেও একথা যেমন খাটে মানুষের মানস ক্ষেত্রেও একথা তেম্নি খাটে বল্‌তে পারি। তাই কবিতার ভিতরকার যা মূল সত্য অর্থাৎ রস, কবিতার ছন্দ সেই রসকে ধ্বনির স্পন্দনের ভিতর দিয়েই আমাদের চিত্তস্পন্দনের সঙ্গে সমান তালে ফুটিয়ে তুল্‌তে চায় এবং এই চিত্তস্পন্দনের

ভিতর দিয়েই আমাদের মর্ম্মকে স্পর্শ করে' রসকে আমাদের মানস লোকে সার্থক করে' তুল্‌তে চায়। কিন্তু ধ্বনির স্পন্দনের এই বিচিত্র সূক্ষ্ম লীলা ব্যাকরণ অর্থাৎ বিশ্লেষণের সূত্রে বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং সে প্রয়াস আমরা কর্‌ব না। তবে বাংলা কবিতায় ছন্দ-স্পন্দনের রীতি বৈশিষ্ট্য এবং কোন্ কোন্ বিশেষ উপায়ে তা আমাদের চিত্তকে দোলা দেয় সে-সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায় এবং বলা দর্‌কারও বটে। আমরা পরে সে-বিষয়ের আলোচনা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।

সুর

ছন্দ ও সঙ্গীতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়ে আমরা মাত্রা লয় যতি ও তাল, উভয় শাস্ত্রের একয়টা সামান্য পরিভাষা এবং দু শাস্ত্রেই এদের সার্থকতা ও পার্থক্য কি, তাই বিশদ কর্‌তে চেষ্টা করেছি। বলা বাহুল্য উভয়শাস্ত্রেই এমন কতকগুলো বিশেষ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে যা এক পক্ষে খাটে অন্য পক্ষে খাটে না। কাব্যছন্দের আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এক্ষেত্রের বিশেষ ধর্ম্মগুলোর আলোচনা পূর্ব্বেই করা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যছন্দের খানিকটা সাদৃশ্য আছে বলে' উভয়ের মধ্যে একটা তুলনা করার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতের অবতারণা করা হয়েছে। সঙ্গীতের আলোচনা গৌণ এবং কাব্যছন্দের আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্যই কাব্যছন্দের কথাই বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে' সঙ্গীতের কথা সংক্ষেপেই সমাপ্ত করেছি। কিন্তু একথা মনে রাখা দর্‌কার যে লয় ও তাল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতই প্রয়োজনীয় হোক্ না কেন এগুলোই সঙ্গীতের মূল-তত্ত্ব নয়, সঙ্গীতের অন্তরতম মূল-তত্ত্ব হচ্ছে সুর। মাত্রা লয় প্রভৃতি সুরের বাহনমাত্র, সুরের গতি-প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা। সঙ্গীতে সুরই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসকে মানুষের মনের স্পর্শ-সীমার মধ্যে এনে পৌঁছিয়ে দেয়। সঙ্গীতে যেমন সুর, কাব্যে তেম্‌নি ভাব। ভাব বল্‌তে শুধু শব্দের অর্থকেই বুঝিনে। ভাব বল্‌তে বুঝি এমন একটা ইঙ্গিত, এমন একটা সৌরভ, এমন একটা সুষমা যা চকিতের মধ্যেই আমাদের মানস লোকে অদ্ভুত সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মায়াজাল বিস্তার করে। কাব্যেও তাল লয় মাত্রা প্রভৃতি গৌণ, এই ভাবকে ফুটিয়ে তোলার মধ্যেই এদের সার্থকতা। যা হোক্, কাব্য এবং সঙ্গীত উভয়ের চরম লক্ষ্য এবং পরম সার্থকতা হচ্ছে সৌন্দর্য্য বা আনন্দ-রসের সৃষ্টি। সঙ্গীতে এই সৌন্দর্য্য প্রকাশ লাভ করে সুরের উপর নির্ভর করে' এবং সুর প্রবাহিত হয় লয় তাল প্রভৃতির আশ্রয়ে। কাব্যেও তেম্‌নি সৌন্দর্য্য ফুটে' ওঠে ভাবের ভিতর দিয়ে এবং ভাব বিকাশিত হয় ছন্দের সাহায্যে। কিন্তু তা বলেও' যে এ দুয়ের মধ্যে কোনো জায়গায় কোনো যোগ নেই তা নয়। সঙ্গীতে সুর যদিও প্রধানত ধ্বনিকে অবলম্বন করে'ই সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করে, তবু সুরের মধ্যেও কাব্যের ভাব-ব্যঞ্জনার আভাস রয়ে গেছে। আবার, কাব্যের ভাবও সম্পূর্ণ সুরনিরপেক্ষ নয়; কেননা কাব্যের ছন্দেরও ত ধ্বনি-নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু গানের সুর ও কাব্যের সুরের মধ্যে গুরুতর প্রকৃতিগত পার্থক্য রয়ে গেছে। সঙ্গীতে ভাব সুরের অনুবর্ত্তন করে; কিন্তু কাব্যের সুরই ভাবের অনুসরণ করে। সেজন্যই কাব্য আবৃত্তি করার সময় আমাদের রসনা বুদ্ধিবৃত্তির অনুসরণ করে' কথার অর্থকে অব্যাহত রেখে কোথাও চলে; কোথাও থামে। কবিতায় ছন্দধ্বনি সুরকেই প্রাধান্য দিয়ে কথার অর্থকে সহজে গৌণ আসন দেয় না; কাব্যে অর্থের অনুযায়ী হ'য়েই সুর কখনো তীব্র কখনো মৃদু, কখনো গম্ভীর, কখনো তরল, কখনো মন্থর, কখনো দ্রুত হ'য়ে থাকে। সকলেই লক্ষ্য করে' থাক্‌বেন কবিতা আবৃত্তি করার সময় আমরা শুধু যে ছন্দ তাল বাঁচিয়েই কথাগুলোকে আওড়াতে যাই তা নয়; যদি শুধু তাই হ'ত তবে কবিতার প্রাণটাই জড় শব্দপুঞ্জের নীচে চাপা পড়ে' মারা যেত। তবে ছন্দ কবিতার ভাবকে গতি দান না করে' বরং পাষাণ প্রাচীরের মতো তার গতিরোধ করে'ই দাঁড়াত। কিন্তু প্রকৃত তথ্য ত তা নয়, ছন্দ কাব্যের বাধা না হয়ে তার সহায় হয়েছে। তার কারণ কাব্যের ভাবকে বহন করে বলে'ই ছন্দের প্রয়োজনীয়তা। ভাবের উপর প্রভুত্ব করাই ছন্দের কাজ নয়, বরং ছন্দের উপরেও

ভাবের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। সেজন্তেই শুধু যতি তাল লয় মাত্রা রক্ষা করে' যন্ত্রের মতো আবৃত্তি করে' গেলেই কবিতার যথার্থ আবৃত্তি হয় না। তাতে কবিতার যথার্থ ভাবটিই ছাড়া পায় না; ছন্দের খাঁচাটাই তখন কাব্যের মুক্তির প্রধান বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। এজন্তেই কবিতা আবৃত্তি করার সময় ছন্দের তাল লয়কেও অতিক্রম করে' গিয়ে কবিতার ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হয়; এখানটাতেই ছন্দ হাজার চেষ্টা করে'ও কাব্যের যথার্থ স্বরূপটির নাগাল পায় না, তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সুতরাং নিজেকে নিজে অতিক্রম করে' যাওয়ার মধ্যেই ছন্দের সার্থকতা। কিন্তু এ অতিক্রম ছন্দের রাজ্য ছাড়িয়ে ভাবের ও সুরের রাজ্যে প্রবেশের উপক্রম। কাজেই আবৃত্তি করার সময় শুধু ছন্দ বাঁচালেই চলে না; তার সঙ্গে একটু ভাবের আভাস, একটু সুরের স্পর্শও যোগ করে' দিতে হয়। এজন্তেই দেখা যায় আবৃত্তি করার সময় আমাদের কণ্ঠ জড়যন্ত্রের যন্ত্রের মতো শব্দগুলোকে শুধু উচ্চারণ করে'ই যায় না, ভাবের গভীরতা, তীব্রতা, ওজস্বিতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কণ্ঠস্বরও কোথাও তীব্র, কোথাও গম্ভীর, কোথাও দৃপ্ত হ'য়ে ওঠে। এখানেই আমাদের চিত্ত কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠে' আমাদের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, সেজন্তেই ত কবিতার আবৃত্তি সজীব সচেতন ও প্রাণের স্পন্দনে এমন স্পন্দিত হ'য়ে ওঠে। আর এখানেই কাব্যের ভাব বিশুদ্ধ কাব্যছন্দের এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে সঙ্গীতের সুরের স্পর্শলাভের জন্ত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এখানেই শেষ, সঙ্গীত-সুরের আভাস লাভ ও তার মধ্যে আত্মপ্রসারের এই ব্যাকুলতার মধ্যেই কাব্যছন্দের চরম তৃপ্তি। কিন্তু গানের সুরের প্রক্রিয়া অন্তরকম, তার অভিব্যক্তির পন্থা স্বতন্ত্র। গানের সুর ধ্বনিকে আশ্রয় করে'ই আনন্দকে রূপ দান করে, কথার ভাবকে আশ্রয় করে' নয়। সেজন্তেই গানের সুর স্বচ্ছন্দগতিতে বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রবাহিত হ'য়ে চলে, গানের কথাকে সে গ্রাহ্যও করে না। গানের সুরের কাছে কথা ও তাহার অর্থের কোনো মর্য্যাদা নেই বল্লেই হয়; কথার অর্থ হয়ত যেখানে থেমেছে সুর সেখানেও চলেছে; কথার অর্থে যেখানে গতি রয়েছে সুর হয়ত সেখানেই মোড় ফিরে' যায় এমন সর্ব্বদাই দেখা যায়। গানের সুরের ধারায় পড়ে' স্রোতের বেগে গানের কথাগুলো নিজ নিজ স্বতন্ত্র রূপকে পর্য্যন্ত বজায় রাখতে পারে না, সুরের বেগে শব্দগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়; কোনো শব্দের বর্ণগুলো পরস্পরসংশ্লিষ্ট থাকতে না পেরে বিশ্লিষ্ট হয়ে এশব্দের বর্ণ ওশব্দের গায়ে গিয়ে পড়ে। শব্দগুলো নিজেই যখন এমন ছাড়া-ছাড়া বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় তখন তারা অর্থের সমতা রক্ষা করবে কেমন করে'? তাই বলছিলুম গানের সুর বাক্ ও অর্থকে অগ্রাহ্য করে' ধ্বনির সাহায্যেই সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে সৃজন করতে চায়। তাই গানে ধ্বনিকে এত বিশ্লেষণ করেছে; তাই গানে ষড়্জ, ঋষভ প্রভৃতি সুরের সাতটি গ্রাম, উঁচু নীচু মাঝারি প্রভৃতি সপ্তকের বিভাগ, কড়ি কোমল প্রভৃতি সুরের সূক্ষ্ম ভেদ, এসমস্ত বহু-বৈচিত্র্য দেখতে পাই। গানে সুরের এ-সমস্ত ভেদকে মাত্রা লয় প্রভৃতি থেকে পৃথক্ করে' দেখা দরকার। কালের দিক্ থেকে ধ্বনির আদর্শ মাপকাঠিকে মাত্রা বলা হয়; কাল ব্যেপে সুরের স্থিতিপরিমাণই হচ্ছে মাত্রাপরিমাণ। এদিক্ থেকে এক-একটি বর্ণ সিকি মাত্রা থেকে সুরু করে' চার পাঁচ প্রভৃতি বহুমাত্রাব্যাপী স্থায়ী হ'তে পারে, সুতরাং কালের স্থিতির দিক্ থেকেও বহুমাত্রাপরিমাণ হ'তে পারে। ঠিক্ তেমনি ধ্বনির তীব্রতা বা মৃদুতার দিক্ থেকেও বহু বিভাগ হ'তে পারে ধ্বনির এই উচ্চতা নীচতা ভেদ অসংখ্যরকম হ'তে পারে; ষড়্জ ঋষভ প্রভৃতি এরই প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু এসমস্ত প্রকারভেদ সম্পূর্ণরূপে মাত্রা-নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন্ মাত্রার বর্ণ তীব্রতার কোন্ গ্রামে থাকবে বা কোন্ গ্রামে মাত্রা-পরিমাণ কত তার কোনো স্থিরতা নেই। ধ্বনির স্থিতি যেমন মাত্রা-ভেদ নিয়মিত করে, তার তীব্রতাও তেমনি সুরের ভেদ নিয়ন্ত্রিত করে। আবার ধ্বনির গতির সমতাকেই লয় বলে এবং এই গতির ক্রম-ভেদে লয়-ভেদ হয়। আবার ধ্বনির গতি-ভঙ্গীতেই তালের সৃষ্টি। মাত্রা লয় যতি তাল ও সুর গানের ক্ষেত্রে যে অপরূপ অরূপ সৌন্দর্য্যের তাজমহল গড়ে'

তুলেছে, কাব্যের ক্ষেত্রে তা গড়ে' উঠেছে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতির মানসী মূর্ত্তির মাধুরীতে। কিন্তু কাব্যেও মাত্রা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে; এরা সেই সৌন্দর্য্য-ইমারতের স্থূল উপাদানই মাত্র জোগায়। সেজন্যই এগুলোকে হিসাবের বিচারে অল্পবিস্তর পরিমাপ করা যায়। কিন্তু কাব্যে সুরের যে আভাস পাই তার কোনো বিশ্লেষণ নেই, ভাবের আবেগে চিত্তে যে গতির সঞ্চার হয় তার থেকেই কাব্যে ওই সুরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সে সুর গানের সুরের মতো আপন গতিতেই আপনি বয়ে চলে না, ভাবের আবেগের অনুসরণ করে'ই কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রিত করে।

সঙ্গীত ও ছন্দ সম্বন্ধে আমরা যে বিষয়গুলোর আলোচনা করলুম্ আশা করি তার থেকে এটুকু স্পষ্ট হয়েছে যে কাব্যের ছন্দ ও গানের ছন্দ কোনো কোনো বিষয়ে সদৃশধর্ম্মা বটে, কিন্তু সমানধর্ম্মা নয়। যে ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে সেখানেও তাদের গতি একদিকে নয়, এ সাদৃশ্যটাও বিভিন্নমুখ। এ দুয়েরই যা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য বা স্বতন্ত্র সার্থকতা তা সম্পূর্ণ পৃথক্ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়েই এ দুয়ের ভিতরকার স্বরূপ বা সৌন্দর্য্যমূর্ত্তিকে আকৃতি দান করে। অতএব কাব্য ও সঙ্গীতের ছন্দের যথার্থ পরিচয় লাভ করতে হ'লে এই দু' শাস্ত্রেরই স্বতন্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন

রাজপথ

[২১]

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে সুরেশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর পুনরায় ইংরেজী প্রবন্ধের প্রুফটা বাহির করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইতস্ততঃ বিচরণ-শীল বিক্ষিপ্ত মনকে চেষ্টা করিয়াও কার্য্যের মধ্যে কোনো-মতে নিযুক্ত করিতে না পারিয়া বিরক্তিভরে কাগজপত্রগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। ভুল সংশোধন করিতে গিয়া অন্যমনস্কতাবশতঃ দুই চারিটা নূতন ভুলই হইয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধের একটা অংশ পাঠ করিতে করিতে রচনাটা এমন নীরস ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হইল যে সুরেশ্বরের একবার ইচ্ছা হইল প্রবন্ধটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু দুইদিন পরের সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধটা নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ছিঁড়িতে পারিল না।

মাধবী ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রবন্ধ ও প্রুফ্ ফেরৎ দিল।

সম্পাদক সসম্মানে সুরেশ্বরকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সবটা দেখা হ'য়ে গিয়েছে ?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সবটা দেখ্‌তে পারিনি; খানিকটা বাকি আছে। সেটা আপনি দেখে' দেবেন।"

"কিছু বদ্‌লাবার আছে কি ?"

"না, তা কিছু নেই।" তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "দেখুন, আমার এ প্রবন্ধটা তেমন ভাল হয়নি। এটা না ছাপ্‌লে কি চল্‌বে না ?"

সম্পাদক ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "না। তা কি করে' চল্‌বে ? এ প্রবন্ধের জন্যে পরশুর কাগজে দু কলাম জায়গা রাখা আছে। তা ছাড়া প্রবন্ধ ত বেশ ভালই হয়েছে; খারাপ কিছুই ত হয়নি।"

মনে মনে বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "বেশ, তা হ'লে ছাপুন।"

সংবাদপত্র-কার্য্যালয় হইতে নির্গত হইয়া সুরেশ্বর মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তাহার তাঁতঘরে উপস্থিত হইল। একটা ভিন্ন সব তাঁতগুলাই তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুরেশ্বর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁতগুলা দেখিতে লাগিল।

অধিকাংশ তাঁতেই শাটী প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া সুরেশ্বর মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, "সব তাঁতেই

শাড়ী চড়িয়াছে কেন? বাংলা দেশের পুরুষমানুষেরা কি ধুতি পরা ছেড়ে দিয়েছে?"

সুরেশ্বরের ভর্ৎসনা শুনিয়া অতুল অগ্রসর হইয়া আসিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল, "এ সব শাড়ীই ত আপনার হুকুমে চড়ান হয়েছে বাবু? মথুরের নক্‌সা আর উপদেশ-মত এগুলোতে পাড় তোলা হচ্ছে।"

মথুর ঢাকা হইতে আনীত নূতন তাঁতী।

এই মৃদু প্রতিবাদে প্রকৃত কথা স্মরণ হওয়ায় সুরেশ্বর মনে মনে অপ্রতিভ হইল। কয়েকদিন পূর্ব্বে, আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় নবসূর্য্যরক্তিমা-প্রবেশের মত, তাহার স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার মধ্যে সুমিত্রা-জনিত নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়ার পর কেমন করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচরে একে একে অধিকাংশ তাঁতে ধুতির স্থান শাটী অধিকার করিয়াছে তাহা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল বিগত তিন-চার দিবসের মধ্যে যখনই কোন একটা তাঁত মুক্ত হইয়াছে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের হিসাব না করিয়া নূতন নক্‌সার পাড় করাইবার আগ্রহে সে তাহাতে শাটী চড়াইবার আদেশ দিয়াছে।

সে-সকল কথা স্মরণ হওয়ায় এই বিপরীত তিরস্কারের জন্ম মনে মনে অপ্রতিভ এবং বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, যা হয়েছে তা হয়েছে; এখন থেকে আগেকার হিসাবে ধুতি আর শাড়ী করবে।"

এ আদেশে অতুল মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।" ধুতি উপেক্ষা করিয়া শাটী প্রস্তুত করিবার বিষয়ে এই অপরিমিত উৎসাহ তাহার মনঃপূত ছিল না।

মথুর অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবু, মিহি সুতো অনেকটা জমা হ'য়ে গিয়েছে। আপনি বলেছিলেন শাড়ীর পাড়ের প্যাটার্ণ পছন্দ করে' দেবেন।"

বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর রুক্ষস্বরে বলিল, "আমিই যদি পছন্দ করে' দোবো তা হ'লে তোমাকে এত মাইনে দিয়ে ঢাকা থেকে আন্‌লাম কেন?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া মথুর সবিস্ময়ে কহিল, "কিন্তু বাবু, আপনিই ত আদেশ করেছিলেন যে আপনি প্যাটার্ণ পছন্দ করে' দিলে তবে মিহি সুতো তাঁতে চড়বে।"

সুরেশ্বর নরম হইয়া বলিল, "সে আমার আর সময় হবে না মথুর। তুমি নিজেই বাজার-পছন্দ কয়েকরকম প্যাটার্ণের পাড় করে' নিয়ো।"

মথুর বলিল, "যে আজ্ঞে, তাই করে' নেব।" তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর একজোড়া যে ফরমাসী ছিল সুমিত্রা দেবীর নামলেখা? সেটা হবে কি?"

সুরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, মথুরের প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "একজোড়ার দরকার নেই, তবে একখানা দরকার হ'তে পারে। একখানা বেশ ভাল-করে' করে' রেখো।"

"যে আজ্ঞে।"

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া, ও কয়েকটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে উপদেশ দিয়া সুরেশ্বর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

মাধবী ফিরিয়া আসিয়া পর্য্যন্ত সুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র হইয়া ছিল। সুমিত্রাকে চরকা দিয়া আসিয়াছে সুরেশ্বরকে সে-সংবাদ দিবার অধীরতা ত ছিলই, তাহা ছাড়া সুমিত্রার সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা জানাইবার আগ্রহও কম ছিল না।

কিন্তু সুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে যখন তাহার সে দিনের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে উদ্যত হইল তখন সুরেশ্বর তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, আজ নয় মাধবী, কাল বলিস, সব শুনব। আজ একটু ব্যস্ত আছি।"

এ সংবাদের জন্ম সুরেশ্বরের এরূপ অনাগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে ব্যস্ত দাদা?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত নই,—এম্‌নি মনে-মনে একটু ব্যস্ত আছি। কাল সব শুনব। চরকাটা দিয়ে এসেছিস্ ত?"

সমস্ত কাহিনীটা বাদ দিয়া শুধু সংবাদটুকু দিতে মাধবী ব্যথিত হইল। ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তা ত দিয়ে এসেছি, কিন্তু কথা যে অনেক ছিল।"

"সে-সব কাল শুনব, মাধবী" বলিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

রাত্রে বহুক্ষণ জাগিয়া সুরেশ্বর নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। কয়েকখানা প্রয়োজনীয় চিঠি লিখিবার ছিল, সেগুলা লিখিয়া শেষ করিল; তাঁতশালা এবং অপর দুই-একটা বিষয়ের হিসাব দেখিবার ছিল, সেগুলি একে একে মিলাইয়া দেখিয়া রাখিল; এবং একটা প্রবন্ধের শেষাংশ লিখিতে বাকি ছিল, তাহাও লিখিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরেশ্বর কোন কার্য্যেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু রাত্রে একার্য্যগুলি সে নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিল। অতর্কিতে দমকা-ঝড়-খাওয়া নৌকার মতো নিরুপায় তাহার যে মন ভাসিয়াই চলিয়াছিল ক্ষণকালের জন্য তাহা বোধ হয় হালের ও পালের অধীনতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দীপ নিভাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবা মাত্র পুনরায় তাহা আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিল।

মনে হইতেছিল যেন মস্ত একটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়া, কেমন করিয়া যে তাহা হইয়া গেল, তাহা কিছুতেই নির্ণীত হইতেছিল না! যে বস্তু কখনও অধিকারের অন্তর্গত হয় নাই তাহা হইতে অধিকারচ্যুতির কোন কথা উঠিতে পারে না, কিন্তু তথাপি অধিকারচ্যুতির এ বেদনা কেমন করিয়া হৃদয় জুড়িয়া জাগিল তাহা সুরেশ্বরের নিকট অভেদ্য রহস্যের মত মনে হইতেছিল। যুক্তি কারণ বিচার ও বিতর্ক বর্জ্জিত ক্ষতি-বোধের এই অর্থবিহীন পীড়া তাহার ন্যায়নিষ্ঠ সবল চিত্তকে একই মাত্রায় বিক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত করিতে লাগিল। সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়া এই অসঙ্গত ক্ষোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসিয়া উঠিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে থাকে ততই ডুবিতে থাকে, তেমনি সুরেশ্বর তাহার দুরপনেয় মানসিক সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য যতই নিজেকে সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই যেন ক্রমশঃ বল হারাইতে লাগিল।

[২২]

প্রত্যূষে সুরেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের একটা জানালা উন্মুক্ত ছিল; দেখিল—সেখান দিয়া উষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকধারা প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া দিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাকি জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া বসিল।

নিদ্রাভঙ্গের পর সুরেশ্বর অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিল; তৎপরে প্রভাতের সুনির্ম্মল শীতলতায় কিছুক্ষণ ধরিয়া স্নাত হওয়ার পর সে তাহার হৃদয়ের অপসৃত শক্তিগুলি একে একে ফিরিয়া পাইতে লাগিল। কাল যাহা জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহারই ভস্ম লেপন করিয়া তাহার বৈরাগ্য-বিকল মন এই হিম-স্নাত প্রভাত-আলোকের উপর ভর দিয়া সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল! যে বিফলতা ধূম্রের আকার ধারণ করিয়া কাল সমস্ত চিত্ত নিবিড় কালিমায় লেপন করিয়াছিল আজ তাহা সফলতার মেঘরূপে বৃষ্টিধারায় নামিবার উপক্রম করিল!

ক্ষণপরে নিত্য নিয়ম-অনুসারে সুতা কাটিবার জন্য সুরেশ্বর চর্‌কা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাধবী তাহার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া মাধবী বলিল, "আজ শুনবে ত, দাদা?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়েছিল, মাধবী?"

সুরেশ্বরের কথায় হাসিয়া ফেলিয়া মাধবী কহিল, "ভাল হয়নি।" তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ সুরেশ্বরের প্রতি উত্থিত করিয়া কহিল, "তোমারই কি হয়েছিল?"

সুরেশ্বরের যে ঘুম হয় নাই, তাহা অবিসংবাদী সত্য, কিন্তু কি কারণে হয় নাই তাহা প্রকাশ না করিয়া সে স্মিতমুখে বলিল, "সুমিত্রাদের বাড়ী তুই কি কাণ্ড করে' এসেছিস্, সে ভাবনায় আমার কাল রাত্রে ঘুম না হবার কথাই ছিল।"

মাধবী স্মিতমুখে কহিল, "কিন্তু যে কাণ্ড করে' এসেছি

তা শুন্‌লে আজ রাত্রেও তোমার ঘুম হবে না;—তবে ভাবনায় নয়, নির্ভাবনায়!"

মাধবীর এ আশ্বাসে সুরেশ্বর কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইল না। সশঙ্কিত হইয়া শুষ্কমুখে সে কহিল, 'কি করে' এসেছিস্, মাধবী?"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার মতো কিছু করিনি। যা করেছি ভালই করেছি।"

তাহার পর, সুমিত্রাদের বাড়ী যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা মাধবী সুরেশ্বরকে শুনাইল।

সকল কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর ব্যথিত গভীর-কণ্ঠে কহিল, "যা হবার, তা দেখ্‌ছি কেউ আট্‌কাতে পারে না! কাল যদি তোকে পাঠাতে আধঘণ্টা দেরী করি মাধবী, তা হ'লে আর কোন অনিষ্ট হয় না!"

মাধবী সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "অনিষ্ট আবার কা'র কি হ'ল, দাদা?"

সুরেশ্বর বিরক্তি-বিরূপকণ্ঠে কহিল, "কতকগুলো অন্যায় কথা বলে' সুমিত্রার অনিষ্ট করে' এসেছিস্ ত!"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "ও এই কথা? আচ্ছা, কখন যদি সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় তা হ'লে তাকেই জিজ্ঞাসা কোরো যে তার অনিষ্ট করেছি কি ইষ্ট করেছি। কিন্তু এখনও তার কোন ইষ্টই কর্‌তে পারিনি। যেদিন তোমার সঙ্গে—"

মাধবীকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর অপ্রসন্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "অন্যায়! ভারি অন্যায়, মাধবী! তুই একেবারে ছেলেমানুষ! কোন্ কথা কখন্ বলা যায়, আর কখন্ বলা যায় না, তাও কি বুঝিস্‌নে?"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "তা বুঝি কি বুঝিনে, বল্‌তে পারিনে। কিন্তু অন্যায় যদি হয় ত' সে কার অন্যায় দাদা? আমার?—না, সুমিত্রার? সে যদি নিজ মনে তোমাকে—" বাকি কথা মাধবীর মুখ হইতে নির্গত হইল না; কতকটা লজ্জায় এবং কতকটা কৌতুকে সে হাসিয়া ফেলিল।

সুরেশ্বর উৎকণ্ঠা গভীরস্বরে কহিল, "কাল এইরকম যা'-তা' সব কথা বলে' সুমিত্রার অনিষ্ট করে' এসেছিস্; আজ আবার সেইরকম করে' অ. 'র অনিষ্ট কর্‌বার ফন্দিতে আছিস্? এ বাস্তবিকই াল নয়, মাধবী!"

এবার মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "অনিষ্ট, অনিষ্ট তুমি যে কি বল্‌ছ আমি তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, দাদা! সুমিত্রার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিমান-বাবুর সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হ'লে সুমিত্রারই ইষ্ট হবে, না তোমারই ইষ্ট হবে?"

মাধবীর এই কঠিন প্রশ্নে সুরেশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার পর দ্বিধা-বিনম্র অদৃঢ়-কণ্ঠে কহিল, "ইষ্ট যে হবে না, তা কি করে' বল্‌ছিস্, মাধবী? কিসে ইষ্ট হবে আর কিসে অনিষ্ট হবে তা চট্ করে' ঠিক্ করে ফেলা কি সহজ কথা রে?"

সুরেশ্বরের এই অতর্কিত শিথিল তর্কে সুবিধা পাইয়া মাধবী দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা-ই যদি, তবে তুমি এতক্ষণ ইষ্ট আর অনিষ্টের কথা তুলেছিলে কেন? কি করে' তুমি বল্‌ছিলে যে কাল আমি সুমিত্রার অনিষ্ট করে' এসেছি, আর আজ তোমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি?"

মাধবীকে সুরেশ্বর নিরস্ত করিতেই চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তর্কের সুযোগে মাধবী এমন একটা সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিল যে তাহাকে প্রতিরোধ করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ইষ্ট অনিষ্টের রহস্য ভেদ করা যে কঠিন তাহা সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে স্বীকার করিবার পর আর সে কথা দিয়া মাধবীকে শাসন করিবার উপায় রহিল না। তাই এই দুশ্ছেদ্য সঙ্কটজাল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য সুরেশ্বর তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া, অনুরোধের দ্বারা মাধবীকে শান্ত করিতে উদ্যত হইল। বলিল, "মানুষের সুখদুঃখ এমন জটিল বিধি-নিয়মে চলে যে তার উপর কোনোরকম জোরজবরদস্তি কর্‌'তে নেই, মাধবী! সহজে, আপনা-আপনি, যা গড়ে' ওঠে সেইটেই আদৎ জিনিস, আর তাই থেকেই শুভ ফল পাওয়া যায়।"

একথায় মাধবী কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে সুমিত্রার মা'র জবরদস্তিতে কি শুভ ফল পাওয়া যাবে বল দেখি?"

সুরেশ্বর বলিল, "শুধু সুমিত্রার মার জবরদস্তির কথাই ভাবছিস্ কেন, মাধবী? এর মধ্যে বিমান তার সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বিমানকে একেবারে ভুলিসনে!"

মাধবী সজোরে বলিল, "বিমান-বাবুকে ভুলব না, কিন্তু সুমিত্রাকে ভুলে' যাব? তার বুঝি কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ নেই? তার পর তোমার কথাও ভুলে যাব, মনে রাখ্‌ব শুধু বিমান-বাবুর সুখদুঃখের আর সুমিত্রার মার সাধ-আহ্লাদের কথা!"

সুমিত্রার কথায় চকিত হইয়া উঠিয়া সুরেশ্বর বলিল, "তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে, মাধবী! তুই আমাকেও এর মধ্যে এমন করে' জড়িয়েছিস্ কেন বল দেখি?"

সুরেশ্বরের তিরস্কারে সামান্য প্রশমিত হইয়া মাধবী কহিল, "রাগ কোরোনা দাদা, কিন্তু এব্যাপার থেকে তুমি দূরে সরে' দাঁড়ালে চল্‌বে না। সুমিত্রা আমার কাছ থেকে কাল যে আশ্বাস পেয়েছে তা যেন একেবারেই মিথ্যা না হয়। আমার কথায় বিশ্বাস কর, বিমান-বাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে তুমি যে শুভ ফল বল্‌ছিলে তা ফল্‌বে না। জুলুম জবরদস্তি যদি বাস্তবিকই অন্যায় হয় তা হ'লে জবরদস্তি থেকে সুমিত্রাকে তুমি রক্ষা কর! একবার তাকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, এবার তাকে তার মার হাত থেকে বাঁচাও!"

মাধবীর এই সনির্ব্বন্ধ সকাতর প্রার্থনায় সুরেশ্বর মনে মনে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "না মাধবী, আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াব না। তুইও একেবারে এ ব্যাপার থেকে তফাৎ হ'য়ে থাকিস। সাপ নিয়ে খেলানর চেয়ে মানুষ নিয়ে খেলা করা অনেক বিপজ্জনক। জয়ন্তী, সুমিত্রা আর বিমান এ তিনজন মানুষকে খেলান আমারও কাজ নয় তোরও কাজ নয়। এ অকাজের চর্চ্চায় আর সময় নষ্ট না করে' আয় আমাদের যা কাজ তা একটু করি।"

তাহার পর উপস্থিতের মতো এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখিয়া ভ্রাতাভগিনী দুইজনে দুইখানি চর্‌কা লইয়া সুতা কাটিতে আরম্ভ করিল। (ক্রমশঃ)

শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মর্ম্মস্থল

শরীরের মধ্যে "মর্ম্মস্থল" নামক এমন কতকগুলি স্থান আছে যাহাতে সামান্য আঘাত করিতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত আশু ও অধিক ফল পাওয়া যায়; সেই হেতুই মর্ম্মস্থল সম্পর্কেও সাধারণ জ্ঞান থাকা নিতান্তই আবশ্যক। মর্ম্মস্থলগুলি সম্পূর্ণ জ্ঞাত থাকিলেই প্রকৃত সংঘর্ষকালে প্রতিদ্বন্দ্বীর উপযুক্ত "ছিদ্র" সন্ধান সম্বন্ধে এবং আত্মছিদ্র সংগোপন ও সংরক্ষণ-সম্পর্কে যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে। তাই নিম্নে সুশ্রুতানুমোদিত কতিপয় মর্ম্মস্থলের উল্লেখ করা গেল।

মাংস, শিরা, স্নায়ু, অস্থি ও সন্ধিদিগের বিশেষ বিশেষ সন্নিপাত ও সংযোগস্থল মারাত্মক হেতু "মর্ম্ম" নামে অভিহিত হয়; ঐ-সকল স্থানে স্বভাবতই বিশেষভাবে চেতনা ও প্রাণসমূহ নিবদ্ধ থাকে, সেই হেতুই মর্ম্মসমূহ আহত হইলে বিভিন্নরূপে প্রাণ-সঙ্কট উপস্থিত হয়। মর্ম্ম ক্ষত হইলে বায়ু প্রবৃদ্ধ হওয়াতে মর্ম্মবিদ্ধ ব্যক্তির সর্ব্ব-শরীর বেদনাভিভূত হইয়া প্রলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শরীর-যন্ত্র-সকল বিকল হইয়া যায়, এবং তাহার সংজ্ঞাও বিনষ্ট হয়। শরীরে সাধারণতঃ একশত সাতটি মর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে হস্তপদাশ্রিত মর্ম্ম অপেক্ষা স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্ম-সকল গুরুতর, কারণ হস্তপদাশ্রিত মর্ম্ম স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্মেরই আশ্রিত; আবার স্কন্ধাশ্রিত মর্ম্মাপেক্ষা হৃদয়, বস্তি ও শিরোগত মর্ম্মসমূহ প্রধান, কারণ ইহারাই শরীরের মূল।

মর্ম্ম-সকল সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত :—

১। সদ্যঃপ্রাণহর; যাহারা বিদ্ধ হইলে সপ্ত (সাত রাত্রি মধ্যে) প্রাণনাশ হয়।

২। কালান্তর-প্রাণহর—যাহারা আহত হইলে এক পক্ষ বা এক মাস মধ্যে প্রাণনাশ হয়।

৩। বৈকল্যকর; যাহারা আহত হইলে অঙ্গের বিকলতা সম্পাদন করে।

৪। রুজাকর; যাহারা আহত হইলে তীব্র যাতনা উদ্ভূত হয়।

৫। বিশল্যঘ্ন; যাহা হইতে শস্ত্র দ্বারা কিম্বা বলপূর্ব্বক শল্য উদ্ধৃত হইলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

বিশল্যঘ্ন ও বৈকল্যকর মর্ম্ম-সকল অতিশয় আহত হইলেও কদাচিৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম-সকলের মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে মৃত্যু ঘটে; আবার কালান্তর-প্রাণহর মর্ম্ম-সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে বৈকল্য সম্পাদন করে; রুজাকর মর্ম্ম সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে অতীব্র (অল্প) বেদনা উৎপাদন করে; বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম-সকল মধ্যে বিদ্ধ না হইয়া সমীপে বিদ্ধ হইলে কালান্তরে ক্লেশ ও রুজা উৎপাদন করে।

ছেদ, ভেদ, অভিঘাত, দহন, বিদারণ প্রভৃতি দ্বারা মর্ম্ম-সকল অতীব্রাহত ও উপাহত (অর্থাৎ সমীপে আহত) হইলেও তুল্য লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন মর্ম্মাভিঘাতই একেবারে আপৎশূন্য নহে। মর্ম্মস্থানসমূহে অভিহত হইলে মানবগণ সুচিকিৎসিত হইলেও প্রায়ই অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হয় কিম্বা প্রাণ হারাইয়া থাকে।

মর্ম্মে অভিহত না হইয়া, কোষ্ঠ, শির, কপাল প্রভৃতি সংভিন্ন ও জর্জ্জরিত হইলেও এবং শরীরের নানা স্থান শল্যাহত হইলেও প্রাণ বিনষ্ট হয় না; এমন কি সমগ্র হস্ত পদ কর চরণ নিঃশেষে ছিন্ন হইলেও (রক্তবাহিনী শিরা-সকল সঙ্কুচিত হওয়া নিবন্ধন রক্ত-নির্গমন-পথ বহুল পরিমাণে অবরুদ্ধ হওয়াতে অল্পই রক্ত নির্গত হয় বলিয়া) ছিন্নশাখ বৃক্ষের ন্যায় মানব একেবারে মরিয়া যায় না। কিন্তু ঐ-সমস্ত অবয়বাশ্রিত "ক্ষিপ্র" "তলহৃদয়" প্রভৃতি মর্ম্ম আহত হইলে, প্রভূত রক্ত নির্গত হইতে থাকে বলিয়া রক্তক্ষয়-হেতু বায়ু কুপিত হওয়াতে অত্যন্ত পীড়া উৎপাদন করে, এবং শস্ত্রাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মানব প্রাণ হারাইয়া থাকে। অতি সুদক্ষ শ্রেষ্ঠ সুচিকিৎসকগণই কেবল কোন কোন স্থলে ঐরূপ অবস্থায় সুফল দেখাইতে পারেন।

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্ম অভিহত হইলে রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ে জ্ঞান-নাশ, মন ও বুদ্ধির বিপর্য্যয় এবং নানাপ্রকার তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। কালান্তরপ্রাণহর মর্ম্ম অভিহত হইলে নিশ্চয়ই মানবগণের ধাতুক্ষয় হয় এবং ধাতুক্ষয়-হেতু নানারূপ বেদনা উপস্থিত হইয়া মানবের প্রাণ নাশ হয়। বৈকল্যকর মর্ম্ম অভিহত হইলে সুচিকিৎসকের নৈপুণ্যে শরীর ক্রিয়াযুক্ত থাকিলেও বিকলতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। রুজাকর মর্ম্ম-সকল অভিহত হইলে বিবিধ বেদনা উপস্থিত হয়, কিন্তু কুবৈদ্য চিকিৎসা করিলে অঙ্গের বৈকল্যও হইতে পারে।

সদ্যঃপ্রাণহর মর্ম্মতালিকা।

১—৪। শৃঙ্গাটক মর্ম্ম চারিটি :—

যে সকল শিরা ঘ্রাণ শ্রবণ দর্শন ও আস্বাদন নির্ব্বাহ করে, তাহাদের এক-এক শ্রেণীর মুখ-সকল মস্তক-মধ্যে চারি স্থানে সংযুক্ত আছে; সেই-সকল সংযোগ-স্থান শৃঙ্গাটক নামে অভিহিত হয়, উহাদের কোন একটি ছিন্ন হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"শির" "সাও্" "উল্টা সাও্" "উল্টাশির" উভয় "চক্রিকা" প্রভৃতি এই-সমস্ত মর্ম্ম ভেদ করিয়া যায়।

শৃঙ্গাটক মর্ম্মগুলি সম্পূর্ণ মস্তকের অভ্যন্তরে অবস্থিত; কিন্তু এরূপ ঘটিতে পারে যে মস্তকের উপরি যে-কোনও স্থানে যে-কোনও আঘাত সংক্রামিত হইয়া উপরিস্থিত চর্ম্ম কিম্বা অস্থি অভগ্ন অবস্থায় থাকিলেও অভ্যন্তরস্থিত মর্ম্মগুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। তাই মস্তক রক্ষাহেতু সুশিক্ষা সর্ব্বরূপেই বিধেয় ও কল্যাণকর।

৫। অধিপতি মর্ম্ম একটি :—

মস্তকের অভ্যন্তরে শিরাসকলের সন্ধিস্থলে, যাহার উপরিভাগে বাহ্য লক্ষণ রোমাবর্ত্ত, তথায় অর্দ্ধ-অঙ্গুলী-

প্রমাণ "অধিপতি" নামক একটি সন্ধি-মর্ম্ম আছে; ইহা আহত হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"শির" "উল্টা শির" "সাও" "উল্টা সাও" প্রভৃতি এই মর্ম্মভেদ করিয়া যায়।

৬—৭। শঙ্খমর্ম্ম দুইটি :—

ললাটের উভয়পার্শ্বে, কর্ণ ও ললাটের মধ্যে ভ্রূপুচ্ছ-দ্বয়ের প্রান্তের উপরি সার্দ্ধ এক অঙ্গুলি প্রমাণ "শঙ্খ" নামক দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে, উহারা বিদ্ধ হইলে সদ্যো-মৃত্যু হয়।

"তেওয়র" দক্ষিণ শঙ্খ এবং "চাকি" বাম শঙ্খ ভেদ করিয়া যায়।

৮—১৫। "কণ্ঠশিরা" মর্ম্ম বা "শিরামাতৃকা" আটটি :—

গ্রীবার এক এক পার্শ্বে চতুরঙ্গুল-পরিমিত চারি চারিটি "কণ্ঠশিরা" বা "শিরামাতৃকা" নামক আটটি শিরা-মর্ম্ম আছে। উহারা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"জবেগার" প্রয়োগে দক্ষিণদিকস্থ এবং "উল্টা জবেগার" প্রয়োগে বামদিকস্থ এই-সকল মর্ম্ম ছিন্ন হইয়া যায়।

১৬। হৃদয়মর্ম্ম একটি :—

বক্ষের মধ্যে স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল হৃদয় নামে অভিহিত। উহার অধোভাগে আমাশয়ের দ্বার; ইহা সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের অধিষ্ঠান; তথায় কমল-মুকুলাকার অধোমুখ এবং চতুরঙ্গুল-পরিমিত "হৃদয়' নামক শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়। "সাও" "উল্টা সাও" প্রভৃতির প্রয়োগে হৃদয়মর্ম্ম বিদ্ধ হইয়া যায়।

১৭। নাভিমর্ম্ম একটি :—

পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে চতুরঙ্গুল-পরিমিত শিরাপ্রভব "নাভি"-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"চির" "হুল" "উদর" "সাও" "উল্টা সাও" প্রভৃতির প্রয়োগে নাভিমর্ম্ম ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হয়।

১৮। বস্তিমর্ম্ম একটি :—

মূত্রাশয়ের অধোদেশে একটি মুখ আছে; তথায় অল্প-মাংস-শোণিত-বিশিষ্ট চতুরঙ্গুল-পরিমিত "বস্তি" নামক স্নায়ু-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়; কিন্তু উভয় দিক্ ভেদ না হইলে অশ্মরী রোগ হেতু ক্ষতে মৃত্যু হয় না। একদিকে ক্ষত হইলে তাহা দ্বারা মূত্রস্রাব হইয়া থাকে এবং যত্নপূর্ব্বক সুচিকিৎসিত হইলে ক্ষত বন্ধ হইয়া যায়।

"কোমরকাট" "ভাণ্ডার কাট" "সাও" "উল্টা সাও" "চির" প্রভৃতির প্রয়োগে বস্তিমর্ম্ম ছিন্ন হইয়া থাকে।

১৯। পায়ুমর্ম্ম একটি :—

স্থূলান্ত্রের (উদরস্থিত প্রধান নাড়ীর) শেষভাগে নিবদ্ধ, বায়ু ও পুরীষের নিঃসারক, চতুরঙ্গুল-পরিমিত পায়ু নামক মাংসমর্ম্ম অবস্থিত; ইহা বিদ্ধ হইলে সদ্যোমৃত্যু হয়।

"চির" "কোমরকাট" "ভাণ্ডারকাট" "সাও" "উল্টা সাও" প্রভৃতির প্রয়োগে "পায়ুমর্ম্ম" ছিন্ন হইয়া যায়। অধিকন্তু বাম বক্ষের অভ্যন্তরে তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত (অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ) যে স্থানের স্পন্দন বাহ্যতঃও অনুভূত হয়, তথায় বিদ্ধ হইলেও সদ্যোমৃত্যু হয়।

"আনি" "মন" "কলপ" "হিমাএল" "মোঢ়া" প্রভৃতির প্রয়োগে ঐ স্থান বিদ্ধ কিম্বা ছিন্ন হইয়া থাকে।

কালান্তরপ্রাণহর মর্ম্মতালিকা :—

১—৫। সীমন্ত মর্ম্ম পাঁচটি :—

মস্তকাস্থির যে পাঁচটি সন্ধি আছে, তাহা "সীমন্ত-মর্ম্ম" নামে অভিহিত। উহারা প্রত্যেকটি চারি-অঙ্গুলী-পরিমিত। উহাদের কোন-একটি অভিহত হইলে উন্মাদ-ভয় বা চিত্তনাশ হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"শির" "সাও" "চক্রিকা" "উল্টা শির" "উল্টা সাও" "উল্টা চক্রিকা" প্রভৃতির প্রয়োগে এই-সমস্ত মর্ম্মগুলি পৃথক্ পৃথক্ আহত হয়।

৬—৭। অপলাপ মর্ম্ম দুইটি :—

অংসকূটদ্বয়ের (স্কন্ধসীমান্তের উচ্চ অংশদ্বয়ের) নিম্নে এবং পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অপলাপ' নামক এক-একটি শিরামর্ম্ম আছে। উহারা অভিহত হইলে রক্ত পূয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে।

"মোচার" প্রয়োগে দক্ষিণ অপলাপ ও উল্টা মোচার প্রয়োগে বাম অপলাপ অভিহত হইয়া থাকে।

৮—৯। অপস্তম্ভ মর্ম্ম দুইটি :—

বক্ষের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত বাতবহা 'অপস্তম্ভ' নামক দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহত হইলে কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হইয়া শ্বাস-কালে কালান্তরে প্রাণহরণ করে।

"জিগরের" প্রয়োগে দক্ষিণ ও 'কলপের' প্রয়োগে বাম অপস্তম্ভ বিদ্ধ হইয়া থাকে।

১০—১১। স্তনরোহিত মর্ম্ম দুইটি :—

প্রত্যেক স্তন-চুচুকের দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "স্তনরোহিত' নামক একএকটি মাংসমর্ম্ম অবস্থিত, উহারা অভিহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইয়া কাশ ও শ্বাসে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"মোচার" প্রয়োগে দক্ষিণ ও "উল্টা মোচার" প্রয়োগে বাম স্তনরোহিত ছিন্ন হইয়া থাকে।

১২—১৩। স্তনমূল-মর্ম্ম দুইটি—

প্রত্যেক স্তনের নিম্নে দুই-অঙ্গলী-পরিমিত "স্তন-মূল" নামক এক-একটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহত হইলে কোষ্ঠ কফে পূর্ণ হইয়া কাশ ও শ্বাসে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"মোচা" "মন" ও "আনির" প্রয়োগে বামস্তনমূল এবং "উল্টা মোচা" "দে" ও "দক্ষিণ আনির" প্রয়োগে দক্ষিণস্তনমূল ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হইয়া থাকে।

১৪—১৫। বৃহতী-মর্ম্ম দুইটি :—

স্তনমূলের সহিত সমসূত্রে স্থিত পৃষ্ঠদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "বৃহতী" নামক দুইটি শিরা-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে অধিক রক্তস্রাব-হেতু রক্তক্ষয়জনিত উপদ্রবসমূহ উপস্থিত হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"আনি," "পৃষ্ঠ-উত্তর" প্রভৃতির প্রয়োগে "বাম বৃহতী" এবং "দক্ষিণ আনি" "পৃষ্ঠ-দক্ষিণ" প্রভৃতির প্রয়োগে দক্ষিণ বৃহতী-মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

১৬—১৭। পার্শ্বসন্ধি-মর্ম্ম দুইটি—

জঘনদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যে প্রতিবদ্ধ এবং জঘন-পার্শ্বদ্বয়ের মধ্যে তির্য্যগ্‌ভাবে উর্দ্ধদিকে জঘনকে আশ্রয় করিয়া অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "পার্শ্বসন্ধি"নামক দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়াতে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"অঙ্কের" প্রয়োগে দক্ষিণ পার্শ্বসন্ধি এবং "উল্টা-অঙ্কের" প্রয়োগে বাম পার্শ্বসন্ধি অভিহত হইতে পারে।

১৮—১৯। নিতম্বমর্ম্ম দুইটি :—

শ্রোণিকাণ্ডের উপর উভয় পার্শ্ব-মধ্যে প্রতিবদ্ধ মলাশয়াচ্ছাদক অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমিত "নিতম্ব" নামক দুইটি অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে অধঃশরীরে শুষ্কতা ও দৌর্ব্বল্য হওয়াতে কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"অঙ্কের" প্রয়োগে দক্ষিণ নিতম্ব এবং "উল্টা অঙ্কের" প্রয়োগে বাম নিতম্ব ছিন্ন হইতে পারে।

২০—২৩। ক্ষিপ্রমর্ম্ম চারিটি :—

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তাহার নিকটস্থ অঙ্গুলী, এই উভয়ের মধ্যে অর্দ্ধ-অঙ্গুলী-পরিমিত "ক্ষিপ্র" নামক শিরামর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ অপর হস্তে একটি এবং পদদ্বয়ে দুইটি 'ক্ষিপ্র' মর্ম্ম আছে। ইহারা বিদ্ধ হইলে কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়। ক্ষিপ্রমর্ম্ম অভিহত হইলে কদাচিৎ সদ্যোমৃত্যুও ঘটিয়া থাকে।

"ঠোক্'-এর প্রয়োগে হস্তস্থিত ক্ষিপ্র মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

২৪—২৭। তলমর্ম্ম চারিটি :—

মধ্যমাঙ্গুলীর সমসূত্রপাতে হস্ততলের মধ্যস্থলে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "তল" (তলহৃদয়) নামক মাংসমর্ম্ম অবস্থিত। এইপ্রকার অপর হস্তে একটি এবং দুই পদে দুইটি "তলমর্ম্ম" আছে। ইহারা অভিহত হইলে যাতনা সহ কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"ছাপ্‌কার"প্রয়োগে হস্তস্থিত এবং "পাগ" "উল্টা পাগ" "পোস্‌ৎপা" "উল্টা পোস্‌ৎপা" প্রভৃতির প্রয়োগে পাদস্থিত তলমর্ম্ম ছিন্ন হইয়া থাকে।

২৮—৩১। ইন্দ্রবস্তিমর্ম্ম চারিটি :—

প্রকোষ্ঠের [মণিবন্ধ ও কফোণির (কনুইর) মধ্যস্থ বাহু-ভাগের] মধ্যদেশে করতলের দিকে উভয় হস্তে এক

একটি করিয়া অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত 'ইন্দ্রবস্তি' নামক মাংসমর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ পার্ষ্ণির (পাদের পশ্চাদ্দিকস্থ সর্ব্বনিম্ন অংশের) দিকে ১১ অঙ্গুলীর মধ্যে অবস্থিত জঙ্ঘা-মধ্যে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত এক-একটি করিয়া উভয় পদে দুইটি ইন্দ্রবস্তি মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে শোণিত ক্ষয় হইয়া কালান্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

"হাতকাটি" ও "শৃঙ্গবাহীর" প্রয়োগে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ দক্ষিণ ও বাম হস্তের এবং 'জঙ্ঘা' ও "পিণ্ডির" প্রয়োগে পদের "ইন্দ্রবস্তি" মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

বৈকল্যকর মর্ম্মতালিকা

১—৪। কূর্চ্চমর্ম্ম চারিটি :—

উভয় পদের ক্ষিপ্রমর্ম্মের তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধে নিম্ন ও উপর উভয় ভাগেই চতুরঙ্গুল-পরিমিত "কূর্চ্চ" নামক এক-একটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ উভয় হস্তের ক্ষিপ্রমর্ম্মেরও দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে এক-একটি কূর্চ্চমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে পদ অথবা হস্ত ঘুরিয়া যায় এবং কাঁপিতে থাকে।

"ধুনিয়া করক" ও "পালট্" দ্বারা পদের এবং 'ঠোক' "হাতকাটি পূর্ব্ব" প্রভৃতি দ্বারা হস্তের কূর্চ্চ-মর্ম্ম অভিহত হয়।

৫—৬। জানুমর্ম্ম দুইটি :—

উভয় জঙ্ঘা ও উরুর সন্ধিস্থলে তিন-অঙ্গুলী-পরিমিত "জানু" নামক এক-একটি বৈকল্যকর সন্ধি-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে খঞ্জতা হয়।

"দিগর" এবং "চাপনির" প্রয়োগে জানু-মর্ম্ম অভিহত হয়।

৭—৮। কূর্পর-মর্ম্ম দুইটি :—

উভয় প্রকোষ্ঠ এবং প্রগণ্ডের সন্ধিস্থলে অর্থাৎ কনুইদ্বয়ে একাঙ্গুলি-পরিমিত "কূর্পর" নামে এক-একটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে সঙ্কুচিত-বাহুমধ্যে (কুনি, নুলো) হইয়া থাকে।

অবস্থা-বিশেষে "হাতকাটি" ও "ভর্জ্জার" প্রয়োগে দক্ষিণ এবং "শৃঙ্গবাহী" ও "ভুজের" প্রয়োগে বাম কূর্পর-মর্ম্ম অভিহত হয়।

৯—১২। আনি-মর্ম্ম চারিটি :—

জানুর তিন অঙ্গুলী উর্দ্ধে উপরিভাগে ও নিম্নভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "আনি"-নামক বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। এইরূপ উভয় বাহুতে ও কফোণির উর্দ্ধে এক-একটি করিয়া আনি-মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে শোথের অতিবৃদ্ধি এবং সক্‌থির (সমগ্র পদের) অথবা হস্তের স্তব্ধতা হয়।

"উল্টা সাকেনের" প্রয়োগে দক্ষিণ পদের ও "সাকেনের" প্রয়োগে বাম পদের এবং অবস্থা-বিশেষে "ভর্জ্জা" কিম্বা "ভুজের' প্রয়োগে হস্তের আনি-মর্ম্ম অভিহত হয়।

১৩—১৬। উর্ব্বী-মর্ম্ম চারিটি :—

উরুদ্বয়ের মধ্যে দুইটি এবং প্রগণ্ড-[কফোণি (কনুই) অবধি কক্ষপুট (বগল) পর্য্যন্ত বাহুভাগ] দ্বয়ের মধ্যে দুইটি,—এই চারিটি, এক-অঙ্গুলী-পরিমিত "উর্ব্বী" নামক বৈকল্যকর শিরা-মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে সক্‌থি (সমগ্র পদ) অথবা বাহু শুষ্ক হইতে থাকে।

"আসর" এবং "উল্টা সাকেনের" প্রয়োগে দক্ষিণ পদস্থ এবং "উল্টা আসর" ও "সাকেনের" প্রয়োগে বাম পদস্থ, আবার "ভর্জ্জার" প্রয়োগে দক্ষিণ হস্তের ও "ভুজের" প্রয়োগে বাম হস্তের উর্ব্বী-মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

১৭—২০। লোহিতাক্ষ-মর্ম্ম চারিটি :—

উর্ব্বীমর্ম্মের উর্দ্ধে ও বঙ্ক্ষণ সন্ধির (কুঁচ্‌কির) নিম্নে উরুমূলে একাঙ্গুল-পরিমিত "লোহিতাক্ষ" নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ম্ম আছে। এইরূপ হস্তদ্বয়ের মূল ভাগে ও কক্ষপুট-সন্ধির নিম্নে দুইটি লোহিতাক্ষ মর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে রক্তক্ষয় দ্বারা পক্ষাঘাত ও উরুদেশের অথবা বাহুর অবসন্নতা হয়।

"অঙ্কের" প্রয়োগে দক্ষিণ উরুসন্ধির এবং "উল্টা অঙ্কের" প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষসন্ধির এবং "ফাঁকের" প্রয়োগে বাম কক্ষসন্ধির লোহিতাক্ষ-মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

২১—২২। বিটপ মর্ম্ম দুইটি :—

উভয় বঙ্ক্ষণ (কুঁচ্‌কি) ও বৃষণের মধ্যে এক-আঙ্গুল-পরিমিত " বিটপ" নামক এক একটি বৈকল্যকর স্নায়ু-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে বৈকল্যবিশেষ জন্মে।

"অঙ্কের" প্রয়োগে দক্ষিণ এবং "উল্টা অঙ্কের" প্রয়োগে বাম বিটপ মর্ম্ম অভিহত হয়।

২৩—২৪। কক্ষধর-মর্ম্ম দুইটি :—

উভয় কক্ষা (বগল) এবং বক্ষের মধ্যস্থলে একাঙ্গুল-পরিমিত "কক্ষধর" নামক এক-একটি বৈকল্যকর স্নায়ু-মর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

অবস্থা বিশেষে "মোঢ়া" ও "উল্টা ফাঁকের" প্রয়োগে দক্ষিণ কক্ষধর এবং "উল্টা মোঢ়া" ও "ফাঁকের" প্রয়োগে বাম কক্ষধর অভিহত হইয়া থাকে।

২৫—২৬। কুকুন্দর-মর্ম্ম দুইটি :—

বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে জঘনের বহির্ভাগে অর্থাৎ পৃষ্ঠ-বংশের উভয় পার্শ্বে কটির পশ্চাৎভাগের নাতিনিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত ঈষন্নিম্নাকার (গর্ত্তাকৃতি) "কুকুন্দর" নামক বৈকল্যকর দুইটি সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে শরীরের অধোভাগে স্পর্শশক্তি হানি এবং কর্ম্মচেষ্টা লোপ হইয়া থাকে।

২৭—২৮। অংসফলক-মর্ম্ম দুইটি :—

পৃষ্ঠের উপরিভাগে পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে "ত্রিক" সম্বন্ধ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অংসফলক" নামক বৈকল্যকর দুইটি অস্থিমর্ম্ম অবস্থিত। (গ্রীবা এবং অংশদ্বয়ের সংযোগস্থল অর্থে "ত্রিক")। উহারা অভিহত হইলে হস্তদ্বয় নিস্পন্দ অথবা শুষ্ক হইয়া থাকে।

"পৃষ্ঠ দক্ষিণের" প্রয়োগে দক্ষিণ এবং "পৃষ্ঠ উত্তরের" প্রয়োগে বাম অংসফলক-মর্ম্ম আহত হইতে পারে।

২৯—৩০। অংস-মর্ম্ম দুইটি :—

বাহুশীর্ষ ও গ্রীবার মধ্যে (স্কন্ধদ্বয়ে) অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অংস" নামক বৈকল্যকর দুইটি স্নায়ু-মর্ম্ম অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে বাহুস্তম্ভ অর্থাৎ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়া লোপ হয়।

"ইয়কুমার" প্রয়োগে বাম এবং "উল্টা ইয়কুমার" প্রয়োগে দক্ষিণ অংসমর্ম্ম বিদ্ধ হইয়া থাকে।

৩১—৩৪। নীলা-মর্ম্ম দুইটি ও মন্যা-মর্ম্ম দুইটি :—

কণ্ঠনালীর উভয়পার্শ্বে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত চারিটি ধমনী আছে; তন্মধ্যে এক-এক পার্শ্বে এক-এক নীলা ও এক-এক মন্যা। উহারা বৈকল্যকর শিরামর্ম্ম। ইহারা অভিহত হইলে মূকতা, স্বরবৈকৃতি এবং রস-জ্ঞানের অভাব জন্মিয়া থাকে।

"অন্তর" ও "উল্টা কণ্ঠার" প্রয়োগে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ এবং "উল্টা অন্তর" ও "কণ্ঠার" প্রয়োগে বাম পার্শ্বস্থ নীলা মন্যা অভিহত হয়।

৩৫—৩৬। ফণ-মর্ম্ম দুইটি :—

ঘ্রাণ-মার্গের উভয় পার্শ্বে, অভ্যন্তর বিবরদ্বারের সহিত সম্বন্ধ অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "ফণ" নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে ঘ্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

৩৭—৩৮। বিধুর-মর্ম্ম দুইটি :—

কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদিকের নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত ঈষন্নিম্নাকৃতি "বিধুর" নামক দুইটি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা বিদ্ধ হইলে বধিরতা হইয়া থাকে।

"তামেচার" প্রয়োগে বাম এবং "বাহেরাব" প্রয়োগে দক্ষিণ বিধুর-মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

৩৯—৪০। কৃকাটিকা-মর্ম্ম দুইটি :—

মস্তক এবং গ্রীবার দুইটি সন্ধিতে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "কৃকাটিকা" নামক দুইটি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা অভিহত হইলে চলমূর্দ্ধতা (শিরঃকম্পন) হইয়া থাকে।

অবস্থাবিশেষ "হাল্‌কুম" এবং "উল্টা হাল্‌কুমের" প্রয়োগে দক্ষিণ কিংবা বাম কৃকাটিকা-মর্ম্ম অভিহত হইতে পারে।

৪১—৪২। অপাঙ্গ মর্ম্ম দুইটি :—

ভ্রূপুচ্ছান্তদ্বয়ের নিম্নে, চক্ষুর বহির্ভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "অপাঙ্গ" নামক বৈকল্যকর দুইটি শিরামর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টিনাশ হইয়া থাকে।

"ভ্রুকুটি" ও "উল্টা ভ্রুকুটির" প্রয়োগে এই মর্ম্ম দুইটি অভিহত হইতে পারে।

৪৩—৪৪। আবর্ত্ত-মর্ম্ম দুইটি :—

উভয় ভ্রূর উর্দ্ধদেশের নিম্নাংশে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "আবর্ত্ত" নামক বৈকল্যকর এক-একটি সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা বিদ্ধ হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টির ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

"ভ্রুকুটি" এবং "উল্টা ভ্রুকুটির" প্রয়োগে এই মর্ম্ম দুইটি অভিহত হইয়া থাকে।

রুজাকর (কষ্টদায়ক ও পীড়াকর) মর্ম্মতালিকা।

১—২। গুল্ফ-মর্ম্ম দুইটি—

পদের ঘুন্টিকাদ্বয়ে অর্থাৎ পাদ ও জঙ্ঘার সন্ধিস্থলে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত "গুল্ফ" নামক দুইটি পীড়াকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অত্যন্ত যাতনা হইয়া থাকে এবং কখন কখন স্তব্ধপাদতা, এমন কি খঞ্জতাও হইতে পারে।

"পালট্" "করক্" "কুচ্" প্রভৃতির প্রয়োগে গুল্ফ-মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

৩—৪। মণিবন্ধ-মর্ম্ম দুইটি :—

উভয় করপল্লব ও প্রকোষ্ঠের [কফোণি (কনুই) হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগের] সন্ধিস্থলে দুই-অঙ্গুলী-পরিমিত এক-একটি পীড়াকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। ইহারা অভিহত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয় এবং কখন কখন হস্তের স্তব্ধতাও হইতে পারে।

"হাতকাটি অধঃ" "হাতকাটি পেশ" "হাতকাটি পোস্ত্" ও "হাতকাটি পূর্ব্ব" প্রভৃতির প্রয়োগে মণিবন্ধ-মর্ম্ম বিভিন্ন পার্শ্বে অভিহত হইতে পারে।

৫—৮। কূর্চ্চশিরা-মর্ম্ম চারিটি—

গুল্ফসন্ধির (পাদসন্ধির) অধোভাগে, উভয় পার্শ্বে প্রত্যেক পদে দুইটি করিয়া এক-এক-অঙ্গুলী-পরিমিত কূর্চ্চশিরা নামক চারিটি পীড়াকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। ইহারা অভিহত হইলে যাতনা ও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"করক" "পালট", "ধুনিয়াপালট" "ধুনিয়াকরক" 'কুচ্' প্রভৃতির প্রয়োগে বিভিন্ন পার্শ্বে এই মর্ম্মগুলি অভিহত হইতে পারে।

বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম-তালিকা।

১—২। উৎক্ষেপ-মর্ম্ম দুইটি :—

শঙ্খদ্বয়ের উপরিভাগে কেশপ্রান্তে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত "উৎক্ষেপ" নামক দুইটি বিশল্যঘ্ন স্নায়ুমর্ম্ম অবস্থিত। উহারা শল্যাভিহত হইলে, যতক্ষণ শল্য উদ্ধৃত না হয় ততক্ষণ রোগী জীবিত থাকে, ক্ষত পাকিয়া শল্য পতিত হইলেও রোগী জীবিত থাকে, কিন্তু শস্ত্রাদি দ্বারা কিম্বা বলপূর্ব্বক শল্য উদ্ধৃত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

৩। স্থাপনী-মর্ম্ম একটি :—

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত স্থাপনী নামক একটি বিশল্যঘ্ন শিরামর্ম্ম অবস্থিত। উহা বিদ্ধ হইলে পূর্ব্বোক্ত "উৎক্ষেপ"-মর্ম্ম-বিদ্ধের ন্যায় ফল হইয়া থাকে।

"ভ্রুকুটি" ও "উল্টা ভ্রুকুটির" প্রয়োগে স্থাপনী-মর্ম্ম অভিহত হইয়া থাকে।

মর্ম্মস্থলসম্পর্কে যে-সমস্ত সাঙ্কেতিক আঘাতের উল্লেখ হইল তাহা সমস্তই অসির আঘাত বুঝিতে হইবে। লাঠির আঘাতে অধিকাংশ মর্ম্মস্থলই ছিন্ন কিম্বা বিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রী পুলিনবিহারী দাস

সামাজিক শ্রমশক্তি ও তাহার ব্যবহার

কোনো কারখানায় যে-সকল লোক কাজ করে তাদের মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক হচ্ছে যারা অন্ত সকলকে মাইনে দিয়ে রাখে অর্থাৎ নিয়োক্তা বা কর্ত্তা, ও আর-এক হচ্ছে যারা মাইনে নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ নিযুক্ত বা কর্ম্মী। কর্ত্তা যে মাইনে দেয় তা আসলে উৎপাদিত ভোগ্যের অংশ মাত্র। তার মানে এই নয় যে কাপড় তৈরী হ'লে প্রত্যেক কর্ম্মী এক কি দুই বা পাঁচ গজ কাপড় মাইনে হিসাবে পায়; কাপড় সবই টাকায় বিক্রি

হয় এবং টাকাতেই মাইনে দেওয়া হয়। এমন উদাহরণ অবশ্য দেওয়া যায় যেখানে মাইনে সম্পূর্ণ বা অংশত দ্রব্যে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণত মাইনে টাকাতেই দেওয়া হয়। দ্রব্যে মাইনে দেওয়া অনেক দেশে আইন অনুসারে নিষিদ্ধ এবং তাতে শ্রমজীবী বা কর্ম্মীর অসুবিধাই হয়; কেননা প্রথমতঃ শ্রমজীবী বা কর্ম্মী, কর্ত্তা বা নিয়োক্তার চেয়ে অল্পবুদ্ধি লোক বলে' ন্যায্য মাইনে তাকে না দেওয়ার চেষ্টা নিয়োক্তা করে' থাকে এবং দেয়ও না। তার উপর যদি মাইনে নানাপ্রকার দ্রব্যে দেওয়া যায় তা হ'লে কর্ত্তার ঠকাবার আরও অনেক সুবিধা হয়ে যায়। উৎপন্ন দ্রব্য যদি কাপড় হয় এবং মাইনে যদি চালে ও ডালে দেওয়া যায়, তা হ'লে কোনো সময় সমাজে কাপড়ের দাম বেড়ে গেলে ও চাল-ডালের দাম কমে' গেলে এবং মাইনে (অর্থাৎ চাল-ডাল) আগের সমান থাকলে শ্রমজীবীর প্রাপ্যের কম পাওয়ার আশঙ্কা আছে। মাইনে টাকায় পেলে অন্ততঃ এক টাকার মূল্যের (অর্থাৎ কিনবার ক্ষমতার) কম-বেশীর ফলে যা ঠকবার সম্ভাবনা তাই থাকে। সাধারণভাবে টাকার কিনবার ক্ষমতা কমে' গেলে যে দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমজীবীরা সাহায্য করে তার বদলেও বেশী টাকা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে শ্রমজীবীর আসল মাইনে (অর্থাৎ উৎপন্নের অংশ) সমানই রাখতে হ'লে টাকায় মাইনে বাড়া দরকার। এইজন্য অনেক দেশে শ্রমজীবী সমাজগুলি (trade unions) বিশেষ করে' টাকার কিনবার ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নজর রাখে এবং অনেক স্থলেই মাইনে এমন-ভাবে দেওয়া হয় যে টাকার কিনবার ক্ষমতা কমলে সঙ্গে সঙ্গে মাইনে বেড়ে যায়। শ্রমজীবীরাই বা কর্ম্মীরাই সাধারণত সমাজের দরিদ্র অংশের অঙ্গ; কাজেই তাদের আয় যদি অস্থির হয় তা হ'লে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য, ধনীর আয় অস্থির হ'লে যত কমে তার চেয়ে অনেক বেশী মাত্রায় কমে' যায়।

তার পর আর-একটি কথা হচ্ছে এই যে, যদি কোনো ব্যবসায়ে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম অন্য-সব দ্রব্যের তুলনায় বেড়ে যায় তা হ'লে সে ব্যবসায়ের কারবার-গুলির কর্ত্তাদের লাভ হয় আগের চেয়ে বেশী। এখন এই উপরি-লাভের অংশ কর্ম্মীরা পাবে কিনা? পেলে সবটাই পাবে, না কিয়দংশ পাবে? এবং কি পরিমাণে পাবে? কর্ত্তারা অবশ্য বলবেন যে, ক্ষতি যদি হঠাৎ হয় তা হ'লে আমরাই সেটা ঘাড়ে করি—সুতরাং লাভ হ'লেও আমরাই সেটা নেব। অর্থাৎ থেকে থেকে যে বেশী লাভ হবে সেটা থেকে থেকে কম লাভ হওয়ার ক্ষতিপূরণ মাত্র। কথাটা কিন্তু ঠিক খাঁটি সত্য নয়। কারণ কম লাভ বা ক্ষতি যখন কোনো ব্যবসায়ে হয় তখন শ্রমজীবীদের অনেকেরই কাজ যায় বা অনেকেই অল্প কাজ পায়। এক কথায় কাপড়ের বাজার খারাপ হ'লে কাপড়ের মহাজনদের আয় কমে মাত্র (আয় একদম বন্ধ কম মহাজনেরই হয়, কারণ অনেকেরই আয়ের অন্য উপায় থাকে), কিন্তু শ্রমজীবীর বা কর্ম্মীর আয় অনেক স্থলে একদমই বন্ধ হ'য়ে যায়, এবং অনেক স্থলেই কমে' যায়। তার উপর স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে দেখলে দেখি যে ২০৲ টাকার রোজগার ১০৲ টাকা হ'য়ে গেলে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য-হানি হয় ১০,০০০৲ টাকার রোজগার ২০০০৲ হ'য়ে গেলে তার চেয়ে কম হয়। কাজেই লাভের অংশ কর্ম্মীদেরও প্রাপ্য। সমস্তটা তারা পেতে পারে না, কেননা যে-ভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসার লাভ বাড়ে সেটা আসে কর্ত্তাদের কাছ থেকেই এবং কর্ত্তাদের লাভের আশা বন্ধ হ'য়ে গেলে লাভের চেষ্টাও কমে' যাবে। লাভের ভাগ কি-ভাবে করা হবে তা ব্যবসায়ের ও অন্যান্য নানা অবস্থার উপর নির্ভর করে। যে-সব ব্যবসায়ের উন্নতি করতে কর্ম্মীরাও বিশেষভাবে সক্ষম সেইসব ব্যবসাতেই তাদের লভ্যাংশ বেশী হয়।

টাকার মাইনে ও আসল মাইনেতে যে তফাৎ আছে তা কতকটা বোঝা গেছে, কিন্তু আরও অনেক কথা আছে। আসল মাইনে নির্দ্ধারণ শুধু টাকার কিনবার ক্ষমতা দেখেই হয় না। কাজ করতে গিয়ে কষ্টের কম-বেশীও এর মধ্যে পড়বে। অর্থাৎ কাজ করতে গিয়ে কর্ম্মীর স্বাচ্ছন্দ্যের যা ক্ষতি হয় তার সঙ্গে মাইনের দ্বারা যে-পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে তার তুলনা করে' তবে আসল মাইনে ঠিক হবে। মাইনের টাকায় যদি কম ভোগ্য কিনতে পাওয়া যায়

তা হ'লে অন্য অবস্থা সব অপরিবর্ত্তিত থাকলে আসল মাইনে কমেছে, ধরতে হবে। তেমনি যদি মাইনে সমানই থাকে আর কাজ আগের চেয়ে বেশী সময় বা অসময়ে করতে হয় তা হ'লেও আসল মাইনে কমল, ধরতে হবে; কেননা বেশী কষ্টজনক কাজ করে' সমান মাইনে পাওয়া ক্ষতির চিহ্ন। আগে যদি শ্রমজীবীকে ভোর পাঁচটায় উঠতে হ'ত আর এখন যদি ৪টায় উঠতে হয়, আগে যদি কারখানায় পাখা, খাবার জল, পরিচ্ছন্নতা দুর্গন্ধনাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকত আর এখন যদি না থাকে তা হ'লে সে-সব ক্ষেত্রে মাইনের টাকা এবং তার কিনবার ক্ষমতা অপরিবর্ত্তিত থাকলেও শ্রমজীবীর অবস্থা খারাপ হয়েছে বা আসল মাইনে কমেছে, ধরতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, টাকার মাইনে বা সামাজিক আয়ের অংশ দরিদ্রের সমান থাকলেও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য অন্য দিক্ দিয়ে কমতে পারে এবং দরিদ্রের স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বলে'ই এদিকে বেশী নজর দেওয়া দরকার। সামাজিক শ্রমশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে বা বাড়াতে হ'লে শ্রমজীবীদের জীবন-যাত্রার (standard of living) দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার। অধিক সময় কাজ করা, শিশু বয়সে কাজ করা, সন্তান-পালনে অবহেলা করে' স্ত্রীলোকের কাজ করা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কাজ করা ইত্যাদি নানা কারণে সমাজের শ্রমশক্তি কমে' যায় এবং তার উপর স্বাচ্ছন্দ্য সাক্ষাৎভাবেও ক'মে যায়।

শ্রম করলে বিশ্রামের প্রয়োজন। যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম না করলে শ্রমশক্তি কমে' যায়। ৮ ঘণ্টা শ্রম করে' যদি ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম যথেষ্ট হয় তা হ'লে ১০ ঘণ্টা কাজ করলে ১০ ঘণ্টার চেয়ে বেশী বিশ্রাম দরকার হয়। অর্থাৎ শ্রমের সময়ের তুলনায় বিশ্রামের প্রয়োজন বেশী হারে বেড়ে চলে। এবং ফলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশী সময় কাজ করলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যথেষ্ট বিশ্রাম-পাওয়া বলে না। যেমন ১০ ঘণ্টা কাজ করলে যদি ১২ ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার হয় এবং ১২ ঘণ্টা কাজ করলে যদি ১৫ ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার হয়, তা হ'লে যে, শ্রমজীবীরা ১২ ঘণ্টা কাজ করে' তাদের পক্ষে যথেষ্ট বিশ্রাম লাভ এই গ্রহেতে সম্ভব নয়; ২৭ ঘণ্টায় দিন হয় এমন গ্রহ একটি তাদের জন্য খুঁজে' বের করা দরকার।

আমাদের দেশে বেশীর ভাগ শ্রমজীবীই অত্যধিক সময় কাজ করে। ফলে তাদের শ্রমশক্তি ও জীবনী শক্তি ক্রমশঃ কমে' যায় এবং শেষে হয় অকালমৃত্যু। বেশী সময় কাজ করলে যে কাজ বেশী হয় তা নয়। ৮ ঘণ্টা ভাল করে' ও ফুর্ত্তির সঙ্গে কাজ করলে যা কাজ হয়, ১২ ঘণ্টা অসাড়ভাবে ও কপাল চাপড়ে অদৃষ্টকে গাল দিয়ে কাজ করলে তার চেয়ে কাজ কম হওয়ারই সম্ভাবনা। **মানুষ শুধু দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নয়, দ্রব্য উৎপাদনও মানুষের জন্য**, এই কথাটা মনে রাখা সব সময় দরকার। অর্থাৎ মানুষ দ্রব্য বা ভোগ্য উৎপাদনের উপায় ও উদ্দেশ্য দুই-ই। কাজেই যে-ভাবে কাজ করলে তার শরীর মন অসাড় হ'য়ে যায় এবং ভোগে সুখ থাকে না ও অকালমৃত্যু ঘটে সে-ভাবে কাজ করে' উৎপাদন বেশী হ'লেও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক্ থেকে দেখলে তা করা উচিত নয়, এবং বৈজ্ঞানিক-ভাবে যখন প্রমাণ করা যায় যে বেশী সময় কাজ করলে কাজ কম হয়, তখন ত আরও উচিত নয়। তা ছাড়া শ্রমজীবীকে যদি যন্ত্র হিসাবেই ধরা যায় তা হ'লে দেখি যে যে-যন্ত্র মাত্র কুড়ি বছর কাজ দেয় তার চেয়ে যে-যন্ত্র তিরিশ বছর কাজ দেয় তার মূল্য বেশী, যদি না প্রথম যন্ত্র দ্বিতীয়ের দেড়গুণের বেশী কাজ দেয়। দিন ৮ ঘণ্টা কাজ করলে যা কাজ হয় ১২ ঘণ্টা করলে বিজ্ঞান বলছে তার চেয়ে কমই হয়। কাজেই দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করে' কেউ ৮ ঘণ্টা কাজ করার দেড় গুণ কাজ দেবে এ-আশা বাতুলের আশা। কেউ বলবেন, আমরা দেখি ৮ ঘণ্টায় যা কাজ পাই ১২ ঘণ্টায় তার চেয়ে বেশী পাই। কিন্তু তা তাঁরা পান সচরাচর ১২ ঘণ্টা কাজ করিয়ে এইপ্রকার শ্রমজীবীর কাছ থেকে। কম সময় কাজ করিয়ে বেশী বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে কেউ দেখেছেন কি? কম সময় কাজ করান সুরু করলে গোড়ার দিকে কিছু দিন কম কাজ পাওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু সেটা শীঘ্রই কেটে যায়।

তা ছাড়া মাইনে দেবার বন্দোবস্ত এমনভাবে করা উচিত যে যথেষ্ট কাজ না দিলে মাইনে কমে' যায়। ফলে কম সময়ে বেশী কাজ করার চেষ্টা বাড়ে এবং বিশ্রামেও আগে ছুটি পাবার আশায় শ্রমশক্তি বেড়ে যায় এবং সে-চেষ্টা সফলও হয়।

অবশ্য শুধু সময়ের দিক্‌টা দেখ্‌লেই হয়না। যা মাইনে দেওয়া হয় তাতে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায় কি না তাও দেখ্‌তে হবে। অল্পাহার ও নিকৃষ্ট বাসস্থান ইত্যাদির জন্যে শ্রমশক্তি কমে' থাকে। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। তা হ'লে সে-সব দোষ দূর করতে হবে। জীবন-যাত্রা একটা নির্দ্দিষ্ট ভাবের চেয়ে নিকৃষ্ট হ'লে শ্রমশক্তি ও উৎসাহ কমে' যায়। সেইপ্রকার জীবন-যাত্রার মধ্যে কি কি পড়ে তা বল্‌তে গেলে মোটামুটি বলা যায়—যথেষ্ট খাবার, পরিষ্কার ও মানুষের বাসের পক্ষে যথেষ্ট বড় বাসস্থান এবং শীত ও লজ্জা নিবারণের উপযুক্ত কাপড়-চোপড়। মাইনে অল্প অল্প করে' বাড়াতে সুরু করলে কাজও অল্প অল্প করে' বেশী পাওয়া যাবে। অবশ্য অনেক কাল জানোয়ারের মত থাকার ফলে, বেশী মাইনের টাকা কর্ম্মীরা মদ খেতে লাগাতে পারে সেইজন্য বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা যথাসম্ভব কর্ত্তাদের করে' দেওয়া উচিত এবং মাইনে বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বন্দোবস্ত করাও উচিত। এতে শ্রমশক্তিও বাড়ে আর মনের উৎকর্ষও হয়। ফলে সামাজিক আয়ও বাড়ে এবং পরোক্ষভাবে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যও বাড়ে।

কর্ত্তা ও কর্ম্মীতে ঝগড়া ও ধর্ম্মঘট

এই ব্যাপারটা আজকাল খুবই একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে' দাঁড়িয়েছে। আজ এখানে ধর্ম্মঘট কাল ওখানে কার্‌খানার কর্ম্মীদের তাড়িয়ে দেওয়া। সব সময়ই প্রায় জগতের কোন-না-কোন জায়গায় কর্ত্তা ও কর্ম্মীতে ঝগড়া লেগে আছে। শ্রমশক্তি জিনিসটি এমনই যে অন্য উপকরণের মত এ স্বাধীন নয়। শ্রমশক্তি সময়ের অধীন। অর্থাৎ কিছু কয়লা বা তুলা বা চাল, আজ না কাজে লাগুক কাল কাজে লাগান যায়। আজ দরে না পোষালে কাল রেখে বেচা যায়। কিন্তু শ্রমশক্তি আজ ব্যবহার না করে' কাল দু'দিনের শ্রমশক্তি একদিনে কাজে লাগান যায় না। আজ বা এই মাসে মাইনেতে না পোষালে কাল বা আগামী মাসে সব শক্তি জমিয়ে রেখে কর্ত্তাকে (মাইনের) সুবিধা দরে দেওয়া যায় না। মূলধনও যতদূর কার্য্যশক্তির জন্যে ব্যবহৃত হয় ততদূর শ্রমশক্তির সঙ্গে তার স্বভাব একই অর্থাৎ মূলধন যন্ত্ররূপে যেখানে ব্যবহৃত হয় সেখানে তার মূল্য বা কার্য্যকারিতা সময়ের অধীন। অর্থাৎ ছাপাখানার কল এক মাস বন্ধ রেখে দ্বিতীয় মাসে একসঙ্গে দু' মাসের কাজ তার কাছ থেকে আদায় হয় না। কাজেই ধর্ম্মঘট বা শ্রমজীবী-বিতাড়ন (প্রথমটির অর্থ শ্রমজীবীদের বেরিয়ে আসা আর দ্বিতীয়টির অর্থ তাদের বের করে' দেওয়া) যে কারণেই হোক, উৎপাদন বন্ধ হ'য়ে গেলে সামাজিক আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ এর দরুন্ অনেক শ্রমশক্তি ও কার্য্যশক্তির অপব্যয় হয়। তা ছাড়া অনেক কাল অলস-ভাবে কাটালে শ্রমজীবীদের কর্ম্মকুশলতা কমে' যায় এবং অন্যান্য কু-অভ্যাসও তাদের মধ্যে ঢুক্‌তে পারে। নানা কারণে ধর্ম্মঘট ও শ্রমজীবী বিতাড়ন অনেক সময় অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে' কিন্তু নিজের কথা রাখার জেদই বহু-ক্ষেত্রে এর কারণ। কাজেই সমাজের কর্ত্তব্য ঐ জাতীয় গোলমালের নিষ্পত্তির বন্দোবস্ত করা। দেশের গণ্যমান্য লোকেদের দ্বারা গঠিত বিবাদ-নিষ্পত্তি-সভা, কি সরকারী বিবাদ-নিষ্পত্তি আদালত, কি কর্ত্তা ও কর্ম্মীদের মনোনীত সভ্যের দ্বারা গঠিত কমিটি ইত্যাদি যাই হোক, বিবাদ-নিষ্পত্তির বন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কিরূপে বিবাদ-নিষ্পত্তি বা-নিবারণ হ'তে পারে তার আলোচনা করার স্থান নেই; কাজেই এখানে এর বেশী কিছু বলা যায় না।

আমরা দেখ্‌লাম যে, সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য এমন একটি ব্যাপার নয় যাতে মানুষের কোনো হাত নেই। মানুষের কোনো হাত নেই এমন কারণে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়্‌তে কম্‌তে পারে বটে, কিন্তু তা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে মানুষ নিজের চেষ্টায় সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে কমাতে পারে না! এমন কি সত্য বল্‌তে গেলে, মানুষের চেষ্টাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শক্তি। "কি করব, ভগবান্ আমাদের

গরম দেশের লোক করেছেন, কাজেই আমরা কাজ কর্‌তে পারি কম ;" এই জাতীয় কথার কোনো মূল্য নেই। দক্ষিণ আমেরিকাও গরম দেশ এবং সেখানে লোকে ঠাণ্ডা দেশের লোকের চেয়ে কম কাজ করে না। সমবেত চেষ্টা ও শিক্ষার গুণে এই ভারতবর্ষের এমন অবস্থা হ'তে পারে যে, অন্য অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা দেশের লোকের চেয়ে আমাদের দেশের লোকের কর্ম্মশক্তি বেশী হ'তে পারে। দেশটা গরম বলে' আমাদের দেশের লোক কাজ কর্‌তে বা কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারে না ; এ-কথাটা একটা বিরাট্ মিথ্যা। আমাদের অক্ষমতা আছে, এইরকম একটা ধারণা আমাদের থাক্‌লে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য কমে' যায় ; কাজেই, আমাদের শক্তি-সামর্থ্যে ভয়ের কারণ আছে এই মিথ্যা কথা বলে' ও লিখে' আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস্ হারিয়ে দেবার একটা প্রাণপণ চেষ্টা অনেকের আছে। এ মিথ্যার হাত থেকে বাঁচার উপায় সজাগ অবস্থায় চোখ খুলে' থাকা ও নিজে না দেখে' ও না বুঝে' পরের কথা বিশ্বাস কর্‌ব না এই ভাব পোষণ করা।

এই ভারতবর্ষে অর্দ্ধাহারী রোগ-ক্লিষ্ট লোকে দিনে বারো ঘণ্টা কাজ করে। ইংলণ্ডে রেসের ঘোড়ার মত যত্নে-পালিত শ্রম-জীবী প্রাসাদতুল্য আরামদায়ক কার্‌খানায় দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করে, তাতেও তারা সন্তুষ্ট নয়। গরম দেশে কাজের ক্ষমতা কমে বটে, কিন্তু সবচেয়ে কমে চরিত্র-দোষে, দারিদ্র্যে ও শিক্ষার দোষে। ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের এমন কিছুই কি দেয়নি, যার জোরে আমরা গরমের বন্ধনকে ছিঁড়ে' ফেলে' শ্রমশক্তির অদ্ভুত উদাহরণ জগৎকে দেখাতে পারি ? সামাজিক শক্তির অপব্যয় নিবারণ ও সদ্ব্যবহার কর্‌তে হ'লে সমাজের নিজের কাজ নিজে করার অধিকার দর্‌কার ; সমাজের সকলের চিন্তাশক্তি প্রখর করে' তোলা দর্‌কার ; তার উপায় শিক্ষা। বর্ত্তমান ভারতে সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন **রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষা**।

শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়

বেনো-জল

চব্বিশ

আনন্দ-বাবু যা ভয় করেছিলেন, তাই-ই হ'ল। কল্‌কাতায় এসেও রতনের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষটা হতাশ হ'য়ে আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "রতন নিজে না ধরা দিলে আমরা তাকে আর ধর্‌তে পার্‌ব না।"

পূর্ণিমা অভিমান-ভরা গলায় বল্‌লে, "রতন-বাবুকে আর খুঁজ্‌তে হবে না, বাবা! আমরা কোন দোষে দোষী নই, তাঁকে আত্মীয়ের মত ভালোবাস্‌তুম, তবুও এত সহজে তিনি আমাদের ত্যাগ কর্‌লেন! যাবার সময়ে একবার দেখাও ক'রে গেলেন না! বেশ, আমরাও আর তাঁর কথা ভাব্‌ব না—এতই বা গরজ কিসের আমাদের ?"

আনন্দ-বাবু মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে বল্‌লেন, "পূর্ণিমা, এই কি তোমার মনের কথা ?"

—"হ্যাঁ, এই আমার মনের কথা!"

—"না, তোমার মনের কথা আমি জানি, তুমি অভিমান ক'রে এ কথা বল্‌ছ—নইলে রতনকে ফিরে' পাবার জন্যে আমার চেয়ে তুমি কিছু কম ব্যাকুল নও।"

পূর্ণিমা বাপের দিকে পিছন ফিরে, দাঁড়িয়ে অকারণে টেবিলের উপরটা ঝাড়্‌তে লাগ্‌ল।...

আনন্দ-বাবু যেন নিজের মনে-মনেই বল্‌লেন, "মায়া জানে—সে মায়াবী! আজ কী মায়ার ফাঁদে আমাদের বেঁধে' রেখে চ'লে গেল, এখন আর মুক্তি পাবার কোন উপায়ও ত দেখ্‌ছি না!"

দিন-পনেরো পরে বিনয়-বাবুও সপরিবারে কল্‌কাতায়

ফিরে' এলেন। আনন্দ-বাবুর সঙ্গে দেখা হবা মাত্র বিনয়-বাবু তাড়াতাড়ি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "রতনের কোন খবর পেয়েছ?"

আনন্দ-বাবু মাথা নেড়ে জানালেন, না।

বিনয়-বাবু একটু চিন্তিতস্বরে বললেন, "আনন্দ, আমি কি করব বুঝতে পারছি না ভাই! রতন চ'লে যাওয়ার পর থেকেই সুমিত্রা যেন কেমন এক-রকম হ'য়ে গেছে। সর্ব্বদা মুখ বিমর্ষ ক'রে থাকে, ঘরের কোণ ছেড়ে' বেরুতে চায় না, কারুর সঙ্গে কথা কয় না,—আমার বড় ভাবনা হচ্ছে, শেষটা কোন শক্ত অসুখে না পড়ে! রতনের অভাবটা যে সে এমনভাবে অনুভব করবে, এ সন্দেহ ত আমি কোনদিনই করি-নি! এখন উপায় কি?"

আনন্দ-বাবু অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়েরইলেন, তাঁর বুঝতে দেরি লাগল না যে, সুমিত্রা রতনকে ভালোবাসে!...... একবার এদিকে-ওদিকে পাইচারি ক'রে শেষটা তিনি বললেন, "কোন উপায়ই নেই! এখন যদি রতনকে পাওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকৃত না বটে, কিন্তু রতন এমন অজ্ঞাতবাসে গেছে, যে, কিছুতেই আমি তার সন্ধান ক'রে উঠ্‌তে পারলুম না!"

মিঃ চ্যাটো ঘরের এক কোণে এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। এখন তিনি মুখ টিপে একটুখানি হেসে বললেন, "মিঃ সেন যখনি বেনো-জল ঘরে ঢুকিয়েছিলেন, তখনি আমি বুঝেছিলুম, যে, তিনি এম্‌নি বিপদে পড়বেন!"

কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গপূর্ণ কৌতুকের উত্তরে বিনয়-বাবু বা আনন্দ-বাবু কিছুই বললেন না।

একটু পরে বিনয়-বাবু বললেন, "আনন্দ, আর-একটা কথা তুমি শোন-নি বোধ হয়। আমি স্থির করেছি, এই মাসেই সুনীতির বিবাহ দেব।"

আনন্দ-বাবু বললেন, "কুমার-বাহাদুরের সঙ্গে?"

—"হ্যাঁ। আমার ইচ্ছা ছিল বিবাহটা আরো কিছুদিন পরে হয়। কিন্তু কুমার-বাহাদুর আর অপেক্ষা করতে পারছেন না।"

—"কেন, তাঁর এতটা তাড়াতাড়ি কিসের?"

মিঃ চ্যাটো বললেন, "কুমার-বাহাদুর পরের মাসে বিলাতে যাবেন।"

আনন্দ-বাবু কেবলমাত্র বললেন, "বটে!"........

দিন-পাঁচেক পরে একদিন সকালে আনন্দ-বাবু সমাগত রোগীদের পরীক্ষা করছেন, এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কাকে চান?"

ভদ্রলোকটি বললেন, "এখানে কি বাবু রতনকুমার রায় ব'লে কেউ থাকেন?"

আনন্দ-বাবু একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন, "হ্যাঁ, রতন-বাবু আমার বন্ধু বটে, কিন্তু এ বাড়ী ত তাঁর নয়, এখানে তিনি কোন কালেই থাকেন না।"

—"এটা যে তাঁর বাড়ী নয়, আমিও তা জানি। কিন্তু যে মেসে তিনি থাকতেন, সেখানকার লোকেরা বললে, এখানে এলেই আমি রতন-বাবুর খবর পাব।"

—"রতন-বাবুর সঙ্গে আপনার কি দরকার?"

—"বিশেষ দরকার, মশাই! আর এ দরকার আমার চেয়ে রতনবাবুর নিজেরই বেশী। আমি তাঁর অ্যাটর্ণির বাড়ী থেকে আসছি!"

অত্যন্ত বিস্মিতস্বরে আনন্দ-বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "রতনের কোন অ্যাটর্ণি আছেন নাকি? কৈ, এ কথা ত আমি শুনি-নি!"

—"কুমারপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর সমস্ত সম্পত্তি রতন-বাবু পেয়েছেন। সেই সূত্রেই সুরেন্দ্র-বাবুর অ্যাটর্ণির কাছ থেকে আমি এসেছি। রতন-বাবু বোধ হয় সুরেন্দ্র-বাবুর মৃত্যুসংবাদ এখনো শোনেন-নি।

আনন্দ-বাবু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, "সুরেন-বাবু কি রতনের মাতুল ছিলেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

—"কিন্তু আমি ত জানতুম, রতনের এক মামাতো ভাই আছে।"

—হ্যাঁ। কিন্তু সুরেন-বাবুর মৃত্যুর পরে এক হপ্তার মধ্যেই তাঁর নাবালক পুত্র কলেরা রোগে হঠাৎ মারা পড়েছেন। সুরেন-বাবুর নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে এখন কেবল রতন-বাবুই বর্ত্তমান।"

অভিভূতকণ্ঠে আনন্দ-বাবু বললেন, "অভাবনীয়

ব্যাপার!……কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এমন খবর শোন্‌বার জন্যে রতন এখানে হাজির নেই।"

—"রতন-বাবু কোথায় আছেন?"

—"কেউ তা জানে না! আমাদের সঙ্গে তিনি পুরী গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকেই একেবারে নিরুদ্দেশ হয়েছেন!"

লোকটি হতাশভাবে বল্‌লেন, "মশাই, আজ ক'দিন ধ'রে চারিদিকেই রতন-বাবুকে খুঁজ্‌ছি। এত ক'রে যদিও বা তাঁর সন্ধান পেলুম, তবু তাঁকে পেলুম না। এ বড় মুস্কিলের কথা! এখন উপায়?"

—"উপায় আর কি, আপনাদের ঠিকানা রেখে যান, রতনের দেখা পেলেই সব কথা তাঁকে জানাব।"

অগত্যা ভদ্রলোক আনন্দ-বাবুর কথামত কাজ ক'রেই বিদায় হ'লেন।

আনন্দ-বাবু নিজের মনে-মনে বল্‌লেন, "তা হ'লে আর তো রতনের অজ্ঞাতবাসে থাক্‌বার কোন দর্‌কার নেই। নিজের দারিদ্র্যের গর্ব্বেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে, তার বিশ্বাস, আমরা ধনী ব'লেই তাকে অবহেলা করি। কিন্তু এখন তো আর সে গরীব নয়, এখন সে হয়তো আমাদের চেয়েও ঢের বেশী টাকার মালিক। অদ্ভুত সৌভাগ্য! এ খবরটা জান্‌তে পার্‌লে তার মনের ভাব কি-রকম হ'বে তা কে জানে? সে আমাদের সঙ্গে দেখা কর্‌বে, না দেশে গিয়ে নূতন পথে নূতন ভাবে জীবন সুরু কর্‌বে?"

এমন সময়ে পূর্ণিমা ভিতর-দিক্‌কার দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বল্‌লে, "বাবা, তোমার রুগীরা চ'লে গেছেন তো একলাটি ওখানে ব'সে আছ কেন? বাইরের ডাক থাকে তো এইবেলা যাও, নইলে ফির্‌তে দেরি হয়ে যাবে যে!"

আনন্দ-বাবু ব'লে উঠ্‌লেন, "পূর্ণিমা, পূর্ণিম', আজ এক মস্ত সুখবর পেয়েছি! চল্, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে সব কথা বল্‌ছি, শুন্‌লে তুই অবাক্ হ'বি!" বল্‌তে বল্‌তে তিনি বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লেন।

এই ঘটনার সপ্তাহখানেক পরে আবার এক অভাবিত ব্যাপার! আনন্দ-বাবু বৈকালে রোগীদের দেখ্‌তে যাবার জন্যে পোষাক পর্‌ছেন, এমন সময়ে পূর্ণিমা একখানা চিঠি হাতে ক'রে ঘরে ঢুকে বল্‌লে, "বাবা, চিঠিখানা এইমাত্র এল—উপরের ঠিকানাটা যেন রতন-বাবুর হাতের লেখা ব'লে মনে হচ্ছে, ছাপ রয়েছে কটকের ডাকঘরের।"

আনন্দ-বাবু ব্যগ্রভাবে চিঠিখানা নিয়ে, খুলে ফেলেই উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠ্‌লেন, "হ্যাঁ রে পূর্ণিমা, রতনই চিঠি লিখেছে বটে—দেখি, দেখি, কি লিখেছে!"

চিঠিখানি এই :—

সম্মাননীয়েষু—

অনেক দিন পরে আবার আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। একটি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আপনাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি, নইলে আজও আপনাকে প্রণাম কর্‌বার সুযোগ পেতুম না। এতদিনে আপনারা নিশ্চয়ই কল্‌কাতায় ফিরে গেছেন ভেবে, কল্‌কাতার ঠিকানাতেই চিঠি লিখ্‌লুম। এ চিঠি আমার বিনয়-বাবুকে লেখাই উচিত ছিল। কিন্তু পাছে তিনি ভাবেন, যে, আমি যেচে তাঁর সঙ্গে আবার আলাপ জমাবার চেষ্টা কর্‌ছি, সেইজন্যে আপনাকেই সকল কথা জানানো ছাড়া উপায় নেই।

বিনয়-বাবুর কাছে আমি নানা বিষয়ে উপকৃত আছি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মনের ভাব অবশ্য খুব প্রীতিকর নয়; তা হ'লেও তাঁর উপকার ভুলে' গেলে আমার পক্ষে ঠিক মনুষ্যোচিত কাজ হ'বে না। এইজন্যেই একটি বিষয়ে আমি তাঁকে সাবধান ক'রে দিতে চাই। আমার হয়ে আপনি তাঁকে আমার কথা জানাবেন।

কটকে আমি আমার এক বাল্যবন্ধুর আশ্রয়ে আছি। এই বন্ধুরই চেষ্টায় আমি এখানকার এক প্রবাসী বাঙালী পরিবারে গৃহ-শিক্ষকের পদ পেয়েছি। এঁরা পাঁচদীঘি গ্রামের জমীদার—বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্যে কটকে আছেন।

এঁদের পরিবারে একটি আশ্রিত লোককে দেখ্‌লুম, তাঁর চেহারা প্রায় নরেন-বাবুর মত—যাঁকে আপনারা 'কুমার-বাহাদুর' ব'লে জানেন। আমি এই চেহারার সাদৃশ্যের কথা তোলাতে জান্‌তে পার্‌লুম যে, নরেন-বাবু এঁর সহোদর হন। এঁর কাছে নরেন-বাবুর স্বহস্তে নাম লেখা ফোটো পর্য্যন্ত আমি দেখেছি। কথা-প্রসঙ্গে আরো শুন্‌লুম যে, নরেন-বাবুরা পাঁচদীঘির জমিদারের খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়, আর গরীব ব'লে এঁদেরই আশ্রিত। তাঁর 'কুমার-বাহাদুর' উপাধিটা একেবারেই

কল্পিত। এই কল্পিত উপাধির জোরে নরেন-বাবু নাকি কোথায় একবার লোক ঠকিয়ে টাকা জোগাড় করেছিলেন, আর সেইজন্যেই নাকি এই জমিদার-পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়েছেন।

ব্যাপারটা সত্য কি না বিনয়-বাবুকে খোঁজ নিতে বল্‌বেন। নইলে তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদান কর্‌লে, একটি নিষ্পাপ বালিকার সর্ব্বনাশ করা তো হ'বেই, তা ছাড়া তাঁকে নিজেকেও চিরদিন অনুতপ্ত হ'তে হ'বে। তাঁকে সাবধান করা কর্ত্তব্য ব'লেই আপনাকে সব কথা জানালুম।

আপনাদের সঙ্গে আস্‌বার সময় দেখা ক'রে আসি-নি ব'লে আপনারা নিশ্চয়ই দুঃখিত হয়েছেন। কিন্তু কি জন্যে আমি বিদায় নিয়েছি, তার কারণ আপনি অবশ্যই শুনেছেন। আমার মত কলঙ্কিত লোককে আশ্রয় দিয়ে বিনয়-বাবু নিজেই শেষে ভীত হয়েছিলেন। এমন অবস্থায় আমার পক্ষে এটা ভাবা খুবই স্বাভাবিক, যে, আপনিও হয়ত আমার সংসর্গ পছন্দ কর্‌বেন না। এই সঙ্কোচেই আপনার সঙ্গে দেখা করি-নি। যদি অন্যায় হয়ে থাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

অথচ আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এই। আমি যে-মেসে থাক্‌তুম, সেখানকার চারজন যুবক ডাকাতীর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, যদিও তাদের চরিত্রের কথা আমি কিছুই জান্‌তুম না। তবু পুলিস মিথ্যা সন্দেহে আমাকেও গ্রেপ্তার করে। পরে প্রমাণ অভাবে আমি মুক্তি পেলেও পুলিসের শুভদৃষ্টি এখনো আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছে।

এ পৃথিবীতে আমার মতন হতভাগ্য খুব কমই আছে। আমি নিজেকে মানসিক ও দৈহিক হিসাবে সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে উন্নত ব'লে মনে করি। প্রতিভা না থাক্, আমার শক্তি আছে—কিন্তু সে শক্তি নিয়ে কোনোদিকেই আমার জীবনকে আমি সফল কর্‌তে পারি-নি এবং তার একমাত্র কারণ দারিদ্র্য। গরীব ব'লেই আমি এত অসহায় হয়ে সকলের পিছনে প'ড়ে আছি।

অথচ চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, যে, একেবারেই যে নির্গুণ সেও দেশের মধ্যে সকল বিভাগেই নাম কিন্‌ছে, কেবলমাত্র টাকার জোরে। অমুক বাবু মস্তবড় 'এডিটর',—কারণ তাঁর টাকা আছে; অতএব খবরের কাগজ প্রকাশ ক'রে নিজেই তার সম্পাদক হয়ে বসেছেন—যদিও এক লাইনও লিখ্‌তে পারেন না। অমুক বাবু রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা শাসন-পরিষদে একজন মাথাওয়ালা লোক—যে-হেতু তিনি ধনীর সন্তান, অতএব মাহিনা দিয়ে শিক্ষিত গরীব কর্ম্মচারী রেখে নিজের বক্তৃতাগুলি লিখিয়ে নেওয়া খুবই সহজ। বল্‌ব কি, আজ মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য-রূপে যারা দেশের নেতা হ'য়ে উঠেছে এবং ত্যাগের বুলি আউড়ে সকলের চোখেই তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছে, তাদের মধ্যেও বেশীর ভাগ লোকই কেবলমাত্র টাকার জোরেই নেতা। আমি এদের অনেককেই ভালো ক'রেই চিনি,—বাইরে এরা খদ্দরের ছদ্মবেশ পর্‌লেও আমার চোখে ধূলো দিতে পার্‌বে না। কাগজে পড়্‌বেন এদের কেউ কেউ দেশের কাজে পঞ্চাশ বা ষাট হাজার টাকা দান করেছে। অথচ খোঁজ নিলে জান্‌বেন, এরা এক পয়সাও না দিয়ে দাতা ব'লে বিখ্যাত! এরা নাকি মহাত্মা গান্ধীর আত্মত্যাগী শিষ্য! হ্যাঁ, খদ্দর পর্‌লেই যদি সব দোষ মাপ হয়, তা হ'লে এরা গান্ধীজীর শিষ্যই বটে! কিন্তু এদের বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লেই দেখ্‌বেন, মদ ও সিগারেট থেকে সুরু ক'রে সব জিনিষই বিলাতী। সামান্য বিলাতী সিগারেট ছাড়্‌বার শক্তিও যার নেই, সেও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী গান্ধীজীর নাম নিয়ে নেতা হয়ে সারা দেশের উপরে হুকুম চালাচ্ছে! আমি মিথ্যা বল্‌ছি না বা অত্যুক্তি কর্‌ছি না। একে একে এদের অনেকেরই নাম আমি প্রকাশ্যে বল্‌তে পারি। তবু দেশের লোক অন্ধ কেন? ভোটযুদ্ধে এই ভণ্ডরাই জয়মালা পায় কেন? কারণ এরা ধনীর সন্তান! এদের ট্যাঁক থেকে একটা কাণা কড়িও দেশের লোকের ভোগে লাগ্‌বে না, তবু এদের পকেটের ঝম্‌ঝমানি শুনেই সকলে মোহিত হ'য়ে থাকে—টাকার এম্‌নি মহিমা! টাকার আওয়াজ শুন্‌লে লোকে গাধার ডাককেও তান-সেনের গান ব'লে মেনে নিতে আপত্তি কর্‌বে না। ধনীর হাজার দোষ থাক্‌লেও কেউ তা আমোলে আন্‌বে না।

আমি গরীব। ধনীকে আমি ঘৃণা করি। কারণ আমাদের যা প্রাপ্য, নিগুর্ণ হ'য়েও কেবলমাত্র টাকার জোরে তারা আমাদের কাছ থেকে তা কেড়ে নেয়। অথচ এই কাঞ্চন-কৌলীন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রেও ধনীদের সিংহাসন আমরা একটুও টলাতে পার্‌ছি না। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র—যে তন্ত্রই হোক্, সর্ব্বত্রই কোন না কোন আকারে কাঞ্চন-কৌলীন্য বিরাজ কর্‌বেই কর্‌বে—এসিয়া, য়ুরোপ ও আমেরিকা—সব দেশেই এ ব্যাপার আছে।

বিফলতার পর বিফলতার ধাক্কায় মন আমার ভেঙে গেছে। আর আমার দেশে ফির্‌তে সাধ নেই, সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমি বিসর্জ্জন করেছি। স্থির করেছি, বাকি জীবনটা লক্ষ্যহীনের মত দেশ-বিদেশে ঘুরে' ঘুরে' কাটিয়ে দেব। আপনারা আমাকে যতই স্নেহ করুন, আমি কিন্তু নিজেকে কিছুতেই আপনাদের সমকক্ষ ব'লে ভাব্‌তে পারব না—সমাজও আমাদের মিলনকে সদয়চক্ষে দেখ্‌বে না। অতএব আমার পক্ষে তফাতে থাকাই ভালো।

আশা করি, আপনি আর পূর্ণিমা দেবী ভালো আছেন। পূর্ণিমা দেবীকে বল্‌বেন যে, তিনি আমাকে চা খেতে শিখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে শিক্ষা আমি ভুলে' গেছি। তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন।

ইতি

ভবদীয়

রতনকুমার রায়।

আনন্দে অধীর হ'য়ে আনন্দ-বাবু পত্রখানা দু-তিন বার পাঠ কর্‌লেন।

পূর্ণিমা বল্‌লে, "বাবা, রতন-বাবুকে এখনি লিখে' দাও যে, কি-ক'রে চা খেতে হয়, আমি আবার নতুন ক'রে তাঁকে শেখাতে রাজি আছি।"

আনন্দ-বাবু বল্‌লেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ,—এখনি লিখে' দিচ্ছি। পূর্ণিমা, নিয়ে আয় কাগজ,—নিয়ে আয় কলম।"

আনন্দ-বাবু লিখ্‌লেন—

"স্নেহাস্পদ রতন,

আমার একান্ত ইচ্ছা, এই পত্র পাবা-মাত্র তুমি মোটমাট বেঁধে যেন কল্‌কাতার টিকিট কিন্‌তে দেরি না কর। অন্যথায় মহম্মদই পর্ব্বতের কাছে যেতে বাধ্য;—এই বুড়ো বয়সে আমাকে আর কটকে টেনে নিয়ে যেও না।

দেখ্‌ছি ধনীদের উপরে তোমার রাগ দিন-দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু এবারে নিশ্চয়ই তোমাকে ক্রোধ-সংবরণ করতে হবে—অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার অনুরোধে। কারণ, তুমি এখন নিজে ধনী-সমাজের অন্তর্গত এবং এ খবর জান্‌লে তুমি নিশ্চয়ই ও-রকম চিঠি লিখ্‌তে পার্‌তে না।

কুমারপুরে তোমার যে মামা থাক্‌তেন, তিনি পরলোকে গেছেন। তোমার মাতুলের একমাত্র সন্তানও ইহলোকে নেই। কাজেই তুমিই সমস্ত জমিদারির মালিক হয়েছ।

অতএব নিজের দারিদ্র্যের জন্য তোমাকে কল্পনায় আর সঙ্কুচিত হ'তে হবে না। সাক্ষাতে সব কথা বল্‌ব, শীঘ্র চলে' এস।

তোমার অপেক্ষায় রইলুম। ইতি।"

পঁচিশ

সেদিনের দুপুর-বেলাটা কিছুতেই কাট্‌তে চাইছিল না। সুমিত্রার মনে হ'ল, গ্রীষ্মের অসহ্য উত্তাপে সময় যেন আজ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছে! চুপ ক'রে শুয়ে থাক্‌তেও তার ভালো লাগ্‌ছিল না, বই পড়্‌তেও ভালো লাগ্‌ছিল না।

শেষটা নাচার হ'য়ে অনেক দিন পরে সে আবার তুলি রং, পেন্সিল ও কাগজ নিয়ে বস্‌ল। কিন্তু কাগজের উপরে গোটাকতক রেখা টেনেই সুমিত্রা বুঝ্‌লে যে, তার হাতের সে-নিপুণতা আর নেই। পেন্সিল ও কাগজ টেনে ফেলে' দিয়ে সে আবার ইজি-চেয়ারের উপরে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়্‌ল।

সুমিত্রার চেহারা আশ্চর্য্য-রকম বদ্‌লে গেছে। ব্যর্থপ্রেমে মানুষের চেহারা যে খারাপ হ'য়ে যায়, এ-কথা যাঁরা কবি-কল্পনা ব'লে ভাবেন, তাঁরা সুমিত্রাকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, কথাটা খুবই সত্যি। সুমিত্রা

আগেকার চেয়ে রোগা হ'য়ে ত গেছেই—বিশেষ ক'রে মলিন হ'য়ে গেছে তার সেই জ্যোৎস্নার মতন স্নিগ্ধমধুর তাজা লাবণ্যটুকু। চোখের তলায় কালো কালো দাগ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে এবং কপোলের গোলাপী আভাও অদৃশ্য হ'য়েছে। তার যে-মুখ আগে হাসি-খুসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকৃত, সে-মুখে এখন সর্ব্বদাই কেমন-একটা শ্রান্ত বিরক্তির ভাব মাখান থাকে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে থেকেই সুমিত্রা আবার উঠে' দাঁড়াল। তার পর ঘরের যে একটিমাত্র জান্‌লা খোলা ছিল, সেটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আবার সে শুয়ে পড়্‌ল।

একটু পরেই দরজা খুলে সন্তোষ এসে ঘরে ঢুকে' ব্যস্ত-ভাবে বল্‌লে, "সুমি, ওঠ্, ওঠ্!"

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

—"রতন-বাবু তোর সঙ্গে দেখা করতে আস্‌ছেন!"

সুমিত্রা কিছুমাত্র ব্যগ্রতা না দেখিয়ে আস্তে আস্তে উঠে' বস্‌ল। রতন যে কাল কল্‌কাতায় ফিরেছে আর সে যে এখন মস্ত বড় জমিদারির মালিক, এ-খবর সুমিত্রা আগেই শুনেছে। কিন্তু রতন যে আবার তার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বে, এটা সে মোটেই ভাবে-নি। সন্তোষের দিকে তাকিয়ে সুমিত্রা সন্দেহপূর্ণস্বরে বল্‌লে, "দাদা, রতন-বাবু কি নিজেই আমাদের বাড়ীতে এসেছেন?"

—"না, আমি আর বাবা আনন্দ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে' এনেছি।"

—"রতন-বাবু তা হ'লে পূর্ণিমাদের বাড়ীতে এসেই উঠেছেন?"

"হ্যাঁ।......আমি যাই, রতন-বাবুকে এখানে পাঠিয়ে দিই। ততক্ষণে ঘরের জান্‌লা তুই খুলে দে, ভারি অন্ধকার"—বল্‌তে বল্‌তে সন্তোষ বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সুমিত্রা উঠ্‌লও না, ঘরের জান্‌লাও খুলে' দিলে না। স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল।

খানিক পরেই রতন এল। ঘরের ভিতরে ঢুকে'ই সহজস্বরে সে বল্‌লে, "একি সুমিত্রা! অন্ধকারে ব'সে আছ কেন?"

—"আলো ভালো লাগ্‌ছে না।"

—"তুমি ভালো আছ ত?"

—"হ্যাঁ।"

এত দিন পরে দেখা, অথচ সুমিত্রার এই চাঞ্চল্য-হীন উদাসীন ভাব-ভঙ্গী, এই নীরস সংক্ষিপ্ত উত্তর রতনের কাছে কেমন অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল। রতন ভেবেছিল, সে ঘরে ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তেই সুমিত্রা প্রশ্নের পর প্রশ্নে ও চটুল বাচালতায় ঠিক আগেকার মতোই তাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুল্‌বে।......একটু বিস্মিত হ'য়ে রতন একখানা চেয়ার টেনে এনে সুমিত্রার সাম্‌নে গিয়ে বস্‌ল। তার পর ভালো ক'রে তাকে দেখে'ই সে ব'লে উঠ্‌ল, "সুমিত্রা! তোমার এ কী চেহারা হ'য়ে গেছে!"

সুমিত্রা মাথা নামিয়ে নিরুত্তর হ'য়ে রইল।

—"নিশ্চয় তোমার অসুখ করেছে!"

—"না।"

—"অসুখ করে-নি ত তুমি এমন শুকিয়ে গেছ কেন?"

—"জানি না"—ব'লে সুমিত্রা শ্রান্তভাবে চোখ মুদ্‌লে।

রতন বুঝ্‌লে, তার সঙ্গে কথা কইতে সুমিত্রার ভালো লাগ্‌ছে না। এর কারণ কি?......তার মনে পড়্‌ল সেই শেষ-দিনের দৃশ্য! তার পায়ের তলায় মাটির উপরে লুটিয়ে প'ড়ে সুমিত্রা সেদিন অশ্রুসিক্ত মুখে কী করুণ আবেদনই জানিয়েছিল! কিন্তু সে আবেদনে কর্ণপাত না ক'রে সে নিষ্ঠুরের মত চ'লে এসেছিল।......সুমিত্রা কি তাই তার উপরে অভি-মান ক'রে আছে? কিন্তু সুমিত্রার বালিকাসুলভ তরল মনের উপরে অভিমান যে এমন স্থায়ী রেখাপাত করবে, এটা সে কিছুতেই ভেবে উঠ্‌তে পার্‌লে না।

সুমিত্রা তখনো ইজিচেয়ারে হেলে প'ড়ে দুই চোখ মুদে' আছে। তার মুখের পানে খানিকক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে রতন মৃদুস্বরে ডাক্‌লে, "সুমিত্রা!"

সুমিত্রার সাড়া নেই।

—"সুমিত্রা, তোমার কি ঘুম পেয়েছে?"

সুমিত্রা ঘাড় নেড়ে জানালে, না।

—"তবে ?"

—"আমার ভালো লাগ্‌ছে না।"

—"কাকে, আমাকে ?"

সুমিত্রা ধীরে ধীরে চোখ খুল্‌লে। একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌লে, 'যদি তাই বলি, তা হ'লে ?"

রতন গম্ভীরকণ্ঠে বল্‌লে, "তা হ'লে আমার দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করব।"

—"কেন ?"

—"আমাকে ভালো না লাগার কোনো কারণ আমি খুঁজে' পাচ্ছি না। আমি তোমাকে আত্মীয়ের মতোই দেখি।"

সুমিত্রা তিক্তস্বরে বল্‌লে, "আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতন দেখেন, না পূর্ণিমাকে ?"

—"সুমিত্রা, কথাবার্ত্তার মধ্যে পূর্ণিমাকে তুমি কি কখনো ভুল্‌তে পারবে না ?"

—"কখনো না, কখনো না! আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতোই দেখেন বটে! তাই কটক থেকে চিঠি লিখেছেন পূর্ণিমাদের বাড়ীতে, এখানে এসে উঠেছেন পূর্ণিমাদের বাড়ীতে। বাবা নিজে যেচে ডাক্‌তে না গেলে হয়ত আমাদের বাড়ীতে আজ আপনার পায়ের ধূলোও পড়্‌ত না। রতন-বাবু, এ চমৎকার আত্মীয়তা! এখন আপনি জমিদার হয়েছেন, আমাদের আর মনে থাক্‌বে কেন ?"

রতনের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। কোনোরকমে রাগ সাম্‌লে সে বল্‌লে, "সুমিত্রা, অবুঝ হোয়ো না। মনে ক'রে দেখ, কি-ভাবে তোমাদের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম! তার পরও নিজে থেকে যেচে তোমাদের চিঠি লেখা বা তোমাদের বাড়ীতে আসা কি আমার পক্ষে শোভন হ'ত ?"

রতনের কথায় কর্ণপাতও না ক'রে সুমিত্রা আবেগভরে বল্‌লে, "কিন্তু মনে রাখ্‌বেন, যে-দিন আপনি গরীব ছিলেন, সেইদিনই আমি ভিখারীর মত আপনার পায়ের তলায়—"

রতন বাধা দিয়ে বল্‌লে, "সুমিত্রা, সুমিত্রা! আগে গরীব ছিলুম ব'লে অনেকের কাছে অনেক অপমান সয়েছি। আবার, এখন ধনী হয়েছি ব'লেও কি সকলের কাছে আমাকে অপমান সইতে হবে ?"

সুমিত্রা সিধা হ'য়ে উঠে বস্‌ল। তীব্রস্বরে বল্‌লে, "কিন্তু আমাকেও আপনি কি অপমানটা ক'রে গেছেন, তা কি আপনার মনে আছে ?"

রতন সবিস্ময়ে বল্‌লে, "আমি তোমাকে অপমান করেছি, সুমিত্রা ?"

—"হ্যাঁ, আপনি আমাকে অপমান করেছেন! আপনার পায়ের তলায় আমি পড়েছি, তবু আপনি মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছেন। নারীর এর চেয়ে বড় অপমান আর কি আছে, বল্‌তে পারেন ? সেই দীনতার লাঞ্ছনার কথা মনে কর্‌লে লজ্জায় ঘৃণায় আমার আত্মহত্যা কর্‌তে ইচ্ছা হয়! ওঃ, আজ দু-মাস ধ'রে যে কি যন্ত্রণাই আমি সহ্য কর্‌ছি, আপনি তা বুঝ্‌তে পারবেন না, রতন-বাবু!"

রতন স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তার পরে দুঃখিতস্বরে বল্‌লে, "সুমিত্রা, তোমার নারীত্বের উপরে আমার শ্রদ্ধা আছে ব'লেই সেদিন আমি তোমার কথা শুনি-নি,—তোমাকে অপমান করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বেশ, আমি না-জেনে যদি তোমাকে ব্যথা দিয়ে থাকি, তবে তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

সুমিত্রা আবার চেয়ারের উপর হেলে প'ড়ে দুই চোখ মুদে বল্‌লে, "এর জবাব আমি পূর্ণিমার কাছে আগেই দিয়েছি!"

—"পূর্ণিমার কাছে ?"

—"হ্যাঁ, আপনি কি শোনেন-নি ?"

—"না"।

—"এজীবনে আপনাকে আর আমি ক্ষমা করব না। আজ ধনী হয়েছেন ব'লে আবার আপনি এখানে এসেছেন, ভেবেছেন আপনার টাকা দেখে' আমি অপমান ভুলে' যাব ? তা নয় রতন-বাবু, অপমান আমি ভুলি না..... আপনাকে ক্ষমা করব না।"

—"এই তোমার শেষ কথা ?"

—"হ্যাঁ".........

খানিকক্ষণ পরে সুমিত্রা চোখ খুলে' দেখ্‌লে, ঘরের ভিতরে রতন নেই—নিঃশব্দে কখন উঠে' গেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়

মাহে-নগর

২

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অগভীর জলের দরুন্, মাহে-তে কোন নোঙর-স্থান নাই। গতকল্য এখানে পৌঁছিয়া, এখান হইতে তিন মাইল দূরে থাকিতে হইল।—আমরা এখন বারদরিয়ায় একেবারে নীল সমুদ্রের উপর, ভারতের মধ্যে নহে—কিন্তু ভারতের কাছাকাছি ; প্রায় সুদূর পদার্থের মত, ভারতীয় অরণ্যের সীমারেখা এবং বহুবর্ণে রঞ্জিত, সুস্পষ্ট রেখাঙ্কিত বড় বড় পাহাড় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

আজিকার দিনটা বেশ শান্ত ; বাতাস খুবই মৃদু, ডিঙ্গিগুলার পাল এই বাতাসে অতি কষ্টে ফুলিয়া উঠিতেছে। প্রখর রৌদ্রে আমরা জাহাজ ত্যাগ করিয়া দুইটার সময় জমির উপর পদার্পণ করিলাম।

বেলা দুইটা, ভরপুর দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপ। এই ক্ষুদ্র নগরটি স্বীয় উদ্দাম উদ্ভিজ্জের মধ্যে ঘুমাইতেছে ; কিন্তু এরূপ নিবিড় ছায়া যে এইসকল তালতরুপুঞ্জের আড়ালে যেন বেশ একটু শৈত্য অনুভব করা যায়।

দৈবক্রমে আমরা কানানোয়ের পথ ধরিয়া চলিয়াছি। দুই জন কথা-কহিয়ে ভারতবাসী আমাদের পিছনে পিছনে চলিয়াছে। এই যাত্রা-পথে একটা বাগান হইতে নিঃসৃত একটা আশ্চর্য্যরকমের বাজনা-বাদ্য শুনিতে পাইলাম।—মনে হইল সেইখানে বহু অনুষ্ঠান সহকারে একটা বিবাহের উৎসব হইতেছে। একদল ভাড়া-করা নর্ত্তকী কানানোর হইতে আসিয়াছে—উহারা সকলে মিলিয়া নৃত্য করিবে। উহারা বলিল, আমরা ওখানে প্রবেশ করিতে পারি, আমরা উহাদের স্বাগত অভ্যর্থনা পাইব ; কেননা, বর-কন্যা আমারই মত ফরাসী, তাহাদের সমস্ত পরিবারবর্গই ফরাসী,—যদিও তাহাদের গৃহ আমাদের উপনিবেশের বাহিরে, ইংরেজের ভূমির উপর।

এই উদ্যান শাদা বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত, বড় বড় তাল-গাছের ডাঁটায় পত্রপল্লবের মালা দিয়া বস্ত্রগুলা আবদ্ধ। পশ্চাদ্‌ভাগে এক পাশে, একটা মঞ্চের উপর কতকগুলি লোক বসিয়া আছে—উহাদের গায় সোনার হার এবং উহাদের মস্‌লিনের পরিচ্ছদ। ইহারা নিমন্ত্রিত লোক—চতুর্দ্দিকস্থ কুটীরের বাসিন্দা। তথাপি দেখিলে মনে হয় যেন একটা দেবতাদিগের সম্মিলনী,—এম্‌নি উহাদের সুন্দর প্রশান্ত মুখ, উন্নত ভব্য ভাবভঙ্গি, বড় বড় গম্ভীর চোখ। উহারা একটা হাল্‌কা-রকমের কাপড় পরিয়াছে,—একটা কাঁধে উহা গ্রন্থির দ্বারা আবদ্ধ ; বাহুদ্বয় নগ্ন ; সুন্দর মধ্য-দেহের অর্দ্ধাংশ দেখা যাইতেছে। তাঁবুর ভিতর দিয়া অত্যুচ্চ তালবৃক্ষের খিলানের ভিতর দিয়া, সেই সোনালি প্রতিবিম্ব, সেই চিরন্তন দিব্য প্রভা, যাহা ভারতে সকল দিনই দেখা যায়,—উহাদের উপর নিপতিত হইয়াছে। উহারা আমাকে একটা সম্মানের আসনে বসাইয়া দিল। আমার গায়ে এক-সারি-বোতাম ওয়ালা একটা সরু ফতুয়া, মাথায় একটা চওড়া টুপি,—এই সাজে উহাদের কাছে বসিতে আমার লজ্জা হইতেছিল......বাড়ির ভিতরে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিত, অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন কতকগুলি স্ত্রীলোক, জানালার ভিতর দিয়া আমাদিগকে দেখিতেছে। এই জনতার মধ্যে এম্‌নি গরম যে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই সোনালি আলো—যাহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এমন সুন্দর যে মনে হয় যেন উহা বায়ু-নিহিত উত্তাপের একটা উজ্জ্বলতা মাত্র। ভূমি হইতে, চারা গাছ হইতে, বড় বড় বৃক্ষ হইতে আমার চারিদিক্‌কার ভারতবাসীদিগের গাত্র হইতে মৃগনাভির গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে।

ছেলেদের নৃত্য আরম্ভ হইল,—খুব বিলম্বিত-ধরণের—মন্দিরার তালে তালে একটা বিষণ্ন ছন্দে এই নৃত্য চলিতে লাগিল। বৃত্তাকারে সারি বাঁধা ৩০ জন ক্ষুদ্র নর্ত্তক, ঘুমাইবার ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চলিতেছে ফিরিতেছে। উহাদের বাঁ হাতে এক-একটা ঢাল, ডান হাতে চওড়া ও খাটো এক-একটা অসি। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝা যায় না। কিন্তু উহারা সকলেই দেখিতে সুশ্রী—বড় বড় চোখ—নেত্রপল্লবের ধারে কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজি। কোঁকড়া চুল, একটা ফিতার দ্বারা প্রাচীন গ্রিশীয় ধরণে রগের উপর আবদ্ধ—তাহার পর ঐ চুল কাঁধের উপর দিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। বক্ষদেশ স্থূল ও পরিস্ফীত কটিদেশ আশ্চর্য্যরকম সরু, লম্বা ধুতি আঁট-সাঁট করিয়া পরা।

একটু বেশী ছিপছিপে, যেন একটু অস্বাভাবিক, দেখিতে কতকটা ইজিপ্টদেশীয় "বাস্‌রীলিফে" মুদ্রিত যাজকসম্প্রদায়ের লোকদের মতো। উহারা ভারতীয় পুরাতন চিত্রের ব্যাখ্যা-স্বরূপ। সেইরূপ খুব সুন্দর মেয়ে কি পুরুষ বুঝা যায় না—বক্ষদেশ গোলাকার, পাছা নাই বলিলেই হয়, কটিদেশ এত সরু যে মনে হয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। উহাদের মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য্য আছে যাহা অর্দ্ধেক যোগীজনসুলভ অতীন্দ্রিয় গুহ্যধরণের এবং অর্দ্ধেক লালসাময় স্থূল পার্থিবধরণের।

...আরম্ভে—তালে-তালে পা-ফ্যালা, সেই সঙ্গে গম্ভীরধরণের গান ; ক্রমশ তালটা জলদ খুবই জলদ হইয়া উঠিল। ঢালে ঢালে তালে তালে খট্ খট্ শব্দে ঘা পড়িতে লাগিল। তলোয়ারগুলা হইতে ধাতুর ঝন্-ঝনে শব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হঠাৎ তাল ও সুরের বদল হইতে লাগিল। আরও দ্রুত আরও দ্রুত। এই শিশুকণ্ঠগুলি প্রথমে বেশ মধুরস্বরে গাহিতেছিল, এখন ভূতের মত ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করিতে লাগিল। ক্রমাগত জলদ্ হইতে আরও জলদ্ ;—ঢালগুলায় আরও জোরে ঘা পড়িতে লাগিল। বাদক-দলও অরমাত্রায় গরম হইয়া উঠিল। ঢাক-ঢোল পাগলের মত বেদম পিটিতে লাগিল। যারা কাঠের বাঁশিতে ফুঁ দিতেছিল, তাদের গাল প্রসারিত হইয়াছিল, শিরগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছিল, চোখ রক্তের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। শুনিয়া মনে হয়, ব্যাগ্-পাইপের উচ্চস্বরাংশগুলা রাগান্ধ হইয়া কর্ত্তালের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে। ডাইনের মতো মুখ এক বৃদ্ধ, যে কেবল সংকেত করিয়া নৃত্য চালাইতেছিল, পশুর থাবাওয়ালা একটা বেত উঠাইয়া লইয়া উন্মত্তভাবে, চোখ ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে ডাইনে বাঁয়ে, বিলম্বিত পদক্ষেপ ছেলেদের পাছায় মারিতেছে—মার খাইয়া তাহারা আরও উচ্চ লাফ দিতেছে, আরও জোরে চীৎকার করিতেছে। আর কিছুই ঠাওর হয় না, কেবল কতকগুলা ছোট ছোট বাহু, ছোট ছোট পা, ছোট ছোট দেহ বাঁকিয়া ঘুরিয়া, মুচড়াইয়া যাইতেছে—কুন্তলগুচ্ছ কৃষ্ণসর্পের মত দীর্ঘপ্রসারিত। এই ক্রম-বর্দ্ধিত গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে একপ্রকার বেদনা অনুভূত হয়,—হাঁপাইয়া পড়িতে হয়। ক্রমশ ইহা একটা তীব্র কোলাহলে, একটা আবর্ত্তে, একটা



প্রোষিতভর্তৃকা—স্নানান্তে

নরক-কাণ্ডে পরিণত হইল...—তাহার পর হঠাৎ সব থামিয়া গেল,—সমস্তই এখন থামা-থামা, নাচ বাজনা সমস্তই—হঠাৎ প্রশমিত, সংহত নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। নাচের ঘোর-পাকটা শেষ হইয়াছে। বেশ শান্তভাবে, স্ফুর্দে নর্ত্তকবৃন্দ, কপালের ঘাম মুছিতেছে, এবং বৃদ্ধ সঙ্গীত-নেতা, এখন আবার খুব পুত্রবৎসল হইয়া উঠিয়া, উহাদিগকে জলপান করাইতেছে।

তাহার পর নবযুবকদের দল—প্রায় পরিণতবয়স্ক—উহারাও বালকদিগের ন্যায় বৃত্তাকারে একত্র জড়ো হইল। বালকদিগেরই মতো, উহাদের পাত্‌লা গঠন, বক্ষদেশ বহির্নির্গত, চকচকে লম্বা চুল,—খুব স্বল্প অঙ্গভঙ্গী, অতীব মধুর নারীসুলভ রূপলাবণ্য; দেখিতে অতীব সুন্দর, প্রাচীন গ্রীকদিগের অপেক্ষাও পেশীবহুল, বন্ধন রজ্জুগুলাও খুব সুকুমারধরণের।

উহাদের নৃত্যের আবেগশূন্য অংশের গোড়ায়, মদালসভাবে থাকিয়া থাকিয়া থামিয়া-যাওয়া, পাণিতলের অবসাদ-ক্লিষ্ট লীলায় ভঙ্গীপ্রদর্শন—উহাদের ক্রমবর্দ্ধিত গতি-বেগটা অতীব ভয়ানক—এবং শেষের দিকে, উহাদের উন্মত্ত-বেগসমন্বিত প্রবল অঙ্গবিক্ষেপের সহিত, কিছু প্রেমের ভাবও মিশিয়াছে।—তাহার পর হঠাৎ উহারা যাত্রার সং হইয়া দাঁড়াইল। যেন একটা প্রকাণ্ড স্থিতিস্থাপক তক্তার টিপনে উল্টাইয়া পড়িয়া, মাথা নীচু করিয়া শূন্যের মাঝে, স্বকীয় দেহযন্ত্র-কীলকের চতুর্দ্দিকে বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। তাহার পর আবার সোজা দাঁড়াইয়া পড়িয়া, সেই অ-নামা বাদ্যোত্থিত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আবার উহারা পূর্ব্ববৎ লাফ মারিতে লাগিল—বাজানা শুনিলে ভয় হয়। মনে হয় যেন উহারা শূন্যে শয়ন করিয়া, নিজ দেহ-কীলকের চারিদিকে বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে—শরীরটা কসি-রেখার আকারে অবস্থিত—যেন একপ্রকার চিরন্তন অধঃপতন—কেবল বেগের জোরে আপনাকে স্বস্থানে ধরিয়া রাখিয়াছে। মধ্যে মধ্যে স্নায়ুবিকারগ্রস্ত পা-টাকে এক ঠেলা দিয়া ভূতল স্পর্শ করাইতেছে। ভারসাম্যরক্ষণ সম্বন্ধে আমাদের যতকিছু ধারণা আছে তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে আপনাকে এইরূপে শূন্যদেশে স্থির রাখিয়াছে। দৈত্য-দানবদের মাথার মতো—যেন কালো-কালো আংটায় গোটানো উহাদের বড় বড় চুলের পাক খুলিয়া যাইতেছে। উহাদের নগ্ন পায়ের পতন-বেগে মাটি কাঁপিয়া উঠিতেছে—এবং উহার চাপা আওয়াজ তালে তালে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উহাদের দেখিলে মাথা ঠিক থাকে না; এইসমস্ত গরম বাষ্পোচ্ছ্বাস এই সুগন্ধ-সিক্ত স্থূল বায়ু এই সোনালি আলো যাহার দ্বারা সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী পরিস্নাত, এই তাল-তরুর খিলানমণ্ডপ—যাহার চাপে তুমি পিষিয়া যাইবে মনে হয়—এইসব "ব্যাগ-পাইপ"-যন্ত্রের গগনভেদী শব্দ, ইসব অঙ্গ-বিক্ষেপ, এই মাথা-ঘোরা-উৎপাদক গতি-চাঞ্চল্য, এইসমস্ত যেন একটা মাত্‌লামির ভাবে অল্পে অল্পে তোমাকে পাইয়া বসে।—মাথার কিছুই ঠিক থাকে না—মাথাটা এই শব্দাতিশয্যে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ে, আর-কিছুই দেখা যায় না...

মাহে নগরটা যতটা ছোট মনে হয় তার চেয়ে আসলে ঢের বড়। হরিৎ-শ্যামল বীথি-পথে বেড়াইতে বেড়াইতে, এমন সব অঞ্চল আবিষ্কার করা যায় যাহা আছে বলিয়া কখনো সন্দেহ মাত্র হয় নাই—তাল-তরু-পুঞ্জের নীচে এমনি সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন; একটা গির্জা—একটা চৌকা চত্বরের উপর কিংবা আরও ঠিক বলিতে গেলে, একটা বনের ভিতরকার ফাঁপা জমির উপর গঠিত। একটা পাদ্রির আবাস—ভারিরকমের ও রূঢ় গ্রাম্যধরণের; একটা ক্ষুদ্র মঠ, তাহার ভিতর কতকগুলি সেবাব্রত 'ভগিনী'; তাহার পর কতকগুলা উচ্চ গৃহ—এইসব গৃহে অধুনা গরীব ভারতবাসীরা বাস করে, কিন্তু প্রাচীনকালসুলভ একটা গৌরবের ভাব এখনও তাহারা বজায় রাখিয়াছে।

গির্জাটা খুব শাদাসিধা ধরণের, চুণ-কাম-করা; কিন্তু যথেষ্ট পুরাতন—অতীতের "মোহিনী" উহাতে এখনো আছে এবং আমাদের ফ্রান্সের গ্রাম্য গির্জ্জার মত উহাতে একটা বিজন আশ্রমের ভাবও আছে।

তাহার পর, একটা অঞ্চল একেবারে ভারতীয়, সজীব কোলাহলময়; এক জায়গায় কতকগুলা লোক জমা হইয়া গান গাহিতেছে—শ্যামল দেহের উপর শাদা লাল নানাপ্রকার পরিচ্ছদের সমুজ্জ্বল বিচিত্র শোভা ফলের দোকান, লাউ-কুমড়ার দোকান, ইজার-পায়জামার দোকান, হাত-পাখার দোকান;—মাছের বাজার—জমির উপর এখানকার রাঙ্গামাটির উপর মাছগুলা বিছানো রহিয়াছে।—এই মেছো বাজারে মুখে-বলি-পড়া, কুঞ্চিত-চর্ম্ম ভীষণদর্শন ভারতীয় মেছোনীরা ঝগড়া করিতেছে—কালো ছাগলের স্তনের মত উহাদের গলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যেন কতকগুলা ফাঁকা খোলে; নাসারন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া উহারা কতক-গুলা মাকড়ি পরিয়াছে ......

রাত্রি সবে আরম্ভ হইয়াছে—আমরা এই সময় আরও দূরে,—জেলেদের অঞ্চলে চলিয়া গেলাম; এই জেলেরা আরও বুনো-ধরণের। বৃহৎ বেলাভূমির উপর, তরঙ্গভঙ্গের সম্মুখে যাহাতে কোনো দ্বীপ নাই, সাগর-গর্ভোত্থিত কোনো শৈল নাই, কোনো পালওয়ালা জাহাজ নাই, সেই অনন্ত-প্রসারিত ভারত সমুদ্রের সম্মুখে আমরা আসিলাম। আজিকার সায়াহ্নে একটা কবোষ্ণ বায়ুপ্রবাহ পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া সমুদ্রকে একটু চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে—আমাদের জাহাজখানি বহু দূরে অবস্থিত, প্রায় অদৃশ্য, একাকী,—এই নীল চঞ্চল জলরাশির মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ কতকগুলা নগ্নকায় ধীবর,—বাহুযুগল তাম্রবর্ণ,—একটা লম্বা ডিঙ্গি সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—কোনো নৈশ অভিযানের জন্য উহাকে সজ্জিত করিয়া—তাহার পর, কল্লোলময় তরঙ্গ-রঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছে; সেই তরঙ্গের মধ্যে উহা শীঘ্রই অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমার চারিদিকে কতকগুলা খাগড়ার কুটীর—মনে পড়িল যেন পূর্ব্বে অন্যত্র কোথায় দেখিয়াছি—কতকগুলা পল্‌কা নারি-কেল গাছ, সমুদ্র বাতাসে দুলিতেছে—এবং উহা হইতে একরকম শব্দ হইতেছে যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছি এবং যাহা আমার নিকট পরিচিত। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শুষ্ক তালবৃক্ষের জমির উপর দিয়া, কালো কালো নুড়ির উপর দিয়া, পলার ফ্যাকড়ার উপর দিয়া আমরা চলিতে লাগি-লাম..."পলিনেসিয়ার" সহিত এইসমস্তের কেমন সাদৃশ্য! ...এই সময়ে আমার গা শিহরিয়া উঠিল—আমি থামিলাম—কি যেন আমাকে আটক করিল।...সেই তীব্র স্মৃতিগুলা সেই খুব দ্রুতগামী স্মৃতিগুলা, শীঘ্রই যাহা মন হইতে অপনীত হইয়াছিল—তাহা আমার মনে পড়িল—আবার সেই সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জের (Oceania) বেলাভূমি-সংপৃক্ত সেই "মোহিনী", সেই বিষাদ আবার মনে আসিল।—তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না—বহুবৎসরব্যাপী কালের সঙ্গে সঙ্গে আমি উহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—আবার উহা দূর দূরান্ত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কি-এক রহস্যময় ভাবে আমাকে ব্যথিত করিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর



[এই বিভাগে চিকিৎসা- ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বোত্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। যাঁহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাঁহারা লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের এক পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত; যাহাতে সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্‌দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়া এই বিভাগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মীমাংসায় বহু লোকের উপকার হওয়া সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতূহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়া যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা দুয়েরই যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়া ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না-ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন—তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমরা দিতে পারিব না। নূতন বৎসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রশ্নগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণনা আরম্ভ হয়। সুতরাং যাঁহারা মীমাংসা পাঠাইবেন, তাঁহারা কোন্ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংসা পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন।]

জিজ্ঞাসা

(১৮৪)

বাংলা ভাষায় হসন্ত উচ্চারণ

বাংলা ভাষায় হসন্ত উচ্চারণের মূল কারণ কি? এবিষয়ে ফরাসী ভাষার প্রভাব কতদূর সাহায্য করিয়াছে?

বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের হসন্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে হিন্দী ভাষার নিয়মগুলি একটু আলাদা। ইহার যথার্থ কারণ কি?

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পুস্তকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ মীমাংসা দেওয়া হয় নাই।

কোনো ভাষাতত্ত্ববিৎ মীমাংসা করিলে বাধিত হইব।

এল্‌-ভি রামস্বামী আয়্যার

(১৮৫)

নব-আবিষ্কৃত প্রস্তর-মূর্ত্তি

মানভূম জেলার বাগ্‌দা পরগণার অন্তর্গত নাগবিড়য়্যা নামক গ্রামে বহু পুরাতন প্রস্তর-নির্ম্মিত চারটি ভগ্ন মন্দির এবং একটি ৭ ফুট লম্বা উলঙ্গ প্রস্তর-মূর্ত্তি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। স্থানীয় অধিবাসীগণ তাহাকে ভৈরব মূর্ত্তি বলিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে ছাগ বলি দিয়া পূজাদি করিয়া থাকে। প্রতিবৎসর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন সেখানে একটি মেলাতে বহু লোক-সমাগম হয়। মাড়োয়ারী সম্প্রদায় সেটিকে মহাবীরের মূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করিতেছেন। মূর্ত্তিটির বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল অবিকল বুদ্ধদেবের অনুরূপ। স্থানীয় অধিবাসীগণ ইহার কোনো সঠিক ইতিবৃত্ত বলিতে পারে না।

এই মন্দির ও মূর্ত্তিটি কাহার? কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল জানাইলে বাধিত হইব।

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী

(১৮৬)

মাস খাটান

এদেশে একটি খনার বচন প্রচলিত আছে:—

"আগে পাছে চাপ ধনু মীন অবধি তুলা।
মকর কুম্ভ বিচ্ছাদিয়া মাস খাটাইয়ে গেলা॥"

প্রতিবৎসর পৌষ মাসের মধ্যেই ষড়্‌ ঋতুর ক্রীড়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পৌষ মাসকে নির্ঘণ্ট (Index) করিয়া কৃষিবিদেরা আগামী বর্ষের ঋতু-পর্য্যায়ের কমী বেশী স্থির করিয়া থাকেন। উপরিউক্ত বচনটির অর্থ এই:—পৌষ মাসের প্রথম ১।০ সওয়া দিন ও শেষ ১।০ সওয়া দিন নিজ পৌষ মাসের লক্ষণ এবং চৈত্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ২॥০ আড়াই দিন হিসাবে ২০ দিন, তৎপর মাঘ ২॥০ দিন ফাল্গুন ২॥০ দিন ও অগ্রহায়ণ ২॥০ দিন মোট ৩০ দিন ভোগ করিয়া গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত ছয়টি ঋতুই তাহাদের আগামী বর্ষের কার্য্যক্রম দিয়া যায়। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে তাহা প্রত্যেকেই বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিনা?

শ্রী মোহিনীমোহন দাস

(১৮৭)

ভরত ও লক্ষ্মণ

ভরত ও লক্ষ্মণের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ কে? আদি কবি বাল্মীকি ভরতকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

ভরতো নাম কৈকেয়্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥
অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্দ্ধসমন্বিতৌ॥
পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥

রামায়ণ, আদি, ১৮ সর্গ, ১৩—১৫।

আবার কালিদাস লক্ষ্মণকেই জ্যেষ্ঠের পদ দিয়াছেন—

পার্থিবীমুদবহদ্ রঘূদ্বহো লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্ম্মিলাম্।
যৌ তয়োরবরজৌ বরৌজসৌ তৌ কুশধ্বজসুতে সুমধ্যমে॥

রঘু, ১১সর্গ, ৫৪।

সৌমিত্রিণা তদনুসংসসৃজে স চৈনম্
উত্থাপ্য নম্র শিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎ প্রহরণব্রণকর্কশেন
ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন॥ রঘু, ১৩শ সর্গ। ৭৩।

ইহার মীমাংসা কি?

শ্রী

(১৮৮)

মকর

আমাদের পুরাণ মতে গঙ্গার বাহন "মকর"। পঞ্জিকাতে গঙ্গার ছবিতে ও রাশিচক্রের ছবিতে এই মকর একটি শুঁড়ধারী বৃহৎ মৎস্য। কিন্তু এরূপ জীব কোনও দেশে বোধ হয় নাই। পূর্ব্বে ছিল—এখন লোপ পাইয়াছে কি? গঙ্গার বাহন কি কাল্পনিক? মকরের প্রকৃত অর্থ ও রূপ কি?

শ্রী অমৃতলাল শীল

(১৮৯)

গোবিন্দভাষ্য

বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বেদান্তদর্শনের ভাষ্য গোবিন্দভাষ্য নামে পরিচিত। উক্ত গোবিন্দভাষ্য কখনও ছাপা হইয়াছিল কিনা? ছাপা হইয়া থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়? যদি কাঁহারও নিকট ঐ গ্রন্থ থাকে তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া তিনি তাঁহার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিবেন।

শ্রী মাণিকলাল মণ্ডল

—

মীমাংসা

(১৫৪)

"দাস-ব্যবসায় বা ক্রীত-দাসপ্রথা"

স্কীট্ বলেন Slavery শব্দ Slava—glory শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইহা মূলতঃ একটি জাতিবাচক শব্দ মাত্র। একটি Greek verb (যাহার সহিত Latin Sero শব্দ সমার্থবোধক,) হইতে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। গিবনের মতে জার্ম্মান্ কর্ত্তৃক ধৃত এবং দাসত্বে নিয়োজিত স্লেভ জাতিকে প্রথমতঃ Slaves বলা হইত এবং ঐ Slave শব্দ হইতেই বর্ত্তমানকালের Slave শব্দ হইয়াছে।

দাসত্ব-প্রথার সর্ব্বপ্রথম প্রচলন আমরা গ্রীসে ও রোমে দেখিতে পাই। হোমারের সময়ে গ্রীসে দাসত্ব প্রথা সুস্পষ্টভাবেই প্রচলিত ছিল। যুদ্ধে ধৃত বন্দী ক্রীতদাসরূপে ব্যবহৃত হইত। সময়ে সময়ে বলপূর্ব্বক লোক ধরিয়া ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইত। গ্রোট্ বলেন হোমারের সময়ে ক্রীতদাসের অবস্থা তাদৃশ শোচনীয় ছিল না। গ্রীস দেশে নিম্নলিখিতভাবে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হইত।

(১) জন্মগত—যথা ক্রীতদাসের সন্তানসন্ততি।

(২) অ্যাটিকা ব্যতীত অন্যান্য স্থলে স্বাধীন পিতামাতাও সন্তান বিক্রয় করিতে পারিত এবং ঐরূপে বিক্রীত সন্তান ক্রীতদাস পর্য্যায়-ভুক্ত হইত। দরিদ্রতা হেতু অনেক ব্যক্তি স্বীয় স্বাধীনতা অপরের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহার ক্রীত দাস হইত। এথেন্স্ নগরে সলোনের সময় পর্য্যন্তও নিঃস্ব অধমর্ণ উত্তমর্ণের দাস হইত। যুদ্ধে ধৃত বন্দী বিজেতার দাস হইত। জল-দস্যু কিংবা অপর কেহ লোক ধরিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। পণ্যভাবে অপর দেশ হইতে দাস আমদানি করা হইত। ডিমস্থিনিস্ বলেন, গ্রীস দেশে ক্রীতদাসের অবস্থা তাদৃশ শোচনীয় ছিল না। বরং তাহারা যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইত সেই পরিবারের প্রাপ্য সম্মানের কিছুটার অধিকারী হইত। হোমারের মতে সাধারণ স্বাধীন দরিদ্র ব্যক্তি (যাহারা wretched class নামে বর্ণিত হইয়াছে) হইতে তাহাদের অবস্থা শ্রেয়তর ছিল। এরিষ্টোফেনিস্ ও প্লটাসের মতে ক্রীতদাসগণকে প্রায়ই বেত্রাঘাতে নির্য্যাতন করা হইত। এথেন্স্ নগরে অপর কেহ ক্রীতদাসের প্রতি অন্যায় করিলে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা ছিল। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে স্বীয় প্রভুর প্রতিকূলেও প্রতিকার পাইত। আপনার মূল্য পরিশোধ করিতে পারিলে ক্রীতদাস স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইত। সময় সময় স্বেচ্ছাক্রমে প্রভুও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন। সর্ব্বসাধারণের কোন বিশিষ্ট কার্য্য করিলে তাহারা স্বতঃ স্বাধীনতা লাভ করিত।

এরিষ্টটল্ বলেন, ক্রীতদাস প্রথা সমাজের পক্ষে দরকারী। জেনোফোনও এই মতের পোষকতা করেন। কেবল মাত্র ইউরিপিডিসের এই বিষয়ে একটু মতান্তর দেখা যায়।

ব্লেয়ার বলেন, রোমে দাসত্ব প্রথা বহুবিস্তৃত এবং সুগঠিতভাবেই ছিল। বর্ত্তমান সাধারণ শ্রেণীও বোধ হয় রোমের এই দাসত্ব-প্রথা হইতে উপজাত হইয়াছে।

মমসেনের মতে পূর্ব্ব সময়ে রোমে দাসত্ব প্রথা তাদৃশ কঠোর ছিল না। প্রথমতঃ কেবল মাত্র যুদ্ধে ধৃত বন্দীই ক্রীতদাসরূপে নিয়োজিত হইত। হিউম বলেন, অতঃপর যুদ্ধে ধৃত বন্দীগণ মাত্রে দাসত্ব-প্রথা সীমাবদ্ধ না করিয়া পণ্যভাবে দাস বিক্রয় আরম্ভ হয়। এমন কি এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর একটা শুল্ক পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়। রোমের আইনে কোনো কোনো অপরাধে লোক স্বাধীনতা হারাইত। পিতা আপনার সন্তানকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। উত্তমর্ণ অধমর্ণকে আপনার দাসরূপে নিয়োজিত করিতে পারিতেন, কিংবা নগরের বাহিরে বিক্রয় করিতে পারিতেন। সেনেকা ক্রীতদাসের প্রতি কুব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ডাইয়োক্লিসিয়ান্ নানাভাবে ক্রীতদাস প্রথা নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন। দুর্ব্যবহার করিলে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার ক্ষমতা নীরোর সময়ে ক্রীতদাসকে দেওয়া হয়। মার্কাস্ অরেলিয়াসের সময় প্রভুর ক্রীতদাসকে শাস্তি দিবার ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করা হয়। কনষ্টেনটাইনের সময়ে পুনরায় পিতাকে সন্তান বিক্রয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। জাষ্টিনিয়ানের সময়ে পুনরায় ক্রীতদাসকে নানা ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বর্ত্তমান দাসত্ব প্রথা সর্ব্বপ্রথম স্পেনদেশীয় উপনিবেশ হইতেই সংক্রমিত হয় এবং এণ্টোমিনস্লেভ সুকে ইহার সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহার পর অর্থলোভে বশীভূত হইয়া স্পেনবাসীগণ আফ্রিকার পোর্টুগিজদিগের অধিকৃত স্থান হইতে স্বদেশে বহু নিগ্রোকে আনয়ন করিত। হিস্পেনিয়োলার শাসকরূপে যখন ভেনড্ডোকে প্রেরণ করা হয় তখন এইরূপ নিগ্রোর বহু সন্তানকে তথায় পাঠান হয়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে খনিতে কাজের জন্য এইরূপ বহু নিগ্রো সন্তানকে তথায় পুনরায় পাঠান হয়। রবার্টসন্ বলেন, রাজা চার্লস্ ক্রীতদাস সরবরাহ করিবার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। ইহার পূর্ব্বে কলম্বাস দাসত্ব-প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করিলে রাজ্ঞী ইসাবেলা "তাহা

নিবারণ করেন। এই প্রথা প্রচলনের জন্য Las basasও কিছুটা দায়ী। স্পেন দেশ হইতেই এই প্রথা ইউরোপের অন্যান্য দেশে ব্যাপ্ত হয়।

ইংলণ্ডে জন্ হকিন্স্ ইহা সর্ব্বপ্রথমে প্রচলন করেন। প্রথমতঃ ইংরেজ বণিকগণ স্পেনদেশীয় উপনিবেশসমূহে ক্রীতদাস সরবরাহ করিত। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে সর্ব্বপ্রথম দাস বিক্রয় হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথার বিপক্ষে লোক-মত সূচিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই প্রথার বিপক্ষে মত প্রচারে করেন:—বাক্স্টার্, স্যার্ রিচার্ড ষ্টীল্, সাদার্ণ, পোপ, টমসন্, শেন্‌ষ্টোন্, ডায়ার, স্যাভেজ, কাউপার, টমাস ডে, ষ্টার্ণ, ওয়ারবার্টন্, হচিসন্, বীটি, জন ওয়েসলী, হোয়াইট্‌ফীল্ড্, অ্যাডাম স্মিথ, মিলার্, রবার্টসন্, ডাঃ জনসন্, পেলী, গ্রেগরী, গিল্‌বার্ট ওয়েকফিল্ড; বিশপ প্রোটেস্ট, ডিন্ টাকার্। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জুন তারিখে লর্ড ম্যান্সফিল্ড্, সোমারসেট্, নামক নিগ্রোর বিচার করিয়া নির্দ্ধারিত করেন যে ব্রিটিশ দ্বীপ পুঞ্জে পদার্পণ মাত্রই ক্রীতদাসের দাসত্ব লোপ পাইবে।

ডেভিড্ হার্টলী কমন্স্ সভায় দাসত্বপ্রথা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে প্রয়াস পান।

সর্ব্বপ্রথম কোয়েকারগণ এই প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। এই প্রথার সহিত সংশ্লিষ্ট সমুদায় ব্যক্তিকে তাঁহারা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের দল হইতে বিতাড়িত করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রথার প্রতিরোধার্থ তাঁহাদের মধ্যে এক সংঘ গঠিত হয়। আমেরিকাতে জন্ উলম্যান্ ও অ্যান্টনী বেনজেট্ ইহার বিপক্ষে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তথায় জেমস্ পেম্বার্টন্ ও ডাঃ বেঞ্জামিন্ রস্ এক সমিতি গঠন করেন। ঐ সমিতি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কলিন্ এর নায়কত্বে অধিকতর বিস্তৃত হয়। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পেকার্ড্ দাসত্ব প্রথার প্রতিকূলে লিখিত একটি রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। টমাস্ ক্লার্কসন্ এই রচনা লিখেন। এই রচনা লিখিবার পর কার্য্যক্ষেত্রে তিনি গ্রেনভীল্ শার্প, উইলিয়াম ডিলন্ ও জেমস্ র‍্যামসে-এর সহযোগিতা লাভ করেন। এই রচনাই পার্লামেন্টে দাসত্ব-প্রথার বিপক্ষে আন্দোলনের মূল কারণ। অতঃপর ক্লার্কসন্ উইলিয়াম্ উইলবারফোস্, ওয়েজুড্, বেনেট্ ল্যাংটন, মেকলে, ব্রুহাম্, জেম্স্ ষ্টিফেন প্রভৃতি প্রতিপত্তিশালী লোকের সহায়তা লাভ করেন। মিঃ পিট্ পার্লামেন্টে এই বিষয় পেশ করেন। আমেরিকাতে দাসত্ব প্রথা নিবারণ-আন্দোলনের নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পথপ্রদর্শক:—বেঞ্জামীন্ লাণ্ডি, গ্যারিসন্, লাভজয়, ফিলিপ্স্, সামাস ও ব্রাউন।

১৯২৩ ইং ২৫শে অক্টোবর তারিখের ফরওয়ার্ড পত্রিকায় প্রকাশ যে যদিও দাসত্বপ্রথা আর প্রচলিত নাই বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তথাপি পৃথিবীর কোন কোন অংশে এখনও দাস ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তর আফ্রিকার ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা সহরে এইরূপ ক্রয়বিক্রয় এখনও হইয়া থাকে বলিয়া ফরাসী পুলিশ খবর পাইয়াছেন। সন্তানসহ একটি স্ত্রীলোক ৩৫০ ফ্রাঙ্ক্ মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। ম্যাডাগ্যাস্কার উপকূলে নৌকা করিয়া ৩০০ শত লোক বিক্রয়ার্থ লওয়া হইয়াছিল এবং ফরাসী গভর্ণমেণ্ট্ এই খবর পাইয়া ইহার প্রতিরোধার্থ সশস্ত্র নৌকা প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল মাত্র নাইগিরিয়াতে দাস-ব্যবসায়ের খবর পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানেও অ্যাবিসিনিয়াতে যে-ভাবে দাস-ক্রয়বিক্রয়-প্রথা প্রচলিত আছে তাহার তুলনায় ইহা অকিঞ্চিৎকর। সাধারণত নীলামে ক্রীতদাসগণের নিম্নলিখিতরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত হয় ও তাহারা সর্ব্বোচ্চ ডাকে বিক্রীত হইয়া থাকে:—১ হইতে ৩ বৎসর বয়স্ক কোন মূল্য নাই। ৩ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক ১৭ হইতে ৪৩ শিলিং। ১০ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক ৪৩ হইতে ১৭০ শিলিং।

League of Nationsএর সহায়তায় ইহা সত্বরেই একেবারে উঠিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

হ্যারিয়েট্ বিচার্ ষ্টো প্রণীত "টম্-কাকার কুটির" ও "ড্রেড্" নামক পুস্তকে ক্রীতদাস-প্রথার জলন্ত দৃশ্য পাওয়া যায়।

শ্রী শিশিরেন্দ্রকিশোর দত্তরায়

(১৬৬)

মাঘ সংখ্যার প্রবাসীতে "চৈতন্যচরিতামৃতে একাদশী প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে দুইজন মীমাংসাকারী সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা না জানিয়া—হয়ত নিছক্ কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়াই—শ্রীহট্টের মস্ত একটা দোষারোপ করিয়াছেন।

মীমাংসাকারী আচার্য্য বন্ধুদ্বয় লিখিয়াছেন, পাবনা, রংপুর, টাঙ্গাইল, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জায়গায় রুগ্না শুষ্ককণ্ঠা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বিধবাকেও—হোক্ সে বালবিধবা অথবা অশীতিপর বৃদ্ধা—একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। কিন্তু সকল জায়গায় প্রকৃতপক্ষে তাই নয়। একাদশীতে ফলমূল খাওয়ার বিধান শ্রীহট্টের সর্ব্বত্র প্রচলিত। কেবল 'শয়ন' 'উত্থান' 'পার্শ্ব' ও 'ভৈমী' এই চারিটি একাদশীতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারাই নিরম্বু উপবাস করেন। কিন্তু যাঁহারা রোগগ্রস্তা তাঁহাদের জন্য দুগ্ধকলার ব্যবস্থাও আছে। আবার পীড়িতাদের উপবাস না করার রীতিও প্রচলিত আছে।

আচার্য্যবন্ধুদ্বয় আবার লিখিয়াছেন "পূর্ব্বকালে শ্রীহট্টেও শাস্ত্রীয় উপদেশের সম্মান রক্ষিত ছিল।" আজকাল শ্রীহট্টে আর শাস্ত্রীয় উপদেশের সম্মান বড় একটা নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত শ্রীহট্টে সম্পূর্ণরূপে মাথা উঁচু করিয়া বিদ্যমান আছে।

শ্রী যোগেন্দ্রভূষণ পাল

(১৬৭)

বরোদা কলাভবনেও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করিতে পারা যায়। এখানের পাঠক্রম (course) বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় অপেক্ষা নিম্ন। তিন বৎসর পড়িতে হয়। কিন্তু এখানে হাতে-কলমে শিক্ষার বন্দোবস্ত বেশ ভাল। ইহা বরোদা গায়কোয়াড়ের নিজস্ব শিক্ষালয়। বরোদা রাজ্যের ছাত্রগণকেই প্রথম সুবিধা দেওয়া হয়, পরে অন্য ছাত্রের স্থান হয়।

পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বাঙ্গালোর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেই শিক্ষার বন্দোবস্ত সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এখানে ৫ বৎসর পড়িতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের I. Sc. পরীক্ষা কিম্বা ঐপ্রকার অন্য কোনো বিশ্ব বিদ্যালয়ের I. Sc.র ন্যায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এখানে পড়িতে পারা যায়। এইটি মহীশূররাজের নিজস্ব কলেজ (State College)। থিওরেটিক্যাল ও প্র্যাক্‌টিক্যাল উভয়বিধ শিক্ষারই খুব সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। হাতে-কলমে শিক্ষার প্রধান সুবিধা যে Tata Hydro-Electric Powerhouseও এই স্থানে আছে।

Tata Research Instituteও এই স্থানে অবস্থিত। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে উপাধিধারী কোনো ছাত্র এখানে গবেষণা করিতে পারেন।

শ্রী সরলকুমার অধিকারী



পুস্তক পরিচয়

বিচার—শ্রী হরিদাস দে প্রণীত। প্রকাশক শ্রী দুর্গাচরণ দে, শান্তিসদন ৭৬ নং লুকারগঞ্জ, এলাহাবাদ (গ্রন্থকার ও সোঽহং স্বামীর চিত্র-সম্বলিত) পৃঃ ১+৩+৪+৫+৬৪; মূল্য ১৲।

এই 'বিচার' "একাত্মবিজ্ঞান বা অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয়"।

পুস্তিকাতে ৪২টি কবিতা আছে; কবিতাসমূহ অদ্বৈতবাদ সমর্থক।

দার্শনিকের রসিকতা—শ্রী গঙ্গাচরণ কর, এম-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীকুলেশচন্দ্র কর, এম-এস্‌সি, ৪৭ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ ৮৩; মূল্য ১৲।

পুস্তকের ৫টি অধ্যায়—১। দার্শনিকের রসিকতা; ২। রসিকেষু দার্শনিক—Novalis; ৩। দার্শনিকেষু রসিক—Guyau; ৪। অধ্যাপক Gegnerএর একখানা চিঠি; ৫। Rabindranath and his Gitanjali.

বলা বাহুল্য প্রথম চারিটি বাঙ্গলায় এবং শেষটা ইংরেজীতে লিখিত।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন "এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিদেশী রসতাত্ত্বিকগণের মধ্যে বড় বড় চার জনের—মার্কিন দার্শনিক Santayana, ফরাসী দার্শনিক Guyau, ইটালীর দার্শনিক Croce, এবং জার্ম্মান্ দার্শনিক Diltheyএর—রসতত্ত্ব সংক্ষেপে হ'লেও বিশদভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে।"

এই পুস্তিকা সাধারণের অবোধ্য; ইহাতে অনেক কঠিন ইংরেজী ও অন্য ভাষার দার্শনিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সে-সমুদায়ের বাঙ্গলাও দেওয়া হয় নাই এবং ব্যাখ্যাও করা হয় নাই। অনেক স্থলে গ্রন্থকারের বাঙ্গলা ভাষাও দুর্ব্বোধ্য।

ইউরোপে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজনের পর 'জানা-শুনা' অনেক বিষয়ে আলাপ করেন। এই-প্রকার আলাপের নাম Post-Prandial Talk। বিষয়গুলি সকলেরই জানা আছে, সকলেই কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের গ্রন্থকারের মন্তব্যও এই শ্রেণীর।

(১) সামবেদ সংহিতা—আগ্নেয় পর্ব্ব (সংস্কৃত ভাষায়, দেবনাগর অক্ষরে) পৃঃ ১৭৭; মূল্য ১৷৹।

(২) সামবেদ সংহিতা—আগ্নেয় পর্ব্ব (সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গলা অক্ষরে)। পৃঃ ৭৫; মূল্য ৸৹।

(৩) সামবেদ সংহিতা—আরণ্য পর্ব্ব (সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায়; বাঙ্গলা অক্ষরে)। পৃঃ ৩২; মূল্য ।৹। এই-সমুদায় গ্রন্থের প্রণেতা—শ্রী সত্যচরণ রায় সাংখ্য-বেদান্ত-বেদ-তীর্থ। প্রকাশক শ্রী ব্রজেশ্বর রায় (১৩ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিকের লেন, রামবাগান, কলিকাতা)।

প্রথম গ্রন্থের ব্যাখ্যাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাতে এই-সমুদায় বিষয় দেওয়া হইয়াছে—

স্বর-সংবলিত মন্ত্র, ইহার ছন্দ, দেবতা ও , পদ-পাঠ, অন্বয়, আধিযাজ্ঞিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নিরুক্ত-প্রমাণ, পাণিনি-সূত্র দ্বারা প্রত্যেক শব্দের সিদ্ধি, ইত্যাদি।

অকারাদিক্রমে মন্ত্রসমূহের সূচীও দেওয়া হইয়াছে।

এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থ এইভাবে সম্পাদিত হইলে, একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ হইবে। এইগ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষার্থিগণ অতি সহজে সামবেদ আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

অপর দুইখানি পুস্তিকাতে স্বর সহ মন্ত্র, ঋষি, ছন্দ, বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রত্যেক মন্ত্রেরই দুইপ্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন ১ম—আধিযাজ্ঞিক অর্থাৎ যজ্ঞপক্ষে ব্যাখ্যা; ২য়—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ঈশ্বর-পক্ষে ব্যাখ্যা। নিম্নে আগ্নেয় পর্ব্বের প্রথম মন্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল—

'অগ্নে' হে পূজনীয় পরমাত্মন্! আপনি 'বীতয়ে' বিদ্যাদি শুভগুণ আমাদিগের বিশেষভাবে প্রাপ্তির জন্য এবং 'হব্য-দাতয়ে' আমাদিগকে শুভ কর্ম্মফল প্রদান করিবার জন্য আমাদিগ-কর্ত্তৃক 'গৃণানঃ' স্তুত হইয়া এই সঙ্কেতে 'আয়াহি' আসুন, ইত্যাদি।

আধিযাজ্ঞিক ব্যাখ্যার প্রণালীও এই-প্রকার, উভয় ব্যাখ্যাতেই কোন উপায়ে সংস্কৃত শব্দ রাখিয়া বাঙ্গলা অনুবাদ করা হইয়াছে। সংস্কৃত গ্রন্থ সাধারণত এইভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে।

যাঁহারা মূলগ্রন্থ পাঠ করিতে চাহেন তাঁহারা আধিযাজ্ঞিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

আমরা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি। মনের কি ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ঋষি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই প্রকৃত অনুবাদ। কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেন তাঁহাদের সংকল্প এই যে মন্ত্রটিকে উচ্চ আদর্শের উপযোগী করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এ-প্রকার ব্যাখ্যায় কোন কোন স্থলে দুই-একজন সাধকের উপকার হইতে পারে, কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে হইলে ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক। ঋষির সময়ে লোকের মতামত ও আচার-ব্যবহার কি-প্রকার ছিল প্রথমে তাহা জানিতে হইবে। তাহার পরে নিরূপণ করিতে হইবে ঋষি সেই সময়ের কতটুকু প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং কতটুকুই বা বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং কেনই বা এপ্রকার করিয়াছিলেন। এই-সমুদায় অবগত হইবার পরে দেখিতে হইবে ঋষির সময়ে ঐ মন্ত্রের কি-প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারিত। ইহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

অগ্নি-বীণা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

এক বৎসরের মধ্যেই কাব্যগ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, বইটি পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদর লাভ করিয়াছে। গ্রন্থখানির সব কবিতাগুলিই অগ্নিগর্ভ, উদ্দীপনাময়, যে যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষ আজ আপনার ভাগ্য গড়িয়া

তুলিতে চাহিতেছে সেই যুগনির্ম্মাতা রুদ্র-দেবতার আগমনধ্বনি গ্রন্থখানিতে শুনিতে পাওয়া যায়

এ সংস্করণে ছাপা ও বাঁধাই আরো ভালো হইয়াছে।

দোলন-চাঁপা—কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা। দাম পাঁচ সিকা। ১৩৩০।

ইহাতে কবির আধুনিক কবিতাগুলি একত্র করা হইয়াছে। কবিতাগুলির ভিতরকার কথা—প্রিয়ের জন্য বেদনা উচ্ছ্বাস। "পূজারিণী" কবিতাটি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই কবিতাটি বইখানির শ্রেষ্ঠ কবিতা,—প্রেম-পিপাসার অপূর্ব্ব প্রকাশ। কাব্যামোদী পাঠক সমাজে বইটি আদর লাভ করিবে, আশা করি। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

ছেলেদের বুদ্ধদেব—শ্রী আদ্যনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী বিজয়কুমার চক্রবর্ত্তী, মডেল লাইব্রেরী লিমিটেড্, ১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। বারো আনা। ১৩৩০।

ভারতবর্ষের মহাপুরুষদের জীবন কথা ছেলেদের উপযোগী করিয়া লিখিবার চেষ্টা আজকাল কিছু কিছু হইতেছে। কিন্তু কয়েকখানি ছাড়া সে রকম বই অধিকাংশই কেমন আড়ষ্ট ও অসবল হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং ছেলেদের পক্ষে তাহা বেশ আনন্দদায়ক হয় নাই। আমাদের আলোচ্য পুস্তকখানি কিন্তু এ বিষয়ে অভিনব। বুদ্ধদেবের জীবন কথা ইহাতে অতি সুন্দর ও সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। বড় বড় আধুনিক বুদ্ধচরিতে যে-সব নূতন কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে এই গ্রন্থখানিতে তাহার অধিকাংশই গ্রন্থকার সরলভাবে ছেলেদের মনোরঞ্জক রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ছেলেদের প্রচলিত বুদ্ধচরিত হইতে এ চরিত-কথাটি স্বতন্ত্র। আমরা বইটি পড়িয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। বইখানি ইস্কুলের পাঠ্য হওয়া একান্ত উচিত। আশা করি গ্রন্থকার এই জাতীয় আরো পুস্তক লিখিয়া ছেলেদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর হইয়াছে।

সখা—শ্রীমৎ অন্নদা ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক শ্রী মন্মথনাথ পাল, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ, দক্ষিণেশ্বর। দাম বারো আনা। ১৩৩০।

ভক্তিবিষয়ক গানের বই। কয়েকটি গানে ভক্তির যথার্থ আবেগ দেখিতে পাওয়া যায়। গানগুলির রচনা মন্দ নয়।

বজ্রবীণা—শ্রী বেলা গুহ প্রণীত। প্রকাশক শ্রী সত্যপ্রিয় গুহ, দেওভোগ গুহ-পরিবার, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা। দাম চার আনা।

কবিতার বই। বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও বইটি কবিত্ব বর্জ্জিত নয়। কয়েকটি কবিতা মন্দ লাগে নাই।

অঞ্জলি—শ্রী সিদ্ধেশ্বর রায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রী তারাপদ রায়, ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ-ভবন, ৮৫ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

কবিতা-পুস্তক। কয়েকটি কবিতা মন্দ নয়। কিন্তু ছন্দের দোষ প্রচুর।

বিশ্বপ্রেম—শ্রী তারিণীশঙ্কর সিংহ প্রণীত। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১।৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম চার আনা।

ফুল-রেণু—শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায় প্রণীত। ময়মনসিংহ কালীবাড়ী রোড হইতে শ্রী বিজয়নারায়ণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত। দাম বারো আনা। ছুঁইখানি পদ্যের বই। উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

মহর্ষি মনসুর—মোজাম্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক মোহম্মদ আফজাল্-উল হক, মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস, ৩। কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম এক টাকা। ১৩৩০।

এই পুস্তকে যাঁহার জীবন-কথা বিবৃত হইয়াছে তিনি বাস্তবিকই মহর্ষি নামের উপযুক্ত। মহর্ষি মনসুর জগতের ধর্ম্মবীরগণের অন্যতম। তাঁহার জীবন-চরিত সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে পঠিত হওয়া উচিত। আলোচ্য পুস্তকখানি ছেলেদের জন্য লেখা। বইটির পঞ্চম সংস্করণ বাহির হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের নিকট বইটি যে আদর লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। আমরা বইটির প্রচার কামনা করি।

ফেরদৌসী-চরিত—মোজাম্মেল হক প্রণীত। প্রকাশক মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউস, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম বারো আনা। ১৩৩০।

মোজাম্মেল হক মহাশয় সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান কবি ও লেখক। তাঁহার এই পুস্তকটিও তাঁহার যশ বর্দ্ধন করিবে। বইটির চতুর্থ সংস্করণ হওয়ায় ইহার মূল্য আপনা হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বইখানি সুলিখিত। ছাপা ও বাঁধাই ভালো।

পুষ্প-পরাগ—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীভিতেন্দ্রশঙ্কর দাস গুপ্ত, ১০ বি গৌর ঘোষের লেন, ভবানীপুর কলিকাতা। দাম এক টাকা।

প্রফুল্লময়ী বঙ্গ-সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিতা নন। বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বিবিধ বিষয়ের কবিতা একত্র করা হইয়াছে। কবিতা-পুস্তকটি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। কবিতাগুলিতে লেখিকার কবিত্ব-শক্তি স্বচ্ছন্দ ও সম্পদশালী ভাষায় প্রস্ফুট হইয়াছে। অধিকাংশ কবিতার মধ্যে এমন একটি সহজ স্নিগ্ধতার ধারা বহিয়া গিয়াছে যে পড়িতে পড়িতে মন অভিষিক্ত হইয়া উঠে। কয়েকটি দুর্ব্বল কবিতাও আছে; কিন্তু সেইগুলি আছে বলিয়াই তাহাদের পাশে ভালো কবিতাগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বইখানিতে ছাপার ভুল প্রচুর।

গুপ্ত

পুণ্যবতী নারী—শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত। ইউ রায় এণ্ড সন্স্ (১০০ নং গড়পার) কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা।

ইংরেজী সাহিত্যে পুণ্যবতী নারীদের বহু জীবনচরিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটি চিরকৌমার্য্যব্রতধারিণী তপস্বিনীদের, কোনটি লোকসেবাপরায়ণা নারীদের, কোনটি বা গার্হস্থ্যধর্ম্মে মহীয়সী মহিলাদের। কিন্তু বাংলাভাষায় এরূপ জীবনচরিতের বড়ই অভাব। অথচ এ দেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক নারী জন্মিয়াছেন যাঁহাদের জীবনকথা গ্রন্থাকারে রচিত হইলে পাঠক-সমাজের বিশেষ কল্যাণ হইতে পারে। অমৃত-বাবুর "পুণ্যবতী নারী"কে অনায়াসেই সেইরূপ পুস্তকের পর্য্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। তিনি এই বইটিতে ব্রাহ্মসমাজের তিনটি নারীর জীবনচরিত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন উচ্চশিক্ষিতা ও অপর দুইজন সাধারণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলা। কিন্তু তিন জনেরই জীবন ধর্ম্মপ্রাণতায় ও মানবসেবায় অসাধারণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ছিল। অমৃত-বাবু সুলেখক, তাঁহার ভাষা সরল, মার্জ্জিত ও সুমধুর। সর্ব্বোপরি তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অভাব এই পুস্তকখানিকে বড়ই সুখপাঠ্য করিয়াছে। তিনি যে-সমাজের ধর্ম্মপ্রচারক, যদিও তিনি সেই সমাজেরই তিনটি নারীর জীবনী

রচনা করিয়াছেন, তবুও কোন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাঠক ও পাঠিকার তাহা পাঠে বিন্দুমাত্র বিরক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ইহার একমাত্র কারণ তিনি কোন বিশেষ ধর্ম্মমতকে শ্রেষ্ঠতার আসনে বসাইবার চেষ্টা করেন নাই—জীবনের মূলে ধর্ম্মকে রাখিলে সে জীবন যে সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয় সেই সৌন্দর্য্যকেই তাঁহার লিপিকুশলতায় মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাই এই পুস্তকখানি সকল সমাজের পাঠকের শুধু যে ভাল লাগিবে এমন নহে, সকলেই পড়িয়া উপকৃত হইবেন। মহিলাদের পক্ষে এমন সুপাঠ্য পুস্তক বহুদিন দেখা যায় নাই।

শ্রী নমলচন্দ্র হোম

পিয়ার্সন-স্মৃতি—মূল্য ।০। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী কার্য্যালয়, ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

এই পুস্তিকায় পরলোকগত পিয়ার্সন সাহেবের কয়েকজন ছাত্র ও একজন পরিচিতা মহিলা তাঁহার জীবনচরিত আলোচনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। রচনাগুলি বেশ সরস ও পিয়ার্সন-সাহেব সম্বন্ধে অনেক অজানা কথায় পরিপূর্ণ। যাঁহারা এগুলি লিখিয়াছেন তাঁহাদের নাম—শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, শ্রী সত্যব্রত রায় ও শ্রী চারুদত্ত রায়। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও অ্যাণ্ড্রুজ সাহেবের সহিত পিয়ার্সন সাহেবের তিন খানি ফোটো আছে। এই পুস্তক বিক্রয়ের খরচ বাদ দিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ পিয়ার্সন-স্মৃতি ভাণ্ডারে দেওয়া হইবে। ছাপা, কাগজ ইত্যাদি সবই ভাল।

বিপ্লবপথে রুশিয়ার রূপান্তর—অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন প্রণীত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভূমিকা সম্বলিত। প্রকাশক সরস্বতী লাইব্রেরী কলিকাতা ও ঢাকা।

এই পুস্তকে লেনিনের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আধুনিক রুশীয় বিপ্লবের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বইখানিতে বিস্তর বর্ণাশুদ্ধি ও ভাষায় স্থানে স্থানে প্রাদেশিকতা-দোষ থাকিলেও বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাঙালী পাঠক এই পুস্তক হইতে অনেক কথাই জানিতে পারিবেন। লেনিনের একখানি চিত্রও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে।

অ

ভারতে দুর্ভিক্ষ—শ্রীকুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য দুই আনা। পৃঃ ১১৭ (১৯৩০)

এই পুস্তকে গ্রন্থকার সরল ভাষায় ভারতের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সরকারী কাগজ-পত্র হইতে হিসাবাদি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার ভারতের দুর্ভিক্ষের অর্থনৈতিক কারণগুলি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

প্রভাত

শুধু কেরাণী

তখন পাখীদের নীড় বাঁধ্‌বার সময়। চঞ্চল পাখীগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুক্‌নো ডাল, মুখে করে' উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ফিরছে।

তাদের বিয়ে হ'ল।—দুটি নেহাৎ সাদাসিধে ছেলে মেয়ের।

ছেলেটি মার্চ্চেন্ট্ আফিসের কেরাণী— বছরের পর বছর ধরে' বড় বড় বাঁধানো খাতায় গোটা গোটা স্পষ্ট অক্ষরে আম্‌দানি-রপ্তানির হিসাব লেখে। মেয়েটি শুধু একটি শ্যামবর্ণ সাধারণ গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—সলজ্জ সহিষ্ণু মমতাময়ী।

আফ্রিকা জুড়ে' কালো কাফ্রী জাতের উদ্বোধন-হুঙ্কারে শাদা বরফের দেশের আকাশ কেমন করে' শিউরে উঠ্‌ছে সে খবর তারা রাখে না। হলুদ-বরণ বিপুল মৃত-প্রতিম জাতি একটা কোথায় কবরের চাদর ছুঁড়ে ফেলে' খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তাজা রক্তের প্রমাণ দিয়ে, সে খোঁজ রাখ্‌বার তাদের দরকার হয় না।

তারা বাংলার নগণ্য একটি কেরাণী আর কেরাণীর কিশোরী-বধূ।

আসন্ন-যৌবনা মেয়েটি স্বজন-হীন স্বামীর ঘরে এসে গৃহিণী হ'ল।

প্রেমের কবিতা তারা লেখে না, পড়্‌বার ফুরসৎ বা সুবিধাও বড় নেই; দুজনে দু-জনকে সম্বোধন করতে নব-নব কল্পনা-লোকের সম্ভাষণ চয়ন করে না। শুধু এ ওকে বলে—"ওগো"।

সকাল বেলা স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে হাতে পানের ডিবেটি দিয়ে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মেয়েটি একটি দরজার আড়াল থেকে ঈষৎ মুখ বার করে' সলজ্জ একটু করুণ হাসি হাসে; ছেলেটিও ফিরে' চেয়ে হাসে। কোন দিন বা মেয়েটি বলে মৃদু-মধুর স্বরে—"ওগো তাড়াতাড়ি এসে, কালকের মতো দেরী কোরো না।" ছেলেটি হয়ত অনুযোগের স্বরে বলে—"বাঃ! কাল ত মোটে আধঘণ্টা দেরী হয়েছিল; বললুম ত রাস্তায় ট্রামের তার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল বলেই ... একটু

দেরী হ'লেই বুঝি অম্‌নি অস্থির হ'য়ে উঠ্‌তে হয় ?......" মেয়েটি লজ্জিত হ'য়ে বলে—"হ্যাঁ আমি বুঝি অস্থির হই !"

সন্ধ্যায় দরজায় একটি টোকা পড়্‌তে না পড়্‌তেই দুটি উৎসুক হাতে দরজাটি খুলে' যায় ; সারাদিনের পরিশ্রম ; শ্রান্ত ছেলেটি ধীরে ধীরে গিয়ে পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটু বসে, আপত্তি করে' বলে—"না 'গো' তোমায় জুতোর ফিতে খুলে' দিতে হ'বে না।" মেয়েটি প্রতিবাদ করে' বলে—"তা দিলেই বা, তাতে দোষ কি ?" ছেলেটি একটু রাগ দেখিয়ে বলে—"ওটা কি আমি নিজে পারিনে ?......" মেয়েটি খুল্‌তে খুল্‌তে বলে—"তা হোক্—তুমি চুপ করো দেখি।"

ছুটির দিন তাদের আসে। সে-দিন একটু ভালো খাবার-দাবারের আয়োজন হয়, কোন দিন দুটি একটি বন্ধু আসে নিমন্ত্রিত হ'য়ে। মেয়েটি সলজ্জ-সঙ্কোচে আপাদ-মস্তক অবগুণ্ঠিতা হ'য়ে পরিবেষণ করে। সে-দিন বিছানায় আলস্যে হেলান দিয়ে গল্প কর্‌বার দুপুর। জ্ঞানাভিমানহীন কেরাণী আর কেরাণী-প্রিয়ার সাধারণ আনন্দ-আলাপ। জটিল তর্কের দুরূহ সমস্যার গোলক-ধাঁধায় তারা ঘুরে' ঘুরে' হায়রান্ হয় না, সহজেই সে-সব মীমাংসা করে' ফেলে। মেয়েটি হয়ত জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, মশা মার্‌লে পাপ হয় ত ?" ছেলেটি হয়ত বলে—"নিশ্চয়ই ; আর মেরো না।" মেয়েটি বলে—"বেশ ! কিন্তু রোজ যে মাছগুলো মেরে খাও, পাঁঠার মাংস খাও, তার বেলা ?" ছেলেটি একটু বিব্রত হ'য়ে বলে—"বাঃ ! ও যে আমাদের আহার। যা আমাদের আহারের তা খেলে কি পাপ হয় ?—তা হ'লে ভগবান্ আমাদের আহার দেবেন কেন ?" মেয়েটি বলে—"ও—।" মেয়েটি হয়ত বলে—"ওদের বাড়ীর বৌরা কাল বেড়াতে এসেছিল, ওরা বল্‌ছিল কোন্ গণৎকার নাকি গুনে' বলেছে আর দশ দিন বাদে পৃথিবীটা চুরমার হ'য়ে যাবে একটা ধূমকেতুর সঙ্গে ধাক্কা লেগে,—সত্যি ?" ছেলেটি হেসে বলে—"মেয়েদের যেমন সব আজগুবী কথা। চুরমার হ'য়ে গেলেই হ'ল কিনা !" মেয়েটি গম্ভীর হ'য়ে বলে—"আমিও বিশ্বাস করিনি—আর-একবারও ক অম্‌নি গুজব উঠেছিল, তখন আমাদের বিয়ে হয়নি।" এমনিতর তাদের ছুটির আনন্দ-গুঞ্জন।

একদিন ছেলেটি ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে হেঁটে এল। সেই পয়সায় রাস্তার মোড়ে একটি গোড়ের মালা কিন্‌লে। ঘরে এসে হঠাৎ মেয়েটির খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে—"বল দেখি কেমন গন্ধ ?" মেয়েটি বিস্মিত আনন্দে মালাটি দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌লে—"কেন আবার তুমি বাজে পয়সা খরচ কর্‌তে গেলে বল ত ?" ছেলেটি বল্‌লে—"বাজে পয়সা খরচ বুঝি ! ট্রামের পয়সা আজ বাঁচিয়ে তাইতে কিনেছি।" এবার মেয়েটি সত্যি রেগে বল্‌লে—"এই ছাই ফুলের মালা কেন্‌বার জন্যে তুমি এই পথটা হেঁটে এলে ? যাও, চাইনে আমি তোমার ফুলের মালা !" ছেলেটি ক্ষুব্ধস্বরে বল্‌লে—"বাঃ—অম্‌নি রাগ হ'য়ে গেল, সব কথা আগে শুন্‌লে না, কিছু না, অম্‌নি রাগ ! আজ আফিসে বড্ড মাথাটা ধরেছিল, ভাব্‌লুম মাঠের ভিতর দিয়ে হাওয়ায় হেঁটে গেলে ছেড়ে যাবে,—তার উপর সকাল-সকাল ছুটি হ'ল ; একি এতই অন্যায় হ'য়ে গেছে ? বেশ যা হোক্ !" মেয়েটি একটু কাতর হ'য়ে বল্‌লে—"আমি রাগ কর্‌লুম কোথায় ? তুমি মিছি-মিছি ফুলের মালা কেন্‌বার জন্যে হেঁটে এসেছ ভেবে—"। ছেলেটি বল্‌লে—"দাও, ফুলের মালাটা ফেলে দাও, তা হ'লে"—এবার হেসে মেয়েটি পরম আনন্দে ফুলের মালাটি খোঁপায় জড়াতে জড়াতে বল্‌লে—"হ্যাঁ—ফেলে দিচ্ছি এই যে ! বাবা ! একটা ভাল কথা যদি তোমায় বল্‌বার যো আছে।"

একদিন একটু বেশী জ্বর হ'ল মেয়েটির। তার পর দিন আরো বাড়্‌ল। তার পর দিনও কম্‌ল না। আফিস যাবার সময় উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ছেলেটি বল্‌লে—"এখানে এমন করে' কি করে' চল্‌বে। দেখ্‌বার একটা লোক নেই,—এই বেলা তোমার বাপের বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করি।" মেয়েটি বল্‌লে—"না না, ও কালকেই সেরে যাবে...তুমি আফিস যাও, ভাব্‌তে হবে না।" ছেলেটি উদ্বিগ্নহৃদয়ে কাজে গেল উপায় ভাব্‌তে ভাব্‌তে। তার পর দিনও জ্বর বাড়্‌ল দেখে' বল্‌লে—"না, আমার আর সাহস হচ্ছে না। আমি সমস্ত দিন আফিসে থাকি, জ্বর বাড়্‌লে কে তোমায়

দেখে। তোমায় রেখে আসি চল ওখানে।" মেয়েটি করুণ-চোখে তার দিকে চেয়ে রইল, তার পর মুখ ফিরিয়ে বল্লে—"আমার সেখানে ভাল লাগে না।"

ভাগ্যে সেখানে "আজকালকার মেয়েগুলো কি বেহায়া"—বল্‌বার লোক ছিল না।

জ্বরের মধ্যে রাঁধারাঁধি নিয়ে দু'জনের রাগারাগি হয়। মেয়েটি বল্লে "আমি খুব পারব—তোমার না খেয়ে আফিস যাওয়া হবে না।" ছেলেটি বলে—"তুমি পার্‌লেও আমি রাঁধ্‌তে দেব না। আমি না হয় হোটেলে খাব।" মেয়েটি বলে—হ্যাঁ, ভদ্রলোকে বুঝি হোটেলে খেতে পারে!" ছেলেটি বলে—"দর্‌কার হ'লে সব পারে।" মেয়েটি তবু বলে—"তোমার এখনো ত দর্‌কার হয়নি।"

তার পর জোর করে' মেয়েটি রাঁধ্‌তে যায়। ছেলেটি এবার খুব রাগ করে' ভীষণ এক দিব্যি দিয়ে বল্‌লে "যে আজ রাঁধবে সে আমার মরা মুখ দেখ্‌বে।" মেয়েটি দিব্যি শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে বিছানায় শুয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেটি অনুতপ্ত হ'য়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত কর্‌বার চেষ্টায় বল্‌তে লাগ্‌ল—"তুমি অবুঝের মত জেদ কর্‌লে তাই না আমি দিব্যি দিলুম; লক্ষীটি. রাগ কোরো না। আচ্ছা ভেবে দেখ দেখি আগুন-তাতে রেঁধে যদি তোমার জ্বর বেশী বাড়ে তখন ত আমারই কষ্ট বাড়্‌বে। এখন ত একদিন রান্না পাচ্ছিনে তখন ত কতদিন পাব না …সে ত আমারই কষ্ট…তুমি ভালো হ'য়ে যত খুসি রেঁধো না, আমি কি বারণ কর্‌ছি…" মেয়েটি বল্‌লে—"বেশ ত খুব হয়েছে, দিব্যি দিয়েছ—আমি ত আর রাঁধ্‌তে যাচ্ছিনে…" ছেলেটি আরো অনুতপ্ত হ'য়ে বোঝাতে লাগ্‌ল।

সেবারে জ্বর আপনা থেকেই ধীরে ধীরে সেরে' গেল। তাদের রাগারাগির পালাও এমনি করে' সমাপ্ত হ'ল।

নূতন নীড়ে তখন অচেনা কচি অতিথির সমাগম হয়েছে। একটি খোকা।

কিন্তু মেয়েটির আর বাপের বাড়ী থেকে আসা হ'য়ে উঠ্‌ছে না। অসুখ আর সারতে চায় না, বাপ-মাও অসুখ-সুদ্ধ মেয়েকে ছেড়ে দিতে রাজি হয় না। ডাক্তার-ধাত্রী বলে—'সূতিকা'।

ছেলেটি বন্ধুদের কাছে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে' বেড়ায়—"হ্যাঁ ভাই, সূতিকা হ'লে কি বাঁচে না?"

মেয়েটি দিন দিন আরো কাহিল হ'য়ে যেতে লাগল—বিছানা থেকে আর ওঠ্‌বার ক্ষমতা রইল না ক্রমে।

ছেলেটি রোজ আফিসে দেরি হবার জন্যে বকুনি খায়। হিসাব-ভুলের জন্যে তাড়া খায়।

কিন্তু তারা সৃষ্টির বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে এই অকারণ উৎপীড়নের জন্যে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌তে জানে না। নির্দ্দোষের উপর এই অন্যায় অবিচারে, বিধাতার পক্ষ-পাতিত্বে ক্ষিপ্ত হ'য়ে অভিশাপ দেয় না সংসারকে। মানুষের কাছে তারা মাথা নীচু করে' চলে,—বিধাতার কাছেও।

মেয়েটি কোনো দিন স্বামীকে একলা কাছে পেয়ে, করুণ কাতর চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলে—"হ্যাঁ গা, আমি বাঁচ্‌ব না?"

ছেলেটি জোর করে' বুক-ফাটা হাসি হেসে বলে—"কি যে পাগলের মত বল তার ঠিক নেই। বাঁচ্‌বে না কেন, কি হয়েছে তোমার?

মেয়েটি চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বলে—"আমি মর্‌তে চাইনে কিছুতেই।"

ছেলেটি আবার হেসে বলে—"ওসব আজগুবী কথা কোথায় পাও বল ত?"

একটা হাসি আছে—কান্নার চেয়ে নিদারুণ, কান্নার চেয়ে হৃৎপিণ্ড-নেংড়ান।

রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল। মেয়েটি আর স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করে না—"হ্যাঁ, গা আমি বাঁচ্‌ব না?" বরঞ্চ তার সাম্‌নে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হাস্‌তে চেষ্টা করে' বলে—"তুমি ভাবছ কেন, আমি ত শীগ্‌গিরই সেরে' উঠ্‌ছি।" তার পর ঘরকন্না পাত্‌বার নব-নব কল্পনার গল্প করে, কেমন করে' ছেলে মানুষ কর্‌বে তার নাম কি রাখ্‌বে এইসব। ছেলেটিও তার শিয়রে বসে' করুণ হেসে তার শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে শোনে। মেয়েটি বলে—"তুমি ভেবে ভেবে মন খারাপ কোরো না, আমি ঠিক সেরে উঠ্‌ব।" ছেলেটি বলে—"কই আমি ভাবিনে ত! সেরে' উঠ্‌বে না ত কি, নিশ্চয়ই উঠ্‌বে।" কিন্তু তারা বুঝতে পারে এছলনা দু'জনের

কারুরই বুঝতে বাকী নেই। তবু তারা পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে এই করুণ ছলনার নিষ্ঠুর মর্ম্মান্তিক অভিনয় করে। তার পর লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

তবু ছেলেটিকে নিত্যনিয়মিত অফিস যেতে হয়। বড় বড় বাঁধান খাতাগুলোর নিভুর্ল গোটা-গোটা অক্ষর-গুলো নির্ব্বিকারভাবে চেয়ে থাকে। তেম্‌নি হিসাবের পর হিসাব নকল করুতে হয়।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফের্‌বার জন্যে প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠ্‌লেও ছেলেটি হেঁটে আসে ট্রামের পয়সা বাঁচিয়ে ফুলের মালা কেন্‌বার জন্যে নয়, অসুখের খরচ জোগাতে।

কোনো সময় হয়ত একবারটি মনে হয় যদি সে এমন গরীব না হ'ত, আরো ভালো করে' ডাক্তার দেখিয়ে আর একটু চেষ্টা করে' দেখ্‌ত।

শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের জন্যে এতদিনকার মিথ্যা করুণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বল্‌লে—"আমি মর্‌তে চাইনি,—ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু—"

সব ফুরিয়ে গেল।

তখন কাল-বোশেখীর উন্মত্ত সমীরণ আকাশে নীড়-ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।

শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র



হারা-শাবক শ্রী সারদাচরণ উকিল



বিদেশ

শ্রমিক মন্ত্রীসভা :—

ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া শ্রমিক নেতা ক্লাইনেস এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং উদারনৈতিক দলের দলপতি অ্যাস্‌কুইথ সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। শ্রমিক দলের পক্ষে ৩২৮ জন ও বিপক্ষে ২৫৬ জন ভোট দিয়াছিল। শ্রমিক ও উদারনৈতিক দলের মিলিত আক্রমণে পরাস্ত হইয়াই ইংলণ্ডের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে প্রধান মন্ত্রী বল্ড্‌উইন্ পদত্যাগ করেন এবং সংখ্যিতিসম্পন্ন বিরুদ্ধ দল বলিয়া গণ্য শ্রমিক দলের দলপতি র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌কে নূতন মন্ত্রী-সভা গঠনের জন্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জ্ আহ্বান করেন। ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করিবার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ প্রধান মন্ত্রীর পদ ব্যতীত পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত-সচিবের পদে মনোনীত হইয়াছেন স্যার্ (এখন লর্ড্) সিড্‌নি অলিভিয়ার। অর্থসচিব হইয়াছেন ফিলিপ স্নোডেন। উপনিবেশ-সমূহের ভার পাইয়াছেন জে এইচ্ টমাস্। নৌ-বিভাগের কর্ত্তা হইয়াছেন লর্ড্ চেম্‌স্‌ফোর্ড্। লর্ড্-সভার নেতৃত্বের ভার পাইয়াছেন ভাইকাউণ্ট্ হল্‌ডেন। যুদ্ধবিভাগের ভার পাইয়াছেন ষ্টিফেন ওয়ালস্ ও এটর্ণী-জেনারেল হইয়াছেন স্যার প্যাট্রিক হেষ্টিংস্। শ্রমিক বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী মনোনীত হইয়াছেন কুমারী মার্‌গারেট বন্‌ফিল্ড্। শাসন-কার্য্যে কোনও বিভাগের ভার ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভায় এই প্রথমবার একজন মহিলার উপর অর্পিত হইল। স্বাস্থ্য-সচিব হইলেন মিঃ হুইট্‌লে। শিক্ষা-সচিব হইলেন মিঃ ট্রেভেলিয়েন; কৃষিসচিব হইলেন মিঃ নোয়েল বাক্স্‌টন্।

প্রধানমন্ত্রী র‍্যাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের পিতা কৃষি-ক্ষেত্রে মজুরের কাজ করিতেন। সামান্য শ্রমিকের সন্তান হইয়াও ইনি অধ্যবসায়-বলে লেখা-পড়া শিখিয়া শ্রমিকদের একজন নেতা হইয়া পড়েন। ইনি জাতিতে স্কচ্। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চাকরী কমিশনের সভ্য হইয়া ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং এই-সূত্রে এদেশ সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নূতন ভারত-সচিব লর্ড্ সিড্‌নি অলিভিয়ার পূর্ব্বে জামাইকা-দ্বীপে শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেখানকার শ্রমিকদের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। সুশাসক বলিয়া ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বহুদিন কৃষিবিভাগের স্থায়ী সেক্রেটারীর পদে বাহাল থাকিয়া কৃষি ও মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে ইনি বহুদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছেন। রাজস্ব ও বার্ত্তা-শাস্ত্রেও ইঁহার গভীর জ্ঞান রাষ্ট্রজগতে ইঁহার পসারপ্রতিপত্তির যথেষ্ট সহায়তা করিবে। যৌবনেই ইনি সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ফেবিয়ান সমিতির একজন প্রধানরূপে পরিগণিত হন।

শ্রমিকদলকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ সমর্থন করিবে না বলিয়া সংবাদ-পত্র-মহলে যে গুজব রটিয়াছিল তাহা যে ভিত্তিহীন তাহা ক্রমেই প্রকাশ পাইতেছে। দলের খাতিরে জাতির অমঙ্গল করিতে ইংলণ্ডের জনসাধারণ নারাজ। সেজন্য ইংলণ্ডের বণিক্‌সভা ও ব্যাঙ্কের কর্ত্তাদিগের সভা শাসনকার্য্যে শ্রমিকদলকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া যাহাতে শ্রমিক দল আপনার দায়িত্বজ্ঞান ভুলিয়া না যায় তাহার জন্য প্রধান মন্ত্রী খুব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে যাহাতে কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রমিক দল শাসনকর্ম্মের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, সে দায়িত্ব আমাদের। এমন দায়িত্ব জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিকশিত হওয়া দরকার যাহা ইতিপূর্ব্বে কোনও মন্ত্রীসভায় ফুটিয়া উঠে নাই। আমি আশা করি এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে শ্রমিকদলের সকলে আমায় সাহায্য করিবেন।

শ্রমিক মন্ত্রীসভা কর্ম্মগ্রহণ করিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। রুশের সহিত ব্যবসায়ের সম্পর্কস্থাপনের চেষ্টায় সোভিয়েট সরকারকে বিধিসম্মত রাষ্ট্র বলিয়া শ্রমিক মন্ত্রীসভা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং সোভিয়েট সরকারের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্কস্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে। জার্ম্মান ক্ষতিপূরণসমস্যারও একটা কিনারা করিবার চেষ্টা চলিতেছে। রাজস্বসচিব ফিলিপ স্নোডেন আনুমানিক আয়ব্যয়ের যে খসড়া করিতেছেন তাহাতে নৌবিভাগের খরচ প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা কমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। চারিদিকেই খরচ কমাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এইরূপে ব্যয় সঙ্কোচ ঘটাইয়া আয়ের অঙ্ক খসড়া হিসাবে বেশী হইতেছে দেখিয়া করভার লঘু করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যুদ্ধের সময় খাদ্যদ্রব্যের উপর কর ধার্য্য হওয়াতে খাদ্যাদির দাম অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়াছিল। এখন নিত্য-প্রয়োজনীয় কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যের উপর কর হয় তুলিয়া দিবার না হয় কমাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। খুব সম্ভব চা ও চিনির উপর যে করভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা কমাইয়া দেওয়া হইবে। ভাড়া বাড়ী এত দুর্ম্মূল্য যে শ্রমিকদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাস একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে। সেই অভাব দূর করিবার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী হুইট্‌লে দুই লক্ষ নূতন বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই বাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ ভাড়ায় পাওয়া যাইবে এবং বাড়ীগুলিও স্বাস্থ্যকর হইবে। এইরূপ নানা জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিয়া নূতন গভর্ণ্‌মেণ্ট্ লোকপ্রিয় হইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

সাম্যবাদের প্রভাবে সম্পত্তিসঞ্চয় প্রথা ও ধনপ্রাধান্য যদি নষ্ট হইয়া যায় সেই ভয়ে সাম্যবাদের প্রভাব হইতে ইংলণ্ড্‌কে মুক্ত রাখিবার চেষ্টায় ইংরেজ-সরকার রুশের সোভিয়েট-সরকারকে

একঘরে করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু খাদ্য-দ্রব্য ও কাঁচামালের এত বৃহৎ একটি আড়ৎ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এক দিকে ইংরেজের ব্যবসায়ের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, অপর দিকে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়াতে জনসাধারণের কষ্ট অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই বহুদিন হইতেই সোভিয়েট-সরকারকে বিধিসম্মত রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত করিয়া তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইংরেজের ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু নিজেরাই যাহাকে অন্ত্যজ বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে সাধিয়া বিশ্বের দরবারে স্থান করিয়া দিলে ইংরেজের ইজ্জৎ নষ্ট হইবার ভয়ে রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা সাহস করিয়া সোভিয়েট-সরকারকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। শ্রমিক মন্ত্রীসভা শাসনভার গ্রহণ করিয়াই সোভিয়েট-সরকারকে বিধি-সম্মত রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সহিত রাষ্ট্রীয় আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

—

বাংলা

বঙ্গের লোক-সংখ্যা—

জেলা	লোক-সংখ্যা
ময়মনসিংহ	৪৮,৩৭,৭৩০
ঢাকা	৩১,২৫,৯৬৭
ত্রিপুরা	২৭,৪৩,০৭৩
মেদিনীপুর	২৬,৬৬,৬৬০
২৪ পরগণা	২৬,২৮,২০৫
বাখরগঞ্জ	২৬,২৩,৭৫৬
রঙ্গপুর	২৫,০৭,৮৫৪
ফরিদপুর	২২,৪৯,৮৫৮
যশোহর	১২,২২,২১৯
দিনাজপুর	১৭,০৫,৩৫৩
চট্টগ্রাম	১৬,১১,৪২২
রাজসাহী	১৪, ৮৯,৬৭৫
নদীয়া	১৪,৮৭,৫৭২
নোয়াখালী	১৪,৭২,৭৮৬
খুলনা	১৪,৫৩,০৩৪
বর্দ্ধমান	১৪,৩৮,৯২৬
পাবনা	১৩,৮৯,৪৯৪
মুর্শিদাবাদ	১২,৬২,৫১৪
হুগলী	১০,৮০,২৪২
বগুড়া	১০,৪৮,৬০৬
হাবড়া	৯,৯৭,৪০৩
মালদহ	৬,৮৫,৬৬৫
বাঁকুড়া	১০,১৯,৯৪১
জলপাইগুড়ী	৯,৩৬,২৬৯
কলিকাতা	৯,০৭,৮৫১
বীরভূম	৮,৪৭,৫৭০
দার্জ্জিলিং	২,৮২,৭৪৮
চট্টগ্রাম (পার্ব্বত্য)	২,৭৩,২৪৩
কুচবিহারের রাজ্য	৫,৯২,৪৮৯
ত্রিপুরা রাজ্য	৪,৫৪,৪৩৭
সিকিম রাজ্য	৮৯,৭২১

—প্রচার

বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি—

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ বেণ্টলী, ১৯২১ ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্যবিবরণীর সারসংগ্রহ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বঙ্গদেশের গত কয়েক বৎসরের শিশু-মৃত্যু, কৌমার মৃত্যু ও প্রসূতি-মৃত্যু সম্বন্ধে যে-সমস্ত তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি নানা দিক্ দিয়া ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। দারিদ্র্য, ব্যাধি ও অকালমৃত্যুতে মিলিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। বোধ হয়, অনেকেই শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, বাঙ্গালী বালকবালিকাদের শতকরা ৫০ জন আট বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মারা যায় এবং মাত্র শতকরা ২৫ জন ৪০ বৎসরও বয়স পর্য্যন্ত পৌঁছায়। ১৯১৮—২০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কৌমার মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহার ফলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বালক-বালিকাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। জীবনীশক্তি ক্ষয়ের ফলে, জাতির জন্মের হারও অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই দুই কারণে দশবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে বালকবালিকাদের সংখ্যা যত ছিল, তাহা অপেক্ষা এখন অনেক হ্রাস হইয়াছে:—

বয়স	১৯১১	১৯২১ শতকরা হ্রাস
১ বৎসরের কম	১৪২৬৪১৬	১৩৭০০৬৬—৩'০৯৫
১—৫	৫০১২২০৬	৪৬০৯৪৬১—৮০৫

বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মৃত্যুর হারের তুলনা।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে—হাজারকরা মৃত্যুর হার

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
১ বৎসরের নীচে	২১১'৪	২০০.৫
১—৫	৪০ ৪	৩৬ ৯
৫—১০	১৭'০	১৪'৫
১০—১৫	১২'৬	১১'৯
১৫—২০	১ ৭	২০'০
২০—৩০	১'	২১ ৯
৩০—৪০	২২'৭	২৩'২
৪০—৫০	২৮ ৮	২৬'৬
৫০—৬০	৪৩'৮	৩৯'৭
৬০ এর উপরে	৮৪'৬	৭৪ ৮

ঐ তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রায় সকল বয়সের পুরুষের মৃত্যুর হার স্ত্রীলোকের হারের তুলনায় বেশী—কেবল ১৫—৪০ এই বয়সের মধ্যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে বেশী। বলা বাহুল্য, এই বয়সেই স্ত্রীলোকেরা সন্তানের জননী হইয়া থাকেন।

প্রসূতির মৃত্যু

অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে প্রসূতি-মৃত্যুর সংখ্যাও ভয়াবহ। মোটের উপর সন্তানপ্রসবক্ষমা স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৮ হইতে ১০ জনের মৃত্যু সন্তান প্রসবের ফলেই ঘটিয়া থাকে। মৃত-প্রসূতির মধ্যে, শতকরা ৫০ জনের বয়স ১৫ বৎসরের নীচে, শতকরা ৫০ হইতে ৬০ জনের বয়স ১৫ হইতে ২৬ এর মধ্যে, শতকরা ৩৩ জনের বয়স ২০ হইতে ৩০এর মধ্যে এবং শতকরা ৩ হইতে ৪ জনের বয়স ৪০এর উপর। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের হিসাব ধরিলে মোটের উপর প্রায় ৬০ হাজার স্ত্রীলোকের মৃত্যু সন্তান প্রসব করিতে গিয়াই ঘটিয়াছে। যাহাকে সাধারণ ভাষায় সূতিকারোগ বলে তার ফলে এইরূপে কত বালিকা ও

যুবতীর যে অকালমৃত্যু হইতেছে, তাহা ভাবিলে মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। অকালমাতৃত্ব ও ধাত্রীবিদ্যায় অনভিজ্ঞতা, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাব দারিদ্র্য তথা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে এই-সকল শোচনীয় অকাল-মৃত্যুর কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিশুমৃত্যু

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে মোট ২৬৮১৬২ জন শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের শিশুমৃত্যু-হারের তুলনামূলক একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল :—

	জন্মসংখ্যা	হাজারকরা মৃত্যুর হার
১৯১৭	১৬২৭৮৬৩	১৮৫
১৯১৮	১৪৮৯১৩৫	২২৮
১৯১৯	১২৪৫৩৯২	২১৮
১৯২০	১৩৫৯৯১৩	২০
১৯২১	১৩০১০০১	২০

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব তিন বৎসর অপেক্ষা শিশুমৃত্যুর হার একটু কম হইয়াছে। ডাঃ বেণ্ট্‌লী বলিতেছেন যে, ইহা প্রধানতঃ জন্মসংখ্যাহ্রাসের ফলেই ঘটিয়াছে। কেননা, যদিও ১৯১৯ ও ১৯২০ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা শিশুমৃত্যুর হার ১৯২১ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৯ ভাগ কমিয়াছে, তবুও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের তুলনায় শিশুমৃত্যুর হার এখনও শতকরা ১২ ভাগ বেশী। ডাঃ বেণ্ট্‌লী আরও বলেন যে তালিকায় শিশুমৃত্যুর যে হার ধরা হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার শিশু-মৃত্যুর হার তার চেয়ে বেশী—বোধ হয় হাজারকরা ১৯০ হইতে ২৫০এর মধ্যে। স্থলবিশেষে এই হার ৭০০ পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। জন্ম-সময়ের বিকলতা-দোষে প্রায় শতকরা ৫০ জন শিশুর মৃত্যু হয় এবং এক ধনুষ্টঙ্কারেই শতকরা ১১·৪ জন শিশু মরে। এই হিসাব অনুসারে ১৯২১ খৃষ্টাব্দেই ধনুষ্টঙ্কার রোগে প্রায় ৩০ হাজার শিশু বাঙ্‌লা দেশে মরিয়াছে! বাঙ্‌লা দেশের সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার তুলনায় শিশুমৃত্যুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ২৯ ভাগ।

বাঙলার কোন বিভাগে শিশুমৃত্যুর হার কত, তাহার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

শিশুমৃত্যুর হার

	মৃত্যুর হার	সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার তুলনায় শতকরা শিশুমৃত্যুর অনুপাত	সমগ্র শিশু-মৃত্যুর অংশ শত-করা
বর্দ্ধমান	২২০	১৮ ৪	১৮ ৬
প্রেসিডেন্সী	২১৮	১৭·৬	২০·৭
রাজসাহী	২১০	২০·৩	২৫·৬
ঢাকা	২০৬	১৯ ৮	২৬·৪
চট্টগ্রাম	১৪৯	১৯·১	৮·৬

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ও অস্বাস্থ্য-কর, সুতরাং এই দুই বিভাগের শিশু-মৃত্যুর হার বেশী। কিন্তু বাঙ্‌লার সমগ্র মৃত্যুর হারের তুলনায় শতকরা শিশু-মৃত্যুর অনুপাত ঐ দুই বিভাগে অপেক্ষাকৃত কম। ডাঃ বেণ্ট্‌লী বলেন, ইহার দুইটি কারণ আছে—প্রথম, ঐ দুই বিভাগে জন্ম-সংখ্যার হ্রাস; দ্বিতীয়, বঙ্গের বাহির হইতে এই অঞ্চলে বৎসর বৎসর নূতন লোকের আমদানী।

বিভিন্ন বয়সের শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা কত, তাহারও একটা তালিকা দেওয়া যাইতে পারে।

বিভাগ	এক মাসের কম বয়সের	ছয় মাসের কম বয়সের	৬ হইতে ১২ মাস বয়সের
বর্দ্ধমান	৫১·৮	৩৬·৯	২১·২
প্রেসিডেন্সী	৪০·০	৩৭·৮	২২·১
রাজসাহী	৩৯ ৪	৩৬·৫	২৪·১
ঢাকা	৩৫ ৮	৪৫ ৮	১৯·০
চট্টগ্রাম	৩৫ ২	৪২·৯	২১·৯

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, বর্দ্ধমান প্রেসিডেন্সী ও রাজসাহী বিভাগে এক মাসের কম বয়সের শিশুদের মধ্যেই মৃত্যু-সংখ্যা বেশী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া ডাঃ বেণ্ট্‌লী বলেন,—প্রেসিডেন্সী বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগের অস্বাস্থ্যকর স্থানে রুগ্ন প্রসূতিদের দোষে অধিকাংশ শিশু জন্মগ্রহণ মাত্রেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইজন্যই ঐ অঞ্চলে ১ মাসের অধিক শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী।

বাঙ্গালার সহরগুলির মধ্যে রাজধানী কলিকাতাতেই শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—হাজারকরা ৩১১। অন্যান্য সহরের নমুনা এই;—নদীয়া—২৫৫, বীরভূম—২৫৬, রাজসাহী—২৪৫, বর্দ্ধমান—২৩৭, বাঁকুড়া—২২৯, দিনাজপুর—২২৭,—ফরিদপুর—২২৭, বগুড়া—২২৪।

কৌমার মৃত্যু—

১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৌমারকাল ধরা যাইতে পারে (বালক-বালিকা উভয়ের)। বাঙ্গালাদেশে এই কৌমার মৃত্যুর হারও অত্যধিক, এমন কি এক হিসাবে শিশুমৃত্যু অপেক্ষাও উদ্বেগের কারণ। সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার মধ্যে শতকরা ২৩ ভাগ বালকদের ও শতকরা ২৫·১ ভাগ হইয়াছে বালিকাদের মৃত্যু। নীচে বাঙ্গলার কৌমার মৃত্যুর একটি তালিকা দিলাম :—

শতকরা কৌমার মৃত্যুর অনুপাত ১—১৫ বৎসর বয়স

বিভাগ	বালক	বালিকা
বর্দ্ধমান	১৯·৪	১৯·২
প্রেসিডেন্সী	২৪·৩	২৪·০
রাজসাহী	২৭·৫	২৬·৫
ঢাকা	৩·৩	২৮·৪
চট্টগ্রাম	২৮·২	২৮·৪

বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর হইলেও এখানে বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাত কম, তাহার কারণ এই অঞ্চলে জন্মসংখ্যার হ্রাস ও অ-বাঙ্গালীদের আমদানী। ঢাকা ও চট্টগ্রামে লোকদের উৎপাদিকা শক্তি বেশী; সুতরাং লোকসংখ্যার তুলনায় বালক-বালিকাদের মৃত্যুর অনুপাতও বেশী হইয়াছে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রদত্ত হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কি শিশুমৃত্যু, কি কৌমার মৃত্যু, কি প্রসূতি মৃত্যু—সব দিক্ দিয়াই বাঙ্গালী জাতির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহাদের কিছুমাত্র চিন্তাশক্তি আছে এবং স্বজাতির কল্যাণের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও যাঁহাদের মনে উদয় হয়, তাঁহারাই বুঝিবেন, বাঙ্গালী জাতির জীবনীশক্তি কিরূপে দ্রুত ক্ষয় পাইতেছে। এই মৃত্যুর আক্রমণ রোধ করিতে না পারিলে ধরাপৃষ্ঠে আমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। শিশু ও কুমারেরাই ভবিষ্যৎ জাতির বীজ, প্রসূতিরাই জাতির জন্মদাত্রী। বাঙ্গলা জাতির ক্ষয় নিবারণ করিতে হইলে সকলের পূর্ব্বে শিশুমৃত্যু ও প্রসূতিমৃত্যু

রোধের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এই শক্তিহীন উৎসাহ-হীন জীবন্মৃতবৎ জাতির কে বা কাহারা এই চেষ্টা করিবে?

—আনন্দবাজার পত্রিকা

কলিকাতায় যক্ষ্মা—

যক্ষ্মারোগে কলিকাতায় গড়ে প্রতিবৎসর দুই হাজারেরও উপরে লোক মারা যায়। এই ভয়ানক ব্যাধির হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান যে স্কীম্ তৈয়ার করিয়াছেন, মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করিয়াছেন যে, উহাকে অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে মিউনিসিপ্যালিটী বর্ত্তমান বৎসরের বজেটে ২০০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কলিকাতার মেডিক্যাল অফিসার বলিয়াছেন যে, এই-জন্য প্রতি বৎসর ঐ পরিমাণ খরচ পড়িবে।

এই স্কীম্ অনুসারে যক্ষ্মা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য একটি বিভাগ নিযুক্ত হইবে এবং ঐ বিভাগের সঙ্গে যাহাদের যক্ষ্মা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, তাহাদিগকে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য একটি ঔষধালয় স্থাপন করা হইবে।

এই সাংঘাতিক ব্যাধি কিরূপ তাড়াতাড়ি প্রসার লাভ করিতেছে তাহা নিম্নোদ্ধৃত মৃত্যুর হার দেখিলেই বোঝা যাইবে। ১৯১৬ খৃঃ অব্দে এই রোগে কলিকাতায় মরে ১৭৩৮ জন, ১৯২১ খৃঃ অব্দে মৃত্যুসংখ্যা ২২০৮তে উঠে; শেষোক্ত বৎসরে এই রোগে সহরে হাজার-করা ১৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯১৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুর হার সাময়িকভাবে একটু কমিয়াছিল বটে, কিন্তু মোটামুটি গত দশ বৎসরে সহরে এই রোগ কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে অধিবাসীদের জীবনীশক্তির হ্রাস করিলে এই রোগ বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পাইয়াছে। ১৯১৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে ইহার প্রকোপ বড়ই ভয়ের কারণ হইয়াছে।

স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমান যে, কলিকাতাতে অন্যূন দশ হাজার লোক অল্পবিস্তর এই কাল ব্যাধিতে ভুগিতেছে। তাঁহাদের স্কীম্ অনুসারে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ১০।১২ জন লোক ঔষধ ও উপদেশ পাইতে পারিবে।

স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার

পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের বিশেষতঃ মুসলমান মেয়েদের মধ্যেই এই রোগের বেশী প্রকোপ দেখা যায়। ১৯২১ খৃঃ অব্দে হাজারকরা ৩৮ স্ত্রীলোক মরিয়াছিল।

কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক যক্ষ্মায় অধিক মরে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকায় দেখান যাইতেছে:—

বয়স		হাজারকরা মৃত্যুর হার
১০ হইতে ১৫ বৎসর	...	১'৯
১৫ " ২০ "	...	৬'৫
২০ " ৩০ "	...	৬'৭
৩০ " ৪৫ "	...	৫'২

যেখানে এই রোগে একজন বালক বা যুবক মরে, সে জায়গায় চারিজন হইতে পাঁচজন বালিকা ও যুবতীর মৃত্যু হয়।

বিশেষজ্ঞদিগের মতে ছোট বাসগৃহ, আলো বাতাসের অভাব, ও পর্দ্দাই মেয়েদের মৃত্যুর কারণ।

কলিকাতায় ফুসফুস্ সম্বন্ধীয় যক্ষ্মাই অত্যধিক; ইহার প্রধান কারণ হইতেছে যেখানে-সেখানে থুতু ফেলা।

[illegible] খাওয়ার পূর্ব্বে যে গরম করিবার বিধি আছে তাহা যুক্তি-সঙ্গত; যেহেতু পীড়িত গরুর দুগ্ধ হইতেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

১৯২১ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কোন ওয়ার্ডে কিরূপ মৃত্যু হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ওয়ার্ড			হাজারকরা মৃত্যুর হার
২০	—	—	৪'৫
৮	—	—	৩'৭০
২১	—	—	১'৩
৫	—	—	১'৯
২২	—	—	১'১
৬	—	—	২'৬
১৯	—	—	৩'৪

১৯১৯ খৃঃ অব্দের মৃত্যুর হারের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় যে, এই ব্যাধি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। চার বৎসর আগে ২০নং ওয়ার্ডে যক্ষ্মায় হাজারকরা মৃত্যুর হার ছিল ২'৫; ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ১৯ নং ওয়ার্ডে ছিল ২'৩ এবং ২২ নং ওয়ার্ডে ছিল ১'৯।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বঙ্গে সিন্কোনার চাষ—

কুইনাইন অপেক্ষা সিন্কোনার গুণ অধিক কিনা তৎসম্বন্ধে চিকিৎসকগণ গত বৎসর অনুসন্ধান করিয়া অনেকের মতে ইহা স্থির হইয়াছে যে, সিন্কোনার গুণ কুইনাইন অপেক্ষা অধিক, সেই-জন্য সিন্কোনা-গাছ (লাল রঙের ছালের গাছ) অধিক পরিমাণে ১৯২১-২৩ সালে রোপণ করা হইয়াছে।

১৯২২-২৩ সালে বীজ বপন করিয়া ৬০,০০০ ইপিকাকের গাছ হইয়াছে। উহা হইতে ২০০ সের মূল পাওয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুতের জন্য কারখানায় পাঠান হইয়াছে। ইহার চাষে ও পরীক্ষায় ৪৭৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ডিজিট্যালিনের চাষও হইতেছে, তাহা সরকারী ও বে-সরকারী কার্য্যের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যাইবে।

—সঞ্জীবনী

বিদেশে চর্কার আদর—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিতেছেন:—"জার্ম্মানীর শিল্পজগতে নূতন পরিবর্ত্তন হইল—যন্ত্র হইতে আবার মানুষের দিকে ফিরিয়া আসিবার প্রচেষ্টা। এবিষয়ে আমি আমার দেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যে জাতটা যন্ত্রের উন্নতি ও যন্ত্রের শক্তি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, উহাই এখন উপলব্ধি করিতেছে, শিল্পকে আবার বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে। এক বৎসর পূর্ব্বেও সেখানে হাতে সূতা কাটিবার কোন প্রথা ছিল না, কিন্তু একটা স্বাধীন জাতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে অসাধ্য সাধন করিতে পারে। বর্ত্তমানে একমাত্র ব্যাভেরিয়াতেই ৫ লক্ষ চর্কা চলিতেছে। "ইণ্ডিয়ান টেক্স্‌টাইল জার্ণাল" নামক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বিবরণটা সকলেরই বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। উহা দ্বারা আমাদের দরিদ্র ও হতাশ খদ্দরপ্রস্তুতকারকদিগের অন্তরে আশার সঞ্চার হইতে পারে:—"দেশে কাপড়ের দাম অত্যধিক মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়াতে জার্ম্মানীর অনেক স্থানে আবার চর্কার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর জার্ম্মানীতে শণের চাষ এইবার শতকরা ৪০ ভাগে বেশী হইয়াছে বলিয়া ওল্ডেনবার্গ, ব্রেমান লুক্সেমবার্গ প্রভৃতি স্থানে প্রায় ২৪০টি ক্ষুদ্র হস্তচালিত কাপড়ের কল স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাভেরিয়ার হস্তচালিত টাকুর সংখ্যা প্রায় ৫০০০০।

—ত্রিপুরাহিতৈষী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন—

বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতম যুগপ্রবর্ত্তক স্বর্গীয় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে [খানাকুল কৃষ্ণনগর, জেলা হুগলী] আগামী ইষ্টারের অবকাশে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশন হইবে।

—স্বরাজ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দান—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় আজীবন দান ধ্যান করিয়া তাঁহার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমস্তই খদ্দর প্রচারের জন্য দান করিয়াছেন। প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণ আনুমানিক ৫০ সহস্র টাকা হইবে। এই অর্থের যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, তজ্জন্য অভিজ্ঞ তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া একটি ট্রাষ্টি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এখন হইতেই উক্ত অর্থসাহায্যে খদ্দর প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

শিক্ষার কথা—

১৯১৭-২২ অব্দের যে পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা-বিবরণী বাহির হইয়াছে তাহাতে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা-লাভেচ্ছুগণের সংখ্যা দেশে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যেমন অধিকাংশ ছাত্রই—"সাধারণ বিভাগে" শিক্ষালাভ করিতে চাহিত, এখন আর সে ভাব নাই। এখন বেশীর ভাগ ছাত্রই ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারী; অথবা অন্য কোনও রকম শিল্পশিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। আইন কলেজের ছাত্র-সংখ্যা কমিয়াও কমে নাই। ১৯১৭ অব্দে আইন-শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০১২ এবং ১৯২২ অব্দের ছাত্রসংখ্যা ২৪৩৯। মেডিক্যাল কলেজগুলির ছাত্রসংখ্যা গত পাঁচ বৎসরে দ্বিগুণ হইয়াছে। অন্যান্য বিভাগীয় শিক্ষালয়গুলিতেও খুব ছাত্র আসিতেছে। দেশের পক্ষে সুলক্ষণ, সন্দেহ নাই।

—এডুকেশন গেজেট

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার অবস্থা।—ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯২২-২৩ সনে ১৭৩টি বিদ্যালয় শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী ছিল। পূর্ব্ব বৎসর বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬৪, আলোচ্য বর্ষে ছাত্রসংখ্যা ৫১১০। ষ্টেট-পরিচালিত বিদ্যালয় ব্যতীত ২৩টি বেসরকারী পাঠশালা আছে, তাহাতে ৬৯১ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। সমগ্র রাজ্যে ৪টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, তাহার ছাত্রসংখ্যা ৭৮৭। এই রাজ্যে বালকদিগের শিক্ষার জন্য ১১টি পাঠশালা আছে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষার জন্য ১০টি বিদ্যালয় আছে। সংস্কৃত বিদ্যালয়, মক্তব, মাদ্রাসা ও শিল্পবিদ্যালয় এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ত্রিপুরা-রাজ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ২৬৫২৭৲ টাকা, মধ্য শিক্ষার জন্য ৩৩২৭৲ টাকা ও বিশেষ শিক্ষার জন্য ৪৪৮৬৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

—সম্মিলনী

অশ্বিনীকুমার দত্ত স্মৃতি ভাণ্ডার—

মহাপ্রাণ জননায়ক স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহোদয়ের পুণ্যস্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষাকল্পে কতিপয় লোকহিতকর উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য বঙ্গের কর্ম্মী ও প্রধানগণকে লইয়া একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত হইয়াছে। এই সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, আবশ্যক ও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইলে (১) কালীঘাটে তাঁহার চিতাস্থানের উপরে একটি বিশ্রামখানার (২) তাঁহার জন্মভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র বরিশালে একটি টাউন-হল (৩) বঙ্গের দুঃস্থ ছাত্রগণের সাহায্যে একটি ছাত্র-ভাণ্ডার এবং (৪) একটি অনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

এই মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ আমরা সাগ্রহে দেশবাসী ভ্রাতা-ভগিনী-গণের নিকটে তাঁহাদের সাধ্যানুযায়ী অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা দিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত ও যথাকালে বিজ্ঞাপিত হইবে। পত্রাদি সম্পাদকের নামে ৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স্বাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সভাপতি, 'অশ্বিনীকুমার-স্মৃতি-সমিতি,' ৯২, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পদক পুরস্কার—

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মীরাট শাখা হইতে পণ্ডিত ৺উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এবং প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় ও বর্ত্তমান যুগের বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয় বিষয়ক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি রৌপ্য পদক প্রদান করা হইবে। প্রবন্ধটি আগামী ১লা আষাঢ় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের মধ্যে শাখা-পরিষদের নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

শ্রীরাজকিশোর রায়
সম্পাদক
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্—মীরাট শাখা
৩২ নং ওয়েষ্ট ষ্ট্রীট,—মীরাট কেণ্ট্।

বাঙ্গালী যুবকের মহাপ্রাণতা—

পত্রান্তরে প্রকাশ, রেঙ্গুন মেডিক্যাল স্কুলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্প্রতি একটি মুসলমান স্ত্রীলোককে নিজের রক্ত দান করিয়া বাঁচাইয়াছেন। স্ত্রীলোকটি রেঙ্গুন জেনারেল হাসপাতালে রক্তাল্পতার জন্য মরণাপন্ন হইয়াছিল। জনৈক ডাক্তার ব্যবস্থা করেন যে, যদি কোন লোকের রক্ত রোগিণীর শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তবে রোগিণী বাঁচিতে পারে। ডাক্তারের কথা শুনিয়া উক্ত মহাপ্রাণ যুবক স্বীয় রক্ত দান করিতে সম্মত হইলেন। ডাক্তার আবশ্যক অস্ত্রোপচার করিয়া প্রায় চল্লিশ আউন্স্ রক্ত যুবকের শরীর হইতে লইয়া রোগিণীর শরীরে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।—

—ঢাকাপ্রকাশ

পদব্রজে দূরদেশে যাত্রা—

কুড়িজন বাঙ্গালী যুবক শ্রীভূতনাথ রায়ের নেতৃত্বে গত ১২ই ডিসেম্বর কাশীধাম অভিমুখে যাত্রা করেন। এই দলের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বালকের নাম সুধীরগোপাল চট্টোপাধ্যায়। সে চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের ছাত্র। দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠের নাম জ্ঞানচন্দ্র সোম কলিকাতা খৃষ্টীয় যুবকসম্মিলনীর ব্যায়াম শিক্ষক। তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর। দলের মধ্যে ২২ জন মধ্য পথ হইতে ফিরিয়া আসেন, বাকী ৮ জন মাত্র ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যাকালে কাশীধামে পৌঁছিয়াছেন। ২৩ দিনে তাঁহারা কাশী পৌঁছিয়াছেন, তন্মধ্যে ৫ দিন পথে বিশ্রাম করিয়াছেন।

—এডুকেশন গেজেট

বাঙালীর সম্মান লাভ—

আগামী মে মাসে নেপল্‌স্ সহরে যে আন্তর্জ্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তাহাতে ভারতবর্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ডাঃ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক মূর ১৯২১ খৃঃ অব্দে প্যারিসে গত আন্তর্জ্জাতিক দার্শনিক কংগ্রেসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

—বন্দেমাতরম্

রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রা—

চীনের রাজধানী পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগামী ১৫ই মার্চ তারিখে দলবলে চীন যাত্রা করিবেন। কবিবরের অনেক পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ চীন দেশে খুব আদরের সহিত পঠিত হইতেছে। এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তাঁহাকে খুব বড় রকমের অভ্যর্থনা দিবার আয়োজন চলিতেছে। ইতিমধ্যে চীন দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ সংস্করণ বাহির করিয়া কবিবরের খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, কবিবরের পুস্তক পড়িয়া চীন দেশীয় যুবকবৃন্দের প্রাণে যে নূতন ভাবোন্মাদনা ও কর্ম্মপ্রেরণার সৃষ্টি হইয়াছে, জগতের কোনও গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে তেমন হয় নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে রবীন্দ্রনাথের চীন গমনে চীনবাসীর প্রাণে আবার নূতন আশা ও নূতন বলের সঞ্চার হইবে।

—ছোলতান

আবেদন—

সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন :—একটি ১২ বৎসর বয়স্কা রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ কন্যা নিকষ কুলীন রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান, ফুলিয়ামেল অবিবাহিতা আছে। তাহার একটি ১৪ বৎসর বয়স্ক জ্যেষ্ঠ সহোদর আছে, এজন্য বালিকার স্বঘরে বিবাহ হওয়া প্রয়োজন। বালকবালিকা অতি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন। তাহারা এখন অনাথ, গৃহহীন ও অর্থহীন—সাধারণের নিকট ভিক্ষা করিয়া খায়। বালিকার বিবাহের বয়স হইয়াছে। যদি কোন মহাত্মা মাত্র বালিকাটিকে গ্রহণ করিয়া স্বঘরে বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমায় পত্র লিখুন। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করিবেন। শ্রীরাখালদাস পালধি, প্রবাসী অফিস, ২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—আনন্দবাজার পত্রিকা

দান—

রামকৃষ্ণসঙ্ঘ অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়—উত্তরপাড়া সন্নিকটস্থ ভদ্রকালী নামক গ্রামে রামকৃষ্ণসঙ্ঘের অধীনে একটা অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। সম্প্রতি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল মহাশয় তাঁহার বিশ হাজার টাকা মূল্যের সুবৃহৎ বসতবাটী এই বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বোর্ডিং এর জন্য দান করিয়া এই মহৎকর্ম্মের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ঐ স্থানে নেপাল মহারাজের ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার শ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে; তাহারও সমস্ত ব্যয়ভার উক্ত পাল মহাশয় সানন্দে বহন করিয়া রামকৃষ্ণসঙ্ঘের বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। এজন্য রামকৃষ্ণসঙ্ঘ তাঁহাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

উক্ত বিদ্যালয়ে ৩৫টি বালিকা হিন্দু আদর্শে নিয়মিতভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে! পূজাপাঠ, সংস্কৃত অধ্যয়ন, এবং নানা গৃহশিল্প শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা যাহাতে বালিকারা আদর্শ নারী, আদর্শ মাতা এবং আদর্শ গৃহিনী হইয়া উঠিতে পারে উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহারই জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি সঙ্ঘের দুইজন ব্রহ্মচারিণী শিক্ষয়িত্রী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য এক-জন পণ্ডিত শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

যদি কোন স্ত্রীলোক সংস্কৃত শিক্ষা এবং স্কুলে পরিচালনের ভার নিঃস্বার্থভাবে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণসঙ্ঘ বিশেষ উপকৃত হয়। বিদ্যালয়ের ব্যায়ভার সম্প্রতি মাসিক ৬০৲ টাকা, যদি কেহ কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘের সম্পাদক ডাঃ কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্, এ; বি, এল; পি, আর, এস; পি, এইচ, ডি, ৯৬নং আমর্হার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন। নিবেদন ইতি।

ডাঃ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু, এম-বি, সহঃ সম্পাদক,

—আনন্দবাজার পত্রিকা

বাঙালীর সম্মান—

সোমেশের কৃতিত্ব।—অনেকে অবগত আছেন যে ঢাকা বজ্রযোগিনী নিবাসী বাবু সোমেশচন্দ্র বসু মানসিক গণনায় বিলাতে এমন কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন যে তাহাতে সেখানকার বড় বড় গণিতজ্ঞগণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। সোমেশ বাবু কুড়ি একুশটি অঙ্কের বর্গ ও ঘন মূল্য মুখে মুখে পাঁচ মিনিটে বলিয়া দিতে পারেন! বিলাতে কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি আমেরিকায় গমন করিয়াছেন! সেখানকার গণিতবিদ্‌গণ তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানসিক গণিতবেত্তা বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

—সম্মিলন

সেবক

ভারতবর্ষ

কাকিনাড়া কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক ভোজ—

কংগ্রেস অধিবেশনের শেষ দিনে কাকিনাড়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমুদায় কংগ্রেস প্রতিনিধি, মান্যগণ্য অতিথি, অভ্যর্থনা-সমিতির সমুদায় সভ্য, পুরুষ- ও নারী-নির্ব্বিশেষে সমুদায় স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতিকে একটি আন্তর্জাতিক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। সন্ধ্যা আটটার সময় এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই কাকিনাড়া ত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যতীত প্রায় সকলেই এই ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় বলিতেছি এইজন্য যে প্রায় দুই শত লোক সর্ব্বসাধারণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে সম্মত না থাকায় তাঁহাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। অপর দিকে কয়েক সহস্র নরনারী হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান জৈন-নির্ব্বিশেষে পাশাপাশি ও অতি ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া নিরামিষ আহার সানন্দে ভোজন করিয়াছিলেন। প্রথম দুই পংক্তি মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তৃতীয় পংক্তিতেই বাঙ্গালীরা বসিয়াছিলেন ও পরে অন্যান্য দেশের লোকেরা আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস-নেতাদের আসন কয়েক পংক্তি পরে সকলের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল। শ্রীমতী মহম্মদ আলী-পত্নী বাঈ-আম্মা প্রভৃতিও আসিয়া অপর হিন্দু নারীদের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। শ্রীমতী মহাম্মদ-আলী-পত্নী, সভা-সমিতিতে বোর্কা পরিয়া আসেন। ভোজন কালে কিছুক্ষণ তিনি বোর্কার মুখাবরণের ভিতর দিয়াই আহার করিতেছিলেন, পরে অসুবিধা হওয়ায় মুখের ঢাকা সরাইয়া ফেলিয়া খাইতে লাগিলেন। খাওয়া চলিতে লাগিলে লোকের আনন্দও বাড়িতে লাগিল। অন্ধ্রদেশের মেয়েরা খাইতে খাইতে নানারকম গান গাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতে লাগিল তাঁহারা যেন নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে কোন উৎসবক্রিয়ায় ব্যাপৃত আছেন।

এইরূপে একত্র পানাহার-ক্রিয়া কংগ্রেসের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে এবারকার কাকিনাড়া-কংগ্রেসে এই আন্তর্জাতিক ভোজই সবচেয়ে বড় ব্যাপার।

অ

জাইটোর হত্যা-উৎসব—

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী জাইটোতে অকালী জাঠাদের উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহার এবং বেসরকারী ইস্তাহারের ভিতর ঢের প্রভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই প্রভেদটা অবশ্য কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে। কারণ, এরূপ প্রভেদ ইতিপূর্ব্বে এইধরণের প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখা গিয়াছে।

জাইটো হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অন্যান্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া উক্ত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। হোম-মেম্বর স্যার্ ম্যাল্‌কম্ হেলী এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলেন—দেশীয় রাজ্যের কার্য্যাবলী ব্যবস্থা-পরিষদের আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। প্রেসিডেণ্ট্ হোম মেম্বরের আপত্তিই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া পণ্ডিত মদনমোহনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ইহার পরেও গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী সর্দ্দার গোলাব সিং অকালীদের সম্পর্কে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে শিখদের অভিযোগের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং অকালী আন্দোলন সম্বন্ধে রিপোর্ট্ করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদ্ হইতে দুই-তৃতীয়াংশ বেসরকারী নির্ব্বাচিত সদস্য এবং এক তৃতীয়াংশ সরকারী সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হউক। এ ব্যাপারেও সরকারী সদস্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অবশেষে নানা তর্ক বিতর্কের পর এ সম্পর্কে ডাঃ গৌরের সংশোধিত প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। ডাঃ গৌরের প্রস্তাব—যে কমিটি গঠিত হইবে, তাহার সদস্য নির্ব্বাচন এবং সরকারী ও বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা নির্ণয়ের ভার থাকিবে গবর্ণমেণ্টের হাতে।

লালা হংসরাজ ও সম্মুগম্ চেটী ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য। তাঁহারা জাইটোর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ঘটনাস্থলে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জাইটোয় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই।

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রকৃত চেহারা এই সব ঘটনার ভিতর দিয়াই চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং ব্যবস্থা-পরিষদের দরবারে আমাদের দুঃখ যে কতটা ঘুচিবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মহাত্মা গন্ধী অকালী শিখগণকে অনুরোধ করিয়াছেন:—শিখনেতা ছাড়াও দেশের অন্যান্য নেতাদের উপদেশ লইয়া তবে ভবিষ্যতে অকালী জাঠা প্রেরণ করা সঙ্গত। এখন জাঠা প্রেরণ বন্ধ করিয়া এই হত্যাকাণ্ডের কি ফল হয় তাহাই দেখা কর্ত্তব্য।

লালা লজপত রায়ও এ সম্পর্কে মহাত্মারই মত সমর্থন করিয়াছেন।

একদল অকালী জাঠা-প্রেরণ-সম্পর্কে মহাত্মার মত আলোচনার জন্য অকাল তখ্‌তের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিলেন। মহাত্মার সঙ্গে একমত হইতে না পারায় তাঁহারা জাঠা প্রেরণ করাই স্থির করিয়াছেন এবং সেই দিনই একদল অকালী চিকিৎসক গ্রন্থ-সাহেব প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া অমৃতসর হইতে জাইটো অভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে।

অকালীদের দুইজন নেতা মহাত্মাজীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে পুণায় চলিয়া গিয়াছেন। নেতাগণ মনে করেন মহাত্মা ভুল সংবাদ পাইয়া ঐরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এখন জাঠা পাঠানো বন্ধ করিলে বারদোলী প্রস্তাবের পর দেশের যে অবস্থা হইয়াছিল আবার ঠিক সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। চতুর্দ্দিক হইতে জাঠাতে যোগদান করিবার জন্য অমৃতসরে বহু শিখ আসিয়া হাজির হইতেছে।

রেলের সুব্যবস্থা—

বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:—

সপারিষদ বড়লাট যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেল-কর্তৃপক্ষদিগকে আদেশ করুন—

(১) ভিড় হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যে স্থানে প্রয়োজন সেখানে যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

(২) যে-সব ট্রেনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী দেওয়া হয় না সে সব ট্রেনে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী দিতে হইবে।

(৩) ছোট ছোট ষ্টেসনেও হিন্দু-মুসলমানদিগের জন্য পানীয় জল সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

(৪) যে সব বড় ষ্টেশনে হিন্দু-মুসলমান যাত্রীদের জন্য খাবারের ঘর নাই সে-সব ষ্টেশনে খাবারের ঘরের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) যে সব বড় ষ্টেশনে মধ্যম শ্রেণীর পুরুষ এবং রমণীদের জন্য বিশ্রাম ঘর নাই সে-সব ষ্টেশনে বিশ্রাম-ঘর তৈরী করিতে হইবে।

প্রস্তাব ত পাশ হইল, কিন্তু এ প্রস্তাব কাজে কতটা খাটানো হইবে সে বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহ আছে। মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীদের অসুবিধার আন্দোলন ঢের দিন হইতেই করা হইতেছে, কিন্তু রেল-কর্তৃপক্ষের ঘুম ভাঙ্গে নাই।

সিংহলে শাসন-সংস্কার—

সিংহলের শাসন-সংস্কারে এবার ভারতবাসীর পক্ষ হইতে দুইজন প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত হইবেন স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বে একজন প্রতিনিধি মনোনীত হইতেন। কর্তৃপক্ষ বলেন, এখন কিছুকালের জন্য মনোনয়ন প্রথা অনুসারে কাজ হইবে। পরে ভারত-প্রবাসী আপনাদের প্রতিনিধি আপনারাই নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন। সেখানকার প্রবাসী ভারতসন্তানেরা বলেন, এখন হইতেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। মনোনীত দুইজন সদস্যের একজন সহরগুলির প্রতিনিধি স্বরূপ থাকিবেন; আর-একজন সিংহলের পল্লীবাসী ভারতসন্তানদের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবেন।

পঞ্জাবের আব্‌গারী হিসাব—

১৯২২-২৩ সালের পঞ্জাবের আব্‌গারী বিবরণে প্রকাশ, দেশী মদের ব্যবহার প্রায় সওয়ালক্ষ গ্যালন কমিয়াছে। ফলে সরকারী রাজস্বও প্রায় ১২ লক্ষ টাকা কম আদায় হইয়াছে। গোপনে মদ তৈরী ১৯১৯-২০ সালের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী। কর্তৃপক্ষের মতে মদের মূল্যাধিক্যই নাকি এই হ্রাসের কারণ।

ব্যবস্থা-পরিষদে শাসন-সংস্কার—

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়ার ভারতের জন্য স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী পেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব ছিল পররাষ্ট্র-ব্যাপারে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনপ্রণালী এবং আভ্যন্তরিক সকল বিষয়ে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রদান করা হউক।

বলা বাহুল্য সরকারের তরফ হইতে এ প্রস্তাবের খুব জবরদস্ত

প্রতিবাদ হইয়াছে। স্যার ম্যাল্‌কম্ হেলী বলিয়াছেন, ভারতীয় রাজন্যবর্গ যতদিন নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ না করিবেন, যতদিন ভারতের সীমান্ত রক্ষার সমস্যার সমাধান না হইবে, সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান যতদিন দূরীভূত না হইতেছে, হীনবল সম্প্রদায়গুলির স্বার্থসংরক্ষণের সুব্যবস্থা যতদিন না হইবে, ততদিন ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু শ্রীযুক্ত রঙ্গচারিয়ারের প্রস্তাবের একটি সংশোধিত প্রস্তাব উপাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেন, ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বড়লাট

(১) সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি পরামর্শ-পরিষদ্ গঠিত করুন। সেই পরিষদ্ সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের জন্য শাসনপদ্ধতি রচনার ব্যবস্থা করিবেন॥

(২) বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহার স্থলে নূতন সভা গঠিত হইবার পর তাহার সমক্ষে সমিতির রচিত শাসন-পদ্ধতির খসড়া উপস্থিত করিতে হইবে এবং তাহাকেই আইনে পরিণত করিবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দরবারে পেশ করা হইবে।

কয়েক দিন ধরিয়া এই ব্যাপার লইয়া তর্কবিতর্ক চলে। অবশেষে ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাবটি সম্বন্ধে ব্যবস্থা-পরিষদে চরম মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ভোটের জোরে পণ্ডিত মতিলালের সংশোধিত প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার Round Table Conference বসাইবার পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ৭৬ জন এবং বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন ৪৮ জন।

চৌরীচোরার স্মৃতিস্তম্ভ—

গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরীচোরা গ্রামে গত ১৯২২ সনেই ৫ই ফেব্রুয়ারী এক জনতা কতকগুলি পুলিশ লোককে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিয়াছিল। সেই পুলিশগণের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বুধবার যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর উক্ত স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন।

চৌরীচোরার অশিক্ষিত ক্ষিপ্ত জন-সঙ্ঘ যে অন্যায় করিয়াছিল তাহার স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল। আর জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে শিক্ষিত উচ্চপদস্থ সাদা কর্ম্মচারী যে অক্ষুব্ধ চিত্তে পাশবিক অত্যাচারের অভিনয় করিয়াছিল এখনও তাহার সমর্থনের চেষ্টায় আমলাতন্ত্রের তরফ হইতে অজস্র তর্কজালের সৃষ্টি হইতেছে। জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে, মলঙ্গার হাটে, জাইটোতে চৌরীচোরারই অভিনয় হইয়াছে ও হইতেছে। তবে সে অভিনয় করিতেছেন "রাজার নন্দিনী প্যারী" সুতরাং 'যা করেন তাই শোভা পায়।'

আয়ুর্ব্বেদীয় কন্‌ফারেন্স্—

আগামী এপ্রিল মাসে কলম্বোতে সর্ব্বভারত আয়ুর্ব্বেদীয় কন্‌ফারেন্সের বৈঠক বসিবে। কলিকাতার কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ সেনকে এই কন্‌ফারেন্সে সভাপতির আসন গ্রহন করিবার জন্য আমন্ত্রন করা হইয়াছে। তিনি ১৯১২ সালে কানপুর আয়ুর্ব্বেদীয় কন্‌ফারেন্সেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই কন্‌ফারেন্সের সংশ্রবে প্রদর্শনীও খোলা হইবে।

মেথরদের সমাজ সংস্করণ—

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত শেঠ রঘুমলের সভাপতিত্বে দিল্লীতে বাল্মীকি আর্য্যসমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লালা লাজপত রায়, স্বামী সত্যানন্দ প্রমুখ আর্য্যসমাজী নেতাগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় লালাজী বলিয়াছেন, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের পাশে, তাঁহাদের সমান আসনে আজ মেথরদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার ভারি আনন্দ হইতেছে। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের উন্নয়ন ব্যতীত হিন্দুজাতির উন্নতি কখনো সম্ভবপর নহে। মেথরদের ভিতর অনেক দুর্নীতি আছে। এইসব দুর্নীতি দুর করিতে হইবে। দীর্ঘকাল সমাজের দ্বারা উপেক্ষিত হওয়াতে তাহাদের সমাজে এই-সব দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। এইসমস্ত দূর হইলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু যাঁহারা এখন তাহাদের সহিত মেলামেশা করেন না তাঁহারাও আর মিশিতে আপত্তি করিবেন না। মেথরদের সমাজ-সংস্কার-মূলক কতকগুলি প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে। ঐসব প্রস্তাবের বক্তারা সকলেই মেথর। সহস্রাধিক মেথর এই সভায় যোগদান করিয়াছিল।

সামন্ত-রাজ্যশাসন-সংস্কার—

পুনার ২০শে ফেব্রুয়ারীর খবরে প্রকাশ, আউন্ধরাজ্যের রাজা শ্রীমন্ত বালা সাহেব তাঁহার প্রজাবৃন্দকে প্রতিনিধিমূলক শাসনপদ্ধতি অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আপাততঃ স্থির হইয়াছে, রাজ্যের শাসন-পরিষদের ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জন প্রজা-সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও বাকী ১৭ জন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত হইবেন।

শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায়



কাশ্মীরের ডাল হ্রদ—সন্ধ্যাকালে
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন কর্ত্তৃক কাঠের খোদাই



লেনিন্

সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের স্রষ্টা, ভাবুক দার্শনিক ও কর্ম্মযোগী লেনিনের দেহাবসান ঘটিয়াছে। যেমন একদিকে তাঁহাকে রক্ত পিপাসু নর-রাক্ষস বলিয়া বর্ণনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই বর্ত্তমান-যুগে শ্রেষ্ঠ মানবরূপে তিনি চিত্রিত হইয়াছেন। তাঁহাকে মানব অথবা দানব যাহাই বলা হউক না কেন, তিনি যে একজন শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপরিচালনায় যে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল, উত্তেজিত জনসাধারণকে বশে রাখিবার কৌশল যে তিনি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়াছিলেন, ইহা শত্রুমিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। একধারে যেমন রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁহার বজ্রের ন্যায় কঠোর মন ছিল, অপরদিকে রুশিয়ার কৃষাণ-কুলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁহার কুসুমকোমল ভরন্ত প্রাণের সহানুভূতি ছিল। রুশিয়ার নিপীড়িত কৃষাণকুলের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিয়া রুশ জাতিকে নূতন যুগের প্রবর্ত্তক ও চালকরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল। লেনিন্ বিগ্রহের পূজক ছিলেন; নরের আত্মার মধ্যেই তিনি নারায়ণের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত মার্কিন পাদ্রী হোমস্ বর্ত্তমান যুগের তিনটি শ্রেষ্ঠ মানবের মধ্যে লেনিনের স্থান স্বীকার করিয়া লেনিনের সহিত নেপোলিয়ান বোনাপার্টের তুলনা করিয়াছেন। লেনিন্‌কে বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন রুশ-ঔপন্যাসিক ম্যাক্সিম গর্কি। গর্কি বলেন যে "বর্ত্তমান যুগে লেনিনের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাত্রায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়াছে। সমস্ত মনুষ্যগুণ তাঁহার মধ্যে যেরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে এমনটি আর পাওয়া যায় না। প্রয়োজনের চাপে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার লইয়া লেনিন্‌কে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইলেও তাঁহার মনে মহামানবের যে পরিকল্পনাটুকু জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা যাহাতে ভবিষ্যতে সত্য হইয়া উঠিতে পারে তাহার চিন্তায় তিনি তাহার অবসর-সময়টুকু ক্ষেপণ করেন। লেনিনের জীবনের মূলমন্ত্র মানবের মঙ্গল সাধন, এবং অদূর ভবিষ্যতে মানবের অকল্যাণকর যাহা কিছু তাহা যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় সেই চেষ্টাতেই ত্যাগী সন্ন্যাসী অমিততেজে ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বোত্তম বলিতে যাহা বুঝেন তাহার জন্য আপনার দেহমন তিলে তিলে ক্ষয় করিতে এই বীর-সন্ন্যাসী কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।"

তিনি যে আদর্শের অনুসরণ করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইলেন সে আদর্শ জগতের পক্ষে হিতকর কি না তাহা মহাকাল ভবিষ্যতে সাক্ষ্য দিবেন। তিনি যেরূপ ঐকান্তিক আগ্রহে জগতের দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার জন্য শত সহস্র রুশ নরনারীর হৃদয়-সিংহাসনে তিনি এমন আসন দখল করিয়া বসিয়াছেন যে তাঁহার আদর্শকে রক্ষা করিতে তাহারা হাস্যমুখে মরণকে বরণ করিতে পারে। বিখ্যাত শ্রমিকনেতা জর্জ্জ্ ল্যান্‌সবেরি রুশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিতেছেন যে সমগ্র রুশ জাতির নিকট লেনিন নব জীবনের প্রতীক। যে নূতন আদর্শ সমস্ত সোভিয়েট রুশিয়াকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে তাহার মূর্ত্ত বিগ্রহ লেনিন্। সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। তাহারা তাঁহাকে সখারূপে ভালোবাসে ও জীবনের পথ-প্রদর্শকরূপে ভক্তি করে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির তিনিই যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। রুশিয়ার এই প্রাণের ঠাকুরটিকে কিন্তু ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদেরা অমানুষ-রূপে পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ চার্চ্চিল বলেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর ও সর্ব্বাপেক্ষা কুৎসিত লোক হইতেছে এই লেনিন্।



মহামানব লেনিন

গুরুতর পরিশ্রমে লেনিন্ সাংঘাতিক রূপে পীড়িত হইয়া পড়েন। তথাপি রুশিয়ার সেবা করিতে বিরত না হওয়াতে তাঁহার মস্তিষ্কের শিরা-গুলি শুকাইয়া যায়। তাহার ফলে যুগমানব লেনিনের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার দেহাবশেষ বহন করিয়া রক্তবসন-পরিহিত, রক্তপতাকাধারী লাল পল্টনের এক বিরাট্ মিছিল বাহির হইয়াছিল এবং ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য রুশিয়ার রাজধানী পেট্রোগ্রাডের নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া লেনিন্‌গ্রাড দেওয়া হইয়াছে।

অনেকে আশা করিয়াছিলেন লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কি, জিনো-ভিয়েফ, কামেনেফ প্রভৃতি নেতাদিগের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিবাদ

বাধিবে এবং তাহার ফলে সোভিয়েট সরকার ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে রুশনেতৃবর্গ রাইকফ্‌কে নায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সাহচর্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। লেনিনের সাধনা ধ্বংস হইবে না।

লেনিনের জন্ম হয় ১০ই এপ্রিল ১৮৭০ খৃঃ অব্দে, তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন গত ২১ জানুয়ারী ১৯২৪ খৃঃ অব্দে। রুশিয়ার ভল্‌গা নদীর উপরে সিমবার্‌স্ক সহরে তাঁহার জন্ম হয়। লেনিনের আসল নাম ভ্লাডিমির্ ইলিচ্ উলিয়ানফ্ (Vladimir Ilich Ulianov)।

লেনিনের পিতা একজন স্কুল-পরিদর্শক ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি সন্তান ছিল। তাঁহার গৃহকে তিনি একটি আদর্শ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছিলেন, এবং সন্তানদের নিকট হইতে প্রতিদানেও যথেষ্ট পাইয়াছিলেন। লেনিনের প্রথম শিক্ষা তাঁহার গৃহে পিতার নিকট শুরু হয়। বাল্যকাল হইতেই লেনিন্ এবং তাঁহার পাঁচ ভাই বোন দেশের শ্রমিক এবং গরীব লোকদের দুঃখ কষ্ট নিজেদের অন্তরে পূর্ণভাবে অনুভব করিতেন। সমস্ত দেশের লোককে তাঁহারা নিজেদের পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহারা দেশের দুঃখীদের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন।

২০শে মে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে লেনিনের ভ্রাতা আলাকজাণ্ডারের শলুশেলবার্গ্ জেলখানায় ফাঁসি হইল। লেনিনের এই ভ্রাতাটি পড়াশুনায় এবং অন্যান্য মানসিক বৃত্তিতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেণ্ট্ পিটার্স্‌বার্গ্ সহরে অবস্থান কালে আলাকজাণ্ডার "জন-মত" নামক বিদ্রোহীদলের সঙ্গে যোগদান করিয়া জারের গোয়েন্দা-পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন। বিচারের সময় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই এবং তাঁহার বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ আনা হয় তাহার কিছুই অস্বীকার করেন নাই। বিচারকালে অভিযোগ স্বীকার করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু তিনি বলেন নাই। সহকর্ম্মীদের বাঁচাইবার জন্যই এই আত্মত্যাগ। তবে বিচারকালে দণ্ড প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি এই কয়েকটি কথা বলেন—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় গোপনে বিদ্রোহের আয়োজন করা ছাড়া আর কোন সহজ পথ নাই, বর্ত্তমান জারের এবং শাসক-সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে দেশকে বাঁচাইবার এই একমাত্র পথ।—ফাঁসির পূর্ব্বে তাঁহার মাতা তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করেন এবং পুত্রকে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বলেন। কিন্তু আলাকজাণ্ডার তাহা করিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন। লেনিনের বয়স এই সময় মাত্র সতের বৎসর। ভ্রাতার মৃত্যু তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করে।

কাজান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "Socialism" প্রচার করার অভিযোগে লেনিন্‌কে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি নেভা সহরে আসেন (১৮৯১)। সেণ্ট্ পিটার্স্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন এবং অর্থনীতি পাঠ করিবার সময় লেনিন্ Marxism সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রুশীয় সোসিয়ালিজমের পিতা প্লেখানফ্ বলেন "একদিন এই যুবা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে"। ভবিষ্যতে এই বাক্য সার্থক হইয়াছিল। ইহার পনের বৎসর পরে লেনিন্ প্লেখানফের হাত হইতে Social-Democratic Partyর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পঁচিশ বছর প্লেখানফকে Great Soviet Congress হইতে একেবারে দূর করেন। কিন্তু এই সময় হইতে শাসক-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়ে। এই সময় তিনি শ্রমিক সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য প্রাণপণে খাটিতে লাগিলেন। দেশের শ্রমিক দলও তাঁহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইল।

২৭শে জানুয়ারী ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে লেনিন্ ধৃত হইয়া পূর্ব্ব সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এই নির্ব্বাসনকে তিনি দুঃখের সঙ্গে বরণ না করিয়া আনন্দের সঙ্গে বরণ করিয়া পাঠ এবং চিন্তায় নিয়োগ করিলেন। এই সময় তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ এবং পুস্তক রচনা করেন। সবগুলি অন্য নামে প্রকাশ করা হয়।

লেনিনের নির্ব্বাসন-দণ্ড সমাপ্তির পর তাঁহাকে রুশিয়ার কোন বড় সহরে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বাস করিতে দেওয়া হইত না। এই সময় আরো কয়েকজন সোসিয়ালিষ্ট নেতার সহিত একযোগে লেনিন্ ইস্‌ক্রা নামে এক কাগজ বাহির করেন এবং এই কাগজের সাহায্যে সমগ্র রুশিয়াতে সোসিয়ালিষ্ট মতবাদ প্রচার হইতে



বল্‌সেভিক্ নেতা ট্রট্‌স্কি—মহামতি লেনিনের সঙ্গে একযোগে রুশিয়ার স্থায়ী উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন

লাগিল। এইবার তাঁহাকে কিছু কালের জন্য রুশিয়া ত্যাগ করিতে হইল—শাসকদলের অত্যাচারে। সকল সময় তাঁহার পিছনে রুশীয় গোয়েন্দা-পুলিস ঘুরিত। লণ্ডন, ম্যুনিক, ব্রুসেল্‌স্, প্যারিস, ইত্যাদি সকল মহা-সহর ভ্রমণ করিয়া লেনিন্ অবশেষে জেনেভা সহরে তাঁহার বাসস্থান স্থির করিলেন। এই দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যে তাঁহার পত্নী নাড্‌এজ্‌ডা ক্রুপ্‌স্কায়া (Nadezhda Krupskaya) কখনও তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। জেনেভা সহরে বাস কালে লেনিন-পত্নী স্বামীর সকল কার্য্যে প্রাণপণ এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে তাঁহার প্রায় প্রাণসংশয় হইল।

১৯০৩ খৃঃ অব্দে Russian Social Democratic Partyর ব্রুসেল্‌স্ সহরে দ্বিতীয় কন্‌গ্রেস হয়। এই মহাসভাতে দলটি দুই ভাগে বিভক্ত হইল। মেনসেভিকি এবং বলসেভিকি। এই দুইটি

কথার অর্থ, কম-সংখ্যার দল এবং বৃহৎ-সংখ্যার দল। আমরা বল্‌শেভিক্ কথার অর্থে যে এক দল বৃহৎ-দাড়িওয়ালা ভীষণ-দর্শন দস্যুর কথা মনে করি তাহা ভুল। লেনিন্ বল্‌শেভিকির নেতা হইলেন।

১৯০৫ খৃঃঅব্দে লেনিন্ রাজ-ক্ষমা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যবর্ত্তন করিলেন কিন্তু পর বৎসর আবার তাঁহাকে ফিন্‌ল্যাণ্ডে পলায়ন করিতে হইল। ইহার পর তিনি কিছুকাল সুইট্‌জারল্যাণ্ড্ এবং প্যারিসে বাস করেন এবং The Social Democrat এবং The Proletariat নামে দুই খানি কাগজ বাহির করেন। এই সময় হইতে মহাযুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত লেনিন্ নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সর্ব্বসমেত তাঁহার প্রায় বিশখানি গ্রন্থ আছে। কতকগুলির নাম— Development of Capitalism in Russia : Twelve years : The Agrarian Problem : The State and Revolution : What is to be Done : Imperialism as the Last Stage of Capitalism : ইত্যাদি।

যুদ্ধের সময়ে তিনি অষ্ট্রিয়ার শ্রমিকদলকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং এই অপরাধে তাঁহার কারাদণ্ড হয়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ফরাসী সোসিয়ালিষ্ট্ দলের চেষ্টায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি সুইট্‌জারল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শান্তি এবং মানব-ঐক্যের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৯১৭ সালে যখন রুশিয়ার জারতন্ত্রের অবসান হইল লেনিন্ দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু মিত্রশক্তি বিষম আপত্তি করিতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি অবশেষে জারমেনির ভিতর দিয়া একশত অনুচর লইয়া স্বদেশে প্রবেশ করিলেন। জারমেনির ভিতর দিয়া প্রবেশ করার জন্য অনেকে বলেন লেনিন্ জারমেনির চর ছিলেন। এই অভিযোগের কোন প্রমাণ নাই।

লেনিন্ যখন পেট্রোগ্রাড্ সহরে প্রবেশ করি —বিপুল সৈন্যদল এবং জনসঙ্ঘ তাঁহাকে রাজার প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে বরণ করিল। এই সময় হইতে লেনিন্ রুশিয়ার ভাগ্য-বিধাতা হইলেন। ইহাই লেনিনের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মিত্র-শক্তি বরাবর বল্‌শেভিজ্‌ম্ এবং ইহার নেতার কলঙ্ক রটনা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। লোকের চক্ষে লেনিন্‌কে রক্ত-পিপাসু নররাক্ষস বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টাও বড় কম হয় নাই। ইহারা লোককে বুঝাইতে চাহিয়াছে যে লেনিন্ মানব-শত্রু এবং মিত্র-শক্তিই একমাত্র মানব-মিত্র। কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও এই মহা-মানবের অনিষ্ট এই মিত্র-শক্তি করিতে পারে নাই। লেনিনের চরিত্রগুণে এবং প্রতিভাশিখায় সকল কলঙ্ক-কথা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে। লেনিন্ ছিলেন গরীবদের মানুষ, তাহাদের দুঃখ তিনি নিজের অন্তরে নিজের দুঃখের মত অনুভব করিতেন। একজন মানুষ দুঃখী থাকিবে এবং আর-একজন সেই সময়ে সুখী হইবে, মহাপ্রাণ লেনিন্ ইহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না। পৃথিবীর দুঃখের এবং সুখের বোঝার ভার সকল মানুষকে সমানভাবে বহন করিতে হইবে এই ছিল লেনিনের মত।

লেনিন্‌কে দেখিলে সাধারণ মানুষ বলিয়াই মনে হইত—কিন্তু তাঁহার চোখদুটিতে এক অসাধারণ জ্যোতি ছিল। তাঁহার বুদ্ধি ছিল অসামান্য এবং তিনি দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতেন কলের মতো। রুশিয়ার জনগণ লেনিন্‌কে প্রথমে অনেকে জার লেনিন্ বলিত, কিন্তু তাহারা সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিত, জার লেনিন্ আমাদের সকলের সঙ্গে পরেন—জয় জার লেনিনের জয়। রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল লোক লেনিন্‌কে কেন এত ভক্তি করিত, তাঁহার কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারিত কেন? তিনি নররাক্ষস বলিয়া না মানবপ্রেমিক বলিয়া? দেশের স্বার্থই লেনিনের স্বার্থ ছিল—তাঁহার স্বতন্ত্র কোন স্বার্থ ছিল না। পরিশ্রম করিতে করিতে একবার তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া পড়ে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী এবং অন্য কেহই অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য খাদ্য অংশের বেশী খাওয়াইতে পারেন নাই। বেশী বা ভালো খাবার দিলে তিনি বলিতেন, দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে খাবার খায়—আমাকেও তাই খাইতে হইবে, তাহাদিগকে যখন ভালো বা পরিমাণে বেশী খাবার দিতে পারিব, আমিও তখন তাহা খাইতে পারিব, তাহার পূর্ব্বে নয়। সাধারণ কৃষকের বেশই তাঁহার পরিধান ছিল। আমাদের দেশের ত অনেক শ্রমিক নেতা আছেন, তাঁহারা বড় বড় বক্তৃতা করেন—সভাস্থলে শ্রমিক এবং গরীবদের দুঃখে তাহাদের প্রাণ একেবারে বেদনায় গলিয়া যায়, চোখে হয়ত জলও পড়ে, কিন্তু তার পর? সভাস্থলে এইসব নেতা সভাই শ্রমিকবন্ধু, কিন্তু সভার বাইরে বড়লোকী এবং বনিয়াদি নীল-রক্তের চাল পুরামাত্রায় বজায় রাখেন।

তর্ক-যুদ্ধে লেনিন্ বেশী কথা বলিতেন না এবং সকল সময় প্রতিদ্বন্দ্বীর সকল কথার জবাব দিতেন না, কিন্তু তাহাকে এমন কতকগুলি কথা ধীরে ধীরে বলিতেন যে সে পরাজয় স্বীকার না করিয়া পারিত না। বিপদের সময়ও তিনি আত্মহারা হইতেন না। শান্ত-ভাবে কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেন। অশিক্ষিত জনগণকে শাসন করা কতবড় কাজ তাহা সকলেই জানেন। বিদ্রোহের প্রথম জয়োল্লাসে রুশিয়ার এই যুগযুগ ধরিয়া অত্যাচারিত জনগণ যখন প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল তখন তাহাদিগকে লেনিন্ অসাধারণ ক্ষমতাবলে শাসন করিয়াছিলেন। রুশিয়ার নূতন লাল-পল্টন জার্ম্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য উন্মত্ত হইল—লেনিন্ তাহাদের কয়েকজন নেতাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিলেন যুদ্ধে পরাজয় এবং মৃত্যু স্থির নিশ্চয়, তাহা অপেক্ষা এখন জারমেনির সহিত সন্ধি স্থাপন করা ভাল নয়? অনেকের ইহা ভাল লাগে নাই, তাহারা বলিল এখন শান্তি করিলে আমাদের হীন হইতে হইবে। লেনিন্ বলিলেন, এ কথা ঠিক, কিন্তু যুদ্ধ করিয়া পরাজয়ের পর সন্ধি করিতে হইলে হীনতর হইতে হইবে। অনেক আলোচনা এবং তর্কের পর সকলকে লেনিনের কথায় সায় দিতে হইল। মাঝে মাঝে লোক যখন একটা কিছু করিবার জন্য ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিত তখন তিনি তাহাদিগকে সামান্য ঢিল দিতেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কার্য্যের ফলাফল কি হইবে বলিয়া দিতেন। পরে হইতও ঠিক তাই। অনেকবার লেনিনের ভবিষ্যৎবাণী সফল হইতে দেখিয়া শেষের দিকে লোকে আর তাঁহার কথার উপর কথা বলিত না, কারণ তাহারা জানিত যে লেনিন্ কখনও ভুল করিবেন না বা দেশের অনিষ্ট করিবেন না।

রুশীয় বিদ্রোহ সম্বন্ধে লেনিন্ বলিতেন যে, আমরা বিদেশী শত্রু বা অন্য কাহারও দ্বারা পরাজিত হইতে পারি। কিন্তু এই যে আমাদের নূতন চিন্তা এবং কার্য্যের ধারা ইহা আর বিনষ্ট হইবার নয়। পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে ইহাকে হত্যা করিতে পারে। ভবিষ্যতে সমস্ত পৃথিবীতে ইহা প্রকাশ পাইবে এবং সকল দেশের লোকে ইহাকে গ্রহণ করিবে।

লেনিন্ বিশ্বাস করিতেন যে দেশের সকল ব্যবসা বাণিজ্য এবং কল-কারখানা মজুররাই শাসন করিবে, কিন্তু তাহা একদিনে হইবার নয়, তাহার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা চাই। একবার একদল লোক লেনিন্‌কে

এবং শ্রমিকদিগের হাতে উহার পরিচালন-ভার দেওয়া হোক। লেনিন্ বলিলেন "বেশ কথা, তাই হোক্ কিন্তু একটা কথা, তোমরা কারখানার হিসাব রাখ্‌তে জান? তাহারা বলিল, না। তোমরা অমুক কাজ জান? না।—তবে কেমন করে' হবে? তবে তোমরা এক কাজ কর, তাড়াতাড়ি সব শিখে' নাও, যেদিন সব শিখ্‌তে পার্‌বে, সেইদিনই সব তোমাদের হাতে আপনাআপনি আস্‌বে। এইজন্য লেনিন্ প্রথমে দেশের সকল লোককে শিক্ষিত করিবার বিরাট্ আয়োজন করিয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি অনেক বিদেশী কোম্পানিকে রুশিয়ার অনেক কলকারখানা এবং খনিতে কার্য্য পরিচালন করিবার ভার দান করিয়াছিলেন। ইহাতে দেশের অনেকে তাঁহাকে সন্দেহ করিত এবং নানারূপ দোষারোপ করিত, কিন্তু লেনিনের কানে এইসব কথা উঠিলে তিনি তাহাদের ডাকিয়া সকল সন্দেহ দূর করিয়া দিতেন।

লেনিনের প্রাণহত্যা করিবার চেষ্টাও বহুবার হইয়াছে, কিন্তু তবুও তিনি প্রায় প্রত্যেক দিনই খোলা জায়গায় সকলপ্রকার সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন। অনেকবার পিস্তলের গুলি তাঁহার টুপি ভেদ করিয়াও গিয়াছে।

সোভিয়েট সম্বন্ধে লেনিন্ বলেন, আমার ধারণা ছিল ইহা কেবল রুশিয়াতেই আবদ্ধ থাকিবে, কিন্তু এখন ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় ইহা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িবে। রুশিয়ার শ্রমিক জাগরণ জগতে সকল দেশের শ্রমিকদের জাগাইয়া তুলিবে—মহাজন শ্রেণীর অত্যাচার এবং দুঃশাসন বেশী দিন চলিবে না।

লেনিন্‌কে দেখিলে দুঃখী বলিয়া মনে হইত না—এত বিষম বোঝা মাথায় লইয়া সুখে থাকা যে সে লোকের কাজ নয়। তিনি হাসিবার মতো কিছু পাইলেই হাসিতেন এবং দর্‌কারমতো গম্ভীর হইয়া শাসন-কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। লেনিন্ সম্বন্ধে বিশদভাবে বলিতে গেলে একখানা মস্ত পুস্তক হইয়া পড়ে, কাজেই স্থানাভাববশতঃ, এ-সময়ের প্রধান একজন মহামানবের এই সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম।

কতকগুলি ইংরেজ এবং আমেরিকান কাগজ লেনিনের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু কুৎসা রটনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। তাহাদের কাজই ছিল কিসে বল্‌শেভিজম্‌কে পৃথিবীর কাছে হেয় করা যায়—কিন্তু এত করিয়াও তাহাদের চেষ্টা বৃথা হইয়াছে।

New York Times লেনিন্ সম্বন্ধে বলেন "Lenin was one of the most remarkable personalities brought by the world-war into prominence from obscurity......the greatest living statesman in Europe." General Hoffman, ইনি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে Brest-Litovskএর সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন, লেনিন্ সম্বন্ধে বলেন "It was a little upstart named Lenin that defeated Germany. Germany did not play with Bolshevism. Bolshevism played with Germany." London "Times" বলেন—The almost fanatical respect with which he is regarded by the men who are his colleagues...........is due to other qualities than mere intellectual capacity......chief of these are his iron courage, his grim, relentless determination and his complete lack of self-interest......" John Spargo তাঁহার "How Lenin Intrigued with Germany" নামক পুস্তকে বলেন "Coldly cynical, grossly materialistic, utterly unscrupulous, repudiating moral codes and sanctions......Lenin was deliberately conniving at the betrayal of his comrades." Princess Radziwill "The Fire Brand of Bolshevism" পুস্তকে বলেন "Lenin is neither an idealist nor an honest man. He is only an opportunist and an ambitious creature." কলিকাতার "Statesman—*The Friend of India*" কাগজ ও এই দলের। লেনিনের মৃত্যুর সংবাদ দিবার সময় ঐ শ্বেতাঙ্গ কাগজখানা লেখে "End of a notorious career."

লেনিনের বিরুদ্ধদলের সকলেই ধনী অথবা মহাজনশ্রেণীর, শ্রমিকজাগরণে তাহাদের সর্ব্বনাশ, কাজেই তাহাদের দায়ে পড়িয়া বলশেভিজম্-বিরুদ্ধদলভুক্ত হইতে হইয়াছে।

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়



গান

দিন-শেষের রাঙা মুকুল জাগ্‌ল চিতে।
সঙ্গোপনে ফুটবে প্রেমের মঞ্জরীতে।
মন্দবায়ে অন্ধকারে   দুল্‌বে তোমার পথের ধারে,
গন্ধ তাহার লাগ্‌বে তোমার
আগমনীতে—
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের
মঞ্জরীতে।
রাত যেন না বৃথা কাটে প্রিয়তম হে,
এস এস প্রাণে মম গানে মম হে।
এস নিবিড় মিলন-ক্ষণে
রজনীগন্ধার কাননে,
স্বপন হয়ে এস আমার
নিশীথিনীতে
ফুটবে যখন মুকুল প্রেমের
মঞ্জরীতে॥

কথা ও সুর—শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সা ঋা II গা -পা পা -া | পা -জ্ঞা ধপা -পজ্ঞা I জ্ঞগা -মা গা -া | -া -া -া -ঋা I
দি ন শে ০ ষে র্ রা ০ ঙা ০ মু ০ কু ০ ০ ০ ০ ল্

I ঋগা -া গা ঋা | সা -া -া -া I মগা -া গা গা | গঋা -া ঋা -ন্া I সা -া -া -া |
জা গ্‌ ল চি তে ০ ০ ০ স ঙ্‌ গো প নে ০ ফু ট্‌ বে ০ ০ ০

| পা -জ্ঞা পা -া I পা -জ্ঞনা না নধা | জ্ঞধপা -জ্ঞপা সা ঋা II
প্রে ০ মে র্ ম ন্ জ রী তে ০০ "দি ন"

II {জ্ঞপা -া গা গা | গপা -জ্ঞা -ধা -পা I ধা -র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -না I র্রসা -া -া -া |
ম ন্ দ বা য়ে ০ ০ ০ অ ন্ ধ কা রে ০ দু ল্ বে ০ ০ ০

| পা -র্সা র্সা -না I নধা না নর্সা র্সনা | ধপা -া -া -া} I {না -ঋা ঋা গা |

| গা -া গা -ঋা I ঋসা -া -া -(পা | পক্ষা -ধপা -পক্ষা -গা) } I -া । পা ক্ষা পা -া
হা র্ শা স্ যে • • • গো •• • • • তো • মা র

I ক্ষা পা ধা না | ধনা -া -নধা -পা I পা -না না নধা | ধপা -ক্ষা গা -মা I
আ গ ম নী তে • • • ফু টু বে য খ ন্ মু •

I মগা -া -া -া | গা -মা গা -ক্ষা I পা -ক্ষধা না নধা | ক্ষধপা -ক্ষপা সা ঋা
ফু • • ল্ প্রে • মে র্ ম ন্ জ রী তে •• "দি ন"

II {পা -র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -না I নধা -না র্সা -া | র্না -া -া -র্সা I নধা না র্সা র্না |
রা ত্ যে ন না • বু • থা • কা • টে • • • প্রি য় ত ম

| ধপা -া -া -া I ধা -র্রা -র্সা -া | -না -ধা -পা -ক্ষা I গপা পা পা পা | পা -ক্ষা ধপা -া
হে • • • না • • • • • • • • এ স এ স প্রা • ণে •

I -া -া ক্ষা গা | গা -ঋা গা -া I -া -া গঋা ঋা | সা -া -া -া I (ধা -র্রা -র্গা -া |
• • ম ম গা • নে • • • ম ম হে • • • না • • •

| -না -ধা -পা -ক্ষা) } I পা -ক্ষপা গা গা | পা ক্ষা ধা পা I ধা -র্সা র্সা -র্না |
• • • • এ •• স নি বি ড় মি ল ন • ক্ষ •

| র্রর্সা -া -া -া I র্সা র্সা র্সা -া | -া -া -া -না I নধা -না না -া | -া -া -া র্সা
ণে • • • র জ নী • • • • • • গ ন্ ধা • • • • র

I র্ধা -না -র্সা র্না | ধপা -া -া -া I {সা ঋা গা গা | গা -া গা -ঋা I ঋসা -া -া (-পা |
কা • • ন নে • • • স্ব প ন হ য়ে • এ • স • • • •

| পক্ষা -ধপা -পক্ষা -গা) } I -া । পা -ক্ষা পা -া I ক্ষা পা ধা না | ধনা -া -নধা -পা I
গো •• • • • আ • মা র্ নি শী থি নী তে • • •

I পা -না না নধা | ধপা -ক্ষা গা -মা I মগা -া -া -া | গা -মা গা -ক্ষা I
ফু টু বে য খ ন্ মু • ফু • • ল্ প্রে • মে র্

I পা -ক্ষনা না নধা | ক্ষধপা -ক্ষপা সা ঋা II II
ম ন্ জ রী তে •• "দি ন"



"বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের উদ্‌বোধন-পত্র"

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঁকুড়া সারস্বত-সমাজের উদ্বোধন-পত্রে"র লিখিত সামন্ত জাতির বিবরণের প্রতিবাদে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মাইতি মহাশয় এবং উহার উত্তরে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় উভয়েই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলায় যাহাদের উপাধি সামন্ত, তাহারা জাতিতে সামন্ত নয়, উহারা জাতিতে উগ্রক্ষত্রিয়। যাহারা জাতিতে সামন্ত, তাহাদের সকলেরই উপাধি রায়। ছাতনা-পরগণায় ছাতনা শুশুনিয়া গুয়ালডাং আলিঝাড়া পায়রা বীজপুর আদের্য্যা শালডিহা আগয়া মাকা হেত্যাতড়া শুবড়দা শুঁড়িবেদ্যা লড়ি শাভামী বাহিদ্যা ঠীকপুর প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বাস। ইহারা নিজদিগকে ছত্রী বলিয়া পরিচয় দেয়। পঞ্চকোটের রাজবংশ ছাতনার জমিদার-পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সামন্তদের পৈতা নাই। ইহারা হাল চালন করে, গাড়ী চালায়, অনেকে ছুতারের কাজ করে। যখন পুলিসের সৃষ্টি হয় নাই তখন ইহারা ঘাটোয়াল ও দীগরের কাজ করিত। এজন্য জমিদারের নিকট হইতে একাধিক গ্রাম বা মৌজা নিষ্কর পাইয়াছিল। তখন ইহারাই পুলিসের কাজ করিত এবং ঘাটীতে ঘাটীতে পাহারা দিত। কেঞ্জাকুড়া শুশুনিয়া আলিঝাড়া শালডিহা ঘাট ইহাদের তত্ত্বাবধানে ছিল। গভর্ণমেণ্ট এইসকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া জমিদারকে মধ্যস্থ রাখিয়া ইহাদিগকে খাজনার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকের এখন দরিদ্রাবস্থা। এজন্য কেহ কেহ ভদ্রলোকের বাসায় চাকরের কাজ করে। ইহারা তেলি তাম্বুলী প্রভৃতি নবশাখ জাতির গৃহে অন্ন গ্রহণ করে। দ্বাদশ দিনে অশৌচান্ত হয়। মাহিষ্য জাতির সহিত ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। মাহিষ্যজাতির অন্ন খাওয়া ত দূরের কথা ইহারা উহাদের জল পর্য্যন্ত পান করে না।

পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোট উভয় রাজ্যই বিস্তৃত ছিল ও তাহাতে প্রতাপশালী রাজা ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে সামন্ত-ভূম রাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্য কোনো সময়ে মল্লরাজকে, কোনো সময়ে পঞ্চকোট-রাজকে কর দিত। সুবিধা পাইলে স্বাধীনও হইত।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন রায় প্রায় জাতিবাচক হইয়া পড়িয়াছে। ছাতনা খাতড়া মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে খয়রা জাতির বাস, ইহাদেরও উপাধি রায়।

এ জেলার বাগ্‌দীরা মৎস্যজীবী নহে। তাহারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করে, অনেকে কাঠ কাড়ে, মেয়েরা চিড়া কুটে। ইহারা গো-খাদক নহে। হুগলী জেলার বাগ্‌দীরা আপনাদিগকে বর্গক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এজন্য সভা করিয়া তাহারা ব্রাহ্মণেতর জাতির গৃহে অন্নভোজন বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অন্য জাতির গৃহে উচ্ছিষ্ট বাসন মাজা ও অন্যান্য কাজ বন্ধ করিয়াছে। এবিষয়ে তাহাদের মধ্যে বেশ আন্দোলন চলিতেছে। মেট্যারা মৎস্যজীবী।

মেট্যাকলা গ্রামে স্বরূপনারায়ণ ঠাকুর আছেন। ইহার সেবাইতরা আপনাদিগকে আহিরগোয়ালা বলিয়া পরিচয় দেয়। এজন্য ইহাদের কেহ কেহ [illegible] [illegible] বিক্রয় করিতে আসে। [illegible] লোক ইহাদিগকে "আঁকুড্যা ডোম" বলে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও ঠাকুরের পূজা করে। ছাতনার জমিদারের নিকট হইতে ইহারা দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছে। ব্রাহ্মণেরাও এই ঠাকুরের নিকট পূজা দিতে আসে, সেবাইতরা ব্রাহ্মণের পক্ষে পূজা করে। প্রতিবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ঠাকুরের দোলযাত্রা উৎসব হয়। এজন্য এসময়ে গাজন হয়।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, 'যখন শুনিলাম বিলাতি আলুরও সেই দর—তখন বুঝিলাম বাঁকুড়া অজ্ঞানও বটে।' বাংলাদেশে সজ্ঞান কয়জন আছেন?

রায় মহাশয় ঝিঙাকে বন্য গাছ বলিয়াছেন, কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় কোনো বনে ঝিঙা জন্মে না। গৃহের উঠানে উদ্বাস্তু জমিতে জলাশয়ের পাড়ে খামার-বাড়ীতে আবাদী জমিতে অথবা বাগানে ঝিঙার চাষ হয়। চারা গাছগুলি একটু বড় হইলে নিকটে গাছের ডাল গাড়িয়া দিতে হয়। কোন্ দেশের জঙ্গলে ঝিঙা জন্মে, তাহা জানান উচিত।

শ্রী রামানুজ কর

উত্তর

মুদ্রাকরের অত্যাচার অনেকে ভুগিয়াছেন, আমিও অনেকবার ভুগিয়াছি। গতমাসের প্রবাসীতে সামন্ত জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম, "বাঁকুড়ায় যাহারা সামন্ত নামে আখ্যাত তাহারা নিজদিগকে মাহিষ্য বলে না।" মুদ্রাকর "বলে না" স্থলে "বলে" করিয়া অনর্থ ঘটাইয়াছেন। বাক্যের শেষের "না" লোপের বহু উদাহরণ আমার মনে আছে। মুদ্রালয়ের পাঠকও এই লোপ-প্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ইহা কোন্ প্রচ্ছন্ন কামনার বাহ্য প্রকাশ, তাহা মনোবিদের অনুসন্ধেয়।

আমি উদ্‌বোধন পত্রে লিখিয়াছিলাম, "বাঁকুড়ায় এক নূতন জাতি দেখিতেছি। ইহারা সামন্ত ও রায় নামে খ্যাত।...কেহ কেহ বলেন, সামন্তেরা ছত্রী।" শ্রী রামানুজ কর মহাশয় একথা সমর্থন করিয়াছেন। গতমাসের উত্তর একটু সাবধানে পড়িলে মুদ্রাকরের অত্যাচার সত্ত্বেও আমার অভিপ্রায় বুঝিতে গোল হইত না।

সামন্ত ও রায়, দুই-ই উপাধি। পূর্ব্বকালে এই জাতির মধ্যে কেহ সামন্ত বা রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রিয়া হইতে উপাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। "জাতিতে কি? সামন্ত। জাতিতে কি?—রায়।" এই উত্তর পাওয়া যায়। অর্থাৎ সে-কালে যাহা উপাধি ছিল, একালে তাহা জাতির সংজ্ঞা হইয়াছে। ইহার অনুরূপ, বৈদ্য নামে পাই। যিনি আয়ুর্বেদ জানেন, তিনি বৈদ্য। এখন বঙ্গদেশের বৈদ্য এক জাতির নাম হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায়, চৌধুরী প্রভৃতিও উপাধি। কিন্তু কেহ বলেন না, আমি জাতিতে বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি জাতিতে চৌধুরী।

আমি জাতিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে চাই না। কিন্তু প্রায়ই দেখি, বিজ্ঞাপনের লেখাতেও পাই, যেহেতু অমুক রাজার নামের শেষে পাল কিংবা সেন ছিল তিনি অমুক জাতি [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible]

সিদ্ধান্তের প্রধান আপত্তি, তর্কবিদ্যার ভাষায় ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞানের অভাব। এই অভাবের ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। যেহেতু অমুকের উপাধি, সামন্ত; অতএব তিনি মাহিষ্য, তিনি উগ্রক্ষত্রিয়, তিনি ছত্রী; এইরূপ অনুমানের গোড়ায় গলদ। আশ্চর্য এই, সকলের চোখে এই গলদ পড়ে না।

আদিতে গুণ ও কর্ম দেখিয়া চারিবর্ণের বিভাগ হইয়াছিল। পরে শর্মা বর্মা গুপ্ত ও দাস, চারিবর্ণের সংজ্ঞা হইয়াছিল। শর্মা ও বর্মা এখনও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণের অধিকারে আছে, গুপ্ত ও দাস যথাক্রমে কেবল বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের অধিকারে নাই। ওড়িয়্যায় দাস সংজ্ঞা ব্রাহ্মণেরও আছে, যদিও ইদানী কেহ কেহ দা-স পরিবর্তে দা-শ বানান করিতেছেন। এতকাল মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সংজ্ঞা কেবল ব্রাহ্মণের অধিকারে ছিল; ইদানী জাতিতে খ্রিষ্টানের নামেও এই এই সংজ্ঞা পাওয়া যাইতেছে।

আমরা সংজ্ঞা না বলিয়া পদ্ধতি বলি। গ্রাম্যজন বলে, পদ্ধিৎ। সংজ্ঞা না বলিয়া পদ্ধতি বলাই ঠিক পদ্ধতি শব্দের অর্থ, পঙ্‌ক্তি। এক এক জাতির মধ্যে নানা পঙ্‌ক্তি আছে। যেমন ব্রাহ্মণের মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় লাহিড়ী ঘোষাল মৈত্র ইত্যাদি। পদ্ধতি শুনিয়া ব্রাহ্মণ কি না বুঝিতে পারা যায়। অন্য জাতির মধ্যেও দুই-একটা পদ্ধতি সে-সে জাতির সংজ্ঞাস্বরূপ হইয়াছে। যেমন, সেন গুপ্ত, বসু মিত্র। কিন্তু দাস দত্ত দে সেন পাল ঘোষ প্রভৃতি পদ্ধতি একাধিক জাতির মধ্যে আছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা জাতি নির্দেশ করিতে পারা যায় না। চৌধুরী মজুমদার বক্‌সী রায় মল্লিক সামন্ত প্রভৃতি উপাধি দ্বারা আদৌ পারা যায় না। নরহরি দত্ত, এই নাম হইতে বুঝি, দত্ত বংশের নরহরি নামক ব্যক্তি; কিন্তু দত্ত বংশ জন্মে অর্থাৎ জাতিতে কি, তাহা বলিতে পারিব না।

দেখিতেছি, আলুঝিঙ্গার দ্বন্দ্ব এখনও মেটে নাই। কলিকাতায় আলুর সের চারি আনা, আর ঝিঙ্গার সের আট আনা হইলেও আশ্চর্যের বিষয় হইবে না, কারণ, কলিকাতা ধনের দেশ, ভোগীর দেশ। বাঁকুড়া সেরূপ নয়। বাঁকুড়ার ঝিঙ্গা ভাল বটে, কিন্তু আলুর তুলনায় অল্প-সার। এই জ্ঞানের নিমিত্ত কৈমিতিক বিশ্লেষণ আবশ্যক হয় না। স্বাদে কিংবা ঘ্রাণে এত উত্তম নয় যে অল্প বস্তু অধিক মূল্যে কেনা যাইতে পারে। পটোলও অল্প-সার, কিন্তু স্বাদে উত্তম। আয়ুর্বেদ-মতে, পত্রফল-শাকের মধ্যে পটোল শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বেশী দাম দিয়া পটোল কিনিতে ইচ্ছা হইতে পারে। গুণে ঝিঙ্গা অধম, অধিক খাইলে নাকি উদরাময় হয়। কটকে দেখিয়াছি বর্ষাকালে যখন কলেরার প্রকোপ হয়, তখন মুন্‌সিপালিটি ঝিঙ্গা খাইতে নিষেধ করেন। ওড়িষ্যাও বাঁকুড়ার তুল্য দরিদ্র, কিন্তু ঝিঙ্গা কখনও চারি আনা সের বিক্রি হইতে দেখি নাই।

উঠিবার সময় দুই দশ দিন নয়, বর্ষাকালে অন্ততঃ দুই মাসকাল চারি আনা সের কেন থাকে, তাহার একটা কারণ দেখিলাম। সুখাদ্য বলিয়া হউক, যে কারণে হউক লোকে চায়। অপর কারণ, উৎপাদন কম হয়। একদিন এক ঝিঙ্গা-বেপারীকে ধরিয়াছিলাম। সে নিজের চাষের ঝিঙ্গা বাজারে বেচিতে যাইতেছিল। "বাপু, ঝিঙ্গার সের চারি আনা কেন বলিতেছ? চাষে খাটনি বেশী কি?" সে উত্তর করিয়াছিল, "ঝিঙ্গা-চাষে খাটনি কিছুই নাই, বর্ষার আগে গাছ জন্মাইবার সময় যা খাটনি। তার পর আর কিছুই করিতে হয় না।" "ফলে কেমন?" "ঢের। একটা গাছ থাকিলে এক গৃহস্থের চলিয়া যায়।" "খাটনি নাই, ফলে ঢের। বেশী চাষ কর না কেন? দুই আনা সের বেচিলেও অনেক লাভ পাইতে।" "তা বটে, করা হয় না।"

স্বচ্ছন্দ-জাত, প্রায় অযত্ন-সম্ভূত বলিয়া ঝিঙ্গা বন্য বলিয়াছি। কিছু চাষ অবশ্য করিতে হয়। বেড়ার গাছ করিতে গেলেও, মাটি খুঁড়িতে হয়, গ্রীষ্মকালে জল দিতে হয়। চাষ পাইলে ঝিঙ্গা উত্তম ফল-শাক হইতে পারিত। এবিষয় প্রশ্নের বাহ্য হইলেও একটু লিখি।

ঝিঙ্গার নিকট জ্ঞাতি ধুন্দুল। কোথাও বলে পরোল। গাছে, তরুতে চড়ে বলিয়া ঝিঙ্গা ও পরোলকে কোথাও তরুই বলে। পরোলের চাষ আরও সোজা। তরমুজ, খরমুজ, গমক, কাঁকুড়, ফুটী, শসা, লাউ, ছাঁচি কুমড়া, গুড় কুমড়া (বা ডিঙ্গলী), পটোল, চিচিঙ্গা (বা হোঁপা), উচ্ছা, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গা, পরোল,—সব এক বর্গের,—কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের। সকলের গুণ সমান নয়। তথাপি, সকলেই অল্পাধিক রেচক। মাকাল, তিতা পরোল, তিতা লাউ প্রভৃতি গাছও এই বর্গের। এই-সকলের রেচকতা প্রসিদ্ধ। কখন কখনও ঝিঙ্গাও তিতা হয়, বন্য অবস্থায় ঘুরিয়া যায়, বিষাক্ত হয়। অর্থাৎ ঝিঙ্গা এখনও পোষ মানে নাই। পাকিলে ঝিঙ্গা কাঠ হইয়া দাঁড়ায়, ফলের মুখে রন্ধ্র হয়, সে পথে বীজ বাহির হয়। সে সময় ইহার অংশুজাল সকলের প্রত্যক্ষ হয়। অংশু দুষ্পচ। কচি অবস্থায় কোমল থাকে, একটু বাড়িলে কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু বাজারে যে ঝিঙ্গা বিক্রি হয়, সে-সব কচি নয়। কচি বেচিতে গেলে ওজনে বাড়ে না। যত্নপূর্বক চাষ করিলে ঝিঙ্গার দোষ কমাইয়া গুণ বাড়াইতে পারা যাইবে। তখন চারি আনা সের কিনিতে কাহারও আপত্তি হইবে না!

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়

"মন্ত্রীদের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ"

ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় উপরি-উক্ত মন্তব্যটির একস্থলে লিখিয়াছেন, মান্দ্রাজের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভাদ্বয়ে ঐ-প্রকার প্রস্তাব (অর্থাৎ মন্ত্রীদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিবার প্রস্তাব) উপস্থিত করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের পরাজয় হইয়াছিল।" ইহাতে, অসাবধানতাবশতঃ একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের ও মধ্যপ্রদেশের ব্যবস্থাপক-সভাদ্বয়ে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু দুইস্থানেই গবর্ণমেণ্টের পরাজয় হয় নাই। মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক-সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। ভোট লওয়া হইলে দেখা যায় যে প্রস্তাবটির সপক্ষে ৪৩টি ভোট ও বিপক্ষে ৬৫টি ভোট দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী অমিয়কান্ত দত্ত

দনুজমর্দ্দনের ব্যক্তিত্বনির্ণয়

ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ, মহাশয় রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে আমার মতামত আলোচনা করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন। আমার নবপ্রকাশিত Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal নামক পুস্তকে আমি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে দনুজমর্দ্দন রাজা গণেশেরই অপর নাম, বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানবংশকে সরাইয়া তিনি দনুজমর্দ্দন নাম ধারণ করিয়া বাংলার সিংহাসনে উপবেশন করেন এবং ঐ নামে মুদ্রা প্রচারিত করেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নত্ব-প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রাখাল বাবুর মত প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক যদি আমার এই সিদ্ধান্ত বিগতসন্দেহ হইয়া গ্রহণ না করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে আমার বক্তব্য আমি ভাল করিয়া বলিতে পারি নাই। কারণ রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দন যে অভিন্নব্যক্তি এই সত্য আমার কাছে এখন এতই স্পষ্ট যে, এই বিষয়ে যে দ্বিধাও উঠিতে পারে তাহা মনেও করি নাই। আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে নিম্নে বলিতেছি।

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি মুদ্রার প্রমাণে অবিসংবাদিতরূপে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে।

৭৯২—৭৯৫ হিজরির মধ্যে কোন সময়ে সুলতান সেকন্দর সাহের মৃত্যু ও গিয়াসুদ্দিন আজাম সাহেবের সিংহাসনারোহণ।

৮১৩ হিজরিতে গিয়াসুদ্দিন আজাম সাহের তিরোভাব এবং সৈফুদ্দিন হামজা সাহের আবির্ভাব।

৮১৫ হিজরিতে সৈফুদ্দিনের তিরোভাব এবং শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ সাহের আবির্ভাব।

৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিনের তিরোভাব এবং আলাউদ্দিন ফিরোজ-সাহের আবির্ভাব।

এস্থলে মনে রাখা দরকার যে আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহের নাম (অর্থাৎ তিনি যে বাঙ্গালা দেশে কোন দিন রাজত্ব করিয়াছেন এই কথা) এ যাবৎ জানা ছিল না। আমিই প্রথম এই রাজার মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছি। বিশেষ স্মরণীয় এই যে তাঁহার মাত্র পাঁচটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উহাদের তিনটি সাতগাঁয়ে মুদ্রিত, একটি মুয়াজ্জমাবাদ নামক টাঁকশালে মুদ্রিত এবং আর-একটির টাঁকশাল বা তারিখ পড়া যায় না।

পরবর্ত্তী রাজা জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ যে রাজা গণেশের পুত্র যদুরই মুসলমান নাম এ-বিষয়ে এপর্য্যন্ত কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। জালালুদ্দিনের ৮১৮ হিজরায় মুদ্রিত বহুতর মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আমার পুস্তকে জালালুদ্দিনের ১২২টি মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছি। কলিকাতা চিত্রশালার মুদ্রা তালিকার দ্বিতীয় ভাগে জালালুদ্দিনের ১৯টি মুদ্রা বর্ণিত আছে। বিশেষ স্মরণীয় এই যে এই ১২২+১৯=১৪১টি মুদ্রার মধ্যে মাত্র একটি মুদ্রার তারিখ ৮১৯ হি। কলিকাতা চিত্রশালায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হাফিজ নাজির আহম্মদ মহাশয়দ্বয়ের কৃপায় সম্প্রতি এই মুদ্রাটির একটি প্লাষ্টারের ছাপ আমার হস্তগত হইয়াছে। তারিখটি খুব স্পষ্ট নহে, তবে ৮১৯ হিঃ বলিয়াই অবধারিত হইতে পারে। অধিকাংশেরই সনাঙ্ক ৮১৮ এবং ৮২৩ হিজরি। ৮২০ হিজরির মুদ্রা একটিও নাই।

আমি দনুজমর্দ্দনের ১০টি মুদ্রার বর্ণনা আমার পুস্তকে দিয়াছি। মহেন্দ্র দেবের একটি মাত্র মুদ্রার বর্ণনা দিয়াছি, রাখেশ বাবু আর একটির দিয়াছিলেন। এইখানে উল্লেখ করিতে পারি যে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের নিকট দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের আরও ৩টি পনের মুদ্রা আছে। আমি তাহাদের সবগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। এইসমস্ত পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে দনুজমর্দ্দনের ১৩৩৯ শকাব্দার মুদ্রাই সংখ্যা'য় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ঐ বৎসরই তিনি পাণ্ডুনগর (পাণ্ডুয়া, মালদহ) সুবর্ণগ্রাম এবং চট্টগ্রাম হইতে মুদ্রা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালার একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। দনুজমর্দ্দনের দুই একটি মুদ্রায় ১৩৪০ শকাব্দও পাওয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র দেবের যত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে উহাদের সমস্ত-গুলিই ১৩৪০ শকাব্দের।+ গণনার সুবিধার জন্য এই ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ শকাব্দ দুইটিকে হিজরায় পরিণত করা আবশ্যক। কিন্তু এই কাজটি সহজ নহে। নানা সমস্যা মীমাংসা করিয়া তবে এই সমীকরণ সম্পন্ন হইতে পারে। প্রথম সমস্যা, শকাব্দ সৌর এবং চান্দ্র-সৌর উভয়রূপেই গণিত হয়। বাঙ্গলাদেশে ব্যবহৃত শকাব্দ সৌর না চান্দ্র-সৌর? বলা বাহুল্য যে এই বিভিন্নরূপ গণণায় বৎসরের আরম্ভ দিনও ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। বাঙ্গালায় বর্ত্তমানে শকাব্দ সৌর বৎসর বলিয়া গণিত। দনুজমর্দ্দনের সময় ঐরূপই গণিত হইত বলিয়া ধরিয়া লইতে হইতেছে।

দ্বিতীয় সমস্যা—শকাব্দ সাধারণতঃ অতীতাব্দরূপে গণিত হইয়া থাকে। দনুজমর্দ্দনের মুদ্রায় ব্যবহৃত শকাব্দ কি অতীতাব্দ না বর্ত্তমানাব্দ? একজন মানুষের বয়স ৩৫ বৎসর ৫ মাস ৭ দিনও বলা যায় বা ৩৬ বৎসর চলিতেছে ইহাও বলা যায়। এই ফাল্গুন মাস নির্দ্দেশ করিতে ১৩৩০ সালের ফাল্গুন বলা যায়। অথবা অতীত বঙ্গাব্দ ১৩২৯ মাস ৯ দিন ১০ ও বলা যায়। জ্যোতিষীগণ সর্ব্বদা

\+ মালদহে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার সনাঙ্ক ১৩০৯ বলিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভুল ধারণা আছে। আমি প্রবাসীতে দনুজ-মর্দ্দন সম্বন্ধে ১৩২৫ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহাতে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে রাখাল বাবু রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৭ সনের ২য় সখ্যায় দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের মুদ্রা দুইটির যে ছবি ছাপিয়াছিলেন তাহাতে দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার উল্টা পিঠ ও মহেন্দ্রের মুদ্রার সোজা পিঠ ১ম চিত্রে এবং দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার সোজা পিঠ ও মহেন্দ্রের মুদ্রার উল্টা পিঠ ২য় চিত্রে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মুদ্রা দুইটি শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা লইয়া আসিয়াছিলেন, তখন আমি স্বচক্ষে ঐ দুইটি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম এবং পরীক্ষা করিয়া নোট রাখিয়াছিলাম। দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার উল্টা পিঠের সনাঙ্কে দশক ও শতকে ৩ এবং ৯ পরিষ্কার ছিল। রাখাল-বাবু ইহাকেই মহেন্দ্রের মুদ্রার উল্টা পিঠ ভাবিয়া তদনুসারে ১৯১১—১২ খৃষ্টাব্দের প্রত্নবিভাগের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে চিত্র আঁকাইয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের মুদ্রার উল্টা পিঠে সহস্র ও শতকের অঙ্ক যথাক্রমে ১ এবং ৩ ছিল। দশকের অঙ্ক অস্পষ্ট এবং এককের অঙ্ক মোটেই ছিল না। মহেন্দ্রদেবের অদ্যাবধি আবিষ্কৃত স্পষ্ট সনাঙ্কযুক্ত সমস্ত মুদ্রাই ১৩৪০ শকাব্দের সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

দ—১ দ—২ দ—৩



দ—৪ দ—৫ ম—১

১ম চিত্র—দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের মুদ্রার সোজা পিঠ

দ্বিতীয়প্রকারেই কাল নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। জ্যোতিষীগণই শকাব্দের প্রধান ব্যবহার কর্ত্তা।

এই সমস্যার মীমাংসা এইভাবেই করিতে হইবে যে যখন কোন মাসের কোন দিন নির্দ্দেশ করা আবশ্যক তখন জ্যোতিষীগণের অতীতাব্দ ব্যবহারই বেশী সুবিধাজনক। কিন্তু যখন গোটা বৎসরই নির্দ্দেশ করিতে হইবে,—যেমন দনুজমর্দ্দনের মুদ্রায় হইয়াছে—তখন বর্ত্তমানাব্দ ব্যবহারই স্বাভাবিক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে ১৩৩৯ শকাব্দ ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার আরম্ভ হইয়া ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ্চ শুক্রবার শেষ হইয়াছে। প্রচলিত তালিকার বহিগুলি খুলিয়া মিলাইলেই দেখা যাইবে যে এই নির্দ্দেশ ঠিক নহে। Cunninghamএর Book of Indian Eras-এর ১৮০ পৃষ্ঠা দেখুন। তথায় দেখিবেন—১৩৩৯ সৌর শকাব্দ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ আরম্ভ হইয়াছে এবং ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ্চ শেষ হইয়াছে। সকলেই জানেন শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ দিলেই খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এই সোজা হিসাবেও ১৩৩৯+৭৮=১৪১৭ খৃঃ ১৩৩৯ শকাব্দের সমান হয়। কিন্তু Cunningham এবং স্বামী কান্নুপিলাই ইত্যাদি সকলেই শকাব্দকে অতীতাব্দ ধরিয়া হিসাব করিয়াছেন। কাজেই তাঁহাদের অতীতাব্দ ১৩৩৮ই আমাদের ১৩৩৯এর সমান। এই হিসাবে রাখাল-বাবুর নির্দ্দেশ ঠিকই হইয়াছে—তবে বৎসরটি ২৬শে মার্চ্চ শেষ হয় নাই, হইয়াছে ২৫শে মার্চ্চ।

কাজেই দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার ব্যবহৃত শকাব্দ সম্বন্ধে দুইটি তথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া সমীকরণে অগ্রসর হইতে হইবে। ১ম, উহা সৌরমান। ২য়, উহা বর্ত্তমানাব্দ।

৮১৯ হিজরা ১৪১৬ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই হিজরা ও শকাব্দের আপেক্ষিক সম্বন্ধ নিম্নলিখিত চিত্রে সুস্পষ্ট হইবে।

২৬শে মার্চ্চ ১৩৩৯ শকাব্দের আরম্ভ

1416 A. D. 1st. Jan.——————————Dec. 31.

১লা মার্চ্চ, ৮১৯ হিজরার আরম্ভ

কাজেই মোটামুটি দেখা যাইতেছে যে—

১৩৩৯ শক=৮১৯ হিঃ+৮২০ হিজরার মাসেক।

১৩৪০ শক=৮২০ হিঃ+৮২১ হিজরার মাসেক।

ইহা হইতে সূক্ষ্মতর গণনায় এখানে আর প্রয়োজন নাই।

এখন ইতিহাসে এই সময়কার ঘটনাবলী যেভাবে বিবৃত আছে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। এই সময়ের ইতিহাসের জন্য আমাদের প্রধান অবলম্বন রিয়াজ-উস্-সালাতিন। বাঙ্গালার ইতিহাস লইয়া যাঁহারা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারাই জানেন যে রিয়াজ আধুনিক গ্রন্থ, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত। উহার ঘটনার বিবরণ এবং পারম্পর্য্য মোটামুটি ঠিক হইলেও উহার সব তারিখগুলি ভুলে ভরা। রাজাদের রাজত্বের কালগুলিও রিয়াজ ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করিতে পারে নাই। যথা, রিয়াজ লিখিয়াছে সেকন্দর সাহের রাজত্ব মোটে নয় বৎসর কয়েক মাস; কিন্তু মুদ্রা ও শিলালিপির প্রমাণে দেখা যায় তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন ৩৭ বৎসর! সকলেই জানেন, মোটামুটি ঘটনার স্মৃতি জনসমাজে থাকিয়া যায়, কিন্তু সব তারিখে গোলমাল হইয়া পড়ে। তাই রিয়াজের ঘটনাবলীর বিবরণ অন্যথা নিরাকৃত না হইলে গ্রাহ্য, কিন্তু সব তারিখ ঠিক করিতে মুদ্রার বা শিলালিপির সাহায্য দরকার।

রিয়াজ এই সময়ের নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে—

শামসুদ্দিন (প্রকৃত নাম রিয়াজের মতে সিহাবুদ্দিন। মুদ্রার সিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহের সহিত অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়) যখন রাজত্ব করিতেছেন তখন ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং শামসুদ্দিনকে মারিয়া বাঙ্গালা দেশে রাজা হন। তিনি রাজা হইয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন এবং বিখ্যাত ফকীর নুর কুতব আলম গণেশের অত্যাচার দমনের জন্য জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহকে আহ্বান করেন। ইব্রাহিম শাহ বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজা গণেশ এইবার ভয় পাইলেন এবং নুর কুতব আলমের শরণাপন্ন হইলেন। নুর কুতব বলিলেন যে গণেশ যদি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন না করেন তবে তিনি গণেশের জন্য কিছুই করিতে পারেন না। গণেশ মুসলমান হইতে স্বীকৃত হইলেন কিন্তু রাণী বাধা দিলেন। গণেশ তখন তাঁহার পুত্র যদুকে নুর কুতবের নিকট লইয়া আসিলেন। যদুকে মুসলমান করা হইল এবং গণেশ সিংহাসন ছাড়িয়া দিলেন, যদু জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। নুর কুতব আলমের অনুরোধে ইব্রাহিম শাহ ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু চটিয়া নুর কুতবের কিঞ্চিৎ অপমান করিলেন এবং নুর কুতবের শাপে শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

" সুলতান ইব্রাহিমের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া গণেশ জালালুদ্দিনকে সিংহাসন হইতে সরাইয়া নিজে রাজা হইয়া বসিলেন এবং সুবর্ণ-ধেনু ব্রত করাইয়া যদুকে পুনরায় হিন্দু করিয়া লইলেন। তিনি আবার মুসলমানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন এবং নুর কুতব আলমের পুত্র শেখ আনোয়ারকে এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র জাহিদকে সোনারগাঁতে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাহাদের পিতৃপিতামহের গুপ্তধন বাহির করিয়া দিবার জন্য তাহাদের উপর নির্য্যাতন চলিতে লাগিল। [illegible]

পড়িলেন। তিনি মোট সাতবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। যদু রাজা হইয়া অনেককে মুসলমান করিলেন এবং জাহিদকে সোনারগাঁ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। তারিখ-ই-ফেরিস্তার মতে যদু (জিতমল) হিন্দুরূপেই পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন, পরে মুসলমান হইয়া তাহার পূর্ব্ব নাম (জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ) গ্রহণ করেন।

এই স্থলে ঐসময়কার ঐতিহাসিক বিবরণ। এইখানে নিম্নলিখিত বিষয়-কয়টি প্রণিধান করা দরকার।

১। ৮১৭ হিঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মুসলমান সুলতানদের ধারা অব্যাহত চলিয়া আসিয়াছে, মুদ্রার প্রমাণে এই অবধারণ অকাট্য। কাজেই গণেশের রাজত্ব ৮১৭ হিঃ-র আগে হইতে পারে না, পরে হইবে। ৮২১ হিঃ হইতে আবার জালালুদ্দিনের মুদ্রার ধারা অব্যাহত চলিল, কাজেই গণেশকে ইহার পূর্ব্বে ফেলিতে হইবে।

২। সুলতান ইব্রাহিম ৮৪৫ হিঃ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে সাহসী হইয়া গণেশ আবার রাজত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, রিয়াজের এই উক্তি মিথ্যা। নূর কুতব আলমের পুত্র সেখ আনোয়ার ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র জাহিদের উপর যেভাবে রাজা গণেশ নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বতঃই সন্দেহ হয় যে নূর কুতব আলম বোধ হয় তখন বাঁচিয়া নাই। নূর কুতব আলমের মৃত্যুর তারিখ লইয়া যথেষ্ট গোলমাল ছিল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বেভারিজ্ সাহেব নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে নূর কুতব আলমের মৃত্যুর তারিখ ৮১৮ হিজরির ৭ই জুলকদ্। নূর কুতব আলমের মৃত্যুর পরেই যে তাহার পুত্র-পৌত্রের উপর নির্য্যাতন সম্ভব হইয়াছিল, এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

৩। রাজা গণেশ বাঙ্গালা দেশের অবিসংবাদিত রাজা হইলেও এই পর্য্যন্ত গণেশের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার প্রতিবেশী কুচবিহার এবং ত্রিপুরার হিন্দু রাজারা ঝুড়ি ঝুড়ি মুদ্রা ছাপিয়া প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু সমকালেই বাঙ্গালার অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রাজা গণেশ বাঙ্গালা গ্রন্থ 'অদ্বৈতপ্রকাশে' সংস্কৃত গ্রন্থ 'বাল্যলীলাসূত্রে' পারসী ইতিহাস তারিখ-ই-ফেরিস্তা, আইন-ই-আক্‌বরী তবকত-ই-আক্‌বরী রিয়াজ-উস-সালাতিন ইত্যাদিতে উল্লিখিত রাজা গণেশ হিন্দু বলিয়া নিজ নামে মুদ্রা ছাপিতে ভরসা করেন নাই, অথচ একটা অজ্ঞাতকুলশীল হিন্দু দনুজমর্দ্দন সহসা যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়া ঠিক রাজা গণেশের সমকালেই বাঙ্গালা দেশটাকে বালকের হস্তের মোদকের মতো কাড়িয়া লইয়া চাটগাঁ, সোনারগাঁ, পাণ্ডুয়া হইতে টাকা ছাপিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন, পরবর্ত্তী মহেন্দ্রের হাতেও নির্ব্বিরোধে সে রাজ্য দিয়া যাইতে পারিলেন ইহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যদি বিশ্বাস করিয়া খুসী হইতে চাহেন ত হউন।

এখন একবার ইতিহাসের বিবরণ এবং মুদ্রার সাক্ষ্য পাশাপাশি সাজান যাউক।

দ—১ পাণ্ডুনগর—১৩৩৯ দ—২ পাণ্ডুনগর—১৩৩৯ দ—৩ পাণ্ডুনগর—১৩৩৯



দ—৪ সুবর্ণগ্রাম—১৩৩৯ দ—৫ চাটিগ্রাম—১৩৩৯ ম—১ পাণ্ডুনগর—১৩৪০

২য় চিত্র—দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রের মুদ্রার উল্টা পিঠ

মুদ্রার সাক্ষ্য।	ইতিহাসের বিবরণ।
৭৯৫ হিঃ হইতে—৮১৩ হিঃ—গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহ। ৮১৩ হিঃ—৮১৫ হিঃ সৈফুদ্দিন হামজা শাহ। ৮১৫ হিঃ—৮১৭ হিঃ শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ্ শাহ। ৮১৭ হিঃ—সাতগাঁয়ে ও মুয়াজ্জমাবাদে (সোনারগাঁয়ে) শিহাবুদ্দিনের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ।	শামসুদ্দিন (শিহাবুদ্দিন) মরিলে রাজা গণেশ রাজা হইলেন ইব্রাহিম শাহের বাঙ্গালা আক্রমণ।
৮১৮ হিঃ—জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহের বহুতর মুদ্রা, অধিকাংশই ফিরোজাবাদের (পাণ্ডুয়া, মালদহ), কয়েকটি সোনারগাঁর।	যদুর মুসলমান হওয়া এবং জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনারোহণ।
৮১৯ হিঃ—জালালুদ্দিনের (অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ১৪১ বা ততোধিক মুদ্রার মধ্যে) একটি মাত্র মুদ্রা।	৮১৮ হিঃ, ৭ই জুলকদ্—নূর কুতব আলমের মৃত্যু।
৮১৯ হিঃ—৮২০ হিঃ (১৩৩৯ শকাব্দ) দনুজমর্দ্দনের অনেকগুলি মুদ্রা। ৮২০—৮২১ হিঃ (১৩৪০ শকাব্দ) দনুজমর্দ্দনের কয়েকটি এবং মহেন্দ্রের কয়েকটি মুদ্রা।	নূর কুতব আলমের মৃত্যুর পরে রাজা গণেশের পুনরায় সিংহাসনারোহণ এবং যদুকে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়ন।
৮২১—হিঃ জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহের মুদ্রার পুনরাবির্ভাব এবং ৮৩৫ হিঃ পর্য্যন্ত অব্যাহতগতি।	গণেশের মৃত্যু ও যদুর হিন্দুরূপে সিংহাসনারোহণ কিন্তু শীঘ্রই মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে মুদ্রার প্রমাণে গণেশের বাঙ্গালার ইতিহাসে ৮১৭ হিজরার আগে এবং ৮২১ হিজরার পরে স্থান নাই, এই দুই অব্দের মধ্যে তাহার স্থান। নূর কুত্‌ব আলমের মৃত্যুর তারিখ ৮১৮ হিঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়া আরও সুবিধা হইল। এই ৮১৮ হিজরার এধারে ও ওধারে গণেশের কার্য্যাবলী ফেলিতে হইবে। উপরে যে মুদ্রার সাক্ষ্য এবং ইতিহাসের বিবরণ পাশাপাশি দেখাইলাম তাহাতে রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের অভিন্নত্বে সন্দেহের অবসর অল্প বলিয়াই ত আমার স্থূলবুদ্ধিতে প্রতীয়মান হইতেছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে গণেশের রাজত্বের সময় যে বৎসর কয়টিতে নির্দ্ধারিত হয়, দনুজমর্দ্দনের নামে ঠিক সেই সময়টুকুতেই মুদ্রা প্রচারিত দেখিতে পাই। দনুজমর্দ্দন যে সর্ব্ববঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন তাহা তাঁহার চাটগাঁ এবং সোনার গাঁ এবং পাণ্ডুয়া হইতে একই বৎসরে মুদ্রার প্রচার দেখিয়া বুঝা যায়। ঐ নামধারী চন্দ্রদ্বীপের ক্ষুদ্র জমিদারের সহিত এই সর্ব্ব-বঙ্গাধিপতির কোনই সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি না।

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। দনুজমর্দ্দন ও গণেশের অভিন্নত্ব আগে ধরা পড়ে নাই কেন?

১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসীতে আমি দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তখনও গণেশের সহিত তাঁহার অভিন্নত্ব ধরিতে পারি নাই। ইহার প্রধান কারণ, বাঙ্গালার সুলতানদের রাজত্বকাল, রাজ্যারম্ভ ও রাজ্যাবসানের তারিখ এতদিন গোল পাকাইয়া ছিল। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গোল ছাড়াইতে কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রা-তালিকায় বাঙ্গালার সুলতানদের মুদ্রার বর্ণনা যিনি করিয়াছেন তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য ভাল করিয়া করেন নাই। পূর্ব্বে ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস ছিল যে গিয়াসুদ্দিন আজাম শাহ ৭৯৯ হিজরাতে মরিয়া গিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের তালিকায় বাঙ্গালার সুলতানদের মুদ্রার বর্ণনাকারী মহাশয় চক্ষু বুজিয়া সেই মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। আমার পুস্তক রচনা করিবার সময় আমি আজাম সাহের ৭৯৯ হিজরা হইতে ৮১৩ হিজরার অনেক মুদ্রা পাই। তখন আমার সন্দেহ হয় যে ঐরূপ মুদ্রা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মেও থাকা সম্ভব। স্বয়ং গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সত্যই অনেক আছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মুদ্রা-তালিকায় সাহেব সম্পাদক উহাদের সবগুলি ভুল পড়িয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিবার সময় এই মুদ্রাগুলি একবার পড়িয়া দেখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই, যদিও তিনিই তখন ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন এবং হাত বাড়াইলেই তিনি মুদ্রাগুলি উল্টাইয়া দেখিতে পারিতেন। ফলে তিনি সাহেবের ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং আজাম শাহ ৭৯৯ হিজরাতেই মরিয়া রহিয়াছে। এখন তাহার রাজ্যকাল ৮১৩ হিঃ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অর্থাৎ ১৪ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। এখন তাই গণেশকে তাঁহার ঠিক স্থানে বসান সম্ভবপর হইয়াছে, আগে তাঁহার রাজ্যকাল বহু বৎসর পিছনে নির্দ্ধারিত ছিল। এই ভুল নির্দ্ধারণের জন্যই বেভারিজ সাহেব যে নূর কুতব আলমের মৃত্যুর সন তারিখ ৮১৮ হিজরার ৭ই জুলকদ্‌ বলিয়া সঠিক নির্দ্ধারিত করিলেন, তাহার মূল্য পূর্ব্বে উপলব্ধ হয় নাই।

২। রাজা গণেশের জাতি।

"রাজা গণেশ যখন হিন্দু ছিলেন তখন তাঁহার নিশ্চয় একটা জাতি ছিল।" ঠিক কথা। তিনি কোন্ জাতি ছিলেন সম্ভব হইলে ঐতিহাসিকের তাহা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা উচিত। তিনি যে জাতি বলিয়াই সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ হউন না কেন, প্রকৃত ইতিহাসভক্তের তাহাতে কিছুই আসে যায় না। প্রকৃত ইতিহাসভক্ত দেশের ইতিহাসকে অপরিসীম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে, স্ববর্ণ অথবা স্বশ্রেণীর তথাকথিত উন্নয়নের জন্য তাহাতে কৃত্রিমতা প্রবেশ করান সকল পাপের উপরে পাপ মনে করে। এই ক্ষুদ্র লেখক ঐসকল মহাপ্রাণ ইতিহাসভক্তগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছে। গালি দিলে গালি যে দেয় তাহার মুখ বন্ধ করা কঠিন। গালি যে খায় সে সবিনয়ে এইমাত্র বলিতে পারে যে তাহার উপর অন্যায় করা হইতেছে, বৃথা তাহাকে গালি দেওয়া হইতেছে। খোঁচা দেওয়ার বিদ্যা বড় বিদ্যা নহে। বিতর্কে বিশেষতঃ সত্যনির্ণয়ের জন্য বিতর্কে প্রতিপক্ষের মন উষ্ণ হইতে পারে এমন কোন বাক্য ব্যবহার করা উচিত নহে। উকীলে উকীলে অথবা কবির দলে অবশ্য এই নিয়ম লঙ্ঘন করাই রীতি।

রাজা গণেশ ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন, এই কথা রিয়াজ-প্রণেতা গোলাম হোসেন আলি, রাখাল-বাবু, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বা ৺ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল জন্মিবার বহু পূর্ব্বে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভাতুড়িয়ার জমিদার ছিলেন কাহারা? ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল বলেন—ভাদুড়ীরা। তাহাদেরই নাম অনুসারে পরগণার নাম হইয়াছে ভাদুরিয়া বা ভাতুরিয়া। তাঁহারা নামমাত্র এক টাকা রাজস্ব দিতেন বলিয়া তাহাদের জমিদারীর নাম একটাকিয়া ভাদুড়িয়া। দুর্গাচন্দ্র বাবু ভাদুড়িয়ার জমিদারদের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাখাল-বাবু বলেন—"বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যেসমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ সত্য হইলেও হইতে পারে কারণ সাঁতোড়, একটাকিয়া নামগুলি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক।" (বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ—১৮৬ পৃষ্ঠা) আমি রাখাল-বাবুরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছি—"The anecdotes of the Bhaturiah Zamindars, as recorded by Mr. Sanyal, are extremely interesting and though they are likely to contain exaggerations and fables, being mainly based on traditions and social chronicles or Kulapanjikas, they are sure to possess a background of truth and as such deserve a thorough investigation." রাখাল-বাবু লিখিলেন—"কিয়দংশ সত্য হইলেও হইতে পারে,"—আমি লিখিলাম—"Sure to possess a background of truth." এই দুইটা কথার বড় বেশী বিভিন্নতা নাই; তবু যদি শ্রেণী তুলিয়া গাল দিয়া ("বারেন্দ্র উপদ্রব") তৃপ্ত হইতে চাহেন, হউন। দুর্গাচন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত বিবরণ সমস্তটাই সত্য, ইহা পাগলেও বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এই সুদীর্ঘ বিবরণ তিনি আগাগোড়া কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন এতটা কল্পনা-কুশলতার গৌরব আমি বেচারা দুর্গাচন্দ্রকে দিতে রাজি নই। আর কুলগ্রন্থের প্রমাণের উপর চিরদিনই আমার সসন্দেহ দৃষ্টি থাকিলেও রাখাল-বাবুর মত কুলগ্রন্থফোবিয়া বা জনপ্রবাদফোবিয়া আমার নাই, ইহাও সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি। জনপ্রবাদগর্ভে সময় সময় ইতিহাস কিরূপ তাজা থাকে ওসমানের ইতিহাস উদ্ধারে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন। (প্রবাসী ওসমান বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ)। সাঁতোড় ও ভাদুড়িয়ার জমিদারী নাটোররাজ রামজীবন



দনুজমর্দ্দন—পাণ্ডুনগর—১৩৪০ শক

কিরূপে গ্রাস করিয়া নিজের বিস্তৃত জমিদারী গঠন করেন তাহার সমসাময়িক দলিলের প্রমাণ কালীপ্রসন্ন বাবুর "নবাবী আমলে" আংশিকভাবে আছে। গ্রাণ্ট সাহেবের ১৭৮৬—৮৮ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত বাঙ্গালার রাজস্ববিচারে বহুবার ভাতুরিয়া ও সাঁতোড়ের নাম আছে। আমার পুস্তক যখন বাহির হয় তখন দুর্গাচন্দ্র বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না, পরে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়ের মধ্যস্থতায় তাঁহার সহিত পরিচিত হই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আমার নিকট অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং ভাদুড়ীদের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ বাদ্শাহী দলিলের খবর তিনি আমাকে জানাইয়া গিয়াছেন। যথাসময়ে এই বিষয়ে আমার অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হইবে। এইখানে কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে ভাতুরিয়া পরগণা স্বপ্নও নহে, মায়াও নহে, উহা এখনও পাবনা জেলার একটা বিখ্যাত পরগণা, ভাদুড়ীদের এক বংশধর চৌগাঁর রাজা এখনও সেখানে বেশ নামজাদা জমিদার। হরিপুরের চৌধুরী মহাশয়েরা ভাতুরিয়া ও সাঁতোড়ের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। অনুসন্ধানের যথেষ্ট ক্ষেত্র ও প্রয়োজন রহিয়াছে।

৺দুর্গাচন্দ্র সান্যালের সামাজিক ইতিহাসের সিদ্ধান্ত আমার পুস্তকে কোথাও আমি "গ্রহণ" করি নাই। ইতিহাসে যে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান ছিল না, তাহা প্রমাণ করা এতই সহজ যে তাহার জন্য রাখাল বাবুর অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তিনি ভাতুরিয়া ও সাঁতোড়ের জমিদারদের যে কাহিনী সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন তাহা উপেক্ষার যোগ্য মনে হয় নাই। উহার 'ছাই' উপেক্ষা করিয়া উহাতে কোন 'রত্ন' আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যোগ্য মনে করিয়াছি, এখনও করি।

৩। "যদি ভট্টশালী মহাশয়ের মৃত......প্রবিষ্ট করা যায় না।" (প্রবাসী ফাল্গুন—৬৫৭ পৃঃ—২য় কলম।)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রিয়াজের ইতিহাসাংশ মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু রাজাদের রাজ্যকাল বা সন তারিখ নির্ভরযোগ্য নহে। গণেশ সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, রিয়াজের এই উক্তি সত্য, ইহা রাখাল বাবু ধরিয়া লইতেছেন কেন? গণেশ বাঙ্গালারাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ত সাত বৎসরই ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজ্য করিয়াছিলেন ৮১৮ হিঃতে নূর কুতবের মৃত্যুর পরে এবং ৮২১ হিঃতে জালালুদ্দিনের মুদ্রার অব্যাহত প্রবাহ আরম্ভের পূর্ব্বে।

৪। "দনুজমর্দ্দন কে ছিলেন সে সম্বন্ধে ভট্টশালী মহাশয় নূতন প্রমাণ কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই"—ইত্যাদি ঐ পৃষ্ঠা, ঐ কলম।

এই সুলতানী আমল সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য এই ক্ষুদ্র লেখক আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই দনুজমর্দ্দন ও গণেশের অভিন্নত্ব প্রমাণ সম্ভব হইয়াছে। রাখাল বাবু দনুজমর্দ্দনের মুদ্রায় 'চ' দেখিয়াই উহা চন্দ্রদ্বীপে মুদ্রিত বলিয়া অবধারণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আমি দেখাইয়াছি উহা, স্পষ্ট চাটিগ্রাম। এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত দনুজমর্দ্দনের মুদ্রার ছবিতেও চাটিগ্রাম পড়িতে পারা যাইবে আশা করি। রাখাল বাবুর মুদ্রা-তত্ত্ব আলোচনায় এইরূপ কত পাপ যে আমার ধুইতে হইয়াছে তাহা রাখাল বাবু ভালই জানেন। দেশ-বিখ্যাত মুদ্রা তাত্ত্বিককে দেশের লোকের নিকট খাটো করিবার অভিলাষ নাই বলিয়াই সেগুলির আর নম্বর দিয়া উল্লেখ করিলাম না। যাহার দেখিতে কৌতূহল থাকে, আমার ইংরেজী পুস্তকখানা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

শ্রী নলিনীকান্ত ভট্টশালী

বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা

১৯২১ সালের মানুষগুন্তি অনুসারে দেখা যায়, বঙ্গের দশটি জেলার লোকসংখ্যা কমিয়াছে; যথা—বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, পাবনা, ও মালদহ। যে জেলায় হাজারকরা যত জন লোক কমিয়াছে, তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

জেলা।	হাজারে কতজন কমিয়াছে।
বাঁকুড়া	১০৪
বীরভূম	৯৪
মুর্শিদাবাদ	৮০
নদিয়া	৮০
বর্দ্ধমান	৬৫
মেদিনীপুর	৫৫
পাবনা	২৭
মালদহ	১৮
যশোর	১২
হুগলী	৯

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, বাঁকুড়াতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হারে লোকসংখ্যা কমিয়াছে। অতএব বাঁকুড়া বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা।

দেশের উন্নতি করিতে হইলে, যে-সকল জেলার ও স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবনতি হইয়াছে, তাহাদের অবনতি নিবারণ ও উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বাঁকুড়া জেলার অবনতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়ায় এবং উহার সহিত আমি অন্য জেলা অপেক্ষা অধিক পরিচিত বলিয়া উহার সম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি।

বাংলা দেশের ২৮টি জেলার মধ্যে মৈমনসিংহের লোকসংখ্যা (৪৮,৩৭,৭৩০) সকলের চেয়ে বেশী। ইহার লোকসংখ্যা ভারতবর্ষেরও অন্য যে-কোন জেলা অপেক্ষা অধিক। লোকসংখ্যা অনুসারে বঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে বাঁকুড়ার স্থান একবিংশতম। ১৯২১ সালের মানুষগুন্তি অনুসারে উহা ১০,১৯,৯৪১ জন লোকের বাসভূমি। ১৮৭২ সাল হইতে এপর্য্যন্ত ছয়বার মানুষগুন্তি হইয়াছে। কোন্ সালে এ জেলায় কত লোক ছিল, দেখাইতেছি।

সাল।	লোকসংখ্যা।
১৮৭২	৯,৬৮,৫৯৭
১৮৮১	১০,৪১,৭৫২
১৮৯১	১০,৬৯,৬৬৮
১৯০১	১১,১৬,৪১১
১৯১১	১১,৩৮,৬৭০
১৯২১	১০,১৯,৯৪১

সুতরাং দেখা যাইতেছে, যে, এই জেলার লোকসংখ্যা ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও কম হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসরে ১,১৮,৭২৯ জন লোক কমিয়াছে। সাধারণতঃ মনে হইতে পারে, যে, যে-সব জেলায় বসতি ঘন, সেখানে লোক না বাড়িয়া, যে-সব জেলা বিরল-বসতি, সেখানেই লোক বাড়া উচিত। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব-বঙ্গে বসতি ঘন; অথচ পশ্চিম-বঙ্গে লোক কমিয়াছে, পূর্ব্ব-বঙ্গে বাড়িয়াছে। দৃষ্টান্ত—বাঁকুড়ায় প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৮৮ জন লোক বাস করে, সেখানে লোক কমিয়াছে; ঢাকায় প্রতি বর্গ-মাইলে ১১৪৮ জনের বাস; সেখানে লোক বাড়িয়াছে।

বাঁকুড়ার সকল অঞ্চলে লোক সমান হারে কমে নাই। সদর সব্‌ডিবিজনে হাজারে ৭০ জন, বিষ্ণুপুর সব্‌ডিবিজনে হাজারে ১৬৯ জন কমিয়াছে। সদর সব্‌ডিবিজনে ৬৯৪৪৪২ এবং বিষ্ণুপুর সব্‌ডিবিজনে ৩২৫৪৯৯ জনের বসতি। কোন্ থানার এলাকায় হাজারে কত লোক কমিয়াছে, তাহা হইতে মোটামুটি বুঝা যাইবে, কোন্ অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও অবস্থা কিরূপ।

থানা।	হাজারে হ্রাস।
বাঁকুড়া, ছাতনা	২৮
ওন্দা, তাল্‌ডাংরা	১২৫
গঙ্গাজলঘাটি, সাল্‌তড়া, বড়জোড়া, মেঝ্যা	৮৩
খাতড়া, ইন্দপুর, রাণীবাঁধ, রাইপুর	৬১
শিমলাপাল	৭১
বিষ্ণুপুর, জয়পুর, পাত্রশায়ের, রাধানগর, ইন্দাস, সোণামুখী	১৭১
শিরোমণিপুর, কোতুলপুর	১৬৩

এখন, বাঁকুড়া জেলার লোকক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, কোন্ জেলায় কৃষিযোগ্য জমীর অংশ কত, সেই অংশের কত অংশে চাষ হয়, বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত কত, জমীর উৎপাদিকা শক্তি কিরূপ, ইত্যাদি।

বাঁকুড়া জেলায় মোট যত জমী আছে, তাহার শতকরা ৩৩·৬ অর্থাৎ মোটামুটি রকম সাড়ে পাঁচ আনায় চাষ করা হইয়া থাকে। আরো শতকরা ৫৬·৪ ভাগে চাষ চলিতে পারে, কিন্তু তাহা অকর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। অর্থাৎ জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, এখন যত জমীতে চাষ হয়, তাহার উপর আরও প্রায় তাহার দ্বিগুণ জমীতে চাষ হইতে পারে। সমগ্র বাংলা দেশে, চব্বিশ-পরগণা, খুলনা দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম বাদ দিলে, বাঁকুড়াতেই কর্ষিত জমীর অনুপাত সর্ব্বাপেক্ষা কম। ইহার মধ্যে দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম পাহাড়িয়া জায়গা, এবং উভয়ই বিরল-বসতি; সুতরাং কর্ষিত জমীর অংশ কম

হওয়া স্বাভাবিক এবং হইলেও ক্ষতি নাই। চব্বিশ-পরগণার অর্দ্ধেকের অধিকাংশ অরণ্য ও জঙ্গল, তাহার অনেক অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যায়। জেলার অনেক অংশে টিটাগড় বারাকপুর দমদমা খড়দহ প্রভৃতি কারখানা-প্রধান স্থান আছে। অতএব এই জেলাতেও কর্ষিত জমির অংশ কম হওয়ার কারণ, এবং তাহার জন্য যে লোকসংখ্যা হ্রাস হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। খুলনার অর্দ্ধেকটা সুন্দরবন। অনেক অংশ জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া যায়। এই জেলাতেও চাষের জমীর পরিমাণ কম হওয়া স্বাভাবিক। তাহার জন্য লোকসংখ্যা কম হইবার কথা নয়।

বাঁকুড়ার গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ৫৩·১১ ইঞ্চি মাত্র। ইহার মানে এই, যে, এই জেলায় যত বৃষ্টির জল পড়ে, তাহা সমুদয় জেলার উপর সমান গভীর ভাবে ঢালিয়া রাখিলে, তাহার গভীরতা ৫৩·১১ ইঞ্চি হইবে। এরূপ কম বৃষ্টি আর কোন জেলায় হয় না। বাংলাদেশের অন্য সব জেলার মত বাঁকুড়ার লোকদেরও প্রধান নির্ভর চাষের উপর। জল বিনা চাষ হয় না। বৃষ্টি বাড়াইবার কোন নিশ্চিত উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং বাঁকুড়ায় যত জল আকাশ হইতে পড়ে, তাহাই নানা প্রকার জলাশয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া তথায় চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতি সাধন করিতে হইবে। ইহার কথা ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে বলিব।

কোন্ জেলার জমীর উৎপাদিকা শক্তি কত, তাহা স্থির করা, এবং তাহার পর তাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। কিন্তু মোটের উপর ভিন্ন ভিন্ন জেলার জমীর উৎপাদিকা-শক্তি পরস্পরের সহিত তুলনায় কিরূপ, তাহা বলা যাইতে পারে। বঙ্গের সেন্সস্ রিপোর্টের লেখক ডব্লিউ এইচ্ টম্সন্ সাহেব এগারটি জেলার গড় বৃষ্টিপাত, চাষ-করা জমী, ফসলের পরিমাণ, এবং বসতির ঘনতা, প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখা হইতে কতকগুলি অঙ্ক সংকলন করিয়া দিতেছি। তাঁহার এই এগারটি জেলা সম্বন্ধীয় তালিকাগুলিতে বাঁকুড়ার কেবল সদর সব্‌ডিবিজনটিই ধরা হইয়াছে। সমগ্র ভূমির প্রতি বর্গ-মাইলে ফসলের পরিমাণ মেদিনীপুরে ৫০০ ধরিয়া তাহার তুলনায় অন্যান্য জেলার পরিমাণ দেখান হইয়াছে।

জেলা	কত ইঞ্চি বার্ষিক বৃষ্টি	প্রতি বর্গ-মাইলে ফসল	প্রতি বর্গ-মাইলে লোকসংখ্যা
বাঁকুড়া (সদর সব্-ডিবিঃ)	৫৫·২৬	৪৫৪	৩৬১
মেদিনীপুর	৫৯·৪৫	৫০০	৫২৮
নদিয়া	৫৭·২০	৫২৯	৫৩৫
রাজশাহী	৫৯·৭৯	৫৫৮	৫৬৯
যশোহর	৬০·৭২	৬৭০	৫৯৩
ফরিদপুর	৬৫·৫৯	৭৬৬	৯৪৯
মৈমন্‌সিং	৮৩·৮১	৬৮৭	৭৭৬
ঢাকা	৬৯ ২২	৬৮৩	১১৪৮
ত্রিপুরা জেলা	১১১·৯২	৯০৯	১০২৭
নোয়াখালী (দ্বীপ বাদে)	১২৬·৮৩	১০৯৯	১২০২
বাকরগঞ্জ	৮৪·২৯	৮১৩	৭৫২

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, যে, বাঁকুড়ায় বৃষ্টিপাত সর্ব্বাপেক্ষা কম, ফসলও জন্মে প্রতি বর্গ-মাইলে সর্ব্বাপেক্ষা কম, এবং প্রতি বর্গ-মাইলে লোক-সংখ্যাও সর্ব্বাপেক্ষা কম। ইহা স্বাভাবিকও বটে। যেখানে জল কম, সেখানে ফসল কম ত হইবেই। এবং যদি তথাকার লোকদের জীবিকা প্রধানতঃ চাষই হয়, তাহা হইলে লোকসংখ্যাও কম হইবে। মোটামুটি ইহাও দেখা যাইতেছে, যে, যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক, সেখানকার ফসলের পরিমাণ এবং বসতির ঘনতাও অধিক। অতএব, বাঁকুড়ার লোকসংখ্যা বাড়াইবার প্রধান উপায় ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি; ফসল বাড়াইতে হইলে জল বেশী পাইতে হইবে; বৃষ্টি বাড়াইবার উপায় নাই বলিয়া, বৃষ্টির জল যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা যথাসম্ভব ধরিয়া রাখিয়া কাজে লাগাইতে হইবে।

এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে সকলেই সহজে অনুমান করিবেন, যে, এ জেলায় অন্নকষ্ট প্রায়ই হইয়া থাকে, এবং তাহা মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করে। ইহার ইতিহাসেও তাহাই দেখা যায়। আগেকার কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, গত দশ বৎসর মধ্যেই গবর্ণমেণ্ট দ্বারা স্বীকৃত দুর্ভিক্ষ দুইবার হইয়াছে; ১৯১৫-১৬ অব্দে একবার, ১৯১৮-১৯ অব্দে আর-একবার। কেবলমাত্র অনশনে ঠিক্ কত

লোক মরিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খাইতে না পাইলে দুর্ব্বলতাবশতঃ মানুষের নানা-প্রকার পীড়া হয়, যা-তা খাইয়াও ব্যারাম হয়। ১৯১৮-১৯ সালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে বাংলার সব জেলায় অনেক লোক মারা পড়ে। যে-সব জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোক মরিয়াছিল, বাঁকুড়া তাহার মধ্যে অন্যতম। এ জেলায় সাধারণতঃ হাজারে যত লোক মরে, সরকারী রিপোর্ট্ অনুসারে ১৯১৮ সালে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার দরুন্ তাহার উপর হাজারে আরো দশজন মরিয়াছিল। কোন কোন শহরে ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত মৃত্যু অধিক হইয়াছিল; যথা সোনামুখীতে হাজারে ২০·৮। স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট্ অনুসারে, ইহার কারণ এই, যে, অনশনক্লিষ্ট লোকদের দুর্ব্বল দেহ রোগের আক্রমণ নিরস্ত বা সহ্য করিতে পারে নাই। ১৯১৯ সালেও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ছিল। স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়, জ্বরে সাধারণতঃ যত লোক মরে, ঐ সালে তাহার অতিরিক্ত হাজারকরা ৭·১ জন লোক বাঁকুড়ায় মরিয়াছিল। এই জ্বর সম্ভবতঃ অনেক স্থলে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। যাহা হউক, জ্বরের নামটা যাহাই হউক, উহার অতিরিক্ত প্রকোপের কারণ যে অন্নকষ্টজনিত ক্ষীণ শরীর, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯১৯ সালের রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, যে, ১৯১৮-১৯এর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় বাঁকুড়ার হাজারকরা ২৫ জন লোক মারা পড়িয়াছিল।

সুপুষ্ট ও সবল অনেক লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় মারা পড়িয়াছিল; কিন্তু ক্ষীণজীবীদের মৃত্যুই বেশী হইয়াছিল। তা ছাড়া, পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না থাকায় শহর অপেক্ষা গ্রামে মৃত্যুর হার বেশী হইয়াছিল। অতএব, মানুষের যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য চাই, চিকিৎসার ব্যবস্থাও গ্রামে গ্রামে চাই।

ম্যালেরিয়ায় মানুষ মরে ইহা সত্য কথা; কিন্তু যাহারা খাইতে পায় না, তাহাদের বেশী ম্যালেরিয়া হয়, কিম্বা যে বৎসর লোকে খাইতে পায় না, সেই বৎসর বেশী ম্যালেরিয়া হয়, একথা সরকারী কর্ম্মচারীরা ভাল করিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা মশার উপর ম্যালেরিয়ার সব দোষটা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান। কিন্তু এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় এ কথাটা খুব নরম ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।* উহা ইংরেজদের প্রধান বিশ্বকোষ। স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার বেণ্ট্‌লীর সত্য কথা বলিবার অভ্যাস থাকায় তিনিও একথা একটু প্যাঁচাইয়া স্বীকার করিয়াছেন।+ অতএব বাঁকুড়ায় ম্যালেরিয়া কমাইতে হইলে যেমন চিকিৎসা ও ঔষধের এবং মশা মারিবার বন্দোবস্ত চাই, অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন রক্ষা ও সংগ্রহের ব্যবস্থাও সেইরূপ চাই।

বাঁকুড়া জেলার কতকটা অপেক্ষাকৃত নীচু ও সমতল এবং কতকটা উঁচু ডাঙ্গা জমী। মোটামুটি সদর সব্-ডিবিজন উঁচু এবং বিষ্ণুপুর সব্‌ডিবিজন সমতল, এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই কারণে সদর সব্‌ডিবিজনে প্রতি বর্গ-মাইলে ৩৬১ জন, কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রতি বর্গ-মাইলে ৪৬৫ জন লোকের বাস।

দিনাজপুরের বালুঘাট মহকুমা, এবং জলপাইগুড়ি ও পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম জেলাদ্বয় ব্যতীত, বাঁকুড়ায় শতকরা যত লোক আদিম-জাতীয়, সাঁওতাল প্রভৃতি, অন্য কোথাও তত নহে। এইজন্য আদিম-জাতীয় লোকদের শিক্ষাদির বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে বাঁকুড়ার সম্যক্ উন্নতি হইবে না।

পার্ব্বত্য-চট্টগ্রাম ও দার্জিলিং ছাড়া আর সব জেলা অপেক্ষা এ জেলায় শতকরা মুসলমান কম।

জেলার মোট ভূমির শতকরা সাত অংশের উপর বনজঙ্গল আছে। ইহা বেশী নহে। ইহা রক্ষা করা দরকার, কেবল গৃহনির্ম্মাণের ও জ্বালানী কাঠের জন্যই যে ইহা দরকার, তা নয়; জমী ও বাতাস সরস রাখিবার জন্যও আবশ্যক।

জেলার উচ্চ ডাঙ্গা অংশ হইতে জল নিঃসারণ

---

* "... malnutrition is also believed to increase susceptibility; both should therefore be avoided." Encyclopaedia Britannica, vol. xvii, p. 464.

\+ 'He holds that in a large measure malaria is not a root cause of depopulation, but appears in localities which suffer adverse economic conditions,..." Bengal Census Report, 1921, p. 37.

সহজেই হয়, উহা অপেক্ষাকৃত ম্যালেরিয়াশূন্যও বটে। কিন্তু বিষ্ণুপুর মহকুমাকে সরকারী সেন্সস্ রিপোর্টে বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অংশ বলা হইয়াছে। তাহার কারণ বলা হইয়াছে তিনটি—দুটি প্রধান, একটি অপ্রধান। এই অঞ্চলের জল নিঃসারণের স্বাভাবিক উপায় ভাল নয়; এবং ইহা নদীর বন্যাতেও বিপন্ন হয়। অপ্রধান কারণ এই, যে, জমীতে জল সেচনের নিমিত্ত নদী ও খালে যে-সব বাঁধ দেওয়া আছে, তাহাতে বন্যার কুফল বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাঁধগুলি সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করা এঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধির অসাধ্য নহে, যাহা দ্বারা এই কুফল নিবারিত হইতে পারে। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে, বিষ্ণুপুর মহকুমায় উদ্বৃত্ত জল নিঃসারণের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার।

মৃত্যুই বাঁকুড়ার লোকসংখ্যা হ্রাসের একমাত্র কারণ নহে। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এ জেলার বিস্তর লোক জেলার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৯১১ হইতে ১৯২১ দশ বৎসরে বাহির হইতে এ জেলায় ১০,৭৯০ জন লোক আসিয়াছিল, কিন্তু এ জেলা হইতে বাহিরে গিয়াছিল ৭২,৬০৭। নিজের জেলাতেই অন্নসংস্থান হইলে এত বেশী লোক বাহিরে যাইবে না। অবশ্য কোন জেলা খুব ধনী হইলেও তাহা হইতে অনেক লোক নানা কারণে বাহিরে যাইবে; কিন্তু উহার ধনশালিতা-হেতু বাহিরের লোকও তেমনি বেশী আসিবে।

১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং ৪০ বৎসর বয়সের পরেও অনেক বাঙালী স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া থাকে; কিন্তু মোটামুটি, ১৫ হইতে ৪০ বৎসর, এই সময়টিকে সন্তান হইবার বয়স বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ১৯২১ সালে এই বয়সের প্রতি একশত জন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের কতগুলি সন্তান ছিল, তাহার দ্বারা বাঙালী জাতির সংখ্যা-বৃদ্ধির শক্তি বাড়িতেছে কিম্বা কমিতেছে বুঝা যাইতে পারে। ১৯২১ সালে উক্তরূপ বয়সের প্রতি একশত জন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সন্তানসংখ্যা সমুদয় বাংলা দেশে ১৭২টি ছিল; ১৯০১ সালে ছিল ১৮২টি, ১৯১১ সালে ছিল ১৮১টি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ক্রমশঃ বাঙালী স্ত্রী-লোকদের সন্তানসংখ্যা কমিতেছে। বাঁকুড়া জেলায় একশত বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সন্তানসংখ্যা বাংলা দেশের গড় অপেক্ষা কম। এখানে ১৯২১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৫৭; ১৯১১ সালে ১৬৭; ১৯০১ সালে ১৮২। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সমগ্র বঙ্গে কুড়ি বৎসরে সন্তানসংখ্যা শতকরা ১০ কমিয়াছে; কিন্তু বাঁকুড়ায় ঐ কুড়ি বৎসরে কমিয়াছে পঁচিশ, অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশী। অতএব এ জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিবাহিতা নারীদের সন্তানসংখ্যা কেন কমিতেছে, বিশেষ বিবেচনা ও অনুসন্ধান না করিয়া বলিতে পারিলাম না।

লেখা পড়া না জানিলে কোন বিষয়েই কোন উন্নতি হয় না, এমন বলা যায় না; কিন্তু লেখাপড়া জানিলে এবং শিক্ষা পাইলে সকল বিষয়েই উন্নতির সম্ভাবনা বাড়ে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাঁকুড়ায় শিক্ষার অবস্থা কিরূপ, দেখা যাক। যাহারা চিঠি লিখিতে ও পড়িতে পারে, তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম বলিয়া সেন্সাসে ধরা হইয়াছে। সুতরাং লিখনপঠনক্ষম বলিলে খুব সামান্য শিক্ষাই বুঝায়। পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক পুরুষ ও নারীর মধ্যে হাজারে কয়জন ১৯২১, ১৯১১, ও ১৯০১ সালে লিখনপঠনক্ষম ছিল, তাহার তালিকা :—

	পুরুষ			স্ত্রী		
প্রদেশ	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৯২১	১৯১১	১৯০১
ব্রহ্মদেশ	৫১০	৪৩১	৪৩৭	১১২	৭০	৫২
বাংলা	১৮১	১৬১	১৪৭	২১	১৩	৯
মান্দ্রাজ	১৭৩	১৭১	১৩৭	২৪	২০	১১
বোম্বাই	১৩৮	১৩৯	১৩১	২৪	১৬	১০
বিহার-ওড়িষা	৯৬	৮৮	৮৭	৬	৪	৩
পঞ্জাব	৭৪	৭২	৭৪	৯	৭	৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৭৪	৬৯	৬৬	৭	৬	৩

ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধ মঠসকলে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া এবং তথায় নারীদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা অর্থাৎ পর্দা না থাকায়, সেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশী—যদিও উচ্চশিক্ষার বিস্তার অধিক হয় নাই। মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়েও পর্দা না থাকায় ঐ দুই প্রদেশেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার অধিক।

১৯২১ সালে বাঁকুড়ায় ৫ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে হাজারে ২৩৭ জন লিখনপঠনক্ষম ছিল। ইহা অপেক্ষা হাজারে অধিকসংখ্যক লিখনপঠনক্ষম লোক বাংলায় চারিটি জেলায় ছিল; যথা—কলিকাতা ৫৩০, হাবড়া ২৮১, চব্বিশ-পরগণা ২৫২, হুগলী ২৪৮। পাশ্চাত্য অনেক সভ্য দেশে এবং জাপানে নিতান্ত শিশু ভিন্ন একেবারে নিরক্ষর পুরুষ ও স্ত্রীলোক দেখা যায় না। কিন্তু সে-সব দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই, বাঁকুড়া অপেক্ষা শিক্ষিত জেলা বঙ্গেই রহিয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষায় বাঁকুড়ার অবস্থা অত্যন্ত হীন; হাজারে এগারটি মাত্র স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে। বঙ্গের কুড়িটি জেলার অবস্থা এবিষয়ে বাঁকুড়া অপেক্ষা ভাল; যথা—কলিকাতা ২৭১, হাবড়া ৩৫, হুগলী ৩২, ঢাকা ২৯, বাকরগঞ্জ ২৬, দার্জ্জিলিং ২৫, চব্বিশ-পরগণা ২৪, নদিয়া ২৩, ফরিদপুর ২২, বর্দ্ধমান ২০, খুলনা ১৯, ত্রিপুরা ১৮, মুর্শিদাবাদ ১৮, যশোর ১৬, পাবনা ১৫, মেদিনীপুর ১৩, বগুড়া ১৩, চট্টগ্রাম ১৩, বীরভূম ১২, মৈমনসিং ১২। রাজশাহী, কুচবেহার, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা-রাজ্য স্ত্রীশিক্ষায় বাঁকুড়ার সমান হীন।

অনেক দেশী রাজ্যের সহিত তুলনা করিলে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হইবে। যথা—ত্রিবাঙ্কুড়ে হাজারে ৩৮০ পুরুষ ও ১৭৩ জন স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারে।

বাংলা দেশে মুসলমান পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, আদিমনিবাসীরা ছাড়া অন্য সকলের চেয়ে কম। বঙ্গে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী কত লোক হাজারে লিখনপঠনক্ষম দেখুন।

	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
হিন্দু	১৫৮	২৬৮	৩৬
মুসলমান	৫৯	১০৯	৬
খৃষ্টিয়ান	৪৬৮	৫৩৯	৪২৫
অভারতীয় খৃষ্টিয়ান	৯১৯	৯৮৪	৯১২
ভারতীয় খৃষ্টিয়ান	২৩৬	৩১৭	১৬৪
ব্রাহ্ম	৮২১	৮৪০	৭৯৯
বৌদ্ধ	৯৬	১৬৯	১৯
আদিম নিবাসী	৭	১৪	১

বাঁকুড়ায় মুসলমানের সংখ্যা খুব কম বলিয়া জেলাগুলির মধ্যে শিক্ষায় ইহার স্থান উঁচু দেখাইতেছে। কিন্তু যদি অন্য সব জেলাতেও কেবল হিন্দুদের শিক্ষাই ধরা যায়, তাহা হইলে এই জেলা অনেক নীচে পড়িবে। হিন্দু পুরুষদের শিক্ষায় ইহা ১২টি জেলার নীচে, হিন্দু স্ত্রীলোকদের শিক্ষায় ইহা ২৫টি জেলার নীচে পড়িবে। কেবল মুসলমান পুরুষদের শিক্ষা ধরিলে বাঁকুড়া চতুর্থস্থানীয় হয়। এ জেলার হাজারে ২০৪ জন মুসলমান পুরুষ লিখনপঠনক্ষম। এবিষয়ে কেবল কলিকাতা (৩১০) দার্জ্জিলিং (২৬৬) এবং হুগলী (২১১) এ জেলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুসলমান স্ত্রীলোকদের শিক্ষায় এ জেলা বঙ্গে নবমস্থানীয়; যদিও ইহাতে গৌরব নাই, কারণ তাঁহাদের মধ্যে হাজারে আটজন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানেন। যাহা হউক, ইহা বাঁকুড়া জেলার মুসলমানদের কিছু প্রশংসার বিষয়, যে, পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই শিক্ষায় তাঁহাদের স্থান বঙ্গের অন্যান্য জেলার মুসলমানদের তুলনায় যেরূপ উচ্চে, বাঁকুড়ার হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষার স্থান অন্যান্য জেলার হিন্দু পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের তুলনায় সেরূপ উচ্চে নহে।

এই জেলার দশমাংশ লোক সাঁওতাল প্রভৃতি আদিমজাতীয়। ইহারা শিক্ষায় হীন। পুরুষদের মধ্যে হাজারে ১৭ জন লিখিতে পড়িতে পারে, স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজারে এক জনও নহে।

১৯২১ সালে এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা।

ধর্ম্ম	মোট	পুরুষ	স্ত্রীলোক
হিন্দু	৮৮০৪৩৯	৪৩৯৩৬৮	৪৪১০৭১
ব্রাহ্ম	৩	২	১
মুসলমান	৪৬৬০১	২৪০৬৪	২২৫৩৭
খৃষ্টিয়ান	১৪২১	৭৪৮	৬৭৩
আদিম জাতি	৯১৪৭৭	৪৫১৯২	৪৬৩২৫

এখানে খৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়িয়াছে। ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯০১, ও ১৯২১ সালে তাহাদের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬, ১৩২, ৩৬৩, ১০১২ ও ১৪২১ ছিল।

এই জেলায় কোন্ জা'তের লোক ১৯২১ সালে কত ছিল, তাহার তালিকা:—

জা'ত	পুরুষ	স্ত্রীলোক
বাগ্দী	২৭৬৯৪	২৭৩৮৩
বৈদ্য	২০০৬	২০৬২
বৈষ্ণব (বৈরাগী)	৮৯৪৬	৯৪৬৫
বারুই	১২৫৪	১২৪২
বাউরী	৪৬৭৮২	৪৯০৬৯
ভুঁইয়া	১৬২৭	১৪৫৭
ভূমিজ	৭৮৩৯	৮৪৩১
ব্রাহ্মণ	৪৭০৬৫	৪৭৫৫৭
চামার	৭০	৯
চাষাধোবা	২১	৩২
ধোবা	১৯৫৪	১৮২৯
ডোম	৬৯৬৫	৬৭১১
দোসাধ	১১	২
গন্ধবণিক্	৬৩০৪	৬৫৩৪
গোয়ালা	৩২৪৯১	৩০৪৩৭
হাড়ি	৩১৯৪	৩২০১
জুগী ও জোগী	২৮৩	২৩৫
কাহার	২১	১২
চাষী কৈবর্ত্ত	৯৫৫০	৯০৯৮
জালিয়া কৈবর্ত্ত	৬৯৫৩	৭৩৫৩
কলু	৯৭৫৮	৯৬৯৮
কর্ম্মকার	৯৯৯৭	৯৫১০
কেওরা	৩	১
কায়স্থ	৮৮৫১	৯৮১২
কুমার	৪৯৫৯	৪৯৩০
কুড়মি	৯৬২৫	৯৯৬৭
লোহার	২০০৮১	২১৪০৫
মাল	৫৪৬০	৫৭৫২
মালাকর	২১৯	২২৮
ময়রা	২৮৮৭	৩২৪০
মুচি	৫৬৩৬	৫৩৪৪
মুণ্ডা (হিন্দু)	৩	২
মুণ্ডা (আদিম)	৭৩	৯৫
নমঃশূদ্র	২৩৩	২৬৪
নাপিত	৫৪৭২	৫৭০৬
মুনিয়া	১	০
ওরাওঁ	২০	০
পাটনী	৫	০
পোদ	২	০
রাজপুত (ছত্রী)	১২৯৯৪	১৩০৮৭
সদ্গোপ	২২০৭৭	২০৯৩৯
সাঁওতাল (হিন্দু)	৬৭১৬	৭১৬৪
সাঁওতাল (আদিম)	৪৪৯৫৭	৪৬০৭৫
শাহা	১৫৭	৭৬
স্বর্ণকার	১২৬	১০২
সুবর্ণবণিক্	৪৩৪১	৪৫৬৫
শুঁড়ি	১৩২২৩	১২৮৯৬
সূত্রধর	২৩৬২	২৪৪১
তাম্বুলী	৯৫০৬	৯৩৬৫
তাঁতি ও তাতোয়া	১২৬৮৮	১১৫৯৫
তেলী ও তিলী	৩২৪৪৮	৩২১২৭
অন্যান্য	২৮৬৩৩	২৮৮৯৫

অন্যান্যের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী আগুরী ৪১৬৮ ও ৪০৯০, কোড়া স্ত্রী ও পুরুষ ২২৯২ ও ২২৭৭, নাইক স্ত্রী ও পুরুষ ১৫ ও ১৫ এবং সামন্ত স্ত্রী ও পুরুষ ৮৭ ও ৩৫।

মুসলমানদের মধ্যে—

	পুরুষ	স্ত্রী
বেহারা	০	১
জোলাহা	৩০৫	৩০৪
পাঠান	১৭৬৬	১৫২১
সৈয়দ	৭৫০	৭৫৯
শেখ	২১১৪৯	১৯৮৭৫
অন্যান্য	৯৪	৭৭

এই জেলায় বাউরীদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তার নীচে ব্রাহ্মণ। বাউরীদের উন্নতি করা সকলের আগে দরকার। সাঁওতালদিগকে হিন্দু সাঁওতাল ও ভূত-প্রেত-পূজক সাঁওতাল এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে।

মোট সংখ্যা ১,০৪,৯১২ ধরিলে তাহারাই বাঁকুড়ার প্রধান অধিবাসী।

বাঁকুড়ার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই, যে, এই জেলায় প্রতি লক্ষে ২৭০ জন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। ভারতবর্ষের আর কোন জেলায় কুষ্ঠের প্রাদুর্ভাব এত বেশী নহে। বঙ্গে ইহার নীচে বীরভূম (১৪৮) বর্দ্ধমান (১১২)। ইহার কারণ কি, বলিতে পারি না। বাঁকুড়ার কোন্ থানার এলাকায় লাখে কত কুষ্ঠী, লিখিতেছি:—বাঁকুড়া ৬৩৬, ছাতনা ২৩১, ওন্দা ৩৪৫, তালডাংরা ২৯৭, গঙ্গাজলঘাটী ৫৪০, শালতড়া ৪৬৬, বড়জোড়া ৩৫৪, মেঝ্যা ৪৫২, খাতড়া ১৮৬, ইন্দপুর ৪২৩, রাণীবাঁধ ৭৬, রাইপুর ১৩১, শিমলাপাল ২২৭, বিষ্ণুপুর ১৭০, জয়পুর ৯৪, পাত্রশায়ের ৮২, রাধানগর ১১৪, ইন্দাস্ ৫৪, সোনামুখী ৩০৮, শিরোমণিপুর ৩২, কোতুলপুর ৭৪। প্রকৃত সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। কারণ, নিজেকে কুষ্ঠরোগী বলিয়া প্রকাশ করিতে লোকে চাহে না, এবং কেহ কেহ জানেও না, যে, তাহার এই ব্যাধি হইয়াছে।

এই জেলার শতকরা ৭৭ জন লোকের নির্ভর চাষের উপর; অথচ নানা কারণে এখানে চাষের অবস্থা ভাল নহে। পূর্ব্বে সেই-সকল কারণের উল্লেখ করিয়াছি। বাকী শতকরা ২৩ জনের নির্ভর অন্যান্য কাজের উপর।

বঙ্গে গড়ে প্রতি কৃষিকর্ম্মীর ভাগে ২.২১৫ একার্ চাষের জমী পড়ে (এই জেলায় কত বলিতে পারি না)। ইংলণ্ডে প্রতি কৃষিকর্ম্মীর ভাগে ২১ একার্ পড়ে। চাষী শ্রেণী সকলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মধ্যে যদি উৎপন্ন শস্য সমান ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, এবং যদি মেদিনীপুরে প্রত্যেকের ভাগের শস্যের দাম একশত টাকা ধরা হয়, তাহা হইলে সর্‌কারী রিপোর্ট্ অনুসারে বাঁকুড়া সব্‌ডিবিজনে প্রত্যেক ভাগের দাম হইবে ১৩৫.৪ টাকা, নোয়াখালীতে ১৩৯.৫, ত্রিপুরাজেলায় ১৪০.২, মৈমনসিংহে ১৪২.৩, ফরিদপুরে ১৪২.৬, রাজশাহীতে ১৪৮.১, ঢাকায় ১৪৮.৮, বাকরগঞ্জে ১৫৩.৩, নদিয়ায় ১৭১.৯, এবং যশোরে ১৭৪.৬। এ জেলায় যে চাষে ফসল কম হয়, তাহা এই তালিকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে।

এ জেলায় কত লোকের কোন্ ভাষা মাতৃভাষা, তাহার তালিকা দিতেছি। মোট লোকসংখ্যা ১০,১৯,৯৪১।

মাতৃ ভাষা।	লোকসংখ্যা।
বাংলা	৯,১৪,৯৫৬
হিন্দী ও উর্দ্দু	৩৩০৪
পূর্ব্ব পাহাড়িয়া	৬
খের্‌ওয়ারী *	১০১১০০
কুরুখ্	৯
ওড়িয়া	২৭২
গুজরাতী	৪৩
মরাঠী	৪
পঞ্জাবী	৮
রাজস্থানী	১০৭
তামিল	৫
তেলুগু	২৭
ইংরেজী	৩১
পোর্ত্তুগীজ	১

রাজস্থানী ভাষা মাড়োয়ারীদের মাতৃভাষা।

বাঁকুড়া জেলায় যাহাদের জন্ম এরূপ লোকের সংখ্যা ১৯২১ সালে ১১,১২,২২২ ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে গণনার সময় ৯,৯০,৩৫৩ জন এই জেলায় ছিল; বাকী অন্যত্র বাস করিতেছিল।

বাঁকুড়া জেলায় যাঁহার জন্ম বা নিবাস, এই প্রবন্ধটি এরূপ কাহারো চোখে পড়িলে তিনি ইহা তাঁহার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবকে পড়িতে বলিলে অনুগৃহীত হইব।

এই জেলার দুরবস্থা দূর করিবার জন্য কি করা উচিত, ও কি করা হইতেছে, অতঃপর তাহার আলোচনা যথাসাধ্য করিব।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩০।

শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

* সাঁওতালী, হো, কোড়া, মুণ্ডারী, প্রভৃতি ভাষা ইহার অন্তর্গত।

বিবিধ প্রসঙ্গ

দেশের আয়ব্যয়

প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে ভারতবর্ষের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়ব্যয়ের আলোচনা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধিরা প্রতিবৎসরই বলেন, সামরিক ব্যয় অত্যন্ত বেশী করা হয়, ও প্রধানতঃ তজ্জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় করিবার টাকা থাকে না। তা ছাড়া, ইহাও বার বার বলা হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষ গরীব দেশ, অথচ ইহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন খুব ধনী দেশসকলের সেইরূপ পদস্থ কর্ম্মচারীদের বেতন অপেক্ষা অধিক, এবং অন্যান্য বন্দোবস্তও ঐরূপ বহুব্যয়সাধ্য। সুতরাং যাহাতে দেশ স্বাস্থ্যকর হয়, সর্ব্বত্র সুগম হয়, বাণিজ্যের সুবিধা বাড়ে, দেশের লোকদের জাহাজ কারখানা প্রভৃতি বাড়ে, শিক্ষা স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাহার জন্য যথেষ্ট টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা স্বরাজ চান, তাঁহাদের মধ্যে দুটি দল আছে। কেহ কেহ চান, যে, আভ্যন্তরীণ সামরিক, বাণিজ্যিক ও পররাষ্ট্রবিষয়ক সমগ্রভারতীয় সব কাজের উপর দেশের লোকদের কর্ত্তৃত্ব হউক। অন্যেরা চান, যে, বাণিজ্যশুল্কাদি-বিভাগ যুদ্ধবিভাগ ও পররাষ্ট্রবিভাগ ছাড়া আর সব বিভাগ অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ আর সব ব্যাপার ব্যবস্থাপক সভাসকলের ও তদ্দ্বারা নির্ব্বাচিত মন্ত্রীদের অধীন হউক। "প্রকাশ থাকে, যে," দেশী রাজ্যগুলির সহিত আমাদের যে যে বিষয়ে সম্পর্ক, তাহাও পররাষ্ট্র-বিভাগের অন্তর্গত। শেষোক্ত দল যাহা চান, তাহা পাইলেও কোনই লাভ নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তাহাতে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কারণ, ঐরূপ ব্যবস্থায়, এখন প্রদেশগুলিতে দেশের লোকদের যতটুকু কর্ত্তৃত্ব হইয়াছে, সমগ্রভারতে তার চেয়ে বেশী কর্ত্তৃত্ব হইবে না। একটা দৃষ্টান্ত লউন। এখন প্রদেশগুলিতে যেমন পুলিশের উপর কর্ত্তৃত্ব ও তাহার জন্য ব্যয় করিবার ক্ষমতা বিদেশী প্রাদেশিক গবর্ণ্‌মেণ্টের আছে, তখন তেম্‌নি সমগ্র-ভারতে সৈন্যদলের উপর কর্ত্তৃত্ব ও তাহার জন্য ব্যয় করিবার ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের থাকিবে। এখন যেমন পুলিশের জন্য ব্যয় খুব বেশী করা হয়, তখন তেম্‌নি যুদ্ধবিভাগের ব্যয় (এখনকারই মত) বেশীরকম করিবার ক্ষমতা বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের থাকিবে। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য আবশ্যক কাজের নিমিত্ত টাকা এখন যেমন পাওয়া যায় না, পরেও সেই অবস্থা থাকিবে। হয়ত সামান্য কিছু সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু তাহা গণনার মধ্যে ধরিবার যোগ্য নহে।

সৈনিক বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে রাখিয়া দেওয়ার মানেটা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বলিবেন, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য এত সৈন্য চাই, এবং তাহাদের খরচ এত চাই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে। বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বলিবেন, পরদেশীর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য এত সৈন্য ও এত টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ চাই। আমাদিগকে তাহা দিতে হইবে।

সৈনিক-বিভাগ ছাড়া পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে রাখার মানেটাও প্রণিধানযোগ্য। মানে এই, যে, পরদেশের সহিত ঝগড়া বাধান, না-বাধান ঐ গবর্ণ্‌মেণ্টের ইচ্ছা- ও ক্ষমতা-সাপেক্ষ থাকিবে। পরদেশের সহিত বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট্ এপর্য্যন্ত যত যুদ্ধ ও সন্ধি করিয়াছেন, তাহা কেবল ভারতবর্ষের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করেন নাই, ভারতবর্ষ

যে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও অধীন, তাহার স্বার্থের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াই করিয়াছেন। তাহাতে অনেক সময় ভারতবর্ষের অনিষ্টই হইয়াছে। পররাষ্ট্র-বিভাগের ভার বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে থাকিলে ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে বলিবেন, অমুক জাতি দেশ বা রাজ্য ভারতের অনিষ্ট করিয়াছে বা করিতে ইচ্ছা করে, অতএব যুদ্ধ বা যুদ্ধের আয়োজন হউক; টাকা দাও।

সাক্ষাৎ- ও পরোক্ষ-ভাবে যেসকল ব্যাপারকে বাণিজ্যিক বলা যাইতে পারে, তাহার উপর কর্তৃত্ব বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্টের হাতে থাকিলে, এখন ভারতীয়দের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা যেরূপ আছে, তাহা অপেক্ষা বেশী ভাল হইতে পারিবে না। আত্মরক্ষার জন্য সব জাতিই দরকার-মত পরদেশ হইতে আমদানী ও পরদেশে রপ্তানী জিনিষের উপর শুল্ক বসায়, উঠায়, বাড়ায়, কমায়। ইহা আমরা এপর্য্যন্ত কেবল নিজেদের দরকার-মত করিতে পারি নাই। দেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য রেলওয়ে লাইন ও রেলভাড়া সম্বন্ধে সুবিধাজনক বন্দোবস্ত আবশ্যক। ইহা আমরা এপর্য্যন্ত করিতে পারি নাই। বরং উল্টা ব্যবস্থাই এপর্য্যন্ত বলবৎ আছে; বিলাতী ও অন্য পরদেশী পণ্যের আমদানী এবং পরদেশে তাহাদের দরকারী ভারতীয় কাঁচামালের রপ্তানী যাহাতে সহজে ও সস্তায় হয়, ভারতবর্ষের রেলওয়েগুলির সেদিকে বেশ দৃষ্টি আছে। দেশী লোকদের দ্বারা দেশী কারখানায় প্রস্তুত জিনিষের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্য সুবিধাজনক রেলভাড়া নাই।

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতির জন্য আভ্যন্তরীণ জলপথসকল ভাল অবস্থায় থাকা আবশ্যক। জলপথে মাল ও যাত্রী বহন স্থলপথে রেল বা অন্য গাড়ীতে বহন অপেক্ষা সস্তায় হইতে পারে। কিন্তু বিলাতী লৌহ-ইস্পাতের কারবারীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিদেশী ভারত-গবর্ণ্‌মেণ্ট রেলপথের দিকেই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিয়াছেন, জলপথ রক্ষা বিস্তার বা তাহার উন্নতির প্রতি নজর দেন নাই; বরং অবহেলায় ও রেলের প্রতিযোগিতায় জলপথের অবনতিই হইয়াছে।

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কের বিশেষ দরকার। সকল ব্যবসায়ীর ও চাষীরই কখন কখন হাতে টাকা থাকে, কখন কখন থাকে না। অনটনের সময় সুদ দিয়া টাকা পাইলে অর্থাগমের সময় তাহা শোধ করিতে অনেকেই পারে। এইরূপে টাকা জোগান ব্যাঙ্কের একটি কাজ। ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্যাঙ্ক্ বিদেশীদের। তাহারা যেরূপ সুদে ও জামিনে নিজেদের স্বদেশীদিগকে টাকা ধার দেয়, আমাদিগকে সেরূপ সুদে ও জামিনে টাকা ত দেয়ই না, অনেক সময় তদপেক্ষা ভাল জামিনেও কিম্বা মোটেই দেয় না। গবর্ণ্‌মেণ্টের আনুকূল্যে শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন ও পরিচালিত ইম্পীরিয়্যাল্ ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতিও এইরূপ। জাপানে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তথাকার গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ব্যাঙ্ক্ স্থাপন বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ সেটা জাপানী গবর্ণ্‌মেণ্টের স্বদেশ।

সাক্ষাৎভাবে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষা দিয়া, তদ্বিষয়ে নানা অনুসন্ধান গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া, জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা সব স্বাধীন দেশেই হইয়া থাকে। ভারতে "পিত্তিরক্ষা"র জন্য কিছু হয়; যথেষ্ট কিছু হয় না।

এইসমুদয় বিষয়ে যতদিন পর্য্যন্ত বিদেশী গবর্ণ্‌মেণ্টের কর্তৃত্ব থাকিবে, ততদিন আবশ্যক-মত টাকা খরচ হইবে না, উন্নতিও হইবে না।

—

গবর্ণ্‌মেণ্টের তরফের যুক্তি

এইসকল বিষয়ে বর্ত্তমান ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সরকার-পক্ষের লোকেরা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা শুনিতে মন্দ নয়। দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

যুদ্ধবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—যুদ্ধবিভাগের কাজকর্ম্ম বুঝিবার ও চালাইবার মত ভারতীয় লোক নাই; প্রধান সেনাপতি হইবার মত লোকের কথা দূরে থাক্, লেফ্‌টেন্যাণ্ট্, কাপ্তেন, মেজর, কর্ণেল হইবার মত লোকও নাই; ইত্যাদি। কিন্তু চিরকাল দেশের এই দুর্দ্দশা ছিল না। এই দুর্দ্দশা ইংরেজের কৃত। খুব প্রাচীনকালের কথা বলিবার দরকার নাই। শিবাজী,

হায়দর আলী, টিপু সুল্তান, রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি ভারতবর্ষের লোক। বর্ত্তমানে ভারতীয় সৈন্যদলে যে-সব ইংরেজ অফিসার কাজ করেন, তাঁহারা এইসকল ভারতীয় নেতাদের চেয়ে বড় যোদ্ধা নহেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও ভারতবর্ষে দেশী নেতার অধীনে ইংরেজ সৈন্য কাজ করিত। কে ও ম্যালিসনের সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে। অনেক বিষয়ে ইংরেজ শাসন মুসলমানী শাসন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে মুসলমানশাসনও শ্রেষ্ঠ ছিল। উচ্চ রাজকার্য্যে হিন্দুদেরও নিয়োগ তন্মধ্যে একটি। সেকালে ভারতীয় মুসলমান নৃপতিদের এক একটা অভিযানে হিন্দু প্রধান সেনাপতি ছিলেন; অপ্রধান নেতার ত কথাই নাই। হিন্দুরা রাজস্ব-মন্ত্রী, ও অন্য-রকম মন্ত্রী ত হইতেনই, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত হইতেন। যথা—মানসিংহ কাবুলের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

ইংরেজের নীতি ও মুসলমান নীতির এবিষয়ে পার্থক্যের কারণ অনেক। একটা কারণ, মুসলমান নৃপতিরা, প্রথম ২।১ জন ছাড়া, সবাই দেশের লোক ছিলেন; এইজন্য, ইংরেজ ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সকলকেই যেরূপ পর ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করেন, ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদিগকে ততটা পর ও বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতেন না। আর একটা কারণ, পাশ্চাত্য খৃষ্টিয়ানরা, বিশেষতঃ টিউটনিক্জাতীয় ইংরেজ প্রভৃতিরা, এখন পর্য্যন্ত অশ্বেতকায় অখৃষ্টিয়ান্ খৃষ্টিয়ান্ সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করেন; কিন্তু মুসলমানরা গায়ের রং অনুসারে মানুষকে কখন উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট মনে করেন নাই।

ভারতবর্ষে ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্টের রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র "পিত্তিরক্ষা করিও",* অথবা, "পূরা সত্য বা পূরা মিথ্যা বলিও না, ৮৴১৭৷৷০ মিথ্যার সঙ্গে আধ পাই সত্য মিশাইয়া দিও।" দুই একটা দৃষ্টান্ত লউন। সৈন্যদলে যে-সব ইংরেজ অফিসার কাজ করে, তাহাদের নিয়োগপত্র বা সনন্দ ইংলণ্ডের রাজা দিয়া থাকেন; ইহাকে কমিশন্ বলে। আগে এই কমিশ্যন্ কোন ভারতীয় পাইত না। কয়েক বৎসর হইল, অতি অল্পসংখ্যক ভারতীয়কে সৈন্যদলের নেতৃত্বের নিম্নতম শ্রেণীগুলিতে রাজ-কমিশন্ দেওয়া হইয়াছে। তাহাদিগকে আঙুলে গোনা যায়। এখন কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে, ভারতীয়দিগকে যুদ্ধবিভাগে উচ্চ কাজ দেওয়া হয় কি না, তাহার উত্তর ইংরেজ সরকার দিবেন, "হয় বৈ কি?" ইহাকে বলে 'পিত্তিরক্ষা'। কারণ, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়; খুব অল্প পরিমাণে সত্য, খুব বেশী মাত্রায় মিথ্যা।

ইউরোপ বা আমেরিকার কোন অনুসন্ধিৎসু লোক যদি জিজ্ঞাসা করে, ভারতবর্ষের মুসলমান রাজারা যেমন হিন্দুদিগকেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিতেন, ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্টও তাহা করেন কি না; উত্তরে বলা হইবে, "নিশ্চয়ই করেন;—লর্ড সিংহকে বিহার-ওড়িষার গবর্ণর নিযুক্ত করা হইয়াছিল।" ইহাও পিত্তিরক্ষা নীতির দৃষ্টান্ত।

পানামায় আমেরিকার গবর্ণ্মেণ্ট, ইটালীতে ইটালীয় গবর্ণ্মেণ্ট, ম্যালেরিয়া বিনাশ করিবার জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ভারতে ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্ট সেরূপ কিছু করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে, "অবশ্যই করেন। এই দেখুন না, বঙ্গে আগামী বৎসরের জন্য ম্যালেরিয়া বিনাশের জন্য টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে।" কিন্তু টাকার পরিমাণটা কত জানিতে চাহিলেই পিত্তিরক্ষা নীতি ধরা পড়িবে। বাংলার মত বিস্তৃত ভূখণ্ড হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার নিমিত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা (কিম্বা দু দশ লাখ টাকাও) কিছুই নয়; মানুষে যাহাতে বলিতে না পারে, যে, গবর্ণ্মেণ্ট কিছুই করিতেছেন না, সেইজন্য এই সামান্য টাকা বজেটে ধরা হইয়াছে।

যদি প্রশ্ন হয়, ইংরেজ গবর্ণ্মেণ্ট পান স্নান প্রভৃতির জন্য জল সরবরাহ করিবার নিমিত্ত কিছু করেন কি না, উত্তর পাওয়া যাইবে, "নিশ্চয়ই করেন; দেখুন না আগামী বৎসরে কেবল বাংলা দেশের জন্যই, এক আধ পয়সা নয়, পঞ্চাশটি হাজার টাকা এইজন্য খরচ

* আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথেষ্ট খাদ্য না জুটিলে কিম্বা যথেষ্ট খাইবার সুবিধা না হইলে, সামান্য কিছু খাওয়াকে গ্রাম্য ভাষায় "পিত্তি রক্ষা করা" বলে।

করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।" অথচ এই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টেরই কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বলিতেছেন,

"Now, if your want to give a sufficient water-supply to each village, I am sure you will require at least Rs. 50 crores, if not Rs. 100 crores." "যদি আপনারা প্রত্যেক গ্রামকে যথেষ্ট জল দিতে চান, তাহা হইলে, একশত কোটি টাকা না হউক, পঞ্চাশ কোটি টাকার দরকার হইবে।"

যেখানে একশ কোটি টাকা দরকার, সেখানে পঞ্চাশ হাজারের বরাদ্দ পিত্তিরক্ষা বই আর কি ?

আমরা যে কথাটা বলিতেছিলাম, তাহা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আবার তাহার অনুসরণ করা যাক।

ইহা সত্য, যে, মানুষের দৃষ্টিতে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে এমন কোন ভারতীয় নাই যিনি আজ কিম্বা কাল প্রধান সেনাপতির বা তাঁহার নীচের পদের কাজ করিতে পারেন। কিন্তু ভগবানের দৃষ্টিতে কি আছে, কেহ জানে না। হায়দার আলি বা শিবাজী অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যে অত বড় নেতা হইবেন, কে ভাবিয়াছিল ? যাহা হউক, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের পিত্তিরক্ষা নীতি বলবৎ থাকিলে একশত বৎসর পরেও উক্ত গবর্ণমেণ্ট ঠিক্ বলিতে পারিবেন, "কৈ, তোমাদের মধ্যে যোগ্য লোক ত দেখিতেছি না ?" অতএব, এই নীতিটা এখনই, এই বৎসরই, পরিবর্ত্তন করা দরকার। ইহাতে ভাবিবার কিছু নাই, রয়াল কমিশ্যন বসাইবারও কোন দরকার নাই। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যে, আপাততঃ সামরিক বিভাগ বাদে অন্য সব বিভাগে দেশের লোকদিগকে কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হউক, এবং দশ বৎসর পরে সামরিক বিভাগেও কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হউক ও তজ্জন্য এখন হইতে আয়োজন করা হউক, তাহা সমীচীন। ইংরেজ প্রধান সেনাপতি বলিতে পারেন, "আমার প্রধান সেনাপতি হইতে পঁচিশ বৎসর লাগিয়াছে ; অতএব তোমরা হঠাৎ কালই প্রধান-সেনাপতি হইতে পার না" ; কিন্তু তিনি পঁচিশ বৎসর আগে যে সামরিক শিক্ষা পাইয়াছিলেন, এবং শিক্ষান্তে যে কাজ ও উন্নতির আশা পাইয়াছিলেন, সেই ২৫ বৎসর আগে কোন্ ভারতীয়কে সেই শিক্ষার, সেই কাজ প্রাপ্তির ও সেই ভবিষ্যৎ উন্নতির আশার সুযোগ দেওয়া হয় নাই ; এখনও হইতেছে না। সুতরাং তিনি যে কথা বলিয়াছেন, তাহা অনভিপ্রেত বা অভিপ্রেত উপহাস ও বিদ্রূপ বলিয়াই আমরা ধরিব। আমরা এখন ছত্রভঙ্গ অবস্থায় দুর্ব্বল আছি। সুতরাং আমাদিগকে উপহাস করা সোজা। কিন্তু আমরা কখনও সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান্ হইতে পারিবই না, এমন বলা যায় না। এবং তাহা হইতে কত অল্প বা দীর্ঘ কাল লাগিবে, তাহাও জানা নাই। অন্ততঃ ভারতের বন্ধু কিম্বা ভারতগ্রাসেচ্ছু অন্য কোন জাতিও শক্তিমান্ হইতে পারে। সুতরাং ইংরেজই বরাবর ভারতের ভাগ্যবিধাতা থাকিবে, তাঁহাদের এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু নাই।

অতএব, ধর্ম্মের অনুগত হইতে হইলে সকল বিষয়ে পিত্তিরক্ষার নীতি ত্যাগ করা ত উচিত বটেই, সাংসারিক লাভালাভ বিবেচনার দিক্ দিয়াও উহা কর্ত্তব্য। কেননা, ভারতবর্ষ স্বাধীন বা স্বশাসক হইবেই। স্বাধীন বা স্বশাসক ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব ও সদ্ভাবের মূল্য আছে, ইহা ইংরেজের বুঝা উচিত।

—

আমেরিকায় উচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি একটি গুরুতর গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রের নৌবহর দেশরক্ষার অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ ; এবং অনেক যুদ্ধজাহাজ পেট্রোলের সাহায্যে চালিত হয় বলিয়া রাষ্ট্রের কর্ত্তারা ১৯১৫ খৃঃ অব্দে ওয়ায়োমিং প্রদেশের অন্তর্গত টীপট্ ডোম্ নামক তৈলক্ষেত্র বিশেষ করিয়া ভবিষ্যতে নৌবিভাগের প্রয়োজনের জন্য আলাদা করিয়া রাখেন। টীপট্ ডোম্ ব্যতীত অন্য দুইটি তৈলক্ষেত্রও ১৯১২ খৃঃ অব্দে এইপ্রকারে সংরক্ষিত করিয়া রাখা হয়। দেশপতি উইল্‌সনের দেশপতিত্বের সময় যুক্তরাষ্ট্রে এইপ্রকারে তৈলক্ষেত্র সংরক্ষণের বিরুদ্ধে খুব আন্দোলন হয়। ১৯২০ খৃঃ অব্দে আইন করিয়া এইসকল তৈলক্ষেত্রগুলিকে নৌ-বিভাগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে

সমর্পণ করা হয়। নৌ-বিভাগ যেরূপে উচিত মনে করেন, সেইরূপে সংরক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। অপরকে তৈলক্ষেত্র ভাড়া দেওয়া, তৈল উত্তোলন বিনিময় ইত্যাদির অধিকারও নৌবিভাগের হস্তে আইসে। কিন্তু ১৯২১ খৃঃ অব্দে দেশপতি হার্ডিং এই-সকল তৈলক্ষেত্রের ভার অভ্যন্তর-বিভাগের (Department of the Interior) হস্তে সমর্পণ করেন। এই সময় অভ্যন্তর বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন এল্‌বার্ট্ বি ফল (Albert B. Fall)। ১৯২২ খৃঃঅব্দে এই বিভাগের কর্ত্তারা টীপট্ ডোম্ তৈলক্ষেত্রটি রয়াল্‌টির সর্ত্তে হ্যারী এফ্ সিন্‌ক্লেয়ার নামক ব্যক্তির গঠিত একটি কোম্পানীকে ইজারা দেন। এই ঘটনার সমালোচনার উত্তরে বিভাগের কর্ত্তারা উত্তর দেন, যে, ঐ তৈলক্ষেত্রের তৈল পার্শ্ববর্ত্তী সল্ট্‌ক্রীক্ নামক তৈলক্ষেত্রের (Salt Creek Oil Fields) ভিতর দিয়া অপরে লইয়া যাইতেছে; সুতরাং ইজারা দিয়া তৈল উত্তোলনই সুবুদ্ধির কার্য্য। নৌবিভাগের ক্যালিফোর্ণিয়াস্থ দুইটি তৈলক্ষেত্রও এইরূপেই এল ডোহেনির গঠিত একটি কোম্পানীর হস্তে ১৯২১ ও ১৯২২ খৃঃ অব্দে গিয়া পড়ে। কিছু কাল পূর্ব্বে এইসকল ঘটনার সমালোচনার এই কারণ ছিল, যে, এইরূপ করিয়া তৈল উত্তোলন অপেক্ষা তৈল ভূগর্ভে থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু গত বৎসর কোন কোন গুজবের ফলে ব্যাপারটি নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। শুনা গেল, যে, টীপট্ ডোমের ইজারার খবর গবর্ণ্‌মেণ্টের পূর্ব্বে বাহিরে লোকেরা জানিতে পায়। এবং মিস্‌টার ফলের নিউ মেক্‌সিকোর জমিদারীতেও নাকি সেই সময় খুব ঐশ্বর্য্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। মিস্‌টার ফল্ ইহার উত্তরে বলেন, যে, তিনি ওয়াশিংটন পোষ্টের সম্পাদক এডওয়ার্ড্ বি ম্যাক্‌লিন নামক বন্ধুর নিকট হইতে ১০০,০০০ ডলার ধার করিয়া জমিদারীর চেহারা ফিরাইতেছিলেন। ম্যাক্‌লিন কিন্তু বলেন, যে, তাঁহার দত্ত চেক্‌গুলি ফল্ না ভাঙ্গাইয়াই ফেরৎ দিয়াছেন। ফল্ বলিলেন, তিনি ডোহেনি বা শিন্‌ক্লেয়ারের নিকট এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই।

গত জানুয়ারী মাসের শেষে যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেশপতি রোজেভেল্টের পুত্র আর্চ্চিবল্ড্ ডি রোজেভেল্ট্ নিজ হইতে সাক্ষ্য দেন, যে, সিন্‌ক্লেয়ার ফলের জনৈক কর্ম্মচারীকে টাকা দিয়াছেন। কর্ণেল জে ডব্‌লিউ জেভ্‌লি [সিনক্লেয়ারের টুর্ণী] সাক্ষ্য দেন, যে, ১৯২৩ সালে সিন্‌ক্লেয়ার ফল্‌কে ২৫,০০০ ডলার ধার দেন। ইহা ব্যতীত তাঁহাকে 'রুষিয়া যাইবার জন্য' সিন্‌ক্লেয়ার আরও ১০,০০০ ডলার নগদ দেন। এক গবর্ণ্‌মেণ্টের কমিটি এইসকল সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। ই এল্ ডোহেনি কমিটিকে বলেন, যে, তিনিই ১৯২২ খৃঃ অব্দে ফল্‌কে ১০০,০০০ ডলার ধার দেন।

এইসকল ঘটনা লইয়া খুব কেলেঙ্কারী হইতেছে। উচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এইরূপ উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ খুবই চিন্তার বিষয় বলিয়া যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক লক্ষ ডলার ধার্য্য করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব এটর্ণী জেনারেল্ গ্রেগরী এবং সাইলাস্ এইচ্ ষ্ট্রন দুই জনকে এই অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহারা সব-কিছু তলাইয়া দেখিবেন। আগামী দেশপতি নির্ব্বাচনের সময় টীপট্ ডোমের ব্যাপার লইয়া খুব গোলযোগ হইবে। বর্ত্তমান দেশপতি কুলিজ ফলের সময়ে হার্ডিঙ্গের মন্ত্রীসভায় ছিলেন। এইজন্য কোন কোন স্থলে তাঁহার নামেও দুর্ণাম দিবার উদ্যোগ হইতেছে। অবশ্য কুলিজের এতটা সুনাম আছে, যে, এসকল অপবাদে অল্প লোকেই বিশ্বাস করিবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ব্যবসাদারী আমেরিকার বহুকালের অপযশের কথা। কিন্তু এরূপ ব্যাপার সে দেশেও বিরল।

দেশপতি কুলিজ বলিয়াছেন, "যদি কেহ অপরাধ করিয়া থাকে, তাহার বিচার হইবে। যুক্তরাষ্ট্রের কোন সম্পত্তি যদি অবৈধ উপায়ে পরহস্তগত হইয়া থাকে তাহার পুনরুদ্ধার হইবে।"

দেখা যাক্ কি হয়।

দোষে সমান হইলেই গুণে সমান হওয়া যায় না, তা আমরা জানি ও বুঝি। স্বাধীন আমেরিকানদের যে-সব দোষ আছে, আমাদেরও সেইসব দোষ থাকিলে,

তাদের সব গুণও আমাদের আছে, এমন চমৎকার যুক্তি প্রয়োগ আমরা করি না। কিন্তু যাঁরা প্রকারান্তরে আমাদিগকে জানাইতে চান, যে, যেহেতু তাঁহারা স্বাধীন অতএব তাঁরা নির্দ্দোষ ও সকল সদ্‌গুণের আধার, তাঁদের জানা উচিত যে দুনিয়ার খবর আমরাও কিছু কিছু রাখি।

অ

—

ওলীম্পিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ

গত ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিল্লীতে প্যারিস্ ওলিম্পিক্ ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতবর্ষের যে-সকল খেলোয়াড়দিগকে পাঠান হইবে, তাঁহাদের নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হইয়াছে। সর্ব্বসুদ্ধ আট জনকে পাঠান হইবে স্থির হইয়াছে। এই আটজনের নাম, প্রদেশ ও তাঁহারা যে যে বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিবেন, তাহা আমরা নিম্নে দিতেছি।

১। দলীপ সিং	পাটিয়ালা	লম্বা লাফান
২। লক্ষনন্	মান্দ্রাজ	১২০ গজ হার্ড্‌লস্ দৌড়
৩। হিঙ্গে	বোম্বাই	ম্যারাথন্ বহুদূরব্যাপী দৌড়
৪। হল্	বাংলা (এংলো-ইণ্ডিয়ান্)	২২০ গজ দৌড়
৫। পাল সিং	উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	তিন মাইল দৌড়
৬। হীথ্‌কোট	মান্দ্রাজ (এংলো-ইণ্ডিয়ান্)	উচ্চ উল্লম্ফন
৭। পিট্	বাংলা (এংলো-ইণ্ডিয়ান্)	১০০ গজ দৌড়
৮। ভেঙ্কটরমণস্বামী	মৈসুর	১ মাইল দৌড়

দলীপ সিংহ শিখ্। তিনি লম্বা লাফান কার্য্যে সুশিক্ষিত নহেন। তথাপি ইনি স্বাভাবিকভাবেই লাফ দেওয়ায় সুদক্ষ। সকলে আশা করেন, যে, রীতিমত শিক্ষা পাইলে ইনি প্যারিসে ভারতবর্ষের সুনাম রক্ষণে সমর্থ হইবেন। হিঙ্গে নিরামিষভোজী ব্রাহ্মণ। ইঁহার ক্ষমতা দেখিয়া সকলেই ইঁহার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিতেছেন। পালা সিং সৈনিক এবং শক্তিশালী পুরুষ। ইনিও আমাদের আশার স্থল। বাংলার দুই জন প্রতিনিধিই অবাঙ্গালী। শ্রীযুক্ত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায় * দিল্লীতে যতগুলি খেলোয়াড় গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চৌকস ও সুদক্ষ বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি তিনটি বিষয়ে দ্বিতীয় হইলেও কোন বিষয়েই প্রথম হন নাই। আশা করি, ইনি ইহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া শক্তিসাধন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ইঁহার বয়স অল্প এবং দেশের লোক ইঁহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে অনেক আশা করেন।

আমাদের দেশের খেলোয়াড়্রা স্বাভাবিক শক্তি-সম্পন্ন হইলেও অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা শিক্ষার ও যথারীতি অভ্যাসের অভাবে অপরের নিকট পরাস্ত হন। গতবারের ওলিম্পিক্ ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধিগণ অত্যন্তই খারাপ ফল দেখাইয়াছিলেন। কারণ, অভ্যাস ও শিক্ষার অবহেলা। আশা করি এই বারে আমাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

অ

* "Chatterjee, who had been winning this event consistently in all the big Calcutta meets, was probably the best all-round athlete on the field; for although he won no first place he took three."—A. G. Noehren in *The Young Men of India*.

—

শ্রমজীবী মন্ত্রীসভার ভবিষ্যৎ

জনৈক রাজনীতিবিশারদ বলিয়াছেন, যে, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা শ্রমিক দলের দ্বারা চালিত হইলেও তাহা ধনিকের কার্য্যসিদ্ধি করিতেছে ঠিক পূর্ব্বেরই মত। অর্থাৎ কিনা ধনিকতন্ত্র পূর্ব্বের মতই রাজত্ব করিতেছে, যদিও রাজকর্ম্মচারীগণ শ্রমিক সংঘের সভ্য। ইঁহারা নিজেদের মতামত অনুসারে কিছু করিতে পারিতেছে না, করিতেছে পরের (ধনিকের) মতামতে। কথাটি সর্ব্বৈব সত্য না হইলেও প্রায় সত্য। শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব সম্পূর্ণ আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিতেছে না। তাহারা বিশেষরূপে অপর দলের অধীন হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ নিজেদের মতামত অনুসারে কাজ করিবার অধিক চেষ্টা করিলে বিশেষ সম্ভাবনা এই, যে, শ্রমিকদিগকে শাসকত্ব ত্যাগ করিয়া অপর ক্ষেত্রে গমন করিতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, যে, প্রথম প্রথম চুপ করিয়া থাকিয়া কিছুকাল পরে নিজেদের ইচ্ছামত কার্য্য করাই রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মতলব; আপাতত চুপ করিয়া পূর্ব্বকালীন প্রথামত কার্য্য করিয়া যাওয়া শুধু একটা

চা'ল্ মাত্র। কিছুকাল পরে না কি শ্রমিকগণ বিশ্ব-প্রেম, সাম্য ও মৈত্রীর রাজত্ব সুরু করিবেন।

আমাদের কি বিশ্বাস, তা আপাতত বলিয়া লাভ নাই। শুধু দুই একটি কথা বলা চলে।

প্রথমত, আজন্ম যাহা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়াছি, "বর্ত্তমানে তাহা'র সহায়তা করিয়া চলিব, কেননা পরে ইহাতে পুণ্য করিবার সুবিধা হইবে", এই প্রকারের নীতিশাস্ত্র কতটা উৎকৃষ্ট, তাহা ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। অনেকে এই-প্রকার ব্যবহারকে কাপুরুষতা বলিয়া থাকেন। অনেকে আবার ইহাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও পাইতে পারেন। এবিষয়ে রুচিভেদ আছে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমিকগণ ইংলণ্ডের বাসিন্দা এবং ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সহিত শ্রমিকের ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশেষরূপে জড়িত। ইংলণ্ডের আয়ব্যয়ের বিধিব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিলে, আঙুলের দাগ লাগিবে সর্ব্বাগ্রে শ্রমিকের জীবনে। যথা, ল্যাঙ্কা-শায়ারের কাপড়ের কল বন্ধ হইলে অথবা অপর কোথাও ইস্পাতের কারখানা কিম্বা জাহাজ তৈরী বন্ধ হইলে সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট পাইবে ইংলণ্ডের শ্রমজীবী। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট্ যদি উত্তমরূপে সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রচার করিতে যান, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যে গোলযোগের সূত্রপাত হইবে। ধনিক যে-প্রকারে ও যে যে উপায় অবলম্বনে বহুদেশে ইংলণ্ডীয় ব্যবসার প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, শ্রমিক তাহা ভাঙ্গিয়া গড়িতে গেলে ইংলণ্ডের (সুতরাং শ্রমিকেরও) বিশেষ আর্থিক লোক্সানের সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক তা করিবে কি?

যথা, ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে শ্রমিকের কাপড়ের কলে কাজ পাওয়া, জাহাজে স্থান পাওয়া, ইত্যাদি শক্ত হইয়া উঠিবে। ভারতপ্রীতি আগে, না স্বার্থ আগে? ইংলণ্ডের শ্রমজীবী-সম্প্রদায় যে সামাজিক পুনর্গঠন ও নানাপ্রকার আমূল পরিবর্ত্তনের চিত্র এতকাল ধরিয়া জগতের চোখের সম্মুখে ধরিয়াছিল, তাহা বাস্তবে পরিণত করিতে গেলে যে স্বার্থত্যাগ ও কষ্ট-স্বীকার প্রয়োজন, তাহার উপযুক্ত মনের ও আদর্শের জোর ইংলণ্ডের সঙ্কীর্ণমনা শ্রমজীবীর মধ্যে আছে কি?

অ

—

রাম্‌সে ম্যাক্‌ডোনাল্ডের রাষ্ট্রনীতি

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ জগৎকে জানাইয়াছেন যে, রুশিয়ার সহিত ইংলণ্ডের আর শত্রুতা রহিল না। উদ্দেশ্য—রুশিয়ার উপকার নহে। উদ্দেশ্য—ইংলণ্ডের ব্যবসা বিস্তার, রুশিয়া ভারতে বোল্‌শেভিক আন্দোলনের চেষ্টা করিতেছে, এই ভ্রান্তবিশ্বাসজনিত ভীতির নিবৃত্তি ও রুশিয়ার নিকট পুরাতন প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ। ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ অসাধারণ ঔদার্য্য দেখাইয়াছেন, বলা যায় না। লয়েড্ জর্জ্ প্রধান মন্ত্রী হইলেও এইপ্রকার ভালবাসার বাণীই জগৎ শুনিত।

ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ ভারতবর্ষকে বিপ্লববাদের নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ একটি বার্ত্তা পাঠাইয়াছেন। সেই বার্ত্তাতে আরও অনেক গভীর তত্ত্বকথাও আছে। কয়েকটি কথা ম্যাক্‌ডোনাল্ড্ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন; যথা, সদা সত্য কথা কহিবে; পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়াকে চুরি করা বলে; ইত্যাদি।

অ

—

প্রসিদ্ধ লোকের আয়ু

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হইতে ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যে-সকল প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের একটি ক্ষুদ্র তালিকা আমরা পাইয়াছি। ইহার মধ্যে সকলেই শ্বেতাঙ্গ। ইহাদের বয়স যথাক্রমে ৮০, ৫৫, ৬৭, ৭৯, ৮১, ৯১, ৭০, ৮০, ৬৫, ৬৭, ৮১, ৫৬, ৫২, ৪৫, ৬৪, ১০৩, ৬৪, এবং ৮৭।

গড়ে এইসকল লোক ৭১ বৎসরেরও অধিক বাঁচিয়া ছিলেন। ১৮ জনের মধ্যে একজন ১০০ বৎসরের অধিক বাঁচিয়া ছিলেন, ২ জন ৯০এর অধিক, ৭ জন ৮০ ও ততোধিক এবং ৮ জন ৭৫এর অধিক। ইহাঁদের মধ্যে লেখক, রাষ্ট্রনৈতিক, পুরোহিত, অধ্যাপক, সৈনিক, ব্যবসাদার ইত্যাদি নানান্ প্রকার লোক ছিলেন।

াতিতে কেহ বৃটিশ, কেহ ফরাসী, কেহ রুশীয়, কেহ পর্ত্তুগিস্ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই কেবল গাছের মত বাঁচিয়া ছিলেন না, শেষ পর্য্যন্ত অক্লান্তকর্ম্মী ও প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। এইরূপ কর্ম্মঠ ও দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ খুঁজিলে দেখা যাইবে, ইঁহারা কেহই বালকবালিকার সন্তান নহেন এবং সকলেই উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ও অন্যান্য শারীরিক এবং মানসিক নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন। আমাদের দেশ অল্পায়ুর দেশ। অল্পায়ু হওয়ার কারণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কুরীতির প্রশ্রয়দান ও উপযুক্ত আহার ব্যায়াম ইত্যাদি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য। অ

—

সোনার ভারতের অজ্ঞ [ঐশ্বর্য্য

ছোট ছোট গ্রামে যাইলেও আমরা দুই একটি দোকান দেখিতে পাই। অতিশয় ছোট গ্রামে দোকান াদি নাও থাকে, তাহা হইলেও গ্রামবাসীরা হাটে অথবা নিকটবর্ত্তী বড় গ্রামে বা সহরে যাইয়া নানা প্রকার দ্রব্য ক্রয় করে। কিন্তু গ্রামবাসী কখনও ভাবিয়া দেখে না, কি করিয়া দূরদেশবর্ত্তী আয়না- বা চিরুনী-নির্ম্মাতার প্রস্তুত জিনিস তাহার হস্তে আসিয়া পড়িল। স কখনও স্বপ্নেও ভাবে না, যে, ধান বিক্রয় করা অর্থে জাপানী আয়না বা ম্যানচেষ্টারের কাপড় ক্রয় করার মধ্যে কোনো জটিলতা আছে। কি বিরাট্ বাণিজ্যযন্ত্রের সাহায্যে তাহার ধানপাটের পরিবর্ত্তে সে শত শত দ্রব্যের অধিকারী হইতে সক্ষম হয়, তাহা গ্রামবাসী াহার জ্ঞানের অতীত। জানে, টাকা পাই ও টাকা দিয়া কিনি।

অতি পুরাকালে গ্রামের বাহিরে প্রস্তুত দ্রব্য গ্রামবাসীর হস্তে প্রায় কখনও আসিত না। গ্রামের অন্তর্গত ব্যক্তিগণই সকল দ্রব্য উৎপাদন করিয়া পরস্পরের সকল অভাব মোচন করিত—যথা, কেহ চাষ করিত, কেহ কাপড় বুনিত, কেহ ব্যাধবৃত্তি করিয়া দিন কাটাইত, কেহ বা মৎস্যজীবী ছিল। আবার অপর কেহ শিক্ষা বা পৌরোহিত্য সরবরাহ করিত। এইরূপেই গ্রামের জনসংঘের জীবন কাটিত।

তখন জীবনে অভাব ছিল অল্প, কেননা মানুষের আকাঙ্ক্ষা আজ-কালকার মত সে-যুগে এত শত শত হাত বাড়ায় নাই। আধুনিক মানুষের অভাব তাহার জ্ঞান ও আকাঙ্ক্ষার বিস্তৃতির সহিত ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। তখন গ্রামের মধ্যেই শ্রমবিভাগ করিয়া মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করিয়া সমবায়ের পথ বাহিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; কিন্তু আজ সুদূর জাপানে তাহার জন্য আয়না ও চিরুনী তৈয়ার হয়; জার্ম্মানীতে তাহার আলোয়ান বোনা হয়, ও ইংলণ্ড তাহার বস্ত্র সরবরাহ করে। এ এক বিরাট্তর সমবায় ও শ্রমবিভাগের চিত্র। কিন্তু এ চিত্র কয়জন নিরক্ষর গ্রামবাসী বুঝিয়াছে ?

বিরাট্তর ও জটিলতর হইলেই যে ইহা পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্দোবস্ত তাহার প্রমাণ কি ? আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও রেলে জাহাজে মাল আসার মধ্যেই কি মানুষের জীবনে সুখ আনয়ন করার কোনো প্রকৃতিগত ক্ষমতা আছে ? না এ এক বিরাট্ ও জটিলতাময় বে-বন্দোবস্তের চিহ্ন মাত্র ? আরও অল্পস্থল ব্যাপিয়া দেশের মধ্যেই কি ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বন্দোবস্ত করা যায় না ? অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমাইয়া ও আভ্যন্তরিক বাণিজ্য বাড়াইয়া অবস্থার উন্নতি হয় না কি ?

কে এসকল প্রশ্নের উত্তর দিবে ? কেই বা শুনিবে ? গ্রামবাসীর—দেশবাসীর—সম্বন্ধে জ্ঞানী মূক, দেশবাসী জ্ঞানীর নিকট বধির। দেশবাসী প্রাচীন কালের গুহার বাসিন্দার মতই সংকীর্ণভাবে জীবন কাটাইতেছে। অজ্ঞানতা তাহাকে অদৃষ্টবাদের মোহে ফেলিয়া রাখিয়াছে। সোনার ভারতের সোনা ভারতবাসীর চক্ষে অবাস্তব—কেননা ভারতবাসী শিক্ষার অভাবে ও কুশিক্ষায় অন্ধ। অ

—

সহরের মধ্যে সহর

আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক্ সহরের মধ্যে আর-একটি সহর আছে। এই সহরের লোকেদের নিজেদের দোকান-পাট থিয়েটার বায়োস্কোপ গির্জ্জা পাঠশালা ইত্যাদি আলাদা করিয়া আছে। ইহারা নিউইয়র্কে

বাস করে অথচ করে না। ইহাদের জীবনযাত্রা নিউ-ইয়র্কের জীবনযাত্রা নহে। শিক্ষা, শিল্প, সঙ্গীত, আনন্দ ও আর্ত্তনাদ, সবই ইহাদের নিউইয়র্কের মধ্যে থাকিলেও বাহিরে।

আড়াই লক্ষ নিগ্রো তাহাদের কালো চামড়ায় ঢাকা সুখ দুঃখ ভালবাসা হিংসা সু ও কু ভরা জীবন এই সহরে কাটায়। তাহার সহরের ভিতরের সহরে কবি শিল্পী সাহিত্যিক নট মহাজন উত্তমর্ণ কিছুরই অভাব নাই। শুধু নাই সেখানে সাদা চামড়া। সভ্য বিশ্ব-প্রেমিক আমেরিকান্ তাহার কালো সহরে সহকর্ম্মী ও সহনাগরিক নিগ্রোকে একঘরো করিয়া রাখিয়া নিজ 'উৎকৃষ্টতা' বজায় রাখিতেছে।

আমেরিকার আরও পাঁচটি সহরে এইরূপ সহরের ভিতর একটি করিয়া বড় কালো-সহর আছে। এই পাঁচটি স্থলেই এক লক্ষের বেশী নিগ্রো কোণঠাসা হইয়া দিন কাটায়। জাতির উৎকৃষ্টতা ও অধমতার মাপ-কাঠিতে যাহারা নীচে পড়ে, তাহাদের উপরওয়ালার উচ্চ জীবননির্ব্বাহ-প্রণালীতে ছায়া ফেলিবারও অধিকার নাই।

একঘরো করিয়া রাখাই একমাত্র অত্যাচার নহে। ব্যবস্থাপক সভাদিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার না পাওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া, বিনা বিচারে ফাঁসি যাওয়া, ভিন্ন রেলগাড়ীতে যাতায়াত করা, সাদা হোটেলে ও রেস্তরাঁয় আহার না পাওয়া ইত্যাদি বহু সভ্যতার ধাক্কা আমেরিকার নিগ্রোকে সামলাইতে হয়। এই-সব অত্যাচারের ফলে আমেরিকার নিগ্রোগণ সংঘবদ্ধ হইয়াছে। এক কোটি নিগ্রো আজ সমস্বরে এই অত্যাচারের শেষ দেখিতে চাহিতেছে। ইহারা অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বলকায় অজ্ঞ ভারতবাসীর মত নহে। ইহাদের শরীরে শক্তি ও মস্তকে শিক্ষাজনিত চিন্তা আছে। অনেকেই যুদ্ধের সময় সৈনিকের কার্য্য করিয়াছে। কাজেই আমেরিকার উচ্চ শ্বেতাঙ্গমহলে আজকাল লুকাইয়া মদ্যপান করিবার চিন্তা ছাড়া আরও একটি গভীরতর দুশ্চিন্তার বোঝা বাড়িয়াছে। নিগ্রোগণ শান্ত বলিয়া খ্যাত নহে। আমেরিকার রাষ্ট্রবিপ্লবের পূর্ব্বেও প্রায় পঁচিশবার নানা স্থলে নিগ্রো-বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে। বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইবার পরে এবং ১৮৬১ খৃঃ অব্দের অন্তর্বিগ্রহের পূর্ব্বে আরও বারোটি নিগ্রো-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। অন্তর্বিগ্রহের একটি কারণ ছিল, নিগ্রো দাসদিগকে মুক্তি দান। দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলিতে দাসত্বপ্রথা খুব প্রচলিত ছিল। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণের সহিত শক্রুতা করিয়া দাস-প্রথা দূর করিতে মনস্থ করে। লিঙ্কলনের মুক্তির পরোয়ানা (Emancipation Proclamation) কত দূর নিগ্রোর প্রতি ভালবাসার ফল ও কত দূর দক্ষিণকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা, তাহা বলা শক্ত। দাসত্বপ্রথা দূর করিয়া উত্তর রাষ্ট্রসমূহের মালিকগণ দক্ষিণের প্রায় ১,৫০০,০০০,০০০ ডলার ক্ষতি করেন। এই মুক্তির পরে "১,৫০০,০০০,০০০ ডলারের কৃষ্ণ হস্তিদন্ত" নিগ্রোর খুব লাভ হইয়াছিল বলা যায় না। "গৃহপালিত পশু" হইতে নিগ্রো "গৃহ হইতে বহিষ্কৃত পশু" হইয়া দাঁড়াইল মাত্র।

আজ নিগ্রোগণ জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা এসকল অত্যাচার দূর করিবে। পূর্ব্বে অপরাধী অথবা নিরপরাধী নিগ্রোকে অবাধে তাহার শ্বেতাঙ্গ প্রভু প্রহার ও অনেক সময় হত্যাও করিত। বিনাবিচারে যথেচ্ছা ও যাহার দ্বারা ইচ্ছা শাস্তি দান বা লিঞ্চিং সচরাচর ঘটিত। কিন্তু আজকাল লিঞ্চিং প্রায় আর হয় না, হয় দুই পক্ষের লড়াই। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নিগ্রোকে প্রহার করিয়া নিজেও প্রহৃত হইতেছে। সম্ভব, ইহাতে উভয় পক্ষেরই উপকার হইবে।

অ

—

ফ্রাঙ্ক্‌ও বুঝি মার্কের দশা পাইল

জার্ম্মান্ মার্কের দুরবস্থার কথা পুরাতন কথা। জার্ম্মান্‌রা ক্রমাগত নোট ছাপাইয়া যাওয়ায় মার্ক্-নোট পুরাণো কাগজের অপেক্ষাও বোধ হয় সস্তা দরে বিক্রয় হইতেছে। নোট ছাপাইবার কারণ জার্ম্মান্ গভর্ণমেণ্টের আয়ের অভাব ও ব্যয়ের বাহুল্য।

ফ্রান্স ও আজ বহুকাল ধরিয়া অযথা ও অজ্ঞাতরে

অর্থ ব্যয় করিতেছে। ফ্রান্স্ নিজের খরচ ধার করিয়া চালাইয়াও চেকো-স্লোভাকিয়া, এস্থোনিয়া, লিথুয়ানিয়া, পোল্যাণ্ড, ইউগো-স্লাভিয়া, রুমেনিয়া প্রভৃতিকে অজস্র অর্থ সাহায্য করিয়াছে। উদ্দেশ্য, ইয়োরোপে আপনার একাধিপত্য স্থাপন। ফলে যুদ্ধের জন্য ফ্রান্স্ যা ধার করিয়াছিল, শান্তির পরে তাহা অপেক্ষা অধিক ধার করিয়াছে। ১৯১৯ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের ১৪৪.৮ বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক্ ধার ছিল। ১৯২৩ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের ১৩০ বিলিয়ন ফ্রাঙ্ক ধার হইয়াছে। এত ধার করিয়া ফ্রান্সের টাকার বাজারে দুর্ণাম হইয়াছে। আজ বেশী সুদেও ফ্রান্সে টাকা পাইতে অসুবিধা হইতেছে। কাজেই ছাপাখানায় নোট ছাপা থামিতেছে না। ফ্রাঙ্কের মূল্যও গড়াইতে সুরু করিয়াছে। শান্তিপূজা ছাড়িয়া শক্তিপূজা করিলেই এই দশা হয়। রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড ও জার্ম্মেনী একপ্রকার দেউলিয়া। এবার বুঝি ফ্রান্সের পালা।

অ

—

ভারতের দারিদ্র্য

স্যার্ মোক্ষগুণ্ডম্ বিশ্বেশ্বরায়া বলেন—

"যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের সম্পত্তির মোট পরিমাণ পাঁচ হাজার চারি শত কোটি টাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। ইহাতে জন প্রতি ১৮০৲ টাকার সম্পত্তি হয়। ক্যানাডায় জন প্রতি সম্পত্তি ৪,৪০০ টাকার কিছু বেশী; ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে (বিলাতে) জন প্রতি ৬০০০৲। বর্ত্তমান সস্তা টাকার দিনেও ভারতের জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৪৫৲ হইতে ৬০৲ টাকার ভিতর। উর্দ্ধতম ৬০৲ টাকা ধরিয়া হিসাব করিলেও জন প্রতি মাসিক আয় দাঁড়ায় পাঁচ টাকা করিয়া। ক্যানাডায় জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৫৫০৲ টাকা, বিলাতে ৭২০৲ টাকা। সমগ্র ভারতের বাণিজ্য জন প্রতি ২০৲ হইতে ২৫৲ টাকা; ক্যানাডায় ৫১০৲ ও বিলাতে ৬৪০৲। আমাদের অধিকাংশ মানুষ দীন ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করে বলিয়া মৃত্যুর হার ভারতবর্ষে ভয়ানক উঁচু। ভারতবর্ষে যেখানে হাজারে ৩০ জনেরও বেশী মৃত্যু হয় সেখানে পূর্ব্বোক্ত দুই দেশে মৃত্যুর হার হাজারকরা ১৪ জনেরও কম। ভারতে মানুষের বাঁচিবার আশা গড়ে ২৪ বৎসর, ইউরোপে প্রায় ৪৫ বৎসর। শিক্ষার অবস্থাও এদেশে অতি হীন। শতকরা ছয় জনেরও কম লিখিতে পড়িতে জানে। যে-কোনো মাপকাঠির দ্বারা পরীক্ষাতেই ভারতের এই দীনতা ও অক্ষমতা প্রকাশ পায়।"

—

স্বাধীন মুসলমান

স্যর্ টমাস্ আর্নল্ড্ বলেন, পৃথিবীর ২২ কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ মুসলমান স্বাধীন ও ইউরোপীয় শাসন হইতে মুক্ত। এই অল্প-সংখ্যক স্বাধীন মানুষগুলিও যে জগদ্ব্যাপারে নিতান্ত নগণ্য নহে ইহা মুসলমানদের পৌরুষ ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

জগতে হিন্দুর সংখ্যা আনুমানিক ২২ কোটি ২৪ লক্ষ; ইহার মধ্যে নেপালের আন্দাজ পঞ্চাশ লক্ষ ও বিদেশীয় দুই চার জন হিন্দু নাগরিককে বাদ দিলে প্রায় সকলেই পরাধীন।

—

তুরস্কের রেড্ ক্রেসেণ্ট্ মিশন্

তুরস্কের রেড্ ক্রেসেণ্ট্ মিশনের চারিজন প্রতিনিধি আনাটোলিয়ার স্বদেশপ্রত্যাগত তুর্ক্ বন্দীদের দুর্গতি মোচনের উদ্দেশ্যে ভারতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন। মিঃ মেহিউদ্দিন জামাল নামক মান্দ্রাজের এক ধনী বণিক্ এক লক্ষ টাকা ইহাঁদের হাতে দান করিয়াছেন। ইহা তাঁহার তুর্ক-প্রীতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। এরকম বদান্যতাও প্রশংসনীয়। যাহা হউক, উত্তর-বঙ্গের বন্যাপীড়িত লক্ষ লক্ষ মুসলমানের দুঃখ মোচনের জন্য ইনি কত টাকা দান করিয়াছিলেন, লোকে হয়ত তাহাও জানিতে চাহিতে পারে। আমাদের কথায় অনেকের ভুল বুঝিবার আশঙ্কা ও ফলে আমাদের উপর রুষ্ট হইয়া উঠিবার ভয় থাকিলেও, আমরা মুসলমান ভাইদের কয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে বাধ্য হইলাম। দুর্ভিক্ষ বন্যা ঝড় মহামারী

ভূমিকম্প প্রভৃতি দ্বারা বিপন্ন ভারতীয় মুসলমানদের সেবার কার্য্যটা প্রায় সর্ব্বাংশে হিন্দু ও অন্যান্য অ-মুসলমানদের হাতে না ফেলিয়া দিয়া, ইঁহারা যেন তুর্ক্ মুসলমানদের ব্যথার সমান সমান করিয়াও স্বদেশী মুসলমানদের ব্যথায় ব্যথিত হন। চাকরী, প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার, প্রভৃতির ভাগ-বাটোয়ারার কথা উঠিলে স্বধর্ম্মীর সুবিধামত মীমাংসা করিবার বেলাই কেবল আজকাল তাঁহারা আপনাদিগকে একটি ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া মনে করেন; নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের সময় সে কথা মনে থাকে না।

তুর্ক্ রেড্ ক্রেসেণ্ট্ মিশন্ ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে নব্বই হাজার টাকা স্বদেশে পাঠাইয়াছেন। দান অবশ্য বাণিজ্য নহে; তথাপি জানিতে ইচ্ছা হয়, তুরস্ক হইতে কখনও এক টাকারও দান ভারতের বিপন্ন মুসলমানদের জন্য আসিয়াছিল কি না।

—

কয়লার খনিতে বেকারদের জন্য কাজ

'ক্যাথলিক হেরাল্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া' পত্র বলেন 'কলিকাতা হইতে যে আশী জন অ্যাংলোইণ্ডিয়ানকে কয়লার খনিতে কাজ করিতে পাঠানো হয়, তাহার মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ জন পুরুষের মত শেষ পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়াছিলেন এবং এখন তাঁহারা তাঁহাদের অধ্যবসায়ের ফল ভোগ করিতেছেন। কাজটি শক্ত, কিন্তু ইহাতে পরিশ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায়, সুতরাং বলিষ্ঠদেহ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কাছে লোভনীয় হইবার কথা। আসানসোলের খনি হইতে কয়লার বাল্তি বোঝাই করিয়া সত্য সত্যই পঞ্জাবীরা মাসে দুই শত হইতে তিন শত টাকা এবং ইংরেজেরা পাঁচ শত টাকা করিয়া রোজ্গার করিতেছে। প্রথমবারে বাছাই ভাল হয় নাই বলিয়া রোজ্গারের এই পথটি বন্ধ করিয়া দিলে দুঃখের বিষয় হইবে।'

ভদ্রলোক শ্রেণীর এমন সাহসী সহিষ্ণু ও শ্রমের মর্য্যাদায় বিশ্বাসী বাঙ্গালী যুবক কি নাই যাঁহারা এইরূপ সৎকার্য্যের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনের কথা ভাবিতে পারেন?

ভারতের আয়ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

ভারতবর্ষের মোট সর্কারী আয়ের অধিকাংশ যুদ্ধবিভাগের জন্য ব্যয় করা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে এক গৃহস্থের সহিত তুলনা করিতাম। গৃহস্থের আয় ১০০৲ টাকা। কিন্তু তিনি চোরডাকাতের ভয়ে অথবা কল্পিত ভয়ে কিম্বা ভয়ের ভাণে চৌকিদার লাঠিয়াল রাখেন ৬২৲ টাকা বেতনে। বাকী আটত্রিশ টাকায় খাজানা আদায়, সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা, নিজের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি করিতে হয়। ইহাতে সেই গৃহস্থের অবস্থা কিরূপ হইবে, সহজেই অনুমেয়। বিদেশী ভারত-গবর্ণমেণ্টের অবস্থা এই গৃহস্থের মত। প্রভেদ এই, যে, এই কল্পিত গৃহস্থটি সত্য সত্যই তাহার সন্তানদের পিতা; কিন্তু বিদেশী ভারত-গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় প্রজাদের মা-বাপ নহেন।

আমরা উপরে যে চোরডাকাতের ভয়ের কথা লিখিয়াছি, তাহার মধ্যে উহা তুলনাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিদেশী ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ বাস্তবিক কেবল পরদেশী শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্যই সৈন্য পোষণ করেন না, পাছে আমরা নিজেই নিজের দেশ 'আক্রমণ' করিয়া স্বদেশের মালিক হইয়া বসি, বর্ত্তমানে-প্রভু ইংরেজের এই ভয়টাও কম প্রবল নহে। যাহা হউক, ইহাও অবান্তর কথা। আমাদের প্রধান বক্তব্য বলি।

ভারতের সর্কারী আয় এখন যাহা, তাহার অধিকাংশ যদি যুদ্ধবিভাগের জন্য ব্যয়িত না হইয়া অল্প অংশ সামরিক উদ্দেশ্যে খরচ হইত, এবং বাকী সমস্ত জাতীয় উন্নতির জন্য খরচ করা হইত, তাহা হইলে তাহাও ভারতবর্ষকে অন্য সব সভ্য দেশের সমতুল্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইত না। ঐসব দেশ শিক্ষার স্বাস্থ্যের কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য জনপ্রতি যত খরচ করে, আমাদিগকে তদপেক্ষা বেশী খরচ প্রথম প্রথম করিতে হইবে; কারণ আমরা পশ্চাতে পড়িয়া আছি। কিন্তু আমাদের আয় না বাড়িলে আমরা খরচ বাড়াইতে পারি না, এবং আমাদের নিকট হইতে অধিকতর ট্যাক্স্ পাইয়া গবর্ণমেণ্টও খরচ বাড়াইতে পারেন না।

কানাডার লোকদের আয় আমাদের অন্ততঃ দশ গুণ; বিলাতের লোকদের আয় আমাদের অন্তত বারো গুণ। সুতরাং তাহারা নিজেরাও জাতীয় উন্নতির জন্য বেশী খরচ করিতে পারে, তাহাদের গবর্ণমেণ্ট্‌কে বেশী ট্যাক্স দিয়া জাতীয় উন্নতির জন্য উহাকে বেশী খরচ করিতে সমর্থ করিতেও পারে।

অন্য দিকে আবার, স্বাস্থ্য রক্ষা, সাধারণ শিক্ষা, কৃষিশিল্পবাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতিতে খরচ বেশী না করিলে আমাদের উপার্জ্জন-ক্ষমতা ও আয় বাড়িতে পারে না। আয় বাড়িলে শিক্ষাদির জন্য ব্যয় বাড়াইব, না, শিক্ষা দিবার জন্য ব্যয় বাড়াইলে তবে আয় বাড়িবে, এই উভয়সঙ্কটের মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া, দুই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে।

যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রায় কোন দেশই সাধারণ বাৎসরিক আয় হইতে যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারে না; উহার গবর্ণমেণ্ট্‌কে ঋণ করিতে হয়। ঐ ঋণ ক্রমে ক্রমে অনেক বৎসর ধরিয়া শোধ হয়। তাহাতে বর্ত্তমানের দেনার বোঝা কতকটা ভবিষ্যৎ বংশের উপরও পড়ে। ইহা ন্যায়সঙ্গত। কারণ, যুদ্ধ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষিত হইলে ভবিষ্য-বংশীয় লোকেরাও তাহার ফল ভোগ করে। দেশের উন্নতির জন্য অন্য যে-কোন স্থায়ী কাজের ফল ভবিষ্যতেও লোকে ভোগ করিবে, তাহা নির্ব্বাহের নিমিত্ত ঋণ করিয়া ক্রমে ক্রমে শোধ করা কর্ত্তব্য। যেমন, বড় বড় সহরে জল সরবরাহের কারখানা কখন কখন ঋণ করিয়া করা হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় উহার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি এবং শিক্ষার বিস্তৃতিও উন্নতির জন্য ঋণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা দরকার। ইহার জন্য দুই-তিন শত কোটি টাকা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু সামান্য একটা ওয়াজিরিস্থান অভিযানে যদি ৩৫ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্ট্ খরচ করিয়া থাকিতে পারেন, যদি গত মহাযুদ্ধের সময় ধনী ইংলণ্ডকে গরীব ভারতবর্ষ দেড়শত কোটি টাকা ঋণ করিয়া "স্বেচ্ছাকৃত দান" করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শিক্ষার উন্নতি-বিস্তৃতির জন্য দুই-তিন শত কোটি টাকা কেন খরচ করিতে পারিবেন না? সামর্থ্যের অভাব মোটেই নাই, ইচ্ছার অভাব যথেষ্ট আছে।

ভারতীয়দের আয় এবং তদ্ধেতু ভারত-গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়িলেই যে জাতীয় উন্নতির কাজে ব্যয় বাড়িবে, ইহা বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। বরং ইহাই বিশ্বাস করা সঙ্গত, যে, যত দিন ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ বিদেশী গবর্ণমেণ্ট্ থাকিবে, ততদিন উহার আয় বাড়িলে ইংরেজদের লাভ সুবিধা ও শক্তি বাড়াইবার জন্যই ইহার বেশীর ভাগ ব্যয়িত হইবে। সেই জন্য, আমাদের সত্বর জাতীয়-আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ একান্ত আবশ্যক।

—

জাতীয় কাজে ব্যয় বাড়াইবার ক্ষমতা আছে।

এদেশের গবর্ণমেণ্টকে বিদেশীর পরিবর্ত্তে স্বদেশী গবর্ণমেণ্টে পরিণত করিতে পারিলেই যে আমাদের প্রদত্ত ট্যাক্সের সুব্যবহার হইবে ও অপব্যবহার নিবারিত হইবে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। স্বাধীন দেশ-সকলেও, কেবল রাজা সম্রাট্‌রা নয়, দেশের লোকদের নির্ব্বাচিত লোকেরাও কখন কখন সরকারী টাকা দেশের কল্যাণার্থ খরচ না করিয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া থাকে। আমাদের দেশেও অনেক মিউনিসিপালিটিতে ও সরকারী বিভাগে যেভাবে টাকা খরচ হয়, তাহাকে সোজা ভাষায় চুরি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। মিউনিসিপালিটিগুলার সঙ্গে তবু বিদেশী গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক আছে। কিন্তু অসহযোগ-আন্দোলনকারীরা বিদেশী গবর্ণমেণ্টের বেতন-ভোগী বা অবৈতনিক ভৃত্য নহেন। তাঁহারা দেশের কাজের জন্য বিস্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। খিলাফৎ আন্দোলনকারীরাও বিস্তর টাকা দেশের লোকদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এইসব টাকার সমস্তটি বা অধিকাংশের সদ্ব্যয় হইয়াছে, বিশ্বাস করিবার মত প্রমাণ আমরা পাই নাই। আগেকার মডারেট্ আমলের কংগ্রেসের টাকারও সমস্তটির সদ্ব্যয়ের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কখন কখন পাওয়া যাইত না। বস্তুতঃ, ভারতবর্ষের ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট্ যাহাকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলেন, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাগুলির

মধ্যে তদ্রূপ ডাকাতি না হইলেও, অন্যবিধ রাষ্ট্রনৈতিক ডাকাত যে আমাদের মধ্যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারা কেহ বা দেশের কল্যাণার্থ সংগৃহীত টাকা আত্মসাৎ করে, কেহ বা যে-কাজের জন্য টাকা সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে ব্যয় না করিয়া নিজের বা নিজের দলের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য তাহা ব্যয় করে।

সর্কারী কর্ম্মী বা বেসরকারী কর্ম্মী দেশী হইলেই বিশ্বাসযোগ্য হইবে, মনে করা ভুল। অবশ্য, গোড়াতেই বিশ্বাসযোগ্য কর্ম্মী নিযুক্ত বা নির্ব্বাচিত করা চাই। তাহার পরেও কিন্তু সর্ব্বদা তাহার উপর চোখ রাখা চাই। কেননা, কেহ বা প্রলোভনে অসাধু হয়, কেহ বা কুসংসর্গে অসাধু হয়, আবার কেহ বা অক্ষমতা- ও বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ অপরের অসাধুতা নিবারণে অসমর্থ হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট নিজেই অসাধু বলিয়া গণিত হয়।

জাতীয় কাজের জন্য টাকা মানুষ চিনিয়া ভাল লোকের হাতে দিতে হয়, এবং দেখিতে হয়, যে, তাহার সদ্ব্যয়ের বন্দোবস্ত আছে কি না। বরাবর দৃষ্টি রাখিতে হয়, যে, সদ্ব্যয় হইতেছে কি না, হিসাব পাওয়া যাইতেছে কি না।

এইরূপ সদাজাগ্রত ও সতর্ক থাকিলে, বর্ত্তমানে জাতীয় উন্নতির জন্য যত টাকা বাস্তবিক খরচ হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী খরচ নিশ্চয়ই হইতে পারে।

তা ছাড়া, আমাদের যে-সব মঠ মন্দির আখ্ড়া আদি আছে, তাহার আয় কখনও কতকগুলি মহান্ত পাণ্ডা প্রভৃতির ভোগবিলাসের জন্য অভিপ্রেত ছিল না। ঐগুলি যে যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, তাহাদের কল্যাণার্থ তাহাদের আয় ব্যয়িত হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যসাধন যদি আমরা স্বয়ং করিতে না পারি, তাহা হইলে রাজশক্তির সাহায্য লইয়া আইন প্রণয়ন অবশ্যকর্ত্তব্য। "ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ" করা হইতেছে, ইত্যাদি চীৎকার জুড়িয়া দিলে, মহান্ত পাণ্ডা প্রভৃতিদের মধ্যে যাহারা দুর্বৃত্ত তাহাদের সুবিধাই করিয়া দেওয়া হয়।

আমাদের অনেক সামাজিক ক্রিয়াকলাপে বিস্তর অপচয় হয়। অনেকে ঋণ করিয়াও অপচয় করে। ইহা নিবারিত হইলে লোকহিত সাধনে আরো বেশী টাকা প্রযুক্ত হইতে পারে।

বহুকাল হইতে বহু দেশহিতৈষী বলিয়া আসিতেছেন এবং ইহা সহজে বুদ্ধিগম্যও বটে, যে, আমরা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ না করিলে, এবং ঝগড়া বিবাদ ঘটিলে আপোসে তাহা মিটাইয়া ফেলিলে, মোকদ্দমার খরচটা বাঁচিয়া যায়। ইহাতে সদ্ব্যয়ের ক্ষমতা বাড়ে। অবশ্য টাকা হাতে থাকিলেই যে মানুষ সব সময় সদ্ব্যয় করিবে, এমন আশা করা যায় না। কিন্তু যদি সুবুদ্ধি-বশতঃ মানুষ ঝগড়া বিবাদ না করে বা আপোসে মিটাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই সুবুদ্ধি তাহাকে উদ্বৃত্ত টাকার কিয়দংশ লোকহিতার্থ ব্যয় করিতেও প্রবৃত্ত করিতে পারে।

সমগ্র ভারতবর্ষের আদালতের আয় কম নয়। ১৯২০ সালে উহা সাত কোটি বারো লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচ শত পঁয়তাল্লিশ টাকা হইয়াছিল। তা ছাড়া, পক্ষদিগকে উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার খরচ, খোরাকী ও তদ্বীরের খরচা প্রভৃতি করিতে হইয়াছিল। মোট খরচ পনর ষোল কোটি টাকা ধরিলে বেশী ধরা হইবে না। ইহার সিকি চারি কোটি টাকাও লোকহিতার্থ ব্যয়িত হইলে কত না মঙ্গল হয়! শুধু বাংলাদেশেই আদালতের আয় ১৯২০ সালে এক কোটি সাতাশি লক্ষ ছিয়াত্তর টাকা হইয়াছিল। এত আয় আর কোন প্রদেশে হয় নাই। বঙ্গে পক্ষদের মোট মোকদ্দমা খরচ চারি কোটি টাকা হইয়া থাকিবে। ইহার সিকি এক কোটি টাকাও লোকহিতার্থ বঙ্গে ব্যয়িত হইলে কত উপকার হয়। মহাত্মা গান্ধির দলের লোকেরা যদি তাঁহার উপদেশ অনুসারে দেশের লোককে ঝগড়া বিবাদ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন, কিম্বা ঝগড়া বিবাদ আপোসে মিটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে দেশের মহা উপকার হইত।

সমগ্র ভারতের ষ্ট্যাম্প-রাজস্ব ১৯২০-২১ সালে ১০,৯৫,৬৮,৪৮৩ টাকা—প্রায় এগার কোটি টাকা—হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বঙ্গে ২,৮২,২৯,১৭৪ টাকা। ইহারও অনেক অংশ অপচয় মাত্র; তাহা বাঁচাইয়া সৎকার্য্যে লাগাইতে পারা যায়। সমগ্র ভারতে কোর্ট্-ফী ষ্ট্যাম্পেরই পরিমাণ ঐ সালে ৬,৭৮,৬১, ৩৭৩ টাকা।

তাহার পর খুব বড় একটা অপব্যয় ধরুন। ইহা মদ গাঁজা প্রভৃতির জন্য ব্যয়। সমগ্র ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের

আব্‌কারী রাজস্ব ১৯২০-২১ সালে ২০,৪৩,৬৫,৩৫৯ টাকা হইয়াছিল। তাহার পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে নিশ্চয় আরও বেশী হইয়াছে; সম্ভবতঃ পঁচিশ কোটি টাকা হইয়াছে। ইহা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ট্যাক্সরূপে পাইয়াছেন। যাহারা নেশা করিয়াছে, তাহারা ইহার চেয়ে অনেক বেশী টাকা খরচ করিয়াছে। হয়ত একশত কোটি টাকা তাহাদের পকেট্ বা ট্যাঁক্ হইতে নেশার জন্য খরচ হইয়াছে। পঞ্চাশ কোটি ত নিশ্চয়ই হইয়াছে। এই পঞ্চাশ কোটি টাকায় নেশাখোররা যদি নিজে পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট খাইত ও পরিবারবর্গকে খাইতে দিত, এবং সন্তানদের শিক্ষাদির জন্য কিছু ব্যয় করিত, তাহা হইলে প্রভূত জাতীয় কল্যাণ সাধিত হইত। অধিকন্তু তাহারা ইহার কিয়দংশ পর-হিতের জন্য ব্যয় করিলে ত সোনায় সোহাগা হইত।

আবগারী সম্বন্ধে বাংলাদেশের অবস্থা খুব খারাপ হইলেও উহা সকলের চেয়ে অধম নহে। ১৯২০-২১ সালে উহার আব্‌কারী আয় ১,৯৬,৬৭,৫৮৮ টাকা হইয়াছিল; মাদ্রাজের ৫,৪৩,৫৬,৯০৪, বোম্বাইয়ের ৪,৬০,৬৭,৮৪৩।

নেশাখোরী অভ্যাস দূর করিবার চেষ্টা বহু বৎসর হইতে হইতেছে; মহাত্মা গান্ধীও ইহার উপর খুব জোর দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কার্য্যতঃ চেষ্টাটা খুব ক্ষীণ ভাবেই হইতেছে।

নেশায় কেবল যে টাকাগুলাই নষ্ট হয়, তাহা নহে; মানুষের স্বাস্থ্য যায়, চরিত্র খারাপ হয়, ধর্ম্ম যায়, বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে ও বুদ্ধির মন্দতা জন্মে।

গবর্ণ্‌মেণ্ট্ যে সাড়ে কুড়ি কোটি টাকা পান, তাহার মধ্যে খরচ হয় মাত্র সওয়া এককোটি টাকা; বাকী সওয়া উনিশ কোটি টাকা মুনফা সরকার বাহাদুর মানুষের অধোগতি হইতে লাভ করেন।

আমরা নেশার জিনিসের দোকান বন্ধ করিতে সমর্থ না হইতে পারি; কিন্তু মুখ বন্ধ করিতে ও করাইতে পারি। মানুষকে বলপূর্ব্বক হাঁ করাইয়া তাহাতে মদ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা এপর্য্যন্ত কোন গবর্ণ্‌মেণ্ট্ করে নাই।

—

বাংলা দেশের আয় ব্যয়

সমগ্র ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধে যেমন দেশের লোকদের এই একটি মন্তব্য বরাবর চলিয়া আসিতেছে, যে, সৈন্যদের জন্য অত্যন্ত বেশী খরচ করা হয়, তেমনি বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রতি বৎসর বলা হইয়া থাকে, যে, পুলিশের জন্য অত্যন্ত বেশী ব্যয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমালোচনায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই। কারণ, আমাদের বিদেশী গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বিশ্বাস করেন, যে, বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে দেশ রক্ষা করিবার উপায় দুটি; (১) সেনাদল, (২) পুলিশ। ইংরেজ সরকারকে যেমন দেখিতে হয়, যে, ভারতবর্ষ যেন পরদেশী অন্য কাহারও হাতে গিয়া না পড়ে, তেমনি ইহাও দেখিতে হয়, যে, দেশটা যেন দেশের লোকদের হাতে গিয়াও না পড়ে। এই-জন্য শাদা ও কালা সৈনিক এবং শাদা ও কালা পুলিশের এত আদর। এইজন্য, পুলিশের বেতন ও উপরিপাওনা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাদের মশারির জন্য এক লাখ টাকা দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু দেশের লোকদিগকে ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকাই যথেষ্ট। "প্রকাশ থাকে, যে," বাংলার লোক-সংখ্যা চারিকোটি সাতষট্টি লক্ষ. এবং অধস্তন পুলিশ কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২৫৯৯৩ ও উপরওয়ালা পুলিশের সংখ্যা ২৪০০; আরও "প্রকাশ থাকে, যে," দেশের লোকের গড় মাসিক আয় সরকারী সর্ব্বোচ্চ আন্দাজ অনুসারে জনপ্রতি পাঁচ টাকা এবং পুলিশের নিম্নতম কর্ম্মচারীর আয় তার চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং প্রমাণ হইল, যে, পুলিশের জন্য এক লাখ ও দেশের লোকের জন্য আধ লাখ ঠিক ন্যায়সঙ্গত। দেশের লোকেরা ম্যালেরিয়া হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মশারি ব্যবহার করুক, ইহা অবশ্য সরকার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাহারা নিজ ব্যয়ে মশারি সংগ্রহ করিয়া স্বাবলম্বন শিক্ষা করুক, ইহাও সরকারের অভিপ্রায়। দরিদ্রতর জনসাধারণের সম্বন্ধে সরকারের এই শুভ ইচ্ছা সম্পন্নতর পুলিশ কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে কেন পোষিত হয় না, তাহা জিজ্ঞাসা করা বেয়াদবি মাত্র। পাঠশালার গুরু মহাশয়, ডাক-ঘরের হরকরা ও পোষ্ট্‌ম্যান্, আদালতের চাপরাসী ও

পিয়াদা প্রভৃতি অল্প বেতনের লোকদের জন্য কেন সরকারী ব্যয়ে মশারির ব্যবস্থা হইল না, তাহাও জিজ্ঞাস্য বটে। কিন্তু উত্তর সহজেই অনুমেয়।

—

ব্রিটিশ শান্তি

ব্রিটিশ জাতি কেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে অধিকারী, তাহার এই একটা প্রধান কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারতে শান্তি স্থাপন করিয়াছে। এই শান্তির নাম লাটিন্ ভাষায় প্যাক্স্ ব্রিটানিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মানে ব্রিটানিক্ শান্তি। সাধারণ শান্তি হইতে ইহার পার্থক্য আছে। তাহা বুঝিতে পারিলেই, যে-সৈন্যদল ও পুলিশের সাহায্যে এই শান্তি রক্ষিত হয়, তাহাদের আদর কেন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বুঝা যাইবে। শান্তি মানে আমরা বুঝি এই, যে, মানুষ নিরুদ্বেগে আরামে থাকিবে। মানুষের উদ্বেগ ও দুঃখ নানা কারণে হয়। ম্যালেরিয়াতে, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ও অন্যান্য রোগে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে; যাহারা ব্যাধি আক্রমণের পর বাঁচিয়া থাকে, তাহারাও আরোগ্যলাভের পূর্ব্বে অনেক কষ্ট পায়, এবং পরেও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। মানুষ মরিয়া যাওয়ায় উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হয়, চিকিৎসাতে অনেক টাকা খরচ হয়, দুর্ব্বল মানুষ তেমন রোজগার করিতে পারে না যেমন সে সবল অবস্থায় পারে। সুতরাং দেশে নানা ব্যাধির প্রাদুর্ভাবে আর্থিক ক্ষতিও হয়। এইসব কারণে, লোকে, দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া, অশান্তিতে কাল যাপন করে। কিন্তু এই অশান্তি দূর করিয়া শান্তি স্থাপন, অর্থাৎ দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা ভাল করিয়া অকালমৃত্যু ও আর্থিক ক্ষতি নিবারণ দ্বারা মানুষকে শান্তি দেওয়ার নাম প্যাক্স্ ব্রিটানিকা বা ব্রিটিশ শান্তি নহে। রোগে দু দশ লাখ লোকের মৃত্যু ও কোটি লোকের দুর্ব্বলতা এবং বহু কোটি টাকার ক্ষতি দ্বারা যে অশান্তি হয়, তাহা দূর করা ব্রিটানিক্ শান্তি নয়। দেশে যে কয়েক শত খুন-জখম হয় এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যাহা কিছু খুন-জখম হয়, তাহা হইয়া যাইবার পর পুলিশ গিয়া যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, তাহার নাম ব্রিটানিক্ শান্তি স্থাপন। চুরি ডাকাতিতে যে কয়েক লক্ষ টাকা অপহৃত হয়, তাহা হইয়া যাইবার পর চোর দস্যু বা চোর দস্যু বলিয়া ধৃত লোকদিগকে শাস্তি দেওয়ার নাম ব্রিটানিক্ শান্তি স্থাপন। দেশে ব্রিটিশ শান্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারতে অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে যত লোক মরিয়াছে, এবং যত টাকার সম্পত্তি লুট হইয়াছে, প্লেগ ম্যালেরিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে ও দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে, এবং আর্থিক ক্ষতিও তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। তাহাতে মানুষের খুব অশান্তিও হইয়াছে। কিন্তু যে-সব ইংরেজ ও ভারতীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ এই অধিকতর জীবননাশ ও অধিকতর অর্থনাশ নিবারণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ব্রিটিশ শান্তিস্থাপক নহেন। ব্রিটিশ শান্তির প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা যাঁহাদের সম্পর্ক অল্পতর জীবননাশ ও অর্থনাশের সহিত। এই লোক-গুলিরই আদর বেশী। কারণ, তাহারা দেশটিকে ঠাণ্ডা রাখিয়া ব্রিটিশ অর্থাৎ ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত রাখে। যে-দেশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত, তথাকার শান্তিই ব্রিটিশ শান্তি। কোনো স্বাধীন দেশে খুব বেশী শান্তি থাকিতে পারে, ব্রিটিশ ভারতবর্ষ অপেক্ষাও বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ব্রিটিশ শান্তি নহে, কারণ সে দেশটাই যে ব্রিটিশ নহে অর্থাৎ ইংরেজের অধিকারভুক্ত নহে।

—

বঙ্গে জল সরবরাহ

সরকার পক্ষ হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যে, দেশে দেশে জল সরবরাহ করা গবর্ণমেণ্টের কাজ নহে। কোন্‌টা উহার কাজ, কোন্‌টা নয়, সে-বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ নাই। সেকালের ভারতীয় রাজারা বহু জলাশয় কূপ আদি খনন করাইয়াছিলেন। আধুনিক কালেও কোন কোন দেশী রাজ্যে বৃহৎ জলাশয় খনিত হইয়াছে। সাধারণতঃ যাহা রাজশক্তির কাজ নয়, বিশেষ কারণে ও অবস্থায় তাহা রাজকর্ত্তব্য হইয়া উঠে। সাধারণতঃ মানুষকে খাইতে দেওয়া রাজশক্তির কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় কর্ত্তব্য। তেমনি সাধারণতঃ জল জোগান সরকারী কাজ না হইলেও, অবস্থাবিশেষে উহা সরকারী কর্ত্তব্য। বঙ্গে সেই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে। আমাদের মনে হয়, যে, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে, যতটুকু দরকার, তার চেয়ে বেশী প্রমাণ করা হইয়াছে। যদি জল সরবরাহ করা রাজশক্তির কাজই নয়, তাহা হইলে ৫০,০০০৲ টাকাই বা কেন দেওয়া হয়? আরও বেশী নাকি দেওয়া হইত, অর্থকৃচ্ছ্রতা বশতঃ নাকি দেওয়া হয় নাই। এই সাধু ইচ্ছা পোষণ করিবারই বা কি দরকার ছিল? যাহা সরকারের কর্ত্তব্য নহে, তাহার নিমিত্ত ৫০০০০৲ টাকার মত সামান্য টাকাও অপব্যয় করা উচিত নয়। এই টাকায় লাটসাহেব ও তাঁহার পারিষদবর্গের মশারি কিনিয়া দিলে কেহ টুঁ শব্দটি করিতে পারিত না।

দত্তমহাশয় দেশহিতৈষী, তাহা আমরা জানি। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথার সহিত আমরা একমত। দেশে যত পুরাতন পুকুর আছে, তাহার পঙ্কোদ্ধার করাইয়া জল বিশুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলে চলে জানি; এবং ইহাও লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে, দেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, অকথ্যভাবে জল দূষিত করে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানাভাববশতঃ আমরা বুঝিতে পারিলাম না, যে, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড ও গ্রাম্য ইউনিয়নগুলি যে জল সরবরাহের জন্য নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ করে নাই বা করিতে পারে নাই, তাহার কারণ কি? তাহারা কি অন্য রকমে টাকা অপব্যয় করিয়াছে? না, তাহাদের উপর অর্পিত সমুদয় কাজ করিবার মত টাকা তাহাদের না থাকায় তাহারা কোনটাই ভাল করিয়া করিতে পারে নাই? আমরা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের অনুমান এই, যে, দেশটাই গরীব হইয়া গিয়াছে; এই কারণে ইহার ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ প্রভৃতির আয় যথেষ্ট নাই। দত্তমহাশয় ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ প্রভৃতির হাতের যে কয় লক্ষ টাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সমস্তই জল সরবরাহের জন্য খরচ করিলেও যথেষ্ট হইত না। কারণ তাহার ন্যূনতম আনুমানিক ব্যয় ৮ কোটি এবং অধিকতম একশত কোটি।

—

কে অপব্যয় করে?

যখন গ্রাম্য ইউনিয়ন্, ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড্ বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট্, কাহারও হাতে যথেষ্ট টাকা নাই, তখন দেখা উচিত, কে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অপব্যয় করে। ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ এবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী, তাহার পর প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট্। ইহাদের অপব্যয় নিবারণ করিতে পারিলে জলের জন্য এক শত কোটি টাকা খরচ করাও অসাধ্য হয় না। যুদ্ধের সময় যে ১৫০ কোটি "স্বেচ্ছাকৃত দান" ভারতের নিকট হইতে আদায় করা হইয়াছিল, উহা অপব্যয়। ইংলণ্ড্ অনেক হাজার কোটি টাকা যুদ্ধে ব্যয় করিয়াছেন নিজের স্বাধীনতা ও স্বার্থ রক্ষা এবং সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য; গরীব ভারতের তুচ্ছ ১৫০ কোটি টাকা না লইলেও তাঁহার চলিত। উহা কেবল জগদ্বাসীর নিকট ভারতের ব্রিটিশরাজ-ভক্তি প্রমাণ করিবার জন্য লওয়া হইয়াছিল। রিভার্স্ কৌন্সিল্ বিল্স্ দ্বারা যে ভারতবর্ষের ৩০।৩৫ কোটি টাকা লওয়া হইয়াছে, তাহারই বা ন্যায্যতা কি? এইরকম আরো নানা অপব্যয় যদি ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ না করিয়া এক-একটা প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্য বিশ পঞ্চাশ কোটি টাকা মঞ্জুর করিতেন তাহা সদ্ব্যয় হইত, এবং তাহা সাধ্যাতীত হইত না।

—

বাংলা দেশের দাবী

বাংলা দেশের লোকদিগকে বাধ্য হইয়া ভিখারী সাজিতে হইয়াছে। কিন্তু আমরা যা চাই, উহা আমাদের ন্যায্য পাওনা। দু একটা দৃষ্টান্ত দি।

পাট বাংলার একটা প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। উহা প্রস্তুত করিবার জন্য বাংলার বহু জেলার জল পাট পচাইয়া মানুষের অব্যবহার্য্য করা হয়। অথচ উহা হইতে সরকারী যে আয় হয়, তাহা বাংলা পায় না, ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ গ্রাস করেন। বাংলা দেশ যদি বলে, আমাদের জল নষ্ট করিয়া আমরা পাট তৈয়ার করি, অতএব ভাল জলের জন্য আমাদিগকে ঐ টাকা দাও, তাহা কি অন্যায়?

টাকাটাও বড় কম নয়। শুধু ১৯২০-২১ সালেই পাটের রপ্তানী-শুল্ক হইতে ৩,২১,১২,৬২৮ টাকা সরকারী আয় হইয়াছিল। এইরকম তিন বৎসরের টাকা দিলেই ত গ্রামে গ্রামে একটা কূপ বা পুষ্করিণী হইতে পারিত। ইহার উপর চা'ল ও চায়ের রপ্তানী-শুল্ক আছে। তাহারও কিছু অংশ বাংলার পাওনা।

বাংলা দেশ হইতে ইন্‌কম্ ট্যাক্স ১৯২০-২১ সালেই ৮,৩৯,৭৫,২৯১ টাকা আদায় হইয়াছিল। তাহার আগের বৎসর সাড়ে নয় কোটি টাকার উপর আদায় হইয়াছিল। এই প্রভূত আয়ের কোন অংশ বাংলা পায় না। ইহা কি ন্যায়সঙ্গত?

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কোন্ কোন্ ট্যাক্সের আয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ লইবেন, তাহার ব্যবস্থা লর্ড মেস্‌টন্ করেন। ইহার নাম মেস্‌টন্ সেট্‌ল্‌মেণ্ট। ইহা এমন ভাবে করা হইয়াছে, যে, যদিও বঙ্গে সব প্রদেশের চেয়ে বেশী রাজস্ব আদায় হয়, তথাপি এখানেই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের জনপ্রতি খরচ করিবার ক্ষমতা সকলের চেয়ে কম। এইজন্য বাংলা-গবর্ণমেণ্ট্ পর্য্যন্ত মেস্‌টন্ সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌কে বেবমানী ব্যবস্থা বা ইনিকুইটাস্ সেট্‌ল্‌মেণ্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অবশ্য একথা সত্য, যে, বাংলা দেশে ইংরেজেরই কৃত ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায়, এই প্রদেশে ভূমির রাজস্ব অন্য বড় বড় প্রদেশ অপেক্ষা কম। তজ্জন্য, আদায়াদি খরচ বাদে কোন্ কোন্ প্রদেশ হইতে তাহার বর্গফল ও লোকসংখ্যা অনুসারে ভারত-গবর্ণমেণ্ট্ কত পান, তাহা স্থির করিয়া, বাংলা হইতে যে পরিমাণ কম পান, তাহা বাংলার অন্য আয় হইতে লইতে পারেন।

কিন্তু বাংলার প্রধান আয়গুলি গ্রাস করা ভারতসরকারের জবরদস্তি মাত্র। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে মোট আদায়ের শতকরা নির্দ্দিষ্ট অংশ ভারত-গবর্ণেণ্ট লইলে ন্যায় বিচার হয়। গরীব প্রদেশগুলিকে না হয় কিছু মাফ্ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার রক্ত যেভাবে শোষণ করা হইতেছে, তাহা অতীব গর্হিত।

—

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্



অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্, এফ্ আরএস্

বিলাতের রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো অর্থাৎ সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার মত উচ্চ বৈজ্ঞানিক সম্মান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর নাই। ইতিপূর্ব্বে প্রথমে মান্দ্রাজের স্বর্গীয় গণিতজ্ঞ রামানুজন্ উহার ফেলো হইয়াছিলেন। তাহার পর আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু নির্ব্বাচিত হন। এক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের তারকনাথ পালিত অধ্যাপক চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন্ রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহা ভারতীয়দের পক্ষে আহ্লাদ ও গৌরবের বিষয়। অধ্যাপক রামন্ মান্দ্রাজে শিক্ষা লাভ করেন। তথাকার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে সহজেই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি বি-এ পাস করেন, এবং তাহার দুই বৎসর পরে আগেকার সব এম্ এ অপেক্ষা বেশী নম্বর পাইয়া এম্ এ পাস করেন। প্রায় তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভারতীয় হিসাব-বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সহকারী একাউণ্ট্যাণ্ট্ জেনারেল হন। তিনি ৩৫ বৎসর বয়সেই রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো হইয়াছেন, ইহা খুব প্রশংসার কথা। তিনি ভারত-গবর্ণমেণ্টের হিসাব-বিভাগের চাকরীতে থাকিলে কালে খুব মোটা বেতন পাইতে পারিতেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে তাহার অর্দ্ধেকও শেষ পর্য্যন্ত পাইবেন কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি যে অর্থের মায়া কাটাইয়াছেন, রয়্যাল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হওয়ায় এই স্বার্থত্যাগের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যই এই ফেলোশিপ্ দেওয়া হয়। ১৭ বৎসর বয়সে ছাত্র থাকিতেই তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বয়সে তাঁহার প্রথম গবেষণা ইংরেজী ফিলসফিক্যাল্ ম্যাগাজিনে মুদ্রিত হয়। গবেষণায় তাঁহার কৃতিত্বের বিশেষত্ব এই, যে, তিনি কেবল ভারতবর্ষেই, শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কোনও প্রসিদ্ধ গবেষকের নিকট গবেষণা শিখিবার সুযোগ পান

নাই, এবং কলিকাতায় যে দুই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামন্দিরে গবেষণা-কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার কোনটিতেই যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম যথেষ্ট নাই।

—

বাধাপ্রদান নীতি

বিলাতী পার্লেমেণ্টে এবং অন্যান্য দেশের ব্যবস্থাপক সভায় যখন কোন দলের রাজনৈতিকগণ নিজেদের প্রস্তাব আদর্শ মত বা বাঞ্ছা অনুসারে গবর্ণমেণ্ট্‌কে কোন আইন প্রণয়ন বা কাজ করাইতে কিম্বা ঈপ্সিত কোন অধিকার লাভ করিতে পারেন না, তখন তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সমুদয় প্রস্তাবে আইনে কাজে অমত প্রকাশ করিয়া বাধা দিয়া থাকেন। ইহা ইতিহাসে সুপরিচিত নীতি—তোমরা আমাদের কথা শুনিবে না, আমরাও তোমাদের কথা শুনিব না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে স্বরাজ্যদলের প্রতিনিধিগণ এবং অন্য কোন কোন প্রতিনিধি এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট্ ইতিমধ্যে অনেকবার ভোটে পরাজিত হইয়াছেন।

বাধাদান-নীতি সভ্যদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহের ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও কিন্তু এংলোইণ্ডিয়ান্ এবং কোন কোন দেশী কাগজ এমন ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, যেন এটা একটা অশ্রুতপূর্ব্ব গর্হিত কাজ। কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাতে আমাদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইবে—ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতশাসনপ্রণালীর যে সংস্কার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহৃত হইবে। আমাদের সে আশঙ্কা নাই। ইংরেজ জাতি পৃথিবীর লোককে দেখাইতে চান, যে, তাহারা ভারতবর্ষকে তাহার অধিবাসীদের সম্মতি অনুসারে শাসন করিতেছে, শাক্ত শাসন জবরদস্তী দ্বারা চালাইতেছে না। এইজন্য স্বাধীন দেশে যেরূপ ব্যবস্থাপক সভা আছে, তাহার নকল মেকি ব্যবস্থাপক সভা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাধাদান-নীতি অনুসৃত হওয়ায় ইংরেজ চটিয়া-মটিয়া হঠাৎ নিজের মুখোস খুলিয়া জগতের সম্মুখে স্ব-ইচ্ছাচারী শাসক বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। রাজনৈতিক কপটাচরণে অভ্যস্ত লোকদের অত সহজে চটিয়া কাজ করিলে চলে না।

সরকারী কাজও অচল হইবার সম্ভাবনা নাই। গবর্ণর্ জেনারেল্ ও প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে ভারতশাসন আইনে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে। তাহারা সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া বজেটের যে-সব বরাদ্দ ব্যবস্থাপক সভায় নামঞ্জুর হইতেছে, তাহা মঞ্জুর করিয়া দিবেন। এই প্রকারে কিছু দিন কাজ চলিবে।

শেষ ফল কি হইবে, সে-বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা অসম্ভব নহে; কিন্তু কখন সেই শেষ ফল ফলিবে, বলা সম্ভব নহে। আমরা জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিবই, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কখন্ করিব, তাহার তারিখ ফেলিবার সাধ্য কাহারও নাই।

আপাততঃ শাসনকর্ত্তারা আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার দ্বারা কাজ চালাইবেন। ইতিমধ্যে বিলাতী মন্ত্রীসভা অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত যে কমিটী নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ কোন কোন দিকে ভারতশাসনসংস্কার আইনের পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিবেন। যদি সেই প্রস্তাবগুলি ভারতীয়দের ইচ্ছানুরূপ হয় এবং তদনুসারে আইন পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ভালই। নতুবা জাতীয়আত্মকর্তৃত্বলিপ্সু প্রতিনিধিদিগকে বাধাদান নীতি অনুসারে কাজ করিতে থাকিতে হইবে। তাহার উত্তরে শাসনকর্ত্তারা আইনপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে টাকা মঞ্জুর করিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন। তখন বাধাপ্রদাতাদিগকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ট্যাক্স না দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। যদি দেশের লোক তাঁহাদের নেতৃত্বে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট্ সম্পত্তি ক্রোক্ ও নিলাম্ প্রভৃতি নানা উপায়ে ট্যাক্স আদায়ের চেষ্টা করিবেন। এই প্রকারে সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, প্রাণ গেলেও, ট্যাক্স দিব না, শান্তভাবে দৃঢ়তার সহিত এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে দেশের জিত অবশ্যম্ভাবী।

ইহার পর আমরা লিখিতে যাইতেছিলাম, যে ট্যাক্স আদায় উপলক্ষে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা শান্তিভঙ্গ খুন-জখম হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহার ফলে "সামরিক আইন" প্রবর্ত্তন ও কিছুকাল ভীষণ শাক্ত শাসনের প্রচলনের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু দেশের লোক সে অবস্থাতেও দৃঢ় থাকিলে লোকমত জয়ী হইবেই হইবে,......

এমন সময় কাগজে দেখিলাম, স্বরাজ্য দল ও ন্যাশ্যনালিস্ট (nationlist) দল বাধাদান-নীতি ত্যাগ করিয়া, আগেকার স্বাধীনচেতা মডারেট্ প্রতিনিধিদের মত, বজেটের প্রত্যেক বরাদ্দ সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার করিয়া অনুকূল বা প্রতিকূল ভোট দিবেন। কি কারণে তাঁহাদের এই নীতি ও মতি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বলিতে পারি না। পণ্ডিত মোতীলাল নেহ্‌রু যে কারণ দেখাইয়াছেন, তাহা যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না।

অপব্যয়ের জন্য বরাদ্দে ত সম্মত হইবই না, ভাল কাজের জন্য টাকার বরাদ্দেও সম্মতি দিব না, এইপ্রকার উভয়মুখী বাধায় ধর্ম্মবুদ্ধি সাধারণতঃ সায় দেয় না। কিন্তু যদি কাহারও ধারণা এইরূপ হয়, যে, গবর্ণমেণ্ট্ কতকগুলা দেশহিতকর কাজে কিছু টাকা খরচ করেন কেবল নিজেদের

আসল মংলবটা ঢাকা দিবার জন্য ও তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য, তাহা হইলে ভাল কাজের বরাদ্দেও বাধা দেওয়া চলে। কিন্তু সেস্থলে বাধাদাতাদের বেসরকারী ব্যবস্থা দ্বারা সেই ভাল কাজ করিবার ক্ষমতা থাকা উচিত। দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, জলাভাবে লোকের প্রাণ যাইতে বসিলে তাহা রক্ষার জন্য সরকারী টাকার বরাদ্দ এইজাতীয়।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার কয়েকটি প্রশ্নপত্রে এরূপ ছাপার ভুল আছে, যে, প্রশ্নগুলির ঠিক্ উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এরূপ ভুল নূতন নয়। প্রশ্নপত্র বিলাতে ছাপা হয় বলিয়া এইরকম ভুল হয়। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ভুলের জন্য পরীক্ষিত ছাত্রদের ক্ষতি হওয়া উচিত নয়। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ত পাস্ হয়; সব ক'টাকেই পাস্ করিয়া দিলে আর দুঃখ থাকে না। ভবিষ্যতে যদি এরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, যে, পরীক্ষার ফী জমা দিলেই পাস্, তাহা হইলে প্রশ্নপত্র ছাপান, পরীক্ষকদিগকে টাকা দেওয়া, নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদির খরচটা বাঁচিয়া যায়, এবং ছেলেমেয়েগুলাও অনেক ঝঞ্চাট ও উদ্বেগ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

প্রশ্নপত্রসকল বিদেশে মুদ্রণের বন্দোবস্তের মধ্যে যে গভীর জাতীয় অপমান ও কলঙ্ক উহ্য রহিয়াছে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার হুঙ্কারকারীদেরও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে তাঁহারা এবিষয়ে স্বাধীন করিতে পারেন নাই। এদেশে প্রশ্ন না ছাপাইবার কারণ এই, যে, প্রশ্ন চুরি যাইতে পারে। চুরির সুবিধার জন্য ঘুস্ দিবার ও ঘুস্ লইবার লোক অনেক আছে। অন্য সব দেশের লোকেরা আমাদের চেয়ে সাধু কি অসাধু, তাহা বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। অন্য সভ্য দেশের লোকেরা কিন্তু নিজেদের প্রশ্ন নিজেরাই ছাপে; হয় ত তাহাতে কখন কখন পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন বাহির হইয়াও যায়। কিন্তু তথাপি তাহারা অন্য দেশে ছাপিবার হীনতা স্বীকার করে না।

আমেরিকার প্রিন্স্‌টন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্য কোন কোন স্থানে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের পাহারা দিবার বন্দোবস্ত নাই; তাহাদের আত্মসম্মানবোধের (sense of honourএর) উপর নির্ভর করা হয়। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের নিয়মও এইরূপ।

—

খলিফার পদ লোপ

মৌলানা শৌকৎ আলি মুস্তাফা কমাল পাশা মহাশয়ের খিলাফৎ সম্বন্ধীয় টেলিগ্রামের উত্তরে ঠিকই লিখিয়াছেন, যে, উহা বিশদ নহে। যাহা হউক, উহা হইতে একটা কথা বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, যে, তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট কেবল ভূতপূর্ব্ব তুরস্ক-সুল্‌তানকে খলিফার পদ হইতে বরখাস্ত করেন নাই, খলিফার পদটাই উঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় ও অন্যান্যদেশীয় মুসলমানদের ক্ষুব্ধ হইবারই কথা। কারণ, খলিফা মুসলমানদের ধর্ম্মনেতা, এবং তাঁহাদের তীর্থস্থানসকল রক্ষা করা ও তথায় নিরাপদে তীর্থদর্শনাদি অর্থাৎ হজ্ করিতে মুসলমানদিগকে সমর্থ করা তাঁহার কাজ ছিল।

ভূতপূর্ব্ব খলিফাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে তুরস্ক হইতে বহিষ্কৃত করিবার কারণ বুঝা কঠিন নহে। তুরস্কে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার দ্বারা আগেকার সুল্‌তান-খলিফা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব লোপে তাঁহার ও তাঁহার বংশের ও দলের সকল লোকের আনন্দ হইয়াছে, মনে করিবার কারণ নাই; বরং দুঃখ ও ক্রোধ হইবারই কথা। সেই কারণে, তিনি বা তাঁহার বংশের বা দলের কেহ কখন ষড়যন্ত্র করিয়া রাজতন্ত্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন না, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; অন্ততঃ তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ দেশে থাকিতে এ বিষয়ে সর্ব্বদাই সাধারণতন্ত্রের কর্ম্মীদের মনে সন্দেহ থাকিবে। এরূপ সন্দেহ যে অমূলক নহে, তাহা প্রমাণ এই, যে, ভূতপূর্ব্ব সুল্‌তান-খলিফাকে সুইস্ গবর্ণ-মেণ্ট্ তাঁহাদের দেশে থাকিতে এই সর্ত্তে অনুমতি দিয়াছেন, যে, তিনি কোনপ্রকার রাজনীতির সহিত জড়িত থাকিবেন না; তা ছাড়া, তিনি যে হোটেলে আছেন, তাহাতে তুর্ক রাজকীয় পতাকা উড়ান হইয়াছে (এবং তুরস্ক সাধারণতন্ত্র তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন)। তাহাতেও বুঝা যাইতেছে, যে, তিনি এখনও আপনাকে সুল্‌তান ও খলিফা মনে করেন। অতএব বুঝা গেল, নিঃসন্দেহ হইবার জন্য, ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা লোপ করিবার জন্য এবং সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব সুল্‌তান-খলিফাকে পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত করা হইয়াছে।

অনেক দেশে রাজতন্ত্র লুপ্ত ও সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা ও রাজবংশের অনেকে নিহত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও রুশিয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছিল। চীনদেশে তাহা হয় নাই, তুরস্কেও তাহা হয় নাই। এ বিষয়ে অখৃষ্টিয়ান্ ও "অসভ্য" তুর্কেরা খৃষ্টিয়ান্ ও সভ্য অনেক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা মানুষের মত ব্যবহার করিয়াছে; তাহারা তাহাদের ভূতপূর্ব্ব রাজাকে কেবল পদচ্যুত ও বহিষ্কৃত করিয়াছে।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে, ভূতপূর্ব্ব সুল্‌তান-

খলিফাকে, তিনি আগে রাজা ছিলেন বলিয়া, পদচ্যুত করিবার কারণ বুঝা গেল, কিন্তু রাজবংশের নহেন এমন কোন ধার্ম্মিক মুসলমানকে তুর্কেরা কেন খলিফা নির্ব্বাচন করিলেন না। ইহার কারণ আমরা অমুসলমান হইলেও কতকটা অনুমান করিতে পারি। খিলাফৎ সম্বন্ধে মুসলমানেরা আগে আগে যাহা বলিয়াছেন ও এখনও বলিতেছেন, তাহাতে এই ধারণা হয়, যে, খলিফা কেবল ধর্ম্মনেতা হইলে চলিবে না, মুসলমান তীর্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য তাঁহার পার্থিব ক্ষমতা সৈন্যদল ধনসম্পত্তিও থাকা দরকার। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের এলাকায় এইরূপ পার্থিবশক্তিশালী কাহারও অস্তিত্বের সহিত গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না। এইরূপ শক্তিশালী ব্যক্তির শক্তির সীমা নির্দ্দেশও কঠিন, এবং তিনি যে ঐ শক্তি বাড়াইয়া সাধারণতন্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিবেন না ও পারিবেন না, সে বিষয়েই বা কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? মানুষের মনের উপর ধর্ম্মের প্রভাব খুব বেশী। ধর্ম্মনেতা খলিফা পার্থিব উদ্দেশ্যে বহু অনুচর পাইবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে।

ইহা গেল আমাদের অনুমান।

তুর্ক দেশপতি মুস্তাফা কমাল পাশা যে টেলিগ্রাম ভারতীয় মুসলমানদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ইহা অপেক্ষা গভীর ও নিগূঢ় কথা বলিয়াছেন। তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি কি না জানি না, কিন্তু যাহা বুঝিয়াছি বলিতেছি। তিনি বলেন, খিলাফৎ মানেই গবর্ণ্‌মেণ্ট্ বা রাষ্ট্র; তুরস্কের গবর্ণ্‌মেণ্ট্ ও রাষ্ট্র এখন সাধারণতন্ত্র। সুতরাং তদ্ভিন্ন আবার একটি খিলাফৎ পদের প্রয়োজন কি? তুরস্ক-সাধারণতন্ত্রের মধ্যে আলাদা একটি খিলাফৎ পদ থাকায় তাহা তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল। এই কারণে খলিফার পদই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তা ছাড়া তিনি আরো বলিয়াছেন, যে, মুসলমানেরা খলিফাকে জগদ্ব্যাপী একটি মুসলমান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা নেতা মনে করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এই জগদ্ব্যাপী মস্‌লেম্ রাষ্ট্র বা গবর্ণ্‌মেণ্ট্ কখন বাস্তবে পরিণত হয় নাই; বরং ইহা মুসলমানদের মধ্যে অনেক ঝগড়া দ্বন্দ্ব ও কপটাচরণের কারণ হইয়াছে। অন্যদিকে, এই নীতিই কার্য্যতঃ গৃহীত ও অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, যে, প্রকৃত লোকহিতার্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশের সামাজিক লোকসংঘ বা লোকসমষ্টি আপনাদিগকে এক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ও গবর্ণ্‌মেণ্টে পরিণত করিতে অধিকারী। তিনি আরও বলেন, ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান দেশের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও প্রকৃত বন্ধনরজ্জু, কোরান্ শরিফের "ইন্না মুল্ মোমিনুন্ ইখ্‌ৱা" এই বচনের অর্থেই নিহিত রহিয়াছে।

তুরস্কে খিলাফৎ উঠাইয়া দেওয়ায় মৌলানা শৌকৎ আলী যে কুফলের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা ইতিমধ্যেই কিয়ৎ পরিমাণে দেখা দিয়াছে। হেজাজ, ইরাক্ ও ট্রান্স্‌জোর্দানিয়ার মুসলমানেরা হেজাজের রাজা হোসেন্‌কে খলিফার পদ প্রদান করিতে চাওয়ায় তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। রয়টারের তারে দেখা গেল, যে, প্যালেষ্টাইনের এক শত জন প্রতিনিধি ঐ দেশের মুসলমানদের পক্ষ হইতে তাঁহাকেই খিলাফৎ প্রদানেচ্ছু। এইসকলের মধ্যে কতটা ব্রিটিশ চা'ল আছে, বলা যায় না। কারণ, রাজা হোসেন্ ব্রিটিশ প্রভাবাধীন। মিশরের লোকেরা তাহাদের দেশে খিলাফতের অধিষ্ঠানভূমি হয়, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া কাগজে দেখা গেল। এমন কথাও বাহির হইয়াছে, যে, মরক্কো তুরস্ক-খিলাফতের প্রভাবাধীন কখন ছিল না। কেহ কেহ হায়দরাবাদের নিজামকে খলিফা করিবার অসঙ্গত প্রস্তাব তুলিয়াছেন। মুসলমান বক্তা ও লেখকদের কথা হইতে আমরা এই বুঝিয়াছি, যে, যে স্বাধীন রাজা বা ব্যক্তির মস্‌লেম্ তীর্থস্থানগুলি রক্ষার শক্তি নাই, তিনি খলিফা হইতে পারেন না। ভারতবর্ষের কোন মুসলমান নৃপতি স্বাধীন নহেন, এবং আরব প্যালেষ্টাইন্ বা অন্য বিদেশে তাঁহাদের কোন ক্ষমতা নাই।

ভারতীয় মুসলমানেরা তুরস্কের মুসলমানদের প্রতি সর্ব্বদাই দরদ দেখাইয়া আসিতেছেন, এবং তাঁহাদের অনেক টাকাও তুরস্কে গিয়াছে। কিন্তু তুরস্ক টাকা লওয়া ছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের কোন খাতির করিয়াছেন, বা তাঁহাদের মতের ও মনের ভাবের প্রতি কার্য্যতঃ কোন শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহার একটা কারণ, নব্য তুর্কেরা গোঁড়া মুসলমান নহেন, এবং তাঁহারা অনেকে নিখিল-তুরানীয় প্রচেষ্টার (Pan-Turanian Movementএর) সমর্থক। এই প্রচেষ্টার মূলীভূত একটি নীতি এই, যে, তুর্কেরা তুরানীয়, অতএব তাহাদের সভ্যতার বিকাশ আরবীয় ও পারসীক সভ্যতার প্রভাব হইতে নির্মুক্তভাবে হওয়া উচিত।

সমগ্র মুসলমান জগৎ যাঁহাকে খলিফা বলিয়া মানিবেন, ভবিষ্যতে এমন কোন ব্যক্তি খলিফা হইবেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু সেরূপ খলিফা নির্ব্বাচন করিতে হইলে সকল মুসলমানপ্রধান দেশ ও প্রদেশ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া একটি কংগ্রেসে বিষয়টির আলোচনা ও মীমাংসা করিতে হইবে।

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ করিবার নিমিত্ত এবার বাংলা-গবর্ণ্মেণ্ট্ এক লাখ টাকা খরচ করিবেন। মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া টাকা খরচ হয়, ইহা আমরা চাই। কিন্তু কিভাবে খরচ হইলে সুফল হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, আমরা স্বতন্ত্র কলেজের সমর্থন করি না। তাহার কারণ অনেক।

একটা প্রধান কথা এই, যে, যে সব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদিগকে এক দেশে বাস করিয়া একত্র কাজ করিতে হইবে, তাহাদের শিক্ষা একত্র হওয়া দরকার। তাহা হইলে ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের বালক ও যুবকদের মধ্যে পরস্পরের সদ্‌গুণ দেখিয়া ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জন্মিবে এবং তাহা জীবনব্যাপী হইবে। তাহা ভিন্ন প্রকৃত জাতীয় মিলন ও ঐক্য অসম্ভব। আমরা নিজে মুসলমান বন্ধুর অভাব খুব অনুভব করি।

মানুষ কেবল নিজের দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে সংকীর্ণমনা ও কূপমণ্ডূক হয়। তাহা নিবারণের জন্য অসাম্প্রদায়িক শিক্ষানিকেতন প্রয়োজন। এইরূপ শিক্ষা-নিকেতনে শিক্ষা পাইলে মানুষের স্বভাবের কোণা-গোঁচাগুলা মোলায়েম হইয়া মানুষ সামাজিক সভ্য জীব হইতে সমর্থ হয়।

যেসব শিক্ষালয়ে সর্ব্বসম্প্রদায়ের ছাত্র পড়ে, তাহাতে যত প্রতিভাশালী ছাত্র আসে, কেবল এক সম্প্রদায়ের ছাত্র পড়িলে তত আসে না। প্রতিভাশালী ছাত্রদের সংসর্গ ও প্রতিযোগিতা অন্য ছাত্রদের পক্ষে উপকারী। ব্যায়াম ক্রীড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সকল সম্প্রদায়ের মিলন ও প্রতিযোগিতা এইপ্রকারে হিতকর।

২।১ লাখ টাকা খরচ করিয়া ভাল কলেজ হইতে পারে না। উহার লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও সরঞ্জাম, অধ্যাপকগণ, ক্রীড়াক্ষেত্র, প্রভৃতি অন্য সব উৎকৃষ্ট কলেজের সমান হইতেই পারে না; বরং নিকৃষ্ট হইবারই সম্ভাবনা।

যদি এরূপ হইত, যে বর্ত্তমান কলেজগুলিতে মুসলমান ছাত্র ধরিতেছে না, তাহা হইলে নূতন কলেজের প্রয়োজন বুঝা যাইত। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক কোন কোন কলেজে যতগুলি মুসলমান ছাত্র লইবার ব্যবস্থা আছে, সব বৎসর তাহাও পাওয়া যায় না। অনেক কলেজে আরবী ফারসী পড়াইবার বন্দোবস্তও আছে।

এইরূপ নানা কারণে আমরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক কলেজের বিরোধী। কলিকাতা মাদ্রাসা ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নূতন আর-একটি সাম্প্রদায়িক কলেজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হওয়া যায় না।

তার চেয়ে যদি মুসলমান ছাত্রদিগকে বর্ত্তমান কলেজগুলিতেই পড়িবার জন্য দুই এক লাখ টাকার বৃত্তি দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহাতে ফল ভাল হইত।

মুসলমান ছাত্রেরা অবশ্য মুসলমান অধ্যাপকের নিকট পড়িতে চান। কিন্তু বিদ্বান্ মুসলমানরা চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান কলেজসকলেও অধ্যাপক হইতে পারেন। পক্ষান্তরে, নূতন মুসলমান কলেজ যেসকল বিষয়ে যথেষ্ট-সংখ্যক মুসলমান অধ্যাপক পাইবেন বা নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া দরকার।

—

মাৎস্যন্যায়

দেশে অরাজকতা অসম্ভবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে গ্রামে ২।১ জন অর্থশালী লোক বাস করে, সেখানেই চুরি কিম্বা ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ডাকাতি করা এত সহজ হইয়া উঠিয়াছে, যে, দুই-এক স্থলে দিনে-দ্বিপ্রহরেও ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। একই দল একরাত্রে কখন কখন একগ্রামে একাধিক বাড়ীতে, অথবা ভিন্ন-ভিন্ন নিকটবর্ত্তী গ্রামে, ডাকাতি করিতেছে। নিরস্ত্র পল্লীবাসীগণ মুহ্যমান মেষযূথের ন্যায় বিনিদ্র নিশি-যাপন করিতেছে।

সাধারণতঃ পল্লীগ্রামের অনেক লোক জীবিকা অর্জ্জনের জন্য বিদেশে বাস করে, বাড়ীতে কয়েকটি স্ত্রীলোক থাকে মাত্র। বলা বাহুল্য, তাহাদের রক্ষক থাকে না। সাহা, বণিক্, গোপ, বারুজীবী প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ অধুনা পল্লীজীবনের মেরুদণ্ড, কারণ তাহারা বিদেশে যায় না ও নগরে বাস করে না। ইহারা অতি নিরীহ, মাইল্ড্ হিন্দুর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধনী মুসলমানগণ প্রায়ই গ্রামে বাস করে না। সুতরাং বেশীর ভাগ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক ও ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীদিগকে চুরি-ডাকাতির প্রকোপ সহ্য করিতে হয়। গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী মহকুমায় প্রায়ই টাকা আদান-প্রদানের এবং অলঙ্কারপত্র গচ্ছিত রাখার জন্য কোন ব্যাঙ্ক্ নাই। থাকিলেও দেশের লোক ঈদৃশ উপায়ে তাহাদের টাকা ও মূল্যবান্ দ্রব্যাদি জমা রাখিতে অভ্যস্ত নহে। শিক্ষার অভাবে, এজন্য যে হিসাবপত্র রাখিতে ও লেখা-পড়া করিতে হয়, গ্রাম্য ধনী মহাজন ও ব্যবসায়িকগণের পক্ষে তাহা কষ্টসাধ্য।

উচ্চ পুলিশ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা বলেন, অধিকাংশ ডাকাতিদলের নেতা শিক্ষিত ভদ্র যুবক। অবশ্য নিম্নশ্রেণীর গ্রাম্য লোক, চুরিডাকাতি যাহাদের পেশা, এইসব দলে আছে। এই

যুবকগণই তাহাদিগকে বুদ্ধি পরামর্শ দেয়, আধুনিক অস্ত্র জোগায়, নিয়মপ্রণালী গঠন করে, দলবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সহিত নিজেদের নেতৃত্বাধীনে কাজ করিতে শিখায়। মোটের উপর ভদ্র যুবকগণই ইহাদের মস্তিষ্কস্বরূপ, তাহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা কার্য্যকুশলতা ও সংবাদ-সংগ্রহপটুতার গুণে নিরক্ষর পেশাদার গ্রাম্য ডাকাতগণ দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মফঃস্বলের মুষ্টিমেয় পুলিশ কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। গ্রামের লোকের নিকট, ভীরুতা প্রযুক্তই হউক আর অস্ত্রাভাববশতঃই হউক, আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না। এইসকল "ভদ্র" ডাকাতদের অধিকাংশই পুলিশের সুপরিচিত, কিন্তু আদালতগ্রাহ্য প্রমাণাভাবে তাহাদিগকে চালান দেওয়া যায় না। সন্দেহমূলে হাজতে রাখিয়া হয়রান্ করা ও ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া চলে না, কারণ তাহা আইনের নীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং এক্ষেত্রে পুলিশ একরকম নিরুপায় বলিলেই হয়। ইহাই পুলিশ পক্ষের ওজুহাত।

যদিও ডাকাতির নেতাগণ কেহ কেহ পূর্ব্বে 'স্বদেশী' দলভুক্ত ছিল, এখন তাহারা অধিকাংশ পেশাদার ডাকাত। ধোপা নাপিত প্রভৃতি গ্রাম্য লোক, যাহাদের সর্ব্বত্র অন্দরে বাহিরে গতিবিধি আছে, তাহারাই নাকি গোয়েন্দা ও গুপ্তচর। দারিদ্র্যই এসকল ডাকাতির প্রধান কারণ। বি-এ পাশ যুবকও যখন দশ টাকা বেতনে চাকরী পায় না, তখন একরাত্রির লুণ্ঠনলব্ধ উপার্জ্জনে বৎসরের খোরাকী সংগ্রহ করার প্রলোভন সম্বরণ করা সময় সময় তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রামে চোরাই মালের রক্ষক অনেকেই ভদ্রলোক। অন্ততঃ অনেক পুলিশ কর্ম্মচারীর এইরূপ ধারণা।

অর্থশালী ভদ্রলোকগণ ম্যালেরিয়া জলকষ্ট প্রভৃতির হাত এড়াইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই শহরবাসী হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে দুচারিজন পল্লীগ্রামের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া পাড়াগাঁয়ে থাকিতেন, তাঁহারাও অতঃপর গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ভদ্রলোক অভাবে গ্রামগুলি অরণ্যে পরিণত হওয়ার বেশী বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার গ্রামে চল (Back to the villages), আবার আমাদিগকে শহর ছাড়িয়া পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাইতে হইবে, স্বদেশপ্রেমিকদিগের মুখে একথা অনেক সময় শুনা যায়। কিন্তু দুর্ব্বলতা দুঃখের হেতু (to be weak is miserable); দুর্ব্বলের কোথাও শান্তি নাই। গ্রামে তাহার স্থান নাই, শহরের কঠোর জীবনসংগ্রামে তাহার আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকাও কঠিন। অতিষ্ঠ হইয়া লোকে কি করিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, অসন্তোষের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিরীহ গ্রামবাসীগণ ভাবিতেছে, উপায় কি?

বস্তুতঃ বর্গীর হাঙ্গামায়, অথবা 'আনন্দমঠে' বর্ণিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোকক্ষয়ের পর, দেশে যেরূপ অরাজকতা দেখা দিয়াছিল, এখন সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গবর্ণমেণ্ট ডাকাতির সাপ্তাহিক বিবরণী প্রকাশ করেন, এবং রাজনৈতিকগন্ধবিশিষ্ট ডাকাতিগুলির আস্কারা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। কিন্তু ঐরূপ ডাকাতি সংখ্যায় অত্যল্প, এবং সাধারণ ডাকাতির ন্যায় এতটা নৈতিক অবনতির পরিচায়ক নহে। অথচ যে মাৎস্যন্যায়ে গ্রামগুলি ভদ্রলোকশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, তৎপ্রতি কর্তৃপক্ষের বিশেষ লক্ষ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কেবল দেশের লোকের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না। গ্রামালোকে ডাকাত ধরা সম্পর্কে পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করে না, একথা বলা সহজ কিন্তু লোকের ধারণা এই যে গ্রাম্য যুবকগণ আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করিয়া লাঠিখেলার আখড়া স্থাপন করিলে তাহাদিগকে পুলিশের নজরবন্দী হইতে হয়।

দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত না হইলে পল্লীসমাজ বিধ্বস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ভদ্র যুবকদের অন্নকষ্ট (economic distress) কথঞ্চিৎ প্রশমিত না হইলে, বর্ত্তমান স্কুলকলেজের শিক্ষা তাহাদের সকলকে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি রাতারাতি বড়মানুষ হওয়ার প্রায়শঃ নিরাপদ সুযোগ হইতে দীর্ঘকাল নিবৃত্ত রাখিতে পারিবে না। কথা আছে, 'বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপং, ক্ষীণা জনাঃ নিষ্করুণাঃ ভবন্তি'। অবশ্য অল্পসংখ্যক ভদ্র যুবকই সম্ভবতঃ ঈদৃশ জঘন্য নৃশংস পাপে লিপ্ত, কিন্তু ইহাদের এই নৈতিক অধোগতির বিষ সমাজশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে বেশীদিন লাগে না। কারণ ইহাদেরই আত্মীয়স্বজন দ্বারা পল্লীর ভদ্রসমাজ গঠিত। গ্রাম্য লোকের যেরূপ ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যে, সর্ব্ববিধ বৈধ উপায়ে অরাজকতা দমনের জন্য তাহাদিগকে রাজশক্তির সহায়তা করা কর্ত্তব্য, কর্তৃপক্ষেরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, আইন ও শৃঙ্খলার (Law and Orderএর) যে দোহাই দিয়া সর্ব্ববিধ অত্যাচার-উৎপীড়নের সমর্থন করা হয়, তাহার আসল উদ্দেশ্য কয়েকটি রাজনৈতিক অপরাধীর দণ্ড নয়, দেশের চুরি ডাকাতি ও অন্যান্য সাধারণ অপরাধ নিবারণ, এবং দারিদ্র্যনিবারণের উপায় উদ্ভাবন দ্বারা প্রজাবর্গের শ্রীবৃদ্ধি সাধন, যেন তাহারা অন্নচিন্তার কবল হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ জাতীয় হিতকর অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিতে পারে।